প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

২৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৩২

১ম সংখ্যা

চিঠি*

[পোস্টমার্ক—বড়বাজার
১৯ অক্টোবর ১৯০৯]

বরেষু

তোমার রাখী সাদরে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করলুম।

ছবির নূতন প্রুফ আত্মীয়বর্গ পছন্দ করেছেন। লাল আজ যাচ্ছেন—বোধ হয় তোমার সঙ্গে খুব একটা ঝগড়া ক'রে নেবেন।

আমার বরোদায় নিমন্ত্রণ আছে। যাব কি না হ।

বাংলার উপর দিয়ে মস্ত একটা ঝড় গেছে। এখনো খবর পাইনি। আমাদের চাষাদের ধান যদি কাত থাকে তবে আমাদেরও সেই সঙ্গে ভূমিসাৎ হ'তে

শিশু বের হয়নি ব'লে অনেকের নিকট হ'তে লাঞ্ছনা ন্না যাচ্ছে। অত আগে থাকৃতে ঘোষণা করলে কেন? রিগের কাছে সত্য রক্ষা না করলে তাদের শ্রদ্ধা বে।

কোথাও পালাতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু পথ পাচ্ছিনে—পাথেয়রও অভাব। ঈশ্বর যদি ডানা দিতেন তা হ'লে রেলোয়ে কোম্পানি ছাড়া আর সকলেরই সুবিধা হ'ত। ডানা যদি না দিলেন তা হ'লে মনটাকে অচল করলে কোনো নালিশের কারণ থাকৃত না।

ইতি ২রা কার্ত্তিক, ১৩১৬।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—বোলপুর
৪ নভেম্বর ১৯০৯]

সুহৃদবরেষু

তোমাকেই চিঠি লিখ্‌ব ব'লে স্থির ছিল, এমন সময় মণিলালকে প্রবাসী সংকলনের জন্যে একটা চিঠি লেখা জরুরি হ'য়ে উঠ্‌ল, তাই নিতান্ত অলসপ্রকৃতি-বশত সব কথা একচিঠিতে লিখে শ্রমলাঘবের কৌশল উদ্ভাবন করেছিলুম। এম্‌নি ক'রেই মানুষ অপরাধের সৃষ্টি করে এবং সেটিকে লাঘব করবার জন্যে এত ফন্দী করে

---

* এই চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন।

সেইটেকেই দশগুণ বাড়িয়ে তোলে। তোমাকেই লেখা আমার কর্ত্তব্য ছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই—তুমি মনে যে বেদনা পেয়েছ বিধাতা সেইটেকেই আমার সকলের চেয়ে গুরুদণ্ডস্বরূপ বিধান করেছেন—আমি অত্যন্ত অনুতাপ ভোগ করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।

গানের বই সংশোধন করা যদি সম্ভব হয় তা হ'লে ভালোই হয়—এজন্যে যতগুলি পারি নূতন গান তোমাকে পাঠানো যাবে।

কিন্তু দোহাই তোমার, তুমি আমার কোনো কথায় উত্তেজিত হ'য়ে নিজেদের কোনো ক্ষতির কারণ ঘটিয়ো না। তা হ'লে সেটাও আমাকে দণ্ড দেওয়া হবে। গোরা তোমরা সময়-মত এবং সুচারুরূপে ছাপিয়ে দিলেই আমার কোনো ক্ষোভ থাকবে না। আমার মনে এই ছিল যে, ধীরে ধীরে ছাপালে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল থাকবার আশঙ্কা থাকবে না, সেইজন্যেই তাগিদ দিয়েছি। নিজের বই সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বভাবতই অধীর ও অসহিষ্ণু—প্রকাশক হ'য়ে আজও যদি সেটা সহ্য করবার শক্তি তোমার না হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তোমার কি দশা হবে আমি তাই ভাবছি। চিত্তকে পর্ব্বতের মতো কঠিন করতে না পারলে গ্রন্থকার-সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গের আঘাতে তুমি টিঁকতে পারবে না। আমার কথায় বিচলিত হোয়ো না—আমি তোমার উপরে রাগ ক'রে একেবারে আগুন হ'য়ে থাকব আমার এমন রুদ্রতা তুমি কল্পনা কোরো না। এই পবিত্র কাগজখণ্ডে পবিত্র কালী দিয়ে আমি স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিচ্ছি তোমার উপরে আমার শিকি পয়সার রাগ নেই। বিশেষত তুমি ভ্রমক্রমে একটা গলদ ক'রে ফেলেছ, সেটাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট দণ্ড, তার উপরে এই সুযোগে আমি যদি তোমার প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে দাঁড়াই তা হ'লে ঈশ্বর আমাকেই বা ক্ষমা করবেন কেন? তোমার দুঃখে তুমি আমাকে ব্যথিত ব'লেই জেনো, ক্রুদ্ধ ব'লে মনে কোরো না।

যদি মণিলালকে ছাপতে দেওয়ায় কোনো সুবিধা থাকে তা হ'লেই দিয়ো, নতুবা যদি বিরক্ত হ'য়ে দাও তা হ'লে আমার প্রতি নির্দ্দয়তা করা হবে—কখনো তা কোরো না। দেখ, এইসমস্ত বই-ছাপানো প্রভৃতি যে জঞ্জাল নিয়ে এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেওয়া গেল তা আর বেশী দিন পর্য্যন্ত চলবে না—এইজন্যেই যা লিখেছি তা যথাসম্ভব নির্ভুল ক'রে ছাপিয়ে দিয়ে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন ব্যগ্র হয়েছে। যখন দ্বিতীয় সংস্করণ হবে তখন আমারও দ্বিতীয় সংস্করণের সময় হবে। ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল যদি ছাপিয়ে যাই তা হ'লে পাছে আমার প্রেতাত্মা সেই ভুলগুলোতে জড়িয়ে প'ড়ে দিনরাত্রি ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হৌসকে ঘিরে ঘিরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফেলে বেড়ায় এই আমার একটা মস্ত ভয় আছে—অতএব ভুল সংশোধন না হ'লে আমার গয়ায় পিণ্ডদান হবে না। কিন্তু, হায়, হায়, কত শত পিণ্ডেরই যে প্রয়োজন হবে!

আমার নমস্কার ও আলিঙ্গন গ্রহণ ক'রে আমাকে ক্ষমা কর। ইতি ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩১৬।

তোমার—

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস থেকে আমি কবীন্দ্রের যে-সব বই প্রকাশ করি তার ছাপা সম্বন্ধে তিনি খুঁত ধ'রে মনে করেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নব-প্রতিষ্ঠিত কান্তিক-প্রেসে ছাপতে দিলে ভালো ছাপা হবে। চারু]

[পোস্টমার্ক—একস্পেরিমেন্টাল পি, ও (শান্তিনিকেতন); ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ বোলপুর]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভালো করতে। প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, এই কারণে প্রবাসীতে আমার কাব্যের গুণগান ঠিক সুশ্রাব্য হবে না। সেজন্যেও না—আসল কথা, অনেক দিন ধ'রে লিখে আসছি, বয়সও কম হয়নি—আর অল্পকাল অপেক্ষা করলেই আমার রচনার সমালোচনার দিন উপস্থিত হবে—আমি যখন রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারে আলো নিবিয়ে স'রে যাব তখন সকলপ্রকার ব্যক্তিগত রাগদ্বেষের বাইরে গিয়ে পড়ব—তখন আমাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে আমার লেখা-

গুলোকে বিচার করতে পারবে। তোমরা আমার লেখার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে যদি চেষ্টা কর তবে একদল লোককে আঘাত দেবে—অথচ সে আঘাত দেবার কোনো দরকার নেই, কেননা আমার কবিতা ত রয়েইছে—যদি ভালো হয় ত ভালোই, যদি ভালো না হয় ত ও আবর্জ্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগবে না—আপনি নিঃশব্দে স'রে যাবে। যতদিন বেঁচে আছি নিজের নাম নিয়ে আর ধুলো ওড়াতে ইচ্ছা করিনে। তোমরা আমার লেখা ভালো বললে আমার ভালো লাগে না এমন কথা বললে মিথ্যা বলা হয়—প্রশংসা শুনলে মনের ভিতরটা বেশ একটু নেচে ওঠে···সেইজন্যেই ঐ নেশাটাকে প্রশ্রয় দিতে কোনোমতে ইচ্ছা হয় না—কারণ, ঐ জিনিষটার মধ্যে অনেকটা আছে যা মিথ্যা—অর্থাৎ সত্যকে জানবার ইচ্ছা নয়, নিজের প্রশংসাবাদ শোনবার ইচ্ছা—সেই ইচ্ছা এ-সম্বন্ধে মিথ্যাকেও কামনা করে, অত্যুক্তিকে ভালোবাসে—নিজের নাম নামক জিনিষ এমনি একটা বিশ্রী জিনিষ। যখন আমার নিজের নাম আর আমার নিজের কানে পৌঁছবে না তখন তোমরা সেটাকে বর্জ্জিয়সেই হোক আর ইংলিশ অক্ষরেই হোক ছাপিয়ো—এখন ওটাকে ঢাকা দিয়ে আড়াল ক'রে রাখ, যথাসম্ভব ওটাকে ভুলতে দাও, ঐটেকে সর্ব্বদা নাড়া দিয়ে চতুর্দ্দিকে বিদ্বেষের বিষ মথিত ক'রে তুলো না।

কাল থেকে জ্বরে পড়েছি। ইতি ২৯শে ভাদ্র ১৩১৭

ত্বদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—শিলাইদা
৩ নভেম্বর ১৯১০]

ওঁ

যবরেষু

আমি এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি বটে, কিন্তু সেটার উপর তোমরা চোখ দিলে চলবে না। নিষটি ছোট নাটক—শারদোৎসবের স্বজাতীয়—আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের অনুরোধে প'ড়ে লিখতে বসেছি। তাকে টুকরো ক'রে তোমাদের কাগজে দিলে কারো ভালো লাগবে না। জিনিষটাও একটু অদ্ভুতরকমের হবে—কেউ বলবে ভালো, কেউ বা বলবে মন্দ, এবং অনেকে হয়ত ভেবেই পাবে না ভালো বলবে কি মন্দ বলবে। মোটের উপর বারো আনা লোক বলবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবিবাবুর সাহিত্যিক শক্তির হ্রাস হচ্ছে। আমি সে-কথা অস্বীকার করিনে—শক্তির রূপান্তর ঘটে—সেই রূপান্তর ঘটবার সজীবতা ঈশ্বর যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে রক্ষা করেন তাহ'লেই শক্তির সার্থকতা ঘটে। যাই হোক্ হঠাৎ যে-জিনিষটাকে ঠিক ধরা যাবে না, তাকে মাসিকে দিলে তার আর দুর্গতির সীমা থাকবে না। তুমি ত দেখেইছ শারদোৎসবটাতে পাঠকদের কি-রকম পীড়া উৎপাদন করেছে।

গোটা-কতক সংকলন জমেছে, ফি'রে গিয়ে দেওয়া যাবে। ইতি বৃহস্পতিবার

তোমার

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
১০ মার্চ্চ ১৯১১]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন আমার বিবাহের সম্বন্ধ কাগজে প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল তখন সেই শুভ সংবাদে আমার বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু নরেন্দ্র সেন মহাশয়ের কাগজে আমি প্রবন্ধ লিখব কি না এ সংবাদে তোমাদের এত কৌতূহল উদ্রেক হ'ল কেন?

এই কাগজের সঙ্গে কোম্পানির কাগজের সম্বন্ধ আছে শুনেছি বটে—কিন্তু ভব-সমুদ্রে এই কোম্পানির কাগজের নৌকোটার উপরে আমি ত আজকাল তেমন ভরসা রাখিনে।

নরেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে গতকল্য অনুরোধ পেয়েছি। আমি সম্মতি দান করিনি। না দেবার প্রধান কারণ

এই যে এত দিন ধ'রে কলমের মুখে অনেক কালী মাখিয়েছি এখন তার কলঙ্ক ক্ষালন ক'রে ভালোমানুষটি হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌ব এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু গবর্মেণ্টের এই কাগজের জয়ঢাকটাকে অবলম্বন ক'রে পলিটিক্‌স্ বাদ দিয়ে অন্যান্য ভালো ভালো প্রয়োজনীয় তথ্য দেশময় প্রচার কর্‌বার সুযোগ অবলম্বন কর্‌লে দোষ কি? কোনো দীনপ্রাণ প্রাইভেট কাগজের দ্বারা ত এ-সুবিধা ঘট্‌তে পারে না। বস্তুত আমাদের বাংলা খবরের কাগজগুলো ত লোকশিক্ষার পক্ষে উপযোগী হচ্ছে না—হ'লেও তার গ্রাহক হওয়া শক্ত হয়। এমন স্থলে এ-রকম কাগজের দ্বারা কাজ পাওয়া যেতে পারে। ইতি ২৬শে ফাল্গুন ১৩১৭

স্বদীয়
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী রবিবারের পর রবিবারে "রাজা" অভিনয়ের নিমন্ত্রণ রইল। ব্যাকরণ লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি।

[পোস্‌ট্‌মার্ক—শিলাইদা
১৬ মে ১৯১১]

ঔঁ

প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ

বাঃ, তুমি ত বেশ লোক! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ কর্‌তে চাও। এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে—এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি কর্‌তে হবে! সম্পাদক হ'লে মানুষের দয়ামায়া একেবারে তিরোহিত হয়, তুমি তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হ'য়ে উঠ্‌ছ।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক্। তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই এবং বড়-দাদার লেখাটাও পাঠানো যাচ্ছে। বড়দাদার লেখা ও প্রুফ্ আমাকে পাঠিয়ো।

কৈ প্রবাসী ত পাইনি। বোলপুরে পাঠিয়েছ বুঝি? এখানে একখানা পাঠিয়ে দিয়ো।

একটা নূতন নাটক লেখ্‌বার চেষ্টায় আছি। দুই-একদিনের মধ্যে সুরু কর্‌ব।

বড়দাদার লেখার দুই কিস্তিই এবার একসঙ্গে ছাপিয়ো।

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবীন্দ্রের জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে ছাপ্‌বার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের খানকয়েক চমৎকার সরস পত্র পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সেগুলিও পরে প্রকাশ করা যাবে। —চারু।]

[পোস্‌ট্‌মার্ক—শিলাইদা
২০ মে ১৯১১]

ঔঁ

শিলাইদা
নদীয়া

প্রিয়বরেষু

আমার জীবনের প্রতি দাবি ক'রে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ, "আপনার জীবনটা চাই।" এর পিছনে যদি কামান বন্দুক বা অন্তত Halliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাক্‌ত, তা হ'লে তোমার যুক্তির প্রবলতা-সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাক্‌ত না—তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাক্‌বে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক্ সম্পূর্ণ বিবেচনা ক'রে এই প্রস্তাবটি করেছ না সম্পাদকীয় দুর্জ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হ'য়ে এ দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্ছ, তা আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে ব'লে কিছু স্থির কর্‌তে পার্‌ছিনে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন; অতএব এ-সম্বন্ধে রামানন্দ-বাবুর মত কি তা না জেনে তোমাদের মাসিকপত্রের black and whiteএ আমার জীবনটার একগালে চুণ ও একগালে কালী লেপন কর্‌তে পার্‌ব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগল্‌ভ

হবার অধিকার লাভ করে, কিন্তু তবুও শাদা চুল ও শ্বেতশ্মশ্রুতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র ক'রে তুল্‌তে পারে না।

মাতা স—কে জানিয়ো যে, উৎসব হ'লে তবে তাঁরা বোলপুরে যাবেন, এ-কথাটা গ্রাহ্যই নয়—তাঁরা গেলেই আমাদের উৎসব হবে এইটেই আসল কথা। অপর মাতা শ—কে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো—তিনি আমাদের আশ্রমে গিয়ে পীড়া ভোগ করেছিলেন সেই দুঃখস্মৃতিই যেন আমাদের স্মরণকে আচ্ছন্ন ক'রে না রাখে।

এইমাত্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ তারকনাথ রায় মহাশয়ের এক তীব্র চিঠি পেলুম। তাতে তোমার প্রতি তিনি সৌহৃদ্য প্রকাশ করেননি। তাঁর "গোরার" সমালোচনাটা "বঙ্গদর্শনে"ই পাঠিয়ে দিয়ো। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস সেটা বেরয়নি দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

ক্ষিতিমোহন বাবু সপরিজনে এখানে আস্‌বেন কথা ছিল—কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পাইনি। তুমি তাঁর কোনো সংবাদ রাখ কি? ইতি ৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তদীয়

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায় আমার ঘনিষ্ঠ প্রিয় বন্ধু; বন্ধু-কলহ শাস্ত্রোক্ত অজা কলহের ন্যায় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়াতেই পরিণত হয়ে থাকে।—চারু।]

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

*

* *

সাধন চক্রবর্ত্তীর শাস্তিতে সমস্ত গ্রাম রোষে ক্ষোভে ভয়ে থম্‌থম্ করছিল। দুর্ব্বলের অবলম্বন নিন্দা কুৎসা ক'রে' যে কেউ মনের ঝাল মিটিয়ে নেবে সে সাহসও কারো হচ্ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে সকলেরই বিচিত্র কল্পনায় অনল ও ধনিষ্ঠা কুৎসার কালীতে কলঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছিল। সকলেরই দুর্দ্দম বাসনা অন্ততঃ ইঙ্গিতেও কথাটাকে প্রকাশ করে' মনটাকে একটু হাল্কা করে' নেয়; কিন্তু যার কাছে বল্‌বে সে যে কোনো সূত্রে সেই কথাটি অনল তথা ধনিষ্ঠার কানে পৌঁছে দেবে না তার বিশ্বাসই বা কি? কেউ কাউকে বিশ্বাস করে' কিছু বল্‌তে পারছিল না বলে' কেউ সহজে নিশ্বাস ফেল্‌তে পারছিল না।

সবচেয়ে রাগ হয়েছিল সাধন চক্রবর্ত্তীর। হবারই কথা। তারা ব্রাহ্মণ; ম্লেচ্ছকে যদি গেলাস-বাটিতে জল খেতে দিতে না পেরে থাকে তাতে তাদের এমন কি অপরাধ হয়েচে যে তার জন্যে তার চাক্‌রী যায়? হলোই বা সে ম্লেচ্ছ ছেলেমানুষ, ম্যানেজারের ভাইঝি; আর জমিদারণীর পোষ্যকন্যা।

সাধন নিজের স্ত্রীর কাছে প্রাণ খুলে যে-সব কথা চাপা-গলায় রোজই আলোচনা কর্‌তে আরম্ভ করেছিল, তার মধ্যে কল্পনা একেবারে উদ্দাম হয়ে তাণ্ডব জুড়ে দিয়েছিল। তারা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল যে, অনলের সুপারিশেই সাধনের চাক্‌রীটুকু এখনো বজায় আছে।

অনল অথবা গৌরীকে দেখ্‌লেই একজন আর-এক-জনের দিকে অর্থভরা দৃষ্টিতে একবার তাকায়, একের চোখ থেকে চাপা হাসি অপরের চোখে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু কেউ একটু টুঁ শব্দও করে না।

সাধনের শাস্তিতে অনল অত্যন্ত কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ করেছিল; কিন্তু সে যে সাধনের চাক্‌রীটি বজায় রাখ্‌তে

পেরেছে, এই আত্মপ্রসাদে তা'র আত্মগ্লানি অনেকখানি চাপা প'ড়ে'ও গিয়েছিল।

ধনিষ্ঠাও রাগের ঝোঁকে জেদের বশে সাধনকে শাস্তি দিয়ে বেশ স্বস্তি অনুভব কর্‌ছিল না; সে কিছু শুন্‌তে না পেলেও অনুমান কর্‌তে পার্‌ছিল যে, তার এই শাসনে গ্রামের আর কেউ না হোক তো অন্ততঃ সাধন সপরিবারে তার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে; এবং সাধনের পক্ষে যে গ্রামে আর একজনও নেই এও তো হ'তে পারে না। কিন্তু তার উপরে বিরক্তির কারণ থাকা সত্ত্বেও কেউ যে তার একটুও নিন্দা কর্‌ছে না এইতেই ধনিষ্ঠার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যদি কেউ ঘুণাক্ষরেও তার নিন্দা কর্‌ত তা হ'লে তার কৃপা ও প্রসাদ পাবার লোভে সে খবর কেউ না কেউ ঠিক তার কানে পৌঁছে দিত; কিন্তু তা যখন আজ পর্য্যন্ত হয়নি তখন ধনিষ্ঠার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, হয় গ্রামসুদ্ধ সকলেই তার নিন্দায় যোগ দিয়েছে, নয়তো কেউই কিছু নিন্দা কর্‌ছে না। সকলেই যদি নিন্দা থেকে বিরত হয়ে থাকে তা হ'লে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারের কারণ নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে দণ্ড পাবার ভয় ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। ধনিষ্ঠার এক-একবার মনে হ'তে লাগল অনলকে অথবা মাধবীকে জিজ্ঞাসা করে, কেউ তার কিছু নিন্দা কর্‌ছে কি না। কিন্তু তার অহঙ্কার তাকে সেই কৌতূহল প্রকাশ কর্‌তে বাধা দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু তার কৌতূহল হয়েছিল বলে'ই তার মন সকলের আচরণ ও বচন-সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিল; সে জান্‌লার খড়্‌খড়ির পাখী তুলে বাইরে পথের উপর দৃষ্টি পেতে বসে' বসে' সকলকে লক্ষ্য কর্‌ত; তার মনে হ'তে লাগল লোকে গৌরীকে দেখ্‌লে হয় বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে, নয় মুখ টিপে হাসে, আর নয় তো তাকে পরিহার করে' তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে' চলে' যায়। কিন্তু ধনিষ্ঠা নিজের মনকে বোঝাতে লাগ্‌ল, তার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে বলে'ই সে নিজের সন্দেহ ও কল্পনাকে অপরের উপর আরোপ কর্‌ছে, বাস্তবিক কারো ব্যবহারে কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ধনিষ্ঠা যখন অপ্রকাশ্য কৌতূহলে ও সন্দেহে দোমনা হয়ে অস্বস্তি অনুভব কর্‌ছিল, তখন একদিন হঠাৎ তার কাছে গ্রামবার্ত্তা মূর্ত্তি ধারণ করে' এসে উপস্থিত হ'ল।

সেই গ্রামে একজন ব্রাহ্মণী বিধবা বাস করে, সে গ্রামের ছেলেবুড়ো, বৌ-ঝি সকলেরই সরকারী জানো-দিদি। সে ঝাড়া চার হাত লম্বা, মোটা-সোটা, আঁটস াঁট, বলিষ্ঠ; মুখখানা তোলো হাঁড়ির মতন, ঠোঁটের উপর দিব্য গোঁফের সমারোহ, চিবুকে স্থানে স্থানে দু-এক গুচ্ছ দাড়িরও চিহ্ন দেদীপ্যমান; তার কণ্ঠস্বর গম্ভীর কর্কশ; মেজাজ কড়া এবং স্পষ্টভাষিণী বলে' গ্রামে তার বিশেষ খ্যাতি আছে ও সেইজন্য সকলেই তাকে বেশ একটু ভয় করে' চলে। তাকে দেখ্‌লেই মনে হয় ভগবান তাকে পুরুষ গড়্‌তে-গড়্‌তে রঙ্গ দেখ্‌বার খেয়ালে তাকে মেয়ে করেছিলেন। তার বয়স যে কত তা তার চেহারা দেখে আন্দাজ করা শক্ত; তার যে-রকম আঁটালো চেহারা,তাতে তাকে পঞ্চাশের বেশী বয়সের মনে করা কঠিন; কিন্তু নিজে সে কখনো বয়সের হিসাব না দিলেও গ্রামের বৃদ্ধতম লোককেও নাম ধ'রে' ডাকে এবং সকলকেই সে হ'তে দেখেছে ও কোলে-পিঠে করে' মানুষ করেছে এমন খবর সে প্রায়ই কারণে-অকারণে ঘোষণা করে' থাকে। তাই সে সকলেরই জানো-দিদি, সম্ভ্রম ও ভয়ের পাত্রী। তার জানো নামটি জানকী অথবা জাহ্নবী বা জানোয়ার কোন্ শব্দের অপভ্রংশ তা শব্দতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় হ'লেও গ্রামের লোক তা নিয়ে কোনো দিন মাথা ঘামায়নি, তারা আচণ্ডাল ও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানো-দিদি বলে'ই নিশ্চিন্ত। জানো-দিদি ব্রাহ্মণ বলে' সকলের পূজনীয়া; সকলের চেয়ে বয়সে বড় বলে' মাননীয়া, স্পষ্টবাদিনী রুক্ষপ্রকৃতি বলে' বিভীষণা। জানো-দিদি বিধবা নিঃসন্তানা নিরাত্মীয়া; লোকে বলে তার হাতে বেশ দু-পয়সা পুঁজি আছে, এবং কতকগুলি শিষ্য-সেবক থাকাতে তার একার খোরাক-পোশাকের জন্য কিছুই ভাব্‌তে হয় না; তার বাড়ীটি নিষ্কর ব্রহ্মত্র জমির উপর, সুতরাং জমিদারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। এইসব কারণে জানো-দিদি ভয় কাকে বলে তা জানে না; সে সকলের কাছে সমান মুখফোঁড় আর বে-পরোয়া, জমিদারকে পর্য্যন্ত সে উচিত কথা শুনিয়ে

দিতে পারে বলে' জোর গলায় স্পর্দ্ধা করে' বেড়ায়। এ-হেন জানো-দিদি কিছুদিন গ্রামে অনুপস্থিত ছিল—শিষ্য-বাড়ী ও তীর্থস্থান পর্য্যটনে বেরিয়েছিল। একদিন বিকালে ধনিষ্ঠা গৌরীকে নিয়ে পড়্‌তে বস্‌বার আয়োজন কর্‌ছে, এমন সময় বিপুল-কলেবরা জানো-দিদির আবির্ভাব হ'লো; প্রয়াগ থেকে সদ্য প্রত্যাগমনের সাক্ষীস্বরূপ তার প্রকাণ্ড মাথাটি নেড়া; মাথায় কাপড় নেই; যেন কোনো পালোয়ান কুস্তির আখ্‌ড়ায় এসে অবতীর্ণ হচ্ছে।

জানো-দিদিকে দূর থেকে আস্‌তে দেখেই ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেল। জানো ধনিষ্ঠাকে প্রথম সম্ভাষণ করে' বল্‌লে—ঐ দূর থেকেই পেন্নাম করো, যে মেলেচ্ছ নিয়ে জপ-জপ কর্‌ছ।

ধনিষ্ঠা জানো-দিদির প্রথম সম্ভাষণেই বুঝ্‌তে পার্‌লে যে জাঁদ্‌রেল জানো-দিদি যুদ্ধার্থিনী হয়েই তার বাড়ীতে শুভাগমন করেছেন। দর্পিতা ধনিষ্ঠার প্রফুল্ল মুখ তৎক্ষণাৎ কঠোর হয়ে উঠ্‌ল, সে গম্ভীরভাবে বল্‌লে—আমি প্রণাম কর্‌তে উঠিনি জানো-দিদি, মাথা কি যার-তার কাছেই নোয়ানো যায়!

এতবড় স্পর্দ্ধার কথা জানো-বামনীর মুখের সাম্‌নে কেউ কখনো বল্‌তে সাহস করেনি, তাই সে এই কায়েতনীর কথা শুনে একেবারে থ হয়ে গেল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ দমে' থাক্‌বার পাত্রী নয়, সে হুতুমথুমো পাখীর মতন গম্ভীর গলায় বলে' উঠ্‌ল—তা তুমি আজ-কাল যে-রকম বিবি সাহেব হয়ে উঠেছ, তাতে তোমার কাছে বেরাম্ভন-কন্যাও যে-সে হবেই তো? সেদিনকের একরত্তি মেয়ে, গাল টিপ্‌লে দুধ বেরোয়, উনি চান জানো-বামনীকে ডিঙিয়ে চল্‌তে! ওলো ছুঁড়ি, তোর শ্বশুরকে আমি হ'তে দেখেছি.........

ধনিষ্ঠা এবার হেসে বল্‌লে—তাতে কি? ঘুঘুডাঙার অশত্থ-গাছটাও ত অনেক-কেলে, অনেককেই ও হ'তে দেখেছে; তা হ'লে ত তাকেও পেন্নাম কর্‌তে হয়।

জানো বলিল—এও তোমার মেম-সাহেবের মতন কথা হলো। আশদ-গাছ হলেন সাক্ষাৎ ভগমান, বিষ্টুর অবতার; তাকে পেন্নাম কর্‌লে উচ্ছন্ন যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে যে! তা বলি নাত-বৌ, এত অহংকার দপ্পহারী সন না। একে ভরা যৌবন, তায় এন্তার টাকা হাতে পড়েছে, ধরাখানাকে শরাখানা ভাব্‌ছ। কিন্তু ভগমান্‌ তো আর সাধন চক্কত্তী নয় যে তোমার চোখ-রাঙানীতে ভয় পাবে! জানো-বামনীই ডরায় না তা দপ্পহারী মধুসূদন ত অনেক দূরের কথা!

সাধন চক্রবর্ত্তীর উল্লেখ শুনে ধনিষ্ঠা কৌতূহলী হয়ে উঠ্‌ল; তার মনে হ'ল এই সব-জান্তা জানোর কাছ থেকে গাঁয়ের অনেক খবর শুন্‌তে পাওয়া যাবে; তাই সে জানোর অভিসম্পাত গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে হেসে বল্‌লে—তা জানো-দিদি, এতদিন পরে তীর্থিধম্ম করে' এলে, সেই-সব কথা বলো শুনি; তা না বাড়ীতে পা দিয়েই গাল-মন্দ দিতে সুরু কর্‌লে। তা আমাকে গাল দিয়ে আর কর্‌বে কি? আমার না স্বামী, না পুত্তুর। বিষয়? সেও তো আমার নয়—যাঁর বিষয় তিনি উইল করে' রেখে গেছেন—আমি যদি পুষ্যিপুত্তুর না নিই, তা হ'লে সমস্ত বিষয় দিয়ে এই গাঁয়ে ছেলেদের কলেজ,মেয়ে-স্কুল,হাঁস্‌পাতাল, অন্নছত্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে; পুষ্যিপুত্তুর আমি নেবো না; যাঁর সম্পত্তি তাঁর ইচ্ছা-অনুসারে খয়রাত কর্‌বার আয়োজন হচ্ছে—তুমি তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব খবরই জানো, এও শুনেছ বোধ হয়।

জানো অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল, আজ তার যাত্রাটা বড় অশুভক্ষণে হয়েছে; সে বার-বার এই একরত্তি মেয়ের কাছে হেরে যাচ্ছে। সে একটু দমা সুরে বল্‌লে—হ্যাঁ তা তো সবই শুনেছি! দান ধ্যান বের্‌তো ধম্মও খুব কর্‌ছ শুন্‌ছি; কিন্তু তার সঙ্গে আবার মেলেচ্ছ ছোঁয়া-নাড়া কর্‌ছ, কেউ যদি তোমার মতন মেলেচ্ছ যজাতে না পার্‌ছে তাকে অপমান কর্‌ছ, এ-সব কি ভালো হচ্ছে ভাই?

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—জানো-দিদি, তোমার তিরস্কার আর উপদেশ তো অল্পক্ষণে শেষ হবে না, তা একটু বস্‌লে হ'ত না?

জানো যখন কথা বলে, তখন মনে হয় সে যেন এক-মুখ খাবার চিবতে-চিবতে কথা বল্‌ছে; সে ভারী গলায় বল্‌লে—তুমি তোমার বাড়ীময় যে মেলেচ্ছ মেড়ে রেখেছ তা বসি কেমন করে' ভাই, আমাদের তো ইহ্‌কাল-পর-কালের ভয় আছে।

ধনিষ্ঠা প্রফুল্লমুখে বল্‌লে—কিন্তু ম্লেচ্ছ-মাড়া বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তো আছ, বস্‌লেই কি যত দোষ? মাধী, জানো-দিদিকে পূজোর ঘর থেকে একখানা আসন এনে বস্‌তে দে।

মাধবী আসন আন্‌তে গেল। ধনিষ্ঠা জানোকে আগ বাড়িয়ে নিয়ে ঠাকুরঘরের দালানে চল্‌ল। মাধবী আসন এনে পেতে দিলে। জানো আসনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এ-আসন সেই মেয়েটা ছোঁয়-টোঁয়নি তো?

ধনিষ্ঠা কিছু বল্‌বার আগেই মাধবী বলে' উঠ্‌ল—না গো না। শুধু কি তোমারই জাতধম্ম আছে, আর সবাই খুইয়ে বসেছে! কোমর বেঁধে যাকে নিন্দে কর্‌তে এসেছ তার দিকে একবার চেয়ে দেখো দেখি—কি ছিরি, কি হয়েছে! বের্‌তো উপোষ আর দিনে-রাতে দশ বার চান কর্‌তে-কর্‌তে যে শরীর পাত কর্‌ছে তাকে নিন্দে কর্‌তে একটু মুখে আট্‌কায় না!

জানো আজকে পদে-পদেই অপ্রতিভ হচ্ছে; তবু সে ভ্রূকুটি করে' বল্‌লে—ওরে বাস্ রে! একেবারে ডান-কুত্তা! মাধী তুই খাসা খোসামোদ কর্‌তে শিখেছিস্।

মাধবী ঝঙ্কার দিয়ে বলে' উঠ্‌ল—এর আর খোসা-মোদ কি? সত্যি কথা বল্‌লে আবার খোসামোদ করা হয় নাকি? গাঁয়ের কোন্ চোখখেকো চোখখাকী মিথ্যে বল্‌বে বলুক দেখি!

মাধবীর কথায় ধনিষ্ঠা লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে গম্ভীর কঠোরস্বরে বল্‌লে—মাধী, তুই এখান থেকে যা।........ জানো-দিদি, তুমি বোসো।

মাধবীর চলে' যাবার কোনো লক্ষণ না দেখে জানো তার দিকে চেয়ে বল্‌লে—বলি ও বড়-মানুষের ঝি, শুধু আমায় বস্‌তে দিলে, তোমার মুনিবকে একটা কিছু বস্‌তে দাও।

. মাধবী মাথা দুলিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বল্‌লে—মুছ! কাকে বস্‌তে দেবো আমার মাথা আর মুণ্ড। শয্যে ত্যাগ করে' বসে' আছেন! বিধবা তো ঢের লোক হয়, কিন্তু......

ধনিষ্ঠা ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে মাধবীর দিকে চেয়ে রূঢ়স্বরে বল্‌লে—মাধী, আমি বল্‌ছি তুই এখান থেকে যা।

মাধবী ধনিষ্ঠার মুখ দেখে আর সেখানে থাক্‌তে সাহস পেলে না, সে প্রস্থান কর্‌লে।

ধনিষ্ঠা জানোর সাম্‌নে মাটিতে বস্‌ল।

জানোর মন ধনিষ্ঠার কৃচ্ছ্রব্রতের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে নরমস্বরে বল্‌লে...তা নাত-বৌ, এত কাণ্ড কর্‌ছ যদি তবে ঐ একটু খুঁত কেন রেখেছ ভাই?

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' মাটিতে আঙুল বুলোতে-বুলোতে বল্‌লে—কি কর্‌বো বলো জানো-দিদি, মেয়েটা মাওড়া, ওকে আমি না দেখ্‌লে শুন্‌লে.........

জানো ধনিষ্ঠার কথা শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা না করে'ই বলে' উঠ্‌ল...তা মেয়েকে দেখ্‌ছ দেখো, কিন্তু মেয়ের জেঠাকে নিয়ে অত মাতামাতি করাটা কি ভালো হচ্ছে? তোমার সকল ব্রতের প্রধান দানের পাত্তর ঐ অনল; তোমার ম্যানেজার ঐ অনল; তোমাকে পড়া-বার ম্যাষ্টার ঐ অনল! ঐ অনল ছোঁড়া ছাড়া কি দেশে আর লোক নেই; মেমের মেয়েটা অনলকে বলে বাবা, আর তোমায় বলে মা...এই বা কেমন ধারা?

জানো ধনিষ্ঠার মুখের ভাব দেখ্‌বার ও বক্তব্য শোন্‌বার জন্যে চুপ কর্‌লে। কিন্তু ধনিষ্ঠা মুখ খুব নীচু করে' নীরবে যেমন বসে' ছিল তেম্‌নি বসে' রইল। তার মুখ গম্ভীর চিন্তাকুল হয়ে উঠেছিল।

ধনিষ্ঠাকে নিরুত্তর নতমুখী দেখে জানো মনে-মনে খুশী হয়ে উঠ্‌ল এই ভেবে যে মুখরা দর্পিতা ধনিষ্ঠাকে সে এইবার কাবু করে' এনেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে...লোকে তোমাদের ভয় করে। একজন জমিদারণী মুনিব, আর-একজন ম্যানে-জার; তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বল্‌তে লোকের সাহসে কুলোয় না। তার পর আবার সাধন চক্কত্তীর অবস্থা দেখে সবাই আরো ভড়্‌কে গেছে। কিন্তু লোকের মুখই যেন বন্ধ কর্‌লে, মন তো আর তোমাদের শাসন মান্‌বে না।......

জানো আবার চুপ কর্‌লে, যদি ধনিষ্ঠা কিছু বলে। ধনিষ্ঠাকে তখনো নিরুত্তর নতমুখী দেখে সে আবার

বলতে লাগ্‌ল—তুমি মেয়েমানুষ, তায় বিধবা, তোমার আবার লেখাপড়া শেখ্‌বারই বা কি দর্‌কার… …

– ধনিষ্ঠা এবার কথা বল্‌লে—জমিদারীর কাগজপত্তর…

জানো ধনিষ্ঠার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—জমিদারীর কাগজ-পত্তর দেখাশোনা সই করা তো রাজকুমারের আমলেও তুমিই করেছ, তখন তো লেখা-পড়া না জানাতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

ধনিষ্ঠা আবার নীরব হয়ে মুখ নত করে' বস্‌ল।

জানো বল্‌তে লাগ্‌ল—লোকে তো বল্‌তে পারে না, কিন্তু সবাই মনে কর্‌ছে, তোমার এইসব বের্‌তো-ফের্‌তো হয়েছে শাগ দিয়ে মাছ ঢাকা……

এইসময় গৌরী সেইখানে ছুটে এসে মা বলে' ধনিষ্ঠাকে ডেকেই জানোকে দেখে থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর পাহারাওয়ালী দাসী ছুটে এসে তাকে ধরে' ফেল্‌লে, যদিও তখন তাকে ধর্‌বার আর কোনো দর্‌কার ছিল না।

ধনিষ্ঠার কানে সেই একাক্ষর ডাকটি এসে পৌঁছতেই তার মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, সে গৌরীর সন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বল্‌লে—ডোণ্ট্‌ কাম্‌ হিয়ার ডার্লিং, হিয়ার্‌'স্‌ এ স্কেয়ার-ক্রো!

গৌরী ভয়ে ভয়ে জানোর দিকে এক-একবার তাকাতে তাকাতে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা, হু ইজ্‌ হি?

ধনিষ্ঠা জানোর দিকে না তাকিয়ে গৌরীকে যেন অন্য কথা বল্‌ছে এম্‌নি ভাবে দেখিয়ে বল্‌লে—ইট ইজ নট হি ডার্লিং, ইট ইজ্‌ শি!

এই কথা বলে'ই কৌতুকভরে ধনিষ্ঠা খিলখিল করে' হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু মার অমন হাসি সত্ত্বেও গৌরী হাস্‌তে পার্‌লে না, তার শিশুমনে প্রশ্ন উঠ্‌তে লাগ্‌ল নেড়া-মাথা বিপুল-বপু ঐ ব্যক্তি কেমন করে' শি হ'তে পারে? তার স্বল্প অভিজ্ঞতায় সে যত স্ত্রীলোক দেখেছে, কারো সঙ্গে তো এর একটুও সাদৃশ্য সে খুঁজে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ছিল না।

গৌরীর ঝি গৌরীকে বল্‌লে—ঠাকুর-ঘরের দালানে আমাদের উঠ্‌তে নেই, চলো আমরা খেলিগে।

গৌরী আড়চোখে জানোকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখান থেকে চলে' গেল।

গৌরীর দাসীর কথা শুনে জানো বুঝ্‌তে পার্‌লে যে গৌরীকে ঠাকুর-দালানে উঠ্‌তে দেওয়া হয় না। সেদিক্‌ থেকে ধনিষ্ঠাকে কিছু বল্‌বার মতন খুঁত না পেয়ে সে বল্‌লে—তুই তো একেবারে মেমের মতন ইংরিজি বল্‌তে শিখেছিস, নাত-বৌ! এইবার নিকে কর্‌লেই হয়।

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় ও রাগে লাল হয়ে উঠ্‌ল, সে আত্মসম্বরণ করে' কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ, শীগ্‌গিরই হবে জানো-দিদি, স্বয়ম্বরা হয়ে বর ঠিক করে' রেখেছি—তোমার নাত-জামাইকে তোমার মনে ধর্‌বে তো?

জানো ঢং করে' বল্‌লে—তা আর মনে ধর্‌বে না ভাই, অমন সোনার চাঁদ নাত-জামাই……

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—বরের নাম তো মুখে আন্‌তে নেই, তবু তোমাকে চুপিচুপি বলি……

জানো মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—সে আর বল্‌তে হবে না ভাই, জানাই আছে……

ধনিষ্ঠা কৌতুকহাস্যে ঝলমল কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—জানা আছে তো নিশ্চয়ই। তাতে আবার তোমার নাম জানো—তুমি জানো না কি? তবু তোমায় বলি—তার নাম যম! এ-নাত-জামাইকে কি মনে ধর্‌বে তোমার?

জানো দুঁদে দজ্জাল হ'লেও তার একটি দুর্ব্বলতা ছিল, সে যমের নাম বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ত না। সে সকলের চেয়ে বয়সে বড় হ'তে চাইত, কিন্তু মর্‌তে চাইত না, সে যেন অমর। তাই সে ধনিষ্ঠার কথায় তেলে-বেগুনে জলে উঠে বল্‌লে—তুই যার নাম কর্‌লি শীগ্‌গির তার বাড়ী যা……

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—স্বয়ম্বরা হয়ে তো বসে' আছি; বর এলেই ঘর-বসত কর্‌তে যাবো। তুমি আমায় বরের বাড়ী রাখ্‌তে যাবে তো?

জানো আসন ছেড়ে, উঠে পড়ে' সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে চেঁচাতে লাগ্‌ল—সেই চুলোর দোরে তোর সাতগুষ্টি যাক, যারা তোর ভালোবাসার তারা তোর সঙ্গে যাক………

আনো চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধনিষ্ঠার মুখ আবার গম্ভীর চিন্তাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সে যেখানে বসে' ছিল সেইখানে বসে'ই রইল।

খানিকক্ষণ পরে মাধবী এসে খবর দিলে—মা, ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠা ভারী গলায় বল্‌লে—তাঁকে বল্‌গে আমার যেতে একটু দেরী হবে।

মাধবী শঙ্কিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ধনিষ্ঠার দিকে চেয়ে চলে' গেল, সে ভাব্‌লে—নিশ্চয় ঐ আনো-বাম্‌নী কিছু বলে' গেছে। আচ্ছা আমি দেখে নেবো মদ্দা মাগী কতবড় দজ্জাল।

মাধবী চলে' যেতেই ধনিষ্ঠা ঠাকুর-ঘরে ঢুকে চোখ বুজে হাত জোড় করে' স্তব্ধ হয়ে বস্‌ল।

[ক্রমশঃ]

প্রাচীন মিশরের দেবতা

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

মিশর দেশ আফ্রিকায়। মিশরের সভ্যতা পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম সভ্যতা—এই সভ্যতার বয়স যে ঠিক কত তাহা এখনও নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। মিশরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী নাইল—প্রাচীন কালে এই নদীর দুই তীরে বহু সহর ছিল, তাহাদের চিহ্ন এখন নানা স্থানে আবিষ্কার হইতেছে। প্রাচীন মিশরের লোকেরা কোনো দিনও নাইল নদীর উৎপত্তি-স্থানের সন্ধান করে নাই। তাহারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একটা বাক্সর মতন কিছু-একটা মনে করিত। এই বাক্সর নীচের দিকে পৃথিবীর অবস্থান ছিল। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ লম্বা এবং পূর্ব্ব পশ্চিম চওড়া দিক্ ছিল। পৃথিবীর উপরে আকাশ সমতলভাবে কিংবা খিলানের মতন ঝুলানো ছিল। দুই দলের দুইপ্রকার মত। এই আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে শক্ত তারে বহুসংখ্যক আলোক ঝুলিয়া থাকিত। দিনে এইসকল আলোক জ্বলিত না, কাজেই আমরা তাহাদের দেখিতে পাইতাম না। এইসকল আলোক নক্ষত্র। আকাশকে তাহার চারিকোণে ঠেকা দিয়া আটকাইয়া রাখা হইত। তবুও মিশরীয়দের ভয় ছিল যে হয়ত কোন্‌দিন ঝড়ে আকাশ হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ে ভাঙিয়া পড়িবে। পৃথিবীর ঠিক মাঝখানেই ছিল মিশর-দেশ। প্রাচীন মিশরীয়দের মতে সূর্য্য ছিল একটা আগুনের চাক্‌তি—ইহা একটা নৌকার উপর রক্ষিত ছিল। এই নৌকা পৃথিবীর দেওয়ালের চারিদিকে ঘুরিত এবং সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ের আড়ালে চলিয়া যাইত বলিয়া পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত হইত। প্রাচীন মিশরীয়দের পৃথিবী এবং সৌর-জগৎ সম্বন্ধে এইপ্রকার নানা অদ্ভুত-অদ্ভুত বিশ্বাস এবং ধারণা ছিল।

এইসময়ে মিশরদেশে যে কতপ্রকার ধর্ম্মের চলন ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রাচীন যে সমস্ত স্তম্ভ এবং প্রস্তরখোদিত মন্দির-আদি এখন মিশরে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের গায়ে হাজার-হাজার দেবতার চিত্র খোদাই করা আছে। এইসকল দেবতা যে কেবল আঁকাই থাকিত, তাহা নহে, অন্তত একজন লোকেরও পূজা প্রত্যেকটি দেবতা পাইত। প্রতি-দেবতার কম করিয়া একটি পূজারী এবং ভক্ত ছিলই। প্রাচীন মিশরে দেবতাদের আতিশয্য দেখিয়া মনে হয় যে যেন সেইসময় মিশরে মানুষ অপেক্ষা দেবতার সংখ্যা অধিকপরিমাণে ছিল এবং এইসমস্ত দেবতাদের বিবিধ অভিলাষ এবং প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার মতন মানুষ এবং অন্যান্য জন্তু ছিল।

মিশরে প্রথম প্রবেশ করিয়াই দেবতাবাহিনী লইয়া বিষম ধন্দে পড়িতে হয়। এক-একজন দেবতার প্রভাব মানুষের জীবনের এক-একটি বিশেষ সময় বা বয়সে—

এই নির্দ্দিষ্ট সময় এবং স্থান ছাড়া সেই বিশেষ দেবতার আর কোনো প্রয়োজন এবং প্রভাব নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও বিশেষ-বিশেষ মুহূর্ত্তে এবং কালে বিশেষ-বিশেষ দেবতার প্রভাব ছিল। প্রত্যেক দেবতাই আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সাধন করিয়া যাইত।

নাপ্‌রিট * (Naprit) নামক দেবতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল গমের পাকা শীষের সঙ্গে। এই দেবতা দেখিতে মানুষের মতনই, কেবল মাথায় দুইটি গম বা যবের শীষ গোঁজা আছে।

মাস্‌খোনিত্‌ (Maskhonit) দেবতা নবশিশুর জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার বিছানা বা দোলনার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত। ইনি স্ত্রী-দেবতা। ইনিও দেখিতে মানবীর মতনই, ইহার মাথায় কচি তাল-পাতা গোঁজা থাকে।

রানিনীত (Raninit) শিশুর নামকরণের এবং লালন-পালন ও শিক্ষাদি-ব্যাপারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। উক্ত দুইজন দেবী যে একইসময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের দরকার-মতন বিরাজ করিত তাহা নহে, ইহাদের ক্রমাগত ছুটিয়া-ছুটিয়া এক স্থান হইতে আর-এক স্থানে গিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইত। একজন দেবীকে প্রসববেদনাগ্রস্তা নারীর বেদনা লাঘব করিয়া ফিরিতে হইত। আর-একজনকে সকল সময় নবাগত শিশুদের জন্য শুভ নাম খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত। প্রত্যেক শিশুরই এমন-একটি করিয়া নাম রাখিতে হইত যে নামের শব্দের জোরে ভবিষ্যতে অনেক অকল্যাণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিত। এই দুইজন দেবীর নিকট হইতে লোকে আর বেশী-কিছুর আশা বা প্রার্থনা করিত না, কারণ তাহারা জানিত যে ইহাদের আর বেশী-কিছু দিবার বা করিবার ক্ষমতা নাই।

Cynocephaliরা (সাইনোসেফালি) দল বাঁধিয়া পূর্ব্ব এবং পশ্চিমদিকের পর্ব্বত-শিখরে ভ্রমণ করিত। ইহাদের একমাত্র কাজ ছিল পৃথিবীতে প্রবেশ করিবার সময় সূর্য্যকে বন্দনা করা। সূর্য্যোদয়ের সময় তাহারা নৃত্য এবং গীত করিয়া সূর্য্যদেবকে পৃথিবীতে প্রতিদিন বরণ করিত। আর-একদল সূর্য্যকে এম্‌নি করিয়া রাত্রির রাজত্বে বরণ করিত। একদল দৈত্যের বিশেষ কাজ ছিল, সূর্য্য আসিবার সময় পৃথিবীর আলোক-তোরণদ্বার খুলিয়া দেওয়া—ইহারা সূর্য্যের পৃথিবী ভ্রমণ করিবার যে নির্দ্দিষ্ট পথ ছিল, তাহাও রক্ষা করিত।

এই দৈত্যগণ দেবতা বলিয়া গণ্য হইত। ইহাদের সকল সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির থাকিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাইতে হইত। নিজের-নিজের স্থান হইতে ইহাদের এক-পাও নড়িবার ক্ষমতা ছিল না। নিজ কর্ত্তব্য করিবার কালের কিছুপূর্ব্বে ছাড়া অন্য-কোনো সময় ইহাদের দেখা যাইত না। কর্ত্তব্যকাজ শেষ হইবামাত্র যে যার স্থানে বসিয়া পড়িত। এই দেবতাদের বিশেষ দেখা পাওয়া যাইত না বলিয়া ইহাদের কোনো ভালো মূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি পাওয়া যায় না। ইহাদের কার্য্যের অনুরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লোকে ইহাদের ছবি আঁকিত বা খোদাই করিত। যেসমস্ত দৈত্য সূর্য্যের পৃথিবী-প্রবেশের-পথে মৃত ব্যক্তিদের বর্শা দ্বারা হত্যা করিয়া বেড়াইত, তাহাদের প্রতিকৃতি তীরধনুকওয়ালা লোকের মতন করিয়া আঁকা হইত। যাহারা মানুষের আত্মাকে কাটিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ছড়াইয়া দিত—তাহাদের ছুরিকা-হস্তে-স্ত্রীলোক বলিয়া কল্পনা করা হইত। ইহাদিগকে নোকিত (Nokit)* বলা হইল। সূর্য্যের পথ-রক্ষক দৈত্য এবং সূর্য্যের ভ্রমণপথ-রক্ষক দেবতাদের কোনো বিশেষ রূপ ছিল না বলিলেও চলে। কাহাকেও মানুষের রূপে দেখা যাইত, কাহাকেও বা কোনো জন্তুর রূপে দেখা যাইত—ষাঁড়, সিংহ, ভেড়া, বাঁদর, সাপ, মাছ, বাজপাখী ইত্যাদি সকলপ্রকার রূপেই এই বিশেষ দেবতাদের দর্শনলাভ ঘটিত। অনেক দেবতা আবার প্রাণহীন দ্রব্য-রূপে বা তাহার মধ্যে বাস করিত। অনেকে মানুষ এবং পশুর সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত রূপ ধরিয়া বাস করিত।

* Naprit কথার অর্থ'ই শস্য-গমকেই বিশেষ ভাবে বলা হয়। (Brugsch, Dict. Hieroglyphique, pp. 752-753)। এই শস্য দেবতার প্রতিকৃতি প্রথম সেটি (Seti I) এর কবরে খোদাই করা আছে।

*Maspero—Etudes de mythologie et d'Archeologie Egyptiennes, vol, ii. pp. 35, প্রথম সেটির কবরের দেওয়ালে নোকিতদের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

মিশরীয়দের নিকট এই মানুষ-পশু সংমিশ্রণজাত বিকট প্রাণী সত্য বলিয়া চলিত ছিল, অবশ্য অন্যান্য দেবতা এবং দৈত্যদের অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা কম ছিল বলিয়াই মনে হয়। আমাদের কাছে এইসমস্ত দেবদেবী এবং দৈত্য-দানাদের কথা মিথ্যা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়দের নিকট এই সমস্ত দেবদেবী প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া চলিত ছিল। শুনা যায়, অনেক শিকারী জঙ্গলে শিকারের খোঁজ করিতে-করিতে বিশেষ বিশেষ দেবতার দেখা পাইত। মেষপালকেরা এইসমস্ত দেবতাদের বিষম ভয় করিত।

মিশরের দেবতা-জাতির মধ্যেও অনেক বিদেশী দেবতা ছিল। মিশরীয়েরাই এইসকল দেবতাদের জাতি-পরিচয় এবং গোষ্ঠী-পরিচয় অবগত ছিল। মিশরীয়েরা জানিত যে হ্যাথর্,. অর্থাৎ দুগ্ধবতী গাভী, অতি পুরাকাল হইতেই তাহার নিজের দেশ পুয়ানিত্ (Puanit) ত্যাগ করিয়া আসিয়া মিশরেই বাস করিতেছে। এই জন্য দুগ্ধবতী গাভীকে বলা হইত—"পুয়ানিতের মহিলা" (The Lady of Puanit)।

হ্যাথরের পিছন-পিছন "বিশু"ও নেকড়ে বাঘের বেশে আসিয়া মিশরে বাসা বাঁধিল এবং হ্যাথরের সঙ্গে-সঙ্গেই মিশরীয়দের পূজায় ভাগ বসাইল। তা'র পর ক্রমে 'বিশু' নেকড়ের চামড়া-পরা মানুষের রূপ ধারণ করিল, কিন্তু তাহার চেহারা অদ্ভুত এবং চরিত্র নেকড়ের মতন ভীষণই রহিয়া গেল। "বিশু" নৃত্য এবং যুদ্ধের বন্ধু-দেবতা বলিয়া গণ্য হইত।

পুরাকালে যে-সব জাতি ফ্যারাওদের দ্বারা বিজিত হইত, তাহারা প্রত্যেকে তাহাদের কয়েকটি করিয়া দেবতা মিশরীয়দের দান করিত। ফ্যারাও এইসব দেবতাগণকে নাইল নদের তীরে স্থাপন করিত। কিন্তু কিছু-কাল পরে এইসমস্ত বিদেশী দেবতা তাহাদের বিজাতীয়তা ত্যাগ করিয়া একেবারে পুরা-মাত্রায় মিশরীয় দেবতায় পরিণত হইত। আকাশ, পৃথিবী, সূর্য্য, নীল-নদ—এই-সবই মিশরীয়দের নিকট প্রাণবান্ ছিল এবং ইহাদের জীবন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ ছিল। সমগ্র মিশরীয় জাতি ইহাদের পূজা করিত এবং ইহাদের শক্তিতে বিশ্বাস করিত। সমগ্র মিশর যখন এইসব দেবতাদের এক ভাবে বিশ্বাস এবং পূজা করিত তখন কোনো-প্রকার গোলমাল ছিল না। সমগ্র মিশরে এইসব দেবতারা একই পরিচয়ে এবং নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু যখন তাহাদের বিশেষভাবে নামকরণ আরম্ভ হইল তখনই গোল বাধিল। এক-এক স্থানের লোকেরা একই দেবতার পরিচয় নাম এবং শক্তি অন্য স্থানের সেই দেবতার নাম এবং পরিচয় অপেক্ষা অন্যপ্রকার করিয়া ফেলিল।

বিদেশী যে-সমস্ত জাতি নাইল-নদের তীরে বসবাস করিয়াছিল, তাহারা যেমন ক্রমশ নিজেদের সকল-প্রকার বিভিন্নতা লোপ করিয়া কালক্রমে মিশরীয়দের সহিত এক-জাতির মতন মিশিয়া গিয়াছিল, সেইরূপ বিদেশাগত দেবতারা নিজেদের বিদেশীয়ত্ব ত্যাগ করিয়া মিশরীয় দেবজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এই দেব-জাতির মধ্যে রাজাপ্রজা উজীর ইত্যাদি নানাবিধ শ্রেণী-বিভাগ করা ছিল। দেবগণের প্রত্যেকেই প্রকৃতির এক-একটি বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যের প্রতিভূ-স্বরূপ ছিল।

এইসমস্ত দেবতারা সকলে মিলিয়া প্রকৃতি এবং পৃথিবী শাসন করিত। আকাশ, বাতাস, নক্ষত্র, সূর্য্য, নীল-নদ ইত্যাদি সবই প্রাণবান্ ছিল, ইহারা সবাই মানুষের মতনই নিশ্বাস ফেলিত এবং চিন্তা করিতে পারিত। ইহারা মিশরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলের নিকটেই পূজা পাইত এবং সকলেই ইহাদের অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসবান্ ছিল।

প্রথমে সকল দেবতাই একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী-রূপেই পূজা পাইত—কিন্তু যখন মিশরীয়েরা, কোন্ দেবতার কি কাজ, কাহার কতখানি শক্তি, কাহার রূপ কি-প্রকার ইত্যাদি সকল বিষয় স্থির করিতে আরম্ভ করিল তখনই দেবতা-জাতির সকলের একইভাবে একইপ্রকার পূজা পাওয়ার দিন চলিয়া গেল। প্রত্যেক সহর, প্রত্যেক প্রদেশ, প্রত্যেক গ্রাম, সকল স্থানের লোকেরাই একই বিশেষ দেবতাকে নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকারে পূজা করিতে লাগিল—একই দেবতাকে বিভিন্নভাবে কল্পনা করিতে লাগিল।

অনেকে আকাশকে "বৃহৎ হোরাস্" (Great

Horus) বলিত। Haroeris ছিলেন 'র' অর্থাৎ সূর্য্য-দেব। উচ্চ মিশরের লোকেরা Haroerisকে তাহার সাথী 'Sit of Ombos'এর সহিত, পূজা করিত। এই শেষোক্ত দেবতা ছিলেন পৃথিবীর প্রতিভূ। এই দুই দেবতাকে প্রায়ই একজন দুই-মাথাওয়ালা-লোকের মূর্ত্তিতে অঙ্কিত বা খোদিত করা হইত। আকাশকেও অনেক সময় Haroeris বলা হইত। এই দেবতা দেখিতে ছিলেন ফোঁটা-ফোঁটা-দাগবিশিষ্ট পালকযুক্ত ছোটো একপ্রকার বাজপক্ষীর মতন। ইনি পৃথিবীর বহু উচ্চে সকল সময় উড়িয়া বেড়াইতেন। ইহার চোখ সকল সময় পৃথিবীর উপর নজর রাখিত। আর-একটি প্রবাদ আকাশ এবং পৃথিবী সম্বন্ধে আছে। আকাশ এবং পৃথিবী বিবাহিত—একজন স্বামী অপর জন স্ত্রী। পৃথিবীর নাম শিবু এবং আকাশের নাম নুইত্ (Nuit)। ইহাদের বিবাহের ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিষের জন্ম হইয়াছে এবং হইবে।

অনেকে আকাশ এবং পৃথিবীর দেবতা দুই-জনকে মানুষের আকারবিশিষ্ট মনে করিত এবং তাহাদের ছবিও আঁকিত দুইজন মানুষের মতনই। এই দুই দেবতার যে প্রাচীন চিত্র পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, আকাশ-দেবের নীচে পৃথিবী-দেবী পড়িয়া আছে। দুইজনেরই মানুষের রূপ। অনেকে শিবু—অর্থাৎ পৃথিবীকে—প্রকাণ্ড-একটি রাজহংস-রূপে কল্পনা করিত। এই রাজহংসের হংসিনীই সূর্য্যরূপ অণ্ড প্রসব করিয়াছিল। এই হংসিনী নাকি এখনও প্রতিদিন এইরূপ একটি করিয়াই সূর্য্য-অণ্ড প্রসব করিয়াই চলিয়াছে। সূর্য্য-অণ্ড প্রসব করিবার পর দেবগণকে এই শুভখবর দিবার জন্য এবং হংসিনীকে অভিনন্দন করিবার জন্য পৃথিবীদেব রাজহংস বিকট-ভাবে চীৎকার করে। এই চীৎকারের জন্য ইহার আর একটি নাম Ngagu oeru অর্থাৎ বিকট প্যাঁক-প্যাঁক-রবকারী পক্ষী (Great Cackler)' *।

আর-একটি বিবরণে পৃথিবীদেবকে প্রকাণ্ড-এক ষাঁড়ের রূপে পাওয়া যায়। এই ষাঁড় পৃথিবীর সকল দেবতা এবং মানুষের পিতা। মাতা—একটি চমৎকার গরু, ইহার বড়-বড় চোখ ছিল। এই গরুর মাথা আকাশমার্গে উঠিত, এবং ইহার শির-দাঁড়া দিয়া পৃথিবী প্লাবনকারী জলের ধারা বহিত। এই গরুর শরীরের তলদেশ অর্থাৎ পেট এবং বক্ষদেশ পৃথিবীর লোকেরা আকাশরূপে দেখিতে পাইত। ইহার চারখানি পা পৃথিবীর বিশেষ চার কোণে দণ্ডায়মান ছিল।

প্রাচীন মিশরীয়দের আকাশের কল্পনার অনুযায়ী গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিষয়ে নানা-প্রকার অদ্ভুত ধারণা ছিল। অ্যাটোনু (Atonu) ছিল একটি আগুনের চাকতির মতন দেখিতে, ইনি জীবন্ত দেবতা ছিলেন এবং ইহার সাহায্যেই সূর্য্যদেব পৃথিবীর লোকদের সাম্নে নিজেকে প্রকাশ করিত। ইহার আর-একটি নাম ছিল রা। সূর্য্যও এই নামে মিশরে পরিচিত ছিল। আকাশ দেবতার ডান চক্ষু ছিল রা অর্থাৎ সূর্য্যদেবতা। মিশরের যে সব স্থানে 'হোরাস' আকাশ-দেবতা বলিয়া পরিচিত ছিল সেই-সব দেশে সকালে হোরাস প্রথম যখন চোখ খুলিত তখন পৃথিবীর লোকের সকাল হইত—এবং সন্ধ্যাবেলায় যখন হোরাস চোখ বন্ধ করিত, তখন হইত রাত্রি।

অনেক স্থানে আকাশকে দেবী বলিয়া মনে করা হইত সেই সব স্থানে রা' অর্থাৎ সূর্য্য ছিল আকাশ-দেবীর পুত্র। রা-এর মা ছিল পৃথিবী। রা প্রতিদিন প্রাতঃকালে নতুন করিয়া জন্মলাভ করিত। সূর্য্যদেব মাথার দুই-পাশে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল লইয়া এবং ঠোঁটের ভিতর আঙুল ভরিয়া দিয়া নবাগত মানবশিশুর মতন পৃথিবীতে আগমন করিতেন।

অনেক স্থলে সূর্য্যকে মানবশিশুর মতনই কল্পনা করা হইয়াছে। জন্ম হইবামাত্র নাপ্রিত এবং মাসখোনিত—এই দুই দেবতা সূর্য্যকে ধাত্রীর মতন হস্তে ধারণ করিত। মাত্র একঘণ্টা কাল অর্থাৎ দিনের প্রথম ঘণ্টা শিশুসূর্য্য এই দেবীদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া দ্বিতীয় ঘণ্টা হইতেই ইহাদের ত্যাগ করিয়া Nuitএর (আকাশের) পেটের তলা দিয়া সজীব হইতে

* Book of the Dead, ch. liv., Naville's Edition, Vol 1. pl., lxvi ; cf. Lepage—Renouf, Seb the Great Cackler.

সজীবতর হইয়া ভ্রমণ করিত। দ্বিপ্রহরে সূর্য্য পূর্ণ-বয়স্ক হইয়া মহাপরাক্রান্ত হইত এবং পৃথিবীর সকল স্থানে নিজের তেজ ছড়াইত। তার পর ক্রমশঃ তাহার বয়স বাড়িতে-বাড়িতে সে বৃদ্ধ হইয়া পড়িত, এবং অবশেষে রাত্রি আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সমস্ত তেজ ফুরাইয়া যাইত এবং বৃদ্ধ সূর্য্য আকাশ-দেবীর মুখের ভিতর দিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িত। পরদিন সকালে তাহার আবার নবজন্ম লাভ হইত।

কুষ্ঠরোগ-সম্বন্ধে দু-চারিটি কথা

কুষ্ঠরোগ আয়ুর্ব্বেদমতে দু-রকমের—গলিত ও ধবল; কিন্তু অ্যালোপাথি-মতে ধবল-কুষ্ঠটা কুষ্ঠ নয়, অন্য-রকমের রোগ; ইহার সহিত গলিত-কুষ্ঠের কোনো সম্বন্ধই নাই। গলিত-কুষ্ঠ সংক্রামক, কিন্তু ধবল মোটেই সংক্রামক নয়। কতকগুলি জীবাণু হইতে গলিত-কুষ্ঠের সৃষ্টি হয়—কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে ধবল-কুষ্ঠ মোটেই জীবাণু-ঘটিত রোগ নয়।

গলিত-কুষ্ঠ গরম দেশেই হয়—শীত-প্রধান দেশে নাই বলিলেই হয়। স্যার্ লিয়োনার্ড রজার্স্ অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের যে-যে জায়গায় বৃষ্টি খুব বেশী হয়, সেইসমস্ত জায়গায় অন্যান্য স্থানের তুলনায় কুষ্ঠ রোগটা বেশী। তাহার কারণ তিনি বলেন যে যেখানে বেশী বৃষ্টি পড়ে সেইসব জায়গায় পোকা মাকড় অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। ঐসকল পোকা-মাকড় কুষ্ঠ-রোগীর ঘা হইতে জীবাণু লইয়া কামড়াইবার সময় সুস্থ লোকের দেহে ঢুকাইয়া দেয়।

কুষ্ঠ-রোগীদের অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে অতি নির্দ্দয় ব্যক্তির প্রাণেও কষ্ট হয়। গরীব লোকের ত কথাই নাই—কোনো অবস্থাপন্ন লোকেরও কুষ্ঠ হইলে তাঁহারও কষ্টের সীমা নাই। কুষ্ঠ-রোগীর সমাজে স্থান নাই—আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সকলেই তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করে ও ত্যাগ করে। তা'র পর আবার হিন্দুশাস্ত্র বলে, পূর্ব্ব-জন্মে গো-হত্যা-ব্রহ্মহত্যা-ধরণের কোনো মহা-পাতকের জন্য লোকে কুষ্ঠগ্রস্ত হয়। অতএব অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগীর উপর ঘৃণাটা কিছু বেশী। কারণ প্রথমতঃ সর্ব্বাঙ্গে ঘা থাকার জন্য ত স্বভাবতই কুষ্ঠরোগী দেখিলেই ঘৃণা জন্মায়, তা'র পর আবার শাস্ত্রমতের জন্য আরও বেশী ঘৃণা হয়। ইহাদের পক্ষে জীবিকা-নির্ব্বাহও স্বাধীনভাবে করা সম্ভব নয়—তা'র পর আবার অন্যান্য রোগের মতন কুষ্ঠরোগের সাধারণ চিকিৎসাতেও কোনো উপকার হয় না। কেহ কুষ্ঠরোগীকে গৃহে আশ্রয় দিতে চান না, পাছে নিজেদের কুষ্ঠগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু কুষ্ঠরোগীর সহিত আট নয় বৎসর কাল একত্রে না থাকিলে কুষ্ঠ অন্যের দেহে সংক্রামিত হয় না।

আমাদের এ-প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য কুষ্ঠ-চিকিৎসা-সম্বন্ধে সাধারণকে দু-চারিটি কথা বলা। কুষ্ঠরোগের ঔষধ বাহির করিবার জন্য অনেক দিন হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা খুব চেষ্টা করিতেছেন—সম্পূর্ণ সফলকাম না হইলেও কতকপরিমাণে হইয়াছেন।

ডাইক্ ও রস্‌চিদ্ বে নামে দুইজন পণ্ডিত কুষ্ঠরোগের জীবাণুর দেহ হইতে একরকম চর্ব্বি-জাতীয় (fatty substance) জিনিষ বাহির করিয়াছেন। এখন কোনো-রকম জীবাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলেও মানুষের রক্তে ঐ জীবাণুগুলিকে বিনষ্ট করিতে পারে, এমন-একটা জিনিষ তৈরি হয়। যে সমস্ত জীবাণু কুষ্ঠরোগের কারণ, তাহাদের দেহে ঐ চর্ব্বিজাতীয় জিনিষটা থা'কবার জন্য

মানুষের রক্তে যে বাধা দিবার জিনিষটা তৈরি হয়, ঐ জিনিষটা কুষ্ঠ-জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে না। তাঁহারা বলেন, কুষ্ঠ-জীবাণুর দেহ হইতে তৈরী চর্ব্বিজাতীয় জিনিষটি ক্রমে-ক্রমে একটু-একটু করিয়া বাড়াইয়া যদি ইন্‌জেক্‌শান্ (Injection hypodermic) দ্বারা কুষ্ঠ-রোগীর দেহের মধ্যে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার রক্তে ঐ চর্ব্বি-জাতীয় জিনিষটাকে নষ্ট করিবার একটা শক্তির বিকাশ হয়। তাহা হইলে মানুষের-রক্তে-তৈরী বাধা দিবার জিনিষটা কুষ্ঠজীবাণুগুলিকে সহজেই ধ্বংস করিতে পারে। কেননা ঐ চর্ব্বি-জাতীয় জিনিষটা—যেটা রক্তে-তৈরী বাধা-দিবার-জিনিষটাকে কুষ্ঠ-জীবাণুর উপর কাজ করিতে দিতেছিল না—সেটা নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা ঐ চর্ব্বিজাতীয় জিনিষটির নাম ন্যাস্টীন-বি (Nastin-B) রাখিয়াছেন। ন্যাস্টীন-বি অনেকগুলি কুষ্ঠরোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, উহা দ্বারা কুষ্ঠরোগ অনেক-পরিমাণে কমানো যায়। আমরাও ন্যাস্টীন-বি ব্যবহার করিয়া অনেক ফল পাইয়াছি—ন্যাস্টীন-বি ব্যবহারে একটি কুষ্ঠরোগীকে সম্পূর্ণভাবে আরাম হইতে দেখিয়াছি। আমরা ন্যাস্টীন-বি ব্যবহারের সঙ্গে-সঙ্গে আণ্ট্রা ভায়োলেট্ (Ultra-Violet) আলোক কুষ্ঠরোগীর ঘায়ের উপর ক্রমাগত কিছুদিন ধরিয়া ফেলিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি।

সূর্য্যের আলোককে যদি কোনো ত্রিকোণাকৃতি কাঁচের (prism) ভিতর দিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সূর্য্যালোক বেগুনী, নীল, লাল, হল্‌দে, সবুজ, ভায়োলেট (Violet) কমলা লেবুর রং (Orange) ও ইণ্ডিগো (Indigo) এই সাত-রকম আলোতে ভাগ হয়। এখন ঐ সাত-রকম আলো ছাড়া আরো কতকগুলি আলোতে সূর্য্যের আলোক ভাগ হয়। কিন্তু ঐ আলোগুলি মানব-চক্ষুর অগোচর। ঐ আলোগুলি ভায়োলেট্ আলোর পাশেই পড়ে। অনেক বৈজ্ঞানিক আণ্ট্রা-ভায়োলেট্ আলোর সাহায্যে এমন অনেক চর্ম্মরোগ সারাইয়াছেন, যাহা বহু চিকিৎসাতেও কিছু হয় নাই। এই আলোকের জীবাণু নষ্ট করিবার শক্তি অসাধারণ।

এখন যদি দরিদ্র কুষ্ঠরোগীগণকে এইভাবে চিকিৎসা করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে। আমরা এই বিষয়টি লইয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছি। ভগবান্ জানেন, কতদূর সফলকাম হইব। পাঠকদিগের নিকট সবিনয় অনুরোধ তাঁহারা যেন গরীব কুষ্ঠরোগীদিগকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন।

শ্রী রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়
১।২।এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট,
বৌবাজার, কলিকাতা।

দৈন্য

শ্রী কালীপদ রায়

ভাগ্যদেবের মহা অভিশাপ কুক্ষণে তব সৃষ্টি,
স্মরণে চিত্ত ভীতি-কম্পিত, শনির করাল দৃষ্টি।
পুষ্পকাননে দাবানল জ্বালি' অন্তরে তব তৃপ্তি,
পূর্ণে করিয়া শূন্য তোমার প্রকাশো দানব-দৃপ্তি।
শিশুর বদনে আনো ক্রন্দন নাশি' হর্ষের হাস্যে,
মসী-কলঙ্ক অঙ্কিত করো সহাস কিশোরী-আস্যে।
শক্তি-সাহসে পূর্ণ যুবকে নিয়োজিত করো দাস্যে,
অপহৃত করো দীর্ঘশ্বাসে কামিনীর কম-লাস্যে।
দিগ্‌ভ্রমকারী প্রবল ঝঞ্ঝা প্রণয়-পয়োধি-বক্ষে,
ভুলায়ে বৃদ্ধে ধর্ম্মসাধনা ঝরাও অশ্রু চক্ষে।

শিল্পীর তুলি তুলিয়া গোপনে নির্জীব করো সৃষ্টি,
কবির লেখনী শুষ্ক করিয়া ব্যর্থতা করো বৃষ্টি।
সুস্থ সবল শরীরে তুমিই দুরতিক্রম-যক্ষ্মা,
মৃত্যু-মহিমা প্রচারে তোমার শক্তি পরম দক্ষা।
বিফলতা তব সদা-সঙ্গিনী, অপমান প্রিয়-সঙ্গী,
বিবেক, বুদ্ধি পলায় সুদূরে সন্ত্রাসে দেখি' ভঙ্গী।
যন্ত্রণা হেরি' সদা আনন্দ পিশাচ-দারুণ-চিত্তে,
সংসারে কেহ স্বপ্নেও তোমা চাহে না ছাড়িয়া বিত্তে।
যাও অনাহূত রুদ্র-শিষ্য ল'য়ে অনুচর-বর্গ,
তোমার দৈন্যে ধন্য মানিয়া মর্ত্ত্য হউক স্বর্গ।

স্রষ্টা

শ্রী অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত

আমিও তোমার মতো সৃজিয়াছি একখানি অপূর্ব্ব ভুবন,
সেথা রাত্রি নেমে আসে বক্ষে ল'য়ে বিরহের ব্যথা-গুঞ্জরণ
রিক্তা নিরাভরণার মতো
অঙ্গে ধরি' ব্যর্থতার ব্রত।
প্রেমের মাধুর্য্য দিয়া রচিয়াছি আকাশের মঙ্গল মহিমা,
ব্যথার লাবণ্য দিয়া আঁকিয়াছি শরতের প্রশান্ত নীলিমা ;
রামধনু আঁকিয়াছি অস্ফুট চুম্বনে,
গগন-কম্পন-ব্যথা মুগ্ধ-আলিঙ্গনে !
অসংখ্য আশার ভাতি জ্বালায়েছি নয়নে তারার,
অশ্রু দিয়া গড়িয়াছি নবঘন পুঞ্জিত আষাঢ়।
যৌবনের ইচ্ছাখানি ছন্দি' তুলি' জলদের কম্পন-আনন্দে,
মনের নিকুঞ্জতল পুঞ্জ-পুঞ্জ বেদনার কেতকী-সুগন্ধে
আন্দোলিয়া উঠিছে উতলি',
আকাঙ্ক্ষার বিহঙ্গ-কাকলী !

যেমন তুমি হে কবি, রচিয়াছ এ সুন্দর সৃষ্টির কবিতা,
আপন আনন্দ-ছন্দে মেলিয়াছ নব-নব বর্ণ-বিলাসিতা,
তেম্‌নি আমিও কবি ; আমার কল্পনা।
আঁকে নিত্য আনন্দের শুভ্র আলিম্পনা !
নিত্য মায়া-মহোৎসব আমার সে মর্ম্মরিত মর্ম্মের জগতে,
প্রিয়া সেথা চিরযাত্রী পল্লব-হিল্লোল-ফুল্ল ফাল্গুনের রথে ;
প্রাণের কুসুম দিয়া সেথা নিত্য মাল্য-বিরচন,
ব্যথিত বুকের গৃহে সেথা মোর বাসক-শয়ন,
সেথা নিত্য আশা যায় বুনি'
আকাশের ফুলের ফাল্গুনী !

আমিও তোমার মতো, হে মায়াবী শিল্পকার, হে ক্ষ্যাপা খেয়ালী,
বেদনার রসায়নে রচি নিত্য ব'সি-ব'সি আনন্দের দীপের দেয়ালি
অন্তর-ব্যঞ্জনা দিয়া মঞ্জুল করেছি মোর মনের মঞ্জুষা,—
সেথা রাত্রি-অবসানে দেখা দেয় তনুগাত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী ঊষা ;
সেথা সূর্য্য-সন্তানের নব-নব জন্মের উৎসব,
আলোকের স্তোত্রে-স্তোত্রে আনন্দের মন্ত্র-কলরব,
সেথা ফোটে প্রেমের মালতী,
তাই সেথা অরুণ-আরতি !

যেমন তুমি গো তা'র পর,
ভেঙে ফেলো স্বপ্ন-খেলা-ঘর,
ধূলির সঞ্চয় কাড়ি' নিঃসম্বল করো ধরণীরে,
সৃষ্টির কবিতাখানি অবহেলে ফে'লে দাও ছিঁড়ে—
তেম্‌নি আমিও একদিন
অশান্ত বিরক্ত তৃপ্তিহীন
দারুণ হেলার ভরে চূর্ণ করি আনন্দ-লেখনী,
দীর্ঘশ্বাসে ভস্ম ক'রে দিয়ে যাই স্বপ্নের বিপণী,
দুইজনে ভয়ঙ্কর বীভৎস নিষ্ঠুর,
শুধু ছবি আঁকি ব'সে জীবন-মৃত্যুর !

আমার ভুবনে আমি তোমা-মতো খুশী-ক্ষ্যাপা স্রষ্টা,ভগবান্—
কাহারে বঞ্চিত করি, বক্ষ ভরি' কাহারে সর্ব্বস্ব করি দান ;
মিলন-চুম্বন কারে, কাহারে বা আতপ্ত বিরহ,
কারে দগ্ধ মরুভূমি, কারে বর্ষা-অশ্রু-অনুগ্রহ ;
আমার খেয়াল-মতো গান গাহি ভৈরবী-বিভাসে,
ধন্য করি কারে প্রেমে ; খিন্ন করি কারে দীর্ঘশ্বাসে ;
কারে কণ্টকের মালা, কারে বা মাধবী,
যাহা খুশী দান করি তোমা-সম, কবি !

আমিও তোমারি মতো পাইয়াছি অমূল্য সে স্বর্গ-সিংহাসন,
রাত্রিদিন সেথা বসি' মূল্যহীন রাজত্বের করি আয়োজন ;
অকারণে ব'সে-ব'সে ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভা হানি',
তোমারি মতন শেষে মৃত্যুর গুণ্ঠন দিই টানি ;
মি'শে যায় একে-একে মূল্যহীন স্বপ্নের বুদ্বুদ,
আতঙ্কে নিবিয়া যায় সে-রহস্যলীলার বিদ্যুৎ,
প'ড়ে থাকে বিদীর্ণ বাঁশরী,
ভগ্ন যত ভাবের গাগরী !

সনৎকুমারের ব্রহ্মবাদ

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সনৎকুমার নারদকে যে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭ম অধ্যায়) অদ্য তাহাই আলোচিত হইবে।

একসময়ে নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ভগবন্! আমাকে (ব্রহ্মবিদ্যা) শিক্ষা দিন।"

সনৎকুমার বলিলেন, "তুমি যাহা জান, তাহা প্রথমে বল; পরে তাহার অতিরিক্ত বলিব।"

তখন নারদ ১৯টি* বিদ্যার নাম করিয়া বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি এইসমুদয় বিদ্যা অবগত আছি। কিন্তু এইসমুদয় বিদ্যা লাভ করিয়া আমি কেবল মন্ত্রবিৎই হইয়াছি—আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। ভগবৎসদৃশ লোকসমূহের মুখে শুনিয়াছি, যে আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকমগ্ন; ভগবান্ আমাকে শোকের পর-পারে লইয়া যান।"

ইহা শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন—"তুমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা নামমাত্র। তুমি নামকে (ব্রহ্মরূপে) উপাসনা কর।"

তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভগবন্! নাম অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?"

সনৎকুমার বলিলেন—"নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ। তুমি এই বাক্যকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর।" ছঃ ৭।১।

ইহার পরে আরও ১৩ বার প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল। এইসমুদয় প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার যাহা বলিয়াছিলেন—তাহা এই:-

বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা সঙ্কল্প, সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত, চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান, ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান অপেক্ষা বল, বল অপেক্ষা অন্ন, অন্ন অপেক্ষা জল, জল অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা আকাশ, আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি, স্মৃতি অপেক্ষা আশা এবং আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। ছাঃ ৭।২—১৪।

এ-স্থলে 'নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রাণ' পর্য্যন্ত ১৫টি সত্তা, বা বস্তু বা বিষয়ের নাম করা হইয়াছে। প্রথমটা অপেক্ষা দ্বিতীয়টা শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়টা অপেক্ষা তৃতীয় শ্রেষ্ঠ, তৃতীয় অপেক্ষা চতুর্থ শ্রেষ্ঠ; এইভাবে অগ্রসর হইয়া শেষবারে বলা হইয়াছে চতুর্দ্দশ অপেক্ষা পঞ্চদশ শ্রেষ্ঠ। একটি অপেক্ষা অপরটি কেন শ্রেষ্ঠ, প্রত্যেকবারেই তাহার কারণও দেখান হইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠতর বস্তুটিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সনৎকুমার শেষবার যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

"আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। (রথচক্রের) অর-সমূহ যেমন (রথের) নাভিতে নিহিত থাকে, তেমনি সমুদায়ই এই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণ দ্বারাই প্রাণ কার্য্য করে, প্রাণই প্রাণকে দান করে, প্রাণই প্রাণের উদ্দেশে দান করে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ। যদি কেহ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য্য বা ব্রাহ্মণকে সম্মান না দেখাইয়া প্রত্যুত্তর করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে বলে—'ধিক্ তোমাকে; তুমি পিতৃহা (=পিতৃ-হন্তা), মাতৃহা, ভ্রাতৃহা, স্বসৃহা, আচার্য্যহা, এবং ব্রাহ্মণহা। কিন্তু ইহাদিগের প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে, যদি কেহ শূল দ্বারা ইহাদিগের দেহকে বিদ্ধ করিয়া সম্যক্রূপে দগ্ধ করে, তাহা হইলেও কেহ বলিবে না—"তুমি পিতৃহা, মাতৃহা, ভ্রাতৃহা, স্বসৃহা, আচার্য্যহা বা ব্রাহ্মণহা"। (সুতরাং) প্রাণই এইসমুদয়।

যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, এইপ্রকার মনন করেন,

---

* ১৯টি বিদ্যা এই:—(১) ঋগ্বেদ, (২) যজুর্ব্বেদ, (৩) সামবেদ, (৪) আথর্ব্বণ (=অথর্ব্ব বেদ), (৫) ইতিহাস ও পুরাণ, (৬) ব্যাকরণ, (৭) শ্রাদ্ধতত্ত্ব, (৮) গণিতবিদ্যা, (৯) দৈব-উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, (১০) কালবিদ্যা, (১১) তর্কবিদ্যা, (১২) নীতিবিদ্যা (১৩) নিরুক্ত, (১৪) ব্রহ্মবিদ্যা, (১৫) ভূতবিদ্যা, (১৬) ক্ষত্রবিদ্যা, (১৭) নক্ষত্রবিদ্যা, (১৮) সর্পবিদ্যা এবং (১৯) দেবজনবিদ্যা।

এবং এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনি অতিবাদী হন। যদি কেহ তাঁহাকে বলে, "তুমি অতিবাদী",— তিনি (ইহার উত্তরে) বলিবেন—'হাঁ আমি অতিবাদী', ইহা তিনি গোপন করিবেন না"। ৭।১৫।

'অতিবাদী' শব্দের একটি অর্থ, 'যে অধিক কথা বলে'; এ অর্থ নিন্দাসূচক। কিন্তু উপনিষদে এই শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতি = অধিক, সাধারণ তত্ত্বের অতীত; বাদী = বক্তা। অতিবাদী = অধিকতত্ত্বের বক্তা কিংবা শ্রেষ্ঠ বক্তা। 'নাম = ব্রহ্ম'—এই তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া "আশা = ব্রহ্ম" এইপর্য্যন্ত যে তত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহা সাধারণ তত্ত্ব। কিন্তু 'প্রাণই ব্রহ্ম'—এই জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত সত্যসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি ইহা জানেন, তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সত্যকে অতিক্রম করিয়া নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত জানেন, সুতরাং কিছু অতিরিক্ত বলেন। এইজন্য এইপ্রকার লোককে এস্থলে 'অতিবাদী' বলা হইয়াছে।

নারদ এপর্য্যন্ত যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে 'অতিবাদী' বলা যাইতে পারে। নারদও বুঝিয়াছিলেন যে তিনি অতিবাদী হইয়াছেন। তিনি যখন অতিবাদী হইয়াছেন তখন তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা হইল যে 'প্রাণই ব্রহ্ম' ইহাই শেষ কথা। সেইজন্য তিনি আর প্রশ্ন করিলেন না—"প্রাণ-অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ কিছু আছে?"

যখন সনৎকুমার দেখিলেন যে, নারদ আর প্রশ্ন করিতেছেন না, তখন তিনি নিজেই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

সত্য

তাঁহার উপদেশ এই :—

যিনি সত্য দ্বারা (অর্থাৎ সত্য লাভ করিয়া) অতিবাদী হন, তিনিই (প্রকৃত পক্ষে) অতিবাদী।

নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি সত্যকে জানিয়া অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি"।

সনৎকুমার বলিলেন :— "সত্যকে বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।"

নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি সত্যকে বিশেষভাবে জানিবার ইচ্ছা করিতেছি।" ৭।১৬।

বিজ্ঞান

সনৎকুমার বলিলেন :—"যখন মানুষ বিশেষ-রূপে জানে, তখনই সত্য বলে। বিশেষ-রূপে না জানিয়া সত্য বলে না; বিশেষ-রূপে জানিয়াই সত্য বলে। সুতরাং এই বিজ্ঞানকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত"।

নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি বিজ্ঞানকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।" ৭।১৭।

মনন

সনৎকুমার বলিলেন :—"যখন মানুষ মনন করে, তখনই বিশেষরূপে জানে, মনন না করিলে বিশেষ-রূপে জানিতে পারে না। সুতরাং এই মননকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত"।

নারদ বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি মননকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।" ৭।১৮।

শ্রদ্ধা

সনৎকুমার বলিলেন—"মানুষ যখন শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তখনই মনন করিতে পারে, শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলে মনন করিতে পারে না; শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেই মনন করিতে পারে। সুতরাং শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে"।

নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।" ৭।১৯।

নিষ্ঠা

সনৎকুমার বলিলেন—"মানুষ যখন নিষ্ঠাবান্ হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবান্ না হইলে শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে না, নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে। সুতরাং নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।"

নারদ বলিলেন—"আমি এই নিষ্ঠাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি"। ৭।২০।

কর্ম্ম

সনৎকুমার বলিলেন :—"যখন লোকে কর্ম্ম সম্পাদন করে, তখনই নিষ্ঠাবান্ হয়। কর্ম্ম না করিলে নিষ্ঠাবান

হইতে পারে না; কর্ম্ম করিলেই নিষ্ঠাবান হয়। সুতরাং এই 'কৃতি'কেই (অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মকেই) বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।

নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি এই কৃতিকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি"। ৭।২১।

সুখ

সনৎকুমার বলিলেন—"যদি মানুষ সুখ লাভ করে, তবেই কর্ম্ম করে। সুখ লাভ না করিলে কর্ম্ম করে না; সুখ লাভ করিলেই কর্ম্ম করে। সুতরাং এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত"।

নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি এই সুখকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।" ৭।২২।

ভূমা

সনৎকুমার বলিলেন—"যাহা ভূমা তাহাই সুখ; যাহা অল্প, তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। এই ভূমাকেই জানিবার ইচ্ছা করা উচিত"।

নারদ বলিলেন—"হে ভগবন্! আমি এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি"। ৭।২৩।

সনৎকুমারের মতে এই ভূমাতত্ত্বই শেষ তত্ত্ব। ইহা-অপেক্ষা অধিক জানিবার বা বলিবার কিছু নাই।

প্রাণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার পরে সনৎকুমার নারদকে সত্য, বিজ্ঞান, মনন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কর্ম্ম ও সুখ-বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশের ভাবার্থ এই :—

(১) সুখ হয় বলিয়াই লোকে কর্ম্ম করে। (২) কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে-করিতে ইহাতে তাহার নিষ্ঠা হয় অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে স্থিতি হয়; কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাহার দৃঢ়তা জন্মে। (৩) কর্ত্তব্যে নিষ্ঠাবান্ হইলেই মানুষ সত্যে শ্রদ্ধাবান্ হয়। (৪) সত্যে শ্রদ্ধাবান্ হইলেই সে সত্যকে মনন করে। (৫) সত্যকে মনন করিলে সত্যের বিজ্ঞান জন্মে। (৬) সত্যের বিজ্ঞান অর্থই সত্য-লাভ। এইরূপে সত্য-লাভ করিয়া যিনি অতিবাদী হন, তিনিই প্রকৃতভাবে অতিবাদী।

কেহ-কেহ বলেন, এস্থলে 'কর্ম্ম' অর্থ 'ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম;' এবং 'নিষ্ঠা' অর্থ গুরু-শুশ্রূষাদিতে তৎপরতা। শাস্ত্রে অতি প্রাচীনকাল হইতেই গুরু-শুশ্রূষাদিকে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এ-অর্থও অসঙ্গত নহে।

এস্থলে সনৎকুমার সত্য-লাভের এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করিলেন। পথ এই—প্রথমে কর্ম্ম, তাহার পরে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও মনন। এই মনন দ্বারাই সত্যের বিজ্ঞান হয় অর্থাৎ সত্য-লাভ হয়। কেহ-কেহ বলেন, এ-স্থলে 'সত্য' অর্থ 'সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম'।

ভূমা

কর্ম্ম-সম্পাদন এইজন্যই সম্ভব হয়, যে কর্ম্মে সুখ আছে। সুখ না থাকিলে মানুষ কর্ম্ম করিতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃত সুখ কি? সনৎকুমার বলিতেছেন—

"যাহা ভূমা তাহাই সুখ; যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। এই ভূমাকেই বিজ্ঞাত হইতে হইবে।" ৭।২৩

ভূমার প্রকৃতি

ভূমার প্রকৃতি-বিষয়ে সনৎকুমার এইপ্রকার বলিয়াছেন :—

যাহাতে অন্য-কিছু (অন্যৎ) দেখা যায় না, অন্য-কিছু শুনা যায় না, অন্য-কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য-কিছু দৃষ্ট হয়, অন্য-কিছু শ্রুত হয়, অন্য-কিছু বিজ্ঞাত হয়, তাহাই অল্প। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত; আর যাহা অল্প, তাহাই মরণশীল।" ৭।২৪।১

এই অংশকে ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য অনেক স্থলে অন্তর্বাহ্য ভেদ-রহিত ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন। শঙ্করপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভূমা-প্রকরণেও ঐপ্রকার ভেদরহিত ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে।

অনেকে বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদ-বাদ প্রভৃতি সমর্থন করিয়া এই অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ভূমা হইতে পৃথক্ ও দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, কিন্তু ভূমাতে স্বগত-ভেদ আছে। ভূমার মধ্যে জড় জীবাদি যাহা আছে, তাহা ভূমারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুতরাং তাহা ভূমা হইতে পৃথক্ নহে।

ভূমার প্রতিষ্ঠা

ভূমার প্রকৃতি কি-প্রকার তাহা শ্রবণ করিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

'হে ভগবন! সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?"

সনৎকুমার ভূমার প্রকৃতি-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সুবিজ্ঞাত হইলে এ-প্রকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যখন একমাত্র ভূমাই বর্ত্তমান, যখন ভূমা এক এবং অদ্বিতীয়, যখন ভূমা হইতে পৃথক্ কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই তখন ভূমার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কোন-প্রকার চিন্তা আসিতে পারে না। কিন্তু শেষে বা কোন ঘটনায় এইপ্রকার চিন্তা আসে, সেইজন্যই নারদের মুখে ঐ প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। প্রশ্ন শুনিয়া সনৎকুমার বলিলেন, "স্বীয় মহিমাতে"। এই সঙ্গে-সঙ্গেই বলিলেন, "অথবা স্বীয় মহিমাতেও নহেন"। ৭।২৪।১

ভূমা নিজেতেই নিজে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থে বলা হইয়াছে, "তিনি স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত"। ইহা শুনিয়া নারদ মনে করিতে পারিত যে ভূমারও আশ্রয় আবশ্যক এবং ইহাও মনে হইতে পারিত যে, 'ভূমা এক এবং ভূমার মহিমা অন্য এবং ইহাদিগের মধ্যে এক অন্যে প্রতিষ্ঠিত'। এইপ্রকার সন্দেহ দূর করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন—"ভূমা নিজ মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন", অর্থাৎ তাঁহার আশ্রয় আবশ্যক হয় না, তিনি প্রতিষ্ঠাবিহীন, তিনি নিরালম্ব।

আমরা এস্থলে যে ব্যাখ্যা দিলাম, সনৎকুমার নিম্ন-লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই বুঝাইয়াছেন :—

"লোকে এই জগতে গো ও অশ্ব, হস্তী ও হিরণ্য, দাস ও ভার্য্যা, ক্ষেত্রসমূহ ও বাসগৃহসমূহকে 'মহিমা' বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি এপ্রকার (মহিমার কথা) বলিতেছি না; কারণ (ইহাদিগের মধ্যে) এক অপর বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত।" ৭।২৪।২

ভূমা-দর্শন

ভূমাকে কিভাবে দর্শন করিতে হইবে সে-বিষয়ে সনৎকুমার এইপ্রকার বলিতেছেন :—

(ক)

"তিনিই অধোভাগে, তিনিই উর্দ্ধভাগে, তিনিই পশ্চাৎভাগে, তিনিই পুরোভাগে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে—আমিই এইসমুদায়"।

(খ)

"আমিই অধোভাগে, আমিই উর্দ্ধভাগে, আমিই পশ্চাৎভাগে, আমিই পুরোভাগে, আমিই দক্ষিণে, আমিই বামে—তিনিই এইসমুদায়"।

(গ)

"আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই উর্দ্ধভাগে, আত্মাই পশ্চাৎভাগে, আত্মাই পুরোভাগে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই বামে—আত্মা এইসমুদায়"। ৭।২৫

এই যে তিনভাবে ভূমাকে দর্শনের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে, ইহার অর্থ অতি গভীর। তাঁহাকে প্রথমে দেখিতে হইবে তৃতীয় পুরুষরূপে। 'তিনিই সর্ব্বত্র এবং তিনিই সমুদয়'—এইভাবে 'ভূম-দর্শন,' সাধনের প্রথম স্তর। কিন্তু এপ্রকার দর্শন যথেষ্ট নহে। ভূমাকে তৃতীয় পুরুষরূপে দর্শন করিলে দ্বৈতজ্ঞান ও ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হয় না। এইজন্য ঋষি উপদেশ দিলেন—'অহম্' ভাবে (অর্থ 'আমি' এইভাবে) 'ভূম-দর্শন' করিতে হইবে। 'আমিই সর্ব্বত্র এবং আমিই সমুদায়,' এইভাবে দর্শনের নাম 'অহম্' দৃষ্টিতে 'ভূম-দর্শন'। ইহা সাধনের দ্বিতীয় স্তর। এইপ্রকার সাধনে ভূমা এবং 'অহম্'—এতদুভয়ের একত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু এপ্রকার দর্শনও যথেষ্ট নহে। 'অহম্' জ্ঞানও দ্বৈত-মূলক। 'অহম্' (অর্থাৎ আমি) বলিলেই 'ইদম্' (অর্থাৎ 'ইহা') বুঝায়। এখানেও ভেদ-বুদ্ধি রহিয়া গেল। এই ভেদ-বুদ্ধি বিদূরিত করিবার জন্য ঋষি উপদেশ দিলেন—ভূমাকে আত্মদৃষ্টিতে দর্শন করিতে হইবে।

আত্মাই সর্ব্বত্র এবং আত্মাই সমুদায়—এইপ্রকার দর্শনের নাম আত্ম-দৃষ্টিতে—'ভূম-দর্শন'। ঋষির মতে ইহাই শ্রেষ্ঠতম সাধন এবং আত্মদৃষ্টি ভূম-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। 'এই জগৎই ব্রহ্ম' কিংবা 'আমিই ব্রহ্ম'—এপ্রকার বলিলে ব্রহ্মের প্রকৃত তত্ত্ব বলা হয় না। 'তিনি আত্মা'—ইহাই শেষ কথা। 'ভূমা প্রকরণে' বলা হইল যিনি আত্মা, তিনিই ভূমা এবং যিনি ভূমা, তিনিই আত্মা।



শিবের বিবাহ
চিত্রকর শ্রী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শান্তিনিকেতন

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা।

ভূম দর্শনের ফল

ভূম-দর্শনের ফল কি, সে-বিষয়ে ঋষি এইপ্রকার বলিতেছেন :—

"যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, এইপ্রকার মনন করেন, এইপ্রকার বিজ্ঞানলাভ করেন, তিনি আত্মরতি আত্ম-ক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দ হন এবং তিনি স্ব-রাট্ হন।

আর যে ইহা অপেক্ষা অন্যরূপ জানে, সে অন্যের অধীন হয় এবং ক্ষয়শীল লোক লাভ করে। সমুদায় লোকে তাহার পরাধীন।

এইপ্রকার দ্রষ্টার, এইপ্রকার মনন-কর্ত্তার, এই-প্রকার বিজ্ঞাতার নিকট আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা, আত্মা হইতেই স্মৃতি, আত্মা হইতেই আকাশ, আত্মা হইতেই তেজ, আত্মা হইতেই জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব ও তিরোভাব, আত্মা হইতেই অন্ন, আত্মা হইতেই বল, আত্মা হইতেই বিজ্ঞান, আত্মা হইতেই ধ্যান, আত্মা হইতেই চিত্ত, আত্মা হইতেই সঙ্কল্প, আত্মা হইতেই মন, আত্মা হইতেই বাক্, আত্মা হইতেই নাম, আত্মা হইতেই মন্ত্রসমূহ এবং আত্মা হইতেই এই সমুদয় (উৎপন্ন হয়)"। ৭।২৬।১

নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য ঋষি নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"তত্ত্বদর্শী মৃত্যুদর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না এবং দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্বদর্শী সমুদায়ই করেন, এবং সর্ব্বদা সমুদায়ই লাভ করেন। তিনি (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এক ; (সৃষ্টির পরে) তিনি তিন-প্রকার, পাঁচ-প্রকার, সাত-প্রকার, নয়-প্রকার হন ; পুনশ্চ তাঁহাকে একাদশ, একশত দশ, এবং এক হাজার বিশ বলা হয় (অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয়রূপে বর্ত্তমান এবং সৃষ্টির পরে বহুরূপে প্রকাশিত)। ৭।২৬।২

যিনি ভূমাকে দর্শন করেন, তিনি ভূমত্বই লাভ করেন। ভূমা আত্মাই ; ভূমজ্ঞও অনুভব করেন যে, তিনিও সেই আত্মা এবং তিনি ইহাও অনুভব করেন যে, এই আত্মা হইতেই প্রাণাদি যাহা-কিছু আছে সমুদায়ই উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মদর্শনের পর যে তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, তাহা নহে। ব্রহ্মজ্ঞ অনুভব করেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি এক অদ্বিতীয় আত্মারূপে বর্ত্তমান ছিলেন এবং সৃষ্টির পরও তিনি সেই আত্মা ; তবে এই সময়ে তিনি বহুরূপে প্রকাশিত (৭।২৬।২)। অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী প্রত্যক্ষ করেন যে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় তিনি সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম।

সিদ্ধান্ত

'ভূম-প্রকরণ' আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি :—

১। ভূমা এক ও অদ্বিতীয়।

২। এই ভূমা আত্মাই।

৩। আমরা যাহাকে মানবাত্মা বলি, তাহা ভূমাই অর্থাৎ ব্রহ্মই।

৪। এই অধ্যায়ে 'নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রাণ' পর্য্যন্ত যে ১৫টিকে প্রথমে ব্রহ্ম বলা হইয়াছিল, সে-সমুদায়ই আত্মা (অর্থাৎ ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন।

প্রাচীন ভারতে কার্পাস-শিল্প ও চরকা

শ্রী বিধুভূষণ দত্ত, এম-এ

চরকাই প্রাচীন হিন্দু জাতির বস্ত্র জোগাইয়া দিত। তখন কল-কারখানা বা অন্য কোনো বিপুলায়তন যন্ত্রের প্রচলন ছিল, এরূপ মনে করা যায় না। কিন্তু কত পূর্ব্ব কাল হইতে যে চরকা এদেশে বস্ত্রদান করিয়া আসিতেছিল তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন। যতদিন হইতে আর্য্য হিন্দুগণ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, ততদিন হইতেই চরকার সৃষ্টি হইয়াছে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর অতি সুদূর কাল হইতেই যে তাঁহারা সভ্যতায় সমুন্নত ছিলেন এবং সভ্যজনোচিত বসনাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায়। এক্ষণে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যে কতকাল পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা গণিয়া স্থির করা যায় না। পুরাণাদির সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে ত সে-কালের সীমা নির্ণয় হয় না; বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকদিগের বিবেচনাতেও উহা বিংশ, ত্রিংশ বা পঞ্চাশৎ শতাব্দী খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব যুগে যাইয়া পড়ে। সেই অতিপ্রাচীন কাল হইতেই যে বয়নশিল্প ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, এবং তাহা ভারতীয় আর্য্য-জাতির সভ্যতার পরিচ্ছদ জোগাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ। আধুনিক পণ্ডিতগণ উহাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। বেদ ধর্ম্মগ্রন্থ হইলেও, তাহাতে সমাজ-নীতি আদি বস্তুবিষয়ের মৌলিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। তৎকালে আর্য্য হিন্দুদিগের সামাজিক গঠন, শিল্প-নৈপুণ্য প্রভৃতি কিরূপ ছিল, বৈদিক গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সূক্তসমূহ যে সময়ে প্রচলিত হয়, মানব-ইতিহাসের সেই প্রাচীনতম যুগে, হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বয়ন-শিল্প সবিশেষ অবগত ছিলেন; এবং সভ্যজনোচিত বেশভূষাদি পরিধান করিতেন। বিবিধ মন্ত্র হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

'উষ্ণীষ' শব্দ মস্তকের ভূষণ বা বসন বাচক, সকলেই জানেন। বৈদিক গ্রন্থে ইহার বহুল উল্লেখ রহিয়াছে—বিজ্ঞানং বাসোঽহরুষ্ণীষং: অথর্ব্ব ১৫.১.১৫), মৈত্রেয় সংহিতা (৪।৪।৩), কাঠক সংহিতা (১৩।১০) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৬।১), শতপথব্রাহ্মণ (৬।৩।২।৩) প্রভৃতি আরও অনেক স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত আছে।

'পরিধান' শব্দের অর্থ সাধারণ কাপড় বা ধুতি; 'নোবি'র অর্থ ভিতরে পরিবার বস্ত্র, যেমন নেঙ্গট-বিশেষ; 'অধিবাস' অর্থে উপরে গায়ে দিবার কাপড়—ওড়না বুঝায়। বৈদিক মন্ত্রে ইহাদের উল্লেখ আছে—

> যত্তে বাসঃ পরিধানং যাং নোবিং কৃণুষে ত্বম্।
> শিবং তে তন্বে তৎকৃণ্মঃ সংস্পর্শে দ্রূক্ষ্ণমস্তু তে॥
>
> (অথর্ব্ব—৮।২।১৬)

—যেই বস্ত্র তোমার ধুতিরূপে পরিধান করিয়াছ, আর যাহা তার নীচে পরিয়াছ, তাহা তোমার শরীরের পক্ষে উত্তম শোভাদায়ক হইয়াছে, আর উহাতে তোমার শরীরে মৃদুস্পর্শ করিবে মাত্র (আঁটা হইয়া কষ্টদায়ক হইবে না)।

আবার, অধিবাসং পরিমাতুরিহন্নহং (ঋগ্বেদ ১।৪০।৯) —ইহা মাতার উপরে-পরিবার (উড়নী) বস্ত্র।

এস্থলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেইকালে শরীরের মাপের ঠিক যোগ্য করিয়া বস্ত্র তৈয়ারি করা হইত; এবং মাতার (স্ত্রীদিগের) জন্য বিশেষ-প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত।

এতদ্ব্যতীত 'দ্রাবি' ও 'অৎক' (চোগা ও কোট ইত্যাদি), 'সামুল' 'শামুল্য' (গরম কাপড়, পশমী বস্ত্র ইত্যাদি) প্রভৃতির বহুস্থানে উল্লেখ রহিয়াছে; [ঋ—১।২৫।১৩, ১।১১৬।১০, ৪।৫৩।২, ৯.৮৬।১৪, ১০।৪৯।৩, ১০।৯১।৯, ১০।৮৫।২৯, ৪।৫৩।২, ৬ ২৯।২, ইত্যাদি]

আবার, ভালো কাপড় (='সুবসন' ঋ—৬।৫১।৪, ৯।৯৭।১৫, ১।১২৪।৭, ৩ ৮।৪, ১০।৭১।৪), রাজার যোগ্য বস্ত্র (ঋ—৬।৫১।৪; অথর্ব্ব—২।১৩),পতিতদিগের পোষাক (অথর্ব্ব ১৪।১।৫৩), মাঙ্গলিক বেশ (অথর্ব্ব ১৪।১।৩০),

বুটীদার বা embroidered কাপড় (—'পেশস্', ঋ—২।৩।৬, ৪।৩৬।৭, ৩।৩৪।১১, ৭।৪২।১; বাজ. যজু—১৯।৮২, ২০।৪০; ঐত. ব্রা,—৩।১০, যজু,—৩০।৯; তৈত্তিরী. ব্রা—৩।৪।৫।১, ইত্যাদি), ঝালর (—'তুস্', তৈ. সং—১।৮।১।১, ২।৪।৯।১, ৪।১।১।৩; কাঠক সং—১৬।১), কিনার বা পাড় (—'দশা', 'দশাপবিত্র', শত. ব্রা ৩।৩।২।৯, ঐ. ব্রা—৭।৩২; শত ব্রা—৪।২।২।১১), আঁচলের দিকের সুতার বহিরংশে গ্রন্থি (—'প্রগাথ', তৈত্তি- সং—৪।১।১।৩; কাঠক সং—২৩।১), দরজা, জানালা আদির পরদা (—'বাত-পান', তৈ. সং—৬।১।১।৩), গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি ছোটো ও মোটা কাপড় (—'প্রবর', 'প্রবার', বৃহদা. উপ, ৬।১।১০; —'বরাসী', কাং সং—১৫।৪; —'প্রাচীনাবীত', শত. প.ব্রা, —২।৪।২।২, ইত্যাদি), বিবাহাদির জন্য বিশেষ-প্রকার কাপড় (—'বাধূয়ংবাস', ঋ—১০।৮৫।৩৪; অথর্ব্ব—১৪।২।৪১) প্রভৃতি বৈদিক কালে প্রচলিত ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার কাপড়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত রঙীন কাপড় (বাজ. যজু—১১।৪০, ঋ—৪।৫৩।২, শত. ব্রা—৫।৬।৫), সুন্দর সুন্দর কাপড় (ঋ—৯।৯৭।৫০, ১।৮।৪, ১।১৩৪।৪, ৯।৯৬।১, ৯।৯৭।২, ৩।৩৯।২, ১০।১।৬, ১৪।১।২৭), রেশমী কাপড় (অথর্ব্ব—১৮।৪।৩১), পশমের কাপড় (ঋ,—১০।৮৫।২৯), অনেক কাপড় পরিবার রীতি (ঋ,—১।১৬।১, অথর্ব্ব ৯।৫।২৬, ঋ, ১।১৫২।১), বস্ত্রদান (ঋ,—৫।৪২।৮, ৬।৪৭।২৩; অথর্ব্ব—৯।৫।২৫, ৫।১।৩,১৪।২।৪১), এমন-কি কাপড়ের চোর (ঋ—৪।৩৮।৫) প্রভৃতি বস্ত্র-বিষয়ক প্রায় সমুদয় বিষয়ের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে বস্ত্র প্রস্তুত-করণ-বিষয়ে বৈদিক গ্রন্থের কি প্রমাণ রহিয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

সাধ্বপাংসি সনতান উক্ষিতে উষা সানক্তা বয্যেবরন্বিতে।
তন্তুং ততং সংবয়ন্তী সমীচী যজ্ঞস্য পেশঃ সুদুঘে পয়স্বতী॥
(ঋ ২।৩।৬)

—'আমাদিগের সাধু কর্ম্ম সকলের চির ফলপ্রদায়ী উষা ও নক্ত বয়ন কুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের সাহায্যার্থ পরস্পর গমনাগমনকরতঃ যজ্ঞের রূপ নির্ম্মাণার্থ পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন-করিতেছেন।

পুনঃ সমব্যয়িততং বয়ন্তী মধ্যা কর্ত্তোর্ন্যধাচ্ছকম ধীর।
(ঋ ২।৩৮।৪)

—'বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্ব্বার আলোককে সম্যক্‌রূপে বেষ্টন করিতেছে।'

নাহং তন্তুং ন বিজানাম্যোতুং ন যং বয়ন্তি সমরেহতমানাঃ।
স ই তন্তুং স বিজানাত্যোতুং স বক্ত্বান্যৃতুথা বদাতি॥
ঋ ৬।৯।২।৩

—'আমি তন্তু (তানা) বা ওতু (বানা) জানি না। কিংবা সতত চেষ্টা করিয়া যে বস্ত্র বয়ন করে, তাহার কিছুই অবগত নহি।

একমাত্র সেই বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু ও ওতু অবগত আছেন। তিনি উচিত অবসরে বক্তব্য-সমূহ বলিয়া দেন।'

আধীষমানায়া পতিঃ শুচায়াশ্চ শুচস্য চ।
বাসো বায়োঽবী না মা বাসাংসি মর্মৃজৎ॥
ঋ ১০।২৬।৬

—'তিনি (পূষা দেবতা) মেষ-লোমের বস্ত্র বয়ন করেন। তিনিই বস্ত্র ধৌত করিয়া দেন; ইত্যাদি

এইপ্রকার সূক্তসমূহের অন্তরালে তন্তু ও বয়ন সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত নিহিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া নানা-প্রকার মত প্রকাশ করা যাইতে পারে। এইসকল কথা ভরদ্বাজ (ঋ ৬।৯।২,৩), গৃৎসমদ (২।৩।৬) প্রভৃতি ঋষিগণের কল্পনাপ্রসূত অলীকবাণী কি না, এবং বৈশ্বানর অগ্নি তন্তু ও বয়নবিদ্যার আবিষ্কার-কর্ত্তা বা প্রথম শিক্ষা-দাতা কি না, অথবা উষা উহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ছিলেন, এবং পূষা তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেন কি না এইসকল তত্ত্বের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সেই সুদূর ঋষি-যুগে তন্তু ও বয়নবিদ্যা ভারতীয় আর্য্য সমাজে সুপ্রচলিত ছিল।

কেবল তাহাই নহে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে তন্তু-করণ বা সুতা-কাটা সম্বন্ধে স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে:—

তন্তুং তন্বন্ রজসো ভানুমন্বিহি, জ্যোতিষ্মতঃ পথো রক্ষ ধিয়া কৃতান্।
অনুল্বণং বয়ত জোগুবামপো মনুর্ভব জনয় দৈব্যং জনম্॥
১০।৫৩।৬

'তোমরা সুতা কাটিয়া তাহাতে রং দিবে, এবং উহা নষ্ট হইয়া না যাইতে-যাইতে কাপড় বুনিয়া লইবে; বিচার-শীল হইবে, সুপ্রজা সৃষ্টি করিবে, আর তেজস্বীদিগের বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে যে পথ, তাহা রক্ষা করিয়া চলিবে। এইরূপ করা বিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কার্য্য।'

এইস্থলে ঋগ্বেদ অন্যান্য কতিপয় সদনুশীলনের সহিত চরকায় সুতা-প্রস্তুত করণ, তাহাতে রং দেওয়া ও তাহা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা সুধীদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্ধারণ করিতেছেন। যাঁহারা বেদের ধর্ম্ম অনুসরণ করেন ও তাহাতে গৌরব বোধ করেন তাঁহারা

তাঁহাদিগের ধর্মের আদেশ বলিয়াই চরকাকে গ্রহণ করিতে পারেন।

বাস্তবিক বৈদিক গ্রন্থসমূহে সূত্র ও বস্ত্র নির্ম্মাণ বিদ্যার এরূপ ভূরি-ভূরি উল্লেখ রহিয়াছে যে তাহাতে সেই-সময়ে আর্য্য হিন্দুদিগের ঘরে-ঘরে চরকা ও তাঁতের প্রচলন ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্য বেদ তন্ত্র বা বয়ন-বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ নহে। কেবল মন্ত্রার্থক অন্য বিষয়ের সম্পর্কে বেদ ইহাদের আভাস বা ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা-দিগের কোনো কোনো মন্ত্র যজ্ঞ-প্রকরণে কোনো মন্ত্র দ্যৌ বা পৃথিবীর বর্ণনে কোনো মন্ত্র উষার বর্ণনে, কোনো মন্ত্র বা অন্য বিষয়ে; দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র বস্ত্র-বয়ন বিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্রসমূহে এইরূপ আরো বহুবিষয়ের উল্লেখ বা আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের ইহা এক বিশেষত্ব; অন্য কোনো সাহিত্যে বা গ্রন্থে এরূপ পাওয়া যায় না।

তখন ঘরে-ঘরে চরকার প্রচলন ছিল। স্ত্রীদিগের প্রধান কার্য্য ছিল দুইটি—সন্তান-পালন ও সূত্র এবং বস্ত্র প্রস্তুত-করণ। ঋগ্বেদের এই মন্ত্র হইতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়:—

> ঋতায়িনী মায়িনী সন্দধাতে মিত্বা শিশুং জজ্ঞতুর্বর্ধয়ন্তী।
> বিশ্বস্য নাভিং চরতো ধ্রুবস্য কবেশ্চিৎ তন্তুং মনসা বিয়ন্তঃ।
>
> (ঋ ১০।৫।৩)

—'সরল-স্বভাব কুশলদায়িনী স্ত্রীগণ সন্তানগণকে জনন ও পালন করিয়া থাকেন, আর স্থির ও চলনশীল সকল পদার্থের মধ্যস্থলে কবিমন-সুলভ মানসিক শক্তি-সাহায্যে সমান মাপে সূত্র-যোজনা করিয়া বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন।'

আবার,

> চিত্র দেবীর্হবিষা বর্দ্ধমানা ইন্দ্রং জুষাণা জনয়োন পত্নীঃ।
> অচ্ছিন্নং তন্তুং পয়সা সরস্বতীড়া দেবী ভারতী বিশ্বতূর্ত্তাঃ।

—'সকল কার্য্যকর্ম নিজ ভূমে, জায়া ও সন্তানের বর্দ্ধনশীল সন্তান-গণের জননীগণ দুগ্ধ ও হবিঃ দ্বারা ইন্দ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকেন এবং অচ্ছিন্ন তন্তু নির্ম্মাণ করেন।'

স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য, যজ্ঞের জন্য বিশেষ-প্রকার কাপড় বোনা, এ-বিষয়ে যজ্ঞস্য পেশঃ সমীচী সংবয়ন্তী (ঋ ২।৩।৬) এই বাক্য পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার মাতা আপন পুত্রের জন্য বস্ত্র বয়ন করিতেছেন এই আভাস প্রতিফলিত হইতেছে:—

> বিতন্বতে ধিয়ো অস্মা অপাংসি বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।
>
> (ঋ ৫.৪৭।৬)

এই মন্ত্রে পুত্রের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। বাস্তবিক মাতা পুত্রের জন্য, পত্নী পতির জন্য নিজ হস্তে কাপড় বুনিয়া দিলে তাহাতে উঁহাদিগের সদিচ্ছা ও সদ্ভাবসমূহ বস্ত্রের সূত্র-নালের সহিত জড়িত হইয়া পুত্র ও পতির কল্যাণ সাধন করিতে পারে, এই ধারণা নিতান্ত ভাবুকেরই কল্পনা-মাত্র বলিয়া উপেক্ষা নাও করা যাইতে পারে।

পত্নী পতির জন্য কাপড় বুনিয়া দিতেছে, নিম্নোল্লিখিত সূক্ত হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে:—

> যে অন্তা যাবতীঃ সিচো য ওতবো যে চ তন্তবঃ।
> বাসো যৎ পত্নীভিরুতং তন্নঃ স্যোনমুপ সম্পৃশাৎ।
>
> (অথর্ব্ব ১৪।২।৫১)

—'অন্ত (আঁচলা) ও কিনারা (পাড়) এবং তানা ও বানা—এই সমুদয় অর্থাৎ সূতা কাটা, আঁচলা ও পাড় তোলা ইত্যাদি সহ পত্নীদিগের দ্বারা বোনা কাপড় আমাদিগের সুখদায়ক হউক।'

এই মন্ত্রের টীকা করিতে গিয়া কেহ-কেহ বলিয়াছেন যে তৎকালে বিবাহের প্রথম দিন পতির পরিধানের নিমিত্ত কোনো বিশেষ-প্রকারের কাপড় নব-পরিণীতা পত্নীর নিজ হাতের তৈয়ারী থাকিত (গ্রিফিথ—অথর্ব্ব-বেদ, পৃষ্ঠা ১৭৯)

পিতারও বস্ত্রবয়ন একস্থানে উল্লিখিত আছে।

—ইমে বয়ন্তি পিতরঃ (ঋ ১০।১৩০।১)

তাহা বলিয়া সমাজে তখন বস্ত্র-বয়ন ব্যবসায়ী তন্তু-বায়ের অভাব ছিল, এরূপ অনুমান করা যায় না। বেদ ইহার ইঙ্গিত করিতেছেন:—

> উতো ত্বা নূনং তদিদর্থয়েথ বিতন্বাথে ধিয়ো বস্ত্রাহপসেব।
>
> (ঋ ১০।১০৬।১)

'কবির কাব্য-রচনা ও তন্তুবায়ের বস্ত্রবয়ন একরূপ। কর্মকুশল তন্তুবায় যেমন সূত্র রচনা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করে, কবিগণ সেইরূপ সুবিচারপূর্ব্বক শব্দ রচনা করিয়া কাব্য প্রস্তুত করে।'' কি সুন্দর উপমা।

বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা বসূয়ূ রথং ন ধীরঃ স্বপা অতক্ষম্। ঋ ৫,২৯।১৫

—'বুদ্ধিমান, নিজ ব্যবসায়ে সুদক্ষ জাতেচ্ছু কারিগরগণ যেই-প্রকার উত্তম ও সুন্দর বস্ত্র তৈয়ারী করে; ইত্যাদি।'

বাসোবায়োঽবীনামা বাসাংসি মর্মৃজৎ। (ঋ ১০।২৬।৬)—'বস্ত্র বয়নশীল তন্তুবায়গণ মেষ-আদির লোমের দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে, আর তাহা মাজিয়া সুন্দর করে।'

সীসেন তন্ত্রং মনসা মনীষিণঃ ঊর্ণা সূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি। (যজু—) ১৯।৮০)

—'মননশীল কবি (পুরুষ) গণ ঊর্ণাসূত্রের সহিত মন মিশাইয়া তানার উপর কাপড় বুনিতেছে।'

ইহা হইতে পুরুষগণের বস্ত্রবয়নে বিশেষ অধিকার জানা যায়; এবং বোধ হয় উর্ণা বা পশমের সূত্রে কাপড় পুরুষগণই বয়ন করিত। বৈদিক অনেক মন্ত্রে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যবসায় হিসাবে পুরুষগণ বয়ন করিত; স্ত্রীগণ তানা প্রস্তুত করিয়া দিত; এই শ্রম-বিভাগ তন্তুবায়গণের মধ্যে এখনও দেখা যায়। চরকায় সূতা কাটা ঘরে-ঘরে প্রচলিত থাকা আরো সম্ভবপর; নচেৎ সমুদায় সমাজের বস্ত্র সরবরাহ হইতে পারিত না। গৃহস্থ-ঘরে স্ত্রীগণও নিজ-নিজ পতিপুত্র প্রভৃতির কাপড় বুনিয়া দিতেন।

বয়ন-জীবীদিগের ব্যবসায়ে পুরুষ এবং স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রমবিভাগ-বিষয়ে বেদ-মন্ত্রের ইঙ্গিত রহিয়াছে—'তানা' তৈয়ারী করিবার কাজ স্ত্রীদিগের হাতে ছিল।

সরীস্তন্তুংতন্বতে। (ঋ—১০।৭১।৯)—'সূত্র কার্য্যে-নিযুক্তা স্ত্রী তানা তৈয়ারী করে।'

আবার স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া বয়ন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশে কাজ করিতেছে, এমন-এক চিত্র অথর্ব্ব বেদের নিম্ন-লিখিত সূক্তে রহিয়াছে:—

তন্ত্রমেকে যুবতী বিরূপে অভ্যাক্রামং বয়তঃ ষন্ময়ূখং। প্রান্যা তন্তুংস্তিরতে ধত্তে অন্যা নাপ বৃঞ্জাতে ন গমাতো অন্তম্।
তয়োরহং পরিনৃত্যন্ত্যোরিব ন বিজানামি যতরা পরস্তাৎ।
পুমানেনদ্বয়ত্যুদগৃণাতি পুমানেনদ্বি জভারধি নাকে।
(অথর্ব্ব ১০।৭।৪২-৪৩)

—এই মন্ত্রে কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগের কি প্রণালীতে কার্য্য করা উচিত তাহা বলা হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তন্তুবায়ের কার্য্য দেখানো যাইতেছে।

"ভিন্ন-ভিন্ন আকৃতির দুইটি নবীনা স্ত্রী ছয়টি খুঁটিতে লাগানো একই তাঁতে কাজ করিতেছে। একজন তাহার দিকের সূতাগুলি টানিয়া দিতেছে, আর একজন তাহা ধরিতেছে। কেহই কোনোরূপে কাজ নষ্ট করিতেছে না। তাহারা কখনও কাজ বন্ধও করিতেছে না। নর্ত্তকীদিগের ন্যায় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ইহারা এই যে কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে কে প্রথম ও কে দ্বিতীয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহা ব্যতীত আর তিনজন পুরুষও কাজ করিতেছে; তাহাদের একজন বানের দিকে কাপড় বুনিতেছে; আর-একজন উহা আলগা করিয়া ধরিতেছে। তৃতীয় জন তাহা ঠিকরূপে উপরে ধরিয়া রাখিতেছে।"

অন্যত্র বয়নশালায় এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে:—

পুমাং এনং তনুত উৎকৃণত্তি পুমান্ বিতত্নে অধিনাকে অস্মিন্। ইমে ময়ূখা উপসেদুরূ সদঃ সামানি চক্রুস্তসরাণ্যোতবে। (ঋ ১০।১৩০।২)
—"একজন 'তানা' ঠিক করিতেছে, আর-একজন 'বানা' খুলিয়া ধরিতেছে। এইপ্রকারে এই সুখদায়ক স্থানে বিশেষ রীতি-অনুসারে বয়ন-কার্য্য চলিতেছে। আর এখানে কয়েকটি খুঁটিতে তাঁত খাটানো রহিয়াছে, তাহাতে আরামদায়ক 'নলি' (মাকু) বানের দিকে চলিতেছে।"

বয়ন-বিষয়ক বহু শব্দ বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যেমন, 'বাসোবায়' ও 'বায়'—তন্তুবায় পুরুষ; সিরী ও বয়িত্রী—বয়নকারিণী স্ত্রী; বেমন—তাঁত; (যজু ১৯।৮৩); তসরং—নালী বা মাকু (shuttle) (ঋ ১০।১৩০।২, যজু ১৯।৩, মৈ. সং ৩।২।১, কাঠক ৩৮।৩); সীসং—সীসার ভার (lead-weight) কাপড় টান করিয়া ঠিক রাখিবার জন্য (যজু ১৯।৮০); নম্ভ, তন্ত্রং (বাজ. যজু ১৯।৮০, ঋ—১০।১৩০।২, অথর্ব্ব ১০।৭।৪৩), অনুচ্ছাদ (শত. ব্রা ৩।১।২।১৮) প্রাচীনতান (তৈ. সং ৬।১।১।৪, ঐ. ব্রা, ৮।১২।৩—তানা (warp), ওতু (ঋ ৬।৯।২—৩, তৈ. সং ৬।১।১৪, অথ ১৪।২।৫২), পর্য্যাস (শত. ব্রা ৩।১।২।১৮)—বানা পড়েন (woof); ময়ূখ—খুঁটি (peg)।

তন্তু-বিদ্যা বা চরকার আর্থিক লাভ-সম্বন্ধেও বেদ-সংহিতায় ইঙ্গিত রহিয়াছে:—

তন্তুনা রায়স্পোষেণ রায়স্পোষং জিন্ব (যজু ২৫।৭)
'ধনবৃদ্ধিকারী তন্তু হইতে ধন বর্দ্ধিত করিয়া লও।'

তন্তু শব্দের উক্ত বেদমন্ত্রে সাক্ষাৎ অর্থ যজ্ঞ; কিন্তু বেদ-মন্ত্র বহুস্থলে দ্ব্যর্থক। এই স্থলে, 'যেমন যজ্ঞ দ্বারা আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ সূত্র দ্বারা ঐহিক সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে',—এইরূপ বুঝা যায়। বেদ-মন্ত্রের অর্থ বহুব্যাপক ও রহস্যময়; ইহা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূলকে বুঝাইয়া থাকে। আবার সূতা কাটার আর্থিক প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে মন্ত্র বলিতেছেন যে

ধনী বা বণিকসমূহ হইতে অর্থ ধার করিয়াও সূতা কাটার সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবে:—

ত্বং সোম পণিভ্য আ বসু গব্যানি ধারয়ঃ। ততং তন্তুমচিক্রদঃ। (ঋ ৯।২২।৭)

আরো অনেকানেক মন্ত্রে বয়ন-বিদ্যার শিক্ষা ও শিক্ষালয় (ঋ ১০।১৩০।১), সূত্র রংকরা (যজু ২০।৪১, অথর্ব্ব ৩।৯।৩), বস্ত্র ধৌত করিবার ব্যবস্থা (অথর্ব্ব ১২।৩।২১), প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

আর্য্য-হিন্দুজাতি এদেশে আপন সভ্যতা বিস্তার করিবার পূর্ব্বে যাহারা এ-দেশের অধিবাসী ছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাই, তাহাদিগের মধ্যেও বয়নবিদ্যার

প্রচলন থাকা অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান সময়ের অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে বস্ত্র নির্ম্মাণ-নিপুণতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ব-শিল্পী বিধাতা মানবের দেহে লজ্জা ও মনে বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া, চতুর্দ্দিকে পশুরোম ও বৃক্ষবল্কলাদি রাশি-রাশি তন্তুর উপাদান রাখিয়া দিয়া, এবং উর্ণনাভ, গুটি-পোকা প্রভৃতির উজ্জ্বল শিল্প-কৌশলের দৃষ্টান্ত সম্মুখে ধরিয়া, এই পৃথিবীর কোন্ যুগের কোন্ সময়, কোন্ স্থানে কাহাকে কিরূপে সর্ব্বপ্রথম তন্তু ও বয়নশিল্পে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, তাহার নির্ণয় কে করিবে ?

কিন্তু কেবলমাত্র কোনো বিষয় জানা থাকিলে হয় না; তাহাদের উন্নতিসাধনই মানবের সভ্যতার পরিচয় দিয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দুগণ তাহাতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। পরবর্ত্তীকালের ভারতীয় সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয় যে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে প্রাচীন ভারতে শিল্পবাণিজ্যাদির উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া আসিতেছিল; এবং সেইজন্য সমাজে বণিক্ ও শিল্পী-সম্প্রদায়ের মধ্যে সুশৃঙ্খল নিয়মাদি প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধদিগের সাহিত্য পাঠ করিলে এবং এই যুগের শিলা-লিপি আদি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তৎকালে এই দেশে নানাবিধ শিল্প ও তাহার উন্নতিকল্পে নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বয়ন তখন ভারতীয় শিল্পে পরিগণিত হইত, এবং গৃহে-গৃহে চরকার কাজ চলিত। উল্লিখিত আছে, একদা ভগবান্ বুদ্ধদেব কোনো শ্রেষ্ঠীর অনুরোধ-ক্রমে একস্থানে সমবেত কুমারীগণকে উপদেশ দিতেছেন—"কুমারীগণ, তোমরা এইরূপ শিক্ষা করিবে, তোমাদিগের স্বামীর ঘরে যাহা আছে, অর্থাৎ উর্ণা বা ছাগ, মেষ প্রভৃতির রোমের কার্য্য, কার্পাস বা সূতার কার্য্য, রং করা, গুচ্ছ-গুচ্ছ করা, তুলা পেঁজা, চরকীতে বিচি-ছাড়ানো, ধোনা, পাঁজ কাটা, সূত্রনাল বাহির করা, প্রভৃতি কর্ম্মে তোমাদিগকে দক্ষ হইতে হইবে। এই-সকল কার্য্যে অলস হইবে না, নানা উপায় উদ্ভাবন করিবে, নিজে দক্ষ হইবে এবং অন্যকে দক্ষ করিয়া লইবে।"

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতে শিল্প ও বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বণিক্ ও শিল্পিগণ নিজ-নিজ ব্যবসায়ে উন্নতি ও সংরক্ষণ করিবার নিমিত্ত, আপনাদিগের মধ্যে সম্প্রদায় * প্রভৃতি গঠন করিয়া চলিত; এবং আপনাদিগের দল-নায়ক (শ্রেষ্ঠী) নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগের নেতৃত্বে ব্যবসায় পরিচালনা করিত; ইহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যের জাতক আখ্যায়িকাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতার রচনা-কালে তন্তু-করণ ও বয়ন-শিল্প যে কেবলমাত্র এই দেশে পরিজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে; বয়নকার্য্যে বর্ত্তমান কালে যে-সকল প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহার সমুদয়ই তখন কার্য্যে প্রযুক্ত হইত।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় বণিক্গণ পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের সহিত বাণিজ্যও করিতে-ছিল; এবং ভারত-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রভৃতি পণ্য প্রাচীন ব্যাবিলন্, মিশর প্রভৃতি দেশের লোকেরা আদরের সহিত গ্রহণ করিত। ইহাদিগের পরে প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের প্রাধান্যকালে, তথায় ইহাদিগের সমাদর ছিল। বর্ত্তমান কালে ঐতিহাসিকগণ ইহার প্রমাণ পাইতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, উত্তর-ভারতে আর্য্য-বসতি বিস্তারের সেই সুদূর প্রাচীন কাল হইতে, হিন্দুগণ অতি নিপুণতার সহিত এমন সূক্ষ্ম বস্ত্রসূত্র প্রস্তুত করিত যে, এই কাল পর্য্যন্ত অন্য আর-কোনো জাতি উহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও অধিক সুন্দর সূত্র প্রস্তুত করিতে পারে নাই। প্রাচীন ব্যাবিলন্ রাজ্যে মস্লিন্ নামক সূক্ষ্ম সূতার কোমল বস্ত্রের নাম ছিল—'সিন্ধু'। সিন্ধু-নদের তীরবর্ত্তী দেশ হইতে আনীত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছিল। ব্যাবিলনের গৌরবের সময় কত প্রাচীন, তাহা ঐতিহাসিক গবেষণার বিচারসাপেক্ষ। কেহ-কেহ উহা খৃষ্টীয় সনের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। সেই প্রাচীন যুগে আর্য্য হিন্দুদিগের শিল্প-সমৃদ্ধির পরিচয় ঐ দেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। তখন তাঁহারা অবশ্যই কার্পাস-বপন, সূত্র-প্রস্তুত-করণ ও বস্ত্র-বয়নে সুদক্ষ ছিলেন।

* Trade-guild (modern)

† 'মস্লিন নামটি পরবর্ত্তী কালের; টাইগ্রিস্ নদের তীরবর্ত্তী 'মোসাল' নামক স্থান হইতে ঐ নাম উদ্ভূত হইয়াছিল। ঐ স্থান মধ্য-যুগ হইতে সুন্দর বস্ত্র-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

অধ্যাপক ভেবার বলেন—অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় শিল্পিগণ যেরূপ নিপুণতার সহিত সূক্ষ্ম সূতার কোমল বস্ত্র প্রস্তুত করিত এবং নানা রংএর মিশ্রণ, ধাতুদ্রব্য ও মণিমাণিক্যাদির কার্য্য, সুগন্ধি দ্রব্যের প্রভৃতি প্রস্তুত-করণ ও অন্য নানাবিধ কারুকার্য্যে তাহাদিগের যেরূপ দক্ষতা ছিল, তাহাতে পৃথিবীময় তাহাদিগের সুখ্যাতি বিস্তারলাভ করিয়াছিল।"

প্রাচীন গ্রীক-সমাজে ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ 'মস্‌লিন্‌' বস্ত্র 'গ্যাঞ্জেটিকা' নামে কথিত হইত; গঙ্গানদীর দেশে উৎপন্ন বলিয়া ঐ নাম হইয়াছিল। তথায় উহার অতিশয় আদর ছিল। পণ্যজাত দ্রব্যের এক অভিধানের গ্রন্থকার ডাক্তার ওয়াট্‌ বলিতেছেন—"গ্রীক্‌ ইতিবৃত্তবিদ্‌ হেরোডোটাস্‌ ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সেই-দেশে একপ্রকার বস্তুবৃক্ষে পশম ফলে; তাহা গুণে ও সৌন্দর্য্যে মেষ-রোম হইতেও উৎকৃষ্ট। ভারতীয় লোকেরা উহা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।" এই হেরোডোটাস্‌ গ্রীক্‌ ঐতিহাসিকদিগের আদিগুরু; খৃষ্টপূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ভারতীয় একপ্রকার বৃক্ষ হইতে যে পশম উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা যে কার্পাস তাহা বুঝা যাইতেছে। আর এই উক্তি হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহার পূর্ব্বে গ্রীকগণ কার্পাসের সহিত পরিচিত ছিলেন না, রোমজ বস্ত্রাদিই ব্যবহার করিতেন। অজ্ঞাত কোনো বস্তুর সহিত প্রথম পরিচয়ে তাহাকে পূর্ব্বজ্ঞাত সমশ্রেণীর বস্তুবিশেষের নামে অভিহিত করা স্বাভাবিক। এই-জন্যই আবার প্রাচীন গ্রীকগণ ভারতীয় কার্পাসকে"শ্বেত-পশম" নামে অভিহিত করিয়াছিল। তাহারা ভারতবর্ষ হইতেই সর্ব্বপ্রথম কার্পাস প্রাপ্ত হইয়াছিল ও উচ্চ ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতে সর্ব্বপ্রথম হেরোডোটাসের গ্রন্থেই কার্পাস-সূত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস-শিল্প ক্রমে পারস্য, আরব, মিশর, ফিনিসীয় ও দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তার লাভ করে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মাত্র ইউরোপীয়গণ সূক্ষ্ম সূত্র করণে প্রবৃত্ত হয়। ইংলণ্ড তাহা সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্রহণ করিয়াছে।

রোম-সাম্রাজ্যে ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি প্রভূত-পরিমাণে ব্যবহৃত হইত এবং তাহাতে রোমকদিগের প্রচুর অর্থ ভারতবর্ষে চলিয়া আসিত। ঐতিহাসিক প্লিনি (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আরো কত পূর্ব্বে, খৃঃ পূঃ বিংশ শতাব্দীর মিশর দেশে 'মামি' করিয়া মৃতদেহ কবরস্থ করা হইত, এরূপ দেখা যাইতেছে যে, তাহা অতি উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় মস্‌লিনে আবৃত করিয়া দেওয়া হইত।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীক্‌-বিজেতা আলেক্‌জান্দার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ ধন, ধান্য ও নানাপ্রকার পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত বিজেতার সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাহার বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তখন আরব, ফিনিসীয়, গ্রীক্‌, রোমান ও মিশরীয় বণিক্‌গণ ভারত-জাত পণ্য পশ্চিম-এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপে লইয়া গিয়া বাণিজ্য করিত ও তাহাতে বিস্তর লাভবান্‌ হইত।

আলেক্‌জান্দারের আক্রমণের পরবর্ত্তী সময়েও ভারতীয় শিল্প ও ঐশ্বর্য্যের কোনোরূপ অবনতি হয় নাই। বরং ঐ সময় হইতে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক এবং গুপ্ত ও চালুক্য প্রভৃতি বংশীয় পরাক্রমশালী নৃপতিগণের রাজত্বকালে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যাদির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া আসিতেছিল। ঐ সময় পারসিক, রোমক প্রভৃতি রাজ-দরবারের সহিত ভারতীয় নৃপতিগণের আন্তর্বাণিজ্যিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত ছিল; ঐতিহাসিকগণ তাহার প্রমাণ পাইতেছেন।

মৌর্য্যনৃপতিগণের রাজত্বকালে ও তাহার পরে যে-সকল বিদেশীয় পরিব্রাজক ও রাজদূত এই দেশে আসিয়া-ছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 'পেরিপ্লাস্‌' নামক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর এক রোমক বণিকের জল-যাত্রা-বিবরণীতে দেখা যায়, তৎকালে ভারতবর্ষের উপকূল ও অভ্যন্তর ভাগ পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে—বন্দর ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত শতাব্দীর

মধ্যভাগে তাঁতে-জাত বস্ত্র রোম-সাম্রাজ্যে অতিশয় চলিতেছিল। তাৎকালিক আরও অনেক পাশ্চাত্য পরিব্রাজক ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ান্, হিউএন্-সঙ্ প্রভৃতি বহুসংখ্যক চীনদেশীয় পরিব্রাজক খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে এদেশে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার যে-বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে শিল্প-কলার বিশেষ উন্নতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে বহিরাক্রমণের বিপ্লব আরম্ভ হয়। দলে-দলে মুসলমান বিজেতাগণ পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক ক্রমে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতভূমিতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু তাহাতে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ কোনো ক্ষতি হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কারণ মুসলমানেরা এই দেশে রাজত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিতেই আসিয়াছিল; শিল্প ও বাণিজ্যের লোপ সাধন করিতে আসে নাই। আবার ভারতীয় সমাজ-বন্ধনের তখনও এমন বিশেষত্ব ছিল যে, বহিরাক্রমণের বা অন্তর্বিপ্লবের অন্তরায়ে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদির বিশেষ কিছু বিঘ্ন হয় নাই। মার্কোপোলো নামক ভিনিস্-দেশীয় পরিব্রাজক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি তখন এই দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের যে-বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মুসলমান রাজত্বের সেই নানা বিপ্লবের ও উদ্বেগের সময় ভারতীয় শিল্পের সমৃদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পরে যখন মোগল রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং আকবর প্রভৃতি মহামান্য নৃপতিগণ ভারত-সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিলেন, তখন ভারতবর্ষের শিল্প ও কারুকার্য্যের কতই না শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বারনিয়ে, তভারনিয়ে প্রভৃতি ইউরোপীয় ভ্রমণ-কারিগণ তাহার উজ্জ্বল কাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন।

* * *

বাস্তবিক ভারতীয় শিল্প ও পণ্যাদির নামে আকৃষ্ট হইয়াই বর্ত্তমানকালের ইউরোপীয়গণ এই দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তবেত্তা মুর বলিতেছেন—"ভারতবর্ষে যেমন সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তেমন জগতের আর কোনো স্থানের মনুষ্যের হাতে হইতে পারিত না। তাহা লইবার জন্য ইউরোপীয় বণিকগণ যৎপরোনাস্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া ও নানা-প্রকার বিপদ্ মাথায় লইয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিত।"

ভারতবর্ষ যে এতকাল পর্য্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তন্তু ও বয়নকার্য্যে নিপুণতাই তাহার প্রধান কারণ। পণ্যের মধ্যে বস্ত্রই প্রধান ও অধিকতর সমৃদ্ধির হেতু। বর্ত্তমান পৃথিবীর বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ও অন্যান্য তন্তু-শিল্প-প্রধান দেশ-সমূহ প্রবেশ লাভ করিবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ বিগত দুই শত বৎসরেরও অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ জগতের বস্ত্র-বাণিজ্যের প্রধান অধিকারী ছিল। চরকাই তাহাতে মূল সম্বল ছিল।

কবি কৃত্তিবাস

শ্রী কলিঙ্গনাথ ঘোষ

আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর অতীত হইতে চলিল, বাঙ্গালীর ঘরের কবি অমর কৃত্তিবাস নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামে বনমালী ওঝার ক্রোড়ে বসিয়া "হাতে-খড়ি" লইয়াছিলেন—'ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উঝাকর' 'হেন গুরুর ঠাঞি' 'বিদ্যার উদ্ধার' করিতে বড়গঙ্গার পার প্রতাপাদিত্যের যশোহরে আসিয়াছিলেন। পাঠ সমাপ্ত করিয়া, গুরুস্থানে 'মেলানি' লইয়া কৃত্তিবাস পণ্ডিত গৌড়েশ্বরের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, 'পঞ্চ শ্লোকে

ভেটিলেন রাজা গৌড়েশ্বরে'। পাণ্ডিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ স্বরচিত সাতটি শ্লোক নানা ছন্দে নানা মতে আবৃত্তি করিলেন,

"পঞ্চদেব অধিষ্ঠান তাহার শরীরে।
সরস্বতী-প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে॥"

রসাল শ্লোক-পাঠ শুনিয়া গৌড়েশ্বর পণ্ডিতের পানে চাহিলেন, এবং খুসী হইয়া মহারাজ 'চন্দনে ভূষিত' কৃত্তিবাসকে ফুলের মালা দিলেন, বহুমূল্য 'পাটের পাছড়া' দান করিলেন—'কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া'। সভার লোক মহা আনন্দিত, 'সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।'

পাত্রমিত্রের কাছে রাজা গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, আর 'কিবা দিব দান?' পাত্রমিত্র সকলে দ্বিজরাজকে বলিল, 'যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে'। কৃত্তিবাস উত্তর করিলেন,

"কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যেথা যাই তথায় গৌরব-মাত্র সার॥"

'দ্বিজরাজে'র উপযুক্ত উত্তর বটে। ত্যাগশীল লোভ-হীন কৃত্তিবাসের আদর্শ চরিত্রের আর দ্বিতীয় নিদর্শন অনাবশ্যক। সাংসারিকদের মধ্যে কৃত্তিবাসের মতন অমন একটি লোভহীন ত্যাগশীল একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দুর্লভ।

এযুগে আমরা শুধু গর্ব্ব করিয়া, অহঙ্কার দেখাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না। 'পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী', কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই স্পর্দ্ধা করিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই, যে পণ্ডিতের শুধু গৌরবমাত্র সার। তাহার মুখে এ আত্মশ্লাঘা অসহ্য নহে—'যে-গরুটায় দুধ দেয় তার লাথিটাও সয়।'

"যত-যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে,
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥"

যে ফুলিয়া পণ্ডিতের অসাধারণ কবি-প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ "সন্তোক" দিয়াও রাজা গৌড়েশ্বর পরিতৃপ্ত হন নাই, রাজসভায়, অশেষ-প্রকারে সম্মানিত সেই 'ধীমান্ সাধ্যশান্তিজনপ্রিয়ঃ' কবি কৃত্তিবাসের মুখে এই আত্ম-অহঙ্কার অশোভন নহে। এই অহঙ্কার-বাক্য কবি অবশ্য তাঁহার সংস্কৃত কবিতা-সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাংলা কবিতার পক্ষে ঐ অহঙ্কারের কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য, গর্ব্বিত বচন লক্ষ্মী সহিতে না পারিলেও, সরস্বতী তাঁহার বরপুত্রগণের এ-অপরাধ সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেন। তাই কৃত্তিবাসের ভাষার প্রাঞ্জলতা, সোজা সরল কথায় মনের ভাব প্রকাশ, তাঁহার কবিতার ঋজু এবং অপ্রতিহত গতি, সর্ব্বোপরি তাঁহার সৃজন-ক্ষমতা ও মধুর কোমল করুণরস-সৃষ্টি, আমরা অতি অল্প কবির ভিতরই দেখিতে পাই—এক কাশীরাম দাস ব্যতীত বাংলাদেশে কৃত্তিবাসের অসামান্য কবি প্রতিভার নিকটে আর-কেহ বড়-একটা ঘেঁসিতে পারেন না।

একটি দেশের ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবাল-বৃদ্ধবনিতার যিনি পরম প্রিয় কবি, তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভায় কে সন্দেহ করিবে? বাংলার রবি, বিশ্বের কবি, আজিও বাংলার জাতীয় কবি কৃত্তিবাসকে বিতাড়িত করিয়া বাঙালীর পল্লী-হৃদয়ের বিরাট্ সিংহাসন দখল করিতে পারেন নাই। পল্লীগ্রামে, মহিলা-মজলিসে, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের অসীম প্রভাবের কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

দীনেশবাবু বলিয়াছেন—"কৃত্তিবাস শুধু কবি নহেন, তিনি বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে উৎসবের স্রষ্টা; তাঁহার কথা লইয়া রামলক্ষ্মণ-প্রসঙ্গ বাঙালী মুখে-মুখে আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে—তাহা না হইলে কি ব্যাধবধূ ফুল্লরা সীতার দৃষ্টান্ত চণ্ডীদেবীকে শুনাইতে পারিত?" কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেখিতে পাই ফুল্লরা কালকেতুকে বলিতেছেন—

"কি লাগিয়া বীর এবে পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥

অথবা 'খঞ্জনগঞ্জন-আঁখি অকলঙ্কশশিমুখী' পাটের-সাড়ী-পরা ষোলো বৎসরের রামাকে ফুল্লরা বলিতেছেন :—

"কৌশল্যা রামের মাতা　　কৈকয়ী তাহার সতা
দুঁহার কোন্দল সর্ব্বদেশে।"
"শুনগো শুনগো সই　　হিত-উপদেশ কই
ইতিহাসে কর অবগতি।"

ব্যাধবধূ ফুল্লরা-কথিত এই যে "ইতিহাস' "সতী

সাবিত্রীর" উপাখ্যান হইতে আরম্ভ করিয়া—ইহার সব ইতিহাসই বঙ্গরমণীর নিকট সুপরিচিত—কৃত্তিবাস-কাশীরামদাসের কল্যাণে বাঙ্গলার জলবায়ুর সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালী ইতিহাস হজম করিয়া মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছে।

কৃত্তিবাস প্রকৃত পক্ষে বাংলার তুলসীদাস। কারণ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু মহাকাব্য নয়, তুলসীদাসের রামায়ণের মতন উহা বাঙালীর ধর্ম্মগ্রন্থ। কৃত্তিবাস একাধারে কবি ও ধর্ম্মোপদেষ্টা। তিনি যেমন আনন্দ দান করেন, তেম্‌নি ধর্ম্মোপদেশও দিয়া থাকেন। রামায়ণের অমূল্য উপদেশাবলী আবৃত্তি করিয়া বাংলা দেশে ধর্ম্ম ও নীতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, তাহা বাংলার যাহারা অস্থিমজ্জা সেই পল্লীবাসীদের মধ্যে—নিরক্ষর অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত কৃষক হইতে, শিক্ষিত ভদ্র পরিবারে—বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। বিদ্যাসাগর-চরিত-লেখক চণ্ডীবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "এদেশের নিম্ন-শ্রেণীর লোক যে অন্যান্য দেশের তদবস্থাপন্ন লোকদের অপেক্ষা নম্র ও ধর্ম্মশীল, কৃত্তিবাসের অক্ষয়কীর্ত্তি ও কাশীরাম দাসের ভারতরত্নখনিই তাহার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেল দ্বারা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, ভারতে বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণসমূহের দ্বারা যে উদ্দেশ্য সম্যক্ সিদ্ধ হয় নাই, বাঙ্গলা দেশে তাহা এই দুই মহাকাব্য-গ্রন্থ দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বহুবিধ বিভিন্নতা ও বিচিত্রতার মধ্যে ভারতে জাতীয়তার শেষ রেখা সমাজ-দেহের ভিত্তি-মূলে যে দেখিতে পাওয়া যায়, রামায়ণ ও মহাভারত তাহা নীরবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম, ভারতে ব্যাস ও বাল্মীকি।"

রামায়ণ-মহাভারত বাঙালী স্ত্রীলোকের উপর কি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। বঙ্গললনা রামায়ণ-মহাভারত কি অকপট বিশ্বাসে, কি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পাঠ করেন, তাহার একটি চিত্র শরৎবাবু তাঁহার 'চরিত্রহীনে' নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে আদ্যশ্রাদ্ধের অব্যবহিত পরেই একপালা রামায়ণ দেওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। প্রেত-আত্মার কল্যাণের নিমিত্তই যে রামায়ণ দেওয়া হয় তাহা মনে করিবেন না। স্ত্রীলোক ও অশিক্ষিতদের ধারণা শ্রাদ্ধের পর রামায়ণ গান হইলে বাড়ীতে আর ভূতপ্রেতের উপদ্রব হয় না। 'রাম নামে ভূত পলায়' এই বিশ্বাসেই ভূত-শান্তির জন্ম অর্থাৎ গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় উক্ত প্রথা আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে।

আর-একটি প্রথা আছে, সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ষষ্ঠ রাত্রিতে অর্থাৎ যে দিন বিধাতা পুরুষ শিশুর ভাগ্য লিখিয়া যান, ছেলে হইলে রামের জন্ম, আর মেয়ে হইলে সীতার জন্ম কৃত্তিবাস হইতে অবশ্য-অবশ্য পাঠ করিতে হয়। আজকাল বটতলার দৌলতে ঘরে-ঘরে রামায়ণের অভাব নাই—যাহার ঘরে রামায়ণ নাই, তাহার অন্যের নিকট চাহিয়া-চিন্তিয়া রামায়ণ জোগাড় করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না—তাই প্রতিঘরে প্রসূতির শিয়রে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সযত্নে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সাজাইয়া রাখা হয়। এ সম্মান কিন্তু কাশীদাসী মহাভারতও পান না, পূর্ব্ববঙ্গে ঘরে-ঘরে রামায়ণ ঐরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের মতন সম্ভ্রম ও ভক্তিসহকারে আজিও আদৃত হয়।

রাম-নাম লইলে ভূত পলায়—এ-বিশ্বাস সকলের না থাকিতে পারে, রত্নাকর-দস্যু 'মরা-মরা' করিয়া সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ পাইয়াছেন একথাও বোধ হয় কেহ-কেহ হাসিয়া উড়াইয়াছেন, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট রামনামের যে অশেষ মহিমা!

কৃত্তিবাসের প্রসাদে বাঙালীর কাছে রাম লক্ষ্মণ সীতা তাঁহাদের মনুষ্যজন্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রাম-লক্ষ্মণ বিষ্ণুর অবতার, সীতা ত স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। কোন্ বাঙালী অস্বীকার করিবেন, তাঁহারা দেবদেবীর অবতার নহেন? ঐ যে হনুমানজি, তিনিও ত ব্রহ্মার শাপে স্বর্গচ্যুত দেবতা! আর দশমুণ্ড কুড়িহস্ত ঐ যে রাবণ রাজা, তিনি ত 'ঠাকুরমা'র ঝুলির রাক্ষসদেরই পূর্ব্ব-পুরুষ! স্বর্ণ-লঙ্কার ঐশ্বর্য্য ও সভ্যতা যে শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাপুরীর অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ন্যূন ছিল না, তাহা

বাল্মীকির কাব্য পড়িয়া বাঙালী শিখিয়াছে। আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে খাঁটি বাঙালীরা নিত্য অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের কাছে "রামস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। রামকে সকলেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়া বিশ্বাস করেন। কৃত্তিবাসের রত্নাকর দস্যুর কাছে ব্রহ্মার কৃপায়—

মরা-মরা বলিতে আইল রাম-নাম।
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥
তুলরাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম-নামে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥

নামের মহিমা দেখিয়া ব্রহ্মারও আতঙ্ক হইয়াছিল। তাই কৃত্তিবাস গাহিয়াছেন—

রাম-নাম বল ভাই এইবার বার।
ভেবে দেখ নাম বিনা গতি নাই আর॥
রামনদী ব'য়ে যায় দেখহ নয়নে।
গঙ্গায় গিয়া স্নান কর কূলে বসি কেনে॥
হেদেরে পামর লোক পার হবি যদি।
মন ভরি' পান করে, ব'য়ে যায় নদী॥
মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ডাকে।
সেই স্বর্গে যায় রাম দাঁড়াইয়া দেখে॥
এমন রামের গুণ কি বলিতে পারি।
হেলায় তরিয়ে যাবে মুখে বল হরি॥

আর-একস্থলে

পতিত পাবন নাম কি গুণ ধরিবে।
সাধুজনে তরাইতে সর্ব্ব লেবে পারে।
অসাধু তরান্ তিনি ঠাকুর বলি তারে॥
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি,
তরিবারে দুটি পদ করেছ তরণী॥
তুমি যদি ছাড় দয়া আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হ'য়ে চরণে বাজিব॥

কেহ-কেহ বলেন, কৃত্তিবাস, যুগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব প্রচুর-পরিমাণে তাঁহাতে ছিল। এ-কথা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু কৃত্তিবাসের মানস-তনয় তরণীসেন ও বীরবাহু এমন রামভক্ত হইয়া উঠিল কেমন করিয়া? তরণীসেন স্বীয় অঙ্গে রাম-নামের ছাপ মারিয়া রামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, তাঁহার রথেও রামনামের ছাপ-দেওয়া সব নিশান উড়িতেছে এবং তাঁহার রণবাদ্য শুধু রামজয়-শব্দ বাজাইতেছে। বীরবাহু শ্রীরামচন্দ্রকে—

"রাক্ষস-বিনাশকারী ভুবনমোহন"

বলিয়া স্তব করিতেছেন! এমন-কি দশমুণ্ড কুড়িহস্ত রাবণরাজা স্বয়ং রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া,

"জন্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার,
করেছি পাতক বহু সংখ্যা নাহি তার।"

বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন এবং তাঁহার কুড়িচক্ষু দিয়া দর-দর করিয়া অশ্রু পড়িয়া রাজ-পরিচ্ছদ সিক্ত করিতেছে।

কথক-ঠাকুরদের মুখে শুনিয়া কৃত্তিবাস ঠাকুর রামায়ণ-রচনা করিয়াছেন একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই কবি কৃত্তিবাসের এই বৈষ্ণব প্রভাবের কথায় বিশ্বাস করিতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাজ-আজ্ঞায় সরস্বতী-বরে রামায়ণ রচিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কথায়-কথায় প্রেম ও ক্ষমার বন্যা বহাইয়া বৈষ্ণব-তত্ত্বের আদ্যশ্রাদ্ধ করেন নাই। তবে "লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত", একথাটা ত অক্ষরে-অক্ষরে সত্য! সুতরাং লোক বুঝাইতে গিয়া কৃত্তিবাস-পণ্ডিত কি কবিগুরু বাল্মীকি ও তাঁহার সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন? গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ, কৃত্তিবাসের রামায়ণেও কি তেমনি বাল্মীকির প্রকাশ? "এ কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে।"

কবিগুরু বাল্মীকি বৈদিক সভ্যতার পরবর্ত্তী যুগের ভারতীয় সভ্যতার প্রতিনিধি, তখনকার নীতিপ্রধান আধ্যাত্মিক সভ্যতার ছাপ বাল্মীকির রামায়ণে স্পষ্ট রহিয়াছে—বিশিষ্ট সমালোচকেরা একথা নখদর্পণে প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং বাল্মীকি-মুনির সৃষ্টি রামলক্ষ্মণ সীতাকে আমরা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ-গ্রন্থে পাইব কিরূপে? কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ করেন নাই, তুলসীদাসের মতন নিজে স্বয়ং রামায়ণ রচনা করিয়াছেন—

"বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু-আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান।"

গৌড়েশ্বরও তাঁহাকে রামায়ণ অনুবাদ করিতে বলেন নাই, "রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ," এবং তাই কৃত্তিবাস "রচে গীত সরস্বতী-বরে।" কৃত্তিবাস পরাধীন

দেশের পরপদানত হিন্দুজাতির কবি, বাল্মীকির যুগে যে-সভ্যতা-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা তখন অস্তমিত। মুসলমানের সংস্পর্শে আসিয়া ইস্লামের প্রভাবে তদানীন্তন বাঙালী হিন্দু সমাজের রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ছায়ায় যেমন আগাছা জন্মে, দাসত্বেও তেম্নি দুর্ব্বল, পরপদলেহী, সংকীর্ণ-চেতা মানুষ গড়িয়া উঠে। উচ্চ ভাব, উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আদর্শ গণ্ডীবেষ্টিত মানুষ হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না।

এই পরাধীন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালী হিন্দুর দৈহিক ও মানসিক অবনতির ছাপটা কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রতি ছত্রে বিদ্যমান। তাই পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি যে, কৃত্তিবাস যুগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই এবং সেইজন্যই কৃত্তিবাস যে মৌলিক রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহাতে "পরিঘসঙ্কাশবাহু", ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ, রঘুকুলতিলক—যিনি নির্ভীক, জিতেন্দ্রিয়, সত্যসন্ধ, অপরিমেয় ধৈর্য্যশীল ও গম্ভীর, বিপৎপাতে ও শোকের তীক্ষ্ণশরাঘাতে ব্যথিত-হৃদয় হইলেও, অবাতবিক্ষোভিত মহাসাগরের ন্যায় প্রশান্ত, চির তুষারকিরীটধারী হিমাদ্রির মতন অটল, অচল আদর্শ প্রজানুরঞ্জক নৃপতি শ্রীরামচন্দ্রের আভাস আমরা পাই না, বরং তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত এক রামকে দেখিতে পাই যিনি ধনুক হাতে করিয়া 'কাননে কাননে' ভ্রমণ করেন!—পাঁচশত বৎসর পরমুখাপেক্ষী, পরপদানত, দাসত্বের গুরুভারে জর্জ্জরিত বাঙালী হিন্দুর আদর্শের সঠিক নমুনা। লঙ্কাকাণ্ডে সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার সময় রামের যে চিত্রটি কৃত্তিবাস আঁকিয়াছেন তাহাতেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে—

> বহিছে চক্ষুর জল শ্রীরাম কাতর।
> সীতারে বলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর॥
> আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাশ।
> ব্যবহার তোমার না জানি দশ মাস॥
> সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
> তোমা হেন নারীতে নাহিক প্রয়োজন॥
> তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে।
> যথা-তথা যাও তুমি থাক অন্য স্থানে॥
> এই দেখ সুগ্রীব বানর-অধিপতি।
> ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি॥
> লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ।
> ইহার নিকটে থাক যদি লয় মন॥
> ভরত শত্রুঘ্ন মম দেশে দুই ভাই।
> ইচ্ছা হয় থাক গিয়া সে-সবার ঠাঁই॥
> যথা-তথা যাও তুমি আপনার সুখে।
> কেন দাঁড়াইয়া কান্দ আমার সম্মুখে॥

ব্যাধবধূ ফুল্লরা চণ্ডীদেবীকে যে-উপদেশ দিয়াছিলেন এখানে আমাদের শুধু সেই-কথাই মনে পড়ে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কালকেতুর স্ত্রীর মুখ দিয়া তৎকালীন বঙ্গসমাজে হিন্দুনারীর অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন মাত্র। ভ্রষ্টাচার লম্পটস্বভাব স্বামী পাপপঙ্কে ডুবিয়া থাকিলেও তার 'সাতখুন মাফ।' আর স্ত্রী একটু চোখের আড়ালে, একরাত্রি ঘরের বাহিরে থাকিলেই তীব্র হলাহলের ন্যায় বর্জ্জিতা হয়, যে স্ত্রী গলিতকুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত স্বামীর ইন্দ্রিয়চরিতার্থের নিমিত্ত তাঁহাকে ঘাড়ে করিয়া বহিয়া রূপসী বারবনিতার ঘরে লইয়া যাইতে পারে, সেই স্ত্রী যেদেশে আদর্শ সতী বলিয়া বিবেচিত হয়, সেদেশে কিছুই অসম্ভব না! ফুল্লরা চণ্ডীদেবীকে ভয় দেখাইতেছেন যে, তিনি যদি ফুল্লরাদের কুঁড়েয়া ঘরে একরাত্রিও থাকেন, তবে স্বামী-পাশে আর ঠাঁই পাইবেন না, তাঁহাকে আর ঘরে লওয়া হইবে না। সুতরাং কৃত্তিবাসের রাম, একদিন একরাত্রি নয়—একেবারে পুরা দশ মাস পরগৃহে বাস করার অপরাধে সীতাকে পরিত্যাগ ক'রতে চাহিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আরো বিশেষতঃ সীতার কাছে রামের কোন আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল না—দশ মাস পর্য্যন্ত সীতার ব্যবহার তিনি কিছুই জানেন না! দশ মাস অদর্শনে রাম-সীতার মতন আদর্শদম্পতীর ভালোবাসা এ-রকম লোপ পাইল কেমন করিয়া তাহা বুঝিতে পারি না। বাল্মীকির রামচন্দ্রের চরিত্রের যে সমালোচনা পড়িয়াছি, তাহাতে বোধ হয় রামের মুখে এসব বাল্মীকি মুনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিতেন না! একথা শুধু কৃত্তিবাসের মেয়েলী-ধরণের নাকে-কাঁদুনে নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন, অবিশ্বাসী, সংকীর্ণ-চেতা দাসসুলভ সংশয়াচ্ছন্ন রামচন্দ্রের মুখেই শোভা পায়।

নীলাকাশের মতন অসীম উদার ভাব, বুকভরা সংকোচহীন অকপট বিশ্বাস অধীন জাতির মানুষ কোথায়

পাইবে? মন্দকে নিজগুণে ভালো করা, কুৎসিতকে সৌন্দর্য্যদান করা, পশুত্বকে দেবত্বে উন্নীত করা, এসব আকাঙ্ক্ষা কি অধীন জাতির পক্ষে সম্ভব?

এই সামাজিক হীন আদর্শ ঢাকিবার জন্য কৌশলী কবি কৃত্তিবাস একটা গোঁজা-মিল দিয়াছেন—বোধ হয় শকুন্তলার দুর্ব্বাসার শাপ স্মরণ করিয়া মন্দোদরীর দ্বারা তিনি জানকীকে অভিশাপ দেওয়াইয়াছিলেন—

এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকস্মাৎ।
বিষদৃষ্টে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ॥

বেচারী জানকী রঘুনাথের বিষ-নজরে পড়িবার মতন এমন-কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন! কৃত্তিবাস আবার যশ-অভিমানী রামের মুখ দিয়া বীর দর্প করাইয়াছেন---

থাকিতে রাক্ষস ঘরে না হইত উদ্ধার।
ত্রিভুবনে অপযশ গাইত আমার॥
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে।
এখন মেলানি দিলাম সভার ভিতরে॥

ইহার উত্তরে পাঁচশতাব্দী পূর্ব্বের জনৈক বঙ্গরমণীর মতন ধীরে-ধীরে ক'ন সীতা মুছিয়া নয়ন—

ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি॥
বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥
সবেমাত্র হরিয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ॥
হনুকে আমার কাছে পাঠাইলে যখন।
আমারে বর্জ্জন কেন না কৈলে তখন॥
বিষ খাইতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ।
লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম ক্লেশ॥ ইত্যাদি।

সীতার এই বিষ খাওয়ার কথায় ব্যাধবধূ ফুল্লরার কথা মনে পড়িল। 'স্নেহলতার' ভগিনীরা কেরোসিনের কথা জানিতেন না—বিষভক্ষণই তখন খুব প্রচলিত ছিল। ফুল্লরাও চণ্ডীদেবীকে তাই বলিতেছেন—

কোপে করি বিষপান,　　আপনি ত্যজিবে প্রাণ,
সতীনের কি হইবে হানি।

বাল্মীকির সীতা বোধ হয় বিষ খাওয়ার কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। আর শুনিয়াছি, সীতাদেবী রামচন্দ্রকে লঙ্কাকাণ্ডে প্রাকৃত ব্যক্তি অর্থাৎ ছোটো লোক বলিয়া গালিগালাজ করিয়াছেন। আর কৃত্তিবাসের সীতা বাঙালীর ঘরের ভীরু মেয়ের মতন স্বামীর সন্দেহ কুবাক্য-বাণ নীরবে সহ্য করিয়া নিজের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন—আরো আশ্চর্য্য, পাঁচশ' বছর পূর্ব্বে আমাদের ভাষায় 'ইতর' শব্দটি ঢুকিয়াছে। তাই বোধ হয় সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় তেজস্বিনী সীতাদেবী যে-জাতির আদর্শ ছিল, সে-জাতির কবির কল্পনায় অঙ্কিত সীতা এতদূর সতর্ক সাবধান ছিলেন যে, বাল্যকালে খেলার সময় ভুলক্রমেও বালক সঙ্গীকে স্পর্শ করেন নাই! পাঁচশ' বছর পূর্ব্বের বাঙালী হিন্দু সমাজের এই 'ছোঁয়াচে' রোগের হাত হইতে কৃত্তিবাস পণ্ডিত অব্যাহতি পান নাই। দীনেশ-বাবু লিখিয়াছেন, "কৃত্তিবাসের সময় বহুবিবাহ বাংলা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, রাম যখন পরশুরামের ধনুর্ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সীতা কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যার ন্যায় স্বামীর বহুবিবাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া বলিয়াছেন:—

একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া রঘুনাথ
করিলেন আমারে বিবাহ সেই সাথ॥
আর বার ধনুক আনিল ভৃগুমণি।
না জানি হইবে আমার কতেক সতিনী॥

এই প্রসঙ্গে বাল্মীকির এক অমোঘ মহিমামণ্ডিত ছত্র মনে পড়ে--ন রামঃ পরদারেভ্যশ্চক্ষুভ্যামাপিপশ্যতি। যেমন বাল্মীকির রাম, তেম্নি তাঁহার সীতাদেবী। "পেঁচা দেখিয়া পেঁচী গড়ায়, রাজা দেখিয়া রাণী গড়ায়"—বাংলার এই প্রবাদবাক্য অতীব সত্য, যেমন কৃত্তিবাসের রাম, তেমনি তাঁহার সীতা, "যেমন সীতা, তেম্নি রাম", একথা কৃত্তিবাস ও বাল্মীকি উভয়ের পক্ষেই সত্য।

তবে বাল্মীকির স্বাধীন ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সভ্যতা-প্রসূত মনুষ্যত্বের মহান্ আদর্শ, আর কৃত্তিবাসের পরাধীন বাংলার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্র আদর্শ—ইঁহাদের হুবহু মিল দেখিতে চাওয়া আহাম্মকি। অপ্রতিহত গতিতে প্রবহমাণ ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহের সহিত বদ্ধ পুষ্করিণীর সলিলের তুলনা চলে না, তাই আমরা বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের তুলনামূলক সমালোচনা এইখানেই শেষ করিতে চাই।

তবে বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের তুলনা করিয়া যাঁহারা কবি-হিসাবে কৃত্তিবাসকে বাল্মীকির কাছে আদৌ আমল

দিতে চান না, তাঁহাদের প্রচেষ্টাও ভ্রান্ত মনে করি। কবি কৃত্তিবাসকে খাটো বা হেয় করিবার প্রয়াস সাগর-ছেঁচার ন্যায় একেবারে ব্যর্থ হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে কৃত্তিবাস, বাল্মীকি বা বাল্মীকির অনুবাদক নহেন। কৃত্তিবাস কৃত্তিবাস; তিনি বাল্মীকি নহেন বলিয়া সমালোচকের দুঃখ বা আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। কৃত্তিবাস বাংলার কবি, বাঙালীর ঘরের কবি, কৃত্তিবাস তাঁহার কৃত্তিবাসী রামায়ণে তদানীন্তন বঙ্গসমাজের সভ্যতা ও আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন; কৃত্তিবাসের রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতির চরিত্রে অলক্ষিতে, বাঙ্‌লার স্ত্রীপুরুষ, বাঙালী হিন্দুর ঘরের স্বামী, দেবর ও বধূর ছাপ অতি স্পষ্টই পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ-রচয়িতা বাঙালীর ঘরের কবি কৃত্তিবাস, ভারতের বাল্মীকি নহেন, এবং এই অপরাধে কোনোদিনই বাঙালী তাঁহার প্রাণের কবিকে—"ধীমান্ সাম্যশান্তিজনপ্রিয়ঃ" কবি কৃত্তিবাসকে—কিছুতেই উপেক্ষা বা অনাদর করিতে পারিবে না।

চণ্ডীবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "বঙ্গের অমর কবি শ্রীকৃত্তিবাস ও শ্রীকাশীরামদাস রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করিয়া আমাদিগকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহাদের ঋণপরিশোধপ্রয়াস বাঙালীর পক্ষে মূঢ়তা—এই দুই মহাত্মা তাঁহাদের অগ্রণী, বঙ্গের গৃহে-গৃহে স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা যে রামায়ণ ও মহাভারতের অমূল্য উপদেশ-বাণী আবৃত্তি করিয়া থাকে তাহার জন্য আমরা বিশেষভাবে ইঁহাদিগকেই ভক্তি-সহকারে স্মরণ করিয়া থাকি।"

পাথুরিয়া কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার

শ্রী কালীপদ ঘোষ

হীরক-অপেক্ষা যে পাথুরিয়া কয়লা অধিক মূল্যবান্, তাহা পাশ্চাত্য-জগৎ এই যুদ্ধের ফলে স্বীকার করিয়াছে। পাথুরিয়া কয়লা না থাকিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধই একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। আজ তাহারা এইটুকু বুঝিয়াছে বলিয়াই কয়লার সমধিক আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকগণ এই কয়লা লইয়া ভীষণভাবে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন; এই কয়লার প্রশ্নই সেখানে সকলের মস্তিষ্কে এখন একমাত্র চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে যদিও প্রায় ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই কয়লার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি ভারতবাসী আমরা আজ পর্য্যন্তও তাহার ব্যবহার শিখিলাম না। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে (১) জানা গিয়াছিল, রাণীগঞ্জে কয়লার খনি আছে, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সেখানে কোনো কোলিয়ারিই স্থাপিত হয় নাই। ঐ সনে মিঃ জোন্স নামে জনৈক ইংরেজই রাণীগঞ্জে প্রথম কোলিয়ারি স্থাপন করেন। তাহার পূর্ব্বেও কিন্তু অন্যান্য স্থানে কোলিয়ারি স্থাপিত হইয়াছিল। এইত এক শতাব্দীরও অধিক কাল হইতে চলিল কোলিয়ারি স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোথাও কয়লার গৌণ উৎপাদিত দ্রব্যের (Byproduct) জন্য কারখানা স্থাপিত হয় নাই। প্রথমে কোলিয়ারিতে খোলামাঠে কয়লার গাদায় আগুন ধরাইয়া কোক্‌কয়লা প্রস্তুত করা হইত, এখন সেইস্থলে শুধু বি-হাইভ (২) (Bee-hive) চুল্লী (oven) নির্ম্মিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে

(১) Geological Survey of India, Vol. III.

(২) কয়লাকে কোক্‌কয়লা করিবার একপ্রকার চুল্লীর নাম। ইহাতে গৌণ উৎপন্ন জিনিষ কিছুই পাওয়া যায় না।

রাণীগঞ্জই কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত; এত কোলিয়ারি আর কোথাও নাই। এরূপ স্থলে রাণীগঞ্জে দুএকটা গৌণ উৎপন্ন দ্রব্যের (By-product) কারখানা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কয়লার গৌণ উৎপাদন-সম্বন্ধে কাহারো কোনো চেষ্টা দেখা যায় নাই। ইহার জন্য খনির স্বত্বাধিকারীগণকে বিশেষভাবে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ একটি গৌণ উৎপাদনের কারখানা-খুলিতে অনেক মূলধন আবশ্যক, সে মূলধন তাঁহাদের না থাকিতে পারে; ইহার জন্য অধিকতর দায়ী আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ, যাঁহারা শুধু কোম্পানির কাগজের সুদ লইয়া বিলাসে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। আমাদের দেশের একটি মজ্জাগত দোষ যে, যাহার কিছু অর্থ আছে অথবা জমিদারি আছে, তিনি কেবল নিশ্চিন্তভাবে, আলস্যে সময় অতিবাহিত করেন। পিতৃপরিত্যক্ত অর্থকে খাটাইয়া তাহা হইতে আয়বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা কাহারও নাই। ব্যবসাকে অনেকে হীন কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমার মনে হয় সেই রুদ্ধ অর্থ লইয়া এইসব শিল্পের যৌথ-কারখানা খুলিলে দেশের ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

এই গৌণ উৎপন্ন দ্রব্য হইতে ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণ যে কিরূপ লাভবান্ হইতেছেন, তাহা আমাদের ধারণাতীত। এখন সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে ও আমেরিকায় এই গৌণ উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য একটা ভীষণ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাজ্য ও কানাডায় গৌণ-উৎপন্ন জিনিষের চুল্লীর(byproduct oven)সংখ্যা ছিল মোট ৬৪৩৮টি, এবং তাহাদ্বারা বৎসরে মোট ২,৪০,০০,০০০ টন (৩) কয়লাকে কোক্‌কয়লায় পরিণত করিয়া প্রায় ১৮,৮০,০০,০০০টন কোক্ কয়লা পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই স্থলে প্রায় ৯,৯০০ চুল্লী (oven) কার্য্য করিতেছে এবং তাহার দ্বারা বৎসরে ৪৭,৪০,০০০ টন কোক্ কয়লাকে কয়লায় পরিণত করিয়া ৩,৬০,০০,০০০ টন কোক্ কয়লা পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই কয় বৎসরেই গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্য প্রায় পূর্ব্বের দ্বিগুণ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইহা ব্যতীত অনেক চুল্লী প্রস্তুত হইতেছে।

(৩) Byproduct Coke—by C. J. Ramsburg

উপরে যে গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কথা বলা হইল উহা শুধু উচ্চ তাপের কোক্ কয়লা করিবার (high temperature carbonisation) জন্য। ইহা ছাড়া নিম্নতাপে কয়লাকে কোক্‌কয়লা (low temperature carbonisation) করিবার জন্য অনেক চুল্লী প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে।

চোঁয়াইবার উপরোক্ত দুইপ্রকার প্রণালীর (method of destructive distillation) মধ্যে প্রভেদ এই যে,—যেখানে ভালো গ্যাসের (coal gas) আবশ্যক সেখানে উচ্চ তাপে চোঁয়াইতে হয়; আর যেখানে ধূমবিহীন উৎকৃষ্ট ইন্ধনের আবশ্যক, সেখানে নিম্নতাপে চোঁয়াইতে হয়। এই নিম্নতাপে চোঁয়ানো ব্যাপারটি (low temperature carbonisation) অল্পদিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনও এসম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে।

গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্য (byproduct) হইতে যে কিরূপ লাভ হইতে পারে, তাহা কয়লার মূল্যে ধরিয়া (coal equivalent) হিসাব করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

তালিকা—(১)

প্রথম শ্রেণীর কোক্ করিতে গেলে যেরূপ লাভ হইতে পারে:—[শতকরা ৮৫ ভাগ high volatile (৪) ; এবং ১৫ ভাগ low volatile মিশ্রিত কয়লা]

অতিরিক্ত গ্যাস	কয়লা মূল্যে (coal equivalent)
৯,০০০ ঘন ফুট, ৫৫০ B.T.U(৫)	কয়লার পাউণ্ড
ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত।	৩৫০
আলকাতরা—	
১২ গ্যালন	১১৩
Creosote oil, পিচ, ভূষা, অন্যান্য তৈল এবং রংএর উপাদান-রূপে ব্যবহৃত।	
অ্যামোনিয়াম সালফেট্ ৩৩ পাউণ্ড কয়লার মূল্য ধরা হইল না। সার, তাপ কমাইবার জন্য, নাইট্রিক এসিড এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত।	
Benzols (লঘুতৈলরূপে)	
৪.৫ গ্যালন	৪২

(৪) Volatile matter—বায়ুর সংস্পর্শবিহীন-ভাবে চোঁয়াইলে যে-অংশ উড়িয়া যায়।

(৫) B.T.U. British Thermal Unit:—উত্তাপ মাপিবার ইংরেজী প্রণালীর পরিমাণ।

হাওয়াগাড়ী ও তৈলদ্বারা চালিত ইঞ্জিনের ইন্ধন, রংএর উপাদান, ফিনল (pheonal) এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত, পরিষ্কার ও দ্রব করিবার জন্য ব্যবহৃত	১০০
কোক্ ব্রিজ (Coke Breeze) ১২০ পাউণ্ড্ ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত	
একুনে ...	৬২৫
Bee-hive চুল্লীতে নষ্ট-অংশ কয়লা মূল্য ...	২০০

প্রত্যেক টন কোক্‌কয়লার গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের আয় ৮১৫

উপরোক্ত তালিকা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রত্যেক টন কোকে ৮২৫৲ পাউণ্ড্ কয়লা বাঁচিয়া যায়। বি-হাইভ্ চুল্লীতে প্রস্তুত কোক্ অপেক্ষা গৌণ উৎপন্ন করার প্রণালী-অনুসারে প্রাপ্ত কোক্ কয়লা ব্যবহারে মোটের উপর যে ২০০ পাউণ্ড্ কয়লা বাঁচিয়া যায়, প্রায় সকল কারখানার রিপোর্ট্ হইতে পাওয়া যায়।

তালিকা—২

প্রত্যেক টন কোক্‌কয়লায় প্রাপ্ত গৌণ উৎপন্ন দ্রব্য।

	শতকরা ৮০ভাগ low volatile " ২০ " high volatile } মিশ্রিত	high volatile matter
আলকাতরা ...	৬·৫ গ্যালন।	১·৩৫ গ্যালন।
অ্যামোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্ ...	২৩·৩ পাউণ্ড্	৩৮·০ পাউণ্ড্।
অতিরিক্ত গ্যাস বেন্‌জলবিহীন	৭৫০০ ঘন ফুট।	১০,০০০ঘন ফুট।
B.T.U প্রত্যেক ঘনফুট গ্যাসে	৫০০	৫৬০
অতিরিক্ত গ্যাসে মোট B.T.U	৩৭,৫০,০০০।	৫৬,০০,০০০।
লঘুতৈল (বেন্‌জল) ...	২·৬ গ্যালন।	৫·৪ গ্যালন।

উক্ত তালিকা-দ্বয় হইতেই সমস্ত ব্যাপারের একটা পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়। সকল জিনিষের মূল্য এখন যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে ২নং তালিকা দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই গৌণ-উৎপন্ন হইতে কিরূপ লাভ হইতে পারে।

উপস্থিত কোলিয়ারিতে যে-সকল চুল্লী কার্য্য করিতেছে, তাহা বি-হাইভ্ চুল্লী—কেবলমাত্র কোক্‌কয়লা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গৌণ-উৎপাদনের জন্য আলাহিদা চুল্লীর প্রয়োজন এবং প্লাণ্ট্ (কল ইত্যাদি) আবশ্যক। ভারতবর্ষে গৌণ-উৎপাদনের কারখানার মধ্যে টাটা আয়রন্-ফ্যাক্টরিতে একটি আছে এবং আর-একটি প্রস্তুত হইতেছে। Bengal Coke এবং Coal Products নাম দিয়া কলিকাতার একটি কোম্পানির গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কারখানা খুলিবার কথা ছিল, তাহা হইয়াছে কি না জানি না। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই ত একটি গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কারখানা।

অনেকে হয়ত বিবেচনা করেন যে, উক্ত কারখানা স্থাপন করিতে প্রচুর মূলধন আবশ্যক, কিন্তু লাভের দিকে চাহিয়া দেখিলে তাহা অল্প বলিয়া বোধ হয়; কারণ এই যে বি-হাইভ্ চুল্লী স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও ত বিনা পয়সায় হয় নাই। তাহার উপর না হয় আর-কিছু বেশী লাগিবে। কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ লাভ থাকিবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না, কারণ যদি লাভ না থাকিত তবে পাশ্চাত্য সকল দেশেই—যেখানে মজুরের দাম এত বেশী; সেখানে এত গৌণ-উৎপন্ন দ্রব্যের কারখানা চলিত না। আসল কথা, আমরা কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার এখনও শিখি নাই। সেইজন্য কয়লার এত অপব্যবহার করিয়া থাকি। কয়লার সাধারণ গৌণ-উৎপন্ন জিনিষ আলকাতরা, অ্যামোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্ এবং গ্যাস। শুধু এরই যদি কারখানা খুলিতে পারা যায়, তাহা হইলেও তাহা হইতে প্রভূত লাভ থাকিতে পারিবে।

অনেক কারখানায় আবার বেন্‌জল্ (Benzol) নিষ্কাশনের কল স্থাপিত হইয়াছে। তাহারা কয়লার গ্যাস হইতে বেন্‌জলটুকু বাহির করিয়া লইয়া থাকে। ইহাতে যদিও গ্যাসের উত্তাপ-শক্তির পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্তু লাভের হিসাবে সে-লোকসান কিছুই নহে। এমন-কি, এই বেন্‌জল্ হইতে যে লাভ পাওয়া যায়, তাহা আল্‌কাতরা হইতে লাভের চেয়েও অধিক। এই হাওয়া-গাড়ীর যুগে বেন্‌জলের প্রয়োজনীয়তা ভীষণভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে, বেন্‌জল্ শুধু যে গ্যাসোলিন্ অপেক্ষা মূল্যবান্ তাহা নহে, গ্যাসোলিনের সঙ্গে ইহা সমপরিমাণে মিশ্রিত করিলে মোটরের ইন্ধনের কার্য্যে প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ শক্তি বাড়িয়া যায়।

আল্‌কাতরা চোঁয়ান (Tar Distillation) ভারতবর্ষের কোথাও নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে Lister Anti-

septic & Dressing কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছিলাম যে, তাঁহারা আল্‌কাতরা চোঁয়াইবেন। জানি না, তাঁহাদের সে কারখানা হইয়াছে কি না। আল্‌কাতরা কল্পতরু-বিশেষ। ইহা চোঁয়াইলে যে কত জিনিষ পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। এক আল্‌কাতরা হইতে প্রায় ৩০০ শত-রকমের রংই পাওয়া গিয়াছে। এইপ্রকার অত্যাবশ্যক কারখানা এত বড় ভারতবর্ষে একটিও নাই, আর স্থাপনের জন্য আজ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টাও হয় নাই।

ইহা ছাড়া আমেরিকা কিংবা ইউরোপে কয়লার গুঁড়াটুকু পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে দেয় না। খনিতে কার্য্যের পর যে গুঁড়া পড়িয়া থাকে, আমাদের দেশের কোলিয়ারিতে তাহা নষ্টই হইয়া থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্যে উহার সম্যক্ ব্যবহার হইয়া থাকে। গুঁড়ার সঙ্গে নানারূপ ধাতু, মৃত্তিকা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকায় তাহা ব্যবহারের অযোগ্য, কিন্তু তাহা হইতে কয়লার অংশটুকু বাহির করিতে পারিলে অনেক কয়লা বাঁচিয়া যায়। সেইজন্য ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় কয়লা ধৌত করিবার (coal-washing) প্রণালী বাহির হইয়াছে। ইহা দ্বারা ধাতব পদার্থ, মৃত্তিকা প্রভৃতিকে কয়লা হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায়। ঐ-সকল দেশের প্রত্যেক কোলিয়ারিতেই কয়লা ধৌত করিবার কল স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতেও যে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই তাহা বেশ বলিতে পারা যায়।

আবার গুঁড়া কয়লা সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না বলিয়া কয়লা ব্রিকেট (৬) (Coal Briquetting) করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দেশে সে-লাভের কথা বোধ হয় কেহ স্বপ্নেও ভাবেন না। কারণ আমাদের স্বভাব অল্প আয়াসে যাহা পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট। পাশ্চাত্যে শুধু এই কয়লা ধৌত এবং কয়লা ব্রিকেট্ করিবার প্রণালী লইয়া এখনও গভীরভাবে গবেষণা চলিতেছে। সম্প্রতি Gee's Process of Coal-Washing বলিয়া Gee এক ধৌত করিবার কল বাহির করিয়াছেন, যাহা দ্বারা প্রত্যেক মিশ্রিত দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়িবে। কয়লা ব্রিকেটিং-এ শুধু কয়লার গুঁড়াকে বাঁধিবার জন্য বাইণ্ডার (binder) লইয়াই যে কত গবেষণা চলিতেছে, তাহা আমরা শুনিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইব।

ইহা আরও দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ কোলিয়ারিই ইংরেজ-পরিচালিত এবং পাশ্চাত্য মূলধনে স্থাপিত। আমরা দেশের লোক হইয়া, জমির স্বত্বাধিকারী হইয়া তাহার লাভটুকু ভোগ করিতে পাই না। কোথাও কয়লার খনি বাহির হইলেই কিছু টাকা লইয়া তাহা বিদেশীকে ধরিয়া দিই। এই দৌর্ব্বল্য কি কম দৌর্ব্বল্য! আমরা বলিব আমরা খনি-সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কি করিয়া চালাইব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, টাটার বিরাট্ লৌহ কারখানা স্থাপিত হইল কিরূপে এবং চলিতেছে কিরূপে। অথবা এই বিজাতী কোম্পানিগুলিই বা চলিতেছে কিরূপে? কোম্পানির স্বত্বাধিকারিগণ কেহই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের যত্ন, পরিশ্রম এবং চেষ্টা থাকা আবশ্যক। একটি কোম্পানি খুলিতে গেলে সে-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (expert) একজন লোকের বিশেষ আবশ্যক। যদি সে-প্রকার লোক ভারতবর্ষে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে এবং আমাদের দেশের লোক উপযুক্ত হইলে শেষে তাহাকে বিদায় দিতে হইবে। এইরূপ সাহস করিয়া না চেষ্টা করিলে কখনও দেশের উন্নতি হইবে না। অনেকে হয়ত আপত্তি করিবেন যে, তাহাতে বেশী টাকা খরচ হইবে, কিন্তু তাহা না হইলে কখনও কোম্পানির সাফল্য আসিবে কিরূপে? মোট লাভের উপর হিসাব করিয়া দেখিলে তাহাতে লাভ ভিন্ন কখনও লোকসান হইতে পারে না। এ শুধু আমাদের দেশের কথা নয়, আমেরিকাকেও সময়ে সময়ে ইংলণ্ড এবং জার্ম্মানি হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানি করিতে হয় এবং কারখানার ক্রমোন্নতির জন্য প্রত্যেক কারখানায় একজন বিশেষজ্ঞ রাখিতে হয়। শুনিলে অবাক্ হইতে হয় যে, লণ্ডনের Low Temperature Carbonisation Ltd. কোম্পানি শুধু গবেষণা করিবার জন্য ১০,০০,০০০ পাউণ্ড্ খরচ করিয়াছেন। অনেকে বলিবেন হয়ত, আমাদের দেশ গরীবের দেশ, টাকা কোথায় পাইব? আমি বলি,

(৬) Briquetting গুঁড়া কয়লাকে চাপ বাঁধিয়ে দেওয়া।

যে-সকল অর্থ শুধু বিলাসে ব্যয়িত হয়, তাহা দ্বারা বিশটা গৌণ-উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। আরো কত যে অর্থ অনর্থক রুদ্ধ হইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহা দ্বারাও দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

এখন সাধারণ গৌণ-উৎপাদনের কারখানা, কয়লা ধৌত করিবার কল এবং কয়লা ব্রিকেটের কল যাহাতে এদেশে স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা উচিত, কারণ কয়লার খনি ত আর অক্ষয় ভাণ্ডার নহে। একদিন-না-একদিন তাহা কম পড়িবেই, তখন কি হইবে এই ভাবিয়া এখন হইতে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের গো-সমস্যা

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ; জন-সংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষি-কার্য্যদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এখানে হল কর্ষণের প্রধান সহায় বলদ। সুতরাং কৃষি-কার্য্যে গো-জাতির বিশেষ আবশ্যকতার কথা এদেশের কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু কৃষির যে মূলশক্তি, সেই গোজাতির প্রতি আমাদের দেশবাসীর সম্যক্ দৃষ্টি এখনও আকৃষ্ট হয় নাই। কৃষির উন্নতি-সাধন ও গো-জাতির উন্নতি-বিধান পরস্পর-সাপেক্ষ, একথা ভুলিলে চলিবে না। ভারতবর্ষে যে গো-জাতির অবনতি ঘটিয়াছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ তাহা দর্শন করিতেছেন। গোজাতির অবনতির সঙ্গে যে, দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বর্ত্তমানে আমাদের ভারতবর্ষে যে-সব গরু রহিয়াছে, সংখ্যা ও গুণের হিসাবে কৃষি-কার্য্য ও দুগ্ধ-দান-পক্ষে তাহা নিতান্ত সামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত এদেশের জন-সংখ্যা গো-সংখ্যা ও ক্ষেত্রফলের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে গরুর সংখ্যা যতটা বেশী মনে করা হয়, ততটা কিছুই নহে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে প্রমাণিত হইবে যে পৃথিবীর প্রধান-প্রধান কৃষি-প্রধান দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের গো-সম্পদ্ কিরূপ হীন।

দেশ	গো-সংখ্যা	জন-সংখ্যা	প্রতি-শত লোকের গো-সংখ্যা
বৃটিশ ভারত	১১,৭৪,২[illegible]৩৬৫	২৪,৭১,৩৮,০০০	৪৭
বাংলা	২,৩৬,৯৮,৪১১	৪,৬৬,৫৩,০০০	৫০
ডেন্মার্ক	২৫,২৭,৩৪৮	৩২,৮৮,০০০	৭৮
মার্কিন	৬,৬৩,৫২,০০০	১১,৭৮,৫৯,০০০	৫৭
কানাডা	৯৮,১৯,৯৬৯	৮৭,৭২০০০	১১৬
অস্ট্রেলিয়া	১,৪৫,৩০,০৮১	৫৫,১০,০০০	২৪৫
নিউজিল্যাণ্ড	৩৪,৮০,৬৯৪	১২,৮৫,০০০	২৫৮*

ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে "প্রাণী বিবরণী" (live-stock statistics) প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে আমাদের দেশের গরুর সংখ্যা ১৫।১৬ বৎসর হইতে ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ১৯১৬-১৭ অব্দে সমগ্র ভারতে গরুর সংখ্যা ছিল ১৪,৯৪,২৫,০০০, ১৯২০-২১ অব্দে ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৪,৫১০৩,০০০। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেবলমাত্র এই পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে ভারতে প্রায় ৪৩ লক্ষ ২২ হাজার গরু কমিয়া গিয়াছে। এই হ্রাস আমাদের দেশের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নহে।

হল-কর্ষণের গরু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে খুব কম আছে। কৃষকের শস্য-উৎপাদনের পক্ষে ইহা কম অসুবিধা নহে। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে একজোড়া বলদ দ্বারা প্রত্যেক ঋতুতে মাত্র ৪একর ভূমি কর্ষণ করা যাইতে পারে। বৃটিশ ভারতে প্রায় ২২ কোটি ৮০লক্ষ একর কৃষি উপযোগী জমি রহিয়াছে। বলদ ও মহিষের সংখ্যা প্রায় ৪কোটি ৯০ লক্ষ। যে-পরিমাণে কর্ষণ-উপযোগী পশু আছে তাহার মধ্যে শতকরা ২৫টি শিশু বা অস্থি-চর্ম্ম-সার অকেজো, আরও প্রায় ২৫টি গাড়ীটানা কার্য্যে নিয়োজিত আছে। শতকরা ৫০টি নানা কার্য্যে পরিত্যক্ত হইলে প্রায় ২॥০কোটি পশু কৃষিকার্য্যের জন্য অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং একজোড়া পশুকে ঠেঙ্গাইয়া-ঠেঙ্গাইয়া প্রতি ঋতুতে প্রায় ১৯ একর জমি কর্ষণ করিতে হয়; কিন্তু এই ১৯ একর জমি চাষের নিমিত্ত অন্ততঃপক্ষে ৪ জোড়া পশুর প্রয়োজন। ৪ জোড়া পশুর পরিবর্ত্তে একজোড়া খাটাইয়া আমরা কি-পরিমাণ ফসল প্রাপ্ত হই, তাহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। নিম্নে একটা হিসাব দেওয়া গেল:—

প্রতি-একরে গড়ে উৎপন্ন

দেশ	গম	যব	ভুট্টা
	বুশেল	বুশেল	বুশেল
ডেন্মার্ক	৫১	৪১'২	—
নেদারল্যাণ্ড	৪৯'২	৫৬.৮	—
বেলজিয়াম্	৪২'৬	৫১'৩	—
নিউজিল্যাণ্ড	২৯'৯	৩৪'৮	—
গ্রেট্ ব্রিটেন্	৩৫'১	৩২'১	—
অস্ট্রেলিয়া	১৩'৩	২১'৪	২৫'
ফ্রান্স	২৪'৬	২২'৮	১৫''
জাপান	২১'৩	২৮'৮	২৯''

* The Official Year-Book of New Zealand, 1924.

দেশ	গম	যব	ভুট্টা
মার্কিন্	২৪·১	২৬·৯	২৯·৭
কানাডা	২৫·১	২০·৫	৫০·২
মিশর	২১·৪	২৯·১	৩৬·৬
সুইডেন্	৩৪·৯	২৯·৬	২০·১
সুইজারল্যাণ্ড	৩২·৪	—	২০·০
জার্ম্মানি	৩০·৩	৩০·৪	৪৮·২
স্পেন্	১৩·০	১৯·৮	২১·১
ভারতবর্ষ	৯·৭	১৫·৬	১০·৯ *

ভারতের প্রধান-খাদ্য-শস্য চাউল। সুতরাং আমাদের দেশে একর-প্রতি কত ধান্য উৎপন্ন হয় তাহাও দেখা যাক্।

প্রতি হেক্টারে উৎপন্ন ধান্য। এক হেক্টার = ২·৪৭ একর

দেশ	ধান্য
স্পেন্	৫৯৫ বুশেল
ইতালি	৩৯১ "
জাপান	৩৫২ "
পর্তুগাল	৩৩৯ "
মার্কিন্	২০১ "
ভারতবর্ষ	১৫৭ " †

ভারতে প্রায় ৯ কোটি টন খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন; কিন্তু ভারত উৎপাদন করে অর্দ্ধেকের কিছু বেশী। ইহার উপর রপ্তানিও আছে। কাজেই কোটি-কোটি লোক অর্দ্ধাহারে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। গো-খাদকের দেশে গবাদি পশুর প্রতি কিরূপ যত্ন লওয়া হয়। গো-জাতিকে জননী-বোধে যে জাতি পূজা করে, তাহাদের দেশে গোজাতির প্রতি তাচ্ছিল্যভাব যে মরণ-দশার প্রথম নিদর্শন, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

কেবল কৃষি-কার্য্যের জন্যই যে গো-জাতি আবশ্যক তাহা নহে, গাভীর দুগ্ধ হইতে আমাদের জীবন-রক্ষার উপায় হয়। ভারতের নরনারী আজ দুগ্ধের অভাবে রোগ-জীর্ণ দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবী ও নষ্টস্বাস্থ্য। সর্ব্বত্রই দুগ্ধের দারুণ অভাব উপস্থিত হইয়াছে। শিশু-জীবনের একমাত্র খাদ্য দুগ্ধের অভাবেই আজ বাংলার তথা সমগ্র ভারতের শিশু কুলের এই দুরবস্থা। যে-পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে, তাহাও অবিশুদ্ধ, জল-মিশ্রিত। এ-দেশের শিশু-মৃত্যু-আধিক্যের প্রধান কারণ বহুস্থলে ও বহু সংসারেই যে বিশুদ্ধ পুষ্টিকর মাতৃ স্তন্য-দুগ্ধের এবং গোদুগ্ধের অভাব তাহা কে না বলিবে? অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশে মৃত্যু-হার ও শিশু-মৃত্যু-সংখ্যার বৃদ্ধির একটা সুস্পষ্ট আলেখ্য চক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হইয়া উঠিবে।

দেশ	প্রতি-হাজারে মৃত্যু-হার	প্রতি-হাজারে এক-বৎসরের কম বয়সের শিশু মৃত্যু-হার
নিউজিল্যাণ্ড	৮·৭	৪৮
নেদারল্যাণ্ড	১৩·২	৫০
নরওয়ে	১৬·৪	৫৪
অস্ট্রেলিয়া	৯·৯	৬৬
সুইডেন্	১৭·৯	৭৬
সুইজারল্যাণ্ড	১৪·২	৮২
গ্রেট্-ব্রিটেন্	১২·৫	৮৩
মার্কিন্	১২·৯	৮০
ডেনমার্ক	১৩·১	৯৫
ইতালি	১৮·৭	১৪০
জাপান	২৬·৮	১৮৯
স্পেন্	২০·৩	১৯২
ভারতবর্ষ	৩৫·৬	২৬১ *

বড়-বড় সহরের শিশু-মৃত্যু-হারের তুলনা-মূলক-হিসাবে ভারতবর্ষের সহরগুলির অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ নিম্নে তাহা দেখাইতেছি:—

সহর	প্রতি-হাজারে শিশু-মৃত্যু-হার
অকল্যাণ্ড	৪৮
স্টকহল্ম্	৬১
নিউইয়র্ক	৭১
লণ্ডন	৮০
ওয়াশিংটন্	৮৫
প্যারিস	৯৫
অ্যান্টোয়ার্প	৯৮
বার্লিন্	১৩৫
শিকাগো	১৪৫
মাদ্রিদ্	১৭৭
মাদ্রাজ	২৮১
কলিকাতা	৩৩১
বোম্বাই	৫৫৬ *

বাঙালী আমরা; বাংলা দেশের অবস্থাটাও এইসঙ্গে একবার দেখা যাক্। বাঙালী-জাতির জীবনী-শক্তিও নানাদিক্ দিয়া ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, দারিদ্র্য ও ব্যাধি মিলিয়া বাঙালী জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। বোধ হয়, অনেকে শুনিয়া চমকিত হইবেন, যে, বাঙ্গালী বালক-বালিকাদিগের শতকরা ৫০ জন আট বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মারা যায় এবং মাত্র শতকরা ২৫ জন ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পৌঁছায়। শিশু ও কুমারেরাই ভবিষ্যৎ জাতির বীজ; কিন্তু সমগ্র বাংলায় প্রতিশত শিশুর জন্মের ৪ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুর হার ৪০·৩ জন এবং জন্মের ৬ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট শিশু-গণের প্রতিশতের মধ্যে মৃত্যুর হার ৬২·০ জন।

বাংলা দেশের সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ। বাংলার কোন্-কোন্ বিভাগে কোন্-কোন্ বয়সের শিশু-মৃত্যু-হার কত তাহার একটা বিস্তৃত তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

	বর্দ্ধমান	প্রেসিডেন্সি	রাজসাহী	ঢাকা	চট্টগ্রাম
প্রতি-সহস্রের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার	২২০	২১৮	২১০	২০৬	১৪৯
শিশু-মৃত্যুর শতকরা হার:—					
১। একমাসের কম বয়সের	৫১·৮	৪০·০	৩৫·৪	৩৫·৮	৩৫·২

*The Year-Book of the Commonwealth of Australia, 1923.

† The International Year-Book of Agri. Statistics. 1922, Rome.

* The Official Year-Book of New Zealand, 1924.

* The Official Year-Book of New Zealand, 1924.

পশু হত্যা করা হইতেছে। ইহার মধ্যে যে বৎস বধ করা হয়,তাহা আরো সাংঘাতিক। কেবলমাত্র উপরে উল্লিখিত কসাইখানায় গত ১৯১৯-২০ সালের গড়ে প্রতিবৎসরে ৮১৯৭টি বৎস হত্যা করা হইয়াছে। ১৯২১-২২ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১১২১ টন্, ১৯২২-২৩ সালে ১২২১ টন্ এবং ১৯২৩-২৪ সালে ১১৭৫ টন বৎস-চর্ম্ম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ভবিষ্যৎ গো-বংশ-রক্ষার একমাত্র উপায় বৎস। এই বৎস-হত্যা-সম্বন্ধে Mr. W. Smith, Imperial Dairy Expert বলেন, ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতির পথে গো-রক্ষা একটি প্রয়োজনীয় ধাপ। ভারতের অনেক প্রসিদ্ধ লোকের মতে গো-রপ্তানি বন্ধ করাই গো-রক্ষার উপায়, অনেকে আবার খাদ্যের জন্য গো-বধ নিবারণ করিতে সরকারকে অনুরোধ করেন। গ্রাম্য একদল লোক মনে করেন, গো-চারণের জন্য বহু জমি রাখিয়া দিলেই সমস্যা মিটিবে। সকল কথার মূলেই সত্য আছে, কিন্তু আমার মতে গো-রক্ষার সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম উপায় সহরে বৎস শিশু গাভী ও শিশু মহিষীবধ নিবারণ। মফঃস্বলেও বহু পশু হত্যা করা হয়। সরকার এ-বিষয়ে কোনো প্রতিকারের চেষ্টা করেন না। অবাধ গো-হত্যা দ্বারা দেশের প্রভূত অমঙ্গল-সাধনে—আমাদের ভবিষ্যৎ যে ঘোর তিমিরাবৃত হইতেছে, সরকার তাহা বুঝিয়াও বুঝেন না, কারণ গোরা-সৈন্যের জন্যই বেশীর ভাগ গো-হত্যা সাধিত হইয়া থাকে। এই মাংস গো-মাংস ব্যতীত অন্য মাংসদ্বারা পূরণ করিতে গেলে অত্যধিক খরচের দরকার। সুতরাং গো-হত্যা-রোধ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠিলেই 'জাতি-বিদ্বেষ-সৃষ্টি'র দোহাই দিয়া সরকার বুদ্ধিমানের ন্যায় মৌন থাকেন।

বর্ত্তমানে কৃষক ও গোয়ালাগণও অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যবশতঃ গো কুলের যে-ভাবে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা ভাবিলেও মর্ম্মাহত হইতে হয়। সাধারণতঃ গাভীর দুগ্ধের অর্দ্ধেকাংশই বৎসকে পান করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আজকাল তাহারা গরুর সবটুকু দুধই দোহন করিয়া লয়; অথচ তাহার পরিবর্ত্তে বৎসকে কিছুই খাইতে দেয় না। শৈশবাবস্থায় এইরূপ যত্নের ফলে বৎস রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পরবর্ত্তীকালে কিছুতেই উহাকে আর সবল করিতে পারা যায় না। তৎপর সহরে-সহরে নৃশংস অথচ ফুকা-প্রথায় দুগ্ধনিঃসরণ করিয়া গাভীগুলিকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে যে ১০।১২ মাস দুগ্ধদানের পর তাহারা কসাইয়ের হস্তে বিক্রীত হইয়া গাভী-জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পায়। তদ্ভিন্ন, পল্লীগ্রামে বলিষ্ঠ উপযুক্ত ষণ্ড নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা একটা গাভী নির্ব্বাচন করিতে বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকি; কিন্তু ষণ্ড-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে উদাসীন। সাধারণত, একটি গাভী হইতে সমস্ত জীবনে ৫।৬টির অধিক বৎস লাভের আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে, একটি ষণ্ড প্রতিবৎসরে অন্ততঃপক্ষে ৫০টি বৎস উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ একটি ষণ্ডের উপর প্রায় ৪০০ বৎসের শুভাশুভ নির্ভর করে। উপযুক্ত ষণ্ড-নির্ব্বাচন যে কিরূপ গুরুতর কার্য্য তাহা ইহা হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। সমস্ত বাংলা দেশে সরকারী ও বে-সরকারী নানা অনুষ্ঠানকর্ত্তৃক মাত্র ১৫৮টি ষণ্ড পালিত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর সুসভ্য দেশ-সমূহের তুলনায় বর্ত্তমান কৃষিপ্রধান ভারত-বর্ষের গো-ধনের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ও তাহার ফল যে কি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে চলিয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাই-বার প্রয়াস পাইয়াছি। আমরা আজ নানাদিক্ দিয়া অধঃপতনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। গো-জাতির ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ্ লোপ পাইতে বসিয়াছে। দেশবাসী এই সর্ব্বনাশের গুরুত্ব হৃদয়-ঙ্গম করিতে পারিলেই, উন্নতির উপায় করিতে তাদের আগ্রহ জন্মিবে। ভারতের সম্মুখে আজ যে বিপুল কর্ত্তব্যের বোঝা রহিয়াছে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। জাতির চক্ষু ফুটিয়াছে, তারা নিজেরাই যদি এ-দিকে দৃষ্টি দেয়, তবেই দেশ বাঁচিবে, নচেৎ মরণ বরণ করিয়াই এ-জাতি ধন্য হইবে।

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(১)

এক্ষণে প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকালিক অবস্থা যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। ১৮৬২ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্‌স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তথায় ফার্স্ট্ আর্ট্‌স্ পড়িতে লাগিলাম। ১৮৬৪ সালে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িবার জন্য আলবার্ট্ হলের দোতালায়স্থিত প্রেসিডেন্সী কলেজের থার্ড্ ইয়ারে পড়িতে গেলাম। আমরা যদ্যপি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম তথাপি সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপেই পরিগণিত হইতাম। ৺আনন্দ-মোহন বসু আমাদের সতীর্থ্য, ইহা মনে করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করি। আমাদের আর দুইজন বিখ্যাত সতীর্থ্য অদ্যাপি জীবিত আছেন। ১ম—প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুদিন ধরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে জজীয়তি করিয়া এক্ষণে পেন্‌শান্ লইয়াছেন। ২য়—রামচরণ মিত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের গবর্ণ্‌মেণ্ট্ উকীল ছিলেন। নিমাই বসু নামক বিখ্যাত হাইকোর্টের এটর্নী আর-একজন সতীর্থ্য।

আমরা যখন থার্ড্ ইয়ারে গিয়া ভর্ত্তি হইলাম, তখন স্‌ভার্স নামক একজন বর্ষীয়ান্ সাহেব আমাদিগকে ইংরেজি-সাহিত্য পড়াইতেন। সাট্‌ক্লিফ্ অঙ্ক কষাইতেন।

বীবী নামক একজন সাহেব ইতিহাস পড়াইতেন। বোধ হয় তখন কাউয়েল্ সাহেব ছুটিতে বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন। নীচের তালায় একজন সাহেব কেমিস্ট্রী পড়াইতেন। তৎকালে ফিজিক্স্ স্বতন্ত্র ছিল না; ফিজিক্স্ ও কেমিস্ট্রী একই ছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা পড়াইতেন। ইতিপূর্ব্বে রামচন্দ্র মিত্র নামক একটি বাবু বাঙ্গালা পড়াইতেন। আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র সুতরাং আমরা বাঙ্গালা পড়িতাম না। কে এম্ ব্যানার্জ্জি কৃত ষড়্দর্শন-সংবাদ এবং মাইকেল মধুসূদন কৃত মেঘনাদ-বধ কাব্য কোর্স্ ছিল। ফোর্থ্ ইয়ারে উঠিয়া অনেক নূতন সাহেব দেখিলাম। সী-এইচ্-টনী নামক একজন লাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন সাহেব আমাদিগকে ইংরেজি-সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন। ক্রফ্ট্ নামে একজন সাহেব ফিলসফি পড়াইতেন। সী-বী-ক্লার্ক-নামে একজন তৃতীয় র‍্যাংলার সাহেব অঙ্ক কষাইতে লাগিলেন। এই ক্লার্ক-সাহেব চারিটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আনন্দমোহন বসুকে একবারেই বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। তৎকালে বি-এ পরীক্ষার একমাস পরে এম্-এ পরীক্ষা হইত। সুতরাং আনন্দমোহন আমাদের সঙ্গে বি-এ দিলেন, এবং একমাস পরেই এম্-এ দিলেন। দুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ ক্লার্ক সাহেব আনন্দমোহন বসুকে বিলাতে পাঠাইবার প্রধান উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনের অর্থাভাব হেতু সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব তাঁহাকে একবৎসরের জন্য এঞ্জিনীয়ারিং প্রোফেসর করিয়া দিলেন। তাহাতে যে টাকা উপার্জ্জিত হইল, তাহা লইয়া আনন্দমোহন বিলাত গেলেন। তৎকালে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গেই ছিল। আনন্দমোহন যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন ক্রীক্ রো'তে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। একদিন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি উপর তালায় ছিলেন। আমি নাম পাঠাইয়া দিবামাত্র তিনি চটি জুতা পায় নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং প্রীতিপূর্ণবচনে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। আমি বলিলাম—"আনন্দমোহন! আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা নহে। তুমি ঠিক সেই আনন্দমোহনই আছ।" তাহাতে আনন্দমোহন বলিলেন—"এজীবনে আপনাদিগকে কখনো ভুলিতে পারিব না।"

আমাদের সময় ৬টি বিষয়ই কম্পাল্‌সারি ছিল। ১ম ইংরেজি, ২য় অঙ্ক, ৩য় সংস্কৃত বা বাঙ্গালা, ৪র্থ ফিলসফি, (mental ও moral), ৫ম ইতিহাস এবং ৬ষ্ঠ কেমিস্ট্রী বা কনিক্স্। আমি দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিহাসে ৩ নম্বরের জন্য ফেল হইয়াছিলাম। ক্যাপ্টেন্ আইভস্ ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি আনন্দমোহন প্রভৃতি ভাল ভাল ছাত্রকে এত কম নম্বর দিয়াছিলেন, যে, সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব গ্রেস্ দিয়া অনেককে পাস্ করিয়া দিলেন। ইতিহাসে ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ হইলেই পাস্ হওয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে বৎসর ১২০ জন বি-এ ছাত্রের মধ্যে ৮০ জন ইতিহাসে ফেল হইয়াছিল; আমরা শুনিয়াছিলাম আইভস্ সাহেব নিজে বি-এ বলিয়া তাঁহাকে এম্-এর পরীক্ষক করা হয় নাই, এইজন্য তিনি রাগ করিয়া ঐরূপ ফেল করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান্‌ই জানেন। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, খড়ি খাগড়ার প্রাণ যায়।" প্রথমতঃ ঐবার ফেল হওয়াতে আমার মনে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল; কারণ ইতিপূর্ব্বে আমি কখনো কোন পরীক্ষায় ফেল হই নাই। সুতরাং ফেল হওয়াতে আমার শরীর এরূপ ভগ্ন হইয়া পড়িল যে, আমি পর বৎসরে আর বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিলাম না। এস্থলে আমি পাঠক ছাত্রদিগকে একটি বিষয় বলিব। লোকে প্রবাদ আছে "দেখে শিখে ও ঠেকে শিখে।" আমার অদৃষ্টে "ঠেকে শিখে" ঘটিয়াছে। আমি পঠদ্দশায় নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি বড় মনোযোগ দিই নাই। অসময়ে আহার ও অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়াতে আমার সাঙ্ঘাতিক "পিত্তশূল" রোগ উপস্থিত হইল। অদ্যাপি ঐ রোগে ভুগিতেছি, এবং যতদিন বাঁচিব ততদিন ঐ রোগে ভুগিতে হইবে। আমি যখন চাকুরি করিতাম, তখন পকেটে খানিকটা সোডা লইয়া যাইতাম। পড়াইতে-পড়াইতে শূল-বেদনা উপস্থিত হইলে মালী দ্বারা জল আনাইয়া ঐ সোডা খাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তবে আবার পড়াইতাম।

আমার ন্যায় আর যেন কেহ এরূপ পিত্তশূল রোগে আক্রান্ত না হন—ইহা আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। পাঠক বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই রোগে আক্রান্ত হওয়াতে একটি আম্রও খাইতে পারিতেন না। আমারও দশা তাহাই। অতএব হে ছাত্রগণ! তোমরা সাবধান হও; কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"। শরীর রক্ষা কর, নতুবা কোন ধর্ম্মের সাধন হইবে না।

১৮৬৯ সালের প্রথমেই আমার প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরি হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সীনিয়ার সংস্কৃত-অধ্যাপক ছিলেন। এবং স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জুনিয়ার সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। একদিন হঠাৎ কৃষ্ণকমল বাবু আমাকে বলিলেন—"হরিশ! তুমি আমাদের কলেজে অ্যাডিশনাল পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছ; অতএব আগামী কল্য হইতে চাকরিতে যাইও; তুমি অগ্রে সাটক্লিফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও।" আমি তাঁহার আদেশানুসারে পরদিন সাটক্লিফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণকমল তোমাকে পাঠাইয়াছেন।" আমি কহিলাম—"আজ্ঞে।" তিনি কহিলেন—"যাও, চাকরি করগে।" এইরূপে বিনা দরখাস্তে আমার চাকরি হইল।

আমার চাকরির কারণ আমি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। ডাঃ কে, এম, ব্যানার্জ্জি তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের পরীক্ষক হইতেন। তিনি নাকি সাটক্লিফ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, যে "তোমার কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ান হয় ভাল; কিন্তু ব্যাকরণ পড়ান বা অনুবাদ করান ভাল হয় না।" সাটক্লিফ সাহেব কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ দুই কার্য্যের জন্য আমাকে নিযুক্ত করেন।

আমি যখন প্রথম চাকরি করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দেখিলাম প্যারিচরণ সরকার মহাশয় এবং মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফার্স্ট-ইয়ার ও সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ান। প্যারি-বাবু ইংরেজি-কবিতা ও মহেশ-বাবু ইংরেজি-গদ্য পড়াইতেন। রীস্ নামে এক ফিরিঙ্গী সাহেব অঙ্ক কষাইতেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেন। আমি প্রত্যহ এক ঘণ্টা মাত্র কার্য্য করিতাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান ও ইংরেজি হইতে সংস্কৃত অনুবাদ করান আমার উপর ভার ছিল। আমি প্রথম দিন যখন ক্লাসে পড়াইতে যাই, তখন ছাত্রেরা একটু চঞ্চল হইয়াছিল। তাহারা রাজকৃষ্ণ-বাবুকে বলিয়াছিল—মহাশয়! আমাদের একটি 'কুচো' পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজকৃষ্ণ-বাবু না কি বলিয়াছিলেন—"ওহে বাবু! ও বড় কুচো পণ্ডিত নয়, ও বড় বুড়ো পণ্ডিত, ইহার পর দেখিতে পাইবে।" ইহার পর হইতে ছাত্রেরা আমাকে খুব ভক্তি করিতে লাগিল। ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; এবং কেহ-কেহ [অধরচন্দ্র সেন প্রভৃতি। সেই অধর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল] রাজকৃষ্ণ বাবু যাহা পড়া দিতেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিত। আমি বলিতাম—"দেখ বাপু! ইহাতে রাজকৃষ্ণ-বাবু আমার উপর রাগ করিতে পারেন।" ছাত্রেরা বলিত—"মহাশয় আমাদের ত পড়া চাই।"

এইরূপে ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৩ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর চাকরি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন সাটক্লিফ সাহেব আসিয়া বলিলেন—Pundit, your service is no longer needed. আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি কহিলেন, It is the order of the Lt. Governor. আমাকে ঐ কথা বলিয়া মহেশ-বাবুকে কহিলেন, You are pensioned off. মহেশ-বাবু কহিলেন, আমার ত এখন পেন্‌শনের সময় হয় নাই। তাহাতে সাটক্লিফ কহিলেন, You are compelled to retire. তৎকালে ক্যাম্বেল নামক একজন ছোটলাট বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া বিলাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচার্থ আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই সকল সরকারী ডিপার্টমেণ্ট হইতে লোক ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া যান। ইতিপূর্ব্বে পটল-

ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের এক দিকে বাঙ্গালা ডাক্তারী ক্লাস ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকুরি যাওয়ার পর আমি আর কোন চাকুরি করি নাই; পৈতৃক "গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র" চালাইতে লাগিলাম।

যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের সৃষ্টি হয় নাই তখন Hindu College নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। তাহার দুইটি Department ছিল—Senior ও Junior। শ্রীযুক্ত প্যারিচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রসিকলাল সরকার ইত্যাদি অনেকগুলি ছাত্র ঐ বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন Captain Richardson নামে একজন সাহেব শিক্ষক ছিলেন। তিনি Richardson's Selections নামে দুইখানি বই প্রস্তুত করেন। ঐ পুস্তকগুলি Hindu Collegeএ পড়া হইত। আমরা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, একদিন Macaulay সাহেব ঐ College দেখিতে আসেন। তিনি ছাত্রদিগকে Hamlet হইতে সুপ্রসিদ্ধ passageটি—to be or not be—ব্যাখ্যা করিতে দেন। ছাত্রেরা নীরব হইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল—যখন Macaulay সাহেব এই স্থানটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন এই স্থানে অন্য কোন গূঢ় অর্থ থাকিবে, এই ভাবিয়া তাহারা কেহ কিছুই বলে নাই। তাহা দেখিয়া Richardson সাহেব ভারি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি তোমাদিগকে যেরূপ পড়াইয়াছি, তাহা বল। তাহাতে ছাত্রেরা বলাতে Macaulay সাহেব খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সময়ে হরমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বাবু অ্যাসিস্টাণ্ট্ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি Head Clerkএর কাজ করিতেন, এবং প্রত্যহ ১১টার পর একবার সকল class পর্য্যটন করিয়া যাইতেন। তৎকালে Presidency College ১১টার সময় বসিত। (হরমোহন-বাবুর ২য় পুত্র চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরে Deputy Magistrate হইয়াছিলেন।) হরমোহন-বাবুর আর-একটি কাজ ছিল জরিমানা আদায় করা। Principal সাহেব বা অন্য কোন professor যদি কোন ছাত্রের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাকে জরিমানা করিতেন, তাহা হইলে হরমোহন-বাবু ঐ জরিমানার টাকা আদায় করিতেন। একবার বিখ্যাত ছাত্র কমলাকান্তকে কোন professor ১৲ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। পরদিন কমলাকান্ত ১৲ টাকার পয়সা, আধ-পয়সা ও কড়ি আনিয়া হরমোহন-বাবুর টেবিলে রাখিয়া দেয়। হরমোহন-বাবু কহিলেন, "কমলাকান্ত! ও কি?" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয়! জরিমানার টাকা।" হরমোহন-বাবু বলিলেন, "আমি এত পয়সা, আধ-পয়সা ও কড়ি গণিতে পারিব না।" কমলাকান্ত কহিল—"মহাশয়! এ-সবের কি মূল্য নাই? মহাশয় আপনি যদি না লন, বলুন, আমি সাহেবের নিকট গিয়া দিই।" তাহাতে হরমোহন-বাবু বলিলেন, "না, না, আর তোমার সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার দরকার নাই। আমি লইতেছি।" বলা বাহুল্য, যে, হরমোহন বাবু সাটক্লিফ্ সাহেবকে বড় ভয় করিতেন। হরমোহন-বাবুর সহিত কমলাকান্তের এইরূপ তামাসা চলিত। একদিন First Year Classএর একখান কাচ ভাঙ্গিয়া যায়। হরমোহন-বাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন, "কমলাকান্ত! তোমাকে কাচের দাম দিতে হইবে।" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয় জানিলেন কিরূপে যে আমি কাচখানা ভাঙ্গিয়াছি।" হরমোহন-বাবু কহিলেন, "তুমিই যত অনিষ্ট করিবার কর্ত্তা।" কমলাকান্ত কহিল, "মহাশয়! সেদিন দপ্তরি যে কালীর বোতল ভাঙ্গিয়াছিল, সে কাজটি কি আপনি করিয়াছিলেন?" হরমোহন-বাবু বলিলেন, "আরে সে দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয়! আমাদের ঘরের কাচ যে দৈবাৎ ভাঙ্গে নাই, আপনি জানিলেন কেমন করিয়া?" হরমোহন-বাবু কহিলেন, "তোমরা হুটোপাটি করিয়া কাচ ভাঙ্গিয়াছ, আমি সাহেবকে বলিয়া দিব।" কমলাকান্ত বলিল, "আজ্ঞে! আমিও সাহেবকে বলিব, যে, হরমোহন-বাবু গবর্ণমেণ্টের এক বোতল কালী নষ্ট করিয়াছেন।" হরমোহন-বাবু কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতাম ও

translation করাইতাম। একদিন কমলাকান্ত আমাকে বলিল,—"পণ্ডিত মহাশয়! ব্যাকরণ ত মুখস্থ হয় না, কি করি বলুন দেখি? ইহার কি কোন সহজ পথ নাই?" আমি বলিলাম, "বাপু! আমরা বালক কাল হইতে ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়াছি। কোন সহজ পথ ত দেখি নাই।" কমলাকান্ত বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি যদি না বকেন, তাহা হইলে বলি।" আমি কহিলাম, "কি বল না।" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয়! না পড়াই সহজ পথ।" আমি বলিলাম, "বাপু! একটু একটু পড়িও, নতুবা বিদ্যা হইবে কেন? পরীক্ষায় ফেল হওয়া বড় লজ্জার কথা।" আর-একদিন কমলাকান্ত আমায় বলিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আমি ত translation লিখিতে পারি না, আঙুল ব্যথা করে।" আমি কহিলাম, "তুমি এত ইংরেজি লেখ কেমন করিয়া?" কমলাকান্ত বলিল, "মহাশয়! ইংরেজি খুব চড়চড় করিয়া লিখিতে পারি, তাহাতে ত আঙুল ব্যথা হয় না। সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে গেলে আঙুলের বড় খাটুনি হয়; বিশেষতঃ বুড়ো আঙুলে সংযুক্ত অক্ষরগুলো লিখিতে বড় কষ্ট হয়। শীঘ্র লিখিতে পারা যায় না, বড় দেরি হয়।"

তিন বৎসর বেকার বসিয়া থাকার পর ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার আবার পূর্ব্বের চাকরিই হয়। পাঠক দেখুন, আমার ৮বৎসর break of service হইল। দ্বিতীয়বার চাকরির কারণ আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি।—ছোটলাট ক্যাম্বেল্ সাহেব ৩ বা ৩।০ বৎসর চাকরি করিয়া অসুস্থ-দেহ হইয়া পড়েন। ডাক্তারগণ তাঁহাকে বিলাত যাইতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি স্বদেশে গমন করিলেন। মিস্টার গ্রে নামক একজন সাহের Offg. ছোট লাট হইলেন। ঐ সময় সাটক্লিফ্ সাহেব কৃষ্ণকমল-বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি ছাপাখানার কাজ করিতেছি, হঠাৎ একদিন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সংস্কৃত কলেজের একটি বেহারা দ্বারা পত্র লিখিয়া আমাকে জানাইলেন—"হরিশ! তুমি এখনি সাটক্লিফ সাহেবের সঙ্গে Senate House এ গিয়া দেখা কর।" তাঁহার আদেশক্রমে আমি তথায় গিয়া সাটক্লিফ্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। আমি এমনি বোকা যে গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত একদিনও দেখা করিতে যাই নাই। কিন্তু তিনি আমাকে ভুলেন নাই। আমি যাইবামাত্র তিনি কহিলেন—"How are you, Haris?" আমি কহিলাম—"In a manner starving." ইহা শুনিয়া সাহেব আমাকে কহিলেন—"Go to the Presidency College and take out your Routine." এই আমার appointment। এস্থলে পাঠক! একটি মজার কথা শুন। Presidency Collegeএ একটি ৫০৲ টাকার চাকরি হইবে জানিতে পারিয়া ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একটি M.A. ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া সাটক্লিফ্ সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন; গিয়া বলিলেন—"Sir, Sir, শুনিলাম আপনার কলেজে একটি চাক্রি খালি আছে; তজ্জন্য এই একটি M.A. ছাত্রকে আনিয়াছি; আপনি ইহাকে ঐ চাকরি দিন।" সাটক্লিফ সাহেব বলিলেন, —"Where is Haris? Is he in Calcutta? Is he employed elsewhere? Better call him, Mahes! I do'nt want any M.A"—ন্যায়রত্ন-মহাশয় হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

সাটক্লিফ্ সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি সেই দিনই Presidency Collgeএ গেলাম; এবং তথাকার asst. secretary মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। (পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম ব্রজনাথ লাহিড়ী।) তিনি আমাকে দেখিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"তুমি বৈদিক?" আমি বলিলাম—"বৈদিক বলিয়া আপনি অত ভয় পাইলেন কেন?" তিনি কহিলেন "না না।" পরে এই ব্রজবাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

এবার যখন Presidency Collegeএ প্রবেশ করিলাম তখন অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। ১ম Senate House হইয়াছে; ২য় Presidency College বাড়ী হইয়াছে; ৩য় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বে Librarian ছিলেন, এক্ষণে Asst. Registrar হইয়াছেন; ৪র্থ হরমোহন-বাবু নাই, তৎপদে পূর্ব্বোক্ত ৺ব্রজনাথ লাহিড়ী নিযুক্ত হইয়াছেন; ৫ম Chemistry পড়াইবার জন্য Pedler নামে এক সাহেব আসিয়াছেন; Physics স্বতন্ত্র পড়ান

হইতেছে, তজ্জন্য Booth নামে একজন সাহেব আসিয়াছেন; ৬ষ্ঠ অঙ্ক পড়াইবার জন্য শ্রী বিপিনবিহারী গুপ্ত আসিয়াছেন। B.A. Class এ পড়াইবার জন্য ক্লাশ নামে আর-একটি সাহেব আসিয়াছেন। তাহার অনেক দিন পরে লিটল্ নামে একটি সাহেব অঙ্ক পড়াইবার জন্য আসেন। কার্জ সাহেব Botanical Garden এ চলিয়া গিয়াছিলেন। সাটক্লিফ্ আর পড়াইতেন না। তিনি আমাদের Principal, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar ছিলেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র নামে এক ব্যক্তি Booth সাহেবের assistant ছিলেন। তিনি প্রাচীন হইয়াছিলেন এবং একটু বেশী মোটা ছিলেন। বুথ্ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে তাড়া করিতেন। একদিন সাহেবও রাজকৃষ্ণ-বাবুকে "নিকাল দেও" বলাতে উক্ত রাজকৃষ্ণ-বাবু মনে করিলেন যে সাহেব তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য চাপরাশিকে হুকুম দিতেছেন ও ভয়ে পলায়ন করেন। পরে জানা যায় যে সাহেব নিকল নামক সাহেবের গ্রন্থ চাহিয়াছিলেন। যতক্ষণ না রাজকৃষ্ণ-বাবু কলেজের কম্পাউণ্ডের বাহিরে যাইলেন; ততক্ষণ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ঐ প্রকাণ্ড জোয়ান আইরিশম্যান বুথ সাহেব যাইলেন। রাজকৃষ্ণ-বাবু গেটের বাহিরে বড় রাস্তায় গেলে সাহেব নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া রাজকৃষ্ণ-বাবু শীঘ্র পেন্‌শন্ লইলেন তবে বুথের ভয় তাঁহার ঘুচিল। রাজকৃষ্ণ-বাবুর পদে হৃদয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন M.A নিযুক্ত হন। হৃদয়-বাবু অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বুথ সাহেবের মন জোগাইয়া চলিতে পারিতেন, তজ্জন্য উক্ত সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। দুঃখের বিষয়! হৃদয়-বাবু আর এ-জগতে নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ি B. A. নামক একজন ছাত্র Chemistry Professorএর assistant ছিলেন। পেড্‌লার সাহেব যখন Director হইয়া যান তখন পি, মুখার্জি নামক একজন বিলাত-ফেরত হুগলী কলেজ হইতে Presidency Collegeএ আসেন। তিনি পরে Presidency Circleএর Inspector of Schools হইয়াছিলেন; এবং এক্ষণে পেন্‌শন্ লইয়াছেন। তাঁহার এই বিশেষত্ব ছিল, যে, তিনি আমার পুরাতন ছাত্র হইলেও আমার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায় কথা না কহিয়া ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতেন।

তাহার অনেক দিন পরে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু বিলাত হইতে আসিয়া Presidency Collegeএ ক্রমান্বয়ে Chemistry ও Physics পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাঁহারা দুইজনেই অতি ভদ্রলোক। বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মনে কোন অহঙ্কার নাই। জগদীশচন্দ্র বসু এক্ষণে একটি নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রথিতযশাঃ হইয়াছেন। সেকথা পাঠক জানেন বলিয়া আর বলিলাম না। প্রফুল্লচন্দ্র রায় গান্ধী মহাত্মার শিষ্য হইয়া দেশে-দেশে চর্‌কার চলন করিতেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ও আমি একত্র হইয়া "রসার্ণব" নামে একখানি সংস্কৃত রসগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। Asiatic Society of Bengal এই গ্রন্থখানি ছাপাইয়াছেন।

সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব পেন্‌শন্ লইয়া বিলাত যাইবার সময় Croft সাহেবকে Director of Public Instruction করিয়া যান। ঐ পদ টনি সাহেবের পাওয়া উচিত ছিল; কারণ তিনি ১বৎসরের senior in service ছিলেন। লোকে বলে, যে, সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব Croft সাহেবকে বিশেষ চতুর দেখিয়া ঐ কাজ করেন। টনি সাহেব বড় ভাল মানুষ বলিয়া তাঁহাকে Presidency College এর Principal ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar করিয়া যান। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তে Croft সাহেব ও টনি এ উভয়ের মধ্যে বড় মনোভঙ্গ (বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে চটাচটি বলে) হইয়াছিল। টনি সাহেব যদি কখন তাঁহার অধীনস্থ কোন শিক্ষকের প্রমোশন্ হউক বলিয়া লিখিতেন, Croft সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিতেন। এই বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার দশ বৎসর কোন প্রমোশন্ হয় নাই। ৫০ টাকা বেতনে থাকিতে হইয়াছিল। পরে টনি

সাহেব একবার বিলাত যাওয়াতে বেলেট্ নামে এক-জন স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। আমি ঐ বেলেট্ সাহেবকে আমার দুর্দ্দশার কথা বলিয়াছিলাম। আমার ভাগ্যক্রমে ঐ বেলেট্ সাহেবই ছয়মাসের জন্য ডিরেক্টর্ হইয়া যান। তিনি আমার কথা মনে করিয়া স্বয়ং আমাকে ৫০্ হইতে ৭৫্ গ্রেড্ দেন। পরে যখন টনি সাহেব একবার ডিরেক্টর্ হইয়া যান, তখন আমাকে ১০০্ হইতে ১৫০্ গ্রেড দেন। টনি সাহেব বিপিনবিহারী গুপ্ত M. A. ও আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং আমরা যাহাতে কিছু টাকা পাই তাহার উপায় করিয়া দিতেন। বিপিন-বাবুকে ১০০্ টাকার একটি মেম-পড়ান কাজ জুটাইয়া দিয়া-ছিলেন। লরেটো হাউসের একজন বিবি শিক্ষয়িত্রীকে অঙ্ক কষাইতে হইত! আর আমাকে নক্‌স্ নামক এক সাহেব-পড়ান কাজ জুটাইয়া দিয়াছিলেন; বেতন ৪৫্ টাকা। নক্‌স্ সাহেব পরে এলাহাবাদ হাই কোর্টের চিফ্ জাষ্টিস্ হইয়াছিলেন। আর Robinson Crusoe নামক একখানি ইংরেজী পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আমাকে দেন। আমি ঐ কার্য্যে প্রায় ২৫০্ টাকা পাইয়াছিলাম।

একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের 1st Year ছাত্রেরা টনি সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিল যে,— "মহাশয়! আমরা মুসলমান ছাত্রদিগের নিকট বসিতে পারিব না; কারণ, তাহাদের মুখ হইতে বড় পেঁজের গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমাদের অসহ্য হয়।" এই দর-খাস্ত পাইয়া প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ হরিশ! তোমার ছাত্রেরা কি দরখাস্ত করিয়াছে।" তাহা পাঠ করিয়া আমি বলিলাম,—"মহাশয় যে-ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহা পালন করিব।" তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন—"হরিশ! আমি কোন বন্দোবস্ত করিব না, যাহা করিতে হয় তুমি কর।" আমি "যে আজ্ঞে" বলিয়া পরদিন আমার ঘরের বেহারাকে একখানি বড় বেঞ্চ আমার বাম দিকে দিতে বলিলাম, এবং মুসল-মান ছাত্রদিগকে বলিলাম, "তোমরা প্রত্যহ এই বেঞ্চে বসিও, আর কোন বেঞ্চে বসিও না।" এবং হিন্দু ছাত্র-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"বাপুসকল! তোমরা সকলেই আমার ছাত্র; কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকেই আমি সমান চক্ষে দেখি; কোন ইতরবিশেষ করি না।" এই বলিয়া ভবভূতির উত্তরচরিত হইতে বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে ইত্যাদি একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সকল ছাত্রকে কহিলাম,—"বাপুসকল! তোমাদের পরস্পর জাতিভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু আমার নিকট কোন জাতিভেদ নাই। আমার নিকট পড়ার ভালমন্দই জাতি, অর্থাৎ যে ভাল পড়ে, সেই আমার নিকট ভাল জাতি আর যে আমার লেক্‌চারে মনোযোগ দেয় না, সে আমার নিকট মন্দ জাতি। জগতে জাতিভেদে আহার ও ব্যবহারের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা অপরের উচিত নহে। দেখ, আমার পিতার একটি ছাপাখানা আছে। আমি তথায় কার্য্য করি। ছাপাখানায় হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিই আছে। আমি তাহাদের সহিত সমান ব্যবহার করি।" আমার এইরূপ উপদেশ শুনিয়া আমার ছাত্রেরা নীরব হইয়া রহিল। হইতে পারে, এই-রূপ বন্দোবস্তে হিন্দু ছাত্রেরা আমার উপর বিরক্ত হইল; কিন্তু মুসলমান ছাত্রেরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল; জগতের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে অপরজন বিরক্ত হয়। এরূপ স্থলে শিক্ষক সমদর্শী হইবেন; কখনো ভিন্ন-ভাবাপন্ন হইবেন না। ইহাই আমার মত।

আমার ছাত্রেরা এক-একদিন এক-একটি কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। একদিন এক ছাত্র কহিয়াছিল— মহাশয়, কর্ম্মফল যদি প্রবল হইল, তবে ঈশ্বরকে মানিবার দরকার কি? আপনি বলিয়া থাকেন "নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" অর্থাৎ কর্ম্মফলের নিকট বিধাতাও প্রবল হইতে পারেন না। এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি কহিলাম "বাপু! তোমরা জান, হাই কোর্ট একটি আছে, এবং জেলখানাও আছে। কোন অপরাধীকে হাই কোর্ট দণ্ড দিলেন—৭ বৎসর মেয়াদ। পুলিশের লোকে তাহাকে জেলে লইয়া গেল; তথায় জেল-দারোগা

সাহেব বন্দো বস্ত করিয়া দিলেন—"তাহাকে পাথর ভাঙ্গিতে হইবে।" একণে দেখ বাপু! মনে কর, High Court ভগবান্। কর্ম্মফল জেলদারোগা। এস্থলে অপরাধীকে ৭ বৎসর ধরিয়া মেয়াদ খাটিতে হইবে, ইহা High Court এর হুকুম। High Court এমন কথা বলে নাই, যে তাহাকে এই-এই কাজ করিতে হইবে। সেকাজ জেলদারোগা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। একণে এই উপমার সহিত জগতের জীবের তুলনা করিয়া দেখ। জীব পূর্ব্বজন্মে যে-সকল কার্য্য করে, ভগবান্ তাহা দেখিয়া থাকেন; কারণ, তিনি সাক্ষী-মাত্র ইহা হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। জীব পূর্ব্বজন্মে পাপ বা পুণ্য যাহাই করে, পর জন্মে তাহার তদ্রূপ ফলভোগ করে। যদি একটু পুণ্য করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই-পরিমাণে সুখভোগ করে। যদি একটু পাপ করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই-পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এস্থলে দেখ, কিরূপ সুখ বা কিরূপ দুঃখ জীব ভোগ করিবে, তাহা তাহার কর্ম্মফলের অনুসারে হইয়া থাকে। ভগবান্ তাহার ইতরবিশেষ কিছুই করেন না।

কিছুকাল পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে Gil Christ পরীক্ষা দিবার জন্য দুইটি ছাত্র উপস্থিত হইলেন। ১ম H. M. Percival, ২য় P. K. Lahiri। যে-কয়েক দিন পরীক্ষা হইয়াছিল, সে-কয়েক দিন আমাকেই guard হইতে হইয়াছিল। ঐ পরীক্ষায় Percival সাহেব পাশ হইয়া বিলাতে চলিয়া যান; পরে তথা হইতে পাশ হইয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে Professor হন। P. K. Lahiri Metropolitan Institution এর অন্যতম Professor ছিলেন। তিনি পাশ না হওয়াতে বিলাত যাইতে পারিলেন না। Tawney সাহেব তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে আসিতে দিলেন না; বরং তাঁহার বেতন ৫০০৲ টাকা করিয়া দিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি Tawney সাহেবের চিঠি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ওরে! সাহেবেরা আমার কলেজ খেলো করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি তাহা কখনই করিতে দিব না।"

আরও কিছুদিন পরে P. K. Ray ঢাকা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া philosophy পড়াইবার professor হইলেন। তিনি একখানি Logic রচনা করেন।

Presidency Collegeএর Libraryর প্রথম Catalogue প্রস্তুত করিবার ভার Rowe সাহেবের উপর পড়ে। এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকসকলের Catalogue করিবার ভার আমার উপর পড়ে। কিন্তু Rowe সাহেব ইংরেজি ও সংস্কৃত, ও বাঙ্গালা সমগ্র Catalogue প্রস্তুত করিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন; তিনি কেবল শেষ প্রুফটি দেখিতেন। আমি অনেক দিন পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

রাজকৃষ্ণ-বাবুর পেন্‌শন্ হওয়াতে ঐপদে নীলমণি মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, এবং ৬ মাস আমাদের সঙ্গে পড়িয়া উপরি শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন—"এ-ছেলেটা বড় খেড়ে, একে উপর শ্রেণীতে দেওয়াই ভাল।" নীলমণি-বাবু রামচন্দ্র মিত্রের Private tutor ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন বাঙ্গালা পড়ান হইত, সংস্কৃত প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তৎকালে রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাঙ্গালা Professor ছিলেন। তাঁহার পর কৃষ্ণকমল-বাবু, senior professor হন। সুতরাং রাজকৃষ্ণ বাবু-গেলেও আমরা ৩ জন professor রহিলাম—১ম কৃষ্ণকমল-বাবু ২য় নীলমণি বাবু, ও ৩য় আমি। নীলমণি বাবু M. A. পাশ করিয়া ২৪ পরগণায় Assistant Deputy Inspector of Schools হইয়াছিলেন। ২৪ পরগণায় ২জন Deputy Inspector of Schools ছিলেন—১ম রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ও নীলমণি মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি চাকরি খালি হওয়াতে (অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ-বাবুর পেন্‌শন্ হওয়াতে) নীলমণি-বাবু জোগাড় করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন।

কিছুদিন পরে তৎকালীন High Courtএর জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় কৃষ্ণকমল-বাবুকে High Courtএর ওকালতি করিতে পরামর্শ দিয়া Presidency College

ছাড়িতে বলেন। তিনি কলেজ ত্যাগ করিলে নীলমণি-বাবু ঐ পদে উন্নীত হন; এবং আমিও নীলমণি বাবুর পদে উন্নীত হইলাম। সুতরাং এ-সময় আমরা ২ জন বই আর Professor রহিলাম না; কারণ আমার পদটি গবর্ণমেণ্ট্ abolish করিয়া দিলেন, তৎপদে আর নূতন লোক রাখিলেন না। ইহাতে নীলমণি-বাবু 3rd year ও 4th year পড়াইতে লাগিলেন; এবং আমি 1st year ও 2nd year পড়াইতে লাগিলাম। আমি তখন একজন Professor হইলাম। Lord Ripon যে Education Report প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে কলেজের অধ্যাপক মাত্রেই professor হইবেন, assistant professor বলিয়া আর নাম থাকিবে না। ঐ নিয়ম অনুসারে বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় professor হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি assistant professor of Mathematics ছিলেন। Lord Ripon Professorদিগকে এরূপ ক্ষমতা দিয়া ছিলেন যে তাঁহারা ছেলেদিগকে fine করা বা rusticate করা যে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন *without reference to the Principal.* এই সময় Rowe সাহেব কয়েক মাসের জন্য off. principal হইয়াছিলেন। তিনি Reportএর ঐ underlined কথাগুলি পাঠ করিয়া বড়ই চটিয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন Principal সর্ব্বময় কর্ত্তা; Professorগণ তাঁহার অধীন। Lord Ripon তাহা করিয়া যান নাই। তিনি সকল Professorকে সমান ক্ষমতা দিয়া গিয়াছিলেন। (Lord Ripon প্রকাশিত Education Report দেখুন।)

প্রতিবৎসর 1st year ও 3rd year classএ যে পরীক্ষা হইত, তাহার ফল দেখিয়া ছাত্রদিগকে promotion দেওয়া হইত। ঐ দুই পরীক্ষার ফল বিপিন-বাবু ও আমি দুইজনে একত্র হইয়া স্থির করিতাম। Tawney সাহেব ঐ ভার আমাদের দুইজনের উপর দিতেন। Tawney সাহেব এতাদৃশ সদাশয় লোক ছিলেন যে, ছাত্রেরা ফেল হইলে যদি আমরা অনুরোধ করিতাম, তাহা হইলে Tawney সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে promoted করিতেন। একবার একছাত্র অঙ্কে শূন্য পাইয়াছিল। বিপিনবাবু অনুরোধ করিলেন—ঐ ছাত্রকে উঠাইয়া দিউন, আমি 2nd yearএ তাহাকে প্রস্তুত করিয়া লইব। Tawney সাহেব হাসিয়া সই করিলেন। এইরূপ কার্য্য করাতে ছাত্রেরা আমাদের দুইজনকে বড় ভালবাসিত, এবং আমাদের খুব বাধ্য ছিল। একবার Robson নামে একটি সাহেবের টমটম গাড়ী ঘিরিয়া ছাত্রেরা দাঁড়াইয়াছিল। সাহেব কিছুতেই বাড়ী যাইতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে আমি উপরতালা হইতে নামিয়া আসিয়া ঐ কাণ্ড দেখিলাম। সাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—Pundit! See the behaviour of your students." আমি তৎক্ষণাৎ ছাত্রদিগকে বাড়ী যাইতে বলিলাম, এবং কহিলাম, আগামী কল্য আমি তোমাদের উপায় করিব। ব্যাপার হইয়াছিল কি, পাঠক শুনুন। Robson Missionary সাহেব ছিলেন। ছেলেরা বলিল, তিনি ইংরাজী ভাল পড়াইতে পারেন না। তজ্জন্য Tawney সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল। সাহেব বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। এইজন্য তাহারা Robson সাহেবকে উত্ত্যক্ত করিয়া তাড়াইয়া দিবে এই তাহাদের মতলব ছিল। পরদিন আমি Tawney সাহেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম—এবং Robson সাহেবকে transfer করিবার জন্য Director সাহেবকে লিখুন বলিয়া অনুরোধ করিলাম। Tawney সাহেব আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। একসপ্তাহ-মধ্যে Gazetteএ দেখিলাম, Robson সাহেব পাটনায় transferred হইয়াছেন।

একবার নীলমণি-বাবু কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়াছিলেন বোধ হয় ৩ মাস। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন, এবং Tawney সাহেবের Private tutor ছিলেন। Tawney সাহেব উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে নীলমণি-বাবুর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। একদিন পড়াইয়া তাঁহাকে আর 3rd yearএ পড়াইতে হয় নাই। কারণ তথাকার ছেলেরা দুরখাস্ত করিয়াছিল—শ্যামাচরণ পণ্ডিতমহাশয় আমাদিগকে পড়াইতে পারিবেন না, হরিশ পণ্ডিতমহাশয়কে আমা-

গকে পড়াইতে দিন। Tawney সাহেব পরদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"হরিশ! তুমি নীলমণির কাজের ভার লও, এবং তোমার কাজের ভার শ্যামাচরণকে দাও। দুঃখের মধ্যে এই হইল—শ্যামাচরণ-বাবু Office allowance পাইতে লাগিলেন; আমি কিছুই পাইলাম না।

একবার Tawney সাহেব শ্যামাচরণ-বাবুর প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে Presidency Collegeএ আনিয়া আমাকে হেয়ার স্কুলে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি ঐকথা শুনিয়া Tawney সাহেবকে বলিয়াছিলাম, আমার কি অপরাধ দেখিলেন যে, আমাকে Presidency College হইতে দূর করিয়া দিতেছেন? তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন—আমি শ্যামাচরণের উপকার করিবার জন্য ঐরূপ বন্দোবস্ত করিব মনে করিয়াছি। Tawney সাহেব আমার কথায় বড় মনোযোগ দিলেন না। কিন্তু আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা Tawney সাহেবের ঐ প্রস্তাব শুনিয়া 1st year, 2nd year, 3rd year ও 4th year এর সমস্ত ছাত্র Tawney সাহেবের নিকট একটি দরখাস্ত করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—যদি আপনি হরিশ পণ্ডিত-মহাশয়কে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অপসারিত করেন, তবে, আমরা সকলেই কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। Croft সাহেব এই ব্যাপার শুনিতে পাইয়া লিখিয়া পাঠান, হরিশকে কোনরূপে যেন স্থানান্তরিত করা না হয়। Tawney সাহেব শ্যামাচরণ-বাবুর নিকট বড় অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন,এবং ব্রজ লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন তুমি শ্যামাচরণকে বলিও—"What can I do? The whole Presidency College is for Haris. Even the Director is for Haris."

যখন নীলমণি-বাবু সংস্কৃত কলেজের Principal হইয়া ন তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Senior Professor হইলেন এবং আমি কেবল Professor রহিলাম। তখন একটি মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত M. A. দিবার জন্য আমাদের কলেজে আসে। সে প্রথমে সংস্কৃত কলেজে গিয়াছিল; কিন্তু মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয় মুসলমান বলিয়া তাহাকে ভর্ত্তি করেন নাই। সে ছাত্র নাগপুরের জেল-দারোগার পুত্র। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা—সংস্কৃতে M. A. দেয়। সে Tawney সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল ভর্ত্তি হইবার জন্য। সাহেব জবাব দিয়াছিলেন—"আমি একটি ছেলের জন্য একটি Class খুলিতে পারিব না।" পরে তিনি হরপ্রসাদ ও আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা এই ছাত্রটিকে M. A. পড়াইতে পারিবে কি না? আমরা উত্তর করিলাম, "আপনি যদি হুকুম করেন, তবে পড়াইতে পারি।" সাহেব বলিলেন "আমি একটি ছেলের জন্য ২ জন Professorকে হুকুম দিতে পারি না। তবে তোমরা যদি ইচ্ছা করিয়া ইহাকে পড়াও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।" আমি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলিলাম "দেখ হরপ্রসাদ! (হরপ্রসাদ আমাপেক্ষা ১০ বৎসরের ছোট হইবে) যদি কোন মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত M. A. পড়িতে আসে, তবে তাহাকে সংস্কৃত কলেজ যদি না লয়, এবং আমরাও (অর্থাৎ Presidency College) যদি না লই, তবে সে যায় কোথায়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কহিলেন—"দাদা যদি তুমি খাটিতে পার, তবে ভার গ্রহণ কর। আমি দুই-একখানা কাব্যের ভার লইতে পারি।" আমি বলিলাম—"তুমি আমাকে যে ভার দিবে, আমি লইব।" এইরূপ কথার পর ঐ ছাত্রকে Presidency কলেজে ভর্ত্তি করা হইল। আমি নিজ নিয়মিত কাজ করিয়া অবকাশকালে তাহাকে বেদান্তচতুঃসূত্রী, কাব্য-প্রকাশ অলঙ্কার, পাণিনি ব্যাকরণ (বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ) পড়াইবার ভার লইলাম। দুঃখের বিষয় এই—উক্ত মুসলমান ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

নীলার দৌলত

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকদিন শেয়ারের দালালি করছি। নিত্যই লাখপতি হবার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবার কোনো লক্ষণ দেখ্‌তে পাইনে। বাড়ীতে দুটি প্রাণী, নিজে আর অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাই টায়েটোয়ে সংসার-খরচ চ'লে যায়। এর ওপর মা-ষষ্ঠীর কৃপা হ'লে আর রক্ষা ছিল না।

নিজের চেষ্টায় মানুষ যখন কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারে না, তখন সে দৈবের দ্বারে ধর্‌ণা দেয়। আত্ম-অবিশ্বাসী অর্থলুব্ধ আমিও একদিন গ্রহাচার্য্যের সাম্‌নে হাত মেলে বস্‌লুম। তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে আমার হাতের তেলো টেপাটিপি ক'রে এদিক্-ওদিক কাত ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানারকমে দেখ্‌লেন, তা'র পর আমার মুখের পানে চেয়ে স্মিতহাস্তে বল্‌লেন, যান যান, বাড়ী যান! আপনার আবার ভাবনা! টাকা ত আপনার হাতে এসে পড়েছে বল্‌লেই হয়!

মনের আনন্দ গোপন ক'রে গম্ভীরভাবে বল্‌লুম, বলেন কি? আমি ত টাকার টিকি পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছিনে।

গ্রহাচার্য্য বল্‌লেন, এক কাজ করুন। ভালো দে'খে একটি নীলার আংটি পরুন। তা হ'লে আর দেখ্‌তে হবে না! আপনার টাকা মারে কে!

গ্রহাচার্য্যের পায়ের ধুলো নিলুম। মনে-মনে বল্‌লুম, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! তা'র পর তাঁর হাতে একখানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে সরাসর আমার আলাপী জুয়েলারের কাছে গিয়ে একটি দামী নীলার আংটি পরলুম।

আংটিটি পরিয়ে দিয়ে সে বল্‌লে, দিনকতক প'রে দেখুন, যদি না সয় অন্য নীলা বদ্‌লে দেবো।

আশ্চর্য্য নীলার শক্তি! পরের দিনই কিছু থোকটাকা পেলুম। তা'র পর, তৃতীয় দিন সকালবেলা বৈঠকখানায় ব'সে চা-পান ও সংবাদপত্রপাঠে রত আছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির। বয়স বছর ২২।২৩, খাসা চেহারা, পরিপাটি বেশভূষা, বুদ্ধির ছাপ চোখেমুখে সুস্পষ্ট।

তাঁকে বস্‌তে ব'লে জিজ্ঞাসা করলুম, মহাশয়ের নাম?

ভদ্রলোক বল্‌লেন, মলয়কুমার মিত্র। আপনার নাম বিনয়-বাবু? শেয়ারের দালাল?

মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলুম।

মলয়-বাবু বল্‌লেন, আপনাকে কিছু বড় কাজ জুটিয়ে দিতে পারি, যদি···

জিজ্ঞাসা করলুম, কত টাকার?

মলয়-বাবু বল্‌লেন, লাখখানেকের কম নয়, বেশি হ'লেও হ'তে পারে।

মনে-মনে বল্‌লুম, বেঁচে থাক আমার নীলা। প্রকাশ্যে বল্‌লুম বেশ ত! তা কাজ হ'লে আপনিও কিছু পাবেন বই কি! তবে বেশি কিছু আশা করবেন না। কিন্তু! আমার ত ফার্ম্ম নেই, আমি আণ্ডার-ব্রোকার। কমিশন যা হয় তার অর্দ্ধেক ত ফার্ম্মকেই দিতে হয়, বাকি অর্দ্ধেক আমার, তা থেকে ত আর বেশি দেওয়া চলে না।

মলয়বাবু বল্‌লেন, তা বেশ ত, যা আপনার সুবিধে হয় তাই দেবেন! আমি অন্যায়-কিছু আপনার কাছে চাইব কেন বলুন?

লোকটি যে যথার্থ ভদ্রলোক সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না।

মলয়বাবুর কাছে খবর পাওয়া গেল মক্কেলের নাম পশুপতি ঘোষাল, ক্রোরপতি লোক, তেজারতির কারবার করেন। শ'বাজারে তাঁর ইন্দ্রভবনতুল্য প্রাসাদ! হীরে জহরৎ আর নগদ টাকা যা ঘরে মজুদ আছে তা দিয়ে একটা গোটা রাজত্ব কেনা যায়!

মলয়-বাবু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রে বল্‌লেন, আজ

তবে উঠি মশাই! তা কবে আপনার সুবিধে হবে বলুন, বাবুকে নিয়ে আসব 'খন!

আমি বললুম, বিলক্ষণ, তাও কি হয়! তিনি আসতে যাবেন কেন? গরজ আমার, আমিই যাবো, একটা দিন স্থির করুন।

মলয়-বাবু বললেন, তবে কাল সকাল আটটা। শুভস্য শীঘ্রং, কি বলেন? ব'লে তিনি ছোটো ছেলের মতন হাসতে লাগলেন। তা'র পর টেবিলের ওপর থেকে স্লিপ প্যাড্টা টেনে নিয়ে বুক থেকে ফস ক'রে স্টাইলো-কলমটা তু'লে নক্সা কেটে পশুপতি-বাবুর বাড়ী ঠিক কোন্খানে তা বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন।

যাবার সময় বললেন, বাড়ী খুঁজে পেতে আপনার কষ্ট হবে না। আমি গেটের কাছেই থাকব'খন!

পরদিন যাত্রাকালে একবার নীলার আংটির পানে চাইলুম। নীলা ঝক্ঝক করছে, মনে হ'ল যেন হাসছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখি প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড বাড়ী, ফটকের ওপর কপারপ্লেটের ওপর লেখা P. Ghoshal। বন্দুক উঁচিয়ে সেপাই পাহারা দিচ্ছে।

সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই মলয়বাবু এগিয়ে এলেন। হাসিমুখে আমায় নমস্কার করলেন। লোকটির সমস্তটাই যেন সৌজন্য! আসুন ব'লে তিনি আমায় নিয়ে ফটকের মধ্যে ঢুকলেন।

বাড়ীর মস্ত হাতা, সেখানে নানারকম বাহারি পাতা আর মরশুমি ফুলের গাছ। আধতালা-সমান উঁচু ভিতের ওপর বাড়ী, সামনেই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে মর্ম্মর সোপানের শ্রেণী। তা দিয়ে চওড়া বারান্দায় গিয়ে পৌঁছলুম। বারান্দার মাঝে সমুচ্চ পাদ-পীঠের ওপর একটি পাশ্চাত্য ধাতুমূর্ত্তি, তা'র দুইপাশে ছাদ থেকে দুটি বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলানো। সেই মূর্ত্তি অতিক্রম ক'রে গিয়ে ডানদিকে একটা সরু পথ। মনে হ'ল বাড়ীর পিছন-পর্য্যন্ত তা'র প্রসার। সেই পথ ধ'রে কিছুক্ষণ চ'লে বাঁদিকে ফি'রে দোতলার চওড়া কাঠের সিঁড়ি, ধাপ-গুলোর মাঝখানটা বরাবর রক্তবর্ণের কার্পেটে ঢাকা। সিঁড়ির ধারে দেয়ালের ওপর গিল্টি-করা ফ্রেমে-বাঁধানো ছোটোবড় নানারকম বিলিতি ছবি।

দোতলায় উঠে ডাইনে-বাঁয়ে অনেক ঘর। এমনি-একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মলয়-বাবু বললেন, এইখানে বাবুর নায়েব বসেন, তাঁর সঙ্গে আগে কথাবার্ত্তা হোক!

প্রায় ঘরজোড়া তক্তপোষের ও'র সতরঞ্চি পাতা, তা'র ওপর ধব্ধবে সাদা জাজিমের আস্তরণ। ইতস্তত কয়েকটা মোটা তাকিয়া, তারই একটার ওপর হেলান দিয়ে এক ভদ্রলোক ব'সে গুড়গুড়ি টানছেন। বয়স অনুমান পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথার সামনে খানিকটা টাক। খড়্গের মত নাক, নাকের ওপর চশমা—চোখ থেকে অনেকটা দূরে। সামনে খেরোয় বাঁধা খানকত জাব্দা খাতা।

আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন, বসুন, বসুন, বিনয়-বাবু! আপনার সঙ্গে বিশেষ কাজ আছে, শুনেছেন বোধ হয় এঁর কাছে? ব'লে মলয়-বাবুর পানে ইঙ্গিত করলেন!

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি।

জুতো খু'লে আরাম ক'রে বসলুম। মলয়-বাবুও তদ্রূপ করলেন। নায়েব গলার সুর নামিয়ে বলতে লাগলেন—বাবুর ত খরচের অন্ত নেই—জানেনই ত বড়মানুষদের ধরণধারণ! কর্ত্তা বেঁচে থাকতে তবু একটু রাশটান ছিল, তিনি মারা যাবার পর থেকে ধারা একেবারে উলটে গেছে! ছেলেছোকরার হাতে অগাধ টাকা পড়লে যা হয় আর কি! ঘোড়দৌড়, বাগানবাড়ী, লজ, তা'র ওপর এদিক্-ওদিক্ সমস্তই আছে, বুঝতেই পারছেন! টাকাকড়ি সব তচনচ ক'রে ফেললে! তাই মনে করছি আস্তে-আস্তে কিছু টাকা শেয়ারে আটকে ফেলব। কি বলেন?

আমি বললুম, আপনি বিবেচকের মতন কথা বলেছেন।

নায়েব বললেন, বাবুকে নিমরাজি করিয়েছি। আপনিও, শেয়ারে টাকা রাখা যে বিশেষ দরকার, আর তা'তে লাভ অনেক, সেটা তাঁকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলবেন।

হঠাৎ মুখ তু'লে বললেন, এই যে, নাম করতেই হাজির!

বাবুর বয়স পঁচিশের বেশী নয়। সুকুমার সুশ্রী

চেহারায় দুধের মতন সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি, ফরাসীডাঙার লাল নরুনপাড় কোঁচানো ধুতি আর সাদা কটকী চটি দিব্যি মানিয়েছে। বাঁহাতে ক'ড়ে-আঙুলের ওপর একটা মস্ত হীরের আংটি।

আমাদের কিছু বল্‌বার বা কর্‌বার অবসর না দিয়েই তিনি বল্‌লেন, বসুন বসুন। ব্যস্ত হবেন না।

নায়েব বল্‌লেন, ইনি শেয়ারের দালাল বিনয়বাবু।

বাবু বল্‌লেন, অ, হাঁ! আপনার আস্‌বার কথা ছিল বটে! তা বেশ! চলুন আমার ঘরে, সেখানেই আলাপ হবে'খন!

বাবুর অনুসরণ কর্‌লুম। বারান্দা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেটা যে বাবুর খাসকামরা তা বুঝ্‌তে কষ্ট হ'ল না। মেঝের ওপর কাশ্মীরী কার্পেট, দোরের গায়ে মখমলের পর্দ্দা, সৌখীন আসবাবপত্র সমস্তই ল্যাজারাসের, অস্‌লারের পাখা আর বিদ্যুতের বাতি, আল্‌মারির দরজায় মানুষসমান বড়-বড় আয়না। ঘরের একধারে কয়েকটা লোহার আল্‌মারি আর সিন্দুক, তা'র পাশে একটা শেল্‌ফের ওপর কয়েকটা পিস্তল ও বন্দুকের চামড়ার কেস্।

একখানা চৌকো ছোটো টেবিলের পাশে সাটিনের গদি আঁটা চেয়ারে আমায় বস্‌তে ব'লে সাম্‌নের চেয়ারে বাবু বস্‌লেন। বল্‌লেন, এইবার বলুন কি কি শেয়ার কেনা যায়? কিছু কয়লা, পাট আর চায়ের শেয়ার কিন্‌ব মনে কর্‌ছি। তা'র পর হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়্‌ল এম্‌নি ভাব দেখিয়ে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়্‌লেন। বল্‌লেন, একমিনিট মাপ কর্‌তে হবে!

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একথোলো চাবি বার ক'রে একটা লোহার আল্‌মারি খু'লে তা'র একটা দেরাজ টান্‌লেন। আমি সেইদিকে মুখ ক'রে বসেছিলুম, বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম দেরাজটা তাড়া বাঁধা নম্বরি নোটে ঠাসা। গোটাকত তাড়া বার ক'রে অন্য একটা দেরাজ খু'লে তা'র মধ্যে রাখ্‌লেন, তা'র পর সে দেরাজ বন্ধ ক'রে আর-একটা দেরাজ খুল্‌লেন। অম্‌নি মোহর আর মুক্তোর মালা আর জড়োয়া গহনার ঝিলিক চোখে এসে লাগ্‌ল। সেই দেরাজটার মধ্যে খানিকক্ষণ খ'রে বাবু যেন কি খুঁজ্‌তে লাগলেন, তা'র পর সেটা বন্ধ ক'রে আল্‌মারিতে চাবি লাগালেন।

আমার পাশে ফি'রে এসে তিনি বল্‌লেন, আপনাকে বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে কর্‌বেন না।

ভদ্রতার খাতিরে বল্‌লুম, না না, তা'তে কি হয়েছে, আমার ত তাড়া নেই! যদিও মনে মনে একটু বিরক্ত হচ্ছিলুম।

বাবু বল্‌লেন, চলুন নায়েব-মশায়ের ঘরে, ফর্দ্দটা ক'রে ফেলা যাক।

ভাব্‌লুম, তা হ'লে এঘরে আস্‌বার কি দর্‌কার ছিল? ঐশ্বর্য্য দেখানো উদ্দেশ্য নয় কি?

নায়েবের ঘরের সাম্‌নে এসে বাবু বল্‌লেন, আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন। আমি আস্‌চি চট্ ক'রে।

নায়েব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কথাবার্ত্তা হ'ল?

আমি বল্‌লুম, বিশেষ কিছু না। এই ঘরেই হবে বল্‌লেন।

নায়েব বল্‌লেন, তা বেশ, বসুন।

এমন সময় একটা লোক নায়েবকে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। মাথার পিছনটা কামানো, সাম্‌নে ঢেউখেলানো সিঁথি, চোখ কোটরগত, মুখ শীর্ণ ও শ্রান্ত, তা'র রেখায়-রেখায় নিশাচর জীবের অকথ্য ইতিহাস পরিস্ফুট। মিহি-সুতার ধুতি ও চাপকানের মতন লম্বা পাঞ্জাবি আধময়লা, পায়ের পাম্প্‌শু ধূলিধূসরিত অপরিচ্ছন্ন। কতকগুলা লোক আছে যাদের উপর প্রথমদর্শনেই বিতৃষ্ণা জন্মে, লোকটা সেই শ্রেণীভুক্ত।

তা'র দিকে মুখ তু'লে নায়েব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কি দর্‌কার আপনার?

লোকটা সবিনয়ে বল্‌লে, আজ্ঞে, আমি এসেছি একটা বাড়ী বন্ধক রেখে কিছু টাকা ধার কর্‌তে।

নায়েব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কত টাকা?

সে বল্‌লে, পঞ্চাশ হাজার।

নায়েব বল্‌লেন, কোথায় বাড়ী? কত জমির ওপর?

সে বল্‌লে, আজ্ঞে বাড়ী পুরোনো নয়, হালে তৈরি হয়েছে। আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীটের ওপর। জমি দশ কাঠা, আট-কাঠার ওপর বাড়ী।

নায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, কত সুদ দেবে?

সে বল্লে, দশটাকা।

নায়েব তাচ্ছিল্যের স্বরে বল্লেন, দশটাকা! বারো-টাকা দিতে পারবে? পারো ত বলো, গিয়ে বাড়ী দেখে আসি।

এমন-সময় বাবুর আবির্ভাব। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

নায়েব আগন্তুককে দেখিয়ে বল্লেন, ইনি বাড়ীর দালাল, বাড়ী বাঁধা রেখে পঞ্চাশহাজার টাকা ধার চান।

বাবু বল্লেন, কত সুদে?

লোকটা বল্লে, আজ্ঞে আমি বল্‌ছি দশটাকা......

বাবু বল্লেন, বারোটাকার এক পয়সা কম নয়।

দালাল বল্লে, আজ্ঞে দশটাকার বেশী......

বাবু বল্লেন, না হে না। হয় ত দেখ। নইলে আমার কাজ আছে, সময় নষ্ট কোরো না।

সে তখন জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে 'আজ্ঞে তা হ'লে আসি,' ব'লে বিদায় হ'ল।

বাবু তক্তপোষে উ'ঠে বসলেন। আমার দিকে ফি'রে বল্লেন, আসুন এবার, কাজে বসা যাক্‌।

কাগজ-পেন্সিল নিয়ে লেখ্‌বার উদ্‌যোগ করছি, হঠাৎ চোখ পড়্‌ল বারান্দায়, বাড়ীর-দালাল তা'র বিশ্রী মুখখানা চট্‌ ক'রে দোরের পাশে টেনে নিলে দেখ্‌তে পেলুম। লোকটা তা হ'লে যায়নি! ওখানে দাঁড়িয়ে করছে কি? মরুক গে, আমার অতশতয় দরকার? আবার কাজে মন দিলুম।

মাথা হেঁট ক'রে লিখ্‌চি, বাবু ব'লে উঠ্‌লেন, আবার কি? ফিরলে যে?

চোখ তু'লে দেখি, বাড়ীর-দালাল আবার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে হাত কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে বল্লে, আজ্ঞে আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি কথা?

সে বল্লে, একটু আড়ালে বলতে চাই।

বাবু বল্লেন, যা বল্‌বার এখানেই বলতে পারো! তিনি বিরক্ত হয়েছেন বুঝতে পারলুম। আর হবারই কথা। দালালটা যে unmitigated nuisance তা'তে আর সন্দেহ কি?

সে আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বলতে লাগ্‌ল, আজ্ঞে দেখুন, অনেকদিন আগে এক আমেরিক্যান সাহেবের কাছে একটা ম্যাজিক শিখেছিলুম। অনুমতি করেন ত আপনাকে দেখাই!

বাবু হাঃ হাঃ ক'রে হাসতে লাগ্‌লেন। বল্লেন, সকাল-বেলা ম্যাজিক, বলো কি হে? দেখ্‌ছ না, কাজ করছি? এখন কি ম্যাজিক দেখ্‌বার সময়?

দালাল মিনতি ক'রে বল্লে, আজ্ঞে বেশী সময় লাগ্‌বে না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখাতে পারি, যদি অনুমতি করেন......

বাবু অবিশ্বাসের স্বরে বল্লেন, হ্যাঃ! ম্যাজিকের তোড়-জোড় করতেই যায় একঘণ্টা, বলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখাবে! তা'র পর আমার দিকে ফি'রে বল্লেন, কি বলেন বিনয়-বাবু, সকাল-বেলা কি ম্যাজিক দেখ্‌বার সময়?

ছেলেবেলা থেকে ম্যাজিকের ওপর আমার ভারি ঝোঁক। কলেজে পড়্‌বার সময় সেটা একরকম নেশায় পরিণত হয়েছিল। অনেক সময় আর অর্থ ব্যয় ক'রে ও বিদ্যাটা বেশ আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলুম। স্কুল-কলেজের অ্যানিভার্সারি বা বিয়ের নিমন্ত্রণ-সভায় ম্যাজিক দেখাবার জন্যে প্রায়ই আমার ডাক পড়্‌ত। বহুকাল পরে ম্যাজিকের নাম শু'নে ভারি কৌতূহল হ'ল, দেখাই যাক্‌না, হয়ত একটা নতুন খেলা শেখা যাবে, তা-ছাড়া লোকটাকেও কেমন অদ্ভুত ঠেকছিল, তাই বাবুর প্রশ্নের উত্তরে বল্লুম, মন্দ কি! পাঁচ মিনিট সময় বই ত নয়!

বাবু ঈষৎ হেসে বল্লেন, আচ্ছা, দেখি কি তোমার ম্যাজিক।

লোকটা বল্লে, যে আজ্ঞে। তা'র পর আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে পকেট থেকে একমুঠো স্ফটিকের দানা বার করলে, মুসলমান ফকিরেরা যার মালা গলায় পরে। সে বল্লে, এখানে চোদ্দগণ্ডা দানা আছে। এই দানা আমি আপনার সামনে রাখ্‌ব। তা থেকে আপনি ছ'টা দানা নিয়ে সামনে একসারে তিনভাগে সাজাবেন। প্রথমভাগে

১, দ্বিতীয় ভাগে ২, তৃতীয় ভাগে ৩। তা'র পর আমি যখন বল্‌ব, তখন ঐ তিন ভাগের যে-কোনো একটা ভাগ এই দানাগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন। তা'র পর আমি গুন্‌ব। গু'নে যদি গণ্ডা পুরো হ'য়ে, যে-কটা দানা মিশিয়েছেন তাই বাড়্‌তি থাকে তা হ'লে আমার জিত, নইলে আপনার। ধরুন এই দানাগুলোর সঙ্গে ঐ মাঝের ভাগ অর্থাৎ দুটো দানা মিশিয়ে দিলেন, আর গু'নে দেখা গেল, গণ্ডা পুরো হয়ে বেশী রইল দুটো, তা হ'লে আমার জিত। বুঝ্‌লেন? বাজি রেখে খেল্‌তে হয়, আর যত টাকা বাজি ধর্‌বেন জিত্‌লে তা'র চারগুণ পাবেন, হার্‌লে চারগুণ দিতে হবে।

বাবু বল্‌লেন, বা: এ আবার ম্যাজিক কোন্‌খানে? এ ত gambling। তবে রেসে হার্‌লে যে টাকা ধরা যায় সেইটেই লোক্‌সান হয় আর তোমার খেলায় হয় চারগুণ, এই ত তফাৎ দেখ্‌ছি।

লোকটা বল্‌লে, আজ্ঞে এইরকমই খেলা, তা এ'কে যাই বলুন। দু-একহাত খেলে দেখ্‌বেন কি? অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে হুজুরের সঙ্গে একবার খেলি।

বাবু অবজ্ঞার স্বরে বল্‌লেন, তুমি খেল্‌বে আমার সঙ্গে? টাকা পাবে কোথা?

সে বল্‌লে, আজ্ঞে সঙ্গে আমার ৮০০৲ টাকা আছে। দর্‌কার হলে আরও হাজার-দুই জোগাড় কর্‌তে পারি।

আমি আর স্থির থাকতে পার্‌লুম না। বল্‌লুম, মশায় মাপ কর্‌বেন, কিন্তু আপনার বুকের পাটা ত কম নয়! করেন ত বাড়ীর দালালি, বাবুর সঙ্গে খেল্‌তে চান কোন্ সাহসে?

লোকটা আমার কথার কোনো জবাব দিলে না, কথাগুলো যে তা'র কানে গেছে, এমন মনে হ'ল না। সে বাবুর দিকে ফি'রে বল্‌লে, তা হ'লে কি একহাত খেল্‌বেন হুজুর?

বাবু বল্‌লেন, আচ্ছা, এস দেখাই যাক্? এই নাও ধর্‌লুম, ব'লে একখানা একশ'টাকার নোট সাম্‌নে রাখ্‌লেন।

লোকটাও পকেট থেকে একখানা নোট বার ক'রে সাম্‌নে রাখ্‌লে।

মলয়-বাবু, আমি আর নায়েব খেলা দেখ্‌বার জন্যে ঝুঁকে পড়্‌লুম।

খেলায় বাবু হেরে গেলেন।

দালাল ও বাবু নিজ-নিজ নোট তু'লে নিলেন। নায়েবের দিকে ফি'রে বাবু বল্‌লেন, লেখো আমার চারশ' টাকা হার।

নায়েব তাই কর্‌লে, আবার খেলা হ'ল। এবারও বাবুর হার হ'ল। বাজি ধরেছিলেন ২০০৲ টাকা, কাজেই ৮০০৲ টাকা হার হ'ল।

পনেরো মিনিটের মধ্যে বাবু যখন ৬৪০০৲ টাকা হেরেছেন তখন নায়েব বাবুর হাত-দুটো চেপে ধর্‌লেন। বল্‌লেন, দোহাই আপনার! আর খেল্‌তে পার্‌বেন না! আপনি দেবেন না টাকা! নিশ্চয় এতে জোচ্চুরি আছে!

লোকটি বল্‌লে, কেন আমি দানা রাখ্‌বার আগে ত গু'নে দেখ্‌লুম?

বাবু বল্‌লেন, থাক! আজ আর না। এ'কে টাকা দেওয়া উচিত কি না, বলুন বিনয়বাবু?

আমি বল্‌লুম, আপনি যখন স্বেচ্ছায় খেল্‌তে বসেছেন তখন দেওয়া উচিত বইকি!

বাবু বল্‌লেন, ঠিক বলেছেন। ডেট্‌-অব্‌-অনার। টাকা আমি দেবো।

লোকটা বল্‌লে, টাকা আজ নাই বা দিলেন! আবার কাল খেলুন। কাল যে জিত্‌বেন না, কে বল্‌তে পারে? কাল খেলার পর একেবারে হিসেব কর্‌লেই হবে।

বাবু বল্‌লেন, না হে না। কালকের কথা কাল হবে। আজকের টাকা চুকিয়ে দিচ্ছি, ব'লে বাবু টাকা আন্‌তে উ'ঠে গেলেন।

লোকটাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, বলুন ত ম্যাজিকটা কেমন ক'রে করেন? বার-বার জেতেন কি ক'রে?

সে বিরক্তভাবে বল্‌লে, আপনার অত মাথাব্যথা কেন?

আমি তখন নায়েবকে বল্‌লুম, আচ্ছা, আমার হাতে দানাগুলো দিতে বলুন ত।

নায়েব লোকটার হাত থেকে দানাগুলো নিয়ে আমার হাতে দিলেন। খেলাটা দেখিয়ে দিলুম।

অবাক্ হ'য়ে নায়েব বল্‌লেন, আপনি পারেন? কি ক'রে কর্‌লেন?

আমি তাচ্ছিল্যের স্বরে বল্‌লুম, ও আর এমন-কি,

হাতের মারপ্যাঁচ বই ত নয়? চোদ্দগণ্ডা থেকে বেমালুম দু'টো দানা সরিয়ে ফেল্‌তে হবে। বাকি থাকে সাড়ে তের গণ্ডা। তা থেকে দু'টো দানা আপনি সাম্‌নে তিনভাগে সকালন ১, ২ আর ৩। বাকি থাকে বারো গণ্ডা। বারো গণ্ডার সঙ্গে আপনি ১, ২ বা ৩ যাই মেশান, প্রত্যেক-বারই গণ্ডা ভর্ত্তি হ'য়ে ঠিক যা মেশাবেন তাই বাড়্‌তি থাক্‌বে, আর আপনার হার হবে।

নায়েব বল্‌লেন, ঠিক ঠিক, আমিও ত তাই বল্‌ছিলুম, নিশ্চয় কোনো জোচ্চুরি আছে, নইলে বার-বার হার হয় কেমন ক'রে!

তা'র পর দালালের দিকে চোখ পাকিয়ে বল্‌লেন, ফের যদি কখনো এখানে আসো তা হ'লে তোমার হাড় আর মাংস আলাদা ক'রে ফেল্‌ব! প্রাণ নিয়ে ফির্‌তে হবে না, মনে থাকে যেন! পাজি কোথাকার!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাবু এসে ঢুক্‌লেন। একতাড়া নোট লোকটার হাতে দিয়ে ৬৪০০ টাকার হিসেব বুঝিয়ে দিলেন।

আমি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলুম। কি-কাণ্ড! পনেরো মিনিটের মধ্যে লোকটা এত টাকা ঠকিয়ে নিলে!

দালাল চ'লে গেলে আমাকে দেখিয়ে নায়েব বাবুকে বল্‌লেন, ইনিও ও-খেলাটা জানেন।

বাবু বল্‌লেন, সত্যি নাকি? আসুন না, একহাত খেলা যাক।

আমি বল্‌লুম, মাপ করবেন। আমি গরীব মানুষ, আপনার মতন আমীরের সঙ্গে খেল্‌বার স্পর্দ্ধা আমার নেই।

বাবু বল্‌লেন, আহা, এম্‌নি না হয় একবার খেলে দেখান না! তা'তে ত আর দোষ নেই!

অগত্যা খেলাটা দেখালুম। দু'-একবার ইচ্ছে ক'রেই বাবুকেও জিতিয়ে দিলুম।

বাবু মহাখুসি! বল্‌লেন, বাঃ, আপনার দেখ্‌ছি পাকা হাত! আসুন, আসুন খেলা যাক! টাকার জন্যে ভাব্‌ছেন কেন? টাকা নয় আমি অ্যাড্‌ভান্‌স করছি!

আমি বল্‌লুম, মাপ করবেন, টাকা ধার ক'রে আমি খেল্‌তে পারব না।

বাবু আর অনুরোধ করলেন না। হঠাৎ বল্‌লেন, বাজে কাজেই সময় গেল, আমাদের আসল কাজটা এখনো হ'ল না, বেলাও হ'য়ে গেল। আচ্ছা আর মিনিটপাঁচেক বসুন, একটু জল খেয়ে আসি।

কিছুক্ষণ ধ'রে যে সন্দেহ আমার মনের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, সেই কথাটায় তা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হ'ল, সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতন পরিষ্কার হ'য়ে উঠ্‌ল। এত-বড় আমীর লোক, এত যার লোকলস্কর, তা'কে জল খেতে উ'ঠে যেতে হয়, কথাটা এম্‌নি অদ্ভুত যে আমার মনে আর সংশয় রইল না, এতক্ষণ যে সমস্ত ব্যাপার ঘট্‌ল, লোহার আলমারি খু'লে ধনদৌলত দেখানো থেকে সুরু ক'রে এই ম্যাজিক পর্য্যন্ত, তার একটাও আকস্মিক নয়, সমস্তই একটা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সুচিন্তিত চক্রান্ত, উদ্দেশ্য আমাকে জালে ফেলা। আমার মনে হ'ল, এই যে, ক্রোরপতি বাবু, যিনি এইমাত্র জল খাবার অছিলায় বার হ'য়ে গেলেন এবং খুব সম্ভবত অগোচরে থেকে এই মুহূর্ত্তে আমার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গী লক্ষ্য করছেন আর সেই বাড়ীর দালালটিও হয়ত তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে আমায় সর্ব্বস্বান্ত করবার ফন্দি আঁট্‌ছে, এই যে আমার সাম্‌নে নায়েব আর তাঁরই পাশে মলয়বাবু ভিজেবিড়ালের মতন অতি নিরীহভাবে ব'সে আছেন, এঁরা সবাই এক গোয়ালের গরু, সকলেই পাকা খেলোয়াড়। এঁরা সকলেই চমৎকার অভিনয় করছেন, সে-অভিনয় দেখ্‌ছি আমি একা। এরা যদি আমাকে দিয়ে জোর ক'রে হ্যাণ্ড্‌নোটেও সই করিয়ে নেয়, তা হ'লেই বা আমায় বাঁচাতে পারে কে?

ভাব্‌তে-ভাব্‌তে আমি শিউরে উঠ্‌লুম, নিজেকে বড় দুর্ব্বল, ভারি অসহায় ব'লে মনে হ'ল, একটা দারুণ উদ্বেগ ও আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। আমি যেন একটা তুচ্ছ মাছির মতন মাকড়সার জালে ধরা পড়েছি। সেই জাল ছিঁ'ড়ে কেমন ক'রে আবার কল্‌কাতার পথে বার হ'তে পারব এই চিন্তায় আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠ্‌লুম। হঠাৎ আঙুলের ওপর চোখ পড়্‌ল, নীলাটা ঝক্‌ঝক করছে। রাগে আমার গা রি-রি ক'রে উঠ্‌ল। ভাব্‌লুম, নীলা প'রেই এই বিপত্তি, সেই ত লোভ দেখিয়ে আলেয়ার মতন পথ ভুলিয়ে

আমায় এখানে নিয়ে এসেছে। প্রাণ নিয়ে যদি ফিরতে পারি, তা হ'লে ঐ নীলাটাকে দূর ক'রে দিয়ে তবে অন্য কাজ! এতটা বেলা হ'ল, অনু নিশ্চয়ই না খেয়ে আমার জন্যে ব'সে আছে, কি সে ভাবছে কে জানে, আমার যদি ভালোমন্দ কিছু-একটা ঘটে, তা হ'লে তা'র উপায় কি হবে?

এমনিধারা এলোমেলো নানাচিন্তা আমার মগজটাকে তোলপাড় ক'রে তুললে, ইলেকট্রিক্ পাখার তলায় ব'সেও সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠ্‌ল আমার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল, অথচ একটু জল চেয়ে খাবারও সাহস হ'ল না, কি জানি যদি বিষ মিশিয়ে দেয়!

কিন্তু একটা কথা বেশ বুঝতে পারলুম, চিন্তার যতই কারণ থাক, বাঁচতে হ'লে আর দেরি করা চলবে না, যেমন ক'রেই হোক, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বার হ'য়ে পড়তে হবে। তা'র একমাত্র উপায় দর্শক হ'য়ে ব'সে না থেকে ওদেরই মতন পাকা অভিনয় করা।

বাবু যেই বার হ'য়ে গেলেন, নায়েব অমনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আপনি ত খাসা খেলেন, বিনয়-বাবু। আসুন না আমরাও বাবুর সঙ্গে খেলে কিছু টাকা মেরে নিই। এতে অধর্ম্ম নেই, দেখলেন ত, বাইরে থেকে একটা কে-না-কে লোক এসে দেখতে-দেখতে কাঁড়িটাকা লুটে নিয়ে গেল।

দুঃখের সুরে তিনি বলতে লাগলেন, এই দেখুন না, এদের কাজে চুল পাকালুম, তা কিইবা এমন সুবিধে করতে পেরেছি। এখনো তিন-তিনটে মেয়ে পার করতে বাকি, বিয়ের বাজার ত জানেনই, কোথেকে টাকা আসে বলুন দেখি? পাঁচভূতে লুটে খাচ্ছে, নয় আমরাও কিছু খেলুম। কেমন? কি বলেন?

তৎপরতার সঙ্গে বললুম, আপনি ঠিক বলেছেন। পয়সা করতে হ'লে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে মালা জপলে চলে না, অনেক ফিকিরফন্দি আঁটতে হয়। আমারই কি অমত? তবে বুঝতেই পারছেন, পুঁজিপাটা ত বিশেষ কিছু নেই, তাই ভাবছি।

নায়েবের মুখে হাসি ফুটল। শিকার জালে পড়েছে। বললেন, বেশি দরকার নেই, হাজার-দুয়েক হ'লেই হবে। গয়না বন্ধক রেখে আমিও হাজার-খানেক জোগাড় ক'রে আনব'খন।

মলয়-বাবু এতক্ষণ একটিও কথা কননি। এবার তিনিও উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। বললেন, আমিও হাজার-খানেক আনব। তা হ'লেই আমাদের পুঁজি হ'ল চারহাজার! বেশ হবে'খন! লাভ যা হবে তিনজনে ভাগ ক'রে নেবো!

আমি বললুম, পুরো দু-হাজার যে জোগাড় করতে পারব, এমন ত মনে হয় না! তবে দুহাজারের কাছাকাছি নিশ্চয়ই আনব। তা হ'লে কবে আসব বলুন।

তা'রা দুজনে একসঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল, কবে? কালকেই! এ-ব্যাপার কি জুড়োতে দিতে আছে? বড় মানুষের খেয়াল, আসতেও যেমন যেতেও তেমনি!

সুযোগ বুঝে, তবে তাই হবে, ব'লে উঠে পড়লুম। মলয়-বাবু ফটক পর্য্যন্ত সঙ্গে এলেন। নমস্কার ক'রে বললেন, বেলা ন'টা নাগাদ আনতে যাবো। ঠিক হ'য়ে থাকবেন।

আমি বললুম, না না, আপনার আর কষ্ট করবার দরকার নেই, আমিই আসব।

বিনয়াবতার মলয়-বাবু বললেন, বিলক্ষণ! কষ্ট কিসের!

বেলা একটা বেজে গেছে। জ্যৈষ্ঠের রুদ্ররূপ আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরছিল। শানবাঁধানো ফুটপাথের উত্তাপ জুতো ভেদ ক'রে উঠতে লাগল। কিন্তু আমার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আমি সামনের দিকে একরকম ছুটে চলেছি, বুকের মাঝটা ধুক্‌পুক করছে, মনে হচ্ছে, একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের হাত থেকে এইমাত্র পরিত্রাণ পেলুম! পিছনে তাকাবার সাহস নেই, সেখানে পশুপতিবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীটা হাঁ ক'রে আছে, বলা ত যায় না, আবার যদি কোনোগতিকে গ্রাস ক'রে ফেলে!

চিৎপুরের রাস্তায় ট্যাক্সির ওপর ব'সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ওঃ! পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে মানে-মানে যে পালাতে পেরেছি, এই ঢের।

পরের দিন সকালে যথাসময়ে মলয়-বাবু আবার আমার বৈঠকখানার দরজায় দাঁড়িয়ে নমস্কার করুলেন।

আমি বল্‌লুম, আসুন। বস্‌তে'আজ্ঞা হয়।

মলয়-বাবু বল্‌লেন, না, বস্‌ব না। সময় হয়েছে, উঠুন।

আমি বল্‌লুম, মলয়-বাবু? আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তা'র পর, আপনার ধর্ম্মবোধের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে লোকে হয়ত সন্দেহ করতেও পারে, কিন্তু আপনার যে বুদ্ধির অভাব আছে, সে-সন্দেহ শত্রুতেও করবে না। আপনার মতন বুদ্ধিমান্ লোকের কি মনে হয়, পাখী একবার জাল কেটে পালিয়ে ফের ধরা দিতে চাইবে?

মলয়-বাবুর মুখের ভাবে অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, যেতে ইচ্ছে নেই তাই বলুন। হেঁয়ালি ব'লে কষ্ট দেন কেন?

তিনি নমস্কার ক'রে চ'লে গেলেন।

দিন-কয়েক পরে শেয়ার-মার্কেটে এক দালাল-বন্ধুকে ব্যাপারটা মোটামুটি বল্‌লুম।

শু'নে সে বল্‌লে, খুব বেঁচে গেছিস! অমন পাল্লাতেও পড়ে! এসাচি খেলার নাম শুনিস্‌নি কখনো?

আমি বল্‌লুম, না। তুই ও-খেলার কথা কি ক'রে জান্‌লি?

সে বল্‌লে, হাজার-দুই টাকা গচ্চা দিয়ে!

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায়?

বন্ধু বল্‌লে, পশুপতি-ঘোষালের বাড়ী।

গজানন্দ

শ্রী ভাবকুমার কাঞ্জীলাল

গজানন্দ শেষাশেষি সত্য-সত্যই একটা পাকা ব্যবসাদারী আফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় কেরাণী-Salesman এর কাজ নিলে। কাঠের ব্যবসা সম্বন্ধে ভাব্‌তে গিয়ে সে গোড়াতেই সমস্ত পার্ব্বত্য ত্রিরাই ইজারা নেওয়ার কথা ভেবেছে, ট্যাক্সি চালাবার কথা হ'লেই সে Indo-Tibetan Railway সম্বন্ধে Scheme ফেঁদেছে—দুকোটি হামান দিস্তা রাখার সুবিধা মতন Warehouse না পাওয়াতে সে কব্‌রেজি ব্যবসাটাতে হাতই দিতে পারলে না, অথচ সেই আজ ঠিক সাড়ে নটার সময় ছাতাটি গলায় আটকে দোকানে হাজির হ'য়ে হাসিমুখে প্রথমেই বড়বাবুকে দর্শন দেয় তা'র পর সারাদিন হাঁকে বাজিয়ে হাতুড়ি ঠুকে নখের আঁচড় দিয়ে রঙের চিরস্থায়িত্ব প্রমাণ ক'রে পূর্ব্ববঙ্গের সওদাকারীদের টীনট্রাঙ্ক বিক্রী করে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ আজন্ম অনন্ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রের গতি ও অবস্থান পর্য্যালোচনা ক'রে একদিন হঠাৎ মাটির দিকে তাকিয়ে পিঁপড়েরাও বুদ্ধিমানের মতো সার বেঁধে চলাফেরা করুছে দে'খে সহসা বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে দূর-বীক্ষণকে বিসর্জ্জন দিয়ে অনুবীক্ষণকেই ধর্ম্মত্যাগী নবলব্ধ ধর্ম্মকে যেমন গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে তেম্‌নি করে পূজা করে; গজানন্দও আজ হঠাৎ হাইফাইনান্স ও ইকনমিক্স্-ক্লিষ্ট মস্তিষ্কে টীনট্রাঙ্ক ব্যবসায়ের অসম্ভব জটিলতা ও চরম পূর্ণতা উপলব্ধি ক'রে ভাবগদগদ-প্রাণে দোকানে ক্রেতার অভাব-অবকাশে ভক্তের মতো 'লক্ অ্যাণ্ড কি' ডিপার্ট্‌মেণ্টের হেড্ ছোটোবাবুর দিকে ঈষৎ বিস্ফারিত বদনে তাকিয়ে থাকে।—

এইত ব্যবসা! বিল আসে, বিল যায়, দরদস্তুর, কেনাবেচা, লাভলোকসান, credit cash, ব্যাঙ্ক চেক, ড্রাফ্‌ট রিমাইণ্ডার, লেজার ডে-বুক, মেমো পেটিক্যাশ প্রভৃতির আবর্ত্তে সে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌লে। যে বড়বাবু ক্রস্‌চেক পোস্ট্‌ ডেট ক'রে ছাড়া পেমেণ্ট্ করেন না, দশ পার্‌সেণ্ট্-এ টাকা ধার ক'রে চব্বিশ পার্‌সেণ্ট্-এ খাটিয়ে

মার্জ্জিন রেখে লাল হ'য়ে উঠেন, তিনি কী মানুষ! না ছোটোবাবুই—যিনি দিশী লকের উপর স্বহস্তে Made in England লি'খে দুনো দামে বিক্রী ক'রে দাঁও মেরেছি-ভেবে-বহির্গমন-পর ক্রেতার দিকে সস্মিত-বদনে চেয়ে থাক্‌তে পারেন—তিনিই মানুষ?

গজানন্দ এতদিন দেবতাহীন ভক্তের মতো তাহার উচ্চ-ব্যবসায়-উন্মত্ত হৃদয়টি নিয়ে আজ Commercial Institute, কাল correspondence course নিয়ে কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। আজ সে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন কর্‌লে বটে, কিন্তু নবাবিষ্কৃত দেবতার দিব্যভাতিতে ধর্ম্মত্যাগের দুঃখ তাহার মনে একবারও জাগ্‌ল না। বড়-বাবু বল্‌লে সে এখন একটা হামানদিস্তা নিয়েই কবরেজি সুরু কর্‌তে পারে; একখানা ট্যাক্সির মালিক হ'য়েই পথে-পথে ভাড়া খুঁজে ছোটাছুটি কর্‌তে পারে; পাঁচ কিউবিক ফুট সেগুন কাঠ কিম্বা দুই স্কোয়ার ফুট টিনের পাত নিয়ে দুঘণ্টা দর-দস্তুরও কর্‌তে পারে।—আর বিজ্ঞাপনের কথা!—সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় যখন সে দেখ্‌ত যে 'বদনচন্দ্র গুড় অ্যাণ্ড সন্স'-এর pure steel trunk পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন এই শ্রেষ্ঠত্বের আভা তা'র নিজের মুখকেও উজ্জ্বল ক'রে তুল্‌ত। যে steel trunk দুশো বচ্ছর পূর্ব্বে কেউ কল্পনায়ও কর্‌তে পার্‌ত না, যা আজ বাংলার ঘরে-ঘরে হাঁড়ি ও কাঠের সিন্দুককে দূর ক'রে বিরাজমান, যার অভ্যন্তরে ছিন্নবস্ত্র থাক্‌লেও বস্ত্রের মালিককে সমৃদ্ধিশালী ব'লে ভুল হয়, যার পেটেণ্ট লক্‌ ছোটোবাবুর নিজের আবিষ্কৃত এবং সকল চোরের সরমের মূল সেই ষ্টীলট্রাঙ্ক-মাহাত্ম্যে গজানন্দ আজ নিজেকে ধন্য মনে কর্‌লে।

নব-নব ব্যবসায়ের নব-নব scheme যার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হ'তে অহরহ গজিয়ে উঠ্‌ত—কাল্পনিক ব্যবসায়ের বিরাট উন্নতিতে মুগ্ধ হ'য়ে যে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ে হাতই দিতে পার্‌লে না, সেই গজানন্দ এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমুগ্ধনয়নে তাহার কলকজ্জা নিরীক্ষণ করে; অদ্ভুত বিস্ময়ে দেখ্‌তে থাকে বর্ণহীন ষ্টীল কি ক'রে বর্ণবৈচিত্র্যে বিচিত্র হ'য়ে ওঠে। ষ্টীলট্রাঙ্কের গায়ে সে দেখে, কখনও বা পীতসাগরের উত্তালতরঙ্গ বিক্ষোভ, কখনো বা লোহিত সাগরের মৃদুমন্দ বীচিভঙ্গ, কখনও বা সুদূর সুদান প্রান্তরের পার্ব্বত্য বালু-গুহায় পশুরাজের পাংশুল কেশররাজি; কোথাও দুর্গম সুন্দরবনের কৃষ্ণ পীতরেখ রয়াল বেঙ্গল শার্দ্দুলের মসৃণগাত্র কণ্ডূয়ন; কোথাও তিব্বত উপত্যকার বাইসনের কৃষ্ণকান্তি, কোথাও অতলান্তিক মহাসাগরের অশান্ত বর্ত্তুলাকার আবর্ত্ত। কখনও বা সে কোনো ট্রাঙ্কের দিকে চেয়ে থাক্‌তে-থাক্‌তে School of Tropical Medicine এর show-caseস্থিত মানব-গাত্রচর্ম্মের বীভৎস রেখা-বৈচিত্র্য দে'খে যুগপৎ বীভৎস ও মাধুর্য্য রসাপ্লুত হয়; কখনও বা বিন্ধ্যাচল গিরির শ্যামল বনানীর হরিৎ, মালয় সাগর-বেলাভূমিস্থিত তমাল-তালীবনরাজি নীলার নীল নয়নসম্মুখে ট্রাঙ্কাকারে সজ্জিত দেখে এই সকলের মূলাধার বড় বাবুর চরণে বারম্বার শত-শত প্রণাম নিবেদন করে।

গজানন্দের দোঁয়াটে জীবন এম্‌নি ক'রে রূপে রসে-বর্ণে গন্ধে ভ'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে মুখে নিজেকে কেরাণী ব'লে প্রচার কর্‌লেও বড়বাবুর ব্যবসা-সাফল্য-গর্ব্বে নিজেকে গৌরববিমণ্ডিত মনে কর্‌ত, পথেঘাটে মাসিক সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় বদনচন্দ্র গুড়ের ষ্টীলট্রাঙ্কের বিজ্ঞাপন দে'খে নিজেরই প্রশংসাপত্র ভেবে আত্মগর্ব্বে স্ফীত হ'ত—ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, নাকের কাছে, দূরে, ব্যাঁকা ক'রে, সোজা ক'রে, বিজ্ঞাপনের type, setting, position, border, spacing effect প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে তন্ময় হ'য়ে যেত।

কোনোদিন হয়ত বড়বাবু বাড়ী ফের্‌বার পথে ছোটো গোলাপী-রং-করা হলদে ১৯০৩ সালে সেলে-কেনা ফোর্ড গাড়িটিতে গজানন্দকেও নিয়ে আস্‌তেন। গজানন্দের বাড়ীর গলির মুখে গজানন্দকে নামিয়ে দিয়ে বড়রাস্তা বরাবর বড়বাবুর গাড়ী যখন দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে যেত, তা'র অনেকক্ষণ পরেও দেখা যেত গজানন্দ তা'র ভক্তি-গদগদ দেহটি নিয়ে মহাশিল্পীর হস্তপ্রসূত সচ্ছত্র কোনো গতায়ু শ্রেষ্ঠের স্মৃতিমূর্ত্তির মতো নিশ্চলভাবে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে-সময়ে কোনো পরিচিত লোক তা'কে ডাক্‌লে কোনো উত্তর পেত না। গজানন্দ তন্ময় ও তদগদচিত্তে অনন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্থাণুর মতো নিঃশব্দ মাদকতায় উন্মত্ত হ'য়ে কখনো আধঘণ্টা কখনো একঘণ্টা

সেই কোলাহলমুখর ভাস্টবিনসঙ্কুল গলির মোড়টিতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিত।

আগে-আগে যেদিন যত বড় sheme গজানন্দের মাথায় খেলত নিজের জীবন ততখানি নৈরাশ্যময় মনে হ'ত, কিন্তু আজকাল জীবনকে সহজ সরল উজ্জল বিরাট্ মনে হয়; ষ্টীলট্রাঙ্ক, বিল আর লেজারের নিরেটসত্তার ভেতর দিয়ে ক্ষোভ আর মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারতে পারে না। গজানন্দ আজ খুসী, গজানন্দ আজ সুখী।

দিন যায়।—বড়বাবু আজকাল অনেকক্ষণ গজানন্দের সঙ্গে ব্যবসা-সম্বন্ধে সলা-পরামর্শ করেন। গজানন্দ বড়বাবুর প্রতি প্রেম ও ভক্তিতে বিগলিত হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে, রোজ ঠিক অভ্যস্ত সময়ে বড়বাবু ডাকেন, গজানন্দ!'.

গজানন্দ মাথা চুল্‌কোতে-চুল্‌কোতে বিনীত ছাত্রের মতো এসে বড়বাবুর সাম্‌নেটিতে বসে।—

বড়বাবু বলেন,—"দেখ ক্যাবিন-সাইজ ট্রাঙ্কে four lever lock দেওয়াটাই দরকার। কি বলো হে—"

গজানন্দ বলে, "আজ্ঞে।"

—"আর দেখ,—বিজ্ঞাপনের দিকে আর একটু বেশী নজর দেওয়া চাই—হাঁ, ষ্টীলট্রাঙ্ক সম্বন্ধে একটা circular বের করতে হবে—তা দেখ আমরা ত মুখ্যুসুখ্যু মানুষ এন্‌ট্রান্সও পাশ করিনি। তা তুমিই এটা লিখো। তবে আমি একটা লিখেছি—দেখ ত যা ভুলচুক আছে তা সংশোধন ক'রে চালানো যায় কিনা—"

গজানন্দ বিস্ফারিতনয়নে circularখানি পড়ে দেখ্‌লে। বল্‌লে—ওর চেয়ে ভালো সে কল্পনাও করতে পারে না।

তা'র পর আপনার জায়গায় এসে ক্রেতার প্রতীক্ষায় গজানন্দ বড়বাবুর মহানুভবতা আর তীক্ষ্ণতার কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে ঢুল্‌তে থাকে। চোখ তা'র ধীরে-ধীরে নিমীল হ'য়ে আসে। কার যেন ক্ষীরস্পর্শে পক্ষ ও চক্ষে এমন একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে ওঠে যে চক্ষুরুন্মীলন অসাধ্য হ'য়ে ওঠে।......

......আহা কে যেন একতাল গিনি সোনা পিষে আকাশের কোলে ছড়িয়ে দিয়েছে—বড়বাবু কি বলেচেন? —গিনি সোনা বাইশ না তেইশ ক্যারেট? সন্ধ্যানিলে ভাসমান পায়রার পালকের মতো ওকি ভেসে আসছে? ওকি পুষ্পক-রথ?—প্রাচীন ভারতের Dirigibleএ কি Hydrogen থাক্‌ত? না, Helium gas? তাইত She-nandoahটা গেল—বড়বাবু বলেছেন, ভারতে ইংরেজ আস্‌বার আগে বিজ্ঞান বা ব্যবসাবুদ্ধি বা system ব'লে কিছু ছিল না—তা নইলে এত অশোকস্তম্ভ এতপ্রস্তর ফলক কোথায়ও business publicityর গন্ধ নাই কেন? Waste of energy! আস্‌ছে, আস্‌ছে—ওই আরও এগিয়ে এল—এ কি Streamline body—একি Valspar না Robaillace? না, পুষ্পক-রথ ত নয়—মোটর কারও নয়, মেঘের কোলে ভেসে-ভেসে ওত আমারই দিকে আস্‌ছে—Show Windowর কাঁচটার ভেতর দিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সোজা এদিকেই এল—তাই ত—কাঁচটা ভেঙে যাবে না ত? যাক্—বড়বাবু window-pane insure করেছেন। আহা, প্রভঞ্জন-জননী গজেন্দ্রগামিনী মেঘমালার কোলে দোদুল্যমান এ ত রথ নয়, এ যে বিশালকায় স্বর্গীয় রঙে রঞ্জিত একটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক্ glass-paneএর ভিতর দিয়ে ওটা যে ভেতরে ঢুকে গেল, কই কাঁচ ত ভাঙ্‌ল না—তাজ্জব ব্যাপার! Counterএর ওপর ভাসমান Steel Trunkটা এসে দাঁড়াল। ধীরে-ধীরে তা'র re-inforced brass-knobbed ঢাক্‌নিটা খুলে গেল......ওকি! ওকি! কি যেন একটা চাপা হাসির আভাস ওর অন্তরতম প্রদেশ থেকে যেন বেরিয়ে আস্‌ছে আমারই দিকে—... কত নূপুরশিঞ্জন, কত বলয়নিক্কণ, কত মন্দ গন্ধানিল —একি? উর্ব্বশী, রম্ভা, তোমরা? কোত্থেকে? এই Steel trunkএর গর্ভ থেকেই হাসিমুখে নৃত্যপরায়ণা নটীর মতো বেরিয়ে এলে—না, না? এ যে শম্ভুদের ছোটো খোকার ঝি। খোকাকে লেডিজ পার্কে রোজ ঠেলাগাড়ীতে ক'রে নিয়ে যায়...... আর তুমি, তোমায় যেন কাদের বাড়ীর না গাড়ীর জানালাতে দেখেছি—ছিছি, একি করছ? লুকিয়ে পড়ো, লুকিয়ে পড়ো—ছোটোবাবু দেখ্‌লে কি ভাব্‌বেন?—চকিত আতঙ্কে গজানন্দ সটান জেগে উঠ্‌ল।—দেখ্‌লে আজানুলম্বিত-খদ্দর-পরিহিত কতিপয় ক্রেতা; তাহাদের 'ক্যাম্‌নে' 'ক্যাম্‌তে' ও 'হঁ—বটে' শব্দে দোকান মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। গজানন্দ কাস্‌টমার পেয়ে স্বপ্ন-শোক ভু'লে

ট্রাঙ্কের ক্রেতা আর কলকব্জার পেছনে যেতে উঠ্‌ল।

দিনগুলো এমনি নানারঙে রঙীন হ'য়ে গজানন্দের salesman জীবনকে রাঙিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। সে এখন বড়বাবু, ছোটোবাবু আর manager মদন মোহন—এই তিনে Trinity God-head দেখ্‌তে সুরু করেছে; লক আঁটবার স্ক্রুড্রাইভারটিতেই সোনার কাঠির পরশ পায়—গজানন্দ আজ ধন্য!

পূজোর ছুটি এগিয়ে আস্‌ছে;—দোকানে প্রত্যহ এবারকার বিজ্ঞাপন কি-ভাবে দেওয়া যাবে, এই নিয়ে বিরাট্ জল্পনাকল্পনা চল্‌ছে। বড়বাবু বল্‌ছেন—সব কাগজে ভালো space নিয়ে খুব অল্প কথায় খুব effective campaign করতে হবে; প্রতিদ্বন্দ্বী সামসুল ও সালিমার কোং কে একেবারে বসিয়ে দেওয়া চাই—ছোটোবাবু বল্‌ছেন—একটা বিরাট্ effect produce করবেন; ম্যানেজার একবার বড়বাবুর কথা শু'নে তাঁর দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ে আর ছোটোবাবুর কথার তালে-তালে সজোরে মাথা নাড়ে। আর গজানন্দ, এই আর্থিক দুরবস্থার সময়েও একটা তেইশ শিলিং দামের বিলিতী বিজ্ঞাপনের বইই অর্ডার দিয়ে ফেল্‌লে। মোটের উপর একটা বিরাট্ রকম বিজ্ঞাপন দিয়ে পূজোর হিড়িকে বড়বাবুর বিশেষ-কিছু লাভ পাইয়ে দিয়ে সামান্য-কিছু bonus পাবার ভরসায় কর্ম্মচারীদের হৃদয় আন্দোলিত হ'তে লাগ্‌ল।

পূজোর দিন-কয়েক আগে নিত্য দোকান জীবন-যাত্রার স্রোতে একটু বাধা পড়্‌ল।—

বড়বাবু একদিন অফিসে এসে ডাক্‌লেন—'গজানন্দ!' গজানন্ নিঃশব্দপদসঞ্চারে সাম্‌নের চেয়ারে এসে বস্‌ল—বড়বাবু তার হাতে একটি টেলিগ্রাম দিয়ে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে দাড়িতে অঙ্গুলিচালনা করতে লাগ্‌লেন। গজানন্দ পড়্‌ল—বড়বাবুর ভগিনীর বেনারসে খুব অসুখ। বড়বাবু আর ছোটো বাবুকে সেখানে অবিলম্বে যেতে হবে। এই পূজোর বাজারের সময় দোকান ছেড়ে যাওয়া! বড়বাবু বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন, তবে গজানন্দ আছে এই যা ভরসা। বড়বাবু বল্‌লেন,—দেখ গজানন্দ—আমাদের ত যেতেই হবে—মদন বিজ্ঞাপনের দিক্‌টা তেমন বোঝে না, অথচ এই বিজ্ঞাপনের ওপরেই পূজোর বিক্রী সব নির্ভর করছে। আমি আর কচি (ছোটো-বাবু) আজকেই বেনারস যা'বো; কবে ফির্‌ব বলা যায় না। একটু সাবধানে সব বিজ্ঞাপন দেবে। তুমি এসব বেশ বোঝো, তবু আমি সামান্য দু-চারটে কথা ব'লে যাচ্ছি।—দেখ সব কাগজে বেশ ভালো space নেবে। টাকা-খরচে ভয় কোরো না, কারণ টাকা না গেলে টাকা আসে না। সব জায়গায় এক বিজ্ঞাপন দেবে—তা'তে কাজ হয় বেশী। অল্পকথায় বেশ ফাঁক রেখে বিজ্ঞাপন লিখ্‌বে। Customerদের কাছে বেশ একটু intellectual appeal থাক্‌বে—এবিষয়ে তুমি বেশ বোঝো—একটু বিবেচনা ক'রে কাজ করবে। আর দেখ জিনিষটা একটু নতুন-ধরণের হওয়া চাই—নতুনের দিকে লোকের চোখ সহজেই আকৃষ্ট হয়। Type setting বেশ ভালো হবে—আর প্রত্যেকটা লাইন আলাদা point এর typeএ দেবে—মোটের ওপর তোমাকে সব ভার দিয়ে যাচ্ছি—জানি তুমি কাজটা ঠিক পারবে,—

গজানন্দ বিনীতহাস্যে একবার হ্যাঁ হ্যাঁ ক'রে সম্ভ্রম-পূর্ণ হৃদয়ে আনন্দাশ্রু গোপন করতে চেষ্টা ক'রে বল্‌লে—সে যথাসাধ্য কাজ করতে চেষ্টা করবে,—

বড়বাবু ও ছোটো-বাবু চ'লে গেলেন। গজানন্দ মহা ভাবনায় পড়্‌ল, অথচ আনন্দ আর তা'র হৃদয়ে ধরে না। এত বড় responsibility! এত অখণ্ড বিশ্বাস!! এমন সহানুভূতি!!! সে একদিন বদনচন্দ্র গুড় অ্যাণ্ড সন্সের partner হবার স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌ল—তা'র মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল, এমন অনেকসব ঘটনার কথা যেখানে গোড়াতেই এর চেয়ে কম বিশ্বাস-সত্ত্বেও ভবিষ্যতে কতজনে Business partner হয়েছে। এই ত সেদিন কুমিল্লার কেশব রায় Germanyর একটা glass-factoryতে mechanic-এর কাজ করতে-করতে তা'র partner ত হয়েইছে আবার কর্ত্তার মেয়েটি পর্য্যন্ত পেয়েছে। সে চারবার মাটির দিকে চেয়ে আর তিনবার সিলিং-এর দিকে চেয়ে সমস্ত steel trunkগুলোর চার পাশে ঘু'রে এল—Thacker Spink-এ ফোন ক'রে জান্‌লে তা'র সেই advertisement-এর বইটা তখনও এসে পৌঁছয়নি।

গজানন্দ সেদিন অনভ্যস্ত হাসিমুখে চায়ের দোকানের

বন্ধুদের সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপ ক'রে বাড়ী গিয়ে ভাবতে লাগল—যত ভাবে ভাবনার আর অন্ত নাই। Advertisement, বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন; Advertisement,Space, Type, Intelligence, Appeal, ঝাঁকে-ঝাঁকে ক্রেতা বড়বাবুর হাসিমুখ, partner—গজানন্দ ঘামতে সুরু করলে, সে লেখে আর কাটে, কাটে আর ছেঁড়ে, একখানা উর্ব্বশী writing-pad প্রায় শেষ হ'য়ে এল—শেষকালে রাত্রি আড়াইটার সময় তিন প্যাকেট ট্যাটলার সিগারেট পুড়িয়ে একটা লেখা খাড়া হ'ল যেটা তা'র বেশ মনঃপূত হ'ল। সে সাতখানা কাগজে বড়-ছোটো হরফে সাত'-রকম ক'রে বিজ্ঞাপনটা লি'খে কাছে নিয়ে দূরে নিয়ে চোখের উপর তা'র effect দেখতে লাগল; scale নিয়ে type-face কি-রকম হবে ঠিক ক'রে নিলে; most up-to-date করবার জন্যে বিশ্বভারতীর নবপ্রচারিত scientific বানানবিষয়ক পুস্তিকাটি একবার দে'খে নিয়ে সেই-অনুসারে বানান ঠিক ক'রে নিলে, তা'র পর যেটি পছন্দ হ'ল সেইটে হাতে ক'রে বহু ক্ষণ ব'সে-ব'সে কত কী ভাবলে—

আহা, বেচারা মদনমোহন!

তা'র পরদিন গজানন্দ দোকানে এসেই জোরে-জোরে পা ফে'লে পায়চারি করতে লাগল। দুই-একটি খদ্দের আসছে,—গজানন্দের কেয়ার নাই। একটা দুটো কি, দশটা-পাঁচটা কি, বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'লে ঝাঁকে-ঝাঁকে লাখে-লাখে খদ্দের জুটবে। Salesmanরা হাঁফ ছাড়বার অবসর পাবে না—মদনবাবুকেও screw-driver ধরতে হবে! গজানন্দ মদন বাবুর দিকে চেয়ে একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলে।—মদন বাবু বললে—'গজানন্দ-বাবু এদের দেখুন।'

গজানন্দ ম্যানেজারকে বিজ্ঞাপনের কাপিটা দিলে। ম্যানেজার চমকে উঠল, বললে—'না মশায়, এ চলবে না, লোকে বুঝবেই না, patent ওষুধের বিজ্ঞাপন না ষ্টীল-ট্রাঙ্কের বিজ্ঞাপন। গজানন্দ একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে—'ঠিক চলবে মশাই, ব'লে ভালো পাটা নাচাতে সুরু করলে। মদন-বাবু কি করবেন—বড়বাবুর হুকুম গজানন্দ বিজ্ঞাপন যা দেবে তাই দিতে হবে; আর বড়বাবুর মত নেবার সময়ও নেই, সে অগত্যা সব কাগজের অফিসে গজানন্দের কপির একটা ক'রে নকল পাঠিয়ে দিলে।

গজানন্দ বড়বাবুকে চিঠি দিলে—বিজ্ঞাপন ঠিক দেওয়া হয়েছে:—সে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরদিন থেকে একঘণ্টা আগে দোকানে যেতে সুরু করলে—কাল 'প্রবাহিনী' কাগজ বের হবে; পরশুদিন আরো গোটাকয়েক বের হবে, গজানন্দ কর্ম্মচারীদের একটু সকাল-সকাল আসতে অনুরোধ করলে।

কিন্তু গজানন্দ মাপকাঠি আর স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; সাধারণ যেমন খদ্দের আসে তেমনিই আসে—গজানন্দ মহা ভাবনায় পড়ল; মদন-বাবু ডাকলেন 'কি গজানন্দ বাবু'—গজানন্দ জোরের সঙ্গে বললে—আরে দেখুন না, এখনও কাগজ লোকের হাতে পৌঁছয়নি।

এদিকে বড়বাবুর কাছে সব কাগজ পৌঁছতে লাগল। তিনি গজানন্দের কীর্ত্তি দে'খে চমকে উঠলেন। সব কাগজেই এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন—বেরিয়েছে।

“দেখা, শোনা, বোঝা, কেনা

চোরের কাজ

আমাদের কাজ

তোমাদের কাজ

পূজার বাজারে পথের মাঝারে

কী জন্য এত হুলস্থূল?

আধুনিক ব্যবসায়ের পাঁচটি মূল মন্ত্র——

সাবধানতা!

শঠতা নিবারণ!!

সুচিন্তিত প্রণালী অনুসরণ!!!

অগ্রগামী ব্যবহারিকতা!!!!

কিম্বদন্তীর মতো প্রচারিত হওন!!!!!

সামাজিক ডাক্তার কেহ থাকিলে বলিবে

Re One or more Badan Chandra Gur's Sure Steel Trunk.

মফঃস্বলে সব বড় বড় দোকানে ও কলিকাতায় Central Avenue Junctionএ আমাদের Show Roomএ প্রাপ্তব্য।”

বড়বাবু প্রমাদ আশঙ্কা ক'রে তৎক্ষণাৎ কলকাতা রওনা হলেন! এসেই দোকানে হাজির হ'য়ে গজানন্দকে ডাক্‌লেন—। 'শোনো ত হে'

গজানন্দ আধশঙ্কায় কম্পিত-জড়িতচরণে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল,—'এ কী সর্ব্বনাশ করেছ।"

"আজ্ঞে, এই ত intellectual appeal হয়েছে, অথচ নতুন-ধরণের,"

"না বাপু তুমি এই বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার মহা লোকসান ক'রে দিলে। দেখ ত আজ অষ্টমী অথচ আট-জনও খদ্দের নেই —তোমাকে বাপু জবাব দিলাম। ওহে মদন গজানন্দকে এই মাসের মাইনেটা পুরো দিয়ে দাও ত—"

গজানন্দ কি যেন বল্‌তে চেষ্টা করলে কিন্তু তার শুষ্ক মুখ দিয়ে কথা বের হ'ল না। ধীরে-ধীরে নিজের জায়গাটিতে এসে ছাতাটি নিয়ে কাঁধে ফেললে, তা'র পর একবার দোকানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র টীপ সমন্বিত ঘরখানি দে'খে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে! বেরিয়ে আস্‌বার পথে মদনবাবুকে একটা শুষ্ক প্রণাম ক'রে বাইরে এসে দাঁড়াল—বড়বাবুকে আর প্রণাম করা হ'ল না।

গজানন্দ বাইরে দাঁড়িয়ে একবার জগতের অকৃতজ্ঞতার কথা ভেবে বড়বাবুর দাড়ির কথা ভাব্‌লে, তা'র পর ধীরে-ধীরে আবার দু কোটি হামানদিস্তা আর তিবাই ইজারা নেওয়ার কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে বাড়ী ফি'রে এল।

তিন দিন পরে Thacker Spink এর দোকান থেকে খবর এল, তা'র অভাবে সেই Pifflés এর Perspicuous Publicity বইখানা এসেছে—নতুন exchange এ দাম ৩৷৹ টাকা বেশী লাগবে।

গজানন্দ আবার একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়্‌ল। তখনও বাড়ীরে বিসর্জ্জনের করুণ সুরে কলকাতার ধোঁয়াটে আকাশ থমথম কর্‌ছিল। গজানন্দ তা'র 'নবাবিষ্কার' ভু'লে ব'লে উঠল—'হায় মা'।

ভূমিকা

শ্রী নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

আজি মিহিরের হাসি মর্ম্ম-হেমন্তীরা
চমকে মহুয়া বন্‌তলে গো বন্‌তলে,
কঙ্কর-কুট মু'খানি লুকায়
নভসীর নীল অঞ্চলে গো অঞ্চলে।
বন্যার বারি ধান্যের বনে
বুকে ধরে সাদা মেঘ ছায়া গো মেঘ ছায়,
দিগ্‌ দুলালীর বঙ্কিমভুরু
বিলাসে বিলায় বেশ্‌ মায়া গো বেশ্‌ মায়া।
তৃণমুঞ্জরা সৌমাসরণী
দূর দেশে ধায় কার তরে গো কার তরে,
পাশে রহি'-রহি' মেহেদী মহুয়া
চাহনি হানিছে মান্‌ভরে গো মান্‌ভরে।
বেদনাবিধুরা বর্কবিধবারা
শিহ'রছে শ্যাম-প্রান্তরে গো প্রান্তরে,
ক্রৌঞ্চকিশোরী মরি। মরি। মরি।
মদনোৎসবে প্রাণ ভরে গো প্রাণ ভরে।
নদীবক্ষল মলয় দুলিছে
মেঘ মধুধারা পান করি' গো পান করি',
রঙ্গের গীতে জড়িমা জড়িত
কাঁহারোয়া রাগে গান ধরি' গো গান ধরি'।
আজি শারদোৎসব ভূমিকা ভুবনে
বনগিরিধরা সব্‌ ভরে গো সব ভরে,
ছায়া গোপসাকী আলোককিশোরে
ডাকে যেন গিরি-গহ্বরে গো গহ্বরে!

চন্দননগরের বয়ন-শিল্প

শ্রী হরিহর শেঠ

চন্দননগরের পরিচয় প্রধানত শিল্পে। বস্ত্রশিল্পই তন্মধ্যে প্রধান। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ফরাস-ডাঙ্গায় বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের আরম্ভ-কাল কোন্ সময়, তাহা বহু চেষ্টায়ও নির্ণয় করিতে পারি নাই। প্রথম যুগে এখানে ঠিক কি প্রণালীতে বস্ত্র বয়ন করা হইত, তাহাও স্থির করা সুকঠিন। ফরাসীদের এখানে আসিবার পূর্ব্বেও চন্দননগরের নাম কোথাও উল্লেখ না পাইলেও, হুগলীর সান্নিধ্যে বিস্তর তন্তুবায় বাস করিত ও তাহারা তুলাজাত সূত্রের ও তসরের বস্ত্র বয়ন করিত বলিয়া জানা যায়। (১) জানি না হুগলীর সান্নিধ্যে সে কোন্ স্থান—চন্দননগর কি না। এখানে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক তন্তুবায়ের বাস ছিল ইহা সত্য। কিন্তু সে কোন্ সময় তাহার স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন, এখানে ১৪০০ ঘর তাঁতীর বাস ছিল। (২)

প্রথমাবধিই এখানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ না পাওয়া যাইলেও, ফরাসী কোম্পানির এখানে উপনিবেশ স্থাপনের পরই ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ফেলিপো (Phelypcaux) নামক একখানি জাহাজেই ১৫০ গাঁইট বস্ত্র রপ্তানির কথা এবং সেইসঙ্গে এখানে প্রচুর-পরিমাণে বস্ত্র ও মস্‌লিন কাপড় পাওয়া যাইত বলিয়া জানা যায়। (৩) চন্দননগরের বস্ত্র রপ্তানি হইয়া যে অন্য স্থানের উৎপন্ন বস্ত্র অপেক্ষা অনেক উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত, তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। (৪) এখান হইতে মস্‌লিন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্র যাহা বিদেশে প্রেরিত হইত; উহা যে এখানকার প্রস্তুত, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। কারণ ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ফরাসীদের ঢাকার সহিত ব্যবসা-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। (৫) ঢাকা ভিন্ন বাঙ্গলার অন্য কোথাও উৎকৃষ্ট মস্‌লিন উৎপন্ন হইত বলিয়া জানা যায় না।

বস্ত্র-শিল্প চন্দননগরের একটি প্রাচীন এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্প হইলেও, এখানে যে তুলার চাষ অধিক হইত, এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুনা যায় চন্দননগরের কিছু উত্তরে কাপাশ-ডাঙ্গা-নামক স্থানে পূর্ব্বে তুলার কাজ খুব প্রবল ছিল এবং তুলাপটীর ঘাটের উপর বড়-বড় তুলার গুদাম ছিল; এই স্থান হইতে তুলা খরিদ হইত। পশ্চিম প্রদেশ ও অন্যত্র হইতেও তুলা আসিত। ম্যানিলা হইতে এখানকার জন্য দু দে অর্লেয়াঁ (Duo d' Orleans) জাহাজে অনেক তুলা আসিয়াছিল উল্লেখ পাওয়া যায়। (৬) ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তুলা আসিয়া এই স্থানে চরকায় কাটিয়া সূতা তৈয়ারি হইত। এই কার্য্যের দ্বারা এখানকার বিস্তর দরিদ্র স্ত্রীলোকের অন্ন-সংস্থান হইত। শুধু তন্তুবায় কন্যারাই যে এ কার্য্য করিতেন তাহা নহে, অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকেরাও এ কার্য্য করিতেন। কিন্তু স্থানীয় কৈবর্ত্তদের এই কার্য্য একটি অবলম্বন-স্বরূপ ছিল। (৭) এখানে অনেক সূত্র উৎপন্ন হইলেও তাহার দ্বারা এখানকার চাহিদা মিটিত না। অন্যত্র হইতেও অধিক পরিমাণে সূতা খরিদ করিয়া আনা হইত। মুসলমানদের দ্বারা প্রস্তুত সূতা বাবনান ও পাণ্ডুয়াতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া যাইত। বোড়াই ও শেঁওড়াফুলির হাট হইতেও সূতা আনা হইত। তখনকার চরকাই সূতা কাটিবার প্রধান যন্ত্র ছিল। তক্র

(১) Diary of William Hedges, Vol. II. এবং The Early Annals of the English in Bengal, Vol. I.

(২) চন্দননগরের শিল্প—স্বরাজ, ১০ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

(৩) La Compagnie Des Indes Orientales.

(৪) The Private Diary of Ananda Ranga Pillai, Vol.—I.

(৫) A Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca in Bengal.

(৬) The Private Diary of Ananda Ranga Pillai, Vol. I.

(৭) চন্দননগরের শিল্প—স্বরাজ, ১০ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ।

(টাকু) দ্বারা সূক্ষ্ম সূত্র ভাল হইত, কিন্তু চর্‌কার মত ইহাতে সত্বর অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইত না।

এখানে এখন প্রায় সকলেই ঠক্‌ঠকি তাঁত ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকে ইহাকে কলের তাঁত বলিয়া থাকেন। হস্ত-পরিচালিত মাকুর ব্যবহার প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। সেরূপ তাঁত এখন বোধ হয় দুই-তিনখানির অধিক এখানে ব্যবহার হয় না। কলের তাঁতে কাপড় পুরাতন প্রণালীর তাঁতের মত সূক্ষ্ম হয় না। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও হস্ত-পরিচালিত তাঁত অধিক চলিত। (৮) এইসব তাঁতের প্রচলন এখানে কত দিন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেহ-কেহ অনুমান করেন, দেড় শতাধিক বৎসর ধরিয়া এখানে এই তাঁতের ব্যবহার চলিতেছে এবং এই স্থান হইতেই নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হয়। (৯) শ্রীরামপুরে যে হস্ত-চালিত ঠক্‌ঠকি তাঁত ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণতঃ যাহা শ্রীরামপুরের তাঁত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা চন্দননগর হইতেই ঐস্থানে অনুনিবিষ্ট হয়। ওম্যালে (L. S. S. O'Malley) সাহেব বলেন, এই তাঁত জন্ কে (John Kay) দ্বারা উদ্ভাবিত পুরাতন বিলাতী তাঁতের কিছু উন্নত যন্ত্র মাত্র; ৬০ বৎসরের অধিক হইল উহা চন্দননগর হইতে শ্রীরামপুরে প্রবর্ত্তিত হয়। (১০) শ্রীরামপুরের তাঁতীদেরও বিশ্বাস উহা ফরাস-ডাঙ্গা হইতে নীত হয়। (১১) এ কথা কত দূর ঠিক্, তাহা বলা যায় না। কারণ বহু পূর্ব্বে যখন এ প্রদেশে উৎকৃষ্ট বস্ত্রসকল প্রস্তুত হইত, তখন এই দেশীয় কাহারও দ্বারা এই তাঁতের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে।

এখনও এখানকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রসিদ্ধি যথেষ্ট থাকিলেও পূর্ব্বের মত মিহি কাপড় আর প্রস্তুত হয় না এবং তাঁতের কাপড়ের কাজ পর-পর কমিয়াই যাইতেছে। ২৫০।৩০০ নম্বর সূতার কাপড় প্রস্তুত করিবার মত শিল্পী এখন আর একজনও নাই। পূর্ব্বের তুলনায় তন্তুবায়দের সংখ্যাও অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে হরিদ্রা-ডাঙ্গা অঞ্চলে বিস্তর তাঁতীর বাস ছিল, এক্ষণে সে-স্থান প্রায় জনশূন্য। ১২।১৩ ঘর যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র চারিজন জাতি-ব্যবসা করিয়া থাকেন। লালবাগানের চক্-নামক পল্লীতে ৬০ বৎসর পূর্ব্বেও অন্ততঃ ১৫০ খানি তাঁত চলিত; তৎস্থানে এখন ১০।১২ খানি মাত্র আছে। এখন সমগ্র লালবাগান অঞ্চলের মধ্যেই তন্তুবায়দের সংখ্যা অধিক এবং তথায় এখনও কয়েকজন ভাল তাঁতী আছেন।

শ্রীরামপুর ও চন্দননগরের মিহি কাপড় বহুদিন হইতেই ফরাস-ডাঙ্গার কাপড় নামে খ্যাত। (১২) এখন ফরাস-ডাঙ্গার কাপড় নামে সচরাচর যে-সব কাপড় কলিকাতায়, এমন-কি ফরাসডাঙ্গার বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে হরিপাল, ধনেখালি, শ্রীরামপুর, খরসরাই, বেগমপুর, হুগলী, কৈকালা প্রভৃতি স্থানের উৎপন্নই অধিক। এইসকল কাপড়ের অধিকাংশই ফরাস-ডাঙ্গায় ধোলাই করা হয়। এখানে যেরূপ সুন্দর ধোলাই-কার্য্য ও কাপড় পাট-করা হইয়া থাকে, সেরূপ এ-প্রদেশের অন্যত্র হয় না। কলিকাতার দোকানদারেরাও এখান হইতে বিস্তর কোরা কাপড় কাচাইয়া লইয়া যান।

বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির সহিত বয়ন-যন্ত্রে ব্যবহারের জন্য সানা এবং মাকু প্রভৃতি যন্ত্রাদিও এখানে ভালরূপ প্রস্তুত হইত, এবং ধুতি ও শাড়ীর পাড়ের জন্য সূতা রং করা কাজও খুব প্রবল ছিল। এমন সুন্দর ও পাকা সূতা রং করিতে অন্যত্র পারিত না। রঞ্জনের কাজ এখানকার একটি বিশিষ্ট শিল্প ছিল। স্থানীয় মুসলমানেরাই এই কার্য্য করিত। তাহাদের কালাকর বলিত। মুসলমানপাড়া ও কাঁটাপুকুর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে তাঁহাদের সংখ্যা ২০০।২৫০ ঘরেরও অধিক ছিল। ফরাসী, ডাচ্ প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকগণ এইসকল সূতা এখান হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহে চালান দিত। (১৩) এখন এই শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। পুরাতন কালাকর দুই-চারিজন

(৮) Monograph on The Cotton Fabrics of Bengal, by N.N. Banerjee, B. A. M. R. A. C., F.H. A. S.

(৯) চন্দননগরের বস্ত্রশিল্প নিবন্ধ, ৪র্থ খণ্ড।

(১০) The District Gazetteers of Hughly, Vol.XXIX.

(১১) Monograph on The Cotton Fabrics of Bengal, by N. N Banerjee, B.A., M.R, A. C. F., H.A.S.

(১২) Bengal District Gazetteers—Hughly, Vol. XXIX.

(১৩) চন্দননগর দশভুজা সাহিত্য মন্দিরের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে পঠিত "চন্দননগরে মুসলমান উপনিবেশ"।

যাহারা জীবিত আছে, তাহারা এখন অন্য কাজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এখন স্থানীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অল্প পরিমাণে সূত্র-রঞ্জনের কার্য্য যাহা হইয়া থাকে, তাহা অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোকদের দ্বারাই প্রায় সম্পাদিত হইয়া থাকে।

বয়ন-শিল্পের এখানে আর উন্নতি নাই; দিনের পর দিন অবনতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। বিলাতী-বস্ত্রের প্রতিযোগিতা ইহার মূল কারণ হইলেও, এই শিল্প রক্ষার্থ উৎসাহ দিবার জন্য কেহই না থাকা ইহার অবনতির অন্যতম কারণ। যদিও এখানে তন্তুবায়গণের মধ্যে এই শিল্প প্রায় একচেটিয়া, তথাপি যোগী, মুচি, বৈরাগী প্রভৃতিদের মধ্যেও কেহ-কেহ তাঁত বুনিয়া থাকেন। বস্ত্র-বয়ন-কার্য্য দ্বারা এখানে কেহ বিশেষ ধন-সম্পদ্‌শালী হইয়াছেন এরূপ শুনা না যাইলেও, এই ব্যবসার দ্বারা পূর্ব্বে তাঁহারা সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন।

এক্ষণে এই জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অনেকেই চাকুরি বা অন্য কার্য্য করিতেছেন। এই দেশীয় প্রাচীন শিল্পটির অবনতি লক্ষ্য করিয়া, উহাকে রক্ষা করিবার জন্য কখনও যে বিশেষভাবে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে 'ফরাসডাঙ্গা-তন্তুবায়-সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া কিছু চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। (১৪) কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল লাভ হয় নাই। এক্ষণে পুনরায় 'চন্দননগর তন্তুবায় সমিতি'-নামে যে-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার, জাতীয় ব্যবসার উন্নতি-বিধান একটি অন্যতম উদ্দেশ্য থাকিলেও, তাহার দ্বারা আড়াই বৎসরের মধ্যে এদিকে যে-কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। স্বদেশী আন্দোলনের ফলেও এখানে শিল্পীদের কোনোই সুবিধা হয় নাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শুধু তন্তুবায়দিগের চেষ্টায় কিছু হওয়া সম্ভব নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চেষ্টা ব্যতিরেকে কোনো দিন এই শিল্পের উন্নতি বা ইহার রক্ষা হইতে পারে না।

(১৪) "ফরাসডাঙ্গা তন্তুবায় সমিতি, লালবাগান"—প্রজাবন্ধু, ২১শে বৈশাখ, ১২৯৬ সাল।

এখানকার বয়ন-শিল্পের পূর্ব্ব ইতিহাস কোনো গ্রন্থাদিতে পাই নাই। কতিপয় প্রাচীন এবং বিশ্বস্ত তন্তুবায় ভদ্রলোকের নিকট বিশেষ অনুসন্ধানে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, (১৫) তাঁহাদের মধ্যে অনেকের পূর্ব্ব পুরুষগণ বর্গীর ভয়ে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রায় দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ধনিয়াখালি, হরিপাল, বেগমপুর, তালন্দা, টাগ্‌রা, রাজবলহাট, দেবানন্দপুর প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করেন। উহাদের মধ্যে অনেকেই জনার্দ্দনের সন্তান দক্ষিণকুলশ্রেণীভুক্ত।

কেহ কেহ বলেন, বর্গীর ভয়ে প্রথমে অনেকে এখানে আসিয়া আশ্রয় লইলেও, দেশ ইংরেজ-কোম্পানীর অধিকারে আসার পর, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নিকট নিষ্কৃতি লাভার্থ বহুসংখ্যক তন্তুবায় পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে আসিয়া চন্দননগর ও শ্রীরামপুরে বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে, কোম্পানীর লোক শিল্পীদের নিকট হইতে বস্ত্র বয়ন করাইয়া লইবার জন্য তাহাদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জোর করিয়া টাকা দাদন দিত এবং যাহা কিছু বস্ত্র বোনা হইত, কোম্পানির লোক তাহার মধ্য হইতে তাহাদের প্রয়োজন-মত ভাল বস্ত্রগুলি লইয়া অবশিষ্টগুলি পাট-করা অবস্থায় কোণ কাটিয়া নষ্ট করিয়া দিত। ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইত। প্রতি-বিধানের কোনো ক্ষমতা না থাকায়, এই অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিভিন্ন রাজাধিকারভুক্ত, তৎকালের একটি প্রধান ব্যবসা ও শিল্প-কেন্দ্র এই চন্দননগরকেই তাঁহাদের বাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহারা এই স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। দিনেমার-অধিকারভুক্ত শ্রীরামপুরেও সেই সময় তন্তুবায়গণ আসিয়াছিলেন। (১৬) পূর্ব্বাপর কার্পাসজাত সূত্র দ্বারাই প্রধানতঃ বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এখনকার ৫০ নম্বর সূতার অপেক্ষা মিহি সূতা সচরাচর তৈয়ার হইত না, বরং আরও মোটা সূতার কাপড় হইত। এই সূতা-কাটা স্ত্রীলোকদেরই

(১৫) এই কার্য্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দাস, এম-এ, মহাশয়ের যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১৬) শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়াছি।

কাজ ছিল। তখন হস্তচালিত তাঁত ছাড়া অন্য কোনো প্রকার তাঁত ব্যবহার হইত না। এখানে পরিধেয় বস্ত্রই প্রধানতঃ প্রস্তুত হইলেও, বিদেশে জাহাজে চালান দিবার উপযোগী রুমালের জন্য 'লাল গিলে' ও 'কালা গিলে'-নামক চৌখুপি ডুরে, সুসী (থান) গিমাম, ছিলে কন্তা, ছড়ীর কাপড, গাউনের কাপড প্রভৃতি তৈয়ারি হইত। পূর্ব্বে খাসা, মলমল এবং মস্‌লিন্‌-নামক সূক্ষ্ম বস্ত্রও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত।

এখানকার বড বাজারে একটি কাপড়ের হাট বসিত। তথায় বিস্তর কাপড বিক্রয়ার্থ আসিত এবং তথা হইতে সংগৃহীত হইয়া বর্ত্তমান চন্দননগরের উত্তরে তলাপটীর ঘাট হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া বপ্তানী হইত। এই স্থানে জাহাজ বাঁধিবার লোহার বড়া পুরাতন ভগ্ন পোস্তার গাত্রে এখনও দেখা যায়। এই স্থানটি এখন বৃটিশ চন্দননগর, তখন উহা ফরাসী অধিকারের মধ্যে ছিল। (১৭)

৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে উৎপন্ন বস্ত্রের উপর একটি শুল্ক আদায় করা হইত বলিয়া জানা যায়। এই শুল্ক আদায় করা প্রসঙ্গে চন্দননগরে ভূতপূর্ব্ব ম্যার্ ভার্ডিভ্যাল্ সাহেবের পিতামহের কৃত অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। (১৮)

দেশী তাঁতে বিলাতী সূক্ষ্ম বস্ত্র-বয়নকারীদের মধ্যে ৺রাধাকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কেহ-কেহ তাঁহাকে এই কার্য্যের প্রবর্ত্তক এরূপও বলিয়া থাকেন। তাঁহার বয়ন-নৈপুণ্যের জন্য তিনি যখন একজন দক্ষ বস্ত্র-শিল্পী বলিয়া পরিচিত হন, তখন তাহার গুরুদেবের আদেশে কোনো বিলাতী অফিসের মুচ্ছুদ্দির অভিপ্রায়-মত,তাঁহাদের অফিসের নূতন আমদানি ৩০০ নম্বরের বিলাতী সূত্র দ্বারা তিন-চারি চডান কাপড বয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহার খ্যাতি বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হয়। পরে তিনি স্থানীয় তন্তুবায়দিগকে এই নব আমদানি সূক্ষ্ম সূত্রে বস্ত্র বয়ন-কৌশল শিখাইয়া দিয়া উক্ত মুচ্ছুদ্দির মারফৎ নানা প্রকার নম্বরের সূতা আনাইয়া তাঁহাদিগকে বিলি করিয়া দিতেন, এবং উৎপন্ন বস্ত্রের অধিকাংশ লইয়া নিজেই বিক্রী করিতেন। এইরূপে ক্রমে অনেকের বিলাতী সূক্ষ্ম সূত্র বয়নের পারদর্শিতা লাভের সহিত তাঁহার ব্যবসাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (১৯) অন্যত্র জানিতে পারি, শম্ভুচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় এখানে প্রথম বিলাতী সূতা আমদানি করেন এবং তিনিই প্রথম উহাতে বয়ন করেন। (২০)

এখানে বিলাতী সূত্রে বস্ত্রবয়নের ইহাই আদি ইতিহাস কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তবে আমি এসম্বন্ধে যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই লিখিলাম। এখানকার পূর্ব্বকার বিলাতি সূত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে চন্দ্রনাথ দে ও ভোলানাথ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য।

ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতা এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রের কাটতি কমিয়া যাওয়ায়, এখানকার বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট দৈন্য প্রাপ্ত হইলেও, এখনও কাপড়ের জমি, পার্শ্ব ও মাঝার সমান, পাড়ের রং এবং ধোলায়ের জন্য ফরাস ডাঙ্গার কাপড তাহার বিশিষ্টতা রাখিয়া চলিয়াছে। (২১) এইসকল কারণে এখনও ইহার আদর অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, বেশী মিহি সূতার বস্ত্র বয়ন করিবার মত শিল্পী আর একজনও নাই। এখন সচরাচর ভাল কাপড বলিতে ৮০ হইতে ১০০ নম্বরের বুঝায়। ১২০।৩০ পর্য্যন্ত কেহ কেহ বয়ন করিয়া থাকেন। ইহার অপেক্ষা মিহি কাপড আর পাওয়া যায় না। হয় ত দুই-চারিজন ১৫০ নম্বর পর্য্যন্ত বয়ন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা পূর্ব্বের মত পরিষ্কার হয় না। প্রথমতঃ শিল্পীদের বয়সের প্রাচীনতা-হেতু দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, দ্বিতীয়তঃ ভাল সূত্রের অভাবই ইহার কারণ বলিয়া শুনা যায়।

---

(১৭) মল্লিখিত 'চন্দননগরের আদি পরিচয় ও বঙ্গে ফরাসীদের আধিষ্ঠান নির্ণয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩১।

(১৮) শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র লাহা মহাশয় এইরূপ বলিয়া থাকেন।

(১৯) ফরাসী স্কুলের সহকারী ৺ নন্দলাল ভড় মহাশয়ের প্রদত্ত লিখিত তথ্য হইতে ইহা অবগত হইয়াছি।

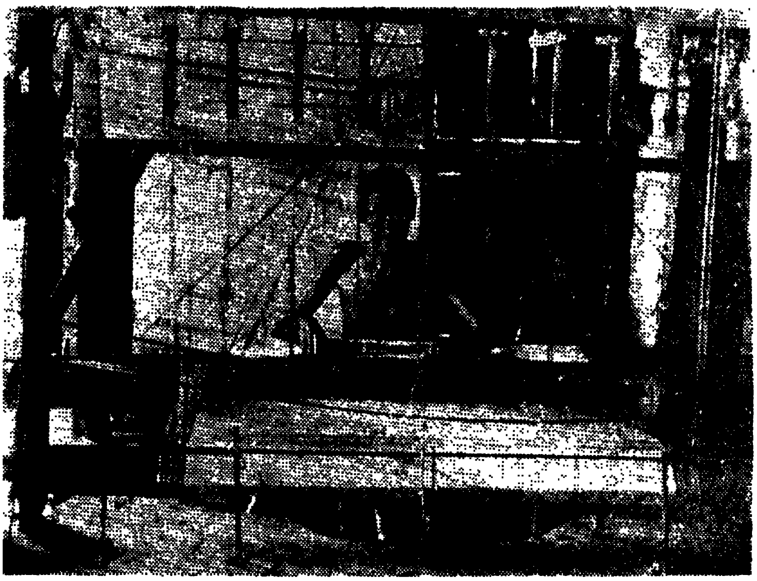
(২০) বস্ত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রেমনারায়ণ নান মহাশয়ের নিকট হইতে অবগত হই।

(২১) Monograph on The Cotton Fabrics of Bengal, by N N Banerjee, B. A., M. R. A. C., F. H. A. S.

অতি পুরাতন কালের বিখ্যাত শিল্পীদের নাম জানিতে পারা যায় না। আনুমানিক শত বৎসর পূর্ব্বে এখানকার বিখ্যাত বস্ত্র-শিল্পীদের মধ্যে রামনিধি ভড়, চন্দ্রনাথ দে, জগৎচন্দ্র দাস, মথুরমোহন লাহা ও চৈতন্যচরণ রক্ষিতের নাম জানিতে পারা যায়। (২২) জগা-মাতাল নামে আর-একজন খুব উচ্চদরের শিল্পীর নামও পাওয়া যায়। জানি না উল্লিখিত জগৎচন্দ্র দাসের নামের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক আছে কি না।



খ্যাতনামা শিল্পী সুধন্যাচরণ লাহা প্রাচীন প্রথায় মাটির নীচে পদদ্বয় রাখিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন



খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভড় তাঁহার ঝাঁপ দেওয়া তাঁতে জরিপাড় শাড়ী বুনিতেছেন

অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে এখানে যে-সকল উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ভড়, রামচরণ দে, তিনকড়ি দত্ত, কৃষ্ণপ্রসাদ ভড়, সাধুচরণ দাস, গোবিন্দ দে, লক্ষ্মীনারায়ণ দে, জগৎবন্ধু দত্ত, নারায়ণচন্দ্র দাস, যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে যে-সকল প্রসিদ্ধ তন্তুবায় গত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভূতনাথ দে, সবু দে, কালীচরণ ভড়, উমাচরণ রক্ষিত, বেণীমাধব দাস, হারাণচন্দ্র দাস, নীলমণি দে, উমাচরণ দে প্রভৃতির নাম শুনা যায়। যাঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ২০০।-২৫০ নম্বরের সূতা বয়ন করিতে পারিতেন। (২৩)

বর্ত্তমানে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতিপন্ন, তাঁহাদের মধ্যে সুধন্যাচরণ লাহা, রজনীকান্ত ভড়, জয়গোপাল সেন, বৈকুণ্ঠ সেন, বেচারাম দে, অধরচন্দ্র তোস, উপেন্দ্রচন্দ্র দে, ক্ষুদিরাম

(২২) শ্রীযুক্ত প্রেমনারায়ণ নান মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি।

(২৩) ৺নন্দলাল ভড়, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল লাহা, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতির নিকট হইতে এই নামগুলি প্রাপ্ত হই।

দাস, জহরলাল প্রামাণিক প্রভৃতির নাম অনেকেই বলিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই প্রায় ৮০ হইতে ১০০ নম্বরের সূতার বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকেন; কেহ-কেহ ১৫০ নম্বরের ধুতি বা শাটীও বয়ন করিতে সক্ষম। আজকাল যে-কয়েক-জন এখানে জরির পাড় বুনিতে পারেন, তন্মধ্যে রজনীকান্ত ভড় মহাশয়ই প্রধান। তাঁহার মত সুন্দর জরির ফুলপাড় কাপড় এ-প্রদেশে কম লোকই বয়ন করিতে পারেন। জরির কাজে এখানে ক্ষুদিরাম দাসের স্থান উঁহার পরই। ইনি উক্ত ভড় মহাশয়ের নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের উৎপন্ন সমস্ত কাপড়ই শান্তিপুরে চলিয়া যায় এবং তথায় শান্তিপুরের কাপড় বলিয়া বিক্রয় হয়। জহরলাল প্রামাণিক মহাশয় কাঁচির কাপড় বয়ন করিতে সিদ্ধহস্ত। সুধন্যাচরণ, বেচারাম, উপেন্দ্র প্রভৃতির হস্তে মিহি কাপড় খুব ভালরূপ জন্মে।

অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এখন এখানে মোট কিছু কম প্রায় একশতখানি মাত্র তাঁত আছে, তন্মধ্যে ৮০খানি আন্দাজ চলিয়া থাকে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচ-ছয় গুণ ছিল। এক চকে তখন প্রায় ১৫০খানি এবং হরিদ্রাডাঙ্গায় প্রায় ৬০খানি ছিল। কোন-কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, তখনকার তাঁতের সংখ্যা প্রায় এক সহস্র ছিল। তাঁহাদের অনুমান শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই সংখ্যা তিন সহস্রের কম ছিল না। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত কৃষ্ণলাল দাস, এম-এ, মহাশয় গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, তখন এখানে প্রায় ১৮০খানি তাঁত ছিল। (২৪) এখানে তাঁত প্রস্তুত হইলেও, বাহিরখণ্ড-নামক স্থান হইতেই অনেকে খরিদ করিয়া আনেন। পূর্ব্বেও এই স্থান হইতে অনেক আসিত।

এখানকার বস্ত্র-শিল্পের পুরাতন পরিচয় সংগ্রহ করিতে যত দূর জানিতে পারিয়াছি, শত বৎসরের মধ্যে এখানে যে-সব উৎকৃষ্ট মিহি বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা বিলাতী সূতায় এবং ৩০০ নম্বর পর্য্যন্ত হইত। এরূপ বস্ত্র বয়ন করিবার শিল্পী তখন এখানে অনেক ছিলেন। তৎপূর্ব্বে দেশী সূতা যাহা প্রস্তুত হইত, তাহা ২০ হইতে ৫০ নম্বর সূতার অনুরূপ হইত। খুব মিহি সূতায় যে-সব উৎকৃষ্ট বস্ত্র পূর্ব্বে প্রস্তুত হইত, তাহার সূত্র কোথায় পাওয়া যাইত, বিশেষ চেষ্টার দ্বারাও তাহা স্থির করিতে পারি নাই। টাকুর সাহায্যে প্রস্তুত সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা ফরাসডাঙ্গার মিহি কাপড় বয়ন করা হইত এইটুকু মাত্র জানা যায়। (২৫) এখানে প্রস্তুত হইত ইহার উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এবং এ-সম্বন্ধে সুমীমাংসা ব্যতিরেকে পূর্ব্বকালের সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সত্যের অনুরোধে এ কথা বলিতেই হইবে।

কলে-চালিত তাঁতের কাপড় চন্দননগরের বয়ন-শিল্পের ঠিক অন্তর্গত না হইলেও, এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় বটকৃষ্ট ঘোষ মহাশয়ের কাপড়ের কলের কথা বাদ দিলে অঙ্গহানি হয় বলিয়া মনে করি। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই এ কার্য্যের অগ্রণী।



বটকৃষ্ট ঘোষ

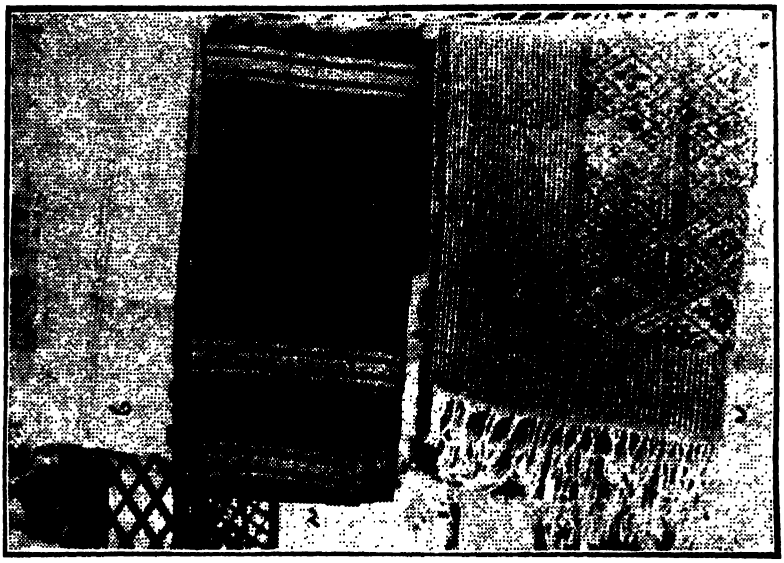
বটকৃষ্ট-বাবুর প্রাথমিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। বস্ত্রশিল্প-সম্বন্ধে তাঁহার কোনো অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে ছিল না বা তিনি এ-শিল্প-সম্বন্ধে কোনো দিন কোথাও কোনো শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। যে উৎসাহ ও মনের বলে তিনি দূরদেশে নাগ-পুরের জঙ্গলে যাইয়া কাঠের ব্যবসা এবং চন্দননগরে ও বিভিন্ন স্থানে একটি সুপরিচালিত চর্ব্বির কারখানা

(২৪) "তাঁতী ও তাঁত"—কমলা, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

(২৫) ভারতে প্রাচীন বস্ত্র-শিল্প—কমলা, শ্রাবণ, ১৩৩২।

চালাইয়াছিলেন, প্রধানতঃ সেই উৎসাহ মাত্র সম্বল লইয়া তিনি নিজের চেষ্টায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়। একদিন একটি জাপানী পায়ে-চালান তাঁতের (Paddle Loom) বিজ্ঞাপন কোনোক্রমে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহাকে পদদ্বারা চালাইয়া একটি স্ত্রীলোক কাপড় বুনিতেছে এইরূপ একটি ছবি ছিল। এই চিত্র দেখিয়া তাঁহার মনে হয়, জাপানী রমণীরা যদি এত সহজে বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশের লোকেই বা সহজে একার্য্য করিতে পারিবে না কেন? ইহা হইতে তাঁহার এখানে ঐ তাঁত বসাইবার ইচ্ছা হয়। তাঁহার এক ভাগিনেয় ৺সত্যেন্দ্রনাথ বসু জব্বলপুরে রাজা গোকুল দাসের মিলে বহু দিন বয়ন-কার্য্য শিখিয়াছিলেন। মাতুলের এই নূতন কার্য্যে আগ্রহ দেখিয়া তিনি প্রথম কতকগুলি ঠক্‌ঠকি তাঁত স্থানীয় সূত্রধরের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া সানা, ব, রিড্ প্রভৃতি, বিলাতী দ্রব্য-সহযোগে উন্নতি করিয়া বসাইয়া দিলেন এবং সেইসঙ্গে জাপানে একখানি জাপানী পদচালিত তাঁতের অর্ডার পাঠাইয়া দিলেন। ইহাই বটকৃষ্ণ-বাবুর কাপড়ের কলের সূত্রপাত।



বটকৃষ্ট ঘোষের কলে প্রস্তুত বস্ত্র—১। টেবিল-ক্লথ্, ২। জরিপাড় কাল রংএর শাড়ী, ৩। তোয়ালে

এই ব্যাপারের কিছু দিন পরে, বিলাতি কলের তাঁতে (Power Loom) মিহি সূতায় দেশী কাপড়ের ন্যায় কাপড় উৎপাদন করিয়া সুলভে বিক্রী করিতে পারা যায় কি না, তাহার পরীক্ষার জন্য বোম্বাই হইতে একখানি কলের তাঁত আনান হয়। উহা প্রথম হস্ত দ্বারাই চালান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কার্য্যের অসুবিধা হওয়ায় একটি ছোট অয়েল্ এঞ্জিন্ খরিদ হয় এবং সেইসঙ্গে আরও দুই-চারিখানি কলের তাঁতও আনান হইল। অয়েল্ এঞ্জিন্ সর্ব্বদা খারাপ হওয়া. বিধায় পরে উহার পরিবর্ত্তে ষ্টীম্ এঞ্জিন্ বসান হয় এবং পর-পর বিলাতের ম্যান্‌চেষ্টারের র‍্যাফেল্ ব্রাদার্সের (Raphael Brothers) নিকট হইতে বহু-সংখ্যক তাঁত আনান হয়।

এই কলে কাপড়, তোয়ালে, টেবিল-ক্লথ্, জামার কাপড় প্রভৃতি সুন্দর প্রস্তুত হইত। বঙ্গ-বিভাগের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই কলের মোটা কাপড় খুবই চলিয়াছিল। মিহি সূতার কাপড়, এমন-কি সুন্দর জরিপাড় কাপড়ও এই কলে উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু দেশীভাবের মিহি বস্ত্র ব্যবসার্থ প্রতিযোগিতায় টিঁকিবার মত উৎপন্ন করিতে পারেন নাই। এজন্য তিনি অনেক চেষ্টা এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাতে অকৃত-কার্য্যতার সহিত এবং এই সময় ইণ্ডিয়ান্ স্পিনিং উইভিং কোম্পানি লিমিটেড্ নামক-একদল দুরভিসন্ধি বিশিষ্ট লোকের কথায় ভুলিয়া কার্য্য করার পর বিস্তর লোক্‌সান হইয়া ইহা শেষে উঠিয়া যায়।

এই কলে শেষ অবধি পঁচিশ-ত্রিশখানি ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের তাঁত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ড্রপ. বক্স্ লুম্ এক-খানা এবং একখানা ভাল ডবল্ লিফ্‌টেড্ জ্যাক্‌কার্ড্ লুম্ ছিল। এই শেষোক্ত প্রকার লুম্ এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলার



মৃণালিনী বস্ত্রালয়

শালা আছে। তথায়ও টুইল এবং অন্যান্য বস্ত্র তাঁতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী দত্তের তাঁত-শালায়ও টুইল এবং অন্যান্য জামার কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইসকল স্থানেও যে সব বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাও ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী, কিন্তু পরিমাণে অল্প। শেষোক্ত ভদ্রলোক তাঁহার তাঁত-শালায় গরম কাপড় বয়নেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কোনো কাপড়ের কলে আছে বলিয়া জানি না। (২৬)

এখানে সাধারণ বস্ত্র-শিল্পীগণ ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার পরিধেয় বস্ত্র ও উড়ানি ভিন্ন অন্য কিছু বয়ন করেন না। খাঁটি খদ্দরের কাজও তাঁহারা করেন না। প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মৃণালিনী বস্ত্রালয়-নামে এখানে একটি তাঁত-শালা আছে। উহাতে মোট তেরখানি তাঁত আছে। পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন ভদ্রলোকের ব্যবহারোপ-যোগী কয়েক প্রকার জামার কাপড় ও টুইলও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে দেশী মিলের সূতা এবং খদ্দরও ব্যবহৃত হয়। এই বস্ত্রালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা বয়ন-যন্ত্রের টানা-বিষয়ে কিছু উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। এখন সমস্ত তাঁতগুলি না চলিলেও, এখানে একত্রে এতগুলি তাঁত আর কোথাও নাই।

'চন্দননগর বয়নালয়'-নামে এখানে আর-একটি তাঁত-

চন্দননগরের বয়ন-শিল্পের কথা-প্রসঙ্গে এখানকার চট ও ক্যাম্বিসের কাজের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বৈদেশিক বণিকগণ-পরিচালিত বাঙ্গলার অন্যতম বিখ্যাত গোন্দলপাড়া-জুট মিলের কথা অনেকেই জানেন, সুতরাং ইহার কথা অধিক বলার আবশ্যক নাই। এদেশে কল-প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে এখানে চট ও ক্যাম্বিসের কাজ খুব বেশী ছিল। উহা সে-সময়ে এখানকার একটি লাভবান ও প্রসিদ্ধ শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তখন উহা হস্ত-চালিত তাঁতে প্রস্তুত হইত এবং উহার কাটতিও যথেষ্ট ছিল।

সহরের দক্ষিণ অংশে বর্ত্তমান মুসলমানপাড়ায় মুসল-মানদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বহুল পরিমাণে এই কাজ করিত। বারাসতের দে-মহাশয়রা ঐ-সকল লোকদের দাদন দিয়া গুন চটের ব্যবসা করিতেন। (২৭) অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে বহু দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত লোকও প্রতিপালিত হইত। স্থানীয় কৈবর্ত্তরা এ-কাজটিও যথেষ্ট করিত।

মেকেন্ত্রী-নামক এক বৈদেশিক ডুপ্লেক্স্‌পটী-নামক পল্লীতে একটি চট বুনিবার কল স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২৬) সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীমান শরৎচন্দ্র পালের নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হই। ইঁহারা উভয়েই এই কলের সহিত সংলিপ্ত ছিলেন। এই কলের উৎপন্ন যে বস্ত্রাদির ছবি দেওয়া হইল, এই দ্রব্যগুলি উঁহাদের ও শ্রীমান হরকৃষ্ণ পালের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছি। বটকৃষ্ট-বাবুর কলের সম্বন্ধে আরও বিশদ রূপে জানিতে হইলে ১৩১২ সালের শ্রাবণের "কমলায়" শ্রীযুত বিরিঞ্চি-মোহন কর-লিখিত "ফরাসডাঙ্গায় কাপড়ের কল"-নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২৭) হুগলী জেলা সাহিত্য মন্দিরের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

যে-স্থানে তাঁহার কল ছিল, এখনও সেই স্থান মেকাবী সাহেবের বাগান বা সাহেব-বাগান নামে পরিচিত (২৮) বোনো (Louis Baunaud) নামক এক ফরাসী সাহেব প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার হাজিনগরের বাগানে একটি বড় দড়ি ও চটের কারখানা করিয়াছিলেন। উহা শেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়। (২৯) নেড়োর মোহনার গোপীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ও এই কার্য্যের দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীর নিকটেই তাঁহার সুবৃহৎ কারখানার উৎপন্ন চট ও থ'লে চালান দিতেন।

তাঁতে বোনা চটের কাজ আর কোথাও দেখা যায় না। চট-কলের প্রসাদে এখন এ-শিল্পটি দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।

(২৮) চন্দননগরে 'মুসলমান উপনিবেশ'-নামক প্রবন্ধ।

(২৯) The Good Old Days of Honourable John Company.

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেখিতে-দেখিতে আরও তিনটি বৎসর অতীত হইল। সুখেন্দুর বিষয়-কর্ম্ম-পর্য্যবেক্ষণের সমস্ত ভার এখন কানাই-লালের উপর। সে যেমন ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ, তেমনি শিষ্ট, শান্ত ও বিনয়ী। তাহার মনের যে একটু উচ্ছৃঙ্খল ও চঞ্চল ভাব ছিল, এই বড় আঘাতটা পাওয়ার পর হইতে তাহা অতিমাত্রায় সংযত হইয়াছে। সে এখন বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কোনো কাজই করে না। গ্রামবাসী সকলেই তাহার উপর সন্তুষ্ট ও শ্রদ্ধাবান্।

মনিবের সহিত প্রজাদের কোনো গোলযোগ ঘটিলে তাহারা কানাইলালকে আসিয়া ধরিত। তাহারা জানিত কানাইলাল মধ্যস্থ থাকিলে একটা সুবিচার হইবে। এইরূপে কানাইলালের সংসর্গে থাকিয়া সুখেন্দুর চরিত্রেরও অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

সুখেন্দুর বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে কানাইলালকে এখন প্রায়ই জমিদারির বিভিন্ন অংশে যাইতে হইত। সে কত বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের ভিন্ন-ভিন্ন আচার-ব্যবহার দেখিত। কেহ জল ছুঁইতে পায়—কেহ পায় না। কেহ ঘরে উঠিতে পায়—জল ছুঁইতে পায় না। আবার খাদ্য-সম্বন্ধেও জাতি-বিশেষে কত ইতর-বিশেষ হয়। কোনো কোনো খাদ্য একে যাহা খায়, অন্যের তাহা অখাদ্য। শিক্ষা, সংস্রব ও অভ্যাসের ফলে চরিত্রেরও বা কত ইতর-বিশেষ হয়।

কানাইলালের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ-মুহুরী প্রায়ই থাকিতেন। তিনি কাছারী বাড়ীতে রান্নাবান্নার কাজও করিতেন। এই ব্রাহ্মণ যুবকটি তাঁহার আচার-রক্ষার জন্য বিভিন্নজাতীয় লোকের সহিত যে ব্যবহার করিতেন, তাহা দেখিয়া কানাইলাল এইসকল জাতির শ্রেষ্ঠতা, নীচতা, ও হীনতার একটা ক্রম পাইত। তাহা ছাড়া নিজে স্বচক্ষে তাহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়াও অনেকটা বুঝিয়া লইত। তাহার বয়স হইয়াছিল, বাংলা দেশে জন্মিয়া মা'র আঁচলের বাহিরে আসিয়া জাতিভেদ ও উচ্চ-নীচের প্রভেদ বুঝিতে তাহার কিছু বাকি রহিল না।

কানাইলাল প্রতিগ্রামের পাড়ায়-পাড়ায় কাজে-অকাজে ঘুরিয়া বেড়াইত, অনেক জাতি দেখিত। কিন্তু যে-জাতিটার পরিচয় জানিবার জন্য তাহার মনে একটা প্রবল আগ্রহ ছিল, সেই বাগ্দী জাতিটা সে কোথাও দেখিতে পাইত না। কাহাকেও সাহস করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিত না।

সে চাক্ষুষ দেখিতে না পাইলেও এই যেসব

অনাচরণীয় জাতি নিত্য তাহার সম্মুখে পড়িতেছে, ইহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহাদেরও আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি কেমন—এবং সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়, সেসবই—কল্পনাবলে সে অনেকটা বুঝিয়া লইতে পারিত।

যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে আজ এই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও নির্ম্মল চরিত্রলাভে সমর্থ হইয়াছিল, এইসব দেখিয়া-শুনিয়া পূজাগৃহে যাইবার এবং রান্নাঘরে ঢুকিবার ছেলেবেলাকার সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষাটা আপনা হইতে তাহার হৃদয়ের কোন্ দূরদেশে যাইয়া থিতাইয়া পড়িয়াছিল। বরং এই ব্রাহ্মণ পরিবার যে তাহার কত-কত অন্যায় ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া তাহাকে ঘরের ছেলের মতন আদরে যত্নে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া নিয়ত তাঁহাদের চরণের ধূলি হইয়া থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইত।

কানাইলালের মনে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায়, সে এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের কাছে সর্ব্বদা হীন জাতির মতন এমন সঙ্কুচিত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল যে, এই শিক্ষিত ও শিষ্ট যুবকের তেমন ব্যবহার পাইয়া সকলে লজ্জা পাইতেন। আপনার পদোচিত মর্য্যাদা ভুলিয়া অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে জাতির হিসাবে কানাইলাল যেরূপ সমাদর করিয়া চলিত, তাহাতে তাঁহারাই সময়-সময় কুণ্ঠিত ও বিব্রত হইয়া পড়িতেন।

বাগ্দী-জাতি নীচ, মনে-মনে ইহা ধারণা করিয়া লইলেও সে জাতি-হিসাবে যে কত নীচ—কত হীন তাহা স্বচক্ষে দেখিবার ও ভালো করিয়া বুঝিবার তাহার দৃঢ় সংকল্প ছিল। তাহার এই উচ্চ পদ এবং নির্ম্মল চরিত্র এই দু'য়ে মিলিয়া-মিশিয়া তাহাকে এ-বিষয়ে আরও অধিকতর অন্ধ করিয়া রাখিবার সুযোগ দিয়াছিল; কেননা গ্রামের কোনো লোকই কোনো দিন তাহার জাতি-সম্বন্ধে ঘাঁটাঘাটি করিয়া তাহার নিকট সেটি স্পষ্ট করিয়া তুলিতেন না। বরং তাহাকে যথেষ্ট সম্ভ্রম ও সম্মান করিতেন। এবং সে যে ব্রাহ্মণ-পরিবারের ঘরের ছেলের মতন প্রতিপালিত হইয়াও আপনার জাতির বিশিষ্টতাটুকু রক্ষা করিয়া চলিতেছে ইহা ভাবিয়া সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইতেন। তাহার আচরণ দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিতেন না যে, এই যুবক তাহার জাতি সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ।

একদিন সুখেন্দু কহিলেন, কানাই! তুমি জমিদারির কাজকর্ম্ম সব দেখ্‌ছ—অথচ তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে তুমি বসো না। সাধারণ কর্ম্মচারীদের মধ্যে ব'সে কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করো—এমন করলে তোমার সম্মান থাক্‌বে কেন?

কানাই হাসিয়া কহিল, "আজ্ঞে সম্মান দিয়ে কি হবে? কাজ চল্‌লেই হ'ল। যাঁরা আমায় সম্মান করবেন, তাঁদের প্রাপ্য সম্মানটুকু না দিয়েও ত পারিনে।"

সুখেন্দু কহিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, বোঝো না, এ-সব কাজে একটু রাশপসার রাখ্‌তে হয়।"

কানাই কহিল, "কিন্তু নিজেকে সকলের কাছে একটা ভয়ের বস্তু ক'রে তোলাও উচিত নয়। তা'তে অনেক সময় প্রাণের কথা প্রাণেই থেকে যায়—কাজ ভালো হয় না।"

সুখেন্দু কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "নন্দ-খুড়োর সুদের টাকাটা নাকি বেবাক ছেড়ে দিয়েছ?"

কানাই কহিল, "হাঁ। আসলই তাঁর দেবার চাড় নেই। আমি নিজেই দেখেছি, পাঁচ-সাত দিন অন্তর তাঁর প্রায়ই একআধদিন উপোষ যায়। তবে আসল টাকাটা পড়্‌বে না। আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তাঁকে একখানা মুদীখানার দোকান ক'রে দিয়েছি। তিনি লাভের টাকা থেকে মাসে-মাসে পাঁচ টাকা ক'রে আসলের বাবদ দেবেন।"

সুখেন্দু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

মহেশ্বরীর প্রাণেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কানাইলালের বয়স হইয়াছে—সে শিক্ষায় স্বভাবে সকল বিষয়েই কৃতী হইয়াছে। তাহাকে সংসারী করিতে মহেশ্বরীর প্রাণে প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু অতি কদর্য্য আচার-ব্যবহার যে-জাতিটার অস্থি-মজ্জায় জড়িত হইয়া আছে, তাহাদের গৃহ হইতে একটা ম্লেচ্ছ কন্যাকে আনিয়া কি করিয়া তাহার জীবনসঙ্গিনী করিয়া দিবেন? সেই মেয়েটি যদি হইত ত বেশ হইত।

কানাইলাল মজুমদার-উপাধিই লিখিত। সেই

কান্‌কালে সে ছোঁয়া-খাওয়া লইয়া প্রশ্ন তুলিলে মহেশ্বরী কদিন তাহাকে বাগ্দীর ছেলে নামে পরিচিত করিয়াছিলেন, সে-কথা কি সে আজিও মনে করিয়া রাখিয়াছে? হেশ্বরী ভাবিলেন,—সে যদি তাহার এই হীন মেরুদণ্ডের ম্ম খবরটুকু আজ পায়, তাহা হইলে তাহার জীবনের লরব হয়ত চিরদিনের মতন থামিয়া যাইবে! চিরদিন চ্চ স্থানে রাখিয়া আজ তাহাকে নিম্নের পংক্তিতে যাইয়া সিতে বলিলে, সে উত্তেজনার বেগ হয়ত সে সাম্‌লাইয়া ঠিতে পারিবে না।

কানাইলালের পরিচয় লুকাইয়া রাখিয়া পরিণামে তাহাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া মহেশ্বরীর কোনোদিনই ইচ্ছা ছিল না। তিনি নবীনের সহিত তাহার সম্বন্ধ জানাইয়া নবীনের কত গল্পই তাহার সহিত বলিতেন। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া কোনোদিন কিছু বলিতে পারেন নাই। ভাবিয়াছিলেন, বয়স হইলে আপনিই সে সব বুঝিয়া লইতে পারিবে। এমন-সময় তাহার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। তাহার পর তাহাকে যখন শিক্ষায়, দীক্ষায়, স্বভাবে সকলদিকেই অতি পবিত্র অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহাকে তাহার পরিচয় শুনাইতে তাঁহার মাতৃ-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। তিনি একদিন তাঁহার পুত্রবধূকে ডাকিয়া কহিলেন—

"শৈল! কানাইলালের ত, একটা বে-থা দিতে হয়—কি করা যায় বল্ দেখি?"

শৈল কহিল, "তাই ত, অমন ছেলের গলায় একটা বাগ্দীর মেয়ে কি ক'রে এনে গেঁথে দেওয়া যায়?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা-ছাড়া আর উপায় কি?"

শৈল কহিল, "না মা, আজন্ম কুমার থাকে সেও ভালো, সে যা জানে না, তা শুনিয়ে অমন একটা দুঃসহ দুঃখ তার প্রাণে ফুটিয়ে তুলো না, সে হয়ত সে-জ্বালা জুড়োবার স্থান পা'বে না।"

মহেশ্বরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কিছুই স্থির হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কানাইলালের চিত্তের অন্তরালে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই চাঞ্চল্যের বশে সে একদিন প্রাতে অশ্বারোহণে নবীনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। এই নবীনের সম্বন্ধে অনেক কথাই সে মহেশ্বরীর নিকট শুনিয়াছিল। সে শুনিয়াছিল, একমাত্র নবীনের সাহায্যেই তাহার পিতা-মাতার সৎকার হইয়াছিল। এবং সে এই মহদাশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল নবীনের সাহায্যেই। সে জ্ঞান হইবার পর নবীনকে কোনোদিন দেখে নাই। কিন্তু যখনই তাহার কথা স্মরণ হইত, কৃতজ্ঞতায় তাহার চক্ষু-দুটি জলে ভরিয়া উঠিত।

সুখেন্দুর জমিদারির সংলগ্ন অন্য এক জমিদারের এলাকায় নবীনের বাস। কানাইলাল জমিদারি-পরিদর্শনে আসিয়া একদিন প্রাতঃকালে কাছারী বাড়ী হইতে অশ্বারোহণে একাকী নবীনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সে বাগ্দী-জাতির সন্ধান করিতে-করিতে নবীনের খবরও পাইয়াছিল।

নবীন যে গ্রামে বাস করিত, তাহার নাম চাঁদপাড়া। কানাইলাল কত কত প্রান্তর ও লোকালয় পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছিল। সুমন্দ বাতাসে তাহার অঙ্গের পরিচ্ছদ নাচানাচি করিতেছিল। পাখীরা কলরব করিতেছিল, গবাদি পশুগণ মাঠের দিকে চলিয়াছিল। সকলেই কোনো-না-কোনো কাজে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। চারিদিকে কেমন একটা আয়োজন ও ব্যস্ততার ভাব। কিন্তু তাহার চিত্ত আজ নিরতিশয় ব্যাকুল! সে বুঝি কৃত্রিমতার কৌশলে আপনার সম্মানের বোঝা ভারী করিয়া চলিয়াছে। সে-কৃত্রিমতা যে কতখানি, তাহাই জানিতে সে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মনের এতকালের জিজ্ঞাসার মীমাংসা সে আজ করিতে চায়। সে প্রাণের মধ্যে এমন-একটা লুকোচুরি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছিল না। সে খোলাখুলিভাবে অতি নিষ্ঠুর সত্যও জানিবে। কিন্তু আজ যে তাহাতে কতখানি গ্লানি মর্ম্মে-মর্ম্মে বিঁধিয়া তাহার সহিষ্ণুতাকে দুঃসাধ্য করিয়া তুলিবে, তাহা কে জানে? মহেশ্বরীর স্নেহধারায় সে যে চির-বসন্তের মতন সুখে জীবন যাপন করিতেছিল! আজ সে জীবনকে অধঃপতিত, লাঞ্ছিত করিতে এবং হীনতার পঙ্কে তলাইয়া দিতে কি জানি কাহার ইঙ্গিতমত ছুটিয়া চলিয়াছে?

কিছুদিন হইতে তাহার মনে হইতেছিল যে এমন-একটা মিথ্যার চোরাবালির মধ্যে সে আর কিছুতেই আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। কিন্তু হয়ত তাহার আজিকার এই গন্তব্য-পথে এমন নির্ভরতা সে পাইবে না, যাহাকে ভর করিয়া সে যেমনটি ছিল, তেমনটি থাকিতে পারিবে। কিন্তু এই অকারণ লুব্ধতায় যে আত্ম-পরিচয় লুকাইয়া রাখিতে চায়, সে গৌরবের নামে আপনার মহামূল্য সম্পদ্‌টাই হারাইয়া ফেলে। জাতির গায়ে কোনো দুর্গন্ধ নাই। দুর্গন্ধ—সে কেবল আচার-ব্যবহার ও কর্ম্মের দোষে। তাহার মনে আপনার জাতিটার উপর যখন একটু সহানুভূতির ভাব আসিতেছিল তখন একটা করুণ আনন্দের সুর প্রাণের মাঝে বাজিয়া তাহার চিত্তের সমস্ত অন্ধকার ও নিরানন্দকে ঠেলিয়া ফেলিয়া জীবনের সত্যকার পরিচয় পাইবার বাসনাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছিল। অন্তরে এইরূপ তুমুল ঝড় তুলিয়া, কখনো উৎসাহে, কখনো অবসাদে টলিতে টলিতে সে নবীনদের গ্রামে চাঁদপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটি পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, দুইটি বালক ছিপ লইয়া মাছ ধরিতেছে। কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "নবীন-বাগ্দীর বাড়ী কোন্ দিকে ?"

ছেলে দুইটি কিছুক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। পরে একটি বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জমিদারের লোক ?"

কানাই বলিল "হাঁ।"

বালক বলিল, "সে যে বাগ্দী-পাড়ায়। ঐ বাঁদিকের রাস্তা ধ'রে যাও।"

"কত পথ হবে ?"

"কত পথ আর হবে—মুচীপাড়া ছাড়ালেই ত বাগ্দী-পাড়া।"

কানাইলাল অশ্বের মুখ বামদিকে ঘুরাইয়া দিল এবং মৃদুগতিতে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহার গতি আরও মন্থর হইয়া আসিল। সে যেন তাহার নিজের ঐশ্বর্য্য নিজেই লুণ্ঠিত করিয়া শূন্যভাণ্ডারের নগ্নমূর্ত্তি দেখিতে চলিয়াছে! সে তখনও ভালো বুঝিতে পারিতেছিল না যে, কোন্ ক্ষীণ লালসার মোহে সে আপনার জয়-শ্রী হরণ করাকেই লক্ষ্মী-শ্রী বলিয়া মনে করিতেছে! কিন্তু শুধু স্বপ্নের মতন একটা আভাস কিছুদিন হইতে তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল যে, তাহার এই সুখ-শান্তির অন্তরালে একটু সত্যের কণ্টক গভীর অবসাদে যেন লুকাইয়া আছে, তাহা একদিন-না-একদিন মর্ম্মান্তিক হইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিবেই। তাই সে তাহার সুখ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের সহিত পরিচয় করিতে দীর্ণ-হৃদয়ে এমন ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়াছে।

সে যখন বাগ্দীপাড়ায় আসিল, তখন বেলা মাথার উপর। সে প্রথমত পরাণ-বাগ্দী-নামক একব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কোম্পানীর লোক ভাবিয়া পরাণ শশব্যস্তে একখানি খাটিয়া টানিয়া আনিয়া তাহাকে বসিতে দিল এবং নমস্কার করিয়া কিছুদূরে যাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কানাই কহিল, "দাঁড়ালে কেন ? বসো।"

পরাণ না বসিয়া দাওয়ার উপরে উঠিয়া একছিলিম তামাক সাজিল এবং একটুক্‌রা কলার পাতা আনিয়া কল্‌কেটা তাহার সম্মুখে ধরিল।

কানাই কহিল, "আমি তামাক খাইনে।"

পরাণ তখন আপনার ডাবা হুঁকাটিতে কল্‌কে পরাইয়া কানাইলালের সম্মুখে বসিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সে কহিল, "আপনারা ?"

কানাই বলিল, "আমরা এই তোমাদেরই মতন মানুষ আর কি!"

পরাণ সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "আমাদের মতন—বলেন কি মশাই ? আমরা পশুরও অধম। আপনারা সব দেব্‌তা-লোক। তা বামুন, কি আর কিছু-জান্‌বার মন ক'রে কথাটা বলেছিলাম।"

কানাই কহিল, "হবো একটা-কিছু। তোমরা লেখা-পড়া শেখো না কেন ?"

পরাণ হাসিয়া কহিল, "নেকাপড়া শিখ্‌তে কি বিধেতা আমাদের পাঠিয়েছে ? ওসব ভদ্দর-নোকের কাজ।"

কানাই বলিল, "বিধাতা কা'কেও 'তুমি এ কর্‌বে—তুমি ও কর্‌বে, ব'লে পাঠাননি! লেখাপড়া শিখ্‌তে কারও মানা নেই। তোমাদের জা'তের মধ্যে কি কেউ লেখাপড়া শেখে না ?"

পরাণ কহিল, "দেখিনে ত বড়।"

কানাই দেখিল, পরাণের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে উঠানে পা ছড়াইয়া দিয়া রোদ-পিঠ করিয়া খাইতে বসিল। পরাণের স্ত্রী তিনখানি শানুকে আমানি ভাত ও দুটা করিয়া মাছ-পোড়া রাখিয়া গেল। মাছ-পোড়ায় না লাগিল তেল—না লাগিল নুন—না লাগিল লঙ্কা। এঁটোর বিচার নাই; তাহারা যে-হাতে শানুক ধরিতেছে সেই-হাত গায়ে-কাপড়ে মাখামাখি করিতেছে। পরিহিত বস্ত্রগুলি মৃত্তিকা অপেক্ষাও মলিন ও দুর্গন্ধ।

কানাই ভাবিতে লাগিল, "ইহারাই বাগ্দী-জাতি! ইঁহাদের ধমনীতে আর আমার ধমনীতে একই রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে? এই হীন বাগ্দী-জাতি আমি! ইহাদের লোকে পূজা-গৃহে, রন্ধন-গৃহে ঢুকিতে দিবে কেন?" তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। আজ কোন্ পথে সে পা বাড়াইবে? কোন্ পথ ধরিয়া সে চলিবে? কোনো পথ নাই! পথ নাই!!

সে নয়ন মুদ্রিত করিয়া নির্জীবের মতন বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "কি অসীম—কি পবিত্র মাতৃস্নেহ এই মহেশ্বরী-মায়ের! এই হীন অনাচরণীয় বাগ্দীর ছেলেকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন! দেশ ছাড়িয়া তাহারই সন্ধানে সুদূর ঘাঁটাল পর্য্যন্ত গিয়াছেন! আত্মীয়-স্বজনের সুতীক্ষ্ণ তীর-গুলি একে-একে বুক পাতিয়া লইয়াছেন! পুত্রকে যে-স্নেহ দেন নাই, বাগ্দীর ছেলেকে তাহা দিয়াছেন!" অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। সে মনে-মনে ডাকিয়া কহিল, "মা! ওমা! মহেশ্বরী-মা! সন্তানকে পথ দেখাও!!"

সে দেখিল, এমন মায়ের বিনিময়ে সকলই দেওয়া যায়। মহেশ্বরী যে তাহাকে বাগ্দীর ছেলে জানিয়া-শুনিয়াই স্নেহ করেন! এমন বিশ্বজননীর স্নেহ হইতে সে ত কোনোদিনই বঞ্চিত হইবে না। অথচ সে শূন্যের উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া যেন নূতন একটা-কিছু গড়িতে চাহিতেছে!

এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে তাহার অন্তঃকরণ তাহার জাতিটার দিকে যখন আবার সদয় হইয়া উঠিল, তখন সে দেখিতে পাইল, এই পরাণ-বাগ্দী যে শক্তি রাখে, তাহার সে-শক্তিও নাই। একটা বিরাট্ জাতির বিশাল শক্তি এই পরাণ-বাগ্দীর পিছনে-পিছনে, আর সে? সম্পূর্ণ নিঃস্ব নিঃসম্বল। কেবল মহেশ্বরী তাহাকে একে সহস্র করিয়া রাখিয়াছেন! মহেশ্বরীর অভাবে এত-বড় একটা শক্তি তাহারও পিছনে থাকিতেও সে শক্তি-হীন! নিঃসম্বল!! একাকী!!!

কানাইলালকে একাকী বসাইয়া রাখিয়া পরাণ বাগানে গরু তাড়াইতে গিয়াছিল। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খাওয়াদাওয়ার কি বিধি হয়েছে?"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "নবীনের বাড়ী কোন্‌টা?"

"এই ত চারখানা বাড়ী পরে।"

"তা'র বাড়ী আমাকে একবার যেতে হবে।"

"আসুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

পরাণ তামাক টানিতে-টানিতে আগে-আগে চলিল, কানাই পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

নবীন ভিন্নগ্রামে এক জমিদারের সরকারে পেয়াদা-গিরির কাজ করিত। সে অনেকটা আদবকায়দা ও সভ্যতা শিখিয়াছিল। এবং তাহার কথাবার্ত্তাও অনেকটা দুরস্ত হইয়াছিল। তথাপি পরাণ যখন এই জামা জুতা-পরা চশমাধারী ঘোড়সওয়ারটিকে অকস্মাৎ তাহার দ্বারে লইয়া হাজির করিল, তখন তাহার পর্ণকুটীরে এমন-একটি ভদ্রলোককে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। যাহা হউক সে কানাইলালকে বসিবার জন্য একখানি মোড়া দিয়া পরাণকেও একখানি পিঁড়ি দিল। পরাণ কহিল, "এ রি নাম নবীন।"

নবীনকে প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইতে গেলে সে চকিত হইয়া দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "করেন কি মশাই?"

কানাই বলিল, "তা হোক্, তা'তে দোষ নেই।" তা'র পর উপবেশন করিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

নবীন এই ভদ্রযুবকের আচরণ দেখিয়া উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিল। পরাণও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। নবীন কহিল, "আমরা আপনার পায়ের ধূলোমাটি!

আমাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য কি এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করলেন ?" পরাণের দিকে ফিরিয়া সে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় পেলে এঁকে ? পাগল নাকি ?"

পরাণ মৃদুস্বরে কহিল, "না। তেমন ত কোনো লক্ষণ পাইনি।"

কানাই এসব শুনিতে পাইল। সে বলিল, "আমি পাগল নই। আপনারা বয়সে বড়। আপনাদের সঙ্গে আমাদের এইরূপ আচরণই করা উচিত। আপনি জমিদার সুখেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানেন ?

নবীন কহিল, খুবই জানি। মুনিব-লোক তাঁরা! জানিনে ?"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোনো সময়—সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয় কুড়ি-বাইশ বছর হবে—একটি আড়াইবছরের শিশুকে তাঁর মায়ের কাছে রেখে এসেছিলেন ?"

নবীনের সে-কথা বেশ মনে ছিল। সে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "হাঁ। সে ত নিতাই-খুড়োর ছেলে। ছেলেটা এখন মানুষ হয়েছে শুনতে পাই। এমন কাজের ঝঞ্ঝাট যে একদিন দে'খে আস্‌তেও পারিনে। যেমন পোড়া অদেষ্ট ক'রে এসেছিল, তা বিধাতা তা'কে দেখ্‌বেন না ত আর কা'কে দেখ্‌বেন ? পেট থেকে না পড়্‌তে বাপ মা ভাই বোন সবগুলিই খেলে।"

কানাই কহিল, "আমিই সে হতভাগা—রাক্ষুসে ছেলে!"

নবীনের বিস্মিত চক্ষু-দুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কানাইলালকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে তাহার বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। করুণার্দ্র-স্বরে কহিল, "আহা! নিতাই-খুড়ো এমন ভালো মানুষ ছিল, এমন ছেলে পেয়েছে একবার দেখে যেতে পার্‌লে না! পরাণ-দা! নিতাই-খুড়োকে ভু'লে গেলে ? এখানে এলে ত তোমাদের বাড়ীতে পাত না পেতে যেত না!" কানাই পরাণের পদধূলি লইল।

পরাণ লজ্জায়, সঙ্কোচে ও পুলকে অভিভূত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তখানি কানাইলালের স্কন্ধের উপর রাখিল। তাহারা আজ কি-বস্তুই হাতে পাইয়াছে! ইহাকে কোথায় রাখিবে—কোথায় বসাইবে—কি বলিয়া আপ্যায়িত করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

নবীনের বর্ত্তমানে চাকুরি ছিল না। সে তাহার স্ত্রী ও পুত্রটিকে লইয়া আজ দুই বৎসর রোগের সহিত লড়াই করিতে-করিতে তাহার সামান্য দু'চার পয়সা যাহা জমা ছিল, তাহা কোন্ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া নিদারুণ দুর্দ্দশার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। তাহার ঘরের চালে ছাউনি ছিল না। যেখানে একেবারে শূন্য সেখানটা পাটি দিয়া আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। ছেলেটিও ঔষধ-পথ্যের অভাবে কঙ্কালসার। কানাইলাল বসিয়া-বসিয়া এই সব দেখিতেছিল।

নবীন শুনিয়াছিল যে, নিতাই-খুড়োর ছেলে লেখা-পড়া শিখিয়াছে, ভদ্র-আচরণ পাইয়াছে এবং বাবুদের সরকারে বড়দরের চাকুরি করিতেছে। কিন্তু এযাবৎ দেখা-শুনা করিবার কোনো সুবিধাই সে পায় নাই।

কানাইলাল গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের হস্তে পঞ্চাশটি টাকা দিল। এবং বলিল, আমি ত আপনার ছোটো ভাই। আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনি এই টাকায় একখানা ঘর বাঁধ্‌বেন। আমি সময়-মত এসে মাঝে-মাঝে দেখে-শুনে যাবো।"

নবীন কহিল, "এত বেলায়—খাওয়া-দাওয়া—

"সে আমি কাছারী থেকে সেরে এসেছি। আবার গিয়ে খাবো। আমার খাবার সেখানে প্রস্তুত আছে। ঘোড়ায় যেতে বেশী সময় লাগ্‌বে না।"

এই বলিয়া পরাণের হস্তেও পাঁচটি টাকা দিয়া সে প্রস্থান করিল। নবীনের চক্ষু-দুটি সজল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কানাইলালের চক্ষের ধাঁধাঁ কাটিয়া গিয়াছে। যে-শক্তি ও সাধনার বলে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ তাহার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই স্থানে সেই অক্ষয়পীঠে যাইয়া না দাঁড়াইলে তাহার কোনো জাতি নাই—শক্তি নাই—ধর্ম্ম নাই—সান্ত্বনাও নাই। সে কেবল তাহার জাতির নিকট দুর্ব্বিনয়ের একটা চিত্র হইয়া থাকিবে। যে-রক্তের মধ্যে তাহার জন্ম, সে-

রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে, সেই রক্তের উপর আসন পাতিয়াই তাহাকে তপস্তা করিতে হইবে। পিতৃপুরুষের সে-সিদ্ধপীঠ ত্যাগ করিয়া আসিলে তাহার শিক্ষা, দীক্ষা ও প্রতিভা একটা আকস্মিক ঘূর্ণীবায়ুর সহিত যুঝিয়া অবশেষে আপনা হইতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তাহার অন্তরে যখন এইরূপ একটা সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন একদিন মহেশ্বরী হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "এখন ত আর এমন উড়ু-উড়ু থাকা ভালো দেখায় না বাছা! এখন একটা বে'-থা' কর।"

কানাই হাসিয়া কহিল, "সে ত তোমার বাগ্দীর মেয়ে নইলে হবে না!"

মহেশ্বরী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! এতদিনেও সে তাহার জাতির কথাটা বিস্মৃত হয় নাই,—শিশুকালের শোনা সেই নিষ্ঠুর কথাটি প্রাণের মধ্যে বড় করিয়া রাখিয়াছে! তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরখ করিয়া দেখিবার জন্য মহেশ্বরীর চক্ষু-দুটি অতিমাত্র ব্যথিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার বেদনাতুর মুখখানি দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতৃস্নেহের নিমন্ত্রণে বালকের সকল খাদ্য জোগাইতে পারেন নাই। তাহার বাল্য-কালের জানিবার শুনিবার সেই ক্ষুদ্র চেষ্টা এখন অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অন্তর-বেদীর উপর দাঁড়াইয়া বিশ্বের সহিত বোঝাপড়া করিতেছে! মহেশ্বরী কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু-দুটি তাহার প্রতি নির্নিমেষ হইয়া রহিল।

কানাই কহিল, "মা! তোমাদের স্নেহ-স্রোত সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ কর্‌তে ব্যস্ত। কিন্তু সংসারে—সমাজে তা চায় না। তুমি তোমার প্রাণ-মন্দিরের মধ্যে আমাকে মুগ্ধ পূজারী ক'রে রাখ্‌তে পারো—কিন্তু বাগ্দীর ছেলেকে বামুন কর্‌বার হাত তোমার নেই!"

মহেশ্বরী নিম্নস্বরে কহিলেন, "সে ত জানি।"

কানাই বলিল, "তবে যে বিশাল শক্তিটা আমার পিছনে জেগে আছে, তা থেকে আপনাকে বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌ব কেন? এখানে একমাত্র তুমি—মহেশ্বরী-মা ভিন্ন আমার আর কেহ নাই; কিন্তু সেখানে তুমিও থাক্‌বে—আর শত সহস্র মা-ভাইও আমার পিছনে থাক্‌বে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তাদের আচার ব্যবহার যে—"

"অতি নীচ—তাই বল্‌ছ? হোক নীচ—হোক্ জঘন্য; তা' ব'লে পিতৃপুরুষকে কেহ ত্যাগ কর্‌তে পারে না। আর তা-ছাড়া আমি যাবোই বা কোথায়? আমার জাতের কতটা কি শক্তি আছে, জানিনে। কিন্তু অনেক স্থলে দেখ্‌তে পাই, লোকে এক জা'ত থেকে অন্য জাতে যায়। যারা যায়, তা'রা আপনার জাতিকে কিছু দেওয়া দূরে থাক্, নিজের অঙ্গ কেটে অন্যের অঙ্গ পুষ্ট করে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "কিন্তু তোমার জাতের মধ্যে কি তেমন পরিচ্ছন্ন মেয়ে পাওয়া যাবে?"

"না পেলেও যে আমি তাই চাই। আমার রক্তটা যেখানে প'ড়ে আছে, তা অ-স্থান হোক্, কুস্থান হোক্, তা'কে মমতারই চক্ষে আমাকে দেখ্‌তে হবে।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "তবে কি বলিস্?"

"আমার বলাবলি কিছু নেই—তোমারও ভাবনার কিছু নেই। আমি জা'ত ছাড়্‌ব না—বে-ও কর্‌ব না। আমার বাপ-মা, ভাই-বোন্ যখন অকালে চ'লে গেলেন, তখন এ-দেহটার পরে আমার আর বিশ্বাস নেই। যে কয়দিন থাক্‌ব, তোমার সেবা, দেশের সেবা, আর আমার জাতির সেবা ক'রে তোমার শ্রীচরণে আমার শক্তির পরীক্ষা দেবো।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "চিরজীবনটা সন্ন্যাসী সেজে কাটাবি?"

"সন্ন্যাসী কেন সাজ্‌তে যাবো? পরের গৃহ নিজের ভেবে নেওয়াই আমার জীবনে তোমার শিক্ষায় বাঞ্ছিত অবস্থা।"

"কিন্তু আমি কি তা'তে শান্তি পাবো?"

"তুমি বেশী শান্তি পাবে। পরিবার ছেড়ে বিশাল পরিবারের দিকে যার প্রাণের শুভ আশীর্ব্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে, সে বাইরে না হ'লেও অন্তরে আরাম পাবে।"

মহেশ্বরীর মুখমণ্ডলে চিন্তার ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কানাইলাল অনেকক্ষণ চাহিয়া-চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা! কি ভাবছ?"

মহেশ্বরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কহিলেন, "ভাব্‌ছি অনেক কথা,—সে আর তুই শুনে কি কর্‌বি ?"

কানাইলাল বলিল, "করা না-করা সে পরের কথা, আগে শোনাও ত ?"

মহেশ্বরী মৃদুস্বরে কহিলেন "ভাব্‌ছি, এ তোর ঘুমের আবেশ, না জাগরণের নেশা !"

কানাইলাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তোমরা চোখ-ছুটি এত দূরে ফেলেও দেখ্‌তে পারো ? ঘুমোলেও তোমার ওই কোল, জাগরণেও ওই কোল, তা'র আর ভাব্‌না কি ?"

মহেশ্বরী কোনো কথা বলিলেন না।

কানাই কহিল, "মা! আমার একটা বড় সাধ হয়েছে—পূর্ণ কর্‌বে ত ?

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা কি ক'রে বল্‌তে পারি ? আকাশের চাঁদ ধ'রে দিতে বল্‌লে হয়ত 'আয়! আয়! চাঁদ আয়!' ব'লেই নিরস্ত হ'তে হবে।"

কানাই হাসিয়া কহিল, "সে-বয়সটা বোধ হয় তোমার এ পর্ব্বতপ্রমাণ ছেলের কেটে গেছে।"

মহেশ্বরী শঙ্কিতা হইয়া কহিলেন, "ষাট্‌—ষাট্‌—অমন কথা বলে না। এখন কি বল্‌বি, শুনি ?"

কানাই কহিল, "বাস্তুভিটায় বাপ-মায়ের প্রদীপটা যাতে জ্বলে তা কর্‌তে হবে।'

"আমাকে ছেড়ে যাবি, বুঝি ? সেখানে একলাটি কি ক'রে থাক্‌বি ?"

"থাক্‌ব ত তোমারই কাছে। শুধু আমি জান্‌তে চাই যে আমার দাঁড়ানোর একটা স্থান আছে। আর আমার পিতৃপুরুষেরা জান্‌তে চান যে তাঁদের ভিটায় প্রদীপ জ্বল্‌ছে।"

* * *

তা'র পর কিছুদিনের মধ্যে নিতাই-বাগ্দীর ভিটার উপর কানাইলালের এক বাসভবন নির্ম্মিত হইল। সেখানে যাহারা বাস করিতেছিল, তাহাদের অন্যত্র জায়গা-জমি দিয়া সুখেন্দু কানাইএর জন্য একটি সুদৃশ্য পাকা-বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

গৃহের নাম রাখা হইল, 'মাতৃ-নিবাস।' কানাইলাল সুখেন্দুর নিকট হইতে বেতন-স্বরূপে যাহা পাইত, আপনার গৃহে বসিয়া সে তাহা হইতে কিছু-কিছু দরিদ্রদিগকে দান করিত। অবশিষ্ট অর্থ বাগ্দী-জাতির শিক্ষার্থে—বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া তাহারই উদ্দেশে ব্যয় করিত। এইরূপে তাহার জনহীন মাতৃ-নিবাস দিন দিন দরিদ্রদিগের কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

মুক্তি লাভ

শ্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

বুড়া রতনদাস বাবাজি নবদ্বীপে তীর্থ করিতে গিয়া যখন ছোট একটি ছেলেকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের লোকে একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ছেলেটি তখন বছর পাঁচেকের ; বেশ হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মুখখানি অতি সুন্দর। মাথাভরা তাহার কালো কোঁকড়া চুলের রাশি। পরণে তাহার অতি জীর্ণ ছোট একখানা কাপড়, বাবাজির ভিক্ষাপাত্র বহিয়া লইয়া সে গ্রামে প্রবেশ করিল।

এমন সুন্দর ছেলে গ্রামে আর একটিও ছিল না। এমন দীর্ঘ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা অনেক বড় লোকের ছেলেরও নাই, ছেলেটি যে কে তাহা জানিবার জন্য সকলেই মনে অদম্য কৌতূহল চাপিয়াছিল। তাই সকলেই গিয়া রতনদাসকে ধরিল, "বাবাজি, এ ছেলেটিকে পেলে কোথায়; কা'র ছেলে কুড়িয়ে আন্‌লে ?"

রতনদাস একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন বাবা। এ ছেলেটির পরিচয় আমি বিশেষ কিছুই জানিনে। স্বরূপনগরের কাছ দিয়ে আসতে দেখলুম পথে' একটা গাছতলায় প'ড়ে কাঁদছে, শুনলুম সারাদিন কিছু খায়নি। আমার কাছে খাবার ছিল, খেয়ে বললে আমি তোমার সঙ্গে যাবো, তাই নিয়ে এলুম। ভগবানের জীব, বন্ধন সব কেটে দিয়েও তিনি আবার বন্ধনে ফেলছেন, এসব তাঁরই ইচ্ছে।"

উদ্দেশে সে ভগবানকে প্রণাম করিল।

ছেলেটিকে এত জিজ্ঞাসা করা হইল তার বাড়ী কোথায়, তার বাপের নাম কি, কেন সে চলিয়া আসিল,—সে সকল প্রশ্নের উত্তর এক-কথাতেই দিয়া দিল, গম্ভীর-মুখে শুধু বলিল, "জানিনে।"

তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করিল, তেম্‌নি গম্ভীর-মুখে সে উত্তর দিল—"নিমাই।"

গ্রামবাসীগণ নিজেরাই তাহার পরিচয় আবিষ্কার করিয়া ফেলিল—নিশ্চয়ই সে কোনো ভ্রষ্টা নারীর সন্তান, অপবাদ-ভয়ে কোথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে, পাঁচ জনের অনুগ্রহে এত বড়টা হইতে পারিয়াছে।

রতনদাস তাহার কড়িবাঁধা ক্ষলো হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরমুখে বলিল, "তা হ'তেও পারে, তা ব'লে ত আমি ফেলে দিতে পারিনে,—জীব নারায়ণ।

তাহার এই অত্যধিক ভক্তি দেখিয়া অনেকে চটিয়া গেল, বলিল, "জীব নারায়ণ ব'লে—তিনকাল কাটিয়ে এই শেষকালটায় জাতজন্ম হারাবে রতন দাস?"

রতন দাস হুঁকাটি পার্শ্বে রাখিয়া ললাটে হাত-দুখানা ছোঁইয়া গদগদ-কণ্ঠে বলিল, "বৈরাগীর জাত জন্ম কি আছে দাদা-ঠাকুর? কথায় বলে জাত হারালেই বৈষ্ণব হয়, আমিও ত তাই। আমার সমাজ নেই, জাত নেই, জন্ম নেই। আমি এসবের বাইরে প'ড়ে আছি, আপনারা দয়া ক'রে সুচোখে দেখেন এই ঢের। আমি আপনাদের কোনো কাজেই ত আসিনে দাদাঠাকুর, ছেলেটি আমার কাছে থাকলেও আপনাদের কোনো কিছুর মধ্যেই যাবে না। আপনাদের পাঁচ জনের অনুগ্রহ থাকলে আমার এই খড়ের ঘরে বাস ক'রে আপনাদের পাঁচজনের দুয়ারে ভিক্ষে ক'রে ওর সারাজীবনটা কাটিয়ে দেবে। অনেক হাড়ি বাগ্‌দীও তো আছে দাদাঠাকুর, যারা আপনাদের ঘরে-দুয়ারে উঠতে না পেলেও আপনাদের দয়া হ'তে বঞ্চিত হয় না, এ-কেও না হয় তেম্‌নি চোখে দেখবেন।"

রতনদাসের এই অনুনয়ে সকলেরই মন ভিজিয়া গেল, অনেকেই বিশেষ করুণার চোখে ছেলেটির পানে চাহিল।

ছেলেটি এখানেই রহিয়া গেল।

রতনদাস যেন বাঁচিয়া গেল। তাহার অনেক কাজ এই ছেলেটি চালাইয়া দিত, যথা—উনানে কাঠ দেওয়া, একঘটি জল গড়াইয়া দেওয়া, কাপড় তোলা ইত্যাদি। অবশ্য, কাজ যে খুবই বেশী তাহা নয়, তথাপি নিমাইয়ের দ্বারা এই সামান্য উপকার পাইয়া রতনদাসের মনে হইত, সে বাঁচিয়া গিয়াছে।

রতনদাসের সংসারে কেহই ছিল না। যৌবনে তাহার সবই ছিল, অবস্থাও বেশ ভালো ছিল, আজিকার মতন ভিক্ষা করিয়া তাহাকে খাইতে হইত না। দু'টি পুত্র-কন্যা তাহার এই পর্ণকুটীর একদিন আলো করিয়াছিল, তাহাদের পানে চাহিয়া একদিন রতনদাসও আশা করিয়াছিল, সে সুখের সংসার পাতাইয়া এখানেই বাস করিবে, কিন্তু তাহার আশা ব্যর্থ করিয়া—তাহার সুখের সংসার দুঃখময় করিয়া একে-একে স্ত্রী, দু'টি পুত্র-কন্যা, সবাই চলিয়া গেল। তখন রতনদাসের বয়স মাত্র বত্রিশ বৎসর, অনেকে তাহাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসার বাঁধিতে উপদেশ দিল, কিন্তু রতনদাস রাজি হইল না। নূতন করিয়া আবার সংসার পাতাইতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না, সে সংসারে বাস করিয়াও অনাসক্ত রহিয়া গেল। হরিনামে সে উন্মত্ত হইয়া গেল, আর কোনো কষ্ট-দুঃখকে সহজে আমল দিল না। বৎসরের মধ্যে এগারো মাস সে ঘর ছাড়িয়া ভিক্ষা করিয়া দেশে-দেশে বেড়াইত, একমাস সে কোনো ক্রমে বাড়ীতে থাকিত।

নিমাইকে আনিয়া তাহার পায়ে সত্যই শৃঙ্খল পড়িল, সে আবার সংসারী হইয়া পড়িল।

দেড় মাস তাহাকে একাদিক্রমে বাড়ী থাকিতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কেহ বা মুখ ফুটিয়াই

জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই রতন, এখনও যে বাড়ী ছেড়ে বা'র হওনি ?"

রতনদাস একটু হাসিয়া তখনি গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "উপস্থিত কিছুদিন বা'র হবো না ব'লেই ভেবেছি দাদাঠাকুর, তা'র পর—ভগবানের যদি ইচ্ছে হয়। তিনি নিজেই নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবেন।"

বর্ষার আগে সে যখন পর্ণকুটীরের পার্শ্বে বহুকাল হইতে পতিত একখণ্ড জমিতে বেড়া দিয়া মাচা তুলিয়া নানাবিধ শাকসব্জি বুনিতে লাগিল, তখন রামনাথ চাটুর্য্যে পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে হাসিয়া বলিলেন, "কি হে বাবাজি, আবার যে গাছপালাও লাগিয়ে ফেল্‌লে।"

রতনদাস একটু হাসিয়া বলিল, "কি করি বলুন ? আবার একটি প্রাণীকে গলায় গেঁথে দিলেন, ফেল্‌তে পার্‌লুম না।

রামনাথ বাবু বলিলেন, "কিন্তু ফেল্‌লেই বোধ হয় ভাল হ'তো বাবাজি। তোমার বেঁচে সন্তোষ করাটা বড় আশ্চর্য্য ব'লেই মনে হয়। ত্রিশ বছর বৈরাগ্য নিয়ে থেকে আবার সংসারী হ'য়ে পড়্‌লে—তা আবার ভীষণ-রকম। যাই হোক, দেখো,—শেষকালটায় যেন রাজা ভরতের মতন না হয়!"

তিনি চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন আগে বৈশাখ মাসে গ্রামে কথকতা হইয়া গিয়াছিল, কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান এমনভাবে বলিয়াছিলেন যে, কেহই অশ্রু সাম্‌লাইতে পারে নাই। সে-সময়টায় রতনদাস গ্রামেই ছিল, সেও কথকতা শুনিয়াছিল। রাজা ভরতের দুর্দ্দশা শুনিয়া সেও চোখের জল সাম্‌লাইতে পারে নাই, সেদিনও সে ভগবানকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধন্যবাদ দিয়াছিল—ঠাকুর, তুমি বেশ করিয়াছ, আমার সকল বন্ধন খসাইয়া আমায় মুক্ত করিয়া দিয়াছ। সে সেদিনও প্রার্থনা করিয়াছিল যেন মায়ামোহে তাহাকে আর জড়াইয়া পড়িতে না হয়, সে যেন মুক্ত থাকিয়া ভগবানের নাম লইয়া দিন কাটাইয়া যাইতে পারে।

তাহার হাতের বীজ মাটিতে পড়িয়া গেল, সে শূন্য-নয়নে অসীম আকাশের পানে দৃষ্টি রাখিয়া আর্ত্তভাবে বলিয়া উঠিল, "একি কর্‌লে ঠাকুর, এমন ক'রে মায়ায় জড়ালে কেন ? আমি ত এ চাইনি প্রভু, কেন আমায় এ-কে দিলে ?"

বিছানায় গিয়া সে শুইয়া পড়িল।

উনানে ভাত হইতেছিল, নিমাই ভাতে জাল দিতেছিল। ভাত পুড়িয়া দুর্গন্ধে যখন চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল তখন তাহার জ্ঞান হইল, সে ঘরে আসিয়া দেখিল, রতনদাস শুইয়া পড়িয়া আছে।

তাহার কাছে যাইবামাত্র রতনদাস চেঁচাইয়া উঠিল, "যা এখান হ'তে, আমার কাছে আসিস্‌নে বল্‌ছি, দূর হ'য়ে যা।"

থতমত খাইয়া নিমাই দাঁড়াইয়া রহিল।

রতনদাসের মনে আজ সম্পূর্ণ নূতনভাবেই রাজা ভরতের উপাখ্যান জাগিয়া উঠিতেছিল। হায়রে, হতভাগা ভরত রাজ্য ছাড়িয়া স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া ভগবানের তপস্যা করিতে বনে গিয়াছিলেন, মায়াকে তিনি জোর করিয়া তাড়াইতে গেলেও তাড়াইতে পারেন নাই, তাই সামান্য একটা হরিণশিশুর মায়ায় তিনি জড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে স্বাধীন জীব, ইচ্ছামত কয়দিন রহিল, তাহার পর কোথায় উধাও হইয়া গেল। ভরতের আহার-নিদ্রা গেল, যাহার জন্য সব ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বনে গিয়াছিলেন, সেই ভগবানের আরাধনা গেল—কোথায় হরিণ, কোথায় হরিণ করিয়া বনে-বনে খুঁজিতে লাগিলেন। কত ঝোপ দেখিয়া হরিণ-ভ্রমে ছুটিলেন, কতবার আছাড় খাইলেন। তাহার পর তাঁহার মৃত্যুকাল, তিনি তখন কি চিন্তা করিতেছেন ? ভগবানের চিন্তা তাঁহার মনে ছিল না, সেই হরিণের চিন্তা তাঁহার মনে, তাঁহার চিরতরে নিমীলিত-প্রায় চক্ষু তখনও সেই হরিণকে দেখিবার জন্য ঘুরিতেছে। ইহার পর ভরত সেই হরিণ-জন্ম পাইলেন। এজন্মে জ্ঞান তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল, তাই তিনি দিন-রাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন।

কি সুন্দর এই উপাখ্যানটি, মায়াতে জীবকে যে কত কষ্ট দেয় তাহা যেন স্পষ্টই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অনাথ শিশুটিও সেই হরিণ শিশুর মতন রতনদাসের এতদিনকার আরাধিত মুক্তিপথ বন্ধ করিতে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। ভগবান্, রক্ষা করো, চিরপ্রার্থিত মুক্তি হইতে বঞ্চিত করিও না, তাহাকে পরিত্রাণ করো।

এই ছেলেটিকে কোথাও দিবার জন্ম রতনদাস ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

(২)

এই কয়মাসের মধ্যে নিমাই গ্রামের সব চিনিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেটি ভারি শান্তস্বভাবের ছিল, কথা-বার্ত্তাও তাহার বড় সুন্দর ছিল; সেইজন্য সে সকলেরই সুনজরে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাকে যতটা দূরে রাখা হইবে ভাবা হইয়াছিল, ততটা দূরে সে রহিল না; দিন-দিন যেন সে গ্রামের লোকের খুব কাছে আসিয়া পড়িল।

রতনদাস তাহাকে কোথাও বিদায় করিয়া দিবার জন্য যে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে একটুও জানিতে পারে নাই। রতনদাসের গম্ভীর মুখখানা দেখিয়া সে আর ততটা সাহস করিয়া তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই, সে রকম অসঙ্কোচে কথাও বলিতে পারে নাই। রতনদাস তাহাকে খাইতে দিত, সে-রকম জোর করিয়া আর ধরিয়া খাওয়াইত না। আগে নিজের কাছেই তাহাকে শোয়াইত, এখন একটু তফাতে তাহার বিছানা করিয়া দেয়। ছেলেমানুষ, রাত্রে একদিন ভয় পাইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল,—'বাবা', আমি তোমার কাছে আগেকার মতন শোবো।" রতনদাস খুব জোরে একটা ধমক্ দিয়া উঠিতেই সে ভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছিল।

আসল কথা—রতনদাস আর এই পরের ছেলের মায়ায় জড়াইবে না। ভগবান্ তাহাকে সংসারের নিয়মানুসারেই বাঁধন পরাইয়া দিয়াছিলেন, আবার একে-একে নিজের হাতেই সকল বাঁধন খসাইয়া দিয়াছেন, এখন স্বেচ্ছায় আর মায়ার বাঁধনে পড়িতে সে চায় না।

ছেলেটার পানে সমস্ত দিন আর সে চোখ তুলিয়াও চায় না। রাত্রে পৃথক্ বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে, রতনদাস এক ঘুম দিয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া তামাক খাইতে-খাইতে অন্যমনস্কভাবে তাহার পানে চাহিয়া ভাবে—বেচারাকে ওখানে শোওয়ানো উচিত নহে। ছেলেমানুষ,—ভয় পাইয়া রাত্রে উঠিয়া পড়ে, সে-সময়ে তাহার গায়ে হাত থাকিলে সে নিশ্চিন্তভাবে তাহার বুকের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। একদিন ধমক খাইয়া সে আর কাঁদিতে পারে না, ডাকিতে পারে না, ভয়ে-ভয়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে বালিশটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আহা, এরকম করাটা কি রতনদাসের উচিত হইতেছে? ও যে নেহাৎ ছেলেমানুষ—"

ভাবিতে-ভাবিতে চট্ করিয়া মনে জাগিয়া উঠে রাজা ভরতের কথা। না না, এ তফাতেই থাক, বুকের মধ্যে পরের ছেলেকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাজ নাই। এই যে সমস্ত ভালোবাসাটা দিয়া সে এই ছেলেটিকে ধরিবে, তাহার পর সে পরের ছেলে যখন চলিয়া যাইবে তখন তাহার উপায় কি হইবে? ভগবানের নাম করা যাইবে না, এই পরের ছেলেটার ভাবনায় সে সব ভুলিয়া যাইবে।

মনটা তাহার নিমিষে কঠিন হইয়া উঠিত, সে জোর করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া অন্যদিকে চাহিত, আলো নিভাইয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িত। জোর করিয়া ভগবানের নাম করিতে চাহিত—এ-বাঁধন দিয়ো না প্রভু!

হায় রে! এই নামের মধ্যে—প্রার্থনার মধ্যে মনে হইত বেচারা অদূরে বিছানার উপর একলাটি পড়িয়া আছে। এই অন্ধকারে ঘুম ভাঙিয়া গিয়া সে ভয়ে তাহাকে ডাকিত না।

খড়কড় করিয়া উঠিয়া সে আলো জ্বালিয়া দিত। বেচারা শিশুটিকে সব হইতে বঞ্চিত করিতে তাহার প্রাণে বড় ব্যথা বাজিত। সে ত সব রকমে তাহাকে দূরে রাখিয়াই চলিতেছে, একটা আলো—তা জ্বালাইয়া রাখিতে দোষ কি?

পরের গরু আসিয়া তাহার চোখের সামনে বাগানের বেড়া ভাঙিয়া ফেলিল, মাচার উপর লাউগাছ, কুমড়া-গাছ ফলেফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সম্মুখে সেই গাছগুলি খাইতে লাগিল; সে দেখিল, কিন্তু তাড়াইল না, নিমাই গরু তাড়াইয়া দিতে গেল,—রতনদাস বাঁশ লইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া গেল—"খাচ্ছে খাক্ না কেন, তোর তা'তে কি, কেন তুই গরু তাড়াতে যাবি?"

কেষ্ট বৈরাগী পাশ দিয়া যাইতে-যাইতে অমন সুন্দর

গাছগুলির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখে বলিল, "গাছগুলো এম্‌নি ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে পরের গরু দিয়ে খাওয়ালে দাদা, তবে এতটা কষ্ট ক'রে গাছ লাগালেই বা কেন ?"

বৃদ্ধ রাগ করিয়া উত্তর দিল, "লাগিয়েছিলুম ইচ্ছে ক'রে, এদের খাওয়াচ্ছিও ইচ্ছে করে, তা'তে কারও কোনো কথা বল্‌বার দর্‌কার দেখ্‌ছিনে।"

ছেলেটাকে কোথাও বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচা যায়। এ যেন তাহার পায়ের শিকল হইয়াছে। আর স্বেচ্ছামত কোথাও যাইবার জো নাই, নড়িতে-চড়িতে শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। এ যে ভারি মুস্কিল হইয়াছে, এ ভার সে নামায় কোথা !

ঠিক এম্‌নি-সময়ে একদিন নিমাই জ্বর করিয়া বসিল। দুপুরেই তাহার জ্বর আসিয়াছিল, ভয়ে সেকথা সে রতনদাস্‌কে জানাইতে পারে নাই। ক্রমাগতয়ে সে ধমক্ খাইয়া আসিতেছিল, অথচ সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতে-ছিল না, তাহার অপরাধ কোন্‌খানে, কেন সে তিরস্কার লাভ করে। সে ছোটো শিশু হইলেও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল রতন দাস তাহাকে দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, সেও সেইজন্য সেও খুব দূরে-দূরে ছিল।

সন্ধ্যা-বেলায় রতনদাস এক হুঙ্কার দিল, "নিমাই, ভাত খাবি যদি—আয়।"

নিমাই বারাণ্ডায় একটা কোণ নির্ব্বাচন করিয়া বসিয়া কাঁপিতেছিল, সে উত্তর দিল, "আজ ভাত খাবো না, বাবা।"

রতনদাস আর কথা বলিল না, নিজে ভাত খাইয়া লইল। একবার বলাটা কর্ত্তব্য, যেহেতু ভগবানের জীব, নারায়ণ উহার মধ্যেও আছেন; তাই বলিয়া সে কি নিমাইয়ের হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া আনিয়া ভাত খাওয়াইতে বসাইবে, তাহাতে মায়াকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে মাত্র।

অদূরে নিমাইয়ের বিছানা করিয়া দিয়া সে তামাক টানিতে বসিল। নিমাই আজ পরনের কাপড়খানা দিয়া গা ঢাকিয়া অত্যন্ত জড়সড়ভাবে শুইয়া পড়িল ও তখনি ঘুমাইয়া পড়িল।

রতনদাস তামাক খাইতে-খাইতে তাহার পানে চাহিতেছিল। তাই ত—আজ নিমাই এ রকম করিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া শুইয়াছে কেন ? এই গরমে রতন-দাসের গা দিয়া ঘাম পড়িতেছে, নিমাইয়ের কি গরম লাগিতেছে না ?

কি আপদ ! উহার যা হয় তাই হোক না কেন ; শীতই বোধ হোক অথবা গরমই বোধ হোক, তাহাতে রতন-দাসের কি ? উহার কথা ভাবাও যে মহা পাপ। নাঃ, ভগবানকে ভাবা যাক, মুক্তির প্রার্থনা করা যাক্।

রতনদাস মালা জপ করিতে বসিল।

নিমাই জ্বরের তাড়নায় বকিতেছিল ; ক্রমে প্রবল শীতের জন্য সে দুই হাঁটু বুকের মধ্যে লইয়া গিয়াছিল। মালা জপ করিতে-করিতে রতনদাস একান্ত উদাসভাবে তাহার পানে তাকাইল। দুর্ভাগ্য, যে, উদাসীনতা বেশীক্ষণ রহিল না।

আচ্ছা, নিমাই আজ ভুল বকিতেছে কেন, এত শীতই বা কেন ? তবে কি উহার অসুখ করিয়াছে ? হাঁ, তাহাও ত বিচিত্র নয়। যে দুরন্ত ছেলে, বারণ করিলে যদি কথা শোনে। আজ কয় মাসই যেন রতনদাস তাহার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছে, তার আগে ত দিনে না হোক পঞ্চাশবার তাহাকে বারণ করিয়াছে, বেশীক্ষণ যেন জলে না থাকে, বৃষ্টিতে যেন না ভেজে, তেঁতুল, আম্‌ড়া প্রভৃতিগুলা যেন না খায়। ভয় ত দেখাইয়া দিয়াছিল, একবছর সে এখানে আসিলেও যদি একবার জ্বর হয়, তাহা হইলেই ম্যালেরিয়া ধরিবে—তখন সারানো মুস্কিল হইবে। আজ-কাল যেন রতনদাস নেহাৎ মায়া কাটাইবার জন্যই কোনো কথা বলে না, তাহা হইলেও ত তাহার আগেকার উপদেশগুলা মনে রাখা উচিত। বয়সও ত হইল, ছয় বছর যার বয়স হইয়াছে, তাহার অনেকটা ভালোমন্দ জ্ঞান থাকা উচিত। সে কি বুঝিতেছে না, নেহাৎ মায়া কাটাইবার জন্যই রতনদাস একটু তফাতে রহিয়াছে, তাই তাহাকে হাতে করিয়া ভাত খাওয়ায় না, বুকের মধ্যে লইয়া শোয় না।

রতনদাস মালা ফেলিয়া উঠিল, আস্তে-আস্তে গায়ের কাপড়খানা সরাইয়া নিমাইয়ের গায়ে হাত দিল, উঃ, গা



চিত্রকর শ্রী বিপিনচন্দ্র দে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

যে ভারি গরম। কখন জর আসিয়াছে তাই বা কে জানে? দুপুর হইতে আজ সে বাইরেই ছিল, সেই সময়ে নিশ্চয় জর আসিয়াছে।

নাঃ, ছেলেটা ভারি ভাবাইয়া তুলিল। এখন এই জর অবস্থায় ইহাকে একা বিছানায় ফেলিয়া রাখা চলে কি? ভালো অবস্থায় রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেলেও চলে, অসুখ অবস্থায় ঘুম ভাঙিয়া যদি ভয় পায়—জর যে ছাড়িবে না। আহা, হয়ত জরের তাড়নায় কত কাঁপিয়াছে, যন্ত্রণায় গোপনে চোখের জল ফেলিয়াছে, মুখ ফুটিয়া তবু তাহাকে তো বলিতে পারে নাই।

রতনদাসের হৃদয়টা বেদনায় টন্ টন্ করিতেছিল। ছেলেটি যে পরের, দু'দিন বাদে—হরিণ-শিশু যেমন করিয়া রাজা ভরতকে ফেলিয়া পলাইয়াছিল—তেমনি করিয়া পলাইবে, তাহা সে ভাবিতে একেবারেই ভুলিয়া গেল। উপরে বাঁশের উপর লেপখানা দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা ছিল, রতনদাস ছোটো টুলখানা টানিয়া আনিয়া তাহার উপর উঠিয়া একঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমে লেপ পাড়িল, সেখানা আস্তে-আস্তে রতনের গায়ের উপর চাপা দিয়া নিজের বিছানা টানিয়া কাছে আনিল।

সমস্ত রাতটাই যে বিনিদ্র দুটি চোখ তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, একখানি হাত বড় স্নেহে তাহাকে জড়াইয়া বুকের মধ্যে রাখিয়াছিল, তাহা নিতাই মোটেই জানিতেই পারে নাই। সকালবেলা ঘুম ভাঙিতেই সহজ জ্ঞান পাইয়া সে দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল, তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া রতনদাস তখনও ঘুমাইতেছে। নিজের গায়ে লেপ দেখিয়া সে সবই বেশ বুঝিতে পারিল। অভিমানে শিশুর হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, সে বৃদ্ধের বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া কোনোরকমে কান্নাটাকে চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

নিমাই ভালো হইবামাত্র রতনদাসের হারানো অশান্তিটা আবার ঘুরিয়া আসিল, অনুতাপে তাহার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইয়া উঠিল। হায়রে! সব ছাড়িয়াও আবার যে জড়াইয়া পড়িতে হয়। সব-রকমেই সে মায়াকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সে জব্দ হয় কই? আরও যে তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে। এরূপে কি তাহার ভগবানের সাধনা করা হইবে? সব ব্যর্থ হইয়া গেল! তাহার এতদিনের সাধনা, ভজনা, মালা-জপ,—এই শিশুটা সব নষ্ট করিয়া দিল!

রতনদাস দুইহাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। না, ইহাকে কাছ ছাড়া করা চাই-ই, নহিলে সে ঠিক্ আবার তাহাকে মায়াতে বাঁধিবে, তাহার মুক্তি কিছুতেই হইবে না।

কোথায় দেওয়া যায়?

ভাবিতে-ভাবিতে মনে পড়িয়া গেল, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মোহান্ত স্বরূপদাসের আখ্ড়ার কথা। তাহার সম্পর্কীয়া এক ভগিনী এই আখ্ড়ায় থাকে। তাহার কাছে ছেলেটিকে দিলে খুব সম্ভব সে রাখিবে। অবশ্য কিছু টাকা দেওয়া চাই, নহিলে তাহারা ছেলেটিকে হয়ত রাখিবে না, নানা আপত্তি জানাইবে। টাকা পাইলে তাহারা একটি কথাও বলিবে না, নিশ্চয়ই রাখিবে।

পরদিন আহার করিয়া নিমাইকে খাওয়াইয়া তাহাকে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে বলিয়া সে বাহির হইল।

প্রথমটায় ভগিনী এতটুকু ছেলে লইতে আপত্তি করিল, কিন্তু রতনদাস যখন টাকার কথা বলিল, তখন তাহার সে আপত্তি আর রহিল না, সে সহজেই রাজি হইয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিল, "কবে তা'কে পাঠাবে, দাদা?"

দাদা গম্ভীরমুখে বলিল, "একদিন দিয়ে যাব।"

ভগিনীর উপস্থিত কিছু টাকার দরকার ছিল, কারণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াও সে বেশ একটি ছোটোখাটো সংসার পাতাইয়া বসিয়াছিল; একটি গরু আনিয়াছিল, তাহার সব টাকা দেওয়া হয় নাই।

সে বলিল, "তবে কাল সকালেই ছেলেটিকে পৌঁছে দিয়ে যেয়ো দাদা, এখানে এসেই দু'জনে খেয়ো, সেখানে রান্না ক'রে খেয়ে আস্তে বড় বেলা হ'য়ে যাবে। আমি কিন্তু সকাল-সকাল এখানে রান্না ক'রে রাখ্‌ব, সকাল-সকাল আসা চাই।"

"কালই সকালে"—হৃদয়টা কে যেন কঠিন হাতে চাপিয়া মুচ্‌ড়াইয়া ধরিল। কালই সকালে, কেন দুই দিন

বাদে আসিলে ভালো হয় না কি ? তাহাকে বিদায় করিতে হইবে বলিয়া কি এতই শীঘ্র বিদায় করা চাই ?

না না, আর কেন, তাহাকে রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা। ভগবান্ দিয়াছিলেন তিনিই আবার খসাইয়া লইতেছেন। তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন, দেখিতেছিলেন ভক্ত যথার্থই তাঁহাকে লয় কি না। রতনদাস ভগবানের সে পরীক্ষায় জয়ী হইয়াছে, সংসারের কাছে সে ধরা পড়ে নাই, সে জড়াইয়া পড়ে নাই।

মনে অবশ্যই একটু গর্ব্ব যে না হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। যতটা ব্যথা জাগিতেছিল ঠিক ততখানিই আনন্দ হইয়াছিল, এই বেদনাভরা আনন্দ বহন করিয়া রতনদাস ফিরিল।

রাত্রে নিমাই ঘুমাইলে সে বাক্স—দেয়ালের ফোঁকর খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার সর্ব্বস্ব বাহির করিল। নগদ ত্রিশ টাকা কয়েক আনা পয়সা আর পরলোকগত ছেলের হাতের একগাছি সোনার তাগামাত্র তাহার সম্বল, আর কিছুই নাই।

আলোর সম্মুখে এইগুলি রাখিয়া তামাক টানিতে-টানিতে সে ভাবিতেছিল। তাগাটির পানে চাহিবামাত্র—ভুলিয়া-যাওয়া-সেই-বহুদিনকার-অতীতের-কথাগুলা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। যে ছেলেটি মারা গিয়াছে, সে নিমাইয়ের চেয়ে চার বছরের বড় ছিল। দশ বৎসর হইলেও সে নিমাইয়ের সমানই ছিল, ছোটো বেলায় অসুখে ভোগার জন্য ছেলেটি বেশী বাড়িতে পায় নাই।

আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়া যাইত, তাহার ছেলেমেয়েতে ঘর ভরিয়া যাইত। হায় রে, তাহারা আজ সব কোথায়, কোন্ দেশে— ?

সে অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল, করিতেছে কি, সে কি ভাবিতেছে ? তাহাদের কথা ভাবিবে না বলিয়াই না সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ? তবু তাহাদের কথাই আবার ভাবিতেছে ! নাঃ, এই হতভাগাটাকে বিদায় না করিলে কিছুতেই চলিবে না, ইহারই জন্য সেসব অতীতের কথা মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিতেছে।

তাগা ও টাকাগুলি বিছানার তলায় রাখিয়া দিয়া রতনদাস শুইয়া পড়িল। টাকা ত ঠিকই রহিল, সকাল বেলা নিমাইয়ের কাপড় জামা কয়খানা গুছাইয়া লইতে আর দেরি হইবে না।

নিমাই একটু বেলায় যখন ঘুম হইতে উঠিল, তখন রতনদাসের সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। নিমাইয়ের খানতিন-চার কাপড়, জামা গেঞ্জি সবই বোঁচ্‌কা-আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিয়া তাগাটা হাতে লইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া সে কি ভাবিতেছিল।

আজ এই ত্রিশটি টাকা দিয়া আসিয়া কাল হইতে আবার তাহাকে প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তবে খাইতে হইবে, এমন একটি পয়সা থাকিবে না যাহা দিয়া সে তর-কারী কিনিবে। কিন্তু ইহার জন্য সে একটুও ভাবে নাই, সে ভাবিতেছিল নিমাই আজ চলিয়া যাইবে সেই কথা। যত সে আনন্দকে মনে টানিয়া আনিতে যাইতেছিল, ততই যেন বেদনায় তাহার হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিতেছিল।

নিমাইকে ডাকিবামাত্র সে কাছে আসিল। রতনদাস বোঁচকাটা হাতে তুলিয়া লইয়া—যদিও ঘরে কিছুই ছিল না, তথাপি শিকলটা তুলিয়া দিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে চল এখনি।"

কোথায় যাইতে হইবে নিমাই সে-কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, রতনদাসের গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া সে নীরবে তাহার পিছনে চলিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, বৈশাখের নিদারুণ রৌদ্রতাপে নিমাইয়ের কচি মুখখানা শুকাইয়া উঠিল। রতনদাস কয়বার তাহার মুখের পানে তাকাইল, গম্ভীর-মুখে বলিল, "হুঁ, চল, আর বেশী দূর নেই।"

আখ্‌ড়ায় যখন তাহারা গিয়া পৌঁছাইল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ভগিনী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিল।

আহারান্তে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া রতনদাস নিমাইকে ডাকিল। সে বাহিরে আমগাছের ছায়ায় বসিয়া শূন্যনয়নে চারিদিক্-পানে কেবল তাকাইতেছিল। রতন-দাসের ভগিনী কয়েকটি তাহার সমবয়স্ক শিশু আনিয়া দিয়াছে, নিমাই কিছুতেই তাহাদের সহিত মিশিতে পারিতেছিল না। কে জানে কেন—কোন্ এক অজ্ঞাত

ভয়ে তাহার বুকটা কাঁপিতেছিল, থাকিয়া-থাকিয়া চোখে কেবল জল আসিতেছিল। দুই করতলে চোখের জল মুছিতে-মুছিতে সে ভাবিতেছিল—বাবা তাহাকে আনিয়া ফেলিল কোথায়? সে যে এখন বাড়ী যাইতে পারিলে বাঁচে!

রতনদাস ভগিনীকে ত্রিশটাকা মিটাইয়া দিতেছিল, ভগিনীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না। সে প্রথমটায় ভাবিয়াছিল, রতনদাস তাহাকে গুটিদুই-চার টাকা দিয়া যাইবে, ত্রিশটি—আন্‌কোরা ঝক্‌মকে টাকা পাইয়া তাহার আনন্দের শেষ রহিল না।

নিমাই আসিলে রতনদাস অতি সন্তর্পণে চাদরের খুঁট হইতে সেই তাগাটি বাহির করিয়া তাহার দক্ষিণ বাহুতে পরাইয়া দিল। এ সোনার তাগা পাওয়ার কারণ নিমাই কিছুই বুঝিতে পারিল না। শুধু ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

তাহার হাতখানা নিজের কোলে টানিয়া আনিয়া বিদায় মুহূর্ত্তে রতনদাস আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "খুব ভালো হ'য়ে চল্‌বি নিমাই, বাবাজি যখন যা ফর্‌মাস করবেন তা শুনিস্‌, তোর পিসি যা বল্‌বে তাই কর্‌বি, অবাধ্য যেন হোসনে।"

নিমাই তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সত্যই কাঁদিয়া উঠিল, তাহার চাদরের কোণ চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত-ভাবে কাঁদিয়া বলিল, "আমি এখানে থাক্‌ব না বাবা, আমি যাবো—"

রতনদাস মিষ্টস্বরে তাহাকে ভুলাইয়া গেল, সে ভুলিল না, আরও বেশী কাঁদিয়া বলিল, "আমি তোমার কাছে যাবো বাবা, আমায় এখানে রেখে যেয়ো না, তা হ'লে—

রতনদাস ধমক্‌ দিয়া উঠিল, মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "থাক্‌ থাক্‌, আমার সর্ব্বস্ব না খেয়ে তোর শান্তি হবে কেন? মায়াবী রাক্ষসের দল, কেবল আমায় সব-রকমে মার্‌বার চেষ্টা তোদের!"

ধমক্‌ খাইয়া নিমাইয়ের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে চাদর ছাড়িয়া দিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, চোখের জল পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল।

রতনদাস আর তাহার পানে তাকাইল না, অত্যন্ত রাগ করিয়াই—হরিবোল—হরিবোল—বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া পড়িল।

(৪)

পথে আসিতে-আসিতেই তাহার মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল, কতবার নিমাইয়ের সেই বিবর্ণ মুখখানার কথা ভাবিয়া সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, মনে ভাবিল ফিরিয়া যাই, নিমাইকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া রাখিয়া না হয় কাল ফেরা যাইবে। মাত্র দুই ঘণ্টা সে সেখানে গিয়াছে, কাহারও সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই, সেখানে সে থাকিবে কি করিয়া? একটা দিন থাকিয়া তাহাকে সব চিনাইয়া দিয়া তাহাকে বুঝাইয়া রাখিয়া আসা তাহার খুবই উচিত ছিল।

দুই পা আখড়ার দিকে ফিরিয়া সে থামিল। আবার—আবার সে যাইতেছে, আবার সেই মায়ার বাঁধনে জড়াইয়া পড়িবে? একটু কাঁদিয়া নিজেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, সকলের সহিত হরির ইচ্ছায় নিজেই পরিচয় করিয়া লইবে। না, আর সে ফিরিবে না, আর সে তাহার কাছে যাইবে না। রতনদাস আবার বাড়ীর দিকে ফিরিল।

হায় রে! শূন্য বাড়ী কাঁদিতেছে। শিশুর অশান্ত চরণ-ক্ষেপণে সে উঠান ত গুঞ্জরিয়া উঠে না, সে যেন আজ একেবারেই মরিয়া গিয়াছে। আজ কিছুর মধ্যেই জীবনের সাড়া যেন নাই। রতনদাস চুপ করিয়া বারাণ্ডার একধারে বসিয়া রহিল।

কৃষ্ণ বৈরাগী সম্মুখের পথ দিয়া যাইতে-যাইতে বুড়াকে চুপচাপ বসিয়া ভাবিতে দেখিয়া বলিল, "কি দাদা, আজ যে বড় সব চুপচাপ।"

শুষ্ক হাসিয়া রতনদাস ডাকিল, "এস নাতি, একটু গল্প করা যাক্‌, একলা ঘরে টিঁক্‌তে প্রাণ আর চাচ্ছে না।"

কৃষ্ণ তাহার পাশে বসিয়া তামাক সাজিতে-সাজিতে বলিল, "তোমার পুষ্যিপুত্তুরটি কোথা গেল দাদা?"

রতনদাস বলিল, তা'কে আমার বোনের কাছে স্বরূপদাস বাবাজির আখ্‌ড়ায় দিয়ে এলুম। অনেক ভেবে দেখ্‌লুম, তোমাদের কথাই ঠিক, আমার কি ওসব পোষায় দাদা? সংসার ভগবান্‌ দিয়েও কেড়ে নিয়েছেন, আবার সাধ ক'রে পরের একটা ছেলে কুড়িয়ে এনে সংসার

পাতি কেন? ওসব ঝক্কি মাথায় নেওয়া ভারি দায়, নইলে আর কি? ভগবান্ যদি দিতেন, তবে আমার ঘর আজ কি খালি হ'ত? এ একটা পরীক্ষা—অর্থাৎ—সব দিয়ে কেড়ে নিয়ে আমায় বৈরাগী ক'রে রেখেও এই একটা ছেলে দিয়ে দেখ্‌ছিলেন আমি আবার জড়িয়ে পড়ি কি না। আমি সে চালাকিটুকু যদি ধর্‌তেই না পার্‌ব, তবে এতদিন ধ'রে তাঁর সঙ্গে কার্‌বারই বা কর্‌ছি কেন? দেড় বছর রাখ্‌লুম অসহ্য, বোধ হ'ল—ফেলে দিয়ে এলুম। যাক্, এবার নিশ্চিন্ত হয়েছি, আর কখনও কোনো জীবকে দয়া দেখাতে গিয়ে ঠকুব না।"

কৃষ্ণ কল্‌কেটা তাহার হাতে দিতে-দিতে বলিল, "ওইটুকুই বুঝো দাদা, ওই বুঝ্‌বার জ্ঞানটুকু থাক্‌লে কখ্‌খনো তোমায় কষ্ট পেতে হবে না, ভগবান তোমার দিন একরকম করে চালিয়ে দেবেনই।"

রতনদাস দম ভরিয়া তামাক টানিয়া কল্‌কে কৃষ্ণের হাতে ফিরাইয়া দিল, অন্যদিন সে সব তামাকটুকু নিঃশেষ না করিয়া কল্‌কে ছাড়িত না, কিন্তু আজ কি জানি কেন,—তামাকটা তাহার কাছে বড়ই বিশ্রী ঠেকিতেছিল।

সে বলিল, যা বলেছ দাদা। ছোঁড়াটা আসার সময় বড় কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, আমার চাদরের এইখানাটা চেপে ধরেছিল—, বলিতে-বলিতে চাদরের যে অংশটা নিমাই চাপয়া ধরিয়াছিল সেই দিক্‌টা একবার দেখাইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিল; আবার বলিল, "তা—আমি কি তাহাতে ভুলি? একধমকে তা'কে একেবারে চুপ করিয়ে দিলুম, ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মুখের পানে চেয়ে রইল, তবু আর একটি কথা বল্‌বার সাধ্যি রইল না!"

কৃষ্ণ এ-বর্ণনাতে যথার্থই একটু ব্যথা পাইল, বলিল, অমন ক'রে তাড়া দিয়ে চ'লে আসাটা তোমার কিন্তু উচিত হয়নি, দাদা। ছেলেমানুষ, তোমাকেই চেনে-জানে, তা'কে—"

ঠিক এই কথাটা রতনদাসের হৃদয়ের মধ্যে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল; সে সেই কথা বাহিরেও শুনিল, অস্থির হইয়া বলিল, "এ-রকম না কর্‌লে সে থাক্‌ত কখনও সেখানে? ঠিক আমার পিছনে-পিছনে, চ'লে আস্‌ত। এই ঘরটাতে তা'র যে কি মধু মাখানো আছে তা জানিনে, এ ঘর ছেড়ে সে কোথাও যেতে চাইত না।"

ঘরের পানে তাকাইয়া বৃদ্ধ একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু সে সজোরনিঃশ্বাসে হৃদয়ের ব্যথা কমিল না, আরও যেন জমাট বাঁধিয়া আসিল।

দিনটা তবু এখানে ওখানে সেখানে করিয়া কাটাইয়া আসিতে পারা যায়, সুদীর্ঘ রাত কাটে কই? বুড়া তামাক সাজিতে বসে, বার-বার তাহার দৃষ্টি পড়ে গিয়া সেই-খানটিতে যেখানে সে শুইয়া থাকিত। হায় রে, কোথায় কার কাছে সে আজ শুইয়া পড়িয়া আছে। বড় অভিমানী যে সে, রাত্রে ভয় পাইয়া ঘুম ভাঙিয়া গেলে সে বিছানায় মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিবে, তবু কাহাকেও ডাকিবে না।

রাঁধিতে বসিয়া মনটা এমন তিক্তবিরক্তিতে ভরিয়া উঠে যে, তাহার আর রাঁধিতে ইচ্ছা হয় না। তা'তে জাল হয়ত নিভিয়া গিয়াছে, উঠি-উঠি করিয়াও সে আর উঠিতে পারে না, কিন্তু উনানের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোনো একখানা তরকারী রাঁধিতে গেলে মনে হয়, কে খাইবে।

নাঃ, এমন করিয়াও দিন কাটানো যায় না। রতন-দাস ভাবিয়াছিল, তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই সব ভাবনা চুকিয়া যাইবে, কিন্তু ভাবনা চুকিয়া যাওয়া দূরে থাক্, এ-যেন বিশ্বের ভাবনা আসিয়া তাহার মাথায় চাপিয়া বসিয়াছে।

বিরক্ত রতনদাস আবার দেশভ্রমণে বাহির হইবে, স্থির করিল। এই তাহার শেষ যাত্রা, আর কিছুতেই সে এ-জীবনে দেশে ফিরিবে না।

খড়ম-জোড়া, আর থেলো হুঁকা, মালা, দু'খানা ময়লা ছেঁড়া কাপড় সে তাহার ভিক্ষার ঝুলির মধ্যে একদিন ভরিয়া লইল। বিদেশ-যাত্রা করিতে হইতেছে, আর সে আসিবে না।

জন্মের শোধ গ্রামটাকে একবার দেখিয়া লইয়া সে যখন ঘরে ফিরিল, তখন দেখিতে পাইল একটি অর্দ্ধ-উলঙ্গ শিশু তাহার বারাণ্ডায় মাটিতে মুখখানা গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

এ কে ?—বিস্ময়ে রতনদাসের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখিল, নিমাই-ই বটে। দুঃখ, মমতা, বিস্ময় মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল, রাগ আসিয়া সেস্থানে দাঁড়াইল। আবার কি বিপত্তি ? কাল দুপুরে সে চলিয়া যাইবে, আজ বৈকালে আপদ্ আসিয়া জুটিল কোথা হইতে ? আজ নয় দশ দিন মাত্র সে গিয়াছে, ইহার মধ্যে—

রাগে রতনদাস ছুটিয়া গিয়া তাহাকে এক ধাক্কা দিল, রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুই আবার এসেছিস্ যে ছোঁড়া, কে তোকে রেখে গেল ?"

অতি কষ্টে সে উঠিয়া বসিল। তাহার গা তখন জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে, মুখখানা সিঁদুরের মতন লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে মোটে চাহিতে পারিতেছে না, কথা কহিতে পারিতেছে না। জড়িতকণ্ঠে সে বলিল, কেউ দিয়ে যায়নি বাবা, আমি পালিয়ে এসেছি। আমায় তা'রা বড্ড মারে, এই দেখ আমার গায়ে মারের কত দাগ রয়েছে! বড্ড জ্বর হয়েছে, তবু বল্ছে গরু নিয়ে মাঠে যেতে, আমি তাই পালিয়েছি।"

"তাই পালিয়েছ"—রতনদাস বিকট মুখভঙ্গী করিয়া উঠিল, "তাই আমায় চরিতার্থ ক'রে দিতে এসেছ ? পাজি বদমায়েস ছেলে, বসিয়ে তোকে ভাত খাওয়াবে কে রে ? দূর হ, দূর হ, এখান আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা।"

নিমাই তেম্‌নিই পড়িয়া রহিল, রাগের প্রাবল্যে রতনদাস তিন ছিলিম তামাকই খাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার সময় নিমাইয়ের অন্বেষণে ভগিনী আসিল। নিমাইকে সে নাকি বড় ভালোবাসে, এমন হতভাগা ছেলে যে তবু সেখানে থাকিতে চায় না। মাঠে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় গরুটিকে ছাড়িয়া দিয়া সে এখানে চলিয়া আসিছে। গরু নিরাপদে বাড়ী গিয়া পৌছিয়াছে, তাহার খোঁজে ভগিনীকে এই আড়াই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এখানে আসিতে হইয়াছে। আজই তাহার ফিরিয়া যাওয়া চাই, কেন-না গরু-বাছুর আছে, থাকিলে চলিবে না। নিমাই যদি না যায়, তবে দাদার কাছেই থাক, সে যেমন আসিয়াছে, তেম্‌নিই যাইবে।

অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রতনদাস বলিল, "না না, নিমাই থাক্‌লে আমার চলবে না। আমি কাল দুপুরে মথুরায় যাবো ঠিক করেছি, ও মায়ার বাঁধনে জড়াবো না ব'লেই ত ওকে তোর কাছে দিয়েছি। সামান্য একটু জ্বর হয়েছে বই ত না, এতখানি থাক্‌তে পেরে থাকে যদি, অনায়াসে যেতে পারবে।"

নিমাইকে উঠাইয়া সে তাহার আদেশ জারি করিল, এখনি এই মুহূর্ত্তে তাহার চলিয়া-যাওয়া চাই-ই, রতনদাস আর তাহার ফাঁদে কিছুতেই পা দিবে না, অতএব তাহার এখানে আসাই অন্যায় হইয়াছে।

নিমাই শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পা ও সমস্ত দেহ তাহার জ্বরের প্রাবল্যে থর-থর কাঁপিতেছিল, ঠোঁট দিয়া একটা আর্ত্ত স্বর বাহির হইতে চাহিতেছিল, সে জোর করিয়া ঠোঁট চাপিয়া রহিল।

তাহারা সেই সন্ধ্যাবেলায় চলিয়া গেল। আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তামাক সাজিতে-সাজিতে রতনদাস বলিল "যাক্ আপদ্ গেল, বাঁচা গেল"।

পরদিন রতনদাস চলিয়া যাইবার আয়োজনে মহাব্যস্ত, তাড়াতাড়িতে ভাতই খাইতে পারিল না।

দলে-দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে, সে এই চিরবিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া সকলেই দেখাশুনা করিতে আসিতেছে।

রতনদাস দরজার শিকল তুলিয়া দিতেছিল, উঠান হইতে শশী পোদ্দার হাঁকিল,—"বাবাজি, চল্‌ছ নাকি ?"

ফিরিয়া একটু হাসিয়া রতনদাস বলিল, "কেমন ক'রে বল্‌ব পোদ্দারের পো, যতক্ষণ না ট্রেনে উঠ্‌ব ততক্ষণ বিশ্বাস নেই।"

শশী পোদ্দার বলিল, "স্বরূপদাস বাবাজির আখড়ার ব্যাপারটা জানো, বাবাজি ? শুনলুম ছেলেটি নাকি তোমার কাছেই এসেছিল, তুমি বুঝি তা'কে আবার ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলে ?"

রতনদাস বিবর্ণ হইয়া গিয়া বলিল, "হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।"

শশী পোদ্দার শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "আহা, ততটা জ্বর গায়ে এই আড়াই-তিন ক্রোশ পথ হেঁটে সাত বছরের

পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় তোমারই কাছে পালিয়ে এসেছিল, তুমি সব জেনে-শুনে সেই জ্বর-গায়ে আবার এতটা পথ হাঁটিয়ে তা'কে পাঠিয়ে দিলে বাবাজি? সে কি কম অত্যাচারটা সচ্ছিল সেখানে? শুনলুম তিনদিন ধ'রে তা'র জ্বর হচ্ছিল, তা'র ওপর অতটা মার খেয়েছে কাজ করতে পারেনি ব'লে, তুমি আবার তা'কে কোন্ প্রাণে সেখানে পাঠিয়ে দিলে, তা'র মরবার জন্যেই নাকি?"

আর্ত্তভাবে চেঁচাইয়া উঠিয়া রতনদাস তাহার হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল—"কি—কি বললে পোদ্দারের পো?"

পোদ্দার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এখান হ'তে ফি'রে গিয়েই ছেলে সেই যে শুয়ে পড়ল, আর উঠল না। এক ঘণ্টার মধ্যে তা'র সব শেষ হ'য়ে গেল। আমি কাল আখড়ায় ছিলুম; ছেলেটা যাওয়ার সময় চীৎকার করছিল—"ও বাবা, বাবা গো, আমি তোমার কাছে থাকব, আমায় কোথাও পাঠিয়ো না", শুনতে-শুনতে আমার চোখের জলে বুক ভেসে গেল, তুমি যত ধর্ম্মই করো না বাবাজি, এই জীবহত্যার মহাপাপ তোমারই—আর কারও নয়; তোমার সব ধর্ম্ম-কর্ম্ম পণ্ড হ'য়ে গেল।"

আড়ষ্ট রতনদাস বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে বজ্রের স্বরে কে যেন গর্জ্জিয়া বলিতেছিল, তুই-ই তাহাকে মারিয়া ফেলিলি মহাপাতকী!

আহা, বাছা রে, সে যে তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছিল। মনে পড়িতে লাগিল নিমাইয়ের কথা, নিজের ব্যবহার; মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন নিমাই চলিয়া যায়, তখন তাহার মুখখানা কিরূপ হইয়া গিয়াছিল।

সুদূর আকাশের কোনোখানে দৃষ্টি রাখিয়া রতনদাস বসিয়া রহিল। যে ট্রেনে সে যাইত, একটার সময় সেখানা চলিয়া গেল, সে উঠিতে পারিল না, নড়িতে পারিল না।

নিমাই—নিমাই রে!

বৃদ্ধ শেষ বেলায় মাটিতে আছড়াইয়া পড়িল—তোমার জিত ভগবান্, পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, কাঁচাগুটি লইয়া খেলিতে বসিয়া তাহার হার হইয়া গিয়াছে, মায়ার বাঁধন পরিব না ভাবিয়া মায়ার বাঁধন পরিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলে না কেন প্রভু, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে সে সংসারে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইত কি না।

রতনদাস ললাটে করাঘাত করিয়া ভাঙাস্বরে চেঁচাইয়া উঠিল, "তুই কি রাগ ক'রে চ'লে গেলি, নিমাই? ওরে, আমি আর তোকে তফাতে রাখব না, তোকে বুকের মধ্যে রাখ্ব! আয় রে, একবার ফি'রে আয়রে নিমাই—"

জমালগঢ়ীর গান্ধার ভাস্কর্য্য

শ্রী প্রভাত সান্যাল

খৃষ্টীয় ও খৃষ্ট-জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে আফ্‌গানিস্থান, ব্যাক্‌ট্রিয়া ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে যে-ধরণের গ্রীক্ মূর্ত্তি-শিল্প প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল মহাবীর আলেকজান্দারের প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীগণ ভারতবর্ষে তাহার কতকগুলি স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রসারে গ্রীক্‌দিগের দান বোধ হয় অতি অল্পই ছিল, সেই কারণে সে দানের স্মৃতি এখন লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রীক্ ঔপনিবেশিকগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে যে-সকল অনপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পরবর্ত্তী গ্রীক্‌গণ ভারতবর্ষে শুধু বিজেতারূপেই আসেন

কখনও সে...

নাই। তাঁহারা ঔপনিবেশিকভাবেও বাস করিয়া গিয়াছেন।

গ্রীক্‌দিগের শিলা শিল্প ভারতীয় অনেকস্থানের শিলা-শিল্প হইতে বিশেষরূপ পৃথক্‌। গ্রীসীয়গণ, প্রথমে গৌণভাবে পারস্যদেশীয় চিত্র-শিল্পের সাহায্যে ও পরে আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শদ্বারা, ভারতীয় ভাস্কর্য্যের উন্নতিসাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। যদিও ভারতীয় শিল্পীগণ গ্রীসদেশের নিকট তাঁহাদের ঋণ বিস্মৃত হইয়াছেন, তথাপি উত্তর ভারতের গান্ধার ভাস্কর্য্যশিল্পের সহিত খাঁটি গ্রীক্‌-শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে গ্রীক্‌ বিজয়ের ও উপনিবেশ-স্থাপনের কথা প্রমাণ করাইয়া দেয়।

গ্রীক্‌গণ ভারতবর্ষে বিজেতারূপে আগমন করেন ও এ-দেশে যথাসম্ভব গ্রীস্‌দেশীয় আচার-ব্যবহার পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। সেলুকাস নিকেটরের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ও স্বাধীন পারস্যের অভ্যুত্থানের দরুন্‌ ব্যাকৃট্রিয়ার গ্রীক্‌গণ তাহাদের ইউফ্রেটিস্‌ উপত্যকা ও এশিয়া মাইনরের স্বজাতীয়গণের ও প্রতিবেশীদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ইহার ফলে প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসী গ্রীক্‌গণ পরবর্ত্তী গ্রীসদেশীয় ও রোমকদেশীয় ইতিহাসে ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ধীরে-ধীরে তাঁহারা ভারতীয় আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্মও গ্রহণ করিয়া এ-দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অন্তর্ব্বিবাহ দ্বারা তাঁহারা ক্রমে এদেশের অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া গেলেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কোটি-কোটি অধিবাসীর ভিতর, এই প্রবাসী গ্রীক্‌দের কোনো চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যাকৃট্রিয়ার ও আফ্‌গানিস্থানের গ্রীক্‌গণ এক নূতন-ধরণের ভারতীয় সভ্যতার অগ্রদূত ও প্রবর্ত্তক-রূপে গণ্য হইতে পারেন। এই সভ্যতার চিহ্ন চীনদেশের ও পারস্যদেশের সীমান্ত-প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীক্‌গণ প্রথমে বৌদ্ধ অথবা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পঞ্জাবের গ্রীক্‌ নৃপতি আণ্টি আল্‌কিডাস্‌ মধ্যপ্রদেশের মালব-রাজের নিকট যে দূত পাঠান, তিনি ভিলসা বা বিদিশার নিকটস্থ বেশনগর নামক স্থানে একটি গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। এই স্থানটি এখন সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীক্‌-রাজদূতটি হেলিওডোরাস নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল ডিয়ন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। থিওডোরাস্‌-নামক অপর একজন গ্রীক্‌ একটি নাগ-দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করান। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ এইসব মন্দিরাদিকে বিহার বা স্তূপ আখ্যা দিয়াছেন। গ্রীক্‌-বৌদ্ধগণ উপাসনায় মূর্ত্তিপূজার প্রথা স্থায়ীভাবে প্রবর্ত্তিত করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধগণের ভিতর মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সেই কারণে বরহুত এবং সাঁচির পাথরে খোদা চিত্রসমূহে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির কোনোই চিহ্ন নাই। সেগুলিতে প্রভুর পদচিহ্ন দ্বারাই তাঁহার উপস্থিতি দেখানো হইয়াছে। গ্রীক্‌গণ অতি প্রাচীনকাল হইতে মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় গ্রীক্‌গণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া প্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। বুদ্ধদেবের বৌদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর এবং বোধিসত্ব হইয়া থাকিবার সময়—এই উভয় অবস্থারই মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ভারতীয় গ্রীক্‌গণ আফ্‌-গানিস্থানে ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গ্রীস্‌দেশীয় মোটিফ্‌ (চিত্রিকা) দ্বারা সজ্জিত করেন।

সমগ্র আফ্‌গানিস্থানে, ব্যাকৃট্রিয়ার অনেক অগম্যস্থানে ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে বহু গ্রীক্‌ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব অঞ্চলে প্রাপ্ত খাঁটি গ্রীসীয়-ধরণের বা ইণ্ডো গ্রীক্‌-ধরণের অনেক ভালো-ভালো খোদিত মূর্ত্তি ইয়োরোপের সর্ব্বত্র চালান হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত পাঞ্জাবী বেনেরা এইধরণের শিলামূর্ত্তিসমূহ ইউরোপে পাঠাইয়া বেশ লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি আইন দ্বারা এই ব্যবসায় বন্ধ করা হইয়াছে। পেশওয়ার, তক্ষশিলা, লাহোর,, কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য যাদুঘরে খাঁটি গ্রীক্‌-ধরণের ও ইণ্ডো-গ্রীক্‌-ধরণের অনেক সুন্দর-সুন্দর ভাস্কর্য্য-শিল্পের সংগ্রহ আছে। এক্ষণে ইউরোপের অনেক জাদুঘরে ও ব্যক্তিবিশেষের গৃহে গান্ধার-ভাস্কর্য্যের অনেক নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে বোধ হয় একমাত্র এলাহাবাদের অবসর-প্রাপ্ত ডাক্তার মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের গৃহেই এই-প্রকার সংগ্রহ রহিয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের প্রদর্শনীতে তিনি এইসব সংগৃহীত মূর্ত্তি সাধারণকে দেখান। তাঁহার সংগৃহীত উৎকীর্ণ শিলালিপি ও প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহের ভিতর গান্ধার দেশীয় ইণ্ডোগ্রীক শিল্পীদের তৈরী অনেক মূর্ত্তি আছে। আমরা এই প্রবন্ধে সেই মূর্ত্তিগুলিরই সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

গ্রীক মোটিফ-চিত্রসমূহ দেখিলেই প্রথমে সেগুলির স্বাভাবিক সজ্জা ও পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। গান্ধার-শিল্পের দুইটি বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয় পাথরের খোদা চিত্রসমূহের সাহায্যে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী বর্ণনা করা।

মেজর বসুর সংগ্রহের মধ্যে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। ১নং মূর্ত্তিট মস্তকবিহীন বুদ্ধ-মূর্ত্তি। ২নং মূর্ত্তিটি পরবর্ত্তী ইণ্ডোগ্রীক যুগের অর্থাৎ কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও শক সম্রাটদের রাজত্বকালের ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন। মূর্ত্তিটা বালি চূণে নির্ম্মিত, পাথরের নহে; এবং ইহার গড়ন নৈপুণ্যও পূর্ব্ববর্ত্তী ইণ্ডোগ্রীক্ শিল্পীদের মতন নয়। তৃতীয় মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণই আছে, কিন্তু নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই



২। চূণ-বালিতে গড়া বুদ্ধমূর্ত্তি



১। বুদ্ধ-মূর্ত্তি [পরিধেয় বস্ত্রাদির কারুকার্য্য দ্রষ্টব্য]



৩। গান্ধার-কারুকার্য্যের অবনতির প্রথম যুগের বুদ্ধমূর্ত্তি



৪। বুদ্ধের মস্তক



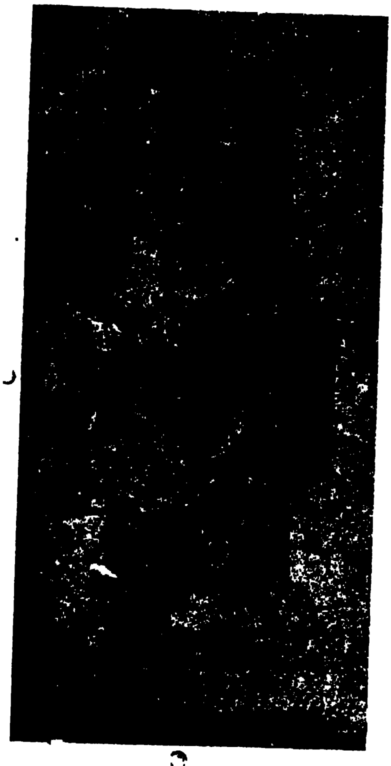
৬। বুদ্ধ-মূর্ত্তি



৫। বুদ্ধদেব



৭। বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি



৮

মস্তকবিহীন বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি
[গলায় হার ও অন্যান্য আভরণ দ্রষ্টব্য]



১০। বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়



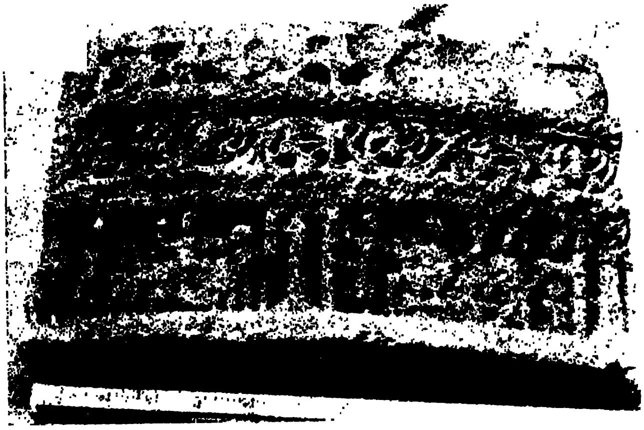
১১। বোধিসত্ত্ব সহ বুদ্ধমূর্ত্তি. (পরিধেয় বস্ত্রাদির কারুকার্য্য দ্রষ্টব্য)



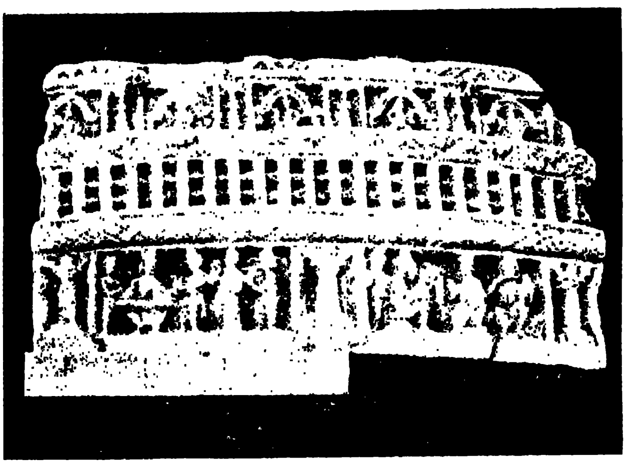
৯। কুষাণরাজত্বের শেষভাগের বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি



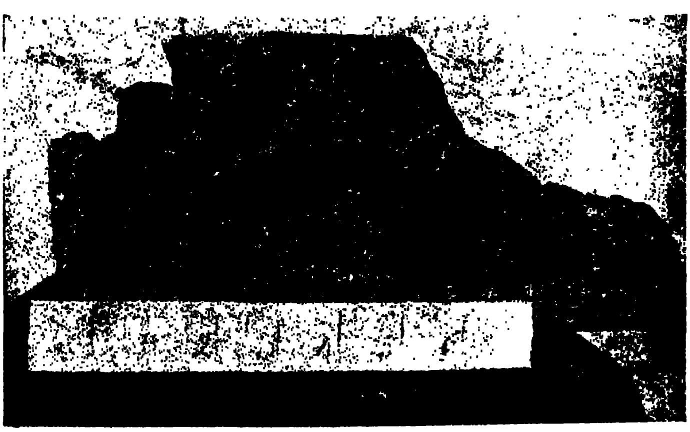
বুদ্ধের জন্মের একটি দৃশ্য



১৩। বুদ্ধের শবদাহ



১৪। বুদ্ধের পাঠশালায় গমন। ললিতবিস্তর হইতে একটি দৃশ্য।
কলিকাতা জাদুঘরের আসল মূর্ত্তিটি হইতে ছাঁচ প্রস্তুত



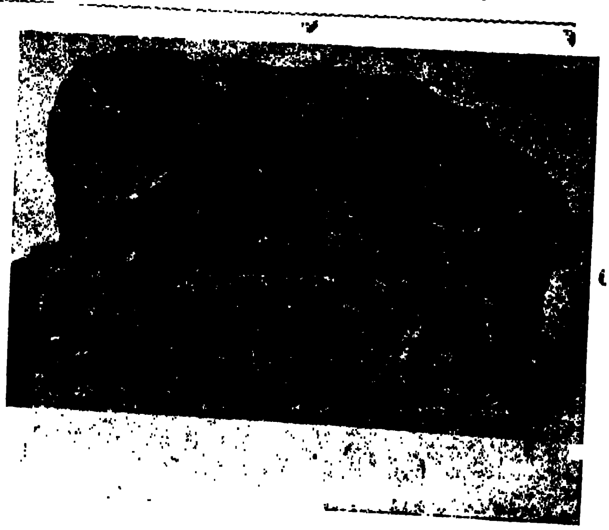


২৭। ইণ্ডোগ্রীক বিহারের দরজার চৌকাঠ





২৫। গ্রীক্‌-ধরণে বুদ্ধ মন্দির সাজানো



২২। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষে বিতরণ



২৬। নেশার ঘোরে অর্দ্ধ উলঙ্গ রমণীমূর্ত্তি



২৩। প্রভুর মস্তকাভরণ

১। কুষাণরাজত্বের শেষভাগের বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি

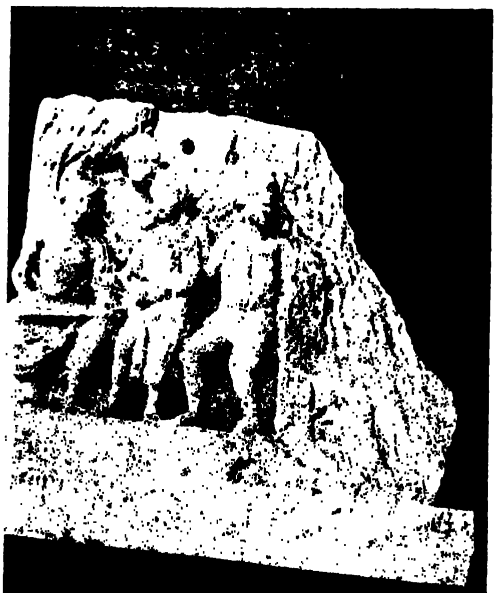
মূর্ত্তিটি গান্ধার-শিল্পের অবনতির প্রথম যুগের বলিয়া মনে হয়। ৪নং মূর্ত্তিটি বুদ্ধের মস্তক। ইহা গান্ধার-শিল্পের উন্নতির সময়কার মূর্ত্তি। ৫ ও ৬ নং মূর্ত্তি-দুইটিতে সমাসীন বুদ্ধ ধর্ম্মের চক্র ঘুরাইতেছেন দেখানো হইয়াছে। বুদ্ধ-মূর্ত্তি খিলানের নিম্নে স্থাপিত হইয়াছে। খিলানের উপরে মন্দিরের গোলাকার গম্বুজ দৃষ্ট হয়। উভয় পার্শ্বে পরিচারকগণ রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি গান্ধার-শিল্পের অবনতির যুগের। বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ৭ নং মূর্ত্তিটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। ইহা গ্রীকদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে অধিকার স্থাপন করার কালের। ৮ নং মূর্ত্তিটিও এই যুগের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির গলায় মালা ও পায়ে পাদুকা ও অন্যান্য বসন-আভরণ দৃষ্ট হয়। খৃষ্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ঐধরণের আভরণাদি ব্যবহৃত হইত। তৃতীয় বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটি (৯ নং) পরবর্ত্তী যুগের বোধ হয় কুষাণ সম্রাট্‌গণের সমসাময়িক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী



১৬। শাক্যসিংহের অন্দর মহলে যুবরাজ সিদ্ধার্থ

যুগের মূর্ত্তিগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীতে (নং ১০) মধ্যস্থলে বুদ্ধমূর্ত্তি আসীন ও উভয় পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর ও মৈত্রেয়র মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলি (নং ১১) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ অবস্থায় সাতটি অতীত ও ভবিষ্যৎবুদ্ধের মূর্ত্তি ছিল; কিন্তু মূর্ত্তিটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এখন মাত্র তিনটি মূর্ত্তি আছে। মধ্যের মূর্ত্তিটি সমাসীন বুদ্ধমূর্ত্তি।

মেজর বসুর সংগ্রহসমূহের মধ্যে প্রভু বুদ্ধের জীবন কথা-পরিচায়ক অনেকগুলি খোদিত চিত্র আছে। এগুলি দ্বারা বৌদ্ধ মন্দির, স্তূপ ও বিহারগুলি সাজানো হইত। যে সকল খোদিত প্রস্তর দিয়া স্তূপসমূহ সজ্জিত হইত সেগুলি অর্দ্ধ গোলাকার। সোজা খোদিত প্রস্তরগুলি বিহারসমূহ হইতে প্রাপ্ত। ১২ নং মূর্ত্তিটিতে বুদ্ধের জন্ম দেখানো হইয়াছে। ইহাতে তিনটি পুরুষ-মানুষের মূর্ত্তি আছে বজ্র হস্তে ইন্দ্রদেব, মূর্ত্তির পুরোভাগে ব্রহ্মা ও অপর একটি দেবতা। কথিত আছে যে প্রভুর জন্ম সাধারণ মানুষের মতন হয় না—তাঁহার মাতার পার্শ্বদেশ হইতে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। যখন তাঁহার জন্ম হয় তখন ইন্দ্রদেব সুবর্ণনির্ম্মিত বস্ত্র হস্তে এই দেবশিশুকে বরণ করিতে আসেন। ১৩ নং মূর্ত্তিটি স্তূপ হইতে সংগৃহীত। ইহাতে দুইটি চিত্র দেখানো হইয়াছে। মূর্ত্তিটি ভগ্নাবস্থায় আছে বলিয়া দৃশ্য-দুইটি ভালো করিয়া দেখা যায় না। বামদিকের চিত্রটিতে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক



১৫। পাঠশালায় অধ্যয়নরত বুদ্ধ। বুদ্ধ কাঠফলকে লিখিতেছেন



১৭। মার বুদ্ধকে প্রলোভন দেখাইতেছে

গণনা করিয়া বলিতেছেন। দক্ষিণ-দিকে রাজা শুদ্ধোদন ও মায়াদেবী রহিয়াছেন। ১৫নং চিত্রেও তাঁহার পাঠশালায় গমনের চিত্র দেখানো হইয়াছে।

গৌতম যখন যুবরাজ সিদ্ধার্থ ছিলেন, তখন তিনি শাক্যসিংহের অন্দরমহলে যেরূপভাবে বাস করিতেন, ১৬নং শিলা-চিত্রে তাহাই দেখানো হইয়াছে। তিনি তখন গৃহবাস ছাড়িতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। পরের মূর্ত্তিটি একটি স্তূপ হইতে সংগৃহীত। ইহাতে দুইটি সম্পূর্ণ দৃশ্য ও একটি আংশিক দৃশ্য আছে। ঘটনাবলী শিলাখণ্ডের বামদিক্ হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিকে শেষ হইয়াছে। আংশিক চিত্রটিতে হিন্দু সন্ন্যাসী উরুবিল্ব কাশ্যপের সহিত

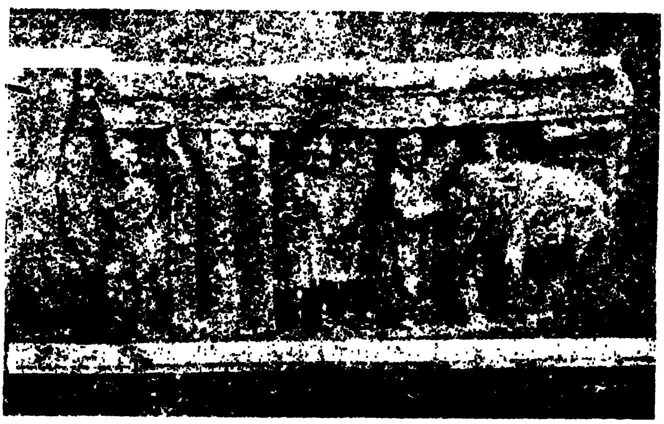
উপবিষ্ট রহিয়াছেন, বুদ্ধ তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, পশ্চাতে একটি বৃষ আসিতেছে। দক্ষিণদিকের চিত্রটিতে ঐ প্রাসাদেরই অপর অংশ দেখানো হইয়াছে। ১৪নং মূর্ত্তিটি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের একটি মূর্ত্তির ছাঁচ। এই মূর্ত্তিটিতে দুইটি দৃশ্য দেখান হইয়াছে। প্রথম দৃশ্যে বোধিসত্ত্ব পাঠশালায় গমনের চিত্র। তাঁহার হস্তে স্লেট রহিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে ঋষি অসিত দেবলের ক্রোড়ে বোধিসত্ত্ব। ঋষি ক্রোড়স্থ শিশুটি ভবিষ্যতে কিরূপ বিশিষ্ট লোক হইবে তাহাই



১৮। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ তাঁহাকে পূজা করিতেছে

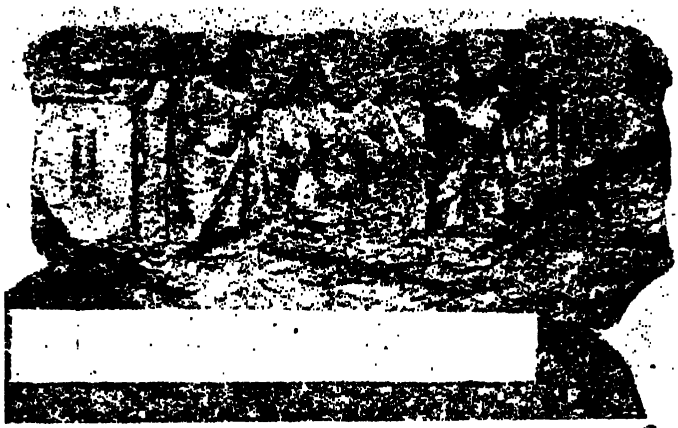
কথোপকথনরত গৌতমের মূর্ত্তি। কাশ্যপ পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মধ্যস্থিত দ্বিতীয় চিত্রটিতে বুদ্ধদেব বৃক্ষের নিকট আগমন করিতেছেন দেখানো হইয়াছে। এই বৃক্ষের নিম্নে ধ্যানমগ্ন হইয়াই তিনি প্রার্থিত আলোক দেখিতে পান।

পরের দৃশ্যটি বোধিদ্রুম-তলে সমাসীন বুদ্ধের মূর্ত্তি। উভয় পার্শ্বে কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই চিত্রখানিতে দেখানো হইয়াছে কিরূপে মার-দৈত্যের বা শয়তানের কন্যাগণ বুদ্ধকে প্রলুব্ধ



১৯। দেবদত্ত কর্ত্তৃক প্ররোচিত প্রমত্ত হস্তী বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিতেছে

করিতে চেষ্টা করিতেছে। বুদ্ধ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে শয়তান মার বুদ্ধকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে। প্রথমে সে তাহার দৈত্য সেনাগণ দ্বারা বুদ্ধকে ভয় দেখাইতে প্রয়াস পায়। ইহাতে বিফল হইয়া সে তাহার সুন্দরী কন্যাগণের নগ্ন-সৌন্দর্য্য দ্বারা বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে (মূর্ত্তি নং ১৭)। পরের ছবিখানিতে প্রভুর সম্যক সম্বোধি দেখানো হইয়াছে। এই শিলাখণ্ডখানি সোজা সুতরাং



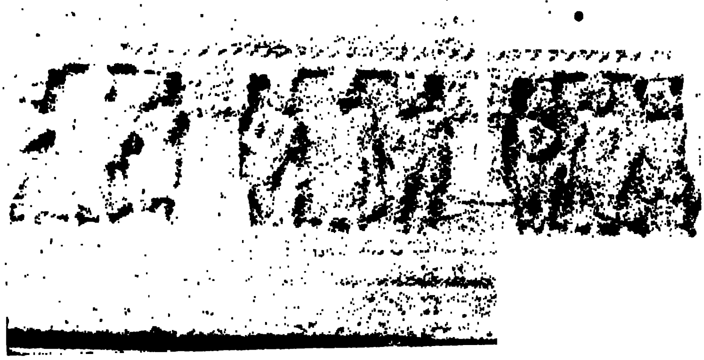
২০। বুদ্ধ-মূর্ত্তি

বামদিকের দৃশ্যটি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর দৃশ্যটিতে একটি গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত স্ত্রীকে বুদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন দেখানো হইয়াছে। বুদ্ধের পশ্চাতে যে মূর্ত্তিটি রহিয়াছে ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পে তাহার পরিচয় একটি অপূর্ব সমস্যা। মূর্ত্তিটিকে দেখিবামাত্র বজ্রধারী ইন্দ্র বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এস্থলে তাঁহার উপস্থিতির কোনো সুস্পষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কেহ কেহ বলেন এটি বুদ্ধের জ্ঞাতি-ভ্রাতা দেবদত্তের মূর্ত্তি। দেবদত্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন ও বহুবার বুদ্ধ-দেবকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া

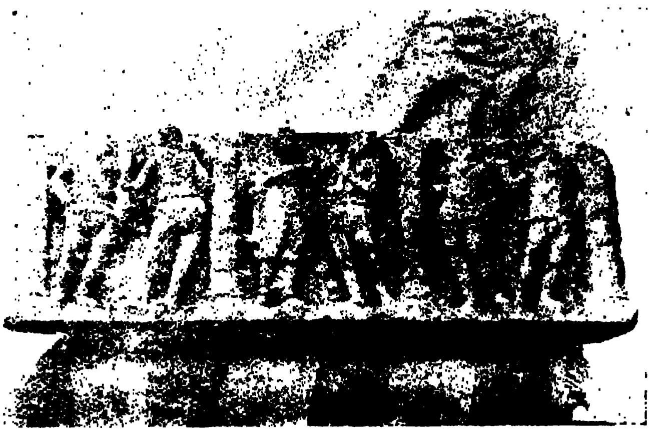


২১। পুরুষ ও রমণীর সহিত কথোপকথনরত বুদ্ধমূর্ত্তি

ইহা বিহার হইতে সংগৃহীত (মূর্ত্তি নং ১৮)। ইহাতে দুইটি দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। বামদিকের দৃশ্যে অস্থিচর্ম্মসার সন্ন্যাসী উরুবিল্ব কাশ্যপ তাঁহার কুটীরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। দক্ষিণদিকের চিত্রে [illegible]ধের রাজা বিম্বিসার সস্ত্রীক বুদ্ধকে [illegible]াম করিতেছেন দেখানো হইয়াছে। [illegible] নং শিলা-চিত্রটিও বিহার হইতে [illegible]হীত। ইহার দুইটি দৃশ্যের মধ্যে



৩৪। মন্দির-সজ্জায় ব্যবহৃত বুদ্ধমূর্ত্তি

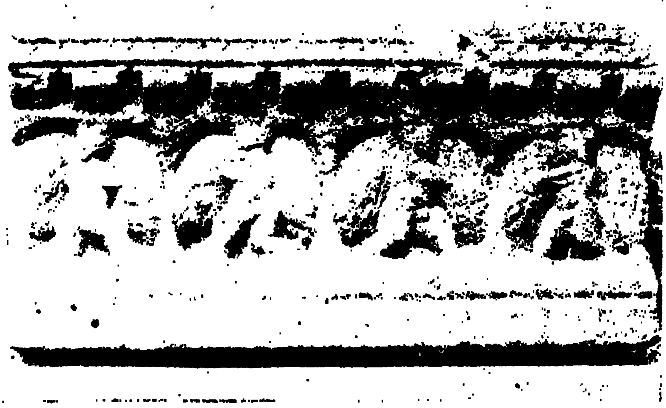


২৯। নৃত্য ও গীত

করণ নামে পরিচিত। হস্তীটির নাম নালাগিরি রত্নপাল।

২০ নং চিত্র প্রচার-কার্য্যে রত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি—উভয় পার্শে দুইটি অনুচর। ২১ নং মূর্ত্তিটি অসম্পূর্ণ। ইহা একটি ভগ্ন মূর্ত্তির বামদিক্‌কার অংশ বলিয়া মনে হয়। এই দৃশ্যে বুদ্ধ একজন পুরুষ ও একজন রমণীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। দৃশ্যটি একটি গৃহের সদর দরজার নিকট বলিয়া মনে হয়। ২২নং মূর্ত্তিতে বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ

প্রকাশ। একবার তিনি একটি প্রমত্ত হস্তীর মাহুতকে রাজগৃহের সঙ্কীর্ণ গলিতে বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু প্রভুর দর্শনমাত্র এই প্রমত্ত হস্তী তৎক্ষণাৎ ভক্ত হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়ে। ১৯ মূর্ত্তিতে এই পদানত হস্তীটিকে প্রভু আশীর্ব্বাদ করিতেছেন দেখানো হইয়াছে। বুদ্ধদেবের চরিতাখ্যান-সমূহে এই বৃত্তান্তটি নালাগিরির বশী-



৩০। বালকগণ ও মাল্য-অর্ঘ্য বহন করিতেছে

প্রভুর ভস্ম বিতরণ করিতেছেন। মহাকাশ্যপ একটি টেবিলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। টেবিলের উপর ভস্ম-গোলক রহিয়াছে। উভয় পার্শ্বে আটজন নৃপতি প্রভুর দেহাবশেষ গ্রহণার্থ পাত্রহস্তে দণ্ডায়মান। অপর দৃশ্যে (মূর্ত্তি নং ২৩) বুদ্ধদেবের মস্তকাভরণ স্বর্গে পূজিত হইতেছে, দেখানো হইয়াছে। ইহা বুদ্ধের কপিলাবাস্তু পরিত্যাগ-করিবার সময়কার ঘটনা। কপিলবাস্তু পরিত্যাগ করিয়া গৌতম পথে একজন ব্যাধের



৩৩। বুদ্ধ-মন্দিরের দুই খিলান

সহিত বেশ পরিবর্ত্তন করেন। সেই সময় ইন্দ্র তাঁহার মস্তকাভরণ স্বর্গে লইয়া যান ও সেখানে তাহা পূজিত হয়। ২৪নং পাথরে-খোদা চিত্রটিতে একটি চতুঃস্তম্ভযুক্ত মন্দিরে প্রভুর দেহাবশেষ পূজিত হইতেছে।

গ্রীকগণ বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ কি-ভাবে সজ্জিত করিতেন, তাহার নিদর্শনও মেজর বস্থর সংগৃহীত শিলাখণ্ডসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়। ২৫ নং শিলাখণ্ডটি একটি চৈত্য দরজার অংশ। একটি খিলানের নীচে



৩১। অর্ঘ্যবাহী বালকগণ



৩২। গ্রীক্ পুরুষ ও রমণীমূর্ত্তি



৩৩। ইণ্ডোগ্রীক্ শিল্পীগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মূর্ত্তি

দুই সারিতে চারিটি বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে। দ্বিতীয় খিলানের নীচে খাঁটি গ্রীক্ আদর্শে অ্যাকান্থাস্ পাতায় চিত্রিত নক্সা আছে। ২৩ নং শিলা-খণ্ডে একটি গ্রীক্ ব্যাকাস্-উৎসবের দৃশ্য দেখানো হইয়াছে। এই চিত্রে একটি অর্দ্ধ-উলঙ্গ রমণী নেশার ঘোরে একটি পুরুষকে আলিঙ্গন করিতেছে।

২৭ ও ২৮ নং শিলাচিত্র ইণ্ডো-গ্রীক্ বিহারের দুইটি চৌকাঠের। ২৯ নং মূর্ত্তিতে তিনজোড়া নৃত্যগীতরত মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রতিদলে ২ জন করিয়া নর্ত্তক আছে। বামদিকের মনুষ্য-দুইটি আধুনিক পেশোয়ারীদের মতন সজ্জিত। মধ্যস্থিত মূর্ত্তি-দুটির মধ্যে একজন রমণী বীণা বাজাইতেছে, অপর পুরুষটি বাঁশী বাজাইতেছে। দক্ষিণ



৩৫। ইণ্ডোগ্রীক শিল্পীগণের নির্ম্মিত মূর্ত্তি



৪০। পাথরে খোদাই-করা সিংহমূর্ত্তি



৪১। প্রস্তর ও বালিচুণে নির্ম্মিত বুদ্ধের মস্তক



দিকের মূর্ত্তিতে আধুনিক-ধরণের পায়জামা ও কোট পরিহিত দুইটি মানুষ নৃত্য করিতেছে। ইণ্ডো-গ্রীক যুগের গ্রীক্ ভাস্করগণ বৌদ্ধ-মন্দির-সজ্জার সময় কাম-দেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেন। ৩০নং শিলাখণ্ডে একদল বালক একটি বৃহৎ মালা লইয়া চলিয়াছে। ৩১নং মূর্ত্তিতে দুইটি খিলানের নিম্নে দুইটি বালক অর্ঘ্য হস্তে দণ্ডায়মান। অনেক খোদিত চিত্রে খাঁটি গ্রীক্-ধরণের মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। ৩২নং



৩৮। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীগণের শোভাযাত্রা



৩৯ নং মূর্ত্তি

মূর্ত্তিতে একটি গ্রীক্-পুরুষ ও গ্রীক্ রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। ৩৩নং শিলাচিত্র একটি ভারতীয় নৃপতি বৌদ্ধ মন্দিরে পূজা দিতে যাইতেছেন, দেখানো হইয়াছে। ৩৪নং দৃশ্য মন্দির-সজ্জায় যেসমস্ত বুদ্ধ মূর্ত্তি ব্যবহৃত হইত তাহার একটি নমুনা। ইহাতে ভিন্ন-ভিন্ন কক্ষে বিভক্ত তিনটি খিলান আছে। প্রত্যেকটি কক্ষে একটি করিয়া দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি রহিয়াছে ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি মনুষ্য মূর্ত্তি আছে। প্রস্তর-খোদিত কক্ষগুলিকে বিভক্ত করিবার সময় ও সজ্জিত করিবার জন্য ইণ্ডো গ্রীক্ শিল্পীগণ সাধারণত ছোটো-ছোটো চতুষ্কোণ থাম অঙ্কিত করিতেন। এইসব দেওয়ালের গাত্রে অ্যাকান্থাস্ পাতারও নক্সা থাকিত। ৩৫নং এবং ৩৬নং মূর্ত্তিদ্বয়ও সুন্দর নমুনা। এইসব দেওয়ালের shaft-এর উপর সাপ, মানুষ এবং বানরের মূর্ত্তি খোদিত আছে। ৩৭নং শিলা-খণ্ড একটি সুন্দর বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তির অংশ। ৩৮নং শিলাখণ্ডে মন্দিরপথ-গামী একদল মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ-ভিক্ষুক-দল।



৩৭। পাথরে-খোদা বুদ্ধমূর্ত্তি

সোনায় সোহাগা

শ্রী প্রমদাচরণ রায়, এম-এ, বি-এল

[শেকভের অনুসরণে]

মহিম—ছা-পোষা লোক—চাকুরে।

নিতাই—মহিমের বন্ধু—অবস্থা ভালো।

স্থান—১৩।৫ বিডন্ ষ্ট্রীট—নিতাইয়ের বাড়ী।

[নিতাইয়ের পড়্‌বার ঘর—সুন্দরভাবে সাজানো। নিতাই টেবিলের কাছে ব'সে একখানা বই পড়্‌ছে। মহিমের প্রবেশ—তা'র বগলে ছাতা, নানা-ধরণের, নানা-আকারের জিনিষে তা'র দুই হাত জোড়া—ডিজ্‌ লণ্ঠনের চিম্‌নি, ছেলেদের খেল্‌বার মোটর-কার, পোষাকের মোড়ক, আরও কত কি। যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে এম্‌নিভাবে একবার চারদিক্‌টা দে'খে নিয়ে হঠাৎ একটা কৌচের উপর এলিয়ে পড়্‌ল।]

নিতাই। এই যে মহিম, তোমায় দে'খে ভারি খুসী হলেম। তা'র পর কেমন আছ? হঠাৎ কি মনে ক'রে?

মহিম। (হাঁপাতে-হাঁপাতে) ভাই, আমি তোমার কাছে একটা জিনিষ চাইছি; জোড়হাত ক'রে বল্‌ছি আমায় নিরাশ কোরো না। আজকের জন্ম আমায় একখানা ছোরা ধার দাও; বন্ধুর কাজ করো।

নিতাই। ছোরা দিয়ে তুমি কি করবে?

মহিম। ছোরা একখানা আমার এখুনি চাই।...হা ভগবান্...আমায় এক গেলাস জল দাও ত—শীগ্‌গীর।...ভাই আমায় একখানা ছোরা দিতেই হবে।...যেতে রাত হ'য়ে যাবে কিনা—তা'র পর জঙ্গলের মধ্যে চারিদিকে ভয়—অতএব বুঝ্‌তে পারছ।

নিতাই। ওটা তোমার মিথ্যা কথা মহিম। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে তোমার কি দর্‌কার? নিশ্চয় তোমার কোনো মতলব আছে। তোমার চেহারা দে'খে তাই মনে হচ্ছে।...আচ্ছা তোমার কি হয়েছে ঠিক ক'রে বল দিকিন—অসুখ করেছে নাকি?

মহিম। একটু সবুর করো; আমায় একটু জিরিয়ে নিতে দাও!...হা ভগবান্...আমায় আজ ঘোড়দৌড় করিয়েছে। আমার এমন মাথা ধরেছে, সারা গা যেন জ্ব'লে যাচ্ছে। আর সহ্য করতে পারিনে।...ভাই, কিছু জিজ্ঞেস কোরো না—ছোরাখানা এখ্‌খুনি দাও, এই তোমার হাত ধ'রে বল্‌ছি।

নিতাই। সত্যি মহিম, একটা সংসারের মাথা তুমি। গবর্ণ্‌মেণ্টের বড় চাকুরে হ'য়ে তোমার এ-কি কাপুরুষতা! লজ্জার কথা, ভাই, লজ্জার কথা!

মহিম। আহা! কি সংসারের মাথা! আমি একটা বলির পশু বই আর কিছুই নই, একটা ভারবাহী গর্দ্দভ, একটা ক্রীতদাসের চেয়ে কোনো অংশে সুখী নই। বুঝতে পারিনে, কি আশায় এখনো সংসারে আছি। আমার মতন মূর্খ আর দুনিয়ায় নেই। আঃ—কেন আমি বেঁচে আছি? এতে কি লাভ? (কৌচ থেকে লাফিয়ে উঠে) বলো, বলো, আমি কেন বেঁচে আছি—এইসব শরীর ও মনের যন্ত্রণা সহ্য করবার কি প্রয়োজন আছে? সত্যের জন্ম জীবনপাত করায় একটা মহত্ব আছে স্বীকার করি; কিন্তু আমি কিসের জন্ম প্রাণ দিচ্ছি—না এইসব লণ্ঠনের চিম্‌নী আর ব্লাউস্‌-পেটিকোটের জন্ম।...নাঃ, যথেষ্ট হয়েছে—আর আমি সহ্য করব না।

নিতাই। ওহে, অত চেঁচিও না, পাশের বাড়ীর লোকে শুন্‌তে পাবে।

মহিম। শুনুকগে তোমার পাড়াপড়্‌শীরা, তা'তে আমার কি এসে যাবে? তুমি যদি ছোরা না দাও ত আর একজন দেবে। আমি আর এ-প্রাণ রাখ্‌ছিনে, আমার সঙ্কল্প স্থির।

নিতাই। আরে থামো, থামো! তুমি যে কোটের বোতাম সব ছিঁড়ে ফেল্‌লে। স্থির হও—তোমার কি হয়েছে বুঝিয়ে বলো।

মহিম। কি হয়েছে? এখনো জিজ্ঞেস করছ কি হয়েছে?...আচ্ছা সব শোনো তবে, শু'নে বিচার কো আমারও মনটা একটু হাল্কা হোক্।...তবে বসা যাক্, আমি একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছি।...আজকের কথাই ধরা যাক্।...তুমি ত জানো আমি দশটা থেকে চারটা অবধি ট্রেজারিতে কাজ করি। সেখানে যেমন গরম, তেম্‌নি ভীড়, মাছিরও অভাব নেই। সেক্রেটারি আছেন ছুটিতে, রমেনও আসেনি—সে গেছে বিয়ে করতে। আর কয়েকজন বাড়ী গিয়ে হয় স্ত্রীর আঁচল চাপা পড়েছে, নয়ত মজা ক'রে সখের থিয়েটার করছে। আর লোকগুলোও এমন বোকা যে এক কথা পাঁচ বার ক'রে বল্‌তে হয়। সেক্রেটারির কাজ যিনি করছেন তিনি আবার কানে খাটো। চারদিকে হুড়োহুড়ি আর ঠেলাঠেলি। একটা সোরগোল লেগেই রয়েছে—কারও কথা শুন্‌বার জো নেই। আর আমার কাজও এত বিতিকিচ্ছি আর এম্‌নি একঘেয়ে যে বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। আঃ—গলাটা শুকিয়ে এসেছে—আর-এক গেলাস জল দাও।......তা'র পর, হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন দেহ মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। এমন অবস্থা, যে দু'টো খেয়ে নিয়ে শুতে পার্‌লে প্রাণটা বাঁচে। কিন্তু তা হবার কি জো আছে?—মফঃস্বলে যখন বাস করি তখন ফরমায়েস খাটতেই হবে। অন্তত আমি যেখানে থাকি সেখানকার লোক মনে করে যে তাদের ফরমায়েস খাট্‌তেই আমি জন্মেছি। সহরে আস্‌বার সময় অমুকের স্ত্রী ব'লে পাঠালেন তা'র একটা ব্লাউস্ আন্‌তে হবে—বুকটা একটু চওড়া চাই, কোমরটা হবে একটু সরু আর অমুক জায়গায় এক ইঞ্চি চওড়া লেস্ থাক্‌বে। আর-এক জনের একজোড়া চীনে বাড়ীর জুতো চাই—লীলার একটা খেল্‌না চাই—শ্যালিকার দুগজ আস্‌মানী রংএর সিল্ক চাই।......দাঁড়াও, আমি ফর্দ্দ ক'রে এনেছি, প'ড়ে শোনাচ্ছি।...(কাগজ বার ক'রে পাঠ) ডিজ লণ্ঠনের চিম্‌নি একটি—দুগণ্ডা গল্‌দা চিংড়ি—পাঁচ আনার মোরব্বা—পারুলের জন্ম কেশরঞ্জন তেল—দশ সের কাশীর চিনি—গিন্নীর জন্ম এক তোলা নাদলরামের স্ফূর্ত্তি। বাড়ী থেকে নিতে হবে—চিনির টিন—জুতোর মাপ—৯।৭ নম্বর গ্রে ষ্ট্রীটে দেবার জন্ম দুসের বেগুন—৭।৫ নম্বর পটলডাঙার দিতে এক টিন ঘি—রামবাগানে শ্যামবাবুকে একটা কোট পৌঁছে দিতে হবে। এ-ছাড়া আরও কত ফরমায়েস আছে তা লি'খে আন্‌বার সময় হয়নি—সেগুলো মনে ক'রে রাখ্‌তে হবে।—তা'র পর কাল আবার

* মুক্তাগাছা পূর্ণিমা-সম্মিলনে পঠিত

সুধীরের জন্মতিথি-উপলক্ষে তা'কে একটা খেলার মোটর-কার দিতে হবে—গিন্নী মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছেন। যোগেশ-বাবুর স্ত্রীর অবস্থা ভালো নয়—তাঁর জন্য রোজ একবার ক'রে লেডি-ডাক্তারের বাড়ী দৌড়তে হয়। এম্‌নি কত কি। আমার পকেটে আছে পাঁচখানা ফর্দ্দ—তা ছাড়া এই দেখ কাপড়ের কোণেও আবার গেরো দিয়ে দিয়েছে একটা। ষ্টেশন থেকে পড়ি-কি-মরি ক'রে অফিসে ছুটতে হয়—আবার অফিসের ছুটি হ'লে চর্‌কির মতো সারা কল্‌কাতা ঘুর্‌তে হয়। পোষাকের দোকান থেকে যাও ওষুধের দোকানে, সেখান থেকে ফলের দোকান, তা'র পর মেছো-বাজার, আবার ঘু'রে এস পোষাকের দোকানে। কোনোখানে হয়ত হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলে, কোথাও মানিব্যাগটি হারালে, আবার কোনো জায়গায় হয়ত দাম দিতে ভু'লে গেলে—আর একশ লোক চোর-চোর ব'লে পেছনে ছুটল। ভাই হাড়গুলো আর আস্ত থাকে না।......তা'র পর, কেনা যখন শেষ হ'ল, তখন ভাবনা হ'ল প্যাক করি কি ক'রে? চিম্‌নীটাকে কোথায় ঢোকাই, কার্ব্বলিক অ্যাসিড আর চিনি একজায়গায় কি ক'রে রাখি, মোটর-কারটা হাতেই নিই না পকেটেই পুরি, আর চায়ের কৌটো নিয়েই বা করি কি? শেষটা ফল এই দাঁড়ায় যে কোনোটা বা ভেঙেই গেল, কোনোটা বা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়্‌ল, আর কোনোটা হয়ত এমনভাবে অদৃশ্য হ'য়ে গেল যে টেরই পেলাম না। এইসব বোঝা ব'য়ে যদি বা ষ্টেশনের কাছে আসা গেল, অম্‌নি দিলে গাড়ী ছেড়ে। এখন ব'সে থাকো দুঘণ্টা পরের গাড়ীর জন্য। গাড়ীতে উঠ্‌লাম, কিন্তু জায়গার অভাব—কোথায় বোঝা রাখি। আর-একজন এসে হয়ত আমার চিম্‌নীর ওপর তার ষ্টীলট্রাঙ্ক রাখলে—অবস্থা তখন কি দাঁড়ায় তা বুঝ্‌তেই পারো। আপত্তি কর্‌তে গেলে আবার গার্ডকে ডাক্‌তে চায়, নয়ত গাড়ী থেকে ঠে'লে ফেলে দেবে ব'লে ভয় দেখায়। অগত্যা বস্‌বার জায়গা অবধি ছেড়ে দিয়ে সারা রাস্তাটা দাঁড়িয়েই থাকি। কোনো রকমে যা হোক্ বাড়ী এসে পৌঁছলাম— ভাব্‌লাম এইবারে একটু হাত-পা ছড়িয়ে শু'য়ে পড়্‌ব। একটু আরাম ক'রে গুড়গুড়ি টান্‌তে পার্‌ব। অম্‌নি চারদিকে সব লোক ঘিরে দাঁড়াল—অমুকের কি হ'ল, অমুক জায়গায় গিয়েছি কি না, এটা আনা হয়নি কেন, ওটা ভেঙেছে কেন—ইত্যাদি প্রশ্নবর্ষণ—উত্তর না দিলে কি রক্ষে আছে? লোকজন যেই বিদায় হ'ল গিন্নি বল্‌লেন তাঁকে ও-পাড়ায় থিয়েটার দেখিয়ে আন্‌তে হবে। প্রথমে আবদারের সুরে আরম্ভ হ'ল, কিন্তু ক্রমে সুর চড়্‌তে লাগ্‌ল—শেষে গর্জ্জন—তৎপরে বর্ষণ। অগত্যা যেতে হ'ল—না গেলে যে কি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হ'ত তা গৃহী যাঁরা তাঁরা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বেন। রাত-দুটোর সময় বাড়ী ফি'রে শোয়া গেল—কিন্তু ঘুম কি হয়...বিছানা ভরা ছারপোকা। সকাল-বেলা তন্দ্রা থেকে জবাফুলের মতন চোখ নিয়ে জেগে হাতমুখ ধোবো ভাব্‌ছি অম্‌নি ফরমায়েস আস্‌তে সুরু হ'ল...আবার অফিস যাবার সময় হ'ল। তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দুটো গুঁজে দে ছুট্, তা ঝড়ই হোক্ আর জলই হোক্, ভ্রূক্ষেপ কর্‌লে চল্‌বে না। ....এই ত আমার জীবন! বলো ত ভাই, এত সহ্য করা যায় কি? ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে দিয়ে বনে চ'লে যাই—সেখানে অন্তত একটু শান্তি পাওয়া যাবে। এর চেয়ে কেউ যদি আমার গলায় ছুরী দেয়, তাও ভালো। সবাই কেবল নিজের কথাই ভাবে, আমার দুঃখ কেউ দেখে না। অন্তত তুমি আমার অবস্থাটা বু'ঝে দেখ, ভাই।

নিতাই। নিশ্চয়, নিশ্চয়, তোমার কষ্টের কথা শু'নে আমি ভারি দুঃখিত হলেম।

মহিম। হাঁ, তুমি যা দুঃখিত হয়েছ তা দেখ্‌তে পাচ্ছি :.........আচ্ছা, তবে আমি। ষ্টেশনে যাবার আগে আমায় একবার রাধাবাজার যেতে হবে, বেঙ্গল কেমিক্যাল্‌টাও একবার ঘু'রে আস্‌তে হবে।

নিতাই। তুমি আজকাল কোথায় আছ?

মহিম। উত্তরপাড়ায়—

নিতাই। তাই নাকি! তবে তুমি উত্তরপাড়ার তারিণী ঘোষকে চেন?

মহিম। বিলক্ষণ। তারিণী বাবুকে জানিনে? তা'র সঙ্গে আমার বেশ আলাপ আছে।

নিতাই। বেশ, বেশ, তবে ত খুব সুবিধেই হ'ল।

মহিম। কেন, কি হয়েছে?

নিতাই। না:—থাক্—আচ্ছা—তা ভাই, আমার একটা সামান্য কাজ কর্‌তে পার্‌বে কি? বন্ধু হ'য়ে তুমি বোধ হয় এতে কিছু মনে কর্‌বে না? যদি কর তবে আর বল্‌তে চাই নে।

মহিম। কি কাজ বলেই ফেল না ছাই।

নিতাই। এই সামান্য একটু কাজ—বন্ধুর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়.......মাথা খাও, এটি তোমায় কর্‌তেই হবে। আর কিছু নয়, একটা সামান্য জিনিস ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে। তারিণী বাবু তাঁর স্ত্রীর জন্য অনেকদিন থেকে একটা সেলাইয়ের কল পাঠাতে বল্‌ছেন। আজ অবধি পাঠাবার সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। তুমি যখন এসেছ, তখন আর কা'কে খুঁজ্‌তে যাবো? এ তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পার্‌বে। যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।......আর দেখ, এই খাঁচাসুদ্ধ পাখীটে নিয়ে যাবে—একটু সাবধানে নিয়ে যেও—দেখো যেন খাঁচাটি ভাঙে না।......ওকি, তুমি অমন ক'রে তাকিয়ে রয়েছ কেন?

মহিম। এত দয়া তোমার। একটা সেলাইয়ের কল, খাঁচাসমেত পাখী একটা—এইমাত্র?—আর কিছু নেই?

নিতাই। এই কি হে, তোমার হ'ল কি? মুখ লাল হোয়ে উঠেছে যে?

মহিম। (হাত-পা ছুড়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে) দাও, দাও, তোমার সেলাইয়ের কল দাও, খাঁচা আর পাখীও দাও...তুমি নিজেও উ'ঠে পড়ো...আমায় খেয়ে ফেল...গলায় ছুরি দাও।......(হাত-দুটো মুঠো ক'রে) রক্ত, রক্ত, রক্ত চাই।

নিতাই। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

মহিম। (খুব জোরে-জোরে পা ফে'লে) রক্ত, রক্ত, রক্ত, চাই।

নিতাই। (ভয় পেয়ে) ক্ষেপেছে। (চেঁচিয়ে) মধু, নবীন, হরি, কে কোথায় আছ...শীগ্‌গির এস...আমায় বাঁচাও।

মহিম। (ঘরময় ছুটোছুটি ক'রে নিতাইকে তাড়া কর্‌তে কর্‌তে) রক্ত, রক্ত, রক্ত চাই।

যবনিকা

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত আশ্বিন সংখ্যায় মালকোষ রাগ দেওয়া হইয়াছে। এই সংখ্যায় উক্ত রাগের তিনটি রাগিণী প্রকাশ হইল। বাকি তিনটি অন্য সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

"কৌশিকী টক্কা চৈব মুদ্রাকী চ বাগীশ্বরী
নাটিকা তথা গুর্জরী মাল-কোষস্য যোষিতঃ॥"

অর্থাৎ কৌশিকী, টক্কা মুদ্রাকী, বাগীশ্বরী, নাটিকা ও গুর্জরী এই ছয়টি মালকোষ পত্নী।

কৌশিকী—ধ্যান

"বিয়োগভীতা দয়িতেন সার্দ্ধং
রক্তোৎপলা বেণযুতাননেন্দুঃ।
শ্যামা সুবেশা ললিতাঙ্গযষ্টি-
মু হুর্ম্মুহুর্ষা খলু কৌশিকীয়ম্॥"

ভাবার্থ—

প্রিয়বিচ্ছেদে ভীতা রক্তবসনা বেণুযুক্তবদনা শ্যামা সুবেশা সুন্দরদেহা মুহুর্মুহু ভ্রমণ করিতেছেন যিনি তিনিই কৌশিকী।

কৌশিকী—আলাপ

সম্পূর্ণ জাতি।
গধনি কোমল
ম—বাদী।
ধ—সংবাদী।

আস্থায়ী

সা ণ্‌া সা মা । জ্ঞাঃ জ্ঞঃ মা ধা -া ণা ধা‿মা -া‿জ্ঞা -া মা‿রা -া
তে ০ ০ না ০ ০ ০ তো ০ ০ ম্ না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা -া সা ধ্‌া ণ্‌া‿ণ্‌া -া -া সা -া রা ণ্‌া -া‿সা -া সা মা জ্ঞা
নে ০ তা ০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০ তো ০ ০ ম্ তে ০ ০

মা ধা ণা -া র্সা ণধা ণা পা মা‿জ্ঞা -া মজ্ঞা মজ্ঞা মা ধা ণা
রে ০ ০ ০ না ০০ ০ ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মজ্ঞা -া মা রা -া সা -া সা সা সা সণ্‌া সণ্‌া সা রা -া সা ।
তোo ০ ০ ০ ম্ না ০ তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম্

অন্তরা

পা পা ণা‿ধা -া ণা র্সা -া র্সা র্সা -া র্সা ণা র্রা -া র্রা
তে রে নে ০ ০ রি ০ ০ রে না ০ তা ০ ০ ০ না

র্মর্জ্ঞা -া র্মা র্রা -া র্সা -া -া র্সা ণা ধা ণা পা -া মা জ্ঞা জ্ঞা
তোo ০ ০ ০ ম্ না ০ ০ তে না ০ ০ ০ ০ তা ০ ০

মা ধা ণা -া মা জ্ঞা জ্ঞা মা মা -া সা সা / সা সা
তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ তে ০ ০ না তে রে না

সণ্‌া সণ্‌া সা রা -া সা -া ।
তে না ০ তো ০ ০ ম্

সঞ্চারী

মজ্ঞা মজ্ঞা মা পা -া পা পধা পধা পপা -া
তা০ ০ ০ না ০ ০ তে হে০ ০ ০ ০ ০ ০
মা ধা ণা মজ্ঞা -া মরা -া সা -া সা ণ্‌া ধ্‌া
না ০ ০ হো০ ম্‌ না ০ ০ ০ আ না ০
ম্‌া ণ্‌ধ্‌া সা া সা সা মজ্ঞা মা ধা ণা -া মজ্ঞা া
হে০ ০ ০ ০ না তে ০০ ০ ০ ০ ০ না০ ০
মা রা -া সা -া ।
তো ০ ম্‌ না ০

আভোগ

মা পধা র্সা -া র্সা -া -া র্সা র্রা র্সণা র্সা া র্সা
তো ০ ০ ০ ম্‌ না ০ ০ তে ০ ০০ ০ ০ রি
র্সা র্মজ্ঞা র্মা র্রা -া র্সা -া -া র্রা র্সা -া
রে ০০ ০ ০ ০ না ০ ০ তা ০ ০
পধা পা পা -া র্পা র্রা র্সা -া রণা র্সা ণা ধা
০০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ হে০ ০ না ০
পা -া মজ্ঞা -া মা রা -া সা -া সা সা সা সণা সণ্‌া সা রা া সা -া ॥
০ ০ না ০ তো ০ ম্‌ না ০ তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম্‌

ধ্রুপদ

কৌশিকী—চৌতাল

কৌন ভ্রম ভুলো রে মন অজ্ঞানি ?
শিখত ন রাগ-রঙ্গ তান অচ্ছর শুধ বাণী
ঔর খারথ সোঁ জনম গঁবায়ো
বিদ্যা বাত অধিক সয়ানী ।
যে সাধ গুণী ভয়ে তিনকো ন
গুণকী মত ঠানী ।
বিলাসকে প্রভুকোঁ জো ভলো চাহত তো
মিলহি তানসেন গুরুজ্ঞানী ॥

বিলাস সেন* ।

আস্থায়ী

০ ৩ ৪ ১ ০ ২
সা র্সণা । র্সা পধা । পধা পণা । মজ্ঞা মজ্ঞা । মা পা । পধা ণা ।
কৌ ০০ ন ভ্র০ ০০ ম০ ভু০ ০০ লো রে ম০ ন
০ ৩ ৪ ১ ০ ২ ০
পা মপা । মজ্ঞা মজ্ঞা । মা রা । সা সা । সা সা । মা জ্ঞা । মা রা ।
অ০ ০০ জ্ঞা০ ০০ ০ নি শি খ ত ন ০ ০ রা ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ৩ ৪
মা পা । ৷ পা । মা ধা । ধর্সা পা । মা মজ্ঞা । মা ধা । পধা পা ।
প থ ০ ম ভ্য ০ ম ০ ম ভ র ০ [illegible] ০ ০ ০ ০
৪ ১´ ০ ২
পধা পমা । পা মজ্ঞা । মজ্ঞা মমা । ৷ সা ।
থ ০ ০০ মা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণী

অন্তরা।

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
পধা পধা । পা র্সা । র্সা র্সা । র্রা পা । র্সা র্সা । র্সা র্সা ।
উ০ ০ ০ র মা র থ সোঁ ০ ০ জ ন ম
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সপা র্রা । র্সর্জ্ঞা র্মা । র্রা র্সা । র্রপা র্সা । পর্সা ধা । পা পা ।
গঁ০ মা ০ ০ ০ যো ০ বি ০ ০ দ্যা ০ ০ ০
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা পা । মজ্ঞা মজ্ঞা । মা ধা । পা র্সা । পধা পধা । পা পা ।
মা ০ ভ০ ০ ০ অ ০ ধি ০ ক০ ০ ০ ০ স
১´ ০ ২
মজ্ঞা মজ্ঞা । মা রা । ৷ সা ।
মাঁ০ ০ ০ ০ ০ ০ নী

সঞ্চারী

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মজ্ঞা মজ্ঞা । মা ৷ । পা পা । পা মা । পা পধা । পা পা ।
বে০ ০০ সা ০ ০ ধ ু ণী ০ ভ ০ রে ০
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
পা মা । পা পা । পা মজ্ঞা । মা জ্ঞা । মা রা । ৷ সা । সণ্‌৷ সা ।
চি ন ০ কো ০ ন ০ ু ০ ০ প ০ কী ম ০ ০
০ ২ ০ ৩ ৪
মা মা । জ্ঞা জ্ঞা । মা ধা । পা মজ্ঞা । মা রমা ।
০ ০ ০ ০ ভ ০ ০ ঠা ০ ০ মী০

আভোগ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পধা পমা । পা র্সা । র্সা র্সা । র্সপা র্রা । র্সা র্সপা । র্সা সা ।
চি০ ০০ কা ০ ন বে খ০ ০ ০ ছু ০ ০ কো
১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
[illegible] । র্সর্জ্ঞা র্সা । র্রা র্সা । র্রপা র্সা । পা মা । পা পা ।
[illegible] ০ ০ ০ কো ০ চা০ ০ ছ ০ ক কো
০ ২ ০ ৩

টোড়ী—ধ্যান।

"শয্যায়াং সুখং ......
বিয়োগিনী ...... বিরাজিতা।"
সুবর্ণবর্ণা গৃহমাগতা যা
কান্তং ...... টোড়িকেয়ম্॥"

ভাবার্থ—

যে দুঃখিতা স্বর্ণবর্ণা বিয়োগিনী গৃহে আসিয়া শয়নের শয্যায় নিদ্রিত কান্তকে জাগ্রত করিতেছেন তিনিই টোড়ী।

টোড়ী—আলাপ

খাড়ব জাতি।
গ—বিবাদী
ম—বাদী।
ধ—সংবাদী
গ ও নি কোমল।

অস্থায়ী।

সা মা -। জ্ঞা মা রা -। সা—-। সা ণ্‌া -। ধ্‌া ম্‌া ধা— -। ণ্‌া -।

তা ০ ০০ ০০ ০ না ০ তে রি ০ ০ রে ০ ০ ০০

সা সা -। সা মা জ্ঞা। মা ধা পা -। ধা মা জ্ঞা -।

০ না ০ তে না ০ ০ তো ০ ০ ম্ না ০ ০ ০

মা রা। সা -। সা সা সা সণ্‌া সণ্‌া সা রা -। সা -।॥

তে ০ ০ না ০ রে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম্

অন্তরা।

মা পধা পা র্সা -। র্সা র্রা -। র্ধা পার্সা -। র্সা -।

রি ০০০ ০ ০ রে না ০ ০ তো০ ম্ না ০

র্সা র্রা র্মজ্ঞা র্মা র্রা র্সা -। র্সা পা ধা মা ধা পা র্সা -। র্সা

তে ০ রি০ ০ ০ ০ ০ রে না ০ ০ ০ ০ ০ ০ নে

পা ধা মা ধা পা -। ধামা জ্ঞাঃ জ্ঞঃ মরা -। -। সা -।

তে ০ ০ ০ ০ ০ না০ ০ ০ তো০ ০ ম না ০

সা সা সা সণ্‌া সণ্‌া সা রা -। সা -।॥

তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম্

সঞ্চারী

মা জ্ঞা জ্ঞা মা ধা পা ধা মা -। ধা -। -। পর্সা ধা পা

তে ০ ০ রি ০ ০ রে ০ ০ না ০ ০ ০০ তে ০

ধা মা -। মজ্ঞা মা রা -। সা -। ণ্‌া সা ণ্‌া ধ্‌া র্‌া -।

না ০ ০ তা০ ০ ০ ০ না ০ তে রে না ০ ০ ০

ধ্‌া ণ্‌া ধ্‌া সা -। সা -।।

তো ০ ০ ০ ম্ না ০

আভোগ।

[illegible] -। র্সা ধা র্সা পা -। স ধা

[illegible] ০ রে না ০ ০ ০ ০ নে

[illegible] মা, জ্ঞা মা রা -। সা

কষ্টিপাথর

চীন-বিপ্লব

চীনের কারখানায় কয়েকটি শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিল বা কয়েকটি ছাত্র-দল শোভাযাত্রা করিল, অমনি সেখানকার বৈদেশিক অধিবাসীরা সেটাকে একটা গুরুতর ব্যাপার মনে করিয়া এক সৈন্য-সমারোহ বাহির করিল। যেমন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ মনোভাবের স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি প্রাচ্য-দেশে প্রতীচ্য মনোভাবের স্বতঃসিদ্ধ এই যে, নেটিভ্‌কে গোড়া হইতেই দাবাইয়া রাখিতে হইবে। এই সূত্রে বড়-বড় রাস্তায় মেশিন্-গান্ বসানো হয়, অশ্বারোহী সেনাদল জনতা তাড়াইতে আরম্ভ করে—সে-জনতা হয়ত বেশীর ভাগ ধর্ম্মঘট-সম্পর্কে উপস্থিত হয় না, বরং পুলিশদের সমারোহ দেখিতেই সমবেত হয়। কয়েক জন নেটিভ হয়ত পুলিশদের ধাক্কা খাইয়া কড়া কথা বলিল; অমনি তাহাদের ধরা হইল এবং প্রহার করা হইল; জনতা হৈচৈ করিয়া উঠিল ও কয়েকটা ঢিল ছুঁড়িল; পুলিশ তাড়া করিয়া আসিল; জনতা রাগিয়া একজোটে পুলিশের দিকে আসিল, আর অমনি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পুলিশগুলি ছুঁড়িতে লাগিল। তার পর, এসব ক্ষেত্রে যেমন বিবরণ দেওয়া হয় তেমনি সত্যবাদিতার সহিত বলা হইল যে, পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি ছুঁড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের ঔদার্য্য-হেতুই তাঁহাদের পক্ষে এমন বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইল।

গোলমালের মূল কারণ যদি সমস্ত বৈদেশিকগণের প্রতি গভীর ঘৃণাই হয়, তাহা হইলেও তাহার কারণ বুঝা শক্ত নয়। চীন-দেশে শ্বেতচর্ম্ম বৈদেশিকরা শত শত বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া যে বীজ বপন করিয়াছে এখন তাহারা তাহারই ফল পাইতেছে। একটা জাতিকে বৎসরের পর বৎসর ক্রীতদাসের মতন ব্যবহার করিতে পারে না, শেষে তাহাদের প্রতিশোধ বাসনা জাগিয়াই উঠিবে। তোমার পথে চলিতেছে বলিয়া একজন চীনাকে বুট মারিয়া পথ হইতে হটাইয়া দিবে; রেলগাড়ীর কামরায় নিজে বসিবে বলিয়া চীনাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে; তোমার রিক্শ-কুলিকে বেদম প্রহার দিবে বা তাহার রিক্শ ভাঙিয়া দিবে, কেননা সে তোমার আদেশ ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই; চীনা বলিয়া তাহাকে সাধারণের ভ্রমণোদ্যানে বা হোটেলের ভোজনাগারে, তাহার নিজের দেশেই তাহাকে ঢুকিতে দিবে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, সে তোমার হুকুম মানিতে দ্বিধা করিলে তোমার শক্তি আছে বলিয়া তাহাকে দাবাইবার জন্য তুমি পশুর মতন ব্যবহার করিবে।

চীনারা আজ বুঝিতে পারিতেছে যে, বর্ত্তমানে বিদেশীরা অপরকে শাস্তি দিতে শক্তিহীন। তাহারা জানে—পাশ্চাত্যের একটি-মাত্র দেশের বা কয়েকটি সম্মিলিত দেশেরও এখন এমন অবস্থা নয় যে, সসৈন্যে আসিয়া চীনকে শাসনে রাখিতে পারে। সুতরাং পশুর মতন নির্দ্দয় ব্যবহারের জন্য বিদেশী লোকদিগকে চীন যদি এখন প্রতিফল দেয়, তাহা হইলে তাহা দুঃখের কারণ হইতে পারে কিন্তু অহেতুক ব্যাপার নয়।

যেমন অন্য ক্ষেত্রে ঘটিতেছে, তেমনি এই ক্ষেত্রেও চীনের বিপ্লবকে বলশেভিক কারসাজি বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে। সেরূপ কারসাজি হয়ত আছে। বিদেশীরা যে নির্দ্দয়তার সহিত একটু-একটু করিয়া চীনদেশকে করতলগত করিতেছে সেই-সম্বন্ধেই বর্ত্তমান আন্দোলনকারী ছাত্ররা বেশী নিন্দোক্তি করে। এই নীতিকে চীন বরাবর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক কারণে ইহা আরো অসহ্য মনে করিতেছে। বিশেষ করিয়া বন্দর-সহরগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে। কলকারখানার সৃষ্টি হইতেছে,—সেগুলির অধিকাংশই ইউরোপীয় বা জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত ও পরিচালিত; তাহারা আবার চীনা কোর্টের সীমানার বাহিরে। কলের শ্রমিকদিগকে নির্দ্দয়তার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশে যে-সব ব্যবসায়িক সম্মেলন আছে এখানে তাহা না থাকায় কলকারখানার আদিম যুগের সমস্ত বীভৎসার পুনরভিনয় এখানে হইতেছে। দেশবাসীর সহিত কলের অধিকারীদিগের জাতিগত বৈষম্য আছে বলিয়া এবং নিজেদের কৃত আইন ছাড়া বিদেশীরা চীনা আইনের বহির্ভূত বলিয়া ঐ বীভৎসতা অতিমাত্রায় সংঘটিত হইতেছে।

কলকারখানার অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি মিউনিসিপ্যাল কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার সভ্যদের মধ্যে সাত জন ছিলেন ইংরেজ, একজন জাপানী ও একজন চীনা। তাঁহারা বলেন, রেশমের ও তুলার কারখানায় ছয় বৎসরের বালকেরা কাজ করিতেছে; দিনে ও রাত্রিতে তাহারা কাজ করিতেছে; দুপুরে একঘণ্টা ছুটি পায়। কলে এইসব ছেলে জোগাইবার কন্ট্রাক্টার্ আছে; তাহারা ঐসব ছেলেদের পিতামাতার নিকট হইতে মাসে এবং প্রায় সাত টাকা দিবার কড়ারে উহাদিগকে কিনিয়া আনে। প্রায় চৌদ্দ টাকায় কলে উহাদিগকে বিক্রয় করে। অত্যন্ত দুর্দ্দশার মধ্যে তাহাদিগকে রাখা হয় ও কদর্য্য আহার্য্য দেওয়া হয়। বারো ঘণ্টা তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া রাখিবার জন্য নির্দ্দয় ব্যবহারও আছে,—অন্তত ছয় ঘণ্টা তাহাদিগকে একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। কাজ করিতে-করিতে তাহাদিগকে দ্রুতগতিতে একবার নীচু হইতে হয় ও আবার খাড়া হইতে হয়।

ইহাদের ক্লেশ-লাঘবের জন্য কমিশন প্রস্তাব করেন, দশ অপেক্ষা কম বৎসর বয়স্ক ছেলেদের কলে নিযুক্ত করা হইবে না এবং চার বৎসর পরে বারো বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক ছেলেদের নিযুক্ত করা হইবে না। চৌদ্দ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক কোনো বালককে কোনো দিন বারো ঘণ্টার অধিক খাটানো হইবে না, এবং তাহাকে পাক্ষিক চব্বিশ ঘণ্টার বিশ্রামের ছুটি দিতে হইবে। করদাতারা অধিকাংশই বৈদেশিক, তাহারা কমিশনের আহূত সভায় উপস্থিত না হওয়ায় কমিশনের প্রস্তাব কোরামের অভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

(দি নিউ রিপাব্লিক)

চীন-বিপ্লবের কারণ

সিংতাও এবং শাংহাইতে জাপানী তুলার কারখানায় শ্রমিকরা বেশী বেতনের দাবি করিয়া ধর্ম্মঘট করে; এই ধর্ম্মঘট কিছু দিন ধরিয়া চলিতেছিল এবং বিনা যুক্তিসঙ্গত কারণে একজন জাপানী একটি ধর্ম্মঘটকারীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। গত ৩০মে তারিখে এই নির্দ্দয়তার প্রতিবাদ-স্বরূপ কয়েকটি অল্পবয়স্ক চীনা ছাত্র ছাত্রী শাংহাইএর রাস্তায়-রাস্তায় দল বাঁধিয়া ভ্রমণ করে। অস্ত্রের মধ্যে তাহাদের হাতে ছিল কিছু হ্যাণ্ডবিল্ বা বিজ্ঞাপনের কাগজ।

সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত ইণ্টার্ ন্যাশন্যাল অধিবাসের পুলিশদল ছেলেদের এই শোভাযাত্রাকে প্রতিরোধ করাই কেবল উপযুক্ত মনে করিল না, তাহাদের কয়েক জনকে গ্রেপ্তারও করিল। বাকী ছাত্রগুলি তখন থানায় গিয়া ধৃত সহকর্ম্মীদের মুক্তি দাবি করিল। পুলিশ তাহাদিগকে সরিয়া যাইতে বলিল। তাহারা যাইতে আপত্তি করায় একজন ব্রিটিশ পুলিস ইন্সপেক্টার্ গুলি চালাইবার হুকুম দিল। বালকদের মধ্যে ছয়জন তৎক্ষণাৎ হত হইল এবং চল্লিশেরও অধিক গুরুতর আহত হইল। গুলি চলিতে লাগিল.........অন্তত ছয়দিন চলিল। অধিকাংশ বিবরণে প্রকাশ—অন্তত ৭০ জন হত ও ৩০০ জন আহত হয়।

(নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড)



পুস্তক পরিচয়

দেশবন্ধুর বজ্রবাণী (সচিত্র)—শ্রী উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও গ্রন্থকারের নিকট ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে প্রবাসী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা।

দেশবন্ধু দাশের বক্তৃতাবলী হইতে তাঁহার সমাজ-সংস্কার, ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, অনুন্নত জাতির উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ের ১৬৩ বাণী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই পুস্তকে দেশবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনীও দেওয়া হইয়াছে। দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন সমস্ত পাঠকই এই মূল্যবান্ সংগ্রহ-পুস্তক সাদরে পাঠ করিবেন ইহা আমাদের বিশ্বাস। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ও চিত্রগুলি খুব সুন্দর হইয়াছে।

কেন্টের মেটিরিয়া মেডিকা (প্রথম খণ্ড)—ডাঃ ক চাটার্জ্জি প্রণীত। মূল্য প্রতিখণ্ড বারো আনা। প্রাপ্তিস্থান দি বুক কোম্পানি ৪.৪ এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে কেন্টের মেটিরিয়া মেডিকা সুপরিচিত। ঔষধ-লক্ষণ ও তুলনামূলক বিচার এই পুস্তকে খুব বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে। ডাঃ চাটার্জ্জি এই অত্যাবশ্যক গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করিয়া হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক ও সাধারণ গৃহস্থের অশেষ উপকার করিয়াছেন। আমরা আশা করি এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির বহুল প্রচার হইবে। পুস্তকখানির ছাপা সুন্দর হইয়াছে।

প্র

বাংলার বাঘ বা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—শ্রী হেমচন্দ্র বক্সী বি-এ প্রণীত। দি বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

বাংলাদেশের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা বাংলাদেশের পুরুষ-সিংহের জীবনের কথা মোটামুটিভাবে এই জীবনী হইতে বেশ ভালো করিয়াই জানিতে পারিবে। লেখকের লেখা ছেলেদের উপযোগী হইয়াছে। স্যার আশুতোষের জীবনের প্রধান প্রধান সকল ঘটনাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বুড়াদেরও এই পুস্তক পড়িতে ভালো লাগিবে।

মৃণাল—শ্রী হেমচন্দ্র বক্সী প্রণীত উপন্যাস। বুক কোম্পানি। কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম ১৷০ টাকা।

উপন্যাসখানি পড়িয়া ভালো লাগিল। বাঙালীঘরের সহজ কথাই লেখক সরস এবং সুন্দর করিয়া, পুরাতনকে নূতনরূপে, ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তবে বইখানিকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করিয়া কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য্য-হানি করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে উপকৃত হইবেন। বইখানির ছাপা, বাঁধাই অতি পরিপাটী হইয়াছে।

গ্রন্থকীট

উপাসিকা-চরিত (সচিত্র)—শ্রী দুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। পৃঃ ১৸৵০+৫১১+।০। ১৩৩২।

থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী মাদাম ব্লাভাট্স্কির জীবন-কথা এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। লেখক ১৯১১ সাল হইতে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া নব্যভারত পত্রিকায় "মাদাম ব্লাভাস্কির জীবন কথা" শীর্ষক প্রবন্ধমালায় এই মহীয়সী মহিলার বিষয় লেখেন। প্রবন্ধগুলি কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেন। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকদের এতদিন মাদামের জীবন-বৃত্তান্ত ও বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ জানিবার কোনোরূপ সুযোগ ছিল না। এই অসামান্যা রুশ-মহিলার জীবন এক আশ্চর্য্য রহস্যজালে বিজড়িত। তাঁহার জীবনী হইতে জানিবার ও শিখিবার অনেক আছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থ-রচনায় অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার লিপিচাতুর্য্যে "উপাসিকা চরিত" সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই মূল্যবান্ গ্রন্থ বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট সমাদৃত হইবে। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

অতসী—শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। একটাকা বারো আনা।

গল্পের বই। ছয়টি গল্প আছে। গল্পগুলির প্রত্যেকটিতেই নূতনত্ব আছে। উদীয়মান গল্পলেখকদের মধ্যে শৈলজাবাবুকে প্রথম স্থান দেওয়া যাইতে পারে। চা-পার্টি, বিলাতী কায়দায় প্রেমে পড়া, হা-হুতাশ—ইত্যাদি আজকালকার গল্পের কাঠামো। এগুলিতে সে সব হাঙ্গামা নাই; এগুলি বাঙালী জীবনের ছবি—সুন্দর ও মিষ্ট। ছাপা ও বাঁধাই ভালো। দাম আর-একটু কম হইলে ভালো হইত।

বিমানিকা—শ্রী শশাঙ্কমোহন সেন। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এ্যাণ্ড সন্, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

কবিতার বই। শশাঙ্কমোহন-বাবু খ্যাতনামা কবি। তাঁহার কবিতায় বিশেষত্ব আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির গোড়ার দিকে ও মাঝে কয়েকটি দুর্ব্বল কবিতা আছে—সেগুলিতে ছন্দের দোষ ও মিলের দোষও আছে। কিন্তু ভালো কবিতা অনেক আছে; দুর্ব্বল কবিতাগুলির পাশে এগুলি বেশ চোখে পড়ে। এগুলি উচ্চ ও উদাত্ত রসে ভরপূর। উপনিষদের ধর্ম্মবাণী ও ভারতবর্ষের স্বরূপ-সত্য এগুলিতে বেশ ফুটিয়াছে। কাব্যমোদী পাঠক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

পল্লী-সংগঠন—শ্রী শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত। প্রকাশক স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ, ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা। পৃঃ ৪৮ (১৩৩২)।

পুস্তিকার লেখক বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর একজন কর্ম্মী। তিনি বাংলায় ও বাংলার বাহিরে গ্রামে-গ্রামে যাইয়া পল্লী সংস্কার কার্য্য-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন সেই বিষয়ে কতকগুলি কথা এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে আসল পথ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পল্লী সংস্কার-বিষয়ে বহু চিন্তাশীল লেখকের মতের সহিত পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। শ্রীশবাবুর বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর। আশা করি, পুস্তকে বিবৃত বিষয়টি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার আবশ্যক। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বেলতলা (জেলা ঢাকা) গ্রামের জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

প্র



আত্মরক্ষার উপায়—

সঙ্গে টাকা কড়ি লইয়া বড় বড় সহরের রাস্তা দিয়া একলা চলা আজকাল বিপজ্জনক ব্যাপার। রাস্তায় ভদ্রবেশধারী চোরডাকাতের অভাব নাই। একপ্রকার ছোটো যন্ত্র আবিষ্কার হইয়াছে—এই যন্ত্রের ভিতর কাঁদানো-গ্যাস ভরা থাকে। দরকার মতন কল টিপিলেই এই ছোটো



যন্ত্র হইতে কাঁদানে-গ্যাস বাহির হইয়া চোরকে নিরুপায় করিয়া দিল

যন্ত্র হইতে ভীষণ বেগে গ্যাস বাহির হইয়া আক্রমণকারীকে কিছুক্ষণের জন্য প্রায় অন্ধ করিয়া দেয়। এই কাঁদানে গ্যাস পঞ্চাশ ফুট পর্য্যন্ত বেশ জোরে যায়। যন্ত্রটিও খুব ছোটো-খাটো এবং পকেটের মধ্যে সহজেই লুকাইয়া রাখা যায়।

—

পাঁচ হাজার মাইল হইতে ফোটো তোলা—

হনলুলু হইতে একটি ফোটো র‍্যাডিওর সাহায্যে নিউইয়র্ক পাঠানো সম্ভবপর হইয়াছে। এই দুই স্থানের দূরত্ব পাঁচ হাজার মাইল। ইতি-পূর্ব্বে নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে বেতারের সাহায্যে ছবি পাঠানো হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দূরত্ব ২০০০ মাইলের বেশী নয়। হনলুলু হইতে একেবারেই সোজাসুজি নিউইয়র্কে এই ছবি পাঠানো যায় নাই। মাঝ-খানে চারটি রিলের (relay) সাহায্য লইতে হইয়াছে। এই চারটি



হনলুলু হইতে নিউ-ইয়র্কে র‍্যাডিও প্রেরিত প্রথম ছবি

রিলে—আপনা-আপনিই (automatically) কাজ করে। মাঝখানে চারটি রিলে থাকা সত্ত্বেও হনলুলু হইতে নিউইয়র্ক রিসিভিং ষ্টেশনে বিদ্যুৎপ্রবাহের ১ম টক্কর পঁহুছিতে ১-৪ সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগিয়াছিল। সমস্তছবিখানি পাঠাইতে মোট ২০ মিনিট কাল সময় লাগিয়া-ছিল। সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া ৭খানি ফোটোগ্রাফ র‍্যাডিওতে পাঠানো হইয়াছিল।

যে-ছবিখানি র‍্যাডিওতে পাঠানো হইবে, তাহার একটি ফিল্ম একটি cylinderএ জড়াইয়া দেওয়া হয়। ফিল্মটি cylinder এ ঘুরিতে থাকে। এইসময় ইহার উপর একটি আলোক-রশ্মি পড়িতে থাকে এবং সেই আলোক রশ্মি ফিল্মের মধ্য দিয়া একটি delicate photo-electric এর উপর গিয়া নিপতিত হয়। এই photo-electricকে light sensitive cell বলা যায়। ফিল্মের গাঢ়তার উপর আলোকের পরি-



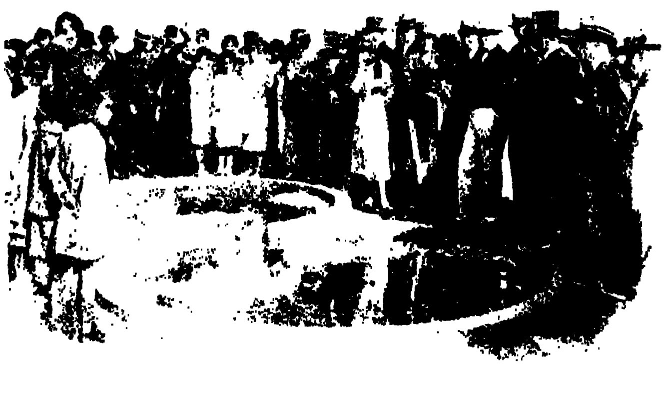
র‍্যাডিও-সাহায্যে প্রেরিত আর-একখানি ছবি

মাণ নির্ভর করে। আলোক-রশ্মি এই light sensitive cellএর উপর আঘাত করিবামাত্র একটি electric impulseএ পরিণত হয়, এই বৈদ্যুতিক impulse relayর সাহায্যে wireless transmitter এর মধ্য দিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়।

রিসিভিং ষ্টেশনে এই impluseকে pen arrangement এর মধ্য দিয়া চালাইয়া photo negative তৈয়ার করা যায়। impulseএর কম বেশী অনুসারে negative গাঢ় বা ফ্যাকাশে হইবে। এই negative হইতে ছবি তোলা সহজ ব্যাপার।

ভূ-পরিচয়ের নতুন উপায়—

স্পেনদেশের Aviles নামক স্থানের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে একটি অভিনব উপায়ে ভূ-পরিচয় করানো হয়। দুইটি গোলাকার



ভূ পরিচয়ের নতুন উপায়

কন্‌ক্রিটের তৈরী প্রকাণ্ড জলাধার আছে। তাহার মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় মহাদেশ এবং দ্বীপগুলির আকারে কাটা পাথর বসানো আছে। দুইটি জলাধারের একটি পুরোনো hemisphere এবং অন্যটি নতুন। ইহার সাহায্যে ছাত্রেরা খুব তাড়াতাড়ি এবং সহজে পৃথিবীর নানা দেশ-মহাদেশ এবং সাগরগুলির সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানলাভ করে। পৃথিবীর জল এবং স্থলের পরিমাণ, বিভিন্ন দেশ মহাদেশের অবস্থান এবং একদেশের সহিত অন্য দেশের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে সহজেই নির্ভুল ধারণা করিতে পারে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতেও এই প্রথার প্রবর্ত্তন অতি সহজেই হইতে পারে। ছবি দেখিলেই এই বিষয়ে ভালো পরিচয় পাওয়া যাইবে।

—

মরক্কোর লড়াই -

যাঁহারা খবরের কাগজ পড়েন, তাঁহারা সকলেই জানেন আফ্রিকার উত্তর প্রান্তে স্থিত মরক্কোদেশের রীফ্‌দের সহিত ইউরোপের স্পেন এবং ফ্রান্সের বিষম লড়াই চলিয়াছে। রীফ্‌রা মরক্কোর প্রাচীন অধিবাসী, মরক্কো তাহাদের দেশ। বর্ত্তমান সময়ে মরক্কো স্পেন এবং ফ্রান্স ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। রীফ্‌দের নেতা আবদুল করিমের সহিত প্রথমে লড়াই বাধে স্পেনের। আবদুল করিম বলেন মরক্কো স্বাধীন দেশ—বিদেশীয়েদের এখানে শাসনকর্ত্তারূপে থাকিবার কোনো অধিকার নাই। স্পেনও তাহার অন্যায় অধিকার ছাড়িতে প্রস্তুত নহে—সে করিমকে বিদ্রোহী ঘোষণা করিয়া তাহার সহিত লড়াই শুরু করিয়াছে গত চার বৎসর ধরিয়া। ফ্রান্সের ভয় হইল যে তাহার অধিকৃত মরক্কোর বিশেষ-অংশ হয়ত করিমের দেখাদেখি বিদ্রোহ করিতে পারে—এইজন্য ফ্রান্স, স্পেনের সহিত যোগ দিয়া করিমকে হারাইবার বিষম উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু জগতের দুইটি প্রধান শক্তির মিলিত শক্তি এই সামান্য আরব বিদ্রোহীকে কোনো রকমেই জব্দ করিতে পারিতেছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে নিজের এবং দেশের স্বাধীনতা প্রয়াসী আবদুল করিম অসামান্য সাহস এবং বুদ্ধিবলে সামান্য অস্ত্রশস্ত্র এবং লোকজন লইয়া স্পেন এবং ফ্রান্সের মিলিত ফৌজকে নাস্তানাবুদ করিয়া দিতেছে। স্পেনের সেনাপতি ডি রিভারাও আবদুল করিম এবং রীফ্‌দের অলৌকিক সাহস এবং বীরত্বের প্রশংসা করিতেছেন। জগতের স্বাধীনতাকামী কয়েকজন আমেরিকান্ বিমান বীর এই রীফ্‌দের দমন করিবার জন্য স্পেনের সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছেন।

আবদুল করিমও মরণ পণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে তাঁহার দেহে একবিন্দু রক্ত এবং তাঁহার একটি অনুচর বর্ত্তমান থাকিতে তিনি দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ ত্যাগ করিবেন না। তাঁহার অনুচরেরাও নেতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মরণ পণ করিয়াছে। খবরের কাগজে আজকাল যে সব খবর আসিতেছে, তাহা পড়িয়া রীফ্‌দেরই ক্রমাগত পরাজয় হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই খবর নিছক সত্য বলিয়া মনে হয় না।

—

পতন-রক্ষী কল—

ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। শিশুটি সবেমাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে। পদে-পদে পড়িয়া যাইবার ভয়—সেইজন্য তাহার চারিদিকে একটি বেড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বেড়া শিশুর সঙ্গে-সঙ্গে চলিবে—এই বেড়াও পাছে শিশুর চাপে উল্‌টাইয়া যায়, সেইজন্য নীচের বেড়াকে একটু বেশী ভারী করিয়া দিলে আর কোনো ভয় থাকে না। চক্রাকার বেড়া-দুটিকে কাঠ বা লোহা যে-কোনো দ্রব্যের সাহায্য

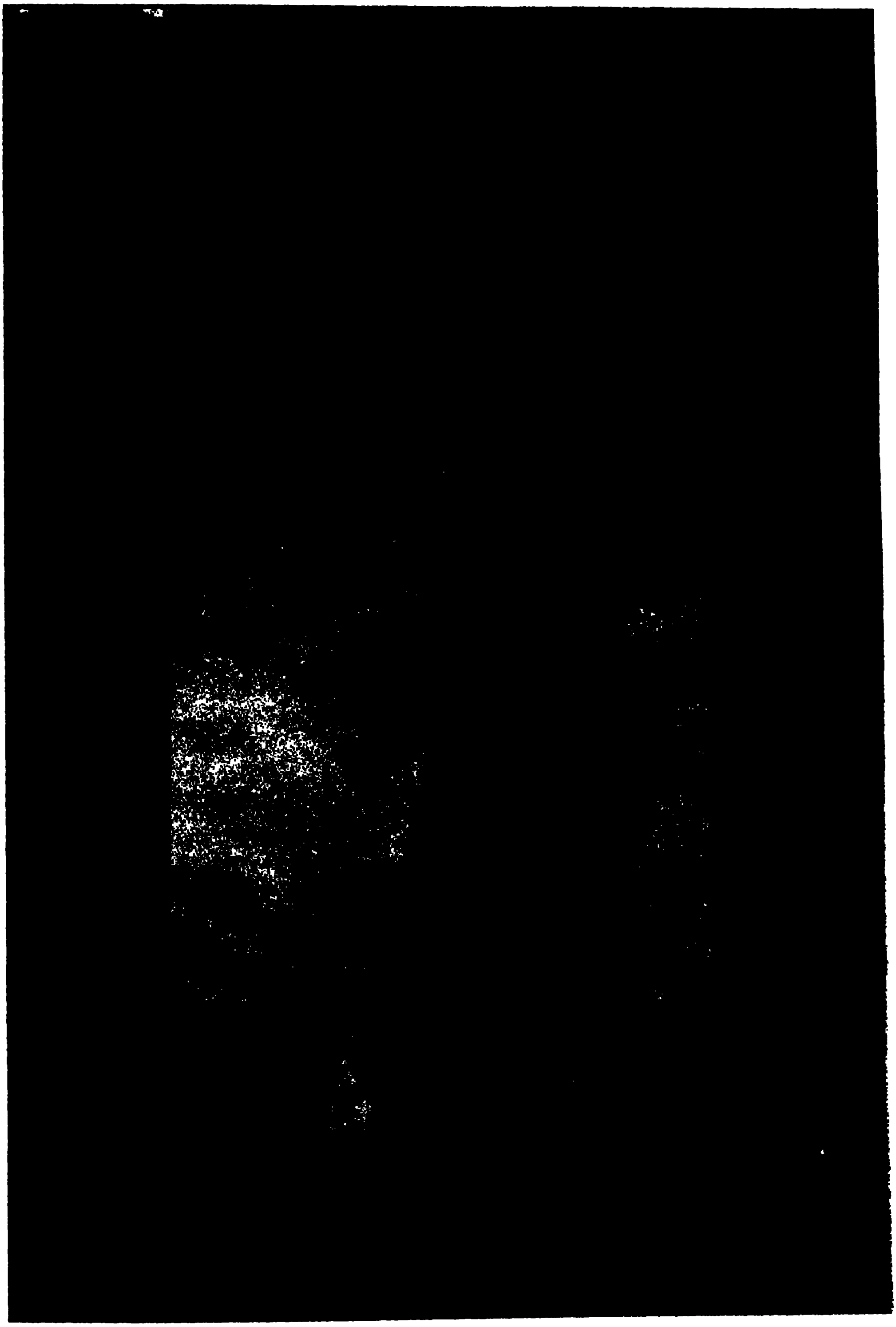


আবদুল করিমের রীফ অশ্বারোহীদল, ইহারা অসমসাহসী স্প্যানিস্ এবং ফ্রেঞ্চ পল্টনকে ইহারা নাস্তানাবুদ করিতেছে।

দেখিয়াছি; দেখিয়াছি ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া কী বিরাট্ প্রবঞ্চনা চলিতেছে! অথচ এইসকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক যাহারা তাহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ। নিরীহ প্রজাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্ম রাজতন্ত্রের নামে কী বীভৎস মিথ্যাবাদ প্রচারিত হইতেছে দেখিতেছি, অথচ যাহারা এই রাজতন্ত্রের কর্ণধার তাঁহারা সকলেই আচার-আচরণ ও বংশ-গরিমায় ভদ্র। ইহার কারণ এই, যে, মানুষ যখন এইসকল বিপুল যন্ত্রসংঘকে নির্ব্বিচারে মানিতে সুরু করে, তখন তাহারা এই যন্ত্রকেই দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়া অশেষ গৌরব অনুভব করে এবং অন্ধ ভক্তের মতো এই যন্ত্রের নামে ভয়াবহ অবিচার-সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না। এই আধুনিক জড়-পৌত্তলিকতার (fetish worship) প্রভাবে অন্যসব মানবীয় ধর্ম্ম লোপ পাইতে বসিয়াছে;—মানুষ ও মনুষ্যত্ব বলির অসংখ্য উপায় এই পৌত্তলিকতাই দিনদিন জোগাইয়া দিতেছে।

আমার এই চিন্তাধারায় সহানুভূতিসম্পন্ন একজন শ্রোতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই সংঘ যন্ত্রকে ঠেকাইয়া রাখা যায় কি করিয়া; তাঁহার ভয় ছিল যে-তাহা করিতে গেলেই অন্যপ্রকারের যন্ত্র মাথা খাড়া করিয়া উঠিবে। আমি বলিয়াছিলাম—ব্যক্তিস্বরূপ (personality) ও আদর্শ (ideal) যাঁহাদের জীবনে একীভূত এমন কতকগুলি মানুষের (individual) উপর আমার ভরসা আছে। যে যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা দণ্ডায়মান, তাহার সহিত তুলনায় তাঁহারা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল মনে হইতে পারেন, প্রকাণ্ড একটি জড় পর্ব্বতের পাশে সজীব একটি বৃক্ষকে যেমন মনে হয়। কিন্তু প্রাণের ইন্দ্রজালশক্তি ত এই বৃক্ষের আছে, দিনে দিনে উহা আপনার প্রাণশক্তির নব-নব প্রকাশে আপনার জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, পরাস্ত হইয়া আপাতমৃত্যুমুখে পতিত হয়, শুধু পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবার জন্য। আমার বিশ্বাস অমানুষিক জড়শক্তি যখন দিকে-দিকে প্রভাব বিস্তার করে, তখন মনুষ্যত্বে দৃঢ় বিশ্বাসপরায়ণ কতকগুলি ব্যক্তির উদ্ভব হয়। তাঁহারা মানুষের প্রাণ শক্তির অবমাননায় তীব্রভাবে সচেতন হইয়া উঠেন এবং অবজ্ঞা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যেও অকুতোভয়ে আপনাদের নির্দ্ধারিত পথ অনুসরণ করিয়া চলেন। ইংলণ্ডে ঠিক্ এম্‌নি একটি ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ই, ডি, মোরেল (E.D. Morel)। তিনি আজ মরিয়াও অমর হইয়াছেন। মৃত্যুতে ইঁহাদের সমাপ্তি নহে। এমন সব লোককে দেখিলে বুঝিতে পারি এই সর্ব্বব্যাপী জড়ত্বের মধ্যে মানব-প্রাণ-শক্তির স্ফুলিঙ্গ এখনো জ্বলিতেছে—নিরাশ হইবার কারণ নাই। মানবের সভ্যতা যেমন কয়েকটি ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে—কয়েকটি ব্যক্তিই তাহা বাঁচাইয়া রাখিবে। আজিকার দিনে জড় যন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্যে যে এমন-সব ব্যক্তি জন্মিতে পারে, রমাঁ্যা রলাঁর জীবন ও সাধনা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে নিরন্তর সহিতে হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে আজিকার দিনে তাঁহাকে জগতের একান্ত প্রয়োজন আছে এবং এই লাঞ্ছনা ও অপবাদের দ্বারাই তাঁহার সমসাময়িক মানুষেরা তাঁহার মহত্ত্বকে স্বীকার করিয়া লইতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ যে-সকল মহাপুরুষকে আধুনিক জড়-জগতে প্রাণস্ফুলিঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা মোরেল ও বিশ্বপ্রাণ মনস্বী রলাঁকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তিনি নিজেও তাঁহাদের অন্যতম; তাঁহার বিশ্বপ্রাণতার কথা দিকে-দিকে প্রচারিত হইতেছে ও আমাদের দেশ ও জাতিকে বিশ্বমানবের কাছে গৌরবান্বিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বিশ্বপ্রেমিক রমাঁ্যা রলাঁর জন্মদিনে এখন দেশে-দেশে উৎসব হইতেছে এবং তাহাতে যোগ দিয়া বিশ্ববাসী তাহাদের অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। কবির সহিত আমরাও এই মহাপুরুষের সম্বর্দ্ধনা করিতেছি এবং বলিতেছি, "দেশের গণ্ডী বা কালের গণ্ডী দ্বারা তোমরা বদ্ধ নও, তোমরা সর্ব্বকালের এবং সর্ব্বদেশের। তোমরা যে সত্য প্রচার করিতেছ তাহা চিরন্তন, মনুষ্যত্বের জয় পতাকা তোমরা দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যেও বহন করিতেছ, তোমাদের কার্য্য জয়যুক্ত হউক।"



ভিক্ষু-বুদ্ধ

চিত্রকর শ্রী পুলিনবিহারী দত্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতগবর্ন্মেণ্টের ব্যবস্থাসচিবের পদ

বাংলাদেশের য়্যাড্‌ভোকেট্‌-জেনার্যাল্‌ শ্রীযুক্ত সতীশ-রঞ্জন দাশ ভারতগবর্ন্মেণ্টের ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। এই নিয়োগে বাংলা দেশের বাহিরের অনেক খবরের কাগজ সন্তুষ্ট হন নাই;—সম্ভবতঃ বঙ্গের অনেকেও খুসী হন নাই।

দাশ-মহাশয় আইন ভাল জানেন না, একথা কেহ বলিতেছেন না। এমন কাহারও নামও কেহ করিতেছেন না, যাঁহার নিয়োগ অধিকতর সন্তোষকর হইত এবং যিনি তাঁহা অপেক্ষা বেশী আইনজ্ঞ। তাঁহার নিয়োগে অসন্তোষের কারণ প্রধানতঃ দুটি। অনেকে বলিতেছেন, যে, বোম্বাই হইতে কোন আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে এবার ব্যবস্থা-সচিব নিযুক্ত করা উচিত ছিল। বোম্বাইয়ের কোন আইনজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে আমরা তাহাতে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিতাম না, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক প্রদেশ হইতেই এক-একজন লোককে নিযুক্ত করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম বা রীতির পক্ষপাতী আমরা নহি। যোগ্যতম ব্যক্তি যে-প্রদেশেরই লোক হউন, তাঁহাকে নিযুক্ত করাই ভাল। যাহা হউক, বোম্বাইয়ের যোগ্য কোন লোক নিযুক্ত হইলে ভালই হইত; কারণ, চাকরীর জন্য বা অন্য কোন কারণে প্রদেশে প্রদেশে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হওয়া ভাল নয়।

দাশ-মহাশয়ের নিয়োগে অসন্তোষের আর-একটা কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, তিনি খুব "অগ্রসর"-রকমের মডারেট্‌ নহেন এবং ভারতগবর্ন্মেণ্টের শাসননীতির উপর তিনি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। তাঁহার রাজনৈতিক মতের সহিত আমাদের মতের মিল নাই। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবার কোন ইচ্ছাও আমাদের নাই। কিন্তু তাঁহার নিয়োগে অসন্তোষের এই যে কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় অমূলক। "অগ্রসর" বা "পশ্চাৎপদ" যে কোন-রকমের যে-কয়জন ভারতীয় এপর্য্যন্ত ভারতগবর্ন্মেণ্টের শাসন-পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি ভারতশাসন নীতির কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন? ভারতীয় সভ্য দূরে থাক্‌, লর্ড রিপনের মত ভারতহিতৈষী বড়লাট কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন কি? সুতরাং যদি দাশ-মহাশয়ের প্রভাবে ভারত-শাসন-নীতির কোন পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহার অযোগ্যতার পরিচায়ক হইবে না। বস্তুতঃ অগ্রসর বা অনগ্রসর যে-কোন ভারতীয় ব্যক্তি ভারত-গবর্ন্মেণ্টের সভ্য হইবেন, তাঁহাকেই মোটের উপর শাসন কার্য্যে অধিকাংশ সভ্যের মতে সায় দিতে হইবে; না দিলে তাঁহার স্বতন্ত্র মতের জয়যুক্ত হইবার যে কোন সম্ভাবনা ঘটিবে, তাহাও নয়। বস্তুতঃ লর্ড্‌ সিংহ হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত যে-কয়জন ভারতীয় ব্যক্তি ভারত-গবর্ন্মেণ্টের শাসন-পরিষদের সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কেহই সামরিক আইন প্রয়োগ, বিনাবিচারে কারারোধ, জনতার উপর অনাবশ্যক গুলিবর্ষণ দ্বারা নরহত্যা, প্রভৃতি জুলুম নিবারণ করিতে পারেন নাই। এইরূপ নানা কারণে "অগ্রসর" ভারতীয় রাজনীতিবিদ্‌দিগের রাজকার্য্য গ্রহণ না-করাই মডারেট সংবাদপত্রগুলির অনুমোদনীয় হওয়া উচিত। কারণ "অগ্রসর" ব্যক্তিরা বেসরকারী অবস্থায় বরং দেশের কিছু কাজে লাগিতে পারেন, সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া গেলে তাঁহাদের দ্বারা ততটা কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। সাবেক কংগ্রেসের আমলে অনেক কংগ্রেস্‌-নেতা হাইকোর্টের জজ বা অন্য বড় চাকর্য়ে হইয়া যাইতেন। তাহাতে তাঁহাদের কাহারও কাহারও ব্যক্তিগত সুবিধা হইয়া থাকিবে, এবং বিচারাসন বা অন্য

কোন আসন অলঙ্কৃত হইয়া থাকিবে; কিন্তু কংগ্রেসের যাহা উদ্দেশ্য তাহা নেতাদের মন্ত্রিত্ব বা অন্য উচ্চপদ-লাভ দ্বারা একটুও সিদ্ধ হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ কোন্ শ্রেণীর মডারেট তাহার আলোচনা আমরা করিতে চাই না; কিন্তু একথা আমাদিগকে বলিতেই হইবে, যে, তিনি স্বদেশবাসীদের অপ্রিয় হইবার আশঙ্কায় নিজের মত গোপন রাখেন নাই, অকপটভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মত সব বিষয়ে ইংরেজদের পক্ষে প্রীতিকর হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। কারণ তিনি বলিয়াছেন, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষের হিতসাধনের জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন বা এদেশ শাসন করেন, এই ভাণ ছাড়িয়া দিন্, এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভারতের শাসন-প্রণালী উৎকৃষ্টতর করুন ও ভারতে স্বায়ত্তশাসন বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর করুন। এপর্য্যন্ত উচ্চপদস্থ সব ইংরেজ রাজপুরুষ প্রকাশ্যভাবে এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন, যে, ইংরেজ ভারতবর্ষের উদ্ধার ও পরিত্রাণের জন্যই ভারতশাসন করিয়া আসিতেছে। সতীশরঞ্জন মডারেট হইয়াও ইংরেজদিগকে এই ভাণ ত্যাগ করিতে বলিয়া সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিজে অন্য অধিকাংশ ভারতীয় রাজনীতিবিদ্দিগের ন্যায়, স্বাধীনতা লাভের জন্য বোমা, রিভলভার প্রভৃতির দ্বারা রাজনৈতিক হত্যার বিরোধী হইলেও ইহা বলিয়াছেন, যে, বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের সময় বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় গবর্মেণ্ট্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অসন্তোষ কিরূপ প্রবল হইয়াছে। অবশ্য, ইহার দ্বারা তিনি বোমা-নিক্ষেপের বিন্দুমাত্রও সমর্থন করেন নাই; কিন্তু কেবল এই ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, যে, যুক্তিতর্ক আবেদন-নিবেদন-রূপ অহিংস সদুপায় দ্বারা গবর্মেণ্টের যে চৈতন্য উৎপাদিত হয় নাই, তাহা হিংসা-প্রণোদিত অবৈধ উপায়ে উৎপাদিত হইয়াছিল। অনেক সময় মানুষ হিতৈষীদের পরামর্শ অনুরোধ উপরোধ উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করিতে থাকে; তাহার ফলে যখন তাহার কোন কঠিন পীড়া হয়, তখন তাহার জীবন-যাপন-প্রণালীর অনিষ্টকারিতা সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া ব্যাধি জিনিষটাকে কেহ কল্যাণকর মনে করে না।

শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের রাজনৈতিক মত-সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই ধারণা প্রচলিত আছে, যে, তিনি সকল বিষয়ে গবর্মেণ্টের মন জোগাইয়া কথা বলেন। ইহা যে সর্ব্বাংশে সত্য নহে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা উপরে কিছু লিখিয়াছি, নতুবা, আমাদের নিজের বিশ্বাস এরূপ নহে, যে, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে উন্নততর শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত করিবে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি না, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিয়া ভারতবর্ষের লোকেরা সকল বিষয়ে ইংরেজদের সমান অধিকার লাভ করিতে পারিবে। ইহা আমরা মানি বটে, যে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির মত আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইলে পরে আমাদের প্রকৃত ও পূর্ণ স্বরাজ্য লাভের সুবিধা হইতে পারে। সুতরাং "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে" আমরা স্বরাজের পথে একটা ধাপ মনে করিলেও উহাকে আমরা প্রকৃত ও পূর্ণ স্বরাজ্য মনে করি না।

কেহ যদি মনে করেন কোন পদ গ্রহণ করিয়া দেশের হিত করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আর্থিক ক্ষতি-স্বীকার করিয়াও তাহা গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহার আছে। এইজন্য যদিও দাশ-মহাশয়ের বেতন তাঁহার বর্ত্তমান আয়ের মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ মাত্র হইবে, তথাপি যদি তিনি মনে করেন, যে, মাসে মাসে হাজার হাজার টাকা ক্ষতিস্বীকার করিয়া তিনি দেশহিতসাধন করিতে পারিবেন, তাহা হইলে ক্ষতিস্বীকার করিবার অধিকার তাঁহার আছে। কিন্তু আমাদের ধারণা এই, যে, তাঁহার ক্ষতিস্বীকারের সহিত তুলনীয় কোন দেশহিত তিনি করিতে পারিবেন না। কোন কোন ভারতীয় আইনজীবী ব্যবস্থাসচিব হইয়া আর্থিক লাভবান্ হইয়াছিলেন। কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলেও, এক লর্ড্ সিংহ ছাড়া, কাহারও আর্থিক ক্ষতি তত হয় নাই, যত সতীশ-রঞ্জন দাশ মহাশয়ের হইবে। তাঁহার ব্যক্তিগত লাভা-লাভের সহিত সর্ব্বসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমাদের এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে, যে, তাঁহার আয়ের

এরূপ প্রভূত হ্রাস হইলে দেশহিতকর কোন কোন কাজের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। দরিদ্র ছাত্র প্রভৃতির সাহায্যার্থ এবং নানা দেশহিতকর কার্য্যে সতীশরঞ্জন শুনিয়াছি ন্যূনকল্পে মাসিক দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া থাকেন। রাজকার্য্য গ্রহণ করিবার পর সৎকার্য্যে এরূপ ব্যয় করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে কি ?

ধর্ম্মমতের পার্থক্যে মানুষকে কিরূপ অন্ধ করে, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে আজকাল প্রচুর-পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। রাজনৈতিক মতের পার্থক্যবশতও এক-দলের লোক অন্য দলের কোন লোকের সদ্‌গুণ বা সৎকার্য্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু সতীশরঞ্জনের দলের লোক না হইলেও আমাদিগকে একটা কথা বলিতে হইবে। তিনি গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া কিম্বা জেলে গিয়া বীরপদবাচ্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু একটা কাজ তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছেন, যাহা বঙ্গের অসহযোগী ও স্বরাজী প্রকৃত বীরেরাও করেন নাই; মেকীদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। বাঙালী সংবাদপত্রপাঠক মাত্রে জানেন, প্রধানতঃ পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে পশুপ্রকৃতি মানুষেরা কুমারী, সধবা, বিধবা কত কত নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এই নরপশুদিগকে আইন-অনুসারে দণ্ডিত করিয়া এবং অন্য উপায়ে নারীনির্য্যাতন বন্ধ করিবার নিমিত্ত "নারী-রক্ষা সমিতি" নামক একটি সমিতি দীর্ঘকাল কাজ করিতেছে। সতীশরঞ্জন তাহার সভাপতি। সভাপতি-রূপে তিনি কত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা নারীদের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য কত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহা উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয় নাই। কিন্তু নারীত্বের, সতীত্বের, মনুষ্যত্বের সম্মান রক্ষা করিতে যাঁহারা চান, তাঁহারা, রাজনৈতিক মতভেদ-সত্ত্বেও নারীরক্ষা সমিতিকে ও তাহার সভাপতিকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য; যদিও রাজনৈতিক দলাদলি ভুলিয়া তাঁহারা সমিতিকে অর্থসাহায্য করিবেন, এরূপ আশা আমরা করি না। যাহা হউক, ইহা অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমাদের বক্তব্য এই, যে, সতীশরঞ্জনের আয় কমিয়া গেলে যদি তজ্জন্য নারীরক্ষা সমিতির কাজ করিবার শক্তি কমিয়া যায় তাহা হইলে তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হইবে। রাজনৈতিক বাগ্‌যুদ্ধ, তর্কযুদ্ধ করিবার লোক অনেক আছে, হাততালি রোজগার করিবার লোকের অভাব নাই, কিন্তু বঙ্গের লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা, অবমানিতা নারীদের জন্য খ্যাতিস্পৃহাবিহীন হইয়া খাটিবার ও টাকা দিবার লোক নিতান্তই বিরল।

প্রধানতঃ এবম্বিধ কারণে আমরা সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয়ের ব্যবস্থা-সচিবের পদে নিয়োগে সুখী হই নাই; বরং দুঃখিতই হইয়াছি; বিশেষতঃ যখন আমাদের ধারণা এই, যে, ভারতশাসন-প্রণালী তাঁহার রাজনৈতিক মত-অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইলেও (তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প), বিশেষ কোন লাভ নাই। কিন্তু আমরা আমাদের এই মত পরিবর্ত্তন করিব, যদি তিনি ভারতগবর্ন্মেণ্টের দ্বারা এমন কোন উপায় অবলম্বন করাইতে পারেন, যাহাতে নারীনির্য্যাতন দমন বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা সহজতর ও অল্পায়াসসাধ্য হয়, এবং নারীরা পথে ঘাটে মাঠে রেলে ষ্টীমারে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারেন। ইহার জন্য গবর্ন্মেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতে মাথা হেঁট হইতেছে। কিন্তু বঙ্গে পৌরুষের অভাব ঘটায় লজ্জা ও অপমান স্বীকার করিতে হইতেছে। নারীনির্য্যাতন নিবারণের প্রতি দেশের লোক যথেষ্ট মনোযোগ করিতেছেন না। গবর্ন্মেণ্টও যথেষ্ট মনোযোগী নহেন। নানা রকম কাজের জন্য দেশের লোক টাকা দিতেছেন; অনেক টাকা চুরিও হইতেছে। কিন্তু নারীদের যে সতীত্বের গৌরব ভারতীয়েরা করিয়া থাকেন, তাহা রক্ষার জন্য যথেষ্ট মনোযোগী লোকের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান একজনের সহায়তা না পাওয়া গেলে বা কম পাওয়া গেলে বাঙালী-সমাজের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

বোম্বাই প্রদেশে খুব-বেশী পরিমাণে নগদ টাকা উপার্জ্জন করিবার লোক বিস্তর আছে। সুতরাং তথাকার কোন লোক আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করিয়াও যদি ভারতগবর্ন্মেণ্টের শাসনপরিষদের সভ্য হইতেন, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বেশী রোজগারী বাঙালীর সংখ্যা কম, এবং তাঁহাদের মধ্যে সৎকার্য্যে দাতার সংখ্যা আরো কম। এইজন্য সতীশরঞ্জন

দাশের মত বেশী রোজগারী অথচ সৎকার্য্যে দাতা লোকের কার্য্যতঃ নিষ্ফল আর্থিক ক্ষতিস্বীকার আমরা ভাল মনে করি না। যদি ক্ষতিস্বীকার করিয়া তিনি ভারতবর্ষের শাসনবিধির উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ত্যাগস্বীকার সার্থক হইত। তাহার যখন কোন সম্ভাবনা নাই, তখন কেন তিনি কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান করিতে রাজী হইলেন ?

যদি সম্মানের কথা বলেন, এবং বিদেশী ভারত-গবর্ন্মেণ্টের শাসনযন্ত্রের একটা অঙ্গ হওয়া সম্মানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন অথচ তিনি পদটি লইতে রাজী হইলেন না, অবস্থা এইরূপ ঘটিলে সম্মানের কিছু কমী হইত কি ?

—

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী

বঙ্গের বাহিরে যে-সব বাঙালী বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া "প্রবাসী"ই তাঁহাদের কথা বঙ্গ-নিবাসী বাঙালীদিগকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিতে আরম্ভ করে, এবং "প্রবাসী"তে প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই কাজ করেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী বলিতে আমরা বরাবর সেইসকল বাঙালী বুঝিয়াছি, যাহারা বাংলা দেশে বাস করেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গ কথাটির মানে দুরকম। প্রাকৃতিক বঙ্গ এবং গবর্ন্মেণ্টের বঙ্গ এক নয়। শ্রীহট্ট প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত, কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট উহাকে আসাম প্রদেশের মধ্যে ফেলিয়াছেন। মানভূম প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত, কিন্তু সর্কারী ভূখণ্ডবিভাগ অনুসারে উহা বিহারের অন্তর্গত। এইরূপ আরো ছোট বড় কোন কোন জেলা ও মহকুমা আছে, যাহা বস্তুতঃ বঙ্গের অংশ অথচ অন্য কোন কোন প্রদেশের সামিল হইয়া আছে। প্রাকৃতিক বঙ্গ আমরা তাহাকেই বলি, যাহার অধিকাংশ অধিবাসী বহুশতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষায় কথা বলিয়া আসিতেছে।

এইরূপ কোন স্থান বাংলার বাহিরের কোন প্রদেশের অন্তর্ভূত থাকা উচিত নহে। ভারত-শাসনসংস্কার-বিধিতে এই নীতি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকৃতও হইয়াছে, যে, এক-ভাষাভাষী পরস্পরের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহ একই প্রদেশভুক্ত হওয়া উচিত।

এইজন্য শ্রীহট্টকে সর্কারী বঙ্গের সামিল করিবার নিমিত্ত যে-আন্দোলন হইতেছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সমর্থন করি।

মানভূমকে বিহার হইতে বিযুক্ত করিয়া বাংলার সামিল করিবার নিমিত্তও এইরূপ আন্দোলন হওয়া উচিত।

এইরূপ আরো যত ভূখণ্ড আছে, তাহার অধিবাসীরাও আন্দোলন করুন।

এক-ভাষাভাষী লোকেরা একত্র বাস করিলে সাহিত্যিক ও অন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা যেরূপ বলবতী হয়, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিলে সেরূপ হয় না।

বাঙালী জাতির অধিকাংশ লোকের সহিত যোগ রক্ষা করিতে না পারায় যে-ক্ষতি, তাহা ছাড়া মানভূমের লোকদের অন্য নানাবিধ অসুবিধাও আছে। বিহারের শিক্ষাবিভাগের সমুদয় বন্দোবস্ত প্রধানতঃ বিহারীদের উপযোগী করা হইয়াছে। বাঙালীদের জন্য যাহা উপযোগী তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত বিশেষ কোন চেষ্টা বিহারের শিক্ষাবিভাগ করিতে পারেন না। ইহাতে শিক্ষাবিষয়ে মানভূমের লোকদের অসুবিধা হইতেছে। মানভূমের আদালতের ভাষা বাংলা। কিন্তু যে-সব বিহারী মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি কর্ম্মচারী তথায় কাজ করিতে যান, তাঁহারা অনেকেই বাংলা জানেন না এবং বাংলা দলিলাদি পড়িতে পারেন না। ইহাতে বিচার ও অন্যান্য রাজকার্য্যের অসুবিধা হয়।

আমরা প্রবাসীর গত এক সংখ্যায় দেখাইয়াছি, যে, বাংলা, আগ্রা-অযোধ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও পাঞ্জাব এই পাঁচটি প্রধান প্রদেশের মধ্যে বাংলার লোক-সংখ্যা যদিও অধিকতম কিন্তু ইহার সর্কারী আয় সর্ব্বাপেক্ষা কম। মানভূমে বর্ত্তমান সময়েই অনেক খনি আছে : ভবিষ্যতে আরও অনেক খনিজ পদার্থ ঐ জেলা হইতে আহৃত হইবে এবং খনির সংখ্যা বাড়িবে। এইসমুদয় খনি

হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে লব্ধ সব্‌কারী আয় হইতে বাংলা গবর্ন্মেণ্ট্‌কে বঞ্চিত করা অনুচিত। বাংলা দেশ হইতে প্রাপ্ত ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স সর্ব্বাধিক; তাহা ভারত গবর্ন্মেণ্ট্‌ গ্রহণ করেন। বঙ্গের বাণিজ্যশুল্কও খুব বেশী; তাহাও ভারত গবর্ন্মেণ্ট্‌ গ্রহণ করেন। পাটের রপ্তানী-শুল্কও বঙ্গের একচেটিয়া; কিন্তু তাহাও ভারত গবর্ন্মেণ্ট্‌ শোষণ করেন। ভারত গবর্ন্মেণ্ট্‌ এই প্রকারে কৃত্রিম অন্যায্য উপায়ে বাংলা গবর্ন্মেণ্টকে দরিদ্র করিয়াছেন। তাহার উপর আবার বহুকাল ধরিয়া যে ছোটনাগপুর বঙ্গের সহিত যুক্ত ছিল, সেই বহুখনিজসম্ভারসমৃদ্ধ ভূখণ্ডকে বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। উহার সমুদয় অংশের উপর বঙ্গের ন্যায্য দাবী নাই—যদিও বিহারেরও ন্যায্য দাবী নাই; কিন্তু যে-সকল অংশের অধিকাংশ অধিবাসী বাঙালী, সেই সমুদয় অংশের উপর নিশ্চয়ই বঙ্গের দাবী আছে। তাহা বঙ্গের সহিত পুনর্যুক্ত হউক।

—

বীরাষ্টমী

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী সরলা দেবী বঙ্গে বীরাষ্টমী উৎসব পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন। বহু বৎসর উহা বন্ধ ছিল। এবার তিনি আবার উহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। বালক ও যুবকেরা সুস্থ, সবল এবং আত্মরক্ষা ও দুর্ব্বলের রক্ষায় সমর্থ হন, ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। শ্রীমতী সরলা দেবী নারীদিগের মধ্যেও আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভের ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গের মহা কল্যাণ সাধন করিবেন।

বীরাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গের আদর্শ বীররূপে খাড়া করার সমর্থন আমরা করিতে পারি না। তাঁহাকে আদর্শ বীর বলিয়া চিত্রিত করিতে হইলে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের অপলাপ করিতে হয়, এবং চূণকামের প্রয়োজনও বড় কম হয় না। একজন আদর্শ বীর খাড়া করিতে না পারিলেও বীরাষ্টমীর উৎসব সুনির্ব্বাহিত এবং উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

—

শৈতানের দেবোত্তর বিল

আধুনিক সময়ে কেহ কেহ পাওনাদারদিগকে ফাঁকি দিবার জন্য নিজের সমুদয় সম্পত্তিকে দেবোত্তর এবং উত্তরাধিকারীদিগকে সেবাইত করিয়া দেন। কিন্তু আগেকার যে-সব দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, তাহার অধিকাংশ ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। কিন্তু তাহা ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও তাহার অধিকাংশ আয় সেবাইতদিগের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য খরচ করা হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দেবোত্তর সম্পত্তির আয় পাপাচরণে ও বহু-সংখ্যক নারীর সর্ব্বনাশসাধনের জন্য ব্যয়িত হয়। অনেক মহান্ত দুরাচার; তাহাদের দ্বারা এইরূপ অধর্ম্ম আচরিত হয়।

দেবোত্তর সম্পত্তির আয় যাহাতে ধর্ম্মার্থেই ব্যয়িত হয়, তাহার আইন-সঙ্গত উপায় নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষিত, প্রকাশিত ও পরীক্ষিত যাহাতে হয়, এতদ্বিষয়ক আইনে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এইরূপ আইন মান্দ্রাজ প্রদেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বাংলায় এইরূপ আইন করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ শৈতান একটি বিল প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার মূল নীতির আমরা সমর্থন করি। এইরূপ আইন অনুসারে কাজ হইলে নারীর সর্ব্বনাশসাধন ও অন্যবিধ নানা পাপাচার কমিবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির কতক আয় ব্যয়িত হইলে তাহা দাতাদের উদ্দেশ্যবিরোধী হইবে না।

—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচনের অনুমোদন করায় তিনি সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। কেবল তিনটি কমিটি পুনার শ্রীযুক্ত নরসিংহ চিন্তামন্ কেলকারকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে চাহিয়াছিলেন।

ভারতীয়া মহিলা এই প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারত-

বর্ষের সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বিষয়ে বহুবার বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি এজন্য বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য তথায় গিয়াছিলেন। বক্তৃতাশক্তি, সাহস, রাজনীতি-জ্ঞান ও মনস্বিতা দ্বারা তিনি তথাকার অনেক ইউরোপীয়ের নিকট হইতেও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমান সভ্যতার উৎকৃষ্ট দিকৃটি সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তিনি অনেক মুসলমান মহিলা ও ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন। এইজন্য তিনি কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে মুসলমান সমাজের পক্ষে প্রীতিকর অনেক কথা বলিতে পারিবেন। উর্দ্দুতে বক্তৃতা করিবার অনুরোধ হইলে তিনি তাহাও সুন্দররূপে করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার কিম্বা অন্য কাহারও বক্তৃতায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত বা বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহা না থাকিলেও সকল রাজনৈতিক দল যাহাতে এখন হইতে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন, তাহার চেষ্টা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু করিতে পারেন, এবং সে-চেষ্টা সফলও হইতে পারে। কারণ, এখন যে-কেহ বার্ষিক চারি আনা চাঁদা দিলেই কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারেন। এখন অবশ্য কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ স্বরাজীরা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে মডারেট বা উদার-নৈতিকদের মতই কখন গবর্মেণ্টের সহযোগিতা কখন বা বিরোধিতা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের মূল রাজ-নৈতিক মত বা কার্য্য-প্রণালীতে উদারনৈতিকদিগের সহিত বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা অবশ্য চরম উপায় নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘনের কথা এখনও উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন বটে; কিন্তু তাহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। উহার মূল্য অন্ততঃ গবর্মেণ্ট্ বুঝিতে সমর্থ।

—

এশিয়া আতঙ্ক-প্রসূত বিল

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোৎপন্ন অনেক লোকের বাস। তথাকার তথাকথিত শ্বেত মানুষেরা নিজেদের ধনোপার্জ্জনের সুবিধার নিমিত্তই প্রথমতঃ অনেক ভারতীয়কে চুক্তিবদ্ধ কুলিরূপে তথায় লইয়া যায়। তাহাদের চুক্তির সময় শেষ হইবার পর তাহারা অনেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া যায়, এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিও অনেক হইয়াছে। তা ছাড়া প্রধানতঃ এইসকল ভারতীয়ের দরকারী নানা জিনিষ জোগাইবার ও প্রয়োজন সাধন করিবার নিমিত্ত অনেক দোকানদার, ফেরীওয়ালা, কারিগর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতিও দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল। অল্পসংখ্যক আইনজীবী, শিক্ষক প্রভৃতি ভারতীয়ও তথায় যায়।

অনেক বৎসর হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়েরা স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহী সমুদয় ভারতীয়কে নানা প্রকারে ঐ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কারণ, শ্বেতকায়েরা বুঝিয়াছে, কোন প্রকার কাজেই তাহারা অবাধ প্রতিযোগিতায় ভারতীয়-দিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না; কেননা, ভারতীয়দের খরচ কম এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী বলিয়া তাহারা জিনিষপত্র শ্বেতকায় ব্যবসা-দারদের চেয়ে সস্তায় দিতে পারে। ভারতীয়দিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ অবলম্বন করেন। তাহার ফলে তৎকালীন মন্ত্রী জেনারাল স্মাট্‌স্‌এর সহিত একটা রফা হয়। সেই রফা ভঙ্গ করিয়া এখন আবার নূতন উদ্যমে ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম মন্ত্রী ডাক্তার ম্যালান্ তৎপ্রণীত আইনের খসড়া তথাকার ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে স্থাপিত করিবার অনুমতি চাহিবার নিমিত্ত যে-বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "জাতি হিসাবে ভারতীয়েরা এদেশে বিদেশী; এই প্রশ্নের কোন সমাধানই এই দেশ-বাসীরা অনুমোদন করিবে না, যদি তাহা এই পরদেশীদের সংখ্যা খুব হ্রাস করিতে না পারে।" অবশ্য বিলটার আসল উদ্দেশ্য ভারতীয়দের হ্রাস নহে, তাহাদের উচ্ছেদই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বাসার্থ জমীর বা চাষের জমীর মালিক হওয়া কিম্বা

ব্যবসা বাণিজ্য করা দুঃসাধ্য বা অসম্ভব করিয়া তোলা হইবে।

ইহা যে কিরূপ অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, যে, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের প্রায় কাহারও ভারতবর্ষে ঘরবাড়ী নাই; তাহাদের অনেকেরই নিজের এবং বিস্তর লোকের বাপ-পিতামহের পর্য্যন্ত জন্ম হইয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকায়; তাহাদের বিস্তর লোক ভারতবর্ষের কোন ভাষায় কথা বলিতে পারে না; তাহাদের পরিশ্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা ধনশালী হইয়াছে; এবং তাহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলে এক ছটাক জমীও কোথাও পৈত্রিক ভিটা বলিয়া দাবী করিতে পারিবে না, এবং কোথাও জীবিকানির্ব্বাহ করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে।

আফ্রিকা কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোদের দেশ। মূলতঃ শ্বেত-কায়েরাও তথায় পরদেশী। কিন্তু পাশ্চাত্য রাজনীতির ন্যায়বিচার এমনি, যে, একজন শ্বেতকায় যদি সত্তর বৎসর বয়সে আফ্রিকার কোথাও গিয়া আড্ডা গাড়ে, তাহা হইলে সে পরদেশী বিবেচিত হইবে না, কিন্তু একজন ভারতীয়ের বাপ-পিতামহ পর্য্যন্ত যদি আফ্রিকা-জাত হয়, তাহা হইলেও সে তথায় পরদেশী বিবেচিত হইবে। ইহাও কম করিয়া বলা হইল। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে, যখন ইংরেজ ভারতে আসে নাই, তখন হইতে অনেক ভারতীয় পূর্ব্ব আফ্রিকায় বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করিতেছে; তাহাদেরই শ্রমে পূর্ব্ব আফ্রিকা সভ্য মানুষের বাসযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব আফ্রিকাতেও ভারতীয়েরা পরদেশী এবং সেদিনকার আগন্তুক ইংরেজরা "স্বদেশী"; সেখান হইতেও ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১১ই অক্টোবর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাক্তার ম্যালানের বিলের প্রতিবাদ করিতে ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দিগের দুঃখমোচনার্থ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। (৬-১০-১৯২৫।)

—

বোম্বাই মিলসকলে ধর্ম্মঘট

বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের মিলে যত কাপড় উৎপন্ন হয়, তাহার কাটতি কম হওয়ায় মিলওয়ালারা শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দেয়। তাহাতে একটি একটি করিয়া সমুদয় মিলের শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়াছে। বোম্বাইয়ের মিলসকলের কাপড়ের কাটতি কমিবার কারণ অনেক। জাপানের প্রতিযোগিতা তাহার মধ্যে একটি। উৎপাদনের ও বিক্রয়ের ব্যবস্থাতেও দোষ আছে। মিলওয়ালারা কিন্তু বলিতেছে, যে, তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের উপর যে-শুল্ক আছে, তাহা উঠাইয়া দিলে তাহারা দর কমাইতে ও কাটতি বাড়াইতে পারিবে। এই শুল্কের ইতিহাস সুবিদিত। বিলাতী কাপড় ও সূতার উপর যখন শুল্ক বসে, তখন বিলাতী মিলওয়ালারা দাবী করে, যে, শুল্ক ভারতের মিলজাত কাপড় ও সূতার উপরও বসুক। দেশী পণ্যশিল্প রক্ষার জন্য বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসান প্রচলিত রীতি; কিন্তু যে-দেশে কাপড় প্রস্তুত হয়, সেই দেশেই তাহার উপর ট্যাক্স্ বসান অসঙ্গত ব্যবস্থা। কিন্তু ভারত-প্রভু ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদের জেদে এই অসঙ্গত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই শুল্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন বহুবৎসরব্যাপী; ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাবও ধার্য্য হইয়া আছে, যদিও গবর্ণেমণ্ট্ তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমান ধর্ম্মঘট না ঘটিলেও ঐ শুল্ক উঠিয়া যাওয়া উচিত ছিল।

মিলওয়ালাদের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ইহা বলা আবশ্যক যে, তাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মূলধনের উপর শতকরা একশত, দুইশত, তিনশত, চারিশত টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তখন শ্রমিকদিগকে সেই অসাধারণ লাভের হারাহারি অংশ দেন নাই। সৌভাগ্যের সময় শ্রমিকদিগকে সুখের ভাগ না দিয়া, এখন কাটতি হ্রাসের সময় তাঁহারা শ্রমিকদিগের মজুরী কমাইতেছেন। এই ন্যায়বিরুদ্ধ ও নির্ম্মম আচরণের জন্য তাঁহারা সর্ব্ব-সাধারণের সহানুভূতি পাইবার অধিকারী নহেন।

মোটামুটি দেড় লক্ষ শ্রমিকের বেকার অবস্থা ঘটিয়াছে,

তাহাদের অনেকে নিজের নিজের গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। বিস্তর লোক বেকার হওয়ায় আহারাদির অপ্রাচুর্য্যবশতঃ নানাবিধ পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে। গবর্ণ্‌মেণ্ট্ এরূপ অবস্থায় বিলাতে যেরূপ সত্বর প্রতিকার-চেষ্টা করেন, এদেশে সেরূপ করেন না। বোম্বাই অঞ্চলে মিল-ওয়ালাদের প্রভাব বেশী বলিয়া শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য যথোচিত বে-সর্‌কারী চেষ্টাও ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে আরব্ধ হয় নাই।

—

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কর্ম্ম-পদ্ধতি

এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ বলেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কানপুর কংগ্রেসের জন্য নির্ব্বাচিত সভাপতিরূপে কি করিবেন, তাহার নিম্নলিখিতরূপ আভাস দিয়াছেন :—

"নারীর পক্ষে যাহা শোভা পায়, আমার কার্য্য-পদ্ধতি সেইরূপ অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য রকমের হইবে। উহার উদ্দেশ্য হইবে কেবলমাত্র ভারতমাতাকে তাঁহার গৃহ-স্থালীতে একমাত্র কর্ত্রীর, তাঁহার সমৃদ্ধির অপরিমেয় উপাদান ও উপায়সকলের একমাত্র অভিভাবিকার এবং তাঁহার অকুণ্ঠিত আতিথ্যের একমাত্র বিতরিত্রীর পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। ভারতমাতার ভক্তিমতী কন্যারূপে আগামী সারা বৎসর ধরিয়া আমার প্রীতিপ্রসূত যদিও দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য হইবে, আমার মায়ের ঘরকন্নায় শৃঙ্খলা আনয়ন, যে শোকাবহ বিবাদ-বিরোধে তাঁহার নানা সম্প্রদায়ের ও ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্মিলিত পরিবারের একত্বকে ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া সদ্ভাব স্থাপন, তাঁহার গৃহস্থালীতে তাঁহার দীনতম ও প্রবলতম সন্তানদের জন্য উপযুক্ত স্থান, জীবনোদ্দেশ্য ও সম্মান নির্দ্ধারণ, এবং তাঁহার গৃহে তাঁহার সন্তান, অতিথি ও বিদেশী আগন্তুকদিগের পোষণ।"

তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক।

—

ব্রহ্মদেশে বহিষ্কার আইনের প্রতিবাদ

ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি যে বহিষ্কার আইন পাস হইয়াছে, তদনুসারে, ব্রহ্ম-প্রবাসী কোন ভারতীয় কোন কোন অপরাধে দণ্ডিত হইলে, তাহাকে ব্রহ্মদেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া চলিবে। ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সভ্যেরা এবং কোন-কোন ইউরোপীয় সভ্য উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও সর্‌কারী সভ্য ও জাতীয় দলের ব্রহ্মদেশীয় সভ্যদের মিলিত ভোটে উহা পাস্ হইয়াছে। এক্ষণে অনেক ব্রহ্মদেশীয় ব্যক্তিও প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া উহার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতেছেন।

অতঃপর খাস্ ভারতবর্ষের এক-একটি প্রদেশের গবর্ণ্‌মেণ্ট্ অন্য-সব প্রদেশের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করিলেই ইংরেজ-ভেদনীতির পূর্ণ বিকাশ হয়! তাহা অসম্ভবও নহে। কারণ নির্ব্বুদ্ধিতা ও প্রাদেশিক ঈর্ষা ব্রহ্মদেশীয়দিগের একচেটিয়া নহে।

একই ব্রিটিশ প্রভুর গোলাম ভারত-সাম্রাজ্যের এক অংশের লোকেরা যখন অন্য অংশের লোকদের বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করিতেছে, তখন দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতীয়দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, যে, দণ্ডিত অপরাধীকে তাড়াইয়া দেওয়া বিশেষ আপত্তিজনক নহে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, ব্যবস্থাটা কিরূপ অদ্ভুত। বিশেষ রকম ও গুরুতর অপরাধ না করিলে এক স্বাধীন জাতির লোক অন্য স্বাধীন দেশ হইতে যথা—ইংরেজ ফ্রান্স্ হইতে, ফরাসী ইংলণ্ড হইতে, সুইডে ইটালী হইতে ইত্যাদি তাড়িত হয় না। কি স্বদেশী কি বিদেশী চির-নির্ব্বাসন দণ্ড গুরুতর অপরাধ ভিন্ন কাহাকেও দেওয়া হয় না। তা' ছাড়া, ব্রহ্মদেশীয় যে-অপরাধ করিলে তাড়িত হইবে না, ভারতীয় তাহা করিলে তাড়িত হইবে। এইরূপ অসাম্য ভারত-বিদ্বেষী ব্রিটিশ উপনিবেশসকলের ভারতীয়বিরোধী নীতির সমর্থনার্থ ব্যবহৃত হইবে।

যে-সব ভারতীয় রাজনৈতিক পুরুষ ব্রহ্মদেশে জাগরণ আনয়নের চেষ্টা করিবেন, কিম্বা ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের নামে একটা যা তা' অভিযোগ আনিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত করা কঠিন হইবে না।

সর্‌কারভৃত্য ইংরেজদের প্ররোচনায় ব্রহ্মদেশের

জাতীয় দল নির্ব্বোধের কাজ করিতেছেন। ভারতবর্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মদেশের বহিষ্কার আইনের মত আইন বর্ম্মাদের বিরুদ্ধে প্রণয়ন করিবেন না। কিন্তু করিলে তাহা বর্ম্মাদের কেমন লাগিবে?

—

গোকুলচন্দ্র নাগ

একত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগের যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্যের ও চিত্রকলার ক্ষতি হইল।

বাল্যকাল হইতে সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা



গোকুলচন্দ্র নাগ

চিত্রকলায় তাঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। তিনি তিন বৎসর কলিকাতায় সরকারী আর্টস্কুলে মিঃ পার্সি ব্রাউন্ ও শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, আনি বেসান্ট্ প্রভৃতির ছবি আঁকিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিবার দিকেই তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল।

তিনি ১৯১৮-১৯ সালে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম চক্রে কাজ করেন ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন।

১৯২০-২১ সালে ফোর্ আর্টস্ ক্লাবের (Four Arts Clubএর) সংস্রবে সুনীতি দেবী, মণীন্দ্রলাল বসু, দীনেশরঞ্জন দাশ ও তিনি "ঝড়ের দোলা"-নামক গল্পের বহি প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী বৎসর তাঁহার ছোট গল্পের বহি "সোনার ফুল", এবং টেনিসনের "দি প্রিন্সেস্" কাব্য অবলম্বনে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য "রাজকন্যা" প্রকাশিত হয়।

১৯২২ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত তিনি দীনেশরঞ্জন দাশের সহিত "কল্লোল" নামক মাসিক পত্র সম্পাদন ও পরিচালন করেন। এই সময়ে "পথিক" নামক সামাজিক উপন্যাসের রচনা আরম্ভ হয়। ইহা কিছুদিন হইল ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি রোগশয্যায় ইহার প্রুফ দেখিয়াছিলেন। তিনি মেটারলিঙ্কের ব্লু-বার্ডের বঙ্গানুবাদ "পরীস্থান" নাম দিয়া রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "মায়ামুকুল" নামক ছোট গল্প গ্রন্থ, ও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

লক্ষ্ণৌ ট্রেন-ডাকাতি ও কংগ্রেস্‌ওয়ালাদের গ্রেপ্তার

লক্ষ্ণৌ ট্রেন-ডাকাতি উপলক্ষ্যে আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের পুলিস্ কয়েকজন কংগ্রেসের সভ্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, এবং পরে হয়ত আরও অনেককে গ্রেপ্তার করিতে পারে। নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ ব্যতিরেকে ধৃত ব্যক্তিদিগকে অপরাধী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। পণ্ডিত জওয়াহির্ লাল নেহ্‌রু বলিয়াছেন, যে, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু আছেন। তিনি বিশ্বাস করেন না, যে, তাঁহারা এরূপ জঘন্য কাজ করিতে পারেন।

এ বৎসর আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইলে এখন আর নিজের হাতে চর্‌কায় সূতা কাটিয়া চাঁদা স্বরূপ তাহা দিতে হইবে না; চারি আনা চাঁদা বৎসরে দিলেই হইবে।

সুতরাং এখন কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা খুব বাড়িতে পারে, এবং কংগ্রেস দলে পুষ্ট হইলে তাহার প্রভাবও বাড়িবে। কিন্তু কংগ্রেসের সভ্য হইলে যদি ডাকাতি অপরাধে র সন্দেহে ধৃত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অনেকে ইচ্ছা-সত্ত্বেও উহার সভ্য হইবে না। কংগ্রেসের সভ্যদিগকে গ্রেপ্তার করিবার কারণাবলীর মধ্যে এইরূপ কোন অভিসন্ধি আছে কি না, বলা যায় না। বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদের পরবর্ত্তী আন্দোলনের সময় অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে "রাজনৈতিক ডাকাতি" অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া দীর্ঘকাল হাজতে রাখিয়া তাঁহাদের "বিচার" করা হয়। কিন্তু পুলিস্ দোষ প্রমাণ করিতে না পারায় তাঁহারা বেকসুর খালাস পান; প্রসিদ্ধ স্বদেশী গায়ক হেমচন্দ্র সেন ইহার মধ্যে ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পূর্ব্বেও বাংলা দেশে ডাকাতি অপরাধে ধৃত কয়েকজন ভদ্রশ্রেণীর যুবক বিচারে খালাস পাইয়াছে।

ভদ্রশ্রেণীর লোকের কিম্বা কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত লোকের ডাকাত হওয়া একেবারেই অসম্ভব, বলিতেছি না। কিন্তু ইহাই বলিতে চাই, যে, কাহাকেও ডাকাত বলিয়া বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে সন্দেহাতীত প্রমাণ চাই। পক্ষান্তরে ইহাও বলিতেছি, যে, কোন-না-কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিরপরাধ লোকদিগকে গ্রেপ্তার করা পুলিসের পক্ষে অসম্ভব নহে।

—

বাংলায় শ্রমিকের সংখ্যা

একজন লেখক মহাত্মা গান্ধীকে বাংলা দেশের কলকারখানাসমূহের শ্রমিকদিগের সংখ্যার একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহা ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ৬,৬২,০০০। ইহাদের অধিকাংশ (প্রায় সকলেই বলিলে অত্যুক্তি হয় না) অবাঙালী। লেখক বলেন, ইহাদের নৈতিক অবস্থা বড় শোচনীয়। মদ, বেশ্যা ও জুয়াখেলায় ইহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ইহাদিগকে সৎপথে আনিয়া চরিত্রবান্ করিতে হইলে অনন্তকর্ম্মা, ত্যাগী ও পবিত্রচেতা এরূপ কর্ম্মীর প্রয়োজন, যাঁহারা ইহাদের মধ্যে দিবারাত্রি বাস করিবেন এবং নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। অর্থের অভাব হইবে না; যথেষ্ট অর্থ শ্রমিকরাই দিবে। ইহারা যদিও বাঙালী নহে, তথাপি ইহারা বাংলাদেশে বাস করে বলিয়া ইহাদের সংস্পর্শে বঙ্গের সামাজিক অধোগতি অনিবার্য্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং ধর্ম্মঘট ঘটাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ইহাদের প্রতি রাজনৈতিক বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকদের দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য এখনও নেতা ও নেতৃত্বাভিলাষী ব্যক্তিগণকে অনুপ্রাণিত করে নাই।

—

শ্রমিকদের নেশার খবর

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাক্তার মোহিনীমোহন দাসের একটি প্রশ্নের উত্তরে গবর্ন্মেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন, যে, কলকারখানার শ্রমিকরা চাষীশ্রেণীর লোকদের চেয়ে মদ, আফিং, গাঁজা প্রভৃতিতে বেশী খরচ করে। উক্ত সভা যখন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করেন, যে, এই অবস্থায় গবর্ন্মেণ্ট্ মদের দোকান কলকারখানার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া পানমত্ততার হ্রাস করিবেন কি না, তখন সরকার পক্ষ হইতে এমার্সন্ সাহেব বলেন, "না"।

লর্ড কার্জ্জন্ বলিয়াছিলেন, ভারতশাসন ও ভারতবর্ষ হইতে ধন আহরণ (administration and exploitation) একই প্রক্রিয়ার দুটা দিক্। বক্ষ্যমাণ বিষয়টি হইতে দেখা যাইতেছে, যে, কম মজুরী দিয়া ইউরোপীয় কলকারখানাওয়ালারা শ্রমিকদের পরিশ্রম হইতে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিতেছে। আবার ভারত-শাসনযন্ত্র মদ, গাঁজা, আফিং শ্রমিকদের দরজার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া ঐ কম মজুরীতেও ভাগ বসাইতেছে।

অসভ্য লোকদিগকে সভ্য করিয়া তাহাদের পরিত্রাণ সাধনের ইহা অপেক্ষা ভাল উপায় আর কি হইতে পারে?

—

নারীর সাহস

নারীর উপর অত্যাচার বাংলাদেশে বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। পুরুষেরা নিরস্ত্র ও নির্বীর্য্য এবং নারীরা

ঘরের মধ্যেই জীবনের অধিকাংশ সময় আবদ্ধ থাকায় দুর্বৃত্ত লোকদের খুব সুবিধা হইয়াছে। এরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও কোন মহিলা সাহস দেখাইলে তাহা প্রাণে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে। এইরূপ একটি সাহসের দৃষ্টান্ত কলিকাতার দৈনিক "হিন্দুস্থান" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

গিরীশচন্দ্র আদক বজবজ থানার এলাকাধীন রাজারামপুরের একজন ধনী গৃহস্থ। গত ১৬ই তারিখ সন্ধ্যার কিছু পরে, গিরীশবাবুর স্ত্রী তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন; ছেলেপিলেরা তাঁহার পাশে খেলিতেছিল। ঐ সময় তিনি কতকগুলি লোককে তাঁহাদের বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে দেখিতে পান। স্বামী গৃহে ছিলেন না, এমন অবস্থায় অপরিচিত লোকদিগকে ঐরূপ সময় বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকের মনে স্বভাবতঃই ভয় হয়। তিনি ছেলেপিলেদিগকে ঘরের ভিতরে দিয়া নিজেও তাহাদের পিছনে ঘরে ঢুকিতে যাইতেছেন ঠিক সেই সময়ই ডাকাতদের মধ্যে একজন ছুটিয়া বারান্দার উপর উঠে এবং দরজা বন্ধ করিতে বাধা দেয়। গিরীশ-বাবুর পত্নী ঘরের ভিতর হইতে দরজা চাপিয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করেন --দুই দিক হইতে প্রবল সংগ্রাম চলিতে থাকে। দরজা বন্ধ হইতেছিল না। ভিতরে মাঝে ফাঁক একটু বেশী হইতেছিল, একজন ডাকাত ঐ ফাঁকের ভিতর দিয়া একটা পটকা ছুঁড়িয়া দেয়; পটকাটি ফাটিয়া গিরীশ-বাবুর পত্নীর গায়ে লাগে। এই ব্যাপারে তাঁহার হাতের জোর একটু ঢিলা হয়। দরজার ফাঁক আরও বেশী হয়। ঐ সময় একজন ডাকাত দরজার দুইটি পাটের ভিতর দিয়া হাত গলাইয়া দেয়। গিরীশ-বাবুর পত্নী মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন—তিনি দমিয়া না গিয়া দ্বিগুণ জোরে দরজা চাপেন এবং ডাকাতের ৪টি আঙ্গুল সহিতই দরজার খিল আঁটিয়া দেন। অতঃপর ডাকাতেরা তাহাদের সঙ্গীকে ছাড়াইবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হয় না। অবশেষে তাহাদের সঙ্গীর চারিটি আঙ্গুল সেই দরজার সঙ্গে রাখিয়াই তাহাদিগকে প্রাণ লইয়া পলাইতে হয়। পুলিশ ঐ চারিটি আঙ্গুলকে সূত্র স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ডাকাতদের খোঁজ করিতে থাকে। খোঁজ হয় যে, রাজারামপুরের নিকটবর্ত্তী কালীপুরের যোগেন্দ্রনাথ দাশের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র দাশের চারটি আঙ্গুলের সম্প্রতি অভাব ঘটিয়াছে। যোগেন্দ্র-বাবু সম্ভ্রান্ত এবং ধনী ব্যক্তি, বঙ্কিম তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আলীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বঙ্কিমকে হাজির করা হইয়াছিল। বঙ্কিম তাঁহার কাছে স্বীকারোক্তি করিয়াছে। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

নারীর সাহসের দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে বিরল নহে। দৃষ্টান্তগুলি যদি কেহ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নিশ্চয় দেশের উপকার হইবে। যিনি সংগ্রহ করিবেন, তিনি কোন্ ঘটনা কোন্ তারিখের কোন্ সংবাদপত্র হইতে গৃহীত, তাহা যেন সকল স্থলে নির্দ্দেশ করেন। দৃষ্টান্তগুলি সংকলিত ও সুবিন্যস্ত হইলে প্রকাশকের অভাব হইবে না।

—

ইতিহাস দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উৎপাদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অতঃপর ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা বাংলা ভাষার সাহায্যে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই নিয়ম প্রণয়ন উপলক্ষ্যে আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, যে, অতঃপর প্রবেশিকার উপযোগী ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক বাংলাভাষায় লিখিতে হইবে।

তৎসম্পর্কে একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে; ভারতবর্ষের বিদ্যালয়পাঠ্য ইতিহাস রচনা করিবার সময় ভারতীয় লেখকেরা সচরাচর ইংরেজ ঐতিহাসিকদের পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল স্থলে তাহা বিধেয় নহে। ইংরেজদের লেখা ইতিহাস দ্বারা অনেক স্থলে অকারণ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব উৎপাদিত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। সত্যের অপলাপ বা গোপন করিতে আমরা বলিতেছি না। কিন্তু মিথ্যা পরিহার করিতে হইবে, এবং সত্যও এরূপ ভাষায় ও এরূপ সাবধানতার সহিত বলিতে হইবে, যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঈর্ষ্যা আদি জন্মিবার বা স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা যথাসম্ভব কম হয়।

—

রামলীলা বন্ধ

বাংলাদেশে যেমন দুর্গোৎসব, হিন্দীভাষী সমুদয় উত্তর ও মধ্যভারতে রামলীলা তেমনি বৎসরের মধ্যে সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য উৎসব। এই উপলক্ষ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ ও রামের জয়লাভ শোভাযাত্রা দ্বারা ব্যক্তিত হয়, এবং তদ্ভিন্ন কোন কোন যুবককে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি সাজাইয়া শোভাযাত্রার সহিত লইয়া যাওয়া হয়। সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তির সংও কিছু কিছু শোভাযাত্রার সহিত বাহির করা হয়।

যাহাতে সাক্ষাৎভাবে সমাজে দুর্নীতি ও অপবিত্রতা বাড়ে, এরূপ কোন কোন সামাজিক অনুষ্ঠান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু অন্ত কোন স্থলেই কোনও

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পূজা-উৎসব প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করা গবর্মেণ্টের অকর্ত্তব্য। কিন্তু এবৎসর গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা এলাহাবাদ ও অন্য কোন কোন জায়গায় প্রকারান্তরে হিন্দুদিগকে রামলীলারূপ উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদ উৎসব বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। আমরা এলাহাবাদের কথা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানি; এইজন্য এখানকার কথাই লিখিব।

আমরা ১৮৯৫ হইতে ১৯০৮ পর্য্যন্ত তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। তাহার পরেও বহুবার এখানে পূজার ছুটিতে আসিয়াছি। এলাহাবাদ-প্রবাসের শেষ কয়েক বৎসর, যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া রামলীলার শোভাযাত্রা গিয়া থাকে, সেই রাস্তার একটি বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম। এখানকার বিখ্যাত পাণিনি আফিস যে-বাড়ীতে অবস্থিত তাহাও গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর। এই বাড়ীতে বসিয়া দাঁড়াইয়া প্রতি বৎসর শতশত হিন্দুস্থানী ও বাঙালী পুরুষ ও নারী রামলীলা দেখিয়া থাকেন; আমরাও অনেকবার দেখিয়াছি। বর্ত্তমান বৎসর এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ হুকুম করেন, যে, গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের উপরে স্থিত তিনটি মস্জিদের সম্মুখে হিন্দুদিগকে শোভাযাত্রার আনুষঙ্গিক গীতবাদ্য বন্ধ করিতে হইবে। গীতবাদ্য শোভাযাত্রার অঙ্গ এবং এলাহাবাদে উহা বন্ধ করিতে কোন বৎসরই বলা হয় নাই। সুতরাং এবৎসর এরূপ হুকুম দেওয়ায় হিন্দুরা স্থির করেন, যে, বরং তাঁহারা রামলীলা করিবেন না, তবু ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় আদেশ মানিয়া লইবেন না। আমাদের বিবেচনায় হিন্দুরা ঠিক্ কাজ করিয়াছেন। সহকারী কর্ম্মচারীর আদেশে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। অবশ্য, যদি কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক আপোষে নিজেদের কোন কোন অধিকার-ভোগ স্থগিত রাখেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে, হিন্দুরা এবার যদি রামলীলা বাহির করিতেন এবং তিনটি মস্জিদের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ করিতেন, তাহা হইলেও কোন-না-কোন অছিলায় একটা দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করা হইত; বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহার আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছিল।

মস্জিদের সম্মুখে, বিশেষতঃ নমাজের সময়, গীতবাদ্য মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহার আলোচনা করিতে আমরা অসমর্থ; কারণ আমরা তাঁহাদের শাস্ত্রের সামান্য অংশমাত্র অনুবাদ পড়িয়াছি। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝিতে পারি, যে, যখন ঈশ্বরের আরাধনা-আদি মস্জিদে হয়, তখন বাহিরে গোলমাল হইলে ব্যাঘাত জন্মে; অন্য সময়ে কোন গোলমাল হইলে ক্ষতি নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের আরাধনা প্রার্থনা ধ্যানধারণার স্থান সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, যে, বড় বড় শহরে রাস্তার উপর নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দির অবস্থিত, এবং রাস্তা দিয়া ভোর হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানারকমের গাড়ী ও অন্য বাহন, নানা রকমের মানুষ ও জন্তু নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে যায়। তাহাতে আরাধনা, ধ্যানধারণা দূরে থাকুক, সাধারণ কথা-বার্ত্তা, পরামর্শ ও লেখাপড়ার কাজ করাও অনেক সময় নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু অভ্যাসদ্বারা মনকে বাহ্যবিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের-নিজের কাজে মন দিতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মের মসজিদ মন্দির গির্জ্জা গুরুদ্বারা প্রভৃতির সম্মুখে দিবস ও রাত্রির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাস্তার সব শব্দ বন্ধ করিতে হইলে নগরবাসীদের কাজ করা সুকঠিন হয়। এইজন্য লোকালয়ে বাস করিতে হইলে কোন কোন অসুবিধা সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই।

মুসলমানেরা যখন অন্য নানা ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত একই দেশে, নগরে, গ্রামে বাস করেন, তখন তাঁহারা এরূপ দাবী করিলে সুশোভন হইবে না, যে, কেবল তাঁহাদেরই জন্য এরূপ কোন-কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহা অন্যের জন্য করিতে হইবে না। মুসলমানেরা যে-দেশের একমাত্র অধিবাসী, সেখানে অবশ্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ সুবিধা হইতে পারে।

শুধু মুসলমানদের শাস্ত্রে নহে, অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রেও এরূপ আদেশ থাকিতে পারে, যাহা কেবল ঐ-ঐ ধর্ম্মাবলম্বীরা মানিতে পারেন, অন্যেরা স্বেচ্ছায় মানিতে

পারে না। এই জন্য নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বাসভূমি ভারতবর্ষে সকলকে সুখে ও সদ্ভাবে এবং উন্নতিকর অবস্থাতে বাস করিতে হইলে, প্রত্যেককেই নিজের কিছু-কিছু দাবী হ্রাস করিতে বা ছাড়িয়া দিতে হইবে। এলাহাবাদ এবং অন্য নানাস্থানে বহুবৎসর ধরিয়া যে মস্‌জিদ গির্জ্জা প্রভৃতির সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্য হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে, ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মের ও সমাজের কোন ক্ষতি হয় নাই।

কেবলমাত্র হিন্দুদের গীতবাদ্যেই ব্যাঘাত বা ধর্ম্মহানি হয়, এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এলাহাবাদের যে গ্র্যাণ্ড্‌ট্রাঙ্ক্‌ রোডের তিনটি মস্‌জিদের সম্মুখে রামলীলার গীতবাদ্য বন্ধ করিতে ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দেন, সেই রাস্তায় ভোর হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত একার ঝন্‌ঝন্‌, ঘড়ং-ঘড়ং শব্দে কান ঝালাপালা হয়; তাহা মস্‌জিদের সাম্‌নে কেহ কখন বন্ধ করে না, করা যায় না। তাহার উপর ঘোড়ার-গাড়ীর শব্দ, মোটরকারের ভেঁপু, থিয়েটারের বিজ্ঞাপনদাতাদের ঢাকের শব্দ, এবং অন্যান্য গোলমাল এই রাস্তায় লাগিয়াই আছে। মহরমের সময় মুসলমানেরা যে দিনরাত ঢাক পিটান, তাহা কোন মস্‌জিদের সম্মুখে বন্ধ হয় না, কোন গির্জ্জার সাম্‌নে বন্ধ হয় না, কোথাও বন্ধ হয় না। সুতরাং যুক্তি ও সুবিবেচনার দিক্‌ দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়, যে, যে-সকল মুসলমানের অনুরোধে এলাহাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার হুকুম জারী করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রতি সদ্ভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই, এবং ম্যাজিষ্ট্রেটও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত দেখান নাই। সমস্ত বৎসর ধরিয়া মস্‌জিদের নমাজকারীরা যদি একার শ্রুতিকটু শব্দ, থিয়েটারের ঢক্কা নিনাদ, ঘোড়ার-গাড়ী, গরুরগাড়ী, মোটরকার প্রভৃতির শব্দ ও অন্য গোলমাল সহ্য করিতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মহানি না হয়, তাহা হইলে বৎসরান্তে একদিন কয়েক মিনিটের জন্য হিন্দুদের গীতবাদ্যে তাঁহাদের ধর্ম্মহানি হইত না, সাধনার ব্যাঘাত হইত না, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

অনেক দিন হইতে যাহা চলিয়া আসিতেছে, ধর্ম্মহানি হইলেও তাহা সহিয়া যাইতে হইবে, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। এই বৎসরই নাগপুরে মুসলমানদের সম্মতিক্রমে মসজিদের সম্মুখ দিয়া গীতবাদ্যসহ হিন্দুরা শোভাযাত্রা করিয়াছেন। তথাপি বলি, যদি এলাহাবাদের মুসলমানেরা মনে করিয়াছিলেন, যে, রামলীলার গীতবাদ্য মস্‌জিদের সম্মুখে বন্ধ না করিলে তাঁহাদেরও ধর্ম্ম টিকিবে না (যদিও গীতবাদ্যসত্ত্বেও এতদিন টিকিয়া আছে) তাহা হইলে হিন্দু-নেতাদের সহিত আপোষে এই বিষয়ে নিষ্পত্তি করাই উচিত ছিল। প্রয়োজন হইলে বাহিরের প্রসিদ্ধ মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের সাহায্য তাঁহারা লইতে পারিতেন। প্রথমেই ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য চাহিয়া তাঁহারা এই অপমানকর সিদ্ধান্তের প্রমাণ জোগাইয়াছেন, যে, হিন্দু-মুসলমানেরা সামান্য বিষয়েও নিজেরা কোন নিষ্পত্তি করিতে পারে না, একই মনিবের পরস্পরদংশনপরায়ণ কুকুরের মত তাহারা মনিবের চাবুকের অপেক্ষা রাখে।

সহজ বুদ্ধিতে ও সাধারণ যুক্তিতে যাহা বলে, আমরা তদনুসারে মুসলমানদের কি করা উচিত ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। কারণ ইংরেজদের যুক্তিই এই, যে, তাহারা হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ নিবারণের জন্যই এদেশে আসিয়াছিল ও এখনও আছে, সুতরাং তাহারা হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, কল্পিত-ঝগড়া, প্রত্যাশিত ঝগড়া, কৃত্রিম উপায়ে বাধান ঝগড়া ইত্যাদি কোনটাই নিবারণ করিবার বা মিটাইবার সুযোগ ছাড়িতে পারে না। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় সামাজিক হিত-সাধনের জন্য বে-সর্‌কারী সভ্যেরা কোন বিচার উপস্থিত করিলে গবর্ণ্‌মেণ্টের মুখপাত্রেরা কখন কখন ন্যাকা সাজেন ও বলেন, আমরা ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক।

মুসলমানদের যে-পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ছিল আমরা বলিয়াছি, মহাত্মা গান্ধীর একুশদিনব্যাপী উপবাসের সময়ের নানা সম্প্রদায়ের একতা-বিধায়ক কন্‌ফারেন্সে সেইরূপ পন্থাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উহার কয়েকটি প্রস্তাব নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

That Muslims must not expect to stop Hindu music near or in front of mosques by force, reso-

lution of a local body, act of legislature or order of court, except by mutual consent, but must rely upon the good sense of Hindus to respect their feelings.

Nothing stated in the above clause shall unsettle or affect any local custom or agreement between the two communities already in existence nor shall it authorise the playing of music in front of mosques where it has not been played before. Any dispute with regard to the latter shall be referred for settlement to the National Punchayet formed under Resolution No. 5.

The Hindu members of this conference call upon their co-religionists to avoid playing music before mosques in such a manner as to disturb congregational prayers.

—

পল্লীগঠনের জন্য স্বরাজ্য তহবিল

১৯২৪ সালের ২রা ডিসেম্বর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বঙ্গের পল্লী সকলের সংস্কার ও পুনর্গঠনের নিমিত্ত তিন লক্ষ টাকার জন্য একটি আবেদন-পত্র বাহির করেন, স্বরাজ্যদলের এই তহবিলের অধিকাংশ পল্লীগ্রামসমূহে কাজ করিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে ('will be mostly devoted to work in the villages') বলা হয়। গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখের ফরওয়ার্ড কাগজে দাশ-মহাশয় প্রকাশ করেন, যে, স্বরাজ্য তহবিলে ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ২২৫০০৩৸৴১১৷৹ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় ১৯শে ভাদ্র তারিখের নায়ক কাগজে লেখেন, যে, ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ২,৩২,২৯১৷১৷৹ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ১১ই সেপ্টেম্বরের ফরওয়ার্ডে এই তহবিলের আর্থিক কমিটির সভ্য প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসু, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাবু নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, বাবু শরৎচন্দ্র বসু ও বাবু নলিনীরঞ্জন সরকার সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়াছেন যে, ঐ তহবিলের হিসাবে ব্যাঙ্কে মোট ৯২,২১৯৶৩ প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মোট ১০৮৬৬৶৹র কতকগুলি চেক ছিল, যাহার টাকা পাওয়া যায় নাই; কারণ চেক্‌দাতাগণের হিসাবে ব্যাঙ্কে কোন টাকা ছিল না। এই সাধু ধনী দাতাগণ ছাড়া কতকগুলি দরিদ্রতর সাধু দাতা কিছু মেকী মুদ্রা দিয়াছিলেন; তাহার মোট পরিমাণ ১৫৻১০। এই সমুদয় সাধু দাতাগণের দান বাদ দিয়া ব্যাঙ্কে খাঁটি ৮১৩৮২৸৶৩ জমা ছিল। এই তহবিলের জন্ত আবেদন বাহির করিবার বহু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী ফরওয়ার্ডের জন্ত ছাপিবার যন্ত্রাদি কিনিবার নিমিত্ত যে সওয়া লক্ষ টাকা মূলধন খাটাইয়াছিলেন, তাহা স্বরাজ্য তহবিলে তিনি দান করেন, অর্থাৎ সেই টাকাটা স্বরাজ্য তহবিলে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তাহা হইতে যে-আয় হইবে, তাহা পল্লীগঠনের জন্ত ব্যয়িত হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

যাহা হউক যখন সর্ব্বসাধারণকে জানান হয়, যে, স্বরাজ্য তহবিলে সওয়া দুই লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে সওয়া লক্ষ টাকা যে এই রকমের দান তাহা প্রকাশ করা হয় নাই; স্বরাজ্য তহবিলে খুব টাকা আসিতেছে সর্ব্বসাধারণের মনে এই মিথ্যা ধারণা জন্মাইয়া আরও টাকা পাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ফরওয়ার্ড-কাগজ হইতে যদি কোন আয় না হয়, কিম্বা উহার পুরাতন যন্ত্রাদি অকেজো হইয়া গেলে নূতন যন্ত্রাদি কিনিবার জন্ত আবার টাকা তুলিতে হয়, তাহা হইলে এই সওয়া লক্ষ টাকা কিম্বা তাহার আয় পল্লীগঠনকার্য্যে কি প্রকারে ব্যয়িত হইবে? এরূপ ভেকী বাজী ভাল নয়। ইহা মিথ্যাচরণের মাসতুতো ভাই।

যে-সব সাধু ধনী দাতা মোট ১০৮৬৬৶৹র বাজে চেক্ দিয়াছিলেন, স্বরাজ্য তহবিলের আর্থিক কমিটির তাঁহাদিগকে উকিলের চিঠি দেওয়া উচিত, যে, হয় তাঁহারা স্ব স্ব চেকের সমান নগদ টাকা দিন, নতুবা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত উপায় অবলম্বন করা হইবে। প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া কমিটির উচিত নহে।

কমিটি যে-হিসাব দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ব্যাঙ্কে ৯২২৪৯৶৩ প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার সহিত তুলসী-বাবুর সওয়া লাখরূপ দ্বিতীয়বার জবাই-করা মুরগী যোগ করিলে মোট টাকা ২১৭২৪৯৶৩ হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন, মোট ২২৫০০৩৸৴১১৷৹ আদায় হইয়াছে। তাহা হইলে ৭৭৫৪৷৴৮৷৹র গরমিল হইতেছে। এই প্রায় আট হাজার টাকা কে লইল? চিত্তরঞ্জন সওয়া দুলাখ সংগৃহীত হইয়াছে প্রকাশ করিবার

পর প্রতাপচন্দ্র গুহরায় যে আরও প্রায় সাত হাজার টাকা আদায়ের সংবাদ "নায়ক" পত্রের মারফৎ জ্ঞাপন করেন, তাহারই বা কি হইল? অবশ্য স্বরাজ্য দলের প্রত্যেক সভ্যকে এই গরমিলের জন্য দায়ী করা যায় না। কিন্তু নেতারা ত দায়ী? চিত্তরঞ্জন পরলোকে, প্রতাপচন্দ্র জেলে। কৈফিয়ৎ কাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে? মহাত্মা গান্ধী এখন একটা খুব জবর রকমের সার্টিফিকেট্ স্বরাজ্য-দলকে বা উহার নেতাদিগকে দিলে ভাল হয়। তাহা সিলেট্ বা কাট্‌নীর অনেক মণ চূণের কাজ করিবে কি না, তাহা অবশ্য বলিতে পারি না।

যাহা হউক অর্থ-কমিটির হিসাব হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, খাঁটি ৮১৩৮২৮৶৩ ব্যাঙ্কে জমা হইয়াছিল। এই টাকার কত অংশ কি বাবতে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা দরকার। হিসাবে দেখা যাইতেছে, যে, একাশি হাজারের মধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা চিত্তরঞ্জনকে দেওয়া হয়, স্বরাজ্য দলের অতীত কালের দেনা শোধ ও বর্ত্তমান রাজনৈতিক কাজের জন্য। এই পঁচিশ হাজার কিরূপে খরচ করা হইয়াছে, তাহার কোন বিস্তারিত হিসাব দেওয়া হয় নাই। ১৯২৪ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখের দেশবন্ধুর স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনে লেখা হইয়াছিল বটে, যে, 'স্বরাজ্য তহবিলের অধিকাংশ টাকা পল্লীসমূহের কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, অর্থাৎ উহার কতক অংশ অন্য কাজেও খরচ হইতে পারে; সুতরাং আইনজীবীদের চুলচেরা তর্ক-অনুসারে এই ২৫০০০ টাকাকে তহবিল-তছরূপ বলা যায় না। তাহা হইলেও কি-কি বাবতে উহা খরচ হইল, তাহার একটা বিস্তারিত হিসাব দেশ-বন্ধুর দেওয়া উচিত ছিল। জমার অর্থাৎ আদায়ের ঘরে তিনি সাড়ে এগার পাইটি-পর্য্যন্ত দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু খরচের ঘরে পঁচিশের পিঠে, একটা নয়, দুটা নয়, একেবারে তিন-তিনটা শূন্য বড় বেমানান দেখাইতেছে।

পঁচিশ হাজার টাকাটা বড় সামান্য টাকা নয়। স্বরাজ্যদলের নেতারা দাবী করেন, যে, তাঁহারা লোকদের ভারী বিশ্বাসভাজন এবং দেশের মহা-উপকার করিয়াছেন। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অতীত দেনা-শোধ ও বর্ত্তমান রাজনৈতিক কাজের জন্য টাকা তুলিবার নিমিত্ত একটা স্বতন্ত্র আবেদন কেন বাহির করেন নাই? পল্লীসকলের দুরবস্থা সর্ব্বজনবিদিত, এবং পল্লীবাসীদের প্রতি অগণিত লোকের সহানুভূতি আছে। এই মমতার সুযোগে টাকা তুলিয়া তাহার মধ্য হইতে স্বরাজ্যদলের দেনা শোধ কি উচিত হইয়াছে?

তাহার পর দেখা যাইতেছে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিকে ৩২০০৲ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য প্রাদেশিক কমিটি কি দলিল দিয়াছেন, বা কি সম্পত্তি বন্ধক দিয়াছেন? এই টাকা আদায় কি প্রকারে হইবে? প্রাদেশিক কমিটির ব্যয় টিলক-স্বরাজ্য-ফণ্ড হইতে বা অন্য কোন উপায়ে নির্ব্বাহিত না হইয়া, পল্লীবাসীদের জন্য সংগৃহীত টাকা হইতে কেন নির্ব্বাহ করা হইল?

তাহার পর দেখা যাইতেছে, যে, ছয় শত কত টাকা স্বরাজ্যদলের মেসের খরচ; অর্থাৎ তাঁহারা ইহা নিজেদের খানাপিনায় ব্যয় করিয়াছেন। অবশ্য স্বরাজ্যদলের ভোক্তা এই সভ্যেরা কিম্বা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিম্বা আত্মীয় কুটুম্বেরা যখন কোন-কোন পল্লীগ্রামে বাস করেন বা করিতেন, তখন এই নবলগ্ ছয় শত টাকা পল্লীগ্রাম-সমূহের জন্য খরচ করা হইয়াছে বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না।

অতঃপর দেখা যাইতেছে, যে, আঠার শত টাকা মোটর-গাড়ীর ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রায় এগার হাজার টাকার বাজে চেক আদায় করিবার নিমিত্ত স্বরাজ্য দলের সভ্যেরা ট্যাক্সিতে চড়িয়া সাধু ধনীদাতাদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে দেখা যাইতেছে, যে, স্বরাজ্য তহবিল হইতে প্রায় দুই হাজার ("about two thousand") টাকা পল্লীগঠনের জন্য খরচ করা হইয়াছে—কোথায়-কোথায় কি-কি বাবতে তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। আশা করি ঠিক্ ১৯৯৯৸৶১৭৷৹ খরচ করা হইয়াছে; দুইয়ের পিঠে তিনটা শূন্য নিতান্ত অশোভন।

ব্যাঙ্কে খাঁটি জমা ৮১৩৮২৮৶৩ পাইয়ের মধ্যে তাহা হইলে মোটামুটি ৩০৬০০ টাকা, অর্থাৎ একতৃতীয়াংশেরও উপর, পল্লীগঠন ভিন্ন অন্য কাজে ব্যয় করা হইয়াছে, এবং পল্লীগঠনের জন্য প্রায় দুই হাজার ব্যয় করা হইয়াছে।

এখনও অর্দ্ধেকের উপর টাকা মজুদ আছে; সুতরাং দেশ-বন্ধুর আবেদনের আইনসম্মত ব্যাখ্যা-অনুসারে এখনও গচ্ছিত টাকার "অধিকাংশ" পল্লীর কাজে ব্যয় করা যাইতে পারে;—তুলসী-বাবুর দুইবার জবাই মুরগী "সওয়া লাখ" অবশ্য হিসাবে না ধরিয়া।

—

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিবেদন

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ (ন্যাশ্‌ন্যাল্ কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশ্যন্, বেঙ্গল) ১৯২৪ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে ইহার ১৯২৪ সালের কার্য্যবিবরণ এবং আর্থিক অবস্থা জানিতে পারা যায়।

১৯২৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইহার সভ্য-সংখ্যা ১৫৯ ছিল। ইহা বড় কম। সভ্য-সংখ্যা আরো বাড়া উচিত। বাড়াইবার কোন চেষ্টা এখন হয় কি না, প্রতিবেদন হইতে তাহা জানা যায় না।

১৯২৪ সালে পরিষদের আয় ৪৭৩৪৭৷৴৬ এবং ব্যয় ৪৭১৯০০৸৴৭ হইয়াছিল। ইহার অনুমোদিত বিদ্যালয়-গুলির জন্য ৫১৯৫, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য ১১৮১৮৩৶৫ এবং পরিষদের সাধারণ ব্যয় বাবতে ৩৪৮৫-২২৮২ খরচ হইয়াছিল। বিস্তারিত হিসাব প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। তাহা হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত।

স্যার্ রাসবিহারী ঘোষের সম্পত্তি হইতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য দানের টাকা দিয়া বাকী সম্পত্তি পরিষদকে তিনি দান করিয়া যান। ইহার মূল্য ষোল লক্ষ টাকার অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই দান পরিষদের কার্য্যকে স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে।

১৯২৪ সালে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল্-ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্র-সংখ্যা ৭০০ ছিল; তন্মধ্যে ঐ বৎসর ২৮৭ জন নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হয়, বাকী পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরে ভর্ত্তি হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠানটির সমুদয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি নির্ম্মিত ও সজ্জিত হইয়া গেলে উহাতে প্রায় এক হাজার ছাত্র শিক্ষা পাইতে পারিবে।

পরিষদ-কর্ত্তৃক পরিচালিত সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ন্যাশ্‌ন্যাল্ কলেজ ছাত্রাভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন সাধারণ শিক্ষার জন্য নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়, এবং মফঃস্বলের একুশটি বিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটে ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্প শিখান হয়। তাহার জন্য পরিষদ আরও টাকা চান। এক্ষণে যতগুলি ছাত্রাবাস ও অধ্যাপকনিবাস আছে, তাহার উপর আটটি ছাত্রাবাস ও ছয়টি অধ্যাপকনিবাস নির্ম্মাণ করিতে হইবে। গ্রন্থাগারের জন্য আরো অনেক পুস্তক, বিশেষতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক কিনিতে হইবে। অনেক কল, যন্ত্র, প্রভৃতি কিনিতে হইবে। বর্ত্তমানে ছাত্রদের নিকট হইতে নিম্নবিভাগে মাসিক ছয় এবং উচ্চ বিভাগে মাসিক আট টাকা বেতন লওয়া হয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যয়ের তুলনায় এই বেতন কম। যদি বেতন না বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে পরিষদের আরো মবলগ দান পাওয়া দরকার, যাহার আয় হইতে ছাত্রদত্ত বেতনের আয়ের প্রপূর্ত্তি হইতে পারে। পরিষদ তাঁহাদের মূলধন আর ইমারতে ও সর-ঞ্জামে ব্যয় করিতে সমর্থ নহেন। এইজন্য বদান্য ব্যক্তি-দের দানের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

লণ্ডনের সিটি এণ্ড্ গিল্‌ড্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ পরীক্ষার কর্ত্তৃপক্ষ বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রদিগকে প্রথম গ্রেডের পরীক্ষা না দিয়াই দ্বিতীয় গ্রেডের পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। লণ্ডনের ঐ পরীক্ষায় ১৯২৪ সালে পরিষদের প্রতিষ্ঠানের ৪৮ জন ছাত্র পাস্ হইয়াছে। এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

বাংলা দেশে গবেষণা ও জ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে অন্য যত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। এইসকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিরই আয় যথেষ্ট নহে শুনিয়াছি। তাহা-দের বর্ত্তমান আয় কিভাবে ব্যয়িত হয় এবং আরও কত আয় হইলে ভাল করিয়া কাজ চলিতে পারে, তাহা সর্ব্ব-

সাধারণকে জানাইলে প্রতিষ্ঠানগুলি আরও সাহায্য পাইতে পারে। সদ্য-সদ্য সাহায্য না পাইলেও, প্রতিবেদন ও হিসাব প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

—

নারীরক্ষা সমিতি

বঙ্গের নানা জেলায়, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে, দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা অনেক স্থলে নারীদের উপর অবাধে অত্যাচার করে। লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা অনেক নারী ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনগণ অনেক সময় সামাজিক পাতিত্যের ভয়ে কিংবা দুর্ব্বৃত্তদের প্রতিহিংসার ভয়ে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেন না। অনেক সময় স্থানীয় পুলিসের শৈথিল্যে বা উৎকোচগ্রাহিতার জন্ম, কিংবা অত্যাচরিতাদের মোকদ্দমা চালাইবার মত টাকা না থাকায়, দুর্ব্বৃত্তেরা দণ্ড পায় না। অন্যদিকে, কয়েকটি মোকদ্দমায়, যেমন বরদাসুন্দরী ও সুহাসিনীর মোকদ্দমায়, দেখা গিয়াছে, যে, অত্যাচরিতাদের অভিযোগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার জন্ম টাকার অভাব হয় না।

এরূপ অবস্থায় অত্যাচার দমনের জন্ম এবং অত্যাচরিতাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমা চালাইবার জন্ম গ্রামে গ্রামে নারীরক্ষা সমিতি স্থাপন, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর সাহসী পুরুষদিগের দ্বারা রক্ষীদল গঠন, অর্থসংগ্রহ, প্রভৃতি করা আবশ্যক। এতদর্থে নারীরক্ষাসমিতির নেতৃবর্গ অর্থ-সাহায্যের প্রার্থী হইয়া একটি আবেদন বাহির করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বশেষে বলিতেছেন :—

> এইসকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্ম জনসাধারণের নিকট আমরা জনবল ও অর্থবল প্রার্থনা করিতেছি।
>
> জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে আমরা আমাদের দেশবাসীদের নিকট আবেদন করিতেছি, এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে তাঁহারা আমাদের সহায় হউন। জনসাধারণের অর্থসাহায্যের গুরুতর প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থ পাঠাইবেন :—
>
> মিঃ জে, এন, বসু (সলিসিটার) কোষাধ্যক্ষ, ১১নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অথবা বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, সম্পাদক, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
>
> নিবেদকগণ—
> এস, আর, দাশ, সভাপতি।
> পি, সি, রায়, সহ-সভাপতি।
> হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ
> যতীন্দ্রনাথ বসু, কোষাধ্যক্ষ।
> কৃষ্ণকুমার মিত্র, সম্পাদক।
> রেভারেণ্ড বি, এ, নাগ।
> সত্যানন্দ বসু।

—

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

রেলওয়ে ট্রেনের গার্ডের কাজের বেতন উচ্চ নহে, এবং শাসন-পরিষদের সভ্য, মন্ত্রী, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি পদের মত ইহা উচ্চ পদও নহে। কিন্তু এই পদের দায়িত্ব খুব বেশী, এবং ইহা কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত করিতে হইলে সুস্থ, সবল দেহ, সাহস, সততা, কর্ম্মিষ্ঠতা প্রভৃতির আবশ্যক হয়। যখন এদেশে প্রথম রেলওয়ে চলিতে আরম্ভ হয়, তাহার পর বহুবৎসর পর্য্যন্ত মালগাড়ীতেও বাঙালীদিগকে গার্ডের কাজ দেওয়া হইত না; তাহাদের বিরুদ্ধে এই অমূলক সংস্কার ছিল, যে, তাহারা এই কাজের উপযুক্ত নহে। তাহার পর ক্রমে-ক্রমে কোন-কোন বাঙালী মালগাড়ী ও যাত্রী ট্রেনে গার্ডের কাজ পান। কিন্তু আমরা যতদূর অবগত আছি, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তই বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র দার্জ্জিলিং ডাকগাড়ীর গার্ড্। কিছুদিন পূর্ব্বে দমদমা ও বারাকপুরের কাছাকাছি কোন স্থানে ডাকগাড়ী হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ঠিক্ কিরূপে ও কি কারণে তিনি পড়িয়া মারা যান, তাহা কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাঁহার মস্তক যেরূপ আহত ও ভগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমিত হইয়াছে, যে, তিনি ডাকগাড়ীতে নিজের কাম্‌রার পাদানীতে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া "লাইন ক্লিয়ার" দেখিতেছিলেন; এরূপ অবস্থায় রেললাইনের খুব নিকবর্ত্তী কোন থামের সহিত তাঁহার মাথায় গুরুতর ধাক্কা লাগায় তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়া যায় ও তিনি মৃত অবস্থায় পড়িয়া যান। আমরা শুনিয়াছি, তিনি অতি সৎ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন, এবং সেইজন্ম দার্জ্জিলিং ডাকগাড়ীর গার্ডের পদ পাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ গাড়ীতে বিস্তর উচ্চপদস্থ ইংরেজ ও তাহাদের পত্নী ও সন্তানাদি যাতায়াত করে। এইজন্ম ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ বাঙালীদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি কিরূপ যোগ্য লোক ছিলেন।

—

অনগ্রসর জাতিদের উন্নতিকামী সভা

বাংলা ও আসামের অনগ্রসর শ্রেণীসকলের উন্নতিবিধায়িনী সভার ১৪শ বার্ষিক প্রতিবেদন পাইয়াছি। ইহার দ্বারা বেশ কাজ হইতেছে। এই প্রতিবেদনে ১৯২৩-২৪ সালের কার্য্যবিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ঐ সালে লর্ড্ সিংহ ছিলেন ইহার সভাপতি; স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার্ প্রভাসচন্দ্র মিত্র, মিঃ এস্ আর্ দাশ, মিঃ সি আর দাশ, বাবু বসন্তকুমার বসু এম্,এ,বি,এল্, মিঃ যুগোলকিশোর বিরলা, সহকারী সভাপতি; রায়সাহেব

রাজমোহন দাস অবৈতনিক সম্পাদক; এবং ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ।

বাংলা ও আসামের কুড়িটি জেলায় এই সভার ৬৬২টি বিদ্যালয় আছে। কোন্ জেলায় কত বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কত ছাত্র বা ছাত্রী পড়ে, ইত্যাদি বৃত্তান্ত পরিশিষ্টে বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৪ সালের ৩১শে মার্চ বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১০৭৬৩ জন ছাত্র এবং ৩৩৯৮ জন ছাত্রী ছিল। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি উচ্চ ইংরেজী, ১০টি মধ্যইংরেজী, ২৫০টি বালকদের প্রাথমিক, ১৫টি বালকদের নৈশ প্রাথমিক এবং ৮৬টি বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি যশোর জেলার মাসিয়াহাটী গ্রামে অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী সুজাইতপুর, কুলটিয়া ও নেহালপুর গ্রামে আগে তিনটি নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা ছিল। মাসিয়াহাটি গ্রামটি নমশূদ্রদের অধ্যুষিত ২৬টি-গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া ঐসব স্থানের নমশূদ্রেরা একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঐ গ্রামটি নির্ব্বাচন করেন। উঁহাদের স্বাধীন চেষ্টায় নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটিকে সম্মিলিত করিয়া প্রথমে একটি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়; তাহার পর কালক্রমে উহা উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। গ্রামবাসীরা সকলেই চাষী। তাঁহারা সন্ধ্যায় দৈনিক শ্রমের পর বাড়ী আসিয়া, কখন-কখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত, ইট প্রস্তুত করিতেন ও তাহা পুড়াইবার জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিতেন। এই প্রকারে তাঁহারা দেড় লক্ষ ইট পুড়াইতে সমর্থ হয়েন। সামান্ত অবস্থার এই গ্রাম্য লোকগুলির একাগ্রতা ও আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সভার কর্ম্মিগণ তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়টিকে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে সাহায্য করেন। ১৯২৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ এই বিদ্যালয়ে ১১৪ জন ছাত্র ছিল, তাহারা সকলেই নমশূদ্র। ইহাদের মধ্যে পাঁচ জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম স্থানীয় বালকটিকে দুই বৎসরের জন্য মাসিক চারিটাকা বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। সভা বিদ্যালয়টিকে ২৫০ টাকার সুনির্ব্বাচিত বহি দিয়াছেন।

সভার ৬৬২টি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণীসকলের বালকবালিকাদের জন্য অভিপ্রেত, এবং অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ঐ ঐ শ্রেণীর। মোট ১৪১৬১ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (৪৫২১ জন) নমশূদ্র, তাহার পর ২৯৬৩ জন মুসলমান। তাহার পর মুচি ৬১১ জন এবং পোদ ৪৯৫ জন। ইহা উল্লেখযোগ্য, যে, যদিও এত মুসলমান বালকবালিকা সভার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা লাভ করে, তথাপি ইহার সভ্য ও চাঁদা-দাতাদিগের মধ্যে একজনও মুসলমান নাই। কোন্-কোন্ জাতির কত ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়গুলিতে পড়ে, তাহার বিস্তারিত তালিকা প্রতিবেদনের পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

ধুবড়ীতে মেথর বালকবালিকাদের জন্য সভার একটি বিদ্যালয় আছে, যদিও উহা প্রথমতঃ মেথরদের জন্যই খোলা হয়, তথাপি ক্রমে-ক্রমে উহাতে অন্যান্য শ্রেণীর বালকবালিকারাও পড়িতে আসিতেছে। কুমার, রাজবংশী ও বৈরাগী জাতির বালকেরা এবং কুমার-জাতীয়া দুটি বালিকা উহাতে পড়িতেছে।

৮৬টি বালিকাবিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৭টির শিক্ষক পুরুষ। বাকী ১৯টির শিক্ষাদানকার্য্য সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকেরাই করেন। শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে একজন বিবাহিতা মুসলমান মহিলা আছেন। তাঁহাকে শিক্ষাদান-কার্য্য শিক্ষালাভের জন্য দুই বৎসর ঢাকা ফিমেল্ ট্রেনিং স্কুলে রাখা হইয়াছিল। একটি ছাড়া সভার সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়ে ছাত্রীরা বিনা-বেতনে শিক্ষা পায়।

নৈশবিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে প্রতিবেদনে অন্যান্য কথার মধ্যে দেখিলাম, বীরভূম জেলার নৈশ বিদ্যালয়গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা লোকদের অনুরাগ-ভাজন, তাহার পর বাঁকুড়ারগুলি।

একটি বিষয়ে সভা পথপ্রদর্শক এবং তাঁহাদের কৃতিত্ব উৎসাহজনক। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে গ্রাম্য বালিকাদিগকে এরূপ ভিন্ন গ্রাম বা সহরে অবস্থিত মধ্য ইংরেজী ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছেন, যেখানে ঐ বালিকাদের কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। তাঁহাদের কেহ-কেহ হোষ্টেল্ বা ছাত্রী-নিবাসে বাস করেন, এবং শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের নিজ-নিজ গ্রামে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার-কল্পে কাজে লাগিবে। প্রতিবেদনে উল্লিখিত এইরূপ দুইটি বালিকার ইতিহাস সংক্ষেপে দিতেছি। বিবাহিতা হিন্দু-বালিকাদের ও তাঁহাদের স্বামীদের এরূপ উৎসাহ বড়ই আশাপ্রদ।

যশোর জেলায় মালিয়াট গ্রামে সভার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পত্নী শ্রীমতী সুধামুখী বৈরাগীকে সভা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে হাওড়া জেলার বানিবন মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য মাসিক চারি টাকা বৃত্তি দেন। শ্রীমতী সুধামুখী ১৯২৩ সালে বর্দ্ধমান ডিভিজনের সমুদয় ছাত্রীদের মধ্যে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক পাঁচ টাকা সরকারী বৃত্তি পান। এক্ষণে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায়

াাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে পড়িতেছেন। সভা তাঁহাকে াসিক ৬টাকার বিশেষ বৃত্তি দিয়াছেন, এবং উহার ার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির একজন সভ্য অতিরিক্ত মাসিক :-টাকা বৃত্তি দিতেছেন।

মালিয়াটে সভার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শক্ষকের পত্নী শ্রীমতী সুরধুনী বিশ্বাসকে সভা ১৯২৩ সালে াসিক ৪টাকা বৃত্তি দেন। তিনি বানিবন মধ্য ইংরেজী বদ্যালয়ে পড়িতেছেন। তিনি শিক্ষয়িত্রীর যোগ্যতা র্জ্জন করিয়া নিজের জাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে ামীর সাহায্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এই সভা ১৯০৯ সালে স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নতৃত্বে ব্রাহ্ম সাধনাশ্রমের কয়েকজন কর্ম্মীর দ্বারা স্থাপিত য়। ইহা পরে ১৮৬০ সালের একুশ আইন-অনুসারে রজিষ্টারী করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহার কমিটিতে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের সভ্য আছেন, এবং অন্য যে কোন র্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সভ্য হইতে কোন বাধা নাই। সভা জাতিধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে বঙ্গের নানা শ্রেণীর লোক-দিগের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছেন। সভার এখনও বিস্তর টাকার প্রয়োজন। যথেষ্ট টাকা পাইলে সভা নিম্নলিখিতরূপে নিজ কার্য্যের স্থায়িত্ব-সাধন, বিস্তার ও উন্নতি করিতে পারিবেন।

১। একটি স্থায়ী ফণ্ড্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন, যাহার সুদ হইতে সভার কাজ দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে।

২। আরও বিদ্যালয় খুলিতে পারিবেন।

৩। বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিবেন।

৪। গুণানুসারে ছাত্রছাত্রীদিগকে বৃত্তি ও পুরস্কার দিতে পারিবেন।

৫। ছাত্রছাত্রীদিগকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার নিমিত্ত কৃষি, কারুকার্য্য, পণ্যশিল্প প্রভৃতি বৃত্তি শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

৬। বিদ্যানুরাগী ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদিগকে, বিশেষতঃ ছাত্রীদিগকে, উচ্চতর শিক্ষালাভের সুবিধা দিতে পারিবেন।

৭। কালক্রমে সভার কার্য্য আরও ভাল করিয়া যাহাতে চলে, তাহার নিমিত্ত সভার বিশেষ প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা ইহার শিক্ষক ও বিদ্যালয়পরি-দর্শকদিগকে দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন স্থাপন করিতে পারিবেন।

৮। শিক্ষাবিস্তার ছাড়া আরও নানা উপায়ে নম্র শ্রেণীর লোকসকলের উন্নতি সাধন করিতে ারবেন।

প্রতিবেদনটির পরিশিষ্টে সভার কার্য্য-সম্বন্ধীয় নানা তথ্য সুশৃঙ্খলভাবে নিপুণতার সহিত দেওয়া হইয়াছে।

বাংলা দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯জন মাত্র লিখনপঠনক্ষম। বঙ্গের মোট অধিবাসী ৪৭৬ লক্ষের মধ্যে ৪৪৪ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৯৩.৩ জন গ্রামে বাস করে। গ্রামবাসী এই ৪৪৪ লক্ষের মধ্যে কেবল শতকরা দুইজন সামান্য লিখিতে পড়িতে পারে। নিরক্ষর সাড়ে চারি কোটি লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সাধন এই সভার উদ্দেশ্য। সুতরাং সভায় যে কত টাকার প্রয়োজন তাহা বলিতে হইবে না।

বর্ত্তমানে সভার মাসিক ব্যয় ১৪৫০ টাকা; কিন্তু মাসিক স্থায়ী আয় ৮০০ টাকা মাত্র। বাকী মাসিক ৬৫০ টাকা সভাকে নানা উপায়ে সংগ্রহ করিতে হইবে; নতুবা ইহার বর্ত্তমান কাজও চলিবে না। কার্য্য বিস্তার করিতে হইলে আরও টাকার আবশ্যক। এপর্য্যন্ত ইহার একটি পয়সাও অপব্যয় বা চুরি হয় নাই; ভবিষ্যতেও অপব্যয় নিবারণের জন্য সুবন্দোবস্ত আছে।

সামান্য টাকায় বাংলা দেশে কত বেশী কাজ সভা করিতে পারেন, ইহার লোকহিতব্রত সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাস তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কেহ মাসিক দশ টাকা চাঁদা দিলে সভা শিক্ষাদানকার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ("trained") শিক্ষকের দ্বারা একটি প্রাইমারী পাঠশালা চালাইতে পারেন। কেহ মাসিক চারি টাকা মাত্র চাঁদা দিলে সভা সাধারণ শিক্ষকের দ্বারা একটি পাঠ-শালা চালাইতে পারেন।

সম্পাদক মহাশয়ের ঠিকানা, ১৪ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা।

—

বড়লাটের পুরাতন-নূতন বুলি

ইংরেজ রাজনীতিকুশল লোকেরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রায়ই এরূপ কথা বলেন, যে, ধৈর্য্যের সহিত তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে।

সিমলা হইতে বড়লাট লর্ড্ রেডিংএর প্রস্থান-উপলক্ষে প্রদত্ত বিদায়-ভোজে স্যার্ মুহম্মদ শফী তাঁহার খুব প্রশংসা করেন। উত্তর দিতে উঠিয়া লাট সাহেব লর্ড বার্কেন্‌হেডের ও নিজের এমন অনেক বুলি পুনর্ব্বার আওড়ান, যাহার উত্তর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার একা-ধিক সভ্য এবং সকল প্রদেশের নানা সংবাদপত্র-সম্পাদক দিয়াছেন। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে ইংরেজ রাজকর্ম্ম-চারীদের কথার যত যুক্তিসঙ্গত উত্তরই দেওয়া হউক না, তাঁহারা তাহা শুনিয়াও শুনেন না, কেবল নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন। ইহা দেখাও গিয়াছে, যে,

কথা কাটাকাটি করিয়া কোন ফল হয় না। কিন্তু বক্তৃতা করা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কাজ, এবং কাগজ ও কাগজে সাহায্যে তর্ক করা প্রতিবাদ করা সম্পাদকদের কাজ। সুতরাং তাঁহাদিগকে তাহা করিতেই হইবে। লাট বেলাটরা যদি তাঁহাদের বুলি একশবার আওড়ান, তাহা হইলে ভারতীয় বক্তা ও ভারতীয় সম্পাদকদিগকে তাহার খণ্ডনও হাজার বার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কখনও ভুলিলে চলিবে না, যে, ভারতীয়েরা যদি স্বদেশে সেইরূপ কর্তৃত্ব চান, যেরূপ কর্তৃত্ব স্বাধীন গণতন্ত্র দেশসমূহের লোকদের তাঁহাদের স্বদেশে আছে, তাহা হইলে বক্তৃতা ও লেখা ছাড়া আরও কিছু করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেক লোককে আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য একতাসূত্রে বদ্ধ করা সম্ভব নহে; কিন্তু অধিকাংশ লোককে তজ্জন্য একতাসূত্রে বদ্ধ করা অসম্ভব নহে। এইরূপ একতার ফলে ইংরেজরা যদি দেখে, যে, বর্ত্তমান প্রণালীতে ভারতশাসন আর সহজ ও লাভজনক নহে, তবেই আমরা স্বাধিকার লাভ করিতে পারিব।

বড়লাট তাঁহার বক্ষ্যমাণ বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের সব রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের প্রতি মিত্রের কাজ করিতে ইচ্ছুক। সবাই ভারতীয়দিগের পক্ষ হইতে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। বড়লাটের মতে ভারতীয়েরা বলিতে পারিত, "আমরা আমাদের মতে দৃঢ় আছি, কিন্তু যেহেতু প্রগতি সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে, তজ্জন্য আমরা সদিচ্ছা দেখাইতে ও সহযোগিতা করিতে রাজী আছি।" ভারতীয়েরা এইরূপ বলিলে, বড়লাটের মতে, একটা সদ্ভাবের তরঙ্গ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিত এবং রাজনৈতিক অবস্থার চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলিত; তখন যেহেতু বিশ্বাসই বিশ্বাস উৎপন্ন করে, সেইজন্য ভারতীয়েরা তাহাদের সহযোগিতার ফল দেখিতে চাহিতে পারিত, এবং তাহার ফলে দেখা যাইত, যে, ইংলণ্ড কৃপণতার সহিত দরদস্তুর করে না কিন্তু মুক্ত হস্তে দান করে।

ভারতশাসন-সংস্কার-আইন-অনুসারে প্রথম যে-সব প্রাদেশিক ও সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়, তাহাতে অসহযোগীরা প্রবেশই করেন নাই; তাহাতে যাঁহারা সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত শাসন-প্রণালী-অনুসারে দেশের উপকার যতটা হইতে পারে, তাহা লাভ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহাদের দলের কতকগুলি লোক মন্ত্রীও হইয়াছিলেন। এই সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ফলে ইংলণ্ড কেন মুক্তহস্ত হন নাই? তর্ক উঠিতে পারে, তখনও অসহযোগীরা বাহিরে কোলাহল করিতেছিল বলিয়া ইংরেজের হাতের মুঠা খুলে নাই। এবার কিন্তু অসহযোগীদের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও প্রবলতম দল স্বরাজী হইয়া ব্যবস্থাপক-সভাসকলে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহাদের অন্যতম নেতা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতির চাকরী লইয়াছেন। স্বরাজী সভ্যেরা একাধিক সরকারী কমিটির সভ্য হইয়াছেন, এবং ব্যবস্থাপক সভায় অনেক বিষয়ে গবর্ণেমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। সুতরাং গবর্ন্মেণ্ট কোন সদিচ্ছা ও সহযোগিতা পান নাই বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অবশ্য সরকারপক্ষ বলিতে পারেন, এখনও মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুচরেরা সহযোগিতা করিতেছেন না, এখনও স্বরাজী ব্যবস্থাপকেরা কোন-কোন বিষয়ে গবর্ণ্মেণ্টের বিপক্ষে ভোট দিতেছেন, এবং এখনও স্বরাজ্য দল বলিতেছেন, যে, তাঁহাদের দাবী মঞ্জুর না হইলে শেষ উপায়-স্বরূপ নিরুপদ্রব ভাবে আইন অমান্য করিতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যে, কোন দেশেই দেশের সব লোক কোন কালেই গবর্ন্মেণ্টের সব কথায়, কাজে, অভিপ্রায়ে সায় দেয় নাই, দিতে পারে না; গবর্ন্মেণ্টের বিপরীতমতাবলম্বী লোক সর্ব্বকালে সকল দেশেই ছিল ও আছে। সুতরাং গবর্ন্মেণ্ট যেরূপ সহযোগিতা চাহিতেছেন, তাহা কোন কালেই পাইবেন না। আমাদের ধারণা এই, যে, ইংরেজরাও জানেন, যে, ঐপ্রকার সহযোগিতা পাইবেন না; এবং সেইজন্যই ভারতীয়দিগের নিকট হইতে ঐরূপ সহযোগিতা লাভের সর্ত্ত জগতের সম্মুখে বারবার স্থাপন করিতেছেন। যেমন সাত মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না, তেমনি ইংরেজরা জানেন, ভারতীয়েরা এই সর্ত্ত পালন করিতে পারিবে না, সুতরাং তাঁহাদিগকেও (ইংরেজদিগকেও) মুক্তহস্তে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে হইবে না।

কিন্তু যদি কো-অপারেশ্যনের বা সহযোগিতার মানে হইত সম্পূর্ণ বাধ্যতা-স্বীকার ও ইংরেজের রাঙাপায়ে চিরকালের জন্য আত্ম-বিক্রয়, যদি অসম্ভব সম্ভব হইত, এবং ভারতের সব নেতা ও অনেতা কো-অপারেশ্যনের উক্ত সংজ্ঞানুসারে গবর্ণ্মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হইতেন, তাহা হইলেও কি সত্য-সত্যই ইংরেজ মুক্তহস্তে ভারতীয়দিগকে স্বরাজ দিয়া ফেলিতেন? কখনই না। না দিবার নানা নূতন-পুরাতন ওজর আবিষ্কৃত হইত।

তদ্ভিন্ন, ইংরেজ তখন স্বদেশবাসীকে ও জগদ্বাসীকে বলিতেন, "দেখ, আমাদের সুশাসনের গুণে ভারতীয়েরা এমন মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট, যে, আমরা যাহা করি ও বলি তাহাতে এখন সকলেই আহ্লাদের সহিত সায় দেয়, কেহ বিরুক্তি মাত্র করে না। অতএব, আমাদের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন করা অনাবশ্যক।"

বস্তুতঃ, আমরা যদি চুপ করিয়া থাকি, তাহা আমাদের সন্তোষ ও সম্মতির লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, এবং বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে যদি আমরা আন্দোলন করি এবং ইংরেজের অন্যায় আদেশ ও আইন-পালনে অসম্মতি প্রকাশ করি, তাহা হইলে প্রভুরা বলেন, "তোমরা আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ, চোখ রাঙাইতেছ? আমরা তাহাতে ডরাইব না, এবং আমরা যে ডরাই নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ তোমাদের আবেদন-নিবেদন ক্রন্দন, দাবী কিছুতেই কর্ণপাত করিব না ও আমাদের বর্ত্তমান কার্য্য-প্রণালীর কোন পরিবর্ত্তন করিব না।"

সুতরাং ভারতীয়দের উভয়-সঙ্কট। কিন্তু যদি বাস্তবিকই সম্পূর্ণ বাধ্যতা ও দাস্য দ্বারা ইংরেজের নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও ভারতীয়দের সে উপায়ে কিছু পাওয়া উচিত ও মনুষ্যত্ব-সঙ্গত হইত না। দাস্য দ্বারা কি কখনও মানুষ্যত্ব ও আত্মকর্তৃত্ব পাওয়া যায়? মনুষ্যোচিত আচরণই স্বরাজ্য লাভের একমাত্র পন্থা। স্বরাজ্য কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। স্ব-রাজ্য অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্ব নিজেই অর্জ্জন করিতে হয়। অপরের দাস হইয়া যাহা পাইতে হয়, তাহা মূল্যহীন, মনুষ্যত্ববিনাশক ও অপমানকর।

ফল যাহাই হউক, মনুষ্যত্বের, বিবেকের, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণা আমাদিগকে যে-পথে চালিত করিবে, আমরা সেই পথেই চলিব।

বড়লাট যুগপৎ হাস্যকর ও ক্রোধজনক একটা কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, trust begets trust, বিশ্বাসই বিশ্বাস উৎপাদন করে। কথাটা সাধারণভাবে সত্য, কিন্তু তিনি যে-চিন্তা মনের মধ্যে রাখিয়া উহা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা ভিত্তিহীন। তিনি বলিতে চান, ভারতবাসীরা ইংরেজদিগকে বিশ্বাস করিলে ও তাহাদের উপর নির্ভর করিলে তবে ইংরেজ ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দিবে। যেন ভারতীয়েরা কখন ইংরেজের উপর নির্ভর করে নাই। সত্য কথা এই, যে, ইংরেজ বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় তবে বহুসংখ্যক ভারতীয় রাজনীতিবিদ্ ইংরেজের সদভিপ্রায়ে, অঙ্গীকারপালনেচ্ছায় সন্দিহান হইয়াছে ও বিশ্বাস হারাইয়াছে। নতুবা ইংরেজের উপর নির্ভর ত খুবই করা হইয়াছিল। দাদাভাই নৌরোজী ব্রিটিশজাতির ন্যায়-পরায়ণতায় নিজের বিশ্বাস পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ঘোষণা করিয়া এবং তাহার দোহাই দিয়া গিয়াছেন। প্রবীণ সমুদয় মডারেট বা উদারনৈতিক কংগ্রেস-নেতা এই নির্ভরে অটল ছিলেন। গোখলের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবক সমিতি (The Servant of India Society) এই নির্ভরের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উক্ত সমিতির একটি স্থায়ী মত এই, যে, ভারতবর্ষের চিরকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকা উচিত, তাহাতেই আমাদের মঙ্গল হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও প্রাণ মহাত্মা গান্ধী ও রৌলট আইন ও জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের পূর্ব্বে ইংরেজের প্রতি এতটা নির্ভরপরায়ণ ছিলেন, যে, জুলুদের ও বোয়ারদের স্বাধীনতার যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজের পক্ষে সৈনিক সংগ্রহের আড়কাটীর কাজ করিয়াছিলেন।

ইংরেজের উপর ভারতীয়দের এই নির্ভর ও বিশ্বাসের ফলে ইংরেজ আমাদিগকে যেরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা রৌলট আইনে, সামরিক তথাকথিত "আইনে"র ভীষণ ও অপমানকর প্রয়োগে, বিনাবিচারে নির্ব্বাসনে, বিনা-বিচারে নজরবন্দী ও অন্তরীণ-করণে, অযথেষ্ট কারণে জনতার উপর গুলিবর্ষণে, এবং আরও নানা ঘটনায় ও ঘোষণায় জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

—

বিদেশী মূলধন আমদানী

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস যাঁহারা মূল উপাদান-গুলি হইতে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে, ইংরেজরা প্রথমতঃ এদেশে স্বদেশ হইতে আনীত কোন মূলধন ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটান নাই; ব্রিটিশ মূলধন বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহা এদেশেই নানা উপায়ে উপার্জ্জিত হয়, এবং তাহারই সাহায্যে ভারতবর্ষের ধন-শোষণ পুনঃপুনঃ চলিতে থাকে। যাঁহারা এবিষয়ে কিছু তথ্য জানিতে চান, তাঁহারা মেজর বামনদাস বসু মহাশয়-প্রণীত "ভারতীয় বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের বিনাশ" ("Ruin of Indian Trade and Industries") নামক পুস্তকের ১২২-১৩৪ পৃষ্ঠা পড়িতে পারেন। তদ্ভিন্ন ইংরেজদের লেখা অনেক বহি হইতেও এবিষয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ১৮৫৯ সালে মেজর উইঙ্গেট্ "ভারতের সহিত আমাদের আর্থিক সম্বন্ধ-বিষয়ে কয়েকটি কথা"* নামক যে-পুস্তিকা লেখেন, এই প্রসঙ্গে তাহা পঠনীয়। এই পুস্তিকার ১৩-১৪ পৃষ্ঠা হইতে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The funded debt of the Government of India borrowed in India, is estimated at nearly sixty millions sterling, of which three-fifths, or thirty-six millions, is the property of our own countrymen. The whole, or mostly the whole of these thirty-six millions, consists of investments by Europeans in

* *A Few Words on Our Financial Relations with India.* By Major Wingate. London. Richardson Brothers, 23, Cornhill, E. C. 1859.

India *out of money made in that country*, and constitute, therefore, a clear addition to British property, gained through our connection with India:......"

ইংরেজরা এদেশে যে মূলধন খাটাইয়াছিলেন, তাহা এই দেশ হইতেই আহৃত, ইহা যেমন ইংরেজদের লেখা হইতেই প্রমাণ করা যায়, তেমনি ইংরেজদের লেখা হইতেই ইহাও প্রমাণ করা যায়, যে, ইংলণ্ডে বাষ্পীয় শক্তি ও নানা বৈজ্ঞানিক কলের সাহায্যে কারখানায় সস্তায় প্রচুরপরিমাণে নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদনদ্বারা শিল্প-জগতে যে-বিপ্লব সংসাধিত হয়, তাহাও ভারতবর্ষ হইতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশ হইতে, আহৃত মূলধনের সাহায্যে করা হইয়াছিল। বঙ্গের লুট ইংলণ্ডে না পৌঁছিলে ইংলণ্ডের কলগুলিতে মরিচা পড়িয়া তাহা অকেজো হইয়া থাকিত।

ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে খাটান "ব্রিটিশ" মূলধন যেমন বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ হইতেই অর্জ্জিত, লুণ্ঠিত বা অন্যপ্রকারে আহৃত মূলধন ছিল, তেমনি বর্ত্তমানেও ভারতবর্ষে যত তথাকথিত "ব্রিটিশ" মূলধন খাটে, তাহার অনেক অংশ ভারতবর্ষেরই টাকা। ইহা সুবিদিত, যে, ইম্পীরিয়াল্ ব্যাঙ্কে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা থাকে। ঐ টাকা ভারতীয় প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের টাকা। তদ্ভিন্ন ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে বিস্তর ভারতীয় লোক টাকা গচ্ছিত রাখে এবং তাহার জন্য সামান্য সুদ পায়। অধিকন্তু অনেক ভারতীয় ঐ ব্যাঙ্কের অংশীদার। তাঁহারা যত টাকা দিয়া ঐ ব্যাঙ্কের অংশ কিনিয়াছেন, তাহাও ব্যাঙ্কে থাকে ও ব্যাঙ্কের মহাজনী তেজারতী কার্য্যে খাটে।

ইহাও সুবিদিত, যে, ভারতবর্ষে যে-সব ইংরেজ ব্যবসাদার ও পণ্যদ্রব্যোৎপাদক ব্যক্তিগতভাবে বা কোম্পানী গঠন করিয়া কারবার করে, প্রধানতঃ তাহারাই অল্প সুদে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পায়, এবং সেই মূলধনের সাহায্যে ভারতবর্ষ হইতে টাকা রোজগার করে। ভারতীয় সওদাগরদের পক্ষে ও কারখানার মালিক কোম্পানীদের পক্ষে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

ভারতবর্ষে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়া ইউরোপীয়দের আরও যত ব্যাঙ্ক আছে, তাহাতেও বিস্তর ভারতীয়ের প্রচুর অর্থ গচ্ছিত থাকে। তাহারাও প্রধানতঃ ইংরেজ কারবারীদিগকে টাকা ধার দিয়া থাকে; ভারতীয়দিগকে তত সহজে দেয় না।

ব্যাঙ্ক ছাড়া ভারতবর্ষে যত বিদেশী লাইফ্ ইন্সিওরেন্স্ বা জীবনবীমার কোম্পানী আছে, তাহারাও ভারতীয় বীমাকারীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকা প্রধানত ভারতবর্ষের ইউরোপীয় ব্যবসাদারদিগকে ধার দেয়, ভারতীয়দিগকে সহজে দেয় না।

ভারতবর্ষের অনেক কোটি টাকা গোল্ড্ ষ্টাণ্ডার্ড্ রিজার্ভ্ বা তদ্বিধ কোন নাম দিয়া ভারতসচিবের হাতে লণ্ডনে গচ্ছিত থাকে। ইংরেজ বণিকরা তাহা শতকরা দুই আড়াই টাকা সুদে ধার পায়। কিন্তু ভারতসচিব যখন ইংরেজ মূলধনীদের কাছে ধার লন তখন ৬।০, ৭, ৭।০ সুদ দিতে হয়।

এইরূপে সংক্ষেপে দেখা যাইতেছে, ইংরেজ প্রথম প্রথম ভারতবর্ষ হইতেই নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া [মাছের তেলে মাছ ভাজিয়া] ঐ অর্থকেই "ব্রিটিশ মূলধন" নাম দিয়াছিলেন। এক্ষণেও ভারতবর্ষেরই টাকা ইংরেজেরা নানা সূত্রে পাইয়া তাহার দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে টাকা রোজগার করিতেছে। অথচ, নামতঃ তাহাদের নানা কারবারে খাটান সমস্ত টাকাই "ব্রিটিশ" মূলধন নামে পরিচিত হইতেছে। অবশ্য আধুনিক কালে ব্রিটিশ মূলধন নামে পরিচিত কতক টাকা ইংলণ্ড হইতে আমদানী হইয়াছে বটে, কিন্তু যত টাকা ঐ নামে খাটিতেছে, তাহা "ব্রিটিশ" নহে, ভারতীয়।

বিদেশী মূলধন ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া উচিত কি না, উচিত হইলে কত ও কি কি সর্ত্তে আসিতে দেওয়া উচিত, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, কাগজে দেখিলাম। কমিটি যে-সকল কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে খবরের কাগজসকলে বাহির হইয়াছে। সেই উপলক্ষ্যে আমরা বিদেশী মূলধন আমদানী সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কমিটির নির্দ্ধারণগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আর স্থান নাই। কিন্তু আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইবে, যে, ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজ বণিক্-রাজাদের সম্পর্ক আরম্ভ হওবার সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত ইংরেজকে ধনী করিবার মত মূলধন ভারতবর্ষের ছিল ও আছে। যুদ্ধের সময় ভারতীয়েরা কোটি কোটি টাকা গবর্ণমেণ্টকে ধার দিয়াছিল ও দান করিয়াছিল। আমাদিগকে এখন ইহা দেখিতে হবে, যে, বর্ত্তমান সময়েই ভারতবর্ষেরই লোকদের টাকা যে যে প্রকারে ইংরেজকে ধন উপার্জ্জন করিতে সাহায্য করে, তাহা সেই সেই প্রকারে আমাদের কারবার ও কারখানাগুলিকে রোজগারে সাহায্য করিতে পারে কি না। স্বরাজ্য-লাভের পূর্ব্বে ইহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা না থাকিলেও, কিছু সুবিধা হয়ত হইতে পারে; ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ইউরোপীয়

ব্যাঙ্ক এবং বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীগুলিকে দেশী কারবার ও কারখানাসমূহকে উপযুক্ত জামীন ও বন্ধকাদিতে হয়ত কিছু কিছু টাকা ধার দেওয়ান যাইতে পারে।

এইরূপ আইন বা নিয়ম প্রণয়ন করাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে, যে, গভর্ণমেণ্ট্‌ মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতির টাকা ধার করা দরকার হইলে, তাহা ভারতবর্ষ হইতে ধার করিতে হইবে; এখানে ধার না পাইলে তবে বিদেশে ধার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের কোন স্থানের কোন খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও বিক্রয় করিবার অধিকার কোনও বিদেশী ব্যক্তি বা কোম্পানীকে দেওয়া উচিত নয়; এখন উহা উত্তোলনাদি করিবার জন্য কোন ভারতীয় ব্যক্তি বা কোম্পানী প্রস্তুত না থাকিলে আপাততঃ এই কার্য্য স্থগিত রাখাই শ্রেয়ঃ। যখন ভারতীয়েরা প্রস্তুত হইবে, তখন উহা উত্তোলিত হইবে। কারণ, খনিজ দ্রব্য একবার নিঃশেষ হইয়া গেলে, গাছপালার মত পুনর্ব্বার গজাইবে না।

ভারতবর্ষে এমন কোন কোম্পানীকে কোন প্রকার কারবার করিতে বা কারখানা চালাইতে দেওয়া উচিত নয়, যাহার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ মূলধন ভারতীয় লোকদের নহে, এবং যাহার ডিরেক্টরদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভারতীয় লোক নহে। বেনামীদারা ও সাক্ষীগোপাল শ্রেণীর লোক দ্বারা এরূপ নিয়ম কার্য্যতঃ ভঙ্গ করা দুঃসাধ্য না হইলেও, এইপ্রকার কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। কেননা ভারতবর্ষের যে-যে কৃষি, বাণিজ্য, পণ্যশিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্র বিদেশীর হস্তগত হইতেছে ও হইবে, তাহাতে দেশী লোকদের প্রবেশ ও সিদ্ধিলাভ অসম্ভব কিম্বা অন্ততঃ দুঃসাধ্য হইবে। অধিকন্তু চীনে যেমন বিদেশী বণিকেরা উহার স্বাধীনতা লাভে বাধা দিতেছে, ভারতবর্ষেও তেমনি বিদেশী বণিকেরা এখনই আমাদের স্বরাজলাভে বাধা দিতেছে, পরে আরও বেশী করিয়া দিবে।

বিদেশী মূলধন কমিটির রিপোর্টের বিস্তৃত আলোচনা সকল রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সভাসমিতি দ্বারা এবং সকল সংবাদপত্রে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফুট্‌কী

শ্রী শান্তা দেবী

১

গলির মোড়ে মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। একখানা থার্ডক্লাশ গাড়ী বোঝাই করিয়া সাতটি সন্তানসহ একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ভদ্রলোক ফুটপাথের উপর সদ্য নামিয়াছেন। গাড়ীর মাথায়ও ভাঙা তক্তাপোষ, টিনের বাক্স, দেয়াল আলনা, ছেঁড়া মাদুর, লণ্ঠন, বালতি, একঝুড়ি শিশিবোতল ও চটে-জড়ানো ময়লা খেরোর তোষক প্রভৃতি হরেক রকম জিনিষ এতক্ষণ শোভমান ছিল। তাহার কিছু-কিছু এখন ছেলেদের হাতে-হাতে ঝুলিতেছে, কিছু বা গলির মুখ জুড়িয়া পথরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাড়া লইয়া গাড়োয়ানের বিরোধ হইয়াছে, তাই এত তুমুল কোলাহল। ছয় আনা পয়সায় এতগুলি সজীব ও নির্জ্জীব মাল যে তাহার পিতৃপুরুষেরাও কেহ কখনও পার করে নাই ইহাই ছিল গাড়োয়ানের প্রধান বক্তব্য। তবে সে মূল বক্তব্যটা যথাসাধ্য উপমা ও অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া শ্রবণসুখকর করিয়াই নিবেদন করিতেছিল। ছয় আনা পয়সার উপার্জ্জনা ঘাঁটিয়া সে হাত ময়লা করিতে চায় না শুনিয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পয়সা ক'আনা পকেটে ফেলিয়া খুসী হইয়াই চলিয়া যাইবে ভাবিয়া এতক্ষণের বাক্‌ বিতণ্ডা তাঁহার সার্থক বোধ হইতেছিল।

কিন্তু গাড়োয়ানের বৈরাগ্য বহুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, বাবুকে ঘরমুখো দেখিয়া সে তার কোচবাক্স হইতে নামিয়া আস্তিন গুটাইয়া ছুটিল। শিশুদলে মহা আর্ত্তনাদ পড়িয়া গেল। একটি দশ এগার বৎসরের মেয়ে কোলে একটি বছর দেড়েকের ছেলেকে লইয়া এবং ডানহাতে দুইটা চিম্‌নি-ফাটা লণ্ঠন ঝুলাইয়া এতক্ষণ কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে সমস্ত ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; এইবার অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া হাতের লণ্ঠন দুইটা ফুটপাথে ফেলিয়া দিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে বাবারে, আমার বাবাকে মেরে ফেল্লেরে, ওরে কি হবে রে!"

গলির ভিতরে একটা ছোট বাড়ীর সম্মুখের রোয়াকে বসিয়া একদল ছেলে একটা দৈনিক কাগজ লইয়া জটলা করিতেছিল। তাঁহারা যখন এক-এক মুহূর্ত্তে দেশের এক একটা সমস্যার সমাধানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় মেয়েটির তীব্র চীৎকার তাহাদের কাণে আসিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া মাণিকলালের হাত চাপিয়া

ধরিয়া বলিল, "শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির এস ; লোকটা আমার বাবাকে মেরে ফেল্‌লে।"

এমন কথা শুনিয়া সভাশুদ্ধ হতভম্ব হইয়া গেল। মাণিকলাল সদলে মেয়েটির পিছন-পিছন ফুটপাথে গিয়া হাজির হইল। তাহাদের দেখিবা মাত্র অশ্বচালকের মর্ম্ম-বেদনা আবার জাগিয়া উঠিল। মাণিকলালের বুঝিতে দেরী হইল না যে ব্যাপার আটআনার মামলা মাত্র। সে আর কিছু না ভাবিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি টানিয়া ঠন্ করিয়া ফেলিয়া দিল। রঙ্গমঞ্চের যবনিকা পড়িয়া গেল।

কিন্তু মাণিকলালের মুখ অকস্মাৎ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া সে যে চট্ করিয়া পরের হইয়া গাড়ী ভাড়া দিয়া দিল ইহাতে অপরিচিত ভদ্রলোকের যে কতবড় অপমান হইতে পারে তাহা তাহার মাথায় আসিল এতক্ষণে। সে লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহিতে যাইবে অথচ কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এমন সময় শুনিল ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিতেছেন, "আরে ছোকরা, তুমিও যেমন! খামকা কতকগুলো পয়সা নষ্ট করলে। ওর যা পাওনা তা আমি কোনকালে চুকিয়ে দি'য়ছি। মাঝের থেকে তোমায় ছেলে মানুষ পেয়ে কিছু লাভ করে নিলে।" মাণিকলাল খানিকটা সপ্রতিভ ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল বাবুটি আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাহারই পাশের বাড়ীর "টুলেট্"লেখা ঘরখানা দখল করিতে অগ্রসর হইতেছেন। মেয়েটির মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। সে চিম্‌নীহীন লণ্ঠন দুইটা কুড়াইয়া লইতে ব্যস্ত।

মাণিকলালকে দেখিয়া সে বেশ সহজ সুরেই বলিল, "তুমি কিচ্ছু জান না। বাবা মিছে কথা বলেছে, বাবা পয়সা দেয়নি।"

পিতার সম্বন্ধে সন্তানের এরূপ মতামত শুনিতে মাণিকলাল অভ্যস্ত ছিল না। তবে ব্যাপারটা তাহার কাছে অদ্ভুত ঠেকিলেও অবিশ্বাস্য বোধ হইল না, কারণ সে দেখিল তাহার পয়সাটা তাহাকে দিবার কোনোরকম ক্ষীণ প্রয়াসও ভদ্রলোক করিল না। বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘর গুছাইতে সে ব্যস্ত।

মেয়েটি তাহার সঙ্গে ভাব জমাইতে উৎসুক দেখিয়া মাণিকলালও তাহার কথায় নানাকথা তুলিল। তাহাকে দেখিলেই যেন কেমন গল্প করিতে ইচ্ছা হয়। রোগা-পাতলা মেয়েটি,ছেলেদের মত ছাঁটা চুল, পোষাকও তেম্‌নি, ছোট হাতের পাঞ্জাবী কোর্ত্তা ও পায়জামা। হাত দুখানি খালি, কোন গহনা নাই। চোখদুটি আশ্চর্য্য উজ্জল ও বড়-বড় ; মুহূর্ত্তপূর্ব্বের ভীতির চিহ্ন মাত্র তাহাতে নাই ; হাসি ও আলো যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু শরীর

মাণিকলাল বলিল, "তোমার নাম কি খুকী ?"

মেয়েটি খিল-খিল্ করিয়া হাসিয়া মাণিকলালের পায়ের উপর পড়িয়া গেল। তাহার হাসি আর থামে না।

মাণিকলাল তাহার মিষ্টিগলার স্বরে পুলকিত হইয়া উঠিল। পিয়ানোর পর্দ্দার মত মধুর কোমল স্বর ; তাহার বালকোচিত বেশভূষার সহিত মোটেই খাপ খায় না। মাণিকলাল কৌতূহল দেখাইয়া বলিল, "ও কি, অত হাস্‌ছ কেন ?"

মেয়েটি আরো হাসিয়া দুলিয়া-দুলিয়া বলিল, "ও মা, তুমি আমার নাম জান না! সে ভ—য়া—ন—ক অদ্ভুত!" আবার হাসির ফোয়ারা ছুটিল। মাণিকলাল বলিল "কি বলই না—"

মেয়েটি দুই হাতে মুখ চাপিয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ফুট্‌কী।" তাহার পরই তাড়াতাড়ি মাণিকের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "হাস্‌তে পাবে না কিন্তু, খবর্দ্দার বলছি।" ফুট্‌কীর চোখ দুইটী রোষে ও কৌতুকে জল্-জল্ করিয়া উঠিল।

ফুট্‌কীর কোলের ছোট ছেলেটি এতক্ষণ গলির মুখে গাদা করা জিনিষপত্রের ভিতর বসিয়া নির্জ্জীবভাবে আঙুল চুষিতেছিল। অন্য ছেলেরা একটা একটা করিয়া জিনিষ টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাইতেছিল। মাণিকলালের সঙ্গে ফুট্‌কীকে ভাব করিতে দেখিয়া তাহারাও তৃষিত দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া উহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে কে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "মট্‌কা, ফুট্‌কী, ছুনী, কুনী, ভোনা!"

ছেলেগুলি ছুড়-ছুড় করিয়া দৌড় দিল। ফুট্‌কী "যাই বাবা" বলিয়া ভোনাকে কাঁকালে তুলিয়া লইল, কিন্তু তখনও নড়িল না। তাহার কথার জের তখনও ফুরায় নাই। সে বলিল, "তোমার নাম কি বল্‌লে না যে বড়!"

মাণিকলাল বলিল, "আমার নামও তোমারই মত, মান্‌কে।"

ফুট্‌কী হাসিয়া বলিল, "আহা, ওটা ত ডাক নাম, ভাল নাম ত মাণিক! আমার যে মোট্টে ভাল নামই নেই। ভাগ্যে ইস্কুল যাই না, তাহলে খাতায় কি লিখ্‌তুম ?"

ভিতর হইতে নাকি সুরে কে চেঁচাইয়া উঠিল, "ফুঁট্‌কী কিঁদে পেঁয়েছে। উঁনুনে আঁগুন দিঁবি নাঁ!"

ফুট্‌কী এইবার পলাইল। বলিল, "যাই কুনীটার জ্বর হয়েছে, বার্লি রেঁধে দিতে হবে। তোমার বাড়ী ঐদিক পানে বুঝি! দুকুর বেলা আস্‌ব'খন।"

যেন তাহার আসাটা নিতান্তই দরকার।

২

মাণিকলাল বড়লোকের ছেলে ; কলিকাতায় থাকিয়া

ঠিক দশজনের পথ অনুসরণ করিয়া চলিত না, কারণ মানুষের সঙ্গে মেশার অভ্যাসটাই ছিল তাহার অত্যন্ত কম। সে লোকের সঙ্গে নিজে গিয়া আলাপ করিতে কি খুঁটিনাটি ঘরোয়া গল্প করিতে কেমন যেন আড়ষ্ট হইয়া যাইত। তাহার কথা বলা মানে ছিল হয় বক্তৃতা নয় সমস্যা-সমাধান। কোনো মানুষ তাহার সহিত কথা সুরু করিলেই পাছে সে একটু কাছে আসিয়া পড়ে এই লজ্জায় বিব্রত হইয়া মাণিক স্বরাজ কি চরকা, কি বাল্যবিবাহ, কি বেকারসমস্যা কি আরো কিছু উৎকট ও দুর্ব্বোধ্য রকম একটা আলোচনায় ঝাঁপাইয়া পড়িত। বেশীর ভাগ কথাই সে নিজে বলিয়া যাইত, সুতরাং কাহারও তাহার সহিত ঠিক আলাপ করিবার সুবিধা হইত না। অবশেষে কথা শেষ করিয়াই মাণিক কোঁচার খুটে চশমাটা মুছিতে-মুছিতে একটা কিছু দুর্ব্বোধ্যতর কৈফিয়ৎ দিয়া বিনা ভূমিকায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। ছোট ছেলে মেয়েরা তাহাকে দূর হইতে একটি আজব চীজ মনে করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত, কিন্তু কেহ কাছ ঘেঁসিত না।

এত লোক থাকিতে ফুটকী এই মানুষটাকেই তাহার বন্ধু বলিয়া কেন নির্ব্বাচন করিল জানি না। মাণিক কিন্তু ফুটকীকে তাহার অটল গাম্ভীর্য্য অসীম লজ্জা ও অপরিসীম মনুষ্যভীতির ব্যূহ এমন অনায়াসে ভেদ করিয়া ঢুকিতে দেখিয়া খুসীই হইল। তাহার প্রাণটা এই ব্যূহের মাঝখানে পড়িয়া সঙ্গতৃষায় শুখাইয়া উঠিতেছিল। বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কেবল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সে তৃষা মোটেই মিটিত না, অথচ ছোট ছেলে মেয়েকে কেমন করিয়া যে কাছে টানিতে হয় সে বিদ্যাটা তাহার মোটেই জানা ছিল না।

ফুটকী নিজেই তাহার ঘরবাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল, নিজেই যাওয়া আসার সময় ইচ্ছা মত ঠিক করিয়া লইল। তাহার উপর গল্পের খোরাক ত তাহার অফুরন্ত ছিলই। মাণিক হয়ত অর্থনীতির অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতেছে, ফুটকী ভোনাকে টানিতে-টানিতে আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, ভোনাটা কি বোকা দেখেছ! এক পয়সায় বাতাসা দেবে এতগুলো আর জিলিপি দেবে দুখানা। তবু বল্বে, জিলিপি খাব। পারিনে বাপু এমন বেয়াড়া ছেলে নিয়ে।"

একটু পরেই গিন্নিপনা ভুলিয়া সে মাণিকের বই টানিয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিত, বলিত, "বইগুলো ফেলে দাও না। তোমার ত এক শ' দু'শ' টাকা আছে। তবে আবার কেন লেখা পড়া কর্‌ছ?"

মাণিক বলিত, "কে বলেছে আমার এক শ' দু' শ' টাকা আছে?"

ফুটকী বলিত, "আহা, আমি যেন আর কিছু বুঝি লোক? তা' হলে তোমার ঘরে কেন টেবিল চেয়ার, তুমি কেন পেয়ালাতে চা খাও? তোমার যে হাতে ঘড়ি বাঁধা আছে। বাবার ত নেই, দাদারও নেই। কখ্‌খনো তোমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে নয়।"

ফুটকীর কাছে মাণিক ছিল ঐশ্বর্য্যের, বিদ্যার, সৌন্দর্য্যের এমন কি আচার ব্যবহারেরও আদর্শস্থল। এহেন মানুষকে বন্ধুরূপে দখল করিতে পারাকে সে গর্ব্বের বিষয়ই মনে করিত! সাধারণ শিশুমহলে ততটা না হইলেও তাহার ভ্রাতৃমহলে এইজন্য তাহার একটা খাতির ছিল।

সাতটি সন্তান রাখিয়া ফুটকীর মা আজ ছয়মাস হইল সংসারের মায়া কাটাইয়া গিয়াছেন তখন হইতে এই নয় বছরের মেয়েটিই হইয়াছে বাড়ীর গৃহিণী। গৃহকর্ত্তার মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ টাকা, অবশ্য উপরি পাঁচদশ টাকা এদিক ওদিক হইতে তিনি যে সংগ্রহ না করিতেন তা নয়। কিন্তু তাহাতেও সাতটি ছেলে মেয়েকে খাইতে পরিতে এবং থাকিতে দিতে ভাল করিয়া কুলাইত না। সুতরাং এই ক্ষুদ্র গৃহিণীটির সহায়রূপ কোনো দাসী চাকরের বালাই ছিল না! উপরন্তু অর্থের অভাবে এত বয়সেও তাহার সাজপোষাক ছেলেদের মত থাকিয়া গিয়াছিল।

তাহাতে ফুটকীর আপত্তি ছিল না; কারণ শাড়ী পরিয়া হাঁড়ি নামাইতে, ছেলে কোলে করিতে এবং মধ্যে-মধ্যে সুযোগ বুঝিয়া এবাড়ী সেবাড়ী লাফ ঝাঁপ করিতে তাহার অত্যন্ত অসুবিধাই হইত। গায়ের জামার উপর প্যাঁচ দেওয়া শাড়ীর অনাবশ্যক অংশটা ক্রমাগত গড়াইয়া পায়ে আসিয়া জড়াইত, পায়ে পায়ে হোঁচট খাইতে হইত। কাজেই শাড়ীর দুঃখে সে মোটেই কাতর ছিল না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাহার দুঃখের অভাব ছিল না। ভোর না হইতে ভোনা কান্না জুড়িয়া দিত, মটকা তাহার খাটো চুল ধরিয়াই হ্যাঁচ্‌কা টান দিত, "ওঠ্ না বাঁদ্‌রী, রান্না কর্‌তে যে বেলা হয়ে যাবে।" কুনী নাকি সুরে কাঁদিয়া উঠিত, "আঁগে আঁমি বাঁর্লি খাঁব।" দুনী বিনা বাক্যব্যয়ে লেপের ভিতর হইতে নিষ্ঠুরভাবে তাহার পা ধরিয়া টান দিত; আর সকলের বড় ভাই মিন্টু ফুটকীর বহু যত্নে সঞ্চিত দুই চার আনা পয়সা, কি টিনের বাক্স, ছোট আর্সী কিম্বা রঙীন ফিতাগুলি আত্মসাৎ করিয়া সকলের আগে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। ফুটকীর ইচ্ছা করিত বিছানাটা আর একটু আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে, কিন্তু ঢালা বিছানায় সব কটি ভাইএর সঙ্গে তাহাকে শুইতে হইত, সুতরাং তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে তাহার নিস্তার পাওয়া শক্ত। কাজ করিবার ও আপনার ধনদৌলত সামলাইবার জন্য আলস্য তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইত।

হঠাৎ কখন যেন উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইত। সারা বাড়ী খুঁজিয়াও তাহাকে না পাইয়া মটুকা আসিয়া মাণিকলালের ঘরে দেখিত ফুটুকী ভোনাকে কোলে করিয়া সকাল বেলা বেশ দিব্য আরামে চেয়ারে পা ঝুলাইয়া ডিমভাজা খাইতেছে। মটুকা আসিয়া পড়িলে অবশ্য ভাগ পাইত; কিন্তু মাণিকলাল চশমা তুলিয়া পরিয়া তৎক্ষণাৎ এমনই কাজের ভাণ করিয়া ভোজে মন্দা পড়াইয়া দিত যে নবাগত অতিথি মোটেই খুসী হইত না। সুতরাং সে রাগে ও হিংসায় জ্বলিয়া গায়ের জোরে ফুটুকীকে টানিতে-টানিতে বাড়ী লইয়া যাইত আর বলিত, "বাবা বলেছে আজ পাড়াবেড়ানি-মেয়েকে মেরে পিঠের ছাল তুলে দেবে।"

মিঠু সচরাচর বাড়ীতে থাকিত খুব কমই, কিন্তু যদিই বা কোনোদিন অসময়ে হঠাৎ আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে সেও মটুকার সহায়ক হইয়া ফুট্‌কীকে শাস্তি দিবার নানা অভিনব উপায় আবিষ্কার করিত।

ফুটুকী কিন্তু দমিত না। ছাড়া পাইলেই আবার ছুটিয়া আসিয়া মাণিকলালের বাড়ী হাজির হইত এবং বলিত, "ওরা আমাকে ধরে-ধরে ছেঁচ্‌ছিল। আচ্ছা, দাঁড়াও না বড় হ'লে আমিও ওদের ধরে ছেঁচ্‌ব, আর সব জিনিষ কেড়ে নেব; কাল তুমি যে আমায় পয়সা দিয়েছিলে মিঠু লক্ষীছাড়া নিয়ে নিয়েছে। ওকে দাদা বল্‌বে না কচু বল্‌বে।"

মাণিকলাল উপহার দিবার একটা মানুষ পাইয়া প্রায় প্রত্যহই ফুটুকীকে হয় লজঞ্জুস, নয় ফিতা, নয় পেনসিল-কলম, কি পয়সা সিকি দুআনি কিছু না কিছু একটা দিত। মটুকা চুনী কুনীরা এই কারণে তাহার খানিকটা স্তাবক ছিল, কিন্তু মিঠু করিত জুলুম। পরদিন প্রায়ই শোনা যাইত, "আহা, মটুকা বেচারী চাইলে," অথবা "কুনীটা ছেলেমানুষ ওকে যে কেউ দেয় না," নয়ত "দাদা লক্ষীছাড়া হাড়জ্বালানে আমার মেরে কেড়ে নিলে।"

সুতরাং এত পাইয়াও ফুটুকীর সম্পদ বাড়িত না।

৩

মাণিক কলেজ যাইতেছিল ফুটুকী পিছন হইতে ডাকিল, 'মাণিকদা শুনে যাও, বিনি বল্‌ছে তুমি বেশ সুন্দর দেখতে, ও তোমার সঙ্গে বন্ধু পাতাবে।"

বিনি নাম্নী বালিকাটি ফুট্‌কীর পিঠে প্রচণ্ড এক চড় মারিয়া বলিল, 'মেরে ফেল্‌ব যদি ফের একটা কথা বলিস্।'

মাণিক একবার মাত্র পিছন ফিরিয়া ছোট বড় মাঝারির নানা রকমের সবেণী ও অবেণী বালিকার দল দেখিয়া হন্‌-হন্‌ করিয়া ছুটিয়া গলির বাহিরে চলিয়া গেল। মেয়েরা ঠাট্টা করিয়া উঠিল, "ওঃ ভারি তোর বন্ধু রে, ডাকলেও তাকায় না।"

ফুটুকী রাগে অভিমানে গাল ফুলাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। একবার মাণিকের খালি বাড়ীটায় ঢুকিয়া কি সব হিজি বিজি কাটিল, তাহার পর নিজের বাড়ী চলিয়া আসিল।

বাড়ীতে এমন সময়ে মিঠু কোনো দিন থাকে না; সস্তা চায়ের দোকানের দরজায় দাঁড়াইয়া যাকে তাকে বন্ধু পাকড়াইয়া পরের পয়সায় কিছু বাসি মাছের চপ খাইয়া ও বিঁড়ি ফুঁকিয়া ট্যাক্সী ড্রাইভারদের সঙ্গে আড্‌ডা দিয়া গায়ে হাওয়া লাগাইয়া বেড়ানোই ছিল তাহার প্রাত্যহিক কাজ। ইহা ছাড়াও আর তাহার যা সব কাজ ছিল তাহাকে ভদ্র কোনো আখ্যা দেওয়া শক্ত।

ফুটুকী বাড়ী ঢুকিয়াই দেখিল মিঠু তাহাদের ঘরের একমাত্র আসবাব বাবার তক্তাপোষখানার উপর পা তুলিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে। ফুটুকী বলিল, "দাদা, বাড়ী এসেছ যে। অসুখ করেছে বুঝি!"

মিঠু লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "একটু মাথা ধরেছিল সে এখ্‌খুনি সেরে যাবে।"

ফুটুকী নাচিয়া উঠিয়া বলিল,"আরে দূর! মাথাধরা বুঝি অমনি সারে? মাণিকদা বলেছে ওডিকলোন দিতে হয়। দাঁড়াও আমি এনে দিচ্ছি, মাণিকদার অনেক আছে।"

মিঠু বলিল, "তোর মাণিকদা বড় নবাব দেখ্‌ছি, সবই তার আছে?"

ফুটুকী গর্ব্বিতভাবে মাথা দোলাইয়া বলিল, "ওমা তা থাক্‌বে না! ওরা যে বড়লোক। সব আলমারী বাক্স বোঝাই পড়ে রয়েছে, তাতে কতো—ও কাপড় জামা, বই, টাকা-পয়সা। ঘরে কেমন সুন্দর আলো, পাখা; তুমি অমন দেখই নি।"

মিঠুর লুব্ধদৃষ্টি চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল "আমাকে দেখাবি।"

ফুটুকী একটু লজ্জা পাইয়া বলিল,"তুমি এত বড় ধেড়ে ছেলে, ইংরিজী জান না, কলেজে যাও না, শুধু-গায়ে রাস্তায় বেড়াও, তোমাকে আমি মাণিকদার কাছে নিয়ে যেতে পারব না। আমার বিচ্ছিরী লাগে।"

মিঠু মুখটা বাঁকাইয়া বলিল, "ওরে আমার বিদুষী রে। তুই বড় ইংরিজী জানিস, আর লেডী-দের বাড়ীর জুতো-জামা পরিস না? নিজের পেত্নীরূপ দেখাতে ত বেশ সুচ্ছিরী লাগে।"

ফুটুকী বলিল, "আমার সঙ্গে যে চেনা হয়ে গেছে, ওযে আমার মাণিকদা।" এই যুক্তির কাছে হার মানিয়া মিঠু বলিল, "আচ্ছা চল্‌ না চুপি চুপি দেখে আসি।" তোর মাণিককে বলিস্‌ না যেন।"

পিসিমার মত সুরে ফুট্‌কী বলিল, "তাই চল। চাকরটাকে বল্‌ব এখন, তাতে আমার লজ্জা করে না।"

চাকর তাহাদের দেখিয়া বলিল, "কি খোকী দিদিমণি! বাবু নেই, উপরে কুথা যাচ্ছ?"

ফুট্‌কী বলিল, "তুই থাম্ না। তোকে অত সদ্দারী করতে হবে না। আমার উপরে কাজ আছে আমি যাচ্ছি।"

চাকরটা আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ফুটকী পরম উৎসাহে ঘর-বাড়ী দেখাইতে সুরু করিল। "এই মাণিকদার পড়্‌বার ঘর। ইংরিজী বইতে পেন্‌সিলের দাগ দিয়ে একজামিনের পড়া এখানে পড়্‌তে হয়। আর গায়ে মাষ্টারের সব কথা লিখে রাখ্‌তে হয়। কেবল একপাতা দুপাতা পড়া নয়, কলেজে অনেক পড়া দ্যায়, গাদি-গাদি মোটা-মোটা বই এক-দিনেই পড়ে।"

"এই যে মাণিকদার খাবার টেবিল। এর উপর চাদর বিছিয়ে খায়, আর বাটির ভিতরে হাত ধোয়। চাদরের উপর জল ফেল্‌তে নেই, ছিব্‌ড়েও না। কেমন রূপোর ফুলদানি দেখেছ? আর টেবিলের ঘড়িটা দ্যাখ, ওটা গান গায়।"

ফুট্‌কীর বক্তৃতা কেহ শুনিতেছিল কিনা এবং তাহার নির্দ্দেশমত সকল জিনিষ দেখিয়া যাইতেছিল কি না, সেদিকে তাহার কোনোই লক্ষ্য ছিল না। সে আপন-মনেই মাণিকের ঐশ্বর্য্য-সম্ভার দেখাইয়া ও তাহার বর্ণনা করিয়া চলিয়াছিল। মিষ্টু মাঝে-মাঝে "হ্যাঁরে, এটা কি ওটা কি?" বলিয়া তাহার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছিল বটে, কিন্তু প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফুটকী প্রায় সব উত্তর শেষ করিয়া রাখিতেছিল। নিজের ধন-দৌলতেরও মানুষের এত গর্ব্ব হয় না, যত তাহার মাণিকের সম্পদে ছিল।

মাণিক যখন বাড়ী ফিরিল, তাহার অনেক আগেই ফুটকী ও মিষ্টু চলিয়া গিয়াছে। মাণিক ঘরে ঢুকিয়া দেখিল পড়িবার টেবিল জুড়িয়া ফুটকী খড়ি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, "মাণিকদা বড় দুষ্টু। আমার কথা শোনে না; মাণিকদা'র সঙ্গে আড়ি, এক শ', দুশ' তিন শ' বার।" তাহার পর টেবিলে ১ এর পিঠে যতগুলি ০ ধরে তত শূন্য দিয়া লিখিয়াছে, "যার চেয়ে বেশী বলা যায় না ততবার।"

সকালে ফুটকীর ডাকে সাড়া না দিয়া চলিয়া যাওয়ার অপরাধেই যে তাহার এই শাস্তি হইয়াছে বুঝিয়া মাণিক হাসিল। কিন্তু তখন রাত হইয়াছে রাগ ভাঙাইতে যাইবার মত সময় নয় এবং বাড়ী গিয়া ফুটকীকে ডাকা-ডাকি করা কোনোদিন তাহার অভ্যাসও ছিল না, তাই মাণিকলাল শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া মাণিকলাল চাকরটাকে ডিম কিনিতে পয়সা দিতে যাইবে, দেরাজে টান দিয়া দেখিল খুচ্‌রো পয়সাগুলো পড়িয়া আছে, কিন্তু পাঁচখানা দশ টাকার নোট নাই।

মাণিক বিস্মিত হইল। চিরকাল খোলা দেরাজে কিম্বা পড়িবার টেবিলের উপর চিঠি-পত্রের সঙ্গে টাকা ফেলিয়া রাখাই তাহার স্বভাব; কিন্তু কখনও ত একপয়সা তাহার লোক্‌সান হয় নাই। আজ হঠাৎ এতগুলো টাকা গেল কোথায়? মাণিক চাকরটাকে ডাকিয়া বলিল, "এই লক্ষ্মীছাড়া, দিন-দিন বুক্ তোর বিদ্যে বাড়ছে? দেরাজ থেকে টাকা কোথায় রেখেছিস্?"

সে বলিল, "রাম রাম, বাবুজি, ই সরমকে বাত। টাকা আমি লিলে গলা দিয়ে খুন উঠারকে মর্ যাব না।"

মাণিক বলিল, "তুই নিস্ নি ত কি ভূতে এসে নিয়ে গেছে নাকি?"

চাকরটা বলিল, "খোকী দিদিমণি এসেছিল, আর সেই চোট্টা বাবুটা এসেছিল। ওই বদ্‌মাসোয়া লিয়ে হোবে।"

মাণিক কিছু বলিল না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ফুটকী একহাত কয়লা মাখিয়া দরজার কাছে একবার উঁকি মারিয়া চলিয়া গেল। মাণিক কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। খানিকপরে শুনিল ভোনাকে সে গর্জ্জন করিয়া বকিতেছে, "না গো না, অত নোলায় কাজ নেই! আর ডিম খায় না; হ্যাংলা ছেলে কোথাকার! মাণিক-দার সঙ্গে আমি আড়ি করে দিয়েছি।"

তাহার আড়ির খবরটা মাণিক যদি ভুল করিয়া না পড়িয়া থাকে, তাই ভোনাকে ধরিয়া আনিয়া মাণিককেই যে খবরটা শুনান হইতেছে তাহা বুঝিতে মাণিকের দেরী হইল না। একটা সন্দেহের চাপে মনটা তাহার ক্লিষ্ট হইয়া থাকিলেও ফুটকীর ব্যবহারে সে তাহাকে না ডাকিয়া পারিল না। সে ডাকিল "ফুটকী, শুনে যাও।" ফুটকী খাটো চুলগুলা দুলাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "সকালবেলায় তোমার ডাকাডাকি শুনবার আমার সময় নেই। আমার কাজ আছে; এত-গুলো রাক্ষসের ভাত জোগাতে হবেনা?"

মাণিক বলিল, "হবে ত হবে! দরকারী কথা আছে, শুনে যাও।"

ফুটকী যেন কতই অনিচ্ছাভরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মাণিক একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "ফুটকী, কাল দুপুরে কাকে সঙ্গে করে এনেছিলে?"

ফুটকী একটু চমকাইয়া উঠিল; মাণিকদাকে বলিতে যে মিষ্টু বারণ করিয়া দিয়াছে। তাছাড়া মিষ্টুর কথা বলিতে তাহার নিজেরও ভাল লাগে না। ফুটকী বলিল, "কাউকে না। একাই এসেছিলাম। কেন, আমি লিখ্‌তে পারি না ভেবেছ? নিজেই লিখেছিলুম।"

মাণিক ভাবিয়া পাইল না, মিষ্টুকে আনিয়া থাকিলে

ফুটকী কেন তাহা লুকাইতেছে। তাহার কি এই ব্যাপারে যোগ থাকা সম্ভব! না চাকরটা নিজের দোষ এই উপায়ে পরের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিতেছে। সে বলিল, "না, তার জন্যে নয়। কতকগুলো টাকা পাচ্ছি না। কেউ যদি ভুল ক'রে নিয়ে থাকে, তাই ভাবছি।"

ফুটকী মুখটা লাল করিয়া বলিল, "সত্যি নাকি? ওমা, কি হবে?"

সে আর দাঁড়াইল না। হন্‌-হন্‌ করিয়া সেখান হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল, মাণিক তাহার রকম দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪)

সারাদিনের মধ্যে ফুটকীর আর দেখা পাওয়া গেল না। মাণিক একবার ভাবিল গিয়া খোঁজ করিবে। কিন্তু পুলিশের মত আজকের দিনে বাড়ীচড়াও হইতে তাহার লজ্জা করিল। সে কাজে-অকাজে যতবার বাহিরে যাওয়া-আসা করিল, ততবারই ঘুরিয়া-ঘুরিয়া শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিল, কি জানি যদি ফুটকী আসিয়া ঘরে বসিয়া থাকে, অথবা যদি চাকরটা তাহাকে ঘরে ঢুকিতে না দিয়া থাকে।

গলির মধ্যে ভোনা ধূলায় একলা বসিয়া মুঠা মুঠা ধূলা গায়ে মাখিতেছিল ও চাল-ডালের খুদ কি কাঁকর-বালি যাহা পাইতেছিল, তাহাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া মুখে পুরিতেছিল। আজ তাহাকে আগলাইবার কেহ নাই। ছুনী ও কুনী দুই টুকরা শুকনো রুটি হাতে করিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিতেছিল, মাণিককে দেখিয়াই পলাইয়া গেল। মটকা একটা গলাভাঙা বোতলে তেল কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, সেও যেন কোনো প্রকারে মাণিকের চোখ এড়াইয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মাণিক যখন বিছানায় শুইয়া বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন হঠাৎ কে যেন তাহার দরজা ঠেলিল। মাণিক ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, মনে হইল যেন ফুটকী বাহির হইতে ডাকিতেছে, 'মাণিক-দা' দরজাটা খোল।" এমন মিহিগলায় ফুটকী কখন ত ডাকে না। মাণিক অবাক হইয়া গেল। খানিক পরে বলিল—"দরজা খোলা আছে ঠেলে এস।"

কি রকম যেন চোরের মত চুপি চুপি ফুটকী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার গতিতে হরিণ শিশুর মত সে চাঞ্চল্য নাই, কথায় হাসির সে উচ্ছ্বাস নাই, চোখের দৃষ্টিতে শরতের আলোর মত সে দীপ্তি নাই; একদিনে কে যেন তাহার ফুটন্ত প্রাণ দুই পায়ে দলিয়া দিয়াছে। মাণিক উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ফুটকী কি হয়েছে ভাই? এতরাত্রে কেন?"

ফুটকী হঠাৎ ঝাঁপাইয়া আসিয়া মাণিকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'মাণিক-দা' আমি মিছে কথা বলেছিলাম। বাবা মিছে কথা বলে, দাদা মিছে কথা বলে, তবে আমি কেন বলব না? মিন্টু পাজিটা চুপি চুপি এসেছিল আমার সঙ্গে।"

মাণিক বলিল, 'এত রাত্রে না বলে কাল সকালে বললেই ত হত।"

ফুটকী গলার স্বর নামাইয়া বলিল, "ওরে বাবা, সকালে যে আমাকে বন্ধ করে রাখবে! আজ সারাদিন আমায় বন্ধ করে রেখেছিল। মাণিক-দা মিন্টুটা বড় লক্ষ্মীছাড়া ও তোমার টাকা চুরি করেছে, আমি বুঝতে পেরেছি। ওটাকে বলেছিলাম তাই আমাকে হাত দুটো বেঁধে কড়ি-কাটের সঙ্গে টাঙিয়ে রেখেছিল' কেবল বুড় আঙুল দুটো মাটিতে ঠেকেছিল। উঃ, এমন মেরেছে জান না। আবার বাবাকে বলেছে আমি নাকি বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশি। বাবা আমাকে তার উপরে বিছুটি দিয়ে মেরে সারাদিন ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। বলেছে, 'কোথাও বেরোতে পাবি না।" রাত্তিরে খাবার সময় ছেড়ে দিয়েছিল। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই দরজা খুলে পালিয়ে এসেছি।"

ফুটকী হঠাৎ নিজের পা-দুইটা ধরিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, "মাণিকদা, তোমার সেই ভাল ওষুধটা দাও না ভাই; পায়ে বড় ব্যথা, গায়ে বড় জ্বালা। আমি হাঁটতে পারছি না।"

মাণিক তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া ওষুধ পাড়িয়া ফুটকীর হাতে-পায়ে লাগাইতে বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে উঁচু-উঁচু হইয়া সারি-সারি কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। দুষ্ট-দুষ্ট হাসি-হাসি মুখখানা একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে। পাহাড়ে ঝরণার মত দুরন্ত মেয়েটির এমন চেহারা দেখিয়া মাণিকের চোখে জল আসিল।

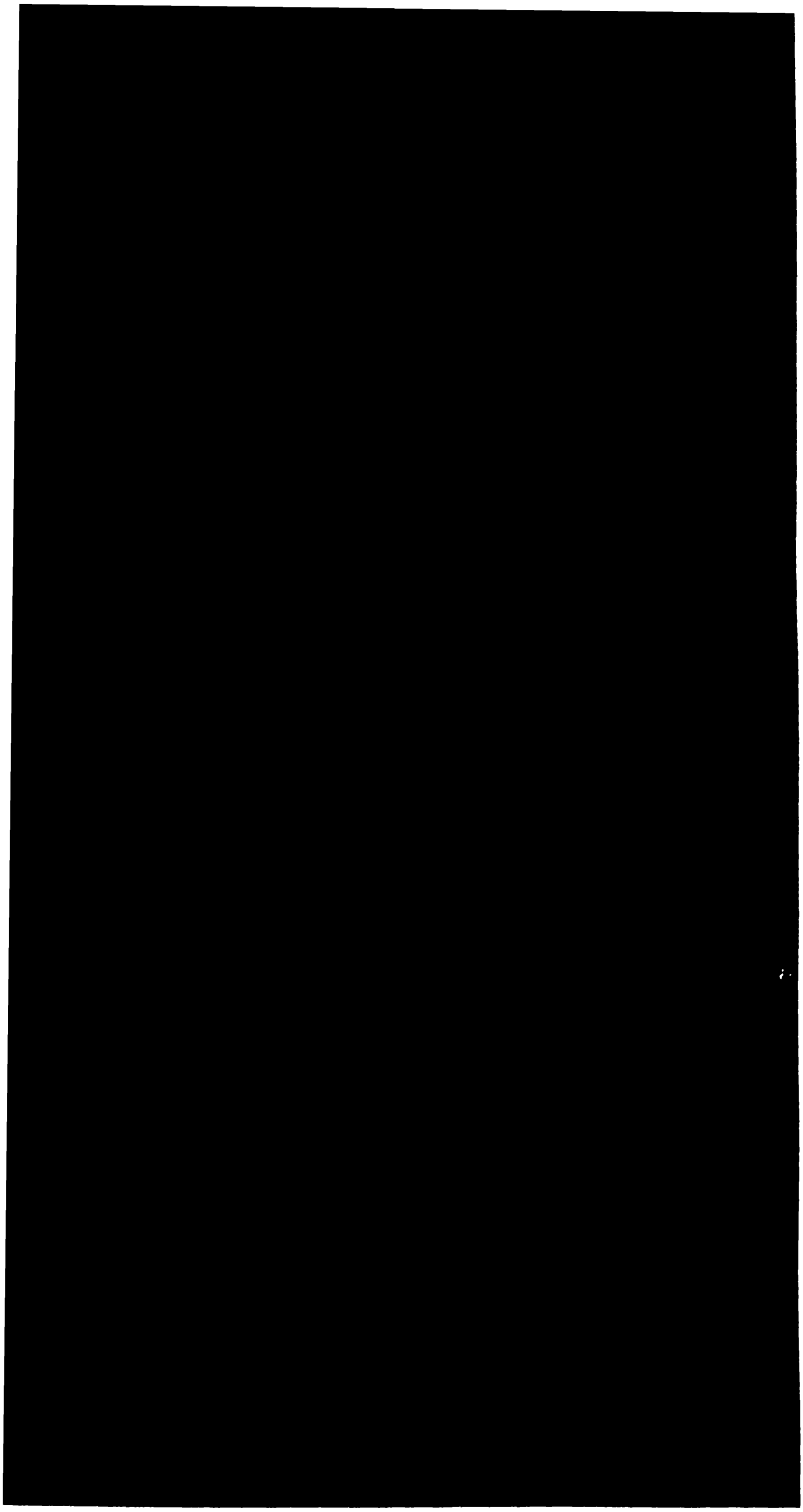
মাণিক বলিল, "চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসি। তা' না হ'লে জানতে পারলে আবার তোমায় ওরা শাস্তি দেবে।"

ফুটকী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, "মাণিকদা' তোমার মালা আছে?"

মাণিক বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন রে?"

ফুটকী বলিল, "তা হ'লে তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে। আমাকে আর যেতে হবে না। আমি ওখানে যাব না, আমার ভয় করে। মিন্টুটা আমাকে মেরে ফেলবে। বলেছে, যদি আমার নাম করিস্‌ তবে খুন ক'রে ফেলব।"

মাণিক বলিল, "আচ্ছা, মিন্টুকে নাই বা বললে এ-সব কথা। সে কেমন খুন করে আমি দেখে নেব। তারপর একদিন আমি ভাল মালা কিনে আনব। আঁধার ঘরে বিয়ে হবে না, অনেক আলো জেলে ভাল করে বিয়ে হবে।"



স্বাধীনতার স্বপ্ন

শিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

২য় সংখ্যা

নামঞ্জুর গল্প

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের আসর জমেছিল পোলিটিক্যাল লঙ্কাকাণ্ডের পালায়। হাল আমলের উত্তরকাণ্ডে আমরা সম্পূর্ণ ছুটি পাইনি বটে, কিন্তু গলা ভেঙেচে; তা ছাড়া সেই অগ্নি-দাহের খেলা বন্ধ।

বঙ্গভঙ্গের রঙ্গভূমিতে বিদ্রোহীর অভিনয় সুরু হ'ল। সবাই জানেন, এই নাট্যের পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্য আলিপুর পেরিয়ে পৌঁছল আণ্ডামানের সমুদ্রকূলে। পারাণীর পাথেয় আমার যথেষ্ট ছিল, তবু গ্রহের গুণে এপারের হাজতেই আমার ভোগসমাপ্তি। সহযোগীদের মধ্যে ফাঁসিকাঠ পর্য্যন্ত যাদের সর্ব্বোচ্চ প্রোমোশন হয়েছিল, তাদের প্রণাম ক'রে আমি পশ্চিমের এক সহরের কোণে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পসার জমিয়ে তুল্লেম।

তখনো আমার বাবা বেঁচে। তিনি ছিলেন বাংলা-দেশের এক বড়ো মহকুমার সরকারী উকীল। উপাধি ছিল রায়-বাহাদুর। তিনি বিশেষ-একটু ঘটা ক'রেই আমার বৃত্তি বন্ধ ক'রে দিলেন। তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে আমার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল কি না অন্তর্যামী জানেন, কিন্তু হয়েছিল পকেটের সঙ্গে। মনি অর্ডারের সম্পর্ক পর্য্যন্ত ছিল না। যখন আমি হাজতে তখনি মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। আমার পাওনা শাস্তিটা গেল তাঁর উপর দিয়েই।

আমার পিসি ব'লে যিনি পরিচিত তিনি আমার স্বোপার্জ্জিত কিম্বা আমার পৈতৃক, তা নিয়ে কারো কারো মনে সংশয় আছে। তা'র কারণ, আমি পশ্চিমে যাবার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সম্পূর্ণই অব্যক্ত ছিল। তিনি আমার কে, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে তো থাক্, কিন্তু তাঁর স্নেহ না পেলে সেই আত্মীয়তার অরাজকতাকালে আমাকে বিষম দুঃখ পেতে হ'ত। তিনি আজন্ম পশ্চিমেই কাটিয়েচেন, সেইখানেই বিবাহ, সেইখানেই বৈধব্য। সেইখানেই স্বামীর বিষয়সম্পত্তি। বিধবা তাই নিয়েই বদ্ধ ছিলেন।

তাঁর আরো-একটি বন্ধন ছিল। বালিকা অমিয়া। কন্যাটি স্বামীর বটে, স্ত্রীর নয়। তা'র মা ছিল পিসিমার এক যুবতী দাসী, জাতিতে কাহার। স্বামীর মৃত্যুর পর

মেয়েটিকে তিনি ঘরে এনে পালন করছেন—সে জানেও না যে, তিনি তা'র মা নন।

এমন অবস্থায় তাঁর আর-একটি বন্ধন বাড়্‌ল, সে হচ্ছে আমি স্বয়ং। যখন জেলখানার বাইরে আমার স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তখন এই বিধবাই আমাকে তাঁর ঘরে এবং হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন। তা'র পরে বাবার দেহান্তে যখন জানা গেল উইলে তিনি আমাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করেননি, তখন সুখেদুঃখে আমার পিসির চোখে জল পড়্‌ল। বুঝ্‌লেন, আমার পক্ষে তাঁর প্রয়োজন ঘুচ্‌ল। তাই ব'লে স্নেহ তো ঘুচ্‌ল না। তিনি বল্‌লেন, "বাবা, যেখানেই থাকো, আমার আশীর্ব্বাদ রইল।" আমি বল্‌লেম, "সে তো থাক্‌বেই, সেই সঙ্গে তোমাকেও থাক্‌তে হবে, নইলে আমার চল্‌বে না। হাজৎ থেকে বেরিয়ে যে-মাকে আর দেখ্‌তে পাইনি, তিনিই আমাকে পথ দেখিয়ে তোমার কাছে নিয়ে এসেচেন।" পিসিমা তাঁর এতকালের পশ্চিমের ঘর-সংসার তুলে দিয়ে আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় চ'লে এলেন। আমি হেসে বল্‌লেম, "তোমার স্নেহ-গঙ্গার ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে বহন ক'রে এনেছি, আমি কলির ভগীরথ।"

পিসিমা হাস্‌লেন, আর চোখের জল মুছ্‌লেন। তাঁর মনের মধ্যে কিছু দ্বিধাও হ'ল; বল্‌লেন, "অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিল মেয়েটার কোনো-একটা গতি ক'রে শেষ বয়সে তীর্থ ক'রে বেড়াবো—কিন্তু বাবা, আজ যে তা'র উল্টো পথে টেনে নিয়ে চল্‌লি।" আমি বল্‌লুম, "পিসিমা, আমিই তোমার সচল তীর্থ। যে-কোনো ত্যাগের ক্ষেত্রেই তুমি আত্মদান করো না কেন, সেইখানেই তোমার দেবতা আপনি এসে তা গ্রহণ কর্‌বেন। তোমার যে পুণ্য আত্মা।"

সবচেয়ে একটা যুক্তি তাঁর মনে প্রবল হ'ল। তাঁর আশঙ্কা ছিল, স্বভাবতই আমার প্রবৃত্তির ঝোঁকটা আণ্ডামান-মুখো, অতএব কেউ আমাকে সাম্‌লাবার না থাক্‌লে অবশেষে একদিন পুলিসের বাহুবন্ধনে বদ্ধ হবোই। তাঁর মৎলব ছিল, যে-কোমল বাহুবন্ধন তা'র চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ও স্থায়ী আমার জন্ত তা'রই ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তবে তিনি তীর্থভ্রমণে যা'র হবেন। আমার বন্ধন নইলে তাঁর মুক্তি নেই।

আমার চরিত্র-সম্বন্ধে এইখানে ভুল হিসেব করেছিলেন। কুষ্টিতে আমার বধ-বন্ধনের গ্রহটি অস্তিমে আমাকে শকুনি-গৃধিনীর হাতে স'পে দিতে নারাজ ছিলেন না, কিন্তু প্রজাপতির হাতে, নৈব নৈব চ। কন্যা-কর্ত্তারা ত্রুটি করেন-নি, তাঁদের সংখ্যাও অজস্র। আমার পৈতৃক সম্পত্তির বিপুল সচ্ছলতার কথা সকলেই জান্‌ত, অতএব ইচ্ছা কর্‌লে সম্ভবপর শ্বশুরকে দেউলে ক'রে দিয়ে কন্যার সঙ্গে সঙ্গে বিশপঁচিশ হাজার টাকা নহবতে সাহানা বাজিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে আদায় কর্‌তে পার্‌তেম। করিনি। আমার ভাবী চরিতলেখক একথা যেন স্মরণ রাখেন যে, স্বদেশসেবার সঙ্কল্পের কাছে এককালীন আমার এই বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার ত্যাগ। জমা-খরচের অঙ্কটা অদৃশ্য কালীতে লেখা আছে ব'লে যেন আমার প্রশংসার হিসাব থেকে বাদ না পড়ে। পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে আমার মহৎ চরিত্রের এইখানে মিল আছে।

পিসিমা শেষ পর্য্যন্ত আশা ছাড়েননি। এমন সময়ে ভারতের পোলিটিক্যাল আকাশে আমাদের সেই ক্ষাত্রযুগের পরবর্ত্তী যুগের হাওয়া বইল। পূর্ব্বেই বলেচি, এখনকার পালায় আমরা প্রধান নায়ক নই, তবু ফুট-লাইটের অনেক পিছনে মাঝে মাঝে নিস্তেজভাবে আমাদের আসা-যাওয়া চল্‌চে। এত নিস্তেজ যে পিসিমা আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তই ছিলেন। আমার জন্তে কালী-ঘাটে স্বস্ত্যয়ন কর্‌বার ইচ্ছে এককালে তাঁর ছিল, কিন্তু ইদানীং আমার ভাগ্য-আকাশে লালপাগ্‌ড়ির রক্তমেঘ একেবারে অদৃশ্য থাকাতে তাঁর আর খেয়াল রইল না। এইটেই ভুল কর্‌লেন।

সেদিন পূজোর বাজারে ছিল খদ্দরের পিকেটিঙ্‌। নিতান্ত কেবল দর্শকের মতন গিয়েছিলেম—আমার উৎসাহের তাপমাত্রা ৯৮ অঙ্কেরও নীচে ছিল, নাড়ীতে বেশি বেগ ছিল না। সেদিন যে আমার কোনো আশঙ্কার কারণ থাক্‌তে পারে সে-খবর আমার কুষ্টির নক্ষত্র ছাড়া আর সবার কাছে ছিল অগোচর। এমন সময় খদ্দরপ্রচারকারিণী কোনো বাঙালী মহিলাকে

পুলিশ সার্জ্জন দিলে ধাক্কা। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার অহিংস অসহযোগের ভাবখানা প্রবল দুঃসহযোগে পরিণত হ'ল। সুতরাং অনতিবিলম্বে থানায় হ'ল আমার গতি। তা'র পরে যথানিয়মে হাজতের লালায়িত কবলের থেকে জেলখানার অন্ধকার জঠর-দেশে অবতরণ করা গেল। পিসিমাকে ব'লে গেলেম, "এইবার কিছুকালের জন্যে তোমার মুক্তি। আপাতত আমার উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব রইল না, অতএব এই সুযোগে তুমি তীর্থভ্রমণ ক'রে নাওগে। অমিয়া থাকে কলেজের হস্‌টেলে; বাড়ীতেও দেখবার শোন্‌বার লোক আছে, অতএব এখন তুমি দেবসেবায় ষোলো আনা মন দিলে দেবমানব কারো কোনো আপত্তির কথা থাক্‌বে না।"

জেলখানাকে জেলখানা ব'লেই গণ্য ক'রে নিয়েছিলেম। সেখানে কোনোরকম দাবীদাওয়া আবদার-উৎপাত করিনি। সেখানে সুখ, সম্মান, সৌজন্য, সুহৃৎ ও সুখাদ্যের অভাবে অত্যন্ত বেশি বিস্মিত হইনি। কঠোর নিয়মগুলোকে কঠোরভাবেই মেনে নিয়েছিলেম। কোনো-রকম আপত্তি করাটাই লজ্জার বিষয় ব'লে মনে করতেম।

মেয়াদ পূরো হবার কিছু পূর্ব্বেই ছুটি পাওয়া গেল। চারদিকে খুব হাততালি। মনে হ'ল যেন বাংলাদেশের হাওয়ায় বাজ্‌তে লাগ্‌ল, এন্‌কোর, এক্‌সেলেণ্ট্‌। মনটা খারাপ হ'ল। ভাব্‌লেম, যে ভুগ্‌ল সেই কেবল ভুগ্‌ল। আর মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, রস পেলে দশে মি'লে। সেও বেশিক্ষণ নয়; নাট্যমঞ্চের পর্দ্দা প'ড়ে যায়, আলো নেভে, তা'র পরে ভোলবার পালা। কেবল বেড়িহাতকড়ার দাগ যার হাড়ে গিয়ে লেগেছে তা'রই চিরদিন মনে থাকে।

পিসিমা এখনো তীর্থে। কোথায় তা'র ঠিকানাও জানিনে। ইতিমধ্যে পূজোর সময় কাছে এল। একদিন সকালবেলায় আমার সম্পাদক-বন্ধু এসে উপস্থিত। বল্‌লেন, "ওহে, পুজোর সংখ্যার জন্যে একটা লেখা চাই।" জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "কবিতা?"

"আরে না। তোমার জীবনবৃত্তান্ত।"

"সে তো তোমার একসংখ্যায় ধর্‌বে না।"

"একসংখ্যায় কেন? ক্রমে ক্রমে বেরবে।"

"সতীর মৃতদেহ সুদর্শনচক্রে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছড়ানো হয়েছিল। আমার জীবনচরিত সম্পাদকী চক্রে তেম্‌নি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সংখ্যায় সংখ্যায় ছড়িয়ে দেবে এটা আমার পছন্দসই নয়। জীবনী যদি লিখি গোটা আকারে বের ক'রে দেবো।"

"না হয় তোমার জীবনের কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা লি'খে দাও না।"

"কি-রকম ঘটনা?"

"তোমার সবচেয়ে কঠোর অভিজ্ঞতা, খুব যাতে ঝাঁজ।"

"কি হবে লি'খে?"

"লোকে জান্‌তে চায় হে।"

"এত কৌতূহল? আচ্ছা, বেশ, লিখ্‌ব।"

"মনে থাকে যেন, সবচেয়ে যেটাতে তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা।"

"অর্থাৎ সবচেয়ে যেটাতে দুঃখ পেয়েছি লোকের তা'তেই সবচেয়ে মজা। আচ্ছা বেশ। কিন্তু নামটাম-গুলো অনেকখানি বানাতে হবে।"

"তা তো হবেই। যেগুলো একেবারে মারাত্মক কথা, তা'র ইতিহাসের চিহ্ন বদল না কর্‌লে বিপদ্‌ আছে। আমি সেইরকম মরীয়াগোছের জিনিষই চাই। পেজ প্রতি তোমাকে—"

"আগে লেখাটা দেখ, তা'র পরে দরদস্তুর হবে।"

"কিন্তু আর কাউকে দিতে পার্‌বে না ব'লে রাখ্‌চি। যিনি যত দর হাঁকুন আমি তা'র উপরে—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে।"

শেষকালটা উঠে যাবার সময় ব'লে গেলেন, "তোমাদের ইনি, বুঝ্‌তে পার্‌চ? নাম করব না, ঐ যে তোমাদের সাহিত্যধুরন্ধর—মস্ত লেখক ব'লে বড়াই; কিন্তু যা বলো তোমার স্টাইলের কাছে তা'র স্টাইল, যেন ডসনের বুট আর তালতলার চটি।"

বুঝ্‌লেম আমাকে উপরে চড়িয়ে দেওয়াটা উপলক্ষ্য-মাত্র, তুলনায় ধুরন্ধরকে নাবিয়ে দেওয়াটাই লক্ষ্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। এইবার আমার কঠোর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

সন্ধ্যা কাগজ যেদিন থেকে পড়্‌তে সুরু, সেইদিন থেকেই আহারবিহার-সম্বন্ধে আমার কড়া ভোগ। সেটাকে জেলযাত্রার রিহার্সাল বলা হ'ত। দেহের প্রতি অনাদরের অভ্যাস পাকা হ'য়ে উঠ্‌ল। তাই প্রথমবার যখন ঠেল্‌লে হাজতে, প্রাণ-পুরুষ বিচলিত হয়নি। তা'র পর বেরিয়ে এসে নিজের পরে কারো সেবা-শুশ্রূষার হস্তক্ষেপমাত্র বরদাস্ত করিনি। পিসিমা দুঃখবোধ কর্‌তেন। তাঁকে বল্‌তেম,"পিসিমা,স্নেহের মধ্যে মুক্তি,সেবার মধ্যে বন্ধন। তা ছাড়া, একের শরীরে অন্য শরীরধারীর আইন খাটানোকে বলে ডাইয়ার্কি, দ্বৈরাজ্য,—সেইটের বিরুদ্ধে আমাদের অসহযোগ।" তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌তেন, "আচ্ছা বাবা, তোমাকে বিরক্ত কর্‌ব না।" নির্ব্বোধ, মনে মনে ভাব্‌তেম বিপদ্ কাট্‌ল।

ভুলেছিলেম, স্নেহ-সেবার একটা প্রচ্ছন্ন রূপ আছে। তা'র মায়া এড়ানো শক্ত। অকিঞ্চন শিব যখন তাঁর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দারিদ্র্যগৌরবে মগ্ন তখন খবর পান না, যে লক্ষ্মী কোন্-একসময়ে সেটা নরম রেশম দিয়ে বু'নে রেখেছেন, তা'র সোনার সুতোর দামে সূর্য্যনক্ষত্র বিকিয়ে যায়। যখন ভিক্ষের অন্ন খাচ্চি ব'লে সন্ন্যাসী নিশ্চিন্ত, তখন জানেন না যে, অন্নপূর্ণা এমন মসলায় বানিয়েছেন যে, দেবরাজ প্রসাদ পাবার জন্যে নন্দীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ কর্‌তে থাকেন! আমার হ'ল সেই দশা। শয়নে বসনে অশনে পিসিমার সেবার হস্ত গোপনে ইন্দ্রজাল বিস্তার কর্‌তে লাগ্‌ল, সেটা দেশাত্মবোধীর অন্যমনস্ক চোখে পড়্‌ল না। মনে মনে ঠিক দিয়ে ব'সে আছি, তপস্যা আছে অক্ষুণ্ণ। চমক ভাঙ্‌ল জেলখানায় গিয়ে। পিসিমা ও পুলিসের ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ভেদ আছে, কোনো-রকম অদ্বৈতবুদ্ধিদ্বারা তা'র সমন্বয় কর্‌তে পারা গেল না। মনে মনে কেবলই গীতা আওড়াতে লাগ্‌লেম, "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" হায়রে তপস্বী, কখন্ যে পিসিমার নানাগুণ নানা উপকরণ-সংযোগে হৃদয়দেশ পেরিয়ে একেবারে পাকযন্ত্রে প্রবেশ করেছে, তা জান্‌তেও পারিনি। জেলখানায় এসে সেই জায়গাটাতে বিপাক ঘট্‌তে লাগ্‌ল।

ফল হ'ল এই যে বজ্রাঘাতছাড়া আর-কিছুতে যে-শরীর কাবু হ'ত না, সে পড়্‌ল অসুস্থ হ'য়ে। জেলের পেয়াদা যদি বা ছাড়্‌লে, জেলের রোগগুলোর মেয়াদ আর ফুরোতে চায় না। কখনো মাথা ধরে, হজম প্রায় হয় না, বিকেল-বেলা জ্বর হ'তে থাকে। ক্রমে যখন মালাচন্দন হাততালি ফিকে হ'য়ে এসেছে, তখনো এ আপদ্‌গুলো টন্‌টনে হ'য়ে রইল।

মনে মনে ভাবি, পিসিমা তো তীর্থ কর্‌তে গেছেন, তাই ব'লে অমিয়াটার কি ধর্ম্মজ্ঞান নেই? কিন্তু দোষ দেবো কা'কে? ইতিপূর্ব্বে অসুখেবিসুখে আমার সেবা কর্‌বার জন্যে পিসিমা তা'কে অনেকবার উৎসাহিত করেছেন—আমিই বাধা দিয়ে বলেছি, ভালো লাগে না। পিসিমা বলেছেন, "অমিয়ার শিক্ষার জন্যেই বল্‌চি, তোর আরামের জন্যে নয়।" আমি বলেছি, "হাঁসপাতালে নার্সিং কর্‌তে পাঠাও না।" পিসিমা রাগ ক'রে আর জবাব করেননি।

আজ শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাব্‌চি, "না হয় একসময়ে বাধাই দিয়েছি, তাই ব'লে কি সেই বাধাই মান্‌তে হবে। গুরুজনের আদেশের পরে এত নিষ্ঠা এই কলিযুগে!"

সাধারণত নিকট সংসারের ছোটোবড়ো অনেক ব্যাপারই দেশাত্মবোধীর চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অসুখ ক'রে প'ড়ে আছি ব'লে আজকাল দৃষ্টি হয়েছে প্রখর। লক্ষ্য কর্‌লেম আমার অবর্ত্তমানে অমিয়ারও দেশাত্মবোধ পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় তা'র এত অভাবনীয় উন্নতি হয়নি। আজ অসহযোগের অসহ্য আবেগে সে কলেজত্যাগিনী; ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা কর্‌তেও তা'র হৃৎকম্প হয় না; অনাথাসদনের চাঁদার জন্যে অপরিচিত লোকের বাড়ীতে গিয়েও সে ঝুলি ফিরিয়ে বেড়ায়। এও লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেম, অনিল তা'র এই কঠিন অধ্যবসায় দে'খে তা'কে দেবী ব'লে ভক্তি করে,—ওর জন্মদিনে সেই ভাবেরই একটা ভাঙা ছন্দের স্তোত্র সে সোনার কালীতে ছাপিয়ে ওকে উপহার দিয়েছিল।

আমাকেও ঐধরণের একটা-কিছু বানাতে হবে, নইলে অসুবিধা হচ্চে। পিসিমার আমলে চাকরবাকরগুলো যথানিয়মে কাজ কর্‌ত, হাতের কাছে কাউকে-

না-কাউকে পাওয়া যেত। এখন একগ্লাস জলের দরকার হ'লে আমার মেদিনীপুরবাসী শ্রীমান্ জলধরের অকস্মাৎ অভ্যাগমের প্রত্যাশায় চাতকের মতো তাকিয়ে থাকি; সময় মিলিয়ে ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে নিজের ভোলা মনের পরেই একমাত্র ভরসা। আমার চির-দিনের নিয়মবিরুদ্ধ হ'লেও রোগশয্যায় হাজিরে দেবার জন্যে অমিয়াকে দুই-একবার ডাকিয়ে এনেচি; কিন্তু দেখ্‌তে পাই, পায়ের শব্দ শুন্‌লেই সে দরজার দিকে চম্‌কে তাকায়, কেবলি উস্‌খুস্ করতে থাকে। মনে দয়া হয়, বলি. "অমিয়া আজ নিশ্চয় তোদের মীটিং আছে।" অমিয়া বলে, "তা হোক না দাদা, এখনো আর-কিছুক্ষণ"—আমি বলি, "না, না, সে কি হয়? কর্ত্তব্য সব আগে।' কিন্তু প্রায়ই দেখ্‌তে পাই, কর্ত্তব্যের অনেক আগেই অনিল এসে উপস্থিত হয়। তা'তে অমিয়ার কর্ত্তব্য-উৎসাহের পালে যেন দম্‌কা হাওয়া লাগে, আমাকে বড়ো বেশি-কিছু বল্‌তে হয় না। শুধু অনিল নয়, বিদ্যালয়-বর্দ্ধক আরো অনেক উৎসাহী যুবক আমার বাড়ির একতলায় বিকেলে চা এবং ইন্‌স্পিরেশন গ্রহণ করতে একত্র হয়। তা'রা সকলেই অমিয়াকে যুগলক্ষ্মী ব'লে সম্ভাষণ করে। একরকম পদবী আছে, যেমন রায়-বাহাদুর, পাট করা চাদরের মতো, যাকেই দেওয়া যায় নির্ভাবনায় কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াতে পারে। আর-একরকম পদবী আছে যার ভাগ্যে জোটে সে বেচারা নিজেকে পদবীর সঙ্গে মাপসই করবার জন্যে অহরহ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে থাকে। স্পষ্টই বুঝ্‌লেম, অমিয়ার সেই অবস্থা। সর্ব্বদাই অত্যন্ত বেশি উৎসাহপ্রদীপ্ত হ'য়ে না থাক্‌লে তা'কে মানায় না। খেতে শুতে তা'র সময় না-পাওয়াটা বিশেষ সমারোহ ক'রেই ঘটে। এপাড়ায় ওপাড়ায় খবর পৌঁছয়। কেউ যখন বলে, এমন করলে শরীর টিঁক্‌বে কি ক'রে, সে একটুখানি হাসে—আশ্চর্য্য সেই হাসি। ভক্তরা বলে, আপনি একটু বিশ্রাম করুনগে, একরকম ক'রে কাজটা সেরে নেবো,—সে তা'তে ক্ষুণ্ণ হয়,—ক্লান্তি থেকে বাঁচানোই কি বড়ো কথা? দুঃখ-গৌরব থেকে বঞ্চিত করা কি কম বিড়ম্বনা? তা'র ত্যাগ-স্বীকারের ফর্দ্দের মধ্যে আমিও প'ড়ে গেছি। আমি যে তা'র এতবড়ো জেল-খাটা দাদা, উল্লাসকর কানাই, বারীন, উপেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে এক জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীতে যার স্থান, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পার হ'য়ে তা'র যে-দাদা গীতার শেষ দিকের অধ্যায়ের মুখে অগ্রসর হয়েছে, তা'কেও যথোচিতপরিমাণে দেখবার সে সময় পায় না। এতবড়ো স্যাক্রিফাইস। যেদিন কোনোকারণে তা'র দলের লোকের অভাব হয়েছে সেদিন আমিও তা'র উৎসাহের মৌতাৎ জোগাবার জন্যে বলেছি, "অমিয়া, ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ তোর জন্যে নয়, তোর জন্যে বর্ত্তমান যুগ।" আমার কথাটা সে গম্ভীরমুখে নীরবে মেনে নিয়েছে। জেলে যাওয়ার পর থেকে আমার হাসি অন্তঃশীলা বইচে—যারা আমাকে চেনে না তা'রা বাইরে থেকে আমাকে খুব গম্ভীর ব'লেই মনে করে।

বিছানায় একলা প'ড়ে প'ড়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌চি, বিমুখা বান্ধবা যান্তি। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, সেদিন কোথা থেকে একটা স্যাঙ্‌লা কুকুর আমার বারান্দার কোণে আশ্রয় খুঁজ্‌ছিল। গায়ের রোঁওয়া উঠে গেছে, জীর্ণ চামড়ার তলায় কঙ্কালের আবরু নেই,—আধমরা তা'র অবস্থা। অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তা'কে দূর্ দূর্ করে' তাড়িয়ে দিয়েছিলেম। আজ ভাব্‌ছিলেম এতটা বেশি ঝাঁজের সঙ্গে তা'কে তাড়ালেম কেন? বেগানা কুকুর ব'লে নয়, ওর সর্ব্বাঙ্গে মরণদশা দেখা দিয়েছে ব'লে। প্রাণের সঙ্গীতসভায় ওর অস্তিত্বটা বেসুরো, ওর রুগ্নতা বেয়াদবি। ওর সঙ্গে নিজের তুলনা মনে এল। চার-দিকের চলমান প্রাণের ধারার মধ্যে আমার অস্বাস্থ্য একটা স্থাবর পদার্থ—স্রোতের বাধা। সে দাবী করে, শিয়রের কাছে চুপ ক'রে ব'সে থাকো; প্রাণের দাবী, দিকে বিদিকে চ'লে বেড়াও। রোগের বাঁধনে যে নিজে বদ্ধ, অরোগীকে সে বন্দী করতে চায়,—এটা একটা অপরাধ। অতএব জীবলোকের উপর সব দাবী একেবারে পরিত্যাগ করব মনে ক'রে গীতা খুলে বস্‌লেম। প্রায় যখন স্থিতধীঃ অবস্থায় এসে পৌঁচেছি, মনটা রোগ অরোগের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে গেছে, এমন সময় অনুভব করলেম, কে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। গীতা থেকে চোখ নামিয়ে দেখি, পিসিমার পোষ্যমণ্ডলীভুক্ত একটি মেয়ে। এপর্য্যন্ত দূরের থেকেই সাধারণভাবেই তা'কে জানি; বিশেষভাবে তা'র

পরিচয় জানিনে—তা'র নাম পর্য্যন্ত আমার অবিদিত। মাথায় ঘোমটা টেনে ধীরে ধীরে সে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল।

তখন মনে পড়্‌ল, মাঝে মাঝে সে আমার দরজার বাইরের কোণে ছায়ার মতো এসে বারবার ফিরে ফিরে গেছে। বোধ করি সাহস ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে পারেনি। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মাথাধরার, গায়ে ব্যথার ইতিবৃত্তান্ত সে আড়াল থেকে অনেকটা জেনে গিয়েছে। আজ সে লজ্জাভয় দূর ক'রে ঘরের মধ্যে এসে প্রণাম ক'রে বস্‌ল। আমি যে একদিন একজন মেয়েকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্তে দুঃখ-স্বীকারের অর্ঘ্য নারীকে দিয়েছি, সে হয়তো বা দেশের সমস্ত মেয়ের হ'য়ে আমার পায়ের কাছে তারি প্রাপ্তিস্বীকার কর্‌তে এসেছে। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক সভায় অনেক মালা পেয়েছি, কিন্তু আজ ঘরের কোণে এই যে অখ্যাত হাতের মানটুকু পেলেম এ আমার হৃদয়ে এসে বাজ্‌ল। নিস্ত্রৈগুণ্য হবার উমেদার এই জেলখাটা পুরুষের বহুকালের শুক্‌নো চোখ ভিজে ওঠ্‌বার উপক্রম কর্‌লে। পূর্ব্বেই বলেছি, সেবায় আমার অভ্যেস নেই। কেউ পা টিপে দিতে এলে ভালোই লাগ্‌ত না,—ধম্‌কে তাড়িয়ে দিতেম। আজ এই সেবা প্রত্যাখান করার স্পর্দ্ধা মনেও উদয় হ'ল না।

খুলনা জেলায় পিসিমার আদি শ্বশুরবাড়ি। সেখানকার গ্রামসম্পর্কের দুটি-চারটি মেয়েকে পিসিমা আনিয়ে রেখেছেন। পিসিমার কাজকর্ম্মে পূজা-অর্চ্চনায় তা'রা ছিল তাঁর সহকারিণী। তাঁর নানারকম ক্রিয়াকর্ম্মে তাদের না হ'লে তাঁর চল্‌ত না। এ বাড়িতে আর সর্ব্বত্রই অমিয়ার অধিকার ছিল, কেবল পূজোর ঘরে না। অমিয়া তা'র কারণ জান্‌ত না, জান্‌বার চেষ্টাও কর্‌ত না। পিসিমার মনে ছিল, অমিয়া ভালোরকম লেখাপড়া শি'খে এমন ঘরে বিয়ে কর্‌বে যেখানে আচার-বিচারের বাঁধাবাঁধি নেই, আর দেবদ্বিজ যেখান থেকে খাতির না পেয়ে শূন্য-হাতে ফিরে আসেন। এটা আক্ষেপের কথা। কিন্তু এ ছাড়া ওর আর-কোনো গতি হ'তেই পারে না,—বাপের পাতক থেকে মেয়েকে সম্পূর্ণ বাঁচাবে কে? সেই কারণে অমিয়াকে তিনি ঢিলেমির ঢালুতট বেয়ে আধুনিক আচার-হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে বাধা দেননি। ছেলেবেলা থেকে অঙ্কে আর ইংরেজিতে ক্লাসে সে হয়েছে ফার্স্‌ট্‌। বছরে বছরে মিশনারি ইস্কুল থেকে ফ্রক্‌ প'রে বেণী দুলিয়ে চারটে-পাঁচটা ক'রে প্রাইজ নিয়ে এসেছে। যেবারে দৈবাৎ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে সে-বারে শোবার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে; প্রায়োপবেশন কর্‌তে যায় আর কি। এম্‌নি ক'রে পরীক্ষা-দেবতার কাছে সিদ্ধির মানৎ ক'রে সে তারি সাধনায় দীর্ঘকাল তন্ময় ছিল। অবশেষে অসহযোগের যোগিনীমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে পরীক্ষা-দেবীর বর্জ্জন-সাধনাতেও সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'ল। পাস্‌ গ্রহণেও যেমন, পাস্‌ ছেদনেও তেম্‌নি, কিছুতেই সে কারো চেয়ে পিছিয়ে থাক্‌বার মেয়ে নয়। পড়াশুনো ক'রে তা'র যে খ্যাতি, পড়াশুনো ছেড়ে তা'র চেয়ে খ্যাতি অনেক বেশি বেড়ে গেল। আজ যেসব প্রাইজ তা'র হাতের কাছে ফির্‌ছে, তা'রা চলে, তারা বলে, তা'রা অশ্রুসলিলে গলে, তা'রা কবিতাও লেখে।

বলা বাহুল্য, পিসিমার পাড়াগেঁয়ে পোষ্য মেয়েগুলির পরে অমিয়ার একটুও শ্রদ্ধা ছিল না। অনাথাসদনে যে-সময়ে চাঁদার টাকার চেয়ে অনাথারই অভাব বেশি, সেই সময়ে এই মেয়েদের সেখানে পাঠাবার জন্তে পিসিমার কাছে অমিয়া অনেক আবেদন করেছে। পিসিমা বলেচেন, "সে কী কথা—এরা তো অনাথা নয়, আমি বেঁচে আছি কী কর্‌তে? অনাথ হোক্‌ সনাথ হোক্‌ মেয়েরা চায় ঘর, সদনের মধ্যে তাদের ছাপ মেরে বস্তাবন্দী ক'রে রাখা কেন? তোমার যদি এতই দয়া থাকে তোমার ঘর নেই নাকি?"

যা হোক, মেয়েটি যখন মাথা হেঁট ক'রে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আমি সঙ্কুচিত অথচ বিগলিতচিত্তে একখানা খবরের কাগজ মুখের সাম্‌নে ধ'রে বিজ্ঞাপনের উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগ্‌লেম। এমন সময় হঠাৎ অকালে অমিয়া ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত; নবযুগের উপযোগী ভাইফোঁটার একটা নূতন ব্যাখ্যা সে লিখেছে। সেইটে ইংরেজিতেও সে প্রচার কর্‌তে চায়; আমার কাছে তা'রই সাহায্য আবশ্যক। এই লেখাটির ওরিজিন্যাল আইডিয়াতে ভক্তদল খুব বিচলিত,—এই নিয়ে তা'রা একটা ধূমধাম কর্‌বে ব'লে কোমর বেঁধেছে।

ঘরে ঢুকেই সেবানিযুক্ত মেয়েটিকে দেখেই অমিয়ার মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তা'র দেশ-বিশ্রুত দাদা যদি একটু ইসারামাত্র করৃত, তা হ'লে তা'র সেবা কর্‌বার লোকের কি অভাব ছিল? এত মানুষ থাকৃতে শেষকালে কি এই—

থাক্‌তে পারলে না। বল্‌লে, "দাদা, হরিমতিকে কি তুমি—" প্রশ্নটা শেষ করৃতে না দিয়ে ফস্‌ ক'রে ব'লে ফেল্‌লেম, "পায়ে বড়ো ব্যথা করৃছিল।"

পুলিস সার্জ্জনের হাতে একটি মেয়ের অপমান বাঁচাতে গিয়ে জেলখানায় গিয়েছিলেম। আজ এক-মেয়ের আক্রোশ থেকে আর-এক মেয়েকে আচ্ছাদন কর্‌বার জন্যে মিথ্যে কথা ব'লে ফেল্‌লেম। এবারেও শাস্তি সুরু হ'ল। অমিয়া আমার পায়ের কাছে বস্‌ল। হরিমতি তা'কে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে কি-একটা বল্‌লে। সে ঈষৎ মুখ বাঁকিয়ে জবাবই কর্‌লে না। হরিমতি আস্তে আস্তে উঠে চ'লে গেল। তখন অমিয়া পড়্‌ল আমার পা নিয়ে। বিপদ্‌ ঘট্‌ল আমার। কেমন ক'রে বলি, দরকার নেই, আমার ভালোই লাগে না। এতদিন পর্য্যন্ত নিজের পায়ের সম্বন্ধে যে স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেম, সে আর টেঁকে না বুঝি!

ধড়ফড় ক'রে উঠে ব'সে বল্‌লেম, "অমিয়া, দে তোর লেখাটা, ওটা তর্জ্জমা ক'রে ফেলি।"

"এখন থাক না, দাদা। তোমার পা কামড়াচ্ছে, একটু টিপে দিই না?"

"না, পা কেন কাম্‌ড়াবে? হাঁ হাঁ, একটু কাম্‌ড়াচ্ছে বটে। তা দেখ্‌ অমি, তোর এই ভাইফোঁটার আইডিয়াটা ভারি চমৎকার। কী ক'রে তোর মাথায় এল, তাই ভাবি। ঐ যে লিখেছিস্‌ "বর্ত্তমান যুগে ভাইয়ের ললাট অতি বিরাট্‌, সমস্ত বাংলা দেশে বিস্তৃত, কোনো একটিমাত্র ঘরে তা'র স্থান হয় না।" এটা খুব-একটা বড়ো কথা। দে, আমি লি'খে ফেলি। With the advent of the present age, Brother's brow, waiting for its auspicious anointment from the sisters of Bengal, has grown immensely beyond the narrowness of domestic privacy, beyond the boundaries of the individual home. একটা আইডিয়ার মতো আইডিয়া পেলে কলম পাগল হ'য়ে ছোটে।"

অমিয়ার পা-টেপার ঝোঁক একেবারে থেমে গেল। মাথাটা ধ'রে ছিল, লিখ্‌তে একটুও গা লাগ্‌ছিল না—তবু এস্পেরিনের বড়ি গিলে ব'সে গেলেম।

পরদিন দুপুর-বেলায় আমার জলধর যখন দিবানিদ্রায় রত, দেউড়িতে দরোয়ানজি তুলসীদাসের রামায়ণ পড়্‌চে, গলির মোড় থেকে ভালুকনাচ-ওয়ালার ডুগডুগি শোনা যাচ্চে, বিশ্রামহারা অমিয় যখন যুগলক্ষ্মীর কর্ত্তব্যপালনে বেরিয়েছে, এমন সময় দরজার বাইরে নির্জ্জন বারান্দায় একটি ভীরু ছায়া দেখা দিলে। শেষকালে দ্বিধা করৃতে করৃতে কখন হঠাৎ একসময়ে সেই মেয়েটি একটা হাতপাখা নিয়ে আমার মাথার কাছে ব'সে বাতাস করৃতে লাগ্‌ল। বোঝা গেল, কাল অমিয়ার মুখের ভাবখানা দে'খে পায়ে হাত দিতে আজ আর সাহস হ'ল না। এতক্ষণে নববঙ্গের ভাইফোঁটা-প্রচারের মীটিং বসেছে। অমিয়া ব্যস্ত থাকৃবে। তাই ভাব্‌ছিলুম ভরসা ক'রে ব'লে ফেলি, পায়ে বড়ো ব্যথা করৃচে। ভাগ্যে বলিনি।—মিথ্যে কথাটা মনের মধ্যে যখন ইতস্তত করৃচে, ঠিক সেই সময়ে অনাথা-সদনের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্‌-হাতে অমিয়ার প্রবেশ। হরিমতির পাখা-দোলনের মধ্যে হঠাৎ চমক লাগ্‌ল;—তা'র হৃৎপিণ্ডের চাঞ্চল্য ও মুখশ্রীর বিবর্ণতা আন্দাজ করা শক্ত হ'ল না। অনাথাসদনের এই সেক্রেটারির ভয়ে তা'র পাখার গতি খুব মৃদু হ'য়ে এল।

অমিয়া বিছানার একধারে ব'সে খুব শক্তস্বরে বল্‌লে, "দেখ দাদা, আমাদের দেশে ঘরে ঘরে কত আশ্রয়-হারা মেয়ে বড়ো বড়ো পরিবারে প্রতিপালিত হ'য়ে দিন কাটাচ্চে, অথচ সেসব ধনী ঘরে তাদের প্রয়োজন একটুও জরুরী নয়। গরীব মেয়ে, যারা খেটে খেতে বাধ্য, এরা তাদেরই অন্ন-অর্জ্জনে বাধা দেয় মাত্র। এরা যদি সাধারণের কাজে লাগে—যেমন আমাদের অনাথা-সদনের কাজ—তা হ'লে—"

বুঝ্‌লেম আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে হরিমতির উপরে বক্তৃতার এই শিলাবৃষ্টি। আমি বল্‌লেম "অর্থাৎ তুমি

চল্‌বে নিজের সখ অনুসারে, আর আশ্রয়হীনারা চল্‌বে তোমার হুকুম অনুসারে; তুমি হবে অনাথাসদনের সেক্রেটারি, আর ওরা হবে অনাথাসদনের সেবাকারিণী। তা'র চেয়ে নিজেই লাগো সেবার কাজে, বুঝ্‌তে পার্‌বে সেকাজ তোমার অসাধ্য। অনাথাদের অভিষ্ঠ করা সহজ, সেবা করা সহজ নয়। দাবী নিজের উপরে করো, অন্যের উপরে কোরো না।"

আমার ক্ষাত্রস্বভাব, মাঝে মাঝে ভু'লে যাই, অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্‌। ফল হ'ল এই যে অমিয়া পিসিমারই সদস্যদের মধ্য থেকে আর-একটি মেয়েকে এনে হাজির কর্‌লে,—তা'র নাম প্রসন্ন। তা'কে আমার পায়ের কাছে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "দাদার পায়ে ব্যথা করে, তুমি পা টিপে দাও।' সে যথোচিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার পা টিপ্‌তে লাগল। এই হতভাগ্য দাদা এখন কোন্‌ মুখে বলে, যে, তা'র পায়ে কোনোরকম বিকার হয়নি? কেমন ক'রে জানায় যে, এমনতরো টেপাটেপি ক'রে কেবলমাত্র তা'কে অপদস্থ করা হচ্ছে। মনে মনে বুঝ্‌লেম, রোগশয্যায় রোগীর আর স্থান হবে না। এর চেয়ে ভালো নববঙ্গের ভাইফোঁটা সমিতির সভাপতি হওয়া। পাখার হাওয়া আস্তে আস্তে থেমে গেল। হরিমতি স্পষ্ট অনুভব কর্‌লে, অস্ত্রটা তারি উদ্দেশে। এ হচ্ছে প্রসন্নকে দিয়ে হরিমতিকে উৎখাত করা। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌। একটু পরে পাখাটা মাটিতে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আস্তে আস্তে দুই পায়ে হাত বুলিয়ে চ'লে গেল।

আবার আমাকে গীতা খুল্‌তে হ'ল। তবুও শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে দরজার ফাঁকের দিকে চেয়ে দেখি—কিন্তু সেই একটুখানি ছায়া আর কোথাও দেখা গেল না। তা'র বদলে প্রসন্ন প্রায়ই আসে, প্রসন্নের দৃষ্টান্তে আরো দুইচারিটি মেয়ে অমিয়ার দেশবিশ্রুত দেশভক্ত দাদার সেবা কর্‌বার জন্যে জড়ো হ'ল। অমিয়া এমন ব্যবস্থা ক'রে দিলে, যাতে পালা ক'রে আমার নিত্যসেবা চলে। এদিকে শোনা গেল, হরিমতি একদিন কাউকে কিছু না ব'লে কল্‌কাতা ছেড়ে তা'র পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে চ'লে গেছে।

মাসের বারোই তারিখে সম্পাদক-বন্ধু এসে বল্‌লেন—"এ কী ব্যাপার? ঠাট্টা নাকি? এই কি তোমার কঠোর অভিজ্ঞতা?"

আমি হেসে বল্‌লেম, 'পূজোর বাজারে চল্‌বে না কি?'

"একেবারেই না। এটা তো অত্যন্তই হাল্‌কা-রকমের জিনিষ"

সম্পাদকের দোষ নেই। জেলবাসের পর থেকে আমার অশ্রুজল অন্তঃশীলা বইচে। লোকে বাইরে থেকে আমাকে খুব হাল্‌কা-প্রকৃতির লোক মনে করে।

গল্পটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এল অনিল। বল্‌লে, "মুখে বল্‌তে পার্‌ব না, এই চিঠিটা পড়ুন।'

চিঠিতে অমিয়াকে, তা'র দেবীকে, যুগলক্ষ্মীকে বিবাহ কর্‌বার ইচ্ছে জানিয়েছে, একথাও বলেছে, অমিয়ার অসম্মতি নেই।

তখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত তা'কে বল্‌তে হ'ল। সহজে বল্‌তেম না, কিন্তু জান্‌তেম, হানবর্ণের পরে অনিল শ্রদ্ধাপূর্ণ করুণা প্রকাশ ক'রে থাকে। আমি তা'কে বল্‌লেম্‌ পূর্ব্বপুরুষের কলঙ্ক অন্যের দ্বারাই ক্ষালিত হ'য়ে যায়, এ তো তোমরা অমিয়ার জীবনেই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছ। সে পদ্ম, তা'তে পঙ্কের চিহ্ন নেই।"

নববঙ্গের ভাইফোঁটার সভা তা'র পরে আর জম্‌ল না। ফোঁটা রয়েছে তৈরী, কপাল মেরেছে দৌড়। আর শুনেছি, অনিল কল্‌কাতা ছেড়ে কুমিল্লায় স্বরাজপ্রচারের কী-একটা কাজ নিয়েচে।

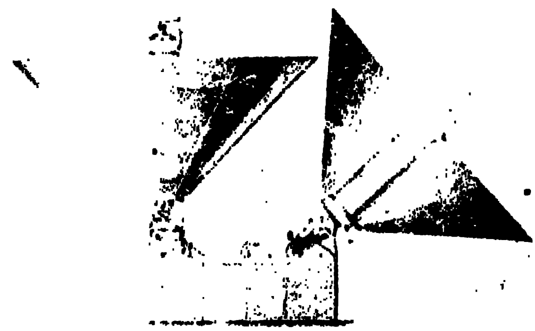
অমিয়া কলেজে ভর্ত্তি হবার উদ্যোগে আছে। ইতিমধ্যে পিসিমা তীর্থ থেকে ফি'রে আসার পর শুশ্রূষার সাতপাক বেড়ি থেকে আমার পা-দুটো খালাস পেয়েছে।

সৌরশক্তি

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায়

আধুনিক সময়কে কলকারখানার যুগ বলা যাইতে পারে। কলকারখানাসমূহ আবার শক্তির লীলাক্ষেত্র। বিজ্ঞানের মূলনীতি বলে, যে শক্তি অক্ষয়, অব্যয়, (conservation of energy)। ইহা রূপান্তরিত হইতে পারে, কিন্তু নষ্ট হইতে পারে না। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির রূপান্তর মাত্র। কোনো যন্ত্রে তাপকে, কোনো যন্ত্রে বিদ্যুৎকে কোনো যন্ত্রে বা রাসায়নিক শক্তিকে (chemical energy) যান্ত্রিক শক্তিতে (mechanical energy) পরিণত করা হয়। এই শক্তির প্রধান উপাদান হইতেছে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম্। দুইতিন শতাব্দী পূর্ব্বে ও প্রাচীন কালে অরণ্যমধ্যস্থ বৃহৎ-বৃহৎ বৃক্ষগুলি আমাদের ইন্ধন জোগাইত। তা'র পর মনুষ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে যখন অরণ্যগুলি লোকালয়ে ও সমতল কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইল, তখন বৈজ্ঞানিকেরা রত্নগর্ভা ধরিত্রীর শরণাপন্ন হইয়া তাহার কুক্ষি হইতে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম্ উদ্ধার করিলেন। এই দুই বস্তুই এখন কলকারখানার প্রধান খাদ্য। প্রমাণিত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীনকালে যে-অবস্থায় পড়িয়া বৃক্ষাদি ভূপ্রোথিত হইয়াছিল, পৃথিবীর আর সে-অবস্থা নাই। এখন বৃক্ষাদি আর ভূপ্রোথিত হইতেছে না, সুতরাং নূতন করিয়া কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি হইতেছে না, অথচ পূর্ব্বসঞ্চিত কয়লাদির ব্যয় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই আয়ব্যয়ের হিসাব করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি বা একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কয়লা ও কেরোসিনের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। তাই বৈজ্ঞানিকেরা শক্তির নব উৎসের সন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

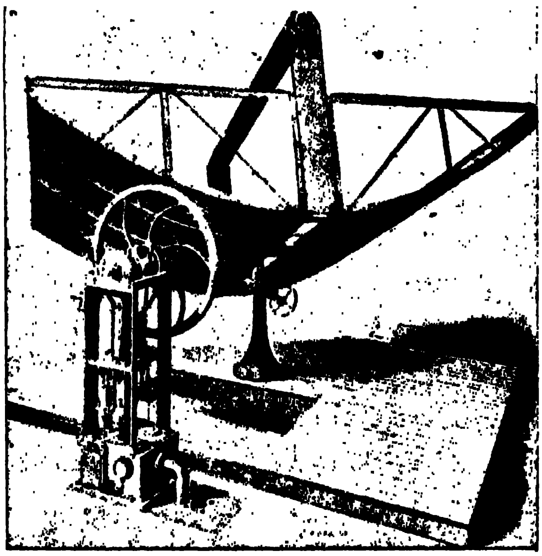
যেসব দেশে জলপ্রপাত আছে, তথায় ঐ শক্তির সাহায্যে নানারূপ যন্ত্রাদি চালিত হইতেছে। আমেরিকার নায়েগ্রাপ্রপাত শক্তির এক প্রকাণ্ড লীলাক্ষেত্র; কিন্তু সমতল-প্রদেশে জলপ্রপাতের অভাব। দেখা গিয়াছে যে এইসব প্রদেশে সৌরতাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদিগকে আর কয়লা বা পেট্রোলিয়ামের খনির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। কলকারখানার বংশধরেরাও নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক হইবেন।



১৮৭৮ খৃঃ অব্দে মুশো কর্তৃক উদ্ভাবিত সূর্য্যতাপ সঙ্কয়কারী বহু পার্শ্ববিশিষ্ট নল

সৌরশক্তির পরিচয়-প্রদানের পূর্ব্বে সূর্য্য-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। প্রাচীন কালে লোকের ধারণা ছিল যে, রাবণের চিতার ন্যায় সূর্য্যের মধ্যে অবিরত দহন-ক্রিয়া চলিতেছে; কিন্তু এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সূর্য্যের মধ্যে যদি ক্রমাগত দহন-ক্রিয়া (combustion) চলিত, তাহা হইলে উহা এতদিনে ভস্মে পরিণত হইত। অধিকন্তু আধুনিক গবেষণায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সূর্য্যের তাপ সেণ্টিগ্রেডের ছয় হাজার ডিগ্রি। ঐ তাপে দহন-ক্রিয়া চলিতে পারে না। কোনো বস্তু যখন দগ্ধ হয়, তখন উহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়, কিন্তু ছয় হাজার ডিগ্রি উত্তাপে রাসায়নিক সংযোগ ত হয়ই না, বরং এত উচ্চ তাপে সমস্ত যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। কি উপায়ে সূর্য্য প্রত্যহ এত তাপ বিকিরণ করিয়াও নিষ্প্রভ হয় না, সে-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে ও অদ্যাপিও ইহার সুমীমাংসা হয় নাই।

বিখ্যাত জার্মান্ পণ্ডিত হেলম্‌হোলৎস্ (Helmholtz) বলিয়াছেন যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-পরিমাণে অবয়ব-সঙ্কোচের জন্যই এই বিরাট্ তাপ নির্গত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই মত অভ্রান্ত হইলে সূর্য্যের বয়স হয় ১ কোটি ৭০ লক্ষ বৎসর, কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎগণ গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পৃথিবীরই বয়স দুই কোটি বৎসরের অধিক, সুতরাং সূর্য্যের বয়স আরও বেশী, এইজন্য এই মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কতকগুলি তেজোনির্গমশীল পদার্থের (radio-active substances) আবিষ্কারের পর হইতে বিজ্ঞান-রাজ্যে যুগান্তর আসিয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপের কারণ আধুনিকতম পণ্ডিতগণের মতে ঐ তেজোনির্গমশীলতার (radio-activity) সহিত সংশ্লিষ্ট।



এরিকসনের তৈরী সূর্য্যশক্তি সংগ্রাহক কল (১৮৮৩)

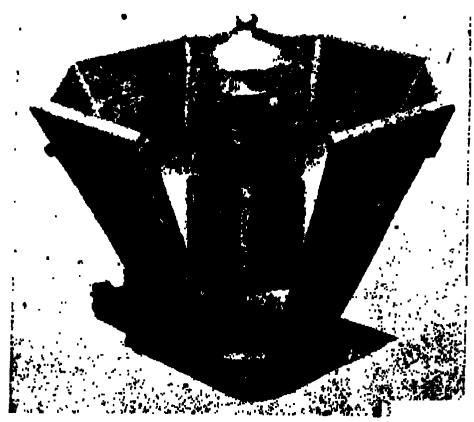
সূর্য্য-দেহের মধ্যে একটি মূল দেহ বা কোষ (nucleus) আছে, তাহার চতুর্দ্দিকে একটি বাষ্পাবরণ আছে। সূর্য্যের মূল-দেহটি কঠিন কি তরল, উহা বাষ্পাকারে আছে কি না, তাহা সঠিক জানা যায় নাই। যদি বাষ্পাকারে থাকে,তাহা হইলে উহা যে অত্যন্ত চাপযুক্ত অবস্থায় আছে, তাহা বর্ণচ্ছত্রপরীক্ষায় (spectrum analysis) বেশ বোঝা যায়। আধুনিক জ্যোতিষীরা সূর্য্যের বাষ্পাবরণটিতে মূলত তিনটি স্তর দেখিতে পাইয়াছেন। প্রথমটির নাম দেওয়া হইয়াছে আলোকমণ্ডল (photo sphere); সূর্য্যের যে দীপ্তি তাহা আলোকমণ্ডল হইতে উৎপন্ন। মূলে এই মণ্ডল প্রজ্বলিত বাষ্প ব্যতীত আর-কিছুই নয়। ইহার পর সূর্য্যের বাষ্পাবরণের যে আর একটি স্তর আছে তাহাকে বর্ণমণ্ডল বলা হইয়া থাকে। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণকালে যখন সৌরবিম্ব কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন এই বর্ণমণ্ডল প্রত্যক্ষ দেখা যায়। রক্ত, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত বাষ্পরাশি শিখাকারে উঠিয়া যে অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখায়, তাহা প্রকৃতই দর্শনীয় ব্যাপার। ইহার পরই সূর্য্যের আকাশের তৃতীয় স্তরটি আছে, তাহা জ্যোতিষীরা নিকট ছটা-মুকুট নামে (corona) প্রসিদ্ধ। দূরবীন্ দিয়া এই স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালই এই স্তর-পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। গ্রহণকালে যখন চন্দ্রের কৃষ্ণবিম্ব সূর্য্যের উজ্জ্বল দেহ ও আলোকমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলে, তখন সূর্য্যের স্তরটি ছটার মতন সূর্য্যকে ঘিরিয়া আছে, দেখা যায়। পরীক্ষায় কতকগুলি শিখাকে প্রায় ষাট হাজার মাইল দীর্ঘ দেখা গিয়াছে এবং কতকগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে দুই শত হইতে তিনশত মাইল বেগে উঠিতে দেখা গিয়াছে।

সূর্য্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র। সূর্য্যের ব্যাস ৮,৬৩,৬০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় একশতগুণ। সূর্য্যের বৃত্তাকার স্থানটিকে সমতল কল্পনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার আয়তন ৫৮৫,৭৫,০০,০০,০০০ বর্গমাইল। এই বিরাট্ অবয়ব হইতে অবিরত তেজোনির্গমন হইতেছে। শক্তি-(energy) নির্গমনের একটি হিসাবও প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা মাপকাঠি (standard) আছে। ইংরাজেরা শক্তির মাপকাঠির নাম দিয়াছেন অশ্বশক্তি (horse power)। অশ্বের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নাই। একটি ৪১২ মণ ভারী জিনিষকে ১ ফুট উচ্চে তুলিতে যে-পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে এক অশ্বশক্তি। তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির বিভিন্ন রূপকে এই মাপকাঠির

সাহায্যে প্রকাশিত করা যাইতে পারে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যের এই বিরাট্ অবয়বের প্রতি বর্গফুট হইতে প্রত্যহ ১২,৫০০ অশ্বশক্তি তেজ নির্গত হয় এবং পৃথিবীতে প্রতি একরে ৭,৩০০ অশ্বশক্তি তেজ পতিত হয়। ইহার মধ্যে পরিষ্কার দিনে দুপুরবেলায় প্রায় ৫০০ অশ্বশক্তি তেজ পৃথিবীর স্থলভাগে পতিত হয়।

সূর্য্যরশ্মি ৯,৩০,০০,০০০ মাইল পথ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়। এই পথের অধিকাংশেই সর্ব্বব্যাপী ইথার (ether) ব্যতীত আর কিছুই নাই। বায়ু কেবল পৃথিবীর উপরেই আছে, নব্বই কি একশত মাইল ঊর্দ্ধে উঠিলে আর বায়ুর অস্তিত্ব থাকে না। সম্প্রতি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ অ্যাব্বে মোরো (Abbe Moreax) উদীচ্য ঊষা (Aurora Borealis) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে বায়ুস্তর ৫৪০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ইথার জিনিষটা সে-প্রকার নয়, ইহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছে।

বায়ুতে বা জলের কোনো স্থানে একটু আলোড়ন হইলে যেমন তরঙ্গাকারে সেই আলোড়ন চারিদিকে ছুটিয়া চলে, ইথারেও তাহাই হয়। কোটি-কোটি মাইল দূরের জ্যোতিষ্কে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ইথারে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় তাহা তরঙ্গপরম্পরায় আসিয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয় এবং এই ধাক্কাতেই আমরা আলোক দেখিতে পাই, কিন্তু সাধারণত সূর্য্যালোক আসিয়া ধরাতলে পতিত হয় ও তাহা প্রতিফলিত হইয়া (reflected) যখন আমাদের চোখে পড়ে, তখন আমরা সূর্য্যালোকের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। সৌরশক্তি (solar energy) যখন তরঙ্গবাহিত হইয়া পৃথিবীস্থ কোনো ভৌতিক পদার্থে (material body) পতিত হয়, তখন ইহার কতকাংশ তাপরূপে প্রকাশিত হয়, কতকাংশ আলোকরূপে প্রকাশিত হয়। মধ্যস্থ ইথার ও বায়ুমণ্ডল মোটেই উত্তপ্ত হয় না। মধ্যস্থ ইথার অতিশয় শীতল, তরল বায়ুও ইহার তুলনায় উষ্ণ। পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া সৌর শক্তি আসিলেও ইহা উত্তপ্ত হয় না। সৌরশক্তি পৃথিবীতে আসিয়া তাপরূপে পরিণত হইলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয় এবং ধরাতলের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু উত্তপ্ত হয়, এইজন্য যত উপরে উঠা যায়, বায়ুর তাপও (temperature) তত কমিতে থাকে। ধরাতলের উত্তাপ গড়ে সেন্টিগ্রেডের ১৫ ডিগ্রি। এক মাইল উর্দ্ধে বায়ুর উত্তাপ শূন্য ডিগ্রি, এই স্থানে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। পাঁচ মাইল উর্দ্ধে বায়ুর শৈত্য—২০ ডিগ্রি, ১০ দশ মাইল উর্দ্ধে-৭৫ ডিগ্রি। ইহা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থ ইথার ও বায়ুমণ্ডল সৌরশক্তির বাহক মাত্র (carrier of solar energy)। দেখা গিয়াছে যে সৌররশ্মি (solar radiation) ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের উপর পতিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপ উৎপন্ন হয়।

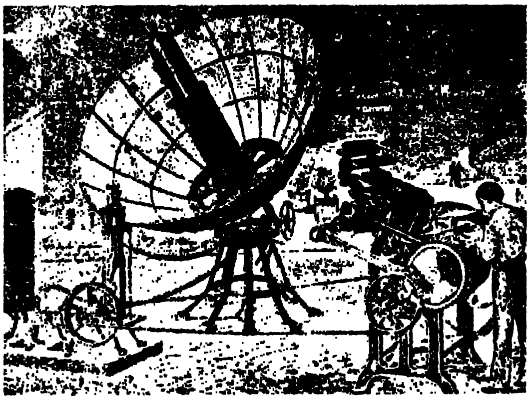


অ্যাডম্‌স্‌-এর সৌরতাপ কুকার।

ধরাতল (surface of the earth) প্রতি একরে প্রায় ৫০০০ অশ্বশক্তি সৌরতেজ গ্রহণ করে। পৃথিবীর অভ্যন্তরও আবার অতিশয় উত্তপ্ত। ধরাগর্ভ হইতেও সর্ব্বদা তাপ আসিয়া ধরাতলে উপস্থিত হইতেছে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই তাপের পরিমাণ প্রতি একরে দুই অশ্বশক্তি। এখন অবৈজ্ঞানিকের নিকট মনে হইতে পারে যে,এই উভয়বিধ কারণের জন্য ধরাতল অল্পকাল মধ্যে এত উত্তপ্ত হইয়া যাইবে যে, ইহা মনুষ্য-বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু ধরাতল যেরূপ সমস্ত দিন তাপ গ্রহণ করে, সেইরূপ সমস্ত রাত্রি তাপ বিকিরণ করে। এই তাপ বিকীর্ণ হইয়া অনন্ত শূন্যে চলিয়া যায়। তাপের আয়ব্যয়ের মাত্রা প্রায় সমান, সেইজন্য ধরাতলের তাপও

প্রায় সমান থাকে। গ্রীষ্মকালে ধরাতলের অংশবিশেষে তাপের আয়, ব্যয় অপেক্ষা অধিক, এজন্য সেই অংশ কিছু উত্তপ্ত হয়, আর শীতকালে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী বলিয়া কিছু শীতল হয়।

এখন সৌরশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ-সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, আতস কাচের (lens) সাহায্যে কেহ-কেহ দেশলাইয়ের অভাবে সিগারেট বা অন্য দাহ্য পদার্থ প্রজ্বলিত করেন। আতস-কাচের দ্বারা সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত (focussed) করিয়া কেন্দ্র-স্থানে (focus) দাহ্য পদার্থ রাখিলে উহা জ্বলিয়া উঠে। ইহাই সৌরশক্তির ব্যবহারের অতি সরল উদাহরণ। কথিত আছে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২১২ অব্দে যখন সিরাকিউজের (Syracuse) অধিপতি হিয়েরোর (Hiero)



পিফ্রের সৌরশক্তিচালিত যন্ত্র ছাপাখানার কল চালাইতেছে (১৮৭৮)

বিরুদ্ধে মার্সেলাসের (Marcellus) নৌবাহিনী পরিচালিত হইয়াছিল, তখন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস (Archimedes) এই পন্থা অবলম্বন করিয়া শত্রুপক্ষের সমস্ত নৌকা দগ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের সত্যতা-প্রমাণের জন্য ফরাসী বৈজ্ঞানিক বুফঁ (Buffon) ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে আয়নাদ্বারা ১৫০ ফুট দূরস্থিত আল্‌কাতরা-লিপ্ত কাষ্ঠখণ্ডে রৌদ্র প্রতিফলিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখেন যে, কিয়ৎক্ষণ পরে কাষ্ঠখণ্ডগুলি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পুরাকালে রোম-দেশে গৃহস্বামী ও অগ্নিকুণ্ডের দেবী ভেস্তার (Vesta) মন্দির-মধ্যে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত রাখার প্রথা ছিল। ঐ মন্দির-মধ্যে একটি ধাতুনির্ম্মিত কলার মোচার মতন প্রতিফলক (conical reflector) ছিল। হঠাৎ কোনো কারণবশত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে, প্রধান পুরোহিত প্রতিফলকের কেন্দ্রে (focus) শুষ্ককাষ্ঠ রাখিয়া দিতেন। সূর্য্যালোক কেন্দ্রীভূত হইয়া কাষ্ঠে পতিত হওয়ার কিয়ৎক্ষণ পরে উহা জ্বলিয়া উঠিত। প্রধান পুরোহিত প্রচার করিতেন যে তিনি দৈবশক্তি দ্বারা কাষ্ঠখণ্ড জ্বালাইয়াছেন। অজ্ঞ নরনারীগণ ইহাকে অলৌকিক ঘটনা মনে করিত ও তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, কেবল-মাত্র দেবীর কৃপায় পুরোহিত দ্বারাই ঐরূপ অগ্নি-প্রজ্বালন সম্ভব।

সৌরশক্তির সাহায্যে কল চালাইবার চেষ্টা সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সলোমঁ ত্ব কো (Solomon-de-caux) সর্ব্বপ্রথম সৌরশক্তি-চালিত এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাহার পর এই তিন শতাব্দী ধরিয়া নানারূপ যন্ত্র-নির্ম্মাণের চেষ্টা চলিতেছে। অধিকাংশক্ষেত্রেই সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিফলকের সাহায্যে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ একটি পাত্রে পাতিত করা হয়। পাত্রটির মধ্যে জল থাকে। পাত্রটি সৌরতাপ গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত হইতে থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে পাত্রমধ্যস্থ জল বাষ্পে (team) পরিণত হয়। এই বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে অন্যান্য কল চালানো হয়। রেলওয়ে ইঞ্জিনে কয়লার সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করা হয়, সৌরশক্তি-চালিত ইঞ্জিনে সূর্য্যতাপ দ্বারা জলকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। যে-সমস্ত সৌরশক্তি-চালিত ইঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে ক্রমাগত প্রতিফলক ও অন্যান্য অংশের বিশেষ উন্নতি করিবার চেষ্টা হইতেছে।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সুইস্ বৈজ্ঞানিক সোস্যুরে (Saussure) সর্ব্বপ্রথম তাপের বাক্স আবিষ্কার করেন। ইহা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও ইহার অভ্যন্তর ভাগ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং দুই স্তর সমতল কাচের (plane glass) দ্বারা ইহার মুখ আবদ্ধ। এই বাক্সের সাহায্যে সেন্টিগ্রেডের ৮০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ পাওয়া গিয়াছিল।

তার পর সার জন হার্শেল (Sir John Herchel) ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ঐপ্রকার একটি মেহগনি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স প্রস্তুত করেন; উহার সাহায্যে তিনি ৬৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত

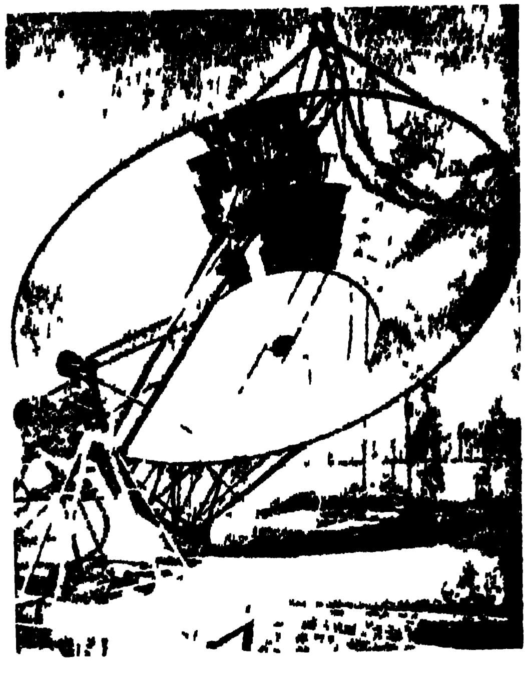
তাপ প্রাপ্ত হন। চতুষ্পার্শ্বস্থ শীতল বায়ুর সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি পরবর্ত্তী পরীক্ষায় বালুকাপূর্ণ আর-একটি বাক্সের মধ্যে প্রথম বাক্সটি স্থাপিত করিয়া কাচ দ্বারা মুখটি আবৃত করিয়া দেন। তিনি এরূপভাবে ইহা সংস্থাপিত করেন যে, সূর্য্যরশ্মি লম্বভাবে আসিয়া পড়িতে পারে। এইপ্রকারে তিনি প্রায় ১২০° ডিগ্রি তাপ প্রাপ্ত হন। জল ১০০° ডিগ্রি তাপে বাষ্পে পরিণত হয়। সুতরাং এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি মাংস ইত্যাদি রন্ধন করিতেন ও অনেক সময় এইরূপে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যাদি বন্ধুবান্ধবগণকে বিতরণ করিতেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুশো (Mouchot) সর্ব্বপ্রথম একটি উল্লেখযোগ্য সৌর-ইঞ্জিন প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্রে তাম্র-নির্ম্মিত একটি প্রতিফলক ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রতিফলকের অভ্যন্তরভাগ রৌপ্য পাত দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া তাম্রনির্ম্মিত বৃহৎ বর্ত্তুলাকার (cylindrical) একটি বয়লারের (boiler) উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া পতিত হইত। বয়লারের বহির্ভাগ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত ছিল। বয়লারের মধ্যস্থ জল ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হইত ও এই বাষ্পের সাহায্যে ইঞ্জিন চলিত। প্রতিফলকটিতে যাহাতে সর্ব্বদা সৌররশ্মি লম্বভাবে আসিয়া পড়ে, তাহার ব্যবস্থা ছিল।

ইহার পর এরিকসন্ (Ericsson) প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করেন ও ইহার উৎকর্ষ-সাধনে যত্নবান্ হন। অবশেষে তিনি আর একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তাহার প্রতিফলকটি বৃত্তের চাপাকৃতি ও মুশোর যন্ত্র হইতে অন্যান্য অংশেও ইহার কিছু বিভিন্নতা ছিল। এই গবেষণা-কার্য্যে তিনি নিজে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। অবশেষে তিনি বলেন যে, সূর্য্যের আলো বিনামূল্যে পাওয়া গেলেও ইহা হইতে তাপ সংগ্রহ করিতে যাহা ব্যয় হয়, তাহা কয়লা ব্যবহার করিয়া ব্যয়ের তুলনায় অনেক অধিক।

ইংরেজদের মধ্যে কেবলমাত্র বোম্বাই হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার উইলিয়াম্ অ্যাডাম্স্ (William Adams) সূর্য্যতাপ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত পরীক্ষা-কার্য্য বোম্বাই-নগরেই সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি অনেক পরীক্ষার পর স্থির করেন যে ধাতু-নির্ম্মিত প্রতিফলক অপেক্ষা কাচের আয়না অধিকতর উপযোগী। কাচের আয়নাকে প্রতিফলকরূপে ব্যবহার করিয়া তিনি একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দ্বিতলে জল উত্তোলন করিতেন। দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া তিনি এই যন্ত্র নগরবাসীদিগকে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

তাঁহার নির্ম্মিত সৌরতাপ কুকারে (solar cooker) ইকমিক কুকারের ন্যায় সহজে ও শীঘ্র পাক করা যাইত,



পাসাডেনার সৌরতাপ সংগ্রাহক যন্ত্র।

অথচ কয়লা বা তৈলের প্রয়োজন হইত না। তাম্রনির্ম্মিত নলাকৃতি পাত্রের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য রাখা হইত। পাত্রটি একটি অষ্টকোণাকৃতি (octagonal) কাচখণ্ড দ্বারা আবৃত ছিল। প্রতিফলকটি আটটি কাচখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত হইত ও ইহার আকার পিরামিডের ন্যায় ছিল। খাদ্য-দ্রব্য অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া যাইত। তিনি ইহার সাহায্যে অনেক-প্রকার খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই কুকারে মাংস রোস্ট্ করা যাইত। রোসট্ প্রস্তুত করিতে গিয়া তিনি দেখিতে পান যে বিজ



টাকোনির শুমান সূর্য্যতাপসংগ্রাহক কলের পশ্চিমাংশের সাধারণ দৃশ্য (১১১)

চর্ব্বির (animal fat) বিয়দংশ বিউটারিক অ্যাসিড নামক দ্রাবকে পরিণত হয় ও উহা ভক্ষণের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। পরে দেখা যায় যে যদি প্রতিফলক ও চর্ব্বির মধ্যে লোহিত বা হরিদ্রা বর্ণের কাচখণ্ড সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে এই দ্রাবক উৎপন্ন হয় না, মাংসও সুখাদ্যে পরিণত হয়।

অ্যাডাম্‌স্‌ ইঞ্জিনিয়ার বা পদার্থতত্ত্ববিৎ ছিলেন না, এইজন্য তাঁহার এই আবিষ্কার অতিশয় প্রশংসার্হ। তিনি সৌরশক্তির উপযুক্ত প্রয়োগ-(utilization of solar energy) সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া বোম্বাইয়ের সাসুন ইন্‌স্টিটিউট্‌ হইতে (Sassoon Institute) স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আবেল পিফ্রে (Abel Pifre) তাঁহার সৌরশক্তি-চালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে একটি মুদ্রাযন্ত্র (printing press) পরিচালিত করিতেন। ইহার প্রতিফলকের আকার অধিবৃত্তের ন্যায় (parabolic ছিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জেমস হার্ডিং (James Harding) সৌরশক্তির সাহায্যে পরিশ্রুত জল (distilled water) প্রস্তুত করিবার এক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্র দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে সালিনাস (Salinus) নামক স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে চারি হাজার তিনশত ফুট উচ্চে অবস্থিত ছিল। এই যন্ত্রে প্রত্যহ পাঁচ হাজার গ্যালন পরিস্রুত জল প্রস্তুত হইত। প্রতি গ্যালন জল প্রস্তুত করিবার ব্যয় দুই পয়সা অপেক্ষাও অল্প পড়িত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যন্ত্রটি কিরূপ কার্য্যকারী ছিল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের(United States) বোস্‌টন (Boston) নগরের কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে পাসাডেনা নামক (Pasadena) এক সৌরশক্তি-আহরণকারী যন্ত্র (sun power plant) নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রতিফলকের আকৃতি মাথা কাটা কলার মোচার ন্যায় (truncated cone) ছিল। প্রথম পার্শ্বের ব্যাসের পরিমাণ তেত্রিশ ফুট ও অপর পার্শ্বের ব্যাসের পরিমাণ পনেরো ফুট করা হইয়াছিল। এই যন্ত্রের বয়লারের মধ্যে একশত গ্যালন জল ও আট ঘনবর্গ ফুট বাষ্প থাকিবার স্থান ছিল। এই যন্ত্রে প্রত্যহ চৌদ্দশত গ্যালন জল প্রতি-মিনিটে ১২ ফুট উর্দ্ধে চালিত হইত। ইহা নির্ম্মাণ করিতে পনেরো হাজার টাকা লাগিয়াছিল ও ইহা তৎকালীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র ছিল।

ফ্র্যাঙ্ক্‌ শুমান্‌ (Frank Shuman) ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্যে অগ্রসর হন। তিনি বৃহত্তর প্রতিফলক নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত প্রথম যন্ত্র বয়লার-মধ্যস্থ জলের মধ্যে সমান্তরালভাবে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণের অনেকগুলি নল



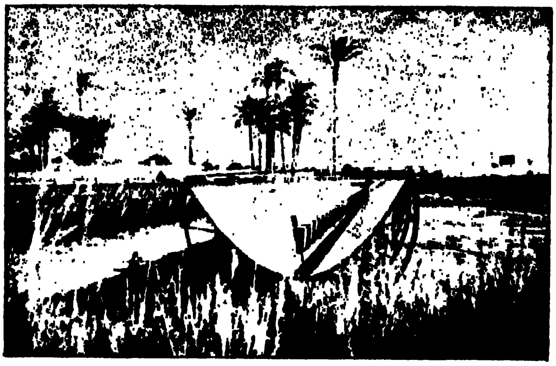
মিয়াডির শুমান-বয়েজ কারখানার দক্ষিণ দিক্ হইতে সাধারণ দৃশ্য (১৯১১)

(pipe) ছিল। নলগুলি ইথারে Di-ethyl ether) পরিপূর্ণ থাকিত। সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া জলে পড়িলে জল উত্তপ্ত হইত ও জলের উত্তাপে ইথার বাষ্পে পরিণত হইত। ইথার-বাষ্পের সাহায্যে এই যন্ত্রের ইঞ্জিন চালিত হইত। শুমান এইরূপ তিনটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তাঁহার তৃতীয় যন্ত্রটি তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) নগরের উপকণ্ঠে ট্যাকোনি (Tacony) নামক স্থানে স্থাপিত করেন।

এই সময় সৌরতাপ দ্বারা যন্ত্র পরিচালনের জন্য Sun Power Company নামক একটি যৌথ সমবায় স্থাপিত হয়। শুমান্, অধ্যাপক বয়েজ্ (Professor C. V. Boys, F..R. S.) ও প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ারগণ সমবেত হইয়া কোম্পানির টাকায় একটি যন্ত্র মিশর দেশে কায়রো (Cairo) নগরীর সাত মাইল দক্ষিণে নীল নদের তীরস্থ মিয়াডি (Meadi) নামক স্থানে সংস্থাপিত করেন। যতগুলি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অবশ্য এইসঙ্গে বলা আবশ্যক যে সৌরশক্তির সকল অংশ আমরা যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করিতে পারি না। কয়লার দ্বারা চালিত ইঞ্জিনেও শক্তির অতিশয় অপচয় হয়। কয়লার মধ্যে যে-শক্তি সঞ্চিত থাকে, পোড়াইলেই তাহা তাপালোকে পরিণত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্ষয়ের সময় যোলো আনা শক্তিকেই যদি আমরা কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের লাভ হয়, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট যন্ত্রেও কয়লা পোড়াইলে সমগ্র শক্তিকে আমরা কাজে লাগাইতে পারি না। অধিকাংশই বৃথা তাপালোক উৎপন্ন করিয়া এবং পার্শ্বের জলবায়ুকে অনাবশ্যক গরম করিয়া নষ্ট হয়। হিসাব করিলে দেখা যায় যে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনে এই অপব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৮৮ ভাগ। এ-অপচয় বড় অল্প নয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় কয়লা পোড়াইয়া তাহার অধিকাংশ শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সাধারণ চুল্লীতে পোড়াইলে কয়লা হইতে যে কতকগুলি অনাবশ্যক বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাই শক্তিকে ক্ষয় করায়। এইসব বাষ্পকে ছাড়িয়া না দিয়া তাহাদিগকে কলে পোড়াইবার ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকেরা করিয়াছেন এবং আংশিক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। দেখা গিয়াছে যে গ্যাস-ইঞ্জিনে শতকরা ২৫.৫ ভাগ শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। ডিসেলের তৈলচালিত ইঞ্জিনে (Diessel's oil engine) শতকরা ৩১ ভাগ শক্তি কাজে লাগে, কিন্তু শুমান্ ও বয়েজের প্রস্তুত যন্ত্রে মাত্র শতকরা ৪.৩২ অংশ সৌরশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হয়। তবে ইহাতে হতাশ হইলে চলিবে না। কালক্রমে আরও উৎকৃষ্ট সৌর ইঞ্জিন প্রস্তুত হইবে ও কয়লা যতই দুষ্প্রাপ্য হইবে, উৎকৃষ্ট সৌর ইঞ্জিন প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও তত বর্দ্ধিত হইবে।

যেখানে কয়লার মূল্য অতিশয় অধিক সেখানে সৌরতাপ চালিত ক্ষুদ্র ইঞ্জিন দ্বারা জল সেচন করা যাইতে



মিয়াডির ওমান-বয়েজ কারখানার উত্তর দিক্ হইতে একাংশের দৃশ্য [১৯১৩]

পারে। যেস্থানে কয়লা দুষ্প্রাপ্য, বৃষ্টির অভাব ও রৌদ্রের তাপ খুব বেশী, তথায় এইরূপ যন্ত্র অতিশয় কার্য্যকারী হইবে।

সূর্য্যের তাপই পৃথিবীর সমগ্র শক্তির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করিয়া রাখে। যে-কয়লা পোড়াইয়া আমরা বাষ্পযন্ত্র বা বিদ্যুতের যন্ত্র চালাইতেছি তাহা উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। উদ্ভিদ্ আবার প্রাচীন যুগে সেই শক্তি সূর্য্যতাপ হইতে আহরণ করিয়া সঞ্চিত রাখিয়াছিল। কাজেই কয়লার শক্তিকে সৌরশক্তির রূপান্তর বলিতে হয়। যে জলপ্রপাতকে শৃঙ্খলিত করিয়া আজকাল নানা কাজ করিয়া লওয়া হইতেছে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের শক্তি সৌর শক্তির রূপান্তর মাত্র। পর্ব্বতচূড়ায় জলের সঞ্চয় সূর্য্যতাপের কাজ। জলই সেই সৌরশক্তিকে বক্ষে ধরিয়া রাখে এবং তাহার পরে নীচে নামিবার সময় তাহার বিকাশ দেখায়।

এই বিরাট্ বিশ্বের শক্তির উৎসের সন্ধান করিলে জলে, স্থলে, নভোনীলে সর্ব্বত্র সৌরশক্তিরই লীলা দেখিতে পাওয়া যায়।

নীড় ও আকাশ

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দুরূহ দূরের লোভে সামান্য যা তা'রে
সামান্য দেখো না যেন অভ্যাস-বিকারে।
মাটির মানুষ মোরা যেখানেই যাই
ফিরে-ফিরে মাটিতেই নিতে হবে ঠাঁই
শূন্যে-শূন্যে ঘু'রে শেষে; ধরণীর বুকে
রচিয়া নিতেই হবে নানা দুঃখে-সুখে
আপন শান্তির নীড়; তুচ্ছ বলি যারে,
ছোটোখাটো যাহা-কিছু নিত্য রহে দ্বারে
সহজে হাতের কাছে,—পথে-যেতে দেখা
অচেনা বনের ফুল, স্বর্ণময় লেখা
সায়াহ্ন-গগনকোণে, বিহঙ্গের গান,
শিশুর সরল হাসি—এতে যদি প্রাণ
আপন আশ্রয় লভে, আছে তা'র পরে
অনন্ত অম্বর পক্ষ মেলিবার তরে।

হরিৎদ্বীপে

শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

ঢোল, কাঁশী, বাঁশী বেজে উঠ্‌ল—কাড়া, নাকাড়া, দামামা করতাল ডিম্‌ ডিম্‌ দম্‌দম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে উঠ্‌ল—নবৎ-খানায় সানাইয়ের গলা চি'রে আগমনীর আলাপ বেরিয়ে এল—কি হয়েছে!—কি হয়েছে! হয়েছে? দুয়োরাণীর এক ছেলে হয়েছে আর সুয়োরাণীর এক মেয়ে হয়েছে।

প্রকাণ্ড রাজা। সাত গাঁ নিয়ে তাঁর রাজপুরী। সাত রাজ্য নিয়ে তাঁর প্রজা। সাত সমুদ্দুর নিয়ে তাঁর শাসন। রাজার অভাব কি? হাতীশালে হাতী—ঘোড়াশালে ঘোড়া—ভাণ্ডার ভরা ধন, রাজ্য-ভরা প্রজা, দেশ-বিদেশে আধিপত্য। কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই। রাজার দুই রাণী। দু'রাণীর যে কারোই ছেলেপুলে হয় না।

রাজার মনে সুখ নেই—সাত রাজ্যের প্রজার মুখে হাসি নেই। রাজার রাজ্যে ফুলের গাছে ফুল ধরে না, ফলের গাছে ফল ধরে না, জোছনার গায়ে পুলক লাগে না—কোকিল ডাকে না, পাপিয়া গায় না, দোয়েল শীস দেয় না—রাজার দুঃখে সব ম্রিয়মাণ। রাজার সব আছে, কিন্তু কিছুই নেই। দু'রাণী—দু'রাণীর কারোই সন্তান হয় না।

এম্‌নি ক'রেই দিন যায় মাস যায়—কত বছর যায়—একদিন যে ভোর হ'তে না হ'তেই রাজার রাজ্যে কোকিল দোয়েল সব ডেকে উঠ্‌ল, শারী, শুক, শ্যামা শীস দিয়ে উঠ্‌ল—রাজার বাগানে কত বছর ধ'রে একটি ফুল ফোটে না, একটি কলি ধরে না, সেদিন মল্লিকা, মালতী, জাতি যুঁথী, বকুল, পারুল, শেফালি, চামেলি, গন্ধরাজ দিকে-দিকে সৌরভ ছুটিয়ে জেগে উঠ্‌ল—কোথা থেকে লক্ষ-লক্ষ মৌমাছি এসে গুঞ্জন তুল্‌লে।

রাজার ঘুম ভাঙ্‌তে-না-ভাঙ্‌তেই সে পাখীর ডাক, ফুলের সৌরভ, মৌমাছির পুলক গুঞ্জন রাজার শয়নকক্ষে গিয়ে পৌঁছল।

রাজা সিংহাসনে এসে বস্‌লেন—পাত্র-মিত্র, অমাত্য সভাসদেরা এসে রাজাকে ঘিরে দাঁড়াল। দৌবারিকেরা সেদিন অভিবাদন কর্‌তে ভু'লে গেল, বন্দীরা সেদিন আর রাজার গুণগান কর্‌তে সাহস পেলে না। সবার মুখেই বিস্ময়, সবার মুখেই আশা-আশঙ্কার দ্বন্দ্ব। সবারই আশা-উদ্বেগ-আকুল দৃষ্টি রাজার মুখের উপর স্থাপিত। রাজা গম্ভীরকণ্ঠে মন্ত্রীকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—"মন্ত্রী এ আজ কি হ'ল? যুবরাজহীন রাজ্যে এ আজ কোন্‌ সৌভাগ্যের সূচনা? কোন আনন্দের আমন্ত্রণ?"

মন্ত্রীর রাজকার্য্য কর্‌তে-কর্‌তে চুল পেকে গেছে। দেশবিদেশের রাজ-দূতদের কাছ থেকে কত-কত গল্প শুনেছেন—কত-কত আশ্চর্য্য ব্যাপারের ইতিহাসকাহিনী শ্রবণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতির এমন খামখেয়ালী ও খোস্‌-মেজাজী আজগবি কাণ্ড কোনো দিন দেখেনওনি কারো কাছ থেকে শোনেনওনি। মন্ত্রী আর কি উত্তর দেবেন! একেবারে চুপ ক'রে রইলেন। জীবনে এই প্রথম বার মন্ত্রী রাজার প্রশ্নে নিরুত্তর রইলেন।

সারা শরীরে অসোয়াস্তি নিয়ে নীচুপানে চেয়ে মন্ত্রী দাঁড়িয়েই রইলেন—সভাসদেরা দাঁড়িয়ে রইল—সমস্ত সভা-মণ্ডপটা যেন নির্ব্বাক্‌-নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময়ে সভাগৃহের বাহিরে একটা চাঞ্চল্যের আভাস জেগে উঠ্‌ল—দৌবারিক-মহল থেকে যেন একটা অস্ফুট গুঞ্জন ভেসে উঠ্‌ল—রাজসভার চক্ষু জিজ্ঞাসুদৃষ্টি নিয়ে সভামণ্ডপের প্রবেশদ্বারে নিবদ্ধ হ'ল।

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দ্বারের পর্দ্দা সরিয়ে দ্বারে-ঝুলোনো পুষ্পমাল্যরাশি দ্বিধা বিভক্ত ক'রে এক সন্ন্যাসী সভাগৃহে ধীরে-ধীরে প্রবেশ কর্‌লেন।

সন্ন্যাসীর উন্নত দীর্ঘ দেহ—মাথায় নিবিড় জটাজট-ভার—পরনে গৈরিক কৌপীন—সর্ব্ব অঙ্গে ভস্মের শুভ্র-ধূসর অবলেপ।

সন্ন্যাসী কোনো দিকে না তাকিয়ে একেবারে সন্নাসর গিয়ে রাজসিংহাসনের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর দক্ষিণ হস্তে একটি অ-দৃষ্টপূর্ব্ব ফল।

সন্ন্যাসী রাজাকে লক্ষ্য ক'রে ফলটি তু'লে ধর্‌লেন—বল্‌লেন—"মহারাজ, এই ফলটি বাসন্তী-পূর্ণিমার দিন আপনার দু'রাণীকে খাওয়াবেন, তবেই তা'রা সন্তানবতী হবে।"

রাজা যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো সন্ন্যাসীর হাত থেকে ফলটি গ্রহণ কর্‌লেন। সন্ন্যাসী তখন যে-পথে এসেছিলেন সেই পথে আবার সভাগৃহ থেকে নিক্রান্ত হলেন।

সন্ন্যাসী বেরিয়ে যাবামাত্র রাজার চমক ভাঙ্‌ল, সভাসদদের চমক ভাঙ্‌ল, সমস্ত সভাগৃহটা যেন সজীব হ'য়ে উঠ্‌ল। কে এ সন্ন্যাসী? কে এ সন্ন্যাসী? তাঁকে যে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি, সম্মান করা হয়নি, পাদ্য-অর্ঘ্য দেওয়া হয়নি! রাজা ব্যস্তকণ্ঠে ডাক্‌লেন—"দৌবারিক, দৌবারিক।"

ত্রস্তে এসে দৌবারিক রাজসিংহাসনের কাছে উন্নত দেহ নত ক'রে দাঁড়াল। রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন?"

দৌবারিক দুই নেত্রে ক্ষণমাত্র বিস্ময়ের আভাস প্রকাশ ক'রে স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলে—"মহারাজ, আমরা সন্ন্যাসীকে সভাগৃহে প্রবেশ কর্‌তে দেখেছি, কিন্তু কেউ-ই সেখান থেকে তাঁকে নিক্রান্ত হ'তে দেখিনি।"

চারিদিকে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠ্‌ল—রাজা মন্ত্রীর দিকে বিস্ময়দৃষ্টিতে চাইলেন। মন্ত্রী বল্‌লেন—"মহারাজ, দৈব-ফলের দৈব-বাণীর সম্মান রক্ষা করুন। ঐ ফলটি আপনার দু'মহিষীকে উপহার দিন।"

রাজা ফলটি বাসন্তী-পূর্ণিমার দিন দু'রাণীকে খাওয়ালেন।

তা'র পর দিনে-দিনে দিন যায়, মাস যায়, দশমাস যায় একদিন শেষরজনীতে—ঢোল, কাঁশী, বাঁশী বেজে উঠ্‌ল কাড়া নাকাড়া দামামা কর্‌তাল ডিম্‌ ডিম্‌ দম্‌ দম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে উঠ্‌ল নবৎখানায় সানাইয়ের গলা চিরে আগমনীর আলাপ বেরিয়ে এল—কি হয়েছে! কি হয়েছে! কি হয়েছে? দু'রাণীর সন্তান হয়েছে—দুয়োরাণীর এক ছেলে হয়েছে—আর সুয়োরাণীর এক মেয়ে হয়েছে।

রজনীর শেষ যাম। তখন একটিও কাক ডাকেনি পূব গগনে একটি রেখাও শুভ্রতা ধারণ করেনি। আঁতুড় ঘরে একদিকে একটি প্রদীপ—মাঝখানে একটা অগ্নিকুণ্ড—পালঙ্কে অচৈতন্য সুয়োরাণী—দাই অগ্নিকুণ্ডের পাশে ব'সে সদ্যোজাত শিশুকে তাপ দিচ্ছে।

অচৈতন্য সুয়োরাণী চৈতন্য লাভ ক'রে জেগে উঠ্‌লেন। তা'র পর ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"দাই কি হ'ল?"

দাই বল্‌লে—"রাণী-মা, মেয়ে হয়েছে—আঃ, কি তা'র টানা-টানা কালো চোখ—চাঁপা ফুলের মতো—"

এক কোপে ধনুকের ছিলেটা কেটে দিলে ধনুক যেমন চট্‌ ক'রে সোজা হ'য়ে যায় তেম্‌নি ক'রে সুয়োরাণী পালঙ্কে উঠে বস্‌লেন—চোখ-দুটোতে ঈর্ষার আগুন জেলে দিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"আর দুয়োরাণীর?"

"দুয়োরাণীর হয়েছে এক ছেলে।"

সুয়োরাণী পালঙ্ক থেকে উ'ঠে নেমে দাঁড়ালেন। কোথায় গেল তাঁর দুর্ব্বলতা? এক মুহূর্ত্তে তাঁর দেহ, মন, প্রাণ থেকে আলস্য, জড়তা, দুর্ব্বলতা সব কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। সুয়োরাণী দাইকে বল্‌লে..."দাই, মেয়েকে আমার কাছে দিয়ে দুর্জ্জনকে ডেকে আন।"

দুর্জ্জন সুয়োরাণীর বাপের বাড়ীর চাকর। ছেলে-বেলা থেকে তা'কে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছে। তা'র পর ধীরে-ধীরে রাজকন্যা বাড়্‌তে লাগ্‌লেন...তা'র পর রাজকন্যা রাজরাণী হলেন...নিজের রাজ্য ছেড়ে স্বামীর রাজ্যে এলেন—দুর্জ্জনও সেই সঙ্গে-সঙ্গে নতুন রাজ্যে এসে সুয়োরাণীর বিশ্বস্ত চাকর ব'লে পরিচিত হ'ল।

দাই সুয়োরাণীর কোলে মেয়েকে দিয়ে দুর্জ্জনকে দেউড়ি থেকে ডেকে আন্‌তে গেল। সুয়োরাণী ডাক্‌ছে, দুর্জ্জন তৎক্ষণাৎ তা'র কাঁধে একষট্টি বছর বয়েসের ও জীবনভরা যত সুকাজ-কুকাজের বোঝা নিয়ে এসে দাঁড়াল—বল্‌লে, "মা আমায় ডেকেছিলি?"

সুয়োরাণী বল্‌লে, "দুর্জ্জন, দুয়োরাণীর এক ছেলে হয়েছে আর আমার হয়েছে এক মেয়ে। দুয়োরাণীর ছেলেকে অপর্ণার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌তে হবে, আর তা'র জায়গায় একটা-কোনো জানোয়ারের বাচ্চাটাচ্ছা রেখে দে। রাজা যেন ভোর হ'লে এসে দেখেন আমার হয়েছে

মানুষ-ছেলে আর দুয়োরাণীর হয়েছে পশুর বাচ্চা। সুয়োরাণী তাঁর গলা থেকে বহুমূল্য মণি-মুক্তা-খচিত রত্ন-হার খু'লে দুর্জ্জনের হাতে দিলেন।

সেইদিনই রাজার পশুশালায় একটি বানরী বাচ্চা পেড়েছিল। সেই বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে দুর্জ্জন দুয়োরাণীর আঁতুড় ঘরে এল। দুয়োরাণী তখনও অচৈতন্য। দুর্জ্জন দাইয়ের হাতে মুক্তামালা ও বানরীর বাচ্চাটা দিয়ে রাজপুত্রকে নিয়ে বেরিয়ে এল। তা'র পর তা'কে একটা কাঠের সিন্দুকে পু'রে অপর্ণার তীরে এসে হাজির। অপর্ণার পরপারে তাল-সুপুরীর ঝোপের আড়ে চাঁদ ঢ'লে পড়েছিল—আকাশের তারাগুলো ম্লান হ'য়ে উঠেছে। দুর্জ্জন সিন্দুকটা মাথায় নিয়ে নদীতে নাম্‌ল—গলা জলে গিয়ে অপর্ণার খরস্রোতে সদ্যোজাত রাজপুত্রকে ভাসিয়ে দিলে।

তা'র পরদিন সারা রাজপুরী আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। চারিদিকে আহ্লাদ, চারিদিকে আনন্দ। প্রকাণ্ড রাজপুরীতে আসল খবর আর কে পায়? সারা স্থানে র'টে গেল দু'রাণীর সন্তান হয়েছে। রাজা ভোরে উঠে দু'রাণীকেই দেখ্‌তে গেলেন। দেখ্‌লেন সুয়োরাণীর এক মেয়ে হয়েছে আর দুয়োরাণীর হয়েছে এক বানরের বাচ্চা। বানরের বাচ্চা দেখে রাজা একেবারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লেন। এত-বড় রাজ্য, তা'র এত-বড় রাজা, তা'রই রাণী কিনা প্রসব কর্‌লে বানরের বাচ্চা! তৎক্ষণাৎ রাজা কোতোয়ালকে ডেকে হুকুম দিলেন—"কোতোয়াল দুয়োরাণী আর তা'র বানরের বাচ্চাকে আমার রাজ্য-ছাড়া ক'রে বনে ছেড়ে দিয়ে এস।" কোতোয়াল, রাজার আদেশ-মতো দুয়োরাণী ও বানরের বাচ্চাকে বনবাস দিয়ে এল। সুয়োরাণীর ক্রূর মুখে আহ্লাদের হাসি ফু'টে উঠ্‌ল।

২

খরস্রোতা অপর্ণা ছু'টে চলেছে উদ্দাম অদম্য রণ-তুরঙ্গমের মতো। তা'রই মধ্যে আবার তা'র কত স্নেহ, কত করুণা, পৃথিবীর গায়ে-গায়ে তা'র কি আদর স্পর্শ। সেই আদর স্পর্শে-স্পর্শে অপর্ণার দু'তীর কি শ্যামল হ'য়ে উঠেছে—বৃহৎ-বৃহৎ বটে কি শীতল কি মনোরম ছায়া বিছিয়েছে—যত দূরে দৃষ্টি চলে—যেন সারা বিশ্ব শ্যামলিমা দিয়ে মুড়ে-দেওয়া পৃথিবীতে এত আদর ক'রেও কিন্তু অপর্ণার অন্তরের সুদূরের ডাক থামেনি। অপর্ণার সে-ডাক বুঝি চিরন্তনের—সারাবিশ্বের প্রতি—অপর্ণা যেন ডাকৃছে।

আয়রে হেথায় ক্ষণেক ব'সে শোনরে আমি কি গাই গান,
কোন্ কাহিনী কোন্ স্বপনে ব্যাপ্ত রে মোর হৃদয়প্রাণ,
অধীর আমার বুকটি নিয়ে
কোন্ মরণের মধু পিয়ে
চল্‌ছি ছুটি' দিবসরাতি স্বপ্ন দেখি কি মহান্!

শোন্‌রে ওরে কান পাতিয়া সুরটি আমার কি গান গায়,
সঙ্গে আমার কে যাবিরে আয়রে তোরা আয়রে আয়;
রাখিস্ না আর কূলের মায়া,
লুটিয়ে দেরে জীবনকায়া,
ভাসিয়ে দেরে অকূল স্রোতে ক্ষুদ্র সকল বাসনায়।

কূলের মায়া করিস্ কে রে? অকূলে কার নাইরে টান
এই অকূলেই সত্য যত বৃহৎ যত মিল্‌বে দান;
একটুখানি আশার ভাষা,
একটু কাঁদা, একটু হাসা,
কূলের-দেওয়া আঁকড়ে-ধরা একটা শুধু দিনের প্রাণ।

কূলের মাটি আঁকড়ে ধ'রে অন্তিমে সুখ মিল্‌বে না,
শাঁখন যদি আঁকড়ে থাকিস্ খুল্‌বে না তা খুল্‌বে না,
আমার মতো সকল ছাড়ি
দীর্ঘ পথের দীর্ঘ পাড়ি
ধর্‌তে হবে নইলে কভু বাঞ্ছিত রে টল্‌বে না।

আয়রে ওরে নরনারী, ওরে কূলের মানুষদল,
আয়রে ছু'টে ফেলিস্‌নে আর কূলে-কূলে আঁখির জল,
একটি নিমেষ সাহস করি'
মধুর স্বপন বক্ষে ধরি'
অকূল আমার শীতল স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে দেখ্ হৃদয়-তল।

থাক্‌বি কি রে বধির চির শুন্‌বি না কি এ-আহ্বান?
এই সুরেতে সুর মিলায়ে গাইবি না কি গাইবি গান?
দীপ্তরে ঐ গগনতলে
থাক্‌বি তোরা কিসের ছলে
অন্ধকারে কিসের তরে ঢাক্‌বি তোদের জীবনখান?

আয়রে আমি নেবো তোদের যেথায় তপনচন্দ্র রে,
উঠ্‌ছে রোজই ডুব্‌ছে রোজই শু'নে সাগরমন্দ্র রে,
সুর যেথায় সাজবিহীন
জীবন-দোলা নয় যেথা দীন,
বাজায় যেথা আনন্দ-বীণ্ প্রতি অণুর রন্ধ্র রে।

আয়রে আমি নেবো তোদের যেথায় কোটি তারার জাল,
দৃপ্ত মোহে দীপ্ত করে স্তব্ধ অসীম আকাশ-তাল,
মুক্তি যেথা মরণে বাঁধা,
জীবন যেথা মরণে কাঁদা,
মিথ্যা যেথায় সৃজন-মাঝে মরণ কিম্বা মহাকাল

এম্‌নি অপর্ণা তারি জলে সংদ্যাজাত রাজপুত্রকে নিয়ে কাঠের সিন্দুক ভেসে চল্‌ল। তা'র পর সে-সিন্দুক নদী বেয়ে কত নগর-নগরী, কত পল্লী-প্রান্তর, কত বন-পর্ব্বত, অতিক্রম ক'রে সমুদ্রে গিয়ে পড়্‌ল। তা'র পর সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে এক দ্বীপে গিয়ে লাগ্‌ল। সেই দ্বীপের এক জেলে পরদিন মাছ ধর্‌তে এসে দেখে চড়ায় এক সিন্দুক প'ড়ে আছে। সিন্দুক খু'লে যখন দেখ্‌লে এক রাজ-পুত্রের মতো শিশু তখন জেলের অন্তরে বিস্ময় ও আনন্দের একটা দারুণ তুফান উঠ্‌ল। জেলে সেই শিশুকে বুকে ক'রে বাড়ী ফির্‌ল। সেদিন আর মাছধরা হ'ল না। তা'র পর মহা আনন্দে জেলে-জেলেনী সেই শিশুপুত্র মানুষ কর্‌তে লাগ্‌ল। জেলে-জেলেনী নিঃসন্তান। রাজপুত্র জেলের ঘরে জেলে জেলেনীর স্নেহে ও আদরে দিন-দিন শশিকলার ন্যায় বাড়্‌তে লাগ্‌ল। জেলে-জেলেনী ভাবে—কোন্ দেবতার আশীর্ব্বাদ তাদের ঘরে সন্তান-রূপে উদয় হয়েছে। এ সন্তান জালও টান্‌বে না, দাঁড়ও ধর্‌বে না, কিন্তু অতুল আনন্দ বিতরণ কর্‌বে।

৩

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আঠারটি বছর কেটে গেল।

এখন ধীবর-পল্লীতে সুর বিছিয়ে সময় নেই অসময় নেই বাঁশীর সুর বেজে ওঠে—কখনও কাছে, কখনও দূরে—কখনও সুখের কখনও দুঃখের—কখনও বাঁশীর সুরে আকাশে-বাতাসে হাসির ঢেউ তু'লে যায়, আবার কখনও তা'র করুণ রাগিণী, জল, স্থল, কানন, বাস্তার কি-একটা অশ্রুভেজা কাহিনীর আভাস দিয়ে ভ'রে দেয়! এ বাঁশীর সুর জলে-ভাসিয়ে-দেওয়া রাজপুত্রের। এই ধীবরপল্লীর সঙ্গে যে রাজপুত্রের কোনোখানেই মিল নেই, তা'রই গাথা বাঁশীর সাতটা রন্ধ্রপথে সাতটা সুরের সাথে বেজে ওঠে। সন্ধ্যেকালের আবছায়াতে যখন সাগরবুকের উচ্ছল কলরোল ধীরে-ধীরে মৃদু হ'য়ে আসে—যখন তা'র বুকের ধ্বংসের মন্ত্র ধীরে-ধীরে ঘুমপাড়ানী গানের সুরের মতো সোহাগ-কোমল মোলায়েম হ'য়ে আসে, তখন নিবিড় বিজন সাগর-সৈকতে রাজপুত্রের বাঁশীর বুক চি'রে কেবলই ফিরে-ফিরে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে—কোথায়? কোথায়?—

"বুকের মাঝে যে-একটি মত্ত শিশু নৃত্য কর্‌ছে—সে-নৃত্যের ছন্দ ত ধীবর-পল্লীর কোনোখানেই মিল খুঁজে পায় না—এ-নৃত্যের ছন্দের মিল মিল্‌বে—সে কোথায়? কোথায়?…"

"এই যে বুকের মাঝে একটা বেদনা দিন-দিন কেবল যেতেই চলেছে—এ ধীবর-পল্লীর কোনো সুখদুঃখই ত তা'কে আপনার ক'রে ধর্‌তে পার্‌ছে না—এ-বেদনার বিরতি হবে—সে কোথায়? কোথায়?…"

"এই যে প্রাণের তারে একটা সুর বাজে কখনও কোমল, কখনও উদ্দাম, কখনও বিশ্বে আপনাকে বিলিয়ে দিতে চায়, কখনও বিশ্বকে আপনার মুঠোর মধ্যে দুর্নিবার-ভাবে ধর্‌তে চায়, এ ধীবর-পল্লীর সহজ-জীবন যাত্রার মধ্যে সে সুর ত কোনোখানেই আপনার সহজ স্থান খুঁজে পায় না—কবে এ সুরের বিজয়-মাল্য মিল্‌বে—সে কোথায়? কোথায়?…

এম্‌নি ক'রে বাঁশীর সুরের পর্দ্দা রাজপুত্রের চারিদিক্ ঘি'রে রাজপুত্রকে ধীবর-জীবনের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র ধর্ম্ম থেকে রক্ষা ক'রে-ক'রে চলেছে।

সেদিন পূর্ণিমা রাত। চারিদিকে জ্যোৎস্না-ধারার বান ডেকেছে। সেই জ্যোৎস্নায় সন্তরণ-লীলা ঊর্ম্মিবালা-দের লীলায়িত তনু সব চিক্-চিক্ কর্‌ছে, বেলাভূমে শুভ্র বালুরাশি শুভ্রতর হ'য়ে উঠেছে, ঝাউকুঞ্জে-কুঞ্জে নিবিড়তা নিবিড়তর হ'য়ে উঠেছে। সেদিন বিজন সাগর-সৈকতে বসে রাজপুত্র একমনে বাঁশী বাজাচ্ছিল। সে বাঁশীর গান একটা অতৃপ্ত আত্মার ব্যাকুল মর্ম্মবেদনা। এই মর্ম্মবেদনা যেন বাঁশীর সুরে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হ'য়ে, সূক্ষ্মতম হ'য়ে আকাশে-বাতাসে আপনার তৃপ্তি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বাঁশীর সুর যেন বল্‌ছিল—"হে আকাশ, তোমার ঐ অনন্ত পথের পথিক ক'রে আমাকে নিয়ে যাও—এই নিগড়বদ্ধ পৃথিবীর কঠোর পাশ থেকে তোমার ঐ অবিরাম স্বপ্ন-স্রোতের মাঝে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলো—মানব-জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও—হে বাতাস তোমার সুদূরের বারতা, তোমার অনির্দ্দেশের মরীচিকা আমার কাছে সত্য হোক্, সত্য হোক্, সত্য হোক্।" বাঁশী ঘু'রে-ঘু'রে ফি'রে-



হংসদূত

চিত্রকর শ্রী [illegible]

শান্তিনিকেতন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ফি'রে অনেকক্ষণ বাজ্‌ল, তা'র পর একটা ক্লান্ত অবসাদের মাঝে তা'র সুর ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল। তখন রাজপুত্র হঠাৎ শুন্‌তে পেলে, কে যেন ডাক্‌ছে—রাজপুত্র, ও রাজপুত্র!"

রাজপুত্র চম্‌কে মুখ তু'লে চেয়ে দেখ্‌লে। দেখ্‌লে, বেলাভূমে যেখানে তরঙ্গের দল সব এসে-এসে ফি'রে যাচ্ছে সেইখানে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতে চিবুক রেখে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় এক অপরূপ জীব। তা'র কটি পর্য্যন্ত একটি অপরূপ রূপসী অনাবৃতদেহ কিশোরী। দীর্ঘ নিবিড় কুন্তল, গায়ের রঙ্‌ জ্যোৎস্নার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, দুইটি নিটোল স্থির বক্ষ, পল্লবের মতো দুটি বাহু, দুইটি চোখে যেন সাগরের মায়া। আর কটি থেকে একটি মৎস্যপুচ্ছ—তা'র শল্করাজি জ্যোৎস্না-কিরণে রূপোর মতো চক্‌-চক্‌ কর্‌ছে।

রাজপুত্র আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"তুমি কে?"

"আমি একটি মৎস্যনারী"

"একটি মৎস্যনারী! তোমার নাম কি?"

মৎস্যনারী উত্তর কর্‌লে—"আমার নাম সাগরিকা।"

রাজপুত্র জিজ্ঞেস কর্‌লে—"সাগরিকা, আমাকে রাজপুত্র বল্‌লে কেন?"

সাগরিকা উত্তর কর্‌লে—"তুমি যে রাজপুত্রই। হরিদ্বীপের রাজা তোমার জনক, বিমাতার হিংসায় তোমার দেশান্তর।"

রাজপুত্র ক্ষণকাল মৌন থেকে ধীরে ধীরে বল্‌লে—বুঝেছি, তাই বুঝি এই ধীবরপল্লীর জীবনের সঙ্গে কিছু-তেই আমার জীবন মিলিয়ে দিতে পার্‌ছিলুম না।"

সাগরিকা উত্তর করলে—"সত্যিই তাই।" তা'র পর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—"রাজপুত্র, আমি তোমার বাঁশী শুন্‌ছিলুম। জানো কি, তোমার বাঁশীর সুর কি বল্‌ছিল?'

"কি?"

"বাঁশীর সুর ঘু'রে-ঘু'রে শুধু এই কথাই বল্‌ছিল—একা-একা—আমি বড় একা।"

রাজপুত্র বল্‌লে—"বুঝিনি। কিন্তু এ আকুলতার মানে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। কিছুদিন থেকে আমার বাঁশীর বুক চি'রে কেবল এই আকুলতাই ফু'টে বেরুচ্ছে—কেন?"

"কারণ—রাজপুত্র তোমার জীবনের কিনারা বসন্ত দেখা দিয়েছে।"

"সে কি?"

"অর্থাৎ যৌবন।"

"তাই বা কি?"

"প্রতিবৎসরে যেমন বসন্ত, প্রতিজীবনে তেম্‌নি যৌবন।"

"তা'তে কি হয়?"

"প্রতিবসন্তে যেমন পৃথিবীর আকাশবাতাস এক নব স্পন্দনে স্পন্দিত হ'য়ে উঠে, প্রতিযৌবনে তেম্‌নি মানুষের জীবন এক নব স্পন্দনে আকুল হ'য়ে যায়।"

"এর শেষ কি?"

"পৃথিবীর উচ্ছ্বসিত হৃদয় যেমন সার্থক হ'য়ে ওঠে নব পল্লবের স্নিগ্ধতায়, প্রস্ফুটিত ফুলরাশির বর্ণচ্ছটায়, অলির গুঞ্জরণে, সৌরভের মাদকতায়, নানা অশরীরী সুরের মূর্চ্ছনায়, তেম্‌নি মানুষের এই আকুলতারও মুক্তি হয়—"

"কিসে?"

"প্রেমে।"

"কি এ প্রেম?"

"এ এক অপূর্ব্ব রহস্য, কেউ জানে না যে কি। দশখানি মুখের মধ্যে একখানি মুখ, দশজোড়া চোখের মধ্যে দুখানি চোখ, একটি নাক, দুখানি ঠোঁট, একটি চিবুক, একখানি গ্রীবাভঙ্গি কেন যে একদিন বিশেষ হ'য়ে ওঠে মোহন হ'য়ে ওঠে, আকাঙ্ক্ষার বিষয় হ'য়ে ওঠে তা কেউ জানে না।" তা'র পর একটু থেমে ধীরে-ধীরে বল্‌লে—"আর জানে না ব'লেই তা মানুষের জীবনে এমন অপূর্ব্ব রহস্য সৃষ্টি কর্‌তে পারে। প্রেমের দেবতা অন্ধ। এই অন্ধ দেবতার চোখ ফুটিয়ে দিলে প্রেমিক হ'য়ে উঠ্‌বে জ্ঞানী। প্রণয়ীর চিত্তলোকের কাব্য তখন হ'য়ে উঠ্‌বে তা'র মানস লোকের বিজ্ঞান। এতে মানুষের লাভ বেশী না ক্ষতি বেশী তা ওজন ক'রে বলা কঠিন।"

ক্ষণকাল মৌন থেকে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"এই প্রেম কোথায় মিল্‌বে?"

সাগরিকা উত্তর কর্‌লে—"সবখানেই। ধীবরপল্লীর কুটীর থেকে রাজপ্রাসাদের কক্ষ পর্য্যন্ত সবখানেই।"

রাজপুত্র বল্‌লে—"তবে এখানে আমার এ আকুলতা কেন?"

সাগরিকা উত্তর দিলে—"রাজপুত্র, তুমি যে রাজপুত্র। তোমার আত্মা ত ধীবরের আত্মা নয়।"

তা'র পর সহসা সাগরিকা জিজ্ঞেস কর্‌লে—"রাজপুত্র, আমাদের দেশে যাবে?"

রাজপুত্র বল্‌লে—"তোমাদের দেশ? সে কোন্ দেশ?"

"মৎস্যনারীর দেশ।"

"সে কোথায়?"

"সাগরের অতল তলে, যেখানে ঊর্ম্মিবালারা ঘুমোয়, শুক্তিরা মুক্তো ফলায়, সূর্য্যের রশ্মি যেখানে স্নিগ্ধ হ'য়ে নামে, বড় যেখানে জল-তরঙ্গের আলাপ শুনায়।"

"সেখানে কি আছে?"

"সেখানে আছে ঘর-বাড়ী, রাজা, রাজপ্রাসাদ আর কেবল মৎস্যনারীর দল।"

"আর কি আছে?"

"আর আছে হীরে, পান্না, চুনি, জহরত, মোতি, মরকত, পোখরাজ, প্রবাল, শঙ্খ, শুক্তি—"

"সুখ আছে?"

"না।"

"দুঃখ আছে?"

"না।"

"হাসি আছে? অশ্রু আছে?"

"না।"

"তবে কি আছে?"

"আছে বিরাট্ শান্তি।"

"শান্তি নিয়ে আমি কি কর্‌ব? আমি বৃদ্ধ না বৈরাগী, দুর্ব্বল না শ্রান্ত?"

সাগরিকা বল্‌লে—"রাজপুত্র, এই ধীবরপল্লীর সুখ-দুঃখ নিয়েই বা তুমি কি কর্‌বে? ধীবরজীবনের সুখ-দুঃখ কোনো দিনই তোমার চিত্ত ভ'রে তুল্‌তে পার্‌বে না। ভিতরে-বাহিরে নিঃসঙ্গ হ'য়ে চিরকাল জীবন কাটাবে এইখানে?"

রাজপুত্র উন্মনা হ'ল—তা'র পর বল্‌লে—"আচ্ছা, যাবো তোমাদের দেশে। কখন?"

"এখ-ই।"

"এখনই?"

"এই মুহূর্ত্তে।"

"আচ্ছা, চলো।"

সাগরিকা বল্‌লে—"রাজপুত্র, এস, আমার হাত ধরো।"

রাজপুত্র গিয়ে মৎস্যনারীর কমল-দল-সম হস্ত ধারণ কর্‌লে। দেখ্‌লে, সে-হাত একেবারে তুহিন-শীতল, তা'তে উত্তাপের লেশমাত্র নেই।

ধীরে-ধীরে দু'জনে জল কেটে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল। তা'র পর ধীরে-ধীরে মৎস্যনারী ও রাজপুত্র তরঙ্গের নীচে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ধীবরপল্লী তখন ঘোর নিদ্রামগ্ন।

৪

সাগরিকার রাজপুত্র মৎস্যনারীর দেশে পৌঁছল।

মৎস্যনারীর দেশ সেদিন মহা চঞ্চলতায় ভ'রে গেল। হাজার-হাজার বৎসরের মৎস্যনারীদের জীবনে এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। এই যে রাজপুত্র এর সঙ্গে মৎস্য-নারীদের যেন কোথায় একটা মিল আছে, কিন্তু তা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই মৎস্যনারীদের কাছে রাজপুত্র এমন রহস্যের। ওর মধ্যে একটা আনন্দের দান লুকোনো আছে, আবার যেন কোথায় একটা আশঙ্কা কর্‌বারও বস্তু আছে।

রাজপুত্র প্রবাল-নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদে রাণীর শতেক সহচরীদের মধ্যে বাস করে।

দিনের পর দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। সঙ্গে-সঙ্গে রাজ-পুত্রের মধ্যে যা অনির্দ্দেশ্য, যা অস্পষ্ট ছিল, তা মূর্ত্ত হ'য়ে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। অন্তরের অব্যক্ত আকুলতা পরিচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লে। চক্ষের কুণ্ঠা-কাতর দৃষ্টি সাহসী হ'য়ে উঠ্‌ল। বাইশ বছরের রাজপুত্র পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে জেগে দাঁড়াল। তা'র চোখের পাতে তড়িৎ-লেখা। স্পর্শে আকর্ষণী শক্তি। আজ তা'র বাঁশীর সুর আর অব্যক্ত আকুলতায় চারিদিক্ ভ'রে তোলে না। সে বাঁশীর সুর যেন বলে—জানি

তুমি কে—জানি তুমি কি—এস আমার এই বাহুবন্ধনে—এস—এস—এস হে।

এই সঙ্গে-সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সহচরীদের মধ্যে একটা হুলস্থূল প'ড়ে গেল। একটা বিশৃঙ্খলা, একটা অশান্তিতে চারিদিক্ ভ'রে উঠ্‌ল। সহচরীদের একটানা সহজ শান্তিময় জীবন যেন কিসের ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। তা'রা আর তেমন ক'রে সাগর-তরঙ্গের সঙ্গে লুটোপুটি করে না—সাগরবুকের সুনীল দোলায় দোল খায় না—কুন্তলজাল বিছিয়ে সূর্য্যরশ্মি ধরে না। দিন যেন আর কাটে না—রাত অতি দীর্ঘ মনে হয়। আর এসবের কারণ ঐ রাজপুত্র—তা'র পরিপূর্ণ উন্নত দেহ—তা'র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—তা'র মধ্যেকার কে জানে কি! এমন ক'রেও দিন কাটবে না। মৎস্যনারীরা সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে—মৎস্যনারীর দেশ লুপ্ত হ'য়ে যাবে। কি করা যায়? সহচরীরা সব যুক্তি করলে যে রাণীকে গিয়ে সব কথা জানাবে।

তখন দল বেঁধে সহচরীরা যে-মহলে রাণী থাকেন সেই মহলে গিয়ে হাজির হ'ল।

রাণীর প্রধানা সহচরী সাগরিকা। সহচরীদের একজন ডাক্‌লে—"সাগরিকা! সাগরিকা।"

সাগরিকা তখন পুরুভুজের স্নায়ুর সঙ্গে চিত্রবিচিত্র কড়ি গেঁথে একটা কুন্তল-শোভা তৈরি করছিল, ডাক শু'নে মহল থেকে বেরিয়ে এল। বললে—"কি লো অতলিকা! তোরা সব দল বেঁধে এখানে কি জন্যে? তোরা আজ বরুণসাগরে মাণিক কুড়োতে যাসনি?

অতলিকা জিজ্ঞেস করলে—"রাণী মা কোথায়?"

"রাণী মা গেল-পূর্ণিমায় কোন্-কোন্ শুক্তিতে স্বাতীর জল পড়েছে তাই দেখ্‌ছেন শুক্তিমন্দিরে।

"তাঁকে ডেকে দে।"

"কেন লো, রাণীমাকে কি দরকার?"

"রাজপুত্রের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ আছে।"

অতলিকার কথা শুনে সাগরিকার দুটি চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে গেল।

আশ্চর্য্যের সুরে বললে—"নালিশ? রাজপুত্রের বিরুদ্ধে? কি নালিশ?'

"রাণীমা এলে বলব—এখন তাঁকে ডেকে দে।"

সাগরিকা গিয়ে রাণী মন্দাক্রান্তাকে ডেকে আনলে।

রাণী এসে বললেন, 'কি গো অতলিকা তরণিকা তরঙ্গিকা তোদের যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না, রাজপুত্রের খবর কি?"

অতলিকা বললে—"রাণীমা, রাজপুত্রের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ আছে।"

"নালিশ? কি নালিশ?"

"ওর ভিতরে একটা দারুণ অমঙ্গল আছে। মৎস্যনারীর দেশ উচ্ছন্ন করবে।"

রাণী আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন—"সে কি—রাজপুত্র কি করেছে?"

অতলিকা বললে—"একদিন রাজপুত্র আমার চোখে চোখে তাকিয়েছিল—আর আমার বুক পর্য্যন্ত সমস্ত রক্ত ধীরে-ধীরে উষ্ণ হ'য়ে উঠল—সে কি জ্বালা—সে অসোয়াস্তি আমার আজ পর্য্যন্তও ঘোচেনি। রাজপুত্রের দৃষ্টিতে বিষ আছে।"

তরণিকা বললে—"আর-একদিন রাজপুত্র আমার একখানি হাত তার মুঠোয় ক'রে ধরেছিল—আর সঙ্গে-সঙ্গে বুক পর্য্যন্ত সে কি একটা কম্পন—মনে হ'ল যেন দেহের সমস্ত অস্থি একেবারে ভেঙে-চু'রে যাবে—আজ পর্য্যন্ত মাঝে-মাঝে আমার বুকে তেমনি কাঁপন লাগে—সেই থেকে জীবনে সব বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছে—রাজপুত্রের স্পর্শে বিষ আছে।"

তরঙ্গিকা বললে—"আর একদিন রাজপুত্র এসে আমাকে বললে, 'তরঙ্গিকা শোন্, তোকে বাঁশী শোনাই' এই না বলেই রাজপুত্র বাঁশী বাজাতে লাগল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমার কি যে হ'ল—দেহের স্নায়ু সব টন্‌টন্ করতে লাগ্‌ল—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জর-জর করতে লাগ্‌ল—মনে হ'ল সমস্ত দেহ কোথায় মিলিয়ে যাবে—রাজপুত্রের বাঁশীর সুর বিষ ছড়ায়।"

সবাই সমস্বরে বললে—"রাজপুত্রের মধ্যে বিষ আছে—বিষ আছে—ও মৎস্যনারীর দেশ উচ্ছন্ন দেবে।"

তখন রাণী সাগরিকাকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"সাগরিকা তুই কি বলিস্?"

সাগরিকা বললে—"রাজপুত্রের মধ্যে যা আছে সে

বিষ নয়, বিদ্যুৎ। মানুষদের রাজ্যে যে-কথায়, যে-সুরে, যে-স্পর্শে, যে-দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ নেই; সে-কথা, সে-সুর, সে-স্পর্শ, সে-দৃষ্টির কাণাকড়িমাত্র মূল্যও নেই। এই বিদ্যুতেই দেহ দেহকে টানে, প্রাণ প্রাণকে টানে, মন মনকে টানে। শিল্পী, কবি, কর্ম্মী, প্রেমিক এদের মধ্যে এই বিদ্যুতেরই নানা প্রকাশ। এই বিদ্যুৎই মানুষের আত্মাকে প্রকাশ করে। এই বিদ্যুৎছাড়া মানুষের সমাজ একটা জড়পিণ্ড হ'য়ে উঠ্‌বে। রাজপুত্রের মধ্যে যা ফুটেছে, সে বিষ নয় সে হচ্ছে সঞ্জীবনী সুধা। তবে মানুষের পক্ষে যা সুধা, আমাদের মৎস্য-নারীদের পক্ষে তাই বিষ। যে-বিদ্যুৎ মানুষদের উজ্জ্বল করে, সেই বিদ্যুৎই আবার মৎস্য-নারীকে পুড়িয়ে দেবে।"

রাণী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"সাগরিকা! এ-সব কথা তুই জান্‌লি কেমন করে?"

সাগরিকা উত্তর কর্‌লে—"আমি যে সন্ধ্যারাতে ধীবর-বালার কালো চোখের নিবিড় দৃষ্টি দেখেছি—জ্যোৎস্না রাতে ধীবর-যুবকের বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়ের দাঁড়-ফেলা, জাল-টানা দেখেছি—আর দেখেছি—রাজপুত্রের বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তা'র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রেখায়-রেখায় সুরের রেশ—তার কুঞ্চিত কেশের গুচ্ছে-গুচ্ছে আকাঙ্খার হিল্লোল, তা'র চোখের পাতে-পাতে ঘনিয়ে-আসা নিবিড় স্নিগ্ধ ছায়া—কিন্তু হায়! তা মৎস্যনারীকে কেবল প্রলুব্ধই করে, কিন্তু প্রবুদ্ধ করে না।"

সাগরিকার কথা শুন্‌তে-শুন্‌তে রাণী মন্দাক্রান্তা ধীরেধীরে গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন—কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে তা'র পর বল্‌লেন—"আমার রাজ্যে আর রাজপুত্রের স্থান নেই—আমি তা'র নির্ব্বাসনের আদেশ দিলাম হরিৎদ্বীপে। হরিৎদ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে চন্দ্রচূড়গিরির সানুদেশে যে পঞ্চদ্বারী গুহা আছে, সেইখানে রাজপুত্রের বাসস্থান।"

তখন সাগরিকা বিনীতকণ্ঠে বল্‌লে—"রাণীমা, আমার একটি আবেদন আছে।"

"কি?"

"রাজপুত্রের সঙ্গে-সঙ্গে হরিৎদ্বীপে আমারও নির্ব্বাসনের আদেশ হোক্।"

"সাগরিকার আবেদন শু'নে রাণী তা'র নির্নিমেষ দৃষ্টি সাগরিকার উপর স্থাপিত কর্‌লেন। সে-দৃষ্টি সহ্য কর্‌তে না পেরে সাগরিকার মস্তক অবনত হ'য়ে গেল। তা'র পর রাণী বল্‌লেন—তোমার আবেদন মঞ্জুর—তোমার নির্ব্বাসন হরিৎদ্বীপে। আজ থেকে অতলিকা আমার প্রধানা সহচরী।"

রাজপুত্র ও সাগরিকা হরিৎদ্বীপে নির্ব্বাসিত হইল।

৫

রাজপুত্র ও সাগরিকা হরিৎদ্বীপে থাকে। রাজপুত্র পঞ্চদ্বারী গুহায়, আর সাগরিকা সেই গুহারই কাছে-কাছে চন্দ্রচূড়-গিরির ধারে ধারে সিক্ত সৈকতের তটে-তটে যেখানে উর্ম্মিরা'জ আসে, আবার ফি'রে-ফি'রে যায়, শুভ্র ফেনপুঞ্জ ছড়িয়ে-ছড়িয়ে।

মৎস্যনারীর দেশের সঙ্গে এই হরিৎদ্বীপের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। মৎস্যনারীর দেশে যা-কিছু সবই অচঞ্চল স্থির। মৎস্যনারীরা সব চিরকিশোরী। তাদের মণিমুক্তা সব ক্ষয়বৃদ্ধিহীন। মণিমুক্তার হৃদয়ের রশ্মি অচঞ্চল—মৎস্যনারীদের চোখের জ্যোতি অচঞ্চল। এখানে যা আছে তা চিরকালই আছে, আবার যা নেই তা কোনো কালেই হবে না। এখানে কিছুর আরম্ভও নেই, সুতরাং কিছুর সমাপ্তিও নাই। এদেশকে যেমন মৃত্যু স্পর্শ করে না, তেম্‌নি আবার জীবনের বিজয়-মাল্যও এর কণ্ঠে পড়ে না।

কিন্তু হরিৎদ্বীপের ব্যাপার উল্টো। ক্ষয়বৃদ্ধির চাঞ্চল্যে এর আকাশ-পাতাল আকুলিত, হাসি কান্নার-হিল্লোলে এর গিরি, কান্তার, উপত্যকা, অধিত্যকা—সব উদ্বেলিত। ঊষার নীলিমায় সন্ধ্যার রক্তিমায় এর জল-স্থল রঞ্জিত। দখিনা বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে এর বুকে কত-কত ফুল মোহন হাসি নিয়ে জেগে ওঠে, আবার উত্তরে বাতাসের স্পর্শে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ধূলোয় ঝ'রে যায়, বসন্তের স্পর্শে এখানে সব শ্যামল হ'য়ে ওঠে—পাখীর কণ্ঠে গান জাগে—অলির পক্ষ-স্পন্দনে গুঞ্জন তোলে, আবার প্রসূনপল্লব সব স্থবির হ'য়ে ওঠে—পাখীর কণ্ঠ নীরব হ'য়ে যায়—অলির গুঞ্জন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। প্রাণের এখানে হিসাব নেই, তাই মৃত্যু এখানে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু চিরন্তনের বেদনা রেখে যেতে পারে না।

হরিৎদ্বীপের একদিনের রিক্ততা আর একদিনের ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভ'রে যায়, আক্ষেপের পাছে পাছে এখানে আনন্দের আয়োজন চল্‌তে থাকে।

এই হরিৎদ্বীপে এসে রাজপুত্রের যেন একটা নবজন্ম লাভ হ'ল। মৎস্যনারীর দেশে যেন কিসের একটা সূক্ষ্ম প্রভাব তা'র চারিদিকে ঘি'রে তাঁর জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তিকে ক্ষুণ্ণ কর্‌ছিল। হরিৎদ্বীপে এসে সে-প্রভাব যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল। আর দখিনা বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে ঝরা ফুলের দীর্ঘশ্বাসের সাথে-সাথে অলি-গুঞ্জরণের সুরে-সুরে তাঁর অর্দ্ধব্যক্ত জীবন-সঙ্গীত তা'র পূর্ণ পরিচয়ের মহিমা নিয়ে ফু'টে উঠ্‌ল। সাগরিকা—সাগরিকা—সাগরিকা !! কিন্তু ও যে কেবল সাগরেরই, ধরিত্রীর কেউ নয়। সাগর তরঙ্গের মতোই ওকে ধরা যায় না—সাগর-বুকের নীলিমার মতোই ওকে আপনার করা যায় না, ফেনপুঞ্জের মতোই মুঠোর মধ্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু তবু—তবু—ওই সাগরিকা—কি—কোথায় কেন! কি এই আকর্ষণ ওর প্রতি—কোথায় লুকিয়ে আছে ওর গোপন রহস্যটি, কেন এই আকুলতা, আর অতৃপ্তি? কাছে থেকে এই দূরের ব্যবধান কোন্ মন্ত্রে তা ঘুচ্‌বে? দখিনা বাতাস ব'য়ে যায়, ফুল-গাছের মাথায় মাথায় ফুল ফুটে ওঠে, লতার গায় গায় পল্লবরাজি দুল্‌তে থাকে, রাজপুত্রের মনে খালি মন্ত্রের মতো ধ্বনি হ'তে থাকে—সাগরিকা—সাগরিকা—সাগরিকা! কিন্তু মিলন-মন্দির,—সে কোথায়? জলেস্থলে না আকাশে—কোথায়? যেন অনল-ভরা একটা দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা তুহিন-আবৃত মেরু-প্রদেশের সীমা-প্রান্তে এসে থেমে আছে।

একদিন রাজপুত্র বল্‌লে—"সাগরিকা, জানো কি আমার এই বুকের উন্মত্ত বাসনা?"

"কি?"

"তোমার ঐ বক্ষ আমার এই অনল-ভরা বুকের উপর নিষ্পেষিত কর্‌তে।"

রাজপুত্রের কথা শুনে সাগরিকা সরল দৃষ্টিতে রাজ-পুত্রের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ল—তা'র পর বল্‌লে—"রাজপুত্র আমি যে তোমারই।"

বিদ্রোহের কণ্ঠে রাজপুত্র ব'লে উঠ্‌ল—"তুমি আমারই, কিন্তু তুমি কি সাগরিকা, তোমার চোখের পাতে অশ্রু কই? ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা কই? গণ্ডে রক্তিম-রাগ কই? বক্ষ ঘি'রে কম্পন কই? কই—কই সাগরিকা—আমার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার অনল-স্পর্শে তোমার স্নায়ুতে-স্নায়ুতে শোণিতে-শোণিতে প্রলয়-প্রবাহের উদ্দাম নৃত্য? সাগর-তলের মতো তুমি স্থির, সাগরের মায়ার মতো তুমি অপ্রাপ্তব্য, কোথায় সেই আত্মা, যৌবন যার অভিসারে বেরোয়, বসন্ত যার সংবাদ বহন ক'রে আনে! হায় মৎস্য-নারী—তুমি আমারই, কিন্তু কোন্ ঐশ্বর্য্যের এ অবদান তোমার? তুহিনে-গড়া ঐ বক্ষে মানবতার উষ্ণতাটুকু পর্য্যন্ত কোথায়? আমি কোন্ পথে তোমার কাছে গিয়ে পৌছব?"

সাগরিকা বল্‌লে—"রাজপুত্র মৎস্যনারীর জীবনের এ অভিশাপ—এতদিন কারো কাছে ধরা পড়েনি—তা'র চির-কৈশোর চিরনিষ্ফলতায় মূক হ'য়ে আমার এ দেহ, আমার মন'ক প্রতিফলিত ক'রে ধর্‌তে পারে না, কিন্তু তবু—তবু—শোনো রাজকুমার——"

"কি?"

"অতলিকা তরলিকা তরঙ্গিকারা যা বুঝ্‌তে পারেনি, আমি তা প্রথম থেকেই বুঝেছি।"

"কি সে?"

"আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু হায়! চিত্তে যা জেগেছে, এ দেহের তা বহন কর্‌বার সামর্থ্য নেই।"

রাজপুত্র সাগরিকার দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। এ যেন মেরুপ্রদেশের তুহিন-গড়া এক মেরু-কন্যা। হায় কোথায় আছে এর মধ্যে একটিও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ! কোথায় এ-জীবনের হোমের বেদী? কোন্ বস্তু এর আহুতি?

বছর ঘু'রে গেল। বসন্তের স্পর্শে আবার হরিৎদ্বীপ স্নিগ্ধশ্যামল হ'য়ে উঠেছে। বন্ত-কুসুমের তীব্র গন্ধ যেন চারিদিক্ মাদকতায় উন্মাদ ক'রে তুলেছে। বৃক্ষে-বৃক্ষে ফুল, ফুলে-ফুলে মধু, মধুতে-মধুতে মধুপ। বনচ্ছায়ে-ছায়ে কুরঙ্গ-কুরঙ্গিনীরা আনন্দে ক্রীড়া কর্‌ছে—কপোত-কপোতীরা ঠোঁটে-ঠোঁটে লাগিয়ে আনন্দ-কূজন-ধ্বনিতে চারিদিক্ আকুল ক'রে তুলেছে—সেই আনন্দ কূজন-ধ্বনি

গিরি-গুহার কন্দরে-কন্দরে যে প্রতিধ্বনি তুলেছে, তা মানুষের মনকে উদাস করে, হতাশ করে। বুঝি আজ এখানে কারো একা থাক্‌বার হুকুম নেই।

রাজপুত্র তা'র গুহা থেকে ছু'টে বেরুল। বনফুলের তীব্রগন্ধের মাদকতা তা'র শিরায়-শিরায় শোণিত-প্রবাহকে মাতাল ক'রে তুলেছে—কপোত-কপোতীর আনন্দ-কূজন-ধ্বনি তা'র চিত্তে স্বপ্নলোকের কোন্ অশরীরী অনির্দ্দেশ্যকে দুর্নিবার ক'রে তুলেছে—যৌবন তা'র রঙীন চিঠি আজ দিকে-দিকে উড়িয়ে দিয়েছে—এ চিঠিকে অস্বীকার কর্‌বার ক্ষমতা কারো নেই।

রাজপুত্র উত্তেজিতকণ্ঠে ডাক্‌লে—"সাগরিকা—সাগরিকা!"

"কি রাজকুমার।"

রাজপুত্র আকুল আবেগে সাগরিকার বক্ষ আপনার বক্ষে জড়িয়ে নিলে—তা'র ঠোঁট-দুখানি একটা নিষ্ঠুর চুম্বনে অধিকার কর্‌লে। পরক্ষণে রাজপুত্র মৎসনারীকে আপনার আলিঙ্গন থেকে দূরে ছুঁড়ে ফে'লে দিলে। দুইটি তুহিন-রেখার চাপে যেন তা'র ঠোঁট-দুখানি থেকে সমস্ত রক্ত নিঃশোষিত হ'য়ে তা নীল হ'য়ে উঠেছে, তা'র হৃদয়ে একটা বরফের চাপ নেমে এসেছে। রাজপুত্র সেইখানে ক্রোধে-ক্ষোভে ব'সে পড়্‌ল। তার মাথাটি হাঁটুর উপরে লুটিয়ে পড়্‌ল। তা'র চোখ ফেটে আর অশ্রু বাধা মান্‌লে না।

পায়ের কাছে তা'র প'ড়ে রইল, মৎসনারী নির্ব্বাক্, নিঃস্পন্দ।

ধীরে ধীরে সূর্য্য ডু'বে গেল। তা'র পর হঠাৎ গুরু গুরু গুরু, দুরু দুরু দুরু! দক্ষিণ সাগরের দিক্‌চক্রবালের পর-পার থেকে সহসা শব্দ উঠ্‌ল—গুরু গুরু গুরু, দুরু দুরু দুরু! প্রথমে ছোট্ট, তা'র পর বৃহৎ, তা'র পর আরও বৃহৎ হ'য়ে একখানি মসীকৃষ্ণ মেঘ দিক্‌চক্রবালের কোল থেকে মাথা তুল্‌লে। ঊর্ম্মিবালারা সে মেঘের ছায়াকে বুকে ধর্‌বার জন্যে ধীরে-ধীরে স্থির হ'য়ে গেল।

মৎস্যনারী ডাক্‌লে—"রাজকুমার।"

রাজপুত্র মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লে—বল্‌লে—"কি?"

মৎস্যনারী বল্‌লে—"ভীষণ ঝড় উঠ্‌বে—আমার ভয় কর্‌ছে।"

রাজপুত্র আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—"মৎস্যনারীর ভয়—তাও আবার সাগর-বুকের ঝড়ে!"

মৎস্যনারী উত্তর কর্‌লে—"হাঁ৷ রাজকুমার—জানিনে এ কি—কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় কর্‌ছে—আমাকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার ঐ গুহার মধ্যে।" মৎস্য-নারীর কণ্ঠস্বর ত্রাস-আকুল।

রাজপুত্র মৎস্যনারীকে বহন ক'রে আপনার গুহার মধ্যে নিয়ে এল—তা'র পর আপনার তৃণশয্যায় তা'কে শায়িত ক'রে দিয়ে নিজে গুহাদ্বারের কাছে গিয়ে ব'সে পড়্‌ল। দৃষ্টি তা'র দূর দিক্‌চক্রবালের আকাশে যেখানে মেঘেরা রণরঙ্গ মূর্ত্তিতে সাজ্‌ছে। রাজপুত্রের অন্তরে যে ঝড় উঠেছে, বাইরেও যেন তারি আয়োজন হচ্ছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে মসীকৃষ্ণ কালো-কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। সমস্ত প্রকৃতি প্রলয়ের পূর্ব্বের মতো প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লে। তা'র পর হঠাৎ সাগরের কোন্ পার থেকে সোঁ-সোঁ শব্দে বাতাস ছুটল—সিন্ধু-বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য তু'লে—বনানী-অন্তর তোলপাড় ক'রে। মেঘের গর্জ্জনে সিন্ধু-বুকের ক্রুদ্ধ আস্ফালনে বনানীর হাহাশ্বাসে আকাশ-বাতাসে একটা প্রলয়-রোল উঠে গেল। তা'র পর মুষলধারে বৃষ্টি অবিরাম অবিশ্রান্ত। দিক্ মু'ছে গেল—বনানী-রেখা মিশিয়ে গেল। বিশ্ব-প্রকৃতির একটা তাণ্ডব-নৃত্য যেন জলস্থলকে দলিত ক'রে চারিদিকে ছুটেছে।

কড়্—কড়্—কড়্—কড়্—কড়াৎ। কোথায় একটা বাজ পড়্‌ল। একটা ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎ-রেখা অসংখ্য লেলিহান সর্প-জিহ্বা বিস্তার ক'রে আকাশ চি'রে দিলে। ক্ষণকালের জন্যে দিক্-দেশ সব আলোকিত হ'য়ে গেল। তা'র পর গভীরতর অন্ধকার।

"রাজকুমার! রাজকুমার!! রাজকুমার!!!"

মৎস্যনারীর ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠ শু'নে রাজপুত্র তাহার পাশে গিয়ে বস্‌ল। মৎস্যনারী বল্‌লে—"রাজকুমার আমার ভয় কর্‌ছে—ভীষণ ভয়! আজ আর আমার কাছ থেকে দূরে থেকো না।"

ঝলকের পর ঝলক, আবার ঝলক, আবার ঝলক,

বিদ্যুৎস্ফুরণ হচ্ছে। তারি আলোকে রাজপুত্র দেখ্‌লে মৎস্যনারীর আঁখিপাত অশ্রু-রেখায় সিক্ত।

আশ্চর্য্যান্বিত-কণ্ঠে রাজপুত্র ব'লে উঠল—"সাগরিকা, তোমার আঁখিপাতে জল!"

মৎস্যনারী উত্তর করলে—"জানি নে—জানি নে, এ কি—আমার অন্তরে যে একটা কি হচ্ছে—একটা ভয়—একটা পুলক—না এ কি—রাজকুমার! রাজকুমার! আজ আমার মৃত্যু হবে!"

রাজপুত্র বল্‌লে—"মৎস্যনারীর কি মৃত্যু হয়?"

"না—কিন্তু আমার হবে।"

মৎস্যনারী তা'র দুই হাতে রাজপুত্রের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলে। বল্‌লে—"রাজকুমার, যেন তোমার বুকে আমার মৃত্যু হয়।"

ব্যথিত কণ্ঠের আকুল আবেদন রাজপুত্রের অন্তরে একটা নিবিড় বেদনা জাগিয়ে তুল্‌লে। একটা বিরাট্ সান্ত্বনার মতো দু'হাতে মৎস্যনারীর দেহকে আপনার বক্ষে জড়িয়ে নিয়ে রাজপুত্র সেই তৃণশয্যার উপর আপনার দেহ রক্ষা করলে।

বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

ধীরে-ধীরে রাজপুত্রের অন্তরের ঝড় ক'মে আস্‌তে লাগ্‌ল। তা'র পর কখন যে তন্দ্রা এসে তা'র চোখ-দুটিকে অধিকার করলে, তা রাজপুত্র টেরও পেলে না। আলিঙ্গনে বদ্ধ তা'র মৎস্যনারী। তা'র অন্তরে কি চল্‌ছে, কে-জানে!

* * * *

রজনীর শেষদিকে ঝড় থেমে গেল। প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করেছে। ঊষার স্নিগ্ধ আলো গুহায় প্রবেশ ক'রে সব স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। রাজপুত্র চোখ মেল্‌লে। তা'র পর ডাক্‌লে—"সাগরিকা।"

সাগরিকা চোখ মে'লে রাজপুত্রের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। পর মুহূর্ত্তে সাগরিকার দৃষ্টি নত হ'য়ে গেল। আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে তা'র গণ্ড, কপোল, কণ্ঠ, বক্ষ—সমস্ত গোলাপে-গোলাপে গোলাপময় হ'য়ে মোহন রক্তিমায় রঞ্জিত হ'য়ে গেল। রাজপুত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শিরায়-শিরায় শোণিতে-শোণিতে একটা পুলক-স্পন্দন একটা আনন্দ-কম্পনে দুর্নিবারভাবে জাগিয়ে গেল। তা'র পর—তা'র পর রাজপুত্র দেখ্‌লে তা'র বাহুবন্ধনে একটি পরিপূর্ণ মানবী-মূর্ত্তি!

গদগদস্বরে কোমলকণ্ঠে রাজপুত্র ডাক্‌লে—"সাগরিকা।"

সাগরিকা লাজ-লিপ্ত চোখদুটি আবার রাজপুত্রের দিকে তু'লে ধরলে, সরম-মিষ্ট কণ্ঠে বল্‌লে—"কি?"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কে, সাগরিকা?"

সাগরিকা উত্তর দিলে, "রাজকুমার আমি সাগরের মায়া—ধরিত্রীর স্নেহ-স্পর্শে বেঁচে উঠেছি।"

মানুষের আকাঙ্ক্ষায় মৎস্যনারী পরিপূর্ণ নারী হ'য়ে উঠেছে!

বামুন-বাগ্দী

শ্রী অরবিন্দ দত্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এমন এক-একটা সময় আসে, যাহার জন্য কেহ কোনো দিন প্রস্তুত থাকে না। অথচ সুসময় হউক দুঃসময় হউক মানুষকে সে তাহার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে বাধ্য করে। কানাইলালের সম্মুখে এমনই একটা দুঃসময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখেন্দুদের গ্রামে প্যারীমোহন রায় নামক আর-একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। একটি জমির অংশ-বিশেষ লইয়া উভয় পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। কানাইলাল এই বিবাদ মীমাংসার জন্য

অনেক চেষ্টা চরিত্র করিয়াও কোনো পক্ষকে ত্যাগস্বীকারে বাধ্য করিতে পারে নাই। একদিন সুখেন্দুর পক্ষের লোকে ঐ জমিতে খানা কাটিতে উদ্যোগী হইলে জমির সীমানা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। এবং প্যারীমোহনের পক্ষের লোকে বাধা দেয়। মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। সুখেন্দুর হুকুম-মতে লাঠি চালাইতে যাইয়া—প্যারীমোহনের পক্ষের একটি লোক জখম হইয়া পড়িল। কানাইলাল তথায় উপস্থিত ছিল। তাহার উপস্থিত থাকাতেই তাহার ভাগ্যের এক বিষম পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল।

প্যারীমোহন ফৌজদারী আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু করিলেন। এবং তাঁহার পক্ষ হইতে কানাইলালকে সাক্ষ্য মান্য করা হইল। তাঁহারা জানিতেন কানাইলাল ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ। সে কখনও মিথ্যা বলিবে না। বিশেষতঃ সে সুখেন্দুর কর্ম্মচারী ও অনুগত লোক, তাহার দ্বারা আদালতে সত্য কথা প্রকাশ পাইলে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবারই সম্ভাবনা।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে কানাইলালের উপর সমন হইল। তাহা দেখিয়া সুখেন্দু চিন্তিত হইলেন। তিনি কানাইকে চিনিতেন, তাহার স্বভাব জানিতেন। একদিন তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমাকে ত ও-পক্ষ থেকে সাক্ষী মেনেছে—"

কানাই কহিল, "হাঁ, সমন পেয়েছি।'

সুখেন্দু সহজ সুরেই বলিলেন, "তোমাকে সাক্ষী মেনে ভালোই করেছে। ফরেদীপক্ষের সাক্ষী তাঁদের বিপক্ষে কথা বললে আসামী পক্ষেরই সুবিধা হয়।"

কথাটা কানাইলালের পছন্দ হইল না। সে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি বল্‌তে বলেন?"

সুখেন্দু বলিলেন, "সে এখানে তা'র কি বলব? সে-জন্যে ভাবনা কি? উকীল-মোক্তারে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে। নিজেদের বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে ত!"

"কিন্তু আমি যা জানি তা'র উপর উকীল-মোক্তার কি শেখাবে?"

সুখেন্দু হাসিয়া বলিলেন, "পাগল আর কা'কে বলে? নিজের জানাজানি নিয়ে কি মামলা মোকদ্দমা চলে? তা'হলে যে খুন করেছে—সে তা' বেশ জানে—আর। তা ব'লে জেলখানার পথটা সোজা ক'রে নিতে পারে?"

কানাই গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা যা'রা নেয় না—তা'রা আর-একটা জেলখানার পথও সোজা ক'রে রাখে।"

সুখেন্দু কহিলেন, "সংসারী লোকে অতদূর ভাব্‌তে পারে না। ভাব্‌তে গেলে পদে-পদে তাদের পরাজয় ঘটে।"

কানাই মৃদুস্বরে কহিল, "নিজের বিবেকবুদ্ধি বলি দেওয়ার চেয়ে সে জয় কি খুবই বড়?"

সুখেন্দু কিছু রুক্ষস্বরেই কহিলেন, "মা দেখ্‌ছি তোমার মাথাটা একেবারে বিগ্‌ড়ে দিয়েছেন। তুমি আমায় জেল খাটাবে নাকি?"

সে নীরবে মস্তক নত করিয়া রাখিল।

সুখেন্দু কহিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। এ-মোকদ্দমায় হার্‌লে কি আমার সম্মান থাক্‌বে?"

কানাই মৃদুস্বরে বলিল, "মিথ্যে দিয়েই যদি সম্ভ্রম কিন্‌তে হয়, তবে সে-সম্ভ্রম হাতছাড়া করা কি আপনার উচিত হয়েছে?"

সুখেন্দু দেখিলেন, সংসার-বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই অর্ব্বাচীন বালককে বিপক্ষেরা সাক্ষী মান্য করিয়া তাঁহাকে অত্যধিক বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমারই জমি—আমি অন্যায়-কিছু করিনি।"

কানাই কহিল, "তা হ'তে পারে। কিন্তু আপনার দাঙ্গা করা উচিত হয়নি। যদি করেছিলেন—এখন ঢাক্‌তে যাওয়া অন্যায়।"

ইহার পর সুখেন্দু অগত্যা মহেশ্বরীর নিকট আসিয়া কহিলেন, "মা! তোমার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এবার আমায় আর জেলে না পাঠিয়ে ছাড়্‌লে না!"

মহেশ্বরী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুখেন্দু কহিলেন, "প্যারী-খুড়োদের সঙ্গে জমি নিয়ে এক ফৌজদারি বেধে গেছে, শুনেছ বোধ হয়?

আমার লোকজনে খানা কাটছিল, এমন সময় তা'রা এসে বাধা দেয়। শেষে আমার হুকুম-মতে একটা দাঙ্গা বেধে একজন জখম হয়। জমিদারি কর্‌তে গেলে অমন

খুন জখম আখ্ছার হ'য়েই থাকে। কানাইলাল সেখানে উপস্থিত ছিল। প্যারী-খুড়োরা এক ফৌজদারী জুড়ে দিয়ে তা'কে সাক্ষী মান্ত করেছে। তোমার যুধিষ্ঠির আবার সত্য বই মিথ্যা বল্বেন না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "সে ত সত্য বই মিথ্যা কোনোদিন জানে না। তা'র দোষ কি বাবা ?"

"জানে না—তা ত জানি। কিন্তু সংসারটা কি নিছক সত্যের উপর চল্ছে ? তা হ'লে ত লোকে এতদিন দেউলে হ'য়ে যেত। "বিষয়-কার্য্য কাউকে আর কর্তে হ'ত না।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "তা বোধ হয় যেত না। মিথ্যে যখন এসে পড়ে, তখন লোকে আবার মিথ্যে দিয়েই তাকে বাঁচায়। তাই সংসারে এতটা কৃত্রিমতা এসে সত্যকে একপাশে ঠেলে রেখেছে। যে জমিটে নিয়ে বিবাদ, ঐ জমি তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের এ-কথা সত্য। এবং সেই সত্যের আশ্রয় নিলে আর এতটা মিথ্যের মধ্যে এসে পড়্তে হ'ত না।"

"তা'রাই ত মিথ্যে-মিথ্যে জমিটার উপর দাবি কর্ছে। আমি ত সত্যই বল্ছি।"

মহেশ্বরী বলিলেন, "আমি শুধু তোমার কথা ত বলিনি। সংসারটার কথাই বল্ছি। সংসারটা সত্য-পথে চল্লে তা'রাই বা মিথ্যা গ্রহণ কর্বে কেন—তুমিই বা কর্বে কেন ? আমরা আত্মাকে মেরে ফেলে মাথাটা বাঁচিয়ে রাখ্তে চাই।"

সুখেন্দু কহিলেন, "সে-সব ধর্ম্মকথা বিচার কর্লে ত আর এখন চল্বে না। এখন সাম্নে যা এসে পড়েছে সেইটে সাম্লাতে হবে।"

মহেশ্বরী কহিলেন, "দেখ, এই মিথ্যার পথ কত অভিগামী। আমরা নিজে এই জালে জড়িয়ে প'ড়ে শেষে অন্যের নিকট বিচারহীন অনুরাগ পেতে চাই। অবস্থা-বিশেষে তা'রও সত্যটুকু বিক্রয় কর্তে বাধ্য করি।"

"তা হ'লে তোমরা সকলে মি'লেমি'শে আমাকে জেলে পাঠাও—এই ত তোমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি বল্ছে ?"

সুখেন্দু বকিতে-বকিতে চলিয়া গেলেন।

শৈল মাতাপুত্রের কথোপকথন দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। এবং স্বামীর বিপদের কথা শুনিয়া—সে ভয়ে একান্ত অভিভূতা হইয়া পড়িতেছিল। সুখেন্দু চলিয়া গেলে সে মহেশ্বরীকে কহিল :

"মা ! এমন-একটা বিপদ্—কানাইলাল দু'একটা মিথ্যা বল্লে যদি বিপদ্টা কেটে যায়—তবে কি তা'র তা বলা উচিত নয় ?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "উচিত কি না সে যে বল্বে, সেই জানে। সুখেন আমার পেটের ছেলে, সন্তানের বিপদ্ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কোনো মাতা আপনাকে মুক্ত ক'রে নিতে পারেন না। কিন্তু সত্য দিয়ে যে গ'ড়ে উঠেছে—মিথ্যার সামান্য সংস্রবকেও যে প্রাণের বিকৃতি ব'লে জানে, তা'কে মিথ্যে বল্তে বাধ্য করানো যে কতবড় বিপদ্ সে আমি জানি।"

এইসময় কানাইলাল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "মা ! বড়বাবুর বিপদের কথা শুনেছ ?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "শুধু বড়বাবুর কেন—তোমারও বিপদের কথা শুনেছি।"

কানাই জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় ?"

মহেশ্বরী কহিলেন, "জননীরা সকল সময়ই সন্তানকে সদ্‌যুক্তি দিতে পারেন। কিন্তু তাদের বিপদের সময়ে মায়ের বুদ্ধি-সুদ্ধি থাকে না। আমি দেখ্তে পাচ্ছি, সুখেনের যেমন বিপদ্, তোমারও সেইরূপ। মা ইচ্ছা করেন না—একটি ছেলেকে মেরে ফেলে আর একটিকে বাঁচাতে। কিন্তু দু'টি ছেলেই যে কি উপায়ে রক্ষা পেতে পারে, তা ত বাবা আমি ভেবে উঠ্তে পারি-নে !"

মহেশ্বরী ভাবিতে লাগিলেন। কানাইলাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে কহিল, "কিন্তু তুমি ভিন্ন আর কে আমাকে পরামর্শ দেবে ?"

মহেশ্বরী বলিলেন, "সে জানি। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি আমার কিছুই নেই, বাবা। বিশেষ-দু'টি-ছেলের বিপদে কি আমার জ্ঞানবুদ্ধি সুস্থ আছে ? পরস্পর আড়ি না ক'রে এক হ'য়ে দুজনায় যাতে রক্ষা পাও এমন কোনো সুপথ বের করার চেষ্টা দেখ। আমি আর কি বল্ব ?"

কানাইলাল আর-কিছু বলিল না।

মু।ওকের সময় সে তাঁহার সহযোগী হইয়া তাহার চরিত্রের বিশিষ্টতা প্রতিপন্ন করিতে সবিশেষ সুযোগ পাইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত-ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। যখন সে উপস্থিত হইল না তখন তিনি বলিলেন, "দেখ—দেখ—খোঁজ করো, আমি আরও আধঘণ্টা সময় অপেক্ষা কর্‌ছি।" কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেও সে হাজির হইল না তখন বিপক্ষেরা তাহার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট্ বাহির করিবার জন্ম প্রার্থনা করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট্-সাহেব দেখিলেন দুই পক্ষেরই যথেষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল কানাইলালের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই মোকদ্দমাটি তখনও পর্য্যন্ত হাতে রাখিয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি ফরিয়াদী পক্ষের আবেদন মঞ্জুর না করিয়া সুখেন্দুর সপক্ষে রায় দিলেন।

কানাইলাল অনুপস্থিত থাকার দরুন্ যখন সুখেন্দুর গলার খাঁড়াটা নামিয়া দাঁড়াইল, তখন হইতে তাহার প্রতি তাঁহার বিদ্রোহী চিত্তটা আবার পরিবর্ত্তনের দিকে চলিতেছিল। এবং এই সাধু যুবকের প্রতি যে-সব হীন-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জা ও বেদনায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। বাড়ী আসিয়া তিনি মহেশ্বরীকে কহিলেন, "মা! কানাই উপস্থিত হয়নি। মোকদ্দমায় আমাদের জয়লাভ হয়েছে, কিন্তু আমার জিহ্বাটা কলঙ্কিত ক'রে না দিয়ে আগে বল্‌লেই পারত। এখন দেখ্‌ছি তা'র কাছে মুখ দেখানো ভার হবে।"

এমন সময় একটি যুবক আসিয়া সংবাদ দিল যে, কানাইবাবু সাহেবখালির বিলের ধারে এক গাছতলায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। সুখেন্দু তখনও বস্ত্রাদি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি সেই অবস্থায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ দুঃসংবাদে মহেশ্বরীর জীবনশক্তি যেন অতি দ্রুত কমিয়া আসিতেছিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "বাবা! আর দেরি করিস্ নে, বেহারাদের ডাকো—আমিও যাবো"

সুখেন্দু কোনো আপত্তি করিলেন না। তৎক্ষণাৎ বাহকেরা পাল্‌কী লইয়া উপস্থিত হইল। একজন ডাক্তারও তাঁহারা সঙ্গে লইলেন।

তাঁহাদের গৃহ হইতে সাহেবখালির বিল একমাইল দূর। তাঁহারা তাড়াতাড়ি করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহেশ্বরী দেখিলেন, তাঁহার অঞ্চলের নিধি—নিষ্ঠুর সংসারে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সহচর—অনাথ বালক—নির্ব্বা-ন্ধব স্থানে ধূলার উপর গড়াগড়ি যাইতেছে!!

মহেশ্বরী পাল্‌কী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয় বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে, তাহার কোমল হৃদয় নিষ্ঠুর দেশের নিষ্ঠুর আঘাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্ম কোন্ সুদূর দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে!! তিনি ভাবিলেন ঘাটালে ক্ষুধার তাড়নায় সে যেমন অচেতন হইয়া পড়িয়া-ছিল—আজ দুইদিন বাড়ী যায় নাই খায় নাই—আজও বুঝি ক্ষুধার জ্বালায় সেইরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছে! তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহার মৃত্যুমলিন দেহখানি ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইলেন। ডাকিলেন "কানাই,—এমন হলি কেন, বাবা!"

কানাইলালের দেহ তখন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। সে চক্ষু অল্প মেলিয়া আবার মুদ্রিত করিল। মহেশ্বরী ডাকিলেন, "বাবা! কথা ক—এই যে আমি—চেয়ে দেখ্—তোর মহেশ্বরী মা!"

কানাই চক্ষু মেলিল। মহেশ্বরী কহিলেন, "বাবা! কথা বল্, একবার মা ব'লে ডাক্, আজ দু' দু'দিন দেখিনি যে—দু'দিন কিছু খাস্‌নি! ছিঃ! অভিমান কর্‌তে নেই। সেই একদিন অভিমান ক'রে কি কষ্টটাই পেয়েছিলি তা ত এখনও ভুল্‌তে পারিস্‌নি? কথা ক্। সবাই ভুল্‌তে পারে—আমি ত কোনো দিন ভুলিনি।"

কানাইলাল ইঙ্গিত করিয়া মহেশ্বরীর পদধূলি চাহিয়া লইল ও জল চাহিল।

মহেশ্বরী তাহার মস্তকে পদধূলি দিলেন। মুখে অল্প-অল্প জল দিলে সে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া সুখেন্দুকে কহিলেন "আফিম খেয়েছেন। এখন চরমাবস্থা, তদ্বিরের আর সময় নেই, এখনই সব শেষ হবে।"

তাহার গাত্র পরীক্ষা করিয়া আমার পকেট হইতে একখানি পত্র পাওয়া গেল। মহেশ্বরী ব্যস্তভাবে সেখানি নিজের হাতে লইলেন এবং পড়িয়া দেখিলেন। পত্রখানিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

"মা। আমার জীবনের বিনিময়ে বড়বাবুর সম্মান এবং আমার সত্য রক্ষা করলাম। তুমি দুঃখিত হোয়ো না—তোমার শিক্ষাই এইরূপ। কিন্তু যে কদর্য্য উপায়ে বিনিময় করতে হ'ল, তা তুমি সমর্থন করবে না; উপায় ছিল না—ক্ষমা করবে। শাস্তি আর নলিনীকে অনেক দিন দেখিনি। বলার প্রাণে বড় বাজবে, তা'কে নিরস্ত করবে। বড়বাবু যেন সাধের মাতৃ-নিবাস থেকে আমাকে বঞ্চিত না করেন। তাঁর মনের গ্লানি গেলে আর তোমার আশীর্ব্বাদ পেলে আমার পাপ-ক্ষয় হবে। তাঁকে এবং ছোটো-মাকে আমার কলঙ্কিত আত্মার কল্যাণকামনায় প্রার্থনা করতে বলবে। জন্মে-জন্মে যেন তোমাকেই মা পাই। মা! মহেশ্বরী-মা! আসি তবে।

সংসারত্যক্ত

তোমারই কানাইলাল।

মহেশ্বরীর হস্ত হইতে পত্রখানি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তিনি কানাইলালের দেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ডাক্তার যাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে-দেখিতে উভয়ের দেহের স্পন্দন ফুরাইয়া গেল! যে-বক্ষে ইতর-বিশেষ নাই—সেই উদার বক্ষে বাগ্দীর ছেলেকে লইয়া মহাপ্রাণা ব্রাহ্মণ-জননী মহানিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। আর সুখেন্দু?—জড়ের মতন - পাথরের মতন বসিয়া-বসিয়া মাতা ও পুত্রের সেই মহামুক্তি দর্শন করিতে লাগিলেন।

সমাপ্ত

ছুরী ও বাঁকশিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

যুযুৎসু

অষ্টম পাঠ

"শঙ্খদক্ষিণে" আক্রান্ত হইলে, কিম্বা "বাহেরা", "ত্রিহর" প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হইলে যুযুৎসুপ্রয়োগ-কারী তুরন্তে সমগ্র শরীর অগ্রসর করাইয়া সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণ মণিবন্ধের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকের পার্শ্ব দ্বারা আক্রমণকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধের ঐ পার্শ্বেই আঘাত করিবে; তদবস্থায় যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর ছুরী আক্রমণ-কারীর করপৃষ্ঠের দিকে থাকিবে; যথা, অষ্টষষ্ঠিতম চিত্রে:—



৬৮তম চিত্র

ক্রমে যুযুৎসু প্রয়োগকারী ক্ষিপ্রতাসহ সবেগে আক্রমণকারীর হস্ত তাহার (আক্রমণকারীর) পশ্চাদ্দিকে অপসারিত করিতে-করিতে নিজ বাম হস্ত আক্রমণকারীর দক্ষিণ কফোণির (কনুইর) দক্ষিণ পার্শ্বের দিক্ দিয়া লইয়া অভ্যন্তরের দিকে প্রবেশ করাইবার উপক্রম করিবে; যথা, উনসপ্ততিতম চিত্রে:—



৬৯তম চিত্র

ক্রমে যুযুৎসু-প্রয়োগকারী নিজ বাম বাহু দ্বারা আক্রমণকারীর দক্ষিণ কফোণি (কনুই) বেষ্টন করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সবেগে ও সবলে আক্রমণকারীর দক্ষিণ কফোণি ভঙ্গ করিয়া নিজ বাম হস্ত দ্বারা নিজ দক্ষিণ কফোণি (কনুই) দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে ; তদবস্থায়



৭০তম চিত্র

যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ প্রগণ্ড { স্কন্ধদেশ হইতে কফোণি (কনুই) পর্য্যন্ত বাহুভাগ } আক্রমণকারীর বাম গলপার্শ্বে এবং তাহার প্রকোষ্ঠ (পুরোবাহু) আক্রমণকারীর গলদেশের পশ্চাতে থাকিবে ; যথা, সপ্ততিতম ও একসপ্ততিতম চিত্রে :—



৭১ তম চিত্র

তদবস্থায় যুযুৎসু-প্রয়োগকারী নিষ্কৃতির চেষ্টা অবলম্বনহেতু "ব্যাঘ্র থাবা" প্রয়োগের উপক্রম করিবে ; কিন্তু যুযুৎসু-প্রয়োগকারী নিষ্ঠাসহ তাহার কৌশল-প্রয়োগে সমর্থ হইলে আক্রমণকারীর পক্ষে উপযুক্তরূপে "ব্যাঘ্রথাবার" প্রয়োগ সাধারণতঃ সম্ভবপর হইবে না ; বরং আক্রমণকারী যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর সম-বলশালী কিম্বা তদপেক্ষা অল্লাধিক বলশালী হইলেও যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকে অপারগ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু, এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, যুযুৎসু-প্রয়োগকারী ক্ষিপ্রকারিতাসহ অষ্টষষ্ঠিতম হইতে একসপ্ততিতম চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলি একযোগে তীব্রবেগে সম্পন্ন করিতে পারিলেই অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেও তাহার উৎকর্ষের আধিক্য পরিলক্ষিত হইবে।

তৎপর যুযুৎসু-প্রয়োগকারী তুরন্তে নিজ দক্ষিণ পার্শ্ব নিম্নাভিমুখে সবেগে ও সবলে চালনা করিয়া আক্রমণকারীকে তাহার (আক্রমণকারীর) নিজ দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে ভূপাতিত করিবার উপক্রম করিবে ; সুযোগ

পাইলে আক্রমণকারীও এই অবসরে "ব্যাঘ্রথাবার" প্রয়োগে নিজকে মুক্ত করিয়া লওয়ার চেষ্টা দেখিবে ; যথা, দ্বিসপ্ততিতম ও ত্রিসপ্ততিতম চিত্রে :—



৭২তম চিত্র



৭৩তম চিত্র

তদবস্থায় যুযুৎসু-প্রয়োগকারী ত্বরন্তে নিজ দক্ষিণ মণিবন্ধ চালনা করিয়া আক্রমণকারীর বক্ষোপরি নিজ ছুরীর অগ্রভাগ প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিবে; এবং আক্রমণকারীও প্রতিকারহেতু ত্বরন্তে নিজ বাম বাহু যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া আনয়ন



৭৪তম চিত্র



৭৫তম চিত্র

করিয়া ক্ষিপ্রকারিতাসহ আক্রমণকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধ কিম্বা দক্ষিণ মুষ্টি দৃঢ়রূপে ধরিয়াই যুযুৎসু-প্রয়োগকারীরই

ছুরী যুযুৎসু-প্রয়োগকারীরই বামস্কন্ধ-মোড়ে কিম্বা তৎ-সন্নিকটস্থ বক্ষ-পার্শ্বে বিদ্ধ করাইবার চেষ্টা দেখিবে—অথবা, যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ মুষ্টি যুযুৎসু-প্রয়োগ-কারীরই দক্ষিণ কর্ণপার্শ্ব ঘেঁষিয়া ঊর্দ্ধদিকাভিমুখে আকর্ষণ করিবে ; যথা, চতুর্সপ্ততিতম ও পঞ্চসপ্ততিতম চিত্রে :—

এই প্রক্রিয়ার ফলে যুযুৎসু-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ বাহু সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হওয়ার উপক্রম হইবে ; এবং, তদবস্থায় যুযুৎসু-প্রয়োগকারী বলপ্রয়োগের উপক্রম করিলে, ও আক্রমণকারী প্রযুক্ত-প্রক্রিয়ায় সুদৃঢ় থাকিলে, যুযুৎসু-প্রয়োগকারী নিজেই উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) ভূপতিত হইবে,—কিম্বা, তাহার দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধি গুরুতর বেদনা-পূর্ণ ও বিকল হইয়া যাইবে ; সুতরাং, নিষ্কৃতিহেতু যুযুৎসু-প্রয়োগকারীকেও তদবস্থায় বামপদ ও সমগ্র শরীর পশ্চাদ্দিকে অপসারিত করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।



৭৬তম চিত্র

তৎপর, উভয়েই নিষ্কৃতিহেতু নিজ নিজ সতর্কতাসহ ঈষৎ শিথিল করিয়াই অবিলম্বে পুনরায় উপযুক্ত ও পরিবর্ত্তিত মুষ্টিতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তমুষ্টি ধরিয়া, হস্তদ্বয় প্রথমতঃ ঊর্দ্ধে তুলিয়াই হঠাৎ সবেগে নিম্নাভিমুখে চালনা করিয়া (ঝাঁকি দিয়া) পরস্পর নিজ নিজ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে ; যথা, ষষ্ঠ-সপ্ততিতম, সপ্ত-সপ্ততিতম ও অষ্ট-সপ্ততিতম চিত্রে :—



৭৭তম চিত্র



৭৮তম চিত্র

অথবা, সপ্ত-সপ্ততিতম চিত্র-সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার পরেই একে অপরের মণিবন্ধ দক্ষিণাবর্ত্তে মুচ্‌ড়াইয়া পরস্পর একে

অন্যের ছুরী হস্ত বিচ্যুত করিয়া লইবে ; যথা, উনাশীতিতম চিত্রে :—



৭৯তম চিত্র

এইভাবে ছুরী হস্ত-বিচ্যুত করিতে হইলে প্রতিপক্ষের হস্তমুষ্টি, দক্ষিণাবর্ত্তে মুচ্‌ড়াইবার পূর্ব্বে, এরূপভাবে ধরিতে হইবে যেন নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রতিপক্ষের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর পার্শ্বে ও তাহার করপৃষ্ঠের দিকে, এবং তাহার (প্রতিপক্ষের) ছুরী-সংলগ্ন থাকে,—এবং নিজ অপর চারিটি অঙ্গুলী যেন প্রতিপক্ষের মুষ্টি র অন্তর্গত অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগের উপরে পাতিত থাকে।

ছুরী প্রতিপক্ষের হস্ত-বিচ্যুত করিতে হইলে কখন-কখন প্রতিপক্ষের হস্ত দক্ষিণাবর্ত্তে মুচ্‌ড়াইবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজকেও সম্পূর্ণ বামাবর্ত্তে ঘুরাইয়া দিতে হয় ; যথা, অশীতিতম চিত্রে :—



৮০তম চিত্র

[এ স্থলে আক্রমণকারী ও যুযুৎসু-প্রয়োগকারী, উভয়কেই সমবলশালী, সম-কৌশলী ও সম-ক্ষিপ্রকারী কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে ; তাই, দেখানো হইয়াছে যে, উভয়েই উভয়ের ছুরী হস্ত-বিচ্যুত করিয়া লইল ; কিন্তু, প্রকৃত ঘটনাকালে যাহার সমবেত উৎকর্ষের আধিক্য থাকিবে, কেবলমাত্র সেই তাহার প্রতিপক্ষের ছুরী হস্তবিচ্যুত করিয়া লইতে সমর্থ হইবে।]

(ক্রমশঃ)

আমার নিজের মতে মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি ইলেক চিহ্ন দিয়ে নির্দ্দেশ করার চেয়ে অনেক জায়গায় সোজাসুজি ো-কার লেখাই সুবিধা অর্থাৎ [ক'র্‌তুম, ক'র্‌ছি, ক'র্‌বো, ক'রো] না লিখে [কোর্‌তুম, কোর্‌ছি, কোর্‌বো, কোরো] লেখাই ভালো। তাতে বারবার ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার কর্‌বার অসুবিধা এড়ানো যায়। তা ছাড়া ইলেক-চিহ্নটিকে শুধু অ-ধ্বনি নির্দ্দেশ কর্‌বার জন্ত রাখা যায়। একই ইলেক চিহ্নটিকে দুরকম ধ্বনি (কোনো জায়গায় অ-ধ্বনি, আর কোনো জায়গায় ও-ধ্বনি) দেখাবার জন্ত দু'কাজে ব্যবহার ক'র্‌তে হয় না।

ো-কার দিয়ে লেখার বিরুদ্ধে কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে একটা বড়ো আপত্তি আছে :—তাতে ধাতুর মূলরূপ ব'দ্‌লিয়ে যাবে। তবে এই রকম একটা রফা হয়তো করা যেতে পারে। অসমাপিকা ক্রিয়ায় [ক'রে, ব'লে, ধ'রে ব'সে ইত্যাদি] সর্ব্বত্র ইলেক ব্যবহার হবে ; [বলেছিলাম, (বলেছিলুম, বলেছিলেন), বলেছি, বলেছো, বলি, বলো প্রভৃতি শব্দে] যেখানে মধ্যস্থিত অ-এর পর হসন্ত অক্ষর নেই সেখানে ইলেক বা ো-কার কিছুই ব্যবহার কর্‌বার দরকার নেই, উচ্চারণের একটা সাধারণ নিয়ম মনে রাখ্‌লেই চ'ল্‌বে। শুধু [বলো] আর [বোলো] মধ্যে পার্থক্য করবার জন্ত [বোলো] লেখা দরকার। হসন্ত অক্ষরের আগে সর্ব্বত্র মধ্যস্থিত অ-কারের অ-ধ্বনি ো-কার দিয়ে লেখাই সহজ। যেমন :—[বোল্‌তাম, (বোল্‌তুম, বোল্‌তেম), বোল্‌তো বোল্‌লাম, (বোল্‌লেম, বোল্‌তুম), বোল্‌লো, বোল্‌ছো, বোল্‌বো]। যা হোক ভাষাতত্ত্ববিদের খাতিরে আপাতত সর্ব্বত্র ইলেক ব্যবহার ক'র্‌তে বাধ্য হ'লুম।

বাঙ্‌লা এ্যা-কার

বাঙ্‌লা এ্যা-কারের জন্ত একটা আলাদা অক্ষর নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে। একটি নতুন অক্ষর ছাড়া, 'দ্যাখো' (দেখহ) আর 'দেখো' (দেখিও), ফ্যালো (ফেলহ) আর 'ফেলো' (ফেলিও) প্রভৃতির পার্থক্য নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এর একটি সহজ সঙ্কেত ব'লে দিয়েছেন।

(চ) ্যা-কারকে মধ্য ে-কার দিয়ে দেখানো হবে।

যেমন :—[দেখো (দ্যাখো—দেখহ) মেলো (ম্যালো = মেলহ), ফেলো (ফ্যালো = ফেলহ) ইত্যাদি]

আদ্য এ্যা-ধ্বনির জন্তও একটা অক্ষর দরকার। এ অক্ষরটিকে সামান্ত একটু ব'দ্‌লিয়ে নিয়ে নতুন একটা অক্ষর তৈরী ক'রে নিলে সুবিধা হয়। সামান্ত পরিবর্ত্তন চোখে লাগ্‌বে না কিন্তু [একক ও একা (এ্যাকা), এম্‌নি ও এমন (এ্যামন) প্রভৃতি শব্দের] উচ্চারণের পার্থক্য দেখানো সম্ভবপর হবে।

উপরের মূল সূত্রগুলি অবলম্বন ক'রে বাঙ্‌লা বানানের একটি খস্‌ড়া নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হ'লো।

নিয়মাবলী

(১) সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বানান প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার নিয়ম-অনুসারে লেখা হবে।

ব্যতিক্রম :—

(১,১), সাধু ও চ'লৃতি দুই ভাষাতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙ্‌লা বিভক্তিযুক্ত হ'লেও ী-কারই বজায় থাকবে। ইন্-অন্ত শব্দে সমস্ত পদে বিকল্পে ই-বানান চ'লৃতে পারে, কিন্তু আমরা বাঙলায় ী-কারান্ত প্রথমার রূপকেই বাঙ্‌লার শব্দরূপ ব'লে ধ'রে নেবো। যেমন [ধনীকে, যাত্রীদল, সঙ্গীহীন ইত্যাদি]

(১,২) সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই ী-কারান্ত শব্দে সম্বোধনে ী-কার বজায় থাক্‌বে। যেমন :—[দেবী, জননী, রূপসী, সুন্দরী, উর্ব্বশী ইত্যাদি]

(১,৩) যেখানে অন্ত্য : (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় না সেখানে : (বিসর্গ) না লেখাই ভালো যেমন :—[জ্ঞানত, বিশেষত, আপাতত, সাধারণত ইত্যাদি (৭)] অবশ্য যেখানে : (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় সেখানে : (বিসর্গ) লিখ্‌তে হবে। যেমন [মাতঃ, পিতঃ, নমোনমঃ ইত্যাদি]

(২) হসন্ত-চিহ্নের ব্যবহার

শেষে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙ্‌লা ভাষার সাধারণ নিয়ম ব'লে শেষে হসন্ত-চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই।

যেমন : [সকল, বালক, নিশ্চিত, ব'ল্‌লেন ইত্যাদি]

(২,১) সাধু ও চল্‌তি দুই ভাষাতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্ত সময়ে সময়ে শেষে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন ["এ জিনিসটার চল্ হ'য়ে গেছে"; "যদিও ব্রাহ্মণবংশজাত তবু জাত্ মানি না" ; "রোজ রোজ যোগান্ যোগানো চলে না, এই সব বাক্যে চল্, যোগান্ প্রভৃতি শব্দ] সাধারণত হসন্ত দিয়ে লেখাই ভালো।

(২,২) চ'ল্‌তি ভাষায় তুচ্ছ অনুজ্ঞায় (বিকল্পে) শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন [ডাক্, কর্, বল্, হোক্, বলিস্, করিস্ ; ইত্যাদি] কিন্তু হসন্ত চিহ্ন না দেওয়াই ভালো।

(২,৩) সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্তান্ত তিন অক্ষরের শব্দে উপান্ত অক্ষরে উচ্চারণ-অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার ; যেমন [মেঘ্‌লা, বাদ্‌লা, পশ্‌লা, এম্‌নি, জান্‌লা ইত্যাদি]

কবিতায় ছন্দ-অনুসারে অনেক সময়ে উপান্ত অক্ষরের অ অথবা হসন্ত দুরকম উচ্চারণই হয় ; তাই কবিতায় অনেক জায়গায় উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার। যেমন :-[বর্‌ষা (বরিষা, সংস্কৃত বর্ষা নয়) আর বর্ষা, ভাবনা আর ভাব্‌না, ভরসা আর ভর্‌সা] এইসব শব্দে উচ্চারণ পার্থক্য দেখানোর জন্ত হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত।

(২,৪) চ'ল্‌তি ভাষায় তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদে উপান্ত অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণই সাধারণ নিয়ম। এসব শব্দে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার না ক'র্‌লেও চলে। যেমন : [ক'রতে, ব'লতে, চ'লতে, ধ'রতে, প'রতে চিনতে]। আবার হসন্ত ব্যবহার করাও চলে ; যেমন : [ক'র্‌তে, ব'ল্‌তে, চ'ল্‌তে, ধ'র্‌তে, প'র্‌তে, চিন্‌তে ইত্যাদি]। কোনোটাতেই অসুবিধা হয় না ; উচ্চারণের দিক্ থেকে হসন্ত ব্যবহার করাই বোধ হয় ভালো।

শব্দের মধ্যস্থিত স্বর-ধ্বনির লোপের ফলে যেখানে উচ্চারণে সংযুক্ত বর্ণ এসে গিয়েছে সেখানে মূল-রূপের অনুযায়ী ব্যঞ্জন-বর্ণগুলিকে পৃথক্ রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমরা [কর্ত্তে, কর্ল্লে, পার্ব্ব, কর্ব্ব প্রভৃতি] বানান ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে ধাতুর নিজরূপ অনাবশ্যক বিকৃত হ'য়ে যাবে—অথচ বিশেষ কিছু সুবিধাও হবে না।

---

(৭) [আপাতত, বিশেষত, প্রভৃতি] শব্দে : (বিসর্গ) লোপ করায় কিছু অসুবিধা আছে ; [আপাতৎ, বিশেষৎ] পড়্‌বার সম্ভাবনা থেকে যায়। চ'লৃতি ভাষায় ইলেক দিয়ে [আপাতত', বিশেষত',] কিংবা পুরোপুরি ো-কার নিয়ে [আপাততো, বিশেষতো] লেখা যেতে পারে ; কিন্তু বোধ হয় চোখে লাগ্‌বে।

(২,৫) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই বিদেশী শব্দে উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন :-[মশ্‌গুল, বুল্‌বুল শেক্‌স্‌পিয়র ইত্যাদি]।

(২,৬) চ'ল্‌তি ভাষায় চার অক্ষরের ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত দেওয়া যেতে পারে, না দিলেও চলে, কোনো অসুবিধা হয় না। সুনীতি বাবু দেখিয়েছেন যে, বাঙলা উচ্চারণের কাঠামো দ্বৈ-মাত্রিক। দুই দুই অক্ষরে শব্দকে ভাগ ক'রে নিয়ে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ হয়। তবে [দেখ্‌বার (ভ্যাখ্‌বার), কর্‌বার, বল্‌বার প্রভৃতি শব্দে] হসন্ত ব্যবহার করা ভালো কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার।

(৩) ইলেক-চিহ্ন (,) ব্যবহার

(৩,১) কবিতায় সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই ি-কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেক-চিহ্ন দিতে হবে। যেমন :-[করি', ভরি', ধরি', চমকি', উচ্ছ্বসি' ইত্যাদি]।

(৩,২) মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি দেখাবার জন্য ইলেক চিহ্ন ব্যবহার হবে ; এসম্বন্ধে আগে আলোচনা করেছি। (৬) সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৩,২-১) চল্‌তি ভাষার ক্রিয়ায় লুপ্ত ইকারের প্রভাবে অ-কার থেকে জাত ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে দেখাতে হবে। ও-ধ্বনি যে-ব্যঞ্জন বর্ণকে আশ্রয় করে, ইলেক-চিহ্ন তা'র পাশে ব'স্‌বে। যেমন :— [ক'রে, ব'লে, ক'র্‌বো, ব'ল্‌বো, ক'র্‌তে, প'র্‌তে, ম'র্‌ত, ক'র্‌ছো ইত্যাদি]।

(৩,২-২) কিন্তু যেখানে ও-উচ্চারণ হয় না, সেখানে ইলেক ব্যবহার হবে না। যেমন :—[কর্‌বার, ধর্‌বার, বল্‌বার ইত্যাদি]

(৩,২-৩) সাধু ভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষায় দুয়েতেই বর্তমান অনুজ্ঞায় ইলেক ব্যবহার হ'তে পারে। যেমন :—[ডাক' (ডাকহ), দেখ' (দেখহ) কর' (করহ), বল' (বলহ) ইত্যাদি] কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষায় ো-কার ব্যবহার করাই সহজ।—যেমন : [ডাকো, দেখো, করো, বলো ইত্যাদি]। সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষায় দ্বিত্ব শব্দে বিকল্পে, যেমন :— [কাঁদ'-কাঁদ', পড়'-পড়', নিব'-নিব'] কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষায় ো-কার লেখাই ভালো ; যেমন :—[কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো ইত্যাদি]।

(৩,২-৪) চ'ল্‌তি ভাষায় [আছ', দিল,' দিত,' ছিল,'] এই কয়টি শব্দে ইলেক চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবত চোখে লাগ্‌বে।

(৩,৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য লুপ্ত অক্ষরের পরিবর্তে আবশ্যক-মতো ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন :—[ক'বে (কহিবে) ও কবে (কোনো দিন), র'বে (রহিবে) ও রবে (শব্দে), তা'র (তাহার) ও তার (তন্ত্রী) ; তা'রা (তাহারা) ও তারা (নক্ষত্র), বা'র (বাহির) ও বার (দিন) ইত্যাদি] কিন্তু তাতে ইলেকের ও-ধ্বনি জ্ঞাপক ব্যবহারের সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'টবে।

(৩,৪) অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : [ভর'সা ও ভর্‌সা, এম'নি ও এম্‌নি ইত্যাদি] কিন্তু তাতে (৩,২)-এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘটে। একই ইলেক-চিহ্ন ও ধ্বনি আর অ-ধ্বনি দুয়ের জন্য ব্যবহার ক'র্‌তে হয়। আমাদের মতে ইলেক-চিহ্নকে শুধু অ-ধ্বনি দেখাবার জন্য নির্দিষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয়। মধ্য ও-ধ্বনি সর্বত্রই ো-কার দিয়ে লিখ্‌লে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

(৪) অ-কার ব্যবহার

(৪,১) তৎসম শব্দে :-[স্নেহ, গত, নত, মৃগ, পালিত, বিহিত ইত্যাদি]

(৪,২) অন্ত্য সংযুক্ত বর্ণে ; তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে সর্বত্রই। [সূর্য, মন্দ, কর্দ্দ, কর্জ ইত্যাদি]

(৪,৩) সাধুভাষার ক্রিয়া-পদে। [রহিয়াছ, করিয়াছ, বলিব, করিব ইত্যাদি]

(৪,৪) [যেন, কেন, যত, তত, এত, কত] এই কয়টি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দে। উচ্চারণ-অনুসারে [যেনো, কেনো, যতো, ততো, এতো, কতো] লেখা উচিত ; কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কারে সইবে কি না সন্দেহ। তবে ো-কার চালিয়ে দিতে পার্‌লেই ভালো হয়।

(৪,৫) অন্ত্য : (বিসর্গ) যেখানে লোপ হ'য়েছে সেখানে আপাতত শুধু অকার দিয়েই চালাতে হবে। যেমন :-[আপাতত, বিশেষত, সাধারণত ইত্যাদি] তাতে কিছু অসুবিধা আছে ; [৫] মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(৪,৬) অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে (৩,২) এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'টবে। (৩,৪) দ্রষ্টব্য।

(৫) অ-এর ও-ধ্বনি

(৫,১) মধ্যস্থিত অ-এর ও-ধ্বনি ইলেক দিয়ে দেখানো হবে। কিন্তু (৩,২) ও (৩.৪) দ্রষ্টব্য।

(৫,২) সাধু ও চল্‌তি ভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দে যেখানে অন্ত্য অ-এর ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে ো-কার দেওয়া হবে। [ভালো, কালো, মতো, ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো, আরো, বারো, তেরো, চোদ্দো (কিন্তু চৌদ্দ) পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পুরানো ইত্যাদি]

ব্যতিক্রম : [—যেন, কেন, যত, তত, কত, এত]। এই সব শব্দে ো-কার চলে কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে। (৪,৪) দ্রষ্টব্য।

(৫,৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষায় 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ো-কার দেওয়া হবে। [করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি]।

(৫,৪) সাধু ভাষায় বিকল্পে ও চ'ল্‌তি ভাষায় সাধারণত দ্বিত্ব শব্দে ো-কার ব্যবহার হ'তে পারে। [কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো] [৩-২৩] দ্রষ্টব্য।

(৫,৫) চ'ল্‌তি ভাষার ক্রিয়ার শেষে সাধারণত ো-কার ব্যবহার হবে। [ডাকো (ডাকিও), থেকো (থাকিও) ; এলো, ব'ল্‌লো, ক'র্‌লো ; ব'য়েছো, ব'লেছো ইত্যাদি]। (৩,২৩) দ্রষ্টব্য।

(৬) ই—ঈ-কার ব্যবহার

(৬,১) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙলা বিভক্তিযুক্ত হ'লেও ঈ-কার লেখা হবে। [গুণীকে, ধনীকে, মন্ত্রীরা, রোগীদের ইত্যাদি]। (১,১) দ্রষ্টব্য।

(৬,২) সাধুভাষা ও চল্‌তি ভাষা দুয়েতেই প্রশ্নসূচক অব্যয় কি [হ্রস্ব] ই-কার দিয়ে লেখা হবে। নির্দেশক সর্বনাম "কী" [দীর্ঘ] ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন [তুমি কি খাবে ? [অব্যয়], তুমি কী খাবে ? [সর্বনাম] তুমি কী কী খাবে [সর্বনাম]]। (৮)

(৭) উ-কার ব্যবহার

তদ্ভব শব্দে সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই [অ] উ-কার লেখাই ভালো ; ঊ কার যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার হবে। [বউ, লাউ, মউ ইত্যাদি] কিন্তু সমস্ত শব্দে বিকল্পে ো কার লেখা যেতে পারে। [বৌঠাকুরাণী, চৌধুরী, মৌমাছি চৌধুরী ইত্যাদি]

(৮) পুরানো বাঙলা পুঁথিতে "কী" বানান অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

(৮) ে-কার ও ৈ-কার ব্যবহার

(৮,১] চ'ল্‌তি ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়ায় অতীতে বিকল্পে ে-কার লেখা হবে। যেমন [কাঁদ্‌লে, কর্‌লে, বল্‌লে ইত্যাদি]

অকর্ম্মক ক্রিয়ায় ে-কার চলে না ; সর্ব্বত্র ো-কার কিংবা ইলেক ব্যবহার কর্‌তে হবে। যেমন [কাঁদ্‌লো, হ'লো, গেলো ইত্যাদি]

(৮-২) চ'ল্‌তি ভাষায় অতীত ক্রিয়ায় বিকল্পে। যেমন [ক'র্‌তেম, কর্‌লেম, বল্‌তেম, বল্‌লেম ইত্যাদি]।

(৮-৩) সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই এ্যা উচ্চারণে সর্ব্বত্র ে-কার ব্যবহার হবে। যেমন : [যেমন,' দেখা, খেলা, বেলা, ফেলা মেলা, বেন, কেন ইত্যাদি]।

(৯) ও-কার ব্যবহার

ও-ধ্বনি যতদূর সম্ভব ে া-কার দিয়ে লেখাই সহজ। কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের খাতিরে মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে নির্দ্দেশ ক'র্‌তে হ'চ্চে। (৩) দ্রষ্টব্য।

(৯,১) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা এই দুয়েতেই [মোতি, গোরু, কোলু এবং বিকল্পে নোতুন] এই কয়টি তদ্ভব শব্দে ও কার লেখা হবে।

(৯,২) [কোনো] আর [কোনও] এই দুয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। আবশ্যক-মতো [কোনও, কখনও, আজও, তখনও ইত্যাদি] লেখা হবে।

(৯,৩) [করিয়ো, দিয়ো প্রভৃতি] শব্দে "য়ো" লেখাই আপাতত চ'ল্‌বে।

(১০) ব্যঞ্জনবর্ণ

(১০.১) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি [illegible] দুয়েতেই [কান, বানান, পান, সোনা] এই শব্দগুলি দন্ত্য-[illegible] লেখা হবে। দন্ত্য-ন বাঙ্‌লা উচ্চারণ আর বাঙলা বানান [illegible] অনুমোদিত। (১)

(১০,২) সাধুভাষা ও [illegible]তেই "আছ" ধাতুর বিকৃতরূপে। সর্ব্বত্র "ছ" ব্যবহার কর[illegible] লেখা হবে না। [ক'রেছো, লিখেছো, ব'লেছো ইত্যাদি]

(১০,৩) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই বিদেশী শব্দে মূলরূপ অনুসারে তালব্য-শ ব্যবহার করা হবে। [শহর, শেক্‌স্‌পিয়র, শেলি, শাজাহান, হামেশা, মশ্‌লা ইত্যাদি] কিন্তু [সরম] শব্দটিতে প্রচলিত বানান অনুযায়ী দন্ত্য 'স' লেখাই চ'ল্‌বে।

(১১) স্বরানুক্রম

চ'ল্‌তি ভাষায় উচ্চারণ-অনুসারে স্বরানুক্রম (vocalic harmony) চ'ল্‌বে। যেমন :—[একটা, দুটো, তিনটে, বিলিতী, দিশী, পুজো, জুয়ো, ধুনুরী, খুড়ো, বুড়ো, শুখো, ফিতে, হিসেব ইত্যাদি।

(১) রবীন্দ্রনাথের "বাঙ্‌লা বানান", প্রবাসী ১৩২৬, বৈশাখ, ৭৮-৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ওড়িয়া ভাষায় মূর্দ্ধন্য-ণ উচ্চারণ থাকা সত্ত্বেও কান, পান দন্ত্য-ন দিয়ে লেখা হয়।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

*

* *

পনেরো বিশ মিনিট পরে ধনিষ্ঠা গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরকে যখন গড় হয়ে প্রণাম কর্‌লে তখন তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজলও ঠাকুরঘরের মেঝের উপর গড়িয়ে পড়্‌ল। সে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসে জোর করে' প্রসন্নতা টেনে এনে তার মুখ উজ্জ্বল করে' তুল্‌লে। তার পর সে যেখানে অনল গৌরীকে পড়াচ্ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। অনল তার দিকে চোখ তুলে চাইতেই ধনিষ্ঠা একমুখ হেসে বল্‌লে—ভানো-দিদি এসেছিল তাই পড়্‌তে আস্‌তে দেরী হয়ে গেল।

অনল হেসে বল্‌লে—দেরী করে' আসার জন্তে আমার ছাত্রীর জরিমানা মাপ করে' দেওয়া গেল ; কিন্তু দেরী করার জন্তে তাঁকে কন্‌ফাইণ্ড্ থাক্‌তে হবে। কেমন ?

তাহার এই ঘনিষ্ঠভাবের কথায় ধনিষ্ঠা লজ্জা পেয়ে চুপ করে' গেল, অনলও তাহার লজ্জায় লজ্জা বোধ কর্‌লে। কিন্তু তাদের দুজনকে রক্ষা কর্‌লে গৌরী। সে খিলখিল করে' বলে' উঠ্‌ল—বাবা, আজ একটা ক্ষেয়ার-ক্রো দেখেছি, সেই আজব দেশ বইয়ের কাগ-তাড়ুয়া ; ওটা অর্দ্ধেক হি, অর্দ্ধেক শি !

অনল মনের অস্বস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধনিষ্ঠার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লে—এ যে কমলাকান্তের সমস্তা দেখ্‌ছি—চন্দ্র, তুমি হি না শি ! সেই কাগতাড়ুয়া পদার্থটি কি ?

ধনিষ্ঠা হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে বল্লে—আনো-দিদিকে দেখে ঐ কথা বল্ছে।

অনল ধনিষ্ঠার কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠ্ল।

গৌরী অনলের হাসিতে উৎসাহিত হয়ে বলে' উঠ্ল —বাবা, মা সেই কাগতাড়ুয়াটার কাছে বসে' ছিল···

অনলকে বাবা সম্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী মা বলে' ধনিষ্ঠার উল্লেখ করাতে ধনিষ্ঠার আবার মনে পড়্ল আনোর কথা এবং অমনি তার মুখ আরক্ত ও কর্ণমূল উষ্ণ হয়ে উঠ্ল; পাছে অনল তার কাছে অকারণ ধনিষ্ঠার এই লজ্জার বিকাশ দেখ্তে পায় সেই আশঙ্কায় ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে গৌরীকে বল্লে—নাও গৌরী, তোমার গল্প রাখো; পড়ে' নাও, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে······

ধনিষ্ঠার এই কথায় অনলের মনে পড়্ল সন্ধ্যাকালে ধনিষ্ঠা জপ পূজা কর্তে ব্যাপৃত হয়। তাই সে বল্লে··· আজ দেরী হয়ে গেছে, আজ না হয় পড়া বন্ধ থাক······

কথা বল্তে বল্তে অনল ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থাম্ল, তার মনের মধ্যে ঈষৎ আশা ও গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল যে ধনিষ্ঠা এখনি পড়া বন্ধ কর্তে চাইবে না, সে অনলের কথায় আপত্তি করে' তাকে আরো কিছুক্ষণ থাক্তে বল্বে। কিন্তু অনল অবাক্ হয়ে দেখ্লে ধনিষ্ঠা কিছুমাত্র আপত্তি ত তুল্লেই না, বরং তার মুখে সম্মতির স্মিতহাস্য ফুটে উঠ্ল। অনল ক্ষুণ্ণ মনে আসন থেকে উঠে দাঁড়াল।

অনল ধনিষ্ঠাকে তখনও নীরব থাক্তে দেখে সেও নীরবে যেখানে জুতো খুলে রেখে এসেছিল সেইখানে গেল, এবং জুতোর মুখ যেদিকে সে এসেছিল সেইদিকে ফিরানো ছিল বলে' সে সেইদিকে ফিরে জুতো পর্তে লাগ্ল। এতে সে আবার ধনিষ্ঠার দিকে ফিরেই দাঁড়িয়েছিল। ধনিষ্ঠা মুখ তুলে অনলের দিকে দেখে উঠে দাঁড়াল এবং অনল জুতো পরা শেষ করে' গমনোদ্যত হতেই ধনিষ্ঠা কয়েক পা অগ্রসর হয়ে গিয়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বল্লে—দেখুন,············

অনলের পিঠের অর্দ্ধেকটা ধনিষ্ঠার দিকে ফিরেছিল; সে আবার ধনিষ্ঠার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে তার মুখের দিকে চাইল।

ধনিষ্ঠা বল্তে লাগ্ল—কাল থেকে আমার পড়ার আর সুবিধা হবে না·········

অনল বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়ে ধনিষ্ঠার মুখের উপর উৎসুক দৃষ্টি ফেলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল—সে ভেবে পাচ্ছিল না ধনিষ্ঠার অকস্মাৎ পাঠ বন্ধ করার কি কারণ হতে পারে—তার কি কোনো ত্রুটি বা অপরাধ ঘটেছে?

অনলের মনের আশঙ্কা মুখে ফুটে উঠ্তে দেখেই বোধ হয় ধনিষ্ঠা বল্লে—আমার ব্রত নিয়ম পূজো অর্চ্চা নিয়ে আমি আর পড়াশুনার সময় পাই না; তাতে লেখাপড়াও হয় না, পূজো অর্চ্চারও ব্যাঘাত ঘটে। ইহকাল ত খুইয়ে বসে'ই আছি, দেখি পরকালে এর চেয়ে কিছু সুবিধা হয় কি না·········

এ কথার উত্তরে অনল আর কি বল্বে? যুবতী সুন্দরী ধনশালিনী ধনিষ্ঠার মুখে এই নির্ব্বেদ হতাশার উক্তি শুনে অনলেরও অন্তর দুঃখভারাতুর হয়ে উঠ্ল। সে বিষণ্ণ-বদনে চলে' যাবার উপক্রম কর্ছে, ধনিষ্ঠা আবার বল্লে —সমস্ত দিন আপিসের খাটুনির পর পড়াতে আপনার খুব কষ্ট হয়·········

অনল তো এতদিন এ খবর জান্ত না, সেই কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আশু সম্ভাবনাতেও সে বিশেষ আনন্দ অনুভব কর্লে না। সে উদাসনেত্রে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

ধনিষ্ঠা বল্তে লাগ্ল—গৌরীকে পড়াবার জন্তে স্কুলের হেড্‌মাষ্টার আর হেড্‌পণ্ডিত দুজনকেই কাল থেকেই নিযুক্ত করে' দেবেন············

এবার অনল কথা বল্লে—গৌরীর জন্তে আর পৃথক্ মাষ্টারের কি দর্কার, আমিই তো······

ধনিষ্ঠা অনলের কথায় বাধা দিয়ে বল্লে—আপনি তো দেখ্বেনই; কিন্তু আজকাল বিষয়-সম্পত্তির নতুন ব্যবস্থা করা নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাক্বেন; আমাদের জন্তে গৌরীর লেখাপড়ার কোনো ব্যাঘাত হতে দেওয়া উচিত হবে না। গৌরীর মাষ্টারদের মাইনে আমি আমার মাস-হারা থেকে·········

অনল লজ্জিত হয়ে বল্লে—মাষ্টারের মাইনে দেওয়ার কোনো কথাই আমার মনে হয় নি। গৌরী আপনার মেয়ে·········

ধনিষ্ঠার মুখের উপর দিয়ে একটা লাজের আভা খেলে গেল।

অনল বল্‌তে লাগ্‌ল—আপনি যা আদেশ কর্‌বেন তাই হবে।

ধনিষ্ঠা একটু চুপ করে' থেকে বল্‌লে…জমিদারীর কাগজ পত্তর সই করাবার জন্তে আপনাকে আর কষ্ট করে' আস্‌তে হবে না……

এই কথা বলে' ফেলেই ধনিষ্ঠার মনে হল এটা যেন নিষেধের আদেশের মত শোনাল; তাই সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে…আপনি প্রধান ম্যানেজার, আপনি কাগজপত্তর সই করাতে আসেন এটা ভালো দেখায় না; ও কাজটাও কাল থেকে পেশকার হরকান্ত-বাবুকে কর্‌তে বল্‌বেন……

হরকান্ত ধনিষ্ঠার শ্বশুরের আমলের অতিবৃদ্ধ কর্ম্মচারী; ধনিষ্ঠার সাবধানতা সত্ত্বেও অনলের মনে হল কাল থেকে এ বাড়ীতে তার কি প্রবেশ নিষিদ্ধ হচ্ছে নাকি।

অনলের মুখের উপর সন্দেহের ছায়াপাত হতে দেখেই ধনিষ্ঠা অনুমানে তার মনের ভাব বুঝে নিয়ে বল্‌লে…কেবল যে-সব কাগজপত্তর আমাকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দর্‌কার মনে কর্‌বেন সেইগুলি আপনি নিজে নিয়ে আস্‌বেন—আর আমার যদি কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকে আপনাকে খবর পাঠালে আপনি অনুগ্রহ করে' একবার পায়ের ধূলো দেবেন………

ধনিষ্ঠার এই কথা শুনে অনলের মনের সন্দেহ অনেকখানি দূর হয়ে গেল; তার মন আবার প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল।

ধনিষ্ঠাকে চুপ করে' যেতে দেখে অনল "যে আজ্ঞে" বলে' প্রস্থান কর্‌লে।

অনল চ'লে যেতেই ধনিষ্ঠার বুক ঠেলে চোখ ফাটিয়ে কান্না ঝাঁপিয়ে বেরিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছিল। সে জোর করে' কান্না চেপে কম্পিতকণ্ঠে গৌরীকে বল্‌লে…মা মণি, তুমি খেয়ে শোও গে যাও; আমি পূজো করে' আসি……

গৌরী নীরবে ঘাড় নেড়ে তার দাসীর সঙ্গে তার ঘরে চ'লে গেল।

ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে লুটিয়ে পড়্‌ল। আজ অনোর কথায় সে জান্‌তে পেরেছে তার এতদিনকার অনাবিষ্কৃত মনের অবস্থা। তার যে কেন কান্না আসছে এ কথা মনে করতেও তার লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল, তাই সে গোপনেও কাঁদ্‌তে পার্‌ল না, নিজের লজ্জাতেই সে নিজেকে সম্বরণ করে' নিলে।

কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে থেকে মাধবীর কথা ধনিষ্ঠার কানে গেল—মা, পুরুত-ঠাকুর এসেছেন, ঠাকুরের আরতির সময় বয়ে যাচ্ছে যে!

ধনিষ্ঠা ধড়মড় করে' উঠে আবার গড় হয়ে ঠাকুরকে একটি প্রণাম কর্‌লে এবং উঠে দরজার খিল খুলে দরজা খুলে দিলে।

পুরোহিত আর মাধবী দেখ্‌লে প্রশান্ত দেবীপ্রতিমার মত ধনিষ্ঠা ঝাড়ের উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল কর্‌ছে। সে যে কি কঠোর শাস্তি আজ নিজেকে দিয়েছে তার কেউ একটু আভাসও টের পেল না।

ধনিষ্ঠা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পুরোহিতকে প্রণাম করে' বল্‌লে—ঠাকুর মহাশয়, আমি এ বছর সাবিত্রী-ব্রত নেবো।

পুরোহিত বল্‌লে—তা বেশ। কিন্তু তার তো মা এখনো অনেক দেরী আছে, সে তো সেই জষ্ঠি মাসে…

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' বল্‌লে—হ্যাঁ তা জানি; তবু আপনাকে আগে থাক্‌তেই বলে' রাখ্‌লাম।

পুরোহিত এ কথার উত্তরে কি যে বল্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে কিছু একটা বল্‌তে হবে বলে'ই বল্‌লে—তা আমি এ কথা মনে রাখ্‌ব মা।

ধনিষ্ঠা ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে' গেল, পুরোহিত ঠাকুরের আরতি কর্‌বে বলে' ঠাকুর-ঘরে ঢুক্‌ল।

* * *

অনল ধনিষ্ঠার কাছ থেকে এসেই স্কুলের হেড-মাষ্টার আর হেড-পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে গেল; সে জান্‌ত ধনিষ্ঠা যা বলে তাই তার আদেশ, এবং সে আদেশের নড়চড় প্রায়ই হতে দেখা যায় না। অনল তাঁদের বল্‌লে—এতদিন আমিই রাণীর সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে

পড়াতাম; রাণী আর কাল থেকে পড়বে না…বড়লোকের সখ দু' দিনেই মিটে গেল, তাই তার হুকুম হয়েছে গৌরীর শিক্ষার ভার অনুগ্রহ করে' আপনাদের নিতে হবে…

অনল গৌরীর শিক্ষক নিযুক্ত করে' বাসায় ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রেই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে কাল থেকে রাণী আর অনলের কাছে পড়বেন না। অনলের কাছে ধনিষ্ঠার পড়ার ব্যাপারটা গ্রামের সকল লোকের মনে এমনি একটা প্রবল কৌতুকের প্রধান ঘটনা হয়েছিল। কিন্তু যে যার কাছ থেকে এই খবরটা শুনলে তাকে কেবল অর্থভরা দৃষ্টিতে একবার বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই নিরস্ত থাকতে হল, বক্তা বা শ্রোতা কেউ রসালাপের বিলাস সম্ভোগ করতে সাহস করতে পারলে না। কেবল সাধন চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খবর শুনে মুচকি হেসে চাপা গলায় বললে—এত শীগ্গির পিরীত চটে' গেল?

সাধন বিদ্যাসুন্দর থেকে পদ্য আওড়ে বললে—

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

খবরটা জানোর কানেও গেল। সে ধনিষ্ঠার উপর চটে' গিয়ে কি বলে' তার কুৎসা রটাবে তারই গল্প রচনায় প্রবৃত্ত ছিল, এই খবরে তার সব কল্পনা ভেস্তে গেল। সে মনে মনে বুঝতে পারলে তারই কথার অপ্রত্যাশিত ফল এই আকস্মিক ব্যাপার। যদি গ্রামের লোকের সন্দেহ সত্য হত তা হলে ধনিষ্ঠার মতন কড়া ও বেপরোয়া স্বাধীনা জমিদারনী আর নিরাত্মীয় নিরাতঙ্ক ম্যানেজার অনল কখনো এত সহজে বিচ্ছেদ ঘটাতে স্বীকৃত হত না। জানো ধনিষ্ঠার উপর রাগ ভুলে গিয়ে গাঁয়ের লোকদের উপর চটে' গেল; সে নিজের মনে মনে বললে—গাঁয়ের লোকগুলোর এমন পাজি পচা-মন যে এমন লোকদেরও মন্দ সন্দেহ করে! হোক না একবার সকাল, কাল আমি সব মুখপোড়া মুখপুড়ীদের মজা টের পাইয়ে দেবো না!

ধনিষ্ঠা প্রত্যহ প্রত্যূষে স্নান সমাপন করে' পূজা করতে বসে, এবং সূর্য্যোদয়ের পর গৌরীর জাগ্বার সময় হলে সে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এই ঘটনার পরদিন প্রভাতে সে যখন ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন অন্য দিনের চেয়ে বিলম্ব হয়ে গেছে; সে বাইরে এসে দেখলে মাধবী তাদের পড়বার জায়গায় বিছানা পাড়ছে। ধনিষ্ঠা মাধবীকে ডেকে বললে—মাধী, আজ থেকে এখানে আর বিছানা পাড়তে হবে না…

ধনিষ্ঠার কথার আওয়াজ শুনে মাধবী তার দিকে চোখ ফিরিয়েই কপালে করাঘাত করে' ক্ষুব্ধ স্বরে বলে' উঠল— আঃ আমার পোড়া কপাল! ও করেছ কি?

ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি স্খলিত ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে একটু মুচকি হেসে মাধবীর আক্ষেপকে চাপা দিয়ে নিজের পূর্ব্বারব্ধ কথার জের টেনে বললে—আজ থেকে আমি আর পড়ব না। গৌরীকে স্কুলের মাষ্টার মহাশয়রা পড়াতে আসবেন; বার-বাড়ীর সিঁড়ির উপরের ঘরটা গৌরীর পড়ার ঘর হবে…

মাধবী ধনিষ্ঠার কথা শুনেও না শোনা ভাবে পাড়া-বিছানা তুলে ফেলতে ফেলতে বললে—তুমি কি কাণ্ডখানা করেছ মা? অমন রেশমের মত চুলগুলো কোন্ প্রাণে তুমি কেটে ফেললে?

ধনিষ্ঠা ঈষৎ হেসে বললে—গৌরীর চুল বাঁধবার গুছি নেই…

মাধবী আবার কপালে করাঘাত করে' বললে—আমার মাথা আর মুণ্ডু! কাকে বোকা বোঝাচ্ছ মা! মেম-দিদিমণির চুল হল কটা ভুট্টার কেশের মতন, আর তোমার চুল হল কালো রেশমের ঝালরের মতন; তোমার চুলের গুছি দিয়ে মেম-দিদিমণির চুল বিননী করলে দিব্যি শঙ্খচূড় সাপের মতন দেখতে হবে!

কাল জানো ধনিষ্ঠাকে তার মনেরও অগোচর অনলের প্রতি প্রসক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে ধনিষ্ঠা সমস্ত রাত জেগে নিজের অন্তরের অনুসন্ধান আর হৃদয়ভাবের বিশ্লেষণ করেছে; সেই সূত্রে তার হঠাৎ মনে হল প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে সে চুল কাটতে হবে বলে' ভয় পেয়েছিল সেও তো ঐ অনলের কাছে তাকে কুশ্রী দেখাবে মনে করে'। তা হলে জানো যে সন্দেহ প্রকাশ করে' গেছে তা তো সত্য। এই কথা মনে হতেই রাত্রেই ধনিষ্ঠা বিছানা থেকে উঠে কাঁচি দিয়ে সমস্ত চুল গোড়া থেকে পুঁচিয়ে কেটে

ফেল্লে। নিজের মনের কাছেও অস্বীকৃত সেই লজ্জার কথা চাপা দেবার জন্যে ধনিষ্ঠা হেসে মাধবীর কথার জবাব সেরে দিয়ে বল্লে—তুই বার-বাড়ীর রাস্তার ধারের কোণের গোল ঘরটায় আমার পূজা কর্‌বার সব জোগাড় করে' দিস। আমি আজ থেকে সেই ঘরে পূজো কর্‌বো···

মাধবী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন, ঠাকুর-ঘরে কি হল ?

ধনিষ্ঠা বল্লে—পূজারী-ঠাকুর যখন পূজা করেন তখন আমি ত সে ঘরে পূজা কর্‌তে পারি না ; অনেক সময় আমি পূজা কর্‌তে বস্‌তে না বস্‌তে তিনি এসে পড়েন, আমাকে তাড়াতাড়ি···

মাধবী বিরক্ত স্বরে বল্লে—এর নাম তোমার তাড়াতাড়ি পূজো সারা। সেই ভোরবেলা ঠাকুর-ঘরে ঢোকো আর সাতটা-আটটা বাজ্‌লে বেরোও ; তারপর আবার দুপুরবেলা আছে, সন্ধ্যেবেলা আছে···

ধনিষ্ঠা হেসে বল্লে—ভগবানকে ডাকার কি সময় অসময় আছে রে ! তাঁকে অষ্টপ্রহর···

মাধবী মাথা নেড়ে বল্লে—তাইতে লেখাপড়া পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে একেবারে সারাক্ষণ ঐ এক পূজা-অর্চ্চা নিয়েই থাক্‌তে হবে ! আহার নিদ্রা তো ত্যাগ করেইছ, একটু সময় তবু লোকে বাইরে দেখ্‌তে পেত, এখন থেকে আর······

ধনিষ্ঠা মাধবীর বকুনি থামিয়ে সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে বল্লে—দেখিগে গৌরীর মুখ ধোওয়া জামা পরা হয়েছে কি না······দেখ্ মাধী, আমার ঘরের পাথরের ঘড়ীটা পূজোর ঘরে দিস····...

মাধবী নিজের মনে গজর গজর করে' বক্‌তে বক্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল—যাই দেখি গে, বামুন-দিদির নাওয়া হয়েছে কি না ; পূজোর জো করে' রাখাই গে······এখন আলাদা ঘরে পূজোর জো হবে, সে ঘর থেকে তো টেনে বার করাই দায় হবে······এমন অত্যাচারে শরীর আর কদিন টিক্‌বে ? মানুষের শরীর তো !········ঢের ঢের বিধবা দেখেছি, কিন্তু এমন করে' আপনা থেকে সোয়ামীর জন্যে দগ্ধে' মর্‌তে কাউকে দেখিনি ; এর চেয়ে যে সহ-মরণে পুড়ে মরা ছিল ভালো······পূজোর ঘরে আবার ঘড়ী ! ঘড়ীর দিকে খেয়াল থাক্‌বে কিনা······

*

* *

ধনিষ্ঠা নূতন পূজার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে' পূজায় বসেছে। গৌরী মায়ের পূজা শেষ হবার আশায় বার বার এসে রুদ্ধ দরজার বাইরে থেকে ফিরে গেছে, দরজা ঠেলে মাকে ডাক্‌তে তার খুবই ইচ্ছা কর্‌ছিল, কিন্তু সে পূজার ঘরের দরজা ছুঁতে সাহস করে নি।

ধনিষ্ঠা জপ পূজা স্তবপাঠ করে'ও কিছুতেই মন থেকে অনলের চিন্তা দূর কর্‌তে পার্‌ছিল না ; তার কেবলই মনে হচ্ছিল অন্যদিন এতক্ষণ তিনি এসে পড়াতে বস্‌তেন ; আমি পড়া বন্ধ করাতে তিনি না জানি কি মনে করেছেন ; এখন তিনি বাসায় একলাটি কি কর্‌ছেন ; এই যে সময়টা তিনি পড়ানোর কাজে ব্যয় কর্‌তেন, এখন থেকে সেটা কি কাজে লাগাবেন ? পড়্‌বেন বোধ হয়। একা তিনি, বিয়ে করেন না কেন ? তা হলে তো তাঁকে দেখ্‌বার শোন্‌বার একজন লোক হয়। নিজে উদ্‌যোগ করে' বিয়ে কর্‌তে বোধ হয় ওঁর লজ্জা কর্‌ছে ; কোনো দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় বা বন্ধু কি তাঁর কেউ নেই যে ওঁকে বিয়ে কর্‌তে অনুরোধ কর্‌তে, জেদ কর্‌তে পারে ? আমি অনুরোধ কর্‌ব ? কেন কর্‌ব, আমি তাঁকে বিয়ে কর্‌তে অনুরোধ কর্‌ব কোন্ অধিকারে আর তিনিই বা আমার অনুরোধ শুন্‌বেন কেন ? আমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে আরো কত লোকের হয় তো বিয়ে হয় নি, স্ত্রী মারা গেছে, তাদের তো আমি অনুরোধ কর্‌তে যাই নি, তবে এঁকেই বা অনুরোধ কর্‌ব কেন ? দেশে শুনি লোকের ভয়ানক কন্যাদায়, এমন কন্যাদায়গ্রস্ত লোক কি দেশে কেউ নেই যে এমন সৎপাত্রকে জেদ করে' কন্যা সম্প্রদান করে ?

এই কথা মনে হতেই ধনিষ্ঠার কেমন একটা অস্বীকৃত আতঙ্ক উদয় হল···যদি বাস্তবিকই কেউ তাকে জেদ করে' ধরে' বসে আর তিনি বিয়ে করেন ? এই আশঙ্কা মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিলে—"বিয়ে যদি করেন সে ভালোই তো।" কিন্তু এত-দিন অনল যে বিয়ে করে নি তার জন্যে একটু ক্ষীণ

আনন্দের আভাস ও ভবিষ্যতে বিয়ে করার সম্ভাবনার ভয় তার মনের কোণে গোপন হয়ে থেকে গেল।

ধনিষ্ঠা এই চিন্তা থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌বার জন্তে ভাব্‌তে লাগ্‌ল গৌরী আজ নতুন মাষ্টারের কাছে পড়ছে, তার না জানি কেমন লাগ্‌ছে! এতদিন সে নিজের জ্যেঠার কাছে পড়েছে, পড়ার সঙ্গে স্নেহ মিশ্রিত থাকাতে পড়ার কঠোরতা সে কখনো অনুভব করে নি; আজ নিঃসম্পর্কীয়ের কাছে পড়্‌তে তার কেমন লাগ্‌ছে? খুব খারাপ লাগ্‌ছে—নিশ্চয়ই…আজ আবার তার মা তার সঙ্গে নেই। ওঁর মতন অমন সুন্দর করে' আর কেউ পড়াতে পার্‌বে কি? উনি কী চমৎকার পড়াতেন! এই অল্প কদিনেই আমরা হেসে খেলে কত কি শিখেছি—যদি আরও কিছুদিন পড়্‌তে পেতাম…… যাক গে আমি বিধবা মানুষ, বেশী লেখাপড়া শিখে কি কর্‌ব……সেই সময়টাতে ভগবানের নাম কর্‌লে পর-কালের কাজে লাগ্‌বে……

ধনিষ্ঠা খুব তাড়াতাড়ি ইষ্টমন্ত্র জপ কর্‌তে লাগ্‌ল।

পাথরের ঘড়ীতে তীক্ষ্ণ মধুর শব্দে টং করে' একটা বাজ্‌ল। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ধনিষ্ঠা ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লে সাড়ে দশটা বাজ্‌ল। অমনি সে তাড়াতাড়ি জপ সাঙ্গ করে' প্রণাম করে' উঠ্‌ল এবং জান্‌লার কাছে গিয়ে বসে' খড়খড়ির একটি পাখী তুলে বাইরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সেই ঘরের সাম্‌নেই সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রকাণ্ড বড় উঠান; কল দিয়ে ছাঁটা ঘাস একখানি দামী বনাতের ফরাসের মতন দেখাচ্ছে; সেই ঘাসের বুকের উপর দিয়ে লাল শুর্কী ফেলা আঁকা-বাঁকা পথ; উঠানের মাঝখানে একটি তেকোণা ছোট্ট বাগান পাতা-বাহার আর ফুলের গাছে সুসজ্জিত হয়ে আছে; বাগানটির সীমার তিন দিকে ফুল-কাটা বেঁটে বেঁটে লোহার খুঁটি পোঁতা আছে ও খুঁটিতে খুঁটিতে কালো রং করা মোটা লোহার শিকল মালার মতন লম্বিত আছে; বাগানটির মাঝখানে শ্বেত-পাথরে বাঁধানো একটি ছোট চৌবাচ্চা আছে, তাতে লাল-মাছ খেলা করে' বেড়ায়। এই উঠানের এক পাশে ঠাকুর-বাড়ী, আর এক পাশে কাছারী-বাড়ী, সাম্‌নে খুব উঁচু দেউড়ি—তার ভিতর দিয়ে পথ সোজা নদীর দিকে চলে গেছে। দেউড়ির দুপাশে দুটি দীর্ঘিকা, দীঘির জলে দলে দলে হাঁস চর্‌ছে। দেউড়ির সাম্‌নে পথের দুধারে দুটা বলরামচূড়া গাছের শীর্ষ দেখা যাচ্ছে। দেউড়ির ভিতর দিয়ে ঝড়ু ঝাড়ুদার, তুফানী দপ্তরী আর আশাদুল্লা ফরাস কাছারীতে এল—সাড়ে দশটার সময় ভৃত্যদের আস্‌তে হয়; ১১টার সময় বাবুরা আসে, তার আগে চাকরেরা এসে ঘর-দোর ঝেড়ে, ফরাস টেবিল চেয়ার সাফ করে', পেন্সিল কলম কেটে, দোয়াতে কালী ভরে' কাজের আয়োজন সব ঠিক করে' রাখে, যেন বাবুরা এসেই কাজে নিযুক্ত হতে পারে। ভাণ্ডারী মুকুন্দ বন্ধ দরজার তালাগুলো প্রকাণ্ড এক গোছা চাবি নিয়ে ক্রমে ক্রমে খুলে দিতে লাগ্‌ল, ঝড়ু ঝাড়ন দিয়ে ধূলা ঝাড়্‌তে প্রবৃত্ত হ'ল; দপ্তরী পেন্‌সিল কলম পরীক্ষা করে' দেখ্‌ছে আর যেটি মনে হচ্ছে ভোঁতা হয়েছে সেইটে একটু একটু চেঁচে দিচ্ছে অথবা ষ্টীল্‌-পেনে নূতন নিব পরিয়ে দিচ্ছে। ক্রমে আরও ভৃত্যেরা এসে একে একে কর্ম্মে নিযুক্ত হতে লাগ্‌ল।

ধনিষ্ঠা এইসব দেখ্‌ছে আর এক-একবার ঘড়ীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। পোনে এগারোটা। বৃদ্ধ মহীপৎ সিং তার শুভ্র চাপ দাড়িকে বেলাতটে আছড়ে পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন মোচড় দিতে দিতে ঠাকুরবাড়ীর দিক্‌ থেকে এসে কাছারীর ছড়-দেওয়া বড় বড় থামওয়ালা বারান্দার উপর উঠ্‌ল—এই মহীপৎ সিং অনলের আপিসের দ্বারবান্‌। তাকে দেখেই ধনিষ্ঠার চিত্ত কেন উতলা হয়ে উঠ্‌ল। সে আবার ঘড়ীর দিকে ফিরে দেখ্‌লে তখনও এগারটা বাজ্‌তে দশ মিনিট বাকী। মহীপৎ সিং অনলের আপিস-ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার উর্দ্দির চাপকান হাত দিয়ে চেপে চেপে চোস্ত কর্‌তে মনোনিবেশ করেছে। ধনিষ্ঠা বুঝ্‌লে সে তার প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা কর্‌ছে। এগারোটা বাজ্‌তে আট মিনিট। জমানবিশ রমানাথ-বাবু আর মহাফেজ ঈশান-বাবু ছাতা মাথায় দিয়ে আপিসে এলেন; শুমারনবীশ তাহের-উদ্দিন মুন্সি, খাজাঞ্চিখানার মোহরের কিফায়েৎ হোসেন একসঙ্গে এসে কাছারীবাড়ীর সিঁড়িতে উঠ্‌ছেন, পিছনে এসে উপস্থিত হলেন খাজাঞ্চি পরাণ-বাবু, পোদ্দার লক্ষ্মীদাস, সেহানবিশ সমরেশ-বাবু।

সময় মত এগারোটার ঘণ্টি হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল কর্ম্মচারী-দের ভিড়ও তত বাড়্‌তে লাগ্‌ল, একে একে দুয়ে দুয়ে তিনে তিনে সব এসে কাছারিতে উঠ্‌ছে। কিন্তু ম্যানেজারের ত এখনো দেখা নেই। তিনি সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী, তিনি বোধ হয় পরে আসেন। কিন্তু তিনি ত অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তিনি ত দেরী করে' আস্‌বার লোক নন। তবে কি তিনি এসে গেছেন, সে তাঁকে দেখ্‌তে পায় নি। এই সম্ভাবনার শঙ্কা মনে হতেই ধনিষ্ঠার মন কেমন হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। তবু সে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এপাশ ওপাশ যতদূর দেখা যায় ঝুঁকে ঝুঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল কোথাও অনলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে কি না। বৃদ্ধ পেশ্‌কার হরকান্ত-বাবু অতি জীর্ণ ময়লা তালি-দেওয়া শাদা কাপড়ে ছাওয়া একটি ছাতা কাঁধে করে' স্থবির শরীর নিয়ে এলেন। এগারোটা বাজ্‌তে পাঁচ মিনিট। হরকান্ত-বাবুর দিক্‌ থেকে চোখ ফিরিয়েই ধনিষ্ঠা দেখ্‌লে দীর্ঘোন্নত সরল-শরীর অনলকান্তি অনল কাছারীতে আস্‌ছে, তার মাথায় ছাতা নেই, রোদ লেগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কুঞ্চিত কেশের তলায় কালো রেশমের ঝালরের মুখে মুক্তার থরের মতন কপালের উপর স্বেদবিন্দু রৌদ্রালোকে চকচক কর্‌ছে। তার পিছনে পুরণচাঁদ পাঠক অনলের আর্দ্দালী একটা টিনের ডেস্‌প্যাচ বক্স আর তার উপরে কাগজপত্রের কতকগুলো ফাইল চাপিয়ে কাঁধে করে' আস্‌ছে। অনল কাছে আস্‌তেই দেউড়ীর পাহারা-ওয়ালা কটিলম্বিত কোষবদ্ধ তরবারী মুহূর্ত্তমধ্যে অর্দ্ধমুক্ত ও পুনঃ-কোষবদ্ধ করে' বাঁ হাতে তরবারি চেপে থেকে ডান হাত উল্টে কপালের পাশে উত্তানভাবে ঠেকিয়ে রীতিমত সামরিক কায়দায় সেলাম কর্‌লে। অনল কাছারী বাড়ীর নীচে যেতেই মালখানার পাহারাওয়ালা হঠাৎ টহলানো থেকে সমুখ ফিরে থমকে দাঁড়াল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে কাঁধ থেকে সঙ্গীন-গোঁজা বন্দুক নামিয়ে সাম্‌নে মাটির উপর ঠেকিয়ে খাড়া করে' ধর্‌লে এবং অনল তার সাম্‌নে থেকে সরে' যেতেই সে আবার বন্দুক তুলে দুবার দুহাতে লুফে কাঁধে রেখে আগের মতন মালখানার মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া দরজার সাম্‌নে টহলাতে লাগ্‌ল। অনলকে আস্‌তে দেখেই যে যেখানে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল সে সেই কর্ম্ম ক্ষণকালের জন্য বন্ধ রেখে তটস্থ হয়ে দাঁড়াল এবং অনল যার যার সাম্‌নে দিয়ে বা দৃষ্টিপথ দিয়ে যেতে লাগ্‌ল সেই সেই ঝুঁকে ঝুঁকে প্রণাম সেলাম নমস্কার নিবেদন কর্‌তে লাগ্‌ল। অনলের এই সম্মান দেখে ধনিষ্ঠার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। ধনিষ্ঠা বসে' বসে' তন্ময় হয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল অনল নিজের আপিস-ঘরের সাম্‌নে যেতেই মহীপৎ সিং ঈষৎ নত হয়ে প্রভুকে সেলাম কর্‌লে। অনল প্রত্যেকের অভিবাদন প্রত্যর্পণ কর্‌তে কর্‌তে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। মালখানার সাম্‌নের পাহারাওয়ালা পেটা-ঘড়ীতে জোড়া জোড়া ঘা ঘন ঘন দিয়ে এগারোটা বাজালে।

ধনিষ্ঠা এইবার উঠ্‌বে-উঠ্‌বে মনে কর্‌তে কর্‌তেও জান্‌লার ফাঁকে চোখ পেতে বসেই রইল কেন তা নিজেও ঠিক স্পষ্ট জানে না, হয় তো অনলকে আর-একবার দেখ্‌তে পাবার ইচ্ছা তখনো তার মনের তলে গোপন হয়ে ছিল। মিনিট পাঁচেক পরে অনল আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ধনিষ্ঠার মুখ আবার উৎফুল্ল, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌ল। অনল এক-একবার প্রত্যেক ঘরে-ঘরে গিয়ে কে এসেছে না এসেছে দেখে আবার ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুক্‌ল। এইবার ধনিষ্ঠা উঠে পড়্‌ল এবং বেরুবে বলে' ঘরের দরজা খুল্‌তে গেল।

দরজা খুলেই ধনিষ্ঠা দেখ্‌লে দরজার সাম্‌নে দরজা থেকে দূরে দালানের রেলিঙে ঠেস দিয়ে গৌরী চুপ করে' বসে' আছে, তার পাশে বসে' আছে তার দাসী। ধনিষ্ঠা গৌরীকে দেখেই হাসিমুখে স্নেহভরা স্বরে বলে' উঠ্‌ল—কি মা, ওখানে বসে' কি হচ্ছে?

দাসী বল্‌লে—মাষ্টার মশায় পড়িয়ে চলে' গেলেন আর দিদিমণি তখন থেকে ঠায় এখানে এসে বসে' আছেন ......কত বল্‌লাম যে খাবে চলো, খেলা করিগে চলো, তা নড়্‌লো না......

দাসীর কথা শুন্‌তে শুন্‌তেই ধনিষ্ঠা ব্যগ্র পদে অগ্রসর হয়ে এসে গৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে গাল টিপে আদর কর্‌লে এবং হেসে বল্‌লে—মরে' যাই আমার বাছা রে!

গৌরী ম্লান মুখে কাতর স্বরে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা, তুমি এতক্ষণ কেন পূজো করো?

বালিকার এই প্রশ্নেও ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল, সে গৌরীকে বুকের মধ্যে সবলে চেপে ধরে' বল্‌লে —পূজো ত করি ছাই! পূজো কর্‌তে চাই, হয় না মা। আমি যে মহাপাপিষ্ঠা!

দাসী বলে' উঠ্‌ল—তুমি যদি পাপিষ্ঠি মা, তবে পুণ্যবতী কে? তুমি যে কি তা দেশের সবাই জানে।

ধনিষ্ঠা হতাশাভরা উদাস স্বরে বলে' উঠ্‌ল—সব লোক-দেখানো ভড়ং রে, সব লোক-দেখানো ভড়ং! আমি যে কী তা অন্তর্যামী জানেন!

ধনিষ্ঠার গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেয়ে মাধবী হনহন করে' সেইদিকে আস্‌ছিল; সে বারান্দার বাঁক ফিরেই ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' দাঁড়িয়ে আছে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল এবং হাতের উল্টা পিঠ আঙুল মুড়ে গালে ঠেকিয়ে ঘাড় কাত করে' বিস্ময় জানিয়ে বলে উঠল—মা, দিব্যি আক্কেল তো তোমার! তিন পহর বেলায় তো পূজোর ঘর থেকে বেরুলে! তার পর বেরুতে না বেরুতে সবাইকে ছুঁয়ে নেড়ে ঠিক করে' রেখেছ! খাওয়া-দাওয়া আজ তা হলে শিকেয় তোলা রইল।

গৌরী মাধবীর ভাব দেখে ও কথা শুনে ভয়-সঙ্কুচিত ম্লান মুখে কাতর মৃদু স্বরে বল্‌লে—মা, আমি তো তোমায় ছুঁইনি, তুমি কেন আমাকে কোলে নিলে?

গৌরীর ম্লান মুখের কাতর কথা ধনিষ্ঠার বুকে গিয়ে বাজ্‌ল, সে ব্যথিত হয়ে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে' বল্‌লে —বেশ করব, মা, আমি তোমাকে বুকে চেপে ধরব, তোকে বুকে চেপে না ধর্‌লে বুক যে আমার ভেঙে যাবে।

মার মুখে এই কথা তাকেই আদর মনে করে' বালিকা গৌরীর মনের গ্লানি অনেকখানি কমে' গেল বটে, কিন্তু মাধবীর ভাবভঙ্গী ও কথা তার কোমল মনে বিদ্ধ হয়ে রইল যে তার মাকে তার ছোঁয়া অত্যন্ত অন্যায়।

গৌরীকে নীরব দেখে ধনিষ্ঠা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে —আজ নতুন মাষ্টার-মশায়ের কাছে পড়্‌লে, গৌরী? কেমন লাগ্‌ল?

গৌরী ধনিষ্ঠার বুক থেকে মাথা তুলে ধনিষ্ঠার মুখ দেখ্‌বার চেষ্টায় মাথাটিকে একটু পিছন দিকে হেলিয়ে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বল্‌লে—আমার একটুও ভালো লাগ্‌ল না। বাবা আর কেন পড়াবে না মা? তুমি কেন পড়্‌তে গেলে না?

ধনিষ্ঠা দাসীদের সাম্‌নে গৌরীর মুখে একই কথার মধ্যে অনলকে বাবা ও তাকে মা সম্বোধন কর্‌তে শুনে লজ্জা অনুভব কর্‌লে; তার মন এখন অনল সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে বলে' সে গৌরীর কথা যেভাবে অনুভব কর্‌লে, অশিক্ষিত ও গৌরীর ঐরূপ সম্বোধনে অভ্যস্ত দাসীরা সেভাবে মোটেই শোনেনি। ধনিষ্ঠা লজ্জিত হাসি হেসে গৌরীকে বল্‌লে—উনি নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন, পড়াবার সময় হয় না। আর আমি বুড়ো মানুষ আর কত কাল পড়্‌ব? আজ থেকে আমি তোমার কাছে পড়্‌ব। তুমি যা পড়ে' আস্‌বে তাই আমাকে পড়াবে। আমি তোমার ছাত্রী হব। কেমন?

ধনিষ্ঠার এই প্রস্তাবে উৎফুল্ল হয়ে গৌরী বল্‌লে—সে বেশ হবে মা। আমি হব তোমার মাষ্টার!

ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—অনেক বেলা হয়েছে, চলো, খাবে চলো।

(ক্রমশঃ)

চিঠি*

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
১৩ই জুলাই ১১]

ওঁ

প্রিয়বরেষু

শেষকালে নাটকটা (অচলায়তন) প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়্‌ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়্‌বে এবং এই নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি চল্‌বে এই আমার একটা মস্ত সান্ত্বনা।

তোমাদের সম্বর্দ্ধনাটা শেষ হ'য়ে গেলে সেটা নিঃশেষে হজম কর্‌বার যোগ্য যথেষ্ট পরিমাণে গাল খেয়ে নেবার সুযোগ হবে। সমস্ত জিনিষটা আর-একবার মেজে ঘসে' বাড়িয়ে কমিয়ে এবারে বেশ আমার মনের মতো ক'রে নিয়েছি।

জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি—ওটাও সাফ-সোফ ক'রে দিচ্ছি—খুব মনোযোগ ক'রে দেখ্‌লুম,এ-রচনাটা সাহিত্যে চল্‌বার মতো হয়েছে—নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২।৩ দিনের মধ্যে ওর প্রথম কিস্তিটা পাঠিয়ে দেবো।

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

tmark—London
৭ই আগষ্ট, ১২]

Telegram
"Whitemore"

Butterton Vicarage,
Newcastle,
Staffs.

প্রিয়বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। দেশ থেকে যাত্রা কর্‌বার সময় মনে করেছিলুম কিছুকালের জন্তে মানুষের ঘূর্ণির মধ্যে থেকে পরিত্রাণ পাবো। এদেশে মানুষের অভাব আছে, এমন কথা আমার মনে ছিল না—কিন্তু অপরিচিত জায়গায় সুবিধা এই যে, ভিড়ের মাঝখানেই নিরালা পাওয়া যায়, তাই ভেবেছিলুম অপরিচয়ের তট-ভূমিতে একলা দাঁড়িয়ে এখানকার জনসমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখ্‌তে পাবো। কিন্তু বুঝ্‌তে পারা গেল, আমার কুষ্ঠিতে ওটা লেখে না। লণ্ডনের পাকের মধ্যে খুব একচোট ঘুর খেয়ে কয়েকদিন হ'ল পাড়াগাঁয়ে একটি পাদ্রির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমার পক্ষে এও ঠিক উল্‌টো ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ ভিড়ের মধ্যে থাক্‌তে গেলে অপরিচিত হওয়ার সুবিধা আছে, ফাঁকা পাওয়া যায়—কিন্তু দুই-একজনের সঙ্গে বাস কর্‌তে গেলে রীতিমত বন্ধুত্ব না থাক্‌লে মনের ভিতরটাতে বিশ্রাম পাওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা লোক খুব ভালো, সন্দেহ নেই।

আষাঢ় মাসের প্রবাসী ও জুন মাসের Modern Review আমাকে পাঠালে না কেন? লণ্ডন থেকে দূরে থাকাতে এবারকার মেল এখনো হস্তগত হয়নি। হয়তো আজ পাওয়া যেতে পারে—দেখ্‌ব তা'র সঙ্গে এসেছে কি না। বিদেশে দেশের বাণীর জন্তে মন উৎসুক হ'য়ে থাকে। অতএব তোমাদের কাগজপত্র পাঠাতে অবহেলা কোরো না। বলা বাহুল্য, Thomas Cook and Son, Ludgate Circus, London ঠিকানায় আমার চিঠি পাঠানোই ভালো। সত্যেন্দ্রকে আমার অন্তরের স্নেহ জানিয়ো—সে আজ এখানে থাক্‌লে কত আনন্দ হ'ত।

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

[Postmark—London
13 Sept. 13]
আমার ঠিকানা
21, Cromwell Road,
South Kensington,
London S. W.

প্রিয়বরেষু

বারম্বার আমার সম্মান-সম্বর্দ্ধনার কথা কাগজে পড়্‌তে পড়্‌তে আমি যে কতটা সঙ্কোচ অনুভব কর্‌ছি সেকথা বল্‌তে পারিনে। এখানকার লোকে আমার

*এই চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন।

রচনার আদর করুছেন, সে-ঘটনায় আমি পুলকিত হইনি এমন কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু তোমরা যখন সেই-সমস্ত খবর জোড়াতাড়া দিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে থাকো, তখন আমি বড় লজ্জা পাই। বিশেষত এবারকার প্রবাসীতে দেখ্‌লুম, Miss Radford এবং Miss Sinclair-এর চিঠি-দুটো তর্জ্জমা ক'রে দিয়েছ—আমি যে কি ভয়ে ভয়ে আছি—পাছে তোমরা ওগুলো Modern Reviewতে তুলে দাও—তা আমি বল্‌তে পারিনে। ওগুলো প্রাইভেট পত্র; ছাপা হ'লে হয়তো তাঁদের পক্ষে বিশেষসঙ্কোচের কারণ হবে এবং ওটা ঠিক সঙ্গত হবে না। অবশ্য কি করেছ জানিনে এবং যদি ক'রে থাকো নিষেধ ক'রে প্রত্যাখ্যান করবারও সময় নেই। কিন্তু দোহাই আমার—এখানে প্রাইভেট-ভাবে কে কি বল্‌ছেন তা নিয়ে প্রকাশ্য পত্রে আলোচনা কোরো না।

বহুকাল পরে কাল ১লা আশ্বিন ১লা আষাঢ়ের প্রবাসী পেলুম। অন্যান্য মাসের প্রবাসী ঠিক সময়েই পেয়েছি, কেবল ঐ আষাঢ়টাতেই আটকে গিয়েছিল।

য়েট্‌স যে বইটা edit করুছেন সেটা ভূমিকাসমেত ছাপাখানায় গেছে—বোধ হচ্ছে, অক্টোবর মাসের মধ্যেই বের হ'তে পারবে। হাতে আরো অনেকগুলো জমেছে। ছোটো গল্প আরো গোটাকতক পেলে মন্দ হ'ত না। স্কুমার কিছু তর্জ্জমা করতে স্বরু করেছে। স্কুমারের তর্জ্জমা মন্দ হয় না। গোটাতিনেক নাটক ক'রে ফেলেছি, কবিতাও কম হয়নি। শেষ বয়সে যে আমাকে ইংরেজি ভাষার সাধনা করতে হবে, সেকথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। ক্ষণিকায় লিখেছিলুম পরজন্মে আমি হয়তো আমার লেখার সমালোচক হবো—ইহজন্মে তা'র একটা ভূমিকা হ'ল, নিজের লেখার নিজে অনুবাদক হওয়াও একটা উৎকট ব্যাপার—ওতেও নিজের রচনাকে কম পীড়ন করতে হয় না, একেবারে তা'র সর্ব্বাঙ্গে কালশিটে পাড়িয়ে দেওয়া হয়।

রামানন্দ-বাবুকে বোলো, Modern Reviewর জন্য রোটেন্‌স্টাইন্‌কে লিখ্‌তে একটু যেন পীড়াপীড়ি ক'রে ধরেন। Modern Reviewর প্রতি তাঁ'র খুব একটা শ্রদ্ধা আছে। ভারতীয় আর্ট্-সম্বন্ধে তিনি যদি একটা সমালোচনা লেখেন এবং আমাদের আধুনিক শিল্পীদের প্রতি তিনি যদি কিছু সদুপদেশ দেন তা হ'লে সেটা নিশ্চয়ই উপাদেয় হবে। জ্যোতিদাদার ছবি তাঁ'র অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তাঁ'র চিত্রকলা-সম্বন্ধে এখানকার কোনো-একটা কাগজে তিনি লিখ্‌বেন মনে করেছেন।

জীবনস্মৃতিতে গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার হয়েছে। এঁরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করেছেন। ও বইটা কি বিক্রি হবার আশা আছে? বিপরীত-রকম খরচ করেছে।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[Postmark—South Kensington
17 May, 13]
C/o Messrs Thomas Cook & Son,
Ludgate Circus,
London.

প্রিয়বরেষু

চারু, আসল কথা—আমার আদবে আর লিখ্‌তে ইচ্ছা করে না। কলমের সঙ্গে মনটাকে জুতে আজ পর্য্যন্ত তাকে হায়রান্ ক'রে ছুটিয়েছি, মারামারি ঠেলাঠেলি রক্ত-পাতও কম হয়নি—এখন মনে হয় এই লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যে আর প্রবেশ করা নয়। প্রবাসীর সঙ্গে আমার লেখনীর একটা যোগসাধন হ'য়ে গেছে এবং তা'র প্রতি আমার অন্তরের স্নেহ আছে—সেই মমতা-বন্ধনে হয়তো আবার কোন্‌দিন জড়িয়ে পড়্‌ব, কিন্তু মুক্তিলাভের জন্যেই চেষ্টা করতে হবে। আমার হাটের বেসাতী হ'য়ে গেছে বোধ হচ্ছে যেন—এবার ভিড় ঠেলাঠেলি এবং লাভ-লোক-সানের হিসাব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে ঘরের মুখে রওনা হ'তে হবে—নইলে রাত্রি এসে পড়্‌বে—আর পথ দেখ্‌তে পাবো না।

তোমাদের সমাজে একটা লড়াইয়ের দিন এসেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি—কিন্তু তোমাদের প্রতি একান্ত স্নেহসত্ত্বেও আমাকেও বোধ হয় হার মান্‌তে হবে। তোমরা যখন দস্যুর আক্রমণে পড়েছ, তখন আমার গাণ্ডীব তোল্‌বার

শক্তি ভগবান্ অপহরণ করেছেন—জয়ী হবার গৌরব আর আমার সইবে না, এখন পরাভবের তলায় নেমে মাটির উপরে আসন নেবার সময় এসেছে। হাতের কাজ যা ছিল তা একরকম চুকিয়েছি—এবার পায়ের কাজ, এখন বিদায়ের রাস্তায় চল্‌তে হবে, ধূলোর উপর দিয়ে হাঁট্‌তে হবে। অতএব বোঝা হাল্‌কা ক'রে দিয়ে যাত্রা করা যাক্—এখন আর পিছু ডেকো না।

এখান থেকে রওনা হ'তে বোধ হয় আর খুব বেশি দেরি হবে না। ইতি ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

তোমাদের

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

508 W. High Street,
Urbana, Illinois,
U. S. A.

ওঁ

প্রিয়বরেষু

চারু, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেলুম। কিছুদিন থেকে প্রবাসীতে আমার লেখা পৌচচ্ছে না কেন, জিজ্ঞাসা করেছ। তা'র একটা কারণ বল্‌লেই বাকীগুলো বল্‌বার আর দরকার হবে না—কিছুকাল থেকে বাংলা একেবারেই লিখিনি। কোনো কালে যে এদেশে এসে ইংরেজিতে যে কোনোরকম লেখাপড়া কর্‌ব একথা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। সেইজন্যেই বিদেশ-যাত্রার আরম্ভের মুখে খুব ক'ষে কোমর বেঁধে দেদার বাংলা লিখ্‌তে সুরু করেছিলুম, ভেবেছিলুম এইরকম অনর্গল চল্‌বে। তোমরাও সেইভাবে পাত পেড়ে বসেছ। ইতিমধ্যে শ্বেতদ্বীপের শ্বেতভুজা ভারতী যখন তলব দিলেন তখন ক্রমশঃ বুঝ্‌তে পার্‌লুম এখানে আমাকে এখানকারই কাজ কর্‌তে হবে। সমুদ্রের ও-পারের বরাদ্দ বন্ধ হ'য়ে এসেছে। এখানে তো চিরদিন থাক্‌ব না; এই ক'দিনের মধ্যে এখানকার কাজ যতটা পারি শেষ ক'রে দিয়ে যেতে চাই। অতএব এখন তোমরা ডাক দিলে সাড়া পাবে না।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি ম্যাক্‌মিলনরা ছাপ্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ছে। ওরাই আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে। সুবিধা এই যে ইংলণ্ডে, আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ওদের কার্‌বার আছে। বোধ হয়, আর্থিক কিছু সুবিধা হ'তেও পারে। এবারকার বইগুলো তো সব বিকিয়ে গেছে—লোকে খুব উৎসুক হ'য়ে উঠেছে—সকলের ভালোও লেগেছে—অতএব এইবার যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবে আমার বিদ্যালয়ের অকাল ঘুচ্‌তেও পারে। এদেশে বোধ হয় লক্ষ্মী সরস্বতীর সতীন নন, কেননা এদেশে বহুবিবাহ আইন-বিরুদ্ধ—এই একটা মস্ত ভরসার কথা দেখা যাচ্ছে।

এদিকে তর্জ্জমা জ'মে উঠেছে। একবার লজ্জার বাঁধ ভাঙ্‌লে তখন ব্যাকরণের রক্তচক্ষুকে আর কে ভয় করে? ছেলেবেলায় যেরকম ক'রে দুই পায়ের চটি সাম্‌নের দিকে ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে চ'লে যেতুম, ঠিক তেম্‌নি-ভাবেই ইংরেজি ভাষার যত্রতত্র ছুঁড়্‌তে ছুঁড়্‌তে চলেছি—মোদ্দা, চলা বন্ধ করিনি। আজ এই খানিকক্ষণ হ'ল শারদোৎসব তর্জ্জমা ক'রে সেরেছি—কাল ওটা আরম্ভ করেছিলুম।

তুমি তো জানোই, এদেশের লোকেরা বক্তৃতার কাঙাল। যতই চেষ্টা করি না কেন, বক্তৃতা না ক'রে পার পাবার জো নেই। সেজন্যে কিছু কিছু লিখ্‌তে হচ্ছে। এ কাজটা আমার কাছে তেমন হৃদ্য নয়, অথচ এটার প্রয়োজন আছে। এদিকে ওদিকে নিমন্ত্রণ জুটছে—যতটা পারি কাটাবার চেষ্টায় থাকি—কিন্তু বাদ-সাদ দিয়েও বাকি থাকে—বক্তৃতার নিমন্ত্রণ তো বিনা-বক্তৃতায় সার্‌বার জো নেই, তাই প্রস্তুত হ'তে হচ্ছে—সাম্‌নে যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে কোথাও অবকাশের টিকিমাত্র দেখ্‌তে পাচ্ছিনে!

—বাবুর জন্যে আমি সত্যই দুঃখ বোধ করি। আমি এদেশে খ্যাতিলাভ কর্‌ব কল্পনাও করিনি, সুতরাং সেজন্যে অগ্রসর হ'য়ে আসিনি—দৈবক্রমে জুটে গিয়েছে। এই খ্যাতির সর্ব্বপ্রধান সুখ এই যে এতে ক'রে আমাদের দেশের লোকের মনে আনন্দ হবে—এ আমার একলার জিনিষ নয়। কিন্তু কোনো একজায়গায় দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে, সে আমারও দুঃখ।—বাবু যখন এ দেশে যশ উপার্জ্জন কর্‌বেন তখন আমি তাতে অন্তরের



প্লেটো এবং এরিস্‌টটল্‌

অমরশিল্পী—র‍্যাফেল

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

তে সুখী হবো, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। আমাদের দেশের যে-কেউ যেটুকু সফলতা লাভ করতে পেরেছেন সে যে আমাদের প্রত্যেকেরই।—বাবুর প্রতিভা কি তাঁর একলার সামগ্রী? তিনি যেখানে বৃহৎ সেখানে সে-মহত্ত্ব আমাদের সকলেরই, কিন্তু যেখানে তিনি ক্ষুদ্র, সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র। দস্যু রত্নাকরের পুত্র-পরিবারেরা তা'র ঐশ্বর্য্যের ভাগ নিয়েছিল, কিন্তু তা'র পাপের ভাগ নিতে তো পারেনি। চাঁদের জ্যোৎস্না সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তা'র কলঙ্ক তা'র নিজের বুকেই দাগা থাকে। আমার কবিতার মধ্যে অযোগ্য জিনিষ ঢের আছে, আমার বাঁশীর সকল রন্ধ্রেই যে উঁচু সুর বেজেছে তা নয়—আমার প্রকাশের স্রোতের মধ্যে পাপের মূর্ত্তিও যে প্রকাশ পায়নি একথা কখনই সত্য নয়—কিন্তু নদীর জলে কাদা মিশল থাকে ব'লে সেইটেই তো তার মুখ্য জিনিষ নয়—সেটা সত্ত্বেও যদি তা'র জল স্নানে পানে কাজে লাগে, তবে পৃথিবীসুদ্ধ লোক তো তাকে ক্ষমা করে—সেই ক্ষমা যদি—বাবুর কাছ থেকে একেবারে না পাই তবে আমার কবিত্বের গ্লানির চেয়ে তাঁরি চিত্তের গ্লানির জন্যে আমি বেশি বেদনা পাবো। এই গ্লানি কবে এবং কেমন ক'রে দূর হবে জানিনে, কিন্তু প্রার্থনা করি, এই কালিমা সম্পূর্ণ কাটিয়ে তিনি তাঁর প্রতিভাকে পবিত্র করুন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসীর জন্যে একটা কবিতা এই-স্থানে পাঠাই।

["কে নিবিগো কিনে আমায়
কে নিবিগো কিনে?"]

কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা আমার যতগুলি কবিতা ছাপিয়েছ কোনোটাই নির্ভুল হয়নি। বোধ হয়,পাণ্ডুলিপি কেউ নকল ক'রে দিয়েছিল এবং নকলে ভুল থেকে গিয়েছিল। কতকগুলো ভুল গুরুতর ছিল—কবিতার অর্থ বোঝা কেউ দরকার মনে করে না ব'লেই সেগুলো ধরা পড়েনি। যাই হোক্ কবিতার উপর এরকম অল্প-মাত্র নিষ্ঠুরতাও ব্যথাজনক।

[পোঃ মার্ক—শান্তিনিকেতন
৫ মার্চ, ১৩]

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু

তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি, কিন্তু এগুলো গান, সে-কথা মনে রেখো—সুর না থাকলে এ যেন নেবানো প্রদীপের মতো—এ তো ছাপ্‌তে দিতে ইচ্ছা করে না।

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হ'ল উতলা,
বুকের পরে দোলে রে তার
পরাণ-পুতলা।

এর মধ্যে তো কোনো আইডিয়া নেই। এর যে বাসন্তী চঞ্চলতা আছে, সেটি গানের সুরেই ব্যক্ত হচ্ছে—শাদা কথায় এর কোনো নেশা নেই—এইজন্যে কাগজে ছাপ্‌বার যোগ্য ব'লে এ'কে মনে করিনে। বরঞ্চ আর-একটা দিচ্ছি, সেটা যদিচ গান, তবু চল্‌তেও পারে।

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলা-শেষের তান।
পথে চলি, পথিক শুধায়
"কি নিলি তোর দান?"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেটা বক্তৃতা করেছিলুম সেটা তত্ত্ববোধিনীতে পাঠিয়েছি। লিখ্‌তে গিয়ে দেখ্‌লুম মনের মতো হ'ল না। তবু দ্বিজেন্দ্রের কাছে কপিটা কিম্বা ওর প্রুফ চেয়ে নিয়ে দেখো, যদি চলনসই মনে করো, তবে প্রবাসীতে নিতে পারো। কিন্তু ছাপ্‌বার কি সময় আছে? ইতি বৃহস্পতিবার।

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজ

শ্রী হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

(২)

আমি বরাবর টেক্‌স্ট্‌ বুকের সমস্তটার উপর প্রশ্ন লিখিয়া দিতাম; কোন শ্লোক বাদ দিতাম না—কোন শ্লোকটির সংস্কৃত টীকা লিখিতে দিতাম, কোনটির বা ইংরেজি অনুবাদ করিতে দিতাম। কোনটির বা বাচ্যপরিবর্ত্তন করিতে দিতাম, কোনটির বা মর্ম্মার্থ লিখিতে দিতাম; কোন শ্লোকের বা ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন লিখিতে দিতাম। ফলতঃ আমার প্রশ্নগুলির মধ্য হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলির অধিকাংশই প্রায়ই পড়িত। এজন্য খুব মনোযোগের সহিত ছাত্রেরা আমার প্রশ্নগুলি শুনিত ও লিখিয়া লইত। একদিন এমন সময় গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেব ও এসিস্‌টাণ্ট্‌ সেক্রেটারী ব্রজ বাবু পশ্চাতে আসিয়া যে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ছেলেরাও সাহেবকে দেখিয়াও চঞ্চল হয় নাই; নীরবভাবে প্রশ্নগুলি লিখিয়া লইতেছিল। সাহেব অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরে ব্রজবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন—"হরিশ! তুমি কি পড়াইতেছিলে? সাহেব তোমার ক্লাস দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তিনি হুগলি কলেজে সংস্কৃত পড়াইবার সময় বড় গোল হয় তাহা দেখিয়াছেন; কিন্তু এখানে আসিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। যাহা হউক, সাহেব তোমাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন। তুমি গিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা কর।" আমি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে আদর করিয়া চেয়ারে বসিতে বলিলেন, এবং ক্লাসে আমার শান্তিরক্ষার খুব প্রশংসা করিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

নিম্নে একটি ঘটনা লিখিলাম। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক বিচার করিয়া বলিবেন—আমি দোষী কি নির্দ্দোষী। পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক সংকলিত ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ নামক পুস্তকখানি প্রায় ১৬ বৎসরের অধিককাল প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য হইয়া চলিয়া আসিতেছিল। ঐ সময় মৎসংকলিত সংস্কৃতপাঠ প্রথম ভাগ নামক পুস্তকখানি অনেক স্কুলের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আমি উহার ২য় ভাগ সংকলিত করি। ঐ শেষোক্ত পুস্তকে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ হইতে গদ্য অংশ সংগৃহীত করিয়া এবং মহাভারত হইতে বক-রাক্ষস বধ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান পদ্য-অংশ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। এবং মোহমুদ্গর, নীতি-নিচয় প্রভৃতি নানা নীতিসূচক শ্লোকও দিয়াছিলাম। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের অনুমতি লইয়া আমি ঐ দ্বিতীয় ভাগ সংস্কৃতপাঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য হইবার উদ্দেশে সিণ্ডিকেটে পেশ করিয়াছিলাম। বইখানির সঙ্গে কে এম্‌ ব্যানার্জ্জি টনি সাহেব, গাফ্‌ সাহেব, হার্নলি সাহেব, এই ৪ জনের অভিমতগুলিও পাঠাইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ঐ বইখানিতে খুব ভাল অভিমত দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বোর্ড্‌ অফ্‌ সান্‌স্ক্রিট স্টাডিস্‌ ঐ বইখানি পছন্দ করিলেন না। তৎকালে ঐ বোর্ডে কে এম ব্যানার্জ্জি মহাশয়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইত্যাদি কয়েকজন সভ্য ছিলেন। প্রথমোক্ত ৪জন মেম্বার আমার পুস্তক মনোনীত করিলেন না। তাঁহারা সিণ্ডিকেটের উপর ভার দিলেন। তৎকালে সার্‌ এলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের প্রধান মেম্বর ছিলেন টনি সাহেব রেজিস্ট্রার ছিলেন; এবং ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এসিস্‌টাণ্ট্‌ রেজিস্ট্রার্‌ ছিলেন

আমি শেষোক্ত ব্যক্তির মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। টনি সাহেব যখন ঐ সংস্কৃতপাঠ ২য় ভাগখানি ও তৎসম্পৃক্ত মতগুলি ও বোর্ডের মতটি ক্রফ্‌ট্ সাহেবের হাতে দেন তখন এই বলিয়া দিয়াছিলেন,—"The opinion of an European is ten times valuable than the opinion of a native"। ক্রফ্‌ট্ সাহেব (যখন দেখিলেন যে সকল সাহেবই ঐ পুস্তকে ভাল মত দিয়াছেন তখন) 'Oh yes' এই বলিয়া সংস্কৃতপাঠ ২য় ভাগখানিকে ১ বৎসরের জন্য পাঠ্য করিয়া দিলেন। সিণ্ডিকেটে কোনরূপ বিচার উঠে নাই; নির্ব্বিঘ্নে আমার বইখানি মনোনীত হইল। ইহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। এবং তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য হইল দেখিয়া এবং প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম দেখিয়া কিছুকাল পরে আমি 'রূপকরত্নম্' নামে একখানি ফার্স্‌ট্ আর্ট্‌স্ পাঠ্য সংগৃহীত করিলাম। উহাতে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বেণী-সংহার প্রভৃতি নাটক হইতে সন্দর্ভ সকল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। উহাতে স্ত্রীলোকের বর্ণনা ছিল না; বীররস ও শান্তিরসের বর্ণনা ছিল। বইখানি সিণ্ডিকেটের সভায় পেশ্ করিবার পর পূর্ব্ববৎ ন্যায়রত্ন মহাশয়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জজ মহাশয়,এই তিন জনে মত দিলেন না। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সারদা মিত্র জজ মহাশয়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক মহাশয় এবং আর-একজন হাইকোর্টের উকীল, নাম গোলাপ শাস্ত্রীসরকার এম্-এ এই চার জনে মত দিলেন; বিশেষতঃ বঙ্কিম-বাবু আমার পুস্তকের জন্য খুব লড়াই করিয়াছিলেন। এ কথা আমি ত্রৈলোক্যবাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম। ত্রৈলোক্যবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বঙ্কিমবাবু তোকে এত ভালবাসে কেন?" আমি বলিয়াছিলাম, "বঙ্কিমবাবুর প্রথম তিনখানি পুস্তক অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ আমাদের ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছিল। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার দুইটি দৌহিত্র আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। এইরূপে 'রূপকরত্নম্' এক বৎসরের জন্য পাঠ্য হওয়াতে ন্যায়রত্ন মহাশয় আরও বিরক্ত হইয়া এই প্রস্তাব করিয়া লইলেন, যে, এখন হইতে আর কোন বাহিরের লোককে কোন পাঠ্য পুস্তক করিতে দেওয়া হইবে না; বোর্ডের মেম্বরগণ আপনারা পুস্তক প্রস্তুত করিবেন। তদনুসারে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এই তিনজনে একত্র হইয়া একখানি প্রবেশিকার পাঠ্য বাহির করিলেন। ঐ পুস্তকের পাদটীকা তাঁহারা সংস্কৃতে লিখিয়াছেলেন। ঐ পাদটীকা-সকলে দুইচারিটি সংস্কৃতব্যাকরণভুল হইয়াছিল। আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্র-নাথ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ এবং বঙ্গবাসী কলেজের স্কুল বিভাগের হেড পণ্ডিত শ্রীমান্ চন্দ্রোদয় বিদ্যা-বিনোদ এই দুই জনে "হিতবাদী" সংবাদপত্রের ৩টা সংখ্যায় ঐ ভুলগুলি ছাপাইয়া দেন, এবং ন্যায়রত্ন, নীলমণি ও কৃষ্ণকমল এই তিনটি নামের উপর রসিকতা করিয়া বেশ দুই চারিটি তামাসা করিয়াছিলেন। এ-সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, এবং এক কলমও লিখি নাই। হিতবাদী কাগজের ছাপা পাঠ করিয়া ন্যায়রত্ন-মহাশয় সার্ আলফ্রেড্ ক্রফ্‌ট্ ডিরেক্টর্ মহাশয়ের নিকট গিয়া এই কথা বলিলেন যে "কলিকাতার মধ্যে হরিশ ছাড়া এমন কোন পণ্ডিত নাই যে আমাদের তিন জন কর্ত্তৃক বিরচিত পুস্তকের দোষ ধরে। এসব কার্য্য হরিশের নিশ্চয়।" ন্যায়রত্ন-মহাশয় আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, তুমি এইগুলি লিখিয়াছ কি না। যদি জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে আমি প্রমাণ করিয়া দিতাম, যে, আমি উহা লিখি নাই। তিনি আমার নামে ঐরূপ দোষারোপ করিতেছেন শুনিয়া আমি শপথ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম যে, আমি উহার কিছুই করি নাই। তিনি চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে রসগোল্লা খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এ কার্য্য কে করিয়াছে, বল, হরিশ কি লিখিয়াছে?" চন্দ্রোদয় বলিয়াছিল—"মহাশয়, ইহা আমিই করিয়াছি; হরিশবাবু কিছুই করেন নাই। চন্দ্রোদয় আরও

বলিয়াছিল, "স্থায়রত্ন-মহাশয়, ভবী ভুলিবার নয়। অর্থাৎ আপনি যতই কেন রসগোল্লা খাওয়ান, আমি কলম ধরিতে ছাড়িব না।" এই কথা উক্ত পণ্ডিত আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুইটি লোকের কার্য্যে স্থায়রত্ন-মহাশয় আমার উপর এরূপ কুপিত হইয়া রহিলেন যে, আমাকে কিরূপে ঘোরতর অপদস্থ করিবেন মনে মনে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখুন, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্‌স্‌ট বুক্-সকলের উপর এক সেট প্রশ্ন খাতায় লিখিয়া রাখিতাম, এবং ঐগুলি সেকেণ্ড্ ইয়ারের ছাত্রদিগকে ডিক্‌টেট্ করিতাম। তাহারা ঐসকল প্রশ্ন লিখিয়া লইত। আমি প্রত্যেক শ্লোকের উপর প্রশ্ন করিতাম তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি। এক বৎসর নীলমণিকে ও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ফার্স্‌ট্ আর্ট্‌স্ সংস্কৃত পরীক্ষক করিল। নীলমণিকে সকালের পেপার্ ও আমাকে বৈকালের পেপার্ দিয়াছিল। তখন মডারেশন্ সিস্‌টেম্ ছিল। সুতরাং স্থায়রত্ন-মহাশয়, গুরুদাসবাবু ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য আমাদের মডারেটার্ হইলেন। আমাদের প্রশ্ন তাঁহারা পৃথক্ সময়ে দেখিয়া দিলেন। অর্থাৎ অগ্রে নীলমণিকে ডাকিয়া তাহার প্রশ্ন দেখিলেন। তখন আমাকে সেস্থানে থাকিতে দিলেন না। এবং আমার প্রশ্ন যখন দেখেন, তখন নীলমণিকে তথায় থাকিতে দিলেন না। এইরূপ লুকোচুরির ভিতর যে একটা গূঢ় রহস্য ছিল, তাহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। পরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। স্থায়রত্ন-মহাশয় আমার প্রশ্নের শ্লোকগুলি যেন গিলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ একটি একটি শ্লোক ৩।৪ বার আমাকে পড়িতে বলিলেন। কিন্তু আমার দত্ত প্রশ্নসকল যথাযথ মুখস্থ করিতে পারিলেন না। ঐদিন তিনি নিজ বাটী গিয়া যে কয়েকটি শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন, সেইগুলি একটা কাগজে লিখিয়া এবং নিজের মনগড়া একসেট প্রশ্ন লিখিয়া (কারণ আমার দত্ত প্রশ্নগুলি তাঁহার ঠিক মনে ছিল না) শীলমোহর করিয়া ঐ কাগজখানি "সঞ্জীবনী"র সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং বলিয়া দেন, যেন এই কাগজে লিখিত বিষয়-গুলি এখন ছাপা না হয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্‌ট্ আর্ট্‌স্ পরীক্ষা হইয়া গেলে যেন ছাপা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর যখন তিনি স্থায়রত্ন মহাশয়-প্রদত্ত শীলমোহর করা প্রশ্নগুলি ছাপিলেন তখন দেখিলেন যে, শ্লোকগুলির মিল আছে, কিন্তু প্রশ্নগুলির কোন মিল নাই। কারণ, ইতিপূর্ব্বে আমি বলিয়াছি যে, তিনি আমার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দত্ত প্রশ্নগুলি মনে করিয়া রাখিতে পারেন নাই। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজের সঙ্গে তাঁহার দত্ত কাগজের ঠিক মিল হয় নাই। কিন্তু স্থায়রত্ন মহাশয় ক্রফ্‌ট্ সাহেবের নিকট গিয়া বলিলেন যে, হরিশ নিজের ছেলেদিগকে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছে, অতএব তাহার বিচার করা উচিত। বিচারে যদি দোষী প্রমাণীকৃত হয়, তবে তাহাকে ডিপার্ট্‌মেণ্ট হইতে দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্রফ্‌ট্ সাহেব, টনি সাহেব, গুরুদাসবাবু, এবং এ এম বোস, এই ৪ জন বিচারক স্থিরীকৃত হইল; এবং একদিন রাত্রি ১০টার সময় রাইটার্স্ বিল্ডিংসে হাজির হইতে আমার উপর হুকুম হইল। আমি ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইলাম। আমি গিয়া শুনিলাম যে, ইতিপূর্ব্বে আমার ৮ জন ছাত্রকে তলব দিয়া আনা হইয়াছিল। সকলেই বলিয়াছিল—পণ্ডিত-মহাশয় আমা-দিগকে কিছুই বলেন নাই। তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসর ছাত্রদিগকে যে-সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছিলেন, আমা-দিগকেও সেইসকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছেন, বেশী কিছু দেন নাই। শুনিলাম, বিচারকগণের একজন এক ছাত্রকে বলিয়াছিলেন, তোমাকে যদি ডেপুটি ম্যাজিস্‌ট্রেট্ করিয়া দেওয়া হয়, তবে তুমি তোমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের নামে কোন দোষ আছে কি না, সত্য বলিতে পার কি না? সে নাকি বলিয়াছিল—আপনি যদি আমাকে হাই কোর্টের জজ করিয়া দেন, তথাপি আমি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের কোন দোষ দিতে পারি না। শুনিলাম, কেহ কেহ লিখিত খাতা আনিয়া প্রমাণ করিয়াছিল, যে "আমাদের পণ্ডিত-মহাশয় নির্দ্দোষ।" এইরূপ আমার অগোচরে আমার ৮ জন ছাত্রের সাক্ষ্য লইয়া বিচারকগণ বসিয়া ছিলেন, এমন সময় আমি তথায় গিয়া উপস্থিত হই। এ এম্ বোস আমাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যে-সকল প্রশ্ন সেকেণ্ড্ ইয়ার্ ক্লাশে ছাত্রদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন সেগুলি কই? আমি আমার খাতা লইয়া গিয়াছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেইখানি এ এম বোসকে দিলাম, এবং বলিলাম যে, আপনি দেখুন যে সংস্কৃত টেক্স্‌ট্‌ বুক্ বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই পুস্তকের ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি সকল শ্লোকেরই উপর প্রশ্ন দিয়াছি। একটি স্ট্যান্‌জাও ছাড়ি নাই। এ এম্ বোস দেখিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—হ্যাঁ, দেখিতেছি সকল শ্লোকের উপর আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি বলিলাম—দেখুন, আমি ক্লাসে যেরূপ প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাপত্রে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ প্রশ্ন দিয়াছি। দেখুন, ক্লাসে যে-শ্লোকে Explain in Sanskrit প্রশ্ন দিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে সে শ্লোকে Translate into English দিয়াছি। এইরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন দেখিবেন। এই সময় গুরুদাসবাবু বলিলেন—"Still the stanza is the same." ইহাতে এ এম বোস বলিয়া উঠিলেন, "গুরুদাসবাবু, আপনি জজ, বিচার করিয়া বলুন দেখি, হরিশবাবু যখন সকল স্ট্যান্‌জার উপরই প্রশ্নাদি করুছেন, তখন তিনি নূতন স্ট্যান্‌জা কোথায় পাইবেন? তিনি ত কালিদাস নন, যে নূতন স্ট্যান্‌জা গড়িবেন। আর গড়িলেই বা আমরা সে স্ট্যান্‌জা অনুমোদন করিব কেন? সেগুলি ত আমাদের নির্দ্দিষ্ট টেক্স্‌ট্‌, নহে। অতএব উঁহাকে একটা না একটা স্ট্যান্‌জা উদ্ধৃত করিতেই হইবে। তবে আমাদের এই দেখা কর্ত্তব্য যে, উনি ক্লাসে যে-সকল প্রশ্ন লিখিয়া দিয়াছেন, সেগুলির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে দত্ত প্রশ্নের একটিও মিলিয়াছে কি না। যদি না মিলিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে আমরা দোষী করিতে পারি না। ইহাতে গুরুদাসবাবু আবার বলিলেন—"It was not fair on the part of Pandit Kaviratna to set questions on the text-book।" ইহাতে এ এম্ বোস, টনি সাহেব ও ক্রফট্ সাহেব সকলেই বলিয়া উঠিলেন—"He has done his duty as a Professor. A Professor must point out difficult and important passages to his students." আমার মনে হয় ক্রফট্ সাহেব বলিয়াছিলেন—"I did such things when I was a Professor in the Presidency College।" ইহাতে গুরুদাসবাবু আর কিছু বলিলেন না। নীরব হইয়া রহিলেন। ইহাতে ক্রফট্‌ সাহেব নিজ টেবিলে একটি দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Haris is honourably acquitted." টনি সাহেব বলিলেন, "O yes, he is honourably acquitted." ইহার পর আমি সকলকে লম্বা সেলাম দিয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম, এবং ঐ রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা গিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি ক্যাল্‌কাটা গেজেটে দেখিলাম—আমি প্রভিন্সিয়াল্ গ্রেডে উন্নীত হইয়াছি ও ২০০৲ টাকা বেতন হইয়াছে। আমাদের কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মিস্‌টার স্ট্যাক্ সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন—"Haris, do'nt fear. Sir Alfred Croft has told me that he has understood everything. When Haris can find out the mistakes of even Pandit Mahes Nyayaratna, he must be promoted." আমি বুঝিলাম ভগবান্, আমার প্রতি কৃপা করিয়া ক্রফ্‌ট্‌ সাহেব দ্বারা আমার উন্নতি করিয়া দিলেন।

এস্থলে আমার বক্তব্য এই—ন্যায়রত্ন মহাশয় যে আমার উপর জাতক্রোধ হইয়া আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে। সম্ভবতঃ তিনি কর্ত্তব্য-বোধেই ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি আমার নামে যেরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণনগর কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক মিস্‌টার হিল্ নামে একজন সাহেবের নামেও ঐরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। হিল্ সাহেব ডিরেক্টর সাহেবের নিকট আসিয়া কিরূপ বলিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না। আমি শুনিয়াছি মাত্র (সত্য-মিথ্যা জানি না) ডিরেক্টর্ সাহেব যখন বলেন, "তুমি ছাত্রদিগকে প্রশ্ন বলিয়া দিয়াছ? তাহাতে হিল্ সাহেব নাকি বলিয়াছিলেন—It is a happy coincidence. যাহা হউক ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় পূর্ব্বে ভালবাসিতেন; এবং আমার অনেক বিপদ্ নিবারণ করিয়াছিলেন।

একবার তিনি আমাকে বলেন, "হরিশ, তুমি তোমার ছাপাখানার কোন পুস্তকে তুমি প্রিণ্টর বলিয়া ছাপিও না। তাহা হইলে গবর্ণ্মেণ্ট্ তোমাকে পেন্‌সন্ দিবেন না। আমি ইঁহাকে শত শত ধন্তবাদ দিয়াছিলাম। আর একবার যখন টনি সাহেব আমাকে হেয়ার স্কুলে হেডপণ্ডিত করিতে স্থির করিয়াছিলেন, তখন আমি চাকরি ত্যাগ করিব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া স্তায়রত্ন মহাশয় ডিরেক্‌টর্-সাহেবের নিকট গিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং আমায় কোথায়ও যাইতে হয় নাই। তখন আমি স্তায়রত্ন-মহাশয়কে আমার পরম-হিতৈষী বলিয়া ধন্তবাদ দিয়াছিলাম। আর-একবার যখন ডিরেক্‌টর্-সাহেব আমাকে ঢাকায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন স্তায়রত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডিরেক্‌টর্-সাহেবকে এরূপ বলিয়াছিলেন যে, আমাকে ঢাকায় যাইতে হয় নাই। এইসকল করিয়া তিনি আমার চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছিলেন।

গুরুদাস-বাবুও বিচারাসনে বসিয়া যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেগুলিতে আমার উপকারই করা হইয়াছিল। কারণ তাঁহাদের তর্কবিতর্ক শুনিয়া ডিরেক্‌টর্ সাহেব বুঝিয়াছিলেন, যে আমি নির্দোষ। গুরুদাস-বাবু আমাকে খুব ভালবাসিতেন এবং আমিও তাঁহাকে বরাবর আন্তরিক সম্মান করিতাম।

প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন রো-সাহেব প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখন অখিলচন্দ্র গুপ্ত নামে একজন কেশিয়ার কতকগুলি টাকা অপহরণ করিয়াছিল। এই বিষয়টি লইয়া তৎকালে সংবাদপত্রে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণ্মেণ্ট্ মাদ্রাজ হইতে একজন অডিটার্ আনাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের খাতাপত্র অডিট্ করিতে হুকুম দেন। সে-ব্যক্তি আমাদিগকে খাতা দেখাইয়া বলিলেন—"দেখুন মহাশয়গণ, কিরূপ ভয়ঙ্কর চুরি। কেশিয়ার-বাবু খাতার এক পৃষ্ঠের নীচে যে টাকা জমা করিয়াছেন, খাতার ঐ পৃষ্ঠা উন্টাইয়া দেখা গেল—তাহার মধ্য হইতে প্রথম নম্বরটি বাদ দিয়া শেষ ৩টি নম্বর তুলিয়াছে। রো সাহেব তাহা পরীক্ষা না করিয়া পরপৃষ্ঠায় সই করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতেছি। পাঠক মহাশয় মনে করুন—৫ম পৃষ্ঠের শেষ লাইনে ২৩৬৭॥৹ এইরূপ আছে। কেশিয়ার-বাবু পাতাটি উন্টাইয়া যখন ঐ নম্বর তুলেন, তখন প্রথম নম্বরটি (অর্থাৎ ২টি) না তুলিয়া কেবল ৩৬৭॥ এই নম্বরটি তুলিলেন। ইহাতে একেবারে দুই হাজার টাকা আত্মসাৎ করিলেন। এইরূপ প্রতি পৃষ্ঠা উন্টাইবার সময় দুই এক হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এইরূপে অডিটার্ অনেক হাজার টাকা তছরূপ হইয়াছে দেখাইল, এবং গবর্ণ্মেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিল, যে কেশিয়ার্-বাবু যাহা করিয়াছেন, রো সাহেব তাহা তদারক না করিয়া সই করিয়াছেন। এইটুকু তাঁহার দোষ হইয়াছিল; তাঁহার উচিত ছিল, দেখিয়া শুনিয়া সহি করা। গবর্ণ্মেণ্ট্ এই রিপোর্ট পাইয়া হুকুম দিলেন—কেশিয়ার-বাবুর যেখানে যে-সম্পত্তি আছে সকলগুলি বিক্রীত হইয়া গবর্ণ্মেণ্টের তহবিলে জমা হউক এবং রো সাহেবের বেতন হইতে প্রতিমাসে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা কাটিয়া লইয়া গবর্ণ্মেণ্টের তহবিলে জমা হউক। যখন এই হুকুম বাহির হয় তখন অখিলবাবু (কেশিয়ার) কোথায় পলাইয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না। গবর্ণ্মেণ্ট্ হুকুম দিলেন, টিক্‌টিকি পুলিশ কেশিয়ারকে ধরিবার চেষ্টা করুক। আর রো-সাহেব সেই সময় দার্জ্জিলিঙে গিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট এই হুকুম গেল যে, প্রতি মাসে ৫০০৲ টাকা তাঁহার বেতন হইতে কাটা যাইবে ও গবর্ণমেণ্ট্ তহবিলে জমা হইবে। আমরা শুনিয়াছিলাম—এই হুকুম প্রাপ্ত হইয়া রো-সাহেব (সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন) পাগল হইয়াছিলেন। এবং যে লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত, তিনি তাহাকে কামড়াইতে যাইতেন। তাঁহার মেম বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি গবর্ণ্মেণ্টের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, "আমার স্বামী রো-সাহেব পাগল হইয়াছেন, আমি তাঁহাকে অরোগ করিবার জন্ত বিলাতে যাইব; সুতরাং আমার স্বামীকে ছুটি দেওয়া হউক।" বলা বাহুল্য—রো সাহেব আর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন নাই এবং টাকাও দেন নাই।

এই রো-সাহেবের আমলে একজন লাইব্রেরিয়ান্

কতকগুলি বই বিক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি নূতন বই-গুলি যখন ক্রয় করা হইত তখন সেগুলির রীতিমত জমা-খরচ রাখিতেন না; অর্থাৎ ৫খানা বই ক্রয় করা হইল; তিনি ৩খানা জমা করিলেন, ২খানা স্বয়ং বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে অনেক টাকার পুস্তক বিক্রয় করিয়াছিলেন। যখন রো সাহেব এই সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি লাইব্রেরির চাবি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এবং লাইব্রেরিয়ান্-বাবুর নামে নালিশ করিলেন। লাইব্রেরিয়ান্-বাবু আদালতে গিয়া বলিয়া আসিলেন, যে-দিন পর্য্যন্ত লাইব্রেরির ঘরের চাবি আমার নিকট ছিল, সেদিন পর্য্যন্ত আমি পুস্তকের হিসাব দিতে বাধ্য। কিন্তু যেদিন হইতে রো-সাহেব আমার নিকট হইতে চাবি স্বয়ং লইয়াছেন, সেদিনের পর যদি কিছু চুরি গিয়া থাকে, তাহার জন্ত আমি দায়ী নহি। মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া যায়।

এদিকে গবর্ণমেণ্ট্ অখিলবাবুর যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই বিক্রয় করিয়া লইলেন। এবং অল্প দিনের পর নেপাল হইতে তাঁহাকে টিকৃটিকি পুলিশ ধরিয়া আনে এবং তাঁহার ১৸৹ দেড় বৎসর মেয়াদ হয়।

রো-সাহেবের সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে নাটক অভিনয় হইত। ছাত্রেরা বেশভূষা করিয়া কোন বৎসর হ্যাম্‌লেটের কোন অঙ্ক অভিনয় করিত; কোন বৎসর মিড্ সামার্ নাইট্‌স্ ড্রিমের এক অঙ্ক বা দুই অঙ্ক অভিনয় করিত। কোন বৎসর ওথেলোর এক অঙ্ক অভিনয় করিত। প্রতিবৎসর এই কার্য্য হইত স্টার থিয়েটারের অমৃতবাবু আসিয়া বেশভূষা করিয়া দিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর দিকের উঠানে ছাত্রেরা জিম্‌নাস্টিক করিত। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

মিস্টার লিট্‌ল্ যখন প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন, তখন আমার সহিত তাঁহার একটু মনোমালিন্ত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রতিবৎসর ফার্‌স্ট্ ইয়ার ও থার্ড্ ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষা হইত। সেবৎসর আমি ও মৌলভী ও লিট্‌ল্-সাহেব গার্ড্ দিতেছিলাম। তেতালার হলঘরের উত্তর দিকে মৌলভী সাহেব, এবং দক্ষিণ দিকে আমি, ও মধ্যস্থলে লিট্‌ল্-সাহেব গার্ড্ দিতেছিলেন। লিট্‌ল্ সাহেব মধ্যস্থলে একখানি চেয়ারে বসিয়া একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি মৌলভী ও আমাকে ক্রমান্বয়ে উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে গার্ড্ দিতে হুকুম করিলেন; এবং স্বয়ং মধ্যস্থলে থাকিবেন এরূপ কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, যদি আপনার এলাকার মধ্যে কোন ছাত্র অপর ছাত্রের সহিত কন্‌সাণ্ট্ করে বা পুস্তক দেখে তাহা হইলে আমরা আপনার এলাকার মধ্যে যাইতে পারিব কি না? লিট্‌ল্ সাহেব বলিলেন—"By no means." আমি বলিলাম, "সাহেব, আপনি প্রেসিডেন্সী কলেজের নিয়ম জানেন না; এই হলে আমরা ৩ জনেই সমান।" তাহাতে লিট্‌ল্-সাহেব একটু ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে কহিলেন, "Do you question my authority?" আমি কহিলাম—"হাঁ, সাহেব।" তিনি ঐ কথা ৩ বার বলিলেন। আমিও ৩ বার ঐরূপ উত্তর দিলাম। তাহাতে তিনি রাগিয়া টক্‌টক্ করিয়া জুতার শব্দ করিয়া আমার নামে নালিশ করিতে প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেবের নিকট গেলেন, এবং তাঁহাকে কি বলিলেন তিনিই জানেন। ক্ষণকাল পরে লিট্‌ল্ সাহেব আমাদের হলে ফিরিয়া আসিলেন এবং তৎপশ্চাৎ একটি বেহারা আসিয়া আমাকে কহিল—"পণ্ডিতজি, বড়া-সাহেব আপ্‌কা সেলাম দিয়া।" তাহা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ টনি সাহেবের নিকট গেলাম। টনি-সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিশ, কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম,—"আপনি কি আমাদের দুজনকে লিট্‌ল্-সাহেবের চাকর করিয়া পাঠাইয়াছেন?" টনি-সাহেব কহিলেন, "By no means. You are all equal in the hall." আমি বলিলাম,—"তবে লিট্‌ল্-সাহেব আমাদিগকে তাঁহার চাকরের ন্তায় ব্যবহার করিতেছেন কেন?" টনি সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, কাল আমি ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত করিব।" পরদিন হইতে আমাদের ৩ জনকে ৩টি পৃথক্ ঘরে গার্ড্ দিতে হুকুম করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিন লিট্‌ল্ সাহেব কলেজে আসিয়া অগ্রেই আমাকে বলিলেন,—"Good

morning, pandit." আমিও কহিলাম, "Good morning, Mr. Little." তাহার পর হইতে লিটল্ সাহেব আমাকে একটু ভালবাসিতে লাগিলেন, কেন জানি না। ঐ বৎসর আমার সঙ্কলিত "রূপকরত্নম্"-নামে একখানি বই ফাস্ট্ আর্টসের পাঠ্য হইয়াছিল। আমি বেণীসংহার নাটকের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। Little-সাহেব ঐ শ্লোকটি বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিলেন। আমি যখন আমাদের বসিবার ঘরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি কি পড়াইতেছিলে, আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, আমাকে সংস্কৃত পড়াইতে হইবে।" আমি একখানি মৎপ্রণীত সংস্কৃত পাঠ ১ম ভাগ আনাইয়া তাঁহাকে দিলাম এবং বলিলাম,—"সাহেব! অগ্রে বর্ণমালা শিক্ষা কর।" তিনি ২।৩ দিনের মধ্যে ক খ শিখিয়া আমাকে বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি বর্ণমালা শিখিয়াছি, আমাকে বই পড়াও।" যাহা হউক তিনি প্রায় এক মাস সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত, আমাকে একটি শ্লোক শিখাও"। আমি তাহাকে হরে মুরারে মধুকৈটভহারে ইত্যাদি শ্লোকটি শিখাইয়াছিলাম। লিট্‌ল্ সাহেব স্কচ্‌ম্যান্ ছিলেন; সুতরাং তিনি "হরে" ইত্যাদি স্থানে "হড়ে" "মুড়াড়ে" বলিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ফুটবল খেলার একটি দল ছিল। গণিতজ্ঞ বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্-এ ঐ দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। কখন কখন ঐ দল গড়ের মাঠে খেলিতে যাইত। সেই দিন ছুটি হইত। সুতরাং আমরাও তাহা দেখিতে যাইতাম। ঐ সময় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ঐ দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

তখন ছোটলাট বাংলা শাসন করিতেন। নূতন শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলে প্রায় প্রত্যেক ছোটলাট প্রেসিডেন্সি কলেজ দেখিতে আসিতেন। আমার মনে হয়, একবার একজন ছোটলাট আমাদের সকলের সঙ্গে শেক্‌হ্যাণ্ড্ করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। কোন্ ছোটলাট আমার মনে নাই। তিনি জে সি বোসের একটি বেহারার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া তাহার ডবল বেতন বাড়াইয়া যান। বেহারার নাম নন্‌কু। সে ইংরেজি পড়ে নাই, কিন্তু সব ঔষধের শিশি চিনিত। উক্ত ছোটলাট নন্‌কু বেহারাকে যে শিশি আনিতে বলিয়াছিলেন, সে তৎক্ষণাৎ সেই শিশি আনিয়াছিল। তাহাতে ছোটলাট তাহাকে Mr. Nanku বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। ঐ বেহারার তৎকালীন আনন্দপূর্ণ মুখখানি আমার এখনও মনে পড়ে।

একসময় কোন ছোটলাট, (আমার স্মরণ হয় না।) প্রেসিডেন্সী কলেজ দেখিতে আসেন। এবং আমার ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা সকলে সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সম্মান করিবার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি পড়াইতেছেন?" আমি কহিলাম—"রঘুবংশ।" তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন—"আমরা পড়িয়াছি, 'আসীদ্রাজা নলো নাম'।" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ"। তখন তিনি চলিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"Sanskrit is a very difficult language."

সেকালের প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা শিক্ষকগণের অতিশয় বাধ্য ছিল। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমার আদেশানুসারে ছাত্রেরা রব্‌সন্-সাহেবকে নিষ্কৃতি দিয়াছিল। একবার কোন সাহেব-অধ্যাপক ছাত্রদিগকে stupid, goose বলিয়াছিলেন। ছেলেরা বিপিন-বাবু ও আমাকে ঐ কথা জানাইলে আমরা পরদিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে ঐ কথা জানাই। প্রিন্সিপ্যাল উক্ত প্রোফেসরকে বাড়ীতে ডাকাইয়া এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, পরদিন উক্ত প্রোফেসর-সাহেব ক্লাসে আসিয়া 'you gentlemen!' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ছেলেরা ঐ কথা আমাদিগকে জানাইয়াছিল। আমি ছেলেদিগকে বলিতাম, তোমরা কখন মাতাকে ইংরেজিতে পত্র লিখিও না। কারণ বাঙ্গলায় যেরূপ ভক্তিবাচক শব্দ আছে, ইংরেজিতে তাহা নাই। ইংরেজিতে মাকে ও স্ত্রীকে একরূপ কথায় সম্বোধন করিয়া থাকে, যথা—My dear mother ও My dear wife ইহা আমাদের কর্ণে বড় বিসদৃশ লাগে।

ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক রমানাথ সরস্বতীর পরলোক হইবার পর ক্রফট্ সাহেব আমাকে ঢাকা

পাঠাইবার কথা বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া আমার ছাত্ররা তাঁহাকে যে পত্র লিখে, তাহা পড়িয়া ক্রফ্‌ট্‌-সাহেব তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ল ক্লাস ছিল, তথায় ৩ বৎসর পড়িতে হইত। যে বৎসর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ল পড়েন, তখন আমিও ঐ সঙ্গে ল' পড়ি। আমার মনে পড়ে তিনি আমাদের হাজিরা করিতেন। মাননীয় স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের কিছু পূর্ব্বে ল পড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরে অনেকদিন ল লেক্‌চারার্‌ ছিলেন, এবং তথায় প্র্যাক্‌টিস্‌ করিয়া পরে কলিকাতায় হাই কোর্টে আসেন। আমার একজন সহাধ্যায়ী স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ বহরমপুরে গিয়া প্র্যাক্‌টিস্‌ করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তথায় একটি বাটীও করিয়াছিলেন।

তৎকালে হাইকোর্টের ইন্টারপ্রেটার্‌ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার নামক একজন কৃতবিদ্য মনীষী প্রেসিডেন্সী কলেজে হিন্দু ল ও মুসলমান ল লেক্‌চার দিতেন। আর-একজন সাহেব রোমান ল ও জুরিস্‌ প্রুডেন্স্‌ পড়াইতেন। কিছু দিন পরে শ্যামাচরণ বাবুর স্থানে একজন সাহেব নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় ব্যবস্থাদর্পণ ও ব্যবস্থাচন্দ্রিকা রচনা করেন। ঐ কার্য্যে আমি প্রায় ২০ বৎসর তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম।

একবার পেড্‌লার সাহেব যখন কয়েক মাসের জন্য অফিশিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন, তখন ঠিক ৺পূজার পূর্ব্বে কলেজের ক্যাশ বাক্স হইতে ১২৫৲ টাকা চুরি যায়। ঐ ঘরের বেহারা ঐ কাজ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহাকে ধরিতে পারা গেল না। সুতরাং ঐ টাকা এসিস্টান্ট্‌ সেক্রেটারি ব্রজবাবুকেই দিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেন্টের টাকা। এসিস্টান্ট্‌ সেক্রেটারী দায়ী; কারণ তাঁহার হাতবাক্স হইতে ঐ টাকা চুরি গিয়াছিল; কেশিয়ারের বাক্স হইতে চুরি গেলে কেশিয়ারকেই দিতে হইত। ৺দুর্গাপূজার পূর্ব্বে নিজ পকেট হইতে ১২৫৲ টাকা দিয়া ব্রজবাবু সাশ্রুনয়নে অফিশিয়েটিং প্রিন্সিপ্যাল পেড্‌লার সাহেবকে জানাইলেন যে, "মহাশয়! আমার বাড়ী ৺দুর্গাপূজা হইবে; আমি যদি এই টাকা নিজ বেতন হইতে দিই, তবে ৺ মায়ের পূজা হইবে না। পেড্‌লার সাহেব সমস্ত শুনিয়া পরদিন ব্রজবাবুকে ডাকিয়া একখানি ১০০৲ টাকার নোট দিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি মায়ের পূজা কর।" ব্রজবাবু সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সাহেব তাঁহাকে ধার দিলেন। কিন্তু ৺পূজার ছুটির পর যখন ব্রজবাবু বেতন পাইয়া ঐ ১০০৲ টাকা পেড্‌লার সাহেবকে দিতে গেলেন, তখন পেড্‌লার্‌ সাহেব বলিলেন, "ব্রজবাবু, ও টাকা দিতেছ কেন? আমি তোমাকে ত ধার দিই নাই, তুমি যখন বলিয়াছিলে, যে, ৺মায়ের পূজা হইবে না, তখন আমি ঐ পূজার জন্যই ঐ ১০০৲ টাকা দিয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া ব্রজবাবু কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমরা এই কথা শুনিয়া পেড্‌লার সাহেবকে মনে মনে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। সাহেব যদিও দুর্গা-ঠাকুর মানেন না, কিন্তু আমরা তাঁহার হৃদয়ের ভাব দেখিয়া অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলাম। একবার একটি বেহারার একটি টাকা হারাইয়া যায়। বেহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পেড্‌লার সাহেবকে জানাইল, "হুজুর আমার একমাসের খোরাক কম পড়িবে।" সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তুমি কাঁদিও না, এই লও"। এই কথা বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিলেন। সে শত শত বার ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল। পেড্‌লার সাহেবের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। তাঁহার হৃদয় অতি দয়ার্দ্র ছিল। তিনি আমাকে ২ বৎসর এক্‌স্‌টেন্‌শন্‌ দিয়াছিলেন বলিয়া আমি অর্দ্ধেক পেন্‌সন্‌ পাইয়াছিলাম; নতুবা একের তিনভাগ বই পাইতাম না। একবার ডাঃ জে সি বোস নিজের বক্তৃতা-গৃহের পশ্চিম পার্শ্বে একটি কাষ্ঠ ও কাচ দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ কোন বাঙ্গালী কন্‌ট্রাক্‌টার্‌ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমরা গ্রীষ্মের ছুটির পর আসিয়া দেখিলাম মাঠের ধারে একটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার এঞ্জিনিয়ার্‌ সাহেব তাহা দেখিয়া বলিলেন, "উহাতে বাড়ীর সামঞ্জস্য থাকিবে না; অতএব ঐ ঘরটি ভাঙ্গিয়া

ফেল"। বলা বাহুল্য, ঐ ঘর করিতে যে খরচ পড়িয়াছিল, তাহা ডাক্তার জে সি বোসকে নিজ হইতে দিতে হইয়াছিল।

সেকালে 'শিবরাত্রি'র জন্ত গবর্ণ্মেণ্ট্ ছুটি দিতেন না। কিন্তু টনি সাহেব যখন জানিতে পাইলেন, যে, ঐ উপবাস অনেক ছেলেরা করে, এবং ব্রজবাবু ও আমি করি, তখন হইতে ১ ঘণ্টা মাত্র কলেজ হইতে লাগিল; অর্থাৎ ১১টার পর ১ ঘণ্টা কলেজ হইয়া ১২টার সময় বন্ধ হইতে লাগিল। সাহেব প্রোফেসররা ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—১ ঘণ্টা কলেজ হইবার অর্থ কি? আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, যে 'শিবরাত্রি'তে হিন্দুরা ৩৬ ঘণ্টা আহার করেন না; অথচ এইটি গেজেটেড্ হলিডে নহে, সুতরাং প্রিন্সিপ্যাল সমস্ত দিন কলেজ বন্ধ রাখিতে পারেন না,—(তাহা করা তাঁহার অধিকার নহে), কিন্তু ছাত্রগণ ও প্রোফেসরদিগের সুবিধা করা তাঁহার অভিপ্রেত, এইজন্ত ঐরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। লিট্‌ল্ সাহেব শুনিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "You Pandit! you do not take a single drop of water for 36 hours." আমি বলিয়াছিলাম, "না, সাহেব।" লিট্‌ল্ সাহেব শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, "We would die then." আমি বলিয়াছিলাম, "সাহেব, আমরা হিন্দু, আমরা উপবাস খুব করিতে পারি। আমরা উপবাস না করিয়া কোন দেবতার উপাসনা করি না।"

একদিন লিট্‌ল্ সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত, আমি দেখিতেছি—তোমার জলখাবার কুঁজা ও গেলাস পৃথক্ স্থানে রক্ষিত হয়। তুমি আমাদের গেলাসে জল খাও না কেন? আমি জানি তোমার মতামত উদার। তবে তুমি কি জাতিভেদ বলিয়া খাও না; অথবা অন্ত কোন কারণ আছে?" আমি কহিলাম, "সাহেব, তোমার প্রশ্নে আমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি যে সকলের গেলাসে জল খাই না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। মনে করুন, যদি কোন ব্যক্তির মুখের ভিতর এমন ক্ষত থাকে, যে, তাহা সংক্রামক। তাহার ওষ্ঠে, দন্তে ও কণ্ঠে যদি কোন ক্ষত থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে গেলাসে জল খায়, সে গেলাসে যদি অপর কোন ব্যক্তি জল খায়, তবে পরোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মুখের রোগে আক্রান্ত হয়। এইজন্ত আমাদের প্রাচীন ঋষিরা নিজ সংহিতাতে লিখিয়া গিয়াছেন, মাতা, কন্যা ও স্ত্রী এই তিনজন ভিন্ন অন্ত কাহাকর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন খাওয়া উচিত নহে। যদি পূর্ব্বোক্ত ৩ জনের মধ্যে কেহ না থাকেন তবে স্বয়ং পাক করিয়া খাওয়া উচিত। এইরূপ শাসনের নিগূঢ় কারণ আছে। ঋষিরা বিনাকারণে কোন কথা লিখেন নাই। সাহেব, আমি এই কারণে কাহারও উচ্ছিষ্ট জল বা অন্ন খাই না। আমি কিপ্রকারে জানিব যে, আপনার মুখের মধ্যে কোন রোগ আছে কি না। মিঃ গাফ্ নামে একজন সাহেব ফিলজফি পড়াইতেন। তাঁহার সহিত রি-বার্থ (অর্থাৎ পুনর্জন্ম) সম্বন্ধে আমার তর্কবিতর্ক হইত। আমি তাঁহাকে বলিতাম কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে ধনী ও নির্ধন, জ্ঞানী ও মূর্খ ইত্যাদির সমন্বয় করা হয় না। ভগবানকে ন্যায়পরায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি পক্ষপাতী নহেন। অনেক তর্কের পরে সাহেব স্বীকার করিতেন যে, কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না।

ইউরোপে অস্ট্রিয়া নামে একটি দেশ আছে। তথায় গ্র্যাজ্ ইউনিভার্সিটি নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একবার ঐ স্থান হইতে আমার উপর দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠায়। ১ম—অনুস্বার ও বিসর্গের স্থান কোথায়? ২য়—মিরাক্‌ল্ প্রমাণ করিতে পার কি না। আমি পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ হইতে অনুস্বার ও বিসর্গের স্থান লিখিয়া দিলাম,—যে, ঐ দুইটির স্থান স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে। কারণ দেখাইয়া দিয়াছিলাম। ২য় প্রশ্ন অর্থাৎ মিরাক্‌ল্ প্রামাণ করিবার জন্ত আমি ঋক্ বেদের ও অথর্ববেদের অনেক স্থান ও তন্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম, এবং যোগশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ দিয়াছিলাম, যে, মিরাক্‌ল্ সত্য হইতে পারে।

তৎকালের ছাত্রেরা সাহেব প্রোফেসরদিগকে ভয় করিত, এবং বাঙ্গালী প্রোফেসরদিগকে ভক্তি করিত। একটি দৃষ্টান্ত

আমার মনে পড়িতেছে। একদিন লিট্ল্ সাহেব ও আমি তেতালার সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছি, ঐ সময় ফোর্থ্ ইয়ারের ছাত্রেরা তাড়াতাড়ি করিয়া আমাদের ঘাড়ে পড়িয়া নীচে নামিতেছিল! ছাত্রদিগকে আসিতে দেখিয়া আমি সিঁড়ির একধারে দাঁড়াইলাম, সাহেব কিন্তু মধ্যস্থল দিয়া নামিতে লাগিলেন। একটি ছাত্রের হাত সাহেবের হাতের সহিত সজোরে ঠ্যাকাঠেকি হওয়াতে সাহেব তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "Who are you?" সে কহিল, "আমি ফোর্থ্ ইয়ারের ছাত্র।" সাহেব কহিলেন—"I fine you fifteen rupees." ছাত্রটি ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে সাহেব তাহাকে ক্ষমা করিলেন।

[ভ্রমসংশোধন—প্রবাসী (১ম খণ্ড, ১৩৩২) ৮৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শ্লোকার্দ্ধের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ হইবে—

তথাহি সানৌ মলয়স্ত নাস্ততো।
মনোহরশ্চন্দন এব রোহতি॥]

জীবনের মূল্য

শ্রী দেবী মুখোপাধ্যায়

হল-ঘরের দরজা খু'লে জোসেফ্ এসে জানিয়ে দিলে যে যাবার জন্তে গাড়ী প্রস্তুত হয়েছে। মা আর বোনেরা ঝুঁ'কে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁরা বল্লেন, "এখনও সময় আছে, এ যাওয়া স্থগিত কর; আমাদের ফেলে রেখে অত দূরদেশে যেও না……" আমি ব'লে উঠ্লুম,—"মা, আমি সম্রান্ত বংশের ছেলে; কুড়ি বৎসর বয়স হ'ল। দেশের কাজ আমায় যে এখন কর্তেই হবে,—খ্যাতি-প্রতিপত্তি ত আমায় অর্জ্জন কর্তে হবে …একজন বড় বীরপুরুষ, কিম্বা সম্রান্ত রাজপুরুষ, কি খুব শক্তিশালী একজন জেনারেল্—যা হয় কিছু একটা হ'য়ে, আমাকে নাম কিন্তেই হবে যে মা……"

মা বল্লেন, "আচ্ছা, তুমি যখন সুদূর বিদেশে চ'লে যাবে, তখন তোমার এই অভাগিনী মা'র দশা কি হবে, বার্ণার্ড?"

"ছেলের প্রশংসা-খ্যাতি শু'নে তোমার বুক গর্ব্বে ভ'রে উঠ্বে; তুমি আরও সুখ পাবে……"

"আর যদি কোনো লড়াইয়ে তোর প্রাণ নষ্ট হয় বাবা……"

"তাতে আর কি হয়েছে মা? এ জীবনটা কি? কেবল স্বপ্ন বই ত নয়! আর, এই যৌবনেই ত গৌরব পাবার, জয়লাভ কর্বার স্বপ্ন জাগে—বিশেষ যখন, একটা মান্তগণ্য বংশের ছেলে আমি। তুমি কিছু ভয় কোরো না মা, দু' চার বছরের মধ্যেই দেখ্বে, আমি একজন কর্ণেল,—কি মস্ত একজন জেনারেল,—এমন-কি ভার্সেলে একজন পদস্থ লোক হ'য়ে, তোমার কোলে ফিরে আসব।"

"সত্যি কি সেদিন আস্বে, বাবা?"

"আস্বে মা সেদিন, আস্বে,—তুমি দেখো, তখন সকলে আমার প্রতিপত্তির ঈর্ষা কর্বে,—আমায় সকলে যথেষ্ট সম্মান দেখাবে। আমায় দে'খে টুপী খু'লে সকলে মাথা নীচু কর্বে; আমি হেন্রিয়েটাকে বিয়ে কর্ব;—বোনেদের ভালো-ভালো ঘরে বিয়ে দেবো; আর সকলে মি'লে মহাসুখে আমাদের এই ব্রিটেনির ষ্টেটে বাস কর্ব।"

"এখনই তাই করো না, বাবা। টাকাকড়ির ত অভাব নেই তোমার চারিপাশে ঘু'রে এসে দেখ দেখি,—এই আমাদের 'রক বার্ণার্ড'এর মতন বড় প্রাসাদ; আর জমিজমা কারও আছে? তোমার প্রজারা কি তোমার সম্মান দেখায় না? তুমি যখন দেশের মধ্যে ঘু'রে বেড়াও, কে তোমাকে দে'খে টুপী খোলে না, নাম ক'রে বলো দেখি? আমাদের ছেড়ে যাস্নে বাবা,……তোর এখানকার বন্ধুবান্ধব,—বোনেরা, এই বুড়ো মা,—এদের কাছেই থাক্। ফিরে এসে হয়ত এই মাকে আর দেখ্তে পাবি নে। মিছামিছি কষ্ট ক'রে খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্তে আর শরীরটা মাটি করিস্ নে। জীবনটা ভারি সুখের,—বড়ই মিষ্ট; আর আমাদের এই দেশ কি চমৎকার!……" এই ব'লে তিনি, আমাকে একটা খোলা জান্লার ধারে নিয়ে গিয়ে, বাগানের সুন্দর ফুলভরা রাস্তাগুলি দেখাতে লাগ্লেন। 'চেস্ট্নাট্' গাছটা ফুলে-ফুলে ভ'রে উঠেছিল; লভান্ডার গাছের ফুলের বাসে বাতাস মত্ত হ'য়ে উঠেছিল; রোদের আলো প'ড়ে তা'র পাতাগুলো ঝক্‌ঝক্ কর্ছিল।

পাশের কাম্রাতেই বাড়ীর চাকর-বাকরেরা জমায়েত হয়েছিল। তাদের বিষণ্ণ শান্ত মূর্ত্তি নীরব ভাষায় যেন বল্ছিল, "হুজুর! আমাদের ছেড়ে যাবেন না, ছেড়ে যাবেন না।" আমার বড় বোন, আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধর্লেন। ছোটো বোন ঘরের এক কোণে ব'সে একখানা ছবির বই দেখ্ছিল। সে আমাকে ছবি দেখিয়ে, আব্দার ক'রে ভুলিয়ে রাখ্বার চেষ্টা কর্লে। আমি তাদের সকলকে সরিয়ে দিয়ে বল্লুম,—"কুড়ি বৎসর বয়স হ'ল আমার—নামজাদা ঘরের ছেলে আমি, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আমাকে অর্জ্জন কর্তেই হবে। নাঃ—আমায় তোমরা সকলে আজ বিদায় দাও……", এই ব'লে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্লুম। সিঁড়িতে দেখ্তে পেলুম, হেন্রিয়েটা দাঁড়িয়ে আছে; তার চোখে একবিন্দুও জল ছিল না, মুখ দিয়েও তার একটিও কথা বেরুচ্ছিল না বটে, কিন্তু সে এত কাঁপ্ছিল যে, আর যেন সে কোনো মতেই দাঁড়িয়ে থাক্তে পার্বে না। তা'র সাদা রুমালখানি নেড়ে আমাকে বিদায় জানিয়েই, সে সেখানে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্ল। আমি ছু'টে তা'র কাছে গিয়ে তা'কে তু'লে নিলুম, আর তা'কে আজীবন ভালোবাস্ব ব'লে আশ্বাস দিলুম। শীঘ্রই তা'র জ্ঞান ফি'রে এল; মার হাতে তা'র ভার দিয়ে, আমি গাড়ীর দিকে ছুটলুম। পিছন দিকে আর না তাকিয়ে, লাফিয়ে গাড়ীতে উ'ঠে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলুম।

(২)

যদি হেন্‌রিয়েটার দিকে ফিরতুম তা হ'লে হয়ত চিত্তবিভ্রম ঘটত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বড় রাস্তা দিয়ে চল্‌লুম। অনেকক্ষণ ধ'রে মা, বোন আর হেন্‌রিয়েটার কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তা মনে জাগ্‌ল না। আমাদের প্রাসাদ 'রক্‌ বার্‌ণার্ড'-এর চূড়াটা যেই দৃষ্টিপথের বাইরে গিয়ে পড়্‌ল, অম্‌নি সঙ্গে-সঙ্গে আবার গৌরব অর্জ্জনের স্বপ্ন আমার মধ্যে জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সে কিসব মতলব—কতই আকাশকুসুমরচনা......ধনদৌলত, মান-প্রতিপত্তি, কিছুই আর অর্জ্জন করতে বাদ পড়্‌ল না। গাড়ী যতই এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল, আমি ততই আপন মনে, উজীর, সেনাপতি, দেশের রাজা হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। শেষে সন্ধ্যার সময় আমি সেদিনকার গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁচলুম। এই সময়ে আমার চাকর জোসেফ্‌ ডাক্‌তেই, আমার স্বপ্নে গড়া সোনার রাজ্য থেকে যেন মাটিতে প'ড়ে গেলুম।

পরের দিন আবার যাত্রা সুরু হ'ল। আবার দীর্ঘপথ পাওয়ায়, আমার মনের ঘোড়া সেই গৌরবময় স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে মহানন্দে ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল। অবশেষে আমরা সীডানে এসে হাজির হলুম। এখানে আমাদের পরিবারের আলাপী একজন ডিউকের সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনিই আমাকে প্যারীতে নিয়ে যাবেন, আর সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেবেন। তিনি আমাদের পরিবারকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন আর, দুদিন বাদেই তিনি প্যারীতেই যাবেন ঠিক ছিল, কাজেই আশা ছিল, তিনি আমার উন্নতির যথাসাধ্য সুবিধা করে' দেবেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সীডানে পৌঁছানো গেল। কিন্তু আমাদের বন্ধুর বাড়ী সহর থেকে দূর ব'লে সে-রাত্রে আর তাঁর বাড়ী যাওয়া ঘ'টে উঠ্‌ল না। কাজে-কাজেই আমে'-দ্য-ফ্রাঁসে নামে সেখানকার সবচেয়ে ভালো হোটেলে সেরাত্রি আশ্রয় নেওয়া গেল।

সেখানে খেতে ব'সে আমি ডিউকের বাড়ী যাবার পথ জিজ্ঞাসা করতেই, পাশের লোকটি ব'লে উঠ্‌ল, "ওঃ! সে বাড়ী আশেপাশের সকল লোকেই জানে। যে কেউ সেপথ দেখিয়ে দিতে পারে, ওই প্রাসাদেই ত সেই মস্ত বড় বীর যোদ্ধা মার্শেল ফেবার্ট্‌ মারা গিয়েছিল।" এই কথা শু'নেই তখনই যুবকদলের মধ্যে ফেবার্টের কথা উঠ্‌ল। কেমন ক'রে ভীষণভাবে তিনি যুদ্ধ করতেন,—অদ্ভুত বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও, কি-রকম বিনয় প্রকাশ ক'রে তিনি সম্রাট্‌ লুইএর-দেওয়া সম্মান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,—এইসব বর্ণনা চল্‌তে লাগ্‌ল। তা'রা সকলে এই ব'লে বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগ্‌ল, কেমন ক'রে এক-একজন লোক হঠাৎ অসম্ভব-রকমের সৌভাগ্যশালী হ'য়ে ওঠে। সামান্য একজন মুদ্রাকরের ছেলে হ'য়ে ফেবার্ট্‌ একেবারে ফ্রান্সের মার্শেল হ'য়ে উঠেছিলেন। এর কমের আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত না পেয়ে, সকলে ঠিক করলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু অমানুষিক ব্যাপার আছে। লোকে বলে, তিনি জাদুবিদ্যা জানতেন,—একটা দৈত্যের সঙ্গে তাঁর সর্ত্ত ছিল,—সেই নাকি তাঁর সব কাজ ক'রে দিত। হোটেলের ম্যানেজার বল্লেন—এখনও দেশের কৃষাণেরা বিশ্বাস করে, ঐ ডিউকের প্রাসাদে, যেখানে ফেবার্ট্‌ মারা গিয়েছিল সেখানে একজন কালো রংয়ের লোককে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—অথচ কেউই তার পরিচয় জানে না। চাকর-দাসীরাও, সেই কালো দৈত্যটাকে, ফেবার্টের ঘরের মধ্যে ঢুকে ফেবার্টের প্রাণ হাতে ক'রে নিয়ে যেতে আস্‌তে দেখেছে। ফেবার্টের প্রাণ নাকি সে একেবারে কি'নে নিয়েছিল, কাজেই সেটা বরাবর তা'র কাছেই থাকে। এখনও যে মাসে ফেবার্টের মরবার দিনটিতে, রাত্রিকালে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যে একটা কালো লোক একটা আলো হাতে ক'রে নিয়ে চলাফেরা করছে;—সেই আলোটাই নাকি ফেবার্টের আত্মা।

আমাদের খাওয়া শেষ হ'য়ে এসেছিল। গল্পটা ভারি চমৎকার লাগ্‌ল। আমরা যাতে খুব বড় বড় যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারি, সেইজন্যে, ফেবার্টের সেই দৈত্যের নামে এক বোতল শ্যাম্পেন্‌ পান করলুম।

পরের দিন সকালে উ'ঠে সেই প্রাসাদের দিকে চলেছি। পুরাতন পথিক প্যাটানে'র মস্ত বড় বাড়ী; এ-ছাড়া আর তা'র কিছু বিশেষত্ব ছিল না। অন্য সময় হ'লে কিছুই হয়ত লক্ষ্য করতুম না, কিন্তু কাল রাত্রে হোটেলের গল্পটা মনে পড়ায়, হঠাৎ আমার ঔৎসুক্য বেড়ে গেল।

একজন বৃদ্ধ চাকর এসে দরজা খু'লে দিতেই আমি তা'কে জানালুম যে গৃহস্বামীর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। সে বল্‌লে, "মনিবকে এখন দেখ্‌তে পাবো কি না তা'র ঠিক নেই...আর তিনি যে দেখা কর্‌বেন এখনও কোনো স্থিরতা নেই।" আমি তা'কে আমার নামের কার্ড্‌ দিতে সে সেখানি নিয়ে চ'লে গেল, আমি একা মস্ত বড় একটা হল ঘরে ব'সে রইলুম......সে ঘরটা চারিদিকে শিকারের স্মৃতি আর পরিবারের পূর্ব্ব পুরুষদের ছবি টাঙিয়ে বেশ ভালো ক'রে সাজানো। আমি খানিক-ক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকা সত্ত্বেও চাকরটা ফিরল না; নির্জ্জনতাটা আমার কাছে ক্রমশঃই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল। চুপ ক'রে ব'সে থেকে ঘরের সমস্ত ছবিগুলো আর কড়ি-বরগা সব চারচার-বার যখন গু'ণে ফেলেছি, তখন একটা শব্দ আমার কানে গেল। চেয়ে দেখি, একটা ঘরের দরজা খু'লে গেছে;—সেটা একটা চমৎকার ড্রয়িং রুম। কাচের একটা দরজা দেখ্‌তে পাওয়া গেল—সেটা খুল্‌লেই একেবারে একটা সুন্দর বাগানে গিয়ে পড়া যায়। ঘরের মধ্যে ঢু'কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে হঠাৎ আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়্‌লুম। একজন লোক দরজার দিকে পিছন করে' কোচের উপর শুয়েছিলেন। তিনি হঠাৎ উঠে পড়ে আমাকে লক্ষ্য না ক'রেই তাড়াতাড়ি জানালার দিকে ছুটে চল্‌লেন। তাঁর গাল বেয়ে চোখের জল ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সারা দেহে নৈরাশ্যের ছাপ ফু'টে উঠ্‌ল। হাতের ওপর মাথাটি রেখে তিনি কিছুক্ষণ অচল অটল অবস্থায় ব'সে রইলেন।

তা'র পর তিনি আবার জোরে জোরে পা ফে'লে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগ্‌লেন। ঘোরবার সময় আমি তাঁ'র দৃষ্টিপথে পড়ায়, তিনি কাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। আমিও ভয়ে হতভম্ব হ'য়ে আমার অবিবেচনার কাজের জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে পড়্‌লুম। পালিয়ে আস্‌বার চেষ্টা ক'রে অসংলগ্ন ভাষায়, আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগ্‌লুম।

তিনি হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে, আমার হাত ধ'রে গম্ভীরস্বরে বল্‌লেন— "কে তুমি? কি চাও?"

আমি ভয়ে যেন কেমনধারা হ'য়ে গেলুম; তবু উত্তর দিলুম— "আমি 'রক্‌ বার্‌ণার্ড'-এর স্তাভালে বার্‌ণার্ড্‌......আমি ব্রিটেনি থেকে সবেমাত্র এখানে এসে পৌঁছেছি।"

তিনি আমাকে সস্নেহে দুহাতে জড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রে বল্‌লেন— "আমি তোমাদের খুব জানি—খুব জানি........" তা'র পর একখানা কোচে তাঁর পাশে বসিয়ে আমাদের পরিবারের সমস্ত সংবাদ, আমার পিতার কথা এমনভাবে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন, যাতে আমার ধারণা হ'ল ইনিই হচ্ছেন এই প্রাসাদের অধীশ্বর।"

আমি তাঁকে বল্‌লুম—"আপনিই তাহ'লে এই বাড়ীর মালিক, ম'সিয়ে—" আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি আমার দিকে কেমন যেন একভাবে চেয়ে রইলেন, তা'র পর বল্‌লেন, "হাঁ ছিলুম বটে; তবে এখন আর নই। এখন আমি আর কিছুই নই......"

আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে দে'খে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, দেখ কথা বোলো না; আমাকে একটিও প্রশ্ন কোরো না......"

আর এই আজকের দিনই, এই পৃথিবীতে আমার শেষ দিন…"শেষের দিকটা তাঁর গলার স্বরটা করুণ হয়ে কেঁপে উঠ্‌ল।"

তা'র পর কাচের দরজার কাছে গিয়ে, বাগানের দিকে চেয়ে তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"হায়,—এই সুন্দর আকাশ,—এই বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, মাণিকঝরা এই যে ঝরণা,—এইসব কিছুই আর আমি দেখ্‌তে পাবো না! বসন্তের মদির বাতাসের স্পর্শ, আর আমি পাবো না!…কি নির্ব্বোধের কাজই আমি করেছি! এইসব, যা কিছু সুন্দর, ভগবান্ দয়া ক'রে মানুষকে দিয়েছেন—অথচ এই সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে দেখ্‌বার খেয়াল, এতদিন মোটেই হয়নি আমার…। হুঁস যখন হ'ল, তখন বড় দেরী হ'য়ে গেছে, আর সময় নেই। আরও পঁচিশ বৎসর আমি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌তে পারতুম…হ'য়ে মিথ্যাই এ জীবনটা নষ্ট করেছি! কি পেলুম আমি? কিছুই নয়! মিথ্যা গৌরব খানিকটা অর্জ্জন করেছি, সে ত, আমার সঙ্গে-সঙ্গেই লোপ পেয়ে যাবে। এতে আমি ত মোটেই প্রকৃত সুখী হ'তে পারিনি।"

বাগানের পাশ দিয়ে যে চাষারা গান কর্‌তে-কর্‌তে কাজে যাচ্ছিল, তাদের দেখিয়ে আমাকে উদ্দেশ ক'রে বল্‌লেন, দেখো—এইসব চাষারা—এইসব লোকেদের সঙ্গে মজুরী ক'রে খেটে দৈন্যদুঃখ লাভ কর্‌তে পেলেও, আমি সব—আমার সব অর্থ গৌরব দান কর্‌তে পারি। এই পৃথিবীতে এখন আর দেবার মতন কিম্বা আশা কর্‌বার মতন আমার আর কিছুই নেই—এমন কি, দুর্ভাগ্য পর্য্যন্তও নয়!"

সেইসময়ে যে মাসের সূর্য্যের খানিক আলো জানলা দিয়ে এসে তাঁর পাণ্ডুর মুখে আর শীর্ণ দেহের ওপর পড়্‌ল। তিনি যেন ঝোঁকের মাথায় আমার হাত দুটো চেপে ধর্‌লেন, তা'র পরে বল্‌লেন, "দেখ ঐ দিকে চেয়ে দেখ—সুন্দর নয় কি? ঐ যে সূর্য্য…সোনার আলো…হায়, এইসবই, আমাকে ত্যাগ ক'রে যেতে হবে! আঃ—তবু এইটুকু সান্ত্বনা—এখনও আমি বেঁচে আছি। আজকের সারা দিনটা বাঁচ্‌তে পাওয়া যাবে—এই চমৎকার সুন্দর দিন…আমি আর কাল এই চমৎকার দিন দেখ্‌তে পাবো না—"

এই ব'লেই তিনি খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাগানের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। সেখানে গিয়ে হরিণের মতন চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগ্‌লেন। আমার বিস্ময়ের মাত্রা এত বেশী হ'য়ে প'ড়েছিল, যে, তাঁকে যে ধ'রে রাখ্‌ব, এমন অবস্থাও আমার ছিল না! প্রকৃতিস্থ হ'তেই দেখি, তিনি একটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। আর সত্য কথা বল্‌তে কি,—আমার মনের বা শরীরের এমন শক্তি তখন ছিল না, যাতে তাঁকে ধ'রে রাখ্‌তে পারি। এতক্ষণ যা শুনলুম, তা'তে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে পড়্‌লুম।…আমার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়…আমি কোচখানার ওপর ব'সে পড়্‌লুম। আমি যে জেগে আছি—এসব যে স্বপ্ন নয়,—এই ভুল ভাঙ্‌বার জন্যে আমি তখনি উঠে দাঁড়ালুম;—তা'র পর ঘরের মধ্যেই এদিক্-ওদিকে পায়চারি কর্‌তে লাগলুম। এই সময়ে হল-ঘরের দরজা খুলে চাকর এসে বল্‌লে—এই যে বাড়ীর মনিব এসেছেন…"

একজন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ আমার দিকে অগ্রসর হ'য়ে অভ্যর্থনা কর্‌বার আশায় তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। তা'র পর, এতক্ষণ বসিয়ে রাখার দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বল্‌লেন—"আমি বাড়ীতে ছিলুম না,—আমার ছোটো ভাইকে আমি এতক্ষণ খুঁজ্‌ছিলাম—তা'র অসুখ করেছে কি না…"

আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বল্‌লুম—"রোগ কি খুব সাংঘাতিক, বাঁচ্‌বার আশা নেই?"

তিনি বল্‌লেন,—"ভগবান্ রক্ষা করুন,—ব্যাপার তত দূর নয়…যৌবনেই, সে বড় হওয়ার আশায়, খ্যাতিলাভের স্বপ্নে একেবারে মেতে উঠেছিল। সম্প্রতি একটা ভীষণ অসুখ থেকে বেঁচে ওঠ্‌বার পর থেকেই, তা'র মাথাটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেছে। এখন তা'র এক খেয়াল হয়েছে—আর কেমন তা'র এক ধারণা হয়ে গেছে, যে আর একদিন মাত্র তা'র পরমায়ু আছে…একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে আর কি…!"

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটি বেশ জলের মতন পরিষ্কার হ'য়ে গেল। ডিউক্ বল্‌তে লাগ্‌লেন—"বাক্—এখন তুমি এদিকে এস—দেখি বেশ চেষ্টা ক'রে কিসে তোমার উন্নতি হ'তে পারে। আমরা এই মাসের শেষেই তা হ'লে রাজধানীতে যাবো, কি বলো? বড় বড় রাজসভায়, তোমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির কর্‌ব…"

আমি বল্‌লুম, "আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন ম'সিয়ে,…আমি আপনাকে সেজন্যে ধন্যবাদ আর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি—কিন্তু আমি আর সহরে যাবো না…লজ্জায় আমার মুখ লাল হ'য়ে নীচু হ'য়ে পড়্‌ল।"

সে কি! তুমি দর্‌বারে যাবে না? সেখানে গেলে তোমার নিশ্চয়ই খুব উন্নতি হবে। এইসব মান-সম্ভ্রম তুমি হেলায় হারাতে চাও?"

"হাঁ, ম'সিয়ে…"

"কিন্তু ভেবে দেখ,—আমি থাক্‌লে পরে আটদশ বৎসরের মধ্যেই তুমি বিশেষ ক্ষমতাশালী আর প্রতিপত্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌বে—তোমার উন্নতি যাতে শীগ্‌গির হয়, আমি তা'র বিশেষ চেষ্টা কর্‌ব…"

আমি সভয়ে ব'লে উঠ্‌লুম—"দশটা বৎসর নষ্ট কর্‌তে হবে।"

বিস্মিত হ'য়ে তিনি বল্‌লেন,—"কি বল্‌ছ তুমি,—মান-সম্ভ্রম, অর্থ-সম্পদ্ লাভ কর্‌তে হ'লে, দশটা বছর কি এতই বেশী হ'ল? না, না,—ওসব পাগ্‌লামি ছাড়ো,—চলো তুমি, আমার সঙ্গে সহরে যেতে হবে তোমায়।"

"না,—তা আর হবে না, আমি ব্রিটেনিতেই ফির্‌তে মনস্থ করেছি, আমরা আপনার এই ভালো কর্‌বার চেষ্টার জন্য আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

তিনি ক্ষুব্ধ হ'য়ে একটু ক্ষীণ হাসি হেসে বল্‌লেন, "কি ছেলেমানুষী বুদ্ধি সব! এসব খেয়াল, আহাম্মকি বুদ্ধি ছাড়ো…খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন কর্‌বার সময়টা হেলায় হারিও না।"

তাঁর ভাইয়ের মুখে এর আগে যে কাহিনী শুনেছিলুম, তাই স্মরণ ক'রে আমি বল্‌লুম, না এ বোকামি নয়,…এই হচ্ছে জ্ঞানীর কাজ, আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন…"

পরের দিন আমি বাড়ী ফের্‌বার জন্য রওনা হলুম। আমাদের প্রাসাদ,…রক্ বারণার্ড—বড়-বড় গাছপালা, আর ব্রিটেনির চমৎকার রোদভরা আকাশ যখন আমার চোখে পড়্‌ল, তখন আনন্দে আমার প্রাণ নৃত্য করে' উঠ্‌ল। আমি আবার আমার মা, বোন, লোকজন আর প্রজাদের পেয়ে সুখী হলুম। আর এই সুখ আমার চিরস্থায়ী হ'য়ে আছে, কেননা, এক সপ্তাহ পরেই আমি হেন্‌রিয়েটাকে বিয়ে ক'রে ফেল্‌লুম। জীবনটা সত্যই এখন বড় আনন্দের—উপভোগ কর্‌বার মতন ব'লে মনে হচ্ছে…। *

---

* Augustin Eugene Scribe হইতে।

শূদ্রধর্ম্ম

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ জীবিকার জন্যে নিজের সুযোগমত নানা কাজ ক'রে থাকে। সাধারণত সেই কাজের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ নেই, অর্থাৎ তা'র কর্ত্তব্যকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয় না।

ভারতবর্ষে একদিন জীবিকাকে ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তাতে মানুষকে শান্ত করে। আপনার জীবিকার ক্ষেত্রকে তা'র সমস্ত সঙ্কীর্ণতাসমেত মানুষ সহজে গ্রহণ কর্‌তে পারে।

জীবিকানির্ব্বাচন-সম্বন্ধে ইচ্ছার দিকে যাদের কোনো বাধা নেই, অধিকাংশ স্থলে ভাগ্যে তাদের বাধা দেয়। যে মানুষ রাজমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে কাজের বেলায় তাকে রাজার ফরাসের কাজ কর্‌তে হয়। এমন অবস্থায় কাজের ভিতরে ভিতরে তা'র বিদ্রোহ থামতে চায় না।

মুস্কিল এই যে, রাজ-সংসারে ফরাসের কাজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু রাজমন্ত্রীর পদেরই সম্মান। এমন কি, যে-স্থলে তা'র পদই আছে, কর্ম্ম নেই, সেখানেও সে তা'র খেতাব নিয়ে মানের দাবী করে। ফরাস এদিকে খেটে খেটে হয়রান্ হয় আর মনে মনে ভাবে, তা'র প্রতি দৈবের অবিচার। পেটের দায়ে অগত্যা দীনতা স্বীকার করে, কিন্তু ক্ষোভ মেটে না।

ইচ্ছার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভাগ্যও যদি যোগ দিত, সব ফরাসই যদি রাজমন্ত্রী হয়ে উঠ্‌ত, তা হ'লে মন্ত্রণার কাজ যে ভালো চল্‌ত তা নয়, ফরাসের কাজ একেবারেই বন্ধ হ'য়ে যেত।

দেখা যাচ্চে ফরাসের কাজ অত্যাবশ্যক, অথচ ফরাসের পক্ষে তা অসন্তোষজনক। এমন অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে কাজ করা অপমানকর।

ভারতবর্ষ এই সমস্যার মীমাংসা করেছিল বৃত্তি-ভেদকে পুরুষানুক্রমে পাকা ক'রে দিয়ে। রাজশাসনে যদি পাকা করা হ'ত তা হ'লেও তা'র মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাক্‌ত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থাম্‌ত না। পাকা হ'ল ধর্ম্মের শাসনে। বলা হ'ল, এক-একটা জাতির এক-একটা কাজ তা'র ধর্ম্মেরই অঙ্গ।

ধর্ম্ম আমাদের কাছে ত্যাগ দাবী করে। সেই ত্যাগে আমাদের দৈন্য নয়, আমাদের গৌরব। ধর্ম্ম আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণকেও অনেক ভোগ বিলাস ও প্রলোভন পরিত্যাগ কর্‌বার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তা'র সঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রচুর সম্মান পেয়েছিল। না পেলে সমাজে সে নিজের কাজ কর্‌তেই পার্‌ত না। শূদ্রও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু সমাদর পায়নি। তবুও, সে কিছু পাক্ আর না পাক্, ধর্ম্মের খাতিরে হীনতা স্বীকার করারও মধ্যে তা'র একটা আত্মপ্রসাদ আছে।

বস্তুত জীবিকানির্ব্বাহকে ধর্ম্মের শ্রেণীতে ভুক্ত করা তখনি চলে যখন নিজের প্রয়োজনের উপরেও সমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য থাকে। ব্রাহ্মণ ভাতে-ভাত খেয়ে বাহ্য দৈন্য স্বীকার ক'রে নিয়ে সমাজের আধ্যাত্মিক আদর্শকে সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ যদি রাখে তবে তা'র দ্বারা তার জীবিকানির্ব্বাহ হলেও সেটা জীবিকানির্ব্বাহের চেয়ে বড়ো, সেটা ধর্ম্ম। চাষী যদি চাষ না করে, তবে একদিনও সমাজ টেকে না। অতএব চাষী আপন জীবিকাকে যদি ধর্ম্ম ব'লে স্বীকার করে, তবে কথাটাকে মিথ্যা বলা যায় না। অথচ এমন মিথ্যা সান্ত্বনা তাকে কেউ দেয়নি যে, চাষকরার কাজ ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে সম্মানে সমান। যেসব কাজে মানুষের উচ্চতর বৃত্তি খাটে, মানবসমাজে স্বভাবতই তা'র সম্মান শারীরিক কাজের চেয়ে বেশি, একথা সুস্পষ্ট।

যেদেশে জীবিকা অর্জ্জনকে ধর্ম্মকর্ম্মের সামিল ক'রে দেখে না, সেদেশেও নিম্নশ্রেণীর কাজ বন্ধ হ'লে সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটে। অতএব সেখানেও অধিকাংশ লোককেই সেই কাজ কর্‌তেই হবে। সুযোগের সঙ্কীর্ণতাবশত সে-রকম কাজ কর্‌বার লোকের অভাব ঘটে না, তাই সমাজ টিঁকে আছে। আজকাল মাঝে-মাঝে যখন সেখানকার

আমি লজ্জিত হ'য়ে বললুম "দেখুন, অনিচ্ছাসত্বেও আমি আপনার এই দুঃখভরা গতিবিধি লক্ষ্য করেছি; আশা করি', আমার শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে আপনার মনের কষ্টের কিছু লাঘব হবে—"

"হাঁ, হাঁ, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যাই হোক্, তুমি ত আর এখন আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে পারবে না। কিন্তু তথাপি তুমি আমার শেষ সাধ আর শেষ প্রতিজ্ঞার কথা আমার কাছে শুনতে পারো। এইটুকু তোমার কাছে এখন আমার প্রার্থনা—তুমি ধীর হ'য়ে আমার কাহিনী শুনবে—"

তিনি ঘরখানা একবার পায়চারি ক'রে ঘুরে দরজা বন্ধ করে' দিলেন, তা'র পর আমার কাছে এসে বসলেন। আমি বিচলিত আর সশঙ্কিত হ'য়ে তাঁর কথা শোনবার আশায় ব'সে রইলুম। তাঁর গলার স্বর ছিল গম্ভীর আর তাঁর আকৃতিতে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যা আমি কখনও কারও লক্ষ্য করিনি। তাঁর প্রশস্ত ললাট,—অদৃষ্টদেবী যেন নিজ হাতে তা চিহ্নিত করে' দিয়েছেন। গায়ের রং একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছে। চোখ-দুটি ছিল কালো, বেশ উজ্জ্বল, আর দৃষ্টি ছিল যেন অনন্ত। মাঝে-মাঝে তাঁর মুখে যন্ত্রণা আর দুঃখের হাসির ছাপ ফুটে উঠছিল।

তিনি বলতে লাগলেন, "আমি তোমার কাছে যে-বর্ণনা আজ করব, তা শুনে তুমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। হয়ত আমার কথায় বিশ্বাস করবে না। আমি নিজেই যে এখনও সব সময়ে এটা বিশ্বাস করতে পারি নে!......আমি নিজেই বলি—'না,—এ হ'তে পারে না, কিছুতেই না! কিন্তু এর প্রমাণ রয়েছে যে, জলজ্যান্ত সত্য ঘটনা! আর এটাও কি সত্য নয় যে, অনেক সময় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ না জেনেও, আমরা অনেক অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করতে বাধ্য হই?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কপালে হাত রেখে, বোধ হয় তিনি সমস্ত ঘটনাটি মনে করতে লাগলেন। তা'র পর ধীরে-ধীরে বললেন, "আমি এই প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেছিলুম; আমার বড় দু ভাইই আমাদের বংশের সম্মান আর অর্থের উত্তরাধিকারী হলেন। আমি সামান্য একটা বাড়ী ছিলুম, অন্য কিছুই পাবার আশা করতে পারলুম না। কিন্তু তথাপি, বড় হওয়ার আশা, গৌরব অর্জ্জন করবার একটা বাসনা, আমার মাথায় জেগে আমার প্রাণে আশার আনন্দ ছড়াতে লাগল। খ্যাতি-প্রতিপত্তি-হীন হওয়ায়, আর লোকচক্ষুর অগোচরে থাকায়—যশ-প্রতিপত্তি লাভ করবার জন্যে আমি যেন মরিয়া হ'য়ে উঠলুম। এই খেয়াল আর পাগলামিতে আমার জীবনের আনন্দ বা মাধুর্য্য উপভোগ করবারও আর হুঁস রইল না। বর্ত্তমানকে আমি ত মোটেই আমলে না এনে, ভবিষ্যতের আশায় প্রাণ ধারণ ক'রে রইলুম; কিন্তু ভবিষ্যৎও আমার কাছে মধুর হ'য়ে ধরা পড়ল না।

ত্রিশ বছর বয়স যখন আমার হ'ল, তখনও আমার আসল কাজের মতন কাজ, জীবনে কিছু হ'য়ে উঠল না। এই সময়ে প্যারী সহরে, সাহিত্য-সাধনার বাতি, এমন উজ্জ্বল হ'য়ে জ্বলে উঠল, যে আমাদের এই সুদূর মফস্বলেও, তা'র খানিক আলো ছড়িয়ে পড়ল। আমি ভাবলুম,—হায়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেই যদি একটা নাম কিনে, আমি বিখ্যাত হ'তে পারতুম, তা হ'লেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যেত।......আমার কাজকর্ম্ম করবার জন্যে একজন বুড়ো চাকর ছিল;—সে আমার জন্মাবার বহু আগে হ'তেই আমাদের বাড়ী কাজ করছে। এ-দেশের মধ্যে, ওই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন,—কেননা, কবে যে, সে প্রথম এদেশে এল তা কেউই বলতে পারে না—চাষা লোকেরা ব'লে থাকে,—মার্শেল কেবার্টের মরবার সময়ও নাকি বেঁচে ছিল, আর আসলে ও হচ্ছে নাকি একটা বদমাইস্ দৈত্য..."

এই নাম শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে চমকিত হলুম। সম্মুখের অপরিচিত লোকটি, আমার এই বিচলিত ভাব লক্ষ্য ক'রে তা'র কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বলে' উঠলুম,—"না ও কিছু নয়।" আমার মনে কিন্তু এই ধারণা দৃঢ় হ'ল, যে, কাল সন্ধ্যাবেলা হোটেলে সকলে, এর কথাই গল্প করছিল......

ভদ্রলোকটি আবার বলতে লাগলেন,—"একদিন ইয়াগোর কাছে,—আমার ওই কাফ্রি-চাকরটার ঐ নাম কি না,—আমি আমার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করলুম; আমার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীন, নিষ্ফল জীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলুম। আমার ব্যর্থ একঘেয়ে জীবনযাত্রার জন্য আমি বিশেষ ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ছিলাম। অবশেষে হতাশ হ'য়ে নিরাশ কণ্ঠে বললুম, 'আমি যদি প্রথম শ্রেণীর একজন নামজাদা গ্রন্থকার হ'তে পারতুম তা' হ'লে সানন্দে আমি আমার জীবনের দশ বৎসর পরমায়ু দান ক'রে দিতাম।

ইয়াগো শান্তকণ্ঠে বললে,—"দশ বৎসর! এ যে চড়া দাম হ'য়ে গেল! সামান্য এই ব্যাপারের জন্য, এ যে প্রচুর ব'লে মনে হচ্ছে। যাই হোক, আমি তোমার দশ বৎসরই গ্রহণ করলুম,......তোমার অঙ্গীকারের কথা কিন্তু মনে থাকে যেন,......আমি কিন্তু আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব—এটা ঠিক জেনো।"

তা'কে এইরকম বলতে শুনে, আমার যে কি রকম আশ্চর্য্য বোধ হ'ল, তা আর তোমাকে কি বলব। আমি ভেবেছিলুম, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তা'র বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। তা'র কথায়, আমি একটু হাসলুম মাত্র! তা'র পর আর তা'র কোনো খবর আমি রাখলুম না। দিন-কয়েক পরে, আমি প্যারীতে গিয়ে হাজির হলুম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে আমি উৎসাহিত হ'য়ে খানকয়েক বই প্রকাশ ক'রে ফেললুম, সেগুলো সব খুব উঁচুদরের বই দাঁড়িয়ে গেল। যাক্,—তা'র বিশদ বিবরণ আমি আর এখন দিতে চাইনে। এই বললেই চলবে, সারা দেশের লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে পড়ল, আর কাগজগুলো আমার প্রশংসা ক'রে পাতা ভরাতে লাগল। আমি যে ছদ্ম নামের আশ্রয় গ্রহণ করে' বই লিখলুম,—ক্রমে সে নাম এত প্রসিদ্ধ হ'য়ে পড়ল, যে আজকালকার দিনের ছোক্‌রারা—তোমরা পর্য্যন্ত—তা'র বইয়ের কদর করো..."

তিনি যে কে হ'তে পারেন; মনে-মনে চিন্তা ক'রেও কিছু ঠিক্ করতে না পেরে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়লুম। তা'র পর বললুম,—তা হ'লে আপনি এবাড়ীর কর্ত্তা;...ডিউক্ নন্?

তিনি শুধু শান্তভাবে উত্তর দিলেন "না," তা'র পর দুঃখভরা একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন। মুখে তাঁর একটুখানি ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। তা'র পর আবার বলতে লাগলেন—"এই সাহিত্যিকের গৌরব—যা লাভ করবার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব পণ ক'রে বসেছিলুম—এতে আর আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত রইল না। আরও বেশী খ্যাতি অর্জ্জন করবার জন্যে আমার হৃদয় মেতে উঠল। ইয়াগো আমার ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখবার জন্যে সঙ্গে-সঙ্গে প্যারীতে এসে হাজির হয়েছিল। আমি তা'কে বললুম—এ কি!...এতে প্রকৃত গৌরব নেই। বিচক্ষণ সমরজয়ী বীর পুরুষ না হ'লে সত্যকার খ্যাতি পাওয়া যায় না। লেখক বা কবি... এসব ত কিছুই নয়! এর চেয়ে আমি একজন জেনারেল বা পল্টনের ক্যাপটেন হ'তে পারলে ঢের বেশী সুখী হতুম। দ্যাখো ইয়াগো—আমি যদি সৈন্য-বিভাগে খুব খ্যাতিলাভ করতে পারি, তা হ'লে আমি হাসতে-হাসতে আমার জীবনের আরও দশটা বৎসর নষ্ট করতে রাজি আছি......

ইয়াগো বললে—'তথাস্তু আমিই তোমার ওই দান গ্রহণ করলুম, কিন্তু শেষে যেন ভুলে যেও না...দেখো..." আমার মুখে ভয় আর অবিশ্বাসের যে ছাপ ফুটে উঠেছিল সেটা লক্ষ্য ক'রে ওই অদ্ভুত লোকটি আবার চুপ করলেন। তিনি আমাকে বললেন

"দেখ, আমি গোড়াতেই ত বলেছিলুম; তুমি এ বিশ্বাস করবে না।...তুমি ভাবছ এ রূপকথা—স্বপ্ন, না? আমার নিজের কাছেও তাই ব'লে মনে হয় বটে...যাই হোক, ইয়াগোর সঙ্গে সর্ত্ত হওয়ার ফলে, আমি যে সৈন্য-বিভাগে সম্মান আর উচ্চপদ লাভ করলুম, সেটা ত স্বপ্ন বা অলীক নয়! আমি খুব পরাক্রমী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে যেতুম। ওঃ!—সে, কি অদ্ভুত অভিযান! কি-রকম দৃপ্ত ভাবে, আমি বিপক্ষদের বিজয়-পতাকা ধূলাশায়ী ক'রে দিয়েছি! সারা ফ্রান্স, আমার বিজয়-ঘোষণায় মুখর হ'য়ে উঠল। যত যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে, তা'র মূলে ছিলুম আমি...আর তা'র জন্যে যা-কিছু গৌরব, সে প্রাপ্য হচ্ছে একা আমার।"

এই ব'লে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে, খুব জোর জোর পা ফে'লে বীরের মতন ঘরের মধ্যে এদিক্-ওদিক পায়চারি করতে লাগলেন। উদ্বেগ আর বিস্ময়ে আমার চৈতন্য পর্য্যন্ত যেন লোপ পাচ্ছিল। আমি আপন মনে জনকয়েক প্রসিদ্ধ যোদ্ধার নাম সংগ্রহ ক'রে, তাদের মধ্যে কে ইনি হ'তে পারেন,...সেই চিন্তা করতে লাগলুম।

এইরকম বীরত্বপ্রকাশের পর হঠাৎ আবার যেন তিনি মনভাঙা হ'য়ে পড়লেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে তিনি আবার বলতে লাগলেন, "ইয়াগো কিন্তু তা'র প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিল।......কিন্তু এই প্রভূত পরিমাণে সমরগৌরব লাভ ক'রেও কিছুদিন পরে তা'তেও যেন আমায় অরুচি আর বিরক্তি ধ'রে গেল। তখন বাস্তবজগতের একমাত্র সারবস্তু যা, সেই ধনদৌলত লাভ করবার জন্যে আমি ব্যগ্র হ'য়ে উঠলুম। আবার পাঁচ বৎসর পরমায়ুর বিনিময়ে আমার মনস্কামনা সে পূর্ণ করলে। শোনো তুমি,—প্রচুর অর্থ আমার আছে; আমার ধনদৌলত, বিষয়-সম্পত্তি এত যে, লোকে স্বপ্নেও তা ধারণা করতে পারে না। এইসব অট্টালিকা, বাগান, জমিজমা, সব এখনও আমার......আমার এইসব কথায় আর ইয়াগোর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যদি তোমার অবিশ্বাস হয়, তা হ'লে একটু অপেক্ষা করো,—দেখতে পাবে, সে আসছে......দেখলে, শুনলে, তোমার পর্য্যন্ত জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে।......এ যে একবারে নিছক সত্য ঘটনা কি না......!"

তা'রপর তিনি আগুন জ্বালবার চিমনীর দিকে একবার এগিয়ে গেলেন। ঘড়িটার দিকে একবার চাইতেই তাঁর মুখে শঙ্কার ছায়া ফু'টে উঠল। তা'র পর আবার ধীরভাবে বলতে লাগলেন—এই আজই সকালবেলা, আমি এত অসুস্থ আর দুর্ব্বল বোধ করছিলুম, যে, আমি বিছানা থেকে উঠতে পারছিলুম না। আমি আমার চাকর ইয়াগোকে ডাক দিতেই সে এসে হাজির হ'ল। আমি তা'কে জিজ্ঞাসা করলুম—"এ আমার কি হচ্ছে বলো দেখি?"

সে বললে, 'বিশেষ কিছুই এমন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়,...সময় হ'য়ে এসেছে হজুর,—দিন ফুরিয়ে এল,—আর কি?"

আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"সে আবার কি?"

সে বললে—"বুঝতে পারছ না? ভগবান্ তোমায় ষাট বৎসর পরমায়ু দিয়েছেন,—আর ত্রিশ বৎসর বয়স থেকেই ত তোমার কাছে কাজ ক'রে আসছি—"

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বললুম—ইয়াগো, সত্য কথাই বলছ তুমি?"

...হাঁা হজুর।...পাঁচ বৎসরের মধ্যেই যে কর্ত্তা তুমি তোমার পঁচিশ বৎসর জীবন নষ্ট ক'রে ফেলেছ। সেসব ত আমাকে বিক্রী ক'রে দিয়েছ,—সে পরমায়ু এখন আমার জীবনের সঙ্গে যোগ হ'য়ে যাওয়ায়,—আমারই বাঁচবার দিনের মাত্রাটা বেশ বেড়ে গেছে......"

"সে কি! তা হ'লে কি আমার জীবনের বিনিময়ে তুমি আমার সমস্ত কাজ করেছিলে?"

"হ্যাঁ তাই বই কি! শুধু তুমি একা নও,—সকলেই ওইভাবে যুগযুগান্ত থেকে তাদের জীবনের মূল্য দিয়ে এসেছে......আমার আগেকার এক মনিব ফেবার্ট, ছিল,—তা'রও হয়েছিল ঠিক ওই দশা—"

আমি ব'লে উঠলুম—"চুপ করো—চুপ করো—এসব মিথ্যা...কখন সম্ভবপর হ'তেই পারে না—কিছুতেই না..."

"সে আপনার যেমন অভিরুচি, বলতে পারেন,—কিন্তু প্রস্তুত হোন্—আপনার আর মাত্র আধঘণ্টা আয়ু অবশিষ্ট আছে।"

"আমার সঙ্গে উপহাস করছ তুমি, ইয়াগো!"

"'না কর্ত্তা, মোটেই না,—তুমি নিজেই হিসাব ক'রে দেখ না। তোমার বয়স হ'ল এখন পঁয়ত্রিশ বৎসর—আর তোমার পঁচিশ বৎসরের পরমায়ু আমাকে বিক্রী ক'রে ফেলেছ,—তা হ'লেই ষাট হ'ল না? এ-ত বেশ সোজা হিসাব প'ড়ে রয়েছে"—এই ব'লে সে চ'লে যেতে চেষ্টা করলে। আমার শক্তি যেন লোপ পেতে লাগল—প্রাণ বেরিয়ে আসবার উপক্রম হ'ল!...

আমি ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে ব'লে উঠলুম—"ইয়াগো, ইয়াগো—আমাকে আর দুচার ঘণ্টা সময় দাও..."

সে বললে,—"না, সে হবে না; তা হ'লে আমার নিজের পরমায়ু থেকে যে তোমায় দিতে হয়! দুঘণ্টা বাঁচতে পাওয়ার সঙ্গে সমমূল্য হ'তে পারে, এমন কোনও সম্পদ্ পৃথিবীতে নেই। আমি তোমার চেয়ে জীবনের মূল্য ঢের বেশী বুঝি।"...

আমি আর কথা কইতে পারছিলুম না। চোখ যেন ব'সে যেতে লাগল। শিরার মধ্যের রক্ত যেন মৃত্যুর স্পর্শে হিম হ'য়ে আসতে লাগল। অনেক চেষ্টা করবার পর, আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটল—আচ্ছা, তুমি তোমার সমস্ত দান ফিরিয়ে নাও। আমি প্রাণ ভ'রে যে ধনদৌলত অর্থ সম্পত্তি চেয়েছি—আর লাভও করেছি,—মাত্র চারঘণ্টা জীবন পাওয়ার আশায় আমি এসমস্তই ত্যাগ করতে এখনই প্রস্তুত আছি..."

আমার কথায় সে ব'লে উঠল—"আচ্ছা, তাই হোক্—তুমি বড় ভালো মনিব—তোমার জন্যে আমি কিছু উপকার করতে রাজি আছি।...যাই হোক্, তোমার কথা-মতই কাজ হবে—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।..."

"আমার শরীরে আবার যেন বল ফি'রে এল। আমি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলুম,—"মোটে চার ঘণ্টা! ভারি বড় অল্প সময় যে সে...ইয়াগো ইয়াগো,—যে সাহিত্যের খ্যাতির জন্যে আমি একজন বিশ্ববিখ্যাত লোক হ'য়ে উঠেছি,—আরও চার ঘণ্টা জীবনের বিনিময়ে, আমি সেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই ত্যাগ করতে রাজি আছি।"

সে বললে—"এরই জন্যে চার ঘণ্টা,—অনেক হ'য়ে গেল যে! থাক্ তোমার শেষ অনুরোধটা, আমি আর অস্বীকার করব না।..."

আমি আবার ব'লে উঠলুম—"এই শেষ নয় ইয়াগো, এই ই শেষ নয়!" আমি মিনতি করছি, আজকের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অন্তত আমাকে বাঁচতে দাও। এই সারাদিনের বিনিময়ে, আমার সামরিক কৌশল, বীরপুরুষের খ্যাতি, জয়ের গৌরব, সব দান করছি,...লোকেরা, তাদের স্মৃতি থেকে আমাকে একেবারে মু'ছে ফে'লে দিক—আমি কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই নে! ইয়াগো—শুধু আজকের সারা দিনটা আমাকে বাঁচতে দাও—কেবলমাত্র দিনটি...বাস্, আমি আর-কিছু চাইব না,—তা'তেই সন্তুষ্ট থাকব।"

"'তুমি আমার দয়ার অপব্যবহার করছ—যাই হোক্, আজকের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমাকে বাঁচতে দিলুম,—কিন্তু তা'র পর আর-কিছু চাইতে পারবে না বলছি! সন্ধ্যা হ'লেই আমি তোমার কাছে আসব'—ব'লে সে চ'লে গেছে। তোমায় আমি আজ এই প্রথম দেখছি।—

সাংঘাই সহরে চীনীয়দের যে ধর্মঘট চল্‌ছে তা'র সম্বন্ধে একজন আমেরিকান লেখক আমেরিকার The Nation পত্রে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। তাতে একজন চীন ভদ্রলোকের যে সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে উদ্ধৃত করি :—

8 *A Chinese Graduate of Glasgow. His English is faultless. His labor library is the best I have seen in the East. His pictures are hung in international exhibitions.*

I am a pacifist. But I shall tell you a story that will show you how I feel about this strike. It will show you how hard it is to be a pacifist in China today.

There is a park here in Shanghai which is paid for chiefly by Chinese taxpayers, but no Chinese person is allowed to enter it. One day I was walking by this park when I saw a Sikh policeman chase away a group of ricksha men from the gate, curse them and deliberately tip over one of the rickshas. He had lost his temper because one of the men had come too close to the forbidden territory. He took the license of one of the ricksha men away from him while the poor fellow stood here in the roa l w h the tears streaming down his face. I walked over to the Sikh policeman and said:

"If I were hired by the British to police India for them, I would never treat your countrymen as you are treating these ricksha men".

He cooled down very quickly and was about to give the license back to the ricksha man when two Englishmen came up. They said to me :

"What are you doing here interfering with this policeman? Don't argue with us. You have no business here. You're nothing but a damned Chinaman. Get out of here."

They said that to me in China.

"গড্ডলিকা" *

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বইখানির নাম "গড্ডলিকা"। ভয় ছিল, পাছে নামের সঙ্গে বইয়ের আত্মপরিচয়ের মিল থাকে,—কেননা সাহিত্যে গড্ডলিকা-প্রবাহের অন্ত নাই। কিন্তু সহসা ইহার অসামান্ততা দেখিয়া চমক লাগিল। চমক লাগিবার হেতু এই যে এমন একখানি বই হাতে আসিলে মনে হয়, লেখকের সঙ্গে দীর্ঘকালের পরিচয় থাকা উচিত ছিল। সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যদি দ্বারের কাছে দেখি একটা উইয়ের ঢিবি,আশ্চর্য্য ঠেকে না, কিন্তু যদি দেখি মস্ত একটা বটগাছ তবে সেটাকে কি ঠাহরাইব ভাবিয়া উঠা যায় না।

লেখক পরশুরাম ছদ্মনামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়াছেন। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, চে-া লোক বলিয়া মনে হইল না। কেননা, লেখাটার উপর কোনো চেনা হাতের ছাপ পড়ে নাই। নূতন মানুষ বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাকা হাত।

পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না, কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকের আছে। পরশু অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপসৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে, লেখক বুঝি জখম করিবার কাজেই প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে। বইখানি চরিত্র-চিত্রশালা। মূর্ত্তিকারের ঘরে ঢুকিলে পাথর-ভাঙার আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে করি ভাঙাচোরাই তা'র কাজ তবে সে ধারণাটা ছেলেমানুষের মতো হয়,—ঠিকভাবে দেখিলে বুঝা যায়, গড়িয়া তোলাই তাহার ব্যবসা। মানুষের অবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কি

* গড্ডলিকা—পরশুরাম রচিত, যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত। পাঁচ সিকা। ১০নং পার্শিবাগান, কলিকাতা।

না, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই। আমি দেখিলাম তিনি মূর্ত্তির পর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি। এমন-কি, তাঁর ভূষণ্ডীর মাঠের ভূতপ্রেতগুলোর ঠিকানা যেন আমার ভ্রমণবিবরণের মধ্যে কোথাও লেখা আছে; এমন-কি, যে পাঠাটা কন্সর্ট্-ওয়ালার ঢাকের চাম্‌ড়া ও তাহার দশটাকার নোটগুলো চিবাইয়া খাইয়াছে, সেটাকে আমারই টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া আমার কবিতার খাতাখানা চিবাইতে দেখিয়াছি বলিয়া যেন স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। লেখক বোধ করি আধুনিক রুদ্র-তেজের দিনে নিজেকে বীরপুরুষের দলে চালাইয়া দিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা তাঁহাকে রসস্রষ্টার দলেই দাবী করি। ইহাতে বর্ত্তমান খ্যাতির অঙ্কে যদি তাঁহার কিছু লোকসান হয়, সুদীর্ঘ ভাবীকালে তাহা পূর্ণ হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে।

লেখার দিক্ হইতে বইখানি আমার কাছে বিস্ময়কর, ইহাতে আরো বিস্ময়ের বিষয় আছে, সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কী চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে। তাই চরিত্রগুলো ভাষায় ও চেহারায় ভাবে ও ভঙ্গীতে ডাহিনে বামে এমন করিয়া ধরা পড়িয়াছে যে, তাহাদের আর পলাইবার ফাঁক নাই।

দেবতার গ্রাস

শ্রী সীতা দেবী

১

সমস্ত দিন অসহ্য গরমের পর সবে একটুখানি বাতাস ঝির-ঝির করিয়া সাম্‌নের নারিকেল-গাছের পাতাগুলি দুলাইয়া দিয়া গেল। চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীর বড় শুইবার ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলিয়া একটি বছর পঁচিশের মেয়ে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। এ-দিক ও-দিক তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'কানু, ও কানু'।

ডাকের উত্তরে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মেয়েটি উঠানে নামিয়া আসিয়া দেখিল, সদর দরজাটা হাঁ করিয়া খোলা। দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া সে উদ্বিগ্ন ভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল। একটি দশ বারো বছরের মেয়ে একখানি লাল ডুরে শাড়ী পরিয়া মল বাজাইতে-বাজাইতে দরজার সাম্‌নে আসিয়া বলিল, "ঘাটে যাবে, সরি মাসি?"

সরি বলিল, "যাব কি? হতভাগা ছেলেটা যে কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না। এই খানাখন্দের দেশে কোথাও জলেটলেই পড়্‌ল নাকি কে জানে?"

মেয়েটি বলিল, "জলে পড়্‌বে কেন? এই ত আমি দেখে এলাম ছিদামদের বাড়ীতে খেলা কর্‌ছে তাঁর নাতি-নাত্নী দুটোর সঙ্গে।"

"লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ার যেমন রূপ তেমনি গুণ।" বলিয়া সরি ওরফে সরোজিনী দরজা পার হইয়া গলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। "বামুনের ঘরে জন্মেছে, কিন্তু মুচি মুদ্দফরাস ছাড়া কারো সঙ্গে ওর ভাব নেই। এখানে এসে অবধি কি যে ছিদামের বাড়ীতে পেয়েছে হতভাগাকে। মেজ মাসি জান্‌তে পার্‌লে আমাকেই ঝাঁটা-পেটা কর্‌বে। মুসলমানের বাড়ী সারাদিন পড়ে' থাক্‌বে ছোঁড়া। জলটলও খেয়ে আসে না কি কে জানে?"

পাড়াগাঁয়ে অত পরদার ঘটা নাই, তাহার উপর সরোজিনী আবার এই গ্রামের মেয়ে। কাজেই তাহার ঘোমটা টানিবারও প্রয়োজন হইল না। "শৈলি, আয় ত

শ্রমজীবীরা সমাজের সেই গরজের কথাটা মাথা নাড়া দিয়ে সমাজের নিষ্কর্ম্মা, বা পরাসক্ত বা বুদ্ধিজীবীদের জানান্ দেয় তখন সমাজে একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তখন কোথাও বা কড়া রাজশাসন, কোথাও বা তাদের আরজি মঞ্জুরির দ্বারা সমাজ রক্ষার চেষ্টা হয়।

আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্ম্মশাসনের অন্তর্গত ক'রে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ'তে ক'রে জাতিগত কর্ম্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখ্‌বার বিষয়।

যেসকল কাজ বাহ্য অভ্যাসের নয়, বা বুদ্ধিমূলক বিশেষ ক্ষমতার দ্বারাই সাধিত হ'তে পারে, তা ব্যক্তিগত না হ'য়ে বংশগত হ'তেই পারে না। যদি তা'কে বংশে আবদ্ধ করা হয়, তা হ'লে ক্রমেই তা'র প্রাণ ম'রে গিয়ে বাইরের ঠাট্‌টাই বড়ো হ'য়ে ওঠে। ব্রাহ্মণের যে-সাধনা আন্তরিক তা'র জন্যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সাধনার দরকার; যেটা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক, সেটা সহজ। আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চল্‌তে চল্‌তে তা'র অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হ'তে পারে, কিন্তু তা'র আসল জিনিষটি ম'রে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হ'য়ে উ'ঠে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়ন প্রথা একসময়ে আর্য্যদ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল,—তা'র শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহবাস সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্য্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ কর্‌বার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যেসকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়ত জাগরূক চিৎশক্তির দরকার সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বার নয়। সেইজন্যেই স্বভাবতই উপনয়ন প্রথা এখন প্রহসন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তা'র কারণ উপনয়ন যে-আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে স'রে। ক্ষত্রিয়েরও সেই দশা, কোথায় যে সে, তা'কে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা ক্ষত্রিয়বর্ণ বলে পরিচিত জাতকর্ম্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তা'রা ক্ষত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

এদিকে শাস্ত্রে বল্‌চেন স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। এ-কথাটার প্রচলিত অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যে-বর্ণের শাস্ত্রবিহিত যে-ধর্ম্ম তা'কে, তাই পালন কর্‌তে হবে। এ-কথা বল্‌লেই তা'র তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম্ম-অনুশাসনের যে-অংশটুকু অন্ধভাবে পালন করা চলে, তাই প্রাণপণে পালন কর্‌তে হবে, তা'র কোনো প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক, তাতে অকারণে মানুষের স্বাধীনতার খর্ব্বতা ঘ'টে তা'র ক্ষতি হোক্। অন্ধ আচারের অত্যাচার অত্যন্ত বেশি, তা'র কাছে ভালো-মন্দর আন্তরিক মূল্যবোধ নেই। তাই যে-শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে কথায় কথায় স্নান কর্‌তে ছোটে, সে নিজের চেয়ে অনেক ভালো লোককে বাহ্যশুচিতার ওজনে ঘৃণাভাজন মনে কর্‌তে দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত তা'র পক্ষে আন্তরিক সাধনার কঠিনতর প্রয়াস অনাবশ্যক। এইজন্যে অহঙ্কার ও অন্যের প্রতি অবজ্ঞায় তা'র চিত্তের অশুচিতা ঘটে। এই কারণে আধুনিককালে যারা বুদ্ধিবিচার জলাঞ্জলি দিয়ে ব্রাহ্মণ-সভার মতে স্বধর্ম্মপালন করে, তাদের ঔদ্ধত্য এতই দুঃসহ, অথচ এত নিরর্থক।

অথচ জাতিগত স্বধর্ম্ম পালন করা খুবই সহজ যেখানে সেই স্বধর্ম্মের মধ্যে চিত্তবৃত্তির স্থান নেই। বংশানুক্রমে হাঁড়ি তৈরি করা, বা ঘানির থেকে তেল বের করা বা উচ্চতর বর্ণের দাসবৃত্তি করা কঠিন নয়—বরং তাতে মন যতই ম'রে যায়, কাজ ততই সহজ হ'য়ে আসে। এইসকল হাতের কাজেরও নূতনতর উৎকর্ষ সাধন কর্‌তে গেলে চিত্ত চাই। বংশানুক্রমে স্বধর্ম্ম পালন কর্‌তে গিয়ে তা'র উপযুক্ত চিত্তও বাকি থাকে না, মানুষ কেবল যন্ত্র হ'য়ে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি কর্‌তে থাকে। যাই হোক্, আজ ভারতে বিশুদ্ধভাবে স্বধর্ম্মে টিকে আছে কেবল শূদ্রেরা। শূদ্রত্বে তাদের অসন্তোষ নেই। এইজন্যেই ভারতবর্ষের নিমকে-জীর্ণ দেশে-ফেরা ইংরেজ-গৃহিণীর মুখে অনেকবার শুনেছি, স্বদেশে এসে ভারতবর্ষের চাকরের অভাব তা'রা বড়ো বেশি অনুভব করে। ধর্ম্মশাসনে পুরুষানুক্রমে যাদের চাকর বানিয়েছে তাদের মতো চাকর পৃথিবীতে কোথায় পাওয়া যাবে? লাথিঝাঁটা-বর্ষণের মধ্যেও তা'রা স্বধর্ম্মরক্ষা কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না। তা'রা তো কোনো কালে

সম্মানের দাবী করেনি, পায়ওনি, তা'রা কেবল শূদ্রধর্ম্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা ক'রেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছে। আজ যদি তা'রা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়, তবে ব্রাহ্মণসভা তাদের স্পর্দ্ধা সম্বন্ধে আক্রোশ প্রকাশ করে।

স্বধর্ম্মরত শূদ্রের সংখ্যাই ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি, তাই একদিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে ভারতবর্ষ শূদ্রধর্ম্মেরই দেশ। তা'র নানা প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া গেছে। এই অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্ম্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হ'য়ে আছে। বুদ্ধিসাধ্য জ্ঞানসাধ্য চারিত্র-শক্তিসাধ্য যেকোনো মহাসম্পদ্‌লাভের সাধনা আমরা আজ করতে চাই তা এই প্রবল শূদ্রত্ব-ভার ঠেলে তবে করতে হবে,—তা'র পরে সেই সম্পদ্‌কে রক্ষা করবার ভারও এই অসীম অন্ধতার হাতে সমর্পণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। এই কথাই আমাদের ভাব্‌বার কথা।

এই শূদ্রপ্রধান ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো দুর্গতির যে ছবি দেখ্‌তে পাই, সেই পরম আক্ষেপের কথাটা বল্‌তে বসেছি।

প্রথমবারে যখন জাপানের পথে হংকঙের বন্দরে আমাদের জাহাজ লাগ্‌ল, দেখ্‌লুম সেখানে ঘাটে একজন পাঞ্জাবী পাহারাওয়ালা অতি তুচ্ছ কারণে একজন চৈনিকের বেণী ধ'রে তা'কে লাথি মারলে। আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। নিজের দেশে রাজভৃত্যের লাঞ্ছনধারীকর্ত্তৃক স্বদেশীর এরকম অত্যাচার-দুর্গতি অনেক দেখেছি, দূর সমুদ্রতীরে গিয়েও তাই দেখ্‌লুম। দেশেবিদেশে এরা শূদ্রধর্ম্মপালন করচে। চীনকে অপমানিত করবার ভার প্রভুর হ'য়ে এরা গ্রহণ করেচে। সে সম্বন্ধে এরা কোনো বিচার করতেই চায় না, কেননা এরা শূদ্রধর্ম্মের হাওয়ায় মানুষ। নিমকের সংস্কৃত দাবী যতদূর পৌঁছায় এরা সহজেই তা'কে বহুদূরে লঙ্ঘন ক'রে যায়, তা'তে আনন্দ পায়, গর্ব্ব বোধ করে।

চীনের কাছ থেকে ইংরেজ যখন হংকঙ্‌ কেড়ে নিতে গিয়েছিল তখন এরাই চীনকে মেরেছে। চীনের বুকে এদেরই অস্ত্রের চিহ্ন অনেক আছে—সেই চীনের বুকে যে চীন আপন হৃদয়ের মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধারণ করেছিল, সেই ইৎসিং হিউয়েন্‌সাঙের চীন।

মানব-বিশ্বের আকাশে আজ যুদ্ধের কালো মেঘ চার-দিকে ঘনিয়ে এসেছে। এদিকে প্যাসিফিকের তীরে ইংরেজের তীক্ষ্ণচঞ্চু খরনখর-দারুণ শ্যেনতরণীর নীড় বাঁধা হচ্চে। পশ্চিম মহাদেশে দিকে দিকে রব উঠেছে যে, এসিয়ার অস্ত্রশালায় শক্তিশেল তৈরি চল্‌চে, য়ুরোপের মর্ম্মের প্রতি তা'র লক্ষ্য। রক্তমোক্ষণক্লান্ত পীড়িত এসিয়াও ক্ষণে ক্ষণে অস্থিরতার লক্ষণ দেখাচ্চে। পূর্ব্ব-মহাদেশের পূর্ব্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তা'র দেওয়ালের চারদিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগ্‌বার উপক্রম করচে। হয়তো একদিন এই বিরাট্‌কায় জাতি তা'র বন্ধন ছিন্ন ক'রে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে,হয়তো একদিন তা'র আফিমে আবিষ্ট দেহ বহুকালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিঝুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল, তা'রা চীনের এই চৈতন্য-লাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ ব'লেই গণ্য করবে। তখন এসিয়ার মধ্যে এই শূদ্রভারতবর্ষের কী কাজ? তখন সে য়ুরোপের কামারশালায় তৈরি লোহার শিকল কাঁধে ক'রে নির্ব্বিচারে তা'র প্রাচীন বন্ধুকে বাঁধ্‌তে যাবে। সে মারবে, সে মরবে। কেন মারবে, কেন মরবে একথা প্রশ্ন করতে তা'র ধর্ম্মে নিষেধ। সে বল্‌বে স্বধর্ম্মে হননং শ্রেয়ঃ, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। ইংরেজসাম্রাজ্যের কোথাও সে সম্মান চায়ও না, পায়ও না—ইংরেজের হ'য়ে সে কুলিগিরির বোঝা ব'য়ে মরে, যে-বোঝার মধ্যে তা'র অর্থ নেই, পরমার্থ নেই, ইংরেজের হ'য়ে পরকে সে তেড়ে মারতে যায়, যে-পর তা'র শত্রু নয়, কাজ সিদ্ধ হবামাত্র আবার তাড়া খেয়ে তোষাখানার মধ্যে ঢোকে। শূদ্রের এই তো বহু যুগের দীক্ষা। তা'র কাজে স্বার্থও নেই, সম্মানও নেই, আছে কেবল স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ এই বাণী। নিধনের অভাব হচ্চে না; কিন্তু তার চেয়েও মানুষের বড় দুর্গতি আছে, যখন সে পরের স্বার্থের বাহন হয়ে পরের সর্ব্বনাশ করাকেই অনায়াসে কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে। অতএব এতে আশ্চর্য্যের কথা নেই যে, যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তা হ'লে নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌বে, "I miss my best servant."

একটু আমার সঙ্গে'', বলিয়া নবাগতা শৈলর হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে সে চলিতে আরম্ভ করিল। শৈল একটুখানি আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমার যে দেরী হ'য়ে যাবে মাসি, মা আমাকে শিগ্‌গির করে'ফিরতে বলেছে।"

"কেন লা? তোর বর আস্‌বে বুঝি আজ?" মেয়েটি লাল হইয়া উঠিয়াই তাহার কথার উত্তর দিল।

"আচ্ছা যা, আমি একলাই এটুকু যেতে পারব," বলিয়া সরোজিনী শৈলকে ছাড়িয়া দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ছিদামের বাড়ী বেশী দূর নয়। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়াই সরোজিনী দেখিল, তাহার চার বছরের ছেলে কানু বসিয়া-বসিয়া একটা ছাগলছানাকে কচি পাতা আর ঘাস খাওয়াইতেছে। ছিদামের নাতি পাতা-ঘাস কুড়াইয়া আনিতেছে এবং নাত্নীটি আপনার পায়ের মল খুলিয়া ছাগলের পায়ে পরানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। চতুষ্পদটি এ-প্রকার প্রসাধনে প্রবল আপত্তি করিলেও তাহাকে মোটেই নিষ্কৃতি দেওয়া হইতেছে না।

ঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটাকতক চড় লাগাইয়া দিয়া সরোজিনী ছেলের হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে বাড়ী আসিয়া হাজির হইল। ছেলে সারাপথ আর্ত্তনাদে মুখর করিয়া তুলিল। বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই সরোজিনী পড়িল তাহার পূজনীয়া মেজমাসির সাম্‌নে। তিনি বারাণ্ডার উপর দুই পা যথাসম্ভব ছড়াইয়া বসিয়া হাই তুলিতেছিলেন। বোন্‌ঝিকে দেখিয়া বলিলেন, "ছেলেটাকে অমন করে' ঠ্যাঙাচ্ছিস্ কেন রে?"

"না ঠেঙিয়ে করি কি? যা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, কোন্ দিন জলে ডুবে মর্‌বে! গিয়ে দেখি পুকুরপাড়ে বসে' কাদা নিয়ে খেল্‌ছে।"

"আমি পুকুরপাড়ে যাইনি, আমি ছাগলছানা নেবো ও-ও-ও", করিয়া কানু আবার চীৎকার সুরু করিল। পাছে সব কথা ফাঁশ হইয়া যায় সেই ভয়ে ছেলেকে আরো গোটা কয়েক চড় লাগাইয়া সরোজিনী তাহার কথা বলার পথ বন্ধ করিয়া দিল। "কি ছেলে-ঠ্যাঙানীই হয়েছিস্ বাছা, দশটা না পাঁচটা না, ঐ ত একটাতে এসে ঠেকেছে মরে' ঝরে', তাকেও রাত দিন চড় চাপড়!" বলিয়া বৃদ্ধা আবার হাই তোলায় মন দিলেন। মাসীর কথায় সরোজিনীর ছেলে ঠ্যাঙানোর উৎসাহ হঠাৎ যেন অন্তর্ধান করিল। সে কানুকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সরোজিনীর বিবাহ হইয়াছিল নিকটেরই এক গ্রামে। বিবাহের পর প্রথম প্রথম প্রতি বৎসরই সে পূজার সময় বাড়ী আসিত। দুই একটি ছেলে মেয়ে হওয়ার পর ক্রমে বাপের বাড়ী আসাটা তাহার কমিয়া আসিল। এইবার সে আসিয়াছে চার পাঁচ বৎসর পরে। ইহার ভিতর সুখ-দুঃখের কত প্লাবন তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। তিনটি সন্তানের মধ্যে দুইটি তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যেটি আছে তাহাকে লইয়া সরোজিনীর আশঙ্কার অন্ত নাই। কানুকেও কি আর বিধাতা তাহার মত হতভাগিনীর কাছে রাখিবেন? তাহার মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সে উজাড় করিয়া এই শিশুদেবতার নিকটেই উৎসর্গ করিতে চাহিত, আবার ভয়ে হাত গুটাইয়া লইত। এইজন্য ছেলের প্রতি ব্যবহারে তাহার কোনো সামঞ্জস্য ছিল না। কখনও তাহাকে আদরে আদরে ডুবাইয়া রাখিত, কখনও বা তাহার অদৃষ্টে চড়চাপড় বকুনি ভিন্ন কিছুই জুটিত না। দেশের বাড়ীতে থাকিতে এইরূপ ব্যবহারে কানুর কিছু অসুবিধা ছিল, কারণ মায়ের আদর বা অনাদর কোনো কিছু হইতেই তাহার পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার উপায় ছিল না। বাড়ীর যে ক'টা ঝি চাকর ছিল, সব ক'জন এই একমাত্র শিশুর পিছনে ঘুরিত। একটু সদর দরজার চৌকাঠ মাড়াইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।

কিন্তু মামার বাড়ী আসিয়া সে বাঁচিয়া গিয়াছিল। মাও এখানে সারাক্ষণ তাহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিতে সময় পায় না; বাল্যসখী, ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করিয়া, তাস পাশা খেলিয়া তাহার অনেকটা সময়ই কাটিয়া যায়। দরিদ্রের সংসারে ঝি-চাকরের বালাইও বিশেষ ছিল না, কাজেই মায়ের হাত হইতে ছাড়া পাইলেই কানুর ছিল অবাধ গতি।

এই নূতনলব্ধ স্বাধীনতাটার সে ভাল করিয়াই সদ্ব্যবহার করিতেছিল। পাড়ার যেখানে যত ছেলে-মেয়ে ছিল, ভদ্রলোক ছোটলোক-নির্ব্বিশেষে সে সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব জমাইয়া তুলিয়াছিল। সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাহার ছিদাম মুসলমানের বাড়ীটা। সমবয়সী দুটি ছেলেমেয়ে ত এখানে ছিলই, তাহার উপর ছিল একটা ছাগলছানা এবং গোটা-দুই কুকুরছানা। ছাগলছানাটাই তাহার বেশী প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের নামের সহিত নাম মিলাইয়া ছানাটার সে নাম রাখিয়াছিল পানু, এবং নিজের এই বছরের কেনা নূতন পূজার কোটটা তাহাকে দান করিয়া ফেলিয়াছিল। সরোজিনী অবশ্য সেটা উদ্ধার করিয়া আনিল। জুতা-জোড়া দিতেও তাহার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাহার দুপাটি জুতাতে পানুর চারটি পায়ের শোভাবর্দ্ধন করা সহজ নয় দেখিয়া সে-সংকল্পটা কানুকে ত্যাগই করিতে হইল।

কিন্তু তাহার মামার বাড়ীর ব্রাহ্মণ্য তাহাকে বড়ই জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল। যখন-তখন তাহাকে ছিদামের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া স্নান করাইয়া শুদ্ধ করিয়া তোলা ত কানুর মায়ের এক নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সরোজিনীর নিজের যে গোঁড়ামী খুব বেশী ছিল তাহা নয়, তবে মাসী পিসীর পাল্লায় পড়িয়া খানিকটা জাত বাঁচানোর চেষ্টা না করিয়া তাহার উপায় ছিল না। তবে অল্প ক'দিনের জন্য সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে অনেক দিন পরে, কাজেই কানু মাঝে-মাঝে ছুটী পাইতই। মায়ের বয়স অল্প, সঙ্গিনীরও অভাব নাই।

পূজার দিন-ক'টা বড়ই যেন তাড়াতাড়ি কাটিয়া গেল। সরোজিনীর এর পর না ফিরিলেই নয়; অনেক বৎসর বাপের বাড়ী যায় নাই, পনেরো ষোলো দিনের বেশী কখনই থাকিবে না, ঠাকুর-ঝি শ্বশুর-বাড়ী যাইবার আগেই সে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবে, ইত্যাদি অনেক প্রকার কথার জোরে তবে সে স্বামীর কাছে ছুটি পাইয়াছিল। তাহার ননদও দিন কয়েকের জন্য দয়া করিয়া সংসার চালাইবার ভার লইয়াছিল।

বিদায়ের দিন কানুকে অনেক কষ্টে ছিদামের বাড়ী হইতে টানিয়া আনা হইল। পানুকে সে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিল, কিছুতেই তাহাকে ছাড়ানো যায় না। তাহার কান্নায় ব্যথিত হইয়া বৃদ্ধ ছিদাম বলিল, "দিদি ঠাক্‌রোন্, আপনি ওটারে নিয়ে যান।"

সরোজিনী বলিল, "না, না, নেব কেন? ছেলেটার যত অনাছিষ্টি আবদার। এই নে, ছাড়্ বল্‌ছি ছাড়্," সে একরকম জোর করিয়া কানুকে টানিয়া লইল। "তোমার ছাগলছানা নিয়ে যাও বাপু, চোখের সাম্‌নে থাক্‌লে, ও কিছুতেই বায়না ছাড়্‌বে না।"

গাড়ীতে উঠিবার বেলা তাহার মাসী বলিলেন, "দেখ্ বাছা, ছেলেটাকে অত করে' ঠ্যাঙাস্ না, মরে' হেজে ঐ একটা গুঁড়োতে ঠেকেছে। আর বামুনের মেয়ে একটু জাতজন্ম বাঁচিয়ে চালিস্, তা না হ'লে কি ঘরে লক্ষ্মী থাকে? ছত্রিশ জাতের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি করিস্, এতে কি কম পাপ হয়?"

২

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কানু কেমন যেন মনমরা হইয়া রহিল। বিকালবেলা তাহাকে দুধ খাওয়াইতে গিয়া সরোজিনী দেখিল সে চুপ করিয়া ঘরের কোণে বসিয়া আছে। মা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, অসুখ করেছে নাকি?" কানু মাথা নাড়িয়া জানাইল অসুখ তাহার করে নাই।

"তবে অমন মুখ হাঁড়ি করে' বসে' আছিস্ কেন?"

কানু হঠাৎ ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে যে।"

সরোজিনী দুধের বাটি তাহার মুখের কাছে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে তা মুখ ফুটে বল্‌তে কি হয়? এমনি ছেলের মুখে খৈ ফোটে, আর দর্‌কারের সময় কনে বৌয়ের মত মুখ বুজে বসে' আছে।"

কানু দুই ঢোক দুধ গিলিয়াই বাটিটা ঠেলিয়া দিল। সরোজিনী বলিল, "এরি মধ্যে গেলা হ'য়ে গেল?"

কানু বলিল, "দুধ বিচ্ছিরি, আমি খাব না।"

তাহার মা বলিল, "বিচ্ছিরি না তোমার মাথা! ওখান থেকে এসে অবধি ছেলে যেন কি হয়েছে,

সারাদিন নাকে কান্না!" সে দুধের বাটি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। স্বামী বাড়ী আসিবামাত্র বলিল, "ছেলেটাকে একটু দেখ না কিছু না, ও যে দিনকার দিন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। খাওয়া শুদ্ধ ছেড়ে দিলে ঐটুকু ছেলে বাঁচ্‌বে কেমন করে'?"

তাহার স্বামী বলিল, "তুমি আছ কি করতে? আমি বাইরেও খাট্‌ব, ঘরেও ছেলে দেখ্‌ব? তা তুমি আমার অফিসের কাজটা করে' দিও, আমি ছেলের খাওয়া দাওয়া দেখ্‌ব এখন।"

একটুখানি সহানুভূতির আশায় আসিয়া এইরকম সুমধুর উত্তর পাইয়া সরোজিনী আর কথা না বলিয়া ফিরিয়া গেল। তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার কতটা ছেলের অমঙ্গল আশঙ্কায় আর কতটা স্বামীর প্রতি অভিমানে তাহা সে নিজেই বুঝিল না।

কানুর খাওয়া-দাওয়া কিছুতেই আর ঠিক মত হয় না। আগে রাত আটটায় ঘুমাইয়া পড়িয়া পরদিন বেলা আটটায় ওঠা ছিল তাহার স্বভাব, এখন সে রাত্রে তিন চার বার কাঁদিয়া জাগিয়া ওঠে। তাহাকে খাব্‌ড়াইয়া নারিকেল নাড়ু খাওয়াইয়া, গল্প বলিয়া অনেক কষ্টে আবার ঘুম পাড়াইতে হয়।

কালীপূজার দিনকয়েক আগে সকালবেলা উঠিয়া সরোজিনী দেখিল কানুর গা গরম। এই বয়সেই বিয়োগ-দুঃখের অভিজ্ঞতা তাহার কম হয় নাই, সে একেবারে ভয়ে যেন অচল হইয়া গেল। খানিক পরে নিদ্রিত স্বামীকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল, "কানুর জ্বর হয়েছে।"

স্বামী বলিল, "ভাল করে' দেখেছ?" সরোজিনী ক্রন্দনজড়িত স্বরে বলিল, "আমার যথাসাধ্য ভাল করে'ই দেখেছি, এইবার তুমি দেখ।"

কানুর বাবা উঠিয়া বসিয়া তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর বিছানা ছাড়িয়া জামা গায়ে দিতে-দিতে বলিল, "ওকে এখনই কিছু খাইও না, আমি যদু ডাক্তারকে ডেকে আন্‌ছি।"

সে বাহির হইয়া গেল। ভয়ের একটা কালো ছায়া যেন সরোজিনীর চোখের সাম্‌নে সমস্ত জগৎ সংসারকে অল্পে অল্পে ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। অল্প বয়সেই তাহার দুঃখের অভিজ্ঞতা কম হয় নাই, ভগবান শোকের অগ্নি-পরীক্ষায় তাহাকে বঞ্চিত করেন নাই। তাই পীড়িত পুত্রের পাশে বসিয়া তাহার ভয় পাইতেও যেন ভয় করিতে লাগিল।

তাহার স্বামী বীরেন্দ্র অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বীরেন্দ্র কি জিজ্ঞাসা করাতে ইংরেজীতে তাহার উত্তর দিলেন। ভয়ে সরোজিনীর বুকের ভিতরটা আরো যেন শীতল হইয়া আসিল। স্বামী ফিরিবামাত্র সে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, ডাক্তার কি বল্‌লে?

বীরেন বলিল, "কি আবার বল্‌বে? সময়টা ভাল নয় তাই সাবধানে রাখ্‌তে বল্‌লে।" পাছে স্ত্রী আবার কিছু জিজ্ঞাসা করে এই ভয়েই যেন সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সরোজিনীর সেদিন নাওয়া খাওয়া, ঘরের কাজ দেখা কিছুই ঘটিয়া উঠিল না। ভাগ্যে তাহার ননদটি তখনও শ্বশুরবাড়ী যায় নাই, তাহা না হইলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মানুষকেও উপবাস করিতে হইত।

পরদিন সকালে উঠিয়াই বীরেন থার্মোমিটার লইয়া ছেলের জ্বর দেখিতে গেল। সরোজিনী উৎকণ্ঠিত মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, জ্বর ছেড়েছে?"

বীরেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে কমে নাই। যম-রাজের সহিত অল্প বয়সেই পরিচয় করিতে হইয়াছিল বলিয়া এই দম্পতিটির মুখে আর যেন কথাই আসিতেছিল না। তাহাদের আর বলিবার আছে কি?

খানিক পরে চোখ মেলিয়া কানু বলিল, "মা, আমি মুড়ি খাব।"

সরোজিনী ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "মুড়ি ত এখন নেই বাবা, পরে দেব; এখন একটু দুধ খাও, লক্ষ্মী ছেলে।"

কানুর লক্ষ্মী ছেলে হইবার কোনোরূপ বাসনা ছিল না। সে মাথা নাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, "না আমি দুধ

খাব না, মুড়ি খাব। আমাকে মামাবাড়ী নিয়ে চল, সেখানে মুড়ি আছে।"

সরোজিনী সান্ত্বনার সুরে বলিল, "আচ্ছা, মুড়ি ভেজে নিয়ে আস্‌ছি, তুমি আগে দুধটা খেয়ে নাও।"

শুধু মুড়িতে ভুলিবার ইচ্ছা কানুর ছিল না, সে একটু-খানি দুধ খাইয়া বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "আমি মামাবাড়ী যাব।"

সরোজিনী বলিল, "আচ্ছা, তাই যাস্‌ এখন, আগে ভাল হ'য়ে নে।"

কানু কিন্তু ভাল হইবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। তাহার জ্বর বাড়িতে লাগিল সর্দ্দি-কাশিও দেখা দিল। সরোজিনীর কান্নাকাটিতে বীরেন সহরে গিয়া ভাল ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। তিনি অনেকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু রোগীর রোগের কোনোই প্রতিকার তাহাতে হইবে বলিয়া মনে হইল না। ছেলে ক্রমেই যেন নিঝুম হইয়া পড়িতে লাগিল; কথা-বার্ত্তা কান্নাকাটি পর্য্যন্ত যেন তাহার বন্ধ হইয়া গেল।

গ্রামে এক বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেন। সরোজিনী কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি রোগের ইতিহাস শুনিয়া বলিলেন, "তা মা, ওষুধ আমি দিতে পারি, কিন্তু ডাক্তারী ওষুধের সঙ্গে ত আমার ওষুধ চলবে না।"

সরোজিনী বলিল, "আমি ডাক্তারী ওষুধ দেব না, আপনার ওষুধই দিন।"

বাড়ী আসিয়া দেখিল বীরেন কানুকে ওষুধ খাওয়াইয়া রাখিয়াছে। দুটা ভাল ঔষধে দ্বিগুণ উপকারের আশা করিয়া সরোজিনী হোমিওপ্যাথীর ঔষুধটাও লুকাইয়া খাওয়াইয়া দিল। একবার নয় কয়েক বারই কানুর উপর দুই ধরণের চিকিৎসার পরীক্ষা হইয়া গেল। জ্বরটা কিন্তু এলোপ্যাথী বা হোমিওপ্যাথী কাহারও উপর পক্ষপাত না দেখাইয়া আপন মনে বাড়িয়াই চলিল।

ভোরের বেলা সরোজিনী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিল। অদূরে খাটের উপর তাহার স্বামী শুইয়া ঘুমাইতেছিল, তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "খোকাকে দেখো একটু, আমি আস্‌ছি এখুনি কালীবাড়ী থেকে।"

তাহার স্বামী বলিল, "এখন তোমায় কোথাও যেতে হবে না, আগে ছেলের দুধ জ্বাল দিয়ে দাও।" সরোজিনী তাহার কথায় কান না দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতে তাহার লাগিল অনেকক্ষণ। এক-মনে দেবীর কাছে কি সে প্রার্থনা করিতেছিল সেই জানে, কিন্তু সময়ের জ্ঞান তাহার আর ছিল না। পীড়িত পুত্রের পথ্যের ব্যবস্থা সে করিয়া আসে নাই, তাহাও যেন তাহার মনে ছিল না।

বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী অত্যন্ত বিরক্ত মুখ করিয়া বসিয়া আছে। সরোজিনীকে দেখিয়া বলিল, "কি ঘোড়ার ডিম কর্‌ছিলে এতক্ষণ ধরে'? রোগা ছেলেটা ক্ষিদেয় চেঁচিয়ে মর্‌ছিল! তোমার যদি কোনো কাণ্ড-জ্ঞান আছে!"

স্বামীর কথার অবজ্ঞা কাহার উপর গিয়া যে পড়িল ভাবিয়া সরোজিনী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। যাহার কাছে সে এতক্ষণ মাথা কুটিয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছিল, তাহাকেই যে বীরেন্দ্র তুচ্ছ করিতে চায়! সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চুকাইয়া ফেলিবার জন্য বলিল, "মা কালীর কাছে জোড়া পাঁটা মানত করে' এলাম, তিনি আমার বাছাকে ভাল করে' দিন। ওকে কিছু কি খাইয়েছ, না দুধ নিয়ে আস্‌ব?"

বীরেন্দ্র অপ্রসন্ন মুখ করিয়া বলিল, "না খেলে কি আর এতক্ষণ রক্ষে রাখ্‌ত? দুধ জ্বাল দিয়ে অর্দ্ধেক ত নিজের গায়ের ওপরেই ফেলেছি। পার ত একটু আলু বাটা টাটা এনে দাও, জ্বলে' মর্‌ছি তখন থেকে।"

রাতটা সরোজিনী একরকম বসিয়াই কাটাইয়া দিল। এক একবার তাহার ঘুম আসিতে লাগিল, কিন্তু আগের রাতের দুঃস্বপ্নের স্মৃতি তাহাকে বারবার ঘুমের সিংহদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। সে উঠিয়া বসিয়া একবার নিদ্রিত পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া একবার জানলার ধারে দাঁড়াইয়া রাতটা শেষ করিয়া ফেলিল। ভোরের আলোয় পূর্ব্বের আকাশটা যখন স্বচ্ছ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন কেন জানি না তাহার মনে হইল বুকের বোঝাটা তাহার যেন অনেকখানিই হাল্কা। তাড়াতাড়ি কানুর কাছে ছুটিয়া গিয়া সে তাহার কপালে



রক্তসন্ধ্যা

চিত্রকর শ্রী অন্নদা মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

হাত দিল। জ্বর যেন অনেক কম। নিজেকে বিশ্বাস হইল না। দুর্ভাগ্যের তাড়না সহ্য করিয়া করিয়া ছোট-খাটো সৌভাগ্যকেও বিশ্বাস করা তাহার শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আর একবার ছেলের গায়ে হাত দিল। এবারও মনে হইল জ্বর কম। সে বীরেন্দ্রের কাছে গিয়া তাহাকে তুলিয়া দিল, বলিল, "একটু কানুর গায়ে হাত দিয়ে দেখ ত।"

বীরেন্দ্র ভয় পাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কেন কেন, জ্বর বেশী মনে হচ্ছে নাকি?"

সরোজিনী বলিল, "ষাট ষাট, বেশী হতে যাবে কেন? একটু কম লাগ্‌ছে তাই তোমাকেও দেখ্‌তে বল্‌ছি, সত্যি না আমার মনের ভুল।"

বীরেন্দ্র খাট ছাড়িয়া উঠিয়া থার্ম্মোমিটার হাতে করিয়া ছেলের জ্বর দেখিতে গেল। সরোজিনী আশা-আশঙ্কায় দুই চোখ ভরিয়া ঐ ছোট কাঁচের নলটির দিকে চাহিয়া রহিল, উহার উপরেই যেন তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। থার্ম্মোমিটার বাহির করিয়া লইয়া হ্যারিকেন-লণ্ঠনের কাছে ধরিয়া বীরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী ভয় পাইয়া বলিল, "অতক্ষণ ধরে' কি দেখ্‌ছ গো, জ্বর কি কমেনি? কথা বল না কেন?"

বীরেন্দ্র চোখ তুলিয়া স্ত্রীর ভয়কাতর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আরে, সব তাতে অত ভয় পাও কেন? ভয় পেয়ে ত অনেক দেখ্‌লে, কিছু লাভ হ'ল কখনও তাতে? আর কি ছেলেমানুষী কর, কান্না আরম্ভ করলে কেন? ভয় নেই তোমার কানুর জ্বর খুবই কম; প্রায় ছেড়ে গিয়েছে বল্‌লেই হয়। এই নাও, দেখ আমার কথায় বিশ্বাস না হয় ত।" সরোজিনী স্বামীর হাত হইতে থার্ম্মোমিটার লইয়া দেখিল সত্যই জ্বর নাই বলিলেই হয়, নিরানব্বইয়ের নীচে নামিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ পরে সে নিজের সারারাত অব্যবহৃত বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িল, তাহার মনের যত আশঙ্কা আর উদ্বেগ যেন চোখের জল হইয়া গলিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। বীরেন্দ্র বুঝিল। সেও কথা না বলিয়া স্ত্রীর পাশে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

কানুর জ্বর সত্যই ছাড়িয়া গেল। অল্পে-অল্পে সে আবার কথা বলা, অন্যায় আব্‌দার করা, খাইবার জন্য উৎপাৎ করা, এমন-কি বিছানা ছাড়িয়া দৌড় মারিবার চেষ্টা সবই সুরু করিল। সরোজিনী এতদিন একলা তিনটা মানুষের কাজ করিয়া আসিতেছিল। রাত্রেও অধিকাংশ সময় সে জাগিয়াই থাকিত, তবু তাহার দেহে মনে শ্রান্তি ছিল না। এখন হঠাৎ তাহার সমস্ত শক্তি তাহাকে যেন ত্যাগ করিয়া গেল। সকালে তাহার খাট হইতে দেহটাকে যেন জোর করিয়া টানিয়া তুলিতে হয়, ঘুমের ঘোর যেন সারাদিনের মধ্যে তাহাকে ছাড়িতে চায় না। রান্নাঘরে সে উনানের পাশে বসিয়া-বসিয়া ঢুলিতে থাকে। কোন্ তরকারিতে কি যে দিয়া বসে তাহার ঠিকানা নাই। অবস্থা দেখিয়া বীরেন্দ্র বলিল, "আর তোমার রান্না করে' কাজ নেই, কোন্ দিন আগুনের মধ্যে পড়ে' মর্‌বে। আমি তারিণী জ্যাঠার কাছে বলে' তাঁর বড় বৌটিকে ঠিক করে' এসেছি। বিধবা মানুষ সারাদিন শ্বশুরবাড়ীর সকলের গাল-মন্দ খায়, সেও একটু বেরতে পেয়ে বেঁচে যাবে, তোমারও একটু বিশ্রাম হবে। ডাক্তার-বাবু বল্‌ছিলেন কানুকে নিয়ে একবার চেঞ্জে যেতে। যে-রকম দেখ্‌ছি—কানুর চেয়ে কানুর মায়েরই চেঞ্জের বেশী দর্‌কার।"

হাওয়া বদ্‌লানোর প্রয়োজন হইল না, কানু ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীর বাহির হইয়া দৌড় মারিবার উৎসাহ তাহার এমন দ্রুতগতিতে বাড়িতে লাগিল যে, সরোজিনীকে তাহাকে আগ্‌লাইয়া রাখিতেই সারাদিন ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হইত। রান্নাবান্নার কাজটা অন্য মানুষের হাতে পড়ায় তাহার অবশ্য সময়ের অভাব ছিল না, তবে বিশ্রামের প্রয়োজন তখনও ছিল। কাজেই ছেলের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া মাঝে মাঝে তাহার আগেকার দিনের ছেলে-ঠ্যাঙ্গানোর ভূত তাহাকে পাইয়া বসিত। কিন্তু কানুর গায়ের কাছে গিয়াই তাহার উদ্যত হস্ত নামিয়া পড়িত। এও ত যাইতেই বসিয়াছিল। আর একটু হইলেই হতভাগিনী মাকে জ্বালাইবার জন্য জগতে আর কেহই অবশিষ্ট থাকিত না। কানু চির-কালের অভ্যাসমত ঘাড় নীচু ও পিঠ কুঁজা করিয়া মার

খাইতে প্রস্তুত হইত, তাহার পর প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ করিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়া থাকিত। কিন্তু মারটা যখন মাঝ-পথে আসিয়াই থামিয়া যাইত, তখন সে অত্যন্তই হতবুদ্ধি হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, যেন এমন ব্যাপার সে সাত জন্মে দেখে নাই।

দিনকয়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। তারপর সরোজিনী বলিল,"হ্যাঁ গা, খুব ত চুপ করে' রয়েছ, আসল কাজ যে বাকি রয়েছে, সেদিকে হুঁস্ নেই?"

বীরেন্দ্র বলিল, "আসল কাজখানা কি?"

"মায়ের কাছে যে মানত্ করেছি, দিতে হবে না? আসচে অমাবস্যাতেই দিয়ে ফেলা উচিত।"

বীরেন্দ্র সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।" সেদিন সকালে উঠিয়া, একবাটি দুধ খাইয়া, বাহিরে আসিয়াই কানু আনন্দে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল, "পানু, পানু, ওমা দেখ পানু এসেছে।" সরোজিনী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। ছাগল কিনিতে হাটে লোক পাঠানো হইয়াছিল, সে কখন্ আসিয়া উঠানে ছাগল বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সরোজিনী তত লক্ষ্য করে নাই। ছেলের চেঁচানিতে বাহিরে আসিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কানু দুই হাতে পানুকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে ঘাস খাওয়াইতেছে, গায়ে হাত বুলাইতেছে এবং কোলে তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টারও তাহার অন্ত নাই। ছাগলছানাটা খুব যে খুসি হইয়াছে তাহা বোধ হইল না, তবে ঘাস-পাতা খাইতে কোনোপ্রকার আপত্তি তাহার দেখা যাইতেছে না। সরোজিনী শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ছেলের হাত হইতে এটাকে কাড়িয়া লওয়া সম্ভব হইবে কিরূপে? কিন্তু না লইয়াই বা উপায় কি? দেবীর নামে যাহাকে সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে, তাহাকে দেবীর কাছেই উৎসর্গ করিতে হইবে। অন্য চিন্তা মনে আনাও যে মহাপাপ! কানুর মঙ্গলের জন্যই তাহাকে কষ্ট দিয়াও একাজ করিতেই হইবে।

ছেলেকে ভুলাইবার চেষ্টায় সে বলিল, "দূর্, ও পানু হ'তে যাবে কেন? তুই এক বোকা, পানু কি এত বড়?"

কানু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "ইঃ, পানুই ত, আমি বুঝি জানি না? এই দেখ ওর চার পায়ে মলের দাগ রয়েছে।" পানুর চারিটি পায়েই যে শাদা লোমের দাগ ছিল তাহা সরোজিনী প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার আশা ছিল যে বাজে কথা বলিয়া সে কানুকে ভুলাইতে পারিবে, কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই সে পুত্রের কাছে হার মানিয়া থামিয়া গেল।

কানুকে লইয়া সেদিন আর কাহাকেও কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইল না। সে পানুর কাছ ছাড়িয়া একপাও কোথাও নড়িল না। ছাগলছানাটার স্নানাহারের ব্যবস্থা এত যত্নের সহিত হইতে লাগিল যে সে চীৎকার করিয়া পাড়া কাঁপাইয়া তুলিল। রাত্রে সরোজিনী শুইতে গিয়া দেখিল তাহার শয্যা অধিকার করিয়া কানুর পাশে পানুও বিরাজ করিতেছে। এবার কানুকে গোটাকয়েক চড় খাইতে হইল, কিন্তু তাহাতেও ছেলের দমিবার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। সেও পানুর সঙ্গে উঠানে শুইতে চলিল। সরোজিনী হার মানিয়া শেষে শোবার ঘরের দরজার কাছে পানুর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। শঙ্কিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল, কাল ত পূজা দিবার কথা কিন্তু পানুকে ছাড়াইয়া লইবে সে কি করিয়া? ঠিক করিল একেবারে খুব ভোরে ভোরে উঠিয়া ছাগল-ছানাটাকে কোনো প্রতিবেশীর বাড়ী রাখিয়া আসিবে, তাহার পর সময়মত সেখান হইতে কালীবাড়ীতে লইয়া গেলেই চলিবে।

কিন্তু যথেষ্ট সকালে উঠিয়াও সরোজিনীকেই হার মানিতে হইল। যে-স্নেহ রক্ষা করিতে চায়, তাহারই চক্ষু বিনাশপ্রার্থীর চক্ষুর চেয়ে যে সজাগ তাহা স্বীকার করিতে হইল। সরোজিনী দেখিল একটা ছাগলছানা মাত্র উঠানে বাঁধা, অন্যটার সন্ধান নাই। কানুও যে ঘরে নাই, তাহা সে ঘুম ভাঙিয়াই দেখিয়াছিল; কাজেই তাহার বুঝিতে দেরি হইল না যে, দুটি পলাতকের সন্ধানই এক জায়গায় মিলিবে। স্বামীকে জাগাইয়া খবরটা দিয়া সে চাকরকে ছেলের খোঁজে পাঠাইয়া দিল। বৌ-মানুষ বলিয়া সে নিজে যাইতে পারিল না, সদর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিতে লাগিল পুত্রের কোনো চিহ্ন দেখা যায় কি না।

কানুর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, কিন্তু এই সময় কালীবাড়ী হইতে লোক আসিয়া জানাইয়া গেল যে পূজার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে, ঠাকুর শীঘ্র করিয়া সব আয়োজন লইয়া তাহাদের যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। সরোজিনী তাহাকে "এখুনি যাচ্ছি" বলিয়া বিদায় করিয়া দিল বটে, কিন্তু এখনই যাইবার কোনো উপায় তাহার মাথায় আসিল না। কানু এবং পানুর সন্ধান না মিলিলে কিছুই যে করা সম্ভব নয়। তাহার পা কিছুতেই সদর দরজা ছাড়িয়া নড়িতে চাহিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া ভিতরে গিয়া পূজার জন্য আর যাহা কিছু আয়োজন করা দরকার সব শেষ করিয়া রাখিল। বীরেন্দ্রকে তাগিদ দিয়া স্নান করাইল, নিজেও স্নান সারিয়া কালীবাড়ী যাইবার উপযুক্ত বেশভূষা করিয়া লইল।

এমন সময় সদর দরজার কাছে মানব-শিশু ও ছাগ-শিশুর এমন একটা মিলিত আর্ত্তনাদ শোনা গেল যে, বাড়ীর সকলে কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। অন্য ছাগল-ছানাটার গলার দড়ি হাতে ধরিয়া যে চাকরটা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল, সে কানুর হাত হইতে পানুকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, তাই এই কাণ্ড। কানু প্রাণপণ শক্তিতে ছোট দুই হাতে পানুকে ধরিয়া আছে, আর যথাসম্ভব হাঁ করিয়া চীৎকার করিতেছে।

সরোজিনী তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া কানুকে ধরিতে গেল, সে ছেলেকে ধরিবামাত্র চাকরটা একটানে পানুকে কানুর হাত হইতে ছাড়াইয়া লইল। কানু পাগলের মত মাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া অস্থির করিয়া তুলিল, সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি পানুকে কাট্‌তে দেব না।"

সরোজিনী ভাবিয়া পাইল না এ খবরটা দয়া করিয়া কানুকে কে দিয়াছে। সে কানুকে কোলে লইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে-করিতে বলিল, "কে বল্‌লে তোকে যে পানুকে কাট্‌বে? ওকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে, ময়লা থাক্‌লে যে অসুখ করবে?"

কানু হাত-পা ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে বলিল, "তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছ! আমাকে ভোলা বলে' দিয়েছে তোমরা ওকে কাট্‌বে। আমি ওকে দেব না।" চাকরটা এই ফাঁকে ছাগলছানা দুটা লইয়া একেবারে সরিয়া পড়িল।

সরোজিনীর মন্দিরে যাইতে অনেক বেলা হইয়া গেল। কানুকে সে শান্ত করিতে কোনোমতেই পারিল না, অবশেষে ননদের হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া কোনো মতে সে বাহির হইল। মন্দিরে বলি তখনও দেওয়া হয় নাই, সে আসিতেই কাজ আরম্ভ হইল, দেখিতে-দেখিতে শেষও হইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিতে সরোজিনীর কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল, না জানি গিয়া কি দেখিবে। বাড়ীতে ঢুকিবার অনেক আগেই সে ছেলের কান্না শুনিতে পাইল এবং ঢুকিয়াই খবর পাইল যে কানুকে নাওয়ানো যায় নাই, খাওয়ানোও যায় নাই। সে মন্দিরে যাইবার জন্য ছুটিয়া যাইতে গিয়া চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার কপাল ফাটিয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল কানুকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহার পিসী পাশে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতেছে। কানুর কপাল বেড়িয়া কাপড়ের পটি বাঁধা, তাহা ভেদ করিয়া রক্তের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে।

সরোজিনীর বুকের ভিতরটা যেন ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। এই মাত্র মন্দিরে যে-রক্তস্রোত দেখিয়া আসিল, তাহাই যেন গড়াইয়া এই শিশুর মাথায় আসিয়া লাগিয়াছে। একজনের কল্যাণের জন্য যে-রক্তপাত হইল, তাহার ফলে প্রথমে রক্তপাতই ঘটিল? তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সে মনে মনে দেবীর চরণে সহস্র প্রণিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, "অবোধ শিশুর অপরাধ নিয়ো না মা, সে না জেনেই তোমার অপমান করেছে! ওর যেন কোনো অকল্যাণ না হয়।"

বীরেন্দ্র কোথায় যেন বেড়াইতে গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে কাঁদিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল আবার?"

সরোজিনী বলিল, "ঘরে গিয়ে দেখ।" বীরেন্দ্র আর কথা না বলিয়া ঘরের ভিতর চলিল এবং মিনিট দুইয়ের

মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জ্বর হ'লে ডাক্তার ডাকতে হয় এ জ্ঞানটা এখনও তোমার হ'তে বাকি আছে? বাড়ীতে দুটো চাকর একটা ঝি রয়েছে, সব কজন ডাক্তারের বাড়ী জানে, এতক্ষণ ধরে' না কেঁদে একজনকে পাঠিয়ে দিলে সত্যিকারের কাজ হত।"

সরোজিনী মুখ শাদা করিয়া বলিল, "জ্বরও হয়েছে নাকি?"

তাহার স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিল, "তাও এতক্ষণ জান না? তবে কাঁদতে বসেছিলে কেন? যাও ছেলের কাছে, আমি ডাক্তার ডেকে আনি। সব এক এক মহা-পণ্ডিত, রোগা ছেলেটাকে কাঁদিয়ে ছাগলছানাটাকে না কেড়ে নিলেই চল্‌ছিল না? বাজারে একেবারে ছাগলের দুর্ভিক্ষ পড়ে' গিয়েছিল নাকি?"

সরোজিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "কি বল গো! মায়ের কাছে উৎসর্গ-করা জিনিষ, সে না দিলে কি রক্ষে আছে?"

বীরেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, এখন দিয়ে কত রক্ষা থাকে তাই দেখ।" বলিয়া সে বিরক্তমুখে ডাক্তারের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিল, মুখ খুব গম্ভীর করিয়া বলিল, "আবার relapse করল? এটা ত ভাল হ'ল না। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে একবারেই কাবু করে' রেখে যায় বড় বড় মানুষকে, আর এইটুকু ছেলে! যা হোক, খুব সাবধানে রাখ্‌বেন। এই ওষুধটা এখনি করিয়ে আনুন, ঠিক সময় মত যেন পড়ে। ছেলেকে মোটেই উঠ্‌তে দেবেন না, আর ঠাণ্ডাও যেন একটুও না লাগে। আপনি নিজে একটু চোখ রাখ্‌বেন মশায়, মেয়েদের হাতে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন না।"

বীরেন্দ্র অফিস কামাই করিয়া ছেলের সেবায় লাগিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে না খাওয়ানো যায় ওষুধ, না রাখা যায় শোয়াইয়া। সে কাঁদিয়া-কাটিয়া ছটফট করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। জ্বর তাহার ক্রমে বাড়িতেই লাগিল, ক্রমেই সে নিঃঝুম হইয়া প'ড়তে লাগিল।

তৃতীয় দিনের দিন হঠাৎ সকালে সে কাঁদিয়া বলিল, "পানুকে এনে দাও।"

তাহার বাবা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আচ্ছা বাবা, তুমি ভাল হ'য়ে ওঠ, আমি পানুকে এনে দেব।"

সে বীরেন্দ্রের হাত ঠেলিয়া দিল। আরো জোরে কাঁদিয়া বলিল, "না আন্‌বে না, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছ, তোমরা তাকে কেটে ফেলেছ।"

রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত সরোজিনী তখন মেঝের উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। স্বপ্ন দেখিতেছিল, দেবী যেন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "বড় দেরি হ'য়ে গেল। বলি কই?"

বীরেন্দ্রের ভীত ডাকে সে যখন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, একটি খেলার সাথী তখন অন্যটির সন্ধানে অচেনা পথে বাহির হইয়া গিয়াছে। পানুকে সে যে কোটটি আদর করিয়া দান করিতে গিয়াছিল, সেইটি পরিয়াই সে বাড়ী হইতে বিদায় হইয়া গেল।



অশ্বারোহী পুলিশ ও অশ্বের শিক্ষা—

আজকাল মানুষের জীবন-যাত্রার সর্ব্ববিভাগে বিজ্ঞানের একছত্র অধিকার। প্রাচীনকালেই যেসকল জিনিষ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল আজকাল তাহার অনেকগুলির কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি; মাটির প্রদীপের পরিবর্ত্তে হ্যারিকেন বা বৈদ্যুতিক আলো, নৌকার পরিবর্ত্তে ষ্টীমলঞ্চ, ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্ত্তে মোটর গাড়ী প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে, আমাদের দেশে তবু এখনও পূর্ব্বকালের স্মৃতিচিহ্ন অনেক কিছু বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নূতনত্বের আমদানির এত প্রাচুর্য্য যে প্রাচীনকালের ব্যবহৃত তৈজসপত্র, আলো ও যানবাহনাদি মিউজিয়ামেই স্থান পাইতেছে। যানবাহনাদিতে আজকাল আর ঘোড়ার ব্যবহার নাই বলিলেই চলে। বড়-বড় সহরেতো দূরের কথা, সামান্য পল্লীগ্রামেও মোটর ও সাইকেলের ছড়াছড়ি, সুতরাং মানুষবাহী ঘোড়াকে বিদায় লইতে হইয়াছে। অথচ ঘোড়ার আদর যে কমিতেছে তাহা নহে ঘোড়দৌড়ের মাঠের দৌলতে ঘোড়ার খাতির অসম্ভব-রকম বাড়িয়া যাইতেছে। তাছাড়া আর-একজায়গায় ঘোড়াকে কেহ হঠাইতে পারে নাই,—সে জনবহুলসহরে mounted-পুলিশের বাহকরূপে দেশের শান্তিশৃঙ্খলায় প্রভূত সহায়তা করিতেছে এবং এই কার্য্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার মত কোনো যন্ত্রেরও আবিষ্কার হইতেছে না।



পতন-উন্মুখ ঘোড়ার পিঠ হইতে পাশের অন্য ঘোড়ার পিঠে চড়া অভ্যাস



ঘোড়ার পিঠে পুলিসেরা জিম্‌নাষ্টিক অভ্যাস করিতেছে।

একজন অশ্বারোহী পুলিশ তিন বা ততোধিক পদাতিক পুলিশের সমান কাজ করে কারণ সে ঘোড়ার উচ্চতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া জনতার বিশৃঙ্খলতা বহুদূর দেখিতে পায় এবং অতি দ্রুত সেখানে উপস্থিত হইতে পারে। জনতার শৃঙ্খলাসাধনে, পথে দুর্ঘটনায়, ধর্ম্মঘটে, দাঙ্গাহাঙ্গামায় লোককে সারিবদ্ধ রাখিতে ঘোড়ার মতন আর-কিছু পারে না—দশবিশ জন লোকে যাহা পারে না, ১টি ঘোড়া দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হয়, কিছুকাল পূর্ব্বে নিউইয়র্ক সহরে অশ্বারোহী পুলিশের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে উহার উপকারিতা প্রমাণিত হওয়াতে আবার পূর্ব্বসংখ্যক অশ্বারোহী নিযুক্ত করা হইয়াছে। শিকাগোসহরের ব্যবসা প্রধান অংশে অশ্বারোহীপুলিশ নিযুক্ত করাতে সহরের অন্যান্য ভাগ অপেক্ষা সেখানে রাস্তার দুর্ঘটনা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ঘোড়াকে সকল বিপৎসঙ্কুলস্থানে নির্ভয়ে হইয়া যাইতে হইলে অন্ততঃ দুই বৎসর নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন—অবশ্য আরোহীকেও যথেষ্ট শিক্ষা হইতে হইবে। এই বিভাগে ইহারা ১০ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষম থাকে। তা'র পর ইহাদিগকে কোনো চাষী গৃহস্থের নিকট বিক্রয় করা হয় এবং পরার্থী হইয়া জমিকর্ষণ করে। ঘোড়া অত্যাশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত পথঘাটে ঠিকমত চলিবার সঙ্কেত ঠিকমত আয়ত্ত করিতে পারে। আরোহীকে যদি কোথাও কোনো কারণে নামিয়া যাইতে হয়, তবে শিক্ষিত ঘোড়া জনতার মধ্যে ঠিকমত চলিতে পারে; এবং প্রয়োজনমত কাহাকেও আঘাত না দিয়া জনতাকে আক্রমণ করিতেও ইহারা পটু।

পথঘাটের কার্য্যোপযোগী ঘোড়ার ওজন সাধারণত ১৪ মণের বেশী হয় না, ঘোড়া কিনিবার সময় এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার, কারণ ভারী ঘোড়া পথঘাটের দ্রুতকাজের উপযুক্ত নয়। ঘোড়া কেনা হইলে

তিনমাস প্রত্যহ ছ-ঘণ্টা করিয়া এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বৎসরে একবার শিক্ষক ঘোড়ার উপযুক্ততা বিচার করে, তাহার সমস্ত গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া তাহার বিশেষত্বগুলি দেখা হয় এবং ভবিষ্যতে তাহার আরোহীকে সেইগুলি জানানো হয়। যদি ঐগুলি সুবিধা-জনক মনে হয়, তবে ঘোড়াকে অন্যান্য নির্ব্বাচিত ঘোড়ার সহিত সকাল সাতটা হইতে সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হয় এবং বিউগল ও অন্যান্য সঙ্কেতধ্বনির সহিত পরিচিত করানো হয়। একাদিক্রমে ছয়ঘণ্টা এরূপ প্রত্যহ খাটানো হয়। প্রত্যহ অন্তত ২০মাইল হাঁটানো হয়। এম্‌নি করিয়া কিছু-কাল ধরিয়া শিক্ষা দেওয়ার পর ঘোড়া শৃঙ্খলার কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করে। এম্‌নি ১৫ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে সহরের শান্তি বিধান করিয়া রাজাব কার্য্য করে এবং তৎপরে বৃদ্ধবয়সে হলকর্ষণ করিয়া ঘোড়া জীবনের শেষ দিনগুলি কাটায়। . . . . .



নানা প্রকার কায়দায় ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস

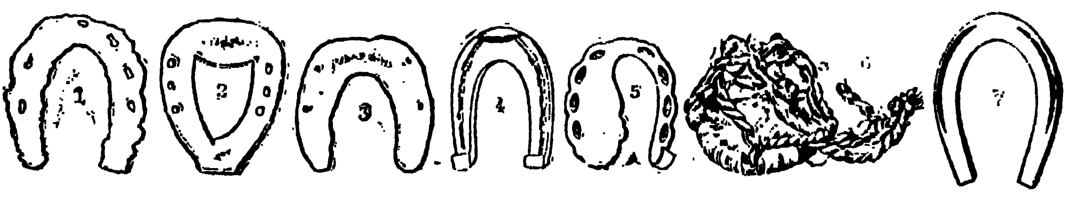
তাহাকে প্রথমতঃ দিন-দশেকের মতন বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহার পর তাহার ডাক্তারী পরীক্ষা হয়, নির্ব্বাচিত হইলেই তাহার শিক্ষা সুরু হয়, প্রথমতঃ পথঘাটের চীৎকার-গোলমালের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়াইয়া এবং তাহার কাজগুলি ধীরে-ধীরে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তা'র পর তাহাকে সহরে আনা হয়। তাহার পায়ে রবারের নাল লাগানো হয়, নরম-ধরণের সাজ পরানো হয়। তা'র পর তাহার শিক্ষকের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার হাতেই ঘোড়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সে তাহাকে নানাভাবে শায়েস্তা (break) করে, তা'র ভালোমন্দ গুণগুলি আবিষ্কার করে এবং তিন মাস পরীক্ষার পর রায় দেয় ঘোড়া পথের কাজের উপযোগী কি না; না হইলে তাহাকে পুনরায় চাষের কাজে পাঠানো হয়।

শিক্ষার পূর্ব্বে ঘোড়া অত্যন্ত চঞ্চল ও রোখা থাকে। সেই অবস্থায় রাস্তায় নানারকম অদ্ভুত শব্দ শোনাইয়া তাহার ভয় কাটাইয়া দেওয়া হয় ;—শান্ত অবস্থায় চলিতে চলিতে আচম্‌কা তাহার সাম্‌নে কিছু ফেলিয়া দেওয়া হয়, রেলগাড়ীর কাছে লইয়া গিয়া ট্রেনের ভীষণ শব্দ শোনানো হয়, কারণ পুলিশের ঘোড়া হইতে হইলে সর্ব্বত্র যাইতে হইতে পারে। বস্তুত সদ্যোধৃত ভীরু ঘোড়ার পক্ষে সহরের পথঘাট নানা বিপদ্ ও ভয়সঙ্কুল এইসব নানা বিরুদ্ধ অবস্থায় আরোহীর হাতের পিঠ-চাপড়ানি এবং গলার আশ্বাসপূর্ণ স্বরে ঘোড়া আশ্বস্ত হয়—না হইলে এই কাজের পক্ষে ঘোড়া অনুপযুক্ত। শিকাগোতে একবার একটি ঘোড়া দোকানের আয়নায় নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া ভড়কাইয়া যায় ও আরোহীর জীবনসংশয় হয়।

ঘোড়ার নালের কথা—

অনেকে মনে করেন যে মোটরের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার ব্যবহার কমিয়া আসিবে এবং সেইসঙ্গে যেসকল লোক ঘোড়ার পায়ে নাল লাগাইবার ব্যবসা করে, তাহাদের ব্যবসাও লোপ পাইবে। ২৫০০ বছরেরও পূর্ব্ব সময় হইতে ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো হইতেছে—এবং ইহা যে সহজে উঠিয়া যাইবে তাহা মনে হয় না। ইহা অবশ্য সত্য যে পূর্ব্বকালে যেসকল কাজ (যেমন লাঙল টানা, গাড়ী টানা, ফায়ার ব্রিগেডের ইঞ্জিন টানা ইত্যাদি) ঘোড়ার একচেটিয়া ছিল, এখন তাহার অধিকাংশই মোটরের সাহায্যে চলিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও গ্রামে এবং যাহারা দরিদ্র তাহারা মোটর অপেক্ষা বহু অল্প ব্যয়ে ঘোড়ার দ্বারাই সেইসকল কাজ চালাইয়া থাকে, অবশ্য এইসকল গরীব লোক রাতারাতি যদি ধনী হইয়া যায়, তাহা হইলে ঘোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার নালেরও ইতিহাস শেষ হইবে।

আমেরিকায় গত ১০ বৎসর সময়ে চাষবাসের কাজ ব্যতীত অন্যান্য নানা কাজে ঘোড়ার পরিমাণ কত কমিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতে বুঝা যাইবে। ১৯১০ সালে আমেরিকাতে গাড়ী টানা ইত্যাদি কাজে ৩,০০০,০০০ ঘোড়া ব্যবহৃত হইত—১৯২০তে এই সংখ্যা কমিয়া গিয়া ২,০০০,০০০ হয়। কিন্তু ১৯২০ সাল হইতে ঘোড়ার সংখ্যা বিশেষ বেশীপরিমাণে হ্রাস পায় নাই। গত মহাযুদ্ধের সময় মোটর ট্রাক্ ঘোড়ার সংখ্যা বহুলপরিমাণে কমাইয়াছিল, কারণ তখন ঘোড়ার খাদ্যের দাম ছিল ভয়ানক এবং ঘোড়ার জন্য উপযুক্তসংখ্যক লোকও পাওয়া দুষ্কর ছিল—অথচ মোটরের খরচও কম এবং মোটর-প্রতি একজন লোক হইলেই চলিয়া যায়।



ঘোড়ার নালের ক্রমবিকাশ চিত্র

[(১) ইংলণ্ডে রোমানরা আসিবার পূর্ব্বে ব্যবহার হইত। (২) প্রাচীন কালে মূরদেশে ব্যবহৃত হইত। (৩) ১৭৫ খৃঃ অব্দে ফরাসী দেশের নাল। (৫) আহত ঘোড়ার-পাকে রক্ষা করিবার নাল। গলরা যখন ফ্রান্সে রাজত্ব করিত, সেইসময়ের। (৪) কোন্ সময়ের ঠিক বলা যায় না—খৃঃ ৩ বা ৪ শতাব্দীর হইতে পারে। (৬) জাপানে ব্যবহৃত—খড়ের তৈরী। ধনী লোকেরা রেশমের তৈরী নাল ঘোড়ার পায়ে লাগাইতেন। (৭) বর্ত্তমান সময়ের ঘোড়ার নাল- নানা-ওজনের হয়। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ারা ৫ আউন্স ওজনের নাল পরে—অন্যান্য ভারী কাজের ঘোড়ারা ১ সের ওজনের নালও পরে।]

বর্ত্তমানে আমেরিকাতে ১৭,০০০,০০০ খচ্চর এবং ঘোড়া চাষের কাজে নিযুক্ত আছে। এইসকল ঘোড়ার খুব কম-সংখ্যককেই নাল পরানো হইয়া থাকে। যেসকল প্রদেশে মাটি শক্ত এবং প্রস্তরময় কেবল সেইসকল স্থানেই ঘোড়ার নালের দরকার হইয়া থাকে। ঘোড়ার ব্যবহার কমিবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়ার নাল প্রস্তুতকারী কামারদের সংখ্যাও আমেরিকাতে কেমন কমিয়াছে তাহাও নিম্নলিখিত সংখ্যা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইবে। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় কামারদের সংখ্যা ছিল ২৩২,০০০ পাঁচ বছর পরে ইহা ১৯৫,০০০ হয় এবং বর্ত্তমানে ইহা ১৭৫,০০০ হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সংখ্যা রহিয়াছে, ইহা আর বিশেষ কমিবে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশ-সম্বন্ধে অবশ্য এসকল কথা খাটে না, কারণ আমাদের দেশে বিশেষ ধনী ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও মোটর গাড়ী নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশের চাষীরা চাষের কাজে মোটর-ব্যবহার দূরের কথা—ঘোড়া ব্যবহারও করে না।

ঘোড়ার পায়ের নালরূপে নানা সময়ে নানা দেশে নানা-প্রকার দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে, যথা- চামড়া, শিং, ভাল্‌ক্যানাইট্, পাপিয়ো-মাশে, দড়ি, রবার, কাঁসা এবং খড়। বিশেষ-বিশেষ সময়ে বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু নালের পক্ষে লোহা এবং ইস্পাৎই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপযুক্ত।

হাতে তৈরী নাল অপেক্ষা কলে প্রস্তুত নাল ভালো হইবে, ইহা সহজ কথা। কলের তৈরী নালের ওজন এবং আকার সমান এবং পরিষ্কার হয়। ঘোড়ার নালের আকারের পরিবর্ত্তন বিশেষ হয় নাই—বহু পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও প্রায় তাহাই আছে। নালের প্রস্তুত প্রণালীও অনেক-পরিমাণে প্রায় পূর্ব্বের মতনই আছে—সামান্য উন্নতি যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন এই ব্যবসায়ে যেমন মন্দা পড়িয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় ইহার আর কোনো প্রকার উন্নতি এখন আর সম্ভবপর হইবে না। এখন যদি হঠাৎ গ্যাসোলিন্ কমিয়া যায় তাহা হইলেই ঘোড়ার ব্যবহার বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

ঘোড়ার নালের কতকগুলি ছবি দেওয়া হইল—ইহা হইতে নালের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস কিছু পাওয়া যাইতে পারে।

—

প্রাণদণ্ডের প্রাণদণ্ড—

League for the Abolition of Capital Punishment অর্থাৎ প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দিবার সঙ্ঘ—এই নামের একটি সমিতি কিছুদিন পূর্ব্বে নিউইয়র্ক সহরে তাঁহাদের কর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। এই সমিতি প্রস্তাব করিতেছেন লোককে প্রাণদণ্ড দিবার প্রথা রদ্ করা উচিত। ইহারা নিউইয়র্ক সহরে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমে-ক্রমে আমেরিকার সকল প্রদেশে ইহাদের কার্য্য বিস্তার করিবেন। ইতিমধ্যেই মিশিগান্, রোড্-আইল্যাণ্ড, উইস্কন্‌সিন, ক্যান্‌সাস, মেন্, মিন্‌নেসোটা (Minnesota) এবং উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা—এই প্রদেশগুলি হইতে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে। এখনও আমেরিকার চল্লিশটি প্রদেশে খুনীর প্রাণদণ্ড হয়। অরেগন, ওয়াশিংটন, আরিজোনা এবং মিশোরী এই কয়টি প্রদেশে প্রাণদণ্ড উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১৯১৮ সাল হইতে আবার তাহা আরম্ভ হইয়াছে। এই সমিতির মতে :—

"চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রদ্ করিবার পক্ষপাতী। প্রাণদণ্ডাজ্ঞা অসভ্যযুগের নিদর্শন—এখনও সভ্যসমাজের বুকে চাপিয়া আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরীব, সরল অর্থাৎ বোকা, অল্পবুদ্ধি এবং নিঃসহায়, ব্যক্তিরাই এই দণ্ড লাভ করে। বড় লোকেরা খুন করিয়া টাকার জোরে বাঁচিয়া যায়। সাধারণ লোকের মতও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা উঠাইয়া দিবার পক্ষে।"

এই সমিতির কার্য্য অতি শক্ত। একদল লোক বলেন যে প্রাণদণ্ড রদ্ হইয়া গেলে দেশের যত পাজী বদমায়েস্ দল বাঁধিয়া খুন-খারাবি সুরু করিবে—ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে প্রাণদণ্ডের ভয়ে যদি খুন বন্ধ হইত তবে এতদিন ধরিয়া পৃথিবীতে অসংখ্য লোক প্রাণদণ্ড লাভ করিয়াছে। কিন্তু কই? তাহাতে খুন বন্ধ হইয়াছে কি? যে খুনি সে অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু অপরাধী শুধ্‌রাইবার অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাকে আইনের সাহায্যে হত্যা করিলে সমাজের এবং যে অপরাধ করিল, তাহার কি লাভ হইল? এই সমিতি প্রাণদণ্ডের বদলে খুনীকে চিরকাল কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী—অবশ্য কারাগারে হত্যাপরাধীর স্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইলে, তাহার পুনর্বিচার করিয়া তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। এই সমিতির সকল সভ্যই অত্যন্ত উৎসাহী এবং নিজেদের মতে ও কার্য্যে বিশ্বাসবান্, কাজেই আশা করা যায়, ইহারা ক্রমে সফলকাম হইতে পারেন।

—

রেলগাড়ী-সংঘর্ষণ-প্রতিরোধক উপায়—

পৃথিবীর নানা স্থানে রেলওয়ে সংঘর্ষের ফলে বহু যাত্রী এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারী প্রতিবৎসর প্রাণ হারায়। এখন যেমন রেলওয়ে সংঘর্ষণ হয় বহুকাল পূর্ব্বেও সেই প্রকার হইত এবং বহুলোক হতাহত হইত। বিলাতের পাঞ্চ্ নামক ব্যঙ্গ-পত্রিকা রেলওয়ে সংঘর্ষণ বন্ধ করিবার একটি ভালো উপায় আবিষ্কার করিয়া তাহার একটি ছবি ১৮৫৭ সালে বাহির করেন। ছবিটি দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইঞ্জিনের সাম্‌নেই রেলওয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা আছে এবং উক্ত কর্ম্মচারী তথায় বসিয়া আছেন প্রত্যেক ইঞ্জিনের সাম্‌নে



রেলগাড়ী-সংঘর্ষণ-প্রতিরোধক উপায়

[পাঞ্চ, জুলাই ১৮,১৮৫৭

এইপ্রকার একজন করিয়া উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বসিয়া থাকিলে কলিশন্ হইবার আর কোনো আশঙ্কা নাই। আমরাও ইহা বিশ্বাস করি।

—

এডিসন্ বধির কেন—

অনেকে বোধ হয় জানেন না যে বিখ্যাত আবিষ্কর্ত্তা এডিসন্ বধির। তাঁহার এ-বধিরতা দূর করিতে পারা যাইত, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া ইচ্ছা করিয়াই বধির হইয়া আছেন। সামান্য অস্ত্রোপচার করিয়া এডিসন্ তাঁহার চির-বধিরতা দূর করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে শ্রবণশক্তি না থাকায় তাঁহার চিন্তা-শক্তি বিনা-বাধায় কাজ করিতে পারে। বাহিরের কোলাহলে তাঁহার কাজের ব্যাঘাত হয় না। শ্রবণশক্তি না থাকিলেও তিনি তাঁহার বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাজ সহজে করিতে পারেন বলিয়া বুঝিতে পারেন। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, চিরবধির এডিসন্ই ফোনগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তা।

এডিসন্ বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য নিজেকে শ্রবণ-সুখের নানা-প্রকার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। পাখীর গান, মানুষের হাসি, পত্নীর প্রিয় সম্ভাষণ, শিশুর কচিমুখের বুলি, এইসমস্ত হইতে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করিলেন। জ্ঞানচর্চ্চার এমনই প্রবল তৃষ্ণা।

একবার অনেক অনুরোধ করিয়া এডিসনের স্ত্রী তাঁহার কানে অস্ত্রোপচার করাইতে তাঁহাকে রাজি করাইলেন। যেদিন ডাক্তার আসিবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন এডিসন ডাক্তারকে খবর দিতে বলিলেন যে তাঁহার আসিবার দরকার নাই, কারণ তিনি অস্ত্রোপচার করাইবেন না। মরিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অনেক গভীর চিন্তার কাজ শেষ করিয়া যাইতে হইবে। শ্রবণ-শক্তি হঠাৎ লাভ করিলে তাঁহার চিন্তা-শক্তির কাজে বাধাও জন্মিবে এবং তাহাতে অনেক সময় অনাবশ্যক নষ্ট হইবে। নষ্ট করিবার মতন সময় এডিসনের নাই।

এডিসন্ সহজে ডাক্তার দেখাইতে রাজি হন না। তাঁহার চোখ খারাপ হইয়া যাইবার বহুবৎসর পরে তাঁহাকে চশ্‌মা পরাইতে রাজি করা হইয়াছিল। চশ্‌মা পরিয়া তিনি বলিতেন যে চোখে চশমা থাকিলে তাঁহার কোনো কাজে মনোযোগ হয় না—সেইজন্য নেহাৎ দর্‌কার না হইলে তিনি চশ্‌মা পরেন না। এডিসন্ কোনো প্রকার খেলা বা আমোদে যোগ দেন না। বাহিরে একমাত্র মোটরে চড়াতে তাঁহার আনন্দ আছে। ডাক্তারেরা এডিসন্‌কে সিগার খাওয়া বন্ধ করিতে অনেকবার বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই—এবং হইবে না। সিগার না খাইলে তাঁহার বুদ্ধি খোলে না।



আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন্ এবং তাঁহার পত্নী·

এডিসনের পত্নী আদর্শ পত্নী। তিনি বলেন যে "এডিসনের সেবা এবং তাঁহাকে আনন্দদান আমার জীবনের একমাত্র কাজ এবং আনন্দ। এডিসনের সেবায় আমি যে আনন্দ পাই, অন্য কিছুতেই তাহা পাই না।"

—

কুষ্ঠব্যাধির প্রতিকার-চেষ্টা—

এতদিন ধরিয়া যেসকল মহাব্যাধি মানুষকে পীড়িত করিতেছিল, তাহাদের কয়েকটি ছাড়া প্রায় সমস্তকে বিজ্ঞানবলে মানুষ জয় করিতে পারিয়াছে। যেসকল ব্যাধিকে মানুষ এখনও জয় করিতে পারে নাই,



কুলীয়ন দ্বীপের দৃশ্য—পৃথিবীর বৃহত্তম কুষ্ঠাশ্রম—
এই দ্বীপ ম্যানিলার ২০০ মাইল দক্ষিণে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত

কুষ্ঠ তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান ব্যাধি। কিন্তু বহু শতাব্দীর ক্রমাগত চেষ্টার ফলে আজ আশা হইতেছে যে মানুষ কুষ্ঠকে জয় করিতে পারিবে। কুষ্ঠগ্রস্ত লোক নীরোগ হইতে পারিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

কুষ্ঠব্যাধিকে তাড়াইবার জন্য যে ঔষধ বাহির হইয়াছে, তাহা চালমুগরা তেল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই তৈল কুষ্ঠব্যাধিতে ব্যবহার হইতেছে কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা প্রকৃষ্ট রাসায়নিক মতে ব্যবহৃত হইয়া আশাতিরিক্ত ফলদান করিতেছে। চালমুগরা গাছের বোটানিক্যাল নাম "Tarakto-genos Kurzii". এই বৃক্ষ শ্যাম, ব্রহ্ম, আসাম এবং বাংলা দেশের গভীর জঙ্গলে জন্মায়। সম্প্রতি হাওয়াই দ্বীপে ১০০ একর জমিতে এই বৃক্ষের চাষ করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। ফল ফলিতে চালমুগরা গাছের আট বৎসর সময় লাগে। যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের অধ্যাপক জে এফ্ রক্ চালমুগরা বৃক্ষের বীজ সংগ্রহের জন্য শ্যাম ব্রহ্ম ইত্যাদি দেশের গভীর-গভীর জঙ্গলে প্রায় এক বৎসরকাল যাপন করেন। এইসব জঙ্গলে ভ্রমণ তাঁহার বৃথা হইয়াছিল, যদিও তিনি চালমুগরা বৃক্ষ ছাড়া অন্যান্য নানা-প্রকার নতুন-নতুন বৃক্ষাদি আবিষ্কার করেন। এইসমস্ত জঙ্গলে তিনি সতের-রকমের বিবিধ শ্রেণীর ওক বৃক্ষ আবিষ্কার করেন। ব্রহ্মদেশ হইতে রক্সাহেব কলিকাতায় আসেন, এবং সুন্দরবন ও আসামের অতি গভীর অনেক জঙ্গলে চালমুগরা বৃক্ষ সন্ধান করেন। এই সময় তিনি একখানি বৌদ্ধ পুঁথি হইতে এই গল্পটি পাঠ করেন:—ব্রহ্মপ্রদেশের এক রাজার কুষ্ঠব্যাধি হয়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে যান। বনে গিয়া তিনি আর-এক জন সাথী পাইলেন—সে নারী এবং তাহারও কুষ্ঠ হইয়াছে। রাজা তাহার প্রেমে পড়িলেন এবং অবশেষে চালমুগরা তেলের জোরে উভয়েই নীরোগ হইলেন। তাহার পর সকল প্রেমের গল্পে যাহা হইবার কথা তাহা হইল, অর্থাৎ তাঁহারা বিবাহ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

এই গল্পে প্রমাণ হইতেছে যে ভারতবর্ষের লোকেরা বহু শত বৎসর পূর্ব্বে চালমুগরার ব্যবহার জানিত। কিন্তু ঠিক প্রথামত ইহার ব্যবহার হইত না বলিয়া বোধ হয় লোকে চালমুগরা তেল ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করিত না। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের বিখ্যাত ডাক্তার ফ্রেড্রিক বি পাওয়ার নানা-প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা চালমুগরা তেলের বিবিধ গুণাবলী আবিষ্কার করেন। ১৯১৮ সাল হইতে চালমুগরা বিশেষ রাসায়নিক প্রথায় কুষ্ঠচিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে।

পৃথিবীতে কত কুষ্ঠ রোগী আছে তাহা বলা যায় না। জাপানে ৬০,০০০ কুষ্ঠরোগী, ফিলিপাইন দ্বীপে ১২,০০০ ভারতবর্ষের কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ, চীনেরও তাই, আফ্রিকার সকল স্থানে এবং দক্ষিণ সাগরের সকল দ্বীপেই কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। সমস্ত পৃথিবীতে বোধ হয় ৫০,০০০,০০০ কুষ্ঠরোগী আছে। কুষ্ঠরোগের বয়স কত তাহা নির্ণয় করা যায় না। মিশর হইতে এই রোগ বোধ হয় গ্রীসে যায় এবং সেখান হইতে ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময় ইহা দমন করিবার নিমিত্ত ইউরোপে নানাপ্রকার কঠিন আইনকানুন তৈয়ার করা হয়। কুষ্ঠরোগীদের আলাদা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে হইত। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পোষাক পরিধান করিতে হইত এবং রাস্তা দিয়া গমনাগমন করিবার সময় বিশেষ এক-প্রকার শব্দ করিতে করিতে যাইতে হইত। সাধারণ পানাগার হইতে তাহাদের জল পান নিষিদ্ধ ছিল। এমন-কি, ধর্ম্মমন্দির-সমূহে কুষ্ঠরোগীদিগকে মৃত বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপাসনা করা হইত। এই সতর্কতার ফলে ইউরোপে কুষ্ঠরোগ কমিয়া যায়।

কুষ্ঠরোগ-সম্বন্ধে অনেকের নানা-প্রকার অদ্ভুত-অদ্ভুত ধারণা আছে। ইহা পৈতৃক ব্যাধি নহে। কুষ্ঠের এক-প্রকার বিশেষ বীজাণু আছে। ইহা ১৮৭৪ সালে আবিষ্কার হয়। কুষ্ঠ সকল স্থানে সমানভাবে ছড়ায় না। স্থানবিশেষে ইহার কম-বেশী দেখা যায়।

কুষ্ঠ কেমন করিয়া ছড়ায় তাহার সম্বন্ধে নানা-প্রকার আলোচনা হইয়াছে কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত কেহ এখনও হইতে পারেন নাই। কেহ-কেহ বলেন, মাছের এই ব্যাধি আছে, কেহ বলেন ইহা ভুল। মশা মাছি এই রোগের বীজ ছড়ায় বলিয়া অনেকের ধারণা, ইহা ইহার কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। ইন্দুরের কুষ্ঠ আছে বটে, কিন্তু প্লেগের মতন কুষ্ঠব্যাধিকে ইঁদুর মানুষের শরীরে সংক্রামিত করিতে পারে কি না, এবিষয়ে কোনো প্রমাণ নাই, তবে যতদূর মনে হয়, পারে না। এক মানুষের শরীর হইতে অন্য শরীরে কুষ্ঠব্যাধি সকল ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয় না। হাওয়াই দ্বীপে একই পরিবারে একই ঘরে একশয্যায় কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামী এবং নীরোগ স্ত্রী বাস করে, কিন্তু স্ত্রীর কোনোকালে কুষ্ঠব্যাধি হয় নাই, ইহাও দেখা গিয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য ইহাও দেখা গিয়াছে যে, সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি কুষ্ঠরোগীর সেবা করিতে গিয়া ঐ রোগগ্রস্ত হইয়াছে। কুষ্ঠরোগ তিনপ্রকারের, (১) nodular অথবা tubercular type. (২) anasthetic and attacks the nerves এবং (৩) প্রথম দুই প্রকারের মিলিত অবস্থা। কুষ্ঠরোগ আক্রমণ করিবার পর একজন লোক ১০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। ক্ষেত্র-বিশেষে অবশ্য ইহা অপেক্ষা বেশীও বাঁচে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই কুষ্ঠরোগ বেশী হয়।

আমাদের দেশে এই রোগ অত্যন্ত বেশী, কিন্তু এই দেশের লোকের এই সর্ব্বজনঘৃণিত ব্যক্তির প্রতিকার-সম্বন্ধে কোনো প্রকার চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে দুইটি কুষ্ঠাশ্রমের নাম করা যাইতে পারে, একটি বাঁকুড়ায় আর একটি পুরুলিয়ার, এই কুষ্ঠাশ্রমটি ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দুইটি কুষ্ঠাশ্রমই খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত।

হাওয়াই দ্বীপে একটি প্রকাণ্ড কুষ্ঠাশ্রম আছে। এই আশ্রম ১৮৭৬ সালে স্থাপিত হয় এবং সেই সময় হইতে বর্ত্তমান বৎসর পর্য্যন্ত ঐ

আশ্রমে মোট ৭০০০ হাজার কুষ্ঠরোগী আশ্রয় পাইয়াছে। ১৯০৫ সালে, অর্থাৎ হাওয়াই দ্বীপ আমেরিকার অধীনে আসিবার সাতবৎসর পরে মোলোকাই নামক স্থানে একটি কুষ্ঠচিকিৎসালয় স্থাপন করা হয়। কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য এই চিকিৎসালয় অনেক কার্য্য করিয়াছে।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ১৮৯৮ সালে আমেরিকানদের হাতে আসে। তখন প্রায় ৬০০০ কুষ্ঠরোগী ঐ দ্বীপপুঞ্জে ছিল। ঐ দ্বীপে ডাক্তার হাইসার (Dr. Heiser) কুলিয়ন দ্বীপে (Island of Culion) কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেন। দ্বীপটি ৪৬০ বর্গ মাইল। এইখানে ক্রমে-ক্রমে একটি সম্পূর্ণ সহর তৈয়ার হইল। বর্ত্তমানে এই দ্বীপে ৫,৬০০ কুষ্ঠ-রোগী বাস করে।

কুলিয়ন দ্বীপের কুষ্ঠাশ্রম পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুষ্ঠাশ্রম। এইখানে কুষ্ঠ রোগীরা তাহাদের সকল-প্রকার নাগরিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাকে কুষ্ঠরাজ্য বলিলেও চলে। সহরের পুলিশ দারোগা মেথর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, কুলী মজুর ইত্যাদি সকলেই কুষ্ঠরোগী। দ্বীপে বিশেষ এক-প্রকার মুদ্রার চলন আছে, এই মুদ্রা এই কুষ্ঠ রাজ্য ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে পারে না। এখান হইতে যেসকল চিঠিপত্র বাহিরে যায় সবই শোধন করিয়া তা'র পর ডাক জাহাজে পাঠানো হয়। এখানে রোগীদের খাওয়া পরা থাকার কোনো খরচ নাই, তবে যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা কাজকর্ম্ম করিয়া বেতন পাইতে পারে। এইখানে কুষ্ঠরোগীরা অনেকটা আরামে বাস করিতে পারে—কুষ্ঠ বলিয়া ঘৃণা করিবার কেহ এখানে নাই এবং অন্যান্য স্থানের মতন কুষ্ঠরোগীদের সমাজবর্জ্জিত হইয়া বাস করিতে হয় না। এই আশ্রম হইতে ১৯৬ জন কুষ্ঠরোগী একেবারে নিরাময় হইয়া গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। ভবিষ্যতে আরো হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।



কুলিয়ন দ্বীপের একদল কুষ্ঠরোগী—
ইহাদের অবস্থা আরোগ্য হইবার পক্ষে বিশেষ আশাজনক

বাঙালী পালোয়ান "বর্ষাতি বাবু"

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

আশানন্দ, শ্যামাকান্ত, গোবর, ভীমভবানী-প্রমুখ বঙ্গজননীর প্রখ্যাত সন্তানগণ বাঙ্গালীর শক্তির সম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করিয়াছেন বঙ্গমাতার এমন আরও অনেক সুসন্তান বঙ্গের বাহিরেও জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন ও বর্ত্তমান আছেন যাঁহাদের নাম আমরা অনেকেই জানি না। তাঁহাদের মধ্যে দুই-এক জনের সহিত পাঠক-পাঠিকাগণের পরিচয় করিয়া দিবার জন্য অদ্য আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। তাঁহারা বিহারের ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী।

বিহারের রাজধানী বাঁকীপুরে বাঙ্গালী বালকদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য "শূরোদ্যান" নামে একটি ব্যায়ামাগার



বাঁকীপুরের "শূরোদ্যানের" বাঙালী পালোয়ানগণ—সর্ব্বনিম্ন পংক্তির বাম দিক হইতে তৃতীয় ব্যক্তি "বর্ষাতি বাবু"

আছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কবিরাজ বি এ, মহাশয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে প্রায় ৭১ বৎসর হইবে। যৌবনে তাঁহার ন্যায় বলশালী বাঙ্গালী বিহার-অঞ্চলে ছিলেন না বলিয়া এখনও একটা প্রখ্যাতি আছে। এই শূরোদ্যানের একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া সম্পাদকের কার্য্য করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। সুরেশ-বাবুর কীর্ত্তি "শূরোদ্যান" আজিও বিদ্যমান এবং সুপরিচালিত। এখানে দেশী ও বিলাতী উভয় প্রথার ব্যায়াম-শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে। এই ব্যায়ামাগারে যোগ দিয়া আজ অর্দ্ধশতাব্দাধিক ধরিয়া যে শত-শত বালক স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়াছে তন্মধ্যে আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বাবু অমরনাথ রায় অন্যতম। তিনি বাঁকীপুরের প্রসিদ্ধ রায় পরিবারের সন্তান। তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যে বাঁকীপুরে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বংশের বহু সন্তান আজ বিহার সরকারের নানা বিভাগে কর্ম্ম লইয়া নানা-স্থান-প্রবাসী হইয়াছেন। অমরনাথ বাবু ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পিতার কর্ম্মস্থান মোতিহারীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাটনার সার্ভে স্কুল—এক্ষণে "বিহার স্কুল অফ্ ইঞ্জিনীয়ারিং"—হইতে পরীক্ষায় পাশ করিয়া ওভারসীয়ারি পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার ভ্রাতা ৺ শ্যামনাথ রায়, এম্-এ, মহাশয়ের কর্ম্মস্থান মুজঃফরপুর-প্রবাসী হন।

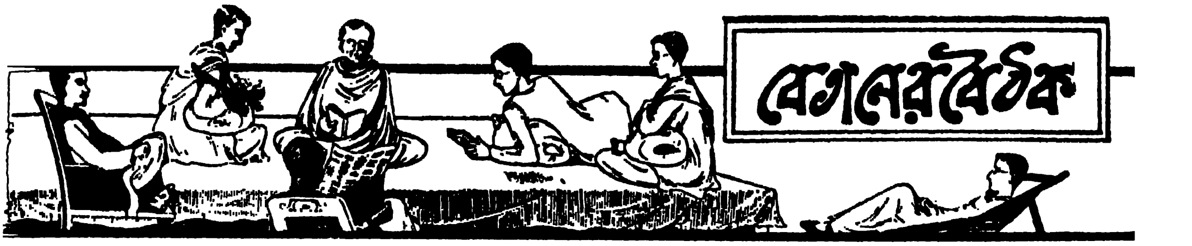
পাটনায় অবস্থানকালে অমর-বাবু "শূরোদ্যানে" যোগদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন বলবান্ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদিকে তাঁহার বিশাল বক্ষ, উন্নত গ্রীবা ও ললাট, দীর্ঘ সুগঠিত পেশল দেহ তাঁহার বীর্য্যব্যঞ্জক শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে সুদর্শন করিয়াছিল, অন্যদিকে তাঁহার ধীরনম্র অমায়িক প্রকৃতি তাঁহাকে আবালবৃদ্ধ সকলের প্রিয় এবং বাঙ্গালী বিহারী সকলেরই নিকট সম্মানিত করিয়াছিল।

বাল্যকালে প্রতিবর্ষায় তাঁহার প্রায়ই ফোড়া হইত বলিয়া শূরোদ্যানের সম্পাদক মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে "বর্ষাতি" এই নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আর সকলেও তাঁহাকে ঐরূপ ডাকিতে ডাকিতে তিনি "বর্ষাতি বাবু" নামেই অধিক পরিচিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা চার সহোদর। অমরনাথই জ্যেষ্ঠ, শিখরনাথ মধ্যম, মেঘনাথ তৃতীয় এবং প্রিয়নাথ কনিষ্ঠ। সকলেই বলিষ্ঠ। এক্ষণে প্রিয়নাথ-বাবুই জীবিত আছেন। দুঃখের বিষয় প্রবাসী বাঙ্গালীদের গৌরব, চিরকৌমার্য্যব্রতী, নিরামিষভোজী বিমলচরিত্র অমরনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বংশগত বহুমূত্র-রোগে ৪৫ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী যৌবনে বহু স্থানে বহু ভদ্র-সমাজে তাঁহার শারীরিক বলের বহু পরিচয় দিয়াছিলেন এবং নানা স্থানের পালোয়ানদের সহিত প্রতিযোগিতায় স্বীয় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

প্রায় কুড়ি-একুশ বৎসর হইল, এলাহাবাদে একটি ভারতবর্ষীয় ব্যায়াম-প্রদর্শনী খোলা হয়। তাহাতে ভারতের নানা স্থান হইতে অনেক হিন্দু মুসলমান শিখ-পালওয়ান এবং ইংরেজ গোরা স্ব স্ব শক্তি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বিহারের তৎকালীন নেতা স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় সেই নিখিল ভারতীয় মল্ল-ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য বাঁকীপুর হইতে বাঙ্গালী বীর "বর্ষাতি বাবু"কে আপন খরচায় এলাহাবাদ পাঠাইয়া দেন। তথায় বল-পরীক্ষণীয় অন্যান্য যন্ত্র মধ্যে একটি স্প্রীং পিস্টন বা চাপদণ্ড (spring piston) রক্ষিত হইয়াছিল। যিনি ঐ পিস্টনে অঙ্কিত ১৯ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দণ্ডটিকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিবেন, তাঁহারই জিৎ হইবে। কিন্তু পিস্টনে হাত না দিয়া কেবল বুক দিয়া বুকেরই জোরে ঠেলিতে হইবে। কি পশ্চিমা পালওয়ান, কি শিখ, কি গোরা, উপস্থিত কেহই যখন সে-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন যুবক অমরনাথ অগ্রসর হইয়া পিস্টনে বক্ষ সংলগ্ন করিয়া সবলে তাহা ১৯ চিহ্ন পর্য্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন! দর্শকমণ্ডলী আনন্দধ্বনি ও প্রশংসাবাণীতে প্রদর্শনীস্থল মুখরিত করিয়া তুলিলেন। এই সংবাদ তৎকালীন অমৃত-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ষাতি বাবুরা চার সহোদরে যখন আহারে বসিতেন তখন তাঁহাদের আহার্য্যের পরিমাণ দেখিবার বস্তু হইত। এক-এক জনের পাত্রে যে রুটির গোছা উপর্য্যুপরি সাজাইয়া দেওয়া হইত তাহা পাত্র হইতে প্রায় কণ্ঠ পর্য্যন্ত উঁচু হইত। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের ভোজনের ফোটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ফোটো ও প্লেট দুইই নষ্ট হওয়ায় আমরা এখানে শূরোদ্যানে গৃহীত একখানি অতি পুরাতন গ্রুপের প্রতিলিপি মাত্র মুদ্রিত করিলাম। সর্ব্বনিম্ন পঙ্‌ক্তির বাম দিক্ হইতে তৃতীয় এবং দক্ষিণ হইতে চতুর্থই "বর্ষাতি বাবু"। তাঁহার পার্শ্বে দর্শকের দক্ষিণে তাঁহার প্রথম অনুজ এবং বামে অন্য-দুই কনিষ্ঠ সহোদর।

আশা করি শূরোদ্যানের বর্ত্তমান পরিচালকগণ তাঁহাদের গৌরবস্বরূপ এই বীরের একখানি তৈল চিত্র রক্ষা করিতে ভুলিবেন না।



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৭)

দালানের দাগ

কোনও দালানের ভিতরের দিকের ছাদে চূণকাম করিবার সময় মেঝের কাঁচা সিমেন্টের উপর ঐ চূণের ছিটা পড়িয়া আর উঠিতেছে না। কেরোসিন, স্পিরিট ইত্যাদি দিয়া কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। উক্ত দাগ তুলিবার কোনও উপায় আছে কি না?

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮)

ভাণ্ডারহাটীর ইতিবৃত্ত

হুগলী জেলায় ভাণ্ডারহাটী নামে একটি গ্রাম আছে। শুনা যায় পূর্ব্বে এই গ্রামের মধ্য দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইত, যদিও এখন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। এই গ্রামে "সাবিত্রী"ও ১মাইল দূরে মোগলপুর গ্রামে জয়চণ্ডী নামে ২টি গ্রাম্য দেবতা আছে, এই দেবতা ২টির নামানুযায়ী ২টি ঘাট ছিল "সাবিত্রী ঘাট" ও "জয়চণ্ডী ঘাট"। শুনা যায় এই দুইটি ঘাট হইতে একটি মাত্র খেওয়া হইত, ইহা কতদূর সত্য জানি না। তবে একটি যে নদী ছিল তাহার প্রমাণ—এই গ্রামে ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্য দুই-একটি গ্রামে পাশাপাশি ছোটবড় ১০।১৫টি পুষ্করিণী, যাহা দেখিলেই মনে হয় নদী বা খাল বাঁধিয়া করা হইয়াছে। সম্প্রতি এইরকম ২।১টি ডোবার পঙ্কোদ্ধারের সময় হাল ও নৌকার ভগ্ন অংশ, মড়ার কয়লা, হাড়, কলসী প্রভৃতি শ্মশানের সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে নদীটি কতদিন পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল? কি কারণেই বা অদৃশ্য হইয়াছে? ইহার কি নাম ছিল? ইহার উৎপত্তিস্থল কোথায় ও ইহা কোন্ নদীর সহিত মিশিয়াছিল? ইহার প্রবাহ কোন্ দিকে ছিল?

এই সাবিত্রী ঠাকুর বর্দ্ধমানের মহারাণীর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রী সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৯)

হিমালয়ের বিবরণ

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কোন্ ভারতীয় গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম হিমালয়ের ও তৎসংশ্লিষ্ট পর্ব্বতমালার প্রথম বিবরণ বা উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক্-সাহিত্যে হিমালয় পর্ব্বতকে নানা প্রকার বিভিন্ন নামে অভিহিত দেখা যায়, কিন্তু হিমালয় নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি?

সত্যভূষণ সেন

(২০)

জলের রং

অনেকেই বলিয়া থাকেন জলের কোন স্বাভাবিক রং নাই, পাত্র-বিশেষে উহার রং হয়। কিন্তু আমরা পদ্মা নদীর জল সাদা এবং মেঘনা নদীর জল কালো দেখিতে পাই; তদ্ব্যতীত বর্ষাকালে প্রায় সকল স্থানেই কালো জল দেখিতে পাই এবং ঐ সকল জলের রং পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তিত হইবার কারণ কি? প্রয়াগসঙ্গমে গঙ্গা ও যমুনার জলের রং দুই প্রকার।

শ্রী সুধীররঞ্জন দত্ত

(২১)

রাক্ষস-তাল বা রাবণ-হ্রদ

মানস-সরোবরের পশ্চিমে প্রায় ৫।। মাইল দূরে একটি হ্রদ আছে। হ্রদটি বেশ বড়—আয়তনে প্রায় মানস-সরোবরের সমান। এই হ্রদের নাম রাক্ষস-তাল বা রাবণ-হ্রদ; ইহার এরূপ নাম-করণের কোন অর্থ-সঙ্গতি কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি?

শ্রী পঙ্কজবাসিনী সেন

মীমাংসা

"মেয়েদের কি ব'লে সম্বোধন করা যেতে পারে"

ভাদ্রের প্রবাসীতে শ্রী জ্যোৎস্নানাথ চন্দ মহাশয় একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার 'উত্তরের' দেশে যাওয়ার দুইটি পথ আমরা দেখিতেছি। এক.—তিনি যে 'দেবী'কে অনুপযুক্ত বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্বপদে আসীনা হইবার জন্য ভোট দেওয়া; আর.—শব্দ-সাম্রাজ্য ঘাঁটিয়া উপযুক্ততর কাহাকে আনিয়া ব্যবহারের জগতে চালাইয়া দেওয়া। তিনি যদিও এই শেষটি ইচ্ছা

করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের "দেবী"কেই বহাল রাখা সমীচীন বোধ হয়। নূতন শব্দ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই।

'দেবী' ও 'বাবু'কে উচ্চারণের দিক্ দিয়া আমরা একই পর্য্যায়ের শব্দ মনে করি। কারণ 'বী'র দীর্ঘত্বটুকু আমাদের উচ্চারণে হ্রস্ব হইয়া পড়ে। সুতরাং কতকগুলি নামের পিছনে যখন 'বাবু'রা স্থান লইতে পারিয়াছেন, 'দেবী'দেরই বা নিরাশ হইবার কারণ কি? তবে চন্দ-মহাশয় "কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে" বলিয়াছেন, তাই কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিতে হইল।

'চারু' "বীণা", "লীলা" প্রভৃতি চলের মত নামগুলির শেষে "দেবী" লাগাইলে যে অশোভন বা শ্রুতিকটু হয়, এ অপবাদ হয়ত চন্দ-মহাশয়ও দিবেন না। তিন অক্ষরের নামগুলি অর্থাৎ "অমলা দেবী" "নির্ম্মলা দেবী" "পূর্ণিমা দেবী" প্রভৃতিকেও একটু কষ্ট করিয়া ঐদলে ঠেলিয়া দেওয়া চলে। যা একটু খাপছাড়া ঠেকে, ব্যবহার-চলে স্নান করিয়া গায়ের ময়লা কাটিলে ওটুকুও সরিয়া যাইবে নিশ্চয়। কিন্তু মুস্কিল বাধায় ঐ বহুবর্ণ ও অতিরিক্ত দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট এবং যুক্তাক্ষর-সংবলিত নামগুলি। যেমন, "গিরীন্দ্রমোহিনী", "শৈবলিনী", "পঙ্কজনলিনী", "অপরাজিতা" প্রভৃতি। কিন্তু ইহাদিগকেও একটু ভাঙাইয়া চুরাইয়া "গিরি দেবী," "পঙ্ক দেবী", "অপরা দেবী", "শৈব দেবী" বলিয়া সম্মান দিলে অন্যায় হয় না। এমনও সব অকাট্য নাম আছে, যাহাদিগকে কোন মতে বাগে ফেলা যায় না যেমন, "সৌদামিনী", "কাদম্বিনী" প্রভৃতি। ইহাদিগকে 'সহু দেবী' "কাদী দেবী"ও বলা চলে না, আবার পিছনে 'দেবী' জুড়িলেও আমার কানে "বাবু'ওয়ালা 'হরবল্লভ" 'দীনবন্ধু', 'জ্যোৎস্না' প্রভৃতির ন্যায় গোবর্দ্ধন গোছের শুনায়। অনেকে বলিতে পারেন, 'এঁদের পিছে বাবু-জুড়িয়া আমরা ডাকিয়া থাকি।' কিন্তু সকলে সমান নয়; তার খাপ-ছাড়া ঠেকানাটাও শব্দ সমাজে কাহারও এক চেটিয়া নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দীনবন্ধু নামক জনৈক বন্ধুকে 'দীনবন্ধু-বাবু" বলিতে গিয়া কানে বাধার দরুণ লজ্জায়, অগত্যা আমার তাহার সহিত 'তুমি'র বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান জিজ্ঞাসুকেও ঐ কারণে আমি বারবার 'চন্দ-মহাশয়' বলিতেছি। কিন্তু দীনবন্ধু ও চন্দ-মহাশয়ের যাতে 'বাবু' হওয়া আটকায় নাই, 'দেবী'র চলচল হইলে ঐ মহাশয়া-দিগেরও একগতি হইবেই। সেদিন আর খাপছাড়া ঠেকিবে না।

পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে যদি কেহ সৌদামিনী, কাদম্বিনী বা হরবল্লভ, দীনবন্ধু প্রভৃতি থাকেন, তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রী দীনেশচন্দ্র সরকার

রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিভার প্রথম বিকাশ *

অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার কথা স্মরণ ক'রে 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখছেন :—

"এক একদিন মধ্যাহ্নে ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম...দূরে দেখা যাইত বৃক্ষচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা সহরের নানা উচ্চ নীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্ব্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমা মধ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে। সেইসকল অতিদূর বাড়ীর ছাদে একটি চিলা কোঠা উঁচু হইয়া থাকিত, মনে হইত তাহারা যেন নিশ্চল তর্জ্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সঙ্কেত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিক্ষুক যেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্দুকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্নমাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজানা বাড়ীগুলিকে কত খেলা কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই মনে করিতাম তাহা বলিতে পারি না। মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত, এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়ীগুলোর সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া "চাই চুড়ি চাই, খেলনা চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।"

স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁর "রবীন্দ্রনাথে" যে একটি চিঠি তুলেছেন তার কতক অংশ এই—

"আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে ভাল করে' ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে, এক একদিন সকাল বেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠ্‌ত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়ীতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়্‌তাম, মনে কর্‌তাম কি একটা রহস্য আবিষ্কৃত হবে।"

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আর বৈচিত্র্যে কিছু-না-কিছু আনন্দ উপভোগ করা বালক কেন সকল মানুষেরই সাধারণ ধর্ম্ম। তবু বল্‌তে হবে, বালক রবীন্দ্রনাথ সেইসকল মানুষের শ্রেণীতে বেমালুম খাপ খেয়ে যান না। বালক বয়সেই অসীমের রহস্যকে এমন সারা প্রকৃতি দিয়ে অনুভব করা এক অসাধারণ ব্যাপার সন্দেহ নেই। বালক নচিকেতা নাকি মৃত্যুর গুহায় তলিয়ে গিয়ে অমৃতের উদ্ধার করে' এনেছিলেন, তাঁর প্রশ্নে দেখ্‌তে পাই আশ্চর্য্য সমাহিত-চিত্ততা। কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিকীর্ত্তিতে যে বৈচিত্র্য, বিপুলতা আর অমর সৃষ্টি-মাহাত্ম্য লাভ করেছেন সেটি এই আশ্চর্য্য রহস্যের অনুভবকর্ত্তা বালক রবীন্দ্রনাথের যোগ্য পরিণতি।

* ঢাকা বিশ্বভারতী সম্মিলনীর এক অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি পড়া হয়েছিল। তারপর এটি জায়গায় জায়গায় পুনর্লিখিত হয়েছে।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষত্বকে অল্প দুটি কথায় নির্দ্দেশ করা যেতে পারে—অতি তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সন্ধানপরতা। অনুভূতি তাঁর ভিতরে এর চাইতে কিছু কম থাকলে এই অপ্রতিহত সন্ধানপরতার মুখে তিনি হয়ত হতেন একজন বড় দার্শনিক অথবা বড় যোগী। কিন্তু প্রকৃত কবির মত অনুভূতিই তাঁর ভিতরে সব চাইতে প্রবল। এই অনুভূতিরই সঙ্গে-সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে চল্‌ছে সন্ধান।" ফাল্গুনীর" অন্ধ বাউলের মতন সত্যের অরুণ আলো প্রথমে তাঁর "ভুরুর মাঝখানে খেয়া নৌকাটির মত এসে" ঠেকে, আর তিনি গান গেয়ে ওঠেন।

প্রথম পর্য্যায়

রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করেন। আশৈশব তিনি সাহিত্যের আব্‌হাওয়ায় মানুষ; তাই বুদ্ধিমান বালকের পক্ষে এইটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু গানে ছন্দে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌বার ক্ষমতা যে তাঁর মজ্জাগত তা'র পরিচয় সেই অল্প বয়সের কবিতায়ও প্রচুর।

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত,
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথ তরু লুন্ঠত,
থর হর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদ পুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

হোক এ অনুসরণ হোক এ "আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুং টাং মাত্র" তবু এ বেশ একটু স্নেহ আর আনন্দের দৃষ্টিতে দেখবার যোগ্য নয় কি? কেমন একটু রসবিলাসী মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে এর ভিতরে!

সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবি নিজের বিশেষত্ব প্রথম উপলব্ধি করেন। আর পরলোকগত শ্রদ্ধেয় অজিতবাবুর বিশ্বাস "প্রভাত সঙ্গীতে কবির সমস্ত জীবনের ভাবটির ভূমিকা নিহিত রয়েছে। মিথ্যা নয়। এর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতায় কেমন এক বিপুল কবিপ্রাণ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে—

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
(ওরে) উথলি উঠেছে বারি;
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

তাঁর রুদ্ধ প্রতিভা-নির্ঝরিণী প্রকাশের মহাসাগরের ডাক শুন্‌তে পেয়েছে—

ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন।

"প্রভাত উৎসব" কবিতায় জগতের আনন্দ আর সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তির কবির চোখের সাম্‌নে কেমন সুন্দর ভাবে খুলে গেছে—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
* * * *
এসেছে সখাসখী, বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন্ পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে 'ভাই ভাই' আঁখিতে আঁখি তুলি।

আর "অনন্ত জীবন" "অনন্ত মরণ," "মহাস্বপ্ন" "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়" প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রতিভা কি এক বিরাট সৃষ্টিতেই না আত্মপ্রকাশ করতে চাচ্ছে!

"চাচ্ছে" কথাটি ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি; আমাদের বল্‌বার মতলব—প্রকৃত স্রষ্টার সাক্ষাৎ এখনো আমরা পাইনি। + সৃষ্টির জন্য কবির মনে আবেগ জেগে উঠেছে—বিপুল গভীর সে আবেগ; কবির দৃষ্টিও কিছু পরিষ্কার; কিন্তু নিশ্চয়ই এত পরিচ্ছন্ন নয় যাতে তা'র সামনে সৃষ্টি পূর্ণচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করতে পা'রে। "প্রভাত উৎসবে"র পরে "ছবিও গানেও" প্রকৃত স্রষ্টাকে আমরা দেখতে পাইনে। কবির দৃষ্টি এখানে আরো কিছু পরিষ্কার; কিন্তু সমগ্রের ধারণায় ত্রুটি রয়েছে ব'লে মনে হয়। পাঠক এর "একাকিনী" কবিতাটির সঙ্গে Wordsworth এর The Reaper কবিতাটি মিলিয়ে পড়্‌লে হয়ত আমাদের সঙ্গে একমত হ'তে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বপ্রথম প্রকৃত স্রষ্টারূপে দেখ্‌তে পাই তাঁর "কড়ি ও কোমলে", বিশেষ ক'রে এর সনেট-গুলোতে। তিনি নিজেও বলেছেন—

+ অতি বিখ্যাত কবিতা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"ও এমন সব চরণ আছে যা আঁটিষ্ট রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে কখনই বেরুত না।

আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বায়ু এবং বর্ষণ ; কিন্তু শরৎকালের "কড়ি ও কোমলে" কেবল আকাশে মেঘের রং নহে সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ভাষা নানা-প্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

"কড়ি ও কোমলের" প্রথম কবিতায় কবির সাধটি যে কি ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেয়েছে সবাইকে বল্‌তে হবে তা সুন্দর। "বলাকার" একটি কবিতার কয়েকটি চরণ এই—

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।

কবিপ্রাণও তেম্‌নিভাবে সংশয়, ব্যথা, আবেগ, উচ্ছ্বাস সমস্তের ভিতর দিয়ে এক শুভ মুহূর্ত্তে ফুলের মতো পূর্ণতা নিয়ে ফুটে উঠেছে—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই!
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।

"কড়ি ও কোমলে" শরীর এই প্রথম সৃষ্টিক্ষমতা নানা-ভাবে সার্থকতা খুঁজ্‌ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি। "শিশু" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ কৃতিত্ব তারও পরিচয় এতে রয়েছে। ("সাত ভাই চম্পা", "পুরানো বট", "হাসিরাশি" "আশীর্ব্বাদ" ইত্যাদি।) আর কবির দেশাত্মবোধও এর আহ্বান গীতে ঝঙ্কৃত হচ্ছে—

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ,
শুনিতে পেয়েছি ওই—
সবাই এসেছে লইয়া নিশান,
কইরে বাঙালী কই।

কিন্তু এর সনেটগুলোই যে সব-চাইতে বেশী প্রশংসার জিনিষ সে-সম্বন্ধে বোধ হয় সব কাব্যরসিকই একমত ; প্রায় প্রত্যেকটি সনেটই দামী মুক্তার মতো নিটোল—প্রকাশে, রসে জমাট।

এইসব সনেটের কতকগুলোর ভিতর যে ভোগের সুর বাজ্‌ছে তা'র জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নিন্দা সহ্য কর্‌তে হয়েছে। মনে হয়, নানা অর্দ্ধসত্যের অত্যাচারে আমাদের জাতীয় জীবন বড় ক্লিষ্ট ব'লেই একটুখানি সংস্কার-বিমুক্ত হ'য়ে কাব্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বার ক্ষমতা আমাদের ভিতর এখন ব্যাহত। কাব্য আত্মারই এক প্রকাশ ; কাজেই এর সৌন্দর্য্যও "ন বলহীনেন লভ্যঃ।"

এই ভোগের "কুসুমের কারাগার" থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরে কবির অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে ব'লেই যে কবি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তা সত্য নয়। অনেক বড় কবির ভিতরে এবিদ্রোহ জাগেনি। তাই বলি, তাঁদের কাব্য আমাদের কম প্রিয় নয়। কালিদাস, বিদ্যাপতি, হাফেজ, Burns (বার্‌ন্‌স) Byron (বায়রন্‌) প্রভৃতি কবির কথা স্মরণ ক'রে আমরা এ কথা বল্‌ছি। আসলে, জীবনে ভোগ অসত্য নয়। আর এই সনেট-গুলোর ভিতরে সুপ্রকাশের সৌন্দর্য্যে স্নাত হ'য়ে সেই ভোগের সত্য যথাযথভাবেই ফু'টে উঠেছে।

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরও বিশেষত্ব আছে। নৈতিক বোধ তাঁর ভিতরে দুর্ব্বল ছিল, পরে সবল হয়েছে বলে যে তাঁর মনে এই প্রতিবাদ জাগাচ্ছে তা নয়। "কুসুমের" কারাগারে বদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ভিতরে তেম্‌নি বলবতী, কেননা, এই দুই-ই একই মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে—তাঁর ভিতরকার সেই চিরজাগ্রত রহস্যের সন্ধানপরতা থেকে। নারী সৌন্দর্য্য ত সাধারণত আমরা তুচ্ছ ভেবেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি ; যাকে আমরা মহত্তর ভাব বলি, পরে পরের কাব্যে দেখ্‌ব, সেই জাতীয়তা, স্বদেশিকতা ইত্যাদির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কবির ভিতরে এমনই প্রবল।

রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব তাঁর ভোগের কবিতার ভিতরে যথেষ্ট পরিস্ফুট। কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা স্মরণ ক'রে বল্‌ছেন—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্‌।

হাফেজ তাঁর "মাশুকের" কথা বল্‌ছেন—
জুল্‌ফিরে মা বা আব লালে শক্করম্‌ আফশানে গুমা +।

আর Burns তাঁর Highland Marya কথা স্মরণ ক'রে বল্‌ছেন—

+ "লাল শীরীন ঠোঁট প্রিয়ার রোজ পাই তরাই লাখলাখ চুমনে।" কবি নজরুল ইসলামের অনুবাদ।

How sweetly bloom'd the gay green birk
How rich the hawthorn's blossoms,
As underneath the fragrant shade
I clasp'd her to my bosom!
The golden hours on angel wings
Flew o'er me and my dearie;
For dear to me as light and life
Was my sweet Highland Mary.

এসব কবিতার ভোগ কেমন আত্মসম্পূর্ণ, যথেষ্ট তৃপ্তি স্বস্তি এতে রয়েছে। তবে কালিদাসের ভোগ কেমন গোলাপগন্ধি, আর হাফেজের, Burns-এ মত্ততা আর আবেগ কিছু বেশী। এসবের সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভোগের স্বরূপ যখন উপলব্ধি করতে যাই তখন দেখি কালিদাসের মতন সৌন্দর্য্যের উপাসক তিনি, মাঝে-মাঝে বুঝ্‌তে পারা যায়, এ ভোগে তিনি তৃপ্ত; কিন্তু মোটের উপর এই ভোগের ভিতরে আকণ্ঠ নিমজ্জনের স্বস্তি যেন তিনি পাচ্ছেন না। সেইজন্য কেমন-একটা ব্যথা তাঁর "বাহু" "দেহের মিলন" প্রভৃতি কবিতায় বর্ত্তমান; আর সব ভোগ সব অনুভূতির ভিতরে পরম রহস্যমণ্ডিত সত্যের সন্ধানই যে তাঁর মজ্জাগত মানসীর "হৃদয়ের ধন" কবিতায় তা পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে।

নাই নাই কিছু নাই শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে!

"কড়ি ও কোমলের" পর মানসীতে দেখ্‌তে পাই কবির প্রকাশ-সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। হৃদয়ের ভাবতরঙ্গ আরো বিক্ষুব্ধ, জীবন হর্ষে আর ব্যথায় জটিল হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই জটিলতায় তাঁর দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত হ'য়ে যাচ্ছে না। উপরে "হৃদয়ের ধন" কবিতার কয়েক চরণ যে উদ্ধৃত হয়েছে তা'তে কবি তাঁর সমস্ত কথা কি নিখুঁত আর অব্যর্থভাবে পাঠকের সাম্‌নে ধর্‌তে পেরেছেন!

"মানসীকে" মোটামুটি দুইভাগে ভাগ ক'রে পড়া যেতে পারে। প্রথমভাগের বিশেষত্ব এর প্রেমের কবিতা। মানসীর চরণাঘাতে কবিহৃদয়ে সৌন্দর্য্য যেন সহস্রধারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। মানসীকে কবি কখনো বল্‌ছেন—

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে।
দেখি ও নয়নে নিমিষের তরে
সেদিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতাদুটি
পড়ে কি ঢুলে!
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়োনা,
এসেছি ভুলে।

কখনো ভুল ভেঙে যাওয়ায় কবি বল্‌ছেন—

বাঁশি বেজেছিল,　ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল　চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি।

কখনো বল্‌ছেন, বিরহেই তিনি ছিলেন ভালো—

তবু সে ছিনু ভালো আধো আলো আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।

কখনো শূন্যহৃদয়ে তিনি বসে' আছেন, মনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌ছে, কবে—

পাগল ক'রে　দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে,　মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।

কখনো সংশয়ের আবেগে কবি স্থির থাক্‌তে পার্‌ছেন না—

ভালো বাসো, কি না বাসো বুঝিতে পারিনে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি'
সর্ব্বগ্রাসী আঁখি।
......
কেন এ সংশয়-ডোরে　বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে,　প্রেম নহে ফাঁকি,
প্রাণ নহে খেলা।

কখনো এক অপূর্ব্ব বিচ্ছেদের ছবি আঁক্‌ছেন—

সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
তবে আর কেন মিছে করুণ নয়নে
আমার মুখের পানে চাও!

আবার কখনো সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়ে কবি বল্‌ছেন—

তবু মনে রেখো…
তবু মনে রেখো যদি মনে পড়ে আর
আঁখি-প্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

এইসব কবিতায় অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিও অনুপম সৌন্দর্য্য ভঙ্গিমা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো যে অ-"বাস্তব" নয় তার খুব ভালো একটি প্রমাণ আমরা জানি। আমাদের এক সুবিখ্যাত কবি-বন্ধু এইসব কবিতার বহু চরণের পাশে-পাশে তারিখ দিয়ে রেখেছেন।

'মানসী'তে কবি দক্ষ স্রষ্টা হ'য়ে উঠেছেন। ভাব, ছন্দ প্রকাশ-ভঙ্গিমা সমস্তেরই উপর পর্য্যাপ্ত অধিকারের জন্যে এই মানসীর সময় থেকে যত কবিতা তিনি লেখেছেন তা'র প্রায় প্রত্যেকটিতেই কিছু-না-কিছু প্রসংশাযোগ্য আছে। জগতের অতি অল্প কবি সম্বন্ধেই এত বড় কথা বলা যেতে পারে। আমাদের কথা যেন কেউ ভুল না বোঝেন। বল্‌ছি না, রবীন্দ্রনাথ যত কবিতা লিখেছেন তা'র প্রায় সবই শ্রেষ্ঠ কবিতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কাব্যে যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোনো কবির ভিতরই তা পরিমাণে বা সংখ্যায় বেশী নয়, এমন-কি অল্পই। এখানে আমরা শুধু এই কথা বল্‌ছি যে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সন্ধান-তৎপরতা আর প্রকাশ-ভঙ্গিমার গুণে সাধারণ লেখকের স্তরে তিনি প্রায় কখনো নেমে পড়েননি; এটি যেন তাঁর প্রতিভার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

যে-সমস্ত কবিতার উল্লেখ করা হয়েছে, তা ভিন্ন 'মানসী'র প্রথম ভাগে "ক্ষণিক মিলন", "একাল ও সেকাল", "আকাঙ্ক্ষা", "নিষ্ফল প্রয়াস", "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি" প্রভৃতি আরো চমৎকার কবিতা রয়েছে —সৃষ্টি হিসাবেই এসব চমৎকার কবিতা; কিন্তু এসমস্তের মুকুটমণি হচ্ছে "নিষ্ফল কামনা"।

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!
রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায় বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!

*

এর ছন্দ, যতি, ভাবাবেগের বিপুলতা, চিন্তার অতল-স্পর্শতা, প্রকাশ-ভঙ্গিমার অব্যর্থতা সমস্তের মিলনে সৃষ্টি যে অপরূপ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে কি কথায় তা'র যোগ্য প্রশংসা হ'তে পারে? ১৭ লাইনের কবিতা এটি, অথচ কোথাও এতটুকু ত্রুটি, এতটুকু দীনতা প্রকাশ পায়নি। এই কবিতাটিকে আমরা কত উঁচুতে স্থান দিই তা শুধু এই কথাতেই বোঝা যাবে যে, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যে এরকম আর দুটি কবিতার সাক্ষাৎ আমরা পাই। চিত্রার "উর্ব্বশী" আর বলাকার "বলাকা" কবিতা। এগুলো কাব্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি একথা বল্‌লে অতি সামান্যই বলা হয়। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে আরো ঢের আছে। কি গগনস্পর্দ্ধী সৃষ্টির অধিকার বিধাতা মানুষকে দিয়েছেন এসব তা'রই প্রমাণ। মানসীর দ্বিতীয় ভাগের অর্থাৎ শেষের দিকের অনেক কবিতায় দেখ্‌ছি কেমন বেদনামাখা কবি-হৃদয়—বিশ্ববিধানে জড়প্রকৃতির নির্ম্মমতার জন্য এই বেদনা ("নিষ্ঠুর সৃষ্টি", "সিন্ধু তরঙ্গ" প্রভৃতি) নিজেকে ক্ষুদ্র জীবনের কারাগারে বন্দী দে'খে এই বেদনা। তাঁর বিরাট্ আত্মা সংসারে পরিব্যাপ্ত হবার জন্য ভিতরে-ভিতরে কামনা কর্‌ছে। এতদিনের যে একলা-মনে রস-সম্ভোগের জীবন, তা'র মায়া কাটাতে তাঁর বাজে; অথচ কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার জন্যে আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনে যথেষ্ট প্রবল হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

কবির এই অবস্থার সুন্দর চিত্র বিধৃত হ'য়ে আছে এর 'ভৈরবী গান' কবিতাটিতে। তাঁর এই সময়কার এমন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-ক্ষমতা, এত সৌন্দর্য্য-উপভোগ, সব যেন ফেটে চৌচির হ'য়ে ভিতরকার বেদনাময় কবিহৃদয় খু'লে ধরেছে।—

যদি কাজ নিতে হয় কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে?
কাঁদে শিশির-বিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে।
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে।

শেষে দেখিব, পড়িল সুখ-যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্ত-বায়ু মিছে চলে গেল
শ্বসিয়া,
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া।

* * *

তবু সামনে না চ'লে তিনি পারছেন না; তাঁর ভিতর-কার দুর্জ্জয় শক্তি-স্রোত আপনা থেকে এগিয়ে চলেছে।

ওগো, থাম, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়ন-বাষ্পে ছেয়ো না!

* * *

সেই আপনার গানে আপনি গলিয়া
আপনারে তা'রা ভুলাবে,
স্নেহে আপনার দেহে সকরুণ কর
বুলাবে।
সুখে কোমল শয়নে রাখিয়া জীবন
ঘুমের দোলায় দুলাবে।
ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে!
যাবো আজীবন কালো পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে!

আস্তে-আস্তে চলার আনন্দই তাঁর ভিতরে কেবল জমাট হ'য়ে উঠেছে; মানসীর 'পরিত্যক্ত' কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে। বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হ'য়েও তিনি আর দমছেন না। প্রতিভার এই স্বাতন্ত্র্য বড় রহস্যপূর্ণ।

বন্ধু এ তব বিফল চেষ্টা,
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখর-গুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে?

'মানসী'র "বঙ্গবীর", "ধর্ম্মপ্রচার" প্রভৃতি ব্যঙ্গ কবিতার ভিতরও যে-বেদনার সঞ্চার হয়েছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা এক বড় জীবনেরই গর্ভবাস থেকে মুক্ত হওয়ার বেদনা। বাঙালীর বোতাম-আঁটা পোষমানা প্রাণের তলে বাস্তবিকই দুরন্ত কামনা "সর্পসম" কবির মনে ফুঁসছে—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন—
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।

"গুরু গোবিন্দের" পরও "নিষ্ফল উপহার" কবিতাটি বেশ বিশিষ্টতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। "সুরদাসের প্রার্থনা", "গুরু গোবিন্দ" প্রভৃতি ভালো কবিতা, কিন্তু সৃষ্টি-হিসাবে ততটা নিখুঁৎ নয়। এসমস্ত কবিতা এমন-একটা গতি-ছন্দের ভিতর দিয়ে ধেয়ে চলেছে যে তা'রই জন্য সৃষ্টি-কমল যেন পূর্ণভাবে দল মেল্‌তে পারেনি। "নিষ্ফল উপহারে" দেখ্‌ছি, কবি তাঁর সেই গতির রাশ খুব জোরে টেনে ধরেছেন, এবং রাশ টেনে ধ'রে তিনি যে এক চমৎকার ভঙ্গিতে রথ চালনা কর্‌তে পারেন, তার পরিচয় দিয়েছেন। এর সর্ব্বত্র কি দৃঢ় সংযম। এক-একটি চরণ এক-একটি ভাব প্রায় পুরোপুরি প্রকাশ কর্‌ছে ব'লে তাদের সমবায়ে সমগ্র কবিতাটিতে যে ভাবধ্বনি উঠছে তা গম্ভীর আর উদাত্ত।

"মানসী"র শেষের দিকে আরো কতকগুলি সুন্দর কবিতা আছে। "ধ্যান", "অনন্ত প্রেম", "উচ্ছৃঙ্খল" প্রভৃতির কথা বল্‌ছি। "ধ্যান" প্রতিভার প্রাণ। কবি নিজের সেই ধ্যানের রূপ যেন উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছেন—

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা।

"উচ্ছৃঙ্খল" কবিতাটি এক সুন্দর সৃষ্টি। কবির মনো-জগৎ এখন যথেষ্ট বিস্তৃত, সেই বিস্তৃত মনোজগতের বুকে উচ্ছৃঙ্খলকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল।
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।
এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাবো,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি' রাখিতে
দু'খানি বাহুর জোরে।

নবীন কবি নজরুল ইস্‌লামের সুবিখ্যাত "বিদ্রোহীর" আবেগ এর চাইতে অনেক বেশী; কিন্তু সে আবেগ এমন স্রষ্টার হাতে নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই তা'র অনেকখানি কাব্যহিসাবে অকিঞ্চিৎকর। অতি বিপুল আবেগ সৃষ্টিক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হ'লে কি অপরূপ কাব্য হ'তে পারে, বায়রনের (Byron) চাইল্ড্ হ্যারল্ডের (Childe Harold) শেষের দিকে সমুদ্র-বন্দন তা'র এক বড় প্রমাণ।

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধ্রুপদ।

টঙ্কা—চৌতাল।

ঈশ্বর তুঁ হৈ দয়াল জগতপতি প্রণতপাল
ব্যাপক পূরণ বিশাল সন্ত চিত্ত সুখ দাই।
সকল ভুবন জনম করণ জীবন কে পরম শরণ
শরণাগত তাপ হরণ নিগমাগম গাই।
তেরী মহিমা অপার কোই নহি পাবে পার
ঋষি মুনি কর কর বিচার অন্ত হার জাই।
ব্রহ্মা শ্রীপতি গণেশ নারদ শারদ সুরেশ
ধ্যাবত মন মে হমেশ ব্রহ্মানন্দ পাই।

ব্রহ্মানন্দ

১´ • ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
মা ধা । ধা ধা । র্সা ণ্‌া । মজ্ঞা -া । মা রা । া সা । সা ণ্‌া । সা ণ্‌া ।
ঈ ০ শ্ব র ০ তুঁ হৈ ০ দ য়া ০ ল জ গ ত প

২ ০´ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০´
ধ্‌াণ্‌া া । মা ধ্‌া । ণ্‌া সা । -া সা । সা মা । মা মা । জ্ঞা জ্ঞা । মা ধা ।
তি • প্র ণ ত পা ০ ল ব্যা • প ক ০ পূ র ণ

৩ ৪ ১´ ০ ২ • ৩ ৪
ণা র্সা । র্সা র্সা । ধা র্সা । ণা র্সা । ণা ধা । র্সণা র্সণা । ধা ণা । -া মা ॥
বি শা ০ ল স ন্ত চি ত্ত সু খ দা০০০ • ০ ই ০

অন্তরা।

১´　০　২　০　৩　৪
মা মা । ধা পা । র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সা র্সা । র্সা র্সা ।
স ক ল ভু ব ন জ ন]ম ক র ণ

১´　০　২　০　৩　৪
র্সা র্মা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্মা র্রা । র্সা পা । র্সা র্সা । পা ধা ।
জী ০ ব ন ০ কে প র]ম শ র ণ

১´　০　২　০　৩　৪´
ধা পা । ধণা র্রা । র্সা র্সা ! ধা র্সা । র্সা র্সা । পা ধা ।
শ র ণা০ ০ । গ ত ভা ০ প হ র ণ

১´　০　২　০　৩　৪
মা ধা । ধা পা । পা পা । র্সণা র্সণা । ধা পা. । ধা মা ।
নি গ ম আ গ ম গা ০ ০০ ০ ০ ই ০

সঞ্চারী

১´　০　২　০　৩　৪
মজ্ঞা -া । জ্ঞা মা । রা রা । রা রা । ণ্‌া সা । া সা
তে ০ ০ ত্রী ম হি মা অ পা ০ ০ ০ র

১´　০　২　০　৩　৪
সা সা । সা ণ্‌া । ধ্‌া -া । ধ্‌া ণ্‌া । সা রা । সা সা
কো ই ন হি ০ ০ পা ০ বে পা ০ য়ুর

১´　০　২　০　৩　৪
সা সা । মা মা । মা মা । জ্ঞা জ্ঞা । মা মা । ধা ধা
ঋ ষি মু ণি ক র ক র বি চা ০ র

১´　০　২　০　৩　৪
ধা র্সা । পা ধা । মা মা । মজ্ঞা -া । মা রা । া সা
অ ০ স্থ হা ০ র জা ০ ০ ০ ০ ই

আভোগ।

১　০　২　০　৩　৪
মা -া । মা ধা । পা র্সা । র্সা র্সা । পা র্সা । -া র্সা
ব্র ০ হ্মা শ্রী প তি গ ণে ০ ০ ০ শ

১　০　২　০　৩　৪
র্সা র্সা । র্সা র্রা । র্মা র্জ্ঞা । র্মা র্রা । র্সা পা । ধা ধা
না ০ র দ ০ শা র দ সু রে ০ শ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
ধা ণা । র্রা র্সা । র্সা র্সা । ধা সা । সা ণা । ধা ধা ।
ধ্যা ০ ব ত ম ন যে ০ হ যে ০ শ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
মা ধা । ধা ণা । । ণা । সণা সণা । ধা ণা । ধা মা ।
ব্র ০ জ্ঞা ন ০ স্ব পা ০ ০০ ০ ০ ই ০

মুদ্রাকী—ধ্যান

"স্তনতটকৃতরাগা কুঙ্কুমৈঃ পীতবস্ত্রা
বিবিধকুসুমস্রজাং কঞ্চুকীমাদধতি।
ভয়চকিতমৃগাক্ষী কান্তকণ্ঠে বিলগ্না
মালকোশকস্য ভার্য্যা মুদ্রাকী রাগিণীয়ম্ ॥"

ভাবার্থ—

কুঙ্কুমের দ্বারা যাঁহার স্তনতট রঞ্জিত, যিনি পীতবস্ত্রা, বিবিধ কুসুমের মালার কঞ্চুকী যিনি ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার মৃগচক্ষু ভয়ে চকিত, এবং যিনি কান্তকণ্ঠে লগ্না, তিনিই মালকোশের ভার্য্যা মুদ্রাকী রাগিণী।

মুদ্রাকী—আলাপ

সম্পূর্ণ জাতি।
গা ও নি কোমল।
ম—বাদী।
প—সংবাদী।

অস্থায়ী।

সা মা -। মপা মজ্ঞা মা -। রা -। সা ণ্া -। স্া রমা মা মা -।
তো ০ ম না ০ ০০ ০ ০ • • তে না ০ ০ ০০ ০ নে ০

পমা পা মা জ্ঞা -। মা । রা -। সা -। সা ণ্ধ্া ণ্া প্া -।
রি ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ না ০ তে রি ০ ০ ০ ০

প্া প্া ণ্ধা ণ্ধা স্ণ্া রা -। সা -। সসা ধা ধা প্া
রে নে না ০ ০ ০ তো ০ ০ ম্ না • তে ০ ০ না ০

র্সা ণা -। ধা পা -। পধা পা মপা মা জ্ঞা -। রা -।
০ ০ ০ নে তে ০ রে ০ ০ রে ০ না ০ ০ • ০

মা -। মপা মজ্ঞা মা রা । সা । সা সা সা
তে ০ না ০ ০ ০ তো ০ ০ না ০ তে রে না

সণ্া সণ্া রা । সা -। ॥
তে না ০ ০ তো ম্

অন্তরা।

মা মা ণধা ণা র্সা -। র্সা র্সা -। র্সা র্রা ণ্া র্সা -। র্সা -।
তে রে নে ০ রি ০ ০ রে না ০ তো ০ ০ ০ ম্ না ০

র্সণা র্সণা সা´ রা´ র্মজ্ঞা´ মা´ রা´ -া সা´ -া সা´ ণধা ণা -া
তে না রি ০ রে০ ০ ০ ০ না ০ তে না০ ০ ০

পা -া পা পমা পা মা জ্ঞাঃ জ্ঞঃ মজ্ঞা মজ্ঞা মা ধা
০ ০ নে রি০ ০ রে ০ ০ ০০ ০০ ০ ০

পা ণা ধপা মজ্ঞা -া মা রা -া সা -া সা সা সা
০ ০ নে০ রি০ ০ রে ০ ০ না ০ তে রে না

সণ্‌া সণ্‌া রা -া সা -া II
তে না ০ ০ তো ম্

সঞ্চারী।

পমা পা মা জ্ঞা মা রা -া সা ণধ্‌া ণ্‌া প্‌া ।
তে০০ না ০ রি ০ ০ রে না০ ০ ০ ০

প্‌া সা -া সা -া সা রা মজ্ঞা মা ধপা ণা
তো ম্ স্ না ০ তে ০ রি০ রে ০০ ০

মজ্ঞা -া মা রা -া সা -া I
তে ০ ০ ০ ০ না ০

আভোগ।

র্সা´ ণধা ণপা র্সা´ -া র্সা´ র্রা´ ণা -া র্সা´ র্স
তা না০ ০০ ০ ০ তে রি ০ ০ ০ রে

র্সা´ ণধা ণপা -া ধমা পা মা জ্ঞা -া
তে না০ ০০ ০ তো০ ম্ না ০ ০

মা ণা ধা পা মজ্ঞা -া মা রা -া সা ।
তা ০ নে তে রে০ ০ না ০ ০ নে ০

সা সা সা সণ্‌া সণ্‌া রা -া সা । II
তে রে না তে না ০ ০ তো ম্

ধ্রুপদ।

মুদ্রাকী—চৌতাল

আদ কঠিন গাইয়ে বজাইয়ে,
শুধ মুদ্রা শুধ-বাণী শুধ-সঙ্গত
শুধ-অক্ষর শুধ-তান-তাল।
শুধ সালক সকীর্ণ শুধ বিকৃত
নেবরয়র একোণ সম বিষম
অতীত অনাগত জব হো প্রসন্ন করতার॥

নেবরয়র।

আস্থায়ী।

```
০      ৩         ৪        ১´       ০        ২
সা মা । মপা মজ্ঞা । রা সা । ণ্‌ সা । রমা মমা । -াঃ পঃা ।
আ ০   দ০ ক০     ঠি ন    গা ০    ০০ ইয়ে   ০ ব

০      ৩         ৪        ১´       •        ২
মা জ্ঞা । মা ররা । সা -া । ণধা ণ্‌ । প্‌ পপ্‌ । ণ্‌ধ্‌ সা ।
জা ০    ০ ইয়ে   ০ ০    ০০ ০    ০ শুধ    মু ০

০      ৩         ৪        ১´       •        ২        ০
-া সা । -া সসা । রা জ্ঞপ্‌ । সা -া । -া সসা । সধা -া । ধা র্সা ।
০ ব্রা  ০ শুধ    বা ০০    নী ০    ০ শুধ    স ০     ০ ০

৩      ৪         ১´       ০        ২        ০        ৩
-া পা । ধা -া । পা পা । -া পধা । পা মপা । মা -া । -া মজ্ঞা ।
০ ০    ০ ০    ০ জ   ০ ত০    ভ ধ০    অ ০    ০ ছ

৪      ১´        ০        ২
রা মমা । মাঃ পঃ । পা মজ্ঞা । মরা রা II
র শুধ   তা •    ন তা০   ০০ ল
```

অন্তরা।

```
১´      ০         ২        ০        ৩        ৪        ১´      ০
মা মা । পধা র্সা । -া র্সা । র্সা -া । র্রা পা । র্সা র্সা । পা পা । পা র্সা
শু ধ   সা০ ল    ০ হ     সং ০    কী ০    র্ ণ     শু ধ   বি০

২       ০         ৩        ৪        ১´       ০        ২
র্সা র্সা । র্সা পা । র্রর্সা র্রা । র্সা পা । পা র্সা । পা ধা । পা ধা ।
কু ত    নে ০    ম০ ব    র ষ    প্র কা   ০ ০    ০ ০

০      ৩         ৪        ১´       ০
পা মা । পা মা । জ্ঞা জ্ঞজ্ঞা । মজ্ঞা মা । ধা ধা
০ ০    ০ শ    ০ সম     বি ষ    ম অ

২      ০         ৩        ৪        ১´       ০
পাঃ পঃ । পপা মজ্ঞা । মা রা । -া সা । -া সসা । সর্সা -া ।
ভী ০    ত অ না     ০ প    ০ ত    ০ জব    হো ০

০      ০         ৩        ৪        ১´       ০        ২
-া র্সা । পর্সা পা । ধা পা । পা পা । মপা মজ্ঞা । -া মজ্ঞা । মা রা II
০ প্র   স০০     ০ ০    ০ র    ক০ র০    ০ তা০    ০ র
```



কৈফিয়ৎ

"আসক্তিপরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশ পালনের অনর্থ বহন করে' অপমানের মধ্যে, অভাবের মধ্যে চিরঞ্জীবনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে এমন সকল বয়স্ক নাবালকের দল আমাদের দেশে ঘরে ঘরে। আমাদের দেশে মাতার ক্রোড়-রাজত্ব-বিস্তারে পৌরুষের যত হানি হয়েছে এমন বিদেশী শাসনের হাতকড়ির নির্মমতায় তারাও হয়নি।" (প্রবাসী—বৈশাখ, পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী—রবীন্দ্রনাথ)। যে-দেশে পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, সে-দেশে সন্তানের জীবন-রাজ্যে মায়ের এমন নিরঙ্কুশ আধিপত্যের পরিকল্পনা কবির পক্ষে নিতান্তই আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে। আর এর ফলে কারো হেঁট মুখে সান্ত্বনার হাসি ফুটে উঠ্‌বে কি না জানি না, তবে পুত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিতা অনেক মাতার ফুল্ল মুখেই আত্মসন্দেহের ছায়া নেমে আস্‌বে এ সুনিশ্চিত। দু'এক স্থলে আসক্তিপরায়ণ মাতার মূঢ় আদেশের সম্মুখে আত্ম-বলিদান বিরল না হ'লেও মাতৃ-ভক্তির অমন উগ্র সংস্করণ দেশের সন্তানদের মনোরাজ্যে যে ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরের মত ব্যাপক ভাবে বাসা বেঁধেছে এমন আশঙ্কা কর্‌বার মতন প্রমাণ আমাদের সমাজেও নেই; সাহিত্যেও নেই। সর্ব্বত্রই ত দেখি ছেলেদের যা ঝোঁক্ ওঠে তা তারা করেই—মায়ের অশ্রু এবং আবেদন সম্পূর্ণ অবহেলা এবং অগ্রাহ্য করে'ই। ত্রেতায় কৌশল্যার আসক্তির টান শ্রীরামচন্দ্রকে বনগমন থেকে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌তে পারেনি; দ্বাপরেও মা যশোদার স্নেহের নীড়ের সহস্র আয়োজন শ্রী কৃষ্ণের কর্ম্মস্পৃহাকে আবিষ্ট রাখ্‌তে পারেনি; আর কলিযুগে মায়ের আসক্তির টান আর চোখের জলের মূল্য যে কতখানি তা ত এ যুগের কবি তাঁর "চোখের বালি"তে চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়েছেন।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমাদের দেশের তথাকথিত নাবালকের দল বিবাহে পণ গ্রহণের সময় পিতার একান্ত অনুগত, এবং দারান্তর পরিগ্রহণের বেলায় মায়ের পরম বাধ্য হ'য়ে থাকে;—কিন্তু ওসব কাজের দরুন্ সমাজে যদি চিরজীবনের কথা দূরে থাক্ ক্ষণকালের জন্যেও কারো মাথা হেঁট হবার সম্ভাবনা থাক্‌ত, তাহ'লে আনুগত্য এবং বাধ্যতা অতটা স্বতঃউৎসারিত হত না। আসল কথা, গো-বধের সময়ে খুড়ো কর্ত্তা হিসেবেই সাধারণতঃ মায়ের আসক্তির টানটাকে আমল দেওয়া হ'য়ে থাকে। নৈলে মায়ের অন্যায় আদেশ পালনের অনর্থ বহন কর্‌বার মতন বীরত্ব যদি সত্যিই আমাদের ঘরে ঘরে থাক্‌ত তা হ'লে মায়েদের সঙ্গে-সঙ্গে দেশেরও শ্রী অচিরেই ফিরে যেত।

লালায়িত আসক্তিই দেশের পৌরুষকে গ্রাস করেছে কিম্বা তস্রাহত পৌরুষই গিয়ে মায়ের আঁচলে আশ্রয় নিয়েছে সে-সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর, যে-পৌরুষ মায়ের আঁচলের কোণে বাঁধা পড়ে-রয়েছে তার বহরও যে খুব বেশী বিপুল নয় একথা বোধ করি নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। এ হতভাগ্য দেশে এই অভিশপ্ত যুগেও যে দু-একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের কর্ম্মের কুশলতা এবং চিন্তার উদারতা জগতের বিস্ময় এবং অর্ঘ্য আহরণে সমর্থ হয়েছে তাঁদের মায়েদের মনের অপত্যস্নেহকে বিশ্লেষণ কর্‌লেও তাতে ত্যাগ এবং আসক্তির রাসায়নিক অনুপাত খুব সম্ভব, এদেশের জলহাওয়ায় যেমনটি হওয়া সম্ভব এবং স্বাভাবিক তেমনটিই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।

এদেশের পৌরুষ মায়ের আসক্তিপরায়ণতায় শৃঙ্খলিত হয়নি। মায়ের টানের চাইতে এদের ঘরের টান ঢের বেশী; আর ঘরের টানের চাইতে প্রাণের টান এদের আরো বেশী।—আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি—এই হচ্ছে এ দেশের হিতোপদেশের অমূল্য নির্দ্দেশ। মায়ের ত্যাগের আলোতে যদি অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাক্‌ত তাহ'লে একই সময়ে একই দেশে সতী-দাহ আর বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকার কথা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত কর্‌তে পার্‌ত না। ছেলেরা অমানুষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের মনও ছোট হতে সুরু করেছে। কুন্তী যখন ত্রস্ত ব্রাহ্মণ পরিবারকে অভয় দিয়ে বালক ভীমকে পাঠিয়েছিলেন দুর্দ্দান্ত বক রাক্ষসকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে তখন তাঁর মনের কোণে সম্ভবতঃ ত্যাগ বা আসক্তির কথা মোটেই ওঠেনি। ভূভারতের কোনো রাক্ষসই তাঁর ভীমকে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বে না এই বিশ্বাসই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর এখনকার মায়েরা যে ছেলে চোখের আড়ালে গেলেই অন্ধকার দেখেন তারও কারণ তাঁদের অন্তরের ত্যাগের অভাব বা আসক্তির টান নয়। সন্তানের সামর্থ্যে বিশ্বাস এবং নির্ভরের একান্ত অভাবই তাঁদের এ দুর্ব্বলতার মূল কারণ। বিদ্যাসাগরের অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞান, অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি আর পরের দুঃখে অফুরন্ত সহানুভূতিই তাঁর মায়ের মনের তারে নূতন সুর ধ্বনিত করে' তুলেছিল। নিষ্ঠাবতী হিন্দু-রমণী তাই বাল-বিধবাদের দুঃখমোচনের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে ছেলেকে অনুরোধ করে-ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মতন ছেলে না পেলে অমন দেশাচার-বহির্ভূত কথা হয় ত তাঁর মনেও উঠ্‌ত না, মুখেও ফুট্‌ত না। সব মায়ের ভাগ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের মতন ছেলে না জুটলেও, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে যে—দেশের কর্ম্মের শক্তি এবং চিন্তার ধারা আবার যখন পারি-বারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে সর্ব্বতোমুখীন হবে তখন দেশের মায়েদের মনও পিছিয়ে পড়ে' থাক্‌বে না।

যে-দিন থেকে ছেলেরা বৃহৎ জগৎ থেকে বিমুখ হ'য়ে সামাজিকতা আর পারিবারিকতার দুর্গের প্রাচীর গঠন আর পরিখা খননেই আত্ম-বিনিয়োগ করেছে সেই দিন থেকেই হয়ত মায়ের মনের উৎসও জমাট বাঁধ্‌তে সুরু করেছে। মৃত-বৎসা জননীর স্তন্য আপনা হতেই শুকিয়ে আসে।—প্রকৃতির রাজ্যে বাজে খরচ হবার উপায় নেই। রাজপুত-জীবনে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, শোনা যায় তখন রাজপুত মহিলারা নাকি মাথার চুলে স্বামী-পুত্রের ধনুকের ছিলা তৈরী করে' দিতেন দরকার হ'লে। আর এখন রাজপুত তার যুদ্ধের নেশা প্রায়শঃ আফিং দিয়েই মেটায়, কাজেই রাজপুত মহিলাদের চুল যথাস্থানেই থাকে, আর বছরের পর বছর আফিংএর কষে তাদের হাতের তেলো ক্রমশঃ পরিপক্ক হয়। সে-কালে যে-সময়টা ধনুর্ব্বাণ, বর্ম্ম-চর্ম্মের তত্ত্বা-বধানে কাট্‌ত এখন তার চেয়ে ঢের বেশী সময় আফিংএর ক্ষেতে অতি-বাহিত হয়। কিছু দিন আগেও হিন্দু-পরিবারে ছেলেপিলেরা ভোরে শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে শিবস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র আরো কত-কি মুখে মুখে শিখত আবৃত্তি কর্‌ত। আর এখন মায়ের ক্রোড়-রাজত্বেরও বিভাগে স্বরাজ স্থাপিত হ'য়ে গিয়েছে। যে-সময়টা

"পুণ্যশ্লোকো নলরাজা ; পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরো" কর্‌বে, সে-সময়টা বা[illegible] কেশে নিয়ে ছুঁৎ[illegible] বা ছু-পাঁড়া [illegible] কেতাব মুখস্থ কর্‌তে [illegible] আখেরের কাজ হবে। এ-বিষয়ে ছেলে এবং ছেলের বাপের ভিতরে তিলমাত্র মত-দ্বৈধ নেই।

ঐ যে ছেলের আখের—ও বিষয়ে চিরদিনই ছেলের মা ছেলের বাপের মুখেই ঝাল খেয়ে আস্‌ছেন। ফলে এ-দেশের ছেলেদের কর্ণ-

[illegible] জীবনের [illegible] মায়েদের [illegible] মতে "সোনার [illegible] এর পরে ধনধন ও আশাও থাকে না তখন মায়েদের শুধু "বেঁচে থাকো" বলেই ক্ষুণ্ণ থাকতে হয়। মায়ের মনের এই যে ক্রমবর্দ্ধনশীল কৃপণতা এর জন্যে দায়ী কে?

শ্রী বরদাচরণ গুপ্ত

কার্ল্‌ স্পিটলার-বিংশ শতাব্দীর এপিক্‌ প্রতিভা *

রম্যাঁ রলাঁ

[মনস্বী রম্যাঁ রলাঁ-কর্ত্তৃক সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জার্ম্মানভাষী অশীতিপর বৃদ্ধ কবি কার্ল স্পিটলারকে প্রদত্ত সম্বর্দ্ধনার ইহা অনুবাদ। মহাত্মা কার্ল্‌ স্পিটলার সম্প্রতি গত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধ রম্যাঁ রলাঁর গভীর গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক। কবিত্বের অনন্ত নির্ঝরিণী-ধারার যে সন্ধান ইহার মধ্যে আমরা পাইতেছি তজ্জন্য আমরা রলাঁ মহোদয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। এই কবিত্ব-নির্ঝরিণীধারা বিশ্বমানবের নিত্য-নূতন আশা আকাঙ্ক্ষাকে চিরনূতন রূপ দান করিতেছে। আমাদের চিত্ত যেন কেবলমাত্র আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যাকাশের নব নব ভাস্বর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে নতমস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারে ইহাই আমাদের কামনা বলিয়া বিদেশের এই মহামনীষার প্রতি অনাত্তর বিদেশী মনস্বীর অর্ঘ্যদান আমরা আমাদের দেশীয় লোকদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি——অনুবাদক]

বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর অমানুষিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নোবেল-প্রাইজ্‌ লাভের ফলে কার্ল্‌ স্পিটলার সাধারণের নিকট যশস্বী হইয়াছেন। অনেকের ধারণা যে মিত্র-পক্ষের অনুকূলে তাঁহার এই উক্তি তাঁহার নোবেল্‌ প্রাইজ্‌ পাইবার কতকটা কারণ, কিন্তু এই ধারণা সত্য না হইতেও পারে। ১৯১৫ সালে টুরিকে (Zurich) সপ্ততিবর্ষ-বয়স্ক এই বৃদ্ধ-কবি প্রকাশ্যে জার্ম্মানীর রাষ্ট্রনীতি ও বিগত মহাযুদ্ধে বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতায় হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে তাঁহার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহা যথেষ্ট সাহসের পরিচায়ক, কারণ তখন ইউরোপে একমাত্র জার্ম্মানীতেই তাঁহার গ্রন্থগুলি পঠিত ও প্রশংসিত হইত এবং জার্ম্মান-সুইসেরা তাহাদের দুর্দ্দান্ত প্রতিবেশীর (জার্ম্মানী) সহিত অত্যন্ত সাবধানভাবে ব্যবহার করিত। কিন্তু কার্ল্‌ স্পিটলারের প্রতিভা যেমন স্বতঃউৎসারিত হইত, তাঁহার সাহসও তেমনি স্বাভাবিক ছিল। তিনি কুৎস ও সন্তোষ থাকিতে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ কোনো বিপদকেই গ্রাহ্য করিতেন না এবং একবার যাহা বলিতেন তাহা লইয়া কখনও মাথা ঘামাইতেন না।

কিন্তু অন্যে তাঁহার সম্বন্ধে বেশ মাথা ঘামাইত। চারিদিক হইতে মিত্র-পক্ষীয়েরা লুজার্ণে (Luzern) তাঁহার বাসভূমিতে অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসিত। তাঁহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ, সম্বর্দ্ধনা-লিপি, প্রশংসাপত্র ঝুড়ি ঝুড়ি বর্ষিত হইত ও তাঁহাকে লইয়া বহু উৎসবাদিও হইত, এমন-কি জেনেভা-সম্বর্দ্ধনায় "ফ্রেঞ্চ্‌ একাডেমী" কয়েকজন সদস্যকে প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল। তৎকালে প্রায়ই দেখা যাইত যে, তাঁহাকে পুষ্পপেলব বচন অর্ঘ্য দিবার জন্য এমন সব লোকে দল বাঁধিয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে, যাহারা জীবনে তাঁহার একটি লাইনও পাঠ করে নাই। সেইসকল কৌতুক-অভিনয়ে আমি উপস্থিত থাকিতাম ও রাজকীয় মহারথিগণের মূর্খতার পরিমাণ লক্ষ্য করিতাম। ফ্রান্সের এইরূপ একজন পদস্থ কর্ম্মচারীর কথা মনে আছে, ইনি এইরূপ একটি সভায় কি বলিবেন খুঁজিয়া না পাইয়া কার্ল্‌ স্পিটলারের কোনো গ্রন্থ-পাঠরূপ ব্যর্থ পরিশ্রম না করিয়া একটি জার্ম্মান অভিধান খুলিয়া স্পিট্‌জ (Spitze) শব্দের অর্থ 'শীর্ষ' বা 'শিখর' দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার 'দ্বিপদী' (Couplet) রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন!

* মূল ফরাসী হইতে।

স্পিটলারের নিমন্ত্রণকারী ল্যাটিন্-সুইস্ জাতিও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। জেনেভা-ভোজে স্পিটলার যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন, আমি তখন একটি কথোপ-কথনের নিম্নলিখিত অংশটুকু শুনিয়াছিলাম—

"কিহে, ওর কোনো বই কি তুমি পড়েছ?"

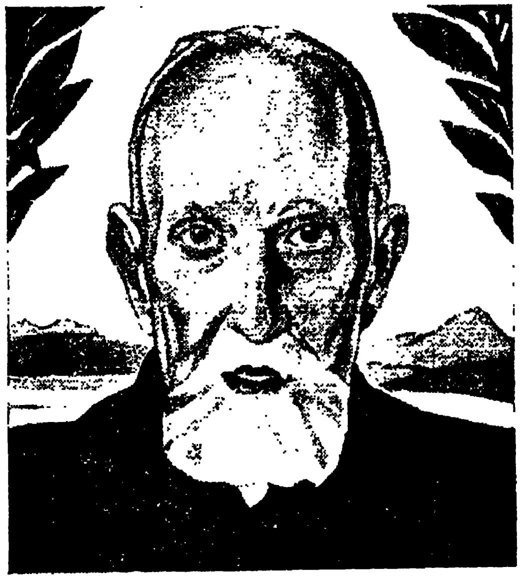
"না, তুমি পড়েছ নাকি?"

'আরে না (ব্যঙ্গ-সহকারে)। প্রথমতঃ কবিতা জিনিষটা আমার পক্ষে অতি উচুধরণের ব্যাপার—তা'ছাড়া আমি জর্ম্মানই জানি না। (বলিতে বলিতে থামিয়া—বক্তৃতার উদ্দেশ্যে) চমৎকার, বাহবা!"

স্পিটলার ইহাতে মোটেই আশ্চর্য্য হইতেন না ও ইহা লইয়া যথেষ্ট কৌতুক করিতেন। আর কখনও কোনো-কিছু তাঁহাকে আশ্চর্য্য করিতেও পারিত না। সত্যই ত তিনি হঠাৎ তাহাদিগকে চমকাইয়া দিয়াছেন। সদাবিখ্যাত লোককে লইয়া হৈ চৈ করার ত চিরচলিত প্রথাই আছে!

সেই ঘটনার পর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে অথচ কার্ল্ স্পিটলার সেদিন অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক পরিচিত হন নাই; ফ্রান্সে তাঁহার সম্বন্ধে লোকে কিই বা জানে? প্রয়োজন হইলে যে ভাবরাজ্যের কবি বাস্তবতার ক্ষেত্রেও শক্তিকৌশলের পরিচয় দিতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য লিখিত 'কোন্‌রাড্ লাফ্‌টেনান্ট্' (Conrad the lieutenant) প্রভৃতি দুটি কি তিনটি মাত্র গ্রন্থের সহিত সেখানকার লোকে পরিচিত। ফ্রয়েড (Freud) সম্প্রতি ফ্যাসনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া সম্ভবতঃ দুই একজনে তাঁহার 'ইম্যাগো' (Imago) পুস্তকখানিও পড়িয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার দু'টি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যাহাদের বর্ত্তমান কালের মহাকাব্যের শিরোমণি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না সেই 'অলিম্পিয়ার বসন্ত' (Olympian Spring) ও 'প্রমিথিয়ুস্' (Prometheus)—অল্‌প্সের (Alps) গগনচুম্বী শিখরের মত যাহারা দীপ্যমান;—ফ্রান্সের কয়জন লোক সুইটজারল্যাণ্ডেরই বা কয়জন তাহা পড়িয়াছে? কখনও কি কাহারও মনে জাগিয়াছে যে স্পিটলার নামক যে লোকটি সেদিন পরলোক গমন করিলেন, তিনি গ্যয়টে ও মিল্টনের সহিত একাসন পাইবার অধিকারী।

তাঁহার তিনটি মহাকাব্যের মধ্যে প্রমিথিয়ুস ও এপি-মিথিয়ুস, অলিম্পিয়ার বসন্ত ও সহ্যের অবতার প্রমিথিয়ুস্ (Prometheus der Dulder) প্রথমটি তৃতীয়টী একই কারু-শিল্পের দুই বিভিন্ন দিক, (সুতরাং দুইটি মিলিয়া সাধারণতঃ প্রমিথিয়ুস্ নামে কথিত হয়) একই সুর যেন বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন তানলয়ে গীত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলিতে পঁয়ত্রিশ বৎসর-বয়স্ক স্পিটলার 'কবির লড়াই-' ক্ষেত্রে কৌশলী যোদ্ধার মত যথেষ্ট ছন্দ-কাটাকাটির খেলা দেখাইয়াছেন; প্রাচীন কবি-যোদ্ধারা তাঁহার জয়ের উপকরণ জোগাইয়াছেন মাত্র কিন্তু তিনি সেই জয়ের নিস্ফল গর্ব্বে আত্ম-প্রতারিত হন নাই।



কার্ল্ স্পিটলার

এই মহাকাব্যগুলির মূল বিষয়, মানুষের চিরন্তন বিদ্রোহ। তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া একাকী দূরে রাখা-হইয়াছে তবু সে বিধিবদ্ধ বিবেক ও আড়ষ্ট নীতির শাসন মানিয়া তাহার স্বাধীন আত্মাকে বলি দিবে না। এই নীতি ও বিবেক প্রভুর মত নিরন্তর তাহাকে হুকুম করিতেছে; রাষ্ট্রতন্ত্রবাদ বা ঈশ্বরবাদরূপ কোনো পৌত্তলিকতাই সে মানিবে না। যাহারা তাহাকে নির্য্যাতিত করিতেছে, তাহাদেরই মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য নিদারুণ যন্ত্রণা



কার্ল্ স্পিটলার

চিত্রকর হোড্লার

সহিয়া সে পরিশেষে বিজয়ী হইয়াছে,—সেই রাষ্ট্রপ্রভু, পরমেশ্বরপ্রভু এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ—যাহাদের ধর্ম্মের অঙ্ক শূন্য ও যাহাদের একমাত্র কৃতিত্ব বলিহিসাবে এই বীরের রক্তপান করা—এইগুলিই হইতেছে এই একক নগ্ন আত্মার (solitary nude soul) বিপুল বিজয় সঙ্গীতের বিষয়—এই আত্মাকে মানুষ নিরন্তর ক্রুশবিদ্ধ করা সত্ত্বেও সে তাহার আত্মোৎসর্গের দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

অলিম্পিয়ার বসন্ত (Olympischer Fruhling) হিন্দু মহাকাব্যের মত যেন বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাস; সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বিপুলা প্রকৃতির ক্রমিক পটোন্মোচন। নবতম দেবতা সমাজ—বর্ত্তমান যুগে যাহারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে—নিশীথিনীর গভীর তমিস্রা হইতে উদ্ভূত হইয়া যাহারা এখন মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত দীপ্যমান—রাজদণ্ড লোভে তাহাদের যুদ্ধ—নূতন প্রণালীর প্রতিষ্ঠা—অলিম্পিয়ান্ স্বর্গের যৌবন—পরিপূর্ণতার আনন্দ—এইসব লইয়াই এই কাব্যটি রচিত। কিন্তু ধীরে-ধীরে সুখের দিনের অবসান হইতেছে—কবি তাই শেষ পর্য্যন্ত না দেখাইয়া ঐন্দ্রজালিক প্রাসাদে প্রথম ফাটল দেখা দিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার কাব্য শেষ করিয়াছেন; তিনি তামসঘন ভবিষ্যৎ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। যে শিখরে তাঁহার অধিষ্ঠান সেখান হইতে নিম্নের অতলস্পর্শ গহ্বরগুলি—যেখানে অচিরে জীবনের সকল আনন্দ নিঃশেষে ভাঙিয়া পড়িবে—তাহা দেখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বিশ্বমানবের জন্য আপনাকে বলি দিতে ভগবানের পুত্র 'হেরাক্লেসের' (Herakles) অবতরণ পর্য্যন্ত দেখাইয়া তিনি তাঁহার কাব্যের যবনিকা ফেলিয়াছেন।

গ্রীক্ নামগুলি দেখিয়া যেন আমরা প্রতারিত না হই। আমরা এতকাল পৌরাণিক গ্রীক নামগুলিদ্বারা যাহা বা যাহাকে বুঝিতাম এই নামগুলির সহিত তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই। পুরাণ-কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছে। ভাব ও রূপে সহজেই নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

আল্‌প্সের এই দেবতামণ্ডলীকে যে-সব নূতন দৃশ্যে অবতারণা করিয়া স্পিটলার নব-নব রূপ দিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই নবজন্ম দেওয়ার ধারা যখন একবার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তখন এগুলিকে তাঁহার সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি ছাড়া অন্য-কিছু বলিয়া মনে হয় না। পুরাতনকে এই নূতন রূপ দেওয়াতেই প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের যথার্থ মাধুর্য্য।

আমার বিশ্বাস আছে যে ফ্রান্স একদিন এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবে। আমার আরো বিশ্বাস এই যে ল্যাটিন-জাতিসমূহ জার্ম্মান-জাতি অপেক্ষা সহজেই এই কাব্যরসগ্রহণে সমর্থ হইবে। এই কাব্যের রূপোন্মেষিণী (plastic) শক্তি অপূর্ব্ব। একজন যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টির ভিতর দিয়া ভাব সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতা পর্য্যন্ত সব কিছু আমরা ইহাতে দেখিতে পাই। অশরীরী আত্মার চরম শূন্যতা পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়টি একটি শরীরে রূপ পরিগ্রহ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফাউষ্টের (Faust) পর জার্ম্মান প্রতিভা আমাদিগকে এমন প্রাচুর্য্য ও গুণসম্পন্ন কিছুই দিতে পারে নাই। আমার বয়স যদি আরো ত্রিশ বৎসর কম হইত আমার জীবনের কয়েক বৎসর আমি স্পিটলারের কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদে অতিবাহিত করিতাম। বর্ত্তমানে যাঁহাকে ইউরোপের কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি সম্মান করি তাঁহার উদ্দেশে শুধু ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে স্পিটলারের সহিত আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। তখন মহাযুদ্ধের আটমাস কাল গত হইয়াছে। এই আটমাস কাল আমি একাকী এই দারুণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আমার এই যুদ্ধকে আমি বেদনামিশ্রিত পরিহাসের সহিত "সমরাঙ্গনের ঊর্দ্ধে" (Above the battlefield) নাম দিয়াছিলাম। আমার এই প্রচেষ্টা ন্যায় কি অন্যায় তাহার বিচার আমি করিব না কিন্তু এই যুদ্ধে আমার সমস্ত ন্যায় বিশ্বাস, সমস্ত অন্তরাত্মা আমাকে প্রণোদিত করিয়াছে। এই সময়ে হঠাৎ আমি"প্রমিথিয়ূসে"'র সন্ধান পাইলাম, এই বীরনায়ক ন্যায়ের জন্য আপনার জীবন ও আত্মাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই আকস্মিক পরিচয়ে আমার ধমনীতে ধমনীতে আনন্দ ও ভাবের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল, আমি অনুভব করিলাম যে আমি আর একক নহি; আমার গুরু ও সাথী জুটিয়াছে।

স্পিটলারের সপ্ততিতম জন্মদিনের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার রচিত গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মুক্তি ও সৌন্দর্য্যের যে দুই আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইতেছে তজ্জন্য তাঁহাকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একটি পত্র লিখিলাম।

১৯১৫ সালের ২১শে এপ্রিল আমি লিখিয়াছিলাম—

"আমার মনে হয় এই দুর্দ্দিনে 'প্রমিথিয়ূস' কাব্যখানি পাঠ করিলে, যে দারুণ কৃষ্ণমেঘ ইউরোপের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে, মাথার উপর হইতে ধীরে ধীরে তাহা অপসারিত হইয়া শান্তিপূর্ণ শাশ্বত অনন্ত নীলাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। যে হিংস্র সমর-দানব আমাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছে তাহার এই উৎপীড়নের মধ্যেই আপনাতে মহাশিল্পীর নির্ভীক প্রশান্তি দেখিয়াছি এবং তাহারই উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করিতেছি।"

তৎপরদিনই স্পিটলারের উত্তর পাইলাম—

"অশরীরী আত্মার বিচিত্র যোগসূত্রের দ্বারা আমাদের পরস্পর বন্ধন ঘটিয়াছে, বিভিন্ন জাতির প্রতি ন্যায়-সাধনের জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি এবং উভয়ে ইউরোপের লোক বলিয়াই আমাদের চিন্তার ধারা একই পথে প্রবাহিত হইয়াছে। আমাদের কাব্যে ও জীবনে আরো কত বিষয়ে যে ঐক্য রহিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমার স্ত্রী তোমার 'জন্ ক্রিষ্টোফার' (John Christopher) পড়িতে পড়িতে বিস্মিত হইয়া আমাকে বলিল—'আশ্চর্য্য, ঠিক মনে হইতেছে যেন তুমিই এই বইখানি লিখিয়াছ'! ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও তোমার মহতী মুক্তির অনুভূতি ঠিক আমারই অনুরূপ এবং 'বেটোফেন' (Beethoven) এর প্রতি আমরা উভয়েই সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন।"

যখন এই পত্র পাই তখন আমি জেনেভাতে 'যুদ্ধ বন্দীদিগের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিনিধি সম্প্রদায়ে' (International Agency for the War-prisoners) কাজ

করিতেছিলাম। ইয়োরোপ তখন যুদ্ধ-জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে, সকলদেশের গুপ্তবার্ত্তাবাহী বিভাগ (Intelligence Department) হিংসা ও উন্মত্ততায় পরস্পরের সহিত পাল্লা দিতে ব্যস্ত। ফ্রান্সে তখন লোকে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কাণ্ট (Kant) গ্যয়টে (Goethe) ও হাইনে (Heine)কে অতি নিম্নস্তরের লেখক বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছে। বেল্‌জিয়ামের নির্লিপ্ততায় হস্তক্ষেপ করাকে নিন্দা করিয়া জার্ম্মানীতে স্পিটলার একঘরে হইয়াছেন। প্রতিদিন তাঁহার নিকট কদর্য্য অপমানকর বহু পত্র আসিত, তিনি সেগুলিকে একটি বৃহৎ কাঁচের পাত্রে রাখিয়া কৌতুক করিয়া বলিতেন, 'এটি আমার যাদু ঘর'। তিনি আমোদের জন্ম মাঝে-মাঝে সেগুলি পাঠ করিতেন। আমিও ঐসময়ে নিষ্কৃতি পাই নাই। আমাকে তখন দুইদিক হইতে দুই মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ফ্রান্সের সংবাদ পত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে আমি বিশ্ব-মানবকে ভালবাসিতে গিয়া ফ্রান্সের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতেছি।* জার্ম্মান পত্রিকাগুলির অভিযোগ ছিল এই যে, আমি আমার লেখা দ্বারা যুদ্ধাবসানে বিলম্ব ঘটাইতেছি। আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগের কোনই ফল হইল না। যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছি তাহা বলিতে দ্বিধা করি নাই। বহুকষ্টে জরেস্ (Jaurès) সম্বন্ধে আমার লিখিত প্রবন্ধগুলি পরপর 'জার্ণাল অফ জেনেভা'তে প্রকাশ করিলাম এবং পুনর্ব্বার অনন্ত ভাবরাজ্যে বিচরণ করিবার সুযোগ পাইলাম।

আমি স্পিটলারের একখণ্ড 'প্রমিথিয়ুস ও এপিমিথিয়ুস' সঙ্গে লইয়া থুন (Thun) এ বিশ্রাম করিতে গেলাম। এই কাব্যরসে নিমগ্ন হইয়া আমি একমাসকাল যেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে বাস করিলাম। আমার সম্মুখ হইতে অন্য সব কিছু অন্তর্হিত হইল। যুদ্ধ-কোলাহল, ইউরোপের উন্মত্ত প্রলাপ সব কোথায় মিলাইয়া গেল। আমি জনশূন্য প্রান্তরের নীরবতা—কাদা-খোঁচার (swallow) সুমধুর স্বরলহরী—আর (Aar) নদী ও তাহার শৈবালদাম, সবুজ জলধারা এবং রজতশুভ্র বৃক্ষের সৌন্দর্য্যের মধ্যে একেলা কোথায় ডুবিয়া গেলাম। নির্ঝরিণী-ধারার তালে-তালে হাস্য মুখরা প্যাণ্ডোরার (Pandora) আনন্দ-চঞ্চল পদক্ষেপ শুনিতাম—যখন পড়িতাম—

'নিশীথিনীর শান্তি তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে—ঊর্দ্ধাকাশে নীলাভ নক্ষত্ররাজি ঝিকিমিকি করিতেছে এবং সেই নিঃসীম শূন্য তাহার নিজের মৃদুচরণপাতের শব্দ ব্যতীত কোনো শব্দই তাহার কানে প্রবেশ করিতেছে না'—

তখন আমি কালের সীমা অতিক্রম করিয়া কোথায় কোন অজানালোকে চলিয়া যাইতাম।

আমার মনে হয়, আমার জন্মের পর ইউরোপে লিখিত এইটীই প্রথম কাব্যগ্রন্থ যাহা অনন্তকাল আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে। অবশ্য টলষ্টয়ের 'সমর ও শান্তি' War and Peace ও এই চিরন্তনী সাহিত্যের একটি, কিন্তু 'সমর ও শান্তি'ও যেন কালের মুখোস পরিয়া আছে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারা চিরন্তন মানুষের চারিদিকে যে অন্তরাল রচনা করে 'সমর ও শান্তি'তে সেই আবরণটি লক্ষিত হয়। স্পিটলার কালের পিঞ্জরদ্বার চূর্ণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মহাশিল্পী চরিত্র সৃষ্টির মত সময়কেও সৃষ্টি করিয়া লন। তিনি কালের প্রভাব স্বীকার করেন না, আত্মার বিশ্বে তিনি সম্রাট। এই বিরাট মহাকাব্যগুলি বৈদিক সাহিত্য ও হোমরিক গ্রীসের মহাকাব্যগুলির সহিত একশ্রেণীতে স্থান পাইবে। আমি ভাবিয়াছিলাম মহাকাব্য রচনা করিবার মত মহাপ্রাণ একালে আর সম্ভব নহে। কিন্তু আজিও সে সৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান। স্পিটলার প্রতীচ্য দেশে সেই মহাপ্রাণ মহাশিল্পীগণের শেষ প্রতিনিধি—বর্ত্তমান যুগে তিনি একক, তিনি আপনাকে যে বর্ণবিমণ্ডিত দেখিয়াছেন তাহা কিন্তু এক শান্ত বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত।—এই মহাকবি নাকি রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে মনস্বী হইয়াছেন।

স্পিটলার মৃদু হাস্যের সহিত আমাকে একবার বলিয়াছিলেন—"আমার জীবন নাট্যে অর্দ্ধ ঘণ্টামাত্র

* ১৯১৫ সালের ২০ [illegible] এ হেনরী ম্যাসিস লিখিল "এই হতভাগ্য রলাঁ এখনও বিশ্বমানবের প্রেম নিবেদন করিয়া আসলে তাহার স্বদেশ ফ্রান্সের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে"। হেনরী ম্যাসিসের গ্রন্থের বিরুদ্ধে 'জ্যোঁ ক্রিস্তফ' নামক পুস্তিকার লেখা হইয়াছে। সুন্দর সমর বিশ্বমানবকে যে সংকীর্ণ প্রেম বিতরণ করে তাহার অন্তরালে সে একটুকু রাখিত করে

পলিটিক্যাল অভিনয় করিয়াছি ; একটি বিন্দু যতটুকু স্থান অধিকার করে আমার জীবনে পলিটিক্সের স্থান ততটুকুও নহে ।"

১৯১৫ সালের আগষ্টের শেষাশেষি ল্যুজার্ণে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি অতীব সমাদরের সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বিপুলকায় ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। কপাট-পৃষ্ঠ, নাতিদীর্ঘ লোহিতচর্ম্ম, শ্বেতশ্মশ্রু স্পিটলারের গোঁফের স্বর্ণাভা তখনও নষ্ট হয় নাই ; চুল পশ্চাদ্দিকে ফিরান ছিল ; দেখিলেই সহাস্যগর্ব্বিত সরল আভিজাত্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। ১৯১৫ সালে হোডলার (Hodler) তাঁহার যে ছবিখানি আঁকিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিখুঁত প্রতিকৃতি।

মিষ্ট ও গম্ভীরভাষী স্পিটলার যেন সৌজন্য ও দয়ার অবতার ছিলেন। অথচ সে দয়া সত্ত্বেও ব্যঙ্গ-পরিহাসের লোভ সংবরণ করিতে পারিত না। স্ত্রীজাতিকে তিনি অসাধারণ সম্মান করিতেন। তিনি চমৎকার ফরাসী বলিতে পারিতেন।

দুই কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া তিনি সম্পূর্ণ নির্জ্জনবাস করিতেন। সাহিত্যিকদের সহবাস বর্জ্জন করিয়া চলিতেন এবং তাহার প্রয়োজনও অনুভব করিতেন না। ল্যুজার্ণে মস্তিষ্কবান লোকদের সহিত আলাপের সুযোগ আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন—'না, ভগবানকে ধন্যবাদ।'

ল্যুজার্ণেও তাঁহার বাড়ীখানি তিনি লতাপাতা ও গাছপালা দিয়া এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মনে হইত বাড়ীটি সহরের বাহিরে অবস্থিত। স্পিটলার নির্জ্জনতাপ্রিয় হইলেও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হইতে ভালবাসিতেন, প্রতিদিন প্রাতে ৭টার সময় তিনি বাজারে গিয়া ফলমূলাদি ক্রয় করিতেন ও সে সময় নানাবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া আনন্দ পাইতেন।

তিনি অত্যন্ত গৃহপ্রিয় (ঘরমুখো,) ছিলেন। তাঁহার যৌবনে মাত্র এক বৎসর জার্ম্মাণীতে, দুই কি তিন বৎসর রুষিয়ায়, আটদিন প্যারিসে, ইটালীর পম্পিয়াই পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে আটদিন—ইহাই তাঁহার জীবনের বিদেশ ভ্রমণের তালিকা। কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে তিনি হাঁটিয়া প্রচুর ভ্রমণ করিতেন এবং একই পথে বার বার গিয়াও বিরক্ত হইতেন না—তিনি তাঁহার পরিচিত পর্ব্বত, তাঁহার নিজস্ব ক্ষুদ্র ডিট্‌সেন্‌ব্যর্গ (Dietchenberg) হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় শোভা ও সৌন্দর্য্য, সকল প্রকারের দৃশ্য আহরণ করিয়া লইতেন।

সুইটজারল্যাণ্ডেই তাঁহার আত্মীয় সংখ্যা অতি অল্প ছিল ; সুইটজারল্যাণ্ডের বাহিরে একেবারেই ছিল না বলা চলে। জার্ম্মানীতে হ্বাইনগার্টনার (Weingartner) স্পিটলারকে পরিচিত করিয়া দেন ; ইহার প্রতি স্পিটলার সর্ব্বদা হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা পোষণ করিতেন যদিও ট্যুরিকে তাঁহার রাষ্ট্রীয় উক্তি (জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে) প্রকাশিত হইবার পর হ্বাইনগার্টনার একটী উগ্র প্রকাশ্য পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের শেষ করিয়া দেন। স্পিটলারের কাব্যগুলির প্রশংসায় তিনি বিরত হন নাই বটে তবে তিনি বলিতেন যে কবি মানুষটা সে প্রশংসার যোগ্য নহে। "এই কাব্যগুলি স্পিটলার লেখে নাই—কোনো দেবতা তাহাতে ভর করিয়া এইগুলি লিখাইয়াছেন"—নিশ্চয়ই সে কোনো জার্ম্মান দেবতা! স্পিটলার ঝাঁঝাল ব্যঙ্গের সহিত উত্তর করেন—"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জার্ম্মানদেবতা একজন সুইসের স্কন্ধে ভর করিবার হীনতা স্বীকার করিলেন—যে সুইস আবার ফরাসী, ইংরেজ ও রাশিয়ানদের সহিত পরিচিত ও তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ; অথচ সেই দেবতা হিণ্ডেনবার্গ, ম্যাকেনসেন এণ্ড কোং মহোদয়গণকে অনুগ্রহ করিলেন না।"

আধুনিক জার্ম্মানীকে তিনি মোটেই ভালবাসিতেন না যদিও এখানেই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার প্রতিভা আদৃত হইয়াছিল। সেখানকার সঙ্কীর্ণতা ও 'পণ্ডিত মূর্খামি' দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। জার্ম্মানীর কথা হইলেই তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত বলিতেন, "এখানে কবির কাব্য না পড়িয়া লোকে তাঁহার সম্বন্ধে সমালোচনা সাহিত্য পাঠ করে" (তিনি বহুবার নাকি এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ পাইয়াছেন ; এমন কি গ্যয়টে এবং তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

ইফিজেনিয়া (Iphigenia) সম্বন্ধেও ওই ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।)

তিনি জার্ম্মানীর জনসাধারণের সহিত ফরাসীদেশের শ্রেষ্ঠজনগণের (*elite*) তুলনা করিয়া দেখাইতেন যে ফরাসীরা তাহাদের শীর্ষ শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে (classics) পূজা করার প্রথা (cult) অব্যাহত রাখিতে এবং তাহাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির স্মৃতি বজায় রাখিতে জানে। স্পিটলার বলিতেন জার্ম্মানেরা বই দেখিয়া তাহার বিচার করে না; তাহারা বই ভাল হইবার যে কতকগুলি বিধিবদ্ধ সিদ্ধান্ত (theory) আছে তাহার সহিত মিলাইয়া তবে বিচার করে। তাহারা বলে না—'এই **বই**খানি ভাল কিম্বা ভাল নয়' তাহারা মনে মনে বিচার করে—'যে যে **গুণ** থাকিলে একটী বইকে ভাল বলা যায় তাহার প্রত্যেকটী এই-বইয়ে আছে কি না?' সুতরাং তাঁহার 'অলিম্পিয়ার বসন্ত' কাব্যখানিকে না পড়িয়া এই অনুমানে (a priori) নিন্দা করা হয় যে (১) বর্ত্তমান যুগে মহাকাব্য রচনা সম্ভব নহে, (২) স্পিটলার যে ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন বর্ত্তমান যুগে তাহা বরখাস্ত করা হইয়াছে। বিধিবদ্ধ সিদ্ধান্ত ও হাল ফ্যাসনের মত প্রতিভারও যে একটা নিজস্ব দাবী আছে একথা ইহাদের মনেই উদিত হয় না।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে জার্ম্মানী নিষ্ঠুর ভাবে স্পিটলারকে পরিত্যাগ করে। তিনি ইহাতে বিরক্তি সূচক অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া বলিয়াছিলেন যে জার্ম্মানেরা দাসজাতি এবং চিন্তার স্বাধীনতা হারাইয়াছে। "স্বাধীন মানুষ ও স্বাধীন জাতিকে বুঝিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে," (সম্ভবতঃ স্পিটলার স্বাধীন মানুষ ও স্বাধীনজাতির **স্বাধীনতাকে** একটু অতিরঞ্জিত করিয়াছেন!) সাহিত্যে ও শিল্পকলায় সুইসজাতির শ্রেষ্ঠতা ও জার্ম্মানীর সংসাধারণ হইতে সুইজারলণ্ডের কয়েকটি মহাপ্রাণ ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া বেড়াইতেন। স্পিটলারের দৃঢ় ধারণা ছিল যে সুইসভূমিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহারা মুক্তির সবলতা ও আনন্দের অধিকারী; সেখানকার লেখকেরা স্বাধীন; সেখানে কৌলিন্যপর্য্যায় (hierarchy) নাই—বিদ্বজ্জন-সংঘ (Academics) নাই;—অসামরিক, সামরিক, সরকারী বা—সাংসারিক কোনো শ্রেণীবিভাগ নাই। কোনো বিখ্যাত শিল্পীকে পূজার বেদীতে এখানে বসান হয় না; তিনি সর্ব্বসাধারণের সহিত সমানভাবে চলিতে ফিরিতে পারেন। এইভাবে এই মহাশিল্পী, অন্তরে অন্তরে আভিজাত্যগর্ব্বী এই স্বাধীন আত্মা আপনার স্ব-জাতিতে গণতান্ত্রিক সাম্যভাবের (democratic equality) প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়াছেন এবং এই সাম্যভাবের দ্বারাই তিনি তাঁহার দেশস্থ জনসাধারণের সহিত প্রগাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ; অথচ সেই জনসাধারণ তাঁহার কোনো গ্রন্থই পাঠ করে নাই।

* * *

আমাদের পরিচয়ের প্রারম্ভে বেটোফেন্ (Beethoven) সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি যেন আমাদের উভয়েরই বন্ধু। যৌবনে আমরা উভয়েই 'দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে' (duca e maestro) তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতাম। তিনিই আমাদের উদ্বোক্তা গুরু ছিলেন। সতেরো বৎসর বয়সে স্পিটলার্ যখন লেখক হইবার অভিলাষী হন, তিনি শপথ করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ বেটোফেনের প্রথম রচনার মত সুন্দর কিছু না লিখিতে পারিলে তিনি লেখা ছাপাইবেন না।

সঙ্গীত-সম্বন্ধে আলোচনার সময় আবেগে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম;—"কিন্তু আশ্চর্য্য—আমার মনে হয়, সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্র-কলায় আপনি অধিক উৎসাহী।"

তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মুখ সহসা বিষাদাচ্ছন্ন হইল। তিনি বলিলেন, "চিত্রবিদ্যা-সম্বন্ধে আমি কথা বলি না—কথা বলিতেও চাহি না—কারণ তাহাতে আমার হৃদয়ের একটি পুরাতন ক্ষতের মুখ খুলিয়া যায়; সম্প্রতি সে ক্ষত আরাম হইয়াছে বটে, কিন্তু অতি অল্প আঘাতেই তাহা যন্ত্রণায় অধীর করে। সেইজন্য আমি ভরসা করিয়া কোনো ছবি দেখি না। ছবি দেখিলেই আমার চিত্ত ব্যথিত হয়। কিন্তু সঙ্গীত-সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে ভালবাসি এবং সঙ্গীতরসে নিমগ্ন হইয়া যাই।"

স্পিটলারের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতা চিত্রকরের জীবনানুসরণে তাঁহাকে নিরস্ত করেন। আমি বলিলাম, আমাকেও ঠিক

ওই বয়সে আমার পিতা সঙ্গীত-কলার অনুশীলনে নিরস্ত করেন। স্পিটলারের মুখ আবার সমবেদনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং আমাদের মিলনের যেন আর একটি বন্ধন বাড়িয়া গেল।

চিত্রকলার প্রতি তাঁহার এই অনুরাগ-অনুভূতি তাঁহার কাব্যে স্বভাবতঃই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছু লিখিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান, দৃশ্য, পারিপার্শ্বিক বেষ্টনী সমস্তই নিখুঁতভাবে কল্পনা করিয়া লইতেন। তিনি বলিতেন,—"আমি সমস্তটা একসঙ্গে **দেখিতে চাই**।"

তাঁহার 'প্যাণ্ডোরা'র অপূর্ব্ব কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, যে, উহা পাঠে বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃতিদেবী যেন নিজহস্তে তাঁহাকে (স্পিটলারকে) চালনা করিয়াছেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে তিনি যেন এক হইয়া গিয়াছেন।

স্পিটলার একটু যেন আহত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু উহা আমার অগোচরে ঘটিয়াছে; প্রকৃতি আমার লক্ষ্যের (objective) মধ্যে ছিল না। আমার ব্যগ্র দৃষ্টি ছিল সেই 'সুদূর বিপুল সুদূরের' পানে—সেই মেঘস্তর, সেই প্রতীকলহরী (symbols)—সাধারণে যাহাকে অধ্যাত্মবস্তু (metaphysics) বলে, তাহা তন্ময় হইয়া দেখিয়াছি; চক্ষুর অগ্রভাগ হইতে মেঘলোক পর্য্যন্ত বিরাট শূন্যে কত ভাব মক্ষিকাসমূহ উড়িয়া বেড়াইতেছে; আমি তাহাদের অনুধাবন করি; এবং মধ্যপথে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলি।"

তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমি বরাবরই ভাবিতাম ও বিশ্বাস করিতাম যে, বাস্তব-বাদীরা (realists) যে ভাববাদীদের (idealists) অপেক্ষা বাস্তবকে বেশী পরিষ্কার দেখিতে পায় এই ধারণা সত্য নহে। ভাববাদীরাই পরিষ্কার দেখে। এ-সম্বন্ধে এই উপমাটি আমার মনে হয়—একটি সুসজ্জিত গৃহ এবং একটি শূন্য গৃহ; অথচ বাড়ীর বাহিরে যাহা-কিছু ঘটে, দুটি ঘরেরই জানালা হইতে সমান স্পষ্ট দেখা যায়।"

কিন্তু যাহা অন্তরের অন্তস্তলের ব্যাপার—আত্মার অতলস্পর্শ গহ্বরের তলদেশ অবধি তিনি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন, তবু সংজ্ঞা হারান নাই! তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই শুধু লিখিয়াছেন; তাহার কিছু অর্থ দিবার চেষ্টা করেন নাই। আমি অত্যন্ত সাবধানে তাঁহার এইরূপ কতকগুলি কল্পনা-অনুভূতির অর্থ জানিতে চাহিয়াছিলাম। গ্যয়টের মতন তিনি উত্তর করিলেন—"হায় আমি যদি উহার অর্থ জানিতাম!" * আমি একবার বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের অর্থ বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। স্পিটলার শব্দ (word) মানে ভাব (thought) মনে করিয়া বলিলেন, "আমার কাছেও বহু জিনিষ অবোধ্য।"

ফাউষ্ট যাহাকে 'মৃৎ-শক্তি' (Earth-spirit) বলিত, সেই শক্তি যখন প্রতিভাবান্ পুরুষ আত্মসাৎ করে তাঁহার উদ্বোধিনী-শক্তি তাঁহার বিচারশক্তিকে অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু ফাউষ্টের মত স্পিটলার তাঁহারই আহূত শক্তির সম্মুখে মুহ্যমান হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার গৃহ হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত তিনি যখন আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাকে কষ্ট করিয়া আসিতে নিষেধ করা-সত্ত্বেও তিনি নিরস্ত হইলেন না। বৃহৎ সেতুর উপর উঠিবার মুখে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি রৌদ্রকে ভয় করেন কি না; তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমি কিছুতেই ভীত নহি।"

সত্য-সত্যই এই বীরপ্রসূ সুইজারল্যাণ্ডের স্বভাব-কবি ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না।

তিনি বলিতেন, "জীবনের সকল রোগে একটিমাত্র প্রতিষেধক আমি ব্যবহার করি; সেটি সাহস—কোনো-কিছুতেই বিক্ষিপ্ত না হওয়া।"

তিনি হাস্যমুখেই তাঁহার অদৃষ্টকে উপহাস করিতেন। চরম প্রলয়ের সহিত মুখামুখি হইয়া যখন সকল সত্তা লোপ পাইতে বসিয়াছে (annihilation) তখনও যেন তাঁহার আত্মা তাঁহার নন্দন মালঞ্চে একটি পুষ্পিত শাখা রোপণ করিয়া যাইবে এবং সেই জীবনবৃক্ষে অনির্ব্বাণ হাস্যের একটি অমর পারিজাত বিকশিত হইয়া উঠিবে।

"সেই রক্তরাঙা অঙ্কুর—তাঁহার আত্মা; 'হাসি' আসিয়া কানে কানে তাহার অফুরাণ আনন্দ-বারতা কহিয়া

* কবিবর রবীন্দ্রনাথের—"যা পেয়েছি তার অর্থ রয়েছে কিছু কি" মনে পড়িয়া যায়—অনুবাদক।

যাইবে···জীবনের উজ্জ্বলতা মুহূর্ত্তের জন্যও বিনষ্ট হইবে না, ভবিষ্যতে নিয়তি যে দুঃখভার বহন করিয়া আনিবে; তাহাতেও সে হাসির দীপশিখা নিবিবে না।"

স্পিটলারের সপ্ততিতম জন্ম উপলক্ষ্যে জেনেভাতে যে বিখ্যাত সম্বর্দ্ধনা উৎসব হয়, তাহার কিছুকাল পরে গ্রীষ্মের শেষাশেষি তাঁহার সহিত আমার আবার দেখা হয়, এবার তাহাকে শীর্ণ ও ক্লান্ত মনে হইল। সহসা-আবির্ভূত ভক্তবৃন্দের বিরুদ্ধে তিনি অনেক কথাই বলিলেন। তাহারা নাকি এক মুহূর্ত্ত তাঁহাকে নিশ্চিন্তভাবে কাজ করিবার অবসর দিতেছে না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আমার ভক্তদের হাত হইতে কি উপায়ে রক্ষা পাই। আমি বলিলাম যে আমি কোনো-রকমে জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া একটু সুবিধা করিয়া লইয়াছি। তিনি ইহাতে প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন ও আমাকে হিংসা করিতে লাগিলেন। তিনি লামার্তীনের (Lamartine) মত পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভুল করিয়াছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন কোনো শিল্পীই যেন এ ভুল না করে। তবে জেনেভা-বাসীর সহানুভূতি তাঁহার কল্যাণই করিয়াছিল, এবং সেই প্রশংসাবাদের স্মৃতি তাঁহার মানসপটে উজ্জ্বল ছিল। তিনি গোপনে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিয়া জীবনকে পুরাপুরি উপভোগ করার বাসনা তাঁহার আছে; তিনি দেখিয়াছেন যে, জীবন তাঁহার কাছে মাধুর্য্যে কল্যাণে পূর্ণ। তাঁহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখে অতিবাহিত হয় নাই। আমি তাঁহার 'প্রমিথিয়ুসের' উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে কবির ব্যক্তিগত এক দারুণ বিয়োগ ব্যথা তাঁহার ওই প্রথম কাব্যে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার মধুময় পরিণত বয়সের ফল, 'অলিম্পিয়ার বসন্তে' শরতের শস্যসমারোহ দেখিতে পাই—কেবল আলোক···

স্পিটলার ব্যথিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিলেন,—"যৌবন সুখের নহে। লোকে বলে যৌবনকাল আনন্দময়—কিন্তু ইহা সত্য নহে। আমাদের দেশের এই নৈতিক পক্ষাঘাতের যুগে অন্ততঃ পুরুষের পক্ষে যৌবন

আমরা পরস্পর আমাদের অতীত জীবনের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলাম। আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, আশা আকাঙ্ক্ষার অনুপাতে জীবন কি ক্ষণস্থায়ী! যেমনি লোকে জীবনকে বুঝিয়া জীবনকে ভালবাসিতে সুরু করে, অমনি তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়।

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের নিমন্ত্রণকারী আমেরিকা যুক্তরাজ্যের পুরাতন রাজকীয় প্রতিনিধি মহামতি মিঃ এইচ রেম্‌সেন্ হোয়াইটহাউস্ মহোদয় সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি ছোট-খাটো সভায় আমাদিগকে লইয়া গেলেন। কিন্তু পলিটিক্সের মত সাহিত্যালোচনায়ও স্পিটলার বিরক্ত হইতেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া একটি ছোট ঘরে লইয়া গেলেন ও আমাদের প্রিয়-প্রসঙ্গ সঙ্গীত-সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে শুনাইবার জন্য সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন ইতালিয়ান ও জার্ম্মান্ সুর, মন্টেভার্দির রচনা (Monteverdi) এবং বেটোফেনের রিটারবালেট (Ritterballet) বাজাইলাম। আমরা নিম্নকণ্ঠে গভীর প্রেমের আদান-প্রদান করিলাম এবং বিদায়-কালে আমি তাঁহাকে চুম্বন করিলাম।

আমি ফিরিয়া আসিয়াই যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম এবং সহসা আজ যাহা খুঁজিয়া পাইলাম তাহা এই—

"আমার বৃদ্ধ প্রিয় বন্ধুর কথা ভাবিতেছি, সেই শ্রান্ত মুখখানি—যাহার উপর মৃত্যু তাহার স্বাক্ষর বসাইয়াছে! আমি এত বিলম্বে তাঁহাকে চিনিলাম বলিয়া একসঙ্গে সুখে ও ব্যথায় পূর্ণ হইয়াছি। আমি তাঁহাতেই প্রথম জীবন্ত কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইলাম* কিন্তু পরিচয় এত বিলম্বে ঘটিল কেন? আজ তাঁহার বয়স ৭১ ও আমার বয়স ৫০—একত্রে আর কটা দিনই বা চলিবে।

প্রতিভার অলৌকিকত্ব এই যে মৃত্যুতেও প্রতিভাবান পুরুষের জীবনের সমাপ্তি নহে। তাঁহারা আপনাদের জীবনেই অমরতার অমৃত আহরণ করেন। তাঁহাদের

* ১৯১৫ সালে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত আমার

কাব্যকলায় তাঁহারা তাঁহাদের সমসাময়িক যুগের সার সংগ্রহ করিয়া প্রয়োগ করেন ;—তাঁহাদের আনন্দ—তাঁহাদের বেদনা, তাঁহাদের বেদনা-মধুর অনুভূতি, তাঁহাদের পুলক-বেদনা (sophrosuny) সমস্তই পরিশোধিত হইয়া তাঁহাদের কাব্যে প্রকাশ পায়। তাঁহারা অনন্তকাল জীবিত থাকেন।

স্পিটলারের সহিত প্রথম পরিচয়ের পর হইতে আমি মানস-সৌন্দর্য্য-লোকে তাঁহার সহযাত্রী হইয়া দূরে ও নিকটে পরিভ্রমণ করিয়াছি। তাঁহার নিত্যপ্রবহমান কাব্যধারা হইতে উৎসারিত সঙ্গীতে আমার সমস্ত হৃদয়-উপত্যকা মুখরিত থাকিত। যখনই আমার চিন্তা ও কর্ম্মের ধারা স্তব্ধ হইয়াছে আমি তাঁহার কলসঙ্গীত শুনিতে পাইয়াছি। বিশেষত পরিচয়ের প্রারম্ভে যখন তাঁহার সকলই আমার নিকট নূতন বলিয়া ঠেকিত, তখন তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াছি। ১৯১৫ সালে এমন একটি দিনও ছিল না যখন আমি স্পিটলার-গহনে নূতন কিছু সন্ধানের জন্ম অভিযান করি নাই।

প্রথমেই আমি 'প্রমিথিয়ুস ও এপিমিথিয়ুস্' পড়িয়া এই কাব্যের উদার অমার্জ্জিত সৌন্দর্য্য (ruggedness) ও মহান্ বিশৃঙ্খলতা (chaotic aspect) দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ওক্ বৃক্ষের মূলদেশ হইতে জীবনী রসধারা যেমন প্রচণ্ড গতিতে ছড়াইয়া পড়িয়া বৃক্ষকে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করে, তেমনি এই কাব্যটি কোথায়ও পুরাণ কাহিনী অবদান ও রূপকোপাখ্যানে বিকশিত হইয়া সহজ ও পরিচিত সমারোহ লাভ করিয়াছে—কোথায়ও বা মধ্য-যুগের কোনো পাশ্চাত্য-পঞ্চতন্ত্রের ভীষণ প্রতীকে শোভা পাইতেছে। সেই পল্লীগীতি (pastoral) 'প্যাণ্ডোরা'র অপূর্ব্ব স্বরসঙ্গতির (symphony) অতুলনীয় আনন্দে বিভোর হইয়াছি, আর মনে পড়িয়া গিয়াছে যুবক বেটোফেনের কথা। তিনি যেন নিপুণ অশ্বারোহীর অভিজ্ঞতা লইয়া ভীমবলে ভাব ও রূপের নিগড়কেও চূর্ণ করিয়া উদ্দামগতিতে অশ্বচালনা করিতেছেন ; যেমন তাঁহার সর্ব্বশেষ সুর-সৃষ্টিগুলির (Quartettes) মধ্যে দেখিতে পাই।

এই বিপুল কাব্যনদীর স্রোতে গা ঢালিয়া আরও কিছুদূর ভাসিয়া চলিলাম—সহসা যেন কোন্ অন্ধকার নদীখাত হইতে বাহির হইয়া 'শাশ্বত প্রেয়সী' (Eternal Beloved) প্যাণ্ডোরা (যাহার সহিত বিরহের কল্পনাও আমার এখন অসহ্য) নয়ন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রৌদ্র-ছায়া পরিস্নাত সেই উপত্যকার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া তাহার উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণ আনন্দ প্রকাশ করিতে গিয়া তাহার সবচেয়ে করুণ ব্যথিত অথচ সবচেয়ে প্রিয় সুর 'ভয়-বিষাদের' গান গাহিয়া উঠিল।

বিপুলকায় বৃত্তাকারে সজ্জিত পর্ব্বত শ্রেণীর মহাদৃশ্য, দুইকূল পরিপ্লাবিনী শান্ত ও বিশাল তটিনী, দেব-নিকেতনে—'অলিম্পিয়ার বসন্ত' ধীরে-ধীরে আমার নয়ন সম্মুখে একখানা চিত্রপটের মত উন্মোচিত হইতে লাগিল। এখন আর ইহা শুধু প্রমিথিয়ুসের হৃদয়বিদারক জীবন কাহিনী নহে, শুধু তাহার আশা ও আশ্বাস, বিজিত বা বর্ত্তমান ব্যথার কথা নহে ; যাহা তাঁহার প্রথম জীবনের লেখার বিশেষত্ব শুধু সেই তীব্র বন্য গন্ধে তাঁহার অনুপম মৌলিকতায় পূর্ণও নহে। আমাদের সৌভাগ্যগুণে'অলিম্পিয়ার বসন্তে' আমরা অদম্য ইচ্ছাশক্তি, ভাবসঙ্গতির অপূর্ব্ব খেলা—এ্যাপোলো-বীর (Apollo the Hero—অলিম্পিয়ার বসন্তে একটি গানের নাম) প্রভৃতির পরিচয় পাই। স্বপ্ন ও কল্পনার কি বিপুল পুষ্পসম্ভার। মহত্তীমধুর সৃজনীশক্তির কি লীলা!—সকলই যেন নূতন, সদ্যবিকশিত স্বাস্থ্যবান্ এবং সবল! বসন্ত ধীরে-ধীরে আপনার পটভূমিকা উন্মোচন করিল—পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিপূর্ণ বসন্ত বিকাশ এবং অনন্ত আকাশে নক্ষত্র পুষ্পরাজি। এ যেন আপনাতে আপনি বিকশিত এক নূতন পৃথিবী—উপকথা আর দেবতার রাজত্ব—এখানে আসিলে উন্মাদনায় বিভোর হইয়া যাইতে হয়।

আমি গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন গটফ্রীড কেলার (Gottfried Kellar) যেমন জাতিহিসাবে সুইজারল্যাণ্ডকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন তেমনি কোনো সুইস্ মহাকবি সুইজারল্যাণ্ডের মৃত্তিকা-সুষমা, তথাকার মেঘমালা, পর্ব্বতশ্রেণী এবং হ্রদ ও নদীর বর্ণনা দ্বারা তাঁহার দেশের যথার্থ পরিচয় দিবেন। এই ত

সেই কবি। স্পিটলারের মত সুইস্-প্রতিভা ব্যতীত আর কে এই বিরাট চিত্র আঁকিতে পারে—অধোলোক (Hades) হইতে স্বর্গলোকে নূতন দেবতাদের বিপুল অবরোহন, মধ্যপথে বিপদ্সঙ্কুল পর্ব্বত-গাত্রের উপর প্রাচীন দেবতাদের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ—তুষার-প্রবাহে প্রাচীন দেবতাদের অধোগমন—ক্ষিপ্ত-অশ্বারূঢ় রাজা ক্রোনসের (Kronos) উপলখণ্ডবৎ গহ্বরের তলদেশে পতন! আমি নূতন দেবতাদের অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম—বহুকষ্টে উপরে উঠিলাম—গোপবালা হিবি (Hebe) শুভ-শঙ্খনিনাদ করিয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিল,শুনিলাম। সেই শিখরদেশের লঘু সমীরণে স্নাত হইলাম; সেখানে সাধু রাজা উরেনাসের (Uranus) সপ্তকন্যা—সাতটি অপূর্ব্ব মোহিনী সুন্দরী যেন সন্তরণ করিয়া ফিরিতেছে। এই মন্ত্রমুগ্ধ বিশ্রামস্থলী হইতে এক প্রশান্ত আবেগময় আনন্দের ধারা প্রবহমান—যে আনন্দ রসধারা আমি আর কোনো কাব্য সাহিত্যে আস্বাদন করি নাই। ইহার সহিত কিসের তুলনা করিতে পারি, আরিয়োস্তো (Ariosto) এবং দান্তে, মোজার্ট (Mozart) এবং ভেরোনীজের (Veronese) কথা একই সঙ্গে মনে আসে। স্পিটলারের কলাশিল্পের ইন্দ্রজালে শব্দ যেন স্বর ও রঙে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে সাহিত্যিক উপকরণকে স্পিটলার 'জড় ও অকৃতজ্ঞ' বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার লেখনীর ইন্দ্রজালস্পর্শে চিত্রে ও সুরে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এমনি সে মোহিনী-শক্তি যে সে সপ্তসুন্দরীদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকে সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায় না। বিচ্ছেদের মধুর বেদনায় সেই 'হারানো প্রেয়সী'র পিছনে সে হাহাকার করিয়া ফেরে। কিন্তু একি! নূতন মায়াজাল যে আবার আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল! আত্মার ও ভাবের ভিন্ন রাজ্যে এ যে বিচরণ করিতেছি;—একই স্বপ্নবিশ্বের এক মেরু হইতে অপর মেরুতে চলিয়া আসিয়াছি; সেই রূপহীন অসীম আনন্দ নীহারিকা যাহাকে রূপ দিবার জন্য চিন্তা করিতে হয় না—বেদনার অতলস্পর্শ গহ্বর—আনাঙ্কে (Ananke) কর্ত্তৃক ক্রুশবিদ্ধ জীবনের প্রহেলিকা—এ সমস্তই দেখিতে পাইতেছি। আমার বিশ্বাস, গ্যয়টে এ সমস্ত যন্ত্রণার আভাষ পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভয়ে শিহরিয়া সেদিক হইতে পিছু হটিয়াছিলেন কিন্তু নিঃশঙ্কতর স্পিটলার ফাউষ্টের মত আদ্যাশক্তির (Mothers) নামোল্লেখে শিহরিয়া পিছাইয়া পড়েন নাই। তিনি গহ্বরের অসীম অতল পর্য্যন্ত—চরম শূন্যতার (annihilation) শেষ অবধি চলিয়া গিয়াছেন, এবং নরক প্রত্যাগত দান্তের মুখে বেদনার যে সুস্পষ্ট বলিরেখা দেখি তাহার একটিও তাঁহার ললাটে দৃষ্ট হয় না। স্পিটলার স্বরাট্ হইয়া ফিরিয়াছেন; অন্তরতম প্রদেশেরও প্রভু হইয়া তাহার চাবি হাতে রাখিয়াছেন এবং তাঁহার উরেনাস যেমন, যে অন্তরঃ জীবনী রসধারা শোষণ করিবার জন্য অদম্য চেষ্টা করিতেছে, সেই মূর্খ দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার আলোক ও ভৈরব হাস্য বিকীর্ণ করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন, তেমনি নিরন্তর গোপনে রজনীর অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। সুরসঙ্গতির (Symphony) স্বর-বৈচিত্র্য (Variation) যেমন অপূর্ব্ব চক্রাকারে (Cycle) ফিরিয়া ফিরিয়া আসে; এই কবিতাটিও তেমনি ধীরে-ধীরে আপনাকে প্রসারিত করে। এই তুলনাটি করিতে গিয়া আমার আবার বেটোফেনের অলৌকিক উদ্ভাবিনী প্রতিভার কথা মনে পড়িল—একই সুর ও একই বস্তু হইতে চিন্তার সমস্ত রেখা ও সুস্পষ্ট রূপ তিনি কেমন করিয়া টানিয়া বাহির করিতেন, অনুপম সঙ্গীত-ভাস্কর্য্যের দ্বারা সকল-প্রকার ভাব—ব্যঞ্জনা করিতেন। আমি মনে করি 'অলিম্পিয়ার বসন্তে' 'পবিত্র সময়ে'র (The Holy Time) বারোটি অপূর্ব্ব তানবিন্যাসেও স্পিটলার সেই চরম শক্তির খেলা দেখাইয়াছেন। ইহা যেন দেবতা-যুগের—আনন্দ-পরিপূর্ণতার চরম (apogee) । ইহা উপলক্ষ্য করিয়া স্পিটলার দ্বাদশটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন; প্রত্যেকটি এক-একটি দেবতার মহিমা-সঙ্গীত। তারপর সেই বাধিত মূর্চ্ছনা—সেই 'আনাঙ্কের নিরোধ!' (Ananke's Halt) যাহা শিশু "আনন্দে"র সঙ্গীতের অকালে কণ্ঠরোধ করিয়া ধরে। এই সুর সঙ্গীতের মধ্যে ভয়, মৃত্যু, হেরার (Hera) যন্ত্রণা-মুক্তির সঙ্গীত প্রভৃতি অবতারণা করিয়া কবি প্রকৃত শিল্পকলা-কৌশল দেখাইয়াছেন। ঐ সমস্ত ভয় ও যন্ত্রণা তুচ্ছ করিয়া

হেরাক্লেশের স্বর্গ হইতে অবতরণ ও তাহার কঠোর কর্ত্তব্যাভিমুখে গর্ব্বিতশিরে অভিযান—সেখানে ক্রুশ যন্ত্রণা তাহাকে পাইতেই হইবে, কিন্তু তবু সে গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্তির সঙ্গে আত্মাকে বলিদান দিবে—এই সমস্ত মিলিয়া সঙ্গীতের একটি অনন্ত সমুদ্র সৃষ্ট হইয়াছে। —এ সমুদ্রের শেষ দেখা যায় না। আবার কাব্যখানি খুলিয়া পড়িতে বসিলাম; ইহাকে ছাড়িয়া দিবার শক্তি যেন আমার নাই। এই রসসমুদ্রে যেন যুগযুগ নিমগ্ন হইয়া থাকিতে চাই। তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন কি? হাসি ও কান্নাময় বিপদসঙ্কুল গহন-সমাকীর্ণ অনন্ত-তমিস্রার অন্ধকার ও তরঙ্গপরিপ্লাবী হাস্যোজ্জ্বল রৌদ্র-কিরণলেখা এই দুই মিলিয়া সম্পূর্ণ জীবনের ধারা ত এখানেই বিদ্যমান!

অলিম্পিয়ার রৌদ্রময়ী সুরসঙ্গত অনুধাবনের বহু বৎসর পরে এই সেদিন মাত্র তাঁহার তৃতীয় মহাকাব্য 'ধৈর্য্যের অবতার প্রমিথিয়ুস্' (Prometheus der Dulder) খানি পাঠ করিলাম। এই কাব্যখানি ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্পিটলারের মৃত্যুর মাত্র ১৫ দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। সেই প্রাচীন নায়কেরা যেন অলঙ্কার-বাহুল্য, স্বপ্নাতিশয্য ও যৌবনের অধীর পক্ষ-বিধূনন পরিত্যাগ করিয়া আরও সুস্পষ্ট ও সুসঙ্গত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন। এই কাব্য অনেক পরিণত আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, classic গুণে ইহা পরিপূর্ণ; বাহিরের অযথা বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে লইয়া নিবিড় ভাবে জমাট বাঁধিয়াছে। পরিণত বয়সের ধীর রেখাঙ্কন, মহিমাময় কারুকার্য্যে ও জীবনের বেদনাতিক্ত মহান অভিজ্ঞতার গৌরবে ভরপুর! প্রথম জীবনের প্রমিথিয়ুসের সহিত তুলনায় মণীষার কি তীক্ষ্ণতা! কবির কি অপূর্ব্ব ভাবসন্ন্যাস (detachment)! যন্ত্রণা যেমন অসীম, যন্ত্রণাশেষে শান্তিও তেমনি সীমাশূন্য। ইহার শেষ গান (chant) 'বিজয়ীর' (The Conquerer) মত গম্ভীর ও প্রশান্ত কোনো কিছুর কথাই আমি জানি না। এই অংশটুকুই স্পিটলারের লেখনীর চরম দানপত্র! তাঁহার প্রথম—'প্রমিথিয়ুস' লেখার পর বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে এবং 'বিজয়ী' 'বণধূলির' আস্বাদ লাভ করিয়াছে। মানুষ এই অবস্থায় উপনীত হইয়া চরম বিজয় ও পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। আছে শুধু নির্ভয়, আশাহীন —ভ্রান্তিহীন দীপ্তি।

সেই বিরাট আত্মনাট্যের উদার পরিকল্পনা এই:— একক আত্মা, বহ্বাড়ম্বর করিয়া নহে, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধীর নির্ভীকভাবে ভগবানের আমলাবর্গের (Angel of God)* সম্মুখে মাথা খাড়া করিয়াছিল এবং ভগবানের দূত তাহাকে বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে বলাতে নিজ বিবেকদ্বারাই তাহাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে। এই গর্ব্বিত বিদ্রোহীকে উপলক্ষ্য করিয়া সদা-প্রভুর ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্ধকার-নির্জ্জন নির্ব্বাসনে বহু বৎসর তাহাকে নির্য্যাতিত করা হয়, এবং এই সহগুণের অবতার এই নির্ব্বাক জবের (Job) মস্তকে সেই নির্য্যাতনের ধূলি ও কালিমা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। তারপর যখন দেবশত্রুরা দেবপুরী আক্রমণ করিল—মানুষ তাহা রক্ষা করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল—তাহাদের দুর্ব্বল বিবেক—নতজানু হইয়া তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিল; সেই বিপৎকালে এই নির্য্যাতিত, অভিশপ্ত, নিঃসঙ্গ 'প্রমিথিয়ুসই' ভগবানের সন্তানদের রক্ষা করিল; সে সমরাভিলাষী ছিল বলিয়া নহে, পুরস্কারের আশায় নহে, এমন কি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পেও নহে—শুধু তাহার 'আত্মা' তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছে! অথচ সেই প্রেয়সী আত্মার মোহবন্ধনও এখন আর তার নাই। দ্বিতীয় 'প্রমিথিয়ুসে' এই আত্মাকে সে যদিও আগের মতই ভালবাসে, কিন্তু এ ভালবাসায় মোহ নাই—এ যেন সমানে-সমানে ভালবাসা; এখন সে জানে এবং বলিতে পারে তাহার প্রেয়সী আত্মার প্রণয়ের কি

* ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর ও মানুষের বরাবর সম্পর্ক নহে তাঁহার প্রতিনিধি দেবদূতগণের (Der Engelgottes) সহিত মানুষের সম্পর্ক। তিনি যেন ভারতবর্ষের বড়লাট! ঈশ্বর রাজকীয় বিবেক বুদ্ধির পাল্লায় পড়িয়া এপিমিথিয়ুসের হাতে আপন শক্তি অর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত আমলা সর্দ্দার অজিত বীর প্রমিথিয়ুসকে নির্ব্বাসন দণ্ড দেন। এই গতিচঞ্চল জগতের বহু ঊর্দ্ধে সেই বৃদ্ধ অদৃষ্ট, রোগাতুর পাপের অনুশোচনায় বিদ্ধ অথচ কিছু করিতে অপারগ ভগবান যেন উন্মাদ রাজা লিয়ারের মত বিষাদের শোচনীয় মূর্ত্তি হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছেন।

মূল্যই না দিতে হইয়াছে। অথচ এই আত্মা যন্ত্রণার সময় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ইহার জন্য সে বিসর্জ্জন দিয়াছে; সে ইহার সকলই লইয়া পরিবর্ত্তে কিছুই দেয় নাই এবং যখন জয়ের (জয় এখন আর তাহাকে আনন্দ দেয় না) সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখনও বন্ধু এমন কি বিশ্বস্ত ভৃত্য যে সে, তাহাকেও মৃত্যুর সম্মুখেও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কোনো অনুযোগ করিবে না। সে এখনও ভালবাসে সেই নিষ্ঠুর প্রিয়া এই আত্মাকে; এবং উহার জন্য প্রয়োজন হইলে আবার ঐ বেদন-নাট্যের অভিনয় করিতে সে রাজি আছে। অসীম নির্লিপ্ততা! বীর্য্যদীপ্ত প্রেম এবং অজেয় আত্মগরিমা—ভাবিতেও মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়।

কিন্তু এমন জ্বালাময় সোমরস কয়জনে পান করিতে পারে? শক্তিশালী পুরুষের সংখ্যা অধিক নহে; ইহা প্রায় ভালই যে এত বড় কাব্য সাধারণের অপরিচিত ও অপঠিত থাকিবে। তাহাদের এই ঔদাসীন্য ক্ষণে ক্ষণে টুটিয়া থাকে শুধু এ হেন রসসৃষ্টিকে উপহাস করিবার জন্য! এই পূত অগ্নিবর্ষনে তাহাদের সামান্য আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভস্মীভূত হয় এবং যদ্দ্বারা এই ভস্মীভূত আশা নবগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে সেই আত্মা—সেই আত্মাবৈশ্বানর সাধারণ মানুষের দুর্ব্বল হৃদয়ের পক্ষে অতিরিক্ত জ্বালাময়।

* * * * *

আমি স্পিটলারকে আল্‌প্সের ম্যাটারহর্ণ (Matter horn) শিখরের মত দুর্গম একটি বিচ্ছিন্ন পর্ব্বতরূপে দেখিতেছি। পাদমূল হইতে শিখর পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটি পর্ব্বত। সেখানে আমরা প্রত্যেকে কিছু না কিছু করিবার অবকাশ পাই—গুল্ম লতা কর্ত্তন করা, পুষ্প সংগ্রহ করা, ফল সঞ্চয় করা। তৃষ্ণার সময় তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য প্রস্রবণও সেখানে রহিয়াছে, শান্তি ও স্বপ্নরচনা করিবার ছায়া-সুশীতল স্থানও আছে। ইহার প্রাচুর্য্য, ইহার জলবায়ু ও দৃশ্যপটের বৈচিত্র্যকে ধন্যবাদ! পথিক এই বিপুল দৃশ্য-ভূমির অর্দ্ধেক বা আংশিক অংশ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতে পারে; কিম্বা একেবারেই কিছু বুঝিতে না পারে, শুধু ভালবাসিলেই যথেষ্ট! এই কলাশিল্পের একটিমাত্র অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খবর্ণনাকে, এই চিন্তাসমুদ্রের একটা মাত্র লহরীকেও যদি কেহ ভালবাসিতে পারে তাহা হইলে সামান্য জনসাধারণের স্মৃতিতেও এই মহাকবি জীবিত থাকিবেন।

কিন্তু এই বিপুল পর্ব্বতের তলদেশে নির্ঝরিণী ধারা যেমন উপত্যকার জনসাধারণকে সঞ্জীবিত করিতেছে—অন্য দিকে তেমনি তুষারধবল শিখরমালা নিঃসীম নীল গগনে মাথা তুলিয়া আছে—শ্বেত-কৃষ্ণ দেওদারশ্রেণী যেন চন্দ্রাতপের মত শোভা পাইতেছে—তুহিন শীতল আকাশে শুধু অনন্ত নক্ষত্রের স্পন্দন! পাদপরাজি প্রামোমেথিনী ঝটিকার নিঃশ্বাসে আনমিত হইয়াছে—গুল্মাদির মর্ম্মর রব উঠিয়াছে; প্রমিথিয়ুস্ যন্ত্রণায় কাতর—তাঁহার রক্তে তাণ্ডবের লীলা শুরু হইয়াছে—সে মৃত্যুহীন সৌন্দর্য্যরূপিণী দেবী-আত্মার আগমনী অনুভব করিতেছে—তাহার অনুপম নয়নসম্পাতে মোহ! প্রমিথিয়ুস্ পলাইতে চাহে, কিন্তু নড়িবার শক্তি তাহার নাই—সে যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সে! ব্যাঘ্রীর মত মোহন-ভয়াল কম্পিত দৃষ্টি অগ্নি শিখার মত তাহারই উপর ফেলিয়াছে! প্রেয়সী সম্মুখে! ওষ্ঠে তাহার অদ্ভুত হাসি, সে তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিল—প্রেয়সী তাহাকেই তাহার বলিরূপে বরণ করিয়াছে!

শ্রী কালিদাস নাগ
শ্রী সজনীকান্ত দাস



বিদেশ

রিফের কথা—

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশে সহায়-সম্পদহীন মুষ্টিমেয় জনকতক অসীম সাহসী দেশভক্ত অনুচরের সাহায্য-মাত্র সম্বল করিয়া রিফ্‌নেতা আব্দুল করিম ইউরোপের দুইটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রনৈতিক শক্তিকে কেমন করিয়া ভুলিলেন, তাহা যেমন একাধারে আমাদের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক তেমনই অন্যধারে দেশ-প্রাণ এই ক্ষুদ্র জাতিটির স্বাধীনতাটুকু হরণ করিবার জন্য ফ্রান্স ও স্পেনের এত ব্যাকুলতা কেন তাহা বুঝিয়া উঠাও আমাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। সত্য বটে, এই ক্ষুদ্র প্রদেশটি খনিজসম্পত্তিতে ধনশালী; কিন্তু কেবলমাত্র সেই খনিজসম্পত্তিটুকুর অংশমাত্র হরণের জন্য রণক্লান্ত ফরাসী জাতি এত বিপুল অর্থ-ব্যয় ও লোক-ক্ষয় করিতেন না। ইহার অন্তরালে বহু জটিল রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা রহিয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে ইস্‌লামের জাগরণে শ্বেতকায় জাতির প্রাচ্যভীতি এবং ইংরেজ ও ফরাসীর পরস্পর অপ্রীতি ও সন্দেহই প্রধান।

ফ্রান্স যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই, সে সময়ে স্পেনকে ক্রমাগত হারাইয়া দিয়া আব্দুল করিম আপনার প্রভাব নিকটবর্ত্তী অন্য মুসলমান জাতিগুলির মধ্যে বিস্তার করিতেছিলেন। তাঁহার বিজয়অভিযানে উৎসাহিত হইয়া ফ্রান্সের অধীন মুসলমান আফ্রিকায় বিশেষত আল্‌জিরিয়া ও টিউনিসে যদি বিদ্রোহ মাথা তুলে সে ভয়ে ফরাসী আব্দুল করিমকে পরাজিত করিতে বদ্ধপরিকর হয়। সেইসময়ে সুবিখ্যাত পত্রিকা Le Figaro লেখেন

"An independent Mohamedan kingdom in Northern Morocco would constitute a very serious change in the equilibrium of Islam."

অর্থাৎ "উত্তর মরক্কোতে (স্পেনের অধিকৃত অঞ্চলে) একটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের সৃষ্টি হইলে মুসলমান জাতির যে স্থাণুবৎ শান্তি ঘটিয়াছে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিবে।"

ইস্‌লামের জাগরণে ফরাসীর এই যে ভীতি ইহা যে শুধু রিফের খনিজ সম্পত্তিহরণের জন্য একটা ছলমাত্র তাহা মনে হয় না। বাস্তবিকই ইউরোপ ইস্‌লামীয় সাম্রাজ্যকে যেরূপভাবে এতকাল ছিন্নভিন্ন করিয়া হীনবল করিয়া রাখিয়াছিলেন ইস্‌লামের এই নবজাগরণে তাহার প্রতি-ক্রিয়া যদি দেখা দেয় তাহা হইলে ইউরোপের ভবিষ্যৎও যে খুব সুবিধা-জনক হইবে না, ইহা ফরাসীর পক্ষে উপলব্ধি করা অতি সহজ। ফরাসী জাতি যে তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিয়াছে তাহাও নানা ব্যাপারে স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুদানে ইংরেজ সেনাপতি স্যর লি স্টাকের হত্যায় যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার করিয়াছিলেন তাহার সমর্থন করিয়া Le Figaro বলিতেছেন

"A fire started in Egypt may spread to the whole of Mohamedan world, even to India."

ইংরেজ সরকারের আচরণ ফরাসীজাতি সমর্থন করিলেও যে ইংরেজ-প্রীতি তখন ফরাসীদের মোটেই ছিল না, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সময় মসুলের ব্যাপার লইয়া ইংরেজ ও তুর্কীর মধ্যে বিবাদ খুবই পাকাইয়া উঠিতেছিল। সেই ব্যাপার-সম্পর্কে সুবিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা Revue Bleue বলিয়াছিলেন

"When we consider the double game that the British agents have played in Syria, what they have done to embarrass us in the administration of our mandate, we are tempted to rejoice in their Asiatic difficulties or at least regard them with an unweeping eye. But today all Westerners must stand shoulder to shoulder before the Mohamedan East."

ফ্রান্সের ইস্‌লামভীতি যতটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে ইংরেজ কিন্তু সেরূপ ভীত নহে। যদি বিপদ্ সত্যই দেখা দেয় তাহা হইলে কতক আপনার বাহুবলে, কতক রাষ্ট্রনৈতিক চাতুর্য্য, কতক কৌশলে আপনার প্রভাব অব্যাহত রাখিতে পারিবে বলিয়া ইংরেজের বিশ্বাস আছে। কাজেই আপনার মনের আতঙ্কে ফরাসীর মতন শিহরিয়া উঠিয়া ইংরেজ আপনার রাষ্ট্রনৈতিক তাল হারায় নাই। সেজন্য ফরাসীর মতন যেন-তেন প্রকারে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে রণ-ঘোষণা করিবার প্রয়োজন ইংরেজ সরকার দেখেন নাই। ইস্‌লামকে দুর্ব্বল করিবার জন্য যেমন ফরাসী সরকার ইজিপ্টে ও মসুলে ইংরেজকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত, ইংরেজ সরকার কিন্তু তেমন মরক্কো ও সিরিয়াতে ফরাসীকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহে। ইংরেজ জানে যদি ইসলামের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে ইংরেজ একাকীই তাহাতে সমর্থ হইবে।

ইংরেজ জাতি বেশ ভালোরকমেই জানে যে যদি রিফ্ জাতি পরাস্ত হয় তাহা হইলে ফরাসী উত্তর মরক্কোর প্রভু হইয়া বসিবে। জিব্রাল্টারের ঠিক দক্ষিণে ইংরেজের নৌ শক্তির ফরাসীর ন্যায় এত বড় একটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যদি আস্তানা গাড়িয়া বসে তাহা হইলে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কাজে কাজেই ফরাসীর এই রিফ্‌দমন পর্ব্ব ইংরেজের অভিপ্রেত নহে। সিরিয়াতে ফরাসীর প্রভুত্ব ইংরেজ সরকারের পছন্দ-সই হইতে পারে না। বিগত বিশ্বযুদ্ধে ফরাসীর ন্যায় ইংরেজও অকাতরে আপনার শক্তিক্ষয় করিলেন কিন্তু ম্যাণ্ডেট-জাত রাজ্যগুলির মধ্যে বাছা-বাছা অংশগুলি পড়িল ফ্রান্সের ভাগ্যে। সার ও রুরে খনিগুলি ও সিরিয়ার লৌহ ও তৈল সম্পদ্ সমস্ত পড়িল ফরাসীর ভাগ্যে। ইংরেজ পাইলেন আরবের মরুভূমি ও ইরাকের খবরদারী; ইরাকের মসুল-অঞ্চলে যদি-কিছু তৈলের সন্ধান মিলিল, তাহা বিনাবাধায় ভোগ করিবার অন্তরায় হইয়া উঠিল তুর্কী। ফলে খনিজ-সম্পত্তি লাভ ইংরেজের ভাগ্যে ঘটে নাই। অথচ বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎস হইল এই খনিজ সম্পত্তি। তৈল ও লৌহের প্রতিযোগিতায়

ফরাসী ও ইংরেজের এই মনোমালিন্যের কথা পূর্ব্বে বিশদভাবে "প্রবাসীতে" প্রকাশিত হইয়াছে, সেজন্য আজ আর তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা যে খনিজ-সম্পত্তির এই মালিকানা লইয়া রেষারেষির ফলে ফরাসীর বিপদে ইংরেজ ফরাসীর সহায় হয় নাই। তাই সিরিয়া ও মরাক্কোতে ফরাসীর যত ক্রটিবিচ্যুতি ঘটিতেছে, তাহার সংবাদ জানা আমাদের সহজ হইয়া পড়িতেছে এবং ফরাসীর পরাজয়ের সংবাদ প্রাচ্যে এত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে। মসুলের ব্যাপার লইয়া যে সমস্যাটি ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহার মূলে ইংরেজ সরকার বলিতেছেন যে ইরাকের খ্রীষ্টিয়ান অধিবাসীবর্গের ও কুর্দ্দিস্থানের কুর্দ্দ জাতিকে রক্ষা করিবার যে দায়িত্ব সন্ধির সময় ইংরেজ স্বেচ্ছায় লইয়াছেন, তাহাকেই কেবল বজায় রাখিবার ইচ্ছাতে তাঁহারা মসুল অধিকার করিতে চাহেন। কিন্তু ফরাসীর মনে-মনে সন্দেহ যে ইংরেজের লোভ, কিন্তু মসুলের তৈল-খনির উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৈলের মালিকানা ছিন্নও অন্য রাষ্ট্রীয় অভিসন্ধিও ইহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে। নিউইয়র্কের New Republic পত্রিকা এসম্বন্ধে বলেন "When Mosul is said, 'oil' occurs to most person. But the thing to bear in mind is Kurdistan, not oil. The Kurds might be roused to a nationalistic movement for self-determination if events were propitious and if there were a neighbour interested in a celerating their desire for Independence. The Turks, therefore, want as much of Mosul as they can get, to keep the British as far away from Kurdistan as possible believing that it is fixed policy of the British foreign office to erect Kurdistan as another buffer State on the route to India."

কুর্দ্দিস্থানের স্বাধীনতা-স্পৃহা জাগাইয়া তোলা যে ইংরেজের পক্ষে সম্ভব ইহা বিশ্বাস করিবার তুরস্কের কতকগুলি কারণ আছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে গোপন চুক্তির বিরুদ্ধে মুখে অনেক নিন্দা করিয়াছিলেন এবং গোপন সন্ধি যাহাতে ভবিষ্যতে সম্ভব না হয় তাহার ব্যবস্থাও করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন; কিন্তু তলায়-তলায় গোপন চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার বিরাম ছিল না। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল এইরূপ একটি গোপন চুক্তিপত্র লণ্ডন শহরে স্বাক্ষরিত হয়; এই চুক্তি পত্রে ইংরেজ সরকার অঙ্গীকার করেন যে রুশিয়াকে যুদ্ধাবসানে আর্মেনিয়া ও কুর্দ্দিস্থান প্রদান করা হইবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যখন সেভ্রে এ সন্ধিপত্র রচিত হয়, তখন রুশিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সেজন্য কুর্দ্দিস্থান আর তাহাকে দিবার প্রয়োজন ছিল না। কুর্দ্দিস্থানে স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য কোনো আন্দোলন না থাকায় ইংরেজ সরকার স্বরাট্ কুর্দ্দিস্থান সংস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দুর্ব্বল তুরস্ক সরকারের নিকট্ হইতে আদায় করিয়া লয়। কনষ্ট্যাণ্টিনোপল্ সরকারের এই দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করিতে নারাজ হইয়া জয়লাভের পরেই আঙ্গোরা সরকার সেভ্রে সন্ধিপত্রকে মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজে-কাজেই কুর্দ্দিস্থানে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল না। কিন্তু আঙ্গোরা সরকারের মনে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়া উঠিল যে কুর্দ্দিস্থান সম্বন্ধে আপনার সঙ্কল্প ইংরেজ আজও পরিত্যাগ করে নাই। তাই সমগ্র কুর্দ্দিস্থানে আপনার প্রভাব বজায় রাখিবার জন্য তুরস্ক মসুল লইয়া ইংরেজের সহিত প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

বাংলা

দেশের অবস্থা—

এ-বৎসর বাংলাদেশে পাটের ফসল ভালোই হইয়াছে এবং দরও বেশ আছে। সে-হিসাবে প্রত্যেক কৃষকই এ বৎসর কিছু কিছু টাকা পাইবে। কিন্তু সে-টাকা কতক্ষণ থাকিবে? শুধু টাকা উপায় করিলে হয় না, টাকা সঞ্চয়ের পন্থাও শিক্ষা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এ বৎসর আমার ধানের ফসল ভালো হয় নাই, অধিকাংশ কৃষককেই ধান্য ক্রয় করিতে হইবে। নানা বাজে খরচে তাহারা পাটের টাকা ও সঙ্গে সঙ্গে খরচ করিয়া ফেলিতেছে, এখন খোরাকী ধান্য ও সম্বৎসর অন্যান্য খরচ কিরূপে সরবরাহ হইবে। তখন বাধ্য হইয়া মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হইবে। আমরা কৃষককুলকে নিম্ন-লিখিত কয়টি বিষয় লক্ষ্য করিয়া চলিতে বলি :—

(১) কেবলমাত্র পাটের চাষ করিয়া টাকা উপায় করিলে চলিবে না। টাকা যাহাতে রক্ষা হয় সে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। কৃষকগণকে ধান্য ও তরকারীর চাষে অধিক মনোযোগী হইতে বলি।

(২) অতিরিক্ত সখের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সখ মিটাইতে যাইয়া ভবিষ্যৎচিন্তাশূন্য হওয়া অন্যায়।

(৩) এ বৎসর যাহাদের খোরাকী ধানের অভাব আছে, টাকা হাতে পাইয়া যেন তাহারা অগ্রে ধান ক্রয় করে। ঘরে ভাত না থাকিলে বুদ্ধি যোগায় না, এ কথা ঠিক। ভাতের জোগাড় অগ্রে তা'র পর অন্য-কিছু।

(৪) সামান্য কারণ লইয়া ভাই-ভাই ঝগড়া-বিবাদ করিয়া কেহই যেন আদালতের আশ্রয় না লয়।

(৫) স্ব-স্ব পুত্র-কন্যাগণকে সকলেই পাঠশালে দিবে। সন্তানকে কিছু-কিছু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার অবশ্যকর্ত্তব্য। যতদিন সমাজে লেখাপড়া ব্যাপকভাবে বিস্তারিত না হইতেছে, ততদিন কোনো স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না। —মোস্লেম হিতৈষী

শ্রীহট্টের বঙ্গ-ভুক্তি—

বাংলা কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বাংলা সরকার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই সত্য, কিন্তু সরকারী সদস্য বলিয়াছেন যে, বাংলা সরকার এখনও এ-সম্বন্ধে কোনো চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। আসাম কাউন্সিলেও শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্ত-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—বাংলা কাউন্সিলও ঐ সম্বন্ধে নিজের মত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ এখনও এ-বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আগামী অধিবেশনে সরকার আবার এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। শ্রীহট্ট বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইলে বাৎসরিক প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ বাড়িবে।

বাংলার জেলখানা—

১৯২৪ সালের বঙ্গদেশের জেলের রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৮৬৫ জন কয়েদী জেলখানায় বন্দি হইয়াছিল। তা'র মধ্যে শতকরা ৫৪·৭৯ জন মুসলমান এবং শতকরা ৪২·৪১ জন হিন্দু। বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান লোকসংখ্যাও ঐ অনুপাতেই।

বয়স-অনুসারে কয়েদীদের হিসাব—

১৬ বৎসরের কম বয়সের কয়েদী-সংখ্যা ছিল ২৫৫ জন বা শতকরা

বৎসর বয়সের শতকরা ৯'৩১ জন এবং ২২ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের শতকরা ৩৪'৪১ জন।

কয়েদীদের মধ্যে শতকরা ১০'৮৪ জন লেখাপড়া জানা ছিল, শতকরা ৪'১৪ জন কেবল পড়িতে পারিত, বাকী শতকরা ৮৫'২ জন নিরক্ষর মূর্খ। সুতরাং মূর্খতা যে অপরাধ-বৃদ্ধির একটা কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী-কয়েদী—

১৯২৪ সালে মোট ৪১৭ জন স্ত্রী-কয়েদী জেলখানায় ভর্ত্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ২৩১ জন হিন্দু, ১২৫ জন মুসলমান, ৮ জন খৃষ্টান এবং ৬৩ জন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

বয়স-অনুসারে স্ত্রী-কয়েদীদের হিসাব—

কোন্ কোন্ বয়সে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা কিরূপ তাহাও হিসাবে জানা যায়। ১৬ বৎসরের নীচে ৪ জন মাত্র, ১৬।১৮ বৎসর ২০ জন, ১০-২১ বৎসরের ৩৯ জন, ২২ ৩০ বৎসরের ১৪৩ জন, ৩১ ৪০ বৎসরের ১২৩ জন, অর্থাৎ পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীলোকদের মধ্যে ২২ হইতে ৩০ বৎসর এই সময়েই অপরাধ-প্রবণতা বেশী দেখা যায়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলার মাদক দ্রব্য—

সরকারী আবগারী-বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে। অসহযোগ-আন্দোলনে বাংলায় মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অনেক কমিয়া গিয়াছিল—কিন্তু ধীরে ধীরে আবার পূর্ব্বাবস্থায় আসিয়াছে। সহযোগী বরিশাল হিতৈষীতে প্রকাশ যে, বরিশালের স্বরাজ সেবক-সঙ্ঘ মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। বাংলার সর্ব্বত্র যে সমস্ত সভা-সমিতি আছে, তাহাদের কর্ম্মীরা যদি মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন, তাহা হইলে দেশের কল্যাণ হইবে। এ-বিষয়ে ঔদাসীন্য জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে।

বাংলায় বিদেশী পণ্য—

বাংলার বিপণিতে বিদেশী তাহাদের পণ্যদ্বারা কিরূপ মজা লুটিয়া লইতেছে তাহার প্রমাণ দেখুন। গত ১৯২৪-২৫ খৃঃ অব্দে নিম্নলিখিত টাকার মাল বিদেশ হইতে বাংলায় আমদানি হইয়াছে। সূতার বস্ত্র ৩৫৫৮৯০৯৮৬, চিনি ৭৫৭৯ ৪৬৭৲, তৈল ৬৮৯৬৯৫৪৭৲ ধাতু দ্রব্য ১৬৫৮৯৩৭১৲, মশলা ১১৭৩৫৩৮৫৲, লবণ ১০৫৪৬৩০৬৲, খাদ্যদ্রব্য ১০৫৩০৩১৭৲, মোটরকার প্রভৃতি ৯৯৯০৭৮০৲, কাগজ, পেষ্টবোর্ড ৮৮০৩৮৬৮৲, কাচ ও কাচের দ্রব্য ৭৭৩৮০৩৫৲, নকল রেশম ৫৪৩০৫৬০৲, রং ও সরঞ্জাম ৪৬০৮৯০২৲, রবার ৪৫৪৫৭০৫৲, পশম ৩৬৯৬১২৪৲, দিয়াশলাই ৫৩০২০৮২৲, সাইকেল ৩০০৫১৯১৲, পুস্তক ৩৫২৯৬৭৭৲; ছাতা ও ছাতার সরঞ্জাম ২৪৮২৩২১৲, মোজা, ও গেঞ্জি ইত্যাদি ২৪১৫৫৪৭৲, বস্ত্র ২২৮৬৪২৫৲, বন্দুক ইত্যাদি ২২৭০৯৭৭, সাবান ২১৪১৯৫০৲, খেলনা ১৯৬১৪৮১৲, চামড়া ১৯৪৪৭৪০, রেশমের বস্ত্র ১৬২৩৭৮৩, অঙ্গরাগ ১৪৪৬১৬৯৲, মাটির দ্রব্য ১৩০৮২৮১, চুরিকাচ ১৩০৫৬২৭, সর্ব্বসমেত ৮৬৮৩১৬৩০৩৲ টাকা।

আর আমরা ?

"পরহাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
বহি লৌহবিনির্মিত হার বুকে।"

বরিশাল

বঙ্গমহিলার কৃতিত্ব—

ঢাকার জজ্ স্বর্গীয় তারকেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী দাশগুপ্তা জার্ম্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ-ডি উপাধি লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার বিজ্ঞান-কলেজ হইতে এম্ এস্-সি পাশ করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। তথায় কিছুদিন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসেন, কলম্বিয়া হইতে এম্ এ উপাধি লইয়া শ্রীমতী প্রভাবতী জার্ম্মানীতে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে পি-এইচ-ডি উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট নারী-শিল্প মেলা—

শ্রীহট্ট নারী শিল্প মেলার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ছাত্রী-সমিতির পক্ষ হইতে এই মেলার আয়োজন হয়। ছাত্রীরা সম্বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করেন। সেই দ্রব্যগুলির বিক্রয়-লব্ধ অর্থদ্বারা দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষার সাহায্য করেন এবং অন্যান্য সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। তাঁহাদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের জনশক্তি লিখিতেছেন :—শিল্প চর্চ্চা ও সেবা এই উভয়বিধ কার্য্যের সুযোগ লাভ হয়। সুখের বিষয় বালিকারা প্রধানতঃ খদ্দর ও দেশী কাপড়দ্বারাই শিল্প চর্চ্চা করিয়াছেন। প্রায় আট শতাধিক বিভিন্ন-প্রকারের দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল। অনেকেই বিদেশী বস্ত্রের উপর শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বিগত দুইটি প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতা দ্বারা বলিতে পারা যায় যে, ক্রমশঃ সূতাকাটা, বস্ত্রবয়ন ও দেশী বস্ত্রের আদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এবার সূতা কাটা ও তাঁতের কাপড় অনেক অধিক হইয়াছে।

বাংলায় নারীমঙ্গল প্রচেষ্টা—

"সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি"র কর্ত্তৃত্বাধীনে কলিকাতায় হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদিগকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিবার জন্য দুইটি শিক্ষালয় শীঘ্র খোলা হইবে। যে-সকল মহিলা এই বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা করিতে বা শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্তারিত সংবাদ অবগত হইবেন।

বাঙ্গলা-দেশের ও আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলায় যে-কোনো নগরে বা গ্রামে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সভ্যাগণের শিক্ষার্থে "সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি" শিক্ষয়িত্রী পাঠাইবেন।

বাঙ্গলাদেশের নানাস্থানে অনেক অভাবগ্রস্ত মহিলা আছেন। তাঁহারা যদি শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য, নার্সের কার্য্য এবং ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আপনার পায়ে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সম্পাদিকা তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন।

শ্রীকুমুদিনী বসু, সম্পাদিকা, সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি, ৮নং জ্যাক্সন লেন, কলিকাতা।

সুখের বিষয়, আজকাল বাঙ্গলার স্থানে-স্থানে নারীমঙ্গল প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গীয়া কৃষ্ণভাবিনী দাসীর নেতৃত্বে "ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের" প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি নারী-শিক্ষার জন্য বাঙ্গলাদেশে অনেক কাজ করিতেছে। "বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের' নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে স্বর্গীয়া ভগিনী-নিবেদিতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত নিবেদিতা বিদ্যালয় ও তৎসংসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি নীরবে বহু নারীমঙ্গল কার্য্য করিতেছে। গৌরী মাতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের কার্য্যও প্রশংসনীয়।

বঙ্গরমণীর বীরত্ব—

ঢাকার অ্যাডিশ্যনাল্ জজের আদালতে সম্প্রতি একটি ভীষণ ডাকাতি-মামলার বিচার হইয়াছে। এই মোকদ্দমায় আমরুক আলী ও অপর ৪ ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়।

প্রকাশ যে গত এপ্রিল মাসে এক নিশীথ রাত্রে তিনজন ডাকাত ঢাকার মাণিকগঞ্জ মহকুমার রামনগর গ্রামের কৃষ্ণকুমার সাহার গৃহে প্রবেশ করে। ডাকাতদের মধ্যে একজন পুলিশের হাবিলদারের বেশে ছিল ও তাহার হস্তে বন্দুক ছিল ও অপর দুইজন কনস্টেবলের বেশ ধরিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণকুমার সাহাকে ডাকিয়া বলে যে, তাহারা গ্রামের চৌকিদারদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে আসিয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করে যে, গ্রামে কোনো ব্যক্তির বন্দুক আছে কি না। এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহারা চলিয়া যায় এবং অল্পক্ষণ পরেই ২০ জন সশস্ত্র ডাকাত কৃষ্ণকুমার সাহার গৃহ আক্রমণ করে। কৃষ্ণ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার প্রতিবেশীদিগকে ডাকাতির সংবাদ দেয়।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণর পাশের বাড়ীর কয়জন গোয়ালা লাঠি লইয়া ডাকাতদের আক্রমণ করে। গোয়ালাদের ৩২ বৎসর বয়স্কা বিধবা ভগ্নী হেমলা গোপিনী তাহার ভ্রাতাদিগকে লাঠি জোগাইয়া দিতে থাকে। মারামারির গোলমালে ডাকাতগণ ঘটনাস্থলের আলোগুলি অপসারিত করে। অন্ধকারে ভ্রাতাদের বিপদ্ দেখিয়া হেমলা তৎক্ষণাৎ একখণ্ড বস্ত্র কেরোসিন তেলে সিক্ত করিয়া তাহাতে আগুন দিয়া মশাল প্রস্তুত করিয়া ঘটনাস্থল আলোকিত করে। সে ঘরের ভিতর হইতে তিনখানি মাছ মারিবার 'গাঁতি' আনয়ন করিয়া ভ্রাতাদের হাতে দেয়। একজন গোয়ালা 'গাঁতি' দিয়া দলের নেতাকে আঘাত করে। আঘাত পাইয়া সর্দ্দার দলকে পলাইতে উপদেশ দেয়। ডাকাতগণ তখন একটি সরু গলি দিয়া পলাইতে থাকে—গোয়ালাগণও অন্ধকারে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এবারও হেমলা মশালহস্তে ভ্রাতাগণকে আক্রমণ করিতে সাহায্য করে। এই সময় একজন ডাকাত সাংঘাতিকরূপে 'গাঁতি' দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া যায়। ডাকাতগণ বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহাকে লইয়া যাইতে অসমর্থ হয় কারণ, তখন গ্রামের আরও লোক জুটিয়া গিয়াছিল। যে পাঁচজন ডাকাত গাঁতি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় পুলিশ তদন্তের ফলে তাহারা গ্রেপ্তার হয়।

বিচারে জুরীগণ একমতে ৪জন ডাকাতকে দোষী সাব্যস্ত করায় জজ্ সাহেব প্রত্যেককে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দিয়াছেন। রায়ে জজ সাহেব গবর্ণমেণ্ট্‌কে হেমলার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি—

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। এই মহান্ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে বঙ্গের মুসলমান সাহিত্যিকদিগের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত এবং সজ্ঞবদ্ধ করিতে হইবে, আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি জাতীয় সাহিত্য-সঙ্ঘের প্রয়োজন অত্যধিক।

সমাজের এই অভাব দূরীকরণের জন্যই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির পরিচালকেরা সমাজের সাহিত্য-সেবীদিগকে তাঁহাদের নিজ-নিজ ব্যক্তিত্বের এবং বিশেষত্বের উপর কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করিয়া, সমাজের মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে জাতীয় সভ্যতার উজ্জ্বল স্বরূপ সংস্থাপনের জন্য মনোযোগী হইবেন। বঙ্গের অধিকাংশ প্রতিভাশালী মুসলমান সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী ব্যক্তিই এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। সমিতির স্বচ্ছলতার জন্য, সমিতি সংশ্লিষ্ট পাঠাগারের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য যদি সমাজ এককালীন ১০,০০০ দশ হাজার টাকা সমিতিকে দান করেন, তাহা হইলে এই সমিতিটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিতে সক্ষম হইবে।

বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে বাঙ্গালার শাসন-পরিষদে বাঙ্গালার মিউনিসিপাল্ শাসন-সম্বন্ধে এক নূতন আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইবে। প্রকাশ যে সকল স্থানে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য আধুনিক-ধরণে এই মিউনিসিপ্যাল আইন রচনা করা হইয়াছে।

দুইটি নূতন বিষয় লক্ষ্য করা হইয়াছে—(১) সর্ব্বত্র মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইতেছে (২) মিউনিসিপাল অধিকারসমূহ সরকারী লোকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া বে-সরকারী লোকদিগের হাতে দেওয়া হইতেছে, সরকারী চেয়ারম্যান্ মনোনয়নের প্রথা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, বাজেট ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা আলোচনার অনেক স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে, নূতন আইনে মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতেও স্বাস্থ্যকর গৃহ ও স্থান পরিষ্কার, ব্যাধিনিবারণ, খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়, জন্ম-মৃত্যুর হিসাবপ্রকাশ, শিশুমঙ্গল প্রভৃতি বিষয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। পূর্ব্বব্যবস্থায় সরকারী কমিশনার চেয়ারম্যান্ নিয়োগ করিতেন—এখনও কোথাও-কোথাও সেরূপ ব্যবস্থা আছে। নূতন আইনে অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটিতে শতকরা ৭৫জন কমিশনার্ নির্ব্বাচিত হইবেন। কোথাও বা শতকরা ৮০ জন নির্ব্বাচিত হইবেন। যে-সকল সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা কম, তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। চেয়ারম্যান্, ভাইসচেয়ারম্যান্ কমিশনার্ প্রভৃতির কার্য্যকাল কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কমিশনার্‌গণকে নির্ব্বাচনের পর সম্রাটের প্রতি বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। দুগ্ধসরবরাহব্যবস্থা, জন্মমৃত্যুর হিসাবরক্ষা প্রভৃতির অন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র শিক্ষাকমিটি গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাড়ীর উপর যে ট্যাক্স বসিবে, তাহার কতকাংশ যাহাতে শিক্ষার জন্য পৃথক্ রাখা হয়, সেজন্য অনুরোধ করা হইবে।

শ্রী প্রভাত সান্যাল



রৌদ্র চিকিৎসা

আমাদের দেশে শিশুর জন্ম হইলে তাহাকে তেল মাখাইয়া দিবসের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে রাখা হয়। শিশুপালনের এই প্রথাটি বড় সুন্দর। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক বাঙ্গালী জননী আর এপ্রথা পালন করিতে চান না। কারণ, সূর্য্যকিরণের যে কত গুণ তাহা তাঁহারা জানেন না।

প্রতীচ্য চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যকিরণের এই মহৎ গুণের সন্ধান পাইয়া চিকিৎসা-ক্ষেত্রে অবলম্বন করিয়া অঘটন ঘটাইতেছেন। ইয়োরোপের স্থানে স্থানে রৌদ্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজীতে এই চিকিৎসা-প্রণালী Heliotherapy নামে পরিচিত।

ইয়োরোপীয় চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা যে বিশুদ্ধ বায়ু, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতির রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র গত শতাব্দীতে প্রতীচ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বায়ু চিকিৎসার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আর সূর্য্যকিরণ এখনও সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই—মাত্র কয়েকজন চিকিৎসক অল্প কয়েক বৎসর ইহার উপকারিতা জানিতে পারিয়া ইহার সাহায্যে চিকিৎসা চালাইতেছেন। তাঁহারা সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া তন্মধ্য হইতে চিকিৎসা-কার্য্যের উপযোগী বিশেষ কিরণ-বর্ণটি বাছিয়া লইয়াছেন। যেখানে সূর্য্যকিরণ সুলভ নহে, সেখানে তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্যালোক উৎপাদন করিয়া সূর্য্যালোকের অভাব মিটাইতেছেন। এই কৃত্রিম সূর্য্যালোকের যে অংশ চিকিৎসা-কার্য্যে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে ultra-violet light বা তীক্ষ্ণ বেগুনী আলো বলা হয়। সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া সাতটি মূলবর্ণ এবং আরও কয়েকটি মিশ্রবর্ণ পাওয়া যায়। রামধনু উদিত হইলে সূর্য্যকিরণের বর্ণ-বিন্যাস কিরূপ তাহা বুঝা যায়। ঐ বর্ণ সমুদায়ের মধ্যে যে কিরণরেখা তীব্র বেগুনী আলো প্রদান করে তাহাই রোগ নিরাময় করিতে পারে।

সূর্য্যকিরণ যে জীবাণু বিনাশ করিতে সমর্থ তাহা অনেক কাল পূর্ব্বেই লোকে জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু গভীর ক্ষত, যেখানে সাধারণতঃ ঔষধ পৌঁছিতে পারে না, সে-সব স্থলে সূর্য্যকিরণ পৌঁছিয়া জীবাণু বিনাশ করিতে সমর্থ, এই তত্ত্বটুকু কয়েক বৎসর হইল বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরীক্ষা এবং পরিদর্শনের ফলে নিশ্চিতরূপে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সূর্য্যকিরণ মানবদেহের চর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহার রক্তকে এমন তেজসম্পন্ন করিয়া তুলে যে, রক্তের স্বাভাবিক রোগ বীজাণু নাশক ক্ষমতা বহুশত গুণ বাড়িয়া যায়। অস্ত্র-চিকিৎসা সাধ্য যক্ষ্মা রোগ ও রিকেট্‌স রোগ আরাম করিবার পক্ষে সূর্য্যকিরণের অদ্ভুত ক্ষমতা। ক্ষত-চিকিৎসার্থও সূর্য্যকিরণ প্রয়োগ করিয়া সফলতা লাভ হইয়া থাকে। তাছাড়া দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে রৌদ্র অতীব হিতকর।

ডাক্তার এ. রোলিয়ার্ (Dr. A. Rollier) একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী বিশেষজ্ঞ রৌদ্র-চিকিৎসক। ইনি ১৮ বৎসর ধরিয়া এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। সুইজারল্যাণ্ডের Leysin প্রদেশে সু উচ্চ আল্‌পস্ পর্ব্বতের উপর তাঁহার চিকিৎসাগার (Clinics) স্থাপিত। ভূপৃষ্ঠে অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্তরের বায়ু ততটা বিশুদ্ধ নহে; তাহাতে ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এবং ইয়োরোপ মহাদেশে সূর্য্যকিরণ ততটা সুলভ নহে। এই দুই কারণে ডাক্তার রোলিয়ার্ আল্‌পস্ পর্ব্বত-পৃষ্ঠে উচ্চ স্থানে তাঁহার চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছেন। কারণ, এখানে ঐ দুইটি পদার্থই অপেক্ষাকৃত সুলভ। এরূপ উচ্চ স্থানে চিকিৎসাগার স্থাপনের আরও একটা প্রবল কারণ আছে। সূর্য্য হইতে রৌদ্রের পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিতে অনেকটা বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয়। এই বায়ুস্তর সূর্য্য কিরণের কতকটা খাইয়া ফেলে। সেইজন্য সমতল ভূপৃষ্ঠে যে সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ ultra-violet rays সবটা থাকে না।

ডাক্তার রোলিয়ারের বিশ্বাস এইরূপ যে, উচ্চস্থানে রৌদ্র চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা-সাধ্য যক্ষ্মারোগ—তা সে শরীরে যে-কোন স্থানেই হউক না কেন, এবং যত দিনের পুরাতন রোগই হউক না কেন,—নিরাময় করা যায়।

পূর্ব্বে চিকিৎসকেরা মনে করিতেন, অস্ত্রচিকিৎসাসাধ্য যক্ষ্মারোগ স্থানীয় ব্যাধি, অর্থাৎ উহা শরীরের যে-অংশে হয় কেবল সেই অংশই পীড়িত হইয়া থাকে। অধুনা অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বলে জানা গিয়াছে যে, ঐ ধারণা সত্য নয়। কোন স্থানে রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে শরীর সাধারণভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে রোগও প্রবল হইয়া থাকে। অতি শৈশবকাল হইতেই যক্ষ্মা রোগের বীজাণু মানব-দেহে বর্ত্তমান থাকে। শরীরের যে স্বাভাবিক রোগপ্রতিষেধ-শক্তি আছে, তাহারই দরুন এই বীজাণুগুলি শান্ত সংযত থাকে, প্রবল হইতে পায় না। কিন্তু শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আর তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। কাজেই রোগ প্রবল হইবার সুযোগ পায়। সংক্রামক রোগসমূহের মধ্যে যক্ষ্মারোগ শারীরিক সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। অতএব ইহার প্রকৃত চিকিৎসা করিতে হইলে কেবল স্থানিক চিকিৎসা করিলে চলে না, শরীরে সাধারণভাবে বলাধান করিয়া তাহার রোগপ্রতিষেধ শক্তি আগে বাড়াইয়া লইতে হয়। উপযুক্ত ভাবে এবং যথোচিত মাত্রায় রৌদ্র প্রয়োগ করিয়া এই উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণরূপে সুসাধ্য ও সুসিদ্ধ হয়। রোগীর সমগ্র উলঙ্গ দেহে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যরশ্মিপাতে এবং বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ পার্ব্বত্য বায়ু সেবনে তাহার স্বাস্থ্যের সমূহ উন্নতি হয়।

মানুষের গায়ের চর্ম্ম একটি অদ্ভুত জিনিষ। ইহা যে কেবল শরীরের ময়লা লোমকূপের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া দেয় তাহা নয়; ইহা বাহির হইতে নানা বস্তু শোষণ করিয়া থাকে। বায়ুস্থিত অম্লজান, এবং জলকণা চর্ম্ম দ্বারা শরীরে শোষিত হয়। বায়ুতে আর একটি পদার্থ আছে—তেজ, energy। চর্ম্ম এই atmospheric energyও শোষণ করে। এই জিনিসটি যে কি তাহাও এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই; তবে ইহা আছে, এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। মুক্ত বায়ুতে অবস্থিতি করিয়া এই তেজ শোষণ করিয়া বহুদিনের শয্যাগত রোগী অচিরে বলবীর্য্য লাভ করিয়া থাকে।

সকল রোগী একইভাবে এই চিকিৎসা সহ্য করিতে পারে না। ইহা সওয়াইয়া লইতে ভিন্ন-ভিন্ন রোগীর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সময় লাগে। একেবারে সমগ্র দেহে সমস্ত দিন ধরিয়া রৌদ্র লাগানো হয় না। প্রথমে শরীরের সামান্য একটু অংশ অনাবৃত রাখিয়া সামান্য ক্ষণের জন্য

রৌদ্র লাগানো হয়। ক্রমে-ক্রমে দেহের বেশী বেশী অংশ অনাবৃত করিয়া বেশীক্ষণ সময় রৌদ্র পোহানো হয়।

সূর্য্যালোক কি? তাহার এই রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল? সূর্য্যালোক সমগ্র সৌরজগতে আলোকের একমাত্র উপাদান। উহা প্রকৃতপক্ষে একটা তেজ মাত্র। ইথারের মধ্য দিয়া এই তেজের তরঙ্গ আসিয়া আলোরূপে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। এই তেজ আবার ইলেক্‌ট্রনের কম্পন হইতে উদ্ভূত। জড়-বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়াছেন—ইলেক্‌ট্রন্। একটি কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ইলেক্‌ট্রনগুলি থাকিয়া কম্পিত হয়। ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যানুপাতে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়। ঐ কেন্দ্রটি পজিটিভ তাড়িত ও ইলেক্‌ট্রনগুলি নেগেটিভ তাড়িত-গুণসম্পন্ন; কাজেই উহাদের সমবায়ে ইলেক্‌ট্রনগুলি নিয়ত কম্পিত হইতেছে। কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করিলে কম্পনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়; এবং বস্তুটি শীতল হইলে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কোন ধাতুকে উত্তপ্ত করিলে তাহা লাল হয় ও তাহা হইতে আলো উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ উহা হইতে তেজের তরঙ্গ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য ও কম্পনের গতিবেগ বিভিন্ন প্রকার। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ তরঙ্গগুলি বেতার বার্ত্তাবহের কাজে লাগে। যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম, তাহার কম্পন বেগ তত বেশী। দৈর্ঘ্যে যে তরঙ্গ দ্বিতীয়, তাহার নাম হার্টজিয়ান্ তরঙ্গ। তৃতীয় তরঙ্গ তাপ উৎপাদন করে। চতুর্থ তরঙ্গ আলোর সৃষ্টি করে। আর কেবল এই তরঙ্গগুলিই মানুষের চোখে ধরা পড়ে। সূর্য্যের কিরণ এইসকল তরঙ্গ সমবায়ে উৎপন্ন। তন্মধ্যে যেগুলি আলোক-উৎপাদক তরঙ্গ, যাহা আমরা দেখিতে পাই, বৈজ্ঞানিকেরা যাহাদের luminous rays বলিয়া থাকেন, তাহারা কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি। একটি ত্রিকোণাকার কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্য-কিরণ দর্শন করিলে এই বর্ণগুলি দেখা যায়। রামধনুও এই বর্ণ সমন্বয়ে উৎপন্ন হয়। উক্ত কাচখণ্ডকে spectrum বলে। ইহার মধ্যে যে-সকল বর্ণ দেখা যায়, তন্মধ্যে এক প্রান্তের বর্ণ infra-red rays ও অপর প্রান্তের বর্ণ ultra-violet rays। লাল বর্ণটি তাপজনক। আর তীব্র বেগুনী বর্ণটি রাসায়নিক বর্ণ। আলোক রেখাটিই ফটোগ্রাফের প্লেটে রাসায়নিক ক্রিয়ার গুণে চিত্র উৎপাদন করে। এই আলোক শরীরের তন্তু বা টিশুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।

ঋতুভেদে সূর্য্য কিরণের উপাদানের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তনের ফল মানবদেহে প্রত্যক্ষ করা যায়। অর্থাৎ ঋতুভেদে রৌদ্রের উপাদানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে দেহের অবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের শরীরে যে ductless glands আছে, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তাহাদের ক্রিয়া ভাল হয়। গোরুর thyroid glandএ শীতকালের অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে আয়োডিনের পরিমাণ অধিক দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে দেহের রক্তে চূণ ও ফসফরাসের ভাগ বেশী থাকে। রক্তে এই দুই পদার্থ কমিয়া গেলেই শিশু rickets রোগে আক্রান্ত হয়। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে এই দোষ শীঘ্রই কাটিয়া যাইতে পারে।

উদ্ভিজ্জগতের উপরও সূর্য্যকিরণের প্রভাব অল্প নহে। বস্তুতঃ রৌদ্র না পাইলে গাছপালা প্রায় বাঁচে না। যদি বাঁচে, তথাপি রুগ্ন অবস্থায় কোনরূপে প্রাণটুকু মাত্র ধারণ করিয়া রাখে। উদ্ভিজ্জ আমাদের অন্যতম খাদ্য। উদ্ভিদ খাদ্যের সহিত আমরা সূর্য্যকিরণ ভক্ষণ করি। যে শাকসব্জি বা তরকারী যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যকিরণ ভোগ করিতে পায় নাই, সেরূপ উদ্ভিজ্জ বস্তু আহার করিলে আমরাও আহারের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হই না—আমাদের দৈহিক পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।

সূর্য্য-কিরণ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ভোগে আসে না, রৌদ্র সেবন করিয়াও যে ক্ষেত্রে আমরা উপকার পাই না, সে-সব ক্ষেত্রে খাদ্যে রৌদ্র খাওয়াইয়া সেই খাদ্য ভক্ষণে প্রভূত উপকার লাভ করা যায়। ইন্দুর-শাবকের উপর সূর্য্য-কিরণের এই বিশেষ গুণটির চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন কালের লোকেরা সূর্য্যকিরণের এই মহৎ গুণের কথা জানিতেন। সেইজন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যোপাসনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন কোন স্থলে আছে।

মেক্সিকো ও পেরুদেশে মেগাস্ ও আজটেক্‌স্ নামক প্রাচীন জাতিদ্বয় সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বাইবেলে লিখিত আছে যে, ইস্রেলাইট্‌স্, ইজিপ্‌সিয়ানস্, আরব্য জাতি চাল্‌ডিয়ান্স, সীরিয়ান্ ও রোমান্ জাতি পুরাকালে সূর্য্যোপাসনা করিতেন। বর্ত্তমান কালে পার্শীরা সূর্য্যোপাসনা করেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু উষাস্নান সারিয়া "জবাকুসুমসঙ্কাশং" মন্ত্র জপ না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। খৃষ্টানদের রবিবার বা সূর্য্যবার পবিত্র দিবস বলিয়া গণ্য। প্রাচীন গ্রীকদের দেবতা Aesculapius সূর্য্য, ঔষধ ও সঙ্গীতের দেবতা ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে গ্রীক্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কোস (Cos) দ্বীপে একটি স্বাস্থ্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের পুরোহিতেরা চিকিৎসক ছিলেন। রোগ-নিরাময়-কল্পে বাতাস, আলো ও জল এখানে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত।

(স্বাস্থ্যসমাচার, কার্ত্তিক ১৩৩২)

দাঁতের কদর

সাধারণতঃ দাঁতের দ্বারা আমরা তিনটি উপকার পাই—

(১) প্রধান উপকার—দাঁত আমাদের খাদ্যগুলি চর্ব্বণ করিয়া সহজপাচ্য করে। খাদ্য রীতিমত হজম হইলে অধিকাংশ রোগ নিকটে আসিতে পারে না। নীরোগ-শরীর কার্য্যে উৎসাহ দেয় ও জীবনে শান্তি আনয়ন করে। অপর পক্ষে রুগ্ন শরীর যন্ত্রণাদায়ক ও অকেজো।

(২) দাঁত আমাদিগকে স্পষ্টরূপে কথা বলিতে সাহায্য করে। যাহাদের কতক দাঁত নাই, তাহাদের কথা অস্পষ্ট হয় ও শ্রুতি মধুর হইতে পারে না। কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য অপরকে সন্তুষ্ট রাখা ও নিজ মতে আনয়ন করা। দন্তহীন লোকেরা এই দুইটি কাজের কোনটিতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

(৩) মুখের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করাও দাঁতের একটি কাজ। কোন দাঁত পড়িয়া গেলে মুখখানা বিশ্রী দেখায়।

দাঁত আমাদের জীবনে দুইবার উঠে। শৈশবে একবার উঠে, তাহাদিগকে দুধে দাঁত বলে। শিশুর বয়স যখন ৬।৭ মাস, তখন হইতে দুধে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত উঠে। এই দাঁতগুলির মোট সংখ্যা ২০টি প্রত্যেক মাড়িতে দশটি করিয়া। এই দাঁতগুলি সাধারণতঃ দেখিতে খুব সুন্দর ও ছোট ছোট। স্থায়ী দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত এই দাঁতগুলি থাকিবে।

৬।৭ বৎসর বয়স হইতে দুধে দাঁত পড়িতে থাকে ও স্থায়ী দাঁত উঠে। স্থায়ী দাঁতের মোট সংখ্যা ৩২টি, অর্থাৎ প্রত্যেক মাড়িতে ১৬টি করিয়া। এই দাঁতগুলি দুধে দাঁত হইতে বড় হয়। এই দাঁতের মধ্যে কয়েকটিকে বলে আক্কেল দাঁত। তাহা ১৭ হইতে ২১ বৎসরের মধ্যে বাহির হয়। এই দাঁতগুলি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকার কথা।

সব দাঁতগুলি দেখিতে এক প্রকার নয়। কোনগুলি ধারাল, কোনগুলি চোখা, কতকগুলির উপরিভাগ প্রশস্ত ইত্যাদি। প্রত্যেক রকম দাঁতের পৃথক পৃথক নাম আছে। দাঁতের নানারকম কাজ করিতে হয় বলিয়া দাঁতও নানাধরণের। কতকগুলি দাঁতের দ্বারা

খাবার জিনিস কর্ত্তন করিবার সুবিধা হয়, কোনগুলি শক্ত খাদ্য-দ্রব্য সহজে ছিঁড়িতে পারে, আর কতগুলি ভক্ষ্যদ্রব্য সহজে পিষিতে পারে। দাঁতগুলির উপরিভাগ সমতল নহে, তাহাও কাজের সুবিধার জন্য।

দাঁতগুলির রীতিমত ব্যবহার না করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অপরিষ্কারের দরুন্ দাঁতের গায়ে একপ্রকার পাথরের ন্যায় শক্ত জিনিস জন্মে, তাহাও দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর। অনেকে বলেন, দাঁত দিয়া যে রক্ত পড়ে, ইহাই তাহার কারণ। দাঁত রীতিমত পরিষ্কার না করিলে খাদ্যদ্রব্যের টুক্‌রা দুই দাঁতের মধ্যে থাকার দরুন্ দাঁত ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। দাঁতরক্ষা-সম্পর্কে কতকগুলি কথা নিম্নে বলা হইবে। আশা করা যায় তাহা অনেকের উপকারে আসিবে।

(১) শিশুকাল হইতেই ছেলে-মেয়েদিগকে দাঁত পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করাইতে হইবে। এইটি মা'র কাজ। একবার অভ্যাস হইলে দাঁত পরিষ্কার করিতে কোনও ত্রুটি কি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। শৈশবে অনেকের দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস না থাকায়, বড় হইয়াও তাহারা দাঁতের প্রতি মনোযোগী হইতে পারে না; ফলে অল্প বয়সে দাঁত নষ্ট হইয়া যায়।

(২) যখন দুধে দাঁত পড়িয়া স্থায়ী দাঁত উঠিতে থাকে, তখন মাতা ছেলে-মেয়েদের দাঁতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। দাঁত নড়িলে যাহাতে যথাসময়ে উঠানো হয় তাহা করিতে হইবে। অনেক ছেলে-মেয়ে বেদনার ভয়ে যথাসময়ে নড়া দাঁত উঠায় না, ফলে দুধে দাঁত থাকার অবস্থায়ই স্থায়ী দাঁত উঠে, ইহাতে মুখ দেখিতে বিশ্রী ও দাঁতগুলি বেঁকাতেড়া হয়। পরে চেষ্টা করিলেও এই দাঁতগুলি পরিষ্কার করা যায় না।

(৩) খুব গরম কিম্বা খুব ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করিবে না, কারণ উভয়ই দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর।

(৪) নিম, বট প্রভৃতি গাছের কোমল শাখাগ্রকে ব্রাশের মতন করিয়া দন্ত মার্জ্জন করিবে। ব্রাশ ব্যবহার করিলে খুব শক্ত ব্রাশ ব্যবহার করিবে।

(৫) দাঁতন বা ব্রাশ দ্বারা দাঁতের বাহির ভিতর ও মাড়ির সমস্ত স্থানই মার্জ্জনা করিবে। মাড়ি হইতে রক্ত বাহির হইলে ভীত হইবে না; আরও দৃঢ়তার সহিত মার্জ্জনা করিবে।

(৬) দাঁত মাজিবারও নিয়ম আছে। উপরের পাটির দাঁত মাজিবার সময় মাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে মাজিবে। নীচের পাটির দাঁত মাজিবার সময় মাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে মাজিতে থাকিবে। এইরূপে দাঁত মাজিলে সহজে দাঁত পরিষ্কার হয়। অন্যভাবে মাজিলে সহজে দাঁত পরিষ্কার হয় না। এইরূপ দাঁত মাজার অভ্যাস হইলে কয়েক দিন পরে কোনই কষ্ট অনুভব হইবে না।

(৭) দিনে দুইবার দাঁত মাজিবে। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া একবার, আর রাত্রে খাওয়ার পর শয়নের পূর্ব্বে একবার। আমরা সাধারণতঃ প্রাতে দাঁত মাজিয়া রাত্রে প্রায় কেহই দাঁত মাজি না। দুই দাঁতের মধ্যস্থিত ছিদ্রের ভিতর খাদ্যদ্রব্যের টুক্‌রা থাকে, তাহা রাত্রে পচিয়া দাঁতগুলির অনিষ্ট করে। ঘুমাইবার পূর্ব্বে দাঁত পরিষ্কার করিলে খাদ্যাবশিষ্টগুলি বাহির হইয়া যায় ও রাত্রে দাঁতের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

(৮) দাঁত মাজিবার জন্য মূল্যবান্ দন্তমঞ্জনের বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। সামান্য একটু লবণ ও কটুকিরির মিহি-গুঁড়ার সহিত পরিষ্কার চকের গুঁড়া দ্বারা মাজিলেই চলে।

(৯) কোন দাঁত নষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা উঠাইয়া ফেলিবে; কিম্বা তাহার ছিদ্রগুলি উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পূরণ করিয়া ফেলিবে। কখনও তাহা ডাক্তার না দেখাইয়া রাখিবে না, বেদনা না থাকিলেও ডাক্তার দেখাইবে।

(১০) দাঁত পড়িয়া গেলে উঠাইয়া ফেলিলে কৃত্রিম দাঁত বসাইয়া লইবে; ইহাতে বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

(১১) কতকগুলি খাদ্য আছে যাহা সহজে দাঁত পরিষ্কার করে; যথা,—নানাপ্রকার শাক, ফল প্রভৃতি। খাবার শেষে এইরূপ দাঁত পরিষ্কারক খাদ্য খাইলে ভালো হয়।

(১২) "মলমূত্র পরিত্যাগের সময় দন্তে দন্তে একটু জোরে চাপিয়া ধরিবে। যতক্ষণ মলমূত্র নিঃসারণ হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিয়া থাকিলে শীঘ্র দাঁত পড়িবে না এবং বহুকাল কার্য্যক্ষম থাকিবে।" (নিগমানন্দের ব্রহ্মচর্য্য-সাধন)।

(স্বাস্থ্য-সমাচার, কার্ত্তিক ১৩৩২)   শ্রী জগদীশচন্দ্র মজুমদার

পুস্তক-পরিচয়

পুষ্পাঞ্জলি—শ্রী ক্ষীরোদকুমার দাস প্রণীত। দাম বাঁধাই এক টাকা, সাঃ বাঃ বারো আনা। ১৩৩২।

কবিতার পুস্তক—এই পুস্তকখানিকে গদ্য কাব্য বলা চলে। কবি যদি তাঁহার লেখাগুলিকে কবিতা না বলিয়া দিতেন তবে সাধারণ পাঠক তাহা গদ্যের মতন পড়িয়া বিষম ভ্রমে পড়িত। কবি নানা-প্রকার ছন্দে গদ্য-কাব্য রচনা করিয়াছেন। অসম ছন্দের উপর কবির যথেষ্ট এক্তিয়ার আছে। স্থানাভাববশত মাত্র দু-একটি কবিতার নমুনা দিলাম—

(১) তাই বলি পুনঃ, হে মানবগণ,
ছেড়ে দাও দলাদলি,
সবলে দুর্ব্বলে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে
কর সবে কোলাকোলি।

(২) সন্দেশ বানায় যদি
খা'য়ে সন্দেশ
প্রশংসা অশেষ,
করে তা'রে অকাতরে
ভালো হয় যদি,
মিঠাই প্রভৃতি—।

বইখানিতে এইপ্রকার বহুত সু-কবিতা আছে।

ব্যথার দান—কাজী নজরুল ইস্‌লাম প্রণীত গল্পের বহি। মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ। দাম দেড় টাকা। ১৩৩১।

আজকালকার মামুলি গল্পের বই। তবে বইখানি যে সাধারণের কাছে আদর পাইয়াছে, তাহার প্রমাণ—বাংলা দেশে বইখানির ২য় সংস্করণ হইয়াছে।

বিদ্রোহ—শ্রী প্রিয়গোবিন্দ দত্ত প্রণীত নাটক। দত্ত গোবিন্দ এণ্ড্ সন্স্, মুঙ্গের। দাম বারো আনা। ১৩৩২।

তবে অভিনয় করিবার অযোগ্য।

ভারতের দাবী—শ্রী নলিনীকিশোর গুহ প্রণীত প্রবন্ধ-সমষ্টি। ক্যাল্‌কাটা পাব্‌লিশার্স ৯০।৭এ হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা। বারো আনা। ১৩৩২।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। স্বরাজ স্বরাজ করিয়া আমরা চীৎকার করিয়া মরিতেছি, কিন্তু স্বরাজ যে কি তাহার স্পষ্ট জ্ঞান বর্ত্তমানের অনেক তথাকথিত নেতাদের নাই। জাতীয় গলদ কোন্‌খানে তাহা লেখক স্পষ্ট ভাষায় চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। লেখক এক স্থানে বলিতেছেন—"বলহীন কোন শ্রেয়কেই লাভ করিতে পারে না—না কোন যোগ, না কোন মুক্তি, না কোন জাতীয় সম্মান। ইংরেজ শক্তিশালী স্বদেশবৎসল জাতি, দুর্ব্বল আমরা ও-জাতির সমকক্ষ নহি; সেবার অধিকার কোথাও পাইলেও সহযোগিতার অধিকার কোথায়?" কথাটা আমাদের পক্ষে লজ্জার এবং দুঃখের হইলেও সত্য। ভিক্ষাদ্বারা আমরা ইংরেজের নিকট হইতে স্বরাজ পাইব না। ইংরেজ যদি স্ব-ইচ্ছায় আমাদের স্বরাজ না দেয়, তাহা ইংরেজদের পক্ষে এমন-কিছু দোষের কথা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়,কোন জাতিই তাহার উপার্জ্জিত অধিকার—তাহা যে উপায়েই লব্ধ হোক না কেন—সহজে ছাড়িয়া দেয় না। অধীন জাতিকে অন্তরে-অন্তরে বলসঞ্চয় করিয়া স্বাধীনতা এবং স্বরাজ লাভ করিতে হইবে। ৭৩ পৃষ্ঠার বইখানিতে এই চিন্তাশীল লেখক অনেক গভীর চিন্তার খোরাক দান করিয়াছেন। গুরুতর বিষয়-সকলের আলোচনা লেখক করিয়াছেন বটে, কিন্তু লেখকের ভাষা কোথাও সহজবোধ্যতা হারায় নাই। পুস্তকের আরো দু-একটি স্থানের সামান্ত অংশের উল্লেখ করিবার লোভ সাম্‌লাইতে পারিলাম না:—"যাহা জন্মস্বত্বে লাভ করিয়াছি, যাহাতে নাকি আমার birthright, তাহাও যখন পরের কাছে চাহিতে হয়, দাবী করিতে হয়, তখন কেমন করিয়া বলিব, আমার রাষ্ট্রবুদ্ধি নিজের জন্মস্বত্বের উপর আস্থাকে অবিচলিত রাখিতে পারিয়াছে।"—এই কথা সত্য। সুতরাং অনেকের কাছেই অপ্রিয় হইবে। লেখকের শেষ কথা—"অতীতের শিক্ষা, বর্ত্তমানের বাস্তব দুই লইয়াই ভবিষ্যতের ভারতের পত্তন করিতে হইবে।"

আলোচ্য বইখানি প্রত্যেক স্বদেশসেবী এবং দেশমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পাঠ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি; বিশেষ করিয়া তথা-কথিত নেতারা এই পুস্তক পাঠে কিছু সত্যকার উপকার পাইবেন বলিয়া মনে হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্য—শ্রী সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী। দি বুক কোম্পানি, ৪।৪এ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দুই টাকা। ১৩৩১।

বৈষ্ণবসাহিত্য বৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা চলিতে পারে না—সেই কারণে এই পুস্তকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনাও বিশদভাবেই করিয়াছেন। লেখক বৈষ্ণবসাহিত্যের অন্তরে যে অপরূপ একটি সৌন্দর্য্যরসধারার স্রোত বহিয়াছে, তাহার সন্ধান এবং আস্বাদ পাঠককে দিতে চেষ্টা করিয়া বহুলপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কেমন করিয়া এই পরম রসাল সাহিত্যটি ধীরে-ধীরে উৎকর্ষ লাভ করিতে-করিতে অবশেষে চরম উৎকর্ষ লাভ করিল লেখক তাহা দেখাইবার চেষ্টার কোনোপ্রকার ত্রুটি করেন নাই। একদল লোক আছেন যাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্যকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের এই বিষম ভ্রম দূর হইবে। পুস্তকে বহু বৈষ্ণব কবির বহু পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহা লেখকের বৈষ্ণব-সাহিত্যে যত্নের একটি প্রধান প্রমাণ। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুইজন প্রধান বৈষ্ণব কবি। এই দুইজনের জীবনী এবং তুলনায় সমালোচনা লেখক বিশদভাবে করিয়াছেন। উক্ত দুই কবির জীবনীর অনেক নূতন কথাও লেখক বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন। "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনায় সমালোচনা" অধ্যায় লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করে। পুস্তকের মধ্যে গ্রন্থকার কোনো বৈষ্ণব কবিকেই বাদ দেন নাই—সকল কবির বিষয়েই বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এবং সকলেরই রচনার উৎকৃষ্ট অংশগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পাঠে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং সাহিত্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও পরম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে, আশা করা যায়। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক আছে, কিন্তু একই পুস্তকের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য সকল বিষয় আলোচ্য পুস্তকখানিতে যেমনভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে—এমন আর কোনো পুস্তকে আছে কি না জানি না। এই বৃহৎ পুস্তকের দাম মাত্র দুইটাকা হওয়াতে ইহা অনেকেই ক্রয় করিবার সুবিধা পাইবেন। পুস্তকখানি প্রণয়ন করিতে লেখক প্রভূত শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। সাহিত্য-মোদীদের নিকট পুস্তকখানির আদর হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

আত্মদান—নূরন্নেছা খাতুন প্রণীত গার্হস্থ্য উপন্যাস। মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস্, ৩নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

লেখিকা দরদ দিয়া লিখিতে জানেন। পুস্তকের চরিত্রগুলি মনকে আকৃষ্ট করে, এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। করুণ দৃশ্যগুলি লেখিকা অতি নরম তুলি দিয়া রচনা করিয়াছেন। বইখানিকে আর-একটু ছোটো করিলে অতি উপভোগ্য হইত।

গ্রন্থকীট

আমেরিকার বিদ্যার্থী (সচিত্র)—স্বামী সত্যদেব প্রণীত। হিন্দী গ্রন্থ হইতে শ্রী মণীন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। ১৩৩২

আমেরিকার "বিদ্যার্থী" নামক হিন্দী পুস্তকে স্বামী সত্যদেব সেই স্থানের নির্ধন বিদ্যার্থীদের শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধে অনেক সারবান্ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে নির্ধন বলিয়া যাহারা লেখাপড়া করিতে পারে না, তাহারা এই পুস্তক পাঠে আমেরিকার তাদৃশ অবস্থার বালকগণ কিরূপ কঠোরতা সহ্য করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া বিদ্যার্জ্জন করে তাহা দেখিতে পাইবে ও যথেষ্ট-উপকৃত হইবে। অনুবাদক বেশ সুন্দর-ভাবে আসল হিন্দী পুস্তকের বর্ণিত বিষয় বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

চিত্ত-কথা (সচিত্র)—শ্রী শৈলেশনাথ বিশী প্রণীত। প্রকাশক কল্লোল পাব্‌লিশিং হাউস,২৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৫৪। মূল্য ।০

লেখকের সহিত দেশবন্ধুর পরিচয় অতি অল্পদিনের। এই পরিচয়-সূত্রে কথোপকথনচ্ছলে তিনি চিত্তরঞ্জনের মুখে যে-সব কথা শুনিয়াছেন তাহাই মোটামুটি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আশা করি স্বর্গগত দেশবন্ধুর সম্বন্ধে এই স্মৃতিকথাগুলি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে। পুস্তকখানির বাঁধাই ও ছাপা চমৎকার হইয়াছে। ইহা কল্লোল পাব্‌লিশিংএর বিশেষত্ব।

অমুক্ত কাহিনী—(মূল্য ১।৵০);

ত্রিবেণী—(মূল্য ।৵০) গল্পের বই। লেখক শ্রী সুরেশচন্দ্র

ঘটক এম্-এ। ২৭ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে কল্লোল পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩২।

বাংলা মাসিকপত্রিকার পাঠকপাঠিকাদের নিকট সুলেখক সুরেশ-বাবুর নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এক-একটা ঐতিহাসিক কালপর্য্যায়কে আশ্রয় করিয়া গল্পগুলি রচিত। দুই-একটি গল্পে হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্দ্য-বন্ধনের যে-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। লেখকের ভাষা উত্তম ও রচনাভঙ্গী জড়তা-বর্জ্জিত। ত্রিবেণীর প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে। বই-দুইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

প্র

শশাঙ্কবর্দ্ধন—শ্রী নিরঞ্জন বসু প্রণীত। প্রকাশক শ্রী নলিন চন্দ্র বসু, ৩ ঈশ্বর ঠাকুর লেন, দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা। পাঁচ সিকা। ১৩৩২

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"শশাঙ্কবর্দ্ধন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু নাটকখানি ঐতিহাসিক নাটক নহে; ইহা নাট্যকাব্য।" নাটকখানি পঞ্চাঙ্ক। চরিত্রগুলি বেশ অঙ্কিত হইয়াছে। লেখকের হাত কাঁচা নয়, রচনায় দক্ষতা আছে।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ)—শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মুখে-মুখে যে-সব ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন গ্রন্থকার (মহর্ষির পৌত্র) তাহাই লিখিয়া রাখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ যে গভীর ধর্ম্মোপলব্ধির পরিচায়ক—তাহা বলাই বাহুল্য। পুস্তকখানি আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থমালার অঙ্গ পূর্ণ করিবে। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

চাণক্য—শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভট্টাচার্য্য এণ্ড্ সন্ ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক "মুদ্রারাক্ষস" হইতে এই চাণক্য চরিতকথা সংগৃহীত হইয়াছে। গোড়ার অংশটি ইতিহাস হইতে গৃহীত। বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস, রাজনীতিকুশলতা প্রভৃতি গুণে চাণক্যের চরিত্র অদ্ভুত কৌতূহলপূর্ণ। এরূপ চরিত্রের সহিত ছেলেদের পরিচয় হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থকার সহজ ভাষায় চাণক্যচরিত গাঁথিয়াছেন। বইখানি স্কুলের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

সব ভাল যার শেষ ভাল, কুঁহুলির শিক্ষা, হ্যাম্লেট— তিনখানা বই-ই শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী প্রণীত। প্রত্যেক খানির মূল্য ছয় আনা। প্রকাশক বরদা এজেন্সী, ১২।১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের বোধগম্য করিয়া সরল ভাষায় Lamb's Tales from Shakespeare অনুসরণে গল্পগুলি লিখিত। বইগুলি ভালো হইয়াছে। আশা করি গ্রন্থকার এ জাতীয় পুস্তক আরো লিখিয়া শিশু-সাহিত্যের অভাব মোচন করিবেন।

প্রভাতী—শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক আদি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। বারো আনা।

ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ। সুলিখিত।

মাটির ঘর—শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। দুই টাকা।

উপন্যাস। লোহার কারখানায় চাকুরিজীবী অনিলের দারিদ্র্য-পীড়নে প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেম উপযুক্ত সঙ্গলাভে পরিণতি লাভ করিল। সব চরিত্রগুলিই সুন্দর হইয়াছে। সুশিক্ষিতা স্বাধীনা হইলেও দীপ্তি আধুনিক নভেলের বিলাতী কায়দায় ঢেমে পড়িল না, অথচ উপযুক্ত বাঞ্ছনীয় স্বামী লাভ করিল। মোটের উপর বইটি সুন্দর হইয়াছে। রচনা সহজ, সরল—কোথাও আড়ম্বর নাই, জড়তা নাই। ভাষার উপর লেখকের প্রচুর দখল আছে। বইখানির দাম বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

ভুঁইচাঁপা—শ্রী দীনেশরঞ্জন দাশ। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। পাঁচ সিকা।

গল্পের বই। সাতটি গল্প আছে। কয়েকটি গল্প ভালো। বাকিগুলি অসরল, জটিলভঙ্গী, একঘেয়ে প্রেমের হা-হুতাশে পূর্ণ।

ফল্গু—শ্রী যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্। প্রকাশক মনোমোহন প্রেস, ঢাকা। এক টাকা।

কবিতার বই। অধিকাংশ কবিতা চলনসই। দুই-একটি কবিতা ভালো লাগিয়াছে।

শ্রীশ্রীবিজয়-মঙ্গল—শ্রী বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রীবসুদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা। দেড় টাকা।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ভক্ত ও শিষ্যগণকে যে সব উপদেশ ও সৎশিক্ষা দান করেন এবং তাঁহাদের সহিত যে সব সদালাপ করেন তাহাই এই পুস্তকে সংগ্রহ করিয়া বরদা-বাবু ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের ও সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্বগুলি একটু জটিল হইলেও ইহা পরমহংসদেবের কথামৃতের ন্যায় লোকের উপকার সাধন করিবে।

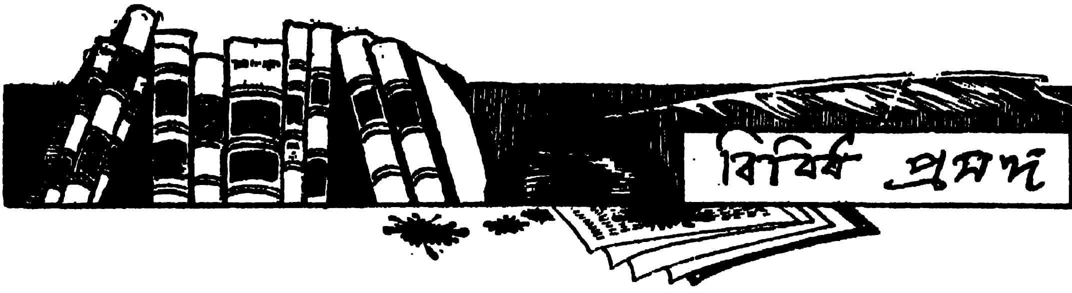
বন্দীজীবন (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব্, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। এক টাকা।

ভূমিকায় আছে—"বিগত যুদ্ধের সময় সারা উত্তরভারতজোড়া কিরূপ বিরাট্ বিপ্লবায়োজন হইয়াছিল তাহা 'বন্দীজীবনের' প্রথম খণ্ডে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে ঠিক তাহার ঘটনা হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে। পঞ্জাবের বিপ্লবায়োজন পণ্ড হইবার পর কিরূপে বিপ্লবায়োজন হয় এবং বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাহাও কেমন করিয়া নষ্ট হইয়া যায়—এইসব কথা এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।" প্রথমখণ্ড পড়িয়া যাঁহারা উৎসুক ছিলেন দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাদের ঔৎসুক্য সানন্দ তৃপ্তি লাভ করিবে। শচীন্দ্র বাবুর রচনা সুন্দর, শক্তিশালী।

নানা কথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দুই টাকা।

বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিবেদী মহাশয়ের বারোটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। চিন্তাস্বাতন্ত্র্যে, সরল ধীর যুক্তিবাদে, বক্তব্য বিষয়ের ধীর সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যানে এবং সারল্যে ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধ অদ্বিতীয়। আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রবন্ধগুলি বহুদিন আগেকার লেখা। তাহা হইলেও ইহাতে এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে যাহা আমাদের আবার পাঠ করিবার দিন আসিয়াছে, যেমন—রাষ্ট্র ও নেশন, সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, শিক্ষা-প্রণালী, পরাধীনতা প্রভৃতি প্রবন্ধ। বক্তব্য বিষয় এত সরলভাবে অভিব্যক্ত ও এমন স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত যে, অল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষেও এগুলি বোধগম্য। ইহাই ত্রিবেদী-মহাশয়ের বিশেষত্ব। আমরা সর্ব্বসাধারণকে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তাকে আবার মনের মধ্যে কার্য্যকরী করিতে অনুরোধ করি।

গুপ্ত



ভারতে বিদেশী হিতসাধন চেষ্টা

কয়েক মাস হইল, জাপান হইতে "দি ইয়ং ঈস্ট্" বা "তরুণ প্রাচ্য" নামক একটি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। তাহার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় জাপানে জনহিতসাধক কতগুলি প্রতিষ্ঠান কোন্ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহার একটি তালিকা দেওয়া আছে। আমরা নীচে তাহার বাংলা অনুবাদ দিতেছি।

কাজ	বৌদ্ধ	খৃষ্টীয়	শিণ্টো	মোট
কৈশোর চরিত্রসংস্কার	১৬	১	২	১৯
শিশুর ধাত্রীপণা	৮৩	২২	১	১০৬
শিশুদের রক্ষা	৮	২	০	১০
দুর্ব্বল বা অস্বাভাবিক শিশুদের রক্ষা	৬	১	০	৭
দরিদ্রদিগকে সাহায্যদান	৩৮	৯	১	৪৮
বিনামূল্যে চিকিৎসা	১৯	৭	০	২৬
বৃদ্ধ দরিদ্র পোষণ	১৪	৩	০	১৭
বিপন্নদিগকে পরামর্শদান	১৬	৪	০	২০
বেকারদিগের কাজ জুটানো	১৫	৩	২	২০
বিনাভাড়ায় বাসা দেওয়া	২৪	১	০	২৫
বিবিধ	৭	২	০	৯
মোট	২৪৬	৫৫	৬	৩০৭

জাপানী কাগজখানির সম্পাদক লিখিতেছেন, যে, জাপানের শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আফিসে যে-সকল হিতসাধক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট প্রেরিত হয়, উপরের তালিকাতে কেবল সেইগুলিই গণিত হইয়াছে। অনেক জাপানী বৌদ্ধ ব্যক্তিগতভাবে উক্তপ্রকার নানা প্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আফিসে তাহার কোন রিপোর্ট্ পাঠান না। তাঁহাদের যাহা করা উচিত তাঁহারা তাহা করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। অন্যদিকে খৃষ্টিয়ানেরা লোকহিত চেষ্টার উপর খুব ঝোঁক দেন ও তাহাতে খুব মনোযোগী বলিয়া তদ্রূপ কোন কাজ করিলে তাহার রিপোর্ট্ যথাসময়ে উক্ত আফিসে পাঠাইয়া দেন। এইজন্য তাঁহাদের প্রায় সমুদয় হিতসাধক প্রতিষ্ঠান উপরের তালিকায় গণিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা যদি সকলে খৃষ্টিয়ানদের মত তাঁহাদের সব হিতসাধনচেষ্টার রিপোর্ট্ দিতেন, তাহা হইলে মোট সংখ্যা উপরের সংখ্যার তিনগুণেরও অধিক হইত।

জাপানী সম্পাদকমহাশয়ের যে-সব মন্তব্যের তাৎপর্য্য উপরে দিলাম, তাহা বিবেচনা না করিলেও দেখা যাইতেছে, যে, জাপানী বৌদ্ধেরা খৃষ্টিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশী হিতসাধক প্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকেন। জাপানে খৃষ্টিয়ানদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্ভবতঃ অধিকাংশ স্থলে বিদেশীদের টাকায় বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহারা জাপানের চেয়ে ধনী দেশের লোক। তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে, যে, স্বাধীন জাপানের বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী দেশী লোকেরা ধনী বিদেশী খৃষ্টিয়ানদের চেয়ে অনেক বেশী-পরিমাণে সমাজসেবার কাজ করিতেছেন। সেইজন্য তাঁহারা যে কেবল রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন তাহা নহে, সমাজসেবা বিষয়েও তাঁহারা আত্মনির্ভর-পরায়ণ ও স্বাবলম্বনসমর্থ।

জাপানে হিতসাধক প্রতিষ্ঠানগুলির যেরূপ সরকারী তালিকা আছে, ভারতবর্ষে সেরূপ কোন তালিকা সংগ্রহের সরকারী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া অবগত নহি। কিন্তু তাহা না থাকিলেও ইহা বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে, ভারতবর্ষে বিদেশী খৃষ্টিয়ানরা সংখ্যায় কম হইলেও যত হিতসাধক প্রতিষ্ঠান চালান, হিন্দুমুসলমানবৌদ্ধজৈন প্রভৃতিরা সংখ্যায় বেশী হইলেও তুলনায় তত বেশী চালান না। ইহার সমুদয় কারণ অনুসন্ধান এখন করিতে পারিতেছি না। এখন কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, আমরা যেমন রাজনৈতিক পরাধীনতাগ্রস্ত, সমাজসেবা বিষয়েও তেমনি অনগ্রসর এবং স্বাবলম্বনে অসমর্থ।

—

বিদেশীদের ভারতহিতৈষণা

বিদেশী খৃষ্টিয়ানেরা ভারতবর্ষে অনেক লোকহিতকর কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্কুল কলেজ অনাথালয় চালান, হাঁসপাতাল চালান, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ-প্রদান করেন, দুর্ভিক্ষের সময় অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন লোকদের সাহায্য করেন, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, ঝড় প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করেন, পতিতাদের উদ্ধারচেষ্টা করেন, মদ্যপানাদি নেশার অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা করেন, চুরি ডাকাতি যাহাদের পেশা এরূপ অনুন্নত জাতিদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করেন, ইত্যাদি। অনেকস্থলে তাঁহারা খৃষ্টীয় সমাজের দল পুষ্ট করিবার জন্য এইসব কাজ করেন, এবং তাহা করিতে পারিলে প্রটেস্টাণ্ট্ পাদরীদের পদোন্নতি ও আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়া থাকে, শুনিয়াছি। তাহা হইলেও কাজগুলি ভাল।

খৃষ্টীয় মিশনারী এবং অন্য বিদেশী জনহিতৈষীরা ভারতবর্ষে যে-সব কাজ করিয়া জগতে লোকহিতসাধক বলিয়া পরিচিত হন, তাহা করিবার সুযোগ তাঁহারা এই জন্য পাইয়া আসিতেছেন, যে, ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট্ পূর্ণমাত্রায় নিজের কর্ত্তব্য করেন না। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

খৃষ্টীয় মিশনারীরা ভারতায় ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য অনেক ছোটবড় শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহার জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্র যশ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট্ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বত্র যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষালয় স্থাপিত হইত এবং মিশনারীদের এরূপ কাজ করিবার কোন প্রয়োজন হইত না ও সুযোগ জুটিত না। অতএব, ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না, যে, বিদেশী গবর্মেণ্টের ত্রুটিই বিদেশী মিশনারীদিগকে বিদ্যাদাতা হইয়া প্রশংসা পাইবার সুযোগ দিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের সময় খৃষ্টীয় মিশনারীরা বিপন্ন লোকদের সাহায্য করেন এবং অনেক পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত বালকবালিকার ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দেশে যদি দুর্ভিক্ষ না হইত, তাহা হইলে মিশনারীদের এইরূপ কাজ করিবার সুযোগ হইত না। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ হইত না, এমন নয়; হইত। কিন্তু পুরাকালে দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর নানা দেশে যেরূপ হইত, এখন আধুনিক প্রণালীতে শাসিত স্বশাসক সভ্য কোন দেশে যুদ্ধজনিত কারণ ভিন্ন তাহা হয় না। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে পুরাকালে যেমন দুর্ভিক্ষ হইত, সেরূপ দুর্ভিক্ষ তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অন্য অনেক দেশেও হইত; কিন্তু পাশ্চাত্য ঐ সব দেশের অধিকাংশে অন্ততঃ শত বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বে যতগুলি, যেরূপ ব্যাপক, এবং যেরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণঘাতক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে তাহা হয় নাই। ইহার অর্থ এই, যে, ইংরেজ জাতি যেরূপ শাসন-ব্যবস্থা, পণ্যদ্রব্যোৎপাদন-ব্যবস্থা, বাণিজ্যনীতি, মহাজনী ব্যবস্থা প্রভৃতির দ্বারা নিজের দেশে ও উপনিবেশসমূহে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন, ভারতবর্ষের জন্য তদ্রূপ কিছু করিয়া ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের বা ভারতীয়দের প্রকৃতিগত কোন দোষকে সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী করা যায় না। ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত দোষ কিছুই নাই, ইহা জোর করিয়া বলা যায়। কারণ, ভারতবর্ষের দৌলতে প্রধানতঃ ইংরেজ জাতি ধনী হইয়াছে; তা ছাড়া জার্ম্মেনীও অনেকটা ধনী হইয়াছে এবং এখন জাপান হইতেছে। ভারতীয় মানুষদের দোষ অবশ্য কিছু আছে; কিন্তু প্রধানতঃ সেই মানুষদেরই পরিশ্রমে যখন বিদেশী নানা জাতি ধনী হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় না, তখন সকল রকমের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলে আমাদের দোষ সুধরাইয়া আমাদের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমাদের দেশেও যে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এখন আমাদের বক্তব্য এই, যে, যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর গুণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যত্র আর দুর্ভিক্ষ হয় না, সেই বৃটিশ শাসনপ্রণালীর গুণে

কিন্তু ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত সেরূপ অবস্থার আবির্ভাব হয় নাই। ইহার জন্ম মিশনারীরা লোকহিতসাধক বলিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আরও নানা-প্রকার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই।

বিদেশী খৃষ্টীয় মিশনারী ও অন্য বিদেশী ভারত-হিতৈষীরা কেহই হিতৈষী নহেন, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃত ভারতহিতৈষণা কি এবং পূর্ণ মাত্রায় ভারত-হিত কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহারই আলোচনা আমরা করিতে চাই।

একটি গরীব অসহায় ছেলে যদি কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে সে যতবার সাহায্য চাহিবে, শুধু ততবার তাহাকে কিছু অন্ন, বস্ত্র বা পয়সা দিলেই পূর্ণ-মাত্রায় তাহার হিতৈষিতা করা হইবে না; বরং কোন কোন স্থলে কেবল তাহার ক্রমাগত সাহায্য করিলে তাহাকে পেশাদার ভিক্ষুক বানাইয়া ফেলিয়া তাহার প্রভূত অনিষ্ট করা যাইতে পারে। প্রকৃত হিতৈষী তিনি, যিনি বালকটিকে এরূপ পরামর্শ ও সাহায্য দিতে পারেন, যাহাতে সে মানুষের মত নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। নতুবা কেহ যদি তাহার বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ভরণপোষণ করে, তাহা তাহার প্রকৃত হিতৈষিতা না হইয়া তাহার বিপরীতই হইবে।

কোন বালক যদি নিজের অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে সে যাহা জানিতে চায় তাহা বলিয়া দেওয়া অবশ্যই তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় তাহার হিতৈষী হইতে হইলে তাহাকে এমন পরামর্শ ও উপদেশ দিতে হইবে, যাহাতে সে পরে ক্রমশঃ নিজেই জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজের অজ্ঞতা দূর করিতে পারে।

বস্তুতঃ কাহাকেও কোন বিষয়েই চিরকাল পরমুখা-পেক্ষী করিয়া রাখিলে সাহায্যদাতার আত্মগৌরব অনুভব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার সুযোগ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পরনির্ভরপরায়ণ লোকটিকে খাট করিয়া রাখা হয়; সুতরাং এরূপ ব্যবস্থায় তাহার পূর্ণ হিতৈষিতা করা হয় না।

ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, জাতির পক্ষেও তাহা সত্য।

বিস্তর সভ্যদেশে সরকারী ব্যবস্থার গুণে ও তত্তদ্দেশ-বাসীদের নিজের চেষ্টায় শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের দেশেও ঠিক্ তাহাই হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে হইলে আমাদের দেশে আমাদেরই কর্ত্তা হওয়া দরকার। সুতরাং ভারতবর্ষে যে-সব বিদেশী লোক স্কুল-কলেজ চালাইতেছেন, তাঁহাদের প্রাপ্য কোন প্রশংসা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া একথা আমাদিগকে বলিতে হইবে, যে, তাঁহারা যদি আমাদের পুরা হিতৈষী হন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভে বাধা ত দিবেনই না, অধিকন্তু আমাদের সেরূপ চেষ্টায় পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ্য-ভাবে যোগ দিবেন। যদি বিদেশী কেহ ইহাতে বাধা দেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বুঝিতে হইবে, যে, তাঁহার অন্য কাজ যাহাই হউক, তিনি পূর্ণমাত্রায় আমাদের বন্ধু নহেন,—বিরুদ্ধাচারীও হইতে পারেন। যদি বিদেশী কোন জনহিতসাধক বাধা না দেন অথচ আমাদের আত্মকর্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টায় প্রকাশ্যভাবে পূর্ণমাত্রায় যোগ না দেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও আমরা আমাদের সম্পূর্ণ হিতকামী মনে করিব না।

আর একটি দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। ইউরোপীয়বংশোদ্ভব লোকদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র যাতায়াত যত সহজ ও বাধাহীন, আমাদের পক্ষে তাহা নহে;—বস্তুতঃ অনেক দেশে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তদ্ভিন্ন, ইউরোপীয় লোকেরা যত সহজে সরকারী নিম্ন ও উচ্চ নানাপদের লোকদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও পত্রব্যবহার করিতে পারে, আমাদের তাহা করিবার উপায় নাই। এবম্বিধ নানা কারণে হিতসাধন-কার্য্যে নেতৃত্বগ্রহণ ইউরোপীয়দের পক্ষে যত সহজ, আমাদের পক্ষে তত সহজ নহে। এই বিষয়ে আমাদের আলস্যের ও জড়তার দোষক্ষালন করিবার বা প্রশ্রয় দিবার জন্য একথা লিখিতেছি না। লিখিতেছি ইহাই নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত, যে, আমাদের পরাধীনতা সাধারণতঃ ও প্রধানতঃ দুই

রকমের বলিয়া বিবেচিত হয়—রাজনৈতিক এবং পণ্য-দ্রব্যোৎপাদন, বাণিজ্য, মহাজনী প্রভৃতি বিষয়ক; কিন্তু ইহা ছাড়া সূক্ষ্ম আকারে আর এক রকমের পরাধীনতা আমাদের রহিয়াছে। তাহা হিতসাধন-প্রচেষ্টা-বিষয়ক। দেশে বিদেশে ভারতবর্ষের যে-কোন মঙ্গলের চেষ্টা হইতেছে বা হইতে পারে, তাহার নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত ভারতীয় লোকদিগকেই হইতে হইবে। নতুবা আমরা সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা কখনও লাভ করিতে সমর্থ হইব না।

অবশ্য, ভারতীয় হিতসাধক ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এরূপ লোক আছেন, যাঁহারা নিজ নিজ নির্ব্বাচিত কার্য্য-ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ভিন্ন অন্য কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কাজ করিতে অভ্যস্ত নহেন, এবং হয় ত তাহা করিতেও চান না। এরূপ অভ্যাস বা মনোভাব পুরা ভারত-হিতৈষণার সহিত সঙ্গত নহে। যেখানে যে-কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ভাল কাজ হইতেছে, অনাবশ্যক হইলেও, অযাচিতভাবে গায়ে পড়িয়া সেখানে গিয়া মুরুব্বিয়ানা করিবার প্রবৃত্তিও কোন বিদেশী ভারতবন্ধুর নাই, এমন নয়। এরকম প্রবৃত্তিও অবাঞ্ছনীয়।

আমরা জানি, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে পূর্ণমাত্রায় যোগ দেওয়া, ভারতীয়ের পক্ষে যেমন, মিশনারী বা অন্য ইউরোপীয়ের পক্ষেও তেমনি নিরাপদ নহে। ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রথমতঃ ত মিশনারী-দিগকে ইংরেজাধিকৃত স্থানে আসিতে ও থাকিতেই দেওয়া হইত না; পরে যখন দেওয়া হয়, তখনও এই বুঝা-পড়ার পর, যে, তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিবেন। যাহারা ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্য নহে, মিশনারী ভিন্ন এরূপ অন্য ইউরোপীয়দের কার্য্যকলাপের প্রতিও কোম্পানীর খর দৃষ্টি ছিল। এই কারণে রাম-মোহন রায়ের সমসাময়িক সিল্ক্‌ বাকিংহাম্‌-নামক একজন ইংরেজ সাংবাদিক ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বিস্তর পাদ্রী গবর্ণ্‌মেন্টের বেতনভোগী ভৃত্য; অন্য রাজভৃত্যদের মত তাঁহারাও রাজনৈতিক বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে বাধ্য। যে-সব পাদ্রী রাজভৃত্য নহেন, তাঁহাদের অনেকেও নানাপ্রকারে পরোক্ষভাবে গবর্ণ্‌মেন্টের সাহায্য পান। যেমন মিশনারীদের বালিকাবিদ্যা-লয়ে এবং তাঁহাদের অন্য-সব স্কুল-কলেজে বেশ মোটা-রকমের সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এই সব প্রতিষ্ঠানের সহিত সংসৃষ্ট পাদ্রীরা ভারতীয় রাজনীতির সহিত যোগ রাখিয়া ভারতীয়দের সাহায্য করিতে পারেন না; কিন্তু প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যাইতে তাঁহাদের বাধা নাই।

ইয়াং মেন্স্‌ ক্রিশ্চিয়ান্‌ এসোসিয়েশ্যান্‌ নামক যে দেশ-ব্যাপী খৃষ্টীয় প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাও সরকারী পোষকতা পাইয়া থাকে। "দি ইয়াং মেন্‌ অব ইণ্ডিয়া" নামে ইহার একটি উৎকৃষ্ট ইংরেজী মাসিক পত্র আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহাতে ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আত্মকর্তৃক লাভের অনুকূল কিছু-কিছু লেখা বাহির হইতেছিল। কিছুকাল পর হইতে সেরূপ লেখা আর বাহির হইতেছে না। অধিকন্তু, আজকাল পরিষ্কার করিয়া এরূপ কথা লেখা থাকে (যাহা না লিখিলেও সব কাগজের পক্ষেই সত্য), যাহাতে বুঝা যায়, যে, প্রবন্ধাদির মতামতের সহিত সম্পাদকের মতের মিল না থাকিতেও পারে। গবর্ন্মেণ্টের অপ্রকাশিত প্রভাব প্রয়োগ এই সব পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া অনুমান করিলে বেশী ভুল হইবে না।

দক্ষিণ ভারতে মিঃ পপলী নামক একজন পাদ্রী রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভারতীয়দের অনুকূল মত প্রকাশ করায় সরকারী তাড়া খাইয়াছিলেন। শুনা যায়, একজন বিখ্যাত বাঙালী খৃষ্টিয়ান্‌ ব্যবস্থাপককে গবর্ণ্‌মেন্টের কোন লোক বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, ইয়াং মেন্স্‌ ক্রিশ্চিয়ান্‌ এসোসিয়েশ্যান্‌ আমেরিকান্‌দিগকে কেন নিযুক্ত করেন। অবশ্য আমেরিকান্‌ হইলেই যে, কেহ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভারতবন্ধু হইবে, এমন কোন কথা নাই; বরং অনেকস্থলে উল্টাই দেখা যায়। তথাপি গবর্ণ্‌মেন্ট্‌ সন্দেহ করিতে পারেন, যে, অব্রিটিশ স্বাধীন দেশের লোকদের পরাধীন ভারতের প্রতি অনুকম্পা হওয়া বিচিত্র নহে।

আধুনিক সময়ে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ভারতীয়দিগের সহিত যোগ দেওয়ায় বা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য তাহাদের চূড়ান্ত চেষ্টার সমর্থন করায় দুই জন ইংরেজ তাড়িত হইয়াছেন। শান্তিনিকেতনের অন্যতম শিক্ষক পিয়ার্সন্‌

সাহেব গত মহাযুদ্ধের সময় চীনদেশে থাকা-কালে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যে, যদি ভারতীয়েরা স্বাধীনতা-লাভের কোন চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ করিবার জন্ম জাপানীরা যেন ইংরেজদের সাহায্য ও ভারতীয়দের শত্রুতা না করে। এই কারণে তাঁহাকে পাকড়াও করিয়া একেবারে ইংলণ্ডে চালান করা হয়, ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়া হয় নাই। দীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে এদেশে আসিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত-প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বোম্বাই ক্রনিক্লের সম্পাদক মিস্টার্ হর্ণিম্যান্‌কে কয়েক বৎসর হইল বিলাত চালান করা হইয়াছে; অনেক আন্দোলনসত্বেও এখনও তাঁহাকে এদেশে আসিতে দেওয়া হয় নাই। মিস্টার্ এণ্ড্রুজ্ লেখায় কয়েকবার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ কেবল অরাজনৈতিক হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, কোন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় কার্য্যতঃ যোগ দেন না, এবং মহাত্মা গান্ধীর বিদেশী বস্ত্রাদির বিরোধিতার তিনি সমর্থক নহেন। এই সকল কারণে মিস্টার্ এণ্ড্রুজ্ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হন নাই।

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য দুটি। প্রথম এই, যে, আমাদিগকে যেমন রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও পণ্যদ্রব্য-উৎপাদন-বিষয়ক স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, সমাজসেবা, শিক্ষাদান ও অন্ত নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যনির্ব্বাহেও তেমনি স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কর্ত্তা ইংরেজ; বাণিজ্যে, আমদানি-রপ্তানিতে, ব্যাঙ্কের কাজে, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে প্রাধান্ত ও প্রভুত্ব ইউরোপীয়দের; জনহিতকর কার্য্যে মুরুব্বিয়ানা করেন ইংরেজ; এমন কি রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টাতেও মিসেস্ বেসাণ্টের মত কেহ কেহ প্রভুত্ব করিতে চান। আমরা কাহারও শত্রুতা অর্জ্জন করিতে ব্যগ্র নহি, সব কাজেই পৃথিবীর সকল দেশের লোকের সহকর্ম্মিতা চাই; কিন্তু যেমন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে স্বাধীনতা চাই, নিজেদের আমদানি-রপ্তানি নিজেদের জাহাজে করিতে চাই, নিজেদের আবশ্যক পণ্যদ্রব্য নিজেরাই উৎপন্ন করিতে চাই, তেমনি দেশহিতকর সব কাজের কর্ম্মী ও পরিচালকও হইতে চাই। ভারতবর্ষের সব রকম জনহিতকর কাজ ভারতীয়দের দ্বারা হইতে পারে। তাহার প্রমাণ এই, যে, সব কার্য্যক্ষেত্রেই ভারতীয়দের কৃতিত্বের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নমুনা আছে; কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কাজই সকলের চেয়ে বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ;—যেমন বোম্বাইয়ের সেবা-সদন প্রতিষ্ঠান, বঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্য চেষ্টা ইত্যাদি। বিদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলে ভারতীয়দের যাওয়াই কঠিন; তথাপি দক্ষিণ আফ্রিকায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও সরোজিনী নাইডু ভারতহিতার্থে গিয়াছিলেন, এবং ফিজি দ্বীপে ব্যারিস্টার্ মণিলাল গিয়াছিলেন।

আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য, এই, যে, কোনও বিদেশী ব্যক্তি ষোল আনা ভারতীয় বনিয়া গিয়াছেন কি না, কিম্বা বনিতে অকপটভাবে ইচ্ছুক কি না, এবং তিনি আমাদের ভাগ্যের পুরা অংশী হইতে চান কি না, তাহার কয়েকটি পরীক্ষা আছে। একটি পরীক্ষা এই, যে, তিনি সব বিষয়েই চাঁইগিরি করেন, না, (অন্ততঃ কোন কোন বিষয়ে) ভারতীয়ের নেতৃত্বে অন্ত ভারতীয়দের সমান অনুচর হইয়া কাজ করিয়াছেন বা করিতে রাজী আছেন কি না। দ্বিতীয় পরীক্ষা এই, যে, ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁহার দহরম-মহরম আছে কি না, এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ খুব সহজে হয় কি না ও তাঁহাদের উপর প্রভাবশতঃ নানাপ্রকার কাজ আদায় হয় কি না। তৃতীয় পরীক্ষা এই, যে, তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় যোগ দিয়া, তাঁহার স্বজাতির লোকেরা তাঁহাদের স্বদেশের যেমন কর্ত্তা, আমাদের দেশে আমাদিগকে সেইরূপ কর্ত্তা করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতেছেন কি না। চতুর্থ পরীক্ষা এই, যে, তিনি বাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্য-উৎপাদন ও ব্যবহারবিষয়ে ভারতীয় স্বাদেশিকতার কার্য্যতঃ সমর্থক, না বিরোধী, না কৌশলপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে উদাসীন। চরম পরীক্ষা এই, যে, ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে একবারও তাড়াইয়া দিয়াছেন কি না।

আমরা ইহা বলিতে চাই না, যে, কেহ ষোল আনা

ভারতীয় বলিয়া না গেলে, ষোল আনা আমাদের দশাভাগী না হইলে, কিম্বা উপরে নির্দ্দিষ্ট সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, তাঁহাকে আমরা ভারতবন্ধু মনে করিব না, বা তাঁহার সেবা অগ্রাহ্য হইবার যোগ্য; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিব, যে, **ষোল আনা** ভারতবন্ধু তিনি নহেন, তাঁহাকে আমরা আমাদেরই একজন, আমাদেরই বড় ভাই বা ছোট ভাই বা ঐরূপ কিছু মনে করিব না।

আরো একটি কথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বা খৃষ্টিয়ানদিগের বিরুদ্ধে কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় খৃষ্টীয়ানেরা নিজেদের কর্ত্তৃত্বে নিজেদের টাকায় দেশসেবায় যে কোন কাজ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভারতীয়দের কাজের মত দেশী চেষ্টা বলিয়া গণনীয় অবশ্যই হইবে।

—

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ত্রিমূর্ত্তি

লাট কর্জ্জন বলিয়া গিয়াছেন, ভারত-শাসন (administration) এবং বাণিজ্য পণ্যদ্রব্যোৎপাদনাদি দ্বারা ভারতের ঐশ্বর্য্য হইতে ধন আহরণ (exploitation) একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক্। আমরা তাহাতে আর একটি কথা যোগ করিয়া তাঁহার উক্তিটি পূর্ণাঙ্গ ও সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রতি প্রয়োজ্য করিতে চাই। আমরা উহাতে মানবসেবাকার্য্য (philanthropy) যোগ করিয়া বলিতে চাই, স্বাধিকৃত বিদেশশাসন, তথা হইতে ধন আহরণ, এবং তথায় মানবসেবাব্রত পালন, এই তিনটি কাজ একই চেহার তিনটি দিক্, অথবা পাশ্চাত্য ত্রিমূর্ত্তির তিনটি মুখ। সবগুলিরই উদ্দেশ্য খুব ভাল হইতে পারে, কিন্তু তিনটির দ্বারাই পরাধীন দেশগুলির চির-নাবালক থাকিবার সুবিধা হইতেছে। বিদেশীরা নিজের দেশে যে রাজনীতি, শিক্ষানীতি, বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, প্রভৃতি চালাইয়া স্বদেশকে নিরক্ষরতা, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, পরাধীন দেশসকলের শাসনকর্ত্তারা ঐসব দেশে সেইসকল নীতি চালাইলে বিদেশী জনসেবকদের শিক্ষাদানের, অন্নদানের, ঔষধদানের ও অন্য নানাবিধ কার্য্যের ক্ষেত্র লোপ পাইত, অন্ততঃ খুব সংকীর্ণ হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন, কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলেও, পাশ্চাত্য জাতিরা বিদেশে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন বলিলে তাঁহাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না। ইহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তি নহে। ইহার নামকরণ সদ্য সদ্য করিতে পারিলাম না। নব ত্রিমূর্ত্তির একটি (উপ)দেবতা কুবের বা যক্ষের মাসতুতো ভাই হইবার সম্ভাবনা। অন্যগুলির নামকরণে গবেষণার প্রয়োজন।

বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠানের কিম্বা বিদেশী কোন শ্রেণীর লোকদের প্রতিকূল সমালোচনা করিলেই সমালোচিত ব্যক্তিরা বলে, যে, সমালোচনা জাতি-বিদ্বেষ প্রসূত। একথার জবাব দিতে যাওয়াও অপমানকর। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা ভারতের পক্ষ হইতে কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, ভারতবর্ষলব্ধ বিত্তের জোরে বিদেশীরা ধনী, হৃষ্টপুষ্ট, শিক্ষিত, জ্ঞানী, কলাকুশল, নীরোগ হইতেছে;—অথচ আমরা সেই ভারতেরই লোক হইয়া কেন বিদেশীদের দয়াপ্রদত্ত শিক্ষা, চিকিৎসা, ঔষধ, অন্ন প্রভৃতি গ্রহণের লজ্জা ও অপমান সহ্য করিতে থাকিব? মানব-হিতৈষী সর্ব্বজাতীয় প্রতীচী-নন্দনদিগকেও বলি, তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার করা উচিত যাহাতে তাঁহাদের জননীর উদ্দেশে তাঁহার শত্রুরাও বলিতে না পারে, "সাপ হৈয়া দংশ, মাগো, ওঝা হৈয়া ঝাড়।"

—

দক্ষিণ-আফ্রিকা-নিবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিশপ ফিশারের উক্তি

পাদ্রী ফ্রেড্রিক ফিশার আমেরিকার লোক। তিনি মেথডিষ্ট খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের কলিকাতাবাসী বিশপ। তিনি কিছুকাল আফ্রিকায় ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান্ ডেলী মেল কাগজের একজন প্রতিনিধির নিকট তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি। তাহা হইতে, ঐ দেশে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতকায়েরা কিরূপ ব্যবহার করে, তাহার ধারণা নূতন করিয়া উজ্জ্বল হইবে।

"আমি দুমাস আফ্রিকায় ছিলাম। এই সময়ে আমি রোডেশিয়া ও পোর্টুগীজ-অধিকৃত দেশ প্রভৃতি আফ্রিকার সমুদয় প্রদেশে ভ্রমণ

করিয়াছি। প্রতি কেন্দ্রে যেসকল ভারতীয় সমিতি আছে, তাহাও আমি দেখিয়াছি। প্রত্যেক নগরের মেয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং বহু কৌন্সিলার,পার্লেমেণ্ট্ সদস্য ও ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সহিত পরিচয়-লাভের সৌভাগ্যও আমার ঘটিয়াছে। ফরাসী, ইংরেজ, পোর্ত্তুগীজ, ভারতীয় ও আদিম আফ্রিকাবাসী প্রভৃতি সকলের মনোভাবই আমি নিরপেক্ষভাবে জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি যাহা জানিয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি যে, সমস্যা বড়ই জটিল! আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ এত প্রবল, যে, পৃথিবীর কোথায়ও আর এরূপ দেখা যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ট্রান্সভালের কথা বলা যাইতে পারে। সেদেশে কোন ভারতীয় বিনা লাইসেন্সে ব্যবসা করিতে পারে না; এবং সে লাইসেন্সও একজন শ্বেতাঙ্গের করায়ত্ত। কোন ভারতীয়ের কোন জায়গায় দোকান থাকিলে ঐ শ্বেত কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলে তাহাকে অন্যস্থানে উঠাইয়া দিতে পারে। ভারতীয়দিগকে কোন স্থায়ী ভূসম্পত্তি দেওয়া হয় না। ইহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে পারে না এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের নিকট উঠিয়া যাওয়ার পরওয়ানা আসিতে পারে। পূর্ব্বে রুশিয়াতে ইহুদীগণ যেরূপ ব্যবহার পাইত, ট্রান্সভালে ভারতীয়েরা আজকাল কার্য্যতঃ সেইরূপ ব্যবহার পাইয়া থাকে। যখন ইহুদীরা উৎপীড়িত হইয়াছিল, তখন কত মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইংলণ্ডের সাময়িক ও মাসিকপত্রে সেইসব অত্যাচার-কাহিনী লিখিয়া ইহুদীদের উপর জগদ্বাসীর সহানুভূতি এবং রুশ-সরকারের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, সেই সকল উদার বিশ্বহিতৈষী অথবা তাঁহাদের পরবর্ত্তী লেখকগণ এই অসহায় দুর্ব্বল ভারতীয়দিগের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী কোন মতেই প্রকাশ করিতেছেন না, অথবা সেই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদকল্পে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না। ইহা দেখিয়া কি মনে হয়? ইহাতে কি মনে হয় না, যে, বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ শ্বেতকায়ের মানব-হিতৈষণা তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার; অথবা তাঁহাদের বিশ্বপ্রেম কেবল মৌখিক; তাঁহাদের হৃদয় উহাতে সায় দেয় না।

এসিয়াবাসীর, বিশেষতঃ ভারতীয়দের উপর দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী শ্বেতকায়গণের এ বিদ্বেষের কারণ কি? ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা বলিতেন যে, ভারতবাসীরা অত্যন্ত নোংরা, এবং সুসভ্য ইউরোপীয়গণ কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে পারে না। এ উক্তির অসত্যতা একাধিক বার প্রমাণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-আফ্রিকায় সমস্ত ভারতীয়কে বহিষ্ঠ করিয়া তোলাই তথাকার শ্বেতকায়দের প্রধান উদ্দেশ্য। তথাকার শ্বেতাঙ্গগণ যে যে কারণে ভারতীয়দের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদেরই মতে তাহার একটি এই যে, ভারতীয়েরা ঐ স্থানের শ্বেতকায়দের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান্। দ্বিতীয় কারণ,—তাহারা খুব কম খরচে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। শ্বেত ঔপনিবেশিকেরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া আইন করিয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। তাহারা দক্ষিণ-আফ্রিকাকে কেবল নিজেদের দেশ বলিয়া মনে করে এবং তথায় নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। বুদ্ধিমান্ প্রতিযোগী ভারতীয়দের দর্প কি করিয়া চূর্ণ করিবে, ইহাই তাহাদের চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্যই দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেত সম্প্রদায় এসিয়াবাসীর উচ্ছেদকল্পে আইনের এক পাণ্ডুলিপি করিয়া তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছে। এই বিল আইনে পরিণত হইলে সমস্ত দক্ষিণ-আফ্রিকায় কোথাও ভারতীয়ের ঠাঁই হইবে না। শ্বেতদের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীগণের মনোভাবও আদৌ সন্তোষজনক নহে। তথাপি যে কেবল ভারতীয়েরাই শ্বেতদের চক্ষুশূল, ইহার কারণ ভারতীয়েরা অধিকতর বুদ্ধিমান্। প্রতিযোগিতায় তাহাদের সহিত শ্বেতদের পারিয়া উঠা দায়। তাই ভারতীয়দিগকে কথা কহিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট্ যদি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে এবিষয়ে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইতে পারে। নতুবা দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দিগকে চিরকাল শ্বেতাঙ্গের পদানত থাকিতে হইবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার খৃষ্টিয়ান বা অন্য ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের কথা এই, যে, এবিষয়ে ভারতবাসীদের একতার নিতান্ত অভাব। দক্ষিণ-আফ্রিকায় যেরূপ সর্ব্বনাশকর আইন প্রণীত হইতেছে, তাহাতে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর একযোগে ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

বিশপ ফিশার্ ইহাও বলিয়াছেন, যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় সমুদয় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন ভারতীয়কে কুলি বলা হয়। শ্বেত বালকবালিকাদের স্কুলপাঠ্য বহিতেও লেখা আছে, যে, সব ভারতীয়ই কুলি। কোন হোটেলে চাকর না হইয়া কোন ভারতীয় ঢুকিতে পারে না। ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ভারতীয়দের সঙ্গেও বিশপ ফিশারকে তাঁহার হোটেলে বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে হইয়াছিল।

কোনও শ্রেণীর মানুষকেই কাহারও অবজ্ঞা করা বা বিদ্বেষের চক্ষে দেখা উচিত নয়। এইজন্য আমরা ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতার নিন্দা ও বিরুদ্ধাচরণ চিরকাল করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইংরেজরা সচরাচর বলেন, "তোমাদের দেশে বিস্তর লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছ; অতএব তোমরা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পাইতে পার না।" কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত মানুষেরাও ভারতীয়দিগকে অস্পৃশ্যের পর্য্যায়ে ফেলিয়া রাখিয়াছে, এবং অধিকন্তু তাহাদিগকে ঐদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য আইন করিতেছে। অতএব, যে যুক্তি অনুসারে আমরা স্বরাষ্ট্র-শাসন-ক্ষমতা পাইবার অনধিকারী, সেই যুক্তি অনুসারেই দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়েরাও শৃঙ্খলিত হইবার যোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা স্বদেশের প্রভু। সুতরাং ইংরেজদের অন্য কোন কথা না বলিয়া ইহা বলাই সঙ্গত, "আমাদের সুবিধা, স্বার্থ ও মর্জ্জি অনুসারে আমরা যেখানে যেমন দরকার সেখানে সেই-রূপ ব্যবস্থা করিব"।

—

জনৈক আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র

অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমরা জাপান ও আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের কৃতিত্বের বৃত্তান্ত তাঁহাদের ছবি-সমেত প্রকাশিত করিতাম। প্রথম-প্রথম তদ্রূপ ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য ইহা করিবার প্রয়োজন ছিল। এখন আর প্রয়োজন নাই। এখন যে ছাত্রটির পরিচয় দিতে যাইতেছি, তিনি কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার জন্য আমেরিকা যান নাই; অবশ্য সে উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়া বিন্দুমাত্রও নিন্দার বিষয় নহে।

এই যুবকের নাম শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত। তিনি দর্শন-শাস্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন শাখায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষা দুইবার দিয়া দুইবারই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। আমেরিকার মীড্‌ভিল্‌-নামক স্থানে যে তত্ত্ববিদ্যালয় আছে, তাহার কর্ত্তৃপক্ষ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া থাকেন। শ্রীমান্ অমল সেই বৃত্তি পাইয়া মীড্‌ভিলে দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন। আহ্লাদের বিষয়, তিনি সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র এবং বী ডী (ব্যাচিলর্ অব্ ডিভিনিটি) উপাধি পাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমেরিকার সুবিখ্যাত হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্ববিদ্যা অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিতেছেন। আমেরিকার একেশ্বরবাদী সভা তাঁহাকে প্রায় সাত শত টাকা এবং হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্ববিদ্যাশিক্ষা-বিভাগ তাঁহাকে প্রায় ১৭৫০্ টাকা বৃত্তি দিয়াছেন।

প্রবাসীর পাঠকেরা শুনিয়া সুখী হইবেন, শ্রীমান্ অমলকুমার সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভাগিনেয়।

ভাই নন্দলাল সেন

বাংলা দেশের অল্প লোকেই ভাই নন্দলাল সেন মহাশয়ের নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু সিন্ধুদেশে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে নবযুগের প্রবর্ত্তক সাধু হীরানন্দের সহকর্ম্মী হইয়া ভাই নন্দলাল তথায় গমন করেন। ধর্ম্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার এবং শিক্ষাদান ও বিস্তার তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র ছিল। সাধু হীরানন্দ আদ্‌ভানি যৌবনে বাংলাদেশে আগমন করেন, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার আদর্শে জীবন গঠন করিয়া মাতৃভূমির সেবা করিতে সংকল্প করেন। জন্মভূমি সিন্ধুদেশে ফিরিয়া যাইবার সময়



ভাই নন্দলাল সেন

তিনি শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনকে সহকর্ম্মিরূপে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ভবানীচরণ পরে রোমান্ ক্যাথলিক হন এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নাম গ্রহণ করেন। বাংলা দেশে ব্রহ্মবান্ধবের জীবন-কথা শিক্ষিত সমাজে সুবিদিত। ভাই নন্দলাল সেন মধ্যে-মধ্যে বাংলা দেশে আসিতেন বটে, কিন্তু জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর তিনি সিন্ধুদেশেই কাটাইয়া গিয়াছেন।

সিন্ধুদেশে তিনি প্রথম-প্রথম হায়দরাবাদ নগরে

য়ুনিয়ন অ্যাকাডেমী নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন ও উহার তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। উহা পরে তত্রত্য বিখ্যাত নবলরায় হীরানন্দ অ্যাকাডেমীতে পরিণত হয়। অতঃপর তিনি কিছুকাল লাহোরের দয়াল সিং কলেজের সেবা করিয়া, করাচীকেই জীবনের কার্য্যক্ষেত্র করেন। তথায় ধর্ম্মানুশীলন ও শিক্ষাদান তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। তিনি বক্তৃতা করিয়া ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বেড়াইতেন না—নির্জ্জনবাস, অধ্যয়ন ও সাধন-ভজনেরই তিনি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। দু চার জন ছাত্র কখন-কখন তাঁহার নিকট আসিলে তাহাদিগকে তিনি শিক্ষা দিতেন। যে সকল পুরুষ ও মহিলা ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ও শান্তিপিপাসু হইয়া তাঁহার নিকট আসিত, তাঁহাদিগকে তিনি উপদেশ দিতেন।

হায়দরাবাদে যাঁহারা তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের এখন অনেকেই নানা কার্য্যক্ষেত্রে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। তাঁহার প্রতি তাঁহাদের সকলেই ভক্তিমান্। তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহাদের অনেকে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া যে-সব চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার অনেকগুলিতে তিনি কর্ম্মযোগী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

তাঁহার শেষ বয়সের কোন ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় নাই—যদিও তিনি নিজে সুদক্ষ ফোটোগ্রাফার ছিলেন। তাঁহার যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা অনেক বৎসর পূর্ব্বের, তাঁহার ভ্রাতা প্রমথলাল সেন মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—

অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়

অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় মহাশয় মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি ঐ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। যখন তিনি ঐ কলেজে কাজ করিতে আসেন, তখন উহা মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশান্ নামে পরিচিত ছিল।

তাঁহার শিক্ষক জীবনের প্রথম অবস্থায় তিনি ছাত্রদের মধ্যে গণিতজ্ঞ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। শিক্ষিতসমাজেও গণিতজ্ঞ বলিয়াই তাঁহার নাম ছিল। তিনি তখন ইংরেজীতে বীজগণিতের একখানি উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক



অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়

লিখিয়াছিলেন। পরে তিনি ছাত্রদের পাঠ্য কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যের সটীক ও সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হন। ছাত্রদের জন্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সব সংস্কৃত কাব্যের সটীক সংস্করণ বাহির হইত, অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়ের সংস্করণগুলি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ছাত্রদের মধ্যে সেগুলির খুব চলন হয়। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণেরও চর্চ্চা করিতেন। সিদ্ধান্তকৌমুদীর ইংরেজী সংস্করণের সন্ধিপ্রকরণের হস্তলিপি তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

ছাত্ররূপে এক বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া ও তাহাতে পারদর্শী হইয়া পরে অন্য বিদ্যায় মনোযোগ দেওয়ার দৃষ্টান্ত আরও আছে। যেমন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছাত্ররূপে বিজ্ঞানের চর্চ্চাই সমধিক করিয়াছিলেন, এবং রসায়নী বিদ্যাতে এম্-এ হইয়াছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের



অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়

ঐ শাখায় পারদর্শিতার জন্তই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি রক্ষিত হইবে রাসায়নিক বলিয়া নহে, সাহিত্যিক বলিয়া এবং দার্শনিক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের লেখক বলিয়াই ভবিষ্যৎ বংশের লোকে তাঁহাকে জানিবে।

সারদারঞ্জন যৌবনকালে ক্রিকেট খেলোয়াড় বলিয়া বিখ্যাত হন। প্রৌঢ় বয়সে, এমন কি বার্দ্ধক্যেও, তিনি ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। যুবকদের মধ্যে পুরুষোচিত খেলার প্রচলন ও উৎসাহদানের জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিজের দৃষ্টান্ত তাহার মধ্যে প্রধান। তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতাও ক্রিকেট খেলায় দক্ষ।

সারদারঞ্জন চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চ্চাও করিতেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাহিলে তিনি তাহা দিতেন।

তাঁহার প্রধান "বাতিক" ছিল মাছ ধরা। ছুটির সময় গিরিডি প্রভৃতি স্থানে এবং অন্য সময়ে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি মাছধরায় কখন কখন সমস্ত দিন কাটাইয়া দিতেন।

বিখ্যাত শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন।

—

আমেরিকা ও শাপুরজি সাক্লাথ্‌ওয়ালা

শাপুরজি সাক্লাথওয়ালা বোম্বাইয়ের একজন পারসী। তিনি বিলাত গিয়া তথাকার পার্লেমেণ্টের অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং বিলাতেই বাস করেন। তিনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন।

আমেরিকাতে ইণ্টারপার্লেমেণ্টারি য়ুনিয়ন্ নামক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে বিলাতী পার্লেমেণ্টের কয়েকজন সভ্য তাহাতে যোগ দিবার জন্য মনোনীত হন। সাক্লাথ্‌ওয়ালা তাহার মধ্যে একজন। কিন্তু আমেরিকার গবর্ন্মেণ্ট্ তাঁহাকে সে দেশে যাইতে দেন নাই। কারণ এই বলা হইয়াছে, যে, তিনি কম্যুনিস্ট্, হয়ত আমেরিকায় গিয়া কম্যুনিজম্ প্রচার করিবেন, ইত্যাদি। সাক্লাথওয়ালা বলেন, যে, তিনি আমেরিকায় কম্যুনিজম্ প্রচার করিতে যাইতেছেন না ও তাহা করিবেন না। তথাপি তাঁহার আমেরিকা-প্রবেশ নিষিদ্ধই আছে।

কম্যুনিস্ট্ দল রুশিয়াতে খুব পুরু। কম্যুনিস্ট্‌দের একটা মত এই, যে, কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত নয়; দেশের ও জাতীয় সব সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের সমান সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত; জাতির সকলের উপার্জ্জন সকলের মধ্যে বণ্টন করা উচিত; ইত্যাদি। এবম্বিধ মতের জন্য ধনী লোকেরা তাহাদের মতকে বড় ভয় করে।

মজার কথা এই, যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া সাক্লাথ্‌ওয়ালা দিন-রাত ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন, কাজ করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, পার্লেমেণ্টের সভ্য হইয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের গবর্ন্মেণ্ট্ ও সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয় নাই, ইংলণ্ড রসাতলে যায় নাই;

কিন্তু আশঙ্কা এই হইয়াছে, যে, আমেরিকায় তিনি কিছুদিন বাস করিয়া কয়েকটা কথা বলিলেই আমেরিকা টলমল করিবে এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর তাহাকে গ্রাস করিবে!

অনেকে প্রকাশ্যভাবে এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, যে, এই ব্যাপারের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাত আছে। ভারতীয় লোকদের মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যাহা সত্য কথা, তাহা আমেরিকায় যাহাতে প্রকাশিত



শাপুরজি সাক্লাৎওয়ালা ও তাঁহার পত্নী

ও প্রচারিত না হয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য সমুচিত চেষ্টা করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট তরফের কথা প্রচার ও গবর্ণমেণ্টের ওকালতি করিবার জন্য আমেরিকায় কতকগুলি ইংরেজ, আমেরিকান্ ও ভারতীয় লোক নিযুক্ত আছে। তাহাদিগকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা সম্ভবতঃ ভারতীয় রাজস্ব হইতেই গৃহীত। সাক্লাৎওয়ালা আমেরিকায় গিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে পাছে অনেক সত্য কথা বলিয়া ফেলেন, এই জন্য তাঁহার সেই দেশে যাওয়া বন্ধ করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবাঞ্ছনীয় মনে করিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার আমেরিকা গমন নিজে বন্ধ না করিয়া আমেরিকান্ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা করাইয়াছেন, এইরূপ সন্দেহ প্রকাশিত হইয়াছে।

এইরূপ সন্দেহ আমাদের মতে অমূলক নহে। কম্যুনিস্টদের মত আমেরিকায় অজ্ঞাত বা নূতন নহে, যে, সেখানে উহা প্রচারিত হইবামাত্র তথাকার গবর্ণমেণ্ট উল্টিয়া যাইবে এবং ব্যাঙ্ক, কারখানা প্রভৃতি লুটপাট হইবে। উহাদের প্রধান লীলাভূমি রুশিয়াতেও প্রভুত্বশক্তি সত্ত্বেও কম্যুনিস্টদিগকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানিয়া লইতে হইয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বিশ্বাস মানবপ্রকৃতির এমন মজ্জাগত যে, আপাততঃ কতকগুলি লোক সম্পত্তিসাম্য ও সাধারণ সম্পত্তিতে বিশ্বাসী হইলেও শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থাই টিকিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। অবশ্য যাহাদের শ্রমে ধন উৎপন্ন হয়, তাহারা বর্ত্তমান কালে পারিশ্রমিকরূপে উহার যে অংশ পায়, তাহা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরো বাড়িয়া ন্যায়ানুমোদিত হইবে, এবং অন্য নানাদিকেও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হইবে।

একবার একটি শিশু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার মাকে আসিয়া বলিতেছিল, "মা, মা, রাস্তা দিয়ে দুটো চোর নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম; ঠিক্ মানুষের মত!" সে বোধ হয় চোরদের ভীষণত্ব সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছিল; সেইজন্য মাকে তাহার আবিষ্কৃত এই তথ্য বিস্ময়ের সহিত জানাইতেছিল, যে, চোরেরা ঠিক মানুষের মত। কম্যুনিস্টরাও দেখিতে ঠিক্ মানুষের মত, সাক্লাৎওয়ালা ও তাঁহার পত্নীর ছবি দেখিলে এইরূপই মনে হয়।

—

আবার বোমা আবিষ্কার

২২শে কার্ত্তিক ৮ই নবেম্বর, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতিকে বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাখিবার বিরুদ্ধে খবরের কাগজে ও বহুজনাকীর্ণ সভায় তীব্র প্রতিবাদ হয়। এরূপ প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য। সুভাষবাবু প্রভৃতিকে হয়

গবর্ণমেণ্ট্ ছাড়িয়া দিউন, কিম্বা প্রকাশ্য আদালতে সাধারণ আইন অনুসারে তাঁহাদের বিচার হউক। আদালত ইংরেজদেরই প্রতিষ্ঠিত, আইন তাঁহারাই করিয়াছেন, এবং বিচারকেরা তাঁহাদেরই নিযুক্ত বেতনভোগী ভৃত্য; সুতরাং প্রকাশ্য বিচারে বন্দীদের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হইবেনা, বলা যাইতে পারে। প্রকাশ্য আদালতে বিচার করিবার বিপক্ষে একটা কথা রাজপুরুষেরা এই বলিয়াছিলেন, যে, বন্দীরা বিপ্লবী, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সাক্ষ্য দিতে কাহারও সাহস হইবে না, কেহ সেরূপ সাক্ষ্য দিলে বিপ্লবীরা তাহাকে খুন করিবার চেষ্টা করিবে, ইত্যাদি। বেঙ্গল আর্ডিন্যান্স্ প্রণয়ন করিবার সময় এই সব যুক্তি প্রদর্শিত হয়। ক্যালকাটা উইক্‌লি নোটস্ নামক আইনের কাগজ এবং পরে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী এই যুক্তি অমূলক বলিয়া প্রমাণ করেন।

অতএব দেশবাসী অন্য সকলের সহিত আমরাও বলিতেছি, গবর্ন্মেণ্ট্ হয় সুভাষবাবু প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিউন, নতুবা প্রকাশ্য আদালতে সাধারণ আইন-অনুসারে তাঁহাদের বিচার করুন।

অতীত কালের ইতিহাসে ও সমসাময়িক ইতিহাসে অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ঘটনাচক্র জিনিষটা এমনি, যে, একটা ঘটনার জবাব আর একটা ঘটনা দেয়। জবাবী ঘটনার মধ্যে মানুষের কোন কারসাজি আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া আগে হইতে বলা যায় না, অনুমান করিয়া লইতে হয়। এই অনুমান কখন কখন পরে সত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়া যায়। যেমন মেদিনীপুরের ষড়যন্ত্র মামলায় প্রমাণ হইয়াছিল, যে পুলিসের চর এক অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ীতে যুদ্ধোপকরণ রাখিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, এখন প্রথম ঘটনা ও জবাবী ঘটনার কথা বলি। প্রথম ঘটনা হইতেছে বিনা বিচারে বন্দীকরণের বিরুদ্ধে ২২শে কার্ত্তিক সর্ব্বসাধারণের প্রতিবাদ; জবাবী ঘটনা ঠিক "ফেরত ডাকে" ("বাই রিটার্ন্ অব্ পোস্ট্") আসিল ২৪শে কার্ত্তিক। সেই দিন পুলিস খানাতল্লাসী করিয়া দক্ষিণেশ্বরে নয়জন যুবককে, একটি জ্যান্ত ("লাইভ") বোমাকে, কিছু বন্দুক ও কার্তুজকে, এবং কিছু নাইট্রিক য়্যাসিড্‌কে গেপ্তার করেন। কলিকাতাতেও কোন কোন স্থানে খানাতল্লাসী করিয়া কিছু মানুষ ও বমাল পাওয়া গিয়াছে।

যদি বলেন, ইহাকে জবাবী ঘটনা কেন বল? বলি এই জন্য। সুভাষবাবু প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিবার যে দাবী দেশের লোকে করিতেছে, তাহার মূলে এই যুক্তি আছে বলিয়া সরকার অনুমান করিতেছেন, যে, দেশে বিপ্লবাদ নাই, এবং বিপ্লবের আয়োজনও কিছু নাই, অতএব সন্দেহে ধৃত বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। জবাবী ঘটনাটি বলিতেছে, "এই দেখ বিপ্লবীদের জ্যান্ত বোমা, এই দেখ বিপ্লবীদের রিভল্‌ভার, এই দেখ তাহাদের কার্তুজ, এই দেখ বোমা তৈরী করিবার এসিড ও অন্যান্য মালমশলা;—এবং, যদি ইহাতেও বিশ্বাস না হয়, এই দেখ খোদ নয়জন বিপ্লবী! তাহারা বেশ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল, এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজন এরূপ পীড়িত ছিল, যে, গ্রেপ্তারকালে ডাক্তার ডাকিতে হইয়াছিল ও তাহাদিগকে এম্বুল্যান্স্ করিয়া যথাস্থানে পাঠাইতে হইয়াছিল; ইহাতে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে, যে, তাহারা অতি ভয়ানক ও দুর্দ্দর্ষ বিপ্লবী।" বোমাটি বাস্তবিক খাটি বোমা কি না এবং জ্যান্ত কি না, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিলে, পুলিস্ নিশ্চয়ই তাহাকে উহা নির্জ্জন প্রান্তরে ফাটাইয়া দেখিয়া নিজের প্রাণবধ করিবার অনুমতি দিবেন।

খানাতল্লাসী ও তাহার ফলকে জবাবী ঘটনা আরও একটা কারণে বলিতে পারা যায়। যৎকালে সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি বন্দীকৃত হন, তখন দেশের যত দুষ্ট সম্পাদক ও অন্য দুষ্ট লোকে বলিয়াছিল, সুভাষবাবুরা যে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার অস্ত্রশস্ত্র কোথায়? বাংলাদেশের রাজধানীতে ও মফঃস্বলের নানাস্থানে খানাতল্লাসী করিয়া কোথাও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় নাই। জবাবী ঘটনা মহাশয় এত দিন পরে বলিতেছেন, "এই দেখ অস্ত্র, আর এই দেখ শস্ত্র।" কিন্তু দুষ্ট লোকেরা এখনও ভয়ে-ভয়ে বলিতে পারে, "হুজুর জবাবী ঘটনা, আপনার দরবারে অধীন মক্কেলের আর্জি

এই, যে, প্রবলপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকারকে হায়রান পরেশান করিবার নিমিত্ত একটা বোমা, কয়েকটা বন্দুক, কয়েকটা কার্তুজ ও কিছু এসিড কি যথেষ্ট? পঞ্জাবে বোমা ছুড়িয়া দস্যুতা অল্প দিন পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা বিপ্লবীদের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অতএব বন্দা কহে, আপনার সহচর আর এক জবাবী ঘটনার প্রয়োজন যাহাতে আরও বেশী বোমা গ্রেপ্তার হইবে। অরাজনৈতিক সাধারণ গুণ্ডা ও ডাকাতদের নিকট, খানাতল্লাসীতে গ্রেপ্তারীকৃত রিভলভার ও কার্তুজ অপেক্ষা, ঐরূপ জিনিষ অনেক বেশী আছে। কিন্তু তাহারা বিপ্লবী বলিয়া রাজসম্মান লাভ করে না। সায়েন্স কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশ-চার্চেজ কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, স্যাকরাদের দোকান, গিল্টিকারীদের দোকান, ইংরেজদের দোকান, প্রভৃতি খানাতল্লাসী করিলে নানারকম এসিড্ আরও অধিকপরিমাণে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, এইসকল স্থান বিপ্লবীদের আড্ডা নহে।"

যাহারা কয়েকটা বোমা, রিভলভার প্রভৃতির দ্বারা দেশকে স্বাধীন করিতে কিম্বা ইংরেজের পিলে চম্‌কাইয়া দিতে চায়, এরূপ বুদ্ধিমান্ লোক বাংলাদেশে একেবারেই নাই, জোর করিয়া বলা যায় না। দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে যে প্রকার যুদ্ধের আয়োজন আবশ্যক, তাহা ইতিহাসে লেখা আছে; বঙ্গের সত্যিকার বিপ্লবীরা সেরূপ কোন আয়োজন করিতে পারেন নাই। তবে যদি ইংরেজের পিলে চম্‌কাইতে কেহ চান, তাঁহাকে আগে প্রমাণ করিতে হইবে, যে, ইংরেজদের পিলে আছে। কেননা, দেখা যাইতেছে, এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত লোক পিলে ফাটিয়া মরিয়াছে, তাহারা সবাই দেশী আদ্‌মী; গোরা নয়, ফিরিঙ্গীও নয়।

কতিপয় বোমা রিভলভারাদি দ্বারা দেশ-উদ্ধার-প্রয়াসী বুদ্ধিমান্ লোকের অস্তিত্ব বঙ্গে যেমন অসম্ভব নহে, তেমনি কিছু "বিবেচনা" করিলে, বিপ্লবচেষ্টা কিম্বা অস্ত্রশস্ত্র বা বিস্ফোরক পদার্থ রক্ষা অপরাধে জেলে যাইতে প্রস্তুত বেকার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ভাড়াটিয়া "ভদ্রলোক" বাংলা দেশে পাওয়াও অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারের লোকের অস্তিত্ব অপেক্ষা শেষোক্তপ্রকার লোকের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বেশী। যদি সরকারের কোন দোস্ত্ বেকার-সমস্যার এই সমাধান আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তারিফ অপেক্ষাও দামী আর কিছু জিনিষ পাইবার উপযুক্ত।

যাহা হউক, পুলিস্ লোককে যাহা বিশ্বাস করাইতে চান, আমরা সেই বিপ্লবপ্রয়াসের ও বিপ্লবীদের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াও কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যখন অনেক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করিয়া অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করেন, তখন বাস্তবিকই এমন একজন মাথা-ওয়ালা লোককে পাক্‌ড়াও করা হয় যিনি পৃথিবীর মনীষীদের মধ্যে গণিত হইবার যোগ্য। যাহা হউক, তিনি বিচারে খালাস পাইলেন। তাহার পর যদিও তিনি অনেক দিন ব্রিটিশশাসিত ভারতে ছিলেন, তথাপি বিপ্লবী বলিয়া আর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। তৎপরে তিনি বহু বৎসর ফরাসীর অধিকৃত পণ্ডিচেরীতে বাস করিতেছেন। তিনি সেখান হইতে বিপ্লবের ষড়যন্ত্র চালাইতেছেন, ইহা এখন ইংরেজরাও কল্পনা করে না; করিলে মিত্রশক্তি ফ্রান্সের সাহায্যে তাঁহাকে কবলিত করিবার চেষ্টা হইত।

অরবিন্দের পর যাঁহারা বিপ্লব-অপরাধে ধৃত হইয়াছেন, পরে পরে তাঁহাদের নাম করিয়া তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার আপেক্ষিক বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বক্তব্য কেবল এই, যে, তিনি যদি সত্য-সত্যই একদা বিপ্লব-চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং যদি তাঁহার পরেও অন্যান্য অনেকে সেই চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, যে, তাঁহার মত লোকের নেতৃত্বের অভাবেও এবং অনেকের প্রাণদণ্ড ও নির্ব্বাসন-দণ্ডাদি হওয়া সত্ত্বেও, বিপ্লব-চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের কথা বলি। যখন সুভাষচন্দ্র বসুপ্রমুখ লোকেরা ধৃত হইলেন, স্বীকার করিতে হইবে, যে, তখনও দেশের কয়েকজন মান্যগণ্য ও বুদ্ধিমান্ লোক ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণ্‌মেণ্টেরই পুলিস্ বিভাগের কার্য্য হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, সেরূপ নামজাদা লোকদের বন্দীকরণেও বিপ্লব-চেষ্টা থামে নাই, এখনও উহা চলিতেছে, এখনও লোকে বোমা তৈরী,

রিভল্‌ভার সংগ্রহ প্রভৃতি করিতেছে। কাহারা করিতেছে? নামজাদা, নেতৃস্থানীয়, সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ লোকেরা নহে, এমন কতকগুলি লোক যাহাদের নামও কেহ কখনও শুনে নাই। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত ইহাই করিতে হয়, যে, বঙ্গের বিপ্লববাদ এমন-একটা জিনিষ যাহা নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে আটক করিয়া রাখিলেও নির্মূল হয় না; উহা তাঁহাদের চেয়ে নিম্নতর ও অধিকতর সংখ্যাবহুল স্তরের লোকদের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইহার উত্তরে অবশ্য গবর্ণ্‌মেণ্ট বলিতে পারেন, যে, যথেষ্টসংখ্যক বিপ্লবী ধৃত হয় নাই, যথেষ্ট ধৃত হইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা বলি, এই যুক্তির অন্ত কখনও পাওয়া যাইবে না। যতবার সরকার বিপ্লবী পাকড়াও করিবেন, ততবারই কিছু বিপ্লবী অধৃত থাকিয়া যাইবে ও তাহাদের দ্বারা বিপ্লববাদ প্রচারিত ও বিপ্লবচেষ্টা সংরক্ষিত হইবে। দেশের লোক যতবারই বলিবে, ধরপাকড় শাস্তি দ্বারা এরোগের প্রতিকার হইবে না, ততবারই সরকার বলিবেন, আরও কতকগুলা লোককে ধরিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

আমরা অপরাধীর শাস্তির বিরোধী নহি। কিন্তু অপরাধের উৎপত্তি যাহা হইতে হয়, সেই কারণ ও অবস্থা-নিচয়ের উচ্ছেদকেই প্রকৃত প্রতিকার মনে করি। ম্যালেরিয়ার বিষবাহী মশা দেখিলেই মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা মন্দ নহে; কিন্তু সে উপায়ে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ হইতে পারে না। যে-যে রকম জায়গায় যে-যে কারণে মশা জন্মে, তাহা আবিষ্কার করিয়া, জায়গাগুলার দোষ দূরীকরণ ও কারণগুলার বিনাশই প্রকৃত প্রতিকার।

অবশ্য ইহা একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা মাত্র। নতুবা বস্তুতঃ স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ম্যালেরিয়ার মত একটা ব্যাধি নহে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও বলা দরকার, যে, স্বাধীন হইবার জন্য ধর্ম্মসঙ্গত বা অবৈধ সব-রকম চেষ্টাই প্রশংসনীয় নহে। কোন-কোন রকমের চেষ্টা মানসিক বিকার-প্রসূত।

পুলিসকর্ত্তৃক বোমার আবিষ্কার প্রভৃতি উপলক্ষে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের বেতনভোগী ভারতীয় লেখক ১৬ই তারিখের ঐ কাগজে কতকগুলি প্যারাগ্রাফ লিখিয়াছেন। এতদ্বিষয়ক প্রথম প্যারাগ্রাফটি-সম্বন্ধে আমাদের বেশী-কিছু বক্তব্য নাই। কেবল এইটুকু বলিব, যে, একদিকে যেমন ইহা নিশ্চিত ধরিয়া লওয়া উচিত নহে, যে, পুলিসের চরেরাই কোন উপায়ে আবিষ্কারস্থলে বোমা প্রভৃতি রাখিয়াছিল, তেমনি উক্ত লেখকের মত ইহাও ধরিয়া লওয়া উচিত নয়, যে, পুলিসের বা তাহাদের চরদের ইহাতে কোন হাত ছিল না এবং তাহারা বা চরেরা পূর্ব্বে এ বিষয়ের খবর জানিত না, পরে পুলিস খবর পাইয়া খানাতল্লাসী দ্বারা জিনিষগুলি আবিষ্কার করিল।

পরবর্ত্তী প্যারাগ্রাফগুলিতে লেখক বলিতেছেন, এরূপ ইঙ্গিত অনেকে করিতেছেন, যে, সরকারী চরেরাই বোমা প্রভৃতি কোন-কোন স্থানে রাখিয়া দিয়া পরে পুলিসকে খবর দিয়া ধরাইয়া দিয়াছে। সে-সম্বন্ধে লেখক বলেন, এখনও ত গবর্ণ্‌মেণ্টই দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু আছেন এবং যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহা হইলে সোজাসুজি সন্দেহভাজন লোকদিগকে ধরিয়া সাজা না দিয়া গবর্ণমেণ্ট এরূপ কুটিল বাঁকা নীচ উপায় কেন অবলম্বন করিবেন? ইহার পর লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কথার উত্তর রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Internments and deportations without trial are very bad things in themselves, and not only the Indians of all shades of opinion, but even a large number of foreigners, have condemned this method, and yet the Government did not hesitate to incur the unpopularity almost all over the civilised world, by having recourse to such a method. One, therefore, fails to realize why Government should set up an agency to place bombs in the houses of those by interning whom ultimately they are bound to incur unpopularity in the end. At least no sane person would do so and it has not yet been proved that the Government of Bengal is composed entirely of *insane* persons."

তাৎপর্য্য। "বিনা বিচারে অন্তরায়ন ও নির্ব্বাসন বড় মন্দ জিনিষ, এবং শুধু সব রকম রাজনৈতিক মতের ভারতীয়েরা নহে, বহুসংখ্যক বিদেশীও এই প্রণালীর নিন্দা করিয়াছে; তথাপি এই উপায় অবলম্বন দ্বারা প্রায় সমগ্র সভ্যজগতের বিরাগভাজন হইতে গবর্মেণ্ট দ্বিধা বোধ করেন নাই। অতএব ইহা উপলব্ধি করা যায় না, যে, যাহাদিগকে অন্তরায়িত করিয়া গবর্মেণ্টকে পরিণামে অপ্রিয় হইতেই হইবে, তাহাদের বাড়ীতে বোমা স্থাপন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট কেন লোক নিযুক্ত করিবেন। অন্ততঃ কোন সুস্থমস্তিষ্ক লোক এরূপ করিবে না, এবং ইহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই, যে, বাংলা গবর্মেণ্ট সম্পূর্ণরূপে পাগল লোকদের দ্বারা গঠিত।"

লেখক কি বলিতে চান, যে, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও

অংশতঃ বাংলা গবর্ণমেন্ট পাগল লোকদের দ্বারা গঠিত? আমরা কিন্তু উক্ত মহামান্য বাংলা গবর্ণমেন্টের এরূপ কোন বদনাম রটাইতে অসমর্থ। আরও একটা কথা লেখককে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। তিনি কেমন করিয়া জানিলেন, ধৃত লোকদিগকে পরিণামে সরকার অন্তরায়িত করিবেনই? পুলিশ কি তাঁহাকে সরকারের মনের কথা বলিয়াছে?

যাহাদিগকে অন্তরায়িত করিয়া গবর্ণমেন্টকে পরিণামে সভ্য জগতের বিরাগভাজন হইতেই হইবে, তাহাদের বাড়ীতে বোমা স্থাপন সরকার করাইয়াছেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে বোমা আবিষ্কৃত হইলে এবং তাহার পর তাহারা অন্তরায়িত বা নির্ব্বাসিত হইলে, সভ্য জগৎ (অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয় লোকদের প্রভু কিম্বা প্রভুত্বলিপ্সু পাশ্চাত্য জাতিরা) অনুমান করিবে, যে, লোকগুলা খুব সম্ভবতঃ দোষী ছিল; কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে কোন অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত না হইলে অন্য লোকদের তাহাদের অপরাধ-সম্বন্ধে সন্দেহ ত থাকিবেই, এমন-কি তথাকথিত সভ্য জগতেরও সন্দেহ থাকিবে। খানাতল্লাসী-দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র না পাওয়াসত্ত্বেও কাহাকেও বন্দী করিলে গবর্ণমেন্টকে সভ্য জগতের যতটা নিন্দা ও বিরাগভাজন হইতে হয়, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলে ততটা হয় না। সুতরাং আশা করি, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের লেখক বুঝিতে পারিবেন, কাহারও বাড়ীতে সরকারের বন্ধুদের দ্বারা বোমা স্থাপনের কারণ যথেষ্ট থাকিতে পারে—যদিও সত্যসত্যই বক্ষ্যমান ঘটনায় কেহ তাহা করিয়াছিল কিনা আমরা জানি না।

লেখক অতঃপর লিখিয়াছেন, যে, দেশভক্ত বাঙালীরা নিশ্চয়ই এই দাবী করিবেন না, যে, বাংলাদেশ রাজনৈতিক চেষ্টায় অন্য-সব প্রদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে এবং বাঙালী যুবকেরা স্বরাজ-লাভের এতটা কাছাকাছি আসিয়াছে, যে, তাহারা সেই কারণে সরকারের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং লেখক বলিতে চান, অন্য-সব প্রদেশে যখন গবর্ণমেন্ট বোমা স্থাপনাদি করান না, তখন বঙ্গে কেন করাইবেন? এই জন্য লেখক লিখিয়াছেন:—

"Mahatma Gandhi is the strongest opponent of the present system of the bureaucratic Government and Pundit Motilal Nehru is now going round the country openly inciting the people to practise civil disobedience. Yet there is no house search, no arrest, no placing of bombs in the houses of patriots either in the Bombay Presidency or in the United Provinces."

তাৎপর্য্য। "মহাত্মা গান্ধী বর্ত্তমান আমলাতন্ত্রের প্রবলতম বিরোধী এবং পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্‌রু নিরস্ত্র আইন অমান্য করিবার নিমিত্ত সমগ্র দেশকে প্রকাশ্যভাবে উত্তেজিত করিয়া বেড়াইতেছেন। অথচ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কিম্বা আগ্রা-অযোধ্যাপ্রদেশে দেশ-সেবকদের বাড়ী খানা-তল্লাসী, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার এবং তাহাদের বাড়ীতে বোমা স্থাপন করা হয় না।"

প্রথমতঃ, এই কথাটা মিথ্যা, যে, অন্য-কোন প্রদেশে দেশসেবকদের বাড়ী খানাতল্লাসী বা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না। লক্ষ্ণৌয়ের নিকট কাকোরীর ট্রেন-ডাকাতি উপলক্ষ করিয়া অনেক কংগ্রেস্ সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ঘর তল্লাস করাও হইয়াছে। বোমা আবিষ্কারটা হয় নাই বটে; তাহার কারণ সম্ভবতঃ ইহা হইতে পারে, যে, একই প্রণালী সব জায়গার উপযোগী নহে।—কিন্তু যুক্ত প্রদেশে কার্ত্তুজ ও রিভল্‌ভার স্থাপন ও আবিষ্কারের নিম্নলিখিত প্রমাণটি "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ঝাঁসীর জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল শর্ম্মা ঝাঁসীর সেসন জজের বিচারে অস্ত্র আইনের ধারায় ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আপীলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। গত ৩১শে মে তারিখে পুলিশ হঠাৎ ঝাঁসী কংগ্রেস কমিটির কার্য্যালয় খানাতল্লাস করিয়া একটি রিভলভার ও ৬৪টী কার্ত্তুজ পায়। ঐগুলি একখানা খবরের কাগজে জড়াইয়া রান্নাঘরে ডালের হাঁড়ির মধ্যে রাখা হইয়াছিল। রান্নাঘর কংগ্রেস কার্য্যালয়ের সংসৃষ্ট হইলেও তাহা বাহিরের নানা লোকে ব্যবহার করিত। খানাতল্লাসীর সময়ে পণ্ডিত কৃষ্ণগোপাল ছিলেন না। তবুও তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হয়; কেননা কংগ্রেস কার্য্যালয়ের বাড়ী তাঁহার নামেই ভাড়া করা ছিল। এই সামান্য সূত্র ধরিয়া সেসন জজ পণ্ডিত কৃষ্ণগোপালকে আঠার মাসের জন্য জেলে পাঠাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ বোধ হয় সেসন জজের মত অতখানি সূক্ষ্মবুদ্ধি নহেন। কাজেই তিনি পণ্ডিত কৃষ্ণলালকে সসম্মানে মুক্তি দিয়াছেন। পণ্ডিতজীর ভাগ্যের জোর বলিতে হইবে। ঝাঁসীর ব্যাপারের মতো আরো অনেকক্ষেত্রেই যে পুলিশ রিভলভার, কার্ত্তুজ প্রভৃতি রহস্যময় উপায়ে আবিষ্কার করে না, তাহা কে বলিতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশ রাজনৈতিক কর্ম্মিষ্ঠতাতে অগ্রসরতম হউক বা না হউক, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যাধির চিকিৎসা সরকার কেন অন্য-সকল প্রদেশ হইতে

একটু স্বতন্ত্র রকমের করিতে চাহিতে পারেন, তাহার কিছু আভাস গত ২২শে জুন তারিখের লণ্ডন্ টাইম্‌সের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়। উহা বঙ্গে দ্বৈরাজ্য বা ডায়ার্কির তিরোভাব সম্বন্ধে। উহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"The fact is that Bengal differs more from most other Indian provinces than they differ from one another. Economic, temperamental and social causes account for this difference. Caste is less powerful: a common literary language unites over forty million Bengalis. Even the Moslem community, who form a narrow majority of the population, are indisputably less divided both socially and politically from their Hindu countrymen than they are in other parts of India. The Bengali temperament, at once calculating and emotional, critical and enthusiastic, baffles other Indians almost as much as it puzzles British administrators. There have been periods when Bengal has led Indian nationalism. But this leadership has been temporary. The disappearance of Mr. Das, the rapidity with which other provinces are gaining ground educationally at the expense of what once seemed a Bengali monopoly, and the growth of "communal" feeling throughout India may to some extent isolate the Nationalism of Bengal from the main current of Indian politics."

তাৎপর্য্য। "বাস্তবিক কথা এই, যে, অন্যসব প্রদেশ পরস্পর যতটা পৃথক, বাংলাদেশ তাহাদের সবগুলি হইতে তার চেয়ে বেশী পৃথক্। আর্থিক, সামাজিক এবং মনোভাবজনিত কারণে এই প্রভেদ ঘটিয়াছে। বঙ্গে জাতিভেদ তত প্রবল নয়; এক সাধারণ ভাষা চার কোটির উপর বাঙালীকে সম্মিলিত করিয়াছে। এমন কি বঙ্গে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য নিশ্চয়ই অন্যত্র অপেক্ষা কম। বাঙালীর ধাত বোঝা যেমন ব্রিটিশ শাসকদের প্রায় তেমনি অন্য ভারতীয়দের পক্ষেও বড়ই কঠিন। কোন কোন সময়ে বাংলাদেশ ভারতীয় স্বাজাতিকতার অগ্রণী হইয়াছিল। কিন্তু এই নেতৃত্ব অল্পক স্থায়ী হইয়াছিল। বঙ্গের স্বাজাতিকতা যে ভারতীয় রাজনীতির মূল ও প্রধান স্রোত হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে, তাহার কারণ মিঃ সি আর্ দাশের মৃত্যু, শিক্ষা-বিস্তার ক্ষেত্রে অন্য সব প্রদেশের দ্রুতবেগে বঙ্গের সমকক্ষতা লাভ, এবং সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বৃদ্ধি।"

রাজনীতিতে যে বাংলাদেশের সহিত ভারতের অবশিষ্ট অংশের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে, এই সম্ভাবনায় টাইম্‌সের মুখ হইয়াছে, এবং এসব বিষয়ে ঐ কাগজ ভারতের শাসনযন্ত্র-পরিচালক লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া আফিসের মুখপত্র। বাংলাদেশ ঘটনাচক্রে ও নানা অবস্থার সমাবেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে "একঘরে" হইবে এই ভাবিয়া যদি আমলাতন্ত্র খুশী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঈপ্সিত সেই সুফলটা যাহাতে নিশ্চয় ও শীঘ্র ফলে, তাহার নিমিত্ত বঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় মনে করা আমলাতন্ত্রের পক্ষে অসম্ভব নহে।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের লেখক ধরিয়া লইয়াছেন, যে, ধৃত যুবকেরা দেশভক্ত দেশসেবক এবং স্বরাজ্য দলের কিম্বা কংগ্রেসের কাজ করিতেছেন। এরূপ মনে করিবার কারণ কি? দেশভক্তি, স্বরাজ্য-দল ও কংগ্রেসকে লোক-চক্ষে হেয় করিবার জন্য কি এইরূপ বলা হইয়াছে?

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের লেখকের কথার সমালোচনা এই জন্য করিলাম যে, তিনি পুলিস ও গবর্ণমেণ্টের ওকালতি করিয়াছেন এবং সম্ভবত সরকারী কৈফিয়ৎ তাঁহার কলম দিয়া বাহির হইয়াছে। নতুবা ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার নিজের কথার সমালোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না।

—

নারীর উপর অত্যাচার

নারীর উপর অত্যাচার কেবল যে বঙ্গের—প্রধানতঃ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের—পল্লীগ্রাম অঞ্চলে হইতেছে তাহা নহে, দিনে-দুপুরে কলিকাতা সহরেও হইতেছে। এই অবস্থা যেমন লজ্জাকর, তেমনি শোচনীয়। সেদিন প্রমথ-নাথ হালদার-নামক এক ভদ্রলোকের পনর বৎসর বয়স্কা কন্যাকে কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা তাহার পিতাকে জখম করিয়া রাস্তা হইতে গাড়ী করিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। গুণ্ডাদের সহায়ক বলিয়া অভিযুক্ত এক পশ্চিমা স্ত্রীলোক ও একজন মিঠাইয়ের দোকান-ওয়ালা ধৃত হইয়াছে। একজন মুসলমান রিক্‌শা-ওয়ালা (মানুষ-টানা-গাড়ীওয়ালা) ও তাহার তিন সহচর আরোহী একজন ভদ্রমহিলাকে বলাৎকার করার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়াছে।

মফঃস্বলের ও কলিকাতার ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের জানা উচিত, যে, সকল সম্প্রদায়ের সব রিক্‌শা-ওয়ালা সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। নিতান্ত অসম্ভব না হইলে মহিলারা যেন চেনা লোক দেখিয়া তবে তাহাদের যানে আরোহণ করেন।

—

আগামী বড়লাট

আগামী বড়লাট মিস্টার্ উড্ যে বিলাতের একজন প্রথম শ্রেণীর লোক নহেন, তাহা ইংরেজদের লেখা কাগজগুলার প্রশংসাসত্ত্বেও বুঝা যায়। আগেকার প্রত্যেক

বড়লাটই যে স্বদেশে প্রথম শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু ইংলণ্ড ভারতবর্ষের কাজের জন্ত সেরা সেরা লোক পাঠান, এইরূপ কথা মধ্যে-মধ্যে ইংরেজদের মুখে শোনা যায় ও কাগজে দেখা যায়। সেইজন্ত কথাটা বলিতে হইল। বিলাতী কাগজে দেখা যাইতেছে, যে, মিঃ উড্ ধার্ম্মিক, দয়ালু, সহানুভূতিসম্পন্ন, জাত্যভিমান ও জাতিবিদ্বেষ-বিহীন, বিদ্বান লোক; তাঁহার মনের ভাব অনেকটা লর্ড ক্যানিঙের মত। ভারতবর্ষে তিনি তাঁহার কাজে তাঁহার এই সকল গুণের পরিচয় দিতে পারিলে তিনি পুণ্যবান হইবেন ও প্রশংসা পাইবেন। আগে হইতে কিছু বলা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা ভারতের বড়লাট হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সবাই ব্যক্তিগত ভাবে মন্দ লোক ছিলেন না; কেহ-কেহ ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য-পূজা এবং ভারত-শাসন যন্ত্রটিই এমন, যে, কেহ ভাল লোক হইলেও ভারতবর্ষের বিশেষ কিছু কল্যাণ করিতে পারেন নাই। খুব শক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, কৌশলী ও ভারতহিতৈষী কেহ যদি বড়লাট হইয়া আসেন, এবং স্বজাতির বিরাগভাজন হওয়াকে অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে ভারতের কোন কল্যাণই করিতে পারেন না, এমন নয়। কিন্তু এমন মানুষ দুর্লভ।

বিলাতী কাগজগুলা আগেই বলিয়াছিল এবং তাহার পর ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডুইন্ বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ প্রধানতঃ গ্রামের দেশ এবং উহার অধিকাংশ লোকের নির্ভর চাষের উপর; মিঃ উড্ চাষ-ঘটিত প্রশ্ন খুব ভাল বুঝেন, সুতরাং যদিও ভারতের কৃষি-সমস্তা ইংলণ্ডের সমস্তা হইতে গভীরভাবে পৃথক্, তথাপি তিনি ভারতীয় কৃষিজীবীদের আন্তরিক দরদী হইয়া ভারতীয় সমস্যাগুলির সমাধান-চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

ব্রিটিশ রাজত্ব-কালের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র কৃষিপ্রধান দেশ ছিল না। ভারতীয়েরা যেমন কৃষি দ্বারা আপনাদের অন্নের জোগাড় করিত, তেমনি নানা পণ্যশিল্পের দ্বারা অন্ত সব আবশ্যক জিনিষের অভাবও পূর্ণ করিত। ইহার বেশী প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা সুবিদিত তথ্য। কেবল ঐতিহাসিক ডাক্তার রবার্টসনের কয়েকটি বাক্য তৎপ্রণীত "এ ডিস্‌কুইজিশন্ কন্সার্ণিং ইণ্ডিয়া" নামক বহি হইতে নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"In all ages gold and silver, particularly the latter, have been the commodities exported with the greatest profit to India. In no part of the earth do the natives depend so little upon foreign countries, either for the necessaries or the luxuries of life. The blessing of a favourable climate and a fertile soil, augmented by their own ingenuity, afford them whatever they desire."

তাৎপর্য্য। "সকল যুগে, সোনা ও রূপা, বিশেষতঃ রূপা, খুব লাভের সহিত ভারতে রপ্তানী হইয়া আসিয়াছে। (অর্থাৎ ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ে পাইবার জন্ত বিদেশীরা এদেশে সোনা ও রূপা চালান করিত।) জীবনধারণের নিমিত্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের জন্ত পৃথিবীর কোন অংশের লোকই ভারতীয়দের মত বিদেশের উপর এত অল্প নির্ভর করে। অনুকূল জলবায়ু এবং উর্ব্বরা ভূমি তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যের সহযোগে তাহারা যাহা কিছু চায় তাহাই তাহাদিগকে প্রদান করে।"

ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতের নানা পণ্যশিল্প লুপ্ত বা প্রায়-লুপ্ত হওয়ায় যাহারা পূর্ব্বে পণ্যশিল্পের কিম্বা কৃষি ও পণ্যশিল্প উভয়ের উপর নির্ভর করিত, তাহাদিগকে হয় কেবল জমীর উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে কিম্বা সাধারণ কুলি-মজুরের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। তাহাতে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের জমী যত লোককে সুস্থ সবল অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তাহা অপেক্ষা বেশী লোক উহার উপর নির্ভর করিতেছে। তাহার উপর আবার নানা খাদ্যশস্তের বিদেশে প্রভূত চালান আছে। ফলে ভারতবর্ষের অনেক কোটি লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অতএব ভারতবর্ষের অনশন ও অর্দ্ধাশন দূর করিতে হইলে শুধু কৃষির দ্বারা তাহা হইবার সম্ভাবনা কম। তাহার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে। সুতরাং কৃষির প্রতি যাঁহার মন চিরকাল আকৃষ্ট হইয়াছে, শুধু এই রকম একজন লোকের দ্বারা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য-সমস্তার সমাধান হইতে পারে না।

"হইতে পারে না" বলাটা হয়ত একেবারে নির্ভুল কথা নয়। ভারতের কৃষিজীবীদের অধিকাংশ যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে চাষ করে, তাহাতে এদেশে জাপানের

মত অল্প জমী হইতে অনেক ফসল ও বৎসরে অনেকবার ফসল আদায় করিবার (ইন্টেন্সিভ্) প্রথা অবলম্বন করিতে পারিলে হয়ত সুফল ফলিতে পারে। জাপানেও ভারতবর্ষের মত আদিম ও সেকেলে কৃষিযন্ত্রের দ্বারা চাষ হয় এবং তথাকার লোকেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে চাষ করে। অতএব কেবল কৃষির সাহায্যেই ভারতবর্ষকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতে হইলে ইংলণ্ড হইতে কৃষি-অনুরাগী ব্যক্তি আমদানী না করিয়া জাপান হইতে করিলে ভাল হয়—অবশ্য যদি আমদানী করিতেই হয়। আমাদের মতে ভারতের লোকদিগকে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনমত এদেশী ও বিদেশী কৃষিবিদ্যালয়ে পাঠাইলেই যথেষ্ট ফল ফলিতে পারে। ইংলণ্ডের চাষের ব্যবস্থাই অন্য রকমের। সেখানে কৃষিজীবী গৃহস্থেরা অপেক্ষাকৃত বড় বড় ভূমিখণ্ড লইয়া চাষ করে;—যথা চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়া বলিতেছেন :—

The charactoristic feature of agriculture in Great Britain is that it is for the most part carried on by tenant-farmers holding comparatively large farms……

তা ছাড়া, ইহাও জানা কথা এবং ঐ বহিতেই দেখিতেছি, যে, কৃষিবিদ্যার উন্নতি বিলাতে বেশী হয় নাই; এবং আমেরিকায় ও ইউরোপের মহাদেশস্থ দেশসমূহে কৃষিবিষয়ক গবেষণায় যত মন দেওয়া হইয়াছে, বিলাতে তাহা দেওয়া হয় নাই। বিলাতের লোককে খাদ্যশস্য বাহির হইতে খুব বেশী পরিমাণে আমদানী করিতে হয়। সুতরাং কৃষিবিৎ আমদানী করিতে হইলে আমেরিকা হইতে বা ইউরোপের মহাদেশ হইতে আমদানী করাই বাঞ্ছনীয়। ইহাও মনে রাখা দরকার, যে, বড়লাটকে বেতন রাহাখরচ অতিথিসৎকার প্রভৃতি বাবতে যত লক্ষ টাকা দিতে হয়, তত হাজার টাকা দিলেই একজন ভাল কৃষিবিৎ পাওয়া যাইতে পারে। যাহা সস্তায় হয়, তাহার জন্য এত বেশী খরচ করিবার কি প্রয়োজন?

ভারতবর্ষের গ্রাম সকলের উন্নতির জন্য যাহা করিতে হইবে, তাহার তত্ত্ব গুহানিহিত এমন কিছু নয় যে তাহা দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন ছার? কৃষির উন্নতির সমস্যাটি স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষারবিস্তার সমস্যাদ্বয়ের সহিত এবং গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি সমস্যার সহিত, সমাধানের জন্য, পরস্পরনির্ভরশীল। ভাবী বড় লাট উড সাহেব বিলাতে শিক্ষাবোর্ডের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীও ছিলেন বটে। কিন্তু তাহা হইলেই ত হইবে না। ভারতের রাজস্ব প্রধানতঃ যুদ্ধ ও যুদ্ধায়োজনের জন্য ব্যয় না করিয়া সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের হিতসাধনে নিয়োগ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা চাই। শুধু কথায় চিঁড়া ভিজিবে না। মাছের তেলে মাছ ভাজিবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ বিংশ শতাব্দীতে হয় হয় নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও হয় নাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হইয়াছে। এত দিন পরে ইংরেজের ঠাওর হইল, যে, ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর সংখ্যা অনেক বেশী এবং তাহাদের জন্য কিছু করিতে হইবে। ইংরেজদের ঘুমটা সচরাচর অধীনস্থ বিদেশীদের উপকার করিবার নিমিত্ত ভাঙে না; নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে ভাঙিয়া থাকে। আমাদের অনুমান হয়, ইংরেজ শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন, যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক চৈতন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অতিক্রম করিয়া নিরক্ষর ও দরিদ্র লোকদিগকেও স্পর্শ করিয়াছে। এই প্রক্রিয়ার আরম্ভ বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাহা এখনকার মত ব্যাপক হয় নাই। শিক্ষিত লোকদের ডাকে নিরক্ষর দরিদ্র লোকেরাও সাড়া দিতে আরম্ভ করায় ইংরেজকে তাহার একটা প্রতিকারের চিন্তা করিতে হইয়াছে। মানুষের পেটের ভিতর দিয়া যে তাহার হৃদয়ে পৌঁছান যায়, ইহা বহুজনবিদিত তথ্য। ইহার প্রতি ইতিপূর্ব্বে কেন যে ইংরেজদের নজর পড়ে নাই, জানি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা কৃষি-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গুলী বিলাতে ভারতীয় পল্লীসংস্কার ও কৃষির উন্নতি বিষয়ে যে লেখালেখি ও দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, হয় ত তাহাতেও ইংরেজের কিছু চোখ ফুটিয়া থাকিবে। যাহা হউক, যে প্রকারেই হউক, ভারতের অধিকাংশ লোকের হৃদয় জয় করিবার জন্য এবার ইংরেজ লাগিবেন। তাই একজন কৃষি-অনুরাগী বড় লাট ভারতে পদার্পণ করিবেন। যদি তাঁহার দ্বারা ভারতের কৃষিজীবীদের বাস্তবিক উপকার হয় ও তাহাদের পেট ভরে, তাহা হইলে আমরা খুব আহ্লাদিত হইব।

কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির মানে হইবে, মোটা বেতনে আরও ইংরেজ কৃষিবিৎ, কীটতত্ত্ববিৎ প্রভৃতির নিয়োগ, ভারী ভারী ও দামী বিলাতী কৃষিযন্ত্রের আমদানী এবং তুলা গম প্রভৃতি যেসব জিনিষের ইংলণ্ডের দরকার বেশী, তাহার উৎপাদন বাড়াইয়া রপ্তানী বৃদ্ধি। কর্ম্মচারীদের নাম হইবে কৃষি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, যদিও ইঁহারা ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের তুলনায় বিশেষ-অজ্ঞ হইতে পারেন। গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কোন ফল হয় না। চাষাদিগকে নিরক্ষর, অজ্ঞ, ও রুগ্ন রাখিয়া মোটা বেতনের কৃষিবিৎ-

দের গবেষণার ফল ইংরেজিতে উৎকৃষ্ট আর্টপেপারে ছবি দিয়া ছাপিলে তাহা উৎকট উপহাসের মত দেখায়।

তাহার পর আরও একটা ভাবিবার বিষয় আছে। দারিদ্র্যজনিত অনশন অর্দ্ধাশন নগ্নতা ও ব্যাধি মানুষের দুঃখের ও অসন্তোষের কারণ বটে। কিন্তু দারিদ্র্য দূর করিয়াই মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায় না। কারণ পেটই মানুষের সর্ব্বস্ব নহে; তাহার হৃদয় মন আত্মা আছে। এই জন্য সে নিজের কাজ নিজে করিতে চায়, নিজের ভাবনা নিজে ভাবিতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চায়। সুপুষ্ট ঘোড়া গোরু কুকুরের মত সুপুষ্ট মানুষ কেবল খাওয়া পরা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে, মনে করা মহাভ্রম। প্রথমতঃ ত ভারতবর্ষ জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব না পাইলে কখনই ভারতের দারিদ্র্য দূর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি আত্ম-কর্তৃত্ব বিনাও ভারতের দারিদ্র্য দূর হয়, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, মানুষের দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে সে উচ্চতর জিনিষের ক্ষুধা এখনকার চেয়ে আরও ভাল করিয়া অনুভব করিবে। বিলাতে ও আমেরিকায় দারিদ্র্য ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক কম; কিন্তু তথাপি তথায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এদেশ অপেক্ষা প্রবলতর।

বিলাতী কাগজওয়ালারা বলেন, উক্ত সাহেবের ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই (ক'জন ইংরেজেরই বা আছে?) এবং কোন মতামত নাই। এক দিক দিয়া তাহা মন্দ নয়। কিন্তু ইহার মানে এও হইতে পারে, যে, ভারতের অভিজ্ঞতা বিশিষ্ট লোকদের চেয়ে তিনি বিলাতী মন্ত্রীদের অধিক আজ্ঞাকারী হইবেন বলিয়াই তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

যাহা হউক, ইংরেজ যদি ভারতের অধিকাংশলোকের পেট ভরাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের লাভ বই অলাভ নাই।

—

সদিচ্ছার ফরমাইস্

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বল্‌ডুইন ভারতীয়দিগকে বলিয়াছেন, "তোমরা সদিচ্ছা দেখাইয়া আমাদের সদিচ্ছা অর্জন কর।" আমলাতন্ত্র-শাসনের প্রধান বিরোধী মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত যুদ্ধের সময় সিপাহী সংগ্রহে নামিয়া সদিচ্ছা দেখাইয়াছিলেন। ভারতের সদিচ্ছা ব্রিটেনের বিপদের সময় লক্ষ লক্ষ সৈনিক ও শ্রমিক, কোটি কোটি টাকা, ও প্রচুর যুদ্ধসম্ভারাদি প্রদানে প্রকটিত হইয়াছিল। তাহার বিনিময়ে ব্রিটেনের সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছিল রৌলট আইনে, সামরিক আইনজারীতে, জালিয়ানওয়ালাবাগে, এবং আরো অনেক জিনিষে। এক কথায়, ভারত সদিচ্ছার কাঞ্চন দিয়া পায়ে লোহার বেড়ী ও পিঠে কশাঘাত পাইয়াছিল। একটা কথা বলা হয়, যুদ্ধে যে সব ভারতীয় প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা অশিক্ষিত শ্রেণীর; তাহাদের জীবনোৎসর্গের বিনিময়ে শিক্ষিত লোকেরা রাষ্ট্রীয় আত্ম-কর্তৃত্ব পাইতে পারে না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে এই আত্যন্তিক প্রভেদ মানিয়া লইলেও জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, অশিক্ষিত শ্রেণীর ভারতী-য়েরাই বা তাহাদের প্রাণপণ সদিচ্ছার বিনিময়ে কি পাইয়াছে?

যাহা হউক, এখন আবার নূতন করিয়া সদিচ্ছার দাবী হইয়াছে। আন্তরিক সদিচ্ছা দেখাইতে আমাদের বিন্দু-মাত্রও অনিচ্ছা নাই। সেই জন্য আমরা জানিতে চাই, এই সদিচ্ছাটার মানে কি এবং কি ভাবে কি রকম কথা ও কাজের দ্বারা উহা দেখাইতে হইবে? ইংরেজরা আমা-দিগকে যেমনটি হইতে, বলিতে ও করিতে আদেশ করিবে, ঠিক্ তেমনটি না হইলে বলিলে করিলে যদি সদিচ্ছা দেখান না হয়, তাহা হইলে আমরা আগে হইতেই বলিয়া দিতেছি আমরা ইংরেজদের সর্ত্ত বা দাবীতে রাজী নহি।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানিতে চাই, আমাদের সদিচ্ছার বিনিময়ে ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী ও তৎপূর্ব্বে ইংরেজ ভারত-সচিব তাঁহাদের যে সদিচ্ছা প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন, সেটা কিবিধ, অর্থাৎ সেটা তাঁহাদের কিরূপ ব্যবহারে প্রকাশ পাইবে। তা ছাড়া, তাঁহারা যে কথা রাখিবেন, তাহার প্রমাণ কি? ইংরেজ জাতি ও গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষের সহিত অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য বিখ্যাত। যদিই বা প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিবের অঙ্গীকার পালনের অকপট ইচ্ছা থাকে, সে ইচ্ছায় যে পার্লেমেণ্ট সায় দিবে, তাহার নিশ্চয় কি?

ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দলেরই সিপাহী-বিদ্রোহের মত একটা কিছু বিদ্রোহ করিবার ইচ্ছা নাই, তাহার সম্ভাবনা নাই, তাহা করা উচিত বা সুবুদ্ধির পরিচায়কও হইবে না। কিন্তু ঐতিহাসিক একটা ঘটনা ইংরেজদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মহারাণী ভিক্টো-রিয়ার ঘোষণা-পত্র অনুসারে কাজ না হইয়া থাকিলেও শিক্ষিত ভারতীয়েরা উহাকে দীর্ঘকাল নিজেদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রধান সনন্দ মনে করিয়া আসিয়াছে। ঐ সনন্দ ভারতীয়েরা সদিচ্ছার বিনিময়ে পায় নাই। পরেও তাহারা যে-সব "বর" ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে পাইয়াছে, তাহাও একটা না একটা প্রবল আন্দোলন অশান্তি বা বিভ্রাটের পরে বা সমকালে পাইয়াছে। এই সব ঐতিহাসিক তথ্য সদিচ্ছার-বিনিময়ে-সদিচ্ছা-বাদ সমর্থন করে কি?

আমাদের মনে হয়, আমরা ইংরেজের সব কথায়, কাজে, মৎলবে চোখ বুজে সই দিয়া সদিচ্ছা প্রকাশ করিলে

তাঁহারা ভারতবর্ষকে, ব্রিটেনকে ও সভ্য জগৎকে এই বুঝাইয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিতে থাকিবেন, যে, ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয়েরা এত সুখী ও সন্তুষ্ট যে টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে না; অতএব শাসনপ্রণালীর বা অন্য কিছুর একটুও পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই।

—

পারস্যে রক্তপাতহীন বিপ্লব

পারস্যের শাহ্ ও তাঁহার বংশ বিনা রক্তপাতে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন এবং রাজশক্তি রিজা খানের হাতে আসিয়াছে। তিনি নূতন রাজবংশের সংস্থাপক হইবেন, না পারস্যে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবে, এখনও বলা যায় না। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবলতম জাতিরা নূতন গবর্ন্মেণ্টকে বৈধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। পদচ্যুত শাহ পারিস্ হইতে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করা ঠিকই হইয়াছে। যে সব রাজা কেবল বিদেশে বেড়াইয়া বিলাসে ব্যসনে পাপাচারে প্রজার রক্তস্বরূপ অর্থের অপব্যয় করে, যেমন পারস্যের শাহ এবং ভারতবর্ষের অনেক রাজা, তাহাদের রাজ্যলোপ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ভারতীয় রাজাগুলার ব্যাপার দেখিয়া যুগপৎ ক্রোধ ও ঘৃণা হয়। যোধপুরের রাজা পোলো খেলা ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে বিলাতে আঠার লাখ টাকা উড়াইয়াছেন, অথচ তাহার অষ্টমাংশও প্রজাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন না। পাটিয়ালার রাজা ৬০ জন অনুচর ও ৩৫০টা বাক্স প্যাটরা লইয়া জেনিভায় জাতিসঙ্ঘে গিয়াছিলেন। অথচ স্বাধীন শক্তিশালী দেশের প্রতিনিধিরা একজন সেক্রেটারী এবং একটা কি দুটা ব্যাগ লইয়া যান। ভারতীয় রাজাগুলার বিদেশে অপব্যয়ে আমাদের আর একটা এই অপকার হয়, যে, তাহাদের ব্যয়বাহুল্য বশতঃ বিদেশীরা অধিকাংশ ভারতীয় লোক যে অতি দরিদ্র তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না।

—

ডামাস্কাসে গোলাবর্ষণ

ফরাসীরা ডামাস্কাসে গোলাবর্ষণ করিয়া পঁচিশ হাজার, বার হাজার, বা দুই শত, কত লোক মারিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহা হইলেও, সভ্যতম শ্বেত মানুষকে আঁচড়াইলে যে অসভ্যতম মানুষ বাহির হইয়া পড়ে, তাহার প্রমাণ ঐ ঘটনা হইতে পাওয়া যাইতেছে। শত্রুনিপাত করিয়া তাহার মৃতদেহ প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবার বর্ব্বর প্রথার অনুসরণও ফরাসীরা করিয়াছে।

এক বিষয়ে জেঙ্গীস খাঁ ও নাদির শাহের সৈন্যেরা ফরাসী সেনাপতি ও সৈনিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারাও নরহত্যা করিয়াছিল বটে; কিন্তু সম্মুখ সমরে এরূপ ভাবে তাহাদিগকে হত্যাকার্য্য চালাইতে হইয়াছিল, যে, তাহাদেরও শত্রুর হাতে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে, ফরাসী সৈন্যেরা বহু দূর হইতে ডামাস্কাসের অযোদ্ধা নরনারী ও শিশুদের উপর গোলা চালাইয়া নির্ভয়ে কাপুরুষোচিত নৃশংসতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

—

নারী-নির্য্যাতন সম্বন্ধে সরকারী ঔদাসীন্য

কলিকাতায় গুণ্ডারা কখন কখন পথিকদিগকে ছোরা মারিয়া বা মারিবার ভয় দেখাইয়া টাকা কাড়িয়া লইত; অমনি গুণ্ডা আইন হইল। কিছু অস্ত্র বোমার মশলা কোথাও আবিষ্কৃত হইল বা না হইল; অমনি কত লোকের নির্ব্বাসন হইল, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারী হইল, ইত্যাদি। কিন্তু এই যে কয়েক বৎসর ধরিয়া শত শত নারীর উপর অত্যাচার হইয়া আসিতেছে, তাহাদের জীবন ব্যর্থ হইতেছে, পরিবার কলঙ্কিত হইতেছে, কেহ বা আত্মহত্যা করিতেছে, কেহ বা দুর্ব্বিষহ দুঃখের বোঝা আজীবন বহন করিতেছে, কেহ বা পতিতার দল বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইতেছে—ইহার কোন প্রতিকার করা গবর্ন্মেণ্ট উচিত বোধ করিতেছেন না। দেশের সার্ব্বজনিক কার্য্যে এবং ব্যবস্থাপক সভায় নারীর বিদ্যমানতা ও প্রভাব থাকিলে গবর্ন্মেণ্ট এরূপ উদাসীন থাকিতে পারিতেন না, দেশের প্রবলতম রাজনৈতিকদল স্বরাজ্যবাদীরাও মুসলমানদিগকে চটাইবার ভয়ে এ বিষয়ে এমন চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত, দীর্ঘকাল বাংলা দেশে সফর করিয়াও, বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার লেখা ও বক্তৃতা হইতে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

—

স্বরাজ্যদলের গৃহবিবাদ

অন্য দলের মত স্বরাজ্য দলেরও সমালোচনা আমরা দরকার হইলে করিয়া থাকি। কিন্তু এখনও তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবলতম দল, এবং আধুনিক সময়ে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় সরকার পক্ষকে যতবার কোণঠাসা

করিয়াছেন, অন্য কোন দল তাহা পারে নাই। অতএব গৃহ বিবাদে তাঁহাদের শক্তিক্ষয় দুঃখের বিষয়।

—

বাংলা মিউনিসিপ্যাল বিল্

বাংলা মিউনিসিপ্যাল বিলে নির্ব্বাচিত সভ্যের হার পূর্ব্বসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হইতে তিন-চতুর্থাংশে এবং কোথাও কোথাও চারি-পঞ্চমাংশ করা হইয়াছে। ইহা ভাল। কিন্তু বিলে ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে সভ্য নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া সম্মিলিত জাতীয় জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, এবং জাতীয় জীবনে একটা তীব্র মারাত্মক বিষের থাকিবার অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে। "স্বরাজ্যচুক্তি"সত্ত্বেও স্বরাজ্যদলের মুখপত্র ফরোআর্ড ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সংখ্যায় ন্যূন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের উৎকৃষ্ট মুখপত্র দি গার্ডিয়ান্ ইহাকে অনিষ্টকর বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, যে, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতিগুলির কাজ সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্যদের দ্বারাই বেশ চলিতেছিল; নূতন করিয়া অবিশ্বাস ও ভেদের উপায় অবলম্বন কেন করা হইতেছে? ২৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত টাইম্‌সের মন্তব্যে বাংলা দেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা হিন্দুমুসলমানের পার্থক্য কম আছে বলা হইয়াছে। সেই জন্য পার্থক্য বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে বোধ হয়।

—

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট এক বৎসর সুপরিচালিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, কোন নিয়মে না বাধিলে, বঙ্গের মফঃস্বল মিউনিসিপ্যালিটীগুলির বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইলে ভাল হয়। মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটীগুলির কথা সাধারণ সংবাদপত্রসকলে ভাল করিয়া আলোচিত হয় না।

—

জজ পেজের মামলা

হাইকোর্টের জজ পেজের নামে এই অভিযোগ হয়, যে তিনি এক মিউনিসিপ্যাল ওভারসিয়ারকে লাথি মারিয়া নিজের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, যদিও সেই ভদ্রলোক সরকারী কাজে তথায় গিয়াছিলেন। কোন আদালতেই ইহার সুবিচার হইল না। নিম্নতন দুই আদালত ত আইনবিরুদ্ধ ভাবে মোকদ্দমা চালাইয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দেন। হাইকোর্টের দুই আদালতে জজেরা বলেন, এ বিষয়ে পূর্ব্বে তাঁহারা জজ্ পেজের কথা শুনিয়াছেন বা লেখা পড়িয়াছেন, অতএব তাঁহারা বিচার করিবেন না। তাহা ভাল। কিন্তু জজ্ পেজ ও অন্য জজেরা জানিতেন, যে, মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আসিতে পারে; সুতরাং এবিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কাহারও এবিষয়ে বাড়ীতে বা ক্লাবে কোন প্রকার আলোচনা করা অনুচিত হইয়াছিল। যে দু জন জজ শেষে বিচার করিলেন, তাঁহারা উভয়েই রায়ে বলিয়াছেন, যে, ম্যাজিষ্ট্রেট আইনসঙ্গত বিচারপ্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। তাহা হইলেও কিন্তু তাঁহাদের মতে পুনর্বিচার অনাবশ্যক! অদ্ভুত রায়! নারী হৃতা ও ধর্ষিতা হইলে ও মোকদ্দমা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইয়া গেলেও, বিচারপ্রণালী নিখুঁত না হওয়ায় হাইকোর্টেরই আদেশে আবার সেই নারীকে পুনর্বিচারের ব্যয় ও দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু এক্ষেত্রে পুনর্বিচারের কোনই প্রয়োজন নাই! অধিকন্তু জজদের মতে, নিম্ন আদালতে আসামীর কৌঁসুলি ঠারেঠোরে আসামীর দুঃখপ্রকাশেচ্ছার আভাস দেওয়ায় ফরিয়াদীর তাহা লাথির মলম স্বরূপ লুফিয়া লওয়া উচিত ছিল!!! আইনের চক্ষে যে ধলা কালা ছোট বড় সবাই সমান, এই মোকদ্দমার রায়টি তাহার আধুনিকতম জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

—

আব্দুল করিম

মরক্কোর নেতা আব্দুল করিম হারিয়াও হারিতেছেন না, মরিয়াও মরিতেছেন না। ফ্রান্সও স্পেনের পক্ষে ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

—

ওড়িষায় দুর্ভিক্ষ

এণ্ড্রুজ্ সাহেব ওড়িষায় দুর্ভিক্ষের কথা নানা খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়া উৎকলীয়দিগের যেমন উপকার করিয়াছেন, বিহার-ওড়িষা গবর্ন্মেণ্টের তেমনি অপ্রিয় হইয়াছেন। বিহার-সরকার তাঁহার বর্ণনার প্রতিবাদও করিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোন মূল্য নাই। সরকারী অনেক কর্ম্মচারীর দেশের দুঃখদুর্দ্দশার কথা চাপা দিয়া রাখা বা খুব কম করিয়া বলাই অভ্যাস।

এণ্ড্রুজ্ সাহেবের পিছনে টিক্‌টিকিও লাগান হইয়াছিল। ইহা যেমন অন্যায়, তেমনি বেকুবী। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকারী মোটেই নহেন; সুতরাং টিক্‌টিকির সেবা পাইতে অনধিকারী।

৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পথপ্রদর্শক জ্যোতি

অমৃত জীবনধারা, স্পন্দমান আলোক রেখায় অভিব্যক্ত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৩২ | ৩য় সংখ্যা

উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন

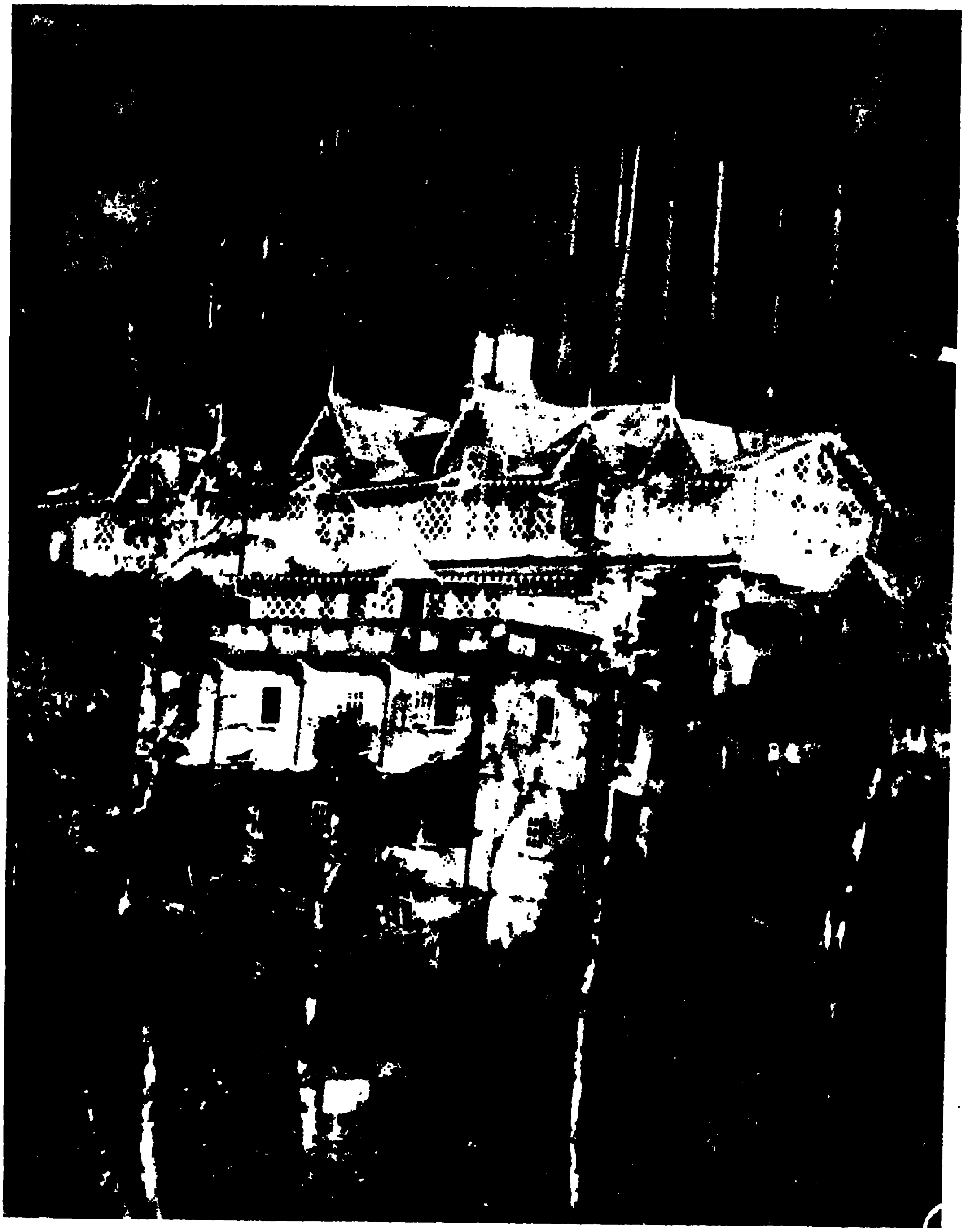
আচার্য্য শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

[গত এক বৎসরের মধ্যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভিদজীবনের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে তিনটি গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই আবিষ্কার সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। গত মাসে দার্জ্জিলিংএর গবর্ণমেণ্ট হাউসে লর্ড লিটনের নিমন্ত্রণে যে-সভা আহূত হয় তাহাতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের পেশীমণ্ডল আবিষ্কারের ঘোষণা করেন। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠাদিনের অষ্টম বার্ষিক উৎসব সভায় তিনি উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন ও রসসঞ্চালন সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ ইংরেজী মডার্ন্ রিভিয়ুতে প্রকাশিত বক্তৃতা ও আচার্য্য বসুর অন্যান্য প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত হইল।]

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি অদৃশ্য বৈদ্যুতিকরশ্মি-সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করি। হার্জ (Hertz) আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অতি বৃহদাকার বলিয়া, সরল রেখায় ধাবিত না হইয়া বক্র হইয়া যাইত। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে আলোর ঊর্ম্মি খর্ব্ব করা আবশ্যক। আমি যে কল নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম তাহা দ্বারা প্রেরিত আকাশ-ঊর্ম্মির দৈর্ঘ্য এক-ইঞ্চির ছয় ভাগের একভাগমাত্র। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না, হয়ত অন্য জীবে দেখিতে পায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই আলোকে উদ্ভিদ্ উত্তেজিত হইয়া থাকে। অদৃশ্য আলো উপলব্ধি করিবার কোন বিশ্বাসযোগ্য কল তৎকালে ছিল না। আমা কর্তৃক গ্যালিনা রিসিভার উদ্ভাবিত হওয়াতে বহুদূর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমি সভাসমক্ষে বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বিদ্যুৎ-ঊর্ম্মি গবর্ণরের বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। তাহা একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল।

জীব ও অজীব

তারহীন কল লইয়া পরীক্ষা করিতে-করিতে দেখিলাম হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই,



মায়াপুরী বসু গবেষণা-মন্দির, দার্জ্জিলিং (৭ হাজার ফুট উচ্চে স্থিত)



মায়াপুরার সম্মুখে তুষার-দৃশ্য

যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি, জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।

উদ্ভিদের সাড়া

ইহার পরে আমি উদ্ভিদের চেতনা-সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলাম। তখন সর্ব্ববাদিসম্মত মত এই ছিল যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনধারার মধ্যে প্রভূত পার্থক্য আছে। আহত হইলে প্রাণী দ্রুত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করে; তাহার হৃদযন্ত্র সর্ব্বদা স্পন্দিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাণী, ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বাহ্যদ্রব্য উপলব্ধি করিতে পারে। অপর পক্ষে বৃক্ষাদির সঙ্কোচন বা প্রসারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাতে কোন স্পন্দন নাই, তাহারা স্নায়ুহীন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস। দুইটি জীবন-ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে, অথচ তাহাদের জীবনে কোথায়ও ঐক্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বহুদিন যাবৎ উদ্ভিজ্জীবনের জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যে-দিন এমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল, যাহার প্রভাবে বৃক্ষ চেতনার সাড়া দিল, সেই দিনই তাহার অজ্ঞাত আভ্যন্তরীণ জীবন-যাত্রা-প্রণালী অবগত হওয়া সম্ভবপর হইল। ক্রমে-ক্রমে

এই সাড়াকে লেখায় পরিণত করিবার যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, সেই লেখা পড়িবার কৌশলাদিও উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। এই নূতন পন্থায় গবেষণার ফলে এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে প্রাণীর জীবন ও উদ্ভিদের জীবন একই প্রকার। মানুষের যেমন হৃৎস্পন্দন আছে, বৃক্ষলতাদিরও ঠিক সেইরূপ হৃৎস্পন্দন আছে। প্রাণী যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সময় মৃত্যুজনিত আক্ষেপ প্রদর্শন করিয়া থাকে, উদ্ভিদ্‌ও সেইরকম আক্ষেপ জ্ঞাপন



মায়াপুরী গবেষণা-মন্দির সংলগ্ন অরণ্যোদ্যান

করে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উত্তেজক ঔষধ বা বিষের প্রক্রিয়া উভয়ের উপরই একই প্রকার। ইহা হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মনে করেন যে, উদ্ভিজ্জীবন সম্পর্কিত এই নূতন গবেষণার ফলে ঔষধ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে উদ্ভিদের পরিবর্দ্ধনের ধারা অবগত হওয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্রের আবিষ্কার হওয়াতে এই ধারার রহস্যও অনাবৃত হইয়াছে।

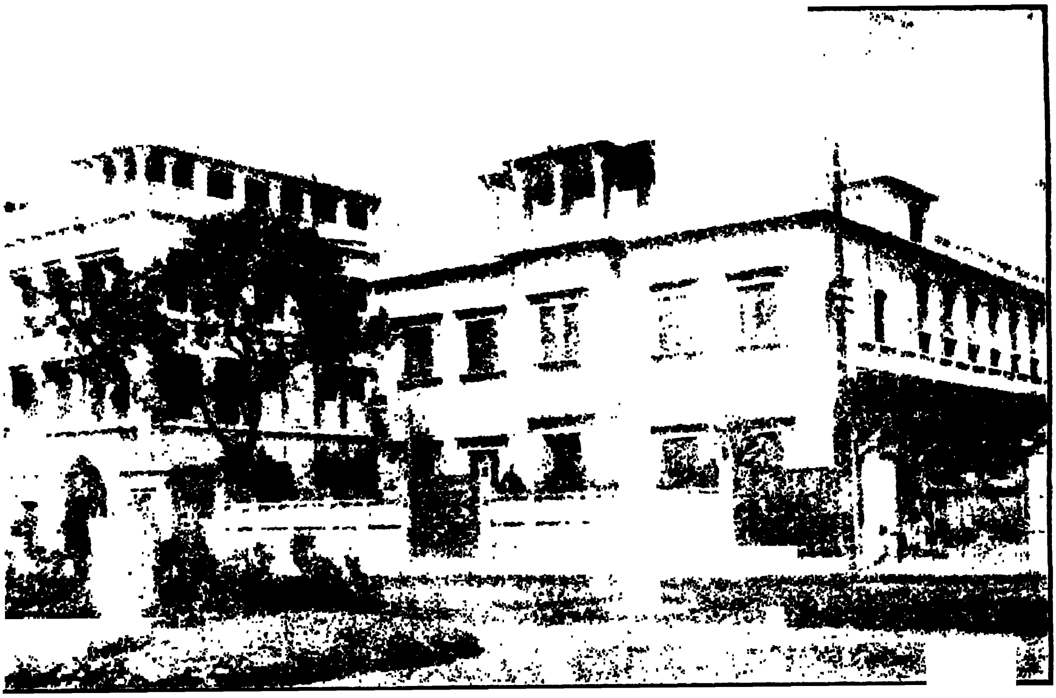
সাধনা

এইসমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। একদিনের চেষ্টায় ইহা সম্ভব হয় নাই। বহু বর্ষ একাগ্রতার সহিত সাধনা করিয়াই ইহা লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। আট বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, তখন যাহারা এই গবেষণা কার্য্যে সমস্ত জীবন নিয়োগ করিবে, যাহারা চরিত্রবল এবং দৃঢ়-সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে ও প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইবে, কেবল তাহাদিগকেই আমার শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। ভারতবাসী কোন কার্য্যেই অগ্রণী হইতে অক্ষম—এই কলঙ্ক ভারতীয়গণকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চিরদিনের জন্য সেই তথাকথিত কলঙ্ক-কালিমা মুছাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম।

অন্তর্দৃষ্টি

অতি মহৎ আবিষ্কার করিতে হইলে প্রবল অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্মযন্ত্র আবিষ্কার ও নির্ম্মাণের দক্ষতা ও অনুসন্ধান করিবার কৌশল জানা আবশ্যক। অন্তর্দৃষ্টিশূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন অনুসন্ধানের কোনই সার্থকতা নাই। ভারতের চিন্তা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের ফলে ভারত জ্ঞান-প্রচার-ক্ষেত্রে বিশেষরূপে পারদর্শী। আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ভারতীয় কল্পনাশক্তি ঐক্যের সন্ধান পায়। একাগ্র সাধনার দ্বারা সেই শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই ক্ষমতাই আবার মনকে ধৈর্য্যশালী করে ও সত্যের অনুসন্ধানে সক্ষম করিয়া তোলে। মনোমন্দিরই প্রকৃত বিজ্ঞান-মন্দির।

উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ প্রাণ-যন্ত্রের গূঢ় রহস্য অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। এই অন্তর্দৃষ্টি মাঝে-মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; কারণ অপরীক্ষিত কল্পনা, চিন্তারাশিকে বিপথগামী করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা যখন কিছু দৃষ্ট হয় না, তখনও আমাদিগকে অদর্শনীয়ের অনুসরণ করিতে হয়। কারণ, যাহা আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকে, তাহার তুলনায় আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহা একান্তই সামান্য। সেই অদৃশ্যরাজ্যে তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান



বসু বিজ্ঞান-মন্দির, কলিকাতা

করিবার জন্য ক্রেস্কোগ্রাফের (Crescograph) আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত জিনিষই তাহার আসল মাপ হইতে দশকোটিগুণ বৃহৎ হয়। তাহাতে দৃষ্টির বহির্ভূত জীবনের মূলগতি প্রত্যক্ষ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে হস্ত সম্পূর্ণরূপ মনের অধীন করিতে হয়। নচেৎ যন্ত্র অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। দেহের উপর মনের প্রভাব অপরিসীম এবং মনের বল দ্বারা যে-সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহা ইন্দ্রজালকেও পরাজিত করিয়াছে। বিশেষ শিক্ষার দ্বারাই এইসমস্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব। বিগত আট বৎসরে এই বিজ্ঞান-মন্দিরে ২০০টি বিষয়, এই কারণে সাফল্যের সহিত পরীক্ষিত হইয়াছে।

বৃক্ষে রস-সঞ্চালন

অন্তর্দৃষ্টি এবং অবিরাম অনুসন্ধিৎসা দ্বারা সুকঠিন সমস্যাসমূহ কি-প্রকারে পূরিত হয়, আমার বর্ত্তমান আবিষ্কার তাহারই প্রমাণ। বৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কি করিয়া রস সঞ্চালিত হয়, এই সমস্যা লইয়া দুইশত বর্ষের অধিক কাল অনুসন্ধান চলিয়াছে, কিন্তু কোন সুমীমাংসা হয় নাই। মাটি হইতে বহু উচ্চে গাছের উপরে জল উঠে। কি উপায়ে জলের গতি নিরূপিত হয় ইহা বহুদিন ধরিয়া এক সমস্যা ছিল। এই রস-সঞ্চালন কি জড়শক্তির প্রভাবে হয় না জীবন-শক্তির ফল? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য স্ট্রাস্‌বুর্গার (Strasburger) বৃক্ষে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে,তাহাতে রস-সঞ্চালনের কোন ব্যতিক্রম ঘটায় নাই। কাজেই তিনি মত দেন, জীবন-শক্তি দ্বারা ঐরূপ রস-সঞ্চালন হইতে পারে না। জড়-বিজ্ঞানের মধ্যে ইহার কারণ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল—কল্পনার সহিত সত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য অদ্ভুত-অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করা হইল। কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। এমন কোন নির্দ্দেশক বাহির করিবার চেষ্টা হইল না, যাহার সাহায্যে রস-সঞ্চালনের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

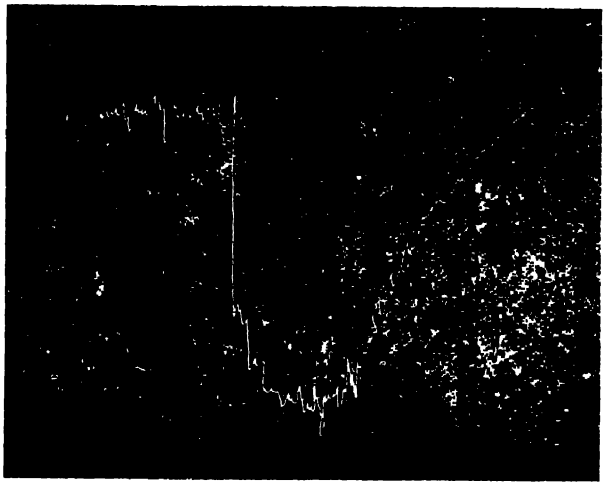
এ-সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আমি দেখাইলাম যে উদ্ভিদের পত্র রস-সঞ্চালনের নির্দ্দেশক। রসের দ্রুত সঞ্চালনের সঙ্গে-সঙ্গেই বৃক্ষের পাতা সতেজ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে

এবং সঞ্চালনে বাধা পড়িলে পাতা ঢলিয়া পড়ে। পাতার গতিবিধি এত সূক্ষ্ম যে সহজে তাহা লক্ষ্যীভূত হয় না। আমি অপ্টিক্যাল্ লিভার (Optical Lever) দ্বারা এই অসুবিধা দূর করিলাম। এই যন্ত্রের একটি দণ্ডের একদিক একটি সূত্র দ্বারা পাতার সহিত বাঁধা থাকে। দণ্ডটির সহিত একটি দর্পণ সংলগ্ন থাকে। পাতার গতিবিধি এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। এইরূপে পাতার অতি সামান্য উত্থান-পতন এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই ৫ হাজার গুণ পরিবর্দ্ধিত আকারে দেখা যায়। এই গবেষণার ফলে স্ট্রাসবুর্গারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।[1]

নাড়ীর স্পন্দন প্রতিফলিত আলোক রশ্মির সাহায্যে বড় করিয়া দেখাইতে পারা যায়। কব্জির নিকটস্থ নাড়ীটি বাহিরেই অবস্থিত, সুতরাং নাড়ীর স্পন্দন সহজেই অনুভব করা যায়। মানুষের নাড়ী স্পন্দন সাধারণ অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭২ বার হয়। উত্তেজনার ফলে হৃদ্‌যন্ত্র সতেজ হয় ও তাহাতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। রেকর্ডারে (Recorder) ঊর্দ্ধরেখা অধোরেখা হইতে দীর্ঘতর দেখা যায়। পক্ষান্তরে অবসাদের সময় অধোরেখা দীর্ঘতর হয় এবং রক্তের চাপ কমিয়া যায়। কিন্তু এই নাড়ী মাংসপেশীতে নিমজ্জিত থাকিলে স্পন্দন অনুভূত হয় না বা রক্তচাপ নির্ণয় করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রাণীর রক্তচাপের মতন বৃক্ষের রস চাপ কি বর্দ্ধিত কিম্বা অবসন্ন হয়। এই অনুসন্ধান স্বভাবতই ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া মনে হইবে। প্রত্যেক স্পন্দনের দরুন্ যে সঙ্কোচ-প্রসারণ হয় অত্যুৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তাহা ছাড়া অন্যান্য পেশীর মধ্যে বৃক্ষ হৃদয় নিমজ্জিত। সুতরাং এই অদৃশ্য ও অবোধ্যকে কি করিয়া দৃশ্যমান করা সম্ভব হইবে?

উদ্ভিদের হৃদয়-সন্ধান

তবে বৃক্ষের হৃদয় কোথায়? এই তথ্য প্রথমে আমার নূতন উদ্ভাবিত বিদ্যুৎশলাকা দ্বারা আবিষ্কৃত হইল। নিস্পন্দিত পেশীর সহিত বৈদ্যুতিক সংস্পর্শ ঘটাইলে তাড়িতমান যন্ত্র নিঃস্পন্দ থাকে। কিন্তু যদি ইহার সহিত স্পন্দমান হৃদ্‌যন্ত্রের সংস্পর্শ ঘটে, তাহা হইলে ঐ স্পন্দনের অনুরূপ বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রতিফলিত হয়। বৃক্ষের হৃদয়ের অধিষ্ঠান-স্থান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত



রক্তচাপলিপি। অবসাদে হৃদয়স্পন্দন নিম্নগামী। উত্তেজনায় ঊর্দ্ধগামী

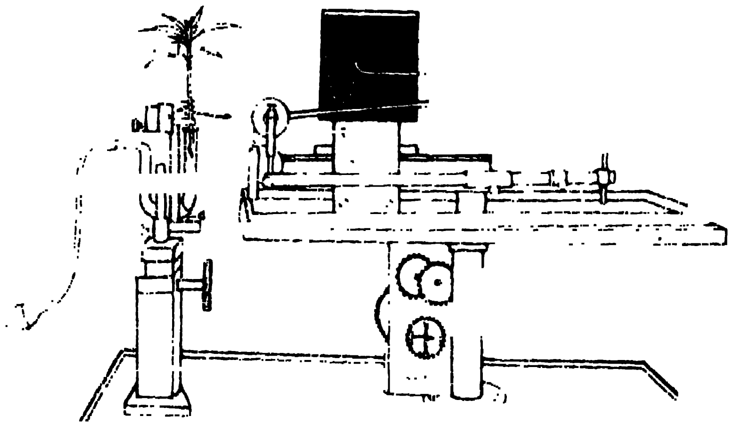
আমি বৃক্ষের কাণ্ডের ধাপে-ধাপে বৈদ্যুতিক শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দেখিয়াছিলাম যে, যে-মুহূর্ত্তে ঐ শলাকা স্পন্দমানস্তরের সংস্পর্শে আসে সেই মুহূর্ত্তে বৈদ্যুতিক সাড়া পাওয়া যায়। ঐ সাড়া গ্যাল্‌ভ্যানোগ্রাফ (Galvanograph) যন্ত্রে লেখা হয়। প্রত্যেকটি জীবকোষ প্রসারণ কালে নিম্নদেশ হইতে জল চুষিয়া লয় এবং সঙ্কোচের সময় উহা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করে। উদ্ভিদের হৃদ্‌যন্ত্র নিম্নশ্রেণীর জীবের হৃদ্‌যন্ত্রেরই অনুরূপ।

হৃদয়-স্পন্দন অনুভব-করার যন্ত্র

ইহার পর অন্য সমস্যা মনে উদিত হইল। বিদ্যুৎ-শলাকা প্রবেশ না করাইয়া বাহির হইতে বৃক্ষের হৃদয়-স্পন্দন কি কোনদিন আমাদের অনুভূতিগ্রাহ্য হইবে? যখন স্পন্দিত রস-প্রবাহ বৃক্ষে সঞ্চারিত হয় তখন প্রত্যেক

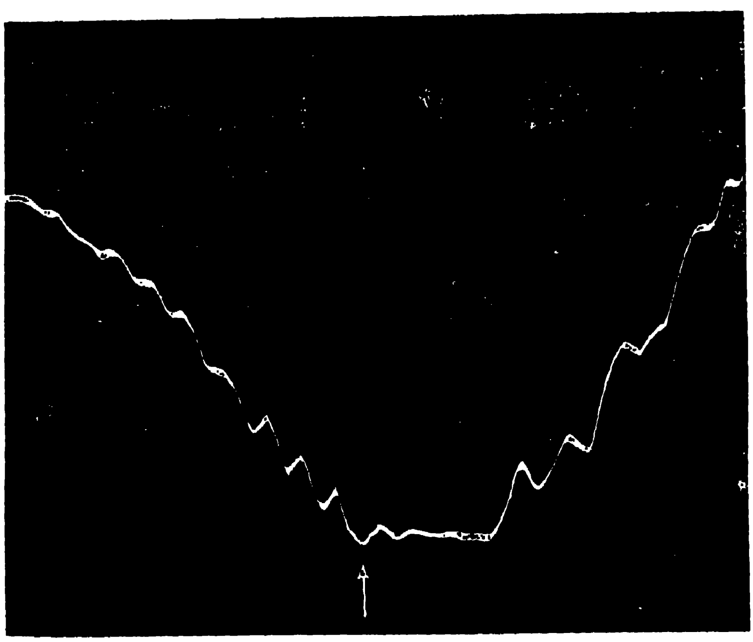
[1] এই স্থানে আচার্য্য বসু একটি বৃক্ষে বিষপ্রয়োগ করিয়া সর্ব্বসাধারণসমক্ষে দেখাইলেন যে, বৃক্ষের চেতনা এবং রস-সঞ্চালনের ক্ষমতা ক্রমে-ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল।

ঢেউ বৃক্ষকে ক্ষণিকের জন্য প্রসারিত করে; ঢেউটি চলিয়া গেলে বৃক্ষ পুনরায় পূর্ব্ব আকার ধারণ করে। এই অদৃষ্ট ও অস্পৃশ্য স্পন্দন মনুষ্য-প্রত্যক্ষ-গোচর করিবার জন্য কল্পনারও অতীত অনুভবযন্ত্র আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই অনুভবযন্ত্রে দুইটি দণ্ড আছে—একটি স্থির, আর-একটি



বৃক্ষের হৃদয়স্পন্দনলিপি-যন্ত্র

দুইটির মধ্যে অবস্থাপিত করিলে প্রসারণতরঙ্গ, চালন-যোগ্য দণ্ডখানিকে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। তবে,ইহা চোখে দেখা যায় না। এই সঙ্কোচন-প্রসারণ এক ইঞ্চির দশলক্ষ ভাগের একভাগেরও কম। সুতরাং আমার ম্যাগনেটিক অ্যাম্প্লিফায়ার (Magnetic Amplifier) যন্ত্রের দ্বারা এই প্রসারণ-সঙ্কোচনকে এককোটি গুণ বাড়াইতে হইয়াছে। এই যন্ত্রের চুম্বকের সহিত সংলগ্ন দর্পণে প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি দূরস্থিত যবনিকায় পতিত হয়। বৃক্ষটির হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে-সঙ্গে এই আলোকরশ্মি আলোড়িত হইতেছে। উত্তেজক বা অবসাদজনক ঔষধ প্রয়োগের ফলে এই আলোড়নের গতি বৃদ্ধি অথবা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। জীবনীশক্তির অদৃশ্য গতিবিধি কম্পিত আলোকরেখা দ্বারা জীবনের গূঢ় রহস্য জগৎসমক্ষে এইরূপ সপ্রমাণে প্রচারিত করিল।



বৃক্ষের হৃদয়স্পন্দন। অবসাদে স্পন্দন রেখা নিম্নে যাইতেছে। পরে উত্তেজনায় উপরে উঠিতেছে

অভাব ও দৈন্য

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানুষের ভার লাঘব করা। দৈন্য এবং অভাব আসিয়া জাতীয় জীবনকে মৃত্যুপথে লইয়া যাইতেছে। দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষি এবং শিল্প উভয়েরই উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। ইহা করিতে হইলে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের ফলে ভারতবাসী বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারে। যেমন আর্থিক

দুরবস্থা ইউরোপে অশান্তি আনয়ন করিয়াছে—ভারতের আর্থিক সমস্যাই ভারতবর্ষের সমস্ত অশান্তির মূল। দেশের মৃত্তিকা-নিহিত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায়—দেশের বহুসংখ্যক যুবককে উন্নত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে দেশের কাজে ব্যাপৃত করা। উদ্যোগী শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। দেশের লোক যখন বৃথা আত্মকলহে ব্যাপৃত, এই সুযোগে বাহির হইতে বহু জাতি আসিয়া ভারতের ধনরত্ন লুটিয়া লইতেছে।

আমরা কি ভুলিয়া গিয়াছি, যে, অকূল জলধি এবং হিমাচল সমগ্র পৃথিবীর প্রতিযোগিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না? ধরিত্রী মাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ, প্রকৃতি জননীও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু; তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

বীরধর্ম্ম

অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুঝিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব—নিশ্চেষ্ট হইয়া নহে। যে দুর্ব্বল এবং যে জীবন-সংগ্রাম হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, সে কাপুরুষ। সে দান করিবার অধিকারী নহে, কারণ তাহার দান করিবার কিছুই নাই। যে বীরের ন্যায় সংগ্রামে যুঝিয়াছে এবং জয়যুক্ত হইয়াছে, কেবল সেইই তাহার জয়লব্ধ বিত্ত দান করিতে পারে এবং সেই দানদ্বারা জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারে। ভারতের গৌরব এবং জগতের কল্যাণ, ইহাই আমাদের চির সাধনা হউক।

বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃথ্বীরাজ রাসোর ঐতিহাসিকতা

অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল, এম্-এ

মহারাজ পৃথ্বীরাজ চোহানকে ভারতের শেষ হিন্দু স্বাধীন নরপতি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে ভারতের নানা স্থানে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার পতনের সহিত (১১৯৩খৃঃ) দিল্লী ও আজমীর শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর কবলে পড়ে ও ভারতে মুসলমানের রাজত্ব আরম্ভ ধরা হয়। পৃথ্বীরাজের সভাতে একজন কবি ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ বা চাঁদ, তিনি লাহোরবাসী ব্রাহ্মণ, তপস্যা করিয়া সরস্বতীর কাছে বর পাইয়া কবি হইয়াছিলেন বলিয়া "বরদাই কবি চন্দ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজ রাসো নামক মহাকাব্যে পৃথ্বীরাজের বিস্তৃত জীবনী লিখিয়াছেন। পৃথ্বী যে-সকল রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদেরও ইতিহাস লিখিয়াছেন। বহুকাল একমাত্র রাসোই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিশ্বসনীয় ইতিহাস বলিয়া গণিত হইত। কিন্তু এখন শিলালেখ, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন ইত্যাদি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ফলে রাসো ইতিহাসের সম্মানিত আসন হইতে পতিত হইয়া কেবলমাত্র কাব্য থাকিয়া গিয়াছে। যদিও তাহার ভাষা খাঁটি হিন্দী না হইয়া পঞ্জাবী মিশ্রিত হিন্দী, তথাপি হিন্দী সাহিত্যে রাসোর স্থান যে অতি উচ্চে তাহাতে সন্দেহ নাই। সমস্ত পুস্তককে বিশেষজ্ঞেরা মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইংরেজি সাহিত্যে শেকস্পিয়রের যে স্থান, হিন্দী সাহিত্যে চাঁদ কবির সেই স্থান বলা যাইতে পারে।

রাসোর প্রধান-প্রধান ভ্রম প্রমাণ-সহ দেখাইতেছি।

চন্দ কবি রাসোতে পৃথ্বীরাজের জীবনের ঘটনাগুলি

ইতিহাসের মতন পূর্ব্বাপর পর্য্যায়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই; রাজার জীবনের এক-একটি ঘটনা-সম্বন্ধে কবির পত্নী এক-একটি প্রশ্ন করিয়াছেন, কবি সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন; উত্তরের সমষ্টি ইতিহাস ও মহাকাব্য রূপ ধারণ করিয়াছে।

রাসোতে যে সম্বৎ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা আজ-কাল প্রচলিত বিক্রম সম্বৎ নহে, চন্দ তাহাকে "অনন্দ সম্বৎ" বলিয়াছেন। এই অনন্দ সম্বৎ কে কোন্‌কালে প্রচলিত করিয়াছিল জানা নাই; তবে বিক্রম সম্বৎ আরম্ভ হইবার ৯১ বৎসর পরে ৩৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছ। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা বলেন অনন্দ অর্থে একশত হইতে নয় কম। অ—বিয়োগ, নন্দ—নয়। একশত হইতে নয় কম করা হইল, কিন্তু একশত কোন্ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। আমার ধারণা এ অর্থ কষ্টকল্পিত ও ভিত্তিহীন। অনন্দ নামধারী কোনও ব্যক্তি এ সম্বৎ প্রচলিত করিয়া থাকিবেন, ইতিহাসে হয়ত তাঁহার অন্য কোনও নাম আছে। প্রাচীন আরও দুই চারি খানি হিন্দী পুস্তকে অনন্দ সম্বতের ব্যবহার আছে।

রাসোর অধ্যায়গুলিকে "সময়" বলা হইয়াছে। এক-একটি "সময়" এক-একটি প্রশ্নের উত্তর। এই প্রশ্নে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষা করা হইয়াছে। রাসোর শেষ সময় (৬৯) মহোবা সময়। ইহাতে পৃথ্বীরাজ ও মহোবা রাজের যুদ্ধ বর্ণিত ও আল্‌হার উপখ্যান আছে, কিন্তু প্রচলিত আল্‌হার গানের সহিত ইহার অনেক প্রভেদ।

ক

রাসোতে আছে:—

১। যখন সোমেশ্বর চোহান শাকম্ভরী দেশের [Sambhar country] রাজধানী অজমীরে রাজত্ব করিতেন, তখন অনঙ্গপাল তোমর দিল্লীর রাজা ছিলেন। একবার কোনও কারণে কনোজপতি কমধ্বজ বিজয়পাল দিল্লী আক্রমণ করিলেন। সেকালে বিজয়পাল উত্তর ভারতে চক্রবর্ত্তী রাজা বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন; তাঁহার রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত, আয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, ও সেনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল। তিনি একবার দিগ্বিজয়ও করিয়াছিলেন। অনঙ্গপাল সোমেশ্বরের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। বিজয়পালের দিল্লী পঁহুছিবার পূর্ব্ব দিবস সোমেশ্বর সসৈন্য অনঙ্গকে সাহায্য করিতে আসিলেন, ও দুইজনে পরামর্শ করিয়া দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। পর দিবস বিজয়পাল আক্রমণ করিলেন ও যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। অনঙ্গপাল সোমেশ্বরকে আপনার কনিষ্ঠা সুন্দরী কন্যা কমলা দান করিলেন। তখনও বিজয়পাল ফিরিয়া যান নাই, অনঙ্গ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরসুন্দরী বিজয়পালকে দান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। কালে, কমলার গর্ভে পৃথ্বীরাজের জন্ম [বৈশাখ ১১৪৮খৃঃ] হইল। বিজয়পালের পুত্র জয়চন্দ, কিন্তু সুরসুন্দরীর গর্ভে কি না সেকথা ভাঙ্গিয়া লেখা নাই। কেবল একস্থানে [৪৮ সময়] জয়চন্দ পৃথ্বীকে বলিতেছেন "মাতুল হম তুম ইক্ক" অর্থাৎ তোমার ও আমার মাতুল একই, ইহা ছাড়া সমস্ত পুস্তকে আর এ সম্বন্ধের কোন উল্লেখ নাই। অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন, বৃদ্ধাবস্থায় বদরিকাশ্রমে তীর্থ করিতে যাইবার পূর্ব্বে দৌহিত্র পৃথ্বীকে পূর্ণক্ষমতাসহ আপনার রাজ্যরক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার মন্ত্রীরা বিদেশী পৃথ্বীকে নিযুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি শুনিলেন না। সোমেশ্বর পৃথ্বীর বাল্যাবস্থা হইতে বাছা-বাছা সদ্বংশজাত যোদ্ধা বালকদের সহচর করিয়া দিয়া-ছিলেন। ইহারা সকলেই অত্যন্ত সাহসী ও বলবান্ ছিল, ও পৃথ্বীর অষ্টোত্তর শূর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অনঙ্গপাল চলিয়া গেলে পৃথ্বী একে-একে দিল্লীর প্রাচীন কর্ম্মচারীদের পদচ্যুত করিয়া আপনার অনুচর শূরদের সেই কর্ম্মভার দিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে দিল্লীবাসীরা দেখিল রাজকোষ রক্ষা, দুর্গদ্বার নগরদ্বার রক্ষা ইত্যাদি সকল দায়িত্বপূর্ণ স্থানেই অজমীরবাসী পৃথ্বীরাজের সহচররা নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা দিল্লীবাসীদের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করে। রাজা ও প্রজা অর্থাৎ অজমীরের আগন্তুক ও দিল্লীবাসীর মধ্যে জেতা ও বিজেতা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লীবাসী কতকগুলি প্রধান বদরিকাশ্রমে গিয়া অনঙ্গপালের কাছে অভিযোগ করিল। অনঙ্গপাল প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু পৃথ্বী তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিলেন

না। অনঙ্গপালকে নগর প্রাচীরের বাহিরে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তীর্থবাসের জন্ম কিঞ্চিৎ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এ-সময়ে সোমেশ্বর অজমীরের রাজা, অর্থাৎ যুবরাজ অবস্থায় পৃথ্বী মাতামহের রাজ্যলাভ করিলেন।

২। বিজয়পাল কমধ্বজ একবার দিগ্বিজয় করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যাদেশের রাজধানী কটক আক্রমণ করিলেন, তখন সোমবংশীয় মুকুন্দদেব যুদ্ধ না করিয়াই অধীনতা স্বীকার করিলেন ও আপনার কন্যা উপহার দিলেন। বিজয়পাল এই কন্যার সহিত পুত্র জয়চন্দ্রের বিবাহ দিলেন। এই কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে জুনাইয়া [জ্যোৎস্না] বলিত। তাহার গর্ভে পতি ও পিতৃকুলক্ষয়কারিণী অদ্বিতীয়া সুন্দরী সংযুক্তার জন্ম হইয়াছিল।

৩। শেষ যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথ্বী দিল্লীতে ছিলেন, দিল্লীতে সংযুক্তা ও রাজপরিবারকে রাখিয়া তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। দিল্লী লাভ করিবার পর তিনি দিল্লীতেই আপনার বাসস্থান বা রাজধানী করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা রাসোর; এখন দেখা যাউক অন্যান্য গ্রন্থ, শিলালেখ ইত্যাদিতে কি সংবাদ পাওয়া যায়।

১। দিল্লীতে একটি অশোকস্তম্ভ আছে। দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্ ফিরোজ তুগলক [১৩৫১—১৩৮৮] উহাকে অন্য স্থান হইতে আনিয়া নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য দিল্লীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে উহাকে ফিরোজসাহের লাট বলে। ঐ স্তম্ভে অশোক শাসনের নীচে ১২২০ সম্বৎ [খৃঃ ১১৬৩] বৈশাখী পূর্ণিমার লেখা কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি সোমেশ্বরের অগ্রজ চতুর্থ বিগ্রহরাজ বীসলদেবের লেখা। তিনি আপনার তীর্থযাত্রা ও সেই সঙ্গে দেশজয় সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"বিন্ধ্যাচল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সকল দেশ জয় করিয়া তিনি কর সংগ্রহ করিলেন ও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে মুসলমানদের তাড়াইয়া আর-একবার ভারতকে যথার্থ আর্য্যভূমি করিলেন" ইত্যাদি। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে অজমীর-রাজ দিল্লী জয় করিয়া ছিলেন। দিল্লীতে অজমীরের এক-জন করদাতা সামন্ত অথবা বেতনভুক্ দুর্গরক্ষক বাস করিয়া দেশ শাসন করিতেন। পৃথ্বীরাজ অজমীরের বিস্তৃত রাজ্যের যুবরাজ হইয়া আপন পিতার অধীন একজন সামন্তরাজার পোষ্যপুত্র হইতে যাওয়া অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়।

২। রাসোতে জয়চন্দ্র পৃথ্বীকে দিল্লী ত্যাগ করিয়া সাম্ভরে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু মাতামহের রাজ্য বলিয়া সমস্ত রাজ্য বা অর্দ্ধেক অংশ দাবী করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি বলিতেছ, অনঙ্গপাল তোমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, কিন্তু আমি চক্রবর্ত্তী সম্রাট্, তাঁহার রাজ্য হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে আমার অনুমতি লওয়া উচিত ছিল; তিনি তাহা লন নাই। আমি ঐ দান অনুমোদন করিতেছি না; তুমি সাম্ভরের রাজা সাম্ভরে যাও, অনঙ্গ-পালের অবর্ত্তমানে দিল্লীর আমি অন্য ব্যবস্থা করিব"।

৩। রাসো অনুসারে পৃথ্বীরাজের জন্ম ১১৪৮ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে। তিনি বার বৎসর বয়সে, অতএব ১১৬০ খৃষ্টাব্দে, মাতামহের রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহের লাটের লেখ ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ বিগ্রহরাজ বীসল-দেবের লেখা, অর্থাৎ পৃথ্বীর দিল্লী সিংহাসন লাভের তিন বৎসর পরে বিগ্রহরাজ রাজা ছিলেন, ও তিনি তখন দিল্লী জয় করিয়াছিলেন। হাম্বীর কাব্য ও বিজওলার পর্ব্বত গাত্রে লেখমতে বিগ্রহরাজের পর অমরগাঙ্গেয়, তাঁহার পর দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার পর সোমেশ্বর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ১১৬০ খৃঃ সোমেশ্বরের রাজ্যকাল হইতে পারে না।

৪। পৃথ্বীরাজের যখন ১১৪৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে জন্ম, তখন ১১৪৭ খৃঃ বা তৎপূর্ব্বেই সোমেশ্বর রাজা ছিলেন, ও অনঙ্গপালকে সাহায্য করিয়া কমলাকে লাভ করিয়াছিলেন। ১২২৬ সম্বৎ (১১৬৯ খৃঃ) এক লেখ সোমেশ্বরের পূর্ব্বরাজা দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের পাওয়া গিয়াছে ও ১২২৬ সম্বতের ফাল্গুন মাসে [ফেব্রুয়ারী ১১৭০ খৃঃ] বিজওলার লেখ সোমেশ্বরের লেখা; অতএব ১২২৬ সম্বতে দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের মৃত্যু ও সোমেশ্বরের রাজ্যলাভ হইয়া থাকিবে। অতএব ১২০৪ সম্বতে (১১৪৭ খৃঃ) বাইশ বৎসর পূর্ব্বে, সোমেশ্বরের অনঙ্গপালকে সাহায্য করিয়া কমলাকে লাভ করা অসম্ভব।

৫। সোমেশ্বরের পিতা অর্ণোরাজা একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন রাণী। প্রথমা, মারবার কন্যা সুধবা, তাঁহার গর্ভে জগদেব ও বীসলদেব, বিগ্রহরাজ (চতুর্থ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়া গুজরাটের সিদ্ধরাজ জয়সিংহের কন্যা কাঞ্চনা দেবী, তিনি অপুত্রক। তৃতীয়া গুজরাট রাজ সোলঙ্কী কুমারপালের ভগ্নী দেবল-দেবী। এই কুমারপাল গুজরাটের পূর্ব্বরাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহের খুড়তুত ভাই ত্রিভুবনপালের পুত্র। দেবল দেবীর গর্ভে সোমেশ্বরের জন্ম হইয়াছিল; সোমেশ্বর বেশীর ভাগ মাতুলালয়ে থাকিতেন, তাঁহার শিক্ষা মাতুলের কাছেই হইয়াছিল। একবার কুমারপাল কোঙ্কন দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন সোমেশ্বর সঙ্গে ছিলেন। সোমেশ্বর স্বহস্তে কোঙ্কনরাজকে নিহত করিয়াছিলেন।

সোমেশ্বরের বিবাহ চেদী [জব্বলপুরের চারি দিকের দেশ; রাজধানী ত্রিপুরী—আধুনিক জব্বলপুর হইতে নয় মাইল দূরে তেবর] দেশের হৈহয়-বংশীয় রাজা নরসিংহ দেবের কন্যা কর্পূরা দেবীর সহিত হইয়াছিল, তাঁহার দুই পুত্র, পৃথ্বীরাজ ও হরিরাজ। সোমেশ্বর ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হাম্মীর কাব্য-মতে ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল।

সোমেশ্বরের চারটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। (১) আধুনিক মিবার রাজ্যে বিজওলা নামক গ্রামের উপকণ্ঠে এক পর্ব্বত-গাত্রে অতি বিস্তৃত লেখ, ১২২৬ সম্বতের ফাল্গুন কৃষ্ণ তৃতীয়ার লেখা; ইহাতে সোমেশ্বরের উপাধি প্রতাপ-লঙ্কেশ্বর। এই লেখে চোহান বংশের ইতিহাস আছে, উপরোক্ত সংবাদগুলি এইলেখ হইতে গৃহীত। (২) সম্বৎ ১২২৮ (১১৭১ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ শুক্লদশমীর লেখা। (৩) সং ১২২৯ শ্রাবণ শুক্লাত্রয়োদশীর লেখা। এই উভয় লেখ ঘোড়গ্রামে রুঠিরাণীর মন্দিরের স্তম্ভে খোদিত। (৪) সং ১২৩৪ (১১৭৭ খৃঃ) ভাদ্র শুক্ল চতুর্থীর লেখা। এই গ্রাম জাহাজপুর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে। এই চারটি লেখ মধ্যে বিজওলার লেখই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়, কেননা তাহাতে সোমেশ্বর পর্য্যন্ত চোহান বংশের ইতিহাস বিস্তৃত-ভাবে লেখা আছে।

৬। হাম্মীর মহাকাব্য ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে নয়চন্দ্রসূরি নামক জৈন সাধু শেষ করিয়াছেন। হাম্মীর পৃথ্বীরাজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, রণথম্বের রাজা ১২৮২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, অতএব এই পুস্তকখানি চোহানবংশের ইতিহাস। এই পুস্তকে সোমেশ্বরের স্ত্রীর নাম কর্পূরা দেবী, কিন্তু তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় নাই। এই কাব্যে শাকম্ভরীর রাজারূপে পৃথ্বীর সবিস্তার জীবন-কাহিনী আছে, কিন্তু দিল্লীর রাজবংশ অথবা তোমর বংশের সহিত কোনও সম্বন্ধের উল্লেখ নাই।

তাহাতে আছে যে মুসলমানেরা দিল্লী অধিকার করিলে পর পৃথ্বী সসৈন্য দিল্লী আক্রমণ করিলেন, অর্থাৎ মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে তিনি দিল্লীতে ছিলেন না।

৭। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা পৃথ্বীকে অজমীরের রাজাই বলিয়াছেন, দিল্লীর সহিত কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। তবকাত-ই-নাসিরী বলেন দিল্লীর রাজা গোবিন্দরাজ বা গোবিন্দরায়।

৮। ফেরেস্তা বলেন পিথোরার ভাই দিল্লীর চামুণ্ড রায়।

৯। তাজ্-উল-মাআসীর বলেন:—"শিহাবউদ্দীন গজনী হইতে ৫৮৭ হিঃ [১১৯১ খৃঃ] লাহোরে আসিলেন, ও সরদার হমজাকে দূত-রূপে অজমীরে রাজার কাছে পাঠাইলেন। অজমীরের রাজাকে পূর্ব্বে শাস্তি দিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন রাজা মুসলমানদের ঘৃণা করেন ও ষড়যন্ত্র করিতেছেন তখন রাজার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। অজমীরের রাজ্য রায় পিথোরার পুত্রকে দিয়া স্বয়ং দিল্লী চলিয়া গেলেন। দিল্লীর রাজা অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুলতান আপনার কতক সেনা ইন্দ্রপথে রাখিয়া স্বয়ং গজনী চলিয়া গেলেন।" অতএব দিল্লী ও অজমীরের রাজা দুই জন ভিন্ন ব্যক্তি। দিল্লীর রাজার সহিত অজমীর রাজের কি সম্বন্ধ, ঠিক জানা গেল না, কিন্তু পৃথ্বীরাজ স্বয়ং দিল্লীর রাজা ছিলেন না। দিল্লীর রাজার সহিত কোনও কুটুম্বিতা থাকা অসম্ভব নহে।

১০। পৃথ্বীরাজের কতকগুলি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহার এক দিকে অশ্বারোহী মূর্ত্তি ও "শ্রীপৃথ্বী রাজদেব" লেখা, ও অন্যদিকে একটি বলদমূর্ত্তি ও "আসাবরী শ্রীসামন্ত

দেব" লেখা। অল্প কয়েকটি এমন মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে যাহার এক দিকে পৃথ্বীরাজের নাম ও অন্যদিকে "সুলতান মহম্মদ সাম" লেখা। এই মুদ্রা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পৃথ্বীরাজ স্বাধীনতা হারাইয়া কিছুকাল ঘোরীর সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাজ-উল-মাআসীরের উপরি লিখিত উক্তি পৃথ্বীরাজের সামন্ত অবস্থাই প্রমাণিত করে।

এইসকল প্রমাণ দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, রাসোর কথাগুলি কল্পিত, সে-সময়ে দিল্লীতে তোমর বংশীয়দের রাজ্য ছিল কি না সন্দেহ, থাকিলেও প্রমাণিত হইল যে সে-বংশ পৃথ্বীর মাতামহ-বংশ নহে। পৃথ্বী কোনও কালে দিল্লীর রাজার পোষ্যপুত্র হন নাই, বা দিল্লী রাজ্য পান নাই। শেষ যুদ্ধের সময়ে তিনি দিল্লীতে ছিলেন না, রাজপরিবার দিল্লীতে ছাড়িয়া যুদ্ধে যান নাই। শেষ যুদ্ধ ও পতনের সময়ে তিনি শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরীর করদাতা সামন্ত ছিলেন, তবে এ সামন্ত অবস্থা কতদিন ছিল জানা যায় না, সম্ভবতঃ বেশী দিন ছিল না।

খ

রাসো অনুসারে পৃথ্বীরাজের যখন বারো বৎসর বয়স, তখন গুজরাটে ভোলারায় ভীমদেব ও আবুতে সলখ্ [সলখ] প্রমার রাজ্য করিতেন; উভয়ে স্বাধীন প্রতিবাসী ছিলেন। রাসোর বর্ণনা অনুসারে পৃথ্বী বার বৎসর বয়সে, তাঁহার ১০৮ সুরের বহাবলে একজন প্রবীণ যোদ্ধা বলিয়া গণ্য। ভীমদেবের ছোট ভাইদের আট পুত্র জ্যাঠার সহিত বিবাদ করিয়া সোমেশ্বরের আশ্রয় লইয়াছিল; তাহারা পৃথ্বীর সমবয়স্ক বলিয়া সোমেশ্বর তাহাদের পৃথ্বীর সহিত রাখিয়াছিলেন। পৃথ্বীর এক সুর কহ্নকাকার সম্মুখে তাহাদের মধ্যে একজন গোঁফে তা দিয়াছিল বলিয়া কহ্ন সকলকে হত্যা করিয়াছিলেন। সলখের দুই কন্যা, মন্দোদরী, ও ইচ্ছিনী, ও এক পুত্র, জেত প্রমার। জ্যেষ্ঠা মন্দোদরীর সহিত ভীমদেবের বিবাহ হইয়াছিল, ও কনিষ্ঠা ইচ্ছিনীর সহিত পৃথ্বীর বিবাহ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তখনও বিবাহ হয় নাই। রাসো ও আল্‌হার গানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ক্ষত্রিয়রা বার বৎসর বয়সে পূর্ণবয়স্ক যোদ্ধা বলিয়া সম্মানিত। বিবাহের সময়ে কন্যার বয়স লেখা নিয়ম নহে, কিন্তু তাহারা প্রায়ই বর অপেক্ষা বেশী বয়স্কা হইত। গুজরাটে এখনও ঐ প্রথা প্রচলিত আছে, অধিকাংশ বর অপেক্ষা কন্যা বয়স্থা। মন্দোদরীর সেবিকাদের মুখে ইচ্ছিনীর অসাধারণ রূপ ও লাবণ্যের কথা শুনিয়া, ভীমদেব ইচ্ছিনীকে লাভ করিতে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি দূত পাঠাইয়া সলখকে সংবাদ দিলেন, যে হয় স্ব-ইচ্ছায় ইচ্ছিনী দান কর, নতুবা আমি আবু রাজ্য ছারখার করিব। ইহাতে সলখ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন, অতএব ভীমকে কন্যাদান করিতে অস্বীকার করিলেন, ও পৃথ্বীকে শীঘ্র আসিয়া বিবাহ করিতে আহ্বান করিলেন। পৃথ্বীর সসৈন্য আবু পহুঁছিবার পূর্ব্বেই ভীমদেব আবু আক্রমণ করিলেন। প্রমারেরা যুদ্ধে পরাজিত হইল, সলখ যুদ্ধে নিহত হইলেন; কিন্তু ভীমদেব জেত বা রাজ পরিবারের সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা আবুতে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া গুজরাটে প্রত্যাগমন করিলেন। গুজরাটে ফিরিবার সময়ে দেখিতে পাইলেন, পৃথ্বী ও তাঁহার সুরেরা গিরিসঙ্কটে লুকাইয়া পথ আটক করিয়া বসিয়া আছেন। যে-দিন চোহানদের সহিত দেখা হইল, সে-দিন ঘোর যুদ্ধ হইল। ভীম পরাজিত হইয়া পলাইলেন। বিজয়ী পৃথ্বীর সহিত জেৎ ও সমস্ত রাজ পরিবার আবুতে ফিরিয়া গেল। পর দিবস পৃথ্বী আবুর রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; (১) তাহার পরদিবস ইচ্ছিনীর সহিত মহা সমারোহে বিবাহ হইল। এই ইচ্ছিনী পৃথ্বীর একাদশ রাণী-মধ্যে প্রধানা বা পাটরাণী ছিলেন। পৃথ্বী আপন শ্যালক জেৎপ্রমারকে তাহার পৈতৃক স্বাধীন রাজ্যে অজমীরের সামন্ত নিযুক্ত করিলেন। জেৎ এইরূপে ভগ্নীদান করিয়া স্বাধীন রাজা হইতে সামন্ত পদে পতিত হইলেন। তিনি কিছুকাল পরে আবুতে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া স্বয়ং পৃথ্বীর সহচর হইলেন। ভবিষ্যতে পৃথ্বীর প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যুর পর জেৎ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কনোজ অভিযানে পৃথ্বীর সঙ্গে ছিলেন, ও জীবিত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঘোরীর সহিত যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীর সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

১। পৃথ্বীরাজ সলখের আহ্বানে ইচ্ছিনীকে বিবাহ করিতে আবু গিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন কেন, তাহার কোনও কারণ লেখা নাই, কেবল সমারোহের সহিত অভিষেকের কথা আছে।

পরাজিত ভীমদেব প্রতিশোধ লইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি অতর্কিত-ভাবে অজমীরে সোমেশ্বরকে আক্রমণ করিলেন, ও তাঁহাকে সৈন্যসংগ্রহ করিতে অবসর দিলেন না। যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে সোমেশ্বর সকল কথা পৃথ্বীকে পত্রদ্বারা জানাইলেন, ও যদি তাঁহার পরাজয় বা মৃত্যু হয়, তবে প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিতে বলিলেন। পরদিবস যুদ্ধক্ষেত্রে সোমেশ্বর বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। রাসোতে এ ঘটনাকে "সোমেশ্বর বধ" লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ সোমেশ্বরকে অধর্ম্ম যুদ্ধে হত্যা করা হইয়াছে। অশৌচান্তে প্রথমে পৃথ্বী পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, পরে ভীমদেবকে শাস্তি দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি ভীমকে [৪৪ সময়] আক্রমণ করিলেন। এ-যুদ্ধের সন লেখা নাই, কিন্তু পৃথ্বীর পিতৃ-রাজ্য প্রাপ্তির পর ইহাই প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধে ভীমদেব নিহত হইলেন, পৃথ্বী তাঁহার ৮৪টি বন্দর কাড়িয়া লইলেন; পরে ভীমের শিশু-পুত্রকে পট্টন রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বিজয় গৌরবে দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।

সোমেশ্বরের মৃত্যুর পরও পৃথ্বী দিল্লীতেই থাকিতেন।

এ-বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থে, শিলালেখাদিতে যাহা পাওয়া যায় তাহা এইরূপ:—

পৃথ্বীরাজের সময়ের বহু পূর্ব্বে—প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে—আবুর প্রমারবংশে ধরণীবরাহ নামক এক রাজা ছিলেন। গুজরাটের রাজা মূলরাজ সোলঙ্কী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, পরাজিত করিয়া পলাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সে-সময়ে রাষ্ট্রকূট [রাঠোর] ধবল আবুরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ধবলের ৯৯৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালেখে এই বর্ণনা আছে। মূলরাজ ৯৬১ হইতে ৯৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক কোন সময়ে ধরণীবরাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাহা জানা নাই। আবুর রাজারা এই সময় হইতে গুজরাটের সামন্ত, ও ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত [অর্থাৎ পৃথ্বীর মৃত্যুর চার বৎসর পরেও] এই সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জিনমণ্ডন নামক একজন জৈন লেখক "কুমারপাল প্রবন্ধ" নামক এক পুস্তকে কুমারপালের জীবনী লিখিয়াছেন। তিনি ঐ পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে একদিন শাকম্ভরী-পতি অর্ণোরাজা আপনার রাণী দেবলদেবীর সহিত পাশা খেলিতেছিলেন। এই দেবলদেবী কুমার-পালের কনিষ্ঠা ভগ্নী। রাজা প্রায়ই রাণীর বাপ, ভাই তুলিয়া বিদ্রূপ করিতেন, রাণীর তাহা অসহ্য বোধ হইত। সেদিন ঐরূপ কোনও বিদ্রূপে রাণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তুমি এরূপে আমার পিতৃবংশের অপমান করিলে, আমি কুমারপাল-দাদাকে বলিয়া দিব, তখন দেখিবে, তিনি তোমার কি দুর্গতি করেন।" একথা শুনিয়া, রাজাও ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি রাণীকে পদাঘাত করিয়া সে প্রকোষ্ঠ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, ও সেবকদের ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, "রাণীকে এখনই তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আইস।" রাণী ইহাতে অত্যন্ত অপমানিতা বোধ করিলেন, ও তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া কুমারপালের কাছে অপমানের প্রতিশোধ ভিক্ষা করিলেন।

কুমারপাল ১১৪৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতি তেজস্বী ও স্বাধীন-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অমাত্যদের পরামর্শ ও মতামত গ্রাহ্য না করিয়া আপনার ইচ্ছামত সকল রাজকার্য্য করিতেন, সেইজন্য রাজসভাতে তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহার প্রধান অমাত্য বাগভট্টের ছোট ভাই আর ভট্টের ডাক নাম চাহড় বা জাহড় ছিল। তাঁহাকে গুজরাটের পূর্ব্বরাজা সিদ্ধরাজ জয়সিংহ পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, ও সকল গুপ্ত পরামর্শের সভাতে ডাকিতেন, কিন্তু নূতন রাজা গ্রাহ্যও করিতেন না। সেই জন্য রাগে ও অভিমানে তিনি কুমারপালকে ত্যাগ করিয়া অর্ণোরাজের আশ্রয় লইলেন, ও তাঁহাকে গুজরাট আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি গোপনে গুজরাটের কতকগুলি সামন্তকে অর্থদ্বারা বশ করিয়াছিলেন ও তাহাদের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে তাহারা হয় কুমার-পালকে ত্যাগ করিয়া অর্ণোরাজের আশ্রয় লইবে, নতুবা যুদ্ধারম্ভের অল্প পরে পরাজিত হইয়া পলাইবার ভাণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিবে। অর্ণোরাজ গুজরাট

আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাণীর ঘটনা ঘটিল। কুমারপালও ভগ্নীর অভিযোগ শুনিয়া অতিশীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই বিপক্ষ সম্মুখীন হইলে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই কয়েকটি গুজরাটের ছোট সামন্ত পলাইয়া ক্ষেত্রত্যাগ করিল, ও কুমারপাল দেখিলেন চন্দ্রাবতীর [আবু] রাজা বিক্রম-প্রমার তাঁহার পক্ষত্যাগ করিয়া অর্ণোর দলে প্রবেশ করিল। তিনি সামন্তদের বিশ্বাসঘাতকতায় চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু ভয় পাইলেন না। তিনি আপনার হস্তীচালককে আজ্ঞা করিলেন, যেরূপে সম্ভব হয় অর্ণোর হাতীর কাছে চল। হস্তী-চালকও অতিশীঘ্র সোজা অর্ণের হাতীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। অর্ণো বা তাঁহার সহচরেরা এরূপ সশরীরে বিপক্ষ রাজার আক্রমণ আশা করেন নাই। আর ভট্ট আপনার হাতী হইতে কুমার-পালের হাতীতে আসিবার জন্য লম্ফ প্রদান করিলে কুমার-পালের হস্তী-চালকের ইঙ্গিতে হাতী একটু সরিয়া গেল; আর তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন, ও আবার উঠিবার পূর্ব্বেই শিক্ষিত গজরাজের পদতলে মর্দ্দিত হইলেন। এই বার, হস্তীপৃষ্ঠে দুই রাজার হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এযুদ্ধও অনেকক্ষণ হয় নাই, বলবান্ কুমারপাল লম্ফ দিয়া অর্ণোর হাতীতে উঠিলেন, ও অর্ণোকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন, ও গলার উপর একটি তীর-ফলক চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে অর্ণো পরাজয় স্বীকার করিলেন। কুমারপাল তাঁহাকে নিরস্ত্র করিয়া একটি কাঠের খাঁচাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সামন্ত ও সৈনিকদের অসি নিষ্কোষ করিতে হইল না, অথচ অর্দ্ধ দণ্ড-মধ্যে যুদ্ধ শেষ হইল। সামন্তরা বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও গুজরাট-রাজের জয় হইল। কুমারপাল অর্ণোকে তিন দিন বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, ও অনেকগুলি হাতীঘোড়া কাড়িয়া লইয়াছিলেন; পরে অর্ণো আপনার ভগ্নী জল্হনা দেবীকে দান করিয়া ও দেবলদেবীর সহিত সদ্ব্যবহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ধি ও মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

চোহানদের ইতিহাসে এপরাজয়ের কথা কেহ লৈখে নাই সত্য, কিন্তু গুজরাটের নানা ইতিহাসে, কাব্যে ও নাটকে এজয়ের কথা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। আজ-কাল নানাপ্রকার অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যে জৈন লেখকেরা কুমারপালের প্রশংসায় অযথা অত্যুক্তি করিয়া-ছেন, অতএব জৈন লেখকদের সকল কথা বিশ্বসনীয় নহে। কুমারপাল পূর্ব্বে শৈব ছিলেন, হেমচন্দ্র আচার্য্য নামক এক জৈন বিদ্বান্ সাধুকে তিনি আপনার সভার প্রধান বিদ্বান্ পণ্ডিত-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই হেমাচার্য্যের প্রভাবে তিনি অল্পকাল-মধ্যে জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার কাছে দীক্ষা লইয়াছিলেন, ও রাজ্য-মধ্যে পশুবধ নিষেধ করিয়াছিলেন। সেইজন্য জৈনেরা কুমারপালের অত্যন্ত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক সুখ্যাতি করিয়াছে।

এ-যুদ্ধের উল্লেখ চোহানদের ইতিহাসে না থাকিলেও অন্য এক তৃতীয় নিরপেক্ষ স্থানে আছে। চিতোরের কেল্লার মধ্যে সমিদ্ধেশ্বরের মন্দির-গাত্রে একটি লেখ আছে, তাহাতে লেখা আছে:—"গুজরাটের সোলঙ্কী রাজা কুমারপাল শাকম্ভরীর (Sambhar country) রাজাকে জয় ও সপাদলক্ষ (২) দেশ মর্দ্দন করিয়া প্রত্যাগমনের সময়ে শালীপুর গ্রামে আপনার সেনা ত্যাগ করিয়া, একাকী চিত্রকূটের [চিতোর] শোভা দর্শন করিতে আসিয়া ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছামত এই লেখ ১২০৭ সম্বতে লেখা হইল।" এলেখে যুদ্ধের সময় জানা যায় না, তবে, ১২০৭ সম্বতের পূর্ব্বে কোনও সময়ে হইয়া থাকিবে।

যুদ্ধ শেষ হইলে, কুমারপাল বিশ্বাসঘাতক সামন্তদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রাবতীর

(২) চোহানদের দেশকে সপাদলক্ষ দেশ বলে। এই শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আমি দুইটি পাইয়াছি। (১) চোহানেরা পূর্ব্বে অহিক্ষেত্রপুরে বাস করিত, তাহার ভগ্নাবশেষ এখন বেরেলীর ৩০ মাইল পশ্চিমে পাওয়া যায়। তাহারা সেখান হইতে পঞ্জাবের পশ্চিম-সীমান্তে শিবালিক পর্ব্বতের কাছে বাস করিল। এ-পর্ব্বতের নাম শিবালিক বা শওয়ালক্ষ, কেননা তাহার ১২৫০০০ শৃঙ্গ আছে। চোহানেরা যখন শাকম্ভরী দেশে আসিল, তখনও তাহাদের দেশের নাম শওয়ালক্ষদেশ রহিয়া গেল। শব্দটি সংস্কৃত ভাবাপন্ন হইয়া সপাদলক্ষ-দেশ হইয়াছে। (২) চোহানদের রাজ্যে সওয়ালক্ষ ১২৫০০০ গ্রাম ছিল বলিয়া সপাদলক্ষদেশ নামে প্রসিদ্ধ।

[আবু] রাজা বিক্রমপ্রমার অর্ণোর সেনার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। সেই অপরাধে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তাঁহার স্থানে বিক্রমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় রামদেবের পুত্র যশোধবলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এ-যুদ্ধে যশোধবল কুমারপালের পক্ষে ছিলেন। আবু পাহাড়ে অচলেশ্বর মন্দির-গাত্রের লেখে ও বাস্তুপালের জৈন মন্দিরের ১২৮৭ সম্বতের প্রশস্তিতে ইহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

আবুর কাছে অজারী গ্রামে ১২০২ সম্বতের [১১৪৫খৃঃ] একটি লেখ আছে, তাহাতে "প্রমার বংশোদ্ভব মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীযশোধবল রাজ্যে......" শব্দ আছে। অতএব, কুমারপাল ও অর্ণোর যুদ্ধ, বিক্রমের সিংহাসনচ্যুতি ও যশোধবলের রাজ্যপ্রাপ্তি ১১৪৫ খৃঃ বা তাহার পূর্ব্বেই কোনও সময়ে হইয়াছিল। নবেম্বর ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন কুমারপাল রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, তখন এ-সকল ঘটনা দুএক বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছিল।

সিরোহী রাজ্যের সীমা মধ্যে কায়দ্রা গ্রামের উপকণ্ঠে কাশী বিশ্বেশ্বরের মন্দির গাত্রে ১২২০ সম্বৎ [১১৬৩ খৃঃ] লিখিত এক শিলালেখ আছে, ইহা "যশোধবলের জ্যেষ্ঠপুত্র ধারাবর্ষের" লেখা। অতএব যশোধবলের মৃত্যুর পর ১১৪৫ ও ১১৬৩ খৃঃ মধ্যে কোনও সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধারাবর্ষ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই ধারাবর্ষ একজন বীর যোদ্ধা ও "ধার পমার" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবু ও তাহার চারিদিকে তাঁহার বহু কীর্ত্তির চিহ্ন বা তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, ও তাঁহার বীরত্বের নানা গীত সে-দেশে এখনও গ্রামে-গ্রামে গীত হইয়া থাকে।

মুসলমানদের ইতিহাস "তাজ-উল-মাআসীর"তে আছে যে "হিজরী ৫৯৩ [১১৯৭ খৃঃ] তে খুসরো [কুতুবউদ্দিন এবক] অনহলবারায় [গুজরাট] রাজাকে আক্রমণ করিলেন, তখন আবুর কাছে তাঁহার দুই সামন্ত রায়কর্ণ ও দারাবর্ষ [ধারাবর্ষ] যুদ্ধ করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে ধারাবর্ষ জীবিত ছিলেন, ও গুজরাটের সামন্ত ছিলেন।

এইরূপে ১১৪৫ হইতে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আবুর রাজাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া গেল, ও তাঁহারা এই সময়ে যে গুজরাটের রাজার সামন্ত ছিলেন, তাহাও প্রমাণিত হইল।

সোমেশ্বরের সহিত ভীমদেবের যুদ্ধ, সোমেশ্বরের পরাজয় ও মৃত্যু [সোমেশ্বর বধ], পরে প্রতিশোধের জন্য পৃথ্বীর আক্রমণ, ভীমের পরাজয় ও মৃত্যু, ইত্যাদি ঘটনা রাসোতেই বর্ণিত হইয়াছে, অন্য কোনও ইতিহাসে, কাব্যে বা নাটকে নাই। গুজরাটের ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিকরা ভীমের পরাজয়ের কথা হয়ত লুকাইয়াছে, অপমানের ভয়ে লেখে নাই, কিন্তু গুজরাটের পক্ষে মহা গৌরব কাহিনী সোমেশ্বরের মত প্রবল শত্রুকে জয় ও বধের কথাও কেহ লেখে নাই। গুজরাটের ইতিহাসে ও মুসলমানদের ইতিহাসে আছে যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ভীমদেব ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করিয়া ১২৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ পৃথ্বীর মৃত্যুর ৪৮ বৎসর পর পর্য্যন্ত—রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সোমেশ্বরের মৃত্যু যখন ১১৭৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল, তখন ভীমদেব ও পৃথ্বী প্রায় এক সময়েই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীর জন্ম ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে সত্য হইলে, ভীম তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ছিলেন, কেননা ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ঐতিহাসিক ও গুজরাটী লেখকেরা ভীমকে বালক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়াই বর্ণিত করিয়াছেন, ও পৃথ্বীর বয়স তখন ৩০ বৎসর। অতএব ভীমের ছোট ভাইদের পুত্রেরা পৃথ্বীর সমবয়স্ক হইতে পারে না; ভীমের পৃথ্বীর বিবাহের পূর্ব্বে মন্দোদরীর সহিত বিবাহ, ইচ্ছিনীর জন্য আবু আক্রমণ, পৃথ্বীর ভীমকে আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলা, ৮৪টি বন্দর কাড়িয়া লওয়া ও তাহার শিশু-পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা কেবল মিথ্যা নহে, অসম্ভব মিথ্যা রূপকথা মাত্র।

রাসোর বর্ণিত সলখপ্রমার ও জৈৎপ্রমরের যখন অস্তিত্বই ছিল না, তখন মন্দোদরী ও পৃথ্বীর পাটরাণী ইচ্ছিনী কল্পিত নায়িকা মাত্র।

রাসোর বর্ণনা-মধ্যে এইটুকু সত্য সংবাদ আছে, যে, পৃথ্বীর সময়ে আবুতে প্রমার বংশ ও গুজরাটে ভীমদেব রাজ্যশাসন করিতেন। ইহা ছাড়া আর সকলই অসম্ভব কল্পনা।

গ

রাসোর বর্ণনা [২০ সময়] অনুসারে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বদেশে সমুদ্র-শিখর-গড়ে যাদব বংশীয় রাজা বিজয়পালের সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য ছিল। তাঁহার দশ হাজার বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী, অনেক হাতী, তিন লক্ষ পদাতিক, দশ পুত্র ও দশ কন্যা ছিল। পদ্মাবতী নাম্নী কন্যার বিবাহ কমাউর রাজা কুমোদমণির সহিত স্থির হইয়াছিল, কিন্তু পদ্মাবতী পৃথ্বীর সাহস ও বীরত্বের নানা গল্প ও গাথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে আপন পুরোহিতের হাতে পৃথ্বীকে একখানি পত্র গোপনে লিখিল, যে আমার বিবাহের পূর্ব্বে, মন্দিরে পূজা করিতে যাইবার সময় আমাকে হরণ করিয়া উদ্ধার কর, নতুবা আমি বিষ খাইয়া মরিব। পৃথ্বী এই পত্র পাইয়া কবি চন্দ ও আপনার অল্প কয়েকটি সাহসী অনুচর ও সংক্ষিপ্ত সেনা সঙ্গে লইয়া সমুদ্রশিখর গড়ে আসিলেন। বিবাহের পূর্ব্ব দিবস যখন পদ্মাবতী দেবপূজার জন্য নগরের বাহিরে মন্দিরে গিয়াছিলেন, তখন পৃথ্বী তাঁহাকে হরণ করিলেন। বিজয়পালের পুত্ররা ও কুমোদমণি তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি সকলকে পরাজিত করিয়া পদ্মাবতীকে লইয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। রাজধানীতে পঁহুছিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রমত বিবাহ হইল।

সমুদ্রশিখর-গড়-নামক কোনও নগরের, বা নগরের ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব আজকালকার ইতিহাস, ভূগোল, বা প্রত্নতত্ত্ব প্রমাণ করিতে পারে নাই। পূর্ব্বদেশে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য হয় বঙ্গের নয় উড়িষ্যার হইতে পারে। রাসো-অনুসারে উড়িষ্যাতে কনোজের বিজয়পালের আক্রমণের সময়ে, এই ঘটনার ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রবল রাজা সোমবংশীয় মুকুন্দদেব কটকে রাজ্য করিতেন। মুকুন্দদেবের কন্যা জুনাইয়া বা জ্যোৎস্নার সহিত জয়চন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার গর্ভে সংযুক্তার জন্ম বিবরণ রাসোতেই আছে, অতএব যদিও যাদবদের সোমবংশীয় বলা যাইতে পারে, তথাপি উড়িষ্যার রাজধানী কটক সমুদ্র-শিখর-গড়, ও মুকুন্দদেব বিজয়পাল হইতে পারে না। সমুদ্রশিখর গড়ের রাজা, ছোট রাজা ছিলেন না, যাহার দশহাজার বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী, তিনলক্ষ পদাতিক সেনা, ও অগণিত হাতী, সে একজন সম্রাট্‌সদৃশ বিস্তৃত রাজ্যের রাজা, অথচ বাঙ্গলা দেশে ঐ নাম বা বংশের কোনও রাজা ঐ সময়ে ছিল না। [রাঢ়ে পাল-বংশীয় রাজারা ও বারেন্দ্র বিজয়সেন প্রতাপী রাজা ছিলেন। বোধ হয়, লেখক ঐ দুই নাম শুনিয়া বিজয়পাল করিয়াছেন]

বিবাহের জন্য রাজকন্যার পুরোহিতের হাতে আপনার মনোনীত বরকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো, পূর্ব্বাবধি অন্য-এক রাজার সহিত বিবাহ স্থির হওয়া, হরণ, নিমন্ত্রিত বরের কন্যার ভ্রাতা ও ভূতপূর্ব্ব বরের সহিত যুদ্ধ, সকলের পরাজয়, রাজকন্যার নিমন্ত্রিত নূতন বরের সহিত তাহার দেশে গিয়া বিবাহ, এই ঘটনাগুলি পড়িয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কোনও রসিক তোষামোদকারী লেখক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহের গল্পটি কেবল নাম বদল করিয়া লিখিয়াছে। এরূপে পৃথ্বীকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত উপমিত করায় তোষামোদের চূড়ান্ত করা হইয়াছে। ঐ তোষামোদের কাহিনীতে ঐতিহাসিক সত্য অন্বেষণ বা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র।

(ক্রমশঃ)

চিঠি*

[পোস্টমার্ক—শিলাইদা
৭ ফেব্রুয়ারি ১৫]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, দুটো নূতন কবিতা পাঠিয়েছি বোধ করি পেয়েছ। আমি যে-ভাবে ছেদ প্রভৃতি দিয়েছি সেই ভাবেই ছাপিয়ো। চল্‌তি ভাষায় লেখা ভাঙা ছন্দে পড়্‌তে পদস্খলন হয় না ত? লেখক স্বয়ং ত দিব্য আরামে পড়্‌তে পারেন—কিন্তু পাঠকের উপরে ভরসা হয় না।

ভবসিন্ধু-বাবু পিতৃদেবের যে জীবনী লিখেছেন তার মধ্যে একটি গল্প আছে, যে, আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো ঘর আমার ইচ্ছামত ভাঙচুর করাতে পিতৃদেব প্রথমে আমাকে ভৎসনা করেন, তার পরে আমার অকীর্ত্তি সংশোধন ক'রে দেন, তার পরে আমাকে বাস কর্‌বার জন্যে নূতন বাড়ি দেন। যখন সমালোচনা কর্‌বে, তখন পাঠকদের বোলো, আমার নূতন বাড়ির ভিত্তি এই ঘটনার ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। তার প্রধান কারণ, আমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোনো কিছুই ভাঙি নি; যা কিছু ক্ষণভঙ্গুর, তা তিনি নিজেই একরকম ভেঙে শেষ ক'রে গেছেন, উত্তর-বংশীয়ের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। অতএব ঐ গল্পটি সংশোধন করা কর্ত্তব্য। তা যদি করা হয়, তাহলে শেষাংশটিই বাকি থাকে, অর্থাৎ তিনি আমাকে বাসের জন্যে একটা নূতন বাড়ি দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে অনেক পিতাই এমন কাজ ক'রে থাকেন। অতএব এই ঘটনা আমার পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হোক্, মহর্ষির জীবনীর পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ইতি ২৩ মাঘ, ১৩২১।

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ
পিতামহের কীর্ত্তির প্রতি কালাপাহাড়ি করা যে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ, এই সংবাদটি আমার পাঠকবন্ধুরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ কর্‌বেন। অতএব এই বেলা এই মিথ্যাটাকে সরিয়ে ফেলা কর্ত্তব্য। আমার বিরুদ্ধে সত্যপ্রমাণ যা আছে, তাই এত বেশি, যে, সনাতনীর দলে আমার মুখ দেখাবার জো নেই—তার উপরে আর কেন?

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
৭ এপ্রিল ১৭]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

চারু, ক্ষিতিমোহন-বাবুকে মোক্তার ক'রে আমার কাছ থেকে একটি গানের জন্যে দর্‌বার করেছ। আমার দর্‌বারে মোক্তারের প্রয়োজন একেবারে নেই, সে তুমি জান। কিন্তু আমার ভাণ্ডার যে শূন্য। গান আমার হাতে দু'চারটে আছে বটে, কিন্তু তোমাদের কাগজের পক্ষে এমন গান চাই যা গাবার এবং পড়বার দুই ক্ষেত্রেই উভচরবৃত্তি কর্‌তে পারে—যা সুরের ঘরে পিসি এবং কাব্যের ঘরে মাসির মত। তেমন ত খুঁজে পাইনে। ধন্না দিয়ে প'ড়ে থেকে একটা আদায় করেছে মণিলাল—আর একটা যেটা কিঞ্চিৎ চলনসই গোছের আছে, পাঠালুম। পয়লা বৈশাখে কি দর্শন দিতে পার্‌বে? রামানন্দ-বাবু এখানে একসময় আস্‌বার ঈষৎ আভাস দিয়েছেন—তিনি এলে খুসি হব, অনেক কথা আলোচনা কর্‌বার আছে। আমেরিকায় Lynchingএর কয়েকটা সাক্ষ্যপ্রমাণ কাল তাঁর কাছে ডাকে পাঠিয়েছি। পেয়েছেন বোধ হয়। তাঁর notesএর মশানে এই দুষ্কৃতির বিবরণগুলিকে শূলে চড়ানো চাই।

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"যখন পড়্‌বে না মোর পায়ের চিহ্ন
এই বাটে" ইত্যাদি।

* এই চিঠিগুলি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখেন।

[পোস্ট্‌মার্ক—শান্তিনিকেতন
১৭ মে ১৯]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কাব্যকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গল প'ড়ে নোট্ ক'রে রেখেছি।

এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহ'লে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু বক্তব্য আছে, জানাতে পারবে। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
২৭ নভেম্বর ১৯]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শোনা গেল, জগদানন্দ সম্পাদকী দপ্তর থেকে তোমার উপর পত্রজারি করেছে। তাতে তুমি বিচলিত হোয়ো না। আমাদের শান্তিনিকেতন পত্রের খিড়কির দরজা জগদানন্দের সভায়, আর তার সদর দরজা না হয় প্রবাসী আপিসে রইল, তাতে ক্ষতি কি? আমাদের এই মাসিক পত্র যোগে আমরা নাম করতেও চাইনে, গ্রাহক বাড়াতেও চাইনি, অথচ এখানে যে আয়োজন হচ্ছে বাইরে যদি তার ব্যবহার চলে তাহ'লে তাতে ভালো ছাড়া মন্দ কিছু নেই। একজন ছাত্র শান্তিনিকেতনের লেখাগুলি প্রবাসীতে প'ড়ে খুব আনন্দ পেয়েছে এবং উপকৃতও হয়েছে—সেই বার্ত্তাটি জানিয়ে সে আমাকে পত্র লিখেছে, তাই আমার এই কথাগুলি মনে এল।

তোমাকে একটা গল্পের প্লট শিলঙ্ থেকে পাঠিয়েছিলুম, পেয়েছ ত? কাজে লাগ্‌বে কি? কিন্তু গল্পে কি কোনো প্লটের বিশেষ দরকার আছে? যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় এবং যদি ততদিনে মনে থাকে তবে সেই প্লটটা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

তুমি একবার সশরীরে সুরেনের আপিসে গিয়ে পোরা উর্ব্বশী সম্বন্ধে তার অভিপ্রায় জেনে নিয়ো। তার কাছ থেকে চিঠির জবাব পাওয়া দুর্লভ। ইতি ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এই গল্পের প্লটটি নিয়ে আমি সম্প্রতি "দোরোখা" নামে একটি উপন্যাস লিখ্‌ছি। এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস সেটি প্রকাশের ভার নিয়েছেন।—চারু]

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
৫ মার্চ ১৯২০]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

গল্প লেখ্‌বার মতো মেজাজও নেই, সময়ও নেই। মনে হয় ও-পাঠ উঠে গেছে—এখন ইচ্ছা কর্‌লেও আর লিখ্‌তে পার্‌ব না। তবে এক কাজ কর্‌তে পারি। আমার কথিকার ছোটো ছোটো গল্প—সে নিতান্তই গল্পস্বল্প—ছ চারটে দিতে পারি। কিন্তু যারা ক্ষুধার খাওয়া চায় তাদের পেট ভর্‌বে না। ওতে বস্তু-অংশ নেই—যারা কিঞ্চিৎ রস গ্রহণ ক'রে খুসি থাকতে চায় তাদের ওতে একটুখানি তৃপ্তি দিতে পারে। তুমি যদি নিজে গল্প লিখ্‌তে চাও আমি বরঞ্চ ভেবে চিন্তে প্লট দিতে পারি, কিন্তু আজকাল তাও আমার মাথায় সহজে আসে না। বোধ হচ্ছে আমার মানসিক উন্নতি হচ্ছে; আমি সাহিত্যে গল্পের ক্লাস থেকে হয় ত বা লোক-শিক্ষার ক্লাসে উত্তীর্ণ হব-হব কর্‌ছি। তাহলে মর্‌বার পূর্ব্বে আমার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জোগাড় করে' যেতে পার্‌ব। কিন্তু তাতে মস্ত একটা ভয়ের কথা এই যে, পুণ্য ফলে হয় ত বাংলাদেশে অধ্যাপকরূপে আমার পুনর্জ্জন্ম ঘটবে। সেইটে এড়াতে চাই। ইতি ২২ ফাল্গুন—১৩২৬

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
১০ মে ২৫]

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

চারু, ছুটিতেও কি তোমার দেখা পাওয়া যাবে না? একবার এসে কিছু আলাপ আলোচনা ক'রে যাও না। আপাতত আমি চলৎশক্তি-রহিত—ভাগ্যক্রমে এখনো বলৎশক্তি আছে। কিছু কাল পরেই আর একবার য়ুরোপ পাড়ি দেব।

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু—

আমার ব্যাকরণ এবং বড় দাদার গীতাপাঠ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। গীতাপাঠের প্রুফটা একবার কাপির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার একটা প্রুফ তত্ত্ববোধিনীতে ও অন্যটা আমার কাছে পাঠিয়ো। জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্ব্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধ হয় দেখেছ। জিনিষটাকে সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ আমার জীবন ব'লে একটা বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হ'য়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি—আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ ফুটে উঠেছে, কিন্তু অপারিতোষাদ্ বিদুষাং ইত্যাদি।

ব্যাকরণটা কি তোমরা ধারাবাহিক প্রকাশ করতে রাজি আছো? ওটা যে খুব রসালো জিনিষ এমন কথা আমার শত্রুপক্ষেরাও বলবে না—ওর মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে যুবক পাঠকের চরিত্র-বিকার ঘট্‌তে পারে। তির্য্যক্‌রূপের মধ্যে যে রূপ আছে তাতে মুনিগণের তপস্যার বিঘ্ন হবে না, অতএব এ রকম জিনিষ কি মাসিকে চলতে পারবে?

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমাদের এবারকার প্রবাসী মোটের উপর ভাল হয়েছে। বিশেষতঃ এবারকার কষ্টিপাথর নামের উপযুক্ত হয়েছে। অনাবশ্যক লোককে আঘাত কোরো না। অনাবশ্যক এই জন্যে বল্‌ছি, যাদের মরণদশা তারা মরবেই—মাঝের থেকে গোহত্যার পাপে লিপ্ত হও কেন? যারা সাহিত্যের গুণ্ডাগিরি ব্যবসায়ে পাকা হ'য়ে উঠেছে, খুনজখমের খ্যাতিটা তাদেরি হোক্। তোমরা ভদ্রলোক, দয়ামায়া আছে ব'লেই যেন সকলে তোমাদের স্মরণ করে।

যারা লিখতে অক্ষম তারা সহজেই হতভাগ্য—বিধাতাই তাদের দণ্ড দেন, তার উপরে তোমরা কেন তাদের দুঃখের বোঝা বাড়াও? যারা তোমাদের প্রতি দ্বেষ বহন করে তারা নিজের অন্তর-তাপে নিজে দগ্ধ হয়, তাদের উপর আর অগ্নিবাণ বর্ষণ কোরো না—শান্ত হয়ে হাসামুখে প্রফুল্লচিত্তে সম্পাদকের আসন আলো ক'রে থাক, এই আমি আশীর্ব্বাদ করি। ললাটে ভ্রুকুটির চিহ্ন দূর হ'য়ে যাক্।

রামানন্দ বাবুর চিহ্নিত একটি প্রবন্ধ শরৎ বাবুকে দিয়ে সঙ্কলন করিয়েছি, সেটা পাঠাই—সংশোধন তুমি ক'রে নিয়ো, আমার সময় আদবে নেই—আরো কতকগুলো পরে পরে পাঠাব।

ওঁ

প্রিয়বরেষু—

প্রবাসীর জন্য রেজেষ্ট্রি ডাকে আজ আমার "বাংলা নির্দ্দেশক", সন্তোষের "অশ্বের মনস্তত্ত্ব" এবং শরৎবাবুর একটা সংকলন পাঠাই। অশ্বের মনস্তত্ত্বটি বেশ ভালো লেখা হয়েছে; একবার ভেবেছিলুম তত্ত্ববোধিনীতেই নেব—তার পরে লোভ সম্বরণ করা গেল।

সোনার তরীর ইংরেজি তর্জ্জমা অজিত করেছিল—বিলাতে তার এক ইংরেজ মহিলা বন্ধুকে দিয়ে সংশোধিত করিয়েছিল, তার পরে বিখ্যাত কবি ও ঋষি Edward Carpenterকে দেখিয়ে সেই মহিলা ওটি পাঠিয়ে দিয়েছেন। Carpenter অজিতের কতকগুলি ইংরেজি অনুবাদের খুব প্রশংসা করেছেন। আমার ত বোধ হয় তার

মধ্যে কতকগুলি এর চেয়েও অনেক ভাল। সেই গুলির দিকে আমার ঝোঁক ছিল, কিন্তু অজিতের ঝোঁক এইটের উপরেই, তাই পাঠিয়ে দিলুম। দুজন ইংরেজের হাতের মধ্যে দিয়ে ফিল্‌টার হয়ে নিশ্চয়ই এর বাঙালিত্ব-দোষ ঘুচে গিয়েছে। রামানন্দ-বাবুকে দেখিয়ো—যদি পছন্দ করেন Modern Reviewতে ছাপ্‌তে পারেন।

তোমরা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে আমার ছবি বের ক'রে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত করেছ। এই রকম বার-বার নিজের ছবি কাগজে দেখার মত শাস্তি নেই। ঐ পাতগুলোর উপর আমি চোখ ফেল্‌তে পারিনে। দোহাই তোমাদের—আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আর আমার ছবি বের কোরো না।

ভারতীর জন্যে গল্প লিখ্‌তে বসেছি। কিন্তু কাজের ভিড় এবং শরীরের অপটুতার জন্য এগতে পারছিনে। মুস্কিলে পড়েছি। পাতা ষোলো লিখেছি, এখনো অন্তত ১২।১৩ পাতা বাকী।

তোমাদের
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়র মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

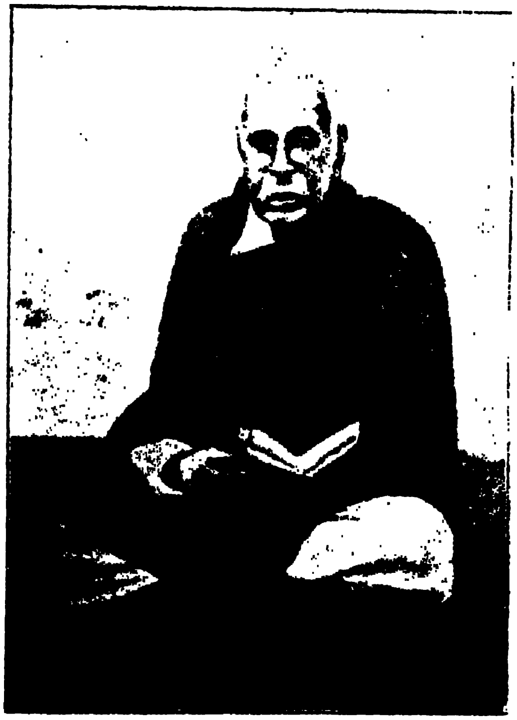
শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

স্বর্গীয় মুন্সী গোবিন্দচন্দ্র সেন-মহাশয় নিজামরাজ্য হইতে বিদায় লইবার পর, সেই বৎসরই (১৮৬৮ খৃঃ অব্দ) বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় নামে আর একজন কৃতী বাঙ্গালী হায়দ্রাবাদ প্রবাসী হন। তাঁহার পিতা ৺শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার বৈঁচির উত্তরে বড়ধামাস নামক একজন সম্মানিত গৃহস্থ ছিলেন এবং কলিকাতায় এক সওদাগরী অফিসে ২৫৲ টাকা বেতনে গুদাম-সরকারী করিতেন। কর্ম্মসূত্রে তিনি কলিকাতা হোগোলকুঁড়িয়ার পৈত্রিক বাটীতে বাস করিতেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ বুধবার শিবচতুর্দ্দশীর সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র মধুসূদনের জন্ম হয়। শৈশব হইতেই তিনি পিতার নিকট কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহার প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিচয়স্বরূপ তিনি নাকি শৈশবে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। দেশস্থ অনেকেই তাঁহার পিতার নিকট চাকুরির উমেদারী করিতে আসিত। একবার অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এইরূপ একজন আসিলে সরলপ্রকৃতি পিতা তাহার জামিন হইয়া এক চিনির কলে চাকুরি করিয়া দেন। কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক কলের তহবিল ভাঙ্গিয়া দশ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিলে চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়কে জামিনের টাকা দিতে হয়। তাহাতে দেশে দুইখানি খোড়োঘর আর সামান্য চাষের জমি ছাড়া সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। কলিকাতার বাড়ী-খানাও যায়। তিনি হোগোলকুঁড়িয়াতেই একখানি খোলার ঘর ভাড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার অনতি-কাল পড়েই তিনি স্ত্রীপুত্র কন্যাগণকে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় ফেলিয়া পরলোক যাত্রা করেন। এই সময় শিশুপুত্রের অক্লান্ত পিতৃসেবায় সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। সপ্তমবর্ষীয় পুত্র তখন পিতৃবন্ধুগণের পরামর্শে ও সাহায্যে বিধবামাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীদ্বয়কে লইয়া দেশে যান, এখানে অনন্যোপায় জননী অতি কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। সেই বিধবাকে গৃহচর্কার সূতা ও সামান্য জমির কৃষিজাত হইতে কত কষ্টে যে চারিজনের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইত তাহা বলাই বাহুল্য। মাতৃভক্ত শিশুর প্রাণে তাহা বাজিল। সেই অতি কষ্টের সংসারে তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে এমনই ভাবে ও এত সত্বর জাগাইয়া তুলিল যে, সেই সপ্তমবর্ষীয় শিশু দুরন্তপণা এককালে পরিহার করিয়া জননী ও ভগিনীদের দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর হইয়া একাকী

কলিকাতায় জনৈক পরিচিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে থাকিয়া বালক হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া স্বীয় সৎসাহস, মধুর প্রকৃতি ও বিদ্যানুরাগে অচিরেই হেয়ার সাহেবের হৃদয় জয় করিয়া বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

বিদ্যার্জ্জনকালে এই কোমলমতি শিশু কত অসুবিধা কত যে বিঘ্নের মুখ দেখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু স্থিরসঙ্কল্প সহিষ্ণু বালক সকল বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রবাদ মিথ্যা নহে যে, "স্বাবলম্বীর সহায় স্বয়ং ভগবান্"। তিনি যে ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না, সুতরাং বালক মধুসূদন রাজপথের আলোকে আসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন। একদিন স্বনামপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র গুহ-মহাশয় তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া এবং কারণ জানিতে পারিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বলেন, "তুমি কাল থেকে আমার ছোট ছেলেকে ইংরেজী প্রথমভাগ পড়াইও, আমি তোমাকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিব।" এই সময় মধুসূদনের বয়স মাত্র নয় বৎসর। সহৃদয় জমিদার বালককে বেতন ব্যতীত প্রতিমাসে এতটা 'সিধা' দিতেন যে, তাঁহার আর খাবার খরচ লাগিত না। সুতরাং, তিনি মাতাকে প্রতিমাসেই তিন টাকা করিয়া পাঠাইতেন। কয়জন ৯ বৎসরের বালক দূর দেশে থাকিয়া শিক্ষকতার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপনার ভরণপোষণ এবং বিধবা জননীকে অর্থসাহায্য করিতে সমর্থ হয়? সময়ে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং প্রথমাবধি কলেজের একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় নাই। হিন্দু কলেজ হইতে তিনি জুনিয়ার পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ২০৲ টাকা এবং ১৮৪৯ অব্দে সীনিয়ার বা চরম পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। এই সময় তাঁহার তৃতীয় পক্ষে বিবাহ হয়। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে প্রথম বিবাহ হইলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয় এবং পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে পুনরায় বিবাহ করিলে দুই বৎসরের মধ্যে সেই স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। মাতার আদেশে কিন্তু ইহার পরও তিনি এক পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন।



পরলোকগত বাঙ্গালী এঞ্জিনীয়র মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মধুসূদনবাবু যখন শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার সহপাঠী ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয়ের পরামর্শে তিনি রুড়কী এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে বিদ্যাসাগর-মহাশয় ও রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের যত্নে তিনি গবর্ণমেণ্ট্ ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ১৮৫২ অব্দের ১৮ই নভেম্বর উক্ত কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হন। তিনি রুড়কী কলেজের দ্বিতীয় বাঙ্গালী ছাত্র। প্রথম ছাত্র বাবু নীলমণি মিত্র ১৮৫১ অব্দের ৩রা মার্চ্চ এখানে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত এবং লালা মন্নালালের সহিত এরূপ বন্ধুত্ব জন্মে যে, তাহা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী

হইয়াছিল। তাঁহারা তিন জনেই এক বাসাতে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজে যেমন, এখানেও তেমনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করা তাঁহার একায়ত্ত ছিল। কিন্তু ১৮৫৫ অব্দের আগষ্ট মাসে পরীক্ষার সময় পীড়িত হওয়ায় এবং একদিন পরীক্ষা দিতে না পাবায় শেষ এঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হন এবং সার্ভেইং (জরীপ) ও সিভিল এঞ্জিনীয়ারিংএ প্রথম হইয়া দুইটি পুরস্কার লাভ করেন। শেষ পরীক্ষার পর তিনি এক বৎসর রুড়কী কলেজের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া যশোলাভ করেন। এই সময় কানপুরের গঙ্গার খাল খনন-কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় তাহাতে সাহায্য করিবার জন্ম ছোটলাট বাহাদুর মধুসূদন-বাবুকে অ্যাসিস্‌টাণ্ট্ এঞ্জিনীয়রের পদ প্রদান করিয়া তথায় পাঠান। কিছুদিন পরেই সিপাহী বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠে। মধুসূদন-বাবুর হস্তে তখন বিস্তর সরকারী অর্থ ছিল। তিনি তৎসমুদয় গোপনে লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে পাঠাইয়া দেন। পরে বিদ্রোহীদল তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করিলে তিনি দ্বিতলের ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ফতেআলী নামক একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের সহিত পলায়ন করেন। দিবসে লুকাইয়া থাকিয়া ও রাত্রিতে পথ চলিয়া ক্রমে তিনি এটাওয়াতে আসিয়া পৌছেন, কিন্তু এই সহরও বিদ্রোহীদল বেষ্টন করিতে আসিলে তিনি রজনীযোগে স্ত্রীলোকের বেশে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করেন এবং শীঘ্রই লর্ড্ গফ্ ও জেনারেল হাভলকের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হন। এক্ষণে তিনি সামরিক এঞ্জিনীয়র হইয়া জেনারেল হাভলকের সেনাদলে কার্য্য করিতে থাকেন। ঝান্সী আক্রমণ এবং লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌয়ের যুদ্ধস্থলে তাঁহার কার্য্য দেখিয়া জেনারেল হাভলক বলিয়াছিলেন,"বাবু এ দুর্দ্দিনে আপনার রাজভক্তি ও সাহস আমাদের মনে থাকিবে।" দুর্ভাগ্যক্রমে সেই যুদ্ধেই জেনারেলের মৃত্যু হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে মধুসূদন-বাবু ছুটি লইয়া দেশে যান। সেই সময় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের হাত দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট্ ঐ প্রদেশে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগকে জায়গীর পুরস্কার দেন। মধুসূদন-বাবু অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার প্রাপ্য জায়গীর তিনি পান নাই। এই সময় মাতৃবিয়োগ হইলে তিনি সপরিবারে কানপুর যাত্রা করেন এবং তথা হইতে মীরাটে বদলি হন। মীরাটে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। এখানে থাকিতে-থাকিতে ১৮৬১ অব্দে হিন্দুস্থানী ভাষায় এল, সি, ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথম গ্রেড অ্যাসিস্‌টাণ্ট এঞ্জিনীয়রের পদে বেরেলী বদলী হন এবং পর-বৎসর ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়র হইয়া ঝান্সী-প্রবাসী হন।

ঝান্সী অবস্থান কালে তাঁহার সহপাঠী বন্ধু রায় মন্নালাল বাহাদুর, সার সালারজঙ্গ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নিজাম রাজ্যের সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হন। তিনি মধুসূদন-বাবুকেও নিজামরাজ্যে কর্ম্ম লইবার জন্ম অনুরোধ করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বন্ধুবরের অনুরোধে ১৮৬৮অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গকে দেশে রাখিয়া আসেন এবং উক্ত সিবিল এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অ্যাসিস্‌টাণ্ট প্রিন্সিপালের পদ লইয়া হায়দ্রাবাদ প্রবাসী হন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু অ্যাসিস্‌টাণ্ট চীফ এঞ্জিনীয়ারের পদ লইলে তিনি তাহার স্থলে প্রিন্সিপাল হন এবং নিজাম রাজ্যের সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার পরীক্ষকও নিযুক্ত হন। ১৮৭২ অব্দে সার সালারজাঙ্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মধুসূদন-বাবু বালক নিজামের বিদ্যাশিক্ষা কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্ম নিজামকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষান্তে তিনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে তাঁহার স্বাধীনমত পাঠ করিয়া জঙ্গবাহাদুর ও নিজামের গৃহশিক্ষক কাপ্তেন ক্লার্ক্ সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধুসূদনবাবুর ছাত্র, বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর এবং পরে নিজামবাহাদুরের অ্যাসিস্‌টাণ্ট মিনিষ্টার মিঃ সৈয়দহোসেন বিল্‌গ্রামী, তাঁহার সহোদর মিঃ সৈয়দআলী বিল্‌গ্রামী এবং রাজা লাল্‌তা প্রসাদ তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণের শীর্ষস্থানীয়। ১৮৭৮ অব্দে তিনি স্বীয় পুত্রগণকে দেশ হইতে আনাইয়া নিজাম-কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইহার দুই বৎসর মাত্র পরে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্যামচরণ আত্মহত্যা করায় তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া

অন্য দুই পুত্র কালীচরণ ও করালীচরণকে দেশে পাঠাইয়া দেন।

কিছুকাল পরে হায়দ্রাবাদের এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ উঠিয়া গেলে মধুসূদনবাবু ১২০০৲ টাকা বেতনে সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৭ অব্দে প্রথম ইণ্টারন্যাশান্যাল এক্‌জিবিশন উপলক্ষে নিজাম বাহাদুর কলিকাতা আসেন। নিজামগবর্ণমেণ্ট মধুসূদনবাবুর উপর সমস্ত বন্দোবস্তের ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতা পাঠান। তিনি পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের প্রাসাদ ভাড়া করিয়া নিজামের বাসের ব্যবস্থা ও সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হয়। এবং সমস্তই মধুসূদন-বাবুর হাত দিয়াই খরচ হয়। এরূপ স্থলে সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত লোকের পদস্খলন হওয়া বিচিত্র ছিল না, কিন্তু চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যায় জাত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়-মহাশয় প্রচলিত প্রবাদকে মিথ্যা করিয়া এমন নির্লোভ, বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও চরিত্রবান্ হইয়াছিলেন, যে, পদস্খলন ত দূরের কথা উহা তাঁহার কল্পনাতেও আসিতে পারিত না। কানপুরে তাঁহার হস্তে যখন ইংরেজ সরকারের প্রচুর অর্থ ছিল, তখন জনৈক বন্ধু এবং অন্যান্য দুই-একজন লোক তাঁহার হস্তে ন্যস্ত বিপুল অর্থের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার ইঙ্গিত করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন বাবু মধুর তিরস্কারে তাঁহাদিগের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সহাস্যে বলিয়াছিলেন, "দাদা! টাকার চেয়ে বিশ্বাসের দাম অনেক বেশী।"

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়র হওয়ায় সর্ব্বদাই তাঁহাকে মফঃস্বলে ভ্রমণ করিতে হইত এবং সেই সূত্রে তিনি এই রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদর্শন করেন। এই সময় কয়েকবার বাঘের মুখে পড়িয়া তাহা হইতে রক্ষা পান। ১৮৯২ অব্দে স্বামী বিবেকানন্দ হায়দ্রাবাদ আসিয়া তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মধুসূদন বাবু কয়েকজন বাঙ্গালীকে নিজাম-সরকারে কর্ম্মোপলক্ষে হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী করাইয়াছিলেন। চীফ এঞ্জিনীয়র পামার সাহেবের পরামর্শে তিনি হায়দ্রাবাদ সহর হইতে তিন ক্রোশ দূরে খয়রাতাবাদে নিজের একখানি বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পামার-সাহেবও তাঁহার উক্ত বাংলার পার্শ্বে নিজের বাংলা প্রস্তুত করিয়া দুইজনেই খয়রাতাবাদে বাস করিতেন। এই সময় মধুবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় নিজাম সরকারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় কলিকাতাতেই থাকিয়া ব্যবসায়াদি করেন।

ত্রিশ বৎসর নিজাম-সরকারে গৌরবের সহিত কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে মধুসূদনবাবু পেন্‌সন্ গ্রহণ করেন। পেন্‌সন্ প্রাপ্তির পরও নবাব ফকর্ উল্-মুল্ক্-খাঁর শৈলবাস নির্ম্মাণের কার্য্যে তাঁহাকে সহস্র টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার শেষ জীবন কলিকাতা টালার বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া ১৯০৯ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ৮৪ বৎসর বয়সে পরলোক যাত্রা করেন। তিনি কয়েকদিন মাত্র সামান্য জ্বর ভোগ করিয়া রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় ডাক্তার ও কবিরাজকে আসিতে দেখিয়া বলেন, "এত রাত্রে কেন আসিয়াছ—আমি ত বেশ ভাল আছি"। ইহার একঘণ্টা পরেই কোনরূপ কষ্ট অনুভব না করিয়া তিন পুত্র—কালীচরণ, করালীচরণ ও শান্তিচরণ, পত্নী দেবী বিন্দুবাসিনী, দুই কন্যা এবং প্রকাণ্ড পরিবার রাখিয়া অনন্ত কালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করেন।

স্বর্গীয় মধুসূদনবাবুর অনন্যসাধারণ গুণরাশির মধ্যে তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা, মনুষ্যোচিত সত্যপ্রিয়তা, সৎসাহস, বিশ্বস্ততা ও বন্ধুবৎসলতা তাহাতে বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। নিঃসহায় বালক দেখিলেই তিনি তাহার ভরণপোষণের ভার লইতেন। সেইসকল বালকের অনেকেই এখন উকীল মুন্সেফ প্রভৃতি হইয়াছেন। তাঁহাকে আত্ম-গুণানুবাদ করিতে কেহ শুনেন নাই। তিনি কখন কাহারও বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নাই।

পেন্‌সন গ্রহণের পর তিনি একবারমাত্র দুই মাসের জন্য হায়দ্রাবাদের পুরাতন বন্ধুদিগের নিকট শেষ বিদায় লইতে গিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি সংসার হইতে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভগবচ্চিন্তায় কালযাপন করিয়াছিলেন, মধুসূদনবাবু ইহজগত হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়দ্রাবাদ তাঁহার স্মৃতি মুছিতে পারিবে

না। হায়দ্রাবাদ রাজধানীতে তাঁহার বহু কীর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। নিজামবাহাদুরের সুদৃশ্য "ফালকনামা প্যালেস" নবাব ফকর্-উল-মুল্কের শৈলবাস চারমিনারের নবশ্রী এবং মুসী নদীর উপর প্রশস্ত সেতু তাহার অন্যতম। তিনি যখন এঞ্জিনীয়রিং কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন একবার সেকেন্দ্রাবাদের "হোসেন সাগরের" বাঁধ ভাঙিয়া যায়। সে জল কেহ আট্‌কাইতে না পারায় হু-হু শব্দে জল আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করে। চীফ এঞ্জিনীয়র পামার সাহেবও ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতে না পারিয়া রাত্রিকালেই সার সালারজঙ্গকে লইয়া মধুবাবুর বাটীতে ছুটিয়া আসেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভগ্নবাঁধের নিকট লইয়া যান। তখন জলের প্রবাহ যেরূপ প্রবল ছিল, তাহাতে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেকেন্দ্রাবাদ ডুবিবার সম্ভাবনা দেখিয়া মধুসূদন-বাবুর ব্যবস্থায় তৎক্ষণাৎ বড়-বড় পাথরে বালি ও খড় বাঁধিয়া ভগ্ন বাঁধের মুখে নিঃক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমাগত তিনঘণ্টা কাল এইরূপ প্রস্তর নিঃক্ষেপের পর জলের প্রবাহপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় মধুসূদন বাবুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা হওয়ায় নগরবাসী সকলেরই মুখে তাঁহার প্রশংসা কৃতজ্ঞতার সহিত ধ্বনিত হইয়াছিল ও তাঁহার যশঃ অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিবার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে যখন মুস্রী নদীর বন্যায় হায়দ্রাবাদ সহর ডুবিয়া যায়, তখন তথাকার অধিবাসীবৃন্দ আক্ষেপ করিতে-করিতে বলিয়াছিল,—"আজ মধু-বাবু থাকিলে আমাদিগকে এমন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত না।"

সন্ধ্যামায়া

বিজন প্রান্তর-'পরে সন্ধ্যা নামে একাকিনী তারাসীঁথি-শিরে
সকলি যেতেছে মিশে অবসন্ন তন্দ্রামুগ্ধ অনন্ত তিমিরে—
দূর পশ্চিমের কোণে চন্দ্রমার ক্ষীণ রশ্মি কাঁপিছে গগনে
ধরণী আঁধারময়ী পরিপূর্ণ নীরবতা সকল ভুবনে—
যেন মায়াপাশে ধরা রহিয়াছে বাঁধা পড়ি' আপন ইচ্ছায়
যেন দূরাগত কোন্ অন্তরের ক্ষীণ বাণী কি কহে হিয়ায়।

সেই নীরবতা-মাঝে সে মায়াবী অন্ধকারে কে গাহিল গান?
নিমেষে সে অবসাদ ধরণী ত্যজিয়া গেল—জাগিল পরাণ!
দেখিনু আকাশে চাহি'—পূর্ণচন্দ্র ধীরে-ধীরে উঠে ঊর্দ্ধাকাশে
শুনিনু শ্রবণ পাতি'—সকল ভুলানো গীতি কাঁপিছে বাতাসে।
কে রচিল সুর দিয়া মায়ার প্রাসাদ নব মণি-আভরণ?—
মায়ার তূলিকাপাত আঁধারের বিভীষিকা করিল হরণ।

সেদিন সন্ধ্যার বেলা দিবস যখন আসে হ'য়ে অবসান,
ধরিত্রী দিনের শেষে আঁধার-রজনী-তটে শেষ ক্লান্ত গান
অবসন্ন-কণ্ঠে গেয়ে ডুবিয়া যেতেছে ধীরে তিমির-তন্দ্রায়
বিম্লান অস্ফুটালোকে দূরদিগন্তের সীমা দেখা নাহি যায়,—
বিমুগ্ধ নিশীথ নামে, নীরবতা চারিদিকে ভুবন ভরিয়া,
বাক্য নাহি, গান নাহি দিনান্তের শেষ আলো যেতেছে সরিয়া।

অপূর্ব্ব মায়ার জালে ধরণী ছাইয়া গেল, ছাপিল আকাশ,
তরঙ্গে-তরঙ্গে আসি' ধরণী ফেলিবে গ্রাসি' সুরের আভাস!
ক্ষীণ চন্দ্রমার করে, নীরব গগন-মাঝে নিশীথ-প্রান্তরে—
দূর হ'তে ক্ষীণ সুর কাঁপি'-কাঁপি' ভাসি'-ভাসি' পশিল অন্তরে!
দূর হ'তে যে শুনেছে সিন্ধুর উচ্ছ্বাসগীত—ভুলেছে কি আর?
করেছে উদ্‌ঘাটন জীবনের শেষ দিন রহস্যের দ্বার…?

কি গান গাহিতেছিল নাহি জানি--নাহি চাহি তাহা জানিবারে
কি কথা কহিতেছিল—বাতাসে মিলায়ে গেল পরাণের দ্বারে।
শুধু তা'র সুরখানি অব্যক্ত পরাণময় করিল আঘাত,
নিশীথের মৌন মায়া পশিল পরাণে আসি' আজি তা'র সাথ;
কি দুখে গাহিতেছিল এমন করুণ সুরে এমন নিশীথে
প্রান্তর ভাসায়ে দিবে, গগন ছাপায়ে দিবে সকরুণ গীতে।

বেদনার সে সঙ্গীতে পরাণ ভরিয়া মোর কত কথা জাগে;
আধসুখ আধদুখ—আধেক বিস্ময়মেশা ঘোর চোখে লাগে।
গেয়ে-গেয়ে ক্লান্ত সুর অবসন্ন ডু'বে গেল সমাপ্তির মাঝে,
নীরব বিস্ময়ে ডুবে প্রেমমন্ত্রবিমোহিত ধরণী বিরাজে।
কি ভাবিনু,—কি হেরিনু,—কি যেন করিনু স্থির, নাহি আর মনে—
জাগিয়া আছিনু কিবা ডুবেছিনু বিস্মৃতির জাগ্রত স্বপনে।

হুমায়ুন কবির

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি ও মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ

স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ

ধর্মলাভ করিতে হইলে মানুষ চোখ, কান বুজিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া চিরচঞ্চল মনকে ধ্যেয় বস্তুতে সমাহিত করিতে সচেষ্ট হয়। অন্যপক্ষে, মনকে সর্ব্বদা সজাগ রাখিয়া চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়ের শক্তিকে শতগুণ বৰ্দ্ধিত করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রসারিত না করিলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। একের সিদ্ধি—মনকে অন্তর্মুখী করিয়া, অন্যের সিদ্ধি—তাহাকে বহির্মুখী করিয়া; এক চায়—ব্যষ্টি ছাড়িয়া সমষ্টিকে, অন্য চায়—সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টিকে। এই দুইটি বিভিন্নমুখী, আলো-অন্ধকারের ন্যায় বিভিন্ন ভাবকে কিরূপে একই উদ্দেশে নিয়োজিত করা যায় তাহাই দেখিতে হইবে। কারণ দেখা যায়, ভারত আধ্যাত্মিক সম্পদের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেও একদিন আসমুদ্রহিমাচল শাসন করিয়াছিল; শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, বিদেহ জনক, অজাতশত্রু, প্রবাহণ, জানশ্রুতি প্রভৃতি নরপতিগণ মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াও এক-একজন বড় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

ভারতীয় দার্শনিকগণ "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" বলিয়া জগৎকে নিঃশেষে উড়াইয়া দিলেও তাহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতেন এবং উহারই উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইত। অদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ," অর্থাৎ 'এই আত্মা এবং অনাত্মাতে যে অবিদ্যাপ্রযুক্ত অধ্যাস ইহাকেই অবলম্বন করিয়া প্রমাণ, প্রমেয়, লৌকিক, বৈদিক প্রভৃতি কার্য্যের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকৃত হয়।' ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যদেব জগতের এই ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়াই অদ্বৈত মত স্থাপনার জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা তাহা করো"রূপ বাক্যের তাৎপর্য্য ইহাই; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক "ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা" উপলব্ধি করিয়া লোককল্যাণ-মানসে সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠান। নতুবা মহাপুরুষগণ যদি জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মত্যাগী হইয়া অবস্থান করেন, তবে ইতরসাধারণ আদর্শচ্যুত হইয়া মহা অনাচারে লিপ্ত হইবে।* তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥"

গীতা—৩য় অধ্যায়, ২৫ শ্লোক।

অর্থাৎ 'হে ভারত, কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞেরা যেরূপ করিয়া থাকে, অনাসক্ত জ্ঞানীরাও লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করণার্থ সেইরূপ করিবেন।' প্রবাহণ, জানশ্রুতি ও বিদেহ-জনক জ্ঞানলাভের পর জগৎকে 'মায়ার খেলা' বলিয়া যদি চুপ-চাপ বসিয়া থাকিতেন, তবে রাজ্যে নানারূপ অশান্তি উপস্থিত হইত এবং প্রজাবর্গ তাঁহাদের কর্ম্মহীনতা অনুসরণপূর্ব্বক অকর্ম্মণ্য হইয়া উৎসন্ন যাইত; শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ যদি সংসারকে মায়া-প্রপঞ্চময় দেখিয়া যুদ্ধবিগ্রহাদির অনুষ্ঠান না করিতেন, তাহা হইলে জগতে পাপের বৃদ্ধি হইত। বস্তুতঃ, তাঁহারা জগৎকে অজ্ঞান-বিলসিত দেখিয়াও, অসত্য বুঝিয়াও, ইহার আপেক্ষিক সত্যতা মানিয়া জগদ্বাসীকে ক্রমশঃ সেই পারমার্থিক সত্যে লইবার জন্য নানারূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা রজ্জুকে রজ্জুরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া আর সর্পরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া ভয়গ্রস্ত হন নাই; অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য বুঝিয়া এখানে নানারূপ সৎকর্ম্ম করিয়াও

---

* "যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।" ইত্যাদি। গীতা—৩য় অধ্যায়, ২৩, ২৪ শ্লোক। অর্থাৎ 'হে পার্থ, যদি আমি কদাচিৎ আলস্যপরিশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথ অনুসরণ করিবে। যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে এই লোকসকল বিনষ্ট হইবে।'

আর মায়ায় জড়িত হইয়া পড়েন নাই। এমন-কি, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিয়াও আত্মার অকর্তৃত্ব জ্ঞানবশতঃ নরহত্যাদি পাপে তাঁহারা লিপ্ত হন নাই। যথা—

"যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥"

গীতা—১৮শ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক।

অর্থাৎ 'আমি এই কর্ম্ম করিলাম—আমি কর্ত্তা,' যাঁহার এইরূপ ভাব নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত হয় না, তাদৃশ আত্মদর্শী ব্যক্তি এইসকল লোককে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তাহার ফলে কর্ম্মে বদ্ধ হন না।' আত্মাকে অকর্ত্তা জানিয়া, ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছে বুঝিয়া পুরাকালের রাজর্ষিগণ প্রজাপালন ও রাজ্যের মঙ্গলার্থে রাজনৈতিক চর্চ্চা এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজনীতি প্রবৃত্তিমূলক হইলেও আত্মজ্ঞানের পরে এবং পূর্ব্বে স্বধর্ম্ম-হিসাবে ব্রহ্মজ্ঞানের হানিকর বা বাধক নহে।

ভারতীয় রাজনীতি প্রধানতঃ সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ এই চারিটি নীতির (policy) উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বকালে রাজনীতিজ্ঞ নরপতিগণ এই নীতিসমূহ অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন।* ইহা শাস্ত্রানুমোদিত। রাজ্য শাসন, রক্ষা বা শত্রুজয় করিতে হইলে হিংসাদি অনিবার্য্য। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী রাজনীতি হইতে হিংসা একেবারে বর্জ্জন করিতে চাহেন, এই অহিংসামূলক রাজনীতি অতি অপূর্ব্ব জিনিষ। তাই রাজনীতি আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই অহিংস রাজনীতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সুতরাং বিশদভাবে ইহার বিচার আবশ্যক। মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনীতি একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা প্রয়োজন, কারণ উহার সহিত গান্ধী-মহারাজের মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। ক্রমাগত যুদ্ধাদিতে লিপ্ত থাকিয়া এবং তৎকালীন সর্ব্বসাধারণের অসীম যন্ত্রণা, বিবিধ অসুবিধা এবং পরস্পরের মধ্যে হানাহানি কাটাকাটি দেখিয়া প্রতীচ্যের কোনো-কোনো মনীষী যুদ্ধবিগ্রহের বিষম বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন। মহামতি টল্‌স্টয় বলেন :—

"All the Governments not only most evidently infringed, and are infringing, the elementary demands of justice in relation to the conquered peoples, and in relation to one another, but they were guilty, and continue to be guilty of every kind of cheating, swindling, bribing, fraud, spying, robbery and murder; and the peoples not only sympathized, and still sympathize, with them in all this, but they rejoice when it is their own Government and not another Government that commits such crimes. * * * * To deliver men from the terrible and ever-increasing evils of armaments and wars, we want neither Congresses nor Conferences, nor treaties, nor Courts of arbitration, but the destruction of those instruments of violence which are called Governments, and from which humanity's greatest evils flow" *

অর্থাৎ 'যাবতীয় শাসক-সম্প্রদায় বিজিত জাতির এবং পরস্পরের প্রতি সাধারণ ন্যায্য দাবীসমূহ বাস্তবিকপক্ষে ভাঙ্গিয়াছে এবং এখনও ভাঙ্গিতেছে; শুধু তাহাই নহে, জুয়াচুরি, প্রতারণা, উৎকোচ দেওয়া, শঠতা, গোয়েন্দাগিরি, ডাকাতি, খুন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্ম তাহারা করিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও করিতেছে। উক্ত পাপকার্য্যে দেশবাসী নিজ শাসক-সম্প্রদায়ের উপর কেবলমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই এবং হয় না, এমন-কি, আনন্দপ্রকাশও করিয়া থাকে; কিন্তু অন্য কোনো শক্তি ঐরূপ দোষ করিলে তাহারা সহ্য করিতে পারে না * * * রণতরীসমূহ এবং যুদ্ধবিগ্রহাদির দিন-দিন পরিবর্দ্ধমান ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইতে মানব-সাধারণকে মুক্ত করিবার জন্য আমরা মহাসভা, সম্মেলন, সন্ধিপত্র, সালিসি প্রভৃতি কিছুই চাহি না, কেবল গভর্ণমেণ্টনামা সেই অত্যাচারের যন্ত্রকে ধ্বংস করিতে চাই যাহা হইতে মানবজাতির উপর ঘোরতর পীড়ন আসিয়া থাকে।'

টল্‌স্টয়, রক্তপাত এবং যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহাতে জগৎ হইতে যুদ্ধ চিরকালের জন্য চলিয়া যায় তাহার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা, অনেক বক্তৃতা এবং অনেক লেখালেখি করিয়াছেন; এমন-কি, ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁহাকে কঠোর রাজদণ্ডও ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার মত—আমাদের অধিকাংশ দুঃখকষ্টের প্রধান কারণ যুদ্ধ; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, জনপদের ধ্বংস, মৃত্যু, অশান্তি প্রভৃতি সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক কষ্টের হেতু যুদ্ধ। যে

* 'সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কুর্য্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।
যথাস্যাভ্যধিকা ন স্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ॥" মনুসংহিতা—৭ম অধ্যায়; ১৭৭ শ্লোক। অর্থাৎ 'রাজনীতিজ্ঞ নরপতি, যাহাতে শত্রু, মিত্র ও উদাসীন, আপন অপেক্ষায় প্রবল না হইতে পারে, সেইরূপে (সাম, দান, দণ্ড, ভেদ) এইসকল উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিবেন।'

* ".Patriotism and Governments"—Leo Tolstoy.

শাসক-সম্প্রদায় প্রজাসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক দুঃখ শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া স্বার্থসাধন করিতেছে, নিজ রত্ন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য যাহারা আমাদের পিতা, পুত্র, স্বামী ও বন্ধুবান্ধবকে টানিয়া লইয়া গিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জবাই করিতেছে, সেই ভয়ানক শাসন-যন্ত্রকে (A terrible machine of power—L.T.) ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু বিনা রক্তপাতে কিরূপে সেই প্রবল শাসন-যন্ত্রকে ধ্বংস করা সম্ভব? টল্‌স্টয়-মতাবলম্বী কোনো ব্যক্তি উহার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—

"We will not enlist. We will not shoot on their order. We will not 'charge bayonet' upon a mild and gentle people. We will not fire upon shepherds and farmers, fighting for their firesides, upon a suggestion of Cecil Rhodes. Your false cry 'wolf! wolf' shall not alarm us. We pay your taxes only because we have to, and we will pay no longer than ge have to" *

অর্থাৎ 'আমরা সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইব না। তাহাদের (শাসক-সম্প্রদায়ের) আদেশে আমরা গুলি ছুড়িব না। নিরীহ জনসাধারণের উপর সঙ্গীন চালাইব না। সেসিল রোড্‌সের নির্দ্দেশানুযায়ী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর মেষপালক ও কৃষককুলের উপর গোলাবর্ষণ করিব না। "ঐ বাঘ, ঐ বাঘ" রূপ প্রতারণাকর মিথ্যা চীৎকারে আমরা আর ভীত হইব না। উপায়ান্তর নাই বলিয়া তোমাদিগকে কর দিয়া থাকি, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত এক দিনেরও অধিক উহা দিতে আর আমরা রাজি নহি।'

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনার জন্য যেন ঐ নীতিকে (policy) অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন :—

"Complete civil disobedience is rebellion without the elements of violence in it. An out and out civil resister simply ignores the authority of the State. He becomes an outlaw claiming to disregard every unmoral State law. Thus, for instance, he may refuse to pay taxes, he may refuse to recognise the authority of the State in his daily intercourse. He may refuse to obey the law of trespass and claim to enter military barracks in order to speak to the soldiers, he may refuse to submit to limitations upon the manner of picketing and may picket within the prescribed area" †

অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ অহিংস-আইন-অমান্য-করারূপ বিদ্রোহে হিংসার ভাব থাকে না। সম্পূর্ণ অহিংস আইন-অমান্যকারী দেশের শাসনকর্তৃত্ব কেবলমাত্র অগ্রাহ্য করিবে। প্রত্যেক নীতিবিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিয়া সে বিদ্রোহাচরণ করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, সে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিবে, দৈনন্দিন জীবনে শাসনকর্তৃত্ব মানিবে না, ট্রেসপাস (trespass) আইন অমান্যকরিয়া সৈনিকগণকে স্বমত শুনাইবার জন্য সে সেনানিবাসে প্রবেশের দাবী রাখিবে এবং পিকেটিং-(picketing) পদ্ধতির সীমানির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া নির্দ্দেশিত সীমামধ্যে পিকেটিং করিবে।'

মহাত্মাজীর অভিমত, ইংরাজ-শাসন-প্রসূত অত্যাচার-অনাচারের হেতু অনেকটা আমরা স্বয়ং। কারণ, এই শাসন-যন্ত্র প্রধানতঃ ভারতীয় লোকদ্বারা গঠিত। কাউন্সিল, কোর্ট্, পুলিস, ইংরাজের বাণিজ্য, সৈন্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ভারতবাসীর সংখ্যাই অধিক, ইংরাজ নাম মাত্র। অদ্য সমস্ত ভারতবাসী যদি একসঙ্গে সর্ব্বতোভাবে ইংরাজের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, রাজস্ব বন্ধ করে, কল্য ইংরাজ-শাসন মূল-কর্ত্তিত মহীরুহের ন্যায় পতিত ও ধ্বংস হইবে। ইহা জানিয়াও এই শয়তানী শাসন ("Satanic Government"—M. K. G.) আমরা সযত্নে রক্ষা করিয়া নিজেদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিতেছি, সুতরাং আমাদের কষ্টের হেতু আমরা স্বয়ং। তাই গান্ধী-মহারাজ ভারতবাসীকে কাউন্‌সিল, কোর্ট্, পুলিস প্রভৃতি বয়কট্ (boycott) এবং রাজস্ব বন্ধ করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও তিনি টল্‌স্টয়ের মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যথা—

"Reflect, and you will understand that your foes are not the Boers, or the English, or the French, or the Germans, or the Finns, or the Russians, but that your foes—your only foes—are you yourselves, who by your patriotism maintain the Governments that oppress you and make you unhappy" *

অর্থাৎ 'চিন্তা করিলেই বুঝিবে যে, বুয়ার, ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান, ফিন্‌স, অথবা রুশীয় তোমার শত্রু নহে, তোমার শত্রু—তোমার একমাত্র শত্রু—তুমি স্বয়ং। এবং তুমিই তোমার স্বদেশহিতৈষিতার অজুহাতে অত্যাচারী এবং অশুভকর শাসনের পোষকতা করিতেছ।'

অনেকের ধারণা, মহাত্মাজীর Non violent Non-co-operation (অহিংস অসহযোগ) Civil Disobedience (অহিংস আইন-অমান্যতা) প্রভৃতি মতবাদ

* "Patriotism and Government"—L. T.

† "The Momentous Issue"—Young India 10. 11. 21. M. K. Gandhi.

* "Patriotism and Government"—L. T.

ভারতের নিজস্ব দান, কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষীদের উপরোক্ত ভাবসমূহের সহিত পরিচিত হইলে মনে হয় তিনি যেন সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের নির্দ্দেশিত পথেই গমন করিতেছেন। তবে, মহাত্মার অহিংস মতবাদের উপর "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"রূপ বৌদ্ধ, জৈন তথা বৈষ্ণব উপদেশের খুব প্রভাব আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, বেদে অধিকারি-ভেদে হিংসারও স্থান আছে, যথা—'অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" অর্থাৎ 'অগ্নি ও সোমদেবের উদ্দেশে পশুহত্যা করিবে।'

"Complete non-violence is complete absence of ill-will against all that lives. It therefore embraces even sub-human life, not excluding noxious insects or beasts. They have not been created to feed our destructive propensities" *

অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণিজাতের উপর অশুভ ইচ্ছার একেবারে বিরতির নাম সম্পূর্ণ অহিংসা-পরায়ণতা। সুতরাং মনুষ্যেতর প্রাণী, এমন-কি তুচ্ছ জীব-জন্তু অথবা কৃমি-কীটের পক্ষেও ইহা প্রযোজ্য। আমাদের ধ্বংস-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের জন্ম হয় নাই।'

মহাত্মাজীর এই মতবাদ অত্যুৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহা কতখানি প্রযোজ্য, সর্ব্বসাধারণকে ঐ মতাবলম্বী করিলে তাহা শুভ কি অশুভ ফল প্রসব করিবে তাহাই চিন্তার বিষয়। আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে অহিংস নীতি চালাইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে।

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ এই শাসনবাক্য অতীব মহান্, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, সাধারণের নহে। * * * বৌদ্ধগণ অহিংসারূপ ধর্ম্ম প্রচার করিল, তাহার ফলে পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত রাজ্যগুলি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। * * * বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার হইতেই ভারতীয় অধঃপতনের আরম্ভ হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অমানুষিক ও অতিমানুষিক কাল্পনিক আদর্শ সার্ব্বজনীন হওয়াতে ভারতীয় জাতি অধঃপতিত ও অবনমিত হইয়াছে। * * * অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ—এই মতবাদের অস্বাভাবিকতায় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, জাতির অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইল। * * * পরবর্ত্তী কালে তথাকথিত বৈষ্ণব ধর্ম্মও ভারতীয় অধঃপতনের সহায় হইয়াছে। এই উভয় ধর্ম্মই জাতীয়তাবোধ নষ্ট করিয়া এক অপূর্ব্ব কাল্পনিক আদর্শে মুগ্ধ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানপ্রবণ বলিয়া কতকটা সজীবতা রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তথাকথিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কৃপায় ভারতবর্ষের না হইলেও বঙ্গদেশের মেরুদণ্ড দুর্ব্বল ও কুব্জ হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় পতনের অন্যান্য কারণ থাকিলেও আমাদের বিবেচনায় এইগুলিই মুখ্য কারণ।"†

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন :—

"বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ম'রে যাবার সময় হিন্দুধর্ম্ম উহার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভিতর ঢু'কয়ে আপনার করে নিয়েছিল। ঐ ধর্ম্মই এখন ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব'লে বিখ্যাত। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ—বৌদ্ধধর্ম্মের এই মত খুব ভালো, তবে অধিকারী বিচার না ক'রে বলপূর্ব্বক রাজশাসনের দ্বারা ঐ মত ইতরসাধারণ সকলের উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশের মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়ে গেছে।"*

Dr. Harald Hoffding (ডাঃ হেরল্ড হফ্‌ডিং) বলেন,—

"For the most part its (Buddhism) effect has been damping, lulling, restraining, except where—as in case of the Japanese, it has encountered and been transformed by an active forward-pressing racial tendency, and by the influence of an earlier religion (Shintoism) which had specially developed the feelings of individuality and of nationality * * Buddha softened Asia."†

অর্থাৎ 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার (বৌদ্ধধর্ম্মের) ফল—অবসাদ, উৎসাহহীনতা ও উন্নতির পরিপন্থী। একমাত্র জাপানে ইহা একটি কর্ম্মপ্রবণ ও গতিশীল জাতীয়-ভাবের সম্মুখীন ও তাহাতে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং একটি প্রাচীন ধর্ম্মের (শিণ্টো ধর্ম্ম) প্রভাবে ইহা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়ভাব বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়াছে। * * * বুদ্ধ এশিয়াকে কোমলভাবাপন্ন করিয়াছেন।'

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অহিংসাধর্ম্মরূপ সাত্ত্বিক ভাব সর্ব্বসাধারণে চালাইতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম দেশকে তমোভাবাপন্ন করিয়াছে। তমের লক্ষণ ভয়, নির্ব্বীর্য্য, আলস্য, উদামহীনতা, দীর্ঘসূত্রতা, পরাধীনতা প্রভৃতি, এইসব লক্ষণের সহিত দেশবাসী মিলাইয়া দেখিতে পারেন, তাঁহারা তমোভাবাপন্ন কি না? স্বামী বিবেকানন্দ এই মুহ্যমান, তমোগুণী জাতির হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহার রজোশক্তি উদ্দীপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ঠিক তাঁহারই পরবর্ত্তীকালে মহাত্মা গান্ধী রজোগুণপ্রধান ক্ষাত্র ধর্ম্মকে দমিত করিয়া দেশবাসীকে সত্ত্বভাবান্বিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যবিভিন্নতা আমরা দেখি না, কেবল তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মতের বা পথের বিভিন্নতা অল্লাধিক দৃষ্ট হয়। মহাত্মাজী ক্ষাত্রধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া দেশকে ব্রহ্মণ্যশক্তিতে শক্তিমান করিতে চাহেন, তথা স্বামিজী ক্ষাত্রধর্ম্মের স্ফুরণে দেশের তমোগুণ দূরীভূত করিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ করিতে ইচ্ছুক। তুলনায় এই দুই মহাপুরুষের পরস্পরের গুরুত্ব কাহারও অপেক্ষা

* "Non-violence"—Young India. 9-3-20. M. K. G.

† "ভারতীয় মতের বিশেষত্ব"—রাজনীতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

* "স্বামি-শিষ্য সংবাদ" (উত্তরার্দ্ধ), শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

† "Philosophy of Religion"—Dr. H. Hoffding.



কর নহে, সুতরাং তাঁহাদের মতবাদের আলোচনা করিতে হইলে ভারতীয় শাস্ত্রসিদ্ধান্তের প্রামাণ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। মহাত্মাজী বলিতেছেন—

"The religion of non-violence is not meant merely for the Rishis and Saints. It is meant for the common people as well. Non-violence is the law of our species as violence is the law of the brute. The spirit lies dormant in the brute and he knows no law but that of physical might. The dignity of man requires obedience to a higher law —to the strength of the spirit. * * * * I do not wait till India recognises the practicability of the spiritual life in the political world" *

অর্থাৎ অহিংস ধর্ম্ম যে কেবল মুনি ঋষিদের জন্য তাহা নহে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সমভাবে ইহা অবলম্বনীয়। হিংসা যেরূপ পশুজাতির, অহিংসা তদ্রূপ আমাদের ন্যায় মানবজাতির ধর্ম্ম। আত্মার মহিমা পশুগণের হৃদয়ে সুপ্তভাবে অবস্থিত, তজ্জন্য তাহারা শারীরিক শক্তি ব্যতীত অন্য কোনো শক্তির বিষয় অবগত নহে। কোনো উচ্চতর শক্তি—আত্মশক্তির নির্দ্দেশানুযায়ী চলিতে মানবের মানবত্ব ইচ্ছা করে। * * * রাজনৈতিক জগতে যতদিন না ভারতবর্ষ ধর্ম্মজীবনের কার্য্যকারিতা স্বীকার করিবে, ততদিন আমি অপেক্ষা করিতে পারি না।'

গান্ধী-মহারাজ ভারতের তথা জগতের রাজনৈতিক সাধনায় অহিংসা নীতি প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাঁহার অভিমত, অহিংসা নীতি সর্ব্বসাধারণের জন্য—"It is meant for the common people as well." কিন্তু ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যুদ্ধ অপেক্ষা অহিংসা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়া যখন গাণ্ডীব ত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, "ন যোৎস্যে"—'আমি যুদ্ধ করিব না,' তখন শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে"—'ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার শোভা পায় না'; "নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ"—'নিষ্কামী ও মমত্বশূন্য হইয়া শোক ত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করো' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনের হিতার্থে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি আবার বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ"—'উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অঙ্গহীনও স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।' ইহার তাৎপর্য্য এই, অহিংস ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যদিও ক্ষাত্রধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তথাপি তোমার স্বধর্ম্ম যে রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারো না; এই ধর্ম্মে থাকিয়া যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহাও ভালো তথাপি পরধর্ম্ম ভয়াবহ—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

কিন্তু গান্ধী মহারাজ এই 'বিগুণ' (অপকৃষ্ট—imperfect) ক্ষাত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সকলকেই 'স্বনুষ্ঠিত' (উৎকৃষ্ট—perfect) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে টানিয়া লইবার পক্ষপাতী। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার সহিত মহাত্মা গান্ধীর মতবাদের সামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু মহাত্মাজী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের এবং কৃষ্ণার্জ্জুনের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

"I do not believe that the Gita teaches violence for doing good. It is pre-eminently a description of the duel that goes on in our own hearts. The divine author has used a historical incident for inculcating the lesson of doing one's duty even at the peril of one's life * * * The Gita distinguishes between the powers of light and darkness and demonstrates their incompatibility." *

অর্থাৎ মহৎ কর্ম্ম সাধনের জন্য গীতা হিংসানীতি শিক্ষা দেয়, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের অন্তরে যে দ্বন্দ্ব (পাপ পুণ্যের সংগ্রাম) চলিতেছে ইহা তাহারই একটি সবিশেষ বর্ণনামাত্র। অমানব গ্রন্থকার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সহায়ে, স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়াও মানবকে কর্ত্তব্যসাধনের শিক্ষা দিয়াছেন। গীতা, আলো-অন্ধকারের (পাপ-পুণ্যের) শক্তির পার্থক্য দেখাইয়া তাহাদের অসামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করিয়াছে।'

মহাত্মা গান্ধী কৃষ্ণার্জ্জুনের ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করুন তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস রামভক্ত মহাত্মাজী শ্রীরামচন্দ্র ও লঙ্কাসমরের সত্যতা-সম্বন্ধে কিছুতেই সন্দিগ্ধ হইবেন না। তিনি নিজেই একস্থানে লিখিতেছেন—

"What is the meaning of Rama, a mere human being, with his host of monkeys, pitting himself against the insolent strength of ten-headed Ravan surrounded in supposed safety by the raging waters on all sides of Lanka? Does it not mean the conquest of physical might by spiritual strength?" †

অর্থাৎ 'দশমুণ্ড রাবণ যিনি চতুর্দ্দিকে বিক্ষুব্ধ সলিলরাশি পরিবেষ্টিত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে নিজকে সম্পূর্ণ নিরাপদ্ মনে করিতেন, সামান্য একজন মানুষবিশেষ রাম একদল বানর লইয়া অতি অসহায়ভাবে তাঁহার দৃপ্ত

* "The Doctrine of the Sword"—Young India, 11-8-20, M. K. G.

* "Religious authority for Non-co-operation"—Young India 25-8-20. M. K. G.

† "Doctrine of the sword"—Young India, 11-8-20 M. K. G.

শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝায়? শারীরিক শক্তির বিরুদ্ধে আত্মশক্তির জয়লাভ কি ইহাতে প্রমাণিত হয় না?"

মহাত্মার বাক্যে স্বীকৃত হইতেছে যে লঙ্কাপতি রাবণের সহিত অযোধ্যানাথ শ্রীরামচন্দ্রের এক সময় যুদ্ধ হইয়াছিল। ভার্য্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য যদি যুদ্ধ করা অন্যায় না হয়, তাহা হইলে স্বদেশ বা স্বজাতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ কোনোরূপেই দূষনীয় হইতে পারে না। অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রেও যুদ্ধের বিধি ও প্রশংসা আছে। যথা—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদকৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥"

অর্থাৎ 'ইহলোকে যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং যিনি সম্মুখ সমরে নিহত হন, এই দুইপ্রকার ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করেন।'

যোগী ও যোদ্ধা উভয়েই মৃত্যুর পর যদি একই গতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে অহিংসবাদী সন্ন্যাসী অপেক্ষা যুদ্ধবাদী সৈনিক কোথায়—কিরূপে নিকৃষ্ট হইলেন? বস্তুতঃ "Each is great in his own placc."* অর্থাৎ 'স্ব-স্ব কার্য্যক্ষেত্রে কেহই ছোটো নহেন' এই স্বামি-বাক্যই সত্য। তাহা ছাড়া মনু বলিতেছেন:—

"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥" মনু সং ৭ম অধ্যায়, ৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ 'যুদ্ধে প্রবৃত্ত নরপতিগণ, পরস্পরের বধের ইচ্ছাপূর্ব্বক পরাঙ্মুখ না হইয়া শক্তি-অনুসারে যুদ্ধ করিলে স্বর্গ লাভ করেন।'

পুনশ্চ,—

"উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীড়য়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং যবসান্নোদকেন্ধনম্॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা॥
উপজপ্যানুপজপেদ্বুধ্যেতৈব চ তৎকৃতম্।
যুক্তে চ দৈবে যুধ্যেত জয়প্রেপ্সুরপেতভীঃ॥" মনু সং—৭ম অধ্যায় ১৯৫-১৯৭ শ্লোক।

অর্থাৎ শত্রুকে অবরোধ করিবে এবং তাহার রাজ্যের অনিষ্টাচরণ করিবে, শত্রুর অশ্ব, সেনা প্রভৃতির পানীয় জল, ঘাস প্রভৃতিকে বিষ্ঠা-মূত্রাদি অপবিত্র দ্রব্য মিশাইয়া নষ্ট করিবে। শত্রুর জলাশয় ও প্রাচীর ভেদ করিবে, পরিখার মধ্যে মৃত্তিকা দিয়া জলশূন্য করিবে এবং নানা উপায়ে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করিবে, রাত্রিতে সিংহনাদ, বাদ্য প্রভৃতি দ্বারা শত্রুর ভয় জন্মাইবে। জ্ঞাতিবন্ধুর সহিত শত্রুর বিচ্ছেদ জন্মাইবে, এবং তাহাদের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, এইসকল অনুষ্ঠান দ্বারা পরিণামে শুভফল জানিয়া জয়াভিলাষী রাজা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিবেন।'

ভারতীয় কোনো প্রাচীন শাস্ত্রই কখনও ক্ষাত্রধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ক্ষাত্রধর্ম্ম না থাকিলে জাতি বাঁচিতে পারে না, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঋগ্বেদে আছে—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"
ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ১২ ঋক্।

অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণই তাঁহার (বিরাট্ পুরুষের) মুখ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য তাঁহার ঊরু এবং শূদ্রই তাঁহার পদ।'

কোনো ব্যক্তি যেরূপ মুখ অর্থাৎ শিরোবর্জ্জিত হইয়া বাঁচিতে পারে না, তদ্রূপ বাহু অর্থাৎ হৃদয়হীন হইয়াও সে জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয় না। অঙ্গের একটা প্রত্যঙ্গ না থাকিলে যেমন অঙ্গহানি হয়, ঠিক তেম্‌নি জাতি-শরীরের কোনো একটা অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলে সে অসম্পূর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ব্রহ্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণ না থাকিলে যেমন দেশের অকল্যাণ, যুদ্ধপরায়ণ ক্ষত্রিয় না থাকিলেও সেইরূপ জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। প্রতি অঙ্গ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনপূর্ব্বক বিরাট্ জাতি-শরীরের পূর্ণতা সাধন করিবে, ইহাই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। বিবিধ শাস্ত্র-সহায়ে দেখা গেল, মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে ও জাতিধর্ম্মে ক্ষাত্রভাবের যে অপ্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতে চাহেন তাহা অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক।

মহাত্মাজী ইতিহাসের দিক্ দিয়াও প্রমাণ করিতে চাহেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা ভারতের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। তিনি বলিতেছেন—

"India cannot become free by armed rebellion for generations. India can become free by refraining from national violence.………The people of the plains do not know what it is to put up an organized armed fight."*

অর্থাৎ 'সশস্ত্র বিদ্রোহাচরণ দ্বারা ভারতবর্ষ পুরুষানুক্রমেও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না। জাতীয় হিংসানীতি পরিত্যাগ করিলে ভারত স্বাধীন হইতে পারে। কিরূপে সংঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হয় তাহা সমতলভূমির লোক জানে না।'

অবশ্য রাজবিদ্রোহের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আনয়ন সম্ভবপর কি না তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, তবে ভারতবাসী সমতলভূমিতে বাস করিলেও যে সংঘবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

* "Karma Yoga"—S. Vivekananda.

* "Needless Nervousness"—Young India. 2-3-22. M. K. G.

"এশিয়ামাইনরের দো-আঁসলা গ্রীক্ হেলেনিষ্টিক্ রাজা সেলিউকস্ হিন্দুর সামরিক শক্তি যোগের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন খঃ পূঃ ৩০৩ সালে। আফগান মুল্লুকের দো আঁসলা গ্রীক হেলেনিষ্টিক নরপতি মেনান্দার বা মিলিন্দকে হিন্দুরা ১৫৩ খৃঃ পূঃ অব্দে পরাজিত করে। এই গেল মৌর্য্য ও শুঙ্গবংশের শক্তি যোগের সাক্ষী। পরবর্ত্তীকালে মধ্য-এশিয়ার হুণ জাতিও হিন্দু জাতির সামরিক শক্তি যোগের ক্ষমতা চাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪৫৫—৪৫৮ সালে স্কন্দগুপ্ত ইহাদের গতিরোধ করেন। ৫২৮ সালেও আর একবার হুনেরা হিন্দু জাতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। বুঝিতে হইবে যে, একমাত্র স্বদেশী লড়াযেই হিন্দু-পল্টন ওস্তাদ ছিল, এমন নয়; বিশ্বশক্তির মাপকাঠিতেও ভারতের জন-সাধারণ সামরিক জীবনের দক্ষতা যাচাই করাইতে অভ্যস্ত ছিল। জীবন-যুদ্ধের আখ্‌ড়ায় দাঁড়াইয়া হিন্দু সেনাপতিরা বিদেশী রণ নায়কগণকে পাঁয়তারায় চিট্ করিতে জানিতেন। ঘরে-বাহিরে লড়িবার জন্ম হিন্দু-জাতিকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইত। কোথায় আফগানিস্থান, কোথায় মধ্য এশিয়া, এই সকল সুদূরস্থিত জনপদেও ভারতের উত্তর সীমানা মাঝে মাঝে গিয়া ঠেকিয়াছিল। ভারতের নরনারীকে সেইসকল দেশের দুর্গরক্ষায় এবং স্বাধীনতা রক্ষায় পল্টন পাঠাইতে হইত। আবার ভারত-সাগরে দ্বীপপুঞ্জও ভারতীয় রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এইসকল দ্বীপ দেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও ভারতের নারীকুল নিজ নিজ সন্তান পাঠাইতে জানিত। * * * খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে মুসলমানেরা ভারতের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। হিন্দু জাতি তাহাদের সঙ্গে প্রায় তিনশ বৎসর ধরিয়া সম্মুখ লড়ায়ে ধস্তাধস্তি করে। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গর্জ্জর প্রতীহারেরা রণে ভঙ্গ দেয় নাই। বাংলার সেন বংশ ১১০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পরাজয় স্বীকার করে নাই। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের যাদব এবং চোল রাজারা কাবু হন। কাশ্মীরের স্বাধীনতা ১১৩৯ সাল পর্য্যন্ত অটুট ছিল। প্রায় আড়াই তিন শতাব্দী ধরিয়া যে জাতি বিদেশীর আক্রমণ রুখিতে পারে, তাহার যোগ এবং স্বদেশ-সেবা-সম্বন্ধে সন্দেহ করা একমাত্র ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। * * যে আড়াই তিনশ বৎসর হিন্দু নরনারী বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়িতেছিল সেই সময়ে এইসকল শত্রুই ইয়োরোপের নানা দেশে ইয়োরোপীয়ানদিগকে গোলাম করিয়া রাখে নাই কি? * * * দুনিয়ার মাপকাঠিতে হিন্দুজাতির সামরিক শক্তি-যোগ অন্য কোনো জাতির তুলনায় খাটো নয়। লড়াইয়ে হারিয়া যাওয়া হিন্দু নরনারী নিন্দনীয় বিবেচনা করিত না। লড়াই না করাই পাপ, এই ছিল হিন্দু সমরযোগের প্রাথমিক ভিত্তি। এই কথাটাই আলেকজান্দার হিন্দু দার্শনিকের মুখে শুনিয়া গিয়াছিলেন।"*

অতীত ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস, বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে মেসোপোটেমিয়ায় এবং ফরাসী রণাঙ্গণে ভারতীয় সৈনিকের অদ্ভুত সমর-কুশলতার সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর "The people of plains do not know what it is to put up an organised armed fight" অর্থাৎ 'কিরূপে সংঘবদ্ধভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা সমতলভূমির লোক জানে না'। এই বাক্যের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

তা'র পর, হিংসা করিব না বলিলেই অহিংস হওয়া যায় না। যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করার নামই প্রকৃত ত্যাগ; নতুবা কায়িক ত্যাগ করিয়া মানসিক ত্যাগ না করিলে কপটাচার হয়, যথা—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

গীতা, ৩য় অধ্যায়, ৬ শ্লোক।

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে-মনে ইন্দ্রিয়-বিষয়সকল স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়।'

সুতরাং শরীর দ্বারা কাহারও অনিষ্ট সাধন না করিয়া মন বা বুদ্ধির দ্বারা কাহারও অনিষ্ট চেষ্টাকেও হিংসা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে, বরং শরীর দ্বারা হিংসা করা অপেক্ষা শেষোক্ত-প্রকারের হিংসা অধিকতর নিন্দনীয়, কারণ উহাতে হিংসা ও মিথ্যাচার উভয়ই অনুষ্ঠিত হয়। এই হিসাবে মহাত্মা গান্ধীও কতখানি অহিংসপরায়ণ, সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, তিনি বলিতেছেন—

"It (non-violence) does not mean meek submission to the will of the evil-doer, but it means the putting of one's whole soul against the will of the tyrant."

অর্থাৎ 'অতি দীনভাবে অত্যাচারীর ইচ্ছার বশীভূত হওয়াই অহিংস-নীতির অর্থ নহে। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমস্ত আত্মশক্তির নিয়োগের নামই অহিংসাধর্ম্ম।'

শারীরিক প্রতীকার চেষ্টা না করিয়া কাহারও বিরুদ্ধে আত্মশক্তির প্রয়োগকেও 'সূক্ষ্মভাবে হিংসা' বলিলে আশা করি, অন্যায় হইবে না। যেহেতু শরীরের ন্যায় মন এবং বুদ্ধিও ক্রিয়াশীল, তবে শরীরের কার্য্য স্থূল এবং মন ও বুদ্ধির কার্য্য সূক্ষ্ম এইমাত্র প্রভেদ। অহিংসনীতি অবলম্বন করিয়া যদি ভারত স্বাধীন হয়, তাহা হইলে ইংরেজের সমূহ ক্ষতি হইবে, সন্দেহ নাই। ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজস্ব, শুল্ক এবং অন্যান্য অনেক প্রকার অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হইয়া তাহার ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে; হয়ত বহু লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগও করিবে। মহাত্মার 'অহিংস-অসহযোগ-নীতি (Non-

* "হিন্দু রাষ্ট্রের সমর-বিভাগ,"—শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

*"The Doctrine of the Sword"—Young India. 11-8-20. M. K. G.

violent Non-Co-operation Policy) কি তাহা হইলে ইংরেজের সর্ব্বনাশের হেতু হইল না? অতএব তাহাকে অহিংসা নীতি কিরূপে বলিব? বেয়োনেটের (bayonet) খোঁচায় হত্যা না করিয়া খাইতে না দিয়া পেটে মারিয়া হত্যা করাকে যদি হিংসা-বৃত্তি বলিলে দোষাবহ না হয়, তবে মহাত্মা গান্ধীর তথাকথিত অহিংসা নীতিও সর্ব্বতোভাবে হিংসাপূর্ণ—এই কথা বলিলে আশা করি, পাঠকবর্গ কিছু মনে করিবেন না। মহাত্মাজীর নীতি লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে বেশ, কিন্তু সাধারণ কার্য্যক্ষেত্রে উহার প্রচলন অসম্ভব বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অর্জ্জুন যখন অহিংসা পরায়ণ হইবার প্রয়াসী, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ" অর্থাৎ 'রাগদ্বেষাদি স্বাভাবিক গুণসমূহ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকে।' ইহার প্রমাণ বর্ত্তমান সময়েও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মহাত্মাজী ভারতের সর্ব্বত্র অহিংসা নীতি প্রচার করিতেছেন, তাঁহার উপস্থিতিকালেই হিন্দু মুসলমান, হিন্দু-পার্শী পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিতেছে; তাহাদের স্বভাবই তাহাদিগকে অবশ করিয়া ঐরূপ হিংসাদি কার্য্য করাইতেছে। তবে কি মানব-সাধারণকে হিংসাদি ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে? তাহা কেন? ঐ হিংসাদি চেষ্টা পরস্পরের মধ্যে হানাহানি না করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য কোনো মহত্তর কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। কার্য্য দুইপ্রকার—নিবৃত্তি মূলক ও প্রবৃত্তিমূলক। নিবৃত্তিমূলক কার্য্যে জোর করিয়া সকলকেই নিযুক্ত করা যায় না; সুতরাং প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মের ভিতর দিয়া ধীরে-ধীরে তাহাদিগকে নিবৃত্তি-মার্গে আনয়ন করাই ভারতীয় শাস্ত্রের বিশেষত্ব। অবশ্য, যাঁহারা মহাত্মাজীর ন্যায় নিবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়া একেবারে অহিংস হইতে পারেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সেরূপ ব্যক্তির সংখ্যা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অতি মুষ্টিমেয়।

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মতবাদ সংক্ষেপে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে বুঝিয়াছি, ক্ষাত্রধর্ম্ম জাতির মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা কোনোরূপেই সঙ্গত নহে। সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ, রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়, রজ ও তম মিশ্রিত বৈশ্য, এবং তমোগুণ-প্রধান শূদ্র, এই চারি বিভাগকেই সযত্নে রক্ষা ও পুষ্ট করিয়া কোনো জাতিকে উন্নতির পথে লইয়া গেলে সেই জাতি একদিন পরিপূর্ণ অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবে; তন্মধ্যে কোনো-একটি ভাবকে বর্জ্জন করিলে সেই জাতির অঙ্গহানি ও অসম্পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। পুরাকালে হিন্দুদার্শনিকগণ ক্ষাত্রভাব জাতির অন্তরে জাগাইয়া দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেন। উপসংহারে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—

"যাঁহারা হিন্দুচিত্তের সমরপিপাসা এবং হিংসাযোগ-বিষয়ক বাস্তব তথ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভারতীয় চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিতে বসেন, তাঁহারা হিন্দুদর্শনের আলোচনায় অনধিকারী বিবেচিত হইবেন। অন্ততঃপক্ষে তাঁহাদের প্রচারিত হিন্দুদর্শন একদেশদর্শী; আংশিক এবং ভ্রমাত্মক থাকিতে বাধ্য।"

গল্প

শ্রী সজনীকান্ত দাস

পর পর পাঁচটি মেস ও হোটেলের রান্নাঘরের দরজায় কিম্বা ম্যানেজারের নোটিশবোর্ডে মাথা ঠুকিয়া শেষে নিজে আলাদা একটা বাড়ী নেওয়াই ঠিক করিলাম। দৈনিক কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতা রূপে মাসিক ৭০৷৭৫ টাকা মাত্র আয় করিতাম বটে, কিন্তু পিতার কনিষ্ঠ পুত্র হওয়ার যে সুবিধা তাহা পুরাপুরি ভোগ করিতেছিলাম। পোষ্য বলিতে আমার কেহ ছিল না। বাবা গবর্ণমেণ্টের দৌলতে বেশ দু'পয়সা আয় করিতেন; তাঁহাকে মাসিক কিছু সাহায্য করার কথা মনেও হইত না। দুই বৎসর হইল বিবাহ করিয়াছি কিন্তু পত্নীটি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো বৎসরের কিছু কাল কলিকাতায় বাগবাজারস্থিত তাহার পিতৃগৃহে এবং কিছুকাল আমার পিতৃগৃহে দোল খাইয়া ফিরিতেছিল। তাহাকে পত্নীহিসাবে প্রাপ্য কিছু দিতে কেমন যেন লজ্জা করিত। সুতরাং যাহা আয় করিতাম তাহা ব্যয় করিবার অধিকারও মনে মনে অর্জ্জন করাতে ৩০ টাকা দিয়া বাড়ী ভাড়া নিতে কিছুমাত্র-দ্বিধা করিলাম না। একটি চাকর রাখিলাম সে একাধারে আমার চাকর, ঠাকুর ও মুরুব্বি ছিল। মোটের উপর এই সামান্য টাকায় ঘরভাড়া এবং গোবিন্দের মাহিনা দিয়াও দুজনের খাইবার উপযুক্ত টাকা থাকিত এবং উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া বন্ধুদের চা ও সিগারেট সরবরাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

আমারই একটি বন্ধু তাহাদের বাড়ীর নীচের তলাটা আমাকে ভাড়া দিয়াছিল। বাড়াটা একটা নোংরা পল্লীর মধ্যে হইলেও আমার তেমন কিছু অসুবিধা হইত না। সকাল ন'টার সময় ভাত খাইয়া বাহির হইয়া যাইতাম এবং পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় প্রায়ই বাড়া ফিরিতাম; মাসের মধ্যে ত্রিশদিনই প্রায় সে সময় এক বা একাধিক বন্ধু আমার সঙ্গে জুটিত। চা ও চুরুটে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত হুল্লোড় করিয়া কাটাইয়া দিতাম। তারপর গোবিন্দের কৃপায় যাহা জুটিত তাহা তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিয়া ইজি-চেয়ারটা প্যাসেজে (passage) রাখিয়া তাহাতে চিৎ হইয়া পড়িয়া সামনে একটা মোড়ায় পা তুলিয়া দিতাম আর চুরুট টানিতে থাকিতাম। মাঝে মাঝে আমার কাংস্য বিনিন্দিত-কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানের পোঁ ধরিতেও ছাড়িতাম না। বস্তুতঃ এই নিঃসঙ্গ রাত্রিগুলিতে রবীন্দ্র-নাথের কাব্যগ্রন্থ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী আর শেলীর 'Complete Works' আমার সঙ্গী ছিল। আমি চেয়ারের পিছনে লণ্ঠন রাখিয়া উচ্চকণ্ঠে কখনও বা মেঘদূত পড়িতাম; কখনও বা মহোল্লাসে 'বর্ষশেষ' আবৃত্ত করিতাম এবং ইংরেজীতেও আমি কম যাই না এই গর্ব্ব ছিল বলিয়া নিঝুম নিশীথ রাত্রে শেলীর 'Spirit of Solitude' কিম্বা 'Hymn to Intellectual Beauty' পাঠ করিতাম। আমার ওই বাড়াওয়ালা বন্ধু যতীন প্রায়ই ওই সময়টা আমার কাছে বসিয়া একটু সংকোচ ও শ্রদ্ধা সহকারে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। কাব্য পাঠের অবকাশে আমাদের সংসারের অনিত্যতা ও বিবাহিত জীবনের নিদারুণ বন্ধন-সম্বন্ধে আলোচনা চলিত।

যখন বাড়াভাড়া লইলাম তখন সরমা (আমার স্ত্রী) হাজারীবাগে তাহার দাদা-মহাশয়ের কাছে থাকিত সুতরাং রাত্রিতে প্রত্যহই গৃহবাস করিতে হইত। মেসে অবস্থানকালে আমার স্ত্রী কলিকাতায় থাকিলে আমি নামমাত্র 'মেসের বাবু' থাকিতাম; খাওয়া ও শোওয়া প্রায়ই শ্বশুর গৃহে করিতে হইত। কিন্তু এখন গোবিন্দের দৌলতে স্ত্রীর অবর্ত্তমানেই home comforts পাইতে-ছিলাম বলিয়া চায়ের দোকান, বায়োস্কোপ বা গড়ের মাঠে কিম্বা কোথাও পরনিন্দা বা কুৎসা করিয়া সময় কাটাইতে হইত না। অবশ্য বাড়ীতে থাকার অসুবিধা যে কিছু ছিল না তাহা নয়; রাত্রি দুই প্রহরে সামনের খোলা-বাড়াগুলির কোনোটায় মাতালের চীৎকারে কিম্বা

উৎপীড়িতা কোনো নারীর আর্ত্তক্রন্দনে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে যে-সব কদর্য্য গালাগালি ও আলোচনা শুনিতে হইয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্থানত্যাগ করিবার বাসনা হইয়াছে তবু মোটের উপর শান্তিতে ছিলাম বলিয়া অন্য চেষ্টা করি নাই। প্রতিবেশীদের বাড়ীতে কচি ছেলে-মেয়ের কাঁদুনি কিম্বা পাশের হরিহর-বাবুর স্ত্রীর সহিত নিত্য কলহ আমার গা-সহা হইয়া গিয়াছিল।

আমি ওপাড়ায় বাসা নেওয়ার পরদিন হইতে সেখানে বেশ একটু সোরগোল পড়িয়াছিল। প্রথম যেদিন বাড়ীতে উঠিয়া আসিলাম আমার সঙ্গের আস্‌বাব বিশেষতঃ দুই গাড়ী বই অনেকেই বেশ উৎসুক হইয়া দেখিয়াছিল দেখিয়াছি। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিতাম আমার নিজস্ব পেটেণ্ট সুরে চেঁচাইয়া গান গাহিয়া, কবিতা আওড়াইয়া পাড়া সরগরম করিয়া রাখিতাম। বিশেষতঃ বৈকালে অফিস ফেরত যখন ইজিচেয়ারটা সাম্‌নের গলিতে পাতিয়া বসিয়া বসিয়া সিগারেট টানিতাম আর কুড়ি পাঁচশ মিনিট অন্তর হাঁকিতাম, 'গোবিন্দ চা' তখন আমার প্রতিবেশীরা আমাকে এক ভিন্ন রাজ্যের জীব বলিয়া কল্পনা করিত। তাছাড়া আমার বাড়ীতে যে-পরিমাণ বন্ধু সমাগত হইয়া যে-পরিমাণ চা ও সিগারেট ধ্বংস করিত ও যে পরিমাণ চীৎকার করিত তাহাতে পাড়ার অন্তরালবর্ত্তিনীদের প্রাত্যাহিক কর্ম্মবন্ধনের অবকাশে দেখিবার বা শুনিবার বিষয়াভাব ঘটিত না। বিশেষতঃ যেদিন হৃদয়দা' আসিয়া রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তাঁহার হাসি গল্প ও গানে আসর জাঁকাইয়া তুলিতেন সেদিন এই ভয় লইয়া শুইতে যাইতাম যে পরদিন প্রাতেই যতীনের বাবা বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ দিবেন।

এমনি করিয়া দিন মন্দ কাটিতেছিল না। যেদিন নূতন কোনো কবিতা বা গল্প লিখিতাম, বন্ধুরা দল বাঁধিয়া শুনিতে আসিত, আমি মনে মনে লেখক-জন সুলভ-গর্ব্ব অনুভব করিয়া বেশ শান্ত নির্ব্বিকার ভাব দেখাইয়া বসিয়া থাকিতাম; চা জোগাইতে-জোগাইতে গোবিন্দের প্রাণান্ত হইত।

ইতিমধ্যে একদিন যতীনের স্ত্রী বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিল। যতীনের একটি মেয়ে লিলি, চমৎকার ফুটফুটে পুতুলের মতন মেয়েটি। আধো-আধো কথা ফুটিয়াছে,—'না' আর 'আবার' কথা দুইটি বিরক্তির সময় এমন জোর দিয়া উচ্চারণ করিত যে মনে হইত সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথই বা হুকুম করিতেছেন। লিলির বয়স দেড় কি দুই বৎসর। প্রথম ক'দিন লিলি আমার পারিপাট্যহীন বিশাল বপু ও গোঁফ দেখিয়া ভয়ে কাছে ঘেঁসিল না, কিন্তু কখন যে ভয়ের ও সঙ্কোচের বাঁধন কাটিয়া গিয়া মেয়েটি একেবারে আমাকে আত্মসমর্পণ করিল লক্ষ্য করি নাই। একদিন হঠাৎ দেখিলাম লিলি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকি সে আমার কাছে কাছে 'কাকা কাকা' করিয়া ফিরিত আর আমার অবর্ত্তমানে কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলকে জ্বালাতন করিয়া মারিত। যতীন আমার কাজের ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া সত্য সত্যই বড় লজ্জিত হইত। যতীনের স্ত্রীরও লজ্জার অন্ত ছিল না। সে লিলিকে কিছুতেই আমার কাছে আসিতে দিতে চাহিত না—তাহাকে মারিয়া ধরিয়া একাকার করিত।

যতীনদের বাড়ীতে যতীনের বাবা, মা, বড় দাদা ও তাঁহার স্ত্রী ও তাঁদের একটি ছেলে, যতীনের একটি ছোট ভাই, যতীনের স্ত্রী, লিলি আর যতীন এই ক'জন মাত্র লোক। লিলি যতদিন ছিল না আমি বাহিরেরই লোক ছিলাম, বাহিরে বাহিরে ফিরতাম, যতীনদের বাড়ীর ভিতরের সন্ধান কিছুই পাই নাই। বরঞ্চ হরিহর-বাবুর বাড়ী আমার খাওয়ার ঘরের ঠিক সাম্‌নেটিতে থাকাতে তাঁদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে অনেক বেশী পরিচিত ছিলাম। যতীনদের বাড়ীর সঙ্গে গোবিন্দর ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশী ছিল—কাজে অকাজে বাড়ীর ভিতর তা'র ডাক পড়িত। কিন্তু লিলি তার অকারণ সৌহৃদ্য আর ঘনিষ্ঠতা দিয়া তাহাদের বাড়ীর সহিত আমার দূরত্বটুকু ঘুচাইয়া দিতে লাগিল।

আমি খুব ভোরে উঠিতাম। ভোরে উঠিয়াই অভ্যাস-মত গান ধরিতাম। লিলি আমার সাড়া পাইয়া নীচে আসিবার জন্য কাঁদিয়া উঠিত; আমাকে দেখিতে পাইয়া দোতালার বারান্দার রেলিং ধরিয়া নীচে ঝুঁকিয়া দেখিত আর ঘন-ঘন ডাকিত 'কাকা'। উপরে মুখ তুলিয়া চাকিতে

দেখিতে পাইতাম লিলির জ্যাঠাইমা রেলিঙের ধার হইতে লিলিকে সরাইবার জন্ম তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। আমাকে দেখামাত্র অন্তরালে সরিয়া যাইতেন; অথচ লিলিকে বলিতেন 'কই কাকা'—। লিলি আর তার কাকার-পরিচয়ের মধ্যে এই জ্যেঠাইমাটির কিছু হাত ছিল। মাঝে-মাঝে কদাচিৎ শুনিতে পাইতাম ভুলাইয়া ভুলাইয়া লিলিকে জামা পরাইবার বা দুধ খাওয়াইবার সময় জ্যাঠাইমা তাহাকে তাহার কাকার সম্বন্ধে নানা গবেষণামূলক কথা বলিতেছেন।

লিলিকে পাইয়া আমি বাহিরের বন্ধুবান্ধব একে একে প্রায় ছাড়িয়া দিলাম। অফিস আর বাড়ী এ-ছাড়া অন্যত্র যাওয়ায় প্রয়োজন অনুভব করিতাম না—রিপোর্ট্ সংগ্রহ করিতেও নয় কারণ সে কাজটা ঘরে বসিয়াই শৃঙ্খলার সহিত করা যাইত। এর বাহিরে মনের যতটুকু খোরাক দরকার হইত পত্নীর ঘনঘন চিঠিতে তাহার পূর্ণ হইত। মোটের উপর আমার মতন নামজাদা বোহেমিয়ান্ একজন ধীরে ধীরে domesticated হইয়া পড়িতেছিল!

বাহিরে যাইতাম না বলিয়া আমার বাড়ীতেই আড্ডা জমিতে লাগিল কারণ আমাকে বাদ দিলে নাকি বন্ধুদের আসরটা তেমন জমিত না। আমি সমানে চা এবং সিগারেট সাপ্লাই করিতাম এবং বাদলার দিন হইলেই খিচুড়ী ও ডিমভাজা অর্ডার করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিতাম না।

পেয়ালার ঠন্ঠন যত দ্রুততর এবং সিগারেটের ধোঁয়া যত নিবিড়তর হইতে লাগিল, মাসিক ১০-১৫ টাকা কোথায় ফুকিয়া গিয়া দেনার অঙ্ক ততই ভারী হইতে লাগিল এবং একদিন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বোধোদয় হইল। ভাবিলাম এ লাটীয় চাল চলিবে না—পুনর্মূষিক হইতে হইবে, মেস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার করিতে গেলাম তিনি খুব একচোট ধমকাইয়া লইয়া বাড়ী এবং চাকর ছাড়িয়া দিয়া বাগ্‌বাজারে তাঁহার কেয়ারে থাকিতে আদেশ করিলেন। আমি সেইটাই সুবিধা ও লাভজনক ভাবিয়া যতীনকে নোটিশ দিলাম। গোবিন্দকেও অন্যত্র চাকুরির চেষ্টা করিতে বলিলাম।

দেখিলাম, বাড়ীর সাম্‌নে আবার বাড়ী ভাড়ার বিজ্ঞাপন ঝোলানো হইল; পাড়ায় আবার একটা গোল পড়িল। লোকে পথ চলিতে চলিতে একবার করিয়া নোটিশ পড়িয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়—আমার চিত্ত ব্যথিত হইতে থাকে। এই যে পাঁচ মাস এখানে হাসি-গান-গল্প দিয়া পাড়াটিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজিকার বিদায় দিনে কোথাও কি এত টুকু ব্যথা বাজিবে না? দম্‌কা হাওয়ার মতো যে আসিয়াছিলাম কোনো চিহ্নই কি রাখিয়া যাইব না? লিলির কথা বড় বেদনার সঙ্গে বুকে বাজিতে লাগিল। কাল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, অভ্যস্ত সময়ে 'কাকা' বলিয়া সে ডাকিবে কিন্তু কাকাকে না পাইলে সে কি দিনের হাসি খেলা ভুলিয়া থাকিবে? আরো কোথাও এতটুকু কাঁটা কি নাই?

আমি জোর গলায় পাড়া শুদ্ধ সকলকে শুনাইয়া গোবিন্দকে বলিলাম, 'কাল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব —তুমি আজই জিনিষপত্র লইয়া যেখানে চাকুরি পাইয়াছ সেখানে যাও।' লিলি কাছে আসিল। তাহাকে বলিলাম —আমি চলিয়া যাইতেছি—বলিয়াই চকিতে যেন কি দেখিবার প্রত্যাশায় দূরের বারান্দার পানে চাহিলাম; শুধু সদ্য-মেলা একটা ভিজাকাপড়ের উপর বসিয়া একটা কাক 'কা কা' করিতেছে দেখিলাম।

সেদিন স্নানের সময় কান পাতিয়া শুনিলাম জেঠীমার সহিত লিলির কথা হইতেছে। জেঠীমা বলিতেছেন, 'লিলি, তোর কাকা যে চলিল।' লিলি বলিল, 'আবার!' অর্থাৎ যাও অমন মিথ্যা কথা বলিও না। জেঠীমা বলিলেন, 'কাকাকে বল্, কাকা যেও না।' লিলি আত্মগত ভাবেই বলিল, 'বল্ কাকা যেও না।'

চরিতার্থ হইলাম। কে বলিল বন্ধন নাই? কোথায় কোন্ অজানা মৃত্তিকায় যে মানুষ পরিচয়ের শিকড় চালায়, কোন্ অদৃশ্য আকাশ হইতে প্রেমের বাণী পরিচয়ের বাণী সে শুনিতে পায়, কে বলিবে? চারিদিকে যখন ঊষর মরু দেখিয়া ব্যথিত ও ক্লিষ্ট হইতেছিলাম

তখন এই অনির্দ্দিষ্ট স্থানে কে শীতল সরসী রচনা করিল?

শেষবারটির মত ইজিচেয়ারটি পাতিয়া চুরুটের টিন লইয়া বসিলাম। কত কথাই একে-একে মনে আসিতে লাগিল! এই যে শৈবালের মতন ভাসিতে-ভাসিতে এই জল ভাগে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, বন্যার স্রোতে আপনার সমস্ত পরিচয় বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অন্য কোথায়ও ভাসিয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাই কি হইবে? মানুষ এমনি করিয়া কি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইতে পারে? পরিচয়ের অসংখ্য বীজ নিরন্তর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হাসি আনন্দে ও বেদনায়, সামান্য ছুটকথা কিম্বা ক্ষণিকের একটি চাউনি কখন কোথায় জীবন পাইয়া কেমন করি। অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফলফুলশোভিত হইতেছে, মানুষের সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রে ত এ প্রশ্নের সমাধান নাই। এই বাড়ী ঘর-দুয়ার সবই ত যেমন ছিল তেমনি থাকিবে;—একবার চুণ ফিরাইয়া লইলেই হয়ত পরিচয়ের কালিমাটুকু নিঃশেষে বিলুপ্ত হইবে, কিন্তু সহরের একপ্রান্তে এই যে এখানে ক্ষণিকের খেলাঘর রচনা করিয়াছিলাম তাহা কি একেলা আমারই জিনিষ? তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আজ যে চলিয়া যাইতেছি, সে ভাঙনের ব্যথা কি শুধু আমাকেই লাগিবে? আমার প্রাণ এই ক্ষণিকের খেলাঘরের স্মৃতি লইয়া যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে—তাহার সাথে আর কোনো উত্তপ্ত শ্বাস কি মিলিত হইবে না?

চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাইতে খাইতে শূন্যে মিলাইতে লাগিল; আমি নির্লিপ্ত বৈরাগীর মতন তাহা দেখিতে লাগিলাম। আমার মাথায় কল্পনার প্রবাহও অমনি পাক খাইতে লাগিল। আমি ভুলিয়া গেলাম, কাল আমাকে যাইতে হইবে, ভুলিয়া গেলাম আমি শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক, খবরের কাগজের অফিসে রিপোর্টার। যুগে যুগে যে সকল বিরহী দেবতার শাপে ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়াছে। আমি ত তাহাদেরই একজন—তাহাদের সঞ্চিত অশ্রুভার যে আমারই বুকে আসিয়া জমিয়াছে।

রোজ যেমন যায়; একটি দুটি করিয়া তেমনি লোক সামনের গলিতে যাতায়াত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—আজ গোবিন্দ নাই। আলো জ্বলা হইল না;—চায়ের আওয়াজ আর শুনা গেল না। বন্ধুরা আজ কেহ আসিল না। পথিকেরা প্রতিদিনের অভ্যস্ত আলোটি জ্বালা হইল না দেখিয়া কি ভাবিল জানি না; আমার মন বলিতে লাগিল—এ ঠিক হইতেছে না। আলোটি জ্বালাইয়া ঠিক জায়গাটিতে রাখিলাম, তার পর আবার ধোঁয়ার খেলা আর মনের খেলা চলিতে লাগিল।

কত অপূর্ণ কামনা, কত হতাশ্বাস, কত সুতীব্র বেদনা আমার মনে জমাট বাঁধিয়া রূপ পরিগ্রহ করিতে লাগিল, আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। আমি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম।—

* * ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—আকাশ বাতাস চারিদিক থমথম করিতেছে। মনে হইতেছে এখনই যেন বিশ্বপ্রকৃতি ফাটিয়া পড়িয়া বজ্র বিদ্যুৎ আর জলধারে ধরণীবক্ষ প্লাবিত করিবে। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, এই দুর্য্যোগে আমি একমাত্র পথিক, গৃহহারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে বাহির হইয়াছি। কুটিরে-কুটিরে দ্বার বন্ধ হইয়াছে; মনে হইল এ যেন আমার অভিসার। 'ঘোর তবধ সব তিমির মগন ভব'—আমি একেলা অজানার অভিসারে চলিয়াছি।

কেমন করিয়া জানি-না আশ্রয় পাইলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া বাতায়ন খুলিয়া দিয়া দেখিলাম, আসন্ন দুর্য্যোগ আশঙ্কায় সব ঘরের বাতায়ন বন্ধ। জনসঙ্কুল নগরীর উপর যেন জনশূন্য মরুর প্রেতাত্মা হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে।

চিত্রের মতো তাহাকে দেখিলাম—আলুলায়িতকুন্তলা নিকষকৃষ্ণমেঘের পানে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তন্ময় হইয়া কি দেখিতেছিল—বিশ্বপ্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলায় তাহার ক্ষুদ্রমনে কি কামনা ঘনাইতেছিল জানি না। আমাকে দেখিয়া সে লজ্জিত হইল। সরমকুণ্ঠিত নয়নে পলাইতে গিয়া লজ্জিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল হঠাৎ ত্রস্ত হরিণীর মত থমকিয়া দাঁড়াইল; সম্মুখের দুই একটি কেশগুচ্ছ তাহার চক্ষুর উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; অঞ্চলপ্রান্তস্থিত চাবির গোছা একটিবার মাত্র ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তারপর দ্রুত

অন্তরালে চলিয়া গেল। তাহার পিঠভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো নৃত্য করিতে করিতে অন্তর্হিত হইল। সেই ক্ষণিকের দেখা, তবু মনে হইল আমারই কারণে চারু চরণ দুটি লজ্জিত, মৃণাল বাহু দুটি কুণ্ঠিত, নয়নদুটি ত্রস্ত আর হৃদয়টি যেন ফুলের ভিতরকার লুকানো মধুটুকুর মতো মধুর—শিশিরটুকুর মতন করুণ।

ভাবিলাম অভিসার সার্থক হইয়াছে, প্রার্থিতের দর্শন পাইয়াছি।

দুর্যোগ কাটিয়া গেল। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শুরু হইল, কিন্তু তাহাকে আর দেখিলাম না। দিনের পরে দিনের ব্যর্থ আশায় ধীরে ধীরে তাহাকে ভুলিয়া গেলাম, এবং আবার দিবসের কর্মগ্লানির অবকাশে অপরিচিতা প্রেয়সীকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলাম।

এমনি করিয়া দিন যায়, বাড়ীর আনাচে-কানাচে romanceএর গন্ধ শুঁকিয়া ফিরি; কল্পিত নায়িকাকে কখনো পেছনের বাড়ীর ছাদে দেখিতে পাই, কখনো সামনের বাড়ীর জানলায় চকিতে তাহার আভাস পাই; কিন্তু এই ধোঁয়াটে পরিচয় ছাড়া তাহার আর কোনো নিরেট পরিচয় জোটে না।

প্রথম কিছুদিন হরিহর-বাবুর মেয়েকে লইয়া কাব্য সুরু করিলাম। তাহার ঘুম হইতে জাগরণ, ছেলে ঠেঙান, স্নান, চুল আঁচড়ান, বাহিরে যাওয়ার পোষাক পরা, রিক্স করিয়া বাহিরে যাওয়া, বৈকালিক ছাদ-বিহার, কালোয়াতী গান ও মার সহিত ঝগড়ার মধ্যে বেশ কয়েকদিন দোল খাইয়া ফিরিলাম; ভাবিলাম এই ত মিলিয়াছে, এই আমার নায়িকা! ইহাকে লইয়াই ত আমার কাব্য—! কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা কেমন বিগড়াইয়া যাইত—সে তাহার মায়ের বা বাবার সহিত ঝগড়া করিবার সময় বা ছেলেকে মারিবার সময় যে কথাগুলি ব্যবহার করিত তা মোটেই নায়িকাদের মুখে শোভা পায় না। বিশেষতঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যখন কেহ দরজায় ঘা দিত তখন সে যে-ভাবে "কে গা!" বলিয়া হাঁক দিয়া উঠিত তাহাতে আমার নায়কের মন অতিশয় পীড়িত হইত। অবশেষে একদিন এই মেয়েটির স্বামী আসিল এবং আমি অবিলম্বে তাহাকে নায়িকার আসন হইতে বরখাস্ত করিলাম।

বসিয়া বসিয়া ভাবিলাম, হায়রে আজ এতকাল কলিকাতার পথে-পথে কাকের অত্যাচার আর মোটরের কাদা সর্বাঙ্গে মাখিয়া ফিরিয়াছি কিন্তু কই চোখের সামনে একটি গাড়ীও ত উলটাইল না—বিনয়ের মতো যে কোনো সকন্যা বৃদ্ধকে দুদণ্ড ঘরে বসাইয়া চিরস্থায়ী আলাপের ব্যবস্থা করিব সে সুযোগও ত মিলিল না। সুচরিতা ললিতা না হয় নাই জুটিল নিদেন পক্ষে একটা সাবিত্রী কি একটা চন্দ্রমুখীই কি ভগবান্ জুটাইয়া দিতে পারিলেন না?

এমনি করিয়া অনিশ্চিতের পিছনে আমার মন যখন কাঁদিয়া ফিরিতেছে তখন কে জানিত আমার শঙ্কিতা বিরহিনী আমারই অতি নিকটে তাহার হৃদয় মেলিয়া বসিয়া আছে; আমি তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ পাইয়াছি, কিন্তু লক্ষ্য করি নাই। আমি যখন বাহিরে ছুটিবার জন্য ব্যস্ত তখন কে জানিত একটি ব্যগ্র হৃদয় আমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল আগ্রহে আমারই ঘরে পথ চাহিয়া আছে। সেই দুর্যোগদিনে যাহাকে চকিতের মতো দেখিয়াছি আমার সেই 'অধরা স্বপন' যে আমাকে লইয়াই স্বপ্ন রচনা করিতেছিল তাহা ত ভাবিতে পারি নাই। আমি কল্পনায় অনেক শৈবলিনী ও আয়েষার স্বপ্ন হয় ত দেখিয়াছি কিন্তু বাস্তব জীবনে এই রূপরসহীন লোকটিকে যে কাহারও প্রয়োজন ঘটিতে পারে তাহা ত পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নামোদিত শারদীয় নিশীথের মুহূর্তের জন্য স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। তাই আশ্চর্য্য হইলাম, ভাবিলাম, প্রাণের দেওয়া নেওয়া ব্যাপারে মানুষ গণিত বা ন্যায়ের পথ ধরিয়া ত চলে না; অসম্ভবের পথেই তাহার অভিযান, ভুলের মধ্যেই তার লীলা, এবং পৃথিবীর যাবতীয় Tragedyর মূলেও এই অঘটন সংঘটন।

যতদিন অনিশ্চিত ছিল ততদিন নায়িকা মিলনের কথা ভাবিয়া রসাপ্লুত হইয়াছি কিন্তু অনিশ্চয় যখন নিশ্চয়-তার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, আমার কল্পিতা বিরহিনী যখন অতি নিকটে চকিত চাহনী বা চঞ্চল পদক্ষেপে তাহার আভাস দিতে লাগিল তখন ভয়ে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলাম—ভাবিলাম এ কী হইল। এমন ত কথা ছিল না।

বেশ অলসভাবে চলিতেছিলাম হঠাৎ বাধা পাইলাম। দিনের পর দিন যখন ইজিচেয়ারে বসিয়া বাহিরে ও ভিতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়াছি কে জানিত একটি শঙ্কিত চিত্ত আমি মনোযোগের সহিত আমার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করিয়াছে; যখন গান ধরিয়াছি কে জানিত আমার সেই অসুর-সুরে একটি 'চঞ্চল' হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছে। সন্ধ্যা হাওয়ায় আমার উতলা ঘরের কোণে বসিয়া যখন হতাশাস হৃদয়ে বাতায়ন-পথে দূর-দিগন্তে প্রেয়সীর সন্ধান করিয়াছি তখন কে জানিত আমার অতি নিকটে তাহারই চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজিয়াছে। যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছি—

—মনে আছে সে কি সব কাজ, সখি,
ভুলাইছ বারে বারে—
বন্ধ দুয়ার খুলিছ আমার,
কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যায় মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল চাহনিতে
ভুলাইছ বারে বারে—

হে আমার সেই অজানা প্রেয়সী কোথায় তুমি? তোমার বিরহে নিরবধি শূন্যতার সীমাশূন্যভারে আমার সমস্ত ভুবন মরুসম রুক্ষ হইয়া গেছে; যখন আমার গোপন অভিসারিকার উদ্দেশে পাঠ করিয়াছি—

'হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ-সুধারস।'

তখন তাহারই চঞ্চল অঞ্চলের মদির স্নিগ্ধ হাওয়া আমায় স্পর্শ করিয়া বলিয়াছে 'ওগো অন্ধ! প্রেয়সী তোমার এত নিকটে উন্মুখ প্রতীক্ষায় অধীর, আর তুমি কোথায় ব্যর্থ হাহাকার করিয়া ফিরিতেছ?' তখন কে সেই মূক ইঙ্গিত বুঝিয়াছে! সরমার চিঠি যখন আসিত আমি কি জানিতাম যে আর একটি প্রাণী অন্তরালে থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিল; এবং চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর আমার মুখে যে—ছায়াপাত করিত তাহা আর কাহারও হৃদয়কেও মথিত করিল! যখন কোনোদিন কোনো কারণে ব্যথিত চিত্তে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতাম একটি স্নেহকর-স্পর্শ দূর হইতে যে আমার কপাল ছুঁইয়া যাইত তাহা কি কখনো বুঝিয়াছি। গোবিন্দ কোনোদিন হয়ত রান্না করিয়া আমার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে; জানিতাম না যে একজন ব্যগ্র আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে আর মনে মনে বলিতেছে—'ওগো খাও, তোমার ভাত যে শুকাইয়া চাল হইয়া আসিল'। যতক্ষণ আমি না খাইতাম সেও কিছু মুখে দিত না। রাত্রিতে আলোটি জ্বালাইয়া লইয়া যেদিন কিছু লিখিতে বসিতাম এবং ভাবের অভাবে ও মিলের অমিলে কুঞ্চিত ললাটে চুপ করিয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতাম তখন যে একটি নারী-হৃদয় বাণীর দুয়ারে কাতর প্রার্থনা করিতে থাকিত তাহাও ত এতদিন বুঝি নাই;—যখন বুঝিলাম তখন শঙ্কা ও সঙ্কোচে ব্যথিত হইলাম।

প্রথম প্রথম কিছুই বুঝিতে পারি নাই হঠাৎ চমক ভাঙিল সেদিন, যেদিন দেখিলাম আমার bachelor's den এ কোনোদিক দিয়া শত্রু প্রবেশ করিয়াছে। আমার ঘরে অনভ্যস্ত পারিপাট্য লক্ষিত হইল। প্রথমে মনে হইল গোবিন্দ কি সহসা আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উঠিল। অফিস যাইবার সময় প্রত্যহ গোবিন্দের কাছে চাবি রাখিয়া যাইতাম—সে ঘর ঝাঁট দিয়া রাখিত, কিন্তু এতকাল ত কই আমার বিছানার উপর বা টেবিলের সঞ্চিত ধূলির দিকে তার নজর পড়ে নাই;—তা হইবেও বা মনিব দিন দিন পুরাণো হইতেছে ত। কিন্তু ক্রমশঃ সে ভুল ভাঙিল,—দেখিলাম ময়লা চাদর পরিষ্কার হইয়াছে, মশারির ছিন্ন অংশগুলি তালি সংযুক্ত হইয়াছে, বইগুলি বাঙলা ইংরেজী ক্রমে বেশ শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে; চিঠিগুলি letter padএ বা fileএ যথাস্থানে

স্থান পাইয়াছে। গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হইল না পাছে অপ্রিয় কিছু শুনিতে হয়।

কিন্তু এই চকিত আভাস ইঙ্গিতের মাঝে মাঝে কী এক অজানা সুর আমার মনের আনাচে-কানাচে গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল; বসন্ত হাওয়া কোন্ দিক্ দিয়া যেন আমার মনে প্রবেশ-পথ পাইয়া তোলপাড় তুলিয়া দিল। যাহার আভাস আভাসে মাত্র পাইয়াছি তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য মন ব্যগ্র হইল।

পরিচয় শেষে একদিন ঘটিলও—কেমন করিয়া তাহা বলিব না। মেয়েটি কে, তাহাও নাই বলিলাম। তাহার নাম উমা। সে এত নিকটে কিন্তু এতদিন আভাসে ইঙ্গিতেও তার পরিচয় পাই নাই বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলাম।—বুঝিলাম কত প্রতীক্ষা, কত শঙ্কিত বিনিদ্র রজনী যাপন ওই ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে করিতে হইয়াছে অথচ এত নিকটে থাকিয়াও তাহার প্রতি বিমুখ ছিলাম। ধীরে ধীরে কখন কেমন করিয়া যেন আমার গৃহটিকে সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং আমার অলক্ষ্যে নিরন্তর আমারই কল্যাণ কামনা করিতেছে। অন্তরালে থাকিয়া আমার যতটুকু পরিচয় উমা পাইয়াছে তাহাতেই এই জন্মবিরহিণী সন্তুষ্ট; সে যে এতদিন শুধু তার বাঞ্ছিতকে দেখার আশায় ব্যর্থ জীবন যাপিতেছিল—এতদিনে কি তাহার প্রিয়তম আমারই মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে উপহাস করিল। তাহার অদৃষ্টদেবতা তাহাকে উপহাস করিল কি না জানি না কিন্তু আমার দেবতা আমার সঙ্গে নিদারুণ পরিহাস করিলেন; মনের কোণে কোণে দখিনা হাওয়া বহিতে সুরু করিলেও ত্রস্ত হইয়া উঠিলাম—ভাবিলাম, এ কী!

উমা তাহার দৈনন্দিন কাজের অবকাশে আমার ঘরটিকে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া রাখিত। বিছানা টেবিল ঝাড়িয়া বই গুছাইয়া কিছুতেই যেন তাহার তৃপ্তি হইত না। সে আমার আর সরমার একসঙ্গে-তোলা ফোটোখানি প্রতিদিন নামাইয়া ঝাড়িয়া রাখিত। আমার কবিতার খাতা আর letter-pad এর দিকে তার লোভ ছিল বেশী; সে কবিতার খাতা হইতে কবি-জনোচিত অজানা প্রেয়সীর উদ্দেশে কবিতাগুলি নকল করিয়া লইয়া বিনিদ্র রজনীর খোরাক সংগ্রহ করিত এবং সরমার চিঠিগুলি এমন লোলুপ আগ্রহে পাঠ করিত যে দুই একদিন তার সময়-সম্বন্ধে জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে এবং সে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

চিরবিরহিণীর ব্যর্থ জীবন এমনি করিয়া রূপেরসে ভরিয়া উঠিতেছিল; তাহার শুষ্ক মরুময় জীবন কখন অলক্ষ্যদেবতার কৃপা-বরিষণে শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিল—উমা একদিন সহসা অনুভব করিল যে, জীবন সুখের, বাঁচিয়া থাকা ভগবানের অসীম অনুগ্রহ।

বাহিরে আমার আজকাল কোনো বন্ধন নাই, বন্ধু-বান্ধব সকলকে ছাড়িয়াছি; আমার বাড়ীর আসরও আর জমে না। আমি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলাম। পতঙ্গভুক গুল্মেরা যেমন আগে তাহাদের শিকারকে বেশ করিয়া লালাসিক্ত করিয়া পরে ধীরে ধীরে পরিপাক করে আমার এই আবাসভূমি আমাকে তেমনি সিক্ত করিয়া আনিতেছিল—আমি আপনার রচিত জালে আপনিই জড়িত হইয়া পড়িতেছিলাম।

অত্যন্ত ব্যথিত কাতর হৃদয়ে অফিস যাইতাম আর তিনটা বাজিবার পর হইতেই বাড়ী ফিরিবার জন্য মন কেমন করিত, চঞ্চল হইয়া উঠিতাম। মাঝে-মাঝে মনে হইত এ কী দ্বিতীয় 'ক্ষুধিত পাষাণে'র অভিনয় নাকি? এখানকার বাড়ী পাষাণ না হইয়া না হয় চুনকাম করা ইটকই হইল কিন্তু এযে দেখি আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আমার অদৃষ্ট বার্ত্তিনীরা বাদশাজাদী নন—বাঙ্গালী ঘরের একটি মাত্র দুঃখিনী মেয়ে, কিন্তু হৃদয়ের খেলায় আকর্ষণ বিকর্ষণে বাদশা-জাদীদের চেয়ে যে কম যান তাহা ত মনে হয় না।

বাড়ীর বাহির হইলেই আমি অহরহ কানের কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইতাম, বুকের কাছে কার যেন উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিতাম। কে যেন অতি কাতর করুণ সুরে নিরন্তর বলিতে থাকিত, "ওগো, সময় যে বড় অল্প, তুমি কেন দূরে দূরে ফিরিতেছ, আমি যে পথ চাহিয়া আছি।" আমি সমস্ত কাজ ফেলিয়া প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতাম। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ীতে আসিয়া চেয়ারটি লইয়া বসিয়া আকুল আগ্রহে কাহার যেন আগমন-প্রতীক্ষা

করিতাম; বাসয়া বসিয়া যতদূর সম্ভব 'দরদ' দিয়া গাহিতাম—

'ওগো সুদূর ওগো মধুর
পথ বলে দাও পরাণ বঁধুর
সব আবরণ তোল' তোল'।'

তখন 'পরাণ-বঁধু' অতি নিকটে স্তব্ধ হইয়া মনে মনে বলিত,'ওগো এই ত আমি আছি'। আমার অপরিচিতাকে উদ্দেশ করিয়া যখন পড়িতাম,—

'পথ বাকী আর নাই ত আমার চলে এলেম একা,
তোমার সাথে কই হ'ল গো দেখা—'

অমনি অন্তরালবর্ত্তিনী হয়ত বলিয়া উঠিত 'ওগো এখনো কি তোমার দেখা শেষ হয় নাই।'

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে অলক্ষ্য যখন লক্ষ্যের মধ্যে আসিতে লাগিল, পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া অপরিচয়ের শেষ অন্তরালটুকু যখন প্রায় সরে সরে করিতেছিল এমন সময় সহসা চমক ভাঙিল। ভাবিলাম, এ কি করিতেছি। এই লুকোচুরির এই অলক্ষ্য আবেদন-নিবেদনের শেষ কোথায়? শৃঙ্খলবদ্ধ আমি, উমাকে দিবার আমার কি আছে। আর এই যে ব্যবধান, ইহার অবকাশে হয়ত স্বপ্ন বা কাব্য রচনা করিতে পারি, কিন্তু দূরত্ব যখন দূর হইয়া প্রাণের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় ঘটিবে তখন কি পঙ্কিলতার ধিক্কারে জীবন ধিক্কৃত হইবে না? এই যে সামান্য ব্যবধান ইহা ঘুচাইবার অধিকার ত আমার নাই। আমি দূর হইতে অন্তরালবর্ত্তিনীকে আমার প্রাণের একান্ত অনুরাগ জ্ঞাপন করিব, কিন্তু মুখামুখি আমার কথা ত ফুটিবে না।

আমি যেন কোনো আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়াছিলাম—মূর্চ্ছাভঙ্গে আঘাতের বেদনায় পীড়িত হইতে লাগিলাম। নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়া থাকিয়া আর একটি ব্যথিত অসহায়া প্রাণীর অন্তরের গোপনবারতা পাইতেছিলাম। আমার সমস্ত দেহ-মন শিহরিয়া উঠিতেছিল। আমি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিলাম, 'ওগো আমি যে নিরুপায়, আমাকে যে যাইতেই হইবে। তোমার স্নেহ-বন্ধন আমাকে দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছে এবং এই বন্ধন অটুট রাখিবার জন্যই আমাকে দূরে যাইতে হইবে, তুমি এই অসহায়কে ক্ষমা করিও—'

পরদিন সকালে বাড়ী ছাড়িবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম, উমা কি কাজে যাইতেছিল তাহার হাত হইতে ঝন্-ঝন্ করিয়া কি যেন পড়িয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম—সে বজ্রাহতের মতো বসিয়া আছে, সকলের খাওয়া হইল কি না সে দেখিল না, দিনের কাজে আজ আর সে কাহাকেও সাহায্য করিতে ছুটিল না। সে মনে-মনে বিনাইয়া-বিনাইয়া বলিতে লাগিল, 'ওগো কৃপণ, এইটুকু দিতেও তুমি কুণ্ঠিত হইতেছ! দিনান্তে শুধু তোমাকে একবার দেখিতাম তাহাও কি তোমার সহিল না। ভীরু আমি কি জানি না তুমি কেন যাইতেছ, এই দুর্ব্বল নারীর কাছ হইতে পলায়ন করা ছাড়া কি তোমার কোনো পথ ছিল না! ওগো আমি তোমার কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিব,আমার অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত তুমি কোনোদিন অনুভব করিতে পারিবে না, শুধু তুমি থাকিয়া যাও!' হায় অসহায়া নারী!

প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বই গুছাইতে-গুছাইতে আমার কবিতার খাতা হইতে একটি চিঠি মাটিতে পড়িল। দেখিলাম আমাকেই লেখা চিঠি—উমা লিখিয়াছে। ভিতরে শুধু একটি লাইন লেখা—'ওগো তুমি যেও না'—কোনো সাক্ষর নাই। জিনিষ গোছানো, বাঁধা ছাঁদা আমার কাছে বিষবৎ মনে হইতে লাগিল, কিন্তু তবু যাইতে হইবে। শঙ্কিত হস্তের তিনটি অক্ষরে হৃদয়ের যে ভাষা ওই অসহায়া আমাকে নিবেদন করিয়াছে—তাহা আমাকে কতখানিই না বলিল! জলস্থল, আকাশে, বাতাসে আমি ওই করুণ আর্ত্তস্বর শুনিতে লাগিলাম,—'ওগো তুমি যেওনা'।

ধরণী নিরন্তর ব্যগ্রবাহু মেলিয়া মানুষকে ধরিয়া রাখিতে চায়—যুগে-যুগে প্রণয়িনীজন তাহাদের প্রেমাস্পদকে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছে শুধু এই তিনটি কথা বলিয়া—'ওগো তুমি যেও না'। কিন্তু কেহ কি ধরিয়া রাখিতে পারে? সব বন্ধন পিছনে পড়িয়া থাকে, ব্যর্থ নয়ন-সলিলে ভাসিয়া প্রেমিকা শূন্য হৃদয়ে চাহিয়া থাকে, যে যাইবার সে চলিয়া যায়।

আমাকেও যাইতে হইল।

আবার সোর-গোল পড়িল। গাড়ীবন্দী করিয়া

জিনিষপত্র লইয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলাম; অন্তরালবর্ত্তিনী উমার বিমর্দ্দিত বুকে আর আমার ছিন্ন হৃদয়ের কোণে কি ঘটিল সে ইতিহাস নাই বলিলাম।

আবার নূতন ভাড়াটে আসিল, উমা একবারমাত্র তাহার শান্ত আয়ত চোখ দুটি মেলিয়া দেখিল, তারপর—

* * *

আমার গল্প আরো কতদূর চলিত বলিতে পারি না, হঠাৎ সামনের খোলার বাড়ীতে একটা হৈ চৈ রব উঠাতে চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, অতি প্রত্যূষে বাড়ী ছাড়িতে হইবে বলিয়া স্বপ্ন ও বাস্তব ভুলিয়া ঘুমের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

কাব্য-কথা

কবি ও কাব্য

শ্রী সত্যসুন্দর দাস

কবি কে?—এই কথার সহজ উত্তর, যিনি কাব্য রচনা করেন, তিনিই কবি। কিন্তু কথাটা এত সহজ নয়, কারণ সঙ্গে সঙ্গে—কাব্য কি?—এ কথারও উত্তর চাই, এবং সে উত্তর কঠিন বটে। তথাপি কাব্যের সংজ্ঞানির্দ্দেশের গুরুভার আপাততঃ কাব্যামোদী পাঠকের উপরে চাপাইয়া যিনি কাব্যকার, কবি বলিতে তাঁহাকেই বুঝিব। কাব্য কি, তাহার উত্তরে এই মাত্র বলিব যে, 'শকুন্তলা' ও 'মেঘদূত' কাব্য, 'লিয়ার' ও 'টেম্পেষ্ট' কাব্য, 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সোণার তরী' কাব্য। ইহাদের মধ্যে কাব্যবস্তু কোথায়—ছন্দে না বাক্যে, অর্থে না আখ্যান-ব্যাখ্যানে, কল্পনা-কৌশলে না সদ্ভাব-বিকাশে—কিম্বা এই সকলের সংযোগে, এমন কি সংযোগেরও অধিক একটি অপূর্ব্ব চিত্ত চমৎকার বা অনুভূতি-বিলাসে—সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল কবি ও কাব্যের কার্য্যগত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চাই, কীর্ত্তি ও কর্ত্তার মধ্যে পরস্পরের পরিচয়ের সূত্র কতটুকু, কবির প্রেরণা ও কাব্যের অভিপ্রায় কিরূপ, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অতএব প্রথমেই ধরিয়া লইলাম, যিনি কাব্যকার তিনিই কবি। আর একটু স্পষ্ট করিয়া লই। প্রথমতঃ যিনি কাব্য রচনা করেন নাই, তিনি কবি নহেন, যথা—নীরব কবি। দ্বিতীয়তঃ যিনি কাব্য রচনা করেন, কবি বলিতে সেই মানুষটিকে বুঝিব না, সেই মানুষটির মধ্যে যে আর একটি মানুষ আছে, কাব্যরচনাকালে যে আত্মপ্রকাশ করে, অথবা আর একটি যে আত্মা যেন তাঁহার উপরে ভর করে, সেই অপর ব্যক্তি বা আত্মাকেই কবি বলিয়া বুঝিব।

যিনি কাব্য রচনা করেন না, তিনি কবি নহেন—এ কথাটা বোধ হয় বেশি বুঝাইতে হইবে না। ভাবুক বা রসিকমাত্রেই কবি নহেন, কাব্যের ভাবনা বা ধারণা করিতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভাবুক বা রসিকের কল্পনা আছে সত্য, কিন্তু সে কল্পনা বন্ধ্যা, ভাবুকের মনেই রুদ্ধ হইয়া থাকে। যে দৈবী-প্রেরণার বশে সেই কল্পনা কাব্যসৃষ্টিতে রূপময়ী হইয়া উঠে, সে প্রেরণা সকলের ভাগ্যে ঘটে না; যাঁহার ভাগ্যে ঘটে, সেই ভাগ্যবানই বাণীর বরপুত্র, তিনিই কবি।

আবার যে মানুষটির মধ্যে এই দৈবী প্রেরণার লীলা দেখিতে পাওয়া যায় সেই মানুষটির সাধারণ মনুষ্যজীবন একরূপ, তাঁহার কবিজীবন বা কাব্যগত পরিচয় স্বতন্ত্র। কবির জীবনে এই দ্বৈত আছে। কাব্যের মধ্যে যাঁহাকে পাই তাঁহার মূর্ত্তি, আর সমাজে সংসারে যাঁহাকে পাই

তাঁহার মূর্ত্তি এক নহে। এমন কি, কাব্যের মধ্যে যাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁহার মধ্যে আমাদের সাধারণ ধারণার অনুযায়ী কোনও ব্যক্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না। কবির ব্যক্তিত্ব বলিতে যাহা বুঝি, তাহা কোনওরূপ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়—ইহাই আমার কথার তাৎপর্য্য।

কাব্যের গৌরব আর যাহা হউক, তাহা যুদ্ধজয়ের মত একটা কীর্ত্তি নয়, সাম্রাজ্যস্থাপন নয়, পতিতোদ্ধার নয়। মানুষের কর্ম্মগৌরব, এবং তাহার মূলে যে বুদ্ধি, নীতি, কৌশল ও চরিত্রশক্তির পরিচয় আছে, সেরূপ কোনও পরিচয় কবি কীর্ত্তির মধ্যে নাই। কবির কাজ ইহা হইতে বহুগুণে উত্তম হইতে পারে; তাহার মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহার চমৎকারিত্ব অনেক বেশি হইতে পারে, তথাপি তাহাতে সাধারণ মানুষ-ধর্ম্মের পরিচয় নাই।

কাব্যে মনীষার পরিচয় নাই, কবিপ্রতিভা বলিতে চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ বুঝায় না, কারণ যাহাকে আমরা চিন্তাবৃত্তি বলি, কাব্য সেই চিন্তাবৃত্তির ফল নয়।

কাব্যের মধ্যে কবির যে সহৃদয়তার পরিচয় পাই, যে সহানুভূতিকে সত্যকার কবি-ধর্ম্ম বলিয়া বুঝি, তাহা লৌকিক হৃদয়বৃত্তি নয়। যে প্রাণ, কুষ্ঠীর ক্ষত নিজ হস্তে ধৌত করিতে চায়, ক্ষুধিতের ক্ষুন্নিবারণে উৎসুক, বিপন্নকে উদ্ধার করিতে চিন্তিত—কাব্যের মধ্যে সেই প্রাণের পরিচয় অসম্ভব; বরং অনেক সময়ে (সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিতে) তাহার উল্টা পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। কবি এমন সকল বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত, যাহা পড়িতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—এমন কল্পনায় মশগুল, যাহা শয়তানকেও আমাদের চক্ষে মহিমামণ্ডিত করে।

অতএব যাহা কিছু লইয়া সাধারণ মানুষের কৃতিত্ব তাহার অনুরূপ লক্ষণ কাব্যে পাওয়া যাইতে পারে না। কাব্যদ্বারা কাব্যকারের বাস্তব চরিত্রের কোনও ধারণা পরিস্ফুট হয় না।

চরিত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কবির মনটাকেই যদি কাব্যের মধ্যে ধরিতে যাই—তবে সেই পরিচয়ের মূল্য কোন্ দিক্ দিয়া কতটুকু তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। কবিকল্পনার সত্যাসত্য অন্যরূপ। সে যে কিরূপ, সেই কথাই এই প্রবন্ধের বিষয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, ব্যবহারিক জীবনে, 'লোকচরচা'য়—যে সংস্কার, সকলের সম্বন্ধেই নানাদিক হইতে ফুটিয়া উঠিয়া মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের একটা ধারণা গড়িয়া তোলে, কাব্যের মধ্যে কবির সম্বন্ধে সেই ধারণাকে সর্ব্বদা দূরে রাখিতে হইবে—ইহাই আমার সর্ব্বপ্রথম বক্তব্য। কথাটা অনেকের পক্ষেই হয়ত নূতন নয়, তথাপি অনেকের মনে এইরূপ একটা অভ্যাসের সংস্কার রহিয়াছে দেখা যায়, এই জন্ম আমি বাহুল্যভয় সত্ত্বেও ওই কথাটাই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে চাই। কাব্য পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক—যাঁহার যতটুকু রসবোধ আছে, সেই অনুপাতে—আনন্দ পাইয়াও, কবির একটা অবান্তর পরিচয় কাব্য হইতে খাড়া করিয়া, কাব্যের অর্থ সঙ্গতি বা অর্থ-গৌরব অথবা অর্থ-লাঘব করিতে চান; ইহাতে কবি ও কাব্য উভয়েরই মর্য্যাদাহানি হয়।

কবির জীবনের সঙ্গে কাব্যের একটা যোগ কোথাও আছে, সে যোগসূত্র বাহির করার উপায়ও স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক জীবনের কার্য্যক্ষেত্রে মানুষের কার্য্য ও স্বভাবের মধ্যে যে একটি সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, মানুষের মতামত ও সামাজিক আচরণের মধ্যে যে মিল না থাকিলে তাহাকে মিথ্যাচারী হইতে হয়—কবির কবিজীবন ও কাব্যের মধ্যে সেইরূপ একটা মিল থাকাই সম্ভব, কিন্তু সে যে কিরূপ এবং কোথায়, তাহা বিচার করিতে হইলে, কবি ও কাব্যের একটি যথার্থ ধারণার প্রয়োজন। কাব্যের কবি-মানস কবির ব্যক্তিগত চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র। ইহার প্রমাণ সকল উৎকৃষ্ট কাব্য পাঠ করিবার সময় মনে-মনে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট নাটক উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার নিদর্শন, সেখানে কবির ব্যক্তিত্ব কোথায়? বরং সেইটি লোপ হয় বলিয়াই নাটক উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কাহিনী-কাব্যের আখ্যানবস্তু-নির্ব্বাচনে বা বর্ণনাভঙ্গিতে কবির যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, তাহাও কবির বাস্তবজীবনের বাস্তব অভিপ্রায়ের সহিত না মিলিবারই সম্ভাবনা। লিরিকের মধ্যে কবির যে আত্মগত উচ্ছ্বাস থাকে, তাহাতে যে আত্মাভিমান প্রকাশ পায়, তাহাও একটা আদর্শ-কল্পনার আবেগ, সেও কবির ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় নয়।

অতএব কবি-ধর্ম্ম বলিতে সাধারণ ব্যক্তি-ধর্ম্ম মনে করা চলে না। তাহার কারণ, কাব্যরচনাকালে মানুষটি আর সেই-মানুষ নাই, তখন একটা বৃহত্তর চেতনার আবেশে প্রাণের অবাধ স্ফূর্ত্তি, কল্পনার দিব্যোন্মাদ ঘটে। কবি তখন মনুষ্যজীবনের সাধারণ স্তর হইতে একটা ঊর্দ্ধতর স্তরে উঠিয়া যান; এই mood বা ভাবাবস্থাই কাব্যের জননী। কাব্যসৃষ্টিতে কবির যে আত্মবিকাশ বা আত্মপ্রসার হয়, তাহাতে কোনওরূপ চরিত্রলক্ষণ থাকে না। চরিত্র কি?—মানুষের সাধ ও সাধ্যের বিষমতায়, অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাবে, তাহার ইচ্ছাশক্তি নিরন্তর যে কর্ম্ম রূপ ধারণ করিতেছে তাহারই একটি বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত আকারকে আমরা চরিত্র বলিয়া থাকি। কবি যখন কাব্যরচনায় ব্যাপৃত, যখন তাঁহার ঐ mood উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার জীবন এই কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, লৌকিকতার সর্ব্বসংস্কার ঘুচিয়া যায়, ক্ষুদ্র ব্যক্তি-জীবন একটি মহত্তর সত্তায় ডুবিয়া যায়—তখন তাঁহার নবজন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ হয়। এই অবস্থায় মানুষ যেন স্বমহিমায় বিরাজ করে। এই উল্লাসের অবস্থায় মানুষের 'অহং'টি আর থাকে না। এই অহংজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার অশক্তি ও অজ্ঞানের মূল। ইহারই ফলে মানুষের সাধনা ও সিদ্ধি, জ্ঞান ও প্রবৃত্তির নিত্য বিরোধ ঘটে, এবং সারাজীবন ধরিয়া তাহাকে আত্ম-সংগ্রাম করিতে হয়। তাহার ইচ্ছাশক্তি, জগৎ ব্যাপারের প্রতিপদে বিঘ্নিত হইয়া ঘূর্ণাস্রোতে বহিয়া চলে, এবং তাহার মুক্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মাকে পীড়িত করিয়া, তাহার উপর ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের বা সঙ্কীর্ণ চরিত্র-বুদ্ধির আরোপ করে। কাব্যসৃষ্টিকালে এই অহং-মুক্তি ঘটে বলিয়াই কবির সম্বন্ধে কোনও চরিত্রবিচার খাটে না। বাস্তব জীবনে কবির কর্ম্মবৃত্তি সাধারণ মানুষের মতই অবস্থা ও চরিত্রবশে নানারূপ হইতে পারে। কেহ যোদ্ধা, কেহ রাজসভাসদ্, কেহ জমীদার, কেহ পল্লীবাসী গৃহস্থ, কেহ শেকস্‌পীয়রের মত সাধারণ বিষয়ী লোক, কেহ গোঁড়া ধর্ম্মবিশ্বাসী, স্বজাতি ও স্বদেশ পরায়ণ; আবার কেহ গেটে বা রবীন্দ্রনাথের মত জাতি ও স্বদেশাভিমান-বর্জ্জিত বিশ্বপরায়ণ মনীষী। কিন্তু যেমনি তাঁহার হৃদয়ে কাব্যপ্রেরণা জাগিয়া উঠে, সেই বৃহত্তর চেতনার আবেশ হয়, অমনি বাহিরের সকল সাজসজ্জা খসিয়া যায়—বিষয়-বুদ্ধি, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা বা অবিশ্বাস, স্বার্থসাধন, আত্মপ্রতিষ্ঠা কোথায় ভাসিয়া যায়, তখন তাঁহার চিত্ত শিশুর মত সরল, বিশ্বাস-প্রবণ ও আনন্দময় হইয়া উঠে।

কবির এই অবস্থা, এই নবজন্মের পরিচয় আমরা কাব্যে সর্ব্বত্র পাইয়া থাকি। দেশ, কাল ও পাত্রের সীমা কোথাও থাকে না, কোনোখানে গণ্ডী নাই, কুত্রাপি ব্যক্তিত্বনিষ্ঠা বা চরিত্রনীতির পরিচয় নাই। বিশ্ব-বিধানের যাহা কিছু বৈচিত্র্য তাহাকে এক দিব্যজ্ঞানের ও আনন্দের ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া,—যুক্তিবিরোধ, নীতিবিরোধ, ন্যায়বিরোধ—সকলই অস্বীকার করিয়া, কবি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল-রসাতলে তাঁহার 'আমি'টাকে প্রসারিত করিয়া এক অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি, এক মহান্ উল্লাস প্রকটিত করেন। নিজেই প্রজাপতি হইয়া ফুলের উপর উড়িয়া বসেন, মেঘ হইয়া আকাশে ভাসিয়া বেড়ান, ঘাতক হইয়া হত্যা করেন, প্রণয়মুগ্ধা কিশোরী হইয়া ব্রীড়াবনতমুখী হন; একই কালে 'ওথেলো'র অরুন্তুদ হৃদয়যাতনা এবং 'ইয়াগো'র নৃশংস উল্লাস ভোগ করেন। কখনও বলিয়া উঠেন,

> ইহার চেয়ে হতেম যদি
> আরব বেদুয়ীন।
> চরণতলে বিশাল মরু
> দিগন্তে বিলীন!
> ছুটেছে ঘোড়া উড়েছে বালি,
> জীবনস্রোত আকাশে ঢালি',
> হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি'
> চলেছি নিশিদিন;
> বরষা হাতে ভরসা প্রাণে
> সদাই নিরুদ্দেশ,—
> মরুর ঝড় যেমন বহে
> সকল বাধাহীন।

আবার,

> যদি নন্দী-ছায়ার গাঁয়ে
> কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে
> আমি কোনজন্মে পাই রে হ'তে
> ব্রজের গোপবালক।

—ইহার মধ্যে ব্যক্তিত্বনিষ্ঠা কোথায়?

আবার, কবি কোনও কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, নিজ জীবনে তাহা আচরণ করিয়াছেন কি না—তাঁহার যে অনুভূতি কাব্যের মধ্যে জলন্ত হইয়া উঠিয়াছে, জীবন-যাত্রায় তাহার কতটুকু সত্য হইয়া উঠিয়াছে—সেই প্রমাণ যদি পাইতে চাই, তবে নিরাশ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কাব্যজগৎ স্বতন্ত্র জগৎ, সেখানে বাস্তবের কঠিন শাসন অগ্রাহ্য করা চলিতে পারে বলিয়াই কবিশক্তিকে পূর্ণমানবতার লীলা বলা যায়। বাস্তব জীবনের সকল অক্ষমতা, অজ্ঞান ও অশক্তির হাত এড়াইয়া কবি কাব্যলোকে প্রবেশ করেন। এই সৃষ্টির অন্তরালে যে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি একাধারে প্রবাহিত, তাহারি পূর্ণ-চেতনায় তিনি তখন লীলাময়। সেই অবস্থায় কবির আহ্লাদের অবধি থাকে না; স্বমহিমায় পুলকিত হইয়া সেই দিব্যশক্তিরূপিনী কাব্যসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কবি তখন জয়োচ্চারণ করেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক গে এ বসুমতী যার খুসী তার।

এ অবস্থা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তিনি তাই, আবার যখন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় নামিয়া আসেন, তখন তিনি যে-মানুষ সেই-মানুষ, তখন তাঁহার চরিত্র আছে, কর্ম্মনীতি আছে, সাধারণ মানুষের যাহা কিছু দুর্ব্বলতা সবই তাঁহার আছে। অতএব কবি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের কর্ম্মনীতির মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ সত্তার প্রভাব রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া যদি হতাশ হইতে হয়, তাহা হইলে কবি যখন উৎকৃষ্ট ভাবাবেশে কাব্যলোকে প্রবেশ করেন তখন তিনি নিজ জীবনের সকল ত্রুটি, অক্ষমতা ও সঙ্কীর্ণতা সেখানেও সঙ্গে লইয়া যান না কেন, বলিয়া দোষ দেওয়া চলে; কেন না, কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবন এই দুইএর সামঞ্জস্য উভয় প্রকারেই হইতে পারে।

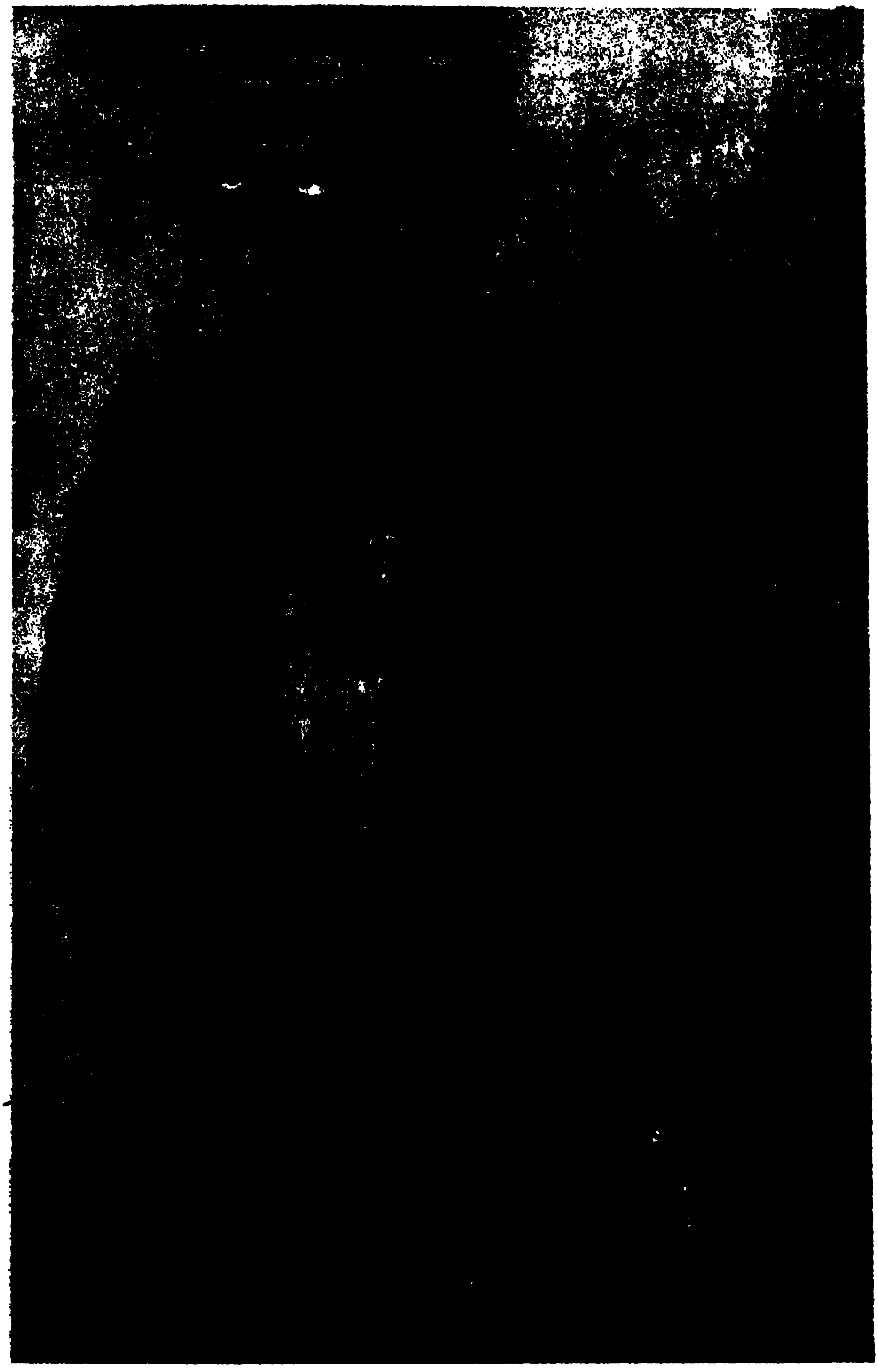
কাব্যের মধ্যে বাস্তব-মুক্তি আছে। জীবনে যে বাধা, কবি-স্বর্গে সে বাধা নাই। সে-স্বর্গে কবি একেশ্বর, সেখানে তিনিই স্রষ্টা, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান। সে স্বর্গ তাঁহার মনের মত করিয়া রচিত, কোথাও তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির বাধা নাই। তিনি যাহা চান তাহাই হইবে; যেমন করিয়া সাজাইতে চান, যেমন করিয়া দেখিতে চান, তেমনি হইবে—জড় ও চেতন সর্ব্ববস্তু তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিবে। কবির যখন বাসনা হয়—

মেয়েটি মোর আগ্‌বাড়ায়ে
দাঁড়িয়ে রবে দ্বারে,
দোপাটি-ফুল খোঁপায় পরে',
সাঁঝের আঁধিয়ারে;
কাজল-দেওয়া চক্ষু দুটি
আদর-দোলে উঠবে ফুটি'
'ফণী মনসা'র বেড়ায় ঘেরা
দুর্গা-দীঘির ধারে।

শিউলি-ফুলের গন্ধে যাবে
সন্ধ্যাখানি ভরে',
জ্যোৎস্নাধারা পড়্‌বে ঝরে',
দূর দেউলের পরে;
অল্প মাজি' দুখের সরে,
ঘাটটি ক'রে ঘটটি ভরে',
সইয়ের সাথে গৃহিণী মোর
আসবে ফিরে ঘরে।

—তখন তাঁহার কামনা অপূর্ণ থাকে না। দোপাটি ফুল সময় না হইলেও ফুটিবে, ঘরে কাজল-পরা শিশু কন্যা না থাকিলেও দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে, শিউলি-ফুলের গন্ধ ও জ্যোৎস্নাধারা মেঘ-বাদলে আচ্ছন্ন হইবে না; ঘাট হইতে ঘট ভরিতে গিয়া গৃহিণীর পা পিছলাইয়া ঘট ভাঙ্গিবে না, সইএর সাথেও কলহ হইবে না—তিনি সুস্থদেহে ও সুস্থমনে, পল্লিপথে সিক্তপদপল্লবের আলিপনা আঁকিয়া স্মিতমুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

এই অধিকার কবির আছে। আবার কবিশক্তির গৌরব ও বিশেষত্ব এই যে, পাঠককেও কবি এই অধিকার দিতে পারেন। কবির এই স্ফূর্ত্তি পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়; কবিতা পাঠ করিবার সময়ে বা গান গাহিতে-গাহিতে আমরা অনায়াসে এই চেতনা-লোক বিহার করি, আমরাও এই উচ্চ সত্তায় যেন কতকটা স্বত্ববান হই। ইহাই কবির প্রধান কৃতিত্ব, এই জন্যই আমরা কবির নিকটে ঋণী। ইহার দ্বারা বুঝা যাইবে, কাব্যের ভিতর দিয়া কবির সঙ্গে যে পরিচয়—সে কতকটা আত্ম-পরিচয়ই বটে। কারণ, আমার ভিতরে যে রসবোধ আছে, কবি তাহাই উদ্বুদ্ধ করেন—তাহার মধ্য দিয়া আমি আমারই পরিচয় পাই। কবিকল্পনার ইন্দ্রজাল বস্তুজগৎকে আমার মনোরম মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়া



তৈমুর

শিল্পী শ্রী অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

আমার মধ্যে আমারই নিগূঢ় সত্তার যেন সাক্ষাৎকার ঘটায়। আমার প্রাণের অবাধ স্ফূর্ত্তি—আমার চিত্তের চমৎকার বিধান করিয়া, আমার মধ্যে যে উদার বৃহৎ 'আমি' রহিয়াছে তাহাকেই মুক্ত করিয়া দেয়। এই আত্মোপলব্ধিই কাব্যের প্রধান অভিপ্রায়।

কাব্যের মধ্য দিয়া কবির সঙ্গে পাঠকের এই পরিচয়, তথা আত্মপরিচয়—ইহাই কাব্য-পরিচয়ের ভিত্তি। এই পরিচয়ের মূলতত্ত্ব ঠিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো হয়ত যাইবে না, তথাপি আমি সেই দুঃসাহস করিব। আমার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে, বিষয়টি শেষপর্য্যন্ত দুরূহই থাকিয়া যাইবে। তথাপি, যদি সহৃদয় পাঠক কেবল তর্কবুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া মর্ম্মগ্রাহী হইবার চেষ্টা করেন তবে সফল হইতেও পারি।

কাব্যের ভিতর কবিচরিত্র সন্ধান করিতে গিয়া একটা কথাই বার-বার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে যে, কবির personality অর্থাৎ কবি-মানুষটির ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রূপটি কাব্যের মধ্যে না ফুটিবারই কথা, তাঁহার ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় না থাকাই সঙ্গত। এই ব্যক্তি-জীবনের সঙ্কীর্ণতা থাকে না বলিয়াই জগৎ ও জীবনের আসল রূপটি তিনি দেখিতে পান। এই 'দেখা', এই কবি-দৃষ্টিই সত্যদৃষ্টি—ঋষির মন্ত্র-দৃষ্টির মত। কাব্যে উপন্যাসে জীবনের যে চিত্র আমরা পাই, তাহার মধ্যে একটা অত্যন্ত সরল সহজ ও তীক্ষ্ণ সত্যবোধ জাগে বলিয়াই আমরা আনন্দ পাই। সত্যের এই মূর্ত্তি সুন্দর না হইয়া পারে না বলিয়াই তাহা সুন্দর। কারণ, যে প্রতীতি সম্যক বা সম্পূর্ণ—সমস্ত সংশয়-সংস্কারের বাহিরে যাহার সঙ্গে পরিচয় হয়, সেই ত আনন্দ। সুন্দর-বোধ ও আনন্দ একই কারণে হয়। যে কাব্যে এই সত্য-সুন্দরের বোধ এমন করিয়া জাগেনা, সে কাব্যের প্রেরণা অসম্পূর্ণ বুঝিতে হইবে। কবির এই সত্যদৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। সুন্দরকে ফুটাইয়া তুলিতে পৃথক আয়াস করিতে হয় না, যাহা সত্য তাহা অনিবার্য্যরূপেই সুন্দর। বরং যেখানে সুন্দরকে ফুটাইবার একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়, সেখানে সত্যের অভাব আছে বলিয়াই মনে হইবে। কাব্যে জীবনের কোনও fact ই রঞ্জিত বা রূপান্তরিত হয় না, গভীরতমরূপে সত্য হইয়া উঠে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, সত্য কি? সত্য আর যাই হোক, তাহা বিজ্ঞানের থিয়রি, ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন বা দর্শনের মতবাদ নয়। সত্য একটি চিন্তাগত ধারণা নয়, তাহা মনুষ্য হৃদয়ের একটি অতি ঘনিষ্ঠ অনুভূতি। সত্যের একটি প্রমাণ এই যে, তাহাকে পাইলে কোনোখানে আর কোনও সংশয় থাকে না। 'জানা' বলিতে আমরা সর্ব্ববস্তু সম্বন্ধে—কি? বা, কেন হয়?—এইরূপ একটা কৌতূহল-তৃপ্তি বুঝি, কিন্তু তাহাতে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না; মনের স্বাচ্ছন্দ্য হয় ত' হয়,—এমনকি সর্ব্ববস্তুর উপর ক্রমান্বয়ে মনের অধিকার বিস্তার করায় একটা আত্মগৌরব জাগে—কিন্তু সংশয়ের শেষ হয় না। কারণ সর্ব্বত্রই পৃথকভাবে কৌতূহল তৃপ্তি হয়—কোনটির পরিচয়েই সমগ্রতাবোধ জাগে না। এই সমগ্রতা বোধ মনের ধর্ম্ম নয়; মন সর্ব্বকে খর্ব্ব করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়া দেখে, সেজন্য সে-দেখায় পূর্ণদৃষ্টির আনন্দ নাই। 'To know all is to pardon all' (জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলেই তিতিক্ষা আসে)—এই উক্তিতে যে জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ দিব্যানুভূতি, তাহাই সত্যোপলব্ধি। তাহার লক্ষণ—সর্ব্বসংশয়ের সমাধান নয়, সর্ব্বসংশয়ের তিরোধান। ইহাকে কেবল মাত্র মনের দ্বারা লাভ করা যায় না। কেবল মন লইয়াই মানুষ নয়। যাহা কিছু লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব—তাহার ভিতরকার সেই সমগ্র রহস্যটি—তাহার সবখানি যখন সজাগ হইয়া ওঠে, তখনই এই সত্যচেতনা সম্ভব হয়। অতএব বলিতে হইবে, দেহ-চেতনা, হৃদয় বেদনা ও মানস ক্রিয়া—এই তিনের পূর্ণ-পরিণাম ও সামঞ্জস্য না ঘটিলে, প্রত্যেকটি পূর্ণবিকশিত অথচ পরস্পরের অনুগত না হইলে, এই সত্যের সাক্ষাৎকার অসম্ভব। এ অবস্থা যে কখন কেমন করিয়া ঘটে, তাহাই মানবের চিরবিস্ময়। ইহারই সাধনাকে লক্ষ্য করিয়া গুরু উপদেশ করেন যে, তাহা—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া

ঋষি ইহারই উদ্দেশে বলিয়াছেন,

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

—যাহাকে তিনি আপনি বরণ করেন সেই তাঁহাকে লাভ করে।—তিনি কাহাকে বরণ করেন? সেই ভাগ্যবান কে?

আদিকাল হইতে তিনি কবিকেই বরণ করিয়া আসিতেছেন। কবি তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ,—তিনি অপরকেও তাহা দেখাইতে পারেন। বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে নাস্তিক, দর্শন তর্ক-বিচারের দুর্ভেদ্য জালে জড়িত; ভক্ত বলেন বটে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'—কিন্তু সে বিশ্বাস তাঁহার নিজেরই থাকে, অপরের মনে জাগাইতে পারেন না। একমাত্র কবিই যাহা দেখেন, অপরকেও তাহা দেখাইতে পারেন। এজন্য সাহিত্যই প্রকৃত জ্ঞানের উপায়, সাহিত্যের জ্ঞানযোগই উৎকৃষ্ট।

কাব্যকে Imitation বা অনুকৃতি বলা হয়। তাহার অর্থ এই যে, কবি কাব্যের মধ্যে যাহা যেমনটি দেখেন তাহাকে ঠিক তেমনটি করিয়া দেখাইয়া থাকেন। যাহা যেমনটি, তাহা ঠিক তেমনটি দেখি বলিয়াই রসোদ্রেক হয়। কবির এই সত্যদৃষ্টির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা বাস্তব-জীবনে পীড়াদায়ক, তাহাই কাব্যের ইন্দ্রজালে মনোহর, অথচ তাহাকে একটুও অযথার্থ বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না—অন্ততঃ যতক্ষণ তাহা পাঠ করি, যতক্ষণ কাব্যের বাহিরে না আসি। ইহাতেই বুঝিতে পারি, এ দেখা আর এক রকমের দেখা। যে-দেখায় নিজ-নিজ ব্যক্তি-জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী ও নানা সংস্কারের বাধা আছে, সেই দেখাই সত্যকার দেখা নয়; সেখানে স্বার্থ ও স্বাভিমানের বিরোধ আছে বলিয়াই সবটুকু চোখে পড়ে না। যখন সবটুকু চোখে পড়ে তখনই সামঞ্জস্য বুঝি, তাই সঙ্গে-সঙ্গে সুন্দর বোধ হয়। সত্য-সুন্দরের এই অদ্বৈততত্ত্ব ঘোষণা করিয়াই ইংরাজ কবি কীট্‌স্ তাঁহার সেই বিখ্যাত বাণী প্রচারিত করিয়াছিলেন—

Beauty is truth, truth beauty,—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

"যাহা সুন্দর তাহাই সত্য, সত্যই সুন্দর,—মানুষের জ্ঞান ইহার অধিক হইতে পারে না, হইবার প্রয়োজনও নাই।"

—এই বাণীর অন্তরালে সাহিত্যবিজ্ঞানের শেষকথাটি রহিয়াছে। ইহার অর্থ বিশদ করিয়া বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যদি সম্ভব হয়, তবে সাহিত্যকে যে অভিনব জ্ঞান-যোগ বলিয়াছি তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

কবি-প্রতিভায় এই জ্ঞানযোগের একটি প্রণালী আবিষ্কার করা যায়। যাহা কিছু কবিচিত্তকে স্পর্শ করে, কবির অন্তরতম অনুভূতিতে কবি যেন তার সঙ্গে এক হইয়া যান—কবি যেন তাহারই রূপ ধারণ করিয়া, তন্ময় হইয়া, তাহাকে প্রকাশিত করেন। ইহাই কবির একমাত্র জ্ঞান-বৃত্তি; ইহারই ইংরেজী নাম Imagination, দেশী নাম প্রতিভা বা প্রজ্ঞা। এই বৃত্তিদ্বারা কিছু জানিতে হইলে তাহা 'হইতে' হয়। কবি কোনও কিছুকে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করেন না, তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহার সত্তায় নিজ সত্তা মিলাইয়া, তন্ময় হইয়া—তাহার রূপটি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। এইরূপ আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা আত্মবিস্মৃতি না হইলে হয় না। এইরূপ আত্মবিস্মৃতি না হইলে, যাহা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি—সেই আত্মোপলব্ধি বা সত্যজ্ঞানের উদয় হয় না। এই অবস্থার আনন্দ স্মরণ করিয়া কবি কীট্‌স্ বলিতেন—

"O for a life of sensation rather than of thought!"
[আমি কেবল দেহে-প্রাণে অনুভব করিতে চাই, বিচার করিতে চাই না।]

এই আনন্দের লোভেই আমাদের দেশের ভক্তেরা বলিয়া থাকেন, "আমায় দে মা পাগল করে,' আমার কাজ নেই জ্ঞান-বিচারে!" এই উপলব্ধিকেই কতকটা চিন্তার আকারে ব্যক্ত করিতে গিয়া আমাদের কবি গাহিয়াছেন—

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে
চারিদিকে চির-যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মুরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

কবি এখানে সেই আত্মবিস্মৃতির অবস্থাকে কতকটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; সেই দিব্যজ্ঞানের অবস্থাকে সজ্ঞান চেতনায় স্থাপন করিতেছেন।

একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।

এবং

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,

এই দুইটি বাক্যের একটিতে বাহ্যজ্ঞানলোপের, ও অপরটিতে পূর্ণজ্ঞানের যে আনন্দ, তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, এই সকল উক্তিতে ইঙ্গিত মাত্র আছে; যিনি এই রসের আস্বাদন করিয়াছেন তিনিই ইহা বুঝিতে পারিবেন, অপরে পারিবেন না। এই সকল শ্লোক ঠিক কাব্য নয়—ইহা ঋষির মন্ত্রোচ্চারণ। আর একটি কবিরও এই ধরণের সাক্ষ্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। গান শুনিতে শুনিতে কবি বলিতেছেন—

পিয়ে ও সঙ্গীতমধু আমার মানসী-বধূ
আহ্লাদে উন্মুখ আজি, ঊর্দ্ধ করি' কাণ।
বধিরতা সারিয়াছে, আত্মা মোর বুঝিয়াছে
রূপ রস স্পর্শ গন্ধ একই উপাদান!
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান এক সেতারের তান!
গেয়ে যাও, থেমনা'ক, গেয়ে যাও গান;
তোমারে সাজে না সখি মিছা অভিমান!

সৃষ্টির মর্ম্মস্থানে যেখানে সর্ব্ববৈচিত্র্য এক হইয়া আছে, সেখানে পৌঁছিতে পারিলে, কোন বৈচিত্র্যই আর ভেদ-বুদ্ধি জাগাইয়া, চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না; জ্ঞান অনুভূতি-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, কোনোখানে আনন্দের বাধা থাকে না—সর্ব্বত্র বিরোধ ঘুচিয়া সর্ব্বাত্মীয়তা জন্মে। বহিঃ-সৃষ্টি একবারে কবির অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে, কবি তন্ময় হইয়া যান। তখন আর কথা থাকে না, ভাব তখন রূপ হইয়া বিরাজ করে—কবি কথা বলেন না, রূপসৃষ্টি করেন। এই সময়ে ভাব যদি রূপের সহিত লুকোচুরী খেলিতে থাকে—কবি যদি রূপ-রসের পরিবর্ত্তে ইঙ্গিত-রসে মজিয়া যান, তবে সে অবস্থায় কি হয়, তাহারও সাক্ষ্য আছে—

মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি'
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

কিন্তু খাঁটি কাব্যসৃষ্টিতে এই তন্ময়তাই অসাধ্য সাধনের একমাত্র উপায়। কবি কীট্সেরই একটি কথায় এই তন্ময়তার অতি সুন্দর উদাহরণ আছে। কীট্স্ একবার বলিয়াছিলেন, "আমার সম্মুখে ওই যে পাখীগুলা নাচিয়া নাচিয়া খাদ্য খুঁটিয়া বেড়াইতেছে—উহাদের পানে চাহিবা মাত্র আমি যেন আমাকে ভুলিয়া যাই, আমি যেন উহাদের মত নাচিয়া নাচিয়া ওই রূপ করিয়া বেড়াই।" তিনি পাখী দেখিতে দেখিতে পাখী হইয়া যান! এই দেখিয়া-হওয়াকেই আমি কবির জ্ঞান-বৃত্তি বলিয়াছি। এই অনু-প্রবিষ্ট হইবার ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলিয়াই কবি যেমন দেখাইতে পারেন, সাধারণ ব্যক্তি নিজে তেমন করিয়া কিছুই দেখিতে পায় না। মহাকবি শেক্স্‌পীয়ারের এই ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ছিল বলিয়াই, তিনি অপরের মধ্যে এইরূপ অবাধে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারিতেন বলিয়াই, মানুষের সমগ্র মনুষ্যত্বকে এমন সত্য-স্বরূপে প্রকটিত করিতে পারিয়াছিলেন।

এই জ্ঞানযোগ বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরও নয়। ইহা প্রকৃত রসানুভূতির অবস্থা। এ অবস্থায় সকল বিরোধ ঘুচিয়া যায়, কোনো সমস্যাই থাকে না—'অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি'। এ অবস্থায় জ্ঞানী ও জ্ঞেয় (Subject and Object) এই দুইএর ভেদ আর থাকে না,—ইহা 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' ব্রহ্মাস্বাদের অবস্থা। যাঁহারা রসিক, যাঁহারা ইহার একটু আস্বাদ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন ইহাই আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার কিনা। যাঁহাদের এই আস্বাদন ক্ষমতা নাই, তাঁহারা কাব্যজগৎ ও ব্যবহারিক জগৎকে পৃথক করিয়া রাখিবেন, কাব্যপাঠের পর তাহার চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া উঠিবেন —A superior pyrotechnic! সুন্দর আতসবাজী! ইহাতে কোনও সমস্যার মীমাংসা নাই। ইহাতে সমাজের কোনও বাস্তব উপকার সাধন হয় না। ইত্যাদি।

কিন্তু জ্ঞানকে যাঁহারা আনন্দরূপে চান, যাঁহারা সত্য-সুন্দরের মূল-রহস্যটি ধরিতে পারিয়াছেন বা ধরিতে উৎসুক—তাঁহারা কবির সঙ্গে-সঙ্গে এই তন্ময় হওয়ার সৌভাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বলিয়া জানেন। তাঁহারা এই জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলিবেন। এই জ্ঞান কাব্যে ভিন্ন ফুটিতে পারে না, যেখানে যেরূপে ফুটিয়াছে তাহাই কাব্য, কাব্য ব্যতীত আর কোথায়ও এই সত্য-সাক্ষাৎকার হয় না। ইহার ধারণা দর্শন করাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা

ধারণা নয়—আস্বাদন করিবার বস্তু। তাই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহা আস্বাদন করাইতে গিয়া বহুল পরিমাণে কাব্যের আশ্রয় লইয়াছেন, বৈষ্ণবদর্শন সাহিত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া গেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী যাহার রূপক, তাহা এই সাহিত্যসাধনারই মূলতত্ত্ব। যে আত্মবিস্মৃতি ও তন্ময়তার শক্তিকে কবির প্রজ্ঞা বলিয়াছি—যাহার সাহায্যে কবি অপরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তদনুরূপ হইয়া, তাহাকে পাওয়ার পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন, বৈষ্ণব-কবি রাধার প্রেমযোগের মধ্যে সেই রহস্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত কাব্য-রচনায় কেমন ফুটিয়াছে!—

"সঙ্কেতবংশী বাজিলেই বনে যাইতে হইবে, অতএব রাধা সমক্ষে দ' রাখিয়া ইতোমধ্যে বেশভূষা তিলকাদি রচনা করিতেছিল। কিন্তু ধ্ আছে কৃষ্ণে। দর্পণে নিজমুখ দেখিতে দেখিতে বাঁশী শুনা গে সচকিত রাধা সহসা দর্পণে কৃষ্ণমুখ দেখিল, নিজ মুখপ্রতিবিম্ব না দেখি কৃষ্ণমুখ দেখিল। এত দৃঢ় কৃষ্ণধ্যান, এত ভালবাসা রাধা ব্যতীত অ কাহারও নাই। আর কেহই দর্পণে এরূপ অলৌকিক দর্শন করে ন করে নাই, করিবে না।"

আমরা বলি, কবির প্রাণই রাধা। আবার এ রাধাকে যে সৃষ্টি করিয়াছে, সেও কবি। এই তন্ময়ত কবিরই আছে, আর কাহারও নাই। এই রাধা অপেক্ষা কবিচিত্ত বড়; কারণ সেই ত রাধার একমাত্র লীলা নিকেতন। কবির প্রতিভাগুণেই, কাব্যের সাহায্যে রাধা সর্ব্বজনমনোমোহিনী হইয়া ওঠে।

মিশরের দেবতা

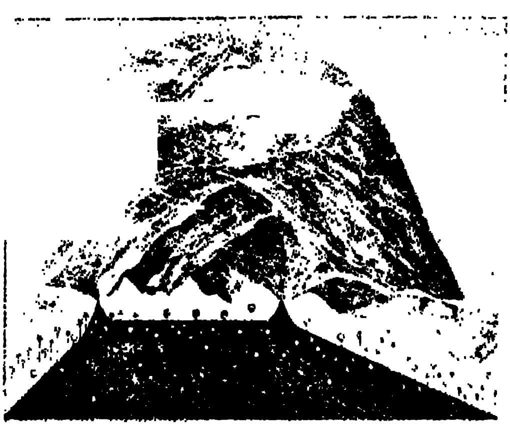
শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(২)



সূর্য্যদেব প্রাতঃকালে পৃথিবীতে দেখা দিবামাত্র একখানি নৌকা তাহাকে পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইত। এই নৌকাটির নাম ছিল, 'শাক্তিত'। দ্বিতীয় আর একখানি নৌকা "মন্থু" সূর্য্যদেবকে দ্বিপ্রহরে নিজের বক্ষে ধারণ করিত এবং তাহাকে "মন্থুর" দেশে বহন করিয়া লইয়া যাইত। সূর্য্যদেবের দেহকে রাত্রিকালের বিভিন্ন সময়ে বহন করিবার জন্য আরো অনেক নৌকা ছিল, কিন্তু তাহারা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া তাহাদের কোনো উল্লেখ করিলাম না। সূর্য্যদেব এই সকল নৌকাতে অনেক সময় কোনো অনুচরাদি না লইয়াই প্রবেশ করিতেন—তখন নৌকাতে দাঁড়ি, মাঝি, দাঁড়, হাল ইত্যাদি কিছুরই দরকার হইত না, ইহারা মন্ত্রবলে চলিত—পথেরও কোনো রকম গোলমাল হইত না। অন্যান্য সময় নৌকাগুলিতে মাঝি মাল্লা ইত্যাদি কিছুরই অভাব থাকিত না।

সূর্য্যের এই নৌকাবিহার যে সকল সময় নিরাপদে হইত, তাহা নহে—জলে "এপোপি" নামে একটি অতিকায় সর্প বাস করিত, ইহা মাঝে মাঝে হঠাৎ জল হইতে মুখ বাহির করিয়া সে সূর্য্যের নৌকার পথ রোধ করিত। সূর্য্যের নৌকার লোকজন যদি এপোপিকে দূর হইতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তাহারা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া প্রার্থনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে এপোপিকে পরাজিত করিবার আয়োজন করিত। পৃথিবীর লোকজন এই সময় দেখিত সূর্য্যদেব হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া নৌকায় পড়িয়া গেলেন; তখন তাহারা দুঃখে

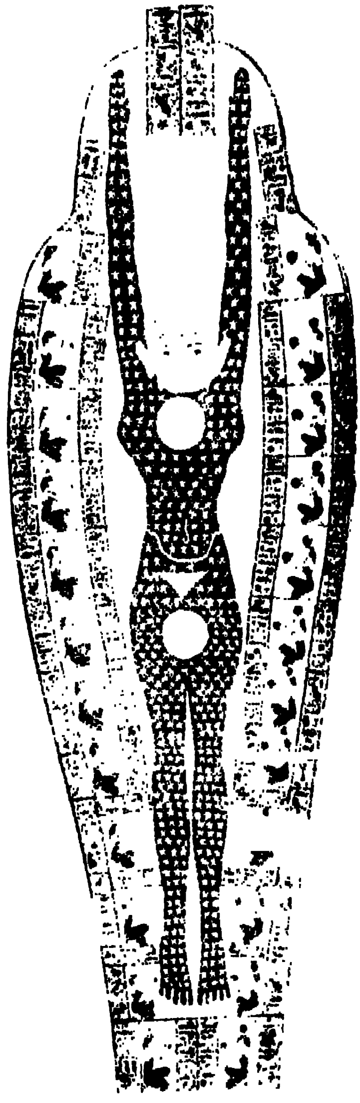


প্রাচীন মিশরীয়দের কল্পিত, আকাশের চিত্র—আকাশের চারি কোন, পৃথিবীর চারি প্রান্তের চারিটি বড় পর্ব্বতচূড়ার উপর স্থিত

বুক চাপড়াইত, ঢাক-ঢোলের বিষম নাদে চারিদিক্ কাঁপাইতে থাকিত এবং সামনে যে-কোনো ধাতু-পাত্র পাইত তাহাই বাজাইতে আরম্ভ করিত। এই শব্দের চোটে এপোপি ভয় পাইয়া পুনরায় জলে মুখ লুকাইত, এবং "রা" অর্থাৎ সূর্য্যদেব জ্ঞানলাভ করিয়া আবার তাহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে আরম্ভ করিত। এপোপি যে কেবল মানুষের নানা-প্রকার শব্দেই ভয় পাইত, তাহা নহে, আকাশ হইতে দেবতারাও তাহাকে নানা-প্রকার অস্ত্র দ্বারা বিষম আঘাত করিত।

সূর্য্য-গ্রহণকে প্রাচীন মিশরীয়েরা এইপ্রকার অপরূপ এক ব্যাখ্যা দান করিয়াছিল। সূর্য্য বৎসরের নির্দ্দিষ্ট এক সময়ে মিশরের অতি নিকটে আসিতেন, তা'র পর পুনরায় ক্রমে ক্রমে অতি দূরে চলিয়া যাইতেন। সূর্য্য যখন নিকটে থাকিতেন, তখন হইত গ্রীষ্মকাল, এবং যখন দূরে থাকিতেন, তখন হইত শীত কাল। সূর্য্যের এইপ্রকার নিকট-দূর হইবার কারণ ছিল। কথিত আছে, যে নদীতে সূর্য্য নৌকায় করিয়া ভ্রমণ করিতেন সেই নদীতে যখন বান ডাকিয়া জল বাড়িত, তখন জল বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে নৌকাও সূর্য্যকে লইয়া পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইত। তা'র পর যখন বানের জল কমিতে আরম্ভ হইত, তখন হইতে সূর্য্যও জলের সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইত

সূর্য্যের এইপ্রকার নিকটে আসা এবং দূরে যাওয়া এমন নিয়মের সহিত এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে হইত, যে সেই সময়ে পণ্ডিতেরা ইহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন



"নুইত" দেবী—আকাশের রাণী

যে স্বর্গীয় নদীতে সূর্য্যদেব ভ্রমণ করিতেন, সেই নদীতে নৌকায় করিয়া আরো একদল দেবতাও বিহার করিতেন। কিন্তু এইসকল দেবতারা সূর্য্যের আলোতে মানুষের চোখ হইতে আবৃত হইয়া থাকিতেন, রাত্রির অন্ধকারে এইসকল দেবতার রূপ মানুষের চোখে দেখা যাইত।



হাথর—স্বর্গের গাভীরূপী দেবী

চন্দ্রদেবতা সূর্য্যের পিছন-পিছন বারো ঘণ্টা অন্তর নাইল নদীতে ভ্রমণ করিতেন। চন্দ্রের মিশরীয় নাম ছিল "ইয়াউহু অউহু" (Yauhu Auhu)—ইহার পথ এবং সূর্য্যের পথ একই ছিল, তবে দুইজন কখনও এক-সঙ্গে ঐ পথে বিহার করিতেন না। চন্দ্রদেবকেও নানা স্থানে নানা সময়ে নানা রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। কোথাও বা চন্দ্র মানুষ, হুইতের সন্তান, কোথাও বা বক-জাতীয় পক্ষী-বিশেষ, কোথাও বা "হোরাসের" একটি চক্ষুরূপে তিনি ব্যক্ত হইয়াছেন। যেখানে চন্দ্রকে হোরাসের চক্ষুরূপে খোদাই করা বা আঁকা হইয়াছে, সেইখানে এই বিশেষ বকজাতীয় পক্ষীকে তাঁহার রক্ষাকর্ত্তারূপে খোদাই করা বা আঁকা হইয়াছে।

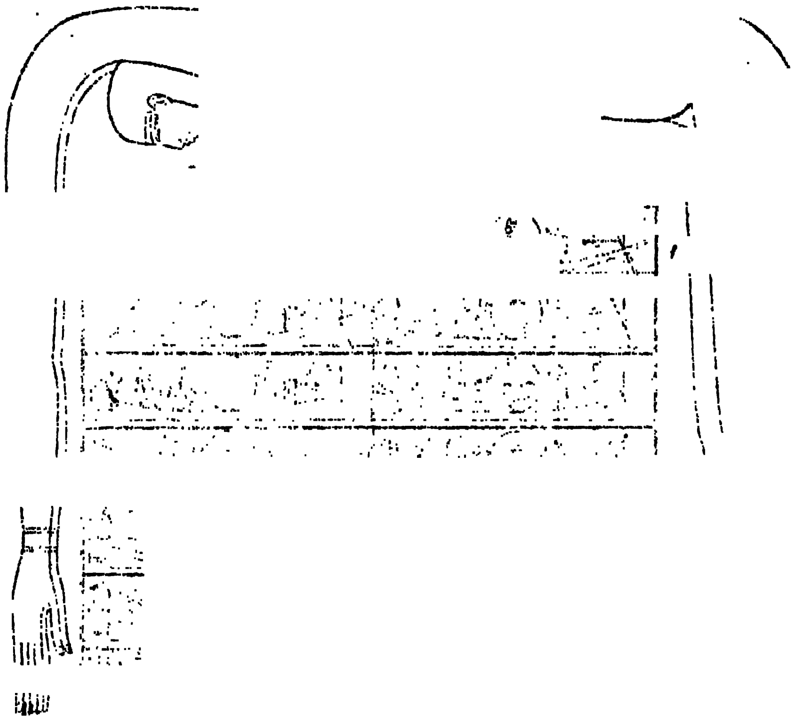
সূর্য্যের মতন চন্দ্রেরও শত্রু ছিল। এই শত্রুদলের সংখ্যা ছিল তিন :—কুমীর, হিপ্পপটেমাস, এবং বরাহ। এই তিন শত্রু সকল সময় চন্দ্রদেবকে গিলিয়া খাইবার বা অন্য-প্রকারে জব্দ করিবার মৎলবে থাকিত। পূর্ণচন্দ্রের সময় বরাহ অনেক সময় চন্দ্রদেবকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাঁহাকে স্বর্গের নাইল নদীতে নিক্ষেপ করিত। ইহার পর চন্দ্রদেবকে কয়েকদিন আর দেখা যাইত না। তখন সূর্য্যদেব বা রক্ষাকর্ত্তা বক অনেক খোঁজাখুঁজির পর চন্দ্রদেবকে জল হইতে উদ্ধার করিতেন। তাহার পর ক্রমে-ক্রমে চন্দ্রদেব পুনরায় সবল হইতে-হইতে নষ্টগৌরব প্রাপ্ত হইতেন। চন্দ্রদেব মাসের মধ্যে পনেরো দিন যুবকরূপে থাকিতেন, বাকি পনেরো দিন মরণের দিকে যাইতেন, এবং মরণ লাভ করিয়া তিনি পুনরায় শিশু হইয়া নবজন্ম লাভ করিতেন। বছরের বারো মাস ধরিয়া চন্দ্রের এই জন্মমৃত্যুর খেলা চলিত।

চন্দ্রের পরম শত্রু শূকর মাঝে-মাঝে একটা বিষম বিপদ্ ঘটাইত। চন্দ্রের রক্ষাকর্ত্তারা সামান্য-একটু অসাবধান হইলেই সে চন্দ্রকে একেবারে গালে পুরিয়া দিত। কিন্তু এইভাবে বেশী কাল সে চন্দ্রকে রাখিতে পারিত না। দেবতাদের অস্ত্রাঘাত চন্দ্রকে উদ্‌গার করিয়া দিতে তাহাকে বাধ্য করিত। চন্দ্রের এইপ্রকার তিরোভাবে পৃথিবীর লোকে ভয়ানক ভয় পাইত, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ দীর্ঘকালস্থায়ী নয় বলিয়া সহজেই লোকের ভয় কাটিয়া যাইত।

সূর্য্য রাত্রির রাজ্যে প্রবেশ করিবামাত্র চন্দ্রদেবের নৌকা সূর্য্যের প্রবেশ-পথেই স্বর্গীয় নীল নদে উপনীত হইত। এইসঙ্গে নক্ষত্রগণও আগমন করিত। নক্ষত্রদের মধ্যে কতকগুলি ছিল চিরস্থায়ী অর্থাৎ তাহাদের কোনো কালে ধ্বংস হইত না, তাহাদের নাম ছিল "আখিমু সোকু" অথবা "আখিমা উর্দু"। এইসকল নক্ষত্র অন্যান্য নক্ষত্রদের পাহারা দিত এবং দরকার-মতন সেবাও করিত।

এই সেবক বা পাহারাওয়ালা নক্ষত্রদের দল যেখানে সেখানে ছড়ানো ছিল না। বিশেষ-বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ইহারা রক্ষিত ছিল। কতকগুলি তারকাকে পৃথিবীর লোকে মানুষ বা অন্যান্য কোনো-প্রকার জন্তুর আকারে দেখিতে পাইত।

আমরা যে সাতটি তারকাপুঞ্জকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলি, প্রাচীন মিশরীয়েরা তাহাকে আকাশের উত্তর কোণ-

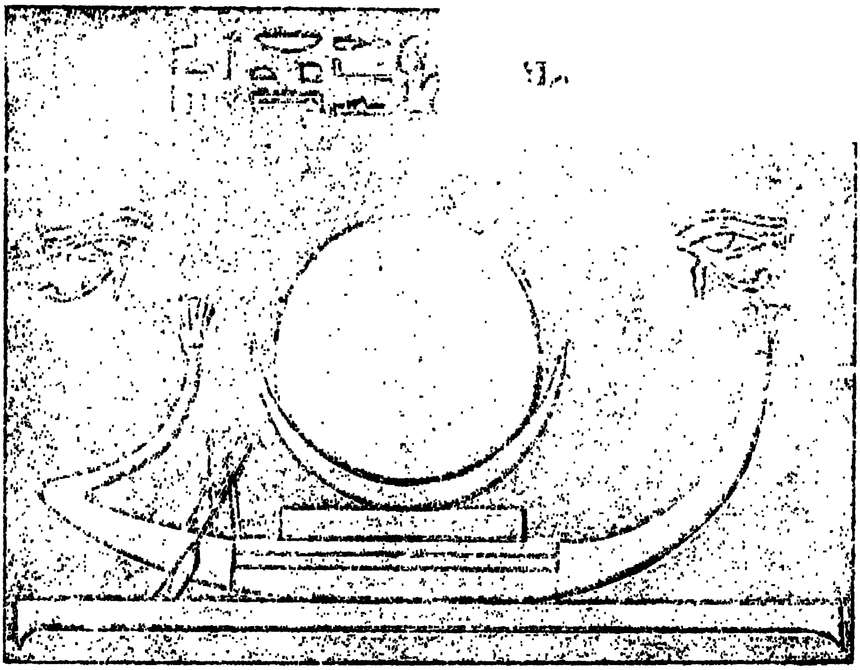


দিনের বার ঘণ্টায় সূর্য্যের বার-প্রকার রূপ

স্থিত একটি ষাঁড়ের কুঁজ বলিয়া কল্পনা করিত। দুইটি ক্ষুদ্র তারকা এই কুঁজটিকে অন্য তেরটি তারকার সহিত যুক্ত করিয়াছিল। এই সাত এবং তেরটি তারকাকে মিশরীয়েরা একটা স্ত্রী হিপ্পপটেমাস বলিয়া কল্পনা করিত। হিপ্পপটেমাস তাহার পিছনের পায়ে যেন দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া মনে হইত এবং সে মাথার উপর একটা কুমীর বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, কুমীর স্ত্রী হিপ্পপটেমাসের মাথার উপর হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে।

বেশীর ভাগ নক্ষত্রই কোনো সময়েই আকাশ ত্যাগ করিত না। প্রতিরাত্রে তাহাদের একই নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখা যাইত। আমরা যে-সকল গ্রহকে বর্ত্তমানে জানি, তাহার অন্তত পাঁচটিকে প্রাচীন মিশরীয়েরা জানিত। বৃহস্পতির নাম ছিল ওয়াপশেতাতুই (Wapshetatui) শনির নাম ছিল কাহিরী, বুধের নাম ছিল সোবকু। ইহারা সকলেই "রা" অর্থাৎ সূর্য্যের মতনই নৌকায় সামনের দিকে চলিত। 'হর দোসিরি' অর্থাৎ মঙ্গল পিছনদিকে চলিত। 'বন্তু-পঙ্কা' অর্থাৎ শুক্রগ্রহের দুইটি প্রধান কাজ ছিল। শুক্র নক্ষত্রদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আকাশে উদয় হইয়া অন্যান্য নক্ষত্রদের অভ্যর্থনা করিত। তা'র পর ভোরের দিকে বন্নু তিউপূতিয়ার নামক দেবতার রূপ ধরিয়া শিশু সূর্য্যকে অভ্যর্থনা করিয়া রাত্রিকে বিদায় এবং দিবার আগমন ঘোষণা করিত।

এই বিশাল তারকারাজ্যের শাসক ছিল সাহু এবং সপডিট অর্থাৎ Orion এবং Sirius। সাহু ১৭টি তারকার সমষ্টি ছিল। এই তারকাগুলি এমনভাবে সজ্জিত ছিল যে দেখিলে মনে হইত যেন একজন লোক আকাশে দৌড়িয়া চলিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকাটি সাহুর মস্তকে শোভা পাইত। সাহুর রূপ জগতের সকলের নিকট প্রকট ছিল। সাহুকে কোনো-কোনো স্থানে নৌকাতে শায়িত গরুর রূপেও কল্পনা করা হইয়াছে।

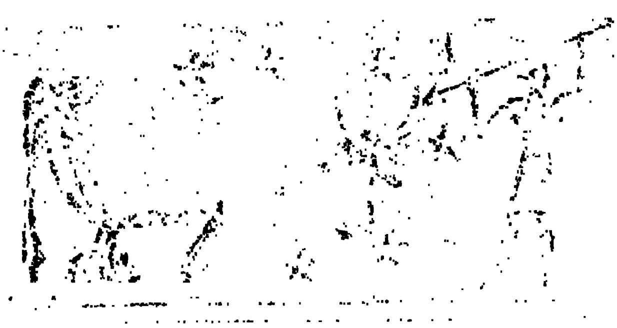


চন্দ্রের নৌকা। এই নৌকা রক্ষা করে দুই পাশের দুইটি চক্ষুরূপী নক্ষত্র

সাহুর একটি বিশেষ কাজ ছিল। আমাদের পৃথিবীর উপর যে আকাশ ছড়ানো আছে, সেই আকাশের ওপারে আর-একটি জগৎ আছে, এই জগতে নদনদী, পাহাড়-পর্ব্বত সমুদ্র আদি সবই আমাদের এই পৃথিবীর মতন—কেবল সেই দেশের লোকেরা যে কেমন তাহা পৃথিবীর কাহারো জানা নাই। সাহু দিনের বেলা এই জগতের উপর ভ্রমণ করিত। সাহু তাহার সহচর দৈত্য-দানাদের লইয়া এইখানে শিকারের খোঁজে আসিত। দেবতাদের শিকার করাই তাহার কাজ ছিল, সেইজন্য সাহুর আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইবামাত্র সেই দ্বিতীয় পৃথিবীর নক্ষত্রাদি এবং দেবগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সাহুর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইত। শিকার করা হইয়া গেলে তাহাদের টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া একটা প্রকাণ্ড পাত্রে আগুনের উপর রাখিয়া রান্না করা হইত। সাহুর খাওয়ার মধ্যে একটা নিয়ম ছিল। প্রাতঃকালে সাহু বড়-বড় দেবতাদের বড়-হাজরি রূপে ভক্ষণ করিত। দ্বিপ্রহরে ছোটোখাটো দেবতাদের ভক্ষণ করিত। একেবারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেবতাদের রাত্রে ভোজন করিত। বৃদ্ধ দেবতাদের আগুনে ঝল্‌সাইয়া নরম করা হইত।

দেবতা ভক্ষণের ফলে সাহু দেবতাদের বিবিধ-গুণাবলী লাভ করিত। যুবক দেবতাদের যৌবনও সে লাভ করিত। দেবতাদের মধ্যে যে তেজ বা অগ্নি থাকিত সেই তেজ বা অগ্নি সাহুকে চির তেজোময় বা জ্যোতিষ্মান্ করিয়া রাখিত।

যে-সমস্ত দেবতাগণ মিশরের বিভিন্ন অংশের উপর প্রভুত্ব বা জমিদারি করিত তাহারা সকলেই কোনো-না-কোনো প্রাকৃতিক দ্রব্যের (যেমন নক্ষত্র, নদনদী, জল, হাওয়া ইত্যাদি) সঙ্গীভূত বা সম্বন্ধীভূত ছিল। প্রাচীন মিশরের দেবতারা কালক্রমে সংখ্যায় অসংখ্য—এমন-কি, মিশরের লোকসংখ্যাকেও ছাড়াইয়া যায়, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি, কার্য্যকলাপ এবং আকার-প্রকার বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহারা সকলে আদি কয়েকটি প্রাচীন দেবতা হইতে উদ্ভূত। বিশেষ-বিশেষ দেবতার আদি রূপটি স্থান এবং কালবিশেষে নানা-প্রকার পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তাহাদের মূল



সপ্তর্ষি-মণ্ডলের প্রাচীন মিশরীয় ধারণার চিত্র

রূপের কতকগুলি চিহ্ন সামান্য লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়। জমির উৎকর্ষদাতা এবং মানব রক্ষা-কর্ত্তা নাইল নদ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবতার রূপে মিশরীয়দের পূজা পাইয়াছে। মিশরদেশের যেখানে নাইল নদ প্রবেশ করিয়াছে, সেইখানে ক্ণুম্ দেবতা নাইলের অবতাররূপে সেই প্রদেশের পূজা লাভ করিয়াছে। নাইল-নদের 'উবিসিস্' হাবৃসাপিতু প্রভৃতি বহু অবতাররূপী নাম আছে।

সমস্ত পৃথিবীকে তাহার নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল ইত্যাদি লইয়া একটি মনুষ্যাকৃতি দেবতার রূপে প্রাচীন মিশরীয়গণ কল্পনা করিয়াছিল। এই পৃথিবী দেবতার তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ছিল, ফ্টাহ্ (phtah) অ্যামন্ এবং মিনু। অ্যামন সারাল ক্ষেত্রসমূহের প্রতীকস্বরূপ ছিল, মিনু মরুভূমিসকলের উপর রাজত্ব করিত।

এই দুই দেবতার এই দুই বিশেষ গুণ অনুসারে সকল স্থানে ভিন্নভাবে পূজিত হইত না, অনেক স্থানে পূজাতে একের গুণ অন্যের ঘাড়ে লোকে চাপাইয়া দিত। অর্থাৎ অ্যামন, মিনু বলিয়া পূজিত হইত এবং মিনু অ্যামনের স্থানে দাঁড়াইত।

আকাশের দেবতাগণ প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন। পুরুষ দেবতা ও স্ত্রী দেবতা। আকাশ 'হোরাস' বা 'অ্যানুহরি নামে চলিত থাকিলেও ইহার সূর্য্য দেবতার সঙ্গে বিশেষ তফাৎ ছিল না। অনেক সময় কোনো-কোনো স্থানে সূর্য্যদেবতাকে আকাশ-দেবতা বলিয়া লোকে কল্পনা করিয়াছে এবং সেই মতন পূজাও করিয়াছে। কালক্রমে 'রা' অর্থাৎ সূর্য্যদেবতার সকল গুণাবলি হোরাস্ হরণ করিয়াছিল এবং হোরাসের বিবিধ নামে 'রা'ও কালক্রমে অভিহিত হইত। মিশরের অন্যান্য নানা স্থানের লোকে নানা নামে আকাশকে পূজা করিত, উপর-মিশরে আকাশকে লোকে 'জারিট্' বলিত এবং নিম্ন মিশরে বলিত 'আনহুরি।'

সকল দেবতাই নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সমস্ত পৃথিবীর রাজা বলিয়া চালাইবার চেষ্টায় থাকিত, কিন্তু নিজ-নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়া তাহাদের অন্য কোথাও বিশেষ খাতির ছিল না। স্ত্রী দেবতাদেরও এইপ্রকার অবস্থা ছিল।

আকাশ-দেবতা যখন সূর্য্যদেবের অর্থাৎ 'রা'এর সকল বিশেষণ হরণ করিত, তখন মিশরীয়েরা তাহাকে আকাশ-বিজয়ী মূর্ত্তিতে কল্পনা করিত। যুদ্ধ করাই তাহার প্রধান কাজ ছিল। ইহার মাথার উপর খাড়া-খাড়া পালকের মুকুট ছিল, এবং বর্শাকে হাতে করিয়া শত্রুর ঘাড়ে কোপ মারিবার জন্য তৈয়ার হইয়া এই আকাশ-দেবতা দিনের বেলায় সমস্ত আকাশে ভ্রমণ করিত। সূর্য্য-দেব 'মণ্টু' নামে যেসকল স্থানে পরিচিত ছিলেন, সেই-সব স্থানেও ইঁহাকে যোদ্ধা-রূপেই কল্পনা করা হইয়াছে। মণ্টু নামা সূর্য্যদেবতার হাতে বর্শার বদলে তলোয়ার আছে।



সাহ—ওরিয়ন্

পুরুষ-দেবতারা যেমন বিশেষ-বিশেষ সহরে রাজার মতন সম্মান এবং পূজা পাইত, সেইপ্রকার স্ত্রীদেবতারাও রাণীর মতন সম্মান ও পূজা পাইত। একই স্থানে বা সহরে একজন পুরুষ-দেবতা এবং একজন স্ত্রী-দেবতা বাস করিতে পারিত। পশুরূপী দেবতা মিশরে প্রচুর-পরিমাণে

ছিল। এই দেবতারা সম্পূর্ণ পশুর মতনও ছিল এবং অর্দ্ধ-পশু অর্দ্ধ-মনুষ্যাকৃতিও ছিল। প্রাচীন মিশরীয়েরা কি কারণে যে এক-একটি পশুকে দেবতারূপে গ্রহণ করিত তাহা বলা বড় শক্ত। তবে মনে হয় যে কোনো-কোনো জন্তুর বিচিত্র স্বভাব বা ব্যবহার দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইয়া তাহাকে পশুরূপী দেবতা বলিয়া মনে করিত। শ্বমুখ কপির দল সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্বে এবং অস্ত যাইবারও পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমায়েত হইয়া বিকট চীৎকার করে। এইজন্য মিশরীয়েরা বলিত—"ইহারা নিম্ন-জাতীয় দেবতা, উচ্চ দেবতা 'রা'কে' অভিবাদন এবং বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া থাকে।"



আন্হুরি

বহু-বহু প্রাচীনকালে 'রা' অর্থাৎ সূর্য্যকে ফড়িং বলিয়া কল্পনা করা হইত, কারণ সূর্য্য মাটি হইতে লাফ দিয়া বহু উচ্চে উঠিয়া থাকে এবং ফড়িং এর মতন পুনরায় মাটিতেই পড়িয়া যায়। নীলনদের দেবতাদের প্রায় ক্ষেত্রেই ভেড়া বা কৃষ্ণসার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। নীল নদের জল লাফাইয়া, ছুটিয়া যায়—এই-প্রকার ছুটিয়া যাওয়ার সঙ্গে ভেড়া এবং কৃষ্ণসারের চলার সঙ্গে মিল আছে বলিয়াই বোধ হয় নাইল দেবতাকে কৃষ্ণসার বা ভেড়ারূপী মনে করা হইত।

জন্মভূমি বা পাথুরে নদীর নিকটস্থ প্রদেশের লোকেরা কুমীরকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত। এইসমস্ত স্থানে কুমীরদের সংখ্যা অত্যন্ত সহজে বৃদ্ধি পাইত এবং লোক-জনের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ের কারণ ছিল। প্রায় প্রত্যেক খাল-ডোবাতেই এক বা ততোধিক কুমীর বাস করিত। কুমীরকে শান্ত রাখিবার জন্য তাহাকে বলি (মানুষ এবং পশু দুইই) দেওয়া হইত। বলি না পাইলে কুমীর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নিজেই শিকার ধরিয়া খাদ্যের জোগাড় করিয়া লইত। মিশরীয়েরা এই ভয়ে অনুসকল জ্ঞান হারাইয়া মনে করিল যে রীতিমত বলির সঙ্গে নিয়ম-মতন পূজা না পাইলে কুমীরদেব কুপিত হইয়া দেশ ধ্বংস করিবেন —অতএব কুমীর-দেবের পাকা-পূজার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে শান্ত রাখিবার বন্দোবস্তও হইয়া গেল। প্রাচীন মিশরে কুমীর-দেবতা যত মানুষ-বলি ভক্ষণ করিয়াছে এমন আর কোনো পশু-দেবতাই করিতে পারে নাই। শত বৎসর পূর্ব্বে এক কুমীর-দেবতার কাছে মানুষ-বলি নিয়মমত দেওয়া হইত। যুদ্ধের বন্দী, অপরাধী ইত্যাদিদের এই পরম দেবতার সেবার কার্য্যে লাগানো হইত।



সাইস্-প্রদেশের নিত্-দেবী

প্রাদেশিক দেবতাগণ রাজ্য আরম্ভ করিবার সময় একলাই আরম্ভ করিত। এক প্রদেশের দেবতার সহিত অন্য প্রদেশের দেবতার একেবারেই সদ্ভাব ছিল না। কালক্রমে প্রাদেশিক দেবতাগণের পরিবারবর্গও হয়। দেবতাগণ দুইটি করিয়া সহচরী সাধারণত গ্রহণ করিত। তবে অনেক প্রদেশের দেবতার এক স্ত্রী এবং এক পুত্র, এই লইয়াই পরিবার গঠিত হইত। অনেক স্থলে প্রাদেশিক দেবতার সহচরীকে একাধারে স্ত্রী এবং ভগিনী দুইই বলা হইয়াছে। নাইল জল-প্রপাতের দেবতা 'কুম্নু'

দুইজন পরীকে বা স্ত্রী-দেবতাকে হরণ করিয়া বিবাহ করে। একজনের নাম "অনুকিত" ইহার কাজ ছিল ফিলাএ (Philae) এবং সাইনে (Syene) নামক স্থানে নাইল নদকে অবরুদ্ধ করা, আর-একজন ছিলেন 'সাতিত'— ইহার কাজ ছিল নাইল নদীর জলকে তীরের মতন বেগে ছাড়িয়া দেওয়া।

যেসকল প্রদেশে স্ত্রী-দেবতার প্রভুত্ব ছিল, সেই-সকল দেশে সেই স্ত্রীদেবতার সঙ্গে দুইটি করিয়া পুরুষ-দেবতা থাকিত। একজন পতি অন্য জন পুত্র। সাইস-প্রদেশের "নিত" দেবী ওসিরিস্ দেবতাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের সিংহশাবক রূপী সন্তান হয়—ইহার নাম ছিল "আর-হস-নোফির"।

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

একদিন পুণ্য-প্রভাতে ভগবান্ তথাগত ভারতকে যে সদ্ধর্ম্ম দান করলেন, কালে সারা এসিয়া যে সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করবে, তা অনেকের কল্পনায়ও আসেনি। সারনাথে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে নানান্ লোকে তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করতে লাগ্‌ল। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব একদল শক্তিশালী শিষ্য সংগ্রহ করেন, এমন-কি মগধের রাজা বিম্বিসারও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইরকমে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রথম রাজ-আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। যখন খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হ'ল, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্ব ভারতেই সীমাবদ্ধ রইল।

মহাপরিনির্ব্বাণের পর সুভদ্র নামে এক ভিক্ষু যখন বল্লে—"তোমরা শোক করছ কেন? আর ত মহাশ্রমণ আমাদের এটা করো ওটা করো ব'লে বিরক্ত করবেন না। তখন মহাকশ্যপ রাজা অজাতশত্রুর সাহায্যে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহাতে ৫০০ অর্হৎ একত্র ক'রে ত্রিপিটক সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন।*

এর ১০০ বৎসর পরে বৈশালী নগরে ভিক্ষুদের আর-একটি সভা হয়, তা'তেও ত্রিপিটকটি আবৃত্তি করা হয়। এই যে দুটি সঙ্গীতি হ'ল, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে—বুদ্ধের বাণী সংগ্রহ করা যার দ্বারা ভিক্ষুরা নিজেদের নিয়মিত করবে। বিনয়-সম্বন্ধে ও শীল-সম্বন্ধে নিয়মাদি সংগৃহীত হয়েছিল ব'লে, ভিক্ষুসংঘ সুভদ্রের মতন দুর্বুদ্ধি ভিক্ষুর পরামর্শ উপেক্ষা ক'রে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল।

যে-পর্য্যন্ত না রাজা অশোক এসে নিজে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন পর্য্যন্ত এইরকম ক'রে সদ্ধর্ম্ম প্রচারিত হচ্ছিল। যদি "দেবানাং পিয় পিয়দশী" নিজে সদ্ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে তা'কে রাজধর্ম্মের আসনে না বসাতেন, তবে বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্মের এত প্রচার হ'ত না। এর প্রচারে তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন ব'লে, তিনি দেশে বিদেশে এ প্রচার করতে পেরেছিলেন। কোথায়-কোথায় তিনি এধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন, তা'র বিবরণ তিনি নিজেই তাঁর শিলালিপিতে দিয়েছেন (Rock Edict No. 13) তা'তে তিনি বলেছেন—"যেখানে গ্রীক রাজা অ্যাণ্টিওকস (Antiochos) বাস করেন; ও তা'র উত্তরে যেখানে টলেমি (Ptolemy), অ্যাণ্টিগোনাস (Antigonas) ম্যাগাজম (Magasm), ও আলেকজাণ্ডার (Alexander) এই চার রাজা বাস করেন; এবং তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণে চোল ও পাণ্ড্য রাজ্যে একেবারে তাম্রপর্ণী নদী পর্য্যন্ত, ও তাঁর নিজের সাম্রাজ্যে যোন, কাম্বোজ; ভোজ ও পতিনিক, অন্ধ্র ও পুলিন্দদের মধ্যে"—* এই সদ্ধর্ম্ম তিনি প্রচার করেছিলেন।

* Kern's Manual of Buddhism দ্রষ্টব্য।

* V. Smith's Asoka—Rock Edict XIII.

এতদিন বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ব্বভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। এই-বার রাজা অশোকের সাহায্য পেয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ সেই গণ্ডীর বাইরে যেতে লাগ্‌ল। তা'র ইতিহাস আমরা ওপরের শিলালিপিতে পেলুম। অশোকের কৃপায় এ-ধর্ম্ম এখন শুধু মগধে বদ্ধ নয়, দক্ষিণ ভারতে চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য, এমন-কি সিংহল অবধি ছড়িয়ে পড়্‌ল; এমন-কি, তিনটি মহাদেশে—পশ্চিম এসিয়া পূর্ব্ব ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায়ও প্রসার লাভ করলে।

মহাবংশ সিংহলের ইতিহাস। কি-ভাবে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে, তা'র বিবরণ মহাবংশে আছে। অশোকের প্ররোচনায় মোগ্‌গলিপুত্ত তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। এই সভাতে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হয়। কতকগুলি ভিক্ষু বিনয়-শাসনকে শিথিল করবার চেষ্টা করেন, তা'র ফলে এই উচ্ছৃঙ্খল ভিক্ষুরা ভিন্ন দল গঠন করে। যখন মোগ্‌-গলিপুত্তের অধীনে মহাসংঘের অধিবেশন হচ্ছিল ও ত্রিপিটকের আবৃত্তি হচ্ছিল—সেই সময় দল-ছাড়া ভিক্ষুরা আলাদা একটি সভা ক'রে নিজেদের জেদ বজায় রাখ্‌ছিল। তা'রা এই সময় মহাস্থানিক ব'লে পরিচিত হয়। মূল সঙ্গীতিতে আরও স্থির হয় যে সম্রাট্‌ অশোক দেশে-বিদেশে বৌদ্ধ প্রচারক পাঠাবেন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য।

সেই সভার মত-অনুযায়ী সম্রাট্‌ অশোক—সিংহলে, ব্রহ্মে, শ্যামদেশেও প্রচারক পাঠান। যদিও অশোকের শিলালিপিতে ব্রহ্মে বা শ্যামদেশে প্রচারক পাঠানোর উল্লেখ নেই, তবু স্থানীয় জনশ্রুতি বলে, অশোকের প্রচারকই এ-সব দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। অশোক নিজের পুত্র মহেন্দ্রকে ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে ধর্ম্মপ্রচার করতে পাঠান। মহেন্দ্র তাঁর সঙ্গে ত্রিপিটক ও অনেক ভিক্ষু সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। সঙ্ঘমিত্রার সঙ্গে অনেক ভিক্ষুণী যান, তাঁরা গিয়ে রাজা তিস্‌সর কন্যাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি গয়ার বোধিদ্রুম থেকে একটি শাখা সিংহলে নিয়ে যান। সেই শাখাটি অনুরুদ্ধ-পুরে রোপিত হয়, এবং সেইটিই এখনও বেঁচে আছে। সাঁচির স্তূপে একটি ছবি আছে, তা'তে বোধিদ্রুমের শাখা সিংহলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটি আঁকা আছে।*

এইরকমে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ভারতের বাইরে যেতে সুরু করলে। তাই ক্রমে এ ধর্ম্ম চীন, জাপান, তিব্বত, তুর্কীস্থান ছেয়ে ফেল্‌লে।

কি ক'রে যে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে, তিব্বতে, জাপানে গিয়ে হাজির হ'ল তা'র ইতিহাস অনেকদিন থেকে অন্ধকারে ঢাকা ছিল। সেই কাহিনী কি ক'রে আমরা জান্‌তে পেরেছি? কেবল কয়েকজন পণ্ডিতদের শ্রমসাধ্য গবেষণার ফলে।

আগে তিব্বত দেশের কথাই ধরুন; এর প্রাকৃতিক অবস্থান এমনই যে সহজে হিমালয় পার হ'য়ে বা অন্যদিক্‌ দিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। সেইজন্য অনেক দিন যাবৎ তিব্বতের কোনো কথাই জানা যায়নি। শেষে দু'একটি ভ্রমণকারী কেবল বেড়াবার সখে তিব্বতে প্রবেশ করেন, তাঁদের দ্বারাই ক্রমশঃ তিব্বতের কাহিনী লোক-চক্ষুর গোচরে আসে। ১৭৬২ সালে রোম সহরে Fr. A Giorgi যখন তাঁর Alphabetum Tibetanum প্রকাশ করেন, তখনই তিব্বত-সম্বন্ধে ইউরোপীয় ভাষায় প্রথম বই পণ্ডিতসমাজে হাজির হয়। সেইজন্য আমরা বল্‌তে পারি যে, এখন থেকে তিব্বতের বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হ'ল। এর আগে জনকতক মিশনারী তিব্বতে যান। তাঁদের মধ্যে একজনও বোধ হয় ইংরেজ ছিলেন না। অনেক দেরীতে (১৮১১ সালে) Manning ব'লে একজন ইংরেজ সে-দেশে যান। তাঁকেই আমরা প্রথম ইংরেজ বল্‌তে পারি। কিন্তু ইতিহাসের দিক্‌ থেকে তিনি তিব্বতের বিষয় আলোচনা করেননি, তাই তাঁর কাছ থেকে আমরা সে-দেশের সমাজ, ধর্ম্ম বা আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে কোনো ভালো খবর পাই-নে।† তিব্বত-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুরু হয় Alexander Cosma de Koros এর সময় থেকে। তাঁকে আমরা Father of Tibetan Studies বলি। Ladak এ কিছুকাল থাকবার পর, Koros একখানি

* Waddell Lamaism, p. 2.

† Macphail's Asoka দ্রষ্টব্য।

তিব্বতী অভিধান ও ব্যাকরণ ১৮৩৪ সালে লেখেন। ইংরেজী ভাষাতে এই প্রথম তিব্বতী অভিধান ও ব্যাকরণ প্রকাশিত হ'ল। এ-সময় Koros বাংলা গবর্ণমেন্টের ও এসিয়াটিক্ সোসাইটির সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁ'র পরে তিনি তিব্বতে যাবার জন্ম যাত্রা করেন, কিন্তু দার্জিলিংএ মারা যান। (১৮৪২ * তিনি তিব্বতী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। Asiatic Researches এ তিনি তিব্বতী বিশ্বকোষের Tanjur ও Khaygur এর বিস্তৃত তালিকা তৈরী করেন। তাঁর আনীত সেই বিশ্বকোষ এখনও এসিয়াটিক্ সোসাইটির লাইব্রেরীতে আছে। তাঁর পর Hodgson নেপাল থেকে তিব্বতী বিশ্বকোষ সংগ্রহ করেন। এ যুগের ভ্রমণকারী ও লেখকদের মধ্যে আমরা Rockhill, Bower, Miss Taylor, ও Waddel-এর নাম করতে পারি। আমাদের দেশের রায় বাহাদুর শরৎদাস ও সতীশ বিদ্যাভূষণের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। শরৎদাস ১৮৭৯ সালে প্রথম তিব্বতে যান, দ্বিতীয় বার তিনি ১৮৮১ সালে তিব্বতে গিয়েছিলেন। শরৎদাসের বৃহৎ তিব্বতী অভিধান তাঁর তিব্বতী জ্ঞানের ও শ্রমের পরিচয় দিচ্ছে। এইসব পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে তিব্বতের মতন দুর্গম দেশের অনেক তথ্য ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিচয় আমরা লাভ করতে পেরেছি।

তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পরিচয় হ'ল—একজন Siculo-Hungarian-এর কৃপায় আর চীনের বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পরিচয় হ'ল একজন ফরাসী পণ্ডিতের অনুকম্পায়। সেই ফরাসী পণ্ডিতের নাম—ABEL† REMUSAT. তিনি ১৮৩৩ সালে চীনা ভাষা শিক্ষা ক'রে চীনা ভাষা থেকে ফাহিয়ানের ভ্রমণ-কাহিনী ফরাসী ভাষাতে অনুবাদ করেন। সেই সময় পণ্ডিত-জগৎ জানতে পারে যে বৌদ্ধ-চীন থেকে ধর্ম্মের টানে ভিক্ষুরা আসত ভারতে তীর্থস্থান গুলি দর্শন করতে।* তাঁর পর ১৮৫৩ অব্দে Stanislas Julien নামে আর একজন ফরাসী পণ্ডিত হুয়েনসাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত চীনভাষা থেকে ফরাসীতে অনুবাদ করেন। তাঁদের পরে দু'-একজন ইংরেজ পণ্ডিত এই Sinology'র ক্ষেত্রে দেখা দেন—যেমন Beal† ও Giles. Beal সাহেব ১৮৬৯ সালে ফাহিয়ান ও ১৮৮৪ সালে হুয়েনসাং ইংরেজী ভাষাতে অনুবাদ করেন। Giles ও ১৮৭৭ সালে ফাহিয়ান অনুবাদ করেন। এ ভ্রমণ-কাহিনী-গুলি ইংরেজীতে অনূদিত হওয়াতে অধিক সংখ্যক পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ-ছাড়া চীনের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ১৮৭৩ সালে Dr. E. J. Eitel—Buddhism ও পরে Hand book for the Student of Chinese Buddhism লেখেন। Edkins (১৮৮০) ও Beal (১৮৮৪) এর চীনা বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে বইও উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান যুগের চীনশাস্ত্রবিৎগণের মধ্যে শাভান্ (Chavannes) পেলিও (Pelliot) ও সিল্‌ভাঁ লেভী (S. Levi) সাহেবের নাম করা যেতে পারে। এইসব পণ্ডিতদের সাহায্যে চীনা বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে আমরা পরিচয় লাভ করেছি।

আগেই বলেছি, কিভাবে অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম তিনটি মহাদেশে প্রসার লাভ করলে। অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম্মের যদিও সমৃদ্ধির যুগ, তবুও সেই প্রসারের সময়েই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দলে দলাদলি দেখা দিয়েছিল।

অশোকের সাম্রাজ্য যদিও ধ্বংস হ'য়ে গেল, তবু তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে যে রাজাসন দিয়েছিলেন, তা থেকে কেউ তাঁকে অনেক দিন পর্য্যন্ত নামাতে পারেনি। তা'র পর শকরাজ কণিষ্ক সদ্ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তাঁকে রাজাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই কুশান বা ইউচি জাতি আগে

* Waddell Preface xii.

† তিনি College de France এ চীনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বই—Foe Koue Ki—Relation of Buddhist Kingdoms.

* Burnouf ১৮৫২ অব্দে চীনা বই *Miau-fa-lien-hwa King* ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন, সেটি Lotus of the Good Law—সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক সূত্র।

† Beal সাহেব Londonএ University Collegeএ চীন ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চীন ভাষা থেকে A Catena of Buddhist Scriptures ও the Romantic Legend of Sakya Buddha. (Edkins Chinese Buddhism p. 3) সঙ্কলন করেন।

Oxus নদীর ধারে বাস কর্‌ত, ক্রমশঃ নানা কারণে তা'রা ভারতের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে আসে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এসে তা'রা রাজ্য স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা করে ও কালে পশ্চিমভারতে কুশান সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পরে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়ে এসে তারা বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের ইতিহাসে পশ্চিম ভারত অনেক সাহায্য করে। এই পশ্চিম ভারত অর্থাৎ পাঞ্জাব, আফ্‌গানিস্থান ও কাশ্মীর অনেক বিভিন্ন জাতির মিলন-ক্ষেত্র ছিল। এখানে গ্রীক ব্যাকট্রিয়ানরা, শকেরা, ভারতীয়েরা ও এসিয়ার অন্যান্য জাতি একসঙ্গে মেলা-মেশা কর্‌তে পার্‌ত। আর এইখানকার লোকেরাই নানা দেশ-বিদেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কর্‌ত।

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য নানা বিহার ও মঠ স্থাপন করেন। তাঁর সময়েই জলন্ধরে বৌদ্ধ সংঘের চতুর্থ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সভাতেই বৌদ্ধভিক্ষুদের মধ্যে দলাদলিটা ঠিকভাবে জ'মে ওঠে। এর পর থেকেই তা'রা দু'টো বড় দলে বিভক্ত হ'য়ে গেল; যারা মহাযান মতের তা'রা বল্‌লে—নির্ব্বাণ সবাই লাভ কর্‌তে পার্‌বে, সেটি কারুর জন্যে বিশেষভাবে রক্ষিত নয়। কিন্তু হীনযানরা বল্‌লে—না, নির্ব্বাণ কেবল বিশিষ্ট কয়েকজনের জন্য, সবাই এমন সৌভাগ্য করেনি যে নির্ব্বাণের যোগ্য হবে। হীনযান সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম দেশে ও মহাযান পূর্ব্ব এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়্‌ল।

পশ্চিম ভারত মহাযান মতের একটি প্রধান আড্ডা হ'য়ে দাঁড়াল। তাই এখান থেকে যে-যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম গেল—সেই-সেই দেশেই মহাযান মত এখনও প্রচলিত আছে।

চীনদেশে যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবাহ গিয়ে পড়্‌ল, সেই প্রবাহের উৎপত্তি-স্থান এই পশ্চিম ভারতেই। কুশানরা এই প্রচার কার্য্যে অনেক সহায়তা করেন। তাঁদেরই রাজসভা থেকে নাকি একজন দূত প্রথম চীনদেশে গিয়ে সেখানে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। তবে আচার্য্য সিলভাঁ লেভী বলেন*—তিনি কুশান রাজসভা থেকে গিয়েছিলেন বটে, তবে আসলে তিনি চীনরাজেরই দূত কুশান দূত নন। তিনি চীন থেকে কুশান রাজ্যে এসে বুদ্ধের বাণীতে নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে, চীনে ফি'রে গিয়ে সে বাণী প্রচার করেন। এই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রবেশ।

এর কিছু দিন পরে চীনের Ming ব'লে এক রাজা স্বপ্ন দেখেন যে—স্বর্গ থেকে এক সাধুপুরুষ তাঁর সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এ স্বপ্নের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিতরা বল্‌লেন—এর মানে হচ্ছে যে ভারতবর্ষ থেকে একজন সাধু আস্‌বেন—যিনি চীনকে কিছু নতুন জিনিষ দেবেন। Ming রাজা এ-কথা শু'নে দূত পাঠালেন—ভারতবর্ষ থেকে সেই অজানা মহাপুরুষকে আন্‌তে। অনেক পাহাড়পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে মরুভূমির বালুরাশির মধ্য দিয়ে, সেই চীনের রাজদূত গান্ধারে এসে উপস্থিত হলেন। গান্ধারে তাঁর দেখা হ'ল এক ভারতীয় ভিক্ষুর সঙ্গে তাঁর নাম—মাতঙ্গ; কাশ্যপ-কুলে তাঁর জন্ম। তাই চীনা বইতে তিনি কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে অভিহিত। তাঁর বাড়ী মগধ দেশে, মগধ থেকে তিনি গান্ধারে এসেছিলেন। সেই চীনা-দূতের কথায় (যার নাম হচ্ছে—Tsai-yin) কাশ্যপ-মাতঙ্গ কতকগুলি বৌদ্ধ পুঁথি ও বুদ্ধের মূর্ত্তি নিয়ে সেই দূতের সঙ্গে চীনদেশের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে রাজা Min Ti তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর থাক্‌বার জন্যে ব্যবস্থা ক'রে দেন। খুব শীঘ্রই তিনি রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং রাজা তাঁকেই নিজের পুরোহিত নিযুক্ত করেন। তিনিই প্রথম চীনদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন।

তিনি সম্ভবত ৬৭ অব্দে চীনে যান, কিন্তু Beal সাহেব বলেন ৭১ অব্দে। সে যা হোক এটি ঠিক যে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে গিয়েছিল।

তিনি Po-Mash বা শ্বেত-অশ্ব মঠে (Lo-yan তে) একখানি বৌদ্ধসূত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেন।* তিনিই বোধ হয় প্রথম ভারতীয় পণ্ডিত যিনি চীনাভাষায়

* Les Voyageurs Chinois (Chavannes) p. 4.

* সে বইটী—Sutra of Forty-two Sections (Edkins —p 88)

বৌদ্ধ বই অনুবাদ করেন। সেই মঠেতেই এর কিছু দিন পরে তিনি মারা যান*।

এইরকমে ভারত থেকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের প্রবাহ সেই সুদূর চীনদেশে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। যে বৌদ্ধধর্ম্ম সে-দেশে গিয়ে হাজির হ'ল সেটা মহাযান মতের। কারণ সে-ধর্ম্ম সেই গান্ধার দেশ থেকে এসেছিল, যেটি কণিষ্কের অধীনে ছিল, এবং যেখানে মহাযান মতের প্রাধান্য প্রচলিত ছিল।

সুখের বিষয় সে-সময় কাশ্যপ-মাতঙ্গ ছাড়াও ভারতে এমন লোক ছিলেন, যাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশ ছেড়ে সেই অজানা দেশে যেতে স্বীকৃত হন। তাই দেখি যে কাশ্যপ-মাতঙ্গের কিছু পরেই আর-একজন ভারতবাসী ভিক্ষু চীনে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে—ধর্ম্মরক্ষ। সেই শ্রমণের বাড়ী ছিল মধ্যভারতে। তিনি বিনয়-পিটকে খুব পারদর্শী ছিলেন। চীনদেশ থেকে যখন তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ এল সে-দেশে যাবার জন্যে, তখন তাঁর রাজা তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না। কিন্তু তাঁর যাবার ইচ্ছাটা খুব বেশী ছিল, তাই রাজাকে না ব'লে লুকিয়ে তিনি চীনদেশে গেলেন—কাশ্যপের যাবার কিছু পরেই। চীনে গিয়ে তাঁর কাশ্যপের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। তাই চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের জন্য, তাঁরা দুজনে মিলে একখানা বৌদ্ধসূত্রের অনুবাদ করেন। সেটি বুদ্ধকথিত একখানি সূত্র, চীনা ত্রিপিটকের ৬৭৮নং পুঁথি (See Nanjio's Catalogue).

কাশ্যপ-মাতঙ্গের মৃত্যুর পরও, ধর্ম্মরক্ষ তাঁর কার্য্যে শিথিলতা দেখাননি। তা'র পরেও (৬৮—৭০ অব্দে) তিনি পাঁচখানি বৌদ্ধ বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন, কারণ সে-সময় চীনা ভাষায় বৌদ্ধ বই এমন ছিল না, যা প'ড়ে চীনের ধর্ম্ম-পিপাসুরা শান্তি পেতে পারে। তাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারের প্রথম যুগে ভারতীয় শ্রমণদেরই অনুবাদ-কার্য্যে হাত দিতে হয়েছিল। পরে তাঁরা চীনা শ্রমণদের সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি (১) বুদ্ধচরিত সূত্র (২) দশভূমি-ক্লেশ-ছেদিক সূত্র (৩) ধর্ম্মসমুদ্র-কোষ সূত্র (৪) একটি জাতক (৫) ও শীল বিষয়ে সূত্র অনুবাদ করেছিলেন। কাশ্যপ-মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ সম্ভবতঃ একই মঠে বাস করতেন। Lo-yan-এর সেই মঠে ধর্ম্মরক্ষ ৬০ বছর বয়সে মারা যান।

তাঁর পরে যাঁরা চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে (১) মহাবল, (২) ধর্ম্মকাল, (৩) বিঘ্ন, (৪) কল্যাণরুচি, (৫) কল্যাণ। এঁদের নাম উল্লেখ-যোগ্য। এসব ভারতবাসী শ্রমণ ছাড়া আরও অনেকেই চীনে এসেছিলেন ও নানা বৌদ্ধ বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

মহাবল ১৯৭খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই চীনে আসেন। তিনি একজন তিব্বত-প্রবাসী ভারতীয় ভিক্ষুর সহিত একখানি বৌদ্ধসূত্র অনুবাদ করেন। সেই সূত্রখানি আর-কিছু নয়, শাক্যমুনি বুদ্ধের জীবনী।

ধর্ম্মকাল ২২২ খৃঃঅব্দে চীনে যান। তাঁর বাড়ী ছিল মধ্যভারতে। চীনদেশে এসে তিনি দেখলেন যে চীনের বৌদ্ধরা বিনয়ের নিয়ম-কানুন জানে না। তাই তিনি ২৫০ অব্দে বিনয়-সম্বন্ধে বই প্রাতিমোক্ষ অনুবাদ করেন। এর আগে বিনয়-সম্বন্ধে কোনো বই চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়নি, এইটিই বিনয়-সম্বন্ধে প্রথম বই।

বিঘ্ন—একজন ভারতীয় শ্রমণ। তিনি প্রথমে সূর্য্য-উপাসক ছিলেন, পরে স্বধর্ম্ম-ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হবার পর তিনি সেই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চীনদেশে আসেন। আসবার সময় তিনি ধর্ম্মপদসূত্রের একখানি পুঁথি নিয়ে আসেন। ২২৪ অব্দে তিনি আর-একজন ভারতবাসী শ্রমণের সাহায্যে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। চীনা ভাষায় অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়। একে চীনা ভাষা খুব শক্ত, তা'তে চীনদেশে গিয়েই অনুবাদ করতে হ'লে, কাজটি আরও শক্ত হ'য়ে পড়ে। তবু এটা খুব গৌরবের কথা, যে,ভারতের লোকেরা চীনদেশে গিয়ে খুব অল্প দিনের মধ্যে চীনের মতন শক্ত ভাষা আয়ত্ত করতেন এবং সেই ভাষাতেই বই অনুবাদ করতেন। বিঘ্ন নামে শ্রমণটি অল্পদিন চীনে গিয়েছিলেন ব'লে, চীনা ভাষায় তত দখল তাঁর হয়নি। তবু তিনি ও তাঁর বন্ধু চীনাভাষায় ধর্ম্মপদটি অনুবাদ করেছিলেন! তা'র ফল হয়েছিল এই যে অনুবাদের ভাষাটি কিছু

* Nanjio's Catalogue, Appendix.

কটমট হয়েছিল। তাঁর জীবনী-লেখক স্বীকার করেছেন যে যদিও ভাষাটি শক্ত হয়েছিল, তবু তাঁর উদ্দেশ্য সাধু ছিল ; তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন মূল পুঁথির ভাবটি রক্ষা করতে।

কল্যাণরুণ ২৫৫ অব্দে চীনে গিয়ে "সদ্ধর্মসমাধি-সূত্র" চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। কল্যাণ-নামে আর-একটি শ্রমণ ভারত থেকে যান ও ২৮১ অব্দে একটি সূত্র অনুবাদ করেন (See Nanjio's Catalogue)

এইরকমে ভারত থেকে এক-একটি তরঙ্গ গিয়ে ঘা দিচ্ছিল চীনের জাতীয় জীবনে। সেই ঘা খেয়ে একটা সাড়া পড়েছিল তাদের মধ্যে। তা'রা স্থির হ'য়ে ভাবতে সুরু করেছিল, কোন্‌টা তা'রা নেবে—কনফুসিয়সের (Confucius) পুরাণ ধর্ম্ম, না বিদেশী বৌদ্ধধর্ম্ম। ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সেখানে গিয়ে বলছিলেন—"বুদ্ধে শরণ লও, সংঘে শরণ লও, তা হ'লে নির্ব্বাণ পাবে।" এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁরা চীনে নিজেরা হাজির ছিলেন। সেইজন্য এই দুটো ধর্ম্মের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল।

ভারত থেকে বৌদ্ধরা যখন চীনে যেতেন, তখন পথে পড়ত পূর্ব্ব তুর্কীস্থান। আগে সেটা মরুভূমি ছিল না, সেখানে বেশ বড়-বড় রাজ্য গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু যেমন বালুরাশির ঢেউ এসে সে দেশে ঢুকল, তখন থেকে দেশটি মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। কেবল মাঝে-মাঝে এক-একটি ওয়েসিস্, আর সেই ওয়েসিস্ নিয়ে এক-একটি রাজ্য। এই ভীষণ মরুভূমি পার হবার সময় এই ওয়েসিস্‌গুলো খুব সাহায্য করত। সেখানে শ্রান্ত পথিকেরা আশ্রয় পেত। তাই চীন, তিব্বত এই ছোটো রাজ্যগুলো জয় করবার খুব চেষ্টা করেছিল। চীনের পথের এই আশ্রয়-গুলি এইরকমে বৌদ্ধ আড্ডা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, মাঝে-মাঝে, বোধ হয়, দু'-একটা বৌদ্ধ মঠও গ'ড়ে উঠেছিল। এইরকমে এই জনপদগুলির একধারে চীন, অপর ধারে গ্রীস ও অন্য ধারে ভারতের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এখানে এই তিন সভ্যতা মি'লে এক নতুন সভ্যতা গড়েছিল। বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের প্রভাবে ক্রমে-ক্রমে এ স্থানটিও বৌদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল। সম্ভবতঃ খৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার ঘটেছিল। সে-সময় এখানকার অবস্থা কি-রকম ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার কি-রকম ঘটেছিল, তার ছবি আমরা সার আউরেল্ স্টাইন্ সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে এই মরুভূমির বালুরাশির মধ্য থেকে কত বৌদ্ধ চিত্রকলার নমুনা, কত পালি, সংস্কৃত পুঁথির ছিন্ন পত্র, কত ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখের সাম্‌নে আস্‌ছে। (See Stein's Sand-Buried Ruins of Khotan and Ancient Khotan.)

যদিও বৌদ্ধধর্ম্ম ১ম শতাব্দীতে চীনদেশে প্রথম প্রবেশ করলে, তবু সেদেশে যথার্থ স্থান লাভ করতে তা'র ২০০-৩০০ বৎসর লেগেছিল। এর কারণ কনফুসিয়সের (Confucius) ধর্ম্মের সঙ্গে সংঘর্ষ। সে-দেশে এধর্ম্ম এত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তা'র স্থান অধিকার করতে বৌদ্ধধর্ম্মকে অনেক বিরোধের সৃষ্টি করতে হয়েছিল। সেই বিরোধের ইতিহাস—দুই শতাব্দীর চীনেরই ইতিহাস। একদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চেষ্টা, অপর দিকে কনফুসিয়সের (Confucius) শিষ্যদের চেষ্টা। যে-পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে রাজাসনে স্থান পায়নি, সেইপর্য্যন্ত এই-রকম বিরোধ চলেছিল। এটি সম্ভবপর হয়েছিল যখন চীনে আর-একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠার তারিখ—৩৫০ অব্দ। পূর্ব্ব তুর্কীস্থান ও চীনের মাঝে একজাতীয় লোক বাস করত। তা'রা তিব্বতী জাতীয়। এই চতুর্থ শতাব্দীতে তা'রা সেই স্থান থেকে এসে চীনদেশ দখল করে ও একটি নতুন রাজবংশ স্থাপন করে। সেই বংশের নাম পূর্ব্ব Tsin রাজবংশ। ভাগ্যক্রমে এই রাজবংশ বুদ্ধদেবের ভক্ত হ'য়ে পড়েন। তা'রই ফলে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম চীনে আরও বেশী প্রসার লাভ করে। দেশের লোকেরা যখন দেখ্‌লে, যে তাদের রাজাই ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, আর তা'র প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তখন তারাও আস্তে-আস্তে নিজেদের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তে লাগল। এই-রকমে বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু আমা'দের মনে রাখতে হবে যে এ বৌদ্ধধর্ম্ম আর বুদ্ধের প্রচারিত

প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক তফাৎ আছে। এ বৌদ্ধধর্ম্ম গান্ধারের বৌদ্ধধর্ম্ম বা মহাযান-মতের বৌদ্ধধর্ম্ম।

ক্রমে চীনদেশে মঠ স্থাপনা হ'তে লাগ্‌ল, ভিক্ষুর সংখ্যা ক্রমে-ক্রমে বাড়তে লাগ্‌ল। ৩৬৬ সালে একজন চীনা শ্রমণ—Lo-Tsouen, একটি ছোটো মঠ এক পাহাড়ের গুহায় স্থাপন করেন, কালে সেটি এক বিরাট মঠে পরিণত হয়।*

ভারত থেকে যে-ধর্ম্মপ্রবাহ তুর্কীস্থান হ'য়ে চীনে গিয়ে লেগেছিল সেটি আরও ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। চীনে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম রাজাসন পেলে, তখন সেটি কোরিয়াতে যাবার চেষ্টা করলে। সেই প্রচার-কাজটি ভার নিয়েছিলেন একজন চীনা ভিক্ষু। ৩৭২ অব্দে তিনি চীনদেশ থেকে কোরিয়াতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। কোরিয়াতে শীঘ্রই এ ধর্ম্ম প্রসার লাভ করলে।

এবার ধর্ম্মের গতি আরও পূর্ব্বদিকে যেতে লাগ্‌ল। কোরিয়া থেকে ক্রমে এটি জাপানে প্রবেশ লাভ করলে। এই সূর্য্য-উদয়ের দেশে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হ'ল—তখনকার তারিখ—৫৫২ খৃঃ অব্দ। সেই সময় কোরিয়ার কুদরা বিভাগের রাজা জাপানের সম্রাট্‌কে এক বুদ্ধমূর্ত্তি ও খানকয়েক ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার পাঠিয়ে দেন। সেই থেকে জাপানের সম্রাটের বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা জন্মে। এর পর ৬২৫ অব্দে আর-একজন ভিক্ষু কোরিয়া থেকে জাপানে এসে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং দুটি সম্প্রদায় গঠন ক'রে যান। এইরকমে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করলে। ৬৫৩ সালে জাপান থেকে একজন ভিক্ষু চীনে যান এবং হুয়েনসাং-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে ধর্ম্ম-বিষয়ে জ্ঞানলাভ ক'রে জাপানে ফি'রে আসেন। এইভাবে জাপানে ক্রমে-ক্রমে ১২টি সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছে। তার ইতিহাস বি ন্যান্‌জিও তাঁর A Short History of the Twelve Japanese Buddhist Sects বইতে সুন্দর ভাবে দিয়েছেন। সেই ১২টি সম্প্রদায়ের নাম—

(১) কু সা-সু (অভিধর্ম্ম-কোষ। শাস্ত্র সম্প্রদায়)
(২) জো-জিৎসু-সু (সত্যসিদ্ধি " ")
(৩) রিৎসু (বিনয় " ")
(৪) হস্‌সো-সু (ধর্ম্ম-লক্ষণ " ")
(৫) সান-রণ-সু (ত্রিশাস্ত্র ")
(৬) কে-গণ-সু (অবতংশক-সূত্র ")
(৭) তেন-দাই-সু (তেনদাই ")
(৮) সিন গণ-সু (মন্ত্র ")
(৯) জোদ-সু (পবিত্র ভূমি ")
(১০) ঝেন সু (সমাধি ")
(১১) সিন-সু (সত্য ")
(১২) নিচিরেণ-সু (সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক-সূত্র ")*

এইরকমে বৌদ্ধধর্ম্ম মগধ থেকে সারা ভারতবর্ষে, গান্ধার থেকে তুর্কীস্থান ও চীনদেশে, চীন থেকে কোরিয়ায়, কোরিয়া থেকে জাপানে বিস্তৃত লাভ করে। এতে এশিয়ার বেশী অংশ একটা সাধারণ বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল। যদিও ভারতবাসী, চীনা, জাপানীরা ভাষায়, ভাবে, আদর্শে আলাদা, তাদের মধ্যে মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই, তবু এই এক ধর্ম্ম-বন্ধন সবাইকে আপন হ'তেও আপন ক'রে দিলে।

এইবার আমরা আলোচনা করব কি ক'রে এ-ধর্ম্ম তিব্বতে প্রবেশ লাভ করলে। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় আধুনিকদের মধ্যে Dr. L. Austine Waddell, M. B. তাঁর The Buddhism of Tibet or Lamaism বইতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন (১৮৯৫)।

যখন চীন, কোরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নিজেদের ধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করলে, তখনও তিব্বতের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় ততটা সজাগ ছিল না। তিব্বতের দক্ষিণে হ'ল ভারতবর্ষ, যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম-স্থান, তা'র উত্তরে হ'ল চীন আর পশ্চিমে হ'ল তুর্কীস্থান—যারা খুব শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়েছিল। তবু এটা স্বীকার করতে হবে যে, তিব্বতের এই কয় পাশে বৌদ্ধ প্রভাব থাকলেও—অনেক দিন সে-প্রভাব তা'র জাতীয় জীবনে দেখা দেয়নি।

মহম্মদ যখন আরবে নিজের ধর্ম্ম প্রচার করছিলেন, তখন তিব্বতে এমন-এক রাজা ছিলেন, যিনি দেশটিকে ঠিক ক'রে গড়বার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা তত সফল না হ'লেও, সেটা তাঁর পুত্রের জীবনে সফল হয়।

* Chavannes—Les Chinois Voyageurs দ্রষ্টব্য।

*জাপানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়—জগজ্জ্যোতিঃ সমভাগ, ১৫ সংখ্যা, ১০৩পৃষ্ঠা।

তাঁর পুত্রের নাম হচ্ছে—Sron Tsan Gampo। তিনি ছিলেন খুব বড় বীর। তাঁর সময়ে তিব্বতে Bon ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সেই ধর্ম্ম চীনের Taoism-এর অনেকটা অনুরূপ। সম্ভবত চীন থেকেই সেটা আমদানি করা হয়েছিল। নতুন রাজা আগে নিজের রাজ্য গুছিয়ে নিয়ে, চীনের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে যান। চীনের প্রান্তভাগ আক্রমণ ক'রে তিনি চীনের তখনকার রাজা Chitsung-luntsan-কে এত ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে সন্ধি কর্‌তে বাধ্য হলেন। আর সন্ধির যুক্তি অনুসারে ৬৪১ অব্দে তিব্বতের রাজার সঙ্গে তাঁর কন্যা Wencheng-এর বিবাহ দেন।

তিব্বতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌তে পেরেছিল, এই বিবাহকে আমরা তা'র অন্যতম কারণ ব'লে ধর্‌তে পারি। আর-একটি কারণ হচ্ছে নেপালের রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ। চীনের রাজকুমারীকে বিবাহ করার দু'বছর আগে তিনি নেপালের রাজা অংশুবর্ম্মণের কন্যা ভৃকুটী দেবীকে বিবাহ করেন। এই দুই রাজকুমারী বৌদ্ধ ছিলেন ব'লে তাঁরা শীঘ্রই রাজাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত কর্‌তে পেরেছিলেন। আর রাজা নিজেই নেপালের রাজকুমারীকে বিবাহ কর্‌বার সময় স্বীকার করেছিলেন যে—তিনি কোনো বিনয়ের নিয়মাদি পালন করেন না। তবে যদি নেপালের রাজা তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করেন তবে তিনিও ভগবান্ বুদ্ধের শরণ নেবেন এবং দেশের মধ্যে ৫০০০ মঠ তৈরী ক'রে দেবেন। রাজার বয়স যদিও অল্প ছিল, তবু বৌদ্ধধর্ম্ম দেশে প্রচার কর্‌বার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। আর তিনি ভারতে, নেপালে ও চীনে লোক পাঠালেন বৌদ্ধ-পুঁথি ও প্রচারক আন্‌বার জন্যে।

যাকে তিনি ভারতে পাঠালেন, তা'র নাম—Thonmi-Sam bhota। সম-ভোট হচ্ছে তাঁর সংস্কৃত উপাধি, তা'র মানে সৎ ভোট অর্থাৎ সৎ তিব্বতী। তাঁর আসল নাম—Thonmi, তিনি Anu-র পুত্র। তিনি কবে ভারতের দিকে যাত্রা কর্‌লেন, বা কবে ফির্‌লেন তা'র সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে কারও মতে তিনি ৬৩২ অব্দে ভারতের দিকে যাত্রা করেন আর ৬৫০ সালে ফি'রে আসেন। সম্ভবতঃ হুয়েনসাং যখন ভারতে আসেন, তিনিও তাঁর সমসময়ে এদেশে আসেন। ভারতে তিনি অনেক বছর ছিলেন, আর লিপিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ও দেববিদ্ সিংহ নামে পণ্ডিতের কাছে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ফের্‌বার সময় তিনি সঙ্গে অনেক বৌদ্ধ পুঁথি নিয়ে আসেন। তিনি তিব্বতী অক্ষরের সৃষ্টি করেন—অর্থাৎ সে-সময় ভারতে যে-লিপি প্রচলিত ছিল—তাই একটু বদল ক'রে নেন। আর সেই অক্ষরে একখানি ব্যাকরণ তৈরী করেন। এ-ছাড়া তিনি আরও দু'একখানা বৌদ্ধ বই তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা ক'রে ফেলেন।

ভারতবর্ষ থেকে সে-সময় কুশর (কুমার ?) ও শঙ্কর ব্রাহ্মণ ব'লে দুটি বৌদ্ধ ভিক্ষু, নেপাল থেকে শিলমঞ্জু, তিব্বতে যান। তাঁরা ছাড়া চীনদেশ থেকে ও কাশ্মীর থেকেও প্রচারক আসেন।

এসব চেষ্টার ফল এই হ'ল যে, এই রাজার মৃত্যুর পর, রাজা দেবত্ব প্রাপ্ত হলেন। লামারা বল্‌লে যে, তিনি স্বয়ং অবলোকিতের অবতার। এ-ছাড়া তাঁর যে দুই স্ত্রী ছিলেন তারাও মৃত্যুর পরে সেই অবলোকিতের স্ত্রী তারার অবতার ব'লে গণ্য হলেন।

তাঁর ১০০ বছর পরে আর-এক রাজা তিব্বতের সিংহাসনে বসেন, তাঁর নাম—Thi-Sron-Detsan। তাঁর মা বৌদ্ধ ছিলেন ব'লে তাঁর গোড়া থেকেই বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে খুব বেশী টান ছিল। আর সেইজন্য তিনি এ-ধর্ম্মের উন্নতির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁর যে রাজগুরু ছিলেন তাঁর বাড়ী ছিল ভারতে। তাঁর নাম—শান্তরক্ষিত। শান্তরক্ষিত পরামর্শ দেন যে—নালন্দার মঠে "পদ্মসম্ভব" ব'লে যে বৌদ্ধ পণ্ডিত আছেন তাঁকে তিব্বতে নিমন্ত্রণ কর্‌তে। পদ্মসম্ভব যে বৌদ্ধ-দলের মধ্যে ছিলেন সেটি হচ্ছে—তান্ত্রিক যোগাচার্য্য-দল।

যখন তিব্বতের রাজার কাছ থেকে সেই ডাক এল, পণ্ডিত পদ্মসম্ভব আনন্দের সঙ্গে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লেন। এই পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের কাহিনী তিব্বতের অনেক বইতে পাওয়া যায়। তা'তে দেখা যায় যে—উদ্যান (কাশ্মীর) দেশে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম হচ্ছে—ইন্দ্রবোধি। তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে রাজ্যের মধ্যে শোকের প্রবাহ ব'য়ে যায়। রাজ্যের অবস্থাও খারাপ হ'য়ে যায়। তখন

প্রজারা ভগবান্ বুদ্ধদেবের কাছে প্রার্থনা কর্তে লাগল—যাতে এ মন্দ অবস্থা থেকে তা'রা উদ্ধার পায়।

সেই রাত্রে রাজা এক স্বপ্ন দেখেন যে, একটি বজ্র তাঁর হাতে এসেছে। পরদিন তাঁর পুরোহিত বল্লেন যে, এক সরোবরে রাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা পদ্মের উপর জন্মেছে।

রাজা সেই পদ্মের কাছে গিয়ে দেখেন, যে একটা পুকুরে পদ্ম ফু'টে আছে, আর তা'তে একটি সুন্দর ছেলে ব'সে আছে। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা কর্লেন—কে তুমি? সে উত্তর দিলে—ভগবান্ শাক্যমুনির আদেশে আমি এসেছি। রাজা তখন তা'কে নিয়ে রাজপ্রাসাদে রাখেন। ছেলেটির নাম হ'ল—সরোরুহ বজ্র। তিনিও ছেলেবেলায় আমোদ-আহ্লাদ ভালোবাস্তেন না, তাই রাজা তাঁর বিবাহ দিয়ে সংসারে তাঁকে বাঁধতে চেষ্টা কর্লেন। একবার সেই ছেলেটি বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু কতকগুলা প্রজাকে হত্যা করেন। তা'তে প্রজারা রাজাকে বলে—এ কুমারকে তাড়িয়ে দিন। তা'তে তাঁর নির্ব্বাসন হয়। রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে তিনি নানাস্থানে বেড়ান, আর অনেকের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। যখন তিনি লাহোরে ছিলেন, সেখানকার রাজকুমারী তাঁকে দে'খে বিবাহ কর্তে চান—কারণ তিনি তাঁর মনের মত স্বামী পাননি। তাঁর সঙ্গেই শেষে রাজকুমারীর বিবাহ হয়। রাজকুমারীর নাম হচ্ছে—কুমারী দেবী। তিনিই পদ্মসম্ভবের সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বতে ভ্রমণ করেছিলেন। এ-রকম আরও অনেক গল্প তাঁর সম্বন্ধে তিব্বতে প্রচলিত আছে। পদ্মে তাঁর জন্ম বলে তাঁকে পদ্মসম্ভব বলা হয়।

তিব্বত দেশে পণ্ডিত পদ্মসম্ভবের যে ছবি আছে, তা'তে দেখা যায় যে—তিনি উদ্যান-দেশের পোষাক প'রে আছেন, তাঁর দক্ষিণ হাতে একটা বজ্র আর বাম হাতে একটা মাথার রক্তের খুলি। আর বগলে একটা ত্রিশূল—সেটা একটা মানুষের মাথায় বিদ্ধ। তাঁর দু' পাশে তাঁর দুই স্ত্রী—তাঁকে রক্ত আর মদ্য মড়ার মাথার খুলি ক'রে দিচ্ছে। তাঁকে পূজা কর্বার সময়ও নরবলি দেওয়া হয়। এইরকমে তাঁর তান্ত্রিক মূর্ত্তিটা যেন ফু'টে উঠেছে।

৭৪৭ অব্দে তিনি তিব্বত দেশে যখন হাজির হলেন, তখন তিব্বতের লোকেরা খুব আদরের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা কর্লে। তিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের যে নতুন স্বরূপ দেন, তা'কে আমরা লামাদের বৌদ্ধধর্ম ... বলব। তাই তাঁকে লামাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলা ... চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম সেদেশে বেশ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তান্ত্রিক অংশ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। ৭৪৯ অব্দে তিনি Sam-yas এ একটি মঠ স্থাপনা করেন। এ-সময় রাজগুরু পণ্ডিত শান্তরক্ষিত তাঁকে খুব সাহায্য করেন। এই যে মঠটি তৈরী হ'ল, এর আদর্শ হ'ল ওদন্তপুরের বিহার। এ-বিহারের প্রথম অধ্যক্ষ হলেন—শান্তরক্ষিত। এখানে তিনি ১৩ বৎসর ছিলেন। তাঁকেই আমরা প্রথম লামা বল্তে পারি। লামা তিব্বতী শব্দ। তা'র অর্থ 'গুরু'। সাধারণত মঠের অধ্যক্ষকেই তিব্বতীয়েরা লামা বলে। এইরকমে তিব্বতে লামা-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হ'ল।

এই যে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ কর্লে, সেটার মধ্যে তান্ত্রিক অংশই বেশী। কাশ্মীরে যে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল—সেটাই তিব্বতে নীত হয়েছিল। তা'র সঙ্গে তিব্বতের ভূত-পূজাদিও মি'শে গিয়েছিল। এই দুটির সংমিশ্রণে লামাধর্ম্মের উদ্ভব হ'ল। তা'র আগে কিন্তু দেশীয় পুরাণ Bon ধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হ'ল। যেমন চীনদেশে, তেমনি তিব্বতে, পুরাতন মতা-বলম্বী লোকেরা তীব্রভাবে নতুন ধর্ম্মকে আক্রমণ কর্লে, তা'রা চেষ্টা কর্লে এই নতুন ধর্ম্মকে একবারে তিব্বত দেশ থেকে বিদায় কর্তে। কিন্তু তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম আর তা'র কর্ম্মবাদ তিব্বতীদের খুব ভালো লাগল। তাই অনেক বড় লোক ও মন্ত্রীরা আপত্তি কর্লেও—বৌদ্ধধর্ম দেশের মধ্যে নিজের অধিকার স্থাপন ক'রে নিলে।

এ-ছাড়া চীনের বৌদ্ধরাও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ছিল। এটা খুব আশ্চর্য্য মনে হ'তে পারে, কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ করেছিল ১ম শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধধর্ম্মে এত আবর্জ্জনা এসে জমেনি। চীনের বৌদ্ধধর্মও মহাযান মতের হ'লেও তা'র মধ্যে ১ম শতাব্দীতে তান্ত্রিক ভাব আসেনি। তাই চীনা বৌদ্ধরা তিব্বতে যে নতুন ধর্ম এল তার পক্ষপাতী ছিল না। সেই কারণে Mahayana Hwa-shang নামক

একজন চীনা বৌদ্ধ এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তিনি বল্লেন, পণ্ডিত পদ্মসম্ভব ও শান্তরক্ষিত যে বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতীদের শিক্ষা দিচ্ছেন—সেটি ভালো নয়। এই নিয়ে তাঁর ভারতীয় বৌদ্ধ পাণ্ডতদের সঙ্গে খুব তর্ক হ'ল। দুঃখের বিষয় তিনি তর্কে পরাজিত হ'য়ে গেলেন। আর কমল-শীল নামে এক ভারতীয় ভিক্ষু তাঁকে তিব্বত থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেন। এই ভিক্ষু কমলশীলও স্বতন্ত্র মাধ্যমিক মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের টিকাও তিব্বতে আছে।

এ ছাড়া আরও ভারতীয় সে-দেশে গিয়ে সংস্কৃত বই তিব্বতী ভাষাতে অনুবাদ করেন। তাঁরা রাজার সাহায্য যথেষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁদের নাম –

(১) বিমল মিত্র
(২) বুদ্ধ গুহ
(৩) শান্তিগর্ভ
(৪) বিশুদ্ধ সিংহ
(৫) তান্ত্রিক বিমলকীর্ত্তি
(৬) কাশ্মীরের জিনমিত্র
(৭) দানশীল
(৮) আনন্দ

তখনও তিব্বতী বৌদ্ধসাহিত্য এত সমৃদ্ধ হয়নি যে, তা'তে ধর্ম্মপিপাসুরা শান্তি পেতে পারে। আর তিব্বতী-দের মধ্যেও সংস্কৃত ভাষার এত প্রচলন হয়নি যে, তিব্বতীরা নিজেই সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য তাদের ভাষাতে অনূদিত করতে পারে। তা'র ফল এই হ'ল যে, ভারত-বর্ষের পণ্ডিত সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করতে হ'ত তিব্বতী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে। এইরকমে যেমন চীন দেশে তেমনি তিব্বতে ভারতীয় ভিক্ষুদের সাহায্য দরকার হয়েছিল। সেইজন্যে এর পরেও ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা Ralpachan যখন তিব্বতের সিংহাসনে ব'সে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করছিলেন তখনও একদল ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত নিজেদের দেশ ছেড়ে পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে সেই পার্ব্বত্য তিব্বতে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁদের মধ্যে

(১) জিন মিত্র
(২) শীলেন্দ্রবোধি } স্থিরমতির ছাত্র

(৩) সুরেন্দ্রবোধি
(৪) প্রজ্ঞা-বর্ম্মণ
(৫) দানশীল
(৬) বোধিমিত্র উল্লেখ-যোগ্য।

এই-যেসব মহাপণ্ডিত ভিক্ষুরা, যাঁরা ভারতের বাইরে জ্ঞানের দীপ নিয়ে গিয়ে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করছিলেন—তাঁরা আসতেন ভারতের নানা দেশ থেকে। সে-সব দেশের মধ্যে কাশ্মীর ও বাংলাদেশই বেশী ভিক্ষু পাঠাতেন। বাংলা দেশের নালন্দার মঠ, বিক্রমশিলার মঠ, ওদন্তপুরের বিহার, ও অন্যান্য বিহার থেকেই ভিক্ষুরা যেতেন। এসব বিহারে যে তিব্বতী ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল, এবং এখানে যে সময়ে-সময়ে তিব্বতী গ্রন্থাদি রচিত হ'ত,—একথা বল্লে সত্যের অপলাপ হবে না। কারণ তিব্বতী বিশ্বকোষে আমরা এর উল্লেখ পেয়ে থাকি। যা হোক এইরকমে যে বিরাট চীনা ও তিব্বতী সাহিত্য গ'ড়ে উঠল—তা'র জন্যে ভারতবাসীদের কৃতিত্ব যথেষ্ট।

বৌদ্ধধর্ম্মের এই দ্রুত উন্নতির গতি অ-বৌদ্ধ তিব্বতী-দের ভালো লাগল না। তাই এর বিরুদ্ধে একটা বড় দল গ'ড়ে উঠল। সেই দলে Ralpachan রাজার ভাই আর তাঁর মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রে রাজা হ'ত হলেন, আর তাঁর ভাই সিংহাসনে ব'সে বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করতে লাগলেন। এ অত্যাচার নানা আকার ধারণ করলে; তাঁর লামাদের অপমান করতে লাগলেন, বিহারাদি ভেঙে দিতে লাগলেন, দামী-দামী পুঁথি পুড়িয়ে দিতে লাগলেন। অত্যাচারের মাত্রা এত বেড়ে উঠল যে লামারা আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলে না। তা'রা শান্তির উপায় খুঁজতে লাগল। একদিন একজন লামা এক নৃত্যকারীর বেশ ধারণ ক'রে রাজার প্রাসাদের কাছে নাচতে থাকেন। রাজা তাঁকে যখন প্রাসাদের মধ্যে আহ্বান করেন তখন সেই লামা নিজের জামার মধ্য থেকে অস্ত্র বা'র ক'রে সেই ধর্ম্মদ্রোহী রাজাকে হত্যা ক'রে বৌদ্ধ-জগতে শান্তি আনেন। লামারা ক্রমে এত

শক্তিশালী হ'য়ে পড়েন যে—তাঁরাই তিব্বতের রাজক্ষমতা হস্তগত করতে পারেন।

যে ধর্মের প্রবাহ তিব্বতে এসে পৌঁছল, মুসলমান আক্রমণও তা'কে বাধা দিতে পারেনি। যখন মুসলমানরা দিল্লীর দরজাতে ঘা মারছিল—তখনও ভারতের নানা দেশ থেকে দলে-দলে ভিক্ষুরা চীনে আর তিব্বতে যাচ্ছিল। তিব্বতে যাঁরা এই সময়ে (১১শ শতাব্দীতে) যান, তাঁদের মধ্যে—

(১) বিক্রমশিলার অতীশ বা দীপঙ্কর
(২) স্মৃতি
(৩) ধর্মপাল (১০১৩ খৃঃ)
(৪) সিদ্ধপাল
(৫) গুণপাল
(৬) প্রজ্ঞাপাল
(৭) সুভূতি শ্রীশান্তি-প্রসিদ্ধ

এদের মধ্যে অতীশ বা শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে এমন-একটি কাজ করতে পেরেছিলেন, যার জন্যে এখনও তিব্বতীরা তাঁকে মঞ্জুশ্রীর অবতার ব'লে স্বীকার করে। তাঁর বাড়ী বাংলা দেশেই ছিল। যদি আমরা তিব্বতী ইতিহাসে আস্থা স্থাপন করতে পারি, তবে আমরা বলব যে—৯৮০ অব্দে তিনি গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কল্যাণশ্রী, আর মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি ওদন্তপুরের বিহারে শিক্ষা ও দীক্ষা দুইই গ্রহণ করেন। পরে তিনি সুবর্ণদ্বীপের চন্দ্রকীর্তির কাছেও শিক্ষা পান। যখন তাঁর সুখ্যাতি খুব বেড়ে উঠল—তখন তিনি বিক্রমশিলার বিহারের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। সে-সময় বাংলার রাজা ছিলেন নয়পাল। তিনি নানাভাবে রাজা নয়পালকে সাহায্য করেন। তিব্বতের রাজা তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শু'নে, তাঁকে আহ্বান ক'রে পাঠান। তা'র ফলে ১০৩৮ অব্দে তিনি তিব্বতী পণ্ডিতদিগের সঙ্গে তিব্বতে উপস্থিত হন।

তাঁর আসার সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বতে ধর্মসংস্কারের সূচনা হ'ল। যদিও তিনি ৬০ বছর বয়সে তিব্বতে এলেন, তবু পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে তিনি লামা-ধর্মের সংস্কার আরম্ভ করেন। তিনি একটি নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি করেন। সেই দল কালে এত শক্তি সঞ্চয় করতে আরম্ভ করে যে, বর্তমানে তাঁর দলই প্রধান ব'লে তিব্বতে গণ্য। তিনিও তিব্বতী ভাষার একজন বড় লেখক, এখনও তাঁর ২০।২৫খানা বই দেখতে পাওয়া যায়। তা'র মধ্যে—

(১) বোধিপথ-প্রদীপ
(২) মধ্যমোপদেশ
(৩) কর্মবিভঙ্গ
(৪) গুরুক্রিয়াক্রম
(৫) লোকোত্তর সপ্তক বিধি
(৬) মহাযানপথসাধনবর্ণসংগ্রহ
(৭) বিমলরত্ন লেখন

উল্লেখযোগ্য।

১১ শতাব্দীর শেষে যখন মুসলমানেরা ভারত জয় ক'রে ফেলেছে তখন লামা-ধর্ম তিব্বতে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই ধর্মের লামারা ক্রমে নিজেদের হাতে দেশ-শাসনের ক্ষমতাও নিতে লাগল। এই ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় লামাদের হাতে আসে কুবিলাই খাঁর (Khubilai Khan) সময়ে। কুবিলাই খাঁ চীনের রাজা, তাঁর আগে Jenghiz Khan ১২০৬ সালে তিব্বত জয় করেন। কুবিলাই খাঁর একটি খেয়াল ছিল, তিনি সাম্রাজ্যের অসভ্য জাতিদের একবন্ধনে বাঁধবার জন্যে একটি ধর্ম খুঁজলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি Saskya Grand Lamaকে মুসলমানদের, খৃষ্টানদের ও কনফুসিয়ানদের (Confucian) তাঁর রাজধানীতে আহ্বান করেন। তিনি তাদের ডেকে বললেন—যারা আমাকে অদ্ভুত কার্য্য ক'রে দেখাতে পারবে, তাদের ধর্মকেই আমি বড় মনে করব। তা'তে লামারা মন্ত্রবলে তাঁর মুখের কাছে একটা মদের পাত্র তু'লে দেন। অতএব তিনি লামাদের ধর্মকেই বড় ব'লে গ্রহণ করলেন। আর Saskyaর লামাকে তিনি প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে তিব্বতের শাসনভারও তাঁর হাতে দেন। এই সময় থেকেই লামারা একসঙ্গে ধর্ম ও দেশের কর্তা হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা শুধু ধর্ম-সম্বন্ধে লোকেদের বিধান দিতে লাগলেন তা নয়, তাঁরা রাজ্যও শাসন করতে লাগলেন। এইরকমে তাঁরা তিব্বতে প্রবল পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠলেন।*

* এই অবস্থার চরম পরিণতি হ'ল ১৬৪০ অব্দে যখন দালাই লামা পদের সৃষ্টি হ'ল। Gusri Khan ব'লে এক Mongol রাজা তিব্বত জয় ক'রে Nag-wan Lo-zang ব'লে লামাকে উপহার দেন ও তাঁকে দালাই বা সমুদ্র উপাধি দেন।

কুবিলাই খাঁ এই লামাদের সাহায্যে আর-একটা বড় কাজ করলেন। তিনি সেই লামাদের সাহায্যে Khaygur-এর সমস্ত তিব্বতী বই মোঙ্গলীয় ভাষাতে অনুবাদ করালেন। অনুবাদের সময় সেই বৌদ্ধ বইগুলো তিনি চীনা বৌদ্ধবই-এর সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিলেন।

তা হ'লে দেখ্‌ছি কুবিলাই খাঁ বৌদ্ধধর্মের জন্যে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। যে বৌদ্ধশাস্ত্র চীনে গিয়ে চীনা ভাষায় ও তিব্বতে গিয়ে তিব্বতী ভাষায় আশ্রয় পেয়েছিল, সেই শাস্ত্রই এখন আবার তিব্বতী থেকে মোঙ্গলীয় ভাষায় স্থান পেলে। এইরকমে বৌদ্ধধর্ম ভারতীয়দের, চীনা তিব্বতী, মোঙ্গলীয়, কোরিয়াবাসী ও জাপানীদের এক-বন্ধনে বন্ধন করতে পেরেছিল।

অপরাধী

শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী

তা'র বাবা ছিল লাঠিয়ালের সর্দ্দার। ছেলেবেলায় ওয়াজিদকে সে বুঝাইয়াছিল, তা'রা শের পাঠানের জাত, নিতান্ত খোদাতালার মর্‌জি, তাই ঘাসজলের জমীন্ বাংলা-মুলুকে আসিয়া ঝিমাইতেছে, এদেশের জমিতে মরদের রক্ত নাই। কিন্তু গোছাগোছা লম্বা চুল ছিপ্‌ছিপে সুন্দর গড়ন, আর দু'চোখভরা স্নেহকরুণ দৃষ্টি লইয়া ওয়াজিদ যখন বড় হইল তখন তা'র সমস্ত দেহ ভরিয়া বাংলা দেশ যেন কথা কহিল, তা'র বাবার উর্দ্দুর বুক্‌নি দেওয়া উগ্র ভাষার সঙ্গে সে-কথার ভাষা একেবারেই মিলিল না।

বাংলা তাহার ধমনীতে বীরের রক্ত প্রচুর করিয়া দিতে পারিল না বটে, কিন্তু যেটুকু দিল তাহাকেই নিজের মনে পাগ্‌লামির বিচিত্র ছন্দে নাচাইয়া দিল, শত্রুজয়ের বদলে সে হৃদয় জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বহুযুগের বাংলা তাহাকে যথাযথসময়ে বুড়িস্‌তা ধরিতে ছুটাইল, কাদাজলে গামছা পাতিয়া মাছ ধরাইল, কাঁচা আম ঝিনুকে কুরিয়া খাওয়াইল এবং তা'র আঁঠির বাঁশীতে ফুঁ দেওয়াইল। পুত্রের এই সমস্ত অধোগতির লক্ষণ দেখিয়া তা'র বাবা যখন প্রাণপণে পীরের দোহাই মানিতেছে, তখন পীরেরা করুণা করিয়াই তা'র সেই শা-সুলতানের দেশের প্রাণটাকে একদিন নিজেদের কাছে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। বাংলা দেশ নিতান্ত নিজের মতো করিয়া তাহার জন্য শোক করিল।

শোকের প্রথম ঘোরটা ভালো করিয়া না কাটিতেই ওয়াজিদ লক্ষ্য করিল, কেবলমাত্র কাঁচা আম এবং কাদা-জলের মাছ তা'র মতো খামখেয়ালি মানুষেরও পেট ভরাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। তখন সে একদিন তা'র এক দূরসম্পর্কের চাচাকে সুপারিশ ধরিয়া তা'র মৃত পিতার মুনিব রায়বাবুদের দরজায় আসিয়া হাজির হইল। সর্দ্দারের ছেলেকে সকলেই চিনিত; বিধাতা তাহাকে কোন্ কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন জানিবার জন্য তাহারা কৌতূহলী হইয়া ভিড় করিল।

কিন্তু দেখা গেল, এইখানে বিধাতার একটু অন্যমনস্কতার ত্রুটি ঘটিয়াছে, ওয়াজিদ যে-কাজটি খুব সুন্দররূপে করিতে পারে সেইটিকেই কোথাও তাহার জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিতে, তিনি ভুলিয়াছেন। বাংলা দেশের জীবনে তখন খুব বড় একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে। —বাঙালী জমিদারের বীরত্ব পাঠান লাঠিয়ালের লাঠির চোটেও আর প্রকাশ পায় না। কিন্তু তাহাদের জায়গায় বাঁশীর ওস্তাদদের নিযুক্ত করিবার রেওয়াজ সুরু হয় নাই।

কাছারীর দরবার হইতে ওয়াজিদকে অগত্যা ফিরিতে হইল। কিন্তু ফটক ছাড়িয়া বাহির হইবার পথটা যেখানে দীঘির কোণ ঘিরিয়া মোড় ফিরিয়াছে সেইখানে, একটি ছায়া এবং সৌরভে নিবিড় বাতাবি-লেবুর বনে, একটি

পরিপূর্ণ দিবস এবং পরিপূর্ণ রাত্রির আবেগ-স্তিমিত সন্ধিক্ষণে, এক সুন্দরী তরুণী তাহার গতি রোধ করিল; এবং কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না।

ইহারা পরস্পরকে চিনিত, বাবুদের বাগানে লিচু চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়া ওয়াজিদ একদিন ইহাকে বখরা দিয়াছিল। মহরমের পর্ব্বের সময় জারি গাহিয়া, ঢোল পিটিয়া, চুল দোলাইয়া সে যখন বাবুদের অন্দর-মহলের প্রাঙ্গণে মশালের আলোয় নাচিয়াছিল, তখন খুসির আগ্রহে এবং উত্তেজনায় বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপে নাই এমনতর তরুণী মানবী চারিপার্শ্বের ভিড়ের মধ্যে একটিও কোথাও ছিল না। সুতরাং মেজোবাবুর সেজো মেয়ে কাত্যায়নীও সে-দল হইতে বাদ পড়ে নাই। আজ প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাকে সে তাই চিনিল, এবং নিজের রক্ষী পরিচারিকারা আশেপাশে কেহ কোথাও আছে কি না চকিত-চোখে একবার দেখিয়া লইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে সবেগে তাহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

একটু পরে কাছারী বাড়ীর লোকেরা যে-যার কাজ ফেলিয়া বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, শাড়ীর আঁচল উপচিয়া পড়া বাতাবি-লেবুর ফুলে সারা পথ চিহ্নিত করিতে-করিতে ওয়াজিদ-বাহিনী কাত্যায়নী হাস্যবিকশিত মুখে অন্দঃমহলের ফটক পার হইতেছে।

(২)

সেই হইতে ওয়াজিদ বিনা-কাজেই বাবুদের বাড়ীতে রহিয়া গেল। সে মাহিনা লইত না, সেই কারণে, অকারণে এবং অকালে যার-তা'র কাছে তা'র বক্শিস্ মিলিত। এইভাবে, কিছুই পাইতেছে না বলিয়া সে যাহা পাইত তাহা যে কোনো তিন জন ভৃত্যের বহু আয়াসের পাওনাকেও সহজেই ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল। ওয়াজিদ যে ভৃত্য হইয়াও ভৃত্য নহে, তাহার মাহিনা না-লওয়ার এই অভিমান একেই ত অন্য ভৃত্যদের গাত্রজ্বালা ধরাইয়াছিল, তদুপরি তাহার এই বিনাপাওনার পাওনা তাহাদের মনে মেঘসঞ্চার করিতে লাগিল। কেবল কাত্যায়নীর পরিচারিকার দল কাজে বাহাল থাকিয়াও কাজ হইতে ছুটি পাইয়া খুসি হইল, এবং ওয়াজিদের পক্ষ লইয়া দুএকসময় দুএকজনের সঙ্গে তর্ক করিল।

ঘুম ভাঙিয়া চোখ কচলাইতে-কচ্‌লাইতে "ওয়াজিদ-ভাই" বলিয়া কাতু যখন তাহার শোবার ঘরের রকে আসিয়া দাঁড়াইত তখন হইতে আবার সেই খোলা রকেরই উপর ওয়াজিদের কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া মধুমালা, রাক্ষসী রাণী, পক্ষীরাজ ঘোড়া ও বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প শুনিতে-শুনিতে তাহার দু'চোখ ঘুমে বুজিয়া আসার সময় পর্য্যন্ত ওয়াজিদের দুদণ্ডেরও তবু ছুটি ছিল না। কেবল মাঝে-মাঝে বাবুরা বিলের চরে পাখী শিকার করিতে যাইবার সময় তাহাকে সঙ্গে লইতেন, সে ছর্‌রা বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিত। নদীর কোন্ বাঁকে মাছ খাইতেছে খবর লইবার জন্য তাহাকে পাঠাইতেন, সে ছিপ হাতে রোদে-রোদে ঘুরিয়া জায়গা ঠিক করিয়া চার ফেলিয়া আসিত। মাঝে-মাঝে জ্যোৎস্নারাত্রের মজ্‌লিসে বাঁশী বাজাইবার ডাকও যে আসিত না এমন নয়, সে-রাত্রে তাহার আর সময়ের জ্ঞান থাকিত না। বাড়ী ফিরিয়া মায়ের কাছে সে বকুনি শুনিত।

বাড়ীতে মা ছাড়া তাহার ছোটো একটি বোন্ ছিল, প্রায় কাত্যায়নীরই সমবয়সী। মুস্কিল ছিল এই,—বোন্‌টি তাহাকে ভালোবাসিত। যে-স্নেহ তাহার পাওনা, তাহা বাহিরের সংসার কোন্ ছলে তাহার দাদার নিকট হইতে ঠকাইয়া লইতেছে, কি-সূত্রে কাত্যায়নীর অধিকার তাহার দাবী অপেক্ষা বড় হইতেছে, তাহার শিশুমনের কাছে তাহা স্পষ্ট ছিল না, তাই কিছুই সে বলিত না, কিন্তু নীরবে কঠিন দুঃখ বহন করিত। ওয়াজিদ বুঝিত এবং অত্যন্তই দুঃখিত হইত, কিন্তু তাহারও মন শিশুবয়সের সীমা পার হইয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই বলিয়া বাবুদের বাড়ীর নিত্য উৎসব, বহুজনাকীর্ণ সুখদুঃখসমাকুল বিচিত্র জীবন-নাট্য, ঐশ্বর্য্যের সম্মোহন দ্যুতি তাহাকে প্রলুব্ধ করিত। সে-আকর্ষণকে কাটাইয়া আসা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না।—তদুপরি কাত্যায়নীকে সে ভালোও-বাসিত।

ওয়াজিদ কেন বকুনি শুনিত তাহার কারণ ছিল। তাহার মা সারাদিন রাঁধা-বাড়া, ধান-ভানা, মাছ-শুকানো, জল-আনা প্রভৃতি কাজে এবং অবসর সময়ে পাড়া বহিয়া কোঁদল করিতে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকিত যে, তাহার

মধ্য দিয়া কোনো ফাঁকে ছেলের চিন্তা তাহার মনে ঢুকিতে পাইত না, কিন্তু রাত্রিতে ওয়াজিদ বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত দৌলতী ওরফে ছুলী, কিছুতেই ঘুমাইতে যাইত না এবং তাহার পাহারা দিতে বাধ্য হইয়া তাহার মাকেও সঙ্গে-সঙ্গে জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইত।

ওয়াজিদ ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিত। দৌলতী তাহার উচ্ছ্বসিত সহস্র কথায় হাঁ-না ব্যতীত আর কোনো জবাব না পাইয়া নিজে হইতেই চুপ করিত। এবং ভাইয়ের হাত-পায়ের আঙুল টানিয়া দিয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া গা টিপিয়া দিয়া তাহার বুকের কাছে পরম পরিতৃপ্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িত। সকালে উঠিয়াই ওয়াজিদ নিঃশব্দে পলাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে চেষ্টা একদিনও প্রায় সফল হইত না। ঝাঁপ খোলার সামান্ত শব্দে চকিত হইয়া ছুলী একেবারে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া পড়িত, একমুখ হাসিয়া পলায়নোন্মুখ ওয়াজিদকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া বলিত, "দাদাভাই, সেলাম।"

তাহার হাসির আয়ুকে শেষ করিয়া দিয়া "সেলাম" বলিয়া ওয়াজিদ চলিয়া যাইত।

(৩)

কিন্তু বাবুদের বাড়ীতে ছুলীর দাদাভাইয়ের পাওনার বহর যত বাড়িয়া চলিতে লাগিল, সে পাওয়াতে তাহার সুখ সেই-পরিমাণে বাড়িল না। বাবুরা তাহাকে কথায়-কথায় পুরস্কৃত করিতেন, সে সত্যই কৃতজ্ঞ হইত, এবং হাসিমুখেই তাঁহাদের স্নেহ-সমাদরের দানগুলিকে লইত, কিন্তু অধিকাংশ সময় প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে হাসিতে হইত। পুরস্কারের যে-অংশগুলি বাড়ী অবধি লওয়া চলিত তাহার সাহায্যে বহু ক্লেশে ছুলী এবং তা'র মায়ের দুবেলা দুমুঠা অন্ন জুটিত এবং কোনোদিন বা জুটিত না, কিন্তু ওয়াজিদের সামনে পায়সের বাটী রাখিয়া মেজো গিন্নি বসিয়া থাকিতেন, সে না খাইলে কাত্যায়নী রাগারাগি করিয়া অস্থির করিত। বাবুরা তাহাকে নিজেদের পরিবারস্থ একজন মনে করিতে পাইয়াই অত্যন্ত খুসি হইতেন, ঐরূপ করিয়াই ওয়াজিদকে তাঁহাদের স্নেহার্দ্র চিত্তের একেবারে মধ্যখানে তাঁহারা লইতে পারিতেন, সুতরাং আরও কোথাও যে তাহার জীবনের কোনো বন্ধন আছে, ইহা ভাবিতে তাঁহাদের ভালো লাগিত না, তাই পূজায়-পার্ব্বণে বিবাহে অন্নপ্রাশনে, জরিপাড় ধুতি হইতে, ফুলকাটা গেঞ্জি, রেশমী আঙরাখা বিলিতি দামী বাঁশী প্রভৃতি নানা উপহারে সে যখন ভারাক্রান্ত হইত, তখন একটি পিতৃহীনা স্নেহসুখবঞ্চিতা কচি বালিকার ছহাতী একটি পাছা-পাড় শাড়ীর ভাবনায় তাহার মনের ভার নামিত না। বাবুদের সম্মুখে জরি-পাড়ের কাপড় পরিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত-মুখ করিয়া তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কিন্তু রাজবাড়ীর ফটক পার হইয়াই দীঘিতে স্নান করিবার ছলে সেই পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া ছাড়া-কাপড়টি সে পরিয়া লইত, তা'র পর বাড়ীর দরজায় আসিয়া হাঁক দিত, "ছুলী! তোর জন্যে কি এনেছি দেখসে!"

দৌলতী স্থিরগতিতে বাহির হইয়া আসিত, দাদার হাত হইতে উজ্জ্বল প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে কাপড়টি লইয়া মাকে গিয়া দেখাইত, তা'র পর এতবড় কাপড়কে বহুকষ্টে শরীর ঘেরিয়া কোনোওরূপে জড়াইয়া লইয়া পরম প্রসন্নমুখে দাদার কাছটিতে আসিয়া বসিয়া থাকিত। একটু পরে তাহার মা আসিয়া মেয়ে নোংরা করিয়া ফেলিবে বলিয়া টান মারিয়া কাপড়টিকে খুলিয়া লইয়া যাইত, তখনও সে কেবল কাতরকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকিত, কোনো কথা কহিত না।

সে-বার মহরমের সময় কাত্যায়নী বায়না ধরিল, ওয়াজিদ-ভাইকে জরির তাজ করিয়া দিতে হইবে, সে তাহাই পরিয়া মিছিলের সময় নাচিবে। কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়া থিয়েটারে সে "ওস্‌মানের" মাথায় যে-রকম তাজ দেখিয়া আসিয়াছিল ঠিক সেই-রকমটি না হইলে চলিবে না, সকলকে বিশেষ করিয়া তাহা বলিয়া দিল। যথাসময়ে লক্ষ্নৌ হইতে যে বিচিত্র-কারুকার্য্য-খচিত শিরস্ত্রাণ আসিয়া উপস্থিত হইল, কাত্যায়নীকে স্বীকার করিতে হইল যে তেমন জিনিস "ওস্‌মান" কোনো জীবনে চোখেও দেখে নাই। বাবুরা চলন-সই-রকম চক্‌চকে একটা টুপি মনে করিয়াই ফরমাস্ করিয়াছিলেন, হঠাৎ এমন জিনিস আসিয়া পড়াতে নিজেরাও একটু

চমৎকৃত হইলেন, বুঝিলেন এ-সব জিনিসের ঠিক দামটি কাহারো জানা না থাকায় এরূপ ঘটিয়াছে।

কাতুর বায়নার বাড়াবাড়িতে ফাঁপরে পড়িয়া ওয়াজিকে মহরমের মিছিলের সময়ের ঢের আগেই তাজ পরিয়া নৃত্য করিতে হইল। তাহার নিজেরও মন প্রসন্ন হইয়াছিল, কিছুক্ষণের জন্ম দৌলতীকে ভুলিয়া অন্তরের অকুণ্ঠিত আনন্দের ছন্দে সে নৃত্য করিল,তা'র পর কলার খোল কাটিয়া আনিয়া কাতুর জন্ম সে খড়্‌কের সাহায্যে নৌকা তৈরি করিল, খোলের টুকরা উন্টাইয়া তাহাতে ছই দিল, মাঝখানে সূতার টানা দিয়া নলের মাস্তল খাড়া করিয়া দিল। তাহার সেই অপূর্ব্ব-গঠন মেকি খেয়ার সাহায্যে যখন শিশুদলের একেবারে খাঁটি নিখাত সোনার আনন্দ-পণ্য সরবরাহ হইতে লাগিল, তখন জরির তাজটিকে কাপড়ে ঢাকা দিয়া সকলের অলক্ষ্যে রায়বাড়ী হইতে সে বাহির হইয়া পড়িল।

(৪)

পথে আসিতে মনে পড়িল, আজ গ্রামের সমস্ত ছেলে-মেয়ে তাদের সাধ্যমত সাজিয়া-গুজিয়া মহরমের মিছিল দেখিতে বাহির হইবে, কিন্তু দৌলতীর জর, সে কোথাও যাইতে পাইবে না। মনে পড়িল, মহরম আসিতেছে, এবং তাহার দাদা-ভাই তাহাতে জারি পিটিয়া নাচিবে, একথা পৃথিবীর আর-সকলের আগে দৌলতীর মনে পড়িয়াছিল। তখন হইতে কতবার সে সে-কথা বলিয়াছে। দু'দিন আগে যখন তাহার জর ধরা পড়িয়াছিল, তখন সেই মৃদুভাষী ক্ষীণপ্রাণ বালিকা দুর্দ্দম্য শক্তিতে জরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছিল, তাহাও বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। উর্দ্ধে চাহিয়া ভাবিল, আজ আল্লাতালার দৃষ্টি খোলা রহিয়াছে, তাঁহার এই দৃষ্টির সমুখে আজ দুই ভাইবোনে তাহারা একটি পরিপূর্ণ মহরম উৎসব সম্পন্ন করিবে। দৌলতী দেখিবে, সে নাচিবে। আজকের দিনে আর কাহারো কথা, আর-কিছুর কথা ভাবিবে না।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া একটা কোলাহল শুনিতে পাইল। বাকী পথটা ছুটাছুটি করিয়া আসিল। আসিয়া শুনিল, দৌলতীকে শান্তভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া তাহার মা নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল। রুগ্ন মেয়েকে ফেলিয়া বাহিরে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না বলিয়া ছুটিতে-ছুটিতে সে ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু দৌলতীকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না।

তখন হঠাৎ তারার মজলিশের মাঝে পড়িয়া সূর্য্যের আলো লজ্জিত আরক্তমুখে বিদায় হইতেছে। মিছিল বাহির হইবার আর দেরি নাই, মোল্লা পাড়ার ঢাকে কাটি পড়িয়াছে শোনা যাইতেছে। ওয়াজিদ মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো চেষ্টা না করিয়াই তাড়াতাড়ি আবার বাহির হইয়া পড়িল, যেখানে-যেখানে ছেলে-মেয়েদের জটলা দেখিল তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল, তা'র পর নিরাশ এবং হতবুদ্ধি হইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে, এমন সময় দেখিল, কাহাদের বাড়ীর আলিসার কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া দৌলতী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতেছে। কাছে গিয়া শুধাইল, কি হইয়াছে। বলিল, "ওরা সকলে মি'লে আমার কাপড় ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে দিয়েছে। বলে, ওর কি এত বড় কাপড়, কাদের কাপড় চুরি করেছে। বলে, ও পুঁটলি! পুঁটলিতে কি রেখেছিস্, আয় সব ফাঁস ক'রে দিই, ব'লে—"

ওয়াজিদের মধ্যে তা'র পিতৃপুরুষের লাঠিয়ালবৃত্তি হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়া দাঁড়াইল, গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কে তা'রা, কোথায় তা'রা?"

দৌলতী বলিল, "জানি না, হাস্‌তে-হাস্‌তে ঐদিকে সব চ'লে গেল।"

দৌলতীর জরতপ্ত দেহ নিঃশব্দে বুকে উঠাইয়া লইয়া সে বাড়ী ফিরিল। বহুবৎসরের সেই প্রথম ওয়াজিদের অভাবে মহরমের উৎসব অঙ্গহীন হইয়া সম্পন্ন হইল। বাবুরা পেয়াদা পাঠাইলেন, কাতু সংবাদ দিল, এখনি না আসিলে সে এমন রাগ করিবে যে আর কখনো তা'র কোলে শুইয়া গল্প শুনিবে না, সে নৌকা গড়িয়া দিলে তাহা লইবে না, ওয়াজিদ মাথার দিব্যি দিয়া সাধিলেও তা'র পাড়িয়া দেওয়া লিচু খাইবে না, ইত্যাদি। কিন্তু ওয়াজিদ সেদিন তা'র এত সমস্ত ভয়ানক সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া একটুও ভীত কিম্বা কাতর হইল না, বাবুদের সেলাম জানাইয়া বলিয়া

পাঠাইল, তার বোন্‌টির অত্যন্ত কঠিন অসুখ, তাহাকে ফেলিয়া কোথাও গেলে আজ তাহার গোসার শেষ থাকিবে না।

পরের দিন দুলীর অসুখ বাড়িল। বাবুরা সকাল হইতেই লোক পাঠাইতে লাগিলেন, কাতু কাল সমস্ত রাত ঘুমায় নাই, আজও ভোর হইতেই গোলযোগ সুরু করিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই শান্ত করা কিম্বা নাওয়ানো-খাওয়ানো যাইতেছে না।

ওয়াজিদ কহিল, "একবার একটু ঘু'রে আস্‌ব, দুলী ?"

দুলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যাও।"

বলিবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, তবু ওয়াজিদ বলিয়া গেল, সে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে।

সেদিন কাতুর অভিমান ভাঙিয়া যাইতেই তাহার আব্দারের আর অন্ত নাই। ওয়াজিদ মাটি দিয়া যে হাতী গড়িয়াছিল, তা'র উপর হাওদা চড়াইয়া দিবার কথা কতদিন ধরিয়া রোজ সে ওয়াজিদকে বলিতেছে, আজ সেটা করিয়া দেওয়া চাই। কাতুর পুতুল-ক'নের সঙ্গে কাতুর খুড়তুত বোন্ কাদুর পুতুল-বরের যে সেদিন বিবাহ হইয়া গেল, তা'তে ওয়াজিদের ঢোল বাজাইবার কথা ছিল, কিন্তু সে বাজায় নাই, আজ আবার নূতন করিয়া ঢোলের বাদ্যের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হইবে। সেদিন রাজপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র গাছে চড়িয়া ঘুমাইতেছেন, কোটাল-পুত্র পাহারায় আছে, এমন-সময় একটা প্রকাণ্ড অজগর গাছের তলায় আসিয়া মাথার মণিটা লইয়া খেলা করিতে লাগিল,—এই পর্য্যন্ত শুনিয়া কাতু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেই গল্পের বাকীটুকু এখনই তাহাকে শুনিতে হইবে। এইভাবে ওয়াজিদের প্রতিশ্রুতির আধ ঘণ্টা সে কতগুণ হইয়া রহিয়া গেল, তাহার কোনো হিসাব রহিল না।

রায়বাড়ীতে চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলে এমন করিয়া ওয়াজিদকে ঘিরিয়া ধরিত, যে তাহার স্বভাবত দুর্ব্বল মন কিছুতেই সেই ব্যূহ ভেদ করিতে পারিত না, আজিও পারিল না। যখন অবশেষে তাহার চৈতন্য হইল তখন সমস্ত আকাশে গোধূলির বিষণ্ণ আলো থম্‌থম্‌ করিতেছে।

দৌলতী, দুলী! আজ সমস্ত দিন জ্বরে ছটফট করিতে-করিতে সে তাহার পথ চাহিয়াছে, আর সে নিজে! বালিকার এত দুঃখের এত আগ্রহের প্রতীক্ষাকে কি দিয়া সে পুরস্কৃত করিবে, কি তাহার কাছে এতদিন সে লইয়া গিয়াছে, কি আজ সে লইয়া যাইবে? সত্যমিথ্যায় মিশানো কতকগুলি দেরি করার অজুহাত?

দুঃখ, অনুতাপ তাহাকে পাগল করিল, সে কি করিতেছে, কোথায় যাইতেছে তাহা বুঝিল না, এম্‌নি অবস্থায়, বাড়ীর সর্ব্বত্র নিজের অবাধগতির সুযোগে, কাতুর ঘরে তার বিছানার পাশের দেরাজের উপর হইতে তা'র গলার লকেট-দেওয়া একগাছা সরু হার সে চুরি করিল।

(৫)

মনে করিয়াছিল, বাড়ী গিয়া দুলীর গলায় পরাইয়া দিবে, কিন্তু পারিল না। তাহার মা বসিয়াছিল, হার সে কোথায় পাইল,এ প্রশ্ন তাহার মা নিশ্চয় করিবে। তখন সে কি জবাব দিবে? লুকাইয়া বাতাসা বাহির করিয়া খাইবার ছলে শিকেয় ঝুলানো একটা হাড়ির মধ্যে হারটিকে রাখিয়া দিল। দুলী তাহাকে দেখিয়া মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, তাহার মাথায় হাত রাখিয়া সেও আজ চোখের জল ফেলিতে লাগিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে যা দুরূহ কাজ আজ দুলীর জন্য তাহাই সে করিয়া ফিরিয়াছে, কি করিয়া তাহাকে সেকথা সে বুঝাইবে?

মনে করিয়াছিল, কিছুতেই ঘুমাইতে পারিবে না, কিন্তু শুইবা-মাত্র শুদ্ধমাত্র মনের ক্লান্তিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিল, প্রাণপণে বাঁশীতে ফুঁ দিতেছে কিন্তু কিছুতেই তাহা হইতে সুর বাহির হইতেছে না, কাতু রাগ করিতেছে, দুলী কাঁদিতেছে, সেও কাঁদিতেছে।

সকাল বেলা ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল। গত রাত্রের কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল সে চুরি করিয়াছে, সে চোর! মনে হইল, পৃথিবীর সব মানুষকে কেবল দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। এক যারা চোর,

আর যারা চোর নয়। যারা চোর, তাদের পৃথিবী আলাদা, তা'রা অন্য পৃথিবীর মানুষদের কেউ হয় না। সেদিনকার সকালবেলাকার রৌদ্র, শরতের স্নিগ্ধ প্রশান্ত আকাশ, তা'র মেঘসজ্জা, একেবারে নূতনরূপে তা'র চোখে প্রতিভাত হইল। একবার মনে করিতে চেষ্টা করিল, সবটাই স্বপ্ন, কিন্তু পারিল না।

কান পাতিয়া রহিল, কখন বাবুদের বাড়ী হইতে পেয়াদা আসিয়া হাঁক দিবে। কিন্তু বেলা বহিয়া চলিল, কেউ আসিল না। দুলীর অসুখ আরও বাড়িয়াছে, বাবুরা শুনিতে পাইয়াছেন, কাতুও শুনিয়াছে। সকলকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেহ যেন ওয়াজিদকে ডাকাডাকি করিয়া ব্যস্ত না করে। দেরাজের উপর খোলা পড়িয়াছিল, কে কখন উঠাইয়া লইয়াছে, ইহার বেশী কাতুর হারের খোঁজ আর কেহ লয় নাই। জমিদার-পরিবারে এমনতর ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটে, বাবুদের তরফ হইতে কিছুই প্রায় বলা হয় না, গিন্নীরা কিছু বকাবকি করেন, ঝিচাকরেরা পরস্পরের স্কন্ধে অসাবধানতার দোষ চাপাইয়া, কলহ করিয়া পালা সঙ্গে করে।

ওয়াজিদ সমস্ত দিন কল্পনার চোখে দেখিল, বাড়ীতে তোলপাড় বাধিয়া গেছে, বাক্স তোরঙ্ খুলিয়া উপুড় করিয়া হারের খোঁজ হইতেছে, পুলিশে খবর গিয়াছে, ঝিচাকরেরা কেহবা প্রকাশ্যে, কেহবা ইঙ্গিতে ওয়াজিদের প্রতি সন্দেহ ব্যক্ত করিতেছে। কাতু কাঁদিয়া হাট বাধাইতেছে বলিয়া বাবুরা প্রকাশ্যে কিছু বলিতেছেন না, কিন্তু ওয়াজিদের অপরাধের কি প্রতিকার করা যায় সে-সম্বন্ধে গোপনে পরামর্শ করিতেছেন।

কিন্তু সন্ধ্যার দিকে অনিশ্চয়তার ভার মনের উপর চাপিয়া ওয়াজিদের যেন শ্বাস-রোধ করিয়া দিতে লাগিল। আর না পারিয়া অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া বাবুদের বাড়ীর আশপাশে সে ঘোরাঘুরি করিয়া বেড়াইল। কোথাও কোনো উত্তেজনা, কোনো চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখিল না, ভাবিল হয়ত এখনও হারের খোঁজ হয় নাই; তখন সাহসে ভর করিয়া আস্তে-আস্তে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাবিল, সেখানকার-যা সব ঠিক আছে দেখিতে পাইলে নিজের মনে অন্তত স্বস্থ বোধ করিবে।

ছোটো বাবু বৈকালিক অশ্বারোহণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, দীঘির পারে ওয়াজিদকে দেখিয়া ঘোড়া থামাইলেন, কহিলেন, "দৌলতী কেমন আছে ওয়াজিদ?"

ওয়াজিদ সেলাম করিয়া কহিল, "জ্বরটা কমেনি হুজুর।"

ছোটো বাবু কহিলেন, "মহিম-ডাক্তারকে বলা হয়েছে সে রাত্রেই গিয়ে দে'খে ওষুধ দিয়ে আস্‌বে। তুমি আর বাইরে বেড়িয়ে দেরি কোরো না, বাড়ী যাও।" ছোটো-বাবুকে সেলাম করিয়া কতকটা সুস্থ মনেই সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

(৬)

রাত্রে ডাক্তার যে ঔষধ দিয়াছিলেন সকালবেলা তাহা বদ্‌লাইলেন। বিকালে আসিয়া আবার দেখিয়া বলিয়া গেলেন, বহুদিনের পীড়ায় ক্রমে-ক্রমে বালিকার জীবনী-শক্তির ক্ষয় হইয়াছে, ঔষধে কিছু হইবার নহে, এক যদি মনের দিক্ হইতে রোগমুক্তির কোনো সাহায্য হয় তবে সে বাঁচিয়া যাইতেও পারে। কিন্তু আনন্দের অনুপান যাহাই তাহার জন্য ব্যবস্থা করা হোক, তা'র মধ্যে অধিক-পরিমাণে উত্তেজনা যেন না থাকে।

দৌলতী মূর্চ্ছার ঘোরে ঘুমাইতেছিল, অশ্রুজলে ভিজিয়া ওয়াজিদ মাকে লুকাইয়া তাহার গলায় হারটি পরাইয়া দিল। কিন্তু দৌলতীকে সে কিছু দিতেছে এই ফাঁকি নিজেকে অধিকক্ষণ দিতে পারিল না। হারটি খুলিয়া লইতে যাইবে, চুলে বাধিয়া দুলী জাগিয়া উঠিল। প্রদীপের আলোয় হারের লকেটটি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল, সেদিকে চাহিয়া দুলীর চোখ-দুটিও যেন প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হারগাছি তাহার দাদা কোথা হইতে আনিয়াছে, কখন আনিয়াছে, আনিতে কত টাকা বা লাগিল কিছু সে জানিতে চাহিল না, কৃতজ্ঞতায় মুখটিকে ভরিয়া তুলিয়া লকেটটিকে মুঠোয় ভরিয়া দাদার কোলের কাছে ঘেঁসিয়া শুইল, যেন বলিতে চাহিল, কত ভাগ্যে তাহার অসুখ করিয়াছে, এখন এম্‌নি কেবল যদি থাকিয়া যায়!

কিন্তু এম্‌নি সময় বাহিরে বাবুদের বাড়ীর পাইকের হুঙ্কার শোনা গেল।—ইহারা সময়ে-অসময়ে একেবারে ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিত, অনেক মজা সুপারী

এবং কড়া তামাক ধ্বংস না করিয়া উঠিত না। ওয়াজিদ অত্যন্ত ত্রস্ত হইল। ছুলীর গলা হইতে হারটা সে প্রায় ছিঁড়িয়া ছিনাইয়া লইল। ছুলী "উঃ" করিয়া উঠিল, তা'র পর আর তা'র কোনো সাড়া মিলিল না। ওয়াজিদ বাহিরে আসিয়া শুনিল, বাবুরা ছুলীর খবর লইতে পাঠাইয়াছেন, তাহার বেশী কিছু নহে। তাহার মনের একটা দিক্ একটু হাল্কা হইতেই সে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া গল্প জুড়িয়া দিল। কাতুরাণী যথাসময়ে স্নানাহার করিতেছে কি না, তাহাকে সকালে বিকালে বেড়াইতে কে লইয়া যাইতেছে, ঢাকা হইতে যে কারিকর তা'র পুতুলের জন্ম জরিপাড় শাড়ী বুনিয়া পাঠাইবে বলিয়াছিল, তাহার নিকট হইতে কোনো খবর পাওয়া গিয়াছে কি না, এম্নি আরও অনেক কথাই হইল। একটা নলের বেহালা তৈরি করিয়াছিল, পেয়াদার হাতে সেইটি পাঠাইল, তা'র পর ঘরে আসিয়া দেখিল, ছুলী আবার মূর্চ্ছিতদেহে এলাইয়া পড়িয়াছে। ডাকাডাকি করিল, নাড়া দিল, সাড়া মিলিল না। মুখেচোখে জলের ছিটা দিয়া মূর্চ্ছা ভাঙাইবার ব্যর্থ চেষ্টা কিছুক্ষণ করিয়া রোরুদ্যমানা মাকে ছুলীর কাছে বসাইয়া আবার সে ডাক্তারের খোঁজে গেল।

ডাক্তার আবার আসিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন, তা'র পর বলিলেন যে, তাঁহার সাধ্যের সীমা বহুক্ষণ পার হইয়া গেছে, ওয়াজিদ যদি ইচ্ছা করে সহরে তার করিয়া ভালো ডাক্তার আনিয়া দেখাইতে পারে। ওয়াজিদ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হারটাকে কাপড়ের খুঁটে লুকাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। একপ্রকার ছুটিতে-ছুটিতে সে রায়গঞ্জের বাজারে আসিয়া হাজির হইল। ভাবিল, ধরা যদি পড়ে ত পরে পড়িবে, আপাতত কোনও মহাজনের কাছে হার গচ্ছিত রাখিয়া টাকা লইবে ও সেই টাকায় দৌলতীর চিকিৎসা চালাইবে। সহর হইতে ডাক্তার আনিতে কত খরচ পড়িতে পারে সে-সম্বন্ধে তাহার কোনোই ধারণা ছিল না, তবু হার বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা সে পাইল এবং তাহাই লইয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ঘুমন্ত দৌলতীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রভাতের প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু পূর্ব্বাকাশ প্রভাতের আলোয় যখন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ঠিক তখনই দৌলতীর নির্ভরভরা করুণ চোখদু'টিতে চিরদিনের মতো রাত্রি নামিয়া আসিল।

(৭)

যে-মহাজনদের কাছে ওয়াজিদ হার গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া ইতিমধ্যেই রাজদরবারে এত্তেলা করিয়া আসিয়াছে। বাবুরা গোপনে বসিয়া সব শুনিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করিয়া তা'র পর বলিয়াছেন, এই হার তাঁহাদেরই বাড়ীর জিনিষ বটে, কিন্তু ওয়াজিদকে ইহা তাঁহারা বক্শিস্ করিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে তাহাকে কিছুই যেন না বলা হয়। সুতরাং হার লইতে আসিবার সময় ধরা পড়িতে কতকটা প্রস্তুত হইয়া আসা সত্ত্বেও ওয়াজিদকে কেহ ধরিল না। সুদের টাকা লইয়া মহাজনদের সঙ্গে সে তর্ক করিল, বলিল, "তোমাদের টাকাও যেমন টাকা, আমার সোনাও তেম্নি সোনা, ওর যদি সুদ থাকে ত এরই বা কেন থাক্‌বে না ?"

রায়বাবুদের বাড়ীর কাছাকাছি যখন আসিল, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত আলো নিবিয়া গিয়া সকলে ঘুমাইয়া পড়ার অপেক্ষায় বহুক্ষণ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া রহিল। যখন কোথাও আর কিছুর সাড়াশব্দ রহিল না, তখন ছুটিয়া আসিয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। অন্দরের দীঘির ঘাটের দরজা প্রায়ই রাত্রে খোলা থাকিত। সেদিক্ দিয়া সাঁৎরাইয়া গিয়া ঢোকা কঠিন হইত না, কিন্তু সে গাছে চড়িবার বিদ্যাতেও অদ্বিতীয় ছিল; একটা পেয়ারা-গাছের ডাল লাফ দিয়া ধরিয়া ঝুলিয়া, দোল খাইয়া দোল খাইয়া হঠাৎ একসময় দেয়ালের উপর উঠিয়া পড়িল। ভিতরের দিকে, প্রায় দেয়ালের আর-এক প্রান্তে কাতুর আদরের গাই "চুমি" দাঁড়াইয়া তা'র-বাছুরের গা চাটিয়া দিতেছিল, সাবধানে তাল সাম্‌লাইয়া সে সেইদিকে গেল এবং চুমির পিঠ আশ্রয় করিয়া ভিতরের উঠানে নামিয়া পড়িল।

ভয়ে উত্তেজনায় তা'র সারা গা ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছিল। একবার হোঁচট খাইয়া প্রাণপণে সাম্‌লাইয়া গেল, পরক্ষণেই সম্মুখে যে-জায়গা খোলা পাইল তাহার ভিতর

দিয়া হারটাকে প্রাণপণে ছুড়িয়া দিয়া পিছন ফিরিয়া ছুট্‌ দিল।

হারটা যতক্ষণ তা'র হাতে ছিল, তা'র সাবধানতার অন্ত ছিল না, কিন্তু ভয়ের আসল কারণটা দূর হইয়া যাইতেই তা'র ক্রমাগত ভুল হইতে লাগিল। ছুটিতে গিয়া পায়ের শব্দ হইল, চুবির পিঠ আশ্রয় করিয়া আবার দেয়ালে চড়িবার চেষ্টা করাতে সে ভয় পাইয়া লেজ উঁচু করিয়া উঠানময় ছুটাছুটি করিল। পেয়ারা-গাছের ডা'লটাও ঝুঁকি সহিতে না পারিয়া ভাঙিয়া পড়িত, কিন্তু বাবুদের বাড়ীর পাইকরা সেটাকে রক্ষা করিল, ওয়াজিদ শূন্যে থাকিতে-থাকিতেই তাহাকে তাহারা ধরিয়া ফেলিল।

ওয়াজিদের আর-কিছুতে বাধিত না, কিন্তু চোর বলিয়া কাতুর কাছে ধরা পড়া, তা'র চোখের সম্মুখে নাজেহাল হওয়া, এই সম্ভাবনামাত্রেই তা'র শরীরে লাঠিয়ালের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। পেয়ারা গাছের যে-ডালটা দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছিল সেটাকে মড়মড় করিয়া সে টানিয়া ভাঙিল, তা'র পর চীৎকারে হুঙ্কারে লাঠি-সোটার ফটাফট শব্দে যথারীতি প্রলয় বাধিয়া গেল।

ভোরবেলা আপাদমস্তক রক্তচিহ্নিত ওয়াজিদকে যখন বাবুদের দরবারে ধরিয়া আনা হইল, তখন তাঁহারা তাহাকে কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাহার একটি অপরাধকে কাটাইয়া দিতে-না-দিতেই তাহার এই দ্বিতীয় অপরাধ তাঁহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছিল। সে যে স্বভাবতই চোর সেবিষয়ে তাঁহাদের আর সন্দেহ রহিল না। তৎসত্বেও, কুড়ি বৎসর আগে হইলে সহজেই সমস্যা মিটিতে পারিত। তাহাকে গ্রামের এলাকার বাহির করিয়া দিয়া হাতী পাঠাইয়া তাহার দু'তিনটি খোড়োঘরকে গুঁড়া করিয়া দিলেই তাঁহাদের চূড়ান্ত কর্তব্য করা হইত। কিন্তু জমিদারের কাছারী ঘেঁসিয়া তখন পুলিশের থানা বসিয়াছে। যে মীমাংসা বাবুরা করিতে পারিলেন না, পুলিসের লোকেরা খবর পাইয়া সাজগোজ করিয়া আসিয়া অযাচিতভাবে তাহার ভার লইল।

বাবুরা ওয়াজিদের দোষ ঢাকিবার নানা চেষ্টা করিলেন, বহু টাকা ঘুস কবুল করিলেন; কিছুতেই কিছু হইল না। দারোগা বলিল, ওয়াজিদ যদি ধরা পড়িয়া একজন পাইকের একটা হাতকে জন্মের মতো অকেজো করিয়া না দিত এবং আর-একজনের মাথাটি চৌচীর করিয়া না ফাটাইত তবে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সম্ভব-অসম্ভব যেকোনো গল্প অবাধে বিশ্বাস করিতে সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন তাহা করিলে চাকুরি যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাকেও জেলে যাইতে হইতে পারে।...

ওয়াজিদ তিন বৎসরের জন্য জেল খাটিতে যাইবার ঠিক পাঁচ দিন পরে সেজোবাবুর ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া তাঁহার খাটের তলা হইতে কাতুর হারানো হারটি ফিরিয়া পাওয়া গেল। বাবুরা আবার একবার পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করিলেন, তা'র পর ভুলিয়া গেলেন। হারটি যেমন ধূলি ও ঝুল মাখিয়া বাহির হইয়াছিল, তেমনিভাবেই কিছুদিন কাতুর ঘরে আয়নার টেবিলের একটা দেরাজে পড়িয়া রহিল। মেজোগিন্নি রোজ মনে করেন, তুলিয়া রাখিবেন, রোজ কিছু-না-কিছু একটা কাজের গোলমালে ভুলিয়া যান। শেষে যে-দিন তিনি নিতান্তই মনের কল্পনাটাকে কাজে পরিণত করিতে আসিলেন, সেদিন আবার সেটাকে কিছুতেই কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এবারেও মেজোগিন্নি সম্মুখে যাহাকে পাইলেন তাহাকেই একটু বকাবকা করিলেন, বাবুরা দাঁড়াইয়া শুনিয়া যার-যার কাজে গেলেন, ঝি-চাকরেরা পরস্পরের মধ্যে কলহ করিল, এবং পরের দিন কাহারোই আর কিছু মনে রহিল না।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

*

বিকাল বেলা ধনিষ্ঠা গৌরীর কাছে বাস্তবিকই পড়্‌তে বস্‌ল। পড়্‌তে-পড়্‌তে যেই চারটে বাজ্‌ল ধনিষ্ঠা অম্‌নি চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। সে হেসে গৌরীকে বল্‌লে—মাষ্টার মশায়, এইবার তোমার পোড়োকে ছুটি দিতে হবে। তুমি খেলা করো গে, আমি কাজ করি গে।

গৌরী মার সঙ্গে পড়া-পড়া খেলাই কর্‌ছিল; সেই খেলা ছেড়ে অন্য খেলা কর্‌তে যেতে তার মন সর্‌ছিল না; কিন্তু প্রতিবাদ কর্‌তে অনভ্যস্ত সে একবার মার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে সেখান থেকে উঠে চলে' গেল।

গৌরী চলে' যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই ধনিষ্ঠাও ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং গৌরীর সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজের আপিস-ঘরে গিয়ে প্রবেশ কর্‌লে।

আপিস-ঘরে এসে সে চেয়ারের উপর চুপ করে' বসে' রইল। রোজ চারটার সময় অনল জমিদারীর কাগজপত্র দেখাতে শোনাতে সই করাতে নিয়ে আস্‌ত। ধনিষ্ঠা তাকে আস্‌তে নিজে বারণ করেছে। আজ হয়তো নিয়ে আস্‌বে হরকান্ত পেশ্‌কার, কিন্তু ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে এই আশা এক-একবার উঁকি মার্‌ছিল যে এমন হয়তো কোনো কাজ থাকবে যা হরকান্তকে দিয়ে বলে' পাঠালেই চল্‌বে না, অনলকে নিজে আস্‌তে হবে। আবার পর-ক্ষণেই মনে হচ্ছিল, আজ তিনি কিছুতেই আস্‌বেন না; কাল তাঁকে আস্‌তে বারণ করেছি, বিশেষ কাজ থাক্‌লেও আজ তিনি কিছুতেই আস্‌তে পার্‌বেন না।

চারটে বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেল। ঘড়ীর দিকে চেয়েই ধনিষ্ঠার মনে হ'ল আজ তিনি কখনই আস্‌বেন না; তিনি এলে কখনোই এত বিলম্ব হ'ত না—তিনি এতদিন এসেছেন একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় চারটেতে; তাঁর সব কাজ একেবারে ঘড়ী-ধরা। আজ নিশ্চয়ই হরকান্তের শুভাগমন হবে।

এত লোক থাক্‌তে সে ঐ মোটা কালো অতি স্থবির জড়ভরত হরকান্তকে দিয়ে তার কাছে কাগজপত্র পাঠাতে বলেছিল কেন? ওর চেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি কি তার সেরেস্তায় কেউ ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, হরকান্তের চেয়ে যে-কেউ সুদর্শন। কিন্তু সে বেছে-বেছে হরকান্তের আগমনই বাঞ্ছা করেছিল এইজন্যে যে অতিনিন্দুকও হরকান্তকে নিয়ে কোনোরকম কুৎসা রটাবার কল্পনা মনের কোণেও স্থান দিতে পার্‌বে না।

চারটা বেজে কুড়ি মিনিট। খান্‌সামা এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—পেশ্‌কার মশায় এসেছেন।

অনলের আগমনের ক্ষীণ-আশা ধনিষ্ঠার মন থেকে খান্‌সামার কথার ফুৎকারে উড়ে গেল। সে উদ্‌গত দীর্ঘনিশ্বাস চেপে মাথার কাপড় একটু টেনে দিয়ে খান্‌-সামাকে বল্‌লে—নিয়ে এস।

কাগজপত্রে সই করিয়ে নিয়ে হরকান্ত পেশ্‌কার প্রস্থান কর্‌লে ধনিষ্ঠা উঠে গিয়ে তার নূতন পূজার ঘরে খড়খড়ির ফাঁকে চোখ দিয়ে বস্‌ল—এইবার আপিসের ছুটি হবে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর কাছারীর পেটা ঘড়ীতে পাঁচটা বাজ্‌ল। কর্ম্মচারীরা দলে-দলে বেরিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল এবং উঠানে নেমে নানান্ দিকে চলে' যেতে লাগ্‌ল। সকলে চলে' গেলে পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিটের সময় অনলের চাপরাসী মহীপৎ সিং দরজার সাম্‌নে তার বস্‌বার টুল ছেড়ে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ধনিষ্ঠা বুঝ্‌তে পার্‌লে যে অনলও তা হ'লে আপিসঘরের ভিতরে চেয়ার ছেড়ে উঠেছে। মিনিট খানেক পরেই অনল ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, মহীপৎ সিং সেলাম করে' তটস্থ হয়ে দাঁড়াল। অনলের পিছনে-পিছনে তার আর্‌দালী সকালবেলার মতন ডেসপ্যাচ বক্সের

উপর কাগজের নথি ফাইল চাপিয়ে চল্‌ল। আবার সকাল বেলার মতন মালখানার পাহারাওয়ালা বন্দুক নামিয়ে ম্যানেজার-সাহেবকে সম্মান দেখালে, দেউড়ির পাহারাওয়ালা কিরীচ অর্দ্ধমুক্ত করে' ফৌজী কায়দায় কুর্ণিশ কর্‌লে।

আজ থেকে ধনিষ্ঠার এই ধরা-বাঁধা কাজ হ'ল—সকাল থেকে দশটা পর্য্যন্ত পূজো জপ করা, এগারোটার সময় কর্ম্মচারীদের কাছারীতে আসা দেখা; দুপুর বেলা গৌরকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, বিকালে গৌরীর কাছে পড়া, অঙ্ক কষা, চারটের সময় অনল আস্‌বে আশা করে' প্রতীক্ষা করা এবং হরকান্তের আবির্ভাবে মনমরা হয়ে জমিদারীর কাগজে দস্তখৎ করা; আবার তার পর পূজার ঘর থেকে আপিসের ছুটির পর কর্ম্মচারীদের প্রস্থান পর্য্যবেক্ষণ করা। রোজই হরকান্তই আসে; সেই এসে বলে—ম্যানেজার বাবু আপনাকে বল্‌তে বলেছেন…… ……, অথবা ম্যানেজার-বাবু এই কাগজগুলো আপনাকে বিশেষ করে' দেখে হুকুম দিতে বলেছেন……, কিন্তু ম্যানেজার-বাবুর স্বয়ং আসার আবশ্যক একদিনও কি হ'তে নেই? ধনিষ্ঠা যতই হরকান্তের কুশ্রী চেহারা দেখে ততই তার মনের সাম্‌নে অনলের অনলপ্রভ দিব্যসুন্দর কান্তি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে-ফুটে ওঠে।

প্রতীক্ষায়-প্রতীক্ষায় দশ দিন কেটে গেল; অনল একদিনও আসা আবশ্যক মনে কর্‌লে না ধনিষ্ঠা মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। সে নিজের কাছেও ঠিক স্বীকার কর্‌তে চায় না যে সে অনলের অনুরাগিণী; অথচ অনল যে তার কাছে না এসে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌ছে, এতেও সে ক্লেশ অনুভব কর্‌ছিল; সে কি অনলের কাছে এমনই তুচ্ছ যে তার আস্‌বার উপায় থাকা সত্ত্বেও অনল এই কদিনের মধ্যে একবার আসার তাগাদা অনুভব করেনি; অথবা অনলও তারই মতন ঔৎসুক্যের আগ্রহের বেদনা বোধ কর্‌ছে, কিন্তু সে বীরপুরুষ, সকল দুঃখ অভাব সে যেমন অম্লানবদনে বহন করেছে এই বেদনাও সে তেম্‌নি সহজে সহ্য কর্‌ছে। এই কথাটাই ধনিষ্ঠার মনে খুব সঙ্গত বলে' মনে হ'ল এবং দুঃখের মধ্যেও সে আনন্দ অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল এই ভেবে যে অনলও তারই মতন বিচ্ছেদবেদনা সহ্য কর্‌ছে এবং অনল সাধারণ পুরুষের চেয়ে চরিত্রবলে শ্রেষ্ঠ, সে বীরপুরুষ; সে যদিই অনলকে দেখে একটুও মুগ্ধ হয়ে থাকে তবে সে অপাত্রে তার শ্রদ্ধা সমর্পণ করেনি।

অনল যখন কিছুতেই কোনো কাজের উপলক্ষ্যেই আসে না, তখন ধনিষ্ঠার ইচ্ছা হ'তে লাগল যে সেই কোনো উপলক্ষ্যে অনলকে একদিন ডেকে পাঠাবে। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যটি কি হবে? ধনিষ্ঠা হাজার-রকম প্রয়োজন উদ্ভাবন কর্‌লে, কিন্তু সব-কটাই তার কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল—তার মনে হ'তে লাগ্‌ল, এইরকম কোনো উপলক্ষ্যে অনলকে ডেকে পাঠালে সে অনলের কাছে হাতে-হাতে ধরা পড়ে' যাবে।

বৈষয়িক কর্ম্ম-উপলক্ষ্যে অনলকে আহ্বান করার সুযোগ না দেখ্‌তে পেয়ে ধনিষ্ঠা পাঁজি দেখ্‌তে বস্‌ল, যদি কোনো পার্ব্বণ-উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে পারা যায়। এটা অগ্রহায়ণ মাস; এ-মাসে কোনো পূজা ব্রত নেই; পৌষ মাসেও না—একেবারে পৌষ মাসের শেষে দধি-সংক্রান্তি ব্রত তার কর্‌তে হবে। অগ্রহায়ণ মাসে অখণ্ডদ্বাদশী ব্রত বা পাষাণচতুর্দ্দশী ব্রত নূতন নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু এইসব নূতন ব্রত নিয়ে তার নিজের কষ্ট স্বীকার করা ছাড়া আর কিছু লাভ হবার তো সম্ভাবনা নেই; ব্রত-উপলক্ষ্যে আর-দশজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনল খেতে আস্‌বে আর খেয়ে দক্ষিণা নিয়ে চলে' যাবে—এতে চোখের দেখা ছাড়া একটি কথা কইবারও সুযোগ ঘটবে না। চোখের দেখা তো সে রোজই দেখ্‌ছে—এ না হয় দূর থেকে দেখ্‌ছে, আর দক্ষিণা দেবার সময় সে নিকটে গিয়ে দেখ্‌তে পাবে এইমাত্র তো তফাৎ। ব্রতের দানসামগ্রী আর তো সে অনলকেই কেবল দিতে পার্‌বে না, অনলকে ব্রতের প্রধান দান দেওয়াতে যখন কথা হয়েছে, তখন এবার থেকে অনলকে বেশী-কিছু দেওয়া উচিত হবে না; অনলই যদি লাভবান্ না হয় তবে মিছামিছি আর কোন্ লোকের ঘর ভরাবার জন্যে সে কষ্ট করে' নূতন ব্রত নিতে যাবে? সে অপেক্ষা করে'ই দেখ্‌বে কতদিনে অনল নিজে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে।

*
* *

পূজোর ঘর থেকে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ফুলের মতন দুটি চোখের দৃষ্টি অনলের আসা-যাওয়ার পথের উপর সকাল-বিকাল পেতে রেখে ধনিষ্ঠার দেড় মাস কেটে গেল; অনল একদিনও ধনিষ্ঠার সঙ্গে একটা কাজের কথার পরামর্শ কর্‌তেও এল না। সমস্ত গ্রাম বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে স্তব্ধ হয়ে উঠেছিল। জানো সবাইকে বলে' বেড়াচ্ছিল—"তবে যে তোরা ভালোমানুষের নামে বড় কলঙ্ক দিয়ে বেড়াচ্ছিলি, এবার বল্ কি বল্‌বি?" সাধনের মতন কারো কিছু বল্‌বার থাক্‌লেও কেউ সাহস করে' বল্‌তে পার্‌ছিল না; সবাই নিরুত্তরে শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়িই কর্‌ছিল। কিন্তু তা'রাও নিজের অন্তরের মধ্যেও ঠিক সাড়া পাচ্ছিল না যে মনে-মনেও বলে ধনিষ্ঠা ও অনলের মনোমালিন্য ঘটেছে; অনলের ভাইঝি গৌরীর আদরের এতটুকুও হ্রাস হয়নি, ম্যানেজার অনলের প্রতাপও একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি; অথচ অনাবিষ্কৃত একটা ঘন রহস্য যে অনল ও ধনিষ্ঠার মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে এটাও অস্বীকার কর্‌বার জো নেই।

পৌষ মাসের শেষে উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির দিন দধি-সংক্রান্তির ব্রত। তার আগের দিন ধনিষ্ঠা তার ব্রত-পূজা-পার্ব্বণের ব্রাহ্মণ পরিচারক প্রাণকৃষ্ণকে ডেকে বল্‌লে—কেষ্ট ঠাকুর, গ্রামের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে' এস, কাল আমার এখানেই তাঁরা অনুগ্রহ করে' পৌষপার্ব্বণ কর্‌বেন।

প্রাণকৃষ্ণ ধনিষ্ঠার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—গ্রামের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হবে?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—হ্যাঁ।

প্রাণকৃষ্ণ একটু ইতস্তত করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সাধন চক্রবর্ত্তী মশায়কেও?

ধনিষ্ঠা নিজের পূর্ব্ব কঠিন আচরণের কথার উল্লেখে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, কাউকে বাদ দিয়ে কাজ নেই; তবে সবাইকে বলে' দিয়ো, আমার বাড়ীতে ভোজন কর্‌তে যে-ব্রাহ্মণের আপত্তি আছে তিনি যেন কেবল-মাত্র জমিদারের খাতিরে খেতে এসে নিজের ধর্ম্ম নষ্ট না করেন। তা'তে আমি একটুও অসন্তুষ্ট হবো না। এ-কথাটা সবাইকে তুমি বেশ করে' বুঝিয়ে বলে দিয়ো।

প্রাণকৃষ্ণ "যে আজ্ঞে" বলে' চলে' গেল।

অনল যখন শুন্‌লে যে এবার সাধনেরও নিমন্ত্রণ হয়েছে তখন সে একটা প্রচ্ছন্ন গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দ অনুভব কর্‌লে।

সাধন নিজের গৃহিণীকে বল্‌লে—বড়লোকদের লীলা-খেলা বোঝা ভার!

পরদিন প্রত্যূষে উঠে ধনিষ্ঠা নিজের হাতে নানাবিধ পিঠে প্রস্তুত কর্‌তে লেগে গেল—মুখশাওলী, রসবড়া, গোকুল-পিঠে, পাটি-সাপটা, গোল-আলুর পিঠে, রাঙা আলুর পিঠে, চিড়ার পিঠে, ক্ষীরের মালপো; ব্রাহ্মণীকে দিয়ে সরু-চাক্‌লি, আস্কে-পিঠে, চালের গুঁড়োর সিদ্ধ পিঠে প্রস্তুত করাতে লাগ্‌ল। তার এত আয়োজনের তলায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল গ্রামের সকল ব্রাহ্মণ-ভোজনের পুণ্যসঞ্চয়ের লোভের ছদ্মবেশে একটিমাত্র ব্রাহ্মণের পরিতোষ।

ব্রত সাঙ্গ হলে ধনিষ্ঠা ব্রাহ্মণভোজন দেখ্‌বে বলে নীচের তলায় যেখানে ব্রাহ্মণেরা ভোজনে বসেছে তারই সাম্‌নের উপরের এক ঘরে এসে খড়খড়ির পাখী তুলে দাঁড়াল। সে চারি দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু কোথাও যাকে দেখ্‌তে চায় তাকে দেখ্‌তে পেলে না; তখন সে জান্‌লা থেকে সরে' অপর জান্‌লায় গেল, দেখ্‌লে অনল সকলের সঙ্গে খেতে বসেছে বটে, কিন্তু এক-টেরে একটা থামের আড়ালে, সেই জান্‌লা থেকে তার শরীরের আভাস-মাত্র দেখা যাচ্ছে। ধনিষ্ঠা সেই ঘরের প্রত্যেক জান্‌লায় গিয়ে নানান্ দিক্ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কোথাও থেকে অনলকে স্পষ্ট দেখা যায় কি না। বৃথা চেষ্টা। থামটা দুর্ভেদ্য আড়াল করে' আছে। তখন ধনিষ্ঠার রাগ হ'তে লাগ্‌ল অনলের উপর—সে কেন এত জায়গা থাক্‌তে ঐ কোণে আড়ালে বস্‌তে গেল। ধনিষ্ঠার ইচ্ছার যদি ধাক্কা দেবার শক্তি থাক্‌ত,তা হ'লে ঐ থামটা ভূমিসাৎ হয়ে গুঁড়িয়ে যেত। সে যে ভোর-বেলা থেকে এত পরিশ্রম করে' নিজের হাতে এত পিঠাপুলি প্রস্তুত কর্‌লে, তা যার ভোগের জন্যে তাকেই সে দেখ্‌তে পেলে না, এমনই তার দুরদৃষ্ট!

ব্রাহ্মণদের ভোজন হয়ে গেল। প্রাণকৃষ্ণ সকলকে অন্দর ও সদরের মধ্যবর্ত্তী দালানে ডেকে নিয়ে এল, রাণী-মা সকলকে নিজের হাতে ভোজন-দক্ষিণা দিবেন।

ধনিষ্ঠা এসেই সঙ্কুচিত দৃষ্টি চকিতে একবার সকল ব্রাহ্মণের মুখের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে দেখ্‌লে, ম্যানেজার হ'লেও অনল প্রায় সকলের শেষে দাঁড়িয়ে আছে। ধনিষ্ঠা এক-একখানি নূতন পাথরের রেকাবিতে ফল উপবীত ও দধিপূর্ণ বাটি নিয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেবে; প্রাণকৃষ্ণ একখানি রেকাবি তুলে ধনিষ্ঠার হাতে দিলে। সাধন চক্রবর্ত্তী ধনিষ্ঠার নজরে ভালো করে' পড়্‌বে বলে সকলের আগে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে ধনিষ্ঠার হাত থেকে দক্ষিণা নিতে অগ্রসর না হয়ে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে অনলকে ডাক্‌লে—ম্যানেজার-বাবু, আগিয়ে আসুন, রাণী-মা দক্ষিণা দিচ্ছেন।

অনল একজনের সঙ্গে কথা বল্‌ছিল, সে সাধনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বল্‌লে—আপনাদের দক্ষিণাই আগে হয়ে যাক, আমার পালা.........

সাধন ব্যস্তভাবে বলে' উঠ্‌ল—আরে মশায়, এও কি একটা কথা হ'ল, আপনি থাক্‌তে অগ্রণী কি আর কেউ হওয়া সাজে.........

অম্‌নি আর দশ জনে বলে' উঠল—হাঁা, হাঁা, আপনি হলেন গিয়ে সকলের প্রধান, সকলের মাথার মণি......

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল; অত শীতের দিনেও তার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিলে; তার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় শিউরে-শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

আর আপত্তি করা অশোভন হবে মনে করে' অনল হাসিমুখে এগিয়ে এসে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে দুহাতের অঞ্জলি পেতে দাঁড়াল; তার মনে হ'ল যেন অনল-শিখা তাকে দগ্ধ কর্‌বার জন্যে লকলক করে' তার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে; ধনিষ্ঠা চোখ তুলে অনলের মুখের দিকে আর তাকাতে পার্‌লে না, সে নতনয়নে কম্পিত-হস্তে অনলের হাতের উপর থালা রেখে দিলে।

তার পর প্রাণকৃষ্ণ একে-একে তার হাতে দক্ষিণার থালা তুলে-তুলে দিতে লাগল, আর ধনিষ্ঠা কলের পুতুলের মতন সেগুলি তার সাম্‌নে প্রসারিত এক-এক ব্রাহ্মণের হাতে সম্প্রদান করে' দিলে; সে একবারও চোখ তুলে দেখ্‌লে না যে কার হাতে সে দক্ষিণা দিচ্ছে।

*
* *

সাধন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ম্যানেজার বলে' অনলকে সর্ব্বাগ্রে দক্ষিণা নিতে অনুরোধ করেছিল কি ধনিষ্ঠার প্রিয়পাত্র বলে তাকে অগ্রণী হ'তে বলেছিল, এই সন্দেহে ধনিষ্ঠার অন্তর নিরন্তর পীড়িত হচ্ছিল; সে যতই ভাব্‌ছিল, ততই ব্রাহ্মণদের কথার মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ইঙ্গিত তার মনের সাম্‌নে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল। এক-একবার ধনিষ্ঠা লজ্জায় অপ্রতিভ হচ্ছিল, আবার এক-একবার সে সকলকে উপেক্ষা-অগ্রাহ্য করে' নিজেকে অহঙ্কারের সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কর্‌ছিল—"বলুক গে যে যার খুশী, আমি কি কাউকে ভয় করি, না কারো তোয়াক্কা রাখি। আর আমি তো কিছু অন্যায় অপকর্ম্ম করিনি যে লজ্জা পাবো।" কিন্তু তখনই আবার তার মনে হচ্ছিল—"স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে ভালো লাগাও যে অপরাধ!" ধনিষ্ঠা নিজের মনেও অনলের প্রতি তার মনের ভাবকে ভালোবাসা বল্‌তে সঙ্কোচ বোধ করে' ভালো লাগা বল্‌লে। পরক্ষণেই সে আবার এই ভেবে সান্ত্বনা খুঁজ্‌লে যে—বাঃ রে! ভালো লোককে ভালো লাগ্‌বে না!

ধনিষ্ঠার মন অনলের চিন্তায় যখন একেবারে পরিপূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে তখন একদিন মাধবী এসে তাকে হাস্‌তে-হাস্‌তে উৎসাহে ব্যস্ত হ'য়ে খবর দিলে—মা গো মা, ননী ঘটক ম্যানেজার-বাবুর···

মাধবীর কথার এইটুকু ধাঁ করে' ছুটে গিয়ে ধনিষ্ঠার বুকে এমন জোরে ধাকা দিলে যে তার সর্ব্বাঙ্গের শিরা-উপশিরা ঝিনঝিনিয়ে উঠল, মাধবীর কথার শেষটুকু, "বিয়ের সম্বন্ধ কর্‌তে এসেছিল," সে আপনি আন্দাজ করে' নিতে পেরেছিল। ধনিষ্ঠার মনের উপর দিয়ে চকিতে চিন্তার ঝড় বয়ে গেল—"উনি যদি বিয়ে করেন তাতে আমার কি, বিয়ে নাই যদি করেন তাতেই বা আমার কি? কেন তিনি চির-জীবনটা একলা থাক্‌বেন, কিসের জন্যে?" এই কথা মনে ভাব্‌লেও ধনিষ্ঠা তার ম্যানেজারের বিয়ের খবরে মুখে কিছুমাত্র উৎসাহ বা সন্তোষ

দেখাতে পার্‌লে না, সে চুপ করে' মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাধবী বল্‌তে লাগ্‌ল—কেতনপুরের জমিদারের মেয়ে, বেশ ডাগর, সুন্দর; তারা খুব সুন্দর সুচ্ছিরি একটি পাত্তর চায়। তা আমাদের ম্যানেজারবাবুর মতন সুন্দর পাত্তর আর পাবে কোথায়? মেয়েও ভালো ঘরও ভালো, এ বিয়ে হ'লে বেশ হ'ত ·········

মাধবীর কথার এই "হ'লে হ'ত" শব্দদুটি সম্ভাবনাকে নিরস্ত করে' দিতেই ধনিষ্ঠার মন প্রফুল্ল ও প্রবল উৎসুক হয়ে উঠ্‌ল, তখন সে হেসে কথা বল্‌তে পার্‌লে—কিন্তু হ'ল না কেন?

মাধবী বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবু এই ব'লে, ননী ঘটককে ফিরিয়ে দিলেন যে তিনি কখনো বিয়ে কর্‌বেন না···

ধনিষ্ঠার মন অকস্মাৎ অকারণ আনন্দে যেন নৃত্য করে উঠ্‌ল। মাধবী বল্‌তে লাগ্‌ল—কে একজন অচেনা লোক এসে মেম-দিদিমণিকে যদি দেখ্‌তে না পারে ······

ধনিষ্ঠার মনটা আবার দমে' গেল—ও। এইজন্যে তিনি বিয়ে কর্‌বেন না? ভাইঝির কষ্ট হবার ভয়ে? আর-কিছুর জন্যে নয়?

এই আর-কিছুটা যে কি তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই রয়ে' গেল,মনের সাম্‌নে সেটাকে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে সে দিলে না।

এই সংবাদ পাওয়ার পর অনলের সঙ্গে দেখা কর্‌বার বাসনা ধনিষ্ঠার মনে প্রবল দুর্দ্দম হয়ে উঠ্‌ল। সে পরদিন সকাল বেলা উঠেই অনলকে বলে' পাঠালে—যদি আপনার অবকাশ থাকে তা হ'লে আজ বিকালে যখন হয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বেন।

আজও ধনিষ্ঠা পূজার ঘরে বসে' বসে' খড়খড়ির পাখীর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি পাঠিয়ে অনলকে আপিসে আস্‌তে দেখ্‌লে—আজ অনলকে যেন আরো ভাস্বর বলে' বোধ হ'ল; অনল বিয়ে কর্‌'ত চায় না পিতৃমাতৃহীন ভাইঝির পাছে কোনো ক্লেশ হয় এই সুদূর সম্ভাবনার কল্পনার ভয়ে! এ কী কম আত্মত্যাগ, সাধারণ সংযম, সামান্য স্নেহপরায়ণতা? অনলের ভাইঝির সকল ভার তো স্বেচ্ছায় সানন্দে ধনিষ্ঠা গ্রহণ করেছে, অনল তো অনায়াসেই ভাইঝির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ঘর-কন্না পাত্‌তে পারত; তবু যে সে অস্বীকার কর্‌ছে এ কি ভাইঝির প্রতি অত্যধিক স্নেহ মমতার পরিচয়, না তদতিরিক্ত আর-কিছু, যা সে প্রকাশ করে' বল্‌তে পারে না বলে'ই ভাইঝির বেনামিতে বিয়ে কর্‌তে আপত্তি কর্‌ছে? এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা ধনিষ্ঠার মনে উদয় হ'তেই তার বুকের রক্তে ঢেউ খেলে উঠ্‌ল, আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

বিকাল বেলা হরকান্ত পেশকার ম্যানেজারের কাছে কর্ত্রীকে দিয়ে সই করাবার কাগজপত্র বুঝে নিতে গেল। অনল একটা কাগজে কি লিখ্‌তে-লিখ্‌তে মাথা না তুলেই বল্‌লে—একটা বিশেষ কাজের জন্যে আজ একবার আমাকে রাণীর কাছে যেতে হবে, আমিই চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়ে আস্‌ব, আপনাকে আর কষ্ট করে' যেতে হবে না।

"যে আজ্ঞে" বলে'হরকান্ত নিষ্ক্রান্ত হ'তেই অনল তার দ্বারবানকে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলে। মহীপৎ সিং ঘরে এসে দাঁড়াতেই একটা কাগজ পত্রের ফাইল তার হাতে দিতে-দিতে অনল বল্‌লে—অন্দরে নিয়ে যেতে হবে।

অনল অন্দরের উদ্দেশে রওনা হ'ল, পিছনে-পিছনে চল্‌ল মহীপৎ সিং।

ধনিষ্ঠা এই সময়টিতে অনলের শুভাগমন দর্শন কর্‌বার প্রতীক্ষাতে তার পূজার ঘরের জান্‌লায় চোখ দিয়ে বসে' ছিল। চারটের আগে থেকে প্রতি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে'-করে' সে দেখ্‌লে,হরকান্ত ম্যানেজারের ঘরে গেল; অমনই আশঙ্কায় তার বুক দুরুদুরু করে' উঠল—তা হ'লে আজও হরকান্তেরই আবির্ভাব হবে! হরকান্ত অতি অল্পক্ষণ পরেই খালিহাতে ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিজেদের আপিস-ঘরে চলে' গেল; এবং সঙ্গে-সঙ্গে মহীপৎ সিং তার টুল ছেড়ে উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকল; এ-দেখে ধনিষ্ঠার মন আশায় দুলে উঠ্‌ল। অল্পক্ষণ পরেই অনল বেরিয়ে অন্দরের দিকে রওনা হ'ল, তার পশ্চাতে কাগজ-পত্রের ফাইল নিয়ে আস্‌ছে মহীপৎ সিং। এই বহু প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেখে ধনিষ্ঠা প্রফুল্লমুখে তাড়াতাড়ি উঠে নিজের অপিস-ঘরে গিয়ে চুপ করে' বস্‌ল। অল্পক্ষণ পরেই তার খানসামা এসে তাকে তার জানা-খবর জানালে—ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

প্রতিদিনের বাঁধি বুলি "নিয়ে এস" বল্‌তে আজ

ধনিষ্ঠার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, গলার স্বর গাঢ় হয়ে গেল।

অনল এসে ঘরে প্রবেশ করলে।

প্রায় দু মাস অসাক্ষাতের পরে আজ উভয়ে পরস্পরের সন্নিহিত হয়ে দুজনেরই কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, যেন আজ তাদের আবার নূতন করে' পরিচয় হচ্ছে, নিত্যকার দর্শনের সেই শিক্ষক-ছাত্রীর সহজ ঘনিষ্ঠতা কেউ আর প্রকাশ করতে পারছিল না।

জমিদারী সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র দেখা-শোনা ও সই করা হয়ে গেল, কিন্তু দুজনের কেউই একথা উত্থাপন করতে পারলে না যে, ধনিষ্ঠার আহ্বানে অনল আজ তার কাছে এসেছে। সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে আর যখন ধনিষ্ঠার কাছে থাকবার কোনো প্রয়োজনই রইল না, তখন অনল কাগজ-পত্র তুলে নিয়ে গমনোদ্যত হ'ল; তখনও সে মনে করছিল যে এইবার ধনিষ্ঠা তাকে তার আহ্বানের প্রয়োজনের কথা বল্‌বে। সে যখন দ্বারের কাছে পর্য্যন্ত চলে' গেল তখনও ধনিষ্ঠা তাকে কিছু বল্‌লে না দেখে সে হতাশ হ'ল, অথচ কৌতূহলের আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠাতে সে ধনিষ্ঠার আহ্বানের কারণ না জেনেও যেতে পারছিল না। অনল মনে করলে, ধনিষ্ঠা হয়তো ভুলেই গেছে যে তারই আহ্বানে আজ অনল এসেছে। কিন্তু ধনিষ্ঠা সে-কথা মোটেই ভোলেনি। সে অনলকে কাছে এনে দেখ্‌বার আগ্রহে যে অছিলা করে' তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, অনল কাছে আসাতে সেই প্রয়োজন এমন অকিঞ্চিৎকর, এমন-কি হাস্যকর বলে' তারই মনে হ'ল যে সেকথা সে উত্থাপন করতেই পারলে না। অনল যখন তার আহ্বানের কথা উত্থাপন না করে'ই চলে' যেতে উদ্যত হ'ল তখন ধনিষ্ঠা যেন স্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল—যাক্‌ তাকে অনলের কাছে সেই হাস্যজনক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে হ'ল না।

অনল দরজা পেরিয়ে গিয়েও যখন দেখ্‌লে, ধনিষ্ঠা তাকে ফিরে ডাকলে না, তখন সে নিজেই আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল এবং যেন সে ভোলা কথা স্মরণ হওয়াতে ফিরে এসেছে এম্‌নিভাবে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন? কোনো কাজ ……

ধনিষ্ঠার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল,—মনে অভিমান ক্ষুব্ধস্বরে বলে' উঠ্‌ল—ওগো অম্‌নি কি কাউকে ডাকতে নেই? কিন্তু সে মুখে মৃদু নম্রস্বরে বল্‌লে—কাজ তেমন কিছু নয়……গৌরীর বিয়ের জন্যে একটি পাত্র… ..

ছ' বছরের মেয়ের বিয়ের জন্যে পাত্র। কথাটা বলতেই ধনিষ্ঠার কানে নিজের কথাই যেন বিদ্রূপের মতন বাজ্‌ল—এই কথা বল্‌তে অনলকে ডেকে আনা যে কত বড় স্পষ্ট ছলনা তা ধনিষ্ঠার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। অনলও বোধ হয় ধনিষ্ঠার ছল বুঝ্‌তে পেরেছিল, নইলে সে ধনিষ্ঠার ঐ অসম্ভব প্রস্তাবে হেসে না উঠে গম্ভীর হয়ে থেকেই বল্‌লে—যে আজ্ঞে, আমি ননী-ঘটককে বলে' দেবো খুঁজ্‌তে থাকবে।

অনলের এই উত্তরে ধনিষ্ঠা আরামও অনুভব করলে—যাক্‌, তা হ'লে তার প্রস্তাবটা অনলের কাছে নিতান্ত হাস্যকর হয়-নি; আবার সে অস্বস্তিও বোধ করতে লাগ্‌ল—এমন অসম্ভব প্রস্তাকে অনল না হেসে, আপত্তি না করে' গম্ভীর হয়ে যে সম্মত হ'ল এতে সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল, তার তুচ্ছ ছলনা নিশ্চয়ই অনলের কাছে ধরা পড়ে' গেছে। ধনিষ্ঠা এই ভেবে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—গৌরীর বিয়ে এখন দেবো না; কিন্তু সদ্‌ব্রাহ্মণের সদাচারী একটি ছেলে দেখে তো গৌরীকে সম্প্রদান করতে হবে; সে-রকম পাত্র সহসা পাওয়া কঠিন হ'তে পারে। তাই মনে করছিলাম একটি ভালো ছেলের সন্ধান পেলে তাকে মানুষ করে' তোলবার ভারও আমরা নিতে পারি…ছেলেটি সৎ বংশের সৎপাত্র হওয়া চাই, আর কিছু দেখ্‌বার দরকার নেই।

অনল কেবলমাত্র বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

অনল ঘর থেকে চলে' গেলে ধনিষ্ঠার মুখ টকটকে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল, তার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হ'তে লাগ্‌ল। সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে—আমি মরে' গেলেও আর কোনো দিন ওঁকে ডেকে পাঠাবো না; উনি নিজে থেকে যদি কখনো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তো আসবেন, নইলে এই শেষ।

শেষ কথাটি মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ধনিষ্ঠার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়্‌ল, মুখ মলিন হয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

কাপ্তেন আমুনসেন

শ্রী কনক গুপ্ত

জগতে জ্ঞানের রাজ্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। জ্ঞানের দিক্ দিয়ে মানুষ সাধনার পথে যতই এগিয়ে যাচ্ছে বিরাট্ দুনিয়ার অজ্ঞাত অখ্যাত দেশগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার স্পৃহাও তা'র ততই বেড়ে উঠ্‌ছে। এইসব অজানা অঞ্চলের আবিষ্কারের দ্বারা যাঁরা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, কাপ্তেন আমুনসেনের (Captain Amundsen) নাম তাঁদের ভিতর বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তাঁর উত্তর-পশ্চিম (North-West Passage) ও উত্তর-পূর্ব্ব-পথের (North-East Passage) আবিষ্কার, তাঁর দক্ষিণ মেরু (South Pole) পরিক্রমণ তাঁকে মানুষের সমাজে যে অমর ক'রে তুলেছে তাতে আর এতটুকুও সংশয় নেই।

কাপ্তেন আমুনসেনের বয়স এই ৫২ বৎসর। জীবনের যে-বয়সে বাঙালীর দেহের ওপর বেলা-শেষের ম্লান অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, সে-বয়সেও কাপ্তেন আমুনসেনের মনের যৌবন এতটুকু হ্রাস পায় নি। প্রাণের পরিপূর্ণ চাঞ্চল্যে এবং অফুরন্ত স্ফূর্ত্তির বাহুল্যে তা এখনও সজীব, তরুণ, তরঙ্গায়িত। দেহের দৈর্ঘ্য তাঁর ছয় ফুটেরও বেশী; চোখ উজ্জ্বল—সমুদ্রের মতন নীল; তা'র ওপরে ভ্রূদুটো এসে ধনুকের মতন ঝুলে পড়েছে; মাথা প্রকাণ্ড একটা চন্দ্রালিপ্তে ঢাকা; স্বরের ভেতর দিয়ে একটা স্বচ্ছন্দ দৃঢ়তার আভাস পাওয়া যায়; মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ধৈর্য্য এবং সাহস তাঁর দেহমনে যে শক্তি এনে দিয়েছে তা যেমন অগাধ, তেম্‌নি অসাধারণ। মেরুপ্রান্তের যুদ্ধ যে তাঁকে একেবারে অক্ষত রেখে যায়নি, তা'র পরিচয়ও তাঁর রেখা-বহুল মুখের ভিতর দিয়েই ফুটে উঠেছে।

আবিষ্কারক বল্‌তে যা বুঝায় কাপ্তেন আমুনসেনের আসন তার চেয়ে অনেকখানি উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। বৈজ্ঞানিক বল্‌লেই তাঁকে যথার্থ সম্মান দেওয়া হয়। আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁর সামুদ্রিক অভিযানগুলি সুরু হবার অনেক আগে ক্রিশ্চিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছু দিন ভেষজ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এইসময় থেকেই তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তরুণ বয়সেই তাঁর মনের ভিতর দুনিয়ার অনাবিষ্কৃত স্থানগুলির আহ্বান এসে পৌঁছেছিল। সেই-সব রহস্য-লোকের মায়া-কন্যারা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌তেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন জাহাজে চ'ড়ে উত্তর-পশ্চিম-পথের অভিসারে। এ-পথটা তিনশ বছর ধ'রে এম্‌নি ক'রে অনেকেই হাতছানি দিয়েছে, কিন্তু কারো কাছে ধরা দেয়নি। সে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের কথা এবং তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বৎসর। এ সেই বয়স যে-বয়সে দেহের ভিতর যৌবনের রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে ফুট্‌তে থাকে এবং মানসীর সন্ধানে দুঃসাহসের পথে পা বাড়াতে মানুষ কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

কাপ্তেন আমুনসেন রওনা হলেন, তখনকার ক্রিশ্চিয়ানিয়া বর্ত্তমান ওস্‌লো সহর হ'তে। আর সেই দিগন্তহারা সমুদ্রের বুকে এই অনিশ্চিত অভিযানে তাঁর বাহন ছিল ছোট্ট একখানা জাহাজ—যাকে নৌক্ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর এই যানের নাম ছিল জোয়া (Gjoa) এবং সেখানা পরিচালিত হ'ত পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনের সাহায্যে। এই দক্ষিণ-পশ্চিম পথের আবিষ্কারের জন্যে ইংলণ্ড্ কত বড়-বড় জাহাজ পাঠিয়েছে, কিন্তু জয়ের গৌরব তারা কেউ কিন্‌তে পারেনি। পথের সন্ধান তা'রা পেয়েছে, কিন্তু পথের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিন বৎসর ক্রমাগত সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত বরফস্তূপ ও পাহাড়-পর্ব্বতের সংঘাত হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে, নানা-রকমের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিপদের সঙ্গে যুঝে তাঁ'র সেই ছোটো ৪৭ টন ভারবাহী ক্ষুদ্র নৌকাখানা গোটা উত্তর-পশ্চিম পথ প্রদক্ষিণ ক'রে একদিন ব্যারিং প্রণালী এবং তা'র পর প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতর প'ড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। উত্তর-পশ্চিম-পথের ওপর সেই প্রথম মানুষের জয়-যাত্রার বিজয়-নিশান উড়্‌ল, কাপ্তেন আমুনসেনের ধৈর্য্য, সাহস ও অনন্যসাধারণ প্রতিভায়।

এই সমুদ্র-যাত্রায় তিনি চুম্বক ও বায়ুমণ্ডল-সম্পর্কীয় এমন কতকগুলি ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যার থেকে একরূপ আকস্মিকভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে যে, উত্তর মেরুর চুম্বকাধার এক জায়গায় স্থায়ী নয় প্রতি মুহূর্ত্তে তা স্থান পরিবর্ত্তন ক'রে চলেছে। এই অভিযানে তিনি বৈজ্ঞানিকদের জন্যে এতসব রসদ সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন যে, ক্রিশ্চিয়ানিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সেগুলোর পরীক্ষা শেষ ক'রে উঠ্‌তে পারেননি, তাঁর ফিরে আস্‌বার বিশ বৎসর পরেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা তাঁর সেইসব মাল-মশলা নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষার জের টেনে চলেছেন।

এর পরে আমুনসেনের মনের খেয়ালী দেবতার কাছে আহ্বান এসে পৌঁছল, দক্ষিণ-মেরুর প্রান্ত হ'তে সেখানকার অনাবিষ্কৃত রাজ্যটা জয় কর্‌বার জন্যে। ইংরেজ পরিব্রাজক শ্যাক্‌লটন দক্ষিণ-মেরুর তুষার-স্তূপকে শ'খানেক মাইল দূর থেকে নমস্কার ক'রেই ফিরে এসেছিলেন—তা'র প্রান্তসীমায় পৌঁছবার শক্তি তাঁর হয়নি। শ্যাক্‌লটন যা পারেননি তাই সাধন কর্‌বার জন্যে এবার আমুনসেনের মন মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি আবার 'ফ্রাম' নামক জাহাজে চ'ড়ে সাগরে ভাস্‌লেন। এই জাহাজখানির পিছনেও একটা খ্যাতির বনিয়াদ ছিল। এই জাহাজে চ'ড়েই তাঁর আগে কাপ্তেন নানসেন উত্তর-মেরুর অভিসারে পা বাড়িয়েছিলেন।

দক্ষিণ-মেরুর আবহাওয়া উত্তর-মেরু অপেক্ষাও পীড়াদায়ক। গ্রীষ্মকালেও এখানকার উত্তাপ তাপযন্ত্রের শূন্য অঙ্কটাকে ছাড়িয়ে নীচের দিকে প্রায় ৫০ ডিগ্রি নেমে যায়। উত্তর-মেরু চারিদিকে স্থল দিয়ে ঘেরা সমুদ্রের ভিতর অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ মেরুর অবস্থান ঠিক এর উল্টো। এ একটা মহাদেশ এবং এর চারিদিকেই সমুদ্র। এর অন্তঃপ্রদেশ অত্যন্ত দুর্গম। কারণ, বরফের বিপুল স্তূপ এ'কে চারিদিক্ থেকে ঘিরে রেখেছে। আর সেইজন্যেই আমুনসেনের আগে যাঁরা এই মহাদেশটাকে আবিষ্কার করার উদ্দেশ্য নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাঁরা কেউ মেরু-কেন্দ্রের ভিতর পৌঁছতে পারেননি, বৃত্তের বাহির এখানে-ওখানে দু'একটা ছোটোখাটো দ্বীপ আবিষ্কার ক'রেই ফিরে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ-মেরু বিস্তৃতিতে গোটা ইয়োরোপের অন্ততঃ দ্বিগুণ হবে। লাখো-লাখো বছর পূর্ব্বে এ মহাদেশটা সম্ভবতঃ আমেরিকার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। তা'র পর প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রলয়-বিক্ষোভে পৃথিবীর ওলটপালট যখন সুরু হ'ল, তখন আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দক্ষিণ মেরু-সমুদ্রের জলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এখন এর কোনো কোনো স্থান ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্তত চার মাইল নীচে অবস্থিত। এর মৃত্তিকাত্যন্তর



উত্তর-মেরুর একদল অধিবাসী

থেকে যে-সব উদ্ভিদের ও জীবদেহের অবশেষ উদ্ধার করা গেছে তা দেখে মনে হয়, এখানকার আব্-হাওয়া গরম না হ'লেও অন্ততঃ নাতিশীতোষ্ণ-রকমের ছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কাপ্তেন আমুনসেন নরওয়ের জাতীয় পতাকা দক্ষিণ মেরুর বুকের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে এসেছেন। কেমন ক'রে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা এই স্থানের তুঙ্গশৃঙ্গ গিরিগুলো অতিক্রম করেছিলেন, তুষার-প্রাচীর ও তুষার-নদীর দুর্গম বাধার পার হয়েছিলেন সে এক অদ্ভুত কাহিনী। অপূর্ব্ব বীরত্ব, ধৈর্য্য এবং দুঃসাহসিকতার ছাপে তাঁর ইতিহাসের আগাগোড়া পরিপূর্ণ।

তাঁর জীবনের এই সার্থকতম দিনটার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:— আমরা বুঝতে পেরেছিলুম, ১৪ই ডিসেম্বর আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারব। অবশেষে সেই ১৪ই ডিসেম্বর এসে হাজির হ'ল। চিত্ত আমাদের এরূপভাবে উত্তেজিত হয়েছিল, যে আমরা বেশীক্ষণ ঘুমুতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি প্রাতর্ভোজন শেষ ক'রে নিলুম। অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন আমাদের পথযাত্রাও অনেক আগেই শুরু হ'ল। আর সব দিনের মতোই সেদিনটাও খুব সুন্দর ছিল। চারিদিকে সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ, বাতাস ধীর মৃদু-মন্দ। আমাদের পথ খুব এগিয়ে চলল। কারো মুখে বেশী কথা নেই। আমার বিশ্বাস প্রত্যেকেই আমরা নিজের-নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম, অথবা আমাদের সকলের মন জুড়ে' একটা চিন্তাই জেগে ছিল, যার জন্যে সম্মুখের বিস্তৃত বিপুল অধিত্যকার দক্ষিণ প্রান্তের দিক থেকে আমরা নিষ্পলক দৃষ্টিটাকে কিছুতেই ফেরাতে পারছিলুম না। আমরা ভাব্‌ছিলুম— আমরাই এখানে প্রথম, না আমাদের আগে আরো কেউ এখানে এসেছে?—— "দাঁড়াও"!— সে-শব্দ আনন্দের তড়িৎ প্রবাহের মতন আমাদের দেহের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। দূর সুদূর নিকটতম হ'য়ে উঠেছে; গন্তব্য স্থান আমাদের অধিগত; বিরাট্ অধিত্যকা আমাদের পায়ের তলায় প'ড়ে রয়েছে যাকে এর আগে আর কেউ কখনো চোখে দেখেনি, মানুষের পায়ের চিহ্ন এর আগে যাকে আর কখনো কলঙ্কিত করেনি! কোথাও কোনো দাগটিও নেই। সে মুহূর্ত্ত কি গাম্ভীর্য্যভরা গৌরবের মুহূর্ত্ত! আমরা সকলে একসঙ্গে হাতে ধ'রে ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুর বুকের উপর স্বদেশের জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করলুম।

আমুনসেনের তৃতীয় কীর্ত্তি উত্তর-পূর্ব্ব-পথ পরিক্রমণ। তিনি নিজে এটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার ব'লেই বর্ণনা করেছেন। পরাজয়ের ভিতর দিয়েও এবার ভাগ্যের খেয়ালী দেবতা তাঁর গলায় যশের জয়মালা দুলিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যে সমুদ্র-যাত্রা করেন, তা'তে উত্তর-পূর্ব্ব পথের আবিষ্কার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, রুশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশের একটা উত্তরতম অংশ হ'তে বরফস্তূপের



তুষার-কুটীরের অধিবাসী একদল মেরুবাসী। ফোটো তুলিবার ভয়ে প্রত্যেকেই মুখ ঢাকিয়া আছে



কাপ্তেন আমুনসেন ও একখানি কুকুরটানা সেজ গাড়ী

পিঠে চ'ড়ে উত্তর-মেরুর ভিতর দিয়ে আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম ক'রে গ্রীণল্যাণ্ডের কাছে এসে পৌঁছানো। তাঁর উত্তর মেরু আবিষ্কারের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ, সাইবেরিয়ার সমুদ্রোপকূলের একটা জন-মানবশূন্য দ্বীপের কাছে তাঁর জাহাজ বরফের ভিতর দু'বছর ধ'রে আট্‌কা প'ড়ে ছিল। তাঁর চারপাশের এই বরফস্তূপের উচ্চতা কোথাও ছিল তিন ফুট, কোথাও চার ফুট, আবার কোথাও বা ন' ফুট। এই বরফস্তূপকে ভেঙে, চূর্ণ ক'রে তাঁকে বেরিয়ে আস্‌বার পথ তৈরী ক'রে নিতে হয়েছিল। ফলে যে উত্তর-মেরু আবিষ্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দরিয়ায় ভেসেছিলেন, তা'তে বাধা পড়্‌লেও তিনি উত্তর-পূর্ব্ব পথ আবিষ্কার ক'রে ফিরে এলেন। তাঁর আগে উত্তর-মেরুর সমুদ্রগুলোকে প্রদক্ষিণ কর্‌বার সামর্থ্য আর কারো হয়নি।

এইসময় কাপ্তেন আমুনসেন এবং তাঁর সহযাত্রী বন্ধুরা চারিধারের অধিবাসীদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বার অবকাশ পান। তাঁ'রা এইসব পরিত্যক্ত প্রান্তরে বরফস্তূপের ভিতর বল্গা-হরিণ সংগ্রহ ও শিলমাছ শিকারের উদ্দেশে এসে হাজির হ'ত। এদের রাজনীতি, ভাষা, বাসের প্রণালী সব এস্কিমোদের থেকে ভিন্ন-ধরণের। এইসব প্রান্তরে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড তাঁবু ফে'লে তা'রা বাস কর্‌ত। এক-একটা তাঁবুর ভিতর একসঙ্গে ৫০ জন লোককেও বাস কর্‌তে দেখা গিয়েছে।

ইয়োরোপিয়ানদের সংস্পর্শ এই উত্তর মেরু অঞ্চলের লোকদের পক্ষে হিতকর হয়েছে কি না, সে-সম্বন্ধে কাপ্তেন আমুনসেনের যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং সে-সন্দেহ প্রকাশ কর্‌তেও তিনি দ্বিধা করেননি। তিনি বলেন—"শ্বেতাঙ্গেরা এই মেরুপ্রান্তবাসী লোকগুলোর ভিতর যক্ষ্মা, উপদংশ, মদ প্রভৃতি জিনিষের আমদানি করেছেন। মিশনারীরা এদেশে এসে দেখ্‌লেন, এরা দেহাবরণের জন্যে খুব সামান্য বস্ত্রই ব্যবহার করে। এ-দৃশ্য দে'খে লজ্জায় এবং করুণায় তাঁদের মন উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সুতরাং তাঁরা এদেরকে উপহার দিলেন, তাঁদের প্যাণ্ট্‌, শার্ট্‌, টুপী প্রভৃতি। এইসব উপহারে দেহ আচ্ছাদন করার ফলে তাদের দেহ বাতাস হ'তে বঞ্চিত হ'ল, যতটা সূর্য্যালোক দেহের জন্যে আবশ্যক তাও তা'রা পেলে না। এম্‌নি ক'রে ক্ষয়-রোগের বীজ তাদের দেহ অধিকার ক'রে বসেছে। এইসব বিধর্ম্মীদের আমরা হয়তো খানিকটা উপকার করেছি, কিন্তু ঋণের খাতায় আমাদের নামে যে অঙ্কগুলো জমা হ'য়ে আছে তা'র পরিমাণও বড় কম নয়।

উত্তর মেরু আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে তিনি যে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তা নয়। তিনি আবার অবিলম্বেই মেরুপথে পাড়ি জমাবার জন্যে ঘর ছেড়ে অকূলে ভাস্‌বেন। এবার তাঁদের বাহন হবে দুখানা উড়ো জাহাজ এবং স্পিট্‌বারজেন থেকে তাঁদের এই উড়ো জাহাজ উত্তর মেরুর অভিযানে বাতাসের দরিয়ায় পা ভাসাবে। উড়ো জাহাজে 'রোল্‌স রয়স্‌' মোটরকার থাক্‌বে। কাপ্তেন আমুনসেন বলেছেন—এই মেরুপ্রান্তর প্রদক্ষিণে তিনি সাত ঘণ্টার বেশী সময় নেবেন না। কিন্তু কুকুর এবং নৌকোর সাহায্যে একাজে সাফল্য লাভ কর্‌তে অন্তত সাত বৎসর সময়ের দরকার হ'ত।

কেবলমাত্র সাহসিকতার দিক্ দিয়েই যে কাপ্তেন আমুনসেন অসাধারণ তা নয়, মানবতার দিক্ দিয়েও তাঁর উদারতা অনন্য সাধারণ। ইয়োরোপ ও আমেরিকার মনে শ্বেতাঙ্গ-শ্রেষ্ঠতার যে গর্ব্ব আজ হিমালয়ের মতন এশিয়ার সঙ্গে মিলনের পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে, কাপ্তেন আমুন-সেনের মন তাতে একটুকুও সাড়া দেয়নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা



একজন এস্কিমো বর্শা দিয়া মৎস্য শিকার করিতেছে

হয়েছিল, "শ্বেত জাতিটাই দুনিয়ায় চিরদিন বড় হয়ে থাকবে, এই-রকমের একটা স্পর্দ্ধা যে শ্বেতাঙ্গদের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে—এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?"

উত্তরে তিনি বলেছেন—"বিজ্ঞান এরকম কোনো স্পর্দ্ধাকে আমল দেয় না। এটা বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা চামড়ার রঙের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই ভেঙে দিতে সুরু করেছে। বিজ্ঞান জোর দিচ্ছে চামড়ার নীচে যে ব্যক্তিগত শক্তি লুকানো রয়েছে তারি ওপরে। তীক্ষ্ণধী, বিদ্যাবত্তা, মানসিক শক্তি—এগুলোর সঙ্গে গায়ের রঙের কোনো সম্বন্ধ নেই।"

ঝোঁকের মাথায় আজ ইয়োরোপ এবং আমেরিকা অবশ্য বুঝতে পারছে না যে, কাপ্তেন আমুনসেনের এই কথার ভিতর কত বড় একটা সত্য নিহিত আছে। তাই তাঁদের কাজ-কর্ম্মে আইনে-কানুনে, আচারে-ব্যবহারে এশিয়ার প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব একান্ত স্পষ্টভাবেই ফু'টে উঠতে আরম্ভ করেছে। সাম্যের দোহাই দিয়ে যত-রকমের অন্যায়ের অনাচার এঁরা দিনের পর দিন মিলনের পথের সম্মুখে জমা ক'রে তুলছেন। কালো, শ্যাম, পীত এম্নি সব বর্ণভেদের বাহুল্যে তাঁদের মনের সাদা রংটা ঘুলিয়ে কালো হ'য়ে উঠছে। এর ফলে মানবের ভবিষ্যৎ আকাশেও যে মেঘের সঞ্চার হচ্ছে তা'র প্রতি কারো লক্ষ্য নেই। কিন্তু ঝড় যদি জেগে ওঠে তবে তা'তে যে কেবল এশিয়ারই ক্ষতি হবে না, এটা সোজা কথা।

কাপ্তেন আমুনসেনের দেহের রং সাদা হ'লেও শ্বেতাঙ্গদের এই দম্ভ তাঁর মনের সাদা রংকে নষ্ট করতে পারেনি। তিনি যে সমগ্র মানব জাতির বন্ধু এবং ন্যায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত তা তাঁর আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির আলোচনার ভিতর দিয়েও ফু'টে উঠেছে। এসম্বন্ধে তাঁর উক্তি পক্ষপাত-বর্জ্জিত ও নির্ভীকতায় ভরা। যুদ্ধের সময় 'লীগ অভ্ নেশন্‌স্' পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন ব'লে পাঁয়তারা সুরু করেছিলেন। এই 'লীগ অভ্ নেশনস্'-সম্বন্ধে কাপ্তেন আমুসেন যা বলছেন তার দু'-চারটে কথা তর্জ্জমা ক'রে দিচ্ছি। তিনি বলছেন, "দুনিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'লীগ অভ্ নেশনস্'এ"র চেষ্টা যে ব্যর্থ হ'ল তা'র কারণ, ন্যায়ের উপর ভিত্তি ক'রে এ-প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে ওঠেনি। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে তা'র বনিয়াদ ন্যায় ও মানবজাতির সৌভ্রাত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। লীগ এশিয়ার কথাটা একেবারেই ভেবে দেখেনি, অথচ এই এশিয়াতে গোটা দুনিয়ার অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক বাস করে। এরাও প্রাচ্য দেশটাকে ইয়োরোপের দোহন করবার গাভী ক'রেই রাখতে চেয়েছেন। লীগের যাঁরা মোড়ল, তাঁরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না, পরস্পরকে হিংসা করেন এবং এশিয়া ও আফ্রিকাতে তাঁরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ে আত্মঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত। .... জেনেভার এই রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজিতে সেই জাতিই জয়লাভ করেছে, হাতিয়ার চালাতে এবং রক্তের নদী বইয়ে দিতে যারা সমান দক্ষ।...... 'লীগ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, এবং করতেও পারে না। কারণ 'লীগে'র অনুষ্ঠাতারা অর্থলিপ্সা এবং স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে আছেন। আর সেইজন্যেই যুদ্ধ শেষ করবার উদ্দেশ্যে আর-একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা এর ভিতরেই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। শীগ্‌গিরই হোক্ আর দেরীতেই হোক্, ইউরোপের বুকের ওপর আবার নতুন ক'রে যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে তা'তে সন্দেহ নেই।

এসব কথা থেকে বেশ বোঝা যায়, কাপ্তেন আমুনসেনের জীবন বিজ্ঞানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হ'লেও রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোও তাঁর অন্তরে ঘা দেয় এবং সেগুলো-সম্বন্ধে কোনো-রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময় তাঁর মনে জাগে সকলের আগে সমগ্র মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের আদর্শ।

কাপ্তেন আমুনসেন 'The North-West Passage' এবং 'South Pole' নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি সুবৃহৎ দুই খণ্ডে সমাপ্ত এবং ইউরোপের প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। যশ এবং সম্মানের পুষ্পবৃষ্টিতে তাঁর সম্মুখের পথ ঢেকে গেছে, কিন্তু এতে তাঁর মাথা এতটুকুও গরম ক'রে তুলতে পারেনি। তিনি বুঁদ হ'য়ে আছেন তাঁর কাজের ভিতর, তাঁর সাধনার ভিতর, তাঁর তপস্যার ভিতর। জীবনের বিরাট যাত্রাপথে তাঁর আদর্শ হচ্ছে—যদি পরাজিত হও, তবুও চলতে হবে, যদি জয়লাভ করো, তবু থামতে পাবে না।" *

* এই প্রবন্ধের উপাদানগুলি 'মডার্ন্ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ সুধীন্দ্র বসুর প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত।

জাম্বুবানের জীবন-কথা

শ্রী সুধীন্দ্রলাল রায়

শরৎ তাহার আলোছায়ার খেলা শেষ করিয়া গিয়াছে—ধানের ক্ষেত পড়িয়া আছে পূজা-শেষের শূন্য বরণ-ডালার মতন। ছোটো নাগপুরের পাথুরে মাটির গাছপালা নিদাঘরবির উৎকটভ্রূভঙ্গিতে ঝলসিয়া পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণস্থায়ী বর্ষার স্নিগ্ধ আশীষধারার সঞ্জীবনমন্ত্র-স্পর্শে তাহাদের জরা কাটিয়া যাওয়ায় নবজীবনের চেতনায় তাহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। হেমন্তের শিশিরে স্নাত হইয়া তাহাদের প্রতিপল্লবে সবুজ রং জমাট বাঁধিয়াছে। কণ্টকগুল্মলতাদির ঝোপজঙ্গলাকীর্ণা বনভূমি আজ পল্লববীথির ঐশ্বর্য্যসম্ভারে গৌরবান্বিতা। সেই তরু-

লতাগুল্মাদির ব্যবচ্ছেদ-পথে হৈমন্তিক বাতাস শীতের আগমনী গাহিয়া পাতায়-পাতায় মর্ম্মর-শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছে।

এইরূপ সময়ে ঘনকৃষ্ণচ্ছায়ায় অন্ধকার পাহাড়ের উপর দিয়া একটি বনবাসী শ্বাপদ নিঃশব্দ অথচ দ্রুত পদ-সঞ্চারে কাঁটাবন উপেক্ষা করিয়া দুর্গমতর বন-মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। কৌতূহলী নীরব তরুশ্রেণী দেখিতেছিল তাহার ঘনকৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশ আর ঈষৎ তামাটে নাসিকা; শান্ত ধরিত্রী দেখিতেছিল তাহার বিশাল বক্ষের শুভ্রতা। তাহার বর্ণ, তাহার ঈষৎ উন্নমিত পশ্চাদ্দেশ ও তাহার দোলায়মান গতিভঙ্গী নির্দ্দেশ করিতেছিল যে, সে জাম্বুবানের বংশধর—প্রাণিবিজ্ঞানের পরিচিত ভারতবর্ষের হিংস্র কৃষ্ণভল্লুক। ইহার আকারও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। নাসিকাগ্রভাগ দেখিয়া মনে হইতেছিল যে সে অবলাজাতীয়া।

পাহাড়পৃষ্ঠে সবুজ শোভার যে আনন্দবাজার বসিয়াছিল, তরুপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে যে কলগুঞ্জন শোনা যাইতেছিল, শীর্ণতোয়া গিরিনির্ঝরিণী যে কল্লোলিত নৃত্যভঙ্গে শিলা হইতে শিলান্তরে উল্লম্ফন-ক্রীড়া করিতেছিল—স্বভাব-সৌন্দর্য্যের এদিকে শ্রীমতী ভল্লুকের কোনো লক্ষ্যই ছিল না। তাহার যেন সময় নাই এরূপ ব্যস্ততার সহিত সে চলিয়াছে। শীত সমীপাগত; তাহার অজ্ঞাতবাসের স্থান তাহাকে অবিলম্বে খুঁজিয়া লইতে হইবে। পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে কতকগুলি জীব ভূগর্ভের মৃদু উত্তাপে সমস্ত শীত ঋতু সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করে। সূর্য্যদেব তখন মকরক্রান্তিতে অবস্থান করেন—দক্ষিণায়নে হাওয়া খাইতে যান। এদেশে ভূপৃষ্ঠ তাই বিবশা শীতলা হইয়া পড়ে। ঐসকল জীব তখন হিমসিক্ত হাওয়ায় আহার অন্বেষণের কষ্টভোগ অপেক্ষা আরামে নিদ্রাদেবীর আরাধনাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করে ও মাস-তিনেকের জন্য ভূগর্ভে আত্মগোপন করিয়া ফেলে। এই অভ্যাস শুধু সরীসৃপের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। অনেক ছোটোখাটো চতুষ্পদও এইরূপ করে। বৃহত্তর জানোয়ারদের মধ্যে একটি হইতেছে আমাদের আলোচ্যমান জীব।

আসন্ন শীতের উপক্রমে তাই সে একটি সুবিধাজনক কোটর অন্বেষণে চলিতেছিল। চলিতে-চলিতে কখনও কখনও তাহার রসনার উপযোগী কোনো মূল অথবা ফলের লোভে থামিতেছিল। তাহার রসনার অনুভূতিশক্তি মনুষ্যরসনা অপেক্ষা অনেক কঠোর। এমন-সব বন্যমূলাদি অবলীলাক্রমে সে চর্ব্বণ ও ভোজন করিতেছিল যাহা মনুষ্যরসনায় পতিত হইলে ঐ স্বাদগ্রাহী অঙ্গটির বিশেষ হানি করিতে পারিত। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে বৃক্ষোপরি একটা গুঞ্জন শুনিতে পাইল। যেন খানিকটা পুলকোৎফুল্ল হইয়া সে পলকে বৃক্ষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সেই অনতিবৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড বাহিয়া যে-ডালে মধুচক্র ছিল তাহাতে আরোহণ করিল। দ্বিধামাত্র না করিয়া তাহার বৃহৎ পদের একটি তাড়নায় সেটিকে সে ভূপাতিত করিল। পরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসবায়ুর সাহায্যে মক্ষিকাগুলিকে অপসারিত করিয়া মধুপানে রত হইল।

খুব কম প্রাণীই মধুমক্ষিকার নীড়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পায়। একটু তাড়নায় এই পতঙ্গ যেন অক্ষৌহিণী হইয়া শত্রুর উপর পতিত হয় এবং নিরুপায় শত্রুর দেহে অসংখ্য তীক্ষ্ণ শলাকা বিদ্ধ করিয়া তাহাকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলে। অনেক মধুলোলুপ নরজাতীয় জীবের এরূপ অভিজ্ঞতা হয়ত আছে। শ্রীমতী ভল্লুক-জায়া কিন্তু এ-আক্রমণ একেবারেই অগ্রাহ্য করিল। অসংখ্য উড্ডীয়মান মক্ষিকা সশব্দ ক্রোধ-গুঞ্জরণে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া ভল্লুক সেই মধুচক্র চিবাইতে লাগিল। মক্ষিকার দল ব্যর্থ রোষে তাহাকে আক্রমণ করিতে যাইয়া অনেকে তাহার দীর্ঘ কর্কশ রোমাবলী মধ্যে আবদ্ধ হইল এবং মুক্তির চেষ্টায় নিবিড়তর বন্ধনে বন্দী হইল। ভোজন সমাপন করিয়া ভল্লুক একবার মাটিতে গড়াগড়ি দিল। তাহাতে রোমাবদ্ধ আক্রমণকারীগণ নিষ্পেষিত হইল। পরে উঠিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিল।

এইরূপে পাহাড় বাহিয়া উঠিতে-উঠিতে একটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পাশে, মনসা প্রভৃতি কাঁটাগাছের ঝোপে-ঘেরা প্রকাণ্ড এক সজিনা-বৃক্ষ দেখিতে পাইল। বনপ্রান্ত হইতে স্থানটি অনেক দূরে—পর্ব্বতের চূড়াও

মূলদেশের মধ্য পথে। কাঁটাঝোপের বাহির হইতে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া বৃক্ষের মূলে সে উপস্থিত হইল। সেই-খানটা সে একটু প্রশস্ততর করিয়া একটি বিবর রচনা করিল। বিবরের প্রবেশ-পথ এত ক্ষুদ্র যে ঐ পথে অত বড় একটি জানোয়ার গতায়াত করিতে পারে ইহা মনেও করা যায় না। তৎপরে বাহিরে আসিয়া বিবরোত্থিত মৃত্তিকারাশি ছড়াইয়া-ছড়াইয়া এমন করিয়া অপসৃত করিল যে সেই মুহূর্ত্তে সেখানে যে মৃত্তিকা খনন করা হইয়াছে ইহা বুঝা দুঃসাধ্য হইল। ভল্লুক অতিশয় সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত মৃত্তিকা-খননের সকল চিহ্ন মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর অনেকগুলি কণ্টকাবৃত শাখা সুড়ঙ্গের রন্ধ্রপথে স্থাপন করিল। সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া, ডালগুলি বিবরের ভিতরে খানিকটা টানিয়া প্রবেশ করাইয়া সুড়ঙ্গ-মুখ উত্তমরূপে পরিরক্ষিত করিল।

তাহার পর ভূগর্ভস্থ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত শরীর গুটাইয়া তিন মাসের নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইল। শীত অন্তে মদনসখা বসন্ত যখন দখিনবাতাসে আপনার পীত উত্তরীয় উড়াইয়া পৃথিবীতে হাসি ফুটাবে, আবার 'যখন ধরণী হবে তরুণা'—তখনই পুনরায় ভল্লুক-জায়া তাহার স্বহস্তে রচিত কারাগার হইতে নিষ্ক্রান্তা হইবে।

পৌষমাস শেষ হইবার সময় সেই বদ্ধ কারামধ্যে দুইটি ভল্লুক শিশু দেখা দিল—শুধু চর্ম্মাবৃত রোমহীন দুটি অসহায় জীব। ভূমিষ্ঠ হইবার ঠিক চত্বারিংশৎ দিবস পরে তাহাদের চোখ ফুটিল। সন্তানের প্রতিভার এই লক্ষণ দেখিয়া মাতা স্নেহাধিক্যে তাহাদের শরীর লেহন করিল।

তদবধি ইহারা শীঘ্রগতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চাঞ্চল্য, স্ফূর্ত্তি, শক্তিও বাড়িতে লাগিল। পরস্পর মল্লযুদ্ধে ও মাতার সহিত ক্রীড়ায় ইহাদের সময় কাটিতে লাগিল।

একদিন ইহাদিগের নিকট বাহিরের ডাক আসিল। বসন্ত তখন তাহার সোনার কাঠির স্পর্শে গাছে-গাছে কচিপাতার জীবন দিতেছিল। ধরিত্রী জীর্ণ চীর পরিত্যাগ করিয়া বসন্ত উৎসবের জন্য প্রসাধনরতা। মহুয়া ফুলের নিবিড় গন্ধ বাতাসে উন্মাদনা ঢালিতেছিল। জানি না, এইসব খবর সেই গহ্বরে কেমন করিয়া প্রবেশ করিল। হয়ত সেই গভীর অরণ্যে বায়ুমণ্ডলের প্রতি স্রোতোরেখা কম্পিত করিয়া শ্যামা পূর্ণকণ্ঠে যে ললিতঝঙ্কার তুলিতেছিল—তাহারই অনুরণন আমাদের ভল্লুক-পরিবারের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল।

সহসা একদিন ভল্লুকশিশুদ্বয় মাথা উঁচু করিয়া বার-বার বাতাস আঘ্রাণ করিতে লাগিল এবং মাঝে-মাঝে নখর-প্রহারে মাটি খুঁড়িতে লাগিল। তাহারা যেন মুক্তি চাহিতেছিল, যেন বলিতেছিল—

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন—
চারিদিকে মোর বাঁধন কেন ?

কয়েকদিন পরে তাহাদের জননী তাহার অলস বপুটিকে টানিয়া তুলিয়া গহ্বরের চারিদিকে ঘুরিয়া লইল। তাহার পর সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিয়া দ্বারমুখের কাঁটা ডাল-গুলি বিপুল থাবার এক আঘাতে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সন্তানদ্বয় মাতাকে অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ ভল্লুকমাতা নাসিকা উত্তোলন করিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস টানিয়া চারিদিকের ঘ্রাণ লইতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ দক্ষিণ দিকে পর্ব্বতসানু বাহিয়া অবতরণ করিতে লাগিল। কিছুদূর চলিয়া দেখিল পাহাড়ের খাঁজের মধ্য দিয়া একটি জলধারা বহিয়া চলিয়াছে। সেই জলে মুখ দিয়া পান করিতে লাগিল। সে যেন অগস্ত্য-তৃষ্ণা—বুঝিবা সে সমস্ত নিঝরিণীটি শোষণ করিয়া ফেলিবে। মাতার পান শেষ হইলে শিশুদ্বয় জলে চুমুক দিয়া দেখিল। সেই তাহারা জীবনে প্রথম জলের আস্বাদ পাইল। আর তাহারা গহ্বরে ফিরিল না। তদবধি মুক্ত আকাশতলে, ঝোপে ঝাপে, গিরিদরীতে নিদ্রা যাইত।

সেইদিন ভল্লুকমাতা তাহার সন্তানদ্বয়কে দিনের আলোতে ভালো করিয়া দেখিল—বার-বার ঘ্রাণ লইল। যেটি বৃহত্তর সেটি পুত্র, তাহার রং খুব ঘনকৃষ্ণ নহে, একটু যেন কটা-কটা। আমরা তাহাকে 'কটা' নামেই অভিহিত করিব। কন্যাটি বেশ কৃষ্ণবর্ণ, এই উপাখ্যানে কৃষ্ণা নামই তাহার পরিচয় হইবে।

তখন ফাল্গুন। পলাশবনে পলাশের লালফুলে পাহাড়-তলী রঙীন—ধরণী যেন আবীরলিপ্তা। মহুয়াফুল ক্রমশঃ

রসাল, স্বাদু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সুমিষ্ট ফলে পরিণত হইতেছিল। ভল্লুকমাতা সন্তানদের শিক্ষা আরম্ভ করিল।

সকল শ্বাপদেরই শিক্ষার মূল কথা দুইটি—জীবনধারণ ও আত্মরক্ষা। ভল্লুকমাতা অবাধ্য হইলেই সন্তানদের কঠোর দণ্ড বিধান করিত। ভূগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথ চলিতে-চলিতে শিশু কৃষ্ণা অনবরত পিছাইয়া পড়িতেছিল। মায়ের সহিত সমান দ্রুত চলিতে পারিতেছিল না। ইহাতে পথ হারাইবার সম্ভাবনা। কাজেই একসময় যখন কৃষ্ণা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে মায়ের নিকট উপস্থিত হইল, মাতা তাহাকে এমন চপেটাঘাত করিল যে, কিছুক্ষণ সে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই হইতে আর সে পিছাইয়া পড়িত না।

অপর কোনো একটি ভল্লুকের পদচিহ্ন তাহাদের সম্মুখে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। সেই পদাঙ্ক ধরিয়া ইহারা চলিল। কটা স্ফূর্তির আবেগে মাতা ও ভগ্নীকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রগামী হইল। ইহা অন্যায়। শিক্ষানবিশী অবস্থায় অজ্ঞাতপথে এত সাহস ভালো নয়। চলিতে-চলিতে সামনে একটি তৃণাস্তীর্ণ স্থানে এক চাপড়া মাটি দেখিল, তাহাতে ভল্লুক-পদচিহ্ন রহিয়াছে। কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া সেই মৃত্তিকাখণ্ডের উপর সে আপনার থাবাটি তুলিয়া দিতেছিল। এমন সময় উপর হইতে তাহার মাতা ও ভগ্নীর গতিবেগে অপসারিত একটি অনতিক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড গড়াইতে-গড়াইতে সেই মৃত্তিকা-চাপের উপর সশব্দে আসিয়া পতিত হইল। কটা চম্‌কাইয়া পিছু হটিল। সেই মুহূর্ত্তে দুই দিক্ হইতে দন্তবিশিষ্ট সাঁড়াশির মতন লৌহযন্ত্রের দুই অংশ সবেগে আসিয়া মিলিত হইল। মানুষ এইরূপে বন্যশ্বাপদের জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখে। কটা সেদিন খুব একটা বিপদ্ হইতে বাঁচিয়া গেল।

এইরূপ ফাঁদে পড়িলে কি অবস্থা হয় কয়দিন পরে ইহারা তাহা চাক্ষুষ দেখিল। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বন্যবদরিকার ছোটোখাটো কাঁটাঝোপ ও ছোটো-বড় প্রস্তরখণ্ডে সমাকীর্ণ ভূমির উপর দিয়া চলিতে-চলিতে দূরাগত বেদনাভরা আর্ত্তনাদ ভল্লুকজায়ার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে সহসা স্থির হইয়া চারিদিকের বাতাস আঘ্রাণ করিয়া লইল। যখন বাতাসে মানুষ প্রভৃতি আততায়ীর সন্ধান পাইল না, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া, সেই ঘ্রাণ অনুসরণ করিয়া ঘন জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরে, সাবধানে চলিতে লাগিল। সন্তানদ্বয় ছায়ার মতন পশ্চাতে চলিল। ক্রমশঃ একটি বৃক্ষ-বিরল খোলা জায়গায় আসিয়া উক্তপ্রকার জাঁতিকলে আবদ্ধ একটি স্ত্রীভল্লুক দেখিতে পাইল। জাঁতিকলের সাঁড়াশিদ্বয় তাহার পশ্চাতের জঙ্ঘা কামড়াইয়া ধরিয়াছে; মুক্তির জন্য সে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াছে, তাহাতে আরও আহত হইয়াছে। ক্রুদ্ধরোষে আপনার আহত জঙ্ঘা বার-বার আপনিই দন্তপেষণে চিবাইয়াছে—তাহাতে অস্থিগুলি ভাঙিয়া গিয়াছে। ভালুকমাত্রেই কোনো স্থানে আহত হইলে সেই বেদনাস্থানে বেদনার কারণ লুক্কায়িত আছে মনে করিয়া আপনার দেহ আপনিই কামড়াইয়া ফেলে। অনেক শিকারী লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—ভালুক হয়ত পায়ে আহত হইয়াছে; পাখানি এমন জোরে কামড়াইয়া ধরিল যে অস্থিগুলি মড়-মড় শব্দে চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, ক্লান্ত রুধিরাক্ত কলেবরে ভল্লুক মৃতকল্প অবস্থায় করুণ বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাসে বনভূমি শোকাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মাঝে-মাঝে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। তা'র পার্শ্বে একটি শিশুভল্লুক মায়ের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মাঝে-মাঝে তা'র ছোটো থাবাটি মায়ের গাত্রে ন্যস্ত করিতেছে।

আমাদের শ্রীমতী ভল্লুক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিল। তাহার সন্তান-দুটি এই দৃশ্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতায় ভীত হইয়া মাতার উদরতলে আশ্রয় লইল। তা'র পর তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিল। ভল্লুকপত্নী জানিত যে, ঐ স্থানে আসা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ যে-পথে সে ফিরিয়া চলিল সে-পথে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নররূপী মৃত্যু তাহার পিছু লইতে পারে। সেই দিন সন্ধ্যাবেলা, ঐ স্থান ছাড়িয়া কয়েক ক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িয়া ভল্লুকজায়া দুইটি বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইল। বুঝিল, দিনের বেলার সেই করুণ দৃশ্যের উপর পর্য্যবেক্ষণ হইল। তাহার সন্তানগণ সে-শব্দ শুনিতে পাইল না, কারণ, তাহাদের শ্রবণ-শক্তি ততটা প্রখর হয় নাই।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে, পশ্চাতে শিশুভল্লুকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল তাহার ছেলেমেয়ের কোনো বিপদ্ উপস্থিত কি না। দেখিল দিবাভাগে যে ভল্লুকশিশুকে মুমূর্ষু মাতার পার্শ্বে দেখিয়াছিল সেটি আর্ত্ত চীৎকার করিতে-করিতে আসিতেছে। ভল্লুকজায়াকে দেখিয়া সে আনন্দধ্বনি করিয়া ছুটিয়া আসিল, এবং তাহার উদরে মুখ দিয়া ক্ষুধিত শাবকের মতন দুগ্ধ যাচ্ঞা করিল। ভল্লুকজায়া একটু ধীরগর্জ্জনে বিরক্তি প্রকাশ করিল, কিন্তু কি ভাবিয়া যেন এই অনাথ শাবকটিকে স্তন্যদানে আশ্বস্ত করিল। ভল্লুকজায়ার সন্তানদ্বয়ও এই নূতন আগন্তুককে আপাদমস্তক আঘ্রাণ করিয়া আপনাদের স্বজন বলিয়া গ্রহণ করিল। নূতন শাবকটি উহাদিগের অপেক্ষাও ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছিল এবং তাহার নাসিকাগ্রভাগে একটি তিলক-সদৃশ শ্বেতটীকা ছিল। ইহাকে আমরা এখানে 'তিলি' নামে অভিহিত করিব।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই, বৈশাখ মাসে ভল্লুকজায়া শাবকদিগকে ক্রমশঃ স্তন্য ছাড়াইয়া দিল। এখন হইতে প্রতিদিন সে সন্তানগণকে ধরিত্রী হইতে আহার সন্ধান করিতে শিখাইতে লাগিল। কত-রকম মূলফলাদি সে চিনাইয়া দিল। আবার যে-সমস্ত মূলাদি খাইলে অপকার হয় তাহা দেখাইয়া দিল। বিশেষ করিয়া বল্মীক-মধ্য হইতে পিপীলিকার ডিম্ব কিরূপে বাহির করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিল। বল্মীকে মুখ দিয়া সজোরে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে বল্মীকের মৃত্তিকা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং এইরূপে মাটি সরাইলেই যে-সকল কামরায় ডিম্ব ও বাচ্চা রক্ষিত থাকে সেগুলি বাহির হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মের আতিশয্য হইলে সন্তানগুলিকে একটি পাহাড়-বেষ্টিত ক্ষুদ্র জলাশয়ে লইয়া গিয়া একে-একে তাহাদিগকে সাঁতার শিখাইল। প্রথম-প্রথম মাতার পুচ্ছ দাঁতে ধরিয়া তাহারা জলে ভাসিতে শিখিল; জল কাটিবার কৌশল শিখিবার পর তাহাদিগকে বিনাসাহায্যে সাঁতরাইতে হইত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি পর্ব্বতগাত্রের জঙ্গলমধ্যে ভল্লুকজায়া পুত্রকন্যাসহ একটি গিরিগাত্রস্থ গহ্বরের সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময় এক অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ভল্লুক বৃক্ষরাশির ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। এপর্য্যন্ত অনেক ভল্লুকের সহিত দেখা হইয়াছে, কিন্তু কেহই পরস্পরকে বড়-একটা গ্রাহ্য করে নাই—পাশ কাটাইয়া গিয়াছে। যদি কেহ অত্যন্ত নিকটে আসিত—ভল্লুকজায়া আপনার রোমাবলী খাড়া করিয়া কণ্ঠ হইতে এমনই বজ্র-নির্ঘোষ বাহির করিত যে, আগন্তুক আর অধিক পরিচয়ের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত না।

আজ কিন্তু ভল্লুকজায়া এই নবাগতের ঘনিষ্ঠতায় কোনোরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। আগন্তুক তাহাদের সকলের দেহ আঘ্রাণ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল—"ঘোঃ-ঘোঃ-ঘোক্।" ভল্লুক-জননী এই মন্তব্যে প্রীত হইল। সেই হইতে এই ভল্লুকপ্রবর সেই দলের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিল এবং সন্তানগণ জানিতে পারিল যে, ইনিই তাহাদের জন্মদাতা। ভল্লুকের দুই বৎসর অন্তর সন্তান হয়; তবে শাবকগণের বয়স এক বৎসর হইলেই দম্পতি পুনর্মিলিত হইয়া একত্র বসবাস করে। ভল্লুক-পিতা দলের কর্ত্তা হইয়া শাবকগণকে অনেক নূতন শিক্ষা দিল এবং নানা বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। কতবার তাহারা নৈশ অভিযানের সময় পানীয়ের জন্য এমন জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, যেখানে মানুষ-শিকারী মৃগয়ার্থ অস্ত্রসজ্জিত হইয়া লুক্কায়িত। শুধু সেই পুং-ভল্লুকের বুদ্ধিমত্তায় সে-সকল বিপদ্ হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়াছে। বর্ষার সময় যখন পাহাড়তলীর গ্রামপার্শ্বস্থ ক্ষেতগুলি কচি ভুট্টার মৃদুগন্ধে ভরপুর তখন একদিন ভল্লুকজায়া অনবধানতাবশত দলচ্যুত হইয়া এক ক্ষেত্রে ঢুকিয়া ভুট্টার দ্বারা রসনা তৃপ্ত করিতে গিয়াছিল। এক গ্রাম্য শিকারীর একটা একনলা গাদা বন্দুকের গুলি হঠাৎ তাহার উত্থিত সম্মুখপদে লাগে। যন্ত্রণায় ভল্লুকজায়া জ্ঞানহারা হইয়া আপনার পাখানি এমন কামড়াইয়া ধরে যে, মড়মড়-শব্দে হাড় গুঁড়া হইয়া যায়। তাহাতে আরও বেদনা পাইয়া সে বিকট চীৎকার করিয়া উঠে। সেই চীৎকারে ভল্লুকপিতা বনমধ্য হইতে বাহির হইয়া ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করে। তাহাকে ও তাহার পশ্চাতে তিনটি ভল্লুক দেখিয়া রিক্তনল শিকারী আর বন্দুকে বারুদ পুরিবার সময় করিতে পারিল না—ঝটিতি সে-স্থান পরিত্যাগ

করিয়া আখস্ত হইল। সেই ক্ষত শুকাইতে ভল্লুকজায়ার অনেক দিন লাগিয়াছিল। আর-একদিন সকলে মিলিয়া যখন একটি পাহাড়-গাত্রের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গমন করিতেছিল, তখন নিম্ন হইতে একজন শিকারী তাহাদিগকে দেখিয়া পুং-ভল্লুককে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে। চলন্ত ভল্লুকের নিতম্ব স্পর্শ করিয়া সামান্য চর্ম্ম-ক্ষত রাখিয়া গুলি চলিয়া যায়। ভল্লুক নিম্নের আততায়ীকে না দেখিয়া পশ্চাতে শাবকদিগের একটিকে এইরূপ দুষ্টামির জন্য দায়ী মনে করিয়া একলম্ফে তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে এবং কণ্ঠনালীর নীচে দন্তদ্বারা অনতিজোরে চাপিয়া ধরিয়া দুইতিনবার ঝাঁকানি দিয়া দেয়। বেচারা শিশু এই অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যেন বলিল—"ও বাবা আমি নই গো।" তখন ভল্লুকপিতার মগজে বোধ হয় অদৃশ্য শত্রু সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা জাগিয়া উঠে, কারণ, সে হঠাৎ শাবককে ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রগামিনী, বনানীমধ্যে অদৃশ্যপ্রায়া, ভল্লুকজায়ার অনুসরণ করে। তিরস্কৃত শাবকটি ক্ষুণ্ণমনে পিতার পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। শিকারী দাঁড়াইয়া এতক্ষণ মজা দেখিতেছিলেন ও পুনরায় গুলি করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ভল্লুকের সহসা অন্তর্দ্ধানে তিনি বোকা বনিয়া গেলেন।

শীতকাল আসিয়া পড়িল। শিশির-ভেজা তৃণাস্তীর্ণ ভূমিতে বড়-বড় বারশিংওয়ালা হরিণের ক্ষুর-চিহ্ন দেখা গেল। সিরগুজার পাহাড় জঙ্গল পার হইয়া ইহারা পালামৌর উপত্যকায় আসিয়াছে সঙ্গিনী-অন্বেষণে। এই সময় ইহারা বড় রুক্ষস্বভাবের হইয়া পড়ে। মানুষ, পশু কাহাকেও ডরায় না। এমনিই-একটি মদমত্ত হরিণের সহিত আমাদের ভালুকদলের সাক্ষাৎ হইল। তাহার সুদীর্ঘ সুচাগ্র শৃঙ্গ তাহাকে ভীষণ করিয়া তুলিয়াছিল। ভালুককে দেখিয়া তাহার কলহস্পৃহা জাগ্রত হইল। গম্ভীর উচ্চনাদে সে ভালুককে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া পশ্চাতের পদভরে দণ্ডায়মান হইয়া শৃঙ্গ অবনত করিয়া লাফাইয়া আসিল। ভালুক স্ত্রীপুত্রবেষ্টিত হইয়া মর্য্যাদা-রক্ষার্থ নাচার হইয়া যুদ্ধোন্মুখ হইল—নহিলে হরিণকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইত। ভালুকও কম কৌশলী ও বলশালী প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। হরিণ সে-কথা ভুলিয়া গিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সম্মুখের ক্ষুদ্বয় দ্বারা আঘাত করিল—ভালুকের হিংস্রভাব সম্যক্ অবগত থাকিলে সে নিশ্চয়ই ভগবদ্দত্ত অস্ত্র শৃঙ্গ ব্যবহার করিত। সে যেরূপ বেগে আঘাত করিল, তাহাতে মানুষ পঞ্চত্ব পাইত, নেকড়ে বাঘের পেট ফাটিয়া অন্ত্র বিনির্গত হইয়া পড়িত, কিংবা ঐরূপই কোনো জানোয়ার বিধ্বস্ত হইয়া ধরাশায়ী হইত। ভালুক কিন্তু অত্যন্ত ঘাতসহ কঠিনপ্রাণের জীব। হরিণ দাঁড়াইয়া পদাঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে তীব্রবেগে ভালুকের সম্মুখ-পদদ্বয় দ্বারা তাহার পাল্টা জবাব আসিতে লাগিল। সহসা হরিণের পা ফস্কিয়া যাওয়ায় সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তমাত্র-অবসরে ভালুক বজ্রহুঙ্কার করিয়া তাহার দীর্ঘনখযুক্ত দক্ষিণপদের থাবা দ্বারা প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করিল—সে-বজ্রাঘাত সহিতে পারে এমন পশু খুব কম। এক আঘাতে হরিণের প্রাণহীন দেহ ভূতলে গড়াগড়ি দিল। তাহার পর মৃত শত্রুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভালুক বিজয়োল্লাস করিল। কখনো কখনো ব্যাঘ্রের সঙ্গে ভালুকের এরূপ খণ্ডযুদ্ধ হয়। সেরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। আমাদের এই উপাখ্যানের ভালুকের ইতিহাসে সেরূপ ঘটনার উল্লেখ আমরা পাই না।

আবার হেমন্তের শেষে একদিন ভল্লুকপিতা স্ত্রী পুত্র-কন্যাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শীতকালে সে ভূগর্ভে আত্মগোপন করিয়া নিদ্রায় কালহরণ করিবে। দু-এক সপ্তাহ পরে ভল্লুকমাতা সন্তানসহ একটি গুহা খুঁজিয়া বাহির করিল। সেই গুহায় তাহারা শীতকাল অতিবাহিত করিল।

আবার যখন বসন্ত ঘুরিয়া আসিল তখন শাবকগুলি কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। 'কটা'ই বাচ্চাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ছিল এবং বেশ সুপুষ্ট ও বলিষ্ঠদেহ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মাতার কুড়ানি কন্যা 'তিজি' তাহাপেক্ষা কৃশ হইলেও বেশ কর্ম্মক্ষম ও দক্ষ ছিল। প্রায়ই সে 'কটার' সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কটা যেখানে শিকার করিত, 'তিজি' তাহাতে ভাগ লইত। সাধারণত ভালুক আহার-বিষয়ে

জন্ত ভালুকের উৎপাত সহ্য করে না। কিন্তু 'তিলি'র উপর তাহার এমনই একটা স্নেহ ছিল যে, সেই শ্বেত-তিলকাঙ্কিত-নাসা ভল্লুক-কন্যাকে সে কিছুই বলিত না। এদিকে কৃষ্ণার যেন কি কারণে মেজাজ বড় রুষ্ট হইয়া পড়িল। 'কটা' তাহার নিকটে আসিলেই সে তাহাকে দাঁত খিঁচাইত। ভল্লুকজায়ারও ক্রমশঃ স্বভাব উগ্ররকমের হইয়া পড়িল। একদিন জ্যোৎস্না-নিশীথে 'কৃষ্ণা' ও 'তিলি' দুজনে একসঙ্গে কোথায় চলিয়া গেল। বসন্তের মলয় বাতাস তাহাদিগের নিকট কি জানি কোন্ স্বপ্নপুরীর ভল্লুক-রাজপুত্রের সংবাদ বহন করিয়া আনিল। তাই তাহারা মদনপূজার জন্য আপন-আপন সহচরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। 'কটা' তাহাদের অনেক খুঁজিল, কিন্তু সন্ধান পাইল না।

এদিকে ভল্লুক-মাতাও কেমন যেন একটু রুক্ষস্বভাবের হইয়া গেল। পুত্রকে সে আর বড় একটা কাছে আসিতে দেয় না। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি তাহার মেজাজ এরূপ হইল যে 'কটা' আর তাহার নিকটে যাইতে পায় না। দূরে-দূরেই মাতার অনুসরণ করে। তা'র পর প্রথম বর্ষার কালমেঘ আকাশে ঘনাইয়া আসিয়াছে—এমনই আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, বনান্তরাল হইতে একটি বৃহৎ কালো পুং-ভালুকের মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। সহর্ষধ্বনি-সহকারে ভল্লুকজায়া তাহার পুনরাগত ভর্ত্তার অভিমুখে ছুটিয়া গেল এবং উভয়ে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। 'কটা' তাহাদিগের পশ্চাৎ লইল, কিন্তু পিতামাতা উভয়েই ফিরিয়া গর্জ্জন-সহকারে এমনই তিরস্কার করিল যে 'কটা' চলিতে-চলিতে থামিয়া গেল। তাহার পিতামাতা উভয়েই তাহাকে ফেলিয়া ক্রমশঃ পাহাড়ের মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এই যে দলভঙ্গ হইল আর কখনও ইহারা সম্মিলিত হইবে না। ক্রমশঃ আর পরস্পরকে চিনিতেও পারিবে না।

'কটা'র কাছে জীবনটা বড় শূন্যময় বোধ হইল। কিছুদিন সে একা-একা বিচরণ করিত, আহার জোগাড় করিত। কিন্তু কি যেন একটা অভাব সে অনুভব করিত। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মে যৌবনে যে সৃজনীশক্তি সকল জীবের মধ্যে বিকাশলাভ করে তাহারই প্রেরণা সে অনুভব করিতে লাগিল। তাহার পর একদিন চাঁদে-ঢাকা পূর্ণিমার রজনীতে সে দেখিতে পাইল এক প্রান্তরধারে একটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্বদেহ ভল্লুকমূর্ত্তি—তাহার নাসিকাগ্রভাগ শুভ্র।—তাহাকে দেখিবামাত্র 'কটা'র মনে হইল যে, সে যেন তাহার হারানিধি পাইয়াছে। সেই নবপরিচিতা ভল্লুক-কন্যার সাহচর্য্যলাভ করিয়া তাহার জীবনে আবার আনন্দ ও হর্ষ ফুটিয়া উঠিল।

সাঁওতালী সংস্কার

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌

অসভ্য সাঁওতাল-জাতির মধ্যেও কয়েকটি সংস্কার প্রচলিত আছে। তাহাদেরও কয়েকটি সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। জাতিবিচার পৌরোহিত্যপ্রথা ও ধর্ম্মানুশাসনের গণ্ডীর বাহিরে তাহারাও যাইতে পারে না। মানুষ বনে-জঙ্গলে বাস করিলেও সমাজ সৃষ্টি করে এবং সভ্যতার ক্রমোন্নতির সহিত সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। সামাজিক নিয়মাবলী আবার পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সংগঠিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সাঁওতালেরা ক্রমশঃ বন-জঙ্গল ছাড়িয়া বাঙ্গলা ও বিহারের লোকালয়ের সংস্পর্শে অনেকটা হিন্দু সংস্কার গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সাঁওতালেরা আজকাল কোথাও-কোথাও কালী ও দুর্গা পূজাও করে। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্কারাদি দেখা যায়।—

ছেটিয়ের্—সন্তানেরা পিতার জাতিতে পরিচিত হয়,

মাতার জাতি পায় না। সাঁওতালদের মধ্যেও জাতি-বিভাগ আছে, কিন্তু তাহা হিন্দুজাতি বিভাগের ন্যায় নহে। সাঁওতালদের এক-এক জাতি এক-এক গোত্র; স্বজাতির মধ্যে বিবাহ হয় না। কোনো গ্রামে কাহারও সন্তান জন্মিলে সমস্ত গ্রামের অশৌচ হয় এবং অশৌচ-মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে-গ্রামে বঙ্গা (পূজাদি) হয় না। যাহার গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে অশৌচমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার গৃহে কেহ আহারাদি করে না। পুত্র-সন্তান জন্মিলে পঞ্চম দিনে ও কন্যা জন্মিলে তৃতীয় দিনে সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। গ্রামে সমস্ত লোকও ঐ ব্যক্তির গৃহে সমবেত হইয়া মস্তক মুণ্ডন করে। নব-জাত শিশুকে তেল-হলুদ মাখাইয়া স্নান করানো হয় এবং সমবেত গ্রামের লোকেরাও ঐরূপ স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। ছেটিয়ের্ সংক্রান্ত নানা-প্রকার ক্রিয়াদিও আছে। ঐ সময় সন্তানেরও নামকরণ হয়। জ্যেষ্ঠপুত্রের পিতামহের নামে, জ্যেষ্ঠা কন্যার পিতামহীর নামে, দ্বিতীয় পুত্রের মাতামহের নামে, দ্বিতীয়া কন্যার মাতামহীর নামে নামকরণ হয়। অন্যান্য পুত্রকন্যাগণকে অন্যান্য আত্মীয়ের নামে অভিহিত করা হয়। অবশেষে সকলকে নিম দাক্'মেণ্ডি* (নিমপাতার সহিত সিদ্ধ ফেনসহ ভাত) ভোজন করাইয়া বিদায় দেওয়া হয়। এই শুদ্ধিক্রিয়াকে জানাম্-ছেটিয়ের্ (জন্মাশৌচমুক্তি) বলে।

বিবাহের পূর্ব্বে কোনো কুমারীর সন্তান জন্মিলে কন্যার পিতা গ্রামের মাঝির নিকট সংবাদ দেয়। তাহারা গ্রামের লোকেদের একত্র সমবেত করিয়া কন্যাকে তাহার সন্তানের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করে। কন্যা কোনো যুবকের নাম করিলে গ্রামের পাঁচজনে গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনে। যদি তাহার সহিত অন্যান্য লোকও সংস্পৃষ্ট থাকা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সন্তান জারজ বলিয়া পরিগণিত হয়। কেবলমাত্র একজন সংস্পৃষ্ট থাকা প্রমাণ হইলে সেই ব্যক্তি ঐ কুমারী ও সন্তানকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সন্তানের মাতা যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে সন্তানের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে না পারে তাহা হইলেও সন্তান জারজ সাব্যস্ত হয়। ঐরূপ কন্যার জন্য জামাতা ক্রয় করিতে ২০ টাকা লাগে। কন্যার পিতৃপক্ষ জামাতা ক্রয় করিতে না পারিলে গ্রামের লোকে জোগাড় করিয়া দেয়। এইপ্রকার জামাতাকে তেজল জাঁওয়াই (উপস্থিত বা ধরা জামাই) বলে; ক্রয়-মূল্য সেই ব্যক্তিই পায়। জারজ সন্তান তাহারই জাতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহারই নামেই সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। কোনো ব্যক্তি ঐ কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত না হইলে গ্রামের মাঝি বা যে-কোনো ব্যক্তির নামেই সন্তানের মস্তক মুণ্ডন করা হয় এবং সন্তান সেই ব্যক্তির জাতি প্রাপ্ত হয়।

আর-একপ্রকার ছেটিয়ের্ আছে, তাহাকে চাচো ছেটিয়ের্ বলে। চাচো ছেটিয়ের্ না হইলে কোনো সাঁওতাল বিবাহ করিতে পারে না। চাচো ছেটিয়ের্ হইবার পূর্ব্বেই কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার শব-দেহ পোড়ানো হয় না, অস্থিও নদীতে নিক্ষেপ করা হয় না। চাচো ছেটিয়ের কালে একটি ছোটোখাটো উৎসব হয় তাহাতে সকলে প্রচুর-পরিমাণে হেণ্ডি (মদ) পান করে ও নাচগানও হয়। পরে বিন্তি কাথা (ধর্ম্মকথা) হয়। কি-প্রকারে পৃথিবী সৃষ্ট হইল, আর কিরূপে সাঁওতাল বংশের বৃদ্ধি ও বিস্তার হইল, এইসব কাহিনী যাহাতে আধুনিক বালকেরা ভুলিয়া না যায় এইজন্য বৃদ্ধেরা এই-সব গল্প করে। পরে গৃহস্থের পক্ষ হইতে সমবেত লোক-দিগকে বলা হয়, "আপে মঁড়ে হড়্ ঠেন্‌লে নেঁহরঃ কানা, কেঁহু লেকালে তাঁহেকানা বাঁক্ লেকালে পণ্ড্‌এনা, আদ আপে মঁড়ে হড়্‌গে গোহা তাহেন্ পে"। (আপনাদের পাঁচজনের নিকট এই মিনতি করিতেছি যে আমরা কাকের মত ছিলাম বকের মত সাদা হইলাম, আপনারা পাঁচজনে সাক্ষী থাকুন)। পরে পুনরায় হেণ্ডিপান ও নাচ-গান করিয়া এই ক্রিয়া শেষ করা হয়।

সিকে—সাঁওতালদের বিশ্বাস, যে-ব্যক্তির সিকে না হয় তাহার পরলোকে দুর্গতি হয়। নেকড়ার সলিতা করিয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া বাম হাতের যে-স্থানে সিকে হইবে সেই স্থান চাপিয়া ধরা হয়। সেই স্থান

* সংযুক্ত বর্ণগুলি অর্দ্ধ-উচ্চারিত হসন্ত বর্ণ। সাঁওতালদের কথোপকথনে এইরূপ শব্দ শুনা যায়, যথা ওড়াক্' (বাড়ী); হেই' এনা আসিল); রায়বায়ুই (ঘটক); লেগিং' (জন্তু) ইত্যাদি।

পুড়িয়া ক্ষত হয় ; ক্ষত সারিয়া গেলে সিকের চিহ্ন থাকে। কেহ একটা কেহ দুইটা কেহ তিনটা এইরূপে সাতটা পর্য্যন্ত সিকে লইতে দেখা গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা সিকে লয় না, তাহারা উল্কি পরে। কালী ... রা ইচ্ছানুরূপ চিত্র করিয়া সূচি দিয়া ফুটাইয়া দাগ করা হয়। পরে হলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া আসে। উল্কিও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য পরা হইত ; আজকাল কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য সাঁওতাল-স্ত্রীলোকেরা ইহা পরিয়া থাকে।

বাপ্‌লা (বিবাহ)—সাঁওতালদেরও বিবাহের ঘটক ('রায়বারূই') আছে ; তাহারা পাত্র ও পাত্রীর সন্ধান করিয়া দেয়। পাত্র ও পাত্রীর ইচ্ছানুসারেও বিবাহ হইয়া থাকে। প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইলে কন্যাপক্ষের লোক দিয়া ভাবী জামাতার গৃহাদি ও অবস্থা দেখিয়া আসে। তা'র পর হরক্' চিখ্‌নে (পাকা দেখা) হয়। প্রথমে বরের পিতা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব লইয়া গিয়া কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। ভাবী বধূর দ্বারা অতিথিগণের সেবা-শুশ্রূষা করানো হয়। ভোজনান্তে বরের পিতা ভাবী বধূর গলায় একটি হাঁসুলি পরাইয়া দেয়। এইরূপে বধূর হরক্'চিখ্‌নে সমাপ্ত হইলে কন্যাপক্ষীয়েরা গিয়া ভাবী জামাতার হরক্'চিখ্‌নে করিয়া আসে। তা'র পর একটি দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া "টাকাচাল" অর্থাৎ পণের টাকা আদান-প্রদান করা হয় এবং বিবাহের দিনস্থির করিয়া যত দিন পরে বিবাহ হইবে একটি সূতায় ততগুলি গাঁট দিয়া রাখা হয়। প্রতিদিন একটি করিয়া গাঁট খোলা হয়, শেষ গাঁট খোলার দিন বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় উভয় পক্ষের লোকেরা প্রচুর-পরিমাণে মদ পান করে ; বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই তাহার সংস্থান কর হয়। নানা-প্রকার নৃত্যগীতও হইয়া থাকে ; বিবাহের সময় কয়েক-প্রকার বিশেষ নৃত্যগীত আছে। বিবাহের সময় উভয়-পক্ষের মাঝিদের মধ্যে যে "বিতি" হয় তাহার কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য। কন্যা-পক্ষের মাঝি বর-পক্ষের মাঝিকে বলে, "গেল্‌বার্‌ আওয়াথন্‌ ডাজান্‌পে বাছাও কেদা, ঠুকিয়ে বাজিয়ে কাতেপে কিরিংকেদা : আদ কুচিয়ে'কান্‌, ভেদড়ে' কান্‌, কাঁড়াক্' কান্‌, খঁড়েক্'কান্‌ গাড়্‌হাক্' সতক্ কান্‌ আলেয়াঃ এলেকা দ বান্থঃ আনা—রাদক্' কান্‌, ক্' কান্‌ দেড়ি' কান্‌, ছিনেরক্' কান্‌, রানক্' কান্‌, নজমক্' কান্‌, আপে সাভাৎগেয়ে চালাক্' আ ; ওড়াক্' গুনেক্' হড়কো বেনাওক্' আ, গোড়া গুনেক্' গেই কো বেনাওক্' আ ; জাং ই জাং তরই' ই তরই' লে এক্রিং আকাদা বহঃ মায়াম্‌ লুতুর্‌ মায়াম্‌ ইনে দ বালে এক্রিং আকাদা, ওনাদলে পাজায়ে গিয়া, তবে মিং দিন তারা দিন দাকা রদক্' উতু রদক্' সাহাওকে লাহাওকেয়া পে ; শিখেউ শিখেউতে পাঢ়হাও পাঢ়হাওতে বাং গানক্ খান্‌, ইন্‌রে মিট্রে' হড়্‌বাড়ে কোল্‌ আলেপে চেপেদাবন্‌।" অর্থাৎ বারো রকমের মধ্যে তোমরা বাসন বাছিয়া লইয়াছ, ঠুকিয়া বাজাইয়া তোমরা কিনিয়াছ ; এখন কুঁড়ে হোক্, দুষ্ট হোক্, কানা হোক্, খোঁড়া হোক্, খারাপ হোক্, হীন হোক্, আমাদের আর এলেকা নাই। রাঙ্ হোক্, তামা হোক্, দুষ্ট হোক্, ভ্রষ্টা হোক্, অবাধ্য হোক্, তোমাদের সঙ্গেই যাইবে—ঘর-গুণে মানুষ হয়, গোয়াল-গুণে গাভী হয়—হাড় হোক্, ছাই হোক্ আমরা বিক্রয় করিয়াছি; কিন্তু মাথার রক্ত, কানের রক্ত বিক্রয় করি নাই (অর্থাৎ হত্যা করিবার অধিকার তোমাদের নাই ; তাহার আমরা প্রতিশোধ লইব। তবে একদিন আধদিন ভাত পোড়া, তরকারী পোড়া সহ্য করিও, শিখাইয়া-পড়াইয়া ভালো না হয় আমাদের কাছে একজন লোক পাঠাইয়া দিও ; আমরা সে-সম্বন্ধে যুক্তি-পরামর্শ করিব।) বরপক্ষের মাঝিও এইসব স্বীকার করিয়া লয়। পরে কন্যা-পক্ষের মাঝি বধূর হাত ধরিয়া বরপক্ষের মাঝির নিকট লইয়া গিয়া বলে, "নি বাবা হড়্‌ইং সপ্রভাপে কান!" (নাও বাবা বধূকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছি)। বরপক্ষের মাঝি বলে, "হেঁ বাবা ঞাম্ কেদানে" (হাঁ বাবা আমরা পাইলাম)। বরপক্ষীয়েরা তখন বধূ লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া যায়। ইহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথাও আছে ; তাহাকে সাকাম্ অড়ে' বলে।

সেন্দ্রা (শিকার)—শিকার সাঁওতালদের প্রধান আনন্দ। ইহারা গ্রামে-গ্রামে সংবাদ পাঠাইয়া সকলে দল বাঁধিয়া কাড়া-নাকাড়া বাঁশী বাজাইয়া শিকারে বাহির

হয়। সঙ্গে শিকারের কুকুর থাকে। শিকার যাত্রারও বিশেষ নৃত্যগীত আছে। ইহারা সাধারণত আহার-অন্বেষণেই শিকার করে, কিন্তু শিকারোন্মত্ত সাঁওতাল-দলের সম্মুখে ব্যাঘ্রাদি বন্যজন্তু পড়িলে তাহাদের নিস্তার নাই। ইহাদের শিকারের সরঞ্জাম তীর-ধনুক, টাঙি, বল্লম, লাঠি ইত্যাদি। শিকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে ইহারা নানা-প্রকার মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি করে।

সেওয়া আর পরব্—সাঁওতালদের প্রধান দেবতা সিং-বঙ্গা (সূর্য্যদেব), তা'র পর মারাং বুরু (বৃহৎ পর্ব্বত) তদ্ব্যতীত আরও অনেক দেবতা ইহারা মানে, যথা চাম্ সিম্ বঙ্গা, মঁড়ে তুরুই, গোঁসাই এরা প্রভৃতি। সম্বৎসরে ইহাদের নানা-প্রকার পর্ব্বও আছে। আষাঢ় মাসে ধান্য-রোপণ-কালে এরঃ সিম্ পরব, ধান্যরোপণ শেষ হইলে শ্রাবণ মাসে হেরিয়েড়্ সিম্ পরব, ভাদ্র মাসে ইড়ি গুঁড়লি নাওয়াই, অগ্রহায়ণ মাসে যাযাড়্ ও প্রধান পরব সোহ্‌রায়। সোহ্‌রায় ইহাদের সপ্তাহব্যাপী বৃহৎ পর্ব্ব।

সাঁওতালদের ভূতপ্রেতে দৃঢ়বিশ্বাস। ডাইনের ভয় ইহাদের খুব বেশী। স্ত্রীলোকেরাই ডাইনের বিদ্যা শিখিয়া ডাইন হয় এবং কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইলে তাহাকে অলক্ষিতে খাইয়া ফেলে, সে-ব্যক্তি শুকাইয়া শুকাইয়া মারা যায়। ইহাদের যত-প্রকার দুঃখকষ্ট ও অশান্তির কারণ এই ডাইনেরা।

ভাণ্ডান্ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া)—সাঁওতালেরা মৃত ব্যক্তির শবদাহ করে এবং মৃতের অস্থি নদীতে নিক্ষেপ করে। ভাণ্ডানক্রিয়ার দ্বারা ইহারা অশৌচমুক্ত হয়। ভাণ্ডান না হওয়া পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির বাড়ীতে কোনো পর্ব্বাদি হইতে পারে না। ইহা শ্রাদ্ধের ন্যায় একপ্রকার ক্রিয়া। এই উপলক্ষ্যেও গ্রামবাসিগণের পান-ভোজনের ব্যবস্থা আছে।*

*হড়্ কোরেন্ মারে হাপড়াম্ কো রেয়াক্' কাথা (The Traditions and Institutions of the Santals, published by the Santal Mission of the Northern Churches of Benagaria) অবলম্বনে লিখিত।

ভারতবর্ষের অর্থের কথা

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায়

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেই অর্থের প্রচলন হইয়াছিল। এই দেশের প্রাচীন কালের ইতিহাস যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালেই ভারতবাসী সভ্যতায় অত্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিল্প-বাণিজ্যে তাঁহারা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ও অধিবাসীদিগের বিবরণ-গ্রন্থ, বেদ, সংহিতা, বৌদ্ধগ্রন্থাদি, এবং তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারতে অর্থের ব্যবহার-সম্বন্ধে যথেষ্ট সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো-কোনো প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে জিনিষের বদলে জিনিষের বিনিময়েরও খবর পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে 'প্রতিপণের' অর্থাৎ সামগ্রী বিনিময়ের উল্লেখ আছে। পাণিনিতে (৫।৪।৯২) আছে—"পঞ্চভির্গোভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগুঃ", "দ্বাভ্যাং পুরুষাভ্যাং ক্রীতা দ্বিপুরুষা (কাশিকা ৪।১।২৪)" "পঞ্চভিঃ মূচীভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চমূচঃ (কাশিকা ১।২।৪০)", ইত্যাদি। আবার প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেই ধাতুমুদ্রা ছাড়া গরুও যে মূল্য-নির্দ্ধারণের মানস্বরূপ ছিল তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দশটি গরু একটি ইন্দ্রমূর্ত্তির মূল্যের পরিমাণ-নির্দ্দেশক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গরুর বিনিময়ে সোমের ক্রয়ের উল্লেখ আছে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন-প্রকারের সোনা, রূপা ও তামার তৈয়ারী মুদ্রার প্রচলন ছিল। বৈদিকযুগে আর্য্য-গণ ভারতবর্ষে 'নিষ্ক' নামক একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত

করেন। ইহা দেখিতে কেমন ছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। এই 'নিষ্ক'ই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মুদ্রা বলিয়া মনে হয়। বৈদিকযুগে ধাতুমুদ্রা ছাড়া স্বর্ণপিণ্ডও অর্থের কাজ চালাইত। বৈদিকযুগের শেষে, ১০০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৪০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে 'নিষ্ক' ছাড়া আরও কতকগুলি ধাতুমুদ্রার প্রচলন ছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে 'শতমান' মুদ্রার উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণে 'পাদ' মুদ্রার নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে "কৃষ্ণাল" নামে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রার উল্লেখ পাই। "শতমান" ও "কৃষ্ণাল" এই যুগের পরেও বহুকাল চলিয়াছিল। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সোনার ও রূপার শতমান মুদ্রার উল্লেখ আছে। মনুসংহিতা পাঠে জানিতে পারি যে, চাকর যদি পীড়িত না হইয়া খেয়ালের বশে চুক্তিমতো কাজ না করিত, তাহা হইলে তাহাকে আট কৃষ্ণাল জরিমানা করিবার রীতি ছিল। বৌদ্ধ জাতকপাঠে জানা যায় যে, গৌতম-বুদ্ধের যুগে, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৩২১ মধ্যে আরও কয়েকটি নূতন ধাতুমুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল, যথ—নিক্‌খ, মাষ, কাকনিকা, কাহাপন (কাষাপণ) ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতে সম্রাট্ বা রাজাই মুদ্রা নির্মাণ করাইতেন। *

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের সময়ে চল্‌তি অর্থের সংস্কারের জন্ত বহু চেষ্টা হইয়াছে। তখনও মুদ্রা-নির্মাণের ভার সম্রাট্‌গণের উপরে ছিল। মহম্মদ তোঘলক্ অর্থ-সংস্কারে হাত দিতে যাইয়া তখনকার রূপার মুদ্রাতে খাদের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তামার মুদ্রা তৈয়ারী করাইয়া উহা রৌপ্য-মুদ্রার মূল্যে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনকার লোক উহাতে রাজি হইল না। এখন গভর্ণমেণ্টের প্রচলিত একটুকরা কাগজের নোট আমাদের সমাজে অর্থের কাজ চালাইতেছে। কিন্তু তখনকার সমাজে সম্রাটের প্রচালিত তাম্রমুদ্রা—যাহা কতকটা এই কালের নোটের মতো ছিল—তাহা চলিল না। সম্রাট্ আকবর সমগ্র ভারতবর্ষে এক আদর্শমুদ্রা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুলতান আল্‌তামাশ ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে রূপার 'টঙ্কা' সর্ব্বপ্রথম তৈয়ারী করান। উত্তর ভারতে এই 'টঙ্কা' খুব চলিয়াছিল।

মোগল আমলে হিসাবপত্র, দরকষা প্রভৃতি সব কাজই রূপার টাকার হিসাবে হইত; কিন্তু তাই বলিয়া স্বর্ণমুদ্রা যে চলিত না তাহা নহে। তবে উহার প্রচলন খুব কম ছিল। মোগল সম্রাট্‌গণ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দুইই তৈয়ার করাইতেন। কিন্তু কয়টি স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্ত্তে কয়টি রৌপ্য-মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহা ঠিক থাকিত না—প্রায়ই বদ্‌লাইত। মোগল রাজত্বের শেষ সময়ে উত্তর ভারতে ও বাংলা দেশে রূপার টাকাই চলিত বেশী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতবর্ষে মুসলমান প্রভাব তেমন হয় নাই বলিয়া তথায় স্বর্ণ মুদ্রার চলন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষে তখন নানান-রকম সোনার মোহর ও রূপার টাকা চলিত। কেহ-কেহ বলেন, তখন ভারতবর্ষে প্রায় দুইশত রকম সোনার মোহর এবং প্রায় ৫৫০শত-প্রকারের রূপার টাকা প্রচলিত ছিল।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী আইনের সাহায্যে সোনা ও রূপার বিনিময়-হার স্থির করিয়া দিয়া দ্বিধাতু-পরিমাণ (Bimetalism) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলেন। একটি সোনার মোহরের দাম ১৪ সিক্কা টাকা স্থির হইল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের রূপার টাকা চালাইবার চেষ্টা করিলেন।

ভারতবর্ষে নানান-রকম মোহর ও টাকার প্রচলন থাকাতে বড় অসুবিধা হইত। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলের সিক্কা টাকা তাঁহাদের কলিকাতা টাঁকশালে তৈয়ার করাইয়া তাঁহাদের সীমানার মধ্যে আদর্শ মুদ্রারূপে চালাইবার চেষ্টা করিলেন। আর

* প্রাচীন ভারতের অর্থ-সম্বন্ধে (১) Economic Life and Progress in Ancient India, by Narayan Chandra Bandyopadhyaya.
(2) The Economic History of Ancient India, by Santosh Kumar Das.
(৩) বেদ ও (৪) সংহিতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইল।

ঐ সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন প্র. .শ আরও তিন রকম টাকা তাঁহারা চালাইলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী দ্বিধাতু-পরিমাণের প্রথা উঠাইয়া দিলেন। সোনার মূল্য আর অ: .র জোরে ঠিক করিয়া না দিয়া উহার ক্রেতার উপরেই ছাড়িয়া দিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষে রূপার টাকাই একমাত্র চলত্-সিক্কা (legal tender money) বলিয়া প্রচারিত হইল। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী আরও হুকুম জারি করিলেন যে, ভারতবর্ষে তাঁহাদের অধিকৃত স্থানে কোথাও সোনার মোহর চলত-সিক্কা বলিয়া আর চলিবে না। কিন্তু ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট্ আইন করিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারীতে ১৫ টাকায় ১ মোহর, এই হিসাবে সোনার মোহর গ্রহণ করা হইবে। কিছু দিন যাইতে না যাইতেই অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতে সোনার খনি আবিষ্কার হওয়ার দরুন পৃথিবীর বাজারে সোনা খুব সস্তা হইয়া গেল। ভারতবর্ষেও (গভর্ণমেণ্ট যে-দরে ১৫ টাকায় ১ মোহর) স্বর্ণ গ্রহণ করিতেছিলেন বাজারে সোনা তাহার চেয়ে সস্তা হইয়া গেল। লোকে বাজার হইতে কম দামে সোনা কিনিয়া উহা গভর্ণমেণ্টের ট্রেজারীতে দিয়া বেশী মূল্য আদায় করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে খাজনা বা অন্য-কোনো বাবদে গভর্মেণ্টের খাজাঞ্চি-খানায় আর সোনা লওয়া হইবে না। এই হুকুমের ফলে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। ভার: ও য়ুরোপীয় সওদাগরগণও গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন যে, ভারতবর্ষে সোনার মুদ্রাই চালানো হউক। ১০৲ টাকায় এক সোভারেন্ এই হিসাবে সোভারেন্‌কে চলত্-সিক্কা (legal tender money) করিতেও তাঁহারা পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট্ তাহাতে রাজি হইলেন না। গভর্ণমেণ্ট্ কেবল এইটুকু পরিবর্ত্তনের আদেশ দিলেন যে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ট্রেজারীতে যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট বিনিময়-হারে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করা হইত, এখন হইতে আবার তেমনি করা হইবে।

কাজেই ভারতবর্ষে রূপার মুদ্রাই চলিতে লাগিল। আমাদের দেশে যখন এই অবস্থা, তখন য়ুরোপের অনেক দেশেই ইংলণ্ডের দেখা-দেখি রূপার মুদ্রার প্রচলন উঠাইয়া দিয়া স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন সুরু হইয়াছে। তাহার ফলে পৃথিবীর বাজারে রূপার টান কমিয়া গেল। পণ্যের জোগান ঠিক থাকিয়া টান যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহার দাম কমে। এই ক্ষেত্রে, রূপারও জোগান ঠিক থাকিয়া টান কম হওয়াতে উহার দাম কমিতে আরম্ভ করিল।

রূপ ও প্রেম

(কোলরিজের অনুসরণে)

মদনের ধনুজিনি সুবঙ্কিম ভুরু-রেখা লতা,
গোলাপের রাগ রক্ত কাপোলের পুষ্পপেলবতা,
উজ্জ্বল নয়ন প্রান্তে কটাক্ষের চটুল বিলাস,
নাহি মাগি, তার লাগি নাহি মোর কোন অভিলাষ।
স্নিগ্ধ নীল আঁখিপুটে প্রণয়ের নম্র নিবেদন,
বিকায়েছি তা'র কাছে, ওগো মোর সমগ্র যৌবন।

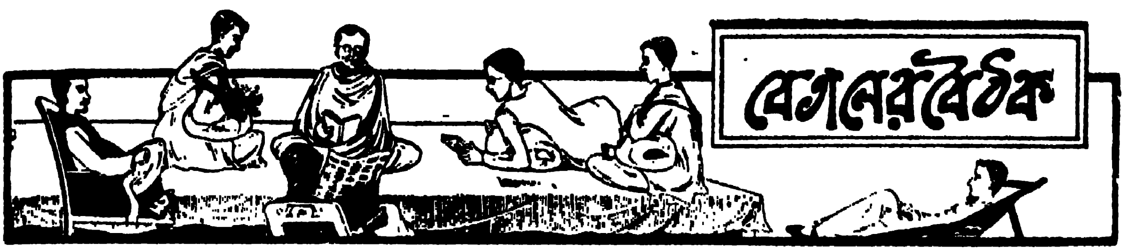
শ্রী চারুবালা চট্টোপাধ্যায়

স্বরূপ

(সেখ সাদী অনুসরণে)

শ্যামল তরুর শিরে—চিত্রিত পল্লব
সে কি শুধু—অর্থহীন ছন্দহীন বাণী,
জ্ঞানীর মানস চক্ষে—প্রতি পত্র তার
—তাঁহার মহিমা মাখা—মহাগ্রন্থ খানি।

শ্রী শচীন্দ্রমোহন সরকার



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

চিনির কারখানা

ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে চিনির কারখানা আছে ও তাহা কতটা দেশের লোক দ্বারা চালিত?

শ্রী মণিলাল সেন

জন্মদিন

হিন্দুদিগের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে, জন্মদিনে কোনো শুভকার্য্যে কোথায়ও গমনাগমন, ক্ষৌরকর্ম্ম ইত্যাদি করিতে নাই। এ-সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মত কি?

শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

—

মীমাংসা

বিধবা-বিবাহ

(৭)

মহাভারতের ভীষ্ম-পর্ব্বে দেখা যায়, নাগরাজ ঐরাবতের পুত্র সুপর্ণকে গরুড় বিনষ্ট করিলে সুপর্ণের বিধবা পত্নীকে নিঃসন্তান দীন-চিত্তা ও দুঃখিতা দর্শন করিয়া নাগরাজ বিধবা পুত্রবধূকে ভার্য্যার্থ অর্জ্জুনকে দান করেন এবং অর্জ্জুনও তাহাকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন। নাগরাজের এই বিধবা পুত্রবধূর গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল (৯০ অধ্যায় ৬—১৬ শ্লোক)। অর্জ্জুনের এই পত্নী ইরাবান্-জননীই "নাগরাজসুতা মৃতভর্ত্তৃকা" ছিলেন। ইহার নাম মহাভারতের কোথাও নাই। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়েরা "ধর্ম্মসংহিতায়" যে-চিত্রাঙ্গদাকে নাগরাজসুতা মৃতভর্ত্তৃকা বলা হইয়াছে এই চিত্রাঙ্গদা মণিপুররাজ চিত্রবাহনের (আভিধানিক মহাশয়েরা এই চিত্রবাহনকে "চিত্রভানু" বলিয়া ভুল করিয়াছেন) একমাত্র কুমারী কন্যা। অর্জ্জুন ইঁহাকে পুত্রিকাধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুন-নন্দন বভ্রুবাহনের জননী। ইনি নাগরাজসুতাও নহেন মৃতভর্ত্তৃকাও নহেন [আদিপর্ব্ব ২১৬ অধ্যায় এবং ২১৭ অঃ ২৩-২৬ শ্লোক]। অতএব এই চিত্রাঙ্গদাকে যে তর্করত্ন মহাশয় "ধর্ম্মসংহিতায়" মৃতভর্ত্তৃকা নাগরাজসুতা বলিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণই ভুল। তর্করত্ন-মহাশয় একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত, সংস্কৃত মহাভারতের সম্পাদয়িতা, তিনি হিন্দুর শাস্ত্র-গ্রন্থগুলির বাঙ্গালা অনুবাদক, তিনি কেমন করিয়া যে "ধর্ম্মসংহিতায়" এত বড় একটা ভুল করিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। যিনি চিত্রাঙ্গদাকে "নাগরাজ-সুতা মৃতভর্ত্তৃকা" বলিয়াছেন তিনি যেমন ভ্রান্ত, ইহা মহাভারতেও আছে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও তেমনি ভ্রান্ত। চিত্রাঙ্গদা "নাগরাজসুতা মৃতভর্ত্তৃকা," ইহা মহাভারতে কি অপর-কোনো প্রামাণিক গ্রন্থেই নাই।

(৮)

বাঙ্গালা দেশে বিবাহ

কোন্ মাসে কি কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ তাহা আমাদের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে এইরূপ আছে, যথা—

আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা, নষ্টপ্রজা শ্রাবণে, বেশ্যা ভাদ্রপদে, ইষে চ মরণং, রোগান্বিতা কার্ত্তিকে, পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহুলা, চৈত্রে মদোন্মাদিনী। আষাঢ় মাসে বিবাহ হইলে কন্যা ধনধান্যভোগ-রহিতা, শ্রাবণে মৃতবৎসা, ভাদ্রে বেশ্যা, আশ্বিনে মৃত্যু, কার্ত্তিকে রোগযুক্তা, পৌষে আচারভ্রষ্টা ও স্বামী-বিয়োগিনী, চৈত্রে মদোন্মত্তা হয়। কিন্তু অরক্ষণীয়া কন্যার পক্ষে কেবল পৌষ ও চৈত্র মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। ইহা প্রচলিত পঞ্জিকাতেও রহিয়াছে, হিন্দুমাত্রের পক্ষেই যখন এই বিধান অবশ্যপালনীয়, তখন, ভারতের অপর প্রদেশের হিন্দু-দিগের মধ্যেও এইসকল মাসে বিবাহ-প্রথা নাই।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(৯)

গত ভাদ্রমাসের প্রবাসীর "বেতালের বৈঠকের" চাউল-রক্ষণ প্রশ্নের মীমাংসায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুভূষণ দত্ত রায় মহাশয় পোকাধরা শস্যের

পোকা নষ্ট করিবার যে কয়েকটি প্রণালী দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথম প্রণালীটি বড়ই বিপজ্জনক। পোটাসিয়াম্ সায়ানাইড্-এর (Potassium Cyanide) সহিত সালফিউরিক্ অ্যাসিড (Sulphuric Acid) মিশাইলে হাইড্রোসায়ানিক্ অ্যাসিড (Hydrocyanic Acid) নামে যে-গ্যাসটি উৎপন্ন হয় তাহা অতীব বিষাক্ত। এই গ্যাস অতি অল্পমাত্রও যদি কোনো প্রকারে নিশ্বাসের সহিত প্রবেশ করে তাহা হইলে অত্যন্ত সবলও সুদৃঢ়কায় মনুষ্য তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখনও পর্য্যন্ত এমন কোনো ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা ইহার প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং এরূপ তীব্র বিষাক্ত দ্রব্য কোনো প্রকারেই ব্যবহার করা উচিত নহে। সামান্য পোকা নষ্ট করিবার জন্য নিজের জীবন এরকমে বিপন্ন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

শ্রী ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১০)

খনার বচন

জিজ্ঞাসু-মহাশয়ের উদ্ধৃত খনার বচনে এবং লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের নবশাকের বর্ণনায় উক্ত অংশে একটু ভুল হইয়াছে। বচনের শেষ পঙ্‌ক্তির "সামনে" শব্দের পর একটি "না" এবং বিদ্যানিধি-মহাশয়ের নবশাকের বর্ণনায় উদ্ধৃত কথায় প্রথমেই যে "তৈলী" শব্দ রহিয়াছে এই "তৈলী" শব্দের স্থানে "তিলি" শব্দ হইবে। কেননা জিজ্ঞাসু-বিদ্যানিধি মহাশয় নবশাকের জাতিগুলির উল্লেখ করিয়া পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই "তিলি" শব্দ তিনি (বিদ্যানিধি-মহাশয়) কোথা হইতে পাইলেন? অতএব বোধ হয় জিজ্ঞাসু ভ্রম-ক্রমে "তিলি" স্থলে "তৈলী" লিখিয়াছেন।

যাত্রা করিয়া পথে বাহির হইতেই যাহা দর্শন করিলে যাত্রা নষ্ট হইবে, সুতরাং যাত্রিক স্থানে যাওয়া নিষেধ, খনার এই বচনাংশে তাহারই নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই—

"মাকুন্দ চোপা" দুইটি শব্দ 'মাকুন্দ' ও "চোপা" যাহার কখনই গোঁফ-দাড়ী গজায় না বা কখনও গজাইবেও না তাহাকে "মাকুন্দ" এবং মুখকে ইতর ভাষায় "চোপা" কহে। অতএব যাহার গোঁফ-দাড়ী গজায় না বা কখনও গজাইবে না, তাহার মুখই "মাকুন্দ চোপা"। যাত্রা করিয়া এই "মাকুন্দ চোপা" দর্শন করা অশুভজনক। অতএব যাত্রিক স্থানে যাইতে পথে এই "মাকুন্দ চোপা" দর্শন করিলে যাত্রিক স্থানে যাইবে না। তাই খনা বলিয়াছেন, "যদি দেখ মাকুন্দ চোপা, এক পা না বাড়াও বাপা।" বাবা! মাকুন্দ চোপা দেখিলে আর যাত্রিক স্থানে যাইও না। কিন্তু যাত্রিক স্থানে একান্তই না গেলে নয় এমন হইলে "মাকুন্দ চোপা" দেখিলেও যাত্রিক স্থানে যাওয়ার বিধান দিয়া বলিলেন, "এরেও ঠেলি", অর্থাৎ "মাকুন্দ চোপা" দেখাও অগ্রাহ্য করি "যদি সামনে না দেখি তেলী"। যাত্রা করিয়া যাত্রিক স্থানে যাইতে পথে "মাকুন্দ চোপা" দেখিলেও যাইতে পারা যায়, কিন্তু "মাকুন্দ চোপা" দেখিয়া যাওয়া যায়, যদি "তেলী" না দেখা যায়। "মাকুন্দ চোপা" দেখিয়া তেলী দেখিলেই যাত্রা একেবারে পণ্ড হইবে। ইহাই খনার এই বচনের অর্থ। এখানে যে 'তেলী' কথা রহিয়াছে, এই "তেলী" শব্দ সংস্কৃতের "তৈলিকঃ" শব্দেরই অপভ্রংশ। এই তৈলিক শব্দের অর্থ কলু, তৈল-প্রস্তুতকারক। এই "তেলী"ই মানব-সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৮৪ শ্লোকের টীকায় টীকাকারের ব্যাখ্যায় "তৈলিকঃ"; এই তৈলিক বা তেলী কলু-জাতি বাচ্য। এই জাতি ব্রাহ্মণাদির অনাচরণীয়। কিন্তু নবশাক ব্রাহ্মণাদির অনাচরণীয় নহে। এমনকি মহর্ষি পরাশর নবশাকের "গোপ" ও "নাপিতের" অন্ন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদির ভোজনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন (১১ অঃ, ২০ শ্লোক)। অতএব নবশাকের "তৈলী" সংস্কৃত "তৈলিকঃ" শব্দের অপভ্রংশও নহে এবং একার্থবাচকও নহে।—তিল+অ (ক) বিকারার্থে "তৈল" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

স্মৃতিতে এই "তৈলী" আচরণীয় নবশাক-শ্রেণীভুক্ত। আভিধানিকেরাও এই "তৈলী"কে একবার আচরণীয় নবশাক বলিয়াছেন; তাঁহারাই আবার নবশাকের এই আচরণীয় "তৈলীকে" অনাচরণীয় "তৈলিক" পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তৈলকারক, কলু, এবং তেলী অর্থ করিয়াছেন। ইহা যে আভিধানিক মহাশয়দিগের সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ইহাতে সন্দেহ নাই।

স্মৃতিশাস্ত্রের নবশাকের বর্ণনাতে রহিয়াছে

গোপ মালী, তথা তৈলী, তন্ত্রী, মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।

গোপ (গোয়ালা), মালী (ফুলমালী), তৈলী (তৈলব্যবসায়ী), তন্ত্রী (তাঁতি), মোদক (ময়রা) বারুজী (পানচি), কুম্ভকার, কর্ম্মকার, এবং নাপিত ইহারাই নবশায়ক। কিন্তু বিদ্যানিধি-মহাশয় নবশায়কের বর্ণনাতে 'তাম্বুলী", "গোহালী" এবং "পুটুলী" দিগকে নবশায়ক বলিয়াছেন; স্মৃতিশাস্ত্রে ইহাদিগের নাম নাই। তিনি এই জাতিগুলি কোথায় পাইলেন বলিবেন কি?

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(১১)

মহিষী

মহিষ শব্দ সংজ্ঞা-বাচক পুংলিঙ্গ। এই শব্দের মহ অর্থ পূজা করা। এই মহ+ইষ (টিষচ) প্রত্যয়ে এই মহিষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই মহিষ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মহিষী হইয়াছে। কেহ কেহ মহিষ শব্দ ঙীপ প্রত্যয় করিয়া মহিষী পদ সাধন করিয়াছেন। মহিষী শব্দের প্রথম অর্থ স্ত্রীমাত্র, ২য় অর্থ কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী। সুতরাং "মহিষী" কথার পৃথক্ কোনো ব্যুৎপত্তি নাই।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব

(১২)

ষাট বলা

জাতকর্ম্মসময়ে "শতবর্ষ জীবিত থাকো" বলিয়া জনক আশীর্ব্বাদ করিয়া জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। সুতরাং অরণ্যষষ্ঠীর পূজা সময়ে স্ত্রীলোকগণ স্নান করিয়া উঠিয়া সন্তান-সন্ততিদিগের মাথায় জল দিয়া (পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলে পাখার বাতাস করে, জল মাথায় দেয় না, পূজার পরে ধানদূর্ব্বাসহ জল মাথায় দেয়) যে "ষাটষাট" বলে, ইহার অর্থ ষাট বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার আশীর্ব্বাদ হইতেই পারে না। তবে কলিকালে মানুষের আয়ু নাকি ১২০ বৎসর তাই "ষাটষাট" অর্থাৎ ৬০+৬০=১২০ বৎসর জীবিত থাকো এই অর্থও করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অর্থও সমীচীন নয়।

সাধারণত দেখা যায় শিশুরা আছাড় খাইয়া পড়িলে বা কোনোরূপ ব্যথা পাইলে "ষাটষাট" বলিয়া তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইয়া সান্ত্বনা করা হয়। অতএব এই "ষাটষাট" সান্ত্বনা-সূচক স্নেহ-বাক্য বলা যাইতে পারে।

অরণ্যষষ্ঠীর ব্রত-কথায় দেখা যায়, ছেলে আবদার করিয়া পিতৃধনার নাসিকা কর্ত্তন, মাতৃধনার মূল্যবান্ শাড়ী ছেঁড়া এবং তেলীর তেলের মট্‌কী ভাঙিয়া গুরুতর ক্ষতি করিলেও তাঁহারা ছেলেদিগকে "ষাটষাট বা ক'রেছ ভালো করেছ" বলিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়াছিলেন। অতএব অরণ্যষষ্ঠীর দিবস ছেলেরা যত ক্ষতি ও অপকারই

করুক না কেন, তজ্জন্য তাহাদিগকে গালি-মন্দ না করিয়া আদরই করিতে হইবে। অতএব আরণ্যষষ্ঠীর দিনের "ষাটুষাটু" সম্পূর্ণ অপরাধ ক্ষমাজনক মঙ্গল-কামনা-সূচক স্নেহবাক্য। এই আরণ্যষষ্ঠী পুত্রের জন্য জননীর অপূর্ব্ব কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ-ব্রত।

(২২)

রাহু চণ্ডাল

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায় মহাশয় "বৃহজ্জাতকাদয়:" গ্রন্থে "রাহু"চণ্ডাল বলিয়া উক্ত হইয়া "শব্দকল্পদ্রুমে" রাহুকে চণ্ডাল-জাতি ও সর্পাকৃতি বলা হইয়াছে বলিয়াছেন। কিন্তু "শব্দকল্পদ্রুম" হইতে রায় মহাশয়ের উদ্ধৃতাংশের শেষভাগে যখন "ইতি বৃহজ্জাতকাদয়:" বলিয়া লিখিত রহিয়াছে তখন ঐ কথা "বৃহজ্জাতকাদয়:" গ্রন্থ হইতেই "শব্দকল্পদ্রুম" উদ্ধৃত করিয়াছেন। "বৃহজ্জাতকাদয়:" এবং তদনুযায়ী "শব্দকল্পদ্রুমের" ঐ কথা ভ্রান্তিপূর্ণ। "রাহু" চণ্ডালও নহে, "সর্পাকৃতি"ও নহে। প্রচলিত পঞ্জিকাতে "কেতুর"ই সর্পাকৃতি এবং 'রাহুর' মানবমস্তক সদৃশ অসুরমস্তকই মুদ্রিত রহিয়াছে দেখা যায়। গ্রহণের মুক্তিস্নান মন্ত্রে রহিয়াছে—

উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গম:।
কর্ম্মচাণ্ডাল যোগোৎথং কুরু পাপক্ষয়ং মম॥

স্নানমন্ত্রের এই "কর্ম্মচাণ্ডাল" কথাটা দেখিয়াই বোধ হয় "বৃহজ্জাতকাদয়:" রাহুকে চণ্ডাল বলিয়াছেন এবং "শব্দকল্পদ্রুম"ও অবিচারিতচিত্তে তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। বস্তুত: রাহুর চণ্ডালত্বের অপর কোন প্রমাণই নাই; বরং রাহুর ব্রাহ্মণত্বেরই প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

মহাভারতে দেখা যায় ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ-প্রজাপতির কশ্যপ মুনির সহিত বিবাহিতা ত্রয়োদশ কন্যার অন্যতম "সিংহিকা"। এই সিংহিকারই গর্ভে কশ্যপ মুনির ঔরসে রাহুর জন্ম (আদিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়, ১১—১৩ এবং ৩১ শ্লোক)। এই রাহু দেবতার ছদ্মবেশে অমৃত পান করিবার সময় চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর ছদ্মবেশ ধরাইয়া দিলে বিষ্ণু চক্রদ্বারা রাহুর মস্তক ছেদ করেন; এই মস্তকই বিদ্বেষবশে চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া গ্রহণ ঘটায়। এজন্য মহাভারতে রাহুকে "চন্দ্রার্কমর্দ্দনম্" ও বলা হইয়াছে (আদিপর্ব্ব ১৯ অ: ৪—৯ শ্লোক)। বাঙ্গালা আভিধানিক মহাশয়েরাও রাহুকে "অষ্টমগ্রহ" এবং সিংহিকা-পুত্র বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাহুর জননী ব্রাহ্মণ দুহিতা এবং জনকও ব্রাহ্মণ, সুতরাং রাহুও ব্রাহ্মণেরই সন্তান, ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ-সন্তান চণ্ডাল হইবে কেন? ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার না হইলেও চণ্ডাল হয় না, শূদ্র হয়; কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ সন্তানের ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার করেন নাই ইহা একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য কথা। পরন্তু মহর্ষি বেদব্যাসকৃত বলিয়া প্রচারিত নবগ্রহ-স্তোত্রেও রাহুকে অষ্টম গ্রহ স্থলে

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকং।
সিংহিকায়া: সুতং রৌদ্রং তংরাহুং প্রণমাম্যহম্।

বলিয়া মহর্ষি ব্যাস এবং ব্রাহ্মণাদি হিন্দুগণ রাহুকে প্রণাম করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানেও ব্রাহ্মণাদি হিন্দুগণ এই স্তোত্র পাঠ করিয়া "তংরাহু প্রণমাম্যহম্" বলিয়া প্রণাম করেন। রাহু চণ্ডাল হইলে মহর্ষি বেদব্যাস এবং ব্রাহ্মণগণ কি চণ্ডালকে প্রণাম করিতেন? এবং বর্ত্তমানেও ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালকে প্রণাম করে নাকি? চন্দ্র সূর্য্যকে রাহুর গ্রাস করা চণ্ডালের কার্য্য কল্পনা করিয়া রাহুকে কর্ম্ম চণ্ডাল বলা হইয়া থাকিলেও সিংহিকা-সুত রাহুকে চণ্ডাল বলা যাইতে পারে না। কোনো চন্দ্রসূর্য্যকে সিংহিকা-সুত রাহু গ্রাস করিয়াও গ্রহণ ঘটায়ই না অপর কোন রাহুও গ্রহণ-সময়ে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিয়া গ্রহণ ঘটায় না। এবং রাহুও গ্রহণের কারণ নহে। প্রাকৃতিক কারণেই গ্রহণ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং রাহু "কর্ম্মচণ্ডালও" নহে। ছদ্মবেশে সিংহিকা-সুত রাহুর অমৃত পান চন্দ্রসূর্য্যের ছদ্ম বেশ ধরাইয়া দেওয়া এবং বিষ্ণুচক্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন ও তদ্ধেতু চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গে রাহু মস্তকের বিদ্বেষ হয়ত সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই রাহু মস্তক "চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দনম্" চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে তজ্জন্য গ্রহণ হয় এবং তজ্জন্য রাহু "চণ্ডাল কর্ম্মকারী" ও রাহু অষ্টমগ্রহ, ইহার সহিত সত্যের আদৌ কোন সম্বন্ধই নাই। ইহা সমুদায়ই পৌরাণিকের অবাস্তব মনোরম গল্পমাত্র। যে প্রাকৃতিক কারণে গ্রহণ সংঘটন হয় আমাদের পৌরাণিক এবং জ্যোতিষী মহাশয়েরা তাহা অবগত ছিলেন না। তাই পৌরাণিক এই অবাস্তব মনোরম গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জ্যোতিষী মহাশয়েরাও তাহাই বিশ্বাস করিয়া পঞ্জিকাতে রাহু-কেতুকে অষ্টম ও নব গ্রহ এবং রাহুর মানবাকৃতি অসুরমস্তক ও কেতুর সর্পাকৃতি মুদ্রিত করিয়াছেন। এবং নবগ্রহ স্তোত্রকার তাঁহার কৃত নবগ্রহ-স্তোত্রে রাহুকে 'চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দকং' এবং কেতুকে 'তারা গ্রহ-বিমর্দ্দকং' বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। রাহু-কেতুর যে কোনই সত্তা নাই, সুতরাং অষ্টম ও নবম গ্রহ নহে এবং যে প্রাকৃতিক কারণে গ্রহণ সংঘটন হয়, তাহা দেখান যাইতেছে।

পৃথিবীকে মাঝখানে রাখিয়া তাহার একদিকে চন্দ্র ও অপর দিকে সূর্য্য থাকিলে পূর্ণিমা এবং উভয়ে পৃথিবীর একই দিকে সমসূত্রস্থ হইলে অমাবস্যা হয়। পৃথিবী পশ্চিম দিক হইতে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া পূর্ব্বদিকে এবং চন্দ্র আবার পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে গমনপ্রযুক্ত সূর্য্য কিরণ পূর্ব্ব হইতে গমন করিতে দেখা যায়, সূর্য্যের সেই কল্পিত গমন-পথকে "ক্রান্তিবৃত্ত" এবং চন্দ্রের গমন-পথকে 'চন্দ্রকক্ষ' কহে। এই 'চন্দ্রকক্ষও" "ক্রান্তিবৃত্ত" পরস্পরকে যে দুই বিন্দুতে ছেদ করে কল্পনা করা হয় সেই দুই বিন্দুকে 'পাত' কহে। চন্দ্র ও সূর্য্য স্বতন্ত্র ভাবে এই দুই সমপাতে বিন্দুতে সমসূত্রস্থ হইলে যদি পূর্ণিমা ঘটে, তাহা হইলে চন্দ্র গ্রহণ এবং উভয়ে একত্রে এক সমপাত বিন্দুতে সমসূত্রস্থ হইলে যদি অমাবস্যা ঘটে তাহা সূর্য্যগ্রহণ হয়। সূর্য্যের গমন-পথ "ক্রান্তিবৃত্ত" এবং 'চন্দ্রকক্ষ' উভয়ই যেমন কল্পিত, ইহাদের পরস্পরের সমপাত বিন্দুদ্বয়ও তেমনই কল্পিত; সুতরাং ইহাদের কোন সত্তাই নাই। ১২৬৪ সন এবং তৎপরবর্ত্তী পঞ্জিকাতে দেখা যায়, এই পাত-বিন্দুদ্বয়েরই এক বিন্দুকে "রাহু' অপর বিন্দুকে "কেতু" কল্পনা করা হইয়াছে। পাশ্চাত্যদিগের গ্রহণের নির্ণীত কারণই এই কল্পনার ভিত্তি। অতএব 'রাহু" ও "কেতু" এবং তাহাদের অষ্টম ও নবম গ্রহত্বের কে জ্যোতিষিক কোন ভিত্তিই নাই। অতএব "রাহু" চণ্ডাল কর্ম্মকারীও নহে অষ্টম গ্রহও নহে। অষ্টম ও নবম গ্রহ-রাহু-কেতু কল্পিত না হইলে পঞ্জিকায় গ্রহদিগের শুভাশুভ, স্ত্রী পুরুষ ভেদ, পরস্পর শত্রুমিত্র ও সম, কোন্ গ্রহ, কোন্ জাতি, কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির অধিপতি; কোন্ গ্রহ উচ্চ, কোন্ গ্রহ নীচ গ্রহ এইসকল স্থলেই অষ্টম ও নবম গ্রহ রাহু কেতুর উল্লেখ দেখা যাইত। স্বর্গীয় নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় ও তাঁহার "হোরা বিজ্ঞান" গ্রন্থে অষ্টম ও নবম গ্রহ কল্পিত বলিয়া এই "রাহু ও কেতুকে' গ্রহ পদ হইতে খারিজ করিয়া ৭টি মাত্র গ্রহ বলিয়াছেন। অতএব "রাহুর' যখন কোন অস্তিত্বই নাই, তখন গ্রহণ-মুক্তিস্নানমন্ত্রে আমরা যাহাকে "উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো" বলি, সেই রাহুও নাই, তাহার কোন জাতিও নাই। অতএব রায় মহাশয় যে "রাহুকে" চণ্ডাল জাতি বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই ভ্রান্তিসূচক। এই ভ্রান্তির মূল "বৃহজ্জাতকাদয়' গ্রন্থ এবং 'শব্দকল্পদ্রুম'।

শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ দেব



বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্য-পুস্তক

বঙ্কিমচন্দ্র যে কখনও ছাত্রশিক্ষার প্রয়োজনে কোনও পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুরাতন পুস্তকরাশির মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আবিষ্কারের পর ঐ ধারণার ও বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়াছে।

পুস্তিকাখানির নাম "বঙ্কিম বাবুর সহজ রচনা-শিক্ষা"। নামের নীচে মলাটে গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু ভিতরের টাইটেল্‌-পেজে "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত" লেখা আছে।

"সহজ রচনাশিক্ষা"-নামক পুস্তিকাখানি আমার হস্তগত হইলে প্রথমেই আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল, এ কোন্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? দেখিলাম পুস্তিকাখানি ৫নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন হইতে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; তাহা ছাড়া বেঙ্গল লাইব্রেরীর তদানীন্তন গ্রন্থপঞ্জীতেও বঙ্কিমবাবুর পত্নীকেই পুস্তিকার স্বত্বাধিকারিণী বলিয়া লেখা হইয়াছে। তথাপি আর-একটি সংশয়ের অবকাশ রহিল।

যে-বইখানি আমি পাইয়াছি, উহা "সহজ রচনাশিক্ষার" তৃতীয় সংস্করণের একখণ্ড, ১৮৯৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর উহা মুদ্রিত হইয়া মুদ্রণালয় হইতে নির্গত হয়। ইহা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনা। দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তক "বেঙ্গল লাইব্রেরী"তে পাওয়া গেল না; তবে তৎসম্বন্ধে যে-বিবরণ পাওয়া গেল, তাহাতে দেখা গেল, উহাও বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে মুদ্রিত হয়। ছাপাখানা হইতে উহার বাহির হইবার তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হয়।

"সহজ রচনাশিক্ষার" প্রথম সংস্করণের কোনও পুস্তক বা তৎসম্বন্ধে কোনও বিবরণ বেঙ্গল লাইব্রেরীতে পাওয়া গেল না। সুতরাং উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলেও বঙ্কিমের জীবিতাবস্থায় হইয়াছিল কি না তাহা বলা যায় না।

"সহজ রচনাশিক্ষা"ই যে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে প্রকাশিত একমাত্র পাঠ্য-পুস্তক তাহা নহে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর দপ্তর অনুসন্ধান করিয়া আরও একখানি গ্রন্থের বিবরণ পাওয়া গেল। উহার নাম "সহজ ইংরেজী শিক্ষা"। লেখক - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ৪৬নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে যদুনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত*; ৫নং প্রতাপ চাটুর্য্যের গলি হইতে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, গ্রন্থস্বত্বাধিকারিণী—"মৃত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী"। তৃতীয় সংস্করণ। ঐ সংস্করণের পুস্তকগুলি ১৮৯৪ সনের ১৪ই ডিসেম্বর ছাপাখানা হইতে বাহির হয়। ইহাও বঙ্কিমের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনা। "সহজ ইংরেজী-শিক্ষা"র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ-সম্বন্ধে কোনও বিবরণ বেঙ্গল লাইব্রেরীর গ্রন্থপঞ্জীতে পাওয়া গেল না।

কি "সহজ রচনাশিক্ষা", কি "সহজ ইংরেজী শিক্ষা"—কোনও পুস্তকেরই আবার তৃতীয় সংস্করণের পরে আর কোনও সংস্করণ পাওয়ার প্রমাণ বেঙ্গল লাইব্রেরীর দপ্তরে পাই নাই। দুইটা বই-ই জাল বলিয়া লোকে সন্দেহ করিয়াছিল কি?

"সহজ রচনাশিক্ষা" অতি ক্ষুদ্র পুস্তক; উহার পত্রসংখ্যা মাত্র ৩২। বাঙ্গালা রচনায় যাহাদের মাত্র "হাতে খড়ির" অবস্থা, তাহাদের জন্য উহা লিখিত। ঐ শ্রেণীর ছাত্রগণের গুরুমহাশয়দিগকে ইংরেজীতে কদাচিৎ কৃতবিদ্য দেখা যায়। এমত অবস্থায় "সহজ রচনাশিক্ষা"র গোড়াতেই একটি ইংরেজীতে লিখিত ভূমিকা দেখিয়া মনে প্রথমেই এই বিতর্ক উপস্থিত হয় যে, এটি কাহাদের জন্য অভিপ্রেত? ভূমিকাটির নীচে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষর নাই, কিন্তু উহা গ্রন্থকারের কথা। উহার প্রথম প্যারাগ্রা-টি এইরূপ—

"It is a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more forcible in the case of those who receive only an elementary education in the Vernacular schools than in the case of their more educated brethren turned out of the colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvantage in this respect; there exist no rules for his guidance, none at least which an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this little primer on composition has endeavoured to collect in it some rules derived from the practice of the best writers in the language aud from his own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited to the capacity of beginners and to be as brief as well as as clear as possible."

যে-বঙ্কিম বঙ্গদর্শনের "পত্র সূচনায়" লিখিয়াছিলেন, "এখন মধ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরেজিতে, সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্‌চার, এড্রেস, প্রসিডিংস্ সমুদায় কার্য্য ইংরেজিতে। যদি উভয়পক্ষ ইংরেজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরেজি। পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরেজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরেজিতে পঠিত হইবে।" সেই বঙ্কিম যে একখানি নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তকের দুই পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরেজী ভূমিকা দিলেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয় কি না?

পুস্তকের ভিতরে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাঠে রচনা "বিশুদ্ধির" বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই পাঠে গ্রন্থকারের দুই চারিটি মত উল্লেখযোগ্য:—

"সংস্কৃত অসংস্কৃতে কখনও সন্ধি হইবে না * * * সকলেই 'মনান্তর' বলে, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। কেননা মন বাঙ্গালা শব্দ; সংস্কৃত মনস্, প্রথমায় মনঃ এজন্য, মনোদুঃখ, মনোরথ শুদ্ধ।"

---

* ৩য় সংস্করণের "সহজ রচনাশিক্ষা" ও ৪৬নং বেচু চাটার্জ্জির গলিতে হেয়ার প্রেসে মুদ্রিত।

"সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত সমাস হয় না। যেমন, মক্তবাধ্যক্ষ উকীলপ্রবণা, যোক্তারাদি এসকল অশুদ্ধ। অথচ এরূপ অশুদ্ধি এখন সচরাচর দেখা যায়।"

"সংস্কৃত শব্দের পরে অসংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার হইতে পারে না। মূর্খামি বলা যায় না, কেন না 'মূর্খ' সংস্কৃত শব্দ, 'মি' সংস্কৃত প্রত্যয় নহে, 'মূর্খতা' বলিতে হইবে। 'অহম্মুখ' সংস্কৃত শব্দ, এজন্য আহাম্মুখি অশুদ্ধ, 'অহম্মুখতা' বলিতে হইবে।"

"অসংস্কৃত শব্দে স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষণ ভাল শুনায় না। 'গর্ভবতী মেয়ে' না বলিয়া 'গর্ভবতী কন্যা' বলাই ভাল। 'সুশীলা' বউ না বলিয়া 'সুশীল বউ' বা 'সুশীলা বধূ' বলা উচিত। 'মুখরা চাকরাণী' না বলিয়া 'মুখরা দাসী' বলিব।"

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, কার্ত্তিক ১৩৩২) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

—

চীন সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা

অন্য সকল দেশের মত চীন দেশেও প্রাণের ভাষা প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে কবিতার মধ্য দিয়া। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আমরা সর্ব্বপ্রথম চীন সাহিত্যের রেখাপাত দেখিতে পাই। ক্ষত্রিয়কুলের জীবনকথা, কৃষকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কথা, হাসি ও কান্না লইয়াই প্রথম চীন সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে। অপর জাতির মধ্যে আমরা যে-সকল প্রাথমিক গাথা পাই, তাহার কথাবস্তু সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহ ও শৌর্য্য; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, চীনের গীতিকবিতা শান্তির ভাবে পরিপূর্ণ।

কিন্তু তাঙ্‌ যুগই সত্য সত্য চীন সাহিত্যের গৌরবের যুগ। এই যুগেই আমরা লীপো, তুফু ও পোচুই এই তিন কবিকে পাই—যাঁহারা তাঁহাদের যশঃগৌরবে চীনের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। চতুর্থ শতাব্দীতে চুয়ুয়ান নামক এক কবির নাম দেখিতে পাই। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হ্যানবংশীয় রাজারা চীনের সিংহাসনে আরূঢ় হন। চারিশত বৎসর কাল তাঁহারা চীনে রাজত্ব করেন। এই চারি শতাব্দী চীন জাতিকে এমন আশ্চর্য্যভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, যে তাহারা এখনও হ্যান পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। এই বংশের সম্রাটগণ সকলেই নিজেরা সাহিত্যিক ও কবিদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। নানাপ্রকার ললিতকলা এই বংশের রাজত্বকালে সমৃদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মও এইসময়ে চীনে প্রথম প্রচারিত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে চীন সাহিত্য হইতে আনন্দবাদ নির্ব্বাসিত হয়।

তৃতীয় খৃষ্টাব্দে "বংশকুঞ্জের সপ্তার্ষ" নামক কবিসংঘ চীনের সাহিত্য-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বন্ধুদলের বিশেষত্ব এই ছিল, যে, তাঁহারা একাধারে সাহিত্যিক, কবি, গায়ক ও দার্শনিক ছিলেন।

তুফু, লীপো ও পোচুই এই তিন জনই অষ্টম শতাব্দীর লোক এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তুফু ও লীপোর ভাগ্যে রাজকার্য্য চিরদিন ধরিয়া করা লেখা ছিল না। সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে তাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন এবং সৌভাগ্যও তাঁহাদিগের কণ্ঠে বরমাল্য দেন নাই।

তুফু বহুবর্ষ ধরিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে সাতাইশ বৎসর বয়সে রাজধানীর অতিথি হয়েন। কিছুদিন পরে তিনি রাজসভার উচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণে এই কাজ কোন সাড়া দিতে পারিল না, স্পষ্টবাদিতার অপরাধে কোন এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তারূপে তাঁহার নির্ব্বাসন-দণ্ড হইল। তুফু শাসনকর্ত্তারূপে অভিষিক্ত হইবার সময় হঠাৎ রাজপ্রদত্ত সকল চিহ্ন ও পদক অঙ্গ হইতে খুলিয়া ও কোন বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, বিস্মিত সভাসদ্‌গণের সম্মুখে রাজসভা হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। এইবার তাঁহার বাহিরের জীবন আরম্ভ হইল। দেশে-দেশে নগরে-নগরে আত্মগোপন করিয়া বেড়াইয়া, কবিতা শুনাইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া, সাহিত্য-প্রেমিক সহৃদয় ব্যক্তিগণের আতিথ্য গ্রহণদ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এমন অবস্থায় সৎচুয়ান প্রদেশের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে তুফুকে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে একটি উচ্চ রাজপদ দেওয়া হইল। ছয় বৎসর কার্য্য করিবার পর একদিন সেই প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইল এবং বাধ্য হইয়া তুফুকে আবার গৃহত্যাগী হইতে হইল।

লীপো অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া শাস্ত্রাচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন। রাজা মিঙ্‌হোয়াঙ্‌এর সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার যশ সমস্ত চীনদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাকে পাইবার জন্য সম্ভ্রান্ত-সমাজে একপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। মিঙ্‌হোয়াঙ্‌এর আশ্রয়ে আসিয়া তাঁহার আদর ও যত্নের সীমা রহিল না।

অবশেষে লীপোকে রাজাতিথ্য ত্যাগ করিয়া বনবাসে যাইতে হইল। লীপো এইবার মুক্ত হইলেন। মুক্তকণ্ঠ বিহঙ্গমের ন্যায় এইবার তিনি দেশে-দেশে নগরীতে-নগরীতে প্রাণ ভরিয়া গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দুর্ভাগ্যক্রমে তনয়ুশানের বিদ্রোহে লিপ্ত হইয়া পড়ায় লীপোর কারাদণ্ড হইল। কিন্তু কারাগৃহের প্রাচীরমালা তাঁহার যশোভাতিকে ম্লান করিতে পারিল না।

পোচুই যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মিঙ্‌হোয়াঙ্‌এর গৌরবময় যুগ চলিয়া গিয়াছে। অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন সপ্তদশবর্ষীয় যুবক পোচুই সমগ্র চীন সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করেন এবং প্রতিভা-বলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করেন। তুফু ও লীপোর সঙ্গে তাঁহার এক বিষয়ে প্রভেদ ছিল; তুফু ও লীপো রাজকার্য্য কখন জীবনের সঙ্গে এক করিয়া লইতে পারেন নাই। পোচুই তাঁহার জীবনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কবিতা রাজকার্য্যের অবসর-সময়ে লিখিত হইয়াছিল।

তিনি জাতিকে এক পরিবার মনে করিতেন এবং সম্রাটকে সেই জাতিরূপ পরিবারের পিতৃস্থানীয় গণ্য করিতেন। উচ্চ স্বদেশপ্রেমের সহিত তিনি "রোমান্স"কে চীনীয় সাহিত্যে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

(নব্যভারত, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩২) শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

—

জাতি-সংগঠনে সমবায়ের স্থান

বর্ত্তমান জাতীয় অবস্থার সহিত নানা প্রশ্ন জড়িত আছে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অর্থনৈতিক সমস্যাই একটা মূল প্রশ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। অপরের স্বার্থসম্ভূত আর্থিক শোষণ বা exploitation দ্বারা ভারতের জনগণ দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপস্থিত, এই দারিদ্র্য নৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থারও কারণ। এইজন্য ভারতের জনবৃন্দ তাহাদের উচ্চ গুণগুলি হারাইয়া স্বাধীন জাতিসমূহের সহিত এক পংক্তিতে স্থান পাইবার অযোগ্য হইয়াছে।

বর্ত্তমানে দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধনই আমাদের আশু কর্ত্তব্য। তাহাদের দারিদ্র্য দূরীকৃত না হইলে সামাজিক ও নৈতিক জীবন সমুন্নত হইবে না। যাহারা দৈন্য ও অভাবের দ্বারা নিষ্পেষিত নহে, যাহারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন, তাহারাই

জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিবার পক্ষে উপযুক্ত ; জাতীয় মুক্তির যন্ত্রস্বরূপ হওয়া তাহাদের পক্ষেই সম্ভবপর।

সমাজের কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জীবিকার্জ্জনের নূতন পথ আবিষ্করণ ও নূতন নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই সঙ্গে গরীব ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেকার শিক্ষিতদলের বাবুয়ানার স্পৃহা (petty-bourgeois mentality) ত্যাগ করিতে হইবে ; কায়িকশ্রমের প্রতি সম্মান শিক্ষা করিতে হইবে ; আইনের ও চিকিৎসার ব্যবসায় ছাড়াও যে সম্মানজনক ব্যবসা আছে, ইহা বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে।

আর্থিক বিনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভারতের শ্রমিকগণ ও দরিদ্র মধ্যবিত্তগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায় পন্থা (Co-operation) অবলম্বন করিতে পারেন। এই বিষয়ে অন্য দেশের দৃষ্টান্ত তাহাদের গ্রহণীয়। সকল সভ্য দেশেই গণবৃন্দ জনবৃন্দ "সমবায়" দ্বারা যথাসম্ভব অন্যায় শোষণের পথ রোধ করিয়া আপনাদের আর্থিক উন্নতি সাধন করে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্যে(mutual aid) শ্রমদ্বারা সৃষ্ট কর্ম্মের মূল্যের অতিরিক্ত লাভ (surplus value of the capital) শ্রমিকদের হস্তে রাখাকে 'সমবায়' বলে।

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এমন যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যাহাতে সাম্যসম্মত কার্য্যপ্রণালী ও অর্থোপার্জ্জনের উপায়দ্বারা সভ্যেরা নিজেদের ও সমাজের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী অন্যসকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতে স্বতন্ত্র। অন্যপ্রকার কারবারে মূলধনের উপরে যে লাভ হয় অংশীরা তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু সমবায় সমিতিতে সভ্যেরা কেবলমাত্র কতকগুলি সুবিধা পাইয়া থাকে। এই পদ্ধতির প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহাতে কর্ম্মোদ্যোগী (entrepreneur) মালিক ও পরিচালকেরা আবার খরিদ্দার হয়। সমবায় সমিতি কেবলমাত্র নিজের সভ্যদের উপকারার্থ নিযুক্ত থাকে, এই বিষয়ে অন্যসকল মহাজনী (capitalistic) কারবার হইতে এই পদ্ধতির প্রভেদ আছে। ইহার অর্থনৈতিক সুবিধা এই যে দ্রব্যের উৎপাদন (production) ও বণ্টন (distribution) কালে মধ্যবর্ত্তী কারবারীদের (middle men) বাদ দেওয়া হয়, অর্থাৎ কারবারের মাল দশ হাতের ভিতর দিয়া খরিদ্দারের হাতে পৌঁছায় না, এইজন্য মাল অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রীত হয়। সভ্যেরা বাহিরের দোকান অপেক্ষা সমিতির দোকানে সস্তায় দ্রব্য পাইয়া থাকে। সমবায়ে আর্থিক দিকের মত একটা সামাজিক দিক্ বিদ্যমান। ইহা কিয়ৎ-পরিমাণে কতকগুলি সামাজিক সঙ্কটের নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংস্কার ও ক্রমবিকাশদ্বারা বিশৃঙ্খল জাতীয় অর্থনীতিক পরিবর্ত্তন করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালীর প্রবর্ত্তনই সমবায় প্রচেষ্টার লক্ষ্য। এই পদ্ধতিকে জমীর খাজনা, ব্যবসায়ে উদ্যোগী ও মধ্যবর্ত্তী লোকদের লাভ, মূলধনের উপর সুদ প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে, এবং যাহাতে প্রত্যেক শ্রমিক তাহার কায়িক শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট দ্রব্যের পূর্ণ মূল্য পায় এবং জাতির দ্বারা দ্রব্যজাতের উৎপাদন (production of the nation) কাটতি বা প্রয়োজনের (consumption) সঙ্গে সমানীভূত (balanced) হয় সেইরূপ যুক্তিযুক্ত (rational) নিয়ম প্রচলিত হইবে। এই উচ্চ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে উন্নত করা আবশ্যক ; তজ্জন্য তাহাদের প্রত্যেককে আহার্য্য উৎপাদনের, বর্ত্তমানকালের যন্ত্রপাতি, কর্ম্মের স্থান, মাল তৈয়ারির উপকরণ (raw stuff) সমবায়-সমিতিকে সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে ঋণদানদ্বারা জোগাইতে হইবে। এইরূপে পরস্পর সহযোগিতাসাপেক্ষ সমবায় সমিতি দ্বারা দরিদ্রগণ আপনাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইবে। এই ব্যাপারের সামাজিক দিকটি প্রণিধানযোগ্য। ইহাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহযোগিতা একত্র মিলিত হইবে (অর্থাৎ co-operate করিবে)। এবং তাহারা পরস্পরকে চিনিবে, জানিবে, এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে। ইহাতে ভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য ও বিদ্বেষ দূর হইয়া সাম্য ও সদ্ভাব স্থাপিত হইবে। ইহার দ্বারা যে শিক্ষালাভ হইবে তাহার মূল্য অনেক। কর্ত্তব্য-জ্ঞান, লাভের (dividend) প্রতি নিস্পৃহতা, ভবিষ্যতের জন্য সংস্থানের (reserve fund) অভ্যাস ইত্যাদি সমবায়ের কার্য্য-প্রণালীর ভিতর দিয়া শিক্ষা করা যাইবে। সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে যে মিলন ও প্রচেষ্টা তাহা দ্বারা স্বার্থপরতা বিনষ্ট হইবে। আজকাল ব্যবসায়ে লাভের জন্য যে একটা অদমনীয় অসীম লোভ দেখা যায় তাহা প্রশমিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অর্থনৈতিক ন্যায়পরতা ও দ্রব্যের সুলভতা প্রবর্ত্তিত হইবে। সমবায়ের উদ্দেশ্য সমবেত বহুজনের সেবা।

(নব্যভারত, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩২) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

—

কাম্বোজ ও চম্পা

ভারতীয় প্রাচীন বণিক্‌গণ যে কেবলমাত্র এসিয়ার পশ্চিমভাগে মিশর দেশে এবং ইয়োরোপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, তাহা নহে, তাঁহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ, মালয়-উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বালী-দ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ (Borneo), শ্যামদেশ, কেম্বোডিয়া বা কাম্বোজদেশ এবং চীনদেশের উপকূলসমূহেও বাণিজ্য করিতে যাইতেন এবং যে যে স্থানে বাণিজ্যের সুবিধা হইত, সেই-সেই স্থানে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণে যবদ্বীপ, সুবর্ণ প্রভৃতি দ্বীপের উল্লেখ আছে। সুমাত্রা-দ্বীপকে রামায়ণে সম্ভবতঃ "রূপ্যক" দ্বীপ বলা হইয়াছে। "সুবর্ণ" দ্বীপকে আধুনিক বোর্ণিওর সহিত অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে, এবং "শিশির" নামক পর্ব্বত সম্ভবতঃ আধুনিক শিলিবিস্ (Celebes) দ্বীপ কিম্বা কোনও উচ্চ পর্ব্বতের নাম হইতে পারে।

কাম্বোজের কথা বলা যাউক। ইংরাজী ভাষায় এই দেশকে কেম্বোডিয়া (Cambodia) বলে। কিন্তু ফরাসীগণ, (বর্ত্তমান সময়ে এই দেশ তাঁহাদের অধিকৃত) ইহাকে কাম্বোজ (Cambodge) বলেন। স্থানীয় খেমর (Khmers) ইহাকে কাম্বোজ-নামেই অভিহিত করিয়া থাকে। রামায়ণে "কাম্বোজ"-নামে এক দেশের উল্লেখ দেখা যায়। সেই দেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব উৎপন্ন হইত। যথা :—

কাম্বোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ।
বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ॥

(আদি, ৭।২৩)

অর্থাৎ "অযোধ্যাপুরী কাম্বোজ ও বাহ্লীকদেশজাত উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহে এবং বনায়ুদেশজাত ও সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী দেশজাত উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য উৎকৃষ্ট হয়সমূহে পূর্ণ থাকিত।" এই কাম্বোজ দেশ গান্ধার দেশের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। সিন্ধু ও বাহ্লীকদেশের উল্লেখ দর্শনে মনে হয়, রামায়ণের কাম্বোজ আধুনিক কাফিরিস্থানের সহিত অভিন্ন, কিন্তু ইহাও মনে হয় যে, তাহা শ্যামদেশের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কাম্বোজ দেশও হইতে পারে। কেননা, এই দেশের অশ্ব, আকারে কিছু ছোট হইলেও দৃঢ়াঙ্গ ও কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধ। খৃষ্টপূর্ব্ব নবম বা দশম শতাব্দীতে কম্বু নামক জনৈক হিন্দুরাজ; ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গমন করিয়া কাম্বোজে



"তাহারে নাচাত প্রিয়া
করতালি দিয়া দিয়া।"

—দ্বিজেন্দ্রনাথ।

চিত্রকর শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বিশি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ দেশে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, এবং "কম্বু" হইতেই কম্বুজ বা কম্বোজ নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও তদ্দেশীয় লোকগণ বিশ্বাস করিয়া থাকে। রামায়ণের উল্লিখিত কাম্বোজ কেম্বোডিয়া না হইতেও পারে এবং সম্ভবতঃ নহে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় যে, হিন্দুবণিকগণ সমুদ্রযাত্রা করিয়া "ভেড়ার বদলে ঘোড়াও" আনিতেন। সে যাহা হউক, কাম্বোজের প্রধান নগরের নাম "আঙ্কোর"; কিন্তু ইহার অপর-একটি নাম "ইন্দ্রপথবুরী" অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থপুরী। কম্বু ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে গিয়া সে-দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি এই নূতন উপনিবেশের রাজধানীর নাম মাতৃভূমির প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরীর নামানুসারেই রাখিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা অসঙ্গত হইবে না।

এসিয়ার মানচিত্র উদঘাটন করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ; তাহার পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে শ্যামদেশ; এবং এই শ্যামদেশের পূর্ব্বদক্ষিণকোণে সমুদ্রতটে কাম্বোজ দেশ অবস্থিত। মেকঙ্গ-নামক নদী এই দেশের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছে। এই দেশের চতুঃসীমা এইরূপ:—উত্তরে শ্যামদেশ ও লেয়স্; পূর্ব্বে আনাম দেশ; দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে কোচিন্-চায়না; দক্ষিণ পশ্চিমে শ্যাম-উপসাগর এবং পশ্চিমে শ্যামদেশ। এই দেশের পরিমাণ ৬৫০০০ বর্গ মাইল এবং বর্ত্তমান সময়ে ইহার অধিবাসিগণের সংখ্যা ১৫ লক্ষ; তন্মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ লোক কাম্বোজ-দেশীয়, এবং অবশিষ্ট লোক চীন, আনাম, চম্পা ও মালয়বাসী এবং আদিম অধিবাসী।

কাম্বোজের প্রধান নৈসর্গিক দৃশ্য একটি বৃহৎ হ্রদ। ইহার নাম তোলে সাপ (Toule-Sap)। ইহা ৬৮ মাইল দীর্ঘ এবং ১৫ মাইল চওড়া।

খেমর জাতি স্থানীয় অধিবাসী এবং আর্য্য ও চীনজাতির সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন। ইহারা এখন বৌদ্ধধর্ম্ম মানিয়া চলে। কিন্তু কাম্বোজের রাজসভায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই প্রাধান্য আছে। হিন্দুগণের ন্যায় ইহাদের জাতি-বিভাগ আছে। রাজাদের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্‌বংশ (Brah-vansa) এবং পঞ্চম পুরুষের ঊর্দ্ধতন ব্যক্তিগণ ব্রাভণ (Brah-van) নামে অভিহিত হয়। প্রাচীন ব্রাহ্মণ-বংশের ব্যক্তিগণের নাম বকৌ (Bakou)। সম্ভবতঃ ইহা ভিক্ষু শব্দের অপভ্রংশ। ইহারা রাজকর দেয় না, এবং বাধ্যতামূলক সকল-প্রকার কার্য্য হইতে বিমুক্ত। এই দেশের রাজভাষা, রাজলিপি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বাক্যসমূহ আর্য্য (সংস্কৃত) ভাষা ও লিপি হইতে সমুৎপন্ন। পালিভাষার সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্রুতবর্ম্মার রাজত্বকালে কাম্বোজের সভ্যতা চরম উন্নতি লাভ করে। ৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে চমৎকার সৌধাবলী সমন্বিত আঙ্কোর-থোম নামক রাজধানীর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠে। মন্দিরসমূহের মধ্যে ব্রহ্মার মন্দিরই প্রকাণ্ড, শ্রেষ্ঠ ও চমৎকার-কারুকার্য্য-সমন্বিত। মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত ও পঞ্চাশটি চূড়ায় দ্বারা শোভিত। মধ্যের চূড়াটি সর্ব্বোচ্চ ও প্রকাণ্ড। প্রত্যেক চূড়ার চারি পার্শ্বেই প্রস্তরের উপর খোদিত ব্রহ্মার সুবৃহৎ মুখাবয়ব আছে।

প্রাচীন রাজধানীর দক্ষিণ দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে পূর্ব্বোক্ত নদীতটে "আঙ্কোর-বাট"-নামক প্রকাণ্ড মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান আছে।

মন্দির ও প্রাসাদের গাত্রে প্রস্তরের উপর লতাপাতা ফুলফল এবং পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পৌরাণিক ঘটনাসমূহের বৃত্তান্ত এরূপ সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় এবং স্থাপত্যশিল্পকলার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

চম্পাদেশ কাম্বোজের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে আধুনিক কোচিন্-চায়না ও আনাম-দেশ ব্যাপিয়া সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে দিন্‌হ্-বো-লান্‌হ (Dinh-Bo-Lanh) আনামের কিয়দংশ অধিকার করিয়া স্বীয় নামে একটি নূতন রাজবংশস্থাপন করেন। চম্পারাজ্য এক সময়ে কাম্বোজ রাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিয়াছিল, এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে বহু যুদ্ধবিগ্রহও চলিয়াছিল। চম্পার অধিকাংশ মন্দিরই শিব মন্দির, এখনও অর্ঘ্য-সমন্বিত শিবলিঙ্গসমূহ বিদ্যমান আছে। মন্দিরগাত্রে ও তোরণের উপর দেবদেবীর যে-সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের শিল্পসৌন্দর্য্যও চমৎকার। এইসকল দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে দশভুজা ভগবতী দুর্গা দেবীর এবং কার্ত্তিকগণেশেরও মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কাম্বোজে নাগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর-মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, কাম্বোজবাসীরা প্রধানতঃ নাগোপাসক ছিলেন, আর চম্পাবাসীরা শৈব ও শাক্ত ছিলেন। এই বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসই যুদ্ধের মূল কারণ হইয়া থাকিবে। বঙ্গদেশে শৈব চাঁদসদাগরের সহিত মনসাদেবীর বিবাদের কাহিনীতে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য মুখরিত। এই বিবাদে সাত-সাতটি পুত্র হারাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি মনসার পূজা করেন নাই। এই চাঁদ সদাগরের বাটী চম্পাই-নগরে ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে—

"চাঁদবেণে সদাগর
চম্পাই নগরে ঘর।"

এই চম্পাই নগর কোথায়? বঙ্গদেশের নানাস্থানে চম্পাই নগরের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। কেহ বলেন, ভাগলপুরের নিকট চম্পাপুরীই চাঁদবেণের চম্পাই নগর; কেহ-কেহ বর্দ্ধমান মানকরের নিকট কসবা গ্রামে চম্পাই নগরের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন;—এইস্থানে এখনও চাঁদ-সদাগরের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন, এবং প্রতিবৎসর মাকরী সপ্তমী তিথিতে চাঁদসদাগরের নামে মেলা বসিয়া থাকে, এবং সেই মেলায় বহু গন্ধবণিক্ নরনারী শিবলিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিতে আসেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গে এবং আসামেরও কোনও-কোনও স্থানে চম্পাই-নগরীর অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। আমার অনুমান হয় যে, বাঙ্গালী গন্ধবণিকগণ বাঙ্গালা দেশ হইতে সুদূর কোচিন্-চায়নাতে বাণিজ্য করিতে গিয়া সেই স্থানে অঙ্গদেশ বা বঙ্গদেশের চম্পা-নগরীর নামানুসারে চম্পা নামে একটি নগর স্থাপন করিয়া থাকিবেন, এবং তাহাই চম্পা-রাজ্য নামে পরিচিত হয়।

(গন্ধবণিক্, কার্ত্তিক ১৩৩২) শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাস

"সোক্রাটীস"।*

(সমালোচনা)

শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ

এই গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় সোক্রাটীসের জীবনচরিত ; দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হইয়াছে 'সোক্রাটীসের বিচার ও মৃত্যু' এবং তৃতীয় ভাগে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে 'সোক্রাটীসের উপদেশ'। প্রথম ভাগে ১২টি অধ্যায়। বিষয় এই :—(১) সোক্রাটীসের আবির্ভাব-কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, (২) সংসারাশ্রম, (৩) জীবনব্রত (৪) সফিষ্ট্‌দল, (৫) শিক্ষাক্ষেত্রে সোক্রাটীসের সংস্কার, (৬) সোক্রাটীসের কয়েকটি মত, (৭) সোক্রাটীসের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ, (৮) সোক্রাটীসের শ্রাবকবর্গ, (৯) চরিত্র, (১০) সোক্রাটীস ও বুদ্ধ, (১১) সোক্রাটীস ও আরিষ্টিফানীস্ এবং (১২) বিচার ও মৃত্যু। এই ১২টি অধ্যায়ের বহু বিভাগ ও উপবিভাগ। ইহাদিগের মোট সংখ্যা ২১৪।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে চারিখানা প্রসিদ্ধ পুস্তক অনুবাদ করা হইয়াছে। পুস্তকগুলি এই—(১) এয়ুথুফ্রোন, (২) সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন, (৩) ক্রিটোন্ এবং (৪) ফাইডোন্। প্রত্যেক গ্রন্থের অনুবাদের পূর্ব্বে অনুবাদক এক-একটি মুখবন্ধ দিয়াছেন এবং যথাস্থলে সমুদায় অধ্যায়ের ভাবার্থও দিয়াছেন। টীকাও আছে বহু।

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে সোক্রাটীসের উপদেশ ; এই অংশ জেনফোন-প্রণীত 'সোক্রাটীসের জীবন-স্মৃতি' এবং 'পানপর্ব্ব' হইতে সঙ্কলিত।

ইহা ব্যতীত পরিশিষ্টে অধ্যেতব্য গ্রন্থাবলি, এবং চারিটী নির্ঘণ্ট গ্রীক সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাক্য, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত বাক্য, ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নাম ; এবং বিষয়নিচয় (২১ পৃঃ), দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের সূচীপত্র ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী। চিত্র দুইখানি—একখানা সোক্রাটীসের, অপরটি তাঁহার বিষপানের দৃশ্য।

গ্রন্থের সূচীপত্র পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন কি বিপুল ব্যাপার। সোক্রাটীসের জীবন-চরিত এবং উপদেশ ত বিবৃত হইয়াছেই, ইহা ছাড়া আছে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ইতিহাস, শিষ্যগণের বিবরণ, প্লেটোর দর্শন, প্লেটোর চারিখানা পুস্তকের অনুবাদ, বুদ্ধের সহিত সোক্রাটীসের তুলনা—আরও কত বিষয়।

গ্রন্থকার নয় বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়া 'সোক্রাটীস' গ্রন্থ (দুই খণ্ড) প্রণয়ন করিয়াছেন। গুরুতর পরিশ্রমে তিনি পুনঃপুনঃ অসুস্থ হইয়াছিলেন, তবুও কার্য্য হইতে বিরত হয়েন নাই। যাহা হউক বিধাতার কৃপায় পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বঙ্গ-ভাষায় এপ্রকার পুস্তক এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রীকভাষা শিক্ষা করিয়া গ্রীকসাহিত্যের রত্নরাজি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অর্পণ করেন নাই। একার্য্যে রজনীবাবুই প্রথম ব্রতী। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে তাঁহার নাম অঙ্কিত থাকিবে।

ধর্ম্ম নীতি চরিত্রাদি বিষয়ে জগতের যদি প্রধান দুইজন মহাপুরুষের নাম করিতে হয়, আমরা দ্বিধাশূন্য হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিব—একজন গৌতম বুদ্ধ, আর একজন সোক্রাটীস্। এই গ্রন্থে উভয় মহাপুরুষেরই দর্শন ও সঙ্গলাভ হইবে। যেমন ইহাদিগের উপদেশ, তেমনি ইহাদিগের চরিত্র। বিষয়গৌরবে গ্রন্থও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

যে চারিখানা গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকখানাই অমূল্য রত্ন। পুস্তকসমূহ বঙ্গভাষায় এই প্রথম অনূদিত হইল। এজন্য আমরা গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই চারিখানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

গ্রন্থকার বহু স্থল হইতে সোক্রাটীসের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন, বৌদ্ধশাস্ত্র এবং হিন্দু শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি সংগ্রহ করিয়া তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন।

সমুদয়ই উপাদেয় হইয়াছে। আশা করি এগ্রন্থের সমাদর হইবে।

সর্ব্ববিষয়ে সকলের সহিত একমত হওয়া সম্ভব নহে ; গ্রন্থকারের সহিতও আমরা সর্ব্ববিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। প্রধান প্রধান যে যে বিষয়ে আমাদের মতভেদ বা মন্তব্য আছে, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

১। গ্রীক্ উচ্চারণ

গ্রীকের ইংরাজী উচ্চারণই আমরা এপর্য্যন্ত বাংলায় গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, অথচ ইংরাজী ভাষায় ইহার উচ্চারণ যত বিকৃত হইয়াছে, ইউরোপের অপর কোনও দেশে এপ্রকার হইয়াছে কি না সন্দেহ। গ্রন্থকার আমাদিগকে গ্রীকের প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতেছেন। ইংরাজী উচ্চারণের তুলনায় অধিকাংশ উচ্চারণই নূতন। আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, এই সমুদায় উচ্চারণ কতটা গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের সাহায্যে আমরা উচ্চারণ-তত্ত্ব আলোচনা করিব। গ্রন্থকারের নামের ঠিক পরেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া হইল। আবশ্যক হইলে প্রবন্ধে এই চিহ্ন ব্যবহার করিব।

১। Jannaris (যান্না) কৃত An Historical Greek Grammar (Macmillan, মূল্য 31-6.)

২। Blass (ব্লা) কৃত Pronunciation of Ancient Greek (Cambridge U. Press. 10-6).

৩। Arnold এবং Canway (আর্) কৃত The Restored Pronunciation of Greek and Latin (C. U. Press. 1-3).

৪। Goodwin (গুড্) কৃত Elementary Greek Grammar (Macmilian. 7s.)

৫। Hadley এবং Allen (হ্যাড) কৃত Greek Grammar (Macmillan. 6s.)

৬। Curtius (কুর্) কৃত A Grammar of Greek Language (Nurury, 7-6)

৭। Thompton (টম্) কৃত Greek Grammar for Schools and Colleges (Murray. 7-6)

৮। Geddes (গেড) কৃত Compendious Greek Grammar (Oliver and Boyd)

---

* সোক্রাটীস, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রী রজনীকান্ত গুহ, এম-এ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৮৩১ ; মূল্য ১০৲ টাকা।

৯। Robertson (রবা) কৃত A Grammar of the New Testament Greek (Hodder and Stoughton. 42s)

১০। J. H. Moulton (মৌল) কৃত Grammar of the N. T. Greek, Vol. i (10s) Vol. ii Part i (7s) T and T. Clark.

১১। Max-mull·· (মাক্) কৃত (The Science of Language (Longmans. 10s).

আন্দোলন

ইউরোপে একসময়ে এই উচ্চারণ লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। মধ্যযুগের শেষভাগে Bizantiumএর (বিজান্‌টিয়ুম্‌, বাইজ্যান্‌টিয়াম্‌) গ্রীক পণ্ডিতগণ ইটালীতে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য পুনঃ প্রবর্তন করেন। তাঁহাদিগের সময়ে গ্রীকভাষা যেভাবে উচ্চারিত হইত, তাঁহারা প্রাচীন গ্রীকভাষাও সেইভাবে উচ্চারণ করিতেন। ক্রমে গ্রীক সাহিত্য অপরাপর দেশেও প্রচলিত হইয়াছিল এবং সেই সমুদায় দেশেও প্রাচীন গ্রীক নবীন গ্রীকের ন্যায় উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এবিষয়ে কোন-প্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবিষয়ে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইল। এরাস্‌মাস্‌ (Erasmus) এবং তাঁহার অনুবর্তিগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, প্রাচীন গ্রীক উচ্চারণ নবীন গ্রীক উচ্চারণ হইতে পৃথক্‌। পণ্ডিতগণ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দলের নেতা 'এরাস্‌মাস্‌', অপর দলের নেতা রয়খ্‌লিন্‌ (Reuchlin), প্রথম দলকে অনেকে 'এটা'-বাদী (Etacists) এবং দ্বিতীয় দলকে 'ঈটা'বাদী (Itacists) বলিত। এপ্রকার বলিবার কারণ এই—গ্রীক বর্ণমালার সপ্তম অক্ষরকে ইংরাজীতে লেখা হয় ē। এরাস্‌মাসের দল বলিতেন ইহার নাম 'এটা'; এইজন্য এদলের নাম হইয়াছিল 'এটা'-বাদী। অপর দলের মতে এ অক্ষরের নাম ঈটা; এইজন্য এদলের নাম 'ঈটা'-বাদী। আরও কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ লইয়াও মতভেদ ছিল, কিন্তু প্রধান মতভেদ ঐ সপ্তম বর্ণের উচ্চারণ লইয়া। সমগ্র ইউরোপে এই আন্দোলন বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৫৪২ সালে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির চ্যান্‌সেলার এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে যদি কেহ গ্রীক 'ai' কে 'e'-রূপে উচ্চারণ না করে, যদি 'ei' এবং 'oi' কে 'i' হইতে বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ করে,' সে সেনেট হইতে বিতাড়িত হইবে, ডিগ্রী গ্রহণে বঞ্চিত হইবে, ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইবে এবং বালকগণকে গৃহে তাড়না করা হইবে। কিন্তু এপ্রকার অত্যাচারে স্থায়ী ফল ফলে নাই। ষোড়শ শতাব্দীতেই নব্য মত ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ('The Erasmian pronunciation prevailed throughout the W··· ব্লা পৃঃ ৫)। সপ্তদশ শতাব্দীতে যাহারা প্রাচীন মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সফলকাম হন নাই। Blass বলে—"All our great grammarians have entered the arena either entirely or essentially on the side of the Erasmian pronunciati··· (পৃঃ ৫)। অর্থাৎ 'ইউরোপে খ্যাতনামা বৈয়াকরণগণ সকলেই এইক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন—সকলেই এরাস্‌মাসের মতে, হয় সম্পূর্ণরূপে, না হয় মৌলিক বিষয়ে সমর্থন করিতেছেন। (য়ান্না, ২৪—২৭; ব্লা, ২—৬; রবা, ২৩৬—২৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

উচ্চারণ

এখন দেখা যাউক গ্রীক বর্ণমালার উচ্চারণ কি। আমরা প্রধানতঃ Jannaris এবং Blassএর পুস্তক অবলম্বন করিয়াই ইহার বিচার করিব। অপরাপর বৈয়াকরণের নাম যথাস্থলে উল্লিখিত হইবে।

প্রথম নিয়ম

১। প্রথম বর্ণ 'a' (alpha, আল্‌ফা)। ইহার উচ্চারণ 'আ'। এবিষয়ে উভয় দলে মতভেদ নাই।

দ্বিতীয় নিয়ম

২। দ্বিতীয় বর্ণের নাম ও উচ্চারণ-বিষয়ে মতভেদ আছে। 'ঈটা'-বাদিগণের মতে ইহার নাম 'বীটা' এবং উচ্চারণ 'অন্তঃস্থ ব'। 'এটা' বাদীদিগের মতে ইহার নাম 'বেটা' এবং উচ্চারণ 'বর্গীয় ব'। সংস্কৃতে উভয় ব' এর উচ্চারণে পার্থক্য আছে: বাংলায় কোন পার্থক্য নাই। তবে ছেলেবেলা শিখিয়াছিলাম বর্গীয় 'ব'—পেট-কাটা 'ব'।

তৃতীয় নিয়ম

৩। তৃতীয় বর্ণকে সাধারণতঃ গাম্মা gamma বলা হয়। 'এটা'-বাদীর মতে ইহার উচ্চারণ 'গ'; কয়েকটি জিহ্বামূলীয় বর্ণ (ক, খ, গ) পরে থাকিলে, ইহার উচ্চারণ হয় অনুনাসিক বর্ণের ন্যায়।

'ঈটা' বাদীর উচ্চারণ 'ঘ'; পূর্বোক্ত জিহ্বামূলীয় বর্ণসমূহ পরে থাকিলে উচ্চারণ হয় অনুনাসিক বর্ণের ন্যায়। 'e' এবং 'i' পরে থাকিলে গাম্মার উচ্চারণ হয় 'y' এর ন্যায় [য়ান্না, পৃঃ ৫৯]

চতুর্থ নিয়ম

৪। চতুর্থ বর্ণের প্রচলিত নাম ডেল্‌টা (delta)। 'এটা' বাদীর-উচ্চারণ 'ড'; 'ঈটা'-বাদীর উচ্চারণ 'দ' (য়ান্না পৃঃ ৩০, ৫৯—৬০; ব্লা, ১১)

পঞ্চম নিয়ম

৫। পঞ্চম বর্ণকে প্রাচীন কালে বলা হইত 'e'; কিন্তু উত্তরকালে নাম হইয়াছিল e-psilon; 'psilon' অংশের অর্থ simple অর্থাৎ অসংযুক্ত (য়ান্না, পৃঃ ২৬)। ইহার উচ্চারণ 'এ'; কোন মতভেদ নাই।

ষষ্ঠ নিয়ম

৬। ষষ্ঠ বর্ণ zēta (জেটা, জীটা)। 'ঈটা'বাদীর উচ্চারণ 'z'; 'এটা'-বাদীর উচ্চারণ 'ds' (কিংবা ts)। বাংলায় ঠিক 'z' এর উচ্চারণ নাই; তবে অনেকটা 'জ' এর ন্যায়।

সপ্তম নিয়ম

৭। সপ্তম বর্ণের নাম ও উচ্চারণ লইয়াই বিশেষ মতভেদ। এরাস্‌মাসের দল বলেন ইহার নাম 'এটা'; অপর দলের মতে ইহার নাম "ঈটা"।

'এটা'-বাদী বলেন, "ভেড়া ডাকে 'বে'"। বাজ কাব্যে এই 'বে' ডাকের উল্লেখ আছে। ব্লাস এবং য়ান্নারিস ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন (ব্লা, ২৭; য়ান্না, পৃঃ ৫০)। এই 'বে' শব্দ লেখা হয় গ্রীক দ্বিতীয় ও সপ্তম বর্ণের সংযোগে। ইংরেজীতে b+ē; বাংলায় ব্‌+এ। সুতরাং বলিতেই হইবে ইংরাজী 'ē' এবং গ্রীক সপ্তম বর্ণের উচ্চারণ 'এ'। সুতরাং সপ্তম বর্ণের নাম 'ঈটা' নহে; ইহার নাম 'এটা'।

এবিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। প্রাচীনকালে গ্রীকভাষা হইতে অনেক শব্দ লাটিন ভাষাতে গৃহীত হইয়াছিল—তাহার কয়েকটি এই:—

(ক) গ্রীক শব্দ ekklēsia (দ্বিতীয় ē=ēta); ইহার আধুনিক

গ্রীক উচ্চারণ ekklisia ('eta' এর উচ্চারণ i অর্থাৎ ই) লাটিনে গৃহীত ecclesia (eta স্থলে e অর্থাৎ এ)। এখানে বলা আবশ্যক লাটিন 'c' এর উচ্চারণ 'ক' এবং 'e' এর উচ্চারণ 'এ'।

(খ) গ্রীক ēthikōs (প্রথম বর্ণ eta) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ ithikos (eta এর উচ্চারণ 'ঈ') লাটিনে গৃহীত ethice (eta স্থলে e অর্থাৎ এ)

(গ) গ্রীক alphabētos (তৃতীয় স্বর eta) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ alphavitos (eta=ঈ) লাটিনে গৃহীত alphabetum (eta=এ)।

(ঘ) গ্রীক শব্দ kēnsos (দ্বিতীয় অক্ষর eta) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ kinsos (eta=ঈ) লাটিনে গৃহীত census (eta=এ)

(ঙ) গ্রীক Loukrētios (ষষ্ঠ অক্ষর ēta) আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ Lukritios (eta=ঈ) লাটিনে গৃহীত Lucretium (eta=ইত্যাদি।

এই সমুদায় বিচার করিলেও প্রমাণিত হয় যে আধুনিক গ্রীক উচ্চারণ প্রাচীন গ্রীক্ উচ্চারণ হইতে পৃথক। প্রাচীনকালে 'eta' এর উচ্চারণ হইত 'এ'।

খ্যাতনামা বৈয়াকরণগণ সকলেই এই মত পোষণ করেন (গুড., পৃঃ XIV, হ্যাড., পৃঃ ৪; কুর্. পৃঃ ৩; টম্. পৃঃ ৪; গেড., পৃঃ ১; আর্. পৃঃ ৬; মৌ. vo ii পৃঃ ৪৩; রবা, পৃঃ ১৯১)।

প্রকৃত ঘটনা এই—অতি প্রাচীন কালে গ্রীক বর্ণমালায় 'ēta' এবং 'ōmega' ছিল না। সাধারণ 'e' এবং সাধারণ 'o' ই দীর্ঘ 'e' এবং দীর্ঘ 'o' এর কার্য্য করিত। ৪০৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে এয়ুক্লেইডেস (ইউক্লিড) বিধিবদ্ধ করিয়া 'ēta' এবং 'ōmega' কে গ্রীক বর্ণমালায় গ্রহণ করেন। প্রথমে 'ēta' এর উচ্চারণ ছিল 'এ'; কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইহার উচ্চারণ হইয়াছিল 'ঈ'। রবার্টসন বলেন, খৃষ্টের পূর্ব্বে প্রথম শতাব্দীতেই এই 'ঈ' উচ্চারণ প্রচলিত ছিল (পৃঃ ২০৮)।

Jannaris একজন ঈটা-বাদী; তিনি বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দীর্ঘ e (=এ) এর কার্য্য করিবার জন্য eta এর সৃষ্টি; কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাকে ei বলিয়া ভুল করিত এবং ঐ সময়ে ei উচ্চারিত হইত i রূপে ("Eta was technically intended for 'long' *e*, but popularly mistaken for *ei*, which *ei* by this time was pronounced as *i*." (পৃঃ ৪১)।

যখন eta এর উৎপত্তি, তখন পণ্ডিত-সমাজ যখন ইহাকে দীর্ঘ e অর্থাৎ দীর্ঘ 'এ' রূপে উচ্চারণ করিতেন, তখন বর্ত্তমান যুগেও পণ্ডিতগণকে সেইভাবেই উচ্চারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ eta=দীর্ঘ 'এ'।

অষ্টম নিয়ম

৮। অষ্টম বর্ণের প্রচলিত নাম থেটা বা থীটা।

'ঈটা'-বাদী উচ্চারণ করেন 'থ'; thin শব্দের 'th' এর ন্যায়—'th' কে একটা বর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়।

'এটা' বাদীর উচ্চারণ t+h=ট্+হ; দুইটি বর্ণই উচ্চারিত হয় যেমন 'কঠ' শব্দকে 'কট্‌হ' বলিলে 'ট্‌হ' এর যেমন উচ্চারণ হয়।

Thompson বলেন, "The aspirates 'thēta' 'phei' are usually pronounced as spirants, thēta as *th* in *thick*, 'phei' as *ph* in *Philip* or *f* in *fear*; 'chei' is pronounced like *ch* in *character*. But in Greek they were real aspirates and were pronounced: 'thēta' as *t-h* in *mast-head*, 'phei' as p-h in *up-hill* and 'chei' as *k-h* in *work-house*." (পৃঃ ৬; পৃঃ ৩, ৪ দ্রষ্টব্য)।

ভাবার্থ এই—গ্রীক ভাষায় পূর্ব্বে *thēta*, *phei* এবং '*chei*' এই তিনটি অক্ষরকে পূর্ব্বে 'হ' যুক্ত করিয়া উচ্চারণ করা হইত, যেমন 'ট্‌হ', 'প্‌হ' 'ক্‌হ'। এখন 'হ' উচ্চারণ না করিয়া কেবল থ, ফ এবং খ রূপে উচ্চারণ করা হয়।

ম্যাক্স্ মূলারও এই কথাই বলেন :—

In Greek we find one set of aspirates *chi*, *thēta phi*, which are surds and which in later Greek dwindle away into corresponding spirants (Vol. ii, পৃঃ ২২৯)।

Moulton (Vol. ii, পৃঃ ৪৫), Hadly and Albu (পৃঃ ৭), Arnold and Conway (পৃঃ ৭) প্রভৃতি বৈয়াকরণগণও এই মত পোষণ করেন।

নবম নিয়ম

৯। নবম বর্ণের নাম 'ইয়োটা' (iota—এটা বাদীর মতে); ইয়টা (iota—ঈটা বাদীর মতে)। উচ্চারণ 'ই'; মতভেদ নাই।

১০ম—১৩শ

১০—১৩। kappa (ক), lambda (ল), mu (ম), nu (ন), এই চারিটি বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে মতভেদ নাই।

চতুর্দ্দশ নিয়ম

১৪। চতুর্দ্দশ বর্ণ ইংরাজীতে x লেখা হয়। উচ্চারণ ক্+স; কোন মতভেদ নাই। ইহার অনুরূপ বাংলাতে কোন একটি বর্ণ নাই। 'ক্ষ' অক্ষরের সংস্কৃত উচ্চারণ ক্ ষ; বাংলা উচ্চারণ খ্খ। ক্+স এবং ক্+ষ এক নহে সুতরাং 'ক্ষ' (অর্থাৎ ক্+ষ দ্বারা 'x'কে প্রকাশ করা যায় না। বাংলায় লিখিতে হইলে ক্‌স (ক্স) ই লিখিতে হইবে।

পঞ্চদশ নিয়ম

১৫। পঞ্চদশ বর্ণ 'o' গ্রীক বর্ণমালায় দুইটি 'o'; পঞ্চদশ বর্ণকে বলা হয় ছোট 'o' (o-mikron) এবং চতুর্ব্বিংশ বর্ণও একটি 'o'—ইহার নাম বড় 'O' (O-mega)। ছোট 'o' এর উচ্চারণ 'অ'—মতভেদ নাই।

১৬শ—১৯শ

১৬শ—১৯শ। Pei (প), Rhō (র), Sigma (স) এবং Tau (এই চারিটির উচ্চারণে মতভেদ নাই)।

বিংশ নিয়ম

২০। বিংশ অক্ষর 'u'। ইহার নাম u-psilon; psilon অংশ যোগ করিবার কারণ-বিষয়ে Liddell and Scott তাঁহাদের গ্রীক অভিধানে এইপ্রকার লিখিয়াছেন—

"Called u-psilon because the original sound was broad like 'ou' and afterwards was thin like French 'u.'

উচ্চারণ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। 'ঈটা'-বাদীর উচ্চারণ 'ই'। 'এটা'-বাদীর উচ্চারণ 'উ'; কেহ কেহ উচ্চারণ করেন জার্ম্মান্ ü এর ন্যায়। হাড্‌লী বলেন, ইহার উচ্চারণ ইংরেজী 'oo' এবং 'ee' এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জার্ম্মানীর 'ü' এর উচ্চারণ কিপ্রকার তাহা বর্ণনা করিবার

ম্যাক্‌সমূলার গ্রন্থ-বিশেষ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

While the tongue gets ready to pronounce 'i' the lips assume the position required for "u" (Vol.ii' পৃঃ ১৩০) অর্থাৎ যখন জিহ্বা 'ই' উচ্চারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন ওষ্ঠ 'উ' উচ্চারণ করিবার আকার ধারণ করে।

জান্নারিস (Jannaris) বলেন, পূর্ব্বে ইহার উচ্চারণ ছিল u (উ) এখন হইয়াছে 'i' (ই) পৃঃ ৪৭।

একবিংশ নিয়ম

২১। একবিংশ বর্ণের নাম phei. ঈটা-বাদীর উচ্চারণ 'ফ'। এটা'-বাদীর উচ্চারণ প+হ; বাংলায় দ্বরান্ত 'কফ' শব্দকে 'কফ্‌হ্‌' রূপে উচ্চারণ করিলে 'প্‌হ্‌' এর যেমন উচ্চারণ হয়।

Curtius বলেন, লাটিন ভাষায় গ্রীক শব্দ লিখিতে হইলে ঐ বর্ণের স্থলে f (=ফ) না লিখিয়া 'ph' লেখা হয় (পৃঃ ৪)।

অষ্টম নিয়মে এই বর্ণের উচ্চারণ বিষয়ে অপরাপর বৈয়াকরণদের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ নিয়ম

২২। দ্বাবিংশ বর্ণের নাম chei। ঈটা-বাদীর উচ্চারণ বাংলা 'খ'। সংস্কৃতে 'খ' এবং অপরাপর বর্গের দ্বিতীয় বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ কি, সে-বিষয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈয়াকরণদিগের মধ্যে মতভেদ আছে (ম্যাক্‌, Vol ii, পৃঃ ১৬০)

'এটা'-বাদীর উচ্চারণ 'ক্‌হ'—বাংলায় 'দেখ' শব্দকে 'দেক্‌ হ' রূপে উচ্চারণ করিলে 'ক্‌হ' এর যেমন উচ্চারণ হয়।

ত্রয়োবিংশ নিয়ম

২৩। ত্রয়োবিংশ অক্ষর প্‌সাই; উচ্চারণ 'প্‌স'—মত ভেদ নাই।

চতুর্ব্বিংশ নিয়ম

২৪। গ্রীক বর্ণমালার শেষ বর্ণের নাম O-mega (বড় 'O')। উচ্চারণে মতভেদ আছে। ঈটাবাদীর উচ্চারণ 'অ'; এটা-বাদীর উচ্চারণ ও, দীর্ঘ 'o'; হ্যাড্‌লির দৃষ্টান্ত prone এর 'o'; গুডউইন এর দৃষ্টান্ত note এর 'o'। Arnold এবং Conway বলেন, এই 'o' cokeএর 'o' অপেক্ষা 'ore' এর 'o' বর্ণের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ইংরাজীতে দীর্ঘ 'o' বর্ণের এইপ্রকার উচ্চারণ। কিন্তু ইউরোপের অপরাপর দেশে দীর্ঘ o এর উচ্চারণ কিছু বিভিন্ন; এই উচ্চারণ saw শব্দের 'aw' এর উচ্চারণের ন্যায় (ব্লাস্‌, অনুবাদকের ভূমিকা, পৃঃ VI).

Thompson বলেন O-mega এর উচ্চারণ 'ought' শব্দের 'ou' এর উচ্চারণের ন্যায় (পৃঃ ৪, ৫).

ইহাদিগের সিদ্ধান্ত যে নিতান্তই অযৌক্তিক তাহা বলা যায় না। ছোট 'o' এবং বড় 'o'—একটা হ্রস্ব, একটি দীর্ঘ। ছোট 'o' এর উচ্চারণ 'অ'; বড় 'o' এর উচ্চারণ ইহারই দীর্ঘ হইবে। 'অ' কে দীর্ঘ করিলে 'ও' হয় না—হয় "অঅ"। দৃষ্টান্ত saw শব্দের aw, কিংবা ought শব্দের ou.

যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে O-mega=দীর্ঘ 'o', তাহা হইলে প্রশ্ন এই দীর্ঘ o ইংলণ্ডের দীর্ঘ 'o', না ইউরোপ মহাদেশের দীর্ঘ 'o'?

এ বিষয়ের বিস্তৃত বিচার Blass এবং Jannaris এর পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

কয়েকটি সংযুক্ত স্বর-বিষয়েও মতভেদ আছে।

২৫। ai=এ (ঈটা-বাদী)=আ+ই (এটা-বাদী,—স্বর দুইটার পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ)।

২৬। ei=ই (ঈটাবাদী=এ+ই) এটা-বাদী Thompson বলেন ইহার উচ্চারণ *bait* এর *ai* এর ন্যায়। (পৃঃ ৫)

Hadley and Allen বলেন, *rein* এর *ei* এর ন্যায়। (পৃঃ ৫)

Goodwin বলেন, "অনেক পণ্ডিত *right* এর *ei* এর ন্যায় ইহার উচ্চারণ করেন এবং এই মতের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে" পৃঃ xv.

কিন্তু তিনি নিজে height এর *ei* এর ন্যায় উচ্চারণ করেন। এপ্রকার করিবার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি জার্ম্মানী ও ইংলণ্ডের প্রচলিত প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন না ("simply to avoid another change". পৃঃ xv)।

Curtiusএর উচ্চারণ heightএর *ei* এর ন্যায়। (পৃঃ ৪)।

২৭। oi=ই (ঈটাবাদী)=অ+ই (এটাবাদী) পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জন উচ্চারণ করেন—oil এর 'oi' কিংবা boy এর '*oy*' এর ন্যায়।

২৮। ui=ই (ঈটাবাদী (=উ+ই (এটা-বাদী))।

Hadley and Allen, Goodwin, Arnold and Conway-এরও মত 'এটা-বাদী'র ন্যায়।

Curtiusএর দৃষ্টান্ত why (অর্থাৎ hwy) এর wy এর ন্যায়।

২৯। au=আ+উ (এটাবাদী) দৃষ্টান্ত house এর *ou* (গুড, পৃঃ xiv); our এর ou (হ্যাড্‌, পৃঃ ৫)।

Thompson উচ্চারণ করেন, note এর 'o' এর ন্যায় (পৃঃ ৫)।

ঈটাবাদীর মতে ইহার উচ্চারণ av (আব্‌—অন্তঃস্থ ব); কিন্তু ক, খ, ট, থ, প, ফ, স পরে থাকিলে au এর উচ্চারণ হয় af (আফ্‌)। এবিষয়ে Jannaris এর ভাষা এই—"The dipthongs au, eu are now pronounced in N [Modern Greek] as av, ev, modified to af, ef before hard consonants" (পৃঃ ৫৫)।

Moulton এর ভাষা এই "The MGr. pronunciation is av, ev (or af, ef, before breathed consonants) Vol. ii, পৃঃ ৪৩।

ত্রিংশ নিয়ম

(৩০)। eu=এ+উ (এটা বাদী) কেহ কেহ উচ্চারণ করেন, feud এর 'eu' এর ন্যায় (গুড, XIV; হ্যাড্‌, ৫)। Curtius এবং Thompson এর দৃষ্টান্ত 'new' এর 'ew' (কুর্, পৃঃ ৪; টম্, ৫), তবে Thompson 'প্রায়' nearly শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

ঈটা-বাদী 'au'কে যে নিয়মানুসারে উচ্চারণ করেন 'eu'কে উচ্চারণ করেন ঠিক সেই নিয়মানুসারে। সাধারণতঃ ইহার উচ্চারণ ev (এব, অন্তঃস্থ ব); কিন্তু ক খ প্রভৃতি পরে থাকিলে উচ্চারণ হয় *ef* অর্থাৎ 'এফ্‌' (উনত্রিংশ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

৩১। ou=উ। উভয় দলে মতভেদ নাই।

Jannaris বলেন, ইহার উচ্চারণ স্পষ্ট '*u*' (=উ)—distinct sound as '*u*' (পৃঃ ২৬, ৪০, ৪৭)।

Goodwin এর দৃষ্টান্ত moon এর '*oo*'; Hadley and Allen এর দৃষ্টান্ত youth এর ou.

Geddes বলেন—"The natural 'u' i.e. English 'oo' is properly 'ou'; bull=bous (পৃঃ ২)।

Thompson এর মত বিভিন্ন—তিনি বলেন, ইহার উচ্চারণ 'note' এর 'o' এর ন্যায় (পৃঃ ৫)।

Plato বলেন ou=o, যেমন kalon=kaloun ; পার্থক্য কেবল হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রায় এবং উদাত্ত-অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরে (ক্রাটুলস্, ৪১৬, বি)।

আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ঈটা-বাদীর মতে নিম্নলিখিত পাঁচটির উচ্চারণই 'ই' ;—

'ē', i, u. ei, oi, ui.

নিম্নলিখিত তিনটির উচ্চারণ "এ" :—

e. ae, ai. এবং নিম্নলিখিত ছুইটির উচ্চারণই "অ" :—o (ছোট 'o'), ō (বড় 'o')।

'এটা'-বাদিগণ বলেন, কাব্য ও দর্শনে যখন গ্রীসদেশ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তখনও যে বহুস্বরের একপ্রকার উচ্চারণ হইত, এপ্রকার কল্পনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক। আরও একটি কথা—সংযুক্ত স্বর-সমূহের উচ্চারণও যদি অসংযুক্ত স্বরের ন্যায়ই হয়, তাহা হইলে সংযুক্ত স্বর সমূহের সার্থকতা কোথায় ? বিনা প্রয়োজনে নূতন কিছু প্রবর্ত্তিত হয় না। অসংযুক্ত স্বরবর্ণ দ্বারা সমুদয় স্বর প্রকাশ করা যাইত না, সেই জন্তই ভিন্ন ভিন্ন স্বরবর্ণের সংযোগ আবশ্যক হইয়াছিল।

আমরা উভয়দলের মত জানিলাম এবং খ্যাতনামা বৈয়াকরণগণ উচ্চারণ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেন, তাহাও আলোচিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক আমাদের গ্রন্থকার কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন।

(১) Sokrates, গ্রীক। প্রথম স্বর, ō-mega, শেষ স্বর, ēta। সোক্রাটীস, গ্রন্থকারের উচ্চারণ ; সক্রাটীস্, ঈটা-বাদীর। সোক্রাটেস্, ইংলণ্ডের এটা-বাদীর। সক্রাটেস্, অপর এটা-বাদীর ; (২৪, ৭ এর নিয়ম)।

(২) Xanthippē. গ্রীক। শেষ স্বর, eta।

ক্সান্থিপ্পী, গ্রন্থকারের ; স্নান্থিপ্পী, ঈটা-বাদীর ; স্নাণ্টহিপ্পে, এটা-বাদীর (১৪, ৮, ৭ এর নিয়ম।)

(৩) Parmenidēs, গ্রীক। শেষ স্বর ēta। পার্মেনিডীস, গ্রন্থকারের ; পার্মেনিদীস্, ঈটা-বাদীর ; পার্মেনিডেস্, এটা-বাদীর, (৪, ৭ এর নিয়ম)।

(৪) Euripides. গ্রীক শেষ স্বর ēta ইয়ুরিপিডীস, গ্রন্থকারের ; এব্‌রিপিদীস্, ঈটা-বাদীর ; এউরিপিডেস্, এটা-বাদীর (৩০, ৪, ৭ এর নিয়ম)।

(৫) Thoukudides—গ্রীক। শেষ স্বর—ēta. থোকুডিডীস—গ্রন্থকার, ১ম খণ্ডে, থোকুডিডীস—গ্রন্থকার, ২য় খণ্ডে ; থুকিদিদীস—ঈটাবাদীর ; টু হু কু ডিডেস্—এটা-বাদীর। (৮, ৩১, ৩০, ৪, ৭ এর নিয়ম)।

(৬) Zēnōn—গ্রীক। প্রথম স্বর—ēta, দ্বিতীয় স্বর—ō-mega। জীনোন—গ্রন্থকারের ; জীনন্—ঈটাবাদীর ; ড্‌সেনোন্—ইংলণ্ডের এটাবাদীর ; ড্‌সেনঅন্—অপর এটাবাদীর ('ড' স্থলে 'ট'ও উচ্চারিত হয়। (৬, ৭, ২৪ এর নিয়ম)।

(৭) Eukleidēs—গ্রীক শেষ স্বর—ēta। এয়ুক্লাইডীস—গ্রন্থকারের ; এব্‌ক্লিদীস্—ঈটাবাদীর ; এয়ুক্লেইডেস্—এটাবাদীর। (৩০, ২৬, ৭ এর নিয়ম)।

(৮) Glaukon—গ্রীক। শেষ স্বর—O-mega। গ্লৌকোন—গ্রন্থকারের ; গ্লাফ্‌কন্—ঈটাবাদীর ; গ্লাউকোন্ গ্লাউকঅন্, এটাবাদীর (৩, ২৯, ২৪ এর নিয়ম)।

(৯) Aischulos—গ্রীক। আইসখুলস—গ্রন্থকার, ১মখণ্ডে আইসখুলস—গ্রন্থকার ২য় খণ্ডে ; এস্খিলস্—ঈটাবাদীর ; আইস্কুলস্—এটাবাদীর (২৫, ২২, ২০, এর নিয়ম)।

(১০) Phaidōn—গ্রীক। শেষস্বর—O-mega। ফাইডোন—গ্রন্থকারের ; ফেদন্—ঈটাবাদীর। প্‌হাই ডোন্, প্‌ হাই ডঅন্, এটা-বাদীর (২১, ২৫, ৪, ২৪ এর নিয়ম)।

(১১) Puthagoras—গ্রীক। পিথাগরাস—গ্রন্থকার, ১মখণ্ডে, পুথাগরাস—গ্রন্থকার, ২য় খণ্ডে ; পিথাগরাস—ঈটাবাদীর ; পুট্‌হাগরাস—এটাবাদীর। (২০, ৮, ৩এর নিয়ম)।

(১২) Lukourgas—গ্রীক্। লুকোর্গস—গ্রন্থকারের। লিকুর্গস ঈটাবাদীর। লুকুর্গস্—এটাবাদীর (২০, ৩১, ৩এর নিয়ম)।

দেখা যাইতেছে অনেক স্থলে গ্রন্থকার 'এ' বাদীদের মত গ্রহণ না করিয়া 'ঈ' বাদীদের মত গ্রহণ করিয়াছেন—যেমন zeta, eta, thēta, phei, chei ইত্যাদির উচ্চারণে।

আবার কোন কোন স্থলে 'ঈ'বাদীর উচ্চারণ অগ্রাহ্য করিয়া 'এ' বাদীর মত গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন gamma. delta, upsilon, omega, ai, ইত্যাদির উচ্চারণে।

আবার কোন স্থলে কাহারও মত গ্রহণ করেন নাই—যেমন au=ঔ ('গ্লৌকন'); ou=উ ('মৌসাইয়স') x=ক্স ('আনাক্সাগরাস')। কোন খ্যাতনামা বৈয়াকরণই ইহা সমর্থন করেন না।

গ্রন্থকার সর্ব্বত্র এক নিয়ম রক্ষা করেন নাই ; কোন স্থলে eu=এয় ('জেয়ুস'), কোন স্থলে বা 'ইয়ু' (ইয়ুরিপিডীস), কোন স্থলে x=জ (জেনফানীস্) কোন স্থলে বা ক (খানাক্সিমেনীস্)। তবে বোধ হয় প্রচলিত নামের ইংরাজী উচ্চারণ দিয়াছেন, এইজন্ত মতভেদ।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের সর্ব্বত্র ঐক্য নাই। যেমন থোকাডিডীস (১ম খণ্ড) এবং থোকুডিডীস (২য় খণ্ড) ; আইস্খুলস (১ম খণ্ড) এবং আইস্খুলস (২য় খণ্ড) ; পীথাগরাস (১মখণ্ড) এবং পুথাগরাস (২য় খণ্ড) ইত্যাদি।

'উপদেবতা'

প্লেটোর গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে সোক্রাটেস বিশেষ বিশেষ সময়ে দৈববাণী শ্রবণ করিতেন বা দৈব ইঙ্গিত লাভ করিতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার গ্রন্থে To daimonion শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ইহারই বাংলা করিয়াছেন 'উপদেবতা' (পৃঃ ৫০ ; ২৪ নিম্ন হইতে তৃতীয় লাইন)। এ বিষয়ে বক্তব্য দুইটি :—

(১) বাংলা ভাষায় উপদেবতা শব্দ ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সোক্রাটেস্ যাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেন তিনি মঙ্গলময় দেবতা। সুতরাং এ স্থলে 'উপদেবতা' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এই শব্দের অর্থ দেবতা, না দেব-কর্তৃত্ব, সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। Riddel প্রমুখ অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে daimonion (ডাইমনিঅন্) এবং daimon (ডাইমোন্) একার্থ-প্রকাশক নহে। উত্তর কালে সর্ব্বত্র ইহাদিগের মধ্যে পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন কালে পার্থক্য ছিল। ডাইমোন্ শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা দেবতা। বিশেষত্ব এই, এই দেবতা মানবের সহিত সংস্রব রাখেন। হোমারের সময় হইতে প্লেটোর সময় পর্য্যন্ত এই অর্থ। To daimonion (ট ডাইমনিঅন্) কখন কর্তৃত্ব, কখন বা কর্ত্তা অর্থে ব্যবহৃত হইত। সোক্রাটেস্ দেবকর্তৃত্ব অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মেলেটস্ সোক্রাটেস্‌কে অভিযুক্ত করিবার সময়ে এই শব্দকে 'দেবতা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। "প্লেটো সর্ব্বত্রই ডাইমনিঅন্‌কে ক্লীবলিঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।" (জাউয়েট, Republic, Vol. iii টীকা, পৃঃ ২৮৫ ; Campbell, Theaetetus টীকা, পৃঃ ৩৪)। বার্ণেট বলেন, "ইহা ঈশ্বর হইতে আইসে, ইহা কোন দেবতা নহে" (Euthyphro টীকা পৃঃ ১৬)। Riddel নিজগ্রন্থে

জেনফোন ও প্লেটো হইতে প্রধান প্রধান অংশ (Apol. 31c; Phaedrus 242 b; Euthydemus 272 E; Theaet 151 a ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃত ভাবে এ সমুদায়ের বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত 'ডাইমনিয়ন' দেবকর্তৃত্ব (agency); দেবতা (agent) নহে (Apology পৃঃ ১০৯—১১৭)।

প্রকৃত পক্ষে ইহা দৈববাণী, দৈবাদেশ বা দৈব ইঙ্গিত। খ্যাতনামা প্রায় সমুদায় পণ্ডিতই এই মত পোষণ করেন (Zeller's Socrates, পৃঃ ৮২-৯৬; গ্রোট, সোক্রাটেস Vol. i, 115. Vol. ii. 104; Thompson's Phaedrus পৃঃ ৩৬; Adam's Apology, p. XXVII: Gifford's Euthedemus, পৃঃ ৮; Gomperz, Greek thinkers, Vol. ii, পৃঃ ৮৭—৮৮; (Riddel এর পূর্ব্বোক্ত পুস্তক ইত্যাদি)।

সুতরাং 'উপদেবতা' শব্দ এস্থলে ব্যবহার করা উচিত নহে।

তবে এস্থলে বলা আবশ্যক, যে, উত্তর কালের অনেক লেখক 'ডাইমোন' এবং 'ডাইমনিঅন্'—এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ প্লুটার্কের অনুসরণ করিয়া 'daemon' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পারিভাষিক শব্দ

গ্রন্থকার অনেক গ্রীক দার্শনিক শব্দ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের ভাষান্তর করা অতীব কঠিন। বাংলা ভাষায় বিশেষ অসুবিধা—অনেক স্থলে নূতন শব্দ সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

প্লেটোর একটি বিশেষ মত আছে যাহাকে ইংরাজীতে Theory of Ideas নাম দেওয়া হইয়াছে। প্লেটো অনুরূপ তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—(১) idea, (২) eidos (এইডস্) এবং (৩) eidē (এইডে)। প্রথম শব্দটির ব্যবহার অল্প। আমরা যাহাকে প্লেটোর ideas বলি তাহা সাধারণতঃ eidē (এইডে)। আর্ডমান (Erdmann) বলেন—"Where we speak of Ideas, Plato generally speaks of eidē" (History of Philosophy, Vol i, পৃঃ ১ ৮)।

Ideas শব্দের নানা অর্থ; আবার কোন কোন অর্থ প্লেটোর অর্থের বিরোধী। এইজন্য অনেকে মূল গ্রীক শব্দই রাখিয়া দিতেছেন; অনেকে আবার প্রকৃত অর্থ-প্রকাশক নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতেছেন। অনেক পণ্ডিত বলিতেছেন, ইহার অনুরূপ শব্দ "form" (Adam's Republic. Greek Text, টীকায়, Vol. i, p. 335; Davies and Vaughan এর Republic, অনুবাদ; Macquire এর Parmenides, টীকা পৃঃ ৭০; Burnit's Phaedo এবং Greek Philosophy. Stewart এর Plato's Theory of Ideas; Taylor's Varia Socratica পৃঃ ১৭৮...২৬৭ দ্রষ্টব্য)। ম্যাক্সমুলার eidē শব্দের প্রতিশব্দ দিয়াছেন 'আকৃতি' (Six Systems, পৃঃ ৩৯৮) Deussen এর মতে আকৃতি=eidos (এইডস্) (System of the Vedanta, p. 69)। আমাদিগের মনে হয় আকৃতি বা পরাকৃতি, রূপ বা পরমরূপ, আদর্শ বা আদর্শরূপ দ্বারা প্লেটোর অর্থ ব্যক্ত করা যাইতে পারে। 'তত্ত্ব' বা প্রকৃত তত্ত্বও উপযুক্ত প্রতিশব্দ। তত্ত্ব=তৎ+ত্ব; ইহার অর্থ 'তাহার ভাব বা বিশেষত্ব'। Taylor সাহেব 'real essences' ব্যবহার করিয়াছেন।

আমাদিগের গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছেন 'স্ফোট'। কিন্তু ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই শব্দের একটী বিশেষ অর্থ আছে। পাণিনি দর্শনের একটি বিশেষ মতের নাম স্ফোটবাদ। নানা গ্রন্থে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা আছে (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, কুমারিল ভট্টের শ্লোক বার্ত্তিক, ৫।১—১৩৭; শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ১।৩।২৮; ম্যাক্সমূলার, Six Systems, পৃঃ ৩৯৭ ৪১৫; সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের History of Indian Logic পৃঃ ১৩১, ১৩২, ১৪৮, ১৪৯। Deussen's System of the Vedanta, পৃঃ ৭১-৭৬ ইত্যাদি)।

সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের সহিতই স্ফোটের সম্বন্ধ। স্ফোটবাদ একপ্রকার 'শব্দ-দর্শন'। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বলা হইয়াছে, যে, নিত্যশব্দকে স্ফোট বলা হয়; 'ইহা বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত কিন্তু বর্ণাতিরিক্ত নিত্যশব্দ'। আরও বলা হইয়াছে, যে, "বর্ণদ্বারা স্ফুটিত হয় এইজন্য ইহাকে স্ফোট বলা হয়; কিংবা ইহা হইতে অর্থ স্ফুটীকৃত হয়, এইজন্য ইহার নাম স্ফোট" (আনন্দাশ্রম সংস্করণ পৃঃ ১১৪)। Deussen এর অনুবাদ 'the bursting forth (পৃঃ ৭১—৭২)। ম্যাক্সমুলার বলেন—"It really means the sound of a word as a whole and as conveying the meaning apart from its component parts (Six Systems, পৃঃ ৪০২—৪০৩) অর্থাৎ স্ফোট সমগ্র পদের শব্দ; ইহা বর্ণাতিরিক্ত ও অর্থপ্রকাশক। বিদ্যাভূষণ অর্থ করিয়াছেন—'the outburst of conglomerate sound, phonetic explosion (পৃঃ ১৩১)। এস্থলে বলা হইল, স্ফোট শব্দের অর্থ, সম্মিলিত শব্দসমূহের স্ফুটীভবন। ভারত বর্ণস্ফোট পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট ইত্যাদির সমালোচনা করিয়াছেন। (বিদ্যাভূষণের গ্রন্থ পৃঃ ১৪৯)। রূপস্ফোট, রসস্ফোটাদির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্রকৃত কথা এই, শব্দের সহিতই স্ফোটের সম্বন্ধ। এই শব্দ একটি পারিভাষিক শব্দ; এবং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে ইহার বহু প্রচলন।

প্লেটোর 'এইডে'-বাদ সম্পূর্ণ পৃথক্। এ অবস্থায় 'এইডে'-বাদকে স্ফোটবাদরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে না।

অনুবাদ

আমরা অনেক স্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, যে, অনুবাদ মূল গ্রীকের অনুগত। দুই এক স্থলে ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে। যেমন এয়ুথুফ্রোন্ গ্রন্থের একস্থলের অনুবাদ করা হইয়াছে :—

"আমি অভিযোক্তা নই, এয়ুথুফ্রোন্, অভিযুক্ত। আমার মোকদ্দমা দেওয়ানী নয়, অথীনীয়েরা ইহাকে বলে ফৌজদারী"। পৃঃ ৩১৯।

এস্থলে আইনসংক্রান্ত দুইটা কথা ব্যবহৃত হইয়াছে (১) dikē (ডিকে); (২) graphē (গ্রাপ্হে)। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে যে অভিযোগ হয়, তাহা 'ডিকে'; আর রাজ্যের বিরুদ্ধে নীতিধর্ম্মাদি বিষয়ে অপরাধ করিলে যে অভিযোগ হয়, তাহার নাম 'গ্রাপ্হে'। (Burnet, Watt and Mills, Adam, Wells প্রভৃতির টীকা; Jowett, Cary, Mills প্রভৃতির অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। কেবল ফৌজদারী বলিলে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয় না। ফৌজদারী ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধেও হইতে পারে; যেমন অনধিকার প্রবেশ। 'গ্রাপ্হে' শব্দের ইংরেজীতে অর্থ impeachment (Jowett), indictment (Cary), public prosecution (Mills)। ইহা দেশের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য বিশেষ ফৌজদারী মোকদ্দমা।

অনুবাদের প্রথম বাক্যের সমগ্র অংশ মূলে নাই। তবে অর্থের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

এ সমুদায় অবান্তর বিষয়। পাঠকগণ গ্রন্থকারের অনুবাদ পড়িয়া গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

অপরাপর বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

সাংবাদিকের ডায়ারি

শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

যখন ফোর্থ্-এ ক্লাশে পড়ি, তখন একদিন অমৃত-বাজার পত্রিকা নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে পড়িলাম, যে, ভারতবর্ষে গবর্ণ্‌মেন্ট্ বলিয়া যে-প্রতিষ্ঠান আমাদের শাসনকর্ত্তা এবং মা-বাপ, তাহার অন্য নাম ডাকাইত। কথাটা পড়িয়া ভালো লাগিয়াছিল—ভারি ভালো লাগিয়াছিল। দেশের লোকদের যাহা বলিবার তাহা সংবাদপত্রেই বলিয়া থাকে—অতএব যাহারা সংবাদপত্রসেবী তাহারাই দেশের মূর্ত্তিমান্ জন-মত। সেই কাঁচা বয়স হইতেই আমার জীবনের সর্ব্বোচ্চ বাসনা ছিল—আমি বড় হইয়া কোনো খবরের কাগজে কাজ করিব, অর্থাৎ কিনা সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া জনমত গঠন করিব। এই কথাটা কল্পনা করিতেও আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রাণমন কেমন যেন একটা কথায়-বলা-যায়-না উল্লাসে নাচিয়া উঠিত।

মনে পড়ে, আমাদের গাঁয়ের শ্রীনকুড়চন্দ্র দাসের কথা। তিনি ভারতবিখ্যাত চুয়াগঞ্জ টাইমস্‌এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে নীলামী ইস্তাহার, কর্ম্মখালি প্রভৃতি অত্যন্ত দরকারী সংবাদে সদা পরিপূর্ণ থাকিত। যুদ্ধের সময় নকুড়-বাবু যখন গাঁয়ে আসিতেন, তখন গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতা (বনিতা বাদ দিয়া) সকলে যুদ্ধের খাঁটি খবর শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। নকুড়-বাবু পরম বিজ্ঞের মতন শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিতেন "আরে সত্যি খবর বল্‌বার কি জো আছে? তা হ'লে যে জেল হ'য়ে যাবে—আমাদের যে সংবাদদাতা এখন যুদ্ধের জায়গায় আছে সে সব খবর পাঠায়। কিন্তু তা আমাদের অন্য কারুকে বল্‌বার জো নেই। এই শোনো না, কাইজার সেদিন প্রায়—না থাক্, একথা বল্‌বার নয়।"

আমরা অবাক্ হইয়া যাইতাম। নকুড়-বাবু এত কথা, এত ভয়ানক-ভয়ানক সংবাদ কেমন করিয়া গোপন রাখেন। আমরা প্রায়ই শুনিতাম যে লাট সাহেব নকুড়-বাবুকে ডাকিয়া নানা গভীর বিষয়ের সংবাদাদি দেন; কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। নকুড়-বাবুও তাঁহার কথা ঠেলিতে পারেন না।

নকুড়-বাবুর কথা এখনও বেশ মনে আছে। নকুড়-বাবুর সঙ্গে আর-একজন লোকের কথা মনে পড়ে। তাহার নাম মনে নাই। সে খবরের কাগজের আপিসে সকলের লেখার ভুল সংশোধন করিত। মনে ভাবিতাম, সে কত বড় না জানি একটা পণ্ডিত! তা'র বিদ্যার পরিমাণ না জানি কত ভয়ানক। তাহার খেতাব ছিল হেড্ প্রুফ-রিডার্।

ক্রমাগত চারবার বি-এ ফেল করিবার পর আর বি-এ পাসের চেষ্টা না করিয়া, অনেকের সুপারিশ জোগাড় করিয়া একটি দৈনিক কাগজের আপিসে বিনা-বেতনের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলাম। কথা হইল যে কাজকর্ম্ম শিক্ষা করার পর কর্ত্তারা আমার উপযুক্ত দক্ষিণার বন্দোবস্ত করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিবেন না, তবে ধৈর্য্য ধরিয়া কাজকর্ম্ম শিখিতে একটু সময় লাগিবে, এই যা! আমার ভবিষ্যৎ যে অতি উজ্জ্বল সে-বিষয়ে সেই কাগজের কর্ত্তাদের কোনোই সন্দেহ ছিল না। মনের আনন্দে কাজে ভর্ত্তি হইলাম। তখন মনে ভাবিলাম যে ক্রমে-ক্রমে দেশের লোকদের মতকে এমনভাবে গঠন করিব যে দেশ একদিন হঠাৎ অত্যাচারী পাশ্চাত্য শক্তি-পুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। সেই অদূর ভবিষ্যতে আমি দেশের লোককে যে-পথে ইচ্ছা চালাইব। আমার কাগজে তখন কি-কি লিখিব, তাহারই কিছু-কিছু মনে উদয় হইতে লাগিল। কোনো দিন হয়ত লিখিব, দেশ জাগো, ঐ দেখ তোমার মা ভাই অনাহারে মরিতেছে, ঐ দেখ, চোখ মেলিয়া দেখ, তোমার পরনে কাপড় নাই। ভাবো, ভাবো, একবার সেই অতীত বৈদিক কালের কথা ভাবো, যখন

তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণের ধমনীতে-ধমনীতে পবিত্র আর্য্য-শোণিত অনাবিল আবেগে ছুটিয়া চলিত, তখন তাঁহারা বল্কলে অঙ্গ আবৃত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বেদগান করিতে-করিতে বনে-বনে মেষ ও কামধেনু-সদৃশ গাভীগণকে চরাইয়া দিন যাপন করিতেন। কি সুখের দিন ছিল তখন! তখন গাছে-গাছে ফল ফলিত, নদীতে জল ছিল, এবং সেই জলে বিবিধ কত সুস্বাদু মৎসকুল মনের আনন্দে বিচরণ করিত। আর আজ! অহো! সে-কথা আর বলিয়া কাজ নাই।" ইত্যাদি

এদিকে বাবা বেজায় চটিয়া গেলেন। তিনি তাঁহার ই-আই-আর-এর বড় সাহেবকে অনেক বলিয়া-কহিয়া আমার জন্য মানকর ষ্টেশনে একটি টিকিট কালেক্টারির কাজ জোগাড় করিলেন,—মাসিক বেতন ৩০৲। আর আমি কিনা তাহা পায়ে ঠেলিলাম! বাবা বলিলেন, তিনি আর আমার মুখ দেখিবেন না। তখন মনে-মনে করুণার হাসি হাসিয়া ভাবিলাম, "হায় বৃদ্ধ! তুমি কি জানিবে এই তরুণ হৃদয়ের আরব টাট্টুর মতন উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার কথা! তোমার প্রাণমন সব শুখাইয়া গিয়াছে, চোখ অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাই কিছু দেখিতে পাও না, কিছু অনুভব করিতেও পারো না। কিন্তু একদিন দেখিবে তোমার এই পুত্র তোমার শৃঙ্খলিতা পদদলিতা মাতাকে কেমন করিয়া দেশ-শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিবে!" মনে-মনে এই কথাগুলি বলিলাম বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার ভরসা হইল না, কারণ বাবা-ঠাকুরের দেহবলের খ্যাতি ছিল।

প্রথম-প্রথম আমি প্রুফ দেখা শিক্ষা করিতাম। তাহার পর ক্রমে সংবাদ সংশোধন করা শিখিতে লাগিলাম। এই সময় একদিন প্রধান সম্পাদক আমাকে বলিলেন "ওহে, অনেক সংবাদ প্রায়ই আসে, যা খুব দরকারী, কিন্তু অনিল সেগুলোকে ভালো ক'রে সংশোধন ক'রে বসাতে পারে না, তুমি বাপু একদিন এই কাজটি ক'রে দেখাও ত কেমন পারো।" আমি ভাবিলাম—কি ধড়িবাজ লোক বাবা! আমি যে ঐ কাজটা ভালো ক'রে করতে পারি, সেটা সোজা কথায় বল্‌বেন না, ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা চাই, সম্পাদকি বুদ্ধি আর কারে বলে! এমন ক'রে সংবাদ সংশোধন কর্‌ব যে—হাঁ, সবাই একেবারে অবাক্ হ'য়ে যাবে, চাই কি কাগজের কাটতিও কিছু-কিছু বেড়ে যাবে।

একদিন একটি সংবাদ আসিল, তাহা এই: "মান্দ্রাজ-বাজারে চিনির দর পড়িয়াছে।" এই এক লাইন সংবাদ কাহারো চোখে পড়িবে না—অথচ এই সংবাদের উপর কত লোকের কত আশা-দুরাশা নির্ভর করিতেছে। আমি সংবাদটিকে অতি মনোহর এবং ছন্দোময় করিয়া লিখিলাম:—

পতন !!

ভীষণ পতন! কারুর পৌষ মাস কারুর সর্ব্বনাশ!

"সংসারের চাকা অবিরাম ঘুরিতেছে—কখনও স্থির হইয়া নাই। আজ যে-বৃক্ষে ফল ফলিল, কাল সে-বৃক্ষ ফলহীন হইল। আজ যে কুমারী বালিকা, কাল সে সপ্ত সন্তানের গৌরবময়ী জননী, তাহার পর দিন সেই জননী আর নাই! কিন্তু তাহার সেই সপ্ত সন্তান কত শততে পরিণত হইল! নদীতে এই জোয়ার আসিল, খানিক পরে দেখ, ভাঁটার টানে জোয়ার ভাসিয়া গেল। আজ তোমার দেহে রেশমী জামা, কাল তুমি খালি-পায়ে পথে দাঁড়াইয়া আছ! চাহিয়া দেখ উজ্জ্বল সূর্য্যালোক কাঁচা ধানের ক্ষেতে সোনা ঢালিয়া দিয়াছে—আবার একটুপরে দেখ রাত্রির গভীর তিমির-পরদা কালো-চাদরে মাঠ-ঘাট আবৃত করিয়া দিয়াছে—। আজ যে জিনিসের দাম চড়া, কাল তাহার দাম পড়িয়া গিয়াছে। সত্য-সত্যই তাহাই আজ ঘটিয়াছে—মান্দ্রাজের বাজারে হাহাকার! কিন্তু ঘরে-ঘরে মুচকি হাসির লহর, কারণ চিনির দাম পড়িয়াছে।

নিজের লেখা বার-বার পড়িলাম—বেশ লাগিল। যেমনি ভাষার ছটা, তেমনি বর্ণনার ঘটা! কেহ কাহাকেও ছাড়াইতে পারে নাই, কিন্তু দুই চমৎকার!

ছাপার অক্ষরে যখন প্রুফ দেখিলাম, তখন আমি আমার এই অদ্ভুত, চমৎকার, সংবাদ-সংশোধনের ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। এবার আটকায় কে? কাল সম্পাদক নিশ্চয়ই দুপুরে আমায় ডাকিবেন—তা'র পর বলিবেন "—তা দেখ তুমিই ঐ সংবাদ-সংশোধনের কাজটা নাও, আর—হ্যাঁ, দ্যাখ,

এ-মাস থেকে কিছু অ্যালাওয়েন্স্ও নিও, এই শ-দেড়েক নিও, তা'র পর একটা-কিছু পাকা বন্দোবস্ত করা যাবে।" হরিশের চোখ টাটাবে! ওঃ! ভারি কাজ ত করেন! "ভালো প্রুফ দেখি, ভালো প্রুফ দেখি" !—"দেখ্ এইবার প্রুফ। আমি যা লিখ্‌ব, তুই দেখ্‌বি তা'র প্রুফ! যদি কোনো ভুল হয়, বা তোমার বিদ্যে ফলাও, তবে বুঝ্‌লে বাবাজি—সামনের ঐ দরজা, দারোয়ান যেখানে টুলে ব'সে ঝিমোয়!"

[আর-একটি সংবাদ সংশোধন আমি করি, তাহার মূল সংবাদ ছিল এইপ্রকার

"আমার পুত্রের বিবাহ এবং পরে আমার হঠাৎ কলেরা হওয়ায়, গত চারদিন কাগজ বন্ধ ছিল—ইতি

সম্পাদক।"

সম্পাদক মহাশয় আমায় একবার বলেন, যে, খবরের কাগজে 'আমি' বলিয়া কোনো জিনিষ নাই, সকল ক্ষেত্রেই "সম্পাদকীয় আমরা" (অর্থাৎ Editorial We) ব্যবহার করিতে হইবে। যেমন 'আমার কাগজ' না লিখিয়া 'আমাদের কাগজ' লিখিতে হইবে। আমি তাই উপরে লিখিত সংবাদটিকে এইপ্রকার সংশোধন করিলাম—

"আমাদের পুত্রের বিবাহের জন্য এবং তা'র পর হঠাৎ আমাদের কলেরা হওয়ায় আমাদের কাগজ গত চারদিন বন্ধ ছিল। ইতি

সম্পাদক।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সংবাদটি ছাপা হইবার পূর্ব্বেই সম্পাদকের হাতে পড়ে এবং তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং জেদি লোক ছিলেন বলিয়া নিজের পূর্ব্ব জেদই বজায় রাখেন।]

সকালে যখন কাগজ বাহির হইল তখন চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল! বোধ হয় কাগজও সেদিন কিছু বেশী বিক্রয় হইয়া থাকিবে। সম্পাদক-মহাশয় দুপুরে আপিসে আসিলেন—তাঁর মুখ বেশ গম্ভীর দেখিলাম। মনে ভাবিলাম—আনন্দের আতিশয্যই ইহার কারণ এবং এক-জন যোগ্য লোককে এতদিন যে নীচে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল—ইহার দরুন দুঃখও যে সম্পাদকের মনকে কিছু-পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে নাই—তাহাই বা কে বলিতে পারে?

আমার ঘরে আমি চেয়ারে বসিয়া দুয়ারের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি, কখন আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় আমাকে ডাকেন। বলিতে মনে ছিল না, ঐ দিনকার কাগজে আরো অনেক-গুলি সংবাদ আমি বিশেষযত্নসহকারে সু-সংশোধন করিয়া দিয়াছিলাম—তাহার মধ্যে একটির এখানে উল্লেখ করিতেছি। মূল সংবাদটি এই :—

"কাল রাত্রে হোঁগলকুড়িয়ার রাজা মারা গিয়াছেন।" আমি এই মৃত্যু সংবাদটিকে সর্ব্বজনমনোরঞ্জক করিয়া কাগজের সংবাদস্তম্ভের সর্ব্বাপেক্ষা ভালো স্থানে বসাইয়া দিয়াছিলাম। সংশোধিত সংবাদটি হইয়াছিল এইপ্রকার :—

প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইল!

সমস্ত পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পরমেশ্বর—তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা—তাঁহার ইচ্ছা মঙ্গলময়, তিনিও মঙ্গলময়। তিনি যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্য। তিনি গরীবকে ধনদান করেন, দুঃখীকে সুখ দান করেন। ভগবান্ যাহা করেন তাহা আমাদের এবং দেশের ভালোর জন্যই করেন। হোঁগলকুঁড়িয়ার রাজার এই যে গত কল্য রাত্রের মৃত্যু ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, ইহাতে আমাদের মঙ্গল হইবে, দেশেরও মঙ্গল হইবে!"

যাক্—হঠাৎ দেখি সম্পাদকের প্রধান বেয়ারা আসিয়া আমাকে সম্পাদকের সেলাম জ্ঞাপন করিল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁহার ঘরে চলিলাম—মাঝখানে দেখি, অনিল তাহার প্যারিসগ্রীন্ বিনিন্দিত দন্তরাজি বাহির করিয়া হাসিতেছে—ভাবিলাম একটা চড় বসাইয়া দিই, তা'র পর মনে হইল, আহা! বেচারা আমার সুখে সুখী হইয়া হাসিতেছে—এই কথা মনে হইবামাত্র অনিলকে আমায় বড় ভালো লোক বলিয়া মনে হইল।

সম্পাদকের ঘরে গিয়া দেখিলাম সম্পাদক এবং কাগজের মালিক ও তাঁহার দুই পুত্র বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া সম্পাদক গম্ভীরভাবে বলিলেন—"কালকের এই সংবাদগুলি কে সংশোধন করেছে?" আমি বলিলাম যে

"সবগুলিই আমি করেছি।" তখন সম্পাদক-মহাশয় বলিলেন "দেখ বাপু, আমাদের সামান্য কাগজে তোমার মত মহাপণ্ডিতকে যথেষ্ট সম্মান এবং দক্ষিণা দিতে পারব না। তা ছাড়া আমাদের কাগজের পাঠকও সব সামান্য বিদ্যেওয়ালা লোক, তাহারা তোমার সু-সংশোধিত সংবাদের মর্ম্ম গ্রহণ একতিলমাত্রও করতে পারবে কি না সন্দেহ! তা তুমি—এই কি বলে, অন্য-কোনো ভালো জায়গায় যাও।" আমি কোনো কথা বলিলাম না। মানুষের অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম!

অনিল তখনও হাসিতেছে। দারোয়ান টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছে। আমি বাহির হইয়া গেলাম।

মনে করিলাম—আর না, এবার পিতার শ্রীচরণে বার-কয়েক প্রণাম করিয়া টিকিট কালেক্টারের কাজেই আত্ম-নিয়োগ করি, তা'র পর মনে হইল—নাঃ! ছিঃ! পুরুষ আমি! নানা বিরুদ্ধ অবস্থার ভিতর দিয়া আমার পুরুষত্বের পূর্ণ বিকাশলাভ হইবে। অনেক হাঁটাহাটি করিয়াও কোথাও কাজ না পাইয়া অবশেষে অতি কম বেতনের একজন রিপোর্টার হইলাম। সহরের যত ভালো ভালো বক্তৃতার এবং ঘটনার সংবাদ আমি জোগাড় করিয়া লিখিয়া আনিয়া দিতাম—আর সেই সমস্ত কাগজে ছাপা হইত। স্থানাভাব হইত বলিয়া আমার লিখিত সংবাদ-সংগ্রহের কিছু-কিছু প্রায়ই কাটিয়া-ছাটিয়া দেওয়া হইত। আমি কিন্তু সেই কাটা অংশগুলি সযত্নে রাখিয়া দিতাম—পরে যখন কোনো পুস্তক রচনা করিব, তাহা কাজে লাগাইয়া দিব, এই মনে করিয়া।

একদিন সহরে এক ভয়ানক জুয়াচুরির ব্যাপার হইল। দুইজন বড় বড় উকিল ইহাতে অভিযুক্ত হইলেন। আমি সংবাদ লিখিলাম :

"সহরের দুইজন প্রধান উকিল জুয়াচুরি করিয়া আজ ধরা পড়িয়াছেন। ইঁহারা অনেক লোককে ঠকাইয়াছেন, ইঁহাদের শাস্তি হওয়া উচিত। বিচার চলিতেছে।"

সংবাদটি পড়িয়া আমাদের কাগজের সম্পাদক বলিলেন "দেখুন—যে সমস্ত ব্যাপার এখনও বিচারাধীন, সেই সমস্ত ব্যাপার ওরকম ক'রে লিখবেন না। দুইজন উকিল অভিযুক্ত হয়েছেন মাত্র—এখনও প্রমাণ হয় নি যে তাঁহারা সত্য-সত্যই জুয়াচুরি করেছেন কি না—তা ছাড়া রিপোর্টারের কোনো বিষয়ে মতামত দিবার বা ভালোমন্দ বলিবার কোনো দরকার নেই। আপনি একটি কথা সকল সময় মনে রাখবেন, কোনো কথা স্পষ্ট ক'রে বলবেন না, অর্থাৎ কিনা commit করবেন না কোনো বিষয়ে। দয়া ক'রে এই কথাটি মনে রাখবেন।"

সম্পাদকের বুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সত্যই ত—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত চোর বলা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। আর কখনও এমন কথা বলিব না।

কয়েকদিন পরে সহরে আই-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমাদের কাগজে পরীক্ষার সমস্ত লিস্ট্ বাহির হইত না। কেবলমাত্র খবরটি বাহির হইত। আমি সংবাদ লিখিলাম :

"সহরে বিষম গুজব যে আই-এ পরীক্ষার ফল নাকি বাহির হইয়াছে। আরো গুজব যে এবার নাকি ৫০ পারসেন্ট্ ছেলে পাস হইয়াছে। এ বিষয়ের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না, ভালোমন্দ সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বলিবার নাই।"

এই সঙ্গে আরো একটি সংবাদ সংগ্রহ করিলাম।

"গুজব যে কাল রাত্রে প্রসিদ্ধ বণিক্ হরিদাস বাবুর বাড়ীতে খুব ভোজ হইয়া গিয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে ইহাও অবগত হইলাম যে আমাদের কাগজের প্রতিনিধিও নাকি সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাও গুজব যে নিমন্ত্রিত সকল লোকে নাকি পেট ভরিয়া ভোজন করেন। আরো প্রকাশ যে নিমন্ত্রিতগণ রাত্রি ১টার সময় যে-যার গৃহে গমন করেন। এ-বিষয়ে কোনো মতামত আমরা এখন দিব না।"

এই সংবাদ-দুটি পরদিন কাগজে প্রকাশ হইল। বেশী রাত্রে এই সংবাদদ্বয় প্রেসে যায় বলিয়া সম্পাদকের হাতে পড়ে নাই—তাহা হইলে বোধ হয় কাগজে স্থানাভাব হইত। দ্বিপ্রহরে সম্পাদক-মহাশয় আমাকে ১৫ দিনের আগামী বেতন দিয়া বলিলেন, "আপনি এখন কিছুদিন বিশ্রাম করুন; সাংবাদিকের হাড়ভাঙা খাটুনি আপনার সহ্য হইতেছে না।" বুঝিতে পারিলাম

সম্পাদকের মনে হিংসার উদয় হইয়াছে। মনে-মনে হাসিয়া বলিলাম—আগুনকে চাপা দিয়া রাখা যায় না—সে একদিন-না-একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেই। সম্পাদক, আজ তুমি আমাকে বিশ্রাম করিবার অবসর দিতেছ—এমনদিন আসিবে যখন তুমি বিশ্রাম চাহিবে না, কিন্তু আমি তোমাকে জোর করিয়া বিশ্রাম দিব।

আমি এখন ঘরে বসিয়া-বসিয়া সংবাদপত্র সেবা করিতেছি—আজ আমি স্বাধীন, কাহারো বেতন-খাওয়া চাকর নহি। আমার নানাপ্রকার সংবাদ, প্রবন্ধ, ইত্যাদি নানা কাগজে বেনামিতে ছাপা হইয়া থাকে।

* * *

সংবাদপত্রের সহিত বহুকালের যোগ থাকাতে এবং সেই সঙ্গে সকল বিষয়ে আমার একটা তীব্র অন্তর্দৃষ্টি থাকার দরুন আমি দেখিতে পাইলাম যে সংবাদ পত্রের যাহারা নিয়মিত বা বিখ্যাত লেখক সকলেরই এক-একটি করিয়া ভালো নাম আছে। এই যে আমরা যাঁকে নকুড়বাবু বলি, ইহার সংবাদ পত্রের নাম জীমূতবাহন। তাহার পর ইহাও বেশ ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম যদি রবীন্দ্রনাথ না হইয়া শ্রীবেচারাম ভড় হইত, তাহা হইলে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে তিনি কখনই এত বড় কবি হইতে পারিতেন না, এবং লোকেও কখনই তাঁহাকে কবীন্দ্র বা সাহিত্যসম্রাট্ নামে অভিহিত করিত না। আমি বেশ জোরের সঙ্গেই এই কথা বলিতে পারি। সত্যমিথ্যা ভগবান্ জানেন—আজকালকার একজন বিখ্যাত কবি এবং ঔপন্যাসিক, এবং ছোটোগল্পলেখক তাঁহার পিতামাতার দেওয়া নামটিকে একদিন গঙ্গাস্নান করিবার সময় পুণ্যস্রোতা জাহ্নবীর জলে ত্যাগ করিয়া সেইসঙ্গে আর-একটি ভালো নাম গঙ্গার দানস্বরূপ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন, এবং সেই সময় হইতেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে বিষম প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। আমার আসল এবং মৌলিক অর্থাৎ পিতার দেওয়া নাম ছিল শ্রীভজহরি হাতী। এখন আমার প্রবল ইচ্ছা হইল, আমি এই নামটিকে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাহিত্যিকের মতন একটা নাম গ্রহণ করিব। কিন্তু নিজের গাঁয়ে বসিয়া নাম বদ্‌লানো একটু কঠিন বলিয়া আমি গ্রাম ত্যাগ করিয়া আবার কলিকাতার একটা নতুন মেসে গিয়া উঠিলাম। সেখানে আমার নাম হইল শ্রীনবীন্দ্রকুমার রায়।

কলিকাতায় আসিয়া আমি আবার সেই পুরোনো কাগজ, যেখানে দ্বিতীয়বারে কাজ করিয়াছিলাম, সেইখানে কাজে লাগিয়া গেলাম। সে সম্পাদক নাই, নতুন একজন সম্পাদক আসিয়াছেন—ইনি বিলাত-ফেরত এবং কাজকর্ম খুব ভালো বুঝিতে পারেন। ইহাকে কেন জানি না আমি প্রথম হইতেই ভয়ানক শ্রদ্ধা করিতাম, এবং সময় পাইলেই তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আসিতাম। ইনি বয়সে আমার চেয়ে ছোটো হইলেও ইহাকে আমি জ্ঞানে বড় বলিয়া মনে করিতাম এবং তিনিও আমাকে 'তুমি' সম্বোধনে আমার সে দাবীকে সার্থকতার মুকুট পরাইয়া দিতেন। প্রথম-প্রথম সম্পাদক-মশায় আমার সঙ্গে একটু পর-পর ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কিছুদিন পরে সেই মেঘ কাটিয়া গিয়া পরম আত্মীয়তার সূর্য্যকিরণ প্রকাশ পাইল। তিনি আমাকে এতটা আপন মনে করিয়াছিলেন যে আমাকে মাঝে-মাঝে তাঁহার বাড়ীর তরকারীর বাজারটাও করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেন, কিন্তু কোনোদিন হুকুম করেন নাই—বা বাজারের হিসাব চাহেন নাই। এতই ছিল তাঁর মহানুভবতা এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি প্রধান রিপোর্টার হইলাম। এই সময় যেন আমার বুদ্ধির লোহার কপাট খুলিবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার ভাগ্যেরও সিংহী দরজা খুলিয়া গেল। আমি প্রায়ই নানা-প্রকার লোমহর্ষক এবং ভয়ানক-ভয়ানক খবর সংগ্রহ করিয়া আনিতাম—যাহা অন্য কোনো কাগজে বাহির হইত না।

একদিন মেছুয়াবাজারের একটা চায়ের দোকানে বসিয়া চা খাইতেছি, হঠাৎ পিঠের কাছে নেপথ্যে শুনিতে পাইলাম—"আজ রাতকো দো বাজে—আমার কান খাড়া হইয়া উঠিল। রাত দো বাজে কি রে বাবা? একটু পরে পিঠের দিকের চাটাই-এর দেওয়াল ভেদ করিয়া কথা আসিল "১১ নং পুকুরঘাটা বাড়ীতে

সিঁধ চালাও, মাল ভি বহুত—আউর রুপিয়া ভি থোড়া বহুত হোগা—"

আমি কালবিলম্ব না করিয়া, সোজা লালবাজারে গিয়া খবর দিলাম এবং কয়েকজন পুলিস ও সার্জ্জন সঙ্গে লইয়া ১১নং বাড়ীর পাশের গলিতে লুকাইয়া রহিলাম। রাত্রি দুইটা বাজিল। সমস্ত আকাশ বাতাস, পৃথিবীর গাছপালা নিস্তব্ধ। অন্ধকার আকাশের বুকে তারাগুলি যেন পৃথিবীর দিকে ব্যথাভরা দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছে—তাহারা যেন বলিতেছে, "ওগো পৃথিবী! কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া আমরা তোমার আশায় এমনি করিয়া বসিয়া থাকিব?"—এমন সময় জন-ছয়েক লোক ১১নং গুদামঘরের দেওয়ালে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিল এবং ঘণ্টাখানেক পরে তাহারা দলবল বাহিরে আসিবা-মাত্র আমরা তাহাদের বমাল বন্দি করিলাম। পরদিন সহরের লোকে আমাদের কাগজে এই ভীষণ চুরির কথা পড়িয়া অবাক্ হইয়া গেল। অন্য কোনো কাগজ এখবর পায় নাই।



কোনোদিন লিখিব "জাগো, ভাবো, চাহিয়া দেখ ভারতবাসী" ইত্যাদি"—

আমাদের কাগজের নাম ছিল "পৃথিবী।" "রাজপথ" বলিয়া দৈনিক কাগজটার সঙ্গে এই সময় আমাদের সকল বিষয় লইয়া ভয়ানক প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। তাহারা আমাদের সঙ্গে কোনো রকমেই যেন পারিয়া উঠিতেছে না। এই সময় আমি মেছুয়াবাজার, চীনা-পাড়া, খিদিরপুর ইত্যাদি স্থানে খুব বেশী সময় ঘুরিতাম।

একদিন শীতকালের সন্ধ্যাবেলা খিদিরপুরের একটা গলিতে ঘুরিতেছি। চারিদিক্ ধোঁয়াতে ভরিয়া গিয়াছে, কাছের মানুষ চিনিতেও বেশ কষ্ট হয়। আমি একটা চায়ের দোকানের সন্ধান করিতেছি, এমন সময় একজন লোক আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া আমার পাশে আসিয়া তাহার জুতার ফিতা বাঁধিতে-বাঁধিতে বলিল "খবর আছে—সামনের গলিতে আসুন।" আমি প্রথম কি করিব ভাবিয়া পাইলাম না। তবে বুঝিতে পারিলাম, অন্য কাহারো সঙ্গে লোকটা আমাকে ভুল করিয়াছে। একবার ভাবিলাম যে তাহাকে বলি, "বাপু হে, আমি ত তোমাকে আমার বাপের-কালে কোনোদিন দেখি নাই" কিন্তু কি জানি কি মনে করিয়া বলিলাম—"আচ্ছা, তুমি এগোও।" লোকটা সামনের একটা সরু অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিল।

গলিটাকে সরু বলিলে গলিটাকে খানিকটা চওড়া বলা হয়—আসলে কিন্তু তাহা নয়। দেড়জন লোক কষ্টেসৃষ্টে পাশাপাশি সেই গলিটা দিয়া চলিতে পারে। দুপাশের বাড়গুলা প্রায় সব তিনতলা হওয়াতে গলিটাকে যেন নরকের বা ঐ-রকম কোনো ভাবের স্থানে গমন করিবার পথ বলিয়া মনে হইতেছিল। মাঝে-মাঝে গ্যাসের বাতিও ছিল, কিন্তু সেগুলা নামমাত্র জ্বলিতেছিল। আলকাতরায় মতন অন্ধকারকে ঐ মিটমিট করা গ্যাস-আলোগুলা যেন আরো জমাট করিয়া দিয়াছিল। লোকটা আমার প্রায় দশ হাত আগে-আগে চলিতেছিল। গলিটা আবার সোজা নয়। হেলে-সাপের মতন আঁকাবাঁকা।

গলিতে কোনোরকমে পথ ঠিক করিয়া চলিতেছি,

এমন সময় হঠাৎ সামনে দেখি, একটা গোলাকার সজীব পদার্থ, তাহার চোখ-দুইটা আমার দিকে চাহিয়া জল-জল করিতেছে। আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। হঠাৎ ফ্যাচ্ করিয়া এক লাফ!—ভালো করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিলাম একটা ডাস্ট্-বিন্ উল্টাইয়া রহিয়াছে—তাহার মধ্যে একটা মিশমিশে কালো বিড়াল খাদ্যের সন্ধান করিতেছে। সমস্ত গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। ভাবিলাম কাজ নাই বাবা, [illegible] সংবাদসংগ্রহের পাল্লায় পড়িয়া শেষে বিঘোরে মরিব। ফিরিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় পিছন হইতে [illegible]-গম্ভীর গলায় হুকুম আসিল—আগে চলো বাবু! পিছনে [illegible] ফিরাইয়া দেখি বাপ! সওয়া-চারহাত লম্বা এক কাবুলি, তাহার লাঠিটা ঠক্ ঠক্ করিতে-করিতে আসিতেছে। আমি আর ফিরিবার সাহস না পাইয়া সামনেই আগাইয়া চলিলাম। গোটা-কয়েক পাক খাইবার পর হঠাৎ কানের পাশে কে যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল, তাহার পরই আমার ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিতে লাগিল! ভয় ত পাইলামই, তাহার সঙ্গে এমন অন্ধকারে এবং এমন চমৎকার স্থানে এমন একটা মন্দ রসিকতায় হাসিও আসিল—সেখানটা আবার গলির একটা পাকের মাথায়, কোনোদিক্ দিয়াই আলো আসে না। দিয়াশালাই ছিল পকেটে, জ্বালিয়া দেখিলাম ভয়ের ব্যাপার বিশেষ নয়, দেওয়ালের একটা ফাটলে শ-পাঁচেক আরশোলা জমায়েত হইয়া মহা হল্লা করিতেছে, তাহারাই দু-একটা আমার ঘাড়ে ভুলক্রমে আসিয়া পড়িয়াছিল।

আর-একটা কাঠি জ্বালিয়া কিছুদূর আগাইয়া গেলাম। হঠাৎ আমার হাতে, মাথায়, ঘাড়ে কি-একটা ঠাণ্ডা তরল পদার্থ আসিয়া পড়িল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম বহু উচ্চ জানলায় আলো দেখা যায়,—ভাবিলাম, ডাকিয়া বলি—কিন্তু আর ডাকিতে হইল না, ডাকিবার ভাবনা শেষ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই মুখের উপর আসিয়া পড়িল খানিকটা তরল পদার্থ। আর কোনো-প্রকার ভাবনা বা চিন্তা না করিয়াই হনহন করিয়া আগাইয়া চলিলাম।

হঠাৎ এক রামধাক্কা! তা'র পরেই বিশুদ্ধ দেবনাগরী ভাষায় মধুর-মধুর সম্ভাষণ আরম্ভ হইল। ব্যাপারটা কি হইয়াছে বুঝিবার পূর্বেই দুই খোট্টা চানাচুরওয়ালা আমার নিকট তাহাদের ভূপতিত চনাচুরের মূল্যস্বরূপ পাঁচটি টাকার দাবি করিল।

অন্ধকারাবৃত গলি। তরল পদার্থে আপ্লুত দেহ এবং বস্ত্র। পিছনে কাবুলিওয়ালার লাঠির ঠক্-ঠকাঠক্ শব্দ। সামনে দুইজন সুদর্শন হিন্দুস্থানী চানাচুর-ওয়ালা। পাঁচটাকার মায়া ত্যাগ করিয়া আগাইয়া চলিলাম।

একটু দূরে আসিয়া দেখি, সেই লোকটা একটা প্রায় ভাঙা বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই আমার মেজাজ চটিয়া গেল। বলিলাম "তুমি আচ্ছা লোক হে—এমন জায়গায় ভদ্রলোককে [illegible]ন—? তাই না হয় সঙ্গে-সঙ্গেই এস, তা নয়! আচ্ছা লোক বাপু তুমি! দেখ ত এখন সমস্ত কাপড়-চোপড় কোথায় বদ্‌লাই?" লোকটা হাসিয়া ফেলিল—বলিল "এতদিন ধরিয়া এইসব জায়গায় ঘোরাফেরা কর্‌ছেন, তবু জানেন না যে এই গলিতে কাশ্‌তে-কাশ্‌তে বা লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে-করতে চল্‌তে হয়? আপনি যে এত কাঁচা এখনও, তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব বলুন?"

বাড়ির ভিতর ঢুকিলাম। প্রকাণ্ড বাড়ি, মাঝখানে বড় উঠান—তাহার চারিদিকে সারি-সারি ঘর। প্রায় সবই কিন্তু অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনতালা বাড়ি, উপরের তালার দু-একটা ঘর হইতে ভাঙা গলার মিঠা গানের আওয়াজ মাঝে-মাঝে আসিতেছিল। লোকটা কোণের একটা ঘরের শিকল খুলিয়া একটা কেরাসিন বাতি জ্বালিল এবং আমাকে একটা ছেঁড়া মাদুরে বসিতে বলিল। "আপনি একটু বসুন—এখুনি সবাই আস্‌বে। আমি একটু জোগাড় দেখি"—বলিয়াই সে হঠাৎ ঘরের বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এবার আমার সত্য-সত্যই ভয়ানক ভয় হইল। অজানা জায়গা, তা'র উপর এই ভীষণ গলি। এত-বড় বাড়িতে লোক নাই বলিলেই হয়, আমি একটা ঘরের মধ্যে শিকল-বদ্ধ অবস্থায়! হায় হায়! আজ বুঝি আমার সব শেষ হইল। পলাইবার কোনো পথ নাই। একটা জানালা আছে বটে

কিন্তু সেটা আবার অনেকখানি উঁচুতে, হাত পৌঁছায় না। ভয়ে আমার শরীরের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। ঘরের বাহিরে কাহাদের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দ ক্রমশঃ কাছে আসিল, অবশেষে ঝনাৎ করিয়া শিকল খোলার শব্দ হইল এবং তাহার পরেই সেই লোকটা তাহার সঙ্গে চারজন ভীষণদর্শন কাবুলিওয়ালাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। দেরী হওয়ার জন্ত লোকটা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আমাকে দেখাইয়া কাবুলি চারজনকে বলিল "আগা সাহেব—ইনি মিরজা সাহেবের বড় পেয়ারের লোক—সব মতলব ইনিই জোগাইয়া থাকেন।" সকলেই দেখিলাম আমাকে বেশ সম্মানের সঙ্গে সেলাম করিয়া মাদুরে বসিল। তা'র পর কথা আরম্ভ হইল।

লোকটা বলিল—"প্রথমে আপনাকে চিন্‌তে পারিনি, তা'র পর আপনি যখন গ্যাসপোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়্‌তে লাগলেন, তখনই বুঝ্‌তে পার্‌লাম। তা'র পর গলিতে আস্‌বার কারণ হচ্ছে যে ওদিকের ভালো রাস্তায় পুলিশের টিকটিকি বসেছে। এখন কাজের কথা বলি—এঁরা প্রায় একলক্ষ টাকার কোকেন চালান এনেছেন। কোকেন চার ভাগে ভাগ করা আছে—৪নং বেলবাগান, ৭নং নিমতলা, ১৩নং গণেশপাড়া এবং ১৭নং কাঁঠালবাগান, এই চার জায়গায় আছে। মিরজা-সাহেবকে এই খবরটা দিতে হবে, আর বল্‌তে হবে যে কাল সকাল আটটার মধ্যেই যেন সমস্তটা কোকেন অন্য-কোথাও চালান করা হয়, কারণ পুলিসের চোখ পড়্‌তে বেশী সময় লাগ্‌বে না। আপনি ঠিকানাগুলো লি'খে নিন—আচ্ছা। না, ওখানে নয়, জুতোর সুকতলার তলায় কাগজটা রাখুন, আপনি ধরা পড়্‌লেও কোকেন বেঁচে যাবে। সব মনে রাখ্‌বেন।"

আমি ভয়ে বি'ময়ে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম, "এরা বলে কি? মিরজা-সাহেব যে ভারতবর্ষে কোকেন-চালানের রাজা! আমি তা'রই দক্ষিণ হস্ত। এত বড় ভুল এরা কেমন ক'রে কর্‌লে?" তা'র পর সেই লোকটা বলিল, "যাবার সময় আপনি একটু সাবধানে যাবেন, রাস্তা'র যেন পুলিস কোনো-রকম সন্দেহ না করে।"

আমাকে বাড়ির বাহিরে আনিয়া দিল এবং তাহারা পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। সেই সরুগলিটা দিয়া চলিতে লাগিলাম। আকাশের দু-একটি তারা সেই গলির তলা হইতেও দেখা যায়। বাহিরের জগতের সহিত এই গলির আর কোনো প্রকার যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। গলির দুই পাশের দুতলা-তিনতলা বাড়ির জানালা-দুয়ার বন্ধ। গলিতে চলিতে-চলিতে কেবল মনে হইতে লাগিল মিরজা-সাহেব এবং আমি ছাড়া এই পৃথিবীতে যেন আর কিছু নাই। তা'র পর পুলিস কমিশনারের জন্ম হইল, তা'র পর কাহার জন্ম হইল বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই আমি ওয়াটগঞ্জ রোডে আসিয়া পড়িলাম। রাত তখন দশটা।

রিকশ করিয়া চীনা-সুন্দরী চলিয়াছে; পুলিস ও জাহাজের খালাসীরা রাস্তায় হল্লা করিতেছে।

আমি একটা রিক্‌শ ভাড়া করিয়া বাড়ীতে আসিয়া স্নান এবং বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় বাহির হইলাম।

তা'র পর সুকতলার তলা হইতে সেই কোকেন-রাজার বাড়িগুলার নম্বর লেখা কাগজটা বাহির করিয়া একেবারে লাল-বাজারে পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে বলিলাম, এবং বাড়িগুলার ঠিকানাও দিলাম। পুলিস সাহেব ভারি খুসী হইয়া বলিলেন, "Thanks very much Baboo—if everything is all right, the government will not forget you—now I will see to the necessary arrangements—all right, good night Baboo—"

অতি-নিকট-ভবিষ্যতের সুখের কল্পনায় আমি ভরপুর। আমাদের কাগজের আপিসে আসিয়া মস্ত বড় এক রিপোর্ট লিখিলাম।

"মিরজা সাহেব !! প্রসিদ্ধ কোকেনওয়ালা !!!

আজ সে বন্দি !!　　আজ সে কারাগারে !!

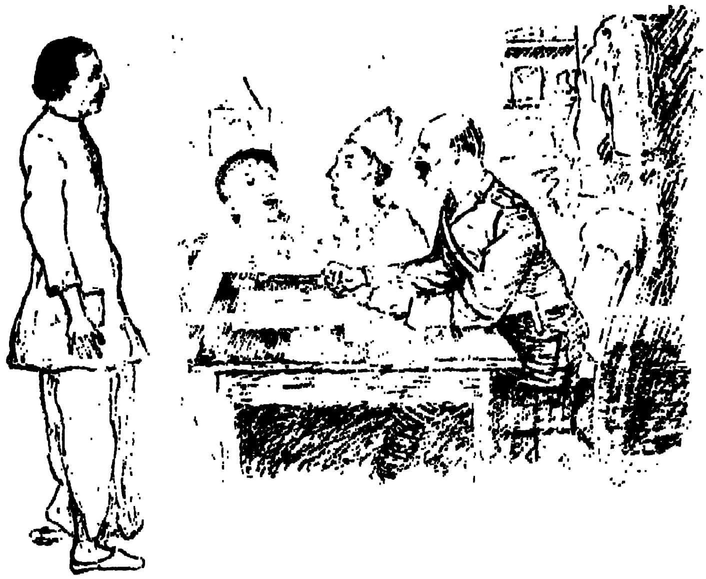
আমাদের নিজস্ব সংবাদ-দাতাই এই

কার্য্যের জন্য দায়ী

১০০,০০০৲ টাকার　　কোকেন ধৃত

ইত্যাদি অনেক-কিছুই লিখিলাম। তা'র পর মনের আনন্দ কোনো প্রকারে দমন করিয়া বাড়ি চলিয়া গেলাম। প্রাতঃকালে সকলে কেমন অবাক্ হইবে তাই ভাবিয়া আমিই অবাক্ হইয়া গেলাম। এত-বড় খবরটা আমাদের আপিসের একজন কম্পোজিটার ছাড়া আর কেহ জানে না, এমন কি সম্পাদক-মহাশয়ও না!

আমি ঘুম হইতে উঠিয়াই মুখে সামান্য-একটু জল দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। আমাদের কাগজ সেদিন হু হু করিয়া বিক্রি হইতেছে। অন্য সব কাগজ, বিশেষ করিয়া "রাজপথ" রাজপথেই পড়িয়া আছে!



D— you liar what the hell did you mean by bluffing the police?

বেলা দশটার সময় আপিসে পৌঁছিয়াই দেখিলাম দুইজন কনেষ্টবল এবং একজন পুলিস্ ইনস্পেক্টার বসিয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখা-মাত্র তাহারা এক-রকম জোর করিয়া একটা মোটরে বসাইয়া লালবাজার লইয়া গেল। সেখানে কমিশনারের ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি সাহেব আগুনের মতন লাল হইয়া বসিয়া আছেন—ঘরে আরো দুইজন লোক রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই সাহেব টেবিলে এক প্রচণ্ড ঘুঁষি মারিয়া বলিলেন "D— you liar—what the hell did you mean by bluffing the police like a fool?

আমি অবাক্ হইয়া গেলাম! সাহেব এ কি বলিতেছেন? তবে কি সব মিথ্যা?

হাঁ, তাই।

সাহেব বলিলেন, "তুমি যে ঠিকানা দিয়াছ, তা'র ১নং বাড়ী নাই, তাহা আজ এক বছর আগে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ভাঙিয়া দিয়াছে। ২নং বাড়ীতে থাকে একজন রায় সাহেব। ৩নং বাড়ীতে গত মাস হইতে আবু বক্কি উল্লা, বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালা ভাড়া লইয়াছেন। ৪নং বাড়ী কোনোকালে ছিল না এবং সেই জন্য বর্ত্তমানেও নাই।"

"পুলিসকে ধাপ্পা দেওয়া বিষম অপরাধ। তোমাকে ইহার জন্য বিষম শাস্তি লাভ করিতে হইবে।" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তা'র পর সাহেবের এবং আবু বক্কিউল্লার পায়ে ধরিয়া বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং অবশেষে ক্ষমা লাভ করিয়া লালবাজারের থানার বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, অনিল দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। আমি ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম কিন্তু কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেলাম।

* * * *

আমি এখন আবার ভজহরি হইয়াছি। নবীন্দ্র যে আমারি নাম ছিল, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।

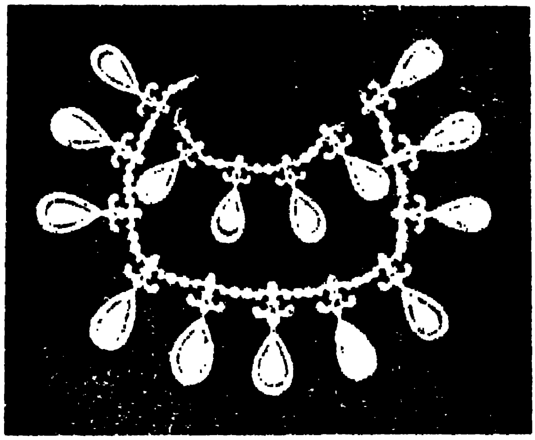
দেশের দুঃখ দূর করিতে পারি নাই। দেশকে শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইতেও পারি নাই। এই লজ্জা এবং দুঃখ আমার বুকে পাথরের মতন বসিয়া আছে। মা! ওমা! তুমি আমার চিরদুঃখিনী মা-ই রহিলে। আমাকে ক্ষমা করো মা!

ইতিমধ্যে একদিন নকুড়-বাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি বল্লেন—"'পৃথিবীর' সংবাদদাতার কাণ্ড শুনেছ হ্যা? নবীন্দ্র নাম?—লোকটা আসল গাধা।"

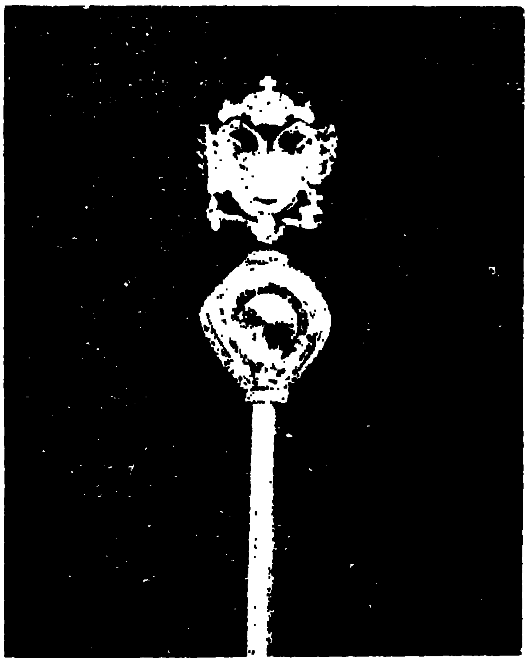
পঞ্চশস্য

রুশ-সাম্রাজ্যের রত্নকোষ—

অনেকের ধারণা ছিল যে রুশিয়ার জারের পারিবারিক ও রাজসভার অলঙ্কারগুলি তাঁহাদের দুর্দ্দশার সময় তাঁহারা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে সেগুলি ভালো ভাবেই আছে। এখন তাহা রুশ প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি। ছয়টি অলঙ্কারের চিত্র দেওয়া হইল।



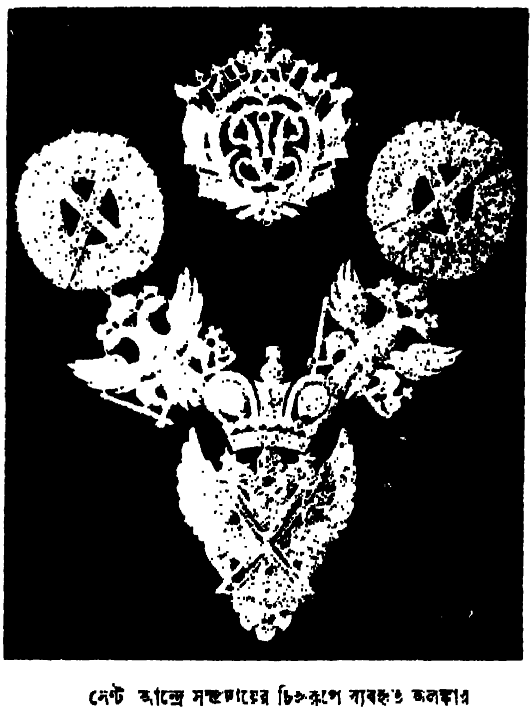
১। রাজদণ্ডের মাথা। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এটি নির্ম্মিত হয়। ১০[illegible] ক্যারেট ওজনের "অরলফ" নামক হীরক ইহার শিরোভূষণ। এই হীরক-সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে।



রাজদণ্ডের মাথা

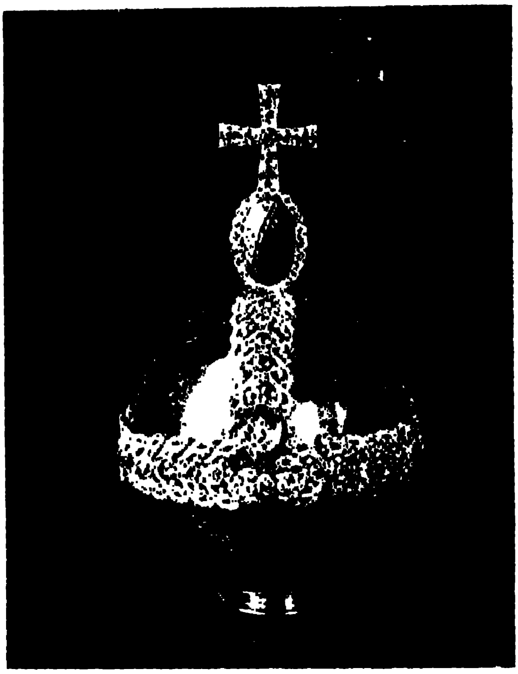
২। মুক্তাকণ্ঠি—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। মুক্তাগুলি ডিম্বাকৃতি ও অত্যুজ্জ্বল; ওজন প্রায় ৩২০ ক্যারেট। ভারতীয় পুরাতন হীরকের সহিত মুক্তাগুলি গাঁথা হইয়াছে। হীরার ওজন ১৩১ ক্যারেট।

৩। সেণ্ট আন্দ্রে সম্প্রদায়ের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত অলঙ্কার। ইহা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। হীরকগুলির অপূর্ব্ব জ্যোতি; সিংহলের হীরক। ওজন ১০৪২ ক্যারেট।



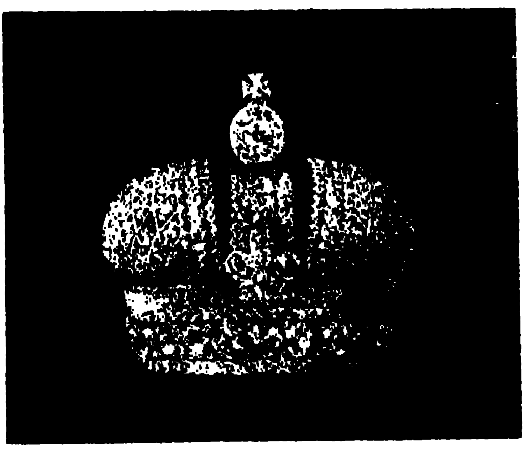
সেণ্ট আন্দ্রে সম্প্রদায়ের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত অলঙ্কার

৪। রাজচিহ্নস্বরূপ হিরণ্ময় গোলক। ইহা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। গোলকটি রক্তাভ স্বর্ণে নির্ম্মিত ও হীরকমালায় বেষ্টিত। মধ্যমণিটি ভারতের গোলকোণ্ডা হইতে আনীত হীরক। শিরোমণি সিংহলের একটি ২০০ ক্যারেট ওজনের ইন্দ্রনীলমণি। মণিটির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়।



রাজচিহ্নস্বরূপ স্বর্ণ-গোলক

৫। ছোটো রাজমুকুট। সম্রাট প্রথম পলের সময় তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত হয়। হীরকগুলি ভারত ও ব্রেজিলের। ওজন ৫৮৪ ক্যারেট।



ছোট রাজমুকুট

৬। সম্রাটের শ্রেষ্ঠ মুকুট। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মণিশিল্পী ডুভাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহা ভারতের প্রাচীন হীরকদামে শোভিত। হীরকের

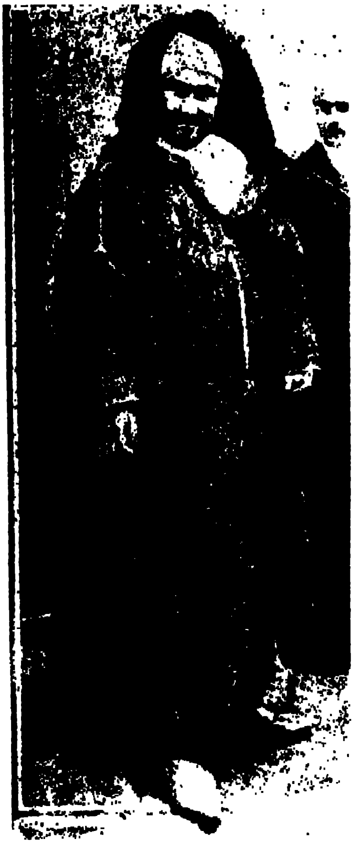


রাজসভার বড়মুকুট

ওজন ২৮০৪ ক্যারেট। শীর্ষদেশে ৪০২ ক্যারেট ওজনের একটি রাগমণি ("Spinelle Virgin") ও দুই সারি বড় মুক্তা আছে।

আবদুল করিম—

মরক্কোর স্বাধীনতার জন্য যে বীর গত চারবছর হইতে ইউরোপীয় দুইটি মহাশক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন তাঁহার নাম আবদুল করিম। খবরের কাগজের সংবাদ পাঠ করিয়া মনে হয় যে ফ্রান্স এবং স্পেন রীফদের প্রায় পরাজিত করিয়া আবার দাসত্বে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সত্যিকার ব্যাপার বোধ হয় একটু অন্য-রকমের হইবে। এই শীতকালের যুদ্ধের জন্য ইউরোপীয় এবং রীফীয় দুই পক্ষই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে। এতদিন যুদ্ধ করিয়াও স্পেন এবং ফ্রান্স রীফদের কাবু করিতে পারে নাই। রীফেরা প্রথমে স্পেনের সহিতই যুদ্ধ করিতেছিল। কিন্তু যখন স্পেনের অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন, তখন ফ্রান্স বাজে অজুহাতে রীফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্স বলে যে



আবদুল করিম

স্পেনের পরাজয় হইলে ফ্রান্স-অধিকৃত মরক্কো-প্রদেশে গোলমাল হইবে এবং তাহাতে নানা-প্রকার অশান্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। পাছে পরে অশান্তি হয় এবং রীফগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে, এই ভয়ে ফ্রান্সই পূর্ব্ব হইতেই রীফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল। যুদ্ধের শেষ ফল কি হইবে বলা শক্ত, তবে রীফগণ তাহাদের বিন্দুমাত্র শক্তি থাকিতে যে আবার শ্বেতাঙ্গের দাসত্ব মানিয়া লইবে তাহা মনে হয় না। জগতের সমস্ত মুসলমান জাতি রীফদের এই দুর্দ্দিনে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, অনেকে সাহায্যও করিতেছে।

রীফ ঘোড়সওয়ারগণ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার বলিলেও হয়। ইহারা "Guerilla Warfare" করে—তাহার কারণ ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ইহাদের হঠাৎ আক্রমণে স্পেন এবং ফ্রান্সের সৈন্যদল নাস্তানাবুদ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আবদুল করিমের অনেক ছবি আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এইসঙ্গে তাঁহার যে চিত্র দিলাম তাহা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গৃহীত। যেন পাহাড় হইতে ঝড়ের বেগে অবতরণ করিতেছে এইপ্রকার একদল রীফ ঘোড়সওয়ারএর ছবি দেওয়া হইল। আমেরিকা হইতে একদল বিমানচারী ইহাদের দমন করিবার জন্য আসিয়াছে।

কপি-পথ—

আফ্রিকায় এমন সমস্ত জঙ্গল আছে সেখানে মানুষ দূরের কথা সূর্য্যের আলোও প্রবেশ করিতে পারে না। এইসমস্ত জঙ্গলের মধ্যে কোটি-কোটি বৃক্ষলতাদি এমন ঘনভাবে অবস্থিত যে কোনো প্রকারেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। এইপ্রকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে সামান্য সামান্য স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়া নরখাদক অসভ্যজাতির বাস। তাহাদের খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টায় মাঝে-মাঝে জঙ্গলের বাহিরেও যাওয়া-আসা করিতে হয়। সেইজন্য তাহারা মাটি হইতে বহু উচ্চে বৃক্ষলতাদির মধ্য দিয়া, যে-পথ দিয়া বাঁদররা যাওয়া-আসা করে, সেইপথ ব্যবহার করে। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, একজন অসভ্য জাতী মানব এইপ্রকার একটি পথ লতাপাতা দিয়া মজবুত করিয়া তৈয়ার করিতেছে। এক-একটি পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহু ক্রোশ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে। জঙ্গলবাসী ভিন্ন-ভিন্ন জাতিরা এই পথের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ভাবের



রীফ ঘোড়সওয়ার পাহাড় হইতে শত্রু আক্রমণ করিতেছে



বৃক্ষাদির মাঝখান দিয়া ঝোলানো-পথ, মাটি হইতে বহু উচ্চে এই পথ ঝুলানো থাকে, ইহাকে সেতু বলাও চলে

আদান-প্রদান করে। পথটিকে একটি সেতু বলিলেও চলে। ছবি দেখিলেই ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পিপীলিকার কথা—

পিপীলিকাকে আমরা সামান্য প্রাণী বিবেচনা করিয়া তাহাদের বিষয় কিছু চিন্তাও করি না। কিন্তু পিপীলিকাদের জীবন ভালো করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের জীবনকাহিনী এবং বুদ্ধি মানুষ অপেক্ষা কোনো অংশেই কম নহে, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও আশ্চর্য্যজনক। বিখ্যাত ইংরেজ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ স্যার জন্ লবক্, বলিয়াছেন যে, ইতর প্রাণীদের মধ্যে পিপীলিকাই বুদ্ধি ইত্যাদিতে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে আসিতে পারে। লণ্ডন চিড়িয়াখানায় একবার একটি বিষয়ের পরীক্ষা হয়। বিষয়টি এই :—

"একদিন সোমবার সকালবেলায় দুইটি পিপীলিকার উপনিবেশের মাঝখানে একটি কাঠের টুক্‌রাকে সেতুস্বরূপ করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল। এই দুইটি পিপীলিকা-উপনিবেশের একটি নতুন আর একটি পুরোনো। সেতু-নির্ম্মাণ হইবার পরেই পুরোনো আবাসের একটি পিপীলিকা ব্যাপার কি জানিবার জন্য সেতু পার হইয়া নতুন উপনিবেশে প্রবেশ করিল। সে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। ইহাই এই দুই দল পিপীলিকার মধ্যে যুদ্ধের কারণ হইল। কিন্তু একদল অন্যদলকে হঠাৎ করিয়া আক্রমণ করিল না। পুরোনো আবাসের দশটি পাকা যোদ্ধা পিপীলিকা লুকাইয়া-লুকাইয়া শত্রুদের সীমানায় প্রবেশ করিয়া যুদ্ধের জন্য দরকারী সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর বোধ হয় পিপীলিকা-আবাসের ভিতর যুদ্ধ-সভা বসিয়াছিল। খানিক-পরে দেখা গেল যে সারিবদ্ধ হইয়া পুরোনো আবাসের সৈন্যদল শত্রু আক্রমণ করিতে চলিয়াছে। কোনো প্রকার এলোমেলো ভাব নাই, গোলমাল নাই। কতকগুলি পিপীলিকা আশেপাশে ছোটো-ছোটো বালুর স্তূপ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। পুরোনো আবাসের সৈন্যদল যখন নতুন আবাসের সীমানার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তখন নতুন আবাসের একটি পিপীলিকা কোনো কারণে বাহিরে আসিয়াছিল সে ব্যাপার দেখিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, সকলকে সংবাদ দিতে। তাহার পর ভীষণ লড়াই আরম্ভ হইল। পিপীলিকায় লড়াই হইলে কি হয়—সে ভয়ানক ব্যাপার! চারদিন চাররাত্রি ধরিয়া লড়াই চলিয়াছিল। মাঝখানে খানিকক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত ছিল।

বৃহস্পতিবার নতুন আবাসের পল্টনে জয়লাভ করিয়া পুরোনো আবাসের দলকে সেতু পার করিয়া তাড়াইয়া দিল। যাহারা আহত হইয়া পড়িয়া রহিল, তাহাদের সেতুর নীচে কাদাজলে ফেলিয়া দিল, অনেককে অঙ্গ-চ্ছেদ করিয়া মারিয়া ফেলিল। পুরোনো দলের কয়েকজনকে দাস করিয়া লইয়া নতুনদল সগৌরবে তাহাদের আবাসের ভিতর প্রবেশ করিল।

পিপীলিকা আশ্চর্য্য স্থপতি। পিপীলিকাদের এক-একটি বাড়ি বা আবাসস্থল দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। পূর্ব্ব আফ্রিকাতে পিপীলিকা নির্ম্মিত প্রায় ২০ ফুট উচ্চ উচ্চ মাটির স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসকল নির্ম্মাণ করিতে পিপীলিকাদের কোনো প্রকার হাতিয়ার নাই—তাহারা তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যেই এইসকল নির্ম্মাণ করে। জার্ম্মানির মিউনিক্ সহরের বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হায়মান্

বলেন যে পিপীলিকারা নাকি কথাও বলিতে পারে। আমেরিকাতে পেন্‌সিলভ্যানিয়ার পাহাড়ে পিপীলিকা-সহর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহর অধিকাংশই মাটির তলায় নির্ম্মিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহরটি ৩০ একর জমি ব্যাপিয়া আছে। ৩০ একর জমি ব্যাপিয়া পিপীলিকার দল! ব্যাপারটা কল্পনা করিলেই অবাক হইতে হয়।

পিপীলিকাদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব অতীব প্রবল। সার্ জন্ লাবক্ একবার কয়েকটি পিপীলিকা ধরিয়া তাহাদের মিষ্টমদ খাওয়াইয়া তাহাদের দলের মাঝখানে ছাড়িয়া দেন। মাতাল পিপীলিকাগুলি টলিতে লাগিল—এমন অবস্থায় তাহাদের জাতি ভাইরা এই কাণ্ড দেখিয়া লজ্জায় যেন অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পর মাতালদের জোর করিয়া ধরিয়া আবাসে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল। এই ব্যাপারে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করা হয়। মাতালদের মধ্যে কয়েকটি অপরিচিত পিপীলিকাও ছিল। তাহাদের ধরিয়া পিপীলিকারা নিকটবর্ত্তী জলে ডুবাইয়া দিল।

পুস্তক-পরিচয়

ঝড়ের দোলা—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১৸০ আনা। ১৩৩২।

উপন্যাস। বাঙালীর সমাজে বালবিধবা-সমস্যা এক মহাসমস্যা; সেই সমস্যাই বইটিতে আলোচিত হইয়াছে। অমলার চরিত্র সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে—হিন্দুরমণীর স্বামীভক্তির জন্মগত সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষা ও আবহাওয়ায় উদ্বুদ্ধ সনাতনত্বের প্রতি বিদ্রোহ—এই দুইটি ভাবই দ্বন্দ্বের মূর্ত্তি লইয়াছে অমলার চরিত্রে। অমলা ছিল তেজস্বিনী; এই তেজের পাশেই তাহার এক কঠোর সত্যানুরাগ ছিল। এবং এই সত্যানুরাগের জন্যই সে কামাক্ষ রমেশের বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে নাই, অথচ তাহার হৃদয় ছিল স্বামীপ্রেমবঞ্চিত সুতরাং প্রেমবুভুক্ষু। অমলার মানসিক দ্বন্দ্ব বেশ ফুটিয়াছে। তবে অমলা ও রমেশের কথাবার্ত্তায় অনেক কথা এত স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যাহা আরো সংক্ষেপে ও আভাসে বলিলেও পাঠকের বুঝিতে বিলম্ব হইত না। শব্দবাহুল্য এবং বর্ণনাবাহুল্যও বইটিতে স্থানে স্থানে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে"র ছায়াও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তাহা হইলেও বইটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ছাপা ও বাঁধান ভাল; কিন্তু দাম বেশী হইয়াছে।

গীতামৃত—শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকালমোহন সোম, ২১৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। আট আনা। ১৩৩১।

পদ্যে গীতা। পদ্যবন্ধ চলনসই। ধর্ম্মতত্ত্ব কবিতায় বাঁধিতে গেলেই কবিতা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে; ইহাতেও সে দোষ আছে।

প্রফেসর-পত্নী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা। ১৩৩২।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ গল্পলেখক কোনান্ ডয়েলের চারিটি গল্পের অনুবাদ এই পুস্তকে আছে। লেখক ডাক্তার; সুতরাং ডাক্তারী গল্প তাঁহার মনোহরণ করিয়াছে;—তাহারই ফল এই অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। বইখানি অনুবাদ সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিবে।

স্বামি-গীতা—শ্রীপূর্ণানন্দ স্বামী বিবৃত এবং শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত, বি-এ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দশ আনা। ১৩৩২।

স্বামী পূর্ণানন্দের সাধনালব্ধ জ্ঞান উপদেশগুলি উচ্চভাবপূর্ণ, গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের পরিচায়ক। পুস্তকখানি আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থপর্য্যায়ে স্থান লাভ করিবে।

গুপ্ত

থেরী—কবিতাপুস্তক। শ্রী কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রকাশক—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, পোঃ মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

এই পুস্তিকাখানি হাতে লইয়া দেখিলাম গ্রন্থকারের নামটি অপরিচিত। প্রাচীন বৌদ্ধ-গাথাকে বাঙলা ছন্দোবদ্ধ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস ভাবিয়া বইটিকে সরাইয়া রাখিলাম; এই কাব্যাতঙ্কের যুগে, বর্ত্তমানের ছন্দজ্ঞানহীন কবিসম্প্রদায়ের মাসিক সাপ্তাহিক এমন কি দৈনিকের সহায়তায় অসহায় পাঠককে নিষ্ঠুর আক্রমণ। একদিন বিখ্যাত কোনো কবিবন্ধু আসিয়া বইখানি আমার টেবিলে দেখিয়া বলিলেন যে বইখানি তাঁহার চাই-ই; শুনিলাম বহুকাল পূর্ব্বে 'সৌরভে' কৃষ্ণদাস বাবুর কবিতা পড়িয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন এবং সেদিন হইতে কৃষ্ণদাস বাবুর লেখা সন্ধান করিয়াও আর কোথায়ও দেখেন নাই বলিয়া ক্ষুণ্ণ আছেন। এই পুস্তকে প্রকাশিত দুইটি গাথারই একটি 'সৌরভে' প্রকাশিত হইয়া কাব্যামোদীর প্রশংসালাভ করিয়াছিল। আমি কৌতূহলী হইয়া পুস্তিকাখানি পড়িতে বসিলাম; অল্পক্ষণেই শেষ হইয়া গেল। বার বার তিনবার বহিখানি পড়িলাম। দেখিলাম—বর্ত্তমান যুগে এ এক অঘটন সংঘটন; রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" বা "বিদায় অভিশাপে"র পর এমন সুন্দর কিছু পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না। ভাব ও ভাষার মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকিলেও লেখকের ক্ষমতাগুণে তাহা তাঁহার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। উপমা ও বর্ণনা মুক্তাবিন্দুর মত স্বচ্ছ—কোথাও এতটুকু আতিশয্য নাই; একেবারে সোজাসুজি হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই গাথা দুইটির বর্ণনাও স্থানে স্থানে স্মৃতিবদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী বর্ত্তমানকালের এই লাঙল মার্কা; 'রক্ত-আবির' 'ঘুম-কিশোরী' প্রভৃতির খোয়াটে যুগেও এমন নিরেট জিনিষ কি করিয়া সম্ভব হইল সত্যই ভাবিবার বিষয়। আর একটি বিস্ময়ের কথা এই যে এই শক্তি সম্পন্ন লেখক এমন অগোচরেই বা রহিলেন কি করিয়া? এই অপূর্ব্ব কাব্যের স্থানে-স্থানে দুই একটি লাইন উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বসন্তের
শুক্লা ত্রয়োদশী। মত্ত জনপদ-বাসী
বসন্ত উৎসবে, ছুটিত কানন পানে
আবীরে কুস্কুমে, রঞ্জিত বিচিত্র-বাস ;
জনপদবধূ, নব চূত মঞ্জরীরে
দুলায়ে শ্রবণে মিলিত সেথায় আসি,
অশোকের তল উঠিত মুখর হয়ে
নূপুর শিঞ্জনে কিঙ্কিণীর ঝিণি ঝিণি,
কল হাস্যে গীতে, প্রিয়জন কণ্ঠাশ্লেষে
লম্বিত বিশ্রাম নৃত্যশ্রান্ত কোন বালা ;
দুলিত তরুণ, প্রিয়াভুজ আবেষ্টিত
কণ্ঠে হিন্দোলায় ;—

* *

হিমানীর
শেষে যবে জনপদ-বধূ, দিন গণি
যাপিত দিবস, ভাবিত উঠিবে বাজি
মুকুলিত চূত মঞ্জরীরে বেড়ি করে
বসন্তের চরণ মঞ্জীর—ভ্রমরের
গুঞ্জরণে, তবু যদি না ফোটে অশোক
নূপুর লাঞ্ছিত মোর চরণ আঘাত
করিতাম রুক্ষ দেহে তার ; ফুলে ফুলে
সুষমার উঠিত সে হাসি।

* *

দিনান্তে ডুবিল সূর্য্য ;
জলে কালো ছায়া, আকাশের পট হতে
মুছে গেল রক্ত রাগ রেখা ; মুখরিত
শঙ্খ ঘণ্টা মন্দিরে মন্দিরে ; ধীর মৃদু
সন্ধ্যার বাতাস বহি আনে ধূপ গন্ধ :
উঠিলাম নদীকূল ছাড়ি।

* *

অতিবাহি মরু পথ
পথিক যখন চাহে ফিরি, দেখে সেই
তপ্ত তাম্র দগ্ধ বালুরাশি দিবাশেষে
হয়ে গেছে সোনা ; তারি মাঝে দূরে ওই
ক্ষুদ্র শ্যাম শোভা, জলের তরল দীপ্তি,
তালীবন ছায়া। সেইরূপ হৃদে মোর
জাগিতেছে স্নেহহীন শৈশবের কথা
অতীত স্মৃতির রঙে হইয়া রঙীন।
তারি মাঝে দু এক দিনের আদরের
শ্যাম-শোভা, আনন্দের তরল কিরণ।

এই ক্ষমতা সম্পন্ন কবিকে আমরা সাদরে বাঙ্গলার কাব্য-মঞ্চে আহ্বান করিতেছি, তিনি গোপনে থাকিয়া যেন আর আমাদিগকে বঞ্চিত না করেন।

শ্রী সজনীকান্ত দাস

নোঙর-ছেঁড়া নৌকা—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রায় এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক ৯০-২ এ হ্যারিসন রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২।০। পৃঃ ৩৩৮ (১৩৩২)

সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার আর নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। শ্রীযুক্ত তুকাবাত্তেই-লিখিত সোনো-ওবোকাজে (ঘর জামাই) নামক উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত। চারু-বাবুর লিপি চাতুর্য্যে চরিত্রগুলি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইখানির ছাপা, বাধাই প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা মনোরম হইয়াছে। প্র

উপল-খণ্ড—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী। প্রকাশক শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। ছয় আনা। ১৩৩২।

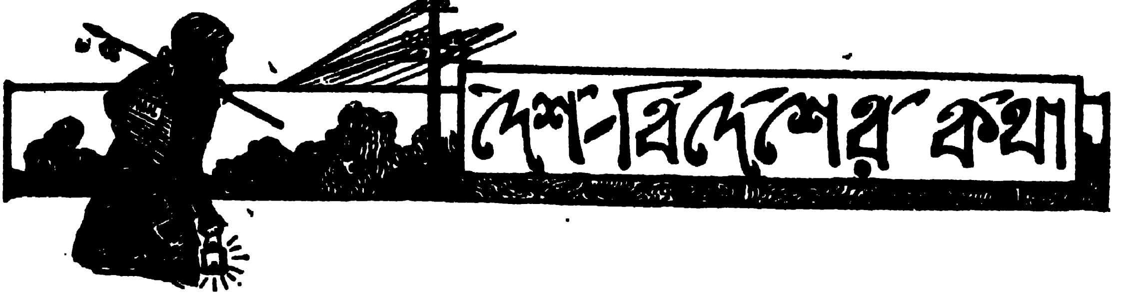
কবি এবং কাব্য, চিত্র, গীতি-কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি চারু কলা সম্বন্ধে লেখকের চিন্তাগুলি অতি সংক্ষেপে ও সংযমের সহিত বিবৃত হইয়াছে। আলোচনা দীর্ঘ নয়, কিন্তু সুন্দর, সুবিন্যস্ত, কবিত্বগর্ভ, কবিদৃষ্টির পরিচায়ক। চিন্তায় নূতনত্ব আছে। উপলখণ্ডের মতোই লেখকের হৃদয় ভাবাবেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। গুপ্ত

অমর

গোলাপের হাসি চুরি ক'রে ক'রে
শিল্পী এঁকেছে ছবি ;
গোলাপের ভাষা গানেতে গাঁথিয়া
কবিতা লিখেছে কবি ;—
শিল্পীর ছবি দেখেছে সবাই,
মুগ্ধ হ'য়েছে সবে—
মুগ্ধ হ'য়েছে কবির গানের
ছন্দ-মুখর রবে।

কিন্তু কোথায় সে গোলাপ হায়,
যার এত হাসি গান,—
বৃন্ত জীবন বৃন্তেই তা'র
হ'য়ে গেছে অবসান!
আনন্দ তার শিল্পী ও কবি
রেখেছে রঙীন ক'রে,
বেদনা তাহার, সন্ধ্যা আঁধারে
ধূলিতে পড়েছে ঝরে!

—বনফুল



বাংলা

বাংলার অবস্থা—

ভারতের এক সময় কত সৌন্দর্য্যে ভরপুর ছিল। এক্ষণে বিদেশের তুলনায় আমাদের দেশের কি দুর্দ্দশা তাহারই একটা তালিকা সহযোগী বরিশাল-হিতৈষী হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

১। শিক্ষিতের হার শতকরা, জাপান ৯১'৮, আমেরিকা ৯৫'৪, ইংলণ্ড ৯৭'৫ ভারত ৫'২, বাঙ্গালা ৯'৭।

২। মৃত্যুরহার হাজারকরা, জাপান ১৫'৩, ইংলণ্ড ১০'৮, আমেরিকা ৮'৮, ভারত ৩০'৫, বাঙ্গালা ৩০'৯।

৩। শিশু-মৃত্যু—হাজারকরা জাপান আমেরিকা ৬৫, ইংলণ্ড ৬৬'২, ভারত ২১৫, বাঙ্গলা ২১৩।

৪। গড়পরতা আয়ু—বৎসর, ইংলণ্ড ৫০, আমেরিকা ৫৬, জাপান ৪৭, ভারত ২২'৯।

৫। জনপ্রতি ধন—ইংলণ্ড ৩৫০০, আমেরিকা ৭৬৮০, জাপান ২৮৬০, ভারত ২৫০, বাংলা ৪২০।

৬। জন প্রতি দৈনিক আয়—ইংলণ্ড ৬৸০, আমেরিকা ১৪।০, জাপান ৪।৶০ ভারত ৴১০, বাঙ্গালা ।৴০।

৭। বাঙ্গালা-দেশের শত করা ৯৪ জন গ্রামেই বাস করে। সহরে মাত্র শতকরা ৪৬ মাত্র বাস করে।

আসামে বন্যা—

ডিব্রুগড়ের লারুয়া জাবরা মৌজা বার বার ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় ভাসিয়া যাওয়াতে ঐ-স্থানের রবি-শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ প্রায় প্রত্যেকবারই এই অঞ্চলের ঐ-প্রকার ক্ষতি হইতেছে। নদীর ধার দিয়া প্রায় ৫০০০ একর জমি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ঐ-স্থানের লোকেরা সমবেতভাবে জেলার ডেপুটী কমিশনারের কাছে খাজানা মাপের জন্য আবেদন করিয়াছে।

বিশ্বভারতী-সংবাদ—

নবনগরের মহারাজা জাম সাহেব, বিশ্বভারতীর কলা-ভবনের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে দ্বিতীয় কিস্তিতে দশ হাজার টাকা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীর মৃত্যু—

ইংলণ্ড-প্রবাসী সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র মহাশয় গত ১৪ই নভেম্বর বোর্ণমাউথে নিজ ভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নানা ভাষাবিদ্ ছিলেন। আরবী এবং পারসী ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ এবং যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ১৯১৩ সালে লণ্ডনে চিকিৎসক-মণ্ডলীর যে বিশ্ব-সম্মিলন হয় তাহাতে মিত্র-মহাশয় হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের প্রতিনিধি-স্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। ডেকান্ পোষ্ট নামক একখানি প্রতিপত্তিশালী সংবাদপত্র তিনি নিজাম রাজ্য হইতে পরিচালনা করিতেন। ১৯০৫ সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংরেজী, বাংলা, পারসী এবং উর্দ্দুতে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। হুগলী কোন্নগর মল্লিক মিত্র-বংশে সিদ্ধমোহনের জন্ম হয়।

মেমারি ইন্‌ষ্টিটিউট ও এ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল সমিতি—

কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট না হইয়া পরস্পর সহযোগীতায় সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে মেমারি ইন্‌ষ্টিটিউট ও এ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রতি ইহার প্রধান লক্ষ্য। সভ্যগণের শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে ব্যায়ামাদি বহির্গৃহ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেহের পূর্ণস্বাস্থ্যের উপরই সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রবৃত্তি নির্ভর করে অতএব শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মিলনজনিত পূর্ণস্বাস্থ্য আনিবার জন্য সভ্যগণের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক কতিপয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষা করিবার জন্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও মহামারী প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাঁহাদেরও শারীরিক স্বাস্থ্য ও পূর্ণস্বাস্থ্য আনয়ন করিবার জন্য সমিতি ব্যায়ামের উৎসাহ দিয়া লাইব্রেরী স্থাপনপূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মবিকাশের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছে।

শ্রমিক বিদ্যালয়—

বেঙ্গল জুট ওয়ার্কস্ এসোসিয়েশনের পরিচালকরা কলের কর্ম্মচারী ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের লেখা-পড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ায় দুটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা ও রাত্রে ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয় দুইটি খোলা হয়। স্থানীয় চটকলের এবং অন্যান্য কলের অনেকগুলি কর্ম্মচারী ও তাহাদের ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। বেতন বাবদ ছাত্রদের নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হয় না। সকলেই এখানে বেতনে পড়িতে পায়।

সমাজে নিগৃহীতার স্থান—

সম্প্রতি রংপুরের নিগৃহীতা রমণী সুহাসিনী দেবীর মৃত্যু হইয়াছে। যে অবস্থা এবং যে মনোভাব লইয়া তিনি বাস করিতেছিলেন তাহাতে মনে হয় না যে তাঁহার মৃত্যু স্বাভাবিক। সুহাসিনীর অত্যাচারের কাহিনী সবাই জানেন। তাঁর শ্বশুর ও স্বামী উদারতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে পুনরায় সংসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কি হয় তাহা সুহাসিনীর নিম্নলিখিত চিঠিখানাতেই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিঠিখানি নারী-রক্ষা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নিকট মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে লিখিত।

"নিবেদন এই যে, পিতা, ভগবান আমাকে স্বামীর সংসারে আনিয়াছেন, উপলক্ষ আপনারাই। আপনারা যে উপকার করিয়াছেন

তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। এখানে আসার পরে শ্বশুরের কাজ গিয়াছে। তাঁহাকে একঘরে করিয়াছে এবং এইরূপ হইয়াছে যে, জীবনে আমার সমাজে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা আমার হাতে আহার করেন নাই, খাইলে কি হইত জানি না। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আমার ন্যায় হতভাগিনী দ্বিতীয়া আছে কি না সন্দেহ। এখন ইঁহাদের এমন অবস্থা যে না খাইয়া মরিবার উপক্রম। সংসারে এক তিল শান্তি নাই। এখন আমার ইচ্ছা যে, কোন আশ্রমে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইয়া দেই। ইহা আমার প্রাণের একান্ত বাসনা। আপনার কি মত জানাইবেন। যদি ভাল বুঝেন, আমার স্বামীর দ্বারা কিংবা আপনি নিজে আমাকে লইয়া যাইবেন। পত্র পাওয়া মাত্র অভিমত জানাইবেন।

অভাগী সুহাসিনী।"

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

সম্প্রতি বাংলা কাউন্সিলে সরকার পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হউক—কারণ তাহাতে না কি বাংলা-সরকারের আর্থিক ক্ষতি হইবে। কিন্তু প্রস্তাবটি ভোটে দিলে উহার পক্ষে ৪৬ ভোট এবং বিপক্ষে ৬৪ ভোট হওয়ায় উহা বাতিল হইয়াছে। শ্রীহট্ট বাঙ্গালী অধ্যুষিত। শ্রীহট্টবাসীগণ বাংলার সহিত পুনরায় মিলিত হইবার জন্য ব্যাগ্র। এখন ভারত-সরকার কি সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক।

স্মৃতি পূজা—

গত মাসে বাংলার নানাস্থানে, ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত, ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ৺রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মহাপুরুষদের স্মৃতি পূজা হইয়াছে।

ভারতীয় কুলী-হত্যার বিচার—

(১) সম্প্রতি আসাম—যোড়হাটে ওখা চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ বিয়েটির মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। মিঃ বিয়েটি টেলুহ নামক এক কুলির মৃত্যু-সংঘটন অপরাধে এবং অন্যান্য অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুলীকে তিনি এরূপ প্রহার করিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে,—ইহাই অভিযোগের মূল মর্ম। জোড়হাটের দায়রা জজ মিঃ জ্যাকের এজলাসে সম্প্রতি মিঃ বিয়েটির বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। জুরীদের মধ্যে অধিকাংশই সাহেব ছিলেন। চারিজন জুরী আসামীকে ৩২৫ধারার অপরাধের নিরপরাধ বলিয়া মত দেন, একজন জুরী এই অপরাধে ইহাকে অপরাধী বলেন এবং অপর দুইটি অভিযোগে সমুদায় জুরী আসামীকে একবাক্যে নিরপরাধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। জজ,—ইঁহাদের মতে মত দিয়া মিঃ বিয়েটিকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন।

(২) মাধবপুর চা-বাগানের উইলসন সাহেব দশরথ নামক একজন কুলীকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। দায়রা আদালতে তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারকালে তিনজন শ্বেতাঙ্গ জুরী দেখিলেন, উইলসন সাহেব উত্তেজনাবশে সামান্য মারধর করিয়াছেন মাত্র; পক্ষান্তরে দেশীয় জুরীদ্বয় দেখিলেন, বেচারা দশরথের মৃত্যুর জন্য উইলসনই দায়ী। দায়রা-বিচারক উইলসনের দুইশত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছেন।

এই বিচারফল আলোচনা করিতে গিয়া সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—

টেলু, দশরথ ও অন্যান্য ভারতীয় 'কুলী'-হত্যার মামলায় জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় কতকগুলি কথা প্রমাণিত হইয়াছে :—

(১) শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের বুটের সঙ্গে ভারতীয় কুলীদের প্লীহার কি একটা বৈদ্যুতিক সম্বন্ধ আছে, যাহার ফলে—সাহেব সামান্য উত্তেজিত হইলেই—সবুট পদাঘাত একেবারে কুলীর প্লীহার উপরে যাইয়া পড়ে এবং তাহা ফাটিয়া যায় ও কুলীর মৃত্যু ঘটে।

(২) কুলীহত্যার অপরাধে সাহেবের বিচারে শ্বেতাঙ্গ-জুরীরা আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া রায় দেন, শ্বেতাঙ্গ বিচারকও শ্বেতাঙ্গ-জুরীদের রায় মানিয়া লন।

এই সমস্যার প্রতিকার কি? কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বলীর সদস্যেরা তো নিজেদের বীরত্বের খুবই বড়াই করেন। তাঁহারা কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বলীতে নিম্নলিখিতভাবে দণ্ডবিধি আইনের সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না কি?—

(১) যদি কোন সাহেব সবুট পদাঘাতে কোন কুলীর প্লীহা ফাটাইয়া দেয় এবং তাহার ফলে কুলীর মৃত্যু হয়, তবে সেটা দণ্ডবিধি আইনানুসারে 'হত্যা বলিয়াই গণ্য হইবে; তামাসা বা রহস্য বলিয়া গণ্য হইবে না;

(২) শ্বেতাঙ্গ-সাহেব কর্ত্তৃক ভারতীয় কুলী-হত্যার মামলায় জুরীর বিচার হইবে না, অথবা জুরী নিযুক্ত হইলেও তাহাদের মধ্যে কোন শ্বেতাঙ্গ-সাহেব থাকিবে না।

রাজবন্দী দিবস—

অর্ডিনেন্স্ আইনের তীব্র প্রতিবাদ করে ও রাজবন্দীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ গত ৮ই নভেম্বর বাংলার নানাস্থানে সভা আহূত হইয়াছিল।

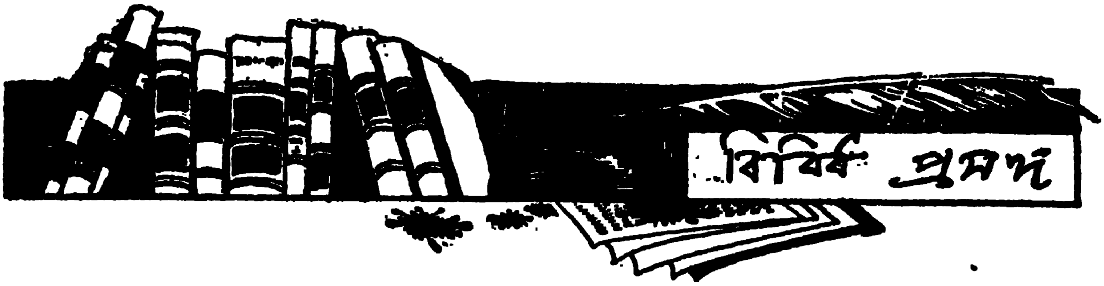
হাঁস্‌পাতালের সাহায্য দিবস—

গত ১২ই ডিসেম্বর, শনিবার, কলিকাতায় হাঁস্‌পাতালসমূহের জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য ভিক্ষার বিশেষ দিন স্থির হইয়াছিল। কলিকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিদিনই হাঁস্‌পাতালের কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রসারতা লাভ করিতেছে এবং হাঁস্‌পাতালের আয় অপেক্ষা ব্যয়ের হার বাড়িয়া চলিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষের অর্থসাহায্যে চিকিৎসার ব্যয়ই কোনও রকমে নির্ব্বাহ হইতে পারে মাত্র, অতিরিক্ত পীড়িতের প্রয়োজনীয় অতি সাধারণ সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের ব্যয়ও সঙ্কুলান হয় না। বলকারক পথ্য, দামী ঔষধ, রোগীর প্রফুল্লতা বিধানের জন্য দুইচারিখানি ভাল বই অথবা কোনওরূপ ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিতে পারিলে পীড়িতের রোগযন্ত্রণার কতই না উপশম হয়। এইজন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন।

সকলের দ্বারে ঐ দিন ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজের ছাত্রবৃন্দ ভিক্ষার্থ গিয়াছিল। নিতান্ত অভাগা ও দীন-দরিদ্রেরাই প্রধানতঃ হাঁস্‌পাতালে চিকিৎসিত হয়। এই আর্ত্ত, নিরাশ্রয়, দরিদ্র দেশবাসীর দারুণ রোগযন্ত্রণার যদি সামান্য উপশমের ব্যবস্থাও হয়, এই আশা লইয়া জনসাধারণের নিকট ছাত্রবৃন্দ সাহায্য ভিক্ষার্থী হয়। সুখের বিষয় যে ছাত্রগণ সাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হয় নাই।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

ভ্রম-সংশোধন—এই সংখ্যার মুখপাত "পথপ্রদর্শক জ্যোতি" নামক চিত্রের শিল্পী শ্রী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভ্রমক্রমে তাঁহার নাম ছাপা হয় নাই।



বিলাতে আয়ুর প্রত্যাশা বৃদ্ধি

বিলাতের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রীর প্রধান চিকিৎসা-কর্মচারী স্যর্ জর্জ্ নিউম্যান্ অল্পদিন হইল বলিয়াছেন, যে, বর্ত্তমান সময়ে বিলাতের শিশুরা গড়ে তাহাদের পিতামহদের চেয়ে বার বৎসর বেশী বাঁচিবার আশা করিতে পারে। তাঁহার মতে ইহার প্রধান কারণ এই, যে,পঞ্চাশ বৎসর আগেকার তুলনায় ইংরেজরা মুক্ত বাতাসে অধিকতর সময় যাপন্ করে; খোলা জায়গায় নানাপ্রকার খেলা বেশী করে; তাহাদের আহার্য্য ও পরিধেয় আগেকার চেয়ে ভাল, পরিমাণে বেশী ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, তাহাদের মধ্যে পানদোষ আগেকার চেয়ে কমিয়াছে, এবং তাহারা তাহাদের অবসর-সময় আগেকার চেয়ে সুবিবেচনার সহিত এরূপভাবে যাপন করে যাহাতে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে।

ভারতবর্ষে আয়ুষ্কালের প্রত্যাশা বাড়িতেছে না কমিতেছে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানই হয় না। সেন্সস্ রিপোর্ট্ হইতে জানা যায়, যে, আয়ুর প্রত্যাশা বাড়িতেছে না। এদেশে মানুষ গড়ে তেইশ-চব্বিশ বৎসর বাঁচে, জাপানে ও ইংলণ্ডে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ। আমাদের আয়ু-হ্রাসের কারণ গুহামধ্যে নিহিত নহে। কিন্তু কারণ জানা থাকিলেও সমুচিত প্রতিকার-চেষ্টা কই হইতেছে?

ধনী আমেরিকান্দের দানশীলতা

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমেরিকার দুজন ধনী একদিনে জন-হিতসাধনের জন্য মোট ৫,২৫,০০,০০০ ডলার অর্থাৎ মোটামুটি ষোল কোটি টাকা দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ঐ দেশের লিটার্যারী ডাইজেস্ট্-নামক সাপ্তাহিক পত্র আমেরিকার ধনী লোকদের (অধিকাংশ স্থলে গত দশ বৎসরে) দানের নিম্নমুদ্রিত তালিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন।

দাতা	ডলার-দানের পরিমাণ।
জন্ ডি রকফেলার্	৫৭৫০০০০০০
অ্যাণ্ড্রু কার্ণেগী	৩৫০০০০০০০
স্ট্যাণ্ডার্ড্ ফাউণ্ডেশন্ (বিবিধ)	১৫০০০০০০০
হেনরী সি ফ্রিক	৮৫০০০০০০
মিল্টন্ এস্ হার্শী	৬০০০০০০০
জর্জ্ ঈস্ট্ম্যান্	৫৮০০০০০০
জেমস্ বি ডিউক্	৪১৫০০০০০
মিসেস্ রাসেল্ সেজ	৪০০০০০০০
হেন্রী ফিপ্স্	৩১৫০০০০০
বেঞ্জামিন্ অল্ট্ম্যান্	৩০০০০০০০
জন্ স্টুআর্ট্ কেনেডি	৩ ০০০০০০
জন্ উইলিয়ম স্টার্লিং	২০০০০০০০
এডোয়ার্ড্ সি হার্কনেস্	২০০০০০০০
জে আর্ ডি লামার্	১৬৫০০০০০
মিসেস্ স্টিফেন্ ভি হার্কনেস্	১৬০০০০০০
অগাস্টাস্ ডি জুইলিয়ার্ড্	১৫০০০০০০
হেনরী ঈ হান্টিংটন্	১৫০০·০০০
জর্জ্ এফ্ বেকার্	১২০০০০০০
জে, পি, মর্গ্যান্	১০০০০০০০
মিসেস্ মিলব্যাঙ্ক্ এণ্ডার্সন্	১০০০০০০০
ডব্লিউ জে এবং সি এইচ মেয়ো	৮০০০০০০
পি এস্ এবং টি কোল্‌ম্যান্ ডু পণ্ট্	৮০০০০০০
জে অগডেন্ আর্মার্	৬০০০০০০
জর্জ্ আর্ হোয়াইট্	৫০০০০০০
ডব্লিউ এ ওয়াকবোল্ট্	৪৫০০০০০
অগাস্ট্ হেক্শার	৪০০০০০০
জন্ জেকব ম্যাস্টর্	৪০০০০৮০
লটা ক্র্যাবট্রী	৪০০০০০০
মোট দান	১৬৩৯০০০০০০ ডলার

এক ডলার তিন টাকা অপেক্ষা কিছু বেশী।

আমেরিকায় ধনীদের সংখ্যা ও ধনের পরিমাণ খুব বেশী সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষে দারিদ্র্য খুব বেশী হইলেও ধনী যে একেবারে নাই তাহা নয়। যেখানে আমেরিকার ধনীরা লোকহিতার্থ কোটি, নিযুত বা লক্ষ টাকা দেন,

সেস্থলে ভারতীয় ধনীরা লক্ষ, অযুত বা হাজার টাকা জনহিত-সাধনের জন্ত দিলে দেশের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

—

যুদ্ধে কাহাদের লাভ হয়

দেশে-দেশে যুদ্ধ হইলে মরে বেশীর ভাগ সাধারণ সৈন্তেরা; সম্রাট্, রাজা ও নানাশ্রেণীর সেনা-নায়কেরা শতকরা তত মরে না। আবার যুদ্ধান্তে যোদ্ধাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে বড়-বড় সেনাপতি প্রভৃতিই খুব বেশী টাকা বথ্‌শিশ পায়, সাধারণ সৈনিকেরা সামান্ত পেন্‌শন্ পায়। জর্জ্ ল্যান্‌সবেরি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি তালিকায় দেখিতেছি, গত মহা যুদ্ধে সম্পূর্ণ অকর্মীভূত সৈন্তদিগকে পেন্‌শ্যান্ দেওয়া হইয়াছে সপ্তাহে ৪০ শিলিং, সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্তদিগকে ৪০ শিলিং, উন্মাদগ্রস্তদিগকে ৪০ শিলিং, অন্ধীভূতদিগকে ৪০ শিলিং, দক্ষিণহস্তহীনদিগকে ৩৬ শিলিং, পদহীনদিগকে ৩২ শিলিং, মূকীভূতদিগকে ২৮ শিলিং, ইত্যাদি। কিন্তু অ্যাড্‌মিরাল্ অর্থাৎ নৌসেনাপতি বেটী পাইয়াছেন একলক্ষ পাউণ্ড, অ্যাড্‌মিরাল জেলিকো পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড, ফীল্ড মার্শ্যাল্ হেগ্ একলক্ষ পাউণ্ড, ফীল্ডমার্শ্যাল ফ্রেঞ্চ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড, ইত্যাদি। এক শিলিং মোটামুটি বার আনার এবং এক পাউণ্ড পনর টাকার সমান। মিঃ ল্যান্‌স্‌বেরী বলেন, এই বৃহৎ বথ্‌শিশগুলি ব্যাঙ্কে জমা দিয়া বা অন্যরূপে খাটাইয়া পুরস্কৃত ব্যক্তিগণ স্বয়ং ও পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সাপ্তাহিক পঞ্চাশ হইতে একশত পাউণ্ড্ পেন্‌শ্যান্ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। অন্যদিকে গরীব অকর্মীভূত সৈনিকদের সামান্য পেন্‌শ্যান্ কেবল তাহারা আজীবন পাইবে।

—

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের ১৯২৩ সালের রিপোর্ট্ অল্পদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৫ সাল শেষ হইতে যাইতেছে। সুতরাং ১৯২৩ এর রিপোর্ট্ সত্বর প্রকাশিত হইয়াছে বলা যায় না।

১৯২৩এ বঙ্গে ১১,৮৫,৭৯১ জনের মৃত্যু এবং ১৩,৭৩, ৪১১ জনের জন্ম হইয়াছিল। জন্মের হার হাজারকরা ২৯·৭ ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে জন্মের হার ইহা অপেক্ষা কম ছিল; ভারতবর্ষের অন্ত সকল প্রদেশে জন্মের হার বাংলা অপেক্ষা বেশী ছিল। বঙ্গে মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ২৫·৫। ছয়টি প্রদেশের মৃত্যুর হার বাংলা অপেক্ষা কম ছিল।

১৯২৩ সালে এক বৎসরের কমবয়স্ক ২৫৩৬৯৪টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। ১৯২২ এ ঐ বয়সের শিশু মরিয়াছিল ২৩৯৪৫১টি। সুতরাং ১৯২৩এ শিশু-মৃত্যু শতকরা ৫·৯ বাড়িয়াছিল।

জরে বাংলাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মানুষ মরে। ১৯২৩ সালে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের মৃত্যু হয় জরে। ম্যালেরিয়া-জরে মৃত্যু ১৯২২এ ৫৪০৪৬৩ হইতে কমিয়া ১৯২৩এ ৫৩৯৮৯৯ হয়; কিন্তু টাইফয়েড্, হাম, কালাজর প্রভৃতিতে মৃত্যু বেশী হয়। কালাজরে মৃত্যু ভীষণ-রকম বাড়িতেছে। উহার সংখ্যা ১৯২১, ১৯২২ ও ১৯২৩ এ যথাক্রমে ১৫৫২, ১৫৩১ ও ৪৫৬৫ ছিল। সম্ভবতঃ আরো বেশী লোক কালাজরে মরে, কিন্তু ঠিক রোগ নির্ণয় হয় না।

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে জরে মৃত্যু অনেক কমিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া-জর বাড়িয়াছে। স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর বলেন, ইহার কারণ কচুরী-পানার বৃদ্ধি, গ্রাম্য উচু পথের সংখ্যা বৃদ্ধি, এবং কোন-কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ মৈমনসিংহে, রেলওয়ের বিস্তৃতি। কচুরী-পানার বৃদ্ধি হইতে বুঝা যায় বিল ও খালসকলের মধ্য দিয়া ভূভাগের উপর জল চলাচল অনেক কমিয়াছে, এবং জলের গতি কমায় পানা বাড়িয়াছে। গ্রাম্য পথগুলি চারি পাশের জমি অপেক্ষা উচ্চ আ'লের আকার ধারণ করে। তাহাতে অবাধে জল চলাচল হয় না, নানাস্থানে জল দাঁড়াইয়া থাকে, ও তাহাতে কচুরী-পানা জন্মে ও বাড়িতে থাকে। রেলওয়ের বিস্তারেও ঐপ্রকারে জল চলাচল বন্ধ হয়। স্বাস্থ্য-ডিরেক্টরের মতে কোনও ভূখণ্ড জলে প্লাবিত হইবার পর জল তথা হইতে সরিয়া গেলে সেখানে

ম্যালেরিয়া হয় না, বা কমিয়া যায়। লোকে নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন সহজে শিক্ষা লাভ করে না। পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা এখন বুঝিতে পারিতেছে না, যে, চারিপাশের জমী অপেক্ষা উচু গ্রাম্য পথের সংখ্যা বাড়াইয়া তাহারা জলের স্বাভাবিক গতি রোধ করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়া বাড়াইতেছে। তাহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া শিক্ষা পাইলে বুঝিতে পারিবে, যে, ইহা নির্বুদ্ধিতার কাজ হইতেছে।

—

প্রতিযোগিতায় ইংরেজ-বাঙালী

একদেশের মানুষ যদি অন্যদেশের মালিক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মালিক-জাতির লোকদের এমন কোন গুণ বা শক্তি ছিল, যাহা অধীন জাতির লোকদের ছিল না, বা কম ছিল। গুণ বলিলে যে সদ্‌গুণই বুঝিতে হইবে, তাহা নয়। শক্তির উল্লেখ করায়, মালিক জাতির লোকেরা শক্তির প্রয়োগ সকল স্থলেই ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গতভাবেই করিয়াছিল, এইরূপও মনে করিতে হইবে না।

ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত লউন। অধিকাংশ ইংরেজ মনে করেন এবং অনেকে বলেন, তাঁহারা তরবারির দ্বারা অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ দখল করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। এইজন্য ভারতীয়েরা জবাবে বলিয়া থাকেন, যে, ষড়যন্ত্র, উৎকোচ-প্রদান, জাল, প্রতারণা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারাও ইংরেজরা ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই কথার প্রমাণ ইংরেজদের লেখা ভারতেতিহাসেও পাওয়া যায়। অবশ্য ইংরেজরা একথা অস্বীকার করিবার বা চাপা দিবার খুব চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যদি সকল ইংরেজ একবাক্যে ইহা স্বীকারও করিতেন, তাহা হইলেও তাহাতে আমাদের গৌরববোধ করিবার কোন কারণ থাকিত কি?

ভারতীয় লোকদের মধ্যে অনেককে যদি ঘুষ দিয়া ইংরেজ হাত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মধ্যে অধম লোকদের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের যে-সব রাজাদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হইয়াছিল, ঘুষ দিতে তাঁহাদেরও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহারা ত ঘুষ দিয়া ইংরেজকে স্বদেশের স্বার্থের বিরোধী কাজ করাইতে পারেন নাই? এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও দেখা যাইবে, ভারতবর্ষে প্রভুত্বস্থাপনে যে-সব ইংরেজ কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহাদের নৈতিক ও চারিত্রিক নানা দোষ থাকিলেও, তাহারা মোটের উপর স্বজাতি ও স্বদেশের স্বার্থ-সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতক হয় নাই; কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে তাহা হইয়াছিল। তা ছাড়া, চাতুরী, দল বাঁধিবার ক্ষমতা, চক্রান্ত করিবার ক্ষমতা, কূট নীতির অনুসরণ করিবার ক্ষমতা, প্রভৃতি ইংরেজদের যতটা ছিল, দেশী রাজাদের ততটা ছিল না। এইরূপ নানা কারণে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হস্তগত হইয়াছে। কেবল যুদ্ধ করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করিয়াছে বলিলে মনে হয়, ভারতীয়দের মৃত্যুভয় বেশী ও সাহস কম ছিল, এবং শারীরিক বলও কম ছিল! কিন্তু তাহা সত্য নহে: ভারতের নানাজাতির সিপাহীরা সাহসে ও শারীরিক বলে আগেও ইংরেজদের সমকক্ষ ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ইংরেজ ইংরেজকে যতটা বিশ্বাস করে ও ভালবাসে, ভারতীয় ভারতীয়কে ততটা বিশ্বাস করে না ও ভালবাসে না। এবম্বিধ নানাকারণে আমাদের পরাধীনতা ঘটিয়াছে।

অন্য অনেক বিষয়েও দেখা যাইতেছে, যে, যেসব কার্য্যক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ অবাধ না হইলেও, কতকটা অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ আছে, সেখানে বাঙালী ইংরেজের চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমরা এখানে প্রধানতঃ বাংলাদেশের কথাই বলিতে চাই।

বিচার-কার্য্য ও ব্যবহারাজীবের কার্য্যে দেখা যাইতেছে, হাইকোর্টের বাঙালী জজেরা, এবং উকীল ব্যারিস্টারেরা ঐ-ঐ কার্য্যে নিরত ইংরেজদের চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন। এত বাঙালী জজ বিচার-কার্য্যে যশস্বী হইয়াছেন, যে, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। সাধারণতঃ ব্যারিস্টারদের মধ্যে অগ্রণী বা অন্ততঃপক্ষে অন্যতম অগ্রণীকেই গবর্ন্মেণ্ট য্যাডভোকেট জেনার্য্যাল নিযুক্ত

করিয়া থাকেন। বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে প্রথমে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ য্যাডভোকেট জেনারাল নিযুক্ত হন। এইকার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত। শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাস যখন ঐ কাজ ছাড়িয়া ভারত গবর্মেণ্টের ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত হন, তখন অন্যান্য-রকমের আপত্তি কেহ-কেহ করিয়া থাকিলেও, তাঁহার আইনের জ্ঞান এবং ব্যারিস্টারীতে দক্ষতা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গের য্যাডভোকেট জেনারাল নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারও আইনজ্ঞান এবং ব্যারিস্টারীতে বিচক্ষণতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করে না। অধিকন্তু, ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ বলিবার এই আছে, যে, ইনি প্রথমে উকীল ছিলেন, পরে বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। বরাবর যদি উকীলই থাকিয়া যাইতেন, তাহা হইলে য্যাডভোকেট জেনারাল হইতে পারিতেন না;—যেমন স্যার রাসবিহারী ঘোষের মত এত বড় আইনজ্ঞ লোকেরও য্যাডভোকেট জেনারাল হইবার সম্ভাবনা ঘটে নাই। এইজন্যই গোড়ায়, সম্পূর্ণ অবাধ প্রতিযোগিতার কথা না বলিয়া কতটা অবাধ প্রতিযোগিতার কথা বলিয়াছি। বাঙালী হইয়া বাঙালীর বড়াই করিবার প্রবৃত্তি হইতে আমরা কোন কথা বলিতেছি না। যাঁহাদের কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের যোগ্যতা এবং ইংরেজের সমকক্ষতা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের নিয়োগ সম্বন্ধে এলাহাবাদের লীডারের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। লীডার বাঙালীদের কাগজ নহে, এবং ইহার প্রধান ও অন্যান্য সম্পাদক বাঙালী নহেন। ইহাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে :—

The appointment of Mr. B.L. Mitter as Advocate-General of Bengal in succession to the Hon. Mr. S. R. Das is thoroughly satisfactory, as Mr. Mitter is one of the ablest leaders of the bar in Calcutta and a man respected for his uprightness.

"শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাসের পর বঙ্গের য্যাডভোকেট জেনারালের পদে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের নিয়োগ সম্পূর্ণ সন্তোষজনক; কারণ মিত্র-মহাশয় কলিকাতার যোগ্যতম ব্যারিস্টারদের মধ্যে একজন, এবং তিনি তাঁহার সততার জন্য সম্মানিত।"

এখন কথা উঠিতে পারে, যে, বসিয়া-বসিয়া বিচার করা বা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া আইনের কূটতর্ক করা তেমন কঠিন কাজ নয়। কঠিন কাজ শান্তিরক্ষা করা, রাজনৈতিক অপরাধী এবং চোর-বদমায়েস্ ধরিয়া শাস্তি দেওয়া, প্রজাদের হিতকর কাজ করা, ইত্যাদি। আমাদের ধারণা, অনুসন্ধান করিলে এবিষয়েও বাঙালী কর্ম্মচারীরা ইংরেজদের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবেন না।

বঙ্গ-বিভাগের সময় হইতে এপর্য্যন্ত যত রাজনৈতিক বা তথাকথিত রাজনৈতিক এবং বিপ্লবঘটিত অপরাধে অনেক লোক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছে বা খালাস পাইয়াছে, তাহার সকল স্থলে বা প্রায় সকল স্থলেই ষড়যন্ত্র বা তথাকথিত ষড়যন্ত্রের আবিষ্কার বাঙালী পুলিস কর্ম্মচারীদের দ্বারা হইয়াছে। দেশে অরাজনৈতিক চোর, ডাকাত ও অন্য অপরাধী যত ধরা পড়ে, তাহার প্রায় সবই বাঙালী পুলিস্ কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় ধরা পড়ে। ম্যাজিস্ট্রেট্‌দের কাজের যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, ইংরেজ ম্যাজিস্‌ট্রেট্‌দের অধীনস্থ জেলাসকলে যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা চুরি-ডাকাতী ও অন্যান্য অপরাধ হয়, বাঙালী ম্যাজিস্‌ট্রেটদের অধীনস্থ জেলা-সকলে তাহা অপেক্ষা বেশী হয় না; বরং কমই হয়। ইহাও বলা চলিবে না, যে,বাঙালী ম্যাজিস্‌ট্রেট্‌দিগকে কেবল সেইসব জেলারই ভার দেওয়া হয়, যেগুলির অধিবাসীরা অতিশয় সাধু ও শান্ত-প্রকৃতির লোক।

দেশহিতকর কাজ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটরা বেশী করেন, না বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেটরা বেশী করেন,তাহার বিচার করাও কঠিন নহে। আমাদের ধারণা এবিষয়েও বাঙালীরা নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবেন না। কোন্ ম্যাজিস্ট্রেটের আমলে কোন্ জেলায় কলেজ, স্কুল প্রভৃতি শিক্ষালয় কত স্থাপিত হইয়াছিল, হাঁসপাতাল কত বাড়িয়াছিল, কৃষির উন্নতির নিমিত্ত জল-সেচনের জন্য পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, নদীতে বাঁধ দেওয়া প্রভৃতি কাহার আমলে কত হইয়াছিল,সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে দেশের পণ্য-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা কাহার আমলে বেশী হইয়াছিল,স্বাস্থ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা কাহার দ্বারা বেশী হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিলেই লোক-হিতসাধন বিষয়ে ইংরেজ ও বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেটদের আপেক্ষিক কৃতিত্ব নির্দ্ধারিত হইতে

পারিবে। কেহ যদি দেশব্যাপী বিস্তারিত অনুসন্ধান করিতে না চান বা না পারেন, তাহা হইলে তিনি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করিতে পারেন। কেবল এই দুই জেলার উল্লেখে অন্যান্য জেলায় বাঙালী কর্ম্মচারীদের কৃতিত্ব অস্বীকৃত হইতেছে না। বাঁকুড়ায় শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং স্বর্গীয় কৃষ্ণগোপাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ যাহা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাজের তুলনা করিলে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইবে না। বীরভূমেও গুরুসদয় দত্ত ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাজ ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট্দের কাজের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচিত হইবে না। এইসব কাজ খুব বেশী না হইলেও, ইংরেজ কর্ম্মচারীদের কাজের চেয়ে কম নয়।

সরকারী বা আধা-সরকারী, আধা বে-সরকারী কাজ দেশে যত রকম হয়, একে-একে সবগুলিতে ইংরেজ ও বাঙালীর কৃতিত্বের তুলনায় আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল আর একটি কার্য্যক্ষেত্রের বিষয় বলিয়া আমরা আমাদের বর্ত্তমান মন্তব্য শেষ করিব।

শিক্ষা ও মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, আগে আমাদের ধারণা এই ছিল, যে, কোনও বিদ্যার উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ইউরোপীয়েরা ভিন্ন কেহ দিতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন মেট্রপলিটান্ ইন্‌ষ্টিটিউশ্যনে এফ-এ ক্লাস্ খুলেন, তখন তাহা সাহসের কাজ বিবেচিত হইয়াছিল। এখন কিন্তু প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, যে, শক্ত শক্ত বিষয়ের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাও বাঙালী অধ্যাপকেরা দিতে পারেন। এমন-কি, এম-এ পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ইংরেজী সাহিত্যের কঠিন কঠিন বহির অধ্যাপনাতেও বাঙালী অধ্যাপকেরা যে ইংরেজ অধ্যাপকদের সমান এবং কোন-কোন স্থলে তাঁহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই, যে, ইংরেজী ইংরেজদের মাতৃভাষা, আমাদের নহে।

গবেষণাতে এবং জগতের জ্ঞানবৃদ্ধিতে বাংলাদেশে আগেকার ও বর্ত্তমান সময়ের নামজাদা ইংরেজ অধ্যাপকেরা যাহা করিয়াছেন, তাহা বাঙালী অধ্যাপকদের কৃতিত্বের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বাঙালীদের মধ্যে বিজ্ঞানে যাঁহারা গবেষণাদ্বারা খুব বিখ্যাত হইয়াছেন, শুধু তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; তাঁহাদের ছাত্রেরাও যাহা করিয়াছেন, বাংলাদেশে ইংরেজ অধ্যাপকেরা অধিকাংশ স্থলে তাহা করিতে পারেন নাই। বাঙালীদের দ্বারা গবেষণা যে শুধু বিজ্ঞানে হইয়াছে, তাহা নহে; সাহিত্যে, দর্শনে, অর্থনীতি-শাস্ত্রে, প্রত্নতত্ত্বে, ভাষাবিজ্ঞানে, ইতিহাসে—নানা বিদ্যায় হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে বঙ্গে ইংরেজ অধ্যাপকদের কৃতিত্ব বাঙালীদের কৃতিত্বকে ম্লান করিতে পারে নাই। বাঙালীদের কৃতিত্বের পরিমাণ অবশ্য অন্য সভ্য দেশের লোকদের কৃতিত্বের তুলনায় খুব সামান্য; কিন্তু তাহা বাংলা দেশের ইংরেজ অধ্যাপকদের কৃতিত্ব অপেক্ষা কম নহে।

অবশ্য, আমরা যে-যে রকম কাজের উল্লেখ করিলাম, তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই এই যুক্তি প্রযুক্ত হইবে, যে, বাংলাদেশে ইংরেজ কর্ম্মীরা কি করিতেছে ও বাঙালী কর্ম্মীরা কি করিতেছে, তাহার দ্বারা উভয় জাতির বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতার বিচার হইতে পারে না। কারণ, শ্রেষ্ঠ ইংরেজরা ত এদেশে আসেন না। সুতরাং তুলনায় বিচার করিতে হইলে ইংলণ্ডের ইংরেজদের সহিত ভারতবর্ষের বাঙালীদের তুলনা করা উচিত। এই যুক্তি-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

বড়-বড় ইংরেজ অনেকবার বলিয়াছেন, ইংলণ্ড ভারতের সেবার জন্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানদিগকে পাঠাইয়া থাকেন। এই কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া যদি আমরা ইংরেজ ও বাঙালীর কৃতিত্ব-সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতাম, তাহা হইলেও অন্যায় হইত না। কিন্তু আমরা জানি, ইহা সত্য নহে; মোটের উপর ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা এদেশে আসেন না। তাহা হইলেও, আমাদের তুলনাটা অন্যায় নহে। কারণ, আমরা ত ইহা বলিতেছি না, যে, বাঙালী জাতির কৃতিত্ব সব বিষয়ে ইংরেজ জাতির কৃতিত্বের সমান, অতএব বাঙালীদিগকে ইংলণ্ডের নানা চাকরীতে ও কার্য্যক্ষেত্রে নিযুক্ত কর। আমরা বলিতেছি, বাংলাদেশে যে-যে কার্য্যক্ষেত্রে ইংরেজ ও

বাঙালী একই রকমের কাজ করিয়াছে, তথায় দেখা গিয়াছে, যে, বাঙালীর কৃতিত্ব ইংরেজের কৃতিত্ব অপেক্ষা কম নয়; অতএব এই সকল কাজের জন্য একজনও ইংরেজ আমদানি না করিয়া বাঙালীদিগকেই সম্পূর্ণ সুযোগ দাও। ইংরেজদের এ পাল্টা জবাব দিবার জো নাই, যে, যে-রকম ইংরেজ এদেশে আসে, তার চেয়ে আরও ভাল ইংরেজ আমদানি করিলে বাঙালীদের চেয়ে তাহাদের কৃতিত্ব বেশী হইবে। কেন না, ইংরেজরা আগে হইতেই বার-বার বলিয়াছেন, যে, শ্রেষ্ঠ ইংরেজরা এদেশে কাজ করিতে আসিয়া থাকেন; সুতরাং এখন বিপরীত কথা বলিলে চলিবে না। তা' ছাড়া, যে-দরের ইংরেজ এদেশে আসেন, তাঁদের বেতনাদি যোগাইতেই ভারতবর্ষকে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইয়াছে; ইঁহাদের চেয়েও যাঁদের দাঁই বেশী, তাঁহারা আসিলে একেবারে ভারতের নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।

—

অধ্যাপনায় বাঙালী

বাংলাদেশে প্রতিযোগিতায় ইংরেজ ও বাঙালীর কৃতিত্ব-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, সে বিষয়ে একটা আপত্তি এই উঠিতে পারে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি উচ্চতম অধ্যাপকতার কাজে বাঙালী নিযুক্ত না হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য কোন-কোন প্রদেশের লোক বাঙালীর দ্বারাই নিযুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং বাঙালীদের সম্বন্ধে আমরা যে দাবী করিতেছি, তাহা ঠিক নয়। এ-বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, আমরা সাধারণতঃ, আবশ্যক হইলে, অবাঙালী আমদানি করিবার বিন্দুমাত্রও বিরোধী নহি—তা, সেই অবাঙালী ইউরোপীয়, আমেরিকান্, জাপানী, বা ভারতের অন্য-প্রদেশীয়ই হউন, তাহাতে আপত্তি নাই; আমরা কেবল অনাবশ্যক আমদানিরই বিরোধী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অবাঙালী অধ্যাপক সম্বন্ধে আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, যে, ইঁহাদের সমকক্ষ লোক বঙ্গেই ছিলেন এবং এখনও আছেন; কিন্তু আশু-বাবুর গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন-কোন অবাঙালী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যেমন অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর। ইঁহার কোন সমালোচনা আমরা করিলেই ইঁহার মুরুব্বি ও দলের লোকেরা বরাবর কতকগুলি বাঙালীর নিন্দা-কুৎসা দ্বারা সমালোচনাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন;—যদিও অন্য লোকদের অপদার্থতা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার দ্বারা অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের সুযোগ্যতা, প্রমাণীভূতা ইত্যাদি কেমন করিয়া প্রমাণিত হয়, বুঝা কঠিন। যাহা হউক, আমরা এখন নিজে তাঁহার কোন সমালোচনা করিতে চাই না, রয়্যাল্ এশিয়াটিক্ সোসাইটীর জার্ন্যালের অক্টোবর সংখ্যায় উপ্সালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যার্ল্ শার্পাঁন্টিয়ে ভাণ্ডারকর মহাশয়ের নবতম পুস্তক "অশোক" সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

So much has been written upon Asoka already and so many times have the materials at our disposal—which are, after all, fairly scanty—been investigated by various scholars without very tangible results, that one gets an uneasy feeling that, unless some startling finds shed new light upon the career of the Buddhist emperor or some genius comes upon a wholly new interpretation of the extant inscriptions, not much is to be won by writing large books on him, merely relying upon the already well-known store of information.

Such rather pessimistic reflections have, however, not obtained a grip on the mind of Professor D. R. Bhandarkar, who has, with admirable energy, retold the old tale in a volume of some 350 pages. This is distinctly too much and tells somewhat upon the patience of the reader, who has the constant feeling that this could just as well have been told in a hundred pages or even less ; but he is at the same time undoubtedly obliged to admire the enthusiasm and zeal of the author.

Professor Bhandarkar's name holds a high rank within the scholarly world of India, and the present writer therefore feels it somewhat painful to admit that his latest book is a heavy disillusion. Not only is the book far too extensive in relation to the rather scanty materials, but the information conveyed in it is not always trustworthy. The author has, on the whole, very little new to add to the results of his predecessors, and where he tries to supply us with some hitherto undiscovered facts, we generally feel inclined to disagree with him.

But these remarks are only concerned with details, and might, after all, detract only a little from our general appreciation of the work. What, however, is distinctly worse is the lack of the sense of historical proportion and the revelling in historical parallels which, at the end, will prove to be no parallels at all.

সমালোচকের এই মন্তব্যগুলির মধ্যে যে কিঞ্চিৎ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গরস আছে, তাহা বাংলা অনুবাদে আমরা রাখিতে পারিব না বলিয়া অনুবাদের চেষ্টা করিব না। কিন্তু তাৎপর্য্য দেওয়া দরকার বলিয়া নীচে তাহা দিতেছি।

ইতিমধ্যেই অশোক সম্বন্ধে এত লেখা হইয়াছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আহৃত সামান্য উপাদানগুলি অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এত বার চর্চ্চা করিয়া বিশেষ কোন ফললাভ করেন নাই, যে, ঐ বৌদ্ধ সম্রাটের জীবনচরিতের উপর কোন নূতন আলোকপাত না হইলে বা কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি তাঁহার বর্ত্তমান অনুশাসনগুলির কোন নূতন ব্যাখ্যা করিতে না পারিলে, মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয়, যে, কেবল তাঁহার সম্বন্ধে সুবিদিত তথ্যভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিয়া বড় বড় বই লিখিয়া বিশেষ কোন লাভ নাই।

এরূপ কোন চিন্তা কিন্তু অধ্যাপক ডি. আর্ ভাণ্ডারকরের মনকে অধিকার করে নাই;—তিনি ভারিক্-বোধ্য কর্ণেল'স্কর সাহায্যে মোটামুটি ৩৫০ পৃষ্ঠায় একখানা বহিতে অশোকের পুরাতন কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ইহা নিতান্তই বাহুল্য, এবং ইহাতে পাঠকের ধৈর্য্যের উপর বড় বেশী চাপ পড়ে; কারণ, পাঠক বহিখানা পড়িতে পড়িতে সর্ব্বদা ইহাই ভাবিতে থাকেন, যে, কাহিনীটা একশত পৃষ্ঠা কিম্বা তাহার কমেও বলা যাইত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাঠক নিশ্চয় গ্রন্থকারের উৎসাহ ও আগ্রহের তারিফ্ করিতে বাধ্য হন।

ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্যিক জগতের সীমার মধ্যে অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের নাম উচ্চ শ্রেণীতে অধিরূঢ় হইয়া আছে। সেই জন্য বর্ত্তমান লেখক ইহা বলিতে কিছু ক্লেশ অনুভব করিতেছেন, যে, তাঁহার (ভাণ্ডারকরের) নূতনতম বহিখানি তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ধারণা যে আছে, তাহারই মস্ত একটা প্রমাণ। কেবল যে বহিখানি সামান্য উপাদানের তুলনায় অতিবিস্তৃত তাহাই নহে, ইহাতে যে-সব কথা লেখা হইয়াছে, তাহাও সকলস্থলে নির্ভরযোগ্য নহে। মোটের উপর, এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বগামী গ্রন্থকারদিগের পরিশ্রমের ফলের উপর তিনি অতি সামান্যই নূতন কিছু যোগ করিতে পারিয়াছেন, এবং তিনি যেখানে আমাদিগকে ইতিপূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত কিছু নূতন তথ্য জোগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সহিত একমত না হইবার দিকেই আমাদের প্রবৃত্তি বেশী হয়।

কিন্তু এই সব মন্তব্য বইখানিতে লিখিত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সমূহের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, এবং হয়ত তজ্জন্য আমাদের মনে বহিখানির সাধারণ কদর সামান্যই কমিত। কিন্তু বহিখানি সম্বন্ধে যাহা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর নিন্দার কথা তাহা এই, যে, গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক গুরুলঘু গুরুত্ব ও বিশালতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুপাত-জ্ঞান মোটেই নাই, এবং তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও কালের ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তি প্রভৃতির মধ্যে যে-সব সাদৃশ্য প্রদর্শনে পুলকবিহ্বলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের "অশোক" বহিখানি, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ইতিহাসাধ্যাপক-রূপে ১৯২৩ সালে যে কয়টি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহারই সমষ্টি। অধ্যাপক র‍্যাল শার্পান্টিয়েরের সমালোচনা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভাণ্ডারকর সামান্য পুরাতন উপকরণ ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া অতিবিস্তৃত বক্তৃতা করিয়া মাসিক চৌদ্দশত টাকা বেতন পাইয়া আসিতেছেন। উপ্সালার অধ্যাপক ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্যিক জগতের অন্যতম শিরোমণি সম্বন্ধে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের অন্য প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুবই সম্মানিত বোধ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব সদস্য বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ভাণ্ডারকর মহাশয়কে তাঁহার পূর্ব্বতন কর্ম্মক্ষেত্র সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগে ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। সেখানে গিয়া তিনি পুনর্ব্বার বার্লিনের অধ্যাপক ল্যুডার্স বা অন্য কোন য়ুরোপের অধ্যাপকের কোন আবিষ্ক্রিয়া আত্মসাৎ করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে না; পুনর্ব্বার কোন পুরাতন পাথরের হাতিয়ারে কাসিমের আঁচড়ান ইংরেজী তারিখ উল্টা করিয়া পড়িয়া ভারতীয় কোন নূতন প্রাগৈতিহাসিক লিপি উদ্ধার করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে না; সেখানে তিনি পাহাড়পুরের মত কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্য দ্বারা গৌরব অর্জ্জন করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পয়সা দিয়া সেই গৌরবের কতকটা অংশ ক্রয় করিতে হইবে না।

পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী পাহাড়পুরে একটি ঢিবি খুঁড়িয়া তাহা হইতে প্রত্নতত্ত্বের অনেক অমূল্য উপকরণ পাওয়া যাইবে, কিছু কাল পূর্ব্বে বঙ্গের অনেক খবরের কাগজে নানা ছবির দ্বারা অলঙ্কৃত এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের নেতা ছিলেন অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকর। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহযোগে এই কাজটি করা হয়।

ইহার জন্য দিঘাপাতিয়ার বিদ্যোৎসাহী কুমার শরৎকুমার রায় মোট আড়াই হাজার টাকা দিয়াছিলেন—বাস্তবিক খনন কার্য্যের জন্য ২০০০ এবং কর্ম্মীদের রাহাখরচাদির জন্য ৫০০। এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান কেবল যদি নিষ্ফল হইত, তাহা হইলেও বিশেষ কোন লজ্জার বিষয় হইত না। কিন্তু ইহা নিষ্ফল ত হইয়াছিলই, অধিকন্তু টাকার অপব্যয় হওয়ায় কুমার শরৎকুমার রায় নিজের প্রদত্ত অর্থ ফেরত চান। শুনা যায় তাহাতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ওটেন সালিস্ নিযুক্ত হন। সালিসীর দ্বারা স্থির হয়, যে, কুমার মহাশয়কে ১৪৭০৲ টাকা ফেরত দিতে হইবে। যাঁহারা অপব্যয় করিয়াছিলেন, এই টাকাটা তাঁহাদের নিকট হইতেই আদায় হওয়া উচিত ছিল, এবং অধ্যাপক ভাণ্ডারকরই অপব্যয়ের অধিক অংশের জন্য দায়ী ছিলেন। কিন্তু তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ মূল্যবান্ চীজ্, যে, তাঁহার টাকার থলিতে হাত পড়া অনুচিত বিবেচিত হওয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার হইতে এই টাকা দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের কথা সম্বন্ধে নির্ভুল সংবাদ পাওয়া কঠিন। অতএব এই খবরে কোন ভুল থাকিলে ও তাহা জানিতে পারিলে সংশোধন করিব।

কুমার শরৎকুমার রায়ের সমুদয় টাকা কিরূপে খরচ করা হইয়াছিল, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত ছাপিবার প্রবৃত্তি ও স্থান আমাদের নাই। কিন্তু মোটামুটি কিছু বলিতে চাই।

অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ও তাঁহার দলের লোকদের যাতায়াত প্রভৃতির ব্যয় হইয়াছিল ৯৩৫।৶০ টাকা; কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের যেরূপ বেতনের লোকদের জন্য সফরের সময় যত রাহাখরচ খাইখরচ প্রভৃতি ধরা হয়, তদনুসারে, এবং কর্ম্মীরা একমাস এই কাজে যাপন করিয়াছেন ধরিলেও, ৫৯১।৶০র বেশী ন্যায্য ব্যয় হয় না। সুতরাং বাকী ৩৪৩৵০ টাকা কোন ব্যক্তির বা কোন কোন ব্যক্তির সিন্ধুকে অনধিকারপ্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিম্বা উহা নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়া থাকিতে পারে।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির দলের রাহাখরচ আদি হইয়াছিল ১৬০৸৶৬; ন্যায্য হিসাবে হওয়া উচিত ছিল ৭৭৵০। সুতরাং এই দলের বাবে ৮৩৵৬ অকারণ খরচ লইয়া থাকিবে। কিম্বা, 'কোম্পানী কা মাল দরিয়া মে ডাল্', নীতিও অনুসৃত হইয়া থাকিতে পারে।

ঠিক খনন কার্য্যের জন্য মোট ৫৩৬।০ ব্যয়িত হইয়াছিল। প্যাকিং খরচা ১২৸৶৯, তাঁবু ও দলিল দস্তাবেজাদির বহন ব্যয় ২১৪।০, এবং বিবিধ ব্যয় হইয়াছিল ১২৪৷৶৬। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্যের জন্য অনাবশ্যক ব্যয় হইয়াছিল—আস্‌বাবে ৬৭।৶০, ব্যক্তিগত আরামের জন্য ৭২৷৴০। তদ্ভিন্ন রাহাখরচ আদিতে অন্যায্য ব্যয় যাহা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা উপরে মোটামুটি ব্যয়ের ফর্দ্দ দিলাম। প্রত্নতাত্ত্বিক দলের ঘরকন্নার হাতা বেড়ী খুন্তি হাঁড়ি বঁটি আঁশবটি চামচ পেয়ালা শিলনোড়া ছাঁকনী চৌকী ট্রাঙ্ক ডালকাটা প্রভৃতি দ্রব্যের দাম সমেত পূর্ণ ফর্দ্দ স্থানাভাবে দিতে পারিলাম না। দিতে পারিলে অবশ্য ভাল হইত; কারণ, ভবিষ্যতে কোন অনভিজ্ঞ লোক যদি কোথাও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্যের জন্য পাহাড়পুরের মত কোন দূর দেশে যান, তাহা হইলে তিনি ঐ ফর্দ্দ অনুযায়ী প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র আগে হইতেই জোগাড় করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিতেন।

—

মহাভারত ও আচার্য্য বসুর আবিষ্কার

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নমুদ্রিত চিঠিটি আমাদের হস্তগত হয়।

"গত সপ্তাহের বঙ্গবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'বৃক্ষের হৃদয় স্পন্দন' উপলক্ষ করিয়া যে বিদ্রোচিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কি না জানি না। উহা কাটিয়া এই চিঠির ভিতরে পাঠাইলাম। আপনার 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় নোটে উহার উপরে একটি …টিপ্পনী দেখিতে ইচ্ছা হয়।…বিশেষ এই অংশটুকুর:—'মহাভারতে বৃক্ষজীবনের সকল রহস্যই বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে, হিন্দুকে জড় বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।'

"আমি বাল্যকাল হইতে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বারা সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ পড়িয়া আসিতেছি। এ পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের কিছুই তাহা হইতে শিক্ষা করিতে পারি নাই। বৃক্ষজীবনের সকল রহস্য কোন্ পর্ব্বের কোন্ অধ্যায়ে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে জানিতে পারিলে আমি উপকৃত হইব এবং আমার মত আরও অনেকে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আপনি নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে পারিবেন।"

যিনি এই চিঠিটি লিখিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি আছে। তিনি যখন মহাভারত হইতে জড়-বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব, বিশেষতঃ আচার্য্য বসুর আবিষ্কারের মত কিছু, উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তখন আমরা কিছু করিতে নিশ্চয়ই পারিব না। সুতরাং সে চেষ্টা করিব না, এবং চেষ্টার পূর্ব্বে বলিবও না, "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, যাঁহারা সুদূর চীনদেশ হইতে সোমলতা আমদানী করিয়া তাহা হইতে সালসা প্রস্তুত করিয়া সমুদয় বাঙালীকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেক হিন্দুর করায়ত্ত মহাভারত হইতে জড়-বিজ্ঞানের সমুদায় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তাহা বঙ্গের আপামরসাধারণ সকল হিন্দুকে এ পর্য্যন্ত "উপহার" দেন নাই। তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের ঐ সব তত্ত্বই শিখিবার জন্য বঙ্গীয় যুবকদিগকে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ইউরোপ আমেরিকা গিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইতে হইত না; তাহাদিগকে জোর বটতলা বা "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় পর্য্যন্ত যাইতে হইত, এবং তাহাতে জাত যাইত না। যাহা হউক, "বঙ্গবাসী" এপর্য্যন্ত যাহা করেন নাই, তাহা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই করিবেন। তখন পাশ্চাত্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিককে আচার্য্য বসুর নিকট তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের জন্য ফরমাইস্ না দিয়া "বঙ্গবাসী"-কার্য্যালয়ে অর্ডার দিলেই চলিবে। আচার্য্য বসুও সাবধান হউন। যাহা অচিরে ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীটে পাওয়া যাইবে, তাহার জন্য কেন তিনি অকারণ শক্তি, সময় ও অর্থব্যয় করিতেছেন? "বঙ্গবাসী" কি বলিতেছেন, দেখুন।

বৃক্ষের স্পন্দন।—মানুষের এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সকলেই সহজে অনুভব করিতে সমর্থ। বৃক্ষের হৃৎপিণ্ড স্পন্দন দেখা যায় না, বা স্পর্শদ্বারাও অনুভব করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে, বৃক্ষের সেরূপ কোন স্পন্দন নাই? লৌকিক-অলৌকিক বহু জ্ঞান বিজ্ঞানের আকর হিন্দুর উপনিষদ্ শাস্ত্র এবং পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি জানাইয়া দিয়াছেন, বৃক্ষেরও জীব-জন্তুর মত ইন্দ্রিয় আছে এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানে অবশ্য একথা নূতন; এখনও এমন অনেক কথাই এবিজ্ঞানে অজ্ঞাত। কাজেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বৃক্ষের হৃৎস্পন্দনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। সম্প্রতি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক স্যর্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এইরূপ কথা শুনাইয়া পাশ্চাত্য জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন। তাঁহার বিস্ময়কর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি আরও দুইটি নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। সে দুইটি এই,—(১) বৃক্ষসমূহের জীব-জন্তুর মতই মাংসপেশী আছে এবং (২) জীব-জন্তুর হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের মত বৃক্ষের দেহাভ্যন্তরেও এক প্রকার স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহার আবিষ্কৃত আরও একটি নূতন তথ্য তিনি আগামী জানুয়ারী মাসে ঘোষণা করিবেন বলিয়াছেন। স্যর্ জগদীশের আবিষ্কারের বিশেষত্ব এই যে, তিনি এইসব তথ্য যাহাতে সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাহার উপযোগী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসমূহ তৈয়ারী করিয়াছেন এবং সেইসকল যন্ত্র সাহায্যেই নিজের বক্তব্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। আমরা অনেক-বারই বলিয়াছি, হিন্দুর নিকট এ সব আদৌ বিস্ময়কর নহে। কিন্তু অনেক হিন্দুর কাছেই ইহা অজ্ঞাত। তাহার কারণ, হিন্দু এখন নিজের পরিচয়ই নিজে জানে না এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নিজের পরিচয় জানিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। হিন্দু বালকের বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই অনেকে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কেন্টিং নগরের ডুবানের গল্প পড়িতে আরম্ভ করে; আমাদের অনন্ত জ্ঞানের আকর মহাভারতের উপাখ্যান পড়িবার অবসর তাহাদের অনেকেরই সারা জীবনেও হয় না। মহাভারতে বৃক্ষ-জীবনের সকল রহস্যই বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে, হিন্দুকে জড় বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কাল-প্রভাবে অনেকে আমাদের পুরাতন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছেন, সুতরাং পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের অতি নিম্নস্তরের আবিষ্কারও এখন তাঁহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। স্যর্ জগদীশের আবিষ্কারের ফলে যদি তাঁহারা হিন্দুর প্রাচীন বিজ্ঞানসমূহে বিশ্বাসবান্ হইতে পারেন, তাহা হইলেও এদেশের অনেক উপকার হইবে।

শুনিয়াছি, আর্য্যসমাজের লোকেরা মনে করেন, বেদে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমরা দয়ানন্দস্বামী প্রণীত "সত্যার্থ-প্রকাশ" পড়ি নাই; সুতরাং উহা সত্য কিনা বলিতে পারি না।

বাস্তবিকই আমরা একান্ত আত্মবিস্মৃত জাতি। বেদে টেলিগ্রাফ-আদি সব-কিছু আছে; মহাভারতে জড়-বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব আছে; রামায়ণে পুষ্পক-রথ অর্থাৎ এরোপ্লেন আছে, মহীরাবণ অহিরাবণের সব্-মেরিন্ আছে; অন্যান্য শাস্ত্রে বে-তার বার্ত্তা, বে-তার টেলিফোন প্রভৃতি আছে। অথচ এই সকল জিনিষের জন্য

আমাদিগকে অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য লোকদিগের নিকট ঋণী হইতে হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতির লোকেরাও কম বেকুব নহে। বেদ প্রথম ছাপিলেন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত; বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত এবং অনেক পুরাণ ও তন্ত্র ম্লেচ্ছ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পাশ্চাত্য অল্পবুদ্ধি লোকদেরও, বহুবৎসর হইল, বোধগম্য হইয়াছে। এক-একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, যেমন প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিণ্টার্নিজ্, সংস্কৃতের চর্চ্চায় চল্লিশ বৎসর কাটাইয়াছেন। অথচ তাঁহারা নানাবিধ জড়-বিজ্ঞান ও যন্ত্র-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এবং নানা-প্রকার কল তৈয়ার করিবার জন্য বড়-বড় ল্যাবোরেটরী, কারখানা প্রভৃতিতে অকারণ অর্থব্যয় ও আয়ুক্ষয় করেন। সংস্কৃত-শাস্ত্র হইতেই এই সবই খুব কম আয়াসে পাওয়া যাইতে পারিত।

আমরাই একমাত্র আত্মবিস্মৃত জাতি নহি। সেদিন যুগপৎ ইরাকের (মেসোপটেমিয়ার) একখানা ও আফগানিস্থানের একখানা—এই দুখানা আখ্বার্ অর্থাৎ খবরের কাগজ কলিকাতা পৌঁছিয়াছে। দু'টাতেই একই-রকমের আফ্সোস জাহির করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে:—"ফেরিঙ্গীরা আসিয়া আস্মান হইতে আমাদের মাথায় বোমা ফেলে; আমরা তাহাদের কিছুই করিতে পারি না। কিন্তু আমাদেরই আল্ফ্ লায়লাহ্ (আরব্য উপন্যাস) কেতাবে লেখা আছে, যে, সেকালে আমাদের এমন গালিচা ছিল, যে, তাহাতে বসিয়া ইচ্ছা করিলেই আস্মানে উড়িয়া যেখানে-সেখানে আমরা যাইতে পারিতাম; এমন কলের ঘোড়াও ছিল, যাহার পিঠে চড়িয়া কল টিপিলেই সে সওয়ারকে লইয়া আস্মানে উঠিত। সেই গালিচা ও ঘোড়া এক-একটা জোগাড় করিলেই ত আমরাও আস্মানে উঠিয়া ফেরিঙ্গীদের উপর ইট-পাটকেল আতস-বাজী ছুড়িতে পারি।"

আরব-দেশেরও একখানা কাগজে স্যার্ জগদীশ বসু মহাশয়ের কোন-কোন আবিষ্কারের বৃত্তান্ত দিয়া লেখা হইয়াছে, "এটা আর এমন-কি আজব খবর? আমাদের আল্ফ্ লায়লাহ্ (আরব্য উপন্যাস) কেতাবে লেখা আছে, যে, সেখানে শাহ্জাদীদের গায়ক বৃক্ষ ছিল; তাহারা নিজে-নিজেই গান করিত। আর এখন কিনা বসু সাহেবকে কল বানাইয়া, গাছের নাড়ী ছাড়িয়াছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইতেছে!"

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বাগানে একটিও গায়ক-বৃক্ষ না থাকা বাস্তবিকই বড় লজ্জার বিষয়।

—

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদের বেতন

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদের বেতন বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য একাধিকবার নামঞ্জুর করিয়াছিলেন। তাহাতে বাংলাদেশে দ্বৈরাজ্য স্থগিত হইয়াছে। এখন আবার সেই ব্যবস্থাপক সভা অধিকাংশের মতে সেই মন্ত্রীদেরই বেতন মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি সভ্যের মতিস্থৈর্য্যের অভাব প্রমাণিত হইতেছে। যাঁহারা দেশের প্রতিনিধি, তাঁহাদের এরূপ চাঞ্চল্য বাঞ্ছনীয় নহে।

যাঁহারা যতদিন কোন কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের তত দিনের পারিশ্রমিক অবশ্যই পাওয়া উচিত। সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হওয়া উচিত নহে। কথা হইতেছে, যে, বেতন দিবে কে? যিনি বা যাঁহারা নিয়োগ করেন, বেতনের দাবী তাঁহার বা তাঁহাদের নিকট হইতেই করা উচিত। মন্ত্রীদিগকে ব্যবস্থাপক সভা নির্ব্বাচিত, মনোনীত বা নিযুক্ত করেন নাই, বঙ্গের গবর্ণর করিয়াছিলেন। সুতরাং বেতনটাও তাঁহারই দেওয়া উচিত। নিয়োগ করিবেন একজন, প্রজাদের প্রতিনিধিদের মতের বিরুদ্ধে; অথচ সেই প্রতিনিধিদিগকেই বেতন মঞ্জুর করিতে হইবে; ইহা হাস্যকর ব্যবস্থা।

—

বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল বিল

বাংলাদেশের মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটীগুলির কাজ যে আইন-অনুসারে চলে, তাহা বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। তদনুসারে কাজ চালাইতে গিয়া উহার যে-সব দোষ ধরা পড়িয়াছে, তাহার সংশোধন হওয়া উচিত; এবং করদাতাদের অধিকার ও দায়িত্ব দুইই বাড়াইয়া দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান আইন শোধন করিবার নিমিত্ত যে বিল প্রণীত হইয়াছিল, তাহাতে অনুমোদনযোগ্য কোন

কোন ব্যবস্থা ছিল। যথা, নির্ব্বাচিত কমিশনারদের অনুপাত বাড়াইয়া পূর্ণসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ, কোথাও কোথাও চারি-পঞ্চমাংশ, করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু বিলটিতে একটি অতিশয় গুরুতর কুব্যবস্থা ছিল। উহাতে, হিন্দু ও মুসলমান করদাতারা নিজের নিজের প্রতিনিধি পৃথক্ পৃথক্ নির্ব্বাচন করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই কারণে, আমাদের বিবেচনায়, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা উহা পেশ্ করিবার অনুমতি না দিয়া ভালই করিয়াছেন। যাহার গোড়াতেই মস্ত গলদ, তাহার খুটিনাটী বিচার করিবার আগেই সেই গলদ দূরীভূত হওয়া দরকার। সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা বাদ দিয়া বিলটি পুনর্ব্বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থিত করিলে উহা বিবেচিত হইতে পারিবে।

—

রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার

এক শতের উপর বাঙালী ভদ্রলোককে বৎসরাধিক পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার পর তাঁহাদের বিচার না করিয়া তাঁহাদিগকে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের নানা জেলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখা অন্যায়; অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এইরূপে বন্দী করিয়া রাখা আরও অন্যায়। ইহার উপর আরও একটি কারণে গবর্ণেণ্ট নিন্দাভাজন হইতেছেন। বন্দীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত তাহা হয় না, এই অভিযোগ প্রায়ই শুনা যায়। তাহাতে তাঁহাদের অনেকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তখন আবার চিকিৎসার সুবন্দোবস্তও হয় না। এই প্রকার নানা অভিযোগ ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হইলে যে সরকারী কর্ম্মচারী উত্তর দেন, তিনি স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া বা করাইয়া উত্তর দেন না; যে যে জেলে বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, সেই সেই জেলের কর্ত্তৃপক্ষ যে-সব জবাব লিখিয়া পাঠান, সরকারী কর্ম্মচারী তাহাই অবলম্বন করিয়া উত্তর দেন। সুতরাং স্বভাবতই এরূপ উত্তরে সর্ব্বসাধারণের সন্দেহ দূর হয় না।

সেদিন এই অভিযোগটি বিবেচনা করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, কতকগুলি রাজবন্দীকে এই শীতের দিনে যথেষ্ট শীতবস্ত্র এবং রাত্রে ব্যবহারের লেপ কম্বলাদি যথেষ্ট না দিয়া এক জেল হইতে অন্য জেলে চালান করা হইয়াছে। প্রস্তাব করেন, স্বরাজ্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সরকার পক্ষের জবাব এই, যে, বন্দীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদত্ত শীতে ব্যবহার্য্য বস্ত্র ও কম্বল ফেলিয়া দিয়াছিল। মানুষ শীতের দিনে অকারণ এইরূপ কাজ করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যদি মানিয়াই লওয়া যায়, যে, তাহারা এইরূপ করিয়াছিল, তাহা হইলে তাহারও ত কারণ অনুসন্ধান হওয়া উচিত? বাংলা দেশে মোটের উপর বিহার, ছোট নাগপুর, আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ অপেক্ষা শীত কম। বাংলা দেশে বেশ মজবুত উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত জেলেরও অভাব নাই। এ অবস্থায় শীতকালে বাঙালী রাজবন্দীদিগকে অধিক শীতের জায়গায় চালান করা অন্যায়। বাঙালীরা যখন স্ব-ইচ্ছায় অধিক শীতের জায়গায় যায়, তখন তাহারা যথাসাধ্য তদুপযোগী খাদ্য পরিধেয়ের বন্দোবস্ত করে; করিতে না পারিলে তজ্জনিত কষ্টের বা স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী হয়। কিন্তু বন্দীদের স্বয়ং যখন প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিবার উপায় নাই এবং জেলের বন্দোবস্ত যখন মধ্যবিত্ত লোকদের গার্হস্থ্য বন্দোবস্তের সমান নয়, তখন মধ্যবিত্ত বাঙালী রাজবন্দীদিগকে শীতের সময় বেশী শীতের জায়গায় চালান করিলে তাহাদের উপর অত্যাচার করা হয়।

—

রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের পার্থক্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পায়, যে, সতীশচন্দ্র মিত্র নামক একজন রাজবন্দীকে এম্-এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, ডালাণ্ডা হাউসে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভের অনুমতিও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কালী-শঙ্কর গাঙ্গুলী নামক অন্য একজন রাজবন্দীকে আই-এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু সন্তোষ মিত্রকে নিজের বাড়ীতেই অন্তরীন করিবার হুকুম করা হইয়াছিল। স্যার্ হিউ ষ্টিফেন্সন্ যে বলিয়াছেন,

যে, কোন্ বন্দীকে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তাহার বিচার প্রত্যেক স্থলে পৃথক্ করিয়া করা হয়, তাহা সত্য; সাধারণ নিয়ম হইতে পারে না। কিন্তু সন্তোষ মিত্রের বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধের অভিযোগ হইয়াছিল তাহা খুব গুরুতর, কালীশঙ্কর গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে সন্দেহ তত গুরুতর নহে। তাহা হইলে সন্তোষ মিত্রকে অধিকতর সুবিধা ও স্বাধীনতা দিবার কারণীভূত ভিতরের কথাটা কি? গবর্ণ্মেণ্ট তাহা বলিবেন এমন আশা করা যায় না। হালদার মহাশয়ের জানা থাকিলে বলিতে বাধা আছে কি?

—

কচুরীপানা-বিনাশ পরীক্ষায় অপব্যয়

ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রশ্নের উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে বলা হয়, যে, কচুরী-পানা বিনষ্ট করিবার জন্য তিন বৎসরের জন্য ২২৫০০ টাকা দিয়া গ্রিফিথ্সের বিষের ব্যবস্থাপত্র ক্রয় করা হইয়াছিল, এবং তদনুসারে প্রস্তুত বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা ঐ পানা বিনাশ করা যায় কিনা, তাহার কতকগুলি পরীক্ষা বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইয়াছে; তাহার ফলে গবর্ণ্মেণ্ট এখনও সন্তুষ্ট হন নাই, যে, উক্ত বিষাক্ত তরল পদার্থ পিচকারী দ্বারা ছড়াইয়া কোন স্থান হইতে কচুরীপানা একেবারে নির্ম্মূল করা যাইবে।

গবর্ণ্মেণ্ট জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে সভাপতি করিয়া কচুরী পানা ধ্বংস করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিয়োগ করেন। বসু মহাশয় স্বয়ং এবং কমিটির অধিকাংশ সভ্য গ্রিফিথ্সের বিষটার কার্য্যকারিতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তথাপি গবর্ণ্মেণ্ট একজন দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ গ্রিফিথ্সকে টাকা পাওয়াইবার নিমিত্ত সাড়ে বাইশ হাজার টাকা দিয়াছেন, এবং উহার বিষের পরীক্ষার কর্ম্মচারীর বেতনাদি প্রদানে এবং যন্ত্রক্রয়ে আরো অনেক টাকা অপব্যয় করিয়াছেন। অথচ দেশের লোকদের পক্ষ হইতে লোক-হিতকর কার্য্যের জন্য টাকা চাহিলে অনেক সময় সরকারী তহবিলে টাকা নাই বলা হয়।

—

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস প্রস্তাব করেন, যে, প্রতি বৎসর শিক্ষার জন্য যে সরকারী বরাদ্দ হইবে তাহার মধ্যে দুলাখ টাকা অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেন আলাদা করিয়া রাখা হয়। মৌলবী শাহ্ সৈয়দ এমদাদুল হকের কথা-মত প্রস্তাবক দুলাখের পরিবর্ত্তে বরাদ্দ তিনলাখ হউক এই রূপ বলেন। গবর্ণ্মেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে শ্রেণীতে শ্রেণীতে কোন প্রভেদ করেন না, সরকারী বিদ্যালয়সমূহ সকল শ্রেণীর লোকদের জন্য মুক্তদ্বার,—স্যার্ আব্দর রহীম সরকার পক্ষ হইতে এই কথার উপর জোর দিয়া বক্তৃতা করেন। ইত্যাকার কারণে তিনি প্রস্তাবটির বিরোধী হন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও উহা গৃহীত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য, সাধারণ ব্যয় ও বন্দোবস্ত ব্যতীত, বিশেষ বরাদ্দ ও বন্দোবস্তও যে আছে, সেবিষয়ে রহীম সাহেব কি বলেন?

—

সুহাসিনীর মৃত্যু

রংপুর জেলার গাইবাঁধায় যে-সুহাসিনীর উপর অত্যাচারের কাহিনী অনেক বার সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, যাহার উপর অত্যাচারের অভিযোগের একটা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বোধ করি এখনও হয় নাই, সেই সুহাসিনীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের লোকেরা, সমাজের লোকেরা, দেশের লোকেরা, গবর্ণ্মেণ্ট তাহাকে যে শান্তি দেয় নাই, দিতে পারে নাই, সেই শান্তি এখন সে পাইয়াছে। সে মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে নারীরক্ষা-সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে যে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

বিশেষ সমাচারপূর্ব্বক নিবেদন এই, যে, পিতা ভগবান, আমাকে স্বামীর সংসারে আনিয়াছেন, উপলক্ষ্য আপনারাই; এবং আপনারা যে উপকার করিয়াছেন, তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। এখানে আমার পরে শ্বশুরের কাজ গিয়াছে। তাঁহাকে একঘরে করেছে, এবং এইরূপ হয়েছে, যে, জীবনে আমার সমাজে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা হাতে না খেয়েই এই; খেলে কি হত জানি না। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আমার মত হতভাগিনী দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। এখন এমন অবস্থা, ইঁহাদের না খেয়ে মরিবার উপক্রম। * * * আমার সংসারে একদিন শান্তি নাই। এখন আমার ইচ্ছা এই, যে, কোন আশ্রমে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দিই। ইহা আমার

মনের একান্ত বাসনা। আপনার কি মত জানাইবেন। ইহাতে আমার স্বামীরও অমত হইবে না। যদি ভাল বোঝেন, আমার স্বামীর দ্বারা কিম্বা আপনি নিজে আমাকে লইয়া যাইবেন। * । বাচালতার জন্য ক্ষমা চাই। পত্র-পাঠ আপনার অভিমত বা, জানাইবেন।

ইতি— সুহাসিনী

সুহাসিনীকে একাধিকবার হরণ করিয়া লইয়া দুর্বৃত্তেরা তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; সুহাসিনী বার-বার পলাইয়া আসিয়াছিল। দুর্বৃত্তেরা তাহাকে প্রহার করিয়া, হাতে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়া, দাঁত ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া,—নানাবিধ যন্ত্রণা দিয়া—তাহাকে সতীত্ব ও পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে বার-বার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু অসাধারণ দৃঢ়তা, সাহস, মানসিক শক্তি ও সতীত্বনিষ্ঠা সহকারে এই বালিকা নিজের দেহ-মন-আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিল। তাহার উপর দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের নানা চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার শরীরে ছিল। সে সাধারণ শিক্ষাও বিশেষ কিছু পায় নাই; শিক্ষা, সদুপদেশ, দেহমনের পূর্ণবিকাশ, অন্তঃপুরের বাহিরের জগতের অভিজ্ঞতা, কোন সুবিধাই তাহার হয় নাই; বাল্যকালেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তথাপি সতী ও বীরাঙ্গনাদিগের মধ্যে তাহার সম্মানিত অতি উচ্চ আসন চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে; পবিত্রতার ও আদর্শনিষ্ঠার পূজা যত দিন জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন এই বালিকা সহৃদয় ন্যায়বান্ লোকদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইবে।

কিন্তু ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, সভ্যতাভিমানী বাংলাদেশে, সুহাসিনীর উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহা হইয়াছিল, এবং পুনরায় অন্য কোন বালিকার উপর হইতে পারে; ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, কল্পিত বা অংশত সত্য রাজনৈতিক বিপ্লবচেষ্টা দমনের জন্য গবর্ন্মেণ্ট ভয়বিহ্বলচিত্তে নানা অঘটন ঘটাইয়া থাকেন, কিন্তু বালিকাদের উপর নারীদের উপর পাশব অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার দমনের ও নিবারণের জন্য গবর্ন্মেণ্ট বিশেষ কোন ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করা উচিত মনে করেন নাই; ঘোরতর লজ্জার বিষয় এই, যে, দেশের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ রাজনৈতিক দল নারীবিগ্রহ সমস্যার দিকে দৃকপাত পর্য্যন্ত করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা নিদারুণ মনস্তাপ ও লজ্জার বিষয় এই, যে, যে-বালিকা তাহার সতীত্ব, দৃঢ়তা ও সাহসের জন্য সর্ব্বত্র পরমপ্রীতি ও সম্মানের পাত্রী হইবার যোগ্য ছিল, তাহার ও তাহার স্বামী ও পরিজন-বর্গের সামাজিক নিগ্রহ হইয়াছিল, এবং নানা-প্রকার নির্য্যাতন নিগ্রহ ও সামাজিক লাঞ্ছনার ফলে ভগ্ন-দেহে ভগ্ন হৃদয়ে মূর্চ্ছাদি রোগে ক্লিষ্টা তাহার অকালে মৃত্যু হইয়াছে। যে সামাজিক ব্যবস্থা, মুসলমান-সংস্রব তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটা সত্ত্বেও, তাহার মত মহীয়সী নারীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিল, তাহা অতি ঘৃণিত ও লজ্জাকর। যাহারা তাহার প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গস্বরূপ তাহার স্বামী ও (জ্যেষ্ঠতাত) শ্বশুরকে ভোজ দিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহারা অতি অধম নীচ হৃদয়হীন ও নির্লজ্জ; যে সামাজিক প্রথা অনুসারে ইহার পরেও সুহাসিনীর হাতের অন্নজল, সমাজের লোকে দূরে থাক্, তাহার পরিবারস্থ লোকেরাও গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই, তাহা অতি ঘৃণ্য ও পৈশাচিক। একদিকে সুহাসিনীর দৃঢ়তা, সাহস ও সতীত্ব যেমন বঙ্গনারীকুলের চিরগৌরবের ও চির আদরের বস্তু হইয়া থাকিবে, অন্য দিকে তেমনি সমাজের লোকের হৃদয়হীনতা, ন্যায়বুদ্ধির অভাব ও কাপুরুষতা আমাদিগকে চিরকাল কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে। কাপুরুষ, হৃদয়হীন, অন্যায়কারী আমরা আত্ম সংশোধন ও সমাজ-সংশোধন করিয়া উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে না পারিলে কখনও স্বাধীন হইতে পারিব না; রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বিদেশীর অনধীনতা কোন-প্রকারে ঘটিলেও মানুষ হইতে পারিব না।

—

লিটনের শান্তিনিকেতন গমন

রবিবাবুর সহিত সকলে সব বিষয়ে একমত হইবে, এ আশা বা ইচ্ছা তিনি নিশ্চয়ই করেন না। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত সব কাজের আলোচনা করাও আবশ্যক মনে হয় না। যে-সব মত বা কাজের সহিত সর্ব্ব-সাধারণের সম্পর্ক আছে, তাহার আলোচনা আমরা কখন-কখন করিয়াছি। যেমন, কলিকাতার বঙ্গীয় থিয়েটারগুলি-সম্বন্ধে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে দূষণীয় বা অনিষ্টকর না হইলেও, উহার অনুকরণ

দ্বারা অন্য লোকদের অনিষ্ট হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। এই কারণে, এবং তাঁহার সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই এরূপ অন্যান্য কারণে, আমরা থিয়েটার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগে-আগে করিয়াছি। সত্য কারণ থাকিলে আমরা যেমন তাঁহার মত ও কাজের সমালোচনা করিবার অধিকারী, অন্তেরাও সেইরূপ করিবার অধিকারী। শুধু অধিকারী নহেন, তাহা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহা সত্য নহে, বা যাহা আংশিক সত্য, তাহাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাকে বা অন্য কাহাকে আক্রমণ করা উচিত নহে। তাঁহার ন্যায় অন্য যেসকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে বিদেশী লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-স্থানীয় মনে করে, তাঁহাদিগের অমূলক সমালোচনা দ্বারা আমরা নিজেদেরই অসম্মান করি, ইহাও মনে রাখা উচিত।

সম্প্রতি লর্ড লিটন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় এবং সুরুলের শ্রীনিকেতনে পল্লীসমূহের উন্নতিসাধন চেষ্টার প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিয়াছেন। এবিষয়ে একজন 'দর্শক' একখানি খবরের কাগজে রবিবাবুর নিন্দা করিয়াছেন, এবং অন্য একখানা কাগজেও এরূপ নিন্দা দেখিয়াছি। নিন্দা যিনি যাহা করুন, সেবিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু আমরা যাহা জানি, তাহাতে "দর্শকের" চিঠিতে তথ্যহিসাবে কিছু ভুল আছে। তাহাতে লিখিত আছে, যে, রবিবাবু লর্ড লিটনকে আমন্ত্রণ করিয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; আমরা নিজে যাহা জানি তাহাই বলিতেছি।

গত পূজার ছুটির আগের দিন পর্য্যন্ত আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তাহার অনেক দিন আগে, তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না, বীরভূমের একজন সরকারী কর্ম্মচারী বোলপুরে আসেন। তাঁহাকে তাঁহার বোলপুর আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, যে, লাট-সাহেব বীরভূম জেলায় আসিবেন এবং তখন প্রাইভেট-ভাবে শান্তিনিকেতন দেখিতেও তিনি ইচ্ছা করেন; কিন্তু লাট-সাহেব কোথাও প্রাইভেট-ভাবে আসিলেও তাঁহার নিরাপদ্-অবস্থান ও আরামাদির বন্দোবস্তের দরকার বলিয়া তত আগে হইতে সব ঠিকঠাক করিতে হইতেছে। কিছুদিন আগে রবিবাবুর সহিত কলিকাতায় কথা-প্রসঙ্গে লাট-সাহেবের শান্তিনিকেতন দর্শন-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি আমরা চাই নাই। অনুমতি থাকিলে প্রমাণ করা সহজ হইত, যে, ঐ দর্শন-ব্যাপারটা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল না। ইহার বেশী কিছু লিখিব না। তবে, কেহ যদি মনে করেন ও বলেন, শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ভাবী অতিথি-অভ্যাগতের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া তবে তাহাকে সেখানে আসিতে দেওয়া উচিত, এবং লাট লিটন আসিতে চাহিলেও তাহাকে নিষেধ করা উচিত ছিল, তাহা হইলে তিনি তাহা করিতে পাবেন।

লাট-সাহেবকে অভিনয়াদি দেখান হইয়াছিল, রবিবাবুর নিন্দার ইহা একটা কারণ। কিন্তু অভিনয়াদি শুধু লাট-সাহেবের জন্যই হয় নাই; পূর্ব্বে আরও নানা উপলক্ষে হইয়া গিয়াছে। যমুনালাল বজাজ মহাশয় একবার যখন আসিয়াছিলেন, তখন হইয়াছিল; বীরভূম জেলার স্বাস্থ্যকৃষিশিল্প-আদির উন্নতির জন্য কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিদের জন্য হইয়াছিল, ইত্যাদি। তাহা হইয়া থাকিলেও লাট-সাহেবের জন্য হওয়া উচিত ছিল না, যদি কেহ মনে করেন, তাহা করিবার অধিকার তাঁহার আছে।

রবিবাবু লিটনের সহিত আহার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ। কিন্তু আহার রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অনেক অপ্রসিদ্ধ বাঙালী ও অবাঙালী অতিথির সহিত, জা'ত ও কর্ম্মের বিচার না করিয়া, করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও, লিটন-সাহেবের সহিত তাঁহার অন্নগ্রহণ করা উচিত হয় নাই, এরূপ মনে করিবার অধিকার অবশ্য প্রত্যেক সমালোচকের আছে। তথ্য-সম্বন্ধে ঠিক খবর দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য, সমালোচনার সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নহে।

ঢাকায় পুলিসের প্রশংসাপূর্ণ যে বক্তৃতায় লিটন ভারতনারীদের উল্লেখ করেন, আমাদের বিবেচনায় রবিবাবু তাঁহাকে সে-বিষয়ে দুখানা চিঠি লিখিয়া ভালই করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম চিঠির জবাবে লাট-সাহেব

ভারতমহিলাদিগের অবিমিশ্র উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে রবিবাবু দ্বিতীয় যে চিঠি লেখেন, তাহাতে লাট-সাহেব কোণঠাসা হইয়া কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারেন নাই। উহাতে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, যে, ভারতীয়েরা লাটসাহেবের গবর্মেণ্টকে এই 'চ্যালেঞ্জ' করিতে প্রস্তুত, যে,উক্ত গবর্মেণ্ট লাট সাহেবের উল্লিখিত এরূপ কোন মোকদ্দমার উল্লেখ করুন, যাহাতে ভারতনারীরা তাহাদের পুরুষ আত্মীয়দের প্ররোচনায় পুলিসকে জব্দ করিবার জন্য নিজেদের সতীত্বের উপর পুলিসের হস্তক্ষেপের মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছে। এরূপ কোন দৃষ্টান্ত লাট সাহেব বা তাঁহার গবর্মেণ্ট্ দিতে পারেন নাই। অবশ্য চর মনাইয়ের মোকদ্দমাকে লাট-সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় লক্ষ্য করেন নাই বলায়, তথাকার স্ত্রীলোকদের উপর পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে ঐ স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য সত্য বা মিথ্যা তাহা বিবেচনার বিষয় ছিল না; অন্য দৃষ্টান্তই রবিবাবু চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই।

কোন-কোন খবরের কাগজ পাঠকদের বিশেষ দর্শনীয়-স্থানে ও বড় অক্ষরে প্রচার করে, যে, রবিবাবু লিটনের অনুরোধে তাঁহাকে প্রথম চিঠি লেখেন; কিন্তু যখন ঐ কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ হয়, তখন প্রতিবাদ ছোট অক্ষরে, সহজে চোখে পড়ে না এরূপ এক কোণে ছাপা হইয়াছিল। এরূপ লোকদের কাছে তিনি ন্যায়বিচার পাইবেন না, জানি; তথাপি আমাদের জ্ঞান-অনুসারে কয়েকটা তথ্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

চা-বাগানে কুলীর প্রাণনাশ

সম্প্রতি দুটি চা-বাগানে দুজন কুলির প্রাণবধ অভিযোগে দুজন ইংরেজের বিচার হইয়া গিয়াছে। মাধবপুরে দশরথ নামক কুলিকে হত্যা করার অপরাধে উইলসনের বিচার হয়। জুররদের মধ্যে ইংরেজ তিন জনের মতে আসামী উত্তেজনাবশে কুলিকে সামান্য আঘাত করিয়াছিল, দেশী জুরর দুজন তাহাকে নরহত্যা অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। জজ ইংরেজদের মতে সায় দিয়া উইলসন্‌কে কেবল দু শ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। অবশ্য বেকসুর খালাস দিলে আরও ন্যায়সঙ্গত হইত। দশরথ বেচারার নাকি সামান্য আঘাতেই প্লীহা ফাটিয়া মৃত্যু হইয়াছিল।

আর একটি মোকদ্দমার আসামী ওখা চা-বাগানের ম্যানেজার বিটী নামক এক ইংরেজ। মৃত কুলিটির নাম তেলুছ। জুররদের মধ্যে অধিকাংশ বিটীকে নির্দোষ সাব্যস্ত করায় জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া তাহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। হতভাগা তেলুছরও নাকি প্লীহা ফাটিয়া প্রাণান্ত হয়।

উভয় মোকদ্দমার বৃত্তান্ত পড়িয়া বেশ বুঝা যায়, যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় পক্ষ হইতে হত্যা বা অন্যবিধ ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু হইলে সচরাচর যেরূপ বিচার বিভ্রাট হইয়া থাকে, এই দুই ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে।

এরূপ বিভ্রাটের প্রতিকার হইতে পারে, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিলে।

বিধাতা ভারতবর্ষের জন্য সম্পূর্ণ প্লীহাবিহীন মানুষ সৃষ্টি করুন, এ আবদার ত করা যায় না; নতুবা তাহাও একটা উপায় ছিল বটে।

প্রজাস্বত্ব-বিষয়ে বঙ্গীয় আইন

বাংলা দেশে প্রজাস্বত্ব বিষয়ে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহা অনেক বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। উহা সংশোধনার্থ সরকার পক্ষ হইতে নদিয়ার মহারাজা ব্যবস্থাপকসভায় একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন।

জমীদার-পক্ষ প্রবল ও ধনশালী। তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। রায়তরা তেমন ধনশালী এবং দলবদ্ধ নহেন। এই কারণেই, রায়তদের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত সিলেক্ট্ কমিটিতে রায়তপক্ষের সভ্য যথেষ্টসংখ্যক থাকা একান্ত আবশ্যক।

যে-সব প্রজা কোন জমীর স্বয়ং চাষ করিয়া থাকে, নূতন বিলে তাহাদিগকে তাহাদের ঐ জমী হস্তান্তর করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে ভিন্ন অন্য প্রকারে ঐ জমী হস্তান্তর হইলে, জমীদার নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ টাকা দিয়া উহা নিজের হাতে লইতে পারিবেন, এই ব্যবস্থা আছে। রায়ত নিজে কোন

জমীর চাষ করিলে তাহাতে তাহাকে এই যে স্বত্ব দেওয়া হইতেছে, ইহাতে তাহার বিপদ্‌ও আছে। এই কারণে জমীদারেরা ঐভাবে জমী বিলি না করিয়া চাষী-দিগকে বেতনভোগী মজুরের মত নিযুক্ত করিয়া চাষ করাইতে পারেন। তাহাতে তাহাদের দশা এখনকার চেয়ে মন্দ বই ভাল হইবে না। এইজন্য নূতন বিলের ধারাটি এরূপভাবে লিখিত হওয়া উচিত, যাহাতে রায়ত-দিগকে বেতনভোগী মজুরে পরিণত হইতে না হয়।

নূতন বিলে চাষী রায়তকে তাহার জমীর উপরের গাছ কাটিয়া বিক্রী করিবার বা নিজের কাজে লাগাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গাছ মূল্যবান্ হইলে তাহার দামের কিয়দংশ জমীদারকে দিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। কোন্ কোন্ গাছ মূল্যবান্, বিলে অন্ততঃ মোটামুটি তাহার একটা নির্দ্দেশ আছে কি না, এবং মূল্যের কত অংশ জমীদারের প্রাপ্য তাহা লিখিত আছে কি না, জানি না। তাহা থাকা দরকার; নতুবা ইহা লইয়া বিবাদ ও মোকদ্দমা হইবার সম্ভাবনা।

কোন জমীর খাজনা জমীদার যাহা পান, তাহা কমিবে না, কিন্তু রায়ত তাহাতে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে বা পুষ্করিণী ও কূপ খনন করিতে পারিবে, নূতন আইনে এইরূপ ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

দু মিনিটের জন্য অর্দ্ধপৃথিবী বেষ্টন

আগামী ৩০শে পৌষ, ১৪ই জানুয়ারী, সুমাত্রা দ্বীপে সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমেরিকার অন্তঃপাতী ওয়াশিংটনের নৌবিভাগের পর্য্যবেক্ষণাগার হইতে একদল বৈজ্ঞানিক সুমাত্রা গিয়াছেন। গ্রহণ কেবল দুই মিনিট স্থায়ী হইবে। কিন্তু সেই দুই মিনিটেই পর্য্যবেক্ষকেরা বায়োস্কোপের জন্য ছবি তুলিতে এবং বহুবর্ণ ফোটোগ্রাফের নেগেটিভ লইতে পারিবেন, আশা করেন। তাহা হইতে সূর্য্যমণ্ডলের নানা গ্যাস সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা, এবং সূর্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ও জানা যাইতে পারে। এই কাজের জন্য আমেরিকার উক্ত বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর আধটা পরিধি বেষ্টন করিয়া সুদূর সুমাত্রায় আসিয়াছেন।

এই বৈজ্ঞানিক অভিযানের লোকেরা তাঁহাদের পর্য্য-বেক্ষণের আড্‌ডা গাড়িবার জন্য এবং দূরবীক্ষণস্থাপনের উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মাণের জন্য তিন মাস ধরিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মেনী হইতে এবং সোয়ার্থমোর্ কলেজ হইতে অন্য এক এক দল বৈজ্ঞানিকও গ্রহণের সময় সুমাত্রায় উপস্থিত থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ইটালীর এক দল বৈজ্ঞানিক আফ্রিকায় থাকিবেন।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যন্ত্রব্যবহারে দক্ষতা, জ্ঞানপিপাসা, ধনশালিতা ও উদ্যোগিতার একত্র সমাবেশ হইলে তবে কোন জাতি দূরদেশে গিয়া বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের জন্য এত অর্থ, সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে ও কষ্ট স্বীকার করিতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে এখনও এই অবস্থা জন্মে নাই। ইহা দুঃখের বিষয়।

পুরাকালে অবশ্য কোন দেশেই জ্যোতির্ষিক ও অন্য-বিধ বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণের জন্য এরূপ বৃহৎ আয়োজন ও চেষ্টা হইত না; কিন্তু কিছু জ্যোতির্ষিক পর্য্যবেক্ষণ ভারতবর্ষে ও অন্যান্য কোন-কোন দেশে হইত।

আমেরিকান্ পুলিসের দক্ষতা

আমেরিকার পুলিস কিরূপ সামান্য প্রমাণ অবলম্বনে অপরাধী নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, সে-বিষয়ে সম্প্রতি সায়েন্টিফিক আমেরিকান্ নামক বৈজ্ঞানিক মাসিকপত্রে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে করিব।

গত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকাপ্রবাসী কতিপয় ভারতীয় ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টায় কারারুদ্ধ হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ যে-সব চিঠিপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বাংলা, গুরুমুখী, হিন্দুস্থানী, উর্দ্দু, জার্ম্মান্, স্পেনীয়, বা ইংরেজীতে লিখিত। কালী-ফর্নিয়াস্থিত বার্ক্‌লী শহরের অপরাধতত্ত্ববিৎ এডোয়ার্ড্ অস্কার্ হাইনরিক্ ভারতীয়ভাষাবিদ্ বা নানাভাষাবিদ্ না হইয়াও কোন-কোন ভারতীয়ের দোষ প্রমাণ করিতে সমর্থ হন। সে-বিষয়ে তিনি বলেন :—

"During the World War enemy Agents busied themselves in an attempt to hatch a nasty brood of

troubles for John Bull, and by making their headquarters in San Francisco, Uncle Sam was drawn into it. The idea was to stir up enough strife to warrant sending troops to India, thereby making that many less effectives available for use on the Western front. This was known as the Hindu-Gadhr Revolution Plot.

"During the trial of these cases I served the United States and British Governments jointly. Examinations were made and authorship established of documents and papers written in Bengali, Gurumukhi, Hindustani, Urdu, German, Spanish and English, and I lay no claim to being a linguist."

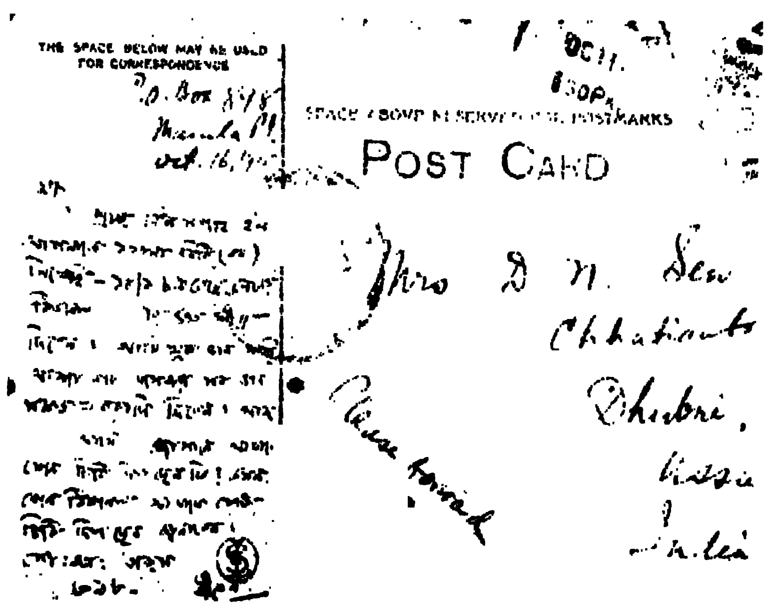
নানাভাষায় লেখা কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়া তিনি সায়েণ্টিফিক্ আমেরিকানের প্রবন্ধলেখককে বলেন—

"This is Bengali script. Do you see how this W-like character is formed? And this one that looks like the letter V? See how it is joined to the next character in every case? These are some of the peculiarities of this man's writing which helped to clear up a great many questions and to convict him.

"In work of this kind, while it is not essential that an examiner should be a linguist, it is necessary that the fundamental movements by which writing is executed be thoroughly understood."

অপরাধতত্ত্বজ্ঞ হাইনরিকের মন্তব্যের তাৎপর্য্য এই, যে, লেখার ছাঁদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইলে ঐ লেখার পরীক্ষকের নানাভাষাবিদ্ হইবার প্রয়োজন নাই; যে-সব মূল রেখাগতি বা টানের দ্বারা লিপিকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা চাই।

হাইনরিক্ যে-সব চিঠি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বাংলা একটি চিঠির প্রতিলিপি এখানে দিলাম।



আমেরিকার হিন্দু-বিপ্লবীদের বিচারে প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহৃত একটি পোস্টকার্ড

সুমাত্রায় হিন্দু সভ্যতা

বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে না হইলেও অন্য নানাবিধ উদ্দেশ্যে হিন্দুরা ভারত মহাসাগরের বহুদ্বীপে পুরাকালে যাতায়াত করিতেন, এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দু সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সুমাত্রার প্রাচীন সভ্যতা ও পুরাকালে তথাকার নানা বিদ্যার উৎপত্তি ও ভারতবর্ষের সহিত সংস্রবে। ঐ দ্বীপের অন্তর্গত পাল্‌ম্বাং মালভূমিতে আবিষ্কৃত উৎকীর্ণ কোন-কোন লিপি হইতে জানা যায়, যে, সুমাত্রার তালা দাকার অঞ্চলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এক প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিল। এইসব লিপিতে সুমাত্রাকে "প্রথম যবদ্বীপ" বলা হইয়াছে। সুমাত্রায় হিন্দু প্রভাবের বিস্তর চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। সুমাত্রার এবং আরও বহুসংখ্যক স্থানে হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাম্পার নদীর তীরবর্ত্তী মুআরা তাকুস্ নামক স্থানের ধ্বংসাবশেষ তাহার মধ্যে প্রধান। সেখানে একটি ৪০ ফুট উচ্চ বৌদ্ধ স্তূপ আছে। এই ইমারৎগুলি বোধ হয় একাদশ শতাব্দীর। পাগার রুজং নামক স্থানে কতকগুলি পাথরে সংস্কৃত ও প্রাচীন মালয় ভাষায় নানা লিপি উৎকীর্ণ আছে। সুমাত্রায় যে-যে ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাতে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ দৃষ্ট হয়। অশ্বত্থ বৃক্ষ যেমন হিন্দুরা পবিত্র জ্ঞান করে, সুমাত্রার বাত্তা জাতিও সেইরূপ করিয়া থাকে। উত্তরকালে যবদ্বীপ হইতেও শৈব সম্প্রদায়ের অনেক ঔপনিবেশিক হিন্দু সুমাত্রায় গিয়া হিন্দু প্রভাব বর্দ্ধিত করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শৈব ভাবের

— . . . . . .

দ্বীপের উত্তরদিক্‌বাসী বৌদ্ধদের সহিত মিলিয়া যাইতে পারে নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব ও শক্তি অনুভূত হইতে আরম্ভ হয়, এবং কালক্রমে উহা প্রধান কয়েকটি রাজ্যে বদ্ধমূল হয়।

১লা পৌষ অধ্যাপক ফোগেল

এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে সুমাত্রায় বৌদ্ধ কীর্ত্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে তৎসমুদয়ের চিত্র দেখাইবেন। তাহা দেখিয়া যদি কোন ভারতীয়ের অবিলম্বে সুমাত্রা যাইবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তি দর্শন এবং সূর্য্যগ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ উভয়ই হইতে পারিবে।

ইটালী ও ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীতে দুইজন সংস্কৃত ও অন্য কোন কোন ভাষাবিৎ ইটালীয় অধ্যাপক আসিয়াছেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি বয়োজ্যেষ্ঠ।



অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি

অন্যের নাম অধ্যাপক টুচ্চি। ফর্মিকি মহাশয়ের সহিত ইটালীর প্রধান মন্ত্রী মুসোলিনি ইটালীয় সাহিত্যের সমুদয় শ্রেষ্ঠ পুস্তক এবং ইটালীয় ললিতকলা-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পুস্তকাবলী ইটালীর পক্ষ হইতে বিশ্বভারতীকে উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। এই উপলক্ষে মুসোলিনি ফর্মিকিকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষকে জগতের সভ্যতার আদি লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

—



ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সিঞর্ মুসোলিনি

কার্পাস-শুল্ক-আদায় স্থগিত

সিকি শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সূতা ও কাপড়ের কলে যত সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার উপর শুল্ক বসান হয়। বিলাতী সূতা ও কাপড়কে ভারতীয় ঐ-ঐ পণ্য দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই শুল্ক স্থাপিত হয়। বিদেশ হইতে যে-সব পণ্যদ্রব্যের আমদানী হয়, তাহার কোন-কোনটা বা সবগুলার উপর একটা কর বসাইবার রীতি নানাদেশে প্রচলিত আছে। দেশী পণ্যশিল্প বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিলে দেশীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কখন-কখন এই শুল্ক ধার্য্য হয়, কখন-বা রাজস্ববৃদ্ধির জন্য তাহা ধার্য্য হয়। এইরূপ কারণে বিলাতী সূতা ও কাপড়ের উপর ভারতবর্ষে শুল্ক স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে বিলাতের কলওয়ালারা চীৎকার জুড়িয়া দিল, যে, ভারতের কলে উৎপন্ন ঐ-ঐ জিনিষের উপর ট্যাক্স্ বসান হউক। তাহারা "বাদশাহ্-কা দোস্ত"; কাজেই তাহাদের হুকুম অনুসারে ভারতের জিনিষের উপরই ভারতে ট্যাক্স্ স্থাপিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন এদেশে বরাবরই হইয়া আসিতেছে। একবৎসরেরও উপর

হইল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব ধার্য্য হয়। কিন্তু এতদিন গবর্ন্মেণ্ট্ সেই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করেন নাই। কয়েক মাস হইল, বোম্বাই অঞ্চলের কলওয়ালারা এই ওজুহাতে শ্রমিকদের বেতন কমাইয়া দেয়, যে, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর ট্যাক্স থাকায় এবং অন্যান্য কারণে তাহাদের ব্যবসাতে মন্দা পড়িয়াছে। তাহাতে দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়া দেয় এবং বেকার থাকিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। বিলাতের শ্রমিকদের বৃহৎ সভায় ইহার খবর পৌছে এবং তাহারা এখানকার শ্রমিকদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করে ও কিছু অর্থসাহায্যও করে। এখানকার কলওয়ালাদের উপর নানাদিক্ হইতে চাপ-পড়া সত্ত্বেও তাহারা বলে, যে, কার্পাস-পণ্যশুল্ক উঠিয়া না গেলে তাহারা শ্রমিকদিগকে আগেকার হারে বেতন দিতে পারিবে না।

যাহা হউক, এত দিনে বড়লাটের হুকুম অনুসারে তিন মাসের জন্য ঐ শুল্ক আদায় স্থগিত হইয়াছে, এবং উহা স্থায়ী-ভাবে উঠিয়া যাইবে, এইরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে। জানা গিয়াছে, যে, উহার আদায় স্থগিত রাখিবার আদেশ দিবার পূর্ব্বে বড় লাটকে বিলাতের মন্ত্রীসভার অনুমতি লইতে হইয়াছিল। ইহা আগে হইতেই জানা ছিল, যে, ভারত গবর্ন্মেণ্ট বিলাতী গবর্ন্মেণ্টের হুকুম অনুসারে কাজ করেন। বিলাতী গবর্ন্মেণ্ট এখন হয়ত কোন-কোন কারণে বুঝিয়াছেন, যে, ভারতীয় কার্পাস পণ্যশুল্ক উঠাইয়া দিলেও বিলাতী কলওয়ালাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে না; কিম্বা কোন রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিলাতী মন্ত্রীসভার সুবুদ্ধি হইয়া থাকিবে। ভিতরের কথা পরে জানা যাইতে পারে।

কারণ যাহাই হউক, শুল্কটা উঠিয়া যাওয়ায় ভারতীয় কলওয়ালাদের সুবিধা হইল। তাহারা শ্রমিকদের বেতন পূর্ব্ববৎ করিয়া দিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তাহাদের কাপড়ের দরও কমিয়াছে বা শীঘ্র কমিবে। গবর্ন্মেণ্ট্ এই কাজটা ভালই করিয়াছেন। কিন্তু যদি বিলাতী কলওয়ালারা আবার ধরিয়া বসে, যে, তাহারা ভারতবর্ষে যে কার্পাস-দ্রব্য রপ্তানী করে, তাহার উপর শুল্কও রদ করিতে বা কমাইয়া দিতে হইবে, এবং যদি গবর্ন্মেণ্ট্ তাহাদের অন্যায় আব্দার শুনেন, তাহা হইলে ভারতীয় কার্পাস-শিল্পের কোন সুবিধা হইবে না।

—

গঙ্গার জল নির্ম্মল রাখিবার উপায় আলোচনা

আশপাশের মাটি ধুইয়া যে জল নদীতে পড়ে, তাহার সহিত নানাবিধ আবর্জ্জনা ও দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে নদীর জলও ময়লা হয়। ইহা অল্পাধিক-পরিমাণে সকল নদীতেই হয়। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য দুটি কারণে গঙ্গার জল খুব দূষিত হইয়া আসিতেছে। একটি কারণ, নদীর উপর যে-সব মালবাহী নৌকা নঙ্গর করা থাকে, তাহার মাঝিরা নদীতেই মলমূত্র ত্যাগ করে। কিন্তু প্রধান কারণ নদীর ধারে বহুসংখ্যক পাটের কল স্থাপন। এইসব কলে হাজার-হাজার মজুর কাজ করে। তাহাদের মলমূত্রে নদীর জল দূষিত হয়। প্রতিকারের জন্য আন্দোলন কুড়ি বৎসরেরও উপর ধরিয়া চলিতেছে, কিন্তু এখনও কাজে কিছু হয় নাই। সেইজন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন, যে, গঙ্গার জল দূষিত হইতেছে কেন, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত বাংলার স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর, স্যার নীলরতন সরকার প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিবার জন্য বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায়, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বরদাপ্রসন্ন দে, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মিঃ এ সি ব্যানার্জ্জি, শাহ সৈয়দ এমদাদুল্হক্ এবং অন্যান্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক।

মাননীয় নদিয়ার মহারাজা সরকার পক্ষ হইতে বলেন, বিষয়টি খুব আবশ্যক; ডাঃ রায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গঙ্গার জল যে খুব দূষিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা সত্য, এবং সরকারেরও এই দোষ নিবারণ-কল্পে কোন আইন প্রণয়নে অমত নাই, এবং এইজন্য প্রস্তাব উত্থাপনের আবশ্যক নাই।

এইসব কথাই খুব সত্য হইতে পারে। কিন্তু গবর্ন্মেণ্টের সাধু ইচ্ছা কুড়ি বৎসরেও কেন কার্য্যে পরিণত হইল না?

ডাক্তার রায়ের মূল প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে অধিকাংশ সভ্যের মতে গৃহীত হইয়াছে।

গবর্ন্মেণ্টের ইচ্ছার অকপটতার প্রমাণ এখন পাওয়া যাইতে পারিবে।

...

নেপালে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ

নেপালের নৃপতি সাক্ষীগোপাল; প্রধান মন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহাকে মহারাজা বলা হয়। মহারাজা নেপালে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। তাঁহার এই কাজ শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি নেপালের দাসদের প্রভুদিগকে দাসগণকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেন; তাহারা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতেছে। প্রভুদের সংখ্যা ১৫০০০ এবং দাসদের সংখ্যা

প্রায় ৫৩০০০। গত বৎসর নবেম্বর মাসে মহারাজা বলেন, যে, তিনি দাসদের স্বাধীনতা ক্রয় করিবার জন্য, অর্থাৎ তাহাদের প্রভুদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার জন্য, চৌদ্দ লক্ষ টাকা রাখিয়াছেন। পরে দেখা গিয়াছে, যে, ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা লাগিবে। এপর্য্যন্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে; তাহার অধিকাংশ মহারাজার নিজের দান। তাঁহার এই কাজটি খুব প্রশংসনীয়।

—

সিন্ধুদেশে অন্নসমস্যার আলোচনা

সিন্ধুদেশে ছাত্রদের কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন গত নবেম্বর মাসে হইয়া গিয়াছে। এবার বঙ্গের জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি কন্‌ফারেন্সের শেষে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ছাত্রদের সমক্ষে তিনি উজ্জ্বলভাষায় জীবনের যে সাদাসিধে আদর্শ স্থাপিত করেন, তাহা মনে রাখিবার যোগ্য। তাহাতে কাজের কথাও যে ছিল না, তাহা নহে। সেরূপ কোন কোন কথার তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি।

"আজকাল বৃত্তিশিক্ষা, পণ্যশিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির এক-রকম বাতিক লক্ষিত হইতেছে। লোকে জীবনে অকৃতকার্য্য হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে চীৎকার করিতেছে, 'আমাদিগকে বৃত্তি শিক্ষা দাও।......... বাঙালী, মান্দ্রাজী ও সিন্ধীদের মত লোকেরা যে জীবনে কিছু করিতে পারিতেছে না, তাহা বৃত্তিশিক্ষা ও পণ্যশিল্প-শিক্ষার অভাবে নয়। বিদেশী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্যশিল্প-শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু শত বাঙালী যুবক আছে। কিন্তু তাহারা, অন্য লোকদের মত, চাকরী খুঁজিতেছে। অন্য দিকে, যে নব মাড়োয়ারী দলে-দলে বৎসর বৎসর বাংলা দেশে আসিতেছে, তাহাদের দিকে তাকাও। আমার বোধ হয় না, যে, মাড়োয়ারীরা যখন বাংলা দেশের জন্য রওনা হয়, তখন তাহারা মাড়োয়ার বা বিকানেরের শক্ত মাটি হইতে আহৃত মূলধনে পকেট বোঝাই করিয়া আসে। কিন্তু তাহারা আমাদের উর্ব্বর দেশে ১০।১৫।২০ বৎসর থাকে; এবং তার পর যখন বাড়ী যায়, তখন থলি থলি সোনা লইয়া যায়। বাঙালী কিম্বা মান্দ্রাজী যেখানে অকৃতকার্য্য হয়, সেখানে মাড়োয়ারী কৃতকার্য্য হয় কেন? ইহা বলিবার জো নাই, যে, মাড়োয়ারী বৃত্তিশিক্ষা ও পণ্য শিল্পশিক্ষার বোঝায় ভারাক্রান্ত। তথাপি সে কৃতকার্য্য হয়। কেন? উত্তরটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট। মাড়োয়ারী কখন শ্রমে বিমুখ হয় না। সে সকাল সন্ধ্যা খুব পরিশ্রম করে, 'বুদ্ধিপ্রধান' বাঙালী বা মান্দ্রাজীর মত সে সর্ব্বদা সোজা নরম চাকরীর জন্য হাঁ করিয়া থাকে না। তা ছাড়া মাড়োয়ারী সাহস করিয়া দায় ঝুঁকি লয়, সর্ব্বস্ব পণ করে; কাজেই, পরিণামে, যা চায় তা সবই পায়। পণ্যশিল্পশিক্ষা বা বৃত্তিশিক্ষা মাড়োয়ারীর কৃতিত্বের কারণ নহে; তাহার স্বভাবে যে সব গুণ আছে, তাহাতেই সে সফলকাম হয়—তাহার সাহস, তাহার দায়ঝুঁকি লইবার ক্ষমতা, তাহার কষ্টসহিষ্ণুতা, অবিরত কঠোর শ্রম করিবার শক্তি তাহাকে সাফল্য দান করে। তোমরাও এইসব গুণ বিকশিত করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলে মাড়োয়ারী যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তোমরাও তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে।"

বৃত্তিশিক্ষা ও পণ্যশিল্পশিক্ষার উপর যদি কেহ মাড়োয়ারীদের গুণসমূহ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সাফল্য নিশ্চয়ই তাহারও করায়ত্ত হইবে।

—

পঞ্জাবে নারীর অধিকার

পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা সকলে একমত হইয়া নারীদিগকে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার দিয়াছেন। অর্থাৎ পুরুষদের যে-প্রকার যোগ্যতা থাকিলে তাহারা ভোট দিতে পারে, সেই-রূপ যোগ্যতাবিশিষ্ট নারীরাও ভোট দিতে পারিবে। এ বিষয়ে পঞ্জাবী সভ্যদের ঐকমত্য বাংলাদেশকে লজ্জা দিয়াছে। এখন পঞ্জাবী নেতারা বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা নারীদিগকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের এই অধিকারের সদ্ব্যবহার করিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি করিলে সুখের বিষয় হইবে।



"এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক না—"

চিত্রকর শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা,

শান্তিনিকেতন

—প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩২

৪র্থ সংখ্যা

গান

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে,
দিগ্‌ দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে।
হের গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে
নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে,
এস আনন্দিত মিলন অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে।
কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ
হউক নির্ম্মল হউক নিঃশেষ,
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণ কাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম
পূর্ব্ব পশ্চিম বন্ধু সঙ্গম,
মৈত্রী-বন্ধন-পুণ্যমন্ত্র-পবিত্র বিশ্বসমাজে॥ *

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* এই গানটি গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন আশ্রমের উৎসবে গীত হইয়াছিল।—প্রঃ সঃ।



পরশুরাম রচিত ▪ নারদ বিচিত্রিত

আলিপুরের সংবাদ—সাগর আইলাণ্ডে বায়ুমণ্ডলে যে গর্ত্ত হইয়াছিল সেটা সম্প্রতি পাকা-রকম ভরাট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর বৃষ্টি হইবে না। চৌরঙ্গীতে তিনটা সবুজ পোকার অগ্রদূত ধরা পড়িয়াছে। ঘোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল রং বাহির হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসার রং ধরিয়াছে, গৃহিণী নির্ভয়ে লেপ-কাঁথা শুখাইতেছেন। শেষরাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয়। টাকায় এক গণ্ডা রোগা-রোগা ফুলকপির বাচ্চা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ-ব্যোমে দেহে মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগ্বিজয়ে যাইতেন।

আদালত বন্ধ, আমার গৃহ মক্কেলহীন। সার্কুলার রোডে ধাপা-মেলের বাঁশী পোঁ করিয়া বাজিল,—চমকিত হইয়া দেখিলাম বড় ছেলেটা জিওমেট্রি ত্যাগ করিয়া রেলের টাইম-টেব্‌ল্ অধ্যয়ন করিতেছে। ছোট ছেলেটার ঘাড়ে এঞ্জিনের ভূত চাপিয়াছে, সে ক্রমাগত দু'হাতের কনুই ঘুরাইয়া ছুঁচার মতন মুখ করিয়া ঝুক্ ঝুক্ ঝুক্ ঝুক্ করিতেছে। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এবার কোথা যাওয়া যায়? দু'একজন মহাপ্রাণ বন্ধু বলিলেন—পূজার ছুটিতে দেশে যাও, পল্লীসংস্কার কর। কিন্তু অতীব লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বহু বহু সৎকার্য্যের ন্যায় এটিও আমার দ্বারা হইবার নয়। জানামি ধর্ম্মং—অন্ততঃ মোটামুটি জানি, কিন্তু নচ মে প্রবৃত্তিঃ। ভ্রমণের নেশা আমার মাথা খাইয়াছে।

পদব্রজ, গো-যান, মোটর, নৌকা, জাহাজ—এসব মাঝে-মাঝে মুখ বদ্‌লাইবার জন্য মন্দ নয়। কিন্তু যানের রাজা রেলগাড়ী, রেলগাড়ীর রাজা ই-আই-আর। বন্ধু বলেন—ইংরাজের জিনিষে তোমার অত উৎসাহ ভাল দেখায় না। আচ্ছা, রেল না হয় ইংরাজ করিয়াছে, কিন্তু খরচটা কে যোগাইতেছে? আজ না হয় আমরা

ইংরাজকে সহিংস-বাহবা দিতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন সে-ও আমাদের কীর্ত্তি অবাক্ হইয়া দেখিত। আবার পাশা উল্টাইবে, দু'শ বৎসর সবুর কর। তখন তারায় তারায় মেল চালাইব, ইংরাজ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখিবে, সঙ্গে লইব না,—পয়সা দিলেও না।

বাংলার নদ-নদী ঝোপ-ঝাড়, পল্লী-কুটীরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানা-পুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলের গন্ধ—এ-সব অতি স্নিগ্ধ জিনিষ। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জ্জনে ছুটিয়া যাইতে। পঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্ত্তন। মাঝে মাঝে বিরাম—পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম্, পুরী-কচৌড়ি, রুটি-কাবাব, dinner, sir, at Shikohabad? তার পর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু'পাশে আকের ক্ষেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান বনানীকে ধীরে পরিক্রমণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্র-মধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তার পর সন্ধ্যা,—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজি এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরো দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল ভাল খাদ্য-সামগ্রী,—তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরো অনেক আছে। গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে লোহা-লক্কড়ে চাকার ঠোক্করে ঝিঞ্জির ঝাণ্ডার ঝঞ্জনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে,—আমি চিৎপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমে নস্ত্, হমে নস্ত, হমে নস্ত্।

এই পাশবিক কবি-কল্পনা—এই অহেতুকী রেলওয়ে-প্রীতি,—ইহার পশ্চাতে মনস্তত্ত্বের কোন্ দুষ্ট সর্প লুকায়িত আছে? গিরীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম—ডালহাউসি যাইব, আমার এক পাঞ্জাবী বন্ধুর নিমন্ত্রণে। একাই যাইব, গৃহিণীকে একটা মোটা রকম ঘুষ এবং অজস্র থিয়েটার-দেখার অনুমতি দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিব। কিন্তু man proposes, woman disposes।

আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি, হঠাৎ বিদ্যুল্লতার মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন—"হোয়াট্-হোয়াট্-হোয়াট্?"

এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। গৃহিণীর ইংরাজী বিদ্যা ফার্ষ্ট বুক পর্য্যন্ত। কিন্তু তিনি আমার ফাজিল শ্যালকবৃন্দের কল্যাণে গুটিকতক মুখরোচক ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই সেগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম—"এই মনে কচ্চি ছুটির ক'দিন একটু পাহাড়ে কাটিয়ে আসি, শরীরটা একটু ইয়ে কিনা।"

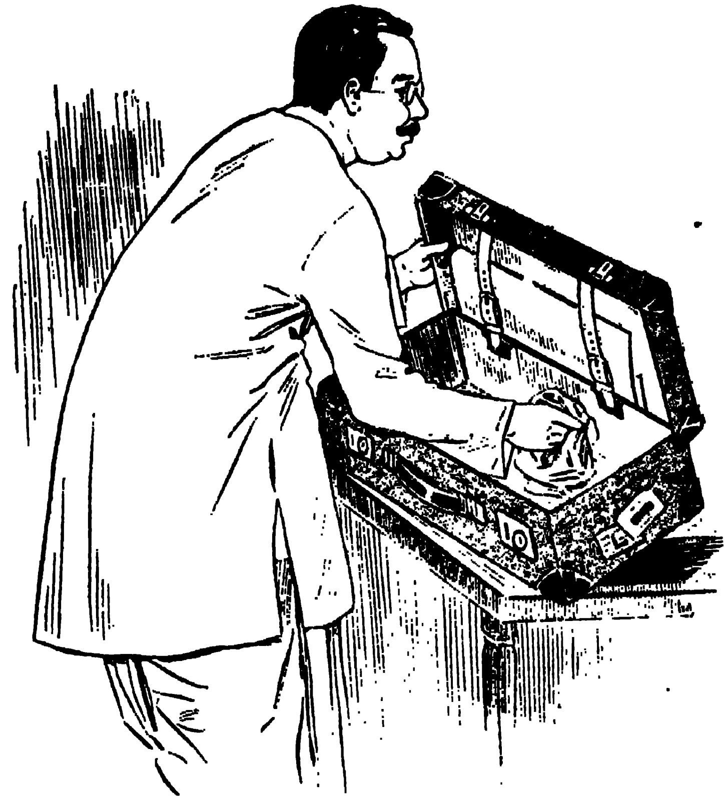
গৃহিণী বলিলেন—"হোয়াট্ ইয়ে? হুঁ, একাই যাবার মতলব দেখ্‌চি,—আমি বুঝি একটা মস্ত ভারি বোঝা হয়ে পড়েচি? পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা হবে নাকি?"

সভয়ে দেখিলাম শ্রীমুখ ধূমায়মান, বুঝিলাম পর্ব্বতো বহ্নিমান্। ধাঁ করিয়া মতলব বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া বলিলাম—"রাম বল, একা কখনো তপস্যা হয়। আমি হব না হব না হব না তাপস যদি না মিলে তপস্বিনী।"

মন্ত্রবলে শোক দুইসান্ধ কাটিয়া গেল। গৃহিণী সহাস্যে বলিলেন—"হোয়াট্ পাহাড়?"

আমি।—ডালহাউসি। সে অনেক দূর।

গৃহিণী।—ছাঃ ডালহাউসি। দার্জিলিং চল। আমার ত্রিশ ছড়া পাথরের মালা না কিন্‌লেই নয়, আর চার ডজন কাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার শুঁয়োপোকা কেনা হ'ল—সেই যে, বোয়া না কি বলে,—আর হীরে-বসানো চরকা ব্রোচ্,—তা ত এপর্য্যন্ত পরতেই পেলুম না। তোমার সেই ডালকুত্তো পাহাড়ে সে-সব দেখ্‌বে কে? দার্জিলিঙে বরঞ্চ কত চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে। টুনি-দিদি, তার ননদ, এরা সব সেখানে আছে। সরোজিনীরা, খুকু-মাসী, এরাও গেছে। মংকি



আমার সুটকেসটা ঝাড়িতেছি—

মিস্তিরের বউ তার তেরোটা এঁড়ি-গেঁড়ি ছানা-পোনা নিয়ে গেছে।

যুক্তি অকাট্য, সুতরাং দার্জ্জিলিং যাওয়াই স্থির হইল।

দার্জ্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিণ্টশ্ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি।···জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর ত ভাল লাগে না···এমন সময় অনতিদূরে—

এই পর্য্যন্ত রবিবাবুর সহিত আশ্চর্য্যরকম মিল আছে। কিন্তু আমার অদৃষ্ট অন্তপ্রকার,—বক্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখা হইল ডুমরাওনের মোক্তার নকুড় চৌধুরীর সঙ্গে, যিনি সম্পর্ক-নির্ব্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই সরকারী মামা।

নকুড় মামা পথের পার্শ্বস্থিত খদের ধারে একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন। তাঁর মাথায় ছাতা, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে ওভারকোট্, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিরক্তি, আমাকে দেখিয়া কহিলেন—"ব্রজেন নাকি?"

বলিলাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ। তার পর, আপনি যে হঠাৎ দার্জ্জিলিঙে? বাড়ীর সব ভাল ত? কেষ্টর খবর কি—বেনারসেই আছে নাকি? কি কচ্চে সে আজকাল?" কেষ্ট নকুড়-মামার আপন ভাগিনেয়, বেনারসের বিখ্যাত যাদব ডাক্তারের একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। সে একটু পাগ্‌লাটে লোক, নকুড়-মামাকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে।

নকুড়-মামা কহিলেন—"সব বল্‌চি। তুমি আগে আমার একটা কথার জবাব দাও দিকি। এই দার্জ্জিলিঙে লোকে আসে কি কত্তে হ্যা? ঠাণ্ডা চাই? কল্‌কাতায়



'হোয়াট্—হোয়াট্—হোয়াট্

ত আজকাল টাকায় এক মণ বরফ মেলে, তারই গোটা-কতক টালির ওপর অয়েলক্লথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সস্তায় শীত-ভোগ হয়। উচু চাই—তা না হ'লে সৌখীন বাবুদের বেড়ানো হয় না? কেন রে বাপু, দু'বেলা তালগাছে চড়্লেই ত হয়। যত সব হতভাগা—।"

এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল, তখন বিশ্বকর্ম্মা তাহাকে লইয়া একবার আচ্ছা করিয়া ময়দা-ঠাসা করিয়া-ছিলেন। তাঁর দশ আঙুলের গাঁট্টার ছাপ এখনো রহিয়া গিয়া স্থানে স্থানে পর্ব্বত-উপত্যকা নদী-জলধি সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মার একটি বিরাট্ চিম্‌টির ফল এই হিমালয় পর্ব্বত। নাই দিলে কুকুর মাথায় ওঠে,—ভগবানের আস্কারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জ্জিলিঙে বাসা বাঁধিয়াছে। নকুড়-মামা ধর্ম্মভীরু লোক, অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না।

আমি বলিলাম—"কি জানেন নকুড়-মামা,—কষ্ট পাবার যে আনন্দ, তাই লোকে আজকাল পয়সা খরচ ক'রে কেনে। অমৃত বোস লিখেচে—

ভাগ্যিস্ আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

দার্জিলিং আছে তাই লোকের পয়সা খরচ ক'রে পাহাড়



নকুড় মামা

ভিজোবার বদ্‌খেয়াল হয়েচে। তবে এইটুকু আশার কথা —এখানে মাঝে-মাঝে ধস্ নাবে।"

মামা ত্রস্ত হইয়া খদের কিনারা হইতে সরিয়া রাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ প্রান্তে আসিয়া বলিলেন—"উচ্ছন্নে যাবে। এটা কি ভদ্দর লোকের থাক্‌বার দেশ? যখন-তখন বৃষ্টি, বাসা থেকে বেরুলে ত দশ-তলার ধাক্কা, দু'পা হাঁটো আর দম নাও। তাও সিঁড়ি নেই, হোঁচট খেলে ত হাড়গোড় চূর্ণ। চল্‌লে হাঁপানি, থাম্‌লে কাঁপুনি। কেনরে বাপু?"

নকুড়-মামা চারিদিকে একবার ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সময়টা যদি সত্য ত্রেতা নিদেনে দ্বাপর যুগ হইত এবং মামা যদি মুনিঋষি বা ভস্মলোচন হইতেন, তবে এতক্ষণে সমস্ত দার্জিলিং শহরটা সাহারা মরুভূমি অথবা ছাইগাদা হইয়া যাইত। আমি বলিলাম—"তবে এলেন কেন?"

নকুড়।—আরে এসেচি কি সাধে। কেষ্টার স্বভাব জানো ত? লেখাপড়া শিখ্‌লি, বে-থা কর, বিষয়-আশয় দেখ্—রোজগার ত আর কর্‌তে হবে না। সে-সব নয়। দিনকতক খেয়াল হ'ল, ছবি আঁক্‌লে। তার পর আম-সত্বর কল ক'রে কিছু টাকা ওড়ালে। তার পর কল্‌কাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়ার সর্দ্দার হয়ে একটা সমিতি কর্‌লে। তার পর বম্বে গেল, সেখান থেকে আমাকে এক আর্জেণ্ট্ টেলিগ্রাম। কি হুকুম? না এক্ষুনি দার্জিলিং যাও, মুন্-শাইন্ ভিলায় ওঠ, আমিও যাচ্ছি, বিবাহ কর্‌তে চাই। কি করি, বড়লোক ভাগ্‌নে, সকল আব্‌দার শুন্‌তে হয়। এসে দেখি—মুন্-শাইন্ ভিলায় নরক

দোকানে। বরযাত্রীর দল আগে থেকে এসে বসে আছে। সেই কচি-সংসদ্,—কেষ্টা যার প্রেসিডেণ্ট্।

আমি।—পাত্রী ঠিক হয়েছে?

নকুড়।—আরে কোথায় পাত্রী। এখানে এসে হয়ত একটা লেপ্চানী কি ভুটানী বিয়ে করবে।

আমি।—কচি-সংসদের সদস্যরা কিছু জানে না?

নকুড়।—কিচ্ছু না। আর জান্লেই বা কি, তাদের কথাবার্ত্তা আমি মোটেই বুঝ্তে পারি না, সব যেন হেঁয়ালী। তবে তারা খায়-দায় ভাল, আমার সঙ্গে তাদের ঐটুকুই সম্বন্ধ। কেষ্ট-বাবাজি আজ বিকেলে পৌঁছবেন। সন্ধ্যেবেলা যদি এস, তবে সবই টের পাবে, সংসদের সভ্যদের সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হবে।

কচি-সংসদের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। এদের সেক্রেটারী পেলব রায় আমাদের পাড়ার ছেলে, তার পিতৃদত্ত নাম পেলারাম। বি-এ পাশ করিয়া ছোকরার কচি এবং মোলায়েম হইবার বাসনা হইল। সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি-টাইপিষ্টের খোঁপার মতন মাথার দু'পাশ ফাঁপাইয়া দিল। তার পর মুগার পাঞ্জাবী, গরদের চাদর, সবুজ নাগ্রা ও লাল ফাউণ্টেন পেন পরিয়া মধুপুরে গিয়া আশু মুখুয্যেকে ধরিল—ইউনিভার্সিটির খাতাপত্রে পেলারাম রায় কাটিয়া যেন পেলব রায় করা হয়। স্যার আশুতোষ এক ভলুম এন্সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া করিলেন। পেলারাম পলাইয়া আসিল এবং বি-এ ডিপ্লোমা বাক্সে বন্ধ করিয়া নিরুপাধিক পেলব রায় হইল। তারই উদ্যমে কচি-সংসদ্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তবে যতদূর জানি কেষ্টই সমস্ত খরচপত্র যোগায়। এই কচি-সংসদের উদ্দেশ্য কি আমার ঠিক জানা নাই। শুনিয়াছি এরা যাকে-তাকে মেম্বার করে না এবং নূতন মেম্বারের দীক্ষা-প্রণালীও এক ভয়াবহ ব্যাপার। গভীর পূর্ণিমা নিশীথে সমবেত সদস্যমণ্ডলীর করস্পর্শ করিয়া দীক্ষার্থী ষোলটি ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ষোল টিন সিগারেট পোড়ে এবং এন্তার চা খরচ হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, মেঘও কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই মুন্-শাইন্ ভিলায় যাইব বলিয়া নকুড়-মামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।



পেলব রায়

গৃহিণী তিনছড়া পাঁচসিকা দামের চুণী-পান্নার মালা উপর্য্যুপরি গলায় পরিয়া বলিলেন—"দেখ ত, কেমন মানাচ্ছে।"

আমি বলিলাম—"চমৎকার। যেন পরস্ত্রী।"

গৃহিণী।—তুমি অতি ব্যাভাভেরাস্। পরস্ত্রী না হ'লে বুঝি মনে ধরে না?

আমি।—আরে চটো কেন। পরকীয়াতত্ত্ব অতি উঁচুদরের জিনিষ। তার মহিমা বোঝা যার তার কর্ম্ম নয়, তবে যে নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রীর মতন নিত্যনূতন—ধরি ধরি ধরিতে না পারি—দেখে, সে অনেকটা এগিয়েছে। রাধাকৃষ্ণই হচ্ছেন মডেল প্রেমিক। ফ্রয়েড বলেছেন—

গৃহিণী।—ড্যাম ফ্রয়েড্,—এও্ রাধাকৃষ্ণ মাথায় থাকুন। আমাদের মতন মুখ্খু লোকের সীতারামই ভাল।

আমি।—কিন্তু রাম যে সীতাকে দু-দু-বার পোড়াতে চাইলেন তার কি?

গৃহিণী।—সে ত লোকনিন্দের বাধ্য হয়ে। ত্রেতা-যুগের লোকগুলো ছিল কুচুণ্ডে রাস্কেল।

আমি।—তা—তিনি ভরতকে রাজ্য দিয়ে সীতাকে নিয়ে আবার বনে গেলেই পারতেন।

গৃহিণী।—সেই আহ্লাদে প্রজারা যে রামকে ছাড়তে চাইলে না।

আমি।—বাঃ, তুমি আমার চাইতে ঢের বড় উকীল। আমি তোমাকে রামচন্দ্রের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু ভাগ্যিস্ তিনি সীতার মতন বউ পেয়েছিলেন তাই নিস্তার পেয়ে গেলেন। তোমার পাল্লায় পড়্‌লে অযোধ্যা শহরটাকেই ফাঁসি দিতে হ'ত।

গৃহিণী।—কেন, আমি কি সূর্পনখা না তাড়কা রাক্ষুসী?

আমি।—সীতা ছিলেন গোবেচারী লক্ষ্মীমেয়ে। তোমার মতন আব্‌দেরে নয়।

গৃহিণী।—সোনার হরিণ কে চেয়েছিল মশায়? কত ওজন তার খোঁজ রাখ? যদি ফাঁপা হয় তবু পাঁচ হাজার ভরি।

আমি।—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারই জিত। আর শুনেছ, কেষ্ট যে এখানে বিয়ে কর্‌তে আস্‌ছে। সেই কাশীর কেষ্ট।

গৃহিণী।—হুরে! ভাগ্যিস্ খানকতক গহনা এনেচি। কিন্তু আশ্বিন মাসে লগ্ন কই?

আমি।—প্রেমের তেজ থাক্‌লে লগ্নে কি আসে যায়। তবে পাত্রীটি কে তা কেউ জানে না। হয়ত এখনো পাত্রীই স্থির হয়নি, যদিও বরযাত্রীর দল হাজির।

গৃহিণী।—গ্যাড্‌! শুনেছিলুম কেষ্টর বাপের ইচ্ছে ছিল টুনি-দিদির ননদের সঙ্গে কেষ্টর বিয়ে দিতে। সে মেয়ে ত এখানেই আছে, আর বড়-সড়ও হয়েচে। তারও বাপ-মা নেই, তার দাদা—টুনিদির বর ভুবনবাবু—তিনিই এখন অভিভাবক।

আমি।—তা বল্‌তে পারি না। কেষ্টর মতি-গতি বোঝা শিবের অসাধ্য। যাই হোক, সন্ধ্যার সময় একবার কেষ্টর বাসায় যাব।

মনোহারিণী সন্ধ্যা। জন-বিরল পথ দিয়া চলিয়াছি শহরের সর্ব্বত্র—উপরে, আরো উপরে, নীচে, আরো নীচে, স্তরে স্তরে অগণিত দীপমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু'ধারে ঝোপে জঙ্গলে পাহাড়ী ঝিঁঝির অলৌকিক মূর্চ্ছনা ষড়জ হইতে নিষাদে লাফাইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কুয়াসার চিহ্নমাত্র নাই। ঐ মুন্-শাইন্ ভিলা।

কিসের শব্দ? দার্জিলিং শহরে পূর্ব্বে শেয়াল ছিল না। বর্দ্ধমানের মহারাজা যে-কটা আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তারা কি মুন্-শাইন্ ভিলায় উপনিবেশ স্থাপনা করিয়াছে? না, শেয়াল নয়, কচি-সংসদ্ গান গাহিতেছে। গানের কথা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে আন্দাজে উপলব্ধি করিলাম এক অচেনা অজানা অচিন্তনীয়া বিশ্বতরুণীর উদ্দেশে কচি-গণ হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতেছে। হা নকুড়-মামা, তোমার কপালে এই ছিল?

আমাকে দেখিয়া সংসদ্ গান বন্ধ করিল। মামা ও কেষ্টকে দেখিলাম না। কেষ্ট আজ বিকালে পৌঁছিয়াছে কিন্তু কোথায় উঠিয়াছে কেহ জানে না। শীঘ্রই সে মুন্-শাইন্ ভিলায় আসিবে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পেলব রায় আমাকে খাতির করিয়া বসাইল এবং সংসদের অন্যান্য সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, যথা—

শিহরণ সেন
বিগলিত ব্যানার্জি
অকিঞ্চিৎ কর
হুতাশ হালদার
দোদুল দে
লালিমা পাল (পুং)

এদের নাম কি অন্নপ্রাশন-লব্ধ না সজ্ঞানে স্বনির্ব্বাচিত? ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বাধা দিল। লালিমা পাল মেয়ে নয়। নাম শুনিয়া অনেকে ভুল করে, সেজন্য সে আজকাল নামের পরে 'পুং' লিখিয়া থাকে।

হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া নকুড়-মামা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর পিছনে ও কে? এই কি কেষ্ট? আমি একাই চমকিত হই নাই, সমগ্র কচি-সংসদ্ অবাক হইয়া

দেখিতে লাগিল। হতাশ বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ, সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে,—সে আঁৎকাইয়া উঠিল।

কেষ্টর আপাদমস্তক বাঙালীর আধুনিক বেশ-বিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তার মাথার চুল কদম্ব-কেশরের মতন ছাঁটা, গোঁফ নাই কিন্তু ঠোঁটের নীচে ছোট একগোছা দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা—তাতে বড় বড় সাদা ছিট, কোমরে বেল্ট্, মালকোঁচা মারা, বেগ্‌নি রঙের ধুতি, পায়ে পট্টি ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোঁৎকা, পিঠে ক্যাম্বিসের ন্যাপ-স্যাক ষ্ট্রাপ দিয়া বাঁধা।

আমিই প্রথমে কথা কহিলাম—"কেষ্ট, একি বিভীষিকা?"

কেষ্ট বলিল,—"প্রথমটা তাই মনে হবে, কিন্তু যখন বুঝিয়ে দেব তখন বল্‌বেন হাঁ, কেষ্ট ঠিক করেচে। ব্রজেন-দা, জীবনটা ছেলেখেলা নয়,—আর্ট্ এণ্ড্ এফিশেন্সি।"

আমি।—কিন্তু চেহারাটা অমন কর্‌লে কেন?

কেষ্ট।—শুনুন। মানুষের চুলটা অনাবশ্যক, শীতাতপ নিবারণের জন্যে যেটুকু দরকার ঠিক ততটুকু রেখেচি। এই যে দেখ্‌চেন দাড়ি, একে বলে ইম্পিরিয়াল, এর উদ্দেশ্য নাকটা ব্যালান্স্ করা। আপনারা সাদা ধুতির ওপর ঘোর রঙের জামা পরেন,—অ-সুন্দর। তাতে চেহারাটা টপ-হেভি দেখায়। আমার পোষাক দেখুন—প্লম্-ভায়োলেট্ এণ্ড সেজ-গ্রীন্, হোয়াইট স্পট্‌স্—কলার কন্‌ট্রাষ্ট্ এণ্ড্ হার্মনি। এইবার পাছাপাড় হাফ-প্যাণ্ট্ ফর্ম্মাস্ দিয়েচি, তাতে ওয়েষ্ট-লাইন্ আরো ইম্প্রুভ্ কর্‌বে। এই যে দেখ্‌চেন লাঠি, এতে বাঘ মারা যায়। এই যে দেখ্‌চেন পিঠের ওপর বোঁচকা, এতে পাবেন না এমন জিনিষ নেই। আমি স্বাবলম্বী, স্বয়ংসিদ্ধ, বে-পরোয়া।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কেষ্ট দুই পকেট হইতে দুইপ্রকার সিগারেট বাহির করিল এবং যুগপৎ টানিতে টানিতে বলিল—"পারেন এরকম? একটা ভার্জিনিয়া একটা টর্কিশ। মুখে গিয়ে ব্লেণ্ড্ হচ্চে।"

নকুড়-মামা চক্ষু মুদিয়া অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষবৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অভ্যন্তরে বিস্ময় ও ক্রোধ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল।

পেলব রায় বলিল—"কেষ্টবাবু, আপনি না কচি-সংসদের সভাপতি? আপনি শেষটায় এমন হলেন?"

কেষ্ট।—কচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাক্‌বার সময় হয়েচে।

আমি।—নিশ্চয়ই, নইলে দরকাচা মেরে যাবে। যাক্ ওসব কথা,—কেষ্ট তুমি নাকি বে কর্‌বে?

কেষ্ট।—সেই পরামর্শ কর্‌তেই ত আসা। আপনিও এসেচেন খুব ভালই হয়েচে। প্রথমে আমি প্রেম-সম্বন্ধে দু'চার কথা বল্‌তে চাই।

আমি।—নকুড়-মামা, আপনি ওপরে গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন—আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। যা স্থির হয় পরে জানাবো এখন। তার পর কেষ্ট, প্রেম কি-প্রকার?—একটু চা হ'লে যে হ'ত।

পেলব হাঁকিল—"বোদা—বোদা—।" বোদা বলিল—"হু!"

বোদা কেষ্টর চাকর, নেপালী ক্ষত্রিয়। তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায় যে সে চন্দ্রবংশাবতংস। পেলব তাহাকে দশ পেয়ালা চা আনিতে বলিল।

কেষ্ট বলিতে লাগিল—"প্রেম-সম্বন্ধে লোকের অনেক বড় বড় ধারণা আছে। চণ্ডীদাস বলেচেন—নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কানুর প্রেম। রুশিয়ান্ কবি ভড্‌কাউইস্কি বলেন—প্রেম নেশার রাজা। মেট্‌স্নিকফ বলেন—প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আরো উপকারী। মাদাম্ দে সেইয়ঁ বলেন—প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র, যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেওয়া যায়। ওমর খায়্যাম্ লিখেচেন—প্রেম চাঁদের সরবৎ, কিন্তু তাতে একটু শিরাজী মিশুতে হয়। হেন্‌রি-দি এইটুথ্ বলেছিলেন—প্রেম অবিনশ্বর, একটি প্রেমপাত্রী বধ কর্‌লে ক্রমে ক্রমে আর দশটি এসে জোটে। ফ্রয়েড্ বলেন—প্রেম হচ্চে পশুধর্ম্মের ওপর সভ্যতার পলেস্তারা। হ্যাভেলক্ এলিস্ বলেন—"

কেষ্ট।—এক পয়সাও নেব না। আমি বিবাহ কর্‌তে চাই জগৎকে একটা আদর্শ দেখাবার জন্যে। জগতে দু'রকম বিবাহ চলিত আছে। এক হচ্চে—আগে বিবাহ, তার পরে প্রেম, যেমন সেকেলে হিঁদুর। আর এক-রকম হচ্চে—আগে প্রেম, তার পর বিবাহ, অর্থাৎ কোর্ট্‌শিপের পর বিবাহ। আমি বলি—দু-ই ভুল। আগে বিবাহ হ'লে পরে যদি বনিবনাও না হয়, তখন কোথা থেকে প্রেম আস্‌বে? আর—আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এও সমান খারাপ, কারণ কোর্ট্‌শিপের সময় দু-পক্ষই প্রেমের লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাখে। তার পর বিবাহ হয়ে গেলে যখন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন টু লেট।

আমি।—ওসব ত পুরানো কথা বল্‌চ। তুমি কি ব্যবস্থা কর্‌তে চাও তাই বল।

কেষ্ট।—আমার সিষ্টেম্‌ হচ্চে—প্রেমকে একদম বাদ দিয়ে কোর্ট্‌শিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাক্‌লেই লুকোচুরি আস্‌বে। চাই—দুজন নির্লিপ্ত সুশিক্ষিত নরনারী, আর একজন বিচক্ষণ ভুক্তভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি,—যিনি নানা বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত বেশ ক'রে মিলিয়ে দেখ্‌বেন। আমি একটা লিষ্ট্‌ করেচি। এতে আছে—বেশভূষা, আহার্য্য, শয্যা, পাঠ্য, কলাচর্চ্চা, বন্ধু-নির্ব্বাচন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি ভিরেনব্বইটি অত্যন্ত দরকারী বিষয়, যা নিয়ে স্বামি-স্ত্রীর হরদম মতভেদ হয়ে থাকে। প্রথমেই যদি এই-সব মোকাবেলা হয়ে যায় এবং অধিকাংশ বিষয়ে দু'পক্ষের একমত হয়, আর বাকী অল্প-স্বল্প বিষয়ে একটা রফা করা চলে, তা হ'লে পরে গোলো-যোগের ভয় থাকবে না। কিন্তু খবরদার, গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে, তা হ'লেই সব ভণ্ডুল হবে। শেষে যতখুসি প্রেম হোক তাতে আপত্তি নেই। এতদিন চল্‌ছিল—কোর্ট্‌শিপ, আর আমার সিষ্টেম হচ্চে—হাইকোর্টশিপ।

আমি।—কোর্ট-মার্শাল বল্লে আরো ঠিক হয়। সিষ্টেম ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু এমন পাত্রী কে আছে যে তোমার এই এক্সপেরিমেন্টে রাজী হবে? তবে তুমি যে প্রেমের ভয় কচ্চ সেটা মিথ্যে। তোমার ঐ মূর্ত্তি দেখ্‌লে প্রেম বাপ্‌ বাপ্‌ ক'রে পালাবে।

কেষ্ট।—পাত্রী আমি আজ ঠিক ক'রে এসেচি।

আমি।—কে সেই হতভাগিনী?

কেষ্ট।—পদ্ম, ভুবন বোসের ভগ্নী।

আমি।—আরে! আমাদের টুনি-দিদির ননদ? তাই বল। গিন্নি তা হ'লে ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু শুন্‌লুম তোমাদের বিয়ের কথা নাকি আগেই একবার হয়েছিল। এতে কেস প্রেজুডিস্‌ড হবে না?

কেষ্ট।—মোটেই না। আমরা দু'পক্ষই নির্ব্বিকার। ব্রজেন-দা, আপনাকেই মধ্যস্থ হ'তে হবে কিন্তু। আপনার লিগাল্‌ ম্যাট্রিমনিয়াল্‌ দু'রকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভাল ক'রে জেরা কর্‌তে পার্‌বেন।

আমি।—রাজী আছি, কিন্তু মেয়েটা আমার ওপর না চটে।

কেষ্ট।—কোনো ভয় নেই, পদ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌ লোক।

আমি।—লোকটি ত বুদ্ধিমান্‌, কিন্তু মেয়েটি কেমন?

কেষ্ট।—মজবুত ব'লেই ত বোধ হয়। সাত মাইল হাঁটতে পারে, দু'ঘণ্টা টেনিস খেল্‌তে পারে, মস্কুলার ইনডেক্স খুব হাই, ফেটিগ-কোয়েফিশেণ্ট্‌ বেশ লো। সেলাই জানে, রান্না জানে, লজিক জানে, বাজে তর্ক করে না, ইকনমিক্স্‌ জানে, গান গাইবার সময় বেশী চেঁচায় না। তা হ'লে কাল সন্ধ্যেবেলা ভুবন বাবুর বাড়ী ঠিক যাবেন,—লভলক্‌ রোড, মত্‌লিন কটেজ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহাভিমুখী হইলাম। মুন্‌-শাইন্‌ ভিলার গেট পার হইতেই একটা কোলাহল কাণে আসিল। আন্দাজে বুঝিলাম রুচি-সংসদের রুদ্ধ বেদনা মুখরিত হইয়া কেষ্টকে গঞ্জনা দিতেছে। আমি আর দাঁড়াইলাম না।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী কহিলেন—"রিপিং! পার্শি-থিয়েটারের চাইতেও ভাল। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যদি পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিন্‌তে হয় তাতেও রাজী আছি।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু তোমাকে ত শুন্‌তে দেবে না। হাইকোর্টশিপ গোপনে হয়, ঐটুকুই সাধারণ



'এইবার দেখ ত'

কোর্ট্‌শিপের সঙ্গে মেলে। ঘরে থাক্‌ব শুধু আমি, কেষ্ট আর পদ্ম।"

গৃহিণী।—আড়ি পাত্‌ব।

আমি।—তার দর্‌কার হবে না। সব কথাই পরে শুন্‌তে পাবে। আমার যে কাণ তাহা তোমার হউক।

গৃহিণী।—যাই হোক, আমিও যাব।

আমি।—কিন্তু তোমার ও-রকম কৌতূহল ত ভাল নয়। ফ্রয়েড এর কি ব্যাখ্যা করেন জানো?

গৃহিণী।—খবদ্দার ও মুখপোড়ার নাম কোরো না বল্‌চি।

অগত্যা দুজনেই টুনি-দিদির বাসায় চলিলাম।

ভুবনবাবু ও টুনিদিদি—এঁরা যেন সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি। কর্ত্তাটি কুঁড়ের সম্রাট্, সমস্তক্ষণ ড্রেসিং গাউন পরিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়েন ও চুরুট ফোঁকেন। গিন্নিটি ঠিক উল্টা, অসীম শক্তিময়ী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, মাছ-কোটা হইতে গাড়ী রিজার্ভ করা পর্য্যন্ত সব কাজ নিজেই করিয়া থাকেন, কথা কহিবার ফুরসৎ নাই। তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা শেষ করিয়াই অতিথি-সৎকারের বিপুল আয়োজন করিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। পদ্ম আসিয়া প্রণাম করিল।

খাসা মেয়ে। কেষ্টা হতভাগা বলে কিনা মজবুত! একি হাতুড়ি না হামানদিস্তা? কচি-সংসদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কেউ কচি থাকে, তবে সে কেষ্ট,—যতই প্রেমের বক্তৃতা দিক। ঋষ্যশৃঙ্গের একটা শিং ছিল, কেষ্টর দু'টো শিং। কিন্তু এই সুশ্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ মেয়েটি কেন এই গর্দ্দভের খেয়ালে রাজী হইল? স্ত্রীজাতি বাঁদর-নাচ দেখিতে ভালবাসে। পদ্মর উদ্দেশ্য কি শুধু তাই? স্ত্রীচরিত্র বোঝা শক্ত। নাঃ, মনস্তত্ত্বের বইগুলা ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

হাইকোর্টশিপ আরম্ভ হইল। ঘরের পর্দ্দা ভেদ করিয়া সুদূর রান্নাঘর হইতে টুনি-দিদি ও আমার গৃহিণীর উচ্চ হাসি এবং কাট্‌লেট-ভাজার গন্ধ আসিতেছে। আমি যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য সঞ্চয় করিয়া শুভকার্য্য আরম্ভ করিলাম—

"এই মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, অনুবাদী, সম্বাদী, বিসম্বাদী কে কে তা এখনো স্থির হয়নি। কিন্তু সেজন্য

বিচার আট্‌কাবে না, কারণ দুই সাক্ষী হাজির,—শ্রীমান্ কেষ্ট এবং শ্রীমতী পদ্ম—"

কেষ্ট বলিল—"ব্রজেন-দা, আপনি এই গুরু বিষয় নিয়ে আর তামাশা করবেন না,—কাজ সুরু করুন।"

আমি।—ব্যস্ত হও কেন, আগে যথারীতি সত্যপাঠ করাই।—শ্রীমান কেষ্ট, তুমি শপথ করে বল যে তোমার মধ্যে পূর্ব্বরাগের কোনো কমপ্লেক্স্‌ নেই! যদি থাকে তবে মকদ্দমা এখুনি ডিস্‌মিস্‌ হবে।

কেষ্ট।—একদম নেই। পদ্ম যখন পাঁচ বছরের, আর আমি যখন দশ বছরের, তখন ওকে যে-রকম দেখতুম এখনো ঠিক তাই দেখি। তবে আগে ওকে ঠেঙাতুম, এখন আর ঠেঙাই না।

আমি।—শ্রীমতী পদ্ম, কেষ্টর প্রতি তোমার মনোভাব কি-রকম তা জিজ্ঞেস ক'রে তোমায় অপমান করতে চাই না। কেষ্টর মূর্ত্তিই হচ্চে পূর্ব্বরাগের এন্টিডোট। কেষ্ট, এইবার তোমার সেই ফিরিস্তিটা দাও। বাপ! তিরেনব্বইটা আইটেম্‌। বেশভূষা—আহার্য্য—শয্যা—পাঠ্য—এ ত দেখ্‌চি পাক্কা পনর দিন লাগ্‌বে। দেখ, আজ বরঞ্চ আমি গোটাকতক বাছা বাছা প্রশ্ন করি,—যদি অবস্থা আশাজনক বোধ হয় তবে কাল থেকে সিষ্টেম্যাটিক টেষ্ট্‌ সুরু হবে। আচ্ছা, প্রথমে আহার্য্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি—কারণ ওইটেই সবচেয়ে দরকারী। কেষ্ট, তুমি লঙ্কা খাও?

কেষ্ট।—ঝাল আমার মোটেই সহ্য হয় না।

আমি।—পদ্ম কি বল?

পদ্ম।—লঙ্কা না হ'লে আমি খেতেই পারি না।

আমি। ব্যাড। প্রথমেই চেরা পড়্‌ল। স্বামিস্ত্রীর ত ভিন্ন হেঁসেল হ'তে পারে না। রফা করা চলে কি না পরে স্থির করা যাবে। জলে লঙ্কা সেদ্ধ ক'রে দুজনকে খাইয়ে এমন একটা পার্সেণ্টেজ ঠিক করতে হবে যা দুপক্ষেরই বরদাস্ত হয়। আচ্ছা—তোমরা চায়ে কে ক' চামচ চিনি খাও?

কেষ্ট।—এক।

পদ্ম।—সাত।

আমি।—ভেরি ব্যাড। আবার চেরা পড়্‌ল।

কেষ্ট।—আমি মেরে কেটে তিন চামচ অবধি উঠ্‌তে পারি। পদ্ম, তুমি একটু নাবো না।

আমি।—খবরদার, সাক্ষী ভাঙাবার চেষ্টা কোরো না। যা জিজ্ঞাসা করবার আমিই করব। আচ্ছা—কেষ্ট, তুমি কি-রকম বিছানা পছন্দ কর? নরম না শক্ত?

কেষ্ট।—একটু শক্ত-রকম, ধরুন দু'ইঞ্চি গদি। বেশী নরম হ'লে আমার ঘুমই হয় না।

পদ্ম।—আমি চাই তুল্‌তুলে।

আমি।—ভেরি ভেরি ব্যাড। এই কের চেরা দিলুম। আচ্ছা—কেষ্ট, পদ্মর চেহারাটা তোমার কি-রকম পছন্দ হয়?

কেষ্ট।—তা মন্দ কি।

আমি সাক্ষী-বিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম—"ও সব ভাসা-ভাসা জবাব চল্‌বে না,—ভাল ক'রে দেখ তার পর বল।

পদ্ম লাল হইল। কেষ্ট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া একটু বোকা-হাসি হাসিয়া বলিল—"খা-খ্‌-খাসা চেহারা। এঃ, পদ্ম আর সে পদ্ম নেই, একেবারে—"

আমি।—বস্‌ বস্‌—বাজে কথা বোলো না। পদ্ম, এবারে তুমি কেষ্টকে দেখে বল।

পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কেষ্টর প্রতি চকিত-দৃষ্টির সার্চ্চলাইট্‌ হানিয়া বলিল—"যেন একটি সং।"

কেষ্ট।—তা—তা—আমি না হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আর দাড়িটাও না হয় ফেলে দেব। আচ্ছা এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলুম,—এইবার দেখ ত পদ্ম।

পদ্ম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম—"হোপলেস্‌। আপত্তির প্রতিকার হ'তে পারে, কিন্তু বিদ্রূপের ওষুধ নেই।

কেষ্ট একটু গরম হইয়া বলিল—"আপনিই ত যা তা রিমার্ক্‌ ক'রে সব গুলিয়ে দিচ্চেন।"

আমি।—আচ্ছা বাপু, তুমি নিজেই না হয় জেরা কর।

কেষ্ট প্রত্যালীঢ়-পদে দাঁড়াইয়া আস্তিন গুটাইয়া বলিল —"পদ্ম, এই দেখ আমার হাত। একে বলে বাইসেপ্স্— এই দেখ ট্রাইসেপ্স্। এই-রকম জবরদস্ত গড়ন তোমার পছন্দ হয়, না ব্রজেন-দার মতন গোলগাল নাদুস নুদুস্ চাও? তোমার মতামত জান্‌তে পার্‌লে আমি না হয় আমার আদর্শ-সম্বন্ধে ফের বিবেচনা কর্‌ব।

পদ্ম।—তোমার চেহারা তুমি বুঝবে—আমার তাতে কি। আমি ত আর তোমায় দারোয়ান রাখ্‌চি না।

কেষ্ট।—আচ্ছা, তোমার হাতটা দেখি একবার— কিরকম পাঞ্জার জোর—

কেষ্ট খপ্ করিয়া পদ্মর পদ্ম-হস্ত ধরিল। আমি বলিলাম—"হাঁ হাঁ—ও কি? সাক্ষীর ওপর হাম্‌লা? ও-সব চল্‌বে না—আমার ওপর যখন বিচারের ভার তখন যা কর্‌বার আমিই কর্‌ব। তুমি ঐ ওখানে গিয়ে বোসো।"

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"বেঁশ ত, আপনিই ফের কোশ্চেন্ করুন।"

আমি।—আর দরকার নেই। তোমাদের মোটেই মতে মিল্‌বে না, রফা করাও চল্‌বে না। আমি এই হুকুম লিখলুম—napoo, nothing doing. কেস্ এখন মুলতুবী রইল। এক বৎসর নিজের নিজের মতামত বেশ ক'রে রিভাইজ কর, তার পরে আবার অত্র আদালতে হাজির হইবা।

কেষ্ট এবার চটিয়া উঠিল। বলিল—"আপনি আমার সিষ্টেম কিছু বুঝ্‌তে পারেননি। আপনি যা কর্‌লেন সে কি একটা টেষ্ট্ হ'ল?—শুধু ইয়ার্কি। আপনাকে মধ্যস্থ মানাই ঝকমারি হয়েচে।"

আমিও খাপ্পা হইয়া বলিলাম—"দেখ কেষ্ট, বেশী চালাকি কোরো না। আমি একজন উকীল, বারো বৎসর প্র্যাকটিস করেচি, পনর বৎসর হল বিবাহ করেচি, ঝাড়া একটি মাস সাইকলজি পড়েচি। কার সঙ্গে কার মতে মেলে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। আর—তুমি ত নির্ব্বিকার, তোমার অত রাগ কেন? দেখ দিকি, পদ্ম কেমন লক্ষ্মীমেয়ে, চুপটি ক'রে ব'সে আছে।"

কেষ্ট গজ্ গজ্ করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া টুনি-দিদির ছোট খুকী প্রবেশ করিল।

আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"নারী, তুমি কী চাও?"

খুকীর নারীত্বের দাবী অতি মহৎ এবং সমস্ত নারী-সমাজের অনুধাবনযোগ্য। বলিল—"খাবেন চলুন, লুচি জুড়িয়ে যাচ্চে।"

কেষ্ট কাহারো সহিত আর বাক্যালাপ করিল না, ভাল করিয়া খাইলও না। আহারান্তে আমি একাই নিজের বাসায় ফিরিলাম। গৃহিণী আজ এখানেই রাত্রি-যাপন করিবেন।



'বাবু রাগ্ গিয়া'

পরদিন বেলা দশটার সময় গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সভয়ে দেখিলাম তিনি কম্বলের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে নড়িয়া উঠিতেছেন এবং অস্ফুট শব্দ করিতেছেন।

বলিলাম—"কিক্ ব্যথাটা আবার ধরেচে বুঝি? ডাক্তার দাসকে ডাক্‌ব?"

গৃহিণী কষ্টে বলিলেন—"না, কিচ্ছু দরকার নেই, ও আপনিই সেরে যাবে। হুঃ হুঃ হিঃ।"

হিষ্টিরিয়া নাকি? ও উৎপাত ত ছিল না, নিশ্চয় বেচারা কন্যাকার ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমার মতলব ত জানে না। মেয়েরা চায় রাতারাতি বিবাহটা স্থির হইয়া যাক। আরে অত ব্যস্ত হইলে কি চলে? কেষ্টা সবে বঁড়শী গিলিয়াছে, এখন তাকে আরো দিন-কতক খেলাইতে হইবে।

বৈকালে মুন্-শাইন্ ভিলায় যাইলাম—উদ্দেশ্য কেষ্টকে একটু ঠাণ্ডা করা। কিন্তু কেষ্টর দেখা পাইলাম না, মামাও নাই। কচি-সংসদের সভ্যগণ স্ব স্ব খাটে শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস,—নিশ্চয় একটা বড়-রকম ব্যথা পাইয়াছে।

বোদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবু কাঁহা?"

বোদার বদন-চক্রে দর্শন নিশ্বাস ও বাক্য-নিঃসরণের জন্য যে কয়টি ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহা বিস্ফারিত হইল। বলিল—"বাবু বাগা।"

অ্যাঁ? কেষ্টবাবু ভাগা! কাঁহা ভাগা? নিশ্চয় ভুবনবাবুর বাড়ীতে গিয়া হোগা।

"বুবনবাবু বাগ্ গিয়া। উন্‌কা বিবি বাগ্ গিয়া। উন্‌কা কোকী বাগ্ গিয়া। কোকীকা গোড়া বাগ্ গিয়া। গোয়ে-সি মিসি-বাবা বো থি সো বি বাগ গিয়া।"

কেষ্ট পলাইয়াছে। ভুবনবাবু, তাঁহার বিবি, তাঁহার খুকী, খুকীর ঘোড়া এবং ফর্সা-মতন মিসি-বাবা—অর্থাৎ পদ্ম—সকলেই পলাইয়াছে। নকুড়-মামা বোধ হয় খোঁজে বাহির হইয়াছেন। কচি-সংসদ্ কিছুই জানে না, জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

গৃহিণীর কাণ্ড মনে পড়িল। ফিক্ ব্যথাও নয় হিষ্টিরিয়াও নয়—শুধু হাসি চাপিবার চেষ্টা। তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিলাম।

বলিলাম—"তুমিই যত নষ্টের গোড়া।"

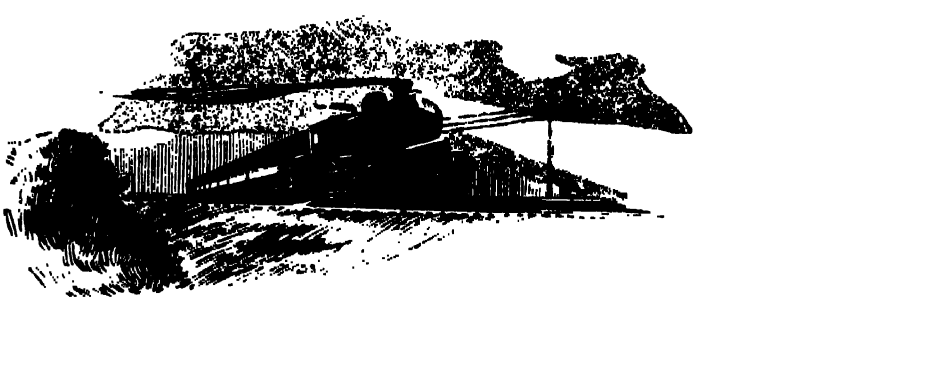
গৃহিণী।—আহা, কি আমার কাজের লোক! নিজে কিছুই করতে পারেন না, এখন আমার দোষ।

আমি।—তার পর ব্যাপারটা কি বল দিকি?

গৃহিণী প্রথমে একচোট হাসিয়া গড়াইয়া লইলেন। শেষে বলিলেন—"তুমি ত রাত সাড়ে দশটায় ফিরে গেলে। টুনি-দিদি আর আমি গল্প করতে লাগ্‌লুম—সে সুখ-দুঃখের কথা। রাত বারোটার সময় দেখি—কেষ্ট টিপি-টিপি আসচে। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বল্লে—কেষ্ট কি হয়েচে? কেষ্ট বল্লে পদ্মর সঙ্গে বে না হ'লে সে আর এ প্রাণ রাখ্‌বে না, তার আর তস্ সইচে না, হয় পদ্ম—নয় কি একটা এসিড। আমি বল্লুম—তার আর চিন্তা কি, আগে সকাল হোক, তার পর যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কেষ্ট বল্লে—সে এক্ষুনি তার সঙের সাজ ফেলে দিয়ে ভদ্দর লোক সাজ্‌বে, কিন্তু অত লাফালাফির পর পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? টুনি-দি বল্লে—কুছ্ পরোয়া নেই, কালকের মেলেই কল্‌কাতায় পালিয়ে চল, গিয়েই বে দেব। পদ্ম বিগ্‌ড়ে এস্‌ল। টুনি-দি বল্লে, নে নেঃ—নেকী। টুনি-দিকে জানো ত, তার অসাধ্য কাজ নেই। সেই রাত্রেই মশায় মোট বাঁধা হ'য়ে গেল,—তেবট্টিটা লগেজ। তার পর আজ সকালে তাদের ট্রেনে তু'লে দিয়ে এখানে চ'লে এলুম।"

বিবাহের পর দেড়মাস কেষ্ট আমার সঙ্গে লজ্জায় দেখা ক'রে নাই,—সবে কাল আসিয়া ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিয়াছি এবং মনস্তত্ত্ব হইতে নজীর দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে তাহার লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই। কেষ্টর মনের আড়ালে যে আর একটা উপ-মন এতদিন ছাই-চাপা ছিল তাহারই ভূমিকম্পের ফলে সে বাঁদর নাচিয়াছে।

কচি-সংসদ্ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কেষ্ট আবার একটা নূতন ক্লাব স্থাপনা করিয়াছে—হৈহয়-সঙ্ঘ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হৈহয়-ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই। ইহার মেম্বার—সস্ত্রীক আমি ও কেষ্ট। এই বড়দিনের বন্ধে আমরা হাওড়া হইতে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত হৈ চৈ করিতে যাইব।



কানপুরে জাতীয় সপ্তাহ

শ্রী প্রভাত সান্যাল

বাংলা পৌষ মাসের গোড়ার দিকের একটি সপ্তাহ ভারতের জাতীয় সপ্তাহ আখ্যা পাইতে পারে। কারণ এই সপ্তাহে ভারতবর্ষে যেন একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। ভারতের নানা সহরে এই সময়ে সভা-সমিতি ও সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। বিশেষতঃ যেখানে নিখিল-ভারত জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয়, সেই স্থানটি সভাসমিতির প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। এবার কানপুরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে—সেই অধিবেশনের সঙ্গে-সঙ্গে



কানপুর সহরের এক-অংশের সাধারণ দৃশ্য



সরোজিনী নাইডু, চত্বারিংশৎ নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতি (ভারবানে গৃহীত ফটো হইতে)

সেখানে নানা প্রকারের প্রায় ৩৪টি সম্মিলনের বৈঠক বসে। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কানপুর সহরের ও সেইসকল সভাসমিতির কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

কানপুর আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি সহর। লক্ষ্নৌ হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে সহরটি অবস্থিত। সহরের নিকটবর্ত্তী নদীকূলে বহু ষ্টীমার ও দেশী ডিঙ্গির সমাগম হয়, কারণ ইহা বর্ত্তমানে উত্তর ভারতের প্রধানতম ব্যবসাকেন্দ্র। বহুদিন পূর্ব্বে অযোধ্যা ও বাংলার অধিবাসিগণ উত্তর ভারতের অভিযানকারীদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত এখানে একটি সেনানিবাস নির্ম্মাণ করে।

কানপুরের অতীত ইতিহাস অতি অল্পদিনের। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও কানপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ জনমানবশূন্য প্রান্তর মাত্র ছিল। আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সচেন্দীর রাজা হিন্দু সিংহ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গঙ্গা-



কানপুরের কারখানা-সমূহের দৃশ্য

হইতে ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত) রাজা ঘনশ্যাম সিংহ চৌহানের উপর নগরের অট্টালিকা-সমুদায় নির্ম্মাণের ও লোকবসতি করাইবার ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের (অপর নাম কানাই বা কানু) জন্মদিনে স্থাপিত বলিয়া নগরটির নামকরণ হইল কানপুর। সেই-সময়ে নির্ম্মিত তোরণদ্বার ও গঙ্গার ঘাট অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে ও তৎকালীন একটি দুর্গের

স্নান করিতে আসিয়া এই স্থানের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন। এমন শুভদিনে এই মনোরম স্থানে নগর পত্তন করিলে কালক্রমে উহা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া তাঁহারই খ্যাতি বৃদ্ধি করিবে এইরূপ আশা লইয়া তিনি এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন। কিন্তু তিনি নিজে বেশী দিন-সেখানে অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নিজরাজ্যে প্রত্যা-বর্ত্তনের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার অধীনস্থ রামাইপুরের (কানপুর



কানপুরে ওয়েষ্টন রোডের উপরের মন্দির। এই রাস্তা নির্ম্মাণকালে মন্দিরের দক্ষিণস্থিত মস্‌জিদ লইয়া দাঙ্গা হয়



জগমন্‌ঘাট ও মহাদেবের মন্দির, কানপুর

ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

একটি প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছাড়া অন্যান্য কারণেও কানপুর ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ সহর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বিষয়েও সহরটি ক্রমশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ পর্য্যন্ত কানপুর অযোধ্যার নবাবদিগের রাষ্ট্রভুক্ত ছিল। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার

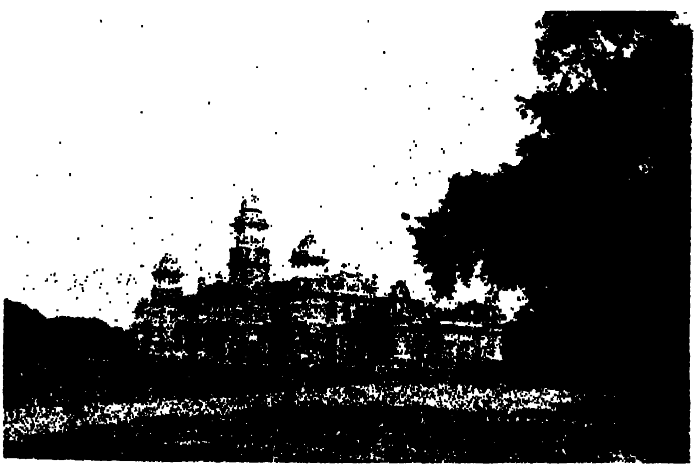
তৎকালীন নবাব সর্ সিডিয়ারি সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইংরেজ সেনানিবাসরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য সহরটি কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই (১৮০১ খৃঃ) ইহা বৃটিশের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়।



কানপুর কৃষি-বিদ্যালয়

সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে কানপুর সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের অনেকেই উক্ত যুদ্ধের যতকিছু দোষ তাহা সমস্তই ভারতীয় সিপাহীদিগের স্কন্ধে আরোপ করিয়া থাকেন। সে-কালের সে-সব বেদনা-মাখা পুরাতন স্মৃতি পুনরায় জাগ্রৎ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে মিঃ ফরেষ্ট্ লিখিত এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "ভারতীয় বিদ্রোহ" (Indian Mutiny) নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে যে নানা-সাহেব স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে-সময় স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার বা অপমানের কোনোও প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসম্বন্ধে ১৯২৫খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "পদকের অপর পার্শ্ব" (The Other Side of the Medal) নামক পুস্তকে গ্রন্থকার এডোয়ার্ড টমসন্ লিখিয়াছেন :

There is long overdue a new orientation in the histories of India. We must no longer stress the Black Hole of Calcutta, and ignore the seventy suffocated Moplah prisoners of our railway vans; we must no longer stress Cawnpore, and ignore Benares and Allahabad and Delhi and Renaud's march on Cawnpore. If there was one phrase more than another in Romesh Dutt's dignified appeal to us which should win our respectful sympathy, it was his request that the darker incidents of the mutiny (or such as we chose shall be told) should be expunged from books, "at least as recorded in school-books meant for boys". Why should Indian boys be compelled to read about the fiendish work at the well, when there is not a word said about Neill's fiendish work on the way to the well?—(p. 126)



এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল্ হল, কানপুর

ভাবার্থ :—বহুদিন পূর্ব্বেই ভারতীয় ইতিহাসগুলি নূতন করিয়া লিখিবার সময় আসিয়াছে। অন্ধকূপ হত্যাকে বড় করিয়া তোলা কিন্তু সেই সঙ্গে চলন্ত রেলগাড়ীতে ৭০ জন মোপ্‌লার দম বন্ধ হইবার ব্যাপারটাকে গোপন করিয়া যাইবার দিন আর নাই। এখন শুধু কানপুরের ঘটনাবলীর (বিদ্রোহসংক্রান্ত) বিস্তৃত বিবরণ দিয়া অথচ সেই সঙ্গে বারাণসী, এলাহাবাদ, দিল্লীর ব্যাপারগুলি ও রেনাডের কানপুর

অভিযানের বৃত্তান্ত গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। ৺রমেশচন্দ্র দত্তের কথা সমর্থন করিয়া মিঃ টমসন্ বলিয়াছেন যে, স্কুল-পাঠ্য পুস্তকগুলি হইতে অন্ততঃ সিপাহী বিদ্রোহের তথাকথিত অখ্যাতিজনক ঘটনাগুলি বাদ দেওয়া উচিত।

স্থান নির্দ্দেশ হয়। কানপুর চাম্ড়ার দ্রব্যাদির কার্বারের জন্যও বিখ্যাত। কাপড়ের কল, ময়দার কল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কল, তাম্বু, টুইল, তোয়ালে ইত্যাদি তৈয়ারির কল, চিনির কল, সুতার কল প্রভৃতি অনেকগুলি কলকার্খানা এই সহরে অবস্থিত। কিন্তু এখানকার



ক্রাইষ্ট্ চার্চ্চ, কানপুর



মেমোরিয়াল্ ওয়েল (সিপাহী যুদ্ধের স্মৃতি কূপ)

কানপুর যুক্তপ্রদেশের অপেক্ষাকৃত নবীন সহর। সেই কারণেই এখানে আগ্রা বা লক্ষ্ণৌ সহরের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সৌধমণ্ডলী নাই। ইতিমধ্যেই ক্রাইষ্ট্ কলেজ, কৃষি কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং ও ব্যবহারিক-শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ইহাকে একটি বিদ্যাকেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্, আউধ রোহিলখণ্ড, রাজপুতনা এবং ইণ্ডিয়ান্ মিড্ল্যাণ্ড্ এই চারিটি রেলপথ কানপুরে আসিয়া মিলিয়াছে। বাণিজ্যকেন্দ্ররূপেও কলিকাতা, বোম্বাই, করাচি, মান্দ্রাজ, ও রেঙ্গুন এই পাঁচটি বন্দরের পরেই কানপুরের

অধিকাংশ কলই বিদেশী মূলধনে স্থাপিত। চাম্ড়া ও অন্যান্য অনেক কাঁচা মাল এখানে আম্দানি হয় ও পরে সেগুলি বাহিরে রপ্তানী হয়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কানপুরের লোকসংখ্যা ১৫১,৪৪৪ ছিল ১৯১১ সালের আদম-সুমারীতে এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ১৭৮,৫৫৭ হয় এবং ১৯২১ সালে উহা ২১৩,০৪। দাঁড়াইয়াছে। এখানকার অধিবাসীগণ অধিকাংশ হিন্দু। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের অনেকেই অযোধ্যা নবাবগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত আমির-ওমরাহগণের বংশধর।



দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদল

দরিদ্র হিন্দুগণের সাহায্যদান-কল্পে এখানে একটি "দরিদ্র-সদন" স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি জন-হিত-কর প্রতিষ্ঠান কানপুর-বাসীদের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছে।



মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের সভাপতি



ডাক্তার এন্ সি হার্দ্দিকর, নিখিল-ভারত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নায়ক



ডা: মুরারীলাল জাতীয় মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক

জাতীয় সপ্তাহে কানপুরে যে-সমস্ত সভা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সভা	সভাপতি
নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু
হিন্দু মহাসভা	শ্রীযুক্ত এন্ সি কেলকার
খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স্	মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
আর্য্য-স্বরাজ্য সভা	শ্রীযুক্ত টি, এল্, ভাস্‌ওয়ানী
রাজনৈতিক বন্দী সম্মিলন	স্বামী গোবিন্দ দাস
কৃষক ও শ্রমিক-সম্মিলন	লালা লজপৎ রায়
নিখিল-ভারত কবি-সম্মিলন	পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদ
নিখিল-ভারত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী	শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী
৯। সনাতন ধর্ম্ম সম্মেলন	আচার্য্য রঘুবীর দয়াল
১০। অস্পৃশ্যতা-নিবারণী সম্মেলন	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
১১। মেথর সম্মেলন	ডাক্তার সত্যপাল
১২। আর্য্য-সমাজ সম্মেলন	শ্রীযুক্ত টি এল ভাস্‌ওয়ানী
১৩। রাষ্ট্র ভাষা সম্মেলন	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র রাও
১৪। সাম্যবাদী সম্মেলন	শ্রীযুক্ত সিঙ্গরাভেলু চেট্টি

সভা	সভাপতি
দেশীয় রাজ্যের প্রজা পরিষৎ	শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল কউল
লোক্যাল বোর্ড্‌স্ কন্‌ফারেন্স্	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল
স্বদেশী প্রদর্শনী	মহাত্মা গান্ধী
সঙ্গীত সভা	শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দিগম্বর
কুর্ম্মী ক্ষত্রিয় সভা	শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনলাল
২০ ভারতীয় পাঠাগার সম্মেলন	শ্রীযুক্ত এন্, সি, কেল্‌কার
২১ বিদ্যার্থী সম্মেলন	আচার্য্য এ,টি, গিদ্‌ওয়ানী
২২ শিখ দীওয়ান	সর্দ্দার মহাতাব সিং

২৩, আত্মবিদ্যা পরিষৎ ২৪। কলোয়ার মহাসভা, ২৫। রাজপুত ধর্ম্মসভা, ২৬। চৌরাশীয়া রাজপুত সভা, ২৭। বর্ণঅয়াল বৈশ্য সভা, ২৮। গোরক্ষিণী মহাসভা, ২৯। শুদ্ধি সভা, ৩০। তাম্বুলি সভা, ৩১। ওমর বৈশ্য সভা, ৩২। বিধবা-বিবাহ সহায়ক সভা, ৩৩। ভারতীয় অধ্যাপক সভা ৩৪। পরলোক তাত্ত্বিক সম্মেলন।

এইসমস্ত সম্মিলনী এত বিভিন্ন প্রকারের—রাজনৈতিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক সভা হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার পর্য্যন্ত—এত বিচিত্র বিষয়ে ইহাদের অভিব্যক্তি যে ইহাদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়

জীবনের বহুমুখী ভাবই প্রতিফলিত হইয়াছিল। আমরা ইহাদের মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই মহাসভার সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন যুক্ত-প্রদেশের বিখ্যাত কর্ম্মী ডাক্তার মুরারী-লাল। জাতীয় মহাসভার সঙ্গে একটি খাদি প্রদর্শনীও হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। খাদি-মণ্ডপে নানা প্রদেশ হইতে আনীত খদ্দরের দ্রব্য-সম্ভার প্রদর্শিত হয় এবং চরকা ও তাঁত চালনের প্রতি-যোগিতা হয়। সুখের বিষয় সুদূর কানপুরেও চরকা-প্রতিযোগিতায় বাংলা বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। প্রদর্শনীতে সুতা-কাটা প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রথম হইয়াছেন। ১৫ নম্বরের



নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী



শ্রীমতী সাঙ্গবাই দীক্ষিত, মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর নেত্রী



পণ্ডিত রামকুমার, অভ্যর্থনা-সমিতির অর্থ-সচিব

সুতা ঘণ্টায় ২৯৫ গজ হিসাবে কাটিয়া তিনি বিভিন্ন দেশাগত দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কংগ্রেস ক্যাম্পের নাম তিলক-নগর দেওয়া হইয়াছিল। তিলক-নগরেই সমাগত নেতা ও প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মহাসভার অধিবেশনের পূর্ব্বে লালা লাজপৎ রায় এই অধিবেশনের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয়-পতাকা স্থাপন করেন। মহাসভা-সম্পর্কে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতি। ডাক্তার আব্দুর



শ্রীযুক্ত জি, জি, যোগ
স্বেচ্ছাসেবক সমিতির সম্পাদক

রহমানের নেতৃত্বে তাঁহারা মহাসভার সমক্ষে তাঁহাদের অভিযোগ বিবৃত করেন। শ্রীমতী সাঙ্গবাই দীক্ষিতের নেতৃত্বে মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা দল জাতীয় মহাসভায় সুশৃঙ্খলার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। এবার মহাসভায় মোট ৩১৬২ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী প্রতিনিধির সংখ্যা ৪২৭।

অন্যান্য রাজনৈতিক সম্মিলনী সমূহের মধ্যে নির্য্যাতিত রাজনৈতিক-বন্দী সম্মিলন ও সাম্যবাদীদের সম্মিলনের কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক-বন্দী সম্মিলনের সভাপতি স্বামী গোবিন্দদাস তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, এইসমস্ত নির্য্যাতিত স্বদেশ-সেবকেরা স্বাধীনতাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া তাহার জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাদেরই ত্যাগ ও দুঃখের মূলে যে সুবিধা লাভ হইয়াছে তাহাই দেশের অন্য সকলে ভোগ করিতেছে। সাম্যবাদী-দল দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আর-একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের কথা এইস্থানে বলা দরকার। এই সম্মিলনের নাম নিখিল-ভারত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সম্মেলন। এই বাহিনী গঠনের জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত এন্ সি হার্দ্দিকর দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন। জাতীয় স্বেচ্ছা-সেবক সঙ্ঘ স্বাধীনতা বা স্বরাজ আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য্য এ-কথা সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী, শ্রীমতী সরোজনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতাগণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হার্দ্দিকর যেদিক্ দিয়া দেশ-মাতৃকার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেদিকে আর কেহ তেমন ভাবে প্রাণমন উৎসর্গ করিয়া কাজ করেন নাই। আশা করা যায় শীঘ্রই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইবে এবং সেগুলি নিখিল-ভারত স্বেচ্ছা-সেবক-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি সুগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ বিপুল স্বেচ্ছাসেবক-দল জাতীয় মহাসভার পতাকা-তলে সম্মিলিত হইয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে।

বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য পৃথ্বীরাজ রাসোর ঐতিহাসিকতা

অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল, এম্‌-এ

ঘ

রাসোর ২৫।২৬ সময়ে আছে যে, একজন দক্ষিণ-দেশীয় বাজীকর উত্তর ভারতে তীর্থ করিতে যাইতেছিল, পথে পৃথ্বীকে খেলা দেখাইয়া কিছু লাভ করিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখে পৃথ্বী শুনিলেন, সে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি-বাসী, দেবগিরিতে যাদব ভানু সে-সময়ের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। ভানুর অদ্বিতীয়া সুন্দরী কন্যা শশিবৃতার সহিত কনোজপতি জয়চন্দ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ আর কয়েক দিবস পরে হইবে। পৃথ্বী বাজীকরকে বিদায় দিয়া শশিবৃতার রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিবাহের আর বেশী দিন ছিল না, অতএব পরদিবস চন্দ কবিও কতকগুলি যোদ্ধা লইয়া দেবগিরি যাত্রা করিলেন। দেবগিরিতে ভানু ও জয়চন্দ্রের মিলিত সৈন্যদের পরাস্ত করিয়া ভানুকে কন্যাদান করিতে বাধ্য করিলেন, ও নব বধূ লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। দেশে ফিরিবার পরই ভানুর দূত গিয়া বলিল যে, আপনাকে কন্যাদান করা হইয়াছে বলিয়া জয়চন্দ্র দেশ হইতে আরও সৈন্য আনাইবার আদেশ পাঠাইয়াছেন, তাহারা আসিলে, দেবগিরি ছারখার করিবেন। দেবগিরি-পতি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। পৃথ্বী আবার সৈন্যসহ দেবগিরি আসিলেন, ও জয়চন্দ্রের সেনাপতিদের তাড়াইয়া দিলেন।

এ যুদ্ধের সন নাই; এইমাত্র আছে যে, সমুদ্রশিখর গড়ের পদ্মাবতীর বিবাহের পর মাঘ মাসে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে কল্যাণে সোলঙ্কীদের প্রবল রাজ্য কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী ছিল। এ কল্যাণ বম্বে হইতে ৩৪ মাইল ক্ষুদ্র নগর কল্যাণ [Kalyan Junction, G. I. P. Ry.] নহে। আধুনিক নিজাম রাজ্যে কল্যাণ বা কলিয়ানী (Kaliani) এখনও এক সামন্ত নবাব বা জায়গীরদারের রাজধানী। কলিয়ানী যে এককালে সমৃদ্ধিশালী ও প্রবল রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। কল্যাণের সোলঙ্কীদের রাজ্য এককালে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত, উত্তরে নর্ম্মদা ও দক্ষিণে কাঞ্চী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন দেবগিরি কল্যাণের একটি দুর্গ। পৃথ্বীর যৌবনাবস্থায় কল্যাণের পতন আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনও দেবগিরিতে কল্যাণরাজের বেতনভুক্ দুর্গরক্ষক থাকিতেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের পর দেবগিরির যাদব দুর্গেশ কল্যাণের রাজার সংস্রব ত্যাগ করিলেন, ও স্বাধীনভাবে রাজ্য স্থাপন করিয়া ধীরে-ধীরে বলসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেবগিরির যাদবেরা পূর্ণ গৌরবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে কুমার আলাওউদ্দীন খিলজী দেবগিরি আক্রমণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণাত্যে ইহাই মুসলমানদের সসৈন্য * প্রথম যুদ্ধ-অভিযান। পৃথ্বীর বিবাহের সন নাই বটে, কিন্তু ১১৮৯র পূর্ব্বে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১১৭৩।৭৪র ঘটনা হইবে। তখন দেবগিরিতে ভানুরূপী প্রবল যাদব-রাজার উদয় হয় নাই, তখনও সেখানে কল্যাণরাজের বেতনভুক্ দুর্গরক্ষক ছিলেন। অতএব শশিবৃতা কাল্পনিক নায়িকা-

* মুসলমান সৈন্য ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণে গিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণাত্যের ভিন্ন ভিন্ন-স্থানে মুসলমান সাধুরা গিয়া আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থানীয় রাজারা তাঁহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা তপস্যা করিয়া সময় কাটাইতেন ও কিছু-কিছু ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। তাঁহারা আপনাদের সাধুব্যবহারের জন্য দেশবাসীর কাছে সম্মানিত ছিলেন। হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতের পশ্চিমতীরে নানাস্থানে অরবরা বাণিজ্য করিতে আসিত। দেশের একজন রাজা যখন শুনিলেন যে, অরব দেশে এক ক্ষমতাপন্ন সাধুর আবির্ভাব হইয়াছে, তখন স্বয়ং গিয়া দর্শন করিয়া তাঁহার কাছে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মগ্রহণ করিলেন। ফিরিবার সময়ে কয়েকটি প্রচারক আপনার প্রজাদের শিক্ষা দিতে আনিলেন। ঐ রাজার দেশে কতক অরবরা বাস করিয়াছিল, ঐ অরব ও নূতন মুসলমান প্রজাদের বংশধর এখন মোপ্‌লা নামে প্রসিদ্ধ। অতএব ভারতে দাক্ষিণাত্যেই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমান আসিয়াছে। ইহারা ৬২২ ও ৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আসিয়াছিল।

মাত্র। পরবর্ত্তী কালের লেখক দেবগিরির প্রবল যাদব-রাজাদের গল্প শুনিয়া ঐরূপ লিখিয়াছে, কিন্তু যাদব-রাজারা পৃথ্বীর সমসাময়িক কি না, তাহা খোঁজ করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে নাই।

৬

রাসোর ৩৩ সময়ে ইন্দ্রাবতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। মালব-রাজ ভীমদেব কন্যাদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পৃথ্বীর কাছে পুরোহিত পাঠাইলেন। পৃথ্বী স্বীকার করিলেন, ও কতকগুলি বন্ধু, সুর ও সহচর লইয়া মালবে বিবাহ করিতে গেলেন। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি রেবা [নর্ম্মদা] তীরে শিকার খেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিবাহের ২।৩ দিন পূর্ব্বে চর-মুখে সংবাদ পাইলেন, ঘোরী চিতোর আক্রমণ করিয়াছে। চিতোরের রাণা সমরসিংহ পৃথ্বীর ভগ্নীপতি, অতএব তিনি আর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ খড়্গ রাখিয়া তিনি চিতোর চলিয়া গেলেন। ইহাতে ভীমদেব আপনাকে অপমানিত * বিবেচনা করিলেন, ও খড়্গের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন। পরে কবি চন্দের উপদেশ ও অনুরোধে স্বীকৃত হইলেন। চন্দ যখন খড়্গের সহিত বিবাহিতা ইন্দ্রাবতীকে লইয়া দিল্লী পহুঁছিলেন, সেই সময়ে পৃথ্বীও ঘোরীকে পরাজিত করিয়া বিজয়-গৌরবে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজধানীতে উৎসবের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইল।

এ বিবাহের তারিখ বা সন নাই। ইহার কিছু পূর্ব্বে ২৮ সময়ে মালব-রাজের নাম যাদব রায়, সোমেশ্বরের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন দেখা যায়। পাঠক অনুমান করিতে পারেন যে,৩৩ সময়ের ভীমদেব ২৮ সময়ের যাদবরায়ের পুত্র বা উত্তরাধিকারী হইবেন।

মালবের প্রমারেরা এককালে অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। বহুকাল এই বংশ হইতেই সম্রাট্ নির্ব্বাচিত হইয়াছে; মহারাজ ভোজ ও বিক্রমাদিত্য এই বংশই অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যও সে-সময়ে অতি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কালক্রমে—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম অংশে—তাঁহারা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, সেকালের রাজা যশোবর্ম্মা গুজরাট-পতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের কাছে পরাজিত হইয়া গুজরাটের সামন্ত-পদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে জয়ী জয়সিংহ ও পরাজিত যশোবর্ম্মা উভয়ের মৃত্যু হইল। তখন গুজরাটের সোলঙ্কীরা নামে দেশ জয় করিয়াছে কিন্তু দেশবাসী সোলঙ্কীদের আধিপত্য স্বীকার করিতেছে না। যশোবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র জয়বর্ম্মা নামমাত্র রাজা হইলেন। তাঁহার এক ভাই অজয়বর্ম্মা কতক অংশে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন, অন্য ভাই লক্ষ্মীবর্ম্মা জয়বর্ম্মার অনুমতি লইয়া কতক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন, অথচ সমস্ত মালবে সোলঙ্কীরা আপনাদের অধিকার প্রকাশ করিত। মালব-রাজবংশের দুই শাখা হইয়া গেল। এইসকল কারণে ১১৪৩ হইতে ১১৭৯ খৃঃ পর্য্যন্ত বিশ্বসনীয় ইতিহাস পাওয়া যায় না; যদিও উভয় শাখার রাজাদের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে।

পৃথ্বীরাজের নিধনের পর চোহানদের দেশের মণ্ডলকর [আধুনিক মেবার-রাজ্যে অবস্থিত মাণ্ডলগড়]-বাসী আশাধর নামক কবি মুসলমানদের অত্যাচার ও অনাচারের ভয়ে মালব দেশে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, ও সৌভাগ্যক্রমে সেকালের সান্ধি-বিগ্রহিক [Foreign Minister] কবি বিল্হনের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মালব-রাজবংশের উভয় শাখার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন। প্রথম শাখার জয়বর্ম্মার ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্ম্মার ১১৪৩ খৃষ্টাব্দের লিখিত দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার পিতা যশোবর্ম্মার ১১৩৪ খৃষ্টাব্দের দান স্বীকৃত হইয়াছে। লক্ষ্মীবর্ম্মার পুত্র হরিশ্চন্দ্রের ১১৭৯ খৃষ্টাব্দের দানপত্র, ও হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়বর্ম্মার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। অন্য শাখার, অজয়বর্ম্মার পুত্র বিন্ধ্যবর্ম্মার সময়ে আশাধর আসিয়া তাঁহার রাজ্যসীমাতে বাস করিয়াছিলেন। পৃথ্বীর পতন-কালে তিনিই রাজা

* বড় রাজারা ছোট রাজার গৃহে গিয়া বিবাহ করেন না, প্রায় খড়্গ পাঠাইয়া দেন, সেই খড়্গের সহিত বিবাহিতা কন্যা পতিগৃহে আসিলে আবার যথাশাস্ত্র বিবাহ হয়। কখন-কখন রাজারা অবিশ্বাস করিয়া সমান মর্য্যাদার অন্য রাজার বাটী যাইতে চাহেন না। কন্যাদান করিয়া ছল করিয়া শত্রুকে মারিয়া ফেলিবার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ছিলেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যবর্ম্মার পুত্র সুভট-বর্ম্মা রাজা ছিলেন।

এই রাজাদের যখন দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের ঐ সময়ে অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। উঁহাদের অস্তিত্ব সত্য হইলে রাসোর ভীমদেব যাদবরায় ও ইন্দ্রাবতী যে কল্পিত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

চ

রাসোর ৩৬ সময়ে আছে যে, রণথম্বের যাদব-বংশীয় রাজা ভানুর কন্যা হংসাবতীকে চন্দেরীর শিশুপাল-বংশীয় রাজা পঞ্চাইন বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ভানু ঐ বিবাহ অনুমোদন করিলেন না, অথচ বলবান্ পঞ্চাইনকে নিরস্তও করিতে পারিলেন না। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া বলবান্ পৃথ্বীরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আপনাকে কন্যাদান করিলাম, আপনি পঞ্চাইনকে পরাস্ত করিয়া হংসাবতীকে গ্রহণ করুন। পৃথ্বীরাজ পঞ্চাইনকে পরাজিত করিয়া হংসাবতীকে বিবাহ করিলেন।

এ বিবাহেরও তারিখ ও সন নাই, তবে ইন্দ্রাবতীর বিবাহের পরের বর্ণনা, অতএব তাহার পরে হওয়াই সম্ভব।

পৃথ্বীরাজের জীবন-কালে রণথম্ব স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল না, শাকম্ভরী-পতিদের অর্থাৎ পৃথ্বীরাজের একটি দুর্গ-মাত্র ছিল, সেখানে পৃথ্বীরাজের বেতনভুক্ একজন দুর্গ-রক্ষক থাকিত। হাম্মীর মহাকাব্য পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর বহুপরে একজন জৈন সাধুর রচনা [১৪৪৩ খৃঃ]। হাম্মীর এই চোহান্ বংশোদ্ভব পৃথ্বীরাজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, ও রণথম্বের রাজা ছিলেন। ঐ কাব্যে পৃথ্বীর সবিস্তার বর্ণনা আছে, এই কাব্যে আছে যে পৃথ্বীর পতনের পর, অজমীর মুসলমানদের হস্তগত হইলে, পৃথ্বীরাজের পুত্র গোবিন্দরাজ রণথম্বকে আপনার বাসোপযোগী করিয়া আপনার রাজধানী করিলেন। এই গোবিন্দরাজই রণথম্বের প্রথম রাজা। পৃথ্বীর জীবনকালে রণথম্বে রাজা ছিল না।

১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডের রাজা পরমাল চন্দেলের তিনটি রাজধানী ছিল, পূর্ব্বে কালিঞ্জর, মধ্যে মহোবা ও পশ্চিমে চন্দেরী। মদনপুরের শিলালেখ-অনুসারে ১১৮২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বী পরমালের পশ্চিমার্দ্ধ রাজ্য ও তাহার সহিত চন্দেরী ও মহোবা জয় করিয়া লইলেন। অতএব ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চন্দেরীতে পরমালের বেতনভুক্ ও পরে পৃথ্বীর বেতনভুক দুর্গরক্ষক থাকিত।

অতএব পৃথ্বীর জীবিতাবস্থায় রণথম্ব ও চন্দেরী উভয় স্থানে রাজা-রাণী ছিল না, অগত্যা রাজকন্যা হংসাবতীও ছিল না। যে-কালে রাসো রচিত হইয়াছে, সেকালে সম্ভবতঃ চন্দেরীতে ও রণথম্বে উভয় স্থানে রাজাদের বাস হইয়াছে, সেইজন্য এরূপ গল্প রচনা করা হইয়াছে।

ছ

রাসো-অনুসারে সোমেশ্বরের, দিল্লীর অনঙ্গপাল তোমরের কন্যা কমলার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল, বড় পৃথ্বীরাজ ও ছোট পৃথা-কুমারী। রাসোতে পৃথ্বীর আর এক ছোট ভাইর উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি কাহার গর্ভজাত লেখা নাই। এই পৃথা-কুমারীর বিবাহ চিতোরের রাণা সমরসিংহের সহিত হইয়াছিল। পৃথ্বী দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিতে যাইবার ২।৪ দিবস পূর্ব্বে পৃথার বিবাহ হইয়াছিল, তখন পৃথ্বীর বয়স ১২, অতএব পৃথার ১০ সম্ভব। সমরসিংহ ১১৯৩ খৃঃ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে পৃথার গর্ভজাত একমাত্র পুত্র রত্নসিংহ চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সমরসিংহ, ও তাঁহার পুত্র রত্নসিংহের কয়েক-খানি দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমরসিংহ পৃথ্বীর পতনের প্রায় একশতাব্দী পরে—খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও রত্নসিংহ তাহার পর আলাউদ্দীন খিলজীর সমসাময়িক ছিলেন। চিতোরের রাণাদের মধ্যে একাধিক সমরসিংহ বা রত্নসিংহের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না, অতএব সমরসিংহ পৃথ্বীর সমসাময়িক বা ভগ্নীপতি ও রত্নসিংহ তাঁহার ভাগিনা হইতে পারেন না।

হাম্মীর মহাকাব্য-অনুসারে সোমেশ্বরের রাণী কর্পূরা-দেবীর গর্ভে দুই পুত্র পৃথ্বীরাজ ও হরিরাজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

জ

রাসোর নানা স্থানে, কোথাও বা প্রকাশ্যে, কোথাও ইঙ্গিতে কবি বলিয়াছেন যে, কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্বীর ঈর্ষা করিতেন; পৃথ্বীও জয়চন্দ্রের ভয়ে রাজধানীতে না থাকিয়া শূর ও সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ বা মৃগয়ার ছল করিয়া খোলা মাঠে বস্ত্রাবাসে থাকিতেন। জয়চন্দ্র স্বয়ং পৃথ্বীকে দমন করিতে না পারিয়া মুসলমানদের পৃথ্বীর রাজ্য আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, ও ডাকিয়া-ছিলেন, ও শেষ যুদ্ধে পৃথ্বীকে সাহায্য করেন নাই, সেইজন্য পৃথ্বীর, ও সেই সংগে হিন্দু-রাজ্যের পতন হইল।

পৃথ্বীর পতনের সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পরে [১৪৪৩ খৃঃ] গোয়ালিয়রের তোমর-বংশীয় রাজা বীরমের কৃপাপাত্র একজন জৈন-সাধু নয়চন্দ্রসূরি হাম্মীর মহাকাব্য-নামক বৃহৎ কাব্য-রচনা শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান নায়ক হাম্মীর পৃথ্বীরাজের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ, রণথম্বের রাজা ১২৮২ খৃঃ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে চোহান-বংশ ও পৃথ্বীরাজের সবিস্তার বর্ণনা আছে।

পৃথ্বীরাজ
|
গোবিন্দরাজ
|
[রণথম্বের প্রথম রাজা]
|
বাল্হন্ দেব
|
বাগভট্ট
|
জৈত্রসিংহ
|
হম্মীর

[বাল্হনদেব গোবিন্দরাজের পর রাজ্যলাভ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি গোবিন্দরাজের পুত্র কি জ্ঞাতি ঠিক জানা নাই।]

প্রসিদ্ধ মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর ১৩৭১ খৃষ্টাব্দে পুরুষ-পরীক্ষা-নামক গ্রন্থে জয়চন্দ্রের চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক, ঠিক পতনের সময়ে পৃথ্বীরাজ-বিজয়-নামক মহাকাব্য লেখা হইয়াছে। এইসকল পুস্তকে, অন্য কোন রাজবংশের গাথাতে, ও সেকালের বা অল্প পরের কোনও শিলালেখে এমন কোনও উক্তি পাওয়া যায় নাই, যাহাতে সন্দেহ করিতে পারা যায় যে, জয়চন্দ্র পৃথ্বীর বিপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য করিয়াছিলেন, বা তাহাদের ডাকিয়াছিলেন। শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরী একজন দূরদর্শী বিচক্ষণ সেনানায়ক ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখিলেন, সে-সময়ে গুজরাটের সোলঙ্কী ভীমদেব, অজমীরের পৃথ্বীরাজ, কনোজের জয়চন্দ্র, চিতোরের রাণা ও মহোবার পরমর্দ্দিদেব এই পাঁচজন হিন্দু রাজা তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে একাই মুসলমানদের বারবার পরাজিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা একত্রিত হইলে মুসলমানদের ভারতে দাঁড়াইবার স্থান হইত না। তিনি বা তাঁহার উত্তরাধিকারী সেনা-পতিরা রাণা ছাড়া অন্য চারজনকে একে-একে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করিয়াছিলেন। শাকম্ভরীর চোহান-বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী গুজরাট-রাজ-বংশ; উভয়ে উভয়ের হিংসা করিতেন। কনোজের জয়চন্দ্র, ও তাহার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা বিজয়পাল চক্রবর্ত্তী-সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন, কেবল পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তথাপি পৃথ্বী যে জয়চন্দ্রকে ভয় করিতেন ও জয়চন্দ্রের ভয়ে রাজধানীতে না থাকিয়া যুদ্ধ ও শিকারের ছল করিয়া খোলামাঠে বস্ত্রাবাসে সৈন্য ও শূর বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, ও একস্থানে ২।৪ দিনের বেশী থাকিতেন না, ইহার প্রমাণ রাসোতেই আছে, রাজকার্য্য পৃথ্বীর বিশ্বাসী শূর ও প্রধান অমাত্য করিতেন।

মহোবাতে সেকালে শ্রাবণী-উৎসব [যাহার শেষ চিহ্ন এখন মির্জাপুর ও কাশীতে কজরীর রূপ ধারণ করিয়া মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়] অতি সমারোহের সহিত হইত। নগরের কাছে বৃহৎ জলাশয়গুলি ও তাহার কাছে সুন্দর পত্রাচ্ছাদিত বন উৎসবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত।

এই উৎসব বা পৌনি [পার্ব্বণী] দেখিতে দেশ-দেশান্তরের লোক একত্রিত হইত। প্রবাদ এইরূপ যে, পৃথ্বীও সেইরূপ উৎসব করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মহোবার গৌরব নষ্ট করিতে পারিলেন না। তিনি এক ছল করিয়া মহোবা আক্রমণ করিলেন। [নানাস্থানে মহোবা আক্রমণের ভিন্ন-ভিন্ন কারণ পাওয়া যায়, কোনটি ঠিক জানিবার উপায় নাই। বোধ হয় পৃথ্বীর ঈর্ষাই প্রধান কারণ।] ১১৮২ খৃষ্টাব্দে বেত্রবতী-নদী (Betwa) তীরে ভীষণ যুদ্ধে বহু সেনা ক্ষয় করিয়া চন্দেলদের বিস্তৃত রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধ জয় করিয়া লইলেন। মহোবা ও চন্দেরী পৃথ্বীর অধিকারে আসিল। চন্দেল রাজারা ইহার পর তাঁহাদের পূর্ব্বদেশের রাজধানী কালিঞ্জরে গিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অতি হীনবল হইয়া পড়িলেন। চন্দেল যত দুর্ব্বল হইলেন, পৃথ্বী তত প্রবল হইতে পারিলেন না। অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষে দুই রাজা মিলিয়া যত বলীয়ান্ ছিলেন, এখন তাহাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

পৃথ্বী কনোজপতির কন্যা হরণ করিয়া আপনার প্রসিদ্ধ ১০৮ স্থরের অধিকভাগ হারাইলেন। তাঁহার বাহুবল চূর্ণ হইয়া গেল, ও সেই সহিত কনোজ ও মহোবা তাঁহার শত্রু হইয়া পড়িল। ঘোরীর মত দূরদর্শী যোদ্ধা এ অবসর ত্যাগ করিলেন না। রাসোতেই আছে যে, শেষ যুদ্ধের জন্য যখন পৃথ্বী সৈন্য একত্রিত করিয়া পরিদর্শন করিলেন, তখন চারিদিকে বালক ও নবীন যোদ্ধাদের দেখিয়া ভীত হইলেন। তাঁহার যে রণ-দক্ষ বহুদর্শী স্থরেরা যমরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করিত না, তাহারা এখন আর নাই; তাহাদের পুত্রেরা বা পৌত্রেরা আছে বটে, তাহারা যে বলবান্ ছিল তাহার পরীক্ষা লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা জীবনে রণক্ষেত্র দেখে নাই। পৃথ্বী আপনার স্থরদের কাছে যাহা আশা করিতেন, এই বালক বীরদের কাছে তাহা কখনই আশা করিতে পারেন নাই। তিনি জয়চন্দের যেরূপ অপমান করিয়াছিলেন, তাহাতে কখনই আশা করেন নাই যে, চক্রবর্ত্তী-সম্রাট্ ঐ অপমানের পর, তাঁহার পতাকার তলে আসিয়া যুদ্ধ করিবে। সেকালের রাজপুতদের যদি বিন্দুমাত্র রাজনীতি-জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে গুজরাট, মহোবা, চিতোর, অজমীর ও কনোজের মিলিত সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইত ও ভারতে একটিও মুসলমান প্রবেশ করিতে পারিত না।

পৃথ্বী জয়চন্দকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করেন নাই বলিয়া জয়চন্দের রাগ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার রাগের প্রধান কারণ সংযুক্তা-হরণ। সংযুক্তাকে যদি পৃথ্বী স্বয়ম্বরের দিন হরণ করিতেন, তাহা হইলে জয়চন্দের রাগের কারণ হইত না, কারণ ঐরূপ হরণই সেকালে ক্ষত্রিয়দের শ্রেষ্ঠতম বিবাহপদ্ধতি ছিল। আল্হার গানেও কতকগুলি বিবাহ-যুদ্ধের কথা আছে, তাহাতে বর পক্ষীয়রা কন্যার পিতা ও ভ্রাতাদের পরাজিত করিয়া বাঁধিয়া রাখিত, পরে তাঁহাদের দিয়া কন্যাদান করাইয়া লইত। কন্যাদানের পর আর শত্রুতা থাকিত না, কোলাকুলি করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিত, ও এইরূপ বিবাহই গৌরবের ও বাঞ্ছনীয় ছিল, ইহাতে কন্যার পিতার মান বাড়িত।

জয়চন্দ যখন চক্রবর্ত্তী ও বড় রাজা, তখন বিপদের সময়ে পৃথ্বীরাজের তাঁহার কাছে গিয়া সাহায্য ভিক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু রাসোর বর্ণনা-মতে, ঘোরীর আক্রমণ সংবাদ পাইয়া পৃথ্বী অন্যান্য ছোট-বড় অনেক রাজার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু জয়চন্দকে মোটে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। জয়চন্দের উচ্চপদ ও গর্ব্ব তাঁহাকে গায়ে পড়িয়া পৃথ্বীর সাহায্য করিতে, ও তাহার পতাকা-তলে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে দেয় নাই। সেজন্য জয়চন্দকে দোষী করা যায় না, জয়চন্দের স্থানে অন্য কোন ব্যক্তিও ঐরূপ করিত।

যাহা হউক, ভারতের কোনও হিন্দু-রাজা মুসলমানদের ডাকে নাই। ঘোরী পৃথ্বীর দুর্ব্বলতা, ও সে-সময়ে যে-কয়টি সামন্ত ও স্থর বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের আপনাদের মধ্যে মনান্তরের সবিস্তার সংবাদ পাইয়াছিলেন। বিচক্ষণ সেনাপতির মতন তিনি শত্রুকে বলসঞ্চয় করিতে না দিয়াই সম্মুখ-সমরে নামিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

নষ্টচন্দ্র

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুদিন পরে একদিন বিকাল বেলা ধনিষ্ঠা তার পূজার ঘরের জান্‌লায় গিয়ে বসে' পথের উপর চোখ পেতে অনলের আপিসের ছুটির পর বাড়ীতে ফিরে যাবার সময় তাকে একবার দেখ্‌বার প্রতীক্ষা কর্‌ছে, এমন সময় মাধবী ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এসে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে নিতে ধনিষ্ঠাকে বল্‌লে—মা গো মা, মেম-দিদিমণির বাবা,………

মাধবীর কথার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে ধনিষ্ঠা তার দিকে চোখ ফিরিয়েই তার ব্যস্ত ভাব দেখে' আর তার প্রথম কথাটুকু শুনেই অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠ্‌ল; গৌরীর বাবা তো অনল—তাঁর সম্বন্ধে কি কথা মাধবী অমন ব্যস্ত হয়ে বল্‌তে এসেছে? তিনি কি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন?—এই ভেবে তার মন আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল এবং পরক্ষণেই আবার তার মনে হ'ল তাঁর কি কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে, তাই মাধবী এমন শশব্যস্ত হ'য়ে সংবাদ দিতে এসেছে? অমনি তার মন শঙ্কাকুল হয়ে উঠ্‌ল। এক নিমেষের মধ্যে ধনিষ্ঠার মনের মধ্যে দিয়ে আনন্দ ও আশঙ্কা বিদ্যুৎ-চমকের মতন বয়ে গেল। পর মুহূর্ত্তেই মাধবীর কথার শেষাংশ শুনে সে স্থির কর্‌তে পার্‌লে না যে, সেই সংবাদে সে সুখী হবে কি দুঃখিত হবে।

মাধবী তার কথা শেষ করে' বল্‌লে—বিলাত থেকে ফিরে এসেছে ………একেবারে সায়েব মা, বেহেড মাতাল!

ধনিষ্ঠা এই কথা শুনে কৌতূহলে পূর্ণ হয়ে বলে' উঠ্‌ল—বলিস্ কি? কোথায় আছে সে? উনি……ম্যানেজার বাবু কোথায়?

মাধবী বল্‌লে—আমি কাছারী থেকে শুনে এলাম—অনিল কাকা-বাবু কাছারীতে এসেছিল; ম্যানেজার-বাবু তাকে নিয়ে সকাল-সকাল বাড়ী চলে' গেছেন।

এতবড় একটি নূতন অপ্রত্যাশিত বিশেষ খবর শোনার ফলে ধনিষ্ঠার মনে যে-সব চিন্তা আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল, সে-সবের উপরে সাগর-তরঙ্গের মাথায় ফেনের মতন ভেসে উঠ্‌ল—উনি কাছারী থেকে বাড়ী চলে' গেছেন, আজ আর তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না।

এই চিন্তার পরেই তার মনে হ'লো—এত বড় একটা অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য্য ব্যাপার যখন ঘট্‌ল, তখন উনি নিশ্চয় আমাকে সমস্ত ঘটনা বল্‌তে আস্‌বেন।

ধনিষ্ঠা সমস্ত বিকাল-বেলাটা উৎসুক হয়ে অনলের আগমনের প্রতীক্ষা করে' মুহূর্ত্ত গুণে-গুণে ক্লান্ত হয়ে উঠ্‌ল; সন্ধ্যা উৎরে রাত্রি হ'ল; তবু অনলের দেখা নেই। অনলের উপর তার ভয়ানক রাগ হতে লাগ্‌ল—তিনি এই খবরটাও আমাকে দেওয়া আবশ্যক মনে কর্‌লেন না? আমি অন্য কারো মুখে এই খবর শুনে যে উৎসুক হয়ে থাক্‌ব এটাও কি তাঁর খেয়াল হচ্ছে না? ওঁর পারিবারিক খবর আমার জান্‌বার দরকার কি, মনে করে' যদি না এসে থাকেন তো ভারি অন্যায় করেছেন? গৌরী কি শুধু ওঁর? গৌরীর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই? তবে যে তিনি একদিন বলেছিলেন—গৌরী সম্পূর্ণই আপনার! সে কি তবে……

ধনিষ্ঠার মনে আস্‌ছিল—"সে কি তবে মুনিবকে খুশী কর্‌বার জন্যে চাকরের মন-রাখা কথা?" কিন্তু এই চিন্তার ক্ষীণ আভাস মনে হ'তেই সে কুণ্ঠিত হয়ে অপরাধীর ভাবে তাড়াতাড়ি সে চিন্তা চাপা দিয়ে মনে মনে বল্‌লে—আমাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা! গৌরীর সুখ-দুঃখ যে আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তা কি উনি অতবড় বুদ্ধিমান্ হয়েও বুঝ্‌তে পারেন না?

ধনিষ্ঠা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্তব্ধ হয়ে বসে' রইল, তার আজ পূজাতে বস্‌তেও মন সর্‌ছিল না।

গৌরী বেড়িয়ে ফিরে এল। এসেই সে ধনিষ্ঠাকে দেখেই বলে' উঠ্‌ল—মা, আমার বাবা ফিরে এসেছে, সবাই আমাকে বল্‌লে……

তাকে মা সম্বোধনের পর অনিলকে বাবা বলে' গৌরী যখন উল্লেখ কর্‌লে, তখন কথাটা গিয়ে ধনিষ্ঠার কানে বাজ্‌ল, তার মনে বিসদৃশ ঠেক্‌ল। তার মনের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে এই চিন্তাও বয়ে গেল যে আর-একদিন গৌরী তাকে মা বলে' ডেকেই অনলকে বাবা বলে' ডেকেছিল, এবং তাতে কী সুখকর মধুর লজ্জাই না তার সারা হৃদয়-মন ছেয়ে ফেলেছিল!

ধনিষ্ঠাকে চুপ করে থাকৃতে দেখে' গৌরী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আচ্ছা মা, আমার তো দুটো বাবা হ'ল, বাবা বলে' ডাক্‌লে কোন্ বাবা উত্তর দেবে?

ধনিষ্ঠা একটুখানি ম্লানভাবে হেসে বল্‌লে—যিনি আজ এলেন, ইনিই তোমার বাবা; আর উনি তোমার… ধনিষ্ঠার গলার কাছে কথাটা যেন আট্‌কে গেল; সে যেন তার একটা অতি গোপন সুখের গলা টিপে শ্বাস রোধ করে' তাকে মার্‌তে যাচ্ছে। সে ঢোক গিলে শক্ত হয়ে নিয়ে বল্‌লে—জ্যোঠামশায়।

গৌরী জোরে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—না আমি বাবাকে জ্যোঠামশায় বল্‌তে পার্‌বো না, বাবাকে বাবাই বল্‌ব; আর এ বাবাকে বল্‌ব পাপা—আমি তো ওকে পাপাই বল্‌তাম!

ধনিষ্ঠা যেন জটিল সমস্যার সহজ মীমাংসা শুনে আরাম অনুভব করে' বল্‌লে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বোলো।

ধনিষ্ঠা অনেক রাত পর্য্যন্ত মনে কর্‌তে লাগ্‌ল যে এইবার হয়তো অনল আস্‌বে। কিন্তু যখন রাত দশটা বেজে গেল, তখন সে হতাশ হয়ে সন্ধ্যাপূজা কর্‌তে গেল।

পরদিন সকাল-বেলাটাও অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কেটে গেল। অনলের আপিসে আস্‌বার সময় ধনিষ্ঠা তার নির্দ্দিষ্ট জান্‌লায় গিয়ে বস্‌ল; সে দেখ্‌লে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনল আপিসে এল। ধনিষ্ঠা মনে করেছিল, মৃতকল্প ভাইকে জীবন্ত ফিরে পেয়ে অনলের মুখ আনন্দোৎফুল্ল দেখ্‌তে পাবে; কিন্তু অনলকে দেখে তার যেন বোধ হ'ল সহজগম্ভীর অনল আরো গম্ভীর বিমর্ষ চিন্তাকুল হয়ে উঠেছে। শুধু কাছারীর উঠানের পথটুকু অতিক্রম কর্‌তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ই ধনিষ্ঠা অনলকে দেখ্‌লে, এবং তার মধ্যেও সব সময় অনলের মুখ সে সম্পূর্ণ দেখ্‌তে পায়নি, কখনো মুখের একাংশ দেখেছে, কখনো বা কেবল মাথার পিছন দিক্‌টাই দেখ্‌তে পেয়েছে, তাই সে সন্দিহান হয়ে রইল, যে, তার যে মনে হ'ল অনল গম্ভীরতর বিমর্ষ চিন্তাকুল হয়ে আছে, সেটা সত্য, না দূর থেকে দেখার দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র।

ধনিষ্ঠা চিন্তাকুল ও কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষায়-অপেক্ষায় কোনো রকমে সমস্ত দিনটা কাটালে; কিন্তু যখন বিকালেও তার কাছে কাগজপত্র সই করাতে হরকান্ত এল, তখন ধনিষ্ঠার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল; তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে আজ হয়তো অনল নিজে চিঠিপত্র সই করিয়ে নিতে আস্‌বে; তা না আসাতে হতাশার পীড়া তাকে অস্থির করে' তুল্‌লে, অনলের উপর তার রাগ হতে লাগ্‌ল, মনে কর্‌তে না চাইলেও মনে হতে লাগ্‌ল অনল যেন তাকে ইচ্ছা করে' অবহেলা কর্‌ছে। বারম্বার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে যখন দেখ্‌লে কাছারীর ছুটি হব-হব হয়ে এসেছে, তখন সে আর অপেক্ষা করে' থাক্‌তে পার্‌লে না; যদিও সে কিছুদিন আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিল—"আমি মরে' গেলেও আর কোনোদিন ওঁকে ডেকে পাঠাব না; উনি নিজে থেকে যদি কখনো আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসেন তো আস্‌বেন, নইলে এই শেষ।" তথাপি সে সেই প্রতিজ্ঞা ভুলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একজন চাকরকে বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবুকে দৌড়ে গিয়ে বলে' আয়, বাড়ী যাবার সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে' যাবেন।

কাছারীর ছুটির পর অনল ধনিষ্ঠার অন্দরে এসে তার কাছে নিজের আগমন-বার্ত্তা পাঠালে। ধনিষ্ঠা অনলের আগমনের জন্যই অপেক্ষা কর্‌ছিলো, কিন্তু তবু চাকর এসে খবর দিতেই তার মুখের গৌরবর্ণে একটু লালের ছোপ বুলিয়ে গেল, হৃদয়ে রক্তধারা একটু দ্রুততালে আনা-

গোনা করতে আরম্ভ করলে। অনল এসে গম্ভীর মুখে নমস্কার করে' দাঁড়াল; ধনিষ্ঠা মাথা ঝুঁকিয়ে যুক্তকরের উপর ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে মৃদুস্বরে বললে—বসুন।

অনল গম্ভীরমুখেই বললে—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন……

ধনিষ্ঠা একখানা চেয়ারের পিঠ ধরে' চেয়ারখানাকে একটু সরিয়ে তাতে বসল। অনলও তার সাম্‌নের এক চেয়ারে বসল। মুহূর্ত্তকাল উভয়েই নীরব। ধনিষ্ঠা অনলকে ডেকে এনেছে; ধনিষ্ঠারই আগে আহ্বানের প্রয়োজন ব্যক্ত করে' বলা উচিত; অনলও বোধ হয় তাই আশা করছিল; কিন্তু ধনিষ্ঠাকে নীরব থাকতে দেখে অনলই নীরবতা ভঙ্গ করে' জিজ্ঞাসা করলে—আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

ধনিষ্ঠার মুখ আবার গোলাপী হয়ে উঠ্‌ল; সে মাথা নীচু করে' আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির গোছা নাড়তে নাড়তে বললে——হ্যাঁ। অনিল ঠাকুর-পো নাকি ফিরে এসেছে?

ধনিষ্ঠা তার স্বামী বেঁচে থাকতেই স্বামীর প্রিয়পাত্র অনিলকে ঠাকুর-পো বলে'ই ডাকৃত, যদিও মাঝে-মাঝে সে স্বামীর কাছে অনিলের নাম করতে হলে তাকে সতীন বলে' উল্লেখ করত। পুরাতন অভ্যাস-বশেই আজও ধনিষ্ঠা অনিলকে ঠাকুর-পো বললে। কিন্তু বলে'ই তার মুখ অত্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল, সে নত চোখের কোণ দিয়ে অনলকে একবার দেখে নিলে।

অনল ধনিষ্ঠার মুখের শ্রী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য না করে' গম্ভীরমুখে শুধু বললে—হ্যাঁ।

অনল আরও-কিছু বলবে এই আশায় ধনিষ্ঠা অনলের মুখের দিকে তাকালে, কিন্তু অনল গম্ভীর হয়ে মুখ একটু ফিরিয়ে বসে' রইল। ধনিষ্ঠা অনলের গাম্ভীর্য্য দেখে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগ্‌ল; সে যে অনলকে ডেকে এনেছে তা কি ঐ এক হ্যাঁ শোন্‌বার জন্য! কিন্তু ডেকে যখন সে এনেছে, তখন অনল কথা না বললেও তাকে কথা বলাবার জন্য ধনিষ্ঠাকে তো কথা বলতে হবে। সে সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—অনিল-ঠাকুর-পোর বৌ যে চিঠি লিখেছিল তা একেবারে আগাগোড়া মিথ্যা?

ধনিষ্ঠা বলতে যাচ্ছিল গৌরীর মা, কিন্তু তা সে বলতে না পেরে বললে অনিল-ঠাকুর-পোর বৌ। গৌরীর মা তো সে-ছাড়া আর কেউ নয়; গৌরী যে অপরের মেয়ে এ চিন্তাও সে মনে স্থান দিতে পারে না।

ধনিষ্ঠার প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অনল বললে—এখন তো দেখ্‌ছি সে চিঠি মিথ্যা; কিন্তু সে চিঠি সত্য হলেই ভালো হত। সেই চিঠিকে সত্য ভেবে যে কষ্ট পেয়েছিলাম, এখন সেই চিঠিকে অসত্য দেখে ততোধিক কষ্ট পাচ্ছি।

যে ভাই অনলের প্রাণতুল্য প্রিয়, যার জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করে' অনল মহত্ত্বের ও ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছে, অনল সেই ভাইয়ের জীবন অপেক্ষা মৃত্যু শ্লাঘ্য বিবেচনা করছে যে কতবড় দুঃখে, তা ধনিষ্ঠা বুঝতে পারলে; নিষ্কলুষ-চরিত্র সুসংযতস্বভাব অনল ভাইয়ের অনাচার দেখে যে কতবড় দুঃখিত হয়েছে, তা বুঝতে পেরে ধনিষ্ঠাও ব্যথিত হ'ল। সে ম্লান-মুখে মৃদু-স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—শুনলাম সে খুব মাতাল হয়ে এসেছে।

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—শুধু মাতাল হ'লে তো তাকে পশু বলে' তার অনাচার ক্ষমা করতে পারতাম; কিন্তু এ যে একেবারে দানব হয়ে ফিরেছে। ওর কথা যে আমি কেমন করে' আপনাকে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না—ও আমার লজ্জা, আমার স্বর্গগতা মায়ের লজ্জা, আমার পিতৃপিতামহদের লজ্জা, ও আমার গৌরীর লজ্জা!

ধনিষ্ঠা গম্ভীর স্বল্পবাক্ অনলের মুখে এই ভাবোচ্ছ্বাসের কথা শুনে কাতর-দৃষ্টিতে অবাক্ হয়ে অনলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনল ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার বলতে আরম্ভ করলে—অনিল বিলাতে গিয়ে মদ খেতে ধরে' আনুষঙ্গিক নানা অনাচারে ডুবে গিয়েছিল; মাত্‌লামির ঝোঁকে নিজের সকল কুকীর্ত্তিই সে ব্যক্ত করে' ফেলেছে। অনাচারের ফলেই গৌরীর জন্ম হয়। কিন্তু গৌরীর জননী……

অনল ধনিষ্ঠার সাম্‌নে অনিলের স্ত্রীকে গৌরীর মা বলতে পারলে না, তার মুখে বাধ্‌ল, তাই সে বললে—গৌরীর জননী ছিল সাধ্বী, সে অনিলকে ভালোবেসে পতি-

ভাবেই তাকে আত্মদান করেছিল; কিন্তু এই পাষণ্ডটা এমনই নরাধম যে, স্ত্রীর ভালোবাসার সুযোগ পেয়ে তার উপর অত্যাচার করত; সে বেচারা নিজে লোকের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে' বা দোকানে চাকরী করে' স্বামী ও কন্যাকে পালন করত, আর এ, স্ত্রীর কষ্টের উপার্জ্জন অনাচারে অপব্যয় করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ত না।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—আপনি তো ওকে মাসে-মাসে অনেক টাকা পাঠাতেন।

ধনিষ্ঠা বল্‌লে না যে সেও অনিলকে অনলের জন্যেই মাসে-মাসে অনাচারের খরচ জুগিয়ে এসেছে।

অনল বল্‌তে লাগ্‌ল—হঁ্যা, আমি যা পাঠাতাম আর আপনি তাকে যা দিতেন, তা হাতে পড়্‌বামাত্রই সে জুয়া খেলে, মদ খেয়ে, অনাচারে উড়িয়ে দিয়ে রিক্তহাতে বাড়ীতে এসে স্ত্রীর উপর জুলুম করত। নিজেকে আর নিজের কচি মেয়েকে পাষণ্ডের উৎপীড়ন থেকে বাঁচাবার জন্যে সে-বেচারী প্রাণপণ পরিশ্রম করে' উপার্জ্জন করত স্বামীর অনাচারের খরচ জোগাবার জন্যে। শেষে এক জায়গায় জুয়া খেলে অনেক বেশী টাকা ধার করে' ফেলে; সেই টাকার মহাজন টাকা আদায় করতে এলে অনিল তার সঙ্গে মারামারি করে' তাকে প্রায় খুন করে' ফেলে। সেই সময় সে তার স্ত্রীকে মারের ভয় দেখিয়ে মিথ্যা করে' নিজের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে আমাকে চিঠি লেখায়; মৎলব ছিল টেলিগ্রাফে তাড়াতাড়ি টাকাটা গিয়ে পড়্‌লে সে সেই টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে' ফেল্‌বে। কিন্তু আমার পাঠানো টাকা গিয়ে পৌঁছানোর আগেই ওকে পুলিসে গেরেপ্তার করে' নিয়ে গিয়ে হাজতে আট্‌কে রাখে। ইতিমধ্যে টাকাটা গিয়ে গৌরীর জননীর হাতে পড়ে। সে-বেচারী পশু-স্বভাব স্বামীর বন্দী-অবস্থার সুযোগ পেয়ে মেয়েকে নিয়ে আমার কাছে পালিয়ে আস্‌ছিল; পথে সে মারা পড়ে, এ পর্য্যন্ত আর এসে পৌঁছতে পারে-নি—এমনি মরণাপন্ন দশা হয়েছিল তার স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে। ওদিকে ওর জেল হয়েছিল। জেল থেকে খালাস হয়ে ও নিঃস্ব অবস্থায় পড়ে। সে যুদ্ধের সৈনিক ছিল বলে' গভর্মেণ্ট্ থেকে ওকে পাথেয় দিয়ে দেশে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা কোনো খবর পাবার পূর্ব্বেই ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে।

অনল অনিলের ইতিহাস বলে' চুপ করল। ধনিষ্ঠার মনে হতে লাগ্‌ল যে তার কিছু বলা উচিত, কিন্তু কি যে বল্‌বে তা ভাব্‌তে গিয়ে তারও আর-কিছু বলা জোগালো না। ক্ষণকাল চুপ করে' বসে' থাকার পর অনল উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ধনিষ্ঠাও উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—এখনও ওর বয়স অল্প, আপনার কাছে থাক্‌লে ওর স্বভাব শুধ্‌রে যাবে।

অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—কতদিনে শোধ্‌রাবে ভগবান্ জানেন; কিন্তু এখন তার পশু-প্রকৃতি দেখে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে—লোকে যে বল্‌ছে ও আমার ভাই তাতে আমার লজ্জা আর কষ্ট হচ্ছে খুবই, কিন্তু ওকে যে গৌরীর বাবা বলে' লোকে পরিচয় দিচ্ছে এ আমার মর্ম্মান্তিক হচ্ছে—দেব-নির্ম্মাল্যের মতন পবিত্র সুন্দর গৌরীর বাবা এই নর-পশু!

ধনিষ্ঠা এর উত্তরে আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না, সে সজল দৃষ্টি তুলে একবার অনলের মুখের দিকে তাকালে। অনল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলে' গেলো।

অনল ধনিষ্ঠার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ধনিষ্ঠা গৌরীর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলে—বাবা, আমার পাপা এসেছে! আমি তাকে দেখ্‌ব। সে আমাকে দেখ্‌তে এল না?

গৌরীর কথা শুনে ধনিষ্ঠা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল এবং দেখ্‌লে অনল গৌরীকে কোলে করে' নিয়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌ছে—হঁ্যা, সে দেখ্‌তে আস্‌বে বৈ কি। সে অনেক দূর থেকে এসেছে কি না, তাই তার শরীরটা তেমন ভালো নেই।

গৌরী বল্‌লে—তবে আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে চলো না।

অনল বল্‌লে—আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্য একদিন নিয়ে যাব।

অনল গৌরীকে কোলে করে'ই চল্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে ধনিষ্ঠা তাদের পিছনে ঘরের দরজার সাম্‌নে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে। অনল গৌরীকে কোল

থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্‌লে—তুমি তোমার মার কাছে যাও।

গৌরী ছুটে ধনিষ্ঠার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মা, এখন তোমাকে ছোঁব?

ধনিষ্ঠা নত হয়ে গৌরীকে কোলে তুলে নিলে।

তাই দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনল সেখান থেকে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠা গৌরীকে তার পিতার প্রসঙ্গ ভুলিয়ে দেবার জন্যে বল্‌লে—মা-মণি, চলো তোমার জন্যে একটা নূতন জিনিষ রেখেছি।

গৌরী উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি মা?

ধনিষ্ঠা হেসে বল্‌লে—আগে বল্‌ব না, দেখ্‌বে চলো।

গৌরী কৌতূহলে নির্বাক্ হয়ে রইল। ধনিষ্ঠা তাকে কোলে করে' নিজের আপিস-ঘরে ফিরে গিয়ে আঁচল থেকে চাবি নিয়ে একটা দেরাজ খুল্‌লে এবং দেরাজের টানা টেনে বার করে' তার ভিতর থেকে সুন্দর এক-ছড়া মুক্তার মালা তুলে' গৌরীর গলায় পরিয়ে দিলে।

গৌরী আনন্দে উৎফুল্ল মুখে বলে' উঠ্‌ল—বাঃ! বেশ সুন্দর!

ধনিষ্ঠা গৌরীকে বুকে চেপে বল্‌লে—আমার গৌরী আরো সুন্দর!

গৌরী ধনিষ্ঠার বুকের মধ্যে চাপা থেকে তার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিল না; সে মাথা একটু পিছন দিকে হেলিয়ে ধনিষ্ঠার মুখ দেখ্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌লে—মা তুমি গয়না পরো না কেন?

ধনিষ্ঠা গৌরীর দুই হাত নিয়ে নিজের গলায় জড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে—এই যে আমার গহনা! তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার অলঙ্কার!

গৌরী মার স্নেহসুখে মার বুকে লগ্ন হয়ে চুপ করে' রইল।

* * *

অনল বাড়ীতে ফিরে যেতেই অনিল মদ্যপানে অবশ-চরণে তার কাছে এসেই স্খলিতবচনে বল্‌লে—দাদৃ-প্রবর! ......

অনল ব্যথিত ও বিরক্তস্বরে বল্‌লে—অনিল, আমাকে অপমান কর্‌তে তোমার লজ্জা বোধ হয় না?

অনিল দুবার টলে' নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে—এতে আবার অপমান কিসে হ'ল? ভ্রাতৃ শব্দের প্রথমার একবচনে হয় ভ্রাতা, কিন্তু অন্য শব্দের সঙ্গে সমাস হ'লে ভ্রাতৃই থেকে যায়; তেমনি দাদৃ শব্দে থেকে হয়েছে দাদা, সমাসে দাদৃই থাক্‌বে। ভ্রাতৃ শব্দের সম্বোধনে হয় ভ্রাতঃ; দাদৃ শব্দের সম্বোধনে হবে দাদঃ। সেটা শুন্‌তে খারাপ লাগ্‌ল—সর্ব্ব-দমনগজসিংহ মলমের কথা মনে পড়ে' যায়; তাই সম্মান দেখিয়ে সমাস কর্‌লাম দাদৃপ্রবর, কিনা দাদার মধ্যে সেরা দাদা! আর সেটা হ'ল কিনা তোমার কাছে অপমান!

অনল ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে—মনুষ্যত্বের লেশমাত্র অবশেষ থাক্‌লে তুমিও ঐ রকম কথাকে অপমানজনক মনে কর্‌তে।

অনিল বল্‌লে—মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন তখন মনুষ্যত্ব কাড়ে কোন্ শালা! ভগবানেরও ক্ষমতা নেই।

অনল একবারে মর্ম্মাহত হয়ে নীরবে সেখান থেকে চলে' যাবার উপক্রম কর্‌লে। অনিল টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে তার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—কতকগুলো বাজে বকিয়ে পালালে ত চল্‌বে না। কাজের কথাটা বলাই হয়-নি—আমার কিছু টাকা চাই।

অনল অনিলের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—তোমাকে আমি এক পয়সা দেবো না; তোমার খাওয়া-পরার যা-কিছু দর্‌কার হবে আমি কিনে দেবো।

অনিল বল্‌লে—বেশ, তবে আমাকে ডজন-খানেক হুইস্কির বোতল আনিয়ে দাও।

অনল বল্‌লে—ঐটি পাবে না।

অনিল বিদ্রূপের স্বরে বল্‌লে—ঐ তো! নিজের কথা ঠিক রাখ্‌তে পারো না। আবার মনুষ্যত্বের বড়াই করো! এখনি যে বল্‌লে আমার খাওয়া-পরার যা-কিছু দর্‌কার সব কিনে দেবে!

অনল বল্‌লে—বিষ খেতে চাইলে তো বিষ কিনে দিতে পারি না।

অনিল ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌লে—মদ বুঝি বিষ! অমৃত!

অমৃত! সুধা! স্বর্গে দেবতারা যা খায়; আগে আমাদের দেশের ঋষিরা যে সোমরস পান কর্‌তেন; পরম পবিত্র বিশুদ্ধ দ্রাক্ষারস!

অনল আবার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—মাতালের সঙ্গে বক্‌বার অবকাশ আমার নেই। যাও ঘরে গিয়ে শোও গে।

অনিল বল্‌লে—বা রে! টাকা দেবে না তো আমার নেশা ছুটে যাবে যে। টাকা না দাও আমি তোমার সব জিনিষ বেচে-বেচে মদ খাব।

অনিল এই বলে' খপ করে' হাত বাড়িয়ে অনলের জামার বুকের উপর লম্বিত সোনার চেনটা চেপে ধর্‌লে। অনলও তৎক্ষণাৎ অনিলের হাত এমন জোরে টিপে ধর্‌লে যে বলিষ্ঠ অনলের টিপনে কৃশকায় অনিল ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—আঃ দাদা, হাত ভেঙে দেবে নাকি, ছাড়ো ছাড়ো, বড্ড লাগ্‌ছে।

অনলের হাতের চাপে অনিলের হাতের মুষ্টি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। অনল অনিলের হাত ছাড়িয়ে ফেলে সেখান থেকে দ্রুত চলে' গেল।

অনিল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের মনেই বল্‌লে—জানি টাকা দেবে না, তাই আগে থাকৃতেই বুদ্ধি করে' রূপোর ডিবেটা হাতিয়ে রেখেছি। যাই সেটাকেই বিক্রমপুর পাঠিয়ে আসি। কিন্তু কোনো শালা কি আমার কাছ থেকে জিনিষ কিন্‌তে চায়? মাটির দরে ছেড়ে দিতে চাইলেও শালারা বলে ম্যানেজার-বাবু টের পেলে ফ্যাসাদে পড়্‌তে হবে। ড্যামনেড্‌ টাইর‍্যান্ট্‌ আর অ্যার‍্যান্ট্‌ কাউআর্ড্‌।

অনিল টল্‌তে টল্‌তে চলে' গেল। রাত্রে আহারের পর অনলকে পান দেবার সময় তার পরিচারিকা হরির মা রূপার পানের ডিবাটা কোথাও খুঁজে পেলে না। অনল শুনে কেবল বল্‌লে—সে আর খুঁজ্‌তে হবে না। আজ থেকে আমি আর পান খাব না।

সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে সেই ডিবে কোথায় গেছে।

পরদিন সকাল-বেলা গৌরীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরে এসে মাধবী হাঁপাতে হাঁপাতে ধনিষ্ঠাকে বল্‌লে—ওমা, মাগো, কাল রাত্তিরে ম্যানেজার-বাবুর রূপোর ডিবে চুরি গেছে; ম্যানেজার-বাবু তাই শুনে চাকর-দাসী কাউকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করে' হরির মাকে বলেছে—আজ থেকে আমি আর পান খাব না। এ যে চোরের উপর রাগ করে' ভুঁইয়ে ভাত খাওয়া হ'ল!

ধনিষ্ঠা নির্বাক্ হয়ে একবার মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নত কর্‌লে; তার মনে যে সন্দেহ হ'ল তা সে দাসীর কাছে ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌লে না।

মাধবী ধনিষ্ঠাকে নিরুত্তর দেখে আবার বল্‌লে—আজ সকালে বাজারে ঢেঁড্‌রা পিটে দিয়েছে ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে সব জিনিস-পত্তর নিলাম হবে আর কাঙালী-বিদায় হবে। ম্যানেজার-বাবুর বাড়ীতে লোকে-লোকাকীর্ণি হয়েছে দেখে এলাম।

—ওঁরে ধনিষ্ঠা মুখ তুলে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—অনিল ঠাকুরপো কোথায়?

মাধবী বল্‌লে—তিনি কাল রাতের গাড়ীতেই কল্‌কাতা চলে' গেছে। হরির মা তাকে বলেছিল—'এত রাত্রে কল্‌কাতা যাবার কি দর্‌কার হ'ল?' তাতে তিনি উত্তর করেছিল—এখানে খেনো মদ ছাড়া পাওয়া যায় না, খেনো তিনি খেতে পাবে না। তাই কল্‌কাতা গেছে হুস্কি না কি বলে মা বিলিতী মদ কিনে আন্‌তে।

ধনিষ্ঠা মুখে আর কিছু বল্‌লে না, কিন্তু তার মনে হ'ল—অমন লোকের ভাই এমন হ'তে পার্‌লে কেমন করে'?

অনল কেবলমাত্র পরিধেয় খানকয়েক মোটামুটি কাপড় চাদর জামা মাত্র রেখে বাড়ীর আর সব জিনিস বিক্রী করে' ফেল্‌লে; জুতো ছাতা তৈজসপত্র থেকে আরম্ভ করে' খাট পালং দেরাজ আল্‌মারি যা যেখানে ছিল কিছুই সে রাখ্‌লে না। সমস্ত বিক্রী করে' যে টাকা পেলে তা থেকে চাকর-দাসীদের মাইনে আগাম চুকিয়ে দিয়ে বাকী টাকা কাঙালীদের মধ্যে নিঃশেষে বিতরণ করে' দিলে। এ একেবারে সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ!

যখন কাঙালী-বিদায় হচ্ছে, তখন অনিল কল্‌কাতা থেকে মদ কিনে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। ব্যাপার দেখে সে মনে মনে বল্‌লে—আমাকে একটা টাকা দিতে পারেন না, এ দিকে নবাবী করে' কাঙালী-বিদায় করা হচ্ছে! কাল আমি সিন্দুক না ভাঙি তো আমার নাম অনিল নয়!

অনিল বাড়ীতে এসে অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে সব শূন্য! যে সিন্দুকে অনিলের টাকা, ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি দামী জিনিস থাক্‌ত, তার পূর্ব্ব-অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্র মাটির বুকে দাগ পড়ে' আছে, সিন্দুক প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্ধান করেছে। অনিল অনলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—দাদা, জিনিসপত্তর সব কোথায় গেল?

অনল তার দিকে মুখ না ফিরিয়ে বল্‌লে—বিক্রী করে' ফেলেছি।

অনিল আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন?

অনল গম্ভীরভাবে বল্‌লে—কাঙালীদের দান কর্‌ব বলে'।

অনিল ব্যঙ্গভরা স্বরে বল্‌লে—ভাইকে কিছু দেবার বেলা যত কৃপণতা, আর যত রাজ্যের কাঙালীদের ডেকে এনে টাকা বিলিয়ে ফোতো নবাবী করা হ'ল!

অনল এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চলে' গেল।

অনিলকে হরির মা এসে ডাক্‌লে—ছোট-বাবু, জল খাবে এস।

কল্‌কাতা থেকে এসে অনিলের ক্ষুধা পেয়েছিল। সে হরির মার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দেখ্‌লে একখানা ফাটা পিঁড়ি পেতে কলার পাতা পেড়ে জলখাবার আর একটা মাটির গেলাসে জল দিয়েছে। এ দেখেই তো অনিলের গা জলে' উঠল, সে কর্কশ স্বরে বল্‌লে—এ আবার কি ঢং! আমি কি হাড়ি না বাগ্‌দী যে আমাকে এ রকম করে' জল খেতে দেওয়া হয়েছে।

অনিল লাথি মেরে জলের গেলাস উল্টে খাবার ছড়িয়ে ফেল্‌লে।

অনল সেখানে এসে অনিলের কাণ্ড দেখেও তাকে কিছু না বলে' হরির মাকে বল্‌লে—হরির মা, ছোট-বাবু নিজে কিছু খেতে না চাইলে আর খেতে দিয়ো না। আমাকে খেতে দাও।

অনিল ক্রোধে ও নেশায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চীৎকার করে' বল্‌লে—আমি ও মালায় ভাঁড়ে খেতে পার্‌ব না।

অনল শান্তস্বরে বল্‌লে—ভাঁড় মালা ছাড়া আমার বাড়ীতে আর কোনো পাত্র নেই যখন, তখন হয় ঐ পাত্রে খেতে হবে, নয় উপোষ কর্‌তে হবে।

অনিল নিরুপায় হয়ে রাগে গরগর কর্‌তে কর্‌তে চলে' গেল; সে স্থির কর্‌লে যে খুব খানিকটা মদ ঢেলে মনের সব ক্ষোভ ভাসিয়ে দেবে।

নিজের ঘরে ঢুকেই সে স্তম্ভিত হয়ে থম্‌কে দাঁড়াল—তার বড় সাধের হুইস্কির বোতলগুলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ে' আছে, আর ঘরে মদের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বেগে অনলের কাছে ফিরে এসে চীৎকার করে' ডাক্‌লে—দাদা!

এই ডাকটা ক্রোধের গর্জ্জন অপেক্ষা শোকের আর্ত্ত-নাদের মতনই বেশী শোনালো।

অনল তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে বল্‌লে—আমার মদের বোতলগুলো কে ভাঙ্‌লে?

অনল শান্ত স্বরে বল্‌লে—আমি।

অনিল গর্জ্জন করে' উঠ্‌ল—এ ভারি অন্যায়। অনল আবার শান্ত স্বরে বল্‌লে—মদ খাওয়া আরো অন্যায়; যে মদকে ঘৃণা করে তার বাড়ীতে মদ এনে রাখা ততোধিক অন্যায়। অনিল চীৎকার করে' উঠ্‌ল—তোমার মাথা ভেঙে ফেলে ঐ রকম রক্ত গড়িয়ে দিতে পার্‌লেও আমার রাগ যায় না।

অনল হেসে বল্‌লে—রাগ যখন যাবেই না, তখন মাথা ভেঙেও তো কোনো লাভ নেই।

অনিল অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—যাও, তোমার হাসি ভালো লাগে না।

অনল এবার কাতর স্বরে বল্‌লে—এ হাসি নয় ভাই, হাসি নয়। লোহা যখন বেশী তেতে ওঠে, তখন লাল হয়, আরো তাত্‌লে শাদা হয়; তেমনি দুঃখ বেশী হ'লে কান্না আসে, আরো বেশী হ'লে কান্না হাসির রূপ ধরে।

অনিল বিরক্ত হয়ে চলে' যেতে যেতে বল্‌লে—রেখে দাও তোমার ও-সব ন্যাকামি কবিত্ব।

*

* *

পরদিন সকাল-বেলা অনিল অনলকে বল্‌লে—দাদা, আমাকে একশো টাকা দিতে হবে।

অনল গম্ভীর অথচ শান্ত ভাবে বল্‌লে—তোমায় তো বলেছি তোমার হাতে আমি এক পয়সা দেবো না।

অনিল ক্রুদ্ধ হয়ে বল্‌লে—আচ্ছা, মাসকাবারে যখন নিয়ে আস্‌বে তখন আমি একশো টাকা কেড়ে মাইনে নেবোই নেবো।

অনল শান্ত স্বরে বল্‌লে—আজ থেকে নিত্যকার খরচের মতন টাকা প্রত্যহ খুচ্‌রা খুচ্‌রা নিয়ে আস্‌ব, বাকী টাকা খাজাঞ্চীখানাতেই জমা থাকবে।

অনিল তবুও দমে না গিয়ে বল্‌লে—আচ্ছা, তুমি না দাও; তোমাকে যে দিচ্ছে তার কাছ থেকেই আদায় করে' আন্‌ব।

অনল এবার ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে ব্যগ্র স্বরে বল্‌লে—খবরদার অনিল, স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে মাত্‌লামি কোরো না। আমার উপর তুমি যা খুশী উপদ্রব কোরো, আমি সহ্য কর্‌ব; কিন্তু অপরের উপর উপদ্রব আমি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ব না।

অনিল বল্‌লে—তবে আমাকে একশো টাকা দেবে বলো।

অনল চুপ করে' কিছুক্ষণ ভেবে বল্‌লে—আচ্ছা, আমি একটু ভেবে বিকাল-বেলা বল্‌ব।

অনিল খুশী হয়ে চলে' গেল। অনল পূজা-আহ্নিক কর্‌তে বস্‌ল। সেদিন সে কাতর হয়ে সাশ্রুনয়নে ভগবানের কাছে অনিলের শুভমতির জন্ম দীর্ঘকাল প্রার্থনা কর্‌লে।

অনল কাছারী চলে' গেলে অনিল ভাবলে—দাদা টাকা দেয় ভালোই; উপরন্তু বৌদিদির কাছ থেকে আদায় কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লে মন্দ কি?

অনিল ছেলেবেলা থেকেই ধনিষ্ঠার স্বামীর সঙ্গে তার বাড়ীতে যেত, ধনিষ্ঠাকে সে বৌদিদি বলে' ডাকৃত; ছেলেবেলার পরিচয়ের অধিকারে এবং বর্ত্তমান ম্যানেজারের ভাই ও গৌরীর পিতা হওয়ার সম্পর্কের জোরে সে অবাধে ধনিষ্ঠার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর্‌লে। ধনিষ্ঠা তখন সবেমাত্র পূজার ঘর থেকে অনলকে কাছারীতে আস্‌তে দেখে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর গৌরীও পণ্ডিত মশায়ের কাছে লেখাপড়া শেষ করে' মার কাছে এসেছে, এমন সময় সেখানে অনিল এসে উপস্থিত হয়ে নেশা-জড়িত স্বরে বল্‌লে—কি বৌ-দিদি, ভালো আছ তো?……

অনিল মাঝে এসে পড়াতে ধনিষ্ঠা স্বামীকে কখনো প্রাণ ভরে' কাছে পায়নি, তার স্বামী অনিল আর থিয়েটার নিয়ে দিবা-রাত্রি উন্মত্ত হয়ে থাকৃত, ধনিষ্ঠার ভাগ্যে স্বামী-সঙ্গ দুর্লভ হয়ে উঠেছিল; এজন্য ধনিষ্ঠা কখনো অনিলকে সুনজরে দেখ্‌তে পারেনি. অনিলকে দেখ্‌লে—এমন কি তার নাম শুন্‌লে ধনিষ্ঠার গা জ্বলে' যেত। এই অনিল মধ্যে কিছুদিন অনলের ভাই হয়ে ধনিষ্ঠার কাছে নূতন ভাবে পরিচিত হওয়াতে তার প্রতি ধনিষ্ঠার বিরাগ অনেকখানি হ্রাস হয়ে গিয়েছিল; তার পর গৌরীর পিতা বলে'ও অনিলের স্মৃতিটার তিক্ততা অনেকখানি দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার অনিল অনলের সাক্ষাৎ মনস্তাপের রূপ ধরে' এসে ধূমকেতুর মতন আবির্ভূত হয়েছে, এই অনিলের জন্য অনল সর্ব্বস্বান্ত হ'ল বারম্বার এবং অনলের অভাব মোচনের জন্য ধনিষ্ঠাকে কী ভীষণ কৃচ্ছ্রসাধনই না কর্‌তে হয়েছে এবং এবার আর অভাব মোচন করা সম্ভবপরও হবে না—ধনিষ্ঠা অনলকে কিছু এমনি দান কর্‌লে সে নেবে না, ব্রতের ছলে দান কর্‌লেও সে সেই সামগ্রী নিয়ে তৎক্ষণাৎ বিতরণ করে' ফেল্‌বে, এবং অনল যেজন্য এবার সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে তাতে তাকে কিছু দেওয়াও ধনিষ্ঠার উচিত হবে না, ভাইয়ের চুরি আর মদ খাওয়া নিবারণ কর্‌বার জন্যই না অনল সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার বিষম দুঃখ বরণ করেছে,—এইসব ভেবে ধনিষ্ঠার মন অনিলের উপর আবার বিরূপ হয়ে উঠেছিল; এখন তাকে মত্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে অসম্মান-ব্যঞ্জক ব্যঙ্গভরা স্বরে কথা বল্‌তে শুনে ধনিষ্ঠার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হ'ল। সে অনিলের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে বিরক্তি বিচ্ছুরিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গৌরী তার জনকের চোখ-মুখের রক্তিমাভা ও কুশ্রী বিকৃতি এবং অবশ অঙ্গভঙ্গী দেখেই ভয় পেয়ে গেল; ধনিষ্ঠার খাওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত ধনিষ্ঠাকে যে তার ছুঁতে নেই সেই নিষেধ ভুলে গিয়ে গৌরী ভীতিপাংশুল মুখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ধনিষ্ঠাকে জড়িয়ে ধর্‌লে। ধনিষ্ঠা

অনিলের দিক্ থেকে চোখ না ফিরিয়েই গৌরীকে কোলে তুলে নিলে; গৌরী কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হয়ে বাঁচল।

অনিল ধনিষ্ঠার বিরক্তি ও গৌরীর ভয়ের দিকে লক্ষ্য না করেই নিজের কথার পিঠেই কথা বলে' চল্ল—আগে তুমি ছিলে আমার পাতানো বৌদিদি, এখন আমার সত্যিকারের বৌদিদি হয়ে গেছ! দিব্যি আছ বৌদিদি!

ধনিষ্ঠার চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে গেল; সে কর্কশ গম্ভীর স্বরে বল্লে—দেখো অনিল-ঠাকুরপো, মুখ সাম্‌লে কথা বোলো, মাতলামি কর্‌বার জায়গা এখানে নয়। তুমি যাও......এখনি চলে' যাও......না, তোমার কোনো কথা আমি শুন্‌ব না......তুমি ম্যানেজার-বাবুর ভাই, গৌরীর বাবা বলে' এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ, নইলে.........

অনিল ধনিষ্ঠার কড়া মেজাজ ও দৃঢ় স্বভাবের পরিচয় বিলক্ষণই জান্‌ত; তাই সে মত্ত অবস্থায় মনের প্রধান কথাটা ব্যক্ত করে' ফেলেই ধনিষ্ঠাকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে বিশেষ দমে' গিয়েছিল; সে মনে করেছিল ধনিষ্ঠা তার কথাটাকে ঠাকুরপোর রসিকতা বলে'ই মনে করে' নেবে। ধনিষ্ঠা কথার মাঝখানে হঠাৎ থেমে যেতেই অনিল ধনিষ্ঠার মুখের শেষ কথা কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে—নইলে কি? আমাকে দারোয়ান দিয়ে বের করে' দিতে?

ধনিষ্ঠা কড়া স্বরে বল্লে—আমি তোমার একটা কথাও শুন্‌ব না, তুমি এক্ষণি চলে' যাও, আর কখনো আমার বাড়ীর ভিতরে আস্‌বে না বলে' দিচ্ছি।

এই বলে'ই ধনিষ্ঠা গৌরীকে কোলে করে' নিয়েই ঠিক পিছনেই তার পূজার ঘরে ঢুকে পড়্‌ল এবং তৎক্ষণাৎ দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

অনিল ভয় ও লজ্জা পেয়ে নম্র স্বরে বল্লে—বৌদিদি, আমার একটা কথা শোনো.. ...

ধনিষ্ঠা বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে অনিলের কথা গ্রাহ্য না করে' মাধবীকে ডেকে বল্লে—মাধী, পাঁড়ে আর তেওয়ারীকে বল্ ছোটবাবুকে সঙ্গে করে' বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।

অনিল এবার বিরক্ত হয়ে বলে' উঠল—হুস্! সতীপনা দেখে আর বাঁচিনে! তবু যদি দেশময় ঢিঢিক্কার না পড়ে' যেত! পেয়াদার ভয় দেখিয়ে তো আর সত্যিকে লুকিয়ে রাখা যায় না!.........

অনিল বাড়ীতে ঢুক্‌তেই অন্দরের দেউড়ির দরোয়ান পাঁড়ে আর তেওয়ারী একটু ব্যস্ত হয়েই ছিল; এখন রাণীজীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হুকুম তাঁদের কানে যেতেই তারা বাড়ীর মধ্যে আস্‌ছিল; আবার অন্য দিকে অনেক দাসী চাকর ধনিষ্ঠার দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থেকে মাতালের কাণ্ড দেখ্‌বার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল, তারাও রাণীমার হুকুম শোন্‌বামাত্র পাঁড়ে ও তেওয়ারীকে ডাক্‌তে দৌড়ে ছিল, মাঝপথে তাদের উভয় পক্ষের দেখা হয়ে গেল। মাধবী অনিলের সাম্‌নে দিয়ে কেমন করে' দারোয়ানদের ডাক্‌তে যাবে ভেবে ইতস্ততঃ কর্‌ছিল; মাধবী এক পা নড়বার আগেই দেখ্‌লে পাঁড়ে আর তেওয়ারী সিঁড়িতে উঠ্‌ছে। সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনে অনিল মুখ ফিরিয়েই যখন দেখ্‌লে দুই বিশালবপু ভোজপুরী জোয়ান উপরে উঠে আস্‌ছে, তখন তার নেশা অনেকখানি ছুটে গেল, মনটাও প্রকৃতিস্থ হয়ে গেল; সে মনে মনে ধনিষ্ঠার সঙ্গে শালী-সম্পর্ক পাতিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে' গেল; পাঁড়ে আর তেওয়ারীও মাঝ সিঁড়িতে পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে ছোটবাবুকে অগ্রসর করে' নিয়ে নেমে চলে' গেল।

ক্ষণকাল সব চুপচাপ। ধনিষ্ঠা ঘরের ভিতর রুদ্ধ থেকে বুঝতে পার্‌ছিল না অনিল গেছে,না এখনো আছে। সে গৌরীকে বুকে চেপে ধরে' পাষাণমূর্ত্তির মতন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিস্ময়বিমূঢ়তা থেকে সচেতন হয়ে মাধবী ধনিষ্ঠাকে ডেকে বল্লে—মা, দরজা খুলে বেরিয়ে এসো, কাকা বাবু চলে' গেছে।

মাধবীর কথা শুনে সাহস পেয়ে গৌরীরও কথা ফুট্‌ল, সে ধনিষ্ঠাকে বল্লে—পাপা তোমাকে মার্‌তে এসেছিল মা? আমার সেই আগের মাকেও এমনি করে' মার্‌ত, আমাকেও মার্‌ত মা, শুধুশুধু, আমরা কোনো দোষ কর্‌তাম না, তবু মার্‌ত!

ধনিষ্ঠা গৌরীর কথার উত্তরেও কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লে না, কেবল তাকে আরো নিবিড় করে' বুকে চেপে

ধর্‌লে; সে দরজা খুলেও বাহির হতে পার্‌ছিল না, লোকের কাছে মুখ দেখাতে তার লজ্জা কর্‌ছিল—অনিলের কথা তো তার চাকর দাসীরা শুনেছে, তারা কী মনে কর্‌ছে! ছি ছি! কী দুর্নিবার লজ্জা! এই যে মিথ্যা কুৎসার জাল ক্রমশঃ তাকে জড়িয়ে ধর্‌ছে এর থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় কি?

মাধবী আবার ব্যথিত মিনতির স্বরে বল্‌লে—মা, তুমি বেরিয়ে এসো, আবার তো নাইতে-টাইতে হবে; ভাত-টাৎ যে ওদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

গৌরী ধনিষ্ঠার বুকের মধ্যে থেকে তার মুখ দেখ্‌বার চেষ্টায় মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে বল্‌লে—মা, আমি তোমাকে ছুঁয়ে দিয়েছি বলে' তোমাকে আবার নাইতে হবে? আমাকে নিয়ে তো তুমি পূজোর ঘরেও এসেছ! আমি তো নিজে আসিনি মা। এ সব জিনিস ফেলে দিতে হবে?

শিশুর মুখের এই প্রশ্ন শুনে ধনিষ্ঠার বুক ফেটে যেতে চাচ্ছিল; এ কথার সে কী উত্তর দেবে, এই শিশুকে কী বলে' সে সান্ত্বনা দিতে পারে?

সে নীরবে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

ধনিষ্ঠার মন এই দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, অনিল আজ যে মিথ্যা অপবাদ তাকে দিয়ে গেল, মদের ঝোঁকে যদি সেই অপবাদ তার দাদার সাম্‌নে ব্যক্ত করে, তা হ'লে সেটা কী বিষম লজ্জার কারণ হবে! এর আগে সাধন চক্রবর্তীর স্ত্রী ও ন্যানো বামনী তার নামে মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করেছে; কিন্তু তারা দুজনেই স্ত্রীলোক, তাদের কুৎসা অনলের কানে পৌঁছাবার সম্ভাবনা কম ছিল এবং কোনো পুরুষ সহসা সাহস করে' জমিদারণী ও ম্যানেজারের নামে যে কুৎসা রটাবে এ সম্ভাবনাও বেশী ছিল না; তাই ধনিষ্ঠা আগে এতটা চিন্তাকুল হয়নি। কিন্তু অনিল একে অনলের ভাই, চিরকাল স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, তাতে আবার মাতাল; সে অনায়াসেই অকথ্য কুৎসা ব্যক্ত করে' ফেল্‌তে পার্‌বে। এই আশঙ্কায় ধনিষ্ঠার অন্তর উদ্বিগ্ন ও লজ্জাকুণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। সে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌লে না; তার চাকর-দাসীর কাছে পর্য্যন্ত মুখ দেখাতে সে সঙ্কোচ বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল।

ক্রমশঃ

ঝঞ্ঝা-আহ্বান

শ্রী শ্রীধর শ্যামল

এস এস ভয়ঙ্কর—হে প্রলয়ঙ্কর,—
ভালে জ্বালি' অনল শঙ্কার,
বিশ্বধ্বংসী মহাহবে স্তব্ধ চরাচর—
হান' হান' ঝঙ্কার ভঙ্কার!

শত-চক্র-ঘর্ঘরিত ধূম্রময়ী রথে গরজি উঠিছ মহারোষে,
দীর্ঘ তব জটাতলে ক্ষুব্ধ যত ভুজঙ্গিনী মুহুর্মুহু ফোঁসে,
থেকে থেকে অট্টহাসে হাহারবে ঝটিকায় ঝাপটিছ পাখা,
উপাড়িছ তরুশ্রেণী নৃত্যভঙ্গে নত ক'রে সবাকার শাখা;

দিকে দিকে প্রসারিত সুগম্ভীর মহিমা বিরাট্‌—
এস হে সম্রাট্‌;—
আস নাই আজ চুপে চুপে
আসিয়াছ ওগো রুদ্র মহাক্রুদ্ধ ভৈরবের রূপে।

মহাতুঙ্গ গিরিশ্রেণী ফেনশুভ্র তরঙ্গ উত্তাল,
গহন, কান্তার, বন—অভ্রভেদী অরণ্য বিশাল,
প্রলয়ের তূর্য্যরবে—জর্জ্জর করেছ সবে
কে তুমি ভয়াল?

কভু তুমি ধেয়ে যাও বালুপূর্ণ মরুভূ'র 'পরে,
মত্ত হ'য়ে নৃত্য কর জনহীন বিরাট প্রান্তরে—
মহাব্যোম হ'তে বেগে ফেটে পড় বজ্ররূপ ধরি',
গ্রাসি' নাশি' ফেল যেন সুপ্তিময়ী শ্রাবণ-শর্ব্বরী ;
কভু ক্ষুব্ধ হাসে—
নিঃশেষে নাশিতে চাও মহাবিশ্বে সুতীব্র নিশ্বাসে।

আজি আস নাই তুমি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাময়ী রাতে,
বিকশিত বিতানের বিহসিত বাসর-সভাতে—
সন্তর্পণে ধীরপদে স্মিতহাসে সুখমদালসে—
যাওনি মন্থরগতি কুন্দকান্তি কবরীর পাশে ;
আস নাই আজি চুপে চুপে ;
আসিয়াছ ওগো রুদ্র মহাক্রুদ্ধ ভৈরবের রূপে।

হান' হান' বজ্রবীণা—ভাঙো মুহ্যমান মায়া-বেড়ী,
সূচীভেদ্য আঁধারের নগ্নদেহ ত্রস্তে ফেল ছিঁড়ি,
উড়াইয়া জীর্ণ পত্র, টুটি' গাত্র শীর্ণ মন্দিরের
মুক্ত কর এ বিশ্বের মুমূর্ষু ও দীন বন্দীদের।
দিকে দিকে প্রসারিত সুগম্ভীর মহিমা বিরাট্,—
এস হে সম্রাট।

ঘরে ঘরে রুদ্ধদ্বার বদ্ধচোখে কে ক্রন্দন করে ?
মুক্তি দাও—মুক্তি দাও পেষি' তব বিশাল খর্পরে,
জনশূন্য দীর্ঘ পথ দেখ তার নাভিশ্বাস ওঠে,
ভগ্ননীড় বিহঙ্গম ফুকারিছে জীর্ণ বাপীতটে।

শঙ্কিতা চকিতা নারী—শূন্য-আঁখি কেন ক্ষুব্ধ-মন ?—
মঞ্জুল বঞ্জুল-কুঞ্জে ভয়ে মরে নূপুর-নিক্কণ।
ওগো ঘরে ঘরে
বদ্ধ-হিয়া নত-আঁখি কে ক্রন্দন করে ?

মুক্ত করি' দিনু দ্বার—এস এস হে প্রলয়ঙ্কর,—
নগ্নবুকে বাঁধ নীড়—বন্ধহারা ওগো ভয়ঙ্কর,—
অগ্নিগিরি-গর্ভ হ'তে টেনে আন' ঘন ঘূর্ণীবায়ু—
মহামন্ত্রে ছিঁড়ে ফেল চন্দ্র তারা গ্রহ কেতু রাহু—
ধরি' দিগন্তের বেণী—হিমশৃঙ্গ অটল অদ্রির
ঘুরাইয়া ফেলে দাও—মহাভার হর ধরিত্রীর।
হে প্রলয়ঙ্কর,—
ভয়ঙ্কর বেশে তুমি হে চিরসুন্দর।

হে দেবতা,—
ওগো বন্ধু, ওগো সখা, ওগো প্রিয় ভ্রাতা—
ওই তব রুদ্র রূপ ওই ঝঞ্ঝা বড় ভালবাসি,—
মোরে কর তব বজ্র-বাঁশী।
করে ধরি' লয়ে চল দিকে দিকে দেশে দেশান্তরে,
ক্ষুব্ধ বারিধির বুকে, দিশাহীন বিশাল প্রান্তরে,
ঘন স্বার্থবিতাড়িত ঈর্ষ্যানীল বিপদের বুকে,
কুটিল আবর্ত্ততলে—নাচায়ে নিবিড় মহাসুখে—
কোথা কুজ্ঝটিকাবৃত সুগভীর অতল পাতালে
ঘৃণ্য কারা পড়ে' আছে জাগাব তাদের মত্ততালে,
বন্ধ ও মন্দির হতে মৃত জড় দেবতারে ধরি
শূন্যে-শূন্যে ঘুরাইয়া মহাশূন্যে ফেলিব আছড়ি',
রুদ্ররূপ বড় ভালবাসি,
বাজিব দুর্জ্জয় তালে দিকে দিকে তব বজ্রবাঁশী।
আস নাই আজি চুপে চুপে,—
আসিয়াছ ওগো রুদ্র মহক্রুদ্ধ ভৈরবের রূপে।

মেটারলিঙ্কীয় নাটকের ভাববস্তু

শ্রী মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

আধুনিক যুগের ইউরোপীয় নাট্যকারগণের মধ্যে মেটারলিঙ্কের যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং নব নাট্য রীতির প্রবর্তক হিসাবেও যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহা ইউরোপীয় নাটকের যাঁহারা পাঠক তাঁহাদের অবিদিত নাই। বর্তমান প্রবন্ধে মেটারলিঙ্কের নাটকগুলির কোনোরূপ বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া সমগ্র মেটারলিঙ্কীয় নাট্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া যে ভাববস্তুটির বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

ভাবজীবন ও নাট্যসৃষ্টি

মেটারলিঙ্কীয় নাটকের সহিত তাঁহার ভাবজীবনের যে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, মেটারলিঙ্কের গভীরতর জীবনের চিন্তা ও অনুভূতি যে তাঁহার নাটকে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার ভাবধারার অনুসরণ করিলে স্পষ্টই চোখে পড়ে। যদিও এখানে অপর কাহারও কথা বলার একান্ত প্রয়োজন নাই, তবু সত্যকার সাহিত্যমাত্রই যে শিল্পীর গভীর জীবনের মর্মস্থল হইতে উৎসারিত হইয়া থাকে তাহা শেলী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনাতেও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মেটারলিঙ্কীয় নাটকের আলোচনা করিতে হইলে তাই প্রথমতঃ আমাদিগকে তাঁহার এই ভাবজীবনের বিকাশের সহিত তাঁহার নাট্য-সৃষ্টির মধ্যে জীবনের যে অনুভূতি, জীবনের প্রতি যে দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার যোগটি দেখাইতে হইবে।

নাটকের ভাব ও রূপ

কিন্তু নাটকের সর্বাঙ্গীণ আলোচনার মধ্যে তাহার রূপের কথাটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। ভাব ও রূপ, এ দুটিকে চিন্তার দ্বারা যতই পৃথক্ করিয়া দেখিবার চেষ্টা আমরা করি না কেন, জীবনের প্রকাশ-ক্ষেত্রে রূপ এবং ভাব একেবারে অবিচ্ছিন্ন অদ্বৈত রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভাবের বিশেষত্বই রূপকেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া তোলে। এইজন্য আমাদিগকে মেটারলিঙ্কীয় নাটকের বিশেষ রূপটিকেও দেখার এবং তাহার সহিত তাঁহার জীবনের নিগূঢ় যোগ কোথায় তাহা বোঝার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কবির সৃষ্টি ও তাঁহার মতামত

নাটক-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া স্বভাবতঃই আমাদের মনে হয় যে, নাটক-সম্বন্ধে নাট্যকার স্বয়ং কি মতামত পোষণ করেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হয় না? কিন্তু এই ইচ্ছাটি স্বাভাবিক হইলেও কোনো কবির মতামতের দ্বারা যে তাঁহার সৃষ্টিকে বিশেষ বোঝা নাও যাইতে পারে, এ-কথাটি ভুলিয়া গেলে অনেকস্থলেই আমাদের ঠকিতে হইবে। কবি তাঁহার কাব্যসৃষ্টির অর্থটি যে, নিজে নাও জানিতে পারেন, এ-কথাটি শুনিতে যতই অসম্ভব লাগুক না কেন, কথাটি সত্য। ইহার কারণ এই যে আমাদের জীবন-দেবতাই বলি আর আমাদের গোপন-মগ্নজীবনই বলি, সেটি নিত্যকালই আমাদের নিকট অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া আমাদের জীবনকে অর্থাৎ যাহাকে আমাদের জীবন বলিয়া আমরা জানি তাহাকে—সৃষ্টি করিতেছে; সে-সৃষ্টির অর্থ আমাদের গোচর নহে। শুধু কখনও-কখনও হয়ত বা দু-একটা অনুমানমাত্র আমরা করিতে পারি, কিন্তু তাহা যে সত্য হইবেই তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। বর্তমান মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া এই সত্যটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে।

আমাদের জীবনের অসীম আশা আকাঙ্ক্ষার উৎসটি আমাদের চেতনার মধ্যে উৎসারিত নহে। আমাদের মগ্ন চেতনার গোপনগুহাতলে আমাদের অনন্ত জীবনখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার যতটুকু আমাদের চেতনার উন্মুক্ত প্রান্তরে বহিয়া আসিতেছে, তাহা অতি সামান্য। সত্যকার শিল্পসৃষ্টি শিল্পীর এই গোপন-চেতনার মধ্যে

হইয়া থাকে বলিয়াই তাহার মধ্যে গোপন চেতনার সবখানি রহস্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু মতামতবস্তুটা খুবই সীমাবদ্ধ,যতটুকু দেখা যাইতেছে বা গিয়াছে ততটুকু হইতেই আমরা একটা মতামত গড়িয়া লই এবং ধরিয়া লই যে এই মতামত জীবনের অসীম অপ্রকাশের ক্ষেত্রেও তেমনই সত্য থাকিবে। অথচ আমাদের গভীরতর জীবনকে তএমন করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিবার কোনো উপায় নাই। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টিগুলি সহস্র মনের সহস্র মতামতের মধ্য দিয়া সমালোচিত হওয়ার পরও, আজও তেমনি নূতন, তেমনি অসীম হইয়া আছে। তাহার কারণ মন-বস্তুটা বাতায়নের মতন। তাহার মধ্য দিয়া বিশ্বকে দেখিয়া আমরা যতই পর্য্যাপ্ত মনে করি না কেন, বিশ্বজীবন বাতায়নের দেখার মধ্যে কিছুতেই সবখানি সম্পূর্ণ হইয়া ধরা দিতে পারে না। এইজন্যই এমনটি প্রায়ই দেখা যায় যে, কবির মতামত 'সেকেলে' হইয়া গেলেও তাঁহার কাব্য চিরকালই নবীনতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তবে মেটারলিঙ্ক্, শেলি, রবীন্দ্রনাথ,—ইঁহাদের মতামত-সম্বন্ধে একটি বক্তব্য আছে। একাধারে শিল্পী এবং চিন্তাশীল দার্শনিক বড়-একটা দেখা যায় না। তাহার কারণ একের ক্ষেত্র অপরের ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিঙ্ক এবং শেলির শিল্প সম্বন্ধীয় উক্তির একটা বিশেষ মূল্য আছে। ইঁহাদের শিল্প জীবনের অনুভূতি হইতে বিচারের দ্বারা ইঁহারা মতবাদ গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন; শুদ্ধমাত্র দার্শনিকের এ সুযোগটি নাই। তাহাকে চিরকালই একটু বাহিরে থাকিয়া শিল্পসৃষ্টিকে বিচারবিশ্লেষণ করিয়া মতবাদ গড়িতে হয়। এইজন্যই প্রথমতঃ আমরা নাটক-সম্বন্ধে মেটারলিঙ্কের মতটি কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

মেটারলিঙ্কের মত

(ক) "দীনের সম্পদে"

নাটক-সম্বন্ধে মেটারলিঙ্কের সর্ব্বপ্রথম চিন্তা তাঁহার 'দীনের সম্পদেই' পাই। 'দৈনন্দিন জীবনের ট্র্যাজেডি' প্রবন্ধে তিনি নাটক-সম্বন্ধে যে-কয়টি মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা হইতেই আমরা তাঁহার নাটক-সম্বন্ধে সেই সময়কার ধারণাটি জানিতে পারি। 'দীনের-সম্পদ্' যে মেটারলিঙ্কের জীবনের কোন্ মুহূর্ত্তে রচিত হইয়াছিল, সেই কথাটি আমাদিগকে এখানে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। 'দীনের সম্পদ্' বইখানি (১৮৯৬) মেটারলিঙ্কের "নৈরাশ্য, ভীতি ও বিষাদ-মুক্ত জীবনের একটি অপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বসিত প্রভাতসঙ্গীত" ইহা বর্ণে-বর্ণে সত্য মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, ইহার পূর্ব্বে মেটারলিঙ্ক্ তাঁহার সন্ধ্যাসঙ্গীত গাহিয়াছেন ; সেই বিষাদ সঙ্গীতের 'রেশ দীনের সম্পদে' কোথাও-কোথাও থাকিলেও তাহা তেমন ধরা পড়ে না। উক্ত প্রবন্ধে মেটারলিঙ্ক বলিতে চাহিয়াছেন যে, নাটক জীবনের কোন ঘটনার আশ্রয়ে জীবনের নিগূঢ়তম রহস্যকথাটিকে ব্যক্ত করিবে, জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে জীবনের মহিমা এবং সৌন্দর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইবে, জীবন যে কি বিশাল, কি রহস্যপূর্ণ এবং মহিমাময় তাহা দেখাইবে। তিনি আরো বলিতে চাহিয়াছেন যে, জীবনের সত্যকার 'ট্র্যাজেডি' (কারুণ্য) বাস্তবিক আমাদের আকস্মিক দুঃখ-বিপ্লবের প্রচণ্ডতার মধ্যে নয় ; সত্যকার ট্র্যাজেডির সন্ধান পাইতে হইলে, অন্তরাত্মার চিরন্তন (সুতরাং দৈনন্দিন) ট্র্যাজেডি কোথায় তাহা বুঝিতে হইলে এইসব আকস্মিক ঝঞ্ঝাকে বাদ দিয়া জীবনের দিকে তাকাইতে হইবে। অর্থাৎ কোলাহল ছাড়িয়া মানবাত্মাকে তাহার নীরবতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। অন্তরাত্মার গভীরতর সত্তাটিকে দেখাইতে হইলে তাহাকে বহির্জ্জীবনের কর্ম্মচাঞ্চল্যের মধ্যে দেখানো যাইবে না। সুতরাং মেটারলিঙ্কের মতে প্রকৃত নাটকে বহির্জ্জীবনের ঘটনাবহুল চাঞ্চল্যকে বর্জ্জন করিতে হইবে এবং নীরবতার মধ্য দিয়াই অন্তরাত্মার সত্য ঘটনাকে প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাই মেটারলিঙ্কীয় গতি-বর্জ্জিত থিয়েটারের (Static Theatre) মূল কথা। নাটকের মধ্যে—যেখানে বার্ত্তালাপ ভিন্ন কোনো-কিছুর প্রকাশই অসম্ভব—মেটারলিঙ্ক্ নীরবতাকে কেন যে এত বড় স্থান দিয়াছেন তাহা পুরাপুরি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে এইখানে তাঁহার 'নীরবতা' প্রবন্ধের কথাগুলি

মনে রাখিতে হইবে। "দীনের সম্পদে"র আলোচনায় আমরা বিশেষভাবে তাহার কথা বলিয়াছি।

স্থিতি নাট্য

মেটারলিঙ্কের এই স্থিতি-নাট্যের(Static Drama)পরিকল্পনার কথা একটু বিস্তার করিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যক। মেটারলিঙ্ক্ গ্রীক নাটকের মধ্যেই তাঁহার এই আদর্শটিকে কাব্যে পরিণত দেখিয়াছেন। গ্রীক নাটকের মধ্যে বাহিরের ঘটনা যেমন একেবারেই নাই, তেমনি অন্তরের মাঝেও ঘটনাবাহুল্য নাই। এই স্থিতিনাট্যের লক্ষ্য জীবনের একটা গতি বা পরিণতি দেখানো নহে, সেইজন্যই ইহার মধ্যে চরিত্রবিকাশ বস্তুটা নাই। গ্রীক নাট্যের লক্ষ্য ছিল জীবনের মাঝখানে অলঙ্ঘ্য নিয়তিকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখানো। গ্রীক নাটকের মধ্যে জীবনপ্রবাহ দেখি না, সেখানে নিয়তির সম্মুখে স্তব্ধ জীবনের একখানি মর্ম্মর মূর্ত্তিমাত্র দেখি। এই স্থিতি নাট্যই মেটারলিঙ্কের নব-নাট্য; গ্রীকনাট্য হইতে ইহার পার্থক্য শুধু উদ্দেশ্যের মাঝে। গ্রীকনাটক দেখাইয়াছে জীবনের উপর নিয়তির অলঙ্ঘনীয় প্রভাবটিকে, কিন্তু মেটারলিঙ্কের মতে নব-নাটকের উদ্দেশ্য হইবে জীবনের পশ্চাতে যে অদৃষ্টরহস্য রহিয়াছে তাহাকেই মূর্ত্ত করিয়া দেখানো। এইজন্য এই নাটক গ্রীক নাটকের মতনই জীবনকে তাহার গতিময় বিচিত্র বিকাশের মধ্যে দেখিবার চেষ্টা না করিয়া একটি-মাত্র সুরকে, একটিমাত্র মনোভাবকে (mood) মূর্ত্ত করিয়া জীবনকে নিশ্চল করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। যে অজ্ঞেয় এবং অপরিসীম অদৃষ্ট রহস্য মানবজীবনকে অন্তরাল হইতে নিত্যকাল চালনা করিয়া আসিতেছে, মেটারলিঙ্কীয় স্থিতিনাট্য তাহাকেই একটা রূপ দিবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

রহস্য ও নব নাটক

মানবজীবন-ঘেরা এই অজ্ঞাত বিপুল রহস্যই নব-নাটকের বিষয়বস্তু হওয়ার ফলে নাট্যপদ্ধতির মধ্যেও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। রহস্য বস্তুটা হইতেছে অন্ধকারের, তাহাকে কখনও আলোকে আনিয়া দেখানো যাইতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিচরিত্র বস্তুটা এই রহস্য-বিরোধী, কারণ ব্যক্তি হইতেছে তাহাই যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, সুস্পষ্ট হইয়াছে; দিবালোকের মধ্যে, জ্ঞানের মধ্যে তাহার সীমারেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই সে ব্যক্তি। এইজন্যই রহস্যকে একটা ব্যক্তির রূপ দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা এই নব নাটক করিতে পারে নাই; তাহাকে বাধ্য হইয়া একটা আব্‌হাওয়ার (dramatic atmosphere) সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। কারণ জীবনের বিপুল রহস্য-বস্তুটি মানবাত্মার নিকট একটা ব্যক্তি হইয়া ধরা দিতে পারে না; একটা আব-হাওয়ার মতন আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত একটা অব্যক্ত,আসন্ন-ভাবের মতন তাহাকে অনুভব করা যায় মাত্র। রহস্যের এই আব্‌হাওয়া প্রকাশ করিতে গিয়া মেটারলিঙ্ক্ তাই নববার্ত্তালাপ-ভঙ্গীর প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। এই বার্ত্তালাপ-রীতির কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে শুধু মেটারলিঙ্ক্ তাঁহার "দীনের সম্পদে" নাটক-সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

(খ) "গোপন-মন্দিরে"

"দীনের সম্পদে" প্রচারিত এই মতবাদ অচিরেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'গোপন-মন্দিরে' (১৯০২) 'রহস্য বিবর্ত্তন' প্রবন্ধে রহস্যালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি নাটকের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে খানিকটা মত প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে তিনি মানব-জীবনকেই নাটকের বিষয়-বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নীতি-রহস্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মেটারলিঙ্ক্ এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মানবজীবনের যাহা-কিছু সংগ্রাম তাহা হইতেছে নৈতিক এবং এই নৈতিক জগৎ বাহিরের কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। মানবের অন্তরাত্মাই এই নীতিবোধের প্রতিষ্ঠাভূমি। মোট কথা অদৃষ্ট-শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেটারলিঙ্ক-এখানে স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তাই তিনি বর্ত্তমান যুগের নাটককে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক হইতে হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কারণ এই নাটককে বর্ত্তমান জীবন দেখাইতে হইবে এবং বর্ত্তমান জীবনে একদিক্ দিয়া সফোক্লীয় নাটকের নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান যেমন স্বীকার্য্য নয়, তেমনি বহির্জ্জগতে কোনো নৈতিক শক্তির অস্তিত্বও স্বীকার্য্য

নয়। যাহা কিছু সংগ্রাম তাহা মানবের অন্তরাত্মার মধ্যে তাহার অন্তরতম নীতি বোধের মধ্যে। যদিও দুর্ব্বল মানবচরিত্র লইয়াও এই শ্রেণীর নাটক হইতে পারে, তবু মেটারলিঙ্কের মতে বর্ত্তমান যুগনাট্য সবল ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানী মানবের, অজ্ঞাত শক্তিপুঞ্জের সহিত সংগ্রামে যে অনিবার্য্য ভ্রান্তি ও বিপদ্ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিবে।

(গ) 'রঙ্গোদ্যানে'

রঙ্গোদ্যানের (১৯০৪) 'আধুনিক নাটক' প্রবন্ধে উপরোক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া মেটারলিঙ্ক্ একটি বিস্তৃত আলোচনা করেন। আধুনিক নাট্যের প্রকৃতির মধ্যে মেটারলিঙ্ক চারিটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন ; দেখিতে পাই নাটকে বাহ্য ঘটনার হ্রাস, প্রচণ্ড ঘটনা সৃষ্টির প্রতি অশ্রদ্ধা, জীবনের ও নৈতিক সমস্যার গভীরতর আলোচনা এবং বাস্তব সৌন্দর্য্যের সন্ধান। বাহ্য ঘটনাবর্জ্জনের দিকে আধুনিক নাটকের গতি দেখা গেলেও মেটারলিঙ্ক তাঁহার প্রথমকার প্রচারিত স্থিতি-নাট্যের সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গভীরতর চেতনায় প্রবেশ করা এবং তাহার সত্যটিকে উদ্ঘাটিত করা, দার্শনিক, নীতিকার ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ও গীতি-কবির কর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু নাট্যকারের নয়। কারণ রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনই বাহ্য জগতের ঘটনা, ইহাকে কিছুতেই বর্জ্জন করা চলে না।

মেটারলিঙ্ক্ বর্ত্তমান যুগনাট্যের আলোচনা করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন, যে আধুনিক নাটক এখনও জীবনে সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই, কারণ এখনও সে জীবনের রহস্যকে বর্ত্তমান যুগের জীবনের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই। এইজন্যই বর্ত্তমান যুগনাট্য কতকগুলি নৈতিক সমস্যানাট্য ছাড়া আর-কিছুরই আলোচনা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

আধুনিক নাট্যের বিষয়বস্তু

চিরকালই মানব জীবনের মাঝে ঈর্ষা-দ্বেষ মারামারি-কাটাকাটির সংগ্রামই একমাত্র-সংগ্রাম হইয়া থাকিবে, মানবজীবনে ইহার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কোনো সংগ্রাম হইবে না, একথা মেটারলিঙ্ক্ স্বীকার করেন নাই। মানবচেতনা যে ধীরে-ধীরে জ্ঞানে ও প্রেমে সবল হইয়া উঠিতেছে এবং এইজন্যই মানবজীবনের সংগ্রামও যে উচ্চতর এবং নবতর রূপ ধারণ করিবে মেটারলিঙ্ক এই সম্ভাবনাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আধুনিক যুগের সত্য নাট্যসৃষ্টি মানবজীবনের নৈতিক দুর্ব্বলতার সংগ্রাম দেখাইবে না ; আধুনিক নাটক মানব-অন্তরের করুণা, মৈত্রী ও ন্যায়পরতার সহিত স্বার্থপরতা: অহমিকা ও অজ্ঞানের সঙ্ঘাত হইতেই উদ্ভূত হইবে।

ট্র্যাজেডির সীমা

আধুনিক নাটকের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা উপলক্ষ্যে মেটারলিঙ্ক্ ট্র্যাজেডির সম্ভাব্যতার সীমা-সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। মানব-চেতনায় যতক্ষণ সঙ্ঘাত আছে, সংগ্রাম আছে ততক্ষণই সেই জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হইবার দাবি করিতে পারে। কিন্তু জীবনের বিকাশের কথাটি ভাবিয়া দেখিতে গেলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, তাহার মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের বিকাশ যতই বেশী হইতে থাকিবে ততই সঙ্ঘাতের সম্ভাবনাও কম হইতে থাকিবে।

মেটারলিঙ্কীয় নাট্যের বিষয়বস্তু

(ক) ১৮৮৬—৯৪

মেটারলিঙ্ক্ কার্য্যতঃ তাঁহার নাটকসৃষ্টির মাঝে নাটকীয় বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে কি মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, এখন আমরা তাহা দেখিবার চেষ্টা করিব। বলিয়াছি যে, "দীনের সম্পদে" মেটারলিঙ্ক্ যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রথম জীবনের মত নহে। দীনের সম্পদের পূর্ব্বেকার আটখানি নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলেই আমরা তাঁহার নাটকীয় মতবাদটি আবিষ্কার করিতে পারিব। উক্ত নাটক-কয়খানির সঙ্গে Serres Chaudes এর কবিতায় (১৮৮৬) প্রকাশিত জীবনানুভূতির কথাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

মেটারলিঙ্কের যৌবন

যদিও উক্ত কয়েকখানি নাটক ছাড়া মেটারলিঙ্কের



প্রতিহিংসা



নিগ্রো

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা । [রুবেনস্ অঙ্কিত

যৌবনকালের কথা আমরা বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই, তবু তাঁহার উপর সেই সময়কার ঘেণ্টের (Ghent) পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ও জেস্যুট কলেজের আনন্দহীন কঠোর শিক্ষার প্রভাব যে বিশেষ শুভ হয় নাই তাহা নিশ্চিত। যৌবনের সমস্ত শক্তি যেন অবরুদ্ধ হইয়া মেটারলিঙ্কের মধ্যে পাক খাইতেছিল এবং খুব সম্ভব তাহারই ফলে তাঁহার মধ্যে বিষাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। যৌবনের স্বাভাবিক জীবনীশক্তি কোনো কারণে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, যদি সে তাহার স্বাভাবিক বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার ফলে যে মানসিক ও দৈহিক ব্যাধির সূত্রপাত হয়, আজকালকার নবমনস্তত্ত্বের পণ্ডিতগণ (Psycho-analysts) তাহা বিশেষভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন। এই মানসিক ব্যাধির নিরাশাপূর্ণ অসহায় অবস্থার মূল কারণ জীবনীশক্তির অবরুদ্ধতা ("Repression")। গ্যেটে, শেলি, রবীন্দ্রনাথ, এমিল ভেরহেরেন, মেটারলিঙ্ক্ ইঁহাদের সকলকেই নৈরাশ্য ও বিষাদের এবং জীবনের প্রতি আশাহীন অবিশ্বাসের ব্যথাময় অধ্যায় পার হইয়া আসিতে হইয়াছে। যৌবনসমাগমে প্রায় সকলকেই যে কিছু-না-কিছু পরিমাণে এই হৃদয়-অরণ্যের অন্ধকারে কাল কাটাইতে হয় এবং বিশেষভাবে ভাবপ্রধান (sensitive) প্রকৃতি যাঁহাদের, তাঁহাদিগকে যে যৌবনকালটা অনেক সময়ই নৈরাশ্যমগ্ন হইয়া কাটাইতে হয় নবমনস্তত্ত্ববিদেরা এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক নূতন কথাই বলিয়াছেন। এখানে তাহার বিস্তৃত কোনো আলোচনাই সম্ভব নহে। তবে মেটারলিঙ্কের জীবনের ভাবধারাটিকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের নিকট নবমনস্তত্ত্বের সিদ্ধান্তটি যে কতখানি সত্য তাহা সহজেই অনুভূত হইবে।*

যৌবনযুগের ভাববস্তু—নিয়তি-বোধ :

মেটারলিঙ্কের এই যৌবনযুগের (১৮৮৬-৯৬) সর্ব প্রথম কথাই হইতেছে নির্দয়, ভীষণ, অনতিক্রম্য নিয়তির বোধ। এই যুগের রচনার সর্বত্রই তাই মেটারলিঙ্কের লক্ষ্য এই নিয়তিকে দেখানো। মৃত্যু যেন চারিদিকে তাহার ভীষণ অদৃশ্যদংষ্ট্রা মেলিয়া অসহায়, শক্তিহীন মানবাত্মার টুঁটি চাপিয়া ধরিবার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে, তাহার নিকট আপনাকে না ছাড়িয়া দিয়া যেন উপায় নাই, এমনই একটা নিরুপায়, দুঃসহ অসহায়তার একাকিত্বের বোধ উপরোক্ত আটখানি নাটকের সমস্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাই এই নিয়তির রাজ্যে মানবাত্মার একমাত্র ক্লান্ত ও অবসন্ন চলা ভিন্ন আর আশা-আনন্দের ভরসা-বিশ্বাসের কণামাত্রও সম্ভাবনা নাই। গ্রীক নাট্যকার অদৃষ্ট বা নিয়তির কথা বলিতে গিয়া তাহার পশ্চাতে একটি ন্যায়শক্তির অমোঘ বিধানকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু মেটারলিঙ্কীয় এই নিয়তি ন্যায়ের কোনো পরোয়াই করে না। মেটারলিঙ্কীয় এই নিয়তি একমাত্র ভীষণ ও নির্দয় নিষ্ঠুরতা লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল। 'রহস্য-বিবর্তন' প্রবন্ধে তিনি তাঁহার যৌবনের এই বিশ্বাসের কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং রহস্যোদ্যানের মেটারলিঙ্ক্ প্রথমযুগের এই বিভীষিকাময় আবহাওয়ার (atmosphere) তত্ত্বটিকে অতি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।*

"দানের সম্পদে" নবভাব

প্রথম যুগের নাটকের মধ্য দিয়া মেটারলিঙ্ক্ যে নিয়তিবাদ এমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন, 'দানের সম্পদে' প্রচারিত আনন্দবাদ যে তাহা হইতে কত দূরে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "দানের সম্পদে" তিনি যে নাটকীয় মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তিনি মানব-জীবনের গোপন সৌন্দর্য এবং মহিমাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। মোট কথা, প্রথম যুগের জীবনানুভূতি হইতে মেটারলিঙ্ক্ এই মতবাদ সৃষ্টি করেন নাই; তবে এই মতবাদের গোড়াপত্তন "পীলিয়াস ও মেলিস্যাণ্ডার" মধ্যেই হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৮৯৬ সালের পরে তাহার যে নাটকগুলি প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে "দানের সম্পদে"র মতবাদ কতটা সার্থক হইয়াছে, এবার

* এইসম্পর্কে কৌতূহলী পাঠককে ক্রয়েডের শিল্প এবং বহির্বিমুখতা, Art and Introversion সম্বন্ধে বক্তব্য পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

* The Buried Temple (Evolution of Mystery), p. 109

আমরা তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু মেটারলিঙ্ক যে অকস্মাৎ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা মনে করিবার কোনো হেতু নাই। 'তিন্তাজিলের মৃত্যু', 'আলাদীন ও পালোমিডিসের' মধ্যে আমরা তাঁহার নব পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাস পাইয়াছি, সে কথাটি ভুলিলে চলিবে না।

নবভাবের সূচনা

অ্যাস্‌টোলেন এবং ইগ্রেন চরিত্রের মধ্য দিয়া সেই নব পরিবর্ত্তনের বার্ত্তা সূচিত হইয়াছে। ছুটির মাঝেই আমরা যে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, উহা মেটারলিঙ্কের জীবনে একটি অভিনব অনুভূতির দিকে নিশ্চিত ইঙ্গিত করিতেছে নাকি? যে নিয়তির অদৃশ্য অস্তিত্বের সম্মুখে মানবাত্মা ভীতিবিহ্বল ও শক্তিহীন হইয়া কাঁপিতেছিল, তাহার সম্মুখে অকস্মাৎ যেন এমন একটি শক্তির আবির্ভাব হইল যাহা নিয়তিকে দেখিয়া সঙ্কুচিত ত হইলই না, বরং বিদ্রোহ প্রচার করিয়া বসিল। মেটারলিঙ্কের জীবনে—নিয়তির অন্ধকার রাত্রির মুখের উপর কোথা হইতে যেন প্রেমের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িল। 'পীলিয়াস মেলিসাণ্ডার' দিকে চাহিয়া দেখা গেল যে, সেই ক্ষীণ জ্যোতিঃ ধীরে-ধীরে পূর্ব্বাকাশকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে, অন্ধকার কাটে নাই, কিন্তু উষার গোলাপী আভা অন্ধকারকে হাল্কা করিয়া তুলিয়াছে। মেটারলিঙ্কের ব্যক্তি জীবনের দিক্ দিয়া যেমন এই পরিবর্ত্তন পরম কল্যাণকে, জীবনের স্বাস্থ্যকে লইয়া আসিল, মেটারলিঙ্কের নাট্যজগতেও তেম্‌নি প্রেমের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মেটারলিঙ্কীয় যুগলতত্ত্ব

'পীলিয়াস মেলিসাণ্ডার' মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম—(যদিও 'আলাদীন পালোমিডিসের' মধ্যেও ইহার আভাস অতি ক্ষীণভাবে পাওয়া যাইতে পারে)—মেটারলিঙ্কীয় যুগলতত্ত্বটি প্রচারিত হইয়াছে। মানবাত্মার অন্তর্লোকে, তাহার চিরপরিচিত প্রেমলোকে যে নিত্যকালের একটি যুগল সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এই যুগল নরনারীর মিলনেই যে জীবন পরিপূর্ণ এবং সার্থক হইয়া যায়, এই কয়টি 'দীনের সম্পদে' কিভাবে মেটারলিঙ্ক্ বলিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি।* প্রেমের এই শাশ্বত পরিচয় যে জীবনের একটি পরম সত্য, সুতরাং নাটকেরও বিষয়-বস্তু তাহা মেটারলিঙ্ক্ নানাস্থানেই দেখাইয়াছেন। মেলিসাণ্ডা ও পীলিয়াস, এগ্লাভেন ও মিলীয়াণ্ডার মোনাভানা ও প্রিঞ্জিভাল, জয়জেল ও ল্যান্সিওর, জয় ও টিলটিল, মডলীন ও খৃষ্ট সোনিয়া ও য়্যাক্সেলের মধ্যে এই যুগলতত্ত্বের বিকাশ লক্ষ্য করিলেই মেটারলিঙ্কীয় প্রেমের মধ্যে এই 'যুগল'বস্তুটি যে কত বড় স্থান পাইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। †

মেটারলিঙ্কীয় নাট্যের বিষয়বস্তু

(খ) ১৮৯৬—১৯২৩

১৮৯৩ সালের পরবর্ত্তী নাটকে আমরা নিয়তির নিদারুণ অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেও সেই-সঙ্গে মানবাত্মার অপরিসীম শক্তি ও পরিচয় পাই। প্রেমের মধ্যে মানবাত্মার যে অতুল মহিমা ও সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে, মানবাত্মা যে কত সুন্দর, তাহার প্রেম যে কি মহীয়ান্ সেই কথাটিই বিশেষ করিয়া এই দ্বিতীয় যুগের নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রেম ও ট্র্যাজেডি

(অ) অন্তর্লোকে

দীনের সম্পদ্ মেটারলিঙ্কের জীবনে যে নূতন

* মেটারলিঙ্ক্ বলেন আমাদের জ্ঞানের বাহিরে নিশ্চয়ই এমন একটি দেশ আছে, যেখানে কেহই আমাদের অপরিচিত নহে। সেই স্বদেশে আমরা সকলেই যাইতে পারি ও পরস্পরের পরিচয়টি পাইতে পারি। সেখানেই আমাদের নিত্যকালের প্রিয়াকে আমরা বরণ করিয়া লইয়াছি; এইজন্যই এই প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁ'রাও যেমন ভুল করিতে পারে না আমাদেরও তেম্‌নি ভুল করা অসম্ভব......আমাদের জীবনের সকল কর্ম্মকে বেষ্টন করিয়া যে মায়াচক্র অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহার বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা করিয়া আমরা আমাদের অন্তর-নেতা সহজ-বোধটিকে (instinct) বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু তবু আমাদের ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিবার শত চেষ্টা করিলেও অবশেষে সে-ই আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

Treasure of the Humble, pp. 77-78.

† মতবাদের দিক্ দিয়া, দার্শনিক দৃষ্টিতে যুগলতত্ত্বের ভিত্তি কোথায় অর্থাৎ অন্তরাত্মার গভীর পরিচয়-বস্তুটি যে নিত্যকালের তাহার 'পাত্রী নির্ব্বাচন' নাটকে জয় ও টিলটিলের চরিত্রে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। তবে খৃষ্ট ও মডলীনের পরিচয়টি ঠিক যুগল-পর্য্যায়ে না পড়িলেও, উহাও মানবাত্মার শাশ্বত পরিচয়ের কথাটিকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল পূর্ব্বে আমরা তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। মানবাত্মার নিভৃত অন্তর্লোকে প্রেম যে কত বড় শক্তি-সুষমাকে ফুটাইয়া রাখিয়াছে তাহাই মেটারলিঙ্কীয় ভাবজগতে তখন অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে,মেটারলিঙ্ক্ এই অনুভবের জগতেই আবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার জাগ্রত বুদ্ধি তাঁহাকে বিচারের পথে চালিত করিতেছিল এবং যাহা কিছু জীবনের দুর্ব্বোধ্য রহস্য তাহাকে অতি স্পষ্ট করিয়া দেখিবার ও জানিবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহাকে চঞ্চল করিতেছিল। ফলে তাঁহার রহস্যবোধ বহুপরিমাণে হ্রাস পাইয়া আসিল এবং মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাব্যতার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস স্থাপিত হইল। অজ্ঞেয় রহস্য চিরকালই মানবাত্মাকে তাহার অপরিমেয় প্রেমসত্ত্বেও চির অসহায় করিয়া রাখিবে, এই কথাটি যেন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া লইতে পারিলেন না। বরং এই অন্তঃসংগ্রামের ফলেই তিনি এই কথাটি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন যে, মানবাত্মার অন্তর্দৃষ্টিও প্রেমের সম্মুখে অদৃষ্টের কোনোই প্রভাব নাই ও থাকিতে পারে না। মেটারলিঙ্কীয় ভাবজগতে এই পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁহার নাটকীয় ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রথমযুগের ট্র্যাজেডি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল নিয়তির সম্মুখে মানবাত্মার ভীতি ও অসহায়তার মধ্যে, এবার মানবাত্মার শক্তি-বোধের ও প্রেমের অপরাজেয় মহিমার ক্ষেত্রে আসিয়া ট্র্যাজেডি দেখা দিল। মানবাত্মার শক্তি-বোধ, তাহার প্রেমবোধ ও নৈতিক বোধ তাহাকে যে-দিকে আকর্ষণ করিতে চায়, বিশ্বনীতি ও বিশ্ববিধান সেই পথে নিয়তির রূপ ধরিয়া সঙ্ঘাত ও বেদনার সৃষ্টি করিয়া বসিল। জয়জেল নাটকখানি এই সঙ্ঘাত ও বেদনাকেই প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছে।

(আ) বাস্তবলোকে

রহস্যবোধের অপসারণের সঙ্গে-সঙ্গেই, অন্ততঃপক্ষে রহস্যভীতির অপসারণ ও মানবীয় শক্তির উপর প্রবল বিশ্বাসের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই মেটারলিঙ্ক্‌কে বাস্তব জগতের দিকে বাহির হইয়া আসিতে দেখি। এতকাল ট্র্যাজেডিকে একটা নিদারুণ নিয়তির সহিত জীবন ও প্রেমের অনিবার্য্য সঙ্ঘাত বলিয়াই মেটারলিঙ্ক্ দেখিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নিয়তিকে মানবজ্ঞানেরই অভাব ও অপরিণতি-মাত্র বলিয়া দেখিলেন সেই মুহূর্ত্তেই মেটারলিঙ্ক্ জীবনকে একটা উচ্চতর নৈতিক-সমস্যা বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইলেন। তাই দেখিতে পাই যে, পরবর্ত্তী মেটারলিঙ্কীয় নাটক অজ্ঞাত রহস্য-ভীতিকে বর্জ্জন করিয়া জীবনে প্রেমের সহিত অজ্ঞান ও স্বার্থপর বৃত্তির সংগ্রামটিকে দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং জীবনে সাহস ও বিশ্বাসের আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মেটারলিঙ্কীয় নাটক অন্তর্লোকের স্বপ্নময় ভাব ছাড়িয়া, অন্ধকার এবং জ্যোৎস্নালোকের রহস্যকে বিদায় দিয়া বাস্তবজীবনের সুস্পষ্ট সূর্য্যালোকে ও উন্মুক্ত হাওয়ার মধ্যে, এই সমাজ ও সংসারের বিচিত্র আবর্ত্তের মধ্যে, মানবাত্মার উচ্চতর নৈতিক সংগ্রামটিকে আঁকিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই এখানে ট্র্যাজেডি আবার আর-একটি রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে, এখানে ট্র্যাজেডি একটি ব্যক্তির প্রেম ও কল্যাণ-বোধের সহিত অপর আর-একটি ব্যক্তির প্রেম ও কল্যাণবোধের প্রতি-যোগিতার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে। দুটি অন্তরই পরস্পরের ভালোবাসায় ব্যাকুল হইয়া আপনার অন্তরের সর্ব্বস্ব যে অপরকে দিয়া নিঃশব্দে নিজের সকল ব্যথাকে বলি দিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হয়, ইহাকে প্রতিযোগিতা বলিলে প্রেমের মর্য্যাদা নষ্ট করা হয়। অন্তরতম প্রেমেরই প্রেরণায় এই যে আত্মবলি, ইহার মধ্যে আনন্দ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আত্মার এই মহিমময় বিজয়ের মধ্যে যে ত্যাগের একটি তীব্রনিবিড় ব্যথা আছে তাহাই যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম ট্র্যাজেডির উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। মেটারলিঙ্ক্ এই ট্র্যাজেডিকেই 'মেঘাপসরণে' যে অতি চমৎকারভাবে দেখাইয়াছেন তাহা পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

মেটারলিঙ্কীয় নাট্যবস্তুর সীমা

প্রথম যুগের রহস্যনাট্যের কথা বাদ দিয়া আমরা 'এগ্লাভেন সেলীসেট' হইতে 'মেঘাপসরণ' পর্য্যন্ত যে নাটক-গুলি দেখিতে পাই তাহার বিষয়বস্তুর দিকে চাহিলে

আমাদের নিকট একটি বস্তু খুবই স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে,মেটারলিঙ্ক্ মানবজীবনে প্রেমের অপরিমেয় শক্তি ও সৌন্দর্য্যের দিকটাই বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন ও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই তিনি ভালবাসার সংগ্রাম ও সমস্যাটিকেই লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া রহস্যভীতি না ফুটাইয়া মানবাত্মার নিগূঢ় অন্তরের বেদনা বোধটিকেই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নাট্য-সৃষ্টির দিক্ দিয়া তাই মেটারলিঙ্ক্ মানবচরিত্রের আর কোনো বৈচিত্র্যকেই দেখিতে পান নাই। প্রায় সর্ব্বত্রই যুগলভালোবাসার মাঝখানে তৃতীয়ের সমস্যাটিকে লইয়া তিনি জীবনের ট্র্যাজেডিটিকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেম ও নিয়তি (মৃত্যু) এই দুইটিই মেটারলিঙ্কীয় নাটকের বিষয়বস্তু বলিলে বোধ করি বিশেষ ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মেটারলিঙ্ক্ ছাড়াও প্রায় নাট্যকারই এইদুটি বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই নাট্যসৃষ্টি করিয়া থাকেন; তবে মেটারলিঙ্কের বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাহাকে বুঝিতে হইলে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে মেটারলিঙ্কীয় প্রেম মানব-জীবনের অতি উন্নত নৈতিকস্তরে বিকাশলাভ করিয়াছে এবং মেটারলিঙ্কীয় নিয়তিও তেম্নি তাহার বিশেষত্ব লইয়াই প্রকাশ পাইয়াছে।

'নীলপাখী' ও 'পাত্রীনির্ব্বাচন'

মেটারলিঙ্কীয় ভাবধারার সহিত নাট্যসৃষ্টির যোগ কোথায় তাহার সন্ধান করিতে গিয়া আমরা 'নীলপাখী' ও 'পাত্রীনির্ব্বাচন' এই দুখানি রূপকনাট্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিই নাই। তাহার কারণ এই-দুখানি বই নাটক বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় তাহা নহে। নাটকের বিষয়বস্তু একটি রসবস্তু; উহা আমাদের মর্ম্মে অনুভূতির মধ্য দিয়া ভাবের মধ্য দিয়া, ব্যথা ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। উহা অনুভবের বস্তু, বুদ্ধির বিষয় নহে। "নীলপাখী" ও "পাত্রীনির্ব্বাচন"—এইদুখানি পাঠকের বুদ্ধিদৃষ্টিকে আকর্ষণ করে মাত্র, অনুভবকে আলোড়িত করিতে চায় না। তাহার কারণ এই নাটক-দুখানি জীবনকে মূর্ত্ত করিয়া দেখায় নাই, জীবনের একটা মতবাদকে, দর্শনকে মূর্ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র। ফলে তাঁহার প্রকাশ-কৌশল আমাদের প্রশংসাকে জাগ্রত করে সত্য, কিন্তু হৃদয়ের মাঝে কোনো রসস্ফুরণের চেষ্টা করে না। যে মতবাদের দিকে তিনি আমাদের চিন্তাশীল মনকে উন্মুখ করিয়া দেন, সেই মতবাদের দিকে চাহিয়া আমাদের বিচার জাগ্রত হয়, অনুভবের মগ্নতা আসে না। নাটকের উদ্দেশ্য জীবন সৃষ্টি না হইয়া যদি মুখ্যভাবে উহা কোনো মতবাক্যেই প্রচার করা হয়,তাহা হইলেই মতবাক্যের সত্যাসত্যের উপায়ই তাহার বাস্তবিক মূল্য নির্ভর করে; আর মতবাদ কোনোকালেই চিরন্তন হয় না দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'কেও প্রায় এইজাতীয় বলিতে পারা যায়।

মেটারলিঙ্কের শেষ জীবনের দার্শনিক চিন্তার ধারা কেমন করিয়া তাঁহার উক্ত দুখানি নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করিতে হয়। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনাটি এখানেই সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

কুষ্ঠরোগ-সমস্যা ও সমাধান

শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

[গত ১৯২১ সনের আদম-সুমারিতে জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১,০২,৫১৩। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা যথার্থ সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম, এমন-কি অর্দ্ধেকও নহে। নানা কারণে ঠিকভাবে গণনা করা সম্ভব হয় না। রাস্তায় যে-সকল ভিক্ষুক কুষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া গণনা

করা হয়; গৃহস্থ কুষ্ঠিগণ লোকলজ্জাভয়ে আপনাদের রোগ প্রকাশ করে না, আর বাহ্যলক্ষণাক্রান্ত নহে বলিয়া তরুণ রোগিগণ গণনা হইতে একেবারে বাদ পড়িয়া যায়। অতএব এ-কথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ ২০০,০০০ কুষ্ঠীর বাস। India's Lepers প্রণেতা বলেন, এই সংখ্যা "অন্ততঃ ২৫০,০০০ হওয়া উচিত"।



কলিকাতার মধ্যস্থিত কুষ্ঠ-উপনিবেশ

সমস্ত ভারতে মোট কুষ্ঠাশ্রমের (Leper Asylum) সংখ্যা ৯২; বর্ত্তমানে তাহাতে কিঞ্চিদধিক ৮০০০ কুষ্ঠরোগী বাস করে। শতকরা ৪ জন কুষ্ঠী সমাজ হইতে পৃথক্‌ভাবে রহিয়াছে, আর সকলেই দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া, সুস্থদেহ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাস করিতেছে, অন্য সকলের মতই ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সাধারণ স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে, কিন্তু ইহার ক্রিয়া আস্তে-আস্তে হয়। এই রোগ বহুদিন পর্য্যন্ত দেহের মধ্যে গুপ্ত অবস্থায় থাকে, রোগী নিজেও ইহার অস্তিত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু তখনো রোগীর নাসিকা ও মুখনির্গত স্রাবের সঙ্গে কুষ্ঠরোগের বীজ বহির্গত হয়। রোগ যখন বিশেষ বৃদ্ধি পায় তখনই দেহের বহির্দ্দেশে ক্ষতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমরা রাস্তায় যে-সকল গলিত কুষ্ঠীকে দেখিয়া শিহরিয়া দূর দিয়া চলিয়া যাই, তাহাদের অপেক্ষা এই-সকল প্রথম অবস্থার রোগিগণ অধিকতর বিপজ্জনক। এই লক্ষ-লক্ষ কুষ্ঠী সমাজের বুকে বাস করিয়া অবাধে রোগের বিস্তার করিতেছে। কুষ্ঠীদিগের পক্ষে কয়েকটি বিশেষ ব্যবসায় করা আইনতঃ নিষিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার বৈলক্ষণ্য প্রত্যহই দেখিতে পাওয়া যায়।

অথচ আমরা এপর্য্যন্ত ইহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমরা রাস্তায় যথাসম্ভব ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া চলি, এবং ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার যথেষ্ট উপায় করা হইল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। কিন্তু ইহাতেই কি আমাদের সকল কর্ত্তব্যের অবসান হইল? এইসকল অগণ্য, রোগক্লিষ্ট, গলিতহস্তপদ আতুরের প্রতি আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? দয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও, শুধু আত্মরক্ষাকল্পে কেবল নিজের মঙ্গলের জন্যও আমাদিগকে এই সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। কুষ্ঠরোগ-বিশেষজ্ঞ সার্ লিওনার্ড্ রজার্স্ বলিয়াছেন :—

"We may safely say that although the contagion is very slow and slight, yet those of us who live here in India, in the midst of hundreds of thousands of lepers, no one of us can claim to be certain of immunity from this disease. Any one of us may at any time be attacked, so we ought to take a deep interest in it and even put our hands in our pockets to help the work of prevention."

অর্থাৎ—ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, সংক্রমণ ধীর ও সামান্য হইলেও, আমাদের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষে শত শত সহস্র

সহস্র কুষ্ঠরোগীর মধ্যে বাস করে, তাহাদের কেহই এই রোগ হইতে মুক্ত আছেন—এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। আমাদের যে কেহ যে-কোন সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে; সুতরাং কুষ্ঠ-রোগ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য, এমন-কি কুষ্ঠ-নিবারণ-কার্য্যে সহায়তা করিতে অর্থপ্রদান করাও আমাদের কর্ত্তব্য।

অনেকের ধারণা, এই রোগ নীচ জাতির মধ্যেই হইয়া থাকে। আমাদের ভদ্রলোকদের এইজন্য বিশেষ ভাবিবার প্রয়োজন নাই। কথাটি মোটেই সত্য নয়। যদিও অধিকাংশ স্থলেই তথাকথিত ছোটলোকদের মধ্যেই রোগের আক্রমণ বেশী, তথাপি ভদ্রলোক কুষ্ঠীও নিতান্ত বিরল নহে। রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক্ ওল্ড্রিভ্ (Secretary, British Empire Leprosy Relief Association; formerly Secretary for India, the Mission to Lepers) তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত India's Lepers গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন। বাঁকুড়া-জেলার কোন এক থানার ৩১৬ জন কুষ্ঠীর মধ্যে ২৩ জন ব্রাহ্মণ।



পুরুলিয়া কুষ্ঠাশ্রমের রোগীরা গির্জ্জায় যাইতেছে

বঙ্গদেশ

বাঙ্গালাদেশের মোট কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা (১৯২১, Census Report অনুসারে) প্রায় ১৬,০০০। ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী কুষ্ঠী বাঙ্গলায়। আবার ইহাদের অধিকাংশেরই নিবাস বাঁকুড়া-জেলায়। তৎকালীন বাঁকুড়ার কালেক্টর মিষ্টার্ ভাস্ বলিয়াছেন, "এই রোগ বিশেষ করিয়া বাকুড়া জেলার একটি স্থানে বাসা বাঁধিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।" সুতরাং বঙ্গদেশকে কুষ্ঠরোগমুক্ত করিতে হইলে প্রথমে বাঁকুড়ার দিকে মনোযোগ দিতে হইবে, সন্দেহ নাই। এই জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ৫,০০০এর কম নহে। এখানে একটিমাত্র আশ্রম আছে ও তাহাতে বর্ত্তমানে ১৫০টি কুষ্ঠী বাস করে। এই জেলার কত গ্রামে যে কুষ্ঠরোগীর বাস, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশে আর-একটি আশ্রম আছে—রাণীগঞ্জে। সেখানে ১৭৮ জন কুষ্ঠী স্থান পাইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট্ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা রোডে একটি কুষ্ঠ-নিবাস নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইলে এখানে একহাজার কুষ্ঠরোগীর স্থান হইবে।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতা সহরের উপরেই গোবরায় গভর্ণ্মেণ্টের একটি আশ্রম আছে। এই আশ্রমে ৩১৫ জন রোগী আশ্রয় পাইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বাঙ্গলাদেশে শতকরা চারি জন কুষ্ঠী আশ্রমে বাস করে। এই সংখ্যা সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদের ন্যায়। একমাত্র কলিকাতা সহরেই ন্যূনাধিক ১০০০ কুষ্ঠী ভিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে। কোনরূপ দ্বিধা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালা দেশে কুষ্ঠীদের জন্য কিছুই করা হয় নাই। সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য এতদপেক্ষা ব্যাপক ও সুন্দর ব্যবস্থার প্রয়োজন।

রোগ ও তাহার বৃদ্ধি

যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের ন্যায় কুষ্ঠরোগের বীজও (lepra bacilli) এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। অধিকাংশ স্থলেই রোগীর নাসিকা ও মুখ-নির্গত স্রাব ও ঘা হইতে এই রোগের বীজ বাহির হইয়া কাটা, ঘা প্রভৃতি পথে সুস্থ দেহে প্রবেশ করে ও রোগ জন্মায়। তবে যক্ষ্মা-রোগের ন্যায় (Bacillus tuberculosis) ইহার বীজ মনুষ্য-শরীরের বাহিরে জীবিত থাকে বলিয়া মনে হয় না।

কুষ্ঠরোগ বংশানুগত (hereditary) নহে। পিতা কিংবা মাতার কুষ্ঠ থাকিলেই তজ্জাত সন্তানেরও কুষ্ঠ

হইবে এমন নহে। ইহা ভগবানের অপার করুণার অন্যতম নিদর্শন। তবে শিশুগণ সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। এই জন্য কুষ্ঠরোগযুক্ত পিতামাতার সংস্রবে বাস করিলে সন্তানেরও কুষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং সন্তান জন্মিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে পিতামাতা হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ তাহাকে এই ভয়ঙ্কর রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। এইজন্যই কুষ্ঠীদের বিবাহ কিংবা কোনরূপ শারীর সম্বন্ধ থাকিতে দেওয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রেত নহে।

কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে। কিন্তু অন্যান্য রোগের ন্যায় ইহার আক্রমণ শীঘ্র বুঝিতে পারা যায় না। শরীরে রোগ জন্মিবার পরও বহুদিন বাহিরে তাহার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। ইহাকে রোগ থাকিবার কাল (incubation period) বলে। সুতরাং কবে, কিরূপে রোগের সূত্রপাত হইল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

এই রোগ অতি অল্পে-অল্পে বৃদ্ধি পায়। প্রথমে শরীরের কোন অংশ ফুলিয়া উঠে, বেদনা হয়। ক্রমে



পুরুলিয়া কুষ্ঠাশ্রমের বাসিন্দারা ক্ষেত্রে চাষবাসের কাজ করিতেছে

দেহের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন চাক্-চাক কুষ্ঠ ফুটিয়া বাহির হয়। তারপর ঘা হয়। শেষে দিনে-দিনে একটু-একটু করিয়া ক্ষতস্থান পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়ে। অসহ্য যন্ত্রণা, পলে-পলে মৃত্যু। কেহ খঞ্জ হয়, কেহ অন্ধ হয়, সকলেই অকর্মণ্য বিকৃত হইয়া যায়। ব্যাধি জ্বলন্ত অগ্নির মত একটু-একটু করিয়া জ্বলিয়া শরীর খাক্ করিয়া দিয়া এক সময়ে নিভিয়া যায়। তখন শরীরে রোগের আর-কোন সজীব ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না; পরীক্ষা করিলে রোগের বীজও হয় ত তখন পাওয়া যায় না।



একটি বালক কুষ্ঠরোগী

(১) চিকিৎসার পূর্ব্বে　　(২) এক বৎসর চিকিৎসার পর

শিক্ষার অভাব এই রোগ-বিস্তারের মূলে কার্য্য করিতেছে। কুষ্ঠিগণ আপনাদের রোগ গোপন করিয়া রাখে, অবাধে জন-সমাজে চলা-ফেরা করে, এইরূপে রোগ ছড়াইয়া পড়ে। অশিক্ষিত নীচ জাতীয় কুষ্ঠী তাহার এই কার্য্যের ভীষণতা ধারণা করিতে পারে না, সে যে সমাজের কি মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা সে বুঝে না। তাই আমাদিগকে শুধু আশ্রম-প্রতিষ্ঠা, কিংবা চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেই হইবে না, যাহাতে লোকের মনে এইরূপ ব্যবহারের কুফল পরিস্ফুট হয়, সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

চিকিৎসা

অনেকে বিশ্বাস করেন, পূর্ব্বজন্ম-কৃত কোন মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই "মহারোগ" জন্মে; ইহা শিবের অসাধ্য ব্যাধি, দিনে-দিনে পলে-পলে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইবে, ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। কুষ্ঠিদিগকে লোকে অত্যন্ত ঘৃণা করে বলিয়া কেহ ভয়ে আপনার রোগের কথা অন্যকে জানিতে দেয় না। যতদিন সম্ভব রোগ গোপন করিয়া আপন প্রিয়জনের মধ্যে বাস করে। তারপর এক সময়ে রোগ বৃদ্ধি পায়, শরীর অকর্মণ্য হয়,

জীবন-ধারণের আর কোন উপায় থাকে না; সংসারে একান্ত লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত হইয়া হতভাগ্য কোন কুষ্ঠাশ্রমে আশ্রয় লয়।

এতদিন লোকের ধারণা ছিল, এই রোগের কোন প্রতিকার নাই। রোগী সাময়িক যন্ত্রণা নিবারণের জন্য নানা-প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিত, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল তাহাতে দর্শিত না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের গবেষণার ফলে আজ আমরা বলিতে পারি, এই রোগের প্রতিকার আছে, ইহা হইতে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব নয়। উপযুক্ত চিকিৎসা করিতে পারিলে রোগীর দেহ



কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কয়েকটি বালক-বালিকা

হইতে রোগের লক্ষণ এককালে দূরীভূত হয়, দেহের অভ্যন্তরে রোগের বীজ নষ্ট হইয়া যায়, আবার সে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন, শ্রীমান্ হইতে পারে। সার্ লিওনার্ড রজার্স্ এই নূতন চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন, ও ডাঃ ই মর্ (Calcutta School of Tropical Medicine) ইহার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। ডাক্তার মিউরের নব-প্রকাশিত Leprosy Diagnosis, Prevention & Treatment নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। রোগের প্রথম অবস্থায় এই প্রণালী-অনুসারে চিকিৎসা করিলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়,ও কিছু দীর্ঘকাল যাবৎ ঔষধাদি সেবন করিলে আর রোগ পুনরাক্রমণেরও সম্ভাবনা থাকে না। Mission to Lepers-এর বহু আশ্রমে এই উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহাতে বিস্তর রোগী আরোগ্যলাভ করিতেছে।

রোগ যত দিন দেহে সম্যক্‌রূপে পরিব্যাপ্ত না হয় ও দেহের ধ্বংসকার্য্য আরম্ভ না হয়, ততদিন এই চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করা যাইতে পারে। রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় তেমন ফল পাওয়া যায় না। ঘা শুকাইয়া যাইতে পারে, দেহ হইতে রোগের বীজ দূর হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে-অঙ্গ একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না, ভগ্ন স্বাস্থ্য আর ত জোড়া লাগিবে না।

আশ্রমে প্রথম অবস্থার রোগী বেশী পাওয়া যায় না। এতদিন রোগমুক্ত হইবার কোন আশা ত ছিল না। আশ্রম শুধু শেষ অবস্থার আশ্রয়। তাই প্রায় অন্তঃসার-শূন্য দেহ লইয়া কুষ্ঠিগণ জীবনের বাকী দিন কয়টা কাটাইবার জন্য আশ্রমে আসিত। তবে ইদানীং আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে জানিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক তরুণ রোগী আশ্রমে প্রবেশ করিতেছে।

যক্ষ্মারোগের ন্যায় এই রোগেও, বাহ্য দৃষ্টিতে যাহাকে নীরোগ বলিয়া মনে হয়, এরূপ বহু লোকের শরীর পরীক্ষা করিয়া এই রোগের বীজ থাকিতে দেখা গিয়াছে। ফলে, নূতন আবিষ্কার আমাদিগকে যতটা আশ্বাস দিয়াছে, আশঙ্কাও তাহা হইতে কম জন্মায় নাই।

কুষ্ঠ-আইন

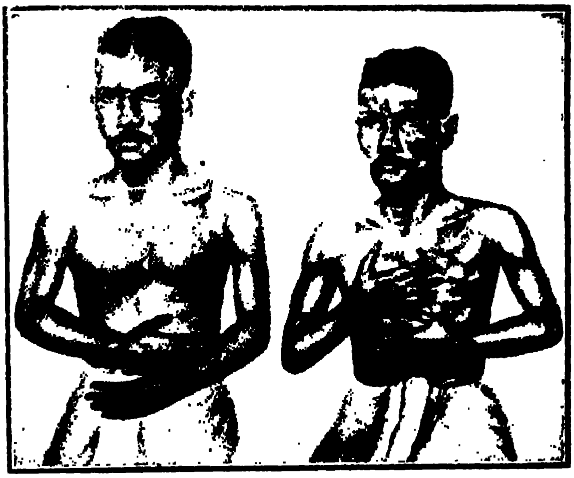
দেশকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রথমেই যাহা দরকার, আমাদের দেশে তাহা নাই। যতদিন পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগিগণ নির্ব্বিঘ্নে রাস্তায় চলা-ফেরা করিতে পারিবে, রেল-ষ্টিমারে যাতায়াত করিতে পারিবে, ততদিন রোগের বৃদ্ধিই হইতে থাকিবে। কুষ্ঠীদের ছোঁয়া পয়সা বাজারে চলে, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রীত হয়,কোন-কোন স্থানে তাহারা মিঠাইওয়ালা, কোথাও গাড়োয়ান, কোথাও দোকানদার; তাহারা দুধ জোগান দেয়, হোটেল করে, তরকারী বিক্রি করে। এমন শত উপায়ে শত কুষ্ঠী নিত্য আমাদের সঙ্গে মিশিতেছে, অবাধে সর্ব্বত্র

যাওয়া-আসা করিতেছে। দেশ রোগশূন্য হইবে কেমন করিয়া?

এইজন্য সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে অন্যান্য লোক হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা (segregation)। আমেরিকানগণ যখন ফিলিপাইন দ্বীপ অধিকার করেন, তখন সেখানে কুষ্ঠরোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। দেশ হইতে এই ভীষণ ব্যাধি তাড়াইবার জন্য আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্ট ডাঃ হীসারের পরামর্শ-মত দেশের এক-প্রান্তে Culion দ্বীপে বহু অর্থ-ব্যয়ে একটি কুষ্ঠ-উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। উহাকে সর্ব্বতোভাবে চিত্তাকর্ষক ও আরামপ্রদ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইল না। স্বাস্থ্যের সুবন্দোবস্ত, স্কুল-কলেজ, থিয়েটার সবই আছে সেখানে। তারপর আইন হইল সকল কুষ্ঠীকে সেখানে আবদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু এইজন্য গভর্ণমেণ্টকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। উপনিবেশে কোনরূপ অসুবিধা নাই দেখিয়া কুষ্ঠিগণ স্বেচ্ছায় সেখানে গেল। প্রায় ৮০০০ কুষ্ঠী সেখানে আবদ্ধ হইল, তাহাদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল। দশ বৎসর পর দেখা গেল, দেশে নূতন রোগী ত একজনও হয় নাই, পুরাতনের সংখ্যা ৩৫০০ এ নামিয়া গিয়াছে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম কুষ্ঠরোগ-সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হয় (Act III of 1898)। সেই আইনের বলে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলে ঘা-যুক্ত (with open sore) কোন ভিক্ষোপজীবী কুষ্ঠীকে (pauper lepers) বিচারকের কাছে লইয়া যাইতে পারে, ও বিচারক ইচ্ছা করিলে **যতদিন না ঘা শুকায়** ততদিন কুষ্ঠীকে কোন কুষ্ঠরোগের হাঁসপাতালে **জোর করিয়া** বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু বাহিরে ঘা না থাকিলেই কুষ্ঠ হয় নাই, একথা বলা চলে না। বরং এরূপ রোগীই বেশী অনিষ্টকর। আর ঘা শুকাইলেও ভিতরে রোগের বীজ থাকিয়া যায় এবং কুষ্ঠী বন্ধনমুক্ত হইবার অল্পদিন পরেই আবার তাহার গায়ে কুষ্ঠ ফুটিয়া বাহির হয়। যাহা হউক, উক্ত আইন প্রায় কোথাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কোন পুলিশ কর্ম্মচারী ভয়ে কোন কুষ্ঠীর কাছে ঘেঁসিতে চাহে না, তাহাকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য তার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নাই, আর কুষ্ঠীও তাহার বাহিরের উন্মুক্ত জীবন হারাইবার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক।

১৯২০ সনে যে সংশোধিত আইন গঠিত (Amendment of Leper Act—Act XXII of 1920) হইয়াছে তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। এখন ভিন্ন-ভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এই আইন স্বীকার করিয়া লইলে, উক্ত গভর্ণমেণ্ট যে-কোন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিক্ষা-ব্যবসায়ীকে তাহার রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত



একজন কুষ্ঠরোগী

(১) এক বৎসর চিকিৎসার পর　　(২) চিকিৎসার পূর্ব্বে

কুষ্ঠ-রোগের হাঁসপাতালে রাখিতে পারে। কিন্তু সেইজন্য যাহা চাই তাহা নাই—গভর্ণমেণ্টের এত বেশী ও এত বড় হাঁসপাতাল নাই যাহাতে সকল কুষ্ঠীর স্থান হইতে পারে। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বিস্তর খরচ। তজ্জন্য সরকার এদিকে তত কান দেন না। সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ (segregation) এদেশে সম্ভব নয় জানি; কিন্তু যতদিন না উপনিবেশ গঠন করিয়া অধিকাংশ কুষ্ঠীকে বাহিরের সমাজ হইতে একান্তে পৃথক্ করিয়া রাখা হইবে, ততদিন দেশ হইতে কুষ্ঠরোগ লোপ করা সুদূরপরাহত।

উপনিবেশ

কিন্তু গভর্ণমেণ্টকে এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে কি? ইহা বহুব্যয়সাধ্য সত্য, কিন্তু প্রজার

স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে গিয়া কার্পণ্য অবলম্বন করিলে চলিবে কেন ?

যাহাতে দেশে আর রোগের বিস্তার না ঘটিতে পারে ও বর্ত্তমান রোগীর সংখ্যা কমিয়া যায়, সেইজন্য ফিলিপাইন-দ্বীপের অনুকরণে আমাদিগকে দেশের বিভিন্ন স্থানে, লোকালয় হইতে দূরে, কুষ্ঠী-বস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাকে সুদৃশ্য এবং যথাসম্ভব আরাম দায়ক করিতে হইবে, কুষ্ঠিগণ যাহাতে স্বেচ্ছায় সেখানে যাইতে চাহে, এইরূপ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সেখানে নূতন এবং পুরাতন রোগীদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে, স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলন নিষিদ্ধ করিতে হইবে। তারপর নূতন প্রণালী-অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে, যতদিন না রোগীর দেহ সর্ব্বপ্রকার রোগ-লক্ষণ-বর্জ্জিত এবং রোগবীজশূন্য (symptom free and suninfective) হইয়া যায়। দেশের সকল কুষ্ঠীকে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়ত ব্যয়বাহুল্যবশতঃ, কোনোদিনই সম্ভব হইবে না, কিন্তু যে-সকল কুষ্ঠরোগী রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষা করে, রেল-ষ্টীমারে যাতায়াত করে, অন্ততঃ তাহাদিগকেও রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যাইবার পর আরো ছয় মাস পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখা উচিত।

কুষ্ঠাশ্রম ও "Mission to Lepers"

এতদিন পর্য্যন্ত এদেশে কুষ্ঠীদের সেবা, চিকিৎসা কিংবা ভরণপোষণের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা অধিকাংশই খৃষ্টান মিশনারী। ভারতীয়গণ অদ্যাপি এই বিষয়ে বড়-একটা উদ্যম দেখান নাই।

আর কুষ্ঠীদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়াছেন Mission to Lepers। মাসের সেপ্টেম্বর মাসে মিশনের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইল। প্রথমে অতি ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ করিয়া আজ তাঁহারা যে বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যদিও দ্বাদশটি বিভিন্ন দেশে ইহার সেবাসদন আছে, তবু ভারতবর্ষই প্রধানতঃ ইহার কার্য্যক্ষেত্র। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া—যখন কুষ্ঠীদের জন্য ব্যবস্থাই ছিল না,—আজ পর্য্যন্ত সমভাবে ইঁহারা একান্ত নিঃসহায়, সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত শত শত কুষ্ঠীর জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ইঁহাদেরই সৎদৃষ্টান্ত এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে আজ দেশে কুষ্ঠীদিগের জন্য একটা সত্যকার বেদনা-বোধ জন্মিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে ব্রিটিশ্ এম্পায়ার লেপ্রসি রিলিফ্ এসোসিয়েশন্ নামে একটি নূতন সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রিন্স-অব ওয়েল্‌স্ ইহার পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষেও ইহার একটি শাখা সমিতি শীঘ্রই স্থাপিত হইবে, এবং বড়লাট এই সমিতির জন্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

বর্ত্তমানে ভারতে কুষ্ঠাশ্রমের সংখ্যা ৯২, তন্মধ্যে ৬২টি Mission to Lepersএর। এইসকল আশ্রমে যত কুষ্ঠী বাস করে, তাহাদের ব্যয়ভার মিশন বহন করিয়া থাকেন। সমাজের নির্য্যাতন, রোগের যন্ত্রণা, হতাশ্বাস মিলিয়া কুষ্ঠীর জীবন দুর্ভর করিয়া তোলে। যেই দেখে সেই দূর দূর করে; কেহ আশ্রয় দেয় না, কেহ একটা আশার কথা বলে না। তদুপরি অক্ষমতার জন্য জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন এইসকল খঞ্জ, গলিত হস্ত-পদ কুষ্ঠ-রোগী আসিয়া আশ্রমে আশ্রয় লয়। সেখানে জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা বেশ শান্তিতেই কাটায়।

এই-সকল আশ্রমে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল প্রকার কুষ্ঠীকেই আশ্রয় প্রদান করা হইয়া থাকে, ইহাদের দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি সাধন মিশনের লক্ষ্য। ইহাদের দুঃখময় জীবন যথাসম্ভব সুখ-ও শান্তিপূর্ণ করিবার চেষ্টা আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন।

আশ্রমে কাহাকেও জোর করিয়া রাখা হয় না। যে-কেহ ইচ্ছা করিয়া আশ্রমে যায় তাহাকেই থাকিতে দেওয়া হয়, এবং রোগমুক্ত হইলেই, কিংবা ইচ্ছা হইলে তৎপূর্ব্বেই আশ্রম ত্যাগ করিতে পারে। বস্তুতঃ কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর কখনো হস্তক্ষেপ করা হয় না।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এখানে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি নাই। মিশনের নিয়মাবলীর ৩নং নিয়মের দ্বিতীয় অংশে এই কথা বলা হইয়াছে যে, আশ্রমস্থ কোন কুষ্ঠীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র-শ্রবণে বাধ্য করা হইবে না। তবে এ কথা বলা

জান যে, সকল আশ্রমেই গির্জ্জা আছে, এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠনার (christian teaching) রীতি আছে। খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণে উপদেশ দেওয়া এবং উৎসাহিত করা হয়। আশ্রমের আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টীয়ান্‌ আশ্রমের পুরাতন বাসিন্দা সকলে খৃষ্টীয়ান, এমতাবস্থায় নবাগত নীচজাতীয় প্রায়-নাস্তিক কুষ্ঠরোগী সহজেই নবধর্ম্ম গ্রহণে স্বীকৃত হয়। তবে জোর করিয়া কাহাকেও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করানো হয় না, সকলে স্ব-স্ব অভিরুচি অনুসারে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু সেইজন্য তাহাদের প্রতি ব্যবহারের কোন তারতম্য করা হয় না।

যাহাতে অহরহ আপন দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া রোগী হতাশ হইয়া না পড়ে, এইজন্য ইহাদিগকে স্বল্প-শ্রম-সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হয়। শাকসব্জির বাগান প্রায় প্রত্যেক আশ্রমেই আছে। বড়-বড় আশ্রমে শস্যোপযোগী ক্ষেত্রও আছে। সেখানে কুষ্ঠীগণ ধান্যাদি শস্যোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া নানারূপ সহজ শিল্প ও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে কুষ্ঠাশ্রম কুষ্ঠরোগীদিগের শেষ আশ্রয়। যে সেখানে যায় প্রায় কেহ আর আপন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া আসে না। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কুষ্ঠাশ্রমকে কুষ্ঠরোগের হাঁসপাতাল করিতে হইবে। রোগ আরোগ্য হইলে রোগী আপন গৃহে, আপন প্রিয় জনের মধ্যে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু কুষ্ঠীগণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহা বিশেষ সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

স্ত্রীপুরুষভেদে কুষ্ঠী রক্ষা ও বালক

বিশেষজ্ঞগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, এইরোগ যদিও বংশানুক্রমিক (hereditary) নহে, তথাপি রোগাক্রান্ত পিতামাতার সংসর্গে বাস করিলে সন্তানেরও কুষ্ঠ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। সেইজন্য এইসকল আশ্রমে স্ত্রীপুরুষ পৃথক্‌ করিয়া রাখা হয়; যাহাতে কুষ্ঠী দম্পতির আর সন্তান না জন্মে তজ্জন্য এই প্রচেষ্টা। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় আশ্রমে প্রবেশ করে, অথবা কেহ স্ত্রীসংসর্গে বাস করিতে চাহে, তবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, নবজাত সন্তানের অতি শৈশবেই তাহাকে পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

এইজন্য আশ্রম হইতে দূরে এক বাড়ী থাকে (Home for Untainted Children) সেখানে কুষ্ঠীদিগের সন্তান রাখা হয়। এইসকল শিশুর অতি অল্পেরই কুষ্ঠ হইতে দেখা যায়। অধিকাংশই সুস্থ সবল সাধারণ মানুষ হইয়া থাকে। যাহাদের কুষ্ঠ বাহির হয়, তাহাদিগকে



একজন কুষ্ঠরোগী
(১) চিকিৎসার পূর্ব্বে　　(২) এক বৎসর চিকিৎসার পর

আশ্রমসংলগ্ন পর্য্যবেক্ষণ-গৃহে (Observation Home) রাখা হয়। আর যাহারা রোগাক্রান্ত হয় না, তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য চলিয়া যাইতে দেওয়া হয়।

মিশনের আশ্রয়ে থাকিতে-থাকিতে এইসকল বালক-বালিকা নানারূপ শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়। ইহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য স্কুল আছে। অনেকে আশ্রমের ডাক্তার-বাবুর নিকট ডাক্তারি শিখে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই সূচীকর্ম্মে ও রন্ধন-কার্য্যে নিপুণতা লাভ করে, এতদ্ব্যতীত স্থানকালোপযোগী অন্যান্য বহুবিধ শিক্ষা ইহাদিগকে দেওয়া হয়।

আয়-ব্যয়

মিশনের প্রতিপাল্য প্রায় ৫০০০ নরনারীর ভরণ-পোষণের জন্য প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক সাত লক্ষ টাকার

প্রয়োজন। ইহার কিয়দংশ গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ বহন করেন, বাকী সবই সহৃদয় দাতৃগণের দয়ার উপর নির্ভর করে। এই টাকার অধিকাংশ বিলাত হইতে আসিয়া থাকে। ইদানীং বিনিময়ের (Exchange) হার কমিয়া যাওয়ায় মিশন বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

বহুদিন পর্য্যন্ত গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌ কিংবা এতদ্দেশীয় জনগণ এই ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে এই অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট্‌ নানাপ্রকারে এই জনহিতকর কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন, রাজপুরুষগণও এতদ্বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আপনাদের সদাশয়তার পরিচয় দিতেছেন।

ভারতীয়দিগের মধ্যেও অনেক মহাশয় ব্যক্তি এইসকল বিপন্ন আতুরের সেবাকার্য্যে যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলিকাতা কলুটোলার স্বনামধন্য রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, মুঙ্গেরের জমিদার রাজা রঘুনন্দন সিংহ ও মাড়োয়ারী-কুলপ্রদীপ ওঙ্কারমল জাঠিয়ার নাম করা যাইতে পারে। মল্লিক মহাশয়ের দয়ায় মান্দ্রাজের অন্তর্গত ভাদাথোরামান্নুতে দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক "লেপার হোম" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই ও কলিকাতার দেশী-বিদেশী বহু ধনাঢ্য মহাজন প্রতিবৎসর প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

কার্য্যের প্রসার

মিশন যে শুধু আশ্রমের পুরাতন অধিবাসীদিগের আহার, পরিধেয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন তাহা নহে। প্রতি বৎসর দেশের বিভিন্ন স্থানে নূতন-নূতন আশ্রম খোলা হইতেছে। স্থানাভাব দূর করিবার জন্য প্রতি আশ্রমে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। কত আশা ও মিনতি লইয়া রোগী তাহার রোগক্লিষ্ট দেহভার বহিয়া আশ্রম-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, স্থানাভাববশতঃ তাহাকে বলিতে হইতেছে, তুমি ফিরিয়া যাও, এখানে তোমার আশ্রয় মিলিবে না।

যে-সকল কুষ্ঠী আশ্রমে স্থান পায় না, অথবা আশ্রমে যাইতে চাহে না তাহাদিগের জন্য চিকিৎসা-বিভাগ (Out Patients' Department) খোলা হইয়াছে। সেখানে রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ, ইন্‌জেক্‌শন্‌ প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে।

উপসংহার

কিন্তু এখনো অনেক কর্ত্তব্য বাকী। দেশ হইতে এই 'মহারোগ'কে দূর করিতে হইবে, যাহাতে রোগের আর বিস্তার না হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; আর এই লক্ষাধিক রোগযন্ত্রণাকাতর আতুরের রোগে ঔষধ, ক্ষুধায় অন্ন, পরিধানে বস্ত্র জোগাইতে হইবে।

দানে শুধু গ্রহীতার নহে, দাতারও কল্যাণ—এই সত্যটি এই-বিষয়ে যেমন প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এমন আর কিছুতে নহে। ইহাদের রোগমুক্ত করা, আর আমাদের * আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা একই। পথে-ঘাটে ইহাদিগকে দেখিয়া আপনাদের মনে যে দুঃখ ও অনুকম্পার উদয় হয়, ইহাদের ভরণপোষণের জন্য, ক্লেশমোচনের জন্য, রোগমুক্তির জন্য অর্থ সাহায্য করিয়া মনের সেই অনুকম্পাকে কার্য্যতঃ প্রকাশ করুন।

সম্রাট্‌ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড্‌ একবার কোন রোগ-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "If preventable, why not prevented?" (যদি দূর করা যায় তবে কেন দূর করা হয় না?) আজ যখন আমরা জানিতে পারিয়াছি কুষ্ঠরোগের ঔষধ আছে, ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষকে কুষ্ঠরোগ মুক্ত করা যাইতে পারে, চেষ্টা করিলে, এ-কথা বলা যাইতে পারে "In India leprosy is a thing of the past," (ভারতে কুষ্ঠরোগ অতীতের ঘটনা) তখন স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয় তবে কেন তাহা করা হইবে না, যদি সাধ্যায়ত্ত, তবে কেন দেশকে রোগমুক্ত করিব না, If preventable, why not prevented?

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় Mission to Lepers-এর Acting Secretary for India শ্রীযুক্ত A. Donald Miller মহাশয় আমাকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।—লেখক।

জীবন-কাব্য

শ্রী অমিয়া চৌধুরী

এক

আকাশে উজ্জ্বল চন্দ্র উঠিয়াছিল। কিন্তু গ্যাস-লাইটের বহর এত বেশী যে জ্যোৎস্না বুঝিবার উপায় নাই। রাত একটু বেশী হইয়াছে; ট্রাম আর চলিতেছে না। পথে লোকজনও খুব কম; দুই-একখানা মোটর কেবল নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এম্‌নি-সময়ে একটি দ্বিতল অট্টালিকার নিরুদ্ধকক্ষে স্তিমিত-দীপালোকে একটি তরুণ যুবক শয্যাশায়িতা একটি অবগুণ্ঠনবতী বালিকার কানের কাছে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে ডাকিতেছিল, "জ্যোতি!"

জ্যোতির্ম্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। দুইতিনটা ডাকের পর "উঁ" বলিয়া চোখ মেলিল।

যুবকের নাম সুরেশ; সে বালিকার শিথিল খোঁপার গ্রন্থিমোচনের চেষ্টা করিতে-করিতে কহিল, "এত শীগগির ঘুমিয়ে গেছ্‌লে?"

জ্যোতি উঠিয়া বসিল; চক্ষু মুছিয়া কহিল, "রাত ত কম হয়নি, এগারোটা বাজ্‌তে শু'নে তবে আমি শুয়েছি। তা'র আগে ত ব'সেই ছিলাম। তুমি নীচে এতক্ষণ কি কর্‌ছিলে?"

সুরেশ মুগ্ধনয়নে স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। জ্যোতি কহিল "বলো না—"

"কি?"

"কোথায় ছিলে এত রাত্তির অবধি?"

"নীচের ঘরে।"

"পড়্‌ছিলে বুঝি?

"না।"

বালিকার কৃষ্ণ আঁখিতারায় বিস্ময় প্রকাশ পাইল। কহিল, "তবে কেন বসেছিলে?"

"পরীক্ষা যে এল, জানো না?"

জ্যোতি কহিল, "জানি ত।"

"শীগ্‌গির যদি শুতে আসি, বাবা দাদা সবাই কি ভাব্‌বেন! তাই খানিক বই নিয়ে ব'সে থাকি—তাঁরা শুতে গেলে তা'র পর আসি"—জ্যোতি কৌতুক বোধ করিল। বয়সে বালিকা হইলেও সে অতিশয় বুদ্ধিমতী; হাসিমুখে কহিল, "সেই যদি ব'সেই থাকো, তবে পড়্‌লেই পারো?"

সুরেশ দুই হাতে জ্যোতির হাত-দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া, উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, "তোমার মুখখানি কেবল আমার মনে পড়ে। কতক্ষণে তোমার কাছে আস্‌ব শুধু তাই ভাবি, পড়ায় ত মন বসে না আমার।"

এই প্রেম-নিবেদনে বালিকা মুগ্ধ হইয়া গেল। ছয়-মাস হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই ছয়মাসের মধ্যে নিজের স্তুতি সে স্বামীর মুখে কত দিন শুনিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু তাহার বিরক্তি বোধ হয় না। কারণ এসব কথা নূতন। নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থ ঘরে, কাব্যের বাষ্পশূন্য আওতায় ও নিরেট গদ্য-খাতের বাপ-মায়ের কোলে সে মানুষ হইয়াছিল। নিজের সম্বন্ধে তা'র কোনো সাড়াই ছিল না। বিবাহের পরেই শুনিল, সে তাহার অপরূপ রূপে সুরেশের নয়ন মুগ্ধ করিয়া দিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে সে তাহার শ্যামবর্ণের জন্য বাপ-মাকে কত না উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে শুনিয়াছে। নিজে খুব সুন্দর নয় বলিয়া একটা সঙ্কোচ তা'র মনে ছিল। সুরেশের প্রশংসায় সে-সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। এখন সে নিত্য-নূতন প্রসাধনে রূপকে উজ্জ্বলতর করিবার চেষ্টায় আছে।

সুরেশ তাহাকে "জীবনের আলো" "হৃদয়ের ধন" "প্রেমের প্রদীপ" প্রভৃতি কত নামে আদর করে। তাহার অতি বিশেষত্বহীন ক্ষুদ্র মুখখানিকে চাঁদের সঙ্গে, গোলাপের সঙ্গে, সন্ধ্যার সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তুলনা করে। সে বলে জ্যোতিকে না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইত। জ্যোতিকে পাইয়া সে তাহার জীবন-যৌবন সার্থক হইল

বলিয়া অনুভব করিতেছে। জ্যোতির কণ্ঠস্বর বীণাধ্বনির মতন, জ্যোতির হাসি সূর্য্যালোকের স্থায় গাঢ় আঁধারকেও উজ্জ্বল করিয়া তোলে; জ্যোতির দুই চোখে সতীত্বের অপরূপ দীপ্তি। এককথায় জ্যোতি মানবী-বেশে দেবী, এই সমুচ্চ দেবীত্বের সিংহাসনে বসিয়া জ্যোতি পৃথিবীকে বড় সুন্দর দেখিতেছে। ভাবিতেছে, এখানে কোনো দুঃখ নাই, শোক নাই, বিচ্ছেদ নাই, দারিদ্র্য নাই। আছে কেবল পরিপূর্ণ আরামের মধ্যে পরস্পরের প্রেমগুঞ্জন ও চির-মিলন। এই অভিনব অপরূপ দৃশ্যপটের কোনো পরিবর্ত্তন সম্ভব, তা জ্যোতির্ম্ময়ীর কল্পনাতেও আসে না। স্বামীর ভালোবাসা ও প্রশংসা লাভ করিয়া সেও জীবন ধন্য বোধ করিতেছিল। সুরেশের একটা হাত জ্যোতির খোঁপার উপর ছিল; জ্যোতি মাথাটি সরাইয়া লইয়া কহিল, "খু'লে দিয়ো না।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"বড়দি বেঁধে দিয়েছেন, কাল সকালে যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি বল্‌ব?"

"সে যা হয় বোলো, এখন খোলো ত দেখি। এমন সুন্দর চুল, কতগুলো কাঁটা গুঁজে না বাঁধ্‌লে তৃপ্তি হয় না বুঝি?"

বড়দির পরিহাসভয়ে জ্যোতি চুল খুলিতে রাজি হইল না। স্বামীর মন ওদিক্ হইতে সরাইবার জন্য চারিদিকে চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা,—ওখানা কি খাতা?"

টেবিলের উপর একখানা মোটা খাতা পড়িয়াছিল। জ্যোতি হাত বাড়াইয়া সেখানা তুলিয়া লইল। "আলোটা একটু বাড়িয়ে দেবে?"

সুরেশ উঠিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। এই শুভ অবসরের আশায় সে খাতাখানি ওখানে ফেলিয়া রাখিয়াছিল; চুলের কথা সে ভুলিয়া গেল। জ্যোতি খাতা খুলিয়া বলিয়া উঠিল "ওমা, এ তোমার লেখা নাকি?"

"হাঁ—ভালো হয়নি, ও কি দেখ্‌বে!"

"আচ্ছা, তুমি চুপ করো ত—আমি পড়্‌ছি—" বলিয়া জ্যোতি মনে-মনে পড়িতে লাগিল।

"ওগো আমার মূর্ত্তিমতি কল্পনালক্ষ্মি, এ আমার ছন্দে-গাঁথা জীবন-কাব্যখানি আমি তোমার শুচিশুভ্র হাত-দুখানিতে এনে দিলাম। এই অসমাপ্ত কাব্য তুমি তোমার প্রেমে সম্পূর্ণ করো। আমার যৌবনের বনে বসন্তের হাওয়া লেগেছে, আমার মনোমৃগ তা'র—"

জ্যোতি থামিয়া গিয়া কহিল, "আচ্ছা, এ তুমি কা'কে লিখেছ বলো না।"

"কা'কে আবার? তোমাকে!" বলিয়া সুরেশ বালিকাকে নিকটে টানিয়া লইল।

জ্যোতি কহিল, "সব কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারিনি।"

সুরেশের প্রেমালোকিত হৃদয় একটু মলিন বোধ হইল; কহিল, "কেন?"

জ্যোতি যে তা'র সামান্য বিদ্যা লইয়া এত কবিত্ব বুঝিতে পারে না, সে কথা স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। তাই সে কেবল কহিল, "এখন থাক্, আমি একসময় একলা ব'সে পড়্‌ব, তাড়াতাড়ি কর্‌লে কি বোঝা যায়?"

"সেই ভালো," বলিয়া সুরেশ খাতাখানা রাখিয়া দিল। আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

দুই

আকাশে ঘন মেঘ। কার্ত্তিক মাসের বাদ্‌লা; বড় শীত বোধ হইতেছিল, এই ছায়াচ্ছন্ন অপরাহ্নে মহানগরাও যেন কতকটা নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার এক বৎসরের পুত্র নন্দদুলালকে কোলে লইয়া শয়ন কক্ষের বাতায়নে বসিয়াছিল। বিকালে চারিটার পর এখানে বসা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

দুই-দুইবার চেষ্টা অথবা অ-চেষ্টা করিয়া সুরেশ যখন বি-এ পাশ করিতে পারিল না, তখন পিতা হতাশ হইয়া তাহাকে কলেজ ছাড়াইয়া লইলেন। সুরেশও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বৎসরখানেক যাবৎ সে মার্কেন্‌টাইল ব্যাঙ্কে কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছে। জ্যোতির শয়নকক্ষের বাতায়ন হইতে গলির মোড় খুব স্পষ্ট দেখা যায়। সেইখানে বসিয়া প্রতিদিন স্বামীর প্রতীক্ষা করা

জ্যোতির অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সুরেশও সে-কথা জানিত।

ক্রমে গলির মোড়ে পরিচিত মূর্ত্তি দেখা গেল। জ্যোতির মুখে-চোখে উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল; সে নন্দর কচি মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে চুম্বন করিল। হৃদয়াবেগ যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন মানুষ অন্তত একটুখানি ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না।

সুরেশ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। এখন আর সে নবপরিণীত কলেজের ছাত্র নয়। তাহার চেহারায় সংসারের ছাপ মারা হইয়া গিয়াছে। গায়ের চাদর ও জামা খুলিয়া সে পাতা-বিছানার উপর ফেলিয়া দিল। হাতের বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া স্ত্রীর দিকে ফিরিল। নন্দ দুই হাত বাড়াইয়া পিতার কোলে আসিবার জন্ত কলভাষায় অর্থহীন অনুনয় জানাইতে লাগিল।

জ্যোতি কহিল, "নাও না একবার, কি কর্‌ছে দেখ, ভারি দুষ্ট হচ্চে।"

সুরেশ কহিল, "তাই ত দেখ্‌ছি। কিন্তু এখন ত নিতে পার্‌ব না। আমায় আবার এখুনি বায়স্কোপে যেতে হবে।"

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল, "ইংরিজী?"

সুরেশ কহিল, "না, বাংলা। 'শ্রীকৃষ্ণ' নাকি খুব ভালো শুনেছি। যতীন, হারু ওরাও যাবে—শীগ্‌গির খাবার দাও দেখি।"

জ্যোতির মনখানি একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল। কয়দিন হইতে পাড়ার সঙ্গিনীদের কাছে 'শ্রীকৃষ্ণ' বায়োস্কোপের প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত স্বামীকে সে অনেক অনুরোধ করিয়াছিল। সুরেশ কাজের ছুতা দিয়া অনুরোধ রাখে নাই। মনের ভাব সম্বরণ করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

সুরেশের বৌদি খাবার লইয়া আসিলেন। সুরেশ খাইতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন। "শ্রীকৃষ্ণ দেখ্‌তে যাচ্চ নাকি ঠাকুর-পো?"

"হ্যাঁ, বৌদি—"

"জ্যোতিকে নিয়ে যাবে? ও ক'দিন থেকে বল্‌ছিল—"

সুরেশ মাথা নাড়িয়া কহিল, "সে কি হয়? তো কেউ যাবে না—একলা ওকে নিয়ে যাই কি ক'রে

বৌদি বলিলেন, "কি করি ভাই! মানুর আজ আ জর এসেছে, নইলে আমিই যেতে পার্‌তাম, কে কথাও হ'ত না—কিন্তু আমি সুবিধে ক'রে মা বা মত করিয়ে দিতে পারি, যাও নিয়ে, তোমার যা কথা বল্‌তে গিয়েই ওর চোখে জল এসেছে।'

"না বৌদি, আমি ত এখুনি যাচ্চি—অত হাঙ্গামা কর্‌তে পার্‌ব না। আমি যাচ্চি আমার বন্ধুদের সঙ্গে— সুবিধেও হবে না ত।"

বৌদি মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া কহিলেন, "ভারি দুঃখিত হবে।"

সুরেশ খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "নন্দাকে নিয়েই ত মুস্কিল হ'বে। ছেলেমেয়ে নিয়ে আর অত সখের দর্‌কার নেই।"

বৌদি চলিয়া যাইতেছিলেন, সুরেশ কহিল, "বৌদি একবার পাঠিয়ে দিও, আমার কাপড়জামা দিতে হবে, বিশ্রী ময়লা হ'য়ে গেছে—"

"দেবো পাঠিয়ে—" বলিয়া বৌদি প্রস্থান করিলেন।

সুরেশ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিপাটী করিয়া চুল আঁচ্‌ড়াইতে লাগিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী আসিয়া বস্ত্রাদি বাহির করিয়া দিল। পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া সে দেওর-ভাজের সমস্ত আলাপই শুনিতেছিল।

কাপড় পরিয়া সুরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "জুতো পাম্প্‌টান্ পাবো?"

"এনে দিচ্চি" বলিয়া জ্যোতি দ্রুত চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি ডিবায় করিয়া দুইটি পা লইয়া আসিল। আর কোনো কথা না পাইয়া সুরেশ প্রশ্ন করিল, "নন্দ কই?" "মার কাছে।"

"ও, আচ্ছা তবে এখন আসি," বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া দ্বারের নিকটে গেল। জ্যোতি গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল "অনেক রাত্তির হবে নাকি?"

সুরেশ উত্তর দিল, "এখন কি জানি!" বলিয়া দ্রুত নামিয়া গেল।

সেই রাত্রে আহারাদির পরে জ্যোতি যখন শয়নকক্ষে আসিল, তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। জ্যোতির বুকের মধ্যে একটা ভারি বেদনা জমিয়া উঠিতেছিল। সে শয়ন করিল না। একবার মশারি তুলিয়া সুপ্ত পুত্রের মুখ দেখিল, তা'র পর নিঃশব্দে সরিয়া আসিয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে একখানা মাদুর মেঝেতে বিছাইয়া আলোটা নামাইয়া লইল। বাক্স্ খুলিয়া একটা রঙীন রুমাল-বাঁধা কাগজের বাণ্ডিল বাহির করিল। সেই বাণ্ডিলে তিনবৎসর আগেকার চিঠি জমানো ছিল। জ্যোতি বাপের বাড়ী থাকিতে সুরেশ এই পত্রগুলি লিখিয়াছিল। একটি বালিশ মাথায় দিয়া মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়া জ্যোতি পত্র পড়িতে লাগিল।

পত্রে লেখকের কি গভীর আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতির মনের মধ্যে গতদিনের মধুর উজ্জ্বল স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সেই প্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ দিনরাত্রিগুলি আজও তাহার মনে নবীন হইয়া বিরাজ করিতেছে। জীবনে সে কখনও তাহা ভুলিয়া যাইবে না। জ্যোতি ভাবিল আমি কি বোকা! স্বামীর প্রেমে সন্দিগ্ধ হইয়া দুঃখ পাইতেছি। একবার ভাবিয়া দেখি না, এমন প্রেম কি পুরানো হইতে পারে? স্বামী আজকাল বেশী কথা কহে না, আদর করে না, ঘরে একটু বসিতে চাহে না, এ-সব জ্যোতি খুব লক্ষ্য করিতেছিল, আর ভাবিতেছিল, স্বামী বুঝি আগের মতন ভালোবাসে না। এখন তাহার মনে হইল, কাজকর্ম আছে বলিয়াই স্বামী সময় পায় না, কিন্তু মনের সেই ভালোবাসা তাহার কখনও ফুরাইয়া যায় নাই।

মনের লুপ্তপ্রায় আনন্দ ও শান্তি ফিরিয়া আসিল। এক নূতন আলোকে তাহার আবার হৃদয় বিকশিত হইয়া উঠিল। জ্যোতির মনে হইল, সে যেন তিন বৎসর পূর্ব্বকার বালিকাবধূ, স্বামীর প্রেমে পরিপূর্ণ সংসারের চিন্তাশূন্য—সুরেশের মূর্ত্ত কল্পনালক্ষ্মী—! সুখের আবেশে তাহার চোখ মুদিয়া আসিল।

"দোর খোলো—"

জ্যোতি চম্‌কিয়া উঠিয়া বসিল; প্রায় ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

সুরেশ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?"

"না।"

"তবু দু'তিনবার ডাক্‌তে হয়েছে"—জ্যোতি নীরব রহিল। সুরেশ বিছানার দিকে অগ্রসর হইতে-হইতে কহিল, "ওখানে চিঠিপত্র কিসের?"

জ্যোতি সেগুলি গুছাইয়া তুলিতেছিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ও আমি এম্‌নি পড়্‌ছিলাম"—

সুরেশের কৌতূহল জাগিল, প্রশ্ন করিল—"কে লিখেছে।"

"তুমিই ত।"

"সেই—পুরোনো চিঠি! ও আবার জমিয়ে রেখেছ কেন? মেয়েদের এত কবিত্ব? এসব দেখ্‌লেই আমার গা জালা কর্‌তে থাকে—। আগে যে মেয়েদের লেখা-পড়ার বালাই ছিল না—সে বেশ ছিল, আর এখন হয়েচে"—মৃদুস্বরে কি বলিয়া সে বিছানার ভিতরে প্রবেশ করিল; লেপটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

জ্যোতি অত্যন্ত আহত হইয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণপূর্ব্বে মনের মধ্যে যে একটা স্নিগ্ধ শান্তি বিরাজ করিতেছিল স্বামীর কথার পর তাহা যে কোন্ শূন্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে লাগিল, জ্যোতি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না।

আস্তে-আস্তে উঠিয়া সে আলোটা টেবিলের ওধারে আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। তা'র পর নিঃশব্দে শয্যায় উঠিয়া নন্দকে বুকে টানিয়া লইল।

অতিশয় মৃদুস্বরে ডাকিল, "ওগো—" সুরেশ বিরক্ত ভাবে কহিল, "কি হ'ল আবার?"

"হয়নি কিছু, ঘুমোওনি দেখ্‌ছি, তাই বল্‌ছিলুম—'

"কি?"

"কি দে'খে এলে গল্প করো না একটু। বেশ ভালো নয়?"

সুরেশ উত্যক্তকণ্ঠে কহিল, "হাঁ, খুব ভালো। এখ আর আমি বক্‌তে পারিনে! রাত একটা বেজে গেছে আবার কাল সাড়ে ন'টায় বেরুতে হবে ত।"

জ্যোতি কোমল অনুনয়ের স্বরে বলিতে গেল, "আগে ত সারারাত—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি জানি, সে আর আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, কিন্তু পেছনের দিকে চেয়ে কান্না আমার স্বভাব নয়। তোমার ইচ্ছে হয় কাঁদো—কিন্তু আমায় জালিও না। কাল থেকে আমি নীচের ঘরেই শোবো, রোজ জ্বালাতন।"

আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও জ্যোতি কাঁদিতে পারিল না। স্তম্ভিত অশ্রুহীননেত্রে নীরব হইয়া রহিল। তাহার জীবন-গ্রন্থের এক নূতন পৃষ্ঠা তাহার নয়ন-সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল, তাহাতে কবিতার বাষ্পও ছিল না।

তিন

অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হ্যারিসন রোডের উপর একখানি নাতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে একখানি বগী গাড়ী আসিয়া থামিল।

প্রৌঢ় গৃহস্বামী গাড়ী হইতে নামিয়াই গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "নিমাই—"

ভৃত্য নিমাই ছুটিয়া আসিল। হাতের কাগজপত্র ভৃত্যের হাতে দিয়া বাবুটি উপরে উঠিয়া গেলেন।

অনেক দিন আগের কথা। কি গোলমাল হওয়ায় সুরেশচন্দ্র "ব্যাঙ্কের" কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দিয়া পাটের কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই কারবারে প্রচুর লাভ করিয়া তিনি যথেষ্ট ধন ও খ্যাতি অর্জন করেন। আজ 'ব্যবসায়ী' বলিয়া সহরে সকলেই তাঁহার নাম জানে।

আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীটে সুরেশচন্দ্র এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতেছেন, সম্প্রতি ভাড়াটে বাড়ীতে আছেন।

দ্বিতলের দালানে দুইটি বালকবালিকা খেলা করিতেছিল। পিতাকে দেখিয়া তাহারা খেলা বন্ধ করিয়া দিল। সুরেশ কিন্তু উহাদের বড় লক্ষ্য করিলেন না; একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিলেন। ছাদের উপর বসিয়া খোলা গায়ে হাত পাখার হাওয়া খাইতে লাগিলেন। ভাদ্রমাসের অপরাহ্ণ; ভারি গরম।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন, "রাধু—"

দালানের ক্রীড়ারতা বালিকাটি ছুটিয়া আসিল। সুরেশ কহিলেন, "তোর মা কোথা রাধু! আমার খাবার দিতে বল্।"

রাধু সভয়ে কহিল, "মা যে কলঘরে গেছেন। ডাকব কি?"

"না না, তবে থাক্গে। পিসিমা কই!"

রাধু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটি বয়স্কা ক্ষীণাঙ্গী বিধবা খাদ্যদ্রব্যহস্তে দ্বার-পথে দেখা দিলেন। বালিকার দিকে চাহিয়া কহিলেন।

"রাধু, ওই আসনখানা পেতে দে, আর ভাঁড়ার ঘরে পাথরের গেলাসে সরবত রেখে এসেছি নিয়ে আয়। সুরেশ তুই খেতে বোস্, মুখ শুকিয়ে গেছে একেবারে। সারাটা দিন খাটুনি! আমি কি আর এখন পারি, বাবা? বৌমাকে কতবার বলেছি তোমার খাবারটা গুছিয়ে রেখে তবে,—দেখ্ দেখি সরবৎটা ঠিক হয়েছে কি না।"

সুরেশ গ্লাসে চুমুক দিয়া কহিলেন, "চমৎকার হয়েচে পিসিমা।"

"হ'লেই ভাল; ও বৌমা। গা ধোয়া হ'ল বাছা! তবে একবার এদিকে এসো। আমি আবার চাল-ডাল বার করে আসিনি—ঠাকুর ব'সে আছে।"

পিসিমা চলিয়া গেলেন। বস্ত্রালঙ্কার ও স্থূল শরীরের গুরুচাপে মন্থরগামিনী যে মহিলা কক্ষে প্রবেশ করিলেন তাহাকে অতীত দিবসের কিশোরী জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া চিনিতে পারা অতিশয় শক্ত।

সুরেশের আহার প্রায় শেষ হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বোধ করি স্থূল দেহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই গম্ভীর-স্বরে কহিলেন। "বাড়ী দে'খে এলে? চুণ দেওয়া হয়েছে?"

সুরেশ তোয়ালে লইয়া মুখ মুছিতে-মুছিতে কহিলেন, "তেতালায় একটুখানি বাকী রয়েছে, হ'য়ে যাবে শীগ্গিরই—"

"হচ্ছে কই? একেবারে বিরক্তি ধ'রে গেছে। এই একটুখানি বাড়ীতে কি এতজনের কুলোয়, একটা বড়

বাড়ী কি ভাড়া নেওয়া চল্‌ত না। বেছে-বেছে এই—"

সুরেশ বাধা দিয়া কহিলেন "তখন ত বড় বাড়ী পাওয়াই গেল না।"

"চেষ্টাও বড় হয়েছিল।"

বড় বাড়ীর জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, এবং এখনও সেকথা সুরেশের বেশ মনে ছিল। কিন্তু স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। কারণ বহুদিন ধরিয়াই তিনি স্ত্রীর সহিত সমস্ত তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আসিতেছেন, আজও যে জয়লাভ করিবেন এমন দুরাশা তাঁহার মনে স্থান পাইল না, তাই নিস্তব্ধ রহিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন, "এ মাসে আমার সংসার খরচের উপর একশ-খানেক টাকা বেশী লাগ্‌বে।"

সুরেশ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, "কেন?" কিন্তু কি ভাবিয়া জিহ্বা সম্বরণ করিলেন। কোনো উত্তর না পাইয়া গৃহিণী কহিলেন,"পারুলের সাধ দেবো ভাব্‌চি—একশ টাকায় কুলোলে হয়। কি বলো, দিতে হবে না?"

সুরেশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা দিতে হবে বই কি!"

পারুল গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। গৃহিণী বলিলেন, 'নন্দর দুটো জামা করাতে হবে। সাম্‌নে শীত—মোটা কাপড়ের দুটো কোট ক'রে দাও, তুমি নিজে দে'খে দিও—সবারই কাপড়-চোপড় কিছু লাগবে, এ-মাসে তুমি ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় তৈরি কর্‌বার জন্যে কিছু টাকা আমার হাতে দিও। পুজোর এখনো একমাস —ততদিন কি এতে চল্‌বে! আমার শাড়ী দু'জোড়া—রাধুর লাগ্‌বে—সেমিজ দুটো চাই—আমি সব নিজেই করাবো, তুমি টাকা দিও।"

"নিও।"

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, কেবল সুরেশের গড়্‌গড়ার শব্দ শোনা যাইতেছে। গৃহিণী আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, দরজার কাছে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। কহিলেন। "হ্যাঁ দেখ, কাপড়ের টাকা না হয় দু'দিন পরেই দিলে, তা'তে আটকাচ্ছে না—কিন্তু কাল আমাকে টাকা-কুড়ি দিতেই হবে যে—"

জ্যোতির্ম্ময়ীর শ্রীহীন মাংসলমুখে এই অনুনয়ের ব্যর্থ প্রয়াস এমন বিশ্রী দেখাইল যে, সুরেশের মতন নীরস কঠিন কার্‌বারী ব্যক্তির চোখেও অদ্ভুত ঠেকিল। তিনি মুখটা ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন—"কেন?"

"আজ দুপুর বেলা—লাহিড়ীদের বাড়ীর সব এসেছিল, কাল ওরা বাংলা-বায়স্কোপে যাবে, আমিও যাবো কথা দিয়েছি, ওরা ত বক্স ছাড়া বস্‌বে না, তু... আমি কি ওদের সঙ্গে গিয়ে দু'এক টাকায় বস্‌ব?"

সুরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তা কি কুড়ি টাকাই লাগ্‌বে?"

"লাগ্‌বে না কেমন ক'রে শুনি। আমি, রাধু, আর পারুলকেও তু'লে নেবো ভেবেছি, পোয়াতী মেয়ে—তিন-জনের হ'ল বারো টাকা, ঝিএর চার আনা, তা'র পর গাড়ীভাড়া, পান, জলখাবার—কুড়িটাকা এমন বেশী কি?"

"না, তা আর বেশী কি।"

"তা হ'লে দেবে ত?"

"দেওয়া আর কি! নিয়ো। নন্দাকে যে দেখছিনে! ইস্কুল থেকে আসেনি।"

"হ্যাঁ, সে বেরিয়ে গেছে।"

"খেল্‌তে বুঝি?"

"না, খেল্‌তে নয়। পুজোর সময় সব ছেলেরা থিয়েটার কর্‌বে কিনা, নন্দও ওরি মধ্যে আছে—"

সুরেশ মৃদুস্বরে কহিলেন, "আছে বুঝ্‌তে পার্‌লাম, কিন্তু সাম্‌নে পরীক্ষা যে!"

"তা'তে হয়েচে কি। ছেলেমানুষ ছুটিছাটাতে একটু আমোদ কর্‌বে না; তুমি এই নিয়ে ওকে বোকো না কিন্তু।"

"না। কিন্তু ফেল হ'লে—"

গৃহিণী সগর্ব্বে ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ফেল্‌ আমার ছেলে হবে না।"

সুরেশ কহিলেন, "ভালো।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আবার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে-ছিল, এমন সময় সুরেশ সহসা কহিলেন "ভালো কথা,

লোহার সিন্দুকের চাবিটে দিও ত, একটা দলিল খুঁজে পাচ্ছিনে, পুরোনো কাগজের বাক্স্‌টা—"

"অবাক্ করলে! সে বাক্সে কতগুলো ছেঁড়া পাতা ও ছাইমাখা চিঠি জমানো আছে—একদিন পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। ওর মধ্যে দলিল! এ কি আজকের বাক্স্?"

"চাবিটে তুমি দিও তো।"

"বেয়াড়া ইচ্ছে যত!" বলিয়া আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা ঝনাৎ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া জ্যোতি বাহির হইয়া গেলেন।

সেই রাত্রে সুরেশচন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরে একাকী বসিয়া আছেন। চারিদিকে কাগজপত্র ছড়ানো; কলেজের নোট, কবিতার খাতা, ধোপার হিসাব, বন্ধুর ছবি, প্রিয়ার পত্র, বিস্মৃত যৌবনের রঙীন স্মৃতি! একখানা খাতার পাতা খোলা, প্রথমটা এইরকম আরম্ভ, 'ওগো আমার মূর্ত্তিমতি কল্পনালক্ষ্মি—"

সুরেশচন্দ্র অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন। বহু যত্নে রচনা করিয়া যাহা একদিন প্রেয়সীর হাতে দিয়াছিলেন, আজ তাহা পাগলের অর্থহীন প্রলাপের মতন বোধ হইতেছে; কি আশ্চর্য্য, যে-মুখ এতদিন সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় বোধ হইয়াছিল, আজ তাহা কি মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে! কেমন করিয়া দিনে-দিনে তিলে-তিলে স্ত্রীর দেহে-মনে এই বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা তিনি কখনো ভাবিয়া দেখেন নাই। সেই লজ্জা-কুণ্ঠিত, সুহাসিনী, আদেশ-পালনে অভ্যস্ত নতশির তরুণীমূর্ত্তি কোথায় গেল! তাহার একটু হাস্যে ক্রোধে বা বাক্যে যাহার দিবসের ভাগ্য নিরূপিত হইত, সে জ্যোতি কই! এ যেন গতজীবনের স্মৃতি! একটা স্বপ্ন! কবেকার কথা—একে-একে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, ব্যবসায় ফাঁপিয়া উঠিল, টাকাকড়ির কোনো অভাব রহিল না, এবং এই সম্পদের দিনে তিনি না জানিয়া আপনার শাসনদণ্ডখানি স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করিলেন। তা'র পর হইতে তিনি একটা অর্থ-অর্জ্জনের যন্ত্রমাত্রে পরিণত হইয়াছেন! জ্যোতির্ম্ময়ী টাকার কাঙাল; বড় বাড়ী, জুড়ীগাড়ী, অলঙ্কার, শাড়ীজামা, থিয়েটার বায়স্কোপ, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, এইসব তাহার কামনার জিনিষ। কোনো মতে স্বামীর নিকট টাকা আদায় করা তাহার জীবনের ব্রত।

বেচারী সুরেশ! স্ত্রীর নিকটে তিনি টাকার ব্যাপার ছাড়া আর সব বিষয়েই নিতান্ত মূল্যহীন; সন্তানরাও ত তাহাকে বড় একটা গ্রাহ্য করে না। বলিতে গেলে তাদের সঙ্গে তাহার কোনো সম্পর্কই নাই। এই তাহার পরিবার! এই তাহার জীবন! অথচ প্রতিদিন কত-জনে তাহাকে পরমসুখী বলিয়া অভিনন্দন করে! তিনি সুখী! সুরেশচন্দ্রের মনে হইল, এর চেয়ে মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। সকলে তাঁহাকে উপহাস করে নাকি! তাহার কারখানার বিরাট্ লৌহযন্ত্রের মতন তাঁর হৃদয়টা—অবিশ্রাম চাকা ঘুরিতেছে, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। রাশি-রাশি রজতচক্র বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই সম্পদে যন্ত্রের কোনো অধিকার নাই; ভোগ করিবে কাহারা? রক্ত-সম্বন্ধে যাহারা তাঁহার অতি আপনার, অথচ যাহাদের সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক নাই, তাহারাই দুই হাতে এই টাকা লুট করিবে!

সমস্ত জীবনটা অদ্ভুত প্রহেলিকার মতন বোধ হইল।

সুরেশ ধীরে-ধীরে উঠিলেন। একখানা ধারালো কাঁচি লইয়া "জীবন-কাব্যের" খাতাখানি কুচি-কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখচোখ ঘৃণা ও বিরক্তিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তা'র পর তিনি আলো নিবাইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে একটি শিশুসন্তানকে পার্শ্বে লইয়া স্থূলকায়া জ্যোতির্ম্ময়ী অঘোরে ঘুমাইতেছেন। তাহার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া সুরেশচন্দ্র হতবুদ্ধির মতন ভাবিতে লাগিলেন। এ কে অপরিচিতা নারী! ইহাকে যেন তিনি জীবনেও জানেন না। অনায়াসে তাঁহার উপর সর্ব্বময় প্রভুত্ব করিয়া তাঁহার গৃহ, তাঁহার সন্তান, তাঁহার সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়া এ কে নিশ্চিন্তচিত্তে নিশীথের গাঢ় নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতেছে।

সুরেশের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। তিনি কুঁজা হইতে একপাত্র জল ঢালিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলেন। মুখচোখে শীতল হস্ত বুলাইলেন; তা'র পর ধীরে-ধীরে বিনা-শব্দে শয্যার একপার্শ্বে শয়ন

করিলেন। খোলা জানালার পাশ দিয়া একটা নিশাচর পাখী পাখার শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। সুরেশচন্দ্র চম্‌কিয়া উঠিলেন।

খুব সকালেই বাহির হওয়া গৃহস্বামীর অভ্যাস। দুয়ারের সামনে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; ঘোড়াটা থাকিয়া-থাকিয়া খুরের শব্দ করিতেছে, যেন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সুরেশচন্দ্র মহাব্যস্তভাবে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে; মহানগরী বিচিত্র ধ্বনিতে মুখরিত; রাজপথে প্রতিদিনের জনতা। রাত্রির আঁধার কাটিয়া প্রভাতের নবীন আলোকে চারিদিক্ অনুরঞ্জিত হইয়াছে। মানুষের মনে নূতন আশা, নূতন উৎসাহ, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার প্রবলতম ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে।

সুরেশচন্দ্রের মনেও কঠিন বাস্তব সংসারের চেহারা জাগিতেছিল। কার্‌খানার প্রকাণ্ড লৌহযন্ত্রটা তাঁহার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তরে কাব্য ও কল্পনার কোনো সুদূর আভাসও বর্ত্তমান ছিল না; কোনো ব্যবসায়ী ব্যক্তিরই থাকে না।

প্রায় শেষ সিঁড়ির ধাপে পা দিয়াছেন, এমন সময় উপরের ঘরে বিরাট্‌কায়া গৃহিণীর মোটা গলায় স্বর বাজিয়া উঠিল। "হরি, এ-ঘরখানা কাগজ কেটে নোংরা কর্‌লে কে রে।"

হরি সানুনাসিককণ্ঠে কহিল, "আমি না মা—"

"তুমি না! বটে! আচ্ছা, মজা বা'র কর্‌ছি, দাঁড়াও —ঘরটা আগে পরিষ্কার করাই। নিমাই, নিমাই—"

সুরেশচন্দ্রের ঘন গোঁপের তলায় মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। কাল রাত্রের ছেলেমানুষিটা ছেলেমানুষেরই উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। তিনি একরকম পলায়িত বন্দীর মতন গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

আত্মদান

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

নিষ্ঠুর নরের হাতে যারা দিল প্রাণ,
ভ্রান্ত শাসনের লাগি' যারা দিল শির,
কুঠারের তীক্ষ্ণ মুখে ঘাতক, অধীর,
যাহাদের পুণ্য রক্ত করি' গেল পান,
তাহাদের তেজোময় তীব্র জয়গান
দেশ হ'তে মহাদেশে বহিছে সমীর।
মন্দির গড়িছে নর তাদের স্মৃতির।
অমর করিছে নর সেই আত্মদান।
সেইসব জ্যোতির্ম্ময়, নির্ভীক চরিত
শাস্তির কুটিল আঁখি উপেক্ষিয়া ধীরে,
গেয়ে গেছে চিরদিন প্রাণের সঙ্গীত;
সুমধুর সুর তা'র সঞ্চারিয়া ফিরে।
সেই শুভ্র জয়গাথা কালের সরিৎ
নিয়ে যায় সুমহান্ ভবিষ্যৎ-নীরে।

প্রেমের মধুর আলো তাদের ললাটে
পড়িয়া লিখিয়া দেছে দীপ্ত জয়টীকা।
তাহাদের শান্ত নেত্রে তীব্র, ধ্রুব শিখা—
সত্যের দেবতা ছিল হৃদয়ের পাটে।
কাটিয়া পড়ুক শির, সত্যেরে কে কাটে?
চিরদিন দীপ্ত র'বে জয়পত্রলিখা,
জাতির মরণে সে যে প্রাণ-সঞ্চারিকা।
নব-নব দধীচির হৃদয়-কবাটে
লাগিবে আঘাত তা'র তীব্র কলরোলে;
নবীন মুক্তির দূত সেই ত্যাগ স্মরি'
হাসিবে মধুর হাস্য; সে কি কভু ভোলে
আত্মার চরম দান? কভু কি আবরি'
রাখে তা'রে বিস্মৃতির অন্ধকার-কোলে?
বীরত্ব অমর হয় বধভূমে মরি'!

রবীন্দ্রনাথের কবিতা

অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, এম্-এ

(পৌষের প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)

সোনার তরী

"মানসীর" যুগের পর রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক বড় পরিবর্ত্তন এসেছিল। এতদিন শুধু একলা-মনে কবির জীবন তিনি যাপন করছিলেন। "সোনার তরী" যে-যুগের লেখা, তখন তিনি জমিদারী কাজের ব্যপদেশে বৃহৎ বাস্তব জগতের সঙ্গে মিল্‌বার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর গভীর সরল প্রকৃতি এই বিপুল বাহিরকে হজম ক'রে যে কি অলৌকিক পরিপুষ্টি লাভ করেছে, "সোনার তরী" "গল্পগুচ্ছ" "চিত্রা" প্রভৃতি তা'র দৃষ্টান্ত। এই যুগ রবীন্দ্র-সাহিত্যে "সাধনার যুগ" নামে খ্যাত, এবং অনেকের বিশ্বাস এই যুগই কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ যুগ। এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা পরে করব।

মানসীর সুরের সঙ্গে সোনার তরী, চিত্রা ইত্যাদির সুরের বেশী পার্থক্য রয়েছে। সোনার তরী প্রভৃতির কবিহৃদয় নিশ্চয়ই পূর্ণতর, পরিপুষ্টতর। রবীন্দ্রনাথের যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সন্ধান তা যেন এখানে এক পরম সৌন্দর্য্যময় প্রকাশে নিজের সার্থকতা উপলব্ধি করেছে। তাই সোনার তরী, চিত্রা, গল্পগুচ্ছ প্রভৃতির ভাব শক্তিমান্ আনন্দময় স্রষ্টার ভাব; ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্তের অন্তরের সৌন্দর্য্য আর সত্য কবি নিবিড়ভাবে অনুভব কর্‌চেন, আর এক অপূর্ব্ব ছন্দে সে-সব শরীরী হয়ে উঠ্‌ছে।

কিন্তু মানসীর সুর সাধারণতঃ সঙ্কাতের সুর। যে অনুভূতি কবির মনে জাগ্‌চে তা তীক্ষ্ণ; সৌন্দর্য্যও তাঁর চোখে ফু'টে উঠেছে নানা রেখা ও বর্ণবৈচিত্র্য নিয়ে; কিন্তু এসব মূর্ত্তির মতো প'ড়ে তোলার দিকে কবির তত চেষ্টা নয়, যত এর সৌন্দর্য্য-আবেগে নিজে মেতে ওঠা—নৃত্য করা। এই আনন্দময়, আবেগময় বেদনাময় কবিহৃদয়ের স্পর্শ যাঁদের কাছে অপূর্ব্ব "মানসী" তাঁদের প্রিয় কাব্য।

রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রকাশ-ভঙ্গির এই দুইরূপ—রহস্যময় বংশীবাদকের রূপ, আর সমাহিত স্রষ্টার রূপ—শুধু তাঁর যৌবনের রচনায় নয়, পরে পরের রচনায়ও প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে মানসী, কল্পনা, ক্ষণিকা খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, অন্যদিকে সোনার তরী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, চৈতালি, কথা, কাহিনী, নৈবেদ্য, বলাকা, প্রভৃতি দাঁড় করিয়ে আমরা এই কথা বল্‌ছি।

শুধু নিজের মনে বদ্ধ না থেকে বৃহৎ জগতে ছড়িয়ে পড়বার জন্যে কবির মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌ছিল, সোনার তরীতে তা কতকটা সার্থক হয়েছে। কতকটা বল্‌ছি এই জন্যে যে, যে-জগতে এখন ঘু'রে-ফি'রে তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন গ্যেটের মেফিস্‌টোফিলিস্‌এর ভাষায় তা ক্ষুদ্র জগৎ (Little World) (রবীন্দ্র-প্রতিভার জন্যও যে তা Little World তা পরে দেখ্‌ব।) সংসারের নানা সুর তাঁর চিত্তে এখন কিছু প্রবেশাধিকার পেয়েছে। আর সবচাইতে বড় কথা এই যে সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের যে একটি আনন্দময় রূপ আছে সেটি কবির চোখে পড়েছে।

আমাদের বৈরাগ্য-প্রপীড়িত তামসিক জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের যে তীব্র প্রতিবাদ, 'সোনার তরী' কাব্যেই তা'র প্রথম সূচনা নয়; কিন্তু যে সত্যের উপর দাঁড়িয়ে কবি এই প্রতিবাদ করেছেন, তা'র প্রথম পর্য্যাপ্ত উপলব্ধি দেখ্‌তে পাই এই সোনার তরীতে, আর এই সোনার তরীর যুগের গল্পগুচ্ছে। 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে দেখ্‌ছি, এক অদ্ভুত সাধক আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার খেয়ালে আর-সব দিকে উদাসীন হ'য়ে শুধু নিজের খেয়াল মতোই চলেছিল; শেষে তা'র চোখ পড়্‌ল প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার উপর, সে দেখ্‌লে, এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার বুকে কি অমৃত লুকানো রয়েছে! অর্থাৎ দেশেরই জড়তাগ্রস্ত খেয়ালী-চিত্তকে প্রাত্যহিক জীবনের ভিতরকার অমৃতের সন্ধান কবি দিচ্ছেন।

এমন সময়ে সহসা কি ভাবি'
চাহিল সে মুখ ফিরে,'
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোটো-ছোটো তরী পাল তু'লে যায়
মাঝি ব'সে গায় গান।

* * *

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ
সুন্দর লোকালয়,
প্রতিদিবসের হরষে-বিষাদে
চির-কল্লোলময়।
স্নেহ-সুধা ল'য়ে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর
প্রতিদিবসের কাজে।

* * *

ছোটো-ছোটো ফুল, ছোটো-ছোটো হাসি,
ছোটো কথা, ছোটো সুখ,
প্রতিনিমিষের ভালোবাসাগুলি,
ছোটো-ছোটো হাসিমুখ।
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া
মানবজীবন ঘিরি'
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই
দেখিতেছে ফিরি'-ফিরি'।

* * *

প্রভাত সঙ্গীতের "প্রভাত উৎসব" কবিতাটি এই "আকাশের চাঁদ" কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়্‌লেই বুঝতে পারা যাবে, কেন আমরা বল্‌তে চাই "প্রভাত সঙ্গীতে" আবেগময় কবিহৃদয়ের সাক্ষাৎ পাই, কিন্তু স্রষ্টাকে পাইনে।

জাগতিক জীবন, প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা যে অমৃতময়, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য-সাধনায় এ এক বড় সত্যের উদ্‌ঘাটন। এ-মন্ত্রের দর্শন কবি পেয়েছেন বহু পরে, "নৈবেদ্য" কাব্যে—

বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি
সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।......

কিন্তু কতরূপে কত ভাবে যে কবি বারবার এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছেন, কাব্যরসিক ও সত্যজিজ্ঞাসু—দুয়েরই তা অনুধাবনের বিষয়। এই-ই "সোনার তরী" কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতরকার কথা; আর গল্পগুচ্ছে এ-সত্য যে-ভাবে অপরিসীম রেখা ও বর্ণবৈচিত্র্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে বাংলা-সাহিত্য কেন, জগতের সাহিত্যে তা গৌরবের বস্তু।

সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যের স্থায় এইসব গল্পেও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি সুপরিস্ফুট। কিন্তু সেই গভীর সৌন্দর্য্যদৃষ্টির সাম্‌নেই মাঝে-মাঝে এমন-এক সত্য মূর্ত্তি ধ'রে উঠেছে, কথা-সাহিত্যে যা সাধারণত অতি দুর্লভ। আমরা শুধু নিখুঁত চরিত্র-সৃষ্টির কথাই বল্‌ছিনে; অবশ্য চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা চিরদিনই শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রে আসছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই, কবি তাঁর বিপুল সৌন্দর্য্যবোধের পটে যেভাবে চরিত্রসৃষ্টি করেছেন তাতে চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন সত্য প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র সৃষ্টির ব্যাপারে বৈচিত্র্য খুবই লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু একত্ব যার মূলে নেই; সে-বৈচিত্র্য অসুন্দর—অর্থহীন। অর্থাৎ বৈচিত্র্যকে একত্বের বৃন্তের উপর ফুটিয়ে তুলতে না পারলে সৃষ্টি হয় না। ইউরোপীয় সাহিত্যে "জীবন"রূপ এক সহজ প্রবল অথচ রহস্যময় ব্যাপার সেই একত্বের সূত্র যোগাচ্ছে। সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতির মতন বিরাট্ শক্তিধরদের কথা বাদ দিয়ে তাঁদের চাইতে অনেক হাল্কা যে স্কট্ বা ডুমা, তাঁদের লেখাতেও দেখ্‌ছি, এই "জীবন" সব বৈচিত্র্যের মূলে রস যোগাচ্ছে, সব বৈচিত্র্যকে সাজিয়ে তুলছে। আমাদের সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য জাতীয় জীবনের দৈন্যের জন্য যে অনেক জায়গায় হতশ্রী, অনেক সময়ে অর্থহীন মাসিক সাহিত্যের পাঠকেরা তা লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পে দেখ্‌ছি, কবি পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভিত্তি যে "জীবন" তা'কে আত্মসাৎ আর অতিক্রম ক'রে তাঁর গভীর সৌন্দর্য্য-অনুভূতির সাহায্যে পাঠককে আত্মার দ্বারদেশে পৌঁছে দিতে পার্‌ছেন। অবশ্য সবখানেই যে সেটি সম্ভবপর হয়েছে তা নয়; কিন্তু যেখানে কবি পাঠককে সেই অতলে পৌঁছে দিতে পারছেন না, সেখানেও এমন-এক সৌন্দর্য্যের পরিমণ্ডলে নায়ক-নায়িকাদের দাঁড় করাচ্ছেন যে, তাদের অতি সাধারণ কথা, কাজ, অতি সাধারণ ঘটনাও, আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের কথায় বলা যেতে পারে, কবি এখানে Realistও নন, Idealistও নন, তিনি এক অসাধারণ ক্ষমতায় সত্যদ্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ এবং ছোটগল্পের অন্যান্য বই থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা অল্প কয়েকটিকে পাঠকদের সাম্‌নে দাঁড় করাচ্ছি—খোকা বাবু গল্পের রাইচরণ, পোষ্টমাষ্টার গল্পের রতন আর তাঁর শেষ বয়সের হৈমন্তী। এইসব নায়ক-নায়িকার প্রতি একটুখানি সহানুভূতি আকর্ষণ করাই কবির সব সাধ নয়। তিনি এদের সব স্থূলতা, মূর্খতা, অক্ষমতা আত্মার জ্যোতিতে অম্লান ক'রে তুলেছেন।

সোনার তরীতে রবীন্দ্রপ্রতিভা যেন বান ডাকতে চাচ্ছে। এখানে এক মহা-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কবিহৃদয় আমাদের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত—ভাব, ছন্দ, সমগ্রের ধারণা সমস্তই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। আর তাঁর বিপুল সৌন্দর্য্যানুভূতি সমুদ্র-ফেনার মতনই এক দিগন্তবিস্তৃত স্বপ্নমাধুরী রচনা করেছে। কিন্তু সৃষ্টি-হিসাবে সোনার তরীর খুব বেশী কবিতা অনবদ্য নয়। কবি চোখে লেগে রয়েছে সৌন্দর্য্যের কেমন-এক স্বপ্নাবেশ; তাই এখনকা বিশালতর গভীরতর কবিপ্রতিভার যে সৃষ্টি-মাহাত্ম্য লাভ করা উচি ছিল, তা কিছু বিলম্বিত হয়েছে। সোনার তরীর মানস-সুন্দরী কবিতাটি কি অদ্ভুত সৌন্দর্য্যপূজা। কিন্তু এই পূজায়ও লেগে রয়েছে রবীন্দ্রনাথে সেই প্রকৃতিগত রহস্যের সন্ধান।

এর "বৈষ্ণব কবিতা"য় কবি তাঁর কথাটি কত স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন আগে "আকাশের চাঁদ" কবিতাটি যে আমরা আংশিক উদ্ধৃত করেছি তা'র চাইতে এর প্রকাশ-ভঙ্গিমা অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। দেশে প্রচলিত মতবিশ্বাসের মোহ কবি কতটা এড়িয়ে উঠেছেন তা'রও স্প পরিচয় এতে রয়েছে।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা.........
..........একি শুধু দেবতার?

..........আমাদেরই কুটীর-কাননে
ফোটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন-তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

সোনার তরীর "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি বাস্তবিকই এক অপরূপ সৃষ্টি। সমস্ত "সোনার তরী" কাব্যখানির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এটি।

"মানসী"তে দেখেছি কবি নিষ্ঠুর সৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু জগতের কাঁচা কোমল প্রাণের সঙ্গে তা'র যে চিরসংগ্রাম তা'র ফলাফল কি, সে-কথাটি তাঁর দৃষ্টিতে তেমন ফু'টে ওঠেনি। এই "যেতে নাহি দিব" কবিতায় সেটি অপরূপ সৃষ্টিতে বিকশিত হ'য়ে উঠেছে।

* * *

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চ'লে যায়।

* * *

............তবু প্রেম বলে'
"সত্যভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্ব্বকথা!

মৃত্যু হাসে বসি'। মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চিরকম্পমান। * *

মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি' দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো!

ভাষার শাণিত দীপ্তিতে, সবল ছন্দোগতিতে দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা ও অব্যর্থতায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির যে এটি অন্যতম, সে-সম্বন্ধে কেউ ভিন্নমত পোষণ করবেন কি না জানিনে। সোনার তরীর "পুরস্কার" কবিতাটির অনেক জায়গায় কবি নিজের কথা এমন চমৎকার ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন, ছোটোখাটো সত্য এমন পূর্ণভাবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে যে, তা'রই জন্য এ-কবিতাটি চিরকাল পাঠকের হৃদয়রঞ্জন করবে। এর বাণী-বন্দনাটি কত সুন্দর। কবি-প্রতিভার ভিতরে কি-একটি নির্লিপ্ততা বা আত্মসম্পূর্ণতা আছে, যার গুণে কবি স্রষ্টা; তা'র কি চমৎকার বর্ণনা কবি দিয়েছেন—

কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে নিমেষে মিলায়,
বালুকার পরে কালের বেলায়
ছায়া-আলোকের খেলা!
জগতের যত রাজা-মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তা'রা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখদুখ লাজ
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।
তা'র মাঝে শুধু ধ্বনিতেছে সুর,
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়-তরণী,
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,
সংসার-কোলাহল।

* * *

বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী,
বারেকের তরে ভুলাও জননী,
কে বড় কে ছোটো কে দীন কে ধনী
কেবা আগে কেবা পিছে,

* * *

তুমি মানসের মাঝখানে আসি'
দাঁড়াও মধুর মূরতি বিকাশি',
কুন্দবরণ সুন্দর হাসি
বীণাহাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবি শশি তারা,
সারি-সারি যত মানবের ধারা
অনাদি কালের পান্থ যাহারা
তব সঙ্গীত স্রোতে।
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি' কেশজাল
নাচে দশদিক্ হ'তে।

জগতের কি কাজে লাগতে কবির সাধ যায় সে-সম্বন্ধে কবি বাণীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন

লক্ষযুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।
এ-ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ-প্রতিবাদ,

* * *

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণ-মন খুলি
পুষ্পের মতো সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশ-ভালে

অন্তর হতে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীত-রসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে

* * *

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন করিয়া দিব।
সংসার-মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাবো করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তা'র পর ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহ-সুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে-অধরে,
আরেকটু মধু দিয়ে যাবো ভ'রে
আরেকটু স্নেহ শিশু-মুখপরে
শিশিরের মতো র'বে।

রবীন্দ্রনাথের নিছক সৌন্দর্য্য-পূজার নিশ্চয় এ এক অসাধারণ সার্থকতা। তাঁর নিছক সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সামনেই মূর্ত্তি ধ'রে উঠেছে; কেমন

সরল অথচ গভীর সত্য। কবি এখানে মানুষের ছোটোখাটো কাজে লাগ্‌তে চেয়েছেন। বাস্তবিক, একহিসাবে কাব্য মানুষের জীবনের এমন ছোটোখাটো কাজেই লাগে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় সামান্য কাজ, মানুষের জীবনের জন্য তা যে সত্যই কি অসামান্য তা কি বলবার দরকার করে?

সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' কবিতাটি সুবিখ্যাত। চিরশ্যাম ধরণীর নিগূঢ় প্রাণরস কবির চিত্তকে বিভোর ক'রে তুলেছে। কবি আবেগভরে বলছেন—

ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,
দিগ্‌বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো......
............হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া, সচকিয়া, আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চ'লে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হ'তে প্রান্তভাগে;

এ কবিতাটিতে বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য 'বিশ্বপ্রকৃতির" সঙ্গে কবির পরম নিবিড় যোগ। মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর যেটুকু সহানুভূতি জন্মেছে, তা "আঘাত সংঘাত"-পূর্ণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তেমন নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যতখানি অবিচ্ছেদে যুক্ত তা'রই সঙ্গে। সেই আঘাত সংঘাতপূর্ণ বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে তাঁকে দণ্ডায়মান দেখতে পাই এর পরে 'চিত্রা' কাব্যে।

সোনার তরীর শেষের কবিতায় দিগন্তবিস্তৃত সৌন্দর্য্যসাগরের বুকে কবির যে নিরুদ্দেশ যাত্রা অদ্ভুত তা'র সৌন্দর্য্য।

বলো দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি
অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার,
ঊর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে?
তুমি হাসো শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।

এই নিরুদ্দেশ যাত্রাকে নিছক নিরুদ্দেশ যাত্রা কল্পনা ক'রে কাব্যরসিক আনন্দ পেতে পারেন; আবার কারো-কারো মনে হ'তে পারে, এই অপরিচিতার নয়নে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার দ্যুতি।

মোটের উপর সোনার তরীর ভাব আনন্দময় স্রষ্টার ভাব, কিছু বেশী সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাও তা'তে আছে। কিন্তু শুধু এই-ই নয়। এই সৃষ্টির আনন্দ আর পরম সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় দেখ্‌ছি, কি-এক গভীরতার জন্য কবির আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। "সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় কবি অনুভব করছেন—

.........মানব-হৃদয়সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে-পলে
আপনি সে নাহি জানে, শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তা'রে,.........
জননী যেমন জানে, জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে। স্তনে যবে দুগ্ধ ওঠে পূ'রে।
প্রাণভরা ভাষাহারা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমাপানে; তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে
আমার এ-মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গ-মাঝখানে
কোলের শিশুর মতো।......

'ঝুলন' কবিতাটিতে কবির চিত্ত যে বিষম দোল খাচ্ছে, সে শুধু খেয়ালের দোল নয়।

দে দোল দোল।
দে দোল দোল।
এ মহা সাগরে তুফান তোল।
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয়-রোল।
বক্ষ শোণিতে উঠেছে আবার
কি হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কি কল্লোল!

কবি নিজের হৃদয়যমুনায় এমন-এক অতলস্পর্শ গভীরতা অনুভব করছেন যার অজানা নাম তিনি দিয়েছেন মরণ।

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

আর কবি নিজে তাঁর 'আমার ধর্ম্ম' প্রবন্ধে বলেছেন "বড়-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগ্‌ল, অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁ'ড়ে বাহিরের আকাশে দেখা দিলে, তা'রই উপক্রম দেখি, সোনার তরীর বিশ্বনৃত্যে।"

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

চিত্রা

এর পর চিত্রাতে দেখি সৃষ্টির আনন্দ আর বাঁশির ব্যথা যুগপৎ কবির সৃষ্টিতে চলেছে। "সুখ" কবিতায় তিনি বলছেন—


শিব
শিল্পী শ্রী শান্তা দেবী

আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা, মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল, কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মতো, শিশু আননের
হাসির মতন ....

কিন্তু সন্ধ্যায়' কবি ব'সে-ব'সে ভাবছেন—

ক্রমে ঘনতর হ'য়ে নামে অন্ধকার
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হ'তে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্য পানে আরো কোথা?" আরো কতদূর?

একদিকে কবির মোহন তুলিকাস্পর্শে উর্ব্বশী জেগে উঠেছে—

যুগ-যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিদিকে
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল অঞ্চলা
বিদ্যুৎ চঞ্চলা।

আর একদিকে এবার ফিরাও মোরে কবিতায় যাঁর চেহারা কবির সামনে আসছে তাঁর সৌন্দর্য্য উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য নয়—

মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম-জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি' রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
.... শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
. ...সহিয়াছে অগ্নিভারে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
সর্ব্ব প্রিয় বস্তু তা'র অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চির জন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন,—

অজিত-বাবু যে বলেছেন সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালির মাধুর্য্য-সম্পন্ন জীবনের সঙ্গে কথা কল্পনা ক্ষণিকা প্রভৃতি পরবর্ত্তী কাব্যের জীবনের যে বিচ্ছেদ সেটি এমন গুরুতর যে এ দুটি দুজন স্বতন্ত্র লেখকের জীবন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, একথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা বরং দেখতে পাচ্ছি, কল্পনার সম্মুখে একই-সঙ্গে আনন্দ আর ব্যথার উচ্ছ্বাসে 'চিত্রা' বিচিত্র হ'য়ে দেখা দিয়েছে। সোনার তরীর নিবিড় সৌন্দর্য্য উপভোগের মধ্যেও যে এর আভাস বিদ্যমান তাও আমরা দেখেছি।

আর রবীন্দ্র প্রতিভার পক্ষে এটি খুবই স্বাভাবিক। অনুভূতি যাঁর এত তীব্র, আর স্বভাবতই সন্ধান যাঁর ভিতরে এমন অপ্রতিহত, নানা পরস্পরবিরোধী ভাবও তাঁর ভিতরে ওতপ্রোত হ'য়ে থাকতে বাধ্য।

সোনার তরীতে দেখেছি রবীন্দ্রপ্রতিভার বান ডাকবার উপক্রম হয়েছে। চিত্রাতে দেখছি সত্যই সে-বান ডেকেছে। তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য্য যেন সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সুরসভাতলে উর্ব্বশীর নৃত্যের মতনই কি যে তা'র সৌন্দর্য্য তার পুরোপুরি বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

চিত্রায় একজাতীয় কবিতা স্থান পায়নি। আরো দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা এতে আছে। নিছক সৌন্দর্য্য পূজা হিসাবে চিত্রা' সুখ' অতি চমৎকার কবিতা। সুখ' কবিতায় সহজ সরল সুখ কবির ছন্দে কি সহজ সরল অথচ সবলভাবে ফুটে উঠেছে। জ্যোৎস্না রাত্রে কবিতায় কবি কেমন এক তৃষ্ণায় কাতর নিদ্রাহীন। সৌন্দর্য্যের এক দিব্যমূর্ত্তি চাক্ষুষভাবে দেখবার জন্যে কবির মনে যে আকুলতা জেগেছে তা কেমন বিচিত্র হ'য়ে ফুটে উঠেছে। কবির এই রহস্য অভিসারী মনোভাবের সঙ্গে খুব বেশী পাঠকের সহানুভূতি না হ'তে পারে কিন্তু তা'র জন্যে এর শিল্পগৌরব ম্লান হয় না। কবি অধিকারী হ'য়ে কাব্য লেখেন পাঠকের বেলায়ও সেই অধিকারের কথা একেবারে ভুলে গেলে চলবে কেন?

এ সন্ধ্যা' কবিতাটিও চমৎকার সৃষ্টি, কিন্তু সন্ধ্যার সৃষ্টি তত নয় যত কবির প্রতিভার এক সন্ধিক্ষণের সৃষ্টি।—এখানে বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রের মাধুর্য্য থেকে চোখ একটু উঠিয়ে কবি দূরে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রের কত দুঃখ কত মৃত্যুর ছবির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

এর পরই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি। রবীন্দ্র প্রতিভা-নির্ঝরের এ আর এক স্বপ্ন ভঙ্গ। এর কয়েক লাইন উপরে উদ্ধৃত হয়েছে। এ কবিতাটি সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় এটি যে আমাদের প্রাণের বস্তু হবে, এ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্য-হিসাবেও এ অমূল্য। মহাজীবনের জন্য মানুষের আত্মায় মাঝে মাঝে যে ক্রন্দন জাগে তা'র কি অসাধারণ প্রকাশ এতে বর্ত্তমান।

এর কাছাকাছি দাঁড় করানো যেতে পারে পরলোকগত সত্যেন্দ্র-নাথের খৃষ্ট আর মহাত্মা গান্ধী কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য পূজার চরম সার্থকতা উর্ব্বশী। কারো-কারো মতে এটিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের ধারণা কি তা আগেই বলেছি। কিছু ভিন্নধরণের হ'লেও বায়রণের (Byron) সমুদ্র বন্দনের সঙ্গে এই উর্ব্বশী কবিতাটির কিছু সাদৃশ্য আছে। দুয়ের ভিতরেই সমুদ্রের কল্লোল আর তরঙ্গবিক্ষেপ কানে বাজে।*

চিত্রার বিজয়িনী' পূর্ণিমা', স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতিও সুন্দর কবিতা। কিন্তু "ব্রাহ্মণ" পুরাতন ভৃত্য' প্রভৃতি কবিতায় দেখছি, কবি বাস্তবিকই তাঁর সৌন্দর্য্যপূজার অখিল মানসস্বর্গ' ছেড়ে মাটির ধরণীর মহিমার পানে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

'ব্রাহ্মণ" কবিতায় বর্ণনাভঙ্গী আর ছন্দোগতি খুব লক্ষ্যযোগ্য। কবির দৃষ্টি সূর্য্যের আলোর মতন পরিষ্কার অথচ অনাড়ম্বর। ছন্দোগতিতে সত্যকার ব্রাহ্মণেরই সংযমের শুচিতা।

পুরাতন ভৃত্যের মতন চমৎকার সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুচ্ছে আরো করেছেন। এ-কবিতাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য এর অতি অনাড়ম্বর অথচ অতি অব্যর্থ শব্দপ্রয়োগ।

---

* উর্ব্বশীর শেষের দুইটি স্তবক বাদ দিলেই এর শিল্পগৌরব বৃদ্ধি পাবে ব'লে মনে হয়।

শু'নে মহা রেগে ছু'টে যাই বেগে
আনি তা'র টিকি ধ'রে—
বলি তা'রে, "পাজি, বেরো তুই আজি,
দূর ক'রে দিনু তোরে।"
ধীরে চ'লে যায়, ভাবি, গেল দায় ;—
পরদিন উঠে দেখি
হু কাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে
ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ,
অতি অকাতরচিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তা'রে,
মোর পুরাতন ভৃত্য।

"ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি" কথাটার গায়ে কি অমৃত মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অজিত-বাবু যে বলেছেন চিত্রাতে আর চৈতালিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে খুব বড়-একটা সম্পূর্ণতা লাভ হয়েছে, সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। চৈতালির সনেটগুলো বেশী প্রশংসাযোগ্য এইজন্যে যে, এর অনেকগুলোতে গভীর জ্ঞান অতি অল্পকথায় চমৎকারভাবে ফু'টে উঠেছে। কবির মানস-প্রকৃতি যে এখন কত সবল, তা'র পর্য্যাপ্ত পরিচয় রয়েছে এই চৈতালির সনেটগুলোর ভিতরে।

এইবার চিত্রার 'অন্তর্য্যামী,' 'জীবন-দেবতা' প্রভৃতি সুবিখ্যাত কবিতা-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার সময় এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা'কে নিয়ে তাঁর সমালোচকেরা যথেষ্ট গোলমালে প'ড়ে গেছেন। আমাদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটি অত গোলমেলে ব'লে মনে হয় না। আমরা সোজা কথায় বলতে চাই, রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার অর্থ—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। অবশ্য প্রতিভা বল্লেই যে কথাটি খুবই পরিষ্কার ক'রে বলা হ'ল, তা নয়। তবে, এ-কথাটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত ; আর আমাদের সবারই অল্পবিস্তর জানা আছে যে 'অপূর্ব্ব', 'অপরূপ', 'নবনবোন্মেষশালিনী', এইসমস্ত হচ্ছে এর বিশেষণ।

ইতিহাসে দেখা যায় প্রতিভাবানেরা প্রায়ই নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি-সম্বন্ধে সজাগ। সর্ব্বসাধারণের ভিড়ে তাঁরা যে বেমালুম খাপ খেয়ে যেতে পারেন না, এ-কথাটি নিজের মনে তাঁরা ভালো-রকমই জানেন, আর নিজেদের অন্তর্নিহিত এই সত্তাকে তাঁরা পরম যত্নেই লালন করেন। 'মানসী'তে তা'র কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। (নিন্দুকের প্রতি, পরিত্যক্ত, ইত্যাদি)। তাই আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরে-শায়িত এই অসাধারণত্বকে পরম যত্নে আর পরম বেদনায় বহন ক'রে আস্তে-আস্তে শেষে পূর্ণ যৌবনে অনেকটা পুরোপুরি দেখতে পেয়েছেন, কি তা'র স্বরূপ।

একি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা-কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?

*

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছু'টে চ'লে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।
যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এসেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

মানুষের ধর্ম্ম,সভ্যতা,বিজ্ঞান,ইতিহাস সবকিছুই এক অদ্ভুত অনুসন্ধান, —অন্ধের মতন মানুষ হাৎড়িয়ে-হাৎড়িয়ে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে চলেছে এক পথ থেকে অন্য পথে, লক্ষ্য থেকে লক্ষ্যান্তরে। বিশ্বমানবের সেই পরম রহস্যপূর্ণ বিরাট্ অনুসন্ধিৎসা এমন অল্পপরিসরে এই এশিয়ার এক-কোণের কবির অন্তরে কেমন ক'রে সজীবতা লাভ করতে পারলে, সেই তত্ত্বকে উদ্ঘাটিত করতে পারি এমন ক্ষমতা আমাদের নেই। রবীন্দ্র-নাথকে যে বিশ্ব-কবি * অর্থাৎ বিশ্বভাবের কবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা'র একতিলও অতিরঞ্জন নয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

কল্পনা

চিত্রা ও চৈতালিতে কবিপ্রতিভার এক পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের পর কল্পনাতে দেখি—কবির নূতন চেহারা। এমন-এক অবস্থায় দ্বার-দেশে কবি এসে দাঁড়িয়েছেন যার পুরো পরিচয় তিনি অবগত নন ; কিন্তু পিছনে-ফে'লে-আসা ঐশ্বর্য্যের পানে চেয়ে আর তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন না।

তাঁর এই অবস্থার ছবিটি কত সুন্দরভাবে ফু'টে রয়েছে কল্পনার প্রথম কবিতাটিতে।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দমন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন অন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

এই কল্পনা-কাব্যখানিও যে কল্পনার সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়ে পাঠ না করা যায় তা নয় ; তবে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা এর ভিতরকার সাধক-হৃদয়টির খবর একটু বেশী না নিয়ে পারেন না। তা-ছাড়া কবির যাঁরা সমসাময়িক তাঁদের কাছে সাধক-রবীন্দ্রনাথের গৌরব কবি-রবীন্দ্রনাথের গৌরবের চাইতে একটুও কম নয় ; কেননা, দুইই সমানভাবে তাঁদের কাছে জীবিত। তাই এই দ্বিতীয়পর্য্যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রম একটু বুঝতে আমরা চেষ্টা করব।

প্রথম কবিতাটি আংশিক উদ্ধৃত হয়েছে। এর 'ভ্রষ্টলগ্ন" কবিতাটি অতি বিখ্যাত। যে বিফল প্রতীক্ষার ছবি কবি এঁকেছেন, কি-এক শান্ত অথচ নিবিড় বেদনা তা'র অন্তরে অন্তরে।

ফাগুন যামিনী, প্রদীপ জলিছে ঘরে,
দখিন বাতাস মরিছে বুকের পরে।

* বিশ্বকবির অন্য অর্থও আছে। কিন্তু তা'তে কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে হয় না। সত্যকার কবিমাত্রেই বিশ্বকবি।

সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ার-সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর-গেহ
অগুরু-গন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি'।
রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,'
বাতায়ন-তলে রয়েছি ধূলায় নামি'—
ত্রিযামা যামিনী একা ব'সে গান গাহি,
"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি।"

এর "ভিখারী", "বিদায়" প্রভৃতি কবিতায়ও এমনি বেদনার সুর বাজ্‌ছে। কবির জীবন-যন্ত্রে যে নতুন সুর বাঁধা হচ্ছে, এ তা'রই বেদনা।

কিন্তু বেদনা-বোধই এ-কাব্যের শেষ কথা নয়। "অশেষ" কবিতার সব বেদনা সরিয়ে রেখে কবি এক সরল আহ্বান কানে শুনেছেন।

মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হ'ল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে
আবার আহ্বান?

তাঁর সমস্ত অবসাদ চূর্ণ ক'রে তাঁর জীবন-দেবতা বড় নির্ম্মমভাবে তাঁকে সামনে টান্‌ছেন ;—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্ত-লোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চা'স হ'রে
আমার যামিনী?

এ-সব কথার সামনে শুধু কাব্যের সৌন্দর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা আপনা থেকে সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়। যে কবি-কীর্ত্তি নিয়ে কোনো কবিই নিজেকে অগৌরবান্বিত মনে করবেন না, তা'রই শীর্ষে দাঁড়িয়ে ইনি বল্‌ছেন—"শেষে নিতে চা'স হ'রে আমার যামিনী?" বাস্তবিক বার-বার এমন নির্ম্মম আঘাত লাভ করবার সৌভাগ্য কত অল্প লোকের ঘটে!

কিন্তু সবচাইতে লক্ষ্যযোগ্য এর "বর্ষশেষ" কবিতাটি। ঝড়ের বর্ণনা হিসাবেও এ-কবিতাটি সুন্দর; কিন্তু কবির আত্মার যে আগুন এর ভিতরে দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে, কি ছার ঝড়ের সৌন্দর্য্য তা'র কাছে! "এবার ফিরাও মোরে," "অশেষ" প্রভৃতি কবিতায় দেখেছি কবির অন্তরে শায়িত মহাজীবন সচেতন হ'য়ে উঠেছে। এই "বর্ষশেষ" কবিতায় দেখ্‌ছি তাঁর যে দ্বিধা-সঙ্কোচ ও অবসাদটুকু এখনো বাকি আছে, তা যেন ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। যাঁর দর্শনে তাঁর এত দিনের প্রতীক্ষা অসাধারণভাবে সার্থক হয়েছে আশ্চর্য্য তাঁর রূপ! কবি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছেন এইভাবে :—

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস-ভ্রংশ করি' চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি' বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেম্‌নি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।

প্রত্যেকটি বিশেষণ, প্রায় প্রত্যেকটি শব্দ এখানে যে নতুন-নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে, অভিধানে তা'র কতটুকু পাওয়া যায়। "অনুভব" যে না করতে চায়, সেই বা তা'র কতটুকু গ্রহণ করতে পারে!

কিন্তু আশ্চর্য্য এর শক্তি! একবারে বজ্র-হৃদয় ভিন্ন হয়ত এ-কথাগুলো আর-কারো কাছ থেকেই ব্যর্থ হ'য়ে ফি'রে যাবে না।

শেলির Ode to West Wind-এর সঙ্গে এই কবিতাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। দুই কবিতায়ই ঝড় প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। কিন্তু শেলি ঝড়কে বলেছেন—

"Be through my lips to unawaken'd earth
The trumpet of a prophecy!"

আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

লাভ-ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড-খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

* * * * *

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্দ্ধে ল'য়ে যাও
পঙ্ক-কুণ্ড হ'তে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

"বর্ষশেষ," "বৈশাখ" প্রভৃতি কবিতায় মহাজীবনের "তপঃক্লিষ্ট" সুষমা চোখ ভ'রে দে'খে নেবার পর কবির ভবিষ্যৎ তাঁর চোখে কি চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে "রাত্রি" কবিতাটিতে তা'র ইঙ্গিত রয়েছে।

তোমার তিমির তলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে-জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তা'র ধ্বজচক্রহীন
নীরব-ঘর্ঘর মহারথে।

বড় চমৎকার ধ্যান-গম্ভীর মূর্ত্তি কবির মনে জেগে উঠ্‌ছে

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্দ্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি'
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হ'তে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি' মহাযোগী করুণাকাতর
চকিতে বিদ্যুৎ-রেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তি-পথ।

তাঁর কল্পনাও কত মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে! এই রাত্রিকেই তিনি বলেছেন—

নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তি-সিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ।

বাস্তবিক রবীন্দ্র-প্রতিভার এই-এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমরা উপলব্ধি করি যে, তিনি নিজের চেতনা দিয়ে সর্ব্বমানবের পরম পুণ্য চেতনার সঙ্গেও আত্মীয়তা করবার, আর তাঁর উদার কণ্ঠে সে-সব প্রকাশ করবার এক অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। অবশ্য কবিপ্রতিভার অর্থই কতকটা তাই. বিশেষ ক'রে গীতি-কবি-প্রতিভায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেই গীতি-কবি-প্রতিভারও এক পরম অসাধারণ বিকাশই দেখ্‌তে

পাই। নবীন প্রেমিক-প্রেমিকার আশা-সুখ-ব্যথা নিবিড় হ'য়েই যাঁর বাঁশীতে এককালে বেজেছিল, তিনিই এখন বাজাচ্ছেন মহাযোগীর পরম নিগূঢ় বেদনার সুর! তবে এইই তাঁর বাঁশীর শেষ সুর নয়!

রবীন্দ্রনাথ যে কবি-শেখরের মুখে নিজের রচনা-সম্বন্ধে বলেছেন, "আমার এসব জিনিষ বাঁশির মতো—বুঝ্‌বার জন্তে নয়, বাজ্‌বার জন্তে," তাঁর কাব্য-সম্বন্ধে এর চাইতে সুন্দর বর্ণনা আর দেওয়া যায় না। বুঝ্‌বার কথা নিশ্চয়ই তাঁর কাব্যে ঢের আছে; কিন্তু সব বোঝা, সব জ্ঞান, আনন্দ, বিষাদ, প্রেম, নৈরাশ্য, সাধনা,—এ-সমস্তের অতি ক্ষুদ্রতম কথাও তাঁর কাব্যে কেমন বাঁশির সুরের নিবিড়তা আর অব্যর্থতা নিয়েই বাজে! "ক্ষণিকার" সময় থেকে তাঁর এ-ক্ষমতায় যে অপূর্ব্বতা জেগেছে, এক হাফেজ ছাড়া আর কোনো গীতি-কবির ভিতরে সেটি প্রত্যক্ষ কর্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

রাজা

শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

(১)

একটা জনম নাইবা পেলাম তোমার দেহের কোমল পরশ,
নাইবা পেলাম গেহের মাঝে তোমার হাসির বিপুল হরষ!
মিলন-সাঁঝের বাসর-মাঝে,
দুঃখ-সুখের লক্ষ কাজে
নাইবা পেলাম বক্ষে তোমার সুনীল আঁচল সোহাগ-সরস!
পল্লী-পথের সন্ধ্যা-উষায় নাইবা পেলাম তোমার দরশ!

(২)

একটা জনম থাক্ না রাণি! থাকো তুমি স্বপন-পুরেই,
চক্রবালের ছবির মতো থাকো এবার ওই সুদূরেই!
অচিন্ দেশের কুঞ্জ-ছায়ে
প্রহেলিকার বুক ছাপায়ে
থাকো এবার প্রাণের তলায় আমার ভাবের রাজ্য জু'ড়েই!
অরূপ-রূপে ছড়িয়ে থাকো বিশ্ব-ছাওয়া হাওয়ার সুরেই!

(৩)

থাক্ না রাণি, একটা জনম বরণ-ডালার ফুলের মালা!
থাকুক্ এবার মোহন আঁখির দৃষ্টি-মায়ার পীযূষ ঢালা,
গন্ধে মাতাল ফাগুন-রাতি,
আলিঙ্গনের মাতামাতি
থাক্ না এবার শারদ রাকা, মদির-মাখা নাট্য-শালা!
এবার থাকুক্ নিশীথ জাগা পাগল-করা চুমুর পালা!

(৪)

একটা জনম থাকো রাণি নিদেশ-হারা মানস-লোকেই!
পথের দিকে চেয়েই-চেয়েই থাকো এবার সজল-চোখেই!
নীলকমলের দলে-দলে
ঘুমিয়ে থাকো অথই জলে,
একটা জনম পরে আবার জাগ্‌বে ভানুর লাল আলোকেই!
গোপন কোষের মধুর মতো থাকো এবার প্রাণ-কোরকেই!

(৫)

একটা জনম তোমায় পাবার আজকে আমার নেই অবকাশ!
মর্ম্মতলে ডাক দিয়ে যায় ঐ যে কাদের দীর্ঘ-নিশাস!
ধরার বিকল দেহের পরে
আসন পাতা সবার ঘরে,
আজকে সেথায় কর্‌তে হবে সত্য আমার রাজার প্রকাশ!
একটা জনম তোমায় ভু'লে কর্‌ব কাজের হিসাব-নিকাশ!

(৬)

আঁখির জলেই হবে এবার অভিষেকের শান্তি-সিনান,
লক্ষ বুকের জীর্ণ বসন নিশান হ'য়ে ভর্‌বে বিমান!
হাহাকারের গভীর বাণী
জয়ধ্বনি তুল্‌বে রাণি!
তোমায় ছেড়ে তা'তেই এবার বুঝ্‌তে হবে মান-অপমান!
মানুষ-বনের ব্যথার ভ্রাণেই উঠ্‌বে মেতে এবার এ প্রাণ!

(৭)

হাতছানিতে ডাক দিয়ে যায় ঐ যে কা'রা পথের ধূলায়,—
হুহু-স্বরে গুম্‌রে ওঠে শ্মশান-জোড়া বহ্নি-চুলায়;
শুষ্ক নদীর কূলে-কূলে
ওই যে কা'রা কাঁদন তু'লে
ঝঞ্ঝাহত তালের বনে ব্যস্ত-ব্যাকুল হস্ত দুলায়!
তপ্তবালুর মরীচিকায় সকল গানের ছন্দ ভুলায়!

(৮)

ওই যে কা'রা চল্‌ছে ছুটে লক্ষ্য-হারা গহন বনে,
ফণীর মালা জড়িয়ে নিয়ে জর্জ্জরিত পায়ের সনে!
বিহঙ্গেরা শুষ্ক নীড়ে
উঠ্‌ছে কেঁপে চম্‌কে ফি'রে;
'হায়রে এক মরণ খেলা'! ভাব্‌ছে ব'সে আকুলমনে!
বনের লতা নিবিড় ভয়ে নেতিয়ে পড়ে একটি কোণে!

(৯)

এবার আমায় আন্‌তে হবে মৃত্যুপারের জীবন-আসার,
শাঙন হ'য়ে ঝর্‌তে হবে আর্ত্তবুকে ঘোর পিপাসার!
আমার বুকের রক্ত ঝরি'
অযুত নির্ঝর পূর্ণ করি'
লাল ক'রে আজ দেবে রাণি বিষাক্ত ঐ নীল পারাবার!
এবার আমায় গাইতে হবে প্রাণের গীতি নতুন ভাষার!

(১০)

ঐ যে কা'রা রুদ্ধনিশাস ডুক্‌রে কাঁদে অন্ধকারে,
আছাড় খেয়ে পড়্‌ছে অচল অশ্রু-পিছল পথের ধারে,
বাতাস হ'য়ে আলোক হ'য়ে
সঞ্জীবনী প্রলেপ ল'য়ে
আজকে আমায় যেতেই হবে মুখ্‌ড়ে পড়া ঐ কাতারে!
রুদ্র নাচন তুল্‌তে হবে জরার অবশ শীর্ণ হাড়ে!

(১১)

ঐ যে কাদের বুকের পরে হিমালয়ের পাষাণ-চাপে,
চণ্ডরাজের দণ্ডনীতি হুম্‌কি ছাড়ে দারুণ দাপে;
গোত্রভিদের বজ্রহাতে
আজকে আমার দিবস-রাতে
কাটতে হবে অত্যাচারের পাহাড়-প্রমাণ বিশাল পাপে!
আশীষরূপে ঝর্‌তে হবে অমঙ্গলের অভিশাপে!

(১২)

একটা জনম কাটবে আমার বর্ষাবাদল নিদাঘ-রোদেই,
হয়ত যাবে অনেক বরষ রণ-অভিযান-অবরোধেই;
তোরণ-দ্বারে রক্ষীরূপে
হয়ত শবের স্তূপে-স্তূপে
কাটবে নিশা দানবদলন রুধির-ভেজা জয়ের বোধেই!
এবার জনম কাটবে আমার ক্ষুব্ধ প্রাণের প্রতিশোধেই!

(১৩)

একটা জনম পরে রাণি তোমার কোলে মুখ লুকিয়ে
কেঁদে-কেঁদে বল্‌ব আমি মানুষ হওয়ার ব্যথা কি এ!
হাত এড়িয়ে মৃত্যুজরার
তোমায় নিয়ে খেলা করার
সময় হেথা নয় যে সুলভ যুগদেবতায় ফাঁকি দিয়ে!
অভিসারের নেই অবসর জাতিকুলের ঋণ চুকিয়ে!

(১৪)

থাকুক্ তবে, থাকুক্ এবার, রাণি, তোমার বাহুর বাঁধন!
বিজন বনেই সাজ করো তরুণ তনুর ফুলপ্রসাধন!
আকুল বুকে বসন ঝাঁপি'
শিথিল বেণী রাখো চাপি'
আপনমনেই গান গেয়ে যাও বিধুর মনের সব আবেদন!
শূন্য গেহের বুক ভ'রে দাও একাকিনীর গভীর মাতন!

(১৫)

দুঃখ কিসের রাণি আমার! একটা জনম নাইবা এলে,
কল্পলোকের দূর অলকায় সঙ্গোপনে র'য়েই গেলে!
মনে করো ক্ষীরোদ-মথন
হয়নি আজো, পাইনি রতন,
লক্ষ্মী তুমি র'য়েই গেছ অতল-তলে আঁচল মেলে!
একটা জনম নাইবা হেথায় সুধার কলস দিলেই ঢেলে!

প্লেটোর আদর্শবাদ*

শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ

প্লেটোর 'এইডস্'-বাদ একটি বিখ্যাত মত। গ্রন্থকার ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 'স্ফোটবাদ'। আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, এই নাম ব্যবহার করা আপত্তিজনক। রূপ বাদ, পরম রূপ-বাদ, পরাকৃতি-বাদ, আদর্শ-বাদ, আদর্শ রূপ-বাদ প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা যাইতে পারে। আবশ্যক-মত আমরা 'এইডস্'-বাদ বা 'এইডে'-বাদও ব্যবহার করিব।

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জানা আবশ্যক প্লেটোর পূর্ব্বে গ্রীক সাহিত্যাদিতে এই শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত। Jowett এর Republic নামক গ্রন্থে এ-বিষয়ের আলোচনা আছে (Vol ii, পৃঃ ২৯৪—৩০৫)। Taylor তাঁহার Varia Socratica নামক গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্রাদি হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্লেটো চিকিৎসা শাস্ত্র এবং বিশেষভাবে গণিত শাস্ত্র হইতে এই শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে এই শব্দের অর্থ ছিল দেহ, বাহ্য আকৃতি। তাহার পরে বস্তুর প্রকৃত রূপকে অর্থাৎ বস্তুর বস্তুত্বকে ("real essence") 'এইডস্' নাম দেওয়া হইয়াছিল।

বহু বস্তুর মধ্যে একটি সাধারণ ভাব দেখা যায়। এই সাধারণ ভাব দেখিয়া বস্তুসমূহকে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখিয়া বলা হয় এই পশুগুলি 'অশ্ব'; আর কতকগুলি সাধারণ গুণ দেখিয়া বলা হয় এই পশুগুলি 'গো'। অন্যান্য বিষয়েও এইপ্রকার। বিশেষ-বিশেষ সাধারণ ভাব দেখিয়া বলা হয় ইহার নাম 'সাহস', ইহার নাম 'সংযম' ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন প্লেটো প্রথমে এই জাতি বা সাধারণত্ব অর্থেই 'এইডস্' শব্দ ব্যবহার করিতেন। তাহার পরে এই সাধারণত্বকে বস্তু-সমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া ইহাকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন।

Taylor (টেলার) বলেন একথা ঠিক নহে; প্লেটোর মতে ইহার মৌলিক অর্থ "real essence" অর্থাৎ phusis (প্‌হুসিস্, ফুসিস্)। বাঙ্গালায় ইহার অর্থ হয় বস্তুর 'বস্তুত্ব', বস্তুর স্বরূপ। তত্ত্ব শব্দও ব্যবহার করা যাইতে পারে; তত্ত্ব=তৎ+ত্ব, অর্থাৎ 'তাহার ভাব' তাহার বিশেষত্ব, "that-ness"।

এখন দেখা যাউক প্লেটো নিজে কি বলেন। অনেকে প্লেটোর বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে উক্তি সংগ্রহ করিয়া এক একটি মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ উপায় প্রকৃষ্ট উপায় নহে। যৌবনকালের মত আর বৃদ্ধ বয়সের মত যে একই হইবে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। সেইজন্য আমরা প্লেটোর ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকে পৃথক্ পৃথক্-ভাবে আলোচনা করিব।

প্লেটো কোন্ বয়সে কোন্ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমরা Lutoslawski র মত গ্রহণ করিলাম এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত ক্রম অনুসারেই প্লেটোর গ্রন্থের আলোচনা করিব। যে-সমুদায় গ্রন্থে 'এইডস্'-বাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই সমুদায় গ্রন্থের প্রধান-প্রধান অংশ আলোচিত হইবে। ইহার পরে আমরা গ্রন্থকারের মতামতের সমালোচনা করিব।

(১) এউথুফ্রোন্

'এউথুফ্রোন্' নামক গ্রন্থের একটি আলোচ্য বিষয় পুণ্য (হসিঅন্)। সোক্রাটেসের প্রশ্ন পুণ্য কি? এউথুফ্রোন্ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সোক্রাটেস্ জানিতে চাহিয়াছিলেন—পুণ্যের বিশেষত্ব কি? বহু ঘটনায় পুণ্য প্রকাশ পায়। এইসমুদায় ঘটনার মধ্যে এমন কি সাধারণ ভাব (eidos) আছে যাহার জন্য এই সমুদায়কে পুণ্য বলা হয় (৬ ডি)। এইস্থলে 'এইডস্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার অর্থ সাধারণ ভাব, লক্ষণ, বিশেষত্ব, স্বরূপ ইত্যাদি (Burnet, Watt and Mills, Graves, Wells প্রভৃতির টীকা দ্রষ্টব্য)। ঠিক ইহার পরেই আছে 'ইডেআ' (idea) শব্দ। উভয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য (Graves, পৃঃ ১২৭, Burnet পৃঃ ৬৫ ইত্যাদি)। এস্থলে সে পার্থক্য অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

ঠিক ইহার পরেই সোক্রাটেস্ এউথুফ্রোন্‌কে বলিতেছেন—"তাহা হইলে সেই স্বরূপটি কি আমাকে তাহা বুঝাইয়া বল যাহাতে আমি সেইটিকে নয়ন পথে রাখিয়া [=apo—blepōn] এবং মানদণ্ডরূপে [=paradeigmati] ব্যবহার করিয়া বলিতে পারি যে, তুমি বা অপরে যেসকল কার্য্য করিতেছ তন্মধ্যে যাহা ইহার অনুরূপ তাহা পুণ্য, যাহা ইহার অনুরূপ নহে, তাহা পুণ্য নহে (গ্রন্থকারের অনুবাদ, গ্রীক কথা দুইটি আমাদের সংযোজনা, 6E)।

এস্থলে দুইটি শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। একটি 'পারাডেইগ্‌মা' শব্দের ব্যবহার। ইহার অর্থ আদর্শ বা মানদণ্ড; এই আদর্শ দ্বারা অপর বিষয়ের বিচার করা যায়। দ্বিতীয় কথাটা apo-blepo (আপো-ব্লেপো) ক্রিয়া। ইহার অর্থ অপর সমুদায় বিষয় হইতে (apo) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে দৃষ্টি স্থাপন করা (blepo)। এস্থলে অর্থ এই—গৌণ লক্ষণ হইতে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া মৌলিক লক্ষণের প্রতি অর্থাৎ সাধারণ ভাবের প্রতি ('এইডস্' এর প্রতি) দৃষ্টি স্থাপন করা। Graves এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—চিত্রকর যেমন চিত্রপট হইতে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করে সেইভাবে এস্থলে দৃষ্টি স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। পৃঃ ৬৮।

মেনোন (৭২, সি), গার্গিআস্ (৫০৩,ই) সাধারণ-তন্ত্র (৫৭১, বি) প্রভৃতি স্থানেও অনুরূপ ব্যবহার আছে।

এউথুফ্রোন্ গ্রন্থে বলা হইল যে, বহু বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে যে 'সাধারণত্ব' আছে তাহাই ইহাদিগের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব বা 'এইডস্'কে আদর্শরূপে সতত নয়নপথে রাখিয়া এবং মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া ভালমন্দ বিচার করা যায়।

---

* সোক্রাটিস্ ২য় খণ্ড; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ২৯+৮৩১; মূল্য দশ টাকা।

এই পুস্তকে 'এইডস্'-বাদের তিনটি বিশেষ শব্দ আছে। (১) এইডস্, (২) ইডেয়া (idea), (৩) পারাডেইগ্‌মা (paradeigma)। Adam বলেন, উত্তরকালে প্লেটো যে অর্থে এই কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এ স্থলে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাঁহার মতে এ গ্রন্থ রচনার সময়ে 'এইডস্'-বাদের জন্মই হয় নাই (as yet unborn, উক্তগ্রন্থের টীকা, পৃঃ ৬৫)। কিন্তু Stewart (Plato's Ideas, পৃঃ ১৭) এবং Burnet (এই গ্রন্থের টীকায়, পৃঃ ৩১) বলেন উত্তর কালে যে অর্থে এ সমুদায় ব্যবহৃত হইয়াছে এস্থলেও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মতভেদ যতই থাকুক না কেন, এ স্থলে ইহাই বলা হইয়াছে যে, বিচার দ্বারা বস্তুর 'এইডস্' নির্ণয় করা যায় এবং এই 'এইডস্' ই বস্তুর স্ব-রূপ বা প্রকৃত রূপ। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বস্তুর প্রকৃতরূপ 'বস্তু গত' ; অপার্থিব লোকে ইহার অবস্থিতি নহে।

২, ৩, ৪, ৫।

ক্রিটান্, খার্মিডেস (=কার্মিডেস্) লাকৃেস্ এবং প্রোটাগরাস—

এই চারিখানা গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডস্' বাদ আলোচিত হয় নাই। (১) ন্যায়পরায়ণতা, (২) সংযম, (৩) মনুষ্যত্ব এবং (৪) ধর্ম্ম বা সাধুতা এই চারিটি গুণের বিশেষত্ব কি, তাহা এই চারিখানা পুস্তকে যথাক্রমে বিচার করা হইয়াছে। বস্তুর বিশেষত্বই বস্তুর প্রকৃত রূপ এবং বিশেষত্বর জ্ঞানই পরম রূপের জ্ঞান। এই চারিখানা পুস্তকে বস্তু বা গুণসমূহ হইতে ইহাদিগের বিশেষত্বকে পৃথক্ করা হয় নাই। গুণসমূহের মধ্যেই বস্তুর মৌলিক গুণ বিদ্যমান। যেমন, সংযমের নানা-প্রকার লক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু এই সমুদায়ের মধ্যে প্রকৃত লক্ষণ কোন্‌টি ? যাহা প্রকৃত লক্ষণ, তাহাই ইহার বিশেষত্ব, তাহাই ইহার পরম রূপ। বস্তুর পরম রূপ বস্তুগত।

৬। মেনোন্

(ক)

এই গ্রন্থে বস্তু এবং গুণের স্বরূপ (ousia-উসিয়া) বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে (৭২, ও পরে)। প্রথমতঃ মধুমক্ষিকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। মৌমাছি বহু, এবং বহু-প্রকারের ; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে এমন কিছু সাধারণ গুণ রহিয়াছে, যেজন্য ইহাদিগের প্রত্যেককেই মৌমাছি বলা হয় (৭২ বি)। ইহার পরে গুণ বা ধর্ম্মের (arete-আরেটে) কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইল যে, নানা-প্রকার গুণের মধ্যে এমন কিছু সাধারণত্ব (eidos—এইডস্) আছে যেজন্য প্রত্যেককেই 'গুণ' আখ্যা প্রদান করা হয়। (৭২ সি)।

এস্থলে 'সাধারণ ভাব' কে এইডস্ বলা হইয়াছে।

ইহার পরে বলা হইয়াছে যে, এই 'সাধারণ ভাব'টিকেই আদর্শরূপে দৃষ্টিপথে (apo-blepsanta-আপ ব্লেপ্‌সান্টা) রাখিতে হইবে (৭২ সি)।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে 'apo-blepo' ক্রিয়া এই অর্থে আরও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Stewart বলেন (পৃঃ ২৭) এই শব্দের ব্যবহার 'আদর্শবাদ' সূচক paradeigmatic view of the Idea) এবং এস্থলে প্রশ্নোত্তরে যুক্তিমূলক বিচার দ্বারা 'এইডস্' নির্ণয়ের কথা বলা হইয়াছে।

(খ)

এই গ্রন্থের একটি বিশেষ মত 'প্রাক্তন স্মৃতি' বাদ। এই মত হইতে কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে 'এইডস্' বা আদর্শ রূপ একটি বস্তু (thing)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন স্মৃতি কোন বস্তু, বা গুণ, বা ঘটনার স্মৃতি নহে। সোক্রাটেস্ মত ও জ্ঞান এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। বিবিধ ঘটনা দেখিয়া অবিচারিতভাবে যে একটা বিশ্বাস হয় তাহাই মত (৬ ক সা) ; আর যুক্তিতর্ক দ্বারা বিচার করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান (এপিস্‌টেমে, episteme)। প্রত্যেক মনুষ্যই অন্তরে এইপ্রকার জ্ঞানলাভের উপায় লইয়া জন্ম গ্রহণ করে ; জগতে কিছু দেখিলেই অন্তরস্থ আদর্শ দ্বারা এই সমুদায়ের বিচার করিয়া থাকে। 'প্রাক্তন স্মৃতি' এই উপায় এবং আদর্শমূলক। যে উপায়ে এবং যে আদর্শে সত্যনির্ণয় করা যায়, এস্মৃতি তাহারই স্মৃতি। এই গ্রন্থেই এই স্মৃতিকে যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলমূলক (aitias logismos, 98, A) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মেনোন্ গ্রন্থের মতে 'এইডস্' কোন বস্তু (thing) নহে।

৭। এউথ্‌ডেমস্।

এই গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডস্' বাদ ব্যাখ্যাত হয় নাই। তবে ইহাতে (৩০১, এ) লিখিত আছে যে, একসময়ে সোক্রাটেস্‌কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে সুন্দর বস্তু কি বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক্ না অপৃথক্ ? সোক্রাটেস্ উত্তর করিয়াছিলেন, সুন্দর বস্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য নহে, কিন্তু ইহাতে সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান।

বস্তু আছে বহু, তাহাদিগের মধ্যে একটি সাধারণ ভাব আছে। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বোক্ত অংশে বলা হইয়াছে ন্যায় শাস্ত্রের এই সাধারণত্ব (logical doctrine of universals) I Gifford's Edition টীকা পৃঃ ৫৯।

এস্থলে 'এইডস্' বাদের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু জেলার (Zeller) বলেন ইহা ঠিক 'এইডস্' বাদেরই ব্যাখ্যান (actual enunciation of this doctrine ; Plato, পৃঃ ১২৬)

৮। গর্গিয়াস্।

এই গ্রন্থে বিশেষভাবে 'এইডস্' বাদ বিবৃত হয় নাই ; তবে ইহাতে এ মত পাওয়া যায়। 'এইডস্' বাদের প্রধান তত্ত্ব "মঙ্গল-রূপ।" এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, "মঙ্গলই সর্ব্বকার্য্যের লক্ষ্য (টেলস্) ; মঙ্গলের জন্যই সমুদায় কার্য্য ; সমুদায় কার্য্যের জন্য মঙ্গল নহে" (৪৯৯, ই)।

অপর একস্থলে (৫০৩, ই) বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মকার (শিল্পী প্রভৃতি) যেমন যথেচ্ছভাবে কার্য্য করে না, কিন্তু কোন আদর্শকে লক্ষ্য পথে রাখিয়া কার্য্য করে, এবং সে যেমন দেখে তাহার রচিত বস্তু আদর্শরূপ ('এইডস্') প্রাপ্ত হইল কি না, সাধুলোকও তেমনি বিশেষ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

জাউয়েট এ স্থলে 'এইডস্' শব্দের অর্থ করিয়াছেন "নির্দ্দিষ্ট রূপ" (definite form). Lodge এই গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন, 'এইডস্' শব্দের অর্থ বাহ্য আকৃতি ; শিল্পীর অন্তরে যে আদর্শ, ইহা তাহারই বাহ্য প্রকাশ। পৃ ২০১।

৯। ক্রাটুলস।

এই গ্রন্থের একস্থলে (৩৮৯, বি) 'তুরী'র (অর্থাৎ 'মাকু'র) আদর্শ-রূপের কথা বলা হইয়াছে। যে তুরী দ্বারা সুন্দরভাবে বস্ত্রবয়ন করা যায়, তাহাই আদর্শ তুরী ; তাহার রূপই আদর্শরূপ।

ইহার পরে বলা হইয়াছে আদর্শ নামের কথা। যে নাম দ্বারা বস্তুর প্রকৃতি প্রকাশ করা যায়, তাহাই আদর্শ নাম। সকলে বস্তুর নামকরণ

করিতে পারে না। যাঁহারা বস্তুতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহারাই নামকরণ করিতে সমর্থ এবং তাঁহারাই বর্ণ ও অক্ষর যোগে নামের পরম রূপ (eidos, এইডস্)প্রকাশ করিয়া থাকেন (৩৯০, ই)।

এস্থলে 'এইডস' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার অর্থ পরমরূপ।

এই দুইটি দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতেছে যে, উপায় উদ্দেশ্যসাপেক্ষ। যাহা পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তাহার রূপই আদর্শরূপ। স্বর্গে বা 'অধিস্বর্গে' 'মাকু' এবং 'নাম' পরমরূপ ধারণ করিয়া বর্তমান রহিয়াছে, আর মানব সেই-রূপের অনুকরণে পৃথিবীতে মাকু ও নাম সৃষ্টি করিতেছে, এ-প্রকার কল্পনা করা নিতান্তই অযৌক্তিক। 'এইডস্' একটি আদর্শ মাত্র। আরিস্টটল্ যাহাকে 'টেলস্' (telos, final cause, অন্ত্যকারণ বা উদ্দেশ্যরূপ কারণ) বলিয়াছেন, 'এইডস্' তাহাই।

১০। সেম্পসিঅন্।

ডি অটিমা নামক একজন স্ত্রীলোক সোক্রাটেস্‌কে প্রেম-তত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা 'সেম্পসিঅন্' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে (২০২-২১১)। 'এইডস্' বাদের সঙ্গে এই মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং ঐ উপদেশের সারাংশ এখানে দেওয়া আবশ্যক। উপদেশ এই—

প্রথম বয়স হইতেই সুন্দর বস্তু দর্শন করিতে হইবে, উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ইহা হইতেই শোভন চিন্তার উদ্ভব হইবে। তখন মানুষ নিজে নিজেই বুঝিবে যে বিভিন্ন রূপের সৌন্দর্য্য একই এবং তখন সে সমুদায় রূপেই অনুরক্ত হইবে। ইহার পরে সে বুঝিবে যে বাহ্যরূপের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য প্রকৃষ্ট। তাহার পরে সে কর্মক্ষেত্রে ও নিয়মের মধ্যে সৌন্দর্য্য দর্শন করিবে এবং বুঝিবে যে এ-সমুদায়ের সৌন্দর্য্যই একজাতীয়। তাহার পরে সে অপার জ্ঞান-সমুদ্রের দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য ধ্যান করিবে এবং জ্ঞানের প্রতি বিপুল প্রেম-বশতঃ বহু শোভন মহৎ ভাব এবং চিন্তার সৃষ্টি করিবে। অবশেষে তাহার নিকটে সেই এক জ্ঞান-সমুদ্র প্রতিভাত হইবে। ইহাই সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব। সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য পরম রূপ দর্শনই সমুদায় সাধনার শেষ ফল। ইহা "নিত্যসৎ, উৎপত্তিরহিত ও বিনাশরহিত, বৃদ্ধিরহিত ও হ্রাসরহিত, ...স্ব-স্থ এবং আপনার সহিত অবস্থিত (auto kath 'auto meth' auton) একরূপ (বা অদ্বিতীয়), নিত্য।......উৎপত্তিশীল ও বিনশ্বর বস্তুসমূহ ইহার অংশভাগী" (২১০—২১১)

['স্ব-স্থ এবং আপনার সহিত অবস্থিত' এই অংশের স্থলে গ্রন্থকার অনুবাদ করিয়াছেন—'শুধুসুন্দর পরম সুন্দর', ১ম ভাগ পৃঃ ৪৮৬]

এস্থলে সৌন্দর্য্যের পরম রূপের কথা বলা হইল। এই গ্রন্থের মতে এই পরম সৌন্দর্য্য সমুদায় বস্তুতেই নিহিত; সমুদায় বস্তুই ইহার অংশভাগী হইয়া রহিয়াছে। মানুষ সাধনবলে পার্থিব বস্তুর অসৌন্দর্য্যের দিকে অন্ধ হইয়া কেবল বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে।

পরমরূপের সহিত এই জগতের কি সম্বন্ধ, এবিষয়ে দুইটি মত আছে —(১) আদর্শবাদ বা অনুকৃতিবাদ (পারাডেইগমা), অর্থাৎ পরমরূপ স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং পার্থিব বস্তু তাহার অনুকরণে সৃষ্ট। (২) অংশ-বাদ, অবস্থিতি-বাদ (methexis, parousia, koinōnia) অর্থাৎ আদর্শরূপ প্রত্যেক বস্তুতে অল্পাধিক-পরিমাণে বর্তমান। এই গ্রন্থে এই দ্বিতীয় মতই গৃহীত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই পরম সৌন্দর্য্য লোকে বা অলোকে অবস্থিত কিম্বা লোকালোকাতীতভাবে অবস্থিত কোন বস্তু বা পদার্থ (thing) নহে। তবে ইহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করা যায়, এই অর্থে বলা যাইতে পারে ইহা বস্তু বা বিষয়। প্রচলিত অর্থে ইহা বস্তু বা পদার্থ নহে (এস্থলে দার্শনিক অর্থে 'পদার্থ' শব্দ ব্যবহৃত হইল না)।

১১। ফাইডোন্

এই গ্রন্থে নানাভাবে 'এইডস্' বাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (ক) মেনোন্' গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থেও 'প্রাক্তন স্মৃতিবাদ' পাওয়া যায়। (৭২৭৮)। এই স্মৃতিবাদের মূলে 'এইডস্'বাদ। মনে কর, দুইখণ্ড যষ্টি দেখিয়া বলিলাম ইহারা সমান। প্লেটো বলেন অন্তরে সমানত্বের আদর্শ ছিল, সেইজন্যই বলিতে পারিলাম ইহারা সমান। অন্তরে আদর্শ না থাকিলে এপ্রকার বিচার করা সম্ভব হইত না। কিন্তু পৃথিবীতে এই আদর্শ লাভ করা সম্ভব নহে। পূর্ব্বজন্মে এই জ্ঞান লাভ হইয়াছিল এবং মানুষ এই জ্ঞান লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এই জ্ঞান লুপ্তাকারে থাকে। দুইটি সমান বস্তু দেখিবামাত্রই সেই সমানত্বের স্মৃতি জাগ্রৎ হয়। কেবল গণিত শাস্ত্রের তত্ত্ববিষয়েই যে ইহা সত্য তাহা নহে—ন্যায়ধর্ম প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগেই মানুষ পূর্ব্বজন্মলব্ধ আদর্শ দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া থাকে। ইহাই প্রাক্তন স্মৃতি তত্ত্ব।

এস্থলে প্রথম বক্তব্য এই যে, অন্তরে যে স্মৃতি জাগ্রত হয়, তাহা বস্তুবিশেষের স্মৃতি নহে, ইহা জ্ঞানলাভের উপায়ের স্মৃতি। ন্যায়শাস্ত্রে ও জ্ঞানজগতে যে সমুদায় স্বতঃসিদ্ধ উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা সত্যাসত্য নির্ণয় করি, স্মৃতিতে জাগ্রৎ হয় সেই উপায়। দ্বিতীয় বক্তব্য এই—সমানত্বাদির এই যে আদর্শ ইহা লোকালোকে অবস্থিত বা লোকালোকাতীতভাবে অবস্থিত কোন স্বতন্ত্র বস্তু (thing) নহে, ইহা অন্তরস্থ আদর্শ।

(খ) ৬৫—৬৮ অংশের আলোচ্য বিষয় বস্তুর তত্ত্ব (তৎ + ত্ব) অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ। Archer-Hind বলেন এস্থলে ideas এবং ideal world এর কথা বলা হইয়াছে (৬৫, ডি; টীকা, পৃঃ ২১)। Burnetও বলেন এস্থলের আলোচ্য বিষয় 'theory of Ideas' অর্থাৎ 'এইডস্' বাদ।

প্লেটো এই অংশে বস্তুর স্বরূপকে ousia (উসিয়া, ৬৫, ডি; ৭৮, ডি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্তুর 'প্রকৃতরূপ' ব্যক্ত করিবার জন্য প্লেটো বিশেষ ভাষা ব্যবহার করিতেন, যেমন auto kath' auto (আউট কাথ-হাউট—; তাহা নিজে যাহা), auto o esti (আউট হ এস্‌টি—ঠিক তাহা হয় যাহা) ইত্যাদি (৭৫,ডি)। এইসমুদায় ভাবই বস্তুর 'এইডস্'।

এই যে আদর্শরূপের কথা বলা হইল ইহা কি-প্রকারে জানা যায়? প্লেটো বলেন (৬৫)—"ইন্দ্রিয় দ্বারা নহে—কেবল চিন্তা দ্বারা" (with thought alone, Burnet, টীকা)। প্লেটোর মতে মন এবং ইন্দ্রিয় পরস্পরবিরোধী। ইন্দ্রিয়জগতে থাকিয়া বস্তুর বস্তুত্ব জানা যায় না; মন যতই ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে অতিক্রম করে, ততই সে বস্তুর প্রকৃত রূপ দেখিতে সমর্থ হয় (৬৫)।

প্লেটো এক স্থলে (৬৪, সি) বলিয়াছেন যে প্রকৃতরূপ যুক্তি বা বিচার দ্বারা জানা যায়। তাঁহার ভাষা 'to logizesthai'. ইহার অর্থ reasoning অর্থাৎ যুক্তিতর্ক (Lutoslawski, পৃঃ ২৫৩)। Burnet, Williamson, Farenside and Kerin, Wagner প্রভৃতি টীকাকারগণ এবং Church, Cary, Blagrave প্রভৃতি অনুবাদকগণ এই অর্থই করিয়াছেন। আমাদিগের গ্রন্থকারের অনুবাদ "মনন—সাহায্যে," পৃঃ ৫৬০।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সত্তার পরমরূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

প্রকৃত কথা এই, বস্তু বা গুণসমূহের মধ্যে যে সাধারণ ভাব রহিয়াছে তাহাই ইহাদিগের প্রকৃত রূপ। Natorp এবং Stewart এ-সমুদায়কে

abstractions বা notions বলিয়াছেন। Stewart : Plato's Doctrine of Ideas, পৃঃ ৪১।

(গ) একস্থলে (৭৫, সি) প্লেটো পরম রূপের কথা বলিতে গিয়া সমানত্ব, সৌন্দর্য্য, মঙ্গল, ন্যায় ও পবিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরে এই সমুদায়কে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন— "প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনায় আমরা যে সমুদায়কে 'প্রকৃত সত্তা' নাম দিয়া থাকি।" (Burnet এর টীকা দ্রষ্টব্য)।

এইপ্রকার আলোচনাতে বস্তুর 'লক্ষণ' নির্ণয় করা হয় এবং এই লক্ষণ বা বিশেষত্বই বস্তুর প্রকৃত রূপ।

(ঘ) আর একস্থলেও (৭৮, ডি) প্লেটো বলিয়াছেন যে, প্রকৃত রূপ সেই সত্তা (ousia—উসিয়া), প্রশ্নোত্তরমূলক আলোচনাতে যাহা নির্ণয় করা হয়"

এস্থলেও লক্ষণ বা 'সাধারণত্ব' বা বস্তুর প্রকৃত রূপ নির্ণয় করায় কথা বলা হইল (Burnet এর টীকা দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) এক স্থলে (১০০) সোক্রাটেস্ (অর্থাৎ প্লেটো) বলিয়াছেন যে স্ব-স্থ সৌন্দর্য্য, মঙ্গল, মহত্ব ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে। ১০০, বি)। যাহা কিছু সুন্দর, মঙ্গল বা মহৎ হইয়াছে তাহা এইজন্য, যে, ইহার মধ্যে স্ব-স্থ সৌন্দর্য্য, মঙ্গল এবং মহত্ব বর্ত্তমান (১০০, ডি, ই)।

আমরা ব্যবহার করিয়াছি 'স্ব-স্থ সৌন্দর্য্য'। মূলে আছে kalon auto kath' aúto (কালন্ আউট-কাথ্-হাউট)। ইহার অর্থ 'সৌন্দর্য্য নিজে যাহা'। ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ হইয়াছে universal beauty (Jowett), absolute beauty (Church), abstract beauty (Cary, Blagrave and Farenside) ইত্যাদি; Burnet ব্যবহার করিয়াছেন "alone by itself"; তিনি বলেন 'in itself' দ্বারা এই অংশের অনুবাদ করা ভ্রমোৎপাদক (misleading), কারণ ইহাতে মনে হইতে পারে যে, বর্ত্তমান যুগের thing in itself এর ন্যায় ইহাও অজ্ঞেয় (৬৫, ডি, টীকা)।

এই অংশে প্লেটো অনুকৃতিবাদ (paradeigma) গ্রহণ না করিয়া অবস্থিতিবাদ (methexis, parousia) গ্রহণ করিয়াছেন। পরম-সৌন্দর্য্য প্রত্যেক বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি

(১) বহুবস্তুর মধ্যে যে সাধারণত্ব আছে, যুক্তিতর্কদ্বারা তাহা নির্ণয় করা হয়। এই সাধারণত্বই বস্তুর লক্ষণ, বিশেষত্ব, পরম রূপ।

(২) পরমরূপ পৃথিবীর বা স্বর্গের অতীত স্থানে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে অবস্থিত নহে। বস্তুর মধ্যেই বস্তুত্ব; জ্ঞানচক্ষে এই পরমরূপ দর্শন করিতে হয়।

১২ ; পলিটেইআ (Republic)।

গ্রন্থের এই নামের বাংলা অর্থ 'সাধারণ-তন্ত্র'। ইহাতে 'এইডস্'-বাদ-বিষয়ে অনেক কথা আছে।

(ক) একস্থলে লিখিত আছে (৪০২, সি) যে, সংযম, মনুষ্যত্ব, বদান্যতা, মহত্বাদির আদর্শ (এইডস্) থাকা আবশ্যক।

এ আদর্শ অবশ্যই মনোগত আদর্শ।

(খ) একস্থলে (৪৭৬—৪৮৩) দুইটী বিষয়ে পার্থক্য করা হইয়াছে :—(১) সংসারের বস্তু বা বিষয়; (২) ইহাদিগের আদর্শ-রূপ, যেমন সৌন্দর্যের আদর্শরূপ স্ব-সৌন্দর্য্য।

এতদুভয়ের সম্পর্ক-বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, পার্থিব বস্তু আদর্শরূপের অংশভাগী। এই অংশভাগিত্ব বুঝাইবার জন্য 'মেটেক্হন্টা' (metechonta) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (৪৭৬, ডি)।

(গ) একস্থলে (৪৮৪, সি) প্রশ্ন করা হইয়াছে—যাহাদের 'তত্ত্ব'-জ্ঞান নাই, আত্মাতে (psyche—পস্যুকহে) পরম সত্যের আদর্শ নাই, তাহারা দেশশাসনের উপযুক্ত কি না। সোক্রাটেস্ এস্থলে চিত্রকরের উপমা দিয়াছেন। চিত্রকরের একটি আদর্শ আছে; সে সেই আদর্শকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া চিত্রকার্য্য করে। যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, এবং আত্মাতে আদর্শ নাই, তাহারা চিত্রকরের ন্যায় আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে পারে না।

এস্থলে বলা হইয়াছে যে এই আদর্শ (paradeigma) আত্মাতে।

(ঘ) একস্থলে (৫০৮, ই) এইরূপ আছে—"যাহা (touto, টুট) জ্ঞাতবস্তুকে সত্য করিয়াছে (=জ্ঞাত হইতে দিয়াছে, Bosanquet) এবং জ্ঞাতাকে জানিবার ক্ষমতা দিয়াছে, তাহা মঙ্গলের আদর্শ (idea—ইডেআ)—তুমি ইহাই বলিবে, তাহাকে তুমি জ্ঞান ও সত্যের কারণ বলিয়া বুঝিবে।......যদিও জ্ঞান ও সত্য উভয়ই সুন্দর, কিন্তু মঙ্গলকে ইহাদিগের অপেক্ষাও সুন্দর বলিয়া জানিবে।"

গ্রন্থকারের অনুবাদে কিছু ভুল আছে। তিনি touto শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'যে সত্তা'। কিন্তু প্লেটো উক্ত অংশের কিছু পরেই বলিয়াছেন—এই মঙ্গলরূপ একটি সত্তা (উসিয়া, ousia) নহে, কিন্তু ইহা, গৌরবে এবং ক্ষমতায় সমুদায় সত্তাকে অতিক্রম করিয়াছে (৫০৯, বি)।

এই অংশের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক। Adam এই অংশের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, মঙ্গল নিজে সত্তা নহে, কিন্তু সত্তার কারণ, ইহাকে uper-ousios ('অতিসত্তা' বা 'অধিসত্তা') বলা যাইতে পারে। Adam-এর আর একটি মন্তব্য এই, যে অর্থে আদর্শরূপ সমূহ সত্তা, সে অর্থে মঙ্গল সত্তা নহে। কিন্তু উচ্চতর অর্থে মঙ্গলই একমাত্র প্রকৃত সত্তা, কারণ সমুদায় সত্তাই মঙ্গলের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ (determinations). Republic : Vol. ii, পৃঃ ৬২।

Adam শেষ অংশে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অবশ্যই প্লেটো এস্থলে বলেন নাই। প্লেটো যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—মঙ্গল সত্তা নহে, কিন্তু সত্তার নিয়ামক।

আরিস্টটল্ যাহাকে telos (অর্থাৎ final cause, অন্ত্য কারণ, উদ্দেশ্য রূপ কারণ) বলিয়াছেন, এই মঙ্গলও সেই উদ্দেশ্য কারণ (Bosanquet : Companion to Republic, পৃঃ ২৮৯ দ্রষ্টব্য)।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ঈশ্বর 'নিমিত্ত কারণ' এবং মঙ্গল 'উদ্দেশ্য রূপ কারণ' এবং এই মঙ্গল ঈশ্বরেরই অন্তরস্থ আদর্শ।

"এই জগৎ লক্ষ্যহীন নহে, ইহার এক মহান্ উদ্দেশ্য আছে। প্লেটোর মতে মঙ্গলই এই উদ্দেশ্য। এই 'উদ্দেশ্য-কারণ' বিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন—

এই বিজ্ঞের জগতে মঙ্গলের আদর্শরূপ সর্ব্বশেষে (teleutaia) এবং অতি কষ্টে (mogis) দৃষ্ট (orasthai) হয়। কিন্তু যখন দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়, যে, যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, ইহাই (অর্থাৎ মঙ্গলের আদর্শরূপই) সে সমুদায়ের কারণই এদৃষ্টজগতে ইহা জ্যোতির (জনক) এবং জ্যোতির ঈশ্বরেরও জনক; জ্ঞানজগতে ইহা স্বয়ং প্রভু হইয়া সত্য ও জ্ঞান বিস্তার করিতেছে। যিনি বিচক্ষণতার সহিত নিজের বা দেশের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই মঙ্গলের আদর্শরূপকে লক্ষ্যপথে রাখিবেন (৫১৭, বি, সি)।

গ্রন্থকার প্রথম বাক্যটির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—"জ্ঞানের রাজ্যে পরম শিব আমাদিগের জিজ্ঞাসার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে; ইহা প্রায় অনধিগম্য"। প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১৯।

তিনি সম্ভবতঃ Davies and Vaughan এর অনুবাদ অনুসরণ করিয়াছেন। ইহাদিগের অনুবাদ এই :—

"The essential Form of Good is the limit of our inquiries and can barely be perceived."

Bosanquet এই অনুবাদ বিষয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"The emphasis of the translation seems hardly right: rather—'in the world of knowledge, the form of good is perceived last and with difficulty, but when perceived' etc." (Companion, পৃঃ ২৬৮)।

Jowett এর অনুবাদ, "The idea of good appears last of all and is seen with difficulty".

Davis এর অনুবাদ, "The idea of the good is the last object of vision" (Bohn's series).

Adam সাহেব টীকায় লিখিয়াছেন—*Teleutaia* as well as *mogis* should be taken predicatively with *o'ras-thai* (Vol. ii, পৃঃ ৯৬) অর্থাৎ 'টেলেউটাইআ' এবং 'মগিস্' এই দুইটিকেই 'হরাস্থাই' ক্রিয়ার সহিত বিশেষণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা শেষ চারিজন লেখকের অনুসরণ করিয়াছি।

(৬) একস্থলে প্লেটো তিন-প্রকার শয্যার উল্লেখ করিয়াছেন (৫৯৭)। প্রথমতঃ ঈশ্বরসৃষ্ট প্রকৃত শয্যা, দ্বিতীয়তঃ সূত্রধররচিত শয্যা; তৃতীয়তঃ চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত শয্যা।

প্লেটো প্রকৃত শয্যার মৌলিক প্রকৃতিকে phusis (ফুসিস্) বলিয়াছেন। Adam এর টীকা এই—It seems to me certain that *phusis* in this passage refers to the essential nature (i. e., the Idea) of the thing in question" (Republic, Vol. ii. পৃঃ ৩৯২)

Burnet ফাইডোন নামক গ্রন্থের টীকায় এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ইহা 'এইডে' (আদর্শরূপসমূহ) বিষয়ক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমুদায় গ্রীক চিন্তাশীল পণ্ডিত অতীব সৎ (most real) বস্তু বিষয়েই এই শব্দ ব্যবহৃত করেন এবং সোক্রাটেসের অর্থ—the world of eidē (—পরম রূপের জগৎ)। টীকা ১০৩, বি (তাঁহার Early Greek Philosophy, পৃঃ ১২ দ্রষ্টব্য)। 'ফাইড্রস্' গ্রন্থের ২৪৬ অংশের টীকায় Thompson লিখিয়াছেন যে Idea এবং phusis বহুস্থলে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

Zeller এর Plato নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৪২) এবং Stewart এর Plato's Doctrine of Ideas নামক গ্রন্থে পৃঃ (৬) বলা হইয়াছে যে, উদ্ধৃত অংশে ঈশ্বরকেই 'এইডস্' এর (অর্থাৎ পরম রূপের) সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

Jowett বলেন, প্রকৃত শয্যা ঈশ্বরের মনোগত আদর্শ (Republic, Vol. iii, পৃঃ ৪৪৩-৪৪৪)।

ঈশ্বর 'এইডস' অর্থাৎ পরম রূপকে সৃষ্টি করেন, এই মতটি অপ্রচলিত। এই জন্য Phusis বিষয়ে এত কথা বলা হইল।

১৩। ফাইড্রস

এই গ্রন্থে রূপকময় একটি উপাখ্যান দ্বারা আত্মার প্রকৃতি এবং বস্তুর প্রকৃত রূপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রূপকটি এই—আত্মা একাধারে ত্রিমূর্ত্তি; তিনটির মধ্যে একজন রথী এবং অপর দুইটি পক্ষযুক্ত দুইটি অশ্ব। দেবগণের উভয় অশ্বই সৎ এবং সদ্বংশজাত। অপরাপর আত্মার একটি অশ্ব সৎ এবং অপরটি অসৎ ও অসদ্বংশজাত।

ব্যাখ্যাতৃগণ অনেকে বলেন, জ্ঞানকে রথী, বিবেককে সুসংযত অশ্ব এবং ইচ্ছা বা বাসনাকে অসংযত অশ্ব বলা হইয়াছে।

জেউস্ দেবগণসহ ঐপ্রকার পক্ষযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বিচরণ করেন এবং তাঁহারা স্বর্গপৃষ্ঠে অধিরোহণ করিয়া উর্দ্ধতরস্থ লোক দর্শন করেন। ঐ লোকেই বস্তুর প্রকৃত সত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা বর্ণহীন (achrōmotos), রূপহীন (aschēmatistos) এবং অগ্রাহ্য (anophēs, যাহাকে স্পর্শ করা যায় না)। আত্মার নিয়ন্তা যে জ্ঞান, কেবল সেই জ্ঞান দ্বারাই ইহাকে উপলব্ধি করা যায়। আত্মা এইস্থলে 'স্ব স্ব' (অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিত) ন্যায়, স্ব স্ব সংযম, এবং প্রকৃত জ্ঞান অবলোকন করেন। এ জ্ঞান উদ্ভবশীল বস্তুর জ্ঞান নহে, বস্তুর প্রকৃত সত্তা যাহা (onta ontos), এ জ্ঞান সেই সত্তার। এই সমুদায় দর্শন করিয়া, এই সমুদায় ভোজন করিয়া আত্মা পুনরায় স্বর্গলোকে নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেবগণের জীবন এইপ্রকার।

যে সমুদায় আত্মা দেবতুল্য, তাঁহারাও জ্ঞানসারথী সহ সেইস্থলে গমন করিয়া এইসমুদায় দর্শন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু অশ্বগণ কর্ত্তৃক বিব্রত হইয়া অতি কষ্টে এই সমুদায় 'তত্ত্ব' দর্শন করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মাও সেই দিকে গমন করে; কিন্তু তাহাদিগের অশ্ব অতি দুর্দ্দান্ত, ইহাদিগের গতি উচ্চাবচ, কখনও উর্দ্ধদিকে, কখনও বা নিম্নাভিমুখে। এইজন্য এই সমুদায় আত্মা, সমুদায় বস্তু দর্শন করিতে পারে না; কোন কোন 'তত্ত্ব' দর্শন করে, আবার কোন তত্ত্ব বা দর্শন করিতে পারে না।

অপরাপর আত্মাও এইসমুদায় দর্শন করিবার ইচ্ছা করে, কিন্তু সফলকাম হয় না। ইহারা নিম্নাভিমুখে নিপতিত হয়। গমন করিবার সময় এক অপরকে পদতলে দলিত করে, এক অপরের উপর নিপতিত হয়, বিপুল শব্দ উত্থিত হয়, সকলে ঘর্ম্মাক্ত হয়, সারথির অকুশলতাবশতঃ কেহ খঞ্জ হয়, কাহারও বা পক্ষ ভগ্ন হইয়া যায়। অবশেষে প্রকৃতরূপ দর্শন না করিয়াই ইহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং 'মত' রূপ খাদ্য ভক্ষণ করে (২৪৬—২৪৮)।

এই স্থলে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'আদর্শরূপ' (এইডস্) একটি পদার্থ (thing)। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক, ইহা একটি কবিত্বপূর্ণ রূপকময় পৌরাণিক উপাখ্যান। এস্থলে একটি বিশেষ সত্যকে রূপকাকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'ফাইডোন' গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, রূপ-রসময় জগতে আদর্শের জ্ঞান লাভ করা দুরূহ। দেহকে যতই অতিক্রম করা যায়, ততই আদর্শ জ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হওয়া যায় (৬৭)। এখানেও রূপকাকারে তাহাই বলা হইয়াছে। আদর্শরূপ কোথায়? না, আকাশেরও অতীত প্রদেশে (uper-ouranion—'over space' 'supercelestial region')। Burnet বলেন, এ রাজ্য স্পষ্টই মনোরাজ্য, বিশুদ্ধ চিন্তার রাজ্য (pure thought—Greek Phil., পৃঃ ১৬৭)। Lutoslawski বলেন, এস্থলে বলা হইল যে "এইডে" অর্থাৎ আদর্শসমূহকে জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করা হয় (পৃঃ ৩৩৮; Plato's Logic)। প্লেটো নিজেই বলিয়াছেন যে, 'আদর্শরূপ' কেবল nous (অর্থাৎ মন, জ্ঞান বা চিন্তা) দ্বারা দ্রষ্টব্য (monō theatē nō—247c)। এই আখ্যানে সারথি হইল জ্ঞান; বিবেক ও বাসনা হইল অশ্বদ্বয়। ইহাদিগের সাহায্যেই আত্মা 'পরমরূপ' দর্শন করেন। এই 'পরমরূপ' মনেই প্রকাশিত হয়; সুতরাং বলিতেই হয় যে, এ-সমুদায় মানস ব্যাপার। জ্ঞানীগণ 'পরমরূপ' ভোজন করেন (২৪৭ ই); অজ্ঞান ব্যক্তি 'মত' ভক্ষণ করে (২৪৮, বি)। এ-সমুদায়ই রূপক।

ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে, "এ নাম স্বর্গেতে গোপনে ছিল"। সত্যই কি 'নাম' নামক একটি পদার্থ স্বর্গলোকে গোপনে বাস করিয়া থাকে? রসময়ী কবিতাকে অরসিক যে ভাবে ব্যাখ্যা করে, প্লেটোর বর্ণনাকেও আরিস্টটল-প্রমুখ অরসজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৪। ঠে আইটেটস্।

(ট্ হে আইটেটস্)।

এই গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডস্' বাদ আলোচিত হয় নাই। কিন্তু জ্ঞান কি, জ্ঞান লাভ কি-প্রকারে সম্ভব, ইত্যাদি বিষয়ের অনেক আলোচনা আছে। প্রথমতঃ, প্লেটো স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বার-স্বরূপ, এই দ্বার দ্বারা বিষয়সমূহ আত্মার নিকট উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, আত্মার কতকগুলি মৌলিক ভাব আছে-- যেমন সৎ ও অসৎ, সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য একত্ব ও পার্থক্য, এক ও অপরাপর সংখ্যা, যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যা ইত্যাদির ভাব (১৮৪-১৮৬)। তৃতীয়তঃ, এইসমুদায় মৌলিক ভাব লইয়া আত্মা নিজে (autē di autēs ē psuchē—185D) বিষয়গুলির উপর কার্য্য করে। বিষয়সমূহকে তুলনা করা হয়, যুক্তিমূলক বিচার দ্বারা বিষয় সমূহের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা হয়।

যুক্তিমূলক বিচারকে Sullogismos (সুল্লগিস্‌মস্) বলা হইয়াছে (১৮৬, ডি)। এই শব্দের পারিভাষিক অর্থ syllogism—ন্যায় শাস্ত্রের 'অবয়বী'। কিন্তু এ স্থলে এ শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। Jowett ইহার অনুবাদ করিয়াছেন reasoning ; Campbell এর অনুবাদ generalization (গ্রন্থের টীকা পৃঃ ১৬৪)।

বিচার দ্বারা আত্মা যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা সাধারণত্বের জ্ঞান। এ গ্রন্থে এইটুকু 'এইডস্' বাদ পাওয়া যায়। কি-প্রকারে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, বস্তুসমূহের সাধারণত্ব ও একটি বস্তু hypostatized entity)—এ মত এ গ্রন্থে গৃহীত হয় নাই (Campbell উক্ত গ্রন্থের উপক্রমণিকা, পৃঃ ৫৩)।

১৫। পার্মেনিডেস্

সাধারণতঃ লোকে যাহাকে প্লেটোর 'এইডস্' বাদ বলে এই গ্রন্থে পার্মেনিডেস্ সেই মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন (tears the theory of ideas into pieces: Windelband: History of Ancient Philosophy, পৃঃ ১৮৭)। আমরা কেবল দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

(১) একটি মত এই—'এইডস্'-সমূহের স্বতন্ত্র সত্তা আছে, কিন্তু প্রত্যেক পরমরূপই আংশিকভাবে বিভিন্ন বস্তুতে অবস্থিত। এই মতের নাম 'অবস্থিতি বাদ'। এই গ্রন্থে বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, এ মত অযৌক্তিক (১৩১-১৩২)।

(২) আর একটি মত এই—'এইডস্' সমূহের স্বতন্ত্র সত্তা আছে ; এসমুদায় আদর্শরূপে অবস্থিত। বিভিন্ন বস্তু এইসমুদায় আদর্শের অনুকরণে সৃষ্ট। এই মতকে 'আদর্শবাদ' বা 'অনুকৃতি বাদ' বলা যাইতে পারে। এ গ্রন্থে প্রমাণ করা হইয়াছে, এ মতও অযৌক্তিক। (১৩২-১৩৩)।

এই আলোচনায় অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যেমন, কেশ, কর্দ্দম, মল প্রভৃতির এইডস্ আছে কিনা। এ সমুদায়ের 'এইডস্' স্বীকৃত হয় নাই। 'তৃতীয় পুরুষ' ন্যায় (tritos anthropos) দ্বারাও পার্মেনিডেস্ 'এইডস্' বাদকে খণ্ডন করিয়াছিলেন। অপরাপর কি যুক্তি দ্বারা এই মত খণ্ডিত হইয়াছিল, এস্থলে সে-সমুদায়ের আলোচনা করা সম্ভব নহে। লোকে যে মতকে প্লেটোর মত বলিয়া মনে করে, প্লেটো নিজে সেই মতকে কেন খণ্ডন করিলেন---সে বিচারেও আমরা প্রবৃত্ত হইব না। তবে এইমাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এইজন্য কেহ কেহ (যেমন Ueberweg) বলেন যে এ গ্রন্থ প্লেটোর নহে। তবে পণ্ডিতসমাজে এমত গৃহীত হয় নাই।

১৬। সফিস্টেস্

এই গ্রন্থে এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতের উল্লেখ আছে যাহাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে 'রূপপ্রেমিক' (এইডোন্ ফিলই eidon philoi)। ইঁহারা বলেন 'সৎ' এবং 'উদ্ভব' পরস্পর বিভিন্ন। 'সৎ' অপরিবর্ত্তনীয় এবং 'উদ্ভব' পরিবর্ত্তনশীল। এই মতে 'সৎ' কোন ক্রিয়ার কর্ত্তাও হইতে পারে না এবং কর্ম্মও হইতে পারে না।

'সফিস্টেস্' গ্রন্থে এই মত নিরাকৃত হইয়াছে। এক স্থলে (২৪৭, ই) বলা হইয়াছে যে, যাহা শক্তি দ্বারা অপরের উপর কার্য্য করে এবং যাহার উপর শক্তি দ্বারা কার্য্য করা যায় তাহাই 'সৎ'। এই গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, পূর্ণ সৎ বস্তুতে গতি (kinēsis), প্রাণ (zōē), আত্মা (psuchē) এবং জ্ঞান (phronēsis) বর্ত্তমান (২৪৮-২৪৯)।

'এইডস্' সমূহ অবশ্যই 'সৎ', সুতরাং আত্মা, জ্ঞান, প্রাণ, গতি প্রভৃতি 'এইডস্' এ বর্ত্তমান।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গ্রন্থে 'এইডস্'-সমূহকে জগদতীত স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে না।

১৭। ফিলেবস্।

যাহা কিছু আছে, সে-সমুদায়কে এই গ্রন্থে ৪ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে :—

(১) যাহা অপরিমিত বা অসীম (Apeiron), (২) যাহা পরিমিত (Peras), (৩) যাহা এতদুভয়ের মিশ্রণ (mikton), (৪) কারণ (aitia) (গ্রন্থের ২৩-৩১ অংশ)

এই গ্রন্থের মতে জ্ঞানই (nous) কারণ। একস্থলে (২৮, সি) বলা হইয়াছে 'জ্ঞানই (nous) পৃথিবী ও স্বর্গের রাজা।' ইহার কিছু পরেই বলা হইয়াছে যে 'জ্ঞান (nous) এবং প্রজ্ঞা (phronēsis) এতজ্জগৎকে নিয়মিত ও শাসন করিতেছে' (২৮, ডি)। অপর একস্থলে (৩০, সি এই কারণকে sophia এবং nous বলা হইয়াছে।

এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল ইহা সাধারণ জ্ঞান বা কর্ত্তৃত্ব-বিহীন জ্ঞান নহে। ইহা জ্ঞানবান্ পুরুষ। প্লেটো এই গ্রন্থে গুণ ও গুণীতে কোন পার্থক্য করেন নাই। একস্থলে (২৬, ই) বলিয়াছেন, কারণ (To aition) এবং কর্ত্তা (To poioun) এতদুভয়ে কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল নামে। আর সাক্ষাৎভাবেই একস্থলে (২৭, বি) এই কারণকে বিশ্বকর্ম্মা (Demiourgos) অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়াছেন।

এই গ্রন্থে কেবল চারিটি তত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। এখানে প্রশ্ন -তবে 'এইডস্' এর স্থান কোথায়? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ ইহাকে দ্বিতীয় তত্ত্বের, কেহ তৃতীয় তত্ত্বের এবং কেহ বা চতুর্থ তত্ত্বের অন্তর্ভূত করেন।

Zeller (প্লেটো, পৃঃ ২৬৬), Bury (Philebus এর উপক্রমণিকাতে, পৃঃ—xiv—xviii ; lxiv—lxxiv), Stewart (Plato's Doctrine of Ideas, pp. 98-99) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন— 'এইডস্' এর স্থান চতুর্থ তত্ত্বে অর্থাৎ কারণে।

Bury, Stewart প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই 'এইডস্' ঈশ্বরেরই মনোগত আদর্শ। আরিস্টটল চারিটি কারণের নাম করিয়াছেন। চতুর্থ কারণের নাম telos, final cause, অন্ত্য কারণ বা 'উদ্দেশ্য কারণ'। ঈশ্বরের মনোগত এই যে আদর্শ, ইহাই এই উদ্দেশ্য-কারণ। (Bury's Philebus, p. xlviii ; Stewart's Plato's Ideas, পৃঃ ৯৬-১০০)।

১৮। টিমাএউস্।

এই গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টিবিষয়ে চারিটি তত্ত্ব পাওয়া যায় :—

(১) বিশ্বকর্ম্মা। (২) আদর্শ রূপসমূহ ('এইডে')। এই আদর্শরূপ অনুসারে বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। 'এইডে' হইল আদর্শ (পারাডেইগ্‌মা (এবং বিশ্ব হইল তাহার অনুকৃতি। (৩) দেশ বা আকাশ (chora, কৃহোরা, খোরা)। (৪) সৃষ্ট জগৎ।

এস্থলে প্রথম প্রশ্ন, বিশ্বকর্ম্মার সহিত ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ ?

ফাইডোন্ গ্রন্থের টীকায় Archer-Hind বলেন : "We must identify *theos* with absolute mind, the *nous basileus* of Philebus, the mythical *demiourgous* of the Timaeus" (পৃঃ ১২০) অর্থাৎ 'ফাইডোন' গ্রন্থের ঈশ্বর, ফিলেবস্ গ্রন্থের জ্ঞানস্বরূপ বিশ্বরাজ, এবং টিমাএউস্ গ্রন্থের বিশ্বকর্ম্মা একই ; এক পরমাত্মাই।

বার্ণেট, (Greek Phil. part i, p. 169), Ueberweg (Ancient Phil., p. 122) প্রভৃতিও বলেন এই গ্রন্থের বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বরই।

উত্তরকালে পরমেশ্বর এবং বিশ্বকর্ম্মা এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্লেটোর গ্রন্থে সে পার্থক্য নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—ঈশ্বরের সহিত মঙ্গল রূপের (অর্থাৎ মঙ্গলের 'এইডস্' এর) কি সম্বন্ধ ?

Zeller এর মতে উভয়ই এক (Plato, pp. 279-292)

Adamও ইহাই বলেন। তিনি Republic এর টীকায় লিখিয়াছেন—The majority of interpreters are now agreed in identifying Plato's Idea of the Good with the philosophical conception of the Deity", p. 51. অর্থাৎ এখন অধিকাংশ ব্যাখ্যাতৃগণেরই এই মত যে প্লেটোর 'শিব-রূপ' এবং দার্শনিকগণের ঈশ্বর একই।

Stewart বলেন—"বিজ্ঞানের দিক্ হইতে যাহা 'শিব-রূপ', ধর্ম্ম-ভাবের দিক্ হইতে তাহাই পরমেশ্বর" (Plato's Doctrine of Ideas, p. 102)

দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে Ueberweg (পৃঃ ১২২), Schwegler (পৃঃ ৮১), Weber (পৃঃ ৮৯) ও এই মত পোষণ করেন।

তবে বিরোধী মতও আছে। Burnet উভয়ের একত্ব স্বীকার করেন না (Gr. Phil., p. 169 footnote)। Erdmann এর মতে মঙ্গলের 'এইডস্' অন্ত্যকারণ, final cause, ঈশ্বরেরই মঙ্গল উদ্দেশ্য (Hist. Phil., Vol. i, p. 109-116)। কেহ কেহ বলেন "মঙ্গলরূপ' পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত ; আবার কাহারও বা মত—মঙ্গল রূপ হইতেই পরমেশ্বরের উৎপত্তি (Stewart এর গ্রন্থে পৃঃ ১০১ এবং Zeller এর প্লেটোতে, পৃঃ ২৮৩—২৮৪, ইহার আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় প্রশ্ন—ঈশ্বরের সঙ্গে অপরাপর 'এইডস্' এর কি সম্বন্ধ ? এবিষয়ে মতভেদ অনেক।

প্রচলিত মত এই যে, আদর্শরূপসমূহ নিরপেক্ষ সত্তা ; ইহারা ঈশ্বর হইতেও পৃথক্ এবং 'স্বতন্ত্র'। প্রথমে আরিস্টটল এইমতকে প্লেটোর মত বলিয়া প্রচার করেন। লোকেও এই মত গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এবিষয়ে গভীর সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আরিস্টটল প্লেটোর শিষ্য ; কিন্তু বিরোধী শিষ্য। বিরোধী শিষ্যের পক্ষে গুরুর সব মত হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। অনেকে মনে করেন, আরিস্টটল প্লেটোর এইডস্ বাদ বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। এ-প্রকার অভিযোগ যে অমূলক নহে, তাহা পূর্ব্বের আলোচনাতেই বুঝা যাইবে। অপরাপর মতামত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Lutoslawski বলেন "The ideas were nothing else for Plato when he wrote *Timaeus* than God's thoughts"। অর্থাৎ প্লেটো যখন টিমাএউস্ লিখিয়াছিলেন তখন তিনি মনে করিতেন 'এইডস্'-সমূহ ঈশ্বরের চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে (Plato's Logic, p. 477).

Erdmann বলেন—"God contemplates the Ideas, the eternal archetypes of things, but contemplates them as a poet does his ideals, i. e., generating them himself (Rep.) and then implants them in matter" অর্থাৎ কবি যেমন নিজ আদর্শকে উৎপন্ন করেন, চিন্তা করেন, ঈশ্বরও আদর্শরূপ বিষয়ে তেমনি করেন (Hist. Phil., Vol. i, p. 115).

কেহ কেহ মনে করেন আদর্শরূপসমূহ ঈশ্বরেরই নিত্য স্বরূপের অন্তর্গত। তিনি যেমন নিজেকে বা স্ব-রূপকে সৃষ্টি করেন না, তেমনি 'আদর্শ' সমূহকেও সৃষ্টি করেন না—এ সমুদায় তাঁহার অজই। এই মতই নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যাহা কিছু চিন্তা করা যাইতে পারে, সেই সমুদায় তিন শ্রেণীর অন্তর্গত ; ১। যাহা সৎ ; ২। যাহা ঘটনা, যাহা পরিবর্ত্তনশীল ; ৩। যাহা স্বতঃসিদ্ধ—যেমন ৮=৮ ; ৫+৩=৮ ইত্যাদি ; এইসমুদায় সত্য নিত্য স্বতঃসিদ্ধ, এ-সমুদায়কে সৃষ্টি করিতে হয় না ; ঈশ্বরের প্রবৃত্তিই এই যে, তিনি এই স্বতঃসিদ্ধত্ব স্বীকার করেন।

Lotze এর 'Validity' এই শ্রেণীর মত (Logic Vol. ii, 209-222)। ইঁহার সময় হইতে এই মতকে অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া আসিতেছেন।

অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। অপরাপর গ্রন্থে সাক্ষাৎভাবে 'এইডস্' তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয় নাই। আলোচনা করিয়া আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা এই :—

১। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে, 'এইডস্' মানবের চিন্তা ও বিচারের ফল। বহু বিষয় বিচার করিয়া তাহাদিগের মধ্যে যে সাধারণ ভাব পাওয়া যায়, তাহাই 'এইডস্'।

২। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে, কতকগুলি 'এইডস্' আত্মার মৌলিক ভাব। যেমন, সাদৃশ্য অসাদৃশ্য, ভালমন্দ, সুন্দর অসুন্দর ইত্যাদির ভাব। এইসমুদায় মৌলিক ভাব আছে বলিয়াই সত্যাসত্য, ন্যায় অন্যায়াদি বিচার করা সম্ভব।

৩। কোন কোন স্থলে বলা হইয়াছে, 'এইডস্' নিত্য ; আবার ইহাও বলা হইয়াছে, এইডস্ সৃষ্ট।

৪। কোন স্থলে বলা হইয়াছে, এইডস্ আত্মার অন্তরে : কোন কোন স্থল পড়িয়া মনে হইতে পারে, 'এইডস্' আত্মার বাহিরে এবং স্বর্গাদি লোকেরও বাহিরে।

৫। ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণের মধ্যে কেহ বলেন, 'এইডস্' একটি বস্তু (thing), কেহ বলেন, নহে। কেহ বলেন, ইহা মানবের চিন্তা, কেহ বলেন ঈশ্বরের চিন্তা, কেহ বা বলেন উভয়ই (Weber, Hist. Phil., p. 84)।

৬। প্লেটো কোন স্থলে বলিয়াছেন, ঈশ্বর জগতের কারণ ; আবার কোন স্থলে বলা হইয়াছে, 'মঙ্গল-রূপ' (মঙ্গলের এইডস্) জগতের কারণ।

৭। কেহ ব্যাখ্যা করেন, ঈশ্বর ও 'মঙ্গল রূপ' একই; কেহ বলেন না।

৮। কেহ বলেন, ঈশ্বর মঙ্গল-রূপ হইতে উৎপন্ন, কেহ বলেন 'মঙ্গলরূপ' ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। কেহ বলেন, ঈশ্বর 'মঙ্গল রূপ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; কেহ বলেন মঙ্গলরূপ ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; এবং কেহ বা বলেন—মঙ্গল-রূপ ঈশ্বরেরই অঙ্গীভূত, ঈশ্বরেরই আদর্শ।

৯। প্রেটো কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন 'এইডস্' আদর্শ রূপ; পার্থিব বস্তু ইহার নকল। আবার কোন স্থলে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এইডস্ পার্থিব বস্তুতে অল্পাধিক-পরিমাণে অনুপ্রবিষ্ট। আবার কোন কোন স্থলে আংশিকভাবে দুই মতেরই সমাবেশ দেখা যায়।

এত বিভিন্ন মত। কেহ বলেন, প্রেটো ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিতেন; কেহ বলেন—মত একই, তবে ইহার ক্রমবিকাশ হইয়াছে। কেহ বা বলেন, মধ্য সময়েই প্রেটো অপরিবর্ত্তিতভাবে একই মতে বিশ্বাস করিতেন। এ অবস্থায় প্রেটোর মতের ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। ব্যাখ্যা করিবার সময় অবিচারিতভাবে কিছুই বলা উচিত নহে এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ কি কি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক।

এখন দেখা যাউক গ্রন্থকার প্রেটো বিষয়ে কি বলিয়াছেন। 'এইডস্'-বাদ বিষয়ে তাঁহার প্রধান প্রধান মন্তব্য এই :—

১। গ্রন্থকার বলিয়াছেন "স্ফোট-সমূহ ঈশ্বর [ঈশ্বরের?] বা মানবের মনন নহে" পৃঃ ১৯৫।

এ বিষয়ে কত মতভেদ তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

২। 'এইডস্' "আদিরূপ (archetypes)", পৃঃ ১৯১। 'স্ফোট-সমূহের একটি স্বতন্ত্র পরম সত্তা আছে; উহারা স্বয়ম্ভূ", পৃঃ ১৯৪।

হাঁ, ইহাও একটি মত। কিন্তু প্রেটো ইহাও বলিয়াছেন, "এইডস্" সৃষ্ট (সাধারণ তন্ত্র ৫৯৭)। ইহা আমাদিগের গ্রন্থকারের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় নাই; ইহাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন।

৩। গ্রন্থকার বহুস্থলে বলিয়াছেন যে 'এইডস্' সমূহ 'পদার্থ', 'বস্তু', 'সত্তা' (পৃঃ ১৮৬, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭ ইত্যাদি)। এই তিনটি শব্দের নানা অর্থ; আমরা বুঝিয়াছি গ্রন্থকার প্রচলিত অর্থেই এই সমুদায় ব্যবহার করিয়াছেন। সমুদায় গুলিরই অর্থ, অন্ততঃ ইহার একটি শব্দেরও অর্থ things কিম্বা hypostatised entities, আলোচনা করিয়া দেখান গিয়াছে যে এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ। Stewart তাঁহার Plato's Doctrine of Ideas নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, যে 'এইডস্' কে thing (অর্থাৎ পদার্থ বা বস্তু) বলা যায় না।

৪। গ্রন্থকার বলেন, সমুদায় পদার্থ এইডস্ সমূহের "অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে।" পৃঃ ১৯৫।

এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এই সমুদায় বস্তু এইডস্ সমূহের 'অংশভাক্' (পৃঃ ১৯৫)।

প্রেটোর গ্রন্থে এই দুইটি মতই পাওয়া যায়; কিন্তু এ দুইটি পৃথক্ মত, একমত নহে। অনেকে এমন ভাবে প্রেটোর মতকে বর্ণনা করিয়াছেন যেন এই দুই মতে কোন পার্থক্য নাই। আমাদের গ্রন্থকারও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এ পার্থক্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রকৃত কথা এই—যে স্থলে একটি জগৎ আদর্শ, আর একটি জগৎ তাহার অনুকৃতি, সে স্থলে দুইটি জগতের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু যখন বলা হয় এক অপরের অংশভাগী, তখন স্বীকার করা হয় যে উভয় জগতের মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে। (Burnet: Greek Philosophy, p.166)।

Adam (Republic, Vol. ii, p. 173), Archer-Hind (Phaedo, 100D) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থকার এবিষয়ে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করেন নাই; ইহাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন।

(৫) গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন—"প্রেটোর স্ফোটবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অভিন্ন; স্ফোটবৃন্দই শাশ্বত দেবকুল এবং স্ফোট-শিরোমণি পরম শিবই ঈশ্বর"। পৃঃ ২১৬।

এই অংশ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আমাদিগের বক্তব্য এই :—

(ক) গ্রন্থকার বলিতেছেন ঈশ্বর বর্ত্তমান এবং সেই সঙ্গে শাশ্বত দেবকুলও বর্ত্তমান। যে-মতে ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় 'শাশ্বত' সত্তার স্থান আছে, সে মত কি ব্রহ্মবাদ? ভারতীয় ব্রহ্মবাদ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহার অর্থ ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তুই নাই। ব্রহ্মবাদ সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতগন্ধবিবর্জ্জিত।

(খ) তিনি অপরস্থলে বলিয়াছেন জড় অসৃষ্ট। "জড় বস্তুতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল"। পৃঃ ১৯৯।

এ স্থলেও বলা হইয়াছে যে, প্রেটো দ্বৈতবাদী।

(গ) গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, মানবাত্মাও "অজ, নিত্য, শাশ্বত" পৃঃ ২০৩; (২০৫ দ্র)।

ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য অজ নিত্য শাশ্বত মানবাত্মা বর্ত্তমান। ইহা ঘোর দ্বৈতবাদ—অথচ গ্রন্থকার বলিতেছেন—প্রেটো ব্রহ্মতত্ত্বই শিক্ষা দিয়াছেন!

(ঘ) গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন, "ঈশ্বর অলঙ্ঘ্য নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং তদ্দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত হইয়া, (পূর্ব্বোক্ত অর্থে) জগৎ সৃজন করিলেন"। পৃঃ ১৯৯।

প্রেটোর মতে ঈশ্বর এক, নিয়তি অন্ধ। এই নিয়তি অলঙ্ঘ্য। ইহার সহিত ঈশ্বরকে সংগ্রাম করিতে হয়। এবং যে অর্থেই হউক ঈশ্বরকে নিয়তি দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহতও হইতে হয়।

এ যে ঘোর দ্বৈতবাদ! কিন্তু গ্রন্থকার বলিতেছেন, প্রেটোর মত ব্রহ্মবাদই।

(ঙ) আর তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেই বলিয়াছেন যে, প্রেটো দ্বৈত-বাদী। একস্থলে লিখিয়াছেন—"সৃষ্টির মূলে দুইটা কারণ স্বীকৃত হইতেছে।......প্রেটোর দর্শনে স্ফোটজগৎ ও জড় জগৎ দুই-ই অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কাজেই তিনি দ্বৈতবাদ পরিহার করিতে পারেন নাই"। পৃঃ ২০০।

অথচ তিনি বলিতেছেন প্রেটোর মত ব্রহ্মতত্ত্বই।

(চ) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেও বলা হইয়াছে, "পরম শিব......ঈশ্বর (উপনিষদের ব্রহ্ম)"। পৃঃ ৪৮৩

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে গ্রন্থকার বলেন যে, পরম শিবের সঙ্গে সঙ্গেই 'শাশ্বত' 'স্ফোটবৃন্দ' বর্ত্তমান। এই 'পরম শিব' 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নহে—তবে ইহা কি প্রকারে ব্রহ্মপদবাচ্য হইবে?

(ছ) গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "স্ফোটবৃন্দই শাশ্বত দেবকুল"। পৃঃ ২১৬ এই ভাষা অত্যন্ত আপত্তিজনক। এই কথিত কেবল অর্থহীন নহে—ইহা ভ্রমোৎপাদক। আদর্শ সংযম, আদর্শ সাহস প্রভৃতি কি দেবতা? আর ফাইড্রস্ নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জেয়ুস এবং দেবগণই এই সমুদায় রূপ (গ্রন্থকারের ভাষায়, এই সমুদায় স্ফোট) দর্শন করেন (২৪৬—২৪৭)।

(ক) গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "স্ফোটবাদের নামান্তর অধ্যাত্মবাদ" পৃঃ ১৯৭

তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'স্ফোট' সমূহ 'স্বতন্ত্র' 'নিত্য,' 'শাশ্বত,' 'স্বপ্রতিষ্ঠ' 'অন্ত-নিরপেক্ষ'। ইহাদিগের অস্তিত্ব পরমাত্মার উপরও নির্ভর করে না। এসমুদায় পরমাত্মার কিংবা জীবাত্মার কাহারও সৃষ্টি নহে, কাহার মননও নহে। আত্মার সহিত ইহাদিগের কোন সম্পর্কই নাই। তবে এমত অধ্যাত্ম-বাদ হইবে কি প্রকারে? Subjective Idealism, Objective Idealism, Absolute Idealism ইত্যাদি যত প্রকার Idealism আছে, কোন Idealism-এই গ্রন্থকার-বর্ণিত স্বতন্ত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ, অন্ত-নিরপেক্ষ 'স্ফোটবৃন্দের' স্থান নাই।

কিন্তু যাঁহারা 'এইডস্' সমূহকে মানবাত্মার বা পরমাত্মার চিন্তা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা অবশ্যই প্লেটোর মতকে একশ্রেণীর অধ্যাত্মবাদ বলিতে পারেন। কিন্তু গ্রন্থকার 'এইডস্'-বাদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্ তত্ত্ব। ইহা এক৫ সম্বন্ধ-বাদ।

Taylor বলেন, "Plato's theory of Ideas as the t objects of knowledge is not at all a doctrinc Idealism" (Plato, p. 43). তিনি ইহার নাম দিয়াছেন 'C ceptual Realism', p. 43. অনেকে এই মত পোষণ করেন।

গ্রন্থকার যেভাবে প্লেটোর 'এইডস্' বাদের ব্যাখ্যা করিয়া তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তিনি সামঞ্জস্য না ক কয়েক স্থলে বিরোধী মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন; অনেক প্লেটোর মত এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় এ ব্য যেন সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন

অদ্য এই স্থলেই প্রবন্ধ শেষ করিতে হইল। তৃতীয় প্রবন্ধে অবা বিষয় আলোচিত হইবে।

কবির খেয়াল

শ্রী রামেন্দু দত্ত

এত যে ব্যাকুল মধু-সঞ্চয়ে অলিকুল—
মধু কি অলিরে চাহে?
চাতক আকুল মেঘের সলিল পিইতে যে—
মেঘ পুলকিত তাহে?
জ্যোৎস্না কি কভু চকোরের তরে
বিরহীর মত গোপনে গুমরে?
মরালের তরে আগমনী কেহ
মানসের সরে গাহে?

ব্যগ্র কি কভু উদার উদাস অম্বুধি
চটুলা তটিনী লাগি'?
ময়ুর-মাতন নেহারি', শ্রাবণ-অম্বুদে
রহে কি পুলক জাগি'?
উঠিবার আগে প্রভাত-তপন
নলিনী-দলের দেখে কি স্বপন?
বরষা কি কভু অপেখিয়া রহে
দাদুরীর ডাক মাগি'?

প্রভুর সমদৃষ্টি

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

ধৈর্য্য ধরিতে পার নাকি মন,—
দেখ না কি সেই জন
পতঙ্গ, কীট, বিহঙ্গ, পশু,—
তত্ত্ব সবার ল'ন?
জঠর-নিবাসে থাকিলেও জীব,
সংবাদ ল'ন তার,
বিস্মৃত তিনি হবেন কেমনে
যাহারা আছয়ে বা'র!
প্রভুর হাসির আলোক হইতে
দূরে কেন যাও ভাই?
প্রিয়তমে ছাড়ি' অন্তে ধেয়াও,
সকলি ব্যর্থ তাই।



[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে, উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। সমালোচিত পুস্তক সম্বন্ধে মতামতের প্রতিবাদ বা সমালোচনা সাধারণতঃ ছাপা হয় না। সম্পাদক।]

"মহাভারত ও আচার্য্য বসুর আবিষ্কার"

(১)

পৌষের প্রবাসীতে "মহাভারত ও আচার্য্য বসুর আবিষ্কার" পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। কোন অজ্ঞাতনামা পত্র-লেখকের কথায় মহাভারতে বৃক্ষজীবনের কোন কথাই নাই সিদ্ধান্ত করিয়া সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় অবাধে কলম চালাইয়া গিয়াছেন! "যিনি এই চিঠিটি লিখিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি" থাকিতে পারে, কিন্তু (মহাভারত পড়া দূরে থাক্) তিনি বোধ হয় বাংলা ভাষার একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিক এই প্রবাসী পত্রিকাটিও নিয়মিত পাঠ করেন না। মহাভারত হইতে কোন তত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়াও সম্পাদক মহাশয় যদি প্রবাসীর পুরাণ ফাইলের কথা একবার স্মরণ করিতেন, তাহা হইলেই আর তাঁহাকে এ অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইত না। মহাভারত-আদি হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থে যে বৃক্ষজীবনের কথা আছে, সে-সম্বন্ধে এই প্রবাসীতেই একাধিক লেখা বাহির হইয়াছিল; আর তাহাও কিছু দশ-বিশ বৎসর পূর্ব্বে নহে—এই সেদিন।

গত ১৩২৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে "উদ্ভিজ্জে চৈতন্য" (৭৮৬ পৃষ্ঠা) নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাভারতে বৃক্ষজীবন-সম্বন্ধে আলোচনার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাভারত-কারের মতে বৃক্ষাদির সমুদয় ইন্দ্রিয়ই আছে এবং ইহারা সচেতন"। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "বৃক্ষাদি যে চৈতন্য-বিশিষ্ট ভারতীয় পাঠকগণের নিকট তাহা নূতন কথা নহে। ....এ-সমুদয় কথা লইয়া অনেকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সাধকগণের বিশ্বাস যে, তাঁহারা বৃক্ষের চৈতন্য দর্শন করেন।......বিজ্ঞান-জগতের পরম সৌভাগ্য যে ডাক্তার বসু ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডাদি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলে এ-সমুদয় বিষয়ে তাঁহার কোন কল্পনাই আসিত কি না তাহা কে জানে? অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে (১৩২৮—১৯৯ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিশ্বাস পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি সুস্পষ্ট ...। আপনার প্রবন্ধকারেরা শান্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু বৃক্ষলতার যে হিতাহিত বিবেচনা আছে, কোন্ কার্য্য হিতকর কোন্ কার্য্য অহিত তাহা বুঝিবার যে সামর্থ্য আছে—তাহা ভীষ্ম অতি বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।"

মহেশবাবুর বক্তব্যে ও বঙ্গবাসীর মন্তব্যে মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই! এক অমূলক কথার উপর নির্ভর করিয়া অধিকাংশ পাঠকের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থসমূহের প্রতি বিদ্রূপাত্মক আঘাত করা প্রবাসীর উপযুক্ত সম্পাদকের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

শ্রী অচিন্ত্যানন্দ রায়

—

"মহাভারত ও আচার্য্য বসুর আবিষ্কার।"

(২)

পৌষ মাসের "প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় নোটে" যে "একটি...টিপ্পনী" প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সুরটি আমাদের ভাল লাগিল না। 'প্রবাসীর' সৌজন্যে 'বঙ্গবাসীর' প্রবন্ধটি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। ইহাতে আচার্য্য বসু-মহাশয়ের অসম্মান বা অগৌরবের কথা কিছুই নাই। পরন্তু প্রবন্ধকার আচার্য্যের আবিষ্কৃত তথ্যের যথাযথ উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহার "আবিষ্কারের বিশেষত্ব"ও দেখাইয়াছেন। বোধ হয়, প্রবন্ধকারের অপরাধ, তিনি লিখিয়াছেন "... হিন্দুর উপনিষদ্ শাস্ত্র এবং পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি জানাইয়া দিয়াছেন, বৃক্ষেরও জীবজন্তুর মত ইন্দ্রিয় আছে এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল।" আমাদের মনে রাখার ভুল যদি না হয়, আচার্য্য বসু-মহাশয়, তাঁহার "মাত্রে" (To mother) উৎসর্গীকৃত পুস্তকের (Response in the Living and Non-living) সূচনাতে স্বয়ংই মুক্তকণ্ঠে খ্যাপন করিয়াছিলেন, যে, তিনি যে তথ্য প্রকাশ করিলেন, তাহা যুগযুগান্ত পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণ ভাগীরথীতীরে গাহিয়া গিয়াছেন।

"বাংলা সাহিত্যে...খুব প্রসিদ্ধি" সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার সহায় হইতে পারে না। আর আর্য্যশাস্ত্রে "জড়বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব" বর্ণিত আছে কি না, তাহার আলোচনার স্থলও ইহা নহে। প্রসঙ্গক্রমে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠে জানা যায়, মহর্ষি নারদ যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 'ভূতবিদ্যা" (Physical Science) তাহাদের অন্যতম। Sir William Jonesও তাঁহার দশম প্রবচনে (Discourse x) লিখিয়াছেন: "এদেশে জড়বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের অনুশীলন স্মরণাতীতকাল ধরিয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়—এসকল বিষয়ে উপাদেয় সংস্কৃত আলোচনা দেখিতে পাইবার আশা করা যায়—কারণ প্রাচীন হিন্দুগণ ঐ মনোমুগ্ধকর শিক্ষায় নিঃসন্দেহই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন" ("Physics appears in these regions to have been cultivated from time immemorial, as well as Chemistry, on which we may hope to find useful disquisitions in Sanskrit, since the old Hindus unquestionably applied themselves to that enchanting study")। উদারচেতাঃ য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক Tunzelmannও লিখিয়াছেন: "যদ্যপি বৈদিক বিশ্বপ্রকরণ আধুনিক জড়বিজ্ঞানের বিশ্বপ্রকরণের সহিত সবিশেষ বা সর্ব্বাংশে তুলনাসহ নহে,—আর সেরূপ প্রত্যাশা করাও চলে না,—তথাপি উভয়ের স্থূল রেখা-পাতের সাদৃশ্য, এমন-কি প্রথম দৃষ্টিতেই, নিরতিশয় কৌতুকাবহ। উক্ত সাদৃশ্য আরও অধিকতর কৌতুকাবহ হইয়া উঠে যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, শক্তি (force) সংজ্ঞায় অভিহিত ভূশ অব্যপদেশ্য—অনির্দ্দিষ্ট বৈদিক পরিকল্পনায় (concept) সামঞ্জস্য, আধুনিক সক্রিয় শক্তির

(force) অপেক্ষা অক্রিয় শক্তির (energy) পরিকল্পনার সহিতই অধিকতর। এবং (বৈদিক বিশ্বপ্রকরণে) যখন সক্রিয় শক্তির (force) স্থলে অক্রিয় শক্তি (energy) এইপদ অধিষ্ঠিত হয়, তখন জড়বিজ্ঞানানুশীলনের আধুনিকতম বিকাশব্যঞ্জক বাদের সহিত বৈদিক সৃষ্টি বিবর্তবাদ একাত্মক বা অভিন্ন হইয়া পড়ে।" (Although the Vedic scheme of the universe does not and could not be expected to bear detailed comparison with that of modern physical science, the similarity of their broad out-lines is extremely remarkable, even at first sight. It becomes still more so when we take note of the fact that the very indefinite Vedic concept designated by the term force corresponds far more with the modern concept of energy than with that of force, and when the term energy is substituted for force, the Vedic scheme of development becomes identical with one which expresses the most recent development of physical research")

'প্রবাসীর' পত্র-লেখক মহাশয় জানিতে উৎসুক, "বৃক্ষ জীবনের সকল রহস্য" মহাভারতের কোথায় আছে। দুঃখের বিষয় তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আমরা উপস্থিত অক্ষম। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে মূল মহাভারতখানি পড়িয়াছিলাম; "বাল্যকাল হইতে" "পড়িয়া আসিবার" সৌভাগ্য হয় নাই। আর মহাভারতখানিও এখন হাতের কাছে নাই। যাহা হউক, তিনি যদি মহাভারতের অন্ততঃ শান্তিপর্ব্বটি আর-একবার পড়েন ত বৃক্ষ-জীবনের অনেক রহস্যের বর্ণনা দেখিতে পাইবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুস্তকান্তরে উদ্ধৃত এই কয়টি শ্লোক আমরা তাঁহাকে "উপহার" দিলাম:

উষ্মতো ম্লায়তে পর্ণং ত্বক্ ফলং পুষ্পমেবচ।
ম্লায়তে শীর্য্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে॥
বায়্বগ্ন্যশনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্য্যতে।
শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ॥
বল্লী বেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্ব্বতশ্চৈব গচ্ছতি।
নহ্যদৃষ্টশ্চ মার্গোঽস্তি তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ॥
পুণ্যাপুণ্যৈস্তথা গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বিবিধৈরপি।
অরোগাঃ পুষ্পিতাঃ সন্তি তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ॥
পাদৈঃ সলিলপানাচ্চ ব্যাধীনাঞ্চাপি দর্শনাৎ।
ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ত্বাচ্চ বিদ্যতে রসনং দ্রুমে॥
বক্ত্রেণোৎপলনালেন যথোর্দ্ধ্বং জলমাদদেৎ।
তথা পবনসংযুক্তঃ পাদৈঃ পিবতি পাদপঃ॥
সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাৎ ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণামচৈতন্যং ন বিদ্যতে॥ শান্তিপর্ব্ব মহাভারত।

অনুবাদ

"উত্তাপসংস্পর্শে পত্র, ত্বক্, ফল এবং ফুলও ম্লান হইয়া যায়; ম্লান হয়, শীর্ণও হয়; অতএব বৃক্ষে স্পর্শশক্তি আছে। বায়ু, অগ্নি, ও বজ্রপাতের শব্দে ফল ও ফুল বিশীর্ণ হয়; শব্দ শ্রোত্র দ্বারা গৃহীত হয়; অতএব বৃক্ষে শ্রবণ শক্তি আছে। লতা বৃক্ষকে বেষ্টন করে, এবং সর্ব্বত্র গমন করে; দৃষ্টিহীনের পথজ্ঞান হয় না; অতএব বৃক্ষে দর্শনশক্তি আছে। ভালমন্দ গন্ধ ও বিবিধ ধূপের প্রয়োগে বৃক্ষ রোগহীন ও পুষ্পযুক্ত হয়; অতএব বৃক্ষে ঘ্রাণশক্তি আছে। মূল দ্বারা সলিল পান হেতু বৃক্ষে ব্যাধি ও ব্যাধির প্রতিক্রিয়া দেখা যায়; অতএব বৃক্ষে রসগ্রহণ শক্তি আছে। যেরূপ কেহ মুখ দিয়া পদ্মের মৃণালের মধ্যে উর্দ্ধ দিকে জল টানিয়া লইতে পারে সেইরূপ বায়ুসহযোগে বৃক্ষ মূল দিয়া জল পান করে। বৃক্ষ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে; ছিন্ন অংশ পূর্ণ করে, অতএব বৃক্ষসকলকে আমি সজীব দর্শন করি; ইহারা অচেতন নহে।"

উদ্ধৃত শ্লোক কয়টিতে বলা হইল, বৃক্ষের "চেষ্টা" (vital activity) আছে; "ইন্দ্রিয়" অর্থাৎ স্পর্শাদি শক্তি (sensibility) আছে এবং "অর্থ" অর্থাৎ সুখদুঃখের বোধ (feeling of pleasure and pain) আছে। এক কথায় জীবশরীরের মৌলিক সকল লক্ষণই অস্ফুটভাবে বৃক্ষে বর্ত্তমান আছে। মহামুনি গৌতম শরীরের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ (ন্যায়সূত্র ১।১।১১), শরীর চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থের আশ্রয়। শঙ্কর মিশ্রও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বৃক্ষের জীবন ও মরণ ব্যতীত, নিদ্রা, জাগরণ, ভেষজ প্রয়োগ, বংশবিস্তার অনুকূল বস্তুর অভিমুখে গমন, প্রতিকূল বস্তু হইতে দূরে গমন, ভগ্ন ও ক্ষত সংরোহণ ইত্যাকার বিবিধ ক্রিয়া ও ব্যাপার আছে (বৈশেষিকসূত্রোপস্কার ৪।২।৫।) সুতরাং প্রাণের দিক্ দিয়া বৃক্ষশরীরের ও উচ্চতর প্রাণী শরীরের জাতিগত ভেদ নাই; প্রভেদ কেবলমাত্র ক্রমবিবর্ত্তনের। অতএব শারীর যন্ত্র যথা পরিপাক যন্ত্র, শ্বাস যন্ত্র, রসসঞ্চালন যন্ত্র, কি বৃক্ষ কি উচ্চতর শরীরে কোন-না-কোন আকারে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহাও স্মর্ত্তব্য যে সৃষ্টি বিধানে ক্রিয়াই যন্ত্রের নির্ম্মাতা—"Function creates structure." শরীরের ধারণ-পোষণই এইসকল যন্ত্রের কার্য্য। প্রাণ-শক্তিই এইসকল শরীরে অহরহ ক্রিয়া করিতেছে। প্রাণের বিষয়ে অনেক তথ্য মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বেও দেখা যায়। আবার এই যে স্থূল শরীর ইহা সর্ব্বত্রই সমান অর্থে "অন্নময়"—আহার দ্বারা বিধৃত অন্নের সূক্ষ্মতম অংশই মনঃ (brain) 'অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।' সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রের ইহাও শিক্ষা যে বৃক্ষের মনঃ (brain) ও আছে। মহামতি Darwinও এ-কথা একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন, "উদ্ভিদের মূল প্রাণীর মস্তিষ্কের ন্যায় বিচারক্ষম (The root of a plant is as intelligent as the brain of an animal)। প্রাণের ক্রমিক বিকাশ যতই অগ্রসর হইয়াছে ততই এইসকল যন্ত্র পিণ্ডীকৃত (formed, massed) ও দেশাবচ্ছিন্ন (localised) হইয়া উঠিয়াছে; নিম্নস্তরে উদ্ভিদের শরীরে, উহারা ব্যাপকভাবে (diffused) পড়িয়া আছে। উদ্ভিদের চৈতন্য তমসাচ্ছন্ন; "প্রাণী"-শরীরে চৈতন্য স্ফুটতর হইতে স্ফুটতম অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে।

মহাভারত, দর্শন, জ্যোতিষ বৈদ্যকশাস্ত্রাদিতে অবান্তরভাবে প্রসঙ্গ-ক্রমে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার কোন-কোন অংশের উদ্ধার, উল্লেখ, সংক্ষেপ বা সারসংকলনমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ-সকল শাস্ত্র উদ্ভিদ্‌বিদ্যার শাস্ত্র নহে। যতটুকু নিদর্শন অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নহে যে প্রাচীন আর্য্যগণ উদ্ভিদ্‌বিদ্যারও চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন।

গয়া। ১২ই পৌষ, ১৩৩২। শ্রীনন্দলাল সিংহ।

সম্পাদকের মন্তব্য

আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে আমি যে চিঠিটি ছাপিয়াছিলাম, তাহা ছাপিবার জন্য আমিই দায়ী; যিনি লিখিয়াছিলেন, তিনি বিন্দু-মাত্রও দায়ী নহেন। অতএব তাঁহার যে সমালোচনা হইয়াছে, তাহার জন্য আমি দুঃখিত।

মহাভারতের এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। আমার লিখনভঙ্গীতে কেহ অশ্রদ্ধার চিহ্ন দেখিয়া থাকিলে আমি তজ্জন্য দুঃখিত। আমার ধারণা আমি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই। যাহা বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তক নহে, তাহাতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব না থাকিলে তাহাতে তাহার অগৌরব হয় না।

পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা যাহা লিখিয়াছেন, মোটামুটি সেইরূপ জিনিষ আমি কোন-না-কোন সময়ে পড়িয়াছিলাম, এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াও যাই নাই। আমার 'সুর' ও লিখনভঙ্গীতে কেহ বেদনা বোধ করিয়া থাকিলে আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিব না। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য প্রত্যাহার করিতে আমি অক্ষম। বিজ্ঞান বলিতে, বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান বলিতে, বর্ত্তমান সময়ে যাহা বুঝায়, মহাভারতের মত মহাকাব্য এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশপূর্ণ গ্রন্থে বা তদ্বিধ অন্যান্য গ্রন্থে তাহা নাই, ইহাই আমার বক্তব্য ছিল। কল্পনা, অনুমান, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের সাহায্য অবশ্যই করে; কিন্তু কেবল কল্পনা, অনুমান, প্রভৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহাকে আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান বা জড়বিজ্ঞান বলা যায় না। এই জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের জন্য মহাভারতাদি শাস্ত্র পঠিত হয় না; ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্য ও কাব্যরসাস্বাদ নিমিত্ত পঠিত হয়। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে, বা অন্য কোন জাতীয় শিক্ষায়তনে, জড়বিজ্ঞান শিখিবার বা শিখাইবার জন্য মহাভারতের মত গ্রন্থ বা উহার কোন অংশ অধীত হয় না। তাহাতে ঐ অমূল্য গ্রন্থের কোন অগৌরব হয় না।

হিন্দুরা কোন বিজ্ঞানই জানিতেন না, বা তাঁহাদের কোন গ্রন্থেই কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চিত নাই, ইহা আমি মনে করি না, বলিও নাই। আমি জানি, যে, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সঞ্চিত আছে। কিন্তু কাব্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ মনে করা ভুল, ইহা আমার অন্যতম বক্তব্য।

আমি পরিহাস করিতে গিয়া আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট করিতে পারি নাই, তাহার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু ইহা বলাও আমি দরকার মনে করি যে, অন্য কোন কোন প্রাচীন জাতির কাব্যাদিতে এমন অনেক কল্পনা ও অনুমান আছে, যাহা বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টায় প্রত্যক্ষ সত্যের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সেইসব প্রাচীন জাতির বর্ত্তমান বংশধরেরা মনে করেন না, যে, এই সত্যগুলি বৈজ্ঞানিক আকারে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। গ্রীকদের প্রাচীন গ্রন্থে ডীডেলস্ ও তাহার পুত্র আইকেরসের আকাশে উড়িবার কথা আছে। কিন্তু তজ্জন্য বর্ত্তমান গ্রীকেরা মনে করেন না, যে, প্রাচীন গ্রীকেরা এরোনটিক্‌স্ ও এরোডাইন্যামিক্‌স্ নামক বিজ্ঞানদ্বয়ের কিছু বা সব-কিছু জানিতেন।

একদিকে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিজ্ঞানের কিছুই জানিতেন না, মনে করা যেমন অতিশয় মূর্খতা; তেমনই, অন্য দিকে, আজ কাল যাহা-কিছু আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত হইতেছে, সবই আমাদের প্রাচীন কাব্য ও শাস্ত্রাদিতে আছে, মনে করাও ভুল।

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যানন্দ রায় লিখিয়াছেন, "মহাভারতে বৃক্ষজীবনের কোন কথাই নাই সিদ্ধান্ত করিয়া" আমরা অবাধে কলম চালাইয়াছি। এরূপ কোন সিদ্ধান্তে আমরা বিশ্বাস করি না। মহাভারতে বৃক্ষজীবনের কথা ও "রহস্য" আছে, আমরা জানিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। তাহা পরে বলিব। "মহাভারতে বৃক্ষজীবনের সকল রহস্যই বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে, হিন্দুকে জড়-বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।" "বঙ্গবাসী"র এই-দুটি উক্তিকে আমরা ভ্রান্ত মনে করিয়াছিলাম, এবং এখনও করি; সেইজন্য তাহা লইয়া পরিহাস করিয়াছিলাম। জড়-বিজ্ঞানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কোন আবিষ্ক্রিয়া হইবার পর, তাহা সংস্কৃত বহিতে আছে বলা সহজ; কিন্তু কেবল সংস্কৃত বহি পড়িয়া জড়-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে কে কি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বা করেন, জানিতে ইচ্ছা করি। বিজ্ঞান এবং জড়বিজ্ঞান সমার্থক নহে, তাহাও মনে রাখা দরকার।

জড়বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ, পুস্তিকা, পুস্তক এখনও প্রতিদিন অনেক বাহির হইতেছে। তাহার "সকল রহস্যই" মহাভারত পাঠ করিলে জানা যায়, বা "তাহা পাঠ করিলে" "হিন্দুকে জড়বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না," এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া যাঁহারা আরাম পান, তাঁহাদের সুখে ব্যাঘাত দিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু আশা করি, এরূপ হিন্দুও বিস্তর আছেন, যাঁহারা এত সহজে আত্ম-প্রতারিত হন না।

শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহ এরূপ অনেক কথা বলিয়াছেন, যাহা ঠিক প্রাসঙ্গিক নহে। হিন্দুরা বিজ্ঞানের বা জড়বিজ্ঞানের কিছুই জানিতেন না, ইহা আমরা বলি নাই। সুতরাং, তাহা আমরা বলিয়াছি, ধরিয়া লইয়া, কিছু লিখিবার আবশ্যক ছিল না। তাঁহার প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের সমালোচনা করা দুঃসাধ্য নহে; কিন্তু বাহুল্যভয়ে ও প্রয়োজন না থাকায় করিলাম না। যাহা লইয়া এই বাদ-প্রতিবাদের উৎপত্তি, কেবল সেই বিষয়েই কিছু লিখিতেছি। স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্‌, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ, বা অন্য কেহ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আলোচ্য বিষয় নহে; মহাভারতে বৃক্ষজীবনের "সকল" রহস্য অর্থাৎ সত্য ও বৈজ্ঞানিক রহস্য এবং জড়বিজ্ঞানের সব কথা আছে কি না, তাহাই মূল বিবেচ্য বিষয়। এবিষয়ে শান্তি পর্ব্ব হইতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিতেছি।

"উত্তাপ-সংস্পর্শে পত্র, ত্বক্, ফল এবং ফুলও ম্লান হইয়া যায়; ম্লান হয়, শীর্ণও হয়; অতএব বৃক্ষে স্পর্শ-শক্তি আছে।" কাগজও উত্তাপ সংস্পর্শে ম্লান হয়, কোঁকড়াইয়া যায়, ইত্যাদি। কিন্তু তজ্জন্য, কাগজের স্পর্শ শক্তি আছে, ইহা কেহ বলে না। বস্তুতঃ বৃক্ষের স্পর্শশক্তির প্রমাণ বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উহার স্পর্শশক্তি প্রমাণিত হয় না। যাহাকে স্পর্শশক্তি-জাত বলা হইয়াছে, তাহার কারণ অন্য। বৃক্ষের শ্রবণশক্তি নাই; বায়ুতে এবং বজ্রপাতের শব্দে ফল ও ফুল বিশীর্ণ হয়, ইহাও সত্য নহে। লতা যে বৃক্ষকে বেষ্টন করে, বৃক্ষের দর্শন-শক্তি তাহার কারণ নহে, অন্য কারণ আছে। সুতরাং উহার দ্বারা বৃক্ষের দর্শনশক্তি প্রমাণিত হয় না। দৃষ্টিহীনের পথজ্ঞান হয় না, ইহাও ঠিক্ নহে; কেননা, অন্ধেরাও যষ্টির সাহায্যে পথ চিনিয়া চলে। ভালমন্দ গন্ধ ও বিবিধ ধূপের প্রয়োগে বৃক্ষ রোগহীন ও পুষ্পযুক্ত হয় না। বৃক্ষের ঘ্রাণশক্তিও নাই। যেরূপ কেহ মুখ দিয়া পদ্মের মৃণালের মধ্যে ঊর্দ্ধদিকে জল টানিয়া লইতে পারে, সেইরূপ বায়ু সহযোগে বৃক্ষ মূল দিয়া জল পান করে না। বৃক্ষের মূল হইতে উচ্চতম পত্রাগ্র পর্য্যন্ত রসসঞ্চারের বৈজ্ঞানিক কারণ অন্যবিধ। তাহা চুমুক দিয়া জলপানের সদৃশ নহে। মানবাদি প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা যেরূপে রক্তসঞ্চালন হয়, বৃক্ষদেহে রসসঞ্চালন সেইপ্রকারে হয়। তাহা আচার্য্য বসু প্রণীত The Physiology of the Ascent of Sap নামক প্রায় তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকে লিখিত আছে। উহাতে নানাবিধ পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের বর্ণনা এবং ৮৩ খানীর ৯৫টি চিত্র আছে। বৃক্ষ সুখ ও দুঃখ অনুভব করে না। বৃক্ষলতার হিতাহিত জ্ঞানও নাই।

যাঁহারা মনে করেন, সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের আবশ্যক নাই, তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে আমরা অনিচ্ছুক। কোন ঘটনার বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ব্যাপারের কারণীভূত নিয়ম যতক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণাদি দ্বারা নির্দ্ধারিত না হয়, ততক্ষণ কেবলমাত্র তথ্যগুলি বিজ্ঞান-নামধেয় হয় না। যেমন, এলোপ্যাথী চিকিৎসক বড় বড় ডাক্তারেরা বলেন, যে, তাঁহাদের অনেক ঔষধে ব্যারাম সারে ; কিন্তু কেন সারে তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ, নিয়ম ও প্রণালী এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া এলোপ্যাথীর অনেক অংশকে তাঁহারা এম্পিরিক বা অভিজ্ঞতালব্ধ বলেন, বৈজ্ঞানিক বলেন না।

প্রাচীন সংস্কৃত কোন কোন গ্রন্থে তথ্যহিসাবে নির্ভুল যে-সব কথা আছে, তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং মূলীভূত বৈজ্ঞানিক নিয়ম, প্রণালী ইত্যাদি বর্ণিত না থাকিলে তৎসমুদয়কে বৈজ্ঞানিক সত্য বলা যায় না। উপরে দেখাইয়াছি, শান্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত শ্লোক-গুলিতে তথ্যের ভুল এবং সিদ্ধান্তের ভুল উভয়ই আছে।

বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জড়বিজ্ঞান, কি, সে-বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু স্থানাভাবে আপাততঃ ক্ষান্ত হইতে হইল।

আচার্য্য বসু তাঁহার "প্ল্যান্ট্ রেস্পন্স্" বা উদ্ভিদের সাড়া নামক গ্রন্থ জননীকে উৎসর্গ করিয়াছেন। তাহাতে নন্দলাল বাবুর উল্লিখিত কথার অনুরূপ কিছু নাই। তৎপ্রণীত "রেস্পন্স্ ইন্ দি লিভিং এণ্ড্ দি নন্-লিভিং," বা "জীবে ও অজীবে সাড়া," নামক গ্রন্থে ঋগ্বেদের "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" বচনের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত আছে। তাহা নন্দলাল বাবুর উল্লিখিত কথা নহে। বসু মহাশয় ১৯০১ সালে লণ্ডনে রয়্যাল্ সোসাইটির সম্মুখে যে বক্তৃতা করেন, তাহা এই বলিয়া শেষ করেন :—

It was when I came upon the mute witness of these self-made records, and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things —......it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

'They who see but one, in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth—unto none else, unto none else !'

সম্ভবতঃ এই কথাগুলিই অশুদ্ধ আকারে নন্দলাল বাবুর মনে আছে। ইহাতে কিংবা অন্য কোথাও কিন্তু বসু মহাশয় বলেন নাই, যে, তিনি যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করিলেন, তাহা যুগযুগান্ত পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ ভাগীরথী তীরে গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছেন, যে, আর্য্যঋষিগণ যে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সত্য অনুভব করিয়াছিলেন, জড়বিজ্ঞানের পথ দিয়াও তিনি তাহার কিছু আভাস পাইয়াছেন।

জড়বিজ্ঞানের নানাগ্রন্থপূর্ণ বড় বড় লাইব্রেরী আছে। তাহার "সকল" কথাই মহাভারতে বা অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে আছে, ইহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কেমন করিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। কেবল উদ্ভিদবিদ্যার একটি-অংশ সম্বন্ধেই একা আচার্য্য বসুই সাতআট-খানি বড় বহি লিখিয়াছেন। তাহার শতাংশের একাংশ জড়বৈজ্ঞানিক কথাও মহাভারতে নাই। যাহা আছে, তাহার সমস্তটি নির্ভুল নহে, দেখা গিয়াছে। ইহাতে মহাভারতের বিন্দুমাত্রও অগৌরব হয় নাই ; কারণ, উহা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ নহে।

"প্রাচীন আর্য্যগণ উদ্ভিদ্‌বিদ্যারও চরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন," এরূপ সিদ্ধান্ত কেহ করিতে চাহিলে তাঁহার আধুনিক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের সব কথা জানিয়া এবং সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহার সত্যতা যন্ত্রাদি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া, তবে সেরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত। নন্দলালবাবু তাহা করিয়াছেন কি না, তাহা তিনি বলিতে পারিবেন। যে মনোভাব আমাদিগকে বিনা প্রত্যক্ষ প্রমাণে কোনও অনুমান বা কল্পনা বা তথ্যকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করিতে নিষেধ করে, তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষেও বিদ্যমান ছিল। এ-বিষয়ে সেদিন বসুমহাশয় বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :—

It may now be asked whether theological bias in India obstructed the pursuit of inquiry. The fact is well known that two different schools of thought flourished here side by side, one of which relied on faith and was supported by established authorities. The other based itself on pure reason, and refused to accept anything which could not be substantiated by demonstrable truth. It is remarkable that the unorthodox were in no way persecuted for their heresy.

খণ্ড খণ্ড কোন্ কোন্ তথ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন, তাহা তত প্রয়োজনীয় নহে ; তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের এবং যুক্তির মূল্য ও গৌরব পূর্ণ-মাত্রায় বুঝিতেন, ইহাই তাঁহাদের পরম গৌরবের বিষয়। কোন ধারণা, কল্পনা বা অনুমান যতক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া অনুভূত না হয়, ততক্ষণ তাহার সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দিহান থাকা বিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি। এইপ্রকার সংশয়প্রবণতা যে প্রাচীন আর্য্যদেরও মধ্যে ছিল, ইহা পরম গৌরবের বিষয়। কোন একটা গাছ বাঁচিয়া আছে, না মরিয়া গিয়াছে, ইহা নিরক্ষর লোকেরাও ভারতবর্ষে ও অন্য নানাদেশে বলে। সুতরাং উদ্ভিদের জীবন আছে, প্রাচীন আর্য্য জ্ঞানীরা যে ইহা বলিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর নহে। কিন্তু উদ্ভিদের ও প্রাণীর নানা সাদৃশ্য যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা, এবং সেইসব যন্ত্রেরও উদ্ভাবন করা কঠিন। ইহা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের সন্তান আচার্য্য বসু করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের অগৌরব না হইয়া গৌরববৃদ্ধিই হইয়াছে। পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিক ধারণা এই ছিল, যে, কেবল জীবদেহের টিশুসমূহেই অর্থাৎ উহার উপাদানীভূত তন্তুবৎ পদার্থেই স্নায়বিক-উত্তেজনা-পরিচালকতা, সঙ্কোচনশীলতা, এবং স্বতঃস্পন্দনশীলতা আছে, উদ্ভিদ্‌দেহের টিশুতে নাই। আচার্য্য বসুই প্রথমে conductivity, contractility এবং rhythmicity এই তিন গুণে উদ্ভিদের ও প্রাণীর সাদৃশ্য যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

—

রূপ ও আলাপ

প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভৈরব রাগ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সঙ্গীতশাস্ত্রানুমোদিত নহে। ভৈরব রাগের 'ম' বাদী ও 'প' সংবাদী কোন শাস্ত্রমতে হইতে পারে না। আশ্বিন মাসের সংখ্যায় বাদী, সংবাদী সম্বন্ধে সঙ্গীতরত্নাবলী হইতে যে

শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে বাদী সংবাদীর স্থূল অর্থ বুঝা যায়। নিম্নে শাস্ত্রানুমোদিত ভৈরব রাগের একটি আলাপ দেওয়া হইল।

গান্ধারাংশগ্রহন্যাসো গান্ধারাদিকমূর্চ্ছনা।
গীয়তে ভৈরবঃ প্রাতর্ইস্তুমন্মতকো বিদৈঃ॥

সা গা। গা। মগা রা । সা ন্‌সা সা ধা । ন্‌সা গা গা । মগা মধা । প মপা ধা না না ধা পা মপা গমা গা রা সা সন্‌া সগা।

গা মা পা ধা না র্সা র্গা রা সা না ধাপা মা সা ননা ধাপা মগা মগা রা । সা র্সা না ধাপা মগা মগা রা স সান্‌া সগা॥

স্বাঃ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য।
প্রধান অধ্যক্ষ, সঙ্গীতপরিষদ্ বিদ্যালয়।

—

অক্‌বরের শিক্ষা

অক্‌বর বাদশাহ নিরক্ষর বা শিক্ষিত ছিলেন, সে-সম্বন্ধে আমার আষাঢ় মাসের (প্রবাসী ৩৯৩ পৃঃ) প্রবন্ধের আশ্বিন মাসে (৮২৬ পৃঃ) একটি প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। এরূপ প্রতিবাদ না হইলে ঐতিহাসিক সত্য নিরূপিত হয় না, কিন্তু এ প্রতিবাদে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না, কারণ :—

১। অবুল ফজল এক স্থানে লিখিয়াছেন, অক্‌বরের কাছে যখন যে পুস্তক যতদূর পাঠ করা হইত, সেই স্থানে পুস্তকের গায়ে সম্রাট্ স্বহস্তে সংখ্যা লিখিয়া দিতেন। এই সংখ্যা সম্ভবতঃ তারিখ, কেননা পরে বলা হইয়াছে পাঠকদের পঠিত পাতার সংখ্যা গুণিয়া বেতন দেওয়া হইত। নিরক্ষর ব্যক্তি এরূপে যত দূর পাঠ হইল সেখানে সংখ্যা লিখিয়া রাখে না।

এখানে বলা উচিত যে ব্লকম্যান এই "হিন্দিসা" শব্দের বিকৃত অনুবাদ Geometrical figure করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দিসা শব্দের অনুবাদ সংখ্যা cardinal number হওয়া উচিত।

২। মহম্মদ কাসিম ফিরিশতা একজন অক্‌বরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক। তিনি ১৫৭০ ঈশাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে ইরানের অস্ত্রাবাদ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; পরে দাক্ষিণাত্যের প্রথমে আহমদনগরে, পরে (১৫৮৯) বিজাপুর রাজ সরকারে সামন্তের পদ পাইয়াছিলেন। যখন বিজাপুরের রাজকন্যার অক্‌বর-পুত্র মির্জা দানিয়ালের সহিত বিবাহ (১৬০৪) হয় তখন তিনি রাজকন্যার দেহ-রক্ষী দলে ছিলেন। অক্‌বরের মৃত্যুর পর (১৬০৬) তিনি জহাঙ্গীরের রাজসভাতে আসিয়াছিলেন। তিনি যে গবেষণা করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ তিনি স্বয়ং যেসকল প্রাচীন পুস্তক পাঠ করিয়া সত্য নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহার ফর্দ্দ দিয়াছেন। তিনি ৩৫ খানি প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলেন ; ইহা ছাড়া ১৪ খানি অন্য ঐতিহাসিক ও ভ্রমণ-বিবরণ পুস্তক হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফিরিশ্‌তা অক্‌বর-সম্বন্ধে যে পার্শী শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ —"অক্‌বর যদিও একজন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত বিদ্বান্ ছিলেন না…।" এই অংশের ইংরেজি অনুবাদ ব্রিগস্ Lt. Colonel John Briggs) এই রূপ করিয়াছেন :—

Although Akbar was by no means an accomplished scholar, he sometimes wrote poetry and was well read in history, এই বর্ণনা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অক্‌বর নিরক্ষর হইতে পারেন না, কেননা accomplished scholar না হওয়া ও নিরক্ষর হওয়াতে আকাশপাতাল প্রভেদ।

অক্‌বর শেখ মোবারকের কাছে অরবী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াই শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল অরবী ভাষা না জানিলে লোকে নিরক্ষর হয় না। তবে, সে-কালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাহারা সংস্কৃত জানিত না, এমন লোকদের, মূর্খ ভাবিতেন ; সেইরূপ অরবী ভাষায় বিদ্বানেরা যাহারা অরবী জানিত না তাহাদের মূর্খ বলিতেন। এভাব আজকাল নাই বটে, কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অরবী ভাষায় বিদ্বান্ মৌলবীদের মধ্যে অনেকেই ঐরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। সম্ভব যে জহাঙ্গীর আপনার পিতাকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভাষা অরবী না জানিবার জন্য উম্মী অথবা মূর্খ বলিয়াছেন।

প্রতিবাদকারী শেষের অংশে যে গল্প লিখিয়াছেন, যাহাতে ফৈজীর উক্তি "নবীয়ে মা উম্মী বুদ……" লিখিয়াছেন, সেটি আষাঢ়ে গল্প মাত্র, কোনও বিশ্বসনীয় পুস্তকে নাই।

শ্রী অমৃতলাল শীল

—

ফকিরের গান

চৈত্রের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় 'পল্লীসঙ্গীতে ভক্তকবি ফকির লালন শা' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যতীন-বাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া ফকিরের যে গান ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেজন্য বাস্তবিকই তিনি ধন্যবাদার্হ। অনেক দিন হইতেই প্রবাসীতে 'হারামণি' নাম দিয়া মধ্যে-মধ্যে সুন্দর-সুন্দর ফকিরের-গান প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই গানগুলির সংগ্রাহকগণ কেবল গান পাইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া যদি কবিদের জীবনী-সংগ্রহের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখেন, তবে এইগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। নিম্নে আমার সংগৃহীত জালাল চাঁদ নামে এক ফকিরের একটু বিবরণ দেওয়া গেল।

জালাল চাঁদ ফকিরের সহিত আমার আলাপ হয় পাবনায় পদ্মার-ধারে এক নির্জ্জন স্থানে। এই বৃদ্ধ ফকিরের চোখে মুখে এমন-একটা কিছু ছিল যে দেখিয়াই ইহাঁর সহিত আমার আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। আমি যখন ফকিরসাহেবের কাছে গিয়া বসি, তখন তিনি সারেঙ্গীর সাহায্যে গাইতেছিলেন—

ও দরদী সাঁই
আমি কিসের লাগি আইলাম হেথা
কিছুই ঠিক ঠিকানা নাই।
পরথম ছিলাম তোমার ঘরে
এক্ষণে আইলাম পরের দ্বারে
পর মোর হইল ভাই
এক্ষণ পরের বেগার খাইট্যা মরি
পরের অন্নই খাই।
ছয় পর আছে ছয় দিকেতে
বাঁধে মোরে দিনি-রাইতে
কতই দুঃখ পাই ;
তবু তাদের লাগি ভিক্ষা মাগি
ছুটিয়া বেড়াই।

যদিও ঘটনাটি পাঁচ বছর আগেকার, তবু গানের সুরটি যেন এখনও আমার কানে লাগিয়াই আছে। এই সৌম্যদর্শন ফকিরের জীবনের

ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই হয়। তাঁর বাড়ী ছিল ঢাকা জিলার কি-একটা গ্রামে। তিনি জাতিতে মুসলমান, কিন্তু এখন আর কোন জাতির গণ্ডীর মধ্যে নাই—কেননা

'কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান,
মিলজুল্‌কে কর সাঁইজীকা কাম'

বছর বারোর সময় মা বাপ মরিয়া যাওয়ায় তিনি এক হিন্দুগৃহস্থের বাড়ী চাকর হন। মাঠে একটা গরু চরানোই ছিল তাঁর কাজ।

এইসময় একদিন কৌপীনধারী এক সাধু আসিয়া তাঁহাকে বলেন যে সে যদি তাঁহার সঙ্গে যায় তবে তার সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। জালাল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, এমনকি তাহার মনিবের সঙ্গেও দেখা না করিয়া, একবস্ত্রে এই সাধুর সহিত চলিয়া আসে। এই সাধুর নামই ঈশান ফকির। 'যশোর ও খুলনার ইতিহাসে' এই ফকিরের উল্লেখ আছে। জালালের গুরু ঈশান নাকি একজন সিদ্ধপুরুষ। জালাল এই মহাপুরুষের সঙ্গে না ঘুরিয়াছে এমন জায়গা খুব কমই আছে। জালাল লেখাপড়া কিছুই জানে না কিন্তু কোরানের অনেক জায়গা বেশ মুখস্থ বলিতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রের অনেক গুহ্য খবরও তাহার জানা আছে। নিম্নে ঈশান ফকিরের একটি গান উদ্ধৃত করা গেল।

একি আজব কারখানা
দেহ-ঘরে
কত রঙ্-বেরঙের মানুষ দেখিগো
রাতি দিন বেড়ায় ঘুরে।
নাই সূর্য্য চন্দ্র তারা
আলো হেথা আপনহারা
আনন্দেরি ছড়াছড়ি গো।
হেথায় আনন্দে বাঁচে মরে
কতই গান কতই বাদ্য
সরোবরে ফোটে পদ্ম
ফুলবাগিচা জমজমা গো ;
এ ফুলের তল্লাস না কেউ করে
পাঁচ দরজা পার হ'লে
বাজপুত্তুরের সাক্ষাৎ মিলে
সোনার খাটে বইস্তা আছে গো
মুখেতে বাক্ না সরে।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়

আশ্বিনের প্রবাসীর বিবিধ-প্রসঙ্গে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী সাহায্যদান'-সম্বন্ধে আলোচনাকালে একস্থানে লেখা হইয়াছে "শুনিলাম স্যার আবদুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আফিসে মধ্যে-মধ্যে চিঠি লিখিয়া এরূপ-সব তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, যাহাতে কলিকাতাকে টাকা কম দিবার কারণ প্রদর্শন করা সহজ হইতে পারে, কিম্বা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা পাওয়াইবার সুবিধা হইতে পারে।" আমরা এই কথা-কয়টির ঠিক অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এই-রকম 'তথ্য' থাকে যাহা বাহির হইয়া পড়িলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিবার কারণ দর্শানো সহজ হইয়া পড়ে, শুধু কলিকাতা কেন যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সেই-রকম অফিশিয়াল 'তথ্য' থাকে তাহা জানিয়া লওয়া এবং তাহার বিহিত ব্যবস্থা করাতে দোষ কি আছে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। স্যার আবদুর রহিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আফিস হইতে যে 'তথ্য' সংগ্রহ করিবেন তাহা অন্ততপক্ষে মিথ্যা বা খেয়ালী হইবে না বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের 'মনে হওয়াটা' যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা যে-কোনো বিশ্ব-বিদ্যালয় আফিসে ঐ-রকম 'তথ্য' পাওয়া যায়, সেখানে নিশ্চয়ই টাকার অপব্যবহার হয়। এই-রকম সত্য তথ্যের সাহায্যে যদি কলিকাতা বা যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্যার আবদুর রহিম বা তাঁহার স্থানের যে-কেহ টাকা কম দিবার কারণ দর্শান, তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য প্রবাসী-সম্পাদক মহোদয়ও ন্যায়-অন্যায়-সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। শুধু কটাক্ষপাত করিয়াছেন মাত্র।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেবের দ্বিতীয় কথা, "কিম্বা নিজের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে টাকা পাওয়াইবার সুবিধা হইতে পারে।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিলে বা একেবারেই না দিলে সেই টাকা কেমন করিয়া স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের পকেটে আনিয়া ফেলান হইবে তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরাও স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের লোক, কাজেই টাকা পাওয়ার নামে আমাদের লোভ হয় বই কি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিয়া বা একেবারেই না দিয়া সেই টাকা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয় তাহাতেও প্রবাসী-সম্পাদক-মহোদয়ের সম্প্রদায়ের যত লাভ স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের তত লাভ নাই।

কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যায়, শিক্ষক সংখ্যায় এবং কর্ম্মচারী সংখ্যায় স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের লোক এক তৃতীয়াংশেরও কম কাজেই শিক্ষাবিভাগের সমস্ত টাকাও যদি ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পায়ে ঢালিয়া দেওয়া হয় তথাপি স্যার আবদুর রহিমের সম্প্রদায়ের চেয়ে প্রবাসী-সম্পাদকের সম্প্রদায়ের লাভ হয় তিনগুণেরও বেশী। সুতরাং স্যার আবদুর রহিম ঢাকা বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দেওয়ায় বা না দেওয়ায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহার স্বসম্প্রদায়ের কোন বিশেষ লাভ বা ক্ষতি নাই। অবশ্য স্যার আবদুর-রহিম কি মতলবে ঐসমস্ত 'তথ্য' সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাও আমরা জানি না ; কারণ স্যার আবদুর রহিমের মতন বড় ঠাকুরের সহিত আমাদের আলাপ থাকা দূরে থাক, আমরা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখচন্দ্রমা দেখিবার সুযোগও পাই নাই। সুতরাং স্যার আবদুর রহিম কি-কি কারণ দর্শাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা কম দিবেন এবং কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া কি-কি যানবাহনাদির মারফৎ সেই টাকাগুলি তাঁহার সম্প্রদায়ের জেবে আনিয়া ফেলিবেন তাহা প্রবাসী-সম্পাদক-মহোদয় একটু খোলসা করিয়া বলিলে সুবিধা হয়। নবীন আমরা, দূরদর্শী প্রবীণের গভীর মতামত হয়ত এখন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, খুলিয়া বলিলে বুঝিতেও পারি।

এইখানে বলিয়া রাখা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য না দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। আমাদের অভিযোগ টাকার অযথা অপব্যবহারে এবং সম্প্রদায়-বিশেষের এক-চেটিয়া প্রভুত্বে বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়েও যদি ঐরকম কুক্রিয়া হইয়া থাকে আমরা তাহারও সমান জোরে প্রতিবাদ করিতেছি। অনেকেই মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে খুব বেশী-রকমের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং ইসলামী শিক্ষার একটা বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে ; প্রবাসী-সম্পাদক সাহেবেরও এই মত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক অ-মুসলমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যঙ্গ করিয়া 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়'ও বলিয়া থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের খবর জানা থাকিলে ইঁহারা এই ধারণা এখনও পোষণ করিতে পারিতেন না। দুঃখের বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচকেরা শুধু অতিরঞ্জিত অনুষ্ঠান লিপি (prospectus) পাঠ্যতালিকা (curriculum) এবং চেন্সেলার ও ভাইস্‌চেন্সেলারের শ্রুতিমধুর কন্‌ভোকেশন্ বক্তৃতা পড়িয়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া বসেন। কিন্তু ইঁহারা তলাইয়া দেখেন না যে, এইসমস্ত হইতেছে 'বাহ্যিক বিজ্ঞাপন' মাত্র। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড ও ৫০০্‌ টাকা পুরস্কারের নীচে ভোলানাথের স্বরের যম, শিশি ।৹ আট আনা মাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার একটি শাখা রাখা হইয়াছে বটে কি, কিন্তু সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই শাখাটি খুব বেশী উপেক্ষিত বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষক নাই বলিলেও হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শাখাকে যেমন ইংরেজী, ইতিহাস, অঙ্ক, ফিলজফি, সংস্কৃত প্রভৃতিকে যতটুকু সুযোগ, সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এই শাখাটিকেও অন্ততপক্ষে ততটুকু সুযোগ, সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় নাই। এই শাখায় শিক্ষকের অভাবে নিয়মিত ক্লাশ হয় না, তাই নির্দ্দিষ্ট পঠিতব্য বিষয়ের এক-তৃতীয়াংশও বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত খতম্ করা যায় না। সময়-সময় দুইতিনটি ক্লাসও সম্মিলিতভাবে করিতে হয়। এই বৎসর ইস্‌লামী শাখার প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক এবং আরবী অনার্সের দ্বিতীয় বার্ষিক আরবী সাহিত্য একসঙ্গে পড়ানো হইতেছে। দ্বিতীয় বার্ষিক ক্লাসদ্বয় প্রথম বার্ষিকের সময় শিক্ষকের অভাবে একদিনের জন্যও মিলিত হইবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই এখন মুড়ি-মুড়কী এক সঙ্গে। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে এই লেখকেরও যোগ দিবার সুযোগ হইয়াছে। যাহারা মনে করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'উচ্চ আরবী শিক্ষার কেন্দ্র' হইয়া উঠিয়াছে তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন। এখানে সংস্কৃত বা অন্যান্য বিষয় যে-রকম সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইস্‌লামী শিক্ষা বা আরবী সেইরূপ হয় না। এই বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইস্‌লামী শিক্ষার কয়েকজন এম্‌-এ, পাশ করিয়া বাহির হইল। ইহারাই ইসলামী শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম এম্ এ, শুনিলাম অধিকাংশই নাকি ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছেন। দেখা যাউক, ইহাঁরা দেশের ও জাতির কতটুকু কি করেন। অনেকেই মনে করেন ইঁহারা চতুর্ভুজ হইয়াছেন—কারণ ইঁহারা আরবী, ইংরেজী, উর্দ্দু, বাংলা, এই চতুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদিগকে যেমন ইস্‌লামী শিক্ষার বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় নাই, অন্যান্যদিকেও তাহারা উপেক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি ছাত্রাবাসের মধ্যে দুইটি অ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত। একটি মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মুসলমান ছাত্রদের সংস্থাপন হইতেছে না। ছাত্রেরা এখানে-ওখানে বাসা করিয়া নানা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। এই দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নজর নাই, অবশ্য নূতন ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের প্রস্তাব পাস হইতে ত্রুটি হইতেছে না। অথচ ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে 'হাতে সূর্য্য ভালে চাঁদ' দেওয়া হইয়াছে।

আবুল ফজল

—

সম্পাদকের মন্তব্য

খবরের কাগজে এমন অনেক চেষ্টার কথা লিখিত হয়, যাহার সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ায় সেসব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং পরে তাহার কোন সহজলভ্য প্রমাণ থাকে না, এবং সে বিষয়ে আলোচনা করিবারও আত্যন্তিক প্রয়োজন থাকে না। তবে ইহা ঠিক্, যে, কোন সম্পাদক এরূপ চেষ্টার কল্পিত কথা প্রকাশিত করিলে সেরূপ কাজ নিন্দনীয়। আমাদের বিশ্বাস আমরা কল্পিত খবর প্রকাশ করি নাই; খবর পাইয়া লিখিয়াছিলাম। অবশ্য, আমাদের কথা মিথ্যা মনে করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার অপব্যবহার নিবারণের জন্য মডার্ন্ রিভিউ ও প্রবাসীতে অন্য কোন কাগজ অপেক্ষা কম চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং স্যার্ আব্দুর রহিম সেরূপ কোন চেষ্টা করিয়া থাকিলে আমরা তাহার বিরোধিতা করি নাই, বুঝিতে হইবে।

তথ্যসংগ্রহে দোষ নাই। কিন্তু তথ্যের অপব্যবহার দ্বারা প্রতিষ্ঠান-বিশেষকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা অসম্ভব নহে। আমরা জানি, এইপ্রকারে একটি অতীব প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কিন্তু সে-বিষয়ে সমুদয় খবর ছাপিবার অধিকার আমরা পাই নাই। এই অকীর্ত্তি রহিম-সাহেবের নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা একেবারেই না দিলে, তাহাতে ভাগ বসান সম্ভব নহে, ইহা আমরাও বুঝি। কিন্তু কাহাকেও টাকা কম দিলে, তাহার ভাগবখরা নিশ্চয়ই হইতে পারে।

আমরা পক্ষপাতশূন্য, কিম্বা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বা সপক্ষে আমাদের কোন বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কার নাই, এরূপ উচ্চ দাবী আমরা করিতে পারি না। কিন্তু ইহা বলিলে অহঙ্কার করা হইবে না, যে, আমরা নিরপেক্ষভাবে লিখিতে চেষ্টা করি। সুতরাং প্রবাসীর সম্পাদকের যদি কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলেও আমরা সেই সম্প্রদায়ের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কিছু লিখি, ইহা সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। মুসলমান সম্প্রদায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানে যে যথাযোগ্য কাজ করিবার ও টাকা রোজগার করিবার সুযোগ পান না, তাহা সম্পূর্ণরূপে অমুসলমানদের দোষে ঘটে নাই। মুসলমানদিগের পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভ করিতে অবহেলা ও বিলম্ব করাও ইহার অন্যতম এবং প্রধান কারণ।

টাকার অপব্যবহারে এবং সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া প্রভুত্বে আমাদেরও আপত্তি আছে, এবং তাহা বহু বার প্রকাশ করিয়াছি।

লেখক বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদিগকে খুব বেশী রকমের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং ইস্‌লামী শিক্ষার একটা বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে—প্রবাসী-সম্পাদক সাহেবেরও এই মত।" আমরা কোথাও কখনও ঠিক্ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না। তবে এরূপ ধারণা আমাদের ছিল বটে, যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় মুসলমানদিগের কিছু সুবিধা হইয়াছে এবং ইস্‌লামী শিক্ষারও কিছু সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু লেখক মহাশয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারণা ভ্রান্ত মনে হইতেছে। ইহা দুঃখের বিষয়।

—

বাঙ্‌লা বানান

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় বাঙ্‌লা বানান সংস্কারের একটি খসড়া দাখিল করিয়াছেন।

এ খসড়াটি পড়িয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

অধ্যাপক মহাশয়ের সর্ব্বপ্রধান প্রস্তাব—"তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের

বানান যতদূর সম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী লেখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।" এই যতদূর সম্ভব কথার অর্থ কি? যদি উচ্চারণই আদর্শ হয়, তবে সর্ব্বত্র বানান সেই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে। এ বিষয়ে রফা মীমাংসা চলে না, তাহা অতিশয় আশঙ্কাজনক। যদি উচ্চারণ অনুসারেই বানান লিখিতে হয় তবে সে বানান সর্ব্বত্র যতদূর সম্ভব নয়, একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই, নতুবা পরে বিষম গোল বাধিতে পারে। 'যতদূর সম্ভবে' ত কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু যে প্রথা তাঁহারা প্রবর্ত্তন করিতে চাহিতেছেন তাহা ত 'যতদূর-সম্ভব'কে ছাড়াইয়া চলিয়াছে! অতএব মধ্যে-মধ্যে আবার 'যতদূর সম্ভবে'র সঙ্গে রফা করিলে ধর্ম্মহানি হইবে। এই 'যতদূর সম্ভব' যে কার্য্যত বেশীদূর সম্ভব নয়, তাহার প্রমাণ এই খসড়াখানির মধ্যেই আছে,—সাধুভাষার ক্রিয়াপদ 'বলি'কে চ'লতি ভাষাতেও 'বলি' বানান করা হইয়াছে; বোধ হয় ব'এর মাথার ইলেকটা কেমন করিয়া ছুটিয়া গিয়া থাকিবে। আবার উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে সুবিধা, পুরাণো, বদলিয়ে—এসবও কি 'যতদূর-সম্ভবে'র ভিতরে না বাহিরে?

ভাষাতত্ত্ব এবং 'চোখে লাগা' এই দুই বিপরীত বিভ্রাটে পড়িয়া অধ্যাপক মহাশয় বেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সহর শহর হইবে কিন্তু সরমের শরম না হওয়াই ভাল। আবার চোখে লাগার ভয়ে তিনি এমন ব্যবস্থাও করিতে চান, যাহাতে চোখে-লাগার দায়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কারণ, প্রুফ্‌রীডার বা মুদ্রাকর ভিন্ন অপর কেহই এপর্য্যন্ত মাত্রাহীন ে কার ও মাত্রাযুক্ত ে-কারের পার্থক্য লক্ষ্য করে নাই, এখন য্যা-কারের খাতিরে সকলকে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস ব্যবহার করিতে হইবে। 'বড়'কে 'ব্যাড়া' করিয়া লিখিতে শুধুই চোখে লাগে না, বোধ হয় যেন মনেও লাগে। এতদিন যে বানান দেখিয়া হাসি পাইত, লেখক বা লেখিকার প্রতি একটু কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব জাগিত। যেমন, "নোবিন কোলিকাতায় গিয়া কত্তোকটা সারিয়া উঠিয়া ছিলো, কিন্তু হঠাৎ সোদ্দিগ্ধ হইয়া মোরিয়া গেলো," ইত্যাদি। এখন দেখিতেছি তাহাই বা তদ্রূপ বানানরীতি পণ্ডিত-জনোচিত হইতে চলিল।

"শেষে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙ্‌লাভাষার সাধারণ নিয়ম," এই নিয়মের ভয়ে বাঙালীর ছেলেকেও 'আজ' 'ছিল' প্রভৃতি অন্ত্যবর্ণে ইলেক অথবা ো কার ব্যবহার করিতে হইবে। আবার জ্ঞানতঃ, বিশেষতঃ, আপাততঃ প্রভৃতির শেষে বিসর্গের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মাতঃ, পিতঃ নমোনমঃ প্রভৃতির পক্ষে বিসর্গের প্রয়োজন আছে কেন বুঝা গেল না। 'আপাতত' একেবারে বাঙ্‌লা হইয়া গিয়াছে, এমন-কি বিশেষ সাবধান না হইলে অনেকের মুখে 'আপাতক' বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু মাতঃ পিতঃ নমোনম, চলতি ভাষায় চলে না এবং সাধু ভাষাতে উচ্চারণকালে অ-কারের উপর যেটুকু জোর পড়ে তাহা না পড়িলে ক্ষতি নাই। বাঙ্‌লা জাত বা যোগান হসন্ত হইবার প্রয়োজন কি? যেখানে জাত সংস্কৃত শব্দ সেখানে উচ্চারণের কথাই আসে না, পাঠকের অর্থবোধের উপর নির্ভর করা চলে; যে সে-অর্থ জানে না তাহার ত পড়িতে যাওয়াই কর্ম্মভোগ। যদি বিদেশীর জন্য এরূপ নিয়ম করিতে হয়, তবে এক কাজ করিলেই এই হসন্ত উচ্চারণের বিপদ্ দূর হইয়া যায়। ইলেকের মতই হসন্ত একটু অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলেই সব গোল মেটে। এই প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন—বাঙ্‌লা বর্ণমালার খণ্ড-ত (ৎ) গেল কো'থায়?

'পুরাণো বাঙ্‌লা পুঁথিতে কী-বানান অনেক জায়গায় আছে"। কী লেখায় আমার আপত্তি নাই, কিন্তু ঐসঙ্গে দুই-একটি পুঁথির উদাহরণ পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। এত সহজে কিছুরই মীমাংসা হয় না। বাঙ্‌লা পুঁথির লিপিকর অনেকেই হ্রস্বদীর্ঘ ও ষত্বণত্ব বর্জ্জিত। সেটা তাহাদের উচ্চারণ সংস্কার-চেষ্টার প্রমাণ না আর কিছু, তাহা বুঝিয়া দেখা উচিত।

কেবলমাত্র হসন্ত ও ইলেকের সাহায্যে উচ্চারণের রূপ কতটা ধরা যাইবে তাহা ভাবিলে শঙ্কিত হইতে হয়। এমনই ত এই দুই চিহ্নের এত প্রয়োগ বাহুল্য দেখা যাইতেছে যে, ইহার পরেও যদি নানা কারণে উহা-দিগকে আরও অধিক ব্যবহার করিতে হয়, তবে এই অসংখ্য পিপীলিকার দংশনে চক্ষে সরিষাফুল দেখা আশ্চর্য্য নয়। শ্রীযুক্ত মহলানবিশ মহাশয়ের খসড়ায় অবশ্যই যাবতীয় স্বর বা ব্যঞ্জনের উচ্চারণভেদ ও তাহাদের অনুযায়ী চিহ্নের একত্র নির্দ্দেশ করা হয় নাই—একটা খসড়াই খাড়া করা হইয়াছে। ব্যঞ্জনের কথা ছাড়িয়া দিলাম, সকল স্বর উচ্চারণের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে।

এতক্ষণ উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানের কথাই বলিলাম। এইবার আমার প্রধান কর্ত্তব্য উচ্চারণভঙ্গির আদর্শের কথা বলিব। উচ্চারণ-বিশুদ্ধির জন্য যে আদর্শ খাড়া করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট স্পষ্ট নহে, সে-সম্বন্ধে মতভেদের প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, কলিকাতার idiom ও উচ্চারণভঙ্গিতে আর আস্থা থাকিতেছে না—নানা জেলার উচ্চারণ ও বাক্যভঙ্গির যথেচ্ছ মিশ্রণ বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিছুকাল হইতে সাহিত্যরচনায় চলতি ভাষার প্রচার খুব বেশী হওয়ায় এবং বহু লেখকই কলিকাতানিবাসী নহেন বলিয়া আসলের নামে মেকী চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। একেই কলিকাতার কতকগুলি ককনী রীতি আছে, তাহার উপর এই প্রাদেশিকতার প্রবল আক্রমণে এখানকার ভাষায় বা উচ্চারণে বিশুদ্ধ রীতির বড়ই ব্যতিক্রম হইতেছে।

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার।

—

"কবি কৃত্তিবাস"

শ্রী ভাগবতচন্দ্র দাস

শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় কৃত্তিবাসের উপর যে-সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন তৎসমুদয় কবির স্বকৃত নহে। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কেবল বাল্মীকির রামায়ণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সময়ে দেশে মহানাটক নামে একখানি রামায়ণ প্রচলিত ছিল। তাহা হনুমৎকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। বস্তুত তাহা সুগ্রীবসহচর উদারমতি হনুমানের রচিত নহে। অন্য-কোনো আধুনিক হনুমানের রচিত হইয়া থাকিবে। যাই হউক, পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র, সেইজন্য পূর্ব্বে প্রায় সমস্ত পণ্ডিতই তাহা মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। এখনও তাহা অনেক পণ্ডিতের মুখস্থ আছে। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে রামের যে-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে এই মহানাটক হইতে গৃহীত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের বটতলা-সংস্করণে প্রথমে যে

> রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
> কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
> রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথ-তনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
> বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং।

শ্লোকটি লিখিত আছে তাহা ঐ মহানাটক হইতে উদ্ধৃত। কৃত্তিবাসের বহু পয়ার মহানাটকের শ্লোকের অনুবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘোষজমহাশয়ের উদ্ধৃত একটি পয়ার এস্থলে পুনরুদ্ধৃত হইল।

একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া রঘুনাথ।
করিলেন আমারে বিবাহ সেই সাথ।
আর বার ধনুক আনিল গুণমণি।
না জানি হইবে আমার কতেক সতিনী।

মহানাটকের সীতাও বহুবিবাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া বলিয়াছেন:—

উচ্চাপমাকর্ষতি তাড়কারাবাকারগুপ্তাপি বিশালনেত্রা।
সাশঙ্কমৈক্ষিষ্ট বিদেহকন্যা কন্যাং কিমন্যাং পরিণেষ্যতীতি।

পয়ারটি এই শ্লোকের অনুবাদমাত্র। বহু বিবাহ কেবল যে কৃত্তিবাসের সময়ে প্রচলিত ছিল তাহা নহে। সকল দেব ও মানবের আদি-পুরুষ মহর্ষি কশ্যপের বহুপত্নী ছিল। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের পিতা দশরথও বহুবিবাহ করিয়াছিলেন। এমনকি তাঁহার অনেক অসবর্ণা ভার্য্যাও ছিল তাহা বাল্মীকির রামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায়। তবে সেকালে একপত্নীকের প্রশংসা সকলে করিতেন, সেকালে প্রাতঃ-স্মরণীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা করিয়া নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন এইমাত্র প্রভেদ।

কেবল কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে ভগবান্ সাজান নাই। রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মহানাটকের বহুশ্লোকে লিখিত আছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম:—

বাল্মীকের্বদনারবিন্দগলিতং শব্দং পরং পাবনং
শ্রোত্রং বাগমৃতং পিবন্ত্বনুদিনং বৈশ্রোত্রপাত্রৈর্নরাঃ।
বিষ্ণোঃ সচ্চরিতং চরাচরগুরোঃ রামায়ণং সাদরাৎ
যেষাং শ্রীবিমলা ভবত্যনুদিনং নশ্যন্তি চারৈর্ভয়াঃ।

মহানাটকের রচয়িতাই রামনামের মাহাত্ম্য গাহিয়া গিয়াছেন, "বীজংধর্ম্মদ্রুমাণাং প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে রাম-নাম।" মহানাটকের রামচন্দ্রকেও ফুলধনু লইয়া কাননে-কাননে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। যাঁহারা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সমালোচনা করিতে বসেন, তাঁহারা মহানাটক পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের সমালোচনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। ঘোষজ-মহাশয়ও মহানাটক পড়িয়া প্রবন্ধ লিখিলে আমরা অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইতাম।

জাভাদ্বীপের নৃত্যকলা

সম্প্রতি যবদ্বীপ বা জাভা হইতে একদল নর্ত্তক মান্দ্রাজে আসিয়া থিয়োসফিকেল সোসাইটির প্রকাশ



অর্জ্জুনবেশে জাভানর্ত্তক



স্ত্রীলোকের অভিনয়ে পুরুষ

বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে তাহাদের নৃত্য-নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। এই নৃত্যের নাম ওয়াং ওয়াং। তাহারা নৃত্যের দ্বারা মহাভারতের একটি কাহিনী অভিনয় করে। ইহাকে



অভিমন্যুবেশে জাভাবাসের নর্ত্তক

তাহারা "ভারত যুদ" বলে। নাটকের যে অংশ মার্জ্জিত-রকমের নৃত্য দ্বারা অভিনীত হয়, তাহা পাণ্ডবদিগের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। পাণ্ডবদের প্রত্যেকের নৃত্য পৃথক্-পৃথক্। অর্জ্জুনের নৃত্য ভীমের নৃত্য হইতে পৃথক্। ভীম সর্ব্বদাই ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুযায়ী নৃত্য করেন। কৌরবদের নৃত্য আবার সম্পূর্ণ অন্য-রকমের; উহা উদ্দাম এবং আততায়িতা-ব্যঞ্জক। দানবদের নৃত্য বর্ব্বরোচিত এবং আক্রমণসূচক। অর্জ্জুনের সঙ্গে সবাই তিনজন বিদূষকের মত লোক থাকে। তাহারা তাঁহাকে শত্রুদের উপর জয়লাভ করিতে সাহায্য করে।

"ভারত যুদ" অর্থাৎ ভারত যুদ্ধের নৃত্যাভিনয় কেবল অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত যুবকেরাই করে। ইহাকে "বেক্সো" বলে। এই নৃত্য-কলার সমুদয় নিয়ম ভাল করিয়া শিখিতে তিন বৎসর সময় লাগে। জাভার অধিকাংশ রাজ-কুমারেরা নৃত্যে সুদক্ষ।

পুরুষ-নর্ত্তকেরা কখন-কখন স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে জাভায় হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তাহার চিহ্নস্বরূপ এখনও তথায় বোরো-বুদর্ প্রভৃতি বিস্ময়কর স্থাপত্য-কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে, এবং জাভার ভাষায় বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে। তদ্ভিন্ন তথাকার অধিবাসীরা বহুকাল হইতে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা নিজেদের প্রতিভার দ্বারা যে-যে ললিতকলার বিকাশসাধন করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করে নাই। নৃত্যকলা তন্মধ্যে একটি। যাঁহারা নৃত্যের মর্ম্মজ্ঞ, তাঁহাদের মতে প্রাচীন বুলগেরিয়ানরা ভিন্ন আর কোনও জাতি জাভানিবাসীদের মতন নৃত্য দ্বারা নিজেদের অন্তরের কথা এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারে না।



শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

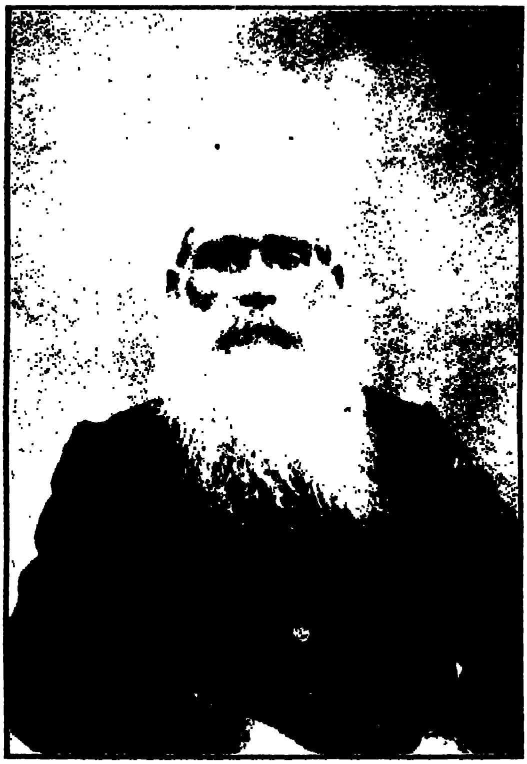
বাসী প্রেস, কলিকাতা]

[লণ্ডনে গৃহীত ফোটো হইতে

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

শ্রী সজনীকান্ত দাস

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যখন রাষ্ট্রীয় মহাসভার পত্তন হয়, তখন খুব অধিকসংখ্যক লোক ইহাতে যোগদান করে নাই। ভারতবর্ষের কল্যাণকামী দু'একটি বিদেশী ভারত-বন্ধু ও স্বাধীনতা-স্বপ্নবিভোর কয়েকটি স্বদেশী যুবক মিলিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। তাহার পর আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের অলিগলির মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের সদর রাস্তায় আসিয়া পৌছিয়াছে; সেই কয়েকটি প্রাণীর আন্দোলন আজ নিখিল ভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। এই সভার নেতৃত্ব-পদ আমরা পরম গৌরবের আসন বলিয়া মনে করি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক মনস্বীর ভাগ্যে এই মহাসম্মান লাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু এবার এই প্রথম একজন ভারতীয় মহিলা এই গৌরবের আসন পাইয়াছেন। কংগ্রেস আরম্ভ হইবার কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী যখন প্রথম মহিলা-সভ্যরূপে সেখানে উপস্থিত হন, তখনকার দিনে তাঁহাকে বিপুল সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী আজ সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছেন। ভারতের নারী-জাতি যে শুধু অন্তঃপুরিকা গৃহিণী হইয়াই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে না, কি রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে বাহিরেও যে তাহাদের প্রয়োজন আছে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে সভাপতির পদ দিয়া এই সত্যটুকুকে মানিয়া লইয়া দেশবাসীগণ নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন। সরোজিনী দেবীও এই মহা-গৌরবের আসন অর্জ্জন করিয়া জাতীয় আন্দোলন-ক্ষেত্রে প্রথম পথ-প্রদর্শকরূপে ভারতবর্ষের নারী-সমাজের চির-কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। ভারতের অতি অল্পসংখ্যক নারীরই তাঁহার মতন যশোবিমণ্ডিত হইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। যে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এতকাল পুরুষেরই একাধিপত্য ছিল, সেখানে আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সরোজিনী দেবী ভারতের নারীগণের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—



ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

'—আমি জানি যে দেশে ও বিদেশে স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি যে সামান্য চেষ্টা করিয়াছি, শুধু তাহার জন্যই আপনারা এই মহাগৌরবের আসন আমাকে দেন নাই—ভারতীয় নারী-সমাজকে আপনারা সম্মান দেখাইতে চাহিয়াছেন ও ইহাতে স্বীকার করিয়া লইতেছেন যে, কি সামাজিক, কি পারিবারিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক সকল বিভাগেই পুরুষের পাশে নারীর সমান অধিকার আছে।...আমাকে সম্মানিত করিয়া আপনারা ভারতের পুরাতন প্রথারই

দেখিতে গিয়া ১৯০১ সালে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত। দ্বিতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ এতকাল নিজাম-সরকারে সহকারী রাজস্ব-সচিব থাকিয়া সম্প্রতি ভারত-জীবন-বীমা কোম্পানীর সেক্রেটারী হইয়াছেন। তৃতীয় পুত্র রণেন্দ্রনাথ; দ্বিতীয়া কন্যা সুনলিনী দেবী—এ, এস্ রাজন্ মহাশয়ের পত্নী। তৃতীয়া কন্যা মৃণালিনী দেবী কেম্বিজের শিক্ষা সসম্মানে সমাপ্ত করিয়া সম্প্রতি মাদ্রাজের বিখ্যাত 'শামা' পত্রিকার সম্পাদক। চতুর্থ পুত্র হারীন্দ্রনাথ একজন বিখ্যাত গায়ক ও কবি। সর্ব্বকনিষ্ঠা



কুমারী লীলামণি নাইডু (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর দ্বিতীয়া কন্যা। ইনি বর্ত্তমানে অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিতেছেন)

কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী বার্লিনে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্ এণ্ড ট্রেড্ রিভিউ অব্ এসিয়া' পত্রিকার সম্পাদক, এ, সি নারায়ণ নাম্বিয়ার মহাশয়ের পত্নী। মোটের উপর প্রত্যেকেই অল্পাধিক-পরিমাণে যশস্বী হইয়া পিতা ও মাতার মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।

সরোজিনীর শৈশবজীবনে তাঁহার পিতার প্রভাব ও শিক্ষা তাঁহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রস্তুত করিতেছিল এবং তাঁহার শৈশবের এই শিক্ষাই জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার পিতার কল্পনাপ্রবণ মনও এই সময়ে সরোজিনীর কবিত্বশক্তি-বিকাশের অনুকূলে কাজ করিতেছিল। স্বাধীন মুক্ত আবেষ্টনের মধ্যে মানুষ হওয়াতে সরোজিনী চিরচলিত সামাজিক গণ্ডীগুলি সহজেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। তিনি সুখের কোলেই লালিত-পালিত। তাঁহাকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। অঘোরনাথ সরোজিনীর কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখিতেন না। তিনি নিজে মুখে-মুখে সন্তানদের বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি শিখাইতেন; এইরূপে অতি শৈশবেই সরোজিনীর মনে প্রবল জ্ঞানস্পৃহা জাগাইয়া দেওয়া হয়। বিভিন্নজাতীয় ছাত্র থাকিত বলিয়া বাড়ীর ছেলেমেয়েরা সকলেই উর্দ্দুতেই কথাবার্ত্তা কহিত। বালিকা সরোজিনীর জন্য একজন ফার্সী শিক্ষকও নিযুক্ত করা হয়, এবং তাঁহাকে 'দ্বিতীয় ভাষা'-হিসাবে ফার্সী লইতে হয়। মাত্র ১২ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরোজিনী একদিনেই যশস্বী হইয়া পড়েন। অতি শৈশব হইতেই বালিকা সরোজিনীর মনে সাহিত্য ও কাব্যানুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। চোদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যেই তিনি প্রায় সকল ইংরেজ কবির কাব্য শেষ করেন। শেলী, ব্রাউনিং ও টেনিসন তাঁহার বিশেষ প্রিয় কবি। ওই সময় হইতেই তাঁহার মানসিক শক্তির নব-নব উন্মেষ সাধিত হইতে থাকে। প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইত এবং দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশায়ও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত।

অঘোরনাথের ইচ্ছা ছিল সরোজিনীকে বিজ্ঞান ও গণিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন করিয়া তুলিবেন। কিন্তু মনে যাহার একবার কবি-প্রেরণা জাগিয়াছে সে কি গণিত ও বিজ্ঞানের বিধিবন্ধনের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে? তাঁহার কবিমন আত্ম-প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া ছিল। তিনি পরে আর্থার সাইমন্‌স্‌কে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে এই অন্তর্নিহিত কবিপ্রতিভার নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর প্রকাশব্যগ্রতার কথা বলিয়াছেন।—

'শৈশবে কবিতা লিখিবার জন্য মনে বিশেষ প্রেরণা অনুভব করিতাম বলিয়া মনে পড়ে না বটে, তবে আমি স্বভাবতই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ও ভাবুক ছিলাম। বাবা আমাকে আদর্শ বৈজ্ঞানিক করিয়া তুলিতে চাহিতেছিলেন,

কিন্তু যে কবিত্বশক্তি আমি তাঁহার ও আমার মায়ের (মা যৌবনে কয়েকটি চমৎকার গীতি-কবিতা রচনা করেন) নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছিলাম, তাহা অদম্য হইয়া উঠিল। আমার এগার বৎসর বয়সে একদিন বীজগণিতের একটি অঙ্ক লইয়া মাথা ঘামাইতে-ঘামাইতে একটি সম্পূর্ণ কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার কাব্য-জীবনের সুরু হইল।'

এই কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ যেন তাঁহার 'নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ'। যে দৈবী-শক্তি লইয়া তিনি জন্মিয়াছেন, তাহা এইবার বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিয়া পাইল এবং তাঁহার কিশোর চিত্তের প্রবল অনুভূতি লইয়াই তিনি কাব্য রচনা করিতে সুরু করিলেন। ইহার পর আর সন্দেহমাত্র রহিল না যে সরোজিনার কবিপ্রতিভা তাঁহার জন্ম-গত মজ্জাগত। তাঁহার হৃদয়-মালঞ্চে তখনই যেন কবিত্বের কোরক ধরিল, কিন্তু তাহা প্রস্ফুটিত হইল অনেক পরে। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি ইংরেজী ভাষায় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা—'মেহের মুনির' রচনা করেন। এই নাটকটি সম্ভবতঃ তাঁহার ফার্সী শিক্ষার ফল। অঘোরনাথ তাঁহার প্রিয় কন্যার এই প্রথম চেষ্টাটি সযত্নে প্রকাশিত করেন। এই নাটকের একখানি স্বর্গীয় নিজামের হাতে ১৮৯৫ সালে দেওয়া হয়। তিনি সরোজিনীর কবিপ্রতিভা ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য যে-কোনো প্রার্থিত পুরস্কার দিতে সম্মত হন। সরোজিনী বিদেশ যাইবার জন্য একটি বৃত্তি প্রার্থনা করেন। সদাশয় নিজাম বাহাদুরও তাঁহাকে বাৎসরিক ৩০০ শত পাউণ্ডের একটি বৃত্তি দিয়া সম্মানিত করেন। সরোজিনী দেবী ১৮৯৫ সালে শিক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ড-যাত্রা করেন।

মাত্র ষোল বৎসরের বালিকা সরোজিনী একাকী বিদেশ যাত্রা করিলেন—ইহা কম সাহসের পরিচয় নহে। বস্তুতঃ তিনি ভয় কাহাকে বলে জানেন না। তিনি বোম্বাইয়ে একটি পরিচিত পরিবারের সঙ্গলাভ করেন ও তাঁহাদের সঙ্গেই সমুদ্র যাত্রা করেন। সরোজিনী ইংলণ্ডে গিয়া ভারতহিতৈষিণী বিখ্যাত মিস ম্যানিংয়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে তাঁহারই বাটীতে থাকিবার সুযোগ পাইলেন। এখানে বহু বিখ্যাত সাহিত্যরথীর সমাগম হইত। এইখানেই বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এড্‌মাণ্ড্ গসের সহিত সরোজিনীর পরিচয় ঘটে; ইনি পরবর্ত্তী কালে সরোজিনীর কাব্যপ্রতিভা-উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করেন। এখানেই তাঁহার, নাট্য-সমালোচক উইলিয়াম্ আর্চার, পুস্তক-প্রকাশক হাইনম্যেন্ প্রভৃতির সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত হয়।



শ্রী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা সরোজিনী কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইলেন না। কারণ, অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কাহাকেও এ সম্মান দেওয়ার প্রথা নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে লণ্ডনের কিংস্ কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইল। বয়স পূর্ণ হইলে তিনি কেম্‌ব্রিজের গার্টন্ কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্তু ছাত্রজীবনের আইন-কানুনের মধ্যে তিনি যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন এবং পাঠ্য পুস্তক ছাড়িয়া কবিতা চর্চ্চা ও রচনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অল্পদিনেই তাঁহার দুর্ব্বল শরীর ভাঙিয়া পড়িল ও তাঁহার কেম্‌ব্রিজের শিক্ষা অকালে সমাপ্ত হইল।

তিনি তৎপর ইতালী ও সুইট্‌স্‌রাল্যাণ্ডে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অতীত-গৌরবময়ী ইতালীকে তিনি নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তিনি দান্তে, র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, গারিবল্‌ডি, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতির স্মৃতিরঞ্জিত ইতালীর চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন।

এড্‌মণ্ড গসের সঙ্গে পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় বন্ধুত্ব-বন্ধনে পরিণত হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর কবিতা লিখিতেন। একদিন তাঁহার এই গোপন বাণী-সাধনার কথা গসের নিকট তিনি ভাবাবেগে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। গস্ তাঁহার এই কবিতাগুলি দেখিতে চাহিলে সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষায় কবি-যশপ্রার্থী এই বালিকা-কবি তাঁহার হাতে এক গাদা কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন। তিনি সেগুলি পড়িয়া হতাশ হইয়া পড়েন এবং ব্যথিতচিত্তে সরোজিনীকে ইংরেজ কবিদের ভাব, ভাষা ও ছন্দের ব্যর্থ অনুকরণ করিতে নিষেধ করেন ও সম্পূর্ণ দেশী বিষয়ে দেশী ভাবে কবিতা লিখিতে অনুরোধ করেন। ভারতের অনুভূতি, শিক্ষা, সৌন্দর্য্যবোধ ও সংস্কার লইয়াই যে ভারতীয় কবির কাব্য রচনা করা উচিত, একথা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। ইংলণ্ডীয় কবিদের ব্যর্থ অনুকৃতি, কিম্বা ইংলণ্ডীয় প্রকৃতির ভাববৈচিত্র্য বর্ণনা না করিয়া ভারতবর্ষের শ্যামল শস্য-সমারোহ, অভ্রভেদী তুষারমৌলী পর্ব্বত-শ্রেণী, গভীর অরণ্যানী ও বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত প্রাচীন মন্দিরগুলিকেই তাঁহার কাব্যের পটভূমি করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। দেশের সহজাত সংস্কার ও অনুভূতিই যে কাব্যাভিব্যক্তির প্রাণ সরোজিনী ইহা বুঝিতে পারিয়া সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয় মন লইয়া কাব্য রচনা সুরু করিলেন এবং তাঁহার কবিতার উৎকর্ষ দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইলেন। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে তিনি পর পর তাঁহার তিনখানি কাব্যগ্রন্থ 'গোল্‌ডেন্ থ্রেশোল্‌ড্' 'বার্ড্ অব্ টাইম্' ও 'ব্রোকেন্ উইঙ্' প্রকাশ করেন। এই কাব্যগুলি কি দেশে, কি বিদেশে সর্ব্বত্রই উচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছে ও জগতের কবিসমাজে সরোজিনীর স্থান চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবে। বিশেষ করিয়া তাঁহার 'বার্ড্ অব টাইম্' কে এডমণ্ড্ গসের ন্যায় সমালোচকও নিখুঁত বলিয়া প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রায় তিন বৎসর বিদেশে বাস করার পর ১৮৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ডিসেম্বর মাসেই তাঁহার স্বয়ম্বৃত ডাক্তার মোতিআলা গোবিন্দরাজুলু নাইডু মহাশয়কে বিবাহ করেন। ১৮৯৫ সালে বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে প্রেমের সূচনা হয় এবং নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তিনি তাঁহার এই ভালবাসা হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার এই বিবাহ লইয়া অনেক বিরোধ ও মনান্তর ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ-কন্যা সরোজিনী অব্রাহ্মণকে বিবাহ করায় তাঁহাকে অনেক গঞ্জনা সহিতে হইয়াছে। তাঁহার বিবাহিত জীবন আনন্দ-পূর্ণ। কিন্তু আশৈশব স্বাস্থ্যহীনতার জন্য দুর্ব্বল শরীরে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সুখভোগ করিতে পারেন নাই। তবু স্বামীর অনাবিল প্রেম ও পুত্রকন্যার নিবিড় স্নেহে তিনি হাসিমুখে সব সহিয়া গিয়াছেন। দুই কন্যা ও দুই পুত্র লইয়া তিনি তাঁহার "ক্ষুদ্রগৃহে" সুখেই কালাতিপাত করেন। তাঁহার মহানুভব স্বামীর গভীর প্রেম তাঁহাকে বর্ম্মের মত ঘিরিয়া থাকে। তাঁহার দুর্ব্বল শরীর মাঝে মাঝে তাঁহাকে পীড়া দিয়া মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া দিত। কিন্তু সরোজিনী মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন। তবে মাঝে মাঝে এই সময় তাঁহার মনে নিরাশা আসিত। তিনি ভাবিতেন—'আমার কবিমন পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করিবার পূর্ব্বেই কি আমি ঝরিয়া পড়িব ? আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কি সফল হইবে না ?' কিন্তু এই মানসিক অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯০৫ সালে মিঃ হাইনমেন্ যখন তাঁহার প্রথম কবিতার পুস্তক 'গোল্‌ডেন্ থ্রেশোল্‌ড্' প্রকাশ করিলেন তখনই আশার ঔজ্জ্বল্যে সরোজিনীর চিত্ত ভরিয়া উঠিল। তাঁহার বন্ধু আর্থার সাইমন্‌স্ এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রাচ্য জগতের সম্মোহিনী মাধুর্য্যে এই গ্রন্থখানি ভরপুর। এই কাব্য-গ্রন্থখানি ইংলণ্ডীয় সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করিল। বায়রণের মত সরোজিনীও একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিলেন যে, তিনি যশের উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়াছেন। ১৯১১ সালে তাঁহার 'বার্ড্ অব্ টাইম্' ও ১৯১৭ সালে 'দি ব্রোকেন্ উইঙ্' এডমণ্ড্ গসের ভূমিকা-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতা বিশে-

যত 'বার্ড্ অব টাইম্'এর গীতিকবিতাগুলি ভাবরাজ্যে সরোজিনীর স্থান অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কবিতাগুলি প্রাচ্য দেশীয় ভাবমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। তাঁহার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য ও রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যে অনবকাশবশতঃ সম্প্রতি তাঁহার কবিত্ব-রসধারা শুষ্ক হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় এখনই এই



শ্রীমতী নাইডুর সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কমলা দেবী

কবির কাব্য-জীবনের সমাপ্তি হয় নাই। তবে তিনি আর কিছু না লিখিলেও তাঁহার উচ্চ আসনে এই তিনটি গ্রন্থের জন্যই চির আধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার কবিতা যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। ১৯১৪ সালে তাঁহাকে 'রয়্যাল্ এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব্ লিটারেচার্'-এর সভ্য করিয়া প্রতীচ্য দেশ তাঁহার কবিতাকে সম্মান করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে খুব অধিক-সংখ্যক নারীর ভাগ্যে এই সম্মান লাভ ঘটে নাই। জীবনে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কিম্বা পারিবারিক জীবনে অনেক দুঃখ তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু সেই বেদনা তাঁহার কবিতাকে মধুরতর করিয়াছে মাত্র; নষ্ট করিতে পারে নাই। তবে যৌবনের সে উচ্ছ্বাস আর নাই।

সরোজিনী দেবী সুন্দরের উপাসক। আর্থার সাইমন্স্ লিখিয়াছেন—'সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণাই সরোজিনী দেবীকে কবি করিয়া তুলিয়াছে; সুন্দর কিছু দেখিলেই তাঁহার সমস্ত দেহমন পুলকে স্পন্দিত হইতে থাকে।' তাঁহার কাব্যে দেশমাতার প্রতি গভীর ভক্তি লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশের সকল লোক যখন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, তখন দেশের কবি কেনই বা সে অনুভূতিকে ছন্দোবদ্ধ না করিবেন? ভারতমাতার উদ্দেশে লিখিত তাঁহার দুইটি ইংরেজী কবিতার বাংলা অনুবাদ দিলাম :—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত

আসিছে প্রভাত, জাগো মা, জাগো মা, সন্তান তব করুণা যাচে,
নতজানু হ'য়ে পূজিব তোমায়; মাগিব প্রসাদ তোমার কাছে।
নূতন দিনের স্বপন দেখিয়া আঁধার রজনী কাঁপিছে ত্রাসে,
তুমি কি রহিবে নিদ্রামগনা, বদ্ধ রহিবে বেদনাপাশে?
জাগো, জাগো, মা গো, ঘুচাও মোদের ব্যর্থ ব্যথার দৈন্য-ভার;
আশীষ কর মা পরাব তোমায় বিজয়-গর্ব্ব-রতন-হার।
আমরা নহি কি সন্তান তব জয়মালা তব মোদের নহে?
আশা তব, তব গর্ব্ব শক্তি শোণিতে মোদের আজো যে বহে!

তোমার তুষ্টি করিব সাধন, ত্যজিব না কভু দ্বিধার ভুলে,
মোদের চিত্তে আসন তোমার, পূজিব তোমায় ভক্তি-ফুলে,
জননী তোমার মহিমা গাহিয়া কাঁপন লাগাব তারার গায়ে;
আসন তোমার উচ্চে সবার, সে মহা আসনে বসাব মায়ে।
জননী, মোদের পূজার অর্ঘ্য মুকুট রচিবে তোমার শিরে;
জননী, মোদের আশার শিখাটি নিত্য তোমারে রহিবে ঘিরে;

জননী, মোদের প্রেমের কৃপাণে বিজিত হইবে তোমার অরি,
জননী, মোদের ভক্তির গীতি নিত্য উঠিবে তোমারে স্মরি',
তোমারে সঁপিব নিত্যভক্তি, শক্তি সাধন তোমারি লাগি,'
বরিব তোমায় ওঠ রাজরাণী, হে দেবী জননী, ওঠ না জাগি।

ভারতমাতার প্রতি

অমর তোমার অতীত স্মৃতির স্মরণে,
ওঠ চির-যৌবনা,
দেখাও টুটায়ে অন্ধ তমসাবরণে,
ঊষার আলোক-কণা।
মহাসৃষ্টির নব-পরিণীতা বধূ গো—
অনাদি তোমার কোলে,
নব গৌরব নিত্য জনম লভিয়া
চিরদিন যেন দোলে।
আঁধার-শিকলে বাঁধা প'ড়ে আছে দেশ—
কাঁদিছে মুক্তি-আশে,
নিয়ে চল তুমি প্রভাতের তীরে যেথা
আলোকের জ্যোতি ভাসে।
জননী, এখনো ভাঙেনি কি ঘুম ঘোর—
পশেনি রোদন কানে?
জাগো, আশা দাও, মা ছাড়া কোলের ছেলে
আর বা কারেই জানে!
ভবিষ্যতের শঙ্খ উঠেছে বাজিয়া
সঘনে ডাকিছে ওই,—
'বিজয়-রতন, যশের মুকুট হায়,
যে নেবে সে কই কই?'
সুপ্তা জননী, ভাঙ' নিদ্রার ঘোর,
সে-মুকুট পর' শিরে,
অতীত দিনের, হে বিজয়ী মহারাণী—
বৈভব আনো ফিরে।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর দৃঢ় ধারণা এই যে, এই জগতে কবিদের হাতে এক মহাকর্ত্তব্যের ভার অর্পিত রহিয়াছে। তাঁহার 'অরণ্যে' নামক কবিতায় তিনি গাহিতেছেন—

অচিরে তুলিব আনত শির,
বাহিরে আবার হব বাহির—
জমেছে যেথায় পথের ভিড়
জনতার কোলাহল—
দ্বন্দ্ব যেথায় বেধেছে ঘোর
সেথায়, চিত্ত, আসন তোর,
কাটায়ে অন্ধ মোহের ঘোর
চল্ রে সেথায় চল্।
স্বপনের স্মৃতি যা রবে শেষ,
মনে যা রহিবে সুরের রেশ—
তাই ত পাথেয়, সেই ত বেশ
তাই নে সঙ্গে ক'রে।
হারানো গানের ব্যথিত সুর
জগতের ব্যথা করিবে দূর,
সঙ্গীতে ব্যথা হইয়া চুর—
সুরেই পড়িবে ঝ'রে।

সরোজিনী দেবীর ব্যক্তিগত ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা অতীব মনোমুগ্ধকর। তিনি যেন ভদ্রতার অবতার। সরলতা-গুণে তিনি সকলকেই আপনার করিয়া লইতে পারেন। মানসিক সম্পদেও তিনি ধনী; তাঁহার মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই 'কাল্‌চারে'র ধারা মিলিত হইয়াছে। তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেই তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি আলাপে পটু এবং হাস্যরস ও প্রাণশক্তি তাঁহার কথায় কথায় ফুটিয়া উঠে। তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার প্রতি অসীম-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন। যাঁহারা সরোজিনী দেবীকে রাষ্ট্রমঞ্চে কেবল বক্তৃতা দিয়া ফিরিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পারিবারিক জীবনযাত্রা দেখিলে আশ্চর্য্য হইবেন। তিনি আদর্শ পত্নী, আদর্শ জননী ও আদর্শ গৃহিণী। তাঁহার পতি-প্রেম গভীর, সন্তান-বাৎসল্য অপরিমেয়।

শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর ইহাই ব্যক্তিগত জীবন ও কাব্য-জীবনের আংশিক ইতিহাস। কিন্তু তাঁহার জীবনের আর-একটি বৃহৎ দিক্ আছে; সেটি তাঁহার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন। দেশ-প্রেমিক অঘোর-

নাথের প্রিয় কন্যা সরোজিনী দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিয়া আপনার পরিবার ও কাব্য-গণ্ডীর ভিতর স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি যেন একদিন অন্তরের মধ্যে ডাক শুনিলেন—

"কবি, তবে উঠে এস যদি থাকে প্রাণ,
তবে তাই লহ আজি সাথে, তাই কর আজি দান।
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার—
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার,
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষ-পট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি—
এবার ফিরাও মোরে—লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে রঙ্গময়ি, দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর।"—

তিনি এ আহ্বান অবহেলা করেন নাই। জননীর মত আর্ত্তের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে তাঁহাকে অনেকখানি ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কবির পক্ষে কাব্য-জীবন ত্যাগ সহজ ব্যাপার নহে। "কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না। প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে-সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়া-তাড়া, বিরোধ-বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য্য তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্ত্বচ্ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যে-সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী-মূর্ত্তির সহিত কর্ম্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে। যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, একাজ তাহাদের নহে; কাজও করিতে হইবে, নিজের শক্তিতে তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে, নিজের মনের ভিতর হইতে নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভার সকলের নাই।"

বিধাতার বরে সরোজিনী অকৃত্রিম কল্পনা-সম্পদ লাভ করিয়াছেন—তাহার প্রমাণ এই, যে, তিনি ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে দেখিতে পান।

সরোজিনী দেবী যখন সমাজ-সংস্কারক ও রাষ্ট্রনেতারূপে দেশের কাজে লাগিলেন—তখন হইতে তাঁহার কার্য্যাবলী সর্ব্বজন-বিদিত; কিন্তু, তাঁহার কাব্যজীবন চাপা পড়িয়াছে। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁহার বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের আমরা নামগুলি মাত্র দিতেছি।



মিঃ এ, এস, নারায়ন নাম্বেয়ার ও শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী

অসহযোগ আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার গভীর দেশাত্মবোধের প্রভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলির মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। জনসাধারণের হিতার্থে কাজ করিতে গিয়া তিনি তদানীন্তন অনেক মহৎ ব্যক্তির সংস্রবে আসেন এবং তাঁহারাই সম্ভবতঃ দেশের কাজে

তাঁহাকে বিশেষভাবে আহ্বান করেন। স্বর্গীয় মহাত্মা গোখলে ইঁহাদের মধ্যে একজন।

১৯০৬ সালে কলিকাতা সমাজ-সংস্কার কন্‌ফারেনসে সরোজিনীর মনোহারিণী বক্তৃতা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করেন ও তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশমাতার সেবাতে যে কি অসীম আনন্দ, গোখলে তাহাই সরোজিনীর নিকট বর্ণনা করিতেন এবং একদিন ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে গভীর আবেগে তিনি সরোজিনীকে বলেন—

'আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের নক্ষত্র-রাজি ও দূর পর্ব্বতশ্রেণীকে সাক্ষী রাখিয়া তোমার শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গীত, বচন, তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন দেশ-মাতার চরণে নিবেদন কর। হে কবি, পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া স্বপ্ন দেখ এবং তোমার আশার বারতা গ্রামের কৃষিজীবীদের নিকট নিবেদন কর।'

সরোজিনী এই গভীর আবেগ-আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি আত্ম-নিয়োগ করিলেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক আকাশ তখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন। হিন্দু মুসলমানে তখন নিত্য বিরোধ, কংগ্রেসে মডারেট ও এক্স্‌ট্রিমিস্ট্ দুই দলে ভাগাভাগি হইয়া গিয়াছে। গোখলে এই মত-বিভাগ দেখিয়া ব্যথিত হইতেন। কোনো রাষ্ট্রীয় নেতার একলার পক্ষে মিলন-সংঘটনের কাজ অসম্ভব ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসারিত হইতেছিল। ১৯১৩ সালের ২২শে মার্চ্চ তারিখে লক্ষ্ণৌ মুসলিম্ লীগের বিখ্যাত অধিবেশনে দেশের উন্নতিকল্পে হিন্দুমুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টা করা হয়। এই সভায় সরোজিনী দেবী বক্তৃতা দিবার অধিকার পাইয়াছিলেন, এবং এই তিনি প্রথম সাধারণ স্থানে বক্তৃতা করিলেন। তৎপর ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌয়ে সার্ এস্ পি সিংহের (এখন লর্ড্) সভানেতৃত্বে কংগ্রেসের যে-অধিবেশন হয়, তাহাতেও তিনি সর্ব্বপ্রথম স্বরাজ-প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক জীবন সেদিন আরম্ভ হইল বলা যায়। ১৯১৭ সালে শ্রীমতী বেসান্তের সভানেতৃত্বে কলিকাতা কংগ্রেসেও তিনি একটি ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতের নারীজাতির অভ্যুত্থান-চেষ্টায় নানা স্থানে অক্লান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ও নানা দেশে বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বিলাতেও ভারতবাসীদের যেন নিয়ন্তা-শক্তিরূপে কাজ করেন ও ১৯১৪ সালে 'লণ্ডন সিবিল্ এসোসিয়েসন্' স্থাপনে সাহায্য করেন।

১৯১৮ সালের মে মাসে কাঞ্জিভরমে মাদ্রাজ প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে তিনি যথেষ্ট ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অতি কৌশলে সে দুর্ব্বৎসরে সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি যুবকদিগকে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিতে আহ্বান করেন। তিনি সেই সভায় কবিতার মানসলোক পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্রনৈতিক কোলাহলে প্রবেশ করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছেন।

১৯১৫ সালের পর হইতে কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং দেশের ছোট বড় প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্না ছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় দেশের আপামর সাধারণ মুগ্ধ, তাঁহার সমাজ-সংস্কার-কার্য্যের জন্য সকলেই কৃতজ্ঞ। তিনি ভারতের নারীজাতির মুক্তির জন্য চিরদিন লড়িয়া আসিতেছেন; ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে কুলী-চালান-দেওয়া-সম্বন্ধে তিনি বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া এই নিরীহ কুলীদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ১৯১৯ সালের প্রারম্ভে তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি নিজে শুধু যোগ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেশের লোককে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন।

ভারতীয় নারীদিগের ভোটাধিকার লইয়া তিনি প্রচুর লড়িয়াছেন। তিনি নিখিল ভারতীয় নারী সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ মণ্টেগু মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হন। ইহার পর তিনি ১৯১৯ সালে "অল্ ইণ্ডিয়া হোমরুল্ লীগ্"এর তরফ হইতে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট্ কমিটিতে দেশের জন্য আবেদন পেশ করিতে গিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক গুরু বলিয়া মানিয়া লইলেন ও ভক্ত শিষ্যের মত আজ পর্য্যন্ত সুখে-দুঃখে তাঁহার গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন।

১৯২০ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়াতে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে তিনি পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা দেওয়াতে মণ্টেগু সাহেব তাঁহাকে তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিতে বলেন। সরোজিনী কংগ্রেস-রিপোর্ট হইতে তাঁহার উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন। মালাবার মোপ্‌লা বিদ্রোহ লইয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়। এবারেও তিনি তাঁহার কথার যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট্‌কে অপদস্থ করেন। ১৯২২ সালের ১১ই মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী ধৃত হন। সরোজিনী দেবী কিন্তু তাহাতেও না দমিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশে-প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া অসহযোগ আন্দোলন করিতে থাকেন।



দণ্ডায়মান (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী রণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুনলিনী দেবী। উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণে)—শ্রীমতী ঊষাবালা দেবী। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী), শামা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী

কেনিয়াতে শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচারে ভারতবাসীর দুর্দ্দশার প্রতিকারার্থ তিনি ১৯২৪ সালে আফ্রিকা যাত্রা করেন। তথায় তিনি তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা ও অদম্য উৎসাহের জোরে প্রবাসী স্বদেশবাসীদের দুঃখের অনেক লাঘব করিয়াছেন।

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান চেষ্টা। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই মহাজাতির মহান্ আদর্শের সহিত তিনি আশৈশব পরিচিত, এবং এই দুই বিভিন্ন ধারার মিলন-সাধনে তিনি নিরন্তর সচেষ্ট। যখন এদিকে ভারতীয় অন্য কোনো মনীষীর দৃষ্টি পড়ে নাই, তখন হইতেই তিনি এই মিলন-সাধনে তৎপর এবং একমাত্র তিনিই হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই সমান শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সরোজিনী দেবীকে 'ডক্টর অব লিটারেচার্' উপাধি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি এ উপাধিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। দেশ-সেবার জন্য অর্জ্জিত কাইসারীহিন্দ্‌ মেডেলও তিনি ১৯২০ সালের আগষ্ট মাসে ফিরাইয়া দেন।

সরোজিনী নাইডুর জীবন কর্ম্মবৈচিত্র্যে এত বিচিত্র যে, তাঁহার সমস্ত কার্য্যের তালিকা দেওয়া সম্ভব নহে। তবে আজ পর্য্যন্ত যেখানে তিনি অত্যাচারীর অত্যাচার দেখিয়াছেন, দুঃখীর দুঃখদুর্দ্দশা লক্ষ্য করিয়াছেন সেখানেই তিনি তাঁহার উদার মন লইয়া প্রতিকার-সাধনে যত্নবতী হইয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে এমন অনেক পুরস্কার ও

সম্মান লাভ ঘটিয়াছে যাহা জাতীয় অন্য কোনো মহিলার ভাগ্যেই ঘটে নাই। ১৯২১ সাল হইতে তিনি বোম্বে কংগ্রেস্ কমিটির প্রেসিডেণ্ট্ হইয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম নারী, যিনি বোম্বে কর্পোরেশনে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। আর আজ তাঁহারই ভাগ্যে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার সভাপতিত্বরূপ সম্মান ঘটিল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ যে-শক্তি লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা জীবনের যে-কোনো বিভাগেই তাঁহাকে যশস্বী করিত। তাঁহার বাহিরের কর্ম্মজীবনের বহুধা বন্ধনের মধ্যেও তিনি তাঁহার পারিবারিক জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন এবং পারিবারিক জীবনেই যে নারীর চরম সার্থকতা নয়, ইহা প্রমাণ করিয়া তিনি ভারতের অবমানিত পদদলিত নারী-জাতির আদর্শ গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের এই নব জাগরণের দিনে তিনি উদ্বোধিনী রাগিণী বাজাইতেছেন। ভারতের ভবিষ্য ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরউজ্জ্বল থাকিবে।

পুস্তক-পরিচয়

বাবলা (উপন্যাস)—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স—কলিকাতা। দেড় টাকা।

বাবলা একজন কম্পোজিটারের ছেলে। অতি শৈশবে সে তাহার পিতাকে হারায়। তখন তাহার পিতৃশোক বুঝিবার জ্ঞান হয় নাই। তাহার কয়েক বৎসর পরে সে তাহার মাতাকে হারাইল। বাবলার জীবনের করুণ কাহিনী পাঠকের মনকে ভিজাইয়া দেয়। লেখক বায়োস্কোপের ছবি হইতে বাবলার চরিত্রের অনেক অংশ গ্রহণ করিলেও, বাবলার বিদেশী রূপ চোখে পড়ে না। লেখক বাবলার জীবন এত করুণ করিয়াছেন যে বইখানি পড়িতে পড়িতে সকল পাঠকের চোখ সজল হইয়া উঠিবে। বইখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন আমাদের চোখের সামনে সমস্ত চরিত্রগুলি চলাফেরা করিতেছে। বইখানি চমৎকার হইয়াছে।

অরুণা (উপন্যাস)—শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। এক টাকা

অরুণা গরীবের মেয়ে। যাহার সহিত বিবাহ হইবার কথা ছিল, তাহার সহিত না হইয়া তাহার বিবাহ হইল এক বৃদ্ধের সহিত। কিছুদিন পরে সে বিধবা হইল। বিধবা হইবার পর যাহার সহিত বিবাহ হইবার কথা ছিল, অরুণাকে তাহারই আশ্রয় লইতে হইল। সেও তখন বিবাহিত। দুইটি জীবন দুজনাকে একান্ত আপন ভাবে কাছাকাছি চায়—কিন্তু উপায় নাই। লেখকের ভাষা এমন সরস এবং সহজ ভঙ্গিতে বহিয়া চলিয়াছে যে, অরুণা এবং অশোক—এই দুইজনাকেই একান্তই আমাদের পরিচিত জন বলিয়া মনে হয়। এই উপন্যাসখানির কোন স্থানে ভাবে বা ভাষায় কুৎসিত ইঙ্গিত নাই। লেখকের লেখাতে এই যে মার্জ্জিত রুচির প্রকাশ তাহা বর্ত্তমান সময়ে অনেক তথাকথিত বৃহৎ ঔপন্যাসিকদের লেখাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লেখক যেমন ভাবে দুইটি বাল প্রেমিক এবং প্রেমিকার শেষ মিলন ঘটাইলেন—তাহাতে অরুণার প্রিয় জন অশোকের সংসার ভাঙ্গিয়া গেল না, অশোক এবং তাহার স্ত্রী মাধবী অরুণাকে নূতন ভাবে একটি নূতন পবিত্র প্রেমের বন্ধনে তাহাদের সংসারে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিল। এই উপন্যাসে আত্মহত্যা নাই, কোথাও চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি নাই—কোথাও বিন্দুমাত্র ন্যাকামি নাই—অথচ উপন্যাসখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না।

চাষার মেয়ে (উপন্যাস)—শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

এই উপন্যাসখানিতে আমরা একটি চাষার মেয়ের জীবনের ইতিহাস পাই। লেখক এমন ভাবে তাহার জীবন-কাহিনী লিখিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় যেন সেই চাষার মেয়ে আমাদের সামনে বসিয়া তাহার জীবন-কথা বলিতেছে। সামান্য সামান্য ঘটনা, কিন্তু লেখকের বর্ণনাভঙ্গিতে তাহা সরস হইয়া উঠিয়াছে। চাষার মেয়ের অপূর্ব্ব স্বামী-প্রেমের কথা পাঠকের চোখকে সজল করিয়া দেয়। চাষার মেয়ে যখন যক্ষারোগগ্রস্ত স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য সমস্ত সম্বল হারাইয়া অবশেষে নিজের দেহকেও বিক্রয় করিল—তখন পাঠকের মন এই চাষার মেয়ের জন্য সমবেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠে—তাহার প্রতি ঘৃণা আসে না। সে সমস্ত পাঠক আজ-কাল "এরিষ্টোক্রাটিক্" নভেল পড়িয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই সামান্য চাষার মেয়ের কাহিনী অতি উপাদেয় লাগিবে। এই বইখানি আমাদের খুব ভালো লাগিয়াছে।

পদ্মকাঁটা (উপন্যাস)—শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম পাঁচ-সিকা।

লেখক মুখপাতে বলিতেছেন যে, বইখানি স্বাধীন ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবেই শেষ করিয়াছেন। তবে শেষের দিকে 'একটি ফরাসী উপন্যাসের ছায়া তাঁকে অনিবার্য্যভাবে অনুসরণ করেছে—' এর জন্যে লেখক নাকি দায়ী নন, কারুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আবশ্যকও নাকি নাই। আমাদের মনে হয় উপকার পাইয়া—তাহা যেমন ভাবেই হোক—তাহা অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ। বইখানি পড়িতে ভালো লাগিল না। ভাষা বড় কাণে লাগে, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, খোয়া-ছড়ান কলিকাতার রাস্তাবিশেষের উপর দিয়া থার্ডক্লাশ গাড়ী চলিয়াছে। লেখক ফরাসী উপন্যাসের ছায়া শেষের দিকে দেখিতে পাইয়াছেন—প্রথম দিকে বোধ হয় তাহা তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

চিত্ত-নামা (কবিতার বই)—কাজী নজরুল ইস্লাম। ডি এম লাইব্রেরী, ৬১, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

৪০ পাতা বইএর দাম এক টাকা। খুব সস্তা নয়। কবিতাগুলি

পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের উদ্দেশে লেখা। তবে পুস্তকের গোড়াতেই কাজী সাহেবের গোঁফে-চাড়া-দেওয়া এবং বিষ্ণুপুরের দল-মাদল কামানের গায়ে হেলান-দেওয়া অবস্থায় তোলা ফোটোগ্রাফের নকল দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দেশবন্ধু দাশের ছবি কোথাও নাই—ইহা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে, এবং বই বিক্রির দিক্ হইতেও ইহা বুদ্ধির পরিচায়ক হয় নাই। বইএর কবিতাগুলি পড়িয়া ভাল লাগিল। লেখকের দেশবন্ধুর প্রতি ভক্তি প্রতিছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানির বাঁধান, ছাপা, কাগজ—সবই খুব ভাল।

পূবের হাওয়া (কবিতার বই)—কাজী নজরুল ইস্‌লাম। ডি এম লাইব্রেরী। দাম পাঁচ সিকা।

বইখানির বাঁধান এবং ছাপা বেশ ভাল। কবিতাগুলি একেই অর্থহীন, তাহার উপর ছাপার ভুলে কতকগুলি একেবারে অপাঠ্য হইয়াছে। কবি নজরুলের পূর্ব্বপ্রকাশিত অনেক কবিতা অর্থহীন হইলেও ছন্দগুণে সুখপাঠ্য ছিল, আলোচ্য কবিতাপুস্তকে ছন্দকে 'কোতল' করা হইয়াছে—একে অর্থহীন তাহার উপর ছন্দহীন অর্থাৎ গণ্ডস্যোপরি-বিস্ফোটকং। যেখানে কোনো অনুপ্রেরণা নাই, সেখানে কেবলমাত্র অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে কবিতার বই ছাপানোর মত বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

মুক্ত পাখী (উপন্যাস)—শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। ডি. এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

বইখানি বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাস The Woman Who Did এর ছায়া লইয়া লেখা। লেখক বলিতেছেন যে, বহু দূর ভবিষ্যতে যে-সমস্যা আমাদের সমাজে জাগিতে পারে, তাহার বিষয় বহু পূর্ব্বে লিখিবার অধিকার আছে। এই পুস্তকে লেখক তাহাই করিয়াছেন। লেখকের লিখিবার গুণে বইখানি সরস এবং সুন্দর হইয়াছে, বিলাতির ছায়া মাত্রও যে আছে তাহা বুঝা যায় না। বইখানি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে।

পাগল দ্বিজদাসের গান—শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত। পাঁচ সিকা। প্রাপ্তিস্থান (১) গ্রন্থকার, পোঃ পারুলিয়া শক্তিমঠ, জিলা ঢাকা (২) মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা।

দ্বিজদাসের গান বাঙ্গালার পূর্ব্বপ্রান্তের বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী প্রচলিত। গানগুলি ভক্তিরসে ভরপুর, ছন্দের বা কবিত্বের মাপ-কাঠিতে ইহার বিচার করিলে অন্যায় করা হইবে। গভীর তত্ত্বকথা সরল এবং সহজ সহজ গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। গানগুলি ভাবের দিক দিয়া প্রাণকে স্পর্শ করে।

সাজি—শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই। আর্য্য পাব্‌লিশিং কোং, পি ৫৭ রসারোড্ সাউথ, কলিকাতা। দাম আট আনা মাত্র।

বইখানি ছেলেদের হয়ত ভাল লাগিবে। তবে গল্প তেমন কিছু নাই। দাম অত্যন্ত বেশী হইয়াছে।

বিক্রমশিলা—শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। আর্য্য পাব্‌লিশিং কোং। দাম লেখা নাই।

লেখক গল্প বলিবার ছলে ইতিহাস লিখিয়াছেন। এচেষ্টা সফল হইয়াছে। ছেলে-মেয়েরা এক সঙ্গে গল্পও পাইবে এবং ইতিহাসও জানিবে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়।

মৃদঙ্গ (কবিতার বই)—শ্রী যোগেশচন্দ্র দেওয়ানজী। আশুতোষ লাইব্রেরি, কলিকাতা। দাম বারো আনা। ১৩৩২।

বইখানি কাব্যামোদীদের আদর লাভ করিবে।

গ্রন্থকীট

মধ্যযুগে বাঙ্গালা—শ্রী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩৩০। মূল্য ৩্ টাকা।

লেখক প্রথিতনামা ঐতিহাসিক। "নবাবী আমলের বাঙ্গলার ইতিহাস" লেখকরূপে তিনি বাংলা দেশে এককালে মুষ্টিমেয় ঐতিহাসিক-গণের একজন বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আধুনিক কালে আর-কয়েকজন ঐতিহাসিক বাংলার ইতিহাসচর্চ্চায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। লেখক-মহাশয় এই শ্রেণীর ইতিহাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"একালে 'বিজ্ঞান-সম্মত' ইতিহাসে আবার 'পাথুরে প্রমাণ' চাই। তত শক্ত জিনিস হজম করিবার সাধ্য না থাকিলেও বহুতর পুস্তকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব প্রকৃতের অনুসরণ করা গিয়াছে।" সুখের বিষয়, গ্রন্থকার পাথুরে প্রমাণও ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। গ্রন্থখানিতে (১) রাজা গণেশ, (২) হোসেন শা, (৩) সেকালের নবদ্বীপ, (৪) শ্রীচৈতন্য, (৫) মোগল পাঠান (৬) জমিদার ও মগ-ফিরিঙ্গী, (৭) (৭) বৈদেশিকের বর্ণনা, (৮) সুবাদারী আমল, (৯) জমিদারী বন্দোবস্ত, (১০) সেকালের গ্রাম্য সমাজ, (১১) গ্রাম্য সমাজ, (১২) সেকালের আহার, (১৩) সে-কালের বসন-ভূষণ, (১৪) শিল্পকলা, (১৫) বাঙ্গালার বাণিজ্য, (১৬) সাধারণ অবস্থা, (১৭) বঙ্গে ব্রাহ্মণ-প্রভাব, (১৮) কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী, (১৯) উপসংহার,—ধর্ম্মকর্ম্ম।—এই উনিশটি ঐতিহাসিক নিবন্ধ ও একটি অবতরণিকা আছে। বেশীর ভাগ প্রবন্ধেরই উপজীব্য সাহিত্যিক উপাদান ও মুসলমান ঐতিহাসিকের রচনা। কিন্তু "বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস" কথাটায় একটু ঠেস দিয়া লিখিলেও গ্রন্থকার প্রমাণালোচনায় যথেষ্ট সাবধানতা ও যুক্তিবিচার প্রয়োগ করিয়াছেন। গ্রন্থে আলোচিত অনেক বিষয়েই নানা বাদপ্রতিবাদ আছে। সে-সব বিষয়ের এখানে উল্লেখ না করিয়া মোটের উপর বলা যাইতে পারে, লেখক খুব সাবধানে মধ্যযুগের বাংলার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবীণ ঐতিহাসিকের এ-প্রয়াস বঙ্গীয় পাঠকের নিকট আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। লেখক মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি বহুতর পুস্তকাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকৃতের অনুসরণ করিয়াছেন। অনেক বিষয়ে কেন নূতন তথ্যের অনুসরণ করেন নাই তাহা বলেন নাই। বঙ্গবিজেতার নাম বক্তিয়ার ছিল না, ইক্তিয়ার উদ্দিন ছিল, তাহা আজকাল শিশুপাঠ্য ইতিহাসেও স্বীকৃত; কিন্তু গ্রন্থকার বক্তিয়ারকে বাহাল রাখিয়াছেন। দু-একস্থলে "খাল্‌জি" লিখিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থলে "খিলজি" রাখিয়াছেন। আল্‌তামাশ নামের বানানেও তিনি কিছু পরিবর্ত্তন করেন নাই। প্রুফ দেখার বহু ত্রুটি লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। এতৎসত্বেও বইখানি বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যের ক্ষীণ কলেবর পুষ্ট করিবে।

বিজ্ঞানভিক্ষু

শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী—শ্রী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সংবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ গুহরায়, বি-এ, সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা। ১৩৩২।

লেখক এখন বিনাবিচারে কারাগারে বন্দী। তবু তাঁহার বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করা সম্ভব হইয়াছে দেখিয়া প্রীতি লাভ করা গেল। বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতেই বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গ-ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের প্রয়োজন ছিল। এসংস্করণেও ভুল-ভ্রান্তি অনেক রহিয়া গেছে। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে লেখক মুক্তিলাভ করিবেন ও তখন ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য বইখানির ঐতিহাসিক ও অন্যান্য ভুলগুলি সংশোধন করিয়া ছাপিতে দিবেন।

টেরেন্স্ ম্যাক্‌স্যুইনী—শ্রী অরুণচন্দ্র গুহ প্রণীত। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। এই গ্রন্থের লেখকও এখন বিনাবিচারে কারাবাস করিতেছেন। সুবিখ্যাত আইরিশ্ বীর ম্যাকস্যুইনার মতন অরুণ-বাবুও প্রতিবাদস্বরূপ একবার জেলে ৬৪ দিন অনশন করিয়া জেল-কর্তৃপক্ষকে নিজেদের অন্যায় ব্যবস্থা রহিত করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে ম্যাক্‌স্যুইনীর জীবন-কথা অবলম্বন করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার ইতিহাস অংশতঃ বিবৃত হইয়াছে।

স্বাধীনতার কথা—শ্রী নগেন্দ্রকুমার গুহরায় প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইহাতে স্বাধীনতার কথা, দাস-মনোভাব, প্রভু মনোভাব, স্বাধীন মনোভাব, হিন্দুমুসলমানের মিলন স্বাধের তারিখ, আমাদের পলিটিক্‌স্, ন্যাশন্যালিজম্ ও স্বাদেশিকতা, নারীর কথা, বন্দে মাতরম্, এই দশটি প্রবন্ধ আছে। লেখক অসহযোগ-আন্দোলনের সময় আলিপুর জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন। অধিকাংশ প্রবন্ধই সেইসময়ে লেখা। সাহিত্যের আবহাওয়ায় লেখকের মন গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য তাঁহার দৃষ্টি অনেক স্থলেই বেশ উদার। "নারীর কথা" ও "ন্যাশন্যালিজম্" প্রবন্ধ তাহার দৃষ্টান্ত। লেখক পূর্ব্ববঙ্গের লোক হইয়া কলিকাতার চলতি ভাষায় বেশ অনায়াসে লিখিয়াছেন। মাঝে-মাঝে কেবল একটু-আধটু প্রাদেশিকতা আসিয়া পড়িয়াছে।

অ

মহাপ্রস্থান—(ঐতিহাসিক উপন্যাস) শ্রী হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸০।

গ্রন্থকারের ভাষা ও বর্ণনার জোর আছে; আজকাল এরূপ মার্জ্জিত ভাষা কম দেখিতে পাওয়া যায়; সংস্কৃতবহুল হইলেও স্বচ্ছ ও সরল। মাঝে মাঝে দার্শনিক তত্ত্ব-কথাগুলি সত্যসত্যই চিন্তার খোরাক জোগাইয়া দেয়; তবে বইখানি উপন্যাস-হিসাবে যে বিশেষ মনোরম হইয়াছে, তাহা মনে হয় না—মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক উপন্যাসে এমন সব অনৈতিহাসিক অবাস্তব কল্পনা প্রবেশ করা হইয়াছে যে, কিছুক্ষণ ভাবিতে হয় ঘটনাগুলি কোন্ যুগে সংঘটিত হইতেছে। মোটের উপর বইখানি আমাদের ভালই লাগিল, তবে গ্রন্থকারকে আমরা গল্পের অবতারণা অধিক করিতে বলি। অতিরিক্ত তত্ত্ব-কথা ও বর্ণনা-বাহুল্য মাঝে মাঝে পাঠককে পীড়া দেয়।

দীপালি—(কথা-সাহিত্য) শ্রী রবীন্দ্রনাথ সেন। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

সুমিষ্ট মার্জ্জিত ভাষায় পশ্চিম ভারতীয় কয়েকটি মহীয়সী নারীর কাহিনী গ্রন্থকার অতীব যত্ন-সহকারে আমাদের হাতে দিয়াছেন। মূল ও অনুবাদের কবিতার টুকরাগুলি বড়ই সুন্দর। প্রত্যেক বাঙ্গালী-পরিবারে এই পুস্তকখানির আদর হইবে। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, ছবি নিখুঁত সুন্দর। গ্রন্থকার ও প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদার্হ।

ব্যবধান—(উপন্যাস) শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা। দাম দুই টাকা আট আনা।

লেখক তাঁহার অন্যান্য পুস্তকে যেরূপ অতি মনস্তত্ত্ববাদ, ক্রিমিনলজি, হেরিডিটি প্রভৃতির ছড়াছড়ি করিয়াছেন এই পুস্তকখানিতে তাহা বহু পরিমাণে কম বলিয়া বইখানি পড়িতে ভালই লাগিল। এই উপন্যাসের পাপ-বর্ণনার ছাপে মনে ছোপ ধরে না। কমলার স্বামী শক্তিকান্ত নিরুদ্দেশ হওয়ার পর আকৃতি-সাদৃশ্যের সুবিধা লইয়া কাশীনাথ গ্রামের লোকের চক্ষে এমন কি তাহার চক্ষেও ধূলা দিয়া তাহার স্বামী সাজিয়া বসিল এবং কমলা কিছুদিন পরে যখন তাহা বুঝিতে পারিল মানসিক দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে শক্তিকান্তের আবির্ভাব হইল। গ্রন্থকার কমলার মানসিক অবস্থা বেশ চমৎকার ফুটাইয়াছেন, পারিপার্শ্বিক বেষ্টনী মানুষকে যে মনে কেমন রূপান্তরিত করে শক্তিকান্তের চরিত্রে তাহাও বেশ ফুটিয়াছে।

পরীর দৃষ্টি—(রূপকথা) শ্রী অখিল নিয়োগী, কুলজা লাইব্রেরী, পোঃ নর্ত্তন, শ্রীহট্ট। দাম ছয় আনা।

আর্টিষ্ট লেখকের রূপের তুলিতে এই রূপকথাটি অপরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। নবীন গ্রন্থকারের প্রথম প্রচেষ্টা হইলেও সুখপাঠ্য, ছবিগুলিও অতি সুন্দর।

মায়ের ছেলে—(উপন্যাস) শ্রী বিভা দেবী। মূল্য দুই টাকা।

অকারণে স্বামী-পরিত্যক্ত একটি নারীর করুণ কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। লেখিকার ভাষা সজীব ও সরস, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই। গ্রন্থের শেষ ভাগে অনিলের ভাগ্যোন্নতি অস্বাভাবিক রকম দ্রুত ঘটিয়াছে। মোটের উপর বইখানি পড়িতে ভালোই লাগে।

মায়ামৃগ—(গল্পের বই) শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রকাশক ক্যালকাটা পাব্লিশার্স্, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

বইটির প্রচ্ছদপট, ছাপা ও কাগজ অতিসুন্দর—বহিরাবরণ এত সুন্দর কম বাঙ্গালা পুস্তকেই দেখা যায়। ভিতরের গল্প পাঁচটিও বাহিরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। নিখুঁত মনোরম ভাষায় হেমেন্দ্র বাবুর অসাধারণ দখল আছে। অথচ তাঁহার লেখার মধ্যে বর্ত্তমান-প্রচলিত কাঁদুনির ছড়াছড়ি নাই। 'বিদ্রোহী' 'পুরীর ডায়েরী' ও 'একটা দিনের ইতিহাস' চমৎকার উপভোগ্য, অথচ বেদনার আন্দোলনে মনকে ব্যথিত করিয়া তোলে। 'একটা দিনের ইতিহাসে' সমাজ-পরিত্যক্তা একটি অভাগিনী নারীর ব্যথা-ক্লিষ্ট মনটিকে কবি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—তাঁহার এই মরু-তৃষা চক্ষুকে অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। বর্ত্তমান রস-দৈন্যতার দিনে হেমেন্দ্র-বাবুর এই বইখানি সমাদৃত হইবে।

শ্রী সজনীকান্ত দাস

বেদান্ত-পরিচয়—শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। পৃঃ ২৫৪; মূল্য ১৷৹।

গ্রন্থে ১৩টি অধ্যায়—(১) উপক্রম; (২) ব্রহ্মের স্বরূপ; (৩) ব্রহ্ম ও জগৎ; (৪) জীব ও ব্রহ্ম; (৫) ব্রহ্মপুর; (৬) ও (৭) মায়া ও প্রকৃতি; (৮) ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম নিরূপণ; (৯) ভূমাবাদ (অদ্বৈতবাদ); (১০) ভূমাবাদ (অনুপ্রবেশ); (১১) ভূমাবাদ (শক্তি-প্রসরণ); (১২) ভূমাবাদ (বিশ্বরূপ); (১৩) মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত।

পরিশিষ্টের বক্তব্য বিষয়—১। বেদ ও বেদান্ত; ২। বেদান্ত ও ব্যাকোর; ৩। বৈদান্তিক সমন্বয়।

গ্রন্থকার উপনিষৎ ও গীতাদি শাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অতি সুন্দর ভাষায় বেদান্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

দুই-একটি বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২।৪।৭—৯ এই তিনটি মন্ত্রের এইপ্রকার অনুবাদ দিয়াছেন—

"যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়,—ব্রহ্ম ও জগৎ-সম্বন্ধেও ঐরূপ"। পৃঃ ৪১ এবং ১০৪।

দুইটা স্থলে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু কোন স্থলেই লিখিত তিনটি অংশের অনুবাদ দেওয়া হয় নাই:—

১। সপ্তম মন্ত্রের "দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা"

২। অষ্টম মন্ত্রের "শঙ্খস্য বা"

৩। নবম মন্ত্রের "বীণাবাদস্য বা"।

প্রথমটির দুইটি অর্থ হইতে পারে—দুন্দুভি-বাদকের ও দুন্দুভির আঘাতের। তৃতীয়টির দুইটি অর্থ করা সম্ভব বীণা-বাদকের ও বীণা-ধ্বনির। শঙ্কর দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয়টির অর্থ "শঙ্খ বাদকের"। এই তিনটি স্থল তুলনা করিয়া দেখিলে প্রথমটির ও তৃতীয়টির প্রথম অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রন্থকার ৭ম মন্ত্রে এই অংশের সমগ্র বাক্যের অর্থ করিয়াছেন—"কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়" ইহার অর্থ হইবে—"কিন্তু দুন্দুভি গ্রহণ করিলে কিম্বা দুন্দুভি-বাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়"।

অষ্টম মন্ত্রের অনুরূপ অংশের অর্থ হইবে—"কিন্তু শঙ্খ গ্রহণ করিলে কিম্বা শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়"।

নবম মন্ত্রেও এই প্রকার।

গ্রন্থকার বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামী-ব্রাহ্মণ হইতে ছয়টি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃঃ ১৫৯—১৬০)।

ইহার প্রথম মন্ত্রটির অনুবাদ উদ্ধৃত হইল:—

"যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী"।

মূলে আছে "পৃথিব্যাঃ অন্তর"—গ্রন্থকারের অনুবাদ "পৃথিবীর অন্তর" অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তর'। ইহার পরবর্তী মন্ত্রসমূহে আছে—"অদ্ভ্যঃ অন্তরঃ", "অগ্নেঃ অন্তরঃ" ইত্যাদি। এ সমুদায়েরও অর্থ করিয়াছেন—'সলিলের অন্তর,' 'অগ্নির অন্তর' ইত্যাদি। শঙ্করের অর্থও এইপ্রকার।

এবিষয়ে দুইটি আপত্তি:—

(১) এইপ্রকার অর্থ করিলে 'পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠন্' এবং "পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ" এই উভয় অংশের অর্থ একই হইয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় বক্তব্য এই:—এই ব্রাহ্মণে এইপ্রকার ২১টি মন্ত্র আছে। ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে পৃথিব্যাঃ, অদ্ভ্যঃ, অগ্নেঃ, অন্তরীক্ষাৎ ইত্যাদি। ১১টি স্থলে পঞ্চমী কি ষষ্ঠী বিভক্তি, সে-বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু অবশিষ্ট ১০টি স্থলে পঞ্চমী বিভক্তিই ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন অদ্ভ্যঃ, অন্তরীক্ষাৎ, আদিত্যাৎ, দিগ্‌ভ্যঃ, তারকাৎ, আকাশাৎ ইত্যাদি। ২১টি মন্ত্র একই প্রকার; সুতরাং সর্ব্বত্র একই বিভক্তি হইবে। সুতরাং সর্ব্বত্র পঞ্চমী বিভক্তি করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে অর্থ করিতে হইবে 'পৃথিবী হইতে পৃথক্', 'সলিল হইতে পৃথক্', 'অগ্নি হইতে পৃথক্' ইত্যাদি। আমাদিগের এই মত গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্রের অর্থ এইপ্রকার হইবে:—

"যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে যমন করেন—ইত্যাদি।"

সত্যের সন্ধান ও অন্যান্য প্রবন্ধ—শ্রী যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত। পৃঃ ১৪+১০৮+২; মূল্য ১৲।

পুস্তকে ১১টি প্রবন্ধ আছে; সমুদায় প্রবন্ধই কোন না-কোন মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধসমূহের নাম এই—নাস্তিকের প্রেম, আস্তিক ও নাস্তিক; নির্ব্বাণ ও জন্মান্তরবাদ; নিয়তিবাদ; বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য; তর্কশাস্ত্র; সতীত্ব; আলোচনা ভৌতিক-তত্ত্ব, ইচ্ছার কর্তৃত্ব, জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি; নিমন্ত্রণ-সভা; দুঃখবাদ; সত্যের সন্ধান।

অনেক প্রবন্ধে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থে অনেক স্থলে ইংরেজী বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সব স্থলে অনুবাদ দেওয়া হয় নাই। ইহাতে অনেকের অসুবিধা হইবে।

ধর্ম্মসূত্র—শ্রী গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ, প্রণীত। পৃঃ ১১৪+৪; মূল্য ১৲।

গ্রন্থের বিষয়—ধর্ম্ম এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য। সুলিখিত।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

অচিন-দেশের রাজপুরী—শ্রী রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ৮২।১ হ্যারিসন রোড হইতে শ্রীসুললিত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৫৪। মূল্য ৵৹। (১৩৩২)

রবীন্দ্রবাবু শিশু-সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত। শিশুদের জন্য লেখা এই গল্পের বইখানি তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্রের আঁকা প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য ছবিগুলি সুন্দর হইয়াছে।

প্র

ইঙ্গিত—শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী। প্রকাশক শ্রী প্রমোদ-রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। আট আনা। ১৩৩২।

গল্পের বই; কিন্তু গল্প বলিতে যাহা বুঝায় এগুলি সেরূপ গল্প নয়; ছোট ছোট কবিতার মত ইহাতে ছোট ছোট গল্প বা গল্পের টুকরা আছে। এগুলি বড় গল্পের আভাস বা ইঙ্গিত মাত্র,—কবিতার মত মনোহর, বড় ভাবের উন্মেষক, অখণ্ড রসের খণ্ড খণ্ড দ্যোতনা। গল্পগুলি হৃদয়কে স্পর্শ করে, আনন্দিত করে, ম্রিয়মাণ করে, মুগ্ধ করে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন—"অল্প কথায় একটি বিশেষ রস, আংশিক রূপে একটি চরিত্র, অথবা একটু মনস্তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি।" তাঁহার চেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে। বইটি কাব্যরসিকের পাঠ্য।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন-চরিত ও কবিতাবলী—৺রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়। ৮১-৮৪ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রেস হইতে এস সি ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আজকাল দেশে সংস্কৃত শিক্ষার আদর কমিয়াছে। সুতরাং সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নামও বাঙালী ভুলিতেছে। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের তথা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট যে, বঙ্গগৌরব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার গুণানুরক্ত ছাত্রস্বরূপ ছিলেন। নৈষধের সুব্যাখ্যাতা ছিলেন বলিয়াও তর্কবাগীশ মহাশয়ের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। এমন ব্যক্তির জীবনচরিত থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য জীবন-

চরিতটি পঞ্চম সংস্করণ। সুতরাং বাঙালী পাঠক জীবনচরিতটি সাদরে গ্রহণ করিয়াছে দেখা যায়; ইহা আনন্দের বিষয়। জীবনচরিতটির ভাষা সংস্কৃতবহুল, তথাপি অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহাতে সেকালের পণ্ডিত-সমাজের সুন্দর চিত্র পাইবেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রী ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ কর্ত্তৃক অনূদিত। ৩৭নং বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, উত্তর-পাড়া হইতে অনুবাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম আট আনা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডীর পয়ার ছন্দে অনুবাদ। বইখানি ছেলেদের জন্য রচিত এবং ছেলেদের উপযোগী হইয়াছে। কাশীদাসী ছন্দে অনুবাদ যথাসম্ভব সরল হইয়াছে। শক্তিশালিনী নারীরূপে চণ্ডী কেমন করিয়া ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হইলেন, দেবশত্রু মহিষাসুর ও তাহার সেনানী এবং প্রচণ্ড শুম্ভ নিশুম্ভকে তিনি কিরূপ অমিতবলে নিধন করিলেন—তাহা বালকদের কল্পনাতৃপ্তিকর অদ্ভুত কাহিনী। ইংরেজী গ্রন্থের দুঃসাহসপূর্ণ গল্প অপেক্ষা ইহা কম কৌতূহল-জনক নয়; এবং ইহা আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনী। সুতরাং বালক-বালিকাদিগকে ইহার সহিত পরিচিত করা কর্ত্তব্য। এই হিসাবে গ্রন্থকার আমাদের উপকার করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদে ছন্দের দোষ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তথাপি বইটির প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মেলেরিয়ার প্রতিষেধ ও আত্মচিকিৎসা—ডাঃ শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম-বি প্রণীত। ৪৫ নং আমহার্ষ্ট-ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে স্বাস্থ্যধর্ম্মসঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি, প্রকার-ভেদ, আনুষঙ্গিক কারণ, চিকিৎসা, প্রতিষেধ, আত্মচিকিৎসা প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ইহাতে প্রচুর অভিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। বইটির একটি কথা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। অনেকে বলেন ও অনেক ঔষধ-আবিষ্কর্ত্তা ঘোষণা করেন যে, কুইনাইন প্রয়োগে ম্যালেরিয়া জ্বর দূর হয় না, চাপা পড়ে মাত্র, সুবিধামত আবার প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রবীণ বিজ্ঞ লেখক বলিতেছেন—"তাঁহাদিগের (ঐরূপ লোক) মধ্যে অনেকেরই ঔষধ বিশ্লেষণ করিয়া কুইনাইন বা সিনকোনা-ঘটিত ঔষধ ধরা পড়ে এবং যাঁহাদিগের ঔষধে উল্লিখিত কোনরূপ পদার্থ নাই, তাঁহাদিগের ঔষধে কদাচিৎ সুফল ফলিতে দেখা যায়।" বইখানি ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া দরকার।

স্বস্তি-ঋদ্ধি—শ্রী রসিকচন্দ্র বসু, বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা হইতে শ্রী হেমচন্দ্র আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চৌদ্দ আনা।

প্রাচীন ভারতবর্ষ ও প্রাচীন বঙ্গদেশ-সম্বন্ধে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি চিন্তাগৌরবে ও বিশ্লেষণ-বৈশিষ্ট্যে অত্যন্ত সুপাঠ্য হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সেকালের সমাজ শাসন, প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, জাতীয় প্রবন্ধগুলি বিশেষ অনুসন্ধিৎসাতৃপ্তিকর। আমাদের বিশ্বাস—বইখানি পড়িয়া সকলেই চিন্তার খোরাক পাইবেন ও আনন্দ লাভ করিবেন।

লড়ায়ের নতুন কায়দা—শ্রী হারাধন বক্সী। প্রকাশক শ্রী রামেশ্বর দে, চন্দননগর। মূল্য চার আনা, ১৩৩২।

সংক্ষেপে বইটির পরিচয় দিতে গেলে এই বলিতে হইবে যে, এখানি আধুনিক যুদ্ধব্যাপারের একটি সুন্দর ইতিহাস। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে লেখক স্বয়ং যোদ্ধার কাজ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা পুঁথিগত বিদ্যা নয়, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ফল। জিনিষটি তিনি এত সরলভাবে বলিয়াছেন যে, তাহা গল্পের মত মনোগ্রাহী হইয়াছে। সেকেলে ও একেলে লড়াই, যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তৃতি, দুর্গ ও খাদ, কামান ও গোলা, বায়ুযান, সংখ্যা ও শক্তি প্রভৃতি আধুনিক লড়ায়ের বহু দিক লেখক আলোচনা করিয়াছেন। আবার আধুনিক যুদ্ধের চোখা চোখা উপায়গুলির প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্রূপ প্রকাশ করিতেও লেখক ছাড়েন নাই। ইহাতে তাঁহার ভারতবর্ষীয় মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা ইউরোপীয় যুদ্ধের কায়দাকরণ, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি জানিতে চান, তাঁহারা অবশ্যই বইটি পাঠ করিবেন। এইসমস্ত বই দেখিয়া আনন্দ হয় যে, বাংলা সাহিত্য বুঝি সর্ব্বাঙ্গপুষ্টির দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

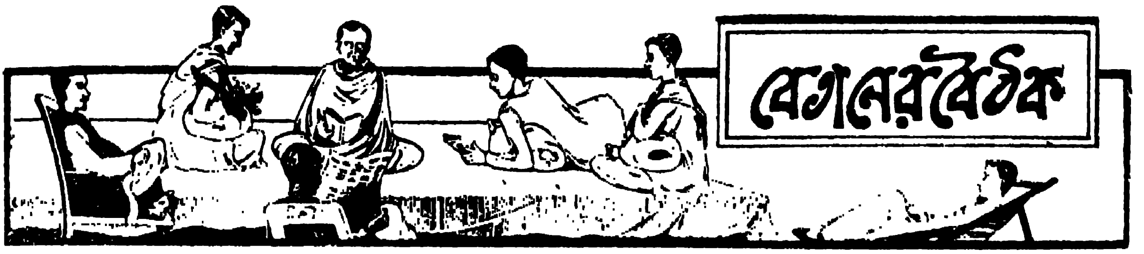
ছেলেদের বিদ্যাসাগর—শ্রী যামিনীকান্ত সোম। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। মূল্য দশ আনা।

পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। ঝর্‌ঝরে সরল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী গল্পের মত অতি সুন্দরভাবে লেখক বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের জীবনকথা বলিয়াছেন। বইটি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বইখানি ছেলেমেয়েদের খুব ভাল লাগিবে, সন্দেহ নাই।

দেশাত্মবোধ ও শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা পূজা—লেখকের নাম নাই। শ্রী গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ৪৩,৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার আনা। ১৩৩২।

ভারতবর্ষের স্বরূপ কি, কিরূপে ভারতবর্ষকে ভালবাসা যাইতে পারে, মাতৃরূপিনী ভারতবর্ষের মূর্ত্তি কি ও সে-মূর্ত্তিকে কিরূপে মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা যাইতে পারে—ইত্যাদি বিষয় বইটির প্রথমাংশে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনা গভীর চিন্তা ও প্রীতির পরিচায়ক। গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও তিনি যে সত্যদ্রষ্টা ও তাঁহার উক্তি যে সাধনাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। বইটির শেষভাগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রূপ কি তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকে অঙ্কিত করিয়া গ্রন্থকার সেগুলিকে স্তোত্ররূপে প্রচারিত করিয়াছেন। এগুলি বাস্তবিকই স্তোত্র রূপে, ভারতমাতার বন্দনা রূপে, বিদ্যালয়ের বালকবালিকাগণের দ্বারা পাঠ ও আবৃত্তির উপযোগী। ইহা প্রত্যেক ভারত-প্রেমিকের হৃদয় স্পর্শ করিবে। রাজনীতি, সমাজসেবা প্রভৃতি যে কোন ক্ষেত্রের কর্ম্মীই দৈনন্দিন জীবনে এই ভারতবন্দনাপদ্ধতি পালন করিলে দেশাত্মবোধে অধিকতর অনুপ্রাণিত হইতে থাকিবেন। দেশোন্নতিকামী সকলেরই বইটি পাঠ করা উচিত।

গুপ্ত



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

ভারতবর্ষে কৃষি-বিদ্যালয়

আজকাল অনেকেই কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য উৎসুক, কিন্তু তাহাদের উপযোগী স্কুল বা কলেজের অভাবে, শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম। যেমন Pusa Research Instituteএ ভর্ত্তি হওয়া দুরূহ ব্যাপার। Non-matric, Matric, I. A. এবং I. Sc. ছেলেদের শিক্ষালাভ করিবার উপযুক্ত স্কুল বা কলেজ ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ স্থানে কয়টি আছে?

শ্রী ধ্রুবজ্যোতিঃ ভৌমিক

'বাঙলা ভাষার প্রথম অভিধান'

বাঙলা ভাষায় কে সর্ব্বপ্রথম অভিধান প্রণয়ন করেন ও তাঁর অভিধানখানির নাম কি?

শ্রী জ্যোৎস্নানাথ চন্দ্র

—

মীমাংসা

(২)

বিষ্ণুপুরে মারাঠাদের পরাজয়

বর্ত্তমান বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার অধিকাংশ প্রাচীন বিষ্ণুপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মল্লরাজবংশ এই বিশাল জনপদের শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন বলিয়া—বিষ্ণুপুর মল্লভূমি নামে পরিচয় লাভ করিয়াছিল। বৃন্দাবনের নিকট জয়নগর নামক স্থানে মল্লরাজ বংশীয়দের আদি নিবাস ছিল। বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম রঘুনাথ সিংহ। তিনি মল্লরাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া আদি মল্ল নামেও খ্যাত হন। বিষ্ণুপুরের এক পঞ্চাশত্তম রাজা ২য় রঘুনাথ সিং ৯২২ মল্লাব্দে আপনাদের বংশগত মল্ল উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়গণের সুপরিচিত "সিংহ" উপাধি গ্রহণ করেন। সেই হইতে বিষ্ণুপুরের রাজাগণ সিংহ উপাধিই ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ২য় রঘুনাথ সিংহের পুত্র রাজা বীরসিংহ নানাবিধ সৎকার্য্য এবং অপরিসীম দানের জন্য বিপুল গৌরব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বীরসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ। তিনি বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ দেবতা মদনমোহনের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। দুর্জ্জন সিংহের পুত্র গোপাল সিংহ বর্গীর হাঙ্গামা বা মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে গোপাল সিংহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া অপূর্ব্ব সাহস ও বীরত্বের সহিত স্বীয় সৈন্য পরিচালন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাদের বিস্ময় উৎপাদন করেন। কিন্তু অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয়দের গতি প্রতিহত করিবার মত সৈন্যবল তাঁহার না থাকায় বাধ্য হইয়া দুর্গে আশ্রয় লন। দুর্গের প্রাকারস্থিত কামানশ্রেণী হইতে প্রচুর পরিমাণে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগায় মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণ পলাইতে আরম্ভ করে। গোপাল সিংহের সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। বর্দ্ধমানাধিপ কীর্ত্তিচন্দ্র গোপাল সিংহের সহিত মিলিত হইলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ক্রমে ক্রমে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এই যুদ্ধে যে-সমস্ত কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে, দলমাদল বা দলমর্দ্দন আজিও বিষ্ণুপুরের ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছে। রাজা গোপাল সিংহ ৯৭৫ মল্লাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ১০৫৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে পাঁচটি দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। তিনি তুঙ্গভূমের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোপাল সিংহের মৃত্যুর পর হইতেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। "মল্ল রাজবংশ" নামক এক প্রাচীন পুঁথিতে বিষ্ণুপুর-রাজগণের বংশপত্র লিখিত আছে। এই পুঁথিখানিকে সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত বলা যায় না, তবুও ইহা বিষ্ণুপুর রাজবংশ সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

(১৫)

বজ্রযোগিনী লোকেশ্বর এবং প্রজ্ঞাপারমিতা বুদ্ধদেবের ভিন্ন ভিন্ন নাম বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে

আকর্ষণ করিতেছি। বুদ্ধগয়াতে মহাবোধিবৃক্ষের নীচে, "বজ্রাসন" অবলম্বনপূর্ব্বক বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পর পাল বংশীয়দের রাজত্ব পর্য্যন্ত বিক্রমপুরেরর সকল স্থানেই বৌদ্ধধর্ম্মের খুব প্রসার এবং প্রতিপত্তি হইয়াছিল, ইতিহসে এ-বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। বজ্রযোগিনী নামটি বৌদ্ধদের দেওয়া। সাহিত্যিক দীনেশ সেন মহাশয় বলেন—"নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রাচার্য্যগণ এক সময়ে বৌদ্ধদের 'বজ্রাসন" তান্ত্রিক সাধনের বিশেষ উপযোগী জ্ঞান করিতেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত "বজ্রযোগিনী" গ্রামে এই বজ্রাচার্য্যগণের একটি প্রধান আডডা ছিল।" (প্রবাসী আষাঢ় ১৩২৯—২৬৯ পৃঃ)

বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত বজ্রযোগিনী নামের সহিত এগ্রামের অন্য কোনও সম্বন্ধ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমহাতান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বজ্রতান্ত্রিকগণের শীর্ষস্থানীয়, ইঁহার নাম বৌদ্ধ-জগতে সুপরিচিত। ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব-কালে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে দীপঙ্কর "বিক্রমপুরে" জন্মগ্রহণ করেন।

১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে ইঁহার মৃত্যু হয়। তিব্বতের শত শত নর-নারী দীপঙ্করের স্মৃতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করে। তিনি ১০৮ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইসব গ্রন্থগুলি বৌদ্ধ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি।

বহুভাষা-ও ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত ও অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, "বিক্রমপুরের ইতিহাস" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"সম্প্রতি আমাদের যোগেন্দ্র-বাবু (গুপ্ত) বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।" কোন্ কোন্ প্রমাণদ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের ঐতিহাসিক এবং ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা "বিক্রমপুরের ইতিহাস" পাঠ করিয়া জানিবার উপায় নাই। (বিক্রমপুরের ইতিহাস, ১৩১৬ সন, ১৬-১৭ পৃঃ)

বাংলাদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ "বিক্রমপুরকেই" দীপঙ্করের জন্মস্থান বলেন। শুধু যোগেন্দ্রবাবু কল্পনার সাহায্যে একটু অগ্রসর হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বজ্রযোগিনীই অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি। বাহুল্য-ভয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত এ স্থানে আলোচিত হইল না।

শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী

জন্মদিন

হিন্দুদের কোন কাজই শাস্ত্রানুমোদন-ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইত না এবং এখনও হয় না। সেই হিসাবে নানা কাজ নানা বিভাগে বিভক্ত। গমনাগমন, ক্ষৌর-কর্ম্ম ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রের অধীন। জন্মদিনে এই-সব কাজের শুভাশুভ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ লেখা আছে।

১। যো জন্মমাসে ক্ষুরকর্ম্ম যাত্রাং কর্ণস্য বেধং কুরুতে চ মোহাৎ। নূনং স রোগং ধন-পুত্র-নাশং প্রাপ্নোতি মূঢ়ো বধবন্ধনাপি।

যে-ব্যক্তি জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম্ম, যাত্রা, কিংবা কর্ণবেধ করে নিশ্চয়ই সে মূঢ়, রোগ ধনপুত্রনাশ এবং বধ-বন্ধন প্রাপ্ত হয়।

২। জন্মর্ক্ষে জন্মমাসে বা যো গচ্ছেদষ্টমে বিধৌ।
আয়ুঃক্ষয়মবাপ্নোতি ব্যাধিঞ্চ বধবন্ধনম্॥

জন্মমাস জন্মনক্ষত্র ও অষ্টমচন্দ্রে যাত্রা করিলে আয়ুঃক্ষয়, ব্যাধি, বধ ও বন্ধন হয়।

৩। ব্যতিক্রম। জাতং দিনং দূষয়তে বশিষ্ঠশ্চাষ্টৌ চ গর্গো যবনো-দশাহম্। জন্মাদ্যমাসং কিল ভাগুরিশ্চ চৌড়ে বিবাহে ক্ষুরি কর্ণবেধে॥

বশিষ্ঠমতে জন্মদিন গর্গমতে আট দিন যবন মতে দশদিন ভাগুরিমতে সম্পূর্ণ জন্মমাসই চূড়া বিবাহ ক্ষৌর ও কর্ণবেধে বর্জ্জনীয়।

শ্রী ভবানীচরণ দত্ত

ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অদ্যকার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অধিকার করিবার ন্যায়-সঙ্গত দাবী আমার নাই। সুতরাং আপনাদের এই সম্মানটি সম্যক্ উপভোগ করিবার পথে অন্তরায় হইতেছে আমার সঙ্কোচ ও আতঙ্ক। আমার এই ক্ষণস্থায়ী পদোন্নতিতে আশঙ্কার কারণ ত আছেই, উপরন্তু ইহার দরুণ অনেকের বিরাগ বিদ্রূপ অর্জ্জন করারও সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় আপনাদের নিমন্ত্রণ প্রতিগ্রহ করা সমীচীন কিনা তাহা ভাবিতেছিলাম। একবার মনে হইল, ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করিয়া এ সঙ্কট উৎরাইয়াই যাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, এই দার্শনিক সমাগমে আমার পদবীর সব চেয়ে কায়েমী স্বত্ব হয়ত আমার দর্শন শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত। এমন হইতে পারে যে, সভাপতি হিসাবে আপনারা তেমন লোকটিই চান যিনি নির্ব্বিকারভাবে উদাসীনপন্থী, যিনি অন্তত কোন বিশেষ মতবাদের বশ্যতা জ্ঞানতঃ স্বীকার করেন না, কারণ যাবৎ মতবাদ সম্বন্ধেই তিনি নিরপেক্ষ-ভাবে অনভিজ্ঞ। এক্ষেত্রে আমার গুণাগুণ তুলনামূলক সমালোচনার বহির্ভূত; কারণ তাহা অস্তি নাস্তি দুই-

বাদেরই বাহিরে এবং হয়ত আমাকে এইস্থানে আনিবার পক্ষে সেটা মস্ত সুবিধার কথা। এ অবস্থায় আমার মনে হয় আমি যেন একটা বাতিদান; বাতির মত তার আলোক বিকীরণের শক্তি নাই বলিয়াই যেন দীপ্তিহীন নিষ্ক্রিয় গাম্ভীর্য্যে অবিচলিত থাকার পক্ষে সে বেশী উপযোগী।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, আপনারা আমায় নীরব থাকিতে দিলেন না, যদিও আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞব্যক্তিদের উপদেশ অনুসারে আমার এ অবস্থায় নীরব থাকাই উচিত ছিল। এই দ্বিধা কাটাইয়া আমার পাণ্ডিত্যরিক্ত মনটিকে কথা বলাইতে সাহায্য করিয়াছে একটি জিনিষ। সেটি এই যে, আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন কাব্য যাহা হউক—একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। স্বাতন্ত্র্য-প্রসূত অসূয়ার বালাই তাহাদের নাই, সুতরাং পাশ্চাত্য সুলভ দণ্ডবিধির সাহায্যে অনধিকার প্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না।

দার্শনিকপ্রবর প্লেটো তাঁহার আদর্শ গণরাষ্ট্র হইতে কবিদের নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে। কারণ এখানে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা—বিদগ্ধমণ্ডলীর রুদ্ধদ্বার খাস কামরা আশ্রয় করা নহে। এই জন্যই বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের মত দার্শনিকের প্রতিও অনেক কবিতার আরোপ করিতে আমাদের জনশ্রুতি কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। অথচ এই শঙ্করাচার্য্যকে কোনও আতিথ্যদ্বেষী "ইমিগ্রেশন" আইনের সাহায্যেই প্লেটো তাঁহার আদর্শরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। হয়ত সেইসব কবিতা অধিকাংশই উচ্চ অঙ্গের কাব্য নহে, কিন্তু কবিতা সরবরাহ করাটা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে একটা অপরাধ বা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার বলিয়া কোন কাব্যামোদী দোষারোপ করেন না।

আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আমাদের মহাকাব্য মহাভারত ইহার সাক্ষী। বিশ্বসাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। ছোট বড় কত রকমের মানব চরিত্র, কি অদ্ভুত বৈচিত্র্যে, কত বিভিন্ন স্তরের মনস্তত্ত্বে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহাই নহে; কত নীতি, রাষ্ট্রীয় ও আধ্যাত্ম্য তত্ত্বের বিচারবিন্যাস এই মহাভারতের উদার আয়তনে কেমন সহজে আশ্রয় পাইয়াছে! এই অমিতাচারী ঔদার্য্যের ফলে কাব্য তার নিজস্ব সীমা লঙ্ঘন করিবার বিপদ স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সম্ভব হইল ভারতবর্ষে; কারণ এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী এক বিরাট্ সাধারণতন্ত্রে (Communism) বিধৃত। বস্তুত মহাভারত যেন একটি ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ; ইহার মধ্যে কত বিচিত্র মানস সৃষ্টি, অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রের মত জটিল-বিষম ছন্দে নৃত্য করিয়া ফিরিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইয়াছে। একজন বিশেষ কবির খামখেয়ালী ইহাতে নাই, সমগ্র জাতির সাধারণ মনোভাব এখানে দেখিতে পাই। আমাদের এই জাতিটি বিচিত্র তর্কবিতর্কজটিল পন্থা আশ্রয় করিয়া সেই ভাবলোকে ভ্রমণ করিতে ক্লান্তি বোধ করে না যাহা অসংখ্য উপাখ্যানের উপগ্রহপরিবেষ্টিত একটি মহাআখ্যায়িকার সৌরমণ্ডল বলিলেই হয়।

মুসলমানযুগেও এই ভারতে যে-সব সাধুসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই গীতরসিক। তাঁহাদের গান ভাবের আগুনে দীপ্তিমান, তাঁহাদের ধর্ম্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্মস্থল হইতে উৎসারিত, মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাঁহাদের কারবার। হয়ত ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। কিন্তু যখন দেখি যে তাঁহাদের সেই সমস্ত বাণী, সমস্ত সঙ্গীত কেবলমাত্র শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য নহে, তাহা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নরনারীর আদরের ধন, তখন বুঝিতে পারি দর্শন বস্তুটি কি গভীরভাবে আমাদের সাধারণের মগ্নচৈতন্যলোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি:

"পানীমে মীন পিয়াসী রে
মুকো শুনত শুনত লাগে হাঁসী রে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে;
ক্যা মথুরা ক্যা কাশীরে।"

কবীরের এই উচ্চ হাস্য সেই হিন্দুগায়কের ধর্মনিষ্ঠায় এতটুকুও আঘাত করে নাই। বরং কবীরের সঙ্গে তিনি একাত্ম; কারণ, তত্ত্বজ্ঞান যে তাঁহার মনকে মুক্তি দিয়াছে এবং তিনি বুঝিয়াছেন তীর্থ হিসাবে মথুরা বা কাশীর প্রতীকগত তাৎপর্য্য থাকিলেও চিরন্তন সত্য হিসাবে তাহাদের স্থান নাই। সুতরাং উক্ত স্থানদ্বয়ে তীর্থযাত্রা করিতে উন্মুখ হইলেও তিনি নিঃসংশয়ে জানেন যে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি যদি তাঁহার থাকিত তাহা হইলে কোন বিশেষ স্থানে যাইয়া ধর্মবোধ জাগাইবার কোন প্রয়োজনই হইত না। তবে যে সমস্ত ধর্মমন্দিরে কত যুগ ধরিয়া কত সাধকের ভজন পূজন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহার উদ্বোধিনী শক্তিটি তাঁহার মত সাধকের তেমনই প্রয়োজন বলিয়া তিনি স্বীকার করেন যেমন প্রয়োজন আমাদের আবহমানকাল প্রচলিত মন্ত্রের, যে মন্ত্র বহুযুগের ভক্তসাধকের কণ্ঠস্বরে প্রাণবান্ হইয়া আমাদের প্রাণকে সহজে উদ্বোধিত করিতে পারে।

পূর্ব্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই—সেটি এই যে, ব্যক্তিস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্ব সত্য। তিনি গাহিলেন;

"মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম;
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুষবয় বদবয়।"

এই সাধক কবি দেখিতেছেন যে, শাশ্বত পুরুষ তাঁহারই ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন। বৈদিক ঋষিও এমনই ভাবে বলিয়াছেন যে, যে-পুরুষ তাঁহার মধ্যে তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত।

"রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে।"

এই সব তত্ত্ব-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্য সাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জ্জিত বলিয়া উচ্চ সাহিত্য কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত। এইসব গ্রাম্য গায়কেরা তত্ত্ববিদ্যার কোন ধার ধারেন না, সেটা তাঁহারা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন। এমনি একটি কবির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ব্যাখ্যান শুনিয়া তিনি এই গানটি রচনা করেন:—

"ফুলের বনে কে ঢুকেছেরে সোণার জহরি
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।"

বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাঙলার সেই শ্রেণীর হইতে আসিয়াছে যাহারা প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। আমি তাহাদের গান কতকগুলি আমায় লিখিয়া দিতে অনুরোধ করায় দেখি তাহারা বেশ একটু বিব্রত হইয়াছিল; শেষে যখন ভরসা করিয়া লিখিল, আমি তাহার পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া হতাশ হইলাম, তাহাদের বানান ও অক্ষরবিন্যাস এমনই অপ্রত্যাশিত রকম অসনাতনী। কিন্তু এই সব কবি-বাউলদের সাধন পদ্ধতি মানবদেহতত্ত্বের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জটিল ও দুরবগাহ। ইহারা পথে বিপথে তাহাদের গান গাহিয়া ফেরে; আমার পথের ধারের জানালা হইতে একটি গান বহুকাল পূর্ব্বে শুনি, কিন্তু এখনও মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া আছে।

"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম তাহার পায়।"

এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে একমত; আমাদের বাক্য ও মন ভূমাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবু সেই প্রাচীন ঋষিগণের মত এই গ্রাম্য কবি অসীমের অভিসার হইতে নিরস্ত নন; বরং এই দুঃসাহসিক ব্রতে সার্থক হইবার একটা পন্থা আছে তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন। ইহা শেলীর সেই কবিতাটির কথা স্মরণ করায় যাহাতে তিনি সুন্দরের অতীন্দ্রিয় আবেশের বন্দনা গাহিয়াছেন।

সেই অজানা দুরধিগম্য হইলেও যেসকল সত্যের মূল সত্য, তাহা এই বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং এই অজ্ঞাতনামা বাঙালী বাউল উভয়েই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য তাহার গ্রাম্য সঙ্গীত সেই অজানা পাখীর ডানার ছন্দে মুখরিত। শুধু এই প্রভেদ যে শেলীর ভাষা জনকয়েক শিক্ষিত লোকের জন্য-আর এই বাউল গান গ্রামের চাষী ও সর্ব্বসাধারণের, যাহারা এই গানের আধ্যাত্মিক অতিবাস্তবতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না।

একটি কারণে এসমস্ত সম্ভব হইয়াছে; লোকশিক্ষার যে আশ্চর্য্য প্রণালী বহুকাল ধরিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে তাহাই সমস্ত বিকাশের মূলে; কিন্তু তাহা আজ ধ্বংসোন্মুখ। আমাদের প্রাক্তন বিদ্যায়তনগুলিতে দলে দলে ছাত্রগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও আর্য্যগণের চারিদিকে সমবেত হইত। সেই শিক্ষা-সত্রগুলি গভীর ও স্থিরসলিল হ্রদের মত; সেখানে আসিতে হইলে দুর্গম পথ অতিবাহন করিতে হয়। কিন্তু সেই সব জলাশয় হইতে প্রতিনিয়ত বাষ্পোদ্গম হইয়া যে সব মেঘ জন্মিত, তাহা বায়ুভরে কত প্রান্তর পর্ব্বত উপত্যকার উপর দিয়া সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইত। পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কত গীতিনাট্য, কথক-শিল্পীর মুখে কত বিচিত্র উপাখ্যান কথা, ভিক্ষুক বাউল গায়কের মুখে লোকসাহিত্যের কত অমূল্য গীতসম্পদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হইত; এবং এই মেঘপুঞ্জই ত জন-সাধারণের চিত্তক্ষেত্রকে সুসিক্তিত ও উর্ব্বর করিয়া তুলিত এবং যে সমস্ত তত্ত্ব মূলতঃ অতি কঠিন তাহা সাধারণগম্য করিত। সাংখ্যযোগ ও বেদান্ত দর্শনের গভীর মতবাদ গুলি লোকসাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়া প্রাণের ফসল ফলাইত এবং যে অগণ্য নরনারী শিক্ষা ও অবসরের অভাবে কোন দিনই সেই তত্ত্ববিদ্যার মূল উৎসে যাইতে পারিত না, তাহাদেরও গৃহদ্বারে সেই তত্ত্বগুলিকে উপস্থিত করিত।

সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা জটিল কর্ম্মভার বহিবার জন্য এক দল লোককে বাস্তব অভাবাদি দূর করিবার ভার লইতে হয়। সে দায়িত্ব যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহা এড়ান চলে না। সুতরাং এই সব মানুষদের পক্ষে মানসিক উন্নতি সাধন করার সুযোগ হয় না। এই ভাবে বিরাট্ জনসঙ্ঘ শুধু পণ্য উৎপাদনের চাপে লুপ্তচৈতন্য যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হয় বলিয়াই কয়েক জন মানুষ বড় ভাব ও অমর শিল্পরূপের স্ফুরণ করে এবং বিশ্বমানবকে অধ্যাত্মসাধনার উত্তুঙ্গ শিখরে লইয়া যায়।

সমাজের জন্য এই যে সকল ব্যক্তি আত্মবলিদান দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভারত কোন দিন উপেক্ষা করে নাই; তাঁহাদের জীবনব্যাপী শ্রমের ভীষণ অন্ধকারের উপর আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য তাঁহাদের উপযোগী করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে এবং সহজ কর্ত্তব্য-বোধেই তাহা করিয়াছে। কোন বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই কাজটি হয় নাই; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত সামাজিক ব্যবস্থার ফলেই ইহা জীবদেহে রক্তপ্রবাহের মত সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়াছে। এই জন্যই তাহার মূল উদ্দেশ্যটি চাপা পড়িলেও কাজটি চলিতেছে।

এক সময় আমি বাঙলার একটি সামান্য গ্রামে যাই। সেখানে প্রধানত মুসলমান চাষীদের বাস। গ্রামবাসীরা আমার জন্য একটি যাত্রা গানের পালা অভিনয় করে। সে নাট্যের আখ্যানবস্তু একটি লুপ্তপ্রায় ধর্ম্মপন্থীদের শাস্ত্র হইতে আহরিত, একদা সেই ধর্ম্মের বিস্তৃত প্রভাব ছিল। সে ধর্ম আজ প্রাণহীন, তবু তাহার বিশেষ বাণী জনসাধারণের নিকট ইহার নিজস্ব তত্ত্বটি প্রচার করিতেছে এবং শিক্ষা ও সংস্কারে সেই লোকেরা ভিন্ন হইলেও সে বাণী শুনিতে তাহাদের বিতৃষ্ণা নাই। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদ অনুসারে উক্ত গীতি-নাট্যটি মানবস্বরূপের বিভিন্ন উপাদান, তাহার দেহ, অহংবোধ ও আত্মা লইয়া বিচার করিয়া চলিল। পরে কথোপকথন ব্যপদেশে একটি মানুষের ইতিহাস বিবৃত হইল। মানুষটি রসকুঞ্জ বৃন্দাবনে যাইতে চায় কিন্তু এক প্রহরী পথরোধ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে চৌর্য্যাপরাধ উপস্থিত করিল। স্তম্ভিত হইয়া মানুষটি প্রশ্ন করায় প্রহরী তাহাকে অপরাধী প্রমাণ করিয়া দিল, যেহেতু যাত্রীটি তাহার গাত্রাবরণের মধ্যে অতি সঙ্গোপনে তাহার অহংটিকে অবৈধপণ্য হিসাবে বৃন্দাবনে আমদানি করিতে উদ্যত; অহং বস্তুটি যে মালিকের, তাহার নিজের নয়, সেটা সে স্বীকার করে নাই! সেই বমালশুদ্ধ ধরা পড়ায় অপরাধীর নিকট তার কল্পলোকের পথ অবরুদ্ধ। বাঁশের উপর ছিন্ন সামিয়ানা খাটাইয়া, ধোঁয়াটে কেরোসিনের আলোয় গ্রামের লোক ভিড় করিয়া শুনিতেছে, মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র হইতে শৃগালের পাল চীৎকার করিয়া রসভঙ্গ করিতেছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসে, তবু শ্রোতাদের ঔৎসুক্যের অন্ত

নাই। তাহারা নাটকটির অভিনয় দেখিতেছে এবং আপাত-বিসদৃশ নৃত্যগীত ও হাস্যপরিহাসের আবেষ্টনে মানব-জীবনের অনেক চরম সমস্যা ও তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যান চলিতেছে।

এই উদাহরণগুলি হইতেই বুঝা যাইবে, ভারতে কাব্য ও দর্শন কেমন হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। জীবনে পূর্ণতা লাভের সহজ ও সম্ভব পথটি মানুষকে ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব দর্শন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই এটি ভারতে সম্ভব হইয়াছে। সে পূর্ণতার অর্থ কি? ইহার অর্থ সত্যের মধ্যে মুক্তি, যাহার জন্য এই প্রার্থনা জাগিয়াছে—অসতো মা সদ্‌গময়—কারণ যাহা সত্য, তাহাই আনন্দ।

আমি চন্দ-শিল্পী। কাব্য-কারবারের ভিতর দিয়া আমি সত্যের একটি আনন্দরূপ উপলব্ধি করিয়াছি। চিত্তের মুক্তিপথ দিয়া সত্যের আস্বাদ আমাদের দান করাই সমস্ত শিল্পের মূল প্রকৃতি। সেই সম্বন্ধটি মনে রাখিয়া যখন আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের (aesthetics) কথা বলি, তখন সৌন্দর্য্যের সাধারণ সংজ্ঞা ছাড়িয়া তাহাতে কবিগণ যে গভীরতর তাৎপর্য্য দিয়াছেন সেই কথাই ভাবি: "সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য।" চিত্র-শিল্পী একটি জরাজীর্ণ মানুষের ছবি আঁকিলেন; ইহা দেখিতে শোভন নয়, তথাপি তার সেই ছবিখানি ছবি হিসাবে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে যখন আমরা তাহার সত্য মূর্ত্তিটি গভীর ভাবে অনুভব করি। ব্রাউনিঙ্-এর কবিতায় ঈর্ষাউন্মত্ত যে নারীটি বিষ প্রস্তুত হইতে দেখিতেছে এবং সেই বিষ তাহার প্রেমঈর্ষার পাত্রীটিকে কি ভাবে জর্জ্জর করিবে তাহা কল্পনায় উপভোগ করিতেছে—এ-হেন নারীর মনকে সুন্দর বলা যায় না। কিন্তু যখন এই নারীর ছবিটি পরিকল্পন ও রূপস্ফুরণের সুসঙ্গতিতে আমাদের চোখের সম্মুখে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠে, তখন আমরা এই ছবিও উপভোগ করি। মহাভারতে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্রে মধ্যে মধ্যে যেনীচতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—তাহার দরুন শিল্পসঙ্গতির আনন্দ ইহাতে আমরা যতটা পাই, কেবল মাত্র অবিমিশ্র ঔদার্য্যের আদর্শ চিত্র হইতে ততটা পাইতাম না। নৈতিক আদর্শের পূর্ণতাটি নানা বিসংবাদী রসের দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে বলিয়াই উক্ত চরিত্রটি আমাদের কাছে সত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই ইহা আমাদের আনন্দ দেয়, প্রীতিকর বলিয়া নহে, সৃষ্টির ছন্দে সুনির্দ্দিষ্ট বলিয়া।

জীবনে যাহা আমাদের মিলে না তাহা শিল্পের ভিতর দিয়া আমরা কতকটা উপভোগ করি বলিয়াই যে শিল্পের এত মূল্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শিল্পের আসল মূল্য এই-খানে যে তাহার বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া ইহা আমাদের সঙ্গে সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। সেই শিল্প সৃষ্টিগুলি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইবার দরকার নাই, তাহারা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে সত্য হইয়া উঠিলেই আনন্দ দেয়। শিল্পের জগতে আমাদের চেতনা ও অনুভূতি স্বার্থবন্ধন হইতে মুক্ত বলিয়াই আমরা ঐক্য ও সঙ্গতির একটি অপ্রতিহত স্বপ্নরূপ উপভোগ করি; পূর্ণসত্যের মানসীপ্রতিমা বলিয়াই তাহা চিরন্তন আনন্দের উৎস।

শিল্পীর জগতে যে নিয়ম, বিধাতার জগতেও তাই; সৃষ্টির উৎস ও চরম লক্ষ্য যে নিঃস্বার্থ আনন্দ, তাহা লাভ করিতে হইলে অহমের কবল হইতে মুক্ত হওয়া চাই। সেই মুক্তির প্রতীক্ষায় আমাদের আত্মা উন্মুখ হইয়া আছে। এবং তাহার যে তৃষিত আমিটা আপাত সত্যের মৃগতৃষ্ণিকার পিছনে ছুটিয়া মরিতেছে, তাহাকে সত্যের ঐক্যলোকে মুক্তিদিবার জন্য ক্রন্দন করিতেছে। এই মুক্তির আদর্শটি আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া আছে ইহা ভারতের জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে এবং আমাদের সমস্ত ভাবপ্রেরণা ও প্রার্থনাকে উৎসারিত করিয়া দিব্য লোকের পানে ছুটাইয়াছে; কাব্য পক্ষপুটে ভর করিয়া আমাদের আত্মা ঊর্দ্ধে উড়িয়া যায়। সহজবিশ্বাসী তুচ্ছশিক্ষিত কত লোক দেখি তাহাদের প্রার্থনা মুক্তি-দায়িনী তারাকে নিবেদন করিয়া গাহিতেছে—

"তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল্।"

আমাদের দেশের এই সব সাধারণ মানুষ সত্যের জগৎ হইতে বিচ্যুত হইবার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত; বস্তু-জগতের ফেন-পুঞ্জের মধ্যে একটানা ভাসিয়া যাওয়া, পুলক-বেদনার তরঙ্গভঙ্গে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়া, জীবনের কোন চরম

লক্ষ্য খুঁজিয়া না পাওয়া, ইহার মত আতঙ্কের বিষয় তাহাদের আর কিছু নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ গাড়োয়ান হাটে গাড়ী হাঁকাইয়া যায়, কেহ বা জেলে মাছ ধরিয়া বেড়ায়। তাহারা যে সকল গান গায় তাহার গভীর অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাহারা খুব সম্ভব উপযুক্ত জবাব দিতে পারিবে না, কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটি বিষয়ে সেখানে কোন সন্দেহ নাই। সেটি এই যে, সমস্ত দুঃখের কারণ জীবনের আসবাব্ পত্রের অভাব নয়,জীবনের সত্য তাৎপর্য্য সম্বন্ধে চেতনার অভাব। এই জন্যই দেখি যে "আমি ও আমার' এই ভাবটার উপর অযথা জোর দিলেই আমাদের দেশের লোক তাহার নিন্দা করিয়া থাকে, কারণ 'আমি ও আমার' উগ্রবোধটা সত্যের পরিপ্রেক্ষণকে অলীক করিয়া তোলে। তাহারা যে দেখিয়াছে, সংসারের সমস্ত সম্বল পিছনে ফেলিয়া দিয়া সত্যের অভিসারে বাহির হইয়াছে কত মানুষ, যাহাদের সামাজিক পদবী বা মানসিক বিকাশ সাধারণের উপরে যায় না।

এই সকল দুর্গমপথ-যাত্রীদের যে পার্থিব শক্তি সম্পদ্ বাড়াইবার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা যে মুক্তির ভিখারী, সেকথা আমাদের দেশের লোক বোঝে। তাহারা হয়ত এমন মানুষকে দেখিয়াছে, যে তাহাদেরই মত দরিদ্র এবং গ্রামে তাহাদের সঙ্গে এক ব্যবসায়লিপ্ত। সে তাহার দৈনন্দিন কাজ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তবু তাহার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যে সে একজন মুক্তজীব —শাশ্বত পুরুষের হৃদয়ে সে আশ্রয় পাইয়াছে। এমন একটি মানুষ একবার আমার চোখে পড়িয়াছিল ; সে একটি জেলে, সারাদিন গঙ্গায় মাছ ধরিয়া ফেরে আর তন্ময় হইয়া গান গাহিয়া যায় ; একজন মাঝি তাহাকে ভক্তিভরে দেখাইয়া বলিল, উনি মুক্তপুরুষ। সমাজ মানুষের উপর যে মামুলী মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, এ-লোকটি তাহার উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে ; বাজার দর অনুসারে দোকানে সাজান পুতুলের মত মানুষকে সমাজ যে ভাবে সাজায়, তার কোন কোটায় এ লোকটি পড়ে না।

এই জেলেটির মুখ যখন মনে পড়ে, তখন না ভাবিয়া থাকিতে পারি না যে, বন্ধন-মুক্ত আত্মার মহাকাব্য যাহারা জীবন দিয়া রচনা করিয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা হয়ত নিতান্ত কম নয়—যদিও ইতিহাসে তাহাদের নাম কখনও দেখিব না। এই সব অবিকৃতআত্মা সামান্য চাষাভুষা জানে যে, সম্রাট্ তাহার সাম্রাজ্যের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হইলে বিচিত্রবেশী ক্রীতদাস মাত্র ; লক্ষপতি তাহার কর্ম্মফলে সোনার খাঁচায় বন্দী, কিন্তু ঐ সামান্য জেলেটি জ্যোতির্লোকে মুক্তি পাইয়াছে।

যখন অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া ফিরিতেছি, তখন কোন একটি জিনিষে ঠোক্কর খাইয়া সেইটিকে আঁকড়াইয়া ধরি এবং তাহাকে আমাদের একমাত্র আশা ও নির্ভরস্থল মনে করি। কিন্তু যখন আলোকের প্রকাশ হয়, তখন ঐ সমস্ত টুক্‌রা টুকরা বস্তুকে ছাড়িয়া দিই। কারণ দেখি যে ভূমার সঙ্গে আমরা সকলে সম্বন্ধযুক্ত, বস্তুগুলি ত তার অংশমাত্র। গ্রামের সামান্য লোকেরা জানে মুক্তি কি জিনিষ—অহমের বিচ্ছন্নতা হইতে মুক্তি, যাহা হইতে আমাদের অত্যুগ্র অধিকার বোধ জাগে সেই বস্তুর ভেদলিপ্সা হইতে মুক্তি। তাহারা জানে যে কেবল মাত্র বন্ধন অস্বীকার করিলেই মুক্তি আসে না, সম্পদের হ্রাস হইলেও নয়—মুক্তি আছে আস্তিক্যবোধের সাধনে, তাহার সিদ্ধি প্রাণে বিশুদ্ধ আনন্দের প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাই গান উঠে :

"যে জন ডুব্‌ল সখী তার কি আছে বাকি গো।"

তাই ত ইহারা গাহিয়া থাকে :

"মনরে আমার মনের সাথে মিল্‌বি যদি আয়
তুই মনেরে এক মন হয়ে আজব সহর চলে যাই।"

এক মন আমারে বাহিরে এই বৈচিত্র্যের রাজ্যে নানা বস্তু খুঁজিয়া ফেরে আর এক মন ভিতরে ঐক্যের স্বপ্নমূর্ত্তির সন্ধানে ছোটে—এই দুই মনের মধ্যে দ্বন্দটি যখন মিটিয়া যায়, তখনই আমরা 'আজব'কে, অনির্ব্বচনীয়কে উপলব্ধি করি। কবীরও এই সত্যটির প্রচার করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম কেবল মাত্র অন্তরের অধ্যাত্ম লোকে বাস করেন ইহা বলিলে বাহিরের এই বস্তুলোকের অপমান করা হয় এবং যখন তাঁহাকে কেবল মাত্র বাহিরে নির্দ্দেশ করি তখনও সত্য বলি না।

এই সব বাউল গায়কদের মতে সত্য ঐক্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মুক্তি ঐক্যের সাধনে। আমাদের দৈনিক আরাধনা ও ধ্যানের মন্ত্রাদি মনকে সেই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করে যাহাতে মনকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার যত ব্যবধান আছে সব জয় করিতে পারা যায় এবং তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় যিনি অদ্বৈতম্ বলিয়াই অনন্তম্। গভীর তত্ত্বজ্ঞান বাষ্পের মত ভারতের জনসাধারণের চিত্তে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদি জাগাইয়াছে। এই জ্ঞান প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া দিতেছে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বাহিরে চলিয়া যাইতে; কারণ এখানে তথ্য মাত্র তথ্য বলিয়া আমাদের কাছে বিদেশী সঙ্গীতের ধ্বনির মত অপরিচিত। কিন্তু স্বরগ্রামের সহিত পরিচয় হইলে যেমন আমরা তাহাদের ঐক্যটিকে সঙ্গীতরূপে পাই; তেমনি অন্তহীন বহু যেখানে এককে প্রকাশ করে, সেই সর্ব্বভূতের অন্তরতম সত্যের মধ্যে মুক্তি লাভ করিবার পরামর্শ এই জ্ঞান হইতে আসে।

এই মুক্তি একমাত্র সত্যেই আছে, সত্যাভাসে নাই; সেইজন্য ফলপ্রাপ্তির লোভ তাড়াতাড়ি যে সার্থকতার পথ কাটিয়া বসে। তাহা ঠিক পথ নহে, একজন নগণ্য গ্রাম্য কবি, যাহাকে বিশ্বের মান্যগণ্য লোকেরা কেহ জানে না, যাহার মনের উপর সরকারী শিক্ষাবিভাগ তাহার ছাঁচেঢালা শিক্ষার নিগড় চাপায় নাই, সেই মানুষটি গানের ভিতর দিয়া ঐ পরম সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছে।

"নিঠুর গরজী,
তুই কি মানস-মুকুল ভাজ্‌বি আগুনে?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।
দেখ্‌না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগ যুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়া হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড;
এর আছে কোন্ উপায়?
কয় সে মদন, দিস্‌নে বেদন, শোন নিবেদন,
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজ ধারা আপন হারা তাঁর বাণী শোনে,
রে গরজী।"

কবি জানেন জোর করিয়া মুক্তি লাভের কোন বাহ্য উপায় নাই। অন্তরের সাধনপ্রক্রিয়ায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া হারাইতে পারিলেই তবে মুক্তির দিকে যাওয়া যায়। বন্ধন তার অসংখ্য রূপে আমাদের এই অহমের মধ্যেই কেল্লা গড়িয়া বসিয়াছে। তাহা বহির্জগতে নাই। বন্ধন রহিয়াছে আমাদের চৈতন্যের নিষ্প্রভতায়, আমাদের দৃষ্টি-রাজ্যের সঙ্কীর্ণতায় এবং সর্ব্বত্র আমাদের স্থায়ী মূল্য নির্দ্ধারণের ভ্রমে।

ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে; এই সভ্যতা এক নিরবচ্ছিন্ন অভাবের তাড়নায় চালিত; এই যে দুর্দ্দমনীয় গতিবেগের অন্ধশক্তি (inertia), যাহা কোথায় কেমন করিয়া থামিতে হয় তাহা জানে না—এই আপাতমুক্তিকেই সত্য মুক্তি বলিয়া মানুষ ভ্রম করিতেছে। কোন কোন বর্ব্বর জাতি মানুষের মাথার খুলির উপর একটা মনগড়া মূল্যের আরোপ করিয়া থাকে এবং সেই সম্বন্ধে তাহাদের গাণিতিক উন্মত্ততা এমনই বাড়িয়া যায় যে, তাহারা নরমুণ্ড সংগ্রহ করিয়া আর শ্রান্ত হয় না। নিষ্ঠুর নিয়তি যেন তাহাদিগকে একটা অন্তহীন বাড়াবাড়ির পথে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহারা কেবলই যোগের পর যোগ দিয়া ছুটিতে থাকে। এই বীভৎস সংগ্রহের পথে যে অবাধ স্বাধীনতা তাহা ঘৃণ্যতম বন্ধনেরই নামান্তর। ইহাদের এই নিষ্ঠুর দাবীর তাড়না কেবল বাড়িয়াই চলে, কারণ যে বস্তু তাহাদের লক্ষ্য ও কাম্য তাহা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া নাই। সেইরূপ এ কথাটাও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, কেবল মাত্র গতিবেগকে বাড়াইয়া, তামসিক ভোগের আড়ম্বর ও আস্‌বাব পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া, প্রাণহিংসার যাবতীয় উপাদান ও অস্ত্রশস্ত্রের বিভীষিকা বিপুল করিয়া তুলিয়া, যাহা মহান্, যাহা বিরাট্ তাহার একটা কাণ্ডজ্ঞান-হীন কদর্য্য পরিহাসোৎসব মাত্র করিতেছি। বন্ধনের শৃঙ্খল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং একটা নিরর্থক নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দাবীর তাড়না সমস্ত পৃথিবীকে শৃঙ্খলিত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বে দেখি, যে, জন্মগত একটি শাস্তি হইতে নিস্তার লাভই মুক্তি। ভারতে মুক্তি হয় অবিদ্যার অজ্ঞানের অন্ধকারা হইতে, যে অবিদ্যা অহম্‌কেই চরম বলিয়া মোহ উৎপাদন করে। কিন্তু যে প্রজ্ঞা আমাদিগকে

এই অবিদ্যা হইতে মুক্তি দিবে তাহা শূন্যগর্ভ নহে। শূন্যতায় মুক্তি নাই। যে অবাধ সুসঙ্গত গতিবিধির ভিতর দিয়া আমরা আমাদের এই আবেষ্টন—এই পার্থিব জীবনের সঙ্গে একাত্ম হইতে হইতে পারি, তাহাই মুক্তি। শূন্য নিষ্ফল নিঃসঙ্গতা নহে, সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি—ইহাই ত উপনিষদের কথা—সর্ব্বভূতে যিনি নিজের আত্মাকে মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার কাছে সত্য আর অপ্রকাশ থাকেন না।

বাস্তব জগতেও মুক্তির সেই একই তাৎপর্য্য। শুধু তাহা তাহার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যতদিন আমাদের কাছে এক দুর্ব্বোধ্য যুক্তিহীন খামখেয়ালীর প্রকাশ মনে হইয়াছে, ততদিন আমরা যেন এক অজ্ঞেয় বিজাতীয় লোকে বাস করিয়াছি। তাহার মধ্যে যে আমাদের স্বরাজের স্থান আছে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে এই জগতের চালচলনের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে সেই মিলনের সেই সঙ্গতির মধ্যেই যে ঐক্য ও মুক্তি দেখা দিল। অবিদ্যাই আমাদের আবেষ্টনের সঙ্গে আমাদের অনৈক্য ঘটায়। এবং বিদ্যা যাহা বস্তুজগতের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশকে বুঝাইয়া দেয়, সেই ব্রহ্ম-বিদ্যাই ত বাস্তবজগতের মর্ম্মস্থলের ঐক্যটিকে ধরাইয়া দেয়—অদ্বৈতমকে চিনাইয়া দেয়।

জগতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে যাহারা বাড়িয়াছে, যাহারা জানে না যে, জ্ঞানের দাবীতে এই জগত তাহাদেরই, সেই সব মানুষ কাপুরুষতায় কায়েমী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। যে নিয়তি অসন্দিগ্ধভাবে আঘাত করিয়া চলিয়াছে—যাহার বিরুদ্ধে আপিল নাই—সেই নিয়তির উপরই আশাহতদের আস্থা। এমন কি মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হইতেও যখন তাহারা বঞ্চিত হয় তখনও তাহারা বিনা সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করে। কারণ তাহারা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে যেন তাহারা জন্ম হইতেই আইনের বাহিরে এবং এ জগৎ সর্ব্বদাই তাহাদের উপর দুর্ব্বোধ্য দুর্ঘটনার উপদ্রব চাপাইবে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই পর-ভাব এবং অদ্বৈতবোধের অভাবই মুক্তির অন্তরায়। মিলনের গ্রন্থি-গুলির উপর জবরদস্তি চালিতেছে বলিয়াই আমাদের বন্ধন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে যাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যাইতেছে, তাহাদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করাই মুক্তি; কারণ সম্বন্ধের অর্থই হইতেছে অপরের প্রতি দায়িত্ব-বোধ। কিন্তু হেঁয়ালীর মত শুনাইলেও ইহা সত্য, যে, জীবজগতে অন্যোন্য সম্বন্ধ বোধটি পূর্ণ করিয়া সুসঙ্গত করিয়া পরস্পরের ভার গ্রহণেই মুক্তি। উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বশে কোন দায়িত্বই স্বীকার না করা কেবল মাত্র বর্ব্বরদের পক্ষেই সম্ভব এবং সেই জন্যই বর্ব্বরদের পূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। যে আগুন ভাল করিয়া জলে নাই সুতরাং ধূমজালেই আচ্ছন্ন, সেই আগুনের মতই বর্ব্বরগণ চাপা পড়িয়া থাকে, তাহারা তামস সমুদ্রে ডুবিয়া আছে। এই নির্ব্বাপিতপ্রায় তমসাচ্ছন্ন জীবনের কারাবাস হইতে তাহারাই মুক্তি পায়, যাহারা পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে ও এক জোটে কাজ করিতে সমর্থ। মানবের মুক্তির ইতিহাস মানবসম্বন্ধের পূর্ণবিকাশেরই ইতিহাস।

এই সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির পথে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ব্যক্তির বা দলের স্বার্থপরতা। বিশ্বমানবের পূর্ণ বিকাশে যত দূর সম্ভব সাহায্য করাই সভ্যতার চরম লক্ষ্য। কিন্তু নৈতিক আদর্শের স্থান অধিকার করিয়া যখন কোন রকম স্বার্থপরতা অবাধে সমাজের মূল উপাদানগুলি গ্রাস করিতে বসে, তখন সভ্যতার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ, গ্রাস করিবার লোভ এবং সৃষ্টি করিবার জীবন্ত শক্তি পরস্পরবিরোধী। জড়ের জগতে প্রাণই প্রথম মুক্তির জয়ধ্বজা উড়াইয়াছে; কারণ প্রাণ কেবল বাহ্যিক ঘটনা মাত্র নহে, ইহা অন্তর-জগতের প্রকাশ, ইহা বস্তুর সীমা ছাড়াইয়া যায়—উপাদানের ভারে আত্মাকে আটক করিতে দেয় না, অথচ নিজের সত্য সীমাটি মানিয়া চলে। প্রাণের প্রাচুর্য্যে তাহার বৃদ্ধি ও সঙ্গতি চাপা পড়ে না; ভিতর এবং বাহির, লক্ষ্য এবং উপায়, বর্ত্তমান এবং অনাগত এক সমন্বয়ে ঐক্য লাভ করে।

জীবন কেবলমাত্র সঞ্চয় করে না, পরিপাক করে। ইহার বস্তু এবং শক্তি, কর্ম্ম এবং সত্তা নিগূঢ় ভাবে একীভূত। আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতের জড় উপাদান যখন ওজন ছাড়াইয়া ভয়াবহ হইয়া উঠে, যখন তাহারা যন্ত্র

এবং সঞ্চয়ের স্তূপ মাত্র, তখন আমাদের জীবন ও আমাদের জগতের মধ্যে সংগ্রামে জীবনই পরাস্ত হয়। প্রাণনদীর স্রোতটি ক্ষীণ হইয়া হটিয়া যাওয়ায় যে খাদ বাহির হইয়া পড়ে, তাহা অবিশ্রাম ধন বর্ষণে পূর্ণ করিতে আমরা চেষ্টা করি কিন্তু দেখি যে ধন ভরাট করিতে পারিলেও যোগ স্থাপন করিতে পারে না। সেজন্য বস্তুস্তূপের চোরাবালির চাকচিক্য বিপদ্‌জনক ফাটলগুলিকে শুধু লুকাইয়া রাখে। কিন্তু একদিন যখন আমরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন পুঞ্জীভূত বস্তুর ভারে হঠাৎ সব তলাইয়া যায়।

কিন্তু আসল দুর্দৈব মনুষ্যত্বের পরাভবে, বৈষয়িক অনুদ্বেগের বিনাশে, নহে। মানুষ তাহার আবেষ্টনকে তাহার প্রাণে ও প্রেমে সজীব করিয়া সৃষ্টিধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে; কিন্তু তাহার সুযোগধর্ম্মী দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সেই মানুষেই আবার নির্ম্মম লোভের দাস হইয়া সমস্ত জগৎকে বিকৃত ও কদর্য্য করিয়া তুলিতেছে। মানুষের সৃষ্ট এই যন্ত্রজগতের বেসুরো আর্ত্তনাদ ও কলের মতন নড়াচড়া মানুষের প্রকৃতির উপর বিষম প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং সর্ব্বদা এমন একটি বিশ্বসংস্থানের দ্যোতনা করিতেছে যাহা সম্বন্ধহীন ও নিরপেক্ষ। এহেন জগতে মুক্তির অবকাশ নাই; কারণ বিচ্ছিন্ন তথ্যের চাপে তাহা নিরেট হইয়া গিয়াছে। শুধু খাঁচাটাই সর্ব্বস্ব, তাহার বাহিরে আকাশ নাই। তাই জগৎটা সর্ব্বতোভাবে একটা বদ্ধ জগৎ; কঠিন খোলার ভিতর বীজের মত বন্দী। কিন্তু বীজের মর্ম্মস্থলে তখনও প্রাণ কাঁদিতেছে মুক্তির জন্য তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্তও যখন মৌন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মুক্তির জন্য এই জীবন্ত পিপাসাকে যখন কোন একটা বিরাট লোভ পদদলিত করিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়, তখন স্ফুরণশক্তিহীন বীজের মত মানব সভ্যতা মরিয়া যায়।

ভারতের মুক্তির আদর্শ নিষ্ক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা পূর্ণভাবে সত্য নহে। ঈশোপনিষৎ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন যে, মানুষের কর্ত্তব্য শতায়ু হইয়া কর্ম্ম করা। কারণ ইহার মতে পূর্ণতার নিষ্ক্রিয় আদর্শ এবং তাহার বিকাশের সক্রিয় পদ্ধতির মিলন করা চাই, অসীম ও সসীমের সমন্বয়সাধন চাই; ইহাতেই পূর্ণ সত্য। সুতরাং শুধু অসীমকেই চরম সত্য বলিয়া যাহারা অনুসরণ করে, তাহারা গভীরতর অন্ধকারে পতিত হয়; তাহাদের তুলনায় সসীমবাদীদের অধঃপতন কম গুরুতর। পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি স্বরের সমষ্টিতেই অপরিবর্ত্তনীয় সঙ্গীতের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সে নিশ্চয় নির্ব্বোধ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবে সঙ্গীতে স্বরের কোন বালাই নাই, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা ততোধিক। কিন্তু সমন্বয় কোথায়? তুরীয়ধর্ম্মা (Transcendental) সঙ্গীত কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন স্বরগ্রামকে তাহার আত্মপ্রকাশের বাহন করিয়া লয়? ইহার সৃষ্টির পর্ব্বে পর্ব্বে যে ছন্দ, যে সীমা দেখা দেয় তাহার দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। সসীমের পন্থা অতিক্রম করিয়াই আমরা অসীমকে লাভ করি। এই কথাই ঈশোপনিষৎ ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।"

সীমার ছন্দেই আমাদের জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং তাহার বিধিনিষেধের ভিতর দিয়াই আমরা অমরত্ব লাভ করি। অমৃতত্ব মাত্র এই বাহ্য জীবনের প্রসারমাত্র নহে—ইহা পূর্ণতার সিদ্ধি, ইহা জীবনের সুসঙ্গত সুন্দর সীমানির্দ্দেশ; প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে সেই সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমাকে প্রকাশ করে। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই উপদেশ আছে, মা গৃধঃ; লোভ করিও না। কিন্তু কেন করিব না? কারণ লোভ সীমার মর্য্যাদা রক্ষা করে না বলিয়া জীবনের ছন্দকে বিনষ্ট করে; সেই ছন্দের ভিতর দিয়াই যে অসীম আত্মপ্রকাশ করেন।

আধুনিক সভ্যতায় দেখি আত্মহননকারীদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহারা আধ্যাত্মিক আত্মঘাতক। এই সভ্যতায় অনিয়ন্ত্রিত বাসনা ও 'অহম্'কে অতিস্ফীত করিয়া তুলিবার অন্তহীন প্রবৃত্তি সীমাবদ্ধ করিবার শক্তি চলিয়া গিয়াছে। জীবনের ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমরা জীবনের সৌন্দর্য্যসংস্কৃতিও হারাইতেছি। অলীক কবির মত আমরা বাক্‌চাতুর্য্যকেই শক্তি বলিয়া, বাস্তববাদকে সত্যবস্তু বলিয়া, ভ্রম করিতেছি। মধ্যযুগে যখন ইউরোপ স্বর্গরাজ্যে আস্থাবান্ ছিল, তখন জীবনের বিচিত্র শক্তিকে

ছন্দোবদ্ধ করিতে এবং সেই আদর্শের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রবৃত্তির রুদ্রসংঘাতের মধ্যে সেই আদর্শ জীবন ডাক দিয়াছে এবং ইউরোপের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই প্রয়াসের মূলে ছিল একটি সৃষ্টির প্রেরণা—একটি গভীর আস্তিক্যবোধ যাহা আদেশ করিয়া বলিত—লোভ করিও না, আপন সীমাটি চিনিয়া লও। সুসঙ্গত সৌধের স্থান জুড়িয়া আজ অসংখ্য ইটের পাঁজা গড়িয়া তুলিবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিয়াছে, এবং চূর্ণইটের গুঁড়ায় দক্ষ স্থপতির আদর্শটি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে বিদ্যার সহিত অবিদ্যার বিচ্ছেদ সূচিত হইয়েছে। সেই জন্যই এক ছন্দহীন শক্তি সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া এক প্রচ্ছন্ন অগ্নিদাহের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে দীপ্তি নাই, শুধু তাপ আছে।

ছন্দেই সৃষ্টি; ছন্দেই বিদ্যা ও অবিদ্যার, সীমা ও অসীমের মিলনভূমি। অরূপের বক্ষ হইতে শতদলটি কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিল জানি না। অস্পষ্টতার গর্ভে যতদিন ইহা লুকাইয়াছিল ততদিন আমাদের কাছে ইহার কোন তাৎপর্য্যই ছিল না, তবু কোথাও সেই পদ্মটি ছিল ত। কোন দুরবগাহের তলদেশ হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া অপূর্ব্ব ছন্দসীমায় ইহা ধরা দিল, আমাদের চেতনায় একটি নূতন আবর্ত্ত জাগাইল! অসীমের স্পর্শে যে আনন্দ চিনিলাম, তাহা যে সীমারই দান। সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজই যে সীমা নির্দ্দেশ করা; তিনি যে বন্ধনের মধ্য দিয়াই মুক্তি পান, সীমার ভিতর দিয়াই অসীমকে পান। জড়-বস্তুর উপাসনায় অসীম অতৃপ্তি। তাহা ক্রমবর্দ্ধমান আতিশয্যের পথে শুধু ছুটায়, কিছু প্রকাশ করে না; তাহার কোন রূপ নাই। এই লোক চিরঅন্ধকারে আবৃত, অন্ধেন তমসাবৃতা; এখানে আছে শুধু মূক বস্তুপিণ্ডের বোঝা। মানুষের সত্য প্রার্থনা বৃহৎকে চায় না; সত্যকে চায়, আলোককে চায়। তাহা অগ্নিকাণ্ড নয় জ্যোতিরুন্মেষ; মানুষ অমৃতকে চায়, কালের ব্যাপ্তিতে নয়, পূর্ণের শাশ্বত গৌরবে।

মুক্তির অন্তর্লোকের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের নিকট বহির্জগতের দাবী এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সে লোকে বস্তু আছে কিন্তু তাহার অর্থ-সিদ্ধির পথ অবরুদ্ধ। সে লোকে বাঁচিয়া থাকা দাসত্ব। জীবনের সত্য যাহাতে নিহিত, অন্ধতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়া মানুষের পক্ষে জীবনকে পাপ বলা সম্ভব হইয়াছে। একটি পাখায় ভর করিয়া পাখী আকাশে উড়িতে গিয়া বাতাসের উপরেই ক্রোধ প্রকাশ করে—কেন সে তাহাকে আঘাত করিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল। খণ্ড সত্যমাত্রই পাপ। খণ্ড সত্য মানুষকে পীড়া দেয়; কারণ তাহা যাহা দিতে পারে না আভাসে তাহারই কথা মনে জাগায়। মৃত্যু আমাদের পীড়া দেয় না, কিন্তু রোগ যন্ত্রণা দেয়, কারণ রোগ কেবলই স্বাস্থ্যকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকেই কাড়িয়া রাখে। অসম্পূর্ণ জগতে জীবনও পাপ; কারণ যেখানে জীবনের অসম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ, সেখানেও তাহা পূর্ণতার ভাণ করে, শুধু পানপাত্রটি মুখের কাছে ধরে কিন্তু প্রাণ-রস হইতে আমাদের বঞ্চিত রাখে। সত্য খণ্ডিত থাকিয়া যায় বলিয়া, তাহার বিকাশযন্ত্রটির পূর্ণাবর্ত্তন হয় না বলিয়াই সৃষ্টির মধ্যে এত দুর্দৈব।

শত বৎসরের পুরাতন একটি বাউলের গান শুনাইয়া আমি আজিকার বক্তব্য শেষ করিব। এই গানে কবি অনন্তের সহিত সান্ত জীবাত্মার চিরন্তন মিলন বন্ধনের কথা গাহিয়াছেন; এ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই, কারণ এই পরস্পর সম্বন্ধেই সত্য সম্পূর্ণ হয়, কারণ প্রেমই পরমতত্ত্ব, নিরপেক্ষ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বন্ধ্যাত্ব ও শূন্যতামাত্র। অবিমিশ্র বিদ্যাতেও সত্য নাই, অবিদ্যাতেও নাই, দুইয়ের মিলনেই সত্যের প্রকাশ—উপনিষদের এই কথায় যাহা পাই, এই গানটিতেও আমরা সেই ভাবটি উপলব্ধি করি।

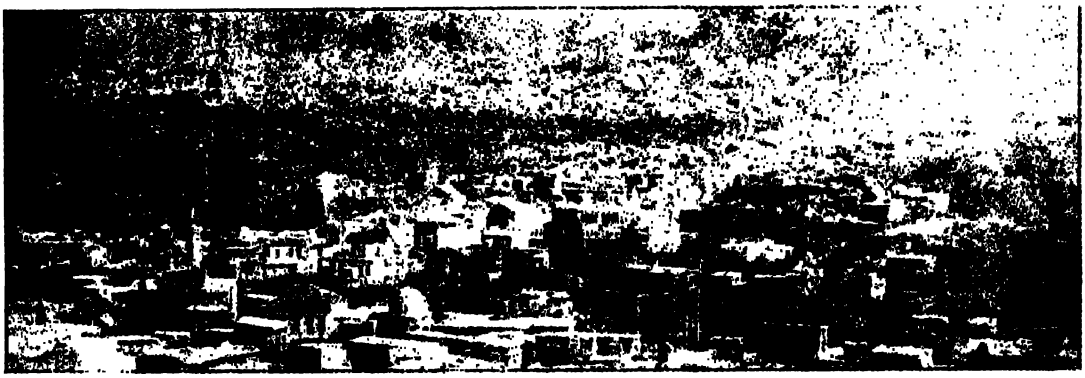
"হৃদয়-কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কী করি।
ফুটে ফুটে কমল ফুটায় না হয় শেষ,
এই কমলের যে-এক মধু রস যে তা'র বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারে না যে তাই।
তাই তুমি ও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
মুক্তি কোথাও নাই।"*

* এই অভিভাষণটি মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।



দামাস্কাস হত্যাকাণ্ড—

কিছুকাল পূর্ব্বে দামাস্কাস সহরে ফরাসীগণ এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছিল, তাহার কথা সংবাদপত্র যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা সকলে জানেন। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সভ্য এবং অসভ্য, উভয় জগতের লোকে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। একটি অতি সভ্য এবং প্রবল পরাক্রান্ত খৃষ্টানজাতি এই হত্যাকাণ্ড-অভিনয়ের অভিনেতা হইলেও খৃষ্টান জাতিরাও ইহাতে বাহবা দিতে পারে নাই! বলিতেছেন যে, "জার্ম্মানদের রিম্‌সের উপর গোলাবর্ষণের জন্ত আমরা এখনও দুঃখ করিতেছি, কিন্তু অপরদিকে দামাস্কাস সহর ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে—তাহার উপর আগুনের খেলা চলিয়াছে।" যে লোকার্নো-সন্ধির এত জয়গান চলিতেছে, সেই লোকার্নো-সন্ধি-বৈঠক বসিবার দুইদিন পরেই এই কসাইএর কাণ্ড অনুষ্ঠান হয়। St. Paul *Pioneer Press* নামক পত্রিকা বলেন যে "ইহা এক অদ্ভুত রহস্যের কথা যে ফরাসীগণ সভ্যতার দোহাই দিয়া এই বিষম নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছেন।"



দামাস্কাস সহরের দৃশ্য

দামাস্কাস সহর পৃথিবীর একটি পুরাতন সভ্য সহর। ইহার বয়স কত তাহা অনুমান করা শক্ত ব্যাপার। ফরাসী কামানের গোলা এবং ফরাসী এরোপ্লেনের বোমা এই অতি প্রাচীন সহরকে একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে। পৃথিবীর একটি আদি সভ্যতার নিদর্শন কত শত মন্দির এবং অট্টালিকা যে ভাঙিয়া-চুরিয়া মাটিতে মিশাইয়া গিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

গত ১৮ই অক্টোবর—রবিবার রাত্রিকালে এই হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয় এবং মঙ্গলবার বৈকাল পর্য্যন্ত এই অতিনিষ্ঠুর খেলা চলিতে থাকে। রবিবার খৃষ্টানদের বিশেষ উপাসনা-দিবস, এইজন্যই বোধ হয় ফরাসীরা বিশেষ করিয়া রবিবার রাত্রেই এই পবিত্রকার্য্য আরম্ভ করে। একজন দর্শক বলেন 'দামাস্কাসের সমস্ত পথ-ঘাট মৃতদেহে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমার মনে হয় অন্ততঃ ২০০০ আবালবৃদ্ধবনিতা ভগ্নস্তূপের তলায় চাপা পড়িয়া নিহত হইয়াছে। আমেরিকান্ খবরের কাগজ-ওয়ালারা এই হত্যাকাণ্ডকে কেহ বা "murder in Damascus" (দামাস্কাসের হত্যাকাণ্ড), কেহ বা "Butchery in Damascus" (দামস্কাসে কসাইয়ের কাজ), কেহ বা "দামাস্কাসে ফরাসী কসাইদের কাণ্ড"—বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Richmond *Times Dispatch* কাগজ বলেন যে "ফরাসীগণ তাহাদের এই সামান্য গোলাবর্ষণে যে প্রচণ্ড ক্ষতি করিল, তাহা হাজার শান্তি-সন্ধি এবং ধর্ম্ম-প্রচারক একশত বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টাতেও পূরণ করিতে পারিবে না।" আর-একখানি কাগজ League of Nations এই অতিসভ্য ফরাসীদের সিরিয়া প্রদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছে। ফরাসীদের এই হত্যাকাণ্ড এতদূর ভয়ানক হইয়াছে যে, জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যাকাণ্ডেও অবিচলিত London *Times* এই হত্যাকাণ্ড-সম্বন্ধে বলিতেছেন, "grotesque imitation of the barbarities of primitive peoples."

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া যাইবার পর ফরাসীগণ বাইশ জন নিহত ব্যক্তির মৃতদেহগুলিকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে চড়াইয়া সমস্ত সহরময় ঘোরায়। পুরাকালে অসভ্যগণ এইপ্রকার করিত বলিয়া শুনা যায়, তাহাও উপকথায়। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানদের যে-সমস্ত কাণ্ডকে ফরাসীগণ প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করে, ফরাসীগণ তাহা অপেক্ষা বহুগুণে নিষ্ঠুর কাণ্ড শান্তির সময়ে তাহাদেরই প্রজাদের উপর করিয়াছে।

এতবড় কাণ্ডের মূল অতি সামান্য। হাসান্ এল্ কারেথ্ (Hassan El Karreth) নামক একজন সর্দ্দার হঠাৎ দামাস্কাসে তাহার দলবল লইয়া প্রবেশ করে (১৮ই অক্টোবর) এবং চাগুর (Chagour) নামক পাড়ায় প্রবেশ করিয়া সেখানকার লোকদের তাহার দলভুক্ত করিয়া লইয়া একটা ফরাসী থানা আক্রমণ করিয়া একজন ফরাসী অফিসারকে হত্যা করে। এই খবর ফরাসী কর্ত্তাদের কাছে পৌঁছাইবামাত্র ফরাসী সৈন্য এবং বিমান বাহিনী শত্রুদের আক্রমণ করে। মাটি এবং আকাশ উভয় স্থান হইতেই প্রায় একই সময়ে সর্দ্দারের দলকে আক্রমণ করা হয়। রবিবার

রাত্রি হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়, এবং মঙ্গলবার বৈকালবেলা তাহা স্থগিত হয়। এই গোলাবর্ষণের ফলে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর একটি প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়াছে। একজন দর্শক বলেন যে "এই হত্যাকাণ্ড যে কতদূর অমানুষিক, তাহা মানুষের কল্পনাতীত। একদল বিদ্রোহীকে (ফরাসী মতে) দমন করিবার জন্ম মানুষ যে কেমন করিয়া জানিয়া-শুনিয়া হাজার-হাজার নিরীহ শিশু এবং নরনারী হত্যা করিতে পারে, তাহা আমরা ভাবিতেও পারি না।" এই দর্শকের মতে এত বড় হত্যাকাণ্ডে খৃষ্টানগণ একেবারেই নিহত হয় নাই—তাহারা গোলাগুলির বর্ষণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।



জেনারেল সারাইল

ফরাসীগণ অনেকে বলিতেছে, সহরের ঘর-বাড়ী, মন্দিরাদির ক্ষতির অধিকাংশের জন্ম নাকি বিদ্রোহীরাই দায়ী। নিরপেক্ষ জাতির লোকেরা কিন্তু কেহই এ-কথা বলিতেছে না। ফরাসীদের ইহাও ধারণা যে, দামাস্কাসে যদি সময়মত এইপ্রকার গোলাবর্ষণ করা না হইত, তাহা হইলে সিরিয়ায় আরো ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত হইত—অর্থাৎ কি না, দামাস্কাসের সামান্য গোলাবর্ষণ সমস্ত সিরিয়া-দেশকে অমঙ্গলের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর ঠিক এইপ্রকার কথা জেনারেল ডায়ারও বলিয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এত করিয়াও ফরাসীরা বিদ্রোহ দমন করিতে পারে নাই। সিরিয়াতে বিদ্রোহীদের সংখ্যা এবং প্রকোপ ক্রমশঃ বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে। পারীর একটি খবর হইতে জানা যায় যে, গোলাবর্ষণের সময় সিরিয়াতে দশ সহস্র ফরাসী সৈন্য ছিল। গোলাবর্ষণের পর আরো দশসহস্র প্রেরিত হইয়াছে। পারীর খবরে প্রকাশ যে ফ্রান্স মরক্কো এবং সিরিয়ার শাসন ভার লইবার পর তাহার '১৭,০০০ হাজার লোক হতাহত এবং ৩,০০০,০০০,০০০ ফ্রাঁ খরচ হইয়াছে। মরক্কোতে তাহার ২,১৭৬ লোক হত এবং ৮,২৯৭ জন আহত হইয়াছে। সিরিয়ার হতাহত সংখ্যা ৬,৬২৬। মরক্কোতে খরচ হইয়াছে ৯৫০,০০০০,০০ ফ্রা—সিরিয়াতে হইয়াছে—২,০০০,০০০,০০০ ফ্রাঁ।

হত্যাকাণ্ডের সময় জেনারেল সারাইল (Major General Maurice Paul Emmanuel Sarrail) সিরিয়ার সামরিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সরাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ফ্রান্সেও তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। লীগ্ অভ্ নেশন্স্ হইতে ফ্রান্সকে এই হত্যাকাণ্ডের জবাবদীহি করিতে তলব করা হইয়াছে।

—

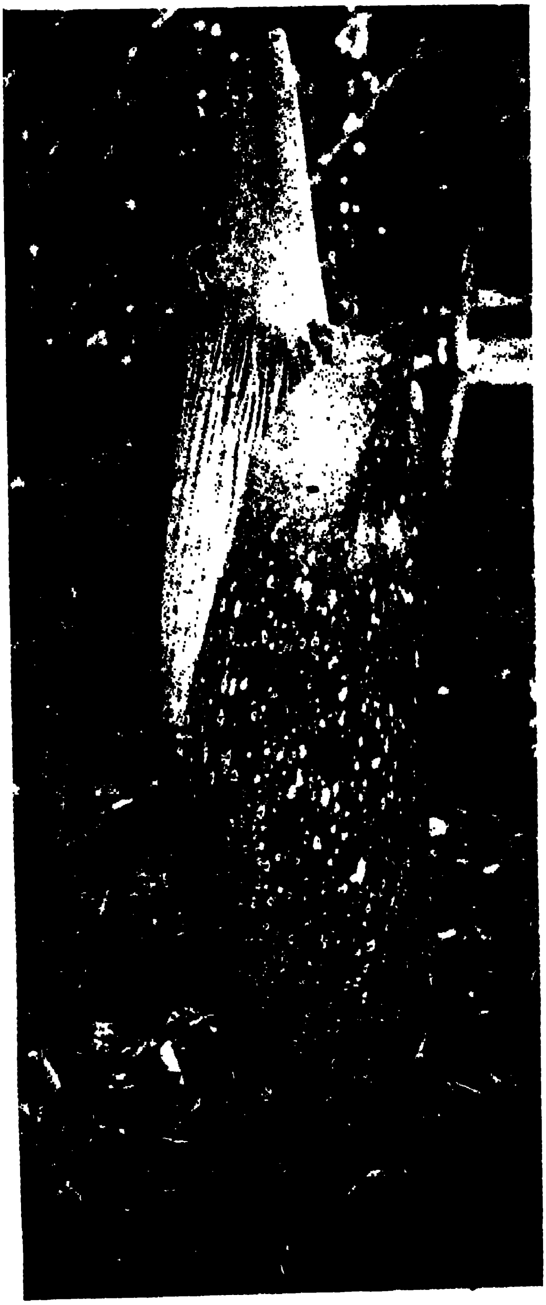
সকলের চেয়ে বড় ফুল—

পৃথিবীতে যত রকম ফুল আছে, তা'র মধ্যে সুমাত্রাদ্বীপের আমর্ফোফ্যালাস্ টাইটেনাম্ সকলের চেয়ে বড়। ইহা ফুলটির লাটিন



পূর্ণবয়স্ক ফুল ৪৮ ফুট লম্বা (৩)

নাম। সুমাত্রাদ্বীপের ভাষায় ইহার কি নাম জানি না। এই ফুলের যে কুঁড়িটির যে ছবি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল, তাহা বাইশ দিন পরে মোটে উনিশ ইঞ্চি লম্বা হইয়াছিল। আরও বার দিন পরে উহা চারি ফুট চারি ইঞ্চি উঁচু হয় এবং তখন কুঁড়িটি ফুটিয়াছিল। তৃতীয় ছবিটিতে চল্লিশদিনের



৩৪ দিনের পরের অবস্থা—এখন ফুলটি ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা (২)

পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলটি দেখানো হইয়াছে। তখন ইহা আট ফুট উঁচু হইয়াছিল। পাশের মানুষটির সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার বৃহত্ত্ব ও উচ্চতা-সম্বন্ধে ঠিক্ ধারণা হইবে। এই ফুলের গন্ধ খারাপ।



আমর্ফোফ্যালাস টাইটেনাম ফুলের শৈশব—
২২ দিনের কুঁড়ি—১৯ ইঞ্চি লম্বা (১)

তীর ধনুক ছোঁড়ার কথা—

রামায়ণ-মহাভারতে আমরা যত যুদ্ধের বিবরণ পাই, সবই তীর-ধনুক



[illegible] আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নারী তীরন্দাজ



আমেরিকার কলেজের নারীরা তীর ছোঁড়া অভ্যাস করিতেছেন

বা গদা লইয়া হইয়াছে। তখনকার দিনে বন্দুকাদির নামও কেহ জানিত না। ইয়োরোপেও কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে তীর-ধনুক লইয়া অনেক লড়াই হইত—বন্দুকের আবিষ্কার তখনও হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের কোল, ভীল, সাঁওতাল, আদি জাতিরাই তীর-ধনুক লইয়া বনে-বনে নানা-প্রকার জীবজন্তু পক্ষী আদি শিকার করিয়া বেড়ায়। বর্ত্তমানের যুদ্ধে তীর-ধনুক অকেজো হইয়া উঠিয়া গিয়াছে বন্দুকও এখন প্রায় যাইবার অবস্থায়। শুনা যাইতেছে, ভবিষ্যতে যে-সমস্ত লড়াই হইবে, তাহা নাকি রাসায়নিকের লড়াই হইবে। যুদ্ধ হইতে তীর-ধনুকের ব্যবহার উঠিয়া গেলেও বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় অনেকে সখ করিয়া ইহার অভ্যাস করিতেছেন। আমেরিকার নারীমহলে আজকাল তীরধনুক ছোঁড়ার অভ্যাস অনেকে করিতেছেন। অবশ্য সকলেই সখ করিয়া তীর-ধনুক ছোঁড়ার অভ্যাস করিতেছেন। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে এখন ২০০০ তীরন্দাজ মহিলা আছেন। ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্যায়ামশিক্ষকদের মতে নারীদের পক্ষে তীর-ধনুক ছোঁড়া খুব ভালো ব্যায়ামের কাজ হইবে—বিশেষতঃ যেসকল মহিলাদের শরীর ফুটবল এবং হকি খেলিবার পক্ষে যোগ্য নয়, তাঁহাদের পক্ষে তীর-ধনুক ছোঁড়াই প্রশস্ত ব্যায়াম। যুক্তরাষ্ট্রের নারী-কলেজসমূহে তীর-ধনুকের আদর খুব বেশী-পরিমাণে হইয়াছে।

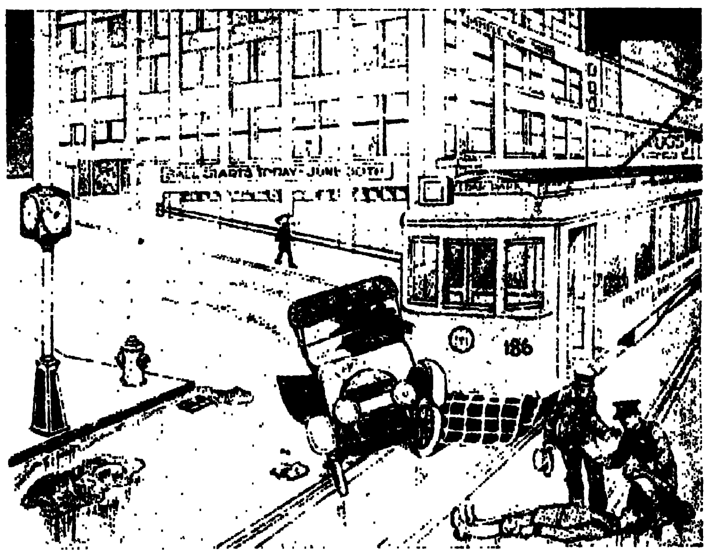
—

পুলিসের স্মৃতি এবং দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা—

যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন সহরে কোনো লোককে পুলিস কর্ম্মচারীর পদ দিবার পূর্ব্বে তাহাকে নানারকম করিয়া পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাগুলি খুব সহজ নহে। এইসঙ্গে একখানি ছবি দেওয়া হইল। ছবিটিতে দেখা যায় যে একটা মোটরকারের সহিত একটা ট্রাম গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়াছে। একজন লোক চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছে—দুইজন লোক তাহাকে দেখিতেছে। রাস্তাটি ওয়াশিংটনের একটি বড় রাস্তা। ভাবী পুলিসম্যান্‌কে ছবিটি তিন মিনিট দেখিতে দেওয়া হয়। এইসময় সে ছবির সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া লইতেও পারে। তাহার পর তাহাকে ছবি-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হয়:—

(১) কোন্ রাস্তা দিয়া মোটর-গাড়ীটা আসিতেছিল ?

(২) ট্রাম গাড়ীটার নম্বর কত



পুলিসম্যান্ পরীক্ষা করিবার ছবি

(৩) কি দেখিয়া বুঝা যায় যে মোটর ড্রাইভার অসাবধান হইয়া গাড়ী চালাইতেছিল ?

(৪) কোন্ দোকান বা বাড়ীর সামনে দুর্ঘটনাটি হয় ?

(৫) কয়জন লোক আহত হয় ? ইত্যাদি।

এইপ্রকারের ১০টি প্রশ্ন তাহাকে করা হয়। সমস্ত প্রশ্নগুলি ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে উত্তর করিতে হইবে—এইসময় অবশ্য ছবি বা নোটবুক তাহার সামনে থাকিবে না। এই পরীক্ষাদ্বারা পুলিসম্যানের স্মৃতি এবং দৃষ্টি-শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আর-একটি পরীক্ষা করা হয়। কোনো একটা মোটর গাড়ীর নম্বর তাহাকে মাত্র তিন সেকেণ্ড দেখিতে দিয়া পরে সেই মোটর গাড়ীর নম্বর কত ছিল তাহা

লিখিতে বলা হয়। রাস্তার অত্যন্ত ভীড়ের সময় অনেক সময় এই সময়ের মধ্যে অনেক মোটর গাড়ীর নম্বর পুলিসম্যান্‌কে লিখিয়া রাখিতে হয়।

মোটর চালাইবার ছাড়পত্র লইবার সময়ও মোটর ড্রাইভারদের নানা-প্রকার পরীক্ষা করা হয়। তাহার একটি :—মোটর চালককে ১০ খানি রাস্তার গাড়ী-ঘোড়াপূর্ণ-বিপজ্জনক-অবস্থার ছবি দেখানো হয়। ছবি দেখা হইবার পর চালককে কোন্ রাস্তায় কি বিপদ্, কোন্‌খানে বিপদ্ এবং তাহা বাঁচাইবার উপায়ই বা কি—এইসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। কেবল গাড়ী ভালো করিয়া চালাইতে পারিলেই কাহাকেও অনুমতিপত্র দেওয়া হয় না। —

পারস্যের রক্তহীন বিদ্রোহ—

পারস্য-দেশে একজন মুসোলিনির উদয় হইয়াছে। ইঁহার নাম রেজা খাঁ পাহ্‌লেভি (Reza Khan Pahlevi) । ইনি পূর্ব্বে পারস্য-দেশের রাজার প্রধান এবং সামরিক মন্ত্রী ছিলেন। সামান্য সৈনিক হইতে



বাঁদিকে—পারস্যের ভূতপূর্ব্ব শাহ ডানদিকে—পারস্যের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা রেজা খাঁ

ইনি অসামান্য মনবশক্তি এবং ক্ষমতার বলেই এত উন্নতি করিয়াছেন। পারস্যের ন্যাশ্‌নাল এ্যাসেম্ব্লিতে, ৮০ ভোটের বিরুদ্ধে ৫ ভোটে, কাজার বংশ এবং বর্ত্তমান শাহকে সিংহাসন হইতে চ্যুত করা হয়। পারস্য এবং পারস্যের বাহিরে ভূতপূর্ব্ব শাহের জন্য কেহই বিশেষ কোনো দুঃখ প্রকাশ করিতেছে না। তাঁহার এই ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের জন্য তাঁহারই দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। শাহ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সে গমন করেন এবং রাজ্য হইতে অজস্র টাকা বিলাস-ভোগে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। শাহের ব্যবহারে পারস্যের লোকেরা ক্রমশঃ বিষম ক্ষেপিয়া উঠিল এবং তাহার চরম পরিণতি হইল শাহের সিংহাসন চ্যুতিতে। পারস্য-দেশের ভূতপূর্ব্ব শাহ আহ্‌মদ মির্জা ইয়োরোপের জুয়ার আড্ডায় তাঁহার রাজত্ব বিকাইয়াছেন। শাহের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯,০০০,০০০ টাকা। ইহা ছাড়া ভোজ এবং নৌকা-পার্টিতে আরো ৩,০০০,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে। পারস্য দেশ হইতে এখন তিনি কিছু পেনসন্ এবং তাঁহার ১,২০০,০০০,০০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি পাইবেন, এইপ্রকার স্থির হইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে পারস্যদেশ, বলিতে গেলে ইংলণ্ড এবং রুশিয়ার মধ্যে ভাগাভাগি অবস্থায় ছিল। তাহার পর রুশিয়ার গোলমালের সময় রেজা খাঁ সুযোগ বুঝিয়া পারস্যে "মুসলিনি" হইয়া উঠেন। পারস্য দেশে তেলের খনি প্রচুর এবং ইহার মূল্য কোটি-কোটি টাকা। পাশ্চাত্য শক্তির প্রায় সকলেই পারস্যে তেলের কিছু সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা গত ছয় বৎসর হইতে করিতেছে। ইহাদের মধ্যে রুশিয়া এবং ইংলণ্ডের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান পারস্যের পরিমাণ ৬০০,০০০ বর্গ মাইল। সমগ্র পারস্য দেশে মাত্র ১০০ মাইল রেলপথ আছে। তের বছর পূর্ব্বে পারস্য-দেশে ১ খানি মাত্র মোটরকার ছিল।

রেজা খাঁ অতি গরীব ঘরের সন্তান। তাঁহার শিক্ষা খুব বেশী কিছু নাই। তাঁহার পিতা ছিলেন সামান্য কৃষক। ১৯২১ সাল হইতেই রেজা খাঁই পারস্য-দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। রেজা খাঁ সৈন্যদলকে নতুন করিয়া গঠন করিয়াছেন। পারস্যের বর্ত্তমান সৈন্য সংখ্যা ৪০,০০০। সৈন্যদলের অনেক-প্রকার সংস্কার হইয়াছে। নানা-প্রকার বাজে উপাধি বর্জ্জিত হইয়াছে। ওজনাদির এবং শাসন-ব্যয়ের নানা-প্রকার কুপ্রথা বর্জ্জন করিয়া সুবিধাদায়ক সুপ্রথার চলন হইয়াছে। সিংহাসনে বসিয়াই রেজা খাঁ রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব শাহকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার পেন্‌সনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজ-পরিবারের অন্যান্য সকলের জন্যও পেন্‌সনের ব্যবস্থা হইয়াছে। —

টাইপ্‌রাইটারে আঁকা ছবি—

একজন দিনেমার চিত্রকর একটি টাইপরাইটারের সাহায্যে হল্যাণ্ডের একটি দৃশ্য আঁকিয়াছেন। টাইপ্‌রাইটারের সব-রকম অক্ষরই এই



টাইপরাইটারে আঁকা ছবি

আঁকিতে ব্যবহার করা হয়। নানা-প্রকার কায়দায় অক্ষরগুলি জোরে আস্তে, কম এবং বেশী করিয়া ফেলিয়া এই ছবি আঁকা হয়। ছবিখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে, চিত্রকরের বাহাদুরি কতখানি ইহার মধ্যে আছে।



বাংলা

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি—

অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া শ্রীহট্টবাসিগণ বাংলার সহিত মিলিত হইবার জন্ম আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এতদিনে তাঁহাদের সেই ব্যাকুল-বাসনা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে চলিল। গত সপ্তাহে আসাম ব্যবস্থাপক-সভায় শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সভায় গবর্ণমেণ্ট-সদস্যেরা নিরপেক্ষ ছিলেন। আসামের মুসলমান মন্ত্রীও করেকজন মুসলমান সদস্য প্রধানত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্বরাজ্যদলের হিন্দু ও মুসলমান সদস্য সকলেই প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছিলেন। সুখের কথা সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। এখন ভারত সরকার কি মীমাংসা করেন তাহা দেখা যাক্। শ্রীহট্টের ন্যায় কাছাড়ের লোকেরাও বাঙ্গালী। কাছাড়কেও বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এ সম্বন্ধে আন্দোলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মরণ-পথে বাঙ্গালী—

নিম্নে বাংলার জন্ম-মৃত্যুর একটি হিসাব দেওয়া হইল।

জেলা	প্রতি হাজারে জন্মের হার।	প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার।	জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর আধিক্য।
বর্দ্ধমান	২১·২	৫০·৫	২৯·৩
বীরভূম	২৩·৭	৬৩·৩	৩৮·৬
বাঁকুড়া	২৫	৩৬·৫	৯·৫
মেদিনীপুর	২৪·২	৪০·১	১৫·৯
হুগলী	২১·৫	৩৬·১	১৪·৬
হাওড়া	২৭	৩৫·১	৮·১
২৪ পরগণা	২২·৫	৩৩·৪	১০·৯
নদীয়া	২৫·৬	৪৩	১৭·৪
মুর্শিদাবাদ	২৮·৯	৪৭·৩	১৮·৪
যশোহর	২১	৩০·২	৯·২
খুলনা	২৭·৮	৪১·২	১৩·৪
রাজসাহী	৩২·৮	৪১·৫	৮·৫
দিনাজপুর	৩১·৬	৪৩·৭	১২·১
জলপাইগুড়ি	৩২·৪	৪৮·৬	১০·২
দার্জ্জিলিং	৩০	৪৮·৪	১৮·৪
রংপুর	৩২·৪	৩৩·৪	১
পাবনা	২৫·৭	৩৭·১	১০·৪
মালদহ	৩০·৫	৩৯	৯·৫
ময়মনসিং	২৭·৩	২৭·৭	·৪
বরিশাল	২৯·৮	৩৪·৭	৪·৯
চট্টগ্রাম	৩০·৩	৪১·৪	১১·১
নোয়াখালী	৩২·৮	৩৩·৪	·৬
ত্রিপুরা	২৭·৮	২৯·৪	১৬

—পল্লীব্যথা।

ভারতীয় দার্শনিক মহাসভা—

গত ৪ঠা পৌষ শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে সেনেট হলে ভারতীয় দার্শনিক মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লর্ড লিটন্ সভার উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কার সভা—

গত মাসে কলিকাতার আলবার্ট ইনস্টিটিউট হলে নিখিল-ভারত সমাজ সংস্কার সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, সভানেত্রী ও প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন।

সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাদেবী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—

"আমি আমার দেশবাসী স্ত্রীপুরুষগণকে সমাজ-সংস্কারে বদ্ধপরিকর হইতে আহ্বান করিতেছি। আমি নূতন সজীব কর্ম্মী চাই—এস দেশসেবক, বিশ্বপ্রেমিক যুবক কর্ম্মীগণ, যাহারা নৈরাশ্যান্ধকারে ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতেছে, সেই রুগ্ন, ভারাক্রান্ত অসহায়দের তোমাদের বলিষ্ঠ বাহু বন্ধনে আবেষ্টন কর; কেননা, আমাদের গৃহে শৃঙ্খলা না আনিয়া আমরা বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিতে পারি না, আমরা রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারিব না এবং তাহা বহন করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতেও পারিব না। স্বার্থান্ধ, নীচমনা, অজ্ঞান পৌরোহিত্যই দেশের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়ায় বাধা জন্মাইতেছে; অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিলে ভারতের স্বাধীন পথে যাত্রা পদে-পদে ব্যাহত হইবেই। হয় স্ত্রীজাতি ও পুরোহিত সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তাঁহাদিগকে শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা আমাদের সহকারী বন্ধু ও সহযাত্রীতে পরিণত করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে জাতির সবল কর্ম্মক্ষম অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে, তাঁহারাও ব্যষ্টির সুখ ও হিত বর্দ্ধন করিবে।

"আমাদের এই ভারতে যুগযুগান্তর ধরিয়া সাধারণতঃ পুরুষ, স্ত্রীজাতির মানসিক খাদ্য জোগান নাই। যখন পাশ্চাত্যের রণতরী ভারতের দ্বারে আসিয়া নোঙ্গর ফেলে, যখন বিদেশী আক্রমণকারী ভারতের বুকের রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে, তখনই প্রথম তাহারা তাঁহাদের উন্নতি পথের বাধা ও কণ্টক স্বরূপ স্ত্রীজাতির বিষয়ে সজাগ হন। স্ত্রীশিক্ষা, পর্দ্দা-প্রথার বিলোপ, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ দূর, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, এবং ধর্ম্মত্যাগীদিগকে পুনর্গ্রহণ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের মোটামুটি কতকগুলি দিক্। নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভা সমাজ সংস্কার সম্মেলনকে শক্তিশালী মিত্র বলিয়াই মনে করিতেছেন এবং শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্য্যধারা অনেক বিষয়ে নিজেদের কর্ম্ম পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়াছেন।"

নিখিল ভারত জাতীয় উদারনীতিক সঙ্ঘ—

গত মাসে কলিকাতায় মধ্যপ্রদেশের স্যার মোরপন্থ যোশীর সভাপতিত্বে উদারনীতিক সঙ্ঘের ৮ম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত

কৃষ্ণকুমার মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সেখানে গৃহীত প্রস্তাব-সমূহের কয়েকটি নিয়ে প্রদত্ত হইল :—(১) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট্ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাচিত সদস্যের দ্বারা গঠিত হইবে। (২) ভারত সচিবের কাউন্সিল তুলিয়া দিতে হইবে। (৩) সমস্ত ব্যবস্থাপক-সভাকে আরও শক্তিশালী করিতে হইবে। (৪) ভোট দেওয়ায়, কাউন্সিলে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে কিংবা লোক্যালবোর্ডে মেম্বর হওয়ায় নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হইবে। (৫) ১৯২৫ সনের ফৌজদারী আইনের সংশোধিত বিধি অনুসারে বঙ্গের অনেক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, উদারনৈতিক সঙ্ঘ দাবী করিতেছে, হয় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, না হয় প্রচলিত আইন অনুসারে তাঁহাদের বিচার হউক। উদারনৈতিক সঙ্ঘের মত এই যে, সে-আইন তুলিয়া দেওয়া হউক। উদারনৈতিক সঙ্ঘ আরও দাবী করিতেছে যে, ১৮১৮ সালের, ১৮১৯ সালের ও ১৮২৭ সালের রেগুলেশন, যাহা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট্ ইচ্ছামত যে-কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, সেই আইন তুলিয়া দেওয়া হউক। (৬) বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগ পৃথক্ করিবার জন্যও আইন ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে বিচার বিভাগে কর্ম্মচারী গ্রহণ করিবার জন্যও সিভিল জষ্টিস্ কমিটির নির্দ্ধারণ অনুসারে অবিলম্বে কার্য্য করিবার জন্য উদারনৈতিক সঙ্ঘ গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী জানাইতেছেন। (৭) ভারত-সচিব যে কেবলমাত্র আটটি সৈনিক দলে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, জাতীয় উদারনৈতিক সঙ্ঘ ইহাকে অপ্রচুর মনে করিয়া তাহাদের নিরাশা প্রকাশ করিতেছে। (৮) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্তের ও ভারতীয় জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে বৃটীশ পার্লিয়ামেণ্ট্ সিভিল্ সার্ভিস্ আইন পাশ করাতে উদারনৈতিক সঙ্ঘ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। (৯) ব্রহ্মদেশে যে ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে এক আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট্ যেন সম্মতি না দেন, সেইজন্য উদারনৈতিক সঙ্ঘ গভর্ণমেণ্ট্‌কে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন।

বঙ্গীয় কেরাণী-সম্মেলন—

গত মাসে কলিকাতায় বঙ্গীয় কেরাণী-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন। সভাপতি মহাশয় কেরাণীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়া একটি বক্তৃতা দেন। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াই কেরাণীদের একমাত্র পথ। সভায় কেরাণীগণের মঙ্গলোদ্দেশে কতকগুলি প্রস্তাবও লিপিবদ্ধ হয়।

দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান সম্মেলন—

গত মাসে কলিকাতা বিশপ্ কলেজে নিখিল-ভারত দেশীয় খৃষ্টান সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সুরা বর্জ্জন করিতে হইবে।

নমঃশূদ্র কন্‌ফারেন্স্—

গত ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় নিখিলবঙ্গ নমঃশূদ্র কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সরকারী চাকুরীতে মুসলমানের সংখ্যা—

বাংলায় সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের সংখ্যা-সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে যে আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে তাহার ফলে বাংলা গভর্ণমেণ্ট্ ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে সরকারী চাকুরীতে বহাল করিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা ও উৎসাহ প্রদান করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের অধিবাসিবৃন্দের অধিকসংখ্যক অধিবাসী মুসলমান। বাংলাসরকার মনে করেন, অধিকসংখ্যক মুসলমানকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ না করিলে সমষ্টিগতভাবে কখনও এ-প্রদেশের অধিবাসীদের মঙ্গল হইবে না। এইসমস্ত বিবেচনা করিয়া সরকার এই প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যানুসারে সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিজের ক্ষমতাধীনে যে-সমস্ত বিভাগের চাকুরী দিবার ক্ষমতা আছে, সেইসমস্ত বিভাগে কতজন মুসলমান চাকুরিয়া নিযুক্ত হইবে, অপারিন্ট গভর্ণর সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন এবং সে বিষয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিস্, সাবর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস্ এবং আবগারী বিভাগে কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে যে, প্রতিযোগী পরীক্ষায় পাশ করিলে এক তৃতীয়াংশ মুসলমানকে লইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট্ এখন ঐ-সমস্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে সংকল্প করিয়াছেন এবং উপরোক্ত বিভাগে কোনো পদ শূন্য হইলে শতকরা ৪৫ জন মুসলমানকে নিযুক্ত করা হইবে স্থির হইয়াছে।

মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারীং, কৃষি-বিভাগ, বন-বিভাগ, পশু চিকিৎসা বিভাগে মুসলমানেরা তেমন যোগ্যতা অর্জ্জন না করায় তাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া হয় নাই। কিন্তু এখন এই-সমস্ত বিভাগে মুসলমান-দিগকে চাকুরি দিবার বিষয় বিবেচনাধীন।

সরকারী চাকুরীতে নিম্নপদ হইতে পদোন্নতি দিয়া অনেক উচ্চতর পদ পরিপূর্ণ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট্ এই নিয়মের কোনোরূপ পরিবর্ত্তন করিবেন না সংকল্প করিয়াছেন, এবং পদোন্নতি-বিষয়ে কোনোরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিচার করা হইবে না স্থির করিয়াছেন। পূর্ব্বকার-মত কার্য্যকালের দীর্ঘস্থায়িত্ব ও গুণের উপরই পদোন্নতি নির্ভর করিবে।

পরলোকগত মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়—

নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় গত ২১শে পৌষ পরলোক-গমন করিয়াছেন। মহারাজা কিছুদিন হইল একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে রোগশয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার বয়স মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ অশেষ সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর বংশধর। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও সেবক বলিয়া সুবিদিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ তিনি বহু বর্ষ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বহরমপুরে যখন প্রথম সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন তিনি তাহার এক-জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। গতবারে মুন্সীগঞ্জের সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁহার খুব পারদর্শিতা ছিল।

প্রথম জীবনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন একবার তিনিই আহ্বান করিয়াছিলেন। ১৯০১ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদে-শিক সমিতির সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য ও কলা-বিদ্যা সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মাদ্রাজে বাঙ্গালীরা বন্দী—

সম্প্রতি মাদ্রাজের মিঃ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার একখানা পত্র পাইয়াছেন। তাহাতে মাদ্রাজ জেলে বাঙালী রাজবন্দীদের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুর ব্যবহার

করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। চিঠিখানার নীচে "যিনি বিশেষ অবগত আছেন" এই স্বাক্ষর রহিয়াছে। চিঠিতে নিম্নলিখিত কথা লিখিত আছে :—

"বাঙ্গালী রাজবন্দী দাশ, গাঙ্গুলী এবং গুপ্ত অকস্মাৎ ত্রিচীনপল্লী জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেন, সরকার এবং মজুমদার দুই বৎসর তিন মাস পরে ক্যানানোর-জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মিঃ দাশ অন্ত্রপ্রদাহ রোগে এবং মিঃ গাঙ্গুলী সর্দ্দি, মূত্রনালী প্রদাহ রোগে ভুগিতেছেন। সিবিল সার্জ্জনের অনুরোধ সত্ত্বেও গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ বিশেষজ্ঞের দ্বারা তাঁহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করান নাই। বাঙ্গালার জেলে তাঁহাদিগকে 'সেলে' রাখা হইত না, তাঁহাদিগকে খোলা ঘরে রাখা হইত; মান্দ্রাজ জেলে তাঁহাদিগকে অন্ধকার কক্ষে রাখা হইয়াছে। জেল-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রতি অতি পাশবিক অত্যাচার করিতেছেন। বাঙ্গালার জেলে —এমনকি ব্রহ্মের জেলে তাঁহারা যেসমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন, মান্দ্রাজ জেলে তাহাদিগকে সেই সমস্ত সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাঙ্গালার বন-বিভাগ—

বাঙ্গালা গবর্ণ্‌মেণ্টের ১৯২৪ সালের বন-বিভাগের রিপোর্ট্‌ প্রকাশিত হইয়াছে। বন-বিভাগের রিজার্ভ্‌ স্থানের আয়তন বর্ত্তমানে ৫২৮৮ বর্গ মাইল অর্থাৎ এবৎসর একবর্গ মাইল বৃদ্ধি হইয়াছে। গত পাঁচবৎসরে টিম্বারের ভূমি ৪৪০২ হইতে ১৫৩২৩ একর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে; কিন্তু উত্তম বন্দোবস্তের অভাবে আশানুরূপ ফল হইতেছে না। ১৯২৩-২৪ সালে ৪ মাইল গো-শকট যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ১৯২৪-২৫ সালে ১২ মাইল তৈয়ারী করা হইয়াছে। তাহার ব্যয় পড়িয়াছে যথাক্রমে ৫০৬৯৲ ও ১১৯৮১৲ টাকা। কাসিয়াং, জলপাইগুড়ি ও বক্সার বিভাগে টিম্বারের সংখ্যা ও মূল্য উভয়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। এ-বৎসর বন-বিভাগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এবার পৌনে পঁচিশ লক্ষ মুদ্রা কর আদায় হইয়াছে, উহা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ টাকা অধিক।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

কষ্টিপাথর

যেতে যদি হয়

(ভৈরবী)

যাবো, যাবো, যাবো তবে,
যেতে যদি হয় হবে।
লেগেছিল কত ভালো
এই যে আঁধার আলো,
খেলা করে শাদা কালো
উদার নভে।
গেল দিন ধরামাঝে
কতভাবে কত কাজে,
সুখে, দুখে, কভু লাজে,
কভু গরবে।
যেতে যদি হয় হবে।

প্রাণপণে কত দিন
শুধেছি কঠিন ঋণ,
কখনো বা উদাসীন,
ভুলেছি সবে।
কভু ক'রে গেনু খেলা,
স্রোতে ভাসাইনু ভেলা,
আনমনে কত বেলা
কাটানু তবে।
যেতে যদি হয় হবে।

জীবন হয়নি ফাঁকি,
ফলে-ফুলে ছিল ঢাকি',
কিছু যদি রহে বাকি—
কে তাহা লবে?
দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে,
বোঝা-খ'সে-যাওয়া বুকে
যাবো চ'লে হাসিমুখে,
যাবো নীরবে।
যেতে যদি হয় হবে।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ভারতী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৩২)

স্বরাজের 'স্ব'

স্বরাজের 'স্ব'টা কি, একটু ভেবে দেখ্‌লে মন্দ হয় না। আর্য্য জাতির যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ, তা'তে 'স্বরাজ' শব্দের প্রয়োগ আছে।

যুবাসি তে বৃষভস্য স্বরাজ
উগ্রস্য যূনঃ স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ।
অজূর্য্যতো বজ্রিণো বীর্য্যাণি
ইন্দ্র! শ্রুতস্য মহতো মহানি॥—৩।৪৬।১

"হে ইন্দ্র! উগ্র, বীর্য্যবন্ত, স্বরাজ, নবীন-প্রবীণ, জরাহীন, বজ্রধারী, বর্ষণকারী, বিশ্রুত তোমার বীর্য্যসমূহ অতিশয় মহীয়ান্‌।" 'স্বরাজ' ইন্দ্রের এই বিশেষণগুলি প্রণিধানযোগ্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে মানুষকে লক্ষ্য ক'রে বলা হ'য়েছে—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে। অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে মানুষ নিজের স্ব-রূপ ভু'লে গেছে। এমন একদিন আস্‌বে, যখন সে পরম জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্‌ হ'য়ে স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে অর্থাৎ স্ব-রাজ হ'বে।

প্রত্যেক মানুষের একটা 'স্ব' আছে—একটা বৈশিষ্ট্য, একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা স্বালক্ষণ্য আছে। আমার যা স্ব-ধর্ম্ম, তোমার তা স্ব-ধর্ম্ম নহে। আমি যদি আমার স্বধর্ম্মের অনুসরণ না ক'রে তোমার স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি,(যেটা আমার পক্ষে পরধর্ম্ম), তা হ'লে আমি শ্রেয়ের পথ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে প্রেয়ের বিপথে গিয়ে পড়্‌ব—তা'তে আমার কল্যাণ হবে না, অকল্যাণ হবে।

স্বধর্ম্মের অনুসরণ করলে মানুষ শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হ'য়ে 'স্ব'তে প্রতিষ্ঠিত হয়—এক কথায় স্বরাজ হয়।

ব্যক্তির যেমন স্ব-ধর্ম্ম আছে, জাতিরও তেমনি স্ব-ধর্ম্ম আছে। আমরা যেন না ভাবি যে, এক একটা জাতি (Nation) কতকগুলো ব্যক্তির রাশিমাত্র—যেমন একরাশ বালি বা একপাঁজা ইট। বালু-কণায় বালু-কণায় মিলিত হয় না, মিশ্রিত হয় মাত্র—মিশ্রিত হ'য়ে একটা রাশি সৃষ্টি করে। জাতি সে-রকম রাশি নয়। যখন অনেকগুলি স্বতন্ত্র ব্যক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হ'য়ে একটা সংহতি (Organic Unity) রচনা করে, সেই সংহতির নাম হয় জাতি। অতএব জাতি একটা সংঘাত বা Organism—যেমন আমার শরীর।

বৈদান্তিকেরা বলেন, যেমন ব্যষ্টি বৃক্ষের সমষ্টি বন, যেমন ব্যষ্টি জলবিন্দুর সমষ্টি জলাশয়, সেইরূপ ব্যষ্টি পুরুষের সমষ্টি বৈশ্বানর বা বিরাট্ পুরুষ। যেমন প্রত্যেক বৃক্ষ ও জলকণা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাদের সংযোগে বন ও জলাশয় রচিত হয়েছে, সেইরূপ এ জগতে যত ব্যক্তি আছে যত ব্যষ্টি জীব আছে, তাদের সমষ্টিতে ঐ বৈশ্বানর বা বিরাট্ পুরুষ রচিত হয়েছেন ; অর্থাৎ তিনি ব্যক্তি জীবপুঞ্জের অঙ্গাঙ্গি-যোগ-সিদ্ধ, সমবায়-গঠিত স্বতন্ত্র সংঘাত।

জগতে যত জাতি আছে, যদি সকল জাতির হৃদয়-বীণায় একই সুর বাজতে থাকত, তা হ'লে তা'তে সঙ্গীত হ'ত না—একতারার একঘেয়ে আওয়াজ মাত্র হ'ত। কিন্তু বিশ্ব-শিল্পীর বিচিত্র বিধান এই যে, বিশ্ব-যন্ত্রে বিশ্ব-সঙ্গীত ধ্বনিত হ'তে হবে—সমস্ত জাতির বিভিন্ন হৃদয়-তন্ত্রীতে যে বিবিধ সুর ঝংকৃত হচ্ছে, একদিন তাদেরই সমবায়ে ঐ বিশ্ব-সঙ্গীতের ঐক্যতান বাদিত হবে। সেইজন্যই প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র; কি প্রবীণ কি নবীন,সমস্ত জাতিরই একটা স্বালক্ষণ্য আছে। হিন্দু,পারসিক,চৈনিক, গ্রীক্, রোমক, মিসরীয়,আসিরীয়, ব্যাবিলোনীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতি এবং ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান্, ইতালীয়, মার্কিন প্রভৃতি আধুনিক জাতি প্রত্যেকেরই এক-এক বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন স্বধর্ম্ম আছে—প্রত্যেক জাতিরও তেমনি স্বধর্ম্ম আছে।

হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য কি ? তা'র স্বধর্ম্ম কি ? এই হিন্দু জাতি যুগ-যুগান্তর ধ'রে নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও অন্ততঃ ছয় সাত হাজার বৎসর জীবিত রয়েছে! সব প্রাচীন জাতি বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু হিন্দু জাতি আজও খাড়া রয়েছে। কেন? কিসে? অন্ততঃ ৬।৭ হাজার বল্‌লাম—আমার কিন্তু ধারণা দশ-বারো হাজার বৎসর। যখন আমাদের পূর্ব্বে পিতৃগণ তাঁদের 'ওকুওক' থেকে উদাত্ত স্বরে সামগান করতে-করতে এই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন, সে আজ খুব সম্ভব দশ-বারো হাজার বৎসরের কথা।

যখন ভারতীয় আর্য্যজাতির সভ্যতা উন্নতির মধ্যগগনে আলোক বিকীর্ণ কর্‌ছিল, তখন গ্রীক-রোমের পত্তন হয়েছিল মাত্র—তখনও গ্রীক ও রোমক সভ্যতা নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। এখন প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিসর, মেক্সিকো, আসিরিয়া, ব্যাবিলন—কেহই জীবিত নাই ; অথচ যখন ভারতবর্ষে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ, তখনও এদের মধ্যে কেহ কেহ মুর্ত্ত হয় নাই। হিন্দুস্থানের বক্ষের উপর দিয়ে যে প্রলয়ের প্লাবন ব'য়ে গেছে—যবন, ইরানী, হূণ, চীন, পাঠান, মোগল, তুর্কী, পর্ত্তুগিজ, ওলোন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ—কত জাতির, কত জেতার বিজয়-তুফান ঝঞ্ঝাবাতের মত ভারতের আকাশকে যে-ভাবে আলোড়িত করেছে, ভারতবাসীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে যে ধিক্কার, অত্যাচার, অবিচার ও দুরাচারের অভিঘাত সহ্য করতে হয়েছে—তা'র একটা ছোট ঢেউ স্পর্শ করলে অন্য যে-কোন জাতি চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেত! কিন্তু হিন্দুকে লুপ্ত করতে পারলে না। হিন্দুজাতি বৈশিষ্ট্যের বলে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল।

শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(ভারতী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৩২)

—

ভাদ্রেশ্বরী বা ভাদু-পূজা

মানভূম জেলার সর্ব্বত্র, বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় এবং বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে ভাদ্রমাস ব্যাপিয়া এই ভাদু-পূজা হইয়া থাকে। ভাদ্রমাসে এই পূজা হয় বলিয়া ইহার নাম ভাদ্রেশ্বরী বা ভাদু-পূজা হইয়াছে। মানভূমের পঞ্চকোট ও রঘুনাথপুরে ভাদু পূজায় এত ধূমধাম হয় যে, অন্য কোনো পূজাতেই এমন ধূম দেখা যায় না। ভাদু-পূজার বিশেষত্ব এই যে, ইহা স্ত্রী লোকেরাই করিয়া থাকেন। এপূজার কোনো মন্ত্র নাই, কোন পদ্ধতি নাই ; ফুল, চন্দন, বিল্বপত্রাদি কিছুই লাগে না; পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না। মেয়েরাই ভাদুর ছড়া বলেন এবং উহাই এই পূজার মন্ত্র।

ভাদ্রমাসের প্রথমেই ভাদু-ঠাকুর আনা হয়। প্রতিমাখানি দেখিতে লক্ষ্মী-প্রতিমার মত,কিন্তু বর্ণ লাল নয় এবং হাতে পদ্ম বা কোনো জিনিষ নাই। বাম পদের উপর দক্ষিণপদ স্থাপন করিয়া দাঁড়ানো, আজকাল আবার কোনো-কোনো স্থলে বাইসাইকেলে বা মোটরে-চড়া ভাদুও দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকের প্রতিগ্রামের প্রত্যেক পাড়ায় লোকে এইরূপ প্রতিমা আনয়ন করে। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ছোটো ছোটো মেয়েরা ভাদু-প্রতিমার সম্মুখে দুধ, চিঁড়া, মিষ্টান্নাদি রাখিয়া ছড়া গাহিতে থাকে। ছড়া শেষ হইলেই পূজা শেষ হয়। তৎপরে ঐ মিষ্টান্নাদি তাহারা প্রসাদ-স্বরূপ গ্রহণ করে। সারা ভাদ্র মাস ব্যাপিয়া এইরকমভাবেই ছড়া বলা হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনকে ভাদুর জাগরণ বলে, ঐ দিনেই পূজার শেষ হয়। এই দিনে সন্ধ্যার পর পাড়ার প্রত্যেক ঘরের মেয়েরা থালা ভরিয়া লুচি, মোহনভোগ ও নানা প্রকার মিষ্টান্ন ভাদুর সম্মুখে রাখিয়া আসেন। সাধারণতঃ পাড়ার কোনো নির্জ্জন বাড়ীতে এদিনে ভাদুকে রাখা হয়। সন্ধ্যার পর হইতে প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েরা—বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, সধবা, বিধবা, কুমারীনির্ব্বিশেষে—বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যেখানে ভাদু থাকে, সেখানে সমবেত হন এবং সমস্ত রাত্রি সকলে ভাদুর ছড়া গান করেন। শেষে কয়েকটি ভাদুর ছড়া দেওয়া গেল। ভোর বেলায় ভাদুর বিদায়গান হয়; তা'র পর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভাদুর বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। কিশোরী কুমারীগণ বিদায়গান গাহিতে-গাহিতে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত ভাদুর অনুগমন করে। তা'র পর ভাদুর বিসর্জ্জনের পর ঘরে ফিরিয়া আসে। ভাদু-পূজা হিন্দু স্ত্রীলোক মাত্রেই উল্লিখিত অঞ্চলে করিয়া থাকেন। উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাই এই পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাদের পূজার মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরমণীগণ একসঙ্গে বসিয়া 'কোরাসে' ভাদুর ছড়া গান করে, তা'র সঙ্গে কোন বাদ্য বাজে না ; বাউরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে একজন নাচে আর

ভাদু বলে, অন্য সকলে তাহার 'দোহারকি' করে। ইহাদের ভাদুর গান কিছু অশ্লীল ও সাদাসিধা।

এই ভাদুপূজা-সম্বন্ধে এদেশে নানাপ্রকার প্রবাদ শুনা যায়। কেহ-কেহ বলে যে, প্রায় দেড়শত কি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে মানভূম জেলার পঞ্চকোটাধিপতি স্বর্গীয় নীলমণি সিংহ দেও বাহাদুর এই পূজার প্রচলন করেন। তাঁহার পরমরূপবতী এক কন্যা ছিল; তা'র নাম ভাদ্রেশ্বরী। কন্যা বয়স্থা হইলে রাজা অন্য-এক দেশের রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের দিন পাত্র বিবাহ করিতে আসিবার কালে পথিমধ্যে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। রাজা ইহা অবগত হইয়া অন্য পাত্র স্থির করিয়া সেই দিনই কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু কন্যা কিছুতেই অন্য পতি বরণ করিতে স্বীকৃত হইল না এবং যেখানে তাহার বাগ্‌দত্ত পতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তথায় যাইয়া জলন্ত চিতায় স্বেচ্ছায় পুড়িয়া মরে। কন্যার স্মৃতি-রক্ষার্থে রাজা এই পূজা তাঁহার রাজধানীতে প্রচলিত করেন। আবার কেহ-কেহ বলে যে-রাজা স্ত্রীলোকের গান শুনিতে বড় ভালোবাসেন, কিন্তু অন্তঃপুরনারীদের গান শুনিবার কোনো সুযোগ না থাকায় নিজ রাজধানীতে এই ভাদু-পূজার প্রচলন করেন এবং নিয়ম করিয়া দেন যে, প্রত্যেক বাড়ীর স্ত্রীলোকেই ভাদ্র মাস ধরিয়া সন্ধ্যার সময় ভাদু গান করিবে।

ভাদুর ছড়া

ভাদু নিজগুণে
দয়া ক'রে এসেছে গো এখানে।
কেহ বারি আনতে চল গো, কেহ যাও ফুল-বাগানে।
(আবার) কেহ বা নিযুক্ত থাকো নৈবেদ্যের আয়োজনে।
কলাপাকা আম্র টাবা গো, বাজারে আন কিনে;
আরো কেহ বা মিষ্টান্ন আনো, ভুবন ময়রার দোকানে।
জিলাপী, খাজা, লেডিকেনি গো, কিনবে যে দে'খে-শু'নে;
ভালো ক'রে পরখিবি, বাসি যেন আনিস নে।

*　　*

ভাদু বিধুমুখি।
বদন তুলে হেসে কথা কও দেখি।
বিরস বদন কেন লো, আজকে তোমার নিরখি।
ধনি, কিবা অভিমান হয়েছে, আমারে বলো দেখি।
সুখনিশি জাগরণে লো, সকলি যে হয় ফাঁকি।
তুমি বহুদিন পরে এলে নিরানন্দ করো ছিঃ।

*　　*

ওলো ভাদুমণি,
কেমন ক'রে ছিলে বলো তাই শুনি।
সম্বৎসর যে গত হ'ল খবর কিছু না জানি।
(তুমি) ভালোয়-ভালোয় এলে ঘরে সুখেতে থাকো তুমি।
(আমি) কি করে যে ছিলাম ঘরে গো জানেন
চিন্তামণি।
ওগো আমার দিব্য থাকে ভাদু শুনিস না কারো বাণী।
পিতার আমার কঠিন হৃদয় গো কথা না শুনেন তিনি।
ওগো সত্য ক'রে বলছি ভাদু ফিবৎসর আনব আমি।

*　　*

এস ভাদ্রেশ্বরী,
হতাশ প্রাণে ঢালিতে আশা বারি।
ভাঙা প্রণয় জোড়া দিতে লো করিয়ে কারিকুরী।
(প্রেমে) ভাসাইতে মাতাইতে কি পুরুষ কিবা নারী।
অন্তরে আনন্দ দিতে লো নিরানন্দ নাশ করি।
(এস) হর্ষভরা করতে ধরা সুন্দরী রাজকুমারী।

*　　*

বিদায় দিতে মন সরে না ভাদু তোমারে।
নিশ্চয় যদি যাবি গো ভুলিস না গো আমারে।
যাচ্ছ যদি ভাদুমণি কেঁদো না গো মনোমোহিনী।
আর-বৎসর থাকি যদি আনব গো তোরে।
আর কেঁদ না ধৈর্য্য ধরো দাসী তোমার প্রণাম করে।
কি করিবি যেতেই হবে বিধাতার নিয়ম রে॥

*　　*

ভাদু সোনা ধনে
ওগো বিদায় দিবো কেমনে।
যেও না যেও না ভাদু গো ধরি তব চরণে।
চ'লে গেলে আমরা বলো গৃহে রবো কেমনে।
দিবানিশি তোমায় হেরে গো থাকি আনন্দ-মনে।
তুমি চ'লে গেলে প্রাণ ত্যজিব কাজ কি এ ছার জীবনে।

(বাঁশরী, কার্ত্তিক, ১৩৩২)　　শ্রী বিপদ্‌ভঞ্জন চক্রবর্ত্তী

সেনহাটীতে বিষ্ণুমূর্ত্তি

গত ফাল্গুন মাসে আমার বাসপল্লী খুলনা জেলার সেনহাটীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত গোপালপাড়ায় একটি পুরাতন পুষ্করিণী খননকালে একখানি নিখুঁত পাষাণময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি একখানি ২´–৭´´×১–৩´´ স্তূপাকৃতি কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ। শুধু মূর্ত্তিটি ১´–৯´´ দীর্ঘ। মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট, গলদেশে কণ্ঠমালা, কৌস্তভমণি, পরে উত্তরীয়, নিম্নে আনাভি যজ্ঞোপবীত, জানুদেশাবলম্বী বনমালা। বামাধো হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধে চক্র, দক্ষিণোর্দ্ধে গদা দক্ষিণাধে পদ্ম-শোভা পাইতেছে। বিগ্রহের পদনিম্নে জোড় হস্ত, স্তব-পরায়ণ দুইটি উপবিষ্ট সাধক মূর্ত্তি। মূল মূর্ত্তির বামে শিলাধারিণী সরস্বতী, দক্ষিণে পদ্ম-হস্তা লক্ষ্মী, সরস্বতীর বামে ও লক্ষ্মীর দক্ষিণে দুইটি কিরীটধারী মূর্ত্তি—'পুরুষ কি নারী, বুঝিতে না পারি।' এই মূর্ত্তির উপরে হস্তী, তাহার উপরে লম্বালম্বিভাবে একটি সিংহ, সিংহের উপরে আবার প্রকাণ্ড হস্তী, তাহার উপরে দুইটি ক্ষুদ্র পুরুষ মূর্ত্তি। মূর্ত্তির মস্তকের উপর দিকে চালের উত্তর পার্শ্বে পক্ষধারী বিদ্যাধর মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলি ব্যতীত বিগ্রহের আশে-পাশে উপরে-নীচে নানাকারে কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুমূর্ত্তি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আছেন। মূল পাথরখানির নিম্নে কীলক আছে। কিন্তু উহা যে পাদপীঠে সংবদ্ধ ছিল সেখানি পাওয়া যায় নাই।

এ বিগ্রহ ঠিক কত দিনের, কাহার দ্বারা কি-ভাবে প্রস্তুত হইয়া কোথা হইতে কেমন করিয়া এখানে আসিল, বহু অনুসন্ধানেও তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

শ্রী অশ্বিনীকুমার সেন

(প্রতিভা, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৩২)



শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর অভিভাষণ

কানপুরে কংগ্রেসের সভাপতি রূপে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যে বক্তৃতা করেন, তাহার দুটি গুণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন; সকলেই বলিয়াছেন উহা দীর্ঘ নয় এবং উহার রচনা উৎকৃষ্ট। কঠোর সমালোচকেরা অবশ্য বলিয়াছেন, যে, উহাতে ভাষা সুন্দর ও কবিজনোচিত করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। কিন্তু উহা পড়িবার সময় আমাদের ওরূপ কোন দোষ ঠাওর হয় নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা তিনটি;—১। কি প্রকারে শীঘ্র স্বরাজ লাভ করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন; ২। সেই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐক্যসাধন এবং একযোগে কার্য্যসম্পাদন; ৩। হিন্দুমুসলমানের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব ও একতা স্থাপন।

সরোজিনী দেবীর অভিভাষণে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে এই তিনটিরই উল্লেখ আছে। প্রথমটির উল্লেখ পরোক্ষ ভাবে আছে। তিনি বলিয়াছেন, যে, ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন সংস্কার আইন অনুসারে শাসন-প্রণালীর যে-সব সংস্কার করা হইয়াছে, তাহা কাহারও আশানুরূপ হয় নাই। সরোজিনী দেবী সংস্কারগুলিকে "মরীচিকা বলিয়াছেন। সকল দলের লোকেরা তাহা মনে না করিলেও একথা ঠিক, যে, কেহই সন্তুষ্ট হন নাই। প্রত্যেক দলের লোকেরা কি চান, তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক; তিনি বলিয়াছেন,

"আমার নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস যাহাই হউক, * ভারতীয় রাজনৈতিক সকল দলের লোকেই, অন্ততঃ স্বায়ত্ত শাসনের গোড়া পত্তনস্বরূপ ভারতবর্ষের জন্য স্বশাসক ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির সমান অধিকার চান। এই উপনিবেশগুলির অধিকার বলিতে কি বুঝায়, তাহা মিসেস বেসাণ্ট্ প্রমুখ রাজনীতিজ্ঞদিগের দ্বারা প্রস্তুত "কমন্‌ওয়েল্‌থ্ অব্ ইণ্ডিয়া বিল্" নামক আইনের খসড়ায় দেখান হইয়াছে এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে জাতীয় দাবী সকল রাজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, তাহাতে উহা সংক্ষেপে ও দৃঢ়তার সহিত অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। সকল রাজনৈতিক দলের লোকেরা ন্যূনতম অধিকার কি কি চান, সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত; এবং অধিকতম রাষ্ট্রনৈতিক অন্যায় ও দুঃখ এবং অধিকারহীনতা তাঁহারা কতটা এখনও সহ্য করিতে প্রস্তুত, তদ্বিষয়েও একমত।"

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুচর নো-চেঞ্জার অর্থাৎ পরিবর্ত্তন-বিরোধীরা, স্বরাজীরা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ বা স্বতন্ত্রদলের লোকেরা, উদারনৈতিকরা, মোস্‌লেম্ লীগের লোকেরা, খিলাফতীরা, এবং মান্দ্রাজের অব্রাহ্মণেরা কি চান, তাহা আমরা যখন খবরের কাগজে পড়ি, তখন দেখিতে পাই, অবান্তর কতকগুলি বিষয় ছাড়িয়া দিলে, সকলের মূল রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্য ও আদর্শে মিল আছে। কিন্তু সকল দলের নেতারা একত্র বৈঠক করিয়া, সকলে কি কি বিষয়ে একমত, তাহা স্পষ্টভাবে বলিলে ভাল হয়। নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত পরস্পরকে দেখিতে পারেন না, কাহারও কাহারও মধ্যে মনোমালিন্য বা বিরোধও থাকিতে পারে, কাহারও কাহারও মধ্যে হয়ত পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও আছে; কিন্তু এসব ভাবকে বাদ দিয়া, চাপা দিয়া, বিনষ্ট করিয়া, সম্মিলিত একটি দাবী স্থির করিয়া জগতের সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে।

সকল দলের মিলনের জন্য কি করা উচিত, সরোজিনী

* এই কথাগুলি হইতে অনুমান হয়, সরোজিনী দেবী স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

দেবী তাহা খুলিয়া বলেন নাই। তাঁহার অভিভাষণের এক জায়গায় আছে বটে, যে, স্বরাজ দল কংগ্রেসের দ্বার মুক্ত করিয়া অন্য সব দলকে উহাতে যোগ দিতে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি না, যে, কংগ্রেসের সভ্য হইবার সব সর্ত্ত সব দলের লোক অবাধে মানিয়া লইতে পারেন। কংগ্রেসে স্বরাজ দলের এক ছত্র প্রভুত্ব মানিয়া লইয়া উহাতে অন্য সকলের যোগদান সম্ভবপর নহে। আগে কংগ্রেসের সভ্য হইবার যে সরল সহজ নিয়ম ছিল, তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিলে সকলের যোগ দিবার সুবিধা হয়। তাহার পর যে বৎসর যে দলেরই প্রাধান্য হউক, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না।

স্বরাজ কি প্রকারে শীঘ্র লাভ করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। মহাত্মা গান্ধী প্রথম প্রথম কয়েকটি সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন, যে, সেগুলি পালিত হইলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাওয়া যাইবে। অবশ্য এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাওয়া যায় নাই। মহাত্মা গান্ধীর পক্ষ হইতে উত্তরে ইহা বলা যায়, যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তগুলিও পালিত হয় নাই। প্রত্যুত্তরে বলিতে পারা যায়, যে, তাঁহার সর্ত্তগুলিই এরূপ ছিল, যে, তাহা এক বৎসরের মধ্যে কখনও অধিকাংশ ভারতীয়ের দ্বারা পালিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সে দিনও কানপুরে তিনি বলিয়াছেন, যে, চরখার ও খদ্দরের আশানুরূপ প্রচলন ও ব্যবহার হইলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কয়েক বৎসরের চেষ্টাতে চরখার প্রচলন এবং খদ্দর উৎপাদন ও ব্যবহার যতটা হইয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যদ্বক্তার আসন গ্রহণ না করিয়াও বলা যায়, যে, চরখা ও খদ্দর সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আশা এক বৎসরে পূর্ণ হইবে না;—কখনও হইবে কি না সন্দেহ। আমাদের মনে হয়, স্বরাজ লাভের তারিখ নির্দ্দেশ করা ভুল। উহার সুচিন্তিত পন্থা ও উপায় নির্দ্দেশ করিয়া তাহাই দেশের লোককে অবলম্বন করাইতে অবিরত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নতুবা এমন অনেক সর্ত্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা যুগপৎ পালিত হইলে, এক বৎসরে কেন, এক সপ্তাহেই স্বরাজ লব্ধ হইতে পারে। এরূপ একটি সর্ত্তের উল্লেখ করিতেছি যাহা বহু বৎসর পূর্ব্বেই কোন কোন ইংরেজ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছিল। যদি ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্টের উচ্চতম হইতে নিম্নতম সৈনিক ও অসৈনিক, বেতনভোগী ও অবৈতনিক, সমুদয় ভারতীয় ভৃত্য চাকরী ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে অবিলম্বে গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে আমাদের দাবী গ্রাহ্য করিতে হইবে। কিন্তু সকলের দ্বারা এরূপ যুগপৎ পদত্যাগ সম্ভবপর নহে। ইংরেজীতে সম্ভাব্যতা বুঝাইবার জন্য ইম্পসিবল্ এবং ইম্প্রবেব্‌ল এই দুই শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাহা ব্যবহার করিয়া বলিতে পারা যায়, যে, সকল ভারতীয় সরকারী চাকরের যুগপৎ পদত্যাগ ইম্পসিব্‌ল না হইলেও ইম্প্রবেব্‌ল। মহাত্মা গান্ধীর সর্ত্তগুলি সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য।

যাহা হউক স্বরাজ লাভের জন্য সরোজিনী দেবী তাঁহার অভিভাষণে কি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতেছি। তিনি বলেন, আগামী বসন্ত কালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের সময় বা তৎপূর্ব্বে যদি গবর্ণ্মেণ্ট আমাদের দাবীতে কর্ণপাত না করেন, কিম্বা যদি গবর্ণ্মেণ্ট যাহা দিতে চান, তাহা আমাদের গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে যাঁহারা কংগ্রেসের প্রভাবাধীন তাঁহাদিগকে সুস্পষ্ট এই আদেশ জানাইতে হইবে, যে, তাঁহারা ভারতীয় ও প্রাদেশিক সমুদয় ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের পদত্যাগ করুন। তদ্ভিন্ন কৈলাস হইতে কন্যাকুমারী ও সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র-নদ পর্য্যন্ত ভারতীয় লোকদিগকে শেষ স্বরাজলাভ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে, যে, ভারতজননীকে তাঁহার দাসত্ব-অপমান হইতে মুক্ত করিবার এবং আমাদের সন্তানদিগকে অবিনশ্বর শান্তি দিয়া যাইবার নিমিত্ত কোন ত্যাগই বেশী নয়, কোন ক্লেশ অতি বড় নয়, কোন দুঃখলাঞ্ছনা ভোগ অতি ভয়াবহ নহে।

সশস্ত্র যুদ্ধ না করিয়া, ইংরেজদের বা ইংরেজ পক্ষের কাহারও প্রাণ বধ না করিয়া, বরং আবশ্যক হইলে নিজের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত দুঃখ স্বীকার করিয়া, শান্তির পথে স্বরাজ লাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। সুতরাং শ্রীমতী

সরোজিনী নাইডু যে শেষ স্বরাজলাভ চেষ্টার কথা বলিয়াছেন, তাহা যুদ্ধ নহে। তাহা ট্যাক্স্ না দেওয়া, তাহা নিরুপদ্রবভাবে কোন আইন লঙ্ঘন বা অমান্য করা, কিংবা ঐরূপ কিছু। প্রয়োজন হইলে উহা করা বিন্দু-মাত্রও গর্হিত নহে। কিন্তু যথেষ্টসংখ্যক লোকের ঐ উপায় অবলম্বন করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং করিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা বিবেচ্য। দেশ নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তুত কি না, অসহযোগীদলের পক্ষ হইতে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত প্রতিকূল হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীও এখন উহার সাধ্যায়ত্ততা-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান। এই কারণে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর, যথা আগামী বসন্তকালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের পর, উহার জন্য দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে বলা আমরা সমীচীন মনে করি না। কারণ, তাহা কতকটা গবর্ন্মেন্টের উদ্দেশে ফাঁকা আওয়াজের মত শুনায়। আমরা নেতা নহি, আমরা কেবল মত প্রকাশ করিতে অধিকারী। আমরা কাহাকেও উপদেশ দিতেছি না। কেবল এই মত প্রকাশ করিতেছি, যে, দেশের লোককে স্বাধীনতা-লাভের জন্য সকলপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ সহ্য করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে হইলে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা এখন হইতেই অবিরত করা হউক।

হিন্দুমুসলমানের মিলন সাধনের জন্য শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমস্তই ঠিক কথা। মহাত্মা গান্ধীর একুশ দিন ব্যাপী উপবাসের পর এই উদ্দেশ্যে যে কন্‌ফারেন্সের বৈঠক হইয়াছিল, তাহার নির্দ্ধারণগুলিও বেশ ভাল। কিন্তু এবিষয়ে সমুদয় কর্ত্তব্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা দুঃসাধ্য। সেইজন্য কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে যাহা বলা হয় নাই, তাহার জন্য সরোজিনী দেবীকে দোষ দেওয়া যায় না।

—

কংগ্রেসের বারটি কর্ত্তব্য

কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে বারটি কর্ত্তব্যের উল্লেখ দেখা যায়। সবগুলিই প্রয়োজনীয়।

পল্লীসংগঠনের কথা তিনি প্রথমে বলিয়াছেন। 'দেশবন্ধু দাসের স্বপ্ন' (ইহা নাইডু মহাশয়ার ভাষা) অনুসারে তিনি এতদ্বিষয়ক অনুষ্ঠান-পদ্ধতি রচনা করিতে বলিয়াছেন। দাশ মহাশয়ের প্রাপ্য কোন সম্মান হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে, যে, তিনি যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন মৌলিকত্ব ছিল না, এবং তাঁহার 'স্বপ্ন' অনুযায়ী কাজ অনেক আগে হইতেই কোথাও কোথাও চলিয়া আসিতেছে। এই সকল অনুষ্ঠানের কর্ম্মীরা প্রশংসা পান বা না পান, তাহা আমাদের দ্রষ্টব্য নহে। আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে সদুপায় অবলম্বন এবং বিপথ ও ভ্রম পরিহারের সুযোগ হইতে পারে। সেই সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।

গ্রামের উন্নতিসাধক কর্ম্মীদের ভরণপোষণের নিমিত্ত যে উপায়ের ইঙ্গিত সভাপতির অভিভাষণে আছে, তাহার সপক্ষে বলিবার অবশ্যই কিছু আছে। সেকালে গ্রামের পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা এবং টোলের অধ্যাপকেরা গ্রামবাসীদের ধর্ম্মভাব ও স্বার্থবোধ প্রণোদিত দানের উপর নির্ভর করিতেন বটে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে মানুষের মতিগতি ঠিক আগেকার মত নাই। আগেও কখন কখন গুরুমহাশয় ও ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের আত্ম-সম্মানের ও স্বাধীনতার হানি হইত না, এমন নহে। বর্ত্তমান সময়ে গ্রামোন্নতিবিধায়ক কর্ম্মীদিগের গ্রাম্য দলাদলির বাহিরে থাকিয়া, আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া, অথচ সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারা আবশ্যক। এইজন্য, তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে গ্রামবাসীদের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিতে না হইলে ভাল হয়। তা ছাড়া, মহাত্মা গান্ধী কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার ইয়ং ইণ্ডিয়ায় দেখাইয়াছেন, যে, কোন কোন কংগ্রেস্-কর্ম্মী কেমন করিয়া লোকের বাড়ীতে অতিথি হইয়া জাঁকিয়া বসেন এবং অতিথিরূপে সেবাটা পাওনা বলিয়া আদায় করিতে চান। এবম্বিধ কারণেও, পল্লীহিতসাধন উপলক্ষে তথাকথিত অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর মত নূতন আর একদল অলস লোকের সৃষ্টি যাহাতে না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন আগে হইতেই

করা দরকার। সেইজন্ত পল্লীকর্ম্মীদিগকে ভরণ-পোষণের জন্ত গ্রামবাসীদের উপর নির্ভর না করাইয়া আধুনিক কালের উপযোগী অন্ত কোন উপায় অবলম্বিত হইলে ভাল হয়।

ঘনবসতি সহরে কলকারখানার শ্রমিকদের কল্যাণ-সাধনের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অযথেষ্ট মজুরী, অস্বাস্থ্যকর সংকীর্ণ-গৃহে বাস, জন্মগ্রামের ও সমাজের প্রভাব হইতে দূরে জীবনযাপন, পানদোষ ও অন্তান্ত পাপাচার, প্রভৃতি নানা অনিষ্টকর অবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা ও উদ্ধার করা আবশ্যক। বঙ্গে এই সমস্যা আরও গুরুতর এই কারণে হইয়াছে, যে, কলকারখানার অধিকাংশ শ্রমিক বাঙালী নহে বলিয়া বঙ্গীয়সমাজের প্রভাব তাহাদের উপর সহজে বর্ত্তে না—তাহারা উহা অনুভব করে না বলিলেও চলে। অধিকন্তু, তাহাদের অস্বাভাবিক জীবনের কুফল বঙ্গীয় সমাজকে দূষিত কবিতেছে। কিন্তু তাহার জন্ত সমাজসেবক সমাজহিতসাধক বাঙালী-দের নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। যাঁহাদের ভাষা জাতি, ধর্ম্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি ভিন্ন, এরূপ বিদেশী অনেক লোক যখন ভারতবর্ষের দুঃখী নানা শ্রেণীর লোকের কল্যাণসাধনে দিনপাত করেন, তখন ভারতীয় আমরা ভিন্নপ্রাদেশিক অন্ত ভারতীয়দিগের কল্যাণসাধন কেন করিতে পারিব না?

তৃতীয় সমস্যা ভারতীয় শিক্ষা বিষয়ক। শ্রীমতী সরোজিনী চান প্রাচ্য কাল্‌চারের সহিত পাশ্চাত্য শিল্প কলা বিজ্ঞান দর্শন ও পৌর শৃঙ্খলাদির সমঞ্জসীভূত মিলন। এই আদর্শ উৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি নিম্নোদ্ধৃত দুইটি বাক্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার কিছু অতিরিক্ত নিন্দা করিয়াছেন।

"The surpassing evil of foreign domination has been to enslave our imagination and intellect and alienate us from the glorious tradition of our national learning. We are today no more than the futile puppets of an artificial and imitative system of education, which, entirely unsuited to the special trend of our racial genius, has robbed us of our proper mental values and perspectives, and deprived us of all true initiative and originality in seeking authentic modes of self-expression."

কাহারও উপর অন্তের প্রভুত্ব অনিষ্টকর; এরূপ প্রভুত্ব বিদেশীয় হইলে আরও অনিষ্টকর। ইহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের কল্পনা ও বুদ্ধিকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি নষ্ট করিয়াছে, আত্মপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত্তি বিনাশ করিয়াছে, ইত্যাদি কথা বলিলে সত্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র হয়। কারণ, আমরা দেখিতেছি, যে, ভারতীয়দের মধ্যে যাঁহারা আধুনিক যুগে সাহিত্যে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, ললিত-কলায়, দর্শনে, প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকেরা কেহই পাশ্চাত্যজ্ঞানবর্জ্জিত কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্রবশূন্য নহেন। বৈদেশিক কোন কিছুরই প্রভুত্ব বা একান্ত প্রভাব আমরা একটুও বাঞ্ছনীয় মনে করি না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রকমের সভ্যতা, সামা-জিক ব্যবস্থা, চিন্তাস্রোত, মনোভাব, প্রভৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ প্রয়োজনীয় মনে করি। কারণ, তাহা ব্যতীত মানুষের মন জাগে না, এবং সংকীর্ণতা হইতে মুক্তি পাইয়া উদারতার প্রশস্ত ক্ষেত্রে উপনীত হয় না।

চতুর্থ সমস্যা, সামরিক শিক্ষা। আত্মরক্ষার জন্তও হিংসা কোন জাতির পক্ষে বৈধ কি না, তাহার আলোচনা এখানে করা যাইতে পারে না। তাহা বৈধ ধরিয়া লইলেও, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় গবন্মেণ্ট আমাদিগকে যতটুকু সামরিক শিক্ষা দিতে চাহিবেন, তাহা অপেক্ষা বেশী আমাদের পাইবার উপায় নাই। গবন্মেণ্ট যাহা দিতে চাহিবেন, তাহা পাওয়া কতটা বাঞ্ছনীয় তাহা বিবেচ্য। বর্ত্তমান সময়ে সামান্ত কয়েকজন নিম্নপদস্থ রাজকীয় কমিশনধারী ভারতীয় অফিসার ছাড়া, অন্ত সব রাজকীয় কমিশনধারী অফিসার ইংরেজ; নেতৃত্ব তাহারাই করে। অধিকাংশ ভারতীয় যোদ্ধা সিপাহীশ্রেণীভুক্ত। তাহারা ইংরেজের হুকুম মানিতে বাধ্য। জালিয়ানওয়ালা-বাগে যে-সব সৈনিক ভারতীয়দিগের উপর গুলি চালাইয়া-ছিল, তাহারা গোরা নহে, গুর্খা সিপাহী। গুর্খারাও ভারতীয়। অশিক্ষিত সিপাহীরা ইংরেজের হাতের অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। শিক্ষিত ভারতীয় যুবকদিগকেও ইংরেজের হাতের অস্ত্র বানান দেশের পক্ষে কতটা বাঞ্ছনীয় ও কতটা অবাঞ্ছনীয়, ভাবিয়া দেখা দরকার। এক দিকে

ইহা যেমন আংশিক সত্য, যে, ভারতীয় শিক্ষিত যুবকেরা ফৌজী অফিসার না হইলে স্বরাজ পূর্ণলব্ধ হইতে পারে না; অন্যদিকে ইহাও তেমনি কি আংশিক সত্য নহে, যে, স্বরাজলব্ধ না হইলে আমাদের শিক্ষিত যুবক ফৌজী অফিসারেরা স্বরাজ-সেবক না হইয়া ইংরেজ সেবক হইবে —যেমন জেনারাল ডায়ারের অধীন সিপাহীরা হইয়াছিল?

অতঃপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলিতেছেন, যে, আমাদের শিক্ষিত যুবকদিগকে আরও অধিক সংখ্যায় সামরিক বিদ্যা শিখাইবার বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্ত যে কমিটি বসিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ যাহাই হউক, আমাদের নিজে হইতে স্বেচ্ছাবৃত জাতীয় বাহিনী গঠন করা উচিত; এখন আমাদের যে-সব বেসরকারী স্বেচ্ছা-সেবক (ভলাণ্টিয়ার) আছে, তাহাদিগকেই কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া এই বাহিনী গঠিত হইতে পারে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যে, একদল লোকের নাম রেজিষ্টারী করা হয় ত চলিতে পারে, কিন্তু গবর্ণ্মেণ্ট তাহাদিগকে কোন প্রকার বন্দুক বা ত্রিবিধ অস্ত্র কিনিতে ও তাহা লইয়া কুচ্‌কাওয়াজ করিতে দিবেন না; বাহিনী খুব বড় হইলে শুধু লাঠি লইয়া ড্রিল্ করিতেও দিবেন কি না সন্দেহ। বীরভূম জেলায় সুরুল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের গ্রামে ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা, স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার চেষ্টা, উন্নত প্রণালীর কৃষির জ্ঞান বিস্তার চেষ্টা ইত্যাদির জন্য ছোট ছোট ছেলেদিগকে লইয়া ব্রতীবালকের দল গঠন করা হইয়াছে। মশা মারিবার এই উদ্যোগ ব্যপদেশে কামান পাতা হইতেছে কি না, সম্ভবতঃ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বীরভূম জেলার পুলিস্ ও শাসন বিভাগ হইতে ব্রতীবালকদল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ হইয়া গিয়াছে। অতএব স্বেচ্ছাবৃত বেসরকারী বাহিনী গঠন করিতে গেলে সরকার-পক্ষ তৎসম্বন্ধে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা অনুমেয়।

নাইডু মহাশয়া আরও বলেন, ভারতীয় জাতিকে দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সমুদ্রযুদ্ধ এবং আকাশযুদ্ধ শিখাইবার কথাও আলোচনা করা উচিত। তাহা অবশ্যই উচিত। কিন্তু এরূপ শিক্ষা বেসরকারী উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে না; কেননা, সরকার বাহাদুর কংগ্রেস্‌কে যুদ্ধজাহাজ ও এরোপ্লেন্ কিনিতে দিবেন না।

ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে আকাশে, ডাঙায়, জলে ও জলের নীচে যুদ্ধ শিক্ষা বিদেশী গবর্ণ্মেণ্টের মর্জ্জি ভিন্ন হইতে পারে না। ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইলেও, সত্য কথা। অবশ্য গবর্ণ্মেণ্ট যাহাতে আমাদের স্বরাজ-লাভ ও যুদ্ধশিক্ষা-লাভ উভয়েই রাজী হন, তাহার জন্য উঁহার উপর নানা রকমের চাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন কোন পরদেশী জাতি সুযোগ পাইলে ভারত আক্রমণ করিতে পারে, ইহা না ভুলিয়া, তাহার জন্য প্রস্তুত থাকাও আবশ্যক। কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না, যে, স্বদেশ-রক্ষার জন্য আমাদের সভ্য জগতের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করাও দরকার। বর্ত্তমানে ইউরোপের যে-সব ক্ষুদ্র জাতিকে প্রবল জাতিরা সহজেই পরাস্ত করিতে পারে, যেমন পোর্ত্তুগীজ, সুইড্, ডেন্, নরুইজিয়ান্, তাহাদিগকে প্রবল জাতিরা যে সচরাচর আক্রমণ করিবার চিন্তা করে না, তাহার অন্যতম কারণ অবশ্য এই, যে, তাহারাও প্রবল জাতিদের মত খৃষ্টিয়ান ও শ্বেতকায়। কিন্তু ইহাও একটা কারণ, যে, তাহাদের প্রতি প্রবল জাতিদের কতকটা শ্রদ্ধা আছে, কিছু প্রীতি আছে। আমরা কেবল আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের কৃতিত্বের জোরে জগতের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইতে পারি না, আমাদিগকেও বর্ত্তমান সময়ে এমন কিছু করিতে হইবে যাহার দ্বারা আমরা অন্য সকল জাতির সম্মান পাইতে পারি এবং যাহার জন্য তাহারা মনে করিতে বাধ্য হয়, যে, বর্ত্তমান কালের ভারতবর্ষের হৃদয়মনের দান না পাইলে জগৎ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র থাকিয়া যাইবে।

দক্ষিণআফ্রিকায় ও অন্যান্য বিদেশে যে-সব ভারতীয় লোক বাস করে এবং যাহারা সেই সেই দেশের শ্বেত-কায়দের দ্বারা নানা প্রকারে লাঞ্ছিত ও নানা অসুবিধা-গ্রস্ত হয়, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন কংগ্রেসের ষষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া সভাপতির অভিভাষণে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা স্ব-শাসক জাতি হইলে এইসব ভারতীয়ের জন্য যাহা করিতে পারিতাম, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা পারি না

বটে, কিন্তু যাহা পারি তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা যদি স্বশাসক হইতাম, তাহা হইলে বিদেশে ভারতীয়দের এই দুর্দ্দশা হইত না। আমাদের স্বশাসন অধিকার যে লুপ্ত হইয়াছে, পুরুষানুক্রমে স্বদেশবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার তাহার অন্যতম কারণ।

কতকগুলি ভারতীয় যুবক মাতৃভূমিকে দাসত্বমুক্ত করিবার নিমিত্ত অধীর হইয়া এমন অনেক কথা বলিয়াছিলেন, লিখিয়াছিলেন, এবং এমন অনেক কাজ করিয়াছিলেন, যাহা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য অন্য অনেক দেশের লোকেও করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। কিন্তু এই ভারতীয় যুবকেরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দেশের মালিকরা তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতেছেন না, যদিও তাঁহাদের অনেকে এখন প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অনেকের এখন আর বিদ্রোহী ভাবও নাই। এই নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদিগকে স্মরণ করিয়া সরোজিনী দেবী কিছু মর্ম্মস্পর্শী কথা বলেন।

কংগ্রেসের নবম কর্ত্তব্য রাজনৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, প্রভৃতি নানা বিষয়ে সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের ব্যবস্থা করা। যাঁহারা কংগ্রেসের রাজনৈতিক চেষ্টায় যোগ দিতে পারেন না, তাঁহারাও দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার নিমিত্ত যত বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন, নিজ নিজ পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে সেই জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করিতে পারেন।

অতঃপর সরোজিনী দেবী হিন্দুমুসলমানের বিরোধ দূরীকরণ ও তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের কথা বলেন।

তিনি বলেন, দেশী রাজ্যসমূহের রাজা ও প্রজা এবং ব্রিটিশ ভারতের লোকদের মধ্যে বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সদ্ভাব যাহাতে জন্মে ও বাড়ে, তাহার চেষ্টা করাও কংগ্রেসের কর্ত্তব্য।

পরিশেষে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেন, সীমান্ত প্রদেশগুলি এক প্রকার চিরস্থায়ী সামরিক আইন অনুসারে শাসিত হইয়া থাকে। তাহার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ-ভারতের অন্য প্রদেশগুলির মত সাধারণ শাসনপ্রণালী লাভের চেষ্টায় সীমান্তপ্রদেশবাসীদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।

—

স্বরাজ্য দলের সাফল্যের পরিমাণ

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মতে স্বরাজ্য দল আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই দল ব্যবস্থাপক সভায় ভোটে অনেক বার গবর্মেণ্টকে পরাস্ত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ফলে দেশ এখনও কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করে নাই। বরং বাংলা দেশে ছোটখাটবিষয়ে মন্ত্রীদের দ্বারা ভাল কাজ যাহা হইতে পারিত, তাহা হইতেছে না। বেসরকারী ভাবে স্বরাজ্য দল নিজেও এখনও এমন কোন কাজ করিতে পারেন নাই, যাহা তাঁহাদের হাতে সঞ্চিত সর্ব্বসাধারণের টাকার পরিমাণ অনুযায়ী। যাহাদের হাঁক ডাক খুবই কম বা মোটেই নাই, এরূপ অনেক সমিতি ও ব্যক্তির দ্বারা স্বরাজ্য দলের চেয়ে অনেক বেশী দেশহিতকর কাজ হইয়াছে ও হইতেছে।

স্বরাজ্য দলের আর একটা কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনি একটা না একটা হুজুক মাতাইয়া দেশবাসীর চিত্তকে অধিকৃত ও বিনোদিত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে মঙ্গল কী হইয়াছে? তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে কী সুফল ফলিয়াছে? আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটে কী সুফল হইয়াছিল? এই উভয় হুজুকে এবং অন্য অনেক হুজুকেও কুফল অনেক ফলিয়াছে। পল্লীসংগঠনাদি কাজের জন্য সংগৃহীত টাকার অপব্যয় হইয়াছে। অপব্যয় অপেক্ষা শক্ত কথা ব্যবহার করিলেও অন্যায় হই না। তা ছাড়া, স্বরাজীরা ব্যবস্থাপকসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন কেবল ক্রমাগত গবর্মেণ্টের কাজে বাধা দিবার জন্য, কিন্তু তাহা করিতে পারেন নাই; অধিকন্তু কেহ কেহ সরকারী চাকরী লইয়াছেন, এবং অনেকেই গবর্মেণ্টের সহযোগিতা করিয়াছেন। সরকারী চাকরী লওয়া ও সরকারের সহিত সহযোগিতা করা ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার এখানে হইতেছে না; ইহাই বলা হইতেছে, যে, স্বরাজীরা অঙ্গীকারভঙ্গ করিয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইয়াছেন।

সুতরাং কোন দিকেই স্বরাজ্য দলের "সাফল্য" আশ্চর্য্য রকম হইয়াছে বলা যায় না।

—

উদারনৈতিক দলের অধিবেশন

কলিকাতায় উদারনৈতিক দলের গত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি স্যার মোরোপন্ত জোশীর অভিভাষণ রাজনীতিকুশল লোকের উপযুক্ত হইয়াছিল। দেশে সার্ব্বজনিক জীবনে ও আচরণে যে অবনতি হইয়াছে, তাহার প্রতি প্রথমেই আমাদের নজর দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"সকল দলের সাধারণ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত মিলিত চেষ্টা হইতেছে না; বরং দলগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এবং পরস্পরের প্রতি দোষারোপ লক্ষিত হইতেছে। আপনাদের কর্ম্মনীতি ও কার্য্যপ্রণালীর শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করিবার জন্য প্রতিযোগী দলের নীতি ও পদ্ধতির উপরই যে আক্রমণ করা হয়, তাহা নহে; ব্যক্তিগত আক্রমণও হয়, এবং পরস্পরের মতামত বুঝিবার কোন চেষ্টা করা হয় না। দলের নেতারা এবং খবরের কাগজের সম্পাদকেরা এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধান হন না। ভিন্ন দলের নেতাদের বয়স, অভিজ্ঞতা,স্বার্থত্যাগ বা নৈতিক শ্রেষ্ঠতা সম্মানের চক্ষে দেখা হয় না। দলের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উপরে স্থান দেওয়া হয়। ইহাতে এদেশের রাজনৈতিক জীবন লোকঠকান ও ভণ্ডামির ব্যাপর হইয়া পড়িয়াছে।"

দুঃখের বিষয়, জোশী মহাশয় যে-সব দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কয়েকটি উদারনৈতিক সংঘের অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির বক্তৃতাতেও লক্ষিত হয়। তিনি মহাত্মা গান্ধী, তাঁহার অনুচরগণ, এবং তাঁহাদের কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মের বিষয় বলিতে গিয়া এরূপ বিদ্রূপ ও উপহাসের ভাষা কোথাও কোথাও প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা না করিলে ভাল হইত। অবশ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বক্তৃতার অন্য উৎকর্ষ কিছু আছে। আজকাল অনেকেই মনে করেন, যে, উদারনৈতিক অর্থাৎ সাবেক মডারেট নামধারী দল দেশের কোন কাজই করেন নাই। ইহা যে ভ্রান্ত,তাহা কৃষ্ণকুমারবাবু তাঁহাদের কাছে তালিকা দ্বারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই তালিকা সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে।

তাঁহার তালিকায় এমন সময়ের নানা কাজের উল্লেখ আছে, যখন ভারতীয় রাজনৈতিক কর্ম্মীরা নানা দলে বিভক্ত হন নাই। ইংলণ্ডের ইংরেজেরা যদি হাম্প্‌ডেন্, পিম্, ক্রম্‌ওয়েল, মিল্টন, প্রভৃতির কার্য্যাবলীর গৌরব তাহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি বলে, তাহা হইলে ঠিক হইবে না। আমেরিকায় ইংরেজবংশজাত যত লোক আছে, এই গৌরবে তাহাদেরও অংশ আছে—যদিও এখন তাহারা ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদের গৌরবে কেবল আধুনিক গোঁড়া হিন্দুরাই গৌরবান্বিত হন না, হিন্দুবংশজাত লোকমাত্রেই তাহাতে গৌরবান্বিত। সেই জন্য, যখন কৃষ্ণকুমারবাবু রামমোহন রায়কে উদারনৈতিক দলে টানিয়াছেন, তখন রামমোহনের উপর উদারনৈতিকদিগের দাবী মানিয়া লইয়াও ইহা বলা দরকার, যে, তাঁহার উপর অন্য সব রাজনৈতিক দলেরও দাবী আছে। তিনি যে যুগে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তখন প্রতিবাদ অভিযোগ আবেদন প্রভৃতি ছাড়াইয়া অন্য কিছু করিবার সময় হয় নাই। কিন্তু রামমোহন, যে, বঙ্গের এখনকার অধিকাংশ উদারনৈতিকদের মত প্রতিবাদ-আবেদন-সর্ব্বস্ব ছিলেন না,তাহা ইহা হইতে প্রমাণ হয়,যে, তিনি বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের রিফর্ম্ বিল পাস্ না হইলে তিনি ঐদেশের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিবেন। এটা ত এক প্রকার চূড়ান্ত অসহযোগের অভিপ্রায়। তা ছাড়া, তিনি বরাবর প্রকাশ্যভাবে, কোন জাতি বিদ্রোহ বিপ্লবাদি দ্বারা স্বাধীন হইলে তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহাতে প্রকাশ্যভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেন। রামমোহন এখন বাঁচিয়া থাকিলে বাংলা দেশের উদারনৈতিক দলে নিশ্চয়ই ভুক্ত থাকিতেন, বলা যায় কি?

লোকমান্য টিলককেও এখন উদারনৈতিক দলে টানা হইতেছে। কিন্তু আগেকার উদারনৈতিক অর্থাৎ মডারেটরা এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট্ বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেন।



স্যার মোরোপন্ত জোশী

তিনি বাঁচিয়া থাকিলে এখন কি হইতেন ও করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না

উদারনৈতিকদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরও একটা কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। উদারনৈতিকরা ইহা মানেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ ইহা জানেন এবং মর্লীর জীবনস্মৃতিতেও ইহা আছে, যে, এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট্‌ অর্থাৎ চরমপন্থী দল থাকার জন্যই মডারেট্‌দিগকে নিজের দলে টানিবার নিমিত্ত (to "rally the Moderates") ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট্‌ ভারতবর্ষকে অল্পস্বল্প রাজনৈতিক অধিকার দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, বোমা-নিক্ষেপক হইতে আরম্ভ করিয়া নরমতমপন্থী পর্য্যন্ত সকলেই রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে কেবল নিজেদের কৃতার্থতার কথাই বলিলেও, এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক আদালতে কেহই ষোল আনা ডিক্রী পাইবেন না, কেহ সম্পূর্ণ বঞ্চিতও হইবেন না। অতএব, উদারনৈতিকদের নীতির কখনও ফলোৎপাদন-শক্তির অভাব লক্ষিত হয় নাই("has never been found wanting"), কৃষ্ণকুমার-বাবুর একথা ঠিক্ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বঙ্গবিভাগ রহিত হইয়াছিল উদারনৈতিকদের কনষ্টিটিউশন্যাল আন্দোলনের ফলে, ইহা কৃষ্ণকুমার-বাবুর অন্যতম দাবী। প্রথমতঃ, বঙ্গবিভাগ ঠিক্ রহিত হয় নাই; কারণ, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর অধ্যুষিত এমন অনেক স্থানকে বঙ্গের বাহিরে ফেলা হইয়াছে, যাহা আগে বঙ্গের সহিত যুক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বঙ্গবিভাগের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল ব্যবস্থা এখনও বজায় রাখা হইয়াছে। দ্বিবিধ উদ্দেশ্য, বঙ্গে হিন্দুমুসলমানের অমিল বাড়াইয়া ও জাগাইয়া রাখা, এবং সর্‌কারী বাংলা প্রদেশের সীমা এরূপ করিয়া নির্দ্ধারণ করা যাহাতে উহার হিন্দু অধিবাসীদের সংখ্যা মুসলমান অধিবাসীদের চেয়ে কম থাকে। এই উভয় উদ্দেশ্য ভাল কি মন্দ তাহার বিচার এখানে করিতেছি না। তৃতীয়তঃ, ঠিক আইনসঙ্গত আন্দোলন বলিতে এখন উদারনৈতিকরা যাহা বুঝেন, বঙ্গবিভাগ কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বিলাতী পণ্যবর্জ্জন ও স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের নিমিত্ত যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহারও কার্য্যকারিতা কিছু ছিল। অ্যাণ্টিসার্কুলার সোসাইটির কাজ সর্‌কারী নিয়ম মানিয়া চালান হয় নাই। তদ্ভিন্ন যে-সব বে-আইনী কাজ হইয়াছিল, তাহার নিমিত্ত বঙ্গবিভাগ পরিবর্ত্তন করিতে গবর্মেণ্ট্‌ কিছু লোকদেখান দেরী করিতে বাধ্য হইলেও সেগুলাও যে পরিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

গোখলে-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সেবক সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আইনসঙ্গত আন্দোলনের পক্ষপাতী হইলেও বলিয়াছেন, যে, ইংরেজ নিজের দেশে যে-সব পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহারও কতটা ঐ সকলের অনুকূল যুক্তিতর্কের প্রবলতাবশতঃ ও ন্যায়ের অনুরোধে এবং কতটা যে উপদ্রব ও অসুবিধা এড়াইবার জন্য, তাহা বলা কঠিন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, আফ্রিকার কেনিয়া দেশে শ্বেতকায়দের অন্যায় জেদ বজায় থাকিবার এবং ভারতীয়দের ন্যায্য আবেদন অগ্রাহ্য

হইবার কারণ এই, যে, শ্বেত ঔপনিবেশিকেরা যেরূপ সমূলক ভয় দেখাইতে পারিয়াছিল, ভারতীয়েরা তাহা পারে নাই। আমরাও বে-আইনী উপদ্রবের সমর্থন করি না। ছুঁচ ফুটাইয়া মানুষকে কেবল ত্যক্তই করা হয়। অবশ্য, বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ কেহ করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি আমাদের মত সম্পাদকদের অনুমোদনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত না।

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই, যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কার্য্যসিদ্ধির জন্য কোন্ পথটা ভাল, তাহা নির্দ্দেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা কেহই দেখাইতে পারিবেন না, যে, কেবল কোন একটি প্রণালীর দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে।

কৃষ্ণকুমার-বাবু উপহাস করিয়া বলিয়াছেন, যে, অসহযোগ লোকদিগকে শিখাইয়াছিল, যে, কোন স্বার্থত্যাগ না করিয়া, প্রাণ না দিয়া এবং গায়ে আঁচড়টি মাত্রও না লাগাইয়া, কেবল চরখা ঘুরাইয়া তিন মাসে স্বরাজ পাওয়া যাইবে। আমাদের মনে হয়, ইহাতে মহাত্মা গান্ধী ও অন্য কোন কোন নেতার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। স্বরাজ লাভের তারিখ নির্দ্দেশ করায় গান্ধীজির ভ্রম হইয়াছিল, ইহা আমরাও আগে বলিয়াছি। কিন্তু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, দরকার হইলে প্রাণ দিতে হইবে কিন্তু প্রাণ লইতে হইবে না, ইহা তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। তিনি এবং আরও কেহ কেহ খুব স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন। বন্দী-দশা-প্রযুক্ত কাহারও কাহারও চিরতরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে, কেহ বা মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছেন।

তাঁহার দলের লোকেরা সরকারের ধামাধরা, চাকরীর উমেদার, সাধারণ লোকদের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ, ইত্যাদি অপবাদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণকুমার-বাবু যে-সব লোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহা সত্য; যদিও অন্য কতকগুলি নামজাদা ও অনামজাদা উদারনৈতিক যে ঐরূপ অপবাদের যোগ্য, ইহাও ঠিক। কিন্তু রাজনীতির কথা বলিতে গিয়া তিনি বিজ্ঞানে, বিচারকার্য্যে, আইনব্যবসায়ে, চিকিৎসায়, অস্ত্রোপচারে, বাণিজ্যে, যে-সব বাঙালীর কৃতিত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত এক সময়ে আমাদের কিছু রাজনৈতিক কথাবার্ত্তা আদি হইত। তাহাতে তাঁহাকে উদারনৈতিকের উল্টা বলিয়াই আমাদের ধারণা আছে। তা ছাড়া, রসায়নী বিদ্যার অনুশীলন কেহ উদারনৈতিক বা কোন রাজনৈতিক মত অনুসারে ত করে না, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই করিয়া থাকে; এবং তাঁহার অন্য কল যে উদারনৈতিক না হইয়া কখন কখন দারুণ চরমপন্থী হয়, তাহাও ত সর্ব্বজনবিদিত। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এখন রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ, কোন সম্পর্কই রাখেন না। আগেও রাখিতেন না, কিন্তু তাঁহার মতের সহিত ভগিনী নিবেদিতার 'অনুদারনৈতিক' কোন কোন মতের সাদৃশ্য ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা। শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাসের বা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের আইন ব্যবসায়ে কৃতিত্ব যদি উদারনৈতিকগণ তাঁহাদের গৌরবের খাতায় জমার ঘরে লেখেন, তাহা হইলে অন্য দলের লোকেরা মহাত্মা গান্ধীর, দেশবন্ধু দাশের ও পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর আইন ব্যবসায়ে কৃতিত্বও তাঁহাদের খাতায় জমা করিতে পারেন। ৺সুরেশ সর্ব্বাধিকারী লিবার‍্যাল মত অনুসারে অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন বলিয়া শুনি নাই; এলোপ্যাথী মতেই করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার কৃতিত্ব উদারনৈতিকদের খাতায় জমা হইলে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কৃতিত্বটা কোন্ দলের খাতায় জমা হইবে? ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসা এলোপ্যাথী মতেই হয়, লিবার‍্যাল মতে হয় না; এবং তাঁহার রাজনৈতিক মত যতটুকু জানি, তাহাতে তাঁহাকে অফিশ্যাল লিবার‍্যাল কিম্বা কৃষ্ণকুমার-বাবুর মত দলের প্রতি নিষ্ঠাবান্ উদারনৈতিক বলিয়া মনে হয় না।

প্রভুত্বশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বা জাতির নিকট হইতে জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব আদায় করিবার পক্ষে উদারনৈতিক পন্থাই যথেষ্ট; তাহাদের নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইবার বা তাহাদিগকে উহা দিতে বাধ্য করিবার জন্য অন্য কিছু করা অনাবশ্যক; কেহ ওরূপ কিছু করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না; ইত্যাদি কথা বুঝাইবার জন্য মিত্র-মহাশয় রুশিয়া, আয়র্ল্যাণ্ড, ইটালী, অষ্ট্রীয়া ও পোর্ত্তুগ্যালের ইতিহাসের উল্লেখ করেন। আমাদের মনে হয়, তিনি এই সব দেশের

ইতিহাস কতকটা ভুলিয়া গিয়াছেন, কিংবা ভুল বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন।

কোন প্রকার ডিরেক্ট্ য়্যাক্‌শ্যন অর্থাৎ স্বাবলম্বনমূলক কোন কাজ করিয়া গবর্ন্মেণ্টের উপর চাপ দিবার মত অবস্থা আজকাল ভারতবর্ষের নাই, ইহা সব দলের লোকেই কার্য্যতঃ এবং অনেকে মুখেও স্বীকার করেন। কিন্তু কন্‌ষ্টিটিউশ্যন্যাল য়্যাজিটেশ্যন্ বা রাষ্ট্রবিধি অনুযায়ী আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোন দেশের লোক জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে নাই, বা স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কোন উন্নতি করিতে পারে নাই, ইহা ইতিহাস-বিরোধী কথা।

স্যার মোরোপন্ত জোশী তাঁহার অভিভাষণে কৃষ্ণকুমার-বাবু অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"আর একটি প্রশ্ন যাহার উত্তর সকলে আশা করেন, তাহা এই, যে, গবর্ন্মেণ্টের উপর চাপ দিবার এবং আমাদের জাতির স্বাধীন হইবার ইচ্ছাকে আত্মশক্তির দ্বারাই ফলবতী করিবার নিমিত্ত উদারনৈতিকেরা কি প্রণালী অবলম্বন করিতে প্রস্তুত। উদারনৈতিকদের আমাদের জাতির উপর প্রচুর বিশ্বাস সতত বিদ্যমান। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, যদি ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচকেরা এবং জাতির অপর সমুদয় লোকেরা রাজনৈতিক বিষয়ে আরও অনেক বেশী মনোযোগ দেন ও আগ্রহ দেখান, তাহা হইলে, ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বশাসন অধিকার দিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টের উপর যথেষ্ট চাপ দিতে পারা যায়। সর্ব্বসাধারণের মনে স্বাধীন হইবার দৃঢ় ইচ্ছা জন্মাইতে হইবে, এবং ভারতীয় জানপদ ও পৌরবর্গের জন্মগত অধিকারের কথা সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ বলিয়া তাঁহাদের স্বাধীনতাকামী মনোভাবের প্রগাঢ়তা সাধন করিতে হইবে। উদারনৈতিকদের এখনও কন্‌ষ্টিটিউশ্যন্যাল প্রণালীর উপর আস্থা আছে; তাঁহারা মনে করেন, উহার কার্য্যকারিতা এখনও সম্যক্‌রূপে পরীক্ষিত হয় নাই। **রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তির চরম উপায় স্বরূপ কিছুই অবলম্বনের অযোগ্য বলা হইতেছে না; নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন ও গবর্ন্মেণ্টের কাজে বাধাপ্রদান ত নহেই, বিপ্লব পর্য্যন্তও বাদ দেওয়া হইতেছে না।** কিন্তু উদারনৈতিকেরা দৃঢ় বিশ্বাস করেন, জাতির সমুচিত প্রস্তুত হওয়া ব্যতিরেকে গবর্ন্মেণ্টের উপর খুব সামান্য চাপই দেওয়া যায়। কেবল দন্ত কিড়িমিড়ি এবং মাটির উপর সদম্ভ পদাঘাত আত্মসম্ভ্রম সঙ্গত নহে, কার্য্যোদ্ধারের উপযোগীও নহে। প্রতিনিধি নির্ব্বাচকদিগকে রাজনৈতিক শিক্ষা দ্বারা প্রস্তুত করিবার দিকে আমরা সমুদয় চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিলেই এমন এক সময় আসিবে, যখন শাসনকর্ত্তারা নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন ও বিপ্লব ঘটিতে দেওয়া অপেক্ষা দেশের লোকদের দাবীতে সায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিবেন। লোকদিগকে যথেষ্ট প্রস্তুত না করিলে গবর্ন্মেণ্ট্‌কে আমাদের অভীষ্টসাধন করিতে বাধ্য আমরা করিতে পারিব না; এবং লোকেরা একবার প্রস্তুত হইলে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন দরকার হইবে না।"

মোটা অক্ষরে ছাপা কথাগুলির উপর আমরা পাঠকদিগকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি। তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে মোরোপন্ত জোশী সদ্য সদ্য মধ্য-প্রদেশের শাসনপরিষদের সভ্যের পদ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মতে, প্রয়োজন হইলে, বিপ্লব পর্য্যন্ত বৈধ। বিপ্লব দ্বারা অনেক জাতি আপনাদিগকে বন্ধনমুক্ত ও উন্নত করিয়াছে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ না থাকিলে জোশী মহাশয় একথা বলিতেন না। তিনি বলিতেছেন, লোকদিগকে রাজনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানবান্, সচেতন, ও আগ্রহান্বিত করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য ক্ষতি স্বীকার করিতে, ত্যাগ করিতে, মৃত্যু পর্য্যন্ত দুঃখ সহিতে প্রস্তুত ও সমর্থ হইবে। ভাষা ভিন্ন হইলেও জোশী মহাশয়ের কথার এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কথার তাৎপর্য্য একই। পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্‌রু কংগ্রেসের প্রধান যে প্রস্তাবটি পেশ করেন, তাহারও অভিপ্রায় যে ভিন্ন নহে, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

কৃষ্ণকুমার-বাবু জমীদার ও রায়ৎ, ধনিক ও শ্রমিক, "উচ্চ" জাতি ও অবনমিত জাতিদের স্বার্থের বিরোধ এবং অসদ্ভাব দূর করিয়া সামঞ্জস্য ও সদ্ভাব উৎপাদনের যে-সব

পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সমর্থনযোগ্য। ইহাও ঠিক যে, "সত্য ও ধর্ম্মের পথ দিয়া ভিন্ন আমরা মহৎ ও শ্রেয়ঃ কোন ফল লাভ করিতে পারি না।" তিনি আরও বলিয়াছেন :—

"আপনি সহযোগী বা অসহযোগী, সামাজিক সাম্যবাদী বা স্বরাজী, উদারনৈতিক বা স্বতন্ত্র,—যাহাই হউন, আমরা সকলেই এক মাতৃভূমির সন্তান, এবং একই মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী।…আসুন আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া সকলের চেষ্টা সম্মিলিত করিয়া আমাদের সকলের একই যে লক্ষ্যস্থল তাহার দিকে অগ্রসর হই।"

স্যার মোরোপন্ত জোশীর অভিভাষণ সুচিন্তিত, এবং গবর্ন্মেণ্টের যে-সব সমালোচনা তিনি করিয়াছিলেন, তাহার কোন জবাব দেওয়া সরকার পক্ষের লোকদের পক্ষে সহজ হইবে না। তিনি শাসনপরিষদের সভ্য ছিলেন এবং পুলিশ ও শাসনবিভাগের ভার তাঁহার হাতে ছিল। সরকার বলিতে পারিবেন না, যে, তাঁহার সমালোচনা অব্যবসায়ী অনভিজ্ঞ লোকের অজ্ঞতাপ্রসূত অনধিকার-চর্চ্চা। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, ডায়ার্কির অর্থাৎ দ্বৈরাজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, ইহার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

ইংরেজদের ভারতবর্ষে শাসক ও প্রভু হইয়া থাকিবার একটা ওজুহাত এই, যে, তাঁহারা না থাকিলে সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। উত্তরে তিনি বলেন :—

"আমি আশা করি, কোনও ইংরেজ এরূপ ভরসা রাখেন না, যে, তাঁহার জাতি অনন্তকাল এদেশে রাজত্ব করিবে। সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায় সকলের প্রতি অন্যায় আচরণ হইবার ভয়টা ব্রিটিশজাতির মুখে বড়ই অশোভন। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ইংলণ্ডে যে রোমান কাথলিকদের অসহ্য দুরবস্থা ছিল, সে বিষয়ে ইংরেজরা কি বলেন? [সেই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কি ইংলণ্ডে কোন বিদেশী জাতির প্রভুত্ব প্রয়োজন হইয়াছিল?] যে ইংলণ্ড, প্যালেষ্টাইনে প্রতিকূল সংখ্যাভূয়িষ্ঠ বেদুইন্ আরবদের মাঝখানে সংখ্যায় ন্যূন কতকগুলি ইহুদীর বসবাস করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ইংলণ্ড এদেশে সংখ্যায় ন্যূন সম্প্রদায় সকলের যুক্তিসঙ্গত অধিকার সুরক্ষিত করিবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করিতে পারেন।"

জোশী মহাশয় ভারতীয় সকল দলের মধ্যে ঐক্যস্থাপন কল্পে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার বক্তৃতার কোথাও উদারনৈতিকদিগের শ্রেষ্ঠত্বসূচক কোন কথা নাই, অন্যান্য দলের প্রতি কোন বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ নাই। তিনি বলিয়াছেন—

"ইংরেজরা যাহাই মনে করুন, অন্য যে সব ভারতীয় দলের আমাদের সকলেরই সাধারণ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার প্রণালী উদারনৈতিকদের অবলম্বিত প্রণালী হইতে ভিন্ন, উদারনৈতিক-দিগকে তাহাদিগের শত্রু মনে করিবার কোনই কারণ নাই।"

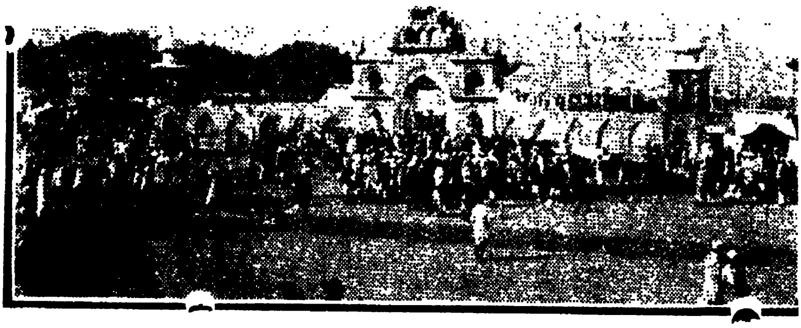
আশা করি জোশী-মহাশয়ের স্বদেশভক্তি ও সদাশয়তা প্রসূত এই কথাগুলির মধ্যে যে মিত্রভাব ও ভ্রাতৃভাব রহিয়াছে, অন্য দলের লোকেরা তাহার আন্তরিক প্রতিদান করিতে পারিবেন।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন :—

"তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী যতই দুর্ভাগ্যজনক ও পরিতাপের বিষয় হউক, উদারনৈতিকেরা অনুভব করেন, যে, সকল দলের লোকেই একই উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছেন। যে-সব অবস্থা ও ঘটনাবশতঃ মহাত্মা গান্ধী এবং দাশ ও নেহরু মহাশয়দের মত লোকের এরূপ মনের ভাব জন্মাইয়াছে, যে, তাঁহারা সংযোগিতায় পদাঘাত করিয়া বাধাপ্রদাননীতি পরামর্শসিদ্ধ মনে করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই শোচনীয় ও দুর্ভাগ্যজাত এবং যে গবর্ন্মেণ্ট সেই সকলের জন্য দায়ী তাহাকে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের দাবী সম্বন্ধে নিজে ভাবগতিক বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের জাতির দিক্ হইতে ভাবিয়া দেখিলে, এই সঙ্কটসময়ে সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্য অতীব বাঞ্ছনীয়, উদারনৈতিকেরা, স্বতন্ত্রেরা, স্বরাজীরা, ব্যতীহার-সংযোগবাদীরা, সকলেই এক কর্ম্মপদ্ধতির অনুমোদন করা কঠিন মনে করিবেন না, ইহা খুবই সম্ভব।"

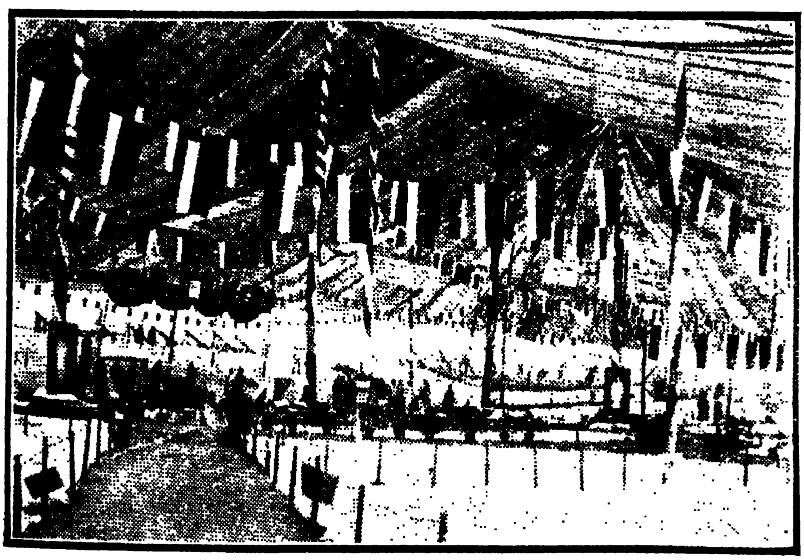
—

গত কংগ্রেসের প্রধান প্রতিজ্ঞা



কংগ্রেস-মণ্ডপের তোরণ-দ্বার

প্রয়োজন হইলে স্বাধীনতা লাভ করিবার নিমিত্ত আমরা যে সকল প্রকার আত্মসম্মান-সঙ্গত, সত্যানুসারী, বৈধ উপায় অবলম্বনের পক্ষপাতী, তাহা অনেক বৎসর ধরিয়া বার বার বলিয়াছি। অতএব কংগ্রেস যে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনের উপর আমাদের জাতীয় দাবী গ্রাহ্য করিতে গবর্ন্মেণ্টকে বাধ্য করিবার ও জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবার একমাত্র নিশ্চিত ফলদায়ক শেষ উপায় বলিয়া আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আস্থা ও বিশ্বাসকে আমরা অনুচিত মনে করি না। কিন্তু এবারকার কংগ্রেসের প্রধান প্রতিজ্ঞায় নিরুপদ্রব আইন অমান্য করিবার কথা যে-ভাবে আনা হইয়াছে, তাহা আমরা সুবিবেচনা ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক মনে করি না। সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কাজ হাসিল করা রাজনৈতিক কার্য্য-প্রণালীর উদ্দেশ্য। কংগ্রেস্ চান, যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে জাতীয় দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং যাহা ঐ সভায় অনুমোদিত হইয়াছিল, গবর্ন্মেণ্ট্ তাহাতে সম্পূর্ণ বা মোটামুটি সম্পূর্ণ সায় দেন। এই অভিপ্রায়ে কংগ্রেস্ সংক্ষেপতঃ বলিতেছেন, যে, গবর্ন্মেণ্ট যদি ফেব্রুয়ারীর শেষের মধ্যে আমাদের দাবীতে কর্ণপাত না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস দেশের লোককে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রস্তুত করিতে বা অধিকতর বলশালী করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহা একপ্রকার ভয়-প্রদর্শন, কিম্বা রাজনৈতিক পেঁচাল ভাষায় ইহাকে সরকারের উপর চাপ দিবার চেষ্টা বলা যাইতে পারে।



কংগ্রেস-মণ্ডপের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ধমকে কাজ কখন্ হয়, দেখা যাক্। একটা দেশের সহিত যদি কোন বিষয় লইয়া অন্য একটা দেশের ঝগড়া-বিবাদ হয়, তাহা হইলে ফরিয়াদী দেশ যদি তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে বলে, "তোমরা আমাদের কথা না শুনিলে যুদ্ধ করিব।" তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি না হইলে ফরিয়াদী দেশ সত্য সত্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। অভিযুক্ত প্রতিবাদী দেশ জানে, যে, বাদী দেশের যুদ্ধ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা ও সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে বাদীর দাবী ভাল করিয়া বিবেচনা করে, নতুবা করে না। কিন্তু যদি বাদী দেশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না থাকে, প্রতিবাদী দেশকে কেবল বলে, "তোমরা আমাদের কথা না শুনিলে আমরা সৈন্যসংগ্রহ করিতে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে, তাহাদের বেতনের টাকার জোগাড় করিতে, কামান গোলা বারুদ তৈয়ার করিবার নিমিত্ত খনি হইতে লৌহ সোরা প্রভৃতি উত্তোলন করিতে ও অস্ত্রের কারখানা নির্ম্মাণ করিতে, এবং যুদ্ধ জাহাজ বানাইবার নিমিত্ত অরণ্যের গাছ কাটিতে আরম্ভ করিব," তাহা হইলে প্রতিবাদী দেশ বাদীর কথা বিবেচনা করিতে খুব সত্বর ও অভিনিবিষ্ট না হইতেও পারে।

যদি রামের কোন প্রবল প্রতিবেশী শ্যাম, রামের কোন জমীজমা বা আর কিছু হইতে তাহাকে বঞ্চিত করে, তাহা হইলে রাম তাহার সহিত তর্কযুক্তি করিতে পারে, ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা বলিতে পারে, তাহাতে ফল না হইলে বলপূর্ব্বক নিজের অধিকার পুনঃস্থাপন করিবার চেষ্টা করিবার ভয় দেখাইতে পারে। যদি রামের সত্য সত্যই শক্তি থাকে, লাঠি-সোঁটা থাকে, তবেই সে ভয় দেখাইতে ও তাহার দ্বারা কাজ হাসিল করিবার আশা করিতে পারে। কিন্তু যদি রাম শ্যামকে বলে, "তুমি যদি আমার জিনিষ আমাকে না দাও, তাহা হইলে আমি ছোলার চাষ করিব, এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত ছোলা ভিজাইয়া খাইয়া ডন্ বৈঠক আরম্ভ করিব; যখন গায়ে জোর হইবে, তখন তোমাকে দেখাইব," তাহা হইলে শ্যামের তৎক্ষণাৎ ভয়ে তটস্থ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী হইবে না।

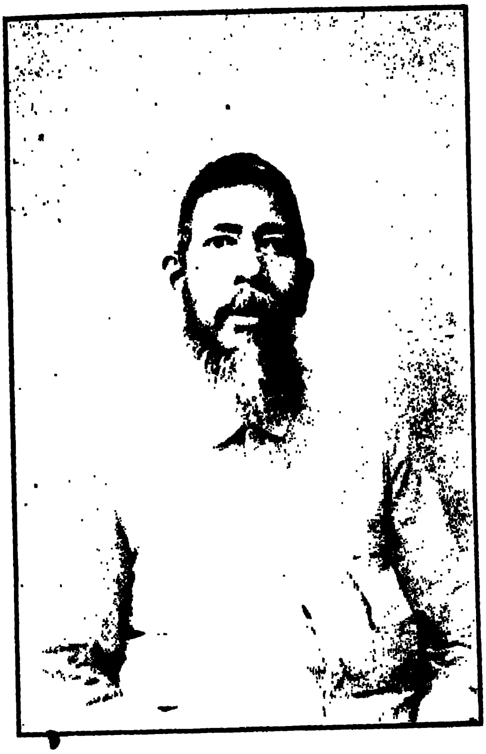
কংগ্রেসের প্রধান প্রতিজ্ঞায় গবর্ন্মেণ্টকে একটা মিয়াদ দিয়া যে শাসান হইয়াছে, তাহা কতকটা কল্পিত রামের শেষোক্ত কল্পিত ব্যবহারের সদৃশ।

নিরুপদ্রবভাবে আইন অমান্য করা প্রয়োজনস্থলে খুব বৈধ। তাহাতে বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ খুব বৈধ। তাহার জন্য দেশকে প্রস্তুত করাও খুব বৈধ। কিন্তু যখন কংগ্রেসের শেষ প্রতিজ্ঞাতেই দেখা যাইতেছে, যে, দেশ উহার জন্য প্রস্তুত নহে, প্রস্তুত করিতে হইবে, তখন, ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গবর্ন্মেণ্ট ভাল ছেলে না হইলে দেশকে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হইবে বলায়, গবর্ন্মেণ্টের উপর যথেষ্ট চাপ পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। তার চেয়ে, যে-সব উপায় অবলম্বন করিলে দেশ প্রস্তুত হইবে, বিনা বাক্য অপব্যয়ে তাহা বরাবর করিতে থাকিলে এবং যথা সময়ে গবর্ন্মেণ্ট্‌কে চূড়ান্ত সর্ত্ত দিয়া তাহাতে গবর্ন্মেণ্ট্ রাজী না হইলে নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন অভিযান আরম্ভ করিলে ভাল হইত।

—

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গের বাহিরে যে-সকল মানবপ্রেমিক সাধু ব্যক্তি চরিত্রবলে ও লোকহিতসাধন দ্বারা শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন, লাহোরের স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কানপুরে তাঁহার জন্ম হয়; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ তিনি পঞ্জাবেই যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি চাকরীতে নিযুক্ত থাকিবার সময়েও দেশহিত ব্রত পালনে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার একখানি পিউরিটি-সার্ভেণ্ট্ অর্থাৎ পবিত্রতার সেবক নামক ইংরেজী কাগজ ছিল। তাহা তিনি বহু বৎসর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও চালাইয়াছিলেন। সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য তিনি ইহাতে লিখিতেন। তদ্ভিন্ন সভাসমিতিতে বক্তৃতা আদি দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেন। পিউরিটি-সার্ভেণ্টের অন্য একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক অপবিত্রতা ও পাপাচার দূর করা। পঞ্জাবে ও পশ্চিমের সর্ব্বত্র আগে হোলীর সময় অশ্লীল গান ও গালাগালির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল; এখন কিছু কমিয়া থাকিলেও



অবিনাশচন্দ্র মজুমদার

তাহা সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। এই অশ্লীলতার জন্য পথে ঘাটে, এমন-কি কখন কখন অন্তঃপুরেও, স্ত্রীলোকদিগকে অতিষ্ঠ হইতে হয়। অবিনাশবাবু ইহা দমন করিবার জন্য "পবিত্র হোলী" প্রবর্ত্তিত করেন। এই অনুষ্ঠানে লোকে দল বাঁধিয়া নিরাবিল গীত ও বাদ্য এবং বক্তৃতা উপভোগ করিত। লাহোরে ইহা বহু বৎসর চলিয়াছিল এবং তাহাতে লোকে আনন্দিত ও উপকৃত হইত। এক বৎসর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ প্রধান লোক-দিগকে লইয়া এলাহাবাদেও মজুমদার মহাশয় পবিত্র হোলী করিয়াছিলেন। পিউরিটি-সার্ভেণ্টে তিনি নির্ভীক ভাবে পঞ্জাবের অনেক নামজাদা লোকদের চারিত্রিক সমালোচনা করিতেন। গরীব লোকদিগকে ঔষধ দেওয়াও তাঁহার অন্যতম কাজ ছিল। এই কাজ করিবার সময় তাঁহাকে অনেক সময় তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির রোগীও দেখিতে হইত। তাহারা অনেক সময় নিজেদের দেহ তাঁহাকে ছুঁইতে দিতে চাহিত না। তিনি তাহাদিগকে, কখন কখন দরকার না থাকিলেও ছুঁইয়া দেখাইতেন, যে, তাহাতে কোন কুফল হয় না।

কাংড়া উপত্যকায় ভূমিকম্পে যখন বিস্তর লোক বিপন্ন হয়, তখন তিনি উদ্যোগী হইয়া টাকা তুলিয়া লোকের সেবা ও সাহায্য করিয়াছিলেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ ও অন্যত্র কোন কোন দুর্ভিক্ষের সময়েও তিনি প্রধান কর্ম্মী হইয়া দরিদ্রদিগের সেবা করিয়াছিলেন।

সিমলা নগর যাইবার পথে ধরম্‌পুর নামক স্থানে যক্ষ্মারোগীদের জন্য যে স্বাস্থ্যনিবাস আছে, তাহা স্থাপনের জন্য তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ও কর্ম্মী ছিলেন।

তিনি সাধু ও ভক্ত লোক ছিলেন। বাংলায়, হিন্দীতে ও ইংরেজীতে তাঁহার ভগবদারাধনা প্রাণস্পর্শী হইত। তিনি বক্তৃতাও এই তিন ভাষায় বেশ করিতে পারিতেন।

শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি উত্তমরূপে অনুরাগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকৃত "জপজীর" অনুবাদ এলাহাবাদের পাণিনি আফিস্ প্রকাশিত করিয়াছেন। "সুখমণি"র অনুবাদ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বাঙালীদের সুমুদ্রিত ও সুপরিচালিত মুখপত্র "উত্তরা" মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল।

তিনি চাকরী হইতে অবসর লইবার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইদানীং কয়েক বৎসর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং বৎসরের অনেক সময় সিমলা যাইবার পথে সোলন নামক স্থানে বাস করিতেন।

মোস্‌লেম লীগের প্রধান প্রতিজ্ঞা

মোস্লেম লীগও যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, মুসলমানেরাও যে অধিকতর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার চান, তাহা লীগের গত অধিবেশনের প্রধান প্রতিজ্ঞা হইতে অনুমিত হয়। ইহা সন্তোষের বিষয়।

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের আমরা চিরবিরোধী। আমাদের বিরোধিতার কারণ অনেক। কেবল দুটির উল্লেখ এখানে করিব।

আলাদা আলাদা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রথা অনুসারে কখনও সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায় বিচার হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমান, এই দুটি ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই। তা ছাড়া, জৈন, খৃষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ইহুদী, শিখ, প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে। দাক্ষিণভারতে আবার ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ভেদকে উগ্র করিয়া তোলা হইয়াছে। খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে রোমান্ কাথলিকরা প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় প্রতিনিধির কার্য্যে ও কথায় বারবার অসম্মতি জানাইয়াছেন। শিখদের ও জৈনদের মধ্যেও নানা দল আছে। মুসলমানদের শিয়া সুন্নী ভেদ আছে। কোন নিয়ম চালাইতে হইলে তাহা প্রথমতঃ ন্যায্য নিয়ম হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, তাহা ন্যায্যভাবে প্রযুক্ত হওয়া চাই। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন আমরা ন্যায্য মনে করি না। উহাকে ন্যায্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, উহার ন্যায়ানুযায়ী প্রয়োগ অসম্ভব। যে-সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা যত, তাহাকে সেই অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এইরূপ নিয়ম অনুসারে যদি কাহারও ভাগে আড়াই, কাহারও ভাগ্যে পাঁচ ও একতৃতীয়াংশ জন প্রতিনিধি পড়ে, তাহা হইলে কয়জন প্রতিনিধি কাহাকে দেওয়া হইবে? আড়াইএর জায়গায় তিন, পাঁচ ও একতৃতীয়াংশের জায়গায় ছয় দিলে বেশী দেওয়া হইবে, এবং তাহাতে অন্য কাহারও ভাগে কম পড়িবে; আবার যথাক্রমে দুই ও পাঁচ দিলেও কম দেওয়া হইবে ও অন্যের ভাগ্যে বেশী পড়িবে। যে-উপায়ই অবলম্বন করা যাউক, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করা যাইবে না ও সকলকে খুশি করা যাইবে না।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্ব্বাচন দ্বারা সকল সম্প্রদায়কে খুশি করা যাইবে না বলিয়া ঐ পথে সমগ্র ভারতীয়ের জাতীয়সংহতি (national solidarity) ও জাতীয় একতাপাদন (national unification) কখনও উৎপাদিত ও সম্পন্ন হইবে না।

প্রতিনিধির ভাগও যে কোথায় থামিবে, বলা যায় না। যদি ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের আলাদা প্রতিনিধি হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অব্রাহ্মণেরা, বিশেষতঃ "অস্পৃশ্য"রা কেন আলাদা আলাদা প্রতিনিধি চাহিবে না, তাহার কোন কারণ নাই।

মুসলমানেরা যে-সব কারণে স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চান, তাহার একটি এই, যে, তাহা না পাইলে তাঁহাদের স্বার্থ অবহেলিত হইবে। তাঁহারা যে-সব প্রদেশে সংখ্যায় অন্য সকলের চেয়ে বেশী নহেন, তথায় তাঁহারা সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রতিনিধি পাইয়াই সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা বলেন, যে, তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা এরূপ হওয়া চাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের মত কার্য্যকরভাবে (effectively) এবং যথেষ্টরূপে (adequately) ব্যক্ত হইতে পারে। ঠিক্ এই দাবী অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইলে, যে-যে প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা কম, সেখানেও শতকরা ৫০ জন প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে দিলে তবে মুসলমান প্রতিনিধিদিগের প্রতিনিধিত্ব কার্য্যকর ও যথেষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলে বাকী শতকরা ৫০ অন্য সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেমন করিয়া ন্যায্যভাবে ভাগ করা যাইবে, এবং তাহাদের সন্তোষ কেমন করিয়া উৎপাদিত হইবে?

ইহা বলিলে চলিবে না, যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বেশী, অতএব তাহাদিগকেই সংখ্যার অনুপাতের অধিক প্রতিনিধি দেওয়া হউক;—অন্যের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক। কারণ, যদি সংখ্যায় ন্যূনদের স্বার্থরক্ষার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্ব্বাচন দরকার হয়, তাহা হইলে যাহারা যত অকিঞ্চিৎকর, সংখ্যায় যত কম ও দলের সংহতি হিসাবে যত দুর্ব্বল, তাহাদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনই তত বেশী সুতরাং যে-সব ধর্ম্মসম্প্রদায় খুব ছোট, তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তত বেশী হওয়া দরকার।

যাঁহারা সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি চান, তাঁহাদের মনে রাখা দরকার, যে, তাঁহাদের ঐরূপ প্রতিনিধি থাকায় ব্যবস্থাপক সভার অন্য সভ্যেরা তাঁহাদের হিতাহিত সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও তাঁহাদের অভিযোগ করিবার ন্যায্য কারণ থাকে না।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ও নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের মত কি বলিলাম। এখন, উহার প্রয়োজন মানিয়া

লইয়া কিছু বলিতে চাই। কেবল মুসলমানদের সম্বন্ধেই কিছু বলিব। কারণ, কেবল তাঁহারাই সমগ্র ভারতবর্ষের আলাদা প্রতিনিধি চাহিয়াছেন; দক্ষিণভারতে ভিন্ন অন্যত্র অব্রাহ্মণেরা আলাদা প্রতিনিধি চান নাই। অন্যান্য সম্প্রদায়েরও এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মতভেদ আছে।

মুসলমানদের আলাদা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবস্থা এই, যে, সব প্রদেশেই তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে; যেখানে তাঁহারা সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী, সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হইবে, যেখানে সংখ্যায় যেরূপ কম, প্রতিনিধির সংখ্যাও সেইরূপ কম হইবে। মোস্‌লেম লীগের গত অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলী প্রধান প্রস্তাবের এইরূপ একটি-ন্যায়সঙ্গত সংশোধন সভার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। যাহা পাস হইয়াছে, তাহাতে এই দাঁড়ায়, যে, লীগ চান, যে, যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী, সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী হইবে, এবং যেখানে তাঁহারা অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা সংখ্যায় কম, সেখানে তাঁহাদের প্রতিনিধি সমষ্টির মত বা ভোটকে কার্য্যকর (effective) এবং যথেষ্ট প্রভাবশালী (adequate) করিবার নিমিত্ত সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশীসংখ্যক প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। ইহাতে কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি অবিচার হইবে। এইজন্য, মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা ন্যায়পরায়ণ তাঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপ মৌলানা মহম্মদ আলী এই সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে, সব প্রদেশেই মুসলমানদের প্রতিনিধির সংখ্যা তাঁহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে নির্দ্ধারিত হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রতিনিধিদের নির্ব্বাচন কি প্রকারে হওয়া উচিত, তাহাও বিচার্য্য। মুসলমানদের কাগজে পত্রে এবং সভা-সমিতির প্রস্তাবে ও বক্তৃতায় যাহা দেখা যায়, তাহাতে এই ধারণা হয়, যে, অধিকাংশ লিখনপঠনক্ষম মুসলমান কেবলমাত্র মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা মুসলমান প্রতিনিধির নির্ব্বাচন চান। আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বসম্প্রদায়ের সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান অমুসলমান সমুদয় সভ্যের নির্ব্বাচন হওয়া ভাল। এই প্রণালীর বিরুদ্ধে মুসলমানেরা বলেন, যে, তাহা হইলে সেইসব মুসলমানেরাই অধিকাংশ স্থলে নির্ব্বাচিত হইবেন, যাঁহারা হিন্দুদের অপেক্ষাকৃত প্রিয়পাত্র। তাহা তাঁহারা চান না। এইরূপ লোকদেরই নির্ব্বাচন হইবে কি না বলিতে পারি না এবং তাহা হইলে মুসলমানদের কি ক্ষতি হইবে, জানি না। কিন্তু শুধু হিন্দুরাই ত নির্ব্বাচক নহেন, মুসলমানেরাও নির্ব্বাচক, এবং যে সব প্রদেশে মুসলমানদের লোকসংখ্যা বেশী, কালক্রমে ও শিক্ষায় ও সম্পদে ঐ সম্প্রদায়ের উন্নতিসহকারে উহার নির্ব্বাচকসংখ্যাও বাড়িবে। তখন প্রধানতঃ মুসলমানদের ভোটের জোরেই মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন। তা ছাড়া, বর্ত্তমান অবস্থাতেও সম্মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা হইলে যেমন এক দিকে মুসলমান সভ্যদিগকে কতকটা অমুসলমান ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে, তেমনি অমুসলমান সভ্যদিগকেও মুসলমান ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ের এই অন্যোন্যনির্ভরতা ত জাতিগঠনের পক্ষে ভালই।

মোস্‌লেম লীগের প্রস্তাবের আর-একটি অংশে বলা হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির এরূপ কোন পুনর্গঠন হইবে না, যাহাতে কোন প্রদেশের মুসলমানদের সংখ্যার আধিক্য ন্যূনতায় পরিণত হয়। অর্থাৎ কোনও প্রদেশকে ছোট বা বড় করিবার যত গুরুতর কারণই থাক্ না, তাহা করা বন্ধ রাখিতে হইবে, যদি তাহাতে ঐ প্রদেশের মুসলমান সংখ্যাধিক্য নষ্ট হয়। ইহা হইতে এই অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, যে, উক্ত প্রস্তাবের সমর্থকগণের মনে অমুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস এবং নিজেদের স্বার্থবোধ এত প্রবল, যে, তাঁহারা চিরকালের জন্য কোন কোন প্রদেশে সংখ্যাধিক্য বজায় রাখিয়া স্বার্থ রক্ষা করিতে চান, অমুসলমানদের সহানুভূতি প্রীতি শ্রদ্ধা ও মানবহিতৈষণার উপর একটুও নির্ভর করিতে চান না, অথচ অমুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলনকালে ও দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প জলপ্লাবন ঝড় প্রভৃতি হইতে জাত বিপদের সময় মুসলমানদের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি কার্য্য দ্বারা

প্রকাশ করিয়াছেন। এখনও খাদিপ্রতিষ্ঠান, অভয়াশ্রম, অনুন্নত জাতির উন্নতি বিধায়িনী সভা প্রভৃতি কেবলমাত্র বা প্রধানতঃ অমুসলমান কর্ম্মী ও দাতাদের দ্বারা পরিচালিত হইলেও, মুসলমানগণ বহুলপরিমাণে তদ্দ্বারা উপকৃত হইতেছেন।

—

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়

মোটর গাড়ীর ধাক্কায় আহত হইয়া মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের অকালে আকস্মিক মৃত্যু দুঃখের কারণ হইয়াছে।

১৯০১ সালে যে বার কলিকাতায় বীডন্‌স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতিরূপে তেজস্বিতাব্যঞ্জক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেণীস্থ রাজারাজড়ারা ওরূপ বক্তৃতা প্রায় করেন না। নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনের কার্য্য প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সেও তাঁহার বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষ্যে আন্দোলনের সময় কলিকাতায় টাউনহলে প্রতিবাদ সভায় তিনি মন খুলিয়া বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তিনি বাংলা গদ্যে ও পদ্যে সুলেখক ছিলেন, এবং কয়েকখানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত অনেক বৎসর "মানসী ও মর্ম্মবাণী" মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গীতবাদ্য ও চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন, এবং স্বয়ং সুদক্ষ বাদক ছিলেন।

ক্রিকেট্ প্রভৃতি খেলায় তাঁহার সখ্ ছিল, এবং নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন ও খেলার দলের জন্য অর্থব্যয় করিতেন।

তিনি দয়ালু, দানশীল ও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন।

—

সমগ্র ভারতীয় সমাজসংস্কার কন্‌ফারেন্স

কংগ্রেসের অধিবেশন যেখানে হয়, সেখানে সমাজ-সংস্কার কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবার একটি প্রথা বহুবৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। কানপুরে এবার সমাজসংস্কারের জন্য কোন সভার অধিবেশন হয় নাই। কিন্তু উদারনৈতিক সংঘের কলিকাতায় অধি-বেশনের সঙ্গে সমাজসংস্কার সভারও অধিবেশন হইয়াছিল। সমাজসংস্কার কেন হওয়া উচিত, তাহার কারণ অনেক। পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি ন্যায্য সমান ব্যবহারের জন্য উহা আবশ্যক, নারীর কল্যাণার্থ উহা আবশ্যক, শিশুমঙ্গলের জন্য উহা আবশ্যক অবনমিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত জাতিসমূহের উন্নতি ও তাহাদের সহিত সপ্রেম ও ন্যায্য ব্যবহারের জন্য উহা আবশ্যক, সমাজ-রক্ষার জন্য উহা আবশ্যক—এইরূপ নানা কারণ বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন, সমাজ-সংস্কার ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করা ও রক্ষা করা অসম্ভব। ইহা অনুভব করিয়া মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপর এত জোর দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন ও বক্তৃতা করিয়াছেন, বালবিধবাদের আবার বিবাহ দিবার সমর্থন করিয়াছেন, এবং তাঁহার জন্মভূমি গুজরাটেও নারীর অবরোধ-প্রথা নাই, এবং তিনি উহার সমর্থনও করেন না। কিন্তু আজকাল কংগ্রেস্ যাঁহাদের হাতে পড়িয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেহ সমাজসংস্কারের বিরোধী না হইলেও উহার একান্ত আবশ্যকতায় হয়ত তেমন বিশ্বাস করেন না। সম্ভবতঃ সেইজন্য কানপুরে অন্য নানা সভার স্থান ও কালের অভাব না হইলেও সমাজসংস্কার সভার জন্য সময় ও স্থান হয় নাই।

কলিকাতার সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হইয়াছিলেন সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ। পণ্ডিত মহাশয় অনেক খাঁটি-কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবীর বক্তৃতা বেশ সারগর্ভ হইয়াছিল। তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার উপর খুব জোর দিয়াছিলেন। আধুনিক জগতে অন্য মহৎ জাতি-সমূহের সহিত একত্র অগ্রসর হইতে হইলে যে ভারতীয় সমাজের সুসংহত হওয়া দরকার তাহাও তিনি প্রদর্শন করেন।

আল্‌বার্ট্‌ হলে সভার অধিবেশন হয়। শেষাশেষি হলে তিলমাত্রও স্থান ছিল না। অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন, এবং কেহ কেহ সভার কাজে বক্তৃতাদি দ্বারা যোগ দিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষার আরও দ্রুত বিস্তার-চেষ্টা, বালিকাদের বিবাহের বয়স আরও বৃদ্ধি, অবরোধ-প্রথার বিনাশ, বরপণ-গ্রহণ-প্রথার উচ্ছেদ, বিধবাদের বিবাহ ও তাহাদের দুর্দশা মোচন, জাতিভেদের বন্ধনের শিথিলতা-সাধন, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, ধর্ষিতা ও অত্যাচারিতা বালিকা ও স্ত্রীলোকদের সমাজে পুনর্গ্রহণ, নারীদিগকে পুরুষদের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান, চিকিৎসার জন্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে সুরা ও অন্য মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার নিবারণ, বায়োস্কোপ ও থিয়েটারগুলির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্ষা, ঘোড়দৌড়ে জুয়াখেলার বিরোধিতা, বালিকা ও স্ত্রীলোকদের জন্য উদ্ধারাশ্রম স্থাপন, যে-সব প্রদেশে বালকবালিকাদের রক্ষার জন্য আইন নাই, তথায় তাহা প্রণয়ন, দেবোত্তরাদি সম্পত্তির আয়ের অপব্যয় নিবারণ ও সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা করণ, এবং হিন্দুমুসলমানে সদ্ভাব রক্ষা—এই সমুদয় সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বক্তৃতাগুলি শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিশেষভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

—

মন্ত্রীদের বেতন

যারা কাজ করে, তাদের মজুরী পাওয়া উচিত, এটা খুব সোজা কথা। কিন্তু সেই মজুরীটা কে দিবে, তাহাও স্থির হওয়া উচিত। বাংলার মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন গবর্ণর সাহেব। সেই নিয়োগ ব্যবস্থাপক সভা অনুমোদন করেন নাই; কারণ মন্ত্রীদের বেতন উহাতে একাধিকবার নামঞ্জুর হইয়াছিল। অতএব মন্ত্রীদের বেতন লাটসাহেবের নিজের পকেট হইতেই দেওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে যে-ব্যবস্থাপক সভা বেতন নামঞ্জুর করিয়াছিল, তাহাই আবার উহা মঞ্জুর করিল। ইহাকেই বলে মতিস্থৈর্য্য। অবশ্য, যদি সভ্য মহাশয়দিগকে টাকাটা নিজের ট্যাঁক হইতে দিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় অটল থাকিত। যাহা হউক, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদিগকে যে শেষপর্য্যন্ত ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে হইল না, ইহা তাঁহাদের পক্ষে খুসীর বিষয়।

—

শিক্ষাবিভাগের ভার বহন

দ্বৈরাজ্য ব্যবস্থায় শিক্ষাটা 'হস্তান্তরিত' বিষয়, এবং ইহার ভার কোন একজন মন্ত্রীর উপর পড়িবার কথা। বঙ্গে এখন দ্বৈরাজ্য নাই। তথাপি যখন শাসন-পরিষদে দুজন বাঙালী সদস্য আছেন, তখন তাঁহাদের একজনের উপর শিক্ষার ভার দিলে দ্বৈরাজ্য ব্যবস্থার উদ্দেশ্যের অনুযায়ী কাজ হইত। কিন্তু গবর্ণরের হইয়াছে বিপদ্। তিনি শাসন-পরিষদের বাঙালী সদস্য করিয়াছেন একজন হিন্দু মহারাজাকে ও একজন মুসলমান নবাবকে। কাহারও শিক্ষা এরূপ নহে, যে, তাঁহাকে প্রাথমিক পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার খবরাখবর রাখিবার ভার দিতে পারেন। সুতরাং তিনি শেষে অধমতারণ সিবিলিয়ানের শরণ লইয়াছেন—শিক্ষাবিভাগের ভার পড়িয়াছে ডোনাল্ড্ সাহেবের উপর। শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার কি অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা আছে জানি না। হয়ত খুব আছে; কিন্তু না থাকিলেও ক্ষতি নাই। অরবিন্দ ঘোষ যখন হাজতে ছিলেন, তখন যে কারাকাহিনী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে, তাঁহাকে সরকার বাহাদুর সুবিবেচনা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতা সহকারে যে যোগিজনোচিত সামান্য তৈজসপত্র দিয়াছিলেন, তাহার অন্তর্ভূত একটি বাটীকে তিনি সিবিলিয়ান্ আখ্যা দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই, যে, সিবিলিয়ান্‌রা যেমন সর্ব্বকর্ম্মে পারদর্শী, তেমনি তাঁহার ঐ বাটীটি তাঁহার পিপাসানিবারণ, ভোজন, স্নান, শৌচ-নির্ব্বাহ, প্রভৃতি সর্ব্বকার্য্যে সহায় ছিল।

যাহা হউক, গবর্ণ্‌মেণ্ট্ যে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করেন, তাহাতে বুদ্ধিমত্তাই প্রকাশ পায়। কারণ, স্যার আব্দুর রহিম সাহেব সম্প্রতি বলিয়াছেন, তিনি যতদিন সদস্য ছিলেন কখনও তাঁহার হিন্দু সহকর্ম্মী নদিয়ার মহারাজার সহিত কোন বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। ইহাতে ইংরেজের দেশ-শাসনের সুবিধা খুবই হয়। হিন্দু সদস্য ও মুসলমান

সদস্য একমত হইলে ততটা সুবিধা হইত না। অতএব মুসলমান রহিম সাহেবের জায়গায় অন্য একজন মুসলমান নিয়োগ ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু রহিম সাহেব শিক্ষিত লোক ছিলেন, শিক্ষাবিভাগের ভার বহন করিতেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিত লোক ত আরও অনেকে আছেন। তাঁহাদের কাহাকেও কেন নিযুক্ত করা হইল না? যোগ্যতম লোকদের নিয়োগই বাঞ্ছনীয়। সেরূপ নিয়োগ হইলে, নিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না।

মুসলমানদিগের চাকরীর সুবিধাবৃদ্ধি

বাংলা দেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। সুতরাং ভবিষ্যতে মুসলমানেরা শিক্ষায় ও যোগ্যতায় সমান অগ্রসর হইবার পর কোন সরকারী নিয়মের সাহায্য ব্যতিরেকেও অধিকাংশ চাকরী তাঁহাদের হইবে। এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু সরকারী নিয়ম করিয়া তাঁহাদিগকে চাকরী দিতে হইতেছে। তাহাতে মুসলমান শিক্ষিত লোকদের সংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদের যত চাকরী পাওনা হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী চাকরী তাঁহারা পাইবেন। বঙ্গের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে, এমন কি লিখনপঠনক্ষম লোকদের মধ্যেও, শতকরা ৪৫ জন মুসলমান নহেন। কিন্তু কোন কোন বিভাগের চাকরী তাঁহারা শতকরা ৪৫টি পাইবেন। আমরা প্রতিযোগিতায় যোগ্যতমের নিয়োগের পক্ষপাতী, এবং বিশ্বাস করি, যে, এরূপ নিয়ম পরিণামে মুসলমানদিগের পক্ষেও কল্যাণকর। কিন্তু এসব বিষয়ের আলোচনা মুসলমানেরা ভালভাবে গ্রহণ করেন না বলিয়া বেশী কিছু লিখিব না। কেবল একটা কথা বলিলে আশা করি তাঁহারা তাহা হইতে আমাদের কুবুদ্ধির কোন প্রমাণ আবিষ্কার চেষ্টা করিবেন না। সেটা এই, যে, যতগুলি চাকরী মুসলমানদের পাওনা, সেইগুলিতে নিয়োগ কেবল মুসলমানদের মধ্যেই প্রতিযোগিতার ফল দ্বারা করা হউক। তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা, যোগ্যতা, ও স্বাধীনচিত্ততাকে উৎসাহ দেওয়া হইবে।

যে-যে কারণ দেখাইয়া বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ কোন কোন বিভাগে শতকরা ৪৫টি চাকরী মুসলমানদিগকে দিতে চাহিয়াছেন, তাহার দুই-একটির আলোচনা করিব।

সরকার বলেন, অফিসারেরা মুসলমান হইলে মুসলমান প্রজারা তাঁহাদের নিকট যত সহানুভূতি পায়, অমুসলমান অফিসারদের নিকট হইতে ততটা পায় না। তা ছাড়া, মুসলমান অফিসারেরা মুসলমানদের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও পরামর্শ, উৎসাহ প্রভৃতি বেশী দিয়া থাকেন। এই তথ্য-দুটি সত্য কি না, স্থির করিবার মত উপকরণ আমাদের নিকট নাই। মুসলমানপ্রধান জেলা ও মহকুমাসমূহে মুসলমান অফিসারদের লোকহিতকর কার্য্য ও অমুসলমান অফিসারদের লোকহিতকর কার্য্যের তালিকা পাইলে বিচার করা যাইত।

যাহা হউক, তথ্যগুলি ঠিক্ বলিয়া মানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, বাঙালী হিন্দুর ভাল করিবার জন্য বাঙালী হিন্দু অফিসার চাই, বাঙালী মুসলমানের ভাল করিবার জন্য বাঙালী মুসলমান অফিসার চাই, বাঙালী খৃষ্টিয়ানদের ভাল করিবার জন্য বাঙালী খৃষ্টিয়ান অফিসার চাই, ইত্যাদি;— তাহা হইলে ইংরেজ অফিসারদের স্থান ও আবশ্যক কোথায়? না, তাঁহারা স্বর্গের জীব, স্বজাতি বিজাতি স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী সকলেরই হিতসাধনের জন্য তাঁহাদের সৃষ্টি হইয়াছে? বাংলা দেশে সরকার যে কারণ দেখাইতেছেন, সেইরূপ কারণে অন্য কোন সভ্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অফিসার নির্দ্দিষ্ট অনুপাত-অনুসারে নিযুক্ত হয় বলিয়া আমরা অবগত নহি। কাহারও জানা থাকিলে সে-সব তথ্য কোন্ বহির কোন্ পাতায় লেখা আছে জানাইলে উপকৃত হইব। বিলাতের কথাই জিজ্ঞাসা করি। ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডে, বিশেষতঃ আয়ার্ল্যাণ্ডে রোমান কাথলিক্ আছেন ও প্রটেষ্টাণ্ট্ও আছেন; প্রটেষ্টাণ্ট্‌দের নানা উপশাখার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। এইসব প্রদেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য কি আলাদা আলাদা অফিসার নিযুক্ত হয়?

রহিম সাহেব মাফ্ করিবেন; প্রশ্নটা করাই বোধ হয় ভুল হইল। কারণ, তিনি তাঁহার অতুলনীয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ভারতের (বোধ করি বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর

জেলার) হিন্দু মুসলমানরা বিলাতের প্রটেষ্টান্ট্ ও রোমান কাথলিকদের মত কেবল দুটা ধর্ম্মসম্প্রদায় নহে; তাহারা সভ্যতায়, আচারব্যবহারে ঐতিহ্যে ইতিহাসে জাতিতে (ভাষাটা বাদ পড়িল কেন ?) একেবারে পৃথক্ দুটি মানবসমষ্টি। যাহা হউক, তাঁহার বক্তৃতার আলোচনা পরে করিবার ইচ্ছা আছে।

বাংলা গবর্ণ্মেণ্ট্ বলিতেছেন, যে, ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি যে-সব বিভাগে বিশেষ রকম জ্ঞানের দরকার সেখানে তদ্রূপ যোগ্যতা দেখিয়াই কর্ম্মে নিয়োগ করা হইবে, শতকরা ৪৫টির নিয়ম খাটিবে না। ইহার মধ্যে তাহা হইলে উহ্য থাকে এই কথাটি, যে, হাকিমি করিবার জন্য বিশেষ কোন রকম জ্ঞান বা যোগ্যতা ততটা দেখিবার দরকার নাই। তাহা হইলে সবকার চেয়ে বড় হাকিমি যে সিবিলিয়ান্‌গিরি তাহার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা কেন করা হয় ? এবং ঐ সিবিলিয়ান্‌গিরি কাজে শতকরা খুব বেশীসংখ্যক ইংরেজ না থাকিলে ব্রিটিশ শাসন-প্রণালীর ইস্পাতের 'কাঠামো' খাড়া থাকিবে না—ইহাই বা কেন বলা হয় ?

জাপান-সম্রাট্ ও ভারত-সম্রাট্

উদারনৈতিক সংঘের অধিবেশনে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বলেন—

"জাপান সম্রাট্ বলিয়াছিলেন. অতঃপর আমার দেশে একটি গ্রামেও একটি নিরক্ষর পরিবার থাকিবে না, এবং একটি পরিবারেরও একজনও নিরক্ষর লোক থাকিবে না। [তদনুসারে কাজও হইয়াছে।] আমাদেরও সম্রাট্ এবং সম্রাট্-প্রতিনিধি আছেন। তাঁহাদের কাহারও মুখে কখনও ওরূপ কথা শুনা গিয়াছে কি ? তাহার কারণটা সুস্পষ্ট। ভারত বিদেশীদের দ্বারা শাসিত; আমাদের দেশের লোকদিগকে শিক্ষিত করা বিদেশী শাসকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবশ্যক নহে।"

জাপানে ও ভারতে কার্পাস-শিল্প

জাপানের মিল্‌গুলিতে মোট ৪৮ লক্ষ টাকু আছে, ভারতের মিল্‌গুলিতে আছে ৮০লক্ষ। কিন্তু তথাপি জাপান সূতা ও কাপড়ের জন্য ভারতবর্ষের সমান কার্পাস ব্যবহার করে, এবং ভারতবর্ষকে প্রতিযোগিতায় পরাস্তও করিতেছে। জাপানের কারিকরদের শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, ও নৈপুণ্যে কিছু শ্রেষ্ঠতা থাকিতে পারে ; জাপানের আব্‌হাওয়াও হয়ত বেশী পরিশ্রমের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু প্রধান কারণ এই, যে, জাপানী মিল্‌গুলিতে প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে এক এক দল শ্রমিক এগার এগার ঘণ্টা কাজ করিয়া মোট ২২ ঘণ্টা কাজ করে ; ভারতবর্ষে কিন্তু মিল্‌গুলিতে সপ্তাহে ৬০ঘণ্টার বেশী কাজ হইবার জো নাই।

বঙ্গে ইংরেজী স্কুলের শিক্ষা

বাংলাদেশের ইংরেজী যে-সব ইস্কুল হইতে ছেলেরা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, তাহাতে শিক্ষার উন্নতি করিবার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই করেন না ; করিবার সময় ও আয়োজনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। অথচ এগুলির উন্নতি না হইলে উচ্চশিক্ষার ভিত্তি পাকা হইতে পারে না, ভাল করিয়া উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধিকাংশ ছাত্র যে শিক্ষা পায়, তাহাও নিকৃষ্ট-রকমের থাকিয়া যায়। এইজন্য, প্রবেশিকা বিদ্যালয়গুলির প্রতি মন দিবার নিমিত্ত একটি বোর্ডের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বঙ্গের সরকারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের কন্‌ফারেন্সে সভাপতিরূপে হাইকোর্টের জজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলর গ্রীভ্‌স্ সাহেব বলেন, যে, বোর্ড্‌টি নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি-অনুযায়ী স্থাপিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার সমর্থন করিবেন :—

(১) উহা গবর্ণ্মেণ্টের অধীন হইবে না।

(২) উহাতে শিক্ষকদের প্রতিনিধি থাকিবেন।

(৩) প্রবেশিকা পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকিবে।

(৪) বোর্ড্ স্থাপন দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইবে না।

এই সর্ত্তগুলির আমরা সমর্থন করিতে রাজী আছি। প্রথম দুটি ত একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তৃতীয় সর্ত্তটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশ

ছেলেকে প্রথম শ্রেণীতে পাস্ করিবার প্রথার ও তাহার মূলীভূত কারণের উচ্ছেদের জন্য কি ব্যবস্থা করিতে চান? বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পরামর্শের পর গবর্ণ মেণ্ট্ বোর্ড্ স্থাপনের জন্য আইনের যে খস্ড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবগুলি দেখিবার কৌতূহল আমাদের আছে। ষ্টেট্স্‌ম্যান্ কাগজ এগুলি এণ্টার্-প্রাইজ দ্বারা ছাপিলে ভাল হয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু; দেশী কোন কাগজের এণ্টার্-প্রাইজ করিবার অধিকার নাই।

বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার কার্য্য

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ২৯১টি বিধবার বিবাহের সংবাদ লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও সহকর্মীদের নিকট হইতে পাইয়াছেন। ১৯২৫এর ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২৬৬৩টি বিধবা-বিবাহের সংবাদ সভা পাইয়াছেন। যথা, জাতি-অনুসারে—

ব্রাহ্মণ ৪৪৭, ক্ষত্রী ৫০৮, অরোরা ৫৭০, অগ্রবাল ১৮০, কায়স্থ ৭৬, রাজপুত ২০২, শিখ ২৫১, বিবিধ ৪২৯; মোট ২৬৬৩।

প্রদেশ-অনুসারে—

পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ ২০৫৭, দিল্লী ৪১, সিন্ধু ৩৮, আগ্রা-অযোধ্যা ৩৫৬, দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ ৫, আসাম ৩০, বঙ্গদেশ ৭৩, মান্দ্রাজ ২৩, বোম্বাই ১২, মধ্যভারত ১১, রাজপুতানা ১৭; মোট ২৬৬৩।

ডিসেম্বর মাসে সভা স্বেচ্ছাকৃত দান পাইয়াছেন ৮৪৮৶ এবং সম্বৎসরে ১৬৮৫৫৷০।

এই সভা স্যার্ গঙ্গারাম ট্রাষ্ট্ সোসাইটী দ্বারা পরিচালিত। স্যার্ গঙ্গারাম তজ্জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন। লাহোরে একজন প্রবীণা মহিলার তত্ত্বাবধানে ইহার একটি বিধবা-আশ্রম আছে। তত্ত্বাবধায়িকা সর্ব্বদা সেখানে থাকিয়া বিধবাদিগের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ভরণপোষণাদির বন্দোবস্ত করেন। বিবাহার্থিনী যে-কোন শ্রেণীর হিন্দু বিধবাকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়। ঠিকানা স্রীম্ বিল্ডিংস, ম্যাকল্যাগ্যান্ রোড্, লাহোর।

শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব

শ্রীহট্ট বহু পূর্ব্বে বঙ্গের অংশ ছিল। ঐ জেলার লোকদের মাতৃভাষা বাংলা। উহাকে পুনর্ব্বার বাংলা দেশের অন্তর্ভূত করিবার প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়াছিল; এক্ষণে তাহা আসামের ব্যবস্থাপক সভাতেও গৃহীত হইয়াছে। আসাম গবর্ণ্‌মেণ্ট আপত্তি করেন নাই। এখন সম্ভবতঃ ভারত গবর্ণ্‌মেণ্টেরও মত হইবে। শ্রীহট্ট জেলার আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইবে, এই আতঙ্কও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দের চেষ্টায় দূর হইয়াছে। আসামের আরও দুটি জেলার কোন কোন অংশের বাংলাই প্রধান ভাষা। সেই অঞ্চলগুলিও বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

মানভূম জেলা বাংলারই অংশ। উহা পূর্ব্বে বাংলা প্রদেশের অন্তর্গতই ছিল। উহার অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা বাংলা। উহাকে বাংলা প্রদেশের সামিল করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এইরূপ সিংভূম জেলা, পাকুড় মহকুমা, সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া মহকুমা এবং পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমা বঙ্গভাষাভাষী। এই-সকল অঞ্চলও বাংলা দেশের সামিল হওয়া উচিত।

কলিকাতায় বড় দিন

"ভারতবন্ধু" স্টেট্‌স্‌ম্যান্ বলিতেছেন, ১৯২৩ সালে রাজনৈতিক হিংসাদ্বেষযোগের প্রবলতাবশতঃ বড়দিন অর্থাৎ কৃষ্ট মাস্ তেমন জমে নাই; কেননা, সৎ ইচ্ছার বাতাস নষ্ট হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে অবস্থাটা কিছু ভাল হইয়াছিল; ১৯২৫এ ত মনে হইয়াছে যেন রাজনীতি বলিয়া জিনিষটাই নাই। সদ্ভাবের নানা প্রমাণ 'ভারতবন্ধু' দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটা এই—ভারতীয় লোকেরা ইউরোপীয় বন্ধুদিগকে আবার উপহার দিতে আরম্ভ করিয়াছে; বড় দিনে কলিকাতার রাস্তাগুলা ইউরোপীয়দের জন্য উপহারের জিনিষে বোঝাই দালাল ও অন্য লোকদের গাড়ীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল! খ্রীষ্টিয়ানেরা বিশ্বাস করেন, যে, যীশু খ্রীষ্ট মানবজাতির মধ্যে সদ্ভাব ও শান্তি বিস্তার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতার ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ানদের

মুখপত্র বলিতেছেন, এই সম্ভাবটা অখ্রীষ্টিয়ানরাই শ্বেত খ্রীষ্টিয়ানদিগকে উপহার (অর্থাৎ কোন কোন স্থলে উৎকোচ) দিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্বেত খ্রীষ্টিয়ানরা অশ্বেত হীদেনদিগের প্রতি সম্ভাব বোধ হয় কেবল উপহার গ্রহণ করিয়াই প্রদর্শন করেন! কারণ, তাঁহারা তাহাদিগকে কিছু দিয়াছেন বলিয়া ত স্টেট্‌স্‌ম্যানে কোন উল্লেখ দেখিলাম না। যাহা হউক, উপহার প্রদান দ্বারা সম্ভাব প্রদর্শন-বিষয়ে হীদেনরা শ্বেত খ্রীষ্টিয়ানদের চেয়ে ভাল খ্রীষ্টিয়ান্। —

বঙ্গীয় শিক্ষকদের কন্‌ফারেন্স্

গত মাসে নোয়াখালিতে বঙ্গীয় শিক্ষকদের কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। আচার্য্য আর্কহার্ট্ সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যতটা শক্তি আছে, তাহা শিক্ষকদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা এক্ষণে একটি ব্যবস্থার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন যদনুসারে কাজ হইলে শিক্ষকদের পদমর্য্যাদা ও বেতনের উন্নতি হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল কমিটি ও শিক্ষকদের মধ্যে সালিসী করিবার নিমিত্ত একটি সালিস্ বোর্ড্ স্থাপনের কথাও আলোচনা করিতেছেন। ইহা স্থাপিত হওয়া খুবই আবশ্যক। শিক্ষকদের পদমর্য্যাদা ও বেতন বৃদ্ধিও খুব দরকার।

গবর্ণমেণ্ট্ গত বজেটে শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির জন্য তিন লক্ষ টাকা রাখিয়াছিলেন বলিয়া এবং প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ড্ স্থাপন করিবার জন্য কিছু সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আর্কহার্ট্ সাহেব আহ্লাদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটিগুলির ও শিক্ষকদের পরস্পর সম্বন্ধের উন্নতি বিশেষ দরকার। কমিটির সভ্যদে শিক্ষকদের অংশ আরও বেশী থাকা উচিত, এবং বর্ত্তমানে যতটা আছে তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কারভাবে ইহা স্বীকৃত হওয়া উচিত, যে, ম্যানেজিং কমিটিগুলি আছে ইস্কুলসমূহের জন্য, ইস্কুলগুলি ম্যানেজিং কমিটির জন্য নহে।

সভাপতি মহাশয়ের সব কথাই ঠিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

মিষ্টার্ ল্যাংলী নামক একজন অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বোধ হয় বেশী দিন শিক্ষাবিভাগে কাজ করিতেছেন না— তাঁহার বিশেষ কোন কৃতিত্বের কথাও শুনি নাই। পাছে তাঁর নিয়োগে তাঁহা অপেক্ষা বেশী দিনের অধ্যাপকরা গোলমাল করেন, এইজন্য নাকি ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে তাঁহার পদ তাঁহাকে প্রথমে ত্যাগ করান হইয়াছে। এলাহাবাদের লীডার্ বলিতেছেন, মিষ্টার্ ল্যাংলীর নিয়োগের কারণ নাকি এই, যে, তিনি দর্শনের অধ্যাপক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনার জন্য স্বতন্ত্র কোন বরাদ্দ নাই। তাহাই যদি কারণ হয়, তাহা হইলে এ দেশে ত দর্শনে তাঁহার অপেক্ষা পণ্ডিত, দর্শনের অধ্যাপনায় তাঁহা অপেক্ষা অভিজ্ঞ, এবং শিক্ষাদানকার্য্যে তাঁহা অপেক্ষা বিচক্ষণ এমন একাধিক লোক আছেন, যাঁহারা কেবল ভাইস্‌চ্যান্সেলরের বেতন লইয়া অধিকন্তু দর্শনাধ্যাপকের কাজও করিতে পারিতেন ও করিতে সম্মত হইতেন।

লীডার্ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"What is the meaning of such an appointment in a presidency so rich in educational and literary talent and experience?"

যে প্রেসিডেন্সীতে শিক্ষা-দান-ক্ষমতা ও সাহিত্যিক শক্তিসম্পন্ন অভিজ্ঞ লোকের এত প্রাচুর্য্য, তথায় এরূপ নিয়োগের মানে কি?

আমরা নিরুত্তর। —

বালীতে রেলের পুল

বালীতে যে রেলের পুল তৈরী করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতির জন্য এবং মানুষের হাঁটিয়া যাইবার জন্য পথ নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। এই সেতু হইলে মাল ও যাত্রী বহন দ্বারা রেলের আয় বাড়িবে। সুতরাং ইহার ব্যয় সরকারী রেলওয়ে বজেট হইতেই দেওয়া উচিত। আর যদি গবর্ণমেণ্ট্‌কে সাধারণ বজেট হইতেই টাকা দিতে হয়, তাহা হইলে শুধু বাংলা গবর্ণমেণ্ট্‌ই কেন টাকা দিবেন? ইহাতে অন্যান্য সকল প্রদেশের ও সমগ্র ভারতবর্ষের সুবিধা হইবে; সকলেরই টাকা দেওয়া উচিত।

সমগ্র বঙ্গের লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্স্‌

সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ সমুদয় গ্রামে ও নগরে লাইব্রেরী স্থাপিত হওয়া উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট্‌ বোর্ড্‌, লোক্যাল্‌ বোর্ড্‌ ও মিউনিসিপালটীগুলির নিজের নিজের এলাকার অন্তর্গত স্থানের লাইব্রেরীতে অর্থ সাহায্য করা উচিত। লাইব্রেরীর কাজ কিরূপে চালাইতে হয়, পুস্তক-তালিকা কেমন করিয়া শ্রেণী-বিভাগপূর্ব্বক প্রস্তুত করিতে হয়, ইত্যাদি শিক্ষা করিবার জিনিষ। এইসব ও অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত পুস্তকাধ্যক্ষ ও লাইব্রেরীর কার্য্যে অনুরাগী লোকদের সাধারণ সভা গঠিত হওয়া উচিত এবং তাহার বার্ষিক অধিবেশন হওয়া উচিত।

এবম্বিধ নানা উদ্দেশ্যে গতমাসে কলিকাতায় ইম্পিরিয়াল্‌ লাইব্রেরীর পুস্তকাধ্যক্ষ চাপ্‌মান সাহেবের সভাপতিত্বে একটি কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। তাহাতে তিনি ছাড়া অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, অধ্যাপক মনোরঞ্জন রায়, অধ্যাপক ব্রিজ, শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, এবং অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

—

দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের প্রশংসা

দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দিগের কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় কেপ্‌ টাউনের মেয়র মিস্‌টার্‌ ডব্‌লিউ এফ্‌ ফিশ্‌ দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের প্রশংসা করিয়া বলেন—

"The Indians have been in South Africa since the year 1860, and no one will deny they have been good and law-abiding people. They are an intelligent and thrifty people...I know the Indian community to be honest, sober and law-abiding."

"১৮৬০ সাল হইতে ভারতীয়েরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় আছে। তাহারা যে ভাল লোক ও আইন মানিয়া চলে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাহারা বুদ্ধিমান্‌ ও সঞ্চয়ী।...আমি জানি ভারতীয় লোকেরা সৎ, তাহারা নেশাখোর নয়, তাহারা আইনের বাধ্য।"

এইসবগুণে তাহারা দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায়দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে বলিয়াই ত তাহাদিগকে সেদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য আইন হইতেছে।

—

মুসলমান নারীর জিৎ

গত মাসে আলিগড়ে মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। এইরূপ ইস্তাহার জারি করা হয়, যে, নারীদিগকে উহাতে উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না। তাহা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ের আটিয়া বেগম ও অন্য কয়েক জন মহিলা উপস্থিত হন। আটিয়া বেগম নারীদের স্বাধীনতাহরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পরিশেষে তাঁহাকে বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয়। তাঁহার পর কলিকাতার মিসেস্‌ সখাৎ হুসেন বক্তৃতা করেন।

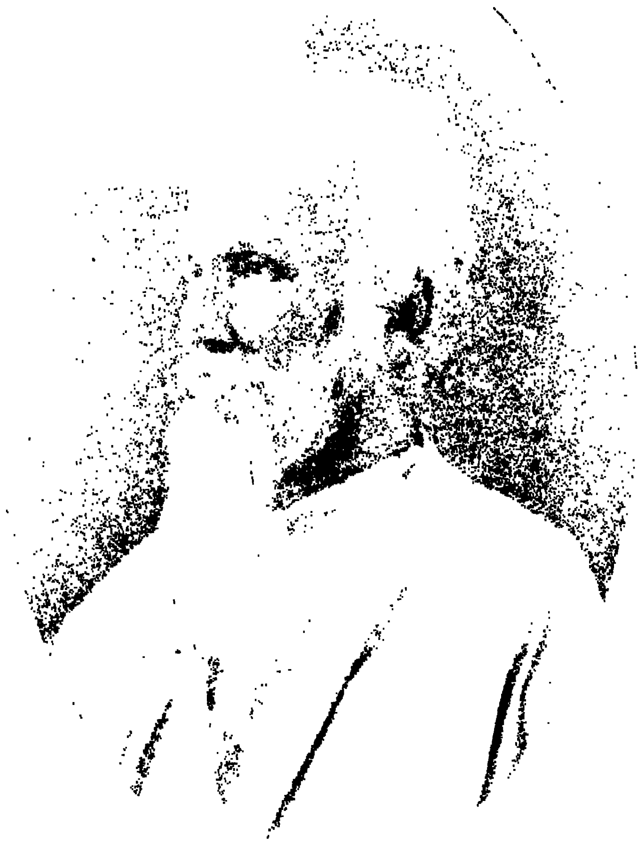
—

ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি

চিত্রবিদ্যা, সংস্কৃতচর্চ্চা এবং অন্যান্য বিষয়ে আধুনিক ভারতের যতদূর উন্নতি হইয়াছে, সঙ্গীতে এখন অবধি ততটা হয় নাই। অবশ্য সকল দিক্‌ দিয়া দেখিলে সঙ্গীত যতটা এখনও ভারতীয়দিগের জীবনের সহিত জড়িত রহিয়াছে, অন্যান্য বিষয়গুলি ততটা নাই। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতের সম্যক্‌ সাধনা ও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন; দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে সঙ্গীতচর্চ্চার স্থান এখনও নাই, তাহাও হওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এবিষয়ে আরও অনুরাগের সঞ্চার হওয়া আবশ্যক।

আজকাল হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধে একটা জাগরণের আভাস কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। তাহার মধ্যে উচ্চ সঙ্গীত সম্বন্ধে পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশ অন্যতম। সঙ্গীত গ্রন্থ প্রকাশকদের মধ্যে কলিকাতার ডোয়ার্কিন এণ্ড্‌ সন্‌ এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "তান-মালা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতিতে ষাটটি গানের কথা, স্বরলিপি ও তান (স্বরলিপি) মুদ্রিত হইয়াছে এই পুস্তকে অষ্টাদশ কানাড়ার সবগুলিই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা ইহার অন্যতম বিশেষত্ব। ইহা ব্যতীত ইহাতে লিপিবদ্ধ দূন ও চৌদূন ছন্দের ঠাটগুলিও মূল্যবান্‌।

অ. চ.



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

বলহীনেন লভ্যঃ”

২৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৩২

৫ম সংখ্যা

দ্বিজের ত্রিজত্ব

কী দেখচি এ! কী করুণা! কী প্রেম! কী স্নেহ!
এত করুণা স্নেহ প্রেম দেখে নাই কভু কেহ ॥
যে যন্ত্রণা সহিনু আমি বাঁধা পড়ি' গিয়া করমে।
ছাড়িব না চরণ প্রভু ছাড়িব না কোন জনমে ॥
জ্বলিতেছিল হৃদে মোর তাপানল অনিবার।
নাহি ঠাঁই আজিকে সেথা আনন্দ রাখিবার ॥
দেখা দিলে যেই নয়নে মোর বাঁধা পড়ি গেল দিঠি।
যত কিছু ছিল মনের সাধ নিমেষে গেল মিটি' ॥
পাষাণে অঙ্কুরে বীজ করুণা-ধারায় তব।
ত্রিজ হ'ল দ্বিজ এ দীন জনম লভিয়া নব ॥

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিপথগা আনন্দলহরী

(১) ব্রহ্মার কমণ্ডলুনিঃসৃতা মন্দাকিনী-লহরী

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
ন বিভেতি কদাচন ॥

ইহার অনুবাদ

ব্রহ্মের আনন্দ যে বুঝিয়াছে,
ডরে না কভু সে কাহারো কাছে।

(২) শঙ্করশিরোধৃতা গঙ্গালহরী

যোগরতো বা ভোগরতো বা
সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তো
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ॥

ইহার অনুবাদ

যোগরত হোক্ ভোগরত হোক্ সঙ্গহীন বা সঙ্গরত।
ব্রহ্মে যে জন যোজিতচিত্ত আনন্দ তার অনবরত ॥

(৩) বিষ্ণুপদবাহিনী নবীনা ভাগীরথী-লহরী

উথলে বিশ্ব তোমার অনুপম আনন্দ হইতে।
আনন্দে রহিবে নরনারীসবে তোমার সহিতে ॥
ইহা চেয়ে মঙ্গল কি আছে আর এ ভব সংসারে।
সাবাস মন্দ ভীমতপা, যে আনন্দে বধি' মারে ॥
ভীম কৈলা শরশয়ন না জানি কী ফলের লোভে।
ভাবিয়া দেখিলে শকুনির মত পাপীকেই তাহা শোভে ॥
মুখ শিট্‌কান বিকট মুরতি দেখিলে উপজে ভয়।
তপস্যা ততটুকুই ভাল, যতটুকু দেহে সয় ॥
কাজ নাই তপস্যা আমার আনন্দ আমি চাই।
হেরিলে তোমার আনন্দরূপ কত না সুখ পাই ॥
তোমার আনন্দে করি ধ্রুবতারা ভাসাই তরণী
দুর্দ্দিনে পাইলে ভয়, তুমি মোর হও দিনমণি।
মাথায় করি লব, যবে তুমি পাঠাইবে মরণ।
মরণে সে ডরে না কভু, রহে যে ধরি' চরণ ॥

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন—

আমাদের পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্য শ্রীমতী হেমলতা দেবীর নিকট অনুরোধ-পত্র আসায় তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি কিছু লিখিতে বলেন, যাহাতে তাহা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর আগামী সংখ্যায় প্রকাশ হইতে পারে। তাই যৎকিঞ্চিৎ যাহা পারি লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিবার বহু কথা আছে। ক্রমশ তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। আজ এই সঙ্গে দুইটি কবিতা পাঠাইতেছি। ইহা তাঁহার শেষ রচনা। প্রথম কবিতাটি (দ্বিজের ত্রিব্রহ্ম) মৃত্যুর সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে লিখিত। ৫ঠা মাঘ সোমবার রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়, আর তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বুধবারে শান্তিনিকেতন পত্রিকার জন্য তিনি তাহার প্রুফ দেখিয়া দেন। দ্বিতীয় কবিতাটি (ত্রিপথগা আনন্দলহরী) তাঁহার শেষ রচনা। মৃত্যুর দিন প্রাতে এক-আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান আকারে ইহা তিনি সমাপ্ত করেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল, তিনি কি চিন্তা করিতেছিলেন, কি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেসম্বন্ধে অন্য কিছু না বলিলেও ঐ কবিতা দুইটিতেই প্রকাশ পাইবে। তাহা ছাড়া যাঁহারা তাঁহার নিকট থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, যাঁহাদের সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল, মনের কথা যাঁহাদিগকে বলিতে পারিতেন, তিনি তাঁহাদের নিকট নিজের এক বিমল আনন্দের ও পরমা শান্তির কথা সঙ্কোচের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীকে ইনি একখানি পত্র লেখেন। তাহার মধ্যে এইরূপ একটি কথা ছিল যে, তিনি এক এমন শান্তি পাইয়াছেন, যাহার পর আর কিছু অভিলাষ করিবার নাই। তিনি বলিতেন বহুদিন পূর্ব্বে একবার তিনি এইরূপ আনন্দ, এইরূপ শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, চেষ্টা করিয়াও তাহার আস্বাদ করিতে পারেন নাই। এই ঘটনা নারদের প্রথম ভগবদ্দর্শনের কথা মনে করাইয়া দেয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইত। ভগবানের যে তাঁহার প্রতি কত করুণা, তিনি যে তাঁহাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, ইহা তিনি প্রায়ই বলিতেন। উপনিষদে আছে, পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পরে বালকের মত থাকিবে। তাঁহার মধ্যে ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এবিষয়ে অনেক কথা আছে। পরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। তিনি যে জীবনের শেষ ভাগে অনেক সময় অধ্যাত্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন তাহা নানাভাবে প্রকাশ পাইত। তাঁহার বালকোচিত সরলতা ও বিচিত্র পরিহাসপ্রিয়তা শেষ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। আলস্য তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। প্রতিদিনই তিনি কিছু না কিছু লিখিতেন, মৃত্যুর দিনেও ইহার অন্যথা হয় নাই। তাঁহার শেষ কবিতার শেষ দুই চরণে লিখিয়াছিলেন—

"মাথায় করিয়া লব যবে তুমি পাঠাবে মরণ।
মরণে সে ডরে না কভু, রহে যে ধরি' চরণ।"

মরণের ভয়ের কোন চিহ্ন তাঁহার মুখে দেখা যায় নাই। তিনি অতি স্থির ও শান্ত ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের জ্যোতি ম্লান হয় নাই। ইতি

আপনাদের

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

*

* *

অনিল যে অন্দরে গিয়ে ধনিষ্ঠাকে অপমান করে' এসেছে এই খবরটা অনলের কাছে গিয়ে আপিসেই পৌঁছল। অনিল যে ধনিষ্ঠাকে অপমান করেছে সেকথা কাছারীময় ছড়িয়ে পড়েছিল; সকল কর্ম্মচারীরা এই ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার নিয়ে চুপি চুপি আলোচনা কর্‌ছিল; অনল তখন কার্য্য-উপলক্ষে তার ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়েছিল; সেই ঘরের পাশের ঘরের লোকেরা জান্‌তে পারেনি যে, পাশের ঘরেই অনল আছে; কাজেই তারা এই কথা অসঙ্কোচেই আলোচনা কর্‌ছিল। তাদের আলোচনা অনলের কানে গেল। অনল এই পর্য্যন্ত বুঝ্‌লে যে, অনিল ধনিষ্ঠার কাছে গিয়ে তাকে অপমান করে' এসেছে। কোন্ বাক্য বা আচরণে অনিল ধনিষ্ঠার অপমান করেছে তা সে শুন্‌তে পেলে না, শোন্‌বার ঔৎসুক্যও প্রকাশ করা উচিত মনে কর্‌লে না। সে স্বভাবতঃই গম্ভীর; অনিলের আগমনের পর থেকে সে আরো গম্ভীর হয়ে গেছে; এই সংবাদে সে আরো গম্ভীর হলো; কিন্তু কেউ তার গাম্ভীর্য্যের হ্রাসবৃদ্ধি উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লে না।

সে আপিসের কাজ করে' নিয়মিত সময়েই বাসায় ফিরে গেল।

আজ ধনিষ্ঠা নিজের কাছেই নিজের লজ্জায় অভিভূত হয়ে অনলের আপিস থেকে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন দেখ্‌তে আস্‌তে পারেনি।

অনিল দাদার প্রত্যাগমনের প্রত্যাশায় উৎসুক হয়ে পথ তাকিয়ে বাড়ীর বাইরেই দাঁড়িয়েছিল; দাদার কাছে টাকা নিয়েই ছটার গাড়ীতে সে কল্‌কাতা চলে' যাবে, খেনো খেয়ে তার অরুচি ধরে' গেছে, স্ফূর্ত্তির অভাবে তার প্রাণে ছাতা ধরে' যাচ্ছে।

অনল কাছে আস্‌তেই অনিল বল্‌লে—দাদা, আমায় টাকা দাও।

অনল তার পাশ দিয়ে চলে' যেতে যেতে বলে' গেল—টাকা আমার নেই; থাক্‌লেও দিতাম না; তুমি আমার কথা অগ্রাহ্য করে' কর্ত্রীঠাক্‌রুণকে অপমান করে' এসেছ।

অনিল কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু অনল তার কথা শোন্‌বার জন্যে অপেক্ষা কর্‌লে না। অনিল দাদার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে একবার দস্তুরমতো ঝগড়া জুলুম করে' টাকা আদায়ের চেষ্টা কর্‌বে স্থির কর্‌ছিল, কিন্তু তার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা হলো না, সে যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়াল। সে দেখ্‌লে ঠেলা-গাড়ীতে চড়ে' হাওয়া খেতে বেরিয়েছে তারই কন্যা প্রিসিলা। তার কন্যার বেশভূষা ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখে অনিলের ক্ষুদ্র চিত্ত হিংসায় জলে' উঠ্‌ল—এ বেটী তো আমার মেয়ে হয়ে দিব্যি সুখে ঐশ্বর্য্যে আছে। আর আমি ওরই বাবা হয়ে একটু মদ খাবার টাকার জন্যে এর দ্বারে ওর দ্বারে হাত পেতে পেতে ফ্যা ফ্যা করে' বেড়াচ্ছি, তবু ভিক্ষা মেলে না!

এই কথা মনে হতেই অনিল গৌরীর দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

ধনিষ্ঠা তার দুঃখ লজ্জা ভোল্‌বার জন্যে আজ সমস্ত দিন গৌরীকে নিয়েই ছিল; সে তার স্বাভাবিক নিপুণতাকে স্নেহে নিপুণতর করে' তুলে গৌরীকে আজ নিজের হাতে সাজিয়েছে—সবচেয়ে ভালো দামী পোশাক পরিয়েছে, তার সব গহনা দিয়ে তাকে ভূষিত করেছে; এমন-কি তার ঠেলাগাড়ীখানাকে পর্য্যন্ত নানান রঙের রেশমী কাপড় কুঁচিয়ে ঝালর করে' সাজিয়ে দিয়েছে। আজ গৌরীও মায়ের যত্নের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পেয়ে খুশী মনে বেড়াতে বেরিয়েছে।

অনিল এগিয়ে গিয়েই কন্যাকে সম্বোধন করে'

বল্‌লে—কি রে প্রিসি, তুই তো মস্ত বড় হয়েছিস, বেড়ে সুখে আছিস্‌।

পিতৃসন্দর্শনে গৌরীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে উঠ্‌ল, সে ভয়কাতর দৃষ্টিতে অবাক্‌ হয়ে পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তার তো এখনো অল্প অল্প মনে পড়ে এই মাতাল পিতার তার মায়ের উপর ও তার উপর অত্যাচারের কথা, আজই তো সে তার নূতন মাকে ভয় পেয়ে ঘরে পালিয়ে দরজায় খিল দিতে দেখেছে, যে ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ সেই ঘরে যে তাকে নিয়ে তার মা ঢুকে পড়েছিলেন, সে তো কম বিপদের আশঙ্কায় নয়! গৌরীর শিশুচিত্ত মাতাল পিতাকে দেখে ভয়ে বিমথিত হচ্ছিল।

অনিল একেবারে গৌরীর কাছে গিয়ে বল্‌লে—বাঃ বাঃ! বেড়ে তোফা মুক্তার মালা পরেছিস তো! দেখি দেখি!

এই কথা বলে'ই অনিল ঝুঁকে মুক্তার মালাটা হাতে তুলে নিলে; দু-একটা মুক্তার নিটোল দানা নখে খুঁটে' আঙুলে টিপে' পরখ করে' দেখ্‌লে মুক্তাগুলো ঝুটা কি না; যখন সেগুলোকে সাচ্চা বলে' প্রত্যয় হলো তখন সে চট্‌ করে' গৌরীর গলার পিছনে হাত দিয়ে হারের খামী খুলে হারছড়া গৌরীর গলা থেকে খুলে নিলে।

অনিল গৌরীর হার খুলে নিতেই গৌরীর সঙ্গের পরিচারিকার ও পাহারাওয়ালার মুখ শুকিয়ে গেল; পাহারাওয়ালা আবদালী অনিলকে বল্‌লে—হুজুর, মেম-দিদিমণির হার আপনি নিলে রাণী-মা হামাদের উপর গোস্‌সা কর্‌বেন, হামরা কি বলে' জবাবদিহি কর্‌ব?

অনিল হারছড়া জামার পকেটে রাখ্‌তে-রাখ্‌তে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্‌লে—রেখে দে তোদের রাণীমার গোস্‌সা। তোরা বলিস, মেম-দিদিমণির বাবা মেয়ের হার নিয়েছে। মেয়ের জিনিসে তো বাপেরই অধিকার।

অনিল আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে' নেশায় অবশ পদে যথাসম্ভব সত্বর ষ্টেশনের দিকে রওনা হলো।

গৌরীর রক্ষী অনিলকে চুরি করে' পালাতে দেখেও ম্যানেজার-বাবুর ভাই ও মেম-দিদিমণির পিতা বলে' তাকে বাধা দিতে পার্‌লে না; গৌরীর অঙ্গ থেকে কোনো অলঙ্কার অপহরণ নিবারণ করা তার কর্ত্তব্য, কিন্তু ম্যানেজারের ভ্রাতা ও রক্ষিতব্যার পিতাকে নিবারণ করা কর্ত্তব্য কি না, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে রক্ষী বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে' গেল; যদি অনিলকে বাধা দিলে ম্যানেজার-বাবু বা রাণী-মা ক্রুদ্ধ হন তা হলেও বেচারার চাক্‌রী যাবে, আর চুরি নিবারণ করেনি বলে'ও যদি তারা রুষ্ট হন তা হলেও বেচারার চাক্‌রী যাবে! সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে সঙ্গের পরিচারিকাকে বল্‌লে—এ বিধু, তুমি দিদিমণিকে দেখো, আমি দৌড়ে ম্যানেজার-বাবুর কাছে এত্তেলা করে' আসি……

সে কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে অনলের বাড়ীর দিকে ছুটল। ব্যস্ত ত্রস্ত স্বরে ডাকাডাকি করে' অনলের চাকরকে ডেকে সমস্ত বলার ও অনলের চাকরের বিস্ময় প্রকাশের পর সন্ধান করে' সে জান্‌লে যে ম্যানেজার-বাবু বাড়ীতে নেই, কোথায় গেছেন কেউ জানে না। অনল বাড়ীতে গিয়েই অনিলের উপদ্রবের ভয়ে খিড়্‌কি দরজা দিয়ে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল।

গৌরীর রক্ষী অনলের নাগাল না পেয়ে আবার ছুটে গৌরীর কাছে ফিরে গেল এবং পরিচারিকাকে বল্‌লে—এ বিধু, চলো বাড়ী ফিরে গিয়ে রাণী-মাকে এত্তেলা করি। ম্যানেজার-বাবু বাড়ীতে নেই আছে।

তারা দ্রুতপদে বাড়ী ফিরে চল্‌ল।

এত শীঘ্রই গৌরীকে বেড়িয়ে ফিরিয়ে আন্‌তে দেখে চাকর দাসী অনেকেই কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে এবং বিধু ও রক্ষীর কাছ থেকে তারা ব্যাপার শুনেই একসঙ্গে অনেকেই ছুটল রাণী-মাকে এই চমৎকার খবর দিতে; কে আগে খবর দিতে পারে এই প্রতিযোগিতায় রীতিমতো রেস্‌ লেগে গেল। একজন চাকর দুই দুই সিঁড়ি এক-সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—মা, মেম-দিদিমণির বাবা… …

এই পর্য্যন্ত বলে'ই সে দম নেবার জন্যে একটু থাম্‌ল।

ধনিষ্ঠা ঐটুকু কথা শুনেই মনে কর্‌লে, অনিল আবার হয়তো মত্ত অবস্থায় বাড়ীর ভিতর আসছে। ধনিষ্ঠা

সচকিত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় রে?

ভৃত্য বললে—রাস্তায়······দিদিমণির গলার মুক্তার হার······,

ধনিষ্ঠা এইটুকু শুনেই বুঝতে পারলে, কি ঘটেছে; সে স্থির শান্ত হয়ে দাঁড়াল।

ভৃত্য তার কথা শেষ করলে—খুলে নিয়েছেন।

ধনিষ্ঠা ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তিনি কোথায়?

এমন সময় বিধু গৌরীকে সঙ্গে করে' সেখানে এসে উপস্থিত হলো; সে ধনিষ্ঠার প্রশ্ন শুনে দূর থেকেই বললে—তিনি ইষ্টিশনের দিকে চলে' গেল।

ধনিষ্ঠার ইচ্ছা হলো, তার সমস্ত চাকর দারোয়ানকে সে হুকুম দেয় যেখানে পাবে অনিলকে ধরে' নিয়ে আসে; কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ল অনিল অনলের ভাই, গৌরীর জনক,—অনিলের অপমানে তাদের অপমান। সে অন্তর্বিগ্ন স্বরে বললে—ম্যানেজার-বাবুকে খবর দেওয়া হয়েছে?

বিধু নিকটে এসে বললে—ম্যানেজার-বাবু এইমাত্র বাড়ীতে এসেই কোথায় বেরিয়ে গেছেন।

ধনিষ্ঠা সংবাদ-দাতা ভৃত্যকে বললে—দারোয়ানদের বলো, পাঁচ সাত জন নানান দিকে গিয়ে ম্যানেজার-বাবুকে খবর দিয়ে আসুক।

ভৃত্য চলে' গেল।

এতক্ষণে ধনিষ্ঠা গৌরীর দিকে মনোযোগ দিতে পারলে; তার ম্লান মুখ দেখে সে ব্যথিত হয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে এবং হাসবার চেষ্টা করে' বললে—তোমার পাপা নিয়েছে নিকগে, আমি আবার তোমাকে ওর চেয়ে ভালো হার কিনে দেবো।

এই কথা বলে'ই ধনিষ্ঠার মনে পড়ল—অনিল তো সুযোগ পেলেই গৌরীর অলঙ্কার অপহরণ করবে; ছেলে-মানুষকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে' রাখাও তো ঠিক হবে না; গহনার লোভে কত লোক তো শিশু-হত্যা করে শোনা যায়; পিতা হলেও মাতাল অনিল এ'কে তো হত্যা করতেও পারে; গৌরীর সঙ্গের রক্ষকেরা গৌরীর পিতাকে ও ম্যানেজারের ভাইকে আজকের মতনই বাধা দিতে দ্বিধা বোধ করবে, আর সেই দ্বিধার ফাঁকে এই কচি প্রাণটুকু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ধনিষ্ঠা এই ভেবে গৌরীকে বললে—মা গৌরী, তোমার গহনা সব এখন খুলে রাখো, বড় হয়ে যখন আর বাড়ী থেকে বেরুবে না তখন পোরো।

গৌরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে বললে—তাই রাখো মা। পাপা বিলাত চলে' গেলে পরব। আজ যখন আমার হার খুলে নিতে এল তখন এমন ভয় হয়েছিল!—আমি মনে করেছিলাম আমাকে মারতে আসছে।

ধনিষ্ঠা ম্লান মুখে গৌরীর গহনা খুলে নিতে বসল; সে বিধবা হয়ে যেদিন নিজের গায়ের গহনা মোচন করেছিল সেদিন সে এত দুঃখ অনুভব করেনি; এক-একখানি গহনা সে খুলে নিচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল যেন তার বুক-ঢাকা পঞ্জরের এক-একখানা হাড় খসে' যাচ্ছে। তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল।

গৌরী ধনিষ্ঠার কান্না দেখে কোমল স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—মা, তুমি কেঁদো না, আমি তো বিলাতে থাকতে কোনো গহনাই পরতাম না।

বালিকার মুখে সান্ত্বনার কথা শুনে ধনিষ্ঠার চোখ দিয়ে আরো বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। বিলাতে গৌরী নিরাভরণা ছিল যে মাতাল পিতার অত্যাচারে, এখানেও নিরাভরণা হচ্ছে তারই জন্য।

অনেক বিলম্বে অনলের কাছে যখন ভাইএর কুকীর্তির সংবাদ পৌছল, তখন অনল ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দারোয়ানদের হুকুম দিলে—যেখানে পাও ছোট-বাবুকে ধরে' আমার কাছে নিয়ে এস।

অনিলকে কিন্তু গ্রামে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না; সে তখন রেলগাড়ীতে চড়ে' কলকাতায় ফুর্তি করতে ছুটেছে।

অনল যখন অনিলের গ্রাম থেকে পলায়নের খবর পেলে, তখন সে রোষে ক্ষোভে বিহ্বল হয়ে ধনিষ্ঠার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার বাবু এসেছেন।—খবর পেয়েই ধনিষ্ঠা

চম্‌কে উঠ্‌ল। এমন সময়ে তাঁর আগমন! ধনিষ্ঠা বুঝ্‌তে পার্‌লে, তিনি অনিলের চুরি সম্বন্ধেই কিছু বল্‌তে এসেছেন। সে কুণ্ঠিত হয়ে সংবাদদাতা ভৃত্যকে বল্‌লে—তাঁকে এইখানে ডেকে আনো।

অনল এসেই কোনো ভূমিকা না করে'ই বলে' উঠ্‌ল—আপনি যখন খবর পেয়েছিলেন তখনই যদি সেই পাষণ্ডটাকে ধরে' আন্‌তে হুকুম দিতেন তা হলে সে পালাতে পার্‌ত না।

ধনিষ্ঠা মাথা নীচু করে' ধীর স্বরে বল্‌লে—সে গৌরীর পিতা, আপনার ভাই, আমার স্বর্গীয় স্বামীরও ভ্রাতৃতুল্য; তাঁকে আমি দারোয়ান দিয়ে ধরিয়ে তো অপমান কর্‌তে পারিনে।

অনল রুষ্ট ক্ষুব্ধ স্বরে বলে' উঠল—কিন্তু যে বিকৃত-স্বভাব তাকে তার পাপাচরণে বাধা না দেওয়া যে ভয়ানক অন্যায়।

ধনিষ্ঠা শান্ত স্বরে বল্‌লে—সেইজন্যেই তো আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

অনল বল্‌লে—আমি যখন খবর পেলাম তখন সে ভেগেছে। আমি কল্‌কাতায় পুলিশে টেলিগ্রাম করে' পাঠাচ্ছি।

ধনিষ্ঠা মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে বল্‌লে—না, ও-সব কর্‌বেন না। সে গৌরীর পিতা।

অনল নিরুদ্ধ রোষে ক্ষোভে গম্ভীর হয়ে আর কোনো কথা না বলে' সেখান থেকে চলে' এল।

ধনিষ্ঠা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পূজার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

*

* *

অনিল পাঁচ দিন পরের রাত্রিকালে প্রমত্ত অবস্থায় কল্‌কাতা থেকে বাসুন্দিয়া গ্রামে ফিরে এল; সঙ্গে করে' নিয়ে এল এক স্ত্রীলোক।

অনল আর সহ্য করে' নীরব থাক্‌তে পার্‌লে না; সে গম্ভীর কঠোর স্বরে অনিলকে বল্‌লে—তুমি একেবারে লজ্জার মাথা খেয়ে গোল্লায় গেছ! এমন বেহায়া অনাচার আমার বাড়ীতে চল্‌বে না। তুমি দূর হয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে, যদি না যাও, আমি তোমাকে জোর করে' বার করে' দেবো।

অনিল স্খলিত বচনে বল্‌লে—কেন? আমি এমন কি অন্যায় করেছি? নিজে যা করো সেটা অন্যায় অনাচার নয়?

অনল ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমি কি অনাচার করি শুনি?

অনিল বল্‌লে—নেকা সাজ্‌ছ? শোনোনি নাকি? গাঁয়ের সবাই জানে, কেবল তুমিই জানো না?

অনল কৌতূহলে ও সন্দেহে ব্যগ্র হয়ে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সবাই কি জানে শুনি?

অনিল বল্‌লে—জমিদারণীর সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়! নামেই গুপ্ত, কিন্তু জান্‌তে কারো বাকী নেই।......

অনল অনিলের কুৎসিত কলঙ্কারোপে মর্ম্মাহত হয়ে ডেকে উঠ্‌ল—অনিল!

আর অনিল! নেশার ঝোঁকে যে কথা সে বল্‌তে ধরেছে তাকে রোধ করা তার দুঃসাধ্য, সে বলে' চল্‌ল—গৌরী তোমাকে বলে বাবা আর রাণী-বৌদিদিকে বলে মা; এর কি কোনো মানে নেই? রাজ-সর্‌কারে চাকরী তো অনেকেই করে, কিন্তু রাজবাড়ী থেকে তোমার বাড়ীতেই বা এত উপহার আসে কেন? এত টাকা রোজগার করো, তবু তুমি বিয়ে করোনি কেন? এর তুমি একটা জবাবদিহি কর্‌তে পারো?

অনল অনিলের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল; সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌ল অনিলের প্রমত্ত প্রলাপ—রাণী-বৌদিদির হঠাৎ লেখাপড়া শেখ্‌বার সখ কেন হয়? দেশে তুমি ছাড়া আর মাষ্টার কেন পাওয়া যায়নি? রোজ দু-বেলা নিজের সাম্‌নে বসিয়ে তোমাকে খাওয়ানোর ঘটা রাণী-বৌদিদি কেন কর্‌ত? ব্রতের ব্রাহ্মণ-ভোজনে তুমি একদিনও বাদ পড়োনি কেন?

কথা বল্‌তে বল্‌তে অনিলের স্বর ক্রমশঃ এড়িয়ে যেতে যেতে অস্পষ্ট হয়ে গেল, অনল আস্তে আস্তে ঘুমে অভিভূত হয়ে পড়্‌ল।

অনিলের প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে অনলের হৃদয় বেদনায় একেবারে টলটল করছিল; কিন্তু তার নিজের দিকে মনোযোগ করবার তখন অবসর ছিল না; অনিল অচেতন হয়ে পড়্‌তেই তার দৃষ্টি পড়্‌ল অনিলের সঙ্গিনীর উপর। অনল গম্ভীর স্বরে তাকে বল্‌লে—রাত বারোটার সময় কল্‌কাতা যাবার একটা গাড়ী আছে; তুমি সেই গাড়ীতে চলে' যাও; আমি পাল্কী আনিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গে দারোয়ান দিচ্ছি, তারা তোমায় ষ্টেশনে রেখে আস্‌বে। তুমি কিছু খেয়ে নেবে এস।

সেই স্ত্রীলোকটি অনিলের সঙ্গে আস্‌বার সময় দেখে এসেছিল চারিদিকে সিপাই সান্ত্রী বরকন্দাজ লাঠিয়াল; যার সঙ্গে সে এসেছে সে মাতাল বেহুঁস হয়ে পড়ে' আছে; সে এখন একাকিনী; এখন তাকে মেরে পুঁতে ফেল্‌লেও তার মা বল্‌তে নেই, বাপ বল্‌তে নেই; সুতরাং সে আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করে' অনলের আহ্বানে উঠে দাঁড়াল।

আহার করে' উঠ্‌তেই অনল তাকে সংবাদ দিলে, পাল্কী এসেছে।

স্ত্রীলোকটি ভয়ে ভয়ে মুখ কাচুমাচু করে' অনলকে বল্‌লে– বাবু আমাকে টাকা দেবার চুক্তি করে' এতদূরে নিয়ে এসেছিলেন।

অনল গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কত টাকা?

সে বল্‌লে— দেড় শো টাকার চুক্তি ছিল।

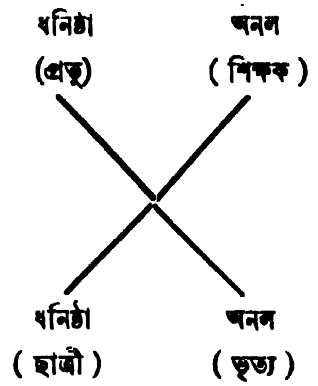
অনল চিন্তিত হলো—তার কাছে তো দেড় শো পয়সা নেই। এত রাত্রে খাজাঞ্চিখানাও খোলা নেই। উপায়? শেষ কালে কি এই পাপ বিদায় কর্‌বার জন্যে ধনিষ্ঠার কাছে টাকা ধার কর্‌তে যেতে হবে? অনিলের মুখে যে কথা সে শুনেছে তার পর সে ধনিষ্ঠার সম্মুখে কেমন করে' উপস্থিত হবে? ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার মনে পড়্‌ল, অনিল গৌরীর গলার মুক্তার মালা নিয়ে গিয়ে এইসব অনাচার করেছে; মুক্তার মালা সে সামান্য দামেই বেচেছে নিশ্চয়, তবু তার কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকা সম্ভব, নইলে সে কোন্ সাহসে এ'কে দেড় শো টাকা দেবে বলে' এখানে নিয়ে এসেছে। এই কথা মনে হতেই অনল অনিলের জামার পকেটে হাত ভরে' দিলে। হাতে মনিব্যাগ ঠেক্‌ল। মনি-ব্যাগ বার করে' ব্যাগ খুলে অনল দেখ্‌লে ব্যাগের মধ্যে নোট ও খুচরা টাকা রেজকী পয়সা আছে। নোট গুণে দেখ্‌লে, সতেরো-খানা দশ টাকার ও দুখানা পাঁচ টাকার নোট আছে। তাই থেকে সে পনেরো-খানা দশ টাকার নোট আলাদা করে' নিলে। সেই নোট-কখানা সেই মেয়েটির হাতে দিতে গিয়েই অনলের মনে হলো, এই টাকা গৌরীর গলার মুক্তামালা বেচে সংগৃহীত। এই টাকা অপব্যয় কর্‌তে অনলের হাত উঠ্‌ছিল না। কিন্তু সে এত রাত্রে কার কাছে কি বলে' টাকা ধার কর্‌তে যাবে স্থির কর্‌তে না পেরে সেই টাকাই ওকে দিয়ে দিলে।

বাড়ী থেকে পাপ বিদায় হয়ে গেলে অনল চাকরদের বল্‌লে, অনিলকে ধরাধরি করে' নিয়ে গিয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিতে। সে চাকর-দাসী সকলকে খেতে অনুমতি দিয়ে জানালে যে সে আজ আর কিছু খাবে না। এই কথা শুনে হরির মা হেঁসেল-ঘরে গজগজ করে' বক্‌তে লাগ্‌ল— এইসব অনাছিষ্টি কাণ্ডের পর বেরাহ্মনের কি খেতে রোচে? আহা মুখের অন্ন গা! এমন লোকের অমন ভাই? পোড়াকপাল অমন ভাইএর!......

অনল বাড়ীর ছাদে গিয়ে পায়চারি কর্‌তে কর্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌ল অনিলের প্রশ্নমালার উত্তর। গৌরী যে তাকে বাবা ও রাণীকে মা বলে, এ তো একেবারে অচিন্তিত ঘটনা; তখন সে মনে করেছিল গৌরী পিতৃমাতৃহীন, তার পিতামাতার স্থান যে দুজনে পূর্ণ কর্‌বে তাদের গৌরী বাবা ও মা বলে' ডাক্‌লে সে পিতৃমাতৃহীনতার দুঃখ কখনো অনুভব কর্‌বে না বলে'ই তাকে ঐরকমভাবে ডাক্‌তে শেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে তো কোনো দুষ্য অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল না। রাজবাড়ী থেকে তার বাড়ীতে উপহার যথেষ্ট এসেছে বটে; কেন এসেছে? সে তো কোনো দিন কিছু প্রার্থনা করেনি; যিনি দিয়েছেন তিনি জানেন কেন। সে তো অনিলের জন্যই বারে বারে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে; তার দুঃখ দেখে ব্যথিত হয়েই রাণীর ভাণ্ডার বোধ হয় মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখ তো দেশে অনেকেরই আছে,

তার প্রতি এই বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণের অর্থ কিছু আছে কি?

এই সন্দেহ মনে হতে অনলের অন্তর সন্ত্রস্ত লজ্জিত কুণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌ল, সে তাড়াতাড়ি অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ কর্‌লে। সে বিয়ে করেনি কেন? যে এ প্রশ্ন কর্‌ছে তারই জন্যে সে বিয়ে করার কল্পনাও মনে আন্‌তে পারে-নি; সে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায় নেশার আর পাপাচরণের খরচ জুগিয়ে এসেছে সে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না,সে কেন বিয়ে করেনি। সে যখন ভাইএর মৃত্যুসংবাদ পেলে তখনও তার বিয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে এল তার ভাইঝি গৌরী; পাছে নিঃসম্পর্কীয়া রমণী পরের বাড়ী থেকে হঠাৎ এসে গৌরীকে স্নেহের চক্ষে না দেখে, এই ভয়েই তো সে বিয়ের চিন্তা মন থেকে বিসর্জ্জন দিয়েছিল। কিন্তু শুধুই এই কি তার বিয়ে না করার কারণ? অনিল তার মনে যে সন্দেহ উদ্রেক করে' দিয়েছে, এখন ক্রমাগত তাই তার মনের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে মেরে তাকে বিভীষিকা দেখাচ্ছে। বাস্তবিকই কি তার ও ধনিষ্ঠার মনে অস্বীকৃত অনুরাগ লুকিয়ে ছিল? রাণী তার কাছেই লেখাপড়া শিখ্‌তে শুরু করেছিলে; সে কি তাকে নিত্য নিকটে পাবার লোভে? তিনি তাকে যত্ন করেছেন, সাহায্য করেছেন, তা কি কেবলই তাঁর ম্যানেজার ও শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকেই? সেও তো রাণীর কাছে প্রভুর সম্মুখে ভৃত্যের মতন ব্যবহার করেনি; অনেক সময় সমান পদবীর লোকের মতন ব্যবহার করেছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ের ভাবে কথা বলেছে; এরই বা কারণ কি? এর কারণ নিত্যকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আর ধনিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রভু-ভৃত্য ও শিক্ষক-ছাত্রী এই যুগল সম্পর্ক। প্রভু বলে' ধনিষ্ঠা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করেছেন, তাকে আদেশ করেছেন, সে পালন করেছে; আবার অপর পক্ষে সে শিক্ষক বলে' ছাত্রীর কাছে সম্ভ্রমে তটস্থ হয়ে থাকেনি; একবার ধনিষ্ঠা বড়, সে ছোট, অন্যবার সে বড় ধনিষ্ঠা ছোট; একটা ঢেরা কেটে এক রেখার উপরে প্রভু ধনিষ্ঠার নাম ও নিম্নে ভৃত্য তার নাম এবং অপর রেখার উপরে শিক্ষক তার নাম ও নিম্নে ছাত্রী ধনিষ্ঠার নাম লিখ্‌লে তাদের সম্পর্ক স্পষ্ট হবে—



তারা উভয়েই একবার নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অনুভব করেছে, আবার অন্যবার অপরের চেয়ে লঘু প্রতিপন্ন হয়েছে; কাজেই তারা পরস্পরের সমকক্ষ-রূপেই সন্নিহিত হয়েছে—ধনিষ্ঠা প্রভু ও অনল শিক্ষক সমকক্ষতা উপলব্ধি করেছে এবং ভৃত্য অনল ও ছাত্রী ধনিষ্ঠা সমকক্ষতা অনুভব করেছে। কিন্তু তারা কি কেবল এই-জন্যেই সমকক্ষতা বোধ করেছিল? এর অভ্যন্তরে আর কিছু ছিল না? যে সন্দেহ একবার মাথা তুলে উঠেছে তাকে নিরস্ত কর্‌তে সে পার্‌ছিল না; সে নিজের অন্তস্তল অনুসন্ধান করে'ও বল্‌তে পার্‌ছিল না—না, এই কারণ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই। তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল, কোন্ দিন কখন কি উপলক্ষে ধনিষ্ঠার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ধনিষ্ঠা তার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চেয়েছে, ধনিষ্ঠার মুখ মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে! তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল, সেও তো ধনিষ্ঠাকে পড়াতে যাবার সময়টির জন্যে সতৃষ্ণ হয়ে ঘড়ীর দিকে ফিরে ফিরে তাকাত; ধনিষ্ঠার সঙ্গ, দৃষ্টি, হাসি, বাক্য তাকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দিয়েছে—এখনো দেয়। তার এখন মনে পড়্‌ল—সকলে ধনিষ্ঠাকে রাণী-মা বলে,কিন্তু সে তাকে কেবল রাণী বলে'ই উল্লেখ করেছে—বড় জোর রাণীজী বলেছে! এর কারণ তো এতদিন সে ভেবে দেখেনি; কিন্তু আজ অনিলের কথার আঘাতে যে সন্দেহের আগুনে তার মন পুড়্‌ছে তারই আলোকে সে আজ নিজের অন্তরলোক তন্ন তন্ন করে' খুঁজে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। সে যে এতদিন অজ্ঞাত কলুষতা চিত্তপুরে গোপন করে' রেখেছিল তার জন্যে সে আপনাকে শত ধিক্কার

দিলে; আপনার প্রতি তার আর বিশ্বাস রইল না। যদিই বা তার মনের এই ক্ষীণ অনুরাগ তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যেই সুপ্ত গুপ্ত থাকত, কিন্তু একবার যখন তাকে খুঁচিয়ে জাগানো হয়েছে তখন তাকে আর লুকিয়ে রাখা যাবে না। যদি কোনো অসাবধান মুহূর্ত্তে সে আত্মসম্বরণ করতে না পারে তবে ধনিষ্ঠা তাকে কী হীন অপদার্থ ভাববেন? তাঁর কাছে সম্মান হারানো অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়, অন্য সকল-প্রকার দুঃখ বরণীয়। আজ অনিল যেরকমভাবে তাকে বচনীয় করলে, এম্‌নি যদি কেউ তাঁকে ইঙ্গিতেও খোঁটা দেয়, তবে তিনি তাকেই বা কি ভাববেন? তার পর সে তাঁর সম্মুখে গেলে তিনি কি আর তাকে আগের মতন সম্মান সমাদর করতে পারবেন? দুশ্চরিত্রকে কেউ কখনো সম্মান করতে পারে? যার জন্যে মানুষ দুশ্চরিত্র হয় সেও তাকে ঘৃণা করে। অতএব আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে সুখভোগে ধিক্ থাক। ধনিষ্ঠা কি এইজন্যেই তার কাছে পড়া বন্ধ করে' দিয়েছিলেন? তার বদলে হরকান্তকে জমিদারীর কাগজপত্র সই করাতে আদেশ করেছিলেন? ধিক্ মূঢ় ধিক্, আগে সে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি! কী দারুণ অপমান মাথায় বহন করে' সে বেড়িয়েছে! লোকে তার মুখের কালী দেখে হেসেছে, কিন্তু মূঢ় সে বুঝতে পারেনি, কখনো নিজের হৃদয়দর্পণের দিকে চেয়ে দেখেনি সেখানে তার কী কুৎসিত কলঙ্কলিপ্ত বিভীষণ মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়েছে!

চিন্তায় গ্লানিতে লজ্জায় অনলের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। ভোরবেলা যখন কাক-কোকিল ডেকে উঠ্‌ল তখন সে ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে মাঠের মধ্যে বেরিয়ে পড়্‌ল।

*

* *

ধনিষ্ঠা তখন সবে পূজার ঘর থেকে বেরিয়েছে, একজন ভৃত্য এসে খবর দিলে—হরকান্ত-বাবু পেশকার মশায় এসেছেন।

এমন অসময়ে পেশকার এসেছে! এমন কি জরুরী কাজ! ধনিষ্ঠা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে—তাঁকে আপিস-ঘরে নিয়ে আয়।

ধনিষ্ঠা আপিস-ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ক্ষণকাল পরেই পেশকার প্রবেশ করলে। পেশকারকে দেখেই ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলে। পেশকার বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবু এই চিঠিটা আপনাকে এখনই দিতে বল্‌লেন, কি জরুরী কথা আছে।

পেশকার একখানা চিঠি ধনিষ্ঠার সাম্‌নে রেখে দিলে। ধনিষ্ঠা হাতীর দাঁতের ফারফোর জাফ্‌রীকাটা একখানা কাগজ-কাটা ছুরী দিয়ে সেই চিঠি কেটে চিঠি বার করে' পড়্‌তে লাগল—

মহামহিমাময়ী রাণী শ্রীমতী ধনিষ্ঠা দেবী
মহোদয়ার সমীপে

বহুল সম্মান ও বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন,

বিশেষ প্রয়োজনীয় কোনো কারণবশতঃ আমি আর মহাশয়ার আশ্রয়ে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। অতএব অধীনের বিনীত নিবেদন এই অধীনকে অদ্য হইতেই কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। আমি কাহাকে আমার কর্ম্মের ভার বুঝাইয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করিব তাহাও জানিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমি আজই বামুন্দিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এবং গৌরীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলে অনুগৃহীত হইব। গৌরীকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে-সব অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সামগ্রী উপহার দিয়াছেন, তাহা এখন আপনার নিকট রাখিলেই অনুগৃহীত হইব। গৌরীর বিবাহ হইয়া গেলে আপনি সংবাদ পাইবেন; তখন ইচ্ছা হয় তাহাকে আপনার যাহা দেয় দিবেন।

আপনি আমার উপর যে অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তাহার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব।

আজ্ঞাধীন ভৃত্য
শ্রী অনল ঘোষাল।

চিঠি পড়্‌তে পড়্‌তে ধনিষ্ঠার মুখে হৃদয়ের সমস্ত রক্ত গিয়ে জড়ো হলো, তার হৃৎপিণ্ড বেদনায় টনটন করতে লাগ্‌ল; তার মনে হলো এই আকস্মিক আঘাতে তার

চেতনা লুপ্ত হয়ে আস্‌ছে। সে চিঠি থেকে চোখ তুল্‌তেই দেখ্‌লে তার সাম্‌নে বৃদ্ধ হরকান্ত স্থূল দেহ বিস্তার করে' তার আদেশ প্রতীক্ষা কর্‌ছে। তার সাম্‌নে পাছে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, এই ভয়ে মনে বল সঞ্চয় করে' সে উঠে দাঁড়াল এবং কেবলমাত্র অতি মৃদু অস্ফুট স্বরে "আস্‌ছি" বলে' সে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা স্নানের ঘরে চলে' গেল। হরকান্তের সঙ্গে বেশী কথা বল্‌তেও তার সাহস হলো না পাছে তার উদ্বেল ক্রন্দন চোখ ছাপিয়ে পড়ে অথবা কথা বল্‌তেই তার গলা কেঁপে যায়। স্নানের ঘরে গিয়েই সে দরজা বন্ধ করে' ঘটী ঘটী জল মাথায় ঢাল্‌তে লাগ্‌ল এবং বিগলিত জলধারার সঙ্গে অশ্রুধারা মিলিয়ে দিয়ে সে নিজের কাছ থেকেও নিজের কান্না গোপন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। সে ভাব্‌ছিল অনলের এই আকস্মিক পত্রের কি কারণ হতে পারে? অনিল কি তাকেও মিথ্যা অপবাদে ব্যথিত করেছে? সেই লজ্জায় কি তিনি আমার সংস্রব ত্যাগ করে' চলে' যেতে উদ্যত হয়েছেন? কিন্তু গৌরী আমার কাছে থাক্‌লে কী ক্ষতি হতো? গৌরীকে ছেড়ে আমি কেমন করে' থাক্‌ব? গৌরী আমার কাছে থাক্‌লে তার সম্পর্কে অনিল এখানে এসে উপদ্রব কর্‌তে পারে ভেবেই কি তিনি গৌরীকেও নিয়ে যাচ্ছেন? অনিল যদি গৌরীকে কোনো রকমে দুঃখ দেয়? উনি তো পুরুষ মানুষ, কর্ম্মে ব্যস্ত থাক্‌বেন, আমার গৌরীকে কে দেখ্‌বে? উনি যে হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন ওঁর চল্‌বে কিসে? উনি তো সন্ন্যাসী মানুষ, কিন্তু গৌরী তো কষ্ট সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। হা ভগবান্! জন্মগত সম্পর্ক না থাক্‌লে কি আর কোনো সম্পর্ক গ্রাহ্য হয় না? গৌরী, গৌরা, মা আমার! আমি তো পাষাণী, তোকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো, কিন্তু তুই আমাকে ছেড়ে কেমন করে' থাক্‌বি?

ধনিষ্ঠা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে ও ক্রমাগত মাথায় জল ঢালার ফলে শীতে যখন কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল তখন সে স্নান সমাপ্ত করে' কাপড় ছেড়ে ঘর থেকে বেরুলো। সে যখন আবার আপিস-ঘরে ফিরে এল, তার শ্রী দেখে হরকান্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল—সদ্যস্নানে তাকে খুব তাজা সুন্দর দেখাচ্ছিল, আবার তার চোখ মুখ লাল থম্‌থমে হয়ে থাকাতে তাকে পীড়িতা বলে'ও আশঙ্কা হচ্ছিল।

ধনিষ্ঠা চেয়ারে ব'সেই ফাউন্টেন্ পেন খুলে অনলের আবেদন-পত্রের কোণে অকম্পিত হস্তে স্পষ্ট স্পষ্ট করে' লিখ্‌লে—ছুটি মঞ্জুর। কর্ম্মভার সহকারী-ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ কর মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন। গৌরীকে ঠিক পাঁচটার সময় আপনার বাসায় পাঠাইয়া দিব। শ্রী ধনিষ্ঠা মিত্র মুস্তফী; ১৮ই মাঘ।

অনলের চিঠিখানা একটা খামের মধ্যে ভরে' খাম বন্ধ করে' উপরে শিরোনামা লিখ্‌লে—শ্রীযুক্ত অনল ঘোষাল, ম্যানেজার-মহাশয়। সেই খামখানা হরকান্তের হাতে দিয়ে ধনিষ্ঠা অকম্পিতকণ্ঠে বল্‌লে—বৈকুণ্ঠ-বাবুকে বল্‌বেন তিনি যেন চারটের সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে' যান।

"যে আজ্ঞে" বলে' হরকান্ত প্রস্থান কর্‌লে।

*
* *

ধনিষ্ঠা ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এল তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল মাধবী। মাধবী ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়েই বলে' উঠ্‌ল—মা, তোমার অসুখ করেছেন নাকি?

ধনিষ্ঠা সেকথা গ্রাহ্য না করে'ই মাধবীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, গৌরী কোথায়? তার খাওয়া হয়েছে?

মাধবী বল্‌লে—মেম-দিদিমণি পুতুলের ঘরে খেলা কর্‌ছে দেখে এলাম। এখনো খাওয়া হয়নি।

ধনিষ্ঠা আর কিছু না বলে' গৌরীর সন্ধানে প্রস্থান কর্‌লে।

সে গৌরীর কাছে গিয়ে হাস্‌বার চেষ্টা করে' বল্‌লে—মা মণি, কি হচ্ছে?

কথা বল্‌তে তার স্বর যে কেঁপে ওঠে, চোখের মধ্যে অশ্রু যে ধারণ করে' রাখা যায় না; অবাধ্য অশ্রুকে গোপন রাখা যে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু গৌরীর সাম্‌নে কান্না কিছুতেই নয়, ছেলেমানুষ ভয় পাবে, কষ্ট পাবে; লোকের সাম্‌নেই কাঁদা চল্‌বে না—এ আমার একলার নিতান্ত গোপনীয় দুঃখ।

গৌরী হাসিমুখে একটা বড় পুতুল দেখিয়ে বল্‌লে—মা, এই মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ী যেতে কাঁদ্‌ছে।

ধনিষ্ঠা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেউ কেউ তো আবার বাপের বাড়ী যেতেও কাঁদে?

গৌরী বল্‌লে—দূর! বাপের বাড়ী যেতে কি কেউ আবার কাঁদে?

ধনিষ্ঠা বল্‌লে—ধরো, তোমাকে যদি তোমার বাবা তাঁর দেশে নিয়ে যান?

গৌরী এবার ভয় পেয়ে বল্‌লে—তা হলে আমি কাঁদ্‌ব।

ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন? এই তো তুমি বল্‌লে, কেউ বাপের বাড়ী যেতে কাঁদে না।

গৌরী বল্‌লে—বা রে! তাদের বাপের বাড়ীতে যে বাপও থাকে মাও থাকে; আমার বাবার বাড়ীতে তুমি যদি যাও তা হলে আমি কাঁদ্‌ব কেন? নইলে কাঁদ্‌ব।

ধনিষ্ঠা টপ করে' গৌরীকে কোলে তুলে নিয়ে আজ বারম্বার তার মুখচুম্বন কর্‌তে লাগ্‌ল।

মাধবীও ধনিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে এসে ধনিষ্ঠার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আজ মায়ের এই ম্লেচ্ছের মুখে চুমু খাওয়া অনাচার দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল; স্নেহের প্রাবল্যে অসতর্ক মনে তিনি ভুল করে' ফেলেছেন মনে করে' সাবধান কর্‌বার জন্ম সে বলে' উঠ্‌ল—মা, ও কর্‌ছ কি? দিদিমণির মুখে মুখ দিচ্ছ!

ধনিষ্ঠা হাস্‌বার চেষ্টা করে' পুনঃপুনঃ গৌরীর মুখচুম্বন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—দেবো দেবো এর মুখে মুখ দেবো, নইলে বুক আমার ভেঙে যাবে……

ধনিষ্ঠা আর ক্রন্দন সম্বরণ করে' থাক্‌তে পার্‌লে না, তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে' অশ্রু ঝরে' পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—যতদিন গৌরী আমারই ছিল ততদিন তো তার মাধুর্য্য সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি। আজ তাকে হারাতে চলেছি, আজ বুঝ্‌ছি, এতদিন কি মধুর আস্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে' রেখেছি। স্নেহের রাজ্যে প্রীতির রাজ্যে অন্তর-রাজ্যে ম্লেচ্ছ অস্পৃশ্য বলে' কেউ নেই!

খানিকক্ষণ কেঁদে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধনিষ্ঠা মাধবীকে বল্‌লে—গৌরীর ভাত দিয়ে যেতে বল্।

ধনিষ্ঠার অকস্মাৎ অকারণ কান্না দেখে মাধবী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে নড়্‌ল না। গৌরীর পরিচারিকা ধনিষ্ঠার আদেশ পালন কর্‌তে চলে গেল।

গৌরীর ঝি গৌরীর ঠাঁই করে' রেখেছিল। বামুন-ঠাকুর ভাত দিয়ে যায় আর সে গৌরীকে কাছে বসে' খাওয়ায়। আজ বামুন-ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল; ধনিষ্ঠা নিজে গৌরীকে খাওয়াতে বস্‌ল। গৌরী নিজে হাতে খেতে শেখার পর আর গৌরীর ঝি নিযুক্ত হওয়ার পর ধনিষ্ঠা আর কোনো দিন গৌরীর উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করেনি। আজ সে গৌরীকে খাইয়ে দিতে বস্‌ল দেখে গৌরী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল আর মাধবী বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেল।

খানিক পরে মাধবী বিস্ময়বিমূঢ়তা থেকে আপনাকে সচেতন করে' তুলে ধনিষ্ঠাকে বল্‌লে—মা, তোমার এ কি কাণ্ড বলো দেখি? নিজে কখন খাবে-দাবে? ভাত-কটা তো জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে!

ধনিষ্ঠা বাদল দিনের অস্তগামী সূর্য্যের ক্ষণিক প্রকাশের মতন ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—আর আমার খাওয়া! আমি আজ আর খাবো না। তোরা সবাই খেয়ে দেয়ে নিগে যা……

মাধবী বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে বলে' গেল—ধন্যি মেয়ে মা তুমি, খিদে-তেষ্টাও লাগে না! খামখা নিত্যি উপোষ, নিত্যি উপোষ।

তার পর নিজের মনে গজর গজর করে' বক্‌তে বক্‌তে মাধবী প্রস্থান কর্‌লে।

গৌরীকে নিজে হাতে খাইয়ে মুখ ধুইয়ে দিয়ে ধনিষ্ঠা তাকে কোলে করে' নিয়ে বস্‌ল। গৌরী আজ মাকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়ে আনন্দে অনর্গল বকে' চলেছিল। ধনিষ্ঠার মনে হচ্ছিল গৌরীকে আর হয়তো কখনো সে দেখ্‌তে পাবে না, গৌরীকে আজ এই শেষ দেখা; এবং সেই দেখাও শেষ হয়ে আসার মুহূর্ত্ত প্রবল বেগে অগ্রসর হয়ে আসছে! সুতরাং আজ গৌরীকে কাছছাড়া করে' তুচ্ছ আহার বা বিশ্রাম কর্‌বার তার

অবসর নেই। সে গৌরীকে কাছে বসিয়ে তার সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে তার সমস্ত জিনিস বাক্‌সে গুছিয়ে দিতে লাগ্‌ল; গৌরীর বাসন বিছানা পর্য্যন্ত নিজের হাতে সে বাক্‌সে তুল্‌তে লাগ্‌ল।

মাধবী মার কাণ্ড দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে —এ-সব কী হচ্ছে মা?

ধনিষ্ঠা ম্লান মুখে হেসে বল্‌লে—আমরা দুজনে তীর্থে যাবো।

মাধবীর মুখ তীর্থদর্শনের পুণ্যলোভে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, সে হর্ষভরা স্বরে বল্‌লে—ওমা তাই বলো। আমি শতেকখানা ভাব্‌তে লেগেছি!..... তা হ্যাঁ মা, সঙ্গে কে কে যাবে?

ধনিষ্ঠা গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—তুই যদি যেতে চাস তো তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

মাধবী গলায় কাপড় দিয়ে ধনিষ্ঠার সাম্‌নে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে' বল্‌লে—তোমার চরণে গড় করি মা, গড় করি, তোমার পুণ্যির জোরে আমাকেও একটু তীর্থিধম্ম করিয়ে দিয়ো মা!

গৌরী সব শুনে শুনে বল্‌লে—মা, আমার খেল্‌না-পুতুলগুলো নেবে না? সেখানে গিয়ে খেল্‌ব কি নিয়ে?

ধনিষ্ঠা মনে করেছিল গৌরীকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পরে খেল্‌নাগুলি সংগ্রহ করে' অনলের বাসায় পাঠিয়ে দেবে, যাতে গৌরা না বুঝ্‌তে পারে যে এ বাড়ী থেকে তার চিরনির্ব্বাসন হচ্ছে। এখন গৌরীর কথায় সঙ্কোচের সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ধনিষ্ঠা বল্‌লে—হ্যাঁ, খেল্‌না পুতুল সবই নিতে হবে বৈ কি।

কিন্তু এই কথা-কটা বল্‌তে তার কলিজা যেন ছিঁড়ে গেল, তার চোখ ঠেলে কান্না বেরিয়ে আস্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। ধনিষ্ঠা গৌরীর খেল্‌নাগুলিও বাক্‌সে তুল্‌তে প্রবৃত্ত হলো।

ধনিষ্ঠা গৌরীর কাজ কর্‌ছে, তার সঙ্গে অনর্গল বক্‌ছে, আর ফিরে ফিরে ঘড়ীর দিকে তাকাচ্ছে। সে তো রোজ এই পাঁচটা বাজার প্রতীক্ষায় ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে বসে' থেকেছে; কিন্তু অন্য দিন ঘড়ীর কাঁটা সর্‌তে চায়নি, আর আজ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতন ছুটে চলেছে! কাঁটার সূচমুখ যে ক্রমাগত বিচ্ছেদ-মুহূর্ত্তের দিকে তীক্ষ্ণ অঙ্গুলি সঙ্কেত কর্‌ছে, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে ধনিষ্ঠার অন্তরে কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার বেদনা অনুভূত হচ্ছে।

চারটে বাজ্‌তে সাত মিনিটের সময় একজন ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে—ছোট ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠা উঠে দাঁড়াল। গৌরীকে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা কর্‌ছিল না; সে গৌরীকে কোলে তুলে নিয়েই নিজের আপিস-ঘরে গেল।

বৈকুণ্ঠ এসে নমস্কার করে' দাঁড়াতেই ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি কি চার্জ্‌ বুঝে নিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি কি আজকেই যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওঁর যাবার পাল্কী গাড়ী লোকজন আর পাথেয় ঠিক করে' দেবেন।

—যে আজ্ঞে।

—তিনি ষ্টেশনে চলে' গেলে আপনি আর-একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।

—যে আজ্ঞে।

* * *

অনলকে হরকান্ত যখন তার দর্‌খাস্তের উপর ধনিষ্ঠার হুকুম এনে দিলে তখন অনল আঁটা খামের উপর ধনিষ্ঠার হস্তাক্ষরে শিরোনামা দেখে আনন্দ অনুভব কর্‌লে, সে ভাব্‌লে ধনিষ্ঠা বোধ হয় তাকে দীর্ঘ চিঠি লিখে অকস্মাৎ কর্ম্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেছে এবং তাকে থাকৃতে অনুরোধ করেছে; কিন্তু সে তো কর্ম্মত্যাগের কারণও বল্‌তে পার্‌বে না, থাক্‌তেও পার্‌বে না; তবু উনি যে থাক্‌তে অনুরোধ করেছেন এই আমার এতকালের পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

চিঠি খুলেই অনলের চক্ষুস্থির! এমন সংক্ষিপ্ত সম্মতি সে তো আশা করেনি! এতদিনের পরিশ্রম ও সেবার কি এই পারিতোষিক! এত উপকার পাওয়ার পর কি এই

কৃতজ্ঞতা! ধনিষ্ঠা যে গোটা গোটা সুন্দর অক্ষরে হুকুম লিখেছেন "ছুটি মঞ্জুর"—এই লেখা লিখ্‌তে তো তিনি শিখেছেন অনলেরই কাছে! তাঁর লেখার ছাঁদও যে অনলের লেখারই অনুরূপ! অনল কি নিজের হাতে নিজের মৃত্যুবাণ শাণিত করে' ধনিষ্ঠার হাতে তুলে দিয়েছিল? "ছুটি মঞ্জুর!" এই আদেশের অর্থ কি? চিরবিদায় মঞ্জুর, না অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্রাম মঞ্জুর? এই হুকুমের মধ্যে নিশ্চয় দুই অর্থই জড়াজড়ি হয়ে গোপন হয়ে আছে। অনল যদি কিছুদিন পরে আবার ফিরে আস্‌তে চায়, তা হলে তার পথ ধনিষ্ঠার এই চাতুরীভরা হুকুম খুলে রেখে দিলে। এই সম্ভবপর অর্থ মনে করে' নিয়ে অনলের ক্ষুণ্ণ আহত মন আবার কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়ে সান্ত্বনা লাভ কর্‌লে।

কিন্তু গৌরী? গৌরীকে চাইবামাত্র পাওয়া, এও তো এক অচিন্ত্য দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার! যে গৌরীকে এখানেই অনলের বাসায় পাঠিয়ে দিতে ধনিষ্ঠার আপত্তি হতো, সেই গৌরীকে একেবারে দূর করে' দিতে সম্মত হওয়ার অর্থ অনল কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌লে না। সে মনে করেছিল তার বিদায় প্রার্থনা অনেক বলা-কওয়ার পর মঞ্জুর হলেও হতে পারে, কিন্তু গৌরীকে কাছছাড়া কর্‌তে ধনিষ্ঠা কিছুতেই সম্মত হবে না। কিন্তু এ যে একেবারে অভাবনীয় কাণ্ড! তিনি অনলের উপর ক্রুদ্ধ হয়েই বোধ হয় এই অবিশ্বাস্য অসম্ভব হুকুম লিখে ফেলেছেন। এখনই হয়তো তাঁর মনস্তাপ হবে এবং এই হুকুম প্রত্যাহারের পত্র আস্‌বে।

অনল নিজের দর্‌খাস্ত হাতে করে' গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিল; হরকান্ত বেচারা যে স্থূল দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তার লক্ষ্যই ছিল না। হরকান্ত অনলের মনোযোগ নিজের দুর্দ্দশার প্রতি আকর্ষণ কর্‌বার জন্যে চেষ্টা করে' একটু কাশ্‌লে।

সেই কাশির শব্দে চম্‌কে উঠে অনল হরকান্তর দিকে তাকালে এবং সচেতন হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—আপনি যান। অম্‌নি দয়া করে' বৈকুণ্ঠ-বাবুকে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

হরকান্ত চলে' গেল।

সঙ্গে-সঙ্গেই বৈকুণ্ঠ এসে ঘরে ঢুকে অনলকে নমস্কার কর্‌লে।

অনল প্রতিনমস্কার করে' বল্‌লে—বসুন।

বৈকুণ্ঠ বস্‌ল।

অনল বৈকুণ্ঠের হাতে নিজের দরখাস্তখানা দিলে।

দর্‌খাস্ত ও হুকুম পড়ে' বৈকুণ্ঠ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল; কিন্তু সেই এবার প্রধান ম্যানেজার হবে, কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর এই হুকুম দেখে তার যে বিপুল আনন্দ হয়েছে তাতে তার বিস্ময় চাপা পড়ে' গেল। তার একবার মনে হলো, মৌখিক ভদ্রতা করে' কিছু বলা উচিত। কিন্তু কি বল্‌বে? কেন তিনি চাক্‌রী ছেড়ে দিচ্ছেন জিজ্ঞাসা করা অনর্থক, কারণ কর্ত্রীর কাছেই যখন কারণ অব্যক্ত থেকে গেছে তখন তার কাছে সেটা প্রকাশ্য হবার কথা নয়। তিনি চাক্‌রী ছেড়ে যাচ্ছেন, এর জন্য দুঃখ প্রকাশ তো করা যেতে পারে? এই কথা মনে হতেই বৈকুণ্ঠ বল্‌লে—আপনি হঠাৎ আমাদের ত্যাগ করে'…

অনল বৈকুণ্ঠকে কথা সমাপ্ত কর্‌তে না দিয়ে গম্ভীর-ভাবে বল্‌লে—আপনি রাণীর হুকুম দেখ্‌লেন তো। আমার চার্জ্জ্ বুঝে নিন।

বৈকুণ্ঠ তটস্থ হয়ে বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

অনল বল্‌লে—আমি বাগ্‌দিয়া ছেড়ে চলে' না যাওয়া পর্য্যন্ত আমার কর্ম্মত্যাগের সংবাদ আপনি গোপন রাখ্‌বেন!

বৈকুণ্ঠ বল্‌লে—যে আজ্ঞা।

(আগামী মাসে সমাপ্য)

কালের কোপ

শ্রী গোপাল হালদার

এ নদীটাকে দেখ্‌লে আজ আর কেউ নদী ব'লে স্বীকার কর্‌বে না। বালুর ভারে আজ সে প্রায় শুকিয়ে উঠেছে,—ভাঁটার সময় ওর মাঝখানটিতে থাকে হাঁটু-জল, জোর কোমর পর্য্যন্ত; আর জোয়ারে সে জল বেড়ে উঠে' দাঁড়ায় গলা পর্য্যন্ত। তবুও কাছাকাছি গাঁয়ের লোকেরা এ'কে নদীই বল্‌ত; এর এককালের দৌলতের কথা তা'রা পিতা পিতামহদের কাছ থেকে শু'নে আস্‌ছিল ব'লেই বোধ হয়।

সত্যই ত, আজ যদি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর সেই দুই পারের প্রবল প্রতাপশালী জমিদার-বংশ-দু'টি হঠাৎ তাঁদের নদী-পারের নির্ব্বাপিত চিতাভস্ম থেকে জেগে ওঠেন। তবে কি তাঁরা এই ক্ষীণধার জল-প্রবাহ-টুকুকে সে আমলের 'করালী' ব'লে চিন্‌তে পার্‌বেন? একদিন এপারের রায় এবং ও-পারের সিংহদের প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বিতা ও বৈরিতাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল এই করালী নদীর করাল স্রোত এপার যখন ও-পারকে দে'খে গর্জ্জেছে, ও-পার যখন এপারের দর্পকে চূর্ণ ক'রে দেওয়ার জন্যে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছে, আর এপারের তাঁবের ফৌজ যখন ও-পারের ফৌজের মাথাগুলো ফাটাবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌ত, তখন বহুবার মাঝখানকার করালী নদীর ভীষণ ভ্রূকুটি তাদের সংযত, সন্ত্রস্ত করেছে। কিন্তু করালীর জল তাদের চিরদিন ঠেকাতে পার্‌লে না। দুই বৎসরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের সুদৃঢ় প্রাসাদ ও সু-উচ্চ দেব-মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে, তাঁদের বিশাল জনশক্তি ও ঐশ্বর্য্যের শোভা যাত্রার মধ্যেই সন্তুষ্ট না থেকে একদিন রীতিমত শক্তি-পরীক্ষার জন্যে মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল! দু-পারের প্রজার হাতে সেদিন লাঠি এবং সড়্‌কি নেচে উঠ্‌ল, সঙ্গে-সঙ্গে দু-পারের নেয়েদের হাতে ঝুপ-ঝাপ নেচে উঠ্‌ল বড়-বড় ছিপের দাঁড়। সেদিন থেকে করালীর বুকে প্রায় দুই শতাব্দী ধ'রে চল্‌ল এই দু-পারের রেষা-রেষি। দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধ'রে ক্রমাগত করালী তাদের রক্তে রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। দুই বংশেরই অর্থের ভাঁটি প'ড়ে এল, তবু তাদের বিবাদের মীমাংসা হ'ল না।

শেষে একদিন করালী নিজে গর্জ্জে উঠ্‌ল—এপারের যে-প্রাসাদ এতদিন ও-পারের দূর প্রাসাদের দিকে ভ্রূকুটি-ভরে তাকিয়েছিল, তা'র উচ্চ শির যেদিন করালীর উচ্ছলিত জলধারার পায়ে নুয়ে পড়্‌ল, সেদিন ও-পারের শিরও খাড়া নেই দে'খে সে এক তৃপ্তি ও ব্যঙ্গের অট্ট-হাসিতে চারদিক্‌ চমকিত ক'রে গেল। ওপারের সম্পদের শেষ রেখা যেদিন মু'ছে গেল, হৃতসর্ব্বস্ব বাবুরা যেদিন একমাত্র গৃহ-বিগ্রহটিকে নিয়ে এতকালের সুরক্ষিত বিশাল পুরীর পিছনের দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে প্রাণরক্ষা কর্‌লেন, সেদিন একবার ও-পারের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন,—যখন শুন্‌লেন, ও-পারের রায়-বংশের শেষ সম্বলও রইল একমাত্র বারাহী দেবী, তখন একবার নিরুদ্বেগে মুক্তির নিঃশ্বাস টান্‌লেন। করালীর সর্ব্ব-গ্রাসী ক্ষুধার হাত এড়িয়ে বেঁচে রইল কিছু দূরের নদী-পারের দুই বংশের শ্মশান-মন্দিরগুলি। লেলিহান ঈর্ষা ও প্রমত্ত রক্তলিপ্সার প্রজ্বলিত টীপের মতন চিতানলের শেষেও জেগে রইল তাদের বৈরিতা কালের কপালে।

তা'র পরেও প্রায় দেড়শ' বৎসর ভেসে গেল—করালীর ক্ষুধা শেষ হয়েছিল,—তা'র শক্তির মদে অবসান ঘোষিত হ'ল। যে-শ্মশানের মন্দিরগুলি অতীতের দম্ভ ও তাণ্ডব-লীলার কাহিনী দু-পারের শান্ত গ্রামবাসীদের মনে জাগিয়ে রেখেছিল, সেখানকার পরিত্যক্ত নির্জ্জনতায় কি-এক নীরব অট্টহাসি ভেসে বেড়া'ত, সেখানকার বাতাসে শৃগালের যে চীৎকার ব'য়ে আন্‌ত, তা শোনা'ত এক মৃত্যুপারের কান্নার মতন, সেখানকার জল-ধারায় যে কানাকানি চল্‌ত তা খেয়া-নৌকোর নেয়ের কানে আস্‌ত এক অব্যক্ত আক্ষেপের মতন। সেখানে দিন-

দুপুরে মরণ-পারের অশরীরীদের যে নৃত্য চল্‌ত, সে-কাহিনী বহু দিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গিয়েছিল; তা'র অনতিদূরের বিস্তীর্ণ পথ থেকে যে কত সরলহৃদয় নিরপরাধ পথিককে সন্ধ্যায় ও নিশীথে ডেকে নিয়ে চিরদিনকার মতন পথচলার পালা শেষ ক'রে দেওয়া হয়েছে, দশ ক্রোশের মধ্যে এ-কথা কারো জান্‌তে বাকী ছিল না। এপারের লোকেরা ধীরে-ধীরে শ্মশানের পাশ থেকে বাড়ি তুলে নিলে; ও-পারের গ্রামও ধীরে-ধীরে তা'র শ্মশানের কাছ থেকে স'রে গেল।

এম্‌নি ক'রে কত-কত বৎসর চ'লে গেল—এপার আর ও-পারের মধ্যে আজ আর সে কলহ নেই, আর সে রাঙা আঁখি নেই। এপারের লোক আজ ও-পারে চ'লে গেছে; ও-পারের লোক, কোথা থেকে তা'রা এল তা বল্‌তে পারে না। কালের স্রোতে রায়-বাবু ও সিংহ-বাবুরা যে কোথায় ভেসে গেলেন, আজ তা'র ঠিক-ঠিকানা নেই—বহুদূরের কোনো-এক দূর গাঁয়ের কোনো-এক পাটের দালাল আজও হয়ত নিজেদের সিংহ ব'লে ভীতি-বিহ্বল পাটের চাষীদের উপর গর্জ্জন কর্‌তেন, সহরের কোনো-এক অফিসের অন্নহীন কেরাণী-বাবু হয়ত বা মাঝে মাঝে তাঁর গিন্নীদের কাছে রায়-বংশের ছেলে ব'লে আপনার আভিজাত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা কর্‌তেন। কিন্তু দেড়শ' বছরের ধুঁয়াসাচ্ছন্ন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ধৈর্য্য ও কৌতূহলের বাতি নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে কেউ তাঁদের এই দাবিকে যাচাই করেনি, কর্‌বার ইচ্ছেও ছিল না, সাধ্যও ছিল না।

তেম্‌নি লক্ষ্মণ-সর্দ্দারের বংশে যে-কথাটা পুরুষানুক্রমে নেমে এসেছে,—যাকে পুরুষানুক্রমে তা'রা অর্দ্ধেক অবিশ্বাস ও অর্দ্ধেক বিশ্বাসের সঙ্গে চিরদিন মেনে নিয়েছে, কেউ যদি তা'র প্রমাণ চাইত, লক্ষ্মণ দিতে পার্‌ত না। লক্ষ্মণ জান্‌ত, যতদিন করালীর জলে স্রোত ছিল, ততদিন তা'র পূর্ব্বপুরুষেরা তা'তেই অকস্মাৎ সমাধি লাভ করেছেন, তা'র পরে যেদিন করালীর জল ক'মে এল, সেদিনও তা'র দাদা ওই বড় গাঙে মাছ ধর্‌তে গিয়ে আর ফেরেনি, একথা সে তা'র বাবার মুখেই শুনেছে; আর কাল-বৈশাখীর হঠাৎ এক ঝড়ে নৌকা-সুদ্ধ তা'র বাবা পরাণ-সর্দ্দার যে তলিয়ে গেল—তা'র খোঁজ পেলে সে নিজে তিন দিন পরে বড় গাঙের ঐ মাঝ-চড়াটায়। লক্ষ্মণ জান্‌ত, তাদের সবাইকে ডুবে মর্‌তে হবে, তাদের বংশে এম্‌নিতর একটা অভিশাপ বহু-শত বৎসর থেকে নেমে আস্‌ছে,—কেননা, তা'রা ভৈরব-সর্দ্দারের বংশধর।

সে ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী ঠিক নেই—কিন্তু তখন দু'-পারের বাবুদের দৌলতের মধ্যাহ্ন, তখন পরিপূর্ণ উৎসাহে এ-পারে আর ওপারে শক্তি-পরীক্ষা হচ্ছে। সেই দুরন্ত ক্ষণে ভৈরব ছিল রায়বাবুদের তাঁবের লাঠিয়ালদের সর্দ্দার। সে তখন জীবনের খর-যৌবনে,—কপাটের মতন তা'র বুক, শালের মত দৃঢ় তা'র দেহ, দর্পিত তা'র শির। তা'র লাঠির কাছে তখন বন্দুক নিয়ে দাঁড়ানো যায় না, তা'র সড়্‌কির লক্ষ্য তখন অভ্রষ্ট, তার মুষ্টির আঘাতে তখন লোহার দরজা ঝন্‌-ঝন্ ক'রে আর্ত্তনাদ ক'রে ভেঙে পড়্‌তে চায়।

সে ছিল এক দূর-গাঁয়ের লোক। রায়বাবুরা তা'কে এনেছিলেন বহু লাখেরাজ দিয়ে, সর্দ্দারির প্রলোভন দেখিয়ে। সেদিন থেকে সে সর্দ্দার, সেদিন থেকে রায়-বাবুরা অধৈর্য্য হ'য়ে বসেছিলেন একবার সিংহদের শিক্ষা দিতে। কিন্তু বাধা দিত ভৈরব। সিংহবাবুদের পক্ষে তখন সর্দ্দার ছিল বৃদ্ধ রমাই ঘোষ—ভৈরবের শৈশবের ও যৌবনের ওস্তাদ। রমাইয়ের দিন কেটে গিয়েছিল, সে শুধু দেরি কর্‌ছিল তা'র একমাত্র ছেলে মাধাই উপযুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত। মাধাই তখনো বছর-কুড়ির ছেলে।

হঠাৎ একদিন সিংহদের ঔদ্ধত্য আর রায়দের সহ্য হ'ল না,—দু'-পারের ছিপ-সেজে দাঁড়াল, দু'-পারের লাঠিয়ালদের হুঙ্কার উঠ্‌ল, দু'-পারের বাবুরা মহা-সমারোহে বল পরীক্ষায় অগ্রসর হলেন। ভৈরবের ভরা-যৌবনের রক্তের তাপে শিরা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল,—ঝুপ্‌-ঝাপ্ দাঁড় ফেলে মাঝ-নদীতে তা'রা মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়াল। তা'র পর লাঠি ও সড়্‌কি, ঢাল, তলোয়ার ও ক্বচিৎ পুরোনো বন্দুকের সঙ্গে যে মরণলীলা উৎসব চালালে, তা'র প্রথম ঝাপ্‌টা শেষ হ'তে-না-হ'তে সিংহ-বাবুরা দেখ্‌লেন শত্রু মাঝ-নদী থেকে তাড়িয়ে তাঁদের তীরে এনে পুরেছে, আর সে শত্রুর সর্ব্বাগ্রে ভৈরব সর্দ্দার। সে-মুহূর্ত্তে রমাই একবার মুখ তু'লে চার-

দিকে তাকালে, তা'র পরে সড়্‌কি নামিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে সে কাটাকাটি দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

সিংহ-বাবুরা হাঁক্‌লেন, 'রমাই, সামালো ভৈরবকো—দুশ' রুপেয়া এক শির।'

রমাই নমস্কার ক'রে বল্‌লে, 'হুজুর, সাম্‌লাবো ঠিক। কিন্তু শির নিতে পার্‌ব না,—সে আমার চেলা।' ভৈরবের সাম্‌নের ছিপে লাফিয়ে পড়্‌তে-পড়্‌তে নতুন যুবক মাধাই ব'লে গেল, 'হুজুর, এক রুপেয়াও চাই নে, শুধু শির দেবো।'

রমাইএর নিষেধ কর্‌বার সময় ছিল না—সে ছেলের পিছন-পিছন ছুট্‌ল।

ভৈরব নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। পিছন থেকে রায়বাবু হাঁক্‌লেন, "হুঁসিয়ার ভৈরব।" সে চম্‌কে দেখ্‌লে, মাথার উপর মাধাই-এর তলোয়ার। বিদ্যুতের মতন সে স'রে গেল। তা'র পর সড়্‌কির এক আঘাতে মাধাইকে নদীর মধ্যে ফে'লে দিলে। আহত মাধাই তখন প্রাণপণে সাঁতার কেটে তীরে উঠ্‌তে চাইছিল। ভৈরব দুরন্ত আক্রোশে তা'কে সড়্‌কির আরেক আঘাতে নদীর তলে ডুবিয়ে দিলে।

"এম্‌নি ক'রে তোরা বংশের পর বংশ ডু'বে মর্‌বি," ব'লে উন্মত্তের মতন শোকাতুর বৃদ্ধসর্দ্দার রমাই-ঘোষ তা'কে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ কর্‌লে।

ভৈরব দাঁড়িয়ে রইল—শুধু আঘাত ঠেকাতে লাগ্‌ল—একবার দু'বার তবু হাত তুল্‌লে না। তা'র চোখ দিয়ে তখন আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌ছিল।

—তা'র পর?

একটিমাত্র কঠিন আঘাত—বৃদ্ধ পিতা পুত্রের কাছে লুটিয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল চিরদিনের মতন।

ভৈরব জয়-কোলাহলের মধ্যে ফির্‌ল—নতশির, শুষ্ক-মুখ কোটর-গত-চক্ষু।

তা'র পরে এম্‌নি আর-এক ধ্বংস-লীলার মধ্যে করালীর জলে ভৈরব তলিয়ে গেল; দু'পারের এম্‌নি নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যে পুরুষের পর পুরুষ তা'রা নদীর জলে বিশ্রাম লাভ কর্‌লে।

তা'র পর একদিন করালীর কোপে দু'পারের এতকালের দাপাদাপি থেমে গেল, একদিন ঐ দুপারের ঐশ্বর্য্যের ও কোলাহলের উপর এক বিস্মৃতির সন্ধ্যা নেমে এল। দীর্ঘ দেড়শ' বৎসরের সে-রাত্রির প্রভাতে রইল শুধু অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন স্মৃতি। লক্ষ্মণ জান্‌ত, যে-ভৈরব যুদ্ধান্তে ম্লান-মুখে প্রেত-পুরীর কঙ্কালের মতন ফি'রে এসেছিল, সে তারি বংশের পূর্ব্ব-পুরুষ। তা'র না ছিল প্রমাণ, না ছিল বংশ-তালিকা।

ও-গাঁয়ের পাঁচু-দাসের বিধবা পত্নীও ঠিক এম্‌নি জান্‌ত যে, তা'র শিশুপুত্র বিশু রমাই সর্দ্দারের দৌহিত্র-বংশের সন্তান। কিন্তু কালের অন্ধকারে রমাই-এর দৌহিত্র-বংশ কি ক'রে এখানে ভেসে এসে ঠেক্‌ল, জিজ্ঞাসা কর্‌লে তা'রাও জবাব দিতে পার্‌ত না।

এপারে-ওপারে আজ আর বিবাদ নেই। লক্ষ্মণ সর্দ্দারের সঙ্গে রমাই-এর দৌহিত্র-বংশের আজ কোনো দ্বন্দ্ব নেই। লক্ষ্মণের শ্বশুরের দিক্ দিয়ে পাঁচুর বিধবা তা'র আত্মীয়াই হ'ত।

লক্ষ্মণের বাবা যখন মারা গেলেন, তা'র বিধবা মা তখন থেকে তা'কে আর নেয়ে হ'তে দিলে না। অগত্যা লক্ষ্মণ হ'ল তাই, যেটা তা'র বাবা ঘৃণা কর্‌তেন, অর্থাৎ চাষী।

সে-বার পূজোয় লক্ষ্মণই তা'র শাশুড়ী, শালী প্রভৃতি সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। পাঁচুর বিধবা স্ত্রীও নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সে পূজো কর্‌ত না, কিন্তু পূজোর কটা দিন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে আমোদ কর্‌তে তা'র ভালো লাগ্‌ত। পূজোর পরে বিজয়ার সাদর-সম্ভাষণের শেষে তা'রা বিদায় নিলে। লক্ষ্মণ তাদের গ্রাম পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

হঠাৎ সেদিন আশ্বিনের আকাশ ছেয়ে মেঘ উঠ্‌ল। নদীর ও-পার পর্য্যন্ত যেতে-না-যেতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নাম্‌ল—সঙ্গে একটু একটু ঝোড়ো বাতাস। অথচ গ্রাম তখন পিছনে অনেক দূরে—ফি'রে যাওয়ারও উপায় নেই। নদীর ও-পারে কয়েকটি বাড়ি ছিল;—লক্ষ্মণ ঠিক কর্‌লে সেইখানেই নদী পেরিয়ে বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌বে।

নদীতে হাঁটুর বেশী জল ছিল না, লক্ষ্মণের পরামর্শ-মত সবাই ধীরে-ধীরে জল ভেঙে-ভেঙে চল্‌ল। লক্ষ্মণ

চল্‌ছিল সকলের আগে পথ দেখিয়ে-দেখিয়ে—তা'র কোলে পাঁচুর শিশু-ছেলে বিশু।

সেখানে জল ছিল মাত্র আঙুল-চারেক—নদী প্রায় পেরিয়ে তা'রা এসেছিল। 'বাপ'! বলে' হঠাৎ লক্ষ্মণ থেমে পিছনের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "এসো না এখানে, চোরা বালি" তা'র পা হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েছিল, এক-পা তুল্‌তে গিয়ে আর-এক পা বেধে গেল। লক্ষ্মণ বার-বার চেষ্টা ক'রে নিদারুণ নৈরাশ্যে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "শীগ্‌গির ঐ ডান দিক্ দিয়ে গিয়ে ও-পারের লোকদের ডাক দাও, দড়ি নিয়ে এসো।"

বৃষ্টিতে তখন চারিদিক্ নিস্তব্ধ, অকালের সন্ধ্যার কালিতে ছাওয়া। নদী-পারের প্রবল বাতাসে সেই বারিপাত-ধ্বনিকে ছাপিয়ে ভীতিপূর্ণ আর্ত্ত নর-নারীর চীৎকার ও-পারের কোনো গৃহবাসীর কানে পৌঁছল না। যে-নদীর ওপরে একদিন শত আহত ও আর্ত্তের কণ্ঠ-ধ্বনি নিষ্ফল কেঁদেছে, আজ তার শীর্ণ ধারার বুকে তা'র দুই তীরের বালুরাশির মধ্যে এই ভীতি-বিহ্বল নারীদের সম্মিলিত আর্ত্তনাদও অতীতের শত হাহাকারের সঙ্গেই গিয়ে মিশ্‌ল।

অসহায় মেয়েরা ছু'টে পাড়ে উ'ঠে সেখানকার লোক-দের খবর দিলে। তা'রা ছু'টে আস্‌ছিল। পাঁচুর বিধবা স্ত্রী মাঝ-পথে হঠাৎ ফি'রে দাঁড়াল—তা'র বিশু? সে ত লক্ষ্মণেরই কোলে! হায় হায় ক'রে সে ছু'টে এল, বল্‌লে, "ওগো, আমার বিশু যে তোমার কোলে ঘুমুচ্ছে, তা'কে কি ক'রে দেবে?

লক্ষ্মণের তখন কোমরের বেশী ডু'বে গেছে। ঠোঁট চেপে ধ'রে সে প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা কর্‌ছিল;—কাঁধ থেকে বিশুকে নামিয়ে সে বল্‌লে, "দূরে দাঁড়াও, কাছে এসো না, আমি ছু'ড়ে দিচ্ছি।"

বালির ওপর ছিট্‌কে প'ড়ে ছোটো শিশু চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, লক্ষ্মণের কানে একটা ক্ষীণ হাসির মতন কি যেন পৌঁছল। সে চম্‌কে একবার ও-পারের দিকে তাকালে, সিংহদের সমাধি-মন্দিরের চূড়াগুলি রূঢ়ভাবে তা'র চোখে এসে আঘাত কর্‌লে। ও-পারের লোকেরা যখন দড়ি-দড়া নিয়ে ছু'টে এসে লক্ষ্মণকে তুল্‌লে, তখন সে বুক পর্য্যন্ত বালুর নীচে তলিয়ে গেছে। বালির ওপর তা'রা তা'র যৌবন-পুষ্ট সুদৃঢ় দেহ শুইয়ে দিলে। তা'র আগেই দুই দিক্‌কার ক্ষুধিত বালির চাপে লক্ষ্মণ সর্দ্দারের প্রশস্ত বুকের নিঃশ্বাস-গ্রহণের শক্তিটুকু পর্য্যন্ত শেষ হ'য়ে গেছে।

মৃত দেহের দিকে তাকিয়ে একজন বল্‌লে, "পরাণ-সর্দ্দারের ছেলে। পরাণ-সর্দ্দার মরেছিল নৌকা ডু'বে।"

"ওদের বংশে সবাই ডু'বে মরে।"

এপার-ওপার চেয়ে অশীতিপর এক বৃদ্ধ তা'র পাকা চুল-কয়গাছির মধ্যে আঙুল চালাতে-চালাতে বল্‌লে, "এই করালীর এম্‌নি জায়গাটাতেই ভৈরব সর্দ্দার রায়বাবুদের পক্ষ হ'য়ে সিংহদের হটিয়ে দিয়েছিল।"

ভাগ্যচক্র

শ্রী সুধীরা দেবী

গরীব হইয়াও সুন্দর হওয়াটা একটা মারাত্মক ভুল। প্রেমে পড়া একমাত্র ধনীরই ধর্ম্ম। চালচুলোর সন্ধান না রাখিয়া আষাঢ়ের নবীন মেঘোদয়ে প্রেয়সীর সুরভি কেশপাশের স্বপ্ন দেখা, জ্যোৎস্না রাতে ছাতে বসিয়া কবিতা লেখা গরীবের পোষাইয়া ওঠে না; আত্মীয় স্বজন তো দূরের কথা রাস্তার লোকগুলিও বোধ হয় সমস্বরে ছি-ছি করিয়া ওঠে। জগতের এই কঠোর সত্য কথার একটিও কিন্তু হুগী বেচারী বিশ্বাস করিত না। দেখিতে সে বেশ সুন্দর ছিল, একথা তা'র অতিবড় শত্রুও স্বীকার করিবে—মুখখানি যেন অতি যত্নে কুঁদিয়া গড়া, পিঙ্গল

চোখ-দুটি যেন চির রহস্যময়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি অল্প বয়সেই সে মা সরস্বতীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; ফলে জীবনে একটা বড় কথা কখনো তা'র মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তবু বেচারীকে সবাই ভালো বাসিত।

হুগী মাঝে মাঝে অস্থির হইয়া পড়িত শুধু অর্থের চিন্তায়। তা'র বাবা মরিবার সময় একখানা বাঁকা তলোয়ার ও একখানা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই উইল করিয়া দিয়া যাইতে পারেন নাই; তলোয়ারটি ঘরের একখানা আয়নার পার্শ্বে ঝুলানো থাকিত, আর বইখানি বহুদিন পূর্ব্বেই একখানা ভাঙা শেল্‌ফে কতগুলি ক্যাটালগের নীচে আত্মগোপন করিয়াছিল। এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসীমা তাহাকে দয়া করিয়া কিছু সাহায্য করিতেন, তাহাতেই কোনোপ্রকারে সে দিনগুলি কাটাইয়া দিত। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা হুগী যে মোটেই করে নাই এমন নয়, বহু জায়গায় সে ঢুঁ মারিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু সুবিধা এ পর্য্যন্ত কোথাও হয় নাই। মাস-ছয় সে লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট্‌-এর কর্ম্ম করিয়াছিল কিন্তু সে যখন দেখিল বীমা-প্রার্থীর চাইতে এজেন্ট্‌-এর সংখ্যা অধিক হইয়া গিয়াছে তখন মনের দুঃখেই কাজটি ছাড়িয়া দিতে হইল। কয়েকদিন চায়ের ব্যবসা ফাঁদিয়া দুদিন যাইতে না যাইতেই বিরক্ত হইয়া সে ঘরে আসিয়া বসিল। মদ বিক্রীও আরম্ভ করিয়াছিল কয়েকদিন, কিন্তু সেটা নেহাৎ নীরস বলিয়া তা'তেও মন টিঁকিল না। অবশেষে সে কিছুই হইল না।—কর্ম্মহীন বেকার অবস্থায় বাড়িতেই বসিয়া রহিল তবু তাহার মুখ হইতে হাসিটি ঘুচিল না।

কিন্তু ব্যাপারটি সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল হুগী বেচারী যখন প্রেমে পড়িল। এক অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের মেয়ে লরা মার্টনকে সে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়া ফেলিল। লরাও তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। এই কর্ণেলটি বহুকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া এমনই বদহজমী ও বদমেজাজ লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন যে, তাহার একটিরও আর সারিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি যে হুগীকে পছন্দ করিতেন না এমন নয়,—কিন্তু বিবাহের কোনো কথা উঠিলেই বলিতেন, না বাপু, এখন নয়। যদি কখনো হাজার-দশেক পাউণ্ড্‌ উপার্জ্জন করতে পারো তবে-ই এসো বিবেচনা ক'রে দেখ্‌ব। হুগী বেচারী দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। এ-বিপদে তা'র একমাত্র সান্ত্বনা-স্থল ছিল লরা।

সেদিন সকালবেলা হলাণ্ড্‌-পার্কে মার্টনদের বাড়ী যাইবার পথে তা'র প্রিয় বন্ধু ট্রেভরের বাড়ীতে হুগী হাজির হইল। ট্রেভর একজন চিত্রকর। আজকালকার দিনে চিত্রকর হওয়ার একটা রোগ দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু ট্রেভর ছিল প্রকৃতই একজন দরদী শিল্পী। মুখভরা হল্‌দে দাগ, আর ইয়া লম্বা লাল দাড়িতে তাহাকে নেহাৎ বেরসিক বলিয়া মনে হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যখন তুলি লইয়া বসিত তখন তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারা যাইত না; বাজারে তা'র ছবির কাটতিও ছিল খুব। হুগীর সৌন্দর্য্যই প্রথম তাহাকে আকৃষ্ট করে এবং এ-বিষয়ে তাহার কতকগুলি বিশেষ মতও ছিল; সে বলিত—চিত্রকরদের পরিচয় থাক্‌বে একমাত্র সুন্দর পুরুষদের সঙ্গে অর্থাৎ যাদের দেখ্‌লে মনে সত্যি বেশ একটু আনন্দ হয়। পুরুষ-ই বলো আর স্ত্রী-ই বলো একমাত্র যারা বিলাসী আর সুন্দর শুধু তা'রাই পৃথিবী শাসন ক'রে থাকে, অন্ততঃপক্ষে তাইত হওয়া উচিত। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে হুগীকে ভালো করিয়া জানিবার পরেও তাহার এই দিল্‌দরিয়া চপল স্বভাবটি ট্রেভরের এত ভালো লাগিল যে, সে খুসী হইয়া তাহাকে স্টুডিওতে অবাধ প্রবেশের অনুমতি দিয়া দিল।

ট্রেভর তখন একটি দরিদ্র ভিখারীর জীবন্ত ছবির উপর তুলি বুলাইতেছিল। স্টুডিওর এক কোণে উঁচু তক্তপোষের উপর ভিখারীটিও দাঁড়াইয়াছিল। বেচারী একেবারে থুথ্‌থুরে বুড়ো—মুখের চামড়াগুলি শুকনো চিলে হইয়া গিয়াছে, দেখিলেই ভারি কষ্ট হয়। তাহার কাঁধের উপর দিয়া একখানা ছেঁড়া চাদর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, পায়ের জুতাজোড়াও অসংখ্য তালি দেওয়া—একহাতে একখানি লাঠি ধরিয়া কুঁজো হইয়া দাঁড়াইয়া অপর হাতে টুপিটি ভিক্ষার জন্য পাতিয়াছে।

—বাঃ, ভারি সুন্দর মডেল ত—বলিয়া হুগী তাহার বন্ধুর কর মর্দ্দন করিল।

ট্রেভর কহিল—হাঁ ভাই, সত্যি তাই এমন ভিখারী সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। দেখ্‌বে, আমি কেমন একখানা ছবি তৈরী ক'রে ফেল্‌ছি।

হুগীর হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল, কহিল—আহা! গরীব বুড়ো বেচারী! মুখখানা কেমন শুকিয়ে গেছে! কিন্তু তোমাদের কাছে বোধ হয় ঐ মুখখানাই তা'র অমূল্য সম্পদ্‌!

ট্রেভর হাসিয়া জবাব দিল, হাঁ ভাই—সত্যি তাই! হুগী একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল —আচ্ছা এর জন্ম সে কত পাবে!

—ঘণ্টায় এক শিলিং ক'রে।

—আর তুমিই বা ছবির জন্যে কত পাচ্ছ?

—এই, হাজার ছুই—।

—কি? পাউণ্ড্‌?

—নাহে, না, গিনি। চিত্রকর, কবি, ডাক্তার এই তিন প্রাণী চিরকাল গিনিই পেয়ে আস্‌ছে।

হুগী হাসিতে-হাসিতে কহিল,—তবে ঐ বেচারীকেও তোমার কিছু অংশ দেওয়া উচিত—সেও ত তোমার মতোই পরিশ্রম কর্‌ছে।

—পাগল! ছবি আঁকার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকার তুলনা হ'তে পারে! তবে নেহাৎ মিথ্যেও বলোনি—মাঝে-মাঝে আর্টের ও শারীরিক পরিশ্রমের সমান দামই হয় বটে! কিন্তু ভাই অত কথা বোলো না, আমি ভারি ব্যস্ত, তুমি বরঞ্চ একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকো।

কিছুক্ষণ পরে চাকর আসিয়া খবর দিল, ফ্রেমমেকার ট্রেভরের জন্যে অপেক্ষা করিতেছে। তাহার নাকি কি বলিবার আছে।

ট্রেভর উঠিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—দেখো পালিয়ে যেও না কিন্তু হুগী—এই আমি এলাম ব'লে।

বৃদ্ধ ভিখারীটি ট্রেভরের এই অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের জন্ম পিছনের একটি কাঠের বেঞ্চির উপরে বসিয়া পড়িল। বেচারীকে এতই দুঃখী ও নিরীহ দেখাইতেছিল যে, হুগীর বড়ই দয়া হইল। পকেটে কিছু আছে কিনা দেখিবার জন্ম হাত দিল—কিন্তু একটা হাফ-ক্রাউন ভিন্ন আর কিছুই বাহির হইল না। স্টুডিওতে পায়চারি করিতে-করিতে সে ভাবিতে লাগিল, আহা, বুড়ো বেচারী! আমার চেয়ে সত্যি তা'র পয়সার বেশী দরকার। কিন্তু……যাক। অবশেষে হাফ-ক্রাউনটিই সে ভিখারীর হাতে দিয়া দিল।

ভিখারীটি অবাক্‌ হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার শুষ্ক মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা খেলিয়া গেল। কহিল, ধন্যবাদ মহাশয় অসংখ্য ধন্যবাদ!

ইতিমধ্যে ট্রেভর আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে হুগী উঠিয়া বিদায় লইল। তখন তাহার মুখখানি লজ্জায় বেশ একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সারাটা দিন সে লরার সঙ্গে কাটাইল, এই অমিতব্যয়িতার জন্ম তাহার কাছ হইতে একটু মিষ্ট তিরস্কার লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। এবং অবশেষে ট্যাঁকে পয়সা না থাকাতে হাঁটিয়াই বাড়ী ফিরিল।

সেই রাত্রিতে প্রায় এগারোটার সময় ঘুরিতে-ঘুরিতে পেলেটক্লাবে উপস্থিত হইয়া হুগী দেখিল ট্রেভর এক কোণে একাকী বসিয়া মদ খাইতেছে। হাতের সিগারেটটা ধরাইতে-ধরাইতে সে কহিল—কি হে, ছবিখানা শেষ করেছ?

—হোঃ,শেষ করা বলো কি? একেবারে বাঁধানো পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে! কিন্তু ভাই,কিস্তি মাৎ ক'রে দিয়েছ যা হোক। —সে বুড়ো বেচারী তোমার প্রতি ভারি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছে। তুমি কে, কোথায় থাকো, কি করো, কত আয় সব কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমার কাছ থেকে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়ে গেল।—

হুগী তাহাকে বাধা দিয়া ঔৎসুক্যসহকারে কহিল, হয়ত বা বাড়ী গিয়ে দেখ্‌ব, সে বেচারী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আহা, দুঃখী গরীব! তা'কে কিছু সাহায্য কর্‌তে পার্‌লে আমি ভারি খুসী হতাম। উঃ! এত কষ্টও মানুষের সইতে হয়! সত্যি ভাই, আমার কিছু পুরোনো কাপড় ছিল—তাও ত তা'কে দিতে পার্‌লে হ'ত! তা'র চাদরটার যা অবস্থা!

ট্রেভর জবাব দিল—কিন্তু ভাই, ওতেই ওকে সুন্দর মানায়। লাখ টাকা দিলেও কিন্তু জরির জামা পরিয়ে

ভিখারীর ছবি আঁক্‌তে আমি রাজি নই। তোমরা যাকে ছেঁড়া বল্‌ছ, দরিদ্রতা বল্‌ছ, ঐখানেই তো কবিত্ব—ঐখানেই যে সত্যিকার আর্ট্‌। যা হোক্‌, তোমার কথা আমার মনে রইল, তা'কে জানাবো।

হুগী গম্ভীর হইয়া গেল। বিরক্তির স্বরে কহিল, তোমরা এই চিত্রকরের দলটাই তবে হৃদয়হীনের দল।

ট্রেভর হাসিতে-হাসিতে জবাব দিল,—দেখ,আর্টিস্‌টদের হৃদয় ব'লে মাথা থেকে ভিন্ন একটা কিছু নেই, বিশেষতঃ একটুও না বদ্‌লে জগৎটা যেম্‌নি আছে ঠিক তেম্‌নি উপলব্ধি করাই যখন আমাদের ধর্ম্ম। যাক্‌, কাজের কথা বলো, লরা কেমন আছে? বুড়ো বেচারী তা'র কথা শুনে ভারি অস্থির হ'য়ে পড়েছে কিন্তু!

—তুমি নিশ্চয়ই তা'র সম্বন্ধে বুড়োর সঙ্গে আলাপ করো নি।

—করেছি বই কি!—সে কর্ণেল, লরা—এমন কি দশ হাজার পাউণ্ডের কথাও জানে।

হুগী রাগে লাল হইয়া উঠিল, কহিল—তুমি ঐ বুড়ো ভিখারীটাকে আমার গোপনীয় কথাও সব বলেছ! ছি ছি ছি!—

ট্রেভর হাসিতে লাগিল, কহিল—ওগো, তুমি যাকে বার-বার ভিখারী বল্‌ছ, তিনি লণ্ডনের সব চেয়ে বড়

, তা জানো? ইচ্ছে কর্‌লে তিনি কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে এই সারা সহরটা কি'নে ফেল্‌তে পারেন—রুশিয়াকে যুদ্ধ থেকে—

হুগী চীৎকার করিয়া উঠিল,কহিল—কি সব পাগ্‌লামি কর্‌ছ?

—পাগ্‌লামি আমি কর্‌ছি! তবে শোনো, তুমি আজ যাঁকে আমার স্টুডিওতে দেখেছ, তিনি আর কেউ নন—ব্যারন্‌ হস্‌বের্গ। তিনি আমার মস্তবড় বন্ধু: আমার প্রায় ছবিই তিনি কি'নে থাকেন। মাসখানেক আগে তাঁকে ভিখারীর বেশে আঁক্‌বার জন্যে তিনি আমাকে কিছু টাকা দেন। সত্যি কথা বল্‌তে কি, ঐ ছেঁড়া জামা জুতো পরে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল; আর ঐগুলো যে আমার স্পন থেকে আনা, সেও ত তুমি জান।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল—অস্ফুটস্বরে কহিল—ব্যারন্‌ হস্‌বের্গ! ছি ছি ছি—আমি কিনা তাঁকে একটা হাফক্রাউন ভিক্ষা দিতে গেলাম, বলিয়াই সে ভয়ে বিবর্ণ হইয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল!

—হাফক্রাউন দিয়েছিলে? বলিয়াই ব্যাপারটা এক-নিমেষে আন্দাজ করিয়া লইয়া ট্রেভর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

হুগী অভিমানের স্বরে কহিল, আমাকে এ-কথা তোমার আগে জানানো উচিত ছিল এলান—তা হ'লে হয়ত আমাকে এমন বোকা বন্‌তে হ'ত না।

—কিন্তু তুমি যে আমার এখানে এসে পাগলের মতো ভিক্ষে দিতে আরম্ভ কর্‌বে, সে-কথা ত আমি কখনো ভাবিনি, হুগী। তুমি একটি সুন্দর মডেলকে চুমো খেতে পারো, বিশ্বাস করি কিন্তু একটি কিম্ভূতকিমাকার জীবকে বখ্‌শিস্‌ দিতে যাবে,সে আমি কি ক'রে ভাব্‌ব বলো! তা ছাড়া, আমি আজ সারাদিন কারো সাথে ভালো ক'রে মেলামেশা করিনি, তা'র পর তুমি যখন এলে, তাঁর পরিচয় দেওয়াটা অশোভনীয় হবে ভেবে চুপ ক'রে গেলাম। তুমি ত জানোই তাঁর ভালো জামা-জুতো পরা ছিল না।

হুগী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ছি ছি ছি, তিনি না জানি আমাকে কি বোকাই ঠাওরেছেন!

—না, না, মোটেই নয়। তোমার চ'লে আসার পরই তিনি হঠাৎ ভারি খুসী হ'য়ে উঠেছিলেন—মাঝে-মাঝে আপন মনে হাস্‌ছিলেন। তখন আমি তা'র কারণ বুঝ্‌তে পারিনি, কিন্তু এখন সব বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তুমি অনর্থক কিছু ভেবো না—তিনি হয়ত তোমার হাফক্রাউনটা সুদে খাটাতেও পারেন—আর বিশেষ কি খাওয়া দাওয়ার পর আসর জমাবার মতো একটা মজাদার গল্পও পাওয়া গেল!

হুগী আপন মনে বলিয়া উঠিল, ছি ছি! আমি একটা অপদার্থ! পালানো ছাড়া এখন আমার আর উপায় নেই! যাক্‌ তুমি ভাই দয়া ক'রে কাউকে কিছু বোলো না; এখন যে রাস্তায় কি ক'রে মুখ দেখাবো তাই ভাব্‌ছি।

—দূর বোকা। এ যে তোমার একটা পরোপকারের চিহ্ন রইল। দোহাই তোমার, পালিও না, আর-একটা সিগারেট ধরাও—ততক্ষণ লরা-সম্বন্ধে বরঞ্চ কিছু গল্প করো।

হুগী বেচারী কিন্তু বসিল না—দুঃখিতমনে বাড়ীর দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিল, পিছনে ট্রেভর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

পরদিন সকালে হুগী যখন খাইতে বসিয়াছে—তখন তাহার চাকর একটি কার্ড্ লইয়া উপস্থিত। তাহাতে লেখা—গুস্তাভ্ নোদিন্, ব্যারন হুস্‌বের্গের প্রধান কর্ম্মসচিব। হুগী ভদ্রলোকটিকে উপরে লইয়া আসিতে আদেশ করিল। সে সঙ্কল্প করিল, আজই তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিবে। না, আর দেরী নয়।

যে ভদ্রলোকটি আসিয়া প্রবেশ করিলেন তাঁহার চোখে সোনার চশ্‌মা—চুলগুলি পাকিয়া বিল্‌কুল সাদা হইয়া গিয়াছে। ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে তিনি কহিলেন —আপনিই কি মসিয়ে হুগী ?

হুগী মাথা নত করিয়া নমস্কার করিল। তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—ব্যারন্ হুস্‌বের্গ আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি—

হুগী অকস্মাৎ থামিয়া উঠিল, কোনোপ্রকারে ঠেকিয়া-ঠেকিয়া সে বলিল, তাঁকে বল্‌বেন আমি তাঁর কাছে ক্ষমা—

ভদ্রলোকটি মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন—ব্যারন্ এই চিঠিখানা দিয়ে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন বলিয়াই একখানা শিলমোহরমারা খাম বাহির করিয়া ধরিলেন।

খামটির উপরে লেখা ছিল—'হুগী এর্স্কিন্ ও লরা মার্টনের বিবাহে বুড়ো-ভিখারীর প্রীতি-উপহার'—ভিতর হইতে বাহির হইল দশহাজার পাউণ্ডের একখানা ক্ষুদ্র চেক্।

*   *   *

তাহাদের বিবাহে সবচেয়ে খুসী হইয়াছিল এলান্ ট্রেভর—বিবাহ-ভোজে-ব্যারণও একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিলেন।

সর্ব্বশেষে এলান্ মন্তব্য প্রকাশ করিল—লক্ষপতির আদর্শ পাওয়া দুষ্কর বটে, কিন্তু আদর্শ লক্ষপতি পাওয়া আরো দুষ্কর।*

* অস্‌কার ওয়াইল্ড্ হইতে।

বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর ঐতিহাসিকতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রী অমৃতলাল শীল

খ

অনৈতিহাসিক ও অসম্ভব ঘটনা।

১। রাসো-অনুসারে সর্ব্বসুদ্ধ ষোলবার পৃথ্বীরাজ ঘোরীকে বন্দী করিয়াছিলেন, ও কখন সামান্য কিছু দক্ষিণা লইয়া, কখন কেবলমাত্র সলাম করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এ কথা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। একজন প্রবল—সম্ভবতঃ আপন অপেক্ষা বলবান্—শত্রুকে ধরিতে পারিলে বড়-বড় বলবান্ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজারা একবারও ছাড়েন না ; ইংরেজরা নেপোলিনকে ছাড়িতে সাহস করেন নাই, আর পৃথ্বী বার-বার ধরিয়াও ছাড়িয়া দিলেন !! এ-সংখ্যাও সকল পুস্তকে এক-প্রকার নহে। হম্মীর মহাকাব্যে আছে সাতবার। অন্যান্য পুস্তকে ৫।৭।১০ বার, যাহার যেরূপ রুচি, সে সেই-রূপ লিখিয়াছে। সেকালে রাজারা বার মাস সৈন্য লইয়া করিয়া বেড়াইতেন। প্রতিবাসী বা অন্য কোনও রাজার সহিত যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কারণ দেখাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি কিছুই করিতে হইত না। প্রত্যেক রাজাকে সকল সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত, দুর্গে ও

নগরে অবরোধের সময়ের জন্য খাদ্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইত। এই বারমেসে যুদ্ধে প্রতিবাসী রাজাদের মধ্যে প্রতিবৎসরই ২।৪ বার সংঘর্ষ হইয়া যাইত। রাসোতে আছে, এইরূপ সংঘর্ষ পৃথ্বী ও ঘোরীর মধ্যে অনেকবার হইয়াছিল, অধিকাংশ বারই ঘোরীর পরাজয় হইয়াছিল। এইরূপ সংঘর্ষে ঘোরী ১৬ বার বন্দী হইয়াছিলেন, ও অনেক যুদ্ধে কোন পক্ষের হার বা জিত হয় নাই, সম্ভব সেগুলিতে পৃথ্বীর হার হইয়াছিল। কিন্তু যোলবার ধরিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব; যে রাজনীতির কোনও ধার ধারে না, সেও পারে না; অতএব বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যখন বন্দী করিবার কথা দন্তকথায়, আল্‌হার গানে ও নানাকাব্যে ও নাটকে আছে, তখন বন্দী করার ব্যাপারটা একেবারে ভিত্তিহীন না হইতে পারে। আমার বিশ্বাস একবার সত্য-সত্যই বন্দী করিয়াছিলেন, ও বলদর্পী উদার রাজপুত রাজা এই বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকিবেন,"দেখ, আমি তোমা অপেক্ষা কত বলবান্, তোমাকে বন্দী করিয়া ছাড়িয় দিলাম। তোমার যদি সাহস থাকে, তবে আবার আসিও, আবার মারিব, আবার বন্দী করিব।" সেকালের রাজপুতরা অতি সরল, বলদর্পী, অদৃষ্টবাদী, আশ্রিতপ্রতিপালক, ও সত্যবাদী ছিল; তাহারা মুসলমানদের কূট রাজনীতি বুঝিতে পারিত না।

২। রাসোর নানাস্থানে প্রথমে সোমেশ্বরের, ও পরে পৃথ্বীর বেতনভুক্ বা সামন্ত একজন প্রতিনিধি লাহোরে থাকিবার উল্লেখ আছে, অর্থাৎ লাহোর [ও পঞ্জাব] পৃথ্বীর বিস্তৃত রাজ্যের এক প্রদেশ ছিল। পৃথ্বীর শেষ বড় যুদ্ধের অথবা পতনের পূর্ব্বে লাহোরের শাসনকর্ত্তা পৃথ্বীর একজন সুর ছিলেন, তিনি ঘোরীর আক্রমণের সময়ে আপনার প্রভু পৃথ্বীকে সাহায্য না করিয়া ঘোরীকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। চন্দ কবি তাঁহাকে বুঝাইয়া অনেক উপদেশ দিলেন ও পূর্ব্ব প্রভু হিন্দু রাজাকে ছাড়িয়া বিদেশী ও বিধর্ম্মী মুসলমানকে সাহায্য করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, এখন সলমানদের ভাগ্যোদয় হইয়েছে, তাহাদের সেবা করাই যুক্তিযুক্ত। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে লইয়া আজ ছয়মাস প্রাসাদের বাহিরে আসেন নাই; রাজ্যের কি অবস্থা হইতেছে, কিছুই সংবাদ রাখেন না; যে প্রভু রাজ্যরক্ষা করিতে নিশ্চেষ্ট, তাহার সেবা করিয়া লাভ কি? ইহা ছাড়া এতকাল কেহ পৃথ্বীকে দেখে নাই; লোকে বলে, তিনি সংযুক্তার অন্তঃপুরে আছেন, কিন্তু তিনি যে বাঁচিয়া আছেন তাহার প্রমাণ কি? চন্দ তাঁহাকে কোন মতে স্বীকৃত করিতে না পারিয়া ভগ্নমনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এ-বর্ণনা রাসোর; কিন্তু অন্য সকল ঐতিহাসিকরা বলে, ১০২২ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহমুদ গজনবী লাহোর জয় করিয়া তথায় আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন। সেই পর্য্যন্ত লাহোর ও তাহার পশ্চিমাংশ মহমুদের বংশধরদের অধীনেই ছিল। কালে তাহারা গজনী হইতে বিতাড়িত হইলে লাহোরেই রাজ্য করিত। ঐ বংশের শেষ বংশধর খুসরো মলিককে ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে ঘোরী ফাঁকি দিয়া বন্দী করিয়া লাহোরে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন।

অতএব সোমেশ্বর ও পৃথ্বীর সময়ে লাহোরে প্রথমে গজনবী বংশীয় ও পরে ঘোরীরা রাজ্য করিয়াছে। সেখানে কোনও হিন্দুরাজা বা রাজার প্রতিনিধি কোনকালে ছিল না।

৩। রাসো অনুসারে রাণা সমরসিংহ যখন পৃথ্বীকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি আর জীবিত ফিরিয়া আসিবেন না; তিনি আপনার দ্বিতীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রত্নসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। এই রত্নসিংহ পৃথ্বীর ছোট ভগ্নী পৃথার একমাত্র পুত্র। রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিলেন না কেন, সে-প্রশ্নের উত্তরে কবি বলিতেছেন, জ্যেষ্ঠা কুম্ভা পিতার সহিত বিবাদ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছে, ও দাক্ষিণাত্যে বিদরের মুসলমান রাজার সহচর হইয়া রহিয়াছে।

এই ঘটনা ১১৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দের, কিন্তু ইতিহাস-পাঠকমাত্রই জানেন যে দাক্ষিণাত্যে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সৈন্য সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণের মুসলমান সেনাপতিরা তোগলক বংশীয় বাদশাকে ত্যাগ করিয়া কুলবর্গাতে বহমনী-বংশীয় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। অহম্মদশাহ বহমনী ১৪২২

খৃষ্টাব্দে প্রাচীন বিদর্ভ নগরের কাছে নূতন রাজধানী অহমদাবাদ বীদর স্থাপন করিয়া সেইখানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বহমনী বংশ দুর্ব্বল হইলে লোকে অহমদাবাদ শব্দ ছাড়িয়া কেবল বীদর বলিতে লাগিল। এখন বীদর নগর নিজাম রাজ্য-মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর স্থান; হায়দ্রাবাদ হইতে মোটরে যাওয়া যায়। কবি দাক্ষিণাত্যে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইবার ১১৫ বৎসর পূর্ব্বে, ও বীদর রাজধানী হইবার ২৩০ বৎসর পূর্ব্বেই কুন্তাকে বীদরের মুসলমান রাজার সহচর করিয়াছেন।

এই উক্তি দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে লেখকের সময়ে বীদর মুসলমান রাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব রাসো অন্ততঃ ষোড়শ শতাব্দীর লেখা হইবে।

৪। রাসোর বর্ণনানুসারে মুসলমানেরা পৃথ্বীকে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া গিয়াছিল, সেখানে তাঁহার দুই চক্ষু নষ্ট করিয়া অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কবি চন্দ, ঘোরীর অনুমতি লইয়া, আপনার অন্ধ প্রভুর কাছে থাকিতেন। কবি ঘোরীকে পৃথ্বীর শব্দভেদী বাণ মারিবার ক্ষমতার কথা বলিলেন। ঘোরী দেখিতে চাহিলেন। লক্ষ্যভেদ করিবার আয়োজন হইলে চন্দের ইঙ্গিত-মত পৃথ্বী ঘোরীর শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণ ত্যাগ করিলেন, এই সময়ে ঘোরী কত দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, কবি পূর্ব্বেই সেই দূরত্ব মাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন পৃথ্বীকে বলিয়া দিলেন। ঘোরীর মৃত্যু হইল, এই অবসরে পৃথ্বী ও চন্দ উভয়ে উভয়কে কাটিয়া ফেলিলেন। অতএব শেষ যুদ্ধের কয়েক মাস পরে—সম্ভবতঃ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে—একই সময়ে ঘোরী, পৃথ্বী ও চন্দের মৃত্যু হইল।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা বলেন, পৃথ্বী সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ শেষ হইলে সরস্বতী-নদীতীরে তাঁহার দেহ পাওয়া গিয়াছিল। ঘোরী ১২০৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু-নদতীরে গক্করদের ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন অর্থাৎ রাসো-বর্ণিত মৃত্যু সময়ের পর আরও বার বৎসর নানা যুদ্ধ ও দেশ জয় করিয়াছিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অগ্রজের মৃত্যুর পর তিনি ঘোর ও গজনী রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু কবিরা পৃথ্বীর মত বীরের কাপুরুষোচিত আত্ম-হত্যা ও শেষ জীবনে অন্ধ ও বন্দী হওয়ার লিখিয়াছেন, কিন্তু মুসলমানেরা বীরের মত সম্মুখ সমরে মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। শিহাবউদ্দীন মহম্মদ ঘোরী ঘোর নগরবাসী ছিলেন। ঐ নগর এখনও আছে। কিন্তু রাসোর কবি বলিতেছেন, শিহাবউদ্দীনের মাতা যখন দুইটি শিশু পুত্র লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন, তখন নানা কারণে পুত্রদ্বয়কে লইয়া রাজবাটী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ও একটি ভগ্ন গোর-মধ্যে কয়েক দিবস লুকাইয়াছিলেন। পরে ঐ দুই শিশু গজনী জয় করিল, বড় রাজা ও ছোট প্রধান সেনাপতি হইল। শৈশবে তাহারা গোরে লুকাইয়াছিল বলিয়া গোরী নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু শব্দটি গোরী নহে ঘোরী, ও গোরের সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই।

কেহ-কেহ বলে, চোহানদের এক শাখার নাম গৌড়িয়া চোহান ছিল। যখন চোহানেরা অহিক্ষেত্র হইতে শিবালিক পর্ব্বতের তলে বাস করিতে গেল, তখন এই গৌড়িয়া চোহানেরা সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে কোনও স্থানে বাস করিয়াছিল। তাহার পর আর তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হয়ত গৌড়ি হইতে ঘোরী হইয়াছে। কিন্তু এ উক্তি অনুমানমাত্র, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। আধুনিক অফগানিস্থানবাসী ক্ষত্রিয়দের সহিত রাজপুতদের আদান-প্রদান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আল্হার গানে আছে, আল্হার পুত্র ইন্দল [ইন্দ্রজিৎ] কান্ধারের শৈব রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন কান্ধারবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে নাই।

৫

এইবার রাসো-লিখিত বংশলতা ও হম্মীর মহাকাব্য ও বিজওলার শিলালেখ অনুসারে বংশলতা উপমিত করিব।

প্রত্যেক নামের পর যে বিক্রম সম্বৎ আছে, সেই-সেই সম্বতের শিলালেখ অথবা দানপত্র পাওয়া গিয়াছে। নামের পূর্ব্বে এক হইতে এগার পর্য্যন্ত সংখ্যা রাজ-সিংহাসনের অধিকারীর ক্রম।

রাসোলিখিত বংশলতা

চাহুমান বংশে
বিসলদেব
|
সারঙ্গদেব
|
আনারাজা
[৭১ বৎসর রাজ্যকাল]
|
জয়সিংহ
[১০৮ বৎসর রাজ্যকাল]
|
অনন্দদেব
[১০০ বৎসর রাজ্যকাল]
|
সোমেশ্বর
|
পৃথ্বীরাজ
|
রেণু সিংহ
[রেণ সী]

শিলালেখ ইত্যাদি মতে বংশলতা

(১) বিগ্রহরাজবীসলদেব [তৃতীয়]
|
(২) পৃথ্বীরাজ (১ম)
|
(৩) অজয় দেব
|
(মারবার কন্যা) সুধবা—(৪) অর্ণোরাজা—দেবল দেবী (কুমারপালের ভগ্নী)

(৫) জগদেব — (৮) পৃথ্বীরাজ (দ্বিতীয়) ১২২৪।২৫।২৬
(৬) বিগ্রহরাজ বাসলদেব (৪র্থ) ১২২০ — (৭) অমরগাঙ্গেয়
(৯) সোমেশ্বর প্রতাপ লঙ্কেশ্বর ১২২৬।২৮।২৯।৩৪ — (১০) পৃথ্বীরাজ (তৃতীয়) ১২৩৯; (১১) হরিরাজ
(১০) পৃথ্বীরাজ — গোবিন্দরাজ, রণথম্বের প্রথম রাজা

হম্মীর মহাকাব্যে (৫) জগদেবের সিংহাসন-প্রাপ্তির উল্লেখ নাই। অর্ণোরাজের পর বিগ্রহরাজ বীসলদেব (৪র্থ)র নাম। তাহার কারণ অর্ণোকে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু ২।৪ দিবস বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে বিগ্রহরাজ পিতৃ-হত্যাকারী অগ্রজকে মারিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। 'পৃথ্বীরাজ বিজয়' কাব্যে আছে "সুধবার জ্যেষ্ঠপুত্র আপন পিতার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন, যেমন পরশুরাম আপনার মাতার সহিত করিয়াছিলেন। বাতি নিবাইয়া দিলে যেমন দুর্গন্ধমাত্র থাকে, তাঁহার কার্য্যেরও সেই-রূপ দুর্গন্ধমাত্র থাকিয়া গেল।" (৭) অমরগাঙ্গেয় অতি অল্প দিন রাজ্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ আপনার পিতার প্রাপ্য রাজসিংহাসন কাড়িয়া লইয়া-ছিলেন। পৃথ্বীরাজ বিজয় ও বিজলিলার লেখে এ-নামের উল্লেখ নাই।

ট

রাসোর সকল বড় ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল, কেবল সংযুক্তা হরণ-সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। ভারতে বিশেষতঃ উত্তর ও মধ্য ভারতে বর্ষাকালে এখনও আল্হার গান গাওয়া হয়। পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক রাজা পরম-দিদেব চন্দেল [পরমাল] বুন্দেলখণ্ডের রাজা ছিলেন। মহোবা তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার প্রধান সেনাপতি আল্হা বনাফর [আলহন রাজা] ও তাঁহার অনুজ উদন বাঁকড়া [উদয়সিংহ] সেকালের প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। আল্হার গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে সংজোগিন-[সংযুক্তা] হরণের গান করা নিয়ম। যখন পৃথ্বীরাজ মহোবা আক্রমণ করিলেন, তখন কনোজপতি জয়চন্দ্র পরমাল চন্দেলকে সাহায্য করিতে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র লাখন [লক্ষণ] রাণার অধীনে সেনা পাঠাইয়াছিলেন। এই সাহায্যের কারণ সংযুক্তা-হরণের অপমানের প্রতিশোধ বলা হয়। আল্হার গানে কয়েক স্থানে লাখন রাণার উক্তি আছে, "যে পৃথ্বী আমাদের বাটীর একটি চেরী [দাসী কন্যা] ভুলাইয়া আনিয়াছে, আমি তাহার প্রতি-শোধ লইতে আসিয়াছি। পৃথ্বী যদি জয়চন্দ্রকে দিয়া কন্যাদান করাইয়া লইতে পারিত, তবে তাহাকে বীর বলিয়া মানিতাম, সে ত চোরের কাজ করিয়াছে।" পৃথ্বী একবার লাখনকে বলিতেছেন, "তুমি এখন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ, কিন্তু আমি যখন সংযুক্তাকে আনিয়া-ছিলাম তখন কোথায় ছিলে?" লাখন উত্তর দিলেন, "তখন আমি বালক, তরবারি ধরিতে শিক্ষা করি নাই,

তাহাই এখন প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছি।" লাখন একবার দিল্লীতে পৃথ্বীর পাটরাণীকে বন্দিনী করিয়াছিলেন; পরে, বন্ধু উদনের অনুরোধে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই সময়ে বলিয়াছিলেন; "পৃথ্বী আমাদের বাটীর চেরী আনিয়াছে, আমি তাহার প্রতিশোধ লইলাম।" মদনপুরের শিলালেখ-অনুসারে ১২৩৯ সম্বৎ [১১৮২] মহোবা জয় হইয়াছিল, অতএব যদি লাখনের উক্তি বিশ্বসনীয় হয়, তবে ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কোনও সময়ে সংযুক্তা-হরণ হইয়াছিল।

যুক্তপ্রদেশের দন্তকথায় সংযুক্তা-হরণ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে, ও ইহার উল্লেখ নানা কাব্যে ও নাটকে দেখা যায়। আল্হার গানে অত্যুক্তি আছে সত্য, কিন্তু অত্যুক্তি ও মিথ্যা সহজে ধরা পড়ে। আল্হার গানে দেখা যায়, পৃথ্বী সামান্য একটি গ্রামের বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করিতে হইলেও সাতলক্ষ সেনা লইয়া আক্রমণ করিতেন। "সাতলাখ সে চঢ়ো পিথোরা" প্রায় সকল অভিযানেই গীত হয়, কিন্তু "সাতলাখ" শব্দ আছে বলিয়া অভিযানগুলি মিথ্যা বা কল্পিত বোধ হয় না।

রাসোতে সংযুক্তা-হরণের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

একদিন পৃথ্বীরাজ চন্দ কবিকে ধরিয়া বসিলেন, আমাকে ছদ্মবেশে আপনার সহিত কনোজ লইয়া চল, তুমি কবিরূপে জয়চন্দের সভাতে প্রবেশ করিবে, ও আমি তোমার পানদানবাহক সেবকরূপে তোমার পশ্চাতে থাকিয়া জয়চন্দের সভা ও সংযুক্তাকে দেখিব।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে, জয়চন্দ রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞে ভারতের সমস্ত ছোটো বড় রাজাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; রাজসূয় যজ্ঞের নিয়মমত রাজাদের এক-একটি কার্য্য করিবার ভার দিয়াছিলেন। পৃথ্বীকে ছড়ি হাতে করিয়া যজ্ঞসভার দ্বার রক্ষা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। পৃথ্বী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না, দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, ও যজ্ঞ নষ্ট করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়চন্দের এক নিকট জ্ঞাতি-ভ্রাতা এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, যজ্ঞারম্ভের দুইএকদিন পূর্ব্বে, পৃথ্বী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন; মৃতশৌচে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া গেল।

এ-যজ্ঞে পৃথ্বীকে দ্বারপালরূপে আহ্বান করা হইয়াছিল, তিনি যখন নিমন্ত্রণ লইলেন না তখন জয়চন্দ, বিদ্রূপ করিয়া, অথবা আপনার আজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য কাগজ ও সুবর্ণের পৃথ্বীর পূর্ণ শরীরপ্রমাণ মূর্ত্তি গড়িয়া হাতে ছড়ি দিয়া, যজ্ঞমণ্ডপের দ্বারের কাছে দ্বাররক্ষকের মতন বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইল না, কিন্তু মূর্ত্তিটি থাকিয়া গেল, মূর্ত্তি তুলিয়া ফেলিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই।

যজ্ঞ নষ্ট হইবার পর জয়চন্দ ভাবিলেন, ভারতের সকল রাজারাইত এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, একমাত্র আদরের কন্যা সংযুক্তাও বয়স্থা হইয়াছে, অতএব এই সুযোগে তাহার স্বয়ম্বর করিলে ভালো হয়! তিনি সেই যজ্ঞের পরিত্যক্ত মণ্ডপে স্বয়ম্বর সভা করিলেন।

সংযুক্তার প্রধানা দাসী কর্ণাট-দেশীয়া ছিল, সে পূর্ব্বে পিথোরার দাসী ছিল, তাহার চরিত্রের জন্য পৃথ্বী শাস্তি দিয়াছিলেন বলিয়া সে পলাইয়া জয়চন্দের আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার মুখে ও ভাট ও কবিদের মুখে পিথোরার নানা বীরত্বের গল্প ও গাথা শুনিয়া সংযুক্তা মনে-মনে পিথোরার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। যদিও তাঁহাকে কখন দেখে নাই, তথাপি তাঁহাকে স্বয়ম্বর সভায় পতিত্বে বরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া এখন সভায় প্রবেশ করিল। সভাতে যখন ভাট একে-একে সকল রাজাদের পরিচয় দিল, তখন পিথোরার নাম না শুনিয়া সংযুক্তা চিন্তিত ও ভগ্ন মনে বরমাল্য হাতে করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল; এমন সময়ে মণ্ডপের দ্বারের কাছে মূর্ত্তি দেখিয়া, কৌতূহলের বশে ঐ মূর্ত্তিটি কি, কাহার, ও দ্বারের কাছে কেন রাখা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল। পিথোরার মূর্ত্তি শুনিয়া সংযুক্তা সেই মূর্ত্তির গলায় মাল্যদান করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। এই ঘটনা দ্বারা উপস্থিত রাজারা আপনাদের অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন; কিন্তু সম্রাটের আদরের কন্যার কার্য্যের আলোচনা বা প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। জয়চন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং কিছু না বলিয়া কন্যাকে তিরস্কার ও শাসন করিতে তাহার মাতার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে সংযুক্তার

মতপরিবর্ত্তন ও সুমতি হইলে দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বর সভা করিবেন, সেইজন্ত অতিথি রাজাদের আরও কয়েকদিবস থাকিতে আজ্ঞামিশ্রিত অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাঁহারাও অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

সংযুক্তার মাতা, মহারাণী জ্যোৎস্না, কন্তাকে নানা কথায় তিরস্কার করিলেন; পরে বলিলেন, "তোর ব্যবহারে তোর পিতার মানসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া গেল, রাজাদের সমাজে মুখ দেখানো ভার হইল। তুই কি নির্ব্বোধ! সভাতে এত বড়-বড় রাজা থাকিতে তুই কিনা তোর পিতার পরম শত্রু ও অপমানকারী, আমাদের বংশের শত্রু, অকারণে ও অধর্ম্ম যুদ্ধে তোর খুল্লতাত ঘাতকের মূর্ত্তিকে বরণ করিলি?" গর্ব্বিতা সংযুক্তা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, মাতার তিরস্কার-বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া কানে তোলে নাই, এখন এই কথাগুলি শুনিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, "মা তুমি ভুলিতেছ, আমি যে-সে সাধারণ বালিকা নহি, আমি চক্রবর্ত্তী রাজা জয়চন্দ্রের কন্তা, যে-রাজা অঙ্গুলী হেলাইলে সে আদেশ সমুদ্রতীর হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত নতশিরে মান্য করে, আমি সেই সম্রাট্ জয়চন্দের কন্তা, যাহার দ্বারে সর্ব্বদা অগণিত ছত্র ও মুকুটধারী ক্ষত্রিয়রা নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রহরীর কার্য্য করে, আমি সেই দিগ্বিজয়ী বীর জয়চন্দ্রের কন্তা। তুমি বলিতেছ, এত বড় রাজা আসিয়াছেন, কিন্তু আমি ত সভাতে একটিও রাজা দেখিতে পাইলাম না। আমার চক্রবর্ত্তী পিতার হুঙ্কার শুনিয়া যে কুকুরগুলা ভয়ে ল্যাজ গুটাইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া বসিয়াছে, আমি জয়চন্দ্রের কন্তা হইয়া, কোন্ লজ্জায় তাহাদের মধ্যে কাহারও দাসী হইতে যাইব? তাহা ত জীবন থাকিতে পারিব না। যে সিংহ আমার পিতার মত রাজচক্রবর্ত্তীর নিমন্ত্রণ-পত্রবাহক দূতকে অবজ্ঞা করিয়া তাড়াইয়া দিতে সাহস করিয়াছে, কেবল সেই বীর আমার স্বামী হইবার উপযুক্ত পাত্র। যদি কখন তাঁহাকে পাই, তবে তাঁহার দাসী হইব, নতুবা কুকুরী হওয়া অপেক্ষা কুমারী জীবনই কাটাইব।" এ উক্তির উপর আর কোনও-প্রকার তর্ক চলে না, অতএব জয়চন্দ্র রাগ করিয়া কন্তাকে গঙ্গাতীরের এক প্রাসাদে অল্প কয়েকটি দাসীর সহিত আবদ্ধা করিয়া রাখিলেন। কিছু-কাল পরে, কনোজ হইতে কোনও পথিক দিল্লীতে গিয়া পৃথ্বীকে এই গল্প শুনাইল। পৃথ্বী,ছদ্মবেশে কনোজে আসিয়া অন্ততঃ একবার এই অদ্ভুতচরিত্রা তেজস্বিনী ও গর্ব্বিতা সংযুক্তাকে দেখিবার জন্ত উৎসুক হইলেন।

চন্দ প্রথমে রাজাকে ছদ্মবেশে সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহস করেন নাই,কিন্তু পৃথ্বীকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া সুর ও মন্ত্রীদের পরামর্শ করিতে বলিলেন, ভাবিলেন, তাহারা কখনই এমন দুঃসাহসের কার্য্যের অনুমোদন করিবে না। চন্দের পরামর্শ-মত পৃথ্বী আপনার সুর ও মন্ত্রীদের ডাকিয়া সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সোমেশ্বর পৃথ্বীর বাল্যকাল হইতে একশত আট জন সঙ্গী করিয়া দিয়াছিলেন, ইহারা সকলেই সদ্বংশজাত বীর ও সাহসী যোদ্ধা, ইহারাই পৃথ্বীর প্রসিদ্ধ "অষ্টোত্তর সুর" নামে পরিচিত। পৃথ্বীর এক জ্ঞাতি খুল্লতাত—কহ্নকাকা—এই সুরদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও সাহসী ছিলেন। তিনি সুরদের প্রধান বা নায়ক বিবেচিত হইতেন। ইঁহাদের বাহুবলে পৃথ্বী এত বলীয়ান্ ছিলেন, যে যতই বলবান্ শত্রু হউক না কেন, তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে চিন্তা না করিয়াই মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রস্তুত হইতেন। সকলেই ছদ্মবেশে যাইতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন "একজন রাজার এ-প্রকার ছদ্মবেশে সেবক সাজিয়া যাওয়া উচিত নহে। ইহা ছাড়া তোমার মতন প্রসিদ্ধ রাজাকে জয়চন্দ স্বয়ং কখন দেখেন নাই বটে, কিন্তু সভার কেহই চিনিতে পারিবে না, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?" পৃথ্বী বলিলেন, "একজন ব্রাহ্মণ কবির পানদানবাহক সেবককে প্রসিদ্ধ বীর ও বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী পিথোরা বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে, এমন মুখ কোথায় পাইবে?" যখন সকলে পৃথ্বীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিলেন, তখন বলিলেন, "একান্ত যদি যাওয়া স্থির করিয়া থাকো, তবে আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইয়া চল।" পৃথ্বী আপনার সঙ্গী অষ্টোত্তর সুর ছাড়া ঐ সুরদের সমকক্ষ, মৃত্যুভয়হীন যোদ্ধা, ১১০০ এগার শত বাছা-বাছা বীর অশ্বারোহী সঙ্গে লইলেন। তাঁহার সুর ও অশ্বারোহী প্রত্যেকে ৫।৭।১০ জন আপনাদের সমকক্ষ বীর, আপনার-আপনার আত্মীয়-কুটুম্ব সঙ্গে লইল। ইহা ছাড়া প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্ত, এক-একটি ধরিলেও,

অতিরিক্ত ১০।১২ হাজার বলবান্, কষ্টসহিষ্ণু, দ্রুতগামী শিক্ষিত অশ্ব, ১২,০০০ যোদ্ধার উপযুক্ত অতিরিক্ত অস্ত্রশস্ত্র, অটালা [ভোজনালয়], বস্ত্রাবাস ও সেবকদের দল সঙ্গে লইতে হইল। এইরূপে, অতি অল্প করিয়া ধরিলেও ২৫।৩০ হাজার লোকের দল হইল। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি পথ হাঁটিতেন ও রৌদ্রের সময়ে বিশ্রাম করিতেন। দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া চতুর্থ দিবস সূর্য্যোদয়ের সময়ে তাঁহারা কনোজ নগরে প্রবেশ করিলেন।

চন্দ রাজদ্বারে আসিয়া প্রচার করিলেন, তিনি দিল্লীর রাজকবি, কনোজপতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন। সেকালে কবিদের, বিশেষতঃ রাজকবিদের অনেক ছোটো-খাটো রাজাপেক্ষা বেশী সম্মান ছিল। তাহারা রাজাদের মতন হাতী, ঘোড়া, ডঙ্কা, নিশান, চোবদার ইত্যাদি ও ২।৪ হাজার বা ততোধিকসংখ্যক লোক সঙ্গে করিয়া পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত, ও ছোটো-বড় সকল রাজপুত সভাতেই সম্মান লাভ করিত। তাহারা নিজেদের রাজাদের কীর্ত্তির গাথা, অথবা শ্রোতা যাহা শুনিতে চাহে তাহাই শুনাইত, ও অন্যদের সংবাদসংগ্রহ করিত, সকলে আগ্রহ করিয়া আপনাদের দেশের সত্য সংবাদ দিত। এই ভ্রাম্যমাণ কবিরা রাজপুতদের ইতিহাসের সচল পুস্তকাগার ছিল, সকল রাজপুতদের কীর্ত্তিকাহিনী ইহাদের কণ্ঠাগ্রে থাকিত। সেকালে সংবাদপত্রাদি ছিল না, এই কবিদের দ্বারাই সকল রাজপুত-বীরদের কীর্ত্তিকাহিনী, ধন ও পুত্র কন্যাদের কথা রাজপুতসমাজে অতি অল্প কালে প্রচারিত হইত। রাজপুতসমাজে পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে এইরূপ সংবাদ কার্য্যকরী হইত। কখন-কখন রাজপুতবালারা যুবকদের বিবাহ করিতে আহ্বান করিত।

যখন চন্দ রাজসভাতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে পিথোরা স্বর্ণময় পানদান হাতে লইয়া সেবকরূপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সভার যাহারা পূর্ব্বে পিথোরাকে দেখিয়াছিল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, কবির পানদানবাহক দেখিতে ঠিক পিথোরার মতন, স্বয়ং পিথোরা নহে ত ? এ-সন্দেহের কথা ক্রমে জয়চন্দের কানে উঠিল, কিন্তু অপমানের ভয়ে, কেবল সন্দেহে একজন সেবককে পিথোরা বলিয়া ধরিতে ও বন্দী করিতে তিনি সাহস করিলেন না। পানদানবাহকের পরিচয় জানিবার জন্য গুপ্ত চরদের আজ্ঞা করিলেন। জয়চন্দ কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার রাজা কিরূপ দেখিতে, ও তাঁহার বয়স কত ?' কবিরা চারি দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাপ্রকারে হাত নাড়িয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া, কবিতা আবৃত্তি করিত; চন্দও তৎক্ষণাৎ পিথোরার রূপ ও গুণ বর্ণনা করিয়া, মুখেমুখে কয়েকটি রচনা করিয়া আপনার পানদান-বাহকের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার রাজা এইরূপ ও তাঁহার বয়স ৩৬ * বৎসর ছয়মাস; অর্থাৎ প্রকারান্তরে পিথোরাকে দেখাইয়া দিলেন। জয়চন্দ কবি ও তাহার অনুচরদের এক বিস্তৃত বাগান বাটীতে থাকিবার স্থান দিলেন, কবির সহিত ৫।৭ হাজার লোক রহিল, বিদেশী ধনবান্ ভ্রমণকারীদের মতন নগরের নানা স্থানে, কিন্তু যত দূর সম্ভব, বাগানের নিকটে স্থান ভাড়া লইয়া আশ্রয় লইলেন।

পরদিন প্রাতে জয়চন্দ বহুমূল্য উপহার লইয়া, হাতী ঘোড়া মণিমুক্তাদি লইয়া, বাগান-বাটীতে আসিয়া কবির সম্মানবৃদ্ধি করিলেন। জয়চন্দের বিদায়ের সময়ে কবি নিয়ম-মত আপনার পানদানবাহককে মহারাজাকে পান দিতে আজ্ঞা করিলেন। পিথোরা পান আনিলেন বটে, কিন্তু হাতে করিয়া পান তুলিয়া জয়চন্দকে দিতে গেলেন। পান দিবার নিয়ম, যে যখন সম্মাননীয় ব্যক্তিকে পান দিতে হয়, তখন নিজের হাত পাতিয়া তাহার উপর রাখিয়া ভেট দিবার মতন করিয়া দিতে হয়, গ্রহীতা তুলিয়া লয়; কিন্তু যখন রাজারা প্রজাদের পান দেন, তখনদান করিবার মতন নিজের হাত উপুড় করিয়া সেই হাতে হাত দিয়া থাকেন, গ্রহীতা হাত পাতিয়া দান গ্রহণ করে। এ অবস্থায় জয়চন্দকে হাত পাতিয়া, তাহার উপর পান রাখিয়া, ভেট দিবার মতন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু পৃথ্বী আপনার পূর্ব্ব অভ্যাসমত, অথবা ইচ্ছা করিয়া জয়চন্দকে অপমান করিবার জন্য, আপনার হাতে পান তুলিয়া দান করিবার মতন দিতে

* রাসোতে পৃথ্বীর জন্ম ১১৪৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল [বৈশাখ] মাসে, অতএব এঘটনা ১১৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর [কার্ত্তিক]মাসের হওয়া উচিত, কিন্তু সংযুক্তার বিবাহের সময়ে ফাল্গুন মাস বলা হইয়াছে। ১১৮৪খৃঃতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গেলেন। জয়চন্দ্র ওরূপে পান লইতে অভ্যস্থ নহেন, অতএব লইতে অস্বীকার করিলেন। কবি জয়চন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে,তাঁহার সেবক নূতন লোক,এরূপ কার্য্যে অনভ্যস্থ, পূর্ব্বে কখনও রাজাদের পান দেয় নাই; অতএব জয়চন্দ্রের নিয়মের বশীভূত না হইয়া কবির আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা উচিত। তিনি দুই চারিটি কবিতা ও শ্লোকও বলিলেন, যে এমন অবস্থায় সজ্জনেরা কেবল প্রীতি ও ভক্তিটুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন; পান ত সামান্য মূল্যহীন উপলক্ষ মাত্র। কবির বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জয়চন্দ্র পান লইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ বাড়িয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি এই পানদান-বাহক সত্য-সত্যই পিথোরা? কিন্তু একজন ছত্র ও মুকুট-ধারী বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী সম্মানিত রাজা এরূপ হীন কার্য্যভার লইবে, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। নূতন সেবক হইলে কি কবি তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাজাদের সভায় পর্য্যটন করিতে বাহির হইয়াছেন, অথচ রাজাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সে শিক্ষা দেন নাই? সেবকের ভুলের জন্য আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু কই সেবকের প্রতি ত রুষ্ট হইলেন না। এরূপ সন্দেহ বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য বাগানবাটীতে আরও কয়েকটি চতুর চর পাঠাইলেন। দ্বিপ্রহরে, কবি জয়চন্দ্রের আহ্বানে রাজবাটীতে গিয়া নানা কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত করিলেন। চোহান-বংশের ইতিহাস, ও পৃথ্বীর পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী শুনাইলেন। ঘোরী কয়েকবার জয়চন্দ্রের রাজ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, তখন পৃথ্বী তাঁহাকে পথেই পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া প্রকারান্তরে জয়চন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন সে-কথাও শুনাইলেন। পৃথ্বী এইরূপে জয়চন্দ্রের কত উপকার করিয়াছেন, জয়চন্দ্র তাহা জানিতেন না, কবি এখন সেইসকল কথা বলিয়া তাঁহাকে পৃথ্বীর প্রতি তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন।

তৃতীয় প্রহরে, ধনবান্ যুবকের বেশে, পিথোরা এক জন সুর সঙ্গে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে নগর ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন তিনি নদীতীরে বেড়াইতেছিলেন, তখন সংযুক্তার প্রধানা দাসী তাঁহাকে চিনিতে পারিল, ও তাঁহার চেষ্টায় পৃথ্বীর সহিত সংযুক্তার সাক্ষাৎ হইল। দাসী উভয়কে পরিচিত করাইয়া দিলে সংযুক্তা পৃথ্বীর গলায় ফুলের মালা দিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে আপনার মূর্ত্তি বরণ করিয়া মনে-মনে নামমাত্র দাসী হইয়াছিলাম, আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, সত্য-সত্যই আপনার দাসী হইলাম।" পিথোরার সঙ্গী সুরটি চোহান বংশের কুল-পুরোহিত বংশীয় ছিলেন, তিনি কন্যাদানের মন্ত্রপাঠ করিলেন, সংযুক্তার প্রধানা কর্ণাটী দাসী কন্যাদান করিল, বিবাহ হইয়া গেল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পিথোরা একা বাগানে ফিরিয়া আসিলেন। কহ্নকাকা, বিবাহের কথা শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "তোমার মত মূর্খ ত্রিজগতে নাই; বিবাহ যদি করিলে, তবে চোহান রাজ-বধূকে অসহায়া ও অরক্ষিতা অবস্থায় কমধ্বজ কারাগারে রাখিয়া আসিতে একটুও লজ্জা বোধ করিলে না?" পৃথ্বী আবার গিয়া সংযুক্তাকে সেই রাত্রেই সঙ্গে করিয়া আনিলেন।

এ ঘটনার পর পৃথ্বী আর কনোজে থাকা নিরাপদ্ বিবেচনা করিলেন না, অতএব কনোজবাসের তৃতীয় দিবস প্রাতে পৃথ্বী ও সংযুক্তা উভয়ে এক বলবান্ অশ্বপৃষ্ঠে বসিলেন, চারিদিকে সুরেরা ব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন পৃথ্বী চন্দ-কবিকে বলিলেন, "যাও, রাজসভাতে জয়চন্দ্রকে সংবাদ দিয়া আইস।" চন্দ বলিলেন, "বৃথা বিবাদ করিয়া লাভ কি? তোমার ত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, এইবার গৃহে চল।" কিন্তু পৃথ্বী স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন "আমি চোর নহি, চুরি করিতে আসি নাই, সংবাদ দিয়া বীরের মতন যাইব, যাহার ক্ষমতা বা সাহস থাকে সে আমাকে আটক করুক।" এইরূপে,সংবাদ দিয়া, পৃথ্বী আপনার সুর ও অনুচরদের মৃত্যু ডাকিয়া আনিলেন।

ইতিপূর্ব্বে, জয়চন্দ্র গুপ্তচরের মুখে কবির দলে পিথোরার অস্তিত্বের সংবাদ পাইয়াছিলেন; তিনি পৃথ্বীকে বন্দী করিবার উপায়-সম্বন্ধে মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ

করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ-কবি রাজসভাতে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :—"মহারাজ! দিল্লীশ্বরী মহারাণী সংযুক্তা পতিগৃহে যাইতেছেন, তিনি পিতার আশীর্ব্বাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া ক্রোধে জয়চন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। তিনি কবিকে বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ ও কবি, সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার সহিত পিথোরা আমার সভাতে—আসিয়াছিলেন কি না?" চন্দ উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ, আসিয়াছিলেন। আমি ত আপনাকে এইপ্রকারে হাত দিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিয়া ছিলাম, "আমার রাজা এইরূপ আপনি না বুঝিতে পারিলে আমি কি করিব?" জয়চন্দ বলিলেন, "তবে পিথোরাই কি তোমার পানদানবাহক সেবক?" কবি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "না মহারাজ! তিনি আমার সেবক নহেন, তবে ঐরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন, সে কথা সত্য।"

জয়চন্দ আপনার প্রধান সেনাপতি রাবণকে পৃথ্বী ও সংযুক্তাকে বন্দী করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন, তিনি উভয়কে স্বহস্তে শাস্তি দিবেন, সে ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। সেনাপতি বলিলেন, "আজ্ঞা করুন পিথোরার মস্তক ও সংযুক্তাকে আনিতেছি, কিন্তু তীর ব্যবহার না করিয়া কেবল তরবারির যুদ্ধে সুরদলবেষ্টিত পৃথ্বীকে জীবিত বন্দী করা কার্য্যতঃ অসম্ভব।" রাজা শুনিলেন না, প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিতেই বারবার আজ্ঞা করিলেন। জয়চন্দের এই হঠে পৃথ্বীর প্রাণ বাঁচিয়া গেল, নতুবা তীরের যুদ্ধ হইলে জয়চন্দের লক্ষাধিক সেনাবেষ্টিত ঐ কয়টি দিল্লীবাসীর প্রাণ অল্পকয়েক মুহূর্ত্তেই যাইত। কনোজ যোদ্ধারা পৃথ্বীকে ঘিরিয়া ফেলিল, ও যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় দল পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময়ে [আধুনিক মিরাট জেলার] * সোরোঁ নগরে দিল্লীর দল গঙ্গা পার হইয়া নিরাপদ্ হইলেন। সংযুক্তা অশ্বপৃষ্ঠে ও পৃথ্বী তাঁহার পাশে সাঁতার দিয়া পার হইলেন। গঙ্গার অপর পারে পৃথ্বীর রাজ্য। জয়চন্দ আপনার রাজ্যসীমা মধ্যেই তাঁহাদের ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, পৃথ্বীর রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই। পৃথ্বীর সুরদল, অশ্বারোহী ও তাহাদের আত্মীয়দের মধ্যে সর্ব্বসুদ্ধ ৭০।৮০ জন যোদ্ধা অনাহত জীবিতাবস্থায় গঙ্গার পশ্চিম তীরে উঠিয়াছিলেন। সেবকদের অবশ্য কেহ মারে নাই।

পৃথ্বীর পক্ষে সংযুক্তা অতি মূল্যবান্, কেননা তিনি প্রায় এগার হাজার যোদ্ধা ও আপনার বাহুবলের বিনিময়ে তাহাকে লাভ করিয়াছিলেন। এতগুলি যোদ্ধার মৃতদেহ অতিক্রম করিয়া সংযুক্তা পতিগৃহে প্রবেশ করিলেন, এগৌরব সম্ভবতঃ অন্য কোনও রাজকুমারীর কপালে হয় নাই। সংযুক্তাকে অনেকে বীর্য্যশুল্কা বলিয়াছেন, কিন্তু ঘটনাগুলি দেখিয়া বিচার করিলে তাঁহাকে বীর্য্যশুল্কা বলা যায় না। বীরত্ব দ্বারা পৃথ্বী তাহাকে লাভ করেন নাই; গোপনে তাহার পিতামাতার অমতে বিবাহ করিয়া, আপনার বিবাহিতা স্ত্রীকে রক্ষা করিতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বীরত্বের বিনিময়ে কন্যালাভ করিলে তাহাকে বীর্য্যশুল্কা বলিতে পারা যায়।

পথের যুদ্ধ বর্ণনাতে আছে যে, একসময়ে সংযুক্তা দেখিলেন তাঁহার পিতা জয়চন্দ আপনার "লাল কমান" [বৃহৎ ধনুর্ব্বাণ] দিয়া পৃথ্বীকে লক্ষ্য করিতেছেন, তিনি যুক্তকরে পিতার কাছে আয়তি ভিক্ষা করিলেন, জয়চন্দ ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া দিলেন। ইহার পর অন্য-একসময়ে দেখিলেন, পৃথ্বী জয়চন্দের প্রতি "লাল কমান" দিয়া লক্ষ্য করিতেছেন, তিনি পৃথ্বীকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে জয়চন্দ পৃথ্বীকে লক্ষ্য করিয়াও ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেদিন তরবারির যুদ্ধ হইতেছিল, কাহাকেও তীরধনু দিয়া লক্ষ্য করা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য হয় না। পৃথ্বী কমান রাখিয়া দিলেন। অর্থাৎ পথিমধ্যে একবার স্বামীর ও একবার পিতার জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিলেন।

পথে তিনদিন ও দুইরাত্রি কাটিয়াছিল। সমস্ত দিন ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ একজন দিল্লীর যোদ্ধা একজন কনোজের যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। একজন নিহত

* বরাহক্ষেত্র, শূকরখেৎ, শূররখেৎ, সোরোঁ Soron on the Ganges, কনোজ হইতে আকাশপথে প্রায় ৮৫ মাইল। তখনকার রাজপথে ৩০।৩২ ক্রোশ হইবে।

বা আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলে অন্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে-করিতে ব্যূহ-বেষ্টিত পৃথ্বী পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কখনও একজন যোদ্ধাকে এককালে দুইজন আক্রমণ করে নাই। সূর্য্যাস্তের সময়ে উভয় দল বস্ত্রাবাস খাটাইয়া বিশ্রাম করিত, সেবকরা খাদ্য প্রস্তুত করিত। তখন ফাল্গুন মাস, অনেকে খোলা মাঠেই নিদ্রা যাইত। রাত্রে, দিল্লীর দল ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন, কিন্তু সে চেষ্টা করেন নাই। সূর্য্যোদয়ের পর, গত বৈকালে যতদূর যুদ্ধ করিতে-করিতে আসিয়াছিলেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া আবার যুদ্ধ করিতে-করিতে অগ্রসর হইতেন। দিল্লীর দল সোরোঁতে গঙ্গাতটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পঁহুছিলেন, গঙ্গাতে ঝাঁপ দিবার পরই যুদ্ধ বন্ধ হইল।

জয়চন্দ কনোজে প্রত্যাগমনের সময়ে পথে যে হতাহত যোদ্ধাদের পাইলেন, তন্মধ্যে উভয় পক্ষের হতদের সৎকার করিয়া কনোজের আহতদের আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন ও দিল্লীর আহতদের ক্ষত স্থানে ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া, অতি যত্নে দোলায় করিয়া, দিল্লী পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের মধ্যে জয়চন্দ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তিনি রাগ করিয়া কনোজ ত্যাগ করিয়া পৃথ্বীর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর কনোজের দলে ছিলেন, যুদ্ধের সময়ে, ঘটনাক্রমে, দুই সহোদরে যুদ্ধ হইয়াছিল, ও উভয়ে আহত হইয়া পথে পড়িয়াছিলেন। এক ভ্রাতা কনোজে অন্য ভ্রাতা দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন। আহত সম্বন্ধে রাজপুতরা শক্রমিত্রে প্রভেদ করিত না, সকলেরই অতি যত্নে সেবা করিত।

জয়চন্দ কনোজ প্রত্যাগমন করিয়া কন্যা ও জামাতার প্রাপ্য দানের দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এ অভিমানে কেবল পৃথ্বীর বাহুবল চূর্ণ হইল না, জয়চন্দ্রও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীর পতনের এক বৎসর পরে মুসলমানেরা—যাহারা বহুবার তাঁহার কাছে পরাজিত হইয়াছিল—তাঁহাকে ও পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতে হিন্দুরাজ্যের চিহ্ন লোপ করিল।

সংযুক্তা হরণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কবে হইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ ও মতভেদ আছে। মদনপুরের শিলালেখ-মতে সম্বৎ ১২৩৯ [১১৮২ খৃঃ] মহোবা জয় হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে কনোজপতি জয়চন্দ্র পৃথ্বীর বিপক্ষে পরমাল চন্দেলকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ও সাহায্যের কারণ [দন্তকথা ও আল্হার গান অনুসারে] সংযুক্তা-হরণের অপমানের প্রতিশোধ বলা হইয়া থাকে; সেইজন্য আগে সংযুক্তা-হরণ সংক্ষেপে গাহিয়া তবে মহোবার যুদ্ধ গান করা হয়। একথা সত্য হইলে, ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই হরণ হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই সংযুক্তা-হরণে পৃথ্বীরাজের বাহুবল একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি কোনও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত রহিলেন না। তিনি সে লুপ্ত বল আবার সঞ্চয় করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই

পৃথ্বী অল্প কিছু কাল, সংযুক্তার মনোরঞ্জনের জন্য নানা-প্রকার শিকারে তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বনে, জঙ্গলে, ঘুরিয়া বেড়াইলেন; পরে রাজকার্য্য মন্ত্রীদের স্কন্ধে চাপাইয়া সংযুক্তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার যে কয়টা সুর বাঁচিয়াছিল, তাহারা রাজার অন্তঃপুর বাস-কালে মন্ত্রীদের আধিপত্য সহ্য করিতে পারিল না, বিরক্ত হইয়া কেহ বা আপনার দেশে চলিয়া গেল, কেহ তীর্থ ভ্রমণ করিবার ছল করিয়া পৃথ্বীকে ত্যাগ করিল; রাজ্য অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ঘোরীর মতন দূরদর্শী চতুর শক্র এ অবসর ত্যাগ করিলেন না, দ্বিতীয় বার বল-সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই পৃথ্বীকে আক্রমণ করিলেন। পৃথ্বী সংযুক্তার অন্তঃপুর হইতে ছয় মাস বাহিরে আসেন নাই। সংযুক্তা আপনার প্রাসাদের পুরুষ-প্রহরী ও সেবকদের তাড়াইয়া স্ত্রী প্রহরিণী ও সেবিকা নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত প্রাসাদ ও বাগানে একটিও পুরুষ ছিল না।

রাসোতে আছে যে পৃথ্বীরাজের রাজধানীতে [দিল্লী হউক বা অজমীর] ঘোরীর অনেকগুলি গুপ্তচর ছিল, তাহারা কাবুলী অশ্ব-বিক্রেতা ইত্যাদি নানা বণিকের ও মুসলমান ফকিরের বেশে সংবাদ সংগ্রহ করিত। পৃথ্বীর লেখক-সম্প্রদায়ের একটি বিশ্বাসঘাতক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করিত। প্রয়োজন হইলে, শীঘ্রগামী উষ্ট্র-পৃষ্ঠে বিশেষ বাহক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করা হইত।

ঘোরীর চরেরা স্বাধীনভাবে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইত, একজন চর কি সংবাদ পাঠাইল অন্যরা জানিতে পারিত না। ঘোরী একজন চরের কথায় বিশ্বাস করিতেন না, একই সংবাদ একাধিক চর আনিলে বিশ্বাস করিতেন। পৃথ্বীর সংযুক্তার অন্তঃপুরে বাসের কথা এত অসম্ভব বোধ হইয়াছিল যে, তিনি একাধিক চর বলিলেও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সেইজন্য একজন উচ্চ রাজকর্মচারীকে ফকির-বেশে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ সংবাদ লইয়া যাইলে, আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। রাজপুতেরা কবিদের অকাতরে সত্য সংবাদ দিয়া থাকে বলিয়া, ইতিপূর্ব্বে একবার একটি গজনীবাসী ব্রাহ্মণ-কবিকে পৃথ্বীর সভায় সংবাদ-সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। পৃথ্বীর কিন্তু এরূপ চর ছিল না; তিনি শত্রুর গতিবিধি বা সৈন্য-সংগ্রহের কোন সংবাদই রাখিতেন না। শেষ বড় যুদ্ধের পূর্ব্বে মুসলমানদের আক্রমণের সংবাদ রাজধানীর বণিকেরা পাইয়া অনেকে মালবদেশে বা জয়চন্দের রাজ্যে পলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু রাজকর্মচারীরা কোনও সংবাদ পান নাই। রাজা ত যুদ্ধের পূর্ব্বে ছয়মাস পুরুষের মুখ দেখেন নাই, রাজ্য আছে কি নাই তাহাও জানিতেন না; রাজার অমাত্যেরা, রাজা জীবিত কি মৃত, তাহাও নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেন না। যখন দেশের প্রজারা পলাইতে আরম্ভ করিল, তখন কবি চন্দ প্রহরিণীদের প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া, বলপূর্ব্বক সংযুক্তার প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, ও আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মহারাজ, রাজ্য যে গেল, আর থাকে না; একবার দেখিবেন না ?" পরে এক কবিতাতে বলিলেন, "তুমি তোমার গোরী [সুন্দরী] লইয়া উন্মত্ত, আর গোরী তোমার রাজ্য লইতে উন্মত্ত।" এই কথা শুনিয়া পৃথ্বী বাহিরে আসিলেন, ও যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন।

অতএব, শেষ যুদ্ধের অল্প দু-এক বৎসর পূর্ব্বে সংযুক্তা-হরণ হইয়াছিল, ও ইহা অনেকটা সম্ভব বোধ হয়। সংযুক্তা-লাভের পর, সংযুক্তার মোহ কাটাইবার পূর্ব্বেই সব শেষ হইয়া গেল। ১১৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যদি হরণ হইত, তবে অন্ততঃ বার বৎসর অন্তঃপুর বাস স্বীকার করিতে হয়। একজন রাজার পক্ষে এত কাল রাজকার্য্য ছাড়িয়া বসিয়া থাকা সম্ভবও নহে, শত্রুরা অবসরও দিত না। সুন্দরীর মোহও এত কালে থাকে না।

সেকালে রাজারা বারো মাস যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেন, বর্ষার পর বিজয়ার দিন যুদ্ধযাত্রা করিয়া আষাঢ় মাস পড়িলে রাজধানীতে ফিরিতেন। ঘোরীর সহিত বড় সম্মুখ সমর অল্প দু-একটি হইলেও প্রায় প্রতিবৎসর ২।৩ বার সংঘর্ষ হইত, রাসোতে এইরূপ অনেকগুলি সংঘর্ষের উল্লেখ আছে। যদিও কোন ইতিহাসে ইহার সবিস্তার বর্ণনা নাই, তথাপি বোধ হয় সংযুক্তা-হরণের পর, যখন পৃথ্বীর বাহুবল একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ঘোরী কোনও স্থানে, সংঘর্ষে পৃথ্বীকে চাপিয়া ধরিয়া থাকিবেন। পৃথ্বী, অন্য উপায় না দেখিয়া কর দিতে, ও ঘোরীর সামন্তপদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়া থাকিবেন। যে তাম্রমুদ্রার এক দিকে "পৃথ্বীরাজ" ও অন্যদিকে "সুলতান মহম্মদ সাম" লেখা, সেগুলি ঐ সামন্তপদ স্বীকার করিবার পর মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বোধ হয় পৃথ্বী সামন্তপদের অপমান সহ্য করিতে পারেন নাই, কোনওরূপ বলসঞ্চয় করিয়া ঘোরীর অধীনতা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব, এই চেষ্টাকেই তাজ-উল-মাআসীর মুসলমানদের ঘৃণা করা ও ষড়যন্ত্র বলিয়াছে। [ক ৯।১০ দেখ]। ঘোরীর মতন দূরদর্শী যোদ্ধা সে-চেষ্টার অবসর দিলেন না, বলসঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই সম্মুখ সমরে আসিতে বাধ্য করিলেন।

শেষ যুদ্ধের জন্য পৃথ্বী অনেকগুলি ছোটো-ছোটো রাজাদের সাহায্যভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড, ও কনোজের মতন প্রবল রাজাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেজন্য অথবা যে কারণেই হউক, তাহাদের কাছে সাহায্য চাহিতে সাহস করেন নাই, বা চাহেন নাই। তাহারাও গায়ে পড়িয়া কেহ সাহায্য করে নাই। রাসোর সমরসিংহ কল্পিত নায়ক, কিন্তু মুসলমানদের ইতিহাস হইতে জানা যায়, যে পৃথ্বীর পতনের শেষ যুদ্ধে, সে-সময়কার রাণা পৃথ্বীকে সাহায্য করেন নাই।

সরস্বতী-নদীতীরে পৃথ্বীর দেহ পাওয়া গিয়াছিল;

সংযুক্তা পৃথ্বীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াই চিতারোহণ করিয়াছিল।

এ-দেশে প্রবাদ ও কোন-কোন কাব্যে আছে যে সংযুক্তা ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহিতা ও ২১ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। এ-কথা সত্য হইলে ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে সংযুক্তা হরণ হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

ধনবিজ্ঞান, মানব ও সামাজিক বিজ্ঞান

শ্রী হৃষীকেশ ত্রিপাঠী

অল্পকয়েক বছর আগেই ধনবিজ্ঞানের আসন অনেক নীচে ছিল। কার্লাইল, রাস্কিন প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যরথীরা ধনবিজ্ঞানকে খুব ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখ্‌তেন। তাঁদের মতে ধনবিজ্ঞানটা ছিল যেমনের নীতি, কতকগুলা স্বার্থপর লোকের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই বিজ্ঞানটার সৃষ্টি। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপর, তা'র চরিত্রের উপর ধনের যে কি-রকম প্রভাব তা তখনকার ধনবিজ্ঞানবিদ্‌রা তত তলিয়ে দেখ্‌তেন না যেমন আজকালকার এঁরা দেখেন। তাঁরা কেবল ধন-উৎপাদন নিয়েই ছিলেন ব্যস্ত। সেই কারণেই ধনবিজ্ঞানের আসন ছিল অনেক নীচে। ধন কেবল উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্‌বার উপায়মাত্র। ইহা মহৎ উদ্দেশ্যে অর্জ্জিত হ'তে পারে, নীচ ও জঘন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর্‌বার জন্যও অর্জ্জিত হ'তে পারে। সারাদিন পরিশ্রম ক'রে আমি আমার কলেজের বেতনের টাকা রোজগার কর্‌তে ব্যস্ত,আমার এই ব্যস্ততা ও অর্থাকাঙ্ক্ষার ভিতর অপ্রশংসার কিছুই নেই। ধন টাকা এগুলিতে আমাদের কাজ কর্‌বার প্রবর্ত্তনার যে-রকম পরিমাণ করা যায়, এ-রকম অন্য কোনো জিনিষদ্বারা হয় না। এ-কথাটি যদি আগেকার ধনবিজ্ঞানবিদ্‌রা বুঝ্‌তে পার্‌তেন তা হ'লে ধনবিজ্ঞানকে এত তীব্র নিন্দাবাদ সহ্য কর্‌তে হ'ত না। অর্থপিপাসাতে অন্য পিপাসার অভাব বুঝায় না, একথাটা তাঁদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কাজ কর্‌বার আনন্দ প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা প্রভৃতির শক্তি ও অর্থপিপাসার মধ্যে আছে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া যেমন প্রতিযোগিতায় জিৎবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে আনন্দ পায় সে-রকম অনেক ব্যবসাদারও তা'র প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে খুব আনন্দ পান, টাকা রোজগার ক'রে তেমন নয়।

অর্থপিপাসা যে সব সময় নিন্দনীয় হয়, শুধু এটি প্রমাণ ক'রে আজকালকার পণ্ডিতরা নিরস্ত হননি।—তাঁদের মতে ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের একদিকে যেমন ধন, অন্য দিকে তেমন মানুষ। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ দিয়ে তা'র চরিত্রের দিক্ দিয়ে ধনের আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের কাজ। তাই অধ্যাপক Marshall তাঁর পুস্তকের প্রথমেই লিখ্‌লেন।

"Political Economy or Economics is the study of mankind in ordinary business of life."

ধনবিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বৃত্তি নিয়ে আলোচনা করে।

*** "Thus it is, on the one side, a study of wealth, and on the other and more important side, a part of the study of man."

ধনবিজ্ঞান যেমন একদিকে ধন-সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে তেমন অন্য দিকে ইহা মানববিজ্ঞানের একটি অংশ, এবং শেষোক্ত দিক্‌টিই ধনবিজ্ঞানের প্রধান দিক্।

ধনবিজ্ঞান আজকাল মানববিজ্ঞানের অংশ,তাই তা'র আসন এত উচ্চে। মানুষের দিক্ দিয়া ধনকে আলোচনা করা হ'ল ধনবিজ্ঞানের প্রধান দিক্। কারণ, মানুষ সারাদিন মাথার ঘাম পায় ফে'লে যা রোজগার ক'রে আনুলে সবই ঢুক্‌ল তা'র উদরে—। সেটির চিন্তা তা'র যেমন বলবতী হবে, এবং সেগুলি চরিত্রগঠনে তা'র যেমন

সহায়তা করবে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিন্তা ছাড়া এরকম বলবতী অন্য কোন চিন্তা হবে না, কিংবা তা'র চরিত্রগঠনে সহায়তা করবে না। ধর্ম্মচিন্তা আর অর্থচিন্তা এদুটি হ'ল মানুষের মূল চিন্তা। ধর্ম্মচিন্তা অতি তীব্র হ'তে পারে কিন্তু মানবজীবনে বেশীর ভাগ সময় দখল করেছে অর্থচিন্তা বা অন্নচিন্তা। অন্নচিন্তা চমৎকারা। যে কাজের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, বেশীর ভাগ সময় মানুষ তা'র কথাই ভাবে, তা'র সহকর্ম্মীদের সঙ্গে প্রভুর প্রভাব সবই তা'র চরিত্র-গঠনে সহায়তা করে। আমি অধ্যাপক, আমার চিন্তা সৎ, যাদের সঙ্গে মিশ্‌বার সুযোগ হয় তাঁরাও সৎ, আমার চরিত্র ভালো হওয়াই স্বাভাবিক। চুরি ক'রে জীবিকানির্ব্বাহ কর্‌লে, ভাব্‌লে চুরির কথা, সঙ্গী হ'ল সব চোর-বদমাইস, আর আদর্শ হ'ল একটা চোরের সর্দ্দার তা'তে তা'র চরিত্র ক্রমশঃ খারাপ না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

তা'রপর আর-এক কথা। দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী। নিজের পরিবারকে খাওয়াতে-পরাতে পারে না, বন্ধুত্ব কর্‌বার সামর্থ্য নাই, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক—তিনদিকেই দরিদ্ররা হ'ল ক্লিষ্ট। অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় কঠিন পরিশ্রম ক'রে এসে না আছে একটু শান্তি না আছে একটু বিশ্রাম। এতে মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ বা কি ক'রেই হয়? টাকা-পয়সা যথেষ্ট আছে, শক্তি আছে, সুখ আছে—তাদের যেমন নিজের কিংবা ছেলেপিলেদের মানসিক উন্নতি কর্‌বার সুযোগ, এমন কি আর হতভাগা গরীবদের হয়?

তাই মানবচরিত্রের উপর ধনের এত আধিপত্য যে মানুষের দিক্ বাদ দিলেই ধনবিজ্ঞান হ'ল অসম্পূর্ণ। সেই সম্পূর্ণতা দিয়েই ধনবিজ্ঞানের আসন এত উচ্চে পেতেছেন আজকালকার ধনবিজ্ঞানবিদ্‌রা।

যদি মানুষ নিয়ে আলোচনা করাই হ'ল ধনবিজ্ঞানের প্রধান দিক্, তা হ'লে সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে এর তফাৎ কি? Marshall ব'লেছেন, "it is a part of the study of man." ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক Gide তা'র উত্তর দিয়েছেন বেশ ভালোভাবেই

* * * * of all relations which exist between beings living in society, Political Economy deals with those alone which tend to the satisfaction of their material wants with all that concerns his well-being.

সমাজে বাস ক'রে মানুষের যত-রকম সম্বন্ধ আছে ধনবিজ্ঞান কেবল সেগুলি নিয়ে আলোচনা ক'রে যাতে ক'রে তা'র জড় পদার্থের অভাব দূর হয় ও যাতে ক'রে সে স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারে। সোজা কথায় ধনবিজ্ঞান হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের এক অধ্যায়। এবং এটি যত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, অন্য সামাজিক বিজ্ঞান এতদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি। তা'র কারণ মানুষ যে-কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করুক না কেন, শারীরিক পারিতোষিক পাওয়ার প্রবর্ত্তনাই তাকে অবিচলিতভাবে সে কাজে লাগিয়ে রাখ্‌তে পারে। প্রত্যেক প্রবর্ত্তনারই সাম্‌নে আছে নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ অর্থ। মানুষের আশা, উচ্চাভিলাষ এবং অনুরাগ, সবই তাদের বাহ্যিক প্রকাশে নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ অর্থের দ্বারা মোটামুটি পরিমিত হ'তে পারে। দু'জন মানুষ মদ খেয়ে কি সুখ পেলে, তা প্রত্যক্ষভাবে তুলনা কর্‌তে না পার্‌লেও, কিংবা একজন মানুষের দু'সময়ের মদ খাওয়ার আনন্দের তুলনা প্রত্যক্ষভাবে না কর্‌তে পারা গেলেও, যদি একটি মানুষ চা খাবে, না তামাক খাবে, কি পায়ে হেঁটে বাড়ী যাবে, না ঘোড়ায় চ'ড়ে বাড়ী যাবে, এ তিনটার কোনোটা কর্‌তে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছে না, তখন আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি যে তিনটে কাজেই সে সমান আনন্দ পাবে। আর যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে তুলনা কর্‌তে পারা যাচ্ছে না, সেগুলিও তা'র আয়ব্যয় দে'খে, তা'র কাজ কর্‌বার মানসিক তাড়না দে'খে অনেকটা মোটামুটিভাবে তুলনা কর্‌তে পারা যায়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ধনবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হ'ল একটি দেশ, একটি জাতি ব্যক্তিগত চরিত্রের তারতম্য নিয়ে ধনবিজ্ঞান আলোচনা করে না। তাই ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের সুখের তারতম্য, এবং অন্য সব তারতম্য গড়ে সব ঠিক হ'য়ে যায়। তাই ধনবিজ্ঞান যত পূর্ণতার দিকে নির্ভুলতার দিকে অগ্রসর হয়েছে, অন্য কোনো সামাজিক বিজ্ঞান এতদূর হয়নি। অধ্যাপক Marshall বলেছেন—

Just as the chemist's fine balance made chemistry

more exact than most other physical sciences, so this economists' balance, rough and imperfect as it is, has made Economics more exact than any other branch of social sience.

রাসায়নিকের সূক্ষ্ম নিক্তি যেমন রসায়নশাস্ত্রকে অন্যান্য অনেক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চাইতে নির্ভুলতর করেছে, সে-রকম ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দের নিক্তি মোটা হ'লেও ধনবিজ্ঞানকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের চাইতে নির্ভুল-তর করেছে।

চীনে ভারতীয় সাহিত্য

শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের সহিত ভারতীয় সাহিত্যও প্রচার লাভ করে। চীনদেশের প্রবাদানুসারে ৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম সে-দেশে আবির্ভূত হয়। শোনা যায়, হান-(*Han*) বংশীয় সম্রাট্ মিংতি একদা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে-একটি সোনার মানুষ তাঁহার প্রাসাদে উড়িয়া আসিয়াছে। সম্রাট্ রাজসভার পণ্ডিত-গণকে এই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, যে,ঐ স্বর্ণময় মানুষটি বুদ্ধ (ফুত্‌ বা ফো) ছাড়া আর কেহই নয়। মিংতি এই স্বপ্নের ব্যাপারে এম্‌নি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বৌদ্ধ গ্রন্থ ও পুরোহিত আনিবার জন্য অবশেষে তিনি ৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে দূত পাঠাইলেন। কেহ-কেহ বলেন, মিংতি ভারতে আঠারো জন দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে দুইজন বৌদ্ধভিক্ষুর সাক্ষাৎ পান। তাঁহারা একটি শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে তাঁহাদের দ্রব্যসম্ভার চাপাইয়া চলিতেছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে বৌদ্ধ পুঁথি ও মূর্ত্তি ছিল। দূতগণ প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে,তাঁহারা নূতন দেশে বুদ্ধের বাণী প্রচার করিতে যাইতেছেন। এই দুইজন ভিক্ষুর নাম কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ। চীনভাষায় ভারতীয় নামসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চীনা উচ্চারণানুযায়ী লিখিত হইয়াছে; কোন-কোন ক্ষেত্রে তিব্বতী প্রথানুসারে অনুবাদিত হইয়াছে। এখানে কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনা ভাষায় কিআ-য়ে মো-থঙ্‌ ও ধর্ম্মরক্ষ চীনা অনুবাদে চু-ফা-লন্‌ লিখিত হইয়াছে। তিব্বতী ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, চু-ফা-লনের নাম ভরণ বা গোভরণ। মাতঙ্গ জাতিতে ব্রাহ্মণ ও মধ্য-দেশের অধিবাসী ছিলেন; ধর্ম্মরক্ষও তদ্দেশীয় ছিলেন। এই দুই ভারতবাসী চীনে গিয়া হান-রাজধানী লোয়াঙ্‌ নগরের নিকটস্থ শ্বেতাশ্ব-বিহারে বাস করিতে লাগিলেন।

উপরে-উক্ত গল্পটি সত্য কি মিথ্যা বলা কঠিন; তবে ইহা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোনো হেতু নাই। কিন্তু ৬২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চীনারা ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিছু জানিত না, এই লৌকিক ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। চীনের পশ্চিমে কাংসু প্রদেশে খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খুব সম্ভব হিন্দু উপনিবেশ ছিল; ঐ অঞ্চলে স্যার্ আউরেল্ স্টাইন্ সাহেবের আবিষ্কার হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। হান ঐতিহাসিক দপ্তরে আছে যে, সি-উঙ নু নামক একটি স্থান হইতে চীনারা একটি 'স্বর্ণময় মনুষ্য' বন্দী করিয়াছিল; অনেকে মনে করেন, ইহা বুদ্ধদেবের একটি স্বর্ণময় মূর্ত্তি। তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বাই-লিও নামে একজন তাও-ধর্ম্মী বুদ্ধের জন্মকথা লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, যে খৃষ্টপূর্ব্ব ২ সালে সম্রাট্ আ-ই যুই-চি রাজের সভায় যে রাজদূত প্রেরণ করেন, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ পাইয়া আসেন। শেষ যুগের হান ইতিহাসে আছে যে চু-রাজ-কুমার বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ শ্রমণ ও উপাসক ছিল।*

* T'oung Pao, 1905, p. 519—Chavannes.

এই সময় হইতে চীনাদের বহির্জ্জগৎ-সম্বন্ধে পরিচয়ের প্রসারতা হয়। তাহাদের কাগজপত্রে এই সময়ে ভারতের নাম প্রথম দেখা যায়। ভারতবর্ষ চীনা ভাষায় ইন্‌তো লিখিত হয়। হিউএন সাঙ্‌ ইন্‌-তো শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। স্পষ্টই বুঝা যায়, ইন্‌-তো শব্দ সিন্ধু শব্দ হইতে হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসীকে গ্রীক ও চীনারা সিন্ধুর নাম হইতেই হিন্দু বলিয়া জানিতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ১২২ অব্দে জনৈক চীনদূত মধ্য-এসিয়া হইতে স্বদেশে ফিরিয়া সম্রাট্ বু-তির নিকট নিবেদন করিয়া বলেন যে, তিনি মধ্য এশিয়াতে সিন্‌-তো দেশের সামগ্রী দেখিয়া আসিয়াছেন। এই সিন্‌-তো দেশ ও সিন্ধুদেশ অভিন্ন।*

মিং-তির পূর্ব্বে ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে চীনের কিছু-কিছু জ্ঞান ছিল, তবে তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট ও স্বল্প। মিং-তির উদ্যোগে প্রথম ভারতীয় সাহিত্য ও বৌদ্ধ ভিক্ষু তথায় নীত হয়। কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ চীনা ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধগ্রন্থ সেই ভাষায় অনুবাদ করিতে মন দিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, সদ্ধর্ম্ম দেশের লোকের ভাষায় প্রচার করিতে হইবে। ভিক্ষুদ্বয় শাস্তার সেই আদেশ স্মরণ করিয়া চীনের ন্যায় দুরূহ ভাষা শিক্ষায় মন দিলেন। ভিক্ষুদ্বয়ের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থের নাম বুদ্ধভাষিত দ্বিচত্বারিংশ সূত্র। এগ্রন্থখানি কোনো সংস্কৃত বা পালি ভাষার গ্রন্থবিশেষের তর্জ্জমা নহে; ইহা বুদ্ধের কতকগুলি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশের সমষ্টিমাত্র। কেহ-কেহ বলেন যে, উহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিলে দুইটি বিষয় আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়। প্রথমটি হইতেছে—বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর হইতে পাঁচশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ মত কিরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছিল; আর দ্বিতীয়টি হইতেছে এই যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকেরা তাঁহাদের ধর্ম্মের কোন্ জিনিষগুলি সর্ব্বপ্রথমে নূতন লোকদের কাছে প্রচার করিবার পক্ষে উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। চীনদেশ ইতিপূর্ব্বে কুয়াং-টসুর (Confucius) ও লাও-টসুর উপদেশে দীক্ষিত হইয়াছিল; সুতরাং সে-দেশে নবধর্ম্ম প্রচার করা কত কঠিন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বিচত্বারিংশ সূত্র-সম্বন্ধে কেহ-কেহ মনে করেন যে, ঐরূপ গ্রন্থ সত্য-সত্যই সংস্কৃত বা অন্য কোনো ভারতীয় প্রাচীন ভাষায় ছিল। কিন্তু এ মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। খুব সম্ভব, অনুবাদকগণ যে-সকল বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচার-কল্পে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে এইসকল স্থান বাছিয়া-বাছিয়া কুয়াং-টসুর গ্রন্থের অনুকরণে প্রস্তুত করেন। কুয়াং-টসুর 'আনালেকট্' গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথমে আছে 'গুরু কহিয়াছেন'; তাহারই অনুকরণে বোধ হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ 'বুদ্ধ বলিয়াছেন', এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি চীনদেশে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে ও য়ুরোপীয় ভাষায় বহুবার অনূদিত হইয়াছে।*

প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন চীনে প্রচারিত হয়, তখন লোকে এই নূতন ধর্ম্মমতের উপর তেমন শ্রদ্ধাবান্ হয় নাই; সেইজন্য মাতঙ্গ তথাকার অধিবাসীদের উপযোগী করিয়া 'দ্বিচত্বারিংশ সূত্র'-খানি সঙ্কলন ও অনুবাদ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থ-প্রণয়নে ধর্ম্মরক্ষের হাত ছিল। ধর্ম্মরক্ষ আরও চারিখানি, কেহ-কেহ বলেন পাঁচখানি, সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় তর্জ্জমা করেন; দুঃখের বিষয় ধর্ম্মরক্ষের একখানি বইও আজ পাওয়া যায় না; তবে প্রাচীন চীনা গ্রন্থতালিকা হইতে আমরা বইগুলির নাম পাই। এই গ্রন্থের মধ্যে একখানি ছিল বুদ্ধের জীবনী; তবে গ্রন্থখানি যে কি তাহা স্পষ্ট চীনা নাম হইতে বুঝা যায় না। কেহ অনুমান করেন যে, সেখানি ললিতবিস্তারের অনুবাদ, কেহ বলেন যে, সেখানি ছিল বুদ্ধ-চরিতের তর্জ্জমা। বর্ত্তমানে অনুমান ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নাই। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের নাম পাঠকদের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য দিলাম; যথা, দশভূমি-ক্লেশচ্ছেদিকা, ধর্ম্মসমুদ্র কোষ-সূত্র, জাতক ও একখানি শীলসংগ্রহের গ্রন্থ।

এই দুই জন ভারতীয় প্রচারক-সম্বন্ধে আমরা তিব্বতী গ্রন্থ হইতে কিছু তথ্য জানিতে পারি। তাঁহাদের

* Edkin's Chinese Buddhism pp. 88-89

* Suzuki—Sermons by a Buddhist Abbot—Chicago, Open Court, 1906.

মতে মিং-তি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন ও ভিক্ষুণীদের জন্য তিনটি মঠ স্থাপন করেন। সম্রাট্ স্বয়ং উপাসকশ্রেণীভুক্ত হন ও এক সহস্র লোক ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করেন। তিব্বতী বর্ণনায় অনেক অতিরঞ্জন আছে; আমরা তাহার মধ্য হইতে সংক্ষেপে সম্ভবপর ঘটনা কয়েকটি-মাত্র উল্লেখ করিলাম; কিন্তু মিং-তির এই চেষ্টায় চীনদেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ ধারণা যেন কেহ না করেন।

কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষের মৃত্যুর পর কিছুকাল চীনদেশে কোনো ভারতীয় ভিক্ষু ছিলেন না; ১৪৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দ্বিতীয় দল উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে বৌদ্ধদের উপর নানাবিধ অত্যাচার হয়, কিন্তু প্রবাদ যে, অলৌকিক শক্তি-বলে তাহারা রক্ষা পায়। দ্বিতীয় দলে যে সব ভিক্ষু ভারতবর্ষ হইতে চীনে উপস্থিত হন—তাঁহারাও লোয়াঙের 'শ্বেতাশ্ব বিহারে' আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথম ভিক্ষুক লোকরক্ষ বা চিলুকাক্ষ য়ুই-চি দেশবাসী শ্রমণ ছিলেন। তিনি বোধ হয় ১৪৭ বা ১৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লোয়াঙে আগমন করেন ও আর্য্যকাল প্রভৃতি অপর ভিক্ষুদের সহিত বহুকাল সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও বৌদ্ধমত প্রচার করেন। লোকরক্ষ বা চিলুকাক্ষ একুশখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন, কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে অর্দ্ধেকগুলি নষ্ট হইয়া যায়; বর্ত্তমানে মাত্র বারো খানি (১২) গ্রন্থ চীনা ভাষায় এখনো পাওয়া যায়।

লোকরক্ষ (১৬৪-১৮৬খৃঃ অঃ) সর্ব্বপ্রথম চীনদেশে মহাযান মতের অন্যতম গ্রন্থ দশসাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা ত্রিশ পরিচ্ছেদে চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রজ্ঞাপারমিতার স্থান অতি উচ্চ। সুতরাং ইহার অনুবাদ ও প্রচার ভারতীয় চিন্তাধারাকে বহুদূর বিস্তৃত করিতে সাহায্য করিল। লোকরক্ষের আর একখানি গ্রন্থ সুখাবতীব্যূহ। ইহার অপর নাম অমিতায়ুর্ব্যূহ বা অমিতাভসূত্র। সুখাবতীব্যূহ-প্রচারের ফলে চীন ও জাপানে পরযুগে নূতন চিন্তার ধারা, নূতন ভক্তি-রসের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল। সুখাবতীব্যূহের বৃহৎ ও সামান্য সংস্করণের সর্ব্বসমেত বারোখানি তর্জ্জমা চীনা ভাষায় ছিল। লোকরক্ষের অনুবাদিত অন্য বইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম করিতেছি; যেমন 'অক্ষোভ্য-তথাগতস্য ব্যূহ'। মহাযান বৌদ্ধমতে অক্ষোভ্য পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম। বুদ্ধদেব অক্ষোভ্যের বুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে ইহাতে উপদেশ দিয়াছেন। 'প্রত্যুৎপন্ন-বুদ্ধ-সম্মুখাবস্থিত-সমাধি' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ লোকরক্ষের অন্যতম অনূদিত গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে ১৬টি পরিচ্ছেদ আছে; তিব্বতী ভাষায় ইহার অনুবাদ আছে; বেঙ্গুরের ১১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী তর্জ্জমা দেখিয়া মনে হয়, মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। 'কাশ্যপ-পরিবর্ত্ত', 'ভদ্রপালসূত্র', 'তথাগত-বিশেষণ-সূত্র','মহাদ্রুম-কিন্নররাজ-পরিপৃচ্ছা', 'অজাতশত্রু-কৌকৃত্য-বিনোদন' প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ লোকরক্ষের দ্বারা অনূদিত হইয়া আজও রহিয়াছে। এইসব গ্রন্থের একখানিরও মূল সংস্কৃত নাই বা এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যে-সব সংস্কৃত পুঁথি ভারতবর্ষ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা চীন দেশে অনুবাদিত হইয়া যাইবার পর যত্নাভাবে বা প্রতিলিপিকারের অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক ছিলেন আর্য্যকাল বা আনসিকাও। মধ্য এশিয়া আনসি দেশে তাঁহার বাস ছিল; তিনিও বুদ্ধদেবের ন্যায় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রমণ হইয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দ ১৪৮ সালে লোকরক্ষের সময়ে তিনি চীনে প্রবেশ করেন এবং ১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোয়াঙের মঠে বাস করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও সাহিত্যানুবাদ করেন। বাইশ বৎসরের মধ্যে আর্য্যকাল ১৭৬খানি বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু ৭৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পুস্তকসমূহের যে বিস্তৃত গ্রন্থতালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে আছে যে, অষ্টম শতাব্দীতে আর্য্যকালের ৫৪খানি গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান চীন ত্রিপিটকে তাঁহার ৫৫খানি অনুবাদিত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

আর্য্যকাল বহু বিষয়ের গ্রন্থ অনুবাদ করেন; তাহার মধ্যে চীন-সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে কতকগুলি আগমের অংশ-বিশেষের অনুবাদ। পালিতে যেমন



অন্ধ এবং পক্ষাঘাত-রোগীর পলায়ন

চিত্রকর—র‍্যাফেল .

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

মজ্ঝিমনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, সংযুত্তনিকায় আছে, তেমন সংস্কৃত ভাষায় অনুরূপ গ্রন্থ ছিল; তাহাদিগকে মধ্যমাগম, একোত্তরাগম, সংযুক্তাগম ইত্যাদি বলিত। বৌদ্ধ চীনা সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ আছে, কিন্তু সংস্কৃতে বহু কাল এই আগম-শাস্ত্রের কোনো সন্ধান না পাওয়ায় সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বুঝি বা সংস্কৃত বৌদ্ধ আগম ছিল না। কিন্তু মধ্য এশিয়ায় আবিষ্কারের ফলে আজ জানা গিয়াছে যে, সংস্কৃত মধ্যম-আগম, সংযুক্ত-আগম প্রভৃতি গ্রন্থ এককালে ছিল। চীনা ভাষায় সম্পূর্ণ আগম গ্রন্থসমূহ পরযুগে সম্পূর্ণভাবে অনূদিত হইয়াছিল; কিন্তু আর্য্যকাল মধ্যম ও একোত্তরাগমের অনেকগুলি পৃথক্‌ভাবে অনুবাদ করিয়া চীনাদের হস্তে উপহার দেন। ইঁহারই সাহায্যে তাহারা প্রথম বিপুল আগম সাহিত্যের আভাস পাইল।

দীর্ঘাগমের ২য় বর্গ হইতে দশোত্তর-ধর্ম্ম-নামক একটি গ্রন্থ আর্য্যকাল অনুবাদ করেন; ইহাতে ৫৫০টি ধর্ম্মকথা আছে। পালি দীঘনিকায়ে ইহাই দসুত্তর সুত্তান্ত-নামে পরিচিত। ঐ বর্গ হইতে মহানিদান উপায় ও বিখ্যাত শৃগালবাদ সূত্র তিনি ভাষান্তরিত করেন। প্রথম গ্রন্থখানিতে বুদ্ধ অবিদ্যা, তৃষ্ণা, জাতি প্রভৃতি দ্বাদশ নিদান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পালি শিগালবাদসুত্ত ও দীর্ঘাগমের শৃগালবাদ অভিন্ন; বৌদ্ধশাস্ত্র-পাঠক মাত্রেই জানেন, পালি শিগালবাদ সর্ব্বত্র কিরূপ সমাদৃত হয়। মধ্যমাগম হইতেও কয়েকটি বিশেষ সূত্র বাছিয়া আর্য্যকাল চীনা-ভাষায় অনুবাদ করিলেন, যেমন আস্রবক্ষয়, ব্রহ্মচর্য্যসূত্র, চতুঃসত্য সূত্র প্রভৃতি। একোত্তর আগম হইতেও কতকগুলি সূত্র চয়ন করিয়া তিনি অনুবাদ করিলেন; সংযুক্ত-আগমও তিনি বাদ দেন নাই।

আগম সাহিত্যের বাহিরের বহু গ্রন্থ আর্য্যকালের সাহায্যে চীনাভাষায় রূপান্তরিত হইয়া তথাকার সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে পড়ে আম্রপালী-জীবসূত্র। আম্রপালী এক রমণীর নাম; বিখ্যাত ভিষক্ জীববুদ্ধের সমসাময়িক আম্রপালীর পুত্র। মগধাধিপতি বিম্বিসারের ঔরসে আম্রপালীর গর্ভে জীবকের জন্ম হয়। এই অদ্ভুতকর্ম্মা অনুবাদকের সকল গ্রন্থের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব নহে; তবে তাঁহারই চেষ্টায় চীন-ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ আগমেরও বহু কথা-উপকথা সূত্রের অনুবাদ পাইল।

হান বংশের অধীনে লোয়াঙের শ্বেতাশ্ব মঠ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও ভারতীয় কৃষ্টির কেন্দ্র থাকিল। এই সময়ে (২৫-২২০ খৃঃ অঃ) বারো জন লেখক ৩৫৯খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অনুবাদকদের সকলেই যে ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছিলেন তাহা নহে; কারণ তখন হিন্দুরা ভারতের বাহিরে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান প্রভৃতি বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যে-সব ভিক্ষু এই পর্ব্বে চীনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বহির্ভারতের হিন্দু ঔপনিবেশিক।

হান যুগের অন্যান্য ভারতীয় ভিক্ষু ও অনুবাদকদের কীর্ত্তি আমরা এপর্য্যন্ত সামান্যই জানিতে পারিয়াছি; যাহা জানা গেছে, সংক্ষেপে এখানে তাহাই বলিব। চু-ফো-সো নামে একজন ভারতীয় শ্রমণ বোধ হয় লোকরক্ষ, আর্য্যকাল প্রভৃতির সহিত চীনে প্রবেশ করেন। ১৭২ ও ১৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন; কিন্তু সে বই দুইটি বহুকাল হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আন্‌সি দেশ হইতে আর-এক জন হিন্দু, চীনা নাম আন্‌সুয়েন, লোয়াঙ মঠে ১৮১ খৃষ্টাব্দে য়েন-ফো-থিয়াঙ নামক জনৈক চীনা শ্রমণের সহিত দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করেন। গ্রন্থদ্বয়ের অন্যতম উগ্রপরিপৃচ্ছা চীনা ভাষায় পরে একাধিক বার অনূদিত হইয়াছিল। চীনা শ্রমণ য়েন-ফো-থিয়াঙ ভালোরূপ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং আন্‌সুয়েনের সহকারিতা করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লোয়াঙ মঠে বাসকালে ৫।৭খানি সংস্কৃত গ্রন্থ মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে বোধিসত্ত্বের ষট্‌পারমিতা সম্বাদ নামক একখানি গ্রন্থ ব্যতীত চৈনিক শ্রমণের আর কোনো গ্রন্থ নাই।

যুই-চি দেশের চ ইয়াও নামে একজন শ্রমণ লোয়াঙ্ মঠে এই সময়েই অনুবাদ-কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। দশ-এগারখানি গ্রন্থ তিনি নাকি ভাষান্তরিত করেন; কিন্তু পাঁচখানিমাত্র চীনা তর্জ্জমায়

ত্রিপিটকে আছে; 'পূর্ব প্রভাসসমাধিসূত্র', মৃগভূমিসূত্র ব্যতীত মধ্যম ও সংযুক্ত আগমের কয়েকটি সূত্র তিনি পৃথক্‌ভাবে অনুবাদ করেন। বোধ হয়, খোটানের দুইজন শ্রমণও এই দলের সহিত চীনে গমন করেন, আমরা মধ্য-এশিয়ার আলোচনা-কালে দেখিব যে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে তথায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই শ্রমণ-দ্বয়ের অন্যতম সংস্কৃত ও পালি হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ চীনা ভাষায় দান করেন ; তাঁহার বইগুলির প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তবে তাহাদের নামগুলি আমরা জানিতে পারিয়াছি, যেমন ব্রহ্মজালসূত্র, চতুঃসত্যসূত্র, কুমারনিদান-শ্রীফল সূত্র; শেষোক্ত গ্রন্থখানি বুদ্ধদেবের জীবনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইনিও আগম হইতে কিছু তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনূদিত নিদান-চর্য্যা সূত্র ছোটো-ছোটো ১০টি সূত্রের সমষ্টি ; বুদ্ধের জীবনের কতকগুলি ঘটনা ইহাতে আছে। এই গ্রন্থ-খানির অন্য নাম চর্য্যানিদান-সূত্র; মহাবন নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধের সাহায্যে গ্রন্থখানি অনূদিত হয়। ধর্ম্মফল বা শাক্য থানকুও কপিলাবস্তু হইতে একখানি গ্রন্থ আনয়ন করেন ; সেখানিও বুদ্ধদেবের জীবনী; পূর্ব্বোক্ত খোটানবাসীর সহায়তায় অনূদিত হয়। গ্রন্থখানি সংস্কৃত দীর্ঘাগমের একটি অংশ।

পূর্ব্ববর্ণিত বারো জন অনুবাদককৃত ৩৫৯খানি গ্রন্থ ব্যতীত ১২৫খানি গ্রন্থের অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না। হান্ যুগে সর্ব্বসমেত ৪৮২খানি গ্রন্থ ভারতীয় ভাষা হইতে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মিং-ত্রিপিটকে ১১১খানি মাত্র বর্ত্তমান আছে।

হান যুগে যে-সব গ্রন্থ চীন দেশে যায়, তাহার অধি-কাংশই হীনযান। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা যে, হীনযান গ্রন্থমাত্রই পালি ভাষায় লিখিত; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হীনযানের অন্যতম শাখা থেরোবাদমাত্র পালি ভাষায় লিখিত; অন্য সব শাখাই প্রায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই সংস্কৃত কাব্যের সংস্কৃত নয়; সর্ব্বদেশে যাহাতে বোধগম্য হয় ইহা সেইরূপ ভাবে লিখিত। আজকাল আমরা যেমন মুসলমানী বাংলা, খৃষ্টানী বাংলা বলিয়া বাংলা সাহিত্যকে খণ্ডিত করি তেম্‌নি বৌদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া একটি পৃথক্ সাহিত্য ও লিখন-পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ সংস্কৃততেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্য রচিত হইত। মধ্য-এশিয়ায় এই সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ-ভাবে প্রচার লাভ করে। তবে চীনে যে বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচারিত হয়, তাহা তখনো নামাঙ্কিত হয় নাই; কারণ হীনযান ও মহাযানের মধ্যে ভেদ তখনো সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; কেবল বিভিন্ন দার্শনিক মত বিচারিত হইতেছিল। তথাপি হান যুগের প্রায় পাঁচশত গ্রন্থের মধ্যে ৯৬খানিতে মহাযানের প্রভাব দৃষ্ট হয়।

হান বংশের প্রভাব ২২০ খৃষ্টাব্দে অস্তমিত হইল। ইহার পর ২৬৫ সাল পর্য্যন্ত তিনটি রাষ্ট্র মিলিয়া চীনে রাজনৈতিক আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। লোয়াঙ তখন ওয়াই বংশের রাজধানী, কিন্তু তখনও শ্বেতাশ্ব মঠ বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতীয় কৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র।

এ পর্য্যন্ত আমরা যে-সাহিত্যের পরিচয় পাইলাম, তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সূত্র-সাহিত্য—সংস্কৃত আগমের অনেকগুলি সূত্র অনূদিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এপর্য্যন্ত বিনয় বা অভিধর্ম্মের কোনো গ্রন্থ চীনদেশে প্রচারিত হয় নাই। হান যুগে শীল ও পাপ-পুণ্য-সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। আর্য্যকাল শীলভঙ্গজনিত পাপ-পুণ্যের লঘুত্ব ও গুরুত্ব-সম্বন্ধে গ্রন্থ এবং আর-একজন লেখক মহাযানীয় শীল-ধর্ম্ম প্রচার করেন। মোট কথা, হান-অনুবাদকগণ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্যের বীজমাত্র বপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টিপ্রচারের অগ্রদূত।

ওয়াই বংশের রাজত্বকালে (২২০—২৬৫) ভারতবর্ষ হইতে পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মকাল নামক একজন ভিক্ষু মধ্যভারত হইতে আসেন। তিনি চীনে আসিয়া দেখিলেন যে, চীনা বৌদ্ধ-দের মধ্যে বিনয় বা সঙ্ঘের নিয়ম-নিষেধ কিছুই নাই। সেই উদ্দেশ্যে তিনি মহাসঙ্ঘিকদের প্রাতিমোক্ষ চীন ভাষায় অনুবাদ করিলেন। বিনয় বা নিয়ম-নিষেধ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৃথক্-পৃথক। ধর্ম্মকালের অনূদিত মহাসঙ্ঘিক

প্রাতিমোক্ষ বহুকাল হইল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মূলও পাওয়া যায় নাই। কেবল সর্ব্বাস্তিবাদের সংস্কৃত প্রাতিমোক্ষ মধ্য-এশিয়ায় ও থেরোবাদের পাতিমোক্‌খ সিংহলে পাওয়া গিয়াছে। মহাসঙ্ঘিক ব্যতীত ধর্ম্মগুপ্তশাখার গ্রন্থাদি এই-সময়ে চীনে আনীত হইতে আরম্ভ হয়—যেমন ধর্ম্মগুপ্ত-নিকায়ের অন্তর্গত 'সংযুক্তকর্ম্ম'।

ওয়াই বংশের রাজত্বকালেই প্রথম অভিধর্ম্ম গ্রন্থ প্রবেশ করে। অর্হৎ ঘোষ সংস্কৃত ভাষায় অভিধর্ম্মামৃত রস-শাস্ত্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃতে এই গ্রন্থ পাওয়া যায় না। চীনভাষায় এই সময়ে গ্রন্থখানির অনুবাদ হয়; অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ণিত সুখাবতীব্যূহ এই সময়ে চীনে খুব জনপ্রিয় হয়। সুখাবতীব্যূহের দুইটি সংস্করণ আছে—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। উভয় গ্রন্থের পুঁথি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। জাপানের একটি প্রাচীন মন্দিরে সংস্কৃত পুঁথি দুইখানি পাওয়া গিয়াছে। সুখাবতীব্যূহের অপর নাম অমিতায়ুসূত্র বা অমিতাভব্যূহ। চীনদেশে ও জাপানে এই গ্রন্থ-খানি এক সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী। এ-র্য্যন্ত উভয় সংস্করণের বারোখানি তর্জ্জমা চীনা ভাষায় হইয়াছে; আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগেই তিনখানি অনুবাদ হইয়াছিল। নিম্নে আমরা এই গ্রন্থখানির বিবিধ নাম ও অনুবাদকদের নাম ও কাল প্রদান করিতেছি।

১। অমিতায়ুস্ সূত্র, অনুবাদক আর্য্যকাল (গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে)।
২। অমিত-শুদ্ধ-সম্বুদ্ধ-সূত্র—লোকরক্ষ।
৩। অমিত-সূত্র - চ-চিয়েন।
৪ অমিতায়ুসূত্র—সংঘবর্ম্মন্।
৫ অমিত-শুদ্ধ সম্যক্-সম্বুদ্ধ-সূত্র—পো-য়েন।
৬ অমিতায়ুস সূত্র—ধর্ম্মরক্ষ।
৭ নব-অমিতায়ুস্ সূত্র—বুদ্ধভদ্র।
৮ অমিতায়ুর্হৎ-সম্যক্-সম্বুদ্ধ-সূত্র—মহাবল (নষ্ট হইয়াছে)।
৯ নব অমিতায়ুস্ সূত্র—পো-য়ুন (নষ্ট)।
১০। নব-অমিতায়ুস্ সূত্র—ধর্ম্মমিত্র (নষ্ট)।
১১। অমিতায়ুস্ তথাগত-পার্ষদ—বোধিরুচি।
১২। মহাযান-অমিতায়ুর্ব্যূহ-সূত্র—ফা-হিয়ান।

সুখাবতীব্যূহে সুখলোকের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে ও অমিতাভের নামে মানুষ উদ্ধার পায় সেই মত প্রচারিত হইয়াছে। সুখাবতীব্যূহ জাপানের শিনরন (Shinran) সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। ইংরেজী ও ফরাসীতে সংস্কৃত সুখাবতীব্যূহের তর্জ্জমা আছে। চীনা তর্জ্জমার ইংরেজী অনুবাদ জাপানী অধ্যাপক তাকাকুসু করিয়াছেন। ৪০২ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব সুখাবতীব্যূহের ক্ষুদ্র সংস্করণে চীনা তর্জ্জমা করেন; এই অনুবাদই চীন-জাপানে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় হইয়াছে। পঞ্চম শতাব্দীতে গুণভদ্র ইহার দ্বিতীয় তর্জ্জমা করেন, সেখানি হারাইয়া গিয়াছে। বৃহৎ-সংস্করণের অনুবাদ বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন্‌ৎসঙ করিয়াছিলেন। চীন ও জাপানে কুমারজীব ও হুয়েনৎসঙের অনুবাদ-দুখানি বিশেষভাবে পঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা

কাজী আবদুল ওদুদ

কথা

নায় যে সহজ প্রবল সত্যের রূপ কবির চোখ ধেঁধে দিয়ে গেল, কথা" কাব্যে দেখ্‌ছি তা'রই সঙ্গে কবির বার-বার মুখোমুখি হচ্ছে। ...তের পুরাণে ইতিহাসে যাঁরা জীবনের রহস্যোদ্‌ঘাটনের তপস্যা ...ছেন, ক্ষুদ্র স্বার্থের কারাগারে বদ্ধ হ'য়ে পলে-পলে যে নিদারুণ আত্ম-... তা'র হাত থেকে উদ্ধার ক'রে ক্ষতির ত্যাগের সময়-সময় মৃত্যুর, ...টীকা পরিয়ে জীবনকে যাঁরা সুন্দর করেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত এক নূতন মহিমা নিয়ে কবির সামনে দাঁড়িয়েছে। অতীত তাঁর কাছে আর অতীত নয়। অতীত ইতিহাসে দীপ্যমান দেখ্‌ছেন যে মহাজীবন তা'রই স্পন্দন কবি নিজের ভিতরে অনুভব করতে পারছেন ব'লেই এর অল্প কিছু কাল পরের একটি কবিতায় অতীতকে বল্‌তে পেরেছেন :—

কথা কও কথা কও।
স্তব্ধ অতীত হে গোপনচারী,
অচেতন তুমি নও—

'কথা' কাব্যখানির প্রায় সব কবিতাই সুন্দর। প্রতিপদ্যেরই মহিমা আছে; তা'র উপর লেখক অসাধারণ কুশলী, কাজেই "প্রবন্ধ" "মন্তর" ত হবেই। রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যখানি বোধ হয় সব চাইতে বেশী জনপ্রিয়।

গাথা (Ballad) হিসাবে শেষের দিকের কবিতাগুলিই (অপমান-বর, স্বামী লাভ, বন্দী বীর, নকল গড়, হোরি খেলা, বিবাহ ইত্যাদি) উৎকৃষ্ট। আর এসমস্তের মধ্যে 'হোরি খেলা' কবিতাটি অতি উঁচু দরের। Balladএর বিশেষত্ব তা'র সবল সরলতায়। এই জিনিষটিই এই কবিতায় পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যায়। আর এর ছন্দ বড় চমৎকার,—যোদ্ধার হোরি খেলার ছন্দই বটে।

পত্র দিল পাঠান কেসর খাঁরে
  কেতুন হ'তে ভুনাগ রাজার রাণী,—
লড়াই করি আশ মিটেছে মিঞা?
বসন্ত যায় চোখের উপর দিয়া,
এস তোমার পাঠান সৈন্য নিয়া—
    হোরি খেলব আমরা রাজপুতানী।
যুদ্ধে হারি' কোটা-সহর ছাড়ি'
  কেতুন হ'তে পত্র দিল রাণী।

কিন্তু 'কথার" পরিশোধ কবিতাটিই হয়ত এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা—রবীন্দ্রনাথের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের অন্যতম। এই কবিতা সম্পর্কে নীতির কথা কেউ তুল্‌লে আশ্চর্য্য হবো না; এর বিশেষত্বও সেইখানেই। কবি-দৃষ্টি যে কি অসাধারণ, প্রায় সর্ব্বভেদী, প্রচলিত নীতি রুচি মত-বিশ্বাস ইত্যাদি স্থূলত সে-দৃষ্টির সাম্‌নে যে কেমন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যায়, সত্য আপনার উলঙ্গ মহিমা'য় সুপ্রকট হয়, এ কবিতাটিতে তা'র আশ্চর্য্য পরিচয় রয়েছে। এর যে-জায়গায় শ্যামা বল্‌ছে—

......বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজ স্কন্ধে ল'য়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্ব্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্ব্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি' এ মোর গৌরব।—

সেখানে বজ্রসেন যদি—

কি কহিলি পাপীয়সী......
............চাহি না আর তোরে

ব'লে নাটকীয় ভঙ্গিতে পদাঘাত ক'রে চ'লে যেত, আর সেখানেই যবনিকা পতন হ'ত,তা হ'লে চারিদিক্ থেকে হয়ত হাততালির আর অন্ত থাক্‌ত না। কিন্তু কবির প্রাণ পুরুষ লজ্জার দুরূহ ভারে পিষ্ট হ'য়ে যেত। মূঢ় যে সেই কেবল জানে পাপ আর পুণ্য দুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। দৃষ্টিমান্ প্রত্যক্ষ করে, ভালো মন্দ পাপপুণ্য সমস্তের ভিতর দিয়ে মানুষেরই জয়-যাত্রা। সে যাত্রা-পথে, মোহ-দুর্ব্বলতার সহস্র কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ মানুষের চরণতল; মানুষের সে-বেদনা পরম দরদী কবি যদি না বুঝ্‌বেন তবে আর বুঝ্‌বে কে?

ক্ষণিকা

কল্পনায় কবি হৃদয়ের যে-বেদনা উপলব্ধি করেছি,'কথার' মহাজনদের অমৃতস্পর্শ লাভ ক'রেও কবির অন্তরের সে-বেদনা প্রশমিত হ'য়ে যায়-নি। কিন্তু এই ক্ষণিকা কাব্যে সে-বেদনা রয়েছে নীচে। সেই ব্যথার মৃণালের উপর তাঁর প্রতিভাপদ্ম যে-ভাবে পাপ্‌ড়ি খু'লে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব্ব তা'র সৌন্দর্য্য আর সৌরভ। বাধা, বিবেচনা, সমস্যা, সন্ধান—সব সরিয়ে দিয়ে ক্ষণ-প্রকাশের বুকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে-অমৃত ফু'টে উঠ্‌ছে কবি তাই চোখ ভ'রে দেখ্‌ছেন আর প্রাণ ভ'রে উপভোগ কর্‌ছেন—

ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফে'লে দেরে
  নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজে তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে,
আজিকার মতো যাক্ যাক্ চু'কে
  যত অসাধ্য সাধনি!
    ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
      ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি!

প্রকাশ-ভঙ্গিমা কি শাণিত! এপর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যত কাব্য লিখেছেন তা'র মধ্যে ছয়খানিকে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে মনে হয়—চিত্রা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পলাতকা। নিছক গীতি-কবিতা হিসাবে এই ক্ষণিকার কবিতাগুলি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে-সম্বন্ধে অনেকেই বোধ হয় আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। সরল চটুল ভঙ্গীতে কবি কথা বল্‌ছেন অথচ তা'রই ফাঁকে-ফাঁকে কবি হৃদয়ের অন্তস্তলে চেয়ে দেখ্‌বার সুযোগ আমাদের যখন ঘট্‌ছে তখন দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, কি গভীরতা থেকে তাঁর কথা উৎসারিত, আর অনেক সময়েই কেমন বেদনা-ভরা সেই গভীরতা।

ওমর খৈয়ামের সঙ্গে এখানে রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে। তবে ওমরের মতো জীবনের অতি গুরুতর সমস্যাগুলোর কোনো মীমাংসা কর্‌তে না পেরে "ভাগ্য-দেবীর ক্রূর পরিহাস পেয়ালা ভ'রে ভুল্‌বার" চেষ্টাই এখানে কাব্যর সব কথা নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভঙ্গিমার বেশী মিল বরং হাফেজের সঙ্গে।*

ক্ষণিকার বহু পরে শিশু, গীতিমাল্য, শিশু ভোলানাথ প্রভৃতি কাব্যে কবির সহজের সাধনা পুরোপুরিই আমরা দেখ্‌তে পাই। এই ক্ষণিকায় তা'রই পূর্ব্বসূচনা। সত্যকে সব বাহুল্যের আবর্জ্জনা থেকে মুক্ত ক'রে এমন সহজরূপে প্রকাশ কর্‌বার ক্ষমতা এর আগে রবীন্দ্রনাথে দেখা যায়নি; কণিকায় এর সামান্য আভাস আছে; কিন্তু ক্ষণিকায় সহজ সুন্দরের লীলা যে-ভাবে দলের পর দল খু'লে যেতে চাচ্ছে বাস্তবিকই তা অপূর্ব্ব; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-বর্ণনায়ও কবির এই সহজ ভঙ্গী—

আমি ভালোবাসি আমার
  নদীর বালুচর,
শরৎকালে যে নির্জ্জনে
    চখাচখির ঘর।

ক্ষণিকার 'মাতাল' কবিতাটি বিখ্যাত। জীবনের সব জটিলতা, দুর্ভাবনা সরিয়ে দিয়ে হৃদয়াবেগের সহজ পথে চলার যে সত্য কবির চোখে ফু'টে উঠ্‌তে চাচ্ছে, তাই-ই ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে এই কবিতায়

---

* মা দর পিয়ালে হাফেজ আয়, বেখবর আক্‌সে রোখে ইয়ার দিদায়েম জেলজতে শুর্‌বে মুদাম মা।—হে শরাব-রসের অরসিক, শোনো, আমি আমার পেয়ালার ভিতরে প্রিয়তমের মুখ প্রতিবিম্বিত দেখেছি।

পাড়ার যত জ্ঞানী গুণীর সাথে
নষ্ট হ'ল দিনের পর দিন
অনেক শিখে পক্ক হ'ল মাথা,
অনেক দেখে দৃষ্টি হ'ল ক্ষীণ,
কত কালের কত মন্দ ভালো
ব'সে ব'সে কেবল জমা করি,
ফেলা ছড়া ভাঙা চোরার বোঝা
বুকের মাঝে উঠ্‌ছে ভরি'-ভরি'
গুঁড়িয়ে সে-সব উড়িয়ে ফেলে দিক্
দিক্‌ বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া !
বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ
মাতাল হ'য়ে পাতাল-পানে ধাওয়া !

যুগল কবিতাটিতে সত্যের সন্ধান কি স্বার্থ! জায়গায়-জায়গায় Browningএর The Last Ride Together মনে করিয়ে দেয়।

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মানব নাক রাজার দারোগারে,—
কেল্লা হ'তে ফৌজ সারে-সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরাছুরি,
বলব, রে ভাই, বেজার কোরো নাকো,
গোল হতেছে একটু থেমে থাকো,
কৃপাণ খোলা শিশুর খেলা-রথে
ক্ষ্যাপার মতো কামান-ছোড়াছুড়ি !
একটুখানি সরে' গিয়ে করো
সঙের মতো সঙীন্ ঝমঝমর,
আজকে শুধু একবেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর !

হৃদয়ের আবেগ যে অসত্য নয়, সৌন্দর্য্যের উপলব্ধির যে কোনো সত্যের কাছেই মাথা হেঁট করবার প্রয়োজন করে না, 'অভিবাদ' কবিতাটিতে কত স্বচ্ছন্দচিত্তে কবি সে-কথা বলতে পারছেন !

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে,

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করচে বিরাজ
সকল-প্রকার অজস্রত্ব।
কেন রাখব কথার ওজন ?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন ?
ছুটুক বাণী যোজন-যোজন
উড়িয়ে দিয়ে যত্ন-পত্ন।

হাফেজের দিউয়ান যাঁদের প্রিয় তাঁরা 'ক্ষণিকায়' এইরকম বহু কবিতায় তাঁর ঝঙ্কার অনুভব করবেন। কিন্তু দুয়ের পার্থক্যও লক্ষ্য করবার যোগ্য। মিলনের যে সৌন্দর্য্য, আবেগ, আনন্দ তাই দিউয়ানের স্থায়ী ভাব; ক্ষণিকায়ও মাঝে মাঝে এসব চিকমিক ক'রে ওঠে, কিন্তু পূর্ণ করেছে এর সব সৌন্দর্য্য-বোধ, আবেগ, আর স্ফূর্ত্তির তলদেশে লুক্কায়িত যে-বেদনা। কতকগুলো কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবি সে-বেদনা আর লুকিয়ে রাখতে পারছেন না।

কবি বলছেন -

গম্ভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কি না
বুঝব কেমন ক'রে ?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই;
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই আমি
নিজের কথাটাই।
হাল্‌কা তুমি করো পাছে
হাল্‌কা করি তাই
আপন ব্যথাটাই।

আর 'পরামর্শ' কবিতায় কবির অশ্রু যেন আর বাধা মানতে চাচ্ছে না !—

অনেক বার ত হাল ভেঙেছে,
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে,
ওরে দুঃসাহসী !
সিন্ধু পানে গেছিস্ ভেসে
অকূল কালো নীরে—
ছিন্ন রসারসি।
এখন কি আর আছে সে বল ?
বুকের তলা তোর
ভ'রে উঠ্‌ছে জলে।
অশ্রু সেঁচে চলবি কত
আপন ভারে ভোর
তলিয়ে যাবি তলে।

কবি নিজেকে সমঝাচ্ছেন, এখন না হয় তরী ঘাটেই বাঁধা থাকুক, আর কাজ কি দুঃসাহসে ভর ক'রে নতুন যাত্রা করা ?

এবার তবে ক্ষান্ত হ রে
ওরে শ্রান্ত তরী !
রাখ্‌রে আনাগোনা !
বর্ষ-শেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা গগন ভরি'
ঐ বেজেছে শোনা।

কিন্তু মিছে প্রবোধ দেওয়া,—

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধ'রে বসেছে তা'র
যমদূতের সম
স্বভাব সর্ব্বনেশে।

ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়্‌বে নাকো আর,
হায় রে মরণ-লুভী।
ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকা-ডুবি।

এর সঙ্গে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতা মিলিয়ে পড়্‌লে এর বিশিষ্টতা সহজেই অনুভব করা যায়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রয়েছে দূর থেকে কবি যে মৃত্যুভীষণ মহাজীবনের কল্লোল শুন্‌তে পেয়েছেন তার'ই ছন্দ; তাই বলেছি এ তাঁর প্রতিভা-নির্ঝরের আর-এক স্বপ্নভঙ্গ। কিন্তু সে জীবন-পথে বহু দূর এগিয়ে কবি যে বিষম আকর্ষণ অনুভব করছেন সেই সর্বনেশে আকর্ষণের টানে সাম্‌নে চল্‌তে যে অদ্ভুত আশঙ্কাও বেদনা কবির চিত্তে জাগ্‌ছে তার'ই অপরূপ ছবি ফু'টে উঠেছে এই কবিতায়। হাফেজও বলেছেন,

...ইশ্‌ক আসান নমুদ আউয়ল
ওলে উফ্‌তাদ মোশ্‌কেল্‌হা। *

অথবা

শবে তারীখ ও বীমে মওজ
ও গিরদ আবে চনিন হায়েল।
কুজা দানন্দ হালে মা
সুবুক্‌ সারানে সাহিল হা। †

কবির আধ্যাত্মিক সাধনার এখন কি অবস্থা তা'র নির্দেশ রয়েছে এর শেষের দিকের 'অন্তরতম' কবিতায়—

আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ
জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে ত কেউ
মানে না।
মোর মুখে পেয়ে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে।

তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলিনে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।

স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।

চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফি'রে আসি তবে গরবে।

প্রভাত না হ'তে কখন আবার
গৃহ-কোণ মাঝে আসিয়া,
বাতায়নে ব'সে বিহ্বল বীণা
বিজনে বাজাই হাসিয়া।

পথ দিয়া যেবা আসে যেবা যায়
সহসা থমকি' চমকিয়া চায়,
মনে করে তা'রে ডেকেছি।
জানে না ত কেহ কত নাম দিয়ে
এক নামখানি ঢেকেছি।

বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে পূর্ব্বরাগের পালা শেষ, কবির চিত্ত এখন অনুরাগের রাঙা রাখীতে বাঁধা প'ড়ে গেছে।

এ ভিন্ন অন্য-ধরণের কবিতাও ক্ষণিকায় আছে, আর কবির অভিনব বর্ণন-ভঙ্গীতে তারও অধিকাংশই সুন্দর কবিতা। এর বর্ষার কবিতাগুলি খুবই চমৎকার। বর্ষার অনেক সুন্দর কবিতা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। তা'র মধ্যেও 'মানসী', 'সোনার তরী' আর 'ক্ষণিকার' বর্ষার কবিতা লক্ষ্যযোগ্য। বাস্তবিকই যেন কাজল মেঘের ছায়া পড়েছে এইসব কবিতার উপর, আর তাই তাদের চেহারায় কেমন তৃণপল্লবেরই নবীনতা।

ওগো আজ তোরা যাস্‌নে গো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে
আকাশ আঁধার, বেলা বেশী আর নাহিরে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথ পানে দেখ্‌ চাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে।

ক্ষণিকার নববর্ষ কবিতাটি খুবই বিখ্যাত। এর খ্যাতি কোনো দিন যে ম্লান হবে তা মনে হয় না।—

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।

শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।

ধেয়ে চ'লে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দু'লে-দু'লে সারা,

* প্রথমে প্রেম বড় আরামের মনে হয়েছিল, কিন্তু শেষে দেখ্‌ছি মুশ্‌কিল এসে পৌঁছেছে।

† অন্ধকার রাত, উর্ম্মিসংঘাত, ঘূর্ণাবর্ত্তও তুমুল গর্জ্জে,
বেলায় বাস যা'র বুঝ্‌বে ছাই তা'র পথের ক্লেশ মোর সমুদ্দুর যে।
—কবি নজরুল ইস্‌লামের অনুবাদ।

কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি' গুমরি'
গরজে গগনে গগনে।

কবির নিবিড় রসানুভূতি পাঠকের হৃদয়কে পুরোপুরিই স্পর্শ করে। এর ক্ষতিপূরণ, প্রতিজ্ঞা, পথে, কবি, সোনারতরি, একগাঁয়ে প্রভৃতি খুবই লক্ষ্যযোগ্য কবিতা। কবির সহজের সাধনার কথা আগেই বলা হয়েছে। কত গভীর আর জটিল কথাও সহজ আর চটুল ভঙ্গিতে কবি প্রকাশ করতে পারেন এসবে তারই প্রচুর পরিচয় রয়েছে। বেশ হাল্কা-ভাবেও এগুলো পড়া যেতে পারে; কিন্তু কবির দিকে একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে চাইলেই বুঝতে পারা যায় ফুর্তিবাজ তাঁকে যতই মনে হোক, আসলে সোজা পাত্র তিনি নন।

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি' হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায়-কণায়।

বাস্তবিক কবির দৃষ্টি এখন কত তীক্ষ্ণ, আর কত প্রসারিত তাঁর হৃদয়, তা'র সুন্দর পরিচয় আমরা পাই এর "কবির বয়স" কবিতাটিতে—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক্‌-বয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি,
কারো হাসি আঁখির কোণে-কোণে,
কারো অশ্রু উছ্‌লে প'ড়ে যায়,
কারো অশ্রু শুকায় মনে-মনে;—
কেউবা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎ-মাঝে কেউবা হাঁকায় রথ,
কেউবা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউবা হারায় পথ।

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক?
সবার আমি সমান বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক।

নৈবেদ্য

কল্পনায় ও ক্ষণিকায় কবির ভিতরে যে নবজন্ম-সঞ্চারের বেদনা উপলব্ধি করেছি, নৈবেদ্যে দেখা যাচ্ছে, সে-বেদনা কেমন একটু সার্থক হ'য়ে দেখা দিয়েছে স্পষ্টতর দৃষ্টিতে। কবি উপলব্ধি করছেন, সারাজীবন তিনি যেভাবে কাটিয়ে এসেছেন, যে-সব অনুভূতির ভিতর দিয়ে এসেছেন তা'র কিছুই বৃথা নয়, মিথ্যা নয়। সেই সমস্তেরই সঙ্গে-সঙ্গে অপরূপও তাঁর ঘরে বহুবার প্রবেশ করেছেন।

নির্জ্জন শয়ন-মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গত জীবনের কত কথা। হেন ক্ষণে
শুনিলাম, তুমি কহিতেছ মোর মনে;—
ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ-ওরে আত্ম-ভোলা
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা,
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক,
যত ভালো মন্দ, যত গীতগন্ধ ল'য়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি'।
দ্বার রুধি' জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম!

নৈবেদ্যের প্রথমে কতকগুলি প্রার্থনা-সঙ্গীত রয়েছে। সত্যকার প্রার্থনার জন্য প্রয়োজন যে স্থির চিত্তের আর স্থির লক্ষ্যের রবীন্দ্র-প্রতিভায় এখন সেটি সম্ভবপর হয়েছে। এই প্রার্থনার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে কবি অনুভব করেছেন, জাগ্রত আত্মার ভার বহন করা কত আয়াসসাধ্য। অথচ এ ভার বহনের প্রতি তাঁর পরম লোভ।—

তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি!
দুখ হবে মোর মাথার মাণিক
সাথে যদি দাও ভকতি।

কিন্তু এ ভারবোধ শেষে আর থাকছে না। আত্মার অপরূপ জ্যোতিই তাঁকে চমৎকৃত করছে:—

দেহে আর মনে-প্রাণে হ'য়ে একাকার
এ কি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার!
এ কি জ্যোতি! এ কি ব্যোম্ দীপ্ত দীপ-জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা!
এ কি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল,
পর্ব্বতে কঠিন, তরুপল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার! এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ!
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন্,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্র কান্ত! ওগো বিশ্বভূপ,
দেহ মনে প্রাণে আমি এ কি অপরূপ?

এই নৈবেদ্য কাব্যখানিতে বেশী ক'রে চোখে পড়ে কবির যোগীর ভাব—পরম মঙ্গলময়ের প্রতি তাঁর চিত্ত সব সময়ে উন্মুখ হ'য়ে আছে। তাঁর এযোগ যেন কিছুতেই ভাঙে না।—

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্দ্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন-সনে;
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি ব'হে ল'য়ে
ফিরি' আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে
দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে। শীতবায়
বুলাল স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্ত্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।
মুহূর্ত্তেই মৌন হ'ল স্তব্ধ হ'ল হিয়া
নির্ব্বাণপ্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্দ্ধপানে; চিত্ত মম
মুহূর্ত্তেই পার হ'য়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে। হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

এই পরম সমাহিতচিত্ততার অবস্থায় এমন অনেক কথা তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রের মতনই যা পূর্ণ আর অগ্নিগর্ভ। নৈবেদ্যের

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

—এমনই এক বাণী—বিশ্বমানবের কানে এক বড় মন্ত্র।

এই মন্ত্রটি তাঁর সাধনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁর সমগ্র জীবনকে দু'ভাগ ক'রে দেখাচ্ছে। একদিকে অসংখ্য বন্ধন-মাঝে যে-মুক্তির আনন্দ প্রচ্ছন্ন রয়েছে রবীন্দ্রনাথকে বারে-বারে ঘুরে-ফিরে নানা পাকে বদ্ধ হ'তে দেখে আর সে-সব বন্ধন এড়িয়ে যেতে দেখে সে-কথার যোগ্য প্রমাণ আমরা পাই। অন্যদিকে গীতাঞ্জলিতে এই সত্যটি আরো গভীর ক'রে উপলব্ধি করবার পর বলাকা, পলাতকা প্রভৃতি কাব্যে দেখতে পাই, দৃষ্টির অব্যর্থতা নিয়ে আনন্দময় কবি যেন স্বর্গমর্ত্ত্য পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্ছেন। ভারত সম্বন্ধে সে-সমস্ত কবিতা এতে আছে, সে-সমস্তও এমনি পূর্ণ আর বীর্য্যবান্ দৃষ্টির আলোকে ভাস্বর। ভারতের অতীত মহিমা, বর্ত্তমান হীনতা দীনতা, আর ভবিষ্যতের লক্ষ্য সমস্তই তাঁর যোগ-দৃষ্টিতে তিনি যেন মধ্যাদিনের আলোকে-দেখা চিত্রের মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন।—

তাঁহারা দেখিয়াছেন—বিশ্বচরাচর
ঝরিছে আনন্দ হ'তে আনন্দ নির্ঝর;
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারই প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি' মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্ম্মরিয়া করে যাতায়াত;

* * *

এ দুর্ভাগা দেশ হ'তে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

দীনপ্রাণ দুর্ব্বলের এ পাষাণ-ভার,
এই চির পেষণ-যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে-পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্য মর্য্যাদাগর্ব্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি' দূর করো!

* * *

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি'
হে ভারত সর্ব্বদুঃখে রহ তুমি জাগি'
সরলনির্ম্মল চিত্ত; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি' পুষ্প ও চন্দনে
আপনার অন্তরের মাহাত্ম্য-মন্দির
সজ্জিত সুগন্ধি করি', দুঃখনম্রশির
তাঁর পদতলে নিত্য রাখিয়া নীরবে।
তাঁহাতে বঞ্চিত করে তোমারে এ-ভবে
এমন কেহই নাই—সেই গর্ব্বভরে
সর্ব্ব ভয়ে থাকো তুমি নির্ভয় অন্তরে
তাঁর হস্ত হ'তে ল'য়ে অক্ষয় সম্মান।
ধরায় হোক না তব যত নিম্ন স্থান
তাঁর পাদপীঠ করো সে আসন তব
যাঁর পাদরেণুকণা এ নিখিল ভব।

আরো লক্ষ্যের বিষয় এই যে, কবি এখানে মঙ্গলময় ঈশ্বরকে অন্তরে-অন্তরে অনুভব ক'রেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। তাঁকেই তাঁর চিত্তমন্দিরে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তাঁরই সৈনিকরূপে সংসার-বক্ষে দৃঢ়পাদক্ষেপে বিচরণ করতে চাচ্ছেন—

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথা
তোমার আদেশে! যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে! যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে ল'য়ে নিজ স্থান!
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

বাস্তবিক ক্লৈব্যবিবর্জ্জিত এক অসাধারণ বলীয়ান্ আত্মার সাক্ষাৎই আমরা এই নৈবেদ্য কাব্যের প্রায় সব জায়গায় পাই। আর এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যকে আমরা তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম বলতে দ্বিধা বোধ করিনি। কাব্যের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক ওজস্বল জাগ্রত আত্মা সেই সৃষ্টি-মহিমা লাভ করেছে এই কাব্যে।

নৈবেদ্য কাব্যখানি মুসলমান পাঠকের কাছে বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ, কেননা মঙ্গলের অভিমুখে এমন ক্লৈব্যবিবর্জ্জিত অগ্রগতিই ইস্লামের প্রিয়। ভাববিলাসী বাঙালীর নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত এই কাব্য।

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে

ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি মদ-ধারা
নাহি চাহি নাথ!
দাও ভক্তি-শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি' মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্ব্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।
সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

কিন্তু এর শেষের দিকের দুটি প্রার্থনায় (৮৬,৮৭) দেখতে পাচ্ছি, আর-এক সুর বাজছে কবির চিত্ত বীণায়। ধ্যান তাঁর হৃদয়ে চমৎকার উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে, তবু অন্তরের শুষ্কতা তাঁর ঘুচছে না। সে উজ্জ্বলতা সময়ে যেন তাঁর পক্ষে "নিঃশব্দ দাহ"। তাই কবি প্রার্থনা করছেন—

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি' বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্দ্ধপানে চাহি'। ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হ'তে এসে
ব্যগ্র শাখা প্রশাখায় চক্ষের নিমেষে
কানে-কানে রটাইবে আনন্দমর্ম্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বন বনান্তর!

এত ধ্যানজ্ঞানের অন্তরে-অন্তরে এই প্রতীক্ষার ব্যথা! তপস্যার রুদ্র দহন প্রেমের বর্ষণই চায়। বিধাতার অসাধারণ কৃপা এই কবির উপর। আমাদের মনে হয়, নানা সংস্কার-জর্জ্জরিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহনের যে-প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে তা'র এক বড় সার্থকতা লাভ হয়েছে এই নৈবেদ্য কাব্যে।

নৈবেদ্য প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। এই ঘটনা হয়ত নিরর্থক নয়।

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল,—হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ঙ্করী। দয়াহীনা সভ্যতা নাগিনী
তুলিছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে,
গুপ্ত বিষ দন্ত তা'র ভরি' তীব্র বিষে।

আর বিংশ শতাব্দীর এই প্রারম্ভকে সামনে ক'রে ভারতের এক প্রান্তে এক জাগ্রত-আত্মা কবি প্রার্থনা করছেন—

……বীর্য্য দেহ, ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীন জ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে; বীর্য্য দেহ, চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে দিতে রাখি'।
বীর্য্য দেহ তোমার চরণে পাতি' শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

শিশু

নৈবেদ্যের কিছুদিন পর শিশুকাব্য প্রকাশিত হয়। এই শিশুকাব্যের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অজিত-বাবু বলেন, পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীন শিশু পুত্র সবাই কবির কাছে পিতার এবং মাতার উভয়েরই স্নেহ লাভ করে ছিল। সেই একটি গভীর স্নেহ থেকে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্য-রসে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

শিশুকাব্য রবীন্দ্র-প্রতিভার এক অসাধারণ নিদর্শন সন্দেহ নেই। অজিতবাবু যে বলেছেন, এ সেই বৈষ্ণব মাধুর্য্যতত্ত্ব, ভগবানকে যাঁরা বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়ে দেখে তাদের সেই মাধুর্য্যের স্রোতটি এর মধ্যে আগাগোড়া প্রবাহিত; সে-কথাটি অনেকপরিমাণে সত্য। অনেক-পরিমাণে বলছি এই শিশুকাব্যের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে। বৈষ্ণব ভগবানকে লাভ ক'রে শিশুতে তাঁর প্রকাশের আনন্দ উপলব্ধি করেন, অথবা গুরুর কাছ থেকে এ তত্ত্বলাভ ক'রে জীবনে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখা যাচ্ছে ভগবৎ-সাধনায় ও নিজের অন্তরের অনুভূতি আর সন্ধানের প্রদীপ তাঁকে পথ দেখাচ্ছে। তাই একাব্যে মাধুর্য্য-রসের সঙ্গে-সঙ্গে মিশে রয়েছে এক রহস্য রস। কিন্তু তাতে কাব্য-হিসাবে এর গৌরব বেড়েছে বই কমেনি; কেননা আধুনিকের সামনে প্রসারিত যে জগৎ-ক্ষেত্র তা বহুল-পরিমাণে বিরাটতর, আর সেই অসীম বৈচিত্র্যপূর্ণ বিরাট জগৎ ক্ষেত্রের উপর ক্ষুদ্র শিশু পরম রহস্যপূর্ণই বটে।—

জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কি কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

এই কাব্যে কবি যেন তাঁর ভগবৎ-উপলব্ধির দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে শিশুতে তাঁ'র সহজ প্রকাশের ছটা প্রত্যক্ষ করছেন। এ আলোর দিকে স্থির নেত্রে চেয়ে থাকা নয়, এহেন প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ গাছের পাতা-ফেকড়ির ফাঁকে-ফাঁকে তীক্ষ্ণ হ'য়ে এসে চোখে পড়ছে।

আগেকার ক্ষণিকার মধ্যে যে সহজ প্রকাশ তা'র সঙ্গেও এর তফাৎ রয়েছে। ক্ষণিকার মধ্যে যে সহজ প্রকাশ সে জীবনানন্দেরই এক বিচিত্র ভঙ্গিমা। ভগবৎ-অন্বেষণ এর তলে তলে লুকিয়ে রয়েছে ব'লে এই বিচিত্রতা; কিন্তু 'শিশু'র ভিতরে ভগবৎ-দীপ্তি যেন কতকটা সোজাসুজি কবির চোখে-মুখে এসে পড়তে চাচ্ছে। তাই কবির কথাগুলো খুব সোজা আর মধুর; কিন্তু তা'রই সঙ্গে-সঙ্গে বাজছে কেমন এক অপ-রূপ সন্ধানের সুর।

রঙীন্ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে, বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রং খেলে মেঘে, জলে রং উঠে জেগে,
কেন এত রং লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

* * * *

যখন নবনী দিই লোলুপ করে,
হাতে মুখে মেখেচুকে বেড়াও ঘরে,
তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদীবারি,
ফল মধুরসে ভারী কিসের তরে,
যখন নবনী দিই লোলুপ করে!

'সমব্যথী' কবিতায় বালকের সহজ খেয়ালের অন্তরে কবির মনের কি এক তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা!—

যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হ'তেম কুকুরছানা—
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে চাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা?
সত্যি ক'রে বল্
আমায় করিস্‌নে মা ছল,
বল্‌তে আমায় "দূর দূর দূর দূর!"
কোথা থেকে এল এই কুকুর?
যা' মা তবে যা' মা,
আমায় কোলের থেকে নামা!
আমি খাবো না তোর হাতে,
আমি খাবো না তোর পাতে!
যদি খোকা না হ'য়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে,
তবে পাছে যাই মা উড়ে
আমায় রাখ্‌তে শিকল দিয়ে?
সত্যি ক'রে বল্
আমায় করিস্‌নে মা ছল—
বল্‌তে আমায় হতভাগা পাখী
শিকল কেটে দিতে চায়রে ফাকি!

এর কতকগুলো কবিতায় বাৎসল্যরস জমাট হ'য়ে দেখা দিয়েছে।—

তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙীন্ আঙিয়া।
বিহান বেলা আঙিনা-তলে
এসেছ তুমি কি খেলা-ছলে
চরণ-দুটি চলিতে ছুটি'
পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া?

* * * * *

বাছারে তোর সবাই ধরে দোষ!
আমি দেখি সকল তা'তে
এদের অসন্তোষ!
খেলতে গিয়ে কাপড়খানা
ছিঁড়ে খুঁড়ে এলে,
তাই কি বলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে?
ছি ছি কেমন ধারা!
ছেঁড়া মেঘে প্রভাত হাসে
সে কি লক্ষ্মীছাড়া?

এর এবং কতকগুলি কবিতা অতি চমৎকার ছড়া—ছোটো-বড়, বীরপুরুষ, বলবান্ ইত্যাদি। সমস্ত শিশুকাব্যখানির ভিতরে একটি তাজা চিরনবীন প্রাণ ঝলমল করছে।

রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্যের কথা ভাব্‌লে বাস্তবিকই চমৎকৃত হ'তে হয়—চিরদিনই হয়ত সাহিত্যানুরাগীরা এই কথাটি ভেবে চমৎকৃত হবে। জগতের কোন্ সুর যে তাঁর চিত্ত-বাঁশিতে বাজেনি, তা খুঁজে পাওয়া শক্ত।

খেয়া

এর কিছুদিন পরে স্বদেশী আন্দোলনের দিনে রবীন্দ্রনাথকে একজন অগ্রণীরূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নৈবেদ্যে তিনি কর্মক্ষেত্রে যোগ্য-ভাবে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রার্থনা করেছেন,—

কর মোরে সম্মানিত নব বীর-বেশে,
দুরূহ কর্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি' নিলীন
কর্মক্ষেত্রে ক'রে দাও সক্ষম স্বাধীন।

স্বদেশী আন্দোলনের দিনে তিনি যে কর্মব্রত নিয়েছিলেন, তার উদ্‌যাপনে তাঁর ভিতরে একটুকু দ্বিধা দেখা যায়নি। সঙ্গীত, বক্তৃতা, আদর্শপ্রচার ইত্যাদি দ্বারা সে-আন্দোলনকে তিনি আরো শতগুণে আন্দোলিত ক'রে তুলেছিলেন।

কিন্তু শেষে দেখা গেল, এ-আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এর জন্য তাঁর অনেক ভক্তও তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই কাজ উচিত হয়েছিল কি অনুচিত হয়েছিল, সে-আলোচনা অনেকটা অর্থহীন। ইতিহাস যে-ভাবে গ'ড়ে উঠছে, সেই-ভাবেই তা'কে গ্রহণ করা ভিন্ন আর উপায় কি আছে! কিন্তু এই যুগের রবীন্দ্রসাহিত্য একটু ভালো ক'রে প'ড়ে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পারা যায়, যে স্বধর্মের সন্ধান কবি আজীবন ক'রে আসছেন, নিজেকে শেষে স্বদেশী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সেই স্বধর্মপালনই তিনি করেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি যে আদর্শ থেকে স্বদেশ-মঙ্গলের কথা বলছিলেন, স্বাদেশিকতার শেষ পর্যায়ে তা ভিন্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল; দ্বিতীয়তঃ এক গভীর আধ্যাত্মিক বোধের জন্য সমস্ত কর্ম-কোলাহলের মধ্যে তিনি বড় পীড়ন অনুভব করছিলেন। সাধকের যে শান্ত সমাধি, ভক্তের যে সঙ্গোপনের পূজা, এইসমস্তই তাঁর বড় প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছিল। এ'কেই লক্ষ্য ক'রে কবি বলেছেন—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি' গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।
অনেক দূর এলেম সাথে-সাথে,
চলেছিলেম সবাই হাতে-হাতে

এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
হিয়া আমার উঠ্‌ল কেমন ক'রে
জানিনে কোন্ ফুলের গন্ধ ঘোরে
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
আর ত চলা হয় না সাথে-সাথে।

ক্ষণিকায় দেখেছি, কবির চিত্তে পরম সুন্দরের প্রতি অনুরাগ জেগে উঠেছে; নৈবেদ্যে দেখেছি, এ প্রত্যয় কবির ভিতরে দৃঢ় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ভক্তভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি খেয়াতে। অনুরাগ আর বিশ্বাসেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন না—প্রতীক্ষা তাঁর ভিতরে নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। সেই প্রতীক্ষার ব্যথায় কবি এক নূতন ভঙ্গিতে কথা বল্‌ছেন।—

আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে চায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশে না তাই চারিদিকের
সহজ সমীরে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কি যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

বেশীর ভাগ কথা কবি রূপক দিয়ে বল্‌ছেন। এর এক কবিতায় বালিকা-বধূর এক সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। কিন্তু সেটি হয়ত শুধু বালিকা-বধূর ছবিই নয়। কবি অনুভব করছেন, সেই বিরাটের পাশে তাঁর নিজের চিত্তও এম্‌নি বালিকা বধূর মতনই দাঁড়িয়ে। তিনি যে কত বড় কি যে তাঁর মহিমা, অবোধ বালিকারই মতন কবি হৃদয় সেই তত্ত্বের রস-বিলাসের সন্ধান পুরোপুরি পায়নি; তবু তাঁর সঙ্গে কবির যে একটি সহজ অথচ নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়েছে একথাটি বাঁশির সুরের অনির্ব্বচনীয়তা নিয়েই বেজে উঠেছে।

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তা'র
খেলিবার ধন শুধু;
ওগো বর ওগো বঁধু।

* * * *

শুধু দুর্দ্দিনে ঝড়ে
—দশ দিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধুলা কোথা প'ড়ে থাকে তা'র
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখ-দিনের ঝড়ে।

যে-প্রতীক্ষা নিয়ে কবি জেগে আছেন, তা'র চমৎকার রূপটি ফু'টে রয়েছে এর জাগরণ কবিতায়;—

কৃষ্ণ পক্ষে আধখানা চাঁদ
উঠ্‌ল অনেক রাতে,
খানিক কালো খানিক আলো
পড়ল আঙিনাতে।
ওরে আমার নয়ন আমার
নয়ন নিদ্রাহারা,
আকাশ-পানে চেয়ে চেয়ে
কত গুন্‌বি তারা?
সাড়া কারো নাইরে সবাই
ঘুমায় অকাতরে;
প্রদীপগুলি নিবে গেল
দুয়ার-দেওয়া ঘরে।
তুই কেন আজ বেড়াস্ ফিরি'
আলোর অন্ধকারে?
তুই কেন আজ দেখিস্ চেয়ে
বনপথের পারে?

বৈষ্ণব কবির রাধার প্রতীক্ষার চাইতে এক হিসাবে, নিবিড়তর এই খেয়ার প্রতীক্ষা। বৈষ্ণব কবির অনুভূতি নিশ্চয়ই অতি গভীর, কিন্তু জীবনের জটিলতা তাঁর সামনে কম। সহজ প্রতীক্ষার ভিতর দিয়েই তিনি সহজ অথচ গভীর মিলনে পৌঁছতে পারছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের (আধুনিকেরও বটে) প্রতীক্ষা বড় আশ্চর্য্য। দেবতার যৌবন নিয়ে একসময়ে যিনি উর্ব্বশীর নৃত্য উপভোগ করেছেন, বিজয়িনীর বিজয় চেয়ে দেখেছেন; গভীর জ্ঞানকে আত্মসাৎ ক'রে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে যিনি ঘোষণা করেছেন—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়," অথবা—

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি',
পৌরুষেরে করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

সেই অসাধারণ বলীয়ান হৃদয় কবি আজ বিরাটের প্রেমের আকর্ষণে নব-অনুরাগিণী কিশোরীর মতন কাঁপছেন! ভাষার যত দীপ্তি, উচ্ছ্বাস, কল্পনার যত উদ্দামতা, সে-সব আজ কোথায়? একেবারে সাদা কথায় হৃদয়টি অনাবৃত করবার জন্য কবি ব্যাকুল!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

পাট-চাষীদের সমবায়

শ্রী চারুচন্দ্র দাস গুপ্ত

একটি প্রণালী-বদ্ধ ব্যবস্থা

বাংলা দেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের মধ্যে পাট বা কোষ্টা অন্যতম। সত্য বটে, এই পাট বিক্রয় করিয়া বহু টাকা এই দেশে আমদানি হয় ও বহু আড়তদার ও দালালের হাত দিয়া অগণিত অর্থের আদান-প্রদান হয়; কিন্তু যে কৃষক গায়ের রক্ত জল করিয়া এই পাট উৎপাদন করে, সে যে-নিরন্ন সেই নিরন্নই থাকিয়া যায়। যাহাতে দরিদ্র কৃষকের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারে, ও যাহাতে তাহারা তাহাদের নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-মূল্য নিজেরা নির্দ্ধারণ করিতে পারে এবং যাহাতে তাহাদিগকে দরের জন্য পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থার একটি আভাস সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এদেশে সাধারণতঃ ধনী মহাজনেরা হয় একা, না হয় কয়েকজন একত্রিত হইয়া এক একটি কোম্পানি গঠন করিয়া পাট ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার খোলে। তাহারা গ্রামে-গ্রামে হাটে বাজারে লোক পাঠাইয়া চাষীদের নিকট হইতে পাট ক্রয় করে, এবং কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বড়-বড় মহাজন বা কারবারীর নিকট উহা বিক্রয় করে। কখনও বা তাহারা কোনো বড় আফিসের দালালরূপে গ্রাম কি হাট হইতে পাট ক্রয় করিয়া সেই আফিসে পাঠায়। এইপ্রকার কয়েক শ্রেণীর লোকই কৃষক ও বড়-বড় কোম্পানীর মধ্যবর্ত্তী লোক বা middlemen. সাধারণতঃ ইহারাই পাটের দর নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা উর্দ্ধতন মহাজনগণের নিকট যে দরে পাট বিক্রয় করিতে পারিবে অথবা ঐ মহাজনগণ তাহাদিগকে যে দরে পাট খরিদ করিতে আদেশ দেয়, সেই সেই দর-অনুসারেই তাহারা বাজারে পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া পাট খরিদ করিয়া থাকে। অতএব দরিদ্র সংস্থানশূন্য নিঃসম্বল কৃষকগণকে বাধ্য হইয়াই সেই মূল্যে পাট ছাড়িয়া দিতে হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার গত্যন্তর নাই। কাজেই পাটের ব্যবসায়ে যে প্রভূত অর্থের আগমন হয়, তাহার অধিক অংশই বিদেশে রপ্তানিকারী বড়-বড় কোম্পানী ও কুঠিয়াল মহাজনগণের ও বঙ্গ-দেশের বহু চট ও থ'লের কলের মালিকগণের হস্তে পতিত হয়। বাকি যাহা থাকে তাহারও সার ভাগ ইহাদেরই কমিশন এজেন্ট্‌গণ এবং মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা ও ছোটো-ছোটো ফড়িয়া বা ব্যাপারীরা ভোগ করে। বস্তুতঃ, যে দরিদ্র কৃষক রৌদ্রে পুড়িয়া জমি চাষ করে ও বীজ বপন করিয়া পাট উৎপাদন করে, আবার দারুণ গ্রীষ্মে পাটবনে বসিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দেয়, এবং বর্ষায় স্থানে-স্থানে অগাধ জলে ডুবিয়া-ডুবিয়া এই পাট কাটিয়া, ভিজাইয়া ও ধুইয়া বহুদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর সামান্য-পরিমাণ পাট হাটে উপস্থিত করে, সে এত কষ্টের পরিবর্ত্তে সামান্য-কিছু প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে ফিরিয়া যায় ও নিজের ভাগ্য-দেবতাকে দোষারোপ করিতে থাকে।

সত্য বটে, পাটের কারবারে এই মধ্যবর্ত্তী জনকতক ক্রেতা-বিক্রেতার অবস্থার উন্নতি হয়। যেখানে একদিন পর্ণকুটীর ছিল সেখানে বড়-বড় টিনের ঘর অথবা বৃহৎ অট্টালিকাসমূহ দেখা যায়; কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে জনকতক লোকের আর্থিক উন্নতিকে সমাজের উন্নতি বলা যায় না। কৃষকরাই বর্ত্তমান সমাজের প্রধান অঙ্গ; তাহারাই উৎপাদনকারী; তাহাদের উন্নতিতেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি। কাজেই কৃষকেরা যে-পর্য্যন্ত এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সম্ভূত তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার হেতু সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতিকল্পে সমবেত চেষ্টা করিতে পারগ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক

অবস্থার উন্নতি হইবার কোনোই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই সমবেত চেষ্টা অর্থাৎ পাঁচ জন মিলিয়া একত্রিত হইয়া কাজ করিবার প্রয়াস, বিশেষ শিক্ষা ও সময়সাপেক্ষ।

এই দেশের কৃষকগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর ও অশিক্ষিত, এইজন্যই তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে নিজেদের স্বার্থ বুঝিয়া উঠে না। ভবিষ্যতে তাহাদের কিসে সমূহ সুবিধা হইবে সেদিকে দৃষ্টি তাহাদের আদৌ নাই। কাজেই যাহাদের অর্থের সদ্ভাব আছে এবং যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাবশতঃ সঙ্গত কর্ম্ম-কৌশল আছে, তাঁহাদের কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃষকদের স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, সময়োচিত উপায় উদ্ভাবন দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতির বিধান করা কর্ত্তব্য। অবশ্য যাহারা বর্ত্তমানে মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিরূপে গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া পাট ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন তাহাদের উচ্ছেদসাধন করা বা তাহাদের কারবারের অনিষ্ট সাধন করা উল্লিখিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বরং যাহাতে তাহারা এই আপাতমধুর পরিণাম-প্রতিকূল ব্যবসার পথ ত্যাগ করিয়া ন্যায্য ও সঙ্গত এবং ক্রমশঃ ধন-বৃদ্ধিকারী ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ অনুসরণ করিতে পারেন সেই পথের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের সর্ব্বসাধারণের দরিদ্রতা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ইহার ফলে জনসমাজের বিলোপ হইবারই কথা। এই কৃষকদিগকে বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে সঙ্গে-সঙ্গে যাঁহারা ধনী ও শিক্ষিত বলিয়া খ্যাত,তাঁহাদেরও বিলোপ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা কৃষকদের একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল। তাই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উদ্ভাবিত ও সঙ্গত ব্যবস্থা দ্বারা এবং ধনীগণ তাহাদের ধনদ্বারা এই ব্যবস্থা কার্য্যকারী করিয়া এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত জন-মণ্ডলীকে ধ্বংস-মুখ হইতে এখনও রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা।

নিম্নে একটি প্রণালীবদ্ধ ব্যবস্থা দেওয়া গেল। ইহা ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য নহে, তবে এই প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিলে, ও উপযুক্ত সময়ে উপস্থিতমত ভ্রমাদির সংশোধন হইলে, কৃষকগণও সমবেত চেষ্টায় কি ফল হয়, তাহার একটা আভাস পাইবে ও তাহাদের স্ব-স্ব অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাতের ক্ষমতা হইবে। আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরতার ভাব স্বতঃই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং এত কষ্টে উৎপন্ন যাবতীয় শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার দাবি বহাল রাখিতে তাহাদের কোনো প্রকার প্রয়াস পাইতে হইবে না। সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশীয় ও স্বদেশীয় বড়-বড় মহাজন ও কুঠিয়ালগণও তাহাদের অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লাভের পরিমাণ কমাইয়া লইতে বাধ্য হইবে।

পাটচাষীদের সমবায় যৌথ কারবার

কৃষক চাষী বা অংশীদার—অন্যূন দুই শত কৃষক অংশীদার (মেম্বর) লইয়া এই কারবার আরম্ভ করা যাইতে পারে। ইহারা মোট অংশের শতকরা ৯৫টির মালিক হইবে। (কৃষকের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভালো, কিন্তু বহু অংশীদার লইয়া কাজ করিবার পূর্ব্বে অল্পসংখ্যক মেম্বর লইয়া আরম্ভ করাই সঙ্গত।)

সাহায্যকারী (বা বিশিষ্ট) অংশীদার—যাহারা খুব নিম্ন হারের সুদে এই সমবায়কে ঋণ প্রদান করিবেন ও যাহারা উপদেষ্টারূপে সমবায়ের কার্য্যাদি-সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহারা বাকী শতকরা ৫টি অংশ পাইবেন।

প্রবেশিকা ৷৹।—প্রতি অংশের জন্য ৷৹ (আট আনা) প্রবেশিকা আদায় হইবে; অথবা প্রত্যেক মেম্বর ভর্ত্তি হইবার সময় ১৲ এক টাকা প্রবেশিকা দিবে। (অবশ্য সমবায় যাহা ভালো বোধ করিবে, তাহাই নির্দ্ধারিত হইবে।)

অংশের মূল্য ১০৲ দশ টাকা—প্রতি-অংশের মূল্য অন্যূন ১০৲ দশ টাকা হওয়া উচিত। প্রত্যেক সভ্যকে অন্যূন একটি অংশ সমবায়ে রাখিতে হইবে। অংশ প্রাপ্তির দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে প্রত্যেক অংশের জন্য কৃষকগণ মাত্র ৷৹ আনা জমা দিবে। যে-পর্য্যন্ত তাহাদের অংশগুলির মোট মূল্য আদায় না হয়, পাটের মূল্য বাবদ তাহাদের প্রাপ্য টাকা হইতে প্রতি দশ টাকায় ১৲ এক টাকা হিসাবে কাটিয়া রাখা হইবে। সম্পূর্ণ টাকা

আদায় হইলে পর আবশ্যক হইলে অংশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কারবারের প্রসারণ করা যাইতে পারিবে। এই বৃদ্ধি হারও উক্তরূপে ক্রমশঃ আদায় হইবে। এইপ্রকারে কয়েক বৎসরে অনায়াসে সমবায়ের আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইতে পারিবে, অথচ অংশীদারগণকে এক কালে নিজ দুই অংশের সমস্ত মূল্য দিতে হইবে না। কারবার ভালোরূপে চলিলে অংশগুলির আংশিক লব্ধ মূল্যই মোট মূলধন-রূপে পরিণত হইতে পারিবে।

সহযোগী বা সাহায্যকারী সভ্য—এই সমবায়-প্রচলন-সময়ে অর্থসাহায্য প্রয়োজন হইবে, এবং ধনী মহাজনগণ হইতে উহা গ্রহণ করা হইবে। এই ঋণদাতৃগণ এক কালে সমস্ত অংশের মূল্য প্রদান করিবে। এই অংশ-গুলির হিসাবে তাহারা লাভের অংশ প্রাপ্ত হইবে এবং যে টাকাটা তাহারা ঋণ দিবে, তাহার সুদ প্রাপ্ত হইবে। উপদেশকগণও অংশ ক্রয় দ্বারা মেম্বর হইবে, তবে তাহারা তাহাদের অংশের সম্পূর্ণ মূল্য ৪ বৎসরে আদায় করিবে। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সাহায্যকারীই সহযোগী সভ্য।

সভ্যের সংখ্যা—সমবায়ের কর্ম্মনির্ব্বাহক সমিতি, প্রতি সভ্য কয়টা করিয়া অংশ লইতে পারিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবে, কিন্তু সাধারণ সমিতি সমবায়ের মোট মেম্বরের সভ্যের ও অংশের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিবে।

সাধারণ সমিতি—প্রত্যেক অংশীদার এই সমবায়ের সাধারণ সমিতির সভ্য হইবে। প্রতিসভ্যের এই সমিতিতে একটি করিয়া ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। দরকার হইলে অনুপস্থিত সভ্যের ভোট দিবার ক্ষমতা অন্য কোনো সভ্যের হাতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি—সাধারণ সমিতির সভ্যগণ দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মনোনীত হইবে। ৯ জন সভ্যদ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে। ইহা ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিবে। এই সমিতি ইহাদের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সাধারণ সমিতির নিকট দায়ী থাকিবে। সাধারণ সমিতি ইচ্ছা করিলে যে-কোনো সময়ে এই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পুনর্গঠন করিতে পারিবেন। এই সমিতির সম্পাদক সাধারণ সমিতিতে নির্ব্বাচিত হইবে। ছয় জন মেম্বর কৃষক সভ্য দ্বারা, এক জন বিশিষ্ট সভ্য দ্বারা ও এক জন গ্রাম্য বোর্ড কি কো-অপারেটিভ সোসাইটি দ্বারা মনোনীত হইবে। আবশ্যক হইলে বোর্ড ও সোসাইটির লোকের পরিবর্ত্তে বিশিষ্ট সভ্যগণ আরও একজন সভ্য মনোনীত করিবেন। সমবায়ের প্রথম অবস্থায় কো-অপারেটিভ সোসাইটির নিকট হইতে কতক টাকা ঋণ লওয়া যাইতে পারে এবং সেইজন্যই উক্ত সোসাইটির মনোনীত একজন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে সভ্য হইবে। যতদিন সমবায় সোসাইটির নিকট ঋণী থাকিবে অন্ততঃ তত দিন এই সোসাইটির তলব-মত ইহার হিসাব-পরীক্ষকগণকে যে-কোনো সময়ে সমস্ত হিসাব-পত্র দেখাইতে হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সাধারণ কার্য্য

১। প্রত্যেক বৎসরেই এই সমিতি পাট বিক্রয়ের সময় অর্থাৎ মর্সুম নির্দ্ধারণ করিবে। এবং কার্য্য পরিচালন করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবে। (অবশ্য কর্ম্মচারীগণের মাহিয়ানা সাধারণ সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে।)

২। প্রতিবৎসর যে তারিখে পাট বিক্রয় আরম্ভ ও বন্ধ হইবে উহা অন্ততঃ দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে ও সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপিত করিবে।

৩। এই সমিতি সমবায়ের অংশীদার মাত্রেরই উৎপন্ন যাবতীয় পাট ক্রয় করিবে এবং ঐ পাট যাচনদারগণ দ্বারা যাচন করাইয়া গুণানুসারে শ্রেণীভুক্ত করিবে। যাচনকারীর কার্য্য-সম্বন্ধে তৎকালে কাহারও কোনো আপত্তি হইতে পারিবে না। যদি দরকার হয় ইহার কার্য্যের বিরুদ্ধে এক সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট আপিল চলিবে।

৪। অংশীদারগণের পাট অত্যন্ত নিকৃষ্ট হইলে এই সমিতি উহা গ্রহণ নাও করিতে পারিবে।

৫। এই সভা পাটের দর নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। (অবশ্য চতুর্দ্দিকস্থ বাজার দর দেখিয়া দর সাব্যস্ত হইবে)।

৬। এই সমিতি বৎসরান্তে ব্যবসায়ের লাভালাভ নির্দ্ধারণ করিয়া প্রতি অংশের লভ্যাংশ ধার্য্য করিবে। এই

কার্য্য করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—

(ক) সমবায়ের ব্যবসায় চালাইবার সমস্ত খরচ।
(খ) গুদাম ভাড়া।
(গ) ঋণের সুদ।
(ঘ) ঋণশোধের জন্ত টাকা জমা।
(ঙ) সম্পত্তির ব্যবহার-জনিত ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ।
(চ) ভবিষ্যতে কোনো অভাবনীয় ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ত টাকা জমা।
(ছ) কার্য্যপরিচালনা-সংক্রান্ত অন্যান্ত খরচ।

সমবায়ের দায়—কোনো অংশীদার উপযুক্ত সময়ে পাট বিক্রয়ের জন্ত উপস্থিত করিলে, সমবায় কোনো কারণে পাট গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলে, (অবশ্য পাট ক্রয়ের উপযুক্ত হওয়া চাই) প্রতিসভ্যকে প্রত্যেকবার পাট গ্রহণ না করিবার জন্ত ৫ টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। (এই পাটের পরিমাণ সমিতি নির্দ্ধারণ করিবে)।

অংশীদারগণের দায়—সমবায়ের মর্সুম আরম্ভ হইবার পর কোনো অংশীদার তাহার উৎপন্ন সমুদায় পাট এই সমবায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবে; অন্ত কোনো স্থানে বিক্রয় করিতে পারিবে না। অন্ত কোনো স্থানে বিক্রয় করিতে হইলে বিক্রয়ের পূর্ব্বেই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্পাদকের লিখিত অনুমতি লইতে হইবে। পাট সমবায়ের পছন্দানুযায়ী না হইলে সম্পাদক তৎক্ষণাৎ তাহা অন্যত্র বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিবেন। কোনো-প্রকার অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র পাট বিক্রয় করিলে অংশীদারকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দণ্ড দিতে হইবে; এই ক্ষতিপূরণ ৫৲ পাঁচ টাকার কম হইবে না এবং ২০৲ বিশ টাকার অধিক হইবে না। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ভবিষ্যতে এই অংশীদারের নিকট কোনো পাট ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে না এবং দরকার হইলে সমবায়ের তালিকা হইতে তাহার নাম কর্ত্তন করিয়া দিতে পারিবে। এমনকি তাহার প্রদত্ত অংশের মূল্য ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

পাটের মর্সুম শেষ হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি যাবতীয় ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিবে। অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ক্রয়-সম্বন্ধে সকলকে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। মর্সুম শেষ বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার হইলে শেষ তারিখের পর কার্য্যকরী সমিতির সভ্যদের বৈধ কি অবৈধ কোনো কার্য্যের জন্ত সমবায় দায়ী নহে।

পাটক্রয়—কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশ-অনুসারে পাটক্রয় আরম্ভ হইলে কৃষকগণ বিক্রয়ার্থ পাট উপস্থিত করিবে। উহা যাচনদার দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষিত হইলে গুণানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সমবায়ে মার্কা দিবার স্থানে নীত হইবে। যাচনদার পাটের শ্রেণী ও পরিমাণ উল্লেখ করিয়া পাট বিক্রেতাকে একখানা রোকা-পত্র প্রদান করিবে। এই রোকা সম্পাদক কিম্বা অন্ত-কোনো ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত করিলে তিনি উহাতে পাটের দর উল্লেখে মোট পাওনা লিখিয়া দিবেন। এই রোকা দৃষ্টিমাত্র আদায়িত মোট মূল্যে একচতুর্থ অংশ বিক্রেতাকে দিবেন ও আদায়ী টাকার পরিমাণ উহাতে লিখিয়া দিবেন। বাকী অর্থ অংশ সম্ভব হইলে ১ মাসের মধ্যে তিন কিস্তিতে তিনবারে ১৷৪ হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে। ঐ প্রদানের তারিখগুলিও রোকায় লিখিয়া দেওয়া হইবে। আফিসের খাতায় এই রোকার নকল থাকিবে যেন টাকা আদায়ের তারিখের পূর্ব্বে সুবিধা-মতো সমস্ত হিসাব-পত্র ঠিক করিয়া রাখা যাইতে পারে। যতদিন সমবায়ের অবস্থা বেশ সচ্ছল না হয়, ততদিন উপরিলিখিত ব্যবস্থা-অনুসারে কার্য্য চলিবে। কিন্তু অবস্থা সচ্ছল হইলেই সর্ব্বপ্রথমে পাটক্রয়ের মোট দেয় মূল্যের অর্দ্ধেক প্রথম দিবসে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক অংশীদার তাহার প্রাপ্য পাটের মূল্য আদায়ের শেষ তারিখে, (অথবা ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বেই) তাহার মোট অংশের দেয় টাকার পরিমাণে প্রতি ১০৲ টাকায় ১৲টাকা হিসাবে কাটিয়া তাহার মোট অংশ মূল্য-বাবদ জমা দিবে, ইচ্ছা করিলে জমা টাকার হার বাড়াইয়া অল্প দিনের মধ্যেই দেয় টাকা আদায় করিতে পারিবে।

পাটবিক্রয়—যেপর্য্যন্ত সমবায় ক্রয়-করা পাট বিদেশে স্বনির্দ্ধারিত মূল্যে রপ্তানি করিতে না পারিবে বা কোনো-প্রকার লাভজনক ব্যবসায় যোগ্য পণ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিবে, তত দিন কলিকাতায় অথবা অন্ত কোনো স্থানের বড়-বড় কুঠিয়াল মহাজন ও বিদেশীয়

কুঠিয়ালগণের এজেন্ট্‌গণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া উহা বিক্রয় করিতে হইবে।

পাট ক্রয় করিবার পর উহাতে যাচন হিসাবে সমবায়ের নাম গুণানুসারে নম্বর ও ছাপা দেওয়া হইবে। কোনো-প্রকার কৃত্রিমতা থাকিতে পারিবে না। ন্যায্য যাচন দ্বারা পাটের শ্রেণী বিভাগ হইয়া গাঁইট বান্ধা হইলে দেশীয় কি বিদেশীয় কুঠিয়ালগণ উহা আগ্রহের সহিত সমুচিত মূল্যে ক্রয় করিবে, এ-সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নাই। এইসব ধনী মহাজন পাট চালানী রসিদ দেখিলেই পাটের মূল্য প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং এই মূল্যের টাকা দ্বারাই কৃষকদের প্রাপ্য ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির পাটের মূল্য আদায় হইবে।

সমবায়ের লাভালাভ—প্রবেশিকা ও প্রথম আদায়ী অংশের মূল্যপ্রাপ্তির পর এই সমবায়ের দ্বারা গড়ে কত টাকার পাট ক্রয় হইবার কথা তাহার মোটামুটি একটা হিসাব করিতে হইবে। এই মোট টাকাটার ১।৩ অংশের পরিমাণ টাকা হাতে লইয়া এই কারবার আরম্ভ করা যাইতে পারে। অবশ্য ব্যবসা আরম্ভ করিলে পাট খরিদের মূল্য ভিন্ন আরও বহুবিধ অন্যান্য খরচ উপস্থিত হইবে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আদায়ী টাকা বাদে অবশিষ্ট টাকা প্রথম দুই এক বৎসরের জন্য সাহায্যকারী সভ্যগণের অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের বা কোঅপারেটিভ সোসাইটির নিকট হইতে ঋণ লইতে হইবে। পাটের মর্সুমের ৫ কি ৬ মাসের জন্য ঐ ঋণ লওয়া হইবে যেন মর্সুম শেষ হইলেই উহা আদায় হইয়া যায়। মর্সুম-শেষে হিসাব-সময়ে প্রথমবারের আদায়ী টাকা অংশীদারগণের অংশের আদায়ী মূল্য এবং লাভের অংশ যোগ হইবে। অতএব দ্বিতীয়বারের মর্সুমে প্রথমে অপেক্ষাকৃত অল্প ঋণ গ্রহণ করিলেই চলিবে। এইপ্রকার তিনচারি বৎসর মধ্যেই মোট কার্য্যকারী অর্থ জমা হইবে এবং সমবায় বিনা-সাহায্যে কার্য্য চালাইতে পারগ হইবে। কৃষকগণ ও অন্যান্য অংশীদারগণকে যথেষ্ট লভ্যাংশ দিবার সুবিধা হইবে।

হিসাবনিকাশ—পাটের মর্সুম শেষ হইবার তারিখের এক কি দুই মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সমস্ত হিসাবপত্র সাধারণ সমিতির নির্ব্বাচিত হিসাব-পরীক্ষকগণের পরিদর্শনের জন্য উপস্থিত করিবে। এই উপস্থিত করিবার তারিখের দুই সপ্তাহের মধ্যেই পরীক্ষকগণের (অন্ততঃ ২ জনের) মতামত সহ উহা সাধারণ সমিতির সমক্ষে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে। সাধারণ সমিতি লাভালাভ নির্দ্ধারণ করিয়া অংশীদারগণকে বিজ্ঞাপিত করিবে। সমস্ত হিসাব-পত্রের নকল অংশীদারগণ ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিবেন। অবস্থা সচ্ছল হইলে সকল সভ্যই নিকাশী ফর্দ্দের ছাপা নকল পাইবে। এই সমবায়ের যাবতীয় নিয়মাবলী এই সাধারণ সমিতি দ্বারা অনুমোদিত হইবে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সাধারণ সমিতির অনুমোদিত নিয়ম দ্বারা চালিত হইবে।

উপরোক্ত প্রণালীতে কার্য্য চালাইলে এই সমবায় ৪।৫ বৎসরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অংশীদারগণের বিশেষ লাভের বিষয় হইবে। সাধুতার সহিত পাটের যাচন হইলে সমবায়ের পাট বাজার দর হইতে বেশী দরে বিক্রয় হইবে। অল্পকাল মধ্যেই এই সমবায় বড় বড় কুঠিয়াল মহাজনদের বিশেষ বিশ্বাসভাজন হইবে ও দরকার হইলে সময়-সময় তাহারা ইহাকে টাকা অগ্রিম দিতেও আপত্তি করিবে না।

কোনো-কোনো গ্রাম্য বোর্ড এই সমবায় পরিচালনা করিতে বিশেষভাবে উপযুক্ত। ইহারা এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া কৃষকগণের ও সমাজস্থ সকলের অবস্থার বেশ উন্নতিসাধন করিতে পারেন। যাঁহারা ধনী তাঁহাদের ধন দ্বারা পরোক্ষভাবে সকল শ্রেণীর লোকের লাভ হইবে, পরন্তু তাঁহাদের নিজের লাভের কোনোই বাধা হইবে না।

এই প্রণালীর ব্যবসায় অন্যান্য রবি-শস্যের সম্বন্ধেও খাটে; তবে পাটের মর্সুম বৎসরে মাত্র ৬ কি ৭ মাস, কিন্তু অন্যান্য শস্যের কারবার সমস্ত বৎসর ধরিয়া চলে, এই-জন্য এইসমস্ত কারবারে বহু প্রয়াস ও অর্থের দরকার।

এই সমবায় যে ভবিষ্যতে নানাবিধ ব্যবসায়ের মূল হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাট দ্বারা প্রস্তুত নানাবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য যাহা বিদেশ



ওমর খৈয়াম

শিল্পী—শ্রী জ্ঞানদাকান্ত দাসগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

হইতে আমদানি হইয়া অথবা এই দেশে বিদেশীয়গণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিদেশীয়দিগকে বহু অর্থশালী করিয়া দেয় তাহার প্রত্যেক পণ্যই দেশীয় লোক দ্বারা দেশীয় অর্থ-সাহায্যে এই দেশে প্রস্তুত হইয়া দেশের আর্থিক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে।

এই সমবায়ের কার্য্যাদি পরিচালনার জন্য যে সমস্ত কর্ম্মচারী ইত্যাদির আবশ্যক হইবে, তাহাদের সমবায়ের সভ্যগণ হইতে নিযুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

অতি অল্প মূল্যের কল ও অল্প মূলধন হইলেই সমবায় নিম্নলিখিত পণ্যগুলি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিবে।

১। সরু সুতলী, মোটা সুতলী, দড়ি এবং কাছি।
২। চট, থলে ইত্যাদি।
৩। মিহি চট, কেম্বিস ইত্যাদি।
৪। গালিচা ইত্যাদি।

কৃষক

শ্রী অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

১

কবি লিখে পুঁথি ল'য়ে ছন্দে বন্ধে গাঁথি'
চিত্রকর রঙে তুলিকায় ;
শিল্পী আসে সাথে ল'য়ে রত্ন-আভরণ,
মনোভাব যতনে সাজায়।
তা'রা গুণী লভে কীর্ত্তি, বিজয়ের মালা
দেশে-দেশে রাজার সভায় ;
ইতিহাস তাহাদের লি'খে রাখে নাম
পুঁথি খুলি 'পাতায়-পাতায়।
কিন্তু হে আদিম কবি, ধরাতলে জোড়া
তব কাব্য মহা শিল্পকলা
কারও চোখে এতদিন পড়েনিকো ধরা—
রূপে কেহ হইনি উতলা।
রুক্ষ হাতে ধরাবক্ষে যুগ যুগ ধরি'
হলমুখে যা লিখিলে কবি,
প্রভাত-সূর্য্যের রঙে চন্দ্র-কৌমুদীতে
আঁকিলে যে বিচিত্রিত ছবি ;
দিগন্তে প্রান্তর জুড়ি' শূন্য বালুচরে,
তাপদীর্ণ দগ্ধ মরুবুকে
যে হাসি আঁকিয়া দিলে, যে-দীপ্তি ফুটালে
শ্যাম পীত পত্রলেখা-মুখে,
পথে লোক চেয়ে যায়, কেউ বলে "দেখ",
কোনো কথা বলে নাকো কেউ ;
কারো চোখে ঠেকে নাকো, কারো মনে লাগে
সৌন্দর্য্যের আঘাতের ঢেউ।
নীরবে উথলে সৃষ্টি রূপের সাগরে
স্রষ্টা শুধু আপনি গোপন ;
সেই ত চরম কথা, হে কলাকুশলী !
তাই বুঝি নাহিক দর্শন ?
মানবের ইতিহাসে তাই নাহি নাম,
সেথা তুমি অখ্যাত মায়াবী ;
তোমার গীতির ছন্দে রোমাঞ্চিত ধরা,
মানবের নাহি শুধু দাবি।
ওগো ও মাটির বন্ধু, নিভৃতবিলাসী,
রহস্যের নব মন্ত্রে তব
মুঞ্জরিছে পত্রশ্যাম বসন্ত বৈভব
তরুণিত চির-অভিনব।
বরষসঞ্চিত তা'র বক্ষের বেদনা
ফুল হ'য়ে ফুটিবারে চায় ;

মূক মেদিনীর ব্যথা খুঁজে ফি'রে পথ,
এস বন্ধু ভাষা দাও তায়।
বীজের গোপন বক্ষে শিহরে উল্লাস
তরু হ'য়ে উঠিতে আকাশে;
কোরকের বদ্ধ হিয়া পেতে চায় ছাড়া
দিশাহারা অশান্ত বাতাসে;
নবীন আষাঢ় এল উড়ায়ে নিশান
তৃণদল আনন্দে বিহ্বল;
এস কবি পূর্ণ করো তাদের কামনা
—স্বপ্ন হোক সার্থক সফল!

প্রথম কর্ষণস্নিগ্ধ বরষের প্রান্তে
মৃত্তিকার সুরভি নিশ্বাস;
প্রথম উষার আলো আকাশের চোখে,
প্রথম পাখীর কলধ্বনি;
নিশান্তের সুপ্তিহারা তটিনীর বুকে
নূপুরের প্রথম নিক্কণি।
জ্বালাইয়া গন্ধদীপ, সাজি ভরি' ফুলে
তাই তব আরাত্রিক গান
রচিছে নিখিল ধরা—নিত্য অহর্নিশ
নান্দীপাঠে তোমার আহ্বান।

মহদানবের শিল্প মিশেছে হাওয়ায়
—কথাসার মহাভারতের;
অযোধ্যা, দ্বারকা, কাঞ্চী, পাটলী, বৈশালী
—ইতিহাস শুধু অতীতের।
তুমি হে অমর শিল্পী, চির যাদুকর,
স্পর্শে তব বিলোল যৌবন;
হয়ত বুঝো না নিজে আপনার কথা,
সৃষ্টির সঙ্গীতে নিমগন।
অরণ্য কাটিয়া নিতি করিছ রচনা
কমলার লীলা-পদ্মাসন;
বিজন শ্বাপদভূমে তুলিছ গড়িয়া
মুখরিত মানব-ভবন।
নগ্না ধরণীর বুকে দিয়াছ বিছায়ে
চীনাংশুক হরিৎ হিরণ;
কবরী সাজালে তা'র ফুটায়ে গোলাপ,
মল্লিকা, মালতী অগণন।
মাতৃত্বের তৃপ্তি আনি' রিক্ততা ঘুচায়ে
গাছে-গাছে ভরি' দিলে ফল;
ভরিয়া মেঘের কুম্ভ সহস্র ধারায়,
বিসর্জ্জিলে অভিষেক-জল।
তোমারে চিনেছে তাই, হে চির-নবীন!
বসন্তের প্রথম বাতাস;

আকাশে আগুন তুলি' নিশান উড়ায়ে,
ডঙ্কারবে আসোনি সম্ভাষি',
নহ তুমি জয়শীল রাজা বাদশাহ
মারী-সম নিষ্ঠুর-বিলাসী।
যুগে-যুগে ঝঞ্ঝাবাত প্লাবনদহন
শির পাতি' করেছ গ্রহণ;
অক্রোধে জিনেছ ক্রোধ, শান্তিতে বিগ্রহ,
—ক্ষমা দিয়া হিংসার বারণ।
তৃণসম নতমাথা করুণ কোমল
তরুসম সহিষ্ণু নির্ব্বেদ;
মুখ ফুটে বলোনিকো, হে মৌনী সাধক,
জীবনের কিবা হর্ষ-খেদ।
কোথা সেই হত্যাপ্রিয় আততায়ী দল
দিগ্বিজয়ী যাহাদের নাম;
কোথা সেই রণোল্লাস, কোন্ ধূলিতলে
ধূলি হ'য়ে লভিছে বিশ্রাম!
ম'রে গেছে রাজা ও নকীব—রক্ত-লেখা
সে-কাহিনী বিস্মৃত সুদূর,
তৈমুরের অস্থি ল'য়ে নগর-তোরণে
খেলা করে পথের কুকুর।
আপনার আশীবিষে দহন-জর্জ্জর
আপনি মরেছে তা'রা সব,

আজও তুমি বেঁচে আছ হে চির-নবীন,
হে কিশোর, তরুণ পেলব!
এখনও তোমারে ঘেরি', তুলিছে উল্লাসে
ষড়্‌ঋতু রূপতরঙ্গিমা;
আশ্বিনের শস্যক্ষেত্রে শিহরিয়া চলে
শ্যামায়িত সহজ ভঙ্গিমা!
এখনও তোমার বাঁশী বেজে উঠে দূরে
প্রভাতের ভাঙাইয়া ঘুম;
এখনও তোমার গানে পূরবীর সুর
সন্ধ্যার ললাটে আঁকে চুম।

৪

আকাশ ধূসর করি' ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায়
আজিকেও এসেছে আবার,
অতীতের অতিকায় বারণের সম
সুবিরাট্ বীভৎস-আকার।
মুখ তার রক্তমাখা, লোহাগড়া দাঁত,
মুহুর্মুহু অনল উদ্‌গার;
ধরণীর ফুলশোভা শ্যাম দেহবাস
নিশ্বাসেতে জ্ব'লে হয় ক্ষার।
দম্ভ তার প্রাণহীন দেহের আহার
বৃত্তি শুধু দুর্ব্বলপীড়ন;
একেশ্বর ধনিকের ফুলাইয়া পেট
লক্ষ জনে দেয় অনশন।
জন্মে যা'র বিশ্বগ্রাসী মারুতির ক্ষুধা
ভাগ্যে তা'র অশনি-সম্পাত;
কক্ষচ্যুত জ্বালাময় ক্ষিপ্ত গ্রহসম
অর্দ্ধপথে হবে বাজী মাৎ...।
তখনও মাঠের পথে দোদুল হাওয়ায়
এম্‌নি ফুটিবে মেঠো ফুল;
তখনও দোয়েল বসি' বেড়াটির গায়—
পিক্-পিক্ গাহিবে ব্যাকুল।
রাত্রির উৎসব-শেষে তখনও শেফালি
ছেয়ে রবে দিনের অঙ্গনে;
তখনও ছুটিবে নদী নটিনী-লীলায়
কলভঙ্গে নূপুর-নিক্কণে।
তখনও রহিবে তুমি, ধরণীর প্রিয়,
হে তরুণ, হে অমর কবি!
তখনও ধরার বক্ষে মোহন তুলিতে
ফুটাইবে স্নিগ্ধশ্যাম ছবি।

পরলোকগত রায়-সাহেব ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ সরকার, ডি-এস্‌সি ; আই-ই-এস্

শ্রী রমাদাস হালদার

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য রসায়নাধ্যাপক রায়-সাহেব ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ সরকার, ডি এস্‌সি; আই-ই এস্ পুরীধামে ৮ই জুলাই দেহত্যাগ করেছেন।

বয়স তাঁর এমন কিছু বেশী হয়নি—এই সবে তিনি বিয়াল্লিশ পার হ'য়ে তেতাল্লিশে পা দিয়েছিলেন। সারা বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর, গরমের অবকাশে পুরী গিয়েছিলেন একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে; কে জানত ভগবান্ তাঁর জন্যে সেই সাগরতীরে চির-বিশ্রাম-স্থান তৈরী ক'রে রেখেছিলেন।

সব সময়েই দেখা যায়, মানুষের যখন বেশী দরকার তখনই ঠিক তা'র অভাব পড়ে। ডাক্তার সরকারেরও আমাদের মধ্যে যখন বেশী দরকার তখনই তাঁকে অকালে

বিদায় নিতে হ'ল। সবে সেদিনের কথা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, একটা মস্তবড় পরিবর্ত্তনের ভিতর থেকে পুরোনো খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে—সে এখনও তরুণ, ভালো ক'রে দাঁড়াতে শেখেনি। যাঁরা শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে তা'কে চালিয়ে নিয়ে চলেছিলেন, ডাক্তার সরকার ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন।

ডাক্তার সরকার আমাদের কর্ণধার ছিলেন রসায়ন-বিভাগে। তাঁর অভাবে আজ বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সব ছাত্রই হাহাকার করছে। বাঙ্গালী ছাত্রদের তিনি



ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ সরকার

সর্ব্বদাই চোখে-চোখে রাখ্‌তেন। তাদের কোনো কাজই তাঁর দৃষ্টির বাইরে যেতে পেত না এবং প্রায়ই তাঁর ঘরে একজনকে না একজনকে ঢুকতে হ'ত তাঁর তলব পেয়ে স্নেহের মৃদু ভৎর্সনা শুনতে।

তাদের সাহায্য করতে তিনি ছিলেন উদার; তাদের জন্য লড়তে তাঁকে কখনও পিছপাও হ'তে দেখিনি। ক্লাসে তাদের যথেষ্ট ভয় দেখালেও বিপদের সময় তিনি তাদের কখনও ত্যাগ করেননি।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অ্যাম্বুলেন্স্ কোর (ambulance corps) ছিল; প্রথম থেকে তাঁকে তা'র সভাপতি ক'রে এবং ক্রমশঃ তাঁকে সেক্রেটারী কায়েম ক'রে তার যা-কিছু ভার তাঁরই ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর্থিক ক্ষতি অনেক ক্ষেত্রে সহ্য ক'রেও বিশ্বস্তভাবে তিনি এ-ভার শেষ অবধি ব'য়ে গেছেন এবং তাঁর চালনায় আমাদের ক্ষুদ্র 'কোর' অনেক উন্নতির ভিতর দিয়ে বেড়ে উঠেছে; শুধু তাঁর জন্যেই এমন-কি আমরা দু' বছর বাইরে গিয়ে অল্-ইণ্ডিয়া অ্যাম্বুলেন্স্ কম্পিটিশনে প্রতিযোগিতা ক'রে এসেছি।

কয়েক বছরের কথা। কলেজের বাঙালী ছাত্রেরা একটা বাংলা অভিনয় করবার সংকল্প করে। তাদের এ সংকল্পে সবাই সহানুভূতি ও সাহায্য করা দূরে থাক্, অনেকভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করে। ডাক্তার সরকার শুধু আমাদের কর্ণধার হ'য়ে নিজের বাড়ীতে আমাদের মহলার জায়গা পর্য্যন্ত দিয়ে সুশৃঙ্খলে আমাদের এসংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করবার অবসর দেন। শুধু তাঁর জন্যেই আমরা পরের বছরেও অন্য অভিনয়ে কৃতকার্য্য হই।

ছাত্রদের সঙ্গে মিলতে, তাদের মতে মত দিতে তিনি ছিলেন একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। "এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী সম্মিলনী" নাম দিয়ে আমরা বাঙালী শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলবার একটা ক্ষেত্র গ'ড়ে তুলেছিলাম। ডাক্তার সরকার মশাই আমাদের বেশ একজন নিয়মিত সভ্য ছিলেন। সম্মিলনীর কোনো কাজে তাঁকে বড়-একটা অনুপস্থিত দেখিনি।

ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল ভারি মধুর। তিনি একাধারে তাদের শিক্ষক, বন্ধু, অভিভাবক ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর বাড়ীর দরজা সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল আমাদের জন্য—আমাদের আব্দার-অত্যাচার তাঁকে সময়ে-অসময়ে সব সময়েই সহ্য করতে হয়েছে। অনেক সময়ে বেশ মনে আছে, ধমক দিতে গিয়ে তাঁকে হেসে ফেলতে দেখেছি।

বুদ্ধ ও সোক্রাটেস্

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা মানুষকে কতদূর বিপথগামী করিতে পারে, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত বুদ্ধ ও সোক্রাটেসের 'খৃষ্টান-সমালোচনা'। খৃষ্টানগণ যীশুর সহিত বুদ্ধের ও সোক্রাটেসের তুলনা করিতে যাইয়া এই দুই মহাপুরুষকে হীন হইতে হীনতর করিয়াছেন। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে Estlin Carpenter প্রণীত Buddhism and Christianity নামক গ্রন্থে। অন্য কোন খৃষ্টানের গ্রন্থে এই দুই জনের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই।

হিন্দুগণ উদার কিন্তু উদাসীন। শাস্ত্রে যাহা আছে, হিন্দু সাধকগণ যে-আদর্শ দেখাইয়াছেন এবং দেখাইতেছেন, তাহাই যথেষ্ট; আদর্শ জীবন এবং সত্যের জন্য অন্যত্র যাইবার আবশ্যক নাই, এই বিশ্বাসের জন্য উদার আদর্শ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুগণ কার্য্যতঃ অনুদার হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদিগের গ্রন্থকার সাম্প্রদায়িকতা অতিক্রম করিয়া অতি উদারভাবে বুদ্ধ ও সোক্রাটেসের জীবন-চরিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যে ইঁহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন—এ উদ্যম সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি এবং পাঠকগণও হইবেন।

আমরা প্রথমে তুলনায় সমালোচনা করিয়া এই দুই মহাত্মার বিশেষত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শত্রুর প্রতি ব্যবহার

সোক্রাটেস্ বলিতেন, শত্রুর প্রতিও প্রীতি-ব্যবহার করিতে হইবে। এবিষয়ে আমরা প্লেটোর গ্রন্থ হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করিব।

(ক)

প্রথম অংশ 'সাধারণ তন্ত্র' (Republic) নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল।

প্রশ্ন উঠিয়াছিল 'ন্যায়' কি? 'সিমোনিডেস' নামক কবির ভাষায় একজন উত্তর দিল যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেওয়াই ন্যায়। ইহার পরে সিদ্ধান্ত হইল মিত্রের প্রাপ্য উপকার এবং অমিত্রের প্রাপ্য অপকার। সোক্রাটেস্ আলোচনা করিয়া দেখাইলেন যে, যাহার অপকার করা হয় তাহার সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। মানুষের যাহা বিশেষত্ব সে তাহাই হারায়। তাহাতে সেই ব্যক্তি অন্যায় পথে চালিত হয়। সুতরাং ন্যায়ের পরিণাম হইল অন্যায়। ইহা কি প্রকারে সম্ভব? সুতরাং অপকার করা কখন ন্যায় হইতে পারে না। শত্রুই হউক, বা মিত্রই হউক, কাহারও অপকার করা ন্যায়সঙ্গত নহে (৩৩১-৩৩৫)।

(খ)

গর্গিয়াস নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, সোক্রাটেস্ নানা ভাষায় বারংবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অপকার পাওয়া অপেক্ষা অপকার করা অধিকতর অকল্যাণ। অন্যায় ব্যবহার পাওয়া অবশ্যই অমঙ্গল এবং অন্যায় ব্যবহার করাও অমঙ্গল। এই দুয়ের মধ্যে অধিকতর অমঙ্গল অন্যায় ব্যবহার করা (৫০৮, বি; ৫০৯, বি, সি; ৫২৭ বি)।

গ্রন্থের শেষভাগে সোক্রাটেস্ কালিক্লিসকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা এই:—"আমার এই উপদেশ গ্রহণ কর। আমার অনুসরণ করিয়া সেই স্থলে আগমন কর, যে-স্থলে গমন করিলে ইহজীবনে এবং পরলোকে সুখী হইতে পারিবে......। লোকে তোমাকে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করুক, যদি তাহারা ইচ্ছা করে, তোমাকে অপমানিত করুক, অপমানসূচক আঘাতদ্বারা তোমাকে প্রহার করুক, কিন্তু দেউসের নামে আনন্দিত হও। যদি তুমি সাধু ও সৎ লোক হও, ধর্ম্মপথে চলিলে তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হইবে না" (৫২৭ সি, ডি)।

কি উচ্চ আদর্শ!

করাতের উপমা

শত্রুকে যে প্রীতি করিতে হইবে বৌদ্ধশাস্ত্রে এপ্রকার উপদেশ ভূরি ভূরি। কেবল একটি উপদেশ উদ্ধৃত হইতেছে। একস্থলে বুদ্ধ বলিতেছেন—

"হে ভিক্ষুগণ। দস্যুগণ যদি দ্বিমুখ ক্রকচ (দুমুখো করাত) দ্বারা তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে তখনও যদি তোমাদিগের কাহারও মন প্রদুষ্ট হয়, তাহা হইলে সে আমার উপদেশ অনুসারে জীবন গঠন করিতে পারে নাই। হে ভিক্ষুগণ! সে অবস্থাতেও তোমাদিগের মনের এইপ্রকার শিক্ষা হওয়া আবশ্যক, 'আমাদিগের চিত্ত বিকৃত হইবে না। কোন পাপ বাক্য আমাদিগের মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে না, আমরা হিতানুকম্পী হইয়া দ্বেষবিহীন হইয়া মৈত্রীদ্বারা চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া বিহার করিব। আমরা সেই পুরুষকে (অর্থাৎ সেই হত্যাকারী দস্যুকে) মৈত্রী-পরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা প্লাবিত করিব। এবং সেই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডকে বিপুল মহত্ত্ব-প্রাপ্ত অপরিমেয়, বৈরবিহীন, হিংসাবিহীন এবং মৈত্রীপরিপূর্ণ চিত্তদ্বারা প্লাবিত করিব।' হে ভিক্ষুগণ! এইপ্রকার তোমাদের শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। অনুক্ষণ তোমরা এই করাতের উপমা হৃদয়ে ধারণ করিও। ইহাতে তোমাদিগের হিত ও কল্যাণ হইবে।" (মজ্ঝিম নিকায়, ককচূপম-সুত্ত।) *

করাতের উপমা কি মধুর। এ উপদেশ একমাত্র বুদ্ধই দিতে পারেন।

আর সোক্রাটেস্ যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা দার্শনিকেরই উপযুক্ত হইয়াছে।

অক্রোধ ও ক্ষমা

বুদ্ধ এবং সোক্রাটেস্ উভয়েই ক্রোধ জয় করিয়াছিলেন এবং উভয়েই ক্ষমাশীল ছিলেন। দুই একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

---

* সোক্রাটীস; শ্রীরজনীকান্ত গুহ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ড; মূল্য ১০৲

* 'করাতের উপমা', নব্যভারত ১৩৩০, শ্রাবণ দ্রষ্টব্য।

আমাদিগের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"একদিন এক বর্ব্বর পথে চলিতে চলিতে কি কথায় সোক্রাটীসের কর্ণমূলে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিল। তিনি শুধু শান্তভাবে বলিলেন 'কখন শিরস্ত্রাণ পরিতে হয়, তাহা না জানাটা আমারই ভুল হইয়াছে'।" (পৃঃ ২৩৮)।

"আর একদিন এক উদ্ধত ও ভ্রষ্টচরিত্র যুবক তাঁহাকে অভদ্রভাবে পদাঘাত করিল; ইহাতে তাঁহার সহচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাকে ধরিয়া শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সোক্রাটীস্ তাঁহাদিগকে বলিলেন—'সে কি? যদি একটা গাধা আমাকে লাথি মারিত তবে তোমরা কি পুনরায় তাহাকে লাথি মারিতে এবং সেই কাজটা শোভন মনে করিতে," (পৃঃ ২৩৮)।

"একদা পত্নী জান্থিপ্পী (=জ্যান্টিপেপ) উত্তেজিত হইয়া স্বামীকে অসংখ্য কটুকাটব্য বলিতে লাগিলেন এবং চেঁচামেচি করিয়া পাড়াশুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিলেন। অনেকক্ষণ কোলাহল করিয়াও যখন একটি কথারও উত্তর পাইলেন না, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; ক্রোধে দিশাহারা হইয়া একগামলা ময়লাজল আনিয়া স্বামীর মাথায় ঢালিয়া দিলেন। সোক্রাটীস মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'এত গর্জ্জনের পর বর্ষণ ত হইবেই'।" (পৃঃ ২৩৯)।

এইপ্রকার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। বুদ্ধের বিষয়েও দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণবিনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথমে কয়েকজন ঘাতক প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বধ করিতে পারে নাই। একজন অনুতপ্ত হইয়া বুদ্ধের নিকট সমুদয় ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল। ইহার পরে হস্তী দ্বারাও তাঁহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহাতেও বুদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য সাবধান হইলেন না। ইহার পরে দেবদত্ত নিজেই তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। একদিন বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন হইয়া গৃধ্রকূটের পাদমূলে পাদচারণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবদত্ত পর্ব্বতের উপরি ভাগে গমন করিয়া এক প্রকাণ্ড শিলা (মহন্তং শিলং) নিম্নদিকে গড়াইয়া দিল। শিলা কিছুদূর আসিয়াই একস্থলে আবদ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ইহার একখণ্ড ভগ্ন হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইল এবং বুদ্ধের পদে আঘাত করিল। ইহাতে সেই আহত স্থান হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সেখানে দেবদত্ত। বুদ্ধ কেবল এই কথা বলিলেন, মোহান্ধপুরুষ! দুষ্টচিত্ত হইয়া বধচেষ্টায় তথাগতের রক্তপাত করিলে—ইহাতে তোমার বহু অপুণ্য প্রসূত হইল। (চুল্লবগ্‌গ, ৭।৩।৯)

গোতম ক্রোধান্ধ হইলেন না, অধিক আর কিছু বলিলেনও না।

আর একটা ঘটনা এই :—

একজন ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া গোতমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে ভারদ্বাজগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তাহাদিগের মধ্যে একজন বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইয়া অসভ্য এবং পরুষ বাক্যে তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন বুদ্ধ বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! তোমার গৃহে কি মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও অতিথি আগমন করে?

ব্রাহ্মণ বলিল—হাঁ, আগমন করে।

বুদ্ধ। তুমি কি তাহাদিগের জন্য সুস্বাদু ভক্ষ্য ও ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত কর না?

ব্রা। হাঁ, করিয়া থাকি।

বু। যদি তাহারা সেই সমুদায় গ্রহণ না করে তাহা হইলে সেই সমুদায় বস্তু কাহার হয়?

ব্রা। আমারই থাকে।

বু। তাহা হইলে এই সমুদায় অসভ্য এবং পরুষ বাক্য তোমারই রহিল, আমি গ্রহণ করিলাম না।

(সংযুক্ত-নিকায়, ৭।১।২)

এই বাক্যোক্তি বুদ্ধের; কিন্তু মনে হয় ইহা যেন সোক্রাটেসেরই।

ঐ উপলক্ষেই আর-একজন ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে অসভ্য ও পরুষ ভাষায় ভর্ৎসনা করে। বুদ্ধ কিছু না বলিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ বলিল, হে শ্রমণ! তুমি পরাজিত হইলে, হে শ্রমণ! তুমি পরাজিত হইলে।

তখন বুদ্ধ বলিলেন :—'বালকই মনে করে পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেই জয় লাভ হয়। যে তিতিক্ষা অবলম্বন করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারই জয়। যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, সে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর পাপী হয়। আর ক্রুদ্ধের প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করে না, সে দ্বিগুণ জয় লাভ করে। যে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধ অবগত হইয়া উপশান্ত হয় সে নিজের এবং অপরের উভয়েরই কল্যাণ সাধন করে, সে নিজের ও পরের—উভয়েরই চিকিৎসক। ধর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহাকে মূর্খ বলিয়া মনে করে'।

(সংযুক্ত-নিকায়, ৭।১।৩)

লিখিত আছে বুদ্ধের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া উভয় ভারদ্বাজ ব্রাহ্মণই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

মিষ্ট ভাষণ

মিষ্ট ভাষণে সোক্রাটেস্ জগতে অদ্বিতীয়। 'তিনি ভব্যতা ও শিষ্টাচারের আদর্শ ছিলেন" (পৃঃ ২৪৬)। এমন-কি অপ্রিয় সত্য কথা বলিতেও সাধারণতঃ কুণ্ঠিত হইতেন।

গোতমও মিষ্টভাষী ছিলেন। প্রতিপক্ষগণের সহিত আলোচনাতে সর্ব্বদাই ভদ্রব্যবহার করিতেন, কখনই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না। সৎকার্য্যের জন্য শিষ্যগণকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন; কিন্তু অন্যায় কার্য্য দেখিলে তিরস্কারও করিতেন। ইহাতে শিষ্যগণ অনেক সময়ে প্রাণে ক্লেশও পাইত। কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবার সময়ও তিনি স্থির ও গম্ভীর থাকিতেন।

সোক্রাটেসের প্রাণ ছিল মিষ্ট-রসে ভরা; এই রসের স্রোত নিত্যই উৎসারিত হইত। বুদ্ধ ছিলেন সমুদায় রস-তরঙ্গের অতীত; নিস্তরঙ্গ অবস্থায় তিনি সকলের সহিত বাক্যালাপাদি করিতেন।

এবিষয়ে সোক্রাটেস্‌ই অধিকাংশ লোকের আদর্শ।

ধ্যানশীলতা

বুদ্ধদেব ও সোক্রাটেস উভয়েই ধ্যানশীল ছিলেন। ধ্যানমগ্ন হইলে কাহারও বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। বিষম ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত, বজ্রাঘাতে মানব ও পশুর মৃত্যু, তজ্জন্য বহু জনতা ও কোলাহল—এসমুদায় ঘটনাতেও একসময়ে বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গ হয় নাই (মহাপরিঃ ৪।৩০-৩২)। তিনি কখন কখন ৭ দিন পর্য্যন্ত সমাধি-মগ্ন হইয়া থাকিতেন (উদান, ১, ২ অধ্যায়): (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩১)। 'সুম্পসিঅম্' গ্রন্থে (১৭৪-১৭৫,২২০) সোক্রাটেসের ধ্যানশীলতা বিষয়ে কয়েকটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। তিনি এক সময়ে ধ্যাননিমগ্ন হইয়া একস্থলে নিস্পন্দ ভাবে একদিন ও একরাত্রি দণ্ডায়মান ছিলেন (সোক্রাঃ, পৃঃ ২৫২-২৫৩)। সোক্রাটেস্‌কে সাধনা করিয়া এই অবস্থা আনিতে হইত না; কিন্তু

বুদ্ধের ধ্যান কতটুকু স্বাভাবিক আর কতটুকু সাধনের ফল, তাহা বলা সুকঠিন।

এখন বৈসাদৃশ্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাউক।

সুন্দর ও গম্ভীর

সুন্দর পুষ্পের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগের প্রাণে একপ্রকার ভাবের সঞ্চার হয়, আর নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অন্যপ্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ইঁহাদিগের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমাদিগের হৃদয়ে ঐপ্রকার বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। সোক্রাটেসের জীবন সুন্দর; আর বুদ্ধের জীবন 'উদার' (মৌলিক অর্থে) গম্ভীর ও বিশাল।

পিতা ও সখা

ভিক্ষুগণ মনে করিতেন তাঁহারা বুদ্ধের পুত্র (বুদ্ধস্‌সপুত্ত, সুগতস্‌সপুত্ত ইত্যাদি? সংযুত্তনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২, P. T. S.; থেরগাথা, শ্লোক ১৭৪, ২৯৫, ৩৪৮, ৫৩৬ ইত্যাদি); এবং ভিক্ষুণীগণ মনে করিতেন তাঁহারা বুদ্ধের দুহিতা ('ধীতা,' থেরী, ৪৬, ৩৩৬ ইত্যাদি)। কি মধুর সম্বন্ধ। সোক্রাটেসের সহিতও তাঁহার সহচরগণের সম্বন্ধ ছিল অতি মধুর—তাঁহারা তাঁহাকে সখা বলিয়া মনে করিতেন (সোঃ, পৃঃ ৩১৮)।

সজনতা ও নির্জ্জনতা

গৌতম যখন সংসারাশ্রমে ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন, তখনও তাঁহার প্রাণ নির্জ্জনতার জন্য ব্যস্ত হইত। সুযোগ পাইলেই তিনি নির্জ্জনে ধ্যাননিমগ্ন হইতেন (মজ্‌ঝিম, মহাসচ্চক)।

সংসারাশ্রম ত্যাগ করিবার পর নির্জ্জনবাসই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছিল। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ভিক্ষুই যে নির্জ্জনবাস করিতেন তাহা নহে। এবিষয়ে এই ঘটনাটি পাওয়া যায়। এক সময়ে ৩০০ শিষ্যসহ পোট্ঠপাদ নামক পরিব্রাজক মল্লিকা রাণীর আরামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সকলে 'উচ্চনাদে, উচ্চশব্দে, মহাশব্দে' নানা প্রকার গল্প করিতেছিল। সেই সময়ে গৌতমের ইচ্ছা হইল যে, তিনি কিছুক্ষণ তাহাদের সঙ্গ লাভ করেন। দূর হইতেই পোট্ঠপাদ দেখিলেন ভগবান্‌ সেইদিকে আগমন করিতেছেন। তখন তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—"হে ভদন্তগণ! আপনারা নিস্তব্ধ হউন, শব্দ করিবেন না, শ্রমণ গৌতম এইদিকে আগমন করিতেছেন, তিনি নিস্তব্ধতা—ভালবাসেন, নিস্তব্ধতার প্রশংসা করেন। সকলে নিস্তব্ধ রহিয়াছে দেখিলে, তিনি আমাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে পারিবেন"। তখন ভিক্ষুগণ তুষ্ণীভাব ধারণ করিলেন (দীঘ, পোট্ঠপাদ সুত্ত, ১-৪)।

উদুম্বরিকা সীহনাদ সুত্তেও অনুরূপ একটি ঘটনা আছে (দীঘ, ৫,৩)।

অপর একস্থলে এইপ্রকার বর্ণিত আছে :—এক সময়ে গৌতম জীবক নামক রাজচিকিৎসকের আম্রবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জীবকের পরামর্শানুসারে রাজা অজাতশত্রু গৌতমকে দেখিবার জন্য সেই আম্রবনের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আম্রবনের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই তিনি ভয়ে অভিভূত হইলেন, তাঁহার প্রাণ শঙ্কিত হইল, তাঁহার লোম-হর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি জীবককে বলিলেন—জীবক, তুমি ত আমাকে প্রবঞ্চিত করিতেছ না? তুমি ত আমাকে শত্রুর হস্তে অর্পণ করিতেছ না? এ কি করিয়া সম্ভব যে, এস্থলে ভিক্ষুগণের এক মহাসঙ্ঘ, ১২৫০ জন ভিক্ষু এস্থলে বর্ত্তমান, আর একজনেরও হাঁচির শব্দ নাই কাশির শব্দ নাই, কোন প্রকার শব্দই নাই? (দীঘনিকায় ২,৮-১০)।

গৌতম যে কেবল একাকিত্ব অবস্থায় নির্জ্জনতা লাভ করিতেন তাহা নহে, যখন ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ বাস করিতেন, তখনও নির্জ্জনতা রক্ষা করিতেন। কখন কখন তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া বনপ্রদেশেও গমন করিতেন (মজ্‌ঝিম, ২৫)।

তাঁহার শিষ্যগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়াছিল। একটি দৃষ্টান্ত এই :—

অনুরুদ্ধ, নন্দীয় এবং কিম্বিল এই তিনজন ভিক্ষু এক সময়ে গোসিঙ্গ শালবনে বাস করিতেন। ইঁহারা মৈত্রী-পরিপূর্ণ হৃদয়ে সাক্ষাৎ ভাবে এবং পরোক্ষভাবে পরস্পরের সেবা করিতেন। সমুদায় কার্য্য সম্পাদিত হইত নিঃশব্দে। প্রতি পঞ্চম দিনে ইঁহারা সমবেত হইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতেন। অন্য সময়ে একত্র বাস করিয়াও বাক্যালাপ করিতেন না। তিন জন একত্র থাকিয়াও প্রত্যেকে একাকী থাকিতেন। (মজ্‌ঝিম, ৩১)।

বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণ এতই নির্জ্জনতা প্রিয় ছিলেন। সোক্রাটেসের প্রকৃতি ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। পথে, ঘাটে, মাঠে, হাটে, বাজারে যেখানে লোকের সমাগম হইত, সেইখানেই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিত আলোচনা করিতেন। তিনি নগরের বাহিরে যাইতেন না বলিলেই চলে। ফ্হাইড্রস্‌ নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনাটি পাওয়া যায়।

একদিন ফ্হাইড্রসের সঙ্গে সোক্রাটেসের দেখা হয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ফ্হাইড্রস্‌ লুসিআসের বক্তৃতা শুনিয়া আসিতেছে। তখন সোক্রাটেস্‌ সেই বক্তৃতার সমুদায় বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি ধরিয়া ফেলিলেন যে, লেখা বক্তৃতাই তাঁহার কাপড়ের নীচে লুকান রহিয়াছে। ফ্হাইড্রস্‌ নগর-প্রাচীরের বাহিরে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঐ বক্তৃতা শুনিতেই হইবে। সুতরাং সোক্রাটেস্‌ তাঁহার সঙ্গ ধরিলেন। স্থির হইল নগরের বাহিরে ঐ বক্তৃতা পড়া হইবে। গ্রীষ্মকাল, বেলা দুই প্রহর, নিকটে ছিল এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। উভয়েই ইহার তীরে উপবেশন করিলেন। উন্নত পাদপের বিস্তীর্ণ শাখা, কুসুমের মনোমোহন সৌরভ, সুস্বর-নিনাদিত গগনমণ্ডল, সুমধুর সমীরণ, স্রোতস্বিনীর সুশীতল সলিল, তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল ক্ষেত্র—সমুদায়ই সোক্রাটেসের মন প্রাণ মুগ্ধ করিয়া দিল। আনন্দভরে সোক্রাটেস্‌ বলিল—প্রিয় ফ্হাইড্রস, কি আশ্চর্য্য পথপ্রদর্শক তুমি! কি সুন্দর স্থানে আমাকে লইয়া আসিলে! ফ্হাইড্রস্‌ বলিল—'হে রহস্যময় বন্ধু! তুমি এক অদ্ভুত লোক। তুমি যেন এদেশবাসী নহ, যেন বিদেশ হইতে আসিয়াছ এখানে কিছু দেখিবার জন্য। তুমি যে কখনও নগর-প্রাচীরের দ্বার পার হইয়া বাহিরে আসিয়াছ ইহা ত মনে হইতেছে না।' সোক্রাটেস্‌ বলিলেন, "ঠিক বলিয়াছ, পরম সখা! আমি নগরে থাকি কেন জান? আমি জ্ঞান ভালবাসি। এই মাঠ, এই গাছ, আমাকে কিছু শিখাইতে পারে না। নগরের যে লোক তাহারাই আমাকে শিক্ষা দেয়। তুমি কিন্তু আমাকে সহরের বাহিরে আনিবার মন্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছ" (ফ্হাইড্রস্‌, ২৩১)।

ফ্হাইড্রসের নিকটে একখানা হস্তলিপি ছিল, ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল—প্রেমতত্ত্ব। এই বিষয়ে জানিবার জন্যই সোক্রাটেস্‌ ফ্হাইড্রসের সঙ্গে সহরের বাহিরে আসিয়াছিলেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, সোক্রাটেস্‌ ও বুদ্ধ এতদুভয়ের প্রকৃতি ছিল বিপরীত। সোক্রাটেস্‌ ভালবাসিতেন জনসমাজ, গৌতম ভাল-

বাসিতেন নির্জ্জনতা। একজন জনকোলাহলের মধ্যে থাকিয়া সত্য লাভ করিতেন এবং তাহা জনসমাজেই প্রচার করিতেন। আর-একজন থাকিতেন নির্জ্জনে, সত্য লাভ করিতেন নির্জ্জনে; এবং তিনিও সেই সত্য প্রচার করিতেন জনসমাজে।

আহার বিহারাদি

আহার বিহারাদি বিষয়ে উভয়েই অত্যন্ত সংযত ছিলেন। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে।

গৌতম মদ্য পান করিতেন না। কিন্তু সোক্রাটেস্ মদ্য গ্রহণও করিতেন আবার বর্জ্জনও করিতে পারিতেন (সুম্ পসি অন্. ১৭৬, সি)। আল্কিবিয়াডেস্ এবিষয়ে এই প্রকার বলিয়াছেন:—

"ভোজের সময় একমাত্র তিনি (=সোক্রাটেস্) ইহা সম্ভোগ করিতে পারিতেন। যদিও তিনি মদ্যপান করিতে ইচ্ছুক হইতেন না, কিন্তু বাধ্য হইয়া পান করিতে হইলে, তিনি সকলকেই ইহাতে পরাস্ত করিতেন। এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, কেহই সোক্রাটেস্‌কে কখন মাতাল হইতে দেখে নাই" (সুম্ পসি অন্. ২২০. এ; গ্রন্থকার প্রথম বাক্যটির অনুবাদ করেন নাই, পৃঃ ২৩১)।

ঐ গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, এক রাত্রিতে আগাথোনের গৃহে এক ভোজে অনেক বন্ধুর সমাগম হইয়াছিল। কেহ কেহ মদ্যপানে বিভোর হইয়া সেইস্থলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আরিষ্টডেমস্ প্রত্যূষে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে, সোক্রাটেস্ এবং আরও দুইজন সেই স্থলেই রহিয়াছেন। তাঁহারা 'প্রকাণ্ড পান-পাত্র' হইতে মদ্যপান করিতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আলোচনাও চলিতেছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন সোক্রাটেস্। অবশেষে অপর দুইজনও নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, কেবল সোক্রাটেস্ই জাগ্রত রহিলেন। সমস্ত রাত্রি এইরূপে মদ্যপানে ও আলোচনায় অতিবাহিত হইয়াছিল (২২৩)।

সোক্রাটেস্ কখনই মাতাল হইতেন না, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণ অনেকেই মাতাল ছিলেন।

বুদ্ধের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। তিনি নিজে মদ্যপান করিতেন না, তাঁহার শিষ্যগণও মদ্যপান করিতেন না এবং কেহই আমোদ-প্রমোদ-পূর্ণ ভোজে যোগ দিতেন না। বুদ্ধ ছিলেন নিত্য গম্ভীর; তিনি কখনও হাসিতেন কি না সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ আছে। সোক্রাটেস্ গম্ভীরও ছিলেন; আবার আমোদ-আহ্লাদের তরঙ্গে ভাসিতেও পারিতেন।

দেব-বাদ

উভয়েই দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু গৌতম দেবোপাসনা করিতেন না, আর সোক্রেটেস্ করিতেন। গৌতমের মতে মহাব্রহ্মাও প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তিনিও অশাশ্বতকে শাশ্বত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সোক্রাটেসের মতে দেব-গণ প্রকৃত তত্ত্ব দর্শন করেন (ফ্রাইড্রুস্, ২৪৭)। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দেবতুল্য (সফিস্‌টেস্, ২১৬); এবং মৃত্যুর পর দেবতুল্য হইয়া দেবগণের মধ্যে বাস করেন—(ফ্হাইডোন, ৮২, সি; টিহেআএটেটস্, ১৭৬)। বুদ্ধ বলেন—দেবতা হইব বা দেবতা হইয়া দেবগণের সহিত বাস করিব এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপন করা চিত্তের একটি 'বিনিবন্ধ' (বন্ধন)। (মজ্‌ঝিম ১। ১০২-১০৩; অঙ্গুত্তর ৩২৪৯; ৪৪৬১; ৫।১৮ ইত্যাদি)। বুদ্ধের মতে বুদ্ধত্ব দেবত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর; নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ দেবগণেরও দৃষ্টির অতীত (উদান, ২।১০, মজ্‌ঝিম্, ২২ ইত্যাদি)।

গ্রন্থকার এক স্থলে বলিয়াছেন,—"মানুষ ঈশ্বরের দাস এ ভাবটিও গ্রীসে গৃহীত হয় নাই" (১ম ভাগ, পৃঃ ৩৩৭)। কিন্তু সোক্রাটেস্ স্বয়ং বলিয়াছেন, মানব দেবগণের সম্পত্তি (ফ্হাইডোন, ৬২, বি)। সম্পত্তির গ্রীক কথা Kte mata; গো-মেষ, দাস প্রভৃতি সম্পত্তিকে Kte mata বলা হয়। গ্রন্থকার নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের উপক্রমণিকাতে তিনি এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"আত্মহত্যা না করিবার একটী কারণ এই—আমরা দেবগণের দাস। তোমার দাস আত্মহত্যা করিলে তুমি বিরক্ত হইবে; দেবগণও তেমনি আমরা আত্মহত্যা করিলে ন্যায়তঃ বিরক্ত হইবেন"। (পৃঃ ৫৫২)

মানুষ দুর্ব্বল, দাস্য-ভাব তাহার অস্থিমজ্জাগত। ঈশ্বর বা দেবগণ মানবের প্রভু। মানব ইঁহাদিগের দাস, জগতের প্রায় সমুদয় ধর্ম্মেরই এই আদর্শ। এভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে কেবল দুইটি ধর্ম্ম—ভারতের অদ্বৈতবাদ এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম। অন্য আদর্শেও এই দাস্য বাদ অতিক্রম করা যায়। যে-স্থলে মানুষ মনে করিতে পারে, ঈশ্বর আমাদিগের পিতা এবং সখা, সে-স্থলে প্রীতি থাকে, সেবা থাকে, কিন্তু দাস্যভাব থাকে না। দাস্য-ভাবে প্রেমের স্থান নাই, দাসের যে-প্রেম, সে-প্রেম প্রেম নহে, সে-প্রেম প্রেমের ব্যঙ্গ।

এস্থলে বলা আবশ্যক কোন কোন স্থলে সোক্রাটেস্ সাধু মানবকে theo-philes অর্থাৎ দেবপ্রিয় (দেবগণের প্রিয়) বলিয়াছেন। (Phil. 39E, 40B: Rep. 612E, 613A; Symp. 212A. Gorgias 507E অংশও দ্রষ্টব্য)। ইংরেজীতে এই শব্দের অনুবাদ করা হইয়াছে Friend of God (Jowett), God-beloved (Burges, Davis) ইত্যাদি।

এই সমুদয় স্থলে বলা হইয়াছে যে, সাধু-মানব দেবগণের বন্ধু, বা দেবগণের প্রিয়। 'লুসিস্' নামক গ্রন্থে 'প্রিয়' এবং 'বন্ধু' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২১২-২১৪)। এস্থলের সিদ্ধান্ত এই—যাহাকে ভালবাসা যায়, সেই প্রিয় বা সেই বন্ধু। সুতরাং যদি বলা হয় 'সাধু মানব দেবগণের বন্ধু', ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দেবগণ সাধু মানুষকে ভালবাসেন; সাধু-মানুষ দেবগণকে প্রীতি করেন, সাক্ষাৎভাবে ইহা বুঝা যায় না।

জীবন ও মৃত্যু

লোকের বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ষেই দেহকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ইহা সত্য যে, বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রের বহু স্থলে বলা হইয়াছে, দেহ একটি বন্ধন। কিন্তু গ্রীস দেশের সোক্রাটেস্ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। বহুস্থলে বলা হইয়াছে যে, দেহ (soma, সোমা) আত্মার সমাধি (sema, 'কবর')। (গর্গিআস্ ৪৯৩, ই)। ফ্হাইড্রুস্ গ্রন্থেও (২৫০, সি) এই "সোমা-সেমা" বাদ গৃহীত হইয়াছে। এই দেহ জীবন্ত সমাধি ('কবর')। শম্বুক যেমন দেহ-কোষে আবদ্ধ থাকে, আমরাও তেমনি এই দেহে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি এবং শম্বুকের ন্যায় দেহ বহন করিয়া বিচরণ করিতেছি। যখন দেহ হইতে মুক্ত হইব (*a-semantoi*), তখন প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিব। এস্থলে 'আসেমান্টই' শব্দ দ্ব্যর্থসূচক (১) একটি অর্থ অচিহ্নিত, চিহ্ন হইতে মুক্ত; (২) দ্বিতীয় অর্থ 'কবর' হইতে মুক্ত। উক্ত শব্দের 'সেমা' অংশ শ্লেষপূর্ণ।

'ক্রাটুলস্' গ্রন্থে সোক্রাটেস্ 'সোমা' শব্দের দুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন; একটি ব্যাখ্যা এই—

'আত্মা ইহজীবনে দেহরূপ 'সেমা'তে (অর্থাৎ কবরে) প্রোথিত, এইজন্য দেহের নাম 'সোমা' (৪০০, বি, সি)।

'ফ্হাইডোন্ গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, দেহ সমুদয় অনর্থের মূল, ইহজীবনে দেহকে যতই অতিক্রম করা যায়, ততই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব লাভ করা

সহজ হয়। দার্শনিক পণ্ডিতগণ মৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দিতই হইয়া থাকেন; কারণ দেহমুক্ত না হইলে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত মঙ্গল লাভ করা সহজ হয় না, মৃত্যুর পরে দিব্যালোকে দিব্য তত্ত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে (৬৪-৬৮; সোঃ ৫৫৬-৫৬৫)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেহ-বিষয়ে বুদ্ধ ও সোক্রাটিসের মধ্যে বিশেষ কোন মতভেদ নাই। তবে একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা আবশ্যক। সোক্রাটেস্ বলেন, দার্শনিক পণ্ডিতগণ মৃত্যু কামনা করেন (ফাইডোন্ ৬৪-৬৮)। কিন্তু বুদ্ধের মতে বিভব তণ্হা অর্থাৎ মৃত্যুকামনাও বর্জ্জনীয়।

নরক

উভয়েই নরককে বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধের ধর্ম্মে অনন্ত নরকের স্থান নাই; কিন্তু সোক্রাটেস্ অনন্ত নরক মানিতেন।

দেবদত্ত বুদ্ধের প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল, সঙ্ঘ ভাঙ্গিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। এমন যে দেবদত্ত তাহার জন্যও অনন্ত নরক নহে। লিখিত আছে যে, এই অপরাধের জন্য তাহাকে এক কল্পপরিমিত সময় নরকভোগ করিতে হইবে (বিনয়-পিটক, চুল্লবগ্গ, ৭।৪।৭)।

প্লেটোর সোক্রাটেস্ বিশ্বাস করিতেন যে, সংশোধন করিবার জন্য শাস্তি ও নরক-যন্ত্রণা। "কিন্তু যাহাদিগের পাপ এত গুরুতর যে, তাহারা সংশোধনের অতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহারা বহুবার দেবস্বাপহরণ-রূপ জঘন্য পাপাচরণ করিয়াছে বা অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে বহু নরহত্যা করিয়াছে কিংবা এইপ্রকার অন্যান্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা সোপার্জ্জিত ভাগ্যবশে টার্টারসে নিক্ষিপ্ত হয়, তথা হইতে তাহারা কখনও উঠিতে পারে না।" (গ্রন্থকারের অনুবাদ, পৃঃ ৬৭৩; ফাইডোন্, ১১৩, ই)।

এই অংশকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন—"সত্য বটে তিনি ফাইডোনে মহাপাপীর জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু উহা উপাখ্যানের অন্তর্গত রূপক বর্ণনা; তিনি বাস্তবিক অনন্ত নরক মানিতেন না" (পৃঃ ৫৩৭)। গ্রন্থের প্রথম ভাগেও তিনি ঐ অংশের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "প্লেটো কিন্তু বাস্তবিক অনন্ত নরক মানিতেন না।" (পৃঃ ৩১৩) কিন্তু গ্রন্থকারের এই শুভ কথা কল্পনা-মাত্র; প্লেটো অর্থাৎ প্লেটোর সোক্রাটেস্ এক শ্রেণীর লোকের জন্য অনন্ত নরকেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'গর্গিআস্' নামক গ্রন্থে (৫২৫,ই) ঠিক অনন্ত নরকের কথাই আছে। 'সাধারণ তন্ত্র' নামক গ্রন্থেও (৬১৫, সি, ডি) লিখিত আছে যে, 'আর্ডিআইঅস্' নামক একজন দুর্বৃত্ত রাজা কখনও নরকের বাহিরে আসিবে না।

তিন পুস্তকে একই কথা; সুতরাং অনন্ত নরক নিতান্ত রূপক নহে।

বার্ণেট্, এবিষয়ে বলেন—"The Neoplatonists are very anxious to get rid of the doctrine of eternal punishment, but it is stated quite explicitly." (Notes, Phaedo, 113 E.)

অর্থাৎ "নব-প্লেটো-মতাবলম্বিগণ অনন্ত নরকবাদ দূর করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত; কিন্তু এই মত অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে"।

গ্রন্থকারের সহিত আরও দুই-একটি বিষয়ে আমাদিগের মতভেদ আছে।

জ্ঞান ও মুক্তি

সোক্রাটেসের সহিত বুদ্ধদেবের সাদৃশ্য দেখাইতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন:—

"বৌদ্ধমতে জ্ঞানলাভই মুক্তি," পৃঃ ৩০৪।

গ্রন্থকারের এই মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বুদ্ধ অবশ্যই প্রচার করিতেন, তাঁহার ধর্ম্ম জ্ঞানসঙ্গত। তিনি নিজে যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া লোককে সত্যাসত্য বুঝাইতেন। তিনি এই উপদেশ দিতেন—বিচার করিয়া নিজে সত্যাসত্য নির্ণয় কর। কেহ অবিচারিতভাবে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করুক, ইহা তিনি ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্ম জ্ঞানদ্বারা নিয়মিত। তিনি বলিতেন, যেমন ধর্ম্ম-জ্ঞান আবশ্যক, তেমনি সেই অনুসারে কার্য্য করাও আবশ্যক—'তক্কর' অর্থাৎ 'তৎ কর' হইতে হইবে (ধর্ম্মপদ, ১৯; দীর্ঘ ১।২৩৫)। তৎ=তাহা; 'তৎ কর—যে ব্যক্তি সেইপ্রকার কর্ম্ম করে। বৌদ্ধধর্ম্মে জ্ঞানলাভ যথেষ্ট নহে; মুক্তিলাভ সাধনসাপেক্ষ। তাঁহার সাধন-প্রণালীর মূলে ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্যম এবং সংযম। গ্রন্থকার যে বৌদ্ধধর্ম্মের 'সপ্ত সাধন' ব্যাখ্যা করিয়াছেন (পৃঃ ২৭৬-২৮২), তাহাতেই ইহা প্রমাণিত হইবে। আবার, বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার সম্পূর্ণ প্রেমের ব্যাপার। বৌদ্ধধর্ম্মে জ্ঞান প্রেম-কর্ম্ম সমন্বয়ীভূত হইয়াছে।

এস্থলে সংযুত্তনিকায় হইতে এক অংশ উদ্ধৃত হইতেছে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৭-১১৮, P. T. S. সং)।

এক সময়ে ভিক্ষু সবিট্ঠ নারদ নামক একজন ভিক্ষুকে নির্ব্বাণ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নারদের উত্তর শুনিয়া সবিট্ঠ বলিলেন—"তাহা হইলে আয়ুষ্মান্ নারদ ক্ষীণাস্রব অর্হৎ হইয়াছেন"। নারদ বলিলেন—"হে আয়ুষ্মান্! আমি সম্যক্ প্রজ্ঞা দ্বারা (সম্ম পঞ্ঞায়) যথাভূত (যথাভূতম্) সম্যক্ দর্শন (সুদিট্ঠম্) করিয়াছি যে 'ভব-নিরোধই নির্ব্বাণ', কিন্তু আমি ক্ষীণাস্রব অর্হৎ হই নাই"।

তাহার পরে তিনি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার অর্থ স্পষ্টতর করিলেন। তিনি বলিলেন—"হে আয়ুষ্মান্! যেন কান্তার মার্গে একটি কূপ রহিয়াছে; কিন্তু সে-স্থলে রজ্জু নাই, উদকপাত্রও নাই। একজন পুরুষ ঘর্ম্মাভিভূত, ঘর্ম্মাক্ত, ক্লিষ্ট, শুষ্ককণ্ঠ, ও পিপাসিত হইয়া সেই স্থলে আগমন করিল। সে কূপ দেখিল—তাহার জ্ঞান (ঞাণম্) হইবে যে ঐ উদক; কিন্তু সে ইহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। তেমনি হে আয়ুষ্মন্, আমিও সম্যক্ প্রজ্ঞাদ্বারা (সম্মপঞ্ঞায়) যথাভূত নির্ব্বাণকে সম্যক্ দর্শন করিয়াছি, কিন্তু ক্ষীণাস্রব অর্হৎ হই নাই"।

দেখা যাইতেছে সম্যক্ প্রজ্ঞা ও (সম্মপঞ্ঞা) যথেষ্ট নহে।

প্রকৃত কথা এই, বুদ্ধের ধর্ম্মে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তি এই তিনেরই সম্মিলন হইয়াছে। কিন্তু সোক্রাটেসের আদর্শ 'জ্ঞানই ধর্ম্ম'। এইস্থলে সোক্রাটেস্ ও বুদ্ধের মধ্যে এক মৌলিক প্রভেদ।

ত্রিবিধ তৃষ্ণা

বুদ্ধদেব ত্রিবিধ তৃষ্ণা (তণ্হা) পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ত্রিবিধ তৃষ্ণা এই:—

(১) কাম—তণ্হা অর্থাৎ সুখভোগের প্রতি তৃষ্ণা।

(২) ভব-তণ্হা—জীবনের প্রতি তৃষ্ণা; বাঁচিয়া থাকিব, অস্তিত্ব-বান্ হইয়া রহিব এইপ্রকার বাসনার নাম 'ভব-তৃষ্ণা'।

(৩) বিভব-তণ্হা—বিনাশের প্রতি তৃষ্ণা; বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অস্তিত্ব-বান্ রহিব না, এইপ্রকার বাসনার নাম বিভব-তৃষ্ণা।

গ্রন্থকার বিভব-তৃষ্ণার অর্থ করিয়াছেন—"বৈভব অর্থাৎ সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির বাসনা," পৃঃ ২৬৯। তিনি যেভাবে বিভব-তৃষ্ণার ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে বিভব-তৃষ্ণা কামতৃষ্ণারই অন্তর্ভূত হইয়া যায়। ইহাতে তৃষ্ণা তিনটি না হইয়া কেবল দুইটি হয়।

'ভব' এবং 'বিভব' একত্র ব্যবহৃত হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এ দুইটি বিপরীত অর্থবোধক। ভব—জীবন, অস্তিত্ব; বিভব—মৃত্যু, বিনাশ, অনস্তিত্ব। বহু স্থলে 'বিভব' শব্দ 'বিনাশ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (দীঘনিকায়, ব্রহ্মজালসুত্ত, ১।৩।৯-১৬; মজ্‌ঝিমনিকায়, অলগদ্দূপম-সুত্তম্, পৃঃ ১১৪০, P. T. S.)

'নিদ্দেস' নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, 'ভব-তণ্‌হা' শাশ্বত দৃষ্টিমূলক এবং 'বিভব-তণ্‌হা' উচ্ছেদ দৃষ্টিমূলক (মহানিদ্দেস, পৃঃ ২৪৫, ২৮২ ইত্যাদি)

'বিভঙ্গ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, "উচ্ছেদদিট্‌ঠি সহগতো রাগো সারাগো, অনুনয়ো, অনুরোধো, নন্দী, নন্দীরাগো, চিত্তস্স সারাগ, অয়ম্ বুচ্চতি বিভব-তণ্‌হা (পৃঃ ৩৬৫) অর্থাৎ উচ্ছেদদৃষ্টির যে-রাগ, সংরাগ, অনুনয়, অনুরোধ, নন্দী, নন্দীরাগ, চিত্তের সংরাগ ইহারই নাম 'বিভব-তণ্‌হা'। রাগ-সংরাগাদি ৬টি শব্দ সমপর্যায়, ইহাদিগের অর্থ আসক্তি।

বুদ্ধঘোষও বলেন, শাশ্বত-বাদমূলক যে-আসক্তি, তাহাই ভব-তণ্‌হা (সস্সত-দিট্‌ঠি সহগতো হি রাগো ভব-তণ্‌হাতি বুচ্চতি) এবং উচ্ছেদ-বাদ-মূলক যে-আসক্তি তাহাই বিভব-তণ্‌হা (উচ্ছেদ দিট্‌ঠি সহগতোহি রাগো বিভব তণ্‌হা তি বুচ্চতি)। বিসুদ্ধি মগ্‌গ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৮ (P. T. S.)।

Rhys Davids

বিনয়পিটকের অনুবাদে বিভব-তণ্‌হার অনুবাদ করিয়াছিলেন, "Thirst for prosperity" (Vinaya-Pitaka, vol. i., p. 95, S. B. E)

গ্রন্থকার এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

বিনয়পিটক অনূদিত হইয়াছিল ১৮৮১ সালে; ১৯২১ সালে Rhys Davids দীঘনিকায়ের শেষ খণ্ড অনুবাদ করেন। ইহাতে 'বিভব-তণ্‌হার" অর্থ করা হইয়াছে, "Craving to end life' অর্থাৎ জীবননাশের বাসনা। ঐ স্থলেই পাদটীকাতে ভব-তণ্‌হা ও বিভব-তণ্‌হা বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন, "Lit. *becoming-craving* and *contra-becoming craving*" (Dialogues of the Buddha, part 3, p. 253)

গ্রন্থকার যাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি মত পরিবর্তন করিয়াছেন।

P. T. Society এর নূতন পালি-অভিধানে বিভব-তণ্‌হার অর্থ "Craving for life to end,' desire for non-existence অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন হইবার বাসনা। Childersএর অভিধানেরও এই অর্থ।

আর-একটি স্থল

আর-এক স্থলে গ্রন্থকার এইপ্রকার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"হে বাসেট্‌ঠ, যেমন বলবান্ শঙ্খধর অনায়াসেই চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি শ্রুতিগোচর করে, তেমনি বাসেট্‌ঠ (ক), যাহা কিছুর প্রাণ ও আকার আছে, তাহার কিছুই তিনি ত্যাগ করেন না, কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না (খ)। কিন্তু তিনি সমস্তই প্রগাঢ়রূপে অনুভূত মৈত্রী ও বিমুক্ত চিত্ত দ্বারা আচ্ছাদন করেন। তেবিজ্জসুত্ত, ৭৭। (পৃঃ ১৮৪)।

অনুবাদের (খ) অংশ মূলের অনুগত নহে। গ্রন্থকার এস্থলেও Rhys Davidsএর অনুসরণ করিয়াছেন; তাঁহার অনুবাদ এই :—

Even so of all things that have shape or life, there is not one that he passes by or leaves aside,

মূল এই :—

'যং পমাণ কতং কম্মং, ন তং তত্র অবসিস্সতি, ন তং তত্র অবতিট্‌ঠতি" ।

ইহার কথায় কথায় সংস্কৃত এই—

"যৎ প্রমাণ-কৃতং কর্ম্ম, ন তৎ তত্র অবশিষ্যতে, ন তৎ তত্র অবতিষ্ঠতে"।

(১) পমাণ-কতং—প্রমাণ-কৃতম্—পরি-মাণ-কৃত—পরিমিত

(২) "কম্ম' তিনপ্রকার হইতে পারে, কায়কম্মং, বচী-কম্মং, মনো-কম্মং অর্থাৎ দৈহিক কর্ম্ম, বাক্য রূপ কর্ম্ম এবং মানসিক চিন্তা ভাবাদি রূপ কর্ম্ম (ধর্ম্ম-সঙ্গনী পৃঃ ১৮০, ১৮৩, পুগ্‌গল পঃ পৃঃ ৪১, অঙ্গুত্তরনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২, ১০৪, ১১০, ১৪৪ ইত্যাদি বহু স্থলে)।

বুদ্ধ ঘোষের টীকা* এই :—

"পমাণ কতং কম্মং নাম কামাবচরং বুচ্চতি" অর্থাৎ "পমাণ কতং কম্মং" অংশের অর্থ কাম্য-বিষয় অথবা কামলোকে উৎপন্ন চিত্তরূপ কর্ম্ম।"

(৩) তত্র—সেই স্থলে মৈত্রী-বিমুক্ত চিত্তে।

(৪) অবসিস্সতি—অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে।

(৫) অবতিট্‌ঠতি—অবতিষ্ঠতে—অবস্থান করে।

সুতরাং এ অংশের অর্থ এই—"যাহা কিছু পরিমিত ভাব, তাহা কিছুই এস্থলে (অর্থাৎ মৈত্রী-বিমুক্ত চিত্তে) অবশিষ্ট থাকে না, কিছুই অবস্থান করে না।"

উহারই অংশ বিশেষ অরক-জাতকে (১৬৯) পাওয়া যায় :—

"অপ্পমাণং হিতং চিত্তং
পরি পুণ্ণং সুভাবিতং,
যং পমাণ কতং কম্মং
ন তং তত্রাবসিস্সতি' ।

Rouseএর অনুবাদ এই :—

Filled full of pity infinite,
infinite charity,
In such a heart nought
narrow or confined can ever be.

অনুবাদে ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

আত্মা

গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ "আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই" (পৃঃ ২৮২,২৮৩,৩০৮)।

বুদ্ধের সময়ে আত্মা বলিলে লোকে কি বুঝিত, তাঁহার শ্রোতৃবর্গই বা ইহা কি অর্থে গ্রহণ করিত, এবং বর্ত্তমান যুগে আমরাও 'আত্মা' শব্দকে সেই অর্থে গ্রহণ করিতেছি কি না, তাহা ব্যাখ্যা না করিয়া ঐপ্রকার সিদ্ধান্ত করায় বুদ্ধের প্রতি অবিচার এবং পাঠকগণকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে।

---

* শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ে বহুবার সাহায্য করিয়া এবং (১৩২৯ সালে) এই অংশের বুদ্ধঘোষের টীকা উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

দুই-একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। হিন্দুগণ যদি বলেন, 'লোকটি দেবতুল্য', বুঝিতে হইবে লোকটি অতি সাধু পুরুষ। কিন্তু অসুরোপাসক (বর্ত্তমান পার্শীগণ) যদি বলেন, "লোকটি দেবতুল্য", বুঝিতে হইবে লোকটি বড়ই অসৎ।

আবার যদি একজন নব্য হিন্দু বলেন, "অসুরের অস্তিত্ব নাই" তাহা শুনিয়া কোন অসুরোপাসক বলিতে পারে, লোকটি নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না। কিন্তু আমরা জানি, অসুরোপাসকের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুলও হইতে পারে। একজন একেশ্বরবাদী হিন্দু অনায়াসেই বলিতে পারে, 'অসুর নাই'।

একজন সাংখ্যবাদী যদি বলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, আমরা বলিব, লোকটি নাস্তিক। কিন্তু কোন অদ্বৈতব্রহ্মবাদী যদি বলে, "ঈশ্বর অস্তিত্ববিহীন", তাহা হইলে আমরা তাহাকে নাস্তিক নামে অভিহিত করিতে পারি না; কারণ আমরা জানি লোকটি ঈশ্বর মানে না বটে, কিন্তু পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যেস্থলে একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ, সে-স্থলে অর্থ নির্ণয় না করিয়া সেই শব্দটি ব্যবহার করিলে অনেক সময়েই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

বুদ্ধ-যুগের আত্মা-বিষয়েও ঠিক তাহাই। দীঘনিকায় গ্রন্থের ব্রহ্মজাল-সুত্তে (২৮—৭৩) জগৎ ও আত্মা বিষয়ে ৬২ প্রকার মতের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। ইহা ছাড়া অপর স্থানেও আত্মা-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের কথা বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগেও আত্মা-বিষয়ে বিভিন্ন মত। প্রচলিত মত এই—আত্মা একটি বস্তু বা পদার্থ (thing, substance, entity)—ইহার কতকগুলি গুণ আছে যেমন ভাব, জ্ঞান, ইচ্ছা, ইত্যাদি। আত্ম-বস্তু গুণ হইতে পৃথক্; এই সমুদায় গুণ না থাকিলেও আত্মা বর্ত্তমান থাকে; আত্মার এইপ্রকার সত্তাকে নির্গুণ সত্তা বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও এক সময়ে এই মত প্রবল ছিল। এখন অনেকেই এই মত পোষণ করেন না। Baldwin, Hoffding, James, Jodl, Ladd, Sully, Wundt প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানবিৎগণ মনে মানসিক প্রক্রিয়া এবং চৈতন্ত বা আত্মা (consciousness) একই। মানসিক প্রক্রিয়া বাদ দিলে আত্মার অস্তিত্বই থাকে না। জেম্স্ self অর্থাৎ আত্মাকে stream of consciousness বলিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার মতে আত্মা একটি প্রবাহ। এই প্রবাহের পশ্চাতে কোন অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা নাই। লোকে সাধারণতঃ এই কল্পিত অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাকে আত্মা বলে। কিন্তু তিনি প্রবাহকেই আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষা self, ইহার ঠিক অনুবাদ আত্মা।

"আত্মা"-বিষয়ে এত বিভিন্ন মত। 'প্রবাহবাদী' ও আত্ম-বাদী; আবার 'স্থায়ি-সত্তাবাদী' ও আত্মবাদী।

এখন দেখা যাউক বুদ্ধ আত্মা-বিষয়ে কি মত পোষণ করেন।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকট প্রমাণ করিতেছেন, যে, আত্মা নাই"।

গ্রন্থকার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"তৎপর ভগবান্ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে হে ভিক্ষুগণ, রূপ (দেহ) আত্মা নহে, রূপ যদি আত্মা হইত, তবে তাহা রোগের অধীন হইত না (ক); তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিতাম, 'আমার রূপ এইপ্রকার হউক'। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ, যেহেতু রূপ আত্মা নহে, এইজন্যই তাহা রোগের অধীন এবং এইজন্যই আমরা বলিতে পারি না, 'আমার রূপ এইপ্রকার হউক।'

বেদনা আত্মা নহে…সংজ্ঞা আত্মা নহে…সংস্কার আত্মা নহে। বিজ্ঞান আত্মা নহে। বেদনা যদি আত্মা হইত…ইত্যাদি (অবিকল পূর্ব্ববৎ)।

এখন ভিক্ষুগণ, তোমরা কি মনে কর, রূপ নিত্য না অনিত্য?

অনিত্য, ভগবন্।

যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, না সুখ উৎপাদন করে?

দুঃখ উৎপাদন করে, ভগবন্। পুনশ্চ, যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক বিকারের অধীন, তাহার সম্বন্ধে কি আমরা ভাবিতে পারি, 'ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহাই আমার আত্মা?' (খ)

না, ভগবন্, এরূপ ভাবিতে পারি না।

বেদনা…সংজ্ঞা…সংস্কার…বিজ্ঞান…নিত্য না অনিত্য?

অনিত্য, ভগবন্।

যাহা অনিত্য, তাহা দুঃখ উৎপাদন করে, না সুখ উৎপাদন করে?

দুঃখ উৎপাদন করে।

পুনশ্চ, যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক, বিকারের অধীন, তাহার সম্বন্ধে আমরা কি ভাবিতে পারি, 'ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহাই আমার আত্মা?' (খ)

না, ভগবন্, তাহা ভাবিতে পারি না।

অতএব হে ভিক্ষুগণ, যে-কোনও রূপ অতীত, অনাগত বা বর্ত্তমান, যাহা কোনও জীবের কিংবা কোন জীবের নহে, যাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে, সে-সমুদায় রূপ আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। যে সম্যক্ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার এইরূপেই দর্শন করা কর্ত্তব্য।

যাহা-কিছু বেদনা…যাহা-কিছু সংজ্ঞা…যাহা-কিছু সংস্কার…যাহা-কিছু বিজ্ঞান…অতীত, অনাগত বা বর্ত্তমান, যাহা কোন জীবের; কিংবা জীবের নহে; যাহা স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উত্তম, দূরে বা নিকটে; সে-সমুদয় বেদনা…সংজ্ঞা…সংস্কার……বিজ্ঞান আমার নহে, আমি তাহা নহি, তাহা আমার আত্মা নহে। যে সম্যক্ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার এইরূপেই দর্শন করা কর্ত্তব্য"। মহাবগ্‌গ, ১।৬।৩৮-৪৫। (পৃঃ ৩০৮-৩০৯)

উদ্ধৃত অংশে আমরা (ক), (খ) দ্বারা তিনটি বাক্যকে চিহ্নিত করিয়াছি।

আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই—এই অংশে 'আত্মা নাই' এমন কোন কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, এমন কোন কথা নাই যাহা হইতে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে 'আত্মা নাই'। এই অংশ পড়িলে অতি সহজে বুঝা যায় যে বুদ্ধের প্রধান বক্তব্য এই :—

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই ৫টি আত্মা নহে। আর বুদ্ধ যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক—ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মা নিত্য, এবং রোগ, দুঃখ ও বিকারাদির অতীত। কেহ-কেহ বলিতে পারেন, এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই কষ্টকল্পনা। এইজন্য কিছু বিচার করা আবশ্যক।

(ক) চিহ্নিত অংশটি এই :—রূপ (দেহ) আত্মা নহে, রূপ যদি আত্মা হইত, তবে তাহা রোগের অধীন হইত না (পৃঃ ৩০৮)।

এই অংশটিকে ন্যায়শাস্ত্রের উপযোগী করিয়া লিখিলে এইপ্রকার হইবে।

"রূপ রোগের অধীন (গ) সুতরাং রূপ আত্মা নহে (ঘ)।

ন্যায়ের তিনটি অবয়ব

(১) সাধ্য (major promiss)

(২) পক্ষ (minor promiss)

(৩) নিগমন (conclusion)

এস্থলে কেবল দুইটি অবয়ব পাওয়া যাইতেছে ; (গ) বাক্যটি পক্ষ ; (ঘ) বাক্যটি নিগমন। সাধ্য অবয়বটি অব্যক্ত। অব্যক্ত সাধ্যটি এই :—

"যাহা রোগের অধীন, তাহা আত্মা নহে" (ঙ)।

(ঙ) বাক্যটিকে নিম্নলিখিত আকারে লেখা যাইতে পারে :—

"রোগের অধীন বস্তু আত্মা নহে" (চ)।

ন্যায়শাস্ত্রের conversion নিয়ম (আবর্ত্তন-অনুমান) দ্বারা (চ) বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত হয়—

"আত্মা রোগের অধীন নহে"।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত অংশ দ্বারা আত্মার অনস্তিত্ব ত প্রমাণিত হইলই না, বরং প্রমাণিত যে আত্মা রোগের অধীন নহে।

এখন (খ) বাক্যটিকে গ্রহণ করা যাউক। এস্থলে বলা হইয়াছে—"যাহা অনিত্য, দুঃখদায়ক, বিকারের অধীন, তাহার বিষয়ে বলিতে পারি না যে, 'ইহা আমার, আমি ইহাই, ইহা আমার আত্মা' (পৃঃ ৩০৮)।

এই (খ) অংশকে বিশ্লেষণ করিলে ৯টি বাক্য পাওয়া যায়। এই ৯টির মধ্যে ২টি বাক্য এই :—

১। 'যাহা অনিত্য, তাহা আমার আত্মা নহে' (ছ)।

২। যাহা বিকারের অধীন, তাহা আমার আত্মা নহে (জ)।

(ছ) বাক্যটিকে নিম্নলিখিত আকারে পরিবর্ত্তিত করা যায় :—"অনিত্য বস্তু আত্মা নহে" (ঝ)। 'আবর্ত্তন অনুমান (conversion) প্রয়োগ করিলে (ঝ) বাক্য হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় :—

"আত্মা অনিত্য বস্তু নহে" (ঞ)। এই (ঞ) বাক্যের উপর obversion (ব্যাবর্ত্তন-অনুমান) প্রয়োগ করিলে এই সিদ্ধান্ত হইবে :—

"আত্মা নিত্য বস্তু"।

এইরূপে (জ) বাক্য হইতে সিদ্ধান্ত হইবে :—

"আত্মা নির্ব্বিকার।"

গ্রন্থকার যে-স্থলে দেখিতেছেন (কিংবা দেখিতেছেন বলিয়া মনে করিতেছেন) "আত্মা নাই"— প্রকৃত পক্ষে সে-স্থলে রহিয়াছে

"আত্মা নিত্য ও নির্ব্বিকার'।

তবে কি বুদ্ধ 'নিত্য নির্ব্বিকার আত্মা'র অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন ? বুদ্ধ নিজে সাক্ষাৎভাবে এবিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই।

একবার বচ্ছগোত্ত নামক একজন পরিব্রাজক বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"আত্মা কি আছে ?"

বুদ্ধ চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

তাহার পরে বচ্ছগোত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন...

"আত্মা কি নাই ?

এবারও বুদ্ধ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া রহিলেন।

তখন বচ্ছগোত্ত সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

আনন্দ তখন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি কেন ঐ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিলেন না।

ভগবান্ উত্তর করিলেন, 'আত্মা আছে' বলিলে শাশ্বতবাদের কথা বলা হইত। 'আত্মা নাই' বলিলে উচ্ছেদবাদ স্বীকার করা হইত (সংযুক্তনিকায়, অব্যাকত সংযুত্ত ; P. T. S., Vol. 4, p. 400)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'আত্মা নাই'—বুদ্ধ ইহা বলিতেছেন না ; কিন্তু গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'আত্মা নাই' ইহাই বুদ্ধের মত। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, গ্রন্থকারও স্বীকার করিয়াছেন যে, বুদ্ধ দশটি প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়া গিয়াছেন (পৃঃ ২৯১)। এই ১০টির মধ্যে ছয়টিই আত্ম-বিষয়ক।

তবে কি বুদ্ধের কোন মত নাই ? তিনি নিজে বলিয়াছেন 'তথাগতের সমুদায় মত (দিট্‌ঠি-গতং) অপনীত হইয়াছে' (মজ্‌ঝিম, ১।৪৮৬)।

কিন্তু এ উত্তরে লোকে সন্তুষ্ট হয় নাই। ক্রমাগতই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়েছে, আত্ম-বিষয়ে বুদ্ধের মনোগত ভাব কি ? সম্যক্ আলোচনা না করিয়া এপ্রশ্নের যে উত্তরই দেওয়া যাউক না কেন, পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন। আবার যদি কোন উত্তরই না দেওয়া যায়, তাহা হইলে পাঠকগণ অধিকতর বিভ্রান্ত হইবেন। সেইজন্য এ-বিষয়ে দুই-একটি মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। বুদ্ধ দুইটি বিষয় স্বীকার করিতেন—

(১) অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগৎ

(২) নিত্যাবস্থা।

যাহা রূপ রস-গন্ধ স্পর্শ শব্দাত্মক তাহাই জগৎপ্রবাহ ; এই প্রবাহের অন্তর্গত যাহা, বুদ্ধ তাহাকে 'অনাত্ম' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। প্রত্যেক মানবের জীবন-প্রবাহও অনিত্য। কিন্তু বুদ্ধ বলেন, ইহ-জীবনেই জীবন-প্রবাহের স্থিরত্ব সম্পাদন করা সম্ভব। যখন এই প্রবাহ স্থিরত্ব লাভ করে, তখন ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং প্রজাপতিও "সেই মুক্ত পুরুষের সন্ধান পান না" ('অলগদ্দ'-উপমা নামক সুত্ত, মজ্‌ঝিম, ১।১৪০)।

মুক্ত পুরুষের এইপ্রকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঐ 'অলগদ্দ' উপমাতেই বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে এইপ্রকার বলিতেছেন :—

"হে ভিক্ষুগণ। আমি এইপ্রকার বলি, এইপ্রকার ব্যাখ্যা করি। কিন্তু তবুও কোন-কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃষা, এবং অভূত (অসত্য) বাক্যে অন্যায়রূপে আমার প্রতি এই দোষারোপ করে যে, 'শ্রমণ গোতম বিনায়ক (অর্থাৎ বিনাশক) ; তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ, বি-ভব (বিনাশ, অনস্তিত্ব) প্রচার করেন।' হে ভিক্ষুগণ ! আমি যাহা নহি, আমি যাহা বলি না, সেই বিষয়ে এই সমুদয় ভদ্র শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃষা এবং অভূত বাক্যে আমার প্রতি এই দোষারোপ করে যে, শ্রমণ গোতম বিনায়ক, তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বি-ভব প্রচার করেন" (মজ্‌ঝিম, P. T. S., প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪০)।

বুদ্ধ নিজে বলিতেছেন তিনি বিনাশক নহেন।

আমাদিগের মন্তব্য এই :—চৈতন্য-প্রবাহকে (stream of consciousness) যদি আত্মা বলা যায়, তবে Baldwin, James, Ladd, Wundt প্রভৃতির ন্যায় বুদ্ধও আত্মবাদী। জীবন প্রবাহ, স্থিতিশীল এবং নিত্য অবস্থা লাভ করিতে পারে। এই নিত্যাবস্থা যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ আত্মবাদী।

ধর্ম্মসাধনের জন্য এবং উন্নত জীবন গঠনের জন্য যাহা যাহা স্বীকার করিতে হয়, বুদ্ধ সে-সমুদয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন, 'আত্মদীপ হও, আত্ম-শরণ হও' (মহাপরিঃ ২।২৬), 'আত্মাই আত্মার নাথ' (ধম্মঃ শ্লোক ১৬০,৩৮০) ; 'আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার কর' (ধম্ম, ৩২৭), আত্মাকে রক্ষা কর (ধঃ ১৫৬, ৩১৭) ইত্যাদি। এসমুদয় যদি আত্মবাদের কথা হয়, তবে বুদ্ধ আত্মবাদী।

জীবন-প্রবাহকে যদি আত্মা সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধ অনাত্মবাদী।

যাঁহারা মনে করেন চৈতন্য-প্রবাহের পশ্চাতে একটি পৃথক্ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় অজ্ঞেয় নির্গুণ সত্তা রহিয়াছে—এবং সেই সত্তাই আত্মা, তাঁহাদের মতে বুদ্ধ অনাত্মবাদী।

যাঁহারা বলেন হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটি অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ রহিয়াছে—এই পুরুষই আত্মা, তাঁহাদের মতে বুদ্ধ অনাত্মবাদী।

যাঁহারা দেহ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার কিম্বা বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে বুদ্ধ অনাত্মবাদী।

এ-প্রবন্ধে এ-বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করা সম্ভব নহে।

সক্কায়-দিট্‌ঠি

দশ সংযোজনের একটি সংযোজন সক্কায় দিট্‌ঠি। আমাদিগের গ্রন্থকার ইহার অর্থ করিয়াছেন "'আমি আছি'—এই ভ্রান্তি"। এই অর্থ ভ্রমাত্মক।

বৌদ্ধ সংস্কৃতে এই শব্দের প্রতিশব্দ সৎকায়-দৃষ্টি। 'দেহ-সৎ' এই মতকে 'সৎকায়-দৃষ্টি' বলা হয়। Childers তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন, ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ "স্ব-কায়-দৃষ্টি"। নূতন পালি অভিধানে এই মত গৃহীত হয় নাই। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ যাহাই হউক না কেন, ইহার অর্থ-বিষয়ে কোন-প্রকার সন্দেহ নাই।

ত্রিপিটকের বহুস্থলে সক্কায় দিট্‌ঠির বিস্তৃত বিবরণ আছে, যেমন, P. T. S. সংস্করণের মজ্‌ঝিম নিঃ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০০; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭, সংযুত্ত-নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪, ১০২, ১৮৮; চতুর্থ খণ্ডের ২৮৭ পৃঃ; বিভঙ্গ, পৃঃ ৩৬৪ ইত্যাদি। 'পটি-সম্ভিদা-মগ্‌গ' গ্রন্থে ইহার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে (১।১৪৩-১৫১)। এই সমুদয় স্থলে দেখা যায় যে সৎকায় দৃষ্টি ২০ প্রকার। রূপ-বিষয়ে সৎকায়-দৃষ্টি চারি প্রকার (১) রূপই আত্মা, (২) আত্মা রূপবান্, (৩) আত্মাতে রূপ, (৪) রূপে আত্মা। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান—এই চারিটির প্রত্যেকটির বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত ৪ প্রকার মত, যেমন—(১) বিজ্ঞানই আত্মা, (২) আত্মা বিজ্ঞানবান্, (৩) আত্মাতে বিজ্ঞান, এবং (৪) বিজ্ঞানে আত্মা। সুতরাং মোট ২০টি মত পাওয়া যাইতেছে। কায়-বিষয়ক অর্থাৎ আত্ম-বিষয়ক এই ২০ প্রকার দৃষ্টির নাম সৎকায়-দৃষ্টি।

এস্থলে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। এস্থলে 'কায়' কে 'আত্মা' বলা হইয়াছে। বৌদ্ধযুগে অনেকেই দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করিত। এইজন্য দেখা যায় অনেকে প্রশ্ন করিত, "দেহ ও আত্মা কি এক?" (দীঘ, ৯.২৬, মজ্‌ঝিম ৬৩, ৭২; সংযুত্ত-নিকায়ের অব্যাকত সংযুত্ত, ইত্যাদি)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'আমি আছি এই ভ্রান্তি' বুঝাইবার জন্য 'সক্কায় দিট্‌ঠি' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

"অতীন্দ্রিয় সত্তা"

গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন—"বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; ইহাতে অতীন্দ্রিয় সত্তাতে বিশ্বাস একেবারেই নাই।" পৃঃ ৩০১।

যাহা পূর্ণ মাত্রায় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস হইতে পারে না,—এপ্রকার যুক্তির সারবত্তা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম্মে অতীন্দ্রিয়-বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েকটি এই :—

(১) সংসার অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; কল্প-কল্পান্তরে কত জগৎ হইয়াছে, তাহার সীমা নাই।

(২) কল্পকল্পান্তরে জন্ম জন্মান্তর।

(৩) স্বর্গ, নরক। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে স্বর্গ-নরকের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থকার অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন—"বুদ্ধ……আপনার সাধন-প্রণালীতে অতীন্দ্রিয় সত্তার স্থান রাখেন নাই"। (পৃঃ ২৬৩)।

গ্রন্থকারের এই মত আমরা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তিনি নিজেই একস্থলে বুদ্ধের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"আমি যে ধর্ম্ম অধিগত হইয়াছি, তাহা সুগভীর, দুর্দ্দর্শ্য, দুর্ব্বোধ্য, শান্তিপ্রদ, মহোচ্চ, তর্কের অগোচর, দুরূহ, (কেবল) পণ্ডিতগণের বেদনীয়" (বিনয়পিটক, মহাবগ্‌গ, ১।৫।২) (পৃঃ ২৯৮)। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের পক্ষেই এই প্রকার উক্তি সম্ভব।

ইহা সত্য যে বুদ্ধপ্রদর্শিত ধর্ম্মের অধিকাংশই সাধারণের বোধগম্য। কিন্তু অষ্ট বিমোক্ষের শেষ ৫টি সোপান এবং অরূপ ধ্যান অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অবোধ্য। বিমোক্ষের চতুর্থ স্তরেই রূপ, সংজ্ঞা এবং ইন্দ্রিয়মূলক জ্ঞান তিরোহিত হয়। বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তনে বিহার, 'কিছুই নাই' এই অবস্থায় বিচরণ, 'সংজ্ঞাও নাই অসংজ্ঞাও নাই' এই অবস্থায় অবস্থান, সংজ্ঞা ও বেদনার অতীত অবস্থা—এ সমুদায়ই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা (মহানিদানসুত্ত, ৩৫; মহাপরিনির্ব্বান-সুত্ত, ৩।৩৩)।

অরূপ ধ্যান ও অনুরূপ এবং অতীন্দ্রিয়।

অতীন্দ্রিয় উপায়ে গোতম কি কি বিষয় অনুভব করিতে পারেন, তাহা মজ্‌ঝিম নিকায়ের মহা-সীহনাদ-সুত্তে বর্ণিত আছে।

'অলগদ্দ' উপমাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষ ইহলোকেই এমন অবস্থা লাভ করেন যে, ইন্দ্র ব্রহ্ম এবং প্রজাপতিও তাঁহার সন্ধান পায় না। (মজ্‌ঝিম, ২২)।

এসমুদায়ই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়।

'সংযুত্ত-নিকায়' গ্রন্থের 'মার-সংযুত্ত' এর অন্তর্গত কস্সকম্ (কৃষক) নামক অংশে রূপকচ্ছলে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। মার গোতমকে বলিল—হে শ্রমণ! চক্ষু ও রূপ, শ্রোত্র ও শব্দ, নাসিকা ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় ও স্পর্শ, মন ও তাহার বিষয় এবং এই সমুদায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-বিষয়-মূলক রাজ্য আমারই। হে শ্রমণ! তুমি কোথায় গমন করিয়া আমা হইতে রক্ষা পাইবে?"

গোতম বলিলেন—হে পাপাত্মা! চক্ষু ও রূপ, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয়াদিমূলক রাজ্য তোমারই। কিন্তু হে পাপাত্মা—যেখানে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়-মূলক রাজ্য নাই, হে পাপাত্মা সেখানে তোমার গতি নাই।

সর্ব্বশেষে গোতম বলিলেন—"হে পাপাত্মা! জানিও আমার মার্গ তুমি দেখিতে পাইবে না" (৪।২।৯)।

এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গোতমের মতে চক্ষুকর্ণাদির অতীত রাজ্যও আছে।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম

গ্রন্থকার পূর্ব্বোক্ত অংশের পরেই লিখিয়াছেন :—

"যিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে চিত্তের নিভৃততম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না" (পৃঃ ৩০২)।

আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক বুদ্ধ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন কি না।

আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই :—বুদ্ধ যে কেবল দেবগণ ও দেবরাজ ইন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন তাহা নহে; তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন। ইহার বর্ণনা এই :—

তিনি ব্রহ্মা, মহা ব্রহ্মা, প্রভু (অভি-ভূ), অজেয় (অনভি ভূত), সর্ব্বদর্শী (অঞ্ঞদত্থু-দসো), নিয়ন্তা (বস-বত্তি), ঈশ্বর (ইস্সর),

কর্ত্তা (কত্তা), নির্ম্মাতা (নিম্মাতা), শ্রেষ্ঠ (সেট্‌ঠ) বিধাতা (সজ্জিতা) বশী (বসী), ভূত-ভবিষ্যতের পিতা (পিতা ভূত-ভব্যানং)। (দীঘ, ব্রহ্মজাল-সুত্ত, ২১৫ ; মজ্‌ঝিম, ব্রহ্ম-নিমন্তিক-সুত্ত, ইত্যাদি)।

প্রায় সমুদায় ধর্ম্ম সমাজের ঈশ্বর এবং বুদ্ধের এই ব্রহ্মা একই ; এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে পৌরাণিক ব্রহ্মার ন্যায় এ ব্রহ্মাও মহাপ্রলয়ে লীন হন এবং নূতন কল্পে আবার সমুত্থিত হইয়া থাকেন।

শঙ্করের পরমব্রহ্ম জ্ঞান-স্বরূপ ; কিন্তু তাঁহার আত্মজ্ঞান বা জ্ঞান-কর্ত্তৃত্ব নাই। তাঁহাতে কোন প্রকার শক্তি আরোপ করা যায় না। যে স্থলে আত্ম জ্ঞান এবং শক্তি, সেই স্থলেই পরিবর্ত্তন। সুতরাং শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম আত্ম-জ্ঞানবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকার শক্তিবিহীন। শঙ্কর ঈশ্বর স্বীকার করিতেন, কিন্তু সে ঈশ্বর পরিবর্ত্তনশীল ও অনিত্য।

এবিষয়ে শঙ্কর এবং বুদ্ধে কোন পার্থক্য নাই। বুদ্ধের মতে জ্ঞান ও শক্তি অনিত্য। ইহাদিগের উদ্ভবও আছে, বিলয়ও আছে। বুদ্ধ অনিত্য বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বরও অনিত্য, সুতরাং ঈশ্বরের কোন প্রাধান্য নাই। শঙ্কর একটিমাত্র নিত্য বস্তু স্বীকার করিতেন এবং এই নিত্য বস্তুর নাম পরব্রহ্ম। বুদ্ধও একটি নিত্য সত্তা স্বীকার করিতেন। ইহার নাম পরব্রহ্ম না হইতে পারে, কিন্তু পরব্রহ্ম যাহা, ইহাও তাহাই।

নিত্য সত্তা

বুদ্ধ এ-বিষয়ে এইপ্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! এমন এক আয়তন আছে, যাহাতে পৃথিবী নাই, জল নাই, তেজ নাই, বায়ু নাই, যাহাতে আকাশের অনন্ত আয়তন নাই, বিজ্ঞানের অনন্ত আয়তন নাই, অবস্তুর আয়তন নাই, সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞার আয়তন নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই, চন্দ্র ও সূর্য্য এতদুভয়ও নাই। আমি ইহাকে আগমনও বলি না, গমনও বলি না ; স্থিতিও বলি না, চ্যুতিও বলি না এবং উপপত্তিও বলি না। ইহা প্রতিষ্ঠাবিহীন, প্রবর্ত্তন-বিহীন ও নিরালম্ব ; এবং ইহাই দুঃখের অন্ত। (উদান, পাটলিগামিয় বগ্‌গ, ১ ; ২ ; ৩—এই তিন স্থলে উক্ত অংশ তিনবার উক্ত হইয়াছে)।

বুদ্ধের নিম্নলিখিত উক্তি 'উদান' এবং 'ইতিবুত্তক' এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যায় :—

"হে ভিক্ষুগণ! এমন কিছু আছে যাহা অজাত (অজাতং), অভূত (অভূতং) অকৃত (অকতং) এবং অযৌগিক (অসংখতং)। হে ভিক্ষুগণ! যদি অজাত, অভূত, অকৃত, এবং অযৌগিক (কোন বস্তু) না থাকিত, তাহা হইলে জাত, ভূত, কৃত ও যৌগিক বস্তুর মুক্তি সম্ভব হইত না। হে ভিক্ষুগণ! যেহেতু অজাত, অভূত, অকৃত ও অযৌগিক (কোন এক বস্তু) আছে সেইজন্য জাত, ভূত, কৃত ও যৌগিক বস্তুর মুক্তি সম্ভব।" (উদান, পাটলিগামিয় বগ্‌গ, ৩ ; ইতিবুত্তক, ৪৩)।

এই যে অজাত, অভূত ও অকৃত মৌলিক সত্তার কথা বলা হইল, বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার কি নাম? অনেকেই বলিবেন—ইহার নাম 'নির্ব্বাণ'। নাম যাহাই হউক না কেন, ইহা উপনিষদের পরম ব্রহ্ম।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে নির্ব্বাণের যে বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেও ঠিক ইহাই প্রমাণিত হইবে। এই নির্ব্বাণ অচ্যুতস্থান (ধম্মপদ ২২৫), অচ্যুতপদ (থেরী ৯৭), শান্তপদ (ধম্মপদ ৩৬৮), বিরজ (থেরগাথা, ২২৭), পরম সুখ (ধঃ পঃ ২০৪, ২০৩) ইত্যাদি। পটি সম্ভিদা মগ্‌গ নামক গ্রন্থের এক স্থলে (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪) ইহার ১৪টি এবং অপর এক স্থলে (২।২৩৮-২৪১ পৃঃ) ৪০টি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার কয়েকটি এই—নিত্য, ধ্রুব, ত্রাণ, শরণ, লয়ন (আশ্রয়), সুখ, পরমার্থ, সার, অবিপরিণামধর্ম্মা, অবিকার, অভয়, অচল, অজাত, অজর, অমৃত, অশোক, অনিমিত্ত ইত্যাদি। এসমুদায় একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিশেষণ হইতে পারে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে তুরীয় ব্রহ্ম-বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে :—

"যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়। যিনি একাত্ম প্রত্যয়ের বিষয় পঞ্চবিষয়ের অতীত, শান্তি-মঙ্গলময় ও অদ্বৈত, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে চতুর্থ বলিয়া জানেন।" নির্ব্বাণ ও পঞ্চ স্কন্ধের অতীত, সংজ্ঞার অতীত, অসংজ্ঞার অতীত এবং অনাখ্যাত।

নির্ব্বাণে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অবস্তু, ইহলোক, পরলোক, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি কিছুই নাই। উপনিষদেও ব্রহ্ম-বিষয়ে বলা হইয়াছে।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

মুণ্ডক, ২।২৯।

নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম যে একই বস্তু, তাহা শঙ্করাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণেরও মত। বেদান্ত ভাষ্যে শঙ্কর এ-বিষয়ে এইপ্রকার লিখিয়াছেন :—

(১) ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য—ব্রহ্ম মোক্ষ-স্বরূপ (১।১।৪, ভাষ্য)।

(২) ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষ :—ব্রহ্মভাবেই মোক্ষ (১।১।৪)।

(৩) ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা—মুক্তির অবস্থা ব্রহ্মই (৩।৪।৫২)।

(৪) "এই মোক্ষ পরমার্থতঃ কূটস্থ নিত্য ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব, স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাব—ইহাই অশরীরী মোক্ষ, ইহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কালত্রয় কিছুই নাই। এই-জন্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—ইহা ধর্ম্ম হইতে পৃথক্‌, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্‌, ভূতভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্‌ ইত্যাদি। (কঠ ১।২।১৪)। ইহাই অর্থাৎ এই মোক্ষই ব্রহ্ম" (১।১।৪, ভাষ্য)।

৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে (৪।৪।৯), শঙ্করাচার্য্য স্মৃতিশাস্ত্র হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

অপুণ্যপুণ্যো পরমে যং পুনর্ভব-নির্ভয়াঃ ;
শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ।

অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যের উপরম হইলে পুনর্জ্জন্মবিমুক্ত হইয়া শান্ত সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সেই "মোক্ষরূপী"কে নমস্কার।

নির্ব্বাণ, মোক্ষ এবং পরব্রহ্ম একই বস্তু।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে স্রষ্টা ও ঈশ্বর বলা হয়—বুদ্ধ তাহা মানিতেন। কিন্তু বেদান্ত ও বুদ্ধ উভয়েরই মতেই এই ঈশ্বর অশাশ্বত।

বুদ্ধ ও বেদান্ত উভয়ই এক নিত্যসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ইহার নাম নির্ব্বাণ বা পরব্রহ্ম ; উভয়েরই মতে ইহা পরমা গতি, পরম শরণ।

সুতরাং বুদ্ধ ঈশ্বরও মানিতেন, পরব্রহ্মও মানিতেন। এই স্থলেই আলোচনা শেষ করিতে হইল। মতভেদ আছে বলিয়া পাঠকগণ যেন মনে না করেন এ গ্রন্থের মূল্য নাই। মত-ভেদ থাকিবেই এবং সে-বিষয়ে আলোচনা হইবেই। বড় বড় তিনটি প্রবন্ধে যে-গ্রন্থের সমালোচনা হয়, সে গ্রন্থ নিশ্চয়ই মূল্যবান্‌। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এইপ্রকার গ্রন্থ প্রথম রচিত হইল। আশা করি ইহার সমুচিত আদর হইবে।



কুড়লরাম রচিত :: ঢেঁকীরাম বিচিত্রিত

ভূমিকা

পাঠক, বৌবাজারের বড় রাস্তার উপরে ঐ যে তিনতলা বাড়ীখানা দেখ্‌ছেন ওটি বাংলার বিখ্যাত বিজ্ঞান-ব্যাকরণ ও ব্যবসাবিদ্‌ দেশভক্ত শ্রীহসন্তচন্দ্র তরফদার এম্‌. এস্‌সি, বি.এল্‌, পিএইচ.ডি, মহাশয়ের পৈতৃক বাড়ী। ওর ছাদের উপর যে আবর্জ্জনার মতো অনেক-কিছু দেখা যাচ্ছে, ও-সব আবর্জ্জনা নয়, কলকব্জা। Radio, lightning conductor ইত্যাদির খুঁটি উঁচিয়ে বাড়ীখানা যেন আকাশকে চ্যালেঞ্জ কর্‌ছে। Rain gauge, weather cock, sundial ইত্যাদি আর যা-কিছু ছাদে জমা হ'য়ে আছে, তা সবই হসন্ত-বাবুর দৈনিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও তাঁর পিতৃঅর্থে সংগৃহীত। ভিতরেও automatic fly-catchers, electric cock-roach-exterminator, hydraulic হামান দিস্তা, ইত্যাদি যন্ত্র-পাতিতে ভর্ত্তি। তা ছাড়া হসন্ত-বাবু নানা স্বাস্থ্যকর জায়গার হাওয়া compressed air cylinder-এ ক'রে এনে বাড়ীতে রেখেছেন ও এই উপায়ে ইচ্ছামতো দার্জ্জিলিং, পুরী, রাঁচি ও হাজারীবাগের হাওয়া খেয়ে থাকেন। প্রাকৃতিক কোনো বাধা তিনি যেমন স্বীকার করেন না, পোষাক-টোষাকও তাঁর তেমনি স্বাধীন ভাবাপন্ন। তাঁর আবিষ্কৃত combined safety pyjama ও কোঁচান ধুতি প'রে অতি অসাবধান লোকেও অবাধে লজ্জা নিবারণ কর্‌তে পারে। তাঁর প্রস্তুত two-in one hold-all overcoat আজকাল ট্রেণের যাত্রীদের প্রধান আসবাবরূপে গণ্য হচ্ছে।' তিনি ব্যায়ামে বিশ্বাস করেন না; injection ও mechanical muscle squeezing এর সাহায্যে শরীর ভাল রাখেন। হসন্ত-বাবু যে বাংলার এডিসন একথা তাঁর ভাই বোন নির্ব্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেন। এক কথায় হসন্ত-বাবু অত্যন্ত উঁচুদরের একজন হালি মানুষ, অর্থাৎ কি না modern man।

ব্যাকরণে এবং ভাষাতত্ত্বেও হসন্ত বাবু কম যান না। প্রথমত এটা তাঁর একটি বংশগত ক্ষমতা। হসন্ত-বাবুর বাবা শ্রীহরকুমার ব্যাকরণবাগীশও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং নিজের লঙ্কার আড়ত থাকা



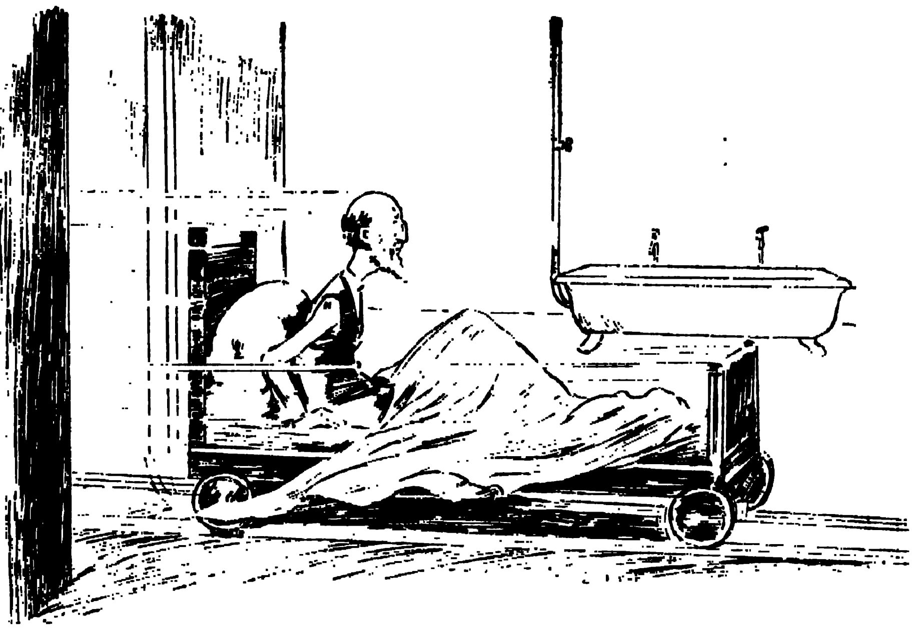
Combined Safety পায়জামা ও কোঁচান ধুতি

সত্ত্বেও বড় ছেলের নাম রেখেছিলেন হসন্ত, মেজ ছেলের নাম কারক ও একমাত্র কন্যার নাম বিভক্তি। কারক ও বিভক্তি বাবার গুণ কিছুই পায়নি ব'লেই বোধহয় ভগবান অধিক মাত্রায় হসন্তকে পিতৃগুণে গুণী করেছিলেন। হসন্তের লিখিত থীসিস্‌গুলি সব ছাপা হ'লে ডবল ক্রাউন আট-পেজী ৫০,০০০।৬০,০০০ পৃষ্ঠা হ'ত সন্দেহ নেই। সচরাচর বৈয়াকরণরা যে-ভাবে ভাষাকে কেটে কুটে নীরস ক'রে তোলেন, হসন্ত-বাবু সে রকম করেন না। তাঁর মতে ভাষাটা একটা জীবন্ত জিনিষ, তার সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্বন্ধ, সুতরাং দেহ ও মনোবিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ব্যাকরণ খোলবর্জ্জিত হুঁকার ন্যায়ই অকেজো। হসন্ত-বাবু একবার একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন "এই যে একটা চেষ্টা আদিমকাল থেকে চ'লে আস্‌ছে, মানুষের মনের রাস্তা ধ'রে সোজা—নিজের তার মনোভাবগুলিকে পরিষ্কার সুমধুর, দ্ব্যর্থবর্জ্জিত ভাবে ব্যক্ত কর্‌তে। এর মধ্যে আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি অন্বয়, সমন্বয় ও সম্ফুট আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা," তখনই সকলে বলেছিল, "আর শব্দরূপ আওড়ালে চল্‌বে না।" এই আদর্শ হসন্ত-বাবুর সকল লেখার মধ্যে দেখা যায়। তাঁর লিখিত "Phonetics in Bengali Poetics and the Influence of the palatal "চ" the dental "ল" and the labial "ম" on the Composition of Nineteenth Century Lyrics" যে পড়েছে সেই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হয়েছে, যে তার মধ্যে তিনি কবিতা লেখা ব্যাপারটার ভাষাতত্ত্বের দিক্‌টা অঙ্কশাস্ত্রের মতোই জলবৎ বুঝিয়ে দিয়েছেন। "On the amazing Absence of the Vowel ঌ (লি) in Bengali Blank Verse" নামক হস্তলিখিত একখানি প্রকরণেও হসন্ত-বাবু বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। হসন্ত-বাবুর মতে বিজ্ঞান-ব্যাকরণ ও দর্শন পরস্পর অনুবন্ধী, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গশস্ত ভূখণ্ড যেমন অর্থহীন, বিজ্ঞানবর্জ্জিত ব্যাকরণ, ব্যাকরণ বর্জ্জিত বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণ বর্জ্জিত দর্শন, ও দর্শন ও বিজ্ঞান বর্জ্জিত ব্যাকরণ এবং দর্শন ও ব্যাকরণ বর্জ্জিত বিজ্ঞানও সেইরূপ অর্থহীন। "ইহাদের অর্থাৎ জ্ঞানের সকল শাখার পরস্পর অবিচ্ছিন্নতার আদর্শ আমাদের চিরাম্বিত রাখ্‌তে হ'বে, এই আদর্শই জ্ঞানজগতের সেই আদিম নীহারিকাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আরম্ভ ক'রে আজ Benedetto Croce (বেনেদেত্তো ক্রোচে) অবধি জ্ঞানজীবীদের একমাত্র অন্বেষিত।" এই কথাগুলি হসন্ত-বাবুর লেখা "The Incidence of the Nativity of the Great on Terrestrial Tremulation as found in Seismographic Records" পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত এই পুস্তিকাতে হসন্ত-বাবু প্রমাণ করেছেন যে মহাপুরুষ-

দের জন্মকালে শুধু তাঁদের গর্ভধারিণীরাই যে যন্ত্রণা পান তা নয়,মাতা ধরিত্রী দেবীও তৎকালে সেইরূপ যন্ত্রণাজনিত কম্পনে মুহুর্মুহু কম্পিত হন। হসন্ত-বাবু ঐরূপ পাণ্ডিত্য- পরিচায়ক আরো দুই-পাঁচটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। C. S. P. C. A.এর ভারবাহী জীবের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কারণ অনুসন্ধান সভার সভ্যরূপে হসন্তবাবু "Pyrotechnical Publicity and its Effects on Vertibrate Assoioates of the Vehicular Traffic on the Howrah Bridge and Elsewhere" নামে একটি প্রকরণ সভায় উপস্থিত করেন। ইহাতে হসন্ত-বাবু দেখিয়েছেন, যে, অত্যুজ্জ্বল আলোক-মালাশোভিত সিগারেট, বিস্কুট প্রভৃতি দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের ঔজ্জ্বল্য ও খামখেয়ালী রকম জলা ও নিভার জন্য ভারবাহী ঘোড়া, গরু ও মহিষদের বিশেষ স্নায়বিক অনিষ্ট হয়। তাঁহার মতে, হয় ঐ সব বিজ্ঞাপন তুলে দেওয়া দরকার, নয় ঐ সকল জীবজন্তুদের জন্য নীল কাঁচের চশমার বন্দোবস্ত করা বিধেয়।

আর একটি পুস্তিকায় হসন্ত-বাবু দেখিয়েছেন যে বঙ্গদেশের জমির মাটির প্রকৃতির সহিত তাহার মহাপুরুষদের আবির্ভাব বিশেষরূপে জড়িত। তিনি দেখিয়েছেন যে, হালি-সহর (রামপ্রসাদ), নান্নুর (চণ্ডীদাস), কেঁদুলী (জয়দেব) ফুলিয়া (কৃত্তিবাস), রাধানগর (রামমোহন), বীরসিংহ (বিদ্যাসাগর), জোড়াসাঁকো (রবীন্দ্রনাথ), কলুটোলা (কেশবচন্দ্র), শ্যামবাজার (বিবেকানন্দ), রামবাগান (রমেশচন্দ্র), কাঁঠালপাড়া (বঙ্কিমচন্দ্র), প্রভৃতি সকল স্থানের মাটিই এক প্রকার অর্থাৎ alluvial (পলিপড়া)। আর বেশী লিখিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। হসন্ত-বাবু যে একজন অসাধারণ ব্যক্তি এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের বলাকার "ছবি" কবিতাটিকে "Theory of Relativity"র কাব্যানুবাদ প্রমাণ ক'রে কবি-মহলে খ্যাতিলাভ করেছেন এবং ত্রিবঙ্কুরম ও আরাবল্লি অঞ্চলে ভ্রমণ ক'রে ও রামায়ণটি তন্ন তন্ন ক'রে "ষ্টাডি" ক'রে "Recruitment and Mobilisation of Infantry in Ancient India" নামক প্রবন্ধ লিখে স্বয়ং জঙ্গি-লাটের ধন্যবাদ লাভে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীহসন্তচন্দ্র তরফদারের নাম জ্ঞানরাজ্যের সর্ব্বঘটে বিদ্যমান, তাঁর জ্ঞানচ্ছায়া "নর্শরির" (চারাবাড়ীর)মতো বিভিন্ন জ্ঞানবৃক্ষের চারাকে পুষ্ট ক'রে বাড়িয়ে তুলেছে। বাৎস্যায়ণ থেকে Havelock Ellis (হ্যাভেলক এলিস); বেদব্যাস থেকে H. G. Wells (এইচ, জি, ওয়েল্স্); Plato (প্লেটো) থেকে Bertrand Russel (বার্ট্রাণ্ড রাসেল) Bergson (বার্গসঁ) ও Giovani Gentile (জিওভানি জেন্টিলে); Laotze (লাওটসে) ও Confucius (কনফুসিয়াস) থেকে Paul Richard(পল রিসার); Adam Smith (এ্যাডাম স্মিথ) থেকে ডাক্তার প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তানসেন থেকে কাজি নজরুল ইসলাম; Herodotus (হেরডোটাস্) থেকে অমর মুখোপাধ্যায়; জৈন মহাবীর থেকে Jinarajadasa (জীনরাজোদাস); চাণক্য থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ; বাণভট্ট থেকে যাদবেশ্বর তর্করত্ন; Michael Angelo (মাইকেল এঞ্জেলো) থেকে হেমেন মজুমদার; পাণিনি থেকে লোহারাম শর্ম্মা; Homer (হোমার) ও Aristophanes (এ্যারিষ্টোফেনিস) থেকে Hillaire Belloc (হিলোয়ার বেলক) ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়; ইত্যাদির মারফতে প্রাপ্ত সর্ব্ব দেশকাল-প্রসূত জ্ঞান-সম্ভার হসন্ত বাবুর মস্তিষ্ক মিউজিয়ামে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

হরকুমার ব্যাকরণবাগীশ মহাশয় যখন জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হসন্ত রেখেছিলেন তখন তাঁর একবারও ব্যাকরণ-পূজা ব্যতীত অন্য কোনো কথা মনে হয়-নি। কিন্তু তাঁর প্রতিভা-সম্পন্ন পুত্র নিজের নামটি একের অধিক উপায়ে সার্থক করেছিলেন। হসন্ত-বাবুর শক্তি ছিল অনেক, যদিও সর্ব্বদাই কোনো না কোনো আদর্শ বা ব্যক্তির পিছনে, ব্যঞ্জনবর্ণের পিছনে হসন্তের (্) মতো, লেগে থাকতেন। ব্যঞ্জনবর্ণবর্জ্জিত হসন্তের যেমন কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কেহ জানে না, কোনো মহাপুরুষের বা মহান্ আদর্শের সংস্রব বর্জ্জিত হসন্তচন্দ্র তরফদারের অস্তিত্বও সেই রকম কেহ কল্পনা করে না। আত্মবিলোপ আর কাহাকে বলে? দুর্ভেদ্য বনানীর ঘনশাখা-প্রশাখাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজির মধ্যে সতত ভ্রমণ ক'রে, শার্দ্দূল-



হসন্ত-বাবুর স্নানযাত্রা

শাবক যেমন ক্রমশঃ সুস্থ বর্দ্ধিতদেহ এবং মহাবলে বলীয়ান্ হ'য়ে ওঠে; জ্ঞানবনানীর অনন্ত "ism" ও "logy"মালার উন্মুক্তির মধ্যে জ্ঞানশার্দ্দূল হসন্তও তেমনি ক্রমশঃ চির উন্নতির মধ্যে এগিয়ে চল্‌ছিল। আপনা অপেক্ষা কোনো বৃহত্তর শার্দ্দূলের সঙ্গলাভ কর্‌লে হসন্ত তাহার পশ্চাতে কিছুকাল যুক্ত থাকৃত কিন্তু সে কখনো নিজের অন্তরের প্রেরণাকে প্রত্যাখান ক'রে এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকৃত না। কোথাও কোনো সময় যদি কোনো নিরীহ নির্ব্বোধ পুষ্টদেহ জ্ঞানগাভী বা জ্ঞান-গর্দ্দভের দর্শনলাভ কর্‌ত তা হ'লে অচিরাৎ তাহার রক্তপানোদ্দেশ্যে হসন্ত সেই দিকে ধাবমান হ'ত। অর্থাৎ কখনো বিনীত এবং কখনো বা হিংস্র ভাবে সর্ব্বদাই হসন্ত-বাবু কোনো না কোনো ব্যক্তি বা জ্ঞানমতের পিছনে লেগে থাকৃতেন। কেউ কেউ বল্‌ত তাঁর তরফদার নামের জন্যেই তাঁর স্বভাব হয়েছিল কোনো না কোনো তরফে সর্ব্বদা যুক্ত থাকা। যাই হোক এখন যে ঘটনাটার কথা বল্‌তে চাই সেটা বলি।

আসল ঘটনা

(১)

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একদিন হসন্ত-বাবু সকাল ছটায় ঘুম থেকে উঠ্‌লেন। একটি সুইচ্ টিপ্‌তেই রেলের উপর বসান খাটখানা ধীরমন্থরগতিতে তাঁকে নিয়েই স্নানের ঘরের দিকে চল্‌ল। অম্‌নি পাশের ঘরের গ্রামোফোনটাতে আপনাআপনি সানাইয়ের সুরে একটা রামকেলীর আলাপ বাজ্‌তে সুরু কর্‌ল; স্থট ক'রে তোতা পাখীটার খাঁচার ঢাক্‌নীটা প'ড়ে গেল, আর সেটা "অসতোমাসদ্গময় তমসোমাজ্যোতির্গময়............" ইত্যাদি অবিশ্রান্ত আবৃত্তি কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, বাবুর্চ্চিখানায় নিদ্রিত মান্দ্রাজী বাবুর্চ্চিটার কানের পাশে দুম্ ক'রে একটা পট্‌কা ফুটে গেল আর সে লাফ্ দিয়ে উঠে প্রাতরাহারের আয়োজনে মেতে উঠ্‌ল। এক কথায় হসন্ত বাবুর ঘুম ভাঙ্গাতেই automatically সমস্ত বাড়ীটা নবজাগরণের অধীর চাঞ্চল্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। হসন্ত-বাবু দেহের নানা স্থানের চামড়ার স্বাস্থ্য

ও অবস্থা অনুযায়ী নানাপ্রকার তেল মেখে স্নান ক'রে উঠে, একটা টিনের বাক্সের মধ্যে মাথাটা ভ'রে কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর একবার "উঃ" ব'লে চেঁচিয়ে মাথাটা বাক্সর ভিতর থেকে বের ক'রে নিলেন। বাক্সটায় গুটিকতক মৌমাছি ছিল। হসন্ত-বাবুর বিশ্বাস যে, প্রয়োজন ও ব্যবহার না থাকলে প্রকৃতি মানুষকে কোনো কিছুই দেয় না, সুতরাং যদি তাঁর ঈষৎ টাক ভাবাপন্ন মাথায় তিনি নিয়মিত মৌমাছির কামড় খান তাহ'লে নাকি প্রকৃতি তাঁর মস্তকে এতদুদ্ভূত প্রয়োজন অনুযায়ী কেশোদ্গম করিয়ে তবে ছাড়বে।

তাঁর একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এই ষট্‌পদ-হুল সেবনের পিছনে। এই প্রচণ্ড বিজ্ঞান-তৃষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো ধর্মভীরুতার ধারা প্রবাহিত ছিল। টিকি জিনিষটা আসলে ছোটো হ'লেও তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অপূর্ব বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হ'তে থাকে একথা তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতেন ও টাকাক্রান্ত মস্তকে টিকি গজিয়ে এ বিষয়ের চরম মীমাংসা করবার জন্যেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক এই মধুকর-কামড়-প্রথায় কেশোদ্গমের চেষ্টা করতেন। তাঁর এই দারুণ ধর্ম্ম-গোঁড়ামীর সঙ্গে অপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভার একত্রসমাবেশ দেখে অনেকে আশ্চর্য্য হ'ত বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁর বহিরাবরণ, combined (মিশ্র) কোঁচান ধুতি ও safety (বিপদ-বারণ) পায়জামা, বিরাট্ Gogglesএর সঙ্গে এই স্বদেশী বৈদ্যুতিক টিকির সামঞ্জস্য দেখলেই তবে লোকে বুঝবে যে,জগৎ-সিংহ ও ওসমানের স্থান একস্থানেই সম্ভব।

তারপর হসন্ত বাবু প্রাতরাহার সেরে আফিস ঘরে এসে বসলেন এবং খবরের কাগজগুলি লাল নীল পেন্সিলের দাগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। এ সমস্ত পরে তাঁর কেরাণী সযত্নে কাঁচি দিয়ে কেটে ফাইল ক'রে রাখবে। হঠাৎ একটা কাগজের একটা খবর প'ড়ে হসন্ত-বাবু বেড়ালের ইঁদুর ধরার মতো তড়িৎ গতিতে সেটার উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং খুব দ্রুতবেগে লেখাটার চারি পাশে মোটা ক'রে কয়েকটা লাল নীল দাগ দিয়ে দিলেন। তার উপরে লিখলেন, "৪৫৫৩"। তার পর টেবিলের গায়ে লাগান একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টিপতেই কেরাণী হরহরি এসে দাঁড়াল। হসন্ত-বাবু বল্লেন, "হরহরিবাবু আমাকে 'ন্যাশন্যাল ডিফারেন্‌সিয়া ফাইলটা' এনে দিন্‌ত।" হরহরি ফাইলটা আন্‌তে চলে গেল।

'ন্যাশন্যাল ডিফারেন্‌সিয়া' ফাইলটাতে হসন্ত-বাবু আমাদের সকলপ্রকার জাতীয় অনন্যসাধারণতার হিসাব রাখতেন। আমাদের জাতি অন্যান্য জাতির তুলনায় কোথায় কোথায় বিভিন্ন, কি কি দোষগুণ আমাদের আছে যা অপর জাতির নেই এই সবের খবর হসন্ত-বাবুর এই ফাইলটির মধ্যে পাওয়া যেত। চার পাঁচ বছর আগে শ্রী স্বামী অত্যুচ্চানন্দের পিছনে হসন্ত-বাবু কিয়ৎকাল যুক্ত ছিলেন। স্বামীজিই প্রথম হসন্ত-বাবুর দৃষ্টি আমাদের জাতীয়তা ও জাতীয় অবনতির দিকে আকর্ষণ করান। হসন্ত বাবু তখনই ব'লেছিলেন যে,জাতীয় অবনতির কারণ প্রকৃষ্টরূপে নির্দ্ধারণ না ক'রে জাতীয় উন্নতির চেষ্টা হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার সহিত তুলনীয়। Diagnosis(রোগ-নির্ণয়)ই যদি না হ'ল, তা হ'লে চিকিৎসা করা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার চেয়ে কি আর কম হ'ল? স্বামীজি যতই বলেন,জাতিভেদ,"মূর্ত্তিপূজা, পর্দা, নিরক্ষরতা, পরাধীনতা ম্যালেরিয়া, হুকওয়ার্ম, ভাড়িখানা, আফিম ও গাঁজা" হসন্ত-বাবু ততই বলেন, "প্রমাণ কি, যে, ঐ সব কারণেই আমাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে? হর্ষবর্দ্ধনের সময় কি জাতিভেদ ছিল না? বর্ত্তমান রোমান ক্যাথলিক ও প্রাচীন প্রতাপশালী সাম্রাজ্যবান্ জাতিরা কি মূর্ত্তিপূজা করত না? আকবরের সময় কি পর্দা ছিল না? রাণী এলিজাবেথের আমলে কি ইংরেজরা সকলে লেখা পড়া জানত? স্কচ্‌রা ও পোলরা পরাধীন হলেও তারা কি কখনো আমাদের মতো দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছিল? ইতালিতে কি ম্যালেরিয়া নেই? অন্যদেশে কি হুকওয়ার্ম ও নেশা করবার মালমশ্‌লা নেই, না আমাদের দেশেই হুকওয়ার্ম ও নেশাহীন লোকেরা খুব উঁচুদরের মানুষ?" ইত্যাদি। তর্কে হেরে গিয়ে স্বামীজি বললেন, "তবে এই দুর্দ্দশা, একি স্বয়ম্ভূব মহাদেবের প্রলয়লীলা?

হসন্ত-বাবু ঈষৎ হেসে তখন ব'লে ছিলেন, "না।" Mythology, theosophy—groping in the dark



হসন্তবাবু। প্রমাণ কি?

(অন্ধকারে হাতড়ান)। ওসবে হবে না। চাই ঠিক মত ও যথেষ্ট পরিমাণে Statistics। Facts and Figures, বুঝ্‌লেন? আমায় Facts and figures দিন, আমি আপনাকে জাতীয় উন্নতি অবনতি সব কিছুর পরিষ্কার মীমাংসা করে দেব। Blue Print (ব্লু প্রিণ্ট) দেখে যেমন যন্ত্রের নাড়ী নক্ষত্র সব জানা যায়; আমিও তেমনি ক'রে সব কিছু আপনাকে দেখিয়ে দেব। কেবল চাই Statistics।"

সেই দিন থেকে হসন্ত-বাবু আমাদের জাতীয় দোষ গুণের যেখানে যা কিছু নিদর্শন পেতেন সব সযত্নে ফাইল বন্ধ কর্‌তেন। তার উদ্দেশ্য ছিল এই উপায়ে বের ক'রে ফেল্‌বেন কি কি বিষয়ে ও কি কি পরিমাণে আমরা অন্য জাতি অপেক্ষা বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতার মধ্যে আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ খুঁজে বের কর্‌বেন আজ প্রায় পাঁচ বৎসর ব্যাপী কঠিন পরিশ্রম করে হসন্ত বাবু হাজার হাজার জাতীয় বিভিন্নতার উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে ফেলেছেন। তাতে দেখা গেছে আমরা অতিভোজন প্রিয়, ঘরোয়াবিবাদ অভিলাষী, চলন্ত ট্রেনে ও ট্রামে ওঠ নাবার পক্ষপাতী, খালি পায়ে হাঁটা চলায় অভ্যস্ত, স্ত্রীনির্ব্যা তক, মশক-দংশন-উদাসী ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিভিন্নতা পাওয়া গেছে আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে তাঁরা ভয়-রোগে বিশেষরূপে ক্লিষ্ট। হসন্ত-বাবু আজকা "কেস' টি সমেত ৪৫৫৩টি নারীর "কাপুরুষতার" উদাহরণ পেয়েছেন। কোথাও নারী ভয়-ব্যাকুলতার জন্য পুত্রকে

কর্ত্তব্যবিমূঢ় করেছে, কোথাও স্বামীকে বিপদে ফেলেছে, কোথাও কুপথগামী হয়েছে, কোথাও পিতার ব্যবসা ফেল পড়িয়েছে, কোথাও বাক্‌দত্ত প্রণয়ীকে বিবাহের জন্য ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাতগ্রস্ত করেছে ইত্যাদি। সব দেখে হসন্ত-বাবু একটি সাময়িক্ কাগজে লিখেছিলেন—

হায় ভীত ভারত-ললনা,
তব দোষে দুষ্ট মোরা; সত্য কথা, নহে এ ছলনা!
অন্য জাতি বানিয়েছে কল কব্জা কত;
মোরা কি সতত
থাকিব এ দুর্দ্দশায় নিমজ্জিত, হায়?
দেশ যায় যায়।

ওঠো, জাগো, ভারতের মেয়ে,
সাহসের নিদর্শনে ফেল দেশ ছেয়ে,
বাঁধো কেশ ও কোমর যতনে,
ভোল আজ মূর্চ্ছা ও পতনে।

জাগরণ চাই,
কাঁদিবে কাঁপিবে ভয়ে, সে সময় নাই।
হ'তে হবে বীরের জননী,
শুন সবে শুন হিন্দু ইন্দু-নিভাননী;
তোমাদের ভয় ব্যাকুলতার বন্ধনে,
তোমাদের হৃদয়ের ক্রন্দন-স্পন্দনে,
কাতর ভারত আজ।

তাই তোরা "সাজ সাজ"
ভারতের মেয়ে,
ছুটে আয় ভয় ভুলে ধেয়ে।

কবিতাটি প'ড়ে সকলেই বলেছিল, যে, হসন্ত-বাবু যদি "সীরিয়াস্‌লি" কবিতার চর্চ্চা করতেন তাহ'লে হয়ত জ্ঞানের রাজ্যের অনেক নীরসতাকেই সরস কবিতায় ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌তেন। তিনি যে অতি দুরূহ ব্যাপারও কবিতায় পরিস্ফুট কর্‌তে পারেন তার প্রমাণ স্বরূপ হসন্ত-বাবু Kant's Critique of Pure Reason এর এক অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে তর্জ্জমা করেন। এ ছাড়া বড় বড় ভাব ও অধিক জটিল ব্যাপার কবিতায় ব্যক্ত করার উদাহরণ স্বরূপ তিনি Plotinus-এর Absolute *Nous*, Leibnitz এর Monad, Momentum, Anaphylaxis ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি সনেট রচনা করেছেন।

যাই হোক, ভারতনারীর কাপুরুষতার এত ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়ার ফলে হসন্ত-বাবু ভাব্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, যে, এইটিই আমাদের জাতীয় অবনতির কারণ। বীরপ্রসবিনী ভারতমাতা যদি নিজে বীর না হন, তা হ'লে তাঁর বীরপ্রসব কার্য্য কিছুতেই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। মাতৃজাতিই শিশুকাল থেকে সন্তানের দেহ ও মনের পুষ্টি ও গুণাগুণের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরাই যদি সাহসহীনতা দোষে দুষ্ট হন, তা হ'লে শিশু কি ক'রে আর বীর পুরুষ হ'য়ে উঠ্‌তে পারে? হসন্ত-বাবু ভাব্‌তে আরম্ভ করলেন, কি ক'রে ভারতে আবার লক্ষ লক্ষ বীর জননীর সৃষ্টি করা যায়।

স্বামী অত্যুচ্চানন্দ ইতিমধ্যে একদিন এসে হাজির হলেন। হসন্ত-বাবু তাঁকে তাঁর ফাইল বের ক'রে দেখালেন কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত বিভিন্ন রূপে নারীর কাপুরুষতার কুফল ফল্‌ছে। স্বামীজি বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েই বল্লেন, যে এতদিন পরে হসন্ত-বাবু ভারতের রোগ ঠিক ধরেছেন। হসন্ত-বাবু একটু বিনয়ের হাসি হেসে বল্লেন এখনও data যথেষ্ট পাওয়া যায়নি; তা ছাড়া এইটাই যে ভারতীয় অবনতির কারণ এই conclusion (সিদ্ধান্ত)টি এখনও সব রকম logical test (ন্যায় বিচার) ক'রে establish (প্রতিপন্ন) করা হয়-নি। এ ঘটনাটি যে সময়ে ঘটে তখন হসন্ত-বাবুর হাতে মাত্র ৩৫০০টি উদাহরণ জমা ছিল। কিন্তু আরও হাজারখানেক "কেস্" না পেলে তিনি কিছুই সঠিক বল্‌তে পার্‌ছিলেন না। কিন্তু আজ তাঁর ফাইলে ৪৫৫৩টি "কেস্" হওয়াতে তিনি তাঁর কাজে লেগে গেলেন। প্রথমত, তিনি স্ত্রী-কাপুরুষতার উদাহরণগুলিকে ভাল ক'রে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে নিলেন। তার পর প্রত্যেক শ্রেণীজাত কুফলাবলি লিপিবদ্ধ ক'রে ফেল্‌লেন। তার পর সেই সমস্ত কুফলের সঙ্গে আমাদের জাতীয় অবনতি যে যে রূপে প্রকাশ পায়, সেই সেই অবস্থা ও ঘটনা-নিচয়ের সঙ্গে যোগ কি না দেখে

নিলেন। তা'র পর দেখ্‌লেন স্ত্রী-কাপুরুষতা ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় বিভিন্নতার ফলাফলের সঙ্গে জাতীয় অবনতির সম্বন্ধ কি। এইরূপ নানা উপায়ে ভেবেচিন্তে, কষে, খাঁড়পেতে হসন্ত-বাবু শেষ অবধি নিম্নলিখিত রূপ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যথা :—

১। নারীর কাপুরুষতা একটি সত্তা।

২। এই সত্তার নানা প্রকার রূপ আছে, অর্থাৎ ইহা নানা কার্য্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

৩। এই সত্তার প্রাবল্য বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ কোথাও ইহা ক্ষীণভাবে প্রকাশ পায় ও কোথাও প্রবলরূপে প্রকাশ পায়।

৪। এই সত্তা ফল-প্রসূ অর্থাৎ ইহা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়, ইহা দ্বারা ফলাফলের উৎপত্তি হয়।

৫। এই সত্তার ফলাফল সাধারণত জাতীয় গুণ ও দোষ রূপে পরিগণিত হয়।

৬। এই সত্তার অভাবে জাতীয় গুণের প্রকাশ দেখা যায় এবং ইহার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ প্রকট হয়।

৭। এই সত্তার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ ইহার প্রাবল্যের অনুপাতে কম বা বেশী দেখা যায়।

৮। এই সত্তা অবিনাশ্য নহে।

৯। এই সত্তা আমাদের জাতীয় দুর্গতির প্রধানতম কারণ।

এ ছাড়া তিনি একটা গ্রাফ্‌ এঁকে দেখিয়ে দিলেন যে নারী-কাপুরুষতা ও জাতীয় অবনতির উদাহরণ কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই ভাবে বাড়ে বা কমে অর্থাৎ এদুটি Positively related। হসন্ত-বাবু এই সিদ্ধান্তগুলিতে হঠাৎ উপনীত হলেন না, অনেক তর্ক মীমাংসা ক'রে তবে এগুলি তিনি স্থির নিশ্চয় ব'লে প্রচার করলেন। প্রথমত তিনি "The Nine Points of National Narcolepsy" ব'লে একটি পুস্তিকা বের ক'রে ফেল্‌লেন। এতে তিনি দেখালেন, যে, আমাদের জাতি এই যে কোনো কিছুতেই সক্ষম হয় না, এই যে আমাদের জাতি কিছুতেই একটানা জাগ্রত অবস্থায় উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌তে পারে না, এই যে সর্ব্বঘটে আমাদের জাতি মাত্র অর্দ্ধ-জাগ্রত, এই যে আমাদের জাতি দুঃখে দারিদ্র্যে নিঝুম হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে, এ সবের কারণ আমাদের নারীদের সাহসের অভাব এবং তৎপ্রসূত সন্তানদের উপর এই ব্যাধির প্রভাব।

"Hasanta's Nine Points" শীঘ্রই ভারতময় ছড়িয়ে পড়্‌ল। নানা জায়গায় জাতীয় অবনতির কারণ-নির্দ্ধারক এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিচার নিয়ে মীটিং ইত্যাদি হ'তে আরম্ভ হ'ল। হসন্ত-বাবু চারিদিক্‌ থেকে কন্‌গ্রাচুলেশন্‌ পেতে লাগ্‌লেন কংগ্রেসেও এই নিয়ে বেশ একটা নাড়াচাড়া প'ড়ে গেল। কয়েকজন নারীসভ্য তাঁদের নামে এই অপবাদ শুনে রাগে উন্মত্তের মতো হ'য়ে পুরুষ সভ্যদের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লাগিয়ে দিলেন। হসন্ত-বাবু যে দুচারখানা মারের ভয়-দেখান বেনামী চিঠিও না পেলেন, তা নয়। যাই হোক, শেষ অবধি সকলেই হসন্ত-বাবুর অকাট্য Statistics এর কাছে হার মান্‌তে বাধ্য হলেন, এবং ভারতকে আবার তাঁর লুপ্ত গৌরব ফিরে দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হ'তে লাগ্‌ল। হসন্ত-বাবু প্রেস ও পাব্‌লিককে জানালেন, যে, নারীদের আবার সাহসী ক'রে তোল্‌বার একটা স্কীম্‌ তাঁর খসড়া করা আছে; আর্থিক সুবিধার আশা দেখ্‌লে তিনি সেটা finally set up করাতে রাজি আছেন। এই আশা পাবামাত্র "বীরপ্রসূ প্রসাবনী ভারত" নামে একটি সংঘ মাদ্রাজ অঞ্চলে গঠিত হ'য়ে টাকা তোলায় কাজে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। হসন্ত-বাবুও তাঁর স্কীম্‌টাকে ঘসে মেজে ঠিক কর্‌তে লাগ্‌লেন।

(২)

হসন্ত-বাবুর স্কীম্‌টা ছিল খুবই 'সিম্প্‌ল' এবং সহজবোধ্য। হসন্ত-বাবুর যখন বয়স খুব অল্প তখন তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসে-মশায়কে ক্ষেপা কুকুরে কাম্‌ড়েছিল। তাতে তাঁকে কাসৌলি যেতে হয় ও সেখানে মহামতি পাস্তরের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা ক'রে তিনি জলাতঙ্কের আশঙ্কা থেকে মুক্তি লাভ করে কলিকাতায় ফিরে আসেন। পাস্তরের চিকিৎসার মূলমন্ত্র মানুষের কোনো বিষয়ে ক্রমশঃ শক্তিলাভের ক্ষমতায় বিশ্বাস। যে বিষ শরীরে অধিকমাত্রায় অকস্মাৎ প্রয়োগ কর্‌লে মানুষ

অচিরে দেহত্যাগ করে, সেই বিষই যদি ক্রমশঃ তাকে সইয়ে অল্প অল্প ক'রে ক্রমবর্দ্ধণশীল মাত্রায় তার প্রতি প্রয়োগ করা যায়, তা হ'লে তার অপকার ত কিছু হয়ই না, বরং উক্ত বিষ সম্বন্ধে তার এমন একটা প্রতিরোধক ক্ষমতা ও অব্যাহতি জন্মায়, যে, বেশীমাত্রায় ঐ বিষে আক্রান্ত হ'লেও তার আর কিছু হয় না। পাগলা কুকুরের বিষ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও মানুষের মধ্যে ঐ রকম উপায়ে, ক্রমশঃ উৎপন্ন করা হয়। বাল্যকালের এই জ্ঞানটুকু এতদিনে হসন্ত-বাবুর কাজে লেগে গেল। তিনি ভাবলেন, জলাতঙ্ক যদি চিকিৎস্য, তাহ'লে সর্ব্বাতঙ্ক নয় কেন? অর্থাৎ ক্রমশঃ ভয় প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব ভয় কেন একেবারে দূর করা যাবে না?

তাঁর এক ভাগ্নের (বিভক্তির বড়ছেলে তড়িত-কুমারের) বড় আঁধারের ভয় ছিল। হসন্ত-বাবু তাকে প্রথমে কিছুদিন ৩২ 'ক্যাণ্ডল্ পাওয়ার' আলোযুক্ত একটা ঘরে বন্ধ করে রাখলেন, তার পর আলোর 'ক্যাণ্ডল্ পাওয়ার' ক্রমশঃ কমিয়ে কমিয়ে শেষ অবধি তাকে একেবারে নিরেট অন্ধকারে রেখে দেখলেন তড়িতের অন্ধকারের ভয় আর নেই। এই এক্স্পেরিমেণ্ট্‌টা সফল হওয়ায় হসন্ত-বাবু আর বিলম্ব না ক'রে তাঁর নারীজাতির ভয় দূরীকরণের স্কীম্‌টা প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লেন। তাতে তিনি লিখলেন, যে, অনেক গবেষণা ক'রে তিনি ভয় জিনিষটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, ১। শারীরিক ভয়, ২। মানসিক ভয়, ৩। আধ্যাত্মিক ভয়; এবং দেখেছেন, যে, এই তিন প্রকার ভয়ই চিকিৎসা ক'রে দূর করা সম্ভব। চিকিৎসার প্রধান ও একমাত্র উপায়, অল্প অল্প ক'রে ভয় সহ্য করিয়ে মানুষকে ক্রমশঃ ভয়শূন্য ক'রে তোলা। যথা, শারীরিক ভয় দূর করতে হ'লে ছারপোকার ভয় থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ ভালুকের ভয় অবধি সইয়ে সইয়ে দেখাতে হবে। মানসিক ভয় দূর করতে হ'লে, একলা থাকা কিম্বা অন্ধকারের ভয় থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ খুব বেশী রকম ভূতের ভয় অবধি দেখাতে হবে। আধ্যাত্মিক ভয়ও ঐ উপায়ে, 'মাষ্টার মশার রাগ করবেন' ব'লে ভয় দেখান থেকে সুরু ক'রে,'ভগবান বিমুখ হবেন' অবধি ব'লে সারান যাবে।

হসন্ত-বাবু ঠিক করলেন মেয়েদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্ত কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা Central Institute খুলবেন; সেখানে ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে মেয়েরা সব রকম ভয় বিমুক্ত হবার জন্তে তাঁর তত্ত্বাবধানেই চলবে। তিনি একবার তাড়াতাড়ি মান্দ্রাজ চলে গেলেন। সেখানে "বীরপ্রসূপ্রসবিনী ভারত সঙ্ঘে"র সভ্যেরা তাঁকে একটা তুমুল-রকম "রিসেপ্‌শন" দিল; সকলে একবাক্যে হসন্ত-বাবুকে উক্ত সংঘের কীর্ত্তিকার প্রধান (Working President) মনোনীত করল; এছাড়া একজন সার্দ্ধপ্রধান (Vice-President) একজন সর্ব্বার্থাধার (Treasurer), তেরজন ভ্রাম্যমান প্রতিভূ (Travelling Agents), ও বিয়াল্লিশজন নৈষ্টিক কার্য্যনায়ক (Members of the General Committee) নিযুক্ত হ'ল। হসন্ত-বাবু পরম উৎসাহে কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং শীঘ্রই অনেক হাজার টাকা তুলে ফেল্‌লেন। তার পর চার পাঁচ মাস ধ'রে খুব হৈ চৈ চলল। চারিদিকে লোকের মুখে শুধু এককথা—"বীরপ্রসূপ্রসবিনী ভারত"। সকলে শুধু "The Nine Points of National Narcolepsy" আওড়ায় ও বলে, "এইবার হসন্ত-বাবু জাতীয় অবনতির একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে ছাড়বেন না।"

(৩)

মধুপুরে একটা মস্ত বাড়ী আর বাগান নেওয়া হ'য়ে গেছে। যারা নিজেদের মেয়েদের ভয় ভাঙ্গাবার জন্ত ব্যস্ত, তাদের লেখা আবেদন-পত্রে হসন্ত-বাবুর দপ্তর গিজ্ গিজ্ করছে। Imperial Bankএ "বীরপ্রসূপ্রসবিনী সংঘে"র account বেশ ভারী হ'য়ে উঠেছে। এখন শুধু কাজ আরম্ভ হ'লেই হয়; হসন্ত-বাবু সংঘের কীর্ত্তিকার প্রধান হিসেবে কাগজে দুইজন সৎ, কর্ম্মক্ষম ও বয়স্কা "মেট্রনের" জন্ত বিজ্ঞাপন দিলেন। অনেকে দরখাস্ত করল এবং বহুকষ্টে হসন্ত-বাবুর আবিষ্কৃত Honesty ও Efficiencyর Infallible Nose Test পাস ক'রে (নাকের মাপ ও আকারের সাহায্যে হসন্ত-বাবু মানুষের চরিত্রবিচার করতে পারতেন) দুইজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলা "মেট্রন" নিযুক্ত হলেন। অতি শীঘ্রই মধুপুরের বাড়ী ছাত্রীতে ভরপুর হ'য়ে উঠল। হসন্ত-বাবু তারাপদ

নিলেন। তা'র পর দেখ্‌লেন স্ত্রী-কাপুরুষতা ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় বিভিন্নতার ফলাফলের সঙ্গে জাতীয় অবনতির সম্বন্ধ কি। এইরূপ নানা উপায়ে ভেবেচিন্তে, ক'ষে, খুঁড়েপেতে হসন্ত-বাবু শেষ অবধি নিম্নলিখিত রূপ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যথা :—

১। নারীর কাপুরুষতা একটি সত্তা।

২। এই সত্তার নানা প্রকার রূপ আছে, অর্থাৎ ইহা নানা কার্য্য ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

৩। এই সত্তার প্রাবল্য বিবিধ প্রকার, অর্থাৎ কোথাও ইহা ক্ষীণভাবে প্রকাশ পায় ও কোথাও প্রবলরূপে প্রকাশ পায়।

৪। এই সত্তা ফল-প্রসূ অর্থাৎ ইহা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়, ইহা দ্বারা ফলাফলের উৎপত্তি হয়।

৫। এই সত্তার ফলাফল সাধারণত জাতীয় গুণ ও দোষ রূপে পরিগণিত হয়।

৬। এই সত্তার অভাবে জাতীয় গুণের প্রকাশ দেখা যায় এবং ইহার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ প্রকট হয়।

৭। এই সত্তার বিদ্যমানতায় জাতীয় দোষ ইহার প্রাবল্যের অনুপাতে কম বা বেশী দেখা যায়।

৮। এই সত্তা অবিনাশ্য নহে।

৯। এই সত্তা আমাদের জাতীয় দুর্গতির প্রধানতম কারণ।

এ ছাড়া তিনি একটা গ্রাফ্ এঁকে দেখিয়ে দিলেন যে নারী-কাপুরুষতা ও জাতীয় অবনতির উদাহরণ কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই ভাবে বাড়ে বা কমে অর্থাৎ এদুটি Positively related। হসন্ত-বাবু এই সিদ্ধান্তগুলিতে হঠাৎ উপনীত হলেন না, অনেক তর্ক মীমাংসা ক'রে তবে এগুলি তিনি স্থির নিশ্চয় ব'লে প্রচার কর্‌লেন। প্রথমত তিনি "The Nine Points of National Narcolepsy" ব'লে একটি পুস্তিকা বের ক'রে ফেল্‌লেন। এতে তিনি দেখালেন, যে, আমাদের জাতি এই যে কোনো কিছুতেই সক্ষম হয় না, এই যে আমাদের জাতি কিছুতেই একটানা জাগ্রত অবস্থায় উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌তে পারে না, এই যে সর্ব্বঘটে আমাদের জাতি মাত্র অর্দ্ধ-জাগ্রত, এই যে আমাদের জাতি দুঃখে দারিদ্র্যে নিঝুম হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে, এ সবের কারণ আমাদের নারীদের সাহসের অভাব এবং তৎপ্রসূত সন্তানদের উপর এই ব্যাধির প্রভাব।

"Hasanta's Nine Points" শীঘ্রই ভারতময় ছড়িয়ে পড়্‌ল। নানা জায়গায় জাতীয় অবনতির কারণ-নির্দ্ধারক এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিচার নিয়ে মীটিং ইত্যাদি হ'তে আরম্ভ হ'ল। হসন্ত-বাবু চারিদিক্ থেকে কন্‌গ্রাচুলেশন্ পেতে লাগ্‌লেন কংগ্রেসেও এই নিয়ে বেশ একটা নাড়াচাড়া প'ড়ে গেল। কয়েকজন নারীসভ্যা তাঁদের নামে এই অপবাদ শুনে রাগে উন্মত্তের মতো হ'য়ে পুরুষ সভ্যদের সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লাগিয়ে দিলেন। হসন্ত-বাবু যে দুচারখানা মারের ভয়-দেখান বেনামী চিঠিও না পেলেন, তা নয়। যাই হোক, শেষ অবধি সকলেই হসন্ত-বাবুর অকাট্য Statistics এর কাছে হার মান্‌তে বাধ্য হলেন, এবং ভারতকে আবার তাঁর লুপ্ত গৌরব ফিরে দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হ'তে লাগ্‌ল। হসন্ত-বাবু প্রেস ও পাব্‌লিককে জানালেন, যে, নারীদের আবার সাহসী ক'রে তোল্‌বার একটা স্কীম্ তাঁর খসড়া করা আছে; আর্থিক সুবিধার আশা দেখ্‌লে তিনি সেটা finally set up করাতে রাজি আছেন। এই আশা পাবামাত্র "বীরপ্রসূ প্রসবিনী ভারত" নামে একটি সংঘ মাদ্রাজ অঞ্চলে গঠিত হ'য়ে টাকা তোলার কাজে উঠে প'ড়ে লেগে গেল। হসন্ত-বাবুও তাঁর স্কীম্‌টাকে ঘসে মেজে ঠিক কর্‌তে লাগ্‌লেন।

(২)

হসন্ত-বাবুর স্কীম্‌টা ছিল খুবই 'সিম্প্‌ল' এবং সহজবোধ্য। হসন্ত-বাবুর যখন বয়স খুব অল্প তখন তাঁর দূর সম্পর্কের এক পিসে-মশায়কে ক্ষেপা কুকুরে কামড়েছিল। তাতে তাঁকে কাসৌলি যেতে হয় ও সেখানে মহামতি পাস্তুরের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা ক'রে তিনি জলাতঙ্কের আশঙ্কা থেকে মুক্তি লাভ করে কলিকাতায় ফিরে আসেন। পাস্তুরের চিকিৎসার মূলমন্ত্র মানুষের কোনো বিষয়ে ক্রমশঃ শক্তিলাভের ক্ষমতায় বিশ্বাস। যে বিষ শরীরে অধিকমাত্রায় অকস্মাৎ প্রয়োগ কর্‌লে মানুষ

অচিরে দেহত্যাগ করে, সেই বিষই যদি ক্রমশঃ তাকে সইয়ে অল্প অল্প ক'রে ক্রমবর্দ্ধণশীল মাত্রায় তার প্রতি প্রয়োগ করা যায়, তা হ'লে তার অপকার ত কিছু হয়ই না, বরং উক্ত বিষ সম্বন্ধে তার এমন একটা প্রতিরোধক ক্ষমতা ও অব্যাহতি জন্মায়, যে, বেশীমাত্রায় ঐ বিষে আক্রান্ত হ'লেও তার আর কিছু হয় না। পাগলা কুকুরের বিষ প্রতিরোধ কর্‌বার ক্ষমতাও মানুষের মধ্যে ঐ রকম উপায়ে, ক্রমশঃ উৎপন্ন করা হয়। বাল্যকালের এই জ্ঞানটুকু এতদিনে হসন্ত-বাবুর কাজে লেগে গেল। তিনি ভাব্‌লেন, জলাতঙ্ক যদি চিকিৎস্য, তাহ'লে সর্ব্বাতঙ্ক নয় কেন? অর্থাৎ ক্রমশঃ ভয় প্রতিরোধ কর্‌বার ক্ষমতা বাড়িয়ে বাড়িয়ে সব ভয় কেন একেবারে দূর করা যাবে না?

তাঁর এক ভাগ্নের (বিভক্তির বড়ছেলে তদ্ধিত-কুমারের) বড় আঁধারের ভয় ছিল। হসন্ত-বাবু তাকে প্রথমে কিছুদিন ৩২ 'ক্যাণ্ডল্ পাওয়ার' আলোযুক্ত একটা ঘরে বন্ধ করে রাখ্‌লেন, তার পর আলোর 'ক্যাণ্ডল্ পাওয়ার' ক্রমশঃ কমিয়ে কমিয়ে শেষ অবধি তাকে একেবারে নিরেট অন্ধকারে রেখে দেখ্‌লেন তদ্ধিতের অন্ধকারের ভয় আর নেই। এই এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌টা সফল হওয়ায় হসন্ত-বাবু আর বিলম্ব না ক'রে তাঁর নারীজাতির ভয় দূরীকরণের স্কীম্‌টা প্রকাশ ক'রে ফেল্‌লেন। তাতে তিনি লিখ্‌লেন, যে, অনেক গবেষণা ক'রে তিনি ভয় জিনিষটাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, ১। শারীরিক ভয়, ২। মানসিক ভয়, ৩। আধ্যাত্মিক ভয়; এবং দেখেছেন, যে, এই তিন প্রকার ভয়ই চিকিৎসা ক'রে দূর করা সম্ভব। চিকিৎসার প্রধান ও একমাত্র উপায়, অল্প অল্প ক'রে ভয় সহ্য করিয়ে মানুষকে ক্রমশঃ ভয়শূন্য ক'রে তোলা। যথা, শারীরিক ভয় দূর কর্‌তে হ'লে আরশোলার ভয় থেকে আরম্ভ ক'রে বাঘ ভালুকের ভয় অবধি সইয়ে সইয়ে দেখাতে হবে। মানসিক ভয় দূর কর্‌তে হ'লে, একলা থাকা কিম্বা অন্ধকারের ভয় থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ খুব বেশী রকম ভূতের ভয় অবধি দেখাতে হবে। আধ্যাত্মিক ভয়ও ঐ উপায়ে, 'মাষ্টার মশার রাগ করবেন' ব'লে ভয় দেখান থেকে সুরু ক'রে,'ভগবান বিমুখ হবেন' অবধি ব'লে সারান যাবে।

হসন্ত-বাবু ঠিক কর্‌লেন মেয়েদের ভয় ভাঙাবার জন্ত কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা Central Institute খুল্‌বেন; সেখানে ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে মেয়েরা সব রকম ভয় বিমুক্ত হবার জন্তে তাঁর তত্ত্বাবধানেই চল্‌বে। তিনি একবার তাড়াতাড়ি মান্দ্রাজ চলে গেলেন। সেখানে "বীর প্রসূপ্রসবিনী ভারত সঙ্ঘে"র সভ্যেরা তাঁকে একটা তুমুল-রকম "রিসেপ্‌শন" দিল; সকলে একবাক্যে হসন্ত-বাবুকে উক্ত সংঘের কীর্ত্তিকার প্রধান (Working President) মনোনীত কর্‌ল; এছাড়া একজন সার্দ্ধপ্রধান (Vice-President) একজন সর্ব্বার্থাধার (Treasurer), তেরজন ভ্রাম্যমান প্রতিভূ (Travelling Agents), ও বিয়াল্লিশজন নৈষ্ঠিক কার্য্যনায়ক (Members of the General Committee) নিযুক্ত হ'ল। হসন্ত-বাবু পরম উৎসাহে কলিকাতায় ফিরে এলেন এবং শীঘ্রই অনেক হাজার টাকা তুলে ফেল্‌লেন। তার পর চার পাঁচ মাস ধ'রে খুব হৈ চৈ চল্‌ল। চারিদিকে লোকের মুখে শুধু এককথা—"বীরপ্রসূপ্রসবিনী ভারত"। সকলে শুধু "The Nine Points of National Narcolepsy" আওড়ায় ও বলে, "এইবার হসন্ত-বাবু জাতীয় অবনতির একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে ছাড়্‌বেন না।"

(৩)

মধুপুরে একটা মস্ত বাড়ী আর বাগান নেওয়া হ'য়ে গেছে। যারা নিজেদের মেয়েদের ভয় ভাঙাবার জন্ত ব্যস্ত, তাদের লেখা আবেদন-পত্রে হসন্ত-বাবুর দপ্তর গিজ্ গিজ্ কর্‌ছে। Imperial Bank এ "বীরপ্রসূপ্রসবিনী সংঘে"র account বেশ ভারী হ'য়ে উঠেছে। এখন শুধু কাজ আরম্ভ হ'লেই হয়; হসন্ত-বাবু সংঘের কীর্ত্তিকার প্রধান হিসেবে কাগজে দুইজন সৎ, কর্ম্মক্ষম ও বয়স্কা "মেট্রনের" জন্ত বিজ্ঞাপন দিলেন। অনেকে দরখাস্ত কর্‌ল এবং বহুকষ্টে হসন্ত-বাবুর আবিষ্কৃত Honesty ও Efficiencyর Infallible Nose Test পাস ক'রে (নাকের মাপ ও আকারের সাহায্যে হসন্ত-বাবু মানুষের চরিত্রবিচার কর্‌তে পার্‌তেন) দুইজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলা "মেট্রন" নিযুক্ত হলেন। অতি শীঘ্রই মধুপুরের বাড়ী ছাত্রীতে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌ল। হসন্ত-বাবু তারাপদ

নামক একস্পেরিমেণ্ট্যাল সাইকলজি পাস একজন ছোক্‌রাকে নিয়ে সেখানে সব বন্দোবস্ত কর্‌তে চ'লে গেলেন। ছাত্রীদের দৈহিক এবং বংশ ও জাতিগত কোনো অবস্থার জন্ম তাদের মধ্যে ভয়ের প্রাদুর্ভাব হয়েছে কিনা নির্ণয় কর্‌বার জন্ম হসন্ত-বাবু তাদের বিষয়ে নানাপ্রকার Statistics নিলেন। যথা তাদের মাথার মাপ, চুলের ও গায়ের রং, নাকের দৈর্ঘ্য, ভুরুর আকৃতি, ওজন, শরীরের দৈর্ঘ্য, ফোর আর্ম বাইসেপ্‌স্‌, চেষ্ট্‌, ওয়েষ্ট্‌ ইত্যাদির মাপ, তাদের দেহে কোথায় কোথায় তিল আছে, তাদের জাতি, গোত্র, পারিবারিক খবরাখবর, বাল্যকালে হাম হয়েছিল কিনা, তাহারা অত্যধিক চা পান করে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। তারাপদ বল্‌লে, অত data সে একলা "ক্লাসিফাই" ও "রেকর্ড" কর্‌তে পার্‌বে না। হসন্ত-বাবু তাতে তারাপদর সাহায্যার্থে তিনজন বি-এ, ফেল কেরাণী নিযুক্ত ক'রে দিলেন।

তার পর আরম্ভ হ'ল প্রত্যেকটি মেয়ের Fear Survey অর্থাৎ তার কি কি প্রকার ভয় আছে এবং সেইসব ভয়ের প্রাবল্য কতটা ইত্যাদি। কারুর নামের পাশে হয়ত লেখা হ'ল physical, minimum—cockroach; mental minimum—darkness five candle; spiritual minimum—maternal uncle go away for ever, অর্থাৎ উক্ত বালিকার আরসুলা মাত্র দেখলেই ভয় হয়, অন্ধকারে এবং পাঁচ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার আলো থাকলেও ভয় হয়, এবং মামা তাকে ছেড়ে চিরতরে চলে যাবেন এইটুকু মাত্র আশঙ্কা হ'লেই ভয় হয়। অন্যান্য সব মেয়েদের নামে এইরকম সকল জ্ঞাতব্য বিষয় লেখা এক একখানা কার্ড তৈরী হ'ল। সেগুলি triplicateএ "রেকর্ডেড্‌" হ'ল।

সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হ'য়ে যাবার পরে হসন্ত-বাবু দেখ্‌লেন, যে, শারীরিক ভয় জিনিষটাই মেয়েদের মধ্যে খুব বেশী এবং অধিকসংখ্যক মেয়েরই বাল্যকালে হাম হয়েছিল এবং প্রায় সকলেই চা পান করে। হসন্ত-বাবু এর ফলে"বীরপ্রসূপ্রসবিনীসংঘে"র সভ্যদের মধ্যে বিতরিত হবার জন্ম একটা "নোট" লিখ্‌লেন :—Physical Fear and its probable Relation to infantile Measles and excessive Tea drinking.

এর পর তিনি সকলের জন্ম "রুটিন" তৈরী ক'রে দিলেন। Emil Cone আবিষ্কৃত Auto-suggestionএর নিয়ম অনুসারে এবং প্রত্যহ দুই ঘণ্টা ক'রে "আমি বীরনারী হব; হবই হব" ইত্যাদি জপ কর্‌বার জন্ম একটা গাথা তৈরী ক'রে দিলেন। মধুপুরের বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড লেক্‌চার 'হল' ছিল। সেখানে প্রত্যহ মেয়েদের হসন্ত-বাবুর জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা শুন্‌তে হ'ত। প্রথম দিনকতক তিনি "ভয়" যে শুধু একটা negative অথবা অভাবাত্মক বা নেতিগর্ভ জিনিস সে সম্বন্ধে মেয়েদের ভাল ক'রে বোঝালেন। অর্থাৎ সাহসের অভাবই ভয়, অর্থাৎ সাহস নেই ব'লেই ভয় আছে, অর্থাৎ সাহস থাক্‌লে ভয় থাক্‌তে পারে না ইত্যাদি। এ কথাও বল্‌লেন, যে, ভয়টা নেতিগর্ভ বলেই তার থাকা-না-থাকার কোনো মানে হয় না, অর্থাৎ ভয় না থাক্‌লেই সাহস আছে প্রমাণ হয় না, সুতরাং না-ভয়-না-সাহসাত্মক এই যে একটা neutral বা নির্লিপ্ত বা অনির্দ্দিষ্ট অবস্থা, প্রথমতঃ তাদের মনের মধ্যে সেই অবস্থাটা আন্‌তে হবে, তার পর Positive Courage বা অস্ত্যাত্মক সাহস গ'ড়ে তুল্‌তে হবে, ইত্যাদি।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা শুনিয়ে মেয়েদের মধ্যে চিকিৎসার জমি তৈরী ক'রে হসন্ত-বাবু একদিন কলিকাতায় চ'লে এলেন। উদ্দেশ্য প্রথম মাত্রা ঔষধের বন্দোবস্ত ক'রে মধুপুরে ফিরে যাওয়া ও যথারীতি চিকিৎসা সুরু করা। দু তিন রাত্রি জেগে অনেক ভেবে ও স্বামী অত্যুচ্চানন্দের সঙ্গে অনেক পরামর্শ ক'রে হসন্তবাবু চিকিৎসার প্রথম মাত্রা হিসেবে মেয়েদের কি ভয় দেখাবেন তা ঠিক কর্‌লেন। খুব ছোটোখাট রকম ভয় দেখান হবে এটা ঠিকই ছিল, তবু ঠিক কি ভয় দেখান হবে সেটা হঠাৎ না ভেবে নির্দ্ধারণ করা উচিত নয় বলেই এতটা দেরী হ'ল।

এই জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবার দিন-চারেক পরেই হসন্ত-বাবু দুটি বড় বড় কাঠের সিন্দুক নিয়ে মধুপুরে ফিরে গেলেন। কেউ জান্‌তে পার্‌ল না যে, সেগুলিতে কি আছে। মেট্রনরাও না। পরদিন সকাল বেলা হসন্ত বাবু

মেয়েদের লেক্‌চার 'হলে' হাজির হ'তে বল্‌লেন। সিন্দুক ছুটি আগেই সেখানে ঠিক মতো ক'রে বসান হয়েছিল। মেয়েরা সকলে এল। কিছু একটা মজার ঘটনা হবে ভেবে মেট্রন কাদম্বিনী ও সুমতিবালাও এসে বস্‌লেন। 'হলে'র চারদিক বন্ধ। শুধু হসন্ত-বাবুর আসনের পিছনে একটা বড় ও আধ ভেজান দরজা। প্রথমত, মেয়েরা সকলে দণ্ডায়মান হ'য়ে বীরনারী হওয়ার গাথাটা সমস্বরে আবৃত্তি কর্‌ল। যথা—

বীরনারী গাথা

তারাপদ রচিত*

(দরদী আবেদন রায়ের সুরে)

তামিল তেলেগু অথবা বাঙ্গালী হইব রমণীবীর
পতিতাত্যজ ব্রাহ্মণ কেবট তুলিব উচ্চ শির—।
হায়, নহিক বীরের নারী
তাহে মোরা কি করিতে পারি—
নিজেরা সবলা হইয়া আমরা দুরিব লাজ পতির—
(মোরা) মাথা খাড়া করি তুলিব দেশের লাজ অবনত শির।

স্বামী কাপুরুষ, কাপুরুষ পিতা, ভ্রাতা কাপুরুষ হোক—
বীর সন্তান গর্ভে ধরিয়া সৃজিব নূতন লোক !
মোরা আনিব নূতনালোক
সখি ভুল তবে মিছে শোক—
এলায়িত চুলে কোমর বাঁধিয়া হও সবে সুস্থির—
নূতন শিক্ষা কর পত্তন উঁচাইয়া তোল' শির—।
ভাব দ্রৌপদী Joan†তারাবাই আর বগিবিন্দীর‡কথা
Sanger দিদি উঠে লেগেছেন ঘুচাতে মোদের ব্যথা।
ভেঙে ফেল ক্ষীণ দেহলতা
ধর পাদপের সবলতা ;
মনু পরাশর সোপেনহাউরে যে ভাবে ভাবুক পীর—
তাদের রচিত শাস্ত্রে লাথিয়া তুলিব উচ্চ শির—।

মোরা'বীরনারী হব বীরনারী হব'জপে যাব অবিরাম ;
গম্ভীর নাদে কাঁপাইব বীর-প্রসু-প্রসবিনী-ধাম
মোরা দাঁড়াব আপন পায়ে—
নহে পুরুষের পদছায়ে ;
এ মহামন্ত্রে পরদা জেনানা ফেটে হবে চৌচির—
জয় হসন্ত কৃপায় যাঁহার উঁচা করিয়াছি শির—।

তার পর হসন্ত-বাবু তাঁর বেগুনে রেশমের চাদরটা একটু ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বল্‌লেন,"আজ আমরা এখানে যে জন্য সমবেত হয়েছি সে একটা খুব উচ্চ আদর্শ নিয়েই। এই ঘটনা হয়ত প্রথম দর্শনে চমকপ্রদ নয়, কিন্তু এরই প্রভাব ভারত-ইতিহাসের অতি দূর ভবিষ্যৎ অবধি পৌঁছাবে। আপনারা সকলে একান্তমনে আমাদের বীর-প্রসু-প্রসবিনী সংঘের মহান আদর্শের কথা চিন্তা করুন ও 'আশুহাসিনী ভারতমাতা' গানটি সকলে মিলিয়া করুন। হসন্ত-বাবু এই উপায়ে মেয়েদের মধ্যে একটা অতর্কিত ভাব জাগাচ্ছিলেন কেন না ভয় দেখান জিনিসটা আকস্মিকতার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে। গান আরম্ভ হ'ল।

আশুহাসিনী ভারত মাতা

(স্বামী অত্যুচ্চানন্দ রচিত)

(কবিবর গাঞ্জা আব্বাস বিটুকেলের "বিদ্রোহিণী ভৈরবী রাগিণী"তে গেয়)

আশুহাসিনী ভারত মাতা—
অভাগা এ তোর সন্তান দলে
মুখ তুলে চেয়ে হরষে মাতা'।—

একবার হাস মা
তুমি অনেক কেঁদেছ অনেক কেটেছ
সুখ-নীরে একবার ভাস মা ;
দুখ নিশি ভোর হ'ল হ'ল ওই
চোখ চেয়ে একবার হাস মা।

ওমা ভেঙেছে মোদের মোহ মায়া ঘোর
বুকে বেঁধে লব হাসি দেখে তোর ;
জেগে দেখ নহ জড়িত-নয়না
নাহি শুধু তব ছিন্ন কাঁথা।
আশুহাসিনী ভারত মাতা।

* হসন্তের সেক্রেটারী
† Joan of Arc
‡ দীনবন্ধুমিত্রের 'জামাইবারিক' দ্রষ্টব্য

একবার হাস মা—
সেই পুরাণ-যুগের সুবেশ-সাজে
দৈন্য মোদের নাশ মা—
সেই হেম-ঝলমল রজত-ধবল
প্রাণ খোলা হাসি হাস মা।

জাপান হাসিছে হাসিতেছে চীন
রিফ্ হাসে হাসে তুর্কী নবীন
তুমি হাস মাগো বুকেতে তোমার
আর ইংরেজ পেষে না জাঁতা।
আগুহাসিনী ভারত মাতা॥

মেয়েরা যখন অন্তরাতে এসেছে ও "প্রাণ খোলা হাসি হাস মা" বলিয়া ভৈরবীতে ভারতমাতাকে হাস্য করতে আহ্বান করছে, এমন সময় হসন্ত-বাবু একটা দড়ীতে সজোরে টান দিলেন। অমনি সিন্দুকের ডালা ছুটি খুলে গেল এবং তার ভিতর থেকে কিচ কিচ্ শব্দে 'হল' মুখরিত ক'রে প্রায় হাজার খানেক ছোটো বড় ইঁদুর লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। গানটাও হঠাৎ থেমে গেল।

তারপর যা দৃশ্য, তার বর্ণনা অসম্ভব। ভয়ব্যাকুল মেয়ে সকলে সমস্বরে ই…… ক'রে একটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। দুচার জন দৌড়ে হসন্তবাবুর পিছনের দরজাটির দিকে চল্‌ল। তাদের দেখাদেখি বাকি সকলেই একটা প্রবল বন্যার মতোই দরজার দিকে ছুটল্। ঘরময় তখন ইঁদুরের ছড়াছড়ি। মেয়েরা এ ওর ঘাড়ে প'ড়ে, ও পরস্পরকে সরিয়ে, আগে পালাবার চেষ্টায় জামা কাপড় ছিঁড়ে, নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে দরজার উপর গিয়ে পড়ল্। হসন্ত-বাবু একবার উঠে তাদের থামাতে গেলেন, কিন্তু সেই সর্ব্বসংহারিণী বন্যার মুখে তিনি রেশমের জামা কাপড় সমেত কোথায় যে তলিয়ে গেলেন, তা বোঝাই গেল না।



Overdose! Overdose!!

কয়েক মিনিট ঘরে যেন ঝড় ব'য়ে গেল; তার পর

বেশার ভাগ মেয়েরা পালিয়ে যাবার পর দেখা গেল, ঘরে অসংখ্য জীবিত, মৃত ও পদদলিত ইঁদুর, দুই একটি মূর্চ্ছিত মেয়ে, কয়েকপাটি জুতা ও কিছু চুড়ি বালা ও ব্রোচ। আর দেখা গেল, এক পার্শ্বে হসন্ত-বাবুর ধূলিমলিন ছিন্নবস্ত্র ভগ্ন-চশমা-রূপ। তিনি সর্ব্বাঙ্গে উঁচু 'হীলে'র আঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে বহুকষ্টে উঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন, শুধু মেট্রন কাদম্বিনী পলায়ন কালে তাঁর হাঁটুর উপর ব'সে পড়ায় তজ্জাত বেদনায় উঠ্‌তে পার্‌ছিলেন না। শেষে বহুকষ্টে তিনি হামাগুড়ি দেবার ভাবে এগিয়ে গিয়ে মনিব্যাগটা কুড়িয়ে নিলেন, তারপর খানিকক্ষণ কাতুকুতু আক্রান্তভাবে ছটফট্‌-ক'রে একটা ইঁদুরকে ল্যাজ ধ'রে পাঞ্জাবীর ভিতর থেকে টেনে বের ক'রে দূরে ফেলে দিলেন। তিনি হামা-দিয়ে ক্রমশঃ দরজার দিকে এগিয়ে চল্লেন ও বল্‌তে লাগ্‌লেন," "Overdose, Overdose! ইঁদুরটা না দিয়ে আরশুলাটা দিলেই ঠিক্ হ'ত। খালি স্বামীজির কথায় এটা কর্‌লাম। এর evil effect দূর কর্‌তে এখন অন্ততঃ দু সপ্তাহ লাগ্‌বে! তার পর আবার আরশুলা দিয়ে কাজ আরম্ভ কর্‌ব। *Vulneratus, non victus*!*"

---

* বিক্ষতদেহ কিন্তু বিজিত নহে (ল্যাটিন)।



কাব্য-কথা

কবিত্ব ও কবিধর্ম

শ্রী সত্যসুন্দর দাস

কাব্যে কবির ব্যক্তি-জীবনের পরিচয় নাই—এইরূপ কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে, কবি যাহা লেখেন তাহা যখন তাঁহার অন্তরতম অনুভূতির প্রকাশ, তখন কাব্যে কবি-মানুষটির গূঢ় প্রকৃতির লক্ষণ কিছু থাকিবে বৈ কি। উত্তরে বলিব, কাব্যে কবি-মানুষটির পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতির পরিচয় নিশ্চয়ই থাকিবে। প্রত্যেক কবির ভাব ও ভাবনার রূপটি কিছু স্বতন্ত্র—সত্য-সুন্দরের একটা ব্যক্তিগত আদর্শও থাকে। এজন্য প্রত্যেক কবির ভাষা ও ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু থাকে যাহা সেই কবির নিজস্ব। এই মৌলিকতাই শক্তিমানের লক্ষণ, এবং ইহারই মধ্যে কবির কাব্যগত বিশিষ্ট ব্যক্তি-পরিচয় খুঁজিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা যে বাংলাভাষা পাইয়াছি, তাহার পূর্ব্বে আর কোথায়ও ঐরূপ ভাষা ছিল না—সে একটি অভিনব রীতি, তাহাকে একটি নূতন ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের ভাষা আর কোনও রূপ হইতে পারিত না, প্রাচীন ভঙ্গিটুকু ছাড়িয়া দিলেও সে ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহা যেন সাধারণ ইংরেজী ভাষা নয়—শেক্‌স্‌পীরিয় ভাষা। ভাষা, ভাব ও ভঙ্গিতে প্রত্যেক কবির স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া ওঠে। একই বিষয়ে দুই বা ততোধিক কবির রচনা পাঠ করিলে ইহা সহজে উপলব্ধি হইবে। ইংরেজীতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলী উভয়েরই 'স্কাইলার্ক'-পাখীর উদ্দেশে লিখিত কবিতা আছে—এই একই উপলক্ষ্যে দুই কবির কল্পনা দুইটি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের কাব্য-সাহিত্যে 'তাজমহল' লইয়া অনেক কবিই কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সকলেরই পরিচিত, এই সঙ্গে আর দুই একজন কবির রচনা পাঠ করিলেই কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। অবশ্য এরূপ বিচারে ইহাও দেখিতে হইবে যে, তুলনাধীন কবিতায় কবির নিজস্ব কাব্য-প্রেরণা পূর্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে কিনা। রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' কবিতাটিতে সে যুগের রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ ঐ একই ছন্দে নিজ কবিজীবনের আরাধ্যা আদর্শ-দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। উভয় কবিতা হইতে কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ভাষার ভঙ্গি ও ভাবনার প্রকৃতি উভয়ের কত স্বতন্ত্র, উভয়ের কল্পনায় কত প্রভেদ! রবীন্দ্রনাথের কল্পনা উর্দ্ধতম লোকে দেশকালের অতীত পরমরহস্যময়ী সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর বন্দনা করিতেছে—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশি!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা.
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনি!

—কবির অন্তর-বিশ্বে সৃষ্টিশতদলে যিনি বিরাজ করিতেছেন, এখানে আমরা তাঁহারই একটি রূপ দেখিতে পাই। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে 'মহাসরস্বতী' রূপে কল্পনা করিয়া আরতি করিয়াছেন,—

ভূলোকে অমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা;
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা!
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী! মহাকবিকুলের জননী!
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী! কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া; চক্র-শূল ধর ধনুর্ব্বাণ;
হলবাহী কৃষকের ধরি' হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ!—
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে!

*　　*　　*

লক্ষ কোটি চিত্তে প্রাণে অলক্ষিতে বিহর' আপনি
বুলাইয়া দাও স্পর্শমণি।

সমুদ্র মূর্চ্ছনা আর হিমাদ্রি 'অচলঠাট' যার
হে মহাভারতী দেবী! গাহ সেই সঙ্গীত তোমার;
এস গো সত্যের ঊষা! অসত্যের প্রলয়-প্রদোষ!
বীণাধ্বনি-ঘণ্টারোলে যুক্ত হোক্ মূর্ত্ত রুদ্র-রোষ
শঙ্খের নির্ঘোষ;
পুণ্যে কর মৃত্যুজয়ী পাপে ছন্নমতি;
মহাসরস্বতী!

এই দুই কবিতায় দুইটি বিভিন্ন কবি-প্রকৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, উভয়ের কবি-স্বপ্নের আভাস গাঢ় অনুভূতির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অতএব প্রত্যেক কবির কবিহিসাবে যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার একমাত্র প্রমাণ তাঁহার কাব্য-প্রকৃতির এই লক্ষণ। সৃষ্টির আর সকল বৈচিত্র্যের মতন কবি-মানসও বিধাতার এক একটি বিচিত্র সৃষ্টি। সৃষ্টির কিছুই নির্ব্বিশেষ হইতে পারে না, তাই কবির যে অনুভূতি দেশকাল পাত্রের সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া স্ফূর্ত্তি পায় তাহারও একটি বিশেষ রং, বিশেষ রূপ ও বিশেষ ভঙ্গি আছে। যে কবি-প্রতিভা নিয়তিকৃতনিয়মরহিত, তাহাই কতক পরিমাণে দেশকালপাত্রের অধীন হইয়া কার্য্যকরী হয়। মহাকবিগণের কাব্য-প্রেরণা যুগকে অতিক্রম করিয়াও, সেই যুগের আশা-বিশ্বাস ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রত্যেক কবির স্বপ্রকৃতি, ও বহিঃ-প্রভাব—এই দুই কারণে কাব্যের বৈশিষ্ট্য ঘটে। মনে রাখিতে হইবে, এই বৈশিষ্ট্যই প্রকৃতির, তথা আর্টের, প্রধান গুণ। আবার, এ বিষয়ে প্রকৃতি ও আর্টের মধ্যেও প্রভেদ আছে—সে কথা পরে। কবি-সৃষ্টির আলোচনায় এই বৈশিষ্ট্যের কথাটাই ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। সত্য বা আনন্দ নির্ব্বিশেষ, অথচ বিশেষের মধ্য দিয়াই যাহা কিছু রস-বিলাস। বিশেষ ও নির্ব্বিশেষের মধ্যবর্ত্তী সেতুটি—'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা'র রহস্যটি কাব্যসৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই 'দুইএ-এক, একে-দুই' বা দ্বৈতাদ্বৈত-তত্ত্বটিই যে পরমতত্ত্ব, কবিকল্পনা তাহাই প্রমাণ করে। সকল রূপের মধ্যেই যে রূপক রহিয়াছে—সর্ব্ববস্তুই যে apparent pictures of unapparent realities—সকল উৎকৃষ্ট কবিতার ভাবব্যঞ্জনায় তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবিগণ, একটি বিশেষ ঘটনা, চিত্র বা চরিত্র অবলম্বন করিয়াই, যাহা সার্ব্বভৌম, সর্ব্বজনীন ও নির্ব্বিশেষ—যে আনন্দ কোনো তথ্যবিশেষের অধীন নয়, তাহাকে প্রকটিত করেন। আশ্চর্য্য এই যে, সেই বিশেষই নির্ব্বিশেষের অনুভূতিকে গভীরতর করে। শেকস্পীয়ারের 'হ্যামলেট' চরিত্র একটি বিশেষ সৃষ্টি, কিন্তু তাহার সেই ব্যক্তিত্বই সর্ব্বকালের সর্ব্বজনীন মানবপ্রাণের একটি গূঢ় রহস্যের প্রতিরূপ। রবীন্দ্রনাথের 'বালিকা-বধূ' একটি স্পষ্ট রূপক; পড়িতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিতে পারি, এ বধূ কোন্ বধূ; নিখিল মানব-প্রাণের ধর্ম্মচেতনার একটি অপূর্ব্ব অনুভূতি-রস এই বধূর মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে মূর্ত্তি এতই পরিচিত, তাহার আকৃতি এতই সুস্পষ্ট, যে ওই বিশেষের দ্বারাই নির্ব্বিশেষ রস-রূপ আরও গাঢ় হইয়া ওঠে।

এই যে বিশেষের কথা উল্লেখ করিলাম, কাব্যের এই ধর্ম্ম অনেকখানি কবির উপরেও নির্ভর করে। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কবিশক্তিকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

কবির গান করার সঙ্গে গাছের ফুল-ফোটানোর যে উপমা প্রায় দেখা যায়, তাহা নিরর্থক নয়। গাছের সম্বন্ধে যেমন এইরূপ মনে করা চলে যে, ফুল-ফোটানো তাহার স্বভাব, তাহার মধ্যে কোনো বিশেষ একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই—সেটি যেন স্বাভাবিক আনন্দের সৃষ্টি-ক্রিয়া, তেমনি কবি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। তথাপি গাছের যেমন একটা স্বভাবগত নিয়ম আছে—যে গাছ যে ফুল ফোটায় তাহার বর্ণে, গন্ধে ও রূপে একটি বৈচিত্র্য আছে, কবির কল্পনাতেও সেই রকমের বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক কবির নিজ নিজ কল্পনার গতি-প্রকৃতি এই কারণেই স্বতন্ত্র—অর্থাৎ, স্বপ্রকৃতির বন্ধনই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের কারণ। ফুলের উপমাটি এখানে খুব যথাযথ এইজন্য যে, ফুল যেমন গাছের স্বপ্রকৃতিবশে একটি বিশেষ ফুল হইয়া ফুটিলেও তাহার সম্বন্ধে কোনো সজ্ঞান উদ্দেশ্য কল্পনা করা যায় না—তেমনি কবি স্বপ্রকৃতির নিয়মাধীন হইলেও তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে একটা সজ্ঞান চেষ্টার ক্রিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না।

অতএব কবির বৈশিষ্ট্য বলিতে কাব্য-প্রেরণার

অন্তর্গত ব্যক্তি-বিশেষের মতামতের কথা আসে না। কবিগণের কল্পনায় একটা কবি-স্বপ্ন বা মনোগত আদর্শের লক্ষণ আছে, তাহাকে কবির মত-বিশ্বাস বা সজ্ঞান অভিপ্রায় বলা চলে না। প্রায় দেখা যায়, কবিধর্ম্ম-সম্বন্ধে কবিগণের একটা স্বগত ধারণা কাব্যের মধ্যে নানা স্থানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল উক্তির মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ কাব্য-প্রেরণার পরিচয় মেলে। এগুলিকে ঠিক মত বলা চলে না—আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করার মতন একটা চেষ্টাই বলা চলে। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি কয়েকটি এইরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমেই শেক্‌স্‌পীয়ারের সেই সুবিখ্যাত বচন—

The poets' eye in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

[দিব্যোন্মাদঘূর্ণিতনেত্র কবি একবার স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে, আবার মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে তাহার দৃষ্টি প্রেরণ করেন; তৎকালে কবির কল্পনায় যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব ভাবসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, কবির লেখনীমুখে তাহারা দেহ ধারণ করে—যাহারা বায়ুভূত শূন্যময়, তাহারাই এক একটি নাম ও ধাম লইয়া সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে।]

—ইহার মধ্যে কবিধর্ম্ম সম্বন্ধে কবির যে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার গূঢ় অর্থ তাঁহার কাব্যগুলির মধ্যেই আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি তাঁহার কবিধর্ম্মের পরিচয়স্বরূপ গ্রহণ করা যায়—

The moving accident is not my trade.
To freeze the blood I have no ready arts,
'Tis my delight, alone in summer shade
To pipe a simple song for thinking hearts.

[কোনওরূপ অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনাচাতুরী আমার নাই; মানুষকে অভিভূত করিবার বিদ্যাও আমার আয়ত্ত নহে। রৌদ্রোজ্জ্বল বসন্তদিনে প্রচ্ছায়বনতলে বসিয়া, ভাবুক-জনের সমীপে দুইচারিটি সহজ সরল সুর আলাপ করাই আমার বাসনা।]

যাঁহারা শেলীর কবি-প্রকৃতির সহিত পরিচিত তাঁহারা কবি সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি স্মরণ করিবেন—

He will watch from dawn to gloom
The lake-reflected sun illume
The yellow bees in the ivy-bloom,
Nor heed nor see what things they be
But from these create he can
Forms more real than living Man,
Nurslings of Immortality!

[সরোবর-জলে সূর্য্যকিরণ বিচ্ছুরিত হইয়া আইভি-কুঞ্জের উপর পড়িয়াছে, সে আলোকে আইভি-ফুলের উপর যে হলুদবর্ণ মৌমাছিরা বসিয়াছে তাহাদিগকে আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে; যিনি কবি তিনি সারাদিন ধরিয়া মুগ্ধনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া থাকিবেন—কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ঠিক সেদিকে নাই, তথাপি তাহারই মাধুরী দিয়া তিনি যাহা সৃষ্টি করিবেন—তাহা রক্তমাংসের চেয়ে বাস্তব, তাহাই শাশ্বত ও মৃত্যুহীন।]

এই সঙ্গে কীট্‌সের সেই Beauty-Truth (সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর)-বিষয়ক বাণী এবং উপরি-উদ্ধৃত শেক্‌স্‌পীয়ারের বচনটি তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সেই একই সত্য বিভিন্ন কবির কল্পনাদর্শে প্রতিফলিত হইয়া কেমন বিভিন্ন বোধ হইতেছে।

আমাদের কবিগণের মধ্যে বিহারীলালের উক্তি এইরূপ—

রহস্য স্বপন-বালা খেলা করে মাথার ভিতরে,
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে,
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।
* * *
ব্রহ্মার মানসসরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীলজলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি' হাসি' ভাসি' যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী।

এই কবি-ভাষণ যে কবি-স্বপ্নের আভাস দেয় তাহা উক্ত কবির সম্বন্ধে কতখানি সত্য, তাহা বিহারীলালের কাব্যপাঠ করিলে বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কবিধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুবার বহু উক্তি করিয়াছেন, একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম—

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি'
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি',
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশভালে।
অন্তর হ'তে আহরি' বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।

* * *

মুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী-নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে'
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মত' রবে।
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে-খুঁজে
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে—
মাগিছে তেমনি সুর;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা
বিদায়ের আগে দুচারিটি কথা
রেখে যাব সুমধুর।

এই শ্লোকগুলিতে কবিধর্ম্মের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা শুধুই ব্যক্তিগত নয়, ইহাতে যাবতীয় কবির কাব্যপ্রেরণার একটি মূল উৎসের সন্ধান রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজ কাব্য সম্বন্ধে এই আদর্শ যে কতখানি সত্য, কাব্যবিচারের দিক দিয়া ইহা যে কত উচ্চ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এখানে কবি কবিত্বের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা যেমন সহজ, সরল, তেমনই যথার্থ।

কবিবর দেবেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতিতে যে বিশিষ্ট কবিধর্ম্মের লক্ষণ আছে, তাহার পরিচয় কবি যেমন দিয়াছেন তাহা ঠিক উক্তি নয়—নিম্নোদ্ধৃত কাব্যখণ্ডটিতে তাঁহার কবি-প্রেরণাই যেন মূর্ত্তিমতী হইয়াছে!—

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী!
সারাসন্ধ্যা সারানিশি, রূপবৃন্দাবনে বসি'
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস বিদ্যুতের পরকাশ
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী,
বাসন্তী ওড়না সাজে প্রকৃতি-রাধিকা সাজে,
চরণে ঘুঙুর বাজে আনন্দে ঝঙ্কারি'!
নগনা দোলনা কোলে মগনা রাধিকা দোলে
কবিচিত্তকল্পনায় অলকা উঝারি'—
আমি সে অমৃতবিষ পান করি অহর্নিশ
সংসারের ব্রজবনে বিপিনবিহারী।

আর এক স্থানে কবি তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর উদ্দেশে বলিতেছেন—

এইরূপে নিত্য তুমি নব নব বেশে,
হে অপূর্ব্ব কুহকিনী, হে বহুরূপিনী!
কল্পনারে করি' জয়, সত্যের মন্দিরে
দেখা'ইতে ছায়াবাজী! কঙ্কাল হইতে
সৃজিতে অপ্সরীমূর্ত্তি; দাবদগ্ধ বনে
সৃজিতে অলকাপুরী, আনন্দনগরী!
পান করি' হলাহল নীলকণ্ঠ যথা
বাঁচাইলা বৃন্দারকে, হায় গো তেমতি
মৃত্যুর উৎসঙ্গে বসি', হে করুণাময়ী!
নিরক্ত অধর-ওষ্ঠে চুম্বিয়া সুধীরে
শুষিতে বিষাক্ত ক্রূর ফেনপুঞ্জরাশি!
দুই ধারে মরণের পঞ্জর হইতে
ঝটপট ইন্দ্রধনু পালক প্রকাশি'
জীবনের যুগ্মপক্ষ দেখা দিত, মরি!

উপরি-উদ্ধৃত কবিতাগুলির মধ্যে যে সপ্রতিভ কবি-কল্পনার পরিচয় আছে, তাহা হইতে প্রত্যেক কবির বিভিন্ন আদর্শের বা বিশিষ্ট কল্পনাপ্রকৃতির অনুমান হয়; কিন্তু কোনোটিকে কবিবিশেষের একটি creed বা মত-বিশ্বাস বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, কবিগণের সকলের অল্পবিস্তর আত্মচেতনা আছে, স্বধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে। এইরূপ কবি-বচনকে যদি আত্মসমালোচনাও বলা হয়, তবে সেগুলিকে সেই মূল্যই দিতে হইবে,—তাঁহাদের কাব্যসম্বন্ধে অপরাপর সমালোচকের মতের যাহা মূল্য, তাহার অধিক মূল্য দেওয়া যাইবে না। কিন্তু এগুলি যে ঠিক সমালোচনা নয়, তাহার প্রমাণ—এগুলিতে কোনও বিচার-বুদ্ধি নাই, এগুলি কবিগণের গুলি নিজ নিজ অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র। কবি যখন বলেন,

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়—

তখন সেরূপ উক্তির মধ্যে যে সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাকে কবিধর্ম্ম না বলিয়া একটা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা মনে করা উচিত। কারণ কাব্য পাঠ করিবার সময় সর্ব্বত্র উহা মনে রাখার প্রয়োজন হয় না। কবির এইরূপ ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া গেলেও, উহা যে কাব্যসৃষ্টির বহুবিচিত্র প্রেরণায় একটি সজ্ঞান উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের মত কার্য্য

করে, এমন বিবেচনা নিতান্তই নিরর্থক। কবির যদি কোনও বাণী থাকে, তবে তাহা যুক্তি-বিচারের দাবী মিটাইয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ম নহে; তাহা একটি অহেতুক—এমন কি অযৌক্তিক আনন্দের নিদান। এজন্ম কবির যদি কোনও মত থাকে, কাব্যপাঠকালে সেই মতটিকে সম্মুখে না ধরিয়া, যদি আবশ্যক হয় কাব্যেরই আলোকে সেই মতের মূল্য নিরূপণ করা অন্যায় হইবে না। দর্শন, বিজ্ঞান, বা নীতিশাস্ত্রের কোনও তত্ত্ব যদি কবির কবিতার মধ্যে উঁকি দেয়, তবে তাহারও তত্ত্ব হিসাবে কোনও মূল্য নাই—এবং সেই সকল মত যদি সুচিন্তিত না হয়—এমন কি সঙ্গতিহীন হয়, তাহা হইলেও কাব্যের কোনও ক্ষতি হয় না। রবীন্দ্রনাথের "হে বিরাট নদী" কবিতাটির মধ্যে একটি সুপরিচিত দার্শনিক চিন্তার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু এখানে তাহা কেবলমাত্র কাব্যপ্রেরণার আবেগ সঞ্চার করিয়াছে। এজন্ম কবিতাটির রস-উপভোগের জন্ম দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা অনাবশ্যক, এবং কবিকে কোনও একটি দর্শনপন্থার পথিক বলিয়া স্থির করা নিতান্তই হাস্যকর। ইংরেজ কবি শেলীর কাব্যগুলিতে ন্যায়নীতি, সত্য ও স্বাধীনতার উগ্র অনুভূতির মধ্যে যে মতবাদ রহিয়াছে, তাঁহার Prometheus Unbound কাব্যের মূল্য সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাঁহার Millennium-স্বপ্ন একটা স্বপ্নই, এই স্বপ্নের মূল্য এই যে, ইহা তাঁহার কবি-কল্পনার আহ্লাদিনী শক্তি—এই স্বপ্ন তাঁহার কল্পনাসমুদ্রের একটি তরঙ্গ, এই তরঙ্গের আঘাতে কবিচিত্ত কতই না দুলিয়াছে! তাঁহার Epipsychidion এর মূলে প্লেটোর যে তত্ত্বকথাই থাক, আমরা তাহা মুহূর্ত্তের জন্ম বিশ্বাস না করিয়াও ঐ কবিতার অপূর্ব্ব কবি-প্রেরণায় মুগ্ধ হই। Adonais-এর শেষ কয়টি শ্লোকে যে নক্ষত্র-লোকের রাগিণী ধ্বনিয়া উঠিয়াছে তাহা শ্রবণকালে কোনও তত্ত্বকথা মনে আসে না। বরং, আবার তখনই যদি পড়ি—

On a poet's lips I slept
Dreaming like a love adept

ইত্যাদি,—তবে কবির কথায় আশ্বস্ত হই, কবির স্বরূপ দেখিয়া সকল আশঙ্কা নিরস্ত হয়।

অতএব কবিধর্ম্ম বলিতে কবিত্বই বুঝিতে হইবে। কবির কোনও খেয়াল, স্বপ্ন বা মতবাদ যদি কাব্যের মধ্যে উঁকি দেয়, তবে তাহাকেও কাব্যের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহাকে কোনও বহির্গত নীতি বলিয়া স্বীকার করিলে তাহা কবির ব্যক্তি-ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে, কবিধর্ম্ম হইতে পারিবে না। কবি-মানুষটির সজ্ঞান চিন্তায় যদিও তাহা একটি বিশেষ মতবাদের মত শুনিতে হয়, কবির দিব্যানুভূতির ভাবাবস্থায় তাহা কবির একটি চিত্তবৃত্তি মাত্র।

তবে কি কবির কোনও নীতি-বিশ্বাস নাই? কবি কি ধর্ম্মহীন? তাঁহার ভাবনার কি কোনও নিয়ম বন্ধন নাই? ইহার উত্তরে কবিকল্পনার স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিবার—পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু কোনও বিধি-সংস্কারের নিয়মানুবর্ত্তিতা যদি ধর্ম্মবিশ্বাসের লক্ষণ হয়, তবে কবির কোনও ধর্ম্ম নাই। কবিচিত্ত এতই উদার, মুক্ত ও লীলাপ্রবণ যে, সাক্ষাৎ অনুভূতিযোগে যাহা কিছু তাঁহার দিব্যদৃষ্টির গোচর হয়—আনন্দের অব্যর্থ প্রমাণে তাহাই তাঁহার নিকট সত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সত্য হওয়ার পক্ষে কোনওরূপ মতসামঞ্জস্যের আবশ্যক হয় না, একারণ তাঁহার কল্পনাপথে কোনও বাধা নাই। কবিধর্ম্ম সম্বন্ধে কবির এই উক্তিই যথার্থ—

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধূলারেও মানি আপনা;
ছোট বড় হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা;
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা;
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

কবির সঙ্গে কাব্যের যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের জন্ম কবি-সৃষ্টির বৈচিত্র্যের নানা কারণ এবং সেই প্রসঙ্গে কাব্যকথায় বিশেষ ও নির্ব্বিশেষের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কবির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্থে কবির মতবিশ্বাস বলিয়া যদি কোনও প্রশ্ন উঠে, তবে তাহারও মূল্য

কিরূপ, সে আলোচনা যথাসাধ্য করিয়াছি। তথাপি এই প্রসঙ্গে একটা দিক এখনো লক্ষ্য করা হয় নাই। কবি-প্রকৃতি বা কবিচিত্তের একটা অন্তরতর প্রভেদ আছে। কবিপ্রকৃতিতে একটা মূল প্রবৃত্তির প্রেরণা আছে যাহার গতি ভিন্নমুখী। এইবার সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কবিত্ব বলিতে একটা সাধারণ ধারণাই সম্ভব, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, কবিত্বের উৎস প্রধানতঃ দুইটি ধারায় প্রবাহিত। একই জগৎ সকল কালে সকল কবির সমক্ষে দণ্ডায়মান, ভাবাবস্থার তন্ময়তাও সাধারণ কবিধর্ম্ম। তথাপি কাব্যপ্রেরণার প্রবৃত্তি এক নহে। কবিচিত্তকে প্রকৃতির দর্পণ বলিলেও সেই দর্পণের গঠনভেদ আছে। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে একটি অহং যুক্ত হইলে সৃষ্টি-প্রেরণা জাগে। এই অহং যেন অনেকটা মজিয়া যায় বলিয়াই রসানুভূতি হয়। তথাপি কবিকল্পনায় সর্ব্বত্র অহং-মুক্তি হইতে পারে না। বরং এক জাতীয় কাব্যে অহং-এর অতিরিক্ত প্রসারই কাব্য-প্রেরণার মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। এরূপ কাব্যে কবির অহমিকা এতই তীব্র, কবির আত্মমোহ এতই প্রবল, যে সেখানে 'তন্ময়তা'র স্থলে 'মন্ময়তা'ই কবিধর্ম্ম বলিতে হইবে। কল্পনা এখানে অন্তরমুখী, কবি এখানে আপনাকেই সম্ভোগ করেন—এই জাতীয় কাব্যে কবির আপন অন্তরতম অনুভূতিই বিশ্বজনীন হইয়া উঠে; মানুষের সঙ্গে মানুষের যে হৃদ্‌গত আত্মীয়তা তাহারই রসে একটি গভীর সহমর্ম্মিতার উদ্রেক হয়। এরূপ কাব্যপাঠে মানুষের যে গূঢ়তম হৃদয়বৃত্তি ঘুমাইয়া আছে, তাহাই জাগ্রৎ হইয়া ওঠে। যাহা আমারই অবস্থা, অথচ স্পষ্ট গোচর নয়—যে বেদনা ব্যাকুল করে, অথচ ব্যক্ত হইয়া উঠে না—যে সৌন্দর্য্যের আভাস পাই, অথচ দেখিয়াও দেখি না—মানুষের সেই আত্মগত গূঢ় বাসনা এইরূপ অন্তর-সন্ধানী কবির কল্পনায় জাজ্বল্যমান হইয়া ওঠে। তাই কবি বলেন—

নব অরণ্যে মর্ম্মর-তান তুলি,
যৌবন-বনে উড়াই কুসুম-ধূলি,
চিত্তগুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।

নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ কিরণে ঢাকি'
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীত-রবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি ক'বে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

* * * *

আপনাকেই বিশ্বের কেন্দ্ররূপে উপলব্ধি করিয়া সেইখানে সৃষ্টির সকল রহস্যকে সাক্ষাৎকার করিয়া অপার বিস্ময়ে অভিভূত কবির আত্মস্ফূর্ত্তি সকল যুগের কাব্য-সাহিত্যেই অল্পবিস্তর আছে। কাব্যে কবিমাত্রেরই এই আত্মস্মৃতা অবশ্যম্ভাবী; এবং এই কারণেই প্রায় কোনও কাব্যই সম্পূর্ণ 'আত্মহারা' হইতে পারে না। তথাপি,

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম—

এমন কথা সকল কবির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খাটে না—আর একরূপ কবি-প্রবৃত্তিও আছে। অন্তর ও বাহির, কবি-মানস ও জগৎ, 'অহং' ও প্রকৃতি—এই দুইএর যুগপৎ লীলা কাব্যসৃষ্টিতে প্রকটিত হয়। এজন্য কাব্যবিচারে এই দ্বন্দ্বের একটি বা অপরটিকে অবলম্বন করিয়া শ্রেণী-বিভাগ করা সম্ভব নয় বটে, তথাপি সমগ্র কাব্য-সাহিত্যে এই যমজ প্রবৃত্তির মিলিত-ধারা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের মতই পৃথক চিহ্নিত করা যায়। কোনও কবির কল্পনা বিশেষ করিয়া ভাবপ্রধান ও আত্মধর্ম্মী, কাহারও কল্পনায় আত্মবিস্মরণী নাটকীয় প্রবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগই যেখানে কাব্যের মূল প্রেরণা, সেখানে বাহিরের ঘটনা বা বস্তুবিশেষের বর্ণনাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; কাব্যবস্তু যাহাই হউক, অন্তরের আবেগেই তাহা মহীয়ান, সেখানে ভাষা—বস্তুগত অর্থের গৌরবে নয়—গানের সুরে রূপান্তরিত হইয়া কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। আর এক জাতীয় কবি-কল্পনা আছে। তাহাতে কবি আত্মমুগ্ধ নহেন; আপনার অন্তর-কাহিনীর পরিবর্ত্তে বহিঃসংসার, বাহিরের মানব-জীবনের রহস্য-বিস্ময় কবি-প্রেরণার মূল কারণ। এই দুই রকমের কবিপ্রবৃত্তি কতকটা যুগপ্রভাবের অধীন

বটে, তথাপি ইহা কবিবিশেষের প্রকৃতিগত। বৈষ্ণব পদাবলী ও পরবর্ত্তীকালের কথাকাব্যে (মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র) আমরা কবি-প্রেরণার এই দুই মূল প্রবৃত্তি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাই। আবার সন্ধান করিলে এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যাইবে—যেখানে যুগধর্ম্মবশে, তদানীন্তন প্রচলিত আদর্শের শাসনে কবির স্বধর্ম্ম পীড়িত হইয়াছে; যাহার প্রেরণা গীত তাহা কাহিনীর আকারে প্রকাশ পাইয়াছে, এবং যাহার প্রেরণা কাহিনী তাহাকে গানের ভঙ্গি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই দুই ভিন্নমুখী কল্পনার বশে কাব্য-সাহিত্যে দুইটি পৃথক আদর্শের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি এই দুই পন্থার নাম-করণে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাব্যসৃষ্টিতে এই দ্বন্দ্বের একটি লুকাচুরী খেলা চলিয়াছে দেখা যায়—কোনও কাব্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আত্মসর্ব্বস্ব বা সম্পূর্ণ বহিঃসর্ব্বস্ব হইতে পারে না। যাহা কিছু বাহিরের তাহা কবির অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ পায়; আবার যাহা কবির নিজস্ব আবেগ তাহাও একেবারে বহিঃসম্পর্ক-শূন্য নহে। এজন্য কবিকল্পনাকে মূলে একটি সাধারণ মানস-ক্রিয়া বলিয়া বুঝিয়াও এইরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করা যায় যে, কাহারো প্রেরণা বহির্মুখী,কাহারো বা অন্তর্মুখী; কোনও কবির কল্পনায় প্রেরণা জোগাইয়াছে তাঁহার অন্তরের ভাবরাশি, কাহারও প্রেরণা আসিয়াছে বাহিরের রূপরাশি হইতে। কেহ বাহিরের রূপকে অন্তরের ভাবে আত্মসাৎ করেন, কেহ বা অন্তরের ভাবকে বাহিরের রূপে প্রসারিত করেন। কেহ বলেন,

> 'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'

কেহ বলেন,

> "আমি মনের মোহের মাধুরী মিশায়ে
> তোমারে করেছি রচনা।"

এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ কবি ও সমালোচকের মত * উদ্ধৃত করিয়া কথাটা স্পষ্ট করিয়া তুলিব।

* Encyclopaedia Britannica'য় Theodore Watts-Dunton লিখিত Poetry শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উক্ত সমালোচক কবিকল্পনার এই দুই প্রবৃত্তির একটিকে Lyric বা Egoistic Imagination (গীতাত্মক, আত্মপরায়ণ) ও অপরটিকে Dramatic Imagination বা নাটকীয় কল্পনা নাম দিয়াছেন। নাম দুইটি ইংরেজী কাব্যসমালোচনায় বহু প্রচলিত। এই দুই জাতীয় কবি-কল্পনায় দুই ধরণের কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাকে তিনি যথাক্রমে Relative Vision বা আপেক্ষিক দৃষ্টি, ও Absolute Vision বা নিরপেক্ষ দৃষ্টি বলিয়াছেন। 'আপেক্ষিক দৃষ্টি'র অর্থ এই যে, ইহা একটা চশমার অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ যাহা দেখে, তাহাতে নিজের মনের রং অল্পাধিক মাত্রায় থাকিবেই। 'নিরপেক্ষ দৃষ্টি' অর্থে স্বাধীন অবাধ দৃষ্টি বুঝিতে হইবে। যাঁহারা নিছক গীতি-কবি তাঁহাদের এই আপেক্ষিক দৃষ্টিও অতিশয় সঙ্কীর্ণ। যাঁহারা মহাকাব্য, কাহিনী বা নাটক-সদৃশ কাব্য রচনা করেন তাঁহাদের দৃষ্টিও আপেক্ষিক। এই দুই দলের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা একটি উপমার সাহায্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যাঁহারা গীতিকবি তাঁহাদের একটিমাত্র কণ্ঠ, এবং সেই কণ্ঠে একটিমাত্র সুর। অপর কবিগণের কণ্ঠ একটি বটে, কিন্তু সেই কণ্ঠে বিবিধ সুর খেলিতে পারে। জগতের প্রায় সকল বড় কবি—কল্পনা ও কাব্যভঙ্গি যাঁহার যেমনই হউক—সকলেই এই আপেক্ষিক দৃষ্টির অধিকারী। দ্বিতীয় প্রধান দল—যাঁহারা নিরপেক্ষ বা পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী—তাঁহাদের কণ্ঠ একাধিক, এবং সেই বহুকণ্ঠে বহুতর সুর বাজিয়া ওঠে। ইঁহাদের সংখ্যা অতিশয় অল্প; য়ুরোপীয় কবিগণের মধ্যে শেকস্‌পীয়ার, এস্কাইলাস্‌, সোফোক্লিস্‌, হোমার ও কতকটা চসারকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

গীতি-প্রাণ কবিদের সম্বন্ধে ইনি বলেন যে, ইহাদের দৃষ্টি অপর সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ, ইহারা অতিমাত্রায় আত্মসর্ব্বস্ব—বাহিরের কিছুই ইঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; ইঁহারা যেন অন্ধ বলিয়াই গান করেন। এই সকল কবির বহির্দৃষ্টি যত সঙ্কীর্ণ, অন্তর-রাজ্য ততই বিস্তৃত। ইঁহাদের গান বড় মিষ্ট, বড় করুণ ও স্বপ্নময়।

কিন্তু যাঁহাদের দৃষ্টি আপেক্ষিক হইলেও যথেষ্ট বৃহৎ ও উদার, জগতের সেই অধিকাংশ বড় কবির

শক্তি একটু স্বতন্ত্র। দার্শনিক-প্রবর হেগেল বলেন—জগৎ সৃষ্টিতে প্রতিবস্তুই অপর হইতে বিশিষ্ট, কোনও দুইবস্তুই একরূপ নহে; কিন্তু আর্টের সৃষ্টিতে সকল বস্তুই সাধারণীকৃত—সকলের মধ্যেই বিশেষ অপেক্ষা সামান্য লক্ষণই প্রবল। এই কবিগণের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাই সত্য। ইঁহাদের কাব্যে ব্যষ্টির বিশিষ্ট লক্ষণের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মনোগত সমষ্টি-লক্ষণ প্রকাশ পায়; অর্থাৎ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী একটা সাধারণ লক্ষণ ফুটিয়া ওঠে। আমাদের প্রত্যেকের জগৎ যে এক-একটি 'অহং' কে কেন্দ্র করিয়া বিরাজ করিতেছে, সেই 'অহং' এর গণ্ডী ইঁহারা ভাঙ্গিতে পারেন না; স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন স্বপ্নদ্রষ্টার আত্মগত কল্পনার সৃষ্টি, তাহারা যেমন স্বপ্নদ্রষ্টাকেই ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরিতে থাকে—সেইরূপ তাঁহাদের সৃষ্টির আপাতগোচর বিভিন্ন "অহং" গুলি সেই একই 'অহং' এর প্রতিচ্ছবি।

যাহাকে নিরপেক্ষ বা পূর্ণ দৃষ্টি বলা হইয়াছে, তাহা একেবারেই আত্ম-সম্বন্ধ-শূন্য—সে দৃষ্টির যাহা সৃষ্টি তাহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র; তাহাদের সামান্য লক্ষণ যেমনই হউক, এমন বিশিষ্ট লক্ষণ আছে যে, তাহাদিগকে প্রাকৃতিক সৃষ্টির মত স্বতন্ত্র ও নূতন বলা যাইতে পারে। সময়ে সময়ে আপেক্ষিক দৃষ্টিও এমন সৃষ্টি করে, যে হঠাৎ ভ্রম হয়—সে বুঝি আপেক্ষিক দৃষ্টি নয়, নিরপেক্ষ দৃষ্টি। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাগা-(Saga)-কাব্য হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। নায়িকার ভ্রাতৃদ্বয় তাহার স্বামীকে হত্যা করিতেছে; তাহার স্বামীর পূর্ব্বপ্রণয়িনী, উপেক্ষিতা অপর এক রমণী এই হত্যাকার্য্যে তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে। হত্যাকার্য্য হইয়া গেলে স্বামীর মৃতদেহের উপর অবলুণ্ঠিতা রক্তাক্তকলেবরা নায়িকার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া, দ্বারদেশে প্রতীক্ষমানা অপরা রমণী হাসিয়া উঠিল। সেই হাসি দেখিয়া হত্যাকারীদের মধ্যে একজন তাহাকে বলিল,

"তোর হাসি দেখিয়া ত মনে হয় না, যে তোর কলিজার শিকড়গুলাও হাসিতেছে—তাহা হইলে তোর মুখ এত পাঙাশ দেখাইবে কেন?"

চিত্রটি খুব সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু ওই নাটকীয় অবস্থায় যে কোনও দুই ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথোপকথনই সম্ভব হইত। এজন্য এখানে কবির দৃষ্টি সাধারণে আবদ্ধ, বিশেষে নয়—ইহাও আপেক্ষিক দৃষ্টি, পূর্ণদৃষ্টি নয়। এই আপেক্ষিক দৃষ্টির দৃষ্টান্ত পূর্ণদৃষ্টির অধিকারী মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারের কাব্যে অনেক আছে—সে এতই চমকপ্রদ যে সহসা তাহাকে পূর্ণদৃষ্টি বলিয়াই ভ্রম হয়, এবং তাহাকে আর কোনও দৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিলে সমালোচকের বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে। 'ম্যাকবেথ' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে লেডি ম্যাকবেথের সেই বিখ্যাত উক্তি—

"রাজার নিদ্রিত মুখ আমার পিতার মুখের মত না দেখাইলে, আমি নিশ্চয় এ কার্য্য (হত্যা) করিতাম।"

—মহাকবির অতি গভীর চরিত্রসৃষ্টির পরিচায়ক, তথাপি এ লক্ষণ সাধারণ মানবচরিত্রের অন্তর্গত, এখানে কোনও বিশেষ চরিত্রের পরিচয় নাই। সত্যসত্যই একবার এক পান্‌সীওয়ালা এক আরোহীর নিদ্রাবস্থায় তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আদালতে যাহা বলিয়াছিল তাহা ঠিক এইরূপ—"যদি উহার ঘুমন্ত মুখ আমার বাপের মুখের মত না দেখাইত, তবে উহাকে হত্যাই করিতাম।" এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

পূর্ণ দৃষ্টির প্রেরণা অন্যরূপ। সে অবস্থায় কবির অহং যেন নিষ্ক্রিয়; তাঁহার মনশ্চক্ষুতে যে ভাবমূর্ত্তি ভাসিয়া ওঠে তাহাই যেন দৈবশক্তিবলে তাঁহার কল্পনাকে চালিত করে—তাহার অতিরিক্ত বা বহির্গত কোনও চেতনা তখন আর থাকে না। তাই কাব্যে যে মূর্ত্তিটি ফুটিয়া ওঠে, তাহার ব্যক্তিত্ব এত নিখুঁত, এত স্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন, যে তাহার তুলনা সে-ই,—তাহা যেন আর্ট নয়, স্বয়ং প্রকৃতি। পুত্র-হন্তা আকিলিসের (Achilles) হস্ত চুম্বন করিবার সময়ে হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামের (Priam) মুখে যে আর্ত্ত চীৎকার শুনি, সে যে-কোনও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ পিতার বিলাপধ্বনি নয়, সে সেই এক মাত্র ট্রয়-রাজ প্রায়ামেরই শোকোচ্ছ্বাস। ওই বিলাপভঙ্গী ঐরূপ অবস্থায়, কোপন-স্বভাব, অবুঝ বৃদ্ধ লিয়ারের (Lear) মুখে মানায় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলিতে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

হ্যামলেট নাটকের প্রথম অঙ্কের একটি দৃশ্য লওয়া যাক্। হ্যামলেট এই প্রথম হোরেসিওর মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা দুর্গ-মধ্যে দেখা দিয়াছে। কয়েকটা দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারা এই অলৌকিক ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট জ্ঞাতব্য কথা জানিয়া লইয়া হ্যামলেট বলিয়া উঠিলেন, "আমি যদি সে সময় সেখানে থাকিতাম!" ইহার উত্তরে হোরোসিও নিতান্ত প্রাকৃত জনের মতই বলিল, "তাহা হইলে আপনি খুব বিস্মিত হইতেন।" এইবার হ্যামলেট যাহা বলিলেন তাহাতে কি অপূর্ব্ব নাটকীয় কল্পনার পরিচয়!—বলিলেন, "খুব সম্ভব, খুব সম্ভব,—বেশীক্ষণ ছিল কি?" শ্রেষ্ঠশক্তির অধিকারী ব্যতীত আর কোনও কবির রচনায় এখানে কি দেখিতাম? যে ঘটনা হ্যামলেটের নিকট দশটা নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হওয়া অপেক্ষাও বুদ্ধিভ্রংশকারী, তাহারই সম্পর্কে হোরেসিওর এই অতি ক্ষুদ্র কথা শুনিয়া হ্যামলেট নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিতেন, "কি বলিলে? বিস্মিত হইতাম!" তার পর ইহা যে তাঁহার পক্ষে কতখানি বিস্ময়কর সেই সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কবি এখানে নিজেই হ্যামলেট হইয়া গিয়াছেন—কবি-প্রেরণার দিব্য-শক্তি তাঁহাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, হ্যামলেটের মত চরিত্রের অন্তর-নিরুদ্ধ ভাবাবেগ ব্যক্ত করিবার ভাষা জুটিল না—তাই এরূপ প্রশ্নের উত্তরে হ্যামলেট যেন আত্ম-গত পরিহাসের ছলে কতকটা মনে মনেই বলিয়া উঠিলেন, "খুব সম্ভব, খুব সম্ভব।" এক হ্যামলেট ভিন্ন আর কেহই এরূপ অবস্থায় এইরূপ উত্তর এমনভাবে দিতে পারিত না।

অতএব কবি-প্রেরণার এই গুণ একটি বিশিষ্ট গুণ বটে। কেবলমাত্র রসবিচারে কাব্য-প্রেরণার এই প্রভেদ অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু কবিকে যদি কাব্য হইতে পৃথক করিয়া দেখার প্রয়োজন হয়, যদি কবি-প্রেরণার বৈচিত্র্য বা কবি-শক্তির তারতম্য তুলনায় বিচার করিতে হয়, তবে এই Absolute Vision বা নিরঞ্জনা কবি-দৃষ্টির কথা বিশেষ করিয়া আলোচনার যোগ্য। কারণ, সত্যকার সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, যে সৃষ্টি-প্রেরণার মূলতত্ত্ব ব্রহ্মের "এক আমি বহু হইব"—এই কামনা,—সেই সৃষ্টিলীলার আনন্দ এই পূর্ণ দৃষ্টিতেই সম্ভব। কবি যখন আপনার সম্পূর্ণ বহির্গত, অথচ সৃষ্টি-রহস্যের অনুগত কিছু সৃষ্টি করেন, তখনই তাহা একটা বিশেষ কিছু, অর্থাৎ সত্যকার সৃষ্টি হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাঁহার কল্পনার লীলা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে চরম কবিশক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে সাহিত্যকেই যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বলিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। এই সত্যকার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে কবির যে দিব্যানুভূতির প্রমাণ পাই তাহাই পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দের লীলা। এইরূপ সৃষ্টি করার শক্তিতে সৃষ্টি রহস্যভেদের যে পরিচয় আছে—উৎকৃষ্ট নাটকীয় শক্তিতেই তাহা সম্ভব, সে যেন সেই অন্তর্য্যামী আদি পুরুষের মত। কবিদৃষ্টি যাহা প্রত্যক্ষ করে, ঠিক সেইটির অস্তিত্ব যেন তৎপূর্ব্বে ছিল না—তাহা যেন 'airy nothing'; কিন্তু তাহাই যখন কবি-কল্পনায় নাম ধাম লইয়া শরীরী হইয়া উঠিল, তখন সে আর অবাস্তব বা অসত্য নহে, বিশ্বশিল্পীর স্বহস্ত-রচিত কীর্ত্তি-বিশেষের মতই তাহা বিশিষ্ট, জীবন্ত ও বাস্তব। এই আত্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিই যে পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ আনন্দের নিদান, আপনা হইতে আপনার বাহিরে দাঁড়াইবার শক্তিই যে সকল রহস্যভেদের শক্তি—এ অবস্থায় যে বুঝিতে হয় না, খুঁজিতে হয় না—সব 'দেখিতে' পাওয়া যায়—সে কথা কবি নিজেও বলিতেছেন—

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়;
মিছে কি করিস নাট-বেদীতে?
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।
ওই দেখ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই চাস্ যদি ভেদিতে
মিছে না ফিরিস্ নাট-বেদীতে।
নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে',
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে নাহি যুঝিবি',—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

ইহাই লক্ষ্য করিয়া আমি কবির দিব্যানুভূতিকে পূর্ণমানবতার লীলা, এবং কবিধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ বলিয়াছি।



শ্রী সজনীকান্ত দাস

চামড়ার সাহায্যে দেখা—

প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক জিন লাবাড়ি প্রথম জীবনে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া তাহাদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিতেন। তন্মধ্যে চোখের উপর পুরু পর্দ্দা বাঁধিয়া দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াও সমস্ত দেখিতে পাওয়া একটি। কিন্তু পরে তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন যে এই সমস্ত বাজিকর প্রত্যেকেই জুয়াচোর। তিনি এতাবৎকাল ওই ধরণের সমস্ত ব্যাপারকেই জুয়াচুরী মনে করিয়া আসিতেছিলেন তাই সম্প্রতি যখন শুনিলেন যে প্যারিসে মাদাম নি—এক দল ডাক্তারের কাছে চোখে কাপড় বাঁধা অবস্থাতেই যে কোনো জিনিষ বা লেখা দেখিয়া বা পড়িয়া বলিয়া দিয়াছেন তখন তিনি সেই মহিলাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ঠক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এবং অবশেষে নিজেই তাহাকে পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন।



চামড়ার দৃষ্টিশক্তি ; লাবাড়ির পরীক্ষা

তিনি খুব সাবধানে মেয়েটির চোখ বাঁধিয়া খুব অন্ধকার ঘরে লইয়া গিয়া একটি কালো বাক্সের ভিতর দৈনিক ক্যালেণ্ডারের একটি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া নিজে না দেখিয়াই মুঠা করিয়া ধরিয়া মেয়েটিকে বলিলেন "কি দেখছ ?"

মেয়েটি বলিল—"দিন ক্যালেণ্ডারের একটি পাতা, ২৯ শে জুলাই। লাবাড়ি নিজে কাগজখানা দেখিয়া চমকিত হইলেন। তাই বটে।

তৎপর আরো নানা প্রকারের অদ্ভুত পরীক্ষা করিয়া তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন যে মুখের চামড়ারও দৃষ্টিশক্তি আছে। তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্গত নে নিবাসী ১১, ১৩ ও ৯ বৎসরের তিনটি মেয়েকে লইয়াও ওই ধরণের নানা পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহারা এইরূপ অবস্থাতেই গড় গড় করিয়া বই পড়িতে পারে, সূচে সুতা পরাইতে পারে, জিনিষের রঙও বলিয়া দেয়। পাশের ছবিতে ওই মেয়েদের একটিকে লাবাড়ি পরীক্ষা করিতেছেন তাহাই দেখান হইয়াছে। মেয়েটির সামনে উঁচু করে একটি ছবি বা লেখা ধরিয়া রাখা হইয়াছে ও আলোকরশ্মি সেই ছবি হইতে যাহাতে কিছুতেই বালিকার চক্ষে প্রবেশ করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা আছে। অথচ মেয়েটি ওই অবস্থাতেই ঠিক ঠিক সব বলিয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল ?

লাবাড়ি মনে করেন সম্ভবতঃ চক্ষু ব্যতীত মানুষের মুখের চামড়ারও দৃষ্টি শক্তি আছে। তবে কপালের চামড়ার শক্তিই বেশী।

কোনো জিনিষ দেখিবার সময় মেয়েগুলি অতিরিক্ত মনোযোগ দিতেছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল ও ইহার পরই তাহারা অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। আরো একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে চক্ষুর দৃষ্টিতে আলোক রশ্মি যেমন সোজাসুজি কাজ করে চামড়ার দৃষ্টিতে ঠিক যেন তার উল্টা ভাবে কাজ হয়। লাবাড়ি মনে করেন চামড়ার মধ্যে বিশেষ নির্দ্ধারিত কোনো দেখিবার অঙ্গ নাই তবে দ্রষ্টব্য জিনিষ হইতে আলোক রশ্মি চামড়ার উপর কার্য্য করিয়া মস্তিষ্কে তাহার অনুভূতি জন্মায়। এ সম্বন্ধে তিনি আরো অনুসন্ধান করিতেছেন।

অদ্ভুত কাজ—

আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে কেরাণীগিরি ছাড়া কোনো কাজ আমরা খুঁজিয়া পাই না। ইহার কারণ আসলে কাজের অভাব নহে আমাদের জীবনীশক্তির অভাব। যাহারা সত্য সত্যই বাঁচিয়া আছে সেই পাশ্চাত্য জাতিসমূহ বিজ্ঞান-বলে পৃথিবীকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের কাজের অভাব কখনো হয় না। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করিয়া যে তাহারা জীবিকার জোগাড় করিতেছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ বরফের পাখী তৈয়ারী করিতেছে, কেহ সারাটা জীবন কেবল মাছ ও পাখী ধারবার চারাই তৈয়ারী করিতেছে, কেহ বা কলকারখানার চিম্‌নীর ধোঁয়ার রঙ ইত্যাদি দেখিয়াই অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। পাশের ছবিটি জার্ম্মান নাবিক কাপ্তান এইচ ওয়ালের। তিনি নাকি পৃথিবীর



কুমীর-পোষা

মধ্যে একমাত্র লোক যিনি কুমীর বশ করিতে পারেন। তাঁহার পোষা এই কুমীরগুলি লইয়াই তাঁহার কারবার।



দাঁতের জোরে শিকল ছেঁড়া

অমানুষিক শক্তি—

দুই একজন অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন লোকের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া মনে হয় ভগবান মানুষের শক্তির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। মানুষ



হাতের জোরে পেরেক পোঁতা

সাধনা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। পাশের ছবি দুইটি মানুষের এই অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। প্রথমটি এক কসাকের ছবি; তাঁহার নাম এ, এস্ জ্যাস। তিনি কাছে থাকিলে হাতুড়ী দরকার হয় না। তাঁহার শক্তি এত বেশী যে এক হাতে ৫৷৬ মণ ওজ কাঠের বরগা ধরিয়া অন্য হাত দিয়া পায়ের জোরে তাহাতে বড় পেরেক আমূল বস'ইয়া দিতে পারেন। দ্বিতীয় ছবিটি বেন ডার নামক এক ভদ্রলোকের, তিনি দাঁত দিয়া লোহার শিকল কাটিয়া দি পারেন।

কুকুরের শিক্ষা—

আমাদের দেশে জীব জানোয়ারকে বিশেষ যত্ন করিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিশেষতঃ সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরে ছাগল মহিষ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় পশুদেরই যথোপযুক্ত যত্ন নেওয়া না; কুকুর বিড়াল ঘোড়া প্রভৃতি সখের জন্তু ত দূরের কথা। অথচ আম নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রায় এই সব পশুদের বাদ দিয়া এক মুহূর্ত চলিতে পারি না। যে গরু মহিষ প্রভৃতি পশুদের আমরা প্রতিদিন না ভাবে দোহন করিয়া থাকি তাহাদেরই প্রতি আমরা কতদূর কৃপাপর যে-কোনো বাড়ীর গোয়ালঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যা গোয়ালঘর আবর্জ্জনার যেন আঁস্তাকুঁড়, অথচ একটুকু যত্ন করিলেই সব নিরীহ প্রাণী আমাদের দ্বিগুণ উপকার সাধন করিয়া থাকে। সে কথা আমরা নিজেরাই নিজেদের যত্ন করিতে শিখি নাই। আমা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এমন বেবন্দোবস্ত যে মনে হয়

কোনো রকমে টিকিয়া থাকিলেই আমরা সন্তুষ্ট। এই টিকিয়া থাকা ব্যাপারটাই যে কত সুন্দর ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা যায় বিদেশী যে-কোনো জাতির দিকে চাহিলেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

ঘোড়ার মত কুকুরও আমাদের দেশে জনসাধারণের সাধারণতঃ প্রিয় নহে। সুতরাং এই দুইটি প্রাণীকে সুকৌশলে শিক্ষা দিয়া কাজে খাটানর ব্যবস্থাও এখানে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যে দুই চারিজন লোক কুকুর পুষিয়া থাকেন কুকুরকে নানা প্রকার শিক্ষা দিয়া নানাভাবে কার্য্যোপযোগী করিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন না। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে কুকুরকে নানাবিধ কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। সে দেশে ব্যক্তি বিশেষের পোষা কুকুরগুলিই যে শুধু শিক্ষালাভ করে তাহা নহে সর্ব্বসাধারণের হিতকর কাজেও এই জন্তুটিকে লাগান হয় এবং রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উপযুক্ত হইতে হইলে ইহাদিগকে প্রভূত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। ইহারাই চোর ডাকাত খুনে প্রভৃতির ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে পুলিশের একমাত্র সহায়ক। অবশ্য সকল জাতীয় কুকুরই যে এই কার্য্যের উপযুক্ত তাহা নহে, তবে 'ব্লাড হাউণ্ড' জাতীয় কুকুরই এই কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী। এতদ্ব্যতীত 'ইংরেজী এয়ারেডেল' কুকুর (airedales); নানা জাতের ইউরোপীয় মেষ কুকুর, 'টেরিয়র' কুকুর প্রভৃতিও যথেষ্ট কার্য্যোপযোগী। মোট কথা এই কাজের জন্য প্রচুর বুদ্ধি ও বিচার শক্তি ও ঘ্রাণ-গ্রহণের ক্ষমতা প্রয়োজন। জার্ম্মাণীতে পুলিশের কার্য্যে 'এয়ারেডেল' ও 'ডবারম্যান পিন্‌সার' নামক এক জাতীয় কুকুর নিযুক্ত করা হয়। লসএঞ্জেলেস (আমেরিকা) এ পুলিসের কার্য্যের জন্য ১০টি আলসেটিয়ান কুকুর ৭০০০টাকা দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে। নিউইয়র্কে পূর্ব্বে একপাল শিক্ষিত 'ব্লাডহাউণ্ড' কুকুর ছিল। পরে বেলজীয়ম-মেষকুকুর তাঁহাদের স্থান অধিকার করে। তবে বিশুদ্ধ ব্লাডহাউণ্ডই প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কাণগুলি লম্বা এবং রক্তিমাভ চক্ষু সর্ব্বাই জ্বল জ্বল করে। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে ইহারা আসামীর পলায়ন-পথ সদ্য সদ্য আবিষ্কার করিতে পারেই— দুই চারিদিন পরেও ঘ্রাণ শক্তির জোরে ঠিক পথ বাহির করিয়া লয়। ইহাদের অধ্যবসায়ও অসাধারণ। ব্লাডহাউণ্ডের বংশগত ইতিহাসও পাওয়া গিয়াছে। 'বিজয়ী উইলিয়ামের' সঙ্গে ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ডে ইহাদের আমদানী হয়। সাদা ও কালো ভেদে ইহারা দুই জাতের হইয়া থাকে। আমেরিকার ব্লাডহাউণ্ড এই কালোজাতের। তবে আমেরিকার ব্লাডহাউণ্ড এখন আর খাঁটি ব্লাডহাউণ্ড নহে। আমেরিকায় এই জাতীয় কুকুরকে পুরাপুরি অহিংস করিয়া তোলা হয় না। প্রয়োজন হইলে তাহারা দাঁত ও নখের যাহাতে উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

ব্লাডহাউণ্ডদের থাকিবার জায়গা যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়। এই বাবদে প্রচুর টাকা ব্যয় করা হয়। একটি শিক্ষিত পূর্ণ বয়স্ক কুকুর কিনিতে অন্ততঃ ২০০০ টাকা লাগে, কুকুর রাখিবার খরচও সামান্য নয়।

যে রূপ অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অধ্যবসায়ের সহিত ইহারা আসামীকে খুঁজিয়া বাহির করে দেখিলে অবাক হইতে হয়। ইহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত কিন্তু শিকারের সন্ধানে যখন বাহির হয় তখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। মানুষের পথ চিনিতে ইহারা ওস্তাদ। একবার খালি শিকারের গায়ের গন্ধের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেই হইল —ব্যস, আসামী বেচারীর আর নিস্তার নাই, তাহার নিজের গৃহ ও আর তাহার পক্ষে নিরাপদ নহে। ঘটনার দুইচারি দিন অতীত হইবার পরও যদি অনুসন্ধান সুরু হয় তবু এই অদ্ভুত জানোয়ার অত্যদ্ভুত ঘ্রাণশক্তি-প্রভাবে ঠিক পথ চিনিয়া যাইবে। হয়ত আসামীর পলায়নের পর বরফ পড়িয়া পথঘাট আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কত গাড়ী ঘোড়া লোকজন সেই পথে যাতায়াত করিয়াছে তবু এই জীবটি পরাস্ত হয় নাই, নাকটি প্রায় ভূমি-সংলগ্ন করিয়া পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা-প্রভাবে ইহারা প্রভূত কার্য্যোদ্ধার করিয়া দেয়। মাঠ শস্যক্ষেত্র, বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া যেপথে খুনী বা দস্যু চলিয়া গিয়াছে ঠিক সেই পথ ধরিয়া ইহারা অগ্রসর হয়—আসামী যেখানে যাহা কিছু ব্যবহৃত জিনিষ পরিত্যাগ করে চিনিয়া লয় এবং এ দিক ওদিকের মাটি শুঁকিয়া আবার গন্ধানুসরণ করিয়া চলে। আসামী যদি কোনো স্থানে রেলগাড়ীতে চড়িয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে ইহারা যেখানে সে গাড়ীতে আরোহন করিয়াছে সেখান পর্য্যন্ত ঠিক লইয়া যায়। মোটের উপর এই কুকুরবাহিনী রাখাই হয় শুধু পথের সন্ধান দিবার জন্য; আসামী কোন্ পথে গিয়াছে সেটুকু খবর ইহারা সঠিক জানিয়া দেয় তার পরের কাজ মানুষ-পুলিশের।



কুকুরকে বন্দুকের আওয়াজে অভ্যস্ত করান হইতেছে

গভীর রাত্রি কিম্বা অতি প্রত্যুষেই ইহারা ভাল পথ চিনিতে পারে কারণ সেই সময়ে নানা কারণে গন্ধটি হারাইয়া যায় না। ঘটনা ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুর লইয়া বাহির হইয়া পড়িলে আসামীর পথ-নির্দ্দেশক গন্ধটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় না। গন্ধ টাট্‌কা থাকিতে থাকিতেই অতি সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইয়া যায়।

এই শান্তিরক্ষা-কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য এই কুকুরদিগকে প্রচুর শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার ব্যবস্থা খুব সহজেই আয়ত্ত হইয়া উঠে না; অনেকদিনের অনেক পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হয়। অবস্থাভেদে নানাপ্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বন জঙ্গল পাহাড়, শস্যক্ষেত্র, বরফ, রাজপথ প্রভৃতিতে গন্ধানুসরণ করিবার জন্য নানারকমের শিক্ষা লইতে হয়। ফুটপাতে গন্ধ ধরিতে পারাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; সেইজন্যও বহুদিন শিক্ষা করিতে হয়। যাহাতে আততায়ীর বন্দুকের আওয়াজে ভড়কাইয়া



জার্ম্মাণ পুলিশ-কুকুরের কুচকাওয়াজ

না যায় সেজন্য বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে অভ্যস্ত করান হয়। পার্শ্বের ছবিখানিতে জার্ম্মানীতে কিরূপে বন্দুকের আওয়াজে অভ্যস্ত করা হয় তাহাই দেখান হইল। ইহা ছাড়া কুকুরদের যথারীতি সৈন্য ও পুলিশ প্রহরীদের ন্যায় কুচকাওয়াজাদিও করিতে হয়। দ্বিতীয় চিত্রে জার্ম্মাণ পুলিশ কুকুরদের মানুষদের মত কেমন ড্রিল করিতে হয় তাহা দেখান হইল।

কিছুকাল এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার পর কুকুরদের পরীক্ষা লওয়া হয়। যাহারা পাশমার্কা পায় তাহাদিগকে দায়ীত্বজনক কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। জনসাধারণের শান্তি-রক্ষার অধিকার ইহারা তখন প্রাপ্ত হয়। কোনো আর্ত্ত, পীড়িত লোক পথে পড়িয়া থাকিলে কিম্বা বরফের মধ্যে মরিয়া থাকিলে ইহারা যথারীতি সাহায্য ও ব্যবস্থা করে; আসামী ধরাইয়া দেয় ও নানা প্রকারে মানুষের কল্যাণ সাধন করে। ইউরোপের কাণ্টিনেণ্টে কুকুর-পুলিশ দুইভাবে কার্য্য করে; এক দুষ্টের শাসক ও শান্তিরক্ষক হিসাবে এবং পলাতক আসামীর পথ নির্দ্দেশকরূপে। শাসন কার্য্যে সে তাহার পুলিশ-প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গভীর রাত্রে জনশূন্য পার্ক, উদ্যান, ও পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সন্দেহজনক কিছুর আভাস পাইলেই নিঃশব্দে তাহার প্রভুর গোচর করে। চোর বদমায়েস গুণ্ডা প্রভৃতিকে শায়েস্তা করিতে ও জনশূন্য স্থানকে সাধারণের পক্ষে নিরুপদ্রব করাই ইহার কাজ; পলাতক অসামীর পশ্চাদ্ধাবকরূপে আসামীকে ধরিয়া দেয় কিম্বা ধরিয়া দিতে সাহায্য করে। জার্ম্মানীতে ও বেলজীয়ামে এই সব শিক্ষিত কুকুরের মূক-সাক্ষ্য আদালতে গৃহীত হয়।

এই সব কুকুরকে পালকেরা যথেষ্ট আদর দিয়া থাকে। কচিৎ ইহাদের জন্য চাবুক ধরিতে হয়। ইহাদিগকে অতি গোপন কুকুরশালায় রাখা হয় যাহাতে অধিক মানুষের সহিত পরিচয় হইয়া মানুষ-সন্ধানের ক্ষমতা বিলুপ্ত না হইতে পারে সেদিকে নজর রাখা হয়।

এই কুকুর গোয়েন্দারা বর্ত্তমানে মনুষ্যের বহু উপকার করিতেছে। দৈনন্দিন সংবাদপত্রে কুকুরের সাহায্যে চোর ডাকাত প্রভৃতি ধরার কথা প্রায়ই পাওয়া যায়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় সমরক্ষেত্রেও শিক্ষিত কুকুরেরা নানা ভাবে সৈন্যদের সাহায্য করিয়াছিল।

—

বোতলের শক্তি পরীক্ষায় হাতী—

সম্প্রতি এক হাতী কৌতুকাবহ উপায়ে কাঁচনির্ম্মিত বোতলের শক্তি পরীক্ষা করা হইয়াছে। একটি কাঠের তক্তার উপর সমান্তরালভাবে চারিটি আধ পাইণ্ট বোতল সমচতুর্ভুজ আকারে রাখিয়া তাহার উপর



কাঁচের বোতলের শক্তিপরীক্ষায় হাতী

আর একটি তক্তা চাপা দেওয়া হয়, তৎপর প্রায় ২০০ মণ ওজনের একটি বিশালকায় হাতীকে সেই তক্তার উপর বসিতে দেওয়া হয়। একটি বোতলও ভাঙ্গে নাই বটে কিন্তু একটু অধিক চাপ পড়াতে একদিকের একটি বোতল আধ ইঞ্চি পরিমাণ তক্তার ভিতর বসিয়া গিয়াছে।

—

ল্যাম্পপোষ্টের অভিনব সজ্জা—

পেনিসিলভানিয়ার একটি সহরে রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টগুলির উপরে ফুলের ঝুড়ি বসাইয়া শোভিত করা হইয়াছে। ফুলের গাছগুলি যাহাতে যথেষ্ট মাটি ও জল পায় তাহার ব্যবস্থা আছে। দুর্বৃত্তগণ যাহাতে গাছগুলি চুরি করিতে না পারে তজ্জন্য যথাসম্ভব উঁচু করিয়া ঝুড়িগুলি



ল্যাম্পপোষ্টের অভিনব সজ্জা

বসান হইয়াছে। তা ছাড়া উঁচুতে সেই ঝোপগুলি সন্নিবেশিত হওয়াতে দৃষ্টি পথে সেগুলি বাধা জন্মায় না। এক একটি রাস্তায় একশ দুইশ এইরূপ ল্যাম্পপোষ্ট থাকার দরুণ রাস্তাগুলিকে ঠিক উদ্যান বলিয়া মনে হয়

—

শুধুহাতে চিতা শিকার—

আমেরিকার কার্ল, ই, অ্যাকলি জীবজানোয়ার সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ লোক। তিনি নানা দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে শিকারসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ও সম্প্রতি তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যকলাপের বিবরণ দিতেছেন। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি কয়েকটি হিংস্র জানোয়ার তাঁর পোষা কুকুরের মত থাকে। তিনি কতবার যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার হইয়াছেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অথচ তিনি দেখিতে রোগা পোটকা; বয়স ষাটের বেশী হইয়াছে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্যায় তিনি অসাধারণ পণ্ডিত এবং যে কোনো জানোয়ারের বহিরাবরণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহা 'ট্যান' করিতে তাঁহার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তিনি 'সিমেণ্ট বন্দুকে'র আবিষ্কারক, চলচ্চিত্র জগতে "অ্যাকলি ক্যামেরা"ও তাঁহার আবিষ্কৃত; ভাস্কর্য্যেও তাঁহার হাত ভাল এবং কারুশিল্প সমালোচনায় তিনি ওস্তাদ। মোটকথা তিনি একজন সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ অদ্ভুত লোক। বয়স ষাট পার হইয়া গেলেও তিনি এখনও বেশ শক্ত আছেন ও অবলীলাক্রমে ভারী বন্দুক বহন করিয়া বেড়ান।

তিনি সম্প্রতি সস্ত্রীক আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন। তিনি আফ্রিকাকেই পৃথিবীর সৌন্দর্য্যনিকেতন আখ্যা দিয়াছেন এবং সেখানে থাকিতে পারিলেই তাঁহার অপার আনন্দ। সহর বাজারের যানবাহনাদির হট্টগোল তিনি সহ্য করিতে পারেন না।

তিনি বহুবার বহু বিপদে পড়িয়াছেন। একবার একটি বুনো হাতী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তিনি মড়ার মত অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিয়া আত্মরক্ষা করেন। তবে তিনি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়াছেন খালি হাতে একটি প্রকাণ্ড চিতাবাঘ শিকার করিয়া। তিনি প্রথমবার যখন আফ্রিকা যান সেইবারই এই বিষম বিপদে পড়িয়া



খালি হাতে চিতা-শিকার

ছিলেন। পাশে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ছবি দেওয়া হইল। সেদিন বৈকালে তিনি একটিমাত্র সঙ্গী লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। প্রথমেই একটি হায়েনা শীকার করিয়া খুসী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তারপর আর কোনো শীকারই মিলিল না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিতেছেন এমন সময় একটি ঝোপের ভিতর খস্ খস্ আওয়াজ শুনিয়া সেই ঝোপ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলেন। তিনি জানিতেন না ঝোপের ভিতর কোন্ জন্তু আছে তবে একটি গর্জ্জন শুনিয়া বুঝিলেন ভীষণ হিংস্র চিতাবাঘের গায়েই গুলী লাগিয়াছে। অন্ধকার ঘনীভূত হওয়াতে তিনি আর সেখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া সঙ্গীসহ নিজের তাঁবুর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে সেই চিতাবাঘের সহিত সাক্ষাৎ। চিতাটি ২০ গজমাত্র দূরে থাকিতে তিনি আবার গুলী ছুড়িলেন কিন্তু তাহা ফস্কাইয়া গেল। তিনি তৃতীয়বার গুলী ছুড়িতেই চিতাবাঘটি ভীষণ হুঙ্কার দিয়া অ্যাকলি সাহেবকে আক্রমণ করিল। কি তাহার বিদ্যুৎ-গতি! এত দ্রুত বোধ হয় কোনো জন্তুই ছুটিতে পারে না। বাঘটি যখন মাত্র ৬ হাত দূরে অ্যাকলি সাহেব আবার বন্দুক তুলিলেন কিন্তু হায়—বন্দুকে আর টোটা পোরা ছিল না। তিনি দেখিলেন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা নিরাপদ নহে। তিনি ছুটিতে ছুটিতে বন্দুকে টোটা

ভরিতে লাগিলেন কিন্তু বাঘটি তখন আসিয়া পড়িয়াছে ও মহাশক্তিতে তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে। বন্দুকটি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল; চিতাবাঘটি তাঁহার ডানহাত কামড়াইয়া ধরিল। এমন অবস্থায় মনের ভাব কি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে অ্যাকলি সাহেব সে অবস্থাতেও আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। তিনি বাঁ হাত দিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে বাঘের গলা চাপিয়া ধরিয়া ক্ষতবিক্ষত ডানহাত খানি সজোরে বাঘের মুখের ভিতর পুরিয়া দিলেন। বাঘটি তাঁহার টুঁটি কামড়াইয়া ধরিবার জন্য প্রাণ-পণ করিতে লাগিল। তিনিও নানা কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। এ ভাবে ক্রমশঃ দুজনেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং অবশেষে দুজনেই গড়াইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে চিতাটি তাঁহার নীচে পড়িয়া যায় ও তাঁহার ডান হাঁটুর চাপে তাহার বুকের পাঁজর ভাঙিয়া যায়। এরূপ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর বাঘটি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। অ্যাকলি সাহেব কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া তাঁহার নিগ্রোসঙ্গীর সাহায্যে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিয়া ক্ষতস্থানে বিষ প্রতিষেধক ঔষধ দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করেন। এই ক্ষমতাপন্ন শিকারীর বিস্তৃত জীবনচরিত পড়িয়া দেখিলে প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান লাভ করা যায়।

—

যান বাহনাদিতে বৈচিত্র্য—

পাশ্চাত্য দেশে জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়ও যেমন অদ্ভুত, পোষাক পরিচ্ছদ যানবাহনাদিতেও সেইরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। বেশ বোঝা যায় যে কাজের অবকাশে বিচিত্র জিনিষ আবিষ্কার করার অবসরও



সাইকেলের বেলুনচাকা

ইহাদের আছে। পাশের ছবিতে দেখুন সাধারণ একটি বাইসাইকেলকেও কিরূপ আরামজনক করিয়া তোলা হইয়াছে। এই ধরণের বেলুনচাকাযুক্ত বাইসাইকেল সিকাগোর রাস্তায় একবার দেখা গিয়াছিল!

—

আলোকচিত্রের কৌশল—

পাশের ছবিটি দেখিয়া মনে হইতেছে যেন ট্রেণখানি ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে কিম্বা সানফ্রান্সিস্কোর ওই স্থানের মাটি ঢেউয়ের তালে নাচিতেছে। আসলে কিন্তু কিছুই হয় নাই। সাধারণ ট্রেণ যেমন সোজাভাবে যায় তেমনি চলিয়াছে কেবল ফটোগ্রাফির কৌশলেই ট্রেণখানিকে এইরূপ মনে হইতেছে।

—



ঢেউ খেলানো ট্রেণ; ফোটোগ্রাফীর কৌশল

ঘুম কি আমাদের অত্যাবশ্যকীয়?—

আমরা প্রত্যহ ঘুমাইয়া যে-সময় কাটাই তাহা সামান্য নহে। অতটা সময় কি আমরা সত্য সত্যই নষ্ট করি না তাহা আমাদের ক্লান্ত মনকে ও দেহকে বিশ্রাম দিয়া আমাদিগকে অধিকতর কার্য্যোপযোগী করিয়া তোলে? সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে আমাদের জীবনের এক তৃতীয়াংশ যে আমরা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিই তাহা একান্তই জীবনের বাজে খরচ। সে সময়টুকু অন্য কাজে লাগাইলে আমাদের শারীরিক মানসিক কোনো ক্ষতিই হয় না। সম্প্রতি ওয়াসিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্রেড, এ, মস চারিটি ছাত্র ও চারিটি ছাত্রী লইয়া এক পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পুরা ষাট ঘণ্টা না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের পরীক্ষার ফল খুব প্রামাণিক না হইলেও অনেক বৈজ্ঞানিকদের মতের সহিত মিলিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন—ঘুম জিনিষটি মানুষকে ভগবানের বর হিসাবে দেওয়া নয়; ইহা অভিশাপই বটে, এই কুঅভ্যাসটি আমাদের প্রাচীনকাল হইতে বংশ পরম্পরায় মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক মস বলেন যে এবিষয়ে তাঁহার পরীক্ষা সবে সুরু হইয়াছে মাত্র তবে ইতিমধ্যে তিনি যাহা জানিয়াছেন তাহা এই—

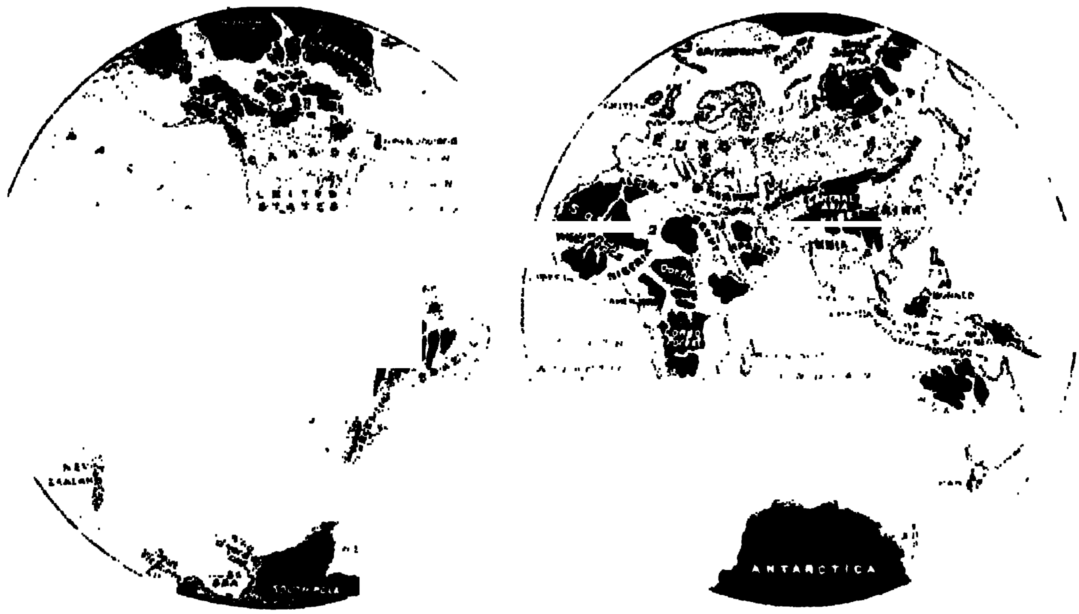
ঘুম আসলে একটা নেশা মাত্র, মাদক দ্রব্যের মত ইহাকে অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করা যায়। অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবন যেমন অনিষ্টকর অত্যধিক ঘুমও তেমনি অনিষ্টকর। ইহা মনের গতিবেগ ও চিন্তার ধারাকে প্রতিহত করে। অভ্যাস করিলে ঘুমের গতি বৃদ্ধি করা যায় অর্থাৎ ২ ঘণ্টা ঘুমের কাজ এক ঘণ্টায় সারা যায়।

অধ্যাপক মস এই তিন বৎসরের অভ্যাসে ২ ঘণ্টা ঘুম কমাইয়া আনিয়াছেন। অনেকক্ষণ এক সঙ্গে জাগিয়া থাকিলে শারীরিক কোনই ক্ষতি হয় না। ইঁহাই ইহার মত তবে মানসিক একটু চাঞ্চল্য ঘটিতে পারে।

—

পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত দেশ—

কলম্বস, ভাস্কোডিগামা, লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যান্‌লী, স্কট, আমুনসেন প্রভৃতির জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে মনে এই ক্ষোভ হয় যে পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত দেশ সবই ইঁহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন— আমাদের জন্য আর কিছুই থাকিলনা। পৃথিবীর এই মানচিত্রখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। এই মানচিত্রের

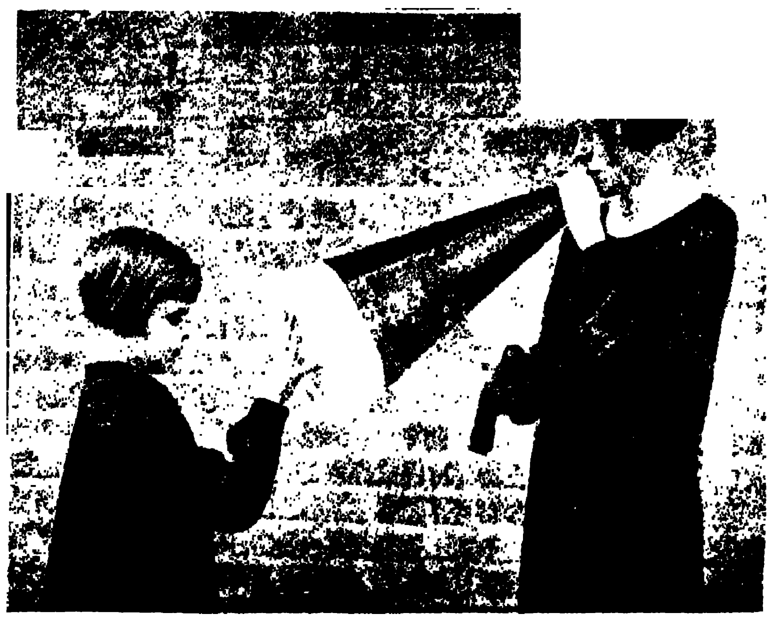


পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত দেশ (কালো চিহ্নিত)

কালো রঙকরা দেশ গুলি এখনও একেবারে অনাবিষ্কৃত। এইসব দেশে শ্বেতদ্বীপবাসীদের পদধূলি এখনও পড়ে নাই। হয়ত ইহার মধ্যেই কোনো স্থানে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত কিম্বা সুন্দর উপত্যকা কিম্বা রেডিয়াম খনি বিদ্যমান। উত্তর মেরু আবিষ্কারক আড্‌মিরাল পিয়ারী যখন শেষবার সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন বলিয়াছিলেন যে সুদূর উত্তর মেরু-সীমান্তে হাজার হাজার মাইলব্যাপী সবুজ তৃণ খণ্ড বিস্তারিত আছে; সেখানে কস্তুরী মৃগ চরিয়া বেড়ায়; মেরু-ভল্লুক, শৃগাল, সিন্ধুমৎস্য প্রভৃতির তাহা নিত্য বাসস্থান। অথচ তাহা কোনো মানুষেরই অধিকারে নাই। দক্ষিণ মেরু, দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা, মধ্য এসিয়া প্রভৃতি মহাদেশেও এখনও বহু স্থান অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। তবে আজকাল বিমানপোতের যুগ। বহুকাল যে সেই সকল স্থান অনাবিষ্কৃত থাকিবে তাহা মনে হয় না।

আঙুলের সাহায্যে শোনা—

বধিরদিগকে এক আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে শ্রবণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়েছে। পার্শ্ববর্ত্তী ছবিতে সেণ্ট লুইএর সেণ্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউটে মেরি টিলসন নামে একটি বধির বালিকাকে মেগাফোনের সাহায্যে কথা শোনান হইতেছে—দেখান হইয়াছে। মেরি টিলসন মেগাফোনের পরদার উপর আঙুলের ডগা দিয়া স্পর্শ করিয়া আছে। কথা বলার দরুণ পরদার যে কম্পন হইতেছে তাহা আঙুল ও হাতের ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে শ্রবণানুভূতির সৃষ্টি করিতেছে।



আঙুলের সাহায্যে শোনা

—

সংখ্যার খেলা—

এক দুই প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে নানা রকমের অদ্ভুত খেলা করা·

যায় এবং বন্ধুবান্ধবদের চমকিত করিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট করিতে হয় না। সাধারণতঃ লোকে অঙ্কের নাম শুনিলেই ঘাবড়াইয়া যায়। সুতরাং অতি সহজবোধ্য সামান্য গুণভাগের খেলা দেখাইয়া অনেক সময় অতি বিচক্ষণ লোকেরও তাক্ লাগাইয়া দেওয়া যায়। নিম্নে সংখ্যাসম্বন্ধে কতকগুলি সহজ কৌশল দেওয়া হইল।

৯ সংখ্যাটি বড় মজার। ইহার যে কোনো গুণিতকের সংখ্যাগুলি পাশাপাশি যোগ করিলে আবার ৯ই হইবে। যেমন ৪ × ৯ = ৩৬ আবার ৩ + ৬ = ৯

দুই একটি প্রশ্ন করিয়া ও দুই চারিবার যোগবিয়োগ গুণ ভাগ প্রভৃতি করাইয়া একজনের বয়স বলিয়া দিয়া তাহাকে চমৎকৃত করা কত সহজ। ধরা যাক্ হরির বয়স ১৫ ও সে ইংরেজী আগষ্টমাসে জন্মিয়াছে। প্রথমে তাহাকে বলা হইল যে সে তাহার জন্মমাস (জানুয়ারী ১; ফেব্রুয়ারী ২; মার্চ্চ ৩ এই হিসাবে) কে ২ দিয়া গুণ করিয়া তাহাতে ৫ যোগ করুক। তৎপর সংখ্যাটিকে ৫০ দিয়া গুণ করিয়া তাহাতে তাহার বয়সটি যোগ করিয়া তাহা হইতে ৩৬৫ বাদ দিয়া তাহাতে ১১৫ যোগ করিয়া যাহা থাকে তাহাই বলুক। জিজ্ঞাসামত গুণ যোগ করিয়া ৮১৫ হইল। ইহার ১ম সংখ্যাটি যে মাসে জন্ম তাহার নির্দ্দেশক ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা দুইটি বয়স নির্দ্দেশক। যে কোনো লোকের বয়স ও জন্মমাস এই নিয়মে বলা যায়।

একটি সংখ্যা হইতে যে কোনো একটি অঙ্ক মুছা হইলে তাহা বলিয়া দিয়া লোককে খুব আশ্চর্য্য করা যায়। চার পাঁচ কি অধিক অঙ্কযুক্ত একটি সংখ্যা কেহ মনে করিল। ধরা যাউক সংখ্যাটি ৪৫৯৩৮। পাশাপাশি অঙ্কগুলি যোগ করিলে হয়, ২৯। আসল সংখ্যা হইতে ২৯ বাদ দিয়া ৪৫৯০৯ থাকে। ইহা হইতে যে কোনো একটি অঙ্ক মুছিয়া ফেলিতে বলা হইল। ৪ অঙ্কটি মুছিয়া ফেলা হইল। আবার পাশাপাশি সংখ্যাগুলি যোগ করিতে বলা হইল। যোগফল হইল ২৩। এই সংখ্যার কাছাকাছি ৯এর গুণিতক সংখ্যা হইতে ইহা বাদ দিয়া যাহা থাকিবে সেই অঙ্কই মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। যদি কিছু বাকী না থাকে তাহা হইলে ৯ মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এক্ষেত্রে কাছাকাছি ৯ এর গুণিতক সংখ্যা ২৭। ২৭ হইতে ২৩ বাদ দিলে থাকে ৪। সুতরাং ৪ মুছিয়া ফেলা হইয়াছে।

আর একটা খেলা এই। ১ হইতে ৬ এর মধ্যে দুইটি সংখ্যা কাহাকেও মনে করিতে বলা হইল। সে যাহা মনে করিয়াছে তাহা সহজেই বলিয়া দেওয়া যায়। ধরা যাক্ সে ৪ ও ৬ মনে করিয়াছে। প্রথম সংখ্যাটী দ্বিগুণ করিলে ৮ হয়। তাহাতে ৫ যোগ করিয়া তাহাকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া ও তাহাতে দ্বিতীয় সংখ্যাটি যোগ করিলে ৭১ হয়। সংখ্যাটি জানিয়া লইয়া তাহা হইতে ২৫ বাদ দিলে থাকিল ৪৬। তাহার বাঁ দিকের অঙ্কটি প্রথম সংখ্যা ও ডানদিকেরটি দ্বিতীয় সংখ্যা।

আর একটী কৌশল এই, তিনি অঙ্কের একটি সংখ্যা কাহাকেও লিখিতে বলা হইল, তার মধ্যে প্রথম অঙ্কের চেয়ে তৃতীয় অঙ্কটি ২ কম হওয়া চাই। সে লিখিল ৮৩৬। সংখ্যাটি উল্টাইয়া লিখিয়া প্রথমটি হইতে বাদ দিলে থাকে ১৯৮। উহা উল্টাইয়া লইলে হয় ৮৯১। যোগ করিলে ১০৮৯ হয়। তিন অঙ্কের যে কোনো সংখ্যা মনে করুন না উপরোক্ত উপায়ে শেষ যোগফল বরাবরই ১০৮৯ থাকিবে।

নীচে যে সংখ্যাগুলি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে কৌশলে যে কোন লোকের বয়স বলিয়া দেওয়া যায়। যিনি বয়স জানিতে চান তাঁহাকে বলিতে হইবে কোন্ কোন্ লাইনে (লম্বালম্বি) তাঁহার বয়সের সংখ্যাটি আছে। সেই সেই লাইনের প্রথম সংখ্যা কয়টি যোগ দিলেই তাঁহার আসল বয়স পাইবেন। যদি তাঁহার বয়স ৩৬ হয় তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে তৃতীয় ও ষষ্ঠ লাইনে তাঁহার বয়সের সংখ্যাটি আছে। সুতরাং তৃতীয় লাইনের প্রথম সংখ্যা ৪ + ষষ্ঠ লাইনের প্রথম সংখ্যা ৩২ = ৩৬।

১	২	৪	৮	১৬	৩২
৩	৩	৫	৯	১৭	৩৩
৫	৬	৬	১০	১৮	৩৪
৭	৭	৭	১১	১৯	৩৫
৯	১০	১২	১২	২০	৩৬
১১	১১	১৩	১৩	২১	৩৭
১৩	১৪	১৪	১৪	২২	৩৮
১৫	১৫	১৫	১৫	২৩	৩৯
১৭	১৮	২০	২৪	২৪	৪০
১৯	১৯	২১	২৫	২৫	৪১
২১	২২	২২	২৬	২৬	৪২
২৩	২৩	২৩	২৭	২৭	৪৩
২৫	২৬	২৮	২৮	২৮	৪৪
২৭	২৭	২৯	২৯	২৯	৪৫
২৯	৩০	৩০	৩০	৩০	৪৬
৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৪৭
৩৩	৩৪	৩৬	৪০	৪৮	৪৮
৩৫	৩৫	৩৭	৪১	৪৯	৪৯
৩৭	৩৮	৩৮	৪২	৫০	৫০
৩৯	৩৯	৩৯	৪৩	৫১	৫১
৪১	৪২	৪৪	৪৪	৫২	৫২
৪৩	৪৩	৪৫	৪৫	৫৩	৫৩
৪৫	৪৬	৪৬	৪৬	৫৪	৫৪
৪৭	৪৭	৪৭	৪৭	৫৫	৫৫
৪৯	৫০	৫২	৫৬	৫৬	৫৬

৫০ পর্য্যন্ত বয়স ইহাতে পাওয়া যাইবে।



জলের রাণী

ওগো জলের রাণি
ঢেউ দিয়ো না ঢেউ দিয়ো না গো,
আমি যে ভয় মানি।
কখন্ তুমি শান্ত গভীর, কখন্ টলমল,
কখন্ আঁখি হাস্যমদির, কখন্ ছলছল,
কিছুই নাহি জানি।
যাও কোথা চঞ্চলি,
লও গো ব্যাকুল বকুল বনের
মুকুল-অঞ্জলি।
দখিন হাওয়ায় বনে বনে জাগল মরমর
তোমার বুকের পরে পুলক-ভরে কাঁপুক থরথর
সুনীল আঁচলখানি।
হাওয়ার দুলালি,
নাচের তালে শ্যামল কূলের মন যে ভুলালি।
অরুণ আলোর মাণিকমালা দোলাবো ঐ স্রোতে,
দেবো তোমার হাতে গোপন রাতে আঁধার গগন হ'তে
তারার ছায়া আনি'।

(ভারতী, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৩২)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন

বায়ু

১। বাসগৃহে যাহাতে যথেষ্ট-পরিমাণে বায়ু ও আলো আসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর চারিপাশে খানিকটা খোলা জায়গা থাকিলে এবং প্রত্যেক গৃহে অন্ততঃ চারিটি বড় বড় জানালা এবং দরজা রাখিলে বায়ু ও আলোক প্রবেশের বিশেষ সুবিধা হয়।

২। গৃহের পোতা উঁচু করিবে। অবস্থায় কুলাইলে ঘরের মেজে পাকা করিয়া লইবে।

৩। বাসগৃহের অতি নিকটে বড় গাছপালা বা বাঁশের ঝাড় অথবা ঝোপ-জঙ্গল থাকিতে দিবে না।

৪। গৃহের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে কখনই বাস করিবে না। শীতকালেও শয়নগৃহের অন্ততঃ দুইটি বায়ুপথ খোলা রাখিবে।

৫। অনেক লোক একত্রে এক গৃহে বা এক মশারির ভিতরে শয়ন করিবে না, কারণ বহুলোকের শ্বাসাক্রিয়াদ্বারা গৃহের বায়ু অতি শীঘ্র বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

৬। গ্রামের জল যাহাতে নিকাশ হইয়া যায়, সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া যতদূর সম্ভব, তাহার সুব্যবস্থা করিবে।

৭। বাড়ীর নিকট ছোটো খানা, ডোবা ইত্যাদি থাকিলে মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া দিবে। খানা ডোবায় পাতা ইত্যাদি পড়িয়া পচিয়া বায়ু দূষিত করে এবং ঐসকল স্থানে মশক জন্মিয়া গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া-রোগ বিস্তারে সহায়তা করে।

৮। গ্রামের পথে ঘাটে, পুষ্করিণীর পাড়ে বা নদীর ধারে কখনও মলত্যাগ করিবে না। এই কদর্য্য অভ্যাসের ফলে গ্রামের জল ও বায়ু অতি শীঘ্র অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

৯। বাড়ীর আশে-পাশে ময়লা থাকিলে বায়ু শীঘ্র দুর্গন্ধ ও দূষিত হইয়া পড়ে। এইজন্য বাসগৃহ হইতে কিছু দূরে গোশালা ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবে। পরিত্যক্ত মল ও আবর্জ্জনাদি যাহাতে শীঘ্র স্থানান্তরিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সে-ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলে উহার উপর তৎক্ষণাৎ শুষ্ক মাটি বা ছাই চাপা দিবে।

১০। যদি প্রত্যেক গ্রামবাসী নিজ-নিজ গৃহ ও তাহার আশ-পাশ এইরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহা হইলে গ্রামের বায়ু সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিবে।

জল

১। প্রতিগ্রামে একটি বা দুইটি ভালো পুষ্করিণী কেবল পানীয় জল সংগ্রহের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে কেহই স্নান করিতে কাপড় কাচিতে—এমন-কি মুখ ধুইতেও পারিবে না। যদি একটি পাম্প (pump) দ্বারা জল উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পুষ্করিণীর জল কোনো মতেই দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। পুষ্করিণীর পাড়ে বড় গাছ বা বেশী জঙ্গল জন্মিতে দিবে না। পাতা পচিয়া জল নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা যথেষ্ট রৌদ্র পায় না।

৩। স্বল্পগভীর কূপের জল পান করা কখনও নিরাপদ্ নহে। যে-কূপের জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, সেই কূপটির ভিতর দিক্ পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত এবং চারিপাশের জল যাহাতে কূপের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, কূপের উপরের জমি কিছু দূর পাকা ও ঢালু করিয়া দিয়া তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

৪। সাধারণ কূপের জল প্রায় নির্ম্মল হয় না, এজন্য আজকাল অনেক দেশে লোহার নলের কূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ কূপের জল সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকে এবং কোনো সংক্রামক রোগের বীজ ইহার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

৫। যদি কোনোপ্রকারে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে ঐ জল যিনি পান করিবেন, তাঁহারই ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব কি উপায়ে পানীয় জল সহজে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহা জানা অবশ্যকর্ত্তব্য। আমাদের মতন গরীব দেশের পক্ষে ইহার একমাত্র সহজ উপায়—জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া শীতল করিয়া পান করা। এই উপায় দ্বারা জলের মধ্যে যে-কোনো সংক্রামক রোগের বীজ থাকুক না কেন, তাহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং এরূপ সিদ্ধ জল পান করাই সম্পূর্ণ নিরাপদ্।

আহার ও পানীয়

১। সহরে নির্দ্দোষ খাদ্য পাওয়া সুকঠিন, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও এ-বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। চাল, ডাল, মাছ, তরকারি, তৈল, দুধ ও নারিকেলের মিষ্টান্ন পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইতে অসুবিধা হয় না। এইসকল খাদ্য সহজপরিপাচ্য, পুষ্টিকর, অথচ দামেও সস্তা।

২। যাঁহারা মনে করেন যে, মাংস না খাইলে শরীর সবল হয় না, তাঁহাদের ধারণা ভুল। মাংসের মধ্যে যে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ আছে, ডাল, মাছ, দুধ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেও সেই সারবান্ পদার্থ যথেষ্ট-পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। মাছ বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহা বাঙালী জাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

৩। যাঁহারা কোনরূপ আমিষ দ্রব্য ভক্ষণ করেন না, তাঁহারা ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি, ঘি, দুধ, ছানা খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করিতে পারেন।

৪। ভাত অপেক্ষা রুটি সারবান্ খাদ্য। আমাদের দেশে এক বেলা রুটির প্রচলন হইলে আমাদের দেহ আরও সবল হইবার সম্ভাবনা। ভাতের ফেন ফেলিয়া খাওয়া কখনই উচিত নহে; উহাতে চালের সারাংশ কতক-পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়। খিচুড়ি অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে ইহার অধিক প্রচলন হইলে ভালো হয়।

৫। যাঁহারা ঘি ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা খাঁটি সরিষার তৈল তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে প্রায় একই ফল পাইবেন।

৬। আমিষ বা নিরামিষ যে-কোনো পদার্থই ভোজন করা যাউক না কেন, গুরু ভোজন প্রভূত অনিষ্টের কারণ। পেট সম্পূর্ণ ভর্ত্তি করিয়া না খাওয়াই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। মিতাহার—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের এক প্রধান উপায়।

৭। প্রত্যহ একসময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাহার প্রশস্ত।

৮। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহার দ্বারা যে কেবল হজম না হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকাংশ সারভাগ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৯। হাত-মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করিতে বসিবে। যে-স্থানে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং যেখানে আহার করা যায়, তাহা অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

১০। মাছি—ময়লা দ্রব্য ও রোগের বীজ পায়ের দ্বারা বহন করিয়া আনিয়া খাদ্য-দ্রব্যের উপর বসিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। সুতরাং রান্নাঘরের মধ্যে এবং আহার করিবার স্থানে যাহাতে মাছি আসিতে না পারে এবং খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে মাছি না বসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর মধ্যে আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিলে মাছির উপদ্রব বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে বাড়ীর মধ্যে মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদা ঢাকা দিয়া রাখিবে।

১১। বাজারের খাবার যে দূষিত—তাহার কারণ এই যে, উহা যে-ভাবে রাখা হয়, তাহাতে উহার উপর সর্ব্বদা পথের ধূলা পড়ে এবং মাছি বসে। তদুপরি বাজারের খাবার প্রায়ই ভেজাল তেল, ঘি, ময়দা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলখাবারের জন্য বাজারের খাবারের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের দেশের পূর্ব্ব-প্রচলিত প্রথা অনুসারে চিঁড়া, মুড়ি, ছোলা বা মটরভাজা, ঝুনা নারিকেল কিম্বা নারিকেলের সন্দেশ ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ অথচ সবিশেষ পুষ্টিকর জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খরচের দিক্ হইতে দেখিলেও ইহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

১২। আহারের সময়ে বা অব্যবহিত পরেই অধিক জলপান বা বরফজল পান না করাই উচিত। উহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

১৩। সহজ শরীরে চা, কোকো বা কফি পান করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, তবে নিয়মিত-পরিমাণে পান করিলে ইহাদের মধ্যে কোনোটিই অনিষ্ট উৎপাদন করে না, বরং পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে। অধিক চা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপস্থিত হয়।

১৪। সুস্থ শরীরে সুরা বা অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার একান্ত বর্জ্জনীয়।

শরীর চালনা

প্রত্যহ কোনো-না-কোনোরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্যকর্ত্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করা যায় না। মুক্তস্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। যে কোনো-প্রকার ব্যায়াম প্রতিদিন অন্ততঃ পনের মিনিট কাল অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বয়স অধিক হইলে অথবা অন্য কারণে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে, পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ উপকারী। সুস্থশরীরে দুই বেলায় অন্ততঃ দুই ক্রোশ ভ্রমণ করা উচিত।

বিশ্রাম

শরীরের পক্ষে পরিশ্রম ও ব্যায়াম যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণ করাও তদ্রূপ আবশ্যক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিলে বা আমোদ-প্রমোদে রত থাকিলে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিদ্রাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করে। রাত্রিকালই নিদ্রার প্রশস্ত সময়। দিবানিদ্রা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। রাত্রিকালে স্বল্পাহার সুনিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত।

পরিচ্ছদ

আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ খুব সাদাসিদে অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। পরিচ্ছদ আড়ম্বরহীন হইবে, কিন্তু রুচিবিরুদ্ধ বা ময়লা হইবে না। ঘর্ম্মাক্ত বা ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহারে শরীরের অনিষ্ট হয়।

(স্বাস্থ্য, অগ্রহায়ণ ১৩৩২) ডাঃ শ্রী চুনীলাল বসু

—

ভারতে নারীর সংখ্যা

ভারতবর্ষে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। ইউরোপে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। ভারতে প্রত্যেক এক হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন স্ত্রীলোক আছে; আর ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্-এ হাজার পুরুষে ১০৬৮ জন স্ত্রীলোক আছে; ফ্রান্স, ইটালী ও অস্ট্রিয়াতে হাজারে ১০৩৬ স্ত্রীলোক। বিশেষ দুঃখের কথা এই—ভারতে নারীর সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। ১৯০১ সালে ছিল ৯৬৩, ১৯১১ সালে ৯৫৪, এবং ১৯২১ সালে ৯৪৫। ভারতে ও ইউরোপে এই পার্থক্যের কারণ এই নয় যে, ভারতে ইউরোপ অপেক্ষা কম স্ত্রী শিশু জন্মায়। বরং ইহার বিপরীতই

ঘটে; ইউরোপ অপেক্ষা ভারতে অধিক স্ত্রীশিশুই জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেক হাজার পুরুষের পক্ষে ইংলণ্ড এবং ওয়েলস্-এ ০ হইতে ১০ বৎসর বয়সের ৯৯৬ জন স্ত্রীলোক আছে; ফ্রান্সে ৯৮৯ জন; কিন্তু ভারতে ৯৯৮ জন, অর্থাৎ অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বেশী। সুতরাং ভারতে স্ত্রী শিশুর জন্মহ্রাস পুরুষসংখ্যা অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা হ্রাসের কারণ নয়। পুরুষ-অনুপাতে ভারতে স্ত্রীলোকের অল্পতার কারণ—এখানে ১০, ২০, ৩০ এবং ৪০ বৎসরের স্ত্রীলোকের মৃত্যু অত্যধিক ঘটে।

গুর্মুখ নিহাল সিংহ

(বেনারস্ হিন্দু ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন)

—

জাপানে হিন্দু দেবদেবী

বর্ত্তমানে জাপানে অধ্যাপক জে তাকাকুসু একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ভারতীয় সভ্যতা-সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। জাপানী সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার নিকট কতটা ঋণী তাহা তিনি কয়েক মাস ধরিয়া জাপানের দি ইয়ং ঈস্ট্ পত্রিকায় প্রবন্ধ-পর্য্যায়ে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তিনি একটি প্রবন্ধে বহু গবেষণার সহিত দেখাইয়াছেন যে নিম্নলিখিত দেবদেবী ভারত হইতে জাপানে উপস্থিত হইয়াছেন :—

মহাকাল, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কুবের, গণেশ, কুম্ভীর (যক্ষ) বরুণ ইন্দ্র-শক্র ব্রহ্মা, রুদ্র, নারায়ণ, হয়গ্রীব, অচল, ভৈরব, দুর্গা, উমা, ডাকিনী, হারিতি, অগ্নি, স্কন্দ, যম, গোমুখ ইত্যাদি। এইসব দেবদেবীর নাম, গুণাগুণ ও প্রভাব অবশ্য জাপানে অনেক পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে।

—

ভারতে ইস্‌লাম

এমন লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন, ইস্‌লাম সকল সময়েই বুঝি একরূপ। আইনের আক্ষরিক ব্যাখ্যা হিসাবে ইহা খানিকটা সত্য বটে, কিন্তু ব্যাখ্যাতার মনোভাবের উপরই সমস্ত নির্ভর করে। আরবীয়ের কাছে এই ধর্ম ছিল আশার বাণী, পারস্যবাসীর নিকট ইহা দার্শনিক দুঃখবাদের সান্ত্বনা, ভারতীয়ের কাছে ইহা তত্ত্ববিজ্ঞামূলক আলোচনার একটা নূতন কাঠামো হইল, ইহাতে তাহার প্রাচীন রীতি-নীতিরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাইল।

অনেকে বলেন, মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে অনেক প্রথা ও রীতি গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ঠিক কথা নয়। অবশ্য হিন্দু প্রথা সর্ব্বত্রই আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আছে এবং জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তাহা আমাদের সাথী নয়; আমরা তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া তাহা আমাদের সাথী।

সামাজিক জীবনের দুইটি ভিত্তিগত অনুষ্ঠান পরিবারবদ্ধতা ও জাতি—এই দুই বিষয়ে আমাদের ধারণা প্রাচীন হিন্দুজাতির ধারণার সমান। ইস্‌লাম জাতিভেদের কিছুই জানে না; গণসাম্যই ইহার ভিতরকার কথা। কিন্তু বিতাড়ণ-চেষ্টা সত্ত্বেও ইস্‌লামের প্রকার বাঁচিয়া রহিল। যে-সব হিন্দু মুসলমান হইল তাহারা নিজেদের জাতি হইতে দীক্ষিত মুসলমান পত্নীই বিবাহ করিতে চাহিল। তাহার ফল এই হইল যে, জাতিভেদ রূপান্তর গ্রহণ করিল, লোপ পাইল না। এখানে-ওখানে একটু-আধটু ইস্‌লামের অনুকূল পরিবর্ত্তনমাত্র হিন্দুধর্ম্মে ঘটিল; তথাপি জাতিভেদের ভিত্তি অটল রহিল। ইস্‌লাম যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দান করে হিন্দুর সমাজপ্রভাব তাহা দমাইয়া দিল, এবং সে-সমাজে অসবর্ণ বিবাহের যেমন স্থান নাই নবীন মুসলমান ধর্ম্মেও তাহার স্থান করিতে দিল না। সুতরাং যে আন্তরিক পরস্পর মিলনের বার্ত্তা লইয়া ইস্‌লাম আসিয়াছিল তাহা এখনও সুদূরপরাহত। আমরা মুসলমানগণ আমাদের হিন্দু পূর্ব্বপুরুষগণের জাতিভেদের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছি, কেবল তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি মাত্র। শারিয়াৎ-অনুসারে মুসলমান ভ্রাতা ও ভগ্নী একসঙ্গে পিতৃসম্পত্তি পরিচালন করিতে পারে; পরিবার-গঠন ইস্‌লামে সমবায়-হিসাবে গণ্য নয়; ব্যক্তিকে ইহা স্বীকার করে ও তাহার পর রাষ্ট্রকে। কিন্তু মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সম্মিলিত পরিবারের ভাব বিদূরিত হইল না। হিন্দুর সামাজিক প্রভাব মুসলমান কন্যাকে পিতৃসম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য করিল। এই বাধ্য করা ক্রমে নিয়মে দাঁড়াইল এবং পরে প্রথায় দাঁড়াইল। কোরাণের উপদেশের বিরুদ্ধে ইহা ঘটিল। ইস্‌লাম সর্ব্বতোভাবে হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিবদ্ধ; সুতরাং ভারতের হিন্দু যেমন মুসলমানও তেমনি, এই সামাজিক ব্যবস্থার অনুবর্ত্তন করিয়া চলিয়াছে। ইহাই আমাদের জাতীয় মিলনের ভিত্তি।

মুসলমানের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর আচারপ্রথা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুর ঐ-ঐ বিষয়ের আচার-প্রথার অনুরূপ।

(নিউ ওরিয়েণ্ট্) মহম্মদ হাবিব

—

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

আমাদের খাদ্যের মধ্যে পাঁচ-জাতীয় সারপদার্থ থাকা আবশ্যক। দুগ্ধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য—দুধের মধ্যে পাঁচ-জাতীয় সারপদার্থ আছে। (১) ছানা-জাতীয়, (২) মাখন-জাতীয়, (৩) শর্করা-জাতীয়, (৪) লবণ-জাতীয়, (৫) জলীয়। সুতরাং দুধের মধ্যে যে সব সার-পদার্থ আছে, শরীর পোষণের জন্য তাহাদেরই প্রয়োজন।

দেশের অবস্থা ভালো নহে,—দুধ, মাছ মাংস প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য; সুতরাং ছানা-জাতীয় পদার্থ পাইতে হইলে ডাল আমাদের প্রধান খাদ্য করিতে হইবে। মাছ, মাংস অপেক্ষা ডালে ছানা-জাতীয় পদার্থ অধিক,—সারবান্ এবং উপরন্তু সস্তা।

ভাত—চালে শরীর-পোষণোপযোগী সার পদার্থ আছে, কিন্তু গম প্রভৃতি অপেক্ষা কম। ইহা হজমের পক্ষে উৎকৃষ্ট। আমরা সৌখীনতার বশে মাজা ধবধবে পরিষ্কার চালের পক্ষপাতী, কিন্তু ধানের তুষের নীচের আচ্ছাদনের ভিতর যে একটি সার পদার্থ থাকে (vitamin) ছাঁটা চালে তাহা বাদ যায়, ইহা স্বাস্থ্য রক্ষার অন্তরায়। বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ইতর প্রাণীকে এই দু'প্রকারের চাল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাঁটা চাল খাওয়ায় তাহাদিগকে রোগে ধরিয়াছে। সুতরাং ধব ধবে পরিষ্কার চাল খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চাল থেকে প্রস্তুত জলখাবার যথা—খৈ, চিঁড়ে, মুড়ি। এই তিনটিই বেশ সুপথ্য। মুড়ি শ্রমজীবীদের দু'বেলাকার খাদ্য, ইহা সুপাচ্য ও ভাতের চেয়ে সারবান্, অথচ অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সব-রকমের সারপদার্থ নাই, তাই ইহার সঙ্গে ছোলা বা মটর এবং নারিকেল মিশাইয়া খাইবে। এই তিনের সমন্বয়ে অতি উত্তম খাদ্য হয়। ছোলা বা মটর—ডালের কাজ করে অর্থাৎ ছানা জাতীয় জিনিসের অভাব পূর্ণ করে। নারিকেল অতিশয় স্নেহযুক্ত জিনিস, ইহা মাখন জাতীয় জিনিষের কাজ করে।

ময়দা—ময়দার রুটি ভাতের দ্বিগুণ সারবান্, কারণ নাইট্রোজেন ময়দায় শতকরা ১০ ভাগ আর ভাতে ৫ ভাগ, কলে পেষা সূক্ষ্ম ময়দার ভুষি বাদ যাওয়াতে ইহার সারভাগ কমিয়া যায়। তাই আটার রুটী খাইবে। জাঁতা-ভাঙা খাঁটি আটা কিনিবে—অনেক সময়ে ভুষি-মিশানো ময়দা আটা বলিয়া চালানো হয়। আটার রুটী স্বাদু ও উপকারী এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। হাতে গড়া রুটী ভালোরূপে তৈয়ারী না হইলে শ্বেতসার পদার্থ ভালোরূপে অগ্নিপক্ব হয় না, ইহাতে হজমের ব্যাঘাত করে। ভালো সেঁক দেওয়া পাঁউরুটিতে এবং লুচিতে এই দোষ থাকিয়া যাইবার ভয় নাই, সুতরাং এ দুটিও ভালো খাদ্য এবং সুপাচ্য। কিন্তু লুচি বেশী ঘৃতযুক্ত হইলে বেহজমী হয়, ইহা স্থূলদেহ লোকদের অনুপযুক্ত।

ডাল—মসূরীর ডাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে ছানা শতকরা ২৫ ভাগ আছে। মুগ ও ছোলায় ইহা অপেক্ষা সার ভাগ অল্প। মুগের ডাল অতি উত্তম। অড়হর ডালের ব্যবহার পশ্চিমে খুব চলিত আছে। ইহাতে ছানা-জাতীয় অংশ অপেক্ষাকৃত কম আছে, কিন্তু তেমনি তাহা উদর অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে।

দুধ—ভালো দুধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য কিন্তু ইহা খাঁটি অবস্থায় যথেষ্ট-পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। ভেজাল ধরাও অনেক সময় মুস্কিল হয়। সকল দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব খাঁটি দুধের সমান করিবার জন্ম তাহাতে কিছু চিনি ফেলিয়া ব্যবসায়ী লোকে ক্রেতার চোখে ধূলা দেয়।

দই—ইহা দুধের বিকার হইলেও দুধের অন্য সকল উপাদান ইহাতে আছে, কেবল চিনি নাই। দইয়ের মধ্যে যে কীটাণুর ক্রিয়ায় দুধ হইতে দই প্রস্তুত হয়, তাহারা জঠরের অনিষ্টকর জীবাণু মারিয়া ফেলে। অন্ত্রস্থ এইসকল বীজাণুই রক্ত বিষাক্ত করে ও অকালবার্দ্ধক্যের হেতু হয়। যাহাদের বাড়ীতে দুধের অভাব নাই তাঁহাদের দুধের কিছু অংশ দইয়ের আকারে খাওয়া ভালো। ঘোল বিশেষ উপকারী। ইহা সরবতের ন্যায় পানীয়। সকালে খাবারের পর খাইলে বিশেষ উপকার হয়। আজকাল রোগীকে ঘোল খাওয়ানো হয়।

ছানা—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট সারবান্ খাদ্য। মাছ ও মাংসে যে ছানা-জাতীয় পদার্থ থাকে, অনেক সময়ে তাহা দূষিত হয়। কিন্তু ছানার এই দোষ ঘটে না।

মাংস—ইহা সুপাচ্য ও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু বিকৃত হইলে পরম অনিষ্টকর। খাদ্য-পশুটি নীরোগ হওয়া দরকার, বড়-বড় সহরে ইহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। বেশী মাংস খাইলে শরীরে ইয়ুরিক অ্যাসিড, জয়াইয়া বাত প্রভৃতি রোগ ঘটে। তাই য়ুরোপীয়দের এই রোগ অতি প্রবল। তা ছাড়া "টোমেন" নামক একপ্রকার তীব্র বিষ অনেক সময়ে পচা মাংসেও জন্মে। এইপ্রকার মাংস আহার করা ভয়ানক বিপজ্জনক।

ডিম—অতি সারবান্ খাদ্য। ইহাতে ছানা প্রায় ১৪ ভাগ, মাখন ১৮ ভাগ আছে। ইহা পূর্ণ সিদ্ধ করিয়া খাইলে হজম হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। অসিদ্ধ ডিম দেড় ঘণ্টায় হজম হয়।

মাছ—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বেশী তৈলযুক্ত মাছ হজমের পক্ষে বিঘ্নকর ও উত্তেজনাজনক হয়। পচিবার উপক্রম হইলে সে মাছ পরিত্যাজ্য।

ঘৃত, তৈল—এই দুটি দেহের অত্যন্ত আবশ্যক খাদ্য-সামগ্রী। কিন্তু ঘৃতে অনেক বীভৎস ও অপথ্য পদার্থের ভেজাল থাকে এবং তাহা মহার্ঘ। ঘৃতের অভাব খাঁটি তেলে পূরণ করা যায়। মান্দ্রাজে তিল তৈল এবং নারিকেল-তৈল ঘিয়ের বদলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া চিনা বাদামের তেলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই-সব তেল অনিষ্টকর নহে এবং ঘিয়ের চেয়ে অল্প-একটু নিকৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য।

তরিতরকারি—ইহার মধ্যে আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মুখরোচক তরকারী। ইহাতে জল ৮০ ভাগ আর শ্বেতসার ২০ ভাগ। খোসা ছাড়াইয়া খাইলে ইহার সারভাগ অনেকটা কমিয়া যায়। আলু সিদ্ধ হইবার পর তাহার খোসা তুলিয়া লইলে সারভাগ এত নষ্ট হয় না। অধিকাংশ তরিতরকারীতেই জল-ভাগ খুব বেশী। কিন্তু তরকারী শরীর পোষণের জন্ম প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে যে লাবণিক পদার্থ আছে তাহা রক্ত পরিষ্কার করে। ফলেও সেই উপকার হয়। তরিতরকারী কোষ্ঠবদ্ধতার নিবারক। রাঙা আলুতে চিনি জাতীয় পদার্থ ও শ্বেতসার থাকাতে বেশ উপকারী খাদ্য। কড়াইশুঁটি, বরবটি, সিম প্রভৃতি শুঁটিজাতীয় তরকারী ডালের মতই উপকারী। কাঁটালের বীজে ছানা-জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট আছে—এই হিসাবে ইহা গমের চেয়েও সারবান্।

চিনাবাদাম—ইহার চাষ আরও বেশীপরিমাণে করিলে ছেলেদের জলখাবারের জন্ম ইহার ব্যবহার হইতে পারে। চিনাবাদাম অধিক খাইলে ইহার তৈলজাতীয় জিনিসটা অপকার করে। ইহাতে ছানা পদার্থ শতকরা ২৬ ভাগ ও তৈল পদার্থ ৪৩ ভাগ আছে।

উপসংহারে বক্তব্য—আহার্য্য ধীরে-ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। পরিপাকযন্ত্রের কাজ মুখ হইতে আরম্ভ হয়। দাঁতকে তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিতে দেওয়া চাই—খাবার অতি সূক্ষ্ম হইয়া উদরে যাওয়া প্রয়োজন এবং মুখের লালা উহার সহিত মিশ্রিত হওয়া দরকার। এই লালা খাদ্যের শ্বেতসারকে চিনিতে পরিণত করে।

(স্বাস্থ্য, পৌষ ১৩৩২) ডাঃ শ্রী চুণীলাল বসু

অনগড়িয়া

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

(কবীর)

ওগো অনগড়া দেবতা আমার,
সেবা করে তব কেবা?
ওরা নিজ-গড়া দেবতারে পূজে,—
নিত্য যে তারি সেবা!
পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ড স্বামী—
জানে না তাঁরেই, লাজে মরি আমি;
কবীর কহিছে,—শোন ভাই সাধু,
তাঁহার রাগিণী খানি
যে শোনে, সেই সে ত'রে যায় সীমা
এ আমি ভালোই জানি!



প্রবেশ-নিষেধ

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" অর্থাৎ কিনা দুর্ব্বল ও কাপুরুষের স্থান এ-পৃথিবীতে নাই। তাহার প্রমাণ আজ আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব উত্তমরূপেই পাইতেছি এবং অন্যান্য স্থানেও ভবিষ্যতে পাইব এইপ্রকার আশা আছে।

আমাদের ক্ষমতার তুলনায় দেশের জনসংখ্যা অসম্ভব-রকম অধিক। হঠাৎ শুনিলে বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের এই পরপদানত দেশে ৩২,০০০০০০০ লোকের বাস। বত্রিশকোটি যে-কোনো-প্রকার জানোয়ারকে ঠিকমত সায়েস্তা রাখিতে হইলে যতজন রক্ষীর প্রয়োজন হয়, আমাদের সায়েস্তা রাখিতে ইংরেজের তদপেক্ষা সম্ভবত কম লোকেরই বেতন জোগাইতে হয়। ইহা গেল আমাদের নিজের ঘরের কথা। ঘরের বাইরেও যেখানেই পরের সুবিধা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে আমরা অবস্থান করিতে চাই, সেখানেই আমাদের অতি শীঘ্র অপরে বুঝাইয়া দেয় যে এ-পৃথিবীতে আমাদের মতন অপদার্থ জাতের লোকের স্থান এক দাসরূপে ছাড়া অন্য কোনরূপে হইতে পারে না। আফ্রিকা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আফ্রিকায় আমরা গিয়াছিলাম তত্রস্থ শ্বেতচর্ম্ম নিগ্রো-বিজেতাদিগের চাষ-বাসের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য। বাণ্টুগণ উত্তমরূপ চাষবাস করিতে অক্ষম প্রমাণ হওয়ার ফলেই শ্বেতকায়গণ আমাদের আফ্রিকায় লইয়া যায় ও আশা দেয় যে উত্তমরূপে তাহাদের কার্য্য সমাধা করিয়া দিলে আমাদেরও সে-দেশে কিছু জমিজমা দিবে। কাজ করা হইল, জমিজমাও হইল, কিন্তু লোভী আমরা আফ্রিকায় ব্যবসায়বাণিজ্য আরম্ভ করিলাম। শ্বেতকায়গণ দেখিল ইহাতে তাহাদের ক্ষতি হইতেছে, এবং আমাদের শক্তিসামর্থ্যের বিশেষ অভাব; সুতরাং তাহারা আমাদের বলিল, "তোমরা বিদায় হও। আমাদের রাজত্বে আসিয়া আমাদের অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করা তোমাদের মতন কৃষ্ণকায় লোকের পক্ষে বেয়াদবি।" আমরা এই কথা শুনিয়া অবধি অনেক ক্রন্দন ও অশ্রুমোচন করিতেছি; কিন্তু "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"; ক্রন্দন করিয়া লাভ কি?

আমাদের দেশের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। খুব সুদূর ভবিষ্যতে নহে, শীঘ্রই এমন সময় আসিবে যখন আমাদের দেশের "বাড়্তি" নরনারীদিগকে অন্যত্র পাঠাইবার বন্দোবস্ত না করিতে পারিলে, আমাদের নিজেদের জীবনযাত্রার অশেষ দুর্গতি হইবে। ইয়োরোপের লোকেরা তাহাদের বাড়্তি জনবল দিয়া আফ্রিকা, আমেরিকা ও

ও অষ্ট্রেলিয়ার জনহীন প্রান্তরগুলি মনুষ্য-অধিবাসিত করিয়া তুলিতেছে। এখনও তাহাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে ৫০।৬০ কোটি অবাধে ঐসকল দেশে স্থান পাইবে; যদিও তাহাদের জন সংখ্যা এমন-কিছু দ্রুতবেগে বাড়িতেছে না, যাহাতে তাহারা আগামী দুইশত বৎসরের মধ্যে ৫০।৬০ কোটি লোক ঐসকল দেশে পাঠাইতে পারে। কিন্তু ঐসকল দেশে তাহারাই রাজা এবং ঐ-সকল দেশ জনহীন থাকিলেও তাহারা শ্বেতকায় ব্যতীত অন্য-প্রকার মানবকে সেখানে আসিতে দিবে না এইরূপ মনস্থ করিয়াছে।



পশম কাটিবার পূর্ব্বে ভেড়ার পাল

অষ্ট্রেলিয়া এইসকল শ্বেতচর্ম্মবাদী দেশগুলির মধ্যে প্রধান। অষ্ট্রেলিয়াতে বিশ-ত্রিশ কোটি লোকের স্থান হইলেও, শ্বেতকায় উপনিবেশকারীর অভাবে আজ অষ্ট্রেলিয়াতে মাত্র ষাটলক্ষ লোকের বাস। অষ্ট্রেলিয়েরা ঠিক করিয়াছে যে "For all time this continent is to know only one race, one language and one nationality." অর্থাৎ "এই মহাদেশে চিরকাল শুধু একজাতি, এক ভাষা ও এক দেশমাতৃকতা থাকিবে"। সে জাতি হইবে অ্যাংগ্লো-স্যাকসন, সে ভাষা ইংরেজী এবং সে দেশমাতা বৃটানীয়া। অ-শ্বেত জগতের পক্ষে ইহা আশার বাণী সন্দেহ নাই। চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ নিজ-নিজ দেশে কয়েদ হইল। তাহাদের আর বাহিরে কোথাও যাইবার উপায় রহিল না, এক যদি তাহারা সে উপায় সঙ্গীনের সাহায্যে না করিয়া লয়। তাহাদের ঘরের সম্মুখে প্রশান্ত মহাসাগরের কোলে ভগবান্ এই যে-সকল-ভোগ্য-বস্তু-সমন্বিত এক মহাদেশ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের কোনো অধিকার নাই, আছে শুধু ইংরেজের। কিন্তু চীন কিম্বা ভারতবর্ষের লোকেরা যদি বলে যে তাহাদের শুধু নিজেদের দেশের হাটবাজার প্রভৃতিতে ইংরেজের স্থান নাই তাহা হইলেই তুমুল কাণ্ড। রাজনীতি-নামক যে একপ্রকার নীতি আছে তাহাতে এই-প্রকার সমতামূলক সূত্রগুলিকে "সুবিচার" "সভ্যতাপ্রচার" নামে অভিহিত করা হয়।



মেরিনো

অষ্ট্রেলিয়া আয়তনে ২,৯৭৪,৫৮১ বর্গ মাইল। এই মহাদেশের প্রায় অর্দ্ধেক জনমানবশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ার ২,০০০,০০০,০০০ একর জমির মধ্যে মাত্র ১৩,২৯৯,০০০ একরে চাষ হইয়াছিল। তাহা হইতে অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা ৭ কোটি পাউণ্ডেরও অধিক উপার্জ্জন করে। ১৯১৯-২০ সালে চাষের হিসাব-নিম্নলিখিত-প্রকার ছিল।



অতীতের ধ্বংসাবশেষ

গম	৬,৪১৯০০০	একর
ওট	১,০৬৯০০০	একর
ঘাস	৩,১২৭০০০	একর
আলু	১১৪,০০০	একর
আখ	১৫৯,০০০	একর
আঙুর	৭৩,০০০	একর
ফলের বাগান	২৭২,০০০	একর

ইহা ব্যতীত অন্যান্য-প্রকার চাষে বাকি জমি ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন ও আধুনিক জগতে পশুসম্পদ্ চিরকাল শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। গরু ও ভেড়া হইতে মানুষ এককালীন দুগ্ধ, মাংস, চর্ম্ম, পশম, ইত্যাদি নানা-প্রকার ভোগ্যবস্তু আহরণ করিতে পারে বলিয়াই, পশু-পালনের সুবিধা পাইলেই মানুষ উক্ত কার্য্যে রত হয়। অষ্ট্রেলিয়াতে পশুপালন একটি খুব বড় ব্যবসায়। এই কার্য্যে অনেকে কোটিপতি হইয়াছে।

১৯১৯ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়াতে ২,৪২১,০০০টি ঘোড়া, ১২,৭১১,০০০টি গরু,৭৫, ৫৫৪,০০০টি ভেড়া এবং ৭৯৬,০০০টি শূকর ছিল। ঐ-বৎসর অষ্ট্রেলিয়াতে ৬৬৩,২৪৯,০০০ পাউণ্ড পশম উৎপন্ন হয়। অষ্ট্রেলিয়ার চামড়া, মাংস, মাখন, চর্ব্বি ইত্যাদি পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি হয়। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শ্যামল প্রান্তরে উদ্ভূত অপর্য্যাপ্ত খাদ্য পাইয়া এবং বিভিন্ন দেশ হইতে উন্নত জাতির ঘোড়া, গরু ও ভেড়া আমদানি করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার লোকেরা আজ পৃথিবীর মধ্যে পশুসম্পদে প্রধান দেশগুলির অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মেরিনো ভেড়া পৃথিবীব্যাপী খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাহাদের ঘোড়াও প্রসিদ্ধ।

অষ্ট্রেলিয়ার মেরিনো ভেড়ার রাজা। তাহার এক-একটি পুরুষ ভেড়া ৫০-৬০ হাজার টাকা মূল্যেও বিক্রয় হইয়াছে। তাহার দেহজাত পশম বহুমূল্য এবং ওজনেও অনেক। পশমের ব্যবসায়ে অষ্ট্রেলিয়া অনায়াসে অপর সকল দেশকে ছাড়াইয়া যায়।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, কয়লা ও লৌহ সম্পদও অষ্ট্রেলিয়ার অজস্র আছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়ার খনিজ ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়াছিল প্রায় ৩৯৩,৮৪০,০০০ টাকার।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে কেন ইংরেজ আজ অষ্ট্রেলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া অপর সকল জাতিকে "প্রবেশ-নিষেধ" বলিয়া অষ্ট্রেলিয়া-আগমনে নিবৃত্ত হইতে বলিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসি-গণ প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজরা একটি অষ্ট্রেলিয়া-সম্পর্কিত পুস্তিকায় অতি আনন্দের সহিত



কলিন্স ষ্ট্রীট ; মেলবোর্ন



উষ্ট্র-যান

হাওয়ার টান বেশী। অষ্ট্রেলিয়ার এক এক স্থানে শুধু মরুভূমি এবং সেইসকল স্থানে উষ্ট্রের সাহায্যে মানুষে যাতায়াত করে। ইয়োরোপীয় মানুষ শুধু এক অষ্ট্রেলিয়াতেই সম্ভবত উষ্ট্র চালনা করে। তবে এশিয়ার বাসিন্দাও জন-কতক উষ্ট্রচালক অষ্ট্রেলিয়াতে আছে।

অষ্ট্রেলিয়াতে কোথাও-কোথাও প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আব্‌হাওয়া ইয়োরোপের সমতুল্য। বরফ-ঢাকা

শ্বেত জনসাধারণকে জানাইতেছে যে অধুনা অষ্ট্রেলিয়ার সমৃদ্ধ স্থানগুলিতে অনেক ঘুরিয়া বেড়াইলেও, একটিও যথার্থ কৃষ্ণকায় দেখা যায় না। এই আদিম অধিবাসিগণকে তাহারা "Relics of the Past" বা "অতীতের ধ্বংসাবশেষ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

এই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ আদিম অধিবাসিগণের আর কোনো আশা নাই। আমেরিকার লাল "ইণ্ডিয়ান্"-দিগের ন্যায় ইহারাও শুধু জগতকে দেখাইবার জন্য মাত্র কয়েক-জন অবশিষ্ট আছে। অষ্ট্রেলিয়ায় শ্বেত-রাজত্বের ইহারা কোনো-প্রকার শত্রুতা করিতে সক্ষম নহে।

পাহাড়ও যে সেখানে দেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া দেখিলে অষ্ট্রেলিয়া এশিয়াবাসীর আবাসের পক্ষেই অধিক উপযুক্ত। অবশ্য এশিয়াবাসীর



অষ্ট্রেলিয়ার 'আল্‌স' পর্ব্বত

অষ্ট্রেলিয়াতে বড়-বড় শহরের অভাব নাই! সিড্‌নি, মেলবোর্‌ন্, ব্রিস্‌বেন্, অ্যাডেলেড, পার্থ; ও হোবার্ট প্রত্যেকটিই শহরনামের যোগ্য। এইসকল স্থানের আব্‌হাওয়া উৎকৃষ্ট, তবে গরমের দিকেই অষ্ট্রেলিয়ার আব্-

তাহা জানিয়া কোনো লাভ নাই। অষ্ট্রেলিয়ার শতকরা ৯৮ জন অধিবাসী আজ বৃটিশ-জাতীয় এবং শতকরা ১০০ জন যাহাতে বৃটিশ হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

শুভইচ্ছা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের কী পরিচয় ? বাইরের নানা বিক্ষেপে তা ভুলে যাই। এইজন্যে, আমরা কোন্ ব্রতের ব্রতী সেটা বৎসরে বৎসরে উৎসবের মহাদিনে অন্তরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করতে হয়। আমাদের সাধনার উপর যে ধূলিস্তর পড়ে সেটাকে মার্জ্জন ক'রে তবে জানি কোন্ লক্ষ্যের দ্বারা আপন স্বধর্মকে আমরা চিনতে পারি।

এই স্বধর্ম্মের পরিচয় গ্রহণ করাকেই বলে দীক্ষা। এই দীক্ষা কেবল একবারের নয়, বারে বারে এর পুনরাবৃত্তি। সেই পুনরাবৃত্তিরই দ্বারা বারে বারে এর নবীনতার প্রমাণ। প্রভাতের আলোতে প্রতিদিনই পৃথিবীর নবজীবনের দীক্ষা, প্রতিদিনই তা'র নব জাগরণ। যে সত্যকে স্বীকার করেছি অথচ সার্থক করতে পারিনি, পুনঃপুনঃ তা'কে নূতন ক'রে স্বীকার করতে হবে। নইলে সে ক্রমেই ম্লান হ'য়ে যায়। সাম্বৎসরিকে আমাদের সেই স্বীকৃতির পুনরাবর্ত্তন।

আমরা যারা বিষয়ী, যারা বিজ্ঞ, তা'রা কী করি ? না, যেটা আছে সেইটেকেই মেনে নিই। "সংসারে সাধারণত এইরকমই ঘ'টে থাকে," এই উক্তিই আমাদের কাছে বাস্তব সত্যের প্রবলতম বাক্য। অধিকাংশের পক্ষে প্রতিদিনের যেটা চল্‌তি পদার্থ সেইটেকেই আমরা ধ্রুব ব'লে গণ্য করি—মনে করি, সেইটেকে আঁকড়ে থাকলেই আমরা ঠকব না। স্বার্থের দিকে অহঙ্কারের দিকে সাধারণ সংসারের যে-গতি আমাদের লক্ষ্য যদি তা'র উল্টো দিকে হয় তা হ'লে জীবনে বিড়ম্বিত হবো, এটা বিষয়বুদ্ধির কথা। যারা উপস্থিতকেই বিশ্বাস করে, যারা বাস্তববাদী, তা'রাই চিরকাল এমন মানুষকে বিদ্রূপ করেছে পীড়া দিয়েছে যে-মানুষ সচরাচরের প্রচলিত সীমানার বাইরে সত্যকে দেখেছে ও মেনেছে, যে-মানুষ সাধারণ লোকের প্রত্যাশা ও বিশ্বাসের অভিমুখতা অনুসরণ ক'রে আপন ক্ষীণ সাহসের সাধনাকে প্রচলিত লোকমতের আঙিনা পার হ'তে দেয় না। পায়ে পায়ে চিহ্নিত হ'য়ে যে সরু পথ হাটমাঠের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে সে ত পণ্যভার-পীড়িত প্রতিদিনের পথ ; ঝড় এসে তা'কে লুপ্ত করে, বন্যা এসে তা'কে মুছে দেয় ; মহা ভবিষ্যতের অভ্যর্থনার জন্য শ্রদ্ধাসবল শক্তি যে-পথ কাটে সেই ত সত্যকার পথ। আমরা সেই পথের অনুসরণ করব, আমরা সেই দীক্ষা নেবো যেটা অসাধ্য-সাধনের দীক্ষা।

মানুষ যুগে যুগে এই কথাই ব'লে এসেছে যে, সে তা'র সহজ প্রবৃত্তিকে চরম ব'লে স্বীকার করে না। যদি করত, তাহ'লে সে পশু হ'য়েই থাকত। উপস্থিত কালে ও উপস্থিত অবস্থায় একমাত্র যেটা সম্ভবপর ব'লে বোধ হয়েছে মানুষ তা'কে উপেক্ষা করতে সাহস করেছে, প্রচলিত প্রমাণ-অনুসারে যেটা একমাত্র সম্ভবপর ব'লে প্রতিভাত, মানুষ তা'কে অতিক্রম করার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আনন্দ পেয়েছে ব'লেই বাহিরের উপরে ও নিজের উপরে তা'র অধিকার কেবলি বেড়ে চলেছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে, যিনি প্রজাপতি তিনি সমস্ত প্রজার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে অনন্ত পুরুষের বিকাশ নিত্য সচেষ্ট। সুদূর কাল থেকে এই অন্তহীনের পরিচয় ক্রমশ স্ফুটতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। যা হয়েছে সে ত অনেক, তা'র চেয়েও আরো অনেক হবে না, এমন ছোটো কথা বল্‌বে কে ? অথচ প্রতিদিনের চলিত কথায়, বিষয়ী বিজ্ঞানের সন্দিগ্ধ আলোচনায়, মানুষের এই সবচেয়ে বড়ো সত্যটিই প্রচ্ছন্ন হ'য়ে উপহসিত হ'য়ে থাকে যে-সত্যটি একদিন আমাদের ঋষিবাক্যে উচ্চারিত হয়েছিল, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" আমাদের সেই সত্যের দীক্ষা। হৃদয়কে বিশ্বায়তন ব'লে ধ্যান করবার দীক্ষা, চিত্তকে নিখিল প্রজার প্রজাপতির আসন ব'লে উপলব্ধি করবার দীক্ষা। মানুষের মধ্যে অনন্তস্বরূপের যে-অভিব্যক্তি

তা'কে আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা গ্রহণ কর্‌বার অনুশাসন আমরা কোথা থেকে পেয়েছি ? পরম সত্যের মধ্যে আত্মোপলব্ধির অনুসরণে যে-বাক্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন ঘোষণা করেছিলেন তাই থেকে। তাঁরা বলেছিলেন, একই বহুর মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করেন—ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে তবে এই সত্য বুঝে নিতে হবে। তাঁরা বলেছেন, সেই এককে জানাই অমৃতকে জানা। এই একের মন্ত্রকে মানুষ প্রতিদিন পরিহাস করেছে। তা'র কারণ, আমাদের রিপু আমাদের প্রবৃত্তি তা'র রঙীন মশালে অহমিকাকেই বড়ো ক'রে দেখিয়েছে ! কিন্তু এইটেই কি মানুষের ধর্ম্ম ? কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, স্বার্থের সংগ্রামই চারিদিকে অত্যুৎকট,—এও ঠিক যে, সেই সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অনেক মানুষ ধনী হ'ল। কালের খণ্ডতার মধ্যে যদি দেখি তবে সেই ছোটো ফ্রেমের মাঝখানে এই ছবিটাকেই বড়ো ক'রে দেখ্‌তে পাই। এই মুহূর্ত্তের খাঁচাটার মধ্যে যদি তাকিয়ে দেখি তবে চোখে পড়ে—ঠেষাঠেষির ভিতর মানুষ পরস্পরকে কেবলি খোঁচাখুঁচি ক'রে মরছে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তের কাঠগড়ার ভিতরে যে-সাক্ষী দাঁড়িয়ে আছে তা'র সাক্ষ্যই কি চরমভাবে প্রামাণিক ? কখনো তা মানব না। হোক্ সে প্রবল, তবু প্রচণ্ড প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের বল্‌তে হবে, মানবসমাজে কল্যাণের পূর্ণরূপ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে, যেহেতু, সে সত্য, সেইজন্যই বাহ্য পরাভবের ভিতর দিয়েও সে জয়ী হবে।

আমাদের দেশে যে মূল অর্থটির উপরে ধর্ম্ম শব্দটি বিরাজ করছে সেটি খুব বড়ো। প্রত্যেক জিনিষের যেটা প্রকৃতিগত, সেইটেই তা'র ধর্ম্ম। দাহ্যগুণ শুক্‌নো কাঠের স্বভাবগত, এইজন্যে যখন সে নাও জ্বলছে তখনো আমরা বল্‌ব দহনীয়তা তা'র ধর্ম্ম। তেমনি, সত্যরূপে মানুষের যেটি স্বভাব সেইটেই তা'র ধর্ম্ম। কত-বড়ো জোরে এমন কথা বলা হয়েছে ! প্রতিদিনই ত চারদিকেই দেখ্‌ছি স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতা মিথ্যা আপনাকে প্রবল করছে। তবে মানুষ কেমন ক'রে বল্‌লে যে, দয়া ত্যাগ সত্যই মানুষের ধর্ম্ম, প্রতিদিন যা আমাদের পীড়া দিচ্ছে, আমাদের অভিভূত করছে তা'কে স্বীকার ক'রেও ত মানুষ বলেছে, সত্যে ত্যাগে দয়াতেই মানুষের পরিচয়। কোনো জন্তু ত মনেও কর্‌তে পারে না যে, যে-সব প্রবৃত্তির পথে তা'র জীবযাত্রা নিরন্তর চল্‌ছে, তা'র পশুধর্ম্ম তা'র বিপরীত। প্রতিদিনের ক্ষেত্রে যে-সব প্রবৃত্তি মানুষকে চালাচ্ছে, তা'কেই মানুষ বলেছে মোহ, অর্থাৎ মিথ্যা। আর শুভবুদ্ধির যে-প্রবর্ত্তনা আমাদের পক্ষে দুরূহ, যার থেকে পদে পদেই আমরা স্খলিত হচ্ছি, তা'কেই মানুষ বলেছে ধর্ম্ম, অর্থাৎ তার সত্যতম স্বভাব। মানুষ সেইসব লোককেই নরোত্তম বলেছে যাঁরা স্বার্থধর্ম্মের আবরণ ছিন্ন ক'রে নিজের মধ্যে মাহাত্ম্যের জ্যোতিকে উজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছেন। তার মানেই, মানুষ উপস্থিতকে, প্রতিদিনের-প্রচলিত প্রামাণ্য-তথ্যকে বিশ্বাস্য সত্য ব'লে মান্‌তে পারেনি। এত যুগযুগান্তর ধ'রে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ সমস্ত দস্যুবৃত্তি সমস্ত প্রতারণার নিরন্তর অভিঘাতের মধ্যেও ত ঐ সত্য মানবসংসারে অটল বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, সর্ব্বমানুষের সর্ব্বকালের মানুষের অন্তরের এই বাণীকে কি তবে আজ অশ্রদ্ধা করতে পারি ? তবু এমন কথা কি বলা চল্‌বে যে, চিরদিনই মানুষ মানুষকে মারবে, ঠকাবে ? পশুধর্ম্মই মানুষের নিত্য ধর্ম্ম ? আজ মানুষের মধ্যে যতটুকু আত্মদমন, আত্মত্যাগ ও আত্মীয়তা দেখা যাচ্ছে, তা যত অল্পই হোক্ না কেন, তা সম্ভব হ'ল কি ক'রে ? কারণ সেইদিকেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলব্ধি করেছে, রিপুর উদ্দামতার দিকে নয়। ভোরের দিকে যখন আলো-অন্ধকারের পরিমাণ প্রায় সমান, তখনো আমরা আলোটাকেই ভোর বেলাকার প্রধান লক্ষণ ব'লে থাকি। মানুষের চরিত্রেও অন্ধকার যতই নিবিড় হোক্ না কেন, সেই অন্ধকারকেই আমরা তার স্বভাব বল্‌তে পারিনে। মানুষ যে বিজ্ঞানচর্চ্চা ক'রে এসেছে, প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত তা'তে ভ্রমের ধারা প্রবাহিত, কিন্তু যতটুকু অংশে সেই ভ্রম কেটে যাচ্ছে, ততটুকু অংশেই আমরা বিজ্ঞানের সত্যধর্ম্ম উপলব্ধি করি। তাই সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে জোর ক'রে বল্‌তে পারি, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্যকে উদ্‌ঘাটন করা, মিথ্যাকে প্রচার করা নয়। যদি প্রশ্ন ওঠে, বিজ্ঞান কি মিথ্যা প্রচার করেনি ? উত্তরে বল্‌তে হবে, হাঁ বারবার করেছে ; এমন কি সংখ্যার পরিমাণ করতে গেলে দেখা

যাবে যে, এপর্য্যন্ত সত্যের চেয়ে তা'র ভ্রমের হিসাব অনেক বড়ো। তবুও জোর ক'রে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের লক্ষ্য সত্য। মানুষের ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও সেই কথা। উপস্থিত প্রমাণের ওজন করতে গেলে দেখা যায়, প্রত্যহই মানুষ অন্যায় করছে, তা'র অসত্যের পার পাওয়া যায় না—তবুও সমস্ত আশু প্রমাণের ভিড় ঠেলে মানুষ ব'লে এসেছে, তা'র ধর্ম্ম অর্থাৎ তা'র নিগূঢ় স্বভাব অন্যায় নয়, অসত্য নয়। এইজন্যে যারা মানুষের শুভবুদ্ধির কোনো আধ্যাত্মিক নিত্য আশ্রয় মানে না, তা'রাও ব্যক্তিগত বা সমাজগত দায়ে ঠেক্‌লে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিরই দোহাই দিতে থাকে।

বাইরের কাজের দিক্ থেকে মানুষের প্রকৃতি বিচার ক'রে দেখা যাক্। মানুষ পাখী নয়, অথচ কতকাল থেকে স্বপ্নে-জাগরণে মানুষ ইচ্ছা করেছে, সে আকাশে উড়্‌বে। যখন সমস্ত আশু প্রমাণ ওড়ার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে, তখনো কল্পনায়, তা'র পৌরাণিক গল্পে, তা'র রূপকথায় নিজের অন্তর্গূঢ় ওড়্‌বার ইচ্ছাকে প্রকাশ করাটাকে মানুষ অদ্ভুত হাস্যকর মনে করেনি। মানুষের সেই অদ্ভুত ইচ্ছাও আজ জয়ী হয়েছে। দূরত্বের ব্যবধানকে মানুষ না মেনে থাক্‌তে পারেনি, কিন্তু মানুষ জাগ্রৎস্বপ্নে চিরদিন সেই ব্যবধান লোপ করতে চেয়েছে; তা'র সেই অত্যন্ত অসম্ভব ইচ্ছা প্রতিদিনই সম্ভবতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। বস্তুজগতে মানুষ যুগে যুগে সর্ব্বত্রই অসাধ্যকে সাধ্য ক'রে চলেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি; সে ভূতলে ভূগর্ভে জলতলে জলগর্ভে আকাশে, সব জায়গাতেই দুশ্চিন্তনীয় বাধাকেও মান্‌লে না, জয়ী হ'ল। মানুষের ইচ্ছা যা কিছু করতে সাহস করেছে প্রায় তা সবই ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে, এবং আশা করতে ছাড়্‌ছে না যে ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে। কেবল কি ধর্ম্মজগতে অধ্যাত্মজগতেই তা'র ইচ্ছার ভীরুতা সহ্য করতে পারি? মানুষের কল্পনায় ত সত্যযুগ আছে, স্বর্গ আছে। কোনো বাহ্যদৈন্যকে মানুষ চিরন্তন ব'লে স্বীকার করেনি, কেবল কি নৈতিক দারিদ্র্যকেই সে চিরকালের ব'লে হাল ছেড়ে ব'সে থাক্‌বে? বল্‌বে মানুষ তা'র ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্তই কাটাকাটি করবে, দস্যুবৃত্তি করবে, স্বার্থের অনুসরণে সমস্ত পৃথিবীকে কদর্য্য কলুষিত ও রিক্ত ক'রে দেবে?

এসম্বন্ধে একান্ত ইচ্ছা করার মধ্যেই কি মানুষের সৃষ্টিশক্তি কাজ করে না? সংশয়-কুটিল বিদ্রূপ কি সেই শক্তির সর্ব্বপ্রধান বাধা নয়? এইজন্যই আমাদের দীক্ষা শুভইচ্ছার দীক্ষা। আমরা শুভ ইচ্ছা করব, মানুষের শুভ ইচ্ছাকেই বিশ্বাস করব, তা'কেই সত্য ব'লে, মানুষের ধর্ম্ম অর্থাৎ শাশ্বত প্রকৃতি ব'লে মানব। দেশবিদেশের সকল মানুষের মধ্যে মৈত্রী হোক্, এ ইচ্ছাটাকে অন্তত ভারতবর্ষ হাস্‌বার কথা ব'লে মনে করেনি। এই ইচ্ছাকেই ভারতবর্ষ সমুদ্রপর্ব্বত পার হ'য়ে দূরে দূরান্তরে প্রচার করেছে। কত হিংস্রবর্ব্বরজাতি এই ইচ্ছাকে ধর্ম্ম ব'লে মাথা নত ক'রে মেনে নিয়েছে, বলেছে এ'তেই মানুষের চরম শান্তি চরম পরিত্রাণ। অথচ উপস্থিত প্রমাণের হিসাবে তখনো ত এর বিরুদ্ধতার অন্ত ছিল না। সেই শুভইচ্ছার সীমাকে আমরা আজ মানুষের মধ্যে বিস্তারিত করবার ব্রত গ্রহণ করেছি। জানি যে সেই ইচ্ছাই মানুষের ধর্ম্ম, এইজন্যে সেই ইচ্ছাকে উত্তরোত্তর জাগ্রত করতে পার্‌লে সিদ্ধি লাভ হবেই। সকল বড়ো বড়ো ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে সেই ইচ্ছা নিত্য নিয়তই কাজ করছে, আমরা সেই শক্তির পক্ষে আপন শক্তিকে নিযুক্ত করবার সাধনা নিয়েছি। শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিকদিনে আমাদের সাধনার সেই আত্মপরিচয় স্মরণ করতে চাই, তা'র সমস্ত মলিনতা দূর ক'রে তা'কে উজ্জ্বল ক'রে তুল্‌তে চাই। সাধনায় সত্য হবার আশা করব, আশু ফললাভের আশা করব না। এর প্রতিকূলে দুঃখবাধা, আত্মীয়-পরিজনের ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা সমস্তই স্বীকার করব, কিন্তু বিশ্বাস হারাবো না। এ-কথা মনে রাখ্‌ব যে, যা আছে তা'র ভিতরেই যা থাকা উচিত তা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে; নইলে সে থাকাটুকু থাক্‌তেই পার্‌ত না। সংসারের সহস্র পাপের ভারে আক্রান্ত হ'য়েও সে বেঁচে আছে। কিসে তা'কে বাঁচিয়ে রেখেছে? প্রচ্ছন্ন সত্যে, যে-সত্যকে আমরা ধর্ম্ম বলি, এবং বলি "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"—ধর্ম্মের তত্ত্ব গভীরের মধ্যে নিহিত থেকেই কাজ করে। শিশুর একান্ত দুর্ব্বলতার মধ্যে শক্তির বাহ্য প্রমাণ নেই। কিন্তু

সেই দুর্ব্বলতার মধ্যেই বলিষ্ঠ যৌবনের প্রত্যাশা নিহিত হ'য়ে আছে ব'লেই শিশু বেড়ে উঠ্‌ছে। নইলে অশক্তির দ্বারা সে অভিভূত হ'য়ে বিনাশ পেত। ভূরি ভূরি অপরাধের ভিতরেও আজও মানুষ বেঁচে আছে। সেই বেঁচে থাকা যে কল্যাণশক্তির লক্ষণ সেই শক্তিতেই মানুষের পরিচয়। এবং সেই পরিচয়েই মানুষের এই অপরাহত আশা, যে মানবসংসারে মানুষের ধর্ম্মই জয়ী হবে। বিশ্বভারতীর সাধনা সেই আশাকেই পরম সম্পদের মতো গ্রহণ করুক, রক্ষা করুক, এই আমাদের প্রার্থনা।*

[* গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপদেশ প্রদান করেন। ইহা তিনি তৎপরে স্বহস্তে আদ্যোপান্ত লিখিয়া দিয়াছেন। লিখিবার সময় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরীর অনুলিখন স্মারক-লিপির কাজ করিয়াছিল।]

বস্ত্রশিল্পের হাতিয়ার

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

অন্ন ও বস্ত্র এই দুইটি জিনিষের প্রয়োজন সমস্ত দেশের পক্ষেই প্রায় সমান। ইহাদের একটিকে ছাড়িয়া দিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না, আর-একটিকে ছাড়িয়া দিলে সমাজ অচল হইয়া উঠে। খাদ্যের প্রয়োজন অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বসনের প্রয়োজন মানুষের নিজ-হাতে গড়া। নিজের হাতে গড়া এই জিনিষটির উপর মানুষ তাহার প্রয়োজনের পর্দ্দা এমনভাবেই টানিয়া দিয়াছে যে, খাদ্যকে যদি বা দুই একদিন বাদ দিলে চলে, বসনকে একমুহূর্ত্তও বাদ দেওয়া চলে না। সৃষ্টির আদিম যুগে যাহা ছিল না, সভ্যতার গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত বা কতকটা বিলাসের দিক্ দিয়াই যাহার সৃষ্টি সুরু হয়, আজ সেই বিলাসের উপকরণ অতি প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য জিনিষের তালিকার ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সভ্যতার রথ যন্ত্র-মুখরিত রাজপথে ধূলি উড়াইয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, বস্ত্রের উপাদানে নূতন নূতন বিলাস-পণ্যের রসদ জোগাইবার কাজ হয়ত ততই বাড়িয়া উঠিবে। জীব-জগতের ল্যাজ দুনিয়ার ক্রমোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে খসিয়া পড়ে—বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে প্রকৃতির সভ্য করিয়া তোলার এম্‌নি-একটি ইতিহাস নাকি ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু মানুষ যে-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতে যে প্রয়োজনের লেজুড় একবার জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার ছাঁটা বা কাটা পড়িবার কোনোই সম্ভাবনা থাকে না। সে ল্যাজ হনুমানের ল্যাজের মতো

"বাড়িয়া উঠিছে ঊর্দ্ধে পঞ্চাশ যোজন।"

আর তাহার উপর একটা আবরণ রচনা করিবার জন্য

"ভারে-ভারে বস্ত্র সবে আনিছে নিকটে।
এত বস্ত্র আনে এক বেড় নাহি আঁটে।"

এ-যুগের মানুষ আজ আর কল্পনাও করিতে পারে না যে, আবার কখনো এমন দিন ফিরিয়া আসিবে, যখন ঠিক্ আদিম যুগের মতোই বস্ত্রের প্রয়োজন খসিয়া পড়িবে। বস্ত্রের প্রয়োজন যখন এমনি অপরিহার্য্য তখন তাহার জন্য কোনো দেশের চাহিদা যাহাতে সেই দেশের ভিতর হইতেই পূর্ণ হয়, তাহারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। World-Republic (বিশ্ব-জন-তন্ত্র) Universal Brotherhood (বিশ্ব মৈত্রী) ইত্যাদি বড়-বড় কথার উপর নির্ভর করিয়া নিজের দেশের কাঁচা মালের বিনিময়ে ভারতবর্ষকে পরের দেশের বাণিজ্য-পণ্য বিকাইবার বাজারে পরিণত করিবার কোনোই সার্থকতা নাই। Imperial Preferenceএর (সাম্রাজ্যগত পক্ষপাত) যে ধুয়া আজ উঠিয়াছে, সাম্রাজ্যের আর সকল অংশের সুবিধা হইলেও তাহাতে ভারতবর্ষের অবস্থার যে কোনো পরিবর্ত্তন হইবে না তাহাও জানা কথা। সুতরাং পক্ষপাত (Preference) যদি কাহাকেও দেখাইতেই হয়, তবে সকলের আগে নিজের

দেশকেই দেখানো উচিত, এ-কথা বলিলে হয়ত আজিকার এই আদর্শ লইয়া নাড়াচাড়ার দিনেও তাহা অন্যায় বলিয়া মনে হইবে না।

ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পের পুনরুদ্ধারের দুইটিমাত্র পথই কেবল খোলা আছে—একটি কাপড়ের মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা, দ্বিতীয়টি চর্কার প্রবর্ত্তনের দ্বারা; বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের জন্য জাতির মনের ভিতর একটা গুরুতর-রকমের তাগিদ্ যখন একবার জাগিয়াছে, তখন দুই পথের কোন্ পথ যে গ্রহণ-যোগ্য সে-সম্বন্ধেও একটা চূড়ান্ত-রকমের মীমাংসা এই সময়েই হওয়া সঙ্গত। উভয় পথের সুবিধা-অসুবিধা বিশেষভাবে বিচার করিয়া না দেখিয়া কাজে নামিলে, সব কাজেই যেমন পস্তাইতে হয়, এ-ক্ষেত্রেও হয়ত তেম্নি পস্তাইতে হইবে। উপরন্তু যে আন্দোলনটা দেশের নিঃসাড় মনের উপর একটা ধাক্কা দিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও সফল করিয়া তোলা সম্ভব হইবে না।

ব্যাবহারিক দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে, মিলের একটা সুবিধার কথাই সকলের আগে মনে পড়ে—মিলের কাপড়ের একছাঁদের বুনানীর কথা। যে যে-রকমের কাপড় পরিয়া অভ্যস্ত, তাহার সেইরকমের কাপড়ের চাহিদাই মিল অতিসহজে মিটাইতে পারে। মানুষ দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে জিনিষে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহার জন্য তাহার একটা ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। এ-ঝোঁকের হাত হইতে যদি কেহ হঠাৎ আপনাকে মুক্ত করিতে না পারে, তবে সেজন্য তাহাকে দোষও দেওয়া যায় না। তাহা ছাড়া মুক্ত করিবার কারণ যদি খুব গুরুতর না হয়, তবে সেজন্য কোনো লোকের উপর জোর জবরদস্তি চালাইলেও তাহা অন্যায় হয়। সুতরাং মিলকে বাদ দিয়া অন্য পথটিকেই যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এইপথে মিলের ব্যাবহারিক সুখ-সুবিধার চাহিদা মিটিবার সম্ভাবনা আছে কি না। আর যদি না থাকে, তবে অন্য-সব সুখ-সুবিধা এত বেশী কি না, যাহার জন্য ইহার ব্যাবহারিক অসুবিধাটাকেও অগ্রাহ্য করা চলে।

এই প্রসঙ্গে বছর-কুড়ি আগের কথা মনে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যখন বাংলার একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বন্যার মতো বহিয়া গিয়াছিল এবং বিদেশী-বর্জ্জনের উত্তেজনার মধ্যে বাংলার তরুণ মন মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই বস্ত্র-সমস্যাই ছিল সে মাতামাতির দিনেরও বিশেষ হাতিয়ার। চর্কা এবং মিল, এই দুইটি জিনিষই সেই প্রথম স্বদেশী ভাবের দিক্ হইতে আমাদের মনে ঘা দিতে সুরু করে। একান্ত ঘরোয়া চেহারার চর্কা সেদিন দু'দণ্ডের অতিথির মতো আমাদের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিলেও আমাদের মনের ভিতর স্থায়ী আসন সে গাড়িতে পারে নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ালোকে ঘেরা আমাদের মনের দুয়ারে মিল সেদিন যে শঙ্খনাদ করিয়াছিল, সেই শঙ্খনাদে মিলের পিছনেই আমরা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ আবার যদি মিলকে বাদ দিয়া চর্কার হাতছানিতেই ছুটিতে হয়, তবে তাহার আকর্ষণ মিলের অপেক্ষাও জোরালো না হইলে মানুষের মন যে তাহাতে সাড়া দিবে না তাহা সুনিশ্চিত।

মহাত্মা গান্ধী চরকাকে ভারতবর্ষের সমস্ত-রকম নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের হাতিয়াররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতের সঙ্গে হয়ত সকলের মত মিলিবে না। রাজনৈতিক উপযোগিতা দূরের কথা, অর্থনৈতিক উপযোগিতা লইয়াও হয়ত মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইবে। বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর আঘাত ঠিক যুক্তির আঘাতও নহে, তিনি আঘাত করিয়াছেন বিশেষভাবে ভাবের দিক্ হইতে। ভাবের আঘাত একেবারে পৌরাণিক যুগের পরশপাথরের আঘাতের মতো! যাহার ভিতর সে পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, তাহাকে একেবারে খাঁটি সোনায় পরিণত করিয়া রাখিয়া যায়। কিন্তু যাহার উপর পরশ-পাথরের প্রভাব নাই, দুনিয়ায় তেমন জিনিষও আছে। যাহা ধাতুদ্রব্য নহে, যাহা ইঁট, কাঠ, পাথরের মতো জিনিষ, তাহাতে পরশ-পাথর ঠেকাইলেও তাহার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। সেগুলির ভিতর কোনো পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে অন্যরকমের ব্যবস্থা দরকার। ভাব বোঝে না অথচ যুক্তি

বোঝে, দুনিয়ায় এরূপ লোকের সংখ্যা একেবারে অল্প নয়।

ভাবের এই মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াও মিলের উপযোগিতা-সম্বন্ধে যাহাদের মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাঁহারা সাধারণত একেবারে বস্তু-জগতের লোক। লাভ-ক্ষতির পরিমাণ লইয়া তাঁহাদের হিসাবের খাতা তৈরী হয়। খাতার হিসাবের বাহিরে পা বাড়াইতে ও তাঁহারা নারাজ। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে লাভ-লোকসানের কষ্টিপাথরে কষিয়া তাঁহাদের খাতার অঙ্ক যে ভুল, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া অন্য-আর কোনো উপায় নাই। এবারকার আন্দোলনের সম্পর্কেও খাতা খুলিয়া ইঁহারা লাভ-লোকসানের হিসাব লইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—কাপড়ের আন্দোলনে জোর দেওয়ার অর্থ বস্ত্রের জন্য প্রতিবৎসর যে ৬০।৭০ কোটি টাকা বিদেশের মালখানায় যাইয়া মজুত হইতেছে, তাহার পথ বন্ধ করা। দেশী মিলের উপরে যদি নির্ভর করা যায়, তাহা হইলেও এই অর্থ দেশে থাকে। দেশী লোকের মূলধনে যে মিল প্রতিষ্ঠিত, দেশী মজুরের দ্বারা যে মিল চলে, দেশী বিশেষজ্ঞ ও কর্ম্মচারীদের দ্বারা যে মিলের তত্ত্বাবধান হয়, এবং দেশের লোক যাহার লাভের অংশ ভোগ করে, তাহাকে বর্জ্জন করিবার কোনোই সার্থকতা নাই। যুক্তি লইয়াই যদি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে হয়, তবে এ-যুক্তিটা বিশেষভাবেই যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ এযুক্তি যাহারা দেয় তাহারা কেবল দলেই ভারী নহে,যুক্তির ভিতরও তাহাদের জোর আছে।

ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের এই লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটাকে নানাদিক্ হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। সূতা, মিলের কল-কব্জা, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা—এ সমস্তেরই হিসাব না গণিয়া তাহার পরীক্ষা শেষ করা চলে না। সূতার কথাটাই আগে ধরা যাক্। বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে হইলে ভারত-বর্ষকে সূতাতেও স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ সূতাতে যে স্বাবলম্বী নয়, আমদানি-রপ্তানির হিসাব-নিকাশটাই তাহার প্রমাণ।

বিদেশী সূতার আমদানি

১৯১৪ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত

বৎসর	সূতার ওজন (পাউণ্ড্)	সূতার দাম (টাকা
১৯১৪	৪৪১৭১০০০	৪১৬০০০০০
১৯১৭	২৯৫৩০০০০	৪০৪৮৯০০০
১৯১৮	১৯৪০০০০০	৪২৯৫২০০০
১৯১৯	৩৮০৯৫০০০	৮৩৬৬৩০০০
১৯২০	১৫০৯৭০০০	৪৩৫৯৫০০০
১৯২১	৪৭৩৩৩০০০	১৩৫৭৮৩০০০
১৯২২	৫৭১২৫০০০	১১৫১২২০০০
১৯২৩	৫৯২৭৪০০০	৯২৫৮৫০০০

কলে বস্ত্রবয়নই যদি চলিতে থাকে, তবে বিদেশ হইতে সূতার এই আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হইবে কি না, সে-সম্বন্ধে সকলের আগে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের খদ্দর আন্দোলনের এই মরশুমের দিনেও বিদেশী সূতার আমদানি কমে নাই, বরং ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যাহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড্, ১৯২২ সালে তাহা বাড়িয়া হইয়াছিল ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড্ এবং ১৯২৩ সালে সেই সংখ্যা পৌঁছিয়াছে প্রায় ৬ কোটি পাউণ্ডে।

বিদেশী সূতার আমদানি ভারতবর্ষে বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে কেন? এই 'কেন'র জবাব নানারকমে দেওয়া চলে। একটি জবাব হইতেছে এই—ভারতবর্ষে তুলা যথেষ্ট জন্মিলেও লম্বা আঁশের তুলা জন্মায় না। ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের মিলগুলির জন্য দেখা যায় লম্বা আঁশের তুলা অপরিহার্য্য। ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলে যাহা অপরিহার্য্য, দুনিয়ার সমস্ত মিলেই তাহা অপরিহার্য্য হওয়া অসম্ভব নয়। মিলের বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইলে, অন্ততঃ মিলের সাহায্যে বস্ত্রশিল্পকে পরিপূর্ণতা দান করিতে হইলে অন্যদেশের লম্বা আঁশের তুলার উপরেও খানিকটা নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং সূতার সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হওয়ার এখানেও একটা বড় রকমের বাধা আছে বলিয়া মনে হয়।

তুলার-সম্বন্ধে অন্য দেশের উপর এই যে নির্ভরতা—ইহার দুঃখ এবং অনিশ্চয়তা যে কত বড়, ইংলণ্ডের বস্ত্র-

শিল্পের আগাগোড়ার ইতিহাসটা আলোচনা করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্ত্রশিল্পই ইংলণ্ডের জীয়নকাঠি মারণকাঠির মতো। অথচ তুলা সে নিজের দেশে জন্মাইতে পারে না—তুলার জন্য তাহাকে দ্বারস্থ হইতে হয় আমেরিকার দ্বারে। আমেরিকা রপ্তানি বন্ধ করিলে ইংলণ্ডের কলগুলির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে, আমেরিকান যুদ্ধের সময় তাহার প্রমাণ ইংরেজ একবার পাইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আবার হয়ত আরো ভালো করিয়া পাইবে। কারণ আমেরিকা আর খুব বেশী দিন যে ল্যাঙ্কাশায়ারের কলগুলিতে তাহাদের চাহিদা-অনুসারে তুলার জোগান দিবে না, আজ তাহা অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। ১৯০৭ সালে আমেরিকার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর (Director of the Bureau of Agriculture) ইউরোপের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রতি-নিধিদের নিকট স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন :—

"আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন যুক্তরাজ্য তাহার তুলার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ রপ্তানি না করিয়া নিজের দেশেই তাহার অধিকাংশ বস্ত্র-নির্ম্মাণে ব্যয় করিবে এবং এই বস্ত্রশিল্প যে কত বড় লাভের ব্যবসা তাহাও অনুভব করিতে সক্ষম হইবে।"

তাঁহার এই নীতির ইঙ্গিত আমেরিকা কতটা যে কাজে পরিণত করিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন মিঃ জি, বিগউড। তিনি তাঁহার 'Cotton' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে যুক্তরাজ্যে তুলার ফলনের মোট পরিমাণ ছিল ৮০,০০,০০০ বেল। পরের পাঁচ বৎসরে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯০,০০,০০০ বেলে দাঁড়াইয়াছিল। ফলনের দিক্ দিয়া ১০.০০০,০০ বেল বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আমেরিকার বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রটাও বাড়িয়া উঠে। পূর্ব্বে যেখানে ২০,০০,০০০ বেল তাহার নিজের দেশে বস্ত্রশিল্পে প্রয়োজন হইত, সেইখানে সেই বৎসর ২৫,০০,০০০ বেল সে নিজের দেশেই বস্ত্র-নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়াছে। অর্থাৎ তাহার বাড়্‌তি উৎপন্নের অর্দ্ধেক সে লাগাইয়াছে নিজের দেশের বস্ত্রশিল্পে। ইহার ফলে দুনিয়ার কাঁচা মালের জোগানে তুলার পরিমাণ ঢের কম পড়িয়া গিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যে তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ ছিল মোট ৯৫,০০,০০০ বেল। সে বৎসর ল্যাঙ্কাশায়ারের অনেক মিলকেই তুলা কম পড়ায় কাজের সময় কমাইয়া দিতে হইয়াছিল। সুতরাং মূলধন এবং মজুর উভয় দিক্ দিয়াই ল্যাঙ্কাশায়ারকে ক্ষতির ঝক্কি সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার পর বর্ত্তমানের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, আমেরিকার কল্‌কারখানাগুলিতে তুলার খরচ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ৫৫,০০,০০০ বেল, ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ৬০,০০,০০০ বেল এবং ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে ৭২৫০,০০০ বেল তুলার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার উপনিবেশ ও অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে তুলা উৎপন্ন করা অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতি এই উভয় দিক্ দিয়াই যে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দুনিয়ার বস্ত্রশিল্পের উপযোগী তুলার জন্য একটি দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকাও সমীচীন নহে। যখন তুলার কাঁচা মালের জোগান পাওয়া না যায়,তখন এ-দেশের কল কারখানাগুলির অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহায় ও শোচনীয় হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণ আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের সময়েই পাওয়া গিয়াছে।"

ইংলণ্ডে তুলা জন্মায় না, কিন্তু ভারতবর্ষে তুলার ফলন বড় অল্প নহে। সুতরাং অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন লম্বা আঁশের তুলার জন্য ইংলণ্ডের যে বিপদ্, ভারতবর্ষের পক্ষে সে-বিপদ্ নিছক কল্পনা-মাত্র। কিন্তু ইহা যে কেবল কল্পনা নহে তাহারও চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার হাতে মার খাইয়া ইংরেজেরা ভারতবর্ষে লম্বা আঁশের তুলা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও তাঁহাদের সে-চেষ্টা সফল হয় নাই। ভারতবর্ষের মাটি লম্বা আঁশের তুলার বীজ ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ১৮১৯ সালে কোর্ট্ অব্ ডিরেক্টর্স্ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কথাটা স্পষ্ট করিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে :—

"আমরা ব্রিটিশ ভারতে বিদেশী ধরণের তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা বহু বৎসর ধরিয়া করিয়াছি এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ার অনুশোচনাও ভোগ করিতেছি।"

মিঃ মার্কারের মতও এই মতেরই পরিপোষণ করে :—

"এইসব পরীক্ষা-কেন্দ্রে গবর্ণ্‌মেন্টের ব্যয় সম্পূর্ণ অনর্থক হইয়াছে আমেরিকার পদ্ধতি ভারতবর্ষে অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নাই। ভারত-বর্ষের কৃষকদের দেশের আবহাওয়া ও জমির শক্তি-সম্বন্ধে বেশ একটু সুস্পষ্ট ধারণা আছে। আর তাহারই ফলে তাহারা ইউরোপীয়ানদের অপেক্ষা ঢের কম খরচে ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করিতে পারে।"

মিঃ মার্কারের একথা জোর করিয়া বলিবার অধিকার যে কাহারও অপেক্ষা কম নয় তাহা বলাই বাহুল্য কারণ ভারতবর্ষের তুলার উন্নতির জন্য গবর্ণ্‌মেণ্ট্ যেসব বিশেষজ্ঞের আম্‌দানি করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন।

'খাদি ম্যানুয়েলের' দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন :—

"গবর্ণ্‌মেণ্ট্ তুলার চাষের উন্নতির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের মাটির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া আমেরিকার মাটির সহিত তুলনা-মূলক আলোচনাও এইসম্পর্কেই সুরু হয়। কিন্তু এত চেষ্টাতেও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তনই সাধিত হয় নাই। * * * ভারতবর্ষের ধীরমন্থর গতিতে হতাশ হইয়া

সাম্রাজ্যের অন্যান্য লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টাতেই এখন তাঁহারা বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন।"

এই অন্বেষণের ফলে ইংরেজের মতো শক্তিশালী জাতির তুলার চাহিদা হয়ত মিটিতে পারে এবং তাহার সম্ভাবনাও হয়ত দেখা দিয়াছে। সুদান লইয়া এই যে এত হানাহানি, তাহা ইংরাজের নেহাৎ নিঃস্বার্থ প্রেম নহে। "Daily Express"-এর একটি প্রবন্ধের কয়েকটি পংক্তির উপর দৃষ্টি দিলেই এই হানাহানির অর্থ বোঝা যায় :—

"সুদানে নানাস্থানে পরীক্ষার দ্বারা বেশ স্পষ্টইরূপেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে-সুদান পৃথিবীর উর্ব্বরতম স্থানগুলির অন্যতম। ইতিমধ্যেই তাহার ২০,০০০ একার জমিতে তুলার চাষ চলিয়াছে। সুদানে প্রায় ৩০ লক্ষ একার জমি চাষ-আবাদের যোগ্য. প্রথমে এই স্থানের দশ ভাগের এক ভাগ জমিতে অর্থাৎ ৩ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাতে বৎসরে প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড তুলার ফসল ফলিতে পারে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এক পুরুষের ভিতরেই ফসলের পরিমাণ ১০ লক্ষ বেলে গিয়া দাঁড়াইবে। ১০ লক্ষ বেল তুলার দাম দুই কোটি পাউণ্ড। * * * সুদানের বন্দর হইতে এই তুলা ইংরেজের জাহাজে লণ্ডন এবং লিভারপুলে প্রেরিত হইবে।"

সুদানের এই জমিগুলি চাষের উপযোগী হইয়া উঠিলে ল্যাঙ্কাশায়রের তুলার জন্য ইংরেজের বিপদ্ হয়ত কাটিবে, কিন্তু ভারতবর্ষের মিলের চাহিদা মিটিবার উপযোগী তুলা তাহাতেও মিলিবে না। মিলের কথা বিশেষভাবে বলার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষে যে তুলা জন্মায়, তাহাতে চর্‌কায় সুতা কাটিয়া বস্ত্র বুনিলে এমন সুক্ষ্ম বস্ত্রও তৈরী হইতে পারে মিল যাহা বুনিবার কল্পনাও করিতে পারে না। মস্‌লীন প্রভৃতি ভারতবর্ষের তুলার সুতাতেই তৈরী হইত। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, লম্বা আঁশের তুলা লইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র মিলের সম্পর্কেই, চর্‌কার সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। ভগবানের দেওয়া হাতে এবং মানুষের তৈরী মিলে এইখানেই তফাৎ। অবশ্য মিলে যদি কেবল মোটা সুতার বস্ত্রই তৈরী করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষের ঘাড়ে এ-বিপদের বোঝা হয়ত না-ও চাপিতে পারে। কিন্তু শিল্প-সম্বন্ধেই হোক্, অথবা আর যে-কোনো সম্বন্ধেই হোক্, কোনো বিশেষ পথ অবলম্বনের পূর্ব্বে সে-পথের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও বিচার করিয়া দেখা দর্‌কার। ভারতবর্ষ নিজের উপর নির্ভর করিয়া মিলের দ্বারা তাহার বস্ত্র-শিল্পকে যদি সম্পূর্ণতা দান করিতে না পারে, তবে সে-পথ আর যাহাই হোক্, তাহার গন্তব্য পথ যে নহে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তুলার এবং সুতার এই পরাধীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও মিলের বস্ত্রের সম্পর্কে ভারতবর্ষের পরাধীনতার জের মিটে না। বস্ত্রের জন্য মিলের উপরেই যদি ভারতবর্ষকে নির্ভর করিতে হয়, তবে আর-এক দিক্ দিয়া এমন আর-একটা পরাধীনতার জোয়াল তাহার ঘাড়ে চাপে যাহার ভারও বড় সহজ নহে। সে-চাপ কল্-কারখানা, লোহা লক্কড়ের। কল-কব্জা তৈরীর উল্লেখযোগ্য কার্‌খানা ভারতবর্ষে কেবলমাত্র একটিই আছে—টাটার লোহা-ইস্পাতের কার্‌খানা। সেটিকে শিবরাত্রির সলিতার মতো নানা জোড়-তোড় দিয়া সাহেব-মিস্ত্রিদের সাহায্যেই নাকি কোনো-রকমে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে হইলে যত-গুলি কল-কার্‌খানা প্রতিষ্ঠা করা দর্‌কার তাহার উপাদান জোগাইবার সামর্থ্য টাটার কারখানার নাই। একটি মিল প্রতিষ্ঠায় কত টাকার মেশিনারি লাগে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্ভবতঃ খুবই অল্প। সুতরাং ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে প্রতিবৎসর যত টাকার মেশিনারি আসে, তাহার একটা আভাস দিলে, হয়ত তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মেশিনারির আম্‌দানি

কাপড়ের কলে

	১৯২২		১৯২৩	
সুতাকাটার যন্ত্র	৬৪২৩১৩৮১	টাকা	৫২২০১৭৩৮	টাকা
বয়নযন্ত্র	১৭৮৪৪৮৪২	"	১২৬৬৩৪৫০	"
রং করার যন্ত্র	১৭০৫৪৫৪	"	৭৪৬০০০	"
ছাপের যন্ত্র	২৫০২০	"	৭৮৩৩	"
অন্যান্য-রকমের যন্ত্র	৫৩৩১৯২৯	"	৪৬৮৪৫৭৮	"
মোট	৮৯১৩৮৬২৬	"	৭০৬৪৩৯৯৯	"

সুতরাং মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে স্বাধীনতা দেওয়ার কোনো-রকমের সম্ভাবনা ত নাই-ই, উপরন্তু এইসব মেশিনারির জন্য একটা বিপুল অঙ্ক অযথা হয়ত ভারতবর্ষকে ব্যয় করিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের অর্থ

বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা নাই, এইসব যুক্তির মাপকাঠিতে মাপিয়া দেখিলে তাঁহাদের কথায় বিশেষ-কোনো দাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তাহা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাটাও একেবারে অবহেলার জিনিষ নহে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য অপরিসীম। এক-একটি মিলের প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহার ব্যয়ের কড়ি গণিয়া এ-দেশের পক্ষে বহু মিলের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কি না তাহাও ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। কয়েকটি কাপড়ের কলের ব্যয়ের অঙ্কটা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এত অর্থ ব্যয় করিয়া এ-দেশের কয়টি কল প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা আছে, এই অঙ্কগুলির দিকে নজর দিলে দেশের লোকের সে-সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ত গড়িয়া উঠিতে পারে।

মিলের নাম	মূলধনের পরিমাণ
সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং	১৬৮৭৫০০
ডান্‌বার মিলস্ কোং	৫০,০০০০০
সাউথ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্স্	৩০০০০০০
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্	১৮০০০০০

অর্থনীতির দিক্ দিয়া মিলের হাতে ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার ভার ছাড়িয়া দেওয়ার এতগুলি প্রতিবন্ধক আছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রতিবন্ধকও নিতান্ত কম নয়। মিলের সহিত প্রতিযোগিতার নিত্যসম্বন্ধ। মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার যদি সমাধান করিতে হয়, তবে এদেশের মিলগুলিকেও প্রতিযোগিতায় বিদেশের, বিশেষভাবে ইংলণ্ডের মিলগুলিকে পরাজিত করিয়াই টিঁকিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ জয়লাভের অর্থ কি তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্ত্রশিল্পের উপর বিলাতের ভবিষ্যৎ কতখানি নির্ভর করে,গত কয়েক বৎসরের খবরের কাগজগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা তাহার পরিচয় নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। যুদ্ধের জন্য এবং ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের দৌলতে যখনই ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কল-গুলিতে বস্ত্রের চাহিদায় কম্‌তি পড়িয়াছে, সমস্ত গ্রেট-ব্রটেন জুড়িয়া তখনই হাহাকার জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই হাহাকারের চাঞ্চল্যের ধাক্কায় এই কয় বৎসর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এতটুকুও সোয়াস্তি ছিল না। তাহার কর্ত্তৃত্বের ভার এইজন্যই ইতিমধ্যে যে কতবার হাত বদ্‌লাইয়া লইয়াছে, তাহার ইতিহাসও খবরের কাগজ যাঁহারা নিত্য-নিয়মিতভাবে পড়েন তাঁহাদের অজানা নাই। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের সাফল্যের উপর যে দেশের ভবিষ্যৎ এতখানি নির্ভর করে, ভারতবর্ষ সেই দেশের কাছেই পরাধীন। সুতরাং মিলের ব্যাপার লইয়া এই দুইটি দেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যখন মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ইংরেজের উদারতার মুখোষ যে একান্ত নির্লজ্জভাবেই খসিয়া পড়িবে না, একথা আজ কেহই হলপ করিয়া বলিতে পারে না। ইংরেজের উদারতাও এদিক্ দিয়া বড় বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কারণ যে সামান্য একটু প্রতিযোগিতা আজ চলিয়াছে, তাহারই ফলে ইতিমধ্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষের কার্পাসশিল্পের উপর Excise Duty, Supertax প্রভৃতি নানা ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। এই ট্যাক্স-গুলির স্বরূপ যে কি 'খাদ ম্যানুয়ালের' ভিতর হইতেই তাহারও আভাস পাওয়া যায়।"

ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের সহিত ভারতীয় মিলের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা তখনই চরমে আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষের ব্যবহারের জন্য ভারতের মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপরেও ট্যাক্স বসিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের Cotton Duties Act এর দ্বারা ভারতীয় মিলের তৈরী বস্ত্রের উপর শতকরা ৩।০ টাকা ট্যাক্স বসাইয়া ভারতীয় কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। * * * কাপড়ের মিল হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর শুল্ক বাবদ ১·৬ ক্রোর টাকা এবং ইনকম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স বাবদ শুল্ক অপেক্ষাও অনেক বেশী টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।"

এই Excise Duty বাবদ ভারতবর্ষের শিল্পগুলিকে বৎসরের পর বৎসর যে ক্ষতির ঝক্কি সহ্য করিতে হইতেছে নিম্নে তাহার নমুনা দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষের কাপড়ের মিল হইতে সংগৃহীত

Excise Dutyর হিসাব

স্থান	১৯১৯	১৯২০
বোম্বাই	১১৬১৮০০০	১২৮৬৬০০০
মান্দ্রাজ	৭৪৮০০০	৭৬৭০০০
বঙ্গদেশ	২১০০০০	৩৩২০০০

ভারতবর্ষের কাপড়ের মিল হইতে সংগৃহীত

Excise Dutyর হিসাব

স্থান	১৯১৯	১৯২০
যুক্তপ্রদেশ	৪৪০০০০০	৫৩৩০০০০
আজমীর-মাড়োয়ার	৬৭০০০	৭৮০০০
পঞ্জাব	২৩০০০	২৩০
দিল্লী	৩৩০০০	
মধ্যপ্রদেশ এবং বেবার	৬৭৫০০০	
করদ মিত্র ও অন্যান্য ভারতীয় স্বাধীন রাজ্য	৫০৭০০০	
মোট	১৫৩২১০০০	১৬৩৯৯০০০

মিলের দ্বারা বস্ত্রসমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই Excise Dutyর জের ভারতবর্ষকে হয়তো চিরদিনই টানিয়া চলিতে হইবে—হয়তো ইহার নাম এবং চেহারা তখন বদলাইয়া যাইবে। অর্থের অঙ্ক বদ্‌লাইয়া আরো ভারী হইয়া উঠাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

আর ইংরেজদের উদারতা সত্যসত্যই নিজেদের বিপন্ন করিয়াও যদি ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনা করে তথাপি এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী নহে। কারণ ভারতবর্ষ কেবলমাত্র অর্থেরই কাঙাল নহে। ইউরোপের ধনিক সভ্যতা যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আজ এত বড় হইয়াছে—সে-সাধনাও ভারতবর্ষের নাই। ভারতবর্ষ কোনোদিনই গোটা দেশকে কারখানার শ্রমিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই সুতরাং পাশ্চাত্য-জগতের শ্রমিকদের যোগ্যতা, পারদর্শিতা, ক্ষিপ্রতা—এগুলির অভাবও ভারতবর্ষকে প্রতিপদে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করিবে। মিঃ রাশ্‌ব্রুক্ উইলিয়মস্ লিখিয়াছেন :—

"মিঃ টমাস্ এইনস্কাফ্‌ ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন, ভারতীয় মজুরেরা ব্রিটিশ ও আমেরিকান মজুরদের তুলনায় কম মজুরী পায় বটে, কিন্তু কাজের দিক্ দিয়াও তাহারা অশিক্ষিত, অনিপুণ ও ঢিলা প্রকৃতির। মিঃ এইনস্কাফের এই মন্তব্য মিথ্যা নহে। * * * যে পর্যান্ত ভারতীয় মজুরদের জীবনযাপনের ও কর্ম্ম-নৈপুণ্যের আদর্শ উচ্চতর না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের সমুদ্রপারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো কাজে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে না। এজন্য ভারতীয় মজুরদের মজুরী, বাসগৃহ, সাধারণ অবস্থা ঢের উন্নততর আদর্শের করিয়া তোলা দরকার। এ-দেশের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ এই উপায়েই কেবল পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"

তাঁহার প্রদর্শিত পথে শ্রমিকদের যোগ্যতা বাড়ানো যেমন অর্থসাধ্য তেম্‌নি সময়সাধ্য ব্যাপার। সুতরাং সে-পথ ভারতবর্ষের পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ পথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা ছাড়া শ্রমিক সমস্যা আজ ইউরোপে যে-ভাবে দেখা দিয়াছে—তাহা দেখিয়াও ওপথে পা-বাড়ানো হয়ত বিশেষ সঙ্গত হইবে না। ধনিক সভ্যতার-জীর্ণ দেয়ালের উপর ভার আর কতখানি সহিবে সেটাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। ইউরোপে নিজের ভারে আজ যাহা নিজেই ভাঙিয়া পড়িবার মতো হইয়াছে তাহারই ভার ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইলে, সে তাহা সহ্য করিতে পারিবে কি না, পাশ্চাত্য-সভ্যতার নীল চশ্‌মা চোখে না পরিয়া সাদা চোখেই তাহা যাচাই করিয়া লওয়া দরকার।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, এই বস্ত্রশিল্পে তাহার প্রতিষ্ঠা বড় সহজ ছিল না। গোটা দুনিয়ার বস্ত্রের অভাব একদিন তাহারই হাতে বোনা কাপড়ে পূর্ণ হইয়াছে। Mr. Shah ষোড়শ শতাব্দীর কোনো বিদেশী লেখকের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে,

"কেপ অব গুড্‌ হোপ হইতে চীন পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের প্রত্যেক অধিবাসী ভারতীয় তাঁতে তৈরী কাপড়েই তাহাদের দেহের আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিত।"

দুনিয়ার কাপড়ের জোগান দিতে গিয়া তাহাকে যখন কলের পায়ে তেল মাখিতে হয় নাই, তখন কেবলমাত্র তাহার নিজের দেশের বস্ত্র বোনার কাজ কল ছাড়া আজ তাহার চলিবে না কেন, তাহার কোনো সুস্পষ্ট যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের জমি, তাহার শ্রমিক, তাহার ব্যবসার ধারা, তাহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সমস্তই কলের পরিপন্থী। কলের উপযোগী লম্বা আঁশের তুলা তাহার জমিতে জন্মায় না, কিন্তু তাহার জমিতে সে তুলা প্রচুর জন্মায় যাহার দ্বারা চর্‌কায় সূতা কাটিলে দেশের অভাব ত মেটেই, তাহা ছাড়া এমন বস্ত্রেরও রসদ পাওয়া যায় মিল যাহা কাটিবার কল্পনাও করিতে পারে না। বিদেশীর কষ্টিপাথরেও এ-দেশের চর্‌কার সূতার যে স্বরূপ ধরা

পড়িয়াছে তাহারই একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"বিশেষ জোরালো নজির উদ্ধৃত করিয়াই আমি দেখাইয়া দিতে পারি যে, এইসব সূতায় গড়পড়তায় ৫০০ কাউন্টের ছিল এবং ছোটো খাঁশের তুলা হইতেই তাহা কাটা হইত। বর্ত্তমান যুগের বিশেষ উন্নততরণের যন্ত্রেও অসাধারণ আয়াস ও পরিশ্রম ছাড়া এত বেশী নম্বরের সূতা কাটা যায় না।" (Mr. Woogewerf in Quarterly Journal.)

যে হাতিয়ারে এই সূতা কাটা হইয়াছে তাহার কলকব্জার জন্ম বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাহার উপাদান সামান্ত কয়েকখানা কাঠমাত্র। আর সে কাঠ ভারতের বনে-জঙ্গলে এত পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে জন্মায় যে, তাহার জন্ম একটি টাকা ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট। এই হাতিয়ারে ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে কেবলমাত্র তাহার নিজের নহে, সমগ্র দুনিয়ার বস্ত্রশিল্পের অভাব পূর্ণ করিতে পারে। যে প্রচুর মূলধন মিলের পক্ষে অপরিহার্য্য এবং যাহার জোগান দিবার সাধ্য ভারতবর্ষের নাই, চরকায় সে মূলধনেরও আবশ্যক হয় না। মিলে যে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আছে, গৃহ-শিল্পের সাধারণ নিয়ম অনুসারে চরকা সে প্রতিযোগিতার হাত হইতেও মুক্ত। সুতরাং যুক্তির দিক্ দিয়াও যাচাই করিতে গেলে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ মিলের উপর জোর দেওয়ার কোনো যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তবে এ আশঙ্কা একেবারে অস্বাভাবিক নহে যে, যন্ত্র-শিল্পের রথচক্র ঘর্ঘরে যেখানে দুনিয়ার অর্থভাণ্ডার মাথা লুটাইয়া দিতেছে সেখানে গৃহ-শিল্পের প্রচেষ্টাকে জীয়াইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে কি না। কিন্তু যাঁহারা দেখিতে জানেন তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন যে, যন্ত্র-শিল্প আপনার মৃত্যুবাণ আপনারই বুকে হানিয়া বসিয়া আছে। যে অবিচার ও অন্যায়ের উপর যন্ত্রশিল্পের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে, দুনিয়ার শ্রমিকদের কুঠার তাহার মূলে ঘা দিতে সুরু করিয়াছে। বর্ত্তমানের চাকচিক্যে তাহার ধ্বংসের নিশানাটা দেখা না গেলেও ভবিষ্যতের অন্তরালে তাহার ধ্বংসেরও খুব দেরী নাই। লক্ষ লোকের বুকের রক্ত পান করিয়া কাহারো গৌরব-ধ্বজা যখন রাঙা হইয়া উঠে, অকস্মাৎ একদিন্ তাহার মাথার মুকুট, যাহাদের রক্ত সে পান করিয়াছে তাহাদেরই পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ে। আভিজাত্যের জয়ধ্বজা একদিন দুনিয়ার দরবারে এম্‌নি করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহার চূড়া যখন ভাঙিয়া পড়িল তখন সাবধান হইবার অবসরটুকুও তাহার মিলে নাই।

ইউরোপ পাশ্চাত্য সভ্যতার মদে মশ্‌গুল হইয়া আছে। সুতরাং তাহার শিল্প-দেবতা যে মিলের ময়দানবের পায়ে মাথা লুটাইয়া মরিয়া গেল, আজও সে তাহা খেয়াল করিতে পারিতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষে মিলের জয়ের অভিযান এখনও সুরু হয় নাই। সুতরাং তাহার সাবধান হইবার সময় এখনও হয়ত মিলিতে পারে, এবং মনে হয় চরকার এই আকস্মিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া সেই ইঙ্গিতটাই আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এ-সকল যুক্তির অপেক্ষাও সোজাসুজি যুক্তির কথা এই যে, খাদ্যের মতো যে জিনিষটা প্রয়োজনীয়, সম্ভব হইলে খাদ্যের মতোই তাহা ঘরে তৈরী করিয়া লইতে পারিলে ভালো হয়, অন্ততঃ তাহার জন্ম ভিন্‌-দেশের মুখাপেক্ষী যাহাতে না হইতে হয়, তাহার পথটা সকলের আগে পরিষ্কার করিয়া রাখা দরকার। চরকায় সূতা কাটিলে নিজের ঘরেই হয়ত বস্ত্রের চাহিদা মিটানো চলে। কিন্তু মিলের শরণাপন্ন হইলে সে সম্ভাবনা ত নাই-ই, কত জিনিষের জন্ম যে সেক্ষেত্রে পরের শরণাপন্ন হইতে হয় তাহারও ইয়ত্তা নাই। শেফিল্ড-বা বার্ম্মিংহাম যদি বলে আমি কল-কব্জা সরবরাহ করিব না, আমেরিকা যদি বলে আমার কাছে লম্বা আঁশের তুলা পাওয়ার আশা মিথ্যা—আমি নিজে কাপড় বুনিয়া তোমাদের দেশে খরচার বিশগুণ বেশী দামে বিক্রী করিয়া লাভ করিব, ইংলণ্ড যদি বলে আমার শিল্প রক্ষার জন্ম যখন প্রয়োজন তখন তোমার কলের পণ্যের উপর এমন শুল্ক বসাইব যে পড়্‌তা পোষাইতে পারিবে না, তবে তাসের প্রাসাদের মতো মিলের দ্বারা দেশের বস্ত্র-শিল্পের পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা কোথায় যে মিলাইয়া যাইবে কেহ খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান দিতে পারিবে না। এইজন্যই সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রে একটি কথা বার-বার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, "সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্,

সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্।" অবশ্য দুনিয়ায় বাস করিতে গেলে একেবারে আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকা যায় না, পরের উপর কতকটা নির্ভর করিতেই হয়। আর এই নির্ভরতা অপরিহার্য্য বলিয়াই মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমাজের ভিতরও পরস্পরের দেনা-পাওনার ঋণ যে কতদূর পর্য্যন্ত গড়ানো দরকার তাহা লইয়াও মত-দ্বৈধের অন্ত নাই। অন্ততঃ এ-কথাটায় কেহই সন্দেহ করে না যে, নিতান্ত প্রয়োজনের জিনিষগুলির জন্য পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকার মতো নির্ব্বুদ্ধিতা আর নাই।

এই চিঠিখানি

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

এই চিঠিখানি,
লিখেছিনু যবে বাণী
আছিল প্রচুর!
গত সে দিনের কত কথা এ মনের উজল মধুর
হাসি দিয়ে মাজা দেয়া আলো দিয়ে লেখা,
ঝলমলে রূপ আর নাহি যায় দেখা,
হাতে হাতে মুছে গিয়ে ঝরামরা কালী,
সাদা কাগজের বুক ছেয়ে আছে খালি
ছায়ার মতন,
ফাঁকা বুক ভ'রে রাখা স্মৃতি পুরাতন।

এই চিঠিখানি,
লিখেছিনু যারে, জানি, সে নাহিক আর;
ছিল কোন্ কালে?
সেই কথা অন্তরালে ভাবি বার-বার,
যেজন লিখিয়াছিল সে আজিকে কোথা?
তার সেই হাসি গান ছেলে খেলা কথা,
নিবু নিবু দীপশিখা ছায়া-ভার নত,
নুয়ে-পড়া দেহখানি, আজি তারি মত,
শুয়ে পড়া মন,
চেয়েছুঁয়ে চেনা দায় এমনি নূতন!

এই চিঠিখানি,
আজি মনে দেয় আনি' গত ইতিহাস,
সকালের আলো
কত লেগেছিল ভালো, ভোরের বাতাস,
ফুলের হাসির সুরে পাখীদের গানে,
সে যে কোন্ নওরোজ মনের বাগানে,
কে সেথা দাঁড়াল হেসে এসে মোর পাশে
পরশ-পুলক-ভরা ফুলের সুবাসে
ভরি' দিল মন,
খুলিল আঁখির আগে নূতন ভুবন।



[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে, উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র অর্ধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের বা পুস্তক সমালোচনার সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম।

সম্পাদক।]

"গ্রীক উচ্চারণ"

পৌষ মাসের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের "সোক্রাটীস (দ্বিতীয় খণ্ড)"-এর সমালোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ গ্রীক উচ্চারণের উপর এক নাতিবৃহৎ প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন। তা'র মধ্যে তিনি এ রকম অনেক কথা বলেছেন, ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে যার প্রতিবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক ব'লে মনে করি। আমার এ-বিষয়ে যা বক্তব্য তা যথাসাধ্য সংক্ষেপে লিখ্‌ছি।

(১) 'ঈটা'-বাদীদের মত ভুলে দেখানোর বা 'এটা'-বাদীদের সঙ্গে তা'দের অনৈক্য ও-রকম বিস্তৃতভাবে দেখাবার কোনই প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল না। * গ্রন্থকারের এবং সমালোচকের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন গ্রীক্, আর বিশেষ ক'রে Attic গ্রীক (খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫ম ৪র্থ শতাব্দী)। 'ঈটা'-বাদীরা কেবল Hellenistic, মধ্যযুগের ও নব্য গ্রীকের উচ্চারণ অবলম্বন ক'রে থাকেন।

(২) Alphaর উচ্চারণ দু-রকম ছিল;—(ক) বিবৃত অ(=হ্রস্ব আ), আর (খ) আ (দীর্ঘ)। ১

(৩) Deltaর উচ্চারণ বাঙ্গলা বা সংস্কৃতের মূর্দ্ধন্য 'ড' নয়; হয় দন্ত্য 'দ', না হয় ইংরেজীর d-র মত বা বৈদিকের মত দন্তমূলীয় ধ্বনি। মহেশবাবু রোমান্ অক্ষর dকে ইংরেজী d মনে করেছেন, আর সাধারণ বাঙ্গালীর মত আন্দাজ করেছেন যে, ইংরেজীর d আর আমাদের 'ড' এক, তাই গ্রীক্ deltaর প্রতিধ্বনি 'ড' ব'লে ধ'রে নিয়েছেন। পরবর্ত্তী গ্রীকে ইহা উষ্ম (spirant) 'ধ' [যথা ইংরেজী then=*dhen* এর ধ্বনি] -তে পরিণত হয়,—'ঈটা'-বাদীরা ইহাই শিষ্ট উচ্চারণ ব'লে ধরেছেন; মহেশবাবু এই উষ্ম 'ধ' কে বাঙ্গলা 'দ' মনে করেছেন। সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীকের মৌলিক সম্বন্ধ ধ'রে deltaকে বাঙ্গলায় 'দ' লেখা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ২

(৪) Epsilon এর ধ্বনি 'এ' (হ্রস্ব)। ৩

(৫) Zetaর উচ্চারণ প্রাচীনতম গ্রীকে ছিল 'dz' [যেমন পূর্ব্ব-বঙ্গীয় 'জ']; পরে বর্ণব্যত্যয় হ'য়ে 'zd' তে পরিণত হয়। Atticএ খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 'dz' 'z' হ'য়ে দাঁড়ায়। ৪

(৬) Eta :—প্রাচীনতম গ্রীকে দীর্ঘ 'আ' ও দীর্ঘ 'এ' এই দুই ধ্বনি ছিল। Ionic Atticএ এক দীর্ঘ æ ['অ্যা']। ধ্বনি ঐ দুটির স্থানেই ব্যবহৃত হ'ত। 'H' অক্ষরটি ঐ ধ্বনির প্রতীক ছিল যেমন, মাতার ৮ ম্যা-ত্যার্ MHTHP। ৫ Hellenistic গ্রীকে 'ঈ' উচ্চারণ এসে প'ড়েছিল। কিন্তু প্রাচীনতম উচ্চারণ Attic ছাড়া অন্য অনেক উপভাষাতে ছিল দীর্ঘ 'এ' উচ্চারণ, সেই জন্যে দুইয়ের একটা সঙ্গতি ক'রে 'এ' লেখাই ভাল।

(৭) Thetaর উচ্চারণ ছিল 'থ'; তবে প্রাচীনকাল থেকেই প্রাদেশিক উষ্ম [spirant যেমন ইংরেজী thin, thank] উচ্চারণও ছিল,—এই থেকেই theta অক্ষর গ্রীকের Lakonic উপভাষাতে 'স' হয়ে দাঁড়ায়। ৬

মহেশ-বাবু অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রভেদ লক্ষ্য করেননি বোধ হচ্ছে। ক, গ অল্পপ্রাণ ধ্বনি; এতে প্রাণ [breath] বা 'হ' যোগ ক'রে 'খ' (ক্ হ) ও 'ঘ' (গ্ হ) হয়। 'খ, ঘ, ঠ, চ, থ, ধ' এই মহাপ্রাণ ধ্বনিদ্যোতক বর্ণগুলি থাকতে আলাদা ক'রে 'ক্ হ' ইত্যাদি লেখার কোনই আবশ্যকতা নেই; মিছামিছি সরল গ্রীক্ ধ্বনিকে পাণ্ডিত্যের আবরণে ঢেকে সাধারণ পাঠকের বিভীষিকা জন্মানো মাত্র। আলাদা ক'রে ছাপা বা লেখা 'প্ হ' এই বর্ণদ্বয়কে বাঙ্গালী পাঠক দুই অক্ষরে প-হ পড়্‌ছেন শুনেছি। এই হিসেবে theta=থ, phei=ফ, chei (বা khei)=খ।

(৮) Iota কেবল 'ই' নয়, 'ঈ'ও বটে। ৭ এবং স্থল-বিশেষে 'য়্'ও বটে।

(৯) Omikronএর উচ্চারণ বাঙ্গালা 'অ' নয়, হ্রস্ব 'ও'। ৮ পরবর্ত্তী যুগে 'অ' উচ্চারণ এসে গেছে।

(১০) Upsilonএর উচ্চারণ প্রাচীনকালে ছিল 'উ' 'ঊ'। Attic গ্রীকে এর হ'য়ে পড়ে জারমানের ü বা ফরাসীর u [অর্থাৎ 'উ, ঊ উচ্চারণের মত ঠোঁট গোল ক'রে 'ই, ঈ' উচ্চারণ। বাঙ্গলায় এই ধ্বনিকে প্রকাশ ক'র্‌তে হ'লে f 'উ' বা 'ই' এর মতন একটা উৎকট কিছু সৃষ্টি করতে হয়। ফরাসী বা জারমান শব্দে এই ধ্বনি থাকলে 'ï' বাঙ্গালা প্রত্যক্ষরীকরণে দিয়ে লেখাও হয়, যেমন বূলর Bühler]। পুরাতন গ্রীক্ ধর্‌লে 'উ, ঊ' বা 'ï-ï' (Attic গ্রীক্ অনুসারে ইচ্ছামত) দুয়ের এক লেখা চল্‌বে। ৯

---

* আমাদের বিবেচনায় ছিল; কারণ রজনীবাবু ইংরেজী উচ্চারণের পরিবর্ত্তে গ্রীক উচ্চারণ দিয়াছেন। তাহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা আবশ্যক ছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক।

১ K. Brugmann, Griechische Grammatik (চতুর্থ সংস্করণ), Munchen, 1913 [দাম জানা নেই], পৃ ৩৭; H. Hirt, Handbuch der Griechischen Laut und Formenlehre (দ্বিতীয় সংস্করণ), Heidelberg, 1912 [দাম জানা নেই] পৃ ৮২, ৮৫।

২ Hirt পৃঃ ৮৭। ৩ Hirt পৃঃ ৮০, ৮৫; Brugmann পৃঃ ৩৪।

৪ Hirt পৃঃ ৮৮-৮৯; I. Wright, Comparative Grammar of the Greek Language, Oxford, 1912 [দাম আনুমানিক ৮ শিলিং] পৃ ৮-৯। ৫ Brugmann পৃঃ ৩৫; Hirt পৃঃ ৮০। ৬ Hirt পৃঃ ৮৭। ৭ Hirt পৃ ৮২। ৮ Hirt পৃঃ ৮৩-৮৫। ৯ Hirt পৃঃ ৮৪-৮৫।

(১১) Phei ও Chei এর উচ্চারণের জন্ত আগের (৭) মন্তব্য দেখুন।

(১২) Omegaর উচ্চারণ দীর্ঘ 'ও'। হির্টের মতে আথেন্স্ নগরে চতুর্থ শতাব্দীতে এই দীর্ঘ 'ও'র শেষে একটু হ্রস্ব 'অ' ধ্বনির আমেজ আসত (ōa)[১০]। কিন্তু এই খুঁটিনাটি-টুকুন না ধ'রলেও চলে—বাঙ্গালায় 'ও' লিখ্‌লেই হবে।

(১৩) AI এর উচ্চারণ 'আই': আ এখানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুই-ই হ'তে পারে।[১১] পরবর্ত্তী যুগে সন্ধি হ'য়ে 'এ' হ'য়ে গিয়েছিল; 'ঈটা'-বাদীরা সেই ধ্বনিই ধ'রে থাকেন। বাঙ্গালায় 'আই' লেখা হ'লে চ'ল্‌বে।

(১৪) EI এর প্রাচীনতম উচ্চারণ 'এই'; পরে সন্ধি হ'য়ে Ionic Atticএ দীর্ঘ 'এ' হ'য়ে পড়ে। 'এই' লেখাই সুবিধার।[১২]

(১৫) OI এর উচ্চারণ 'ওই'।[১৩] পরে সন্ধি হ'য়ে 'ই' হ'য়ে দাঁড়ায় ['ঈটা'-বাদী]।

(১৬) UI এর উচ্চারণ 'উই' [১৪]; যখন U ক্রমে ই, ঈ হ'ল তখন UI > - II > I (ঈ) ['ঈটা'-বাদী]।

(১৭) AU এর উচ্চারণ 'আউ'।[১৫] এই 'আউ' থেকে 'আব্' (aw), পরে ঘোষ ধ্বনির পূর্ব্বে w ধ্বনি উষ্ম 'ভ'য়ে (v-তে) পরিণত হ'য়ে দাঁড়িয়ে যায় (av); আর অঘোষ ধ্বনির পূর্ব্বে উষ্ম 'ফ' (f: af) হয়; সেই রকম 'eu' = এউ > ew > ev, ef।

(১৮) OU এর প্রাচীন উচ্চারণ দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের stone, bone এর ধ্বনির মত; = বাঙ্গালায় 'ওউ'। পরবর্ত্তী যুগে Atticএ দীর্ঘ 'ও' হ'য়ে পড়ে, আর যখন U বর্ণের উচ্চারণ ü হ'য়ে গেল তখন OU 'ও' (দীর্ঘ) থেকে 'উ, ঊ'তে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যায়।[১৬]

এইবার মহেশ-বাবুর উদ্ধৃত গ্রীক্ নামগুলির বাঙ্গালা প্রতিরূপ দিতেছি।

Sokrates = 'সো-ক্রা-ত্যাস্' (Sokrates এ'র নিজের উচ্চারণে); কিন্তু সাধারণ গ্রীকের পদ্ধতি ধ'রে 'সো-ক্রা-তেস্' লেখা চল্‌বে।

Xanthippe = ক্সান্-থিপ্-প্যা, বা 'স্থান্ থিপ্-পে'।

Euripides = 'এউরিপিদ্যাস্' বা 'এউরিপিদেস্'।

Parmenides = 'পার্‌মেনিদ্যাস্,' বা 'পার্‌মেনিদেস্'।

Thoukudides — 'থো-কু-দি-দ্যাস্' (নিজের উচ্চারণ); কিন্তু সাধারণ মান ধ'রলে 'থৌ-কু-দি-দেস্'।

Zēnōn — 'জ্যা-নোন্,' বা 'জে-নোন্'।

Eukleides — 'এউ-ক্লে-দ্যাস্,' বা 'এউ-ক্লেই-দেস্'।

Glaukon — 'গ্লাউকোন্'।

Aiskhulos — 'আইস্‌খুলোস্', বা 'আইস্‌খুলোস্'।

Phaidon — 'ফাইদোন্'।

Puthagoras — 'পিথাগোরাস্,' বা 'পুথাগোরাস্'।

Lukourgos — 'লিকোর্‌গোস্' বা 'লুকোর্‌গোস্'।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রী সুকুমার সেন
৬ই মাঘ ১৩৩২।

১০ Hirt পৃঃ ৮৫। ১১ Brugmann পৃঃ ৫৭-৫৮; Hirt ৮৪। ১২ Brugmann পৃঃ ৫৪-৫৬; Hirt পৃঃ ৮২, ৮৫। ১৩ Brugmann পৃঃ ৫৬-৫৭; Hirt ৮৪ ৮৫। ১৪ Brugmann পৃঃ ৫৮-৫৯। ১৫ Brugmann পৃঃ ৬১, Hirt পৃঃ ৮৪-৮৫। ১৬ Brugmann পৃঃ ৬১; Hirt পৃঃ ৮৫।

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রত্যুত্তর

বঙ্গভাষায় কিভাবে গ্রীক ভাষা উচ্চারিত হইবে, সেবিষয়ে এই প্রথম আলোচনা হইতেছে। রজনীবাবু একপ্রকার উচ্চারণ দিয়াছেন; ১১ জন গ্রন্থকার এবিষয়ে কি বলেন, মহেশবাবু তাহার আলোচনা করিয়াছেন। সুকুমার বাবু এই ১১ জন লেখকের মতামত আলোচনা না করিয়া কয়েকটি স্থলে নূতন উচ্চারণ দিয়াছেন। তিনি নূতন তিন জন লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের অনুসরণও করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য-নির্ণয়ের উপায় নহে। ৩ জন খ্যাতনামা লোকের নাম উল্লেখ করিলেই যে ১১ জন খ্যাতনামা লোকের মত অসিদ্ধ হইয়া গেল, ইহা বলা যায় না। সত্যনির্ণয়ের প্রধানতঃ দুইটি উপায়:—

(১) মৌলিক গবেষণা

(২) খ্যাত্যাপন্ন লেখকদিগের মতামতের আলোচনা।

সুকুমারবাবু একটা পথও অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার নিজের মতই সত্য, ইহা সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে যুক্তি-সহকারে দেখান উচিত ছিল যে

(১) পূর্ব্বোক্ত ১১ জনের মত ভুল।

(২) কিংবা মহেশ বাবু ইহাদিগের মত ভুল বুঝিয়াছেন এবং অমুক অমুক স্থলে ভুল বুঝিয়াছেন।

(৩) কিংবা মহেশ-বাবু ভুল বুঝাইয়াছেন এবং অমুক অমুক স্থলে ভুল বুঝাইয়াছেন।

লেখক এসব কিছুই করেন নাই; তবে এক স্থলে বলিয়াছেন মহেশ বাবু এক 'd' কে অপর 'd' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন এবং আর এক স্থলে বলিয়াছেন মহেশ বাবু সম্ভবতঃ অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির পার্থক্য করেন নাই। এতদুভয়ই লেখকের কল্পনা, তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই (কিংবা আমরা বুঝিয়াছি তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই)।

এইপ্রকার প্রতিবাদে সত্য নির্ণয় হয় না। একজন বলিল ১১ জনের এই মত; আর এক জন বলিল অপর তিন জনের অন্যমত। ইহাতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইয়া বলেন "নানা মুনির নানা মত।"

প্রকৃত পক্ষে বিষয়টিও অতি জটিল। প্রাচীন কালে গ্রীক উচ্চারণ কি ছিল, বর্ত্তমান যুগে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এবিষয়ে অতি শান্ত-ভাবে বহুল আলোচনা হওয়া আবশ্যক—কাগজে, পুস্তকে, বিশেষজ্ঞ-গণের সম্মিলনে আলোচনা করিয়া নির্ণয় করা আবশ্যক—বাংলায় কি উচ্চারণ গ্রহণ করা উচিত। ভাষায় একবার ভুল উচ্চারণ প্রবিষ্ট হইলে, তাহা সংশোধন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এখন লেখকের মন্তব্য বিষয়ে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে।

(১) তাঁহার প্রথম অভিযোগ, মহেশ-বাবু বিকৃতভাবে 'ঈটা' বাদের সহিত 'এটা' বাদের তুলনা করিয়াছেন। এপ্রকার বলা নিতান্তই প্রতিবাদের জন্ত প্রতিবাদ? তিনি ভাবান্তরের জন্ত প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। কিন্তু এ তুলনা কি ভাবান্তরের বিরোধী?

উচ্চারণ-বিষয়ে অসংখ্য মত, তবে প্রধান মত দুইটি। মহেশ-বাবু এইজন্তই এই দুইটি মতকে প্রধান স্থান দিয়াছেন—; এই সঙ্গে অপরাপর মতেরও আলোচনা করিয়াছেন।

লেখক একটি ভুল করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস 'ঈটা'-বাদীর সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক উচ্চারণের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত পক্ষে 'ঈটা'-বাদী প্রাচীন গ্রীককেও ঈটাবাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন— এইজন্তই 'এটা'-

বাদের জন্ম। এখনও গ্রীস দেশে অধিকাংশ লোকই প্রাচীন গ্রীক বিষয়েও 'ঈটা'-বাদী।

(২) লেখক বলেন alpha এর উত্তর 'বিবৃত অ'। বাংলা ভাষার 'বিবৃত অ' নাই, আছে 'অ' এবং 'আ'। সংস্কৃতের সহিত তুলনায় বাংলা 'অ' কারের উচ্চারণ অতি অদ্ভুত। ই, ঈ কিংবা উ, ঊ এক শ্রেণীর উচ্চারণ, পার্থক্য এই ই, উ হ্রস্ব এবং ঈ, ঊ দীর্ঘ। কিন্তু 'অ' এবং 'আ' এতদুভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা কেবল হ্রস্বদীর্ঘ-মূলক নহে। আমরা যেভাবে 'অ' উচ্চারণ করি তাহাতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে 'অ' এবং 'আ'—দুইজাতীয় ধ্বনি। হিন্দীতে এপ্রকার নহে। তাহাদের 'অ' এবং 'আ' একজাতীয়। হিন্দীতে লেখা হয় 'হজারী' কিন্তু উচ্চারণ করা হয় এমনভাবে যে বাঙ্গালী শুনে 'হাজারী'; বাংলাতে লেখাও হয় 'হাজারী।' যে স্থলে আমরা শুনি 'হা', হিন্দুস্থানী সে স্থলে শুনে 'হ'। দোষ বাঙ্গালীরই; আমাদের হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান নাই। হিন্দুস্থানীর 'হ' এর 'অ' কার এবং 'জা'র 'আ'কার একই শ্রেণীর; একটি হ্রস্ব, অপরটি দীর্ঘ। বাঙ্গালীর 'হা' এবং 'জা' একইপ্রকার উচ্চারণ—'হা'কে হ্রস্ব করিয়া উচ্চারণ করা হয় না। বাংলা 'আ'-কারে হ্রস্বদীর্ঘ নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে alpha এর উচ্চারণ 'আ' ই লিখিতে হইবে। হিন্দুস্থানীর জন্য পুস্তক লিখিতে হইলে, লিখিতে হইবে alpha উচ্চারণ 'অ' এবং 'আ' উভয়ই।

(৪) মহেশ বাবুর ভুল অনেক হয়; কিন্তু delta এর উচ্চারণ বিষয়ে তাঁহার কোন ভুল হয় নাই এবং তিনি এক 'd' কে অন্য 'd' বলিয়াও ভুল করেন নাই।

ইংরেজী ভাষায় যত গ্রীক ব্যাকরণ লেখা হইয়াছে, তাহা ইংরেজের জন্য। এসমুদায় গ্রন্থে যদি বলা হয় delta এর উচ্চারণ 'd' তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই 'd' ইংরেজী 'd'; ইহা রোমান ভাষাসমূহের d নহে।

Goodwin বলেন, "Probably beta, delta·········were sounded as b, d······in English (পৃঃ ১১, শেষ সংস্করণ)।

Simonson বলেন—"The consonants beta, delta······ were practically the same as b, d······in English" Gr. Accidence, পৃঃ ১৭।

Thompson (পৃঃ ৩) Jannaris (পৃঃ ৩৩), Hadley and Allen (পৃঃ ৭) প্রভৃতির ব্যাকরণেও ঐ মত।

লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন মহেশ-বাবু 'সাধারণ বাঙ্গালীর মত আন্দাজ করেছেন যে ইংরেজী d আর আমাদের 'ড' একই"। ইহাতে মনে হইতেছে যেন ইংরেজী 'd' এবং বাংলা 'ড' এক নহে। এবিষয়ে যখন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তখন কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথম বক্তব্য এই যে ইংরেজের পক্ষে 'ত' বর্গ উচ্চারণ করা সহজ নহে, অধিকাংশ স্থলেই ইহারা ভারতীয় দন্ত্যবর্ণকে মূর্দ্ধন্য বর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহারা

'তুমি'	কে বলে	টুমি
দাস	...	ডাস
দত্ত	...	ডট

ইহা হইতেই অনুমিত হইতে পারে যে ইংরেজী বর্ণ মালায় প্রকৃত ত; থ, দ, ধ, নাই। (আমরা বলিতেছি 'প্রকৃত')।

ইংরেজগণ সংস্কৃত বা বাংলা 'ড'ও পূর্ণভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে পারে চৌদ্দ আনা।* এবিষয়ে Sayce বলেন—

The English 't' and 'd' are also said to be cerebral, though the tip of the tongue is not bent very sharply backwards in forming them.—The Science of Language Vol. 1 276

সুতরাং বলিতেই হয় ইংরেজী 't' এবং 'd' মূর্দ্ধন্য বর্ণ এবং ইহাদিগের উচ্চারণ প্রায় 'ট' এবং 'ড'।

সুতরাং delta এর উচ্চারণ যে 'ড'—ইহা মহেশ-বাবুর স্বকপোলকল্পিত মত নহে।

এখন প্রশ্ন ঈটাবাদী delta কে 'দ' বলেন না 'ধ' বলেন। বহু গ্রন্থে বলা হইয়াছে ইহার উচ্চারণ 'then এর 'th'। এস্থলে জিজ্ঞাস্য, then এর উচ্চারণ 'দেন' না 'ধেন? দ্বিধাশূন্য হইয়া বলা যাইতে পারে যে উচ্চারণ 'ধেন' নহে। খাটি ইংরেজগণ 'ধ' উচ্চারণ করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বর্গের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ করিতেই ইহারা অসমর্থ। ইহারা ধর্ম্মকে বলে ডর্ম্ম (অভিধানও দ্রষ্টব্য), ঘোষকে বলে গোষ।

ইংরেজীতে 'gh' এর উচ্চারণ 'g' যেমন ghost=gost, ghast=gast. উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়াই ইহাদিগের বর্ণমালায় আমাদিগের বর্গের চতুর্থ বর্ণ নাই। এইসমুদায় বর্ণের স্থলে gh, jh, dh, dh, ph, এই কয়েকটি সংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'ঘ' এবং gh, 'ঝ' এবং jh 'ঢ' এবং dh, 'ধ' এবং dh, 'ফ' এবং ph এক নহে। বর্গের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় ইহারা তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে বাতাস নির্গত করে; যেমন পূর্ব্ববঙ্গে হইয়া থাকে—

gh = গ, অস্ম

ph = প, অস্ম, ইত্যাদ।

কোন কোন ইংরেজ

'ঘ' উচ্চারণ করেন গ,গ, অস্ম

ফ " " ফ,ফ, অস্ম।

যাহারা চতুর্থ বর্ণকেই তৃতীয় বর্ণে পরিণত করে, তাহারা যে তৃতীয় বর্ণকে চতুর্থ বর্ণরূপে উচ্চারণ করিবে, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

সুতরাং বলিতে হয়, then = দেন, দ্দেন। আর যদি স্বীকারও করা যায় যে, then এর th = ধ, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহা পূর্ব্ববঙ্গের ধ, অর্থাৎ দ্ অস্ম। Grimm এর একটি নিয়ম এই :—

"If the same roots or the same words exist in Sanskrit, Greek, Latin, Celtic, Slavonic, Gothic and High-German, then wherever the Hindus and Greeks pronounce an aspirate, the Goths, and the Low Germans generally, the Saxons, Anglo-Saxons, Frisians, etc., pronounce the corresponding Sonant Check" (Max-Müller, Science of Language, Vol. ii, pp. 229-230).

অনাবশ্যক অংশ বাদ দিয়া ভাবার্থ গ্রহণ করিলে এই দাঁড়ায়—

"যে স্থলে হিন্দুগণ মহাপ্রাণ বর্ণ ব্যবহার করে ইংরেজগণ সেইস্থলে সেই বর্গের অল্পপ্রাণ বর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকে।" দৃষ্টান্ত :—যে স্থলে হিন্দুগণ 'ধ' ব্যবহার করে, ইংরেজগণ সে স্থলে 'দ' ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সমুদায় কারণে সিদ্ধান্ত যে ঈটাবাদীর delta এর উচ্চারণ 'দ', 'ধ' নহে। আর 'এটা'-বাদীর উচ্চারণ 'ড'।

৪র্থ ও ৫ম প্রতিবাদ প্রকৃতপক্ষে প্রতিবাদ নহে, মহেশ-বাবুরই মত সমর্থন।

৬। ৬ষ্ঠ প্রতিবাদে লেখক মহেশ-বাবুকে সমর্থন করিয়াছেন 'eta' এর উচ্চারণ 'এ'।

(৭) ও (১১)

সপ্তম ও ১১শ প্রতিবাদ বিষয়ে বক্তব্য এই :—

(ক) theta, phei, chei এর উচ্চারণ নিতান্ত সরল বিষয় নহে। এ বিষয়ে বহু মতভেদ ; বহু বাক্‌বিতণ্ডা, বিবাদ বিসংবাদ হইয়া গিয়াছে।

(খ) মহেশবাবু নিজের কোন মত প্রকাশ করেন নাই, এটাবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহাই বলিয়াছেন—তিনি বার্ত্তাবাহক মাত্র। এটাবাদিগণ ঐ তিনটির প্রত্যেকটিকেই সংযুক্ত অক্ষররূপে গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকটির প্রত্যেক বর্ণকেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

Theta=t+h
Phei=p+h
Chei=c+h

এস্থলে শিক্ষজনের মতামত উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে।

(১) Jannaris বলেন, "The aspirates chei, theta, phei are sounded according to the Erasmians like two separate elements k-h, t-h, p-h, while traditionists pronounce them as simple ch, th, f, (p. 57).

অর্থাৎ এটাবাদী প্রত্যেক বর্ণকে পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করেন, আর প্রচলিত মতে এ সমুদায়ের উচ্চারণ খ, থ, ফ।

(২) Hadley and Allen বলেন—

"The letters phei, theta, chei, seem to have had at first the sounds of ph, th, ch in English up*h*ill, hot*h*ouse, bloc*kh*ead. But afterwards they came to sound as in English gra*ph*ic, pa*th*os and German ma*ch*en (p. 7). অর্থাৎ প্রাচীনকালের phei এর উচ্চারণ uphill এর p-h ; theta এর উচ্চারণ hothouse এর 't-h' এবং chei এর উচ্চারণ blockhead এর k-h.

(৩) Goodwin বলেন—The rough consonants *theta chei* and *phei* in the best period were *t, k* and *p* followed by '*h*'. (পৃঃ ১১) তাঁহার দৃষ্টান্ত এই—

hen(th)a=hen-t (ha) : ha (ph) iēmi=ha-p (hi) ēmi ; he (ch) ō=he-k (ho)

আমরা theta, phei এবং chei অক্ষরকে বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজী অক্ষরে th, ph, এবং ch লিখিয়াছি।

গ্রীক্ ভাষায় 'হ' অক্ষর নাই ; স্বরবর্ণের মস্তকে উল্টা কমা (c; *spiritus asper* দিয়া 'হ' উচ্চারণ করা হয়। আমরা এইরূপ 'হা' ('হ' চিহ্নিত আ) স্থলে ha, হে' (ɐ চিহ্নিত এ) স্থলে he, হো ('ভ' চিহ্নিত ও) স্থলে ho বন্ধনীর মধ্যে রাখিয়াছি। প্রেসে গ্রীক অক্ষর নাই বলিয়া এই রূপ করিতে হইল।

Goodwin যাহা বলিয়াছেন তাহার বাংলা ব্যাখ্যা এই :—

গ্রীক্ ভাষায় 'হ' নাই ; কিন্তু চিহ্ন দ্বারা স্বরবর্ণকে 'হ' যুক্ত করা হয়। এই প্রকার চিহ্নিত 'অ' অর্থ 'হ', চিহ্নিত ই অর্থ 'হি', চিহ্নিত 'এ' অর্থ 'হে', চিহ্নিত 'ও' অর্থ 'হো' ইত্যাদি। নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া বলা যাইতে পারে যে গ্রীক ভাষায় 'অ' কারের ন্যায় 'হ' কারও আছে ; এইরূপ 'ই' কার এবং 'হি'কার উভয়ই আছে ; এইরূপ 'হ' কার, 'হে' কার, 'হো' কারাদিও আছে। Goodwin বলিতেছেন :—

theta তে 'অ'কার = 'ট' তে 'হ' কার, theta তে 'আ' = 'ট' তে 'হা' কার, এইরূপ phei তে 'এ' = 'প'তে 'হে' কার ইত্যাদি।

উক্ত অংশের পরে Goodwin বলিতেছেন :—We cannot represent the rough mutes in English ; but our nearest approach is in words like ho*th*ouse, bloc*kh*ead, and u*ph*ill, but here the 'h' is not in the same syllable with the mute. In later Greek *theta* and *phei* came to the modern pronunciation of *th* (in *thin*), and f, and *chei* to that resembling German *ch* in machen" (পৃঃ ১১ শেষ সংস্করণ)।

ইহার মতে প্রাচীন উচ্চারণ ট্‌হ, প্‌হ, ক্‌হ এবং নূতন উচ্চারণ থ, ফ, খ।

(৪) Thompson বলেন—

"The aspirates theta, phei are usually pronounced as spirants, theta as *th* in *thick*, phei as *ph* in Philip or f in fear ; chei is pronounced like *ch* in *character*. But in Greek they were real aspirates and were pronounced : theta as 't-h' in *mast-head*, phei as p-h in *up-hill* and chei as *k-h* in *work-house*." (p. 6.)

Simonson বলেন—

The rough mutes theta, chei, phei were pronounced as t, k and p followed by rough breathing. Gr. Accidence. (p. 17.)

Goodwin এর ন্যায় তিনিও 'হ'-কার 'হা'-কারাদি দ্বারা এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

han(th)os=han-t(hos), he(ch)o=he-k(ho), ha(ph)elko=ha-p(he)lko তাহার পরে লিখিতেছেন

We may represent these sounds approximately in words like potHook, blockHouse, upHill, পৃঃ ১৮।

(৫) Arnold and Conway এইমত পোষণ করেন। ইহাদিগের দৃষ্টান্ত—

anT-Hill এর t-h, uP-Hill এর p-h এবং baCK-Handed এর k-h.

(৬) Moulton বলেন—"The aspirates were during the classical period mutes followed by h ; our sheP-Herd, hoT-House packHorse give the sounds fairly, except that the mute has to be pronounced in the same syllable as the 'h' (she-pherd etc). Gram. N. T., voll. ii, part i, পৃঃ ৯৫।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, 'এটা-বাদী' এবং অনেক খ্যাতনামা বৈয়াকরণের মতে প্রাচীন গ্রীক ভাষায়—th, ph, ch—এই তিনটির প্রত্যেকটিতেই দুইটি অক্ষর পৃথক পৃথক উচ্চারিত হইত। এই মতানুসারে বাংলায় ঐ কয়েকটী উচ্চারণ লিখিতে হইলে ট্‌হ, প্‌হ, ক্‌হ লিখিতে হইবে।

(ঘ) কেহ কেহ বলিতে পারেন ঠ, ফ, খ—এই তিনটি মহাপ্রাণ বর্ণ থাকিতে এ বিকট বিধি কেন ? ইহার উত্তর এই :—

এটাবাদীর মতে ঐ তিনটি সংযুক্ত বর্ণ (diphthong) ; কিন্তু ঠ, ফ খ অসংযুক্ত বর্ণ 'monophthong', সংযুক্ত অক্ষরের পরিবর্তে অসংযুক্ত বর্ণ ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন এক অর্থে মহাপ্রাণ বর্ণসমূহও সংযুক্ত বর্ণ ; খ=ক্‌হ ; ঘ=গ্‌হ ; ঠ=ট্‌হ ইত্যাদি।

এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। এ সমুদায় যদি সংযুক্ত বর্ণ হইত, তাহা হইলে ছন্দে এ সমুদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হ্রস্বস্বরও দীর্ঘস্বর বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু এপ্রকার হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হয় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই মহাপ্রাণ বর্ণসমূহ সংযুক্ত বর্ণ নহে।

(৪) বিজ্ঞ শিক্ষকগণ অনেকেই জানেন যে, শিশুগণকে মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ শিখাইতে হইলে অনেক সময়ে পরোক্ষ প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। মনে করা যাউক—'ঠ' শিখাইতে হইবে। যে শিশু 'ঠ' উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য 'ঠ'যুক্ত একটা উপযুক্ত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন 'কুঠার' বা 'কঠিন।' প্রথমে শিখাইতে হইবে কুট্, হার ; কুট্‌হার। তাহার পরে শিখাইতে হইবে

কুট্‌হার ; কুট্-হার।

তাহার পরে শিখাইতে হইবে

কুট্-হার ('ট্' এত পরে না থামিয়া)

তাহার পরে সে শিখিবে 'কুঠার'।

ইহাতেও দেখা যাইতেছে যে, অল্পপ্রাণবর্ণের সহিত 'হ' উচ্চারণ করিলেই মহাপ্রাণ বর্ণ হয় না।

(৮) এইস্থলে 'অল্পপ্রাণ' ও 'মহাপ্রাণ' বর্ণ-বিষয়ে আরও কিছু বলা আবশ্যক। 'প্রাণ' অর্থ 'বায়ু'। অল্পপ্রাণ বর্ণে মুখ হইতে অল্প বায়ু নির্গত হয়, আর মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণে অধিক বায়ু নির্গত হয়। কিন্তু ইহাই একমাত্র পার্থক্য নহে। অল্পপ্রাণ বর্ণ 'অল্প প্রযত্ন' এবং মহাপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রযত্ন। অল্পপ্রাণ বর্ণসমূহ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রভূত বায়ু নির্গত করিলেই যে মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইয়া যায়, তাহা নহে। রোগশয্যায় শায়িত ব্যক্তি নির্জীব হইয়া 'বাবা' উচ্চারণ করিবার সময় বলে "বাআআবাআ" ; কিন্তু ইহাতে 'ভাভা' উচ্চারিত হয় না। সংস্কৃত মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারণ করিতে মহাপ্রযত্ন আবশ্যক ; আবার বর্গের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ অপেক্ষাও মহত্তর প্রযত্নসাপেক্ষ।

দেখা যাইতেছে 'ক্‌হ' কিংবা 'ক্‌অঅ' উচ্চারণ করিলে 'খ' হয় না, 'গ্‌হ' কিংবা 'গ্‌অঅ' উচ্চারণ করিলে 'ঘ' হয় না। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান সংস্কৃতের খ, ঝ, চ, ধ, ভ এর উচ্চারণ অপরাপর আর্য্য ভাষায় নাই বলিলেই চলে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—

'খ'	বর্ণ	'ক্‌হ'	নহে।
'ঘ'	বর্ণ	'গ্‌হ'	নহে।
'ঠ'	বর্ণ	'ট্‌হ'	নহে।
'ফ'	বর্ণ	'প্‌হ'	নহে।

ইত্যাদি।

আমরা ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে 'এটা'-বাদ সত্য হইলে theta, phei এবং chei স্থলে ঠ, ফ খ লেখা যায় না। তবে 'এটা-' বাদ সত্য কি না মহেশবাবু পূর্ব্বেও তাহার বিচার করেন নাই, এখনও তিনি করিতেছেন না। ঘটনা যাহা, তিনি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

৮। অষ্টম প্রতিবাদের বিশেষত্ব নাই।

৯। নবম প্রতিবাদে লেখক বলিয়াছেন, "Omikronএর উচ্চারণ বাংলা 'অ' নয়, হ্রস্ব 'ও' ; পরবর্ত্তী যুগে 'অ' উচ্চারণ এসে গেছে।"

রজনীবাবুর সহিত মতভেদ ছিল না বলিয়াই এ বিষয়ে আলোচনা নাই। এখন কিছু আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে।

Thompson বলেন, ইহার উচ্চারণ 'not' এর 'o' (পৃঃ ৪)।

Arnold and Conwayএর মতে ইহার উচ্চারণ cannot কিংবা consistএর 'O' এর ন্যায় (পৃঃ ৬)

Jannaris কোন দৃষ্টান্ত না দিয়া কেবল বলিয়াছেন ইহার উচ্চারণ short 'o'.

Hadley and Allenএর দৃষ্টান্ত obeyএর 'o' (পৃঃ ৪)।

Goodwin বলেন, ইংরাজীতে অনুরূপ উচ্চারণ নাই। তবে ইহার উচ্চারণ monastic কিংবা renovate শব্দের 'o' এর নিকটবর্ত্তী (পৃঃ ১১, শেষ সংস্করণ)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে কিছু মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ইহা অকার, কেহ বলেন ইহা প্রধানতঃ 'অ', তবে 'ও'কারের কিছু টান আছে। 'ও' কারের টান অতি কম এবং 'অ' কারের ধ্বনি বেশী বলিয়াই পরবর্ত্তীকালে ইহার উচ্চারণ বাংলা 'অ' কারের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষাতেও এমন বহু শব্দ আছে যাহার 'অ'কারে 'ও'কারের টান পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই :—

মতি, গতি, রতি, নতি, কবি, পতি, সখি ইত্যাদি।

মনু, ধনু, তনু, দগু, কটু, মধু, পটু, বহু ইত্যাদি।

অদ্য, পদ্ম, সদ্য, মদ্য, কন্যা, গদ্য, পথ্য, নব্য ইত্যাদি।

এইপ্রকার বহু শব্দ আছে যাহার অন্তর্গত 'অ'কারের গতি 'ও'কারের দিকে। বাংলায় যেমন আমরা এ সমুদায় স্থলে 'ও'কার না লিখিয়া 'অ'-কারই রাখিয়া দিই, মোতি, গোতি রোতি, নোতি না লিখিয়া মতি, গতি, রতি নতিই লিখিয়া থাকি, তেমনি গ্রীক্ ভাষার সামান্য 'ও'কার মিশ্রিত 'অ কার ধ্বনিকে, বাংলায় 'অ'কাররূপেই লিখিতে হইবে।

সংস্কৃত উচ্চারণ দ্বারা বিচার করিলে আমরা এসমুদয় স্থলে 'ও'কার লিখিতেই পারি না। 'ও' নিত্য দীর্ঘ—সংস্কৃতে হ্রস্ব 'ও'কার নাই।

'অ'-কে অনেক স্থলে বাধ্য হইয়া 'ও' করিতে হয় ; কিন্তু কোন স্থলেই 'ও' কার 'অ'কাররূপে পরিণত হয় না।

এই সমুদায় বিচার করিলে মনে হয় Omikron-কে বাংলা 'অ'-রূপেই গ্রহণ করা উচিত। ১০ম, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ মন্তব্য প্রতিবাদ নহে।

১১শ প্রতিবাদের উত্তর ৭ম প্রতিবাদের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

১৫শ প্রতিবাদে লেখক বলেন oi=ওই।

মহেশ বাবুর বক্তব্য এই।—Thompson বলেন, ইহার উচ্চারণ 'oil' এর 'oi' (পৃঃ ৫)। Goodwin (পৃঃ ১১), Arnold and Conway (পৃঃ ৮) এর দৃষ্টান্তও oil. Hadley and Allen (পৃঃ ৫) এবং Simonson (পৃঃ ১৬) এর দৃষ্টান্ত foil এর 'oi'

Curtins এর দৃষ্টান্ত boy এর 'oy' (পৃঃ ৪)।

অবশ্যই এসমুদয় স্থলে oi=অই। এ-প্রকার বোধ হয় কেহই বলিবেন না যে, oil ওইল্

foil—ফোইল্
boy=বোই।

১৬শ ১৭শ মন্তব্যে নূতন কিছু বলা হয় নাই। বাংলাতে অবশ্যই এই কয়েকটি কথার উচ্চারণ

১৮। ১৮শ প্রতিবাদে লেখক বলেন ou=ওউ।

Jannaris বলেন, ইটা বাদী ও এটা-বাদী উভয়েরই উচ্চারণ 'u' (=উ)—'distinct sound of u' (পৃঃ ২৬, ৪০, ৪৭ দ্রষ্টব্য)।

Hadley and Allen (পৃঃ ৫) এবং Simonson-এর (পৃঃ ১৬) দৃষ্টান্ত 'youth' এর 'ou' (=উ)।

Goodwin-এর দৃষ্টান্ত moon এর 'oon' (দ্বিতীয় সংস্করণে) ; তৃতীয় সংস্করণে বলেন প্রাচীন উচ্চারণ ছিল 'o'।

Geddes বলেন, ou = oo = u (পৃঃ ২)।

মহেশবাবু ইহাও বলিয়াছিলেন যে, অন্য মতও আছে। যেমন Thompson বলেন, ইহা 'note' এর 'o." Platoও বলেন, ou = o.

লেখকের মত ধরিলে আরও একটি নূতন উচ্চারণ পাওয়া গেল।

কিন্তু প্রকৃত উচ্চারণ কি নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে এটা-বাদী, ঈটাবাদী এবং আরও অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ইহার উচ্চারণ 'উ' (কিংবা ঊ)।

লেখক এই স্থলেই উচ্চারণ-তত্ত্ব শেষ করিয়াছেন। কিন্তু আলোচনা না করিয়া গ্রীক নামের উচ্চারণে 't' স্থলে লিখিয়াছেন 'ত'।

annaris এর মতে ইহার উচ্চারণ ইংরাজী 't' (পৃঃ ২৫)।

Goodwin এর উচ্চারণ 'ট', যেমন 'tin' কিংবা 'to' এর। (পৃঃ ১১)।

Hadley and Allen (পৃঃ ৭) এবং Simonson এর (পৃঃ ১৭) দৃষ্টান্ত 'to' এর 't.'

Thompson এর মতে ইহার উচ্চারণ ইংরাজী 't' (পৃঃ ৪)।

ইংরাজী 't' যে মূর্দ্ধন্য বর্ণ ইহা Sayce এর মত উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

সুতরাং বলা যাইতে পারে অনেকের মতে গ্রীক্ 'tau' এর উচ্চারণ 'ট'।

এইস্থলেই উচ্চারণ-তত্ত্ব শেষ হইল।

উপসংহারে দুই-একটি মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক।

লেখক লিখিয়াছেন, 'মহেশ বাবু এ-রকম অনেক কথা বলেছেন, ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে যার প্রতিবাদ একান্ত আবশ্যক ব'লে মনে করি।'

এখানে জিজ্ঞাস্য :—

মহেশ-বাবু কি স্বকপোলকল্পিত কোন কথা বলিয়াছেন? তিনি কি নিজের কোন মত প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? তিনি কি কোন স্থলে সত্য গোপন করিয়াছেন? 'এটা-বাদের ও ঈটাবাদে'র বিরোধী মতেরও কি তিনি উল্লেখ করেন নাই? তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার একটিও কি ভুল? তিনি কি প্রাকৃতজনের মত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন? তাঁহার প্রত্যেক কথাই কি শিষ্টজনের উক্তি নহে? তিনি কি কোন স্থলে নিজে বলিয়াছেন—'ইহাই প্রাচীন উচ্চারণ?'

তবে প্রতিবাদ কিসের? প্রতিবাদ করিলে পূর্ব্বোক্ত শিষ্টজনগণের মতামতের সমালোচনা করিতে হইবে, এসমুদয় মতামত অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না।

লেখক তিনখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। মহেশ-বাবু তাহা পড়েন নাই—এজন্য যদি তাঁহার অপরাধ হইয়া থাকে, তিনি অপরাধ স্বীকার করিতেছেন।

প্রপূর্ত্তি।

অসময়ে Wrightএর Comparative Grammar of the Greek Language হস্তগত হওয়ায় নিম্নলিখিত অংশ পরে সংযোজিত হইল।

এ গ্রন্থ সুকুমার-বাবুর একটি আশ্রয়। কিন্তু এ-গ্রন্থ হইতে তাঁহার সমুদায় মত সমর্থিত হয় না। দুই-একটি দৃষ্টান্ত এই :—

Wright বলেন, O-mega was an open vowel like the 'au' in English "aught" । পৃঃ ৬। অর্থাৎ O-megaএর উচ্চারণ 'aught' এর 'au'। এ উচ্চারণ অবশ্যই 'ও' নহে। কিন্তু সুকুমার-বাবু বলেন O mega এর উচ্চারণ 'ও'। O-mikron-বিষয়ে Wright এর মত এই :—

'O' was a close vowel which is common in some English dialects in such words as coal (kol, 'o' এর উপরে বিন্দু), foal (fol, বিন্দুযুক্ত o) and in the final syllable of such words as fellow (felo, বিন্দুশীর্ষ 'o') and window (windo, বিন্দুশীর্ষ 'o')। পৃঃ ৬।

এ স্থলে 'o' কে close vowel অর্থাৎ সংবৃত স্বর বলা হইল। মোক্ষমূলার 'o' এর চারিপ্রকার উচ্চারণ দিয়াছেন (১) দীর্ঘ বিবৃত, (২) হ্রস্ব বিবৃত (৩) দীর্ঘ সংবৃত (bone এর 'o') এবং (৪) হ্রস্ব সংবৃত (soft এর 'o').—The Science of Language, ii. 126.

Wright এর মত Max-muller এর বিরোধী হইবার কথা নয়। O-mikron যখন হ্রস্ব ও সংবৃত তখন সম্ভবতঃ Wright এর মতেও ইহার উচ্চারণ soft-এর 'o' এর ন্যায়।

প্রাদেশিক উচ্চারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,

coal = kol (বিন্দুশীর্ষ 'o')
oal = fol (বিন্দুশীর্ষ 'o')
ellow = fello (বিন্দুশীর্ষ 'o')
window = windo (বিন্দুশীর্ষ 'o')

ইহাতে মনে হইতেছে এই কয়েকটিতে উচ্চারণ 'কল্' ফল্, ফেল উইন্‌ড।

উপস্থানে দেখা যায় প্রাদেশিক অশিক্ষিতলোক 'fellow' স্থলে 'fellar' এবং অনেক সৌখীন্ পুরুষ এইস্থলে 'fellah' ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতেও মনে হয় পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি কথার 'o' স্বরের গতি 'আ'কারের দিকে।

তবে ইহা নিশ্চিত যে বিন্দুশীর্ষ 'o' কিংবা সংবৃত হ্রস্ব 'o' কখন 'ও' নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংবৃত হ্রস্ব 'o' এর দৃষ্টান্ত soft-এর 'o'।

সুকুমার বাবু Thoukudi দুইটি উচ্চারণ দিয়াছেন : একটিতে ou স্থলে ঔ। কিন্তু Wright বলেন খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ইহার উচ্চারণ ছিল 'উ'। তাঁহার ভাষা এই :—

ou = o + u until the fifth century, it then became long close ū" । পৃঃ ৭

অপর এক স্থলে বলিয়াছেন, "In the Attic and Ionic it became u [long 'u' = ঊ].........in the fifth century B. C.। পৃঃ ৩০

সুতরাং সোক্রাটেস্ এবং প্লেটোর সময়ে 'ou'-এর উচ্চারণ ছিল 'উ'। এ সময়ে ইহা 'ঔ'-রূপে উচ্চারিত হইত না।

Wright বলেন, প্রাচীনকালে গ্রীক 'tau' এবং 'delta' এর উচ্চারণ ছিল প্রায় ইংরাজী 't' এবং 'd' (had approximately the same sound values as in English—পৃঃ ৮)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংরাজী t = ট এবং d = ড। সুতরাং Wright এর মতে tau = ট, delta = ড। এস্থলেও সুকুমার বাবুর মত সমর্থিত হইল না।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

[গ্রীক উচ্চারণ এবং তৎসম্পর্কিত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক আর কোন বাদপ্রতিবাদ অতঃপর ছাপা হইবে না। [প্রবাসীর সম্পাদক]

স্বরাজ্য পল্লীসংগঠন তহবিল

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে পল্লীসংগঠনের জন্য সংগৃহীত স্বরাজ্য তহবিল সম্বন্ধে যে-মন্তব্য বাহির হইয়াছে, তাহাতে দুইটি ভুল দেখা যায়।

(১) মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে, স্বরাজ্য সপ্তাহের পর প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় যে আরও প্রায় ৭হাজার টাকা সংগ্রহ করেন, তাহারই বা কি হইল? এসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, গত ১৯শে ভাদ্র তারিখে 'নায়কে' প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রতাপ-বাবুর মারফতে যে ৭২৫১।৵ আনা আদায় হয়, তাহা সাতকড়ি রায় প্রমুখ ভদ্রলোকদের হাতে দেওয়া হয়, ইহার মধ্য হইতে স্বরাজ্য সপ্তাহের বন্দোবস্ত ও অর্থসংগ্রহের খরচ বাদে ৫৫৭২৷৵৩পাই দেওয়া হইয়াছে।

(২) উক্ত মন্তব্যে আরো লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিকে ৩২০০ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ২১শে ভাদ্র তারিখের দৈনিক বসুমতীতে যে-হিসাব বাহির হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে যে, উক্ত কমিটিকে ৩১০০০্ একত্রিশ হাজার টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে।

গত ২৫শে ভাদ্র তারিখের সঞ্জীবনীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সপ্তম কলমে স্বরাজ্য সপ্তাহে সংগৃহীত টাকার যে হিসাব মুদ্রিত হইয়াছে, তদবলম্বনে উল্লিখিত ভ্রম দুইটি প্রদর্শিত হইল।

শ্রী সত্যপ্রিয় গুপ্ত

"ফকিরের গান"

মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে ৫১৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর স্বাক্ষরিত "ফকিরের গান" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত দুটি ফকিরের গানপ্রাপ্তির বিবরণ-পাঠে বড়ই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ ঐদুটি গান বহুদিন পূর্ব্বে আমি নিজে কোনো ফকিরের মুখে গাহিতে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। পরে ১৩২৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসীতে" "বেতালের বৈঠকে" ৯৬নং প্রশ্নের শেষাংশের লিখিতানুসারে মনোরঞ্জন-বাবুর নিকট ঐদুটি গান ১৩২২ সালের শেষ ভাগে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম; এবং তিনি রাজসাহী পি. এন্ বোর্ডিং হইতে ১৫।১২।২২ তারিখে আমাকে পত্র লিখিয়া আমার প্রেরিত গান-দুটির কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছেন। এমতাবস্থায় মনোরঞ্জন-বাবু কি কারণে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত গান-দুটি অন্যভাবে জ্ঞাত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা বুঝিতে অক্ষম অন্ততঃ সৌজন্যের খাতিরে বর্ত্তমানে প্রকাশিত গান দুটি আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় উল্লেখ করা উচিত ছিল। তর্কস্থলে আমার নিকট হইতে গান-দুটি পাইবার পূর্ব্বে উহা সংগৃহীত হইয়া থাকিলে তাহাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে বা আমার নিকট পত্র লিখিবার সময় প্রকাশ করিলে পারিতেন। আর যদি তিনি ঠিক এই-দুটি গান আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই বলিতে চাহেন, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত যে দুটি গানের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছিলেন সেদুটি গানের পাণ্ডুলিপি কি সাধারণকে দেখাইতে পারেন?

৬।১।৩২　　　　শ্রী হিরণ্ময় মুনসী

কাদির পাড়া, পোঃ রাধানগর,
জেলা যশোর

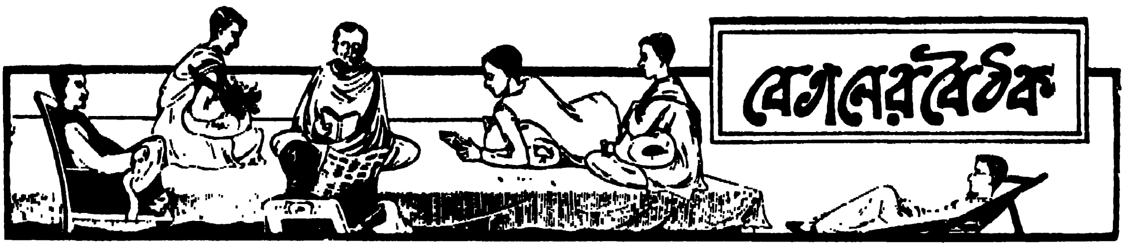
নিভৃতে

শ্রী জাহাঙ্গীর বকীল

বসেছি একেলা। অতীতের মাল্য হ'তে
খসি' পড়ে কোন্ বিচ্যুত-মাঘের দিন
আজিকার কোলে। বসন্তের তপ্ত ক্ষীণ
বাসনা-নিশ্বাস জাগাইল মৃদু স্রোতে
বিশ্বের সঞ্চিত চঞ্চলতা, আমাদের
রুদ্ধ ভালোবাসা অপূর্ব্ব দুর্দ্দম। তব
নয়ন-পল্লব হ'তে কোন্ অভিনব
অজানা বিহঙ্গ মোর চিত্ত-আকাশের

স্থির নীলিমার মাঝে ঝলসিল তার
ফিরোজা পাণ্ডুর ডানা? কিসের সন্ধানে
ঘু'রে ফিরেছিল মোর ওষ্ঠ বারেবার
গ্রীবায় তোমার—বক্ষে ললাটে নয়ানে?

জানি না এখনো—কথাতীত সে পূর্ণতা
সেই কি আনে এ শূন্যে—কম্প্র ব্যাকুলতা?
শান্তিনিকেতন।



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন-চরিত

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন-চরিত বাংলা ভাষা ভিন্ন আর যে যে ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, সেই গ্রন্থগুলির নাম, এবং সম্ভব হইলে প্রাপ্তিস্থানের ঠিকানা "প্রবাসী"র পাঠক মহাশয়গণের নিকট জানিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রী অমূল্যধন রায়ভট্ট

কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি

কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ও কি-কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হয়?

শ্রী জ্যোৎস্নানাথ চন্দ

পঞ্চ রত্ন

কোনো গৃহের ভিত্তিস্থাপনের সময়, সেই স্থানে, কোনো পাত্রে, পঞ্চ-রত্ন—সোনা, রূপা, মুক্তা, তামা, পলা—প্রোথিত করিয়া দিবার প্রথা আছে। এবং সেই রাত্রে ঐস্থানে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়। কেন ও কি করিয়া এই প্রথার চল্ হইল?

শ্রী অঞ্জলি ও সুপ্রকাশ ঘোষ

গৌরীশঙ্কর ও মাউণ্ট্ এভারেস্ট্

গৌরীশঙ্কর ও মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্ বল্‌তে আমরা সাধারণত একই চূড়াকে বুঝি যা ২৯০০২ ফুট উঁচু। কিন্তু হিমালয়ের মানচিত্রে গৌরী-শঙ্কর ও মাউণ্ট্ এভারেষ্ট্‌কে দুইটি তফাৎ পর্ব্বত-শৃঙ্গ ব'লে দেখানো হয়; গৌরীশঙ্কর নাম দেওয়া হয় মাউণ্ট্ এভারেস্টের চেয়ে বেশ ছোটো একটি পাহাড়ের চূড়াকে।

এখন কথা হচ্ছে গৌরীশঙ্কর ও মাউণ্ট্ এভারেস্ট যদি দুইটি তফাৎ পর্ব্বত শৃঙ্গই হয় তা হ'লে মাউণ্ট্ এভারেস্টের দেশীয় নাম কি? আর যদি একই পর্ব্বত-শৃঙ্গ হয় তবে কবে থেকে ও কি কারণেই বা এর মাউণ্ট্ এভারেস্ট্ নাম হ'ল? এবং এখন মানচিত্রে যাকে গৌরীশঙ্কর (মাউণ্ট্ এভারেস্টএর চেয়ে ছোটো) বলে' দেখানো হয়, তা'র কবে থেকে ও কি কারণে এই নাম হ'ল এবং এর দেশীয় নামই বা কি?

পুষু

—

মীমাংসা

গত শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

"Bengal District Gazetteers"এর XIV সংখ্যায় বাঁকুড়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, ১৭৩০ হইতে ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে গোপাল সিং বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার আদেশে বিষ্ণু-পুরবাসী সকলকে সন্ধ্যার সময় হরিনাম করিতে হইত। প্রজাদিগের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ এই রাজাদেশ হইতে "গোপাল সিংএর বেগার" কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে। এই রাজার সময় মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর দুর্গের দক্ষিণ তোরণ আক্রমণ করে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরের সৈন্যগণ মারাঠাদিগকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরে গোপাল সিংএর আদেশে তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজা তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের নাম করিতে ও তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দেন। অবশেষে ভাস্কর পণ্ডিতের সৈন্যদল বিষ্ণুপুর দুর্গ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া বাংলা দেশের অন্যান্য অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত অংশে প্রস্থান করে। মারাঠাদিগের এই পরাজয়-সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মদন-মোহন ঠাকুর স্বয়ং কামান দাগিয়া মারাঠাদিগকে বিষ্ণুপুর হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে মারাঠাদিগের এই প্রথম অভিযানে রাজ-মহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড মারাঠাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, কেবল বিষ্ণুপুর রক্ষা পাইয়াছিল। এই ঘটনা ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ঘটে। অতঃপর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে যখন মারাঠা সেনাপতি শিওবৎ ভারতসম্রাট্ সাহ আলমের সহিত বঙ্গদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তখন তদানীন্তন বিষ্ণুপুরের রাজা তাহাদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে এইসকল তথ্যের নিমিত্ত Gazetteer-লেখক, রিয়াজুস সলাতিন ও মুতাক্ষরিন নামক দুইটি প্রামাণিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াছেন।

শ্রী গোকুলবিহারী দাস



পরশ

শিল্পী শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

ভারতবর্ষে কৃষি-বিদ্যালয়

(মাঘ ১৩৩২ সালের প্রশ্নের উত্তর)

ভারতবর্ষে যে-সকল কৃষি-কলেজ আছে তাহার নামের তালিকা দিয়ে প্রদত্ত হইল।—

(১) Allahabad Agricultural Institute, Allahabad.
(২) College of Agriculture, Cawnpur.
(৩) Agricultural College, Nagpur.
(৪) Agricultural College, Lyallpur (The Panjab).
(৫) College of Agriculture, Poona Camp.
(৬) Agricultural College, Coimbatore (Madras).

Sabour Agricultural College সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে।

উপরি-উক্ত কলেজসমূহের বিষয় সবিশেষ জানিতে হইলে অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে জানিতে পারা যায়।

Capt. Pactaval পরেশনাথ পাহাড়ের নিকট একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টায় আছেন।

Pusa Research Instituteএ কেবলমাত্র Post-Graduate Course পড়ানো হয়।

ব্রহ্মদেশে Mandalayতে একটি Agricultural College সম্প্রতি নূতন হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ, এখানে কোনো কৃষিকলেজ নাই। তবে কোনো কোনো High Schoolএর কর্তৃপক্ষ কৃষিবিদ্যা পড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বাঙালী ছাত্রদের অন্য প্রদেশের কৃষিকলেজে ভর্ত্তি হওয়া খুবই কঠিন। ইহার একমাত্র কারণ domicile-প্রথা।

এন, মুখার্জ্জী

বিদায়ের ক্ষণে

শ্রী পরেশনাথ চৌধুরী

কুহেলিমন্থর আজি শিশিরের বিদায়-বাতাস
করুণ লিপিটি তা'র রেখে গেছে ব্যথিত মর্ম্মরে
বনানীর জীর্ণ পত্রে,—

ওগো ধরা উন্মন-উদাস,
প্রবাসী চলেছে ফিরে' সঙ্গীহীন মেরুর অন্তরে।
আজিকে বিদায় দাও। দীর্ঘতর বিরহবেলায়
আমি একা ছিনু তব পাশে; আজি মিলনের প্রাতে
মোর স্থান সেথা নাহি আর।

সেই একদিন হায়,
হেমন্তের নিশাশেষে উৎসবের বেণুরব-সাথে
সবাই গেছিল চ'লে। শেফালিকা, কাশের মঞ্জরী,
কুমুদ, কহ্লার, শ্যাম বিটপী। ঘনপর্ণরাজি—
ঝরিয়া পড়িল তা'রা গীতিশেষে অস্ফুট গুঞ্জরি'।
আমি এনু উদাসীর বেশে রক্ত গোলাপের সাজি
হাতে ল'য়ে।

হায় বন্ধু, সেই মোর প্রথম পরশে
মনে পড়ে শিহরিয়া ম্লান হাসি হেসেছিলে তুমি,
মোর পানে চেয়ে! আমি সেই ক্ষণে একটি দরশে
তোমারে বেসেছি ভালো! তব রুক্ষ কেশপাশ চুমি'
আমার নিশ্বাস গেছে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া, তুমি হায়
পারোনি বুঝিতে।

যবে ফাগুনের সমীরণ-সাথে
তোমার প্রেমের কত কথা—না না বিদায় বিদায়!
আমারে মার্জ্জনা কোরো। কতদিন কত স্তব্ধ রাতে
যে-কথা বলিতে গিয়া আধপথে থেমেছি নীরবে
আজি বিদায়ের ক্ষণে মৌনে তা'রে পারিনে ঢাকিতে।
মুগ্ধা তুমি আনমনে মলয়ের প্রণয়-গৌরবে
কয়েছ কাহিনী তা'র; আমি যত্নে মলিন হাসিতে
ঢেকেছি প্রাণের ব্যথা।

আজি তা'র নাহি প্রয়োজন।
আসিছে দখিন বায়ু নব পত্র পুষ্পডালা ল'য়ে
কুহুর সঙ্গীতে; আমি যাই রিক্তহাতে বিসর্জ্জন
দিয়া সব দীর্ঘশ্বাসে কুমেরুর তুষার-আলয়ে।
বন্ধু মোর, বিদায়ের ব্যথাভরা আজি সন্ধিক্ষণে
কহিতে প্রাণের কথা ফাটে বুক, রোদন-উচ্ছল
দুনয়ন। দুখের সাথীরে তব রেখো বন্ধু মনে,
বিশীর্ণ গোলাপ-দলে দিও একবিন্দু আঁখিজল।



ভারতবর্ষ

বোম্বাই কর্পোরেশনে মহিলা-সদস্য—

সম্প্রতি বোম্বাই কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। তিন জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমতী সরোজিনী, শ্রীমতী গোখলে ও শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই গত বারে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এবারে বোম্বাই কর্পোরেশনে নির্ব্বাচিত মহিলা-সদস্য-সংখ্যা কমিয়া গেল।

ভারতীয় কৃষি-কমিশন—

ব্রিটিশ ভারতে কৃষির ও গ্রাম্য আর্থিক অবস্থার তদন্ত এবং গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নতির জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যায় তৎসম্বন্ধে যে রাজকীয় কমিশন বসানোর কথা ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন। উক্ত কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি-সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন—

(১) কৃষি ও পশুপালন-সম্বন্ধে গবেষণা, কৃষি-বিষয়ে সংখ্যাসংগ্রহ ও ফসলের পরিমাণ-বৃদ্ধির জন্য নূতন বীজের আমদানি, চাষের প্রণালী-পরিবর্ত্তন, গো-পালন ও প্রজনন।

(২) কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় ও আমদানি রপ্তানি।

(৩) কৃষকদিগকে ঋণপ্রদানের উপায়।

(৪) গ্রামের সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধি ও কৃষকের উন্নতি।

বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ব, বসতীভূমি, রাজস্ব, সেচন প্রভৃতি-সম্বন্ধে এই কমিশন কোনো তদন্ত করিবে না। তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি এই সম্পর্কে যে-সমস্ত কাজ করিতেছেন তৎবিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কি-ভাবে সাহায্য করিতে পারেন তৎসম্বন্ধে কমিশন আলোচনা করিবেন।

এই কমিশনে কে-কে সভ্য হইবেন তাহা পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

বড়োদার জুবিলী উৎসব—

সম্প্রতি বড়োদা-রাজ্যে জুবিলী উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে বরোদায় নানা-প্রকার উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। বরোদার প্রজা-সাধারণ মনে করিয়াছিলেন যে, এই উপলক্ষ্যে গাইকোয়াড় শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবেন এবং প্রজাদের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দিবেন। কিন্তু প্রজাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু মহারাজা এই উপলক্ষে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমি সুসভ্য রাজ্যসমূহের উন্নত আদর্শ অনুসরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। প্রজাদের কল্যাণের নিমিত্ত দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও সামাজিক দুর্নীতির উচ্ছেদসাধন করিতে যত্ন করিয়াছি। কোনো-কোনো বিষয়ে আমি বিফলমনোরথ হইয়াছি বটে, তবুও আমার আশা আছে যে, দেশের মধ্যে যদি প্রকৃতরূপে শিক্ষার বিস্তার হয়, তবে একদিন না একদিন আমার আদর্শ সার্থক হইবেই হইবে।"

ভারতীয় রেলওয়ে-সমূহের বিবরণ—

১৯২৪-২৫ সনে ভারতীয় রেলপথসমূহের অবস্থা-সম্বন্ধে সরকারী বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ-সনে গবর্ণমেণ্ট রেলপথগুলি হইতে মোট ১২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের রেলপথগুলির এ-বৎসরে মোট ১১৪ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা আয় হয়। তাহার মধ্যে ৬৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা মাল আমদানি রপ্তানিতে এবং বাকী টাকা যাত্রীদের কাছ হইতে ভাড়া বাবদে আয় হইয়াছে। এ-বৎসর মোট ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন মাল রেলপথসমূহে আমদানি-রপ্তানি হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৩৮২৭০ মাইল লম্বা রেল-লাইন আছে। উহার মধ্যে ১৫৪১৪ মাইল গবর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। গবর্ণমেণ্ট আরও ২২৮৫ মাইল রেলপথ সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আলোচ্য বৎসরের শেষভাগে ১২০১ মাইলের নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছিল।

ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য মহাসভা—

আগামী ১৯শে এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে শিল্প বণিজ্য মহা-সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে; দেশীয় শিল্প সংরক্ষণ, বয়ন-শুল্কের বিলোপ সাধন, বিলাসদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক স্থাপন, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন, স্বর্ণমুদ্রার জন্য টাঁকশাল স্থাপন, বিনিময়ের স্থায়ী হার নির্দ্ধারণ, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন, সর্ব্বত্র এক ওজন প্রচলন এবং বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে শিল্প-বাণিজ্য বিভাগ ভারতীয় সদস্যের হস্তে প্রদান।

নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—

নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ১৯২৫ সনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে কয়েকটি আশার কথা আছে। এই বৎসরের প্রারম্ভে মাত্র ৮টি সমিতি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন ৫১টি ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মোট সভ্যসংখ্যা একলক্ষ পঁচিশ হাজার। এই সমিতিগুলি রেলপথ, বয়নশিল্প, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম, নৌ-চালন, খনি ও বাণিজ্য প্রভৃতির কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করিতে পারে। গত বৎসরে তিনটি বড় ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। যথা :—নর্থ-ওয়েষ্টার্ন্ রেলওয়ে ধর্ম্মঘট, বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘট ও ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর ধর্ম্মঘট। এই তিন ক্ষেত্রেই শ্রমিকদিগকে ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। বোম্বাই মিল ধর্ম্মঘটের সময় বৃটেনের আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড্ ইউনিয়নগুলির নিকট হইতে অর্থসাহায্য আসিয়াছিল। ভারতীয় ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস তজ্জন্য উক্ত সমিতিগুলিকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ভারতের জন্ম-মৃত্যুর হার—

দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার সমিতি নিম্নলিখিত বিবরণে ভারতের জন্ম-মৃত্যুর হার (হাজার করা) দেখাইয়াছেন।

	১৯১৩		১৯২১	
	জন্ম	মৃত্যু	জন্ম	মৃত্যু
ভারতবর্ষ	৩৯'৩৭	২৮'৭	৩২'২৩	৩০'৫৯
মান্দ্রাজ	৩২'৯	২১'৪	২৭'০	২০'২
বোম্বাই	৬৪'৯৬	২৬'৬৩	৩২'৫৬	২৬'০
বাংলা	৩৩'৭৫	২৯'৬৮	২৮'০	৩০'১
যুক্ত-প্রদেশ	৪৭'৬৭	৩৪'৮৪	৩৪'৩৯	৩৯'৪৫
পাঞ্জাব	৪৫'৩	৩০'১৯	৪১'৫	৩০'১৩
বিহার-উড়িষ্যা	৪২'১০	২৯'১৪	৩৪'৬	৩২'৮০
মধ্য-প্রদেশ	৪৯'২৬	৩০'২৮	৩৭'৯	৪৪'০১
আসাম	৩৪'০৬	২৭'৬৬	২৭'৬৩	২৬'৬৮

ইহাতে দেখা যায় ভারতে জন্মের হার যেমন কমিতেছে মৃত্যুর হার তেমনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার প্রতিকার কি ?

ব্রহ্মদেশের বহিষ্কার আইন—

লেজিস্লেটিভ এসেম্ব্লীর বর্ত্তমান অধিবেশনে মিঃ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও মিঃ মোয়াং টো কাই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন যে ব্রহ্মদেশের বৈদেশিক অপরাধী বহিষ্কার আইন যাহাতে অবিলম্বে তুলিয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য ভারতসচিবকে অনুরোধ করা হউক। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে ভারত-সরকার যদি এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য না করেন, তবে উক্ত আইন রহিত করার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদে একটি সংশোধিত আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইবে।

ভারতে মদ্যপান-নিবারণ আন্দোলন :—

ভারতে মদ্যপান-নিবারণ আন্দোলন রীতিমতভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য গত ২৯শে ৩০শে, ও ৩১ শে জানুয়ারী দিল্লীতে এক বৈঠক বসিয়াছিল। দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত যমুনাদাস মেটা, ডাক্তার এস. কে দত্ত, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মওলানা মোহাম্মদ আলী, শ্রীযুত জি. এ নটেসন, হাজি ওয়াজিহুদ্দীন প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। বেগম মোহাম্মদ ইসমাইল খাঁর সভাপতিত্বে দিল্লীর পর্দ্দা পার্কেও ঐ উদ্দেশ্যে একটি সভা হইয়াছিল।

ভারতবন্ধু মিঃ বি, জি, হর্ণিম্যান,—

বোম্বে ক্রনিকেল পত্রের সম্পাদক মিঃ বি. জি. হর্ণিম্যানের নাম এ-দেশে সুপরিচিত। যে কয়েকজন ইংরেজ এ-দেশের দুঃখদুর্দ্দশায় ব্যথিত, এ-দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তন্মধ্যে তিনি একজন। ভারত-হিতৈষণার অপরাধ রাজপুরুষগণের চক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। সুতরাং ইংরেজ হইলেও তিনি তাহার যোগ্য লাঞ্ছনা-লাভ হইতে বঞ্চিত হন নাই। সম্প্রতি তিনি ভারতে প্রত্যাগমনের অনুমতি পাইয়া, আবার ক্রনিকেল পত্রের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কংগ্রেসের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করাই প্রত্যেক ভারত হিতৈষীর কর্ত্তব্য। সম্প্রতি তিনি কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বোম্বাই মিউনিসিপালিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ঝান্সীর রাণীর স্মৃতিস্তম্ভ—

সমগ্র ভারতের আদর্শস্থানীয়া বীররমণী ঝান্সীর রাণী স্বর্গীয়া লক্ষ্মী বাইয়ের একটি উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য সম্প্রতি আলোচনা চলিতেছে। গত নভেম্বর মাসে এই উদ্দেশ্যে ঝান্সীতে একটি জনসভা হইয়াছিল। এই কার্য্যের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হইয়াছে। ঝান্সীর মিউনিসিপ্যাল বোর্ড এই কার্য্যে ৫ হাজার টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, রণবেশে অশ্বোপরি অধিষ্ঠিতা রাণীর একটি প্রতিমূর্ত্তি, রাণীর নামযুক্ত একটি পার্ক ও পুস্তকালয় স্থাপন করা হইবে।

নাভার মহারাজার দুর্দ্দশা—

লাহোরের উর্দ্দু সহযোগী 'বন্দে মাতরম্' রাজ্যচ্যুত নাভার মহারাজার নিকট জনৈক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে মহারাজা তাঁহার নিকট বলিয়াছেন —

"আমাকে পদচ্যুত করিবার সময় সরকার এই সর্ত্ত করিয়াছিলেন আমাকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে। দেরাদুনে আসিবার ৮।১০ দিন পর আমি ৫০ হাজার টাকা পাইয়াছিলামও। তাহার পর গত দুই বৎসরের মধ্যে আর এক পয়সাও পাই নাই। সম্ভবতঃ সরকার এই চাল দিতেছেন যে, আমি ভাতার প্রার্থনা করি, তাহা হইলেই তাঁহারা এই কথা বলিবার সুযোগ পাইবেন যে, আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছি। সরকার সর্ত্তভঙ্গ করিয়া প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কথার মূল্য নাই। টীকা সাহেব আমার সহিত আছে; তাহার শিক্ষাদীক্ষার কোনো বন্দোবস্তও সরকার করিতেছেন না। সরকার আমার অনেক জিনিষ বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ব্রিটিশ ভারতে আমার যে বাড়ী ছিল, তাহাও বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কে আমার যে টাকা ছিল তাহাও বন্ধ করা হইয়াছে। আমি এখন মাত্র একবেলা করিয়া আহার করিতেছি।

"আমার সম্মান নষ্ট না হয়, এমন কোনো মীমাংসা করিতে আমি অস্বীকৃত নহি।"—আনন্দবাজার পত্রিকা

—

বাংলা

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী—

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে মহাত্মা গান্ধী ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছেন :

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ইহজগতে নাই, একথা বিশ্বাস করাও শক্ত। শান্তিনিকেতন হইতে একখানি টেলিগ্রাম পাইয়া জানিতে পারিলাম যে, 'বড়দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরতরে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় নব্বই হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যসম্পদ দেখিয়া বোঝা যাইত না যে, তাঁহার পার্থিব-অস্তিত্বের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। 'বড়দাদা' বিখ্যাত মনীষী পরিবারের কৃতী সন্তান ছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন—ইংরেজী যেমন জানিতেন, সংস্কৃত ভাষাতেও তেমন সুপণ্ডিত ছিলেন। 'বড়দাদা' অতি উদার, ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি উপনিষদের উপদেশ আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম হইতে তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। ভক্তের ঐকান্তিক নিষ্ঠা লইয়া তিনি দেশকে ভালোবাসিতেন। তাঁহার দেশপ্রীতি হিংসাপ্রসূত নহে। অহিংস-অসহযোগের আধ্যাত্মিক মাধুর্য্য তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রাজনীতিতে ইহার সার্থকতা তিনি কখনও অস্বীকার করিতেন না। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে চরকায় বিশ্বাস করিতেন এবং এই বৃদ্ধ বয়সেও খদ্দর ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যৌবনের উৎসাহ লইয়া সাময়িক ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।

"বড়দাদার মৃত্যুর অর্থ, আমাদের মধ্য হইতে একজন জ্ঞানবৃদ্ধ



মহাত্মা গান্ধী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী হেমপ্রভা দাসগুপ্তা

দার্শনিক-দেশভক্তের তিরোধান। আমি, কবি এবং শান্তিনিকেতনের অধিবাসীর প্রতি, তাঁহাদের গভীর শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ—

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এবারে তিনি ঢাকা, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিবেন। ঢাকার অধিবাসীগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও বিশ্বভারতীর ঢাকা-শাখার-কর্ম্মীগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি ও জন-সাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী উপলক্ষে তিনি আর-একবার ঢাকায় গিয়াছিলেন। এই তাঁহার দ্বিতীয়-বার ঢাকা-গমন। অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"ইতিপূর্ব্বে আমি আর একবার ঢাকায় আসিয়াছিলাম। সে-সময় আমি বলিয়া গিয়াছিলাম যে, ভিক্ষা দ্বারা মুক্তি আসিবে না। অদ্য মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে যে মানপত্র দিয়াছেন, তাহাতে সে কথার উল্লেখ আছে। একদল রাজনীতিক ক্ষমতালাভের জন্ত উপর্য্যুপরি আবেদন-নিবেদন করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সেই কথা বলিয়াছিলাম। আমি দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, সেবা ও আত্মত্যাগ ব্যতীত প্রকৃত কাজ হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ কুমিল্লায় অভয়-আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে সভাপতিত্ব করিবেন।

সামরিক শিক্ষায় বাঙালী—

সম্প্রতি লেজিসেটিভ্ এসেম্ব্লিতে একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারী বলিয়াছেন, ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এ-পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নিম্নলিখিত-মত ছাত্র সামরিক শিক্ষার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে :—

বোম্বাই—৩, পাঞ্জাব—১৬, যুক্তপ্রদেশ—৩, বিহার—১, আসাম—১, ব্রহ্মদেশ—১, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—২, রাজপুতানা—২, এবং হায়দরাবাদ—২। মোট—৩১। এই ৬ বৎসরে একজনও বাঙালী শিক্ষার্থ মনোনীত হয় নাই।

বাংলায় নারীনির্য্যাতন—

বাংলায় নানাস্থান হইতে নারী-নির্য্যাতনের সংবাদ আসিতেছে। সহযোগী আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি হইতে প্রতীয়মান হয়, এই গুণ্ডাদের অত্যাচার দিন-দিন শিরূপ বাড়িয়া চলিতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে।

"ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে আবার নারী নির্য্যাতনের সংবাদ আসিতেছে। কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা মিলিয়া আনন্দপুর গ্রাম হইতে একটি নমঃশূদ্রের মেয়েকে বলপূর্ব্বক তাহার বাড়ী হইতে লইয়া যায়। লইয়া যাইবার পথে মেয়েটি চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে থাকিলেও কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে সাহস করে নাই। দ্বিতীয় ঘটনাটি নারায়ণগঞ্জের, নির্য্যাতিতা মেয়েটি মুসলমান; জনকয়েক মুসলমান গুণ্ডা মিলিয়াই তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায় এবং নানাস্থানে রাখিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। মেয়েটির স্বামী একবার পুলিশের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিলেও, আদালত হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে আবার ঐ মুসলমান গুণ্ডারা তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যায়।

এইসব নারী-নির্য্যাতনের ব্যাপারে দুইটি জিনিষ চোখে পড়ে। প্রথম—অত্যাচারকারী পাষণ্ডেরা প্রায় সকল স্থলেই মুসলমান; দ্বিতীয়—গ্রামের লোক বা প্রতিবাসীরা এমনই কাপুরুষ ও ভীরু যে তাহারা এইসব লম্পট গুণ্ডাদের হাত হইতে নির্য্যাতিতা মেয়েদের উদ্ধার করিতে সাহস পায় না।"

শিশু-মঙ্গল ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী—

গত ২৫শে মাঘ লেডী লিটন কলিকাতায় শিশুমঙ্গল ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে চিত্র ও মডেলের সাহায্যে বাংলার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় দেখানো হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা—

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভার বাসন্তিক অধিবেশন হইবে। সভায় অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইবে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি দিলাম।

১। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়সের স্কুলের ছাত্রদের বাধ্যতামূলক ব্যায়াম-শিক্ষার প্রবর্ত্তন। এবং কলেজে সামরিক শিক্ষা-প্রবর্ত্তন।

২। বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ কলিকাতায়, ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করিবার নিমিত্ত আইন-প্রণয়ন।

৩। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ পুনরায় মন্ত্রীদের হস্তে প্রদান করিবার প্রস্তাব।

৪। সমস্ত রাজবন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার প্রস্তাব।

খাদি-প্রতিষ্ঠান—

খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র খাদি-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলায় খাদির যে কি অপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে এই প্রদর্শনী দেখিলে তাহা বোঝা যায়। প্রদর্শনী-গৃহে বড় বড় প্লাকার্ডে যে সব তথ্য লিখিত আছে, তাহাতে দেখা গেল বঙ্গদেশে প্রায় ১০ হাজার বাঙালীকে তাঁহারা অন্ন দিতেছেন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যাঁহারা ৬ হাজার টাকার কাপড় বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৮ হাজার টাকার খাদি বিক্রয় করিয়াছেন।

সুরমা-উপত্যকা রাষ্ট্র সম্মিলন—

আগামী ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হবিগঞ্জে সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্র সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

বাংলায় অবৈতনিক প্রাথমিকশিক্ষা—

বাংলায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার আলোচনার নিমিত্ত বাংলার প্রত্যেক বিভাগে সভা হইয়া গিয়াছে। বাংলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগেই এইসমস্ত সভাগুলি বসে। কোনো কোনো বিভাগের সদস্যমণ্ডলী শিক্ষাকর-স্থাপনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়াছেন, রাজসাহী ও অন্য কোনো-কোনো বিভাগের সদস্যগণ করস্থাপনের অনুকূলে মত দিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান কাহার হাতে থাকিবে, এ-বিষয়েও আলোচনা হইয়াছে। বিষয়টি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন।

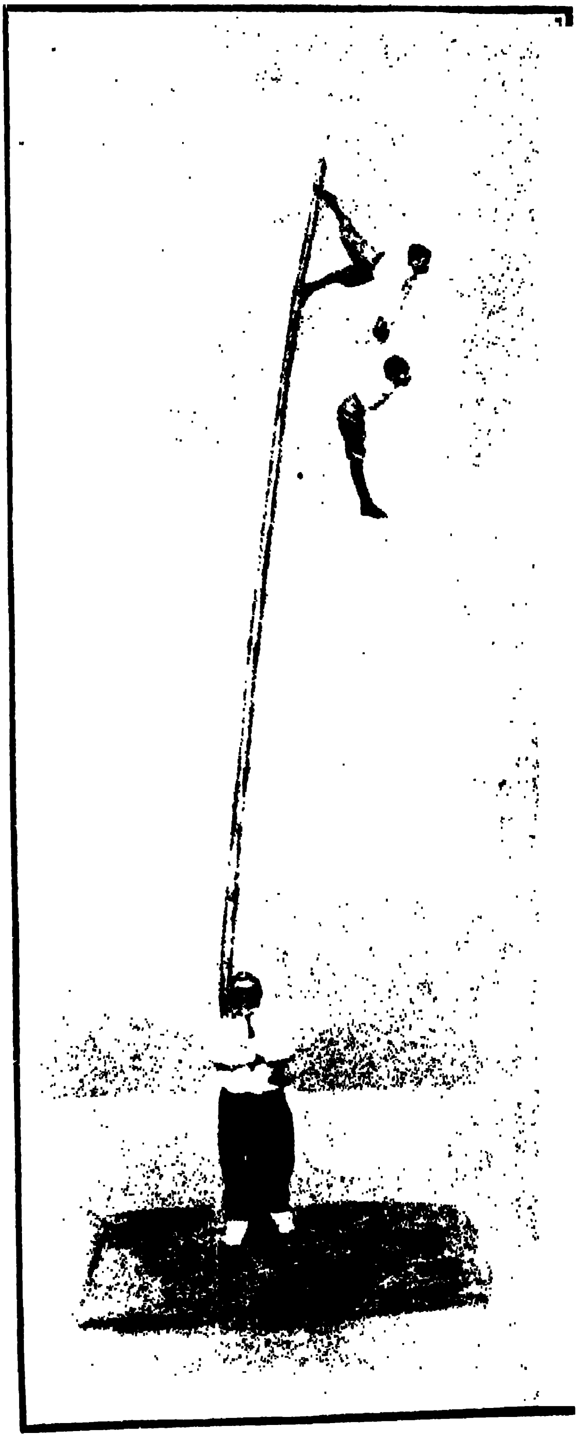
বঙ্গভুক্তি ও কাছাড়—

আসাম ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি আলোচিত হইবে, "এই কাউন্সিল আসাম গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন যে, কাছাড়-জিলার পার্ব্বত্য অংশ বাদ দিয়া কাছাড় জিলাকে শ্রীহট্টের সঙ্গে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিতে আসাম সরকার কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জ্ঞাপন করুন।" আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করি।

বঙ্গবীর মাষ্টার বসন্ত—

মাষ্টার বসন্ত, ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীগৌরহরি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম-সমিতির একজন উদীয়মান ছাত্র। এই সমিতি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেনিয়াটোলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাষ্টার বসন্তের বয়স বিংশতিবর্ষমাত্র। তিনি কলিকাতা মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

এই অল্প বয়সে মাষ্টার বসন্ত যেরূপ অদ্ভুত ও দুঃসাহসিক ব্যায়াম-ক্রীড়া অভ্যাস করিয়াছেন, তাহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি বহু যুবকবৃন্দ ও বালকবৃন্দকে ব্যায়াম শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। তিনি কলিকাতা ও বাহিরের কয়েকটি ব্যায়াম-সমিতিতে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। মাষ্টার বসন্ত ৩৫ ঘোটকের মটর-গাড়ীর গতিরোধ করিতে পারেন এবং সম্প্রতি তিনি একই দিকে ধাবমান দুইখানি গাড়ীর গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়া বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।



ব্যায়ামবীর মাষ্টার বসন্তের স্কন্ধোপরি একটি উচ্চ বংশদণ্ডের উপর অদ্ভুত শরীরাবর্ত্তন। ভারকেন্দ্রের অদ্ভুত সাম্যভাব; কেবলমাত্র বসন্ত কর্ত্তৃক প্রদর্শিত।

সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি সমিতি—

সম্প্রতি কলিকাতায় মহারাণী সুচারু দেবীর সভানেত্রীত্বে সরোজনলিনী দত্ত স্মৃতি সমিতির প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাৎসরিক রিপোর্টে প্রকাশ যে, গত বৎসরে ২৪ পরগণায় ১৩, ঢাকায় ৩, হাওড়ায় ৩, ময়মনসিংহে ৩, বাঁকুড়ায় ২, ফরিদপুরে ৫, যশোহরে ২, বরিশালে ১, বগুড়ায় ১, দার্জ্জিলিংএ ১, এবং শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ ও কুবাজপুরে ২টি, সর্ব্বসাকল্যে ৫৩টি শাখা-সমিতি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে কার্য্য করিতেছে এবং দিনদিনই শাখা-সমিতির সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গীয় বিধবা বিবাহ-সমিতি—

সমিতির কার্য্যকরী সম্পাদক লিখিতেছেন যে, শিক্ষিত ভদ্রবংশসম্ভূতা রূপেগুণে বিশেষরূপে প্রশংসনীয়া ১৮ জন হিন্দু বালবিধবার অভিভাবকবৃন্দ পুনরায় তাহাদিগকে বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন; তন্মধ্যে ৬টি ব্রাহ্মণ, ৮টি কায়স্থ ও ৮টি শূদ্র। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব বর্ণানুসারে হিন্দু-মতে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন।

বাংলার রাজবন্দীদের কথা—

(১) শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২০শে জানুয়ারী হইতে ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের বাড়ীতে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি আলীপুর সেণ্ট্রাল্ জেলে বদলী হইয়াছেন।

(২) মেদিনীপুর জেলার খেজরী নামক স্থান হইতে চিকিৎসার জন্যে শ্রীযুত বিনয়েন্দ্র চৌধুরীকে আবার আলীপুর সেণ্ট্রাল্ জেলে আনয়ন করা হইয়াছে।

(৩) ১৮১৮ সনের ৩নং রেগুলেশনের বন্দী ডাক্তার যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-বি-কে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল্ জেল হইতে আলীপুর সেণ্ট্রাল্ জেলে বদ্‌লি করা হইয়াছে। তিনি দাঁতের পীড়াতে ভুগিতেছেন।

(৪) শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার আটক-থাকার জায়গায় গিয়াছেন।

(৫) শ্রীযুত অংশুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পিতার অসুস্থতা-হেতু এক মাসের জন্যে ৬১, মালাঙ্গা লেনে বাস করার অনুমতি পাইয়াছেন।

(৬) নদীয়া জেলার শ্রীযুত পান্নালাল মুখোপাধ্যায় কয়দিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার হইয়া আলীপুর সেণ্ট্রাল্ জেলে আনীত হইয়াছেন।

(৭) শ্রীযুত কিরণচন্দ্র যে তাঁহার পিতার অসুখের জন্য তাঁহাদের ময়মনসিংহের বাড়ীতে ১৫ দিন বাসের অনুমতি পাইয়াছেন।

(৮) শ্রীযুত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এক সপ্তাহ বাড়ী যাইয়া থাকিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

(৯) শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী মুক্তি পাইয়াছেন।

(১০) শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চৌধুরীকে তাঁহার বাড়ীতে আটক রাখা হইয়াছে।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

পথ চেয়ে

শ্রী প্রিয়ংবদা দেবী

পথ চেয়ে বসে আছি,
শুধু আশা লয়ে বাঁচি,
কবে যে গিয়েছ তুমি চ'লে;
এ অদূর পথ চেয়ে আরবার যাবে গেয়ে,
চোখে চেয়ে যাবে কথা বলে,
পড়িবে তোমার আলো বুকের আঁচলে।
হেমন্তের শেষ রাতে জেলে দেবে নিজ হাতে
বরণের দীপ শত শত
আঁখিতে পরাণ আঁকি, কত আর ব'সে থাকি
নয় দিন সে দিনের মত।
উষার আরতি হিয়া চায় অবিরত।

আমি একে-একে তুলি' দিনু সব দিনগুলি,
অঞ্জলি করিয়া ছুটি পায়।
চঞ্চল পবনে তুমি আন্‌মনে গেলে চুমি'
বনানীর সীমন্ত-সীমায়।
ছুটে এসে সমীরণ, ক'রে নিল আহরণ,
অতুলন পরিমল যত প্রাণ চায়;
আমার পূজার ফুল তবে কি মনের ভুল
চায়নি কখনো জেগে উঠে?
চেয়ে দেখি দলে-দলে হোথা শ্যাম বনতলে
পূজারি পাতার করপুটে
মুদিত মুকুল দল পুষ্প হ'ল ফুটে।

পুস্তক পরিচয়

[পুস্তক-পরিচয়ের কিংবা পুস্তক-সমালোচনার সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম—প্রঃ সম্পাদক]

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস—শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত, শ্রী রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ সম্পাদিত। প্রকাশক—শ্রী নিশিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীশঙ্করমঠ, বরিশাল। চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ২৮৯ ৩৯২।

পূর্ব্বে তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চারিখণ্ডে নিম্নলিখিত আচার্য্যগণের মত সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—বাদরি, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, ঔড়ুলোমি, আশ্মরথ্য, কাশকৃৎস্ন, জৈমিনি, শঙ্কর, পদ্মপাদ, সুরেশ্বরাচার্য্য, সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি শ্রীকণ্ঠাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র, যামুনাচার্য্য, অভিনব গুপ্তাচার্য্য, নিম্বার্ক, শ্রীনিবাস ও যাদবপ্রকাশ।

বাদরি প্রমুখ আচার্য্যগণের বিষয়ে বিশেষ-কিছু জানা যায় না; ব্রহ্মসূত্রে ইঁহাদিগের বিষয়ে যাহা পাওয়া যায় গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শঙ্করপ্রমুখ আচার্য্যগণের বিবরণ কিছু বিস্তৃত। প্রথমে সংক্ষেপে চরিতাবলী, জীবন তাহার পরে এই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তাহার পরে ইঁহাদিগের দার্শনিক মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যাঁহারা বেদান্তদর্শনের ইতিহাস জানিতে চাহেন তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। এ-প্রকার গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই। আমাদিগের একটি বক্তব্য এই :—গ্রন্থকার আচার্য্যগণের আবির্ভাবের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন সে-বিষয়ে গুরুতর মতভেদ আছে।

The Evidences of Theism. The Four-fold Proof of God's Existence : শ্রী সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত; পৃঃ ৬০; মূল্য।০

সচরাচর চারিপ্রকার প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করা হয়। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় সুন্দর ভাষায় সংক্ষেপে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং যাঁহারা ঈশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তিকা পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

মহেশ চন্দ্র ঘোষ

সরোজ-নলিনী—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত, আই, সি, এস্ মহোদয় লিখিত। মূল্য।০ আনা। দি বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা।

সরোজ-নলিনী দেবীর মৃত্যুতে শুধু যে দত্ত মহাশয়েরই নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে, সমগ্র দেশ একটি কল্যাণপরায়ণা আদর্শ নারী হারাইয়াছে। গভীর পত্নী-প্রেমের নিদর্শন এই পুস্তকের ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে অথচ অকারণ উচ্ছ্বাসে জীবনটিকে আড়ম্বরপূর্ণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা ইহাতে নাই। জীবনীটি পড়িলে বুঝা যায় যে সরোজনলিনী দেবী সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে, পারিবারিক জীবনে কিম্বা কর্ম্ম-জীবনে, যথার্থ সহধর্ম্মিণী ছিলেন। অথচ তাঁহার উদার হৃদয় শুধু স্বামী ও সন্তানের সেবাতেই সম্পূর্ণ নিয়োজিত হয় নাই; তিনি এই দুর্দ্দশাক্লিষ্ট দেশের জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও চিন্তা করিয়াছেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ সরোজনলিনীর জীবনীর ভূমিকায় সত্যই বলিয়াছেন,—"আজকালকার দিনে যে-নারী কেবল একান্তভাবেই গৃহিণী তিনি আমাদের আদর্শ নহেন। ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্রই যিনি কল্যাণী তিনিই আদর্শ; যাঁহার জীবন কেবলমাত্র চিরাগত প্রাদেশিক প্রথা ও সংস্কারের ছাঁচে ঢালা, তিনি আদর্শ নহেন; কিন্তু যাঁহার মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান ও ভাবের বিচিত্র ধারা গভীর ও সুন্দরভাবে সঙ্গতি লাভ করিতে বাধা না পায় তিনিই আদর্শ।" সরোজনলিনী দেবীর জীবনে এই আদর্শ আমরা দেখিতে পাই।

প্রচ্ছদপটে বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু মহাশয়ের চিত্রটি সরোজ-নলিনীর জীবনকে তুলির রেখায় রূপ দিয়াছেন, পুস্তকটির ছাপা, কাগজ; বাঁধাই সুন্দর ও ইহা বহু চিত্রসম্বলিত। নামমাত্র।০ মূল্য করিয়া দত্ত মহাশয় দরিদ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অতি অল্পব্যয়ে এই সুন্দর আদর্শ জীবনীটি ঘরে-ঘরে বিরাজ করিবে।

শ্রী সজনীকান্ত দাস।

কর্ণ (সচিত্র)—৺ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রী নরেন্দ্রশঙ্কর দাসগুপ্ত, বগুড়া। ২য় সংস্করণ। মূল্য ।।৵০ আনা. পৃঃ ১৩৩। (১৩৩২)

৺ প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্তের চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া সাহিত্যিক মহলে খ্যাতি ছিল। এই সচিত্র শিশুপাঠ্য বইখানিতে কর্ণের চরিত্র-মাধুর্য্য সরল সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস বালক-বালিকাদের নিকট পুস্তকখানি আদৃত হইবে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

আরো মজা—শ্রী রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত ও আশুতোষ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৩২। (১৩৩২)

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু শিশুপাঠ্য গ্রন্থরচনায় সিদ্ধহস্ত। এই ছোটো ও মজার গল্পগুলি শিশুদের নিশ্চয়ই খুব ভালো লাগিবে। শিল্পী চারু-চন্দ্রের অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি সুন্দর হইয়াছে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

প্র

বিবিধ প্রসঙ্গ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে কলিকাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম হয়। বর্ত্তমান ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হইবার পর হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চা অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল। ৪ঠা মাঘ রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়; সেদিন প্রাতেও তিনি একটি স্বরচিত নূতন কবিতা অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে নূতন আকার প্রদান করেন। তাহা এ মাসের প্রবাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্ম্মিত ব্রোঞ্জ-প্রতিমূর্ত্তির ছাপ)

বাল্যকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তা ছাড়া তাঁহাদের বাড়ীর এক বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তিনি প্রত্যহ রামায়ণ মহাভারতের গল্প আগ্রহের সহিত শুনিতেন। সাত আট বৎসর বয়সেই তাঁহার বাংলা লেখার ঝোঁক চাপে। তখন যাহা কিছু মনে আসিত, তাহাই গদ্যে বা পদ্যে লিখিয়া ফেলিতেন।

তিনি প্রথমে বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর পড়িয়া ইংরেজী সেণ্টপল্‌স স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বাংলা শিখিবার ও লিখিবার তাঁহার যেরূপ আগ্রহাতিশয় বরাবর ছিল, ইংরেজী শিখিবার ও লিখিবার সেরূপ আগ্রহ তাঁহার কখনও হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ইংরেজী বেশ জানিতেন, এবং শেক্সপিয়ার, বায়রন্ ও কীট্‌সের গ্রন্থাবলী তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। ইংরেজীতে তিনি দর্শনের বহিও অনেক পড়িয়াছিলেন, বিশেষতঃ জার্ম্মান্ দার্শনিক কাণ্টের বহির অনুবাদ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন; গণিতজ্ঞ ছিলেন;—ভারতবর্ষের লোক ইহাতে কিছু অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। ভারতীয় দার্শনিক সংঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন, কাব্য, যাহা হউক—একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। স্বাতন্ত্র্য-প্রসূত অসূয়ার বালাই তাহাদের নাই; সুতরাং পাশ্চাত্য-সুলভ দণ্ডবিধির সাহায্যে অনধিকারপ্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না। দার্শনিকপ্রবর প্লেটো তাঁহার আদর্শ গণতন্ত্র রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে। কারণ, এদেশে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা, পণ্ডিতমণ্ডলীর রুদ্ধদ্বার খাস্-কামরা আশ্রয় করা নহে।.... আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধী-শক্তি শ্রদ্ধার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাবলী এইসকল কথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবন-স্মৃতি" পুস্তকে তাঁহার বড়দাদার কাব্যরচনার কিছু-কিছু আভাস দিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"বেশ মনে পড়ে বড় দাদা একবার কি একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য (burlesque) রচনা করিয়াছিলেন—প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড় বৈঠকখানা ঘরে তাহার রিহার্স্যাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু-কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যের কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনও মনে আছে—

ও কথা আর বোলো না আর বোলো না,
　　বলচ বঁধু কিসের ঝোঁকে—
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা
　　হাস্‌বে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে!

এত বড় হাসির কথাটা যে কি তাহা আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই—কিন্তু একসময়ে জানিতে পাইব এই আশাতেই মনটা খুব দোলা পাইত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের হাস্য অসাধারণ-রকমের ছিল। ১৩২১ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে গুপ্তনামা কোন লেখক তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন,

"হাস্যরসের সময় যে অট্টহাস্য শুনিয়াছি, সে হাস্য সমস্ত শরীর ও অন্তঃকরণ দিয়া একটি বিরাট সম্পূর্ণ হাস্য। তাহার মধ্যে কার্পণ্যের লেশমাত্র থাকিত না, বাড়ীর ছাদ দ্বিধা বিভক্ত হইবার উপক্রম হইত এবং করতলনিম্নস্থ টেবিলের কাষ্ঠখণ্ডের আয়ুঃশেষ হইবার উপক্রম হইত। এ হাসি গ্রামোফোনে তুলিয়া রাখিবার মত হাসি—সরস উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রাচুর্য্যে দীপ্তিময় হাসি।"

তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন পরমবন্ধু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হাসিও এইরকমের ছিল।

রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"তে তাঁহার বড় দাদার "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের উল্লেখ দুজায়গায় আছে। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সাম্‌নে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্ত বাতাসের মত কাজ করিত। বড় দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন-ঘন উচ্চ হাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেম্‌নি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।



দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবিত ফোটোগ্রাফ
(৭ ই পৌষ ১৩৩২ উৎসবের দিন গৃহীত)

"তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মত প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব-নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না।' সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি

না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না ; কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত !"

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

"সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চায় আমি অংশী ছিলাম।

"স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভাল লাগিত। বিশেষতঃ আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুসরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই এইরকমের কিছু একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

"স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্ত্তি ও কারুনৈপুণ্য! তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগান বাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথের মত কবি এবং অন্য অনেক সমজ্‌দার ব্যক্তি স্বপ্নপ্রয়াণের প্রশংসা করিলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমার যথার্থ কবিতার মুড্ যখন ছিল—অর্থাৎ সেই কালে—তখন আমি একাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই; ইহার রচনার সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মস্‌গুল ছিলুম, তাই জন্য উহাতে মেটাফিজিক্‌স্ ঢুকিয়াছে।" তাঁহার পক্ষে একথা বলা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ তিনি নিজের লেখার কঠোর সমালোচক ছিলেন; নিজে কিছু লিখিয়া সহজে সন্তুষ্ট হইতেন না। বার বার সংশোধন, এমন কি পুনর্লিখন চলিত।

স্বপ্নপ্রয়াণের আগে এবং পরেও তিনি অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পদ্যানুবাদ তাহার মধ্যে অন্যতম। তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ বাল্যকালের রচনা বলিলেও চলে। অথচ অনুবাদটি উৎকৃষ্ট। উহার কতকগুলি পংক্তি বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও পরিচিত ; যথা—

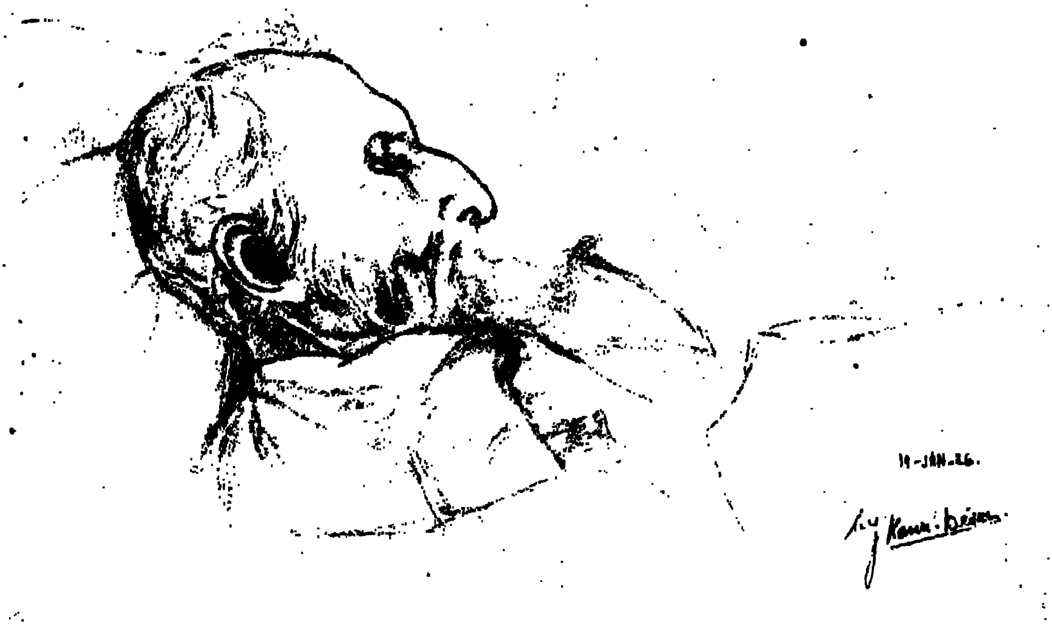
"কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়—"
"তাহারে নাচাত প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া
রণ রণ বাজে তায় বালা।"

হাস্যরসাত্মক কবিতা তিনি অল্পবয়সে লিখিয়াছিলেন, জীবিতকালের শেষ দুই তিন বৎসরেও লিখিয়াছিলেন। আগেকার হাস্যরসাত্মক কবিতার মধ্যে "গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য" তাঁহার পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। উহার শেষে এইরূপ ফলশ্রুতি আছে :—

"শুনিলে সুশ্রাব্য, এই কাব্য কবিকুল-অভাব্য
মধুর ছটা।
লভে ইষ্টসিদ্ধি, গোঁপবৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি,
কালো কি কটা॥
পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারি ভারি, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে॥"

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা দ্বিজেন্দ্রনাথকে অধীর করিয়া তুলিত। এক সময়ে তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল, কেন? ঐ সুদূর আকাশের বর্ণমাধুরী আমার চিত্তকে এমন নাড়া দেয় কেন? আমার মন এবং আকাশের সহিত কি সম্বন্ধ?" অতঃপর তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহার ফলস্বরূপ "তত্ত্ববিদ্যা" পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

"আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।" রবীন্দ্রনাথ এই বাক্যে যে প্রজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ সেই প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। পরলোকগত কবি



দ্বিজেন্দ্রনাথ
মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র শ্রীযুক্ত কানুদেশাই অঙ্কিত চিত্র)

শান্তিনিকেতনের অন্যতম শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজের এক বন্ধুকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন,

"মাটর্‌লিংকের 'প্রজ্ঞা ও নিয়তি' নামক বহিটি পড়িতেছিলাম—পড়িয়া দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা মাটর্‌লিংক করিয়াছেন। অত্যন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় শান্ত নিরহঙ্কার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের রহস্যের মুখামুখি শয়ান, অভিভূতব্য (?) চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে প্রজ্ঞা বা উইজডম্‌। সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্র বাবুর আছে।"

প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন।

"সংসারে লোকের অনেক দিক্‌ থাকে, সংসারীকে অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের যদি কোন দিক্‌ থাকে, যদি তিনি সমগ্র জীবনে কিছু আরাধনা করেন, তবে তাহা এক মাত্র জ্ঞান। সংসারে আমার যে-সকল ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আর একজনকেও দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় জ্ঞানের অনন্যনিষ্ঠ সেবক দর্শন করি নাই। এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও কি দিন, কি রাত্রি, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর জ্ঞানচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। উৎসাহসম্পন্ন যুবকের ক্লান্তি আছে, কিন্তু শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচিন্তায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কখন ক্লান্তি দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধিবাসিগণ গভীর নিশীথ সময়ে সুষুপ্ত, শালসমীরণ তাহাদের ললাট স্পর্শ করিয়া দিবসের ক্লান্তিখেদকে অপনয়ন করিতেছে, আশ্রমলক্ষ্মী শান্ত-স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানকার আমলক কুঞ্জের অধিদেবতা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনও জাগিয়া রহিয়াছেন; ভৃত্য মুনীশ্বর

দুই ধারে দুইটি মোমবাতী জ্বালিয়া দিয়াছে, আর তাঁহার লেখনা অবিশ্রাম চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন লোহিত রাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! দ্বিজেন্দ্রনাথের এ নিশাকাহিনী পিতামহীর কাহিনী নহে।"

প্রবাসীর যে সংখ্যায় এই বাক্যগুলি বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই গুপ্তনামা পূর্ব্বোক্ত লেখকও বলিয়াছিলেন,

"পূর্ব্বে দেখিয়াছি লিখিতে লিখিতে ভোর হইয়া গেল,



দ্বিজেন্দ্রনাথ
(মৃত্যুর পরে)

চাকরকে ডাকিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন, প্রভাতের বিহঙ্গম বৈতালিকগণ তাহাদের গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর শয়ন করা হইল না, স্নান করিয়া দৈনিক দুই মাইল পর্য্যটন সমাপ্ত করিয়া চা পান করিয়া আবার খাতা লইয়া লিখিতে বসিলেন।"

তিনি দর্শনশাস্ত্রের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। উহার চর্চ্চা ও চিন্তাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় যাপিত হইত। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে তিনি উচ্চাঙ্গের গণিতের অনুশীলন করিতেন। তাঁহার রেখাক্ষর বর্ণমালা বিশ্রামকালে লিখিত। একান্ত বিশ্রাম করিতে চাহিলে তিনি সূতা বা আঠার সাহায্য না লইয়া বিচিত্র কৌশলে কেবল ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া কাগজের নানা-রকম খাতা, খাপ, ব্যাগ, পেটিকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেন। তিনি প্রবাসীতে যে অগণিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সমুদয় এইরূপ খাতায় লেখা। তাঁহার চিঠিও খামের মধ্যে পুরিয়া পাঠাইতেন না, সুকৌশলে তাহা ভাঁজা হইয়া আসিত। তিনি যাহাদিগকে স্নেহ করিতেন, তাহারা কলম পেন্সিল লেফাফা প্রভৃতি রাখিবার এক একটি কাগজের পেটিকা উপহার পাইত। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও একটির অধিকারী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে খুব বেশী বহি পড়িতেন, তাহা নহে; কিন্তু পাঠ অপেক্ষা চিন্তা করিতেন বেশী। তিনি গীতার ও উপনিষদাদি হিন্দু শাস্ত্রের যে-সকল ব্যাখা স্বদেশবাসী-দিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার অসাধারণ চিন্তাশক্তির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিভার বলে অন্যে যে-সকল সত্যের অস্তিত্ব অনুমান করে না, তিনি শাস্ত্রবচন হইতে তাহা পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইতেন

ইউরোপ হইতে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁহার বড় দাদাকে একখানি চিঠি লেখেন, তাহাতে এইরূপ মর্ম্মের কথা ছিল, যে, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ভারতীয় দর্শনে ও জ্ঞানে সামান্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও যাহা বলিতেছেন, তাহাতে ইউরোপীয়েরা বিস্মিত হইতেছে। এই জন্য তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে এই অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন ইংরেজীতে ভারতীয় জ্ঞানসম্ভার ইউরোপীয়-দিগের নিকট উপস্থিত করেন; তাহা হইলে তাহারা উপকৃত ও মুগ্ধ হইবে। এই চিঠি যখন আসে, তখন আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিঠিখানি আমাদিগকে পড়িতে দেন; তাহার পর নিজের ইংরেজী লেখার অনভ্যাস প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, পরোক্ষভাবে, কেন যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহা জানান। প্রসঙ্গক্রমে সেই সময়ে তিনি



দ্বিজেন্দ্রনাথের শবদেহ

আমাদিগকে বলেন, "রবির wonderful literary powers (আশ্চর্য্য সাহিত্যিক শক্তি) আছে," অর্থাৎ কিনা "রবি" যাহা পারে সকলের পক্ষে কি তাহা সুসাধ্য ? রবীন্দ্রনাথও প্রৌঢ় বয়সে ইংরেজী লিখিতে আরম্ভ করেন। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ যদি ইংরেজী লেখার অভ্যাস করিতেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা জগৎ উপকৃত হইত।

দর্শনের প্রসঙ্গে আমাদের একটি আখ্যান মনে পড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সাতিশয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, এবং ভারতীয় দর্শনের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বাংলার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড্ রোনাল্ড্‌শে আমাদের যুবকদিগের পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা কিম্বা পাশ্চাত্য দর্শনের পূর্ব্বে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করেন, তখন আমরা তাঁহার প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে হইয়াছিল, যে, আমাদের লেখায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই। এই কারণে তিনি হঠাৎ একদিন প্রাতে তাঁহার রিক্‌শাটি আরোহণ করিয়া আমাদের তখনকার শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজনার সহিত যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহার দেশাভিমানে ও ভারতীয় দর্শনের প্রতি ভক্তিতে আঘাত লাগিয়াছে। ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমাদের যে কোনও অশ্রদ্ধা নাই, তাহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যাহা করা দরকার তাহা করিয়াছিলাম এবং তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আর একবার, প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভার্থ ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অসমর্থ, এইরূপ কিছু লিখিবার কথা উত্থাপিত হয়। তাহাতে, ওরূপ কোন কথা লিখিলে ভারতবর্ষের অপমান করা হইবে, এই মত তিনি প্রকাশ করেন।

এণ্ড্রুজ্ সাহেব শান্তিনিকেতনে থাকিতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া ও চা খাইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার

সহিত যাপন করিতেন। তিনিও এণ্ড্রুজ্ সাহেবকে স্নেহ করিতেন। তথাপি, একদিন দেশে কি একটা অত্যাচারের কথা খবরের কাগজে পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে (অর্থাৎ ইংরাজদের মধ্যে অত্যাচারীদিগকে) তাড়াইয়া না দিলে আর শান্তি নাই" (ইংরেজী কথাগুলা ইহা অপেক্ষা জোরাল ছিল; তাহা লিখিলাম না)। তাহাতে এণ্ড্রুজ্ সাহেব দ্বিজেন্দ্রনাথের এক পৌত্রকে বলিয়াছিলেন, "I say,—, your grand-father is a terrible—." তাঁহার স্বদেশ-প্রেম কিরূপ ছিল, তাহার আভাস দিবার জন্যই এই কথাগুলি লিখিলাম; নতুবা ধীর শান্ত (যদিও বীর্য্যবান্) দ্বিজেন্দ্রনাথ যে হিংসামূলক কোন হঠকারিতার সমর্থন করিতেন না, তাহা তাঁহার ভক্তমাত্রেই জানেন।

ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ম্রিয়মাণ থাকিতেন ও তজ্জন্য ক্ষোভ লইয়া মরিবেন,এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত প্রচেষ্টায় তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ইহার পর তাঁহার হৃদয় হইতে নৈরাশ্যের ভাব চলিয়া যায়। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভাল-বাসিতেন, এবং আমাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর বলিতে শুনিয়াছি।

"ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার,
ভয় নাই আর কিছুতে তার ॥"

তিনি এই আনন্দের অন্বেষণে অন্তিম বৎসরগুলি ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার অধিকারী হইয়া অনেক দিন জীবিত থাকিয়া তিনি শান্তিতে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। "দ্বিজের ত্রিজন্ম" কবিতা-টিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রপৌত্র ধনজনবিভব সবই ছিল, কিন্তু তিনি অনাসক্ত গৃহী ছিলেন। অথচ তিনি যে আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। তাঁহার অনেক কথায় তাহাদের প্রতি স্নেহের পরিচয় অনেক বার পাইয়াছি।

তাঁহার বাসভবনসংলগ্ন আমলক-কুঞ্জের জীবগুলির প্রতি তাঁহার স্নেহকরুণা দেখিলে প্রাচীনকালের শান্ত-রসাস্পদ তপোবনের কথা মনে পড়িত। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, এবং আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি:—

"তিনি নিরুপদ্রবে একাকী বসিয়া জ্ঞানসমুদ্রের রত্নগুলি আহরণ করিতেছেন, আর সম্মুখের আমলক তরু হইতে পাখী নিজের মনে তাঁহার গায়ে মাথায় আসিয়া বসিতেছে, খেলা করিতেছে, আবার খাবার খাইতেছে; কাঠবিড়ালগুলিও লাফাইয়া লাফাইয়া এইরূপ খেলা করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভৃত্যকে দিয়া ইহাদের উপযুক্ত আহার প্রচুররূপে সংগ্রহ করাইয়া নীরব চিন্তায় বসিয়া আছেন। কাহারো কোন উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই সকলেই যেন বলিতেছে, সর্ব্বা আশশা মম মিত্রং ভবন্তু—সমস্ত দিক্ আমার মিত্র হউক! মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে—মিত্রের চক্ষুতে আমরা দর্শন করি! একদিন একটি পাখী তাঁহার কাঁধে বসিয়া খেলিতে খেলিতে সহসা ঠোঁট দিয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে। চোখটি ইহাতে অত্যন্ত লাল হইয়া উঠে। সংবাদ পাইয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়াছি, এমন সময় দেখি তিনি স্বয়ং আমাদের নিকট উপস্থিত। দেখিয়াই বুঝিলাম চোখে বেশ আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু তিনি বলিলেন—'না, ও বিশেষ কিছু নহে, এখনই সারিয়া যাইবে। ও তো আর ইচ্ছা করিয়া আমায় কষ্ট দেয় নাই!' দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরস হইয়া যান নাই, তাঁহার 'ভূতদয়া' এইরূপই পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

এই বিষয়ে প্রবাসীর পূর্ব্বোক্ত গুপ্তনামা লেখকও লিখিয়াছিলেন:—

"শালিক চড়াই কাঠবিড়ালী আসিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গায়ের উপর, মাথার উপর, খাতার উপর নির্ভয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে বিচরণ করিতেছে। লেখার ব্যাঘাত হইলে মাঝে মাঝে 'আঃ বড় জ্বালাতন করুচে' বলিয়া বৃদ্ধ চেঁচাইয়া উঠিতেছেন, তাহারা ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া যাহারা যেমন ছিল তেমনি রহিল, কেবল কাঠবিড়াল ভদ্রতার অনুরোধে লেখার টেবিল ছাড়িয়া পার্শ্বস্থিত পাথরের টেবিলে লাফাইয়া চড়িয়া লেজে ভর করিয়া বসিল।"

চোখের ভিতরে পূর্ব্বোক্ত পাখীটি ঠোকরাইয়া দেওয়ায় তাঁহাকে পনের দিন চোখ বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। "রাগিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে যখন দেখিলেন সে উপস্থিত নাই, ত' ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'আহা, তাড়াতে



ছাতিম তলায় দ্বিজেন্দ্রনাথের শবদেহ

বল্‌লেই কি তাড়াতে হয়! যা তাকে ডেকে নিয়ে আয়।' ডাকিয়া আনিতে হইল না, সে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।"

"দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠিয়া দেখিলেন একটি শীর্ণদেহ কুকুর বারাণ্ডায় শুইয়া শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং কুঁই কুঁই করিয়া কাঁপিতেছে। তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন, বলিলেন 'তোদের কি কোনও মায়া দয়া নেই! আহা, কুকুরটা এইরকম ক'রে কাঁদ্‌চে, আর তোরা দরজা বন্ধ ক'রে ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমুচ্ছিস্?' এই বলিয়া আপনার একখানি নূতন লালরঙের কম্বল আনিয়া কুকুরের গায়ের উপর তাহা চাপা দিয়া যখন দেখিলেন যে সে কতকটা সুস্থ হইয়াছে, তখন আবার ফিরিয়া গিয়া আপনার বিছানায় শয়ন করিলেন।"

কোন মানুষ তাঁহার কথায় বা আচরণে ক্লেশ পাইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে তিনি ব্যথা পাইতেন এবং তাহার যথাসম্ভব প্রতিকার করিতেন। তাঁহার কোন কথায় কেহ হয়ত রাগ করিয়াছে এরূপ ভ্রমও তাঁহার কখন কখন হইত। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর একটি কি বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবার পরেই আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসি। আমি বোধ হয় একটু হঠাৎ আসিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার সন্দেহ হয়, যে, আমি বুঝি বা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। সেই জন্য কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'বাবু মহাশয় আপনাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন'। আমি গেলে তিনি নিজের সন্দেহের কথা বলিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলাম, যে, তাঁহার কথা শেষ হওয়ায় ও আমার অনেক কাজ থাকায় আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম, অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি আমাদের সকলের এরূপ পূজনীয় ও ভক্তিভাজন ছিলেন, এবং সকলকে এরূপ স্নেহ করিতেন, যে, তিনি তিরস্কার করিলেও (আমাদিগকে

তাহা কখনও করেন নাই) আমাদের অসন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া, সেদিন তিনি, অন্য কোন কোন দিনের মত, বম্‌ওয়েচ্ নামক জার্ম্যান মিশনারীর বাংলা কথাবার্ত্তা ও বাংলা কবিতা পাঠের হাস্যকর অনুকরণ করিতেছিলেন; এবং অন্যবিধ লঘু কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সুতরাং তাঁহাকে যে চিনিত না, এরূপ লোকেরও সেদিনকার কথাবার্ত্তায় কোন বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের সহিত ব্যবহারে তাঁহার শিষ্টতার ও কোমলহৃদয়ের পরিচয় এইরূপ সামান্য সামান্য ঘটনাতেও পাওয়া যাইত। আপন আপন অভিজ্ঞতা হইতে অন্য অনেকেও এইরূপ ঘটনার বৃত্তান্ত দিতে পারিবেন।

কোনপ্রকার অহমিকা প্রকাশ তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। পরোক্ষভাবেও যাহাতে নিজের বা নিজ পরিবারের কোন বড়াই করা না হয়, সে-বিষয়ে তিনি এরূপ সতর্ক ছিলেন, যে, উহা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। আমি একবার তাঁহাকে বলি, যে, তাঁহার বাল্য ও যৌবন কালে বঙ্গের সামাজিক ও অন্য নানাবিধ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু লেখেন, ত, তাহা উপাদেয় হইবে ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তাহাতে সেরূপ কিছু না লিখিবার দুটি কারণের তিনি উল্লেখ করেন। একটি এই, যে, তাঁহার স্মৃতি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, অনেক কথা ভাল করিয়া মনে নাই। দ্বিতীয় কারণ এই বলেন যে, উহা লিখিতে গেলে তাঁহাদের নিজেদের পরিবারের কথা এত বলিতে হইবে, যে, তাহা আত্মম্ভরিতা মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ, তিনি এই দ্বিতীয় কারণটি যত গুরুতর মনে করিতেন, উহা তাহা নহে। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার স্বভাবনম্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার অন্তরে যেমন একটি সহজ সরল দর্পহীন তেজস্বিতা ছিল, বাহিরের পরিচ্ছদেও তিনি তেমনি, অন্যের মতামতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, নিজের অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুসারে চলিতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন,

"তাঁহার আচার ব্যবহার সমস্তই প্রয়োজন অনুসারে, প্রচলিত প্রথা বলিয়া তাঁহার নিকটে কিছু নাই। চশমার যে-যে স্থান শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব হয় বলিয়া তিনি চশমার সেই সেই স্থানে তুলা জড়াইয়া লইবেন। বেড়াইবার সময় চাপকান ঝুলিয়া থাকায় অসুবিধা হয়, তিনি বাম-দক্ষিণ স্কন্ধে মোটা ফিতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া চলিবেন। চটি জুতার বুড়ো আঙুলে লাগে, তিনি তজ্জন্য জুতার সেই স্থানটুকু গোল করিয়া কাটিয়া লইবেন। [তিনি শীতকালে গরম মোজার ভিতর হাত ঢুকাইয়া সুতা দিয়া মোজা ও জামার আস্তিন হাত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতেন, যেমন বাইসিক্‌ল্ আরোহীরা মোজা ও পাতলুন পায়ে জড়াইয়া বাঁধে; ইহাও শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতে পারিতেন।] যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করিবেন, তা যে-কোন বিষয়েই হউক; আহার-বিহার বসন-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই তাঁহার এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই করেন না।"

একবার এণ্ড্রুজ্ সাহেব তাঁহাকে একটি গরম ওভার-কোট্ উপহার দেন। তিনি উহা লইয়াছিলেন, কিন্তু গায়ে না দিয়া উহার দ্বারা তাঁহার কেদারাটি মুড়িয়া তাহাতে বসিতেন।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু না করার যে নিয়ম, শব্দপ্রয়োগসম্বন্ধেও তিনি তাহা রক্ষা করিতেন। সকল-রকম লেখাতেই তিনি বিশেষ বিবেচনা ও ওজন করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই জন্য তাঁহার লেখায় তাঁহার চিন্তা ও ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইত।

তিনি বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মানুষ বুঝিয়া চতুরতাপূর্ব্বক মত বা মনের ভাব গোপন করিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। এই জন্য কখন কখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হাস্যকর অবস্থা ঘটিত। একদিন মিঃ এণ্ড্রুজ্ ও আমি তাঁহার সহিত সন্ধ্যায় দেখা করিতে গিয়াছি। সেদিন তিনি, আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যেও অনেক সময় কেমন উচ্চ ধর্ম্মভাব ও দার্শনিক চিন্তা লক্ষিত হয়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে, খৃষ্টিয়ান্ মিশনারীরা যে আমাদের দেশের লোককে পুতুলপূজক বলিয়া ভুল বুঝে ও অবজ্ঞা করে, এই মর্ম্মের নানা কথা খুব উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন। শ্রোতা দুজনের মধ্যে এক-

জন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহী, তাহা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। আমরা যখন বিদায় লইয়া নিজ নিজ আবাসে চলিলাম, তখন এণ্ড্রুজ্ আমাকে ইংরেজীতে বলিলেন, "আজ বড় দাদার কথোপকথন খুব ইন্টারেষ্টিং হইয়াছিল।" আমি চুপ্ করিয়া এই মন্তব্যের রসটুকু উপভোগ করিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের ছাপকে মোটেই মূল্যবান্ মনে করিতেন না; এই জন্য বহুবার আমাদের সাক্ষাতে বি-এ এম্-এ-দের সম্বন্ধে এরূপ অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যাহা শুনিলে তাঁহারা খুশ হইবেন না। তাঁহার শ্রোতাও বিশ্ববিদ্যালয়ের দাগী লোক, তাহা তাঁহার মনে থাকিত না; অথবা হয়ত তাঁহার স্নেহগুণে তিনি তাহাকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ, শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধেও তাঁহার কতকগুলি প্রতিকূল ধারণা ছিল। কিন্তু তাহার জন্য, ঐরূপ যেসব মহিলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতি কম ভক্তিমতী ছিলেন না। আজকালকার মেয়েরা যে সেকেলে ভাল ভাল রান্না ভুলিয়া যাইতেছেন, এটা তাঁহার একটা অভিযোগ ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যেমন বিস্তর সত্য আখ্যানমালা সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাহা হওয়া উচিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তি বিস্ময়কর ছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও তিনি কেবল নিজের চিন্তা-প্রভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তরভাবে বলিয়াছেন, যে, ইহা এইরূপ হইতেই হইবে। আনন্দের বিষয় বস্তুতও তাহা সেইরূপই শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে।" "তাঁহার শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচর্চ্চায় সফলতা লাভের একটি প্রধান কারণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা। তাঁহার হৃদয় কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কারে কলুষিত নহে।...হউক না কেন ভিন্ন সম্প্রদায়, তিনি কাহারও প্রতি কোন অনুচিত আরোপ সহ্য করেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। একদিন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করেন, যে, হিন্দুগণের শ্রীকৃষ্ণের যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অতি কুৎসিত; এবং ইহা অসভ্য বর্ব্বর জাতিগণের কল্পনা হইতে লওয়া হইয়াছে। কথাটা ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কর্ণে গিয়া পৌছে। দিবা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, প্রখর রৌদ্র, বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী ধীরপদক্ষেপে উপস্থিত হইয়া মৃদুতীব্র ভাষায় তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া উপসংহার করিলেন—'শ্রীকৃষ্ণের কুৎসিত রূপের কথা কোথায় আছে? সর্ব্বত্রই ত তাঁহাকে 'শ্যামসুন্দর' 'মদনমোহন' বলা হইয়াছে!"

যুবা সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রকৃত আইডিয়্যালিষ্টের প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম। ইঁহাদের একটি লক্ষণ এই, যে, ইঁহারা যে কথাই বলুন, তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন—বাইরের লোক সাম্নে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি—জাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি কথাবার্ত্তা সব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, কি তীব্রতা, কি তেজ প্রেরিত হইতে বাধ্য।......দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে সরল ভাব তো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় জোরের অথবা বীর্য্যের ভাব আছে। এইসকল জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে।"

—

সূর্য্যগ্রহণ

গত ২০ শে পৌষ সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ণয় ও সত্য আবিষ্কারের নিমিত্ত ঐ উপলক্ষে সুমাত্রাদ্বীপে যে পাশ্চাত্য নানা জাতির লোকে পর্য্যবেক্ষণমঞ্চ নির্ম্মাণ ও দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে বলিয়াছি। পর্য্যবেক্ষণের ফলও পরে পাঠকদিগকে জানাইবার ইচ্ছা আছে। ভারতবর্ষে সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হয় নাই। হইলেও এখানে আমাদের দেশের লোকেরা পর্য্যবেক্ষণের কোন সমুচিত ব্যবস্থা করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। প্রথমতঃ, ভারতে যথেষ্ট জ্ঞানবান্ বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা কম; দ্বিতীয়তঃ, এরূপ লোক যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের যথেষ্ট আর্থিক আনুকূল্য পাইবার সম্ভাবনা কম, এবং হয়ত সেই কারণে ও অন্যান্য কারণে উদ্যোগিতাও কম।

ভারতবর্ষে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে নানা তীর্থে স্নানার্থীদের খুব ভীড় হইয়াছিল। গ্রহণের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। তাহা জানিয়া তাঁহারা, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ কখন হইবে, তাহা গণনা করিবার নিয়মও লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে গণনা করিয়া আমাদের পঞ্জিকাকারেরা গ্রহণের দিন-ক্ষণ পঞ্জিকায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গ্রহণ-সম্বন্ধে এইরূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে থাকা সত্ত্বেও অন্তবিধ এবং ভ্রান্ত ধারণাও চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাই অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসবশতঃ অসংখ্য নর-নারী সূর্য্যকে রাহুর গ্রাস হইতে বাঁচাইবার জন্য শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন, এবং নিজেদের অশুচিতা ক্ষালনার্থ তীর্থস্থানে স্নান করিয়া থাকেন।

কলিকাতায় গঙ্গার নানা ঘাটে লক্ষ লক্ষ নরনারী ৩ শে পৌষ স্নান করিয়াছিলেন। নানাপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য, আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য, সঙ্গীহারা স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে তাহাদের অভিভাবক-দের হাতে অর্পণ করিবার জন্য, বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যূষ হইতে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাঁদের আত্মোৎসর্গ ও নিয়মানুগত্য অতীব প্রশংসনীয়।

—

মাঘমেলা ও সূর্য্যগ্রহণ-স্নান

প্রয়াগে প্রতিবৎসর মাঘমাসে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে মাঘমেলা হইয়া থাকে। মেলা একমাস থাকে; কিন্তু প্রথম দিন ও শেষ দিনেই বেশী ভীড় হয়। এই এই দিনে প্রায় দুই তিন লক্ষ লোক স্নান করে। সাধারণ মাঘমেলায় সচরাচর খাদ্য মিষ্টান্ন ব্যতীত অন্য কিছু বড় বেশী বিক্রী হয় না। কিন্তু বার বৎসর অন্তর যে কুম্ভমেলা এই মাঘমাসেই হয় তাহাতে কাপড়, বহি, বাসন, খেলনা, মিষ্টান্ন, পট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। কোন কোন কুম্ভমেলায় ত্রিশ লক্ষ পর্য্যন্ত লোক প্রয়াগে সঙ্গমে স্নান করে।

বর্ত্তমান বৎসরে মাঘমেলার প্রথমে সূর্য্যগ্রহণও পড়ায় স্নানার্থীর ভীড় খুব বেশী হইয়াছিল। এইরূপ অনুমিত হইয়াছে, যে, প্রায় পঁচিশ লক্ষ লোক এবার স্নান করিয়াছিল। আমরা গ্রহণের পূর্ব্বদিন ও গ্রহণের দিন যাত্রীর জনতা দেখিতে গিয়াছিলাম। তিন দিকের তিনটি রেলওয়ে যারা প্রয়াগে পৌঁছা যায়। তিন ষ্টেশনেই কয়েক দিন ধরিয়া লোকারণ্য হইয়াছিল। যাত্রীদের সাতিশয় কষ্ট হইয়াছিল—বিশেষতঃ ফিরিবার সময়। তাহারা বস্তার মত মাল গাড়ীতে পর্য্যন্ত ঠাসা বোঝাই হইয়া যাতায়াত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অথচ আইন মানুষকে এইরূপ যন্ত্রণা দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা লক্ষলক্ষ টিকিট বিক্রী করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন; যাত্রীদের অসুবিধা নিবারণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই। শুনিয়াছি, পাণ্ডারা স্নান উপলক্ষে তাহাদের লব্ধ বহু অর্থের কিছু অংশ ষ্টেশনে হস্তান্তর করিয়া গাড়ীতে কোন প্রকারে ঠাসিয়া ঠুসিয়া যাত্রী বোঝাই করিয়াছিল; ঐপ্রকারে অর্থব্যয় করায় রেলওয়ের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে বাধা দেয় নাই। এক দল যাত্রীর নিকট হইতে যথাসাধ্য আদায় করিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া অন্য আরো যত দলের নিকট তাহারা আদায় করিতে পারে, ততই তাহাদের লাভ।

গঙ্গাতটে কিন্তু যাত্রীদের জন্য নির্ম্মল জল সরবরাহের ও তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রয়াগের সেবাসমিতি হারান ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের আত্মীয়দের হাতে অর্পণ করিবার নিমিত্ত এবং অন্যান্য-প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা ও সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সঙ্গমস্থলে কেহ ডুবিয়া গেলে তাহাদের উদ্ধার ও প্রাণরক্ষার জন্যও বন্দোবস্ত ছিল।

এবার সঙ্গম গঙ্গার বাঁধের প্রায় দুই মাইল নীচে হওয়ায় সুবিস্তৃত বালুকাময় নদীতটে যাত্রীদের থাকিবার ও চলা ফিরা করিবার অসুবিধা হয় নাই। প্রায় পাঁচবর্গ মাইল স্থান যাত্রীরা পাইয়াছিল।

গ্রহণের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, অনেক পুরুষ ও নারী বালুকার উপর নিজেদের সামান্য খাদ্য পাক করিতেছে। তাহারা সেই খানেই রাত্রি যাপন করিবে।

অধিকাংশের কোন বিছানা লেপ কাঁথা নাই; গায়ে যে সামান্য কাপড় আছে তাহাতেই তাহারা খোলা জায়গায় আকাশের নীচে বালির উপরে এলাহাবাদের রাত্রের দারুণ শীত কাটাইবে। কেহ কেহ কিছু খড় সংগ্রহ করিয়াছে; তাহারই উপর রাত্রি যাপন করিবে। বাকী অধিকাংশের বালুকাশয্যা। হিংস্রতায় ভারতীয়েরা পৃথিবীর নানা জাতির নিকট পরাভব স্বীকার করিতে পারে; কিন্তু সাদাসিধা জীবনযাপন প্রণালী ও কষ্টসহিষ্ণুতায় অন্য কোনও সভ্য জাতি তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। আমাদের জ্ঞান বাড়ুক, ঐশ্বর্য্য বাড়ুক, ইহা আমরা চাই; কিন্তু সাদাসিধা-ভাবে জীবন যাপনের ক্ষমতা ও কষ্টও অসুবিধা সহিবার ক্ষমতা আমাদের না কমে, এই ইচ্ছা আরও অধিকপরিমাণে করি।



প্রয়াগ-ঘাট ষ্টেশন (ও, আর্ রেলওয়ে) দারাগঞ্জ

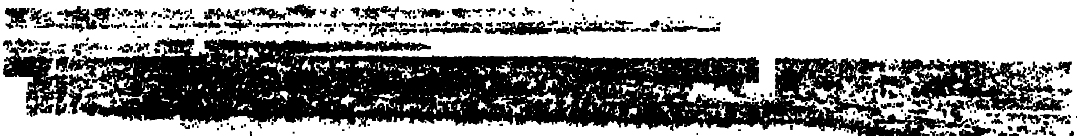
[ডাঃ ললিতমোহন বসু এম্ বি কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

যাহারা স্নান করিতে আসিয়াছিলেন ও স্নান করিতেছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও মুখে ভক্তি শ্রদ্ধার চিহ্ন দেখিতে পাই নাই; কিন্তু অনেকের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের, মুখের ভাব দেখিয়া শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। কোনও ভ্রান্ত বিশ্বাস বা কুসংস্কার কাহারও থাকে, তাহা আমরা চাই না; সকলেই যে বাহ্যিক স্নানের পাপক্ষালন ক্ষমতায় বিশ্বাসবশতঃ স্নান করিয়াছিলেন,



ইজাৎ ব্রিজ ষ্টেশন (বি, এন্, ডব্লু রেলওয়ে) বেণীঘাট বাঁধ হইতে।

[ডাঃ ললিতমোহন বসু এম্ বি কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ



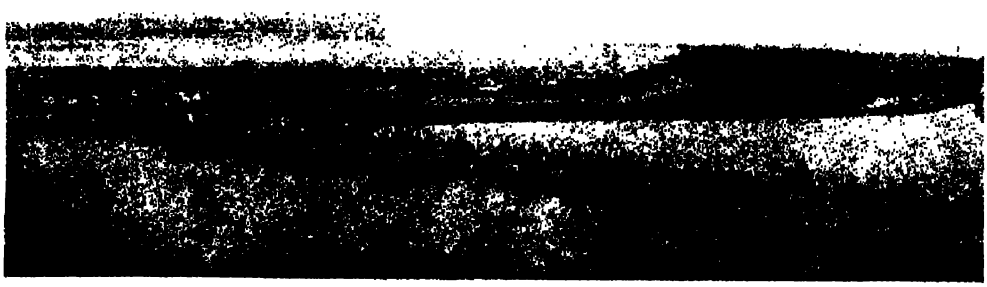


দারাগঞ্জঘাট ঝুঁসী হইতে দৃশ্য

[ডাঃ ললিতমোহন বসু এম্ বি কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

তাহাও মনে করি না, উচ্চতর ভাব হইতেও কেহ কেহ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া ঔদাসীন্য ও বিদ্রূপের ভাব তাহার স্থান অধিকার করিলে তাহা আরও অবাঞ্ছনীয়। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার হউক, সকলে শিক্ষিত হউন, কিন্তু আমাদের জাতির বিশেষত্ব যে ভক্তিশ্রদ্ধা তাহা নির্ম্মল ও বদ্ধমূল হউক, ইহাই চাই। আমাদের দেশের নারীরা যে আত্মোৎসর্গ ও সেবা অনেক সময় বাধ্য হইয়া করেন, শিক্ষিতা, অবরোধমুক্তা, বন্ধনমুক্তা হইয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাহা করিলে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ পুণ্যতর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্নানের ভীড় তিনদিনব্যাপী চলন্ত ভীড় বলিয়া এবং জনতা সুবিস্তৃত স্থানের উপর হওয়ায়, ফোটোগ্রাফগুলি দেখিয়া উহার কোন ধারণা হইবে না। আমরা রাস্তায়,



পণ্টুন সেতু, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড্

[ডাঃ ললিতমোহন বসু এম্ বি কর্ত্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ



বেণীঘাটে মেলার ভিতরকার দৃশ্য—মেঠাইর দোকানের কাছে

[ডাঃ ললিতমোহন বসু এম্-বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ



মেলার ভিতরকার অপর একটি দৃশ্য

[ডাঃ ললিতমোহন বসু এম্-বি কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

বালুময় গঙ্গাতটে, এবং সঙ্গমে ও তাহার নিকটবর্ত্তী জলের স্রোতে যাত্রীদের মধ্যে গিয়া তাহাদের সংখ্যাধিক্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তা ছাড়া, বেশী ভীড়ের কয়েকটি ফোটোগ্রাফ না উঠায়, তাহা হইতে কোন ছবি পাওয়া যায় নাই।

—

জাতিসংঘ ও ভারতবর্ষ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন সভ্যের প্রশ্নের সরকারী উত্তর হইতে জানা গিয়াছে, যে, লীগ্ অব্ নেশুন্স্ বা জাতিসংঘের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বিলাতের গবর্ণ্মেণ্ট্ যত অর্থ দেন, ভারতবর্ষকেও তত অর্থ দিতে হয়, এবং ভারতবর্ষকে যত দিতে হয় এদেশের দেশী রাজ্যসমূহের নিকট হইতে তাহার কোন অংশ পাওয়া যায় না। অথচ প্রতিবৎসরই কোন-না-কোন দেশী রাজ্যের রাজাকে প্রতিনিধি করিয়া জাতিসংঘে পাঠান হয়। পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করাতেও গবর্ণ্মেণ্টের প্রতিনিধি স্বীকার করেন নাই, যে, এই রাজারা দেশী রাজ্যের প্রতিনিধি; গবর্ণ্মেণ্টের মত এই,যে, উহারা ভারতবর্ষেরই প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ বলিতে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও দেশী রাজ্যগুলির সমষ্টি বুঝায়। দেশী রাজ্যের রাজারা যদি নিয়মিতরূপে জাতিসংঘে প্রতিনিধিরূপে যাইতে চান, তাহা হইলে উহার ব্যয়ও তাঁহাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু শুধু ব্যয়ের অংশ দিতেই তাঁহাদিগকে বলিতেছি না।

তাঁহাদের অধিকার কি কি তাহাও নির্ণীত হওয়া উচিত, এবং তাঁহাদের প্রতিনিধি ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট্ দ্বারা মনোনীত না হইয়া দেশী রাজাদের সভা যে "নরেন্দ্রমণ্ডল" আছে, তাহার দ্বারা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও গবর্ণমেণ্ট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত না হইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত, এবং ব্রিটিশ ও দেশী ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের নেতা ইংরেজ না হইয়া ভারতীয় হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের একজন প্রতিনিধি আছেন স্যার্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। যেমন অনেক বেসরকারী দেশনায়কের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে, তাঁহার সহিতও তেমনি মতভেদ থাকিলেও তাঁহার স্বদেশ-হিতৈষিতা, বিচক্ষণতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও সহজেই বুঝা যায়, যে, তিনি যদি ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ভারতবর্ষের বেসরকারী প্রতিনিধি হইতেন, তাহা হইলে তিনি যাহা বলিতে ও করিতে পারিতেন, এখন তাহা পারেন না।

ভারতবর্ষ আত্মশাসন-অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ জাতিসংঘে নিজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতেও তাহার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। জাতি-সংঘ হইতে ব্রিটেন্ যেরূপ লাভবান্ হন, ভারতবর্ষ তাহা ত হনই না, অধিকন্তু ভারতীয়দের বিদেশে লাঞ্ছনার কথা জাতিসংঘে উত্থাপিত পর্য্যন্ত হইতে পায় না। যেমন আফ্রিকার টাঙ্গান্যীকা দেশবাসী ভারতীয়দের লাঞ্ছনা ও অসুবিধার কথা জাতিসংঘে উত্থাপিত হইতে পায় নাই। তথাপি যখন আমরা এত টাকা দিতে বাধ্য হই, তখন তাহার অনুরূপ কিছু লাভ ও সুবিধা পাইবার চেষ্টা সতত করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইংরাজ বা ভারতীয়, যাঁহারা ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের নিকট আমাদের সার্ব্বজনিক সভা-সমিতি সকল হইতে এবং ব্যবস্থাপক সভা সকল হইতে আমাদের দাবী ও বক্তব্য যাওয়া উচিত। যাহাতে আমাদের বৃথা পণ্ডশ্রম না হয়, সেইজন্য জাতিসংঘের মূল ও অবান্তর নিয়মাবলী এবং গঠনব্যবস্থা আমাদের সকলের জানা উচিত। এই আপত্তি উঠিবে, যে, কাজ ত কিছু হইবেই না, বৃথা এসব করিয়া লাভ কি? উত্তরে জিজ্ঞাস্য, ব্যবস্থাপক সভায় তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা করিবার জন্য সভ্যেরা যত পরিশ্রম করেন, তাহার সদৃশ ফল পান কি?

জাতিসংঘের জন্য ভারতবর্ষকে যত টাকা দিতে হয়, তাহার পরিমাণও কমাইবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, তথায় আমাদের অধিকার বড় কম।

আপাততঃ জাতিসংঘ হইতে আমরা যে পরোক্ষ ফল লাভ করিতে পারি, তাহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। এ কথার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি যে, আমরা আত্মশাসনক্ষমতা পাইবার পূর্ব্বে আমাদের মনের মত প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিব না এবং আমাদের ইচ্ছামত কোন বিষয়ের অবতারণাও জাতিসংঘে করিতে পারিব না। কিন্তু এ সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা সংঘের আন্তর্জাতিক কাজ-সকলে অনেকটা প্রভাব অর্জ্জন করিতে এবং এই উপায়ে পৃথিবীর অন্যসব দেশের সংঘসভ্যদিগকে ভারতবর্ষের প্রতি অনুরক্ত করিতে পারি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা যদি সংঘের আলোচনায় ন্যায়ের এবং অন্য সব দেশের লোকদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিনিধিদেরও ভারতের প্রতি কতকটা মিত্রভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য আত্মশাসনক্ষমতা পাইতে হইলে **সাক্ষাৎভাবে**, তাহার প্রধান চেষ্টা **আমাদিগকে**, এবং **এই দেশেই** করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ভুলিলেও চলিবে না, যে, ইংলণ্ড তাহার উপনিবেশগুলির এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের সভ্য জগতের লোকমতের প্রভাব অনেকটা অনুভব করে। এই প্রভাবটি যাহাতে ভারতবর্ষের অনুকূল হয়, তাহার চেষ্টা আমাদের করা কর্ত্তব্য। আমাদের অনেক সময় এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মে, যে, সাক্ষাৎভাবে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যাহা করেন, কেবল তাহাই বুঝি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সাহায্য করিবে। কিন্তু, ঐরূপ নেতাদের ঐরূপ কাজের মূল্য বিন্দু-

মাত্রও কমাইবার ইচ্ছা না করিয়া বলিতে চাই যে,সাহিত্যে বিজ্ঞানে,দর্শনে,শিল্পে,ইতিহাসে কিম্বা মানব চেষ্টার অন্যান্য বিভাগে যাঁহারা জগতে ভারতবর্ষের নামকে গৌরবান্বিত করেন, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিতেছেন। অজ্ঞতা, আত্মাহংকার, প্রভুত্বপ্রিয়তা বা স্বার্থান্ধতা বশতঃ ভারতের আত্মকর্তৃত্বের বিরোধী ইংরেজরা যাহাই মনে করুক, ন্যায়বান্ ইংরেজরা এবং জগতের অন্য সভ্যদেশের লোকদের মধ্যে ন্যায়বান্ ব্যক্তিরা



স্যার্ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যখন দেখিবেন, যে, পরাধীন অবস্থাতেও ভারত নানা বিদ্যার ও কার্য্যের ক্ষেত্রে দুনিয়ার দরবারের উপযুক্ত লোকের জন্ম দিতেছে, তখন তাহাদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মিবেই যে, এ-হেন ভারতকে শৃঙ্খলিত রাখা অন্যায়। এরূপ বিশ্বাসের ও তাহার প্রভাবের কোন ফলই হইবে না, মনে করিতে পারি না। জাতিসংঘের ক্ষমতা এখন সীমাবদ্ধ, কিন্তু উহা ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিতেছে ও অদূর ভবিষ্যতে বলিষ্ঠ হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও,যে পরোক্ষ প্রভাবের কথা উপরে বলিলাম, তাহা আমরা অর্জ্জন করিতে পারি।

তাহা করিবার জন্য আমাদের কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী যদি জেনিভায় জাতিসংঘের অধিবেশনের সময় থাকেন, এবং সবদেশের সভ্যদের মধ্যে ভারতীয় ব্যাপারসমূহের জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

পৃথিবীর সব সভ্যজাতিদের মধ্যে জ্ঞানজগতে সহযোগিতা-স্থাপনের জন্য জাতিসংঘের একটি সমিতি আছে। তাহাতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। তিনি আগামী মার্চ্চ্ মাসে ঐ সমিতির কার্য্য-উপলক্ষে জেনিভা যাইবেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার উপস্থিতি এবং তাঁহার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও যন্ত্রাদি প্রদর্শন দ্বারা জেনিভায় সমবেত নানা সভ্যজাতির প্রতিনিধিদের মনে ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। জাতিসংঘ হইতে ইহা ভারতবর্ষের অন্যতম লাভ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সম্প্রতি যে বর্ণ-বাধা আইন পাস্ হইয়াছে, তাহাতে আফ্রিকার আদিমনিবাসী ও ভারতীয়দিগের সে দেশে খনি ও রেলওয়ে সমূহে চাকরী পাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর একটি এরূপ আইন হইতেছে, যাহার দ্বারা তথাকার ভারতীয়েরা জীবিকার উপায় অভাবে মরিতে বা সেদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এইসকল বিষয় জাতিসংঘের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

লক্ষ্ণৌতে সন্তরণের প্রতিযোগিতা

গত ১৯শে ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ শহরে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের গবর্ণরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাদেশিক ওলম্পিক্ ক্রীড়াদির অন্যতম অঙ্গস্বরূপ সন্তরণের যে প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, তাহাতে তথাকার ইণ্টারমীডিয়েট্ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ পৃথ্বীশচন্দ্র ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করেন। আশা করি, এই বালকের প্রশংসনীয় শক্তি তাহাকে সমাজসেবায় প্রবৃত্ত ও সমর্থ করিবে।



শ্রীমান্ পৃথীশচন্দ্র ঘোষ



দামাস্কাসের দৃশ্য
এই খানে হয়ত একসময় সেন্ট্ পল চলাফেরা করিয়াছেন

দামাস্কাস্

প্রথম কে যে দামাস্কাস্ শহর নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বাইবেলে দামাস্কাসের নাম অনেকবার উল্লিখিত আছে। রাজা দায়ুদ দামাস্কাসের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সলোমনের রাজত্বকালেও দামাস্কাসের রাজা বহুবার তাঁহাকে উত্যক্ত করেন। খৃঃ-পূর্ব্ব ৩৩৩ অব্দে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি পারমেনিও দামাস্কাস অধিকার করেন এবং পারস্যসম্রাট্ দরায়ুসের অন্তঃপুরিকাসমূহ ও কোষাগার আত্মসাৎ করেন।

সেন্ট্ পল দামাসকাসে ছিলেন। এখনকার দামাস্কাসের রাস্তায় হয়ত একদিন সেন্ট্ পল চলাফেরা করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৫০ অব্দে রোমসম্রাট্ ট্রাজান দামাস্কাসকে প্রাদেশিক রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহার পরে দামাস্কাস্ বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যের সীমান্ত-উপনিবেশ ছিল। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে খলিল্-ইব্ন্-ওয়ালিদ্ দামাস্কাস্ অধিকার করিয়া খিলাফত মক্কা হইতে উক্ত নগরীতে স্থানান্তরিত করেন এবং এই ঘটনার পর হইতে নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত ওম্মাইয়দ্ বংশের আশ্রয়ে দামাস্কাস্ বিখ্যাত হইয়া উঠে। ওম্মাইয়দ্দিগকে আব্বাসিদ্‌গণ পরাস্ত করে এবং দামাস্কাস্ হইতে খিলাফত্ ও রাজধানী বাগ্দাদে লইয়া যায়। ইহার পর দামাস্কাস্ উপর্য্যুপরি মিশরী কারমাথিয়ান ও সেলজুক সৈন্যদলের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। খৃষ্টিয়ান্ ক্রুসেডারগণ ১১২৬ খৃঃ অব্দে দামাস্কাস্ আক্রমণ করে। কিন্তু উহারা কখনও অধিক কাল ঐ শহরের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। ফ্রাঙ্ক্দিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিবার কালে সম্রাট্ সলাদীন্ দামাস্কাসে নিজের গতিবিধির কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহার সমাধি এখন দামাস্কাসের একটি দেখিবার জিনিস। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে জার্ম্যান সম্রাট্ কাইজার্ ভিল্হেল্ম্ দামাস্কাস্ ভ্রমণকালে সলাদীনের সমাধির উপর একটা



দামাস্কাস্ সহর

ব্রন্‌জ্ ধাতুর মাল্য স্থাপন করেন। তাহাতে লিখিত ছিল, "একজন মহা-সম্রাটের নিকট হইতে আর একজন মহা-সম্রাটকে"। ইংরেজদের সেনাপতি য়্যালেন্‌বী ১৯১৮ খৃঃ অব্দে তুর্ক দিগের নিকট হইতে দামাস্কাস্ কাড়িয়া লইবার পর উক্ত ধাতু-মাল্যটি সলাদীনের কবর হইতে অপসারিত করেন।



দামাস্কাসের দৃশ্য
পিছনে পুরাতন একটি রোমান প্রাচীরের এক অংশ দেখা যাইতেছে

ইতিহাসে দামাস্কাস্ অসংখ্য বার বিধ্বস্ত হইয়াছে। আজ আবার "সুসভ্য" ফরাসীরা দামাস্কাসের উপর গোলাবৃষ্টি করিয়া শহরের অনেক বিখ্যাত ও অমূল্য স্থাপত্য-সম্পদ্ চিরকালের মতন নষ্ট করিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বকালের 'অসভ্যরা" এত উত্তমরূপে ধ্বংস কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিত না; তাই দামাস্কাস্ দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু "সভ্য' ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্র যদি ইহার বক্ষের উপর হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ।



ফরাসী সেনাপতি সারেল্

যে শহর দূর হইতে দেখিয়া, দামাস্কাস্‌বাসিগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হজরত মহম্মদ বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুর পর ত স্বর্গে যাইবই, তবে এখন হইতে দামাস্কাসে যাইবার কি প্রয়োজন ?" সেই শহর আজ ফরাসীরা গোলাঘাতে চূর্ণ করিয়াছে।

ইংরেজ অভিজাতের আদর্শানুসারিতা

সার্ ব্রোড্‌রিক হার্টওয়েল্ জাতিতে ইংরেজ ও সামাজিক মর্য্যাদায় ব্যারনেট্। আমেরিকা যখন প্রাণপণে সুরাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিতেছিল (সে-সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই), সেই সময় সার্ ব্রোড্‌রিক আমেরিকায় গোপনে হুইস্কি নামক মদ চালান করিবার



ইংলণ্ড-গৌরব স্যার ব্রোড্‌রিক হার্টওয়েল বার্ট

জন্ম একটি কোম্পানি গঠন করেন। তিনি তাঁর অংশীদার-দিগকে প্রতি দুই মাস অন্তর শতকরা কুড়িটাকা করিয়া লাভ দিতে অঙ্গীকার করেন। অতঃপর কিছুকাল লাভ করিবার পর তাঁহার বিদ্যা ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার ব্যবসা ফাঁসিয়া যায়। আমেরিকানরা এই বৃটিশ অভিজাতের কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছে। একটি আমেরিকান্ কাগজে লিখিত হইয়াছে :—

"এইপ্রকার ইংরেজদের পূর্ব্বপুরুষরাই, পৃথিবীতে যখন সর্ব্বত্র দাসব্যবসা বন্ধ হইয়া যায়, তখনও জাহাজে করিয়া নিগ্রো দাস চালান দিত। আশা করি ইংরেজরা, এই মহাপুরুষের ব্যাপার দেখিয়া, অতঃপর, যাহাতে তাহাদের স্বজাতীয় লোকেরা অপর দেশের আইন ভাঙিয়া ছেঁচড়ামি আর না করে, তাহার বন্দোবস্ত করিবে।"

এই ব্যক্তির ব্যাপারে মনে হইতেছে, যে, সকল ইংরেজ, এমন-কি সকল সম্ভ্রান্ত ইংরেজও, মহানুভব নহে।

অ।

বর্গা জমির ভাগ ব্যবস্থা

[শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী]

প্রজাস্বত্ব আইনের কোন কোন ধারায় কিছু কিছু অদলবদল হওয়ার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। দেশে যাহাদের বাড়ীঘর, জমি-জমা কিছু আছে—এই আইনের অদল-বদলে তাহাদের অনেক যাইবে আসিবে।

নিজের পৈতৃক বা স্বকৃত ভূসম্পত্তিতে অধিকার বৃদ্ধি বা অধিকার-চ্যুতি সামান্য কথা নহে। শত সম্পদের অধিকারীরাও দেশের বাস্তুভিটেখানি ও জমি-জমাকেই শেষের পরম সম্বল বলিয়া মনে করে। আর যাহাদের ইহাই সম্বল, তাহাদের জীবনই ইহার উপর নির্ভর করে।

প্রজাস্বত্ব আইনের যে কোন ধারার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দেশবাসীর সতর্ক মতামত, দেশের সত্য অবস্থা, বিশেষ-রূপে জানিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে যথেষ্ট বিচক্ষণতার সহিত এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

পল্লীগ্রামে পরিবার পরিজন আছে, জীবিকা-সংস্থানের কিছু ও একটু মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া চলিবার ব্যবস্থা আছে, এমন লোকদের বর্গা আইনের পরিবর্ত্তনের কথায় সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এবং ইহার যথেষ্ট কারণও আছে।

বাংলায় জমির মালিক মাত্রেই চাষী নহে। যে জমির মালিক নিজে হাল চাষ করে না, সে অপর হাল-ওয়ালা চাষীকে দিয়া নিজ জমি চাষ আবাদ করাইয়া লয়। চাষ আবাদের বিনিময়ে চাষী অর্দ্ধেক শস্য পায়। ইহাকেই বর্গার ভাগীদার কহে।

আইনপরিবর্ত্তনকারীগণ যে জমির চাষী বা বর্গাদার

তাহাকেই জমির একরকম সর্ব্ব-অধিকারী অর্থাৎ একমাত্র ফসলভোগী করিতে চাহেন। কারণ যে চাষ করে শস্য তারই প্রাপ্য হইবে, জমির মালিক জমির খাজনা পাইবে। ক্ষেত্রস্বামকে কোন্ দোষে এত বড় অধিকারচ্যুত হইতে হইবে এবং দেশের ইহাতে কি মহা উপকার হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

চাষ বাস, কৃষির উপকারিতা অনেকেই বোঝে ও জানে, কিন্তু সকলেই চাষী হইতে পারে না। চাষ যাহারা হাতে করিতেছে, তাহাদের শতকরা নব্বইটিরও বেশী দিন মজুর। চাষকে ব্যবসায় হিসাবে যাহারা লইয়াছে তাহারা নিজের জমিও মাহিনা বা রোজের লোক দিয়া চষাইতেছে—বর্গা জমিও চষাইতেছে। সকলেই হাল ধরিয়া চাষ করিবে ইহা সম্ভব নহে।—দু'বিঘা চার বিঘায় হাল চলে না, পোষায় না—বর্গা দিলে ভাগীর ভাগ আধা পাইয়া তবু তাহাদের কিছু খোরাকের জোগাড় হয়।

ভদ্র-গৃহস্থের পক্ষে চাষীর কাজ করা নানা কারণে সম্ভব হয় নাই। শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কায়িক সহনক্ষমতা, ভদ্র গৃহস্থের একরকম—চাষী গৃহস্থের একরকম। তাহার উপর চাষ করিলে পোষাইবে এ উপযুক্ত জমিও অনেকের নাই। যে জমি আছে তাহা বর্গা দিয়া দু'মাস, ছ'মাসের খরচ চলিতে পারে। কিন্তু তাহার উপরই নির্ভর করিয়া চাষী সাজা চলে না।

পৈতৃক বা স্বকৃত জমিকে ভদ্র গৃহস্থেরা নিজের সব চেয়ে বড় সম্পত্তি মনে করে। খুব দায়ে না পড়িলে কেহ মুখের আধার জমিজমা বা বসতবাড়ী ছাড়ে না। ভদ্র গৃহস্থগণ এ বিষয়ে যেমন মায়া করে, চাষী গৃহস্থ অনেকস্থলে ঠিক তত করে না। তাহারা জমি হস্তান্তর করিতে বিশেষ ইতস্ততঃ করে না।

বর্গা যাহারা দেয় সেসব ভদ্র গৃহস্থ বা সাধারণ গৃহস্থ তাহাতে যে খুব লাভবান্ হয় তাহা নহে, অনেক সময়ই তাহাদের বর্গাদারের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া, সে হাতে তুলিয়া যাহা দেয় তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হয়। যাহাদের দেখিবার শুনিবার লোক নাই এমন জমির মালিকদের অনেক সময়ই বিশেষ ঠকিতে হয়। জমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে এই ঠকা-ঠকির ভাব বর্ত্তমান সময়েই বেশী আসিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যযুগে ও অভাবের যুগে সব বিষয়ে যেমন নীচতা ও প্রবঞ্চনা আসিয়াছে, এ ব্যাপারেও তাহার অন্যথা হয় নাই। এ বিষয়ে যে সব ধর্ম্মনীতি পূর্ব্বকালীন বর্গাদারেরা মানিত এখন তাহা শিথিল হইয়াছে। তবু যাহা আছে তাহাতে দিনে ডাকাতি হয় না—এই লাভ।

ভদ্র গৃহস্থ বর্ত্তমানে নূতন জমি কেহ করিতে পারিতেছে না—তাহার নানা কারণ আছে। জমির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহার উপর চরে চাচরে নূতন জমি যাহা উঠিতেছে, চাষী গৃহস্থেরাই তাহার পোণে ষোলআনা অধিকার করিতেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা, মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া তাহাতে ভদ্রলোকের পা বাড়াইবার উপায় নাই।

চাষীর জন্য, শ্রমীর জন্য খেদ আজকাল বহু হইতেছে। কিন্তু ইহাদের অভাবের চেয়ে বাংলা দেশের মধ্যবিত্তের অবস্থা শোচনীয়। না খাইয়া চাষী বা শ্রমী যত না মরে, মধ্যবিত্ত ভদ্ররা তাহার চেয়ে বেশী মরে।

এভাবে যদি নিজের জমি বর্গাদারকে ছাড়িয়া দিতে আইন বাধ্য করে, তবে বাঙ্গালী ভদ্রসমাজ তাহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে।

কত নিঃসম্বল বিধবা, কত নারী, কত ভদ্র পরিবার যে মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হইবে তাহার সংখ্যা নাই। বহু চাষী বা মজুর গৃহস্থও অসহায় হইবে। কারণ চাষী বা মজুরও অনেকেই হেলে-গৃহস্থ নহে।

বর্গা আইনের এইভাবের কিছুমাত্র রূপান্তর হইলে জনকত চাষী গৃহস্থ আনন্দে লাফাইয়া পরের জমি হস্তগত করিবার জন্য ফন্দী আঁটিবে। দেশে মামলা-মোকর্দ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাড়িবে; অসহায় ভদ্র গৃহস্থের অসীম নির্য্যাতন ও দুঃসহ কষ্ট হইবে।

বর্গা আইনের এইরূপ কোন পরিবর্ত্তনে দেশের জমির বা চাষের বিন্দুমাত্র উন্নতি হইবার আশা নাই। এ আশা যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে তাহা একান্ত মিথ্যা।

ভবিষ্যৎ যাহাই হউক না কেন—বর্ত্তমানেই বা জমির অধিকার ছাড়িতে বলা হইবে কোন্ নীতির অনুশাসনে?

দেশে কৃষির উন্নতির পন্থা কি ইহাই ? ভারতের কৃষিসম্পদের উন্নতির কথা যখন সাগরপারের উচ্চতম দপ্তরে ও ভারত-সরকারে আলোচিত হইতেছে, বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় কি তখন এইরূপ আত্মঘাতী কৃষি সমর্থিত হইতে পারে ?

দেশে দেশী কারবার অর্থাভাবে আদৌ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে অনেক দেশী লোকের অগাধ অর্থ জমা আছে। সুতরাং সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারিবে কি ? কলিকাতা সহরে বাড়ীর বড় কষ্ট—অথচ বাড়ীওয়ালাদের অনেক বাড়ী আছে, সুতরাং ভাড়াটেরা বাড়ীগুলি অধিকার করিয়া বাড়ীওয়ালাকে শুধুমাত্র ট্যাক্স্ বহনের দায় হইতে মুক্তি দিলেই তো পারে। কলিকাতায় ইহা কি প্রয়োজনীয় নহে ?

কিন্তু আইন দ্বারা এরূপ করিতে গেলে কিরূপ দাঁড়াইবে ? বর্ত্তমান বর্গাজমি সম্বন্ধীয় প্রস্তাবিত আইন ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর প্রস্তাব।

আইনে জন-সাধারণকে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখাইবে। তাহা না হইয়া ইহা আতঙ্কেরই সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞ আইনজ্ঞ আইনের কূটজালে বা ধোঁয়াটে সমীকরণ-বাদীরা কোন অছিলায় ইহা সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু পরের ধনে পোদ্দারী এইভাবে আইন দ্বারা করিতে গেলে দেশময় যে হাহাকার উঠিবে, তাহা কিভাবে নিবারিত হইবে ? ইহার গুরুত্ব কোন্ দিকে কত দেখিতে হইবে।

প্রজাসাধারণ বা চাষীমাত্রেই ইহাতে লাভবান্ হইবে না। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে অসংখ্য দেশবাসী। তাহার পর, নিজ অধিকার, বিশেষ করিয়া মুখের গ্রাস খেতের ফসলের অধিকার, কে কাহার ছাড়িয়া দিতে পারে ? কিন্তু এমন সর্ব্বনেশে আইনও যদি এ-দেশে এ-যুগে সম্ভব হয়, তবে ভদ্র গৃহস্থের দুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না। বাংলার পল্লীতে এখনো ভদ্রসমাজ যেটুকু ভদ্রস্থতা লইয়া আছে, তাহাও আর থাকিতে পারিবে না।

শতকরা ৬০ বা ৮০ জন সরকারী চাকুরী পাওয়ার দ্বন্দ্বের চেয়ে এই জীবন-ধারণ সমস্যা ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার দ্বন্দ্ব কত যে তীব্র হইবে, তাহা আজ দেশজীবনে অনভিজ্ঞ খেয়ালী তীব্র সংস্কার-কামীরা মনে না করিতে পারেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুমাত্র জানিয়াও কে এই ভীষণ প্রস্তাব সমর্থন করিবে ? বাংলার মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের পক্ষ হইতে এমন আইনের তীব্র প্রতিবাদ হইতেছে। যাঁহারা এ বিষয়ে উৎসাহী, আশা করি, তাঁহারাও জিনিষটির গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবেন।

—

বিদ্রূপের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

আমরা যখনই সমাজসংস্কারের কথা বলি, তখনই আমরা কতকগুলি সামাজিক দোষ ও নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভাবি। সত্য ন্যায় ও জ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া সামাজিক জীবনগঠনের চেষ্টাকেই সমাজসংস্কার বলা হয়। মানুষ যেসকল সামাজিক নির্ব্বুদ্ধিতায় আসক্ত থাকে, তাহার সকলগুলিকেই যে সে জানিয়া শুনিয়া নিজের জীবনে স্থান দেয় তাহা নহে। অনেক স্থলেই মানুষ জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত অথবা ভুল বুঝিয়া কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। এই কারণে সমাজ সংস্কার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হয় সমাজের সকল ব্যক্তিকে আদর্শ জীবনের মূল্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া এবং আদর্শবিচ্যুত জীবন-যাপন-প্রণালীর দোষগুলিকে দোষ বলিয়া দেখিতে শিক্ষা দেওয়া। ইহা নানান্ উপায়ে করিতে হয়।

প্রথমত, জ্ঞানবিস্তার করিলেই সমাজের লোক আপনা হইতেই দেখিতে পায়, যে, তাহার জীবনের কোন্ খানে কি দোষ কিভাবে রহিয়াছে। যথার্থ খাদ্যাখাদ্য-বিচার, যথার্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা কি তাহা নির্দ্ধারণ, সামাজিক উন্নতি ও অবনতি কি-ভাবে হয় তাহা বুঝিতে পারা, ইত্যাদি সকল বিষয়ে মানুষের মস্তিষ্কের উৎকর্ষ বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। বাল্য-বিবাহ, পর্দ্দা, স্ত্রীলোকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখা ইত্যাদির সামাজিক অপকারিতা বুঝিতে হইলে, বিজ্ঞানচর্চ্চা ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন আছে। শিক্ষাবিস্তার সমাজ-সংস্কারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও অনেক উপায়ে, সমাজের চোখ ফুটান প্রয়োজন হয়। অনেকে আছেন, যাঁহাদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী

বিভিন্ন-প্রকার। তাঁহারা শিক্ষাবিরুদ্ধভাবে জীবন যাপন করিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করেন না। কারণ অশিক্ষিত জাতিবর্গের মনস্তুষ্টি, অথবা মানসিক নির্জ্জীবতা, অথবা অপরে যাহা করিতেছে তাহা ব্যতীত অন্য কিছু করিবার উদ্যোগের ও সামর্থ্যের অভাব। এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা শিক্ষায় ও বিশ্বাসে জাতিভেদ, পর্দ্দা, বাল্যবিবাহ, পৌত্তলিকতা, জীববলি ইত্যাদির বিরুদ্ধমতাবলম্বী, কিন্তু কার্য্যতঃ ঐ সকলগুলিই মানিয়া চলেন। এইপ্রকার লোকদের জন্য কেহ কেহ বিশেষ ঝাঁঝাল রকম ঔষধের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার প্রয়োগ সম্ভবপর হইয়া উঠে না। তাহার পরিবর্ত্তে অতি পুরাকাল হইতেই মনুষ্যসমাজে বিদ্রূপাস্ত্রের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। যাহার কিছুতেই জ্ঞান হয় না, তাহাকে লোকসমাজে হাস্যাস্পদ করিতে পারিলে অনেক ক্ষেত্রে তাহার সুবুদ্ধি হয়।

মূর্খের উপকারার্থে যত-প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিদ্রূপ প্রাচীনতম না হইলেও অতিশয় প্রাচীন বটে। বাইবেলে, হোমারের লেখায় ও প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের রচনায়, আমরা বিদ্রূপরসাত্মক অনেক-কিছু পাই। সেইসকল রচনার উদ্দেশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই যে সমাজ-সংস্কার, তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত-বিদ্বেষ-বশতঃ তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যত আমরা আধুনিক সময়ের দিকে আসি, বিদ্রূপরস ততই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া সমাজের নানা-প্রকার প্রতিষ্ঠান, সংঘ ও বিকারের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। এরিষ্টোফেনিস, ইরাস্মাস্, পাসকাল, থেরভান্টেস্, মোলিয়ের, পোপ, ড্রাইডেন, ভোল্‌তেয়ার প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বার্নার্ড্ শ, আনাতোল ফ্রাঁস্, রবীন্দ্রনাথ, রম্যাঁ রলাঁ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ সকলেই বিদ্রূপ রসের ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত এবং ইহার সাহায্যে নানা-প্রকার দোষ ও নির্ব্বুদ্ধিতার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই গেল লেখার কথা।

চিত্রকলার সাহায্যেও এই বিদ্রূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। আধুনিক জগতে ব্যঙ্গচিত্র সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইংলণ্ডের পাঞ্চ্ কিম্বা ফ্রান্সের লা ভি পারিজিয়েন্ শুধু বিদ্রূপরসের পত্রিকা এবং ব্যঙ্গ করিয়াই অনেক জাতীয় উপকার করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও আজকাল ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে সকলগুলিই মার্জ্জিত রুচির পরিচয় না দিলেও এইপ্রকার চিত্র যে বাংলায় ক্রমশঃ নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অনেক সদুপদেশের বিরুদ্ধেও লোকের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সঙ্গীত আলোচনা করিত বা লোকের সৌন্দর্য্য-বোধকে আহত করিয়া মোরগের ঝুঁটির ন্যায় চুল ফিরাইয়া রাজপথে বিচরণ করিত, সে আজ নিজের অপরূপ ব্যঙ্গচিত্রে দেখিয়া ভাবিতেছে— "আমার দিন ফুরাল"। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ের ভিতর দিয়াও এই বিদ্রূপের বন্যা সমাজের পঙ্কিলতা ধৌত করিতেছে। বহু শতাব্দী ধরিয়াই পাশ্চাত্যে বিদ্রূপাত্মক অভিনয় চলিয়া আসিতেছে। অধুনা আমাদের দেশেও অনেকে এইপ্রকার অভিনয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিনয় দেখিয়া অনেক নির্ব্বোধের জ্ঞান হইয়াছে। বাংলা দেশে এইপ্রকার অভিনেতাদের মধ্যে মার্জ্জিত রুচির অত্যন্ত অভাব। যে কয়েকজন রুচিসঙ্গতভাবে নানান্ দোষের ব্যঙ্গ অভিনয় করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ব্যঙ্গ-অভিনয়-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সুরুচি বাংলা দেশে আমদানি করিয়া দেশের উপকার করিয়াছেন। আমাদের থিয়েটারগুলির ব্যঙ্গ অভিনয়ের এখনও অনেক উন্নতি সম্ভব।

বিদ্রূপ-রসের যথার্থ ব্যবহার করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি মন দেওয়া দরকার।

প্রথমতঃ, ইহা হাস্যরসাত্মক হওয়া প্রয়োজন। হাস্য-রসবিযুক্ত বিদ্রূপ ও গালাগালির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইহার ভাষা বা অভিব্যক্তির উপায় মার্জ্জিত ও সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে এক দিকে ভাল আদর্শ জাগ্রত করিতে গিয়া অপর একদিকে অবনতির পথ খুলিয়া দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ, বিদ্রূপের মধ্যেও অর্দ্ধপ্রচ্ছন্নভাবে সত্য যাহা তাহা প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা হওয়া চাই। তাহা না হইলে শুধু ভাঙাই হইবে, গঠনের কোন সাহায্য হইবে না। ইহা সর্ব্বক্ষেত্রে সম্ভব না হইলেও অনেক স্থলেই সম্ভব।

বাংলায় সংস্কার করিবার আছে অনেক। ঐসকল সমাজ-অবনতিকারক দোষগুলির বিদ্রূপাত্মক বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। তাহা করিতে হইবে নানা উপায়ে নানারূপে—উপন্যাসে, নাটকে, গল্পে, কবিতায়, গানে, চিত্রে, থিয়েটারে, সিনেমায়, যাত্রায়—যাহাতে দেশের কোথাও এমন একজনও নির্ব্বোধ না থাকে যাহাকে চোখে আঙুল দিয়া তাহার দোষগুলি না দেখান হইয়াছে।

অঃ

—

চাই—"বাংলার দশটি প্রধানা লেখিকার নাম"

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী দয়া করিয়া আমাদিগকে

প্রবাসীতে 'অনতিবিলম্বে' ছাপিবার জন্য "ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণা নারীসঙ্ঘে"র একটি বিজ্ঞাপনের প্রুফ পাঠাইয়াছেন। উহা বিলম্বে প্রেরিত হওয়ায় সমস্তটি ছাপিবার সময় নাই। এই জন্য আমরা কেবল উহার শেষ অংশটি নীচে মুদ্রিত করিতেছি। আশা করি, তাহাতেই প্রেরয়িত্রীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

কর্ম্মবিভাগেই কর্ম্মের সুশৃঙ্খলা, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সমিতিকে আমরা ক্ষুদ্রতর কয়েকটি শাখা-সমিতিতে বিভক্ত করেছি। তা'র মধ্যে সাহিত্য-শাখা যে কাজটি প্রথম হাতে নিয়েছে, তা'র সহায়তা প্রার্থনা করাই এই বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক ফরাসী মহিলা-বন্ধু আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট লেখিকার সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাঁহাদের গদ্য-পদ্য রচনার নমুনা যেন ইংরেজীতে তর্জ্জমা ক'রে পাঠাই; তিনি আবার তা ফরাসীতে তর্জ্জমা ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ কর'বেন। কারণ আজকাল ফরাসী মেয়েদের মধ্যে ভারতীয় নারী-সম্বন্ধে একটা কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে। আমরা তাই কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত মতের উপর নির্ভর না ক'রে বাঙ্গলাদেশের পাঠকপাঠিকাসাধারণের দ্বারস্থ হলুম; তাঁরা যদি আমার এই নির্ব্বাচন-ব্রতে সাহায্য করেন, এবং তাঁদের মতে ব্রিটিশযুগের দশটি শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-লেখিকা ও তাঁদের দুই-একটি শ্রেষ্ঠ গদ্য বা পদ্য-রচনার নাম লিখে ফাল্গুন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করেন, তা হ'লে বিশেষ বাধিত হব।

২০ মে'ফেয়ার, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী,

President, F. I. U. W.

—

ডাকমাশুল কমাইবার প্রস্তাব

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পোষ্ট‌্কার্ড্ ও চিঠির মাশুল কমাইবার প্রস্তাব হইয়াছে। লিখিবার সময় উহার শেষ মীমাংসার খবর পাই নাই। প্রস্তাবের সব সমর্থকই পোষ্ট‌্কার্ডের মাশুল এক পয়সা করিতে চান, কিন্তু চিঠির মাশুল কেহ দুই পয়সা, কেহ তিন পয়সা করিতে চান। আমরা যথাক্রমে এক ও দুই পয়সার সমর্থন করি। তা-ছাড়া, বহির ডাকমাশুল আগেকার মত প্রতি দশ তোলায় দু-পয়সা করা শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের জন্য একান্ত আবশ্যক মনে করি। খবরের কাগজও এক পয়সায় দশ তোলা এবং দু-পয়সায় চল্লিশ তোলা পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে ডাকমাশুল এবং রেলভাড়া বাড়িয়াছিল। যুদ্ধের পর তথায় দুইই কমিয়া গিয়াছে। ভারতে তাহার অনেক পরে রেলভাড়া কিছু কমিয়াছে। এখন ডাকমাশুল কমিলেই ঠিক ন্যায্য ব্যবস্থা হয়। ডাকমাশুল কমিলে হয়ত আপাততঃ ডাক-বিভাগে কিছু টাকা ঘাটতি পড়িবে। কিন্তু পোষ্ট‌্কার্ড, চিঠি, খবরের কাগজ ও পুস্তকাদি আরও বেশী-পরিমাণে ডাকে যাইতে থাকায় ঘাটতি ক্রমশঃ পুরিয়া আসিবে। তা ছাড়া, ডাক-বিভাগ কতকটা শিক্ষা-বিভাগের ন্যায়, উহার দ্বারা জ্ঞান-বিস্তার হয়; সুতরাং উহার ব্যয় আয় অপেক্ষা কিছু বেশী হইলে তাহাতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। ডাক-বিভাগ দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধি হয় বলিয়াও কিছু অতিরিক্ত ব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া অনুচিত।

—

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়া, বাঙালী যে তাঁহাকে ভালবাসে, ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন দেখিয়া সাতিশয় সুখী হইলাম। এ-বিষয়ে তাঁহার সন্দেহে আমরা বরাবর যেমন দুঃখ অনুভব করিতাম, তেমনি তাঁহার ভ্রমে হাসিও পাইত স্বীকার করিতেছি।

তাঁহার অভ্যর্থনা উপলক্ষে যে-সব অভিনন্দন-পত্র পঠিত হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার পুরাতন কথা হইলেও নূতন করিয়া প্রণিধানযোগ্য। তাহার কোন-কোন অংশের তাৎপর্য্য এই :—

ইতিপূর্ব্বে আমি আর একবার ঢাকায় আসিয়াছিলাম। সে-সময় আমি বলিয়া গিয়াছিলাম যে, ভিক্ষা দ্বারা মুক্তি আসিবে না। অদ্য মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে যে মানপত্র দিয়াছেন, তাহাতে সে কথার উল্লেখ আছে।

আমি দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম যে, সেবা ও আত্মোৎসর্গ ব্যতীত প্রকৃত কাজ হইতে পারে না। অবিরত চেষ্টা এবং আত্মোৎসর্গের বলে নিজের দেশের উপর যে অধিকার ও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়, সেই অধিকার ও শক্তি যতদিন পর্য্যন্ত আমরা লাভ করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত শাসকবর্গের সহিত আদান-প্রদানে মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমরা চলিতে পারিব না, আর সেই আদান-প্রদানে কোনো খাঁটি লাভও আমাদের হইবে না। সম্প্রতি আমি আর একটি কথা বলিয়াছি, তাহাও মিউনিসিপ্যালিটি-প্রদত্ত মানপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি বলিয়াছি যে, লুপ্ত না হইয়া যাওয়াই একটা দেশ বা জাতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। স্বীয় অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডার হইতে অপরকে কিছু-কিছু দিবার ভার তাহাকে লইতে হইবে। অতীত ভারত এই কর্ত্তব্যকে স্বীকার করিয়া, গিরি-কন্দর, সাগর-প্রান্তর ভেদ করিয়া স্বীয় দানের পসরা দূরদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই ভারতের আজ এ-কথা নিশ্চয়ই বলা উচিত নহে যে, তাহার ভাণ্ডার আজ শূন্য—সে নিঃস্ব ভিখারী। অন্ততঃ আমি সে-কথা বলিবার মত হীন কখনও হইব না। 'জগতের যে যেথায় আছ, আমার কাছে এস,' ভারতের এই সনাতন আহ্বানের বাণী বহন করিয়া আমি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি। নিঃস্ব কৃপণ কখনও এ-আহ্বান দিতে পারে না। কিন্তু ভারতের প্রাচুর্য্য এবং চিরন্তন আতিথেয়তার উপর আমার বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমি ভারতের নামে ভারতের পক্ষ হইতে একটি অতিথিশালা খুলিয়াছি, যে কোনো পর্য্যটক আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিতে পারে এবং ভারতের চিরপ্রবাহিত উৎসের সুধাধারা পান করিতে পারে।

আপনারা আমাকে স্মরণ রাখিয়াছেন দেখিয়া আমি অতীব আনন্দিত হইলাম। আমার প্রতি আপনাদের যে প্রীতি আছে, সেই প্রীতির এবং আমি চলিয়া গেলে আমার স্মৃতির সহিত যদি আপনারা আমার একান্ত প্রিয় কার্য্যকে স্মরণ রাখেন, তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব।

আর কতকগুলি অভিনন্দনপত্রের উত্তরে তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে, মাতৃভাষার ব্যবহার না করিলে, চিন্তা ও কর্ম্মের পরিপন্থী বিদেশী ভাষার দাসত্ব-পাশ ছিন্ন না করিলে, যে জনসাধারণের রাজনৈতিক চৈতন্য জন্মিতে পারে না, তাহার উল্লেখ করিয়া এ-বিষয়ে অতীত কালে তাঁহার মাতৃভূমির সেবার কথা বলেন।

আমার সেইদিনের চেষ্টা হয়ত কতকটা ফলবতী হইয়াছে। মাতৃভাষা আজ দেশে যোগ্যস্থান অধিকার করিয়াছে এবং জনসাধারণও স্ব-স্ব অধিকার এবং কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

তাহার পর তিনি শেষ বিদায়-গ্রহণ-সূচক যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া ব্যথা পাইয়াছি। আমাদের হৃদয় বলিতেছে, তাঁহার অন্তিম বিদায়ের সময় এখনও আসে নাই। তিনি আগেও অনেক বার গদ্যে ও পদ্যে এরূপ বিদায় লইবার কথা বলিয়াছেন। আটাশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩০৪ সালে, তিনি গাহিয়াছিলেন,

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

ঢাকায় তিনি বলিয়াছেন, অস্ত-সাগরের কূল হইতে তাঁহার মিত্র, "রবি," তাঁহাকে ডাকিতেছে। অস্তমিত-প্রায় সূর্য্যের সহিত নিজের এই সখ্য-বন্ধনের কথাও তাঁহার মুখে নূতন নহে। তের বৎসর পূর্ব্বে লোহিত-সাগরে ভাসমান সিটি অব্ লাহোর জাহাজে তিনি গাহিয়াছিলেন,

জানি গো দিন যাবে,
এদিন যাবে।
একদা কোন্ বেলা-শেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।

সেই "বেলা-শেষ" এখনও আসে নাই, আমরা তাঁহাকে বিদায় দিতে প্রস্তুত হই নাই, প্রস্তুত নহি। এখনও তিনি নূতন বাণী শুনাইতেছেন; আমরা আরও শুনিতে ও আত্মার মধ্যে গ্রহণ করিতে চাই।

তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছে বটে; কিন্তু তাঁহার পিতা দীর্ঘজীবী ছিলেন, তাঁহার অগ্রজত্রয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন। এবম্বিধ নানা-কারণে আমরা পূর্ণ আশার সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি দীর্ঘায়ু হউন, আরও বহু বহু বৎসর মানব-কুলের আনন্দ ও কল্যাণের কারণ হউন। তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা হইতে এখনই ত মানব-সমাজ এমন অনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়াছে, যাহা তাহাদের শাশ্বত সম্পত্তি; তাহারা আরও অনেক-কিছু পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে।

রাজকীয় কৃষি-কমিশন

ভারতের কৃষির উন্নতির জন্য যে রাজকীয় কমিশন বসিবে, তাহার অনাবশ্যকতা দেখাইবার জন্য আমরা বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে লিখিয়াছিলাম, যে, ভারতে কৃষির অনুন্নত অবস্থার প্রধান-প্রধান কারণ সুপরিজ্ঞাত এবং সেই কারণগুলির উল্লেখও করিয়াছিলাম (পৃঃ ২৩৫)। মধ্য প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব শাসন-কর্ত্তা স্যার্ রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডক্ ছুটা প্রদেশে কৃষি বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইয়াছিলেন। তিনিও লণ্ডনের এশিয়াটিক্ রিভিউ কাগজের জানুয়ারী সংখ্যায় লিখিয়াছেন,

"There is, indeed, little that a Royal Commission can find out that the Government does not know already, or cannot collate from the abundant material available in the settlement and revenue reports, and the recommendations of numerous committees and conferences held annually or from time to time."

আমরা আরও লিখিয়াছিলাম, যে, ভারতবর্ষের জমীর খাজনা, জমীর উপর প্রজার স্বত্ব, জমী বিলির নানা-রকম বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সেইসকলের দোষ সংশোধন না করিলে কৃষির উন্নতি ও কৃষকদের দারিদ্র্য-নিবারণ হইতে পারে না; কিন্তু প্রস্তাবিত কমিশন এইসব একান্ত-আবশ্যক বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করিবেন না ("**what is excluded is of vital importance**")। ক্র্যাডক্ সাহেবও দেখিতেছি তাঁহার প্রবন্ধে ঠিক্ এইরূপ কথাই বলিতেছেন :—

"If you exclude land tenures from examination, you will be excinding matters which have a vital influence upon agriculture......"

"It would be singularly unfortunate if its terms of reference laid down any forbidden ground upon which it must not trespass, even though the interests of agriculture were vitally affected by the prohibition."

—

বাংলা ভাষায় ফারসী ও আরবী শব্দের বহুল ব্যবহার

গত ১৭ই মাঘ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির এক অধিবেশনে মৌলবী আবদুল মজিদ এম্-এ মহাশয় "বাঙালী মোস্‌লেম ভাষা ও সাহিত্য"-সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রবন্ধের মধ্যে লেখক বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গলাদেশে মুসলমানেরই সংখ্যা অধিক, সুতরাং বাঙ্গালীর মাতৃভাষাকে ইস্‌লামী রূপ দিবার জন্য বহুলভাবে আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলি, মৌলবী গোলাম মোস্তফা বি-এ বি-টি, "দি মুসলমান"

চনায় যোগদান করেন। তাঁহারা বলেন যে, ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিশিষ্ট ভাব ও চিন্তা, ধ্যান ও ধারণা প্রকাশের জন্য আমাদিগকে বাঙ্গলায় বহু আরবী, ফারসী শব্দের আম্‌দানি করিতে হইবে বটে; কিন্তু বিনা বিচারে আরবী ফারসী শব্দ হইলেই যে মুসলমান সমাজের খাতিরে তাহা বাঙ্গালায় প্রচলন করিতে হইবে, এরূপ মনোভাব সমীচীন নহে। ইস্‌লামের নিজস্ব ভাব-সম্পদ্ দান করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলাই আমাদের কর্ত্তব্য—তাহার রূপের দিকে অধিক মনোযোগ প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা শেষোক্ত মতের সমর্থন করি। তাহার দ্বারাই সমগ্র বাঙালী জাতির উপর ইস্‌লামের প্রভাব বিস্তৃত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠান, আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মমত, ধর্ম্মভাব, সাধনা, শিল্প, প্রভৃতি বিষয়েকিছু বলিতে বা লিখিতে গেলে যদি বাংলায় প্রচলিত কোন কথার দ্বারা, যাহা বক্তব্য তাহা প্রকাশ করা না যায়, তাহা হইলে অবশ্য ফারসী বা আরবী কথার আমদানী করিতে হইবে। এইরূপ কারণে বহুশতাব্দী ধরিয়া অনেক ফারসী ও আরবী কথা বাংলার মধ্যে ঢুকিয়াছেও। জোর করিয়া ঐরূপ কথা চালাইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়। মিলিত চেষ্টার দ্বারাই ভাষার শক্তি ও সম্পদ্ বাড়ে, অকারণ ভাগাভাগির দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

—

বড়লাটের বুলি

বড়লাট ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং তাহার পর ব্যবস্থা-পরিষদে আবার ভারতীয়দিগকে গবর্ণ্‌মেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে বলিয়াছেন, তাহা করিলেই শাসন প্রণালীর আরও উন্নতি ও সংস্কার হইবে বলিয়াছেন, নতুবা হইবে না। এ-বিষয়ে আমরা অনেক লিখিয়াছি। যখন অসহযোগ প্রচেষ্টার জন্ম হয় নাই, যখন স্বরাজ্যদলের জন্ম হয় নাই, বহুপূর্ব্বে যখন চরমপন্থী দলের উদ্ভব হয় নাই, তখন ত সহযোগিতা যথেষ্ট ছিল; তখন ব্রিটিশ জাতি আকাশের কটা চাঁদ আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন? উদারনৈতিক অর্থাৎ মডারেট্ দলের প্রধান নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও সার্ভেণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়া কাগজে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, যে, তিনি বিশ্বাস করেন না, যে, ভারতীয় সব রাজনৈতিক দল গবর্ণ্‌মেণ্টের সব কথায় ও কাজে সায় দিলেই গবর্ণ্‌মেণ্ট আমাদিগকে অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার দিতেন। বস্তুতঃ কোন আন্দোলন না থাকিলে, গবর্ণ্‌মেণ্টের কোন কথা ও কাজে দেশের লোক অসন্তোষ প্রকাশ ও বাধা প্রদান না করিলে, ব্রিটিশ জাতি বলে, তাহাদের সুশাসনে ভারতীয়েরা ভারি সন্তুষ্ট ও খুশি; অতএব কোন পরিবর্ত্তনের দরকার নাই। পক্ষান্তরে আমরা আন্দোলন করিলে, প্রতিবাদ করিলে, অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, বাধা প্রদান করিলে, তাহারা বলে, "তোমরা আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ? আমরা কি ভয় পাইয়া তোমাদের কথা শুনিব মনে করিতেছ? কখনই না।"

উদারনৈতিকরা ত শাসন-সংস্কার-আইন প্রবর্ত্তনের প্রথম হইতেই সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন। তাহার পর অসহযোগীদের স্বরাজ্য-সম্প্রদায় কৌন্সিলে ঢুকিয়া, তর্জ্জন-গর্জ্জন সত্ত্বেও, ক্রমশঃ অধিক-পরিমাণে সহযোগিতা করিতেছেন। অবশ্য সব রাজনৈতিক দল ও নেতা তাহা করিতেছেন না। কিন্তু সবাই সব সময়ে সব বিষয়ে ব্রিটিশের রাঙা পায়ে দেহ-মন সঁপিয়া দিবে, ইহা অসম্ভব ঘটনা। সেই অসম্ভব ব্যাপারের ফরমাইস্ করাতেই বুঝা যাইতেছে, যে, লর্ড্ রেডিং ও লর্ড্ বার্কেন্‌হেড্ ইংরেজের পক্ষ হইতে যে সহযোগিতা চাহিতেছেন, তাহা না-পাওয়াটা কিছু না করিবার একটা ছুতামাত্র। তাঁহারা বাধ্য না হইলে কিছুতেই কিছু করিবেন না।

—

ভয়? না সত্য ও ন্যায়?

ইংরেজরা বলিতেছে, আমরা ভীত হইব না, ভীত হইয়া তোমাদের ভাল কিছু করিব না, কখনও ভীত হইয়া কোন সংস্কার করি নাই বা কাহারও কথা শুনি নাই। ইতিহাস কিন্তু বলিতেছে, যে, তাহারা কখনও, কি স্বদেশে কি বিদেশে, শুধু সত্য ও ন্যায়ের দোহাইয়ে, শুধু তর্কযুক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া, কোন সংস্কার করে নাই। অতীতে মানুষ যেজন্য যাহা করিয়াছে, বরাবরই সেইজন্য তাহা করিবে, আমরা এরূপ মনে করি না। সেইজন্য আমরাও চাই, যে, কেবল সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে, কেবল আমাদের তর্কযুক্তির অকাট্যতাবশতঃ, আমাদের জন্মগত রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদিগকে ভোগ করিতে দেওয়া হউক। আমরা খুনখারাবী উপদ্রবের পক্ষপাতী মোটেই নহি।

সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইলে, যাহারা বল-প্রয়োগের পক্ষপাতী তাহাদিগকেও বুঝাইবার সুবিধা হইবে, যে, বলপ্রয়োগ না করিয়াও, এমন-কি ভয় না দেখাইয়াও, রাজনীতি-ক্ষেত্রে ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়।

—

ভারতীয়দের মধ্যে ঐকমত্যের দাবী

বড়লাট ও ভারতসচিবপ্রমুখ ইংরেজরা যেমন চাহিয়াছেন, যে, সব ভারতীয় রাজনৈতিক দল ও নেতা এক-যোগে সরকারের সহিত সহযোগিতা করুক, তবেই কিছু করা যাইবে, তেমনই নানা উপলক্ষে ও সময়ে ব্রিটিশ

রাজনীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে বলিয়াছেন, "আপনারা সবাই একমত হইয়া একটা স্বরাজ্যের খসড়া আমাদিগকে দিন্, তাহা হইলে আমরা বিবেচনা করিব"—"মঞ্জুর করিব" বলেন নাই। এই যে ঐকমত্যের ব্রিটিশ দাবী, এটাও একটা পুরাতন ফাঁকী। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ছোট জন্ ডিকিন্সন্ কর্ত্তৃক রচিত "Government of India under a Bureaucracy" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও মতপূর্ণ বহি সম্প্রতি এলাহাবাদের পাণিনি আফিস পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে এক জায়গায় ছোট জন্ ডিকিন্সন্ বলিতেছেন :—

"I shall be met, I know, by the old argument that the Legislature [*i.e.*, the British Parliament] cannot make any change because Indian reformers do not agree among themselves upon what ought to be done. But is this argument really serious? Why, men must have remained savages ever since the creation of the world, if nothing had ever been done till all men were agreed upon what ought to be done. The argument is as much as to say that there shall be no progress until a condition is complied with which is notoriously impossible. Besides, I apprehend that it is not merely the function of legislators to redress grievances but their duty to find out the means of doing so. There is not the same obligation on a private person who proves the grievance; he is only one of the patients; a legislator is the state physician: and if it is not the business of members of Parliament to know and apply the proper cure for political grievances, then what is their business?

—

রাজবন্দীদের মুক্তি ও নির্ব্বাসিতদের প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য এবং রাজনৈতিক কারণে স্বনির্ব্বাসিত লোকদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সুবিধা দিবার নিমিত্ত যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত। সন্দেহভাজন লোকদিগের হয় সাধারণ আইন অনুসারে বিচার কর, নতুবা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, ইহা অতি সঙ্গত প্রস্তাব। সাধারণ বা অসাধারণ আইন-অনুসারে বিচারিত লোকদিগকেও মিয়াদের শেষ দিন পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিবার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ লোকেরা বুদ্ধিহীন নহেন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তনও সম্ভবতঃ হইয়াছে। বিদেশবাসী ভূতপূর্ব্ব বিপ্লববাদী ও বিপ্লব-প্রয়াসী কাহারও কাহারও যে মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আমরা স্বয়ং জানি। অনুসন্ধান করিয়া এরূপ লোকদের ভারতপ্রত্যাবর্ত্তনের বাধা দূর করিলে দেশের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না।

—

দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা

দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলার আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছে। এরূপ হইবে বলিয়া অনুমিতও হইয়াছিল। ইহাদের বিচার সাধারণ আইন অনুসারে হয় নাই, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স্ অনুসারে হইয়াছিল। তাহাতে, আসামীরা কি কি প্রকারে ও কারণে আত্মপক্ষ সমর্থনের যথেষ্ট সুবিধা পায় নাই, তাহা তাহাদের কৌঁসিলী শ্রীযুক্ত নিশীথ সেন বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করেন। ইহাও বর্ণিত হয়, যে, তাঁহাদের একজন সহচরের নানা আত্মীয় কুটুম্ব সব পুলিস্ কর্ম্মচারী; সুতরাং গুপ্ত চরের বানান অনেক ব্যাপার ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির মধ্যে আছে বলিয়া সন্দেহ হইবারই কথা।

সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য যতদূর সম্ভব আইনসঙ্গত সুবিধা লাভ করুক, এরূপ কোন প্রবল ইচ্ছাবশতঃ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স্ প্রণীত হয় নাই।

—

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিবার নিমিত্ত নূতন আইন জারী করিবার ও নূতন ট্যাক্স বসাইবার কথা উঠিয়াছে। বাংলা দেশ হইতে অনেক কোটি টাকা ইন্‌কম্ ট্যাক্স বাবদে ও পাটের রপ্তানী-শুল্ক বাবদে আদায় হয়। আমাদের বিবেচনায় তাহার কতক অংশ বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ শিক্ষা বিস্তারের জন্য পাইলেই চালিতে পারে। যদি নূতন ট্যাক্স্ বসাইতেই হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহা গরীব প্রজাদের ঘাড়ে না বসে, তাহা করা কর্ত্তব্য। এরূপ একটি প্রস্তাব খবরের কাগজে দেখিলাম। তাহা এই। পাটের জিনিষের মূল্যের উপর শতকরা দুই টাকা এবং কাঁচা পাটের রপ্তানীর উপর শতকরা দশ টাকা ট্যাক্স্ বসাইলে মোটামুটি বাৎসরিক তিন কোটি টাকা আয় হইবে। তাহার আবশ্যকমত অংশ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত।

ট্যাক্স্ যেরূপই হউক বা না হউক, প্রাথমিক শিক্ষার উপর গবর্ণ্‌মেণ্টের পূর্ণক্ষমতাবিস্তার বাঞ্ছনীয় নহে।

—

আদালত-অবমাননা আইন

আদালত অবমাননা সম্বন্ধীয় আইন সংশোধিত হইয়া নূতন আকারে পাস্ হইয়াছে। বিচারকদের অযথা নিন্দা অবশ্য গর্হিত কাজ। কিন্তু বৈধ ও অবৈধ সমালোচনার মাঝখানে দাঁড়ি টানা বড় কঠিন। এই জন্য খবরের কাগজগুলিকে বরং একটু বেশী স্বাধীনতা দিলে

আদালতসকলের কার্য্যকারিতা বাড়ে এবং সুবিচারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ নিজের কর্ম্মচারী-দিগকে সমালোচনা হইতে রক্ষা করিতে অধিকতর ব্যস্ত। ফলে সম্পাদকদিগের পক্ষে নিজ-নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন অধিকতর বিঘ্নসঙ্কুল ও কঠিন হইল।

আফ্রিকার এশিয়া-বিরোধী আইন

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ ম্যালান পষ্টাপষ্টি বলিয়াই দিয়াছেন, তিনি যে আইন তথাকার পার্লামেণ্ট পেশ করিয়াছেন, তদ্দেশে ভারতীয়দের সংখ্যা কমান তাহার উদ্দেশ্য। নামতঃ ইহা সব এশিয়াজাত লোকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে, কিন্তু অস্ত্রটার লক্ষ্য হইতেছে ভারতীয়েরা; কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় এশিয়া-সম্ভূত লোকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই বেশী। সম্প্রতি এই আইনের খসড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম বার পঠিত হইয়াছে। ইহার পক্ষে ৮[illegible]জন, বিরুদ্ধে ১০জন ভোট দিয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব জেনারাল্ স্মাট্সের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে চুক্তি হইয়াছিল, এই আইন তাহা ভঙ্গ করিতেছে। স্মাট্স্ ইহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা কিছু-কিছু করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভোটের বেলায় তিনি ও অন্য কয়েকজন নামজাদা সভ্য কোন দিকেই ভোট দেন নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা তথাকার শ্বেতদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্, মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী, এবং নেশা-বিমুখ। এইজন্য শ্বেতরা তাহাদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারে না। সুতরাং আইন দ্বারা তাহাদের সংখ্যা কমাইতে হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য না-চলায় তাহারা উপবাসে অর্দ্ধাশনে মরে কিম্বা ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হয়।

ব্যবস্থা-পরিষদে বড়লাট বলিয়াছেন, এখনও এবিষয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছে; বলিয়াছেন,

"I gratefully acknowledge that the attitude of the Indian Legislature and the standing committee has been a strong support to me throughout these negotiations."

ব্যবস্থাপক সভার এরূপ প্রবল সমর্থন কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াও কিন্তু তিনি ঐ বক্তৃতাতেই সহযোগিতার অভাবের কাঁদুনী গাহিয়াছেন। সাধে কি বলি, ওটা কেবল ছলমাত্র?

আমাদের "রুপী"র ভবিষ্যৎ

আমাদের দেশের চল্তি মুদ্রার ইংরেজী নাম "রুপী"। ইহাকে "টাকা", "টঙ্কা", বা অপরাপর নামেও আখ্যাত করা হয়। রুপী-নামটি হিন্দুস্থানী "রুপেয়া" হইতে আসিয়াছে এবং উক্ত নামের সহিত সংস্কৃত "রৌপ্য" যে জড়িত আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে দিল্লীতে মুসলমান সম্রাট্গণ এই মুদ্রা প্রস্তুত করাইতেন। ইহার নাম তখন ছিল টঙ্কা এবং ইহার ওজন ছিল মাত্র ১৭৫ গ্রেন। রুপী বা রুপেয়া শের সা ১৫৪২ খৃঃ অব্দে মুদ্রণ করান। তাঁহার মুদ্রিত রুপীর ওজন ছিল ১৭৯ গ্রেন। ইংরেজরা তাহাদের আমলের গোড়ার দিকে বিভিন্নপ্রকার ওজনের ও বিশুদ্ধতার রুপী চালাইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে তাহারা আইন করিয়া ভারতে সর্ব্বত্র একমাত্র ১৮০ গ্রেন ওজনের (১৬৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য ও বাকি খাদ) রুপীর প্রচলন করে। এই ওজন স্থির করিবার কারণ এই, যে, ইহাতে রুপী নানান্-প্রকার তৎকালপ্রচলিত মুদ্রার মধ্যে অধিকসংখ্যকের সহিত প্রায় এক ওজনের হয় এবং ১৮০ গ্রেন এক তোলার সমান। তোলা ভারতীয় ওজন প্রণালীর প্রধান অঙ্গ। প্রচলিত মুদ্রা যদি এক তোলা হয়, তাহা হইলে ওজনের কাজ দেশময় সর্ব্বত্র সহজ হইয়া যাইবে, ইহা কম সুবিধার কথা নহে।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দ অবধি এই ১৮০ গ্রেন ওজনের রৌপ্য মুদ্রা ও তাহার অংশরূপে অভিহিত অন্যান্য মুদ্রাগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে দেশের সকলপ্রকার বিনিময় কার্য্য চালাইয়া আসিতেছিল। এ-সময় অবধি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরস্পরের তুলনায় মূল্য বরাবর প্রায় এক-প্রকারই ছিল। সেইজন্য ভারতের সহিত যে-সকল অপরজাতীয় লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বা রাজনৈতিক কারণে লেন্‌দেন্ ছিল, তাহাদের নিজেদের দেশের প্রচলিত মুদ্রা স্বর্ণের হইলেও তাহারা ভারতের সহিত কারবার করিতে কোন অসুবিধা বোধ করিত না। স্বর্ণ ও রৌপ্যে বিনিময়ের হার যদি স্থিরনির্দ্দিষ্ট-প্রকারের না হইয়া পরিবর্ত্তনশীল হইত, তাহা হইলে কখনও নির্ব্বিবাদে এই সকল দেনা-পাওনার কার্য্য সম্পন্ন হইত না।) যে ভারত হইতে ধারে কিছু দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিলাতে তাহা ১০০ গিনিতে বিক্রয় করে, সে হয়ত ক্রয়কালে প্রতি ১০ টাকার দ্রব্য এক গিনিতে বিক্রয় করিলে তাহার লাভ হইবে এইরূপ স্থির করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ একশত গিনিতে বিক্রীত দ্রব্যের জন্য সে ১০০০ টাকা খরচ ধরিয়াছিল, কিন্তু ধার শোধের সময় যদি রৌপ্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়া প্রতি দশটাকার জন্য তাহাকে এক গিনি অপেক্ষা কিছু অধিক দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার ধার শোধ করিতে গিয়া লোকসান হইয়া যাইবার কথা। এইরূপে ভারতের ক্রেতার পক্ষেও স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া গিয়া ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।)

১৮৭৩ খৃঃ অব্দের পরে রৌপ্যের মূল্য ক্রমশ এত কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে যে, যে-স্থলে লোকে একটাকায় দুই শিলিং পাইত, সে-স্থলে এক সময় মাত্র টাকায় এক শিলিং পাওয়া যাইত। ইহার ফলে যাহাদের বিলাতে টাকা পাঠাইতে হইত, তাহাদের বিশেষ কষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এইপ্রকার লোকের মধ্যে বহু বৃটিশ কর্ম্মচারী ছিল। ইহা ব্যতীত ভারত-গবর্ণমেণ্ট্‌কে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইত। যাহাতে টাকার মূল্য ও রৌপ্যের মূল্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া টাকার মূল্য রৌপ্যের মূল্য অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত স্থির রাখা যায়, সেই জন্য ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে টাঁকশালে সাধারণের পক্ষে অবাধে টাকা মুদ্রণ বন্ধ করা হয়। তা'র ফলে লোকে সস্তা দামে রৌপ্য পাইলেও আর পূর্ব্বের মত ইচ্ছামত তাহা দিয়া টাঁকশালে টাকা গড়াইয়া লইতে পারিত না। অর্থাৎ রৌপ্য অপেক্ষা টাকা অধিক দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়া টাকার দাম রৌপ্য অপেক্ষা অধিক হইতে পারিত এবং হইতও। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট্‌ টাকার মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ১৫টি স্থির করিয়া দেন। অর্থাৎ যে-কোন সময় ১৫ টাকায় একটি পাউণ্ড, অথবা একটি পাউণ্ডে ১৫টি টাকা দিতে গবর্ণমেণ্ট্‌ প্রস্তুত আছেন এইরূপ প্রচার করেন ও দিতেও আরম্ভ করেন।

বাজার-দর অপেক্ষা কম দামে টাকা বা পাউণ্ড দিবার এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গবর্ণমেণ্ট্‌ যুদ্ধের আগে অবধি স্বর্ণ ও রৌপ্যের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও প্রায় বরাবর ১৫ টাকায় এক পাউণ্ড এই আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধের ফলে তাঁহারা আর এই অস্বাভাবিক নির্দ্দিষ্টভাব রক্ষা করিতে পারিলেন না।

গবর্ণমেণ্ট্‌-যদিও সর্ব্বসাধারণের নিকট টাঁকশালের দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন, তবুও নিজেদের নিকট টাঁকশাল সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন। অর্থাৎ সস্তায় রৌপ্য ক্রয় করিয়া টাকা মুদ্রণ যদ্যপি সাধারণের পক্ষে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বন্ধ হয়, গভর্ণমেণ্ট্‌ কিন্তু যথেচ্ছা উক্ত উপায়ে "রুপী" মুদ্রণ করিতে থাকিলেন। এই উপায়লব্ধ যে আয় তাঁহাদের হইতে লাগিল, তাহা তাঁহারা একটি ফণ্ড্‌ করিয়া রাখিলেন। এই ফণ্ড্‌ হইতে তাঁহারা পাউণ্ড্‌ ও টাকার বিনিময়ের নির্দ্দিষ্ট হার বজায় রাখিবার খরচ জোগাইতেন। কিন্তু এই ফণ্ড্‌ অফুরন্ত ছিল না। যুদ্ধের পরে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে গিয়া এবং তৎসঙ্গে ইংরেজ বণিকের সুবিধা করিয়া দিতে গিয়া এই ফণ্ড্‌ গবর্ণমেণ্ট্‌ নিঃশেষ করিয়া ফেলেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হন, যে, এই উপায়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা-বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট রাখা অবস্থা-বিশেষে সম্ভব হইলেও অবস্থা বিশেষ খারাপ হইলে আর সম্ভব হয় না।

আজ বহুকাল ধরিয়া আমাদের টাকার স্বদেশে ও বিদেশে ক্রয়শক্তি অনির্দ্দিষ্টভাবে রহিয়াছে। কেহই বলিতে পারে না, যে, একটাকায় সাধারণভাবে এদেশে কি-পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করা যাইবে এবং অপর দেশের মুদ্রাই বা কি-পরিমাণ এক টাকায় পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ দেশে **গবর্ণমেণ্টের কাছে টাঁকশালের দ্বার চিরউন্মুক্ত** এবং বাহিরে অন্য দেশের মুদ্রা স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত। সর্ব্বদেশের মুদ্রা যদি স্বর্ণের হইত, তাহা হইলে এই আন্তর্জাতিক বিনিময় সমস্যা অনেকাংশে সহজ হইয়া আসিত, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিগণ বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধে স্বর্ণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এত স্বর্ণপ্রিয় হইয়াছে, যে, তাহারা যে-কোন উপায়ে পারে স্বর্ণকে ভারতে বা চীনে যাইতে দিতে নারাজ। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যে স্বর্ণ এত বেশী জমিয়াছে, যে, এখন কোন-কোন দেশের অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রাচ্যে স্বর্ণ-প্রেরণের সমর্থন করিতেছেন। ইহা ব্যতীত স্বাভাবিক উপায়ে যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুদ্রা-বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে শঠতার স্থান কোথাও থাকে না। অস্বাভাবিক উপায়ে দুই দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার ঠিক্‌ রাখিবার ব্যবস্থা হইলে ব্যবস্থাপকগণ অনায়াসে সে ব্যবস্থার কুব্যবহার করিয়া এক দেশের খরচে অপর দেশকে ধনবান্‌ করিয়া দিতে পারেন। এই সকল বিদেশীর পক্ষে সুবিধাজনক কারণেই আজকাল শুনা যায়, যে, ভারতের পক্ষে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার অসম্ভব কেন না:

১। ভারতবর্ষের লোকেরা স্বর্ণ পাইলেই পুঁতিয়া রাখিবে,

২। স্বর্ণমুদ্রা এত অধিক মূল্যের যে তাহা এ গরীব দেশে চলিবে না,

৩। স্বর্ণমুদ্রা চালাইলে গবর্ণমেণ্টের অত স্বর্ণ জোগাইতে অনেক খরচ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে বর্ত্তমানে রৌপ্যের উপর নির্ভরশীল থাকিলে চলিবে না বলিয়াই ধারণা হয়। যেমন দেশের অভ্যন্তরে নানা-প্রকার বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন থাকিলে ও সেই সকল মুদ্রার পরস্পরের সহিত বিনিময়-সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনশীল হইলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ ক্ষতি হয়, তেমনি বর্ত্তমান জগতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা সকল জাতির আর্থিক উন্নতির দিক্‌ দিয়া এত অধিক যে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মুদ্রাপ্রণালীসমূহের মধ্যে তারতম্য যত কম হইবে, ততই জাতিসকলের মঙ্গল। ভারতবর্ষ শুধু ইংরেজের অধীনে আছে বলিয়াই তাহার টাকাকড়িসংক্রান্ত সকল বিধিব্যবস্থা এরূপভাবে

করা হয়, যাহাতে ইংরেজের ভারতের সহিত ব্যবসার কোন ক্ষতি না হয়। এতকাল ধরিয়া ভারতের মুদ্রাপ্রণালী শুধু এই বাহিরের সম্বন্ধ বজায় রাখিতে নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। দেশের ভিতরে টাকার ক্রয়ক্ষমতার অদৃষ্টে যাই থাক্, যেন এক পাউণ্ডে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক টাকা সব সময় পাওয়া যায়, ইহাই ছিল আমাদের মুদ্রানীতির মূলসূত্র। কিন্তু ইংরেজ প্রবর্ত্তিত অস্বাভাবিক উপায়ে সে কার্য্যও আর করা চলিতেছে না।

ভারতের লোক বহু প্রাচীন কাল হইতেই স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। মুসলমান আমলেও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাশাপাশি ভারতে চলিয়াছে। অবশ্য কোন সময়েই তাহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন বিনিময়ের হার বজায় রাখিবার চেষ্টা হয় নাই। শুধু ইংরেজ আমলেই আমাদের দেশ হইতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন এতদূর উঠিয়া যায়, যে, লোকে গিনি পাইলেই জমাইয়া রাখে। কিন্তু পুনর্ব্বার যথেষ্টসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা চলিলেই সে দোষ আপনা হইতেই দূর হইবে।

যে-দেশে ১০৲, ২০৲, ১০০৲ ও তদূর্দ্ধ মূল্যের নোট চলে, সে-দেশে স্বর্ণমুদ্রা বহুমূল্য বলিয়া চলিবে না, এ কথা অবিশ্বাসযোগ্য। স্বর্ণমুদ্রা আদরের সহিতই লোকে ব্যবহার করিবে এবং স্বর্ণমুদ্রার সমান মূল্যের নোটও ঠিক টাকার পরিবর্ত্তে নোটের ন্যায়ই চলিবে। স্বর্ণমুদ্রা চালাইতে কিছু খরচ প্রথমত হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর যে-পরিমাণে রৌপ্য ক্রয় করেন, তাহাতে মনে হয় না, যে, চেষ্টা করিলে কিছু কালের মধ্যেই স্বর্ণমুদ্রা ও ব্যাঙ্কস্থ স্বর্ণের পরিবর্ত্তে নোট দেশে চলিবে না। ইহাতে পকেটে পকেটে ঘুরিয়া স্বর্ণ নষ্টও হইবে না এবং লোকে নোটগুলি পুঁতিয়াও রাখিবে না।

এইরূপে দেশের মুদ্রা-প্রণালী স্বর্ণের উপর গঠন করিলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের মুদ্রার সম্বন্ধ আরও অটুট হইবে। ইহা ব্যতীত এই উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের টাঁকশালের ও টাকার বিনিময়-হারের ব্যবস্থাপকদিগের হস্ত হইতে আমরা অনেকটা মুক্তি পাইব। টাঁকশালের দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া তৎসাহায্যে যথা-ইচ্ছা "রুপী"-মুদ্রণ এবং তাহার লাভের টাকায় বিদেশী বণিকের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিও ইহাতে কমিবে। এবং টাঁকশালের অভ্যন্তর অপেক্ষাকৃত দুর্গম হইলে দেশের ভিতরে টাকার আধিক্যজনিত গোলমালও কিছু কমিবে।

সকল দিক্ দিয়াই ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বাঞ্ছনীয়। কারেন্সী কমিশন বিদেশে গিয়া যদি এখন দেখেন, যে, ভারতে স্বর্ণ প্রেরণ করিলে বিদেশীরা খুশি হইবে না তাহা হইলেই যা বিপদ্।

অঃ

স্বাজাতিকতা বনাম সাম্প্রদায়িকতা

মুসলমানদিগের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইউনিয়নে মাস-দেড়েক পূর্ব্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, যে, সাম্প্রদায়িক সুবিধার উদ্দেশ্যে রচিত কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তে সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে রচিত কার্য্য-প্রণালী অবলম্বিত হউক। মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্না, স্যার্ আলী ইমাম্, স্যার্ মোহম্মদ শফী, প্রভৃতি নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক মতের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে, এই প্রস্তাব হইতে হয়ত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

ভ্রমসংশোধন

অগ্রহায়ণ সংখ্যা

২৮০ পৃঃ ১ম স্তম্ভ ১৪ পংক্তি—"ইংরেজদের" হইবে "রংরেজদের"

মাঘ সংখ্যা

৫৫৩ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ১০ পংক্তি—"৪৮ ফুট লম্বা" হইবে "৮ ফুট লম্বা"।

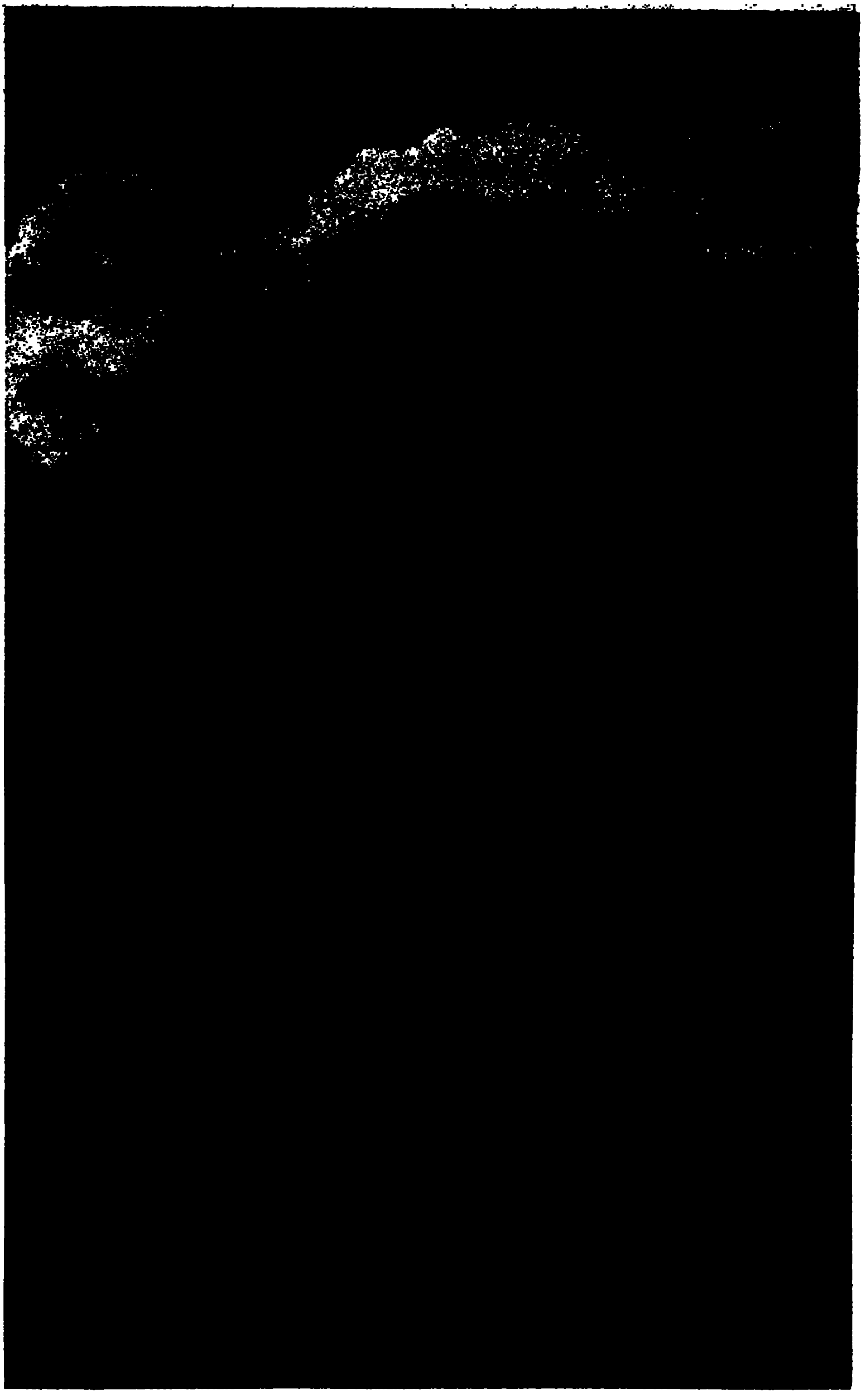
৫৬৭ পৃঃ ২য় স্তম্ভ ১৯ পংক্তি—"অধিকৃত" ও বিনোদিত করিতে পারিয়াছিলেন" হইবে "অধিকৃত ও বিনোদিত রাখিতে পারিয়াছিলেন"।

পৃঃ ৬৫৩ প্রথম কলমের অষ্টম ছত্রে Assoioates স্থলে Associates হইবে।

পৃঃ ৬৫৩ দ্বিতীয় কলম অষ্টাদশ ছত্রে হিলোয়ার স্থলে হিলেয়ার হইবে। সপ্তবিংশ ছত্রে যদিও স্থলে তিনি হইবে।

পৃঃ ৬৫৭ দ্বিতীয় কলম দ্বিতীয় ছত্রে Nous স্থলে Nons হইবে।

পৃঃ ৬৬০ দ্বিতীয় কলম চতুর্থ ছত্রে Cone স্থলে Coue হইবে।



গিরি-পরিব্রাজক

শিল্পী শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৫শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৩২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

কন্‌ফিউশিয়াস্

শ্রী হরিপদ ঘোষাল এম্-এ, বিদ্যাবিনোদ

চো বংশের (১১২০—২৪৯ খৃঃ পূঃ) রাজত্বকালে ৫৫০ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে চীনদেশের লু প্রদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কন্‌ফিউশিয়াস্। তাঁহার বংশের উপাধি কুং ছিল। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে "আমাদের প্রভু কুং" বলিয়া অভিহিত করেন। এখনও চীনদেশে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা কন্‌ফিউশিয়াসের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। কন্‌ফিউশিয়াসের পিতার নাম সু-নিয়াং-হি ছিল। তিনি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার দেহে অমিত তেজ ও সাহস ছিল। কন্‌ফিউশিয়াসের তৃতীয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে মাতা ও পুত্রের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাঁহার বয়স যখন ২৩।২৪ বৎসর তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার একটি পুত্র ছিল। তাঁহার পুত্রের লিখিত বিবরণ হইতে তাঁহার জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বাইশ বৎসর বয়সের সময় কন্‌ফিউসিয়াস্ নিজ গ্রামে লোকশিক্ষার কার্য্য আরম্ভ করেন। অনুসন্ধিৎসু বহু তরুণ যুবক তাঁহার গৃহে আগমন করিত। জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের দিকে তিনি তাহাদের মন আকৃষ্ট করিতেন এবং তাহাদের সহিত মানুষের কর্ত্তব্য ও শাসনতন্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার শিষ্যের সংখ্যা তিন সহস্রের বেশি হয় নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকের বয়স ৭০ হইতে ৮০র মধ্যে ছিল। এইসমস্ত ব্যক্তিকে তিনি খুব সম্মান করিতেন। শিষ্যগণের যৎসামান্য অর্থ দ্বারা তিনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দেড়শত বৎসর পরে মেন্‌সিয়াস্ যখন কন্‌ফিউশিয়াসের উপদেশ প্রচার করিয়া দেশে-দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন তিনি রাজগণের দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু ইহা কন্‌ফিউশিয়াসের নীতিবিরুদ্ধ ছিল। যে রাজার কার্য্যাবলী তিনি অনুমোদন করিতেন না এবং যে তাঁহার শিক্ষা-

অনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিত না, সেইরূপ রাজার দান গ্রহণ করিয়া তিনি আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই।

কন্‌ফিউশিয়াস্ উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিশক্তির জন্য তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চপদ পাওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু তাহা হয় নাই। তখন চীনদেশে অশান্তি ও অনাচার পূরামাত্রায় চলিতেছিল। সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধে দেশ বিধ্বস্ত হইতেছিল—কৃষিকার্য্য অবজ্ঞাত হইতেছিল—মেরামতের অভাবে নদীর বাঁধ ভাঙিয়া দেশ জলপ্লাবিত হইতেছিল। গোলমাল, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা পূর্ণমাত্রায় সমস্ত দেশকে তোলপাড় করিতেছিল। দেশের এই দুর্দ্দিনে, এই "মাৎস্যন্যায়ের" কালে কন্‌ফিউশিয়াস্ দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ চীনদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত চীনরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তির অমৃতবার্ত্তা প্রচার করিতেছিলেন, দেশে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য দেশবাসিগণকে তাহাদের প্রাচীন রীতি, নীতি ও প্রথা অনুবর্ত্তন করিয়া একছত্র চীনসম্রাটকে ভক্তি, প্রীতি ও বশ্যতা দেখাইতে আহ্বান করিতেছিলেন। বিংশ বৎসর বয়সে তিনি গোলারক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং সাধারণের ক্ষেত্র ও পশুদল রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার পাইয়াছিলেন। দারিদ্র্য ও অভাববশতঃ তিনি শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও তাঁহার যশঃসৌরভ দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি লু প্রদেশের কোনো-এক নগরের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই পদে পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যের Minister of Crime নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে রাজ্যে এক নূতন যুগ আসিয়াছিল। দুর্বৃত্ত ও চরিত্রহীন ব্যক্তিগণ যেন লজ্জায় কোথায় লুকাইয়া গেল। রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পাইল এবং শত্রুগণ হীনবল হইয়া পড়িল। পুরুষগণ রাজভক্তি ও সাধুতার জন্য এবং স্ত্রীলোকগণ পতিভক্তি ও বশ্যতার জন্য অপর রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কনফিউশিয়াস্ প্রজাসাধারণের অতি প্রিয় হইয়া উঠিলেন। গানে ও ছড়ায় তাঁহার নাম মুখে-মুখে গীত হইয়া অপর রাজ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। দেশে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অন্যান্য রাজ্যের বহুপ্রজা লু প্রদেশে বাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। কিন্তু এই সুখ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। অকালে মেঘের সঞ্চার হইতে লাগিল। লু প্রদেশের শৃঙ্খলা ও ঐশ্বর্য্যে নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহ ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল এবং কন্‌ফিউশিয়াসের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া মন্ত্রী একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। চীনরাজ্যের শাসনকর্ত্তা কন্‌ফিউশিয়াসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া লু রাজ্যের শাসনকর্ত্তার মন খারাপ করিতে লাগিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া আর বেশীদিন রাজকার্য্যে থাকা অপমানজনক ভাবিয়া ৪৯৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কয়েকজন শিষ্যের সহিত কন্‌ফিউশিয়াস্ স্থানত্যাগ করিলেন। প্লেটোর ন্যায় আদর্শ রাজ্য স্থাপন করিবার জন্য ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া তিনি বহুরাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং নিজ আদর্শ অনুযায়ী রাজ্য শাসন করিবার জন্য রাজগণকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো শাসনকর্ত্তা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ও তাঁহার কতিপয় বিশ্বস্ত শিষ্য উত্তেজিত লোকের হস্তে অনেকবার প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। বিপদের সময়ও তিনি ধৈর্য্য হারান নাই। তিনি বলিতেন, ভগবান্ তাঁহার মধ্যে শক্তি দিয়াছেন, কেহই তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না। তিনি নিজেকে অতিমানুষ বলিয়া কখনও ঘোষণা করেন নাই, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি ভগবানের আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি বলিতেন মানুষ কোন্ পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং শাসন কর্ত্তাগণ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে তাঁহাদের প্রজাগণ ধর্ম্মভাবে জীবনযাপন করিয়া সুখভোগ করিতে পারে তাহা তিনি জানেন। মানুষকে ইহা শিক্ষা দেওয়া তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং অনন্তভাবে তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে লাগিয়া থাকিবেন বলিয়া প্রচার করিতেন। ক্ষুধার্ত্ত ও ভীত শিষ্যগণের মধ্যে

তিনি সর্ব্বদা ধীর ও স্থির থাকিতেন এবং বীণাবাদ্যের সহিত গান গাহিয়া তাহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। তিনি বলিতেন, আমি জ্ঞান লইয়া জন্ম গ্রহণ করি নাই, আমি পুরাতত্ত্ব জানিতে ভালোবাসি এবং আমার এই জ্ঞানপিপাসা প্রবল। শিষ্যগণের সহিত ভ্রমণ করিবার সময় অনেক সংসারত্যাগী যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারের বিফল চেষ্টার জন্ত তাঁহারা তাঁহাকে উপহাস করিতেন। তিনি বলিতেন, পশুপক্ষীর সহিত বাস করা অসম্ভব। মানুষের সহিত না মিশিলে আর কাহার সহিত মিশিব? পৃথিবীর লোক ঠিক্ পথ অবলম্বন করিলে ইহার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে আমাকে চেষ্টিত হইতে হইবে না।

অবশেষে ৪৮৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে কন্‌ফিউশিয়াস্‌কে পুনরায় লু রাজ্যে আহ্বান করা হয়। তখন তাঁহার জীবনের মাত্র পাঁচ বৎসর বাকী ছিল। এক বৎসর পরে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি এই শোকাবহ ঘটনা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করেন। পর বৎসর তাঁহার প্রিয় শিষ্য ইয়েন হুই ইহ-সংসার ত্যাগ করিলে তিনি শোকে বিচলিত হইয়াছিলেন —তাঁহার বিশাল হৃদয় দুঃখে আলোড়িত হইয়াছিল। ৪৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নিজে-নিজে বলিতেছিলেন—বিশাল পর্ব্বত ক্ষয় হইয়া যাইবে, লোহার শক্ত কড়ি ভাঙিয়া যাইবে; এবং জ্ঞানী ব্যক্তি লতার ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কন্‌ফিউসিয়াস্ দীর্ঘকায় ছিলেন। তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন। যথানিয়মে, যথাকালে এবং যথাস্থানে তিনি সকল কার্য্য করিতেন। তাঁহার ভোজন-প্রণালী সুন্দর ছিল। তিনি বেশী আহার করিতেন না। তিনি খুব কমমাত্রায় মদ্যপান করিতেন। না দেখিয়া না জানিয়া তিনি কোনো সিদ্ধান্ত স্থির করিতেন না। একগুঁয়েমি ও অহঙ্কার তাঁহার মধ্যে স্থান পাইত না। শিষ্যগণের সহিত তিনি প্রায়ই কাব্য, ইতিহাস ও ভদ্র ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও অভিমান, উপবাস ও রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে বলিতেন। সাহিত্য ও নীতি আলোচনা করিতে এবং সরলতা ও সত্যকথন অভ্যাস করিতে তিনি উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, পাঁচটি সম্বন্ধের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত—স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ; পিতাপুত্র সম্বন্ধ; জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সম্বন্ধ; রাজ-প্রজা সম্বন্ধ এবং বন্ধু সম্বন্ধ। এই-কয়েকটি সম্বন্ধের লোক যথাযথ-ভাবে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলে সমাজ ও দেশ সুশাসিত হইবে। তাঁহার পূর্ব্বেও এইসমস্ত নীতিশিক্ষা চীনদেশে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তিনি পুরাতনের মধ্যে এক নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। নৈতিক শিক্ষায় তিনি সর্ব্ববিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার এক শিষ্য তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এমন একটি নীতি আছে কি না যাহা অভ্যাস করিলে জীবনে আর কোনো শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি নিজে যেভাবে আচরিত হইতে চাও না, অপরের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিও না। অনেক জ্ঞানগর্ভ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বাক্য তাঁহার অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

১। চিন্তাশীলতা-বিযুক্ত পাণ্ডিত্য-অর্জ্জনের পরিশ্রম বৃথা; পাণ্ডিত্যরহিত চিন্তাশীলতা বিপজ্জনক।

২। অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করিয়া দারিদ্র্য ভোগ করা অতি কঠিন।

৩। গর্ব্ব না করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া সহজ।

৪। জাতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিলে দেশ ও রাজার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

৫। নিম্নশ্রেণীর লোকগণ যতই শিক্ষিত হইবে তাহারা উপরিস্থগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরিচালিত হইতে ততই অনিচ্ছুক হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কন্‌ফিউশিয়াস্ মধ্যপন্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা ছিল না যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা থাকিতে পারে। সৎ কর্ম্মের দ্বারা শত্রুকে জয় করিতে পারা যায়—আমার প্রতি কেহ মন্দ ব্যবহার করিলেও আমি তাহার প্রতিশোধ না লইয়া বরং তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিব, তাহাকে বন্ধুর ন্যায় দেখিব, ভালোবাসিব ও তাহার দোষ ক্ষমা করিব। এই কথার উত্তরে কন্‌ফিউশিয়াস্ বলিয়াছিলেন, যদি মন্দ ব্যবহারের জন্ত তুমি তোমার শত্রুর প্রতি ভালো ব্যবহার করো, তাহা

হইলে ভালো ব্যবহারের জন্য কিরূপ ব্যবহার করিবে? অতএব সদ্ব্যবহারের জন্য সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার করিবে।

কন্‌ফিউশিয়াস্ কোন নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করেন নাই। তিনি বুদ্ধ বা যীশুখৃষ্টের ন্যায় ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন্ নীতি অবলম্বন করিলে মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং পারিবারিক জীবন কিরূপে দুঃখময় না হইয়া শান্তি-সুখের আকর হইয়া উঠিবে, এই সমস্যা সমাধান করিতে কন্‌ফিউসিয়াস্ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি চীনের প্রাচীন চিন্তা ও শিক্ষার ধারা রক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি নূতন কিছুই করেন নাই। তাঁহার শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতা ছিল না, তাহাতে কোনো ধর্ম্ম-বিশেষের উল্লেখ নাই। তিনি ভাবিতেন যে মানুষের বর্ত্তমান জীবন এক বিষম সমস্যা ও শিক্ষার বিষয়। তিনি বলিতেন যে মানুষ সামাজিক জীব। আন্তরিকতা থাকিলে মানবপ্রকৃতি পূর্ণবিকাশ লাভ করিবে, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে অতুলনীয় ক্ষমতাপন্ন হইবে। তাও-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক লাওৎসে কন্‌ফিউশিয়াসের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার দার্শনিক মত মানসিক শক্তি ও চিন্তা-স্ফুরণের সহায়ক। তিনি চাহিয়াছিলেন মানুষকে প্রকৃতির সহিত খাপ্ খাওয়াইতে—বাহ্য প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে—মানবপ্রকৃতির জন্মগত পবিত্রতা রক্ষা করিতে—নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিজননীর বৃত্তি অবলম্বন করিতে—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে, প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ নৈষ্কর্ম্ম্য অবলম্বন করিতে। কিন্তু কন্‌ফিউশিয়াস্ চাহিয়াছিলেন নির্দ্দিষ্ট বিধি ও প্রথা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন সংস্কার করিতে, ইউ ও সুন আমলে যে রাজনীতি ও প্রথা প্রচলিত ছিল, যে সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা প্রাচীন চীনকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিয়াছিল তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে। লাওৎসে বলিয়াছিলেন আদি অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে—রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হইবার পূর্ব্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে, কিন্তু কন্‌ফিউশিয়াস্ উপদেশ দিয়াছিলেন ইউ ও সুন বংশের শান্তিসুখময় রাজত্বকালের আদর্শ নীতি অবলম্বন করিতে। তাঁহার মতে ইউ ও সুন্ বংশের রাজত্বকাল চীনের ত্রেতাযুগ—চীনের রামরাজত্ব। সেই কালের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ও পারিবারিক ব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুবর্ত্তন করিলে চীনে নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে।

বর্ত্তমান চীন অনেক বিষয়ে কনফিউশিয়াসের নিকট ঋণী। চীনের সভ্যতা, চীনের উৎকর্ষ, চীনের আচার-ব্যবহার, এককথায় সর্ব্ববিষয়ে তিনি এক নূতন ভাব আনয়ন করিয়াছিলেন। যতদিন চীনদেশ ও চীনজাতি ধরাপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত কনফিউশিয়াসের নাম তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

ভারতীয় আর্য্যগণের আমিষ-ব্যবহার

শ্রী অমূল্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই বলিয়া থাকেন "প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ কেবলমাত্র ফল-মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন।" কেহ-কেহ বলেন "তাঁহারা কেবলমাত্র হরীতকী ভক্ষণ করিয়া নানাবিধ শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন ও তত্ত্ব-জ্ঞান অন্বেষণ করিতেন।" কিন্তু যাঁহারা ঋষিদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। মহাভারতখানি আগাগোড়া পড়িলে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে মাংসই আর্য্যদিগের প্রধান খাদ্য ছিল। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় মাংস ব্যবহৃত হইত, অতিথি-অভ্যাগত গৃহে আসিলে মাংস দ্বারা তাঁহাদের

অভ্যর্থনা করা হইত, শ্রাদ্ধে পিতৃপুরুষগণকে মাংস প্রদান করা হইত, দেবগণের তৃপ্তির জন্ম মাংস উৎসর্গ করা হইত, আর মাংসই অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল। ক্রমে এই মাংস-ভোজন-প্রথা ভারতবর্ষে কমিয়া আসে; বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহাভারতে আমিষভোজনের কতকগুলি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে আমরা দেখিতে পাই যে মাংস ভোজন-সম্বন্ধে ঋষিগণের কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। যে-কোন পশুর মাংস পাইলেই তাঁহারা ভোজন করিতেন। যাহা দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত তাহাও ভোজন করিতেন, যাহা উৎসর্গ করা না হইত তাহাও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। মাংস তাঁহাদের দৈনন্দিন খাদ্য ছিল।

সূর্য্যদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে বর দিতেছেন

"হে নরাধিপ! আমার প্রদত্ত তাম্রনির্ম্মিত এই স্থালী গ্রহণ কর। পাঞ্চালী অনাহারী হইয়া যাবৎ এই পাত্র রক্ষা করিবে, তাবৎ পাকশালায় পক্ক ফল, মূল, শাক, আমিষ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন অক্ষয় হইয়া থাকিবে।" বন ৩।

পাণ্ডবেরা যখন বনগমন করেন তখন

"তাঁহারা মুনিভোজ্য সুরস ফল-মূল এবং বিশুদ্ধ শর-নিহত মৃগ-মাংস ভোজন ও হিমাচলসম্ভূত বিবিধ পবিত্র মধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।" বন ১৬০।

এক ব্যাধ কোনো ব্রাহ্মণকে কহিতেছেন

"লোকে পশুগণকে আক্রমণপূর্ব্বক বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ এবং বৃক্ষ ও ওষধি সমুদয় ছিন্ন করে।" বন ২০৭।

রাজা দুর্য্যোধন

"পরে গোরস পান ও অন্যান্য মাংস উপযোগ করিয়া মত্ত মধুকর-সেবিত, ময়ূরগণের কেকারব-মুখরিত পরম রমণীয় বন ও উপবন-সকল অবলোকনপূর্ব্বক সপ্তচ্ছদ, পুন্নাগ ও বকুল সমাকীর্ণ অতি পবিত্র দ্বৈতবন-নামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন।" বন ২৩৯।

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিতেছেন

"আমাদের বনবাসের আর একবৎসর আটমাস অবশিষ্ট আছে, ঐ সময় আমাদিগকে মৃগমাংসও উপযোগ করিতে হইবে, অতএব আইস, আমরা মরুভূমির প্রান্তরস্থিত তৃণবিন্দু সরোবর সমীপবর্ত্তী সেই পরম-রমণীয় কাম্যক-বনে গমনপূর্ব্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতি-বাহিত করি।" বন ২৫৭।

ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, যাঁহারা বনগমন করিতেন তাঁহারা কেবল ফল-মূল আহার করিতেন না। মাংসই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন ছিল।

কোনো সমরাভিযানের সময় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত মাংস সরবরাহ করিতে হইত।

লঙ্কা সমরের প্রাক্কালে রামচন্দ্রের বানর-সৈন্যগণ—

"প্রভূত মধু মাংস ও জলসম্পন্ন, বিবিধ ফলমূলসংকীর্ণ অরণ্য ও গিরি-শিখরতলে বাস করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ক্ষীরোদ-সাগর-সমীপে সমুপস্থিত হইল।" বন ২৮২।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস-সময়ে—

"ভীমসেন মৎস্যরাজপ্রদত্ত মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন।" বিরাট ১৩।

রাজাদিগের ন্যায় অন্যান্য ধনী-ব্যক্তিগণেরও মাংসই প্রধান খাদ্য ছিল।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন—

"আঢ্যগণের ভোজন মাংসপ্রধান, মধ্যবিত্তগণের ভোজন গব্য-রসপ্রধান ও দরিদ্রগণের ভোজন তৈলপ্রধান।" উদ্যোগ ৩৩।

সমুদ্র-পারে কোনো ধনবান্ বৈশ্যের পুত্রেরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাককে ভরণ-পোষণ করিত। কর্ণ ৪২।

"ব্যাধগণ ভীমের আহারার্থ প্রতিদিন পরমভক্তিসহকারে মাংস আহরণ করিত।" শল্য ৩২।

ধৃতরাষ্ট্রের ভোজনের নিমিত্ত মৈরেয়, মৎস্য, পানীয় ও মধু প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষ্য-সমুদয় প্রস্তুত হইত। আশ্রমবাসিক ১।

ভীষ্ম কহিতেছেন—

"মাংস ভক্ষণ করিলে অচিরাৎ বল ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে।" অনুশাসন ১১৬।

শান্তি পর্ব্বে তিনি বলিতেছেন

"ব্রহ্মা ছাগ, অশ্ব ও ক্ষত্রিয়কে সাধারণের হিত-সাধনার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" শান্তি ১৪২।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন—

"মৃন্ময় গৃহ যেমন মৃত্তিকাদ্বারা লেপিত হয় তদ্রূপ এই মৃন্ময় দেহও মৃত্তিকার দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মধু, তৈল, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস, লবণ, গুড়, ধান্য ও ফল মূলাদি সমুদয় দ্রব্য সলিল ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়।" শান্তি ২১২।

শৃগালরূপী ইন্দ্র এক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—

"দেখ মদ্য ও লভক পক্ষীর মাংস এই উভয়ের তুল্য সুখজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই।" শান্তি ১৮০।

এইরূপ মাংস ভক্ষণে তাঁহারা কোনোরূপ অধর্ম্ম দেখিতে পাইতেন না।'

সৌপ্তিক পর্ব্বে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মা অমর সৃষ্টিকর্ত্তার বাক্য শ্রবণে প্রজাগণের আহারার্থ ওষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ-সমুদয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণিগণ বলবান্‌দিগের আহারার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" সৌপ্তিক ১৭।

বাসুদেব কহিতেছেন—

"বলবান্ জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে, নকুল মূষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুক্কুর মার্জ্জারকে, চিত্র-ব্যাঘ্র কুক্কুরকে, এবং মনুষ্য সেই চিত্র ব্যাঘ্রকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।" শান্তি ১৫।

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন—

"আর অনেক সামান্য মনুষ্যও ভূমিভেদ এবং ওষধি পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিতেছে।" শান্তি ১৫।

ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণও প্রচুর-পরিমাণে মাংস উপযোগ করিতেন।

পাণ্ডবেরা বনগমন করিলে—

"পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ বিশুদ্ধ শরনিপাতিত মৃগমাংস ও বন্যজন্তু আহরণ করত অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনারা ভোজন করিতেন।" বন ৫০।

অন্যত্র—

রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাণ দ্বারা রুরু ও কৃষ্ণসার মৃগ এবং অন্যান্য পরিশুদ্ধ বন্যজন্তু নিহত করিয়া সহস্র-সহস্র ব্রাহ্মণ, মহাত্মা স্নাতকগণ ও দশজন মোক্ষবেত্তাকে ভরণ-পোষণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন প্রদান করিতেন। বন ৫০।

স্নাতক ব্রাহ্মণগণ, মোক্ষবেত্তা ও অন্যান্য সকল ব্রাহ্মণই মাংসপ্রিয় ছিলেন।

আবার দেখুন, অর্জ্জুন যখন অস্ত্র শিক্ষার্থে স্বর্গে গমন করেন তখন, অর্জ্জুনবিহীন পাণ্ডবগণ অতি অপ্রশস্ত মনে সেই কাম্যকবনে বাস করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত প্রতিদিন বিশুদ্ধ বাণ দ্বারা বহুবিধ পবিত্র মৃগসমূহ সংহার করিয়া ও অন্যান্য-প্রকার বন্য আহার আহরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। বন ৮০।

পাণ্ডবগণ যখন তীর্থ যাত্রা করিতেছেন তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন—

"যে-সকল ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ ও যতি ক্ষুৎপিপাসা, পথশ্রম, আয়াস ও শীতবাতাদি সহ্য করিতে অসমর্থ, যে-সকল ব্রাহ্মণ মিষ্টান্নভোজী, যাঁহারা পর্য্যাপ্ত, লেহ্য পেয় ও মাংসের অভিলাষী, যাঁহারা ভোজনের নিমিত্ত সর্ব্বদা সূপকারের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা সকলেই তীর্থাভিগমনে বিনিবৃত্ত হইয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করুন।" বন ৯২।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে কেবলমাত্র মাংস ও অন্যান্য দ্রব্য ভোজনের নিমিত্ত অনেক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের সহচর হইয়াছিলেন।

অন্যত্র—

পূর্ব্বে কায়ব্য নামে এক নিষাদ বাস করিত। "অরণ্যবাসী প্রব্রজিত ব্রাহ্মণগণের পূজা করা তাহার নিত্য ধর্ম্ম ছিল। সে প্রতিদিন মৃগ বধ করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত লইয়া যাইত।" শান্তি ১৩৫।

আমিষভোজনে ঋষিগণের পরমার্থ সাধনার কোনো বিঘ্ন হইত না। বরং অনেকে আমিষের উপর নির্ভর করিয়াই পরমার্থ সাধনা করিতেন।

শল্য-পর্ব্বে লিখিত আছে—

"সরস্বতী এইরূপ কহিলে মহাত্মা সারস্বত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক মৎস্যাহারে প্রাণধারণ করিয়া দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ, ও বেদপাঠ করিতে লাগিলেন। শল্য ৫২।

স্ত্রীলোকেরাও তৎকালে মাংস-ভোজনে অভ্যস্তা ছিলেন। দময়ন্তী বাহুকবেশী নলকে চিনিবার নিমিত্ত কেশিনীকে তাঁহার সংস্কৃত মাংস আনয়ন করিতে কহিলেন। কেশিনী তৎক্ষণাৎ ত্বরিতপদে বাহুক-সমীপে গমন করিয়া অত্যুষ্ণ মাংস আনয়ন করিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিলেন। দময়ন্তী সেই মাংস ভোজন করিয়া বাহুককে নল বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বন ৭৫।

অতিথি-অভ্যাগত গৃহে আসিলে মাংস প্রভৃতির দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করা হইত।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শল্য যখন দুর্য্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তখন দুর্য্যোধন তাঁহার প্রীতি সম্পাদনার্থ

"শিল্পী দ্বারা স্থানে-স্থানে এক-এক সভা নির্ম্মাণ ও নানা-প্রকার ক্রীড়াদ্রব্য প্রস্তুত করাইলেন। তথায় নানাবিধ অন্ন, মৎস্য, মাংস, সুসংস্কৃত ভক্ষ্য ও সুধাসোদর পানীয় আহরণ, বিবিধ রমণীয় কূপ ও বাপী খনন এবং অনেকানেক রমণীয় গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন।" উদ্যোগ ৭।

পাণ্ডবেরা বনগমন করিলে জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করিবার নিমিত্ত পাণ্ডবগণের কুটীরে অতিথি-বেশে

গমন করেন তখন দ্রৌপদী তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত কহিলেন—

"আমি তোমার প্রাতরাশ সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং তোমাকে এণ, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, রুরু, ঋক্ষ, শম্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন।" বন ২৬৮।

কত-প্রকারের বন্য জন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ভক্ষ্য-শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন এক্ষেত্রে তাহাও দ্রষ্টব্য। উষ্ট্র, ভল্লুক, শূকর, বন্য গো ও মহিষ, এ সমস্ত পশুর মাংস হরিণ, শশক প্রভৃতির সহিত এক-পর্য্যায় ভুক্ত ছিল।

কোনো ব্রাহ্মণ এক বকের অতিথি হইয়াছিল।

"সদাশয় বক এই বলিয়া যথানিয়মে তাঁহার পূজা করিয়া তাহাকে শালপুষ্পময় দিব্য আসন, গঙ্গা-সলিলান্তর্গত বৃহৎ-বৃহৎ মৎস্য ও প্রদীপ্ত হুতাশন প্রদান করিল।" শান্তি ১৭০।

মহর্ষি চ্যবন কোনো সময়ে মহারাজ কুশিকের অতিথি হইয়াছিলেন—

"মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র নরপতি ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে সত্বরে সিদ্ধান্ন, বিবিধ মাংস, শাক, রসাল, পূপ, বিচিত্র মোদক, নানা-প্রকার রস এবং মুনিভোজ্য, রাজভোগ্য ও গৃহস্থভোগ্য রাশি-রাশি ফল আহরণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে সংস্থাপিত করিলেন।" অনুশাসন ৫৩।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"রোহিণী নক্ষত্রে ব্রাহ্মণগণের আনৃণ্য লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহা-দিগকে মৃগমাংস, অন্ন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বিবিধ পানীয় প্রদান করিবে।' অনুশাসন ৬৪।

পুনশ্চ তিনি বলিতেছেন—

"উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে মেষমাংস প্রদান করেন তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তি-সম্পাদনে ও দেহান্তে অনন্ত ফললাভে সমর্থ হয়েন।" অনুশাসন ৬৪।

একদা রাজা কল্মাষপাদ

"বন হইতে প্রস্থান করিতেছেন এমন সময় এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া তৎসন্নিধানে মাংস ভোজনের প্রার্থনা করিলেন। আদি ১৭৬।

বৃহৎ-বৃহৎ যজ্ঞে ও অন্যান্য উৎসবে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের নিমিত্ত যে-সমস্ত খাদ্য সংগৃহীত হইত তাহার মধ্যে মাংস একটি প্রধান খাদ্য ছিল।

দক্ষযজ্ঞে—

"ভৃত্যগণ ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, দধি, খণ্ড, শর্করা ও মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য এবং উৎকৃষ্ট পেয়-সমুদয় নানাপ্রকার সুধধারা ভোজন ও পান করিতে লাগিল।" শান্তি ২৮৩।

এইসমস্ত খাদ্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রলোক-দিগের নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

যুধিষ্ঠির যখন প্রথম সভা প্রবেশ করেন তখন তিনি

"ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পায়স, ফল, মূল, হরিণাদি মৃগমাংস, বিবিধ চোষ্য, নানাবিধ পেয় ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানা দিগ্‌দেশাগত অযুতসংখ্যক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন।" সভা ৪।

উত্তরার বিবাহের সময় বিরাট-রাজ্যে

"উচ্চাবচ মৃগ, মৎস্য ও মৈরেয় প্রভৃতি সুরা সকল সমাহৃত হইল।" বিরাট ৭২।

যদুবংশধ্বংসের প্রাক্‌কালে—

দুর্নিমিত্ত-সমুদয় উপস্থিত হইলে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় বীরগণ সকলেই সপরিবারে তীর্থ-যাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় ও মদ্য মাংস প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মৌষল ৩।

গোমাংস ভক্ষণও তৎকালে অবাধে চলিত।

'মহাত্মা সঙ্কৃতিনন্দনের ভবনে প্রত্যহ এত অধিক অতিথি সমাগত হইত যে মণিকুণ্ডলধারী সূপগণ একবিংশতি সহস্র বলীবর্দ্দের মাংস পাক করিয়াও অতিথিগণকে কহিত, অদ্য তোমরা অধিক-পরিমাণে সূপ ভক্ষণ কর, আজি অন্য দিনের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত মাংস নাই।" দ্রোণ ৬৭।

ইন্দ্র ও অগ্নি যখন শ্যেন ও কপোত বেশে শিবি-রাজাকে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন শিবিরাজা কহিলেন

"এই কপোতের পরিবর্ত্তে ওদনের সহিত বৃষভ পাক করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি, হে শ্যেন! তুমি যে প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া প্রীত হও তথায় গমন কর, শিবিরাজা তোমার নিমিত্ত সেই স্থানে মাংস বহন করিবে।" বন ১৯৬।

গোমাংস ভক্ষণ প্রথার বহুল প্রচলন না থাকিলে শিবিরাজা একটি কপোতের পরিবর্ত্তে একটি বৃষভ হত্যা করিতে সম্মত হইতেন না।

কর্ণ কহিতেছেন

"মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসী সকলে একত্র মিলিত এবং·········মদ্যপানপূর্ব্বক শক্তু, মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করত কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন-কখন অসংবদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে।" কর্ণ ৪১।

কোনো রাক্ষসী গাহিতেছে

"আহা আমি কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ী সুরাপান এবং গোমাংস ও পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেকি সঙ্গীত করিব? যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে তাহাদের জন্ম নিরর্থক।" কর্ণ ৪৫।

যুধিষ্ঠিরের মাতুল শল্যের রাজ্যে এই প্রথা ছিল।

অন্যত্র দেখুন

"অরট্ট দেশের ন্যায় প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার প্রচলিত আছে।" কর্ণ ৪৫।

বলা বাহুল্য, এইসকল দেশের অধিকাংশই আর্য্য-দিগের অধ্যুষিত ছিল ও আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ছিল।

নর-মাংস-ভোজনেরও আভাস মহাভারতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে একবার ঘোরতর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে শৈব্য রাজার কুমার প্রাণত্যাগ করে। তখন কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি, এই সাত জন ঋষি সেই কুমারকে ভক্ষণ করিবার মানসে স্থালীতে পাক করিতে লাগিলেন। এমন সময় শৈব্য রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন ও ঋষিদিগকে এই জঘন্য কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। তখন সকলে শবদেহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অনুশাসন ৯৩। এক ব্রাহ্মণ শিবিরাজাকে কহিলেন,

"রাজন্! বৃহদ্গর্ভ নামে তোমার যে পুত্র আছে, তাহাকে বিনষ্ট করত তাহার মাংস পাক ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে।" বন ১৯৭।

যদিও ব্রাহ্মণ এস্থলে শিবিরাজাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন তথাপি নর-মাংস ভোজন প্রচলিত না থাকিলে তিনি রাজাকে এরূপ অন্যায় ও অসম্ভব আদেশ করিবেন কেন? শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা-গ্রহণ-কালে তাহার বক্ষ-শোণিত পান করা হইত।

ভীমসেন

"সোৎসুকনয়নে ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করত আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসে শিতধার অসি সমুদ্যত করিয়া কম্পিত-কলেবরে তাঁহার উপর পদার্পণপূর্ব্বক বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিলেন।" কর্ণ ৮৪।

স্বর্গেও এইরূপ প্রথার কল্পনা করা হয়।

মহিষাসুর বধের পর

"এইরূপে মহাসেন অনবরত শর বর্ষণ করিয়া শত্রুগণকে নিঃশেষ করিলে পর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ তদীয় পারিষদবর্গ প্রহৃষ্টমনে অবশিষ্ট অসুরগণকে সংহার করিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিতে লাগিল।" বন ২৩০।

যজ্ঞেও দেবতাদিগের উদ্দেশে নানাবিধ পশু উৎসর্গ করা হইত।

মহর্ষি স্যমরশ্মি কপিলকে কহিতেছেন

"ছাগ, অশ্ব, মেষ, ধেনু ও পক্ষী প্রভৃতি গ্রাম্য ও আরণ্য জন্তু সমুদয় এবং, ওষধি-সকল জীবগণের জীবনধারণের উপায়।......ধেনু, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, মার্জ্জার, অশ্বতর ও গর্দ্দভ এই সাত গ্রাম্য এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর, এই সাত আরণ্য, এই চতুর্দ্দশ-বিধ জন্তু দ্বারা যজ্ঞ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।" শান্তি ২৬৮।

ভীষ্ম কহিতেছেন

"গো-সমুদয় পরম পবিত্র জগতের অবলম্বন দেবগণের মাতা ও উপমা-রহিত। উহাদিগকে যজ্ঞে নিধন, যাত্রাকালে দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া গমন ও উপযুক্ত কালে সৎপাত্রে প্রদান করিবে।" অনুশাসন ৮০।

ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে গাভীসকল বহুল-পরিমাণে যজ্ঞে উৎসর্গ করা হইত।

মহর্ষি বক একবার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যজ্ঞ-সম্পাদনের নিমিত্ত কতকগুলি গাভী প্রার্থনা করেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কতকগুলি মৃত গাভী প্রদান করেন। ইহাতে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া

"সেইসমস্ত মৃত পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য ক্ষয় করিবার নিমিত্ত হোম করিতে লাগিলেন।" শল্য ৪২।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন

"যেমন পশু, যজ্ঞ ও চিত্তসংস্কার এই তিনটি মোক্ষসাধনের উপযোগী, তদ্রূপ কোষ, বল ও জয় এই তিনটি রাজ্যপুষ্টির প্রধান সাধন।" শান্তি ১৩০।

বেদব্যাস শুকদেবকে কহিতেছেন

তাঁহারা (গৃহস্থেরা) যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত চতুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ছাগাদি পশু ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষ ছেদন করিবেন।" শান্তি ২৪৩।

সরস্বতী-তীর্থে

উদারবুদ্ধিসম্পন্ন সুরগুরু বৃহস্পতি অসুরগণের বিনাশ ও দেবগণের মঙ্গল-সাধনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান-পূর্ব্বক মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। শল্য ৪২

দেবরাজ রাজা মরুত্তকে কহিতেছেন

"অতএব ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে অগ্নির প্রীতির নিমিত্ত লোহিত ছাগ, বিশ্বদেবগণের প্রীতির নিমিত্ত নানাবর্ণ ছাগ এবং অন্যান্য দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করুন।" আশ্বমেধিক ১০।

ব্রাহ্মণেরা স্বহস্তে এইসমস্ত ছেদন ব্যাপার সম্পন্ন করিতেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

অশ্বমেধ-যজ্ঞের সময়

"পাণ্ডুতনয়গণ ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসুকে রাজ্যরক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন, মোদক, পায়স, ও মাংস-নির্ম্মিত পিষ্টক দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা সমাধান, সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ এবং শোকসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, ও পৃথার অনুমতিগ্রহণ-পূর্ব্বক অর্থ আনয়নার্থ নগর হইতে বহির্গত হইলেন।" আশ্বমেধিক ৬৩।

আবার অন্যস্থানে দেখুন

"তখন বেদ-পারদর্শী পুরোহিত ধৌম্য যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক চরুপ্রস্তুত করিয়া সেই মন্ত্রপূত চরু এবং বিবিধ বিচিত্র পুষ্প, মোদক, পায়স ও মাংস দ্বারা প্রথমতঃ মহেশ্বরের অর্চনা করিলেন।" আশ্বমেধিক ৬৫।

মহাদেব প্রথমে মাংসপ্রিয় ছিলেন। আজকাল তিনি নিরামিষাশী।

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে

"মনীষী ঋত্বিক্‌গণ শাস্ত্রানুসারে নানা দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ পক্ষী, বৃষ ও জলচর সমুদয়কে সংস্থাপন করিয়া যূপ সমুদয়ে তিনশত পশুর সহিত সেই অশ্বকে নিবদ্ধ করিলেন।" আশ্বমেধিক ৮৮।

"অনন্তর যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ ক্রমে-ক্রমে সমুদয় পশু পাক করিয়া শাস্ত্রানুসারে সেই অশ্বকে ছেদন করিলেন।" আশ্বমেধিক ৮৯।

"ঐ যজ্ঞে কত শত লোক যে খাণ্ডব মিষ্টান্ন নির্ম্মাণ ও ভোজন করিয়াছিল এবং কত শত পশু যে নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।" আশ্বমেধিক ৮৯।

উপরি-উক্ত অংশসমূহ হইতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে যজ্ঞকালে গো, বৃষ ইহারা অন্যান্য পশুর সহিত এক-পর্য্যায়-ভুক্ত ছিল। প্রাচীন ঋষিগণ ইহাদিগকে অন্য পশু হইতে কোনোরূপে পৃথক্ করিতেন না।

এইবার আমরা দেখাইব পিতৃকার্য্যেও এইসমস্ত পশুর মাংস ব্যবহৃত হইত।

"রন্তিদেবের ক্রিয়ানুষ্ঠান-কালে গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুসকল স্বয়ং তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া 'আমাকে পিতৃকার্য্যে নিয়োগ করুন' বলিয়া উপাসনা করিত।" শান্তি ২৯।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন

"উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত, সোমরস ও আরণ্য পশুর মাংস প্রাপ্ত হইলেই শ্রাদ্ধ করা উচিত।" অনুশাসন ২৩।

অন্যত্র তিনি কহিতেছেন, "শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুইমাস, মেষ মাংস প্রদান করিলে তিন মাস, শশ মাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজ মাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাংস, বরাহ মাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষত-নামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশ মাস, মহিষমাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে একবৎসরকাল তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। ঘৃত ও পায়স গোমাংসের ন্যায় পিতৃগণের প্রীতিকর; অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃত ও পায়স প্রদান করা অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধে বাধ্রীনস ছাগের মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর তৃপ্তি-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। গণ্ডকের মাংস, কালশাক, ও রক্তবর্ণ ছাগের মাংস প্রদান করিলে তাঁহাদের অনন্তকাল তৃপ্তি উৎপাদন করা যায়। অনুশাসন ৮৮।

কসাইয়ের দোকানে সর্ব্ববিধ পশুর মাংস বিক্রয় হইত। এবং ঐ মাংস শ্রাদ্ধে ও দেবগণের পূজায় ব্যবহৃত হইত।

এক ব্রাহ্মণ মিথিলায় গমন করিয়া দেখিলেন

"তপস্বী ব্যাধ সূনা মধ্যে আসীন হইয়া মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছে।" বন ২০৬।

উক্ত ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন

"হে দ্বিজসত্তম! বিধিই প্রাণিগণকে সংহার করেন, ঘাতক কেবল নিমিত্তমাত্র। তদনুসারে আমরাও পশুবধে কেবল নিমিত্তভূত হইয়াছি। হে ব্রাহ্মণ! আমরা যে সমুদয় পশুমাংস বিক্রয় করি উহা ভক্ষণ করিলে ধর্ম্ম হয়, কারণ উহা দ্বারা দেব, অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। আর ওষধি, লতা, পশু, মৃগ, ও পক্ষীসকল যে লোকের ভক্ষ্য ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।" বন ২০৭।

ঋষিগণ যখন যে মাংস খাইতেন অগ্রে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে তাহা সমর্পণ করিয়া তবে খাইতেন।

একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কোনো খাদ্য না পাইয়া এক চণ্ডালের গৃহ হইতে কুক্কুর মাংস অপহরণ করিয়াছিলেন।

"অনন্তর ভগবান্ বিশ্বামিত্র বিধিপূর্ব্বক দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য সমাধানপূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন করিয়া স্বয়ং সেই কুক্কুরমাংস ভক্ষণ করিলেন।" শান্তি ১৪১।

এইরূপ বহুকাল চলিলে পর আর্য্যদিগের মধ্যে মাংস-ভোজন-সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয় ও তাহার ফলে কতকগুলি প্রাণীর মাংস নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই কালের যেসকল উক্তি মহাভারতে পাওয়া যায় তাহাকে আমরা দ্বিতীয় স্তরের রচনা বলিয়াছি ও নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলে এই দ্বিতীয় স্তর কিরূপ ছিল তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

বিশ্বামিত্র যখন চণ্ডালগৃহ হইতে কুক্কুরমাংস চুরি করেন, তখন সেই চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে কহিতেছেন

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পঞ্চনখ-সম্পন্ন শল্লকী প্রভৃতি পাঁচ জন্তু ভক্ষণ করাই শাস্ত্র-সঙ্গত।" শান্তি ১৪১।

অন্য জন্তুর মাংসভক্ষণ এইসময় দ্বিজাতির পক্ষে নিন্দনীয় হইয়াছিল।

ভীষ্মদেব কহিতেছেন

"যে-ব্যক্তি কুক্কুর, বরাহ, মনুষ্য, কুক্কুট, বা উষ্ট্রের মাংস, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিবে, তাহার পুনঃসংস্কার বিধান করা কর্ত্তব্য।" শান্তি ১৬৫।

মুরগী শূকর ও নরমাংস প্রভৃতি এই সময় হইতে সমাজে নিষিদ্ধ পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। এইসময় গোহত্যার বিরুদ্ধেও আন্দোলন উপস্থিত হয়।

"পূর্ব্বে মহারাজ নহুষ মধুপর্কদানসময়ে গোবধ করাতে মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, 'মহারাজ তুমি মাতৃতুল্য গাভী ও প্রজাপতিতুল্য বৃষকে বিনষ্ট করিয়া যার-পর-নাই গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ।'" শান্তি ২৬২।

"পূর্ব্বে নরপতি বিচখ্যু গোমেধ যজ্ঞে যজ্ঞভূমিস্থ নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষতদেহ বৃষকে দর্শন এবং গো-সমূহের আর্ত্তনাদ শ্রবণপূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া কহিয়াছিলেন, 'আহা গো-সমুদয় কি কষ্ট ভোগ করিতেছে।'" শান্তি ২৬৫।

এই সময় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক গোহত্যা দর্শন করিয়া কাহারও-কাহারও দয়ার উদ্রেক হইতে লাগিল।

নরপতি বিচখ্যু আরও বলিতেছেন

"অতঃপর সমুদয় লোকে গো-সমূহের মঙ্গললাভ হউক। বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ়প্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসা-যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" শান্তি ২৬৫।

একদা মহর্ষি ত্বষ্টা নরপতি নহুষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে তিনি শাশ্বতবেদ-বিধানানুসারে তাঁহাকে মধুপর্কপ্রদানার্থ গোবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এমন সময় জ্ঞানবান্ সংযমী মহাত্মা কপিল যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া নহুষকে গোবধে উদ্যত দেখিয়া স্বীয় শুভকরী নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিপ্রভাবে 'হা বেদ' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। শান্তি ২৬৮। ইহার পর কপিল ও স্যূমরশ্মিনামক ঋষি এই দুইজনের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। স্যূমরশ্মি গোহত্যার ও বেদবিধির সমর্থন করিতেছিলেন। যাহা হউক অনেক বিতণ্ডার পর কপিল স্যূমরশ্মিকে স্বমতে আনয়ন করিলেন।

বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন

"বৃষ, মৃত্তিকা, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাতক, বিষ, শল্কবর্জ্জিত মৎস্য কচ্ছপ ভিন্ন চতুষ্পদ জন্তু, মণ্ডুক প্রভৃতি জলচর, ভাস, হংস, সুপর্ণ, চক্রবাক্, প্লব, বক, কাক, মদগু, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পদ পক্ষী, মাংসাশী জন্তু ও দ্বিদন্ত ও চতুর্দ্দন্ত প্রাণীর মাংস ভোজন এবং মেষ, বড়বা, গর্দ্দভী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থা গাভী, মানুষী, ও মৃগীর দুগ্ধ পান করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। শান্তি ৩৬।

এখন দেখুন বৃষ প্রভৃতি জন্তুর মাংস নিষিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন—

"ছাগ, গো ও ময়ূরের মাংস, শুষ্ক মাংস এবং পর্য্যুষিতান্ন ভোজন করা নিতান্ত গর্হিত।" অনুশাসন ১০৪।

ইহার পরই অনুশাসন-পর্ব্বের ৭৪ অধ্যায়ে একেবারে কঠিন অনুশাসন।

"যে-ব্যক্তি গোমাংস ভক্ষণ এবং যে-ব্যক্তি সকলকে গোবধে অনুমতি প্রদান করে, তাহাদের সকলকেই সেই নিহত ধেনুর লোম-পরিমিত-বৎসর নরকে নিমগ্ন থাকিতে হয়। অনুশাসন ৭৪।

এই সময় হইতেই গোহত্যা ভারতবর্ষে রহিত হইয়া যায়। অনুশাসন পর্ব্বের অন্য স্থানে এই কথাটি পরিষ্কার করিয়া লেখা আছে।

"পূর্ব্বকালে মহাত্মা রন্তিদেব স্বীয় যজ্ঞে গো-সমুদয়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া ছেদন করাতে উহাদিগের চর্ম্মরসে চর্ম্মণ্বতী নদী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে উহারা আর যজ্ঞীয় পশুত্বে কল্পিত হয় না। উহারা এক্ষণে দানের বিষয় হইয়াছে।" অনুশাসন ৬৬।

ইহার পর অনুশাসন-পর্ব্বের ৬৯ হইতে ৮১ অধ্যায় পর্য্যন্ত এইসমস্ত অধ্যায়ে গো-সেবা ও গো-দানের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদিগকে দেবতারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই সময় হইতে গোসমূহ পবিত্র ও দেবতাস্থানীয় হইয়া ভারতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

উক্ত অধ্যায়-সমূহের মধ্য হইতে দুই-একটি স্থান কেবল মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ভীষ্ম কহিতেছেন

"এই ত্রিলোক-মধ্যে গো-সমুদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। গো-সমূহ দেবগণের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকে।" অনুশাসন ৮১।

মহর্ষি বশিষ্ঠ সৌদাসকে কহিতেছেন

"গোনাম কীর্ত্তন করিয়া শয়ন ও গাত্রোত্থান, প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গো-সমুদয়কে নমস্কার, গোমূত্র ও গোময় দর্শনে অবজ্ঞা পরিহার এবং গোমাংস ভক্ষণের বাসনা পরিত্যাগ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।" অনুশাসন ৭৮।

মহর্ষি চ্যবন নহুষকে বলিতেছেন

"উহারা সমুদায় লোকের নমস্য ও অমৃতের আধার-স্বরূপ।" গাভী স্বর্গের সোপানস্বরূপ। স্বর্গে দেবগণও উহার পূজা করিয়া থাকে। অনুশাসন ৫১।

ব্রহ্মা দক্ষ-দুহিতা সুরভিকে বর দিতেছেন

"তুমি আমার প্রসাদে চিরকাল সমুদায় লোকের উপরিভাগে বা-

করিতে পারিবে; তোমার লোক গো-লোক বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে।" অনুশাসন ৮৩।

যাক্, এখন আমাদের বক্তব্যে আসা যাক্। দ্বিতীয় স্তরে আমরা দেখিলাম যে কতকগুলি পশু নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল। তৃতীয় স্তরে আমরা দেখিতে পাই বৃথামাংসভোজন নিন্দনীয় ও পাপজনক বলিয়া গণ্য হইল। যেসকল পশু দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয় নাই তাহার মাংস অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইল।

ধর্ম্মব্যাধ কৌশিককে কহিতেছেন

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংসভোজন দোষাবহ নহে, প্রত্যুত শ্রুত্যনুসারে তাহাকে অমাংসাশী বলা যায়। বন ২০৭।

ভীষ্ম কহিতেছেন

"ধর্ম্মরাজ, যাঁহারা বেদোক্ত ব্রতনিষ্ঠ না হইয়া সুখের নিমিত্ত অভোজ্য মাংসাদি ভোজন করেন, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী······আর যাঁহারা বেদোক্তবিধি-অনুসারে উহা ভোজন করিয়া থাকেন তাঁহারা ব্রতানুরাগী।" শান্তি ২২১।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন

যে-মাংস মন্ত্রপূত ও প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃযজ্ঞাদিতে প্রদান করা হয় তাহাই পবিত্র ও ভক্ষ্য এবং তদ্ব্যতীত সমুদয় মাংসই বৃথা মাংস ও অভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।" অনুশাসন ১১৫।

শান্তিপর্ব্বে তিনি বলিতেছেন

"বৃথামাংস ও পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।" শান্তি ১৯৩।

ইন্দ্র লক্ষ্মীকে দানবগণকে পরিত্যাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মী বলিতেছেন

"তাহারা বৃথামাংস ভক্ষণে নিরত এবং কেবল আপনাদের আহারের নিমিত্ত পায়স, তিলান্ন, ও শষ্কুলি প্রভৃতি পিষ্টক সমুদয় পাক করাইয়া থাকে।" শান্তি ২২৮।

পূর্ব্বে কৌশিকী তীর্থে অগস্ত্য ঋষির মৃণাল অপহৃত হইলে তত্রত্য ঋষিগণ আপনাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য শপথ করিতে লাগিলেন। শুক্র কহিলেন "যে আপনার মৃণাল অপহরণ করিয়াছে সে বৃথামাংস ভোজন করুক।"

ইহার পর চতুর্থ স্তর। এই স্তরে সর্ব্ববিধ মাংস ভোজনই নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইল। যজ্ঞের সময়ও পশুবধ নিষিদ্ধ হইল ও যজ্ঞে পশুহত্যাকারিগণকে ক্ষুদ্রস্বভাব ধূর্ত্ত ও পিশাচ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সমগ্র শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্ব এবং বনপর্ব্বের অনেকাংশ এই অহিংসা ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ। আমরা এই স্তরের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

একবার ইন্দ্র মহা সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যজ্ঞে পশুবধের সময় উপস্থিত হইলে মহর্ষিগণ পশুদিগকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন

"দেবরাজ! এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান কখনই মঙ্গলকর নহে।·········যজ্ঞে পশুহত্যা করা শাস্ত্র-সম্মত নহে।" আশ্বমেধিক ৯১।

তুলাধার নামে এক বণিক্ কোনো ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন

"সকল মূঢ় ব্যক্তিরা ওষধিপরিত্যাগপূর্ব্বক পশুহিংসা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।" শান্তি ২৬৩।

নরপতি বিচখ্যু বলিতেছেন

পূর্ত্তেরাই মদ্য, মাংস, মধু, মৎস্য, তালরস ও যবাগূতে আসক্ত হইয়া থাকে।" শান্তি ২৬০।

দেবস্থান কহিতেছেন

"বিদ্বান্ ব্যক্তিরা এইসমস্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া অহিংসাকেই সাধুসম্মত পরম ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" শান্তি ২১।

ভীষ্ম কহিতেছেন

অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা।" শান্তি ৭৯।

ব্যাসদেব শুকদেবকে কহিতেছেন

"যেমন মাতঙ্গের পদচিহ্নে অন্যান্য সমুদয় পাদচারী জীবের পদচিহ্ন বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এক অহিংসাধর্ম্মে অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্মই বিলীন রহিয়াছে।" শান্তি ২৪০।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন

"মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য আর কিছুই নাই; কিন্তু মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেক উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।" অনুশাসন ১১৬।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন

"মাংস ভক্ষণ না করিলে সমুদয় সুখ উৎপন্ন হয়।" অনুশাসন ১১৫।

মহেশ্বর পার্ব্বতীকে কহিতেছেন

"যাঁহারা বীতরাগ হইয়া কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ করেন·········তাঁহারাই কর্ম্মপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বভূতে দয়াবান্; সকলের বিশ্বাস-পাত্র, হিংসা-বিহীন,······তাঁহাদিগের স্বর্গলাভ হয়।" অনুশাসন ১৪৪।

ব্রহ্মা বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে বলিতেছেন

"সর্ব্বভূতে অহিংসাই পরমধর্ম্ম ও প্রধান কার্য্য।" "যাঁহারা হিংসা-

পরায়ণ নাস্তিক ও লোভমোহে একান্ত আসক্ত, তাহারা নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইয়া থাকে।" আশ্বমেধিক ৫০।

এইরূপ বহু স্থান উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল। সমস্ত উক্তির সারমর্ম্ম একরূপ। অহিংসা-ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। এই যুগকে বৌদ্ধযুগ বলিয়া বোধ হয়। এই যুগে মদ্য মাংস একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। কেবলমাত্র নিম্নস্তরে অনার্য্য জাতির মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এ-যুগের অবসান হইল; এবং পূর্ব্বে ঋষিগণ যাহাদিগকে ধূর্ত্ত ও পিশাচ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাদিগের বংশধরেরা নানা দেবদেবীর আবিষ্কার করিয়া তাহাদের পূজায় পুনরায় মদ্য মাংস চালাইতে লাগিল ও সেই সমস্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া নানারূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে লাগিল ও তাহাদের নাম দিল তন্ত্র। আমরা আজকাল ঐসমস্ত গ্রন্থের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া মদ্য মাংসকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি। বলা বাহুল্য এইরূপ লোককেই আমাদের বহুদর্শী ঋষিগণ ধূর্ত্ত ক্ষুদ্রস্বভাব লোভী বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন।

বাক্‌দেবী

শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

কলা ও সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সরস্বতীর পূজা বিভিন্নভাবে ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে যুগে-যুগে দেশে-দেশে হ'য়ে আস্‌ছে। কেউ নদীর ধারে ব'সে বিদ্যার আরাধনা করেছিলেন,—সেই নদীই সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হ'ল, কেউ গ্রন্থকে বাক্‌দেবীর প্রতীকরূপে পূজা করলেন, কেউ সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র বীণাকে বাণীর কমল-করে তু'লে দিলেন, হংসের কলতান ও বাণীপূজকদের দৃষ্টি এড়ালো না; সরোবর, কমল, বসন্তকাল সবই বিদ্যার সঙ্গে একত্র হ'ল। কোন স্মরণাতীত যুগে এইসব মিলিত হ'য়ে সাত্ত্বিক শ্বেতবর্ণের সরস্বতী, বীণা-পুস্তক-কমল-হস্তা বাণী বসন্তের শুভ আগমনে মানবের মানসলোকে জেগে উঠেছিলেন; সেদিন হ'তে এই শাশ্বত মাঘোৎসবে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিমা গ'ড়ে অন্তর ও বাহিরের অর্ঘ্যসম্ভারে বাণীর পূজা ক'রে আস্‌ছেন।

"যা কুন্দেন্দুতুষার-হার-ধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা বীণাবর-দণ্ডমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা।"

হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে দেবী সরস্বতীর ভিন্ন-ভিন্ন নাম ও বিভিন্ন রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। চণ্ডীতে বাণীর দশটি নামের উল্লেখ আছে;—

মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী।
আর্য্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্ব্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী ॥ ১৬, চণ্ডী প্রা. রঃ.

এই ছত্রদ্বয়ে সরস্বতীর অনেকগুলি নাম রয়েছে, ইনি বেদগর্ভা আর ধীশক্তির ঈশ্বরী। অন্যত্র ইনি "মহালক্ষ্মী" নামে অভিহিতা হয়েছেন।

"তামিত্যুক্তা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ।
সত্ত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ ॥ ১৪, চণ্ডী; প্রাধানিকং রঃ

মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, আর্য্যা, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি বিদ্যাদেবীগণের স্বরূপ হচ্ছে এইরকম;—

"অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী। ইত্যাদি
১৫, চণ্ডী, প্রাধানিকং রহস্যম.

হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে অষ্টভুজা সরস্বতীরও উল্লেখ আছে, ইনি শুম্ভ আর নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে বধ করেছিলেন। এঁর আটহাতে যথাক্রমে বাণ, মুষল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাঙ্গল আর কার্ম্মুক আছে, এই দেবীর আরাধনায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হওয়া যায়। এর স্বরূপ হ'ল এই;—

"গৌরী দেহাৎসমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী। ১৪
দধৌ চাষ্টভুজা বাণান্ মুষলং শূলচক্রভৃৎ।
শঙ্খং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্চ কার্ম্মুকং বসুধাধিপ। ১৫

এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি।
নিশুম্ভমথিনী দেবী শুম্ভাসুরনিবর্হিণী॥
১১, চণ্ডী, বৈকৃতিকং রহস্যম্

এই বর্ণনাংশ থেকে জান্‌তে পারা যায় যে, এই সরস্বতীর আর-একটি নাম নিশুম্ভমথিনী; স্থানান্তরে সরস্বতীকে মহা-কালী বলা হয়েছে, এই দেবী 'খড়্গমালাঙ্কুশপুস্তকধরা', শববাহনা, এঁর কৃপায় ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে জ্ঞানলাভ করা যায়।

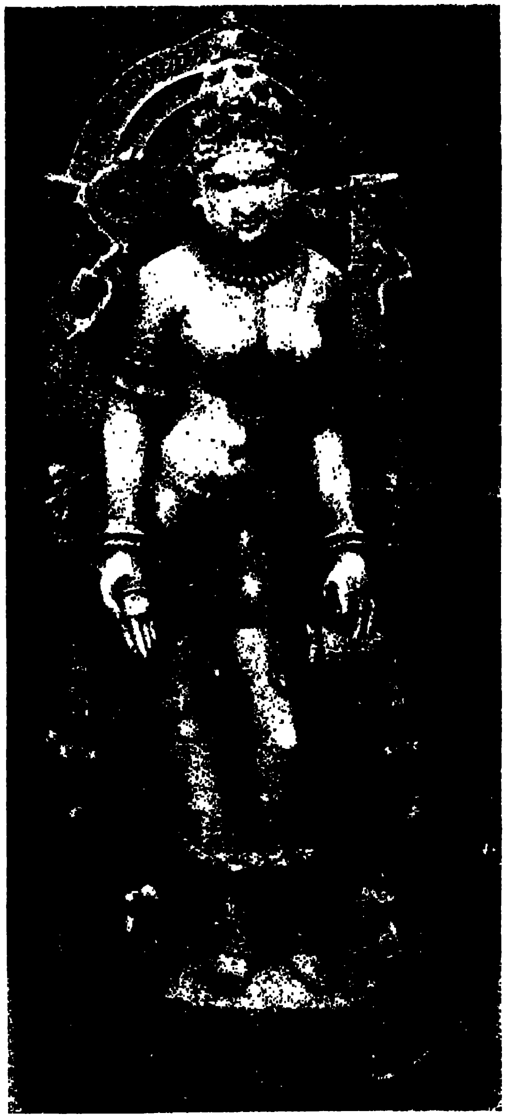
হিন্দু তন্ত্রাদিতে নীল সরস্বতীর উল্লেখ আছে, তা থেকে জান্‌তে পারা যায়, এই দেবীর নাম কৃষ্ণা আর নীল সরস্বতী :—

"তরুণশাম্বরী……ভয়তারিণী।
উগ্রা উগ্রপ্রভা নীলা কৃষ্ণা নীলসরস্বতী॥ ৩, মুণ্ডমালাতন্ত্র

স্থানান্তরে নীল সরস্বতীর যে বর্ণনা পাওয়া যায় তদনুসারে ইনি শবারূঢ়া চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা; চার হাতে অসি, নর-কপাল, নীলকমল আর খড়্গ আছে, এঁর অর্চ্চনায় সৌভাগ্য ও সম্পৎলাভ হয়।

মাতর্নীলসরস্বতি……সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে।
প্রত্যালীঢ়পদস্থিতে শিবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্ত্রীং কপালোৎপলে।
খড়্গাঙ্কাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে। ১, নীলতন্ত্র

এই দেবীর রূপ অত্যন্ত ভয়াল, অন্যত্র ইনি 'দশমহা-বিদ্যা'র এক বিদ্যারূপে বর্ণিতা। বেদ এবং অন্যান্য বৈদিক ও পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে বাণীদেবীর যে বর্ণনা আছে তা'তে ইনি শ্বেতকমলাসনা, শ্বেতবরণী বীণাপুস্তক-কমলধারিণী। এই ত হ'ল আমাদের হিন্দু বিদ্যা-দেবীর বর্ণনা আর তাঁদের স্বরূপ।



দেবী সরস্বতী মহামানসী বা নির্ব্বাণী

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরাও বিদ্যাদেবীর অর্চ্চনা করেন, তাঁদের সরস্বতীর বর্ণ নীল, ইনি নীলাক্ষী, নীলকমলাসন, ডমরু আর শূলধারিণী। এঁর কৃপায় সর্ব্ববিদ্যালাভ হয়, এই বৌদ্ধদের ধারণা। এই সরস্বতী ছাড়া বৌদ্ধ গ্রন্থা-দিতে অন্য-কোনো বিদ্যাদেবীর নাম বা রূপের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

হিন্দুদের মতো জৈনরাও বাণীর অর্চ্চনা করেন। মাঘ-মাসের পঞ্চমীর দিন উপবাসী থেকে তাঁরাও যথানিয়মে লেখনী পুস্তকাদির পূজা করেন, বিদ্যার উপকরণগুলিকে তাঁরা বিশেষ যত্ন ক'রে স্থাপন করেন, মাঘ মাসের এই পঞ্চমী জৈনদের মধ্যে "জ্ঞান-পঞ্চমী" নামে প্রসিদ্ধ।

জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রে একজন নয়, ষোলো জন সরস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে বহুগ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত, এইসব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত জৈন গ্রন্থে ষোড়শ বাণীর বিস্তৃত পরিচয় আছে। শ্বেতাম্বর জৈনদের কর্ম্মকাণ্ডের বই "আচারদিনকর" আর দিগম্বর সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠা-সারোদ্ধার নামক গ্রন্থেই বিশেষ ক'রে এঁদের বর্ণনা করা হয়েছে।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতেও ষোড়শ বাক্‌দেবীর নাম পাওয়া যায়।



সরস্বতী দেবী পুরুষদত্তা

জৈন-ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীতে উপরের ঐ ষোলজন সরস্বতীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে, সেগুলিও খুব চিত্তাকর্ষক।

রোহিণী—ইনি চতুর্ভুজ, শঙ্খ, অক্ষমালা, ধনু ও বাণধারিণী, বর্ণ এঁর "কুন্দ-তুষার-গৌরা" গোচরপ্রভবা বলে বর্ণিতা। দিগম্বরের বইয়ে এরই অন্য রকম বর্ণনা পাওয়া যায়, সে-বর্ণনায় রোহিণীর চিহ্ন—কুম্ভ, শঙ্খ, ফল ও কমল, এর অর্চ্চনায় পরা দৃষ্টি লাভ হয়, ইনি গোবাহনা।

প্রজ্ঞপ্তি দেবী—ইনি প্রজ্ঞপ্তি-বিজ্ঞপ্তি নামে অভিহিতা দুটি হাত, এক হাতে শক্তি অস্ত্র অন্য হাতে কমল, আভা এঁর কমলের মতন, ময়ূরবাহনা। দিগম্বরের মতে ইনি খড়্গ ও চক্রহস্তা; দৃগ্‌জ্ঞান, চরিত্র ও তপের দেবী ইনি।

—প্রতিষ্ঠাসরোদ্ধার MSS in Arrah Gaina Bhavan

বজ্রশৃঙ্খলাদেবী—ইনি পদ্মাসনা শৃঙ্খল ও গদাহস্তা। এঁর কৃপায় বৃত্ত ও শীল লাভ হয়; বৃত্ত ও শীল বজ্র-শৃঙ্খলের মতনই দৃঢ় হওয়া দরকার, তাই বোধ হয় বজ্রশৃঙ্খল এঁর রূপক।

দেবী বজ্রাঙ্কুশা,—হাতে অঙ্কুশ ও বীণা, বাহন পুষ্পযান, বীণা বাণীর একটি বিশেষ স্মারকচিহ্ন; ইনি জ্ঞানদান করেন;—

বাণী চক্রেশ্বরী—ইনি গরুড়বাহনা, আয়ুধ- ও চক্র-হস্তা। দিগম্বরদের গ্রন্থে এঁকে জাম্বুনদ বলে।

হিন্দুশাস্ত্রেও ময়ূরবাহনা সরস্বতী আছেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এইরূপ বাণীর উল্লেখ আছে। চক্র বা ধর্ম্মচক্র বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের একটি প্রধান চিহ্ন।

পুরুষদত্তাভারতী—এঁর বাহন কোকিল হাতে বজ্র ও কমল, এই দেবীর অর্চ্চনায় শক্তি সংযম ও ত্যাগলাভ হয়, ইনি পুরুষত্বদান করেন। উপরোক্ত গুণত্রয় পৌরুষের লক্ষণ।

দেবীকালী—এঁর বাহন মৃগ, একহাতে মুষল অন্য-হাতে তলোয়ার—মতান্তরে মুষল ও গদা। এই দেবীর দয়ায় তপঃ ও বীর্য্য লাভ হয়।

মহাকালী—ইনি শ্যামাঙ্গী—শবারূঢ়া চতুর্ভুজা; চার হাতে যথাক্রমে ধনু, খড়্গ, ফল ও অস্ত্র।

সমাধিকামীরা এই দেবীর পূজা করেন। শবসাধনা সমাধিলাভের এক উপায়; সম্ভবত সেইজন্যই ইনি শবারূঢ়া-শ্বেতাম্বর মতে ইনি ফল, ঘণ্টা, অক্ষসূত্রাদি-ধারিণী। হিন্দু-শাস্ত্রেও বাণীর মহাকালী-রূপের বর্ণনা আছে।

সরস্বতী গৌরী—ইনি কুন্দ-কর্পূর-নির্ম্মল-বর্ণা পদ্ম-হস্তা গোধাবাহিনী। ইনি তপস্বীগণের আরাধ্যাদেবী।

দেবী গান্ধারী—ইনি মুষল- ও বজ্রধৃতা, মূর্ত্তি এঁর

কমনীয়; দিগম্বরমতে এঁর এক হাতে চক্র অন্য হাতে অসি, আর বাহন হচ্ছে কূর্ম। এই দেবীপূজায় ভক্তি-লাভ হয়।

মহাজ্বালাদেবী—এই দেবীর বর্ণ শশাঙ্কধবল, বাহন বিড়াল। দিগম্বর-মতে—চার হাতে ধনু, খেটক, খড়্গ ও চক্র থাকে। আর বাহন—মহিষ। এঁর দয়ায় সাধুসন্ন্যাসীর ভক্তি লাভ হয়; এই দেবীর অন্য নাম জ্বালামালিনী।

দেবী মানবী—এই দেবী নীলাঙ্গী আর নীলকমলাসনা, প্রধান চিহ্ন এঁর ত্রিশূল।

বাণী বৈরাটী—ইনি খড়্গহস্তা সিংহবাহিনী, বর্ণ এঁর তুষারগৌর।

সরস্বতী অচ্যুতা—এই দেবীর হাতে খড়্গ আর কার্ম্মুক আছে, বাহন এঁর অশ্ব; শ্বেতাম্বর-মতে নাম—অচ্ছুপ্তা।

মানসীদেবী—সর্পবাহনা ইনি; হিন্দু দেবী মনসার সঙ্গে এঁর খুবই সাদৃশ্য আছে।

দেবী মহামানসী—এই দেবীর চার হাতে অক্ষসূত্র, বর, অঙ্কুশ আর মালা আছে, ইনি হংসবাহনা। এই দেবীর স্বরূপ ঠিক হিন্দু বিদ্যা দেবীর মতন, শ্বেতাম্বর-মতে এঁর হাতে বই, কমণ্ডলু, কমল আর পদ্মনাল আছে; তাঁরা এই সরস্বতীর নাম রেখেছেন—নির্ব্বাণী।

শ্বেতবর্ণই জ্ঞানের প্রকৃত বর্ণ, তাই এইসব বর্ণনায় কেউ বা কুন্দধবলা কেউ বা তুষারগৌরা। নীলবর্ণা বাণী হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন তিন ধর্ম্মশাস্ত্রেই আছেন। বই, হংস, কমল, অক্ষসূত্র, বীণা, কোকিল, ময়ূর, শঙ্খ ইত্যাদি বিদ্যা ও কলা-শিল্পের যেন প্রধান অঙ্গ। এখন ভাব্‌বার কথা এই যে, জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা যোলোজন সরস্বতীর কল্পনা করলেন কেন? আমাদের মনে হয়, চৌষট্টি কলার প্রধান চতুর্থাংশ কলা ও বিদ্যার দেবীরূপে ষোড়শ বাণীর কল্পনা হয়েছে। রুচি-অনুসারে দেবতা ভিন্ন-ভিন্ন হন। এই ষোড়শবিদ্যাদেবীর মধ্যে কেউ জ্ঞান, কেউ প্রতিভা, কেউ ভক্তি, কেউ শক্তি দিচ্ছেন, কেউ চরিত্র, শীল, ব্রত দিচ্ছেন, কেউ বা ধর্ম দিচ্ছেন, এই সবগুলির মিলনই বাণীর সনাতনী মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তিই একদিন আর্য্যগণের মানসলোকে জেগে উঠেছিল, ভারতবাসী সেই প্রতিমাকেই হৃদয়পীঠে বসিয়ে আজও ভক্তি-অর্ঘ্য দিচ্ছেন।



মানসী দেবী সরস্বতী

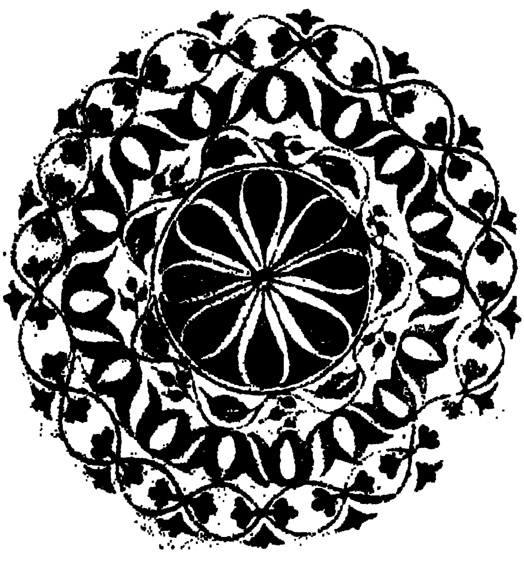
হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সকল ধর্ম্মাবলম্বীই পুণ্য মাঘোৎসবে বাণীর অর্চ্চনা করেন। পুণ্যপঞ্চমী তিথিকে কোনো ধর্ম্মাবলম্বী "বসন্ত-পঞ্চমী," কেউ বা "বিদ্যাপঞ্চমী," কেউ আবার "জ্ঞান-পঞ্চমী" নামে অভিহিত করেছেন। এই চিরন্তনী তিথিটিতে সমগ্র ভারতে সকল ধর্ম্মাবলম্বীই সাগ্রহে বাণী-অর্চ্চনা করেন, তবে বাংলার বাণীপূজা অন্যান্য প্রদেশের বাণী-পূজার চেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ আর মনোরম।

চিত্র-শিল্পে পল্লীরমণী ও আল্‌পনা

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস

অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে বঙ্গ ললনা গণের চিত্র-শিল্পে রুচি ও অধিকার আছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ এই প্রবন্ধে তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

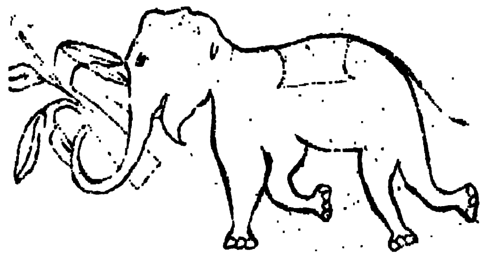
আল্‌পনা দেওয়ার প্রথা বঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। ক্ষুদ্রবৃহৎ সর্ব্বপ্রকার পূজা-পার্ব্বণে এবং অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক শুভানুষ্ঠানেই পুরাঙ্গনাগণ সর্ব্বাগ্রে আল্‌পনা দিয়া থাকেন; ইহা স্ত্রী-আচারের প্রধান অঙ্গ। আল্‌পনা দেওয়ার সহিত বাহ্যতঃ ধর্ম্মের সংস্রব থাকায় ইহার প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁহাদের যথেষ্ট।



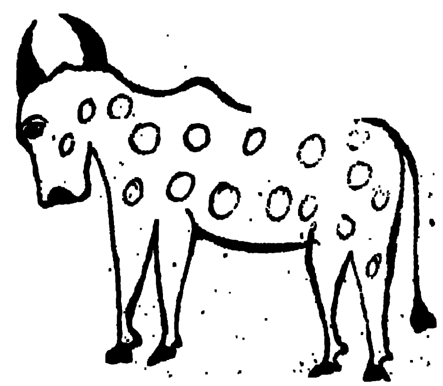
১নং চিত্র—গোবর-আল্‌পনার দিন অঙ্গনে এই আলপনা দেওয়া হয়



২নং—চিত্র

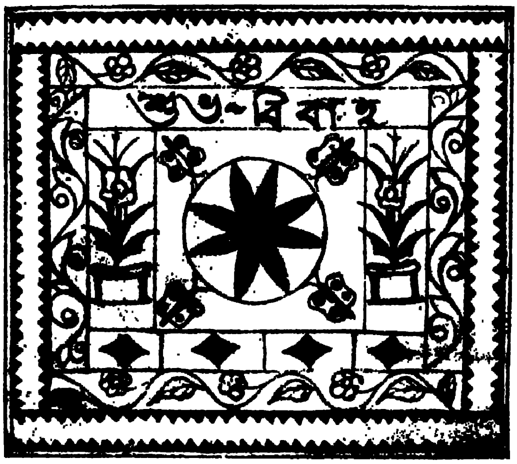


৩নং চিত্র

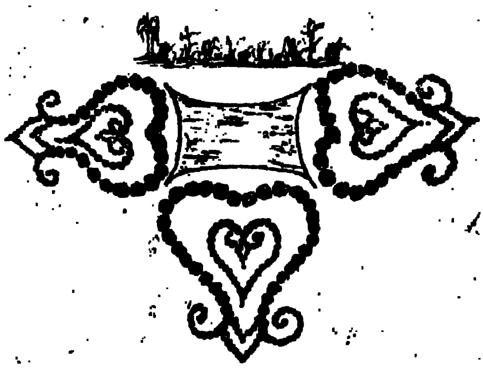


৪নং চিত্র—গোবর-আল্‌পনার দিন গরুর গায়ের আল্‌পনা

আল্‌পনা দিবার নিয়ম—স্নানান্তে অনাহারে থাকিয়া আল্‌পনা দেওয়ার নিয়ম। আতপতণ্ডুল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা ঘন দুগ্ধের ন্যায় হইলে উহাতে তুলিকা কিম্বা বাঁশের কলম ডুবাইয়া আল্‌পনা দিতে হয়। প্রাচীনকাল হইতে এই যে আল-



১নং চিত্র—বিবাহের সময় বর যে পিঁড়িতে বসে তাহার উপরের আল্পনা



৬নং চিত্র—পুকুর-পূজায় দুধের আল্পনা

আদর্শ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে-কয়টি পাইয়াছি তাহাই দেখাইতেছি।

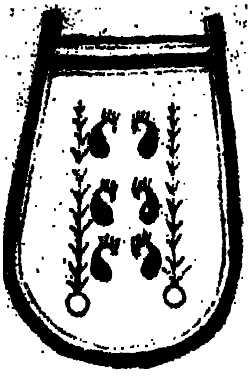
"গোবর আল্পনা।"—পাবনা জিলার শিরাজগঞ্জ মহকুমায় পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস "গোবর আল্পনা" বলিয়া মেয়েদের একটি অনুষ্ঠান বা উৎসব হয়। ঐ দিবস প্রাঙ্গণাদি উত্তমরূপে নিকানো হয় এবং প্রাঙ্গণ শুষ্ক হইলে পূর্ব্বাহ্ণ ৭।৮ ঘটিকার সময় বাটির গৃহিণী, বধূ ও মেয়েরা স্নান করিয়া আসিয়া অনাহারে থাকিয়া আল্পনা দিয়া থাকেন। প্রথমে গৃহিণী সূচনা করেন, পরে অন্যান্য-সকলে নিজ-নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে পান।

ঐদিন রাখালগণ প্রত্যুষে স্নান করিয়া গাভীদের পুচ্ছাগ্রভাগ কাটিয়া দেয় ও আল্পনার জলে কস্কের মাথা ডুবাইয়া গরুর গাত্রে ছাপ দিয়া থাকে। এই প্রথাকে "গরুকে পিঠা খাওয়ানো" বলে। গোবর আল্পনার দিবস অঙ্গনে যে আল্পনা দেওয়া হয় তাহার কয়েকটি নমুনা ১—৩ নং চিত্রে দেখানো হইল।

এতদঞ্চলে কুমারীগণ বাড়ীতে ক্ষুদ্র একটি পুকুর কাটিয়া উহা নানাবিধ পুষ্পে সজ্জিত করিয়া কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবস হইতে সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত একমাস কাল পূজা দিয়া থাকে। ইহাকে পুকুর-পূজা বলে। এই পূজার ফলে নাকি আশানুরূপ বর পাওয়া যায়। এক বাড়ীতে ২।৩টি বালিকা থাকিলে প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পুকুরের পনা দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে ইহাতেই আমরা বিশেষ করিয়া পল্লীবালাগণের চিত্র-শিল্পের প্রতি অনুরাগ ও দক্ষতা বুঝিতে পারি। গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ময়ূরভঞ্জের আল্পনা শীর্ষক প্রবন্ধ দেখিয়া আমাদের পাবনা জিলার পল্লীসমূহের আল্পনার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাহা প্রকাশ করিতে অভিলাষী হই এবং সেই জন্য আমি মেয়েদের নিকট হইতে আল্পনার



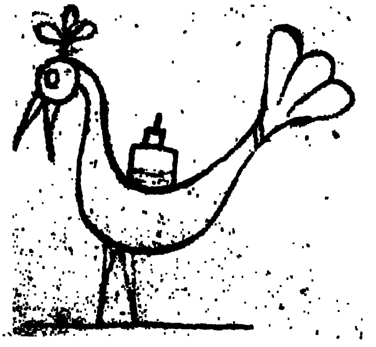
৭নং চিত্র—কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীর আসন হইতে ঘরের দরজা পর্য্যন্ত মেজের উপরের আল্পনা



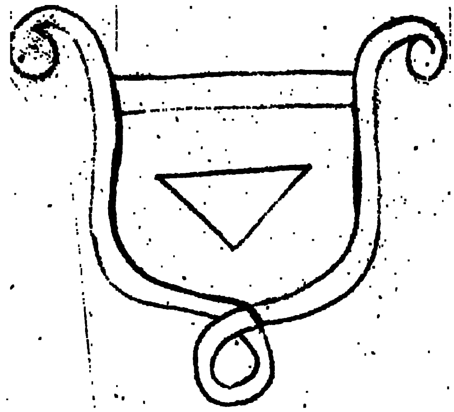
৮নং চিত্র—লক্ষ্মী পূজার কুলার পৃষ্ঠের আলপনা



৯নং চিত্র—লক্ষ্মী পূজার দিন প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে এইপ্রকার আলপনা দেওয়া হয়



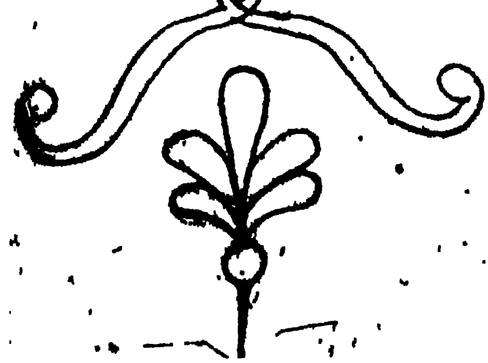
১০নং চিত্র—এই চিত্রের পৃষ্ঠের উপর কেরোসিনের আলো, তেলের বাটি ইত্যাদি মাটি দিয়া আঁকা হয়



১১নং চিত্র—মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়া আঁকা

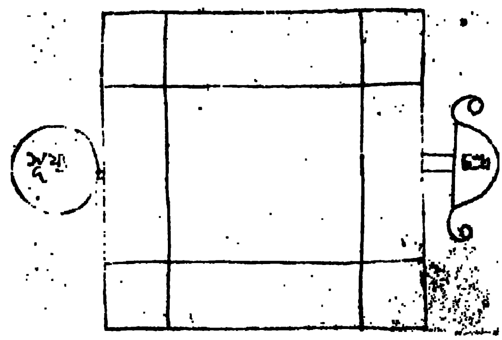
প্রয়োজন! প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া মেয়েরা পুষ্প চয়ন করে, পরে অরুণোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে স্নান করিয়া আসিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া থাকে—

"* পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা।
কে পূজিবে দুপুর-বেলা॥
আমি সতী লীলাবতী।
সাত ভাইয়ের বোন্ ভাগ্যবতী॥
পতির কোলে পুত্র থুয়ে (১)।
জন্মি যেন বামুনের কুলে॥
মরি যেন গঙ্গা জলে।
পড়ি যেন শিবদুর্গার পদতলে॥"

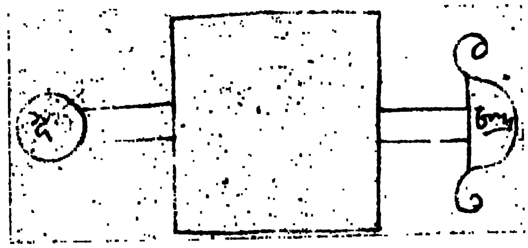


১২ নং চিত্র—মাটির দেওয়ালে মাটি দিয়া আঁকা

* মেয়েদের নিকট যেমন শুনিয়াছি অবিকল তেম্‌নি রাখা হইয়াছে। (১) থুয়ে—রেখে। উক্ত মন্ত্রে উৎকৃষ্ট পতিলাভের জন্য কোনো প্রার্থনা না থাকিলেও সেই উদ্দেশ্যেই ঐ অর্চনা প্রচলিত।



১৩নং চিত্র—"চন্দ্র পূজি চন্দনে।
সূর্য্য পূজি বন্দনে।
চন্দ্র সূর্য্যে দিয়ে ফুল।
সুখে থাকে তিন কুল॥



১৪নং চন্দ্র-সূর্য্য পূজার আর-একটি আল্পনা

পুকুরের তিন পার্শ্বের যে-প্রকার পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় তাহা ফুলের আল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এইসকল পল্লীগ্রামে ধনী দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের গৃহেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। লক্ষ্মীর আসন হইতে ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত মেঝেতে যে আল্পনা দেওয়া হয় তাহা ৭নং চিত্রে দেখানো হইল। ঐ দিন প্রত্যেক গৃহের সম্মুখভাগে মেঝেতে লক্ষ্মীর পদ ও ধানশীষের আল্পনা দেওয়া হয়, এমন-কি ধান ভানিবার ঢেঁকি ও ধান ঝাড়িবার কুলার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না। (৮—৯ নং চিত্র)

এই জিলার দরিদ্র হিন্দুদিগের ঘরের কাদার দেয়ালে মেয়েদের প্রস্তুত কাদার ছবি দেখিতে পাওয়া যায়; উহার ২।১টি নমুনা দেওয়া গেল। ১০ নং চিত্রে প্রদর্শিত কাদার ছবির-পৃষ্ঠ-দেশে কেরোসিনের আলো, তেলের বাটি ইত্যাদি রাখা হয়।

এতদ্দেশীয় কুমারীগণ উৎকৃষ্ট পতি-লাভার্থে তারাব্রত গ্রহণ করিয়া নক্ষত্র চন্দ্র ও সূর্য্য পূজা করিয়া থাকেন। উহার আল্পনা ও মন্ত্র ১৩নং চিত্রে দেখানো হইল। বিবাহের পর সধবাগণ এই পূজা করিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত কাঁথা, বালিশের আচ্ছাদন, কাপড়ের পাখা প্রভৃতিতে অনেকেই লতা, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি সূতা দ্বারা সেলাই করিতে পারেন।

জলখাবারের সামগ্রীর মধ্যে ক্ষীরের 'সন্তি' ও ক্ষীরের পুতুল ইত্যাদিও পল্লীরমণীগণের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। পাথরের টুক্‌রার উপর নানাবিধ মনোহর ফুল লতা পাতা খোদিত করিয়া উহা ক্ষীরের 'সন্তি' তৈয়ার করিবার ছাঁচরূপে ব্যবহৃত হয়।

উল্লিখিত বিষয়-সমূহ হইতে আমরা পল্লীরমণীগণের চিত্র-শিল্পের যথেষ্ট পরিচয় পাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা পল্লীগৃহেও চায়ের কেতলী ও ষ্টোভের উনান প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পল্লীবধূগণ এক্ষণে চা প্রস্তুত ও ছেলেমেয়ের সাগু সিদ্ধ করিয়াই সময় করিয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং প্রাচীনাদিগের ঐসকল পুরাতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার রুচি ও অবসর তাঁহাদের অতি অল্প।

নষ্টচন্দ্র

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

*
* *

পাঁচটার সময় অনল আপিস থেকে বাসায় চলেছে। আজও তার সঙ্গে আর্দালী আছে, কিন্তু তার ঘাড়ে আজ ডেস্‌প্যাচ্‌-বক্স্‌ও নেই, কাগজপত্রের নথি ফাইলও নেই। আজ সে সব ছোট ম্যানেজার বৈকুণ্ঠের পশ্চাদনুসরণ করেছে।

অনল 'অন্য দিন অন্যমনস্ক হয়ে চলে' যায়; কিন্তু

আজ তার দৃষ্টি ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে রাজান্তঃপুরের প্রত্যেক জানালায় জানালায় কাকে একবার শেষ দেখা দেখে নেবার দুরাশায় ঘন ঘন অভিসার কর্‌ছে। সে যেতে যেতে দেখ্‌লে, এক জান্‌লায় গৌরীকে বুকে করে' দাঁড়িয়ে আছে ধনিষ্ঠা! অনলের মুখ সাফল্যের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল; সে ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিলে, এবং মাথা নত করে' চলে' গেল। কিছু দূর গিয়ে যখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখ্‌লে তখন পথের বাঁকে সেই জানালাটা দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেছে। অনলের মনে পড়্‌ল, রবার্ট্ ব্রাউনিঙের "বাষ্ট্ এণ্ড ষ্ট্যাচু" এবং "ইন্ এ ব্যাল্‌কনি" কবিতার কথা।

অন্য দিন ধনিষ্ঠা গোপনে চুরি করে' অনলকে দেখে; কিন্তু আজ সে জান্‌লা একেবারে খুলে ফেলে নিজেকে প্রকাশ করে' দাঁড়িয়েছিল। আজ সে শেষ দেখা দেখে নেবে, শেষ দেখা দিয়ে নেবে; তার পর তার বিসর্জ্জন—

"এক দিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জ্জন!"

অনল দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেলে ধনিষ্ঠা ঘরে থেকে বাহিরে এসে মাধবীকে ডেকে বল্‌লে—মাধী, তুই গৌরীকে নিয়ে ওর বাবার বাসায় পৌঁছে দিয়ে আয়; আর চাকরদের বল্ এই বাক্‌স্ বিছানাগুলো সব দিয়ে আস্‌বে।

গৌরী আপত্তি জানিয়ে বল্‌লে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো মা।

ধনিষ্ঠা গৌরীর মুখচুম্বন করে' বল্‌লে—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে আগে যাও, তার পর আমিও যাবো।

গৌরী সন্দেহ করে' বল্‌লে—না, তুমি যাবে না।

ধনিষ্ঠা কষ্টে চোখের জল সম্বরণ করে' বল্‌লে—সত্যি বল্‌ছি মা, আমিও যাবো, আজই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবো। আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বল্‌তে পারি। তোমাকে ছেড়ে এ বাড়ীতে কি আমি থাক্‌তে পার্‌বো?

গৌরী আর আপত্তি কর্‌লে না। কিন্তু মাধবীর মনে একটা বিষম খট্‌কা লেগে রইল। আজকের ব্যাপারটা সে কিছুতেই গুছিয়ে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না।

* * *

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে অনিল যখন দেখ্‌লে যে তার সঙ্গিনী তার কাছে নেই তখন সে প্রথমে মনে কর্‌লে সে বাড়ীতেই কোথাও আছে। কিন্তু এই বাড়ীতে তার দাদাও আছে মনে করে' তার একটু লজ্জাও বোধ হলো। সে বাইরে বেরিয়ে একটু লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে সকল ঘরে উঁকি মেরে মেরে বেড়াতে লাগ্‌ল; সে যে কি খুঁজছে তা যে চাকর-দাসীরা বুঝ্‌তে পার্‌ছে এই ভেবেও তার লজ্জা বোধ হতে লাগ্‌ল। কিন্তু যখন সে বাড়ীর কোথাও তার সন্ধান পেলে না তখন সে অত্যন্ত বিরক্ত ও সন্দিগ্ধ হয়ে হরির মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—হরির মা, আমার সঙ্গে কাল যে লোকটি এসেছিল সে কোথায় গেল?

হরির মা বল্‌লে—কাল রাত্তিরে বাবু তাকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অনিলের পিত্ত জলে' উঠ্‌ল, সে চেঁচিয়ে বলে' উঠল—আমার লোককে বাবু বিদায় করে' দেন কোন্ আক্কেলে!

এ কথার জবাব হরির মা আর কি দেবে? সে নীরবে মনে মনে অনিলের বেহায়াপনাকে শত ধিক্কার দিতে দিতে সেখান থেকে চলে' গেল।

অনিল স্থির কর্‌লে, এখনই সে কাছারীতে গিয়ে তার দাদার সঙ্গে একচোট ঝগড়া করে' কল্‌কাতা চলে' যাবে। সে জামা গায়ে দিতে গিয়ে দেখ্‌লে, তার মনি-ব্যাগটা জামার পকেটে নেই। সে আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—হরির মা, নফর, সাধু, আমার টাকা কি হলো।

চাকর-দাসীরা বল্‌লে—বাবু আপনাকে বল্‌তে বলে' গেছেন টাকা তিনি নিয়েছেন।

অনিল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অনলের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লে, সদর দরজায়

তালা বন্ধ। সে চাকরদের ডেকে বল্লে—এই, দরজায় দিনের বেলা চাবি কেন? চাবি খুলে দে।

চাকরেরা বল্লে—বাবু চাবি দিতে বলে' গেছেন; তিনি না আসা পর্য্যন্ত খুল্‌তে বারণ করেছেন।

অনিল ক্রোধে উন্মত্তবৎ হয়ে দরজায় লাথি মেরে বল্লে—আমি কি বাড়ীতে বন্দী নাকি? আমি তালা ভেঙে ফেল্‌ব।

চাকরেরা বল্লে—আপনি তালা ভাঙ্‌তে গেলে আপনাকে ধরে' রাখ্‌তেও তিনি বলে' গেছেন।

অনিলের মাথায় খুন চেপে উঠ্‌ছিল; তার মনে হতে লাগ্‌ল সব কটা চাকরকে সে তখনই মেরে খুন করে' ফেলে। কিন্তু সে একা, আর ওরা তিন জন। কাজেই সে আত্মসম্বরণ কর্‌তে বাধ্য হলো। তখন তার নির্জ্জীব জড় পদার্থের উপর রাগ ঝাড়্‌বার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল; ইচ্ছা হতে লাগ্‌ল বাড়ীর জিনিসপত্র ভেঙেচুরে ছিঁড়ে খুঁড়ে নষ্ট করে' গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয়। কিন্তু বাড়ীতে আছে কি যে সে নষ্ট কর্‌বে? খান কতক খুরি সরা মাল্‌সা মাটির গেলাস আর খান কতক লেপ কম্বল তো বাড়ীর পুঁজি! সেগুলো নষ্ট কর্‌লে হাতের আঁজ্‌লায় করে' জল খেতে হবে, আর এই শীতের রাতে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে' কাটাতে হবে। কাজেই অনিল নিষ্ফল ক্রোধে থম্‌থমে হয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে শান্ত হয়ে বস্‌ল।

অনল আপিস থেকে বাড়ীতে এসেই অনিল যাতে শুন্‌তে পায় এমন উচ্চ স্বরে চাকর-দাসীদের ডেকে বল্লে—আমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে' যাচ্ছি, তোমরা সবাই তোমাদের মাইনে নিয়ে যাও।

হরির মা এই আকস্মিক দুঃসংবাদে কেঁদে ফেল্লে; চাকরদের মুখ শুকিয়ে গেল। হরির মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে—তুমি চলে' যাবে বাবা? তবে আমাকেও নিয়ে চলো। যে কটা দিন আছি তোমার চরণ সেবা করে'ই মর্‌তে দাও।

অনল ছলছল চোখে বল্লে—তা কেমন করে' হবে মা, আমি যে গৌরীকেও নিয়ে যাচ্ছি; আমি তো আর ছোঁওয়া-নাড়ার বিচার করে' চল্‌তে পার্‌ব না।

কথাগুলো অনিলের কানে গেল। তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে' রইল।

অনল বল্‌তে লাগ্‌ল—তোমরা আমার অনেক যত্ন করেছ; তোমাদের ঋণ আমি শোধ কর্‌তে পার্‌ব না। আমার এই মাসের মাইনেটা আমার নিজের যারা কাজ করেছে তাদের মধ্যে ভাগ্ করে' দিতে খাজাঞ্চি-বাবুকে বলে' এসেছি। আমার আর কিছু নেই······

অনিল আর চুপ করে' বসে' থাক্‌তে পার্‌লে না। সে ছুটে বেরিয়ে এসে বল্লে—চাকরী ছেড়ে দিয়ে একেবারে খালি হাতে গৌরীকে নিয়ে বাড়ী গিয়ে খাবে কি? শেষ-কালে গৌরীর গায়ের গহনা বেচে বেচে খেতে হবে তো?

অনল একটু হেসে ব্যঙ্গভরা স্বরে বল্লে—আমি তো আর মদ খাই না যে মেয়ের গায়ের গহনা বেচে বিলাসিতা কর্‌ব? গৌরীকে যিনি গহনা দিয়েছিলেন তিনিই গৌরীকে নিরাভরণা করে' পাঠিয়ে দেবেন; সুতরাং ভয় নেই, আমি ইচ্ছা কর্‌লেও গৌরীর গহনা বেচে খেতে পার্‌ব না।

অনিল একেবারে বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তবে? বাড়ীতে গিয়ে আমরা খাবো কি?

অনল বল্লে—তুমি কি খাবে তা তুমি জানো। তোমাকে বাড়ীতে রেখে আমি গৌরীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবো; আমাদের দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাবার মতন উপার্জ্জন আমি কর্‌তে পার্‌ব।

অনিলের মনে হলো তার আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে ধনিষ্ঠাই বোধ হয় অনলের চাকরী ছাড়িয়ে দিয়েছে, গৌরীকেও বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই সে অনলকে বল্লে—আমি রাণী-বৌদিদির কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে···

অনল মাথা নেড়ে বল্লে—এখন too late. যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, এর আর নড়চড় হবে না।

অনিলের মনে পড়্‌ল, ধনিষ্ঠা কী ভীষণ একরোখা জেদী মেয়ে; সে যা একবার স্থির করে তার নড়চড় করানো দুঃসাধ্যই বটে। সে স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় মাধবী প্রভৃতি চাকর-দাসীরা গৌরীকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো।

গৌরীর নিরাভরণা শ্রী দেখে অনলের বুক ফেটে যাবার উপক্রম হলো; অনিলেরও অত্যন্ত দুঃখ অনুতাপ হলো।

অনল তাড়াতাড়ি গৌরীকে বুকে তুলে নিয়ে তার মুখচুম্বন কর্‌লে।

মাধবী অবাক্ হয়ে দেখতে লাগ্‌ল। আজ সকলেরই কি এক মতিভ্রম উপস্থিত হয়েছে! ধনিষ্ঠা গৌরীর মুখচুম্বন করেছে, এখন অনলও তার মুখচুম্বন কর্‌ছে! এদের হয়েছে কি?

মাধবী ক্ষণকাল নীরব থেকে অনলকে বল্‌লে—রাণী-মা তীর্থে যাবার কথা বল্‌ছিলেন। আপনারা কি আজই এগুনে যেতেছ?

অনল এর কি উত্তর দেবে ভেবে স্থির কর্‌বার আগেই গৌরী জিজ্ঞাসা কর্‌লে— বাবা, আমরা কখন যাবো?

—এখনই যাবো মা।

গৌরী ভয়ে ভয়ে অনিলের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—পাপাও যাবে? পাপা আমাকে যদি মারে?

অনিলের কানে এ কথা গেল। সে অন্তরে বেদনার সঙ্গে লজ্জা অনুভব কর্‌লে। তার সাম্‌নে অভাব ও রিক্ততার যে দারুণ বিভীষিকা তাকে ভয় দেখাচ্ছিল তাতে তার স্বভাব অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছিল।

অনল গৌরীকে বল্‌লে—তোমাকে কেউ মার্‌তে পার্‌বে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো।

গৌরী উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হয়ে বল্‌লে—মাও তাই বল্‌ছিল—মাও তো ঐ জন্যে তীর্থে পালিয়ে যাচ্ছে।

অনিল অনুতপ্ত স্বরে বল্‌লে—দাদা, আমাকে ক্ষমা করো.........

অনল বল্‌লে—এখনই না। আমি যেখানেই থাকি তোমার খবর নেবো। যখন শুন্‌ব গৌরীর তোমাকে বাবা বলে' পরিচয় দিতে লজ্জার কোনো কারণ নেই, তখন তোমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌ব।

অনিল মাথা নীচু করে' সেইখানে বসে' পড়্‌ল।

*
* *

সন্ধ্যার সময় একজন চাকর এসে ধনিষ্ঠাকে খবর দিলে—নতুন ম্যানেজার-বাবু এসেছেন।

ধনিষ্ঠার কানে গিয়ে সেই কথাটা বাজ্‌ল। বৈকুণ্ঠ এতদিন ছিল ছোট ম্যানেজার, আজ সে হয়েছে নতুন ম্যানেজার।

ধনিষ্ঠা তার আপিস ঘরে গেল। বৈকুণ্ঠ ঘরে ঢুক্‌তেই ধনিষ্ঠা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—গৌরীরা চলে গেল।

—আজ্ঞে হাঁ।

ধনিষ্ঠা একটু চুপ করে' থেকে উদ্গত অশ্রু দমন করে' নিয়ে কম্পিত কণ্ঠকে সংযত করে' বল্‌লে—আমি আজই কাশী যাবো। পাল্কী একখানা পাঠিয়ে দিন; আমার সঙ্গে মাধী আর দুজন চাকর দুজন দরোয়ান আর প্রাণকৃষ্ণ যাবে; তাদের ষ্টেসনে যাবার জন্য দুখানা গাড়ীও চাই।

বৈকুণ্ঠ বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ধনিষ্ঠার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌ল—কাশীতে রাজকুমার-বাবু আছেন; তাঁকে একটা জরুরী টেলিগ্রাম করে' আমার জন্য একটা বাড়ী ঠিক কর্‌তে বলুন, আর ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবকেও একটা টেলিগ্রাম করুন যে তিনি যেন এষ্টেট্ কোর্ট্-অব-ওয়ার্ড্‌সে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা শীঘ্র করেন। আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবকে একখানা চিঠিও লিখে নিয়ে আসুন, আমি যাবার আগে সই করে' দিয়ে যাবো।

এবার বৈকুণ্ঠ বিমূঢ়ের মতন মুনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, মুনিবের আদেশের উত্তরে বল্‌তে পার্‌লে না—যে আজ্ঞে।

ধনিষ্ঠা বল্‌তে লাগ্‌ল—আমাদের এষ্টেটের উকিলকে দিয়ে আমার একটা দানপত্র তৈরি করাবেন, আমার সমস্ত স্ত্রীধন সম্পত্তি গৌরীকে আমি দান কর্‌ব; তার বিয়ের পর সে সেই সম্পত্তি পাবে।

বৈকুণ্ঠ বল্‌লে—যে আজ্ঞে।

*

*　*

একই দিনে অকস্মাৎ অনল ও ধনিষ্ঠা দুজনেই একেবারে বামুন্দিয়া ত্যাগ করে' চলে' গেল। বিস্মিত গ্রামবাসীরা এতদিনে নির্ভয়ে প্রাণ খুলে' নিজের নিজের কল্পনা ছুটিয়ে তাদের নামে অপবাদ-জল্পনায় প্রমত্ত হয়ে উঠ্‌ল। কেবল জানো-দিদি কারো মুখে অনল বা ধনিষ্ঠার নিন্দা শুন্‌লে খড়্গহস্ত হয়ে প্রতিবাদ করে। এই জানো-দিদির ভয়ে লোকের মনে শান্তি নেই। সবাই তার‍ও তীর্থযাত্রা বা গঙ্গাযাত্রার শুভ অবসরের জন্য উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছে।

(সমাপ্ত)

কাশীর কতিপয় বাঙ্গালী পণ্ডিত

অধ্যাপক শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দীনবন্ধু মিত্র কাশীর সংস্কৃতকলেজ-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> "চন্দ্রনারায়ণ-গুণে এই বিদ্যালয়।
> করেছে পণ্ডিত-মাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয়।"
> —সুরধুনী কাব্য (পৃঃ ৪৯, চতুর্থসর্গ)

ভারতীয় জ্ঞানগরিমার কেন্দ্রস্থান কাশীর সংস্কৃত কলেজটি বোধ হয় ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান বিদ্যালয়। যে মহামনীষীর সময়ে এই বিদ্যালয় প্রথম সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাঁহার নাম ব্রাহ্মণপণ্ডিতসমাজে কথঞ্চিৎ প্রচলিত থাকিলেও বোধ হয় বাঙ্গালার জনসাধারণ এখন ভুলিতে বসিয়াছে। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" প্রভৃতি গ্রন্থে কাশীতে বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনী অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে; তাহাতে বহুতর পণ্ডিতের বিবরণও স্থান পাইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় চন্দ্রনারায়ণ-সম্বন্ধে বিশেষ-কিছুই কেহ উল্লেখ করেন নাই। অথচ তিনি সর্ব্বতোভাবে বিদ্বৎসমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া কাশীতেই জীবনযাপন করিয়াছিলেন। আমরা দীনবন্ধুর কবিতার টীকাচ্ছলে কাশীসংস্কৃত কলেজের ইতিবৃত্তপ্রসঙ্গে চন্দ্রনারায়ণ ও অন্যান্য বিস্মৃতপ্রায় বাঙ্গালী কৃতী পুরুষের পরিচয় প্রদান করিলাম।

১৮৪৯ খৃঃ কাশীর উক্ত বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার জি নিকলস্ Historical Sketch of the Benares College (কাশীকলেজের ঐতিহাসিক চিত্র) নামক গ্রন্থ লিখিয়া বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, কাশীর তৎকালীন রেসিডেন্ট্‌, মিঃ জে ডন্‌কান প্রথমতঃ নিজব্যয়ে ১৭৯১ খৃঃ ১৭ নবেম্বর তারিখে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং পরবৎসর (১৭৯২ খৃঃ) হইতেই উহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হয়। ম্লেচ্ছের সংসর্গে পাছে কাহারও আপত্তি থাকে, তজ্জন্য একজন প্রধান পণ্ডিতকে অধ্যক্ষ (Rector) নিযুক্ত করিয়া তাহার উপর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা ও পরিচালন ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হয়। কাশী সংস্কৃত কলেজের এই প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বাঙ্গালী—"কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য।" এই "সর্ব্বশাস্ত্রগুরু" পণ্ডিতপ্রবর তৎকালে সাহেব-মহলে পরিচিত ছিলেন এবং ইঁহার উপাধিও কিছু বিচিত্র-রকমের ছিল—"কাশীনাথ তর্কালঙ্কার পণ্ডিতেন্দ্র, বিদ্যাবাহাদুর।" ইনি স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্সের জন্য "শব্দসন্দর্ভসিন্ধু" নামক বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান রচনা করিয়াছিলেন (Cat. of Jones MSS. in the India Office Library: Tawney and Thomas, 1903, p. 7)। ইহা নিতান্ত কলঙ্কের বিষয় যে, উক্ত ডন্‌কান্ (Duncan) সাহেব চলিয়া গেলে, পণ্ডিতপ্রবর কাশীনাথের নানাবিধ অসদাচরণে বিদ্যালয়টি ধ্বংসের মুখে অগ্রসর

হয়। অবশেষে ১৮০১ খৃঃ এপ্রিল মাসে কাশীনাথ বিতাড়িত (expelled) হন। (Brooke's Minute of 1804). বিদ্যালয়ের এই বিশৃঙ্খলতা ও দুরবস্থার আর-একটি কারণ—তৎকালে সরকারী চাকরী-গ্রহণে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বিশেষ আপত্তি ছিল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একবাক্যে এই চাকরী গ্রহণে পরাঙ্মুখ ছিলেন ("the most learned pandits have consequently invariably refused the situation"...Lord Minto's Minute of 1811 A. D.)। নানাবিধ পরিবর্ত্তনের পর ১৮২০ খৃঃ একজন সাহেব সেক্রেটারী নিযুক্ত হয় এবং তৎপর বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করে। প্রথম সেক্রেটারী লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ এডওয়ার্ড ফেল্‌ (Lieutenant Edward Fell) ভালো সংস্কৃত জানিতেন("a profound Sanskrit scholar") এবং ১৮২১ খৃঃ পুরস্কার-বিতরণী সভায় স্বয়ং সংস্কৃতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের স্থাপন-কালে অধ্যক্ষ ভিন্ন আরও আট জন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তন্মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ ন্যায়ের অধ্যাপক পণ্ডিত রামপ্রসাদ তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খৃঃ ইঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা পেন্‌সন্‌ ও একটি প্রশংসাপত্র দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয়—তৎকালে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ ছিলেন এবং বয়স হইয়াছিল ১০৩ বৎসর! এ বয়সেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল ("bore a high character for learning and attention to his duties")। ইঁহারই স্থানে নিযুক্ত হন ফরিদপুর, (পং বিক্রমপুর) খাহুকা গ্রামের বিখ্যাত "কৃষ্ণাত্রেয়"-বংশীয় পণ্ডিত চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন। ১৮২০ খৃঃ সেক্রেটারী লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ ফেল্‌ (Secretary Lt. Fell) বিখ্যাত পণ্ডিত এইচ এইচ উইলসন্‌ (H. H. Wilson)-এর সহযোগে ন্যায়শ্রেণীর পরীক্ষাকালে জানিতে পারেন যে, চন্দ্রনারায়ণের পাণ্ডিত্যখ্যাতিতে নানাদেশ হইতে বহুতর ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট তাঁহার বাটীতে ("out of the college") পাঠ গ্রহণ করিত। ১৮২৫ খৃঃ তাঁহার বেতন মাসিক ৬০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকায় বৃদ্ধি হয়, তৎকালে নূতন সেক্রেটারী কাপ্তেন থরস্‌বি (Secretary Captain Thoresby) মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, চন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন ("was the most celebrated Logician in India"). ১৮২৭ খৃঃ ন্যায়শ্রেণীর প্রশংসা করিয়া সেক্রেটারী লিখিয়াছিলেন—"I am sure I do not err in saying that it is esteemed the first class in this very difficult branch of Sanskrit Literature at Benares. But this is no more than might be expected, considering that it is instructed by a pandit of such eminent acquirements as Narain Bhattacharji." অর্থাৎ বারাণসীতে সংস্কৃত সাহিত্যের এই অতি কঠিন শাখায় এই ন্যায়শ্রেণী প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া গণিত হয়, বলিলে যে ভুল বলা হয় না, এবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মতন প্রভূতগুণশালী পণ্ডিত যে-শ্রেণীর শিক্ষক সে-শ্রেণীর পক্ষে এ প্রশংসা ত আশাতিরিক্ত বলা যায় না। ১৮৩৩ খৃঃ এপ্রিল মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়—তদুপলক্ষেও তাঁহার উচ্চপ্রশংসা ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি—তৎপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ৪।৫ বৎসরেই ছাত্র-সংখ্যা অনেক কমিয়া যায় (১৮৩৯ খৃঃ শিরোমণি তাঁহার জবানবন্দিতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন)। ১৮৪৬ খৃঃ জানুয়ারী মাসে শিরোমণির মৃত্যুর পর চন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাকান্ত শিরোমণি ("considered to be one of the most learned in the Nyaya Shastra now living)" [ন্যায়শাস্ত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবিত পণ্ডিত] (General Report on Pub. Ins. N. W. P. 1846-47, p. 40) নিযুক্ত হন কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হয় এবং তৎপদে তাঁহারই জামাতা কালীপ্রসাদ শিরোমণি ১৮৪৭ খৃঃ জানুয়ারী মাসে অস্থায়ীভাবে ন্যায়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ("until enquiries should be made for a suitable successor to the late Pandit who was a scholar of established reputation"—*Ibid* 1847-48, p. 24)। বস্তুতঃ কিন্তু কালীপ্রসাদই স্থায়িভাবে থাকিয়

যান এবং ১৮৮০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর পর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ১৯০৭ খৃঃ পর্য্যন্ত স্থায়ের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন (প্রবাসী ১৩১৬, ৪৪ পৃঃ)।

এইভাবে যে-সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত ধারাহিকরূপে কাশীতে স্থায়ের আসন অলঙ্কৃত করিয়া নব্যন্যায়ের বিলাসভূমি বঙ্গদেশের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন তন্মধ্যে চন্দ্রনারায়ণ, কেবল সরকারী প্রশংসাবাক্যে নহে; সাম্প্রদায়িক জনশ্রুতিতেও সর্ব্বতোভাবে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। আমাদের একজন পূজনীয় অধ্যাপক ৺কৈলাস শিরোমণির নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তৎকালে কাশীর বাঙ্গালী সমাজে দুইজন মহাত্মা চরিত্রগুণে সাক্ষাৎ "বিশ্বেশ্বর" ও "কেদার" বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ছিলেন "বিশ্বেশ্বর"। গৌতমাবতার এই মহানৈয়ায়িকের অভ্যুদয়-কালে নিজ বঙ্গদেশ হইতে নবদ্বীপ ছাড়িয়া কাশীতে গিয়া ছাত্রগণ তাঁহার নিকট পাঠ সমাপন করিত। তন্মধ্যে নব্যন্যায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "পত্রিকা"র বিক্রমপুর-নিবাসী কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ প্রধান ছিলেন—তাঁহার পৌত্র ৺রজনী তর্করত্ন ("সারমঞ্জরী"র টীকায়) চন্দ্রনারায়ণ-রচিত ন্যায়ের (অনুগমে) টীকা ও টিপ্পনী, কুসুমাঞ্জলির টীকা এবং স্থায়সূত্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন—"প্রাণৈবীদতিগৌরবামনুগমে টীকাং তথা টিপ্পনীং, ব্যাখ্যানং কুসুমাঞ্জলেশ্চ বিমলং স্থায়স্য বৃত্তিং বরাম্ ॥" তন্মধ্যে ন্যায়ের টীকা "চান্দ্রী পাতড়া" নামে বঙ্গদেশের নৈয়ায়িক সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। চন্দ্রনারায়ণের পাণ্ডিত্যের নিদর্শন-স্বরূপ একটি বিচার-কাহিনী উল্লেখযোগ্য। খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-পাদে পূর্ব্ববঙ্গের একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক স্বীয় প্রতিভাধারা তদানীন্তন পণ্ডিত-সমাজকে চমকিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীনদের মুখে সেই দিগ্বিজয়ী, ফরিদপুর জপ্সা নিবাসী অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কারের গল্প এখনও শুনা যায়। বিজয়ী রাজার মত এই বিচারমল্ল পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত করেন এবং নবদ্বীপ পর্য্যন্ত জয় করিয়া তথায়ই অধ্যাপনা করিতেন। ১৮১৭-৮ খৃঃ নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকগণের মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। তিনি অবশেষে চন্দ্রনারায়ণের সহিত বিচারপ্রার্থী হইয়া কাশী গমন করেন। কথিত আছে, নৌকাযোগে যে-ঘাটে তিনি অবতীর্ণ হন ভাগ্যক্রমে সে-ঘাটেই চন্দ্রনারায়ণের সাক্ষাৎ পান এবং নৌকা বাঁধিয়া সেই মুহূর্ত্তেই সর্ব্বাগ্রে বিশ্বেশ্বর দর্শন করার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া গঙ্গাতীরে স্থায়ের "পক্ষতা" গ্রন্থের একটি দুরূহ পূর্ব্বপক্ষ করেন। অভয়ানন্দ চন্দ্রনারায়ণের প্রদত্ত ক্রমান্বয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্তের দোষ খুঁজিয়া পাইলেন না এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার "গোদ"-যুক্ত পদদ্বয়ে প্রণত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনিই সাক্ষাৎ 'বিশ্বেশ্বর', আমি আর অন্য বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে চাই না।" কথিত আছে, এই ঘটনার কিছুকাল পরেই ৩৫ বৎসর বয়সে এই দাম্ভিক নৈয়ায়িকের মৃত্যু ঘটে।

চন্দ্রনারায়ণের সময়ে যে মহাত্মা কেদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহার নাম রামকিশোর স্থায়লঙ্কার। তিনি মেহারের প্রসিদ্ধ "সর্ব্ববিদ্যা"-বংশীয় এবং নিজেও একজন উন্নত সাধক ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ বৈয়াকরণ ছিলেন বটে, কিন্তু কাশীতে তাঁহার টোলে প্রায় সকল শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁহার রচিত কলাপপঞ্জীর টীকা পূর্ব্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত আছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে তিনটি ছাপা হইয়াছে—মুদ্রাপ্রকাশ (রচনাকাল ১৭৫২ শকাব্দা) দীক্ষাতত্ত্বপ্রকাশ উভয়ই তন্ত্র-সম্বন্ধীয় এবং বহু পূর্ব্বে কাশীতে ছাপা হয়। সম্প্রতি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় তাঁহার মৌলিক গ্রন্থ "শাব্দবোধ-প্রকাশিকা" বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য এইসকল গ্রন্থেই পরিস্ফুট রহিয়াছে। তিনি নিঃসন্তান, পরলোকগত হইলে (আনুমানিক ১৮৫০ খৃঃ) তাঁহার পত্নী তাঁহার সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজি শ্রদ্ধাসহকারে স্বদেশীয় সুধীদের ডাকিয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

চন্দ্রনারায়ণের অন্যতম ছাত্র প্রবন্ধ-লেখকের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ রামশঙ্কর তর্কপঞ্চানন (খৃঃ ১৭৯৮-১৮৬৭) অধ্যাপকের মৃত্যুর পর কাশীতেই টোল করেন এবং একজন প্রধান নৈয়ায়িক বলিয়া পরিচিত হন। নেপালের

মহারাজকুমার "মুহিলা সাহেব" প্রকৃত নাম "উপেন্দ্র-বিক্রম সাহ" জঙ্ বাহাদুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করায় প্রয়াগে অবরুদ্ধ হন। ১৮৫৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে তাঁহার মুক্তির পর তিনি লক্ষাধিক টাকা আয়ের সম্পত্তি বৈরাগ্যবশতঃ অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং উক্ত রামশঙ্করই তান্ত্রিক অভিষেকদ্বারা তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই রাজ-সন্ন্যাসী তাহার পর বহুকাল নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

ডাঃ রাইট্ (Dr. Wright) স্বরচিত History of Nepal (নেপালের ইতিহাস) গ্রন্থে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অদ্ভুত বলিয়া উদ্ধৃত হইল।

"The king's brother, who seems to be tainted with hereditary insanity, became a *fakir* and may still (1875) be seen wandering about and bathing at the various holy places in all the odour (and filth) of sanctity (p.61)

অর্থাৎ রাজভ্রাতা সম্ভবত বংশগত উন্মাদ-দোষে দুষ্ট, ইনি ফকির হন, এখনও ১৮৭৫ ইহাকে নানাতীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং পবিত্রতার পূতিগন্ধ ও পঙ্কে স্নান করিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

পরিশেষে আমরা উক্ত রামশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ছাত্র কাশীর প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের (১৮২৯—৮৭ খৃঃ) নামোল্লেখ করিয়া উপসংহার করিলাম। তিনি কাশীর পণ্ডিত-সমাজের একজন বিশিষ্ট "দলপতি" ছিলেন এবং কাশীর বর্ত্তমান এবং পরলোকগত অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

বরদাই মহাকবি চন্দের মহাকাব্য রাসোর ঐতিহাসিকতা

অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভ

রাসোতে ক্ষত্রিয়-চরিত্র

রাসো পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক গ্রন্থ নহে, কিন্তু যখনই রচিত হউক না কেন, গ্রন্থরচনার সময়ের ক্ষত্রিয়-চরিত্র ও পৃথ্বীর সময়ের ক্ষত্রিয়-চরিত্রে বিশেষ প্রভেদ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব, পুস্তকে বর্ণিত চরিত্র পৃথ্বীর সময়ের বর্ণনা বিবেচনা করিলে বিশেষ ভ্রম হইবে না। রাসোর কয়েকটি গল্পেই সেকালের ক্ষত্রিয়চরিত্র বুঝিতে পারা যায়।

১। পৃথ্বীর অষ্টোত্তর সুরের মধ্যে কহ্নকাকা প্রধান ছিলেন, তিনি সোমেশ্বরের জ্ঞাতি-ভাই। গুজরাটের ভীমদেব আপনার ভাইদের যে বৃত্তি দিতেন, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন না; প্রায়ই রাজার গ্রাম ইত্যাদি লুট করিতেন, সেইজন্য ভীম তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর ভীমের আটটি ভ্রাতুষ্পুত্র বৃত্তি বাড়াইতে অনুরোধ করিলেন; ভীম যখন বাড়াইলেন না, তখন তাঁহারা রীতিমত ডাকাতি আরম্ভ করিলেন। ভীম তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন; তাঁহারা ভীমের শত্রু সোমেশ্বরের আশ্রয় লইলেন। সোমেশ্বর শত্রুর ভাইপোদের হাতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মনোমত বৃত্তি ধার্য্য করিয়া অল্পবয়স্ক বলিয়া পৃথ্বীর সহচররূপে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

পৃথ্বীর বাটীতে একদিন মহাভারতের কথকতা হইতেছিল, পৃথ্বীর সহচর সুরেরা, গুজরাটের রাজপুত্রেরা, ও সেবকের দল কথা শুনিতেছিল। কহ্নকাকা যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার ঠিক সম্মুখে গুজরাটের এক রাজপুত্র বসিয়াছিলেন। কথক কোনও যুদ্ধের কথা তেজস্বিনী ভাষায় বলিতেছিলেন, হঠাৎ কহ্নকাকা তরবারি দিয়া সম্মুখের রাজপুত্রের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। অন্য রাজপুত্র ও তাঁহাদের সেবকরা কহ্নকে আক্রমণ করিলেন।

সুরেরা কেহ কহের পক্ষ, কেহ রাজপুত্রের পক্ষ লইল; কথকতার সভা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। অল্প সময়ের মধ্যে গুজরাটের আটটি রাজপুত্র ও তাহাদের কয়েকটি সেবক কাটা পড়িল, কিন্তু বিবাদের কারণ কেহই জানিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর পৃথ্বী কহের গৃহে গিয়া বিবাদ আরম্ভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কহ বলিলেন, কথক যখন যুদ্ধের বর্ণনা করিতেছিল, তখন দেখিলাম আমার সম্মুখে যে রাজপুত্র বসিয়াছিল সে গোঁপে তা দিতেছে। আমার সম্মুখে বসিয়া কেহ গোঁপে তা দিলে আমার অপমান হয়, আমি তা সহ্য করিতে পারি না, অতএব আমি তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলাম। তাহার পর অন্য রাজপুত্রেরা আক্রমণ করিলে আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। পৃথ্বী কহকে দোষী করিলেন; কেননা তিনি রাজপুত্রকে মারিবার পূর্ব্বে তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন নাই; রাজপুত্রের কাছে তরবারি ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি নিরস্ত্র। ক্ষত্রিয়দের ধর্ম্মযুদ্ধের নিয়ম-অনুসারে বিপক্ষ অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলে, তবে আক্রমণ করা উচিত। অতর্কিতভাবে কাহাকেও আক্রমণ করা ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মযুদ্ধের অঙ্গ নহে।

পৃথ্বী ইহার পর সকল সময়ে কহকাকার চক্ষে ঠুলি দিয়া রাখিতেন, কেবল স্ত্রীদের মধ্যে শয়নাগারে, ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঠুলি খুলিয়া দেওয়া হইত।

২। পৃথ্বীর আদরের হাতী মারিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া আপনার এক শ্যালক ও সুরের কাছে এক জোড়া লোহার বেড়ী পাঠাইয়া পৃথ্বী আজ্ঞা করিয়াছিলেন, নিজ হস্তে এই বেড়ী পা য়ে পরিয়া আপনার গৃহে বন্দী থাক। সুর এই আজ্ঞাপালন করিয়াছিলেন। তিনি বহকাল বন্দী ছিলেন, কনোজ অভিযানের পূর্ব্বে বন্দী হইয়াছিলেন, ও শেষ যুদ্ধের পূর্ব্বে সমরসিংহের অনুরোধে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হাতী মারিলেন কেন, বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, আমি এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম সম্মুখে হাতী মত্ত হইয়া আসিতেছে। হাতীকে না মারিলে আমাকে পিছনে ফিরিয়া আসিতে হয়, অর্থাৎ পলাইতে হয়। আমি ক্ষত্রিয় হইয়া একটা পাগ্‌লা হাতীর সম্মুখ হইতে ফিরিতে বা পলাইতে পারিলাম না। আমি হাতীকে না মারিলে, হাতী আমাকে মারিত, অতএব রাজার আদরের হাতী জানিয়াও মারিতে বাধ্য হইলাম।

৩। জয়চন্দ্রের এক ভাইপো রাগ করিয়া পৃথ্বীর কাছে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কনোজ-অভিযানে তিনি জয়চন্দ্রের বিপক্ষে আপনার সহোদরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দুই সহোদর দুই পক্ষে ছিলেন। তাঁহার রাগের কারণ এইরূপ :—একদিন তিনি কয়েকটি বন্ধু লইয়া শিকারের ফেরতা নগরের বাহিরে একটি সুন্দর বাগান দেখিয়া সেই বাগানে, বাগানরক্ষকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন, ও বাগান-বাটীতে ভোজ ও আমোদ করিবার উদ্যোগ করিলেন। সুন্দর ফুলের কেয়ারিতে তাঁহাদের ঘোড়া বাঁধা হইল। বাগান-রক্ষক তাহার প্রভু জয়চন্দ্রের প্রধান মন্ত্রীর পুত্রকে সংবাদ দিল। তিনি কয়েকটি সেবক সঙ্গে লইয়া আসিলেন, ও রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গীদের বাগান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। রাজপুত্র জয়চন্দ্রের কাছে অভিযোগ করিলেন, ও মন্ত্রীপুত্রকে শাস্তি দিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু জয়চন্দ্র তাঁহার মুখেই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, তাহাকেই পরের বাগানে অনুমতি না লইয়া প্রবেশ করিবার জন্য ভর্ৎসনা করিলেন। রাজপুত্র জ্যাঠার এই অবিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন ও তাঁহার শত্রু পৃথ্বীর আশ্রয় লইলেন। তিনি পৃথ্বীর কাছে বলিয়াছিলেন জয়চন্দ্র যদি মন্ত্রীপুত্রকে প্রাণে না মারিয়া কেবল দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলেও আমার মান রক্ষা হইত, কিন্তু তিনি তাহাও করিলেন না। এত অবিচার করিলে তাঁহার দেশে কিরূপে বাস করিতে পারি?

৪। ঘোরীর সহিত শেষ যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথ্বীর অমাত্যদের এক মন্ত্রণা সভা হইয়াছিল, তাহাতে দুর্গরক্ষা, নগররক্ষা ইত্যাদি ভার লইতে কেহই স্বীকৃত হইতে-ছিল না; সকলেই সম্মুখসমরে মরিয়া স্বর্গে যাইতে ব্যস্ত। রাসোতে পৃথ্বীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নাম রেণসী বা রেণু সিংহ, হাম্মীর মহাকাব্যে নাম গোবিন্দরাজ, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা কেবল "গোলা" লিখিয়াছেন; রাজপুতা

ভাষায় গোলা অর্থে দাসীপুত্র। পৃথ্বী তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজধানীতে রাখিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু সে বলিল আমার রাজ্য চাই না, আমাকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দিন। সকলে সম্মুখ-সমরে মরিয়া স্বর্গে যাইবে, আর আমি যাইতে পারিব না? সকলে স্বর্গে গেলে দেশের দশা কি হইবে, সে চিন্তা কেহই করিতে চাহিত না। তাহারা বলিত পুরুষেরা স্বর্গে গেলে সতীরা চিতারোহণ করিবে; অসতীরা যাহা ইচ্ছা তাহা করুক। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাদের মত "হুইয়ে ওহী যো রাম রচ রাখা অর্থাৎ যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা হইবেই. তবে সে-বিষয়ে এত চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি?

৫। রাসোতে পৃথ্বীর উক্তি আছে যে কীর্ত্তিহীন জীবন অপেক্ষা মৃত্যু ভালো।

৬। ক্ষত্রিয়রা আশ্রিতকে কখনও ত্যাগ করিত না। পৃথ্বী মুসলমানদের ঘৃণা করিতেন, তথাপি একবার ঘোরীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় চাহিলে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহার জন্য ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তবুও ত্যাগ করেন নাই।

৭। ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত বলদর্পিত ছিল, যখনই ঘোরীকে বন্দী করিয়াছে তখনই বলিয়াছে তোমাকে আমরা গ্রাহ্য করি না, তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম, পলাও; সাহস হয় আবার আসিও, আবার মারিব আবার বন্দী করিব।

৮। ক্ষত্রিয়রা স্ত্রীপুরুষে উভয়ে পাশা খেলিতে বড় ভাল বাসিত।

৯। ক্ষত্রিয়রা অতি সরল ও অদৃষ্ট-বিশ্বাসী ছিল। গঙ্গাজলকে তাহারা অমৃত বলিয়া বিশ্বাস করিত। মানুষ যতই পাপী হউক না মৃত্যুর পর তাহার একখানি হাড় যে-কোনো উপায়ে গঙ্গাতে পড়িলে তাহার নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে বিশ্বাস করিত। ব্রাহ্মণদের ভক্তি করিত, ব্রাহ্মণের হাতে মরিলে ব্রহ্মলোক লাভ হইবে বিশ্বাস করিত কিন্তু মজ্‌তা বা ভিখারী বলিয়া তাহাদের ঘৃণাও করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইলে দেহ পবিত্র হয়, আত্মার স্বর্গলাভ হয়। আহ্লার গানে আছে যে পৃথ্বীর ব্রাহ্মণ-সেনাপতি চূড়ামণি উদনকে মারিয়াছিল, সেই রাগে আহ্লা চূড়ামণিকে মারিয়াছিলেন কিন্তু অস্ত্র দ্বারা মারিলে স্বর্গ লাভ করিবে বলিয়া গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন।

১০। পৃথ্বী যখন মৃগয়াতে যাইতেন তখন সকল সহচরদের সহিত সমানভাবে কষ্ট সহ্য করিতেন। সকলের সহিত এক বৃহৎ বস্ত্রাবাসে ঢালা বিছানাতে শুইতেন, স্বয়ং সুখে থাকিয়া অন্যদের কষ্টে রাখিতেন না।

১১। ক্ষত্রিয়রা ভূত, প্রেত, দেব, দানব ইত্যাদি ও স্বপ্নে, শকুনে, যাদুমন্ত্রে, তন্ত্রে, হাঁচি-টিকটিকির ডাকে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। সকল কার্য্যারম্ভেই শুভ মুহূর্ত্ত খুঁজিত। শুভ মুহূর্ত্ত না হইলে যুদ্ধে যাত্রার জন্য অশ্বারোহণ করিত না, কিন্তু শত্রুর আগমন সংবাদ পাইলে আর শুভ সময়ের অপেক্ষা করিত না বা হাঁচি গ্রাহ্য করিত না।

১২। ক্ষত্রিয়রা বহু বিবাহ করিত, কিন্তু অবিবাহিতা অথবা পর স্ত্রীর সহিত একাসনে বসা অতি ঘৃণিত কার্য্য বিবেচনা করিত; বলিত, ঐরূপ করিলে রাজপুতী নাশ হইয়া যায়। রক্ষিতাদের অর্দ্ধপত্নী বলিত ও তাহারাও এক পুরুষগামিনী ছিল ও আপনাদের পতিব্রতা বলিয়া দম্ভ করিত। পিতার রক্ষিতাকে বিমাতার মতন মান্য ও ভরণ-পোষণ করিত। কোনও স্ত্রীলোককে মুখে একবার মাতা বা ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিলে চিরকাল তাহার সহিত মাতা বা ভগ্নীর মতন ব্যবহার করিত। ক্ষত্রিয়বালাদের বিপদে রক্ষা করিবার ভার তাহাদের ভ্রাতারা অথবা ধর্ম্ম-ভ্রাতারা লইত। ক্ষত্রিয়বালারা মোগল-সম্রাটদেরও রাখী উপহার দিয়া ধর্ম্মভ্রাতা সম্বন্ধ পাতাইয়াছে।

১৩। সমুদ্রশিখরগড়ের যুদ্ধের আহতরা ভুলিয়া, বর্ষার সময়ে অনুমতি না লইয়া মহোবার পরমাল চন্দেলের বাগান-বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরমাল উদনকে আজ্ঞা করিলেন, বাগানে যাহারা ঢুকিয়াছে তাহাদের মাথা কাটিয়া আনো। উদন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন তাহারা ত আহত, আমি ক্ষত্রিয় হইয়া আহতদের প্রাণে মারা ত পরের কথা, গায়ে হাত তুলিতে পারিব না। ক্ষত্রিয়রা রুগ্ন, আহত, যুদ্ধে অক্ষম, অস্ত্রত্যাগী, পরাজয় স্বীকার-কারীকে কখনও আক্রমণ করিত না।

১৪। পৃথ্বী যখন মহোবা আক্রমণ করিলেন তখন



মজুরনী

শ্রী অন্নদাকুমার মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা ।

আল্‌হা ও উদন মহোবা ত্যাগ করিয়া কনোজে বাস করিতেছিলেন। মহোবা রাজদূত পাঠাইয়া বলিলেন, এখন আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নহি, একমাস আমার আতিথ্য স্বীকার কর, আল্‌হা আসিলে যুদ্ধ করিব। পৃথ্বী বেত্রবতী নদীতীরে একমাস অপেক্ষা করিয়াছিলেন; আল্‌হা ও জয়চন্দের প্রেরিত সৈন্য আসিলে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৫। পৃথ্বীর সুর ও সেনা মধ্যে সকলজাতীয় ক্ষত্রিয় ছিল। চাঁওড়া বা চূড়ামণি নাগর একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ তাঁহার এক প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

১৬। পৃথ্বীর রাণীরা ও রাজবাটীর দাসীরা সকলেই পত্র লিখিবার পড়িবার মতন বিদ্যাবতী ছিল। সেকালের ক্ষত্রিয়বালারা প্রায় সকলেই পত্র লিখিতে ও পড়িতে পারিত কিন্তু পুরুষদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়া শিখিত না। পৃথ্বীর লেখক-সম্প্রদায় কায়স্থ ছিল।

১৭। রাসোতে অবরোধ প্রথার যথেষ্ট কঠোরতা বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা পৃথ্বীর একমাত্র পুত্রকে গোলা অর্থাৎ দাসীপুত্র বলিয়াছে, কিন্তু রাসো-অনুসারে রেনসী বিবাহিতা রাণীর পুত্র, তবে তাঁহার মাতা রাজকন্যা ছিলেন না। যখন পৃথ্বী সংযুক্তার অন্তপুরে বাস করিতেছিলেন, ও প্রজারা মুসলমান-আক্রমণের ভয়ে পলাইতে আরম্ভ করিল, তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক রেনসী অনেক চেষ্টা করিয়াও বিমাতার অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পান নাই। এক স্থানে, মহারাণী সংযুক্তা ও চিতোররাণী পৃথার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আছে; সেখানে তাঁহাদের দোলা বা পাল্কী সুবর্ণগ্রথিত কাপড়ে ঢাকা, তাঁহার চারিদিকে সেবিকার দল, তাহার চারি দিকে অস্ত্র হস্তে স্ত্রী প্রহরিণী, তাহার চারিদিকে খোজার পাহারার বর্ণনা আছে। ইহা অনেকটা মোগলদের হারেমের অনুকরণ বলিয়া সন্দেহ হয়।

১৮। পৃথ্বী একবার রাণা সমর সিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দুই রাজা, সুর ও সামন্তরা খাইতে বসিলে পরিবেষণের পর কয়েকটি পশু ও পক্ষী সেখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, কোনও পাত্রে কোনও খাদ্যে বিষাক্ত দ্রব্য থাকিলে ঐ পশুরা একপ্রকার শব্দ বা অঙ্গভঙ্গী করিত। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্তব পাঠ শুনিয়া গৃহকর্ত্তা অনুমতি দিলে সকলে ভোজনারম্ভ করিল। ঐ ভোজের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, আগে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন তাহার পর নিমকী মুখরোচক চাট্‌নী, ও অন্ন তাহার পর নানা-প্রকার নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হইল, সকলের শেষে নানা প্রকার পশু ও পক্ষীর মাংস পরিবেষণ করা হইল। এই ভোজে বহুপ্রকার পশু ও পক্ষীর মাংসের উল্লেখ আছে কিন্তু মৎসের উল্লেখ নাই, সম্ভবতঃ রাজপুতদের দেশে মৎস্য দুষ্প্রাপ্য বলিয়া উল্লেখ নাই।

চ

রাসোর ভাষা

রাসোর ভাষা পঞ্জাবি-মিশ্রিত হিন্দী, ও তাহাতে যথেষ্ট পার্সী ও অরবী শব্দ আছে। চন্দ বলিয়াছেন তিনি বেদের দেবভাষা, প্রাকৃত দেশীয় ভাষা, ব্রজভাষা ও কোরাণের ভাষাতে রচনা করিয়াছেন, তথাপি রাসোতে বিদেশী শব্দবাহুল্য দেখিয়া তাহাকে দ্বাদশ শতাব্দীর দিল্লী ও অজমীরের ভাষা বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

রাজপুতানার একজন দেশাচারবিৎ ও ভাষাবিৎ বিশেষজ্ঞ রাসো-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে রাজপুতদের মধ্যে চোহানদের কুলমর্য্যাদা বড় বেশী নাই, ও চিতোরের রাণা-বংশ কুলীনশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য; রাণার বংশে যে-বংশের কন্যার বিবাহ হয়, তাহার সম্মানবৃদ্ধি হয়, ও রাণা-বংশের কন্যা যে বংশে যায়, সে কুলীনের মতন সম্মানিত হয়। এই সম্মানের লোভে রাণা-বংশের কন্যা অনেকে আকাঙ্ক্ষা করে। রাণা-বংশে সচরাচর চোহান-কন্যার বিবাহ দেখা যায় না, সেইজন্য চোহান-বংশের কোনও পুরোহিত-কবি চোহানদের মর্য্যাদা-বৃদ্ধির জন্য চোহান রাজকুমারীর বিবাহ রাণার সহিত হইবার কাল্পনিক গল্প রচনা করিয়া সমাজে চালাইয়াছেন। তিনি রাসোর ভাষা দেখিয়া ও নানা আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারা অনুমান করেন যে এই পুস্তকখানি শাহজহানের সময়ে [অল্প পূর্ব্বে বা পরে] রচিত হইয়াছিল। [কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল, ১৮৮৬] কিন্তু কাশীর নাগরী-প্রচারিণী-সভা বলেন, যে অকবর-বাদশা একবার

বিশেষ সভা করিয়া রাসো ও আহ্লার গান শুনিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদের কাছে আছে, অতএব অকবরের সময়ে, ষোড়শ শতাব্দীতে, রাসো ও আহ্লার গান ছিল। কিন্তু তখন যে আধুনিক পুস্তকখানিই ছিল, ও ইহাই গীত হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। খুব সম্ভব, তখন অন্য একখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল, এখন সেখানি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বা লোপ পাইয়াছে। আধুনিক রাসোর অনেকগুলি পাঠান্তর আছে, অনেকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইয়া নাগরী-প্রচারিণী সভা যে গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন এখন তাহাকেই প্রামাণিক বলিতে হইবে।

উত্তর ভারতে এক শ্রেণীর লোক ছিল, রাসো গান করা যাঁহাদের বংশগত ব্যবসা ছিল। তাহারা ভিন্ন-বংশীয় শিষ্যও গ্রহণ করিত। তাহাদের মধ্যে পুস্তক অতি অল্পই ছিল, অধিকাংশ গায়কের কণ্ঠেই এই বৃহৎ গ্রন্থ ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সিবিলিয়ন মিস্টর [পরে সর চার্ল্‌স্] ইলিয়ট্‌ [যিনি পরে বঙ্গের ছোটলাট হইয়াছিলেন] একখানিও লিখিত আহ্লার গান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তিনি গায়কের কণ্ঠ হইতে সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাসোও ঐরূপ ছিল, এখন মুদ্রিত হইয়াছে। রাসোর মতন যে গীত কেবল গায়কদের কণ্ঠে থাকে, তাহা কালে-কালে গায়কদের বিদ্যা ও শ্রোতার রুচি অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। অকবরের সময়ে রাসো ও আহ্লা লিখিত ছিল কিম্বা কেবল কণ্ঠে ছিল ঠিক জানা নাই। প্রাচীন ভাষার যে রাসো এখন পাওয়া যায়, বিশেষজ্ঞরা তাহার ভাষাকে পৃথ্বীর সময়ের ভাষা বলিয়া বিশ্বাস করেন না। নাগরী-প্রচারিণী সভার প্রকাশিত রাসোর এক অধ্যায় বা সময়ের নাম "আহ্লাখণ্ড"। তাহাতে আহ্লার কেবল পৃথ্বীর সহিত যুদ্ধের কথা আছে, অন্য যুদ্ধের কথা নাই, তাহার ভাষাও অন্য অংশের ভাষার মত প্রাচীন নহে, যদিও অনেকটা সেই ছন্দে লেখা ও চন্দ বরদাইর ভণিতা আছে। সম্পাদকেরাও এ ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন।

হিন্দী ভাষাতে অনেক কবি ১৭, ১৮ এমন কি ১৯ শতাব্দীতেও কবিতা রচনা করিয়া, তাহাতে আপনার নাম না দিয়া, বরদাই কবি চন্দের ভণিতা দিয়াছেন, সেই জন্য এখন একই বিষয়ে কবি চন্দের ভণিতাযুক্ত একাধিক এমন রচনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ভাষা বা শব্দ মিলে না। কবি চন্দের ভণিতাযুক্ত অতি নিকৃষ্ট কবিতাও দেখা যায়; সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃতের অনুকরণ, কেননা, বেদব্যাসের নামে চলিত নানা-প্রকার কবিতা পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রবাসী এক ব্রাহ্মণের কাছে একখানি আয়ুর্ব্বেদ-মতে জ্বর চিকিৎসার পুস্তিকা দেখিয়াছি, তাহাও বেদব্যাসের রচনা বলা হইয়াছে, হরপার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তর-রূপে লেখা, অথচ তাহাতে কুইনাইন প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে।

রাসোর পক্ষপাতীরা বলেন কবি চন্দ পঞ্জাবের লাহোর-বাসী ছিলেন। লাহোর পৃথ্বীর পতনের ১৭০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে [১০২২ খৃঃ হইতে] মুসলমান রাজাদের অধীন রহিয়াছে, অতএব লাহোরের ভাষাতে, পৃথ্বীরাজের সময়ে, পার্সী অরবী শব্দ প্রবেশ লাভ করাই সম্ভব; সেইজন্য রাসোর ভাষাতে এত বিদেশী শব্দ। কিন্তু রাসোতেই আছে যে কবি চন্দের পিতা বহু পূর্ব্ব হইতে—চন্দের বা পৃথ্বীর জন্মের পূর্ব্ব হইতে—শাকম্ভরি-পতিদের কবি ছিলেন, অজমীরে থাকিতেন, অতএব চন্দ-পরিবারের আদি নিবাস লাহোরে হইলেও চন্দের জন্ম অজমীরে হইয়াছিল, তিনি বাল্যাবধি অজমীরে ছিলেন। চন্দ পৃথ্বীর সমবয়স্ক ছিলেন, পৃথ্বীর সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন, অতএব চিরকাল অজমীর ও দিল্লীবাসী ছিলেন। চোহানেরা মুসলমানদের ঘৃণা করিত, চোহানদেশে মুসলমান ছিল না, বা অতি অল্প কাবুলী অশ্ববিক্রেতা, অন্য ২।৪টি বণিক্ ও ফকির ছিল; এরূপ বিদেশীদের ভাষা দেশে প্রচলিত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব অজমীরের ভাষাতে পার্সী ও অরবী শব্দ ছিল না। দিল্লী-সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। এ-কারণে কবি চন্দের কবিতাতে,—যদি তিনি পৃথ্বীরাজের সম-সাময়িক হয়েন—বিদেশী শব্দ থাকা উচিত নহে। উহাতে বিদেশী শব্দের বাহুল্যই উহাকে পরবর্ত্তী কালের লেখা বলিয়া প্রমাণিত করিতেছে।

চন্দ যখন জন্মাবধি অজমীর ও দিল্লীবাসী, তখন তাঁহার ভাষাতে পঞ্জাবী বিশেষত্ব থাকাও সম্ভব বা উচিত

নহে, অথচ সমস্ত গ্রন্থে একটিও কবিতা এমন আছে কি না সন্দেহ, যাহাতে একটিও পঞ্জাবী শব্দ বা উচ্চারণ নাই। এইসকল কারণে রাসোকে বিশেষজ্ঞরা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বিবেচনা করেন।

সমাপ্ত

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিঠি *

পোস্‌ট্‌মার্ক—শান্তিনিকেতন
২৯ নভেম্বর ১৬

ওঁ

চারুচন্দ্র

এবার দ্বিখণ্ডিত করা কঠিন!
সবটা দিলেই ভাল হয়।
যন্ত্রে সঁপি দেও, থাকিতে দিন,
দ্বিজ প্রতি হইয়া সদয়॥
বলিতেছ "করিব চেষ্টা"—
হইবে দেখিতেছি শেষটা
—পুরুফ্ সাতাশে বা আটাশে
উড়িয়া আসিবে বাতাসে।
পোষ্ট্‌কার্ড্ তব—কী তোমায় ক'ব—
মাথায় গো হানিল ডাণ্ডা॥
ইহার সত্বর, ভেটিয়া উত্তর,
দ্বিজের মন কর ঠাণ্ডা॥

—

পোস্‌ট্‌মার্ক—শান্তিনিকেতন
২৬ মে ১৯

ওঁ

চারুচন্দ্র

তুমি যাহা আমাকে করিতে বলিয়াছিলে তাহাই করিলাম—তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে সারিয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে রসদ যোগাইলাম। আমার দুইটা কথা এখন তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর:—

প্রেসাম্বুদ হ'তে যবে প্রুফ-ধারা ঝরে।
চাতক দ্বিজের মনে আনন্দ না ধরে॥
প্রেসাম্বুদ না হইলে সময়ে সদয়।
যে করে চাতক-প্রাণ বলিবার নয়॥

সারদা দেবীর বরপুত্র

—

পোস্‌ট্‌মার্ক—শান্তিনিকেতন
২৮ মে ১৯

ভেট যাহা পাঠাইনু যতনে-সোহাগে
পেয়েছেন প্রবাসী? না নিয়ে গেছে কাগে?
ন-ডাকে সাড়া যে নাই! এ কি ভাব চারু!
তোমার ব্যাভার দেখি বনে' গেছি দারু!!

—

পোস্‌ট্‌মার্ক—শান্তিনিকেতন
৩০ মে ১৯

পরাণ পাইনু ধড়ে পাইয়া উত্তর।
খুসী হৈনু শুনি প্রুফ পাঠাবে সত্বর॥
যে দেখে কলঙ্ক শুধু চারুদ্বিজরাজে।
বিফল নয়ন তার এ ধরণী মাঝে॥

—

পোস্‌ট্‌মার্ক—শান্তিনিকেতন
১৬ জুন ১৯

ওঁ

চারুচন্দ্র

সঁপিনু তোমার হাতে মস্তকের ছেলে।
পুরিয়া রেখো না তা'রে যন্ত্রঘর-জেলে॥
প্রুফ-যানে করি ভর, সপ্তাহ ভিতরে—
ঘরের ছেলেটি যেন শীঘ্র আসে ঘরে॥

* এই চিঠিগুলি পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লেখেন। প্রঃ সঃ

পোস্টমার্ক—শান্তিনিকেতন
১০ আগস্ট, ১৯

ওঁ

চারুচন্দ্র

কাঁটাবনে ভরা প্রুফের ক্ষেত্র।
নিরখিলে মোর ব্যথয়ে নেত্র॥
অ্যাতো কাটিলাম—হ'ল না ফর্‌সা।
এ ঘোর বিপদে তুমিই ভরসা॥
স'পিনু তোমায় মাথার ধন।
তরাও ইহারে গহন বন॥

—

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
নভেম্বর ১৯

প্রিয়দর্শন চারুচন্দ্র

তুমি লিখিয়াছ—"আমার তিতুমিঞার* শিষ্য বলিয়া যে অনুযোগ আছে তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না।" অর্থাৎ তোমার নামে আমি যেন ভয়ানক একটা charge আনিয়াছি; অথচ তুমি মানুষ খুনও কর নাই—জালও কর নাই—চুরি ডাকাতিও কর নাই! তিতুমিঞার ইতিহাস কি তুমি শোনো নাই কখনো? সে যখন বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়া অ্যাকা হাতে কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন কোম্পানির ফৌজেরা দুই একবার ফাঁকা আওয়াজ করাতে সে বলিল, "গোলা খা ডলা"। তোমার প্রতি আমি যতবার কবিতার ছিটাগুলি বর্ষণ করিয়াছি—একবারও তুমি তাহার সম্বন্ধে ভালমন্দ কোনো একটি কথার উচ্চবাচ্য না করাতে আমার মনে হইল তুমি "গোলা খা-ডলা" বলিয়া তাহা waste paper basketএ নিক্ষেপ করিলে, এই যা কেবল।

শ্রীদ্বি

* প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ১৩১ পৃষ্ঠা, "ক্ষীণপ্রভ চক্ষুর কাহুনী গীত" নামক কবিতা দ্রষ্টব্য।

—

পোস্টমার্ক, শান্তিনিকেতন
১৮ মে ২১

ওঁ

চারুচন্দ্র

প্রুফ শীঘ্র পাঠাইলেই ভাল হয়—
কেননা এটা ব্রহ্মবাণী
"বিলম্বে হয় কর্ম্মহানি!"
Rhyme কে সাম্‌লানো ভার—
দেখা দিয়াছে আবার!
আদর যদি দিই তাকে
পড়িব ঘোর বিপাকে।
পায়ে পড়ি থাকে ধমক খে'লে।
শিরে চড়ি বসে আদর পে'লে॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

জগতের তুমি ছিলে না ত' কেহ
কল্পনা-লোকে রহিতে তাই
চিন্ময় ছিলে ঋষি দ্বিজেন্দ্র
জড়তা তোমারে পরশে নাই।
যে হেরেছে তব শান্ত শুভ্র
দিব্য দীপ্ত মূরতিখানি

যে শুনেছে তব কোমল মধুর
মর্ম্মভরা সে অমিয় বাণী—
সে হাস্য তব হা-হা-হা আ-হা-হা
ঝরিয়া দুগ্ধ শুভ্র ধারে
কর্ণ ভরিয়া ক্ষালিয়া চিত্ত
কভু পবিত্র ক'রেছে যারে

তারি হিয়া-মাঝে তব রূপ রাজে
আজিকে অরূপ মরণজয়ী
শান্ত বদন দীপ্ত নয়ন
শুভ্র মূরতি প্রতিভাময়ী।
নন্দন-মধু- স্বপনে উধাও
ছিলে না ত তুমি ধরণী-তলে,
নব রসে ভরা কাব্য-জগতে
বিচরিতে সদা কৌতূহলে।
পারিজাত-ফোটা মনোরাজ্যের
কামধেনু-চরা সোনার ধূলি
বিচরিয়া সেথা কৌতুকী তুমি
ধরিয়া উজল-বরণ তুলি
আঁকিলে কি ছবি রুদ্র ভীষণ
কোমল মধুর উদাস কভু,
কভু বা বিকট বীভৎস রসে
লোমহর্ষণ করিয়া প্রভু,
কভু আনন্দ কভু বা বিষাদ
রৌদ্র-মেঘের রচিলে মেলা
নিখিল কাব্য- রস নিঙাড়িয়া
বসাইলে ঘরে প্রমোদ-মেলা।
ভুবনের সার সত্য-অমৃত
আহরি' বিলালে জগৎজনে,
গীতার ভূমিকা রচি' আচার্য্য
কত না প্রসাদ লভিলে মনে।
খুঁজিয়া মিলালে তুমি যে শান্তি
পরিবেষি' দিলে সবার কাছে
আনন্দ-রসে ভরি' মঙ্গল
বিতরিলে সুধী-জন-সমাজে।
ভাবিতে সবারে আপনার মত
তত্ত্বদর্শী গভীর জ্ঞানী
তাই ত কহিতে সবাকার আগে
নিগূঢ় মর্ম্ম-শাস্ত্র-বাণী;
তাই তব পাশে রহিত যে জন
আনন্দ-লোক-বার্ত্তা লভি'
ক্ষণেক ভুলিত মরম-বেদনা
নেহারিয়া তব মুখচ্ছবি।
তেমন হৃদয় লোকদুর্ল্লভ
কখনো কাহারো হেরিনি আর,
পরের বেদনা শুনিলে যা গলি'
ঝরিত নয়নে শতেক ধার।
মানবাত্মারে দিয়েছ শ্রদ্ধা
কারেও করনি অবিশ্বাস,
আপন সরল চিত্তেরি সম
তোমাতে সবার হ'ত প্রকাশ।
শুভ্রশীর্ষ শিশু-ভোলা-নাথ
তোমার তুলনা তুমিই প্রভু,
সরল সত্য ছিল তব সাথী
ছলেও ছলনা করনি কভু।
ধরণী তোমার না হইতে শেষ
স্বর্গেরে তুমি লভিয়াছিলে,
সাধক-উচিত তব তিরোধানে
আজকে সে কথা বুঝায়ে দিলে।

শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলিতে দেখা যাচ্ছে, খেয়ার এই প্রতীক্ষা কান্নায় ফেটে পড়তে চাচ্ছে:—

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো। (১৮)

গীতাঞ্জলির প্রায় সব জায়গায়ই দেখতে পাওয়া যায়, কবি বিরহের ব্যথা বড় গভীর ক'রে অনুভব করছেন। সেই বিরহের ভিতরেই কখনো-

কখনো প্রিয়তমের কোনো একটুখানি সান্নিধ্যও লাভ কর্‌তে পার্‌ছেন।

বাঞ্ছিত-সম্বন্ধে নানা কথাই কবির মনে জাগ্‌ছে, বড় মাধুর্য্যমাখা সেইসব কথা। কখনো বল্‌ছেন—

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চল্‌বে না।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো
কেউ জান্‌বে না কেউ বল্‌বে না। (২৪)

তিনি জানেন, তাঁর হৃদয় এখনো তাঁর চরণস্পর্শে ধন্য হবার মতো হয় নি,—

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,

কিন্তু এ কথা বল্‌বার অধিকার কবি পেয়েছেন—

সখা তোমার হাওয়া লাগ্‌লে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গল্‌বে না?

আর এ যে-সে অধিকার নয়।

মাঝে-মাঝে কবি অদ্ভুত আব্‌দারের কথা বলেছেন—

মুখ ফিরিয়ে রবো তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে। (৯১)

কখনো অজানিতভাবে তাঁর ক্ষণিক স্পর্শ লাভ ক'রে সচেতন হ'য়ে কবি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি। (৬২)

বলা যেতে পারে বিরহের বেদনাই গীতাঞ্জলির পূর্ণ সুর, আর রীতিমত তীব্র সে বেদনা।

কবি প্রায় সব অবস্থায়ই এই বিরহের বেদনা অনুভব কর্‌ছেন। প্রভাতে জেগে উঠে বল্‌ছেন,—

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ বরণ পারিজাত ল'য়ে হাতে। (৬৮)

মেঘলা দিনে বল্‌ছেন,—

মেঘের পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখো
একা দ্বারের পাশে। (১৭)

বৃষ্টির মাতামাতি দে'খে তিনি বল্‌ছেন—

ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ঐ ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে। (২৮)

ম্লান বৈকালে তাঁর মনে পড়্‌ছে—

এখন বিজনপথে করে না কেউ
আসা যাওয়া
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া।
জানি না আর ফির্‌ব কিনা
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে। (২৭)

ঝড়ের রাতে তিনি আকুল হ'য়ে ভাব্‌ছেন—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণসখা বন্ধু হে আমার। (২১)

আর সব অবস্থাতেই তাঁর মনে জাগ্‌ছে—

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে। (২৯)

গীতাঞ্জলিতে কবির দুই ভাবের সাধনা আমরা লক্ষ্য করি। একবার তিনি বল্‌ছেন—

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত সেথায় খোলো দ্বার,
আজি লবো তাঁর দেখা। (৫১)

আর-বার বল্‌ছেন—

ভজনপূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক প'ড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস্ ওরে? (১২০)

অথবা বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়ক বনে, নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো। (১০)

এর ভিন্ন-ভিন্ন পরিণতি আমরা গীতিমাল্য আর গীতালি বলাকা পলাতকা ইত্যাদিতে দেখ্‌তে পাই।

গীতাঞ্জলির এই বিরহকে বৈষ্ণব বা সুফীর বিরহের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। প্রকৃত বৈষ্ণব চমৎকার প্রেমিক, তাই প্রেমের ব্যথা রবীন্দ্রনাথ যখন অনুভব করেছেন তখন বৈষ্ণবের ভাবটি মাঝে-মাঝে তাঁর ভিতরে যে ফু'টে উঠ্‌বে এটি স্বাভাবিক। রাধিকার ভাবটি গীতাঞ্জলির অনেক জায়গায়ই বেশ ফু'টে উঠেছে। এমন-কি কেউ যদি বলেন, বৈষ্ণবের প্রেমের ভাবটিই গীতাঞ্জলিতে বেশী প্রস্ফুট, তা হ'লে তাঁর সঙ্গে তর্ক না কর্‌লেও অন্যায় হবে না। তবু একথা বল্‌তেই হবে, মোটের উপর বৈষ্ণবের প্রেমের ধাত রবীন্দ্রনাথের নয়। বৈষ্ণব মূর্ত্তিবাদী, রাধাকৃষ্ণ এক সুন্দর রসঘনবিগ্রহ ব'লেই বৈষ্ণব তা অবলম্বন ক'রে আনন্দ পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ের পূজারী। সে রহস্যময় তাঁর কাছে "জলে স্থলে" "নানা আকারে" ধরা দেন। কবি নিজের গাঢ় অনুভূতিতে কখনো তাঁর চরণ ছুঁতে পার্‌ছেন। কখনো মৃত্যুর বেশে তিনি কবির মনোনেত্রে আবির্ভূত হচ্ছেন।

এই জন্যই সুফীর আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গেও তাঁর কিছু অমিল রয়েছে; সুফীও পীর মানেন; শাস্ত্রের সত্যকে জীবনে উপলব্ধি কর্‌তে চেষ্টা করেন। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের সাধনায় নূতনত্বই বেশী ক'রে চোখে পড়ে।

ইয়োরোপ তাঁকে বলেছে 'মিস্টিক' (Mystic), কিন্তু মিস্টিক বল্‌লে তাঁর বিশেষত্ব-নির্দ্দেশ পুরোপুরি হয় না, কেননা এ-কথাটি খুবই ব্যাপক। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ (Wordsworth)ও Mystic, 'এমার্সন' (Emerson)ও Mystic, আবার ব্লেক (Blake)ও Mystic। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত Mystic-এর এক সংজ্ঞা দিয়েছেন—"তার কাছে মধ্যাহ্নের তপন বড় রূঢ়, রুক্ষ, সে ভালোবাসে ছায়া-আলোর মিশ্রণ।" একশ্রেণীর Mystic-সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে

একথাটি একেবারেই খাটে না। তাঁর সন্ধানের তীব্রতা অনুভূতির গাঢ়তা আর প্রকাশের পর্য্যাপ্তি প্রায় সব জায়গায় চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ Mystic এই হিসাবে যে সত্যের চিররহস্যময় দ্বারে তিনি উঁকি মেরেছেন। সেই হিসাবে জগতের কোন্ শক্তিমান Mystic নন?

বৈষ্ণবের ভক্তির সুর রবীন্দ্রনাথে পান না ব'লে অনেককে দুঃখ করতে দেখেছি। তাঁরা ভু'লে যান, মানুষের জীবন বিচিত্র, জীবনের সার্থকতাও বিচিত্র। তা ছাড়া অপরের পরিচয় যখন আমরা পেতে যাই তখন আমাদের উচিত, নিজের খেয়াল রুচি ইত্যাদিকে একটুখানি চেপে রাখা। এই জ্ঞানী মানী সুসভ্য কবি যখন বলছেন—

জড়িয়ে গেছে সরু-মোটা
দুটো তারে
জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে না রে (১২৯)

তখন কি দুঃখে তাঁর হৃদয়ে এই দারুণ অশান্তি বাজ্‌ছে, কি সত্য রয়েছে এর ভিতরে, কোন্ অবস্থায় পড়ে মানুষের হৃদয়-তারে এমন ঝঙ্কার ওঠে—সেই সমস্তের অনুসরণই কি সত্য অনুসরণ নয়? যাঁরা সহজ অধিকারে ডুব দিয়ে অতলে তলিয়ে যেতে পেরেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্। কিন্তু যিনি তেমনি ক'রে নিজেকে তলিয়ে দিতে পারছেন না, অথচ অতলের জন্য প্রাণ তাঁর আকুল হ'য়ে উঠেছে। তাঁর সেই আকুলতায়ও ত বিশ্ববিধাতার এক চমৎকার লীলা। মানুষের ইতিহাসে তা একতিলও অসত্য নয়। তার উপর খেয়া গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য শুধু বিরহীর কান্নাই নয়, এ-সমস্তে ফুটে উঠেছে এক নব বিরহমূর্ত্তি। এইসমস্ত কাব্যের অনেক কবিতা যে ইয়োরোপের আধুনিক ভাবুক মনীষীদের হৃদয় স্পর্শ করেছে সেও এই জন্যেই।

গীতাঞ্জলিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম বলেছি। গীতিমাল্য আর গীতালির ভিতরে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার যে গ্রাম তা হয়ত গীতাঞ্জলির গ্রামের চাইতে উচ্চতর। কিন্তু সৃষ্টি পূর্ণতর অর্থাৎ স্থূলতর ব'লে মনে হয় গীতাঞ্জলির ভিতরে।

গীতিমাল্য

গীতাঞ্জলির যে কান্না গীতিমাল্যে তা থেমে যায়। কিন্তু সে অশ্রুর এখন এক নতুন বেশ। এ তীব্র বেদনার অশ্রু নয়, এ অশ্রুর ভিতর দিয়ে কবি-হৃদয়ের কেমন-এক স্নিগ্ধ শান্তি চোখে পড়ে—যেন বৃষ্টিতে ভেজা টগর। গীতাঞ্জলিতে ঝড়ের রাত্রে কবি বলেছেন

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার ইত্যাদি

আর গীতিমাল্যে বলেছেন

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙ্‌ল ঝড়ে
জানি নাই ত তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো
নিবে গেল দীপের আলো
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে।
অন্ধকারে রইনু প'ড়ে
স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি?

সকাল বেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি,
ঘরভরা মোর শূন্যতারি
বুকের পরে। (৬৭)

কবির অন্তরের ব্যথা ঘুচে যায়, কিন্তু অন্তরের তলে কেমন একটু তৃপ্তি গীতিমাল্যের অনেকগুলি কবিতাকে সরস ক'রে রেখেছে।

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ (৭)
কোলাহল ত বারণ হ'ল
এবার কথা কানে-কানে। (৮)
কে গো অন্তরতর সে?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে। (২২)
ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ ক'রে গেছ হেসে। (৩৫)
ইত্যাদি

ভক্তের যে সঙ্গোপনের পূজা সেইটিই গীতিমাল্যের মূল সুর। কবির যত কথা যত দুঃখ যত সার্থকতা যত আনন্দ একান্ত ক'রে তাঁকেই তিনি বলছেন—

লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ। (৪৭)

গীতিমাল্যে কবি বড় খাদের পর্দ্দায় সুর বেঁধেছেন; তাই তা পুরো-পুরি উপভোগ করবার জন্য খুবই দরদীর কান চাই। সেই কান থাকলে গীতিমাল্যে খুবই একটা গভীর তৃপ্তি অনুভব করা যায়। এই খাদের পর্দ্দাতেই সময়-সময় কবির মনের কথা কি মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে বেজে উঠেছে।

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বল্‌ব আমি ব'লে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ আছ"র স্রোত ব'হে যায়
'কই তুমি কই' এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গলে। (১৪)

* * * *

যদি জান্‌তেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায়, আমি
কি জানি তার নাম।

* * * *

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধ'রে।
ভুবন ভ'রে আছে যেন
পাইনে জীবন ভ'রে।
সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তা'রে ক্ষণে-ক্ষণে,
গভীর সুরে "চাইনে, চাইনে,"
বাজে অবিশ্রাম। (৫৭)

তখন মনে হয় এমন খাদের পর্দায় সুর না ধর্‌লে এমন অপূর্ব্ব গান শুন্‌বার সৌভাগ্য আমাদের হ'ত না। *

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার চেহারা গীতিমাল্যে অনেকখানি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। কোনো গুরু বা শাস্ত্র তাঁর পথ-প্রদর্শক নন। উপনিষৎ তাঁর প্রিয়, বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, দেশ-বিদেশের সাহিত্য-মহারথীদের প্রতি তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা; কিন্তু প্রকৃত গুরুর পদে বরণ তিনি কাউকেই করেন নাই। তাঁর অন্তরের অনুভূতিই বিশ্ব-জগতের বুকের উপর দিয়ে তাঁর পথ দেখিয়ে চলেছে।

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাবো কাহার দ্বারে ?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারি কাছে
কথার কি তার অন্ত আছে ?
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার। (৬২)

নিজের অন্তরের সত্যকার বেদনা যে কেমন ক'রে মানুষকে পথ দেখায়—চিরকাল মানুষকে পথ দেখিয়ে এসেছে—সে-কথাটি অন্ত-এক কবিতায় বড় সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে। সমস্ত রবীন্দ্র-কাব্যে এ একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তা'রে।
* * *
আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে,
সেই গানের টানে পারো না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে-গান মম
ঝড়ের রাতের পাখী-সম,
বাহির হ'য়ে এস তুমি
অন্ধকারে;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তারে। (৬৪)

এর "ঝড়ে যায় গো উড়ে" শীর্ষক কবিতাটি বড় অদ্ভুত।

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না যে হায় গো
তা'রে রাখ্‌তে নারি টানি। (১৯)

কোন্ চুম্বকের আকর্ষণে কবি-চিত্ত এমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে আমাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ নয়। হাফেজও এক জায়গায় বলেছেন

দিল্ মি রওদ যে দস্তম্
সাহিবদিলাঁ খোদারা।

সহজের সাধনায় কবি যে অনেকখানি এগিয়েছেন গীতিমাল্যের অনেকগুলি কবিতায় তার পরিচয় রয়েছে।

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ তাকানো হাসিতে
সেই সুরে মোরে বাজাও। (৩৯)

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
সে-সুধা গড়িয়ে গেল লোকে-লোকে।
গাছেরা ভ'রে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধ'রে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখীরা পাখায় তা'রে নিল এঁকে। (১০৮)
* * *

গীতিমাল্যের শেষের দিকে কতকগুলি কবিতায় দেখা যাচ্ছে কবির বেদনা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, আর আনন্দ বেশ সজীব হ'য়ে উঠেছে।

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে,
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝ'রে পড়ুক ঝ'রে। (৬৮)
* * * *

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
সে আগুন ছড়িয়ে গেল
সবখানে।
যতসব মরা গাছের ডালে-ডালে
নাচে আগুন তালে-তালে
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে। (৮৯)

বৈষ্ণবের সেই

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙিনার পরে তিতিছে বঁধুয়া
দে'খে যে পরাণ ফাটে—

কবিতার সঙ্গে গীতিমাল্যের "কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না" শীর্ষক কবিতাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। বৈষ্ণবের সরল হৃদয়, বাইরের বন্ধনই তাঁকে আকুল করেছে। তিনি কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছেন। কত মর্ম্মস্পর্শী এই কান্না তা কে না বুঝ্‌তে পারে? কিন্তু গীতিমাল্যের কবির দুঃখ দেখ্‌চি একটু ভিন্ন-রকমের;

তুমি পার হ'য়ে এসেছ মরু
নাই যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়,
এমনি ভাগ্যহত। (৯১)

বাইরের তেমন-কোনো প্রতিবন্ধকতা তাঁকে দুঃখ দিচ্ছে না। তাঁর প্রিয়তমের আস্‌বার পথ রুদ্ধ হয়েছে তাঁর নিজের অন্তরের শুষ্কতায়

* গীতাঞ্জলিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম বলেছি। কেউ যদি সে জায়গায় গীতামাল্যের নাম করেন তবে আমরা তর্ক করব না।

মরুতে—শিথিল প্রবস্থার মরুতে। আধুনিক কবির এই দুঃখ বিশেষ ক'রে আধুনিক জগতের লোকেরই দুঃখ, কেননা মানুষের এই ভিতরকার বন্ধনই আজ বেশী প্রবল হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

এক যুগের কাব্যের ভিতরকার কথার সঙ্গে অন্য যুগের কাব্যের ভিতরকার কথার নিশ্চয়ই খুব বেশী মিল। তবু একযুগের ভাবের অবলম্বন আর প্রকাশভঙ্গিমা অন্যযুগের ভাবের অবলম্বন আর প্রকাশ ভঙ্গিমা হ'তে ভিন্ন হ'তে বাধ্য, নইলে ভিন্ন-ভিন্ন যুগ ব'লে কোনো কথাই থাকত না। অতীতের যাঁরা অন্ধ ভক্ত এ কথাটি তাঁদের স্মরণ রাখা দরকার।

গীতিমাল্যের শেষের কবিতায় কবি যে প্রণাম নিবেদন করছেন কেমন-এক সার্থকতার আনন্দ রয়েছে তাতে—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
　　তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
　　তোমায় করি গো নমস্কার। (১১১)
　　　　গীতালি

কবির এত দিনের সব কান্না-ব্যথা কেমন-এক সার্থকতার শ্রীতে মণ্ডিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে গীতালিতে।

দুঃখের বরষায়
　　চক্ষের জল যেই
　　　　নাম্‌ল
বক্ষের দরজায়
　　বন্ধুর রথ সেই
　　　　থাম্‌ল।
*　　*　　*　　*
এত দিনে জান্‌লেম
　　যে কাঁদন কাঁদ্‌লেম
　　　　সে কাহার জন্য।
ধন্য এ ক্রন্দন,
　　ধন্য এ জাগরণ,
　　　　ধন্য রে ধন্য। (১)

গীতালির প্রায় সব কবিতারই এই সুর—এই সার্থকতার মহিমার সুর। ভক্ত কবি তাঁর চিরবাঞ্ছিতের সামনে বসে যেসব আবদারের কথা বলছেন কত নিবিড় তা'র রসটি!

বক্ষ আমার এমন ক'রে
　　বিদীর্ণ যে করো
উৎস যদি না বাহিরায়
　　হবে কেমনতরো? (৩২)

অথবা

গর্ব্ব আমার নাই রহিল প্রভু,
চোখের জল ত কাড়বে না কেউ কভু। (৬৪)

তাঁর হৃদয়-গৃহে-শয়ান প্রিয়তমকে জাগাবার জন্য কবি যে ডাকছেন কোনো ব্যথা কোনো আশঙ্কা নেই সেই স্বরে। পূর্ণ বিশ্বাসে প্রাণ ভ'রে তিনি বলছেন

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে—
　　প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কত কাল এমনে কাটিবে স্বামী—
　　প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

*　　*　　*　　*
মিলাবো নয়ন তব নয়নের সাথে
মিলাবো এ-হাত তব দক্ষিণ হাতে—
　　প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।

এখন সার্থকতার অন্তরে কবির দৃষ্টি আরো পরিষ্কার আর প্রেমামৃত পানে তাঁর কণ্ঠ আরো সবল। তাই তাঁর এতদিনের আধ্যাত্মিক সাধনার যে বেদনা আর এখনকার যে আশা সে-সম্বন্ধে কবি বেশ দরাজ স্বরে কথা বলছেন—

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
　　সে যে বিষম ব্যথা!
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
　　সকল দুখের কথা (১৭)

গীতালিতে কতকগুলো উঁচুদরের কবিতা স্থান পেয়েছে—রূপ আর রসের দিক দিয়েই উঁচুদরের।

আগুনের
　পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে
এজীবন
　পুণ্য করো
　　—দহন দানে। (১৮)
যে থাকে থাক্‌ না দ্বারে
যে যাবি যা না পারে।
*　　*　　*　　*
কুঁড়ি চায় আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে।
　ফোটাফুল চায় না নিশা
　প্রাণে তার আলোর তৃষা
　　—কাঁদে সে অন্ধকারে। (২০)
অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
　　কেমন ক'রে?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
　　গানের ঘোরে। (৫৫)
*　　*　　*　　*
পুষ্প দিয়ে মারো যারে
　চিন্‌ল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে
　ধরে তোমার চরণকে। ৭৩
　　ইত্যাদি।

এর দুটি কবিতা গীতিমাল্যের সেই 'বড় যায় উড়ে গো যায়' শীর্ষক কবিতার মতনই আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্জ্ঞেয়। গুহ্য (Esoteric) সাধনা যাঁরা করেন তাঁরা হয়ত এ সমস্তের রস ভালো ক'রে উপভোগ করতে পারেন—

কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে দিলি দ্বারে,
জোড় হাতে তুই ডাকিস কারে?
　　প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে। (১০)
*　　*　　*　　*

আমি যে আর সইতে পারিনে
সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে। (১১)

* * *

যাঁর প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে কবি এতকাল কেঁদেছেন তাঁর সেই প্রেমকে কবি বলেছেন সর্ব্বনাশা। হাফেজও বলেছেন :—

কস্ বদৌরে নার্গিসত ব্‌রুকিনবস্ত আজ আফিয়াত

বাস্তবিক সত্যের যে সন্ধানী তাঁর আরাম-আয়েসে আগুনের স্পর্শই লাগে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা তাঁর কাছেও এই কথাটিরই আভাস বেশী ক'রে পেয়েছেন।

গীতালির "আবার যদি ইচ্ছা করো" শীর্ষক কবিতাটিও খুবই লক্ষ্য-যোগ্য। কত অল্প কথায় কত বিস্তৃত আর রসময় ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! কবির এই ক্ষমতার আরো বেশী পরিচয় পাওয়া যায়, এর পরে রচিত পলাতকায় আর বিশেষত লিপিকায়।

তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চভূমিতে দাঁড়িয়ে চিরপরিচিত অতি বড় ধরণীর পানে চেয়ে কবি বলেছেন—

আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফি'রে
দুঃখ সুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার পরে করি খেলা
হাসির মায়া-মৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন-নীরে।
কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি;
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা
আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে।
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার স্বরূপ গীতালিতে বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলেন—

সেই ত আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা ত নাই।

* * *

এম্‌নি ক'রে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্যনূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন বাধা।

"নিত্যনূতন সাধনাতে নিত্যনূতন বাধা" সহ্য করার ভিতরে মুক্তির স্বাদ আছে। কবির জীবন এতেই ভোর হবে না, এমন দিন আসবে যে-দিন তাঁর প্রতিভা-নির্ঝরিণীর সব কলকল ভাব সাগরসঙ্গমে নীরব হ'য়ে যাবে, কে তা বল্‌তে পারে? কিন্তু এই কবিতার অন্য জায়গায় তিনি যে বল্‌ছেন—

ফলের তরে নয়ত খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফে'লে
আবার ফুল ফুটাই।

এটি তাঁর ব্যক্তিগত সাধনার কথা হ'লেও এর ভিতরে একটি বড় সত্যেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে।

আধ্যাত্মিক সাধনায় যাঁদের উপলব্ধি তত্ত্ব-আকারে, অনুশাসন-আকারে ফলের মতন দেখা দিয়েছে, তাঁদের মাহাত্ম্য ইতিহাসে কীর্ত্তিত হয়েছে। অবতার-পয়গম্বররূপে, শাস্ত্রকাররূপে, পথপ্রদর্শক গুরুরূপে তাঁরা মানুষের পূজা পেয়েছেন। তাঁদের মাহাত্ম্য যে অসাধারণ একথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু একদিকে যেমন রয়েছে তাঁদের প্রতিভার উজ্জ্বলতা, তেম্‌নি অন্যদিকে দেখা যায় দুর্ব্বল লোকের জীবনে তাঁদের প্রভাবের বিকারের অন্ধকার। তাঁদের আবিষ্কৃত যে-সব তত্ত্ব, যে-সব উপদেশ তাঁরা মানুষকে দিয়েছেন, যে-সব কালে-কালে মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচারই করেছে। জগতে সব ধর্ম্মের ইতিহাসই বহু-পরিমাণে এই ফলের বিষম বোঝার দৌরাত্ম্যের ইতিহাস নয় কি? অনন্ত তত্ত্ব, অনন্ত সৌন্দর্য্যের নিলয় যে ভগবান্ তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর বিশেষ আনন্দ, বিশেষ শক্তি প্রকাশিত যে অবতারে পয়গম্বরে, মানুষ তাঁদেরই জীবনের সব অবস্থার অবলম্বনরূপে বেশী ক'রে চেপে ধ'রে নেই কি? মানুষের সব ব্যাপারেই এই গুরুর অত্যাচার, আদর্শের অত্যাচার—সাধনার ফলের "বিষম বোঝার" অত্যাচার।

এখন অবশ্য এই গুরুগিরির অত্যাচার আস্তে-আস্তে হাল্‌কা হবার পথে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে গুরু এখন বন্ধু হ'য়ে উঠেছেন—অন্ততঃ সে-সত্য স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন যে ধর্ম্ম—ভগবৎ-উপলব্ধি—সেখানেও যে গুরু শুধু বন্ধু, অবতার পয়গম্বর প্রাচীন আদর্শ সবাই বড় একটুখানি সহায়, তা'র বেশী নয়; তা'র বেশী হ'লেই তাঁরা যে মানুষের উপর দৌরাত্ম্য করেন, তাদের জীবনে সত্যকার ফুল ফোটাবার সুযোগ নষ্ট করে দেন *—দেখা যাচ্ছে এই আশ্চর্য্য সন্ধানী মানুষের বড় কামনার ধন সেই সত্যকে কবি নিজের জীবনে উপলব্ধি ক'রে মানুষকে উপহার দিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনাকে তত্ত্ব-আকারে অনুশাসন-আকারে জমিয়ে তুলতে তাঁর কত সঙ্কোচ।

ফলের তরে নয়ত খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা!

একহিসাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-জীবনই বিশ্ব-মানবের কাছে এই সংস্কার-মুক্তির উপহার,—ইতিহাসের ধারায় সহস্র সংস্কারবদ্ধ মানুষের ভিতরেও অনুভব করা যায় যে অবন্ধনের চমৎকারিত্ব,তা'রই মূর্ত্ত মহিমা।

তৃতীয় পর্য্যায়

বলাকা

গীতালিতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার বেশ একটা সার্থকতা লাভ হয়েছে, আমরা দেখেছি। এই সার্থকতার রসে কবি নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিতেও পারতেন—অর্থাৎ অনেক ভক্ত তা পেয়েছেন। তা হ'লে তাঁর গানে হয়ত অনুভব করতে পারা যেত হাফেজ বা কবীরের জমাট মিলনানন্দ। কিন্তু তা না পেয়ে আমরা দুঃখিত নই, কেননা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বরং কবি এর জন্য দুঃখিত নন। তিনি আর কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, আর-এক অপূর্ব্ব মমতার সঙ্গে সে-পথ অনুসরণ ক'রে চলেছেন।

গীতালির এই সার্থকতার সবলতায় কবি অনুভব করছেন গতির

*চতুরঙ্গের শচীন বল্‌ছেন,"আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়েই আনাগোনা করেন।"

আনন্দ। তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরেই গতি যথেষ্ট তূর্য—হিল্লোলিত ত বটেই। এখনকার এই দৃষ্টির আর চিত্তের সবলতায় কবি প্রত্যক্ষ করছেন তাঁর সেই আজীবন পথিক রূপ।

আমি পথিক, পথ আমারই সাথী।
* * * *
বাহির হ'লেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

কবি তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন—

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দ-গান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

তাঁর এই পরিব্রাজকরূপ বলাকায় পরম ঐশ্বর্য্যমণ্ডিতভাবেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। জীবনেও তিনি এখন থেকে পুরোপুরি পরিব্রাজক, কিন্তু এই বলাকা কাব্যের ভিতরে তাঁর যে পরিব্রাজকরূপ তা দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে এক অসাধারণ সৃষ্টি-মাহাত্ম্যই লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রায় সর্ব্বত্রই আমরা যে একটা গতিবেগ দেখ্‌তে পাই, তত্ত্ব-হিসাবেও তা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে খুব প্রিয়; কেননা আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়, প্রতিক্রিয়ারূপে গতিবেগের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু এই গতির তত্ত্বই তাঁর দেশবাসীকে দিতেন তা হ'লেও বাংলার সামাজিক ইতিহাসে তাঁর একটি বড় স্থানই লাভ হ'ত। কিন্তু তিনি সত্যকার কবি, তাই গতির যে চিরকালের সত্য তাই-ই রূপ ধ'রে উঠেছে তাঁর সামনে।

বলাকার অনেক কবিতাই সুন্দর। তত্ত্ব এসমস্তের ভিতরে কম নেই, কিন্তু তা'কে রাঙিয়ে দিয়েছে আর জীবন্ত করেছে তাঁর কল্পনা। কি বিরাট্‌ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কল্পনা তা ভাবলে স্তম্ভিত হ'তে হয়। বলাকার কতকগুলো কবিতার ছন্দও অসাধারণ। গ্রহনক্ষত্রের ঘূর্ণনের মহাচ্ছন্দে যেন ছন্দিত হ'য়ে উঠেছে কবির ভাবোচ্ছ্বাস।

হে বিরাট্‌ নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু-ফেনা উঠে জেগে;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণ-স্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্‌বুদের মত।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে, ইতিহাসে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে চলার যে লীলা, তা'র অপরূপতা প্রত্যক্ষ ক'রে কবি যেন আনন্দে নৃত্য করছেন।

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তা'রা কাঁদবে।

ছবি শুধু ছবি, চিরচঞ্চলের মাঝে শান্ত, একথায় তাঁর আর মন ওঠে না, তিনি বলেন—

কি প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে নও শুধু ছবি!
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
* * *
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই।
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।

চিত্রা কাব্যের ভিতরে দেখা গেছে রবীন্দ্র-প্রতিভার এক পূর্ণ-উচ্ছ্বসিত রূপ, তেমনি আর-এক বন্যাবেগ পরিলক্ষিত হয় এই বলাকা কাব্যে।

বলাকার "তাজমহল" কবিতাটি খুবই বিখ্যাত। তা'র বর্ণনা জায়গায়-জায়গায় দ্বিতীয় তাজমহলের মতনই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে।

হে সম্রাট্‌ কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।

বলাকাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের অন্যতম বলেছি। অনেকেই হয়ত আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। বড় ভাব কি বড় রূপ এতে লাভ করেছে! এর প্রায় সব কবিতাই পাঠককে সেই কথা মনে করিয়ে দেয়। সামান্য ভাবও এতে কী পূর্ণ আর পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করেছে। এর "মোর গান এরা সব শৈবালের দল" শীর্ষক কবিতাটি তার প্রমাণ।

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করেনি অচল।

মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই নাইক সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইক নিশ্চয়।
যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,

আমার শৈবালদল
উদাস চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

কিন্তু এর "তাজমহল" কবিতাটি সম্বন্ধে আমাদের আরো কিছু বল্‌বার আছে। কবির গতি-তত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব এসব শিরোধার্য্য ক'রে নিয়েও, যখন কবিকে বল্‌তে শুনি "মিথ্যা কথা,—কে বলে রে ভোলো নাই?"—তখন আমাদের অন্তরপুরুষ কেমন একটু পীড়ন অনুভব করে। কবি যা বল্‌ছেন তা মিথ্যা নয়, তবু মন বলে, "আর যে বলে বলুক, কিন্তু কবির মুখ থেকে একথাটা এই ভঙ্গিতে শুন্‌তে রাজি হওয়া যায় কি?"

এই অসম্পূর্ণতা হয়ত কবির মনেও লেগেছিল, তাই তাজমহল-সম্বন্ধে অন্য-একটি কবিতায় তিনি বল্‌ছেন—

আজ সর্ব্ব মানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

অতীত অস্তমিত বটে, কিন্তু তা'র সবটুকু চিরঅস্তমিত নয়। কবি নিজে একথাটা খুব ভালো ক'রেই বোঝেন, তাই বলাকার একটি কবিতায় কবিকে বল্‌তে শুন্‌ছি—

এমন একান্ত ক'রে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এত কাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হ'য়ে যেত কালো।

আমাদের মনে হয় এই তাজমহল কবিতাটির শেষের দিকে কবি যেন তত্ত্বের আকর্ষণে বড় বেশী আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছেন।

বলাকা যে-যুগের লেখা, রবীন্দ্র-সাহিত্যে সে একটি বড় যুগ। সবুজ পত্রের যুগ। আগেকার সাধনার যুগের মতন এযুগও কাব্যে,গল্পে,উপন্যাসে নাটকে এবং প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। সাধনার যুগ আর সবুজ পত্রের যুগ এ দুয়ের কোন্‌টি সমৃদ্ধতর—শিল্প-সম্ভারে সমৃদ্ধতর, সে-সম্বন্ধেও আলোচনা হ'তে পারে। দুই যুগ সম্বন্ধেই ঢের কথা বল্‌বার আছে। সবুজপত্রের যুগের বলাকা, পলাতকা, লিপিকা, কয়েকটি ছোটো গল্প, আর সাধনার যুগের সোনার তরী, চিত্রা, পঞ্চভূত, গল্পগুচ্ছ পাশাপাশি দাঁড় করালে সাধারণতঃ সবুজপত্রের যুগের দিকেই পক্ষপাত কর্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যখন মনে করা যায় পঞ্চভূতের নবীন মনীষা—নবীন প্রতিভাচ্ছটা, প্রথম ছোটো গল্পের নিবিড় রসানুভূতি আর সোনার তরী ও চিত্রার তত্ত্ব-নিরপেক্ষ প্রায় নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনা—বর্ণবৈচিত্র্যে পরম আঢ্য কবি-কল্পনা, তখন পক্ষপাতিত্ব ব্যাপারটি যথেষ্ট কঠিন হ'য়ে ওঠে। সবুজ পত্রের যুগের কবির অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি ক্ষমতায় আমরা মুগ্ধ, বলাকা, পলাতকা, কালো মেয়ে, হৈমন্তী, শেষের রাত্রি, বাঁশি প্রভৃতি কবিতা আর ছোটো গল্প পড়লে কে না মুগ্ধ হয়? বাস্তবিক দার্শনিকতা আর কল্পনার অদ্ভুত মিলনে সবুজপত্রের যুগ খুবই লক্ষ্যযোগ্য; তবু সোজা কথা বলাই ভালো—সাধনার যুগ থেকে এযুগ মোটের উপর শিল্প-গৌরবে শ্রেষ্ঠতর কি না সে-সম্বন্ধে আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি।

আগেই বলা হয়েছে, বলাকার অনেক কবিতাই সুন্দর কবিতা। এর 'স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই" শীর্ষক কবিতায় 'নৃত্য দোদুল' ছন্দটি বড় মর্ম্মস্পর্শী। "অশ্রুজলে চিংড়ান ধরণীর স্বর্গখণ্ডগুলির" প্রতি চিরকালই কবির অপরিসীম মমতা। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চির আরামের কল্পিত স্বর্গের পানে কবি আর চাইতেই চান না। সে-স্বর্গ স্বর্গই নয়। অনন্ত সুখে আর অনন্ত দুঃখে বিচিত্র যে মাটির ধরার জীবন, তা'র চমৎকারিত্ব আর সত্যতা কবির চোখে এত বেশী যে সে-কথা ভেবে আনন্দে তিনি যেন নৃত্য কর্‌ছেন।—

স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই?
তা'র ঠিক ঠিকানা নাই!
তার আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ,
ওরে নাইরে তাহার দেশ,
ওরে নাইরে তাহার দিশা,
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।
ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।
কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা আমার সজ্জা আমার দুঃখেসুখে।
আমার জন্ম মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে।

রসের এমন অনুপম উপলব্ধির জন্যই রবীন্দ্রনাথ এত তাত্ত্বিকতা সত্ত্বেও চমৎকার কবি—যেমন চমৎকার কবি কালিদাস, যেমন চমৎকার কবি হাফেজ।

'বলাকা' কবিতাটির কথা আগেই বলা হয়েছে। বলাকা কণ্ঠহারের এ মধ্যমণি। গতির যে জগদ্‌ব্যাপী কালব্যাপী তত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভায় তা যেভাবে বিগ্রহান্বিত হয়েছে, তার সামনে আনন্দে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় শুধু অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়; সমালোচকের তাত্ত্বিকতা আপনা থেকে মাথা নত করে।

হে হংস-বলাকা',
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,

এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকারে আলোর ক্রন্দনে।
শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনে রাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।'

গ্যেটের ফাউস্ট্-এর প্রারম্ভে দেবদূতদের যে স্তুতি আছে, তা'রই বিরাট্ ভাবধারণা এর সঙ্গে কিছু তুলিত হ'তে পারে।

পলাতকা

বলাকায় রবীন্দ্র-প্রতিভার যে জোয়ার এসেছে, পলাতকায় তাতে ভাঁটা পড়েনি, শুধু তার দিগ্‌দিগন্তব্যাপী ফেনোচ্ছল তরঙ্গভঙ্গের পালা চু'কে গেছে, মানুষের অত্যন্ত আপনার জনের মতন সে জোয়ার এখন তা'র দ্বারের সাম্‌নে দিয়ে বইছে—বিস্তৃত, প্রশান্ত, আনন্দরশ্মি-দীপ্ত তার রূপ।

পলাতকা কাব্যখানি রীতিমত পছন্দ করেন না, রবীন্দ্র-কাব্যের এমন পাঠক আজো আমাদের চোখে পড়েননি।

বাস্তবিক, এর এমন সরল ভঙ্গিমা আর অব্যর্থ কবিদৃষ্টি সূর্য্যালোকের মতন যার উপর পড়েছে,তা'রই সমগ্ররূপ উন্মুক্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কত গভীর কথা কত সহজভাবে কবি বলেছেন। আর কি অব্যর্থ তাঁর ইঙ্গিত। এর প্রথম কবিতা পলাতকার আংশিক উদ্ধৃত করছি।

কুকুরছানা বারে বারে এসে
কাছে ঘেঁসে ঘেঁসে
কেঁদে কেঁদে চোখের চাওয়ায় শুধায় জনে জনে,
"কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তা'রে না দেখি অঙ্গনে?"
আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তা'র সাথী।
আঁধার হ'ল, জ্বলল ঘরে বাতি;
উঠ্‌ল তারা; মাঠে মাঠে নাম্‌ল নীরব রাতি।
আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে,
"নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে?"

কেন যে তা সেই কি জানে? গেছে সে যার ডাকে
কোনো কালে দেখে নাই যে তা'কে।
আকাশ হ'তে, আলোক হ'তে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হ'তে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এলো।
বুকে যে তা'র বাজল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তা'র আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তা'রেই অন্বেষণ
জন্ম হ'তে আছে যেন মর্ম্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছু'টে চলার বেগে,
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই ত তাহার চেনাশুনার খেলাধূলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তা'রে ডাক দিয়েছে কেঁদে
আলোক তা'রে রাখ্‌ল না আর বেঁধে।

পলাতকার আর-একটি কবিতা আংশিক উদ্ধৃত ক'রে আমরা এ আলোচনা শেষ করব। দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ আর বংশীধর রবীন্দ্রনাথ কি গাঢ় আলিঙ্গনে এক হ'য়ে গেছেন, পলাতকার এইসব কবিতার ভিতরে তাই উপলব্ধির বস্তু।

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোষে শুয়ে পড়ি ধপাস্ ক'রে।
হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ প'ড়ে যায় উপরেতে,—
মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জান্‌লাখানি,
ব'সে আছে পাশের বাড়ীর কালো মেয়ে নন্দরাণী।

* * * *

ঐ যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরাণী
যেমনতর ওর ভাঙা ঐ জান্‌লাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশ-তলে দিশাহারা;
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলসভরে;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী;
তেম্‌নি আমার বাঁশের বাঁশি আপন-ভোলা
চারদিকে মোর চাপা দেয়াল,ঐ বাঁশিটি আমার জান্‌লা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এসংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে-কথাটা কান্না হ'য়ে বোবার মতো ঘু'রে বেড়ায় বুকে
উঠ্‌ল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া।

এই কি অসাধারণ প্রতিভার সঙ্গলাভ আমরা এতক্ষণ করলাম। বাঙালীর ভবিষ্যৎ হয়ত মন্দ নয়; এক শত বৎসরের ভিতরে বাঙালীর ঘরে জন্মেছেন রামমোহন, মধুসূদন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ। এঁদের একজনকেও এক শত বৎসরে পেলে যে-কোনো সমাজ ধন্য হ'য়ে যায়।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে যে প্রভাবান্বিত সে-কথা বল্‌বার দরকার বোধ করি নে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রবীন্দ্র-প্রতিভার চাকচিক্যেই যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে রয়েছি, তা'র প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে তেমন প্রবল হয় নি—এ-কথা ভাব্‌বার সময় এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্ববিখ্যাত পুরুষ; তাঁর খ্যাতিতে বাঙালী গৌরবান্বিত। কিন্তু তাঁর এখ্যাতিকে সত্যকার খ্যাতিতে রূপান্তরিত করবার অর্থাৎ তাঁর প্রতিভাকে একটা জাতির জীবনের বস্তু ক'রে তা'কে সার্থকতা দান করবার, শ্রেষ্ঠ অধিকার যে বাঙালীরই আছে এ-কথা ভুলুলে চল্‌বে কেন ?

রবীন্দ্রনাথের বহু সুন্দর সৃষ্টির সামান্য সামান্য পরিচয় আমরা এতক্ষণ পেয়েছি। কিন্তু তাঁর সমগ্র কাব্যশতদল আশ্রয় ক'রে ফু'টে রয়েছে যে এক মহিমান্বিত প্রতিভা, বিধাতার হাতের সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টির মাহাত্ম্য উপলব্ধির অধিকারী শ্রদ্ধাবান্, মার্জ্জিতবুদ্ধি, শ্রম-অকাতর পাঠক।

সমাপ্ত

হাজী ওয়ারিস্ আলী শাহ্ এবং ওয়ার্সী সম্প্রদায়

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

পনের-ষোল বৎসর অতীত হইল, আলীগড় প্রবাসকালে একজন মুসলমান ফকিরের সহিত আমার আলাপের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার নাম আলিফ্ শাহ্। তিনি প্রায় নিত্যই আমার বাসায় আসিতেন এবং ধর্ম্ম-জগতের অনেক মূল্যবান্ সংবাদ দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার সঙ্গে মধ্যে-মধ্যে জনৈক প্রৌঢ় বৈদান্তিক সন্ন্যাসীও আসিতেন। তিনি বেদান্ত-বিষয়ক একখানি স্বরচিত হিন্দী পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন। পুস্তকখানি বহুদিন আমার গৃহে ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাহা পাইতেছি না। সন্ন্যাসীর নামও এখন মনে নাই। আলিফ্ শাহের বয়স তাঁহার অপেক্ষা কিছু কম ছিল। ফকির দীর্ঘ-কুঞ্চিতকেশ, শ্যামল বর্ণ, সন্ন্যাসী শ্মশ্রু-গুম্ফহীন, মুণ্ডিতমস্তক ও গৌর-কান্তি। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। যিনি ফকিরের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, একদা আমার সেই মুসলমান বন্ধুর বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইবার কালে একটি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিতনেত্রে দাঁড়াইয়া গেলাম। দেখিলাম বাটীর বাহিরের খোলা রোয়াকে একখানি বড় "পাত্তলে"র দুই দিকে বসিয়া ফকির ও সন্ন্যাসী তাহা হইতে অম্লানবদনে অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিতেছেন। আমার দিকে সন্ন্যাসী হাসিমুখে চাহিয়াই আহারে মন দিলেন। ফকির প্রথমে উপরে, পরে সন্ন্যাসীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"উপরমে একহী খোদা, নীচে হাম্ দোনো ভাই, আগে ধরম্‌কা রাস্তা খুলা হৈ।" আমি তাঁহাদের ভোজনে বাধা না দিয়া "দুরুস্ত" (ঠিক) এই কথা বলিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিয়া গেলাম। যাইবার কালে মনে পড়িল, মীরাটের সূর্য্যকুণ্ডস্থ মুসলমান ফকির ও পরমহংস সন্ন্যাসীর কথা।* তাঁহারাও উভয়ে হরিহর-আত্মা ছিলেন।

পরদিন আলিফ্ শা' আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিয়াছিলেন, "কাল আমাদের দুইজনকে এক পাতে আহার করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন না ?" আমি বলিলাম, সত্যই তাই, কারণ ইতিপূর্ব্বে কখন এরূপ দেখিয়া আমার চোখ দোরস্ত্ হয় নাই। তখন তিনি "প্রেম পত্রিকা" নামক একখানি হিন্দী পুস্তকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা হইতে—

"আলিফ্ এক হৈ এক নিরালা
কো ই কুমত্ কোই মাতোয়ালা ;
কঁহি ধূপ কঁহি মেঘা বরসে
হর দরপন্ মে আপহি দর্সে।"

"ইন্ ভূলন্ মে ভূলমৎ গদা ১ কহে সো মান
পানিওয়ালা এক হৈ ইন্ সে না দুজা জান।"

বিন্ দেখে কাম না সব্ হৈ
হাজির-২ নাজির কবলগ্ কর্ হৈঁ
যব তু খোঁজে আপন মাহিঁ
পরঘট৩ হোয়েঁ ঘট্‌মে সাঁই।"

---

* ইঁহাদের বিষয় আমরা ১৩২৪ আষাঢ় সংখ্যায় "উদ্বোধন" পত্রিকায় উল্লেখ করিয়াছিলাম—লে।

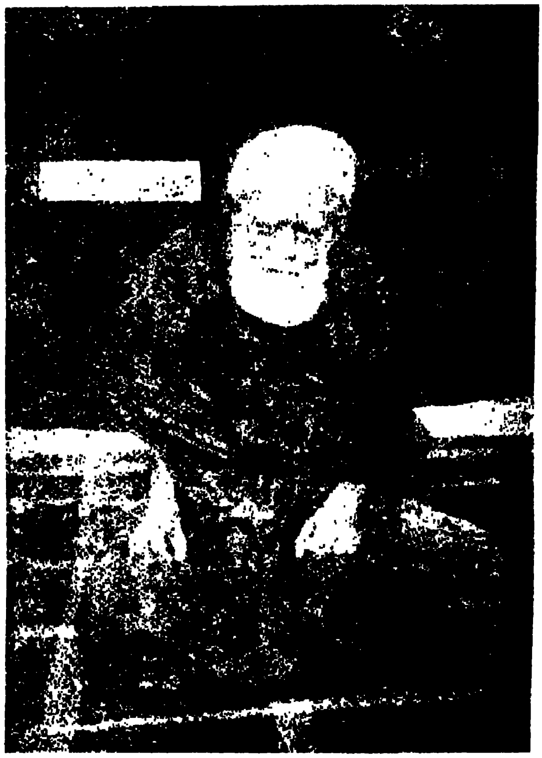
১—ফকীর। আহাম্মোক। ৩—প্রকট। ২—সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও সর্ব্বদর্শী সগুণ ব্রহ্মের উপাধি-বিশেষ।

"পহলে তন্‌মন্ গুরু-পর বারে
প্রেম কি পেণ্ডি তব্‌-পক্ ডালে
ত্যজ দে শীল সকোচ সব ভরম
না হিয়্‌দে আন
গুরু জ্ঞানী অজ্ঞান জো কহে
সো নিশ্চয় জান।
সে সবুত কর মেরী মাতে
হৈঁ সব রাম মিলন কি ঘাতে॥"

ইত্যাদি ইত্যাদি বহুস্থল পাঠ করিয়া বলিলেন—

"জাত ভাঁত না পুঁছো কোয়
হরকো ভজে সে হরকা হোয়্‌।"
"মাত পিতা সব এক হৈঁ
শুন্ মূরখ নাদান *।
ফির্ লড়্‌কা কৈসে ভয়ে
বামন মোগল পাঠান ?"

অতঃপর ফকির-সাহেব কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিলেন। তিনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ষোল-সতের বৎসর বয়সে অযোধ্যা,কাশী,বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিতে-করিতে অযোধ্যার অন্তর্গত বারাবাঙ্কীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এবং এই চিরকুমার ব্রাহ্মণ-যুবক এখানকার ধর্ম্মগুরু হাজী ওয়ারিস্ আলী শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার মুরীদ্ অর্থাৎ শিষ্য হন। আলিফ্‌ শা' তাঁহার গুরুদত্ত নাম। হাজী সাহেবের বাস ছিল বারাবাঙ্কী সহর হইতে ৮ ক্রোশ দূরে "দেবা" নামক গণ্ডগ্রামে। হাজী সাহেব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই মুরীদ করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে ভারতের শিখ ও ব্রাহ্মণ হইতে ধোবী ও ভঙ্গী পর্য্যন্ত সকল জাতি ও বর্ণের এবং অর্দ্দল, নিসারা প্রভৃতির লোকও দেখা যায়। ভাগলপুরের জনৈক বাঙ্গালী প্রথমে ঘড়ির কাজ করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম জানিতে পারা যায় নাই। তিনি হাজী সাহেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া মহাদেব বক্স্‌ নামে পরিচিত হন। আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু কাহাইয়া লাল, আলীগড়ের আমীন হাফিজ হাসেন খাঁ, দ্বারবঙ্গের পণ্ডিত চতুর্ভুজ মিশ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লাল মিশ্র, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার এবং পাটনার পরলোকগত জজ সর্ফুদ্দীন সাহেব, ধরমপুরের নবাব আবদুল সফুর খাঁ, পাটনার বাবা মুরলীধর, গয়ার সৈয়দ আবদুল্লা শাহ, ভূপালের হাফিজ পেয়ারে এবং গয়ার



হাজী ওয়ারিস্ আলি শাহ

ভূতপূর্ব্ব তহশীলদার ফজিহৎ শাহ ও পূর্ব্বোক্ত আলফ্‌ শাহ্-প্রমুখ প্রায় চার হাজার হিন্দু এবং অত্যধিক-সংখ্যক মুসলমান হাজী সাহেবের শিষ্য। তন্মধ্যে গৃহস্থ এবং ফকির উভয়ই আছেন।

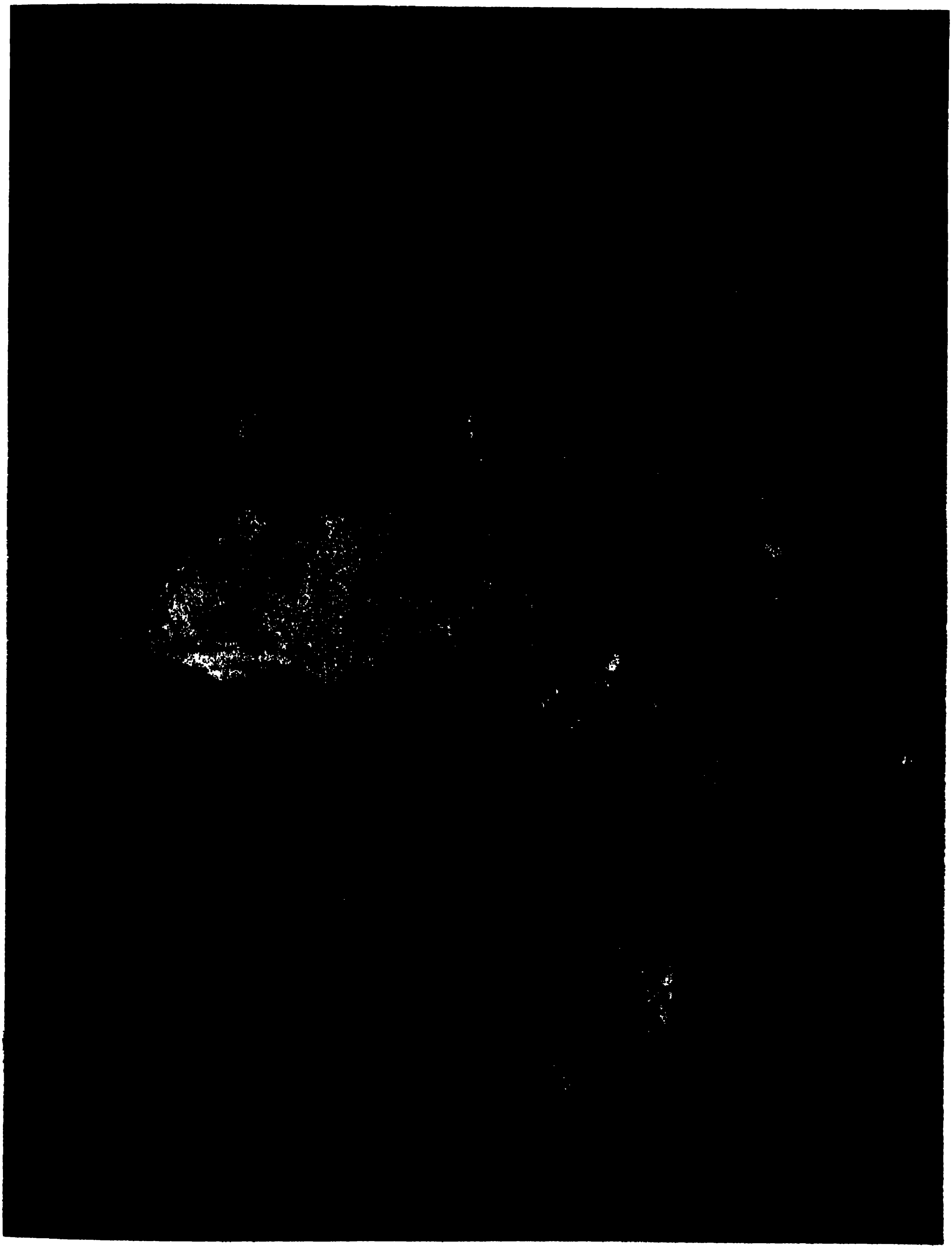
হাজী সাহেব বিবাহ করেন নাই। তিনি জীবনে কখন পাদুকা ধারণ করেন নাই। পশু-বাহনে কখন গমনাগমন করেন নাই। তিনি রেলেই যাতায়াত করিতেন এবং অতি বৃদ্ধাবস্থায় পাল্কীতে যাওয়া-আসা করিতেন। তিনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। প্রায় ২০।২১ বৎসর হইল তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। আলিগড়ের নিকটবর্ত্তী ধরমপুরের নবাব আবদুল সফুর খাঁর সফুরগঞ্জ কুঠীর উদ্যানে তাঁহার সমাধি আছে। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি নবাব সাহেবকে স্বীয় সমাধি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। হাজী সাহেবের শিষ্য

*—নির্ব্বোধ।

পূর্ব্বোক্ত সৈয়দ আবদুল্লা শাহ্ ওয়ারসী, মহাজনবাণী সংগ্রহ করিয়া উল্লিখিত "প্রেমপত্রিকা" পুস্তক প্রচার করিয়া যান। গয়ায় তাঁহার জন্মস্থান ছিল, কিন্তু বুলন্দ সহরে তাঁহার সমাধি হয়। হাজী ওয়ারিস্ আলী শাহের ধর্ম্মমতাবলম্বীরা ওয়ারসী সম্প্রদায় নামে অভিহিত। এই সম্প্রদায় "প্রেমপন্থী" নামেও পরিচিত।

উক্ত হয়, বিহার গবর্ণমেণ্টের জনৈক উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী, যিনি অল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন, হাজী সাহেবের বিশিষ্ট শিষ্যগণের অন্যতম ছিলেন। যৌবনে তিনি বিলক্ষণ উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তাঁহার পিতা শাহজীর মুরীদ ছিলেন। তিনি পুত্রের চরিত্রের জন্য চিন্তিত হইয়া স্বীয় গুরুর শরণাপন্ন হন এবং পুত্রকেও তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার জন্য অনুরোধ করেন। পুত্রকে তাহাতে সম্মত না দেখিয়া পিতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া দেবাসরীফে লইয়া যান। হাজী-সাহেব শিষ্য-পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে মৃদু মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলেন, "দুষ্ট, তোমাকে অচিরেই মদ্যাদি ত্যাগ করিতে হইবে, কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং দীক্ষা গ্রহণ করিতেই হইবে।" বিদ্যা ও ধনপদগর্ব্বিত যুবক সে-কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। তাহার অল্পদিন পরেই দীর্ঘ অবসরে রেলপথে দেশে যাইবার সময় কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে মদের বোতল খুলিয়া গ্লাসে যেমন ঢালিতে যাইবেন, অমনি প্লাট্‌ফরমের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, হাজি ওয়ারিস্ আলী তাঁহারই দিকে ফিরিয়া দণ্ডায়মান। তিনি চক্ষুলজ্জায় বোতল বন্ধ করিয়া প্লাট্‌ফরমে ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হাজি সাহেবকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সুরা-পানের ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় চলন্ত গাড়িতে পুনরায় গ্লাসে সুরা ঢালিবার কালে বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, গাড়ির পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া হাজি সাহেব গাড়ির ভিতর ঝুঁকিয়া দেখিতেছেন। বোতল ও গ্লাস যথাস্থানে রাখি-য়াই দ্বারদেশে আসিলেন, কিন্তু পিতৃ-গুরুর আর দর্শন পাইলেন না। হাজী সাহেব সেই ট্রেনেই উঠিয়াছেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছেন ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন, বাড়ী পৌঁছিয়া আপনার কক্ষে যখন সুরাপানের চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন হাজী সাহেব তাঁহার কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান। বহু অনুসন্ধানেও হাজী সাহেবকে খুঁজিয়া পাইলেন না বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে চিরদিনের জন্য তাঁহার সুরাপানের অভ্যাস তিরোহিত হইল। একদা তিনি গণিকালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান তাঁহার বাঞ্ছিতা যে পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছে, সেই শয্যাতে ও তাহারই পার্শ্বে তাঁহার পিতৃগুরু হাজী ওয়ারিস্ আলী সাহেব শয়ান রহিয়াছেন, সেই কক্ষদ্বারে পদার্পণ করিতেই হাজী সাহেবের বিস্ফারিত নেত্র-যুগলের বিদ্রূপ-দৃষ্টি যেন তাঁহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া লজ্জা, সংকোচ এবং ভয়ে অভিভূত করিয়া দিল।

বিষধর সর্পের দংশন-ভয়ে ভীত ব্যক্তির ন্যায় তিনি বারাঙ্গনা গৃহ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া বারাবাঙ্কীর টিকিট ক্রয় করিলেন এবং যথাসময়ে দেবাসরীফে গিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে হাজী সাহেবের চরণে পতিত হইলেন। এবং তাঁহার অতি বিনীত শিষ্য হইলেন। এইরূপ দ্বারবঙ্গের চতুর্ভুজ মিশ্রের সহোদর লালমিশ্র হাজী সাহেবের মুরীদ হইলে চতুর্ভুজ তাঁহাকে 'মুসলমান হয়েছে' বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন। লালমিশ্র বলেন, তোমাকেও তাঁহার চরণে পতিত হইতে হইবে। চতুর্ভুজ সহোদরের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। লালমিশ্র তখন বলেন, 'তাঁহার সৌরভ তোমাকে তাঁহার সমাজে টানিয়া লইয়া যাইবে।' ইহার কয়েকদিন পরে চতুর্ভুজ হীনার সুগন্ধ অনুভব করিতে থাকেন। এবং যেখানেই গমন করেন, সেই স্থানেই হীনার গন্ধ পান। ক্রমে সেই তীব্র গন্ধ অহরহ পাইতে-পাইতে তাহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠে এবং সে গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে অনুসন্ধান করিতে-করিতে ভ্রাতার বাক্য স্মরণ করিয়া শান্তির জন্য হীনার গন্ধের সূত্র ধরিয়া দেবাসরীফে আসিয়া উপস্থিত হন। হাজী-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তিনি রুষ্ট হইয়া বলেন, ফকিরকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছ? মিশিরজীর তখন তাঁহার শিষ্য হইতে ইচ্ছা আদৌ ছিল না; তিনি বলিলেন, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি মাত্র, আমি খালি



চাঁদের আলো

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা।

দেখিতে চাই। চতুর্ভুজ মিশ্র গৃহে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তদবধি তাঁহার প্রত্যেক জীবন-ব্যাপারে উঠিতে-বসিতে শয়নে ভোজনে, মলমূত্র-ত্যাগকালে ফলতঃ সর্ব্বকর্ম্মে ও সর্ব্বত্রই মনে হইত হাজি-সাহেব সম্মুখে দণ্ডায়মান। এই বিভীষিকা অধিক দিন স্থায়ী হইতে না দিয়া চতুর্ভুজ মিশ্র হাজী ওয়ারিস্ আলী শাহের অতি বিনীত ভক্ত মুরীদ হন।

সম্প্রতি বাঙ্গালা প্রদেশের রেজিস্ট্রেশন্ অফিস-সমূহের অবসর-প্রাপ্ত ইন্স্পেক্টর্ খাঁ সাহেব আবদুল গুণি মহোদয়ের মুখে শুনিলাম যে, তাঁহারা অনেকেই জানেন ব্যারিস্টার সর্ফুদ্দীন সাহেব একবার তাঁহার গুরুর চরণে নিবেদন করেন যে, তাঁহার যেন জজিয়তি লাভ হয়। তাহা শুনিয়া হাজী-সাহেব তাঁহাকে একপাটি জুতা ছুঁড়িয়া মারিয়া বলেন, "যা জজই হোগে যা"। ইহার অল্পদিন পরেই যে কয়জনের উক্ত পদ পাইবার কথা, তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া সর্ফুদ্দীন সাহেবই হাইকোর্টের জজ হইয়া পাটনা গমন করেন।

আমি যখন আলীগড়ে প্রবাসে ছিলাম, তখন ফকির আলিফ্ শাহ্ এবং আলীগড় সিভিল্ কোর্টের উকিল বাবু কহ্নাইয়া লালের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদের গুরু মুসলমানকে হিন্দুর দীক্ষা-মন্ত্র দিতেন এবং হিন্দু শিষ্যকে মুসলমানের কল্মা দিতেন এবং বলিয়া দিতেন, চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে নেমাজ পড়িয়া কোন ফল নাই। বাবু কহ্নাইয়া লালকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছিলেন, যে, হাজী সাহেব তাঁহাকে মুসলমানের কল্মাই দিয়াছেন। তিনি কল্মা পড়েন বলিয়া মুসলমান বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না। তিনি প্রেমপন্থী এবং গৃহী।

সে-সময়ে নিচুবাগানে ওয়ার্সী সম্প্রদায়ের কয়েকজন ফকির বাস করিতেন। এখন তাঁহাদের কেহ আছেন কি না জানি না। হাজী সাহেব-সম্বন্ধে জষ্টিস্ সর্ফুদ্দীন সাহেবকে পত্র লিখিলে, তিনি উত্তরে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের জানাইয়াছিলেন, যে তিনি সেই মহাত্মার অলৌকিক জীবনের অনেক কথা বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা যথাসময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারায় তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে আমাদিগকে অমূল্য সুযোগ হারাইতে হয়।

আমরা এখানে হাজী সাহেবের যে ফোটো দিলাম, তাহা আলীগড় সফুরগঞ্জে নবাব সাহেবের উদ্যানস্থ প্রাসাদে রক্ষিত তৈল-চিত্রের প্রতিলিপি।

টেলিগ্রাম

শ্রী সুবোধকুমার রায়চৌধুরী

ডেড্‌লেটার আপিসের চিঠির মতো সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপ-মারা এক হিন্দুস্থানী গণৎকারের সহিত আপিসের পথে মল্লিনাথের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তখন বেলা সাড়ে দশটা; বাদ্‌লার রোদ উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই গণৎকার প্রশংসাপূর্ণ নেত্রে বলিয়া উঠিল—"বারে—বাঃ! বড়ি জবর!"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মল্লিনাথ থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল এবং মহা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেয়া? সাধুবাবা?"

হাতের চেটোতে ঘুষি মারিয়া গণৎকার বলিল, "পয়লা বাজী তুমারা!"

বলে কি! মল্লিনাথ যে একখানা ডার্ব্বীর টিকিট কিনিয়াছে। চারিদিকে সেবার ডার্ব্বীর মহা পশার—কল্পিত বিজয়ের আনন্দে অনেকেই উৎফুল্ল। রাস্তা-ঘাটে

কেবল ঐ একই কথা ভাবিবি—ভাবিবি—ভাবিবি। জীবনে স্বর্ণসুযোগ একবারই আসে, সুতরাং সেটা ছাড়তে চায় কে! মল্লিনাথ একটু কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ক্যা জী ? পয়লা বাজী ?"

– "ল্যাড়কা!"

—"বলো কি গণৎকার মহারাজ! সে যে বহুৎ! সাত লাখ যে ভাবিবিতে ; লেজারে তিন লাখ!"

গণৎকার পুনরায় জোর গলায় বলিল, "ভগবান্ এক—বাৎ এক! মগর এ বাৎ ঝুটা হোয় হাম বিন্ধ্যাচল চলা যায়েঙ্গে—আউর ইএ কেতাব দরিয়ামে ফেক্ দেঙ্গে"—বলিয়া রোদ্র বাদির কাগজে ছাপা একখানা পুঁথি কাপড়ের মধ্য হইতে বাহির করিল। প্রত্যেক পাতায় সুদর্শন চক্রের মতন কত কি আঁকা—আর তাহার মধ্যে হাঙর, কুমীর, কর্কট—আরো কত কি নম্বর। গণৎকার মল্লিনাথকে উহা দেখাইয়া বলিল, "দেখিয়ে ইস্‌মে।" মল্লিনাথ ঝুঁকিয়া কি দেখিল কে জানে! সে সন্তুষ্টচিত্তে ঝনাৎ করিয়া একটা টাকা তাহার সাম্‌নে ফেলিয়া দিল। পার্শ্বস্থিত পানের দোকান হইতে গুটিকয়েক পান মুখে পুরিয়া সে ভাবিতে লাগিল—"লেগে যাবে দেখ্‌ছি—তা হ'লে! ওঃ! শিখেছে বটে! কসরৎ করেছে! ইয়ারকি নয়!"

আপিস গম-গম করিতেছে। কেরাণীরা কেহ হেঁটমুণ্ডে, কেহ উর্দ্ধমুখে লিখিতেছে, ঠিক দিতেছে, চাপরাশি ছুটিতেছে সাহেবের বেল শুনিয়া। মল্লিনাথ অপরাধীর মতন ধীরে-ধীরে আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল। এগারোটার কাঁটা এগারোবার দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল মল্লিনাথের বুকে ভল্ল মারিবার পূর্ব্বে। পিছন হইতে বাজখাই গলায় বড়বাবু হাঁকিয়া উঠিলেন, "কি নাম হে তোমার ?"

—"আজ্ঞে, মল্লিনাথ।"

মুখ ভ্যাঙচাইয়া বড়বাবু আবৃত্তি করিলেন, "মল্লিনাথ! গাল-ভরা নাম, বহর খুব, আর সই কর্‌তে হবে না, স'রে পড়।"

মল্লিনাথের নিশ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সে কাকুতি-মিনতি-স্বরে বলিল—"আজ্ঞে, দেরী হ'য়ে গেছে আজ।"

বড়বাবু কোনো কথা কহিলেন না, রাগে গজ-গজ করিতে-করিতে একটা কাগজে কি খানিকটা লিখিয়া ফেলিলেন। কাতরমুখে হাত জোড় করিয়া মল্লিনাথ বলিল, "বড়বাবু, আপনি গরীবের মা বাপ, এবারটা ক্ষমা করুন—কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে বড্ড জড়িয়ে পড়েছি, মশায়।"

কিন্তু যাহার কাছে মিনতির আবেদন হইল কথাটা তাহার কানে গেল কি না সন্দেহ।

মল্লিনাথ বার-কয়েক "বড়বাবু—বড়বাবু—দয়া করুন" বলিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং তাঁহার শ্রীমুখের করুণা-মিশ্রিত একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিল—বড়বাবু হঠাৎ ধম্‌কাইয়া উঠিলেন "আঃ! বড় জ্বালাতন করো তোমরা!"

ত্রিশ টাকায় অমন চাকরি! এখনি যে বি-এ পাশ ছুটিয়া আসিবে, হয়ত ইহারই মধ্যে বাহিরের দরজায় বিশ-ত্রিশ জন অপেক্ষা করিতেছে সুপারিশের চিঠি লইয়া। মল্লিনাথ থামে না—ঘ্যান ঘ্যান করিতেছে।

বড়বাবু রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"যাও।"

—"যাচ্ছি" বলিয়া মল্লিনাথ দুই-এক পা পিছাইয়া আসিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তবে জেনে রাখবেন, এইসব বড়বাবুদের খেয়াল ও অনুগ্রহের উপর যে-সব ভদ্র সন্তানদের জীবিকার ভার তা'রা অতি বেচারী—তাদের উচিত কি জানেন ?—রেলের লাইনে গলা পেতে দেওয়া, কিম্বা তেতালার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া, কেন ? কি হয়েছে যে চাকরী যাবে ? ভেটকী মাছ, লালপানি সব্‌বরাহ করতে পারিনি ব'লে ?"

বড়বাবু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন "ডেঁপো ক্রিচার!"

সুর চড়াইয়া মল্লিনাথ উত্তর করিল, "ক্রিচার মানে কি জানেন ?—তেলী—এ তেলী তেল বেচে না, ভদ্র-সন্তানদের রক্ত বেচে চাকরির ঘানিতে পেশে।"

উন্মত্তের মতন বড়বাবু হাঁকিলেন—"প্রাসি"।

—"আর চাপরাশি কেন ? তুমিই এস না সোনার চাঁদ—হোঁৎকামি সায়েস্তা ক'রে দিই"—বলিয়া সে দ্রুত-বেগে বাহির হইয়া গেল।

গড়ের মাঠে বড়-বড় গাছে সবুজ রং ধরিয়াছে। মল্লিনাথ একটা গাছের তলায় গিয়া বসিল। ঘাসের উপর একটা মরা কাক পড়িয়াছিল অনন্ত আকাশের বুকে ঠ্যাং তুলিয়া, আর গাছের উপর কাকের দল চীৎকার করিয়া কান ঝালাপালা করিয়া তুলিল। মাঠের মধ্যে খানায় জল জমিয়া আছে। ছেলেরা ইহারই মধ্যে বল পিটিতেছে। মল্লিনাথ বেঞ্চীর উপর শুইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙিল, চাহিয়া দেখে দলে-দলে লোক কেল্লার দিকে চলিয়াছে। বিকালে ড্যালহাউসি ও মোহনবাগানের ম্যাচ—মহামারি কাণ্ড! কাঠের গ্যালারিতে বিপুল জনতা। খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দর্শকের দলের শ্যেন-পক্ষীর দৃষ্টি পড়িয়াছে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের উপর। গ্যালারি হইতে চীৎকার উঠিতেছে—"বাক্ আপ্ মোহন-বাগান," "man at the back", "হুঁসিয়ার সেনগুপ্ত"; কিন্তু যাহাদের জন্য এই বিকট চীৎকার, এই অসাধারণ সাবধানতা তাহারা চাহিয়াও দেখিতেছে না, বা ইহাদের একটি কথাও তাহাদের কর্ণগোচর হইতেছে না, সমবেত চীৎকারের বীভৎস গণ্ডগোলে।

'ভড়াক্ ভড়াক্' শূটের আওয়াজের সঙ্গে বলটা আকাশে ঠিক্‌রাইয়া উঠিতেছিল, তাহাই দেখা গেল। গ্যালারির পাশে এমন ফাঁক নাই যে, মল্লিনাথ মাথা গলায়। "চিনাবাদাম," "পাকোড়ি" ক্রমাগত ঘুরিতেছে। এখনি ভীড় ভাঙিবে; মল্লিনাথ ধর্ম্মতলার মোড়ে আসিয়া ট্রামে চড়িল।

(২)

ঘরে বিছানা পাতা ছিল—ময়লা বিছানা। তাহার উপর গুটি চারেক ছেঁড়া বালিশ, কেমন একটা স্যাঁতানে গন্ধ। মল্লিনাথ বিছানার উপর আসিয়া বসিল। সদ্য চাকরি যাওয়ার দুঃখে তাহার মুখ কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ, কিন্তু আসন্ন ডার্‌বি-বিজয়ের আশায় উৎফুল্ল।

মেনকা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—"আজ এত দেরি যে? কাজ বড্ড বেশী ছিল বুঝি? টিপিন খেয়েছিলে পাঁউরুটিখানা চিনি দিয়ে?"

"পাঁউরুটিখানা খেয়েছি, কিন্তু এবার খাবো কি? চাকরি গেছে!"

—"বলো কি!"

নেড়ী বাপের কাদামাখা জুতাটা বাহিরে রাখিয়া আসিল। বাপের পায়ে এক-হাঁটু কাদা—নেড়ী উহা জল দিয়া ধুইয়া দিল।

মল্লিনাথ উত্তর করিল—"হাঁ—ঐ শালা; শালীর ছেলেকে ঢোকাবে ব'লে তাড়ালে—আমি আর বুঝিনে কিছু!"

"হা ভগবান্! গরীবের খুদ-কুঁড়ো যা কিছু চল্‌ছিল তাও নিলে"—বলিয়া মেনকা হলুদমাখা হাতখানা চোখে একবার ঘষিয়া মেজের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িল।

সিঁড়ির নীচে একটা ঘর—ঐত ঘরের শ্রী। স্যাঁতসেঁতে, সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে না, দিনেও কেরোসিন জলে, পার্শ্বে অপ্রশস্ত গলি, নোংরা ড্রেনের বেজায় গন্ধ। আর এদিকে বাঁধানো একটা চাতাল, তাহার এক কোণে কল-চৌবাচ্চা, পাঁচ সাত ঘর উপর নীচের ভাড়াটের বাসন-মাজা-কার্য্য দিনরাত ওখানে চলিতেছে। উহারই ভাড়া আট টাকা। এই সদ্য নরক-কুণ্ডের মধ্যে বিষাক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে মল্লিনাথ কি করিয়া যে ছেলেপুলে লইয়া বাঁচিয়া আছে কে জানে! কিন্তু তাও যায়—ভাড়া না দিতে পারিলে উঠিয়া যাইতে হইবে।

দেয়ালে জগন্মাতার মূর্ত্তি। মেনকা সেই দিকে সজল-নয়নে চাহিয়া ছিল, আর কত কি মনে-মনে মানত করিতেছিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি হবে তা হ'লে? কি ক'রে ছেলেরা বাঁচ্‌বে? কি ক'রে তুমি বাঁচ্‌বে? উপায় কি নেই কিছু?"

মল্লিনাথ এ-দিকে রাজা মাৎ করিয়া বসিয়া আছে! সে হঠাৎ প্রফুল্লমুখে উত্তর দিল, "উপায়? উপায় ঐ '১২০৭৫'—যাহা বাহার, তাঁহা তিপ্পান্ন! লাগে! গণৎকার আজ বল্‌লে আমায় 'পয়লা বাজী তুমারা'—হ্যাঁগো! ঢের নাগা সন্ন্যাসী দেখেছি—এরকম সাঁচ্চা লোক দেখিনি—ধড়াক্ ক'রে ব'লে দিলে আচ্ছা বোকো, কি ক'রে বুঝ্‌লে সে আমার ডার্‌বির টিকিট কেনা আছে! তোমাকেও কি বলেছি এতদিন ডার্‌বির কথা—১২০৭৫!" মেনকা ভ্যাবড়েবে চোখ মল্লিনাথের উপর ফেলিয়া

কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল—পরে বলিল "আমায় বল্‌বে কেন? আমি যে কেড়ে নেবো।"

"—না—না—না, তা নয়। বুঝ্‌লে—মানে—বেশী বল্‌লে ফস্‌কে যায়—কথাটা উঠ্‌ল তাই বল্‌লাম," বলিয়া স্বচ্ছন্দভাবে কোলের উপর বালিশটা টানিয়া লইয়া মল্লিনাথ হাঁকিয়া উঠিল, "ওরে ভূতো, দেশলাইটা নিয়ে আয় ত একবার।" ভূতো দেশলাই আনিয়া দিল—বাক্সে দুটি কাঠি—ভিজা—জ্বলে না!

মেনকা বিড়িটা উনান হইতে ধরাইয়া আনিয়া স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল ও বলিল—"হাঁ গা? বারো হাজার পচাত্তর কি?"

মল্লিনাথ মুরুব্বিয়ানাস্বরে বলিল—"ঐ যে—ডার্‌বির নম্বর, যা ধরেছি আমি।"

"গণৎকার বল্‌লে পাবে? মা মঙ্গলচণ্ডী যেন তাই করেন, বড় দুঃখী আমরা" বলিয়া মেনকা বার-বার মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

—"কর্‌বেন না ত কি? আমি কারো কখন অনিষ্ট করিনি", বলিয়া মল্লিনাথ নাক দিয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িল।

—"হাঁ গা? কত পাবে?"

—"লাক সাতেক হয় গণৎকারের হিসাবে, আরে পয়লা বাজি হয় ভালোই, না হয় থার্ড্‌ই হোক—সেও ত তিন লাখ গো! মারি ত হাতী, বুঝেছ গিন্নী? এ পাতাচাপা কপাল, হাওয়া এসেছে অম্‌নি স'রে গেছে—কি 'নম্‌ডিপ্লুম' দিয়েছি জানো?"

—"সেটা কি?"

—"ঐ যে গো—"জয় তারা" "জয় হরি" গোছের একটা কিছুকে বলে 'নম্‌ডিপ্লুম'।"

—"তুমি কি দিলে?" বলিয়া মেনকা গৌরবান্বিত-মুখে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় ভূতো বলিল, "হা-হা, বাবার গোঁফ পুড়ে যাচ্ছে।"

বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া মল্লিনাথ বলিল, "দিলাম 'রম্ভা' —ঐটেই ঝাঁ ক'রে মাথায় এল"।

—"এঃ! রম্ভা যে অযাত্রা! ওটা দিলে কেন?"

মল্লিনাথ মহা বিরক্তির সহিত বলিল—এ তোমার সে রম্ভা—অষ্টরম্ভা নয়—কাঁটাল্‌, মর্ত্তমান, গাবল্‌ গাবল্‌ গিল্‌বে—এ সে নয়—এ হচ্ছে রম্ভা।—ঐ যে ইন্দ্রের সভার যে নাচের স্পেসালিস্ট্ (specialist)—তোমারই সখী; তুমি মেনকা, এ রম্ভা, বড় মজলিসি মেয়েমানুষ"।

নেড়ী আট হাত ডুরে পরিয়া বসিয়াছিল—ছেঁড়া-চটা, জ্যাল্‌জেলে একটা ডুরে; ভূতো একেবারে দিগম্বর, তাহার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে বলিল, "আমায় একটা ডার্‌বি বাবা"। নেড়ী অম্‌নি নাকিস্বরে বলিল, "আমায়ও একটা বাবা, আমি ডার্‌বি খেতে বড্ড ভালোবাসি"।

মল্লিনাথ হাসিতে-হাসিতে বলিল, "ডার্‌বি খায় না রে, খেলে"।

—"আমিও খেল্‌ব" বলিয়া নেড়ী বাপের কামিজ ধরিল। "যা—যা" বলিয়া নেড়ীকে হঠাইয়া দিয়া মল্লিনাথ মেনকার দিকে চাহিয়া বলিল "যাক্‌ গে চাক্‌রি—ভারী ত! মাসখানেক পরে তার আস্‌বে সাহেবের কাছে যার কাছ থেকে আমি টিকিট কিনেছি—আমি আজ থেকেই কাগজ দেখ্‌তে থাক্‌ব"।

মেনকা বলিল, "দেখ, আর-একটু ভালোমন্দ খেও—গেছে চাকরীটা—আপদ গেছে—দিনকতক জিরোও এখন; আজ একটু কাটা ইলিশ এনে দিলে না কেন—ঝাল দে ক'রে দিতাম"। মল্লিনাথ ফূর্ত্তির সহিত বলিল, "খিচুড়ী চড়াও—আর বেশী ক'রে পেঁয়াজ, আলু ছেড়ে দাও তা'তে।"

নেড়ী ও ভূতো দমভোর খিচুড়ী খাইবার আনন্দে নাচিতে লাগিল।

(৩)

মাসখানেক পরে মল্লিনাথ একদিন কাগজ পড়িতে-পড়িতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মাৎ"—১২০৭এর পরের অক্ষরটি ছাপায় ভাল ওঠেনি—তবে ওটা যে ৫ মল্লিনাথের সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মল্লিনাথ সার্ট গায়ে দিয়া বাহির হইবে, মেনকা জিজ্ঞাসা করিল—"কি? কোথায় যাচ্ছ?"

—"যাচ্ছি ষ্টেটস্‌ম্যানে (Statesman)—ঠিক ক'রে জেনে আস্‌তে—উঠেছে দেখা যাচ্ছে, তবু যাচ্ছি—অম্‌নি কিছু টাকা ধার ক'রে কিছু কিনে-কেটে আন্‌ব'খন।

তার পর বাজীর টাকা থেকে শোধ দিলেই হবে—ভাব্‌বি মেরেছি জান্‌লে অনেক বেটা টাকা ধার দেবে।”

—“হা গা—মেরেছ বাজি? ও নেড়ী ও ভুতো—তাদের কি-কি আস্‌বে ব’লে দে” বলিতে-বলিতে মেনকা দুমদাম শব্দে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ভুতো ও নেড়ী একসঙ্গে চীৎকার করিল, “ইন্‌জিন্ একটা; —রে একটা—বাবা।”

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আপিসে প্রবেশ করিয়াই মল্লিনাথ টাগকান-পরা একটি মোটা বাবুকে সম্মুখে দেখিতে পাইল। মল্লিনাথ জিজ্ঞাসা করিল, “ওটা ১২০৭৫ ত মশাই?”

মোটা বাবুটি উত্তর দিল, “কোন্‌টা? Box-নম্বর? ওটা কন্‌ফিডেন্‌শ্যাল।”

—“আহা— না মশাই। ১২০৭—এর পর ৫ টা যেটা ছাপায় ভালো ওঠেনি।”

—“ওঠেনি—পরের ইস্যুতে একটা না হয় ইন্‌সার্‌শন্ পাওয়া যাবে—দেখি কি ভুল হয়েছে আপনার অ্যাড-ভার্টাইসমেন্টে (advertiscment)।”

—“কি মুস্কিল! advertisement নয়—বাজও নয়।”

“তবে কি? চাকরী? এখানে খালি নেই” বলিয়া বাবুটি অন্যকাজে মন দিল। মল্লিনাথ আর কোনো কথা না বলিয়া ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের ছাপাখানায় প্রবেশ করিল এবং প্রিণ্টারের হাতে আট আনা গুজিয়া দিয়া বাহিরে খবরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রিণ্টার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল “ওটা ১২০৭১—”

চোখের সম্মুখে পৃথিবীটা ঘুরিতে লাগিল—চারিদিক্ ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। মল্লিনাথ যে যায়!—ধরো।

একজন কেরাণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মিরগী কি?” মল্লিনাথ স্তব্ধ।

সেই লোকটি বলিল—“কি ব’লে ফোন্ করব কলেজে?”—কোনো উত্তর নাই।

জমাদার আসিয়া বলিল, “মাতয়ালা কা হিঁয়া কুছকাম নেহি—বাহার যাও।”

মল্লিনাথ টলিতে-টলিতে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। অপরাহ্নের ফুরফুরে হাওয়া বহিতেছে। হোয়াইটওয়ের দোরে বিস্তর বাঙালী কাচের ভিতর দিয়া দেখিতেছে ওয়াটারপ্রুফ, সোয়েটার, গাউন, টাই, কলার—দেখিয়াই তৃপ্তি। মেমেরা বাহার দিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছে—কাহারও বা গলা কণ্ঠা-উঠা; কাহারও বা ঘাড় কামানো।

রাস্তায় বর্ষার কাদা; এইমাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর গাড়ীর চলাচল; কাদা লাগিয়া কাপড়-চোপড়ে চিতাবাঘের রং ধরিয়াছে। জুতার একপাটি ফড়াৎ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল এবং গাদাখানেক কাদা গিলিয়া ফেলিল। আর চলা অসম্ভব। মল্লিনাথ জুতা-জোড়াটি ড্রেনের মধ্যে ফেলিয়া দিল! ছুঁচালো-খোয়া-ওঠা রাস্তা খালি-পায়ে ফুটিতে লাগিল। কে একজন একটি ফোটো সাম্‌নে ধরিয়া বলিল, “চার আনায় তু’লে দেবো।” মল্লিনাথ তাহার দিকে কটমট করিয়া দেখিল। লোকটা চলিয়া গেল। মল্লিনাথ কলুটোলার মোড়ে আসিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে ঝম্-ঝম্ শব্দে কাহার একটা ব্রুহাম ছুটিয়া আসিল—ঘাড়ে পড়ে আর কি। গালপাট্টাওয়ালা গাড়োয়ানটা হৈ-হৈ শব্দে চাবুক হাঁকড়াইল, মল্লিনাথ ড্রেনের ধারে পড়িয়া গেল। ফুটপাথের উপরে মুসলমানের কাফিখানা; যে-লোকটা চা খাইতেছিল সে দৌড়াইয়া আসিল এবং মল্লিনাথের কোমর ধরিয়া চায়ের দোকানে লইয়া গেল।

* * * *

ভরা সন্ধ্যা। কাহারও দেখা নাই। মানুষ সেই বাহির হইয়াছে। মেনকা রাস্তার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং যত দূর চক্ষু যায় দেখিয়া লইল—কেহ কোথাও নাই।

ভুতো চাদর পরিয়া আসিয়া বলিল, “মা চুল আঁচড়ে এলাম।”

মেনকা অন্যমনস্কভাবে বলিল—“বেশ।”

নেড়ী সাজিয়া আসিয়াছে—মাথায় কতকটা নারিকেল তৈল ঢালিয়া; তাহা কান ও কপালের পাশ দিয়া ক্রমাগত গড়াইতেছে। সে মায়ের কমলালেবু রংএর ‘বে’র চেলিটা গুছাইয়া পরিয়াছে, কেবল পেটের কাছটা

সামলাইতে পারে নাই। আর পরিয়াছে মেনকার রং-ওঠা ফেরোজা বডিটা, সেটা প্রকাণ্ড—হাতা ছেঁড়া। নেড়ী বলিল, "কৈ মা ? বাবা এখনো এল না যে !"

ভূতো বলিল, "বাবাকে একটা চটি আন্‌তে ব'লে দিলে না কেন মা ? আর একটা সবুজ গেঞ্জি ?"

ভূতোর কথার উত্তরে মেনকা বলিল, "আন্‌বে'খন বাবা"—তার পর নেড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল,"এই আসে আর কি—আবার চুলে হাত দেয়—নাঃ তোকে আবার ভালো ক'রে চুল বেঁধে দিতে আছে—ইঃ পোড়া বৃষ্টির আর বিরাম নেই—মানুষটা আসুকই ফি'রে, ছাই !"

একটা ট্যাক্‌সি দেখা গেল, সেই দিকে আসিতেছে। নেড়ী আহ্লাদে চেঁচাইয়া উঠিল, "মা, বাবা আস্‌ছে।"

"কি রে নেড়ী, আলোটা ধর্, মা," বলিয়া মেনকা শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু কই ! ট্যাক্‌সিতে কেহ নাই। সেটা চলিয়া গেল। নবদ্বীপ একটা ইলিশমাছ হাতে ঝুলাইয়া ঘরে ফিরিতেছিল, নেড়ী জিজ্ঞাসা করিল "নবদ্বীপ-বাবু, বাবাকে দেখ্‌লেন ?"

"কই ? না"—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

উপরতালার দুইচারিটি স্ত্রীলোকের নিকট ভাবৃবি মারার খবর বলা হইয়াছিল ; তাহারা নামিয়া আসিল। খেতাঙ্গিনী বলিল, "কই গা মেনকা ?—এঃ ! এখানে চারটি খোয়া ফে'লে দিস্, বড্ড প্যাচ্‌পেঁচে হয়েছে—মন্নিনাথ এখনো ফেরেনি ? বাজার ক'রে এনে ফেল্‌ছে বোধ হয়—তাই দেরি হচ্ছে।"

মেনকা উত্তর দিল, "হাঁ দিদি—ব'লে গেছে তাই"।

অনঙ্গসুন্দরী বলিল, "হাঁ দেখ্—কি-কি গহনার প্যাটার্ণ্ ফরমাস হয়—দেখাস্—আমিও ভালো-ভালো প্যাটার্ণ্ ব'লে দেবো—বুঝিছিস্ মেনকা ?"

মেনকা মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমাদের আশীর্ব্বাদ ছাড়া, রাঙাদিদি, আর আমি কিছু চাইনি"।

রাঙাদিদির দুধে-আল্‌তার রং, জাঁকালো গড়ন, গহনাগুলোও তেম্‌নি ভারী। চুড়ির গোছা ঝনঝন শব্দে নাড়িয়া রাঙাদিদি বলিল, "কেন চাবিনে লো, আমায় বল্ দেখি,—বরাৎ যখন ফিরেছে—আমোদ-আহ্লাদ কর্ ; দুখানা পর্—এই ত সময় তোদের"।

ওপাড়ার হলধর রাস্তা দিয়া যাইতেছিল—হাঁকিয়া উঠিল "কৈ হে ? মন্নিনাথ ? ফির্‌লে নাকি ? নেড়ী চেঁচাইয়া বলিল, "না জ্যাটামশাই, বাবা এখনো ফেরে-নি"।

"সে কি রে ! এখনো ফেরেনি !"

রাত্রি আটটা। বৃষ্টি ধরিবার কোনো চিহ্ন নাই—বরং আকাশ ঘোলাটে। সাইক্লোন-ঝড় মাতাল হইয়া যাহা সম্মুখে পাইতেছে তাহাকেই ধাক্কা দিতেছে। এদিক্‌টার লোক-চলাচল ইহারই মধ্যে বন্ধ হইয়াছে। একটা লোম-ওঠা কুকুর ঘাড় বাঁকাইয়া ভিজিতে-ভিজিতে ছুটিতেছিল। মুখুজ্জেদের রোয়াকের উপর কে একজন কাত্‌রাইতেছিল। নেড়ীর হাতে একটা আনি দিয়া মেনকা বলিল,"যা ওকে দিয়ে আয়—আর ব'লে দিস্, বাবু এখনি আস্‌বে,এলেই একটা টাকা দিয়ে যাবো'খন"। নেড়ী ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে আনিটা দিল। মেনকা চেঁচাইয়া বলিল,"বল্ না ওকে—এখানে ভিজ্‌ছে কেন ? মুখুজ্জেদের গোয়ালে গিয়ে বসুক্ না—বলে কিছু ওরা—আমি ব'লে পাঠাব'খন"। সে কাঁপিতে-কাঁপিতে গোয়ালঘরে গিয়া বসিল। একখণ্ড ছেঁড়া লেপের টুক্‌রো ভূতোর হাতে দিয়া মেনকা পাঠাইয়া দিল। ভিখারী সেটা গায়ে জড়াইয়া শুইয়া পড়িল, আর গ্যাঙাইয়া গ্যাঙাইয়া কত-কি বলিতে লাগিল—বড়-বড় ঠাকুরদের কথা।

কলিকাতার রাস্তা—কতকটা গ্যাসের আলো, কতকটা আঁধার মা খয়া প্রকাণ্ড অসুরের হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে আর আকাশ হইতে দেবতাদের অজস্র বৃষ্টির বাণ তাহার পিঠে আসিয়া বিঁধিতেছে ! গ্যাসের অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল একটা মনুষ্যমূর্ত্তি দল হইতে ছট্‌কে-পড়া অসুরের মতন যেন দেবাসুরের যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া আসিতেছে সেই দিকে—ধীরে-ধীরে আসিতেছে। তাহার লম্বা ভিজা চুল মুখেচোখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, খালি পা, পরিধানের বস্ত্র ছিন্নভিন্ন, ভিজিয়া ঢোল—যুদ্ধক্লান্ত কুম্ভিগিরের মতন সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত-দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে আসে যে !

নেড়ী বলিল, "কে গা তুমি ? বাবা বাড়ী নেই।"

ভূতো বলিল, "তবুও ঢোকে—মা দেখসে—কথা কয় না।"

মেনকা আসিয়া দেখিল—তাহারই স্বামী। বিশ্রী ভিজিয়া আসিয়াছে। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"এত দেরি কর্‌লে কেন? জিনিষপত্র পরেই না হয় কিন্‌তে—পেছিয়ে পড়েছে বুঝি—তুমি কি ট্রামে এলে? মোটরে এলেই ত পার্‌তে যদি গাড়ীতে জায়গা নেই—না হয় কিছু ভাড়াই যেত।"

মল্লিনাথ কথা বলিল না। সে যেমন আসিয়াছিল সেই অবস্থায়ই সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

"কে কি ক'রে দিয়েছে, মা গো" বলিয়া মেনকা উপর-তালায় খবর দিতে গেল।

ষষ্ঠীচরণ ভালো করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল মুখে মদের গন্ধ আছে কি না—পরে জোরে-জোরে ডাকিল, "মল্লিনাথ, মল্লিনাথ"। কোন সাড়া নেই।

নিশিকান্ত বলিল,—"ও, দেখ্‌ছ কি? যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে—অত টাকা! বেজায় আমোদ টাকার হে! সেই মেথরটার মত হ'ল আর কি! সেও ভাব্‌বিতে সাত লাক মেরে হাস্‌তে-হাস্‌তে দম ফেটে ম'রে গেল—এও সেই জিনিষ!—ভিতরে হাস্‌ছে, উপরে দম ফেটে যাচ্ছে।"

ষষ্ঠীচরণ মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "তাই ত! কি করা যায় হে? একটা কিছু বাৎলাও যাতে—"

নিশিকান্ত বলিল, "শক্ত! ভায়া শক্ত! ঐজন্যেই ভাব্‌বি ধরি নে আমি—কি জানো,দশটা টাকার জন্যে নয়, কড়াক ক'রে উ'ঠে গেলেই, বাস্! এই দশা—নইলে—যাক্—এখন একটা চাবুক নিয়ে সপাসপ মারা, কি ছেলে-মেয়ে একটা কিছু মরেছে-টরেছে—এইরকম একটা কিছু অভিনয় করা—থিয়াটারের ফার্স্‌ আর কি!—বুঝেছ তা'তে কি হবে? শোকের পাল্লাটা আমোদের পাল্লাটাকে খানিকটা ঠেলে তুল্‌বে।"

উমাপতি একটা চাম্‌ড়ার হন্টার আনিয়া ফেলিল। সে জিম্‌ন্যাস্‌টিক করে—যেন স্যাণ্ডো! সে চাবুক মারিবে।

ষষ্ঠীচরণ চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "তোমরা সব এস—শীগ্‌গীর এস—ভূতো মোটর চাপা পড়েছে—ওঃ! কি রক্ত! মাংসের টুক্‌রো ছড়াছড়ি—মুণ্ডুটা 'মা, মা' ডাক্‌ছে।"

ভূতো ঘরের মধ্য হইতে সাড়া দিল, "মা, আমি মোটর চাপা পড়িনি এই যে আমি এখানে ব'সে—তক্তোপোষে—ইন্‌জিন চালাছি।"

"বালাই—ষাট! তুমি মোটর চাপা পড়্‌বে কেন বাবা," বলিয়া মেনকা ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তাহার মুখে বার-বার চুম্বন করিতে লাগিল।

ভূতো ও মেনকার কাণ্ডে নিশিকান্ত বড়ই খাপ্পা হইয়া গেল, সে গম্ভীর-গলায় বলিল, "এখন অত আদর কাড়ালে, এদিকে যে যায়! যত সব হুঁ!" বলিয়া সে রাগে গর্‌-গর্‌ করিতে-করিতে বাহির হইয়া যাইবে, ডাক-পিয়ন হাঁকিল "তার আছে।" হল্‌দে খামে মল্লিনাথের নাম লেখা। নেড়ী চেঁচাইয়া বলিল, "মা বল্‌লে পড়ো জ্যাঠামশাই খু'লে ওটা"। নাকে চশ্‌মা লাগাইয়া নিশিকান্ত স্পষ্ট-স্পষ্ট পড়িল—"মল্লিনাথের শালা লিখ্‌ছে দানাপুর থেকে—আজকে রাত্রে যদি স্টার্ট্‌ করিয়া কাল জয়েন্ করিতে পারো, ৭৫৲ টাকার চাকরি নির্ঘাত—দেরিতে আসা বৃথা—সপরিবারে এস।"

দানাপুর মল্লিনাথকে বরণ করিয়া লইবার জন্য বরণডালা সাজাইয়া সম্মুখে ধরিল—তাহার পরিষ্কার রাস্তা, ক্যান্টনমেণ্ট্, সবুজ গাছপালা, স্বচ্ছ পুষ্করিণী, মল্লিনাথের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। সে স্বপ্নোত্থিতের মত ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কাপড়-চোপড় সাম্‌লাইয়া লইয়া আঁকপাঁক করিতে করিতে বলিল "এখনি বেরুতে হবে—এখনি—দশটার ট্রেণে—সময় বেশী নেই—তাড়াতাড়ি গোছগাছ ক'রে নাও—দেরি নয়—মোটে নয়—বুঝ্‌লে? গাড়ী আন্‌তে চল্লুম আমি।" সে গাড়ী আনিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে একখানা ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী ডাকিয়া আনিল এবং ধুপ্‌ধাপ্ শব্দে টিনের প্যাঁট্‌রা, সতরঞ্চী-জড়ানো বিছানা, হ্যারিকেন, জলের কুঁজো, গাড়ীর মধ্যে ফেলিতে লাগিল। নেড়ী বাবার কোলে আর্দ্রস্বরে বলিল,

গ্রহণ করিয়া অথচ সেই জীবন দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া যৌবন ও সৌন্দর্য্যের জীবনে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন এবং 'বলাকায়' আমরা তাহার প্রথম আভাস লাভ করিলাম। পূরবীতে যাহা শক্তিতে, সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে দেখা দিবে, 'বলাকা'য় তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় লাভ ঘটিল।

১৩২৩ সালের বৈশাখের প্রথম খরদাহে নববর্ষের রুদ্ররূপকে আহ্বান করিয়া কবি 'বলাকা" হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তা'র পর হইতেই কবি-জীবনে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। কি জানি কেন মনে হইতে লাগিল—জীবন হইতে একটা জিনিস হারাইয়া গিয়াছে অথচ তাহাকে ফিরিয়া না পাইলে কিছুই আর ভালো লাগিতেছে না। চারিদিকে যারা নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়া আছে, এই পৃথিবীর সকল বস্তু যারা এই জীবনকে ঘিরিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি একসময়ে কবির পক্ষে যত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, তাহা যেন দুর্ল্লভ ও দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে—অথচ এদিকে জীবনের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিল। শেষে কি এই দুঃখ থাকিয়া যাইবে—যারা 'আপন হিয়ার পরশ দিয়ে' কবির হৃদয়ে

* * সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
* * * * এই জীবনের সকল সাদা-কালো

যাদের আলো-ছায়ার লীলা * * * * সেই যে কবির 'আপন মানুষগুলি'; তাদের সঙ্গলাভ, তাদের প্রাণের সাড়া হইতে 'এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায়' বঞ্চিত থাকিতে হইবে? না, চাই না গূঢ় তত্ত্বের পাকে-পাকে আপনাকে জড়াইতে, চাই না জীবনের রহস্য বুঝিতে, অধ্যাত্ম-জীবনের নিগূঢ় ও দুর্ল্লভ আনন্দের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া রাখিতে। এর চাইতে জীবনের শেষ কয়টা দিন 'দিনের আলো থাকিতে থাকিতে' এই হৃদয়ের সুহৃত্তম যারা তাদের হাতে হাত দিয়া গাহিয়া লই, বলিয়া লই,

"এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো,
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধূলো-মাটি ফল হাওয়া জল তৃণতরুর সনে।

ইহাই "পূরবী"র প্রথম কবিতা। বাস্তবিকই ত যে ধরার ধূলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর মধ্যে এই জীবন গানে গন্ধে রসে রূপে প্রেমে আনন্দে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন কতদিন বাঁচে? নীড়-ছাড়া বিহঙ্গ ত আপন মনের আনন্দে মুক্ত বাতাসে উদার আকাশে শুধু ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে অসীম আলোকে বিচ্ছুরিত জ্যোতির মধ্যে কোথায় যে উড়িয়া বেড়ায় কিন্তু সন্ধ্যার রঙীন্ আলোর-আলোয় যখন সকল জগৎ রঙীন্ হইয়া উঠে তখন সেই সুদূর আকাশের প্রান্ত হইতে নীড়ের পাখী নীড়ের পানে উন্মুখ হইয়াই ফিরিয়া আসে; অনন্ত অসীমের নেশা তাহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এই ভাবিয়াই কি কবি 'কান্না-হাসির, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে আবার ফিরিয়া আসিলেন? যেমন করিয়াই যৌবনের সেই 'লুপ্ত দিনগুলি'কে ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তাঁহার প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রথম স্ফুরণ ত 'বলাকা'তেই দেখা গিয়াছে—এবং 'বলাকা'র সুর "পূরবী"তে তা'র শেষ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে "বিজয়ী" কবিতাটিতে। এই কবিতাটির ভাব ও ছন্দ যেন 'বলাকার' সুরেই গাঁথা। তা'র কারণও আছে; পূরবীর প্রথম কবিতা দুটি ১৩২৪ সালে লেখা এবং তখনও কবি 'বলাকা'র জীবন' সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অন্য কোন গ্রন্থে এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই বলিয়াই তাহা 'পূরবী'তে স্থান লাভ করিয়াছে, নহিলে 'পূরবী'র ভাব-ধারার সঙ্গে 'বিজয়ী' কবিতাটির কোন ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। *

'শিশু ভোলানাথে'র পর হইতে অর্থাৎ ১৩২৬ এবং ২৭, এই পরিপূর্ণ দুটি বৎসর এবং ২৮ সালের ও দীর্ঘ কতকগুলি মাস বঙ্গবাণীর মুখর কবিটি একেবারে স্তব্ধ নীরব হইয়া রহিলেন। †

শুনিয়াছি একবার দুই বৎসরে একটি মাত্র কবিতা লিখিয়াছিলেন—'নদী'। আর এইবার দ্বিতীয় বার। মানুষের জীবনের চিন্তাধারা যখন এক রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য রাজ্যে গমনোদ্যোগ করে, তখন একদিকে বিচ্ছেদের দুর্ভাবনা, অন্যদিকে সম্মুখে ভবিষ্যতের অস্পষ্ট প্রেরণা এই দুইয়ে মিলিয়া যে সংশয় ও সংঘাতের সৃষ্টি হয় তাহাতে কবিচিত্তের প্রকাশ নীরব হইয়া পড়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্যে'র নিবিড় অধ্যাত্মজগৎ হইতে জীবন ক্রমেই দূরে সরিয়া আসিতেছিল এবং অতীতের সর্ব্বব্যাপী প্রেম ও সৌন্দর্য্যের এক নূতন রূপ ক্রমেই দৃষ্টির সম্মুখে প্রসারিত হইতেছিল। এই পরিবর্ত্তনের মুখে 'বলাকা'য় যাহা লাভ করিয়াছিলেন তাহা শুধু যৌবনের শক্তি এবং জীবন ও সৌন্দর্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব—সহজ উপলব্ধি নয়। কিন্তু জীবনের গতি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া মোড় ফিরাইয়াছিল 'বলাকা'য় তাহার সন্ধান মিলিল না; অতৃপ্তি রহিয়াই গেল। এই অতৃপ্তি ও সংশয় আরও বাড়িয়া উঠিল মহাযুদ্ধের অবসানে রণক্লান্ত পশ্চিমের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং কবিহৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া। এই ক্ষমতামত্ত ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত পশ্চিম, যন্ত্রসভ্যতার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম, জ্ঞান বিজ্ঞান ললিতকলার লীলাভূমি পশ্চিম—এরা ত মানুষের প্রাণকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া পৃথিবীর বুকে ধন ও রক্ত ছড়াইয়া যৌবনের তাণ্ডব লীলায় মাতিয়াছিল, শক্তির অদ্ভুত বিকাশ দেখাইয়াছিল, কিন্তু এরা মঙ্গলকে, কল্যাণকে লাভ করিতে পারিল কি? জীবনের নিগূঢ় রহস্যও ত এদের কম জানা ছিল না, বিশ্বের কল্যাণকামী মহাত্মাদের শান্তি ও প্রীতির বাণীও ত এরা কম শোনে নাই, কিন্তু কিছুই ত এদের রক্ষা করিতে পারিল না। কবি অবশ্য দেশে ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বাগ্রে একথা স্বীকার করিলেন যে প্রাণের লীলার অদ্ভুত বিকাশে, কর্ম্ম ও চিন্তার জগতে শক্তির স্ফুরণে 'পশ্চিম-জয়ী হইয়াছে' কিন্তু ব্যক্তি জীবনে কবিচিত্তের মধ্যে তাঁহাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইল, প্রাণের গতি চাঞ্চল্যে কিংবা শুধু শক্তির স্ফুরণে কল্যাণ নাই, আনন্দ নাই—জীবনের নিগূঢ় অধ্যাত্মোপলব্ধির মধ্যেও নাই, প্রেম ও শান্তির রহস্য-প্রচারের মধ্যেও নাই। আছে, এই যে জীবনের আশে-পাশে চারিদিকে ধূলো মাটি ফল ফুল তৃণ নিজেদেরে বিলাইয়া দিয়াছে, হাসি-কান্নায় ভরা এই যে মানব-সংসার চিরকাল ধরিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে, ইহাদেরই মধ্যে। ব্যক্তিজীবনের শান্তি ও কল্যাণকে লাভ করিতে হইলে এই সংসারের বিচিত্র লীলার মধ্যে, তা'র ঋতু উৎসবের মধ্যে, তা'র সুখ ও দুঃখের মধ্যে, যে-কারণে 'স্বর্গ হইতে বিদায়' লইয়া কবিচিত্ত এই ধরার স্নেহে পুষ্ট সকল প্রাণীর মধ্যে

* 'পূরবী'র সঞ্চিতা অংশে যাহা ছাপা হইয়াছে তাহা এই আলোচনায় নিবিষ্ট হয় নাই।

† E. J. Thompson তাঁর রবীন্দ্রনাথে'র এক জায়গায় লিখিয়াছেন—"I remember asking him (the poet) in April 1920 if he had ever known a period of deadness in poetry. He answered, 'I am passing through it now." *(p. 55)*

ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহাদেরই মধ্যে খুঁজিতে হইবে। মনের মধ্যে এই কথাটি যেখানে জাগিল সেইখানেই 'পূরবী'র সৃষ্টি।

'সোনার তরী'র 'ধরিত্রী' 'কিংবা'স্বর্গ হইতে 'বিদায়', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'ক্ষণিকার' অনেক কবিতাতে দেখা যায় এই ধরিত্রীর প্রতি কবির প্রাণের কি একটা অচ্ছেদ্য ভালবাসার টান—তাহার সঙ্গে প্রেম কি নিবিড়; এই জীবনের এবং পৃথিবীর সকল বস্তুই যেন কবির প্রাণে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে; যাহা কিছু দেখিতেছেন,

'কিছু তুচ্ছ নয়—
সকলি দুর্লভ বলে' আজি মনে হয়।'

গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষার মেঘ, শরতের রৌদ্র, সবুজ মাঠ, হরিৎক্ষেত্র সকলের সঙ্গে তাঁর কি বন্ধুত্ব—প্রকৃতির সঙ্গে কি নিবিড় যোগ !! কিন্তু বলিয়াছি, এ জীবন হইতে তিনি বিদায় লইয়াছিলেন। তার পরে কত সুদীর্ঘ দিবস কাটিয়া গিয়াছে; ঐ বিচিত্রতার জীবন হইতে নির্ব্বাসনের পর জীবনের উপর দিয়া কত ভাবের ঝঞ্ঝা-প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে আবার সেই অতীত জীবনের কথা মনে পড়িল কেন ?—কেন মনে পড়িল

"শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠ্‌ত ক্ষেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যে-দিন দিকে দিগন্তরে
লাগ্‌তো পুলক কি মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সে-দিন মনে হতো কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জ-ছায়ে।" (মাটির ডাক)

কেন মনে হয় 'আশ্বিনের ফসল ক্ষেতে' কিংবা 'নীল আকাশের কূলে কূলে সাগরের ঢেউয়ের তালে' সবুজের নিমন্ত্রণে কবির প্রাণের দাবী আছে। দাবী যে এক সময় ছিল একথাও সত্য, কিন্তু কবি নিজেকে নিজেই দোষী করিতেছেন,

'কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিলে চাবী ?'

যে মাটী-জননীর কোলে তাঁহার জন্ম সেই কোল হইতে কে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়াছিল; তাই আজ কে যেন কবিকে বলিতেছে,

'বাঁধন-ছাড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি—
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"

কবিও এতদিন 'নানা মতে নানান্ হাটে' নানান্ পথে হারাণো কোন খুঁজিয়া-খুঁজিয়া কেবলি ঘুরিয়া মরিয়াছেন। এতদিন পরে আবার তাহার সন্ধান মিলিল।

"আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে,
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ।"

উপরে 'পূরবী'র যে-কবিতাটি উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই অনুরূপ ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে "লীলাসঙ্গিনী'তেও। জীবনের যে প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনী কবিকে একা ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল,আজ আবার তাহার বন্ধুকে মনে পড়িয়াছে। সেই কবেকার পুরাতন চেনা সুরে আবার আসিয়া সে কিঙ্কিণী বাজাইল—সে-শব্দে কবি দুয়ার-বাহিরে আসিয়া যেই চাহিলেন অমনি তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিলেন। এই লীলাসঙ্গিনী অতীতের সেই মধুর দিনগুলিতে কতদিন কত লীলার ছলে আসিয়া কবিকে বারবার দেখা দিয়া গিয়াছে—তার কঙ্কণ-ঝঙ্কারে কবির বন্ধ দুয়ার কতদিন খুলিয়া গিয়াছে, বাতাসে-বাতাসে তার ইসারা ভাসিয়া আসিয়াছে, কখনও 'আমের নব মুকুলের বেশে' কখনও নব মেঘভারে, কত বিচিত্র রূপে চকল চাহনিতে কবিকে বারেবারে ভুলাইয়াছে—এতদিন পরে আজ সকল কথাই কবির মনে পড়িয়া গেল। শুধু কি তাই—কত প্রশ্ন যে বুকের মধ্যে উতলা হইয়া উঠিল—

"এলো চুলে বহে এনেছো কি মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?"

এর পরেই সুন্দর একটি সনেট—শেষ অর্ঘ্য; সেখানেও ঐ একই কথা। যে-কবিকে প্রত্যুষে 'মাহেন্দ্রক্ষণে প্রথম নিশান্তের বাণী' শুনাইয়াছিল, যে তাঁহাকে এই 'নিখিলের আনন্দ-মেলায়' ডাকিয়া আনিয়াছিল, যে

"দিল আনি'
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে; যে সুন্দরী যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দচরণে আসি' কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা—" সে কবির

জীবন হইতে কোথায় খসিয়া পড়িল, কোথায় আত্মগোপন করিল। অথচ আজ তাহাকে না হইলে ত আর কিছুতেই চলিতেছে না, জীবন-সন্ধ্যায় একবার তাহার দর্শন, একবার তাহার নিবিড় আলিঙ্গন চাই। তাই সব-কিছু তুচ্ছ করিয়া প্রিয়তমের সন্ধান

"এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।"

যাহাদের সঙ্গে তাঁর অতীত জীবন জড়াইয়া ছিল, তাহাদের কতজন আজ সন্ধ্যা-বেলায় 'কাজের কক্ষকোণে'আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছে—হাতছানি দিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। চোখের সমুখ দিয়া 'বকুলবনের পাখী' উড়িয়া যাইতেছে; কবি তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন—তুমি ত এক সময়ে আমার মনোজগতের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে; আজ যে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দূরে চলিয়া আসিয়াছি, তার বেদনা কি তোমার বুকে বাজে নাই ?—আমি যে তোমায় ভালবাসিতাম! আষাঢ়ের জলভরা মেঘের খবর কি তুমি বলিতে পার—সে কি আমার আশায় উন্মুখ হইয়া থাকে না ? নদীর কলতানে আমার অভাবের বেদনা কি বেসুরে বাজে না; আমি হারাইয়া গিয়াছি বলিয়া কাহারও আঁখি-জলে বুক ভাসিয়া যায় নাই ?

"শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখী,
সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি?
পার ঘাটে যদি যেতে হয় এইবার
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হবো পার,
শেষের পেয়ালা ভরে' দাও হে আমার
সুরের সুরার সাকী

একদিকে এই বেদনাময় আকুলতা আর একদিকে বিশ্বাসের দীপ্তি —'আমি ত এই বিশ্বের উচ্ছ্বসিত আনন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতির জীবনকেই আবার ফিরিয়া পাইলাম,' নহিলে এই জীবন-সন্ধ্যার 'পঁচিশে বৈশাখ'

"পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণ দেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার
নীলকান্ত আকাশের থালা
তারি পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা"

সাজাইয়া আনিবে কেন?

এর পরে আমি যে কবিতাটির উল্লেখ করিতে চাই, কবি তাহার নামকরণ করিয়াছেন তপোভঙ্গ। এই অপূর্ব্ব কবিতাটিকে ছন্দে এবং ধ্বনিতে, শব্দসজ্জায় এবং বর্ণনাভঙ্গীতে ভাবের সূক্ষ্ম প্রকাশ এবং অনুভূতিতে উর্ব্বশীর সহিত একাসনে স্থান দিতে আমার একটুও দ্বিধা নাই। উর্ব্বশীতে কি শক্তিতে অথচ কি সংযত কৌশলে শব্দ দ্বারা ধ্বনিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অপূর্ব্ব কল্পনায় ভাবকে রূপদান করিয়া কবি সৌন্দর্য্যের তীব্র অথচ শান্ত ও নির্ম্মল অনুভূতিকে প্রকাশ করিয়াছেন। "তপোভঙ্গে"ও প্রকাশ-ভঙ্গী একই কিন্তু অনুভূতি হইতেছে তারুণ্যের সদানন্দ প্রাণশক্তির। কি করিয়া এই অপূর্ব্ব বর্ণনাচাতুর্য্য ও প্রকাশ-ভঙ্গী এতদিন পরে পুনরায় করিলেন তাহা বাস্তাবিকই বিস্ময়কর। "তপোভঙ্গে" কবিগুরু যাহা বলিতে চাহিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা এই :—

কালের অধীশ্বর মহেশ্বরের হিসাবের খাতায় ত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিনের কথাই লিখা থাকে। তিনি কি কবির 'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলির' কথা ভুলিয়া গিয়াছেন? সেদিনগুলি কি অযত্নে ভাসিয়া গিয়াছে, না 'স্বেচ্ছাচারী হওয়ার খেলায় নির্ম্মম হেলায়' বিস্মৃতির ঘাটে ডুবিয়া গেল? একদিন সেই যৌবনের দিনগুলি প্রাণশক্তিতে কি পরিপূর্ণ ছিল—তাহারা ভোলানাথের রুদ্ররূপকে সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া দিয়াছিল, ডম্বরু-শিঙ্গা কাড়িয়া লইয়া হাতে মন্দ্রিয়া বাঁশরী তুলিয়া দিয়াছিল; তাঁর তপস্যাকে 'শীতরিক্ত হিম মরুদেশে' নির্ব্বাসিত করিয়া সন্ন্যাসের অবসান করিয়া দিয়া বিশ্বের ক্ষুধার জ্যোতির্ম্ময় সুধাপাত্রটি তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিল। মহেশ্বরের এই নব সৌন্দর্য্যরূপই কবি-হৃদয়কে প্রেমে ও গানে, রসে ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কবির যৌবনের দিনগুলির সঙ্গে-সঙ্গে ভোলানাথের এই নব রূপকে কে সংহরণ করিয়া লইয়াছিল? নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যে 'অগীত সঙ্গীতে' 'অশ্রুর সঞ্চয়ে' পরিপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় সুধাপাত্রটি কি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল? কবির যৌবনের লুপ্ত দিনগুলি কি নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিঃশ্বাসে আকুলিয়া উঠিল? না, সে দিনগুলি লুপ্ত হইয়া যায় নাই; মহেশ্বরের প্রেম ও সৌন্দর্য্যের চিরন্তন রূপও নিঃশেষিত হয় নাই—আছে তারা;

"নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছো তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।"

যৌবনের সেই অকারণ-আনন্দ-উল্লাসে সৌন্দর্য্যের সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বেগ 'তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে' শান্ত হইয়া আছে। কিন্তু এ তপস্যা কি চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে? যৌবন কি চিরকাল বন্দী হইয়া থাকিবে;—এর কি অবসান হইবে না? হইবেই—এ তপস্যার

"চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আবার উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।"

কবি এতপস্যাকে স্থায়ী হইতে দিবেন না; তিনি যে তপোভঙ্গ দূত, স্বর্গের চক্রান্ত। ভোলানাথের ছলনা তিনি জানেন; সেই শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী তপস্যার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সুন্দরের সাধক কবির হাতেই ত পরাজয় কামনা করিতেছে। সেইজন্যই

"বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব বলে'
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে'
মৃত্তিকার কোলে।"

মহেশ্বরের তপস্যা তখন ভাঙ্গিয়া যায়; তার চিতাভস্ম, বিভূতি সমস্তই খসিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, পরিবর্ত্তে দেখা দেয় পুষ্পমালা। বহুদিন বিচ্ছেদের পরে কবির প্রসাদে আবার উমার সঙ্গে তাঁর মিলন—সেই মিলনের বিচিত্র ছবি কবির বীণায় আবার সুর জাগায়; আর

"কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবিপানে
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশী সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে
কবির পরাণে।"

শুধু অপরূপ কাব্যসৃষ্টির দিকে হইতে না দেখিয়া এই কবিতা-টিকে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের উপর প্রতিফলিত করিয়া এই কথা বলি যে "তপোভঙ্গে" কবিগুরু নিজের তপস্যাও ভঙ্গ করিয়াছেন তবে খুব ভুল করিব কি? আমার মনে হয় কবিগুরু মহেশ্বরের তপোভঙ্গের আড়ালে নিজের এই "নিত্য নূতনের লীলা চিত্ত ভরিয়া" দেখিবার আকুলতার অস্পষ্ট আবরণটি ছিন্ন করিয়া একেবারে আপন মর্ম্মবাণীটি ব্যক্ত করিলেন।

কবিচিত্তের এই পরিবর্ত্তনকে শুধু তাঁহার কাব্যকথার মধ্যেই খুঁজিলে চলিবে না। ভাব ও কথা যে-রূপ ধরিয়া, যে ছন্দে ও ধ্বনিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। "তপোভঙ্গে" আমি তাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। শুধু সেই কবিতাটিতেই নয়; "পূরবী"র অনেক কবিতাতেই সে আভাস অতি সুপরিস্ফুট। "সাবিত্রী," আহ্বান," "সমুদ্র," "যাত্রী" প্রভৃতি কবিতা কিছুতেই "বর্ষশেষ" "সমুদ্রের প্রতি," "রাত্রি," "এবার ফিরাও মোরে" প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া না দিয়া পারে না। বাস্তবিক 'পূরবী' পড়িলে মনে হয় ছন্দের জগতেও কবি আবার ফিরিয়া আসিলেন। 'বলাকা'তে অবশ্য একটা নূতন ছন্দ প্রথম সৃষ্টিলাভ করিল; তার মধ্যে একটা বিপুল শক্তি, উদ্দাম গতিবেগ, যাহা আছে যাহা পাইয়াছি সেই জানা সীমার মধ্যে বন্ধনের একটা চঞ্চল অতৃপ্তি, সেই অতৃপ্তির হাত হইতে মুক্তির বন্ধনবিহীন আবেগ ও উচ্ছ্বাস সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে, শুধু ছন্দে নয়—ভাবেও। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিসের যেন একটা অভাবও তাহার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। 'বলাকার' ছন্দ-গতিতে ও শক্তিতে মনটাকে বর্ষার পার্ব্বত্য নদীর মত উদ্দাম বেগে ঠেলিয়া লইয়া যায় কিন্তু শরতের ভরা নদীর যেমন শান্ত, সংযত গভীর অথচ দ্রুতগতির তরঙ্গায়িত লীলা আছে

এবং তা'র চলার মধ্যে যে-মাধুর্য্য আছে সেই লীলা ও মাধুর্য্য তাহাতে নাই। ছন্দের এই লীলা ও মাধুর্য্যের জগৎ "বলাকার" দানে সমৃদ্ধ হইয়া 'পূরবীর' কবিতাগুলিতে পুনরাবিষ্কার লাভ করিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমি এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি সেই কথাটি নানাস্থানে কবিহৃদয় হইতে বিচিত্ররূপে আপনি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দে সৌন্দর্য্যে এক সময় যে জীবন পরিপ্লুত হইয়াছিল, জীবনের সেই আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল—আজ তাহা জীবন-সন্ধ্যায় অতি ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আবার আসিয়া গোপনে কবির ভাবের ও রূপের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বড় দ্রুত ক্ষণিকার মতো সেদিনের সেই ত্রস্ত আঁখি-যুগল সুনিবিড় তিমিরের তলে ডুবিয়া গিয়াছিল—দুজনের জীবনের চরম অভিপ্রায় সেদিন পূর্ণ হয় নাই—; আজ তাই

"খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিলো আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তা'র ভীরু দীপশিখা
দিগন্তের কোন্ পারে চ'লে গেলো আমার ক্ষণিকা।"
*　*　*　*　*　*　*
*　*　*　*　*

"আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তা'র
আমার গানের ছন্দ গোপনে করিছে অধিকার,
দেখি তা'র অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্ন-অশ্রু-সরোবরে ক্ষণে-ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি'।" (ক্ষণিকা)

তা'র পরে "খেলা" "কৃতজ্ঞ" প্রভৃতি কবিতায়ও এই একই কথা। "কৃতজ্ঞ" কবিতাটি ভারি চমৎকার একটি সরল মাধুর্য্য এবং করুণ সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে; অতীত জীবনের ছোটো-খাটো স্মৃতিগুলি কবিকে কি-রকম বেদনা দিতেছে এই একটি কবিতা পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কোন অতীত দিনে কবেকার সেই প্রিয়া কবিকে তা'র শেষ চুম্বন দিয়া গিয়াছে। কবি এতদিনের বিচ্ছেদে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আজ যখন আবার তাহাকে মনে পড়িয়াছে তখন বড় আকুল হৃদয়ে এই বিস্মৃতির জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। সেই শেষ চুম্বনের পরে কত মাধবী-মঞ্জরী থরে-থরে শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, কত 'কপোতকূজন-মুখরিত মধ্যাহ্ন' কত 'সন্ধ্যা সোনার বিস্মৃতি আঁকিয়া দিয়া', কত 'রাত্রি অস্পষ্ট রেখার জালে আপন লিখন আচ্ছন্ন করিয়া' প্রতি মুহূর্ত্ত 'বিস্মৃতির জাল বুনিয়া' দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে কবি যদি তাঁর প্রিয়াকে ভুলিয়া গিয়াই থাকেন—আজ তা'র জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন। তবু একদিন এই প্রিয়া কবিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল বলিয়াই গানের ফসলে কবি-জীবন ভরিয়া উঠিয়াছিল—'আজো তার শেষ নাই'; তার পরশ আজ আর নাই কিন্তু কি যে 'পরশমণি' কবির অন্তরে সে রাখিয়া গিয়াছে যার কল্যাণে

"* * * বিশ্বের অমৃত ছবি দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। * * *"

আজ সে প্রিয়া আর নাই তবু তা'র স্মৃতি কবির বক্ষলগ্ন হইয়াই আছে—

"আজ তুমি আর নাই, দূর হ'তে গেছো তুমি দূরে
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিঁদুরে।
সঙ্গীহীন এ জীবন, শূন্যঘর হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।"

এই কবিতাটির করুণ মাধুর্য্যের তুলনা 'পূরবী'র আর একটিতেও আছে বলিয়া মনে হয় না।

'পূরবীর' 'পথিক অংশে' যে-কবিতাগুলি গ্রথিত হইয়াছে তাহা ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় লেখা; কিন্তু এই কথাটি জানা না থাকিলে কিংবা কবিতার নীচে "আণ্ডেস্ জাহাজ" অথবা "বুয়েনোস এয়ারিস্" লেখাটি না দেখিলে কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই, এই সহজ সুন্দর মাধুর্য্যময় কবিতাগুলি জাহাজের নির্জ্জন কক্ষে কিংবা পশ্চিমের জনসংঘাতের উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে বসিয়া লেখা না বাংলাদেশের খাল, বিল, নদী, বট, শাল, পলাশ, যূথী, বেলা, করবীর চিরপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে প্রসূত। 'কিশোর প্রেম', 'অস্তহিতা' 'শেষবসন্ত' প্রভৃতি যে-কোনো কবিতা পড়িলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। স্থান ও কালের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত কি করিয়া সর্ব্বদাই চিরপরিচিত গৃহের সুমধুর আবেষ্টনের মধ্যে বিহার করিয়া ও একই সঙ্গে সমস্ত বিশ্বানুভূতির সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া চলে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে না।

'চাপাড় মালাল' কিংবা 'বুয়েনোস এয়ারিসে'ও অতি তুচ্ছ 'আকন্দ' এবং 'যূথী' যে কবিচিত্তের স্মরণ ও ভালোবাসা আকর্ষণ করিয়াছে ইহা বিস্ময়কর নয় কি?

অতীতের সৌন্দর্য্য ও রসভরা দিনগুলিকে যখনই ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগিয়াছে তখনই তা'র সঙ্গে সঙ্গে শেষের সুরটিও অতি করুণ ঝঙ্কারে হৃদয়তন্ত্রীকে পীড়ন করিয়াছে। এই পীড়া, এই বেদনা সবচাইতে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে "লীলাসঙ্গিনী"তে।

'প্রিয়তমা লীলাসঙ্গিনী এই জীবন-সন্ধ্যায় আবার আসিয়া চিত্ত-দুয়ারে হানা দিয়াছে; কিন্তু এতদিন পরে বেলা-শেষে সে যে আসিল তাহাকে আমি বরণ করিয়া ঘরে লইতে পারিব কি—পারিলেও আর কতদিন!

"দেখো না কি হায়, বেলা চলে যায়
সারা হ'য়ে এলো দিন।
বাজে 'পূরবী'র ছন্দে রবির
শেষ-রাগিণীর বীণ্।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশী
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।"
"এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ অন্ধকারে?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে?"

আবার "বৈতরণী"তে—কতবার মরণ-সমুদ্রের খেয়ার তরণী —এসেছিলো এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।

"নিয়ে গেলো কালহীন তোমার কালোতে
কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথী,
দিবসেরে রিক্ত করি' তিক্ত করি' আমার রাত্রিরে।
সেই হ'তে চিত্ত মোর আশ্রয় নিয়েছে তব তীরে।"

কবির হৃদয়ের একদিকে এই সুতীব্র বেদনাবোধ এবং অন্য দিকে ব্যথাজীর্ণ হৃদয় লইয়া শেষ দিনটির জন্য নীরব প্রতীক্ষা—ইহা পাঠককেও পীড়িত না করিয়া পারে কি ? বাংলার যে কবি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বিশ্বের রসপিপাসু চিত্তকে রসে গানে গন্ধে সৌন্দর্য্যে ভরিয়া দিয়াছেন, যিনি অনাগত যুগের জন্যও রসের পেয়ালা অফুরন্ত সুধায় পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন তিনি আজ পরপারের যাত্রার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিয়া রাখিতেছেন—ইহার চিন্তামাত্রই আজ অনুরক্ত পাঠকের চিত্তকে বেদনাপ্লুত করিয়া তুলিতেছে। তবু মনে হইতেছে এই জীবন-সন্ধ্যায় ও রোগ ও জরার পীত উত্তরীয়ের অন্তরালে যে সবুজ হৃদয়টির পরিচয় আমরা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পাইতেছি, সেই চিরনবীন হৃদয় শীতের কুয়াসাপাতে এত সহজে পীতবর্ণ ধারণ করিবে না ; বসন্তের দক্ষিণা বাতাস আবার তাঁহার প্রাণে দোলা দিয়া সুর জাগাইবে ; সে সুরে কত অকালজরাগ্রস্ত প্রাণ আবার পুলক-সঞ্চারে মাতিয়া উঠিবে।

শ্রী নীহাররঞ্জন রায়

সন ১৩৩৩ সালের স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম গৃহপঞ্জিকা—সম্পাদক শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা, ৪৩১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

সুন্দর পয়ার ছন্দে স্বাস্থ্য-বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংবাদকোষে সাধারণের নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এত অল্পমূল্যে এমন প্রয়োজনীয় পঞ্জিকা বাহির করিয়া কার্ত্তিক-বাবু দেশের উপকার করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালী-গৃহে একখণ্ড রাখা কর্ত্তব্য।

ছেলেদের চিত্তরঞ্জন-জীবনী।—শ্রী শোভনা ঘোষ। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে অপূর্ব্ব কৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় আনা।

ছেলেদের জন্য মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের সচিত্র জীবনী। বইখানি ভালো হইয়াছে।

হজরতের বাণী—শাহাদত আলী খাঁ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াছিন আলী খাঁ, বি-এ, মদনপুর, পাংশা ৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ আনা।

হজরত মহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার বাণী। গ্রন্থকার বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মুসলমান ধর্ম্মের সারসংগ্রহ একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ধরিয়া দিয়াছেন।

শিবপূজা-পদ্ধতি—পরমহংস শ্রীমৎ প্রণবানন্দ স্বামী উপদিষ্ট ; আদিমা মন্দির হইতে শ্রী যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃ-শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৪ পৃষ্ঠা, দাম দুই আনা।

এই পুস্তিকাখানিতে শিবপূজা-পদ্ধতি, আচমনমন্ত্র, প্রণব-আবাহন, গায়ত্রীমন্ত্র ও শতাষ্টক মন্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মিলন—নাটিকা শ্রী অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী। বর্দ্ধমানের প্রত্যেক পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। ১৪ পৃষ্ঠা দাম দুই আনা।

স্মৃতিপূজা—(কবিতাপুস্তক) শ্রী অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক হিতৈষিণী সভা, পুরাতন চক, বর্দ্ধমান ২৮ পৃষ্ঠা, দাম দুই আনা। দুই একটি কবিতা বেশ ভালো।

সঃ

ঐন্দ্রজালিক—শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক শ্রীরামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস, বোড়াইচণ্ডীতলা, চন্দননগর। ১২৭ পৃষ্ঠা। উত্তম কাগজ ছাপা ও বাঁধাই। মূল্য পাঁচ সিকা।

লেখক নিজেই ঐন্দ্রজালিক। সোনার কলমের স্পর্শে তুচ্ছ বিষয়কেও কল্পনার কুহকে জড়াইয়া অপরূপ মোহন করিয়া তুলিয়াছেন। এই পুস্তকে ১৫টি ছোটো গল্প আছে। সেগুলি ঠিক গল্প নয়, কতকগুলি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত কথিকা শ্রেণীর, কতকগুলি গদ্য কবিতা ; পড়িতে-পড়িতে মুগ্ধ হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া গিয়াছি। ভাষা ভাব ভঙ্গী মনোহর। যিনি পড়িবেন তিনি মুগ্ধ হইয়া বলিতে বাধ্য হইবেন—বাঃ! যাঁহারা উচ্চ সাহিত্যের মধুররসাস্বাদ করিতে চান তাঁহাদিগকে এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

কমলাকান্ত—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী রামেশ্বর দে, চন্দননগর। দেড় টাকা।

বাংলা-সাহিত্যের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক অমর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অমর কমলাকান্ত। প্রকাশক মহাশয় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি সুন্দর শোভন সজ্জায় প্রকাশ করিয়া সাহিত্যামোদীর ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। ছাপা কাগজ বাঁধাই সবই সুন্দর সুরুচিসঙ্গত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের পুনঃপরিচয় দিয়া বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের অপমান করিতে চাহি না ; যাঁহারা না পড়িয়াছেন তাঁহারা সত্বর ইহা পাঠ করিয়া নিজেদের লজ্জা ও দৈন্য মোচন করিবেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের নবজন্ম—শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ২০।৭।এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ১।০। ১৩৩২।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের "দি রেনেসাঁস ইন ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। যেসব বাঙালী পাঠক ইংরেজী জানেন না তাঁহারা এই অনুবাদ-গ্রন্থদ্বারা অরবিন্দ বাবুর ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। অরবিন্দ-বাবুর আধুনিক কালের ইংরেজী রচনা এরূপ রীতিতে লেখা যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ভাবগ্রহণ করা দুরূহ। যে-সে অনুবাদক হয়ত তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া ভুল অনুবাদ করিতে পারে, কিন্তু তাঁহারই একজন শিষ্য যখন এ-কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন তাঁহাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা কমিয়া গেল। তবে নলিনী-বাবুর "রূপায়ন" "রূপবৈবশ্য" প্রভৃতির কথাগুলির অর্থ সাধারণ পাঠক কি বুঝিবে বলিতে পারি না। মোটের উপর, অনুবাদের ভাষা বুঝিতে কোনো কষ্ট হয় না, তবে পদবিন্যাসরীতি ইংরেজী ও ফ্রেঞ্চরীতিই অনেক স্থলে অনুসরণ করিয়াছে। বইখানির ছাপা খুবই ভালো, তবে প্রুফ্‌ দেখার ভুল এত বিস্তর রহিয়াছে যে পড়িতে বড়োই অসুবিধা হয়। মূল গ্রন্থকারের মতামত-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলাম না, কারণ তাহার স্থান এই "পুস্তক-পরিচয়" নহে।

জ্ঞানভিক্ষু



কলিকাতায় প্রথম ইংরাজের ফাঁসী

লর্ড্ এলগিনের শাসনকাল একটি ঘটনার জন্ত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সে-ঘটনা তাঁহার সমদর্শিতা ও স্তায়পরতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয়, আমরা সংক্ষেপে সেই ঘটনা-বিবৃত করিব।

সম্রাটের ৯২ সংখ্যক রেজিমেন্টে জন্ রাড্-নামক এক ২৫।৩০ বৎসর বয়স্ক ইংরাজ-সৈনিক ছিল। অপর-এক রেজিমেন্টের গ্রেলিকো ও পিটর্স-নামক দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অবসর গ্রহণ করিয়া নিউজিল্যাণ্ডে গমন করিবার উদ্যোগ করেন এবং অর্থদ্বারা মুক্ত করিয়া জন্ রাড্কে তাঁহাদের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর, রাওলপিণ্ডীতে অবস্থানকালে প্রভুগণের আদেশে রাড্, কাজিন-নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি মেষী ক্রয় করিতে যায়। মেষীটি সন্তানসম্ভাবিতা বলিয়া কাজিন উহা বিক্রয় করিতে অসম্মত হয় এবং অন্ত-কোনও মেষ বা মেষী লইতে অনুরোধ করে। জন্ রাড্ কোনও কথা শ্রবণ না করিয়া সেই গর্ভবতী মেষীটিকে এক মুটের মাথায় চাপাইয়া লইয়া যায়। কাজিন তাহার প্রভুদিগের নিকট অভিযোগ করিবার জন্ত পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আগমন করে। রাড্ কাজিনের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া, তাহাকে পদাঘাত করিয়া ও তাহার মাথার উপর দিয়া দুইবার গুলি ছুঁড়িয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে অসমর্থ হয় এবং অবশেষে তাহার প্রভুগণের বাসস্থানের অতিসন্নিকটে একটি বন্দুক আনিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে গুলি করে। কাজিন হাঁসপাতালে নীত হয় এবং পরদিন সৈন্তাধ্যক্ষ উইলিয়ম্ মরগানের নিকট তাহার এজেহার দিয়া প্রাণত্যাগ করে। তৎকালীন ব্যবস্থানুসারে সহস্র মাইল দূরে কলিকাতায় সুপ্রিম্ কোর্টে আসামী ও সাক্ষীদিগকে আনিয়া বিচার হয়। জুরীগণ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং বিচারপতি স্তর্ চার্ল্স্ জ্যাক্সন্ জন্ রাডের ফাঁসীর আদেশ প্রদান করেন।

ইহাতে ইংরাজ-সমাজে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ব্যারিস্টার লঙ্ভেল্ ক্লার্ক্ (Longevelle Clarke) এবং কয়েকজন ইংরাজ জন্ রাডের অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়া লর্ড্ এল্গিনের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। লর্ড্ এলগিন্ এক স্থানে লিখিয়াছেন, আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যেন দেখি প্রাচ্য-জগতে ইংলণ্ড কেবল আসুরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই, ব্রিটিশ স্তায়পরতা প্রাচ্যজগতের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছে। তাঁহার নিকট কৃষ্ণাঙ্গের ও শ্বেতাঙ্গের প্রভেদ ছিল না। তিনি দৃঢ়তার সহিত এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া লিখিলেন যে, তিনি এমন কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছেন না যাহার জন্ত বিচারপতির আদেশ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। তিনি তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ স্যর্ চার্ল্স্ উড্কেও (পরে লর্ড্ হ্যালিফ্যাক্স) লিখিয়াছিলেন যে, হত ব্যক্তিটি তাহার মেষীটিকে ফেরত চাওয়া ভিন্ন আর কোনও অপরাধ করে নাই এবং এমন কোন কার্য্য করে নাই, যাহাতে তাহার প্রতি কোন ব্যক্তি উত্তেজিত হইতে পারে।

লর্ড্ এলগিনের আদেশ-অনুসারে কলিকাতায় হতভাগ্য জন্ রাডের ফাঁসী হয়। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় কোনও ইংরাজের ফাঁসী হয় নাই—বিশেষতঃ কৃষ্ণাঙ্গ হত্যার জন্ত। ইতঃপূর্ব্বে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন য়ুরোপীয়ের ফাঁসী হইয়াছিল বটে—সে আয়র্ল্যাণ্ডবাসী ছিল এবং একজন য়ুরোপীয়কে হত্যা করিবার অপরাধে তাহার ফাঁসীর আদেশ হয়।

(অর্চ্চনা, ফাল্গুন: ১৩৩২) শ্রী মন্মথনাথ ঘোষ

—

দেড়শত বৎসরের পুরাণো কথা

লালদিঘী

"লালদিঘী" দেড়শত বৎসরের উপরও প্রতিষ্ঠা ভোগ করিয়া আসিতেছে। কোম্পানীর প্রথম আমলে কলিকাতা উপনিবেশের লোকদের জন্ত এই "লালদিঘী"ই পানীয় জল সরবরাহ করিত। লালদিঘীর "মিঠে জলই" তখনকার কলিকাতাবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ করিত। গঙ্গা-জলও প্রচুর ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্ত পানার্থে এই লালদিঘীর জলই প্রশস্ত ছিল। তখন বরফের নাম-গন্ধও ছিল না, টানা-পাখার প্রচলনও ছিল না। গ্রীষ্মকালে দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে পানীয় জলকে "সোরা" সহযোগে ঠাণ্ডা করিয়া লওয়া হইত।

এই লালদিঘীর মধ্যে জব্ চার্নকের সময় সাবর্ণ-চৌধুরীদের শ্যামরায়ের মন্দির ছিল। তখন সাবর্ণ-চৌধুরীরাই কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরে তাঁহারা এই তিনখানি গ্রামই নামমাত্র মূল্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। ইহাতেই বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। যে-দামে সেকালে সাবর্ণেরা, এই তিনখানি গ্রাম বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা এখনকার দিনে কলিকাতার উপকণ্ঠে এক বিঘা জমির দাম অপেক্ষা অনেক কম। সমগ্র কলিকাতার এখন জমি ও বাড়ীঘর সমেত মূল্য কত?

এই শ্যামরায়ের মন্দিরে রাস, দোল প্রভৃতির জন্ত একটা মহোৎসব হইত। তাহা দেখিবার জন্ত হাটের লোক জড় হইত। এত আবীর খেলা হইত যে, তাহার জন্ত মন্দিরের সম্মুখস্থ পুকুরটি লালে-লাল হইয়া যাইত। এইজন্ত অনেকে অনুমান করেন, ইহার নাম "লালদিঘী" হইয়াছিল। রাধাবাজার প্রভৃতির নামকরণ এই শ্যামরায়ের নামের সহিত খুব নিকট সম্বন্ধ। তখন Writers' Buildingএর অস্তিত্বমাত্র ছিল না। কলিকাতার পুরাতন কেল্লার (যাহা সেরাজ-উদ্দৌলা আক্রমণ করেন) কাছে কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাকারী জব চার্ণকের কুঠী বা মাল-গুদাম ছিল।

তখন কলিকাতায় নানা ইউরোপীয় জাতি ব্যবসায়ে লিপ্ত। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার ও কাজ-কর্ম্ম করিবার জন্ত, সাবর্ণ-চৌধুরীরা এণ্টনি-নামক এক পর্টুগীজ ফিরিঙ্গীকে নিজেদের কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। এই এণ্টনি বাঙ্গালা, ফার্সী বেশ ভালো জানিতেন। আর ইংরাজ, দিনেমার ও ফরাসীদের ভাষাতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। এই এণ্টনি সাহেবই বঙ্গবিখ্যাত সেকালের কবি-ওয়ালা এণ্টনি সাহেবের পিতামহ ছিলেন।

একদিন শ্যামরায়ের দোল-উৎসব। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন-কয়েক গোরা-সৈনিক মদ খাইয়া আসিয়া শ্যামরায়ের ঠাকুরবাড়ীর

কাছে একটি মহা হাঙ্গা উপস্থিত করে। উন্মত্ত গোরাদের যখন আর কেহ শাসন করিতে পারিল না, তখন এন্টনি সাহেব চাবুক-হস্তে আসিয়া তাহাদের ঠাকুরবাড়ীর সীমানা হইতে বাহির করিয়া দেন। তখন জব্‌ চার্ণক্‌ কলিকাতা কুঠীর ম্যানেজার। এইজন্য এন্টনির সহিত জব্‌ চার্ণকের খুব বিবাদ বাধে। শেষে একটি আপোষ রফা হইয়া যায়।

জব্‌ চার্ণক্‌ এক এ-দেশীয়া স্ত্রীলোককে সহমরণ-ক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। জব্‌ চার্ণকের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার এই বাঙ্গালী-পত্নীর কবর আজও বর্ত্তমান। শুনিয়াছি আগে-আগে এই কবরের উপর চার্ণকের জন্মদিনেই হউক, কিম্বা মৃত্যুদিনে ছুইটি করিয়া মোরগ বলি দেওয়া হইত।

পুরাণো গোরস্থান

আজকাল কৌন্সিল্‌ হাউস্‌ ষ্ট্রীটে, যে-ঘড়ীওয়ালা গির্জ্জাটা আছে—তাহার পার্শ্বের বিঘা কয়েক স্থানের মধ্যে অনেকগুলি, সেকালের নামজাদা ইংরাজের সমাধি আছে। এখন যেখানে এই-সব শতাধিক বর্ষের উপরের পুরানো সমাধি দেখা যায়, পূর্ব্বে ইহা ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোংএর কলিকাতাবাসী ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সমাধিক্ষেত্র ছিল। এই সমাধিক্ষেত্রের নীচে অর্থাৎ বর্ত্তমান Stamp ও Stationery Dept.এর রাস্তা পর্য্যন্ত গঙ্গার বিস্তৃতি ছিল। ঈস্ট্‌ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে-সমস্ত জাহাজ বাণিজ্যার্থে সেকালে কলিকাতায় আসিত, তাহাদের মৃত কাপ্তেন সুটুয়ার্ড্‌ প্রভৃতির গোর এই স্থানে হইত।

আজকাল যেখানে ঘড়ীওয়ালা গির্জ্জাটি দাঁড়াইয়া আছে, তাহা মহারাজা নবকৃষ্ণের দান। ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংসের সহিত মহারাজা নবকৃষ্ণের খুব-একটা মাখামাখি ছিল। তখন সাহেবদের কোনো নির্দ্দিষ্ট ভজনাগার ছিল না। মিশন্‌ রো'র গির্জ্জাটি বোধ হয় তখনকার কলিকাতায় একমাত্র গির্জ্জা, সুতরাং ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংসকে বাধ্য করিবার জন্য মহারাজা নবকৃষ্ণ জমিটুকু তাঁহাকে বিনা-মূল্যে দান করেন। সেই স্থানের উপরই এই গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়া আজও নবকৃষ্ণ ও ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংসের বিজড়িত স্মৃতি-চিহ্ন বহন করিতেছে। গির্জ্জার মধ্যে এক প্রস্তরফলকে নবকৃষ্ণের এই দানের কথা আজও খোদিত আছে।

(অর্চ্চনা, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রী হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

—

অজীর্ণ রোগের কারণ

কলোম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সুবিখ্যাত ডাক্তার Jesse Feiring Williams অজীর্ণ রোগের একাদশটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন।—

১। কুপথ্য আহার।

২। রন্ধনের দোষ।

৩। বিশেষ দ্রব্যের প্রতি অতিরিক্ত লালসা।

৪। শারীরিক ক্লান্তি। অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে আহারের পূর্ব্বে বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য কিম্বা স্বল্প-পরিমাণে আহার করা উচিত; ক্লান্ত অবস্থায় আহার না করাই সর্ব্বাপেক্ষা ভালো।

৫। শোক, বিরক্তি ও মানসিক অশান্তি।

৬। দ্রুত আহার।

৭। গরম খাদ্য গ্রহণের পূর্ব্বে শীতল জল পান।

৮। অপরিমিত আহার।

৯। কোষ্ঠ-কাঠিন্য।

১০। দাঁতের দোষ।

১১। অন্য নানাপ্রকার রোগ।

অজীর্ণ রোগ, Appendicitis বা উপাজ প্রদাহের লক্ষণসূচক হইতে পারে। আন্ত্রিক ক্ষতের (Gastric ulcer) অন্যতম কারণ দীর্ঘকালস্থায়ী অজীর্ণ রোগ। অজীর্ণ রোগ প্রৌঢ়দিগের মধ্যে পাকস্থলীর Cancer নির্দ্দেশ করিতে পারে।

(শরীর, অগ্রহায়ণ ১৩৩২)

—

বাঙ্গালী মহিলা কর্ম্মী

সর্ব্বপ্রথম মিস্‌ চন্দ্রমুখী বসু ও মিস্‌ কাদম্বিনী বসু বি-এ, পাশ করেন। মিস্‌ চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনী বসু মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাশ করেন।

ইঁনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা-ডাক্তার। ইঁহার কার্য্যকলাপ কেবল চিকিৎসাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্বাধীনতাযুদ্ধের দিনে ইনি ভারত মহিলাদিগের পক্ষ হইতে তীব্র আন্দোলন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যেবার নারীদিগের প্রতিনিধি হইবার ক্ষমতা প্রদান করেন, সেইবারেই ইনি প্রতিনিধি হইয়া বোম্বাই-কংগ্রেসে যোগদান করেন; কলিকাতা কংগ্রেসে ইনি বক্তৃতা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহিলা-সমিতি গঠন করেন এবং ইহার সহকারী সভানেত্রীরূপে বাঙ্গালী পল্টনের জন্য নানারূপ ব্যাজ, মোজা, খাবার ইত্যাদি প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভামিনী দাস নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য করিয়া সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেন। ইনি ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাত্রী; একটি বিধবাশ্রমও স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরলোকগতা হিরণ্ময়ী দেবী বালীগঞ্জ গড়িয়া-হাটায় মহিলা-শিল্পাশ্রম স্থাপন করিয়া দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী খাস্তগীর মহীশূর বালিকা-বিদ্যালয়ের এবং পরে বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যালরূপে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাসের নামও উল্লেখযোগ্য। কুমারী হৃদয়বালা বসু এম-এ, শিক্ষা-বিভাগে স্কুল-ইনস্‌পেক্‌ট্রেসের কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় বেথুন কলেজ ও কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজে দীর্ঘ দিন অধ্যাপনা করিয়া সিংহলের মহিলা কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে ১৯১৮ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত ইনি Southern Indian Association বা দক্ষিণ ভারতীয় সমিতির সভানেত্রী ছিলেন। তা'র পর সিংহল জাতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক নিযুক্ত শিশু-শ্রমিক কমিটির সদস্যরূপে ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া শিশুশ্রমিকের ন্যূনতম বয়স ৬ হইতে ১২ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেন এবং প্রত্যেক শ্রমিক উপনিবেশে বিদ্যালয় ও শ্রমিক রমণীদিগের প্রসাবাগার স্থাপন করেন। ১৯২০ সালের কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেসে ইনি মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদের পরিচালনা করিয়া বিশেষ যশ লাভ করেন; পরে জলন্ধর বালিকা বিদ্যালয় ও কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের প্রিন্সিপ্যালরূপে যথেষ্ট কার্য্যকুশলতা দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্তা অবলা বসু বর্ত্তমান বাঙ্গালী নারীকর্ম্মীদিগের মধ্যে বিশেষ অগ্রণী। ইনি নারীশিক্ষা সমিতি, বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—এই কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ইনিই প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পরলোকগতা সরোজনলিনী দত্ত কয়েকটি জেলায় মহিলাসমিতি স্থাপন করেন এবং হাঁসপাতালে রোগিণীদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মহিলা কর্ম্মীদিগের মধ্যে গোখ্‌লে মেমোরিয়াল্‌ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা মিসেস্ পি, কে, রায়, সঙ্গীতসম্মিলনীর সম্পাদিকা মিসেস্ পি, এল, চৌধুরী, পালংএর শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেবী, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, পাবনার শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। সুকবি শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের সম্পাদিকারূপে স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী দাসের প্রারব্ধ কার্য্য চালনা করিতেছেন। শ্রীমতী কামিনী রায় ও শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতা বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র (বসু) বি-এ, বহুদিন যাবৎ সুপ্রভাত-নামক একখানি মাসিক পত্রিকা যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন।

আইন-ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় মহিলা উকিল হইয়াছেন পাটনার শ্রীযুক্তা সুধাংশু হাজ্‌রা। ইনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের প্রথম মহিলা ফেলো(fellow)। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম বঙ্গরমণী শ্রীযুক্তা রেজিনা গুহ আইন-পরীক্ষায় পাশ করিয়া উকিল হইবার জন্য আবেদন করেন; কলিকাতা হাইকোর্ট্‌ তাঁহার সে-আবেদন নামঞ্জুর করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী দাস সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এম্‌-এ, এবং জর্ম্মণী হইতে পি এইচ-ডি উপাধি-ভূষিতা হইয়া আসিয়াছেন।

অসহযোগ-আন্দোলনের দিনে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী স্বামী চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেশের কাজে বিশেষভাবে নিযুক্তা ছিলেন। চট্টগ্রাম্ প্রাদেশিক সভায় তাঁহার সভানেত্রীর কার্য্য পরিচালন কম গৌরবের কথা নহে।

শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারের প্রভাব সমগ্র বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বীরাষ্টমী ব্রতের প্রবর্ত্তন করিয়া বাংলার যুবকদিগের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে বাংলায় ফিরিয়া আসিয়া ইনি এবৎসর হইতে এই ব্রত পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। এখন ইনি "ভারতীর" সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এ-বারকার কানপুর কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু বাঙ্গালী মহিলা, সুকবি বলিয়া ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। ভারতীয়দিগের-স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য ইনি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সুদূর আফ্রিকা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

(মাতৃমন্দির, পৌষ ১৩৩২)

আলোর খেলা

শ্রী কুমারলাল দাসগুপ্ত

মাসিক-পত্রে একখানা ছবি দেখ্‌লাম, ছবিখানির নাম 'আলোর খেলা'। অজস্র রবিকিরণ এসে কূপের পাশে জমায়েৎ কয়েকটি মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে—এই হচ্ছে ছবির বিষয়। এই যে আলোর খেলা, উন্মুক্ত আকাশের নীচে রবিকিরণের আলিঙ্গন—এ'কে রং ফলিয়ে পটে ফুটিয়ে তুল্‌তে এদেশে ক'জন চেষ্টা করেছেন জানিনে। ইউরোপে এই শ্রেণীর পটুয়ারা একটা বিশেষ সম্প্রদায়, আর তাদের আঁকা অনেক পট বিশ্বের গুণিসভায় বহু সম্মান লাভ করেছে। আমাদের দেশে কোনো-কোনো শিল্পী আজ যখন এই শ্রেণীর পট আঁকতে প্রয়াস পেয়েছেন, তখন সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা একেবারে নিরর্থক হবে না।

ইউরোপের যে বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ আমি করেছি, তা'কে বলা হয় "ইম্প্রেশনিস্ট্ স্কুল" (Impressionist School)। ইম্প্রেশনিজ্‌ম্‌-এর জন্মস্থান হচ্ছে ফরাসী দেশ। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে ফ্রান্সের একদল তরুণ শিল্পী চিরন্তন পদ্ধতিকে ত্যাগ ক'রে এক অভিনব উপায়ে অভিনব বিষয়ে এমন-সব অদ্ভুত ছবি আঁক্‌তে সুরু করলে যে তাদের ছবি সালঁয় (চিত্র-প্রদর্শনীতে) স্থান পেলে না। নবীনের সাধক কোনোকালে কোনো দেশে বাধা পেয়ে নিরাশ হয়নি, তাই যে কতিপয় নবীন-প্রবীণের কাছ থেকে তিরস্কার পেয়ে ফি'রে এল, তা'রা নিজেরা একটা প্রদর্শনী খুল্‌তে ভয় পেলে না। ৩০ জন তরুণ শিল্পী এক সঙ্ঘ গঠন ক'রে নিজেদের সেই উপেক্ষিত চিত্রাবলী ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণের সামনে ধরলে ম্যাসিয়ে নাদারের চিত্রশালায়। এই

প্রদর্শনীতে অ্যাপ্রেসিঁ—সো-লেই লেভাঁ Impression—Soleil Levant সূর্য্য উঠ্‌ছে—তারই ইম্‌প্রেশন্‌-চিত্র নামে মোনের আঁকা একখানা ছবি ছিল। অনেকের মতে এই ছবির নাম থেকে সঙ্ঘের নাম হয়েছে ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌স্‌।

এই তরুণবৃন্দ শিল্প-জগতে কোন্ অপরূপ রূপকে সৃজন করলে সেইটি জানা এখন প্রয়োজন। তা'রা চিত্রে আলোর খেলা ফুটিয়ে তুলতে চায়, তাই তাদের আর-এক নাম 'উন্মুক্ত আকাশের শিল্পী' pleiin air painters (প্ল্যা এয়ার পেন্‌টার্স্)। মেঘমুক্ত আকাশ থেকে সূর্য্যের প্রখর আলো যখন মাঠের বুকে তরুর শিরে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তখন যে উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে, ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌ শিল্পী পটে আঁকতে চায় তাই। চিত্রশালার জানালার ফাঁকের মৃদু আলো নয়—মুক্ত বাতাসের মাঝে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীব্র আলো। এই আলো তা'রা চায় বর্ণ-বিন্যাসে ফুটিয়ে তুলতে। চঞ্চল জলের বুকে আলোর খেলা তা'রা আঁকে, ঘরের চালে, গাছের মাথায় আলোর চমকানি তা'রা আঁকে।

ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌ শিল্পীর আঁকবার বিষয় হচ্ছে ভূদৃশ্য। ভূদৃশ্যকেই প্রধান বিষয় ক'রে এই নবীনরাই প্রথম ছবি আঁকতে সুরু করলে। গ্রীকরোমান্ শিল্পে ভূদৃশ্য-চিত্র চিরদিন নীচু আসনই পেয়ে এসেছে। ভূদৃশ্য কোনো দিন ভূদৃশ্যেরই খাতিরে আঁকা হয়নি। তা'র পরে রেনেসাঁস-(Renaissance) এর যুগেও ভূদৃশ্যের আদর হ'ল না। রেনেসাঁস-এর শিল্পী ভূদৃশ্যকে ছবির একটা অলঙ্কারমাত্র বিবেচনা করেছেন—মূলবস্তু মনে করেননি। ভূদৃশ্যকে মূলবস্তু বিবেচনা করেছে উনবিংশ শতাব্দীর নবীন শিল্পীরা। ভূদৃশ্যে যত বর্ণবৈচিত্র্য আছে, এমন আর কোনো কিছুতেই নেই, তাই এই বর্ণপ্রিয় শিল্পীর দল ভূদৃশ্যকেই বরণ করলে।

ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌এর চিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে আলো, আর এই আলোকে নিয়েই অন্যের সঙ্গে তা'র বিরোধ। এতকাল বস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে শিল্পী আলোর প্রয়োজন বোধ করেছেন, তাই আলো ছিল গৌণ, বস্তু ছিল মুখ্য। ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌ চাইলে আলোর মুখ্যত্ব, তাই সঙ্গে-সঙ্গে বস্তু গৌণত্ব প্রাপ্ত হ'ল। বস্তুকে সে চায় না, চায় বস্তুর সর্ব্বাঙ্গে আলো যে রহস্যকে সৃজন করে তা'কে। সমালোচকের সঙ্গে এইখানে তা'র মতের অমিল। জনসাধারণ এইখানে তা'কে বুঝতে পারে না।

আর যে একটা দোষে ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌দের দোষী ব'লে নির্দ্দেশ করা হয়েছে, সে হচ্ছে চিত্রের অস্পষ্টতা। পুরাতন পদ্ধতিকে মেনে নিয়েছেন যে চিত্রকর, তিনি যখন ছবি আঁকেন, তখন তা'তে থাকে স্পষ্টতা—রেখার স্পষ্টতা, আলো ও ছায়ার স্পষ্টতা, বর্ণের স্পষ্টতা। কিন্তু ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌ শিল্পী তা করতে রাজি নয়। সে জেনেছে কোনো দিন কোনো সময়ে কোনো বস্তুকেই চোখে স্পষ্ট দেখা যায়নি। সে বস্তুকে দেখেছে কতকগুলি স্তরের সমষ্টিরূপে। আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে প্রত্যেকটি স্তর আবার বিভিন্নবর্ণে রঞ্জিত। তাই ইম্‌প্রেশনিস্ট্‌ যখন কোনো বস্তুকে আঁকে, তখন সে হয় কতকগুলি রঙীন্ স্তরের সমষ্টি। তখন স্পষ্টতার পরিবর্ত্তে হয় একটা অপরূপ অস্পষ্টতার সৃষ্টি। এই অস্পষ্টতাকে চিত্রে চালাবার আরো একটা হেতু আছে। দৃষ্টি কোনো বস্তুর বা স্থানের সমগ্ররূপ স্পষ্ট দেখতে পায় না; সে যখন বস্তুর কোনো বিশেষ স্থানকে লক্ষ্য করে,তখন বস্তুর অবশিষ্ট অংশ অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। মানুষের মুখের দিকে যখনই চাই তখন তা'র গায়ের জামা পায়ের মোজা স্পষ্ট আমরা দেখতে পাইনে। আবার কারো কাজল আঁখি যখন দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, তখন তা'র কালো চুল রাঙা ঠোঁট ঝাপসা হ'য়ে ওঠে।

এই বিদ্রোহী পটুয়ার দল পটের বুকে রংএর ছোপ (dabs of paint) দিয়ে দিয়ে ছবি এঁকে চলে, তাই খুব কাছে গেলে তা'তে এলোমেলো রংএর ছোপ ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু একটু দূর থেকে সেই ছবিকেই পরখ করলে দেখা যায় যে সে এলোমেলো রংএর ছোপ বিশেষ একটা রূপগ্রহণ করেছে। কাছ থেকে দেখলে যেটা হয় হাসির জিনিষ, দূর থেকে দেখলে সেইটিই হয় আর-এক পরম বিস্ময়।

পৃথিবীতে কোনো জিনিষ স্থির হ'য়ে নেই—হয় সে কাঁপছে নয় ছুটছে, আবার যদিই বা কোনো জিনিষের পক্ষে স্থির

থাকা সম্ভব হয়, তবে যে দ্রষ্টা, সে নিজে কাঁপ্‌ছে বা ছুট্‌ছে ব'লে দৃষ্ট বস্তুকে কাঁপ্‌তে বা ছুট্‌তে দেখ্‌বে। ইম্‌প্রেশনিস্‌ট্‌ শিল্পী তা'র আঁকা ছবিতে ঐ কম্পন বা গতি দিতে পেরেছে। তা'র বর্ণ-বিন্যাসের এই অপরূপ রীতি, এলোমেলো রংএর ছোপ চিত্রে কম্পন বা গতি ফুটিয়ে তুলেছে।

আলোর ঝলক আলোর নৃত্য আলোর দীপ্তিকে আঁক্‌তে গিয়ে ইম্‌প্রেশনিস্‌ট্‌ শিল্পী এক অভিনব অঙ্কন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। তা'কে বলা হয় পোঁয়াতিয়িজ্‌মে (Pointillisme)। একাধিক রং মিশিয়ে একটা রং তৈরি ক'রে পটে লাগাবার যে পদ্ধতি এতকাল ছিল, তা'রা তা'র বদলে পটে লাগাতে লাগ্‌ল অমিশ্রিত রং পাশা-পাশি ছোপ দিয়ে। এতে কাছ থেকে ছবির সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র উপভোগ করা সম্ভব হ'ল না, দূরে থেকে সেই ছবিতে দেখ্‌তে পাওয়া গেল আলোর কম্পন, আলোর দীপ্তি। বিজ্ঞান-জগতের অ্যানাটমি (শরীরসংস্থাপনবিদ্যা) ও পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌ (পরিপ্রেক্ষণ) সম্বন্ধে গবেষণার যুগের মতন শিল্পজগতে যেমন একটা অ্যানাটমি ও পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌এর যুগ গেছে, তেম্‌নি বিজ্ঞান-জগতের আলো ও বর্ণের যুগের মতো শিল্পজগতে এও একটা আলো ও বর্ণ সম্বন্ধে বিপুল গবেষণার যুগ। আরো একটা নতুন জিনিষ যা ইম্‌প্রেশনিস্‌ট্‌ শিল্পীর ছবিতে দেখা গেল সে হচ্ছে এক রংএর পরিবর্ত্তে অন্য আর-এক রংএর সমাবেশ। রোদ্দুরের মাঝে বস্তুর যে ছায়া তা'কে চিরদিন আঁকা হয়েছে কালো রংএ কিন্তু ইম্‌প্রেশনিস্‌ট্‌ আঁক্‌লে তা'কে বেগুনী রংএ। এতে লাভ ছাড়া লোকসান হ'ল না, কারণ পটে রোদ্দুরের দীপ্তি অনেকখানি বেড়ে গেল।

এইবার এই বিপ্লবের সুরু হ'ল কবে এবং কেমন ক'রে তা দেখ্‌তে হবে। যারা এর অগ্রদূত তাদের কথা একটু বলা তাই প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের মতে ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌ উনবিংশ শতাব্দীর নতুন জিনিষ নয়; তাঁরা বলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে এর উদ্ভব হয়েছিল। তখন তা'র নাম দেওয়া হয়েছিল স্প্রেট্‌সাটুরা (Sprezzatura), কিন্তু শতাব্দীর সমাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে সেদিনের সে আন্দোলনেরও সমাপ্তি হয়েছিল। তা'র পরে ১৫০ বছর পরে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখানে সুদূর জাপানের শিল্পপ্রভাব যখন ইউরোপের শিল্পজগতে বিস্তার লাভ করছিল তখন আবার তা'কে দেখ্‌তে পাওয়া গেল ইতালিতে নয় ফ্রান্সে।

সনাতন পথ থেকে যাঁরা বিপথে চল্‌তে প্রথম প্রয়াস পেয়েছিলেন গুস্‌তাভ্‌ কুর্‌বে ছিলেন তাঁদের একজন। কুর্‌বে জন্মেছিলেন ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। তাঁর ছবির বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি চোখে যা দেখেছেন পটেও ঠিক তাই এঁকেছেন। কোনো কিছু বৃহৎ ক'রে মহৎ ক'রে দেখ্‌বার চেষ্টা তিনি কোনো দিন করেননি। তিনি ছিলেন সোশ্যালিস্‌ট্‌ তাই তাঁর আঁক্‌বার বিষয় ছিল ষ্টেশন, কারখানা, খনি, অন্নহীন দীন গ্রামবাসী, পাথরভাঙা মজুরের দল। যারা এতদিন সব-কিছুর ভাবমূর্ত্তি দেখে এসেছে তা'রা কুর্‌বের আঁকা বর্ত্তমানের সত্যিকার মানুষকে দে'খে চম্‌কে উঠ্‌ল!

এরই কিছু দিন পরে একদল ফরাসী দৃশ্যচিত্রকর প্রকৃতিকে বিশেষ ক'রে জান্‌বার জন্যে প্রকৃতির মাঝে আত্মসমর্পণ কর্‌লেন। ফঁতেনব্লোর বনের ধারে বার্‌বিসঁ গাঁয়ে করো, দিয়াস্‌, রুশো গাঁয়ের লোকের মতনই বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন আর বছরের পর বছর বনে-বনে ছবি এঁকে যেতে লাগ্‌লেন। বার্‌বিসঁ-সম্প্রদায় ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌-এর অগ্রদূত আর করো হচ্ছেন এই সম্প্রদায়ের অগ্রণী বা গুরু।

কামিল করো ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পারিতে জন্মেছিলেন। পঞ্চাশ বছরে পা দেবার পর করোর বিশেষত্ব প্রকাশ পেতে সুরু করে। করো শুধু পটুয়া ছিলেন না, গায়কও ছিলেন। তাই তাঁ'র পটে সুরের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর রং নির্ব্বাচনে একটা বিশেষত্ব ছিল। এমন সব রং-এ তিনি ছবি আঁক্‌তেন যাতে ছবিতে একটা শান্তস্নিগ্ধ মাধুর্য্য ফুটে উঠ্‌ত। তাঁর দৃশ্যপটে স্পষ্ট কিছু থাক্‌ত না—অস্পষ্টতার সূক্ষ্ম আবরণে সব-কিছু ঢাকা থাক্‌ত। ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌ কথাটির উদ্ভব যখন হয়নি তখন করোর পটে ইম্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌এর সূত্রপাত হয়েছে। করোর বন্ধু, বার্‌বিসঁ সম্প্রদায়ের আর একজন শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন জঁ

ফ্রাঁসোয়া মিলে। মিলে ছিলেন চাষার ছেলে, তাই চিরদিন গাঁয়ের প্রতি তাঁ'র টান দেখা গেছে। তিনি তাঁরই মতন গরীব চাষাদের জীবন-কথা তুলি দিয়ে লিখ্তেন। রুসো ছিলেন গোঁড়া বাস্তবদর্শী। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ (classical) ছবিতে প্রকৃতির যে রূপ আমরা দেখ্তে পাই সে তা'র সত্যিকার রূপ নয়—অনেকখানি পালিশ করা, মাজা রূপ। সে-ছবির মূর্ত্তি প্রায়ই মানুষের নয়, দেবতার বা পরীর, ঘরবাড়ী পৃথিবীর নয় কল্পলোকের। রুসো এঁকেছেন প্রকৃতির সত্যিকার রূপ—অগোছালো, অসংস্কৃত, কঠিন; আর তা'র মাঝে যে মানুষকে এঁকেছেন সেও প্রকৃতিরই সন্তান—সে চাষা, যে ঘরবাড়ী এঁকেছেন সে চাষার কুঁড়ে। দিয়াথ্ আঁক্তেন গাছের মাথায় আলোর খেলা।

এঁদের পরে যে দু-একজন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে তাঁরা প্রতিভাবান্ না হ'লেও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। য়োহান্ বার্টোল্ড্ য়োঙ্কিণ্ড্ (Johann Barthold Jongkind) ছিলেন ওলন্দাজ শিল্পী। হল্যাণ্ড তাঁর জন্ম স্থান হ'লেও ফ্রান্সেই তিনি সারাজীবন কাটিয়েছিলেন। লুই বুদাঁ এর শিল্পশিক্ষা হয়েছিল মিলের হাতে।

ইম্প্রেশনিস্ট্ নাম যিনি প্রথম পেয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন এডুয়ার্ড্ মানে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সে জন্মলাভ করেন। ঊনবিংশতি শতাব্দীর যে কয়জন নবীন শিল্প-সাধক নূতনের আরাধনা করেছিলেন, দেলাক্রোয়া, জেরিকো, রুসো, করো, কুর্বে, মিলে,—সকলকেই লাঞ্ছনা, অনাদর, অবহেলার তীব্র বিষ অনেক পান করতে হয়েছিল, কিন্তু মানে পান করেছিলেন আকণ্ঠ। চিত্রকরের প্রথম জীবনে চিরদিন যা ঘটে মানের জীবনেও তা ঘটেছিল। আত্মীয় অনাত্মীয়ের বহু বাধাকে উপেক্ষা ক'রে তাঁকে শিল্পাচার্য্য কুতুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। প্রতিভা কোনোদিন বয়সের বিচার ক'রে প্রকাশ পায় না, তাই যেদিন গুরুকে অতিক্রম ক'রে শিষ্য বিশেষত্ব লাভ করলেন সেদিন গুরুশিষ্যে বিরোধ বাধ্ল। মানে, কুতুরের চিত্রশালা ত্যাগ ক'রে বিশ্বের চিত্রশালার সন্ধানে বের হলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসার জাতীয় জীবন যখন একটা ভীষণ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছিল—শিল্পী মানে তখন দেশ-দেশান্তরে সৌন্দর্য্যের সন্ধানে ফির্‌ছিলেন। জর্ম্মানী, অস্ট্রিয়া, ও ইতালীর চিত্রশালা দে'খে তিনি যখন দেশে ফির্লেন তখনও তাঁর রূপতৃষা মেটেনি। তিনি যে সত্যের আলোকের দর্শনপিয়াসী হয়েছিলেন তা'র দর্শন লাভ হ'ল না।

সহসা একদিন অভীপ্সিতের দর্শন মানে পেলেন স্পেনদেশীয় শিল্পী ভেলাস্কেথ্এর চিত্রে। ভেলাস্কেথ্ তাঁকে মুগ্ধ করলে, ভেলাস্কেথ্কে তিনি গুরু ব'লে মেনে নিলেন। সেইদিন থেকে তাঁর নিজের পথে নিজের বলে চলা সুরু হ'ল। দিনের পর দিন মানের তুলি অবিরাম ছবি এঁকে চল্ল। এত তীব্র যার সাধনা সাধারণ তা'কে চিন্তে পার্লে না। কতিপয় সমসাময়িক প্রতিভাবান্ পুরুষ হুইস্লার, লেগো, ফাঁতাঁ লাতুর, জোলা ও বোদ্লেয়ার মানেকে অভিনন্দিত করলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সালঁর (চিত্রপ্রদর্শনীর) সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। দি স্প্যানিশ সিঙ্গার-প্লেয়ার নামে যে ছবি তাঁর সালঁ (চিত্রপ্রদর্শনী)এ গৃহীত হয়েছিল, প্রশংসাও তা'র যথেষ্ট হয়েছিল। এম্নি একটা জয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর বিচিত্র জীবন সুরু হয়। পরের বছর তাঁর ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেলে না। ঐ বছর সালঁর দরজা থেকে এত শিল্পী নিরাশ হ'য়ে ফিরে এল যে তা'রা নিজেরা একটা প্রদর্শনী খুল্তে দ্বিধা কর্‌লো না। এই প্রদর্শনীতে, বিদ্রোহীদের এই আড্ডায় মানে ছিলেন নেতা। তাঁকে ঘিরে হুইস্লার, স্যাঁৎ মার্সে, সাটার, লাভিয়েল্ একটা সম্প্রদায় গঠন কর্‌লে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের বিশ্ব-প্রদর্শনীতে (universal exposition) মানে ও কুর্বের স্থান হ'ল না। নূতন পথে যারা চ'লে বাধা তারা অনেক পায় কিন্তু নিরাশ হয় না। মানে-সম্প্রদায় আবার আর একটি প্রদর্শনী খুলে নবীন শিল্পীদের মিলন ঘটালে। মানের বন্ধু সাহিত্যিক জোলা তাঁর ছবির সমালোচনা ক'রে যে প্রবন্ধ লিখ্লেন আজ পর্য্যন্ত তা'র যথেষ্ট নাম আছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ শিল্পজগতের একটা স্মরণীয় বছর।

যুদ্ধ তখনও সুরু হয়নি এমনি সময় মানে একদিন পারির কাছেই তাঁর বন্ধু নিভির গৃহে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বন্ধুর বাগানে ব'সে ছবি আঁকতে-আঁকতে হঠাৎ মানে এক অভিনব অঙ্কনপদ্ধতি আবিষ্কার করলেন—মুক্ত আকাশের নীচে ছবি আঁকবার পদ্ধতি —প্ল্যাঁ এয়ার পেন্টিং (plein air painting)। এক নূতন জগৎ তাঁর সাম্‌নে খু'লে গেল। সেই দিন থেকে তিনি এই নূতন পথে চল্‌তে সুরু করলেন। তাঁর পায়ের রেখা ধ'রে তাঁর সহচর নবীন শিল্পীরাও এগিয়ে চল্‌ল। মানেকে ঘিরে এই যে নবীন সঙ্ঘ,এর নাম হ'ল—লেকোল দ্য বাতিঞোল্ (L'Ecole de Batignolle), কারণ বাতিঞোল্-এ ছিল এদের ক্লাব। দীর্ঘ জীবনের অবসান যখন ঘনিয়ে এল তখন মানে পেলেন সম্মান; সালঁ (প্রদর্শনী) তাঁর ছবিকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহসী হ'ল না, লিজিয়ন অব্ অনার-এর সম্মান তিনি পেলেন।

যাঁরা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে ইম্প্রেশনিস্ট্ ব'লে দেশবিদেশে বিখ্যাত হ'য়ে উঠ্‌লেন কামিল্ পিসারো হচ্ছেন তাঁদের একজন। ব্যবসায়ীর ছেলে পিসারোকে সবাই যখন বল্‌লে দোকান খুলতে, তখন পিসারো খু'লে বস্‌লেন চিত্রশালা। ফ্রান্সে পিসারো করোর আঁকা ছবি দে'খে করোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তা'র পরে তাঁর পরিচয় হ'ল মানের সঙ্গে, বাতিএল স্কুল তাঁকে গ্রহণ করলে। পিসারোর প্রতিভা প্রকাশ পেলে।

প্রত্যেক আন্দোলনের আবর্তে—সে কি ধর্মের, কি বিজ্ঞানের, কি সাহিত্যের, কি শিল্পের—একজন ক'রে প্রতিভাবানের জন্ম হয়। ইম্প্রেশনিজ্‌ম্ আন্দোলনের আবর্তে জন্ম নিলেন মোনে। ক্লদ্ ওস্কার মোনে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পারিতে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবসা করবে, এ খুব সহজ কথা, কিন্তু অতি সহজ যা জগতে তাও অনেক সময় ঘটে না। মোনে হলেন শিল্পী। পারির এক প্রদর্শনীতে মনের ছবি দে'খে মোনে মানের অঙ্কনপদ্ধতি গ্রহণ করলেন।

প্রকৃতির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে করো, কুরবে, মানে যখন প্রকৃতিকে আঁকতে লাগ্‌লেন তখন তাঁরা বুঝ্‌তে পারলেন নিবিড়তা নয়, উজ্জ্বলতাকে পটে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। প্রকৃতি আলোর লীলানিকেতন—প্রকৃতি উজ্জ্বল, আর এই আলো, এই উজ্জ্বলতা,এই দীপ্ত মনোহর আবরণ, ভগবানের এই অভিনব বিকাশকে পটে প্রকাশ করতে প্রয়োজন হয় হাল্‌কা উজ্জ্বল রং। ফ্রান্সের প্রথম বর্ণবিপ্লবী দেলাক্রোয়া পথ নির্দ্দেশ করলেন। তা'র পরে এলেন করো, কুরবে, মানে; আলো ও বর্ণের জয় হ'ল। মোনে যখন এলেন তখন মানুষ দৃশ্যপটকে আর অসম্মান করে না, আলো ও বর্ণকে ভালোবাসে; তাই মনের প্রতিভা সহজেই সম্মান পেলে।

মোনে তাঁর সব ছবিই এঁকেছেন মুক্তাকাশের নীচে ব'সে—আঁকবার বিষয়কে সাম্‌নে রেখে। কোনো দৃশ্যের নিখুঁত প্রতিকৃতি তিনি কোনোকালে আঁকেননি—তিনি এঁকেছেন শুধু দৃশ্যের সেই বিশেষ রূপ আলো ও বর্ণের মিলনে যা ফু'টে উঠেছে। কানন-কান্তারে, মাঠের বুকে যে মুহূর্ত্তের আলোর লীলা-বর্ণের মাধুর্য্য তিনি আঁকতেন, দিনের সেই মুহূর্ত্ত যখন চ'লে যেত ছবি আঁকাও তাঁর বন্ধ হ'ত। আর-এক দিনের সে-মুহূর্ত্তের আশায় তিনি থাক্‌তেন। বস্তুর সুচারু বিন্যাসে বা বস্তুর নিখুঁত অবয়বে তিনি সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পেতেন না—সৌন্দর্য্যের সন্ধান তিনি পেতেন বস্তুর উপরে আলো ও বর্ণ যে দৃশ্য রচনা করে তা'তে। ক্ষণিকের এই সৌন্দর্য্যই ছিল তাঁর উপাস্য।

মোনের সঙ্গে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা কতখানি, তাঁর আর্টের বিশেষত্ব কোথায় এ জানা সহজ হয় তাঁর আঁকবার বিষয় নির্ব্বাচন দেখ্‌লে। একই দৃশ্যের ছবি তিনি এঁকেছেন একাধিক—একাধিক ক্ষণের। একই তরুবীথিকার শিরে আলোর লীলা মোনে সাতটি পটে চিত্রিত করেছেন—দিনের সাতটি ক্ষণে। প্রভাতের রঙীন আলোর খেলা তিনি এঁকেছেন, মধ্যাহ্নের প্রখর আলোর দীপ্তি তিনি এঁকেছেন, সায়াহ্নের স্তিমিত আলোর রহস্য তিনি এঁকেছেন। মাঠের মাঝে যে তৃণের স্তূপ, তা'রই ছবি তিনি এঁকেছেন ২০ খানি—ঋতুর পরিবর্ত্তনে স্তূপের ২০টি রূপ। রুআঁ্যা কাথিড্রালকে একাধিক পটে চিত্রিত করেছেন।

মোনের পর যাঁদের নাম করা যেতে পারে

তাঁরা হচ্ছেন আল্‌ফ্র্যাদ্‌ সিস্‌লে, পল সেজ্‌সানে, দেগা, রেনোয়া, মহিলাশিল্পী বেয়ার্তা মেরিসো। এঁদের মধ্যে দেগা ও সেজ্‌সানে বিখ্যাত। দৃশ্যপট আঁকবার ইম্প্রেশনিস্ট্‌ পদ্ধতিতে দেগা এঁকেছেন মূর্ত্তি। বর্ত্তমান সভ্যতার বিষটুকু আকণ্ঠ পান করেছে লালসা-কাতর যে নারীবৃন্দ, দেগা তাদের এঁকেছেন। সেজ্‌সানে হচ্ছেন পোস্‌ট্‌ ইম্প্রেশনিজ্‌ম্‌ বা উত্তর ইম্প্রেশনিজ্‌ম্‌-এর অগ্রদূত। ইম্প্রেশনিজ্‌ম্‌-এর পরে এল পোস্‌ট্‌ ইম্প্রেশ-নিজ্‌ম্‌, তা'র পরে এল কিউবিজ্‌ম্‌ (cubism)। নূতনত্বের ঢেউ অনন্তকাল ধ'রে সভ্যতার কূলে ঘা দেবে।

বিস্মরণী

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

আমারে তোমরা ভুলে' যেও, ভাই,
এসেছিনু পথ ভুলে'—
পান করিবারে জাহ্নবী-বারি
কীর্ত্তিনাশার কূলে।
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার পূরিবে মনে ছিল আশা,
ভাঙা-মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা
পুরাণো বটের মূলে;—
প্লাবনের মুখে ভেসে গেল সব
কীর্ত্তিনাশার কূলে!

তারার আখরে কে লিখেছে লিপি
ধরার ললাট-পটে!—
ভেবেছিনু আমি পড়িব তাহারে
দ্বিধাহীন অকপটে।
যে কাহিনী কহে নিশীথ-গগন,
যার অভিনয়ে দিবস মগন—
ধরিবারে চাই সে লিপি-লিখন
বসুধার বালুতটে—
তারার আখরে যে-লিপি বিহরে
নভোনীলিমার পটে!

নিশীথ-শিয়রে সপ্তমী-চাঁদ—
তখন কৃষ্ণাতিথি,
কুহেলি-আকাশে কাঁদে দিক্‌বালা
হারায়ে তারার সিঁথী;
সেই কালে আমি বাহিরিনু পথে,
নদী-গিরি পার হ'নু কোনো মতে,
উত্তরিনু শেষে স্বপনের রথে
বন-যূথিকার বীথি,
পূর্ণিমা-চাঁদ ছিল না আকাশে—
তখন কৃষ্ণাতিথি।

মরণ আমারে দু'হাতে বাঁধিল
মুখ-চুম্বন লাগি
হিম হ'য়ে গেল বুকের পাঁজর
শিশির শয়নে জাগি'—
হেরিনু জীবন আধেক স্বপন
তারকার চোখে তাকায় তপন!
যে আধা আঁধারে রয়েছে গোপন
হনু তার অনুরাগী,—
বুকের আগুন জুড়াইয়া গেল
হিমেল হাওয়ায় জাগি'।

তোমাদের তরে রয়েছে সমুখে
ধরার অরুণোদয়,
আমি তিমিরের তীর্থ-পথিক—
তারকার গাহি জয়!
যে আলো কাঁদিছে উর্দ্ধ ভুবনে,
তরল তুহিনে কাঁপিছে পবনে,
তারি এক কণা মনের ভবনে
করিয়াছি সঞ্চয়,
তারি হাসি হেসে রজনীর দেশে
করিনু অরুণোদয়!

ত্রিযামা যামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি
মণি সে বিস্মরণী!
কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
বেদনার বন্ধনী।
যা-কিছু কুড়াই হাটে আর মাঠে
ফে'লে দিয়ে যাই জনহীন বাটে,
জীবনের এই যৌবন-ঘাটে
তরিনু বৈতরণী—
গাঁথি কামনার শতনরী-হারে
মণি সে বিস্মরণী!

সুপ্তি-সাগরে ফেন-তরঙ্গ
স্ফুরিছে জ্যোতির্ম্ময়!
মনোমৃদঙ্গে ধ্বনি অনাহত
নিবারিছে সংশয়!
কানে জাগে রূপ, সুর বাজে চোখে!
বেড়াই অতীত অনাগত লোকে,
সমুখে পিছনে—সুদূরের শোকে
ভুলি নিকটের ভয়,
যে সুখ স্বপন তাহারি রভসে
জগৎ জ্যোতির্ম্ময়!

হাসি হাহাকার না জানি সে কার—
প্রাণ করে উতরোল,
সেই কলরবে ভুলি জন-রব
পথের কলহ-রোল।
অজানা জনের আঁখির পাহারা
স্বজন-সভায় করে দিশাহারা—
তাই ফিরে যায় স্নেহরসধারা,
কেঁদে যায় ফুল-দোল!
যত হাহাকার হাসির মতন
চিত করে উতরোল!

ভুলিবার ছলে ভরিলাম ডালা
বাছা-বাছা বনফুলে,
সৌরভে তা'র মৃদু ধূপবাস,
আঘ্রাণে আঁখি ঢুলে।
মুকুতা-মুকুলে কার আঁখি কাঁদে,
রাঙা অশোকের হাসি কারা সাধে,
কেবা নীল নীবি নীপহারে বাঁধে
চম্পক-অঙ্গুলে!—
রঙে সে অতুল মনোবন-ফুল,
আঘ্রাণে আঁখি ঢুলে!

রূপের আরতি করিনু আঁধারে
আবেশে নয়ন মুদি'—
হেরি দেহে-মনে বাধা নাই আর,
—উদ্বেল অম্বুধি!
যে-রেখা আঁকিনু তিমির-ফলকে,
যে-ছায়া ধরিনু নিমীল-পলকে,
যে মুখ চুমিনু অলখ-আলোকে,
দিবসের দ্বার রুধি'—
তাহারি আবেশে উথলিল সুধা-
মন্থন-অম্বুধি!

ভুলে গেছু শোক, ভুলিছু ভাবনা,
—মমতার পরাজয়,
রাখীটির মত রাঙা হ'য়ে ওঠে
জীবনের ক্ষতি-ক্ষয়!
বাণী বিনাইয়া বাঁধি যে ছন্দ
তারি মধুমদে পরাণ অন্ধ!
হয়ত মনের এ মকরন্দ
সত্যের সুধা নয়—
তবু ভুলে আছি তাহারি পুলকে
জীবনের ক্ষতি-ক্ষয়।

হোথা অস্ফুট উষার কিরীটে
শোভিছে হীরক দুল,—
জানি সে আলোক-শিখার সকাশে
দুলিবে না মোর ফুল।
চাঁদের সোনা যে রূপা হয়ে আসে!
তারারা পলায় আগুনের ত্রাসে!
রথ-ঘর্ঘর ওই যে আকাশে
অরুণের—নাহি ভুল!
হেথা সে আলোক-শিখার সকাশে
ফুটিবে না মোর ফুল।

আমি ধরেছিনু নিশীথের গান
তোমাদের শেষ-রাতে,—
জ্যোৎস্না যখন মিলাইয়া যায়
গোধূলি-ধূসর প্রাতে।
গান শেষ করে' চলে' গেল সবে,
আলোগুলি সব নিবিতেছে নভে,
দিবাও আসেনি, নিশা নাই যবে,—
বাঁশিখানি লয়ে হাতে
আমি বাহিরিনু বন-পথে একা
গোধূলি-ধূসর প্রাতে।

* * *

আমারে তোমরা ভুলে যেও ভাই,
এসেছিনু পথ ভুলে,—
নয়নে ভরিতে নিশার নিদালি
আতপ-উৎস কূলে!
যে-গান হেথায় হ'ল নাকো সারা,
সুরখানি তা'র হবে না যে হারা,
আরেক ভুবনে সন্ধ্যার তারা
লইবে তাহারে তুলে'—
নব-জাগরণী গাইবে সেথায়
বিস্মরণীর কূলে।

দিবসের শেষে

শ্রী জগদীশচন্দ্র গুপ্ত

(১)

রতি নাপিতের বাড়ীর অবস্থান-ক্ষেত্র বড় চমৎকার। বাড়ীর পূবে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান, উত্তরে বেণুবন, দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। সূর্য্যদেব দিগন্ত স্পর্শ করিতে-না-করিতেই তাঁর হিঙুল-টক্‌টকে আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে; রতি ঠিক পাখীর ডাকেই জাগে, গোধূলিতে তা'রা বৃক্ষবাসে ফি.রয়া আসিলেই তাদের কল-কাকলীর সঙ্গে-সঙ্গে শান্তিসুরে সুর মিলাইয়া রতির তুলসী-তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে, দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ সির্ সির্ করে, পশ্চিমে তা'র প্রতিধ্বনি জাগে; দক্ষিণে সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না। কিন্তু রতির সে দিকে দৃক্‌পাতও নাই, তা'র চোখ-কান এসব দেখিতে-শুনিতে শিখে নাই। রতি বস্তুতান্ত্রিক। সে যে চাক্‌রান্ জমি ভোগ করে, তাহাই তা'র একমাত্র ধ্যান।

একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতি লোক ভালোই

হইত। এবং, রতির বাড়ীর পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস বাগানের আম-কাঁটাল-সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে, তাহা যদি অমূলক জ্ঞানে বিশ্বাস না করা যায়; তবে রতি নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র। কিন্তু লোকে যাদবের কথা বিশ্বাস করে। দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী রামচন্দ্রপুরের হাটে তাহাকে গ্রামের অনেকেই আম-কাঁটালের কালে আম-কাঁটাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ফলগুলি আহরণের উপায়-সম্বন্ধে সতর্ক প্রশ্ন করিয়াও কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

রতির একটিমাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসব-গৃহ হইতে নদী-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বীরাষ্টমী-ব্রত গ্রহণ এবং পাঁচুগোপালের মাদুলী ধারণ করে; তা'র পর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলী কবচ তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর অঙ্গে উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে অহরহ প্রহরা দিতেছে। অগণ্য নির্ম্মাল্য, জাগ্রত মন্ত্র ও প্রসাদ ধারণ করাইয়াও নারাণীর অনুক্ষণ সশঙ্ক উৎকণ্ঠার সীমা নাই—পাঁচু ক্ষণেকের তরে নীরব হইলেই নারাণীর মনে হয় বুঝি সে হারাইয়া গেছে।

এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই যে কথাটি বলিল, তাহা যেমন অবিশ্বাস্য তেম্‌নি ভয়ঙ্কর। নারাণী তাহাকে হাত ধরিয়া ক্ষেতের দিকে লইয়া যাইতেছিল, নিঃশব্দে যাইতে-যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—মা, আজ আমাকে কুমীরে নেবে।

নারাণী চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল,—সে কি রে?

—হাঁ মা, আজ আমাকে কুমীরে নেবে।

—কি ক'রে জান্‌লি?

—তা জানিনে।

ছেলের সর্ব্বনেশে কথা শুনিয়া নারাণী প্রথমটা চম্‌কিয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই দুর্ভাবনা কাটিয়া তা'র বুক হাল্‌কা হইয়া গেল। পাঁচু অসংলগ্ন অনেক কথাই বলিয়া থাকে,—একদিন সে সন্ধ্যাবেলায় একটি পেচককে তাদের ঘরের চালে বসিয়া অট্টহাস্য করিতে দেখিয়াছিল, আর-একদিন একটি কচ্ছপকে বাচ্চাসহ তাদেরই উঠানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল। এমনই-সব অসম্ভব কথা পাঁচু নিত্য বলিয়া থাকে। পাগল ছেলে!

রতি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধম্‌কাইয়া দিল। এই সংশ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেল, তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বক্সীর কথাটা। অধর বক্সী সে-বার নৌকাযাত্রা করিবার ঠিক পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলার আব্‌ছায়া জ্যোৎস্নায় নিজেরই ছায়া দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল; প্রাঙ্গণে লাফাইয়া-লাফাইয়া নিজেরই ছায়ার দিকে আঙুল দেখাইয়া সে কেবলি চীৎকার করিয়াছিল,—ও কে? ও কে? তা'র রক্তবর্ণ নিষ্পলক চক্ষুর দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া থাকিতে কাহারও সেদিন সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার মতন সে শান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তা'র নৌকা আর ফেরে নাই, সে-ও না। জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেদিন রতিকে বলিয়াছিল,—রতি, রকম ভালো না, ওটা মৃত্যু-লক্ষণ। ও-রকম মনের ভুল হয়—পাগলের আর যার মরণ ঘনিয়েছে।......

তাই রতি ছেলেকে কঠোরকণ্ঠে শাসন করিয়া দিল,—খবরদার, ফের্ যদি ও-কথা মুখে আন্‌বি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাঙ্‌ব।

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ। নদী বাড়িয়া চড়া ডুবিয়া জল ছল্‌ছল্ শব্দে খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা লেহন করিতেছে। স্বচ্ছ শান্ত জল খরগতি ও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই। এই নদী কামদা, তা'র দুই তীর, আর তা'র জল তাদের চির-পরিচিত; এ নদী ত নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মতন মমতাময়ী; চিরদিন সে গিরিগৃহের স্নেহের শীতল নীর পল্লী-কুটীরের দুয়ার পর্য্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তা'কে ভয় নাই।

স্নানের বেলায় রতি পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল,—আয়, নেয়ে আসি।

কাঁচা কঞ্চির ভয়ে পাঁচু সেখানে কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল। মায়ের পিঠের

উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া তা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপি-চুপি বলিল,—আমি আজ নাইব না, মা।

নারাণী বলিল,—কেন ?

পাঁচু বলিল,—ভয় কর্‌ছে।

নারাণী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল,—পাঁচু নাইবে না আজ।

রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—কেন, কি হয়েছে ?

—হয়নি কিছু।

—তবে ?

—নাইতে চাইছে না, থাক্ না আজ।

—না, ওর ভুলটা ভাঙা দর্‌কার। বাবুকে বল্‌লুম, শু'নে তিনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

গ্রামের বাবু চৌধুরী-মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া চাম্‌ড়ায় ক্ষুর ঘষিতে-ঘষিতে রতি পাঁচুর উদ্ভট কথাটি বিবৃত করিয়াছিল। বাবু ত হাসিয়াই ছিলেন, উপস্থিত ইতর-ভদ্র অন্যান্য সকলেও কথাটি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমীর ? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি কি হইতে পারে ? বাবু বলিয়া দিয়াছিলেন,—কিছু না, তুই সঙ্গে ক'রে নাইয়ে নিয়ে আসিস্, কুমীরে যদি নেয় ত তোকেই নেবে।

রসিক পোদ্দার প্রতিধ্বনির মতন বলিয়াছিল,—বাবু বলেছেন ঠিক, যাতে তা'র খোরাক হবে।

হলধর হালদার বাবুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া কলিকা টানিতেছিল, সে টাট্টা করিয়া বলিয়াছিল, —রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ্ঞ ? তা'র উপর জেতে নাপিত !···

এম্‌নি-সব কথায় মনে-মনে রুখিয়া উঠিয়া এবং এই শ্রেণীর ভুলের দরুন অধর হস্তীর প্রত্যক্ষ নিধন-প্রাপ্তির কথাটি স্মরণ করিয়া পাঁচুকে আজ নদীতে নাওইতেই হইবে, এই সংকল্প করিয়া রতি বাড়ী আসিয়াছিল।

নারাণী পাঁচুকে বলিল,—যাও বাবা নেয়ে এস। সঙ্গে বড়-একটি মানুষ যাচ্ছে। ভয় কিসের ? বলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া পাঁচুকে নামাইয়া দিল ; মনে-মনে তাহাকে সহস্র আশীর্ব্বাদ করিল।

অন্য দিন তেল মাখাইবার সময় পাঁচু ছট্‌ফট করিত, আজ সে নির্ব্বিবাদে তেল মাখিল এবং বাপের গামছা-খানা হাতে করিয়া তাঁর পিছন্-পিছন্ ঘাটে আসিল। স্নানার্থিগণের উঠানামার সুবিধার জন্য পাড় কাটিয়া জল পর্য্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জলের ধার পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, তার কেমন ভয়-ভয় করিতে লাগিল। নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে—এতবড় একটা গতিবেগ, অথচ তা'র শব্দ নাই, আকার নাই, ভালো করিয়া যেন সে চোখে পড়ে না ; যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্ম্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দ্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে।······এমন নিদারুণ অকরুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তা'র চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কত হিংসা দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে। রতি শিহরিয়া উঠিল। শঙ্কিতদৃষ্টিতে রতি সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে বহুদূর পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, একটি বুদ্‌বুদও কোথাও নাই।······ঠিক সম্মুখে ওপারের বালুচর দুটি গ্রামের বন-প্রান্তের মধ্য দিয়া বহিয়া বহুদূরে গিয়া দিক্-প্রান্তে মিশিয়াছে, সন্ধিস্থলটা ধূসর ধূম্র একটা দীর্ঘ রেখার মতন। প্রসারিত বালুরাশির নগ্ন রিক্ত শুভ্রতাকে সবুজ বুটিতে সাজাইয়া স্থানে-স্থানে তৃণগুচ্ছ জন্মিয়াছে।······নদীর দুই তীর নির্জ্জন জনশূন্য। রতি ভাবিতে লাগিল।

পাঁচু হঠাৎ সভয়ে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া রতিকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিল,—ওটা কি ?

পাঁচুর ভয়ের কারণটাও রতি দেখিয়াছিল, একটি জলচর জানোয়ার হুপ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগ্‌বাজি খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল।

পাঁচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিল,—শুশুক মাছ তাড়া করেছে।

পাঁচু বলিল, কেন বাবা ?

—খাবে ব'লে। ওরা বড়-বড় রুই-কাৎলা মেরে মেরে খায়।

গুণ্ডকগণ বড়-বড় রুই-কাৎলা মারিয়া খায় শুনিয়া পাঁচু-গোপালের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। জলের ভিতর ত অন্ধকার, কেমন করিয়া খুঁজিয়া পায়।

এদিকে হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল। তখন তাহার মনে পড়িল, কামদায় কুমীর ভাসিতে এ গ্রামের কদাচ কেহ দেখে নাই, এমন-কি কোনো দিন জনশ্রুতিও আসিয়া এগ্রামের কানে পৌঁছায় নাই। তবে ভয় কিসের?

ঝপ্ করিয়া গভীর জলে পড়িতে না হয়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া রতি হাঁটুজল পর্য্যন্ত নামিল, ছেলেকেও টানিয়া লইল; তাহাকে হাঁটুর সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া বেশ করিয়া তাহার গা মাজিয়া দিল; ডানা ধরিয়া তাহাকে ডুব দেওয়াইল; তা'র পর উপরে তুলিয়া গা-মাথা মুছিয়া দিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

রতি আসিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল,—পাঁচু কই রে?

রান্নাঘরের ভিতর থেকে ভারি-গলায় পাঁচু বলিল,—খাচ্ছি, বাবা।

—কেমন কুমীরে নেয়নি ত?

পাঁচুও মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল,—না।

নারাণী বলিল,—ছেলের আমার এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

(২)

বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া নারাণী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুর সমবয়সী অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহাদের এই অকস্মাৎ পলায়নের হেতু নির্ণয় করিতে আসিয়া যে ব্যাপারের ভগ্নাবশেষ নারাণীর চোখে পড়িল, তাহাতে সে গালে হাত দিয়া একেবারে থ হইয়া গেল। অপরাধীগণের মধ্যে পাঁচুই একা ধরা পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ব্যাপার এই—নারাণী যখন ঘুমাইতেছিল, তখন পাঁচু ও তাঁর সঙ্গীরা ঘরে-রাখা ছোটো একটি পাকা কাঁটাল চুরি করিয়া ভাঙিয়া খাইয়াছে, কিন্তু খাইবার পদ্ধতি না জানা থাকায় ছেলে কাঁটালের গাঢ় রসে সর্ব্বদেহ আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার উপর আনন্দের আবেগে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছে, সুতরাং ছেলের মূর্ত্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলিয়া উঠিবারই কথা।

পাঁচু মার খাইতে-খাইতে বাঁচিয়া গেল, কিন্তু তা'র আর্ত্ত চীৎকারে এবং নারাণীর ক্রুদ্ধ চীৎকারে রতির ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে গা মোড়া দিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল,—যেমন ছেলের গলা, তেম্নি তা'র—হয়েছে কি?

—হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ, চুরি ক'রে কাঁটাল খাওয়া হয়েছে; ছেলের বিদ্যে কত। বলিয়া নারাণী এম্নি-ভাবে রতির দিকে চাহিল যেন চুরি করিয়া কাঁটাল খাওয়াটা পুরুষ-জাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

রতি ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—থামো, আর চেঁচিও না। আমি ধুয়ে আন্ছি। বলিয়া সে উঠানে নামিল।

পাঁচুর হাতে খেলার একটা ঘট ছিল; সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে বাপের আগে-আগে নদীর দিকে চলিল।

রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগ্ড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিল। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু বলিল,—বাবা,আমার ঘট?

উভয়ে ফিরিয়া দেখিল, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু ব্যস্ত হইয়া বলিল,—নিয়ে আসি বাবা?

রতি বলিল,—যা'।

পাঁচু হেঁট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দুইটি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, পরমুহূর্ত্তেই সেস্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিল, লেজটা একবার বিদ্যুৎ-বেগে ঘুরিয়া গেল, এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলের তলে অদৃশ্য হইয়া গেল। মুদ্রিতচক্ষু ভয়ার্ত্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটি কাটিতে বেশী সময় লাগিল না; পরক্ষণেই তাহার মুহুর্মুহু তীব্র আর্ত্তনাদে দেখিতে-দেখিতে নদী-তীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল।

যখন ওপারের কাছাকাছি পুনর্ব্বার পাচুকে দেখা গেল, তখন সে কুন্তীরের মুখে, নিশ্চল। জনতা হায়-হায় করিয়া উঠিল। তাহার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের উপর সূর্য্যের শেষ রক্তরশ্মি জলিতে লাগিল। সূর্য্যকে ভক্ষ্য দেখাইয়া লইয়া কুম্ভীর অদৃশ্য হইয়া গেল—কেবল নারাণী সে দৃশ্য দেখিল না; সে তখন মূর্চ্ছিতা।

টাটা লৌহ-কারখানার কাঁচা উপাদান

শ্রী কালীপদ ঘোষ

লোহা প্রস্তুত কর্‌বার প্রধান উপাদান হচ্ছে লোহার পাথর (iron ore) এবং সেই পাথর থেকে লোহার অংশ বা'র কর্‌বার জন্য আরও কয়েকটি উপাদানের প্রয়োজন। লোহার পাথরকে উত্তাপে গলিয়ে তা'র সঙ্গে আরও দুএকটা জিনিষ মিশিয়ে তা'র ভেজালটুকু বার ক'রে নেওয়া হয়।

লোহার পাথরের সঙ্গে নানা-রকম জিনিষ মিশ্রিত থাকে যথা—এলুমিনিয়াম, ম্যান্‌গানিজ্‌, ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফস্ফরাস্‌, টিটানিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি। আবার লোহার অংশটুকুও খাঁটি লোহা থাকে না, উদজান (oxygen) বাষ্পের সঙ্গে মি'শে অন্য আকারে বহুরূপী-ভাবে থাকে (যথা—FeO_2, FeO_3, Fe_3O_4) এই রূপান্তরিত আকারকে খাঁটিরূপে আন্‌তে এবং ভেজালগুলি দূর কর্‌তে ডলোমাইট্‌ (Dolomite), চূণের পাথর (Lime Stone), ম্যান্‌গানিজের পাথর ও পাথুরিয়া কয়লার প্রয়োজন হয়।

এইসকল জিনিষ কি'নে একটা বিরাট্‌ কার্‌খানা চালানো বড় দুরূহ ব্যাপার, তাই কোম্পানী এই সকল জিনিষের খনি আবিষ্কার ক'রে কাজ চালাচ্ছে।

লোহার পাথর:—লোহার পাথর ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই পাওয়া গেছে, কিন্তু সকলগুলির কাছে কয়লার খনি না থাকায় সেগুলিকে আধুনিক-ভাবে লোহা প্রস্তুতের কাজে লাগাতে পারা যাচ্ছে না। পুরাতন দেশী-ভাবে লোহা প্রস্তুত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই হ'ত, কিন্তু আধুনিকভাবে 'পিগ্‌'লোহা ১৮৭৫ সালে প্রথমে কুল্‌টিতে হয়। এবং ১৯১১ সাল থেকে টাটা কোম্পানী আরম্ভ করে।

লোহার পাথরের খনি টাটা কোম্পানীর অনেক স্থানে আছে। কিন্তু এখন ময়ূরভঞ্জের মধ্যে গরু-মহিষাণীই প্রধান। এই ময়ূরভঞ্জের মধ্যে আরও দুইটি খনি আছে—বাদাম পাহাড় এবং সুলেপাট্‌। সিংভূম জেলায় একটি প্রকাণ্ড লোহার খনি টাটা নিয়েছে, তা'র নাম হচ্ছে জামদা। ময়ূরভঞ্জের তিনটি খনিতেই কাজ চল্‌ছে, আর জামদায় কাজ আরম্ভ হবার চেষ্টা হচ্ছে। এ ছাড়া কেঁওঝোরে কাটামাটি, জোডা (Joda), খোন্দোবন্দ নামে আরও তিনটি খনির কাজ শীঘ্র আরম্ভ হবে।

মধ্যপ্রদেশে বুলিরাজারা, চান্দা প্রভৃতি স্থানেও খুব ভালো লোহার পাথর টাটার অধিকারে আছে, কিন্তু সে-সকল জায়গা থেকে পাথর আন্‌তে অনেক খরচ পড়ে ব'লে সেখানকার কাজ বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এই খনির পাথরেই প্রথম লোহার চুল্লীতে আগুন দেওয়া হয়। গরুমহিষাণীর খনি কাছে থাকার জন্য মধ্য-প্রদেশের খনি বন্ধ ক'রে গরুমহিষাণীরই কাজ চল্‌ছে।

এইসব খনির পাথরে সব জায়গায় সমান লোহার ভাগ থাকে না। এখন চল্‌তি খনির মধ্যে সুলেপাট খুব ভালো, তা'র নীচের গরুমহিষাণী, বাদাম পাহাড়ের পাথর হলুদ রংএর হাল্কা এবং তা'তে লোহার ভাগ কম গরুমহিষাণী ও সুলেপাটের পাথরের রং উজ্জল কা

(specular) দেখ্‌লে খাঁটি লোহার মতন বোধ হয় এবং অত্যন্ত ভারি।

আমদা, জোডা প্রভৃতি স্থানেরও পাথর খুব ভালো এবং এগুলিও কারখানার কাছে।

লোহার পাথরের রং তিন-প্রকার—উজ্জ্বল কালো, ঘোর লাল এবং হলুদ। উজ্জ্বল কাল রং-এর যে সেই-গুলিই সব চাইতে ভালো এবং তা'তে এমন-কি ৭০ থেকে শতকরা ৭২ ভাগ পর্য্যন্ত লোহা পাওয়া যেতে পারে। এর নীচেই হচ্ছে লাল রং-এর পাথর এবং লালের নীচের হচ্ছে হলুদ রং-এর। এই হলুদ রং-এর পাথর চেনা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কারণ তা'তে শতকরা ৩০ থেকে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত লোহা থাক্‌তে পারে। লাল রং-এর পাথর হ'লেই বুঝ্‌তে হবে যে তা'তে কিছু লোহার ভাগ আছে।

কয়লা—লোহার কারখানায় পাথুরে কয়লার অত্যন্ত প্রয়োজন, সেই কারণে সকল সময়ে যাতে কয়লা পাওয়া যায় তা'র বন্দোবস্ত রাখা উচিত। টাটা কোম্পানীর নিজের প্রায় তেরটি কয়লার খনি আছে এবং সে-গুলি ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনির (coal fields) এলাকায়। গ্যাস কয়লা এবং বাষ্পের জন্য কয়লা (steam coal) খুব ভাল-প্রকারের হওয়া আবশ্যক।

গ্যাসের কয়লার (gas coal) জন্য কয়লাতে বাষ্পীয় অংশ (volatile matter) খুব বেশী থাকা প্রয়োজন, এবং steam কয়লার জন্য তাপ উৎপাদক শক্তি (calorific value) বেশী থাকা আবশ্যক। আবার কয়লার মধ্যে গন্ধক এবং ফস্ফরাসের ভাগ বেশী থাকিলে তাহা গ্যাস বা স্টীমের জন্য ব্যবহারের উপযুক্ত নয়; কারণ তা'তে বয়লার (boiler) খারাপ হ'য়ে যায়। বয়লারে (boiler) কাঁচা কয়লা দেওয়া হয়, কিন্তু ব্লাস্‌ট্‌ ফার্নেস (blast furnace) এর জন্যে কোক (coke) কয়লার প্রয়োজন, সেইজন্যে কোম্পানীর আলাদা চুল্লী (oven) আছে।

আবার ব্লাস্‌ট্‌ ফার্নেস ইস্পাত তৈরীর চুল্লী প্রভৃতির জন্য গ্যাসের আগুন প্রয়োজন। কারণ, সাধারণ-ভাবে এইসব চুল্লীর উত্তাপ দুহাজার তিনহাজার ডিগ্রীতে তোলা সম্ভব নয়। আবার এই কয়লাকে কোক কয়লা কর্‌বার সময় যে গ্যাস বেরোয় তা থেকে, আল্‌-কাতারা, অ্যামনসালফেট্‌, বেনজল্‌ প্রভৃতি চোঁয়ানো হয়। কয়লার রং ঘোর কালো, আবার যেগুলো কাল ও চক্‌চকে সেইগুলোই খুব ভালো কয়লা। কিন্তু কয়লার খাদানে কয়লারই মতন এক-রকম পাথর বেরোয় তা'কে বলে শেল্‌ (shale)। সেগুলো খুব নিকৃষ্ট জিনিষ। কয়লার মতন দেখ্‌তে, কিন্তু কোনো কাজের নয়, রংটা তা'র মেটে-মেটে কালো।

ডলোমাইট্‌ এবং চুণের পাথর (lime-stone)

শুধু কয়লা দ্বারা লোহার পাথর থেকে তা'র ময়লা দূর করা যায় না, সেই কারণ লোহার পাথরের সঙ্গে ডলোমাইট এবং চুণের পাথর ব্যবহার করা হয়।

চুণের পাথর এবং ডলোমাইট প্রায় এক-জাতীয় পদার্থ। দুএর মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটিতে চুণের ভাগ বেশী এবং অপরটিতে চুণের ভাগ কম। এ পাথরগুলি দেখ্‌তে ধূসর-বর্ণের কতকটা। এ পাথর প্রায়ই সমতল-ভূমি খুঁড়ে পাওয়া যায়, আবার পাহাড়েও আছে।

এই কোম্পানির ডলোমাইট পাওয়া যায় আমঘাট, কলুঙ্গা, পানপোস্‌ গোমার্ড এবং খোটকুরিবাহালে, এবং চুণের পাথর পাওয়া যায় বারদুয়ার হ'তে। উপরোক্ত জায়গার খনিগুলি সবই গাংপুর করদরাজ্যে এবং চুণের পাথরের খনিটি শাকুটি করদরাজ্যে। এবং সবগুলিই বি, এন, রেলের লাইনের ধারে। অবশ্য এখানকার চুণের পাথর খুব ভালো নয়। অদ্রব অংশের (insoluble residue) পরিমাণ বেশী এবং চুণের অংশ কম। আবার কখনও-কখনও কোম্পানি কাটনী থেকে চুণের পাথর কি'নে আনে। সেখানকার পাথর অবশ্য বারদুয়ারের পাথরের চেয়ে ভালো। এই পাথরে সাধারণতঃ অদ্রব অংশ, লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম, চূণ এবং ম্যাগনেশিয়াম্‌ ও অন্যান্য পদার্থ সামান্য-পরিমাণে থাকে। জুকেহিতে কোম্পানির নিজের খনি আছে, সেখানকার চুণের পাথর ভালো।

ম্যাংগানিজ:—ম্যাংগানিজ অবশ্য খুব কম-পরি-মাণেই আবশ্যক হয়। এ পাথর কতকটা লোহার পাথরের মত, লাল্‌চে কাল রংএর, কিন্তু লোহার মতন উজ্জ্বল নয় (dark brown)। এই পাথরে বালির (silica) লোহা এবং ম্যাংগানিজ্‌ থাকে, কিন্তু এ-ছাড়া অন্যান্য ধাতুও সামান্য-পরিমাণে থাক্‌তে পারে। অবশ্য তাদের পরিমাণ এত কম যে সেগুলিকে পরিত্যাগ করাই চলে। ইহা দানার আকার, এক সঙ্গে জড়িত।

ইহা পিণ্ড লোহা (pig iron) প্রস্তুতের সময় সামান্য-পরিমাণে দেওয়া হয়। ইহা লোহার পাথরের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে ফেরো ম্যাংগানিজ(ferromanganese)প্রস্তুত হয়।

কোম্পানির এই ম্যাংগানিজ্‌এর খনি হ'চ্ছে মধ্য প্রদেশের, রামরামা, কাটানগিরি, বলাগিরি, প্রভৃতি স্থানে, ও নেত্রায় সরকারী অরণ্যে।

ম্যাগনেসাইট্‌:—ইহাও একপ্রকার পাথর, কিন্তু ইহার ভিতরে অনেক শিরা আছে। ইহার রং কটা (brown) কিম্বা সাদা। কতকটা ডলোমাইটের মতন। ইহা লোহা প্রস্তুতের জন্য লাগে না, কিন্তু ইস্পাত প্রস্তুতের চুল্লীর (Hearth) জন্য লাগে। ভিতরে ইহার ইট দিয়া একটি স্তর গেঁথে দেওয়া হয়। কারণ এই ইট অনেক

উত্তাপ সহ্য করতে পারে। এই কোম্পানির ম্যাগনেসাইটএর খনি হচ্ছে মহীশূর রাজ্যে। কারখানা থেকে ১৩০০ মাইলেরও উপর দূরে।

এছাড়া অন্যান্য যে-সব জিনিষের প্রয়োজন অতি অল্প সেসব প্রায় কি'নে আনা হয়। যেমন সিলিকা ব্রিক্, ফায়ার ব্রিক্, ক্রোমাইট (Chromite) গন্ধক, সোরা, সিমেণ্ট, ইত্যাদি।

কয়লার খনি-সংক্রান্ত বিশেষ ক'রে টাটা লৌহ কারখানায় ব্যবহৃত লোহার উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ইত্যাদি নিম্নলিখিত তালিকাগুলিতে দেখানো হ'ল।

লৌহ-প্রস্তর

স্থান	ভূমির পরিমাণ	পাথরের পরিমাণ টন	বিশ্লেষণ লৌহাংশ, ফস্ফরাস্, গন্ধক, অভ্রবাংশ	দাম + টাটানগর পর্য্যন্ত	টাটানগর হইতে দূরত্ব। মাইল
ময়ূরভঞ্জ					
গরুমহিষাণী	৫.১ বর্গমা	৯৫ লক্ষ		টাকা ৩-৩-৬	৪০
বাদাম পাহাড়	৩.৬ ,,	৯০ ,,	৬১.২০ .১৩৩ — ২.৬১	,, ৩-৯-৬	৫৬
সুলাইপাট	২.২ ,,	২৫ ,,	৬৬.৪০ .০৫৬ — ২.৮১	,, ৩-১০-০	৪৭
পূর্ণাপাণি	.৫ ,,	৫১০০০ টন			
সিংভূম					
জামদা ব্লক ১	৩.২ ,,	৮০০ ,,	৬২.৬৬ .০৮২ .০৩০ ৩.৫৯	এগুলির কার্য্য এখনও আরম্ভ হয়নি।	৮১
,, ,, ২-৬	.৫১ ,,	১০০ ,,			৯৮
শাশাংদা ,, ৭	৪.১৫ ,,	১.৫০০ ,,	৬৩.৩৭ .০৫৮ .০১৫ ১.১২		
কেঁওঝোর					
কাটামাটি ব্লক ২	১.৫৮ ,,	৪০ ,,	৬৩.০৪ .০৫ .০২৮ ৩.১৫	১০০ হইতে ১২০	
পশ্চিম জোডা ,, ১০	৪.১৮ ,,	৪০ ,,			
পূর্ব্ব জোডা ,, ১১	২.৪৪ ,,	৪৬০ ,,			
খোন্দোবন্দ ,, ১৩	৩.৫০ ,,	২৭০ ,,			
বাস্তার	৬.৮৬৭ ,,	২৬১০ ,,	৬৬.০০ .০৭৮ .০২২ ১.৫৫	৭-৮-০	৫০৪
মধ্যপ্রদেশ					
ধুলিরাজারা	৮.৭ ,,	৭২ ,,	৬৭.৪৫ .০৬১ .০৮০ ১.০৮		৪০০
চান্দা	৩০৪.১৭ একর		৬৯.৫০ .০১৯ .৩০ .৩২	১৩-৫-০	৫৬৬
* একুনে	৪৪.৭৭৭ বর্গমাইল	৫৫৫০.৭ লক্ষ টন			

* এখানে বাস্তার ও মধ্যপ্রদেশের খনি বাদ দেওয়া হ'ল কারণ সেগুলির কাজ বন্ধ হ'য়ে গেছে।

+ দাম টাটানগর পর্য্যন্ত অর্থ, খনি থেকে তুলবার খরচ রয়েলটি, ও গাড়ি-ভাড়া টাটানগর পর্য্যন্ত নিয়ে।

লৌহ-প্রস্তর বিশ্লেষণ

সাল	অদ্রব অংশ	লৌহাংশ	ম্যাংগানিজ্	ফস্ফরাস্
১৯১৮	৩.৯৯	৬০.৫১	.৬৯	.১১৫
১৯১৯	৪.৯৬	৬০.২৯	.৭৪	.০৭২
১৯২০	৫.৬১	৫৯.৫১	.৬৮	.০৮১
১৯২১	—	—	—	—
১৯২২	৪.৭৮ (Si O2)	৫৯.০৬	.৪৯	.৬৬
১৯২৩	৪.১৫ ,,	৫৯.৮০	.৫১	.০৬৭
১৯২৪	৪.০৩ ,,	৬০.১১	.৫৬	.০৬৬

ডলোমাইট্ এবং চূণের প্রস্তর

স্থান	পরিমাণ একর	পরিমাণ টন	বিশ্লেষণ অদ্রবাংশ, চূণাঙ্গার, ম্যাগ্নাঅঙ্গার $CaCO_3$ ($MgCO_3$	দাম টাটানগরে	টাটানগর থেকে দূরত্ব
জুকেহি					
বিস্তারা	৭০.৯৪	৯০ লক্ষ	৩.১৪, ৯১.৫৫, ৩.৭৪	টাকা ৯-৮-০	৫০০
কাঁচ গাঁও	১৮.৭৫				
গাংপুর করদরাজ্য					
পত্তনি কে	২২৫	ডলোমাইট	২.৫০, ৩০.০০, ২০.০০	৫ ৩-৩	১২১ হইতে
,, এল্	৪০	৮৬০ লক্ষ			১৩৪ মাইল
,, এম্	৬৫				
,, এন্	৫০	চূণের পাথর	৭.৫০ ৪৭.৮৯ ৪.০৮	३-১০-০	
,, ও	২৬০	১৬০ লক্ষ			
,, পি	৫০				
,, জেড্	২৫				
গোমার ডি	৪৭৫	৪৫০ লক্ষ	৪.৭৪, ৩০.৫২, ১৮.৮৮	৬	১২৯ ,,
খোট্কুড়ি বাহাল	৪৩৬	২০০ লক্ষ	৩.৩০, ৩০.৫৩, ২০.০০		১৩৪ ,,
শাক্তি করদরাজ্য					
ডেরাগড়্ হেলাডি	১৬৮.৭৭	১৩ লক্ষ	৫.২৮, ৪০.৩৩, ৩.২৬	৬-১১-৬	২৪৯ ,,
বিলাসপুর					
ডুমার পাড়া রাইপুর অরণ্যাংশ	৯৮.৯০	৪.৬ লক্ষ	৫.৬০, ৪৫.৩১, ৬.৪২	৬-১১-৬	২৪৯ ,,
জোডাপুকুর	১৫০	২.২ লক্ষ	৯.২৯, ৫০.৫৮ ০.৩৩		৪৯

ডলোমাইট্‌এর বিশ্লেষণ

সাল	অদ্রব অংশ	লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম্ Al_2O_3 & Fe_2O_3	চূণ CaO	ম্যাগ্‌নেশিয়া MgO.
১৯১৮	৩.৩৭	.৯২	২৯.৪৮	২০.৮৪
১৯১৯	২.৮৪	.৮৪	২৯.৬৯	২০.৬৭
১৯২০	৩.৫০	.৯০	২৯.৭১	২০.২৯
১৯২১	—	—	—	—
১৯২২	৩.৬১	১.৪৪	২৯.৬৮	২০.০২
১৯২৩	৩.৬৬	১.১৭	২৯.৫৭	২০.৪৫
১৯২৪	৩.৭৫	১.১২	২৯.৮১	২০.৪০

চূণের প্রস্তর

সাল	অদ্রব অংশ	লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম্	চূণ	ম্যাগ্‌নেশিয়া
১৯১৮	৪.২৫	১.১১	৫০.৭৬	১.৮৯
১৯১৯	৩.০৫	.৯৬	৫১.৮৮	১.৬১
১৯২০	৩.৫৮	১.১৭	৫১.৫৫	১.৭২
১৯২১	৪.২০	১.৯০	৫১.০২	১.৫৬
১৯২২	—	—	—	—
১৯২৩	৩.৯৪	১.১২	৫১.২৩	১.০৮
১৯২৪	৫.৮৪	১.৩৭	৪৭.৬৬	৪.১৭

পাথুরিয়া কয়লা

স্থান	ভূমির পরিমাণ বিঘা	টণ পরিমাণ প্রমাণিত	টণ পরিমাণ আন্দাজী	দাম টাটা-নগরে প্রত্যেক টনে	টাটা-নগর থেকে দূরত্ব
জামাডোবা	১১৬২-০-০		জামাডোবা	টাকা—৫-১০-০	১১৭
সিরগুজা	১০-৪-১৪		ও		
ভাতগোরিয়া	৭৬-৫-৬		গুণসাদি		
জোড়া পুকুর	৪৭৫০-০-০	১২৯০ লক্ষ	৪৮৬০ লক্ষ		
ডোংরি	২৪৩৭-১৫-০				
পাতিয়া	২০৯৮-১৮-৪				
ভেলাটাণ্ড	৯৬৩-০-০	১৫ লক্ষ	৪৮৫ লক্ষ	৫-৫-০	১১৭
মালকেরা	১৭৩২-৯-৮	৪০ লক্ষ	১১১৭ লক্ষ		
চৈটোডি	৫০৫-৯-৮				১১৭
সিজুয়া	২৬০০-০-০	৯৪৫ লক্ষ	১৫১১ লক্ষ		১১৭
গুণসাদি	৫৩২-০-০				
পুরুষোত্তমপুর	৩০৬৩ ০-০	৭০০ লক্ষ	৪০৭ লক্ষ		১৪৬
অভিরামপুর	২৩৭১-০-০	২০০ লক্ষ	২০০ লক্ষ		৩৩২
ঝরিয়া	১৩ বর্গ মাইল	—	৫০০ লক্ষ	ইহার কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি।	

কোক্‌কয়লা-বিশ্লেষণ

সাল	জল	ছাই	ভোলাটাইল অংশ	ফিক্‌স্‌ড্‌ কার্‌বন্ (Fixed Carbon) অঙ্গার	গন্ধক	ফস্ফরাস্
১৯১৮	৪.০৫	২১.০৬	১.৯৯	৭৬.৯১	.৬৫	.১৯১
১৯১৯	৫.১৭	২০.৪৬	২.১৩	৭৭.৪০	.৬৩	.১৬২
১৯২০	৪.৫১	১২.১১	১.৮৪	৭৬.০৪	.৫৭	.১৬৪
১৯২১	—	—	—	—	—	—
১৯২২	৩.২১	২৩.৭৯	২.৬৫	৭৩.৫১	৫৬	.২০০
১৯২৩	৫.৩২	২৪.৩১	২.৩০	৭২.৪৪	.৫৬	.১৭৫

ম্যাংগানিজ

স্থান	ভূমির পরিমাণ একর	পাথরের পরিমাণ টন	বিশ্লেষণ বালি (SiO_2) লৌহাংশ (Fe) ম্যাংগানিজ (Mn) ফস্ফরাস্ (P)	টাটানগরে দাম প্রতি টনে	টাটানগর থেকে দূরত্ব মাইল
মধ্যপ্রদেশ					
রামরামা ১ } কাটান্ গিরি ১ }	২১২.৪৫	২১৫, ০০০	৪.২১, ৫.০৫, ৫১.৯৬, .০৩৫	টাকা, ১৪-৪-০	৪৯৩
রামরামা ২	৪৭.৬২				
কাটান্ গিরি II } ওবালা গিরি I }	৬৭৭.৯৫				
কাচওয়া	১৪৮.৮৩				
নেত্রা সরকারী জঙ্গল	৬০০.০০				

ক্রোমাইট্ ও ম্যাগ্‌নেসাইট্।

			বালি SiO_2, Al_2O_3, CaO, ম্যাংগানিজ MgO		
মহীশূররাজ্য					
দুধকানাইয়া	১৪৭.৫০	১০০০, ০০০	১.৮২, .৯৬, ২.৬৭, ৪৪.৭৪ বালি অ্যালুমিনা চূণ ম্যাগ্‌নেশিয়া	টাকা ৩০-০	১০২৯
দুধকাটুর	৪৯.২৫	১০০, ০০০			
সোলাপুর	১৫৩.১৫	১৫০, ০০০			

কাঁচা উপাদান
খনি থেকে চালান দেবার পরিমাণ

	লৌহপ্রস্তর টন	ডলোমাইট টন	চুণের পাথর টন	ম্যাগ্‌নেসাইট
১৯১৮	৩৩৮৯৩৬	৩৪৯৪৪	২২১৬৭	১৪৪১
টাটানগরে দাম	১-৭-৪	১২৩৬৩৬	৭-৫-১	
		৬-১০-৪৩৪-২-১০		
১৯১৯	৪২৯৮৭৩	১৯৩৮৬৩	১৯৮৯৫	২৯৬৩
টাটানগরে দাম	২-০-৪	৪-৮-২	৬-৭-০	২৯-৬-৬
১৯২০	৪০৩৪৫০	১৫৩৫৫১	২৩৯৯৪	১৮৮০
টাটানগরে দাম	২-১০-৬	৫-৫-১০	৭-৪-০	৪৬-০-৬
১৯২১	৪৩৮৮০৮	১৮২৭৯০	৩৬১৬৭	২৬০১
টাটানগরে দাম	২·১২-০	৫-৫-২	৬-১৩-১	৪৫-১১-৮

কাঁচা উপাদান

ধাতু	পরিমিত টন (Estimated Reserve)	প্রতিমাসে আবশ্যক	বৎসরের ব্যয় টন
লৌহ প্রস্তত	৩৩৮০ লক্ষ	৮৩৩০	১০০০০০০
কোক্ করবার কয়লা	৪১০০ „	১০১৭০০	১২২০০০০
কোক্	—	৭২১৮০	৮৭৫৪০০
গ্যাসের কয়লা	৯০৮ „	১৩৫২৫	১৬২৩০০
ষ্টীম্ কয়লা	৩৮৭০ „	২১১৭৬	২৫৪১০০
ডলোমাইট্	১১৪০ „	৩৭১০০	৪৪৫০০০
চুনের পাথর	৩৮ „	৪৩৭৫	৫২৫০০
ম্যাগ্‌নেসাইট্	১৫ „	৪০০	৪৮০০
ম্যাংগানিজ্ পাথর	২ „	২৯৩০	৩৫১৪০
চীনা মাটি (koelin)	—	২০	২৪০
ফ্লুওস্পার	—	১৪৫	১৭৪০
ক্রোমাইট্	—	১৭০	২০০০
ফ্যায়ার ক্লে		৩৬০	৪৩২০

বর্ত্তমানে টাটার কারখানায় ৫টা লোহার তৈরীর চুল্লী (Blast Furnace) চল্‌ছে, তা থেকে pig iron আন্দাজী বছরে ৬,১০,২০০ টন বা'র হ'তে পারে এবং সাতটি পুরাণো ইস্পাত-তৈরীর চুল্লী ও নতুন নতুন Duplex চুল্লীতে বছরে আন্দাজী ৫৭০০০০ টন ইস্পাত তৈরী হ'তে পারে। তবে অবশ্য কার্য্যত (practically) সাধারণত কিছু কম হওয়া সম্ভব।

এখন লোহা তৈরীর চুল্লীতে কি-কি জিনিষ কোন্-পরিমাণে দেওয়া হয় এবং কি-পরিমাণে লোহা (pig iron) তৈরী হয়, তা'র একটি তালিকা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে, চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত উপাদান।

উপাদান	'A' চুল্লী টন	'B' চুল্লী টন	'E' চুল্লী টন	'D' চুল্লী টন
খণ্ড-লোহা (Scrap)	৬৭২.৭	১৯৩	৮৪৭.২	১২০.৯
Scale	—	—	৪২৫.৯	—
লোহার পাথর	১২৭৫৪.২	১৩৬৪৯	১২১৪৪.৪	২০৭৩৩.৩
ম্যাংগানিজ্	১৩৭.১	৩৯	১১৮.৮	৪৫৯.৪
কোক্	১০৬০৬.৭	৩০৩৫	১০৬১৪.৯	১৬২৫৯.৮
চূণের পাথর	৩৬৭৩.৫	১০.৫১	৩৬৯৩.২	—
ডলোমাইট	—	—	—	১০৯৮৫.
উৎপন্ন পিণ্ড-লৌহ (Pig Iron)	৭৮২৮	৮৫২৫	৭৭৫৩	১৩০৩৫
দৈনিক পরিমাণ	২৫২ টন	২৭৫ টন	২৫০ টন	৪২০.৫ টন

কাঁচা উপাদান মিশাবার কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নেই। লোহার পাথরের ভেজালের অংশের পরিমাণ-মত, এবং যে-রকম লোহা তৈরী কর্‌তে হবে, সেই অনুযায়ী অন্যান্য উপাদান মেশানো হয়।

চিত্তবাসন্তী

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত

হে সুন্দরী মর্ম্মব্যথা! কতদিন পরে,
উষা-রজনীর স্নিগ্ধ তারকার মত
জ্যোতিঃস্নাত বসন্তের পথে এলে দেবী,
ছন্দোহীন সুরহীন জড়কণ্ঠে মোর;
হৃদয়ের তপ্ত-তালে না লভিয়া সাড়া
শিরা-মাঝে নাচিয়া উঠিলে; কত রাগ-
রাগিণীর মৌন ব্যথা, গুমরিয়া কাঁদি,
বুকে মোর জাগাইল বেদনাহিল্লোল,
সে কি দেবী তোমার চঞ্চল পদক্ষেপ?
জীবনবাঁশীর কোন্ সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে
ছন্দোবদ্ধ গীতিকার তানে লয়ে মিশি'
কভু উচ্ছ্বসিয়া উঠে আকুল ক্রন্দন

কভু হর্ষে ছেপে ওঠে সমগ্র পরাণ।
দূর অতীতের স্মৃতি কভু আসে মনে
খর স্রোতে ভাসমান শৈবালের মত ;
বালির চরের প্রায় কত দুঃখ সুখ,
কত বেদনার ক্ষত, কত হাসিমুখ,
জন্মজন্মান্তর হ'তে যত ভালোবাসা
ভু'লে গেছি, মনে আছে আরো যতখানি
সব যেন ভেসে উঠে, চকিতে মিলায়
আবার ভাসিয়া উঠে হৃদিসিন্ধু-মাঝে।
স্বপ্নধ্বনি-সম এই দূরাগত তান
কানের অন্তরে এই সঙ্গীত ঝঙ্কার,
নিবিড় এ সুরের নিক্কণ, একি তব
নূপুর-গুঞ্জন দেবী ? সুখদুঃখ সে কি
জীবন-বীণায় তব সুরের আলাপ ?
উড়ায়ে আঁচলখানি দিলে গো পরশ
যদি আজি দক্ষিণের ঝিরি-ঝিরি বায়ে
আকুলিত-মুকুলিত পল্লব-মর্মরে
কহ দেবী, কোথা ছিলে লুকাইয়া তুমি,
এতকাল স্বপ্নহীন গাঢ় সুপ্তিসম
হৃদিশতদল-বৃন্তে গোপনে গড়িয়া
চিরন্তন আনন্দের মধুচক্রখানি,
রস তা'র বিন্দু-বিন্দু সিঞ্চি' প্রাণে মোর
অকস্মাৎ একদিন করিলে মাতাল।
উন্মত্ত যৌবন মম মত্ত হস্তী-সম
প্রবেশিল রক্ষীহীন তপোবন-মাঝে
বিধ্বংসিল তরুলতা। নিষ্কম্প-নিবাত
দীপশিখা-সম অন্তরের যোগাসনে
ধ্যানমগ্ন ভোলা-মহেশ্বর, যেন আজ
কিসের পরশ পেয়ে কাঁপিয়া উঠিল !
নহ তুমি বাহিরের ঋতুলক্ষ্মী শুধু
রসালের চারুগন্ধ নূতন মুকুলে
পেয়েছি তোমার গন্ধ, অশোককলিকা
রাগ-দীপ-শিখা জ্বালি তোমারে দেখায় ;
ভ্রমর-গুঞ্জনে শুনি তোমার সঙ্গীত
তোমারে ধরিতে চাই, মায়া-মৃগ-সম
রূপ তব রূপান্তরে খেলিয়া ভুলায়।
চক্ষুকর্ণনাসা মোর বাহিরে-বাহিরে।
যত ধায় খুঁজিতে তোমায় রূপমাঝে,
ক্লান্ত শ্রান্ত ব্যর্থ হ'য়ে ফি'রে-ফি'রে আসে।
কিন্তু ঐ রূপ তব শব্দ গন্ধ গান
নহে মায়া নহে মরীচিকা ; স্পর্শে তব
আনন্দে অমৃতে বিশ্ব পূর্ণ হয় মোর।
নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয়-পথে যদি পেতে হবে
তোমায় অতনু দেবী, তবে ওষ্ঠপুটে
কেন মোর প্রিয়া করে সুধার সিঞ্চন,
মৃগী কেন মৃগ মুখে চক্ষুটি বুলায়,
জ্যোৎস্না কেন সুধা-স্নাত করে বসুন্ধরা,
নদী কেন আপনারে নিঃশেষ করিয়া
ঢেলে দেয় অবিরত সাগরের বুকে ?
এ লীলার মাঝে নিত্য আমি লভি যে গো
তোমার পরশ দেবী, সে ত মিথ্যা নয়।
সে নহে ছলনা। যোগাসনে যোগীন্দ্রের
ধ্যান তুমি ভাঙো ; চিরগুপ্ত বিরহিণী
কে তুমি গো হৃদে বসি' তপ্তশ্বাসে মোর
ভোগ-ক্ষুধা জাগাও নিয়ত ? তবু ভোগে
ভোগ নাহি মিটে ! কে তুমি গো নীলাম্বরে
ঢেকেছ শরীর ? শুধু অঙ্গ-আভাটুকু
হয় যে বাহির, মন্ত্র মুগ্ধ করে প্রাণ
অন্তরে-বাহিরে ; যেন উদাসীর মত
আছাড়ি' পরাণ মোর কাঁদে অবিরত
সন্ধ্যালোকে নদীতীরে চক্রবাক সম ;
দিবারাত্রি সুপ্তিহীন জাগরণ মম !
ওগো মৌন, কথা কও, কথা কও রাণী,
অন্তরে জ্বালিয়া দিব্যপ্রেমজ্যোতিখানি।

পঞ্চশস্য

শ্রী সজনীকান্ত দাস

ঘরে বসিয়া ঘোড়ায় চড়া :—

ঘোড়ায় চড়িলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নিয়মিতরূপে চালিত হইয়া শরীরের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। বস্তুতঃ অশ্বারোহণ ও সন্তরণ ব্যায়ামের সেরা। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট কুলিজ প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে অশ্বারোহণ করিয়া শরীর পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা জীবিত অশ্ব নহে ও অশ্বারোহণ কাজটি ঘরে বসিয়াই সম্পাদিত হয়। ফরমায়েস দিয়া তিনি লোহা ও কাঠের একটি ঘোড়া নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়। পাশের ছবিতে প্রেসিডেন্ট



প্রেসিডেন্ট কুলিজ ও তাঁহার ঘোড়া

কুলিজ ও তাঁহার ঘোড়াটিকে দেখান হইয়াছে। এক হর্স পাওয়ারের মোটরের শক্তিতে ইহা চলে। মাথায় স্যুইচ টিপিলেই ঘোড়া চলিতে স্বরু করে। ঘোড়ায় চড়িলে যেমন সামনে পিছনে উপরে নীচে ঝাকানি লাগে ইহাতেও ঠিক সেইরূপ লাগে। ইচ্ছামত বিদ্যুতের শক্তি বাড়াইয়া অতি দ্রুতও ঘোড়া ছোটান যায়।

—

দোষীর শাস্তি :—

মানুষে একবার কি দুইবার পদস্খলন হইলেই সে যেন একেবারে সমাজবহির্ভূত হইয়া পড়ে। যে মানুষ একবার কয়েদ খাটিয়াছে তাহাকে লোকে ভয়ে ভয়ে দূরে রাখে। এই নির্ম্মম ব্যবহারে অনেক সময় তাহারা মনের সমস্ত সদ্‌গুণগুলি হারাইয়া সত্য সত্যই পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। নিউইয়র্কে কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি কয়েদী আসামীদের শাস্তি না দিয়া নানা প্রকারে সমাজহিতকর কাজ দিয়া সৎপথে আনিবার চেষ্টা



এডুইন জে কুলা

করিতেছেন ও সফলকামও হইয়াছেন ; এডুইন, জে কুলা ইহাদের মধ্যে একজন। ইঁহার বিশ্বাস শতকরা পঁচাত্তর জন দোষীকে সহজে সৎপথে আনা যায়।

—

আগুল্‌ফলম্বিত চুল :—

আগুল্‌ফলম্বিত চুলের কথা আমরা কাব্য-সাহিত্যেই পড়িয়া থাকি - আমাদের দেশে খুব লম্বা চুল আজকাল বড় একটা দেখা যায় না ; ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও কচিৎ দেখা যায়। শ্রীমতী নিকফুসেক সম্প্রতি একটি লম্বা চুলের প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছেন।



আগুল্‌ফলম্বিতচুল

তিনি ওয়াস প্রদেশের বাক্‌লী সহরের অধিবাসী। তাঁহার চুলের দৈর্ঘ্য ৭৮ ইঞ্চি, চুল খোলা থাকিলে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।



শ্রীমতী সেৎসু-টাকামুরা

—

দৌড়ে জাপানী বালিকা :—

জাপানে শ্রীমতী সেৎসু-টাকা-মুরা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছেন। তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর তিনি ১৩ সেকেণ্ডে ১৩৪ গজ দৌড়াইয়াছেন।

—

বিদেশে ভারতীয় বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য :—

পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় শিল্পকলা দিনে দিনে প্রসার লাভ করিতেছে। এমন কি, সে দেশের অনেকের ভারতীয় প্রস্তরমূর্ত্তি-সংগ্রহের বাতিক হইয়াছে। এক এক দল বিদেশী ভ্রমণকারী আসিয়া অসম্ভব মূল্য দিয়া ভারতীয় কলাশিল্পের নিদর্শনসমূহ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিদেশী যাদুঘরগুলিতে ভারতীয় এমন সব মূর্ত্তি রক্ষিত আছে যাহার নমুনা আমাদের দেশেও আর নাই। বোষ্টোনের চারু শিল্পের যাদুঘরে (Museum of Fine Arts, Boston) ভারতের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ চমৎকার ভাস্কর্য্য সমূহ রক্ষিত আছে। সম্প্রতি সেখানে ডাক্তার ডেন-ম্যান, ডব্লিউ রস সাহেব কতকগুলি চমৎকার ভারতীয় জাভা ও শ্যামদেশীয়

এবং কাম্বোডীয় মূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি বুদ্ধমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই মুখ দুইটির প্রতিচ্ছবি দেওয়া হইল। প্রথমটি বালু-প্রস্তর নির্ম্মিত ও সম্ভবতঃ ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির অঙ্গ। ব্যাটাভিয়ার বরবুদর স্তূপ হইতে উহা সংগৃহীত। খুব সম্ভব এই মূর্ত্তি অষ্টম শতাব্দীতে জাভাদ্বীপে নির্ম্মিত হয়। এই বরবুদর স্তূপ প্রাচীন বৌদ্ধদিগের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। সম্প্রতি পাশ্চাত্যদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই স্তূপকে তন্ন তন্ন করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছেন ও উল্লেখযোগ্য কিছু পাইলেই সযত্নে তাহা স্বদেশে চালান করিয়া নাম কিনিতেছেন। বরবুদর স্তূপের মধ্যের স্তূপটি ফাঁকা এবং সম্ভবতঃ তাহাই আসল স্তূপ। কিন্তু স্তূপনির্ম্মাণকালে এক দিক ক্রমশঃ বসিয়া যাওয়ায় সেদিকে পাশাপাশি অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্তূপ



বরবুদর]　　　বুদ্ধমুখ　　　[জাভা, ৮ম শতাব্দী
মিঃ রস কর্ত্তৃক সংগৃহীত

[নির্]ম্মাণ করিয়া আসল স্তূপটি রক্ষা করা হইয়াছে। মধ্যের স্তূপটিতে [এ]কটি বৃহৎ অসম্পূর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। অন্য প্রত্যেকটি স্তূপে একটি করিয়া [ধ্যা]নী বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় মুখমূর্ত্তিটি শ্যামদেশীয় ও সম্ভবতঃ [দশ]ম কি একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। থাই (Thai) কলাশিল্পের [ই]হা একটি নিদর্শন। এই শিল্প কিরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা [দু]ইটি মুখের পার্থক্য দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহা চাকচিক্য ও মসৃণতায় ... নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এই মূর্ত্তিটি প্রায় নিখুঁত বলিলেই হয়। ... নাসিকা ও ওষ্ঠাধরের রেখা সুস্পষ্ট কিন্তু কপাল ও ভ্রূ যেন সম্পূর্ণতা ... করে নাই।

শ্যামদেশীয় কলা-শিল্পের ক্রমবিকাশ প্রণিধানযোগ্য। এ, স্যালমণি [প্রণ]ীত 'শ্যামে ভাস্কর্য' (Sculpture in Siam, London



বুদ্ধমুখ　　　[শ্যাম, ১১শ শতাব্দী
মিঃ রস কর্ত্তৃক সংগৃহীত

1925) নামক পুস্তকে ধ্যানীবুদ্ধ, দীপঙ্করবুদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণনা আছে।

—

পৃথিবীর প্রাচীনতম নগর উর :—

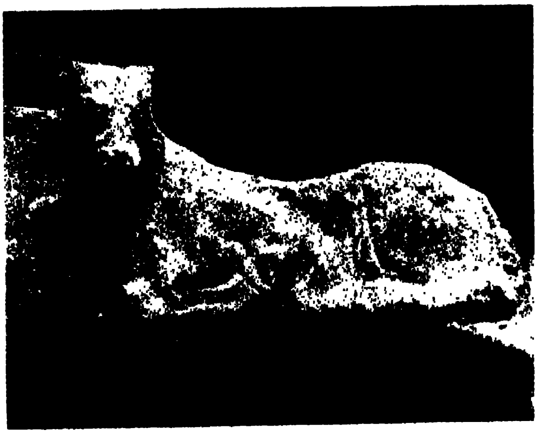
বাইবেলের জেনেসিসের বর্ণিত একাদশ অধ্যায়ে আছে যে এব্রাহাম ও তাঁহার আত্মীয়গণ পিতৃভূমি 'ক্যাল্‌ডীয়দের উর' পরিত্যাগ করিয়া প্রভূত পর্য্যটনের পর ক্যাননভূমিতে উপস্থিত হন। উর সম্বন্ধে আর কোথায়ও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত বিখ্যাত উর নগরীর কথা এতকাল বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতি-হাসিক হেরোডোটাস কিম্বা প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার ধর্ম্মযাজক বেরোসাসের লিখিত ইতিবৃত্তে উরের কোনো উল্লেখ নাই। যাদুবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া ক্যাল্‌ডীয়গণের নাম করা হইত কিন্তু তাহাদের নগরীর কথা এক বাইবেলের এব্রাহামের গল্পের মধ্যে ছাড়া কোথায়ও দৃষ্ট হয় না।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই প্রাচীন নগরী নবাবিষ্কৃত হয়। পারস্য উপসাগর হইতে শতাধিক মাইল দূরে ইউফ্রেটাস নদীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত মরুভূমিতে আকার-প্রকারহীন বৃষ্টি-ধৌত একটি আবর্জ্জনার স্তূপ আছে বলিয়া জানা ছিল। এই স্তূপের আশেপাশে তীরের ফলার মত অদ্ভুত লিখনাঙ্কিত ইষ্টক দৃষ্ট হইত। যখন এই লিখনগুলি উদ্ধার করা হইল তখন জানা গেল যে এই বৃহৎ স্তূপ ও আশে পাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্জ্জনার ঢিপিগুলি এব্রাহামের জন্মভূমি উর নগরীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ইষ্টক লিপিগুলি প্রাচীন ব্যাবিলোনের ভাষা।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই আবিষ্কার সম্বন্ধে কাজ বিশেষ কিছুই অগ্রসর হয় নাই। ইংরেজ সৈন্য ব্যাবিলোনিয়া অধিকার করিবার পর প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি ওই দিকে পতিত হয়। গত তিন বৎসর ধরিয়া মেজর সি. এল. উলীর নায়কত্বে ব্রিটিশ যাদুঘর ও পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই স্তূপের আশেপাশে খনন করিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন।

মেজর উলী যে কেবলমাত্র চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের, এব্রাহামের সমসাময়িক মন্দির ও প্রাসাদ আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে তিনি তাহা হইতেও বহু শতাব্দী পূর্ব্বের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এব্রাহাম শৈশবকালে যখন উরে তাঁহার আত্মীয়দের কাছে মানুষ হইতেছিলেন তখনই নগরীটি দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন ছিল; এবং তখনই দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া সহরটি সভ্যতা ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রস্তর লিপি (যাহা পাওয়া গিয়াছে) উরের অনতিদূরে টেল-এল ওবিদ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ টেল-এল-ওবিদ উর নগরের সহরতলী ছিল। এই শিলালিপি প্রথমে কোনও মন্দিরের ভিত্তিতে গ্রথিত ছিল। উরে তৎকালীন প্রচলিত অদ্ভুত চিত্রলিপন সেই ক্ষুদ্র শিলা-খণ্ডটির উপর লিপিবদ্ধ ছিল। পেনসিল-



টেল-এল-ওবিদে প্রাপ্ত তাম্রনির্ম্মিত বৃষ :
(মাথাটি ঢালাই করা ও শরীরটি পেটা।)



শঙ্খ-নির্ম্মিত বৃষ
(টেল-এল-ওবিদে নিন-হার-সাগের মন্দিরে প্রাপ্ত।)



সম্ভবতঃ খৃঃ পূ ২৮০০ সালের নির্ম্মিত মূর্ত্তি
(উরে প্রাপ্ত)



মন্দিরগাত্রে চূণ-পাথরে নির্ম্মিত পাখী
(টেল-এল-ওবিদে নিন-হার-সাগের মন্দিরে প্রাপ্ত)

ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা সেই লিপি উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে লিখিত আছে যে উরের তৎকালীন সম্রাট আ-আন-নি পদ্ম দেবী নিন-হার-সাগের নামে ওই মন্দির উৎসর্গ করিলেন। প্রায় চৌষট্টি শতাব্দী পূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০ তে উহা লিখিত হইয়াছিল।

খননকালে কতকগুলি আশ্চর্য্য শিল্প কলার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটির ছবি দেওয়া হইল।

নিন-হার-সাগের বৃহৎ মন্দিরগাত্র ও বিস্তৃত অঙ্গন এবং অন্যান্য প্রাসাদগুলিও চিত্রিত বা খোদিত দৃশ্য দ্বারা মণ্ডিত। উরে প্রাপ্ত মূর্ত্তি ও ছবিগুলির মধ্যে ঢালাই ও পেটা তাম্র নির্ম্মিত একটি চমৎকার খোদিত মূর্ত্তি আছে। একদল বৃষের শোভাযাত্রা তাহাতে দেখান হইয়াছে। জমাট আলকাতরার উপর শামুকের খোলের টুকরা দিয়া নির্ম্মিত অন্যান্য অনেক দ্রব্যও আছে। সম্ভবতঃ এই জমাট আলকাতরা কেরোসীন তেলের প্রস্রবণের কাছাকাছি পাওয়া যাইত। আজও ব্যাবিলোনিয়াতে এইরূপ আলকাতরাখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এই বস্তুই শিল্পীদের কাজে লাগিত।

বিখ্যাত সুমেরিয়ান জাতি উর নগর স্থাপন করে। এই সুমেরীয়গণ নিশ্চয়ই প্রাচীন ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী ছিল। ইহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতগণ ব্যাবিলোনিয়ায় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া সমাহিত ইহাদের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। সুমেরীয়দের আদিম বাসস্থান সঠিক জানা যায় না। খুব সম্ভবতঃ তাহারা ভারতবাসী এবং বোধ হয় ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাযোগে ভারতমহাসাগর ও পারস্যোপসাগরের কূলে কূলে এখানে উপস্থিত হয়।

প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে বোধ হয় ৫০০০-৪০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুমেরীয়গণ ব্যাবিলোনিয়াতে আগমন করে। তথাকার অসভ্য আদিম অধিবাসীগণ তখন উপসাগরের তীরসন্নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করিত। সুমেরীয়গণ প্রথম সেখানে সভ্যতা বিস্তার করে। তাহারা লিখিতে ও প্রস্তরে খোদাই করিতে জানিত। তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহার করিত, বস্ত্রাদির ব্যবহার অবগত ছিল এবং মহিষ প্রভৃতি পশুগণকে বশ করিতে পারিত। তাহাদের রাজা ছিল, জ্ঞানী পুরোহিত ছিল ও তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিত।

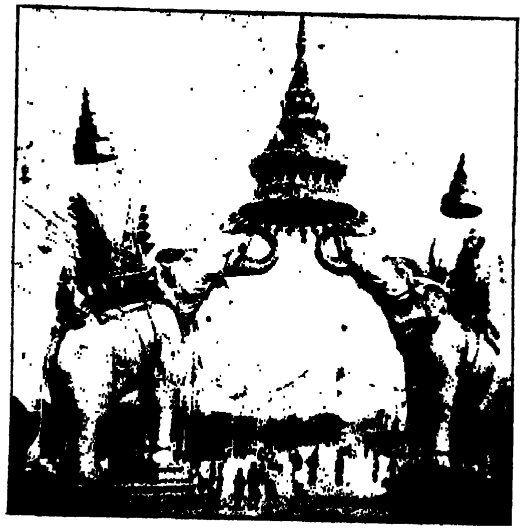
সম্ভবতঃ ৪৫০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কি আর দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইউফ্রেটীস নদীর উপত্যকা ভূমিতে অন্ততঃ পাঁচটি নগর স্থাপিত হয়। উর তাহার মধ্যে একটি। সাগরের উপকূল তখন আরও উত্তরে ছিল এবং উর সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর ছিল। ধীরে ধীরে নদীর পলি পড়িয়া সমুদ্র ভরাট হইতে থাকে এবং এই নগরটিকে সমুদ্র হইতে শতাধিক মাইল তফাৎ করিয়া দেয়। আরো কিছু দক্ষিণে হরিদু নামে একটি সহর ছিল। পূর্ব্বে লাগাশ ও ৩০ মাইলের মধ্যে হরেক ও লার্সা সর্ব্বশুদ্ধ এই পাঁচটি সহর জুড়িয়া সুমেরীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় এবং ইহাই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ।

তখন হইতে আব্রাহামের জন্ম পর্য্যন্ত ২৫ শতাব্দী ধরিয়া সুমেরীয় দেশে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। রাজার পর রাজা ও রাজবংশের পর রাজবংশ রাজত্ব করিতে থাকে। পরিশেষে পশ্চিমের এক পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে সেমাইট নামে এক জাতি আসিয়া এই দেশ অধিকার করে ও পরাজিত জাতির ভাষা শিল্পকলা ও সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। সমৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধি হইতে থাকে। নগরীর পর নগরী স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ ব্যাবিলোন ইহার অন্যতম। উহা আরো ১০০শত মাইল উত্তরে ইউফ্রেটীস নদীর তীরে অবস্থিত। পরিশেষে এব্রাহামের সময়ে এই ব্যাবিলোনীয় উপত্যকা বিংশাধিক নগরী-সম্বলিত হইয়া ব্যবসায় ও শিল্প কলায় পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়ায়।

—

শ্যামের নূতন সম্রাটের অভিষেক :—

শ্যামের বৌদ্ধ সম্রাট ষষ্ঠ রামের দেহত্যাগের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার প্রজাধিপকের ব্যাঙ্কক রাজপ্রাসাদে অভিষেক হইয়াছে। কথিত আছে ইঁহারা গৌতমবুদ্ধের বংশধর। নূতন সম্রাট অক্সফোর্ডে ও আমেরিকায় শিক্ষিত। পরলোকগত সম্রাটও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন ও শতাব্দীব্যাপী মজ্জাগত বহু কুসংস্কারের উচ্ছেদ করিয়াছেন; তন্মধ্যে বহু-



অভিষেক উৎসবে শ্যামদেশের পথ-সজ্জা

বিবাহ একটি। তিনি পালি ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন ও চমৎকার নাটক রচনা করিতে পারিতেন। নূতন সম্রাটের অভিষেককালে রাস্তাগুলি কেমন চমৎকার সজ্জিত করা হয় তাহার নমুনা দেওয়া হইল। শ্বেতহস্তী মূর্ত্তি শ্যামে মঙ্গলের চিহ্ন।

—

টার্কি-রমণীর রূপান্তর :—

দেড়শত বৎসরের মধ্যে টার্কীর মেয়েদের কি আশ্চর্য্য দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই এই ছবিটিতে দেখান হইয়াছে।



১৫০ বৎসরে বোরকা হইতে গাউন
টার্কীর মেয়েদের পরিবর্ত্তন

জাপানের শিশুসাহিত্য :—

জাপানের শিশুসাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা বুঝিয়াছে শৈশবের শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা ও ভবিষ্যতের জাতিগঠনের একমাত্র উপায় শিশুকে গড়িয়া তোলা। জাপানে শতাধিক শিশুদের মাসিক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। মূল্য খুব অল্প। কাট্‌তি খুব বেশী। বিলাতের মত শিশুদের জন্য সেই সব কাগজে অদ্ভুত আজগুবী ছবি দেওয়া হয় না। সাধারণ ছেলেমেয়েদেরই ছবি দেওয়া হয়। এই সাময়িক পত্রিকাগুলিতে সমস্ত সচিত্র গল্প দেওয়া হয়। সারা মোফাট



জাপানী শিশু-পত্রিকার প্রচ্ছদপট

গেন্ধ নামক একটি আমেরিকার মহিলা জাপানের শিশু সাহিত্য আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন "পাশ্চাত্য দেশের শিশুরা যেমন অদ্ভুত অবাস্তব কিম্বা বীভৎস ছবি পছন্দ করে জাপানের শিশুরা তেমন করে না ; তাহারা মনোহর বাস্তব ছবি পছন্দ করে। শিশুসাথী (কো দোমো নো টোমো) নামক একটি পত্রিকার প্রচ্ছদপট দেখানো হইল।

সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ শৈশবে :—

এটি সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার পৃষ্ঠে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ছবি। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন ওয়েল্‌সের যুবরাজ ছিলেন এই ছবি তখনকার।

—



মায়ের পিঠে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ

সোক্রাটেসের প্রতিমূর্ত্তি :—

কোনও এক বিখ্যাত জার্ম্মান লেখক কিছুকাল পূর্ব্বে মত প্রচার করেন যে আমরা আজকাল প্রতিমূর্ত্তি বলিতে যাহা বুঝি প্রাচীনকালে



সোক্রাটেস্

তাহার প্রচলন ছিল না। কোনও বিখ্যাত লোকের মূর্ত্তি গড়িবার সময় তাহার আসল আকৃতি না গড়িয়া তাঁহার গুণগুলি প্রকটিত করিবার জন্য আদর্শ মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা হইত। কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটিশ যাদুঘর (British Museum) সোক্রাটেসের এক প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাতে এই মতটি খণ্ডিত হইয়াছে। সোক্রাটেসের মৃত্যুর অন্ততঃ এক শতাব্দীর মধ্যে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। যদি জার্ম্মাণ মতটি ঠিক হয় তবে বলিতে হইবে সোক্রাটেস্ তাঁহার সমসাময়িক লোকদের চক্ষে কামুক, সৌন্দর্য্যহীন ও গুণহীন পুরুষ ছিলেন। কিন্তু লণ্ডন টেলিগ্রাফ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

প্রাচীন কালে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যাঁহাদের ভাব ও চিন্তার ধারা মানুষকে জ্ঞানসম্পন্ন করিয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে কেহই সোক্রাটেসের ন্যায় জনসাধারণের পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা আপনাদের ভাবের ঘোরে মগ্ন থাকিতেন। সেই জন্য লোকে তাঁহাদের চিন্তাগুলির সঙ্গেই পরিচিত হয় আসল ব্যক্তিটির কোনই খোঁজ লয় না। এরিষ্টটল কেমন ছিলেন, জেনো কেমন কথা বলিতেন, এপিকিউরাসের পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল এ প্রশ্ন কাহারও মনে উদিত হয় না অথচ গ্রীকভাষা জানে না কিম্বা সোক্রাটেসের দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হাজার হাজার লোক সোক্রাটেসের জীবনের বহু কথা জানে। অবশ্য বিখ্যাত প্লেটো তাঁহার শিষ্য হওয়ার দরুন্ তাহার পরিচিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল কিন্তু প্লেটো তাহার আদর্শ চরিত্র যথার্থ চিত্রিত করিয়াছেন কিনা সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত জীবনের বৈচিত্র্যের মোহ লোককে পাইয়া বসে। একজন সিনিক (Cynic) বলিয়াছিলেন যে 'সোক্রাটেসের দৈহিক কদর্য্যতাই তাঁহার যশের কারণ। সুন্দর চেহারার লোকে যশস্বী হইতে পারে না।' সত্যই হয়ত তাই। সব দিক দিয়া নিখুঁত চেহারাসম্পন্ন লোকে সাধারণের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে না যেমন অদ্ভুত চেহারা বিশিষ্ট লোকে করে। এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই সোক্রাটেস সাধারণের প্রিয়। প্লেটো লিখিয়াছেন সোক্রাটেসের কদর্য্য কামুকের চেহারা ছিল; তিনি হ্রস্ব, স্ফীতোদর, স্থূলকণ্ঠ, ভাঁটা-চক্ষু, বক্রনাসা পুরুষ ছিলেন। রোমীয় যুগের প্রতিমূর্ত্তিসমূহেও আমরা এই আকৃতির পরিচয় পাই। কিন্তু আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ইনিই কি শীত কি গ্রীষ্ম খালিপায়ে খালিগায়ে এথেন্সের পথে পথে যাহাকে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেন; এবং ক্রীতদাস অপেক্ষা কষ্টকর জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু নবাবিষ্কৃত এই প্রতিমূর্ত্তিটি দেখিলে মনে হয় যে তিনি সুপুরুষ না হইলেও বীভৎস ছিলেন না। তাঁহার মুখ ও দৃষ্টি ধীশক্তির পরিচায়ক এবং সম্ভবতঃ ইহাই তাহার যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি।

পরিচ্ছদ-বিপ্লব

শ্রী উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রাচীনকালে ভারত-ভূমি যখন অসভ্য জাতির আবাস-স্থল ছিল, যখন তাহাদের বংশধরগণ গৃহহীন অবস্থায় জঙ্গলে ও পর্ব্বত-কন্দরে অবস্থান করিত, তখন তাহাদের কোনো-প্রকার পরিচ্ছদাদি ছিল না। তাহারা উলঙ্গ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ তৎকালীন কোনো ইতিহাস অদ্যাবধিও নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইয়া তৎসময়কে প্রাগৈতিহাসিক কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

ভীল, কোল, মুণ্ডা, টিবেটো-বার্ম্মান্ ও কোলেরিয়ান্ প্রভৃতি অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ আপন-আপন উলঙ্গ অবস্থাকে ঢাকিবার নিমিত্ত বৃক্ষ-পত্রাদি ব্যবহার করিত। অতঃপর এইসমস্ত জাতিকে বিতাড়িত করিয়া দ্রাবিড়গণ যখন তাহাদের স্থানে উপনীত হইল, তাহারাও তাহাদেরই ন্যায় উলঙ্গ অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিল। এই দ্রাবিড়গণও কখনও বা অত্যধিক শৈত্য-প্রযুক্ত বৃক্ষ-বল্কল ও বৃক্ষ-পত্রদ্বারা আপন-আপন গাত্র-রক্ষা করিত, কখনও বা গাত্রাদি রঙীন্ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। এই শরীর-রক্ষার প্রচেষ্টার পরিণামই পরিচ্ছদ-ধারণ।

অতঃপর যখন আর্য্যগণ ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করিলেন, তখন হইতে পরিচ্ছদ-প্রচলন। এই পরিচ্ছদ কে, কোথায়, বা কখন্ সৃষ্টি করিল, কেহ বলিতে পারে না। আর্য্যগণের সঙ্গে-সঙ্গে অসভ্য আদিম অধিবাসিগণও পিতৃপিতামহের উলঙ্গ অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া বৃক্ষপত্র দ্বারা অঙ্গসৌষ্ঠব পরিবর্দ্ধন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা কখন-কখন বা বৃক্ষ-বল্কলেও গাত্রাচ্ছাদন আরম্ভ করিল। বৈদিক ভারতীয় কালেও সেই বল্কলের ব্যবহার দেখা গিয়াছে।

ডক্টর মোক্ষমূলার ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্থির করিয়া গিয়াছেন, খৃঃ পূঃ ২৪৪ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ভারতের

মহাকবি কালিদাস তৎকালীন কাব্য-জগতের উদীয়মান কবি ছিলেন। তাঁহার শকুন্তলা-নামক নাটকে দেখা যায়—দুষ্মন্ত কথাপ্রসঙ্গে শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া যখন তাহার রূপমাধুরী পান করিতেছিলেন, সেই সময় শকুন্তলার পরিধেয় বল্কল কটিদেশে দৃঢ়সম্বন্ধহেতু কষ্টানুভব করিতেছিল। এই সময় আমরা বল্কলের উল্লেখ দেখিতে পাই এবং মনে হয় সেই বল্কলেরই ব্যবহার তৎকালীন মুনিদের আশ্রমে প্রচলিত ছিল।

দ্রাবিড়গণের সেই নূতন পরিচ্ছদাদির আদর দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তাহারা অশিক্ষার শান্তিময়ী ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াও বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে উলঙ্গ অবস্থাতে সন্তোষ-প্রাপ্ত না হইয়া শরীরাচ্ছাদনের উপায় খুঁজিতেছিল। তাহারা পরিচ্ছদ কখনও দেখে নাই, কিম্বা পাইবার প্রত্যাশাও করে নাই। কিন্তু নবানুসন্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহাদের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিল।

ভারতের বৈদিক যুগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে তৎকালীন পরিচ্ছদাদির ব্যবহার দেখিতে পাই—ঋগ্‌বেদে বয়ন-বিদ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালেও নানাপ্রকার বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত।

ঋগ্‌বেদে আমরা দেখি—

"মূষো না শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ
স্তোতারম্‌ তে শতক্রতো বিত্তম্ মে অস্য রোদসী।"

হে শতক্রতু! যেমন মূষিক সূত্রখণ্ড ছেদন করে, তেম্‌নি দুঃখ আমার অন্তর ছেদন করিতেছে।

"সায়ণ" তাঁহার টীকায় বলিয়া গিয়াছেন, বয়নার্থ সূত্রে যে মাড় প্রদত্ত হইত, উহা মূষিকের একটা উৎকৃষ্ট খাদ্য ছিল। ইহাতেও বয়নবিদ্যার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তখন যজ্ঞকালে তদুপযোগী দ্রব্যাদি আবরণার্থে নানাবিধ ছোটো-ছোটো বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত।

ঋগ্‌বেদের ৫ম, ২৯ ও ১৫ শ্লোকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের বর্ণনা আছে—"ভদ্রেব বস্ত্রা সুকৃতা।"

ঋগ্‌বেদের ১০ম, ১১, ৪ শ্লোকে দেখি—"জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ।"

ঋগ্‌বেদের ৮ম, ৪৬ ও ৩৩ খণ্ডে উত্তমবস্ত্রপরিহিত দাসীর বর্ণনা দেখিতে পাই।

তৎকালে পরিচ্ছদাদি সাধারণতঃ ভেড়ার লোমদ্বারা নির্ম্মিত হইত।

ঋগ্‌বেদের ১০ম, ২৬ ও ৬ শ্লোক পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই তখনও বয়ন ও রেশমের নির্দ্দেশ আছে।

ঋগ্‌বেদের ১ম, ৩১, ১৫ শ্লোকে দেখিতে পাই, পাট বা শণের বস্ত্রনির্ম্মিত বক্ষস্ত্রাণ ব্যবহৃত হইত। আবার ৫ম, ১০১ ও ৮ শ্লোক পড়িয়া দেখি, তন্নির্মিত রেশমের একপ্রকার কাপড়ও ব্যবহৃত হইত, উহাকে তার্পা বলা হইত।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণ আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বে ধুতিচাদর ব্যবহার ব্যতীত অপর কোনো পরিচ্ছদের ব্যবহার জানিত না।

পরন্তু ইহা একটি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় যে, তৎকালীন ধনশালী ব্যক্তিগণও শুধুমাত্র ধুতি-চাদরে সন্তুষ্ট থাকিত। বস্তুতঃ সীবন-বিদ্যা যে তখনও প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। (Wilson's Rig-Veda, Vol. II, p. 280 and IV, p. 60)

আমরা তৎকালীন গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, বৈদিক যুগের আর্য্যগণ নানাবিধ পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিত। তাহারা যে ভিতরের পোষাক ব্যবহার করিত, উহাকে নীবি বলা হইত। (অথর্ব্ববেদ-৮ম, ২, ও ২৬।) ইহার উপরে যে-কাপড় ব্যবহৃত হইত, উহাকে বাসস্ বলিত; এবং সর্ব্বোপরি যে কাপড় বা পোষাক ব্যবহৃত হইত, উহাকে অধিবাস বলা হইত" (ঋক্, ১ম, ১৪০ ও ৯)। এই অধিবাসের অপর নাম ছিল "অৎক ও দ্রাপি"। এতদ্ব্যতীত যখন তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইত তখন তাহারা যে একটি রেশমের গাত্রাবরণ ব্যবহার করিত, উহাকে তার্পা বলিত। মস্তকাচ্ছাদনার্থে যে বস্ত্র ব্যবহৃত হইত, উহাকে "ওপশ" বলিত। (ঋগ্‌বেদ ১০ম, ৮৫-৮) কেহ-কেহ, যথা অধ্যাপক ব্লুম্‌ফিল্ড, এই ওপশকে ওড়্‌না বলিয়া গিয়াছেন। (Hymns of the Atharva-Veda, p. 538, 39)

এইসকল বিভিন্ন পোষাক পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় তৎকালে এতদ্দেশে সীবন-বিদ্যা (tailoring) প্রচলিত ছিল।

অমরকোষ-গ্রন্থে দেখিতে পাই, বৈদিক যুগের সীবন-বস্ত্র (tailored cloth) ব্যবহৃত হইত, উহাকে সৌচিক বলা হইত। যাহারা ইহা প্রস্তুত করিত, তাহারা পরিশেষে একটি নীচজাতি হইয়াছিল। শুনা যায় তাহারা বৈশ্য পিতার ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। অদ্যাবধিও এই জাতি কাশীতে বর্ত্তমান আছে।

ঋগ-বেদে ২য়, ৩,৬, ৩৮, ৪ ও ৬ষ্ঠ ৯২ শ্লোকে দেখা যায়, স্ত্রীলোকগণও বয়ন-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

ভগবান্ মনুর স্মৃতি-গ্রন্থের ৩।৫২, ৭।২১৭ ও ১১।১৮১ শ্লোকে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। তৎকালে কার্পাস, রেশম ও পশমী বস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। তাহারা জল প্রক্ষালনদ্বারা কার্পাস বস্ত্র, এবং ক্ষারজ মৃত্তিকাদ্বারা রেশমী ও পশমী বস্ত্র বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন।

উক্ত গ্রন্থের ১০ম অধ্যায় ৩৫ ও ৫২ শ্লোকে নিষাদ চণ্ডালাদি হীন জাতীয়ের মৃতের চেলী পরিধানের বিধি আছে দেখা যায়।

মহাভারতেও নানাপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদেহরাজ নল বনে যখন দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি একখানা বস্ত্রের অর্দ্ধ আপন অঙ্গে রাখিয়া লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন।

তখন যদি বস্ত্রের প্রচলন না থাকিত, তবে বোধ হয় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্ভব বলিয়া মনে হইত না।

মহাভারতের সাবিত্রী-উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্যবান্ ও সাবিত্রী বনে গমন করিলে পর যখন সত্যবানের শিরোবেদনা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন তিনি বস্ত্রদ্বারা মস্তক বন্ধন করিতে আপন ভার্য্যাকে বলিয়াছিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডব-সভায় গমন করিয়া ভ্রমবশত কূপমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। এক্ষেত্রেও আমরা বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই।

মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৫ম খণ্ডের ১৬ ও ১৭ শ্লোক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তৎকালে বয়ন-বিদ্যার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

রামায়ণ যুগেও আমরা দেখিতে পাই, তৎকালে নানাপ্রকার বস্ত্রাদি প্রচলিত ছিল।

বালকাণ্ডে দেখা যায়, রামের পরিণয়-কালে জনকরাজ প্রভূত রেশম বস্ত্রাদি বিতরণ করিয়াছিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ডের ৩য় সর্গের ১৯ শ্লোকে দেখি, দশরথ যোদ্ধাদিগকে পরিষ্কার বসন পরিধানপূর্ব্বক অন্দর-মধ্যে থাকিতে আদেশ করিলেন।

ঐ সর্গে আবার ৭ম শ্লোকে দেখিতে পাই রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত দশরথ কহিলেন—"আপনারা কল্য প্রভাতে মহীপতির অগ্নিহোত্র গৃহে ঘৃত, মধু, লাজ, অনেক সদ্যোজাত বস্ত্র, রথ প্রভৃতি যথাযোগ্য স্থানে রক্ষা করিবেন।

অযোধ্যাকাণ্ডের ৪র্থ সর্গে দেখা যায়, রাম মাতা-কৌশল্যার গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি তাঁহার রাজলক্ষ্মী কামনা করিয়া ক্ষৌমবাস পরিধানপূর্ব্বক, দেবালয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া দেবতার আরাধনা করিতেছেন।

ঐ কাণ্ডের ৬ষ্ঠ সর্গের ৭ম শ্লোকেও ক্ষৌমবস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

ঐ কাণ্ডের ত্রিংশ সর্গে ১৪ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, রাম বনে গমন-কালে যখন সীতাদেবীকে নিবৃত্ত করিতেছিলেন, তখন তিনি রামকে বলিয়াছিলেন, "স্বামিন্! তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণ-শয্যায় শয়ন করা অপেক্ষা তোমার বিরহে বিচিত্র কম্বলাস্তরণে শোভিত শয্যায় শয়ন করা কি সমধিক সুখজনক হইতে পারে?"

এখানেও আমরা পুরাকালের বয়ন-বিদ্যার পরিচয় পাই, আবার এই সর্গেই দেখিতে পাওয়া যায়, যখন সীতা-দেবী বনে গমনের জন্য রামের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, তখন রামচন্দ্র কহিয়াছিলেন, "আমার সকল

মহামূল্য ভূষণ, উত্তম উত্তম বস্ত্র প্রভৃতি ভৃত্যবর্গকে প্রদান করো।"

ঐ কাণ্ডের ২৪ সর্গের ১৪ শ্লোকে দেখা যায়, রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন-কালে রাজা দশরথ গণনা-পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের উপযুক্ত বস্ত্র ও আভরণ দিয়াছিলেন।

ঐ কাণ্ডের অষ্টসপ্ততিতম সর্গের ৬ শ্লোকে দেখা যায়, কুব্জা অঙ্গে চন্দন লেপনপূর্ব্বক রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান করিয়া যথাস্থানে সেই-সেই বহুবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়াছিল।

রামায়ণে অরণ্য-কাণ্ডের ৪৬ সর্গে তৃতীয় শ্লোকে দেখা যায়, রাম মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল এবং লক্ষ্মণ রামের ত্রাণার্থে গমন করিলে লঙ্কার রাজা দশানন রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে উপস্থিত হইলেন। সে উত্তম গৈরিক-বসন পরিহিত ছিল।

অরণ্য-কাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গের ১৪, ১৫ শ্লোকে দেখি, তখন বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ পীতবর্ণ কৌশেয়-বসন-পরিধারিণী রাজনন্দিনী সীতা অতীব শোভান্বিতা বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা ধারণ করিলেন। রাবণ তাহার বায়ুসঞ্চালিত পীতবর্ণ বসনদ্বারা অগ্নি-প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় সমধিক বিরাজমান হইল।

এই কাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গের ২।৩ শ্লোকে দেখা যায়, রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা সীতা পথি-মধ্যে রামকে না দেখিয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান-প্রধান পাঁচটি বানরকে দেখিতে পাইলেন এবং রামের নিকট তাহারা সংবাদ বলিবে ইহা মনে করিয়া তাহাদিগের নিকটে নিজের স্বর্ণপ্রভ উত্তরীয়, কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে দ্বাদশ সর্গের ১৫ শ্লোকে দেখা যায়, তখন সুগ্রীব বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়ভাবে কটিদেশ আবদ্ধ করিয়া ত্বরিতবেগে নগরের নিকট গেল।

"সুগ্রীবোঽপ্যনদদ্ ঘোরং বালিনোহ্বানকারণাৎ।
গাঢ়ং পরিহিতোর্ব্বেগাদ্নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্॥

এই কাণ্ডে সপ্তদশ সর্গের ১৬ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় সুগ্রীবকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া পরম ক্রোধনস্বভাব বীর্য্যবান্ বালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিল।

সুন্দরকাণ্ডে নবম সর্গের ৩৩ শ্লোকে দেখা যায় যে, হনুমান লঙ্কানগরীতে গমন করিয়া দেখিল, তথাকার স্ত্রীগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা—তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র বিচিত্রবর্ণ।

ঐ কাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গের ৬ শ্লোকে দেখি, রাবণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে কোপনস্বভাব রাক্ষসগণ জীর্ণ কার্পাস-বস্ত্র দ্বারা হনুমানের লাঙ্গুল বেষ্টন করিতে লাগিল।

ইহা দেখিয়াও প্রমাণিত হয় তখনও কার্পাসবস্ত্রের প্রচলন ছিল। এই সর্গেরই ২৬ শ্লোক বলিয়া দিতেছে যে, তখনও বসন ব্যবহৃত হইত। এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, হনুমান সীতা-সাক্ষাদনন্তর রাম-সন্দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়া অরিষ্ট-নামক পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন। তখন ঐ পর্ব্বত বিশাল ভূর্জ্জ-তরু-শোভিত নীলবর্ণ বনরাজি রূপ বসন পরিধান করিয়া, শৃঙ্গসংলগ্ন মেঘস্বরূপ উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক, প্রীতিনিবন্ধন দিবাকরকররূপ শুভকর-স্পর্শে যেন তত্রত্য বস্তু-সকলকে জাগরিত করিতেছে।

এই কাণ্ডের নানা শ্লোকে আলোচনা করিয়া দেখা গেল, তৎকালে নানাপ্রকার বস্ত্রাদির বহুল প্রচলন ছিল।

লঙ্কাকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, দশানন রাম-কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইলে তাহার আত্মীয়গণ রাক্ষসরাজকে ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করাইয়া সুবর্ণময় দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইলেন।

আবার অপর শ্লোকে দেখা যায়, বিভীষণ স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রেই বিধিপূর্ব্বক তিল- ও দর্ভ-মিশ্রিত উদকাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

আবার ঐ কাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় রাবণ-বধান্তর সীতাদেবী স্নানান্তে উত্তম বসন ও অলঙ্কার পরিধান-পূর্ব্বক রাম-সন্নিকটে প্রয়াণ করিলেন।

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, সীতাদেবী আগমন করিলে রাম বিভীষণকে কহিয়াছিলেন, গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর অথবা এরূপ লোকাপসারণ স্ত্রীলোকের আবরণ নহে।

দেশ-বিশেষের জলবায়ু-অনুযায়ী পরিচ্ছদাদির বৈশিষ্ট্য

লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, তাই এদেশবাসিগণ ধুতিচাদর ও ঢিলা জামা ব্যবহারে অভ্যস্ত। আবার এতদ্দেশেই যে-স্থান একটু শীতপ্রধান বলিয়া মনে হয় তথাকার অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত গরম জামা ও মস্তকাচ্ছাদনার্থ উষ্ণীষ কিম্বা পাগ্‌ড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইংলণ্ড্ শীত-প্রধান দেশ। সে-দেশবাসিগণ তদনুযায়ী গরম পরিচ্ছদাদির ব্যবহার করিয়া থাকে। তবে জগতের নিয়ম চিরস্থায়ী নহে। মানবের রুচিও একই-প্রকারের নহে বরং পরিবর্ত্তনশীলই দেখা যায়। কাজেই কাল-স্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে রুচিও পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল।

এই জগতে প্রত্যেক জাতির এক-একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক জাতি আপন-আপন নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে। যখন কেহ আপন দেশ হইতে পরদেশে গমন করে, তখন সেই পরদেশবাসী তদ্দেশে সমাগত ব্যক্তিকে তাহার পরিচ্ছদ দ্বারা চিনিয়া লন। সুতরাং পরিচ্ছদ জাতীয়তার প্রধান সাক্ষ্য এবং বৈশিষ্ট্য। তাই ধুতিচাদর ভারতবাসীর প্রকৃষ্ট চিহ্ন। উচ্চনীচ সকলেই ধুতিচাদর ব্যবহার করিত বটে, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা ধনী ছিলেন, তাঁহারা মূল্যবান্ দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন। তখন রাজা-মহারাজগণ অতি মূল্যবান্ স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আপন-আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন।

ধুতিচাদর ভারতবাসীর সারল্য ও আড়ম্বর-বিহীনতার পরিচায়ক। যাহারা যেমন লোক তাহাদের পরিচ্ছদাদিও তদ্রূপ। শ্রেণীভেদে যে পোষাকেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, উহা কেবল এতদ্দেশেই নহে, জগতের সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে।

যেমন ইংলণ্ডে দেখা যায়, রাজার পোষাক (royal dress), মন্ত্রীর পোষাক (minister's gown); সৈন্যের পোষাক (soldier's dress), চাকরের পোষাক ইত্যাদি, তদ্রূপ ভারতেও পোষাকের বিভিন্নতা বর্ত্তমান আছে। রাজা-মহারাজগণ বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার সভাসদ্‌গণ মর্য্যাদানুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রাজসভা সমুজ্জ্বল করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলী মন্ত্রপূত উপবীত-শোভিত সমুন্নত দেহে শুভ্র ধুতিমাত্র পরিধান করিয়া একখানি উত্তরীয়মাত্র স্কন্ধদেশে রক্ষা করিতেন। কৃষকগণ ও নানা নিম্ন-শ্রেণীর অধিবাসিগণ ধুতি পরিধান করিত বটে, কিন্তু তাহারা যে ধুতি ব্যবহার করিত তদ্দ্বারা তাহাদের সম্পূর্ণ নগ্নতা দূরীকৃত হইত না। তাহারা কখন বা উত্তরীয়ের ন্যায় স্কন্ধদেশে একখানা নাতিক্ষুদ্র বস্ত্র রক্ষা করিত; তদ্দ্বারা উত্তরীয় ও গামছার কার্য্য সাধিত হইত। অদ্যাবধি সেই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে।

পোষাক-পরিচ্ছদ বলিলে যে জিনিষটি বুঝায়, তাহা যে এতদ্দেশে ছিল না তাহা নহে। সীবন-বিদ্যার প্রচলন যে পুরাকালেও ছিল, পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণের বালকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, রামের পরিণয়ান্তে সীতাদেবী যখন অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন রেশমের পরিচ্ছদাদি তাঁহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

এদেশবাসিগণ বাহ্যিক পারিপাট্য আদৌ পছন্দ করিত না। পরিচ্ছদ-পারিপাট্যে এদেশ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করিলেও বয়ন-বিদ্যায় যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই; তাহার একটি প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

পাশ্চাত্য-মতে মিশরের সভ্যতা সকল দেশের সভ্যতার আদিভূত। কিন্তু সেই প্রাচীন মিশরেও ভারতের শিল্প কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সে-বিষয়ের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল। প্রাচীন মিশরের মৃতদেহ-রক্ষার যে-প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে দৃষ্ট হয়, তত্রত্য ধনবান্‌গণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎকৃষ্ট শিল্প-সম্পদে ও বস্ত্রাদিতে সেই দেহ আবৃত করিতেন। ১৪৬২ বৎসর পূর্ব্বে মিশরীয় রাজগণের অষ্টাদশ রাজবংশের পরিসমাপ্তি। কবরে যে-সকল মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই মস্‌লিন বস্ত্রে আবৃত ছিল দেখা গিয়াছে। আর সেই মস্‌লিন ভারতজাত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ইজেকিএল গ্রন্থাংশে লিখিত আছে—বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া গিয়াছিল; সেইসকল

পণ্যদ্রব্যের মধ্যে নীলবর্ণ বস্ত্র, জরির কাজ-করা মূল্যবান্ পরিধেয়, গজদন্ত ও আব্‌লুশ কাঠ ছিল।

সাধারণত আমরা দেখিতে পাই, যাহারা যে জিনিষটাকে পছন্দ করে, তাহারা কেবল সেই আদৃত দ্রব্যের উৎকর্ষ-সাধনে ব্যস্ত হয়।

পরিচ্ছদাদির পারিপাট্যে ও তাহার উৎকর্ষ-সাধন করা যে একটি উত্তম কলা-বিদ্যা—এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মানবগণ যেমন আপন-আপন সুবিধা-অসুবিধার বিচার করিতে সক্ষম হইল, তেমন তাহারা আপন-আপন আবশ্যকতানুযায়ী পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিল।

রোম-নগরী যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, রোমের রমণীগণের নিকট তৎকালীন ভারতীয় রেশ্‌মী জিনিষ অতি আদরের দ্রব্য ছিল।

যদিও তখন পরিচ্ছদ-কলা-বিদ্যার আদর তত ছিল না বটে, কিন্তু মানবগণের শিক্ষা ও সভ্যতার শীর্ষস্থানের অধিকারী হইতে হইলে যে-সকল উত্তম কলা-বিদ্যার অধিকারী হওয়া আবশ্যক, ভারতবাসী সেই-সকল কলা-বিদ্যার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছে।

ভারতের অত্যুৎকৃষ্ট-রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্রাদির নিমিত্ত সুদূর সপ্তসমুদ্রের উপকূলস্থিত,পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্ভাসিত মানবমণ্ডলীও হস্তপ্রসারণ করিয়া উৎকণ্ঠিত-চিত্তে অবস্থিতি করিতেন। ঢাকার মস্‌লিন্, কাশীর রেশম জগদ্বিখ্যাত লোভনীয় সামগ্রী।

তামিল ভাষার প্রাচীন কাব্যগ্রন্থাদির নানা স্থানে এতদুল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাণ্ড্য-বংশীয় রাজা চেলিয়ানের রাজত্বকালে ভারত হইতে বহুদূর দেশে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রেরিত হইত।

ছোটনাগপুরের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার হিউরেট (Mr. Hieuret) আদিম জাতিসমূহের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের জন্য প্রখ্যাত। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ হইতে বাবিলনে "মস্‌লিন্" রপ্তানি হইত। এই মস্‌লিন্ বাবিলনে সিন্ধু-নামে পাওয়া যায়। এইসকল বস্ত্র বাবিলনে (Babylon) ব্যবহৃত হইত। মিস্টার হিউরেট্ উহা সমুদ্র-পথে সংবাহিত হইয়াছিল বলিয়া, উহার নাম "সিন্ধু" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তথাকার বস্ত্রাদির তালিকায় এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এমন-কি, সভ্যতার উচ্চ শিখরে সমাসীন ও সভ্যাগ্রগণ্য গ্রীক্ জাতিও খৃঃ পূঃ ৪৮০ সংবতেও ভারতীয় মস্‌লিন্ ব্যবহার করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

মস্‌লিন্ বস্ত্রের তিরোধান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সমকক্ষ বস্ত্রাদি অদ্যাবধিও জগতের কোনো জাতি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া কোনো ইতিহাস সাক্ষ্য-প্রদানে অসমর্থ। ভারতের বস্ত্রাদি যেরূপ চিত্তাকর্ষক ছিল, তদ্রূপ চিত্তাকর্ষক সামগ্রী আর কোথায় মিলিবে?

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা-অনুযায়ী পরিচ্ছদ পারিপাট্য যেমন সুরুচি ও শিক্ষাসম্মত, অপর দিকে তেমনি ইহা সভ্যতার পরিচায়ক। ভারতবাসী পাশ্চাত্য আব্‌হাওয়া প্রাপ্ত হইয়া সেখানকার পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেছে; ভারতবাসী মুসলমান-রাজত্বে ইস্‌লামের অনুকরণে আপন দেশ-মর্য্যাদা ও পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া নব স্রোতে গা ভাসাইয়াছিল।

ভৃত্য সদাই তাহার প্রভুর অনুগত ও তাহার চাল-চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ অনুকরণ করিতে প্রয়াসী।

এদেশে ধুতি-চাদরের স্থানে পাজামা ও চোগা-চাপ্‌কানের সৃষ্টি হইল; আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতানুযায়ী যেমন ভারতবাসী রাজ-দরবারে উপনীত হইলে কিম্বা রাজকার্য্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলে ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদাদি ধারণ না করিলে চলে না, তদ্রূপ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও মুসলমান রীতি-নীতি-অনুসারে তদ্দেশীয় পোষাক ধারণ করিতে হইত। এখনও দেখা যায় মুসলমানগণ তাহাদের নিজ-নিজ জাতীয় পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করে; ভারতবাসীও পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী সেই বৈদেশিক চোগা-চাপ্‌কান, শিরোয়ানী প্রভৃতি পরিধান করিতেছেন।

তৎকালীন পরিচ্ছদ-মধ্যে চোগা, চাপ্‌কান, শিরোয়ানী, আচ্‌কান, তুর্কী কোট, ঢিলা পাজামা ও চুড়ীদার বা আঁটা পাজামার প্রচলন ছিল। এই চুড়ীদার পাজামা হইতে আমাদের চুড়ীদার পাঞ্জাবীর সৃষ্টি হয়। মুক্তারাট

ঢিলা থাকিলে ঝুলিয়া পড়ে ও কাজ করিতে নিতান্ত অসুবিধা, তাই ইহাকে চুড়ীদার করা হয়।

পুরাকালে তুর্কিস্থানের অধিবাসিগণ যে কোট ব্যবহার করিত, উহাকে টার্কিশ্ কোট অথবা ইংলিশ মতে ফ্রক্ কোট বলা হয়। তবে পুরাকালে যে-সকল কোট ব্যবহৃত হইয়াছিল, ঠিক সেই কোটই অধুনা প্রচলিত নহে; কিন্তু সেই জিনিষটিই সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

পাঞ্জাবের ও তৎসন্নিকটস্থিত প্রদেশসমূহের মুসলমানগণ অদ্যাবধিও চুড়ীদার ও ঢিলা পাজামা ব্যবহার করে, এবং তাহাদের গাত্রে শিরোয়ানী ও টার্কিশ্ কোট দেখা যায়। আধুনিক মাড়োয়ারীগণের গাত্রেও শিরোয়ানী দৃষ্ট হয়। বিশিষ্ট হিন্দু-মহোদয়গণ ও পদস্থ ব্যক্তির গাত্রে চোগা-চাপ্কান সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীগণ ও ইংরেজগণ যখন এদেশে রাজ্যবিস্তার আরম্ভ করিল, ভারতবাসী তাহাদের পূর্ব্ব-বিজেতা মুসলমানগণের পরিচ্ছদাদি ও আচার-ব্যবহার পরিহার করিয়া, ফরাসী ও ইংরেজগণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতীয়গণ চোগা-চাপ্কানের পরিবর্ত্তে হ্যাট্-কোটের উজ্জ্বল কিরণে শোভিত হইলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের বিশিষ্টতার অবসান হইল। তাহারা দেখিল, বিদেশীয় পোষাক পরিলেই রাজ-সম্মান ও রাজানুগ্রহ লাভ করা যায়।

রাষ্ট্রজগতে বর্ত্তমান ভাবের ধারা

কি-কি ভাবের ধারা বর্ত্তমানে রাষ্ট্রজগতে আন্দোলন তুলিতেছে তাহা নির্দ্দেশ করাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিশেষ নূতন-কিছু বলিবার নাই; এসম্বন্ধে রাষ্ট্রনীতির পুস্তকেরও অভাব নাই, তবুও ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, কেননা, বাঙ্গলা ভাষায় এইপ্রকার পুস্তক এখনও প্রচুর হইয়া উঠে নাই। বৈজ্ঞানিক (Academic) আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি সরল কথায় কয়েকটি জিনিষ বলিতে চাই যাহা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার কাছে সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

যে-তিনটি ভাবের তরঙ্গ বর্ত্তমানে রাষ্ট্রজগৎকে সচকিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা এই :—(১) স্বাধীনতা (Liberty), (২) জাতীয়তা (Nationalism) ও (৩) অন্তর্জ্জাতীয়তা (Internationalism)। সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনতার আলোচনা করা যাউক।

স্বাধীনতা বলিতে এক কথায় আমরা বুঝি অনধীনতা (absence of restraint), আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করিবার ক্ষমতা, অর্থাৎ তাহা করিবার পথে কোনো বাধা না থাকার যে-অবস্থা, তাহাকেই আমরা স্বাধীনতা মনে করিয়া থাকি। ইহা স্বাধীনতা সন্দেহ নাই, এবং ইহাই মানবজীবনের কাম্য স্বাধীনতা হইতে পারিত, যদি পৃথিবীতে একের সহিত অন্যের সম্পর্ক না থাকিত, যদি সবাই নিজের মত একলাই একস্থানে পরিপূর্ণ-ভাবে বসবাস করিতে পারিত এবং অন্য জনমানবের বা সমাজের কাছে তাহাদের কোনো প্রয়োজন না থাকিত। কিন্তু মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক, অর্থাৎ কিনা, দলবদ্ধ ও সমাজবদ্ধ হইয়া থাকাই তাহার রীতি; সুতরাং এইপ্রকার স্বাধীনতা কিছু থাকা সম্ভবপর নয়। আমি হয়ত এক-জনকে চপেটাঘাত করিতে চাই, কিন্তু সে-ব্যক্তি আমার চপেটাঘাত বরণ করিতে অনিচ্ছুক, এরূপ অবস্থায় এক-জনের সেই অনধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। হয় আমি প্রবৃত্তি-অনুযায়ী তাহাকে চপেটাঘাত করিতে পারিব না, অথবা তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে আমার চপেটাঘাত

সহ্য করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং বাধাহীন স্বাধীনতা (absolute liberty) বা অনধীনতা সামাজিক বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর বা যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা যায় না, বস্তুত ইহাই যথেচ্ছাচার (licence)।

তবে, প্রকৃত স্বাধীনতা কি? জিনিষটি বুঝিতে হইলে আমাদের আরও একটু ভিতরে ঢুকিতে হইবে। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই মানুষ সমাজবদ্ধ ও সকল স্থানেই তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত, প্রজাদের সমষ্টিগত ক্ষমতার উপর তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত; সুতরাং তাহার প্রভাব যে-কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় হইতে অনেক বেশী। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভিতর সর্ব্বপ্রথম আমাদের নজরে পড়ে রাজশক্তি, সেই রাজশক্তির আজ্ঞাই বিধি বা আইন (law)। আইনের প্রধান লক্ষ্য পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করা। চোরকে চুরি হইতে নিবৃত্ত করে এই আইন, ডাকাতকে পরদ্রব্য লুণ্ঠন হইতে প্রতিহত করে এই আইনের রাজশক্তি। ইহাতে চোর বা ডাকাতের অনধীনতা খর্ব্ব করা হয় বটে, কিন্তু যাহাদের স্বোপার্জ্জিত ধনরত্নাদি রক্ষা হইল, তাহাদের স্বাধীনতা বর্দ্ধনই হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, আইনের উদ্দেশ্য সর্ব্বজনীন স্বাধীনতা খর্ব্ব করা নয়; পরন্তু সকলকে নির্ব্বিবাদে স্বাধীনতা উপভোগ করিতে সুবিধা করিয়া দেওয়াই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এমনও অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজশক্তি তাহার ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া লোককে জোর করিয়া স্বাধীনতা দান করিয়া থাকে, যাহাকে Rousseauর কথায় বলিতে হয় "forced to be free."। এই-প্রকার স্বাধীনতার সুবিধা করিয়া দিবার সময় অনেকেই রাষ্ট্রের কার্য্যের ভুল অর্থ করিয়া থাকেন, অনেকে ইহাকে রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই দ্বিতীয় চিন্তায় বুঝিতে পারেন যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা। একটা সোজা দৃষ্টান্তে জিনিষটা বুঝিয়া লওয়া যাউক। কলিকাতায় বড়-বড় রাস্তার মোড়ে পুলিশ দাঁড়াইয়া পথিকগণের গতিবিধি পরিচালনা করিয়া থাকে, তাহা আমরা সবাই দেখিতে পাই। আমি হয়ত একটা বিশেষ প্রয়োজনে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইয়া যাইতেছি, রাস্তায় পুলিশ আমাকে থামাইল, অন্য পথের কতক গাড়ী যতক্ষণ না চলিয়া গেল ততক্ষণ আমায় মোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। আমি হয়ত মনে-মনে তখন খুবই বিরক্ত হইব, কিন্তু উপায় নাই, আইনভঙ্গে শাস্তি। হঠাৎ আইনের অত্যাচারের কথাটাই চট্ করিয়া আমার মনে আসিবে, ও আইন অযথা আমার স্বাধীন কার্য্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে মনে করিয়া আমি বিরক্ত হইয়া উঠিব। কিন্তু একটু ভাবিলে আর আমার তাহা মনে হইবে না। আমি যদি ইচ্ছামত অগ্রসর হইবার স্বাধীনতাটুকু নির্ব্বিবাদে সেখানে ব্যবহার করিতে পারিতাম, তবে হয়ত অন্য রাস্তার একটি লরী আসিয়া আমার গাড়ীর উপর পড়িয়া তাহা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিত; সুতরাং ইচ্ছামত অগ্রসর হইবার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া লরীর ধাক্কা হইতে অব্যাহতি পাইবার স্বাধীনতা আমি লাভ করিলাম, ও তাহা এই আইনেরই জন্য।

তা'র পর স্বাধীনতা উপভোগ করিতে হইলে কতকটা শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজন। তাহার অভাবে লোকে কোন্‌টা স্বাধীনতা কোন্‌টা অধীনতা তাহা বিচার করিয়া লইতে পারে না। ক্রীতদাসগণকে যখন মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব হইল, তখন তাহারা সম্মিলিত এই আবেদন জানাইয়াছিল যে, তাহারা নিজেদের অবস্থায়ই তুষ্ট রহিয়াছে, তাহারা অন্য কোনো অবস্থার ভিতর গিয়া পড়িতে চাহে না। তখন যদি তাহাদের ইচ্ছানুরূপ ছাড়িয়া দেওয়া হইত, অর্থাৎ কিনা তাহাদের সেই দাসত্বের ভিতর থাকিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে এমন কথা কখনও বলা চলিত না। মানুষের স্বভাব রক্ষণশীল, তাহাদের মন চিরদিনই পরিবর্ত্তনের বিরোধী। নূতন কিছুর ভিতর গিয়া পড়িলেই (বিশেষতঃ যখন সে নূতন অবস্থার কথা একেবারেই অজানা) অনেক অসুবিধা, সুতরাং আমাদের দেশে যে কথা আছে "সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো" এই মনোভাবই সর্ব্বত্র মানুষকে পাইয়া বসে। দ্বিতীয়তঃ

মানুষ সাধারণতঃ দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে চাহে না, সবাই জানে যে,ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্ব আসিয়া ঘাড়ে জুটিবে। এই দায়িত্বের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেক সময় লোকে স্বাধীনতার ইচ্ছা মন হইতে দূর করিয়া দেয়। ক্রীতদাসগণ খুবই বুঝিত যে, তাহাদের অবস্থা কষ্টদায়ক, কিন্তু যে-অবস্থায় তাহারা আছে তাহা তবু জানা, তাহা ছাড়িয়া একেবারে অজ্ঞাত অবস্থায় (যে-অবস্থা তাহাদের সন্দিগ্ধ-মনে আরও কষ্টদায়ক বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল) গিয়া পড়িতে তাহাদের ইচ্ছা হইতেছিল না। অশিক্ষিত মনে স্বাধীনতার মত্ততা তাহাদের পাইয়া বসিতে পারে নাই। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে নারীর অবস্থাও তদ্রূপ; তাই দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রতিবাদ করিতেছেন নারীরা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিগত শক্তির সমষ্টিতে রাষ্ট্রের শক্তি। সুতরাং তাহা প্রবল বলে বলীয়ান ও সমাজের বিধি সংরক্ষার্থ অপরাধীদিগকে শাস্তি বিধান করিতে সমর্থ। ব্যক্তি মাত্রেরই রাষ্ট্রের সহিত এই সম্পর্ক যে রাষ্ট্র রক্ষার্থ যাহা-কিছু প্রয়োজন সমস্তই ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকলকেই দিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহারা পাইবে জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা (security of life and property) ও স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা কথাটা লইয়াই যত কিছু গোল। কি কি বিষয়ে রাষ্ট্রের ব্যক্তির উপর হস্তক্ষেপ করা বিধেয় ও কতটা করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে ও কতখানি অগ্রসর হইলে তাহার স্বাধীন কার্য্যকলাপে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হয়—এই প্রশ্ন লইয়া নানা দলে প্রভূত বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে ও এখনও সে-বিষয়ে কেহ একমত হইতে পারেন নাই।

একদল আছেন যাঁহারা অরাষ্ট্রবাদী (anarchist),* তাঁহারা রাষ্ট্রের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, বরঞ্চ রাষ্ট্রের ভিতর সমাজের যত-কিছু অমঙ্গল দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা রাষ্ট্র তুলিয়া দিতে চাহেন ও প্রত্যেক লোককে স্ব-স্ব বিবেকের কাছে ছাড়িয়া দেওয়ার যুক্তি দেন। মানুষরা খারাপ, এধারণাটাই মূলতঃ ভুল, বরঞ্চ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মানুষ স্বভাবতঃ ভালো; আইন, বিধি, দণ্ড, সামাজিক অসাম্য ও অবিচার তাহাকে খারাপ করিয়া তোলে। মানুষ স্বভাবত অন্যকে খুন করিতে প্রবৃত্ত হয় না, পরের জিনিষ অপহরণ করাও মানুষের স্বভাবের ভিতর নহে। ডাকাতদের ভিতরও কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে যাহা তাহারা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রতিপালন করিয়া থাকে। চুরি জিনিষটা অন্যায় বটে, কিন্তু ইহা অন্য একটা অন্যায়েরই প্রতিবাদ, বর্ত্তমান কালের অর্থ-বণ্টনে সাম্যের লেশগন্ধ নাই, ইহা মুষ্টিমেয় লোককে বা সম্প্রদায়কে সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। যাহাতে মুষ্টিমেয় লোক নিজেদের অন্যায়লব্ধ ধনবৈভব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহারা স্বীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) আইনত স্বীকার্য্য করিয়া লইয়াছেন ও তাহা ভঙ্গে ভঙ্গকারীকে শাস্তি বিধান করিবার জন্য রাষ্ট্রকে চালিত করিয়া থাকেন। যদিও সকলের শক্তি-সমষ্টিতে রাষ্ট্রের স্থিতি, তথাপি রাষ্ট্র এই মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই চলে ও তাঁহারা নিজেদের সুবিধার জন্য ইচ্ছামত আইন-কানুন করিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিয়া যদি সম্পত্তি সর্ব্বত্র সমাজের হইত, (যাহা এক-কথায় কাহারও নয় অথচ সকলেরই,) তবে চুরি কথাটার কোনো অর্থ থাকিত না। এই দলের একজন লেখক একটি চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়াছেন, চিত্রটি এইরূপ। "কোনো মাঠে একদল পাখী বসিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতেছে; কিন্তু কেহই সেই সংগৃহীত খাদ্য উপভোগ না করিয়া এক-কোণে জমাইয়া রাখিতেছে তাহাদের মধ্যে একটি অকর্ম্মণ্য পাখীর জন্য, সেই পাখী ক্ষমতায় হয়ত তাহাদের প্রত্যেকের হইতে দুর্ব্বল, তবু সে খাইয়া যাহা উচ্ছিষ্ট রাখিতেছে তাহা খাদ্যসংগ্রহকারীরা খাইয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেছে। হয়ত তাহাদের মধ্যে একজন মনে করিল যে, "আমি যখন খাবার সংগ্রহ করিতেছি, তখন

* অনেকে বিপ্লববাদী বলিতে অ্যানার্কিস্ট বুঝেন, কিন্তু অ্যানার্কিস্ট প্রকৃতপক্ষে বিপ্লববাদী নহেন, তাঁহারা বিপ্লব চাহেন না, তাঁহারা চাহেন সমাজের শৃঙ্খলা ও সাম্য। রাষ্ট্রের অভাবেই ইহা রক্ষিত হইবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

নিজে খাইব না কেন ?" ও এই মনে করিয়া নিজ-সংগৃহীত খাদ্য খাইতে অগ্রসর হইল, অমনি দলের সমস্ত পাখী তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিল।" এই চিত্র বর্ত্তমান-সমাজের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

এবিষয়ে অধিক আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্থানে-স্থানে একটু অতিরঞ্জিত থাকিলেও এই অরাষ্ট্রবাদীদের অনেক কথাই সত্য,ও একথাটাও সত্য যে, বর্ত্তমান অপরাধের অনেকগুলির জন্য দায়ী সমাজের বর্ত্তমানকালীন অসাম্য। তবে ইঁহাদের বিপক্ষে এই বলা যায় যে, ক্রিমিনলজি বা অপরাধতত্ত্ব যতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে অন্ততঃ ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এমন দু'-একজন লোক আছে যাহারা জন্ম-অপরাধী, অপরাধ করাই যাহাদের জন্মগত স্বভাব ও সংস্কার। তাহাদের লইয়া যে এই অরাষ্ট্রবাদীরা কি করিবেন তাহাই সমস্যার বিষয়।

অন্য দল যাহারা স্বাতন্ত্র্যবাদী (individualist), তাঁহারা রাষ্ট্রের আবশ্যকতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাহার হস্ত বেশী দূর অগ্রসর হইতে দিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের কাজ স্বল্প-পরিধির ভিতর নিবদ্ধ থাকা কর্ত্তব্য, তাঁহাদের ভাষায় যাহাকে বলে, ' Individualistic minimum "। প্রতি ব্যাপারে রাষ্ট্র ব্যক্তির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয়। হার্‌বার্ট্ স্পেন্সার্ এই মতের একজন প্রধান সমর্থক, তাঁহার মতে রাষ্ট্র একটি জয়েন্ট্ স্টক্ প্রোটেক্‌শন্ সোইটি (Joint-Stock Protection Society,) অথবা যৌথসংরক্ষণ সমিতি তাহার কাজ প্রজা-রক্ষা; তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কোনো প্রয়োজন রাষ্ট্রের নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে এই মতের খুবই প্রতিপত্তি ছিল। অ্যাডাম্ স্মিথ্ (Adam Smith)-এর "Wealth of Nations" পড়িয়া সবার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে লোকদের নিজ-নিজ হাতে ছাড়িয়া দিলে জাতির ধনসম্পত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বিবর্ত্তনবাদের সূত্র (Evolution Theory) তখন খুব প্রতিপত্তি লাভ করে। সবার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া যায় যে, সত্য-সত্যই পৃথিবী জুড়িয়া প্রধানত একমাত্র তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতে প্রত্যেকেই লিপ্ত ও প্রত্যেকেই একে অন্যের সহিত লড়িতেছে। তাঁহারা তাহাও বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে সেই কেবল টি কিয়া থাকিবার উপযুক্ত যে, এ-সংগ্রামে জয়লাভ করে। যাহারা মরে মরুক, কারণ মৃত্যুই তাহাদের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি; তাহারা মরিলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল, কারণ অক্ষম লোক সমাজকে শুধু নীচুই করিয়া দেয়, আর কোনো কাজে আসে না। এই যুক্তির ফল যে কি বিষময় হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেই কিছু-কিছু জানেন। ধনিক ও শ্রমিকের প্রতিযোগিতায় শ্রমিকেরা দিন-দিন নিঃস্ব হইতে নিঃস্বতর হইয়া চলিল ও তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বের ক্রীতদাস অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া পড়িল, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহাদের নিকট মরিবার স্বাধীনতা বই আর কিছুই রহিল না। সকলেই বুঝিল যে, প্রতিযোগিতা চলে সমানে-সমানে, অসমানের সহিত প্রতিযোগিতায় দুর্ব্বলের নিধন অবশ্যম্ভাবী। শ্রমিকেরা দুর্ব্বল বলিয়াই তাহারা নিকৃষ্ট নহে, কারণ অর্থের অধিকারী হইলে প্রতিযোগিতায় তাহারা ধনীদের সংহার করিতে সমর্থ। তা ছাড়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভই উৎকর্ষের মাপকাঠি নহে। এই জয়লাভ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সুবিধার (opportunities) উপর নির্ভর করে। আর-একটা জিনিষও সকলের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইল যে, সমাজ কখনও পরস্পরের সহিত পরস্পরের প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে পারে না, ইহার প্রধান ভিত্তি সহানুভূতি ও সামাজিকতা বা সামাজিক একতা (social unity)। উনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রভার এক বা অল্প লোকের হাতে ন্যস্ত ছিল বলিয়াই তখন এই স্বাতন্ত্র্য-বাদ লোকের মনকে অতখানি মাতাইয়াছিল। গণতন্ত্র থাকিলে হয়ত তাহারা বুঝিত যে, রাষ্ট্রকে বেশী ক্ষমতা দিলেই তাহার জনসাধারণের পক্ষে অধিক উপকারে আসিবার সম্ভাবনা। সেইপ্রকার স্বাতন্ত্র্য আজকাল বড়-কেহ একটা চাহে না, ইহার কি-কি দোষ, তাহা সকলের চোখেই স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে; আর গণতন্ত্রের সঙ্গে-সঙ্গে আজকাল সবাই চায় যে, রাষ্ট্র ব্যক্তিগত অনেক ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করুক। আজ সকলেরই বিশ্বাস যে,

রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তির পক্ষে (বিশেষত দুর্ব্বলের) স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হইয়া বরঞ্চ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমান সামাজিক অসাম্যের প্রতিবাদে গণবাদের (Socialism) সৃষ্টি। কার্ল্ মার্ক্স্ (Karl Marx) এই মন্ত্রের প্রধান হোতা। গণবাদীরা বলেন যে, ভূমি (land) কাহারও নিজের সৃষ্টি নহে, ইহা প্রাকৃতিক দান, সুতরাং ইহা কখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে না। দেশের সম্পদ্-সৃজনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ভূমি ও পরিশ্রমের (labour), ধনের (capital) কাজ খুবই সামান্য। কিন্তু সম্পদের ভাগ হইবার সময় সম্পদ্-সৃজনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ শ্রমের ভাগ্যে পড়ে নামমাত্র, যাহা দিয়া শ্রমিকেরা অনেক সময় নিজেদের দু'বেলার দু'মুঠা অন্ন-সংস্থান করিতেও পারে না, কিন্তু ধনিকেরা বিশেষ-কিছু না করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া সম্পদের ১৫ আনা ভাগের উপভোগী হইতেছে। অলস সম্প্রদায় যাহারা ন্যায়তঃ এক কপর্দ্দকও পাঠাইবার অধিকারী নয়, তাহারাই সমস্ত ধনের মালিক ও তাহাদের হাতে শ্রমিকেরা কেনা গোলামের মত খাটিতেছে। এই অন্যায় অত্যাচার দূর করাই এখন সমাজ-হিতৈষীদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কোন-কোন গণবাদীর মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। সকল সম্পত্তি ন্যায়ত ও ধর্ম্মত রাষ্ট্রের, দেশের এবং জাতির; যে যেরূপ পরিশ্রম করে, সে সেইরূপ ফললাভ করিলে ন্যায় রক্ষা হয়। গণবাদের তত্ত্ব আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের বাহিরে, তবে গণবাদীরা রাষ্ট্রের কার্য্য-সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানা দরকার।

গণবাদীদের মতে রাষ্ট্রের প্রতিকাজেই হস্তক্ষেপ করা উচিত। ধনিকেরা যাহাতে শ্রমিকদের দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় লইয়া তাহাদের নির্য্যাতন করিতে না পারে এবিষয়ে কড়া নজর রাখা কর্ত্তব্য। রাষ্ট্রকেই ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইবে। অসাম্য ও অন্যায় একমাত্র তাহাতেই দূর হইবে। গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে লোকের মনে রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাস দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সবাই বুঝিয়াছে, রাষ্ট্র একটা ভিন্ন পদার্থ নহে, ইহা তাহাদেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় টিকিয়া আছে, সুতরাং ইহার কার্য্য-কলাপ তাহাদেরই সমষ্টির কার্য্যকলাপ, ও তাহারা ইচ্ছামত ইহা দ্বারা ভাল কাজ করাইয়া লইতে পারে। গণবাদের সহিত যে এখন প্রায় বেশীর ভাগ লোকেরই সহানুভূতি তাহার প্রমাণ বেশ দেখা যায় যে, ইতালি প্রভৃতি স্থানে ফ্যাসিষ্ট্ (Fascist)-দের প্রতিপত্তি-সত্ত্বেও ইংলণ্ড্, জার্ম্মান্ এবং রুষিয়ার রাজ্যভার বর্ত্তমানে এই গণবাদীদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

এই গণবাদীদের ভিতর একদল চরমপন্থী আছেন, যাঁহারা সমস্ত একাকার করিয়া দিতে চাহেন; ইঁহারা কমিউনিস্ট্; বর্ত্তমান রুষিয়ার বল্‌সিভিজম্ এই কমিউনিজ্‌ম্-প্রসূত। আর একদল আছেন, যাঁহারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা স্বীকার করিতে চাহেন না, পরন্তু কেবল ধর্ম্মঘট করিয়া শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী ও পাওনা আদায় করিয়া লইবার উপদেশ দেন, ইঁহারা সিণ্ডিক্যালিস্ট্।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রজগতে গণবাদ সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত না হইলেও প্রতিরাষ্ট্রই এটুকু ধরিয়া লয় যে, রাষ্ট্র যখন সকলের সম্পত্তি ও সকলেই তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি-উপভোগে এই রাষ্ট্রের নিকট দায়ী, তখন এমন কোনো জিনিষ নাই, যাহা একমাত্র ব্যক্তিগত কাজ (individual concern) যাহাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। বস্তুত প্রতি ব্যাপারেই রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ ও প্রয়োজনানুসারে তাহার তাহা করাও কর্ত্তব্য। তবে কতকগুলি জিনিষ আছে, যেমন সন্তান-শিক্ষা, গৃহধর্ম্ম ইত্যাদি, যাহাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিয়া প্রতিব্যক্তির নিজ-নিজ হাতে ছাড়িয়া দিলে তাহা আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। সে-সব বিষয়ে সুবিধা ও সৌষ্ঠবের নিমিত্ত রাষ্ট্র তাহা ব্যক্তির হাতে ছাড়িয়া দেয়। উপরন্তু রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যাপার পরিচালনা করা সম্ভবপরও নহে। মানুষের রুচি ও প্রকৃতি বিভিন্ন, এক নিয়মে (যাহা ছাড়া রাষ্ট্রের গত্যন্তর নাই) সমস্ত পরিচালনা করা অনুচিত ও অসম্ভব। কিন্তু স্থানে-স্থানে মানুষের প্রকৃতির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইলেও মোটামুটি দেখিলে আমরা আশ্চর্য্য রকম এক, অনুসন্ধান করিলে সব মানুষের ভিতরই একটা সামাজিক মিলন (social harmony) পরিদৃষ্ট হয়, যাহার

উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্র সার্ব্বজনীন উন্নতি সাধন করিতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে গণতন্ত্র (democracy) এই স্বাধীনতা-দানে প্রবৃত্ত চেষ্টা করিতেছে। গণতন্ত্র আজকালের সৃষ্টি নহে, ইহা গ্রীক্‌ আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এথেন্সের গণতন্ত্র (Athenian Democracy) সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান গণতন্ত্রের মৌলিক তফাৎটা আমাদের দেখিতে হইবে। এথেন্সের গণতন্ত্র ছিল একমাত্র সিটিজেন্‌দের জন্য, সাধারণের তাহার সহিত কোনো সম্পর্ক ছিল না। এরিস্টটলের মতে সে-ই সিটিজেন্ হইবার উপযুক্ত যাহারা হুকুম করিতে (to rule) ও হুকুম পালন করিতে (to obey) শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ক্রীতদাসদের ত কথাই নাই, কারণ তাহারা জীবিত যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়; এমন-কি mechanics, helots ইত্যাদিরা সিটিজেন্ হইবার উপযুক্ত নয়, কারণ তাহারা এমন কাজ করে, যাহাতে তাহাদের নিজেদের জীবনের খাদ্য সংগ্রহ করিতে পরের হুকুমের উপর নির্ভর করিতে হয় ও কাজে-কাজেই তাহাদের হুকুম করিবার ক্ষমতা জন্মে না। সম্প্রদায়ের হাত হইতে বর্ত্তমানে রাজ্যভার সাধারণের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ জনসাধারণ (the people), সুতরাং গণতন্ত্র বুঝিতে আমরা আজকাল সাধারণের রাজত্ব বুঝি।

কিন্তু গণতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারে নাই। যে-দলের সংখ্যা কম (minority), তাহাদের সাধারণত গণতন্ত্রের অধিক সংখ্যকের (majority) দ্বারা নিপীড়িত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের স্বার্থ (intrests) ও দাবী (claims), গণতন্ত্রে অবহেলা পাইবার আশঙ্কা, বিশেষতঃ সেইখানে যেখানে একমাত্র লোকের ভোটের সংখ্যা দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। তা' ছাড়া গণতন্ত্রের সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে হইলে দলাদলি সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। দলাদলিমূলক রাজকার্য্যে (party system of government) চিরদিনই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে দলের নিয়মের (party discipline) জন্য ক্ষুণ্ণ করিতে হয় ও দলের নেতাদের প্রায়ই রাজার অধিক ক্ষমতা জন্মে। একান্ত স্বাধীনচেতা যিনি, সাধারণতঃ তাঁহার কোনো দলে স্থান হইবার সম্ভাবনা কম। তাঁহার কোনো-না-কোন দলের নিয়মাধীনে থাকিতে হইবে, নহিলে জনসাধারণের কাজের দ্বার (the opportunities of public life) তাঁহার নিকট চিরদিনের তরে বন্ধ থাকিবে।

বর্ত্তমান গণতন্ত্র মানুষের দাবী অনুযায়ী নহে, ইহা ক্রমশই স্বীকৃত হইতেছে। কিন্তু উপায় কি? শত সহস্র লোকের এই সময়ে একই নিয়মাধীনে থাকিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা কি উপায়ে সম্ভবপর হইতে পারে? সম্প্রতি একটি দল সৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহারা বহুরাষ্ট্রে (pluralistic state) ইহার উপায় দেখেন। ইংলণ্ডে Lashi, ফ্রান্সে Despagnet এই মন্ত্রের প্রধান পুরোহিত। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমান রাষ্ট্রকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া উচিত ও তৎপরিবর্ত্তে অসংখ্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক মানুষই নিজের জীবনের ভিতর এমন অনেক সঙ্ঘের (associations) সহিত সংমিশ্রিত যাহার সহিত তাহার বোঝাপড়া তাহার রাজ্যের রাষ্ট্রশক্তি হইতে অনেক গুণ বেশী। আমেরিকার বণিকদের সহিত ইংলণ্ডের বণিকের যে-সদ্ভাব ও পরস্পরের মধ্যে যে-বোঝাপড়া আছে, ইংলণ্ডের অধূমপানকারীদের সঙ্গে তাহার দেশের বণিকদের হয়ত ততটা নাই। সমগ্র বিশ্বজোড়া শ্রমিকদের ভিতর যে-সদ্ভাব বর্ত্তমান কোনো দেশের ধনিক ও শ্রমিকদের ভিতর তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। প্রতি লোকের কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর এক-একটি রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইবে; তাহারা নিজেদের কাজ নিজে বোঝে সুতরাং নিজেদের সুবিধানুযায়ী রাষ্ট্রকে পুনঃ গঠন করিয়া লইতে পারিবে। একমাত্র এই উপায়ে রাষ্ট্রকে তাহার বর্ত্তমান কাষ্ঠভাব (wooden character) হইতে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব ও এই উপায়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিবর্দ্ধন করা যাইতে পারে। চার্চ্চের হাতে বিশপদের ছাড়িয়া দাও,ব্যবসা বাণিজ্যের সমবায়ের(Trade guilds) হাতে ব্যবসায়ীদের ভার ন্যস্ত কর; একরাজ্যেও ব্যবসায়ী, কবি, সন্ন্যাসী ইত্যাদী সকলকে এক নিয়মে একই আইনের

পেষণে একাকার করিয়া দিতে চাহিও না, তাহা হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা আকাশ-কুসুম বই আর কিছুই থাকিবে না। বহুরাষ্ট্র (Pluralistic State) প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারে কি না স্থানাভাববশত এখানে সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম না। যাঁহারা এ-সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান তাঁহারা লাস্কির (Laski) বই বা মিস্ ফাউলেট্ (Miss Fowlett) প্রণীত "The New State" পড়িয়া দেখিতে পারেন।

'স্বাধীনতা'-প্রসঙ্গ এইখানে শেষ করিয়া এখন জাতীয়তা (Nationalism) সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা যাউক। জাতীয়তা উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি, রাষ্ট্রজগতে ইহার প্রবল শক্তির প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় জার্ম্মান্ শক্তির গঠনে। মানব-সমষ্টির ভিতর তাহারাই জাতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, যাহাদের ভিতর একটা প্রচণ্ড একতা বর্ত্তমান, বাহিরের ধাক্কা যাহাদের কখনও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে না। লোক-সমষ্টি হইলেই শুধু শক্তির সৃষ্টি হয় না, তাহাদের সমষ্টির ভিতর ঐক্য থাকা প্রয়োজন। প্রথম ঝাপ্টায় যদি তাহারা যে যাহার সরিয়া পড়ে তবে সংখ্যায় যতই বেশী তাহারা হউক না কেন, শক্তি তাহাদের তেমন কখনও জন্মিতে পারে না। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, ভাল-মন্দের এক সূত্র, এক শিক্ষা সাধারণতঃ মানব-সমষ্টির ভিতর একতা জন্মাইয়া দেয়। অন্য ক্ষেত্রে একই স্থানে বসবাস, একই অবস্থার ভিতর দিয়া দৈনন্দিন জীবন অতিবাহন করাও জাতীয়তা গঠনে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। একই বিপদ যখন সমগ্র দেশকে অভিভূত করিয়া তোলে, কোনো শক্তির বিরুদ্ধে যখন দেশের সকলের একই অভিযোগ মন তোলপাড় করে তখন সেই দেশের লোকসমষ্টির ভিতর জাতীয়তা অতি সহজেই গঠিত হইয়া উঠে, অষ্ট্রিয়ার ভয়ে ভীত ইটালির জাতীয়তা অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ-বলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল; বর্ত্তমানে যে ভারতবর্ষে জাতীয়তার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে তাহার প্রধান কারণ যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, মারাঠা সকলেই আজ বিদেশীর বিরুদ্ধে মনে-মনে অভিযোগ পরিপোষণ করিতেছে, সকলেই আজ একই দুঃখে মিলনের ক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছে।

জাতীয়তার প্রধান দাবী স্বতন্ত্র শাসন। পোলরা (the Polish) আর জার্ম্মান্ কিংবা রুষিয়ার শাসনাধীনে থাকিতে চাহে না, তাহারা নিজেদের মত নিজেদের রাজত্ব চায়, কারণ তাহারা নিজেরা একটি জাতি হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, অন্য জাতির শাসনাধীনে থাকিতে তাহারা নারাজ। যুদ্ধের পর রাজ্য-বিভাগে এই জাতীয়তার দাবী সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য করা হইয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা স্থাপন, বর্ত্তমান রুষিয়ার বিপ্লব—সকলই এই জাতীয়তার শক্তির প্রধান প্রধান দৃষ্টান্ত।

অন্তর্জাতীয়তা (Internationalism) ও জাতীয়তা বিরুদ্ধবাদী শব্দ নহে। জাতীয়তা যাহা ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর করিয়া দেয় অন্তর্জাতীয়তা তাহা জগৎ জুড়িয়া সম্ভব করিতে প্রয়াস পায়। এক দেশে ভিন্ন সম্প্রদায়রা যেমন স্ব-স্ব ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া তাহাদের সমোদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া তাহার উপর মিলনের দৃঢ় ভিত্তি গাঁথিয়া তোলে তেমনি পৃথিবীর নানা জাতি সার্ব্বজনীন মিলনের ক্ষেত্র বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব সুবিধার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরস্পরের ভিতর একটা সম্মিলনের অচ্ছেদ্য বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিল্প, কলা ও বিজ্ঞান-আলোচনা (ইহাদের পরিধি কখনও একই দেশের গণ্ডীর ভিতর নিবদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহাদের ক্ষেত্র জগৎ-জোড়া) ধর্ম্ম-প্রচার—এইসমস্ত মিলিয়া বর্ত্তমানে সকল জাতির চক্ষে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে, সভ্যতার এই যুগে, এককোণে পড়িয়া থাকা আর চলে না, জগতের ধারা আর তাহাদের না টানিয়া যাইবে না, সুতরাং বর্ত্তমানে সমাজ, দেশ ও পৃথিবী সংস্করণের প্রধান লক্ষ্য অন্তর্জাতীক সংস্পর্শ ও সৌহৃদ্য। আন্তর্জাতিক বিধি (International Law) এই বিষয়ে জগৎকে অনেক দূর অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানে জাতি-সঙ্ঘ (League of Nations) ইহার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিবে বলিয়া দাবী করিতেছে।



আমি ও তুমি

কুড়ুলরাম রচিত ∴ ঢেঁকীরাম চিত্রিত

মহাকবি বাইরন্ লিখিয়াছেন—পুরুষের জীবন-গ্রন্থে প্রেম একটি অধ্যায় মাত্র, কিন্তু নারীর জীবনে ইহা সর্ব্বস্ব। এই উক্তির সত্যতা ও প্রেমের একটি অধ্যায়ই যে দুই এক-জনের পক্ষে কী সাংঘাতিক হইয়া উঠে কবি মদনমোহন খাস্তগীরের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী ইতিহাস লিখিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

মদনমোহন খাস্তগীর কবি। কাব্য তাঁহার পেশা না হইলেও তিনি চায়ের দোকানে কবি, মেসে কবি, রাস্তায় বটের ছায়ায় কবি, পানের দোকানের সম্মুখে কবি, চলনে কবি, বক্তৃতায় কবি, আত্মাভিমানে কবি এবং গৃহিণী ও সম্পাদকগণের সহিত মানঅভিমানেও কবি। বস্তুতঃ কাব্য তাঁহার জীবনের সবখানি না হইলেও তাঁহার জীবনের সমস্ত কাজে কাব্য-আর্ট-প্রেমের ছাপ আছে। তিনি কবিতা লেখেন ভাল, কিন্তু লেখা কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা করেন অনেক বেশী। কোনো-না-কোনো দিক্ দিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা কাব্যসাহিত্যের বিশেষ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, কোনো কবিতা তাঁহার বাঙলা স্পেনস্‌র-রীয়ান্ ছন্দে লিখিত, কোনো কবিতার অন্তে মিল না থাকিলেও পাঠক মিল আছে ভাবিয়া মহোল্লাসে পড়িয়া যায়—ইত্যাদি। তিনি হুইট্‌ম্যানী ছন্দে কবিতা লেখেন না। মোটের উপর এক কথায় মদনমোহন-বাবু বস্তুতঃ কবি এবং কার্য্যতঃ ইস্কুল-মাষ্টার।

মদনবাবু তাঁহার কাব্যানুভূতির প্রথম হিড়িকে তাঁহার কবিতা-স্তূপ বাছাই করিয়া "ধোঁয়ার হাট" নামে এক কাব্যগ্রন্থ ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলেন যে, অচিরাৎ এই বস্তুতান্ত্রিক জগতের কঠোরতার উপর তাঁহার ভাবের ধোঁয়ার আবরণ দিয়া তাহাকে বোর্‌কাবৃতা আরব-মহিলার মতই মহিয়সী ও লোভনীয়া করিয়া তুলিবেন। আসলে কিন্তু বইখানিতে বেশ উঁচু ধরণেরই কবিতা স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু কয়েকটি কবিতা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাধারণ পাঠকের মনে শ্রদ্ধা ও ভয়-জাতীয় একটা ভাব জাগাইয়াছিল মাত্র; প্রীতির উদ্রেক করিতে পারে নাই।

মদনবাবু বেশ উঁচুদরের কবিই ছিলেন। তাঁহার কবিতা যথার্থ কাব্যামোদীদের আনন্দ বিধান করিত। কিন্তু হায়, এই কবির দেশে যথার্থ কাব্যামোদী কোথায়? তাঁহার কবিতা ইত্যাদির ভক্ত যে কেহ ছিল না তাহা নহে তবে তাঁহার অকবিজনোচিত চেহারার নীচে অনেক ভক্ত চাপা পড়িয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ বাজে কবিতা লিখিতেন না এবং উচ্ছ্বাসবশে খারাপ জিনিষ কলমের মুখে বাহির হইয়া পড়িলেও খারাপ মনে

হইলে কোনো লেখাই ছাপিতেন না; বারবার কাটিয়া-কুটিয়া ভদ্রগোছের করিয়া নিজের মনোমত হইলে তবে ছাপাইতেন। তবু লোকে তাঁহার লেখা পড়িত না; বাজে 'রদ্দি' কবিদের লইয়া হুড়াহুড়ি করিত!

এই নিদারুণ হতাদরে মদন-বাবু বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন এবং সেই হইতেই তাঁহার লিখিত কবিতাকে ছাপাইয়া তাঁহার মৌখিক কবিতা মাথা তুলিয়া উঠে ও তাহা রীতিমত একটা ব্যারামে দাঁড়াইয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদেরা সম্ভবতঃ ইহাকে Repression (কামনাদমন) এর পর্য্যায়ভুক্ত করিবেন। কিন্তু আমরা জানি বলিয়াই মদন-বাবুকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না।

মদন বাবু তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই বলিয়াই তাঁহার সামান্ত কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে সেই সম্মান একটু অধিক পরিমাণে দাবী করেন। হয় ত একই কবিতা পাঁচটি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পাঁচ বার শুনিতে হইবে, শুনিয়াছি বলিলে নিষ্কৃতি নাই; কবি অমনি ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং অরসিকেষু......ইত্যাদি বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সেকী সাধ্য-সাধনা! কবির স্ত্রীবেচারীকে হয়ত প্রত্যেকটি কবিতা ২৫ বার টীকাটীপ্পনী সমেত শুনিতে হইয়াছে। আমরা মদন-বাবুর দুঃখের কারণ জানিতাম বলিয়াই তাঁহাকে অজস্র বাহবা দিয়া ফুলাইয়া রাখিতাম। তিনি আমাদিগকে তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় কল্পনা করিয়া সুখে থাকিতেন।

কিন্তু এত করিয়াও রক্ষা করিতে পারিলাম না। অলক্ষ্য দেবতা যে আমাদের অলক্ষ্যে বেচারী কবিকে এতখানি নাকাল করিবে তাহা কি বুঝিয়াছিলাম?—অথবা একচক্ষু হরিণের মত যেদিকে বিপদের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম অতর্কিতে সে দিক্ হইতেই আক্রমণ হইল।

আমরা ভাবিতাম, মাসিক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত মদন-বাবুর কবিতা কেহ পড়ে না; আমরাই স্থানে অস্থানে চায়ের দোকানে বা ফুটপাতে দাঁড়াইয়া অনন্যমনা হইয়া শুনিয়া সুদে আসলে মদন-বাবুকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিয়া থাকি। কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম। অন্ততঃ একজন মহিলা যে তাঁহার নিয়মিত পাঠিকা ছিল তাহা জানিতে পারিয়াছি।

বিপদ আরম্ভ হয় 'পসারিণী' পত্রিকায় প্রকাশিত মদন-বাবুর 'আমি' কবিতাটি হইতে। মদন-বাবু সুপুরুষ নহেন। স্ফীতোদর, কৃষ্ণকায়মূর্ত্তি; বিকশিত দন্তপংক্তি বিদ্যুৎচমকের সৃষ্টি করিত। তিনি হেলিয়া দুলিয়া চলিতেন, সশব্দে বলিতেন, যেখানে-সেখানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেন এবং কথার তোড়ে থুথু ছিটাইয়া প্রেমের পরিবর্ত্তে বিরুদ্ধ ভাবই মনে জাগাইতেন। কিন্তু ছাপার অক্ষরে ত আর মানুষটিকে দেখা যায় না। কালিদাস যদি সুপুরুষ না হইয়া আজকালকার মত মাসিক পত্রিকায় মাসের পর মাস তাঁহার মেঘদূত বা কুমারসম্ভব ধারা-বাহিক ভাবে ছাপাইতে আরম্ভ করিতেন তবে তাঁহার পাঠিকা প্রেমিকাদের মধ্যে যে একটা রীতিমত কুরুক্ষেত্রের অবতারণা হইত, ইহা আমরা হলফ্ করিয়া বলিতে পারি। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। 'আমি' কবিতাটি পড়িয়া শ্রীমতী পঙ্কজিনী হালদার আপনাবিস্মৃত হইয়া মনে মনে কবিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে সুরু করিলেন। সেই কবিতার 'আমি' ব্রহ্মণ্যগৌরবে দীপ্যমান পুরুষ। তাঁহার ললাট প্রশস্ত, বক্ষ সুবিশাল, নাসিকা খড়্গধার, জিহ্বায় মধু—অন্তরে উদ্বেল অজানিত প্রেয়সীর 'লাগিয়া' প্রণয়োল্লাস। পঙ্কজিনী কবিতে কাব্যবর্ণিত গুণগুলি কল্পনা করিয়া মজিলেন।

কবিতাটি পড়িলে পঙ্কজিনীকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সেই 'আমি'কে আমাদেরই হিংসা হয়। 'আমি'র খানিকটা এই—

* * * *

আমি ব্রাহ্মণ, ললাটে আমার দাউ দাউ হোমানল—
নয়নে আমার যজ্ঞ-অগ্নি হবি-শিখা দ্যুতিমান;
নাসিকায় মোর খড়্গের ধার—মুখ-জ্যোতি জলজল,
তপের বহ্নি আমি, তেজে জলি' দীপ্তিতে অবসান।

আমি গায়ত্রী, মধু-জিহ্বায় সবিতার গাহি জয়—
আমিই সবিতা'ভূর্ভুব' আমি.'স্ব' মোর শিখাটি ঘিরে;
ওঙ্কার আমি, টঙ্কারে মোর ব্যোম ব্যোম ধ্বনি হয়
নয়নাগ্নিতে মদনভস্ম,—রতি সে কাঁদিয়া ফিরে।

বক্ষ আমার কবাট-বিশাল, মৃগরাজ জিনি' কটি ;
যাহাতে আমার ভীম বিক্রম, আমি সে সব্যসাচী ;
অন্তরে মোর জনম নিতেছে নব ভাব কোটি কোটি ;
পার্ব্বতী হ'ল প্রেমের যোগিনী আমার প্রসাদ যাচি'।

আমি শুধু 'আমি' ধ্যানী যোগীবর তুষারমৌলি গিরি ;
বক্ষ আমার অতলান্তিক উদ্বেল ভাব-ঝড়ে।
আমি 'কাবা' আমি মক্কাশরীফ হজ ক'রে ক'রে ফিরি—
আমার জ্যোতিই হিমমেরুদেশে অরোরার আলো ধরে।

উমারে আমার স্কন্ধে লইয়া আমি নাচি তাণ্ডব—
ভাব-উমা মোর লেখনী-চক্রে হয় যে পীঠস্থান ;
আমি ব্রাহ্মণ আমারই বক্ষে আজো দহে খাণ্ডব,
প্রেমের অমৃতে ক্ষণে ক্ষণে আমি হই অমৃতায়মান।

পঙ্কজিনী নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়িলেন। মদনবাবুর কবিতা পাইলেই অতি যত্নে তাঁহার নোটবইয়ে সংগ্রহ করিয়া অবসর-বিনোদন করিতেন। তাঁহার ধ্যান-ধারণা মদনবাবুর 'আমি'কে লইয়া একাকার হইয়া গেল। পঙ্কজিনী মরিলেন—মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেলেন।

পঙ্কজিনী হালদার কে তাহা আমরা বলিব না। প্রেমের যাহা বাধা এবং আজকালকার উপন্যাস ও গল্প-লেখকগণ যে বাধার কথা একেবারে বিস্মৃত হন অর্থাৎ পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, মানসম্ভ্রম, অর্থাভাব এসব কিছুরই বাধা গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের মতন তাঁহার ছিল না। তিনি প্রায় তুইফোঁড় ছিলেন। স্বাধীনা ছিলেন। সুতরাং মাসিকে মদনবাবুর নিত্যনবপ্রকাশিত কবিতারূপ ফুঁদার বাতাসে সে প্রেম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতায়তন হইয়া তরুণ-পত্রে প্রকাশিত 'ঐরাবত' কবিতাতে আসিয়া বিরাট-রূপ ধারণ করিল। কবি মদনমোহন ইন্দ্রের ঐরাবতে চড়িয়া প্রেমের বিজয়যাত্রা করিয়াছেন। শচী হইতে পাঁচী পর্য্যন্ত কেহ আর বাদ রহিল না, একে-একে সকলেই সেই প্রেম-ঐরাবতের চরণতলে পিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকার হইয়া গেল। ঐরাবতের উপরে কবি; প্রেমিকারা হতাশ হইয়া সরিয়া যাইতেছে—

* * * * *

"ঘণ্টা-নিনাদ ওই শোনা যায়—
গজরাজ আসে ধীরে—
প্রেমিকারা সবে সব ভুলে ধায়
দাঁড়ায় পথটি ঘিরে।
নিমীলচক্ষু কবি বসে' পিঠে
বুদ্ধের অবতার—
এত যে তরুণী, এত দিঠি মিঠে—
সব হয় ফুৎকার !
ঐরাবত সে দুলে-দুলে চলে
কিছু না খেয়াল করি'—
প্রেমিকারা পায়ে পড়ে দলে-দলে
কবি যায় আগুসরি'—"

তার পর কবির স্বপন-বাঞ্ছিতা আসিলেন; এবং মোজেসের সম্মুখে নীল নদীর মতন নারীর ভিড় দুই পাশে সরিয়া গেল। মোহিনীর দৃষ্টি অঙ্গে লাগাতে ধ্যানীর ধ্যান ভাঙিল, কবি আয়ত আঁখি মেলিয়া চাহিলেন, চারি চক্ষের মিলন হইল, ঐরাবত হাঁটু গাড়িয়া বসিল, প্রেয়সী গজপৃষ্ঠে উঠিলেন, জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, কবি বলিলেন—

"ওগো বাঞ্ছিতা, কোথা ছিলে তুমি
কোন্ সে স্বপন-লোকে !
জীবন আমার ছিল মরুভূমি
তোমার বিরহ-শোকে।"

প্রেয়সী বলিলেন—"জীবন আমার সফল আজিকে
আমি পেনু হৃদিরাজা"।

কবি বলিলেন—"এসো মুখোমুখি থাকি অনিমিখে—"

তারপর বাদ্যকরদের ডাকিয়া বলিলেন—
"মিলন-বাদ্য বাজা।"

পঙ্কজিনী নায়িকার স্থলে আপনাকে বসাইয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া চাই-ই। তিনি 'পসারিণী' পত্রিকার সম্পাদকের কেয়ারে মদনবাবুকে বহু স্তুতিবাদ করিয়া একটি 'লিপি' লিখিলেন। সে-লিপিটি আমরা মদনবাবুর কাছে অনেকবার



চারি চক্ষের মিলন হইল, ঐরাবত হাঁটু গাড়িয়া বসিল

দেখিয়াছি। বিশেষ কিছু ছিল না, কেবল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। শুধু একটি লাইন ছিল—'হে সুন্দর কবি—বঙ্গের নারী সমাজের তরফ হইতে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি'। সেই লাইনটিই মারাত্মক হইল। মদন-বাবু বিগলিত হইয়া মাথা চুলকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি করা যায়। একদিন আমাদের সঙ্গে চায়ের দোকানে তর্কই বাধিয়া গেল। হাতের লেখা, চিঠির কাগজ, খাম ইত্যাদি দেখিয়া মদন-বাবু পঙ্কজিনীর এক রূপ কল্পনা করিয়া লইলেন, আমাদের বর্ণনার সঙ্গে তাহা মিলিল না বলিয়া মদন-বাবু মহা খাপ্পা। "তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' নিশ্চয়ই"। আমরা শেষে হটিয়া গিয়া বলিলাম "নিশ্চয়ই"।

তার পর যাহা ঘটিল, অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন; মদন-বাবু আমাদিগকে গোপন করিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে অবশ্যই সমস্ত জানিয়াছি। যখন মদন-বাবু পঙ্কজের 'জ'টি উড়াইয়া দিয়া পঙ্কের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তখন এই গোপন অভিসারের বার্ত্তা গোপন করিতে পারেন নাই।

পঙ্কজিনীর চিঠি পাইয়া মদনবাবু তাঁহার এক কপি "ধোঁয়ার হাট"এর উপর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে ঠিকানা-জানা অজানা প্রেয়সীর উদ্দেশে গোপন অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে লিখিলেন—

"হে গোপন, তব মু'খানি হেরেছি স্বপনে,
কাটায়েছি কাল না-জানা নামটি জপনে;
তব প্রেম মম হৃদয়-কুঞ্জে বপনে—
হে প্রেয়সী, আমি ভূখারী—"

যাহা হইবার হইল, ঘন ঘন পত্রাঘাত হইতে লাগিল। পঙ্কজিনী মজিলেন, মদন-বাবু ডুবিলেন।

তারপর একদা প্রেয়সী ঠিকা গাড়ী করিয়া অভিসারে বাহির হইয়া পড়িলেন। সেদিন রবিবার, মধ্যাহ্নকাল। বসন্তের হাওয়া তখন সবে মাত্র কচি অশ্বত্থপাতাগুলি দোলাইয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। মন উড়ু উড়ু

করিতেছে। কবি স্নানের গামছাখানি পরিধান করিয়া দেড়হাত মাদুরের উপর নগ্নগাত্রে উবু হইয়া বসিয়াছেন। বাঁ হাতে খেলো হুঁকাটি ধরিয়া নিমীলনেত্রে ঘন ঘন টান দিতেছেন। ডান হাতে সম্মুখেখোলা সুইন্‌বার্ণের Songs before Sunrise (উষার গান) নামক কবিতা-পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন। সাধের কন্যা পিতার রোমশ কৃষ্ণ বুকে তৈল মর্দ্দন করিতেছে। কবিগেহিনী রান্নাঘরে ইলিশমাছ ভাজিতেছেন।

স্থান ও কাল উপযুক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু পাত্রটি তখন ঠিক নায়কের অবস্থায় ছিলেন না। এমন সময় ঠিকা গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল।

মদনমোহনবাবু যখন পঙ্কজিনীর উদ্দেশে সপ্রেম লিপিগুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন ক্ষণেকের জন্যও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই যে, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী পঙ্কজিনী এমন অধীর হইয়া অভিসারে বাহির হইয়া পড়িবেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহাই কাব্য, ইহাই মধু। কিন্তু কাব্যের পিছনে 'বস্তু' দাঁত বাহির করিতে পারে বা মধুর লোভে হুলের তাড়না সহ্য করিতে হয় ইহা তাঁহার কবি-মানসের সুদূর কল্পলোকেও ছিল না। আর এও ত অন্যায়। কবির সহিত সাক্ষাতের স্থান কখনই কবির গৃহ নয়; সেখানে গৃহিণীরূপ প্রকাণ্ড একটা 'বস্তু' শতমুখী হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। স্থান ঠিক কর্, তারপর ত সাক্ষাৎ। ইর্ডেন গার্ডেন রহিয়াছে, ম্যাডান কোম্পানীর অমন অমন প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা রহিয়াছে, ষ্টার থিয়েটার আছে, গড়ের মাঠ আছে, নিদেনপক্ষে কালীঘাটের কালীবাড়ীও ত রহিয়াছে। তাহার পর, ফরসা ধুতি আছে, কোঁচান চাদর আছে, পাউডার, ক্রীম,পমেটম আছে,আরো কত কি ভাবিতে হয়; বিয়াত্রিচে কি করিয়া-ছিলেন ভাব্—মহাশ্বেতার কথা মনে কর্। তা না, এমন সময়ে বাড়ীতে অকস্মাৎ—

পঙ্কজিনীরও দোষ নাই। তিনি কবি ও কাব্যকে তফাৎ করিতে পারেন নাই। কাব্যে যেমন কবি অবাধে ঔরঙ্গজীবের অন্তঃপুর হইতে শচীর বিলাসকক্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আড়ি পাতিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল জীবনেও তাঁহার সেইরূপ অবাধ গতিবিধি। তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার নাই তিনি যেন একখানি ডাঁটাহীন পদ্ম—কাব্য-সরসীর বুকে হাওয়ায় দোল খাইতেছেন। কিন্তু এই সামান্য ভুলের জন্য এত বড় আঘাতটাই মানুষকে পাইতে হয়!

নাগ্‌রা-জুতা-পরিহিতা পঙ্কজিনী অতি সন্তর্পণে আসিয়া অনামিকা- ও তর্জ্জনী-সহযোগে ধীরে ধীরে কড়া নাড়িলেন। কটাকট শব্দ হইল; পঙ্কজিনীর বুক ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বুক বুঝি শতধা ফাটিয়া পড়িবে। এত করিয়া শাড়ী আর ব্লাউজের রং মিলাইয়া পরিয়া আসিলেন—মনে হইতে লাগিল বোধ হয় ঠিক খাপ খায় নাই। ঘামে বুঝি পাউডারটা সব উঠিয়া আসিল। ঘন ঘন রুমালে মুখ মুছিতে লাগিলেন। ভাবিলেন ফিরিয়া যাই—কিন্তু কড়া নাড়িয়া চলিয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে? আর এতক্ষণ হয়ত কবির অন্তর্লোকে আগমনীর সানাই বাজিতে সুরু হইয়াছে।

রান্নাঘরের পাশেই দরজা। 'কে গা' বলিয়া কবি-গিন্নী দরজা খুলিলেন। পঙ্কজিনী ধীর-মন্দগতিতে ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিকে চকিতে চাহিয়া লইলেন। গিন্নীকে দেখিয়া ভাবিলেন—ঝি বোধ হয়। তারপর উঠানে কবির সেই বিচিত্র বেশ দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন, ভাবিলেন কবি বাস্তব জগতের কিছুই দেখেন না বলিয়া ঝি চাকরে বাড়ীর উঠানেই এত-সব বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করে। কবিকে এ-সম্বন্ধে কি বলা কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিলেন।

তারপর সাহস সঞ্চয় করিয়া গিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা বাছা, মদনমোহন-বাবু কোথায়?" কবি-গিন্নী একটু মুচ্‌কি হাসিয়া কথা না বলিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে কবিকে দেখাইয়া দিলেন।

পঙ্কজিনীর চারিদিকে বাড়ী ঘর-দুয়ারগুলি দুলিতে সুরু করিল। উঠানে উপবিষ্ট কবিকে কয়লার গাদা বলিয়া ভ্রম হইল। তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কবিগিন্নী চেয়ার আগাইয়া দিয়া যখন বলিলেন, 'বসুন না', তখন তাঁহার ক্রোধের বেগ একটা বহির্দ্বার পাইয়া সবেগে বাহিরে আসিতে চাহিল। তিনি ছুটিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া দুই হাত নাড়িয়া কান্না-গদগদস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'তুমি, আপনি—মদন-বাবু' বলিয়াই নাগরা-জুতা-সমেত



কয়লার গাদা বলিয়া ভ্রম হইল

দুই পাক্ ঘুর খাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুখ হইতে বাহির হইল 'জুয়াচোর!'

কবি ত এদিকে ভ্যাবাচ্যাকা। বহুকষ্টে হুঁকাটি নামাইয়া ক্ষীণস্বরে গিন্নীকে কহিলেন, "ওগো এঁকে দেখো"। কবি-কন্যা কাঁদিয়া উঠিল। গিন্নী জল লইয়া পঙ্কজিনীর মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে সুরু করিলেন।

পঙ্কজিনী ও কবির মধ্যে সে-যাত্রা কে রক্ষা পাইলেন বলা কঠিন। তবে কবি গিন্নীর নিকট কেঁচো বনিয়া গেলেন; আজকাল তাঁহার কবিতার ধারা স্তব্ধ হইয়াছে, বড়-একটা কোথায়ও বাহির হয় না। তবে বঙ্গসাহিত্য-গগনে আর-একটি নূতন কবির আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি পঙ্কজিনী হাল্দার।

পঙ্কজিনীর গায়ের জ্বালা অনেক দিন ধরিয়াছিল। তাহার পর 'পসারিণী' পত্রিকায় পঙ্কজিনী হাল্দারের 'তুমি'-নামক কবিতাটি বাহির হইবার পর এই হৃদয়বিদারক বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পতন হইয়াছে। কবিতাটির কতক অংশ তুলিয়া দিয়া আমরাও এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

*　　*　　*　　*

তুমি শূদ্রক, ভণ্ড পূজারী, আবর্জ্জনার স্তূপ—
　　তুমি 'ধাপা', তুমি 'বিদ্যাধরী'র খাল—
তুমি কালিঝুলি নিদারুণ, তুমি অন্ধকারের কূপ,
　　তুমি 'ডাষ্টবিন' উঠানের * জঞ্জাল।

* পাঠক উঠান কথাটি লক্ষ্য করিবেন।

তুমি হে ভীষণ, মোহ-কারাগার, তুমি যে ভয়ঙ্কর,
তুমি উন্মাদ, প্রলাপ বকিছ সদা—
শুভ্র তুমি হে রুদ্রের সাজে নিজে সাজ সুন্দর—
ক্রাচেরে † তোমার ভাবিছ ভীমের গদা।

† ক্রাচ—খোঁড়ার লাঠি।

আঁস্তাকুড়ের গোবরের পরে কে ফোটাল 'তুমি' ফুল—
ভীমকায়া মাঝে দিল কবিতার জ্যোতি—
যত লেখ কবি—পঙ্কজ আর কভু না করিবে ভুল—
তুমি 'তুমি' থাক, দূর হ'তে নিও নতি।

কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের বিশুদ্ধীকরণ

অধ্যাপক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

"শুদ্ধি" লইয়া দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সেটা সামাজিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও শুদ্ধির আয়োজন হইয়াছে। সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক্‌গুলিকে "শুদ্ধ" (pure typc) করার চেষ্টা হইতেছে। একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক্ একটি যৌথ কারবার। উদ্দেশ্য কৃষকদিগকে টাকা ধার দিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। যাহারা টাকা ধার লইবে, তাহাদিগকে একটি মণ্ডলীতে পরিণত হইতে হইবে। ইহারই নাম কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট সোসাইটি। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে টাকা আসে দুই রকমে—যাঁহারা প্রথমে অংশ ক্রয় করেন তাঁহাদের নাম প্রেফারেন্স্ শেয়ার হোল্ডার। ইঁহারাই ব্যাঙ্কের সূচনা করেন। ইঁহারা আপনাদের টাকার সুদ ডিভিডেণ্ড্ বা লভ্যাংশরূপে প্রাপ্ত হন। নিয়ম হইয়াছে শতকরা ১২র বেশী পাইবেন না। তা'র পর বহুলোক ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন, যেজন্য তাঁহারা নিয়মিত সুদ প্রাপ্ত হন। কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট সোসাইটিগুলি এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক্ হইতে টাকা ধার লইয়া সেই টাকার কিয়দংশ জমা দিয়া ব্যাঙ্কের অংশীদাররূপে গণ্য হয়েন। ইঁহাদের নাম অর্ডিনারী বা সাধারণ শেয়ার হোল্ডার। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডাররা আপনাদের ঘর হইতে টাকা দিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ অংশীদাররা এই টাকা ধার লইয়া তাহারই কিঞ্চিৎ দিয়া ভাগীদার হইয়াছেন। এই ভাগীদারেরা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের খাতক। তাহারা টাকা লইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছে কি না তাহা দেখিবার ভার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপর। ব্যাঙ্ক্ পরিচালনের জন্য যেসকল ডিরেক্টর আছেন, তাহার অর্দ্ধেক নিযুক্ত হয় প্রেফারেন্স্ অংশীদারদের দ্বারা, আর অর্দ্ধেক ক্রেডিট সোসাইটিগুলি দ্বারা। অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ক্রেডিট সোসাইটিগুলিকে অত্যন্ত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পাওনাদারের উপরে দেনদারের এরূপ ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। তাদের কোনই দায়িত্ব নাই। যে টাকার জোরে তাহারা ভাগীদার, সে টাকাও ঐ ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের ধার করা। সুতরাং ব্যাঙ্কের মরণ-বাঁচনের জন্য তাহাদের তেমন একটা দরদের সম্ভাবনা নাই যাহা প্রেফারেন্স্ শেয়ার হোল্ডারদের স্বভাবতই থাকিবে। অন্যদিকে এই বঙ্গদেশে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক্‌সমূহে খাটিতেছে। তাহার সাড়ে চারি কোটিই এই প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার এবং ডিপজিটর বা আমানতকারীদের। বাদবাকী এই সামান্য অংশ মাত্র ক্রেডিট সোসাইটিসমূহের, তাহাও ব্যাঙ্ক হইতে ধার করা টাকা। প্রথম যেভাবে ব্যাঙ্ক্ পরিচালিত হয়—উভয়-প্রকার অংশীদারদের মনোনীত ডিরেক্টার দ্বারা—ইহারই নাম মিক্স্‌ড্ টাইপ বা মিশ্র ছাঁচের। প্রস্তাব হইতেছে বিশুদ্ধ ছাঁচ বা আদর্শের করা। অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যপরিচালনের ভার পড়িবে ক্রেডিট সোসাইটি কর্ত্তৃক মনোনীত লোকের উপর—ঠিক যার শিল তা'রই নোড়া, তা'রই ভাঙ দাঁতের গোড়া।

পাওনাদার সম্পূর্ণরূপে দেনদারের অধীন হইবে। দেনদার কর্জ্জ টাকার কি ব্যবহার করিতেছে তাহা দেখিবার ভার যাহার উপর তাহাকে গ্রহণ বর্জ্জন করিবার অধিকার ঐ দেনদারদের। হবুচন্দ্রের দেশেও ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুবন্দোবস্ত ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা দেশের বিশেষতঃ কৃষিজীবীদিগের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদিগের ধারণা। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলি উঠাইয়া দিবার ইহা অপেক্ষা সুচতুর চাল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন মূর্খ কে আছে যে, এই বন্দোবস্তে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবে বা প্রেফারেন্স্ শেয়ার হোল্ডার থাকিবে। যেখানে অন্যের লেখা, ব্যথা ত তথায়। টাকাগুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেলে যাহাদের গায়ে আঁচড় লাগিবে না, এতগুলি টাকা তাহাদের হাতে কোন্ অর্থনৈতিক শাস্ত্র-অনুসারে দেওয়া যাইতে পারে তাহা এই প্রস্তাবক মহাশয়েরা বলিয়া দিতে পারেন কি? অপর পক্ষে, ক্রেডিট সোসাইটিগুলির সহজ কার্য্য যাহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না বলিয়া যাঁহারা নিয়মের উপর নিয়মের ইট বসাইয়া বিরাট্ আইনের সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাঁহারাই যদি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের জটিল কার্য্যের ভার উঁহাদেরই উপর স্থাপন করিবার প্রস্তাব লইয়া আসেন, তবে সে কার্য্যটার উদ্দেশ্য-বিষয়ে মনে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। সুতরাং ব্যাঙ্কে যাঁহাদের টাকা আছে তাঁহাদিগকে এখন হইতেই সাবধান হইতে হইবে। দেশে অর্থের এমন প্রাচুর্য্য হয় নাই, যে, এতগুলি টাকা চক্ষের উপরে বিনষ্ট হইতে দেওয়া যাইতে পারে। এ দেশের আমানতকারী (depositors) জনসাধারণ অজ্ঞ। এ-বিষয়ে তাঁহাদের কোন জ্ঞানও নাই, আর এ-বিষয়ে কোন খোঁজখবর রাখাও দরকার মনে করেন না, টাকা জমা দিয়াই নিশ্চিন্ত। তাই তাঁহাদের টাকা লইয়া কর্ত্তাদের এরূপ খেলাখেলি চলিতে পারে। সেইজন্যই সংবাদ পত্রের মধ্য দিয়া আন্দোলন প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক্ দেশের জন্য নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু যে আয়োজন হইতেছে, তাহাতে ব্যাঙ্কগুলি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

প্রিয়া

শ্রী চন্দ্রশেখর আঢ্য

বসন্তে গাওনি গান, শুভক্ষণে না কহিলে কথা
মঞ্জু যবে কুঞ্জবন, বুকে দিলে মরণের ব্যথা।
বিশ্বজয়ী ফিরি যবে শিরে বহি গৌরবের ভার,
নরনারী মাল্য রচি' কণ্ঠে দেয় প্রীতি-উপহার,—
তুমি শুধু ওগো প্রিয় না চাহিলে তুলি' মৃদু আঁখি,
সবাই কুড়ালো ফুল তুমি শুধু প'ড়ে র'লে বাকি।
উপেক্ষায় অনাদরে দিলে মোরে তীব্র অভিশাপ,
গর্ব্বোজ্জল স্নিগ্ধদিনে মাথে দিলে নিশ্বাস-উত্তাপ।

(তা'র পর) বসন্ত ফুরালে যবে শূন্য হ'ল পুণ্য শুভক্ষণ,
ভগ্ন হ'ল কুঞ্জবন হাহাকারে জাগিল ক্রন্দন,
জীবনের দীপ্তদিন অস্ত গেল রাত্রির আঁধারে
দুর্ভাগ্য মেলিল পাখা, নেমে এনু ধূলির মাঝারে,
সেইযুগে-মহাযুগে শুভব্রতা ওগো মহারাণী
আমার মলিন কণ্ঠে পরাইলে শুভ্র মাল্যখানি।
ব্যথার গভীর রাত্রি কেটে গেল, তব মুখ চাহি
সূর্য্যোদয়ে মুক্তি পেনু, মুক্তকণ্ঠে উঠিলাম গাহি।



[কোন মাসের "প্রবাসী"র কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা সমালোচনা কেহ আমাদিগকে পাঠাইতে চাহিলে, উহা ঐ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক; পরে আসিলে ছাপা না হইবারই সম্ভাবনা। আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ "প্রবাসী"র আধ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া আবশ্যক। পুস্তক-পরিচয়ের সমালোচনা বা প্রতিবাদ না-ছাপাই আমাদের নিয়ম। —সম্পাদক।]

"সোক্রাটীস্"-গ্রন্থকারের নিবেদন

বিবিধশাস্ত্রবিৎ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুনের প্রবাসীতে "সোক্রাটীস্" দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আমাকে সম্মানিত ও উপকৃত করিয়াছেন। তিনি এই সমালোচনা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক গুরুতর বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার সমুদায় সিদ্ধান্ত যাতসহ কি না, তাহা পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও আমি পারতপক্ষে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছুক হইতাম না। কিন্তু তিনি কোন কোন স্থলে আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন; স্থলবিশেষে আমার প্রতি অবিচারও করিয়াছেন। কাজেই সত্যানুরোধে আমাকে দুই চারিটি কথা বলিতে হইতেছে।

কিন্তু এই ব্যাপারে অগ্রসর হইয়া গোড়াতেই এক সঙ্কটে পড়িয়াছি। কারণ, প্রবাসীর সম্পাদক-মহাশয় উত্তর দিবার জন্য আমাকে মোটে একপক্ষ কাল সময় দিয়াছেন, এবং জানাইয়াছেন যে, তিনি "এ-" বৎসরের বাদপ্রতিবাদ আগামী বৎসরে লইয়া যাইতে চাহেন না। মহেশবাবুর ন্যায় পরিপক্ক ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচক তিন মাস ধরিয়া যে-সকল সূক্ষ্ম ও দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করিলেন, পনর দিনের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করা আমার পক্ষে একপ্রকার অসাধ্যসাধন। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমি সমালোচনার প্রথম দফা বাহির হইবামাত্রই উত্তর দিতে আরম্ভ করি নাই কেন, তবে তাঁহাকে বলি, সমালোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই আমার নিকটে সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তা'র পর সমালোচনা তিন বারে প্রবাসীর প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছে। এই বিপুল সমালোচনার আলোচনার জন্য অন্ততঃ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার প্রয়োজন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় যে এক মাসে তাঁহার পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধাংশ আমাকে ছাড়িয়া দিবেন, তাঁহার সদাপ্রসন্ন চিত্তৌদার্য্য স্মরণ রাখিয়াও তদ্বিষয়ে আমি কিছুমাত্র আশাও মনে পোষণ করিতে পারিতেছি না।

এই দুই কারণে আমি কোন কোনও গুরুতর প্রশ্ন আপাততঃ আলোচনার বাহিরে রাখিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিব।

পৌষের প্রবাসী

১। গ্রীক উচ্চারণ

মহেশবাবু গ্রীক বর্ণমালার উচ্চারণ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিষয়টি কত বিরোধসঙ্কুল, তিনি নিজেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই ফাল্গুনের প্রবাসীতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমি শব্দকোন্দল হইতে দূরে থাকিব, এবং নিজে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, শুধু তাহাই বিবৃত করিব। এই উদ্দেশ্যে প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত হইতেছে।

"আমি এবিষয়ে যে-নিয়ম মানিয়া চলিয়াছি, তাহা এই যে—গ্রাক নাম বাঙ্গলায় সুপ্রচলিত নহে, তাহার গ্রাক উচ্চারণ দিয়াছি, যথা 'আইস্খ্যুলস,' যে গ্রীক নামের উচ্চারণ স্পষ্টই অবিশুদ্ধ, তাহার শুদ্ধ উচ্চারণ প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন "সোক্রাটীস্," আর যে গ্রীক নাম ইংরাজীসাহিত্য হইতে বিকৃত উচ্চারণ লইয়া এদেশে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইংরেজী উচ্চারণই গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে "প্লাটোন" না লিখিয়া 'প্লেটো' লিখিয়াছি, ইহাই তাহার কারণ। এই নিয়ম পালন করিতে যাইয়া আমি সকল স্থলে সঙ্গতিরক্ষা করিতে পারি নাই, কিন্তু বৈদেশিক নাম লিখনে সঙ্গতিরক্ষা অতি দুরূহ।"

সর্ব্বশেষ বাক্যটির প্রমাণ সমালোচক স্বয়ং। তিনিও 'প্লাটোন' না লিখিয়া "প্লেটো" এবং "ক্সেনপ্হোন' না লিখিয়া "জেনফোন" লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে Theaitotos নামের বিশুদ্ধ উচ্চারণ 'ঠেআইটেটস্' বা 'ট্হেআইটেটস" ; কিন্তু তিনি "এউথুফ্রোন্" লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি গ্রন্থকারের অনেকগুলি গ্রীক নামের উচ্চারণ অবিশুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সে বিষয়ে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। আমি শুধু একটি শব্দ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতেছি। তৎপূর্ব্বে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, তিনি যে-সকল নিয়ম চালাইতে চাহেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যে চলিবে কি না, সন্দেহ। আমার তো মনে হয়, বাঙ্গালী পাঠকেরা তাঁহার "ক্সেনোন্"কে "ক্সসেনোন্" (প্রবাসীতেই "ক্সসেনোন্" ছাপা হইয়াছে—৩৯৪ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ), "কৃহামিডেস" কে "কহামিডেস", "ট্হেআইটেটস"কে "টহেআইটেটস" "প্হিলেবস"কে "পহিলেবস" উচ্চারণ করিবে। দুর্ব্বলদন্ত বঙ্গবাসী এইপ্রকার দাঁতভাঙ্গা নাম বরদাস্ত করিতে পারিবে কি?

আমি কেন "সোক্রাটেস" না লিখিয়া "সোক্রাটীস" লিখিয়াছি, তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত। এটা-বাদীর মতে eta দীর্ঘ 'এ'। বাঙ্গালায় হ্রস্ব 'এ' ও দীর্ঘ 'এ' এই দুইটির পার্থক্য বুঝাইবার কোনও চিহ্ন নাই। সুতরাং বঙ্গীয় পাঠক যে "সোক্রাটেস" শব্দটি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই। পক্ষান্তরে সমালোচক রবার্ট্সনের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে "খৃষ্টের পূর্ব্বে প্রথম শতাব্দীতেই এই 'ঈ' উচ্চারণ প্রচলিত ছিল।" তা' ছাড়া 'সক্রেটিস' রূপে etaর 'ই' উচ্চারণ বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। 'ই'কে 'ঈ' করা অতি সহজ, কিন্তু "সক্রে" রাখিবার উপায় নাই, কেননা, ওটা স্পষ্টই ভুল। সুতরাং 'সোক্রাটীস" লিখিলে উচ্চারণ শুদ্ধ, অথচ পরিবর্ত্তনও যথাসম্ভব অল্প হয়। আমি অবিমিশ্র এটা-বাদীও নই, ঈটা-বাদীও নই, আমি সুবিধাবাদী। বৈদেশিক নামের রূপান্তরকরণে সুবিধাটা উপেক্ষার জিনিস নয়। মুসলমান লেখকেরা Sokratesকে "সোক্রাৎ" Platon 'এফ্লাতুন' Aristotetesকে 'আরিস্তু' করিয়া ফেলিয়াছেন; সেজন্য তাঁহাদিগকে কেহ দোষ দিতেছে না।

২। উপদেবতা

আমি কোন-কোন স্থলে (সর্ব্বত্র নহে) to daimonion এর বাঙ্গালা করিয়াছি 'উপদেবতা'। সমালোচক বলেন, ইহা উচিত হয় নাই। কারণ, তিনি বলেন,

(১) "বাংলা ভাষায় উপদেবতা শব্দ ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না।" কথাটা বিচার্য্য।

বাংলা ভাষায় 'অপদেবতা' শব্দ মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু 'উপদেবতা' শব্দের হীনার্থক প্রয়োগ বিরল, এবং উহার মৌলিক ভাব নিন্দাসূচক নহে। তাহার প্রমাণ

শব্দকল্পদ্রুম বলেন,

উপদেবতা (উপগতা সাদৃশ্যেন দেবতাম্) যক্ষ ভূতাদিঃ।

উপদেবতাশ্চ দশ। যথাহ অমরঃ।

বিদ্যাধরো২প্সরো যক্ষো রক্ষো গন্ধর্ব্বকিন্নরৌ।

পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতো২মী দেবযোনয়ঃ।

বাচস্পতি অভিধানেও উপদেব শব্দের ব্যাখ্যাতে ঐ মত সমর্থিত হইয়াছে; অধিকন্তু তাহাতে লিখিত আছে, 'এষাকোলৌকিকশক্তি-কত্বাত্তথাত্বম্'—ইহারা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়া উপদেবত্ব (উপদেব আখ্যা) লাভ করিয়াছেন। ইহাতে মন্দ ভাব অনুস্যূত নাই। অপিচ, অমর উপদেবগণের যে দশ শ্রেণী উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রক্ষঃ, পিশাচ ও ভূত, এই তিনটি ছাড়া অপর সাতটি বাংলা ভাষায়ও মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

Boehtlingkএর St. Petersburg Dictonaryতে উপদেব শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে eine untergeordnete Gottheit অর্থাৎ an inferior deity.

আপ্তের মতে উপদেবতার ইংরেজী অর্থ a minor or inferior God, সুবল মিত্রের বাঙ্গালা ইংরেজী অভিধানেও a minor deity, a demigod, a ghost প্রভৃতি প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষায় উপদেবতা শব্দটি কোন স্থলেই ভাল অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। আর যদিই বা উহা নিত্য মন্দার্থে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলেও উহার মৌলিক অর্থ পুনরুদ্ধার করা অসঙ্গত হইত না। ইংরেজীতে demon (বা daεmon) শব্দটি প্রায়শঃ মন্দার্থে ব্যবহৃত হয়; অথচ the demon (বা daemon) of Socrates এই শব্দটির বহুল প্রচলন আছে।

(২) সমালোচকের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, daimonion "শব্দের অর্থ দেবতা না দেবকর্ত্তৃত্ব, সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।" কথাটা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি অনেক পণ্ডিতের সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন। সাক্ষ্যগুলি আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেছি, কেন না Platoর Apologyর যে-সংস্করণ আমি পড়িয়াছি, তাহার ভূমিকায় সম্পাদক স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, "It is perfectly clear from all these passages that Socrates meant by *to daimonion* some 'divine agency, not a divine agent or deity,' in other words that *daimonion* is an adjective and not a substantive," তা সত্ত্বেও কোন-কোন স্থলে বাধ্য হইয়া আমাকে 'উপদেবতা' শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। নতুবা অর্থ প্রকাশের অসুবিধা ঘটিত। সমালোচক তাঁহার সপক্ষে জাউএটের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। জাউএট নিজে Theaetetos 151a 'to gignomenon moi daimonion' এই শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন 'my familiar' তার পর Liddel and Scott সঙ্কলিত বৃহৎ Greek-English Lexiconএ Daimonion শব্দের অর্থগুলির মধ্যে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে 'an inferior divine being, a demon' এবং 'the name by which Socrates called his genius, or the spirit that dwelt within him,' এইরূপ লিখিত আছে।' জেনফোন-প্রণীত "সোক্রাটীসের জীবন স্মৃতির" ভাষ্যকার Cluerএ ঐ শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ষ্টুয়ার্ট (The Myths of Plato, p. 3) daemonion শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "his familiar spirit."

আর একটা কথা

এয়ুথুফ্রোণ সোক্রাটীসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি এমন কি করিতেছ, যাহাতে সে বলে যে তুমি যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছ?"

সোক্রাটীস—ও বিচিত্রবুদ্ধি, তাহা শুনিতে বড়ই অদ্ভুত। সে বলে যে, আমি দেবতা সৃষ্টি করিতেছি। আমি নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছি (kainous poiounta theous) ও পুরাতন দেবতায় বিশ্বাস করি না, এইজন্য সে বলিতেছে, পুরাতন দেবগণের পক্ষে সে আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে।

এয়ুথুফ্রোণ—বুঝিতে পারিতেছি, সোক্রাটীস; তুমি কিনা বল যে তুমি সময়ে-সময়ে দৈববাণী (to daimonion) শুনিতে পাও। এই জন্য—Plato, Euthyphron.

জেনফোন "জীবনস্মৃতির" প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলিতেছেন, "লোকে সদাসর্ব্বদাই বলিত, যে সোক্রাটীস বলিয়া থাকেন, তিনি দৈব ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন, অথবা দেবতা তাঁহাকে ইঙ্গিত প্রেরণ করেন (to daimonion heautoi semainein)। আমার মনে হয় প্রধানতঃ এই-জন্যই তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনীত হইয়াছিল, যে তিনি নূতন দেবতা kaina daimonia—daimonion শব্দের বহুবচন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।"

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে প্লেটো যে-স্থলে theous শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, জেনফোনের গ্রন্থে ঠিক তার অনুরূপ স্থলে daimonia শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দ-দুটি যে সমার্থক তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অতএব আমার মতে স্থলবিশেষে to daimonionএর অনুবাদ 'উপদেবতা' করিলে কাজটা খুব অনুচিত হয় না। সমালোচক লিখিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে ইহা দৈববাণী-দৈবাদেশ বা দৈব ইঙ্গিত।" আমি ২৪ পৃষ্ঠায় এই তিনটি পদই ব্যবহার করিয়াছি; একাধিক স্থলে (যথা ৩৬০ ও ৩৭৪ পৃষ্ঠায়) অন্তর্দেবতা শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৪ পৃষ্ঠায় "দৈববাণীর বিবিধ ব্যাখ্যা" নামক যে-প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, "কিন্তু তাঁহার নিত্যসঙ্গী দৈববাণী যে কি, তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। সোক্রাটীস নিজে ইহাকে কায়া প্রদান করেন নাই।" ইহার কয়েক ছত্র পরে 'উপদেবতা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া সমালোচক এমনভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে পাঠকেরা মনে করিতে পারেন গ্রন্থকার to daimonionএর প্রকৃত অর্থ না জানিয়া আগাগোড়াই ভুল অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি যে তিনটি পদ দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, গ্রন্থখানির এক পৃষ্ঠাতেই যে সে তিনটিই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা তিনি মোটেই উল্লেখ করেন নাই। সাড়ে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী "দৈববাণীর বিবিধ ব্যাখ্যা" তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল, আর তিনি এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, যে গ্রন্থকার সম্ভবতঃ প্লুটার্কের অনুসরণ করিয়া daimon শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।"—ইহাতে কি গ্রন্থকারের প্রতি সুবিচার করা হইয়াছে?

পারিভাষিক শব্দ

সমালোচক লিখিয়াছেন, "'এইডে' বাদকে স্ফোটবাদরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে না।"

Ideaর প্রতিশব্দ 'স্ফোট', অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আমাকে এই প্রকার বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি পরে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে স্ফোটের ব্যাখ্যা (বোধ হয় দ্বিতীয় বার) পাঠ করি।

যদি আমার অনুবাদে ভুল হইয়া থাকে, তবে সে-ভুলের জন্ম শীল মহাশয় দায়ী। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ম রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন কি না, সে-বিষয়ে গভীর সংশয় আছে। বিচার পণ্ডিতে পণ্ডিতেই শোভন হয় আমি কেবল আমার বক্তব্য বলিয়া অব্যাহতি পাইতে চাই।

আমার ধারণা, শুধু একটা শব্দ দ্বারা কোন দর্শনেরই মর্ম্মকথা পরিব্যক্ত হয় না। বৈদেশিক পরিভাষার অনুবাদে ইহা আরও তীব্ররূপে অনুভূত হয়। স্ফোটবাদ বলিলে শুধু এই নাম হইতে প্লেটোর Doctrine of Ideas বিষয়ে কোনই জ্ঞান হয় না; সেজন্ম উহার বিবৃতি আবশ্যক। বিবৃতি স্পষ্ট হইলে একটা অপূর্ব নামেও কাজ চলিয়া যাইতে পারে; এবং কালে ঐ নামটি একটা দার্শনিক মতের সহিত যুক্ত থাকিয়া সাহিত্যে স্থান লাভও করিতে পারে।

এখন কথা এই যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে স্ফোট শব্দটির বহু প্রচলন আছে বলিয়াই Ideaর প্রতিশব্দরূপে ইহার ব্যবহার অসমীচীন হইয়াছে কি না।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, ভারতীয় দর্শনে 'বিবেক' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে, তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গলা সাহিত্যে উহা 'ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ' বা Conscience অর্থে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং স্ফোট শব্দটিকে শব্দস্ফোট হইতে বিযুক্ত রাখিয়া 'রূপস্ফোট' রচনা করিয়া Ideaর প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহার করিলে গুরুতর প্রত্যবায় হয় না। বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি, যে, বাঙ্গলা ভাষার দৈন্যবশতঃ কোন শব্দ দ্বারাই প্লেটোর Doctrine of Ideas সুষ্ঠু রূপে অনুদিত হইতেছে না। 'প্লেটোর আকৃতিবাদ,' 'প্লেটোর পরাকৃতিবাদ,' 'প্লেটোর রূপবাদ বা পরমরূপবাদ' 'প্লেটোর তত্ত্ব বা প্রকৃততত্ত্ব', 'প্লেটোর আদর্শবাদ'—ইহার কোনটিই গ্রন্থকারের মনঃপূত নয়, যেহেতু কোনটির দাবিই 'স্ফোটবাদ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে আমি তো মনে করি, Plato's X বলিলে আমাদের যতখানি জ্ঞানোদয় হয়, 'প্লেটোর রূপ' বা 'প্লেটোর তত্ত্ব' বলিলে তদপেক্ষা অধিক হয় না।

সমালোচক মোক্ষমূলর হইতে যে-বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩১৫ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ), তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আচার্য্য লিখিয়াছেন, "It has been translated by expression, notion, concept or idea, but none of these renderings can be considered as successful." দেখা যাইতেছে, স্ফোট ও idea সমার্থক বলিয়া ধরিয়া লইবার ত্রুটি আমার একার হয় নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী আরও অনেকের এইরূপ প্রমাদ ঘটিয়াছে।

মাঘের প্রবাসী

প্লেটোর স্ফোটবাদ

মহেশবাবু Doctrine of Ideas কথাটির বাঙ্গালা করিয়াছেন 'আদর্শবাদ'। প্লেটো Ideaকে এক অর্থে আদর্শ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; ১১৫ পৃষ্ঠায় আমি বলিয়াছি, "স্ফোটসমূহ সত্তার শাশ্বত আদর্শ বা প্রথম রূপ।" কিন্তু প্লেটোর গ্রন্থাবলিতে স্ফোটের অন্যরূপ ও বিরোধী বর্ণনাও যথেষ্ট আছে; আমি তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিয়াছি।

সুতরাং বর্ত্তমান আলোচনায় আমি 'আদর্শবাদের' পরিবর্ত্তে 'স্ফোটবাদ' শব্দই ব্যবহার করিব।

মহেশবাবুর একটি বিশেষ গুণ আছে, যে তিনি যে-বিষয়ের বিচারেই প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেই বিষয়টিকে নিঃশেষে পরীক্ষা না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন না। মাঘের প্রবাসীতে প্লেটোর Doctrine of Ideas সম্বন্ধে তিনি তাহাই করিয়াছেন। এই পল্লবিত আলোচনার জন্ম আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কিন্তু তিনি আলোচনাটির অন্তিম ভাগে গ্রন্থকার-সম্বন্ধে যে-সকল টিপ্পনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু না বলিলে পাঠকগণ "বিভ্রান্ত" হইবেন; কাজেই আমি কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে চাই।

সমালোচক লিখিয়াছেন (৫১৪ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ)—

"গ্রন্থকার যে-ভাবে প্লেটোর 'এইডস্' বাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করিতে পারিতেছি না। তিনি সামঞ্জস্য না করিয়া কয়েক স্থলে বিরোধী মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, অনেকস্থলে প্লেটোর মত এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় এ ব্যাখ্যা যেন সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন না।"

অভিযোগটি গুরুতর; এখন দেখা যাক্, গ্রন্থকারের পক্ষে কি বলিবার আছে।

(১) গ্রন্থকার যে-ভাবে প্লেটোর 'এইডস' বাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রথমে সেই কথাই বলি। গ্রন্থখানির নাম 'সোক্রাটীস' ,প্লেটোর 'জীবনচরিত' বা 'গ্রীক-দর্শনের ইতিহাস' নয়। স্ফোটবাদ ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই তত্ত্বটি কত জটিল; দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য ও বিরোধসঙ্কুল, সমালোচক তাহা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। এমন একটি তত্ত্বের বৃত্তান্ত আমাকে মোটে দশ পৃষ্ঠায় (১৯৩—২০৩) সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। সুতরাং একটা মত উল্লেখ করিয়াই তৎক্ষণাৎ সঙ্গে-সঙ্গে আর দশটা বিরোধী মত উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই, সঙ্গতও বোধ করি নাই। ওরূপ করিলে পুস্তকখানি সুপাঠ্য না অপাঠ্য হইত, সে-বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে। আমি প্লেটোর স্ফোটবাদ নিজে যেমন বুঝিয়াছি যথাসম্ভব সংক্ষেপে সেইরূপ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। সমালোচক আমার ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে পারিতেছেন না, ইহা আমার পক্ষে দুঃখের বিষয়; কিন্তু তিনি যে-প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছেন, "সোক্রাটীসের জীবনচরিতে" সে-প্রণালীতে স্ফোটবাদ ব্যাখ্যা করা এখনও আমার নিকটে সুবিবেচনার কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

(২) আমি সামঞ্জস্য না করিয়া কয়েক স্থলে বিরোধী মতের একত্র সমাবেশ করিয়াছি, এই ত্রুটি (যদি বস্তুতই এটা ত্রুটি হয়) আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এই ত্রুটি পরিহার করিবার উপায় ছিল না। প্লেটোর স্ফোটবাদের সামঞ্জস্য-সাধন আমার সাধ্যাতীত। সমালোচক নিজেই বলিতেছেন, "এত বিভিন্ন মত ।...এ অবস্থায় প্লেটোর মতের ব্যাখ্যা করা সহজ নহে। ব্যাখ্যা করিবার সময় অবিচারিতভাবে কিছুই বলা উচিত নহে এবং প্রধান-প্রধান বিষয়ে খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ কি-কি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক।" গ্রীক দর্শনের ইতিহাস যিনি সঙ্কলন করিবেন, তাঁহার পক্ষে এই উপদেশ অবশ্যই শিরোধার্য্য। কিন্তু সোক্রাটীসের জীবনচরিতকারের পথ স্বতন্ত্র। পুস্তকখানির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬০। স্ফোটবাদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের মতাবলি উদ্ধৃত করিয়া তিনি যদি উহার কলেবর আরও বিপুল করিয়া তুলিতেন, তবে বোধ করি পাঠকেরা কেহই তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না। তা ছাড়া, প্লেটো বাস্তবিকই স্ফোট-সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত

করিয়াছেন, সেগুলি পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত করা লেখকের একটা কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রত্যেক বাক্যের পরে এক-একটা আলোচনা জুড়িয়া দেওয়া যে তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

(৩) সমালোচক লিখিয়াছেন, "(গ্রন্থকার) অনেক স্থলে প্লেটোর মত এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহাতে মনে হয় এব্যাখ্যা যেন সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাতে পাঠকগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন না।"

পাঠকগণ আমার পুস্তকে দশ পৃষ্ঠার মধ্যে স্ফোটবাদের ব্যাখ্যা পড়িয়া "প্রকৃত তত্ত্ব" জানিতে পারিবেন, এদুরাশা আমি অন্তরে স্থান দিই নাই; আগাগোড়া ভুল বুঝিবেন, তাহাও মনে করি না। কিন্তু সমালোচকের উক্তিটি কি যুক্তিসঙ্গত? পাঠকগণ বিচার করুন।

(ক) গ্রন্থের সোয়া পৃষ্ঠায় (১২৫—৬) স্ফোটের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। এই নিবন্ধে স্ফোট-সম্বন্ধে প্লেটোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছি, "প্লেটো এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আগাগোড়া অসঙ্গতি-দোষ এড়াইতে পারেন নাই।" এতদ্দ্বারা কি বলা হইল, আমি যেভাবে প্লেটোর মত ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত? অসঙ্গতিদোষ-দুষ্ট মত কি কখনও সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে?

(খ) 'জড়' বিষয়ক আলোচনার পরিশেষে লিখিত আছে, "কেহ-কেহ বলেন, প্লেটো বিশ্বাস করিতেন, সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই শাশ্বত শরীরী জড় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এবিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা সকলে নিঃসংশয় নহেন।" (১২৮ পৃঃ)

এখানে কি একটা "সর্ব্ববাদি-সম্মত মত" প্রচারিত হইয়াছে?

(গ) গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠায় যে নিবন্ধটি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নাম "স্ফোটের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ।" উহার প্রথম কয়েকছত্র উদ্ধৃত হইতেছে—

"অনেকে বলেন, প্লেটোর দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও স্ফোট জগৎ পরস্পর পাশাপাশি অবস্থিত, এবং উভয়ের সত্তা মূলতঃ বিভিন্ন। কিন্তু প্লেটো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যে স্ফোটই একমাত্র সত্য বস্তু; ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থসমূহের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আমরা উক্ত মত দ্বিধারহিত হইয়া সমর্থন করিতে পারি না। তবে উভয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, অথবা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থনিচয় স্ফোটজগৎ হইতে প্রসূত হইয়াছে কি না; মানবাত্মার স্ফোট কি রাম শ্যাম যদু, মধুর মধ্যে খণ্ড-খণ্ড রূপে বিকীর্ণ হইয়াছে, না প্রত্যেকের মধ্যেই অখণ্ড ও পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে; পরম সুন্দর কি করিয়া যুগপৎ সমুদায় সুন্দর বস্তুতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে?—এইসকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে; তাহার কারণ এই, যে প্লেটো স্বয়ং এ সমস্যার একটা সুসঙ্গত সমাধান করিয়া যান নাই।" ইহার একটু পরেই আমি লিখিয়াছি, "ফলতঃ বিষয়টি এমন জটিল, যে, উহার মীমাংসা করিতে যাইয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্লেটো দ্বৈতবাদী, কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন প্লেটো অদ্বৈতবাদী।" (১২৯ পৃষ্ঠা)

আমি তো বুঝিতেই পারিতেছি না, এই কথাগুলি পড়িলে পাঠকদিগের বিভ্রান্ত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে।

(ঘ) সমালোচক আরও বলিতেছেন, 'পদার্থসমূহ স্ফোটের অনুকরণে সৃষ্ট'; এবং 'পদার্থসমূহ স্ফোটের অংশভাক্', এই দুই মত পৃথক্, কিন্তু আমি এমনভাবে প্লেটোর মতকে বর্ণনা করিয়াছি যেন এই দুই মতে কোনো পার্থক্য নাই।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, "গ্রন্থকার এবিষয়ে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করেন নাই, ইহাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন।"

উপরে যে-অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরেই আমি লিখিয়াছি—

"ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উদ্ভবের ন্যায় তাহার অবস্থিতিও সংশয়-তিমিরে আচ্ছন্ন। স্ফোট হইতে পরিদৃশ্যমান পদার্থ কিরূপে উদ্ভূত হইল, প্লেটো তাহা যেমন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, তেমনি এই উভয়ে কি করিয়া যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহাও বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বলিতেছেন, স্ফোট জড়ীয় বস্তুর আদর্শ বা আদিরূপ, আবার তাহার সত্তা ও বাস্তবতা। পদার্থ যে পরিমাণে স্ফোটের অংশভাক্, সেই পরিমাণে তাহার অনুকৃতি। সুতরাং পদার্থ কিরূপে স্ফোটের অংশভাক্ হইল, তাহা ব্যাখ্যাত না হইলে, পদার্থ স্ফোটের অনুকৃতি, শুধু একথার দ্বারা ব্যাখ্যার অভাবের পরিপূরণ হইবে না।" (১২৯ পৃষ্ঠা)

সমালোচক বোধ করি এই কথাগুলি গ্রন্থকারের মন্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

দশ পৃষ্ঠার মধ্যে চার বার প্লেটোর অসামঞ্জস্য এবং তাঁহার এক একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে মতানৈক্য উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পরেও যদি সমালোচক বলেন, যে, আমি "অনেক স্থলে," প্লেটোর মত এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, "যাহাতে মনে হয়, এব্যাখ্যা যেন সর্ব্ববাদিসম্মত", তবে আমি নিরুপায়।

সমালোচকের ৪ সংখ্যক মন্তব্য সম্বন্ধে গ্রন্থকারের যাহা বক্তব্য আছে, এই মাত্র বলা হইল। ১ ও ৩ সংখ্যক মন্তব্যে তিনি মতভেদের কথা বলিয়াছেন, তদুত্তরে যাহা বলিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ২য় মন্তব্যে তিনি লিখিয়াছেন, "কিন্তু প্লেটো ইহাও বলিয়াছেন, এইডস্ সৃষ্ট (সাধারণতন্ত্র ৫৯৭)। ইহা আমাদিগের গ্রন্থকারের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয় নাই; ইহাতে পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন।" 'এইডস' (স্ফোট) সৃষ্ট, ইহার সপক্ষে সমালোচক একটি মাত্র স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেস্থলেও প্লেটো শয্যার দৃষ্টান্তে 'এইডস' সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন; স্পষ্ট করিয়া 'এইডস' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তথাপি, আমি স্বীকার করি এই স্থলটি উল্লেখ করিলে ভাল হইত।

এখন তাঁহার পঞ্চম মন্তব্য বিষয়ে একটু বলিতে চাই। তিনি লিখিয়াছেন,

"গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন—'প্লেটোর স্ফোটবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অভিন্ন; স্ফোটবৃন্দই শাশ্বত দেবকুল এবং স্ফোটশিরোমণি পরম শিবই ঈশ্বর।'

"এই অংশ পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আমাদিগের বক্তব্য এই:—

"(ক) গ্রন্থকার বলিতেছেন ঈশ্বর বর্ত্তমান এবং সেই সঙ্গে শাশ্বত দেবকুলও বর্ত্তমান। যেমতে ঈশ্বরের সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয় শাশ্বত সত্তার স্থান আছে, সে মত কি ব্রহ্মবাদ? ভারতীয় ব্রহ্মবাদ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহার অর্থ ব্রহ্মছাড়া দ্বিতীয় বস্তুই নাই। ব্রহ্মবাদ সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতগন্ধ-বিবর্জ্জিত।"

এখানে ভারতীয় ব্রহ্মবাদের কথা কোথা হইতে আসিল? প্রথমোদ্ধৃত বাক্যটার সরল অর্থ, 'প্লেটোর স্ফোটবাদ ও প্লেটোর ব্রহ্মতত্ত্ব।' পাঠকগণ সমগ্রস্থলটি পাঠ করিয়া দেখুন, উহার আর কি অর্থ হইতে পারে।

"তৃতীয় প্রকরণে স্ফোটবাদের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, যে প্লেটোর স্ফোটবাদ ও ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অভিন্ন; স্ফোটবৃন্দই শাশ্বত দেবকুল, এবং স্ফোটশিরোমণি পরম শিবই ঈশ্বর। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে অধ্যাপক বার্ণেটের মতে পরম শিব ও ঈশ্বর বিভিন্ন। স্ফোটবাদের সাহায্যে প্লেটো ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে লৌকিক সংস্কার মার্জ্জিত করিয়াছেন। ঈশ্বর ঈর্ষাপরবশ, তিনি সাকাররূপ

পরিগ্রহ করেন, তাঁহাতে অজ্ঞতা ও আত্মবঞ্চনা বা মিথ্যার লেশ থাকিতে পারে; তিনি বলি ও প্রার্থনাদ্বারা প্রসন্ন বা বশীভূত হন—প্লেটো অশ্রদ্ধাভরে এই জাতীয় প্রচলিত মত নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, প্রেমময়, মঙ্গলময়, ন্যায়বান্, পূর্ণ পরম সুন্দর, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ডবিধাতা। আমরা প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায়ে (৩৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা) প্লেটোর ব্রহ্মতত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি, অতএব এস্থলে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।" (২১৬ পৃষ্ঠা)

তবে সমালোচক যদি বলেন, 'ব্রহ্মতত্ত্ব' শব্দ একমাত্র ভারতীয় অদ্বৈতবাদের সংস্রবেই ব্যবহার করিতে হইবে, কোন বৈদেশিক দার্শনিক বা মহাপুরুষের ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যাতে উহার প্রয়োগ অবৈধ তবে আমার নিশ্চয়ই অপরাধ হইয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি 'ভারতীয় ব্রহ্মবাদ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ', এবং 'সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতগন্ধ-বিবর্জ্জিত'?

সম্প্রতি ছান্দোগ্যোপনিষদের এক 'অপূর্ব্ব' সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা "শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি কর্ত্তৃক পদপাঠ, অবিকল বঙ্গানুবাদ' প্রভৃতি সহ ব্যাখ্যাত, এবং পণ্ডিত "সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক খণ্ডার্থ" ইত্যাদি সহ সম্পাদিত। এই সংস্করণের ভূমিকায় "ব্রহ্মবাদের দুই ধারা" নামক প্রবন্ধে তত্ত্বভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, যে যাজ্ঞবল্ক্য অভেদভাবকেই অমৃতত্ব বলিয়াছেন, এবং "যাজ্ঞবল্ক্যের মত হইতেই যে গৌড়পাদ এবং শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিকগণের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ এবং লয়বাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।" পক্ষান্তরে প্রজাপতির মতে ব্রহ্মলোকে উপাস্য উপাসকের ভেদ থাকে; এবং ইন্দ্র "স্পষ্টরূপেই ভেদাভেদবাদী, নির্ব্বিষয় অদ্বৈতবাদের বিরোধী।" 'এই দ্বিতীয় চিন্তাধারা হইতেই যে আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিকশিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।" (২।৶-২।৹ পৃষ্ঠা।)

তত্ত্বভূষণ মহাশয় বলিতেছেন, ভারতীয় ব্রহ্মবাদের অদ্বৈত এবং দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত, এই দুই ধারা।

সমালোচকের নিজের নামে যে-গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ভূমিকাতেই তাঁহার মতের প্রতিবাদ রহিয়াছে। ঐ ভাষ্যে ছান্দোগ্যের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়; মহেশবাবু এ যাবৎ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মত হইতে আপনাকে বিমুক্ত (dissociate) করেন নাই।

সমালোচক শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মের সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য অজ নিত্য শাশ্বত মানবাত্মা বর্ত্তমান।"

হাঁ, গ্রন্থকার ও সমালোচক যে সমাজের সভ্য, তাহা এই মতই প্রচার করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মেরা "অদ্বৈত" বা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মের উপাসক; আবার তাঁহারা শ্রাদ্ধবাসরে ভগবদ্গীতার "অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" ইত্যাদি বাণীও শ্রদ্ধার সহিত আবৃত্তি করেন। সমালোচকের সহযোগী পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল নানা পুস্তকে ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ভেদাভেদ প্রতিপন্ন করণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

"কোটিবৃন্দই শাশ্বত দেবকুল," এই বাক্যটী উল্লেখ করিয়া সমালোচক বলিতেছেন, "এই ভাষা অত্যন্ত আপত্তিজনক। এই কবিত্ব কেবল অর্থহীন নহে—ইহা ভ্রমোৎপাদক।"

আপত্তি করিলে চলিবে কেন? এই "অর্থহীন, ভ্রমোৎপাদক কবিত্ব", প্লেটোর নিজের, আমার নয়। তিনি "টিমাইয়সের" সৃষ্টি প্রকরণে লিখিয়াছেন, যে এই বিশ্ব পিতা দ্বারা 'রচিত, শাশ্বত দেবগণের প্রতিমা' (Ton aidion theon gegonos agalma) (Tim (37c)। ইহার মর্ম্ম এই যে, জগৎপিতা শাশ্বত দেবগণের আদর্শে (বা তাঁহাদিগের অনুকৃতিতে) এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জেলারের মতে এস্থলে 'শাশ্বত দেবগণ' পদের অর্থ জ্যোতিষ্কসমূহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। (Plato, pp. 283, 495) গম্পার্টসও জেলারের সহিত একমত। Greek Thinkers, Vol. III. pp. 209, 212, 213. সমালোচক হয় তো এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অপর দশটা ব্যাখ্যা আনিয়া উপস্থিত করিবেন; কিন্তু আমি একেত্রে বিসংবাদী মতাবলির নিবিড় অরণ্যে এই দুইজনকেই পথ-প্রদর্শক করিয়া চলিয়াছি।

ফাল্গুনের প্রবাসী

ফাল্গুনের সংখ্যার আলোচ্য বিষয় 'বুদ্ধ ও সোক্রাটীস'। ইহাতে সমালোচক কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। সে গুলির বিচার আবশ্যক। তৎপূর্ব্বে দুই-একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া রাখি।

প্রথম কর্ত্তব্য ভ্রমস্বীকার। সমালোচক তিন স্থলে আমার ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) ত্রিবিধ তৃষ্ণা

বিভবতণ্হার আমি যে অর্থ করিয়াছিলাম ও তদপেক্ষা সমালোচকের অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত; তিনি তাহার সপক্ষে প্রমাণও দিয়াছেন। আমার মনের সকল সংশয় এখনও যায় নাই, কিন্তু সে-কথা এখানে তুলিব না।

(২) আর একটি স্থল

গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠে তেবিজ্জসুত্তের অনুবাদে 'যাহা কিছুর প্রাণ ও আকার আছে' ইত্যাদি বাক্যটি সম্বন্ধে আমার নিজের মনেই একটা অতৃপ্তি ছিল। সমালোচক প্রমাণপ্রয়োগসহকারে ইহার সদর্থ করিয়াছেন।

(৩) সক্কায়দিট্‌ঠি

আমি ইহার বাঙ্গলা করিয়াছিলাম, "আমি আছি, এই ভ্রান্তি।" সমালোচক এই অর্থ ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া শব্দটির কুড়ি প্রকার অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মজ্‌ঝিমনিকায়ে (১।৩০০ পৃঃ) এই কুড়িটির উল্লেখ দেখিলাম, সুতরাং অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তথাপি একটা কথা বলিতেছি। আমি দশ সংযোজনের তালিকায় ঐ চারিটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। সমালোচক যদি উহার স্থলে সংক্ষিপ্ত একটা কিছু বলিয়া দিতেন, তবে ভাল হইত। আর মোটের উপরে অর্থের পার্থক্যও যে খুব বেশী দাঁড়াইতেছে, তাহাও মনে হয় না। আত্মা শব্দটি অনেক সময়ে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাতেই যত গোলযোগ ঘটে। P. T. S. অভিধানে সক্কায়দিট্‌ঠির একটি অর্থ, the heresy of individuality.

এই তিনটি সংশোধনের জন্য আমি সমালোচককে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এখন দুইটি অবান্তর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিয়া পরে কয়েকটি গুরুতর সমস্যার আলোচনায় প্রবেশ করিব।

(১) আহার বিহারাদি

আহারবিহারাদি শীর্ষক আলোচনাতে 'পানপর্ব্ব' হইতে একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক বলিতেছেন, "গ্রন্থকার প্রথম বাক্যটির অনুবাদ করেন নাই।" এখানে সমালোচক ভুল করিয়াছেন। ২৩১ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র উহার অনুবাদ, এবং আমার মতে এই অনুবাদই ঠিক।

(২) নরক

সমালোচক বলেন, "প্লেটো বাস্তবিক অনন্ত নরক মানিতেন না".

গ্রন্থকারের এই শুভ কথা কল্পনামাত্র।" তাঁহার মতে "প্লেটো অর্থাৎ প্লেটোর সোক্রাটেস এক শ্রেণীর লোকের জন্য অনন্ত নরকেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন।" প্রমাণস্বরূপ তিনি তিনটি স্থল উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনটিই উপাখ্যানের অন্তর্গত। এই সম্পর্কে জেলারের দুইটি উক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"The Platonic myths, in short, almost always point to a gap in scientific knowledge : they are introduced where something has to be set forth, which the philosopher indeed acknowledges as true but which he has no means of establishing scientifically." (Plato, p. 161)

"However admirable in themselves, therefore, they are in a scientific point of view, rather a sign of weakness than of strength: they indicate the point at which it becomes evident that as yet he cannot be wholly a philosopher, because he is still too much of a poet." (Do. 162)

ইহার সারার্থ এই যে, প্লেটো যাহা বিশ্বাস করিতেন, অথচ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিতে পারিতেন না, তাহারই বর্ণনাচ্ছলে উপাখ্যান রচনা করিতেন। উপাখ্যানগুলি যতই চমৎকার হউক না কেন, জ্ঞানের হিসাবে এগুলি দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। প্লেটো (বা সোক্রাটীস) যে উপাখ্যানের সকল কথাই বিশ্বাস করিতেন, তাহাও বলা যায় না। কেন না, পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি উপাখ্যানের মধ্যে দুইটির শেষেই সোক্রাটীস এমন কথা বলিয়াছেন, যাহাতে মনে হয়, উপাখ্যানগুলিকে অক্ষরে-অক্ষরে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। ফাইডোনের উপাখ্যানটি সমাপ্ত করিয়া তিনি বলিতেছেন, "এখন কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই জোর করিয়া এপ্রকার বলা সঙ্গত হইবে না, যে এই বিষয়গুলি আমি যেমন বর্ণনা করিলাম, ঠিক সেইরূপ।" গর্গিয়াসের উপাখ্যানটি বিবৃত করিয়াও সোক্রাটীস কাল্লিক্লীসকে বলিতেছেন, "খুব সম্ভব তোমার নিকটে এগুলি বুড়ী দিদিমার গল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, এবং তুমি এগুলি অবজ্ঞা করিবে।"

অতএব, 'প্লেটো অনন্ত নরক মানিতেন', এই মত সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বলবত্তর প্রমাণ আবশ্যক। সমালোচক বার্ণেটের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে আর্চ্চার-হাইণ্ডের মত উপস্থাপিত করা যাইতেছে।

"The hopeless reprobation of the incurable criminals described in the myth of the *Phaedo* belongs simply to the pictorial presentation : we find it only when Plato is pressing popular legend into his service ; not when he is presenting his own views undisguised by this veil of tradition." (*Phaedo*, Introduction, p. XXVII)

টিমাইয়স (42 C) হইতে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয়, যে প্লেটোর মতে অধঃপতিত আত্মা জন্ম-জন্ম সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে কোনও কালে সংশোধিত হইয়া পুনশ্চ আদি শুদ্ধতা লাভ করিতে পারে।

অতীন্দ্রিয় সত্তা

আমি লিখিয়াছি, "বৌদ্ধধর্ম পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; ইহাতে অতীন্দ্রিয় সত্তাতে বিশ্বাস একেবারেই নাই। যিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তিনি যে চিত্তের নিভৃততম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।"

দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমটির প্রপূর্ত্তি। সমালোচক বাক্য দুইটির বিচ্ছেদ ঘটাইয়া প্রথমটির বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, এবং যাহা প্রমাণিত করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। আমি ভাবি নাই যে, পাঠককে ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন আছে যে 'অতীন্দ্রিয় সত্তা' বলিতে, যিনি উপনিষদের 'ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং' ইত্যাদি শ্রুতির বিষয়ীভূত, তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমি যদি লিখিতাম যে, বৌদ্ধধর্ম্মে ধর্ম্ম, মৈত্রীকরুণামুদিতাউপেক্ষা, আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ, নির্ব্বাণ প্রভৃতি সকলই সাকার, তবে অবশ্যই আমার অজ্ঞতা বিমোচনের উদ্দেশ্যে সারবত্তী যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা ছিল যে, "গোতমের মতে চক্ষুকর্ণাদির অতীত রাজ্যও আছে।"

জ্ঞান ও মুক্তি

সমালোচক 'বৌদ্ধমতে জ্ঞানলাভই মুক্তি,' এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া যাহা-যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

প্রথমতঃ তিনি বাক্যটি অবিকল উদ্ধৃত করেন নাই। গ্রন্থে আছে, "বৌদ্ধমতে সত্যজ্ঞান লাভই মুক্তি।" তিন পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনার সারনিষ্কর্ষরূপে বাক্যটি লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা আলোচনাটি পড়েন নাই, তাঁহারা শুধু এই বাক্যটি (apart from the context) পড়িয়া বিভ্রান্ত হইবেন।

তার পর, "গ্রন্থকারের এই মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না," এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বলিতেছেন, (১) "বৌদ্ধধর্ম্মে জ্ঞানপ্রেমকর্ম্ম-সমন্বয়ীভূত হইয়াছে।" এবং (২) "দেখা যাইতেছে সম্যক্ প্রজ্ঞাও যথেষ্ট নহে।"

(১) বাক্যটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পৃষ্ঠায় তাহার ব্যাখ্যা আছে। এস্থলে প্রেম ও কর্ম্মের সাধন উপেক্ষিত হয় নাই। গ্রন্থে সাধন-প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কাজেই 'জ্ঞান ও ধর্ম্ম' নামক নিবন্ধে (৩০১ পৃষ্ঠা) জ্ঞানের কথাই বিশেষরূপে বলা হইয়াছে। আমার আশঙ্কা হয়, সমালোচকের মন্তব্যের ফলে বাক্যটিতে একটি বক্রার্থ অন্ত প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(২) গ্রন্থকারের মত সত্য কি না, পাঠকগণ তাহা বিনয়পিটকের নিম্নোক্ত বর্ণনার আলোকে বিচার করুন।

গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠায় আত্মার বিষয়ে যে-আলোচনা আছে, তাহার উপসংহারে বুদ্ধ বলিতেছেন—'(রূপ প্রভৃতি আত্মা নহে। যে সম্যক্ যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার ইহা এইরূপেই দর্শন করা কর্ত্তব্য।) হে ভিক্ষুগণ, এইরূপ দর্শনকারী জ্ঞানী আর্য্য শ্রাবকের রূপের প্রতি, বেদনার প্রতি, সংজ্ঞার প্রতি, সংস্কারের প্রতি, বিজ্ঞানের প্রতি নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, নির্ব্বেদ হইতে তাঁহার বিরাগ উৎপন্ন হয়, বিরাগ হইতে তিনি বিমুক্তি লাভ করেন, (বিমুক্ত হইলে) বিমুক্ত ব্যক্তির এই জ্ঞান হয়, 'আমি বিমুক্ত হইয়াছি।' তিনি সম্যক্ জানেন, 'পুনর্জ্জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য (উচ্চতরধর্ম্মজীবন) উদ্যাপিত হইয়াছে, যাহা করণীয় ছিল কৃত হইয়াছে; ইহজীবনের পরে আমার আর পুনরাগমন নাই।" (মহাবগ্‌গ ১।৬।৪৬)

তথাগত এস্থলে সরল ভাষায় বলিয়াছেন, সত্যজ্ঞানলাভের ফল মুক্তি। গ্রন্থের ২১২-২১৩ পৃষ্ঠায় সামঞ্ঞফল সুত্ত হইতে যে অংশটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে অবিকল এই ভাষায় আস্রবযুক্ত ভিক্ষু অর্থাৎ অর্হতের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। সমালোচক সংযুত্তনিকায় হইতে যে-অংশ বিকৃত

করিয়াছেন, তাহা যদি পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যানের বিরোধী হয়, তবে তাহাতেই গ্রন্থকারের মত অসত্য প্রমাণিত হয় না। নিম্নোক্ত বচন দ্বারাও এই মত সমর্থিত হইতেছে।

তথাগতের উপর্য্যুক্ত উপদেশের পরেই লিখিত আছে—

"ভগবান্ (বুদ্ধ) এই প্রকার বলিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু পরিতুষ্ট হইলেন এবং ভগবানের অভিভাষণে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যখন এই ব্যাখ্যান বিবৃত হইল, তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত সংসারাসক্তি ছিন্ন করিয়া আস্রবসমূহ হইতে বিমুক্ত হইল। সেই সময়ে জগতে ছয় জন অর্হৎ ছিলেন।" মহাবগ্‌গ, ১।৬।৪৭।

সমালোচক যদি বুদ্ধবাণী অপেক্ষা নারদের বাক্যকে অধিকতর মূল্য সমর্পণ করেন, তবে আমার কিছু বলিবার নাই।

পরিশেষে সমালোচক লিখিয়াছেন—

"প্রকৃত কথা এই, বুদ্ধের ধর্ম্মে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তি এই তিনেরই সম্মিলন হইয়াছে। কিন্তু সোক্রাটেসের আদর্শ 'জ্ঞানই ধর্ম্ম'। এই স্থলে সোক্রাটেস ও বুদ্ধের মধ্যে এক মৌলিক প্রভেদ।"

এই আপ্তবাক্য সমগ্র গ্রন্থখানির একটি অতি সংক্ষিপ্ত 'দুর্ব্যাখ্যা'।

সমালোচক সোক্রাটিসের একটি মতকে তাঁহার আদর্শ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই মতটির আলোচনা আট পৃষ্ঠার অধিক অধিকার করিয়াছে। (৬০-৬৮ পৃষ্ঠা)। নবম অধ্যায়ে ২২২ হইতে ২৬১, এই চল্লিশ পৃষ্ঠায় সোক্রাটিসের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এগুলি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু প্লেটো "পানপর্ব্বে" সোক্রাটিসের যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, —২৩৪ পৃষ্ঠা) তাহা তো অবজ্ঞার বস্তু নয়। এবং তাঁহার যে চারিখানি গ্রন্থ আমার পুস্তকে ভাষান্তরিত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি, তাহাতেও সোক্রাটিসের একটি মূর্ত্তি পাঠকগণের নয়নসমক্ষে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। এইসমুদায় গভীর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া সমালোচক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সোক্রাটিসে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির সম্মিলন হয় নাই, এবং "এই স্থলেই সোক্রাটেস ও বুদ্ধের মধ্যে এক মৌলিক প্রভেদ।"

আমি যাহা মৌলিক ঐক্য বলিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, সমালোচক তাহাকেই মৌলিক প্রভেদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ও সমালোচকের মধ্যে যেখানে এইপ্রকার সুমেরুকুমেরুর ব্যবধান, সেখানে বিচারের পথ অবরুদ্ধ।

অপর দুইটি বিষয়ে গ্রন্থকার ও সমালোচকের মধ্যে গুরুতর মত-বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে।

(১) আত্মা

আমি লিখিয়াছি, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। সমালোচকের মতে এই সিদ্ধান্ত দ্বারা "বুদ্ধের প্রতি অবিচার এবং পাঠকগণকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে।"

পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু সমালোচকের তর্কব্যূহের মধ্যে পড়িয়া আমি যে বিভ্রান্ত হইয়াছি, তাহা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেছি।

সমালোচক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, বুদ্ধের সময়ে আত্মা বিষয়ে যে বাষট্টি প্রকার কিংবা ততোধিক মত প্রচলিত ছিল, সেগুলি এবং বর্ত্তমান যুগের বিখ্যাত বিখ্যাত দার্শনিকগণের ভূরি ভূরি মতাবলি আলোচনা না করিয়া বুদ্ধের আত্মবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা সমীচীন হয় নাই।

সমালোচকের প্রদর্শিত প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় কেহ জীবনচরিত লিখিয়াছেন কি না, জানি না। লিখিত হইতে পারে কি না, তাহাও আমি বলিতে অক্ষম।

আমি মোটামুটি এই বুঝি যে, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন কি না, এই আলোচনায় প্রথম বিবেচ্য আত্মা শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর কি অর্থে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ তৎকাল-প্রচলিত কোন একটি মতেও আত্মা মানিতেন কি না।

(১) পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা আত্মা বলিতে এক নিত্য ও শাশ্বত সত্তা বুঝিয়া থাকি। সমালোচক যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'আমরা কে?' তবে প্রথমে বলিব, 'বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ;' তৎপরে আবশ্যক হইলে বলিব, 'অন্ততঃ লেখক যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজ'।

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, বুদ্ধ এই অর্থে আত্মার অস্তিত্ব প্রচার করিয়াছেন কি না? আমি বলি, "না।"

গ্রন্থের ২৮২-৩ পৃষ্ঠে মজ্‌ঝিমনিকায় হইতে ইহার একটি প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। উহার প্রথম খণ্ডের ১৩৮ পৃষ্ঠায় আত্মাসম্বন্ধে একটি ব্যাখ্যান আছে। ব্যাখ্যানটি প্রশ্নোত্তরমূলক। বুদ্ধ শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, যদি আত্মা থাকে, তবে আমার আত্মীয় (আত্মা বলিবার কিছুও থাকিবে?" "হাঁ, ভগবান্।" (কিম্বা হাঁ, প্রভো)। "যদি আত্মীয় থাকে, তবে আমার আত্মাও থাকিবে।" "হাঁ, ভগবন্।" "ভিক্ষুগণ, আত্মা ও আত্মীয় সত্যতঃ (যথার্থতঃ) স্থির বর্ত্তমান, ইহা যদি উপলব্ধ না হয়, তবে এই যে মত—এই জগৎ এই আত্মা, 'আমি মৃত্যুর পরে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, বিকারবিহীন আত্মাই হইব, (এবং) শাশ্বতী সমা সেইরূপই অবস্থান করিব,'——ভিক্ষুগণ, ইহা কি কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম্ম (বা ভ্রান্ত বিশ্বাস) নয়?" "ভগবন্, ইহা কেন কেবল পরিপূর্ণ বালধর্ম্ম হইবে?"

এই প্রশ্নের পরে গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠায় বিনয়পিটক হইতে আমরা যে-অংশ অনুবাদ করিয়াছি (মহাবগ্‌গ। ১।৬।৩৮-৪৫), তাহারই শেষার্দ্ধ (১।৬।৪১-৪৫) পুনরায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। মজ্‌ঝিম, ১ম খণ্ড, ৮ পৃষ্ঠায়ও আত্মা সম্বন্ধে এতদনুরূপ উক্তি আছে।

এই ব্যাখ্যানে বুদ্ধ, "আত্মা নিত্য ও নির্ব্বিকার" এবং "আত্মা রূপ বেদনা, ইত্যাদি," এই দুই মতের নিরসন করিয়াছেন।

(২) বুদ্ধ যে আত্মা-বিষয়ে তৎকালপ্রচলিত কোন-একটি মতও গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিনয়পিটক ও সূত্রপিটকে তাহার প্রমাণ এযাবৎ আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তিনি আত্মা কি নয়, শিষ্যদিগকে পুনঃ পুনঃ তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন; আত্মা কি, তাহা কোথাও ব্যাখ্যা করেন নাই। আত্মা-সম্বন্ধে পালি সাহিত্যে 'নেতি'-বাচক উপদেশ ভূরি ভূরি আছে, কিন্তু 'অস্তীতি'-বোধক উপদেশ একটিও নাই। তিনি এই প্রশ্নটি অব্যক্ত তত্ত্বের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য হইয়াছি, তিনি আত্মা—অন্ততঃ আত্মা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা—মানিতেন না।

এই প্রসঙ্গে সমালোচক 'নিত্য'বস্তু'-নামক মন্তব্যে জগৎ-প্রবাহ ও জীবন প্রবাহ উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "কিন্তু বুদ্ধ বলেন, ইহজীবনেই জীবনপ্রবাহের স্থিরত্ব সম্পাদন করা সম্ভব। যখন এই প্রবাহ স্থিরত্ব লাভ করে, তখন ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং প্রজাপতিও 'সেই মুক্ত পুরুষের সন্ধান পান না।'" ('অলগদ্দ-উপমা নামক সূত্র, মজ্‌ঝিম, ১।১৪০)।

বুদ্ধ কোথায় ইহা বলিয়াছেন? সমালোচকের লিখন-ভঙ্গী হইতে মনে করিয়াছিলাম, মজ্‌ঝিম, ১।১৪০ পৃষ্ঠায় বুদ্ধ ঐপ্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে "ইন্দ্রাদি মুক্ত পুরুষের সন্ধান পান না," এই কথা বলিয়া তিনি অন্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে, ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে মুক্ত পুরুষের বর্ণনাই চলিয়াছে। সমালোচক ইহার সহিত বুদ্ধবাণী-রূপে জীবন-প্রবাহের স্থিরত্ব সম্পাদন করিবার কথা জুড়িয়া দিয়াছেন। আমরা ইহার মূলের সন্ধান পাইলাম না।

ইহার একটু পরে তিনি মহাপরিনিব্বানসুত্ত হইতে একটি ও ধম্মপদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, "এসমুদয় যদি আত্মবাদের কথা হয়, তবে বুদ্ধ আত্মবাদী।"

ইহার একটিও আত্মবাদের কথা নয়। মহাপরি, ২।২৬এ উল্লিখিত উক্তির প্রথমার্দ্ধে তিনটি বাক্য আছে। সমালোচক তৃতীয় বাক্যটি বাদ দিয়া প্রথম দুইটির মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। আমরা সমগ্র উক্তিটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"তস্মাৎ ইহ আনন্দ অত্ত-দীপা বিহরথ অত্ত-সরণা। অনঞ্ঞ-সরণা, ধম্ম দীপা ধম্ম-সরণা অনঞ্ঞ-সরণা।" মহাপরি, ২।২৬।

"অতএব, হে আনন্দ, তোমরা আপনার প্রদীপ হও, আপনার শরণ লও, অন্যের শরণ লইও না, তোমরা ধর্ম্মকে আপনার প্রদীপ কর, ধর্ম্মের শরণ লও, অন্যের শরণ লইও না।"

ইহা পুরুষকারের কথা, আত্মবাদ নহে। সমালোচক ধম্মপদের যে-কয়টি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৫৬ ও ৩১৭ শ্লোকে আত্মার কোন কথাই নাই। ১৬০ ও ৩৮০ শ্লোকের মর্ম্ম (মানুষ) "আপনই আপনার নাথ;" ৩২৭ শ্লোকের মূল বক্তব্য "স্বচিত্তকে রক্ষা কর, আপনাকে উদ্ধার কর।"

ধম্মপদের অত্তা (আত্মা) শব্দ আত্মবাদের সমর্থক কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে দ্বিতীয় এই প্রশ্নের উপরে, যে বুদ্ধ আত্মা মানিতেন কি না? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরস্বরূপ ধম্মপদ হইতে "অত্তাহি অত্তনো নাথো" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিলে ঘোটকের সম্মুখে শকটস্থাপনের অসঙ্গতি ঘটে।

সমালোচক লিখিয়াছেন, "বুদ্ধ নিজে বলিতেছেন, তিনি বিনাশক নহেন।"

হাঁ, তিনি বলিয়াছেন, তিনি "সত্তো সত্তস্স" "বেনয়িকো" এই অভিযোগ মিথ্যা। কেন? না, শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে মোটেই জানে না; যেহেতু তথাগত অজ্ঞেয় (অননুবেজ্জো); না জানিয়াই, তিনি যাহা কখনও বলেন না, তাহাই তাঁহার প্রতি আরোপ করে। এখানে দুইটি বিষয় বিবেচ্য।

(১) বুদ্ধ এখানে স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই। (He does not commit himself to any particular view)।

(২) সত্তো সত্তস্স বেনয়িকো এই তিনটি কথার অর্থ কি?

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ-উপাধিকারী, বৌদ্ধবংশোদ্ভূত পালির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে এখানে বুদ্ধ নৈতিক সত্তার বা সনাতন রীতির কথা বলিয়াছেন। তাহার প্রমাণ বিনয়পিটক, সুত্তবিভঙ্গ ১।১।৩। বুদ্ধ কোন্ অর্থে বিনাশক, কোন্ অর্থে বিনাশক নহেন, এই স্থলে তিনি তাহা নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "হে ব্রাহ্মণ, আমি বিনয়ের (বা বিনাশের) জন্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিই; আমি আসক্তি, দ্বেষ এবং মোহের বহুবিধ পাপ ও অহিতকর কর্ম্মের (বা কলের) বিনাশের জন্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিই। হে ব্রাহ্মণ, ইহাই সেই তাৎপর্য্য, যে তাৎপর্য্য অনুসারে কেহ সত্যই বলিতে পারে; যে গৌতম বিনাশক (বেনয়িকো); তুমি যাহা লক্ষ্য করিয়া আমাকে বিনাশক বলিতেছ, সে অর্থে নহে।"

বড়ুয়া মহাশয় বলেন, মঝ্‌ঝিম, ১।১৪০ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা সিদ্ধ হয় না।

সমালোচক গ্রন্থের ৩০৮ পৃষ্ঠা হইতে "আত্মা নাই" শীর্ষক ব্যাখ্যানটি উদ্ধৃত করিয়া তদুপরি তর্কবিদ্যার ইন্দ্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত আহরণ করিয়াছেন, যে, "আত্মা নিত্য ও নির্ব্বিকার।"

আমি প্রথমেই স্বীকার করিতেছি, যে, ব্যাখ্যানটির শিরোদেশে ও তন্নিম্নে প্রথম পংক্তিতে 'আত্মা নাই' না লিখিয়া 'আত্মা আছে কি না' লিখিলেই ঠিক হইত। কিন্তু এই অসাবধানতার জন্য সমালোচকের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয় নাই। প্রথমতঃ বুদ্ধের শিষ্যগণ তাঁহার কোন উপদেশের প্রতিই আবর্ত্তন-অনুমান, ব্যাবর্ত্তন-অনুমান প্রয়োগ করিয়া তাহা হইতে, বুদ্ধ যাহা বলেন নাই, এমন কোনও সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন নাই। গ্রন্থের ৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "তিনি এত বিশদরূপে দুরূহ তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতেন, যে বিনয় পিটকে ও সূত্র-পিটকে ও তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রশংসাসূচক একটি বাক্য পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।" পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান শুনিয়া বুঝিলেন, রূপ প্রভৃতি আত্মা নহে, তাঁহারা যে সাধ্য পক্ষ নিগমন ইত্যাদির সাহায্যে 'আত্মা নিত্য ও নির্ব্বিকার', এই মীমাংসায় উপনীত হইয়া বিমুক্তি লাভ করিলেন, বিনয়পিটক এমন কথা বলে না। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ স্বয়ং এই-প্রকার সিদ্ধান্তের অবসর তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, কেন না, তিনি ঐ মতটিকে "বালধর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সমালোচক যে লিখিয়াছেন, "বুদ্ধ নিজে সাক্ষাৎভাবে এবিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই", ইহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। তাহার কারণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা Baldwin, James, Ladd, Wundtএর শিষ্যের ন্যায় চৈতন্যপ্রবাহকে আত্মা বলি না; আমরা যাহাকে আত্মা বলি, বুদ্ধ তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; তাঁহার সমসাময়িকেরা আত্মা সম্বন্ধে যে-সকল মত পোষণ করিত, সেগুলিও তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; তিনি নিজ আত্মা বলিতে কি বুঝিতেন, তাহা কোথাও কাহাকেও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দেন নাই—শ্রাবকগণকে তদ্বিষয়ক আলোচনার সুযোগ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি যাহা মানিতেন না, তাহা সুপরিজ্ঞাত; যাহা মানিতেন, তাহা অজ্ঞাত; অতএব আমরা বুদ্ধের আত্মবাদ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছি, তাহা অযৌক্তিক নহে।

(২) ঈশ্বর ও ব্রহ্ম

সমালোচক বলেন, "বুদ্ধ ঈশ্বরও মানিতেন পরব্রহ্মও মানিতেন।" "কিন্তু এই ঈশ্বর অশাশ্বত।"

আমরা অশাশ্বত ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলি না। আমরা যখন 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করি, তখন বেদান্তের ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, পরব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, তুরীয় ব্রহ্ম ইত্যাদির ভেদ মনে রাখিয়া বিজ্ঞ বৈদান্তিকের ন্যায় কথা বলি না। আমি যখন লিখিয়াছিলাম "যিনি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তিনি যে চিত্তের নিভৃততম কোণেও ঈশ্বরে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, তখন "শাশ্বতমভয়-মশোকমদেহং পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং। চিন্তায় শাশ্বতে পরমেশং"—রামমোহন রায় এই ভাষায় যাঁহার বন্দনা গাহিয়াছেন, তাঁহাকেই স্মরণপথে রাখিয়াছিলাম। "বুদ্ধ অশাশ্বত ঈশ্বর মানিতেন" একথা দ্বারা আমার মতের নিরসন হয় না।

সমালোচক বলেন,

"প্রায় সমুদায় ধর্ম্ম-সমাজের ঈশ্বর এবং বুদ্ধের এই ব্রহ্ম একই; এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে পৌরাণিক ব্রহ্মার ন্যায় এ ব্রহ্মও মহাপ্রলয়ে লীন হন এবং নূতন কল্পে আবার সমুত্থিত হইয়া থাকেন।"

তবে খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর মহাপ্রলয়ে লীন হন এবং নূতন কল্পে আবার সমুত্থিত হইয়া থাকেন। এতদিন ইহা জানিতাম না।

সমালোচক "নিত্য সত্তা" বিষয়ে উদান হইতে বুদ্ধের দুইটি উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে-সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই, যে (১) উক্তি দুটির ব্যাখ্যা এখনও নিশ্চিত নির্দ্ধারিত হয় নাই। বুদ্ধের অন্য বহু শত উপদেশের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে ইহা যে ব্রহ্ম বিষয়ক উক্তি, এমন প্রতীতি জন্মে না। (২) উদান (এবং ইতিবুত্তক) বিনয়পিটক ও নিকায়সমূহের পরবর্ত্তী রচনা। উক্তি দুটি যে বুদ্ধের, তাহা প্রমাণিত করা আবশ্যক। (৩) বিশেষণের সাম্য হইতে বিশেষ্যের সাম্য অবধারিত হইতে পারে না। বৌদ্ধ সাহিত্যে নির্ব্বাণের বর্ণনায় উপনিষদের ভাষার প্রতিধ্বনি আছে। (গ্রন্থের ২৯৫ পৃষ্ঠায় তাহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে।) ইহাতেই নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মের একত্ব নিষ্পন্ন হয় না। (৪) নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম একই বস্তু" ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সমালোচক শঙ্কর হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে মোক্ষের কথা আছে, কিন্তু নির্ব্বাণের কথা নাই। নির্ব্বাণ ও মোক্ষ যে এক, তাহার প্রমাণ পাইলাম না।

পরিশেষে সমালোচককে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি—

১। বুদ্ধ যদি পরব্রহ্ম মানিতেন, তবে শিষ্যদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন নাই কেন? তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "হে আনন্দ, আমি আমার ধর্ম্মে অন্তর-বাহির ভেদ না রাখিয়া উহা প্রচার করিয়াছি, কোন কোনও আচার্য্য যেমন এক-একটা তত্ত্ব মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তথাগতের সত্য-সমূহে সেরূপ মুষ্টিবদ্ধ কিছুই নাই।" (মহাপরি।২।২৫।)

যিনি ব্রহ্মতত্ত্বের ন্যায় পরমতত্ত্ব শ্রাবকবর্গের নিকটে সঙ্গোপন রাখিলেন, তাঁহার মুখে কি একথা শোভা পায়?

২। বুদ্ধ তাঁহার সাধন-প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনার স্থান রাখিলেন না কেন? তাঁহার সমকালে ভারতে ব্রহ্ম-স্বরূপ ও ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে আলোচনা অপ্রচলিত ছিল না; তিনি আজীবন এসম্বন্ধে নীরব রহিলেন কেন? তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য আনন্দ, উপালি ও মহাকাশ্যপই বা তাঁহাকে ভুল বুঝিলেন কেন?

৩। মহাপরিনির্ব্বাণের কয়েক শতাব্দী পরেই বৌদ্ধেরা বুদ্ধকে ব্রহ্মের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল কেন? তাহারা কেন সুদীর্ঘকালেও বুঝিতে পারিল না, যে বুদ্ধ ব্রহ্ম মানিতেন, সুতরাং উপাসনার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য বুদ্ধে ব্রহ্মের স্বরূপাবলি আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই, তৎপক্ষে একা ব্রহ্মই যথেষ্ট?

৪। বুদ্ধ যদি ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তবে হিন্দুগণ তাঁহার বিরোধী হইল কেন? শুধু পশুঘাতমূলক যজ্ঞবিধির নিন্দার জন্য? শঙ্করমিশ্র কেহই তাঁহার ধর্ম্মের গভীরতম উৎসের সন্ধান পাইল না, ইহার কারণ কি?

৫। "নির্ব্বাণ, মোক্ষ ও পরব্রহ্ম একই বস্তু।" তবে শঙ্কর বৌদ্ধগণকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন কেন? যে-ধর্ম্মের মর্ম্মমূলে তাঁহার সহিত এমন নিগূঢ় ঐক্য ছিল, তাহাকে সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত করিবার প্রয়াস না পাইয়া তিনি তাহা একেবারে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি?

৬। এপর্য্যন্ত পালি সাহিত্য প্রায় বার হাজার পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে বুদ্ধের ব্রহ্মবিষয়ক উক্তি কয়টি পাওয়া গিয়াছে? তাঁহার এক-একটি উপদেশ কতবার কত স্থানে বলিতে গেলে প্রায় একই ভাষায় বিবৃত রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের সারতত্ত্ববোধক ব্যাখ্যানের সংখ্যা নাই। অথচ ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধীয় উক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন; এবং যে দুই-একটি সমালোচক প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহারও 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লিখিত হয় নাই। এই সমস্যার সমাধান কোথায়?

সমালোচক হয় তো বুদ্ধের ব্রহ্মবাদপ্রতিপাদক, আরও প্রমাণ সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছেন, সেগুলি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া যে-বিষয়ে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে, তাহার নিঃশেষ মীমাংসার জন্য প্রমাণগুলি সাধারণের গোচর করা বাঞ্ছনীয়। তৎপূর্ব্বে একটি কার্য্য একান্ত আবশ্যক। তাহা এই যে, সমালোচক খৃষ্ট-বিষয়ক আলোচনায় বাইবেলের প্রতি যে-সমালোচনা-প্রণালী প্রয়োগ করিয়াছেন, বিনয়পিটক ও সূত্রপিটকও সেই প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে হইবে। (১) পিটকান্তর্গত গ্রন্থগুলির স্তর-নির্ণয়, (২) প্রত্যেক গ্রন্থের রচনাকাল নির্দ্ধারণ, (৩) কোন্ কোন্ ব্যাখ্যান বুদ্ধের, কোন্গুলি প্রক্ষিপ্ত, এই প্রশ্নের যথাযথ নিষ্পত্তি—এই তিনটি বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হইতে না পারিলে বিরোধী পক্ষদ্বয় শুধু বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া লাভবান্ হইবেন না। বুদ্ধকে ব্রহ্মবাদী বলিয়া বরণ করিবার জন্য বহু-লোকের চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যদি তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তিসাধনের অভিপ্রায়ে উচ্চতর সমালোচনার নিয়মানুসারে বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ অক্ষয় ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন, তবে তিনি ভারতবাসীর অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে-সঙ্গে অমর কীর্ত্তির অধিকারী হইবেন।

—

সমালোচকের প্রত্যুত্তর

গ্রন্থকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন, যে, তিনি যথেষ্ট সময় পান নাই। কিন্তু তিনি তিন সমালোচনার পৃথক পৃথক জবাব দিয়াছেন। প্রথম সমালোচনার জবাব দিতে সময় পাইয়াছেন আড়াই মাস, দ্বিতীয়টির জবাব দিতে সময় পাইয়াছেন দেড় মাস, তৃতীয়টির জন্য সময় পাইয়াছেন ১৫ দিন।

আর মহেশবাবু সময় পাইলেন আড়াই দিন। তিনি ১লা মার্চ্চ সোমবার ১০টায় জবাব পান, প্রত্যুত্তর দিলেন ৩রা মার্চ্চ বুধবার সাড়ে তিনটায়। *

প্রথম বক্তব্য গ্রীক উচ্চারণ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা অনাবশ্যক। ইহা সত্য, প্রবন্ধের কোন-কোন স্থলে আমি ইংরেজী নাম লিখিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত প্রাচীন উচ্চারণ কি তাহা যথাস্থলে আলোচিত হইয়াছে। বাংলায় কি উচ্চারণ হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে নানাদিক হইতে বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে যে (১) d—ড, (২) t—ট,

* অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ মহাশয় সময়ের কথা না তুলিলে ভাল হইত। তিনি যে-গ্রন্থ লিখিতে ৯(নয়)বৎসর পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার সমালোচনায় মহেশবাবু সত্যসত্যই তিন মাস সময় লইলেও কিছু অন্যায় হইত না। কিন্তু তিনি বাস্তবিক তিন মাস ধরিয়া সমালোচনা করেন নাই, কয়েকদিনের মধ্যে করিয়াছেন; আমারই তাহা ছাপিতে তিন মাস লাগিয়াছে। রজনীবাবুর বহিখানির দ্বিতীয় খণ্ড ৮৩১ পৃষ্ঠা পরিমিত। উহার পৃষ্ঠা ও অক্ষর যেরূপ, সেইরূপ পৃষ্ঠা ও অক্ষরে ছাপা হইলে মহেশবাবুর সমালোচনা আনুমানিক ৫০ পৃষ্ঠা হইত। ৮৩১ পৃষ্ঠা পড়িয়া তাহার সমালোচনা করিতে মহেশবাবু যদি বাস্তবিকই তিন মাস লইতেন, তাহা হইলে ৫০ পৃষ্ঠা সমালোচনা পড়িয়া তাহার জবাব দিতে রজনীবাবুর সাড়ে পাঁচ দিনেরও কম সময় পাওনা হয়। কিন্তু তাঁহার নিজের কথা অনুসারেই তিনি ১৪ দিন সময় পাইয়াছেন। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই, যে, কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা বড় কঠিন। গ্রন্থ-সমালোচনার সমালোচনা আমি সাধারণতঃ ছাপি না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া রজনীবাবুকে দীর্ঘ প্রতিবাদ লিখিবার সুযোগ দিয়াও আমার নিষ্কৃতি নাই। সেজন্য প্রবাসীর অনেক অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ছাপিতে আগেকার ও বর্ত্তমান মাসে শ্রম ও অর্থ ব্যয়ও কম হয় নাই।

প্রবাসীর সম্পাদক।

(৩) eta = এ, (৪) o-mikron = অ, (৫) o-mega = ও। Theta, Phei, Chei স্থলে ট্‌হ (হট্‌স্ত'স'), প্‌ হ (হসন্ত প্‌) ক্‌ হ (হসন্ত ক্‌) লিখিলে উচ্চারণ বিভ্রাট হইবে। এইজন্য এই তিনটির স্থলে ঠ ('থ' নহে) ফ এবং 'খ' লেখা যাইতে পারে। তবে এই সঙ্গে-সঙ্গে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। psi স্থলে 'প্স' লেখা যাইতে পারে। সংযুক্তস্বর সমূহকে পৃথক পৃথক উচ্চারণ করিতে হইবে। তবে o u = উ বা ঊ। গ্রন্থকার 'সোক্রাটীস্' উচ্চারণের যে-যুক্তি দিয়াছেন, তাহাতে আমরা তৃপ্ত হইলাম না।

দ্বিতীয় বক্তব্য—আমাদিগের (= আমার) বিশ্বাস 'উপদেবতা' ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অনুরূপ দৃষ্টান্ত উপপতি, উপপত্নী, উপধর্ম্ম ইত্যাদি। 'অপদেবতা' সর্ব্বত্রই কদর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয়; উপদেবতা কোন-কোন স্থলে অপদেবতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গভাষায় সর্ব্বত্রই ইহা হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। দেবতা হিন্দুগণের উপাস্য; কিন্তু তাঁহারা কেহই উপদেবতার উপাসনা করেন না। সংস্কৃত অভিধানের মতে বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত এই দশটি দেবযোনি বা উপদেবতা। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"রক্ষ, পিশাচ ও ভূত—এই তিনটি ছাড়া অপর সাতটি ভাষায় ত মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয় না।"—আমাদিগের মনে হয়—এক মাত্র 'সিদ্ধ' ব্যতীত অপর নয়টিই হীনতাসূচক। অপ্সরা, কিন্নর, বিদ্যাধরাদির স্থান উচ্চ নহে। আর-একটি কথা এই সোক্রাটেস্ যাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেন তাঁহার প্রকৃতি কি বিদ্যাধরাদির ন্যায়? অবশ্যই নহে।

গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, daimon on অর্থ divine agency; তবুও তিনি এই বলিয়া আপত্তি করিতেছেন :—

"জৌউএট্‌ নিজে Thoae letus 151 A to gignomenon moi daimonion." এই পদের অনুবাদ করিয়াছেন "my familiar" হাঁ, ঠিক। কিন্তু Campbell ঐ স্থলের টীকায় লিখিয়াছেন—"Here, as always, not commanding but forbidding; and as generally neuter and impersonal." (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ৩৪)। ইহার মতে ঐ শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ এবং ইহাতে ব্যক্তিত্ব অর্পণ করা হয় নাই।

যদি বিশেষ কোন স্থলে এই ক্লীবলিঙ্গ শব্দের পুংলিঙ্গ অর্থ করিতেই হয় তবে 'উপদেবতা' ব্যবহার না করিয়া 'অন্তর্দেবতা' ব্যবহার করা যাইতে পারে।

Daimonion অর্থ দেবকর্তৃত্ব এই মত সমর্থন করিবার জন্য গ্রন্থকার Apology-এর কোন বিশেষ সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ অংশের তিন পংক্তি পরে এইরূপ আছে—"It is clear then that all references in later writers, whether anicent or modern, to Socrates' belief in a special 'Genius' or 'Guardian Angel' that watched over him are based on a misinterpretation and are quite beside the mark".—Williamson's Edition p. XXII). অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালে যাঁহারা ঐ শব্দের অর্থ Genius বা Guardian Angel করিয়াছেন তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছেন।

এবিষয়ে অধিক আলোচনা করা অনাবশ্যক।

তৃতীয়তঃ—স্ফোটবাদ ও 'এইডস্'-বাদ এক নহে। বিনা যুক্তিতে বৃহস্পতির বচনও গ্রহণীয় নহে। স্ফোটবাদ একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দ। বহু গ্রন্থে, ভাষ্যে ও টীকাতে ইহা একটি বিশেষ অর্থে গৃহীত হইয়াছে। এঅবস্থায় এই শব্দে নূতন অর্থ আরোপ করিলে অর্থ-বিভ্রাট হইবে।

ভুলক্রমে দুই-একটি সংস্কৃত শব্দ নূতন অর্থে অল্পে অল্পে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। তাই বলিয়া কি বিশেষ বিশেষ পারিভাষিক শব্দকেও নূতন অর্থে ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে? এপ্রকার করিবার কোন প্রকার আবশ্যকতাও দেখিতেছি না।

চতুর্থতঃ—গ্রন্থকার যে-যে স্থলে বিচার না করিয়া পরস্পর-বিরোধী মতসমূহের মধ্যে একটা মতকে প্লেটোর মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমরা কেবল সেই-সেই স্থলেই বলিয়াছি যে, এপ্রকার ব্যাখ্যায় পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইবেন। যে অধিকরণে গ্রন্থকার বিরোধ স্বীকার করিয়াছেন সে-স্থলে অবশ্যই কিছু বলা হয় নাই। এক অধিকরণের সিদ্ধান্ত অপর অধিকরণে প্রযোজ্য নহে।

পঞ্চমতঃ—অনুকৃতিবাদ ও অংশভাগিত্ব—দুইটি পৃথক মত। আমরা বলিয়াছিলাম, গ্রন্থকার এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই। জবাবে গ্রন্থের ১৯৯ পৃঃ হইতে যে-অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহাতেও এপার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন—অংশভাগিত্ব হইতেই অনুকৃতি হয়।

ষষ্ঠতঃ—গ্রন্থকার স্ফোটবাদকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছেন। আমরা বলিয়াছিলাম—ইহা ভারতীয় ব্রহ্মবাদ নহে। গ্রন্থকার জবাবে বলিতেছেন, "ভারতীয় ব্রহ্মবাদের কথা কোথা হইতে আসিল?" উত্তর এই—গ্রন্থকারের মতে ঈশ্বর এবং উপনিষদের ব্রহ্ম একই। তিনি প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন "পরম শিব……ঈশ্বর (উপনিষদের ব্রহ্ম)" পৃ ৪৮৩। ঈশ্বর অর্থই যখন উপনিষদের ব্রহ্ম তখন ব্রহ্মতত্ত্ব অর্থ নিশ্চয়ই "উপনিষদের ব্রহ্মবাদ"। আমাদিগের যদি বুঝিবার ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে সেজন্য আমরা অপরাধী নহি।

৭। আমরা বলিয়াছিলাম, "ব্রহ্মের সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য অজ নিত্য শাশ্বত মানবাত্মা বর্ত্তমান,—ইহা ঘোর দ্বৈতবাদ। (মুদ্রাঙ্কনে ভুলক্রমে বর্ত্তমান শব্দের পরে কমা না ছাপাইয়া পূর্ণচ্ছেদ ছাপান হইয়াছিল)। গ্রন্থকার মনে করেন ব্রাহ্ম সমাজের লোকে বিশ্বাস করেন যে, ব্রহ্মের সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য অজ নিত্য শাশ্বত মানবাত্মা বর্ত্তমান। আমাদিগের অভিজ্ঞতা অন্য প্রকার। আমরা জানি যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মই মনে করেন যে, মানবাত্মার আরম্ভ ও জন্ম আছে। যাহার জন্ম আছে তাহা অজ নহে এবং নিত্য ও শাশ্বত নহে। এই স্থলে আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম সমাজ আত্মার অনন্ত উন্নতি স্বীকার করিয়া থাকেন; সুতরাং এআত্মা পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীল বস্তু কখন নিত্য শাশ্বত হয় না।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার গীতার 'অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং' ইত্যাদি অংশের উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের মনে হয়, এস্থলে গ্রন্থকার কিছু ভুল করিয়াছেন। গীতার ঐ অংশ শ্রাদ্ধবাসরে পাঠ করা হয় না—শাস্ত্রের বিধি কঠোপনিষদের অনুরূপ অংশ শ্রাদ্ধবাসরে পাঠ করা। যদি কোন ব্রাহ্ম শ্রাদ্ধবাসরে ঐ অংশ পাঠ করেন, কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু কোন ব্রাহ্ম যদি গীতা বা কঠোপনিষদের ঐ অংশ ব্রাহ্ম সমাজের মতানুসারে ব্যাখ্যা করেন, আমরা বলিব ব্যাখ্যা ভুল হইয়াছে। তবে কোন ব্রাহ্ম যদি অদ্বৈতবাদী হন, কথা স্বতন্ত্র।

৮। উপনিষদের কোন স্থলেই আত্মার বহুত্ব স্বীকার করা হয় নাই। সর্ব্বত্রই 'আত্মা এক' এবং এই আত্মা ব্রহ্ম। কিন্তু প্লেটোর মতে আত্মা বহু এবং ঐ সমুদয় আত্মা ব্রহ্ম নহে। প্লেটো দ্বৈতবাদী বা নানাত্ববাদী।

৯। ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্মকে বা উপনিষদের ব্রহ্মকে কখন নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয় না। স-সীম ঈশ্বরই নিয়তির সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন। সুতরাং প্লেটোর স্ফোটতত্ত্ব ব্রহ্মবাদ নহে।

১০। ছান্দোগ্য উপনিষদের কথাটা না তুলিলেই ভাল হইত। "অপূর্ব্ব" কথাটা আমার নহে। আমি বিজ্ঞাপন দেই নাই—কাহাকে দিতেও বলি নাই এবং এসমুদায় বিষয়ে আমার কোন সম্পর্কও নাই।

সুতরাং বিজ্ঞাপনে "অপূর্ব্ব" কথাটা ব্যবহার করায় যদি দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমার নহে।

গ্রন্থের টীকা, অনুবাদ ও মন্তব্য বিষয়েই আমি দায়ী। সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন সেজন্য সম্পাদক দায়ী—একজনের মতের জন্য অপরে দায়ী নহেন। সর্ব্বদেশেই এইপ্রকার ঘটিয়া থাকে। আমার মতামত সমালোচনা করিতে হইলে উক্ত গ্রন্থের মন্তব্য ও প্রবাসীতে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সমালোচনা করা আবশ্যক।

১১। 'ক্ষোট বৃন্দই শাশ্বত দেবকুল' এ কথায় আমরা আপত্তি করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার 'টিমাইঅস্' গ্রন্থের 37c অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এস্থলে শাশ্বত দেবগণের কথা বলা হইয়াছে এবং এই শাশ্বত দেবগণ ক্ষোটসমূহ হইতে অভিন্ন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, তিনি এস্থলে 'জেলার' ও 'গম্পার্টস' এই দুই জনের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থকার Archer-Hindএর মতকে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মত বলিয়া মনে করেন। তিনি গ্রন্থকারের উদ্ধৃত অংশ বিষয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"This is a very singular phrase. The *Kosmos* we know is the image of the *auto zōon* and the creatures in it are the images of the *noēta zōa*. Therefore *aidioi theoi* can be nothing else than the ideas. But nowhere else does Plato call the ideas 'gods' and the significance of so calling is very hard to see. If however Plato wrote *theon* (which I cannot help regarding as doubtful), I am convinced that he used this strange phrase with some deliberate purpose in view; but what that purpose was, I confess myself unable to divine." (পৃঃ ১১৮)

অর্থাৎ উক্ত অংশ অতি অদ্ভুত; প্লেটো দ্বিতীয় কোন স্থানে এপ্রকার কোন কথা বলেন নাই; তিনি এই স্থলে 'দেবতা' শব্দটিই ব্যবহার করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তবে যদি তিনি ঐ শব্দটি ব্যবহার করিয়াই থাকেন তবে বলিতে হইবে তিনি বিশেষ কোন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে সে অর্থটা যে কি, তাহা টীকাকার বুঝিতে অক্ষম।

এই অতি অস্পষ্ট অংশ অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার 'ক্ষোট'বৃন্দকে শাশ্বত দেবকুল বলিয়াছেন।

আর-একটা কথা বলা আবশ্যক। এস্থলে 'এইডস্'এর (গ্রন্থকারের 'ক্ষোটে'র) উল্লেখ নাই। আছে 'দেবতা'; ব্যাখ্যাতে মনে হয় ইহা যেন 'এইডস্'ই।

১২। প্রসঙ্গক্রমে একস্থলে (প্রবাসী, পৃঃ ৬৪৪) বলিয়াছিলাম গ্রন্থকার একটি বাক্যের অনুবাদ করেন নাই। জবাবে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "২৩১ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র ইহার অনুবাদ এবং আমার মত এই অনুবাদই ঠিক।" গ্রন্থকারের প্রথম ছত্র এই :—"যখন প্রচুর খাদ্য জুটিত, তখন তিনি একা সৈনিকের খাদ্য খাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন।"

মূল এই :—en t'au tais euōchiais monos apolaucin oios t'ēn ইত্যাদি (সু ম্ প সি অন্, ২২০এ)। এস্থলে

euōchiais = ভোজে
monos = একমাত্র, একাকী
apolaucin = সম্ভোগ করিতে
oios te = সমর্থ
ēn = ছিলেন

Jowettএর অনুবাদ :—

"Y at a festival he was the only person who had any real powers of enjoyment."

Burgess-এর (Bohn's edition) অনুবাদ :—

"On the other hand at our jollifications, he was the only person who could enjoy them."

১৩। প্লেটো তিন স্থলে অনন্ত নরকের কথা বলিয়াছেন এবং যে অনন্ত নরক ভোগ করিবে তাহার নাম পর্য্যন্ত আছে। এঅবস্থায় এসমুদায়কে কি করিয়া রূপক বলি? আজকাল অনেকে নরক নামক স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রাচীনকালে সর্ব্বদেশেই নরক স্বীকার করা হইত। প্রত্যেক রূপকের মূলেই একটি সত্য আছে। নরক যদি রূপক হয় তাহা হইলে বলিব—'নরকভোগ' অর্থ 'পাপভোগ' বা শাস্তিভোগ ইত্যাদি। 'অনন্ত নরকভোগ' অর্থ 'অনন্ত কাল পাপভোগ বা শাস্তি ভোগ' ইত্যাদি।

রূপকেও অনন্ত শাস্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতেছে না।

আমরা Burnetএর মত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। Stewart বলেন—

"The incurably wicked who suffer eternal punishment are mostly tyrants—men like Archelaus and Tantalus who had the opportunity of committing the greatest crimes and use it. All praise be to the few who had the opportunity and did not use it. But Thersites, a mere private offender, no poet has ever condemned to eternal punishment. He had not the opportunity of committing the greatest crimes and in this is happier than those offenders who had. Here is a mystery set forth. The man who has the opportunity of committing the greatest crimes and yields to the special temptation to which he is exposed, is held worthy of eternal damnation......This mystery is set forth in the *Gorgeas* Myth (The Myths of Plato. p. 129).

এস্থলে বলা হইতেছে যে, যে-ব্যক্তির দুষ্কর্ম্ম করিবার সুযোগ আছে এবং সুযোগ পাইয়া সেই দুষ্কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তি অনন্ত নরক ভোগ করিবে।

এই মতকে রূপক বলিবার কোন কারণ নাই। এ মত যদি গ্রীকদিগের নিকট একটি নূতন বিষয় হইত তাহা হইলে এবিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারিত। হোমারের Odyssey নামক গ্রন্থে Tantalus, Sisyphus, Tityos প্রভৃতির অনন্ত নরকের ব্যবস্থা হইয়াছে। Pindarএর গ্রন্থেও এইসমুদায় বিবরণ পাওয়া যায়। এইসমুদায় প্রসিদ্ধ কবির মতামত গ্রীকদিগের সুপরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, সোক্রাটেস্ ও প্লেটোর সময়ে লোকে অনন্ত নরকে, বিশ্বাস করিত। আর এই প্রাচীন মতের বর্ণনা যখন প্লেটোর গ্রন্থেও কয়েকটি স্থলে পাওয়া যাইতেছে তখন এই মতকে রূপক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই।

১৪। জ্ঞান ও মুক্তি বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই :—"বৌদ্ধধর্ম্মে সত্য জ্ঞান লাভই মুক্তি"। এস্থলে 'জ্ঞানলাভ-ই' 'ই' অক্ষরের প্রতি প্রণিধান করা আবশ্যক'। এই 'ই' অক্ষর বলিতেছে যে, মুক্তি লাভের জন্য একমাত্র জ্ঞানই যথেষ্ট। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, গৌতম কখনই এপ্রকার মত পোষণ করিতেন না। 'জ্ঞানলাভই মুক্তি' জ্ঞান হইতে

মুক্তি হয়' —এ দুইটি এক কথা নহে। গ্রন্থকার মহাবগ্গের ১।৬।৪৬ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। উদ্ধৃত অংশ একটি প্রকাণ্ড উপদেশের শেষ ভাগে। উপদেশের প্রথম অংশে গোতম কি বলিয়াছেন গ্রন্থকার তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। ঘটনাটি এই :—সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুকগণকে মধ্যপন্থের কথা বলিলেন; এই সঙ্গে-সঙ্গেই বলিলেন, আষ্টাঙ্গিকমার্গই এই মধ্যপথ (মহা, ১।৬।১৭, ১৮ ইত্যাদি)।

সেই ৮টি পথ এই :—

(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সংকল্প, (৩) সম্যক্ বাক্য, (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত, (৫) সম্যক্ আজীব, (৬) সম্যক্ ব্যায়াম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি এবং (৮) সম্যক্ সমাধি।

এই ৮টিই নির্ব্বাণলাভের উপায়। অসংখ্য স্থলে এই আষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হইয়াছে। এই ৮টি উপায়ের প্রথমটি মাত্র জ্ঞান। গ্রন্থকার প্রথমটির অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টির এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—

"দুঃখের জ্ঞান, দুঃখসমুদয়ের জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধের জ্ঞান, দুঃখ-নিরোধগামী পথের জ্ঞান—ইহাই সম্যক্ দৃষ্টি নামে অভিহিত" (পৃঃ ২৭১)।

যদি একমাত্র জ্ঞানই যথেষ্ট হইত তাহা হইলে অবশিষ্ট সাতটি উপায়ের কথা বলা হইত না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞান, সুতরাং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ দিয়া গোতম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আবার জ্ঞানের কথা বলিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, জ্ঞানই একমাত্র পথ। আর মুক্ত পুরুষ যদি অনুভব করেন (অর্থাৎ এই জ্ঞান লাভ করেন) আমি মুক্ত হইয়াছি, ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, সত্যজ্ঞান লাভই মুক্তি।

আমরা নারদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, জ্ঞানলাভ যথেষ্ট নহে। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, নারদের মত বুদ্ধের মতেরই অনুগত। আর ইহা যদি বুদ্ধের বিরোধী মত হইত তাহা হইলে বুদ্ধের নিত্য-সঙ্গী আনন্দ নিশ্চয়ই ঐ মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এখানে বলা যাইতে পারে যে, 'সুত্তপিটক' আনন্দের সাহায্যেই সংগৃহীত হইয়াছিল।

আর সোক্রাটেসের বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মতে "জ্ঞানই ধর্ম্ম"—ইহা দার্শনিক জগতের একটা সাধারণ সত্য। Zoller বলেন—"The leading thought of the ethics of Socrates may be expressed in the sentence—"All virtue is knowledge" (Socrates, p. 141). Erdmounএর ভাষা—"Virtue is epistēmē (=জ্ঞান) (Hist. of Phil. Vol. ., পৃঃ ৮২)। Wildelbandএর ভাষা —"It is the formula of the identity of virtue and knowledge (Ancient Phil, পৃঃ ১৩১)। নিম্নলিখিত গ্রন্থও দ্রষ্টব্য—Schwegler's Hist. of Phil., পৃঃ ৫১ ; Paulsen's. Ethics, পৃঃ ৪০ ; Mackenzie's Ethics. পৃঃ ৭৯ ; Sidgwick's Method of Ethics, পৃঃ ২২৭ ; Wundt's Ethics, Vol. ii., পৃঃ ৬ ; Grotes' Plato, Vol. ii., পৃঃ ২৩৯ ; ইত্যাদি।

সোক্রাটেসের মতে ধর্ম্ম ও জ্ঞান যে এক, সে-বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। সোক্রাটেসের দর্শনে যদিও ধর্ম্মকে জ্ঞান বলা হইয়াছে, সোক্রাটেস্ জীবনে জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন।

১৫। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, বুদ্ধ আত্মবাদী কি না, ইহার মীমাংসা নির্ভর করে আত্মা শব্দের অর্থের উপরে। গ্রন্থকার তাঁহাকে আত্মবাদী না বলিতে পারেন, কিন্তু অনেক দার্শনিক পণ্ডিত তাঁহাকে আত্মবাদী বলিবেন।

বুদ্ধ আত্মা মানিতেন না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার মজ্ঝিম্-নিকায়ের 'অলগদ্দ উপমা' হইতে (১।১৩৮ পৃঃ) অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ইহা দ্বারা বুদ্ধ যাহা প্রমাণ করিয়াছেন তাহা এই :—বুদ্ধের সময়ে একশ্রেণীর লোকে মনে করিত যে, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই সমুদায়ের কোন-না-কোনটি কিংবা এই পাঁচটিই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, এবং বিকারবিহীন আত্মা। বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, এইপ্রকার নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও বিকারবিহীন আত্মা অস্তিত্ববিহীন। তিনি যে রূপ, বেদনা, প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়াই এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ এই যে, ঠিক ইহার পরেই তিনি আলোচনা করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, রূপ, বেদনাদি অনিত্য। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাহা অনিত্য, দুঃখময়, বিকারময় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলা যায় যে 'ইহা আমার, ইহা আমি, ইহা আমার আত্মা ?"—ইহার উত্তর—'না' (মজ্ঝিম্ ১।১৩৮)।

ইহার পরে আরও আলোচনা করিয়া বুদ্ধ বুঝাইয়া দিলেন—আর্য্যশ্রাবক উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া রূপ বেদনাদি বিষয়ে নির্ব্বেদ লাভ করেন এবং বিমুক্ত হয়েন (পৃঃ ১৩৯)।

ইহার পরে গোতম এইপ্রকার বিমুক্ত সাধকদিগকে চারিটি বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করিলেন (পৃঃ১৩৯)।

ইহার পরে বিমুক্ত-পুরুষদিগের বিষয়ে গোতম যাহা বলিয়াছেন, গ্রন্থকার ১৪০ পৃষ্ঠায় তাহা খুঁজিয়া পান নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতে হইল।

"এবং বিমুক্ত-চিত্তং খো ভিক্খবে ভিক্খুং স-ইন্দা দেবা স-ব্রহ্মকা স-পজাপতিকা অন্বেসং নাধিগচ্ছন্তি ; ইদং নিস্সিতং তথাগতস্স বিঞ্ঞাণন্তি. তং কস্স হেতু ? দিট্ঠে বাহং ভিক্খবে ধম্মে তথাগতং অননুবেজ্জো তি বদামি।"

ইহার অর্থ এই—হে ভিক্ষুগণ। ইন্দ্র, ব্রহ্ম, প্রজাপতিপ্রমুখ দেবগণ এইরূপ বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর সন্ধান পান না। (এবিষয়ে বলা হয়) যে তথাগতের বিজ্ঞান আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে (নিস্সিতং —নিশ্রিত—নিশ্চিন্তরূপে আশ্রিত)। কিসের জন্য (ভিক্ষুর সন্ধান পাওয়া যায় না) ? (ইহার উত্তরে) আমি বলি এই দৃষ্টধর্ম্মেই (অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগতেই, এই জীবনেই) তথাগত অননুবেদ্য (অর্থাৎ এই পৃথিবীতেই তথাগতকে অনুভব করা যায় না)।

এই কথা বলিয়া বুদ্ধ বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ আমি এইপ্রকার বলি, এইপ্রকার ব্যাখ্যা করি ; কিন্তু তবুও কোন-কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃষা, অসত্য বাক্যে অন্যায়রূপে আমার প্রতি এই দোষারূপ করে যে, 'শ্রমণ গোতম বিনায়ক (অর্থাৎ বিনাশক) তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ বি-ভব (অনস্তিত্ব) প্রচার করেন'। হে ভিক্ষুগণ, আমি যাহা নহি, আমি যাহা বলি না সেই বিষয়ে এইসমুদায় ভদ্র শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ অসৎ, তুচ্ছ, মৃষা এবং অভূত বাক্যে আমার প্রতি এই দোষারূপ করে যে, শ্রমণ গোতম বিনায়ক তিনি সত্তার উচ্ছেদ, বিনাশ ও বি-ভব প্রচার করেন" পৃঃ ১৪০।

আমরা যে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ দিলাম তাহাতে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রহিয়াছে। গ্রন্থকার অপরের মত উল্লেখ করিয়া যে-ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নিতান্তই অসঙ্গত ও কষ্ট-কল্পিত।

আমাদিগের ব্যাখ্যা যদি প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে (১) লোকে রূপ বেদনাদিকে নিত্য আত্মা বলিয়া মনে করিত, (২) বুদ্ধ ইহা অস্বীকার করিতেন, (৩) তিনি এমন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন যাহা আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া স্থিরত্ব লাভ করে ; (৪) তিনি উচ্ছেদবাদী নহেন।

১৬। পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অংশে একস্থলে বুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাহা অনিত্য তাহা আমার নহে, তাহা আমি নহি, তাহা আমার আত্মা নহে।

ইহা হইতে যাহা প্রমাণিত হয়, তাহা বলিতে ভয় হইতেছে। গ্রন্থকার বলিয়া ফেলিবেন, আমি ন্যায়শাস্ত্রের ইন্দ্রজাল বিস্তৃত করিয়া লোককে বিমুগ্ধ করিতেছি। যাঁহারা নিতান্তই ইন্দ্রজাল দেখিতে চাহেন, তাঁহারা দয়া করিয়া পূর্ব্বের প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন।

১৭। ধর্ম্মপদ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল—"আত্মাকে রক্ষা কর।" শ্লোকসংখ্যা ১৫৭ এবং ৩১৫ (১৫৬ এবং ৩১৭ নহে)।

১৮। গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন যে বুদ্ধের মতে "জগতের সকলই…অনাত্ম-লক্ষণ" (পৃঃ ২৮৩)।

এই অংশ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বুদ্ধ 'আত্মা' মানিতেন। আত্ম-বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে কোন বস্তুকে অনাত্ম-বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তবে কষ্ট কল্পনা করিয়া অন্য ভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। জগতের সকলই অনাত্মলক্ষণ—ইহার অর্থ লোকে যাহাকে আত্মা বলে, জগৎ সেপ্রকার আত্মবস্তু নহে। লৌকিক অর্থে ইহা অনাত্ম বস্তু।

১৯। বুদ্ধের আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আমি এই পর্য্যন্ত নিজের কোন মত প্রকাশ করি নাই। আলোচনা যখন চলিতেছে, তখন নিজের মত প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে।

সাধারণ লোকে মনে করে, প্রত্যেক জীবন-প্রবাহের পশ্চাতে এক-একটি অজ্ঞেয় নিত্য সত্তা আছে,—এই সত্তাই আত্মা। বুদ্ধ এ-প্রকার আত্মার (self-in-itself) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না।

তিনি জীবন-প্রবাহ স্বীকার করিতেন এবং এই জীবন-প্রবাহের ধর্ম্মাধর্ম্ম ও মুক্তি স্বীকার করিতেন। একটি উপমা দ্বারা বুদ্ধের মতামত ব্যক্ত করা যাইতে পারে। জীবন-প্রবাহ যেন একটি সচেতন নদী। এই নদী সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে-করিতে অগ্রসর হইতেছে। দেখা গেল অকস্মাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং সমুদয় অভিজ্ঞতাসহ জীবন-প্রবাহ অদৃশ্য হইয়া গেল। এই অদর্শনই মৃত্যু। এই অবস্থায় জীবন-নদী বৃক্ষ-বীজের ন্যায় সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে। আবার জন্ম-লাভ করিয়া পূর্ব্বজন্মের সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতাসহ জীবন-নদী প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন এই প্রবাহের নূতন চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের ঘটনাসমূহের স্মৃতি থাকে না বটে কিন্তু ঐ ঘটনাসমূহের প্রভাব বিলুপ্ত হয় না। পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা বর্ত্তমান জীবন-প্রবাহকে অনুরঞ্জিত এবং যথানিয়মে নিয়মিত করিয়া থাকে।

জীবন-প্রবাহ এই ভাবে জন্মজন্মান্তরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন প্রবাহ আর প্রবাহিত হয় না। এই মুহূর্ত্তে জীবন স্থিরত্ব লাভ করে। বেদান্তের ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, তখন নদী-প্রবাহ ব্রহ্ম-সমুদ্রে নিপতিত হয়। বুদ্ধের ভাষায় ইহা নির্ব্বাণ, বেদান্তের ভাষায় ইহা ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

বুদ্ধের মতে চৈতন্য ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু জীবনের ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপপুণ্যাদি কিছুই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, যখন নির্ব্বাণ লাভ হয় তখনই কেবল এই সমুদায়কে অতিক্রম করা যায়।

সাধারণ লোকের মতে আমি-নামক বস্তুই মৌলিক, তাহারই জীবন-প্রবাহ। বুদ্ধের মত অন্য প্রকার। তিনি বলেন, বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় জীবন-প্রবাহে আমিত্বের উদ্গম হয়। সুতরাং এক জীবন-প্রবাহে ভিন্ন-ভিন্ন জন্মে ভিন্ন-ভিন্ন আমিত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব জন্ম আমার কি না, বুদ্ধের ধর্ম্মে এ-প্রশ্নের স্থান নাই, পর জন্মে আমি থাকিব কি না, অর্হৎ কিংবা তথাগত থাকিবেন কি না এ-সমুদায় প্রশ্নও অসঙ্গত।

এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, অনেক আস্তিক দার্শনিকের মতে আমিত্ব-বোধ অপূর্ণতাসূচক। এই কারণে অনেকে ব্রহ্মে চৈতন্য আরোপ করেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অধিচৈতন্য বা অতিচৈতন্য; ব্রহ্মের স্থান চৈতন্যের নিম্নে নহে, উচ্চে। শঙ্কর এই শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত।

উপনিষদ পাঠক জানেন যে, যাজ্ঞবল্ক্যীয় আত্মা মৃত্যুর পরে সংজ্ঞাবিহীন হয়।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ দর্শনেই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতিকে অনাত্মবস্তু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অহঙ্কার শব্দটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। 'অহঙ্কার' শব্দের অর্থ অহং এইপ্রকার জ্ঞান; অর্থাৎ আমিত্ব এই অহঙ্কার আত্মার নহে। বুদ্ধ যে অহঙ্কার কিংবা বেদনা, সংজ্ঞা প্রভৃতিকে অনাত্মবস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে অহিন্দু দর্শনের কথা বলা হয় নাই।

২০। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-বিষয়ে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই:—শঙ্করপ্রমুখ পণ্ডিতগণের ঈশ্বর ও বুদ্ধের ঈশ্বর এক; শঙ্করাদির পর-ব্রহ্ম ও বুদ্ধের নির্ব্বাণ এক। শঙ্করের ব্রহ্মবাদ এবং বুদ্ধের মত প্রায় এক শ্রেণীর।

২১। আমরা লিখিয়াছিলাম:—প্রায় সমুদায় ধর্ম্ম-সমাজের ঈশ্বর এবং বুদ্ধের এই ব্রহ্মা একই; এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তবে পৌরাণিক ব্রহ্মার ন্যায় এব্রহ্মাও মহা প্রলয়ে লীন হন এবং নূতন কল্পে সমুত্থিত হইয়া থাকেন।

ইহার জবাবে গ্রন্থকার এক অদ্ভুত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"তবে খৃষ্টীয় সমাজ, মুসলমান সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর মহাপ্রলয়ে লীন হন এবং নূতন কল্পে আবার সমুত্থিত হইয়া থাকেন, এতদিন ইহা জানিতাম না।"

সমালোচক ক্ষুদ্র দুইটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সেই দুইটির প্রতি প্রণিধান করিলে গ্রন্থকারকে হীনতা স্বীকার করিয়া অজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইত না। ঐ দুটির একটি শব্দ "তবে"। প্রথমে বলা হইয়াছে কোন পার্থক্য নাই। তাহার পরে 'তবে' শব্দ ব্যবহার করিয়া পার্থক্য দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় কথাটি "প্রায়।"

২২। এপর্য্যন্ত ত্রিপিটকের স্তর সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ত্রিপিটকে যে-যে উক্তিকে বুদ্ধের উক্তি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সেই-সমুদায় উক্তিকে বর্ত্তমান যুগে বুদ্ধের উক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয় উদান, ইতিবৃত্তক, সুত্তনিপাত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রাচীন।

২৩। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, "উদান (এবং ইতিবৃত্তক) বিনয়-পিটক ও নিকায়সমূহের পরবর্ত্তী রচনা"—

প্রথম বক্তব্য—কেন বলিব, পরবর্ত্তী কালের রচনা? দ্বিতীয় বক্তব্য—উদান এবং ইতিবৃত্তক নিকায়েরই অন্তর্গত। খুদ্দকনিকায়ে ইহাদিগের স্থান।

২৪। পূর্ব্বোক্ত দুইখানা গ্রন্থ হইতে দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, ঐ সমুদায় স্থলে বুদ্ধ যাহা বলিয়াছেন তাহা ব্রহ্মবাদেরই কথা। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "উক্ত দুটির ব্যাখ্যা এখনও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই।" কে বলিল? আমরা দেখিতেছি, ইহার ভাষা ও ভাব অতি স্বচ্ছ এবং প্রাঞ্জল। ইহাতে এমন-একটি কথা বা ভাব নাই যাহা দুর্ব্বোধ্য।

গ্রন্থকারের শেষ যুক্তি 'উক্তি দুইটি যে বুদ্ধের তাহা প্রমাণিত করা আবশ্যক'। আমাদিগের বক্তব্য:—

১। গ্রন্থ দুইখানি বুদ্ধের নামে চলিয়া আসিতেছে, বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহার শিষ্যগণ এই গ্রন্থদ্বয়কে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। ইহাতে এমন কোন মত নাই, যাহাকে অবৌদ্ধ বলা যাইতে পারে।

৩। ঐ দুইটি উক্তি যে বুদ্ধের, তাহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রমাণ করার আবশ্যক নাই যে, ইহা বুদ্ধের। যিনি বিরোধী মত প্রকাশ করিবেন, তাঁহারই প্রমাণ করা আবশ্যক যে ইহা বুদ্ধের উক্তি নহে।"

৪। গ্রন্থকার নিজে যে-সমুদায় উক্তিকে বুদ্ধের উক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সে-সমুদায়কে বুদ্ধের উক্তি বলিয়া প্রমাণ করার আবশ্যক হয় নাই। আমরা নিকায় হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাকেই বুদ্ধের উক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। এ অতি আশ্চর্য্য কথা।

২৫। বুদ্ধের নিকটে নির্ব্বাণ যাহা শঙ্করের নিকটে মোক্ষ তাহাই। 'মোক্ষ' যে-ধাতু হইতে উৎপন্ন বুদ্ধ নির্ব্বাণ বিষয়ে সেই ধাতু এবং সেই ধাতুমূলক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

২৬। বুদ্ধ অনেক স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন (প্রবাসী, ১৩১৮ শ্রাবণ, দ্রষ্টব্য)। প্রবাসীতে উদ্ধৃত উক্তিসমূহে কিংবা অনুরূপ স্থলে বুদ্ধ 'অব্রহ্ম' অর্থে 'ব্রহ্ম' ব্যবহার করিয়াছেন এপ্রকার বলিবার কোন কারণ নাই।

২৭। গ্রন্থকার কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন; তাহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে :—

(১) বুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্ম অবশ্যই ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম নহে। তাঁহার নির্ব্বাণ-তত্ত্বই ব্রহ্মতত্ত্ব এবং এই নির্ব্বাণ ও তুরীয় ব্রহ্ম বা শঙ্করের পরব্রহ্ম একই বস্তু।

(২) তুরীয় ব্রহ্মবাদে বা নির্গুণ ব্রহ্মবাদে ব্রহ্মোপাসনার স্থান নাই। এইরূপ নির্ব্বাণবাদেও নির্ব্বাণের উপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনার স্থান নাই।

সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা হয় নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রবণ মননাদিকে প্রকৃত অর্থে (ব্রাহ্মগণের অর্থে নহে) ব্রহ্মোপাসনা বলা যায় না।

(৩) অদ্বৈতব্রহ্মবাদের দেশে রাম, কৃষ্ণাদি ব্রহ্মের সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন। বুদ্ধও যে সেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সাধারণ মানুষ যাহা চায়, ব্রহ্মবাদে বা নির্ব্বাণবাদে তাহা পাওয়া যায় না এইজন্যই অবতারবাদের আবশ্যকতা হইয়াছিল।

(৪) হিন্দুগণ সর্ব্ববিষয়ে বুদ্ধ-বিরোধী হন নাই। প্রধানতঃ বিরোধী হইয়াছিলেন আশ্রম-বিধি, সামাজিক-বিধি ও যজ্ঞ-বিষয়ক মতামতে। হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ সামাজিকবিধিমূলক; এইজন্য অনেকে বুদ্ধবিরোধী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনীতি, বিশ্বপ্রীতি প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার নির্ব্বাণবাদও শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

হিন্দুগণ বুদ্ধকে ত পরিত্যাগ করেনই নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে অবতাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবত ১।৩।২৪, মৎস্যপুরাণ ৪৭।২৪৭; বায়ুপুরাণ, একলিঙ্গ-মাহাত্ম্য ১২।৪৩, ১৪।৩৯; গরুড়পুরাণ ৮৬।১০, বরাহপুরাণ ৪।৩,১১৩।২৭, কল্কিপুরাণ ২।৩।২৬, নৃসিংহপুরাণ ৩৬।২৯ প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। ব্যক্তি বিশেষের সাধ্য নাই যে সে কোন ব্যক্তিকে সমাজে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। বুদ্ধ ছিলেন সর্ব্বজনপূজনীয়, প্রথমে ধর্ম্মাচার্য্যরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন; কালক্রমে তাঁহার স্থান হইয়াছিল অবতারগণের মধ্যে। শাস্ত্রকারগণ এই প্রচলিত মতকেই শাস্ত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন।

কোন-কোন গ্রন্থে যে তাঁহাকে নিন্দা করা হয় নাই তাহা নহে। সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে এপ্রকার হইয়াই থাকে। কেহ নিন্দা করিয়াছেন শিবকে, কেহ করিয়াছেন বিষ্ণুকে, আর বৈষ্ণবগণ পরমব্রহ্মকেও হীনতর স্থান অর্পণ করিয়াছেন।

(৫) মৌলিক বিষয়ে শঙ্করের সহিত বুদ্ধের মতভেদ নাই। শঙ্কর বুদ্ধের মত জানিতেন কি না সন্দেহ। তিনি এক শ্রেণীর বৌদ্ধ-মত জানিতেন এবং সেই মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

তিনি বুদ্ধের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া বৌদ্ধদিগকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঘটি-বাটী সহ তাহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করা হয় নাই। কেহ কেহ এই কথাটিকে নূতন বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে এবং কেহ কেহ প্রমাণ করিয়াছেনও। ইহার একটি প্রমাণ 'গৌড়পাদকারিকা'। গৌড়পাদ শঙ্করের গুরুর গুরু। তাঁহার নামে যে কারিকা প্রচারিত আছে, তাহার অধিকাংশই বৌদ্ধ শাস্ত্র। মূল কারিকাতে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে; এখন সমগ্র পুস্তকই হিন্দুশাস্ত্র নামে পরিচিত। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধাদি এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের পুস্তকে (পৃঃ ৪২৩) ইহা আংশিক আলোচিত হইয়াছে। উক্ত কারিকাতে বুদ্ধের নাম পর্য্যন্তও রহিয়াছে। শাস্ত্রী-মহাশয় উক্ত গ্রন্থের এক সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই গ্রন্থের জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া আছি।

(৬) শব্দ লইয়া বাদ-বিতণ্ডা করা বৃথা। অনেক স্থলে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন লোকে একই বিষয় স্বীকার করে, কিন্তু বিভিন্ন নাম বলিয়া তাহারা বুঝিতে পারে না যে, তাহাদিগের মত একই; না বুঝিয়া তাহারা ঝগড়া করে। বুদ্ধের বিষয়েও তাহাই হইয়াছে।

বুদ্ধ যে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করেন নাই, তাহা নহে; ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু অল্প। ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহারে তাঁহার আপত্তি ছিল। উপনিষদের যুগে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইত। আত্মা বা ব্রহ্ম বিষয়ে গুরুতর মত-ভেদ ছিল। প্রাচীন উপনিষৎসমূহেই ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। ব্রহ্মের সংজ্ঞা আছে, ব্রহ্মের সংজ্ঞা নাই; ব্রহ্মের ইচ্ছা ও শক্ত্যাদি আছে, ব্রহ্মের ইচ্ছা ও শক্ত্যাদি নাই; ব্রহ্মের অহম্ ইদম্ জ্ঞান আছে; ব্রহ্মের অহম্ ইদম্ জ্ঞান নাই; ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান আছে, ব্রহ্মের আত্মজ্ঞান নাই; ইত্যাদি বহু বিরোধী মত প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে। এই সমুদায় বিবাদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বুদ্ধ নূতন ভাষায় নিজের মত প্রচার করিয়াছিলেন। এইজন্যই ব্রহ্মাদি শব্দ সহজে ব্যবহৃত হয় নাই। তিনি নিজের ধর্ম্মকে ব্রহ্মবাদ বলিয়া প্রচারিত করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমরা আলোচনা করিয়া বুঝিতেছি যে, তাঁহার মত তুরীয় ব্রহ্মবাদই। শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণবাদ একই। বুদ্ধ যখন নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তখন বলিতে হইবে যে তিনি নূতন ভাষায় ব্রহ্মবাদই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে বলা আবশ্যক এব্রহ্মবাদ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবাদ নহে, ইহা শঙ্করের ব্রহ্মবাদ।

বুদ্ধের ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর নহে, ইহা পৌরাণিক ঈশ্বর এবং শঙ্করের ঈশ্বর।

যদি সমালোচনায় এবং এই প্রত্যুত্তরে গ্রন্থকারের প্রাণে কোন-প্রকার আঘাত লাগে আশা করি তিনি দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন।

১৯শে ফাল্গুন ১৩৩২

মহেশচন্দ্র ঘোষ

—

প্রজাস্বত্ব আইন

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজা-স্বত্ব ৮ আইন সংশোধনপূর্ব্বক ১৯২৫ সালে যে-সকল ধারা সংযোজিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে সিলেক্ট কমিটিতে দাখিল হইয়াছে, ঐ আইন পাশ হইলে বাঙ্গালা দেশের প্রজা-বর্গের ভূসম্পত্তির স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক ভাবী বিপ্লবের আশঙ্কায় ভীত হইয়া আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, (৩ ধারা, ৩ উপধারা) "বর্গাদারদিগকে জোতস্বত্ব দেওয়া হইবে," বলিয়া যে-বিধান হইয়াছে, তাহা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন হইতে আমূল উঠাইয়া দেওয়া হউক; প্রজা-স্বত্ব আইনের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে আপত্তিকর যে-ধারাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাও সম্যক্‌প্রকারে সংশোধিত হউক।

ভাগ ফসলের দ্বারা বঙ্গের পল্লীগ্রামের সকল শ্রেণী প্রজার হাজার হাজার পরিবার আবহমান কাল হইতে প্রতিপালিত হইতেছে, ভাগচাষের আয়ে স্মরণাতীত কাল হইতে যে-সকল দেবালয়, সেবালয়, বিদ্যালয়, জাতীয়-বিদ্যালয় ও দাতব্যচিকিৎসালয় প্রভৃতি সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠান চলিতেছে, ঐ আইন পাশ হইলে এইসকল সার্ব্বজনীন কার্য্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

এই ভাগপ্রথা শত শত বৎসর হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া অদ্যাবধি সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিতভাবে বঙ্গের প্রজামণ্ডলীর সমান রূপে হিতসাধন করিতেছে। ভাগপ্রথায় জমী চাষ চলিতেছে, ভাগ-প্রথায় গরু প্রভৃতি-পশু প্রতিপালিত হইতেছে, ভাগ-প্রথায় ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কারবার করিয়া ধনী ও শ্রমী উভয় পক্ষই সমানভাবে লাভবান হইতেছে। এখন আইন করিয়া একের পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি অন্যকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া এই চিরাচরিত ভাগপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিলে দেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা প্রত্যেক দেশ-হিতৈষী ও মহামান্য গবর্ণমেণ্ট্‌কে একবার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ঐ প্রস্তাবিত আইনের নজীরের বলে বড় বড় কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীর স্বত্ব শ্রমিক সম্প্রদায় পাইবে না কেন? প্রজা-স্বত্ব আইনের সংস্কারক ও সমর্থক মহাশয়রা বর্গাদার বা ভাগচাষীকে বা কৃষিমজুরকে প্রজার জোত বা রাইয়তী স্বত্ব দিতে যে-প্রকার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, রেল, জাহাজ ও চা-বাগানের স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব ছাড়াইয়া লইয়া ঐসকল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদিগকে সেই স্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করার স্পর্দ্ধা রাখেন কি?

আমি রীতিমত সেলামী টাকা দিয়া, জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট জমী বন্দোবস্ত লইয়া ঐ বন্দোবস্তী জমীর জঙ্গল কাটিয়া, বাঁধবন্দী করিয়া, মাটি কাটিয়া, সমতল করিয়া, সারাদি দিয়া চাষ করিতেছিলাম। হঠাৎ বাতরোগাক্রান্ত হইয়া চলৎশক্তিরহিত হওয়ায় একবার অন্য চাষীকে ভাগে দেওয়ায় আমার জমীতে তাহার স্বত্ব হইয়া গেল। এমন আইন না করিতে পারিলে বাহাদুরী কি? পল্লীর কি কৃষক, কি মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণী প্রজার মোকররী স্বত্ব, স্থিতিবান্ স্বত্ব ও মধ্যস্বত্বাধিকারীর জমিতে যাহাতে ভাগ-চাষী বা বর্গাদার বা কৃষিমজুরকে কোন স্বত্ব দেওয়া না হয়—উপসংহারে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

২৩,২।২৬

প্রজা—শ্রীজগন্নাথ দাস,
মহিষাদল।

"থের গাথা" হইতে

(Saundersএর অনুবাদ অবলম্বনে)

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১) জ্ঞানের মুক্তি

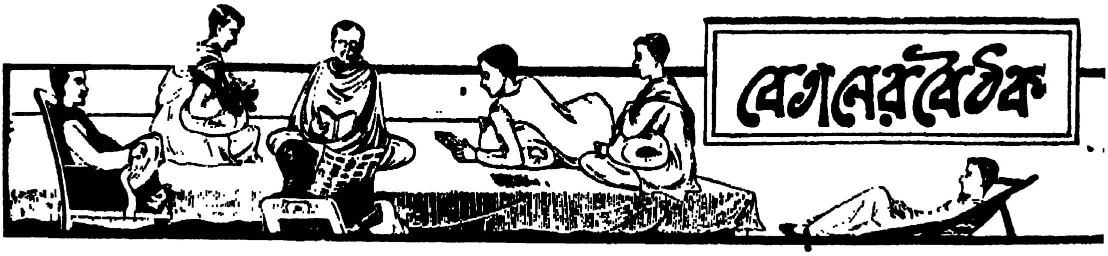
কি স্বাধীন শিক্ষা মোরে দিয়েছেন প্রভু,
গ্রামে থাকি, সদা মন চলে যায় তবু
উন্মুক্ত প্রান্তরে বনে, বাধা বন্ধ নাই,
জ্ঞানের আলোকে মুক্তি সর্ব্বত্র সদাই॥

(২) জাগ্রত সাধনা

সুখনিদ্রা তরে নহে তারাময়ী রাত্রি;
জাগ্রত সাধনা লাগি', জেনো হে তাপস!
যুঝিতে তামস সনে নাহি অপযশ
ঘটিলেও পরাজয়; নিয়ো শির পাতি'
নির্ভয়ে বীরের মৃত্যু স্বাধীন সমরে,
—ধিক্ ব্যর্থ বেঁচে থাকা দাসত্বের ডোরে!

(৩) নিষ্ঠা

"এত শীতে থাক্ কাজ; অসহ্য গরম আজ,
আজ বেলা নাহি আর মোটে!"
—এই ভাবি দিন দিন, থাকে সবে কর্ম্মহীন,
সুসময় কিছুতে না জোটে!
তবু আছে হেন লোক, দুর্য্যোগ যেমনি হোক
নিমগন মৌন আরাধনে,—
এস, মোরা ভিক্ষু যত, বরিব তেমনি ব্রত
একনিষ্ঠ কঠিন সাধনে॥



[এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক-পিঠে কালীতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুইয়ের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোনো বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোনো জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনোরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

নৌ-বিদ্যা

নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের দেশে কোথায় কিরূপ বন্দোবস্ত আছে? দেশের বর্ত্তমান জাহাজ-কোম্পানীগুলির তাবৎ কর্ম্মচারীবৃন্দই মুসলমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুদের এই দিকে ঝোঁক নাই কেন? আমি প্রধানতঃ Marine ও Stearing Dept. এর কথাই বলিতেছি। কোম্পানীগুলির কেরাণীকুলে অবশ্য হিন্দুরই সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হইবে, কিন্তু ষ্টীমার-চালনায় (সারেঙ্গের), মালরক্ষায় (সুখানীর) ওয়ালাদীদের কাজের সমস্তই মুসলমানরা অধিকার করিয়া আছে। ইহার প্রধান কারণ কি? জাত্যাভিমান কি? না যোগ্যতার অভাব? অথবা হিন্দুদের আইনের কোনও বাধকতা আছে কি না? দেশের ষ্টীমার কোম্পানীগুলি বহুদিনের। আশ্চর্য্য এই—এই অর্থসঙ্কটের দিনেও কোন হিন্দুকে সারেঙ্গ অথবা অন্য কোনও হাতের কাজ করিতে এপর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কোনও পাঠক এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩ নং চেলার রোড পোঃ জেমশেদপুর

টিহিরির রৌপ্যমুদ্রা

আমি টিহিরির একটি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছি। তাহার মূল্য ৩ মাসা। তাহার এক পিঠে "বিক্রম" ও অন্য পিঠে "শা" এই শুধু পড়া যায়; আর সব অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। টিহিরিতে "বিক্রমশা" বলিয়া কোন রাজা ছিলেন কি? তিনি কোন্ শকাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন?

শ্রী সরযূ রায়

গেঁদো আগাছা

রোয়া জমিতে এক প্রকার আগাছা জন্মায় তাহার নাম গেঁদো (দেশ-চলিত কথায় উহাকে রসুনিয়া বলে)। উহার গন্ধ ঠিক রসুনের মত, শ্রাবণের শেষে এবং ভাদ্রের প্রথমে জন্মায়। উহা বর্দ্ধিত হইলে ধান গাছ লাল রং ধারণ করে। জমি প্রায়ই পতিত হয়। কোন-কোন জমিতে উহা হাঁটু নাগাৎ উঁচু হয়।

ঐ গেঁদো বা রসুনিয়া নিবারণের সহজ এবং প্রকৃষ্ট উপায় কি?

সম্পাদক, খোদামবাড়ী পল্লী পাঠাগার

ঘরের মেঝে শুষ্ক করা

ঘরের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ভিত্তির সেঁতসেঁতে (damp) দূর করিবার উপায় কিছু আছে কি না। চুন ছড়াইয়া দিলে পরে মেঝে শুষ্ক বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাতে সেঁতসেঁতে দূর হয় কি?

শ্রী ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাগজী লেবু রক্ষার উপায়

বরিশাল অঞ্চলে বহু কাগজি লেবুর গাছ আছে ও অসংখ্য লেবু ফলিয়া থাকে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই বড় হইতে না হইতে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। আর যাহা গাছে অবশিষ্ট থাকে তাহাও হলদে রং হইয়া অকালে পরিপক্বতা লাভ করে। লোকে বলে লেবু মউয়ায় ধরিলেই ঝরিয়া যায়। কিন্তু কেহ কোনো প্রতীকারের উপায় বলিতে পারে না। প্রবাসীর কোনো পাঠক-পাঠিকা এর প্রতীকারোপায় বলিতে পারেন কি?

শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল

—

মীমাংসা

(১৯৩)

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

৫০ মাইল ঊর্দ্ধ পরিমাণ বায়ুমণ্ডল স্বভাবতঃ পৃথিবীর সঙ্গে আবর্ত্তন করিয়া থাকে এবং দূরত্ব অনুসারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও এস্থলে কম বেশী কার্য্যকরী হয়; এজন্য বিমান পোতখানি ঠিক কলিকাতাতেই অবতরণ

করিবে। তবে বায়ুর অস্বাভাবিক গতি হেতু সামান্য একটু স্থানান্তরিত হইতে পারে। ঠিক এই একই কারণে চিল, ঈগল কিম্বা শকুনি প্রভৃতি গগনবিহারী পক্ষিগণ সারাদিন অতি ঊর্দ্ধে অবস্থান করার পরও আপনাপন বাসার সন্ধান পাইয়া থাকে।

মোহাম্মদ সেকেন্দর আলি

(১১১)

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

শোহরাত অর্থ ঘোষণা। কেশোয়ারী নামক অভিধানে ইহা আরবি শব্দ বলিয়া উল্লেখ আছে। সহরত এই শোহরাত শব্দেরই অপভ্রংশ। মোছলমান বাদশাহগণের সময়ে শোহরাত শব্দের ন্যায় দলিল, নকিব ইত্যাদি আরও অনেক আরবি পার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মোহাম্মদ সেকেন্দর আলি

(২৫)

১৩৩১ সাল আশ্বিন

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে দিলু নামে এক নৃপতি যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার নামানুসারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন, এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। বাঙ্গালা অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র।

শ্রী সুকুমার পৈত

"সর্ব্বপ্রথম বাঙলা অভিধান"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩২৯ সালের পৌষ মাসের ভারতীতে 'প্রথম বাঙলা অভিধান' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে যাহা জানিতে পারিলাম নিম্নে তাহা লিখিত হইল। "পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য যখন কোন-কোন প্রাচ্য দেশে চলিতেছিল তখন Nunoda Cunha (১৫২৯-১৫৩৮) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ Dacunhaর চেষ্টায় পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন...... ১৭৯৮ সালে Henry Pithsforster-এর বাঙলা অভিধান মুদ্রিত হয়।...ইনিই ১৭৯৯ সালে বাঙলা ও ইংরেজী উভয় ভাষা সম্বলিত একখানি বাঙলা অভিধান সঙ্কলন করেন...রাজনৈতিক যুক্তি ও ফষ্টারের সাহিত্যানুরাগ এই কারণদ্বয়ের সম্মিলনে তাঁহার অভিধান সৃষ্ট হয়। ইহাতে ৪৪২ পৃষ্ঠা আছে। ইহার শব্দ সংখ্যা ১৮৫০০। অভিধানখানির নাম "A Vocabulary in two parts, English and Bengalee and vice versa. By H. P. Forster অভিধানখানি Thomas Grahamকে উৎসর্গীকৃত..."

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি

আদৌ প্রজাপতের্ জাতা মুখাদ্ বিপ্রাঃ স-দারকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা ঊর্ব্বোর্ বৈশ্যা বিজজ্ঞিরে॥
পাদতশ্চ শূদ্রাঃ সম্ভূতাস্ ত্রিবর্ণস্য চ সেবকাঃ।
হীন-নাম্না সুতস্ তস্য প্রদীপস্ তস্য পুত্রকঃ॥
কায়স্থস্ তস্য পুত্রোঽভূদ্ বভূব লিপিকারকঃ॥
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তশ্ চিত্রসেনো বিচিত্রশ্ চ তথৈব চ।

ইত্যাদি।—অগ্নিপুরাণ

অগ্নিপুরাণের মতে কায়স্থ একজন লোকের নাম। সেই লোকের বংশজাত সকলে আদি পুরুষের নামে সংজ্ঞিত হচ্ছে।

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূতস্ তস্মাৎ কায়স্থ-সংজ্ঞকঃ।

—ভবিষ্যপুরাণ।

ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতির্ উচ্যতে।

—পদ্মপুরাণ।

ক্ষত্র-শব্দেন কায়ং স্যাৎ ইয়েতি স্থিতিবাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয়-শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥

—বৃহৎব্রহ্মখণ্ড।

ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন জাতি, অথবা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে (কায়-ধর্ম্মে) স্থিত জাতি কায়স্থ।

হাতের অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অপর চার অঙ্গুলির (তর্জ্জনী মধ্যমা অনামিকা কনিষ্ঠার) নাম কায়; কায় দ্বারা (কলম মুঠা করে' ধরে') যে স্থিতি (জীবিকা) লাভ করে—কায়েন তিষ্ঠতি যঃ সঃ—সে কায়স্থ।

কায়স্থ শব্দের অপরাপর ইতিহাস মৎপ্রণীত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কায়স্থ শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও ব্যুৎপত্তি

কা [(কায়)-স্থ (স্থা) থাকা+অ-কর্ত্তৃ-ক]

যে শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকে কায়স্থ বলে—কায়স্থ শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে কায়স্থ আত্মা বা দেহী শব্দবাচক।

বর্ত্তমানে কায়স্থ জাতিবাচক শব্দমাত্র; কিন্তু পূর্ব্বে কায়স্থ ও লেখক একার্থবাচক ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

বিষ্ণুসংহিতার ৭ম অধ্যায়ে আছে:—"রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং রাজসাক্ষিকম্"।

চৈতন্যভাগবতে মধ্য খণ্ড ১৪শ অধ্যায়ে

"এ দুইর পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ সব উত্তাপিত হয়ে।"

কবিকঙ্কণে আছে:—বিচারিয়া কেহ দেখে, তাহারে কায়স্থ লেখে, সায় করি দেখে দেয় টঙ্কা।"

শ্রী গঙ্গাগোবিন্দ রায়

রূপ ও আলাপ

সঙ্গীত-নায়ক শ্রী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাগীশ্বরী—ধ্যান।

বীণা-বিনোদী কমলায়তাক্ষী
সৌন্দর্য্যলাবণ্যযুগৌরগাত্রা।
কান্তসমীপে কমনীয়কণ্ঠা
বাগীশ্বরী সা মালকৌশভার্য্যা॥

ভাবার্থ—

বীণাবিনোদী কমলনয়না সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যযুক্তা গৌরবর্ণা সুকণ্ঠা যিনি কান্তের নিকট উপবিষ্টা তিনিই মালকোশের ভার্য্যা বাগীশ্বরী।

*বাগীশ্বরী—আলাপ

সম্পূর্ণ।
গ ও নি কোমল।
ম—বাদী।
ধ—সংবাদী।

আস্থায়ী।

সা মা -া -া ধা -া -া পা -া র্সধা পা ধা মা -া জ্ঞাঃ জ্ঞঃ রজ্ঞা রজ্ঞা
তা • • • না • • • • • তে • • না • ০ • • • • •

সা -া সা ণ্‌া ধ্‌া -া ম্‌া -া মধ্‌া পধ্‌া ণ্‌া -া -া ধপ্‌া ধা -া
তো ম্‌ তে রে না • • ০ রি ০ • • • • ০ • • • • রে ০

ণ্‌া -া সা সা -া -া -া সা মা । ধা পা ধা -া -া পা ধপা ধা মা ।
• • ০ না • • • তো • • • ম্‌ না • • • তে • • • •

জ্ঞা । রা -া জ্ঞা সা -া সা সা সা সণা সণা সা রা ০ সা । ০ । । ।
• • না • • নে তে রে না তে না ০ তো • ০ ম্‌

অন্তরা।

মা ধা ণা -া । ধপা ধা -া -া ণা র্সা -া র্সা র্সা -া । -া
তো • • • ম্‌ নে• রি • • • • • রে না • • •

র্সর্রা র্সা র্জ্ঞা -া র্রা র্সা -া । র্সধা র্সা ণা -া । ধা মা
তা• ০ • • নে না • তে • • • • না •

---

* বাগীশ্বরীর দুই প্রকার ঢং প্রচলন হইয়াছে। বহু পুরাতন বাগীশ্বরী যাহা আছে, তাহাতে পঞ্চম বেশী ব্যবহার হয় এবং ইম্রাবরষ সাঁই-এর ধরণে যে বাগীশ্বরী, তাহাতে পঞ্চম কম ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ টক্কারাগিণীর ধরণ। মহম্মদ শা বাদশার সময়ে ইম্রাবরষ সাঁই গায়ক ছিলেন, ইঁহার রচনাও অতি সুন্দর এবং বড় গায়ক ছিলেন। উপরে যে বাগীশ্বরী দেওয়া হইল ইহা ইম্রাবরষ সাঁইএর ধরণ। বিষয়টি না জানিয়া বাগীশ্বরীর ঢং বিষয়ে অনেকে গোলমাল করেন তজ্জন্য ইহার প্রকৃত কারণ লেখা হইল। মৎকৃত তানমালা-নামক গ্রন্থে ১৮ কনেড়ার বিষয়ে সমস্ত দ্রষ্টব্য।

মা ধপা ধা -া ।ঃ পঃ র্সাধা পা ধা মা
নে তে০ তে ০ ০ ০ ০০ ০ না ০

মাধা পপা । -া মা জ্ঞা -া রজ্ঞা রজ্ঞা সা -া ।
তো০ ০০ ম্ 'না ০ ০ ০০ ০০ না ০ ০

সা সা সা সণ্া সণ্া সা রা -া সা -া ॥
তে রে না তে না ০ তো ০ ০ ম্

সঞ্চারী ।

র্সা পা ধাপা ধা পা । । র্সধা পা ধপা মা -া মা মপা পধা
তে রে নে০ রি ০ ০ ০ রে০ না ০ তা ০০ ০০

র্সা পা ধামা মা জ্ঞা -া রজ্ঞা রা সা সা ণ্া ধ্া
০ না ০০ তো ০ ০ ০০ ০ ০ তে রি ০

ণ্া সা -া মা -া ধপা পা ধা মা -া মজ্ঞা -া । রাঃ জ্ঞঃ সা -া ॥
রে ০ ০ না ০ ০০ ০ ০ ০ ০ তো ০ ম্ ০ ম্ না ০

আভোগ ।

মা ণধা র্সা -া র্সা ০। র্রা পা র্সা -া র্সা । । ।
তা ০০ ০ ০ না ০ তে ০ ০ ০ না ০ ০ ০

র্সা র্রা র্সা র্মা -া র্মা -া র্জ্ঞা -া র্রা -া র্সা -া
তে ০ ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ না ০

র্সা পা ধপা ধা । । পা র্সসা ধনা ধা মা
তে রে না০ রি ০ ০ ০ ০০ ০ রে না

মধা পধা মা জ্ঞা -া রজ্ঞা রজ্ঞা সা -া সা সা সা
তা০ ০০ না ০ ০ ০০ ০০ নে ০ তে তে না

সণ্া সণ্া সা রা -া সা -া ॥
তে না ০ তো ০ ০ ম



বাংলার কথা

চক্ষু চিকিৎসকের সহৃদয়তা—

বিশ্বভারতীর পল্লীসংস্কার-বিভাগের আহ্বানে অবসর-প্রাপ্ত সিভিল্ সার্জ্জন ও বড়লাটের অনারারী অস্ত্রচিকিৎসক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায় মহাশয় শ্রীনিকেতনে আসিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের দরিদ্র-গণের চক্ষের ছানি কাটিয়াছেন। তিনি এজন্য তাহাদিগের নিকট কোনো পয়সা লন নাই।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে ডাঃ রায়-মহাশয় বরিশালে এইভাবে ৯০০ শত লোককে চক্ষুদান করিয়াছেন, এখানেও তিনি তিন শতেরও উপর লোকের চক্ষুর ছানি কাটিয়া বহুলোককে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়া দরিদ্র-সাধারণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

রায়-মহাশয়ের ইচ্ছা তিনি বাংলাদেশের স্থানে-স্থানে গিয়া এইভাবে লোকসেবা করেন। আমরা আশা করি, দেশবাসিগণ ও দেশের কর্ম্মিগণ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া রায়-মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া বহু দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি লাভ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে চান, তাঁহারা এ-বিষয়ে শ্রীনিকেতনে জানাইলে সমস্ত খবর জানিতে পারিবেন।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা—

১৩৩৩ সালের গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা। এই ৫৭ বৎসর ধরিয়া সুপরিচিত পঞ্জিকা এবার বর্দ্ধিতকলেবরে প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্জিকায় যাহা-যাহা থাকা আবশ্যক তাহা ইহাতে আছে, এবং তাহা ছাড়া অন্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের জন্য অভিপ্রেত হইলেও অন্য সম্প্রদায় বাঙালীরও কাজে লাগিবে।

কুণ্ডা শিল্প-বিদ্যালয় * —

কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয় ইংরেজী ১৯১৮-১৯ সালে প্রথম স্থাপিত হয়। সে বছর দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সরকার এবং নানাপ্রকার সেবা-সমিতির সাহায্যে এ-অঞ্চলের অধিকাংশ লোক আধমরা হইয়াও বাঁচিয়াছিল। যে-দেশে কৃষিই একমাত্র সম্পদ্ ও সম্বল সে-দেশে অনিবার্য্য কারণে ফসল-হানি হইলে পরিণাম এই ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেই দুর্দ্দিনে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রিলিফ্ কমিটীর সম্পাদকরূপে ইহার প্রতিকারার্থ এই বিদ্যালয় ও কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিয়া কতগুলি গৃহশিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটির" শিল্প-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সম্পাদক-মহাশয়কে মৌখিক উৎসাহ প্রদান ও একখানা শ্রীরামপুরের ঠক-ঠকে তাঁত উপহার দেন। তভিন্ন সম্পাদক স্বয়ং বহু প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে প্রয়াস পান। প্রতিষ্ঠাতা নিজেও যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়ে আজ কতকগুলি লোক এই শিল্প-বিদ্যালয়দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। বর্ত্তমানে বাংলা-সরকারের শিল্প-বিভাগ, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্, ও ওয়ার্ড্ ষ্টেটের সাহায্যে বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে এবং কার্য্যকরী বিভাগগুলি ক্রমশঃ নিপুণ শিল্প (fine articles) উৎপন্ন করিতেছে। বাঁশবেতের কাজে মেয়েরাও বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। বয়ন-বিভাগে নানাপ্রকার ডিজাইনের কাজ হয়। ভদ্রঘরের মেয়েরাও অনেকেই মণিপুর তাঁতের (hand-loom) কাজ শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে কাজ পাওয়া যায় বড়ই কম।

গৃহশিল্প-সমিতিগুলিতে যাহারা কাজ করে, তাহাদের উপাদান অর্থাৎ বাঁশ, বেত ইত্যাদি জোগাইয়া দিতে হয় শিল্পবিদ্যালয়ের তহবিল হইতে। জিনিষ প্রস্তুত হইলে পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উপাদানের মূল্য কাটিয়া রাখিয়া বাকী সব প্রস্তুতকারককেই দেওয়া হয়। বিক্রয়ের ভার কর্ম্ম-কর্ত্তাগণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে মাসিক ৮।১০ টাকা পাইয়া থাকেন।

কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে কাপালী, নমঃশূদ্র দাস, ভদ্রলোক ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকই কাজ করিতেছে।

সমগ্র ত্রিপুরা-জেলার গ্রামের মধ্যে মাত্র এই শিল্প-বিদ্যালয়টি আট বছর যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে। অবশ্য ব্যবসায়ের হিসাবে আরো কোনো-কোনো গ্রামে শিল্পকার্য্য আছে, কিন্তু নানা বিষয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আর নাই।

বিগত ১৩২৬ বাংলার আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীর "দেশের কথা"তে বিস্তৃতভাবে কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়ের কি-কি জিনিষ প্রস্তুত হয়, তাহা শ্রীমতী হেমলতা দত্তের পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশেষে যাঁহার আশীর্ব্বাদ একেবারে বিফল হয় নাই, সেই পূজ্যপাদ ঋষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ-পত্রখানা নিম্নে দিয়া শিল্পবিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমাপ্ত করা হইল।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

গ্রামে শিল্প-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য তোমরা যে চেষ্টা করিতেছ, আমি একান্তমনে তাহার সফলতা কামনা করি। এ-পর্য্যন্ত দেশের জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা সহরেই বদ্ধ ছিল। এখন এই চেষ্টার স্রোত পল্লীতে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। ইহাতেই আমরা যথার্থ শুভফল লাভ করিবার আশা করিতে পারি। দেশের যে-সকল যুবক নিঃস্বার্থ উদ্যমের সহিত এই কল্যাণ-সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য—তাঁহারা সমস্ত দেশের আশীর্ব্বাদের পাত্র। সমস্ত বাধা-বিপত্তিতে

---

* কুণ্ডা-শিল্পবিদ্যালয়ের শ্রী সত্যভূষণ দত্ত পরিচালক মহাশয়ের প্রেরিত বিবরণ হইতে।

তাঁহাদের নিষ্ঠা অবিচলিত থাকে, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে এমন শক্তি দিন।
ইতি ১০ই পৌষ ১৩২৬ বাং

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গ মহিলার বীরত্ব—

গত ২২শে মার্চ্চ, ১৯২৫, তারিখে ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত রামনগর গ্রামের কৈলাসচন্দ্র সাহা মণ্ডলের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হয়। ঐ ডাকাতির বিবরণ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ ডাকাতিতে বীর রমণী হেমলা গোপিনী ও তাহার ৩ ভাই ডাকাতদিগকে আক্রমণ করিয়া অসীম সাহসের সহিত ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং ফলে ২জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য আসামী-গণও ধৃত হইয়া ইতঃপূর্ব্বেই দণ্ডিত হইয়াছে। হেমলা গোপিনী ও তাহার ৩ ভাই সশস্ত্র ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহার পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট হেমলাকে ১৫০ টাকা ও তাহার ৩ ভাইকে ১৫০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

সপ্তদশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন—

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন এবার ঈস্টারের ছুটিতে বীরভূমের সিউড়ী সহরে হইবে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন—

পশ্চিমাঞ্চলের সাহিত্যপ্রেমী বাঙ্গালীদিগের উদ্যমে চারি বৎসর হইল যে, সাহিত্য সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও যাহা বর্ত্তমানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নামে পরিচিত তাহার ৪র্থ অধিবেশন আগামী ঈস্টারের অবকাশে কানপুরে হইবে স্থির হইয়াছে।

এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য চারিটি—

১। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করা।

২। পরস্পরের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের দ্বারা বিচ্ছিন্ন প্রবাসী বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে প্রীতির যোগ-সূত্র রচনা করা।

৩। বাঙ্গলার ভাব-ধারার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবের অক্ষুণ্ণতা-রক্ষণ।

৪। পরস্পরের অভাব অভিযোগের আলোচনা দ্বারা বাঙ্গালীর প্রবাস-জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান।

বলা বাহুল্য, যেসকল প্রবাসী বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টা ও আন্তরিক সহানুভূতির উপরই এই সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সমিতির সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ লিখিতেছেন :—

যাঁহারা নিজে আসিতে অক্ষম তাঁহারা পরিচিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক গণের নাম ধাম পাঠাইয়া অভ্যর্থনা সমিতিকে সাহায্য করিতে পারেন। এই উপলক্ষ্যে আমরা প্রবাসী সাহিত্যিকগণের নিকট বিশেষভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি তাঁহারা সম্মেলনে পাঠের জন্য সাহিত্য, মৌলিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ; দর্শন প্রত্নতত্ত্ব প্রবাসী বাঙ্গালীর নানা প্রদেশের তথ্য এ প্রদেশের লোকাচার সমাজ-তত্ত্ব গাথা, কবিতা প্রভৃতি মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া অভ্যর্থনা সমিতেকে অনুগৃহীত করিবেন।

বাংলায় নারী-নির্য্যাতন—

মুসলমান কর্তৃক হিন্দুরমণী হরণ

আত্রাই নদীর ধারে কোনো এক গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ জমিদার স্বজাতি, স্বশ্রেণী ও আত্মীয়-কুটুম্ব লইয়া বাস করিতেছেন। গ্রামটি ছোট-খাট নহে, নানা শ্রেণীর হিন্দুও তথায় আছে। এই অবস্থায় চোখের সামনে গ্রামের বুকের উপর হইতে একজন মুসলমান যুবক একজন ব্রাহ্মণ কন্যাকে অবাধে হরণ করিয়া লইয়া এক মাইল ব্যবধানে তাহার বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছে; জমিদারগণ বা অন্য হিন্দু অধিবাসীরা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, শুনিয়াও শুনিতেছেন না। ব্রাহ্মণদেরও আর কোনো শক্তি নাই। তাহারা বিষহীন ঢোড়াসাপ। এইরূপ দুর্বৃত্তেরা যে কলমা পড়াইয়া তাহাকে মুসলমান করিয়া বিবাহ বা নিকা করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মণ জমিদার ও হিন্দু প্রতিবেশী থাকিতে ব্রাহ্মণ-কন্যা আজ মুসলমানী হইতে চলিল। আজ যদি ইহার কোনো প্রতিকার না হয় তবে আবার কাল আর একটিকে লইয়া যাইয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে। এইরূপ করিয়া ব্রাহ্মণ-কন্যারা মুসলমান হইবে আর ব্রাহ্মণগণও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তপস্যার ভাণে আত্মত্যাগ দেখাইবেন।

(হিন্দুরঞ্জিকা)

সহযোগী বরিশাল হিতৈষীতেও এইরূপ অত্যাচারের কয়েকটি করুণ কাহিনী বাহির হইয়াছে। সহযোগী লিখিতেছেন,

"আমরা আশা করি এই কাঁদুনী না গাহিয়া একদল হিন্দু যুবক এখনই ঐসমস্ত গ্রামে পাহারা দিতে আরম্ভ করুক—এবং দুর্বৃত্ত যে-ই হউক বা যত বড়ই হউক তাহাকে বুঝাইয়া দিক্ যে এই সমস্ত গুণ্ডা শাসনের জন্য হিন্দুগণ আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছে।"

লাঞ্ছিত রাজনীতিক সম্মেলন—

হবিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় সম্মিলন মণ্ডপে ১৩ই ফেব্রুয়ারী সুরমা উপত্যকার লাঞ্ছিত রাজনীতিকদের একটি সম্মেলন হয়। করাচীর সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মী মৌলানা হোসেন আহম্মদ সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রায় শতাধিক ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক বন্দী (ex-prisoners) উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালায় শিক্ষা—

১৯২৩-২৪ সনের বাঙ্গালা দেশে শিক্ষার অবস্থা-সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে উহাতে বাঙ্গালা দেশে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত এবং অননুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ৫৬০০১টি ছিল। উহার মধ্যে ৪২৭৭১টি বালকদিগের এবং ১৩২৪০টি বালিকাদের বিদ্যালয় ছিল। এইসমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যাও আলোচ্য বর্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে মোট ২০৫৭০৬২ ছাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিল; এই সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১০৬১৩৩ বেশী। মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ১৬৯২৬৮৮ জন বালক ও ৩৬৪৩৭৪ জন বালিকা ছিল। ছাত্র ও ছাত্রী উভয়েরই সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সমূহের ৫১টি আর্ট ও শিল্প কলেজ, ৯৫৫টি উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়, ১৬৬৪টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, ৪১৪২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২৫৬৪টি বিশেষ-ধরণের বিদ্যালয় ছিল। এইসমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৭৩টি গবর্ণমেণ্ট, ৩৪৬৫টি জিলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড পরিচালন করে। ৪২৮০০টিতে সরকারী সাহায্য আছে।

আলোচ্যবর্ষে শিক্ষা-বিভাগে মোট ৩৪৪৪৮৩০৭ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩১৪২২১৬। উহার মধ্যে বাঙ্গালা সরকার ১৩০০৯৪৮৬ টাকা দিয়াছেন। জিলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডগুলি যথাক্রমে ১৪৮৯২০৪ টাকা ও ৬৩০৩৫৪ টাকা দিয়াছেন

এবং বাকী ১৪০১৬৩৬৪৲ টাকা ও ৫৬০২৮৬৯৲ টাকা ছাত্র-বেতন ও অন্যান্য উপায়ে পাওয়া গিয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে বিদ্যালয়সমূহে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ও ছাত্রীদের সংখ্যা দেওয়া হইল—হিন্দু ছাত্র ৯১৫৬৬৪, মুসলমান ছাত্র ৭৯১৪৫০; হিন্দু ছাত্রী ১৩১৩৩৮, মুসলমান ছাত্রী ১৬৯৬৫০। উহাতে দেখা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা হিন্দুদের অপেক্ষা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

এই বিবরণে প্রকাশ যে ১৯২৩ সনের শেষ ভাগে বাঙ্গালা দেশে মোট ১০০টি জাতীয় বিদ্যালয় ছিল। উহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯০৮১; পূর্ব্ব বৎসরের বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১৭৫ ও ২২৭৯১।

বিধবা বিবাহ—

মেদিনীপুর বিধবা বিবাহ-সমিতির উদ্যোগে গত ২৩ শে মাঘ চন্দ্রকোণা থানার শ্রীরামপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীআশুতোষ ঘোষ, গড়বেতা থানার গোকুলগঞ্জ নিবাসী ৺রমানাথ পাত্রের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বালিকাটি ২॥০ বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়া ৬ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল।

উক্ত সমিতির চেষ্টায় এগরা থানার কুলটিকরী মৌজার শ্রী অক্ষয় নারায়ণ বেরার সহিত শ্রীমতী ক্ষীরোদামণি ও উক্ত থানার বাড়িদা গ্রাম-নিবাসী শ্রীপদ্মলোচন বেরার সহিত শ্রীমতী পরামণি নাম্নী বাল-বিধবার বিবাহ হইয়াছে।

নারায়ণগড় থানার বাগভূম পরগণার বেলদা গ্রাম নিবাসী শ্রীবাইন চরণ বারিক স্বজাতীয়া শ্রীমতী বিন্দ্যাসুন্দরী নাম্নী বালবিধবার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন।

সমিতির চেষ্টায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫০টি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল। বাংলার সকল জেলায় বিধবা-বিবাহ-সহায়ক-সমিতির শাখা স্থাপন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান—

দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যার্থ স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় ৫০,০০০৲ টাকা রিপণ কলেজকে দিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকা হইতে কলেজের আগামী বর্ষ হইতে বর্ত্তমানে যে বৃত্তির বরাদ্দ আছে, তাহা অনেক বাড়ান হইবে।

বাংলা সরকারের আয়-ব্যয়—

আগামী ১৯২৬-২৭ সনের জন্য গবর্ণমেণ্টের আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, মোট ১০৭৬৭৮০০০৲ টাকা। গত বৎসর বাংলা গবর্ণমেণ্টের যে আয় হইয়াছিল তদপেক্ষা এ বৎসর প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। এই বৎসর গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ধরা হইয়াছে মোট ১০৯৭২৯০০০৲ টাকা। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা ৫২ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইয়াছিল।

সাধারণ শাসন বিভাগে বর্ত্তমান বৎসরের ব্যয়ের অপেক্ষা আগামী বৎসরে দুই লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে; পুলিশ বিভাগে ৪ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে।

চিকিৎসা বিভাগে বর্ত্তমান বৎসরে যে টাকা ব্যয় হইতেছে আগামী বৎসরে তদপেক্ষা আড়াই লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগে বর্ত্তমান বৎসরে যে খরচ হইতেছে তদপেক্ষা ১২৫০০০০৲ টাকা অধিক আগামী বৎসরে ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বিভাগে মফঃস্বলে জল সরবরাহের জন্য ২৮৪০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

আগামী বৎসরে শিক্ষার জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট মোট ১৩৯৬০০০০৲ টাকা ব্যয় করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের সাধারণ কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য যদি অতঃপর আর অতিরিক্ত টাকার দাবী উপস্থিত না করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রতি বৎসর ২৪৩০০০৲ টাকা হিসাবে পাঁচ বৎসর কাল অর্থ-সাহায্য দেওয়া হইবে।

পল্লী-সেবা—

দেশবন্ধু পল্লী-সংস্কার-সমিতি স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সমীপে নিম্নলিখিত আবেদন জানাইয়াছেন :—

পরীক্ষার পর এই লম্বা ছুটাতে কি করিবেন? নিজের গ্রামে যান, গিয়ে মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গ্রামের জন্য পল্লী-সংস্কার কাজ আরম্ভ ক'রে দিন। চার মাস ত ছুটি? এ চার মাসে অন্ততঃ (১) ৫টি পুকুর পরিষ্কার ক'রে পানীয়জলের অভাব দূর করুন। (২) ১টি নৈশ ও দিবা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন। (৩) ১টি দাতব্য চিকিৎ-সালয় স্থাপন করুন। (৪) চরকা ও খদ্দর প্রচলন করুন। (৫) একটি ব্রতীদল সংগঠন করুন। (৬) ঘন ঘন সভা সমিতি এবং মেশা-মেশি ক'রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবার প্রবৃত্তি এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করুন। (৭) ধর্ম্মগোলা স্থাপন করুন। (৮) দেশী জিনিষের দোকান খুলে গ্রামে স্বদেশী প্রচলনের চেষ্টা করুন। গ্রামই জাতির মেরুদণ্ড—গ্রামকে বাঁচানই জাতিকে বাঁচান। নিজেদের গ্রাম নিজেদেরই গ'ড়ে তুল্‌তে হবে বিদেশীর ভরসায় থাক্‌লে চল্‌বে না। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন বৈঠকে প্রধানতঃ "জ্ঞান-ভাণ্ডারে ভারতের দান" বিষয়ে আলোচনা হইবে। এই উপলক্ষ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহার নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করিবেন। তিনি আগামী ২০ মার্চ্চ তারিখে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হইবেন। এবার তিনি রাষ্ট্র-সঙ্ঘ এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া আসিবেন। আগামী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান মহা-সভার অধিবেশন হইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মৈমনসিংহের চাঁদ মিঞার দান—

করটীয়ার বড় তরফের জমিদার জনাব মৌলবী ওয়াজেদ আলী খানপণি ওরফে চাঁদ মিঞা তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া-ছেন। এই উপলক্ষে গত ২১ এ ফেব্রুয়ারী করটীয়ায় একটি সভার অধিবেশন হয়; ঐ সভায় ওয়াক্‌ফের সর্তসমূহ পঠিত হইয়াছিল।

ওয়াক্‌ফ দলিলের মর্ম্ম :—

(ক) জমিদারীর প্রায় সমস্ত অংশই ওয়াক্‌ফ হইল।

(খ) চাঁদ মিঞা সাহেব স্বয়ং প্রথম মোতওয়াল্লী থাকিবেন, তৎপর মোতওয়াল্লী হইবেন তাঁহার একমাত্র পুত্র, তৎপর জ্যেষ্ঠ পৌত্র, তৎপর জ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র, তৎপর জ্যেষ্ঠ প্রপ্রপৌত্র এইরূপ—।

(গ) সমস্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির নেট আয়ের চারি আনা পারি-বারিক ভরণ-পোষণে ব্যয়িত হইবে; অপর চারি আনা ব্যয়িত হইবে নানা লোক-হিতকর কাজে— যথা করটীয়াস্থিত হাই স্কুলে

বার্ষিক ২৫০০৲, মাদ্রাসায় ২৫০০৲, কলেজে ৬০০০৲, দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩৫০০৲, মসজিদে ১০০০৲, এতিম ও দরিদ্র আত্মীয়গণের জন্ম ২০০০৲, ঈদ, ফাতেহা-দোয়াজ-দহম প্রভৃতির জন্ম ৫০০৲, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দরিদ্র মুছলিম ছাত্রগণের বৃত্তিতে ১০০০৲, ইছলাম প্রচারে ৫০০৲ এবং অন্যান্য সৎকাজে অবশিষ্ট টাকা। নেট আয়ের অবশিষ্ট আট আনাদ্বারা প্রতি বৎসর নূতন সম্পত্তি খরিদ করা হইবে। এইরূপে খরিদা সম্পত্তিও ওয়াক্ফ মধ্যে গণ্য হইবে এবং ঐরূপে সম্পত্তির নেট আয়ের চারি আনা পারিবারিক ভরণপোষণে এবং বার আনা শিক্ষা, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইসলাম প্রচার ও ধর্ম্ম পুস্তক মুদ্রণে ব্যয়িত হইবে।

কুমিল্লা অভয়-আশ্রম—

বিগত ২ই ফাল্গুন কুমিল্লা অভয় আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। শ্রী জগদীশচন্দ্র পালিত মহাশয়ের সৌজন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের নিম্নলিখিত সারাংশ প্রাপ্ত হইয়াছি।



আগরতলা কুঞ্জবাণী প্রাসাদে রবীন্দ্রনাথ

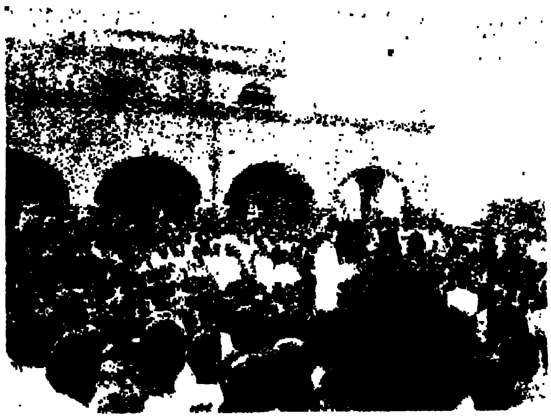
রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ

আমার বন্ধুগণ, আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মৃত্যু-দূতের পদধ্বনি শোনা গিয়েছে। তাই চিকিৎসকগণ আমাকে কর্ম্মের থেকে ছুটী দিয়েছেন। কিন্তু কর্ম্মকে এড়িয়ে নয়, কর্ম্মকে সমাধা ক'রেই তবে কর্ম্ম থেকে ছুটী নিতে হবে—বিধাতার সেই হুকুম আমার কাছে এসেছে। এইজন্যে পূর্ব্ববঙ্গে আজ উপস্থিত হয়েছি। যাবার সময় আমার শেষ কথাটি ব'লে যাব।

দেশের মধ্যে অনেক দিন থেকে কর্ম্ম করবার যে-সংকল্প জেগে উঠ্‌ছে, তার সম্বন্ধে ব'লে যাবার এই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কেননা পূর্ব্ববঙ্গের লোক নিষ্ঠাবান, দৃঢ়সংকল্প, সরলচিত্ত—তারা বুদ্ধির অহঙ্কারে বিদ্রূপের দ্বারা বড় বড় কথাকে দূর ক'রে দেয় না। সেইজন্যে পূর্ব্ববাংলা দেশের মধ্যে বড় কাজের ক্ষেত্র। আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানে আমি কর্ম্মের একটি রূপ দেখ্‌তে পেয়েছি—আমার আশা অঙ্কুরিত হয়েছে।

বাঁশী সুন্দর ক'রে তৈরী হ'লে বাদক খুসি হয়—সে বলে, এতে আমার গান ধ্বনিত হবে। দেখ্‌লুম, আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানের বাঁশী সুর বাজাবার মত হয়েছে,—'যদি তোমার সময় থাকে, সুর বাজাও'—এই প্রেরণা আমার মনে এসেছে।

দেহের মধ্যে প্রাণশক্তি কতগুলি ঐক্যকেন্দ্র স্থাপিত ক'রেছে—সেইগুলি মর্ম্মস্থান, যেমন হৃদয়-যেখান থেকে দেহের সর্ব্বত্র প্রাণরস সঞ্চারিত হয়। এতে দেহের উৎকর্ষ। এই প্রতিষ্ঠান সেই-রকম একটি মর্ম্মস্থান। এইখান থেকে পল্লীতে-পল্লীতে প্রাণরস সঞ্চারিত হবে। হৃৎপিণ্ড, মাথা পা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রাণরস প্রবাহিত ক'রে দেয়—তাই প্রাণের স্বরাজ দেহে। এম্‌নি ক'রে দেশে মর্ম্মস্থান সব সৃষ্টি হ'লে তবেই এখানে প্রাণের স্বরাজ হবে। এই কাজের এখেকে সূত্রপাত হয়েছে। এর জন্যে দেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। যদি মাফ্ করেন, একদিন আমি ঘোষণা করেছিলেম, পল্লীর মধ্যে প্রাণের ঐক্যই ঐক্য দান



মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় সমবেত জনমণ্ডলী

করবে। বাহিরের যে-অনুষ্ঠান, সে-দড়ি; নাড়ী নয়। কিন্তু কবির কথা লোকে কাব্য-কথা ব'লে উপহাস করেছিল সেদিন, আপনারা অনেকে তা জানেন না। আমি জানি,—কেননা আমার সংকল্প তখন বড় দুঃখের আঘাত পেয়েছিল। সেইজন্যেই যদি দেখ্‌তে পাই আমার সেই সংকল্প কোথাও কোনো জায়গায় আকার পেয়েছে, আনন্দ পাই।

হৃৎপিণ্ড দৈহিক, হৃদয় মানসিক পদার্থ। দেশের হৃদয়কে যদি দেশের অধিবাসীরা না জান্‌তে পায়; তবে দেশের আত্মবোধ জাগ্‌বে না। একদিন ছিল—পল্লীতে পল্লীতে দেশের প্রাণশক্তি জ্বাল্‌তে জ্বাল্‌তে আপামর সাধারণকে এক ক'রে তুলেছিল। সে হৃদয়ের সম্বন্ধ একদিন বিচ্ছিন্ন হ'ল। সে পুরাতন প্রীতি, স্নেহ, সেবার সম্বন্ধ পুনরায় আজ বিধাতার প্রাণ-সমীরণের মতো সমীরিত।

এইজন্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যে আমি এসেছি। আমার খেয়া নৌকো তৈরি আছে, আমার যাবার সময় হ'ল। সমস্ত দেশের অন্তরের মধ্যে যে সংকল্প ছিল, তা' আজ এখানে আকার লাভ করেছে,—এর



শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী
শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতি

[কুমিল্লায় গৃহীত ছবি

বিনাশ নেই ; এই দেশে আমার যা' আনন্দ, তা' প্রকাশ ক'রে গেলুম।

অমৃত লাভ করেছে তারা, যারা হৃদিমনীষামনসা সত্যের বিরাট্ মূর্ত্তিকে দেখে আনন্দে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্ম-সমর্পণের আনন্দ দেশকে বাঁচাবে, কোনো আচার নয়। আমি এখানকার আত্ম-সমর্পণ দেখে আনন্দিত ; ক্ষীণকণ্ঠে এইটুকু বল্‌বার জন্যে আমি এসেছি।

সমগ্রতার রূপকে বাল্যকাল থেকে পূজো ক'রে এসেছি, খণ্ডতাকে বড় মনে করিনি। সত্যের পরিপূর্ণতার আদর্শ আমার। বিষয়ী লোকের বুদ্ধি আংশিককে আঁক্‌ড়ায়। আংশিকের মধ্যে যা' দি, তা' মৃত্যুকে দেওয়া হয়, সমগ্রের মধ্যে যা' দি, তা' অমৃত। ক্রীড্‌ওয়ালা ধর্ম্ম মানুষকে বড় রকম মুক্তি দেয় না। চৈতন্যকে সর্ব্বত্র প্রসারিত ক'রে দেওয়াই মুক্তি, কর্ম্মেও তাই।...

মানুষের সর্ব্বোতোমুখী শক্তিকে আজ আহ্বান করতে হবে। তপস্বী জ্ঞানের, কর্ম্মী কর্ম্মের, ভাবুক ভাবের তপস্যা করছে। আমাদের দেশেও তপস্যা বিস্তৃত হোক, বহুধা হোক, নানা তপস্যা জাগ্রত হোক। সঙ্কীর্ণ সীমায় চৈতন্যকে বদ্ধ করলে সিদ্ধি হবে না। মানব-ধর্ম্মের মধ্যে বৈচিত্র্য, বহুধা শক্তির স্থান আছে। অস্বীকার করলে মনুষ্যত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হবে। সমগ্রতার, পরিপূর্ণতার উপাসক আমি। আপনাদের কর্ম্ম যেন সমগ্রতাকে বাদ না দেয়।

আশ্রমের ৩য় বার্ষিক বিবরণী হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদ দিলাম।

বর্ত্তমান আশ্রমের সেবক-সংখ্যা ৫০ জন। ইহা ব্যতীত আশ্রমের বিভিন্নপ্রকার কর্ম্মের নিমিত্ত প্রায় ২০ জন বেতনভোগী কর্ম্মচারীও নিযুক্ত আছেন। উক্ত সেবক ও কর্ম্মচারীরা আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রে থাকিয়া আশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করিতেছেন।

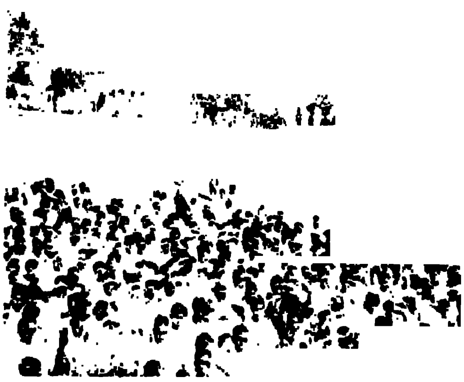
নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে এই বৎসর আশ্রমের শাখা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিপুরা—কুমিল্লা আশ্রম, কুমিল্লার খদ্দর ভাণ্ডার, বরকামতা, পাঁচপুকুরিয়া ও চৌদ্দগ্রাম। নোয়াখালী—ফেণী ও মুন্সিরহাট। চট্টগ্রাম—মিঠাচরা। ফরিদপুর—ফরিদপুর। ঢাকা—ঢাকা। —জলপাইগুড়ী—চেঙড়াবাঁধা। নদীয়া—কৃষ্ণনগর। মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর। বাঁকুড়া—বাঁকুড়া। কলিকাতা—কলেজষ্ট্রীট মার্কেট ও রসারোড, ভবানীপুর।

আশ্রমের চিকিৎসা বিভাগ (outdoor)

গত বৎসর ৬৪২৯ জন রোগী এই বিভাগে ২৬২৭৩ বার উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে হিন্দু পুরুষ ২১৭৫, হিন্দু রমণী ৭২৫, মুসলমান পুরুষ ২৭৪৩, মুসলমান রমণী ৭৮৬।

উপস্থিত রোগীদিগের শতকরা প্রায় ৭৫ জনকে বিনামূল্যে ঔষধ

বিতরণ করা হয়। বাকী ২৫ জনের অর্থের দ্বারা ডিস্‌পেনসারীর ঔষধ বাবদ যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহিত হয়। গত বৎসর এইভাবে ৪৪৪৬/০ সংগৃহীত হইয়াছিল। আশ্রমের চিকিৎসা-বিচক্ষণতা দেখিয়া ক্রমশঃ ইহা অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে।



রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমনে নদীপারের দৃশ্য

হাসপাতাল

আশ্রমের হাঁসপাতালের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়াছে। এই হাসপাতালের জন্য প্রতিমাসে প্রায় ৩৫০্ টাকা খরচ হইবে। তন্মধ্যে স্থানীয় 'অভয়-আশ্রমসেবা-সমিতি' সহরে মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা প্রতিমাসে ১০০্ টাকা সংগ্রহ করিতেছে। অপেক্ষাকৃত ধনী রোগীদিগের নিকট হইতেও মাসিক কিছু কিছু টাকা আদায় হইবে। বাকী প্রায় ২০০ টাকা কোথা হইতে আসিবে তাহা ভগবান জানেন। এই জিলায় বহু ধনী লোক আছেন যাঁহারা পূজাপার্ব্বণে হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া থাকেন। প্রায় ২৫০০্ টাকা দান করিলে উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি রোগীশয্যা চিরতরে বিনা খরচে রাখা যায়। আমরা আশা করি, সহৃদয় ব্যক্তিগণ এই মহৎ কার্য্যে টাকা দান করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ২৫০০্ টাকা যে ব্যক্তি দান করিবেন তাঁহার মনোনীত নামানুযায়ী একটি রোগ-শয্যার নামকরণ হইবে।

স্থানীয় স্কুল কলেজের যুবক এবং আশ্রমের কতিপয় সেবক লইয়া গত ২।৩ মাস হইল এই সেবা-সমিতি আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন এই সমিতির সেবক সংখ্যা ৭০ জন। এই সমিতির উদ্দেশ্য:—১। আশ্রম হাঁসপাতালের অসমর্থ দরিদ্র রোগীদের সাহায্যের জন্য সহরের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে রীতিমত মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করা। প্রতি রবিবার মুষ্টি-ভিক্ষা সংগৃহীত হয়। বর্ত্তমানে প্রতি সপ্তাহে ৪/ মণের অধিক চাউল সংগৃহীত হইতেছে। তাহাতে মাসিক ১০০্ টাকার অধিক আয় হয়।

২। সহরের দরিদ্রের জন্য অবৈতনিক শিক্ষালয় ও পাঠাগার স্থাপন।

খদ্দর বিভাগ

১৯২৪ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমরা এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২১০১৩৷৶ টাকার খদ্দর উৎপাদন ও ২১৮২২৸/৫ টাকার খদ্দর বিক্রয় করিয়াছিলাম। গত বৎসর আমরা প্রায় ৯০,০০০্ টাকার খদ্দর উৎপাদন ও ৭৪৬২০্ টাকার খদ্দর বিক্রয় করিয়াছি।

বর্ত্তমান বৎসরে আমরা প্রায় দুই লক্ষ টাকার খদ্দর উৎপন্ন করিতে চাই। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই বিভাগে আমাদের নিজেদের মূলধন ১১০০২।৯ পাই ছিল। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্কে শতকরা ৯্ টাকা হার সুদে ১১০৩১৶, নিখিল ভারত চরকা সমিতির ১০,০০০্ বেঙ্গল খাদি বোর্ডের ১,০০০ দেনা আছে।



নারায়ণগঞ্জ জেটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় সমবেত জনতা

আমরা আশ্রমের জমী বন্ধক দিয়া হাজারকরা বাৎসরিক ১্ টাকা সুদে নিখিল ভারত চরকা সমিতির নিকট হইতে ৩৫০০০্ টাকা কর্জ্জ লইবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এই টাকা আমাদিগকে দুই বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। যেমন করিয়াই হউক দুই বৎসরের মধ্যে এই টাকা আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা আমাদের সহৃদয় বন্ধুবর্গ ও শুভানুধ্যায়ী পৃষ্ঠপোষকগণের অবগতির জন্য ইহা নিবেদন করিলাম।

আমাদের আশ্রমের তত্ত্বাবধানে গত বৎসর প্রায় ১৮৬২৪্ মূল্যের কার্পাস ও তূলা খরিদ এবং ৬৪৫৫৮্ মূল্যের সূতা উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পরিমাণ সূতা কাটিবার জন্য প্রায় ১০,০০০ কাটুনীর দরকার যাহারা অবসর সময়ে সূতা কাটে।

সূতা হইতে খদ্দর উৎপাদন করিবার জন্য আশ্রমের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৫০ তাঁতী পরিবার, ছেলে, মেয়ে বুড়ো সকলেই, নিযুক্ত থাকে। প্রায় ৪৫ জন কর্ম্মীও এই কাজে ব্যাপৃত। ইহা ব্যতীত তুলার চাষী



নদীতীরে কবিকে দেখিবার জন্য জনতা

কামার, ছুতার, গাড়োয়ান প্রভৃতি বহু শ্রেণীর লোক এই কার্য্যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

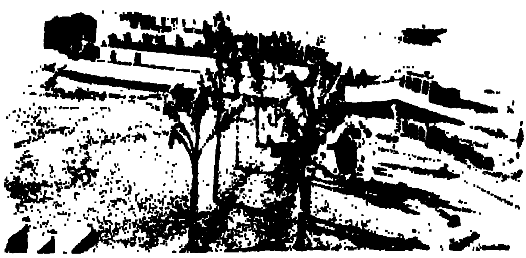
অতএব দেখা যাইতেছে খদ্দরের কাজের অধিকাংশ টাকাই দেশের গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে।

রঞ্জন

আশ্রমের উৎপন্ন খদ্দরের জিনিষ প্রায় সমস্ত আশ্রমেই রং করা ও ছাপ দেওয়া হয়। রঙের কাজ বেশ লাভজনক। নানা প্রকারের ছাপ ও ১৮।২০ রকমের রং আশ্রমেই হইতেছে। সরঞ্জাম ও উপযুক্ত ঘরের অভাবে এই বিভাগের কাজ ইচ্ছামত অগ্রসর হইতেছে না।

বয়ন

আশ্রমের অধীনে একজন বয়ন-শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তিনি আশ্রমের বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়া সাধারণ তাঁতিদিগকে নানা প্রকার রঙীন নক্সাকরা ও বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ তৈয়ার করা নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন।



ভুরণ বজরা—কবির ঢাকায় নদীবক্ষের আবাসস্থল

খদ্দর বিভাগে ৪৫ জন কর্ম্মী আছেন। ইঁহাদের ভরণ-পোষণ, বিভাগীয় খরচ এবং ব্যাঙ্কের সুদ প্রায় ৭০০৲ টাকা বাদে গত বৎসর ৮০০।৯ পাই পয়সা লাভ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে শিক্ষা-বিভাগের অধীনে নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলি আছে। (১) আশ্রম বিদ্যালয়। (২) মেথর বিদ্যালয়। (৩) আশ্রম-বালিকা-বিদ্যালয়। (৪) আশ্রম নৈশবিদ্যালয়।

আশ্রম-বিদ্যালয় বর্ত্তমানে ছাত্র-সংখ্যা ১০৮ জন। তন্মধ্যে মুসলমান তাঁতী, ধোপা, নাপিত, বৈরাগী, নমঃশূদ্র, সূত্রধর প্রভৃতি বেশী। ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা ৮।৯ জন।

মেথর-বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৫ জন। তন্মধ্যে মেথর ১৭ জন, বেশ্যার ছেলে মেয়ে ৫ জন, মুসলমান ৬ জন এবং ঋষি ১৭ জন।

নৈশ-বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ম্মপরিধি দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। বর্ত্তমানে ইহার ছাত্রী সংখ্যা ৩০জন। তন্মধ্যে ১৬ জন নমঃশূদ্র বাকী ১৪ জন মুসলমান।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১০ জন। দেশের শ্রমজীবীগণ এখনও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে নাই। তাই দিবসব্যাপী পরিশ্রমের পর তাহারা লেখাপড়া পছন্দ করে না। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য তাহাদের মধ্যে জ্ঞানার্জ্জনের প্রতি এই ঔদাসীন্য দূর করা।

গ্রন্থাগার ও পাঠভবন

শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত একটি গ্রন্থাগার ও পাঠভবন আছে। ইহার সভ্য সংখ্যা ২০০এর অধিক।

বাংলা দেশে সঙ্গীত চর্চ্চা—

বাংলা দেশে সঙ্গীত বিদ্যা যে প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা বোঝা যায় এই বিষয়ক নানা পত্রিকার প্রকাশে। পত্রিকাগুলির মধ্যে "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" নামক সচিত্র মাসিকখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ভারতীয় গীতবাদ্য বিষয়ক বহু গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ ও উৎকৃষ্ট গানের স্বরলিপি এই পত্রিকাতে প্রতি মাসে ছাপা হয়।

নারী শিল্প-প্রদর্শনী—

হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম

পরলোকগতা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর উদ্যোগে বালীগঞ্জে ৫৫নং পরিয়াহাটা রোডে বিধবা শিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অসহায়া ও নিরাশ্রয়া বিধবা হিন্দু-রমণীগণ শিক্ষা লাভ করেন। গত ৫ই ডিসেম্বর এই স্থানে নারী শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন হয়। শ্রীযুক্ত বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমরা ইহার একটি বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহা হইতে আমরা কিছু কিছু সংবাদ দিলাম।

প্রদর্শনীতে ত্রিপুরার রাজকুমারী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা নানা কদমূলে প্রস্তুত যে কারুশিল্পটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা মনোরম হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ঝিনুকের কাজ, মাছের আঁশের ফুল, সুঁচিকার্য্য, মূর্ত্তি-গঠন প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর দেখিবার জিনিষ ছিল। আশ্রমের সম্পাদিকা



পরলোকগতা হিরণ্ময়ী দেবী

শ্রীমতী কল্যাণী দেবীর নিকট প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগের যে পুরস্কার তালিকাটি পাইয়াছি, সাধারণের জ্ঞাতার্থে তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইল।—



হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম

১। কারুশিল্প।—রাজকুমারী শ্রীইন্দুপ্রভা (ত্রিপুরা)। (বিশেষ স্বর্ণপদক) এই পুরস্কারটি ময়ূরভঞ্জের রাজমাতা শ্রীমতী সুচারুদেবী প্রদত্ত।

২। সূচিকার্য্য (সৌখীন)—শ্রীস্নেহলতা দাস। (রৌপ্য-পদক)।

৩। সূচিকার্য্য (সাদা)—শ্রীপ্রফুল্ল কুমারী দাসী। (সনন্দ)।

৪। মূর্ত্তি-গঠন—শ্রীপ্রভাবতী সেন। (রৌপ্য-পদক)।

৫। চিত্রকলা—শ্রীসুনন্দা দেবী। (রৌপ্য-পদক)।

৬। চিত্রকলা (অঙ্কন)—মিস্ সুইনহো। (সনন্দ)।

৭। সূতার শিল্প—শ্রীগজেন্দ্র মোহিনী দাসী। (রৌপ্য-পদক)

৮। বয়ন-কার্য্য—শ্রীপ্রিয়বালা গোল্ডস্মিথ। (সনন্দ)।

৯। পাথরে খোদাই—শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী। (সনন্দ)।

১০। সেলাইয়ের ছবি—শ্রীনিরুপমা দেবী। (সনন্দ)।

১১। কাপড়ের ফুল—শ্রীগিরিজাবালা দেবী। (সনন্দ)।

শিল্পাশ্রমের প্রথমে নিজস্ব কোন বাস-গৃহ ছিল না। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন বসতবাটী ও ভাড়াটিয়া বাটীতে শিক্ষার্থিনীগণকে আশ্রয় দেওয়া হইত। এই সময়ে শিক্ষয়িত্রীর বেতন প্রভৃতি বাবদ প্রায় এক হাজার টাকা মাসে খরচ পড়িত। এই খরচের এক তৃতীয়াংশ বাংলা সরকার বহন করিতেন। বাকী টাকা আশ্রম নিজে সংগ্রহ করিয়া লইত। ১২৯৩ সালে "সখী সমিতি" নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠান হইয়াছিল; পরে ১৯১১ খৃঃ এই সমিতির তহবিল শিল্প আশ্রমে অর্পিত হয়, ও তখন হইতে ইহা সখী-শিল্প-সমিতি নাম ধারণ করে। এই সমিতি দ্বারাই মহিলা শিল্পাশ্রম পরিচালিত।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সমিতি বালীগঞ্জে একখণ্ড জমী ক্রয় করিয়া নিজস্ব একটি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ইহার কিছুদিন পর হইতে সমিতি সরকারী সাহায্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার কারণ এই যে, সরকারী স্কুল সমূহের তত্ত্বাবধায়িকা মহাশয়া এমন দুইটি প্রস্তাব করেন, যাহা পালন করিতে হইলে আশ্রমের প্রতি সাধারণের সহানুভূতি নষ্ট হয়। প্রস্তাব দুইটি এই যে, এখানে ভর্ত্তি হইবার সময় প্রতি ছাত্রীরই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শিক্ষা থাকা চাই, এবং শিক্ষান্তে সকলকেই সরকারী ট্রেনীং স্কুলে যাইতে হইবে। সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ায় সমিতি ব্যয় সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। প্রথম কয় বৎসর সমিতি ৩০টি নারীর ভরণ-পোষণের ভার লইতেন, কিন্তু বাধ্য হইয়া বর্ত্তমানে তাহার সংখ্যা ১৫ পর্য্যন্ত কমাইয়া আনিতে হইয়াছে।

আশ্রমটির শিক্ষা-বিভাগ দুইভাগে বিভক্ত:—

১। অন্তঃপুর কলাভবন।—এখানে বিশেষ করিয়া শিল্প-শিক্ষা ও চতুর্থমান পর্য্যন্ত সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

২। পাঠাগার।—এখানে ষষ্ঠমান পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। যাঁহারা উচ্চতর শিক্ষার উপযুক্ত, বা পাইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের কোন বালিকা বিদ্যালয়ে দৈনিক ছাত্রীরূপে পাঠান হয়।

পূর্ব্বে এখানে লেশ প্রস্তুত, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি তৈয়ারী ও নানা প্রকার কারুকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে সূচিকার্য্য, সূতা-কাটা এবং তাঁত-বোনা বাদে আর সব স্থগিত রাখা হইয়াছে। কারণ দেখা গিয়াছে সুচারুরূপে শিল্পকার্য্য শিখিয়াও কেহ মাসিক ১৫।১৬ টাকার বেশী আয় করিতে পারেন না। অথচ সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াই তাঁহারা ট্রেনিং পাশ করিয়া মাসিক ৩০ হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। আশ্রমটি বিধবাশ্রম নামে সাধারণ্যে পরিচিত। ইহার উদ্দেশ্য হিন্দু-বিধবাগণকে আশ্রয়দানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইবার উপযোগী শিক্ষা প্রদান করা। সুতরাং হিন্দু বিধবাগণের থাকিবার মতন সমস্ত বন্দোবস্তই এখানে আছে এবং নিজের ধর্ম্ম সংস্কার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিবার কোনই বাধা নাই। একজন প্রবীণা মহিলা সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া এই আশ্রম বাটীতেই বাস করেন। কয়েক বৎসর যাবত আশ্রমটির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে ও সেই অবধি আশ্রম অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া আছে। কেবল চাঁদা বা দানের উপর কোন প্রতিষ্ঠান চিরকাল টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। একটা স্থায়ী আয়ের বন্দোবস্ত করা উচিত। সমিতি সেই হেতু আশ্রম প্রাঙ্গনস্থ জমির উপর একটি বাটী নির্ম্মাণের মানস করিয়াছেন। এই বাড়ীটির আয় হইতে আশ্রমের স্থায়ী আয়ের একটি ভিত্তি হইতে পারে। কিন্তু সেজন্য অন্ততঃ ২৫,০০০ টাকার আবশ্যক। সাধারণের সহানুভূতি ব্যতিরেকে এ উদ্দেশ্য কোন মতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ৺হিরণ্ময়ী দেবীর অশেষ ও অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নের ফলস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে টিঁকিয়া থাকিতে পারে বাংলার সাধারণ সে ব্যবস্থা করিবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

নারী-শিক্ষা-সমিতি

গত মাসে নারী-শিক্ষা-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে একটি নারী-শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনী তিন দিন ধরিয়া খোলা ছিল এবং বহু সংখ্যক মহিলা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অবলা বসু ও সমিতির অন্যান্য কর্ম্মীর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রদর্শনী সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনী-কমিটি নিম্নলিখিতরূপ পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। এই পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে শেষদিনে একটি সভা হয়। তাহাতে সন্তোষের রাণীসাহেবা সভানেত্রীর কাজ করেন।

১। শ্রীমতী নির্ম্মলপ্রভা চালিহা রেশমের বস্ত্র বয়নের জন্য, ২। শ্রীমতী স্নেহলতা ভট্টাচার্য্য, সূতার বস্ত্র বয়নের জন্য, ৩। শ্রীমতী সুপ্রভা রায়, সূক্ষ্ম সূচী-শিল্পের জন্য, ৪। শ্রীমতী চারুবালা সোম, সূক্ষ্ম সূচী-শিল্পের জন্য, ৫। শ্রীমতী হিরণবালা দাস (বোলপুর), সূক্ষ্ম



শ্রীযুক্তা অবলা বসু

সূচী শিল্পের জন্য, ৬। হিন্দু মহিলা টেনিং স্কুল—সাদা সেলাইয়ের জন্য, ৭। হিন্দু মহিলা ট্রেনিং স্কুল, চাটনীর জন্য, ৮। শ্রীমতী চারুশীলা দেবী (বিদ্যাসাগর বাণীভবন) জেলির জন্য, ৯। শ্রীমতী হেমলতা সেন ''রিকেলের খাবারের জন্য, ১০। শ্রীমতী অক্ষয়কুমারী দাসগুপ্তা কাগজ দিয়া নানা ছবির জন্য ১১। শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী সেন চটের আসনের জন্য, ১২। শ্রীমতী সুরবালা দেবী কার্পেট বয়নের জন্য, ১৩। শ্রীমতী রাধারাণী রায় মাটির তৈয়ারী গ্রাম্য গৃহস্থালীর দৃশ্যের জন্য, ১৪। শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু, চরকার ১৮০ নম্বরের সুতা কাটার জন্য, ১৫। শ্রীমতী রেবা মিত্র বালিকাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্যের জন্য।

প্রদর্শনীতে ছোট ছোট বালিকাদের সুন্দর সুন্দর সূচী-শিল্পের জিনিষ প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতিরেকে আসন, চটের আসন ও নানা প্রকার সুন্দর কাঁথা সেলাই ছিল। ৬০ বৎসর পূর্ব্বেকার দুইটি কাঁথা যশোহর ও পাবনার মেয়েদের হাতের নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছে। প্রদর্শনীর সাফল্য দেখিয়া আশা করা যায় যে, বাংলা দেশের মেয়েদের হাতের নিপুণতা পূর্ব্বের মতনই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং তাঁহাদের হাতের নিপুণতা শিক্ষা দ্বারা নিপুণতর হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ভারতের গৌরব বাড়াইবে।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

ঢাকা ম্যুনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের উত্তরে*

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১।

নর্থব্রুক হল,
অপরাহ্ণ ৪৷৹ ঘটিকা।

আপনারা আমাকে যে সাদর অভিবাদন করলেন আমি তা'র যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদন করতে পারি এমন শক্তির আমার অভাব ঘটেচে। আপনারা বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি দুর্ব্বল ক্লান্ত। সে কথা সহসা আপনারা সকলে হয়ত গ্রাহ্য না করতে পারেন। সেজন্য আমিই দায়ী,কারণ, আজ আমার এখানে উপস্থিতিই শারীরিক অপটুতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্চে। যখন আপনাদের নিমন্ত্রণ আমার কাছে পৌঁছল, দুর্ব্বল শরীর বল্‌লে, এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারব না। কিন্তু মনেরও যে দুর্ব্বলতা আছে। তাই আপনাদের ডাক এড়াবার সাধ্য রইল না। দেহ যখন বলে, না, মন তখন বলে, হাঁ। শেষে মনেরই জিৎ হ'ল। ডাক্তারের উপদেশ লঙ্ঘন ক'রেই এসেছি, এখন আর অসুস্থ শরীরের দোহাই দিয়ে কি হবে? অতএব, আমাকে কিছু বল্‌তেই হবে, কেবল আমার আবেদন এইটুকু যে আমার কাছে বেশি বলা দাবী করবেন না।

ঢাকা সহরে বহুপূর্ব্বে একবার এসেছিলাম, কিন্তু সে না-আসারই মধ্যে। এই আজ প্রথম এসেছি বল্‌লেই হয়, এই সুযোগে আপনাদের কাছে আমার পরিচয় স্পষ্ট করতে হবে। কেমন ক'রে করি? সময় কোথায়? অথচ না করতে পারলে আনন্দ কিসের? কতকগুলি প্রথাগত অনুষ্ঠানের ভিড়ের মধ্যে মুখের কথা কিছু ব'লে গেলে মনের ভিতরকার অতৃপ্তি থেকে যায়। তাই ভয় ছিল যে, হয়ত স্বল্প সময়ে ও শ্রান্ত শরীরে তা ঘটে উঠবে না; হয়ত বা আপনাদের মধ্যে আমার আসন বাইরের আসন হ'য়ে থাকবে। কিন্তু আজ আপনাদের অভিনন্দন শুনে বুঝ্‌লাম যে আমাকে আপনাদের স্মরণ আছে। শুনে আপনারা হাস্‌তে পারেন, মনে করতে পারেন বিনয় করচি। কিন্তু তা নয়। আমার বিশেষ একটা পরিচয় স্মরণ না রেখে আপনাদের উপায় নেই। বই বিস্তর লিখেছি, ছাপার কালীতে তা'র প্রমাণ র'য়ে গেল। আমি সাহিত্য লিখে থাকি একথা গোপন নেই কিন্তু সে ছাড়াও আরো কিছু পরিচয় বাকি ছিল। কাজের ক্ষেত্রেও নিজের বুদ্ধিবিচার ও শক্তি অনুসারে দেশের সেবা কিছু করেছি। ভেবেছিলাম এই কথাটাই বুঝি আপনারা ভুলেছেন। ভোল্‌বার কারণ আছে। যে উদ্দীপনার মশাল-আলোকে কর্ম্ম-আন্দোলনের সকল ভঙ্গীই সাধারণের মনের মধ্যে চিহ্নিত ক'রে দেয় একদিন বাঙ্‌লায় সেই উদ্দীপনার বহ্নিদীপ্ত কাল এসেছিল। যাঁরা অল্পবয়স্ক, এখনকার কালের ধারার সঙ্গে যাঁদের জীবন দোলায়মান হ'য়ে চলেছে, তাঁরা আমার সেদিনকার বৃত্তান্ত হয়ত কিছু জান্‌তেও পারেন। কিন্তু সে তাঁদের স্পষ্ট ক'রে মনে রাখ্‌বার কথা নয়। তা'র পর অনেক দিনের অনেক কার্য্যকোলাহল অনেক কথাই চাপা দিয়েছে। তৎসত্ত্বেও আজ এই অভিনন্দন থেকে দেখ্‌লাম একটি কথা আপনাদের মনে আছে। সেটি এই। সে আজ হয়ত ত্রিশ বৎসর হ'ল, সেদিন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বারবার বলেছিলাম, যে, নিজের শক্তিতে নিজের অভাব দূর করবার ভার যদি আমরা না নিলাম তা হ'লে দেশকে পাওয়াই হ'ল না। এই কারণে সেদিন যখন জলের জন্য, অন্নের জন্য, জ্ঞান বিস্তারের জন্য, অস্বাস্থ্য নিবারণের জন্য, আমাদের লোকেরা রাজদ্বারে সম্মিলিতকণ্ঠে ভিক্ষা করবার উদ্দেশে সভায়-সভায় সংবাদপত্রে-পত্রে কখনো বা মিনতি, কখনো বা অভিমান, কখনো বা ক্রোধের তাড়নায় রাজভাষা আলোড়িত ক'রে তুল্‌ছিলেন, আমার তখনকার কালের রচনা যদি প'ড়ে দেখেন তবে দেখ্‌বেন আমি সেই আবেদনের পুনঃপুনঃ পুনরাবর্ত্তনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

---

* বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা নগরীতে কবিবর যে বক্তৃতা দেন, তিনি স্বয়ং তাহা লিখিয়া দিয়াছেন। দৈনিক কাগজে তাঁহার বক্তৃতার যেসব প্রতিলিপি বাহির হইয়াছিল তাহার অনেক স্থলের সহিত ইহার অমিল দৃষ্ট হইবে। — প্রবাসীর সম্পাদক

প্রকাশ করেছি। তা'র কারণ কেবল এই অত্যন্ত বাহুল্য কথা নয় যে, দেশের হিতসাধনের চেষ্টায় দেশের অভাব ও দুঃখ দূর হ'তে পারে, তা'র আর-একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের রাজ-শক্তির সঙ্গে যদি ব্যবহার করতে হয় তবে সেটা ভিক্ষুকের মতো করলে চলে না। আত্মশক্তিদ্বারা দেশকে যে-পরিমাণে আয়ত্ত করতে পারব সেই-পরিমাণেই রাজশক্তির সঙ্গে সমকক্ষভাবে আমাদের ব্যবহার চলতে পারবে। একপক্ষে কেবল প্রার্থনা অন্যপক্ষে কেবল দাক্ষিণ্য, এর মাঝখানে যে ফাঁক সেটা অসীম। সে আমাদের আত্মাবমাননার প্রকাণ্ড গহ্বর। তখনকার কালের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি দুই অসমানের মিলনের সেতু নির্ম্মাণ করতে লেগেছিল। আমি তখন বলেছিলাম, অসাম্যের মিলন অসম্মানের মিলন। তখনকার দেশহিতৈষীরা এই ব্যাপারে আমাকে কর্ম্মনাশা ব'লে মনে-মনে বিরক্ত হয়েছিলেন। সংশয় ছিল, একথা হয়ত আপনারা ভুলে গিয়ে থাকবেন। ভোলেননি জেনে আমি ধন্য হয়েছি।

আমার পরিচয় বর্ণনা ক'রে আপনারা আরো-একটি কথার আভাস দিয়েছেন, সেও আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। আমি বলেছিলাম ভিক্ষা নেবো না, নিজের শক্তিকে উদ্বোধিত করার দ্বারাই নিজের দেশকে অধিকার করব, এরই সঙ্গে আরো-একটি কথা আপনিই এসে পড়ে, সে হচ্ছে এই যে শুধু যে নেবো না তা নয়, দেবো। যে দিকে নিজের দারিদ্র্য আছে, অজ্ঞান আছে, অস্বাস্থ্য আছে, সেদিকে অভাবপূরণের জন্য নিজের শক্তি সচেষ্ট হ'য়ে থাকবে, কিন্তু যেদিকে আমাদের পূর্ণতা সেদিকে দেবার দায়িত্বই আমাদের। আমরা যে বর্ব্বর নই তা'র প্রমাণ দিতে হ'লেই ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে হবে। সে পরিচয় ত দানের দ্বারা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মানুষকে এমন-কিছু দিয়ে গেছেন যা চিরকালের দান; অহঙ্কার করবার বেলায় সে-কথা আমরা বলি, ব্যবহার করবার বেলায় সে-কথা আমরা ভুলি, তা'তেই ত আমাদের পিতামহদের গৌরবকে ম্লান ক'রে দিয়ে থাকি। তাঁরা বলেছিলেন আয়ন্ত সর্ব্বতঃ স্বাহা—সব জায়গা থেকে সবাই আমাদের কাছে আসুক। এতবড় নিমন্ত্রণ কোনো দরিদ্র করতে পারে না। তাঁদের সেই নিমন্ত্রণ ত কেবল তাঁদের কালের নয়, সে চিরকালের,—তা'কেই কি আজ আমরা ব্যর্থ করতে বসব? আজ কি দ্বার বন্ধ ক'রে এই কথাই বলতে হবে যে, আমাদের যা আছে তা'তে আমাদের নিজেরই চলে না, বলতে হবে পিতামহদের আমন্ত্রণ কালের সীমা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আজ আমাদের নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি! যদি আমার দেশের অধিকাংশ লোকেই এমন কথা বলে, তবুও আমার দেশের হ'য়েই সেই অধিকাংশ লোকেরই প্রতিবাদ করব, ভারতবর্ষের পূর্ণ ভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়িয়ে বলব, আয়ন্ত সর্ব্বতঃ স্বাহা।

আজ পৃথিবীব্যাপী দুঃখের দিনে মানুষ বলচে, শান্তি চাই। একদিন ভারতবর্ষ আত্মার মধ্যে শান্তির মন্ত্র শুনেছিল। একদা দেশে-বিদেশে সমুদ্রপর্ব্বত লঙ্ঘন ক'রে ভারতবর্ষ শান্তিমন্ত্র প্রচার করেছিল। ভারতবর্ষ সেদিন দূরদেশে পণ্য বিক্রয় করতে যায়নি, দেশজয় করতে যায়নি, অন্তরে যে সম্পদ্ সে আবিষ্কার করেছিল সেই সম্পদ্ দান করবার পরম অধিকার প্রকাশ করতে সে গিয়েছিল। তা'র সেই সম্পদ্ কখনো কি নিঃশেষ হ'য়ে যেতে পারে? বিশ্বযজ্ঞের আয়োজন ভারতবর্ষে আজ কিছুই কি বাকি নেই? অথচ মানুষের সংসারে দূরত্বের ব্যবধান প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছে,—আমরা ইচ্ছা করি আর না করি বিশ্বপৃথিবী আমাদের দ্বারে এসে উপস্থিত; আজকের দিনে তা'রাই ধন্য সকল মানুষকে আতিথ্যে ডাকবার মতো সাহস ও সম্বল যাদের আছে! তাদের নেই যারা বিষয়ী, যারা স্বার্থকেই একান্ত ক'রে জানে, জাতীয় অহমিকায় যারা উন্মত্ত। কিন্তু এমন কথা যারা বলেছেন, আপনাকে সকলের মধ্যে না জানলে সত্যকে জানা হয় না তাঁদের আতিথ্যের অন্ত নেই, তাঁদের অতিথিশালার দ্বার কখনই রুদ্ধ হ'তে পারে না। তাই আমি অতিথিবৎসল ভারতবর্ষের নামে তাঁর হ'য়ে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠার ভার নিয়েছি। এই জন্যে আমি আপনাদের সকলের কাছেই দাবী করতে এসেছি। সকলের অন্নে সকলের সম্মিলিত আয়োজনে তবেই ত এই অতিথিশালা ভারতের হ'তে পারে? এ গৌরব যদি আমার একলার হয়, তবে তা'তে

দেশের গৌরবের হানি। আমি কি এই কথা বল্‌বার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবো যে একদিন বাংলাদেশের লোকের মনে এই আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল যে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে তা'র মাতৃভূমি একঘরে হ'য়ে থাকবে না?

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বারম্বার বলেছিলাম, বধিরের কাছে, অসাড়ের কাছে, উদাসীনের কাছে যে, নিজের ঘরে ফিরতে হবে সেবার দ্বারা কর্ম্মের দ্বারা। ক্ষমতার অভাবে কৃতকার্য্য না হ'তে পেরে থাকি, কিন্তু আমার সাধনার ত্রুটি হয়নি,—আমার কণ্ঠ ক্ষীণ ব'লে আমার বাণী যদি সকলের হৃদয়ে পৌঁছে না থাকে তবে আমার সঙ্কল্পকে দোষ দেবেন না, দোষ দেবেন আমার অপটুতাকে। কিন্তু একদিন আমি যে বলেছিলাম সে-কথা আপনারা স্মরণ করেছেন তা'তেই আমি ধন্য। আজ আমি অন্য কথা বলতে বসেছি,—প্রান্তরের প্রান্তে, নিভৃত আশ্রমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, মুখের কথায় নয়, কর্ম্মের ভিতর দিয়ে। কিন্তু সে আমার নিজের কথা নয়, তা'র মধ্যে আমাদের ঋষিদের কথার প্রতিধ্বনি। সেই জন্যে কেউ-কেউ কখনো-কখনো যখন আমাকে ঋষি উপাধি দেন তখন আমার সঙ্কোচের সীমা থাকে না। আমি ঋষিদের বাণী চয়ন করেছি কিন্তু আমি ত মন্ত্রদ্রষ্টা নই। যে উচ্চপদে যার অধিকার নেই তা'কে সেই পদগৌরব দেওয়ার মতো অন্যায় আর হ'তে পারে না। আমি যাঁদের অন্তরের সঙ্গে সম্মান করি তাঁদের সম্মানের অংশ নিজে হরণ করাকে অধর্ম্ম ব'লেই জানি। কবি ব'লে আমাকে যে সম্মান করেন তা গ্রহণ করতে আমি কুণ্ঠিত হইনে। ভাষার সেবা করেছি, কর্ত্তব্যবোধে দেশের লোকের রুচিবিরুদ্ধ কথাও বলেছি, ভারতের শ্রেষ্ঠদান দেশে বিদেশে বহন করেছি। এই পথিকবৃত্তিতে দেহ ক্লান্ত ও দুর্ব্বল, তবু আমার পক্ষে যে ভার অসাধ্য তাও নিতে বিমুখ হইনি। আমার সেই প্রয়াসের পুরস্কারস্বরূপ আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবার দাবী করি, আর কিছুই না। আপনাদের অভিবাদন নীরবে গ্রহণ করা অসৌজন্য ব'লেই এত কথা বললাম। এখন নমস্কার জানাই, যদি দয়া ক'রে আমাকে মনে রাখেন তবে আমার যেটুকু সত্য পরিচয় তাই মনে রাখবেন। অত্যুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই। আমি যতটুকু কাজ যথার্থভাবে করেছি সেটুকুর জন্যে যদি আপনাদের হৃদয় পাই তবে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব।

২। ঢাকা করোনেশন পার্ক,
অপরাহ্ণ ৫।০ ঘটিকা।

বহুকাল পূর্ব্বে আর একবার এই ঢাকা নগরীতে এসেছিলাম সেদিনকার রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন-উপলক্ষ্যে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ব্যাপারে নিপুণভাবে যোগ দিতে পারি এমন অভ্যাস ও শক্তি আমার ছিল না,—এই অনুষ্ঠানে আমার দ্বারাও যে কাজটুকু হ'তে পারে আমি কেবলমাত্র তা'র ভার নিয়ে এসেছিলাম। তখনকার রাষ্ট্রীয় সভাগুলিতে ইংরেজি ভাষাতেই বক্তৃতা হ'ত। যাঁরা বাংলাভাষার চর্চ্চায় বিরত ছিলেন, যাঁরা এ-ভাষা সংভাষণে ব্যবহার করতে জানতেন না, তাঁদেরই অনেকে রাষ্ট্রিক আন্দোলন-কার্য্যে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তা'র ফল হয়েছিল এই যে, জন-সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রিক শিক্ষা-বিস্তারের যে একটিমাত্র উদ্যোগ তখন ছিল, ইংরেজি ভাষার চাপে তা'র উদ্দেশ্যটি মারা গিয়েছিল। দেশের হিত কিসে হয়, তা'র বাধা কি, সে বাধা দূর হ'তে পারে কোন্ উপায়ে, দেশের লোককে সেই কথাটি ভালো ক'রে ভাবিয়ে তোলাই দেশহিতের প্রথম ও প্রধান কাজ, কিন্তু এই ভাবনার চর্চ্চা বদ্ধ ছিল ইংরেজি-জানা অল্পকয়েকজনের মধ্যেই। এই সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে দেশসেবার যে সাধনা বিদেশী ভাষার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হ'য়ে ছিল তা'কে তা'র আপন ভাষার মধ্যে মুক্তি দেবার জন্যেই এখানে এসেছিলাম। আমার বিশ্বাস আমার সেদিনকার সে চেষ্টা সফল হয়েছিল; তা'র পর থেকে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীতে ইংরেজি ভাষার প্রভুত্ব দূর হ'য়ে গেছে। মাতৃভাষার প্রতি দেশসেবকদের উপেক্ষা ঘুচিয়ে দেবার জন্য ঢাকায় তিনদিনকাল যে চেষ্টা করেছিলাম সে-স্মৃতি আমার মনে আছে। তখনো আমি রোগে পীড়িত ছিলাম, তাই সেদিন এখানকার পৌরসাধারণের সঙ্গে আমার মিলন হবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু আমার যেটা কাজের ক্ষেত্র সে ত চাক্ষুষ মিলনের ক্ষেত্র নয়। আমার সাধন-

উপলক্ষে আমি দূরে নিভৃতে থেকেও ভাষার ধারা বেয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারি। সেই ভাষার যোগে মিলনই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে খাঁটি। সেদিন সেই ভাষার নাম নিয়ে তা'রই জয়পতাকা বহন ক'রে এখানে অল্পকাল প্রচ্ছন্নপ্রায় থেকেই চ'লে গিয়েছিলাম। আজ আমার সৌভাগ্য এই যে কেবলমাত্র বাক্যরচনার যোগে আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে আমার অদৃশ্য আসন পাতা হয়নি, আজ প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে পারব। বিশেষ-কিছু কাজ ক'রে যেতে পারব এমন শক্তি নেই, আশা নেই। কেবল, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের দিকে দিকে চৈতন্যকে পরিব্যাপ্ত করব, আপনাদের সঙ্গে প্রীতিসম্মিলন-উপলক্ষে বঙ্গদেশের বিচিত্রপীঠস্থানে অধিষ্ঠিতা বঙ্গলক্ষ্মীর কাছে প্রীতি-অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিয়ে যাবো, এইবার এইটুকুমাত্র আমার আশা। আজ জীবনপথযাত্রার শেষ প্রান্তে পৌঁচেছি। মাতৃভূমির সকল তীর্থ হ'তেই বঙ্গজননীর শেষ চরণধূলি নিয়ে যাবো সেই প্রত্যাশায় এখানে আমার আসা। আপনারা আমার প্রতি অনুকূল হোন্। সমস্ত জীবনে দেশের কাছে আমার যা উৎসর্গ করেছি, সেই নৈবেদ্য থেকে নির্ম্মাল্য নিয়ে প্রসন্নমনে যদি বলতে পারেন, "এ রইল, এ রাখ্‌লুম, আমাদের ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, আমাদের কর্ম্মসঙ্কল্পের মধ্যে"—তা হ'লেই আমার চরিতার্থতা। মনে রাখ্‌বেন, আপনাদের কবি একদিন এই সুন্দর সূর্য্যাস্তকালে এই সুন্দর নদীতীরে আপনাদের সকলের মধ্যে হৃদয় প্রসারিত করেছিল। এই মনোহর সন্ধ্যার আলোকে আলিঙ্গিত কবির চিত্রকেই স্মৃতিপটে রেখে দেবেন। কেননা, এই মর্ত্ত্য কবিরও অস্তের দিন কাছে এসেছে, পশ্চিম সূর্য্য ঐ যে তা'র জ্যোতীরশ্মির অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাকে অস্তাচলের পথ নির্দ্দেশ করচে। তাই আজ ঐ সন্ধ্যাসূর্য্যের শেষ বাণীর দ্বারাই আমার বিদায় অভিবাদনকে পূর্ণ ক'রে আপনাদের কাছে রেখে দিয়ে গেলাম।

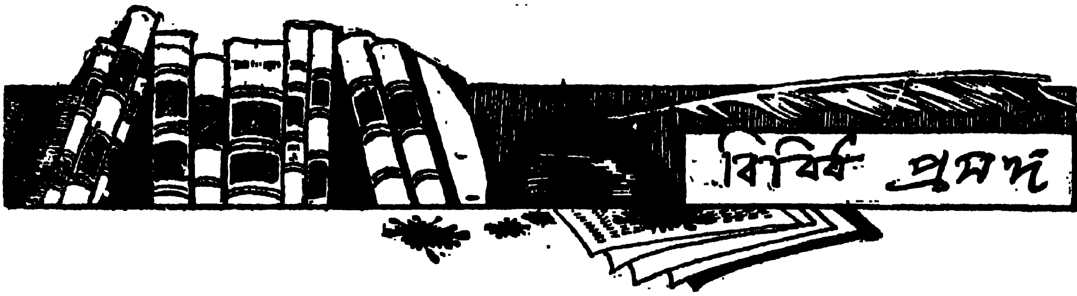
ভ্রম-সংশোধন—৭৪৯ পৃষ্ঠা ২য় কলমের ২২শের লাইনে 'আত্রসবাসিক' স্থলে 'আশ্রমবাসিক' পড়িতে হইবে।

৭৫২ পৃষ্ঠা ১ম কলমে নীচে হইতে ২য় লাইনে 'স্বামরশ্মি' স্থলে 'স্যমরশ্মি' পড়িতে হইবে।

৮২৯ পৃষ্ঠা ১ম কলমে ২৪শের লাইনে '৫০০০-৪০০০ খ্রীষ্টাব্দের' স্থলে '৫০০০-৪০০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের পড়িতে হইবে।

৮৩৭ পৃষ্ঠা 'রাষ্ট্রজগতে বর্ত্তমান ভাবের ধারা' প্রবন্ধের লেখক—শ্রীরামাপ্রসন্ন সেন গুপ্তের নাম ভ্রমক্রমে ছাপা হয় নাই।

৮৪৯ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ১ম লাইনে 'ধরিয়াছিল' স্থলে 'ধরিয়া ছিল' পড়িতে হইবে।



প্রবাসীর বয়স

ঈশ্বরের কৃপায় প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। যাঁহারা এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া কিংবা উহার কোন-না-কোন সময়ে কোন-না-কোন প্রকারে আমার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহারা সাহায্য না করিলে আমার একার চেষ্টায় ইহা কখনই টিকিয়া থাকিতে পারিত না।

যাঁহাদের আদর্শ অতি উচ্চ তাঁহাদের কথা দূরে থাক্, প্রবাসী আমার নিজের আদর্শের অনুরূপও এখনও হয় নাই। কিন্তু ইহার উন্নতি সাধন করিবার ইচ্ছা ও আশা আমি এখনও পোষণ করিতেছি।

আমি জানি, কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া কখন কখন আমার ভ্রম ও ত্রুটি হইয়াছে। তাহার জন্য আমি দুঃখিত।

ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্টের আয় ব্যয়

১৯২৫ ২৬ সালে ভারত গবর্ন্মেণ্টের যত আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, ১৯২৬-২৭ সালের আয় তাহা অপেক্ষা দুই কোটি টাকারও উপর বেশী হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ভারত-গবর্ন্মেণ্টের আয় কিরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, তাহা ১৯১৫-১৬ এবং ১৯২৪-২৫ সালের আয় হইতে বুঝা যাইবে। ১৯১৫-১৬ সালের আয় ছিল ৮০,০০,৯৬,০০০ টাকা, ১৯২৪-২৫ সালে আয় হইয়াছিল ১৩৮,০৩,৯২,০০০ টাকা। এই যে নয় বৎসরে গবর্ন্মেণ্টের আয় ৫৮ কোটি টাকা বাড়িয়াছে, ইহার মানে এ নয়, যে, দেশের সমৃদ্ধিও এই ভাবে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিতেছে; ইহার মানে প্রধানতঃ এই, যে, গবর্ন্মেণ্ট্ ক্রমাগত অধিক হইতে অধিকতর টাকা ট্যাক্স্ রূপে দেশের লোকদের নিকট হইতে লইতেছেন। সুতরাং ১৯২৫-২৬ অপেক্ষা ১৯২৬-২৭ সালের আনুমানিক আয় বেশী হইবে বলায় ইহা বুঝাইতেছে না, যে, দেশের ধন বাড়িয়া চলিতেছে।

রাজস্বসচিব অনুমান করিতেছেন, যে, আগামী বৎসর আয় হইবে ১৩৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হইবে ১৩০ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা; উদ্বৃত্ত থাকিবে তিন কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা। ইহাও সমৃদ্ধির লক্ষণ নহে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ট্যাক্স্ আদায় করিয়া উদ্বৃত্ত প্রদর্শনে বাহাদুরী নাই। দেশের লোককে সুস্থ সবল জ্ঞানবান্ এবং ধনশালী করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে তবে তাহাকে বলি রাজনৈতিক কৃতার্থতা।

১৯২৬-২৭এর সামরিক ব্যয়

১৯২৬-২৭ সালে সামরিক ব্যয় হইবে ৫৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। রাজস্বসচিব বলিয়াছেন, যে, ইহা ১৯২৫-২৬ সালের বরাদ্দ সামরিক ব্যয় অপেক্ষা এক কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা কম। তাহা হইলেও ইহা অত্যন্ত বেশী। ব্রসেল্‌স্ নগরে নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে কোন গবর্ন্মেণ্টের সামরিক ব্যয় উহার মোট আয়ের পঞ্চমাংশের অধিক হওয়া উচিত নহে। কিন্তু ভারত-গবর্ন্মেণ্টের সামরিক ব্যয় উহার মোট আয়ের পঞ্চমাংশের অনেক বেশী। যদি এদেশের প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট্‌গুলির আয় ভারত-সরকারের আয়ের সহিত যোগ করা যায়, তাহা হইলেও ৫৪ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা সামরিক ব্যয় মোট সরকারী আয়ের পঞ্চমাংশ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য যে ইঞ্চ্‌কেপ্ কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার মতে ভারতের সামরিক ব্যয় পঞ্চাশ কোটি টাকা মাত্র হওয়া উচিত। সেই মাপকাঠি অনুসারেও ১৯২৬-২৭ সালের সামরিক ব্যয় অনেক বেশী।

বিলাতের ১৯২৬-২৭ সালের বজেটে যে সামরিক ব্যয় ধরা হইবে, তাহা ১৯২৫-২৬ সালের বরাদ্দ অপেক্ষা তিন কোটি টাকা কম হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের নিকটেই ইউরোপের অনেক শক্তিশালী যুদ্ধক্ষম জাতি আছে, এবং তাহাদের কেহই ইংলণ্ডের চিরবন্ধু নহে। তাহা সত্ত্বেও যদি সে-দেশে সামরিক ব্যয় তিন কোটি টাকা কমান যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের যুদ্ধবিভাগের বরাদ্দ নিশ্চয়ই এক কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী কমান যাইতে পারে; কারণ ইংলণ্ডের যত নিকটে যুদ্ধক্ষম শক্তিশালী যত জাতি আছে, ভারতবর্ষের তত নিকটে যুদ্ধক্ষম শক্তিশালী জাতি ততগুলি নাই।

ভারতের যুদ্ধব্যয় এত বেশী থাকিতে দেশের উন্নতির জন্য নানা দিকে যথেষ্ট ব্যয় কখনই হইতে পারিবে না।

—

উদ্‌বৃত্ত টাকার সদ্ব্যবহার

১৯২৬-২৭ সালের বজেটে যে উদ্‌বৃত্ত দেখান হইয়াছে তাহা হইতে দুটি কাজ করা হইবে। প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় মিলের সূতা ও কাপড়ের উপরে যে শুল্ক ছিল, তাহা স্থায়ী ভাবে উঠাইয়া দেওয়া হইবে; দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক গবর্ণ্মেণ্ট্‌সমূহ ভারত-গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে বৎসর বৎসর যত টাকা দিতে বাধ্য, তাহা হইতে মান্দ্রাজকে ৫৭ লক্ষ, আগ্রা অযোধ্যাকে ৩৩ লক্ষ, পঞ্জাবকে ২৮ লাখ এবং ব্রহ্মদেশকে ৭লাখ মোকুব করা হইল।

কার্পাসজাত পণ্যের উপর কোন কালেই শুল্ক বসান উচিত হয় নাই। যাহাতে ভারতের মিলসকলের প্রতিযোগিতায় বিলাতের মিলসমূহের ক্ষতি না হয়, সেইজন্যই উহা বসান হইয়াছিল। এক্ষণে জাপানী মিলের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ও বিলাতী (বিশেষতঃ বিলাতী) মিলের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া সম্ভবতঃ জাপানী মিলসকলের বিরুদ্ধে ভারত ও বিলাতের একজোট হইয়া কিছু করিবার সুবিধার নিমিত্ত ভারতীয় মিলসকলকে শুল্ক হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে। যে-উদ্দেশ্যেই উহা দেওয়া হউক, কাজটা মন্দ হয় নাই।

কিন্তু ইহার অন্য একটা দিক্‌ও আছে। ভারতীয় কার্পাস-শিল্পজাত দ্রব্য দুই প্রকার; (১) মিলের সূতা ও কাপড়, (২) চর্‌কার সূতা ও হাতের তাঁতের কাপড়। এই উভয়কে রক্ষা করা যায়, এমন উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য ছিল। যদি বিলাতী, জাপানী এবং অন্য সব বিদেশী সূতা ও কাপড়ের উপর উচ্চ হারে কর বসান যায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ভারতীয় উভয় প্রকার কার্পাস-শিল্পের সংরক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু এখন যাহা করা হইল, তাহার দ্বারা ভারতীয় মিলগুলির কিছু সুবিধা হইলেও, চর্‌কার সূতা ও হাতের তাঁতের কাপড়ের সুবিধা ত হইলই না, বরং অসুবিধাই হইল। কারণ, এখন ভারতীয় মিলের সূতা ও কাপড় আগেকার চেয়েও সস্তা দামে বিক্রী হওয়ায় চর্‌কার সূতা ও হাতের তাঁতের কাপড়কে অধিকতর প্রবল প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে হইবে। তাহাতে টিকিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইবে। অন্য দিকে শুধু শুল্ক উঠাইয়া দিয়াই ভারতীয় মিলগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হইবে না। তাহাদিগকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে হইলে বিদেশী সূতা ও কাপড়ের উপর উচ্চ হারে কর বসাইতে হইবে, দেশী মিলগুলির পরিচালনায় মিতব্যয়িতা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, এবং তৎসমুদয়ে আধুনিকতম কল ও উৎপাদন- ও বিক্রয়-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

—

প্রত্নতাত্ত্বিক ফণ্ড

ভারত-সরকারের আয় হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র করিয়া মূল ধন রূপে রাখা হইবে, এবং তাহার সুদ আনুমানিক আড়াই লক্ষ টাকা প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের কাজের জন্য প্রতি বৎসর ব্যয়িত হইবে। ইহা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অপব্যবহার নহে। কিন্তু যে-গবর্ণ্মেণ্টের বার্ষিক আয় একশত ত্রিশ কোটিরও উপর, তাহার পক্ষে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া কোন বৎসরই কঠিন নহে। সুতরাং তাহার জন্য আলাদা একটা থোক্ টাকা মূলধন-রূপে গচ্ছিত রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

রাজস্ব-সচিব অবশ্য বলিয়াছেন বটে, যে, এই ফণ্ডটা

স্থাপিত করিয়া তাহার ট্রষ্টী নিযুক্ত করিলে ভারতীয় রাজামহারাজা ও অন্য ধনী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজের জন্য মূলধন পাওয়া যাইবে। তখন বৃহত্তর ফণ্ডের সুদে প্রত্নতাত্ত্বিক কাজ আরও অনেক বেশী করা চলিবে। কিন্তু বড় লাট প্রভৃতি যাহার মুরুব্বি, সেরূপ কোন কাজের জন্য টাকার অভাব হয় না। সুতরাং রাজস্ব হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আলাদা করিয়া না রাখিলেও, প্রত্নতাত্ত্বিক ফণ্ড্ একটা খুলিলে এবং রাজা মহারাজাদিগকে টাকা দিতে বড়লাট বলিলে টাকা পাওয়া যাইত।

রাজস্ব-সচিব এবিষয়ে তাঁহার বজেট বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটা আশঙ্কার কথাও আছে। তিনি বলিয়াছেন, যে, প্রত্নতাত্ত্বিক ফণ্ড্ একবার খোলা হইয়া গেলে ভারতীয় রাজা মহারাজা, প্রত্নতত্ত্বামোদী অন্যান্য লোক এবং শীতকালে বিদেশী ভারত-পর্য্যটকদিগের নিকট হইতে ইহাতে টাকা আকৃষ্ট হইবে। * ইতিমধ্যেই একটা প্রস্তাব হইয়াছে, যে, যেহেতু ভারতবর্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্যের জন্য যথেষ্ট টাকা ও বিশেষজ্ঞ লোক পাওয়া যায় না, অতএব বিদেশী উপযুক্ত লোকদিগকে এই সর্ত্তে এই কাজে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হউক, যে, তাঁহারা খনন করিয়া যে-সকল ঐতিহাসিক জিনিষ পাইবেন, তাহার একটা অংশ তাঁহারা নিজেদের দেশে লইয়া যাইতে পারিবেন। ঐতিহাসিক কোন সামান্য প্রমাণও যাহা হইতে পাওয়া যায়, এরূপ কোন জিনিষ বিদেশে চালান হওয়ার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজস্ব-সচিবের প্রস্তাব-অনুসারে যদি বিদেশী লোকেরা প্রত্নতাত্ত্বিক ফণ্ডে টাকা দেয়, তাহা হইলে প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিষের উপর ভাগ বসাইবার তাহাদের একটা দাবী জন্মিতে পারে। রাজস্ব-সচিব সেইরূপ দাবীর একটা ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন কি না, বলিতে পারি না।

এবিষয়ে আরও কিছু বলিবার আছে। তাহা পরে বলিতেছি।

* "Once the fund came into existence, it might, it is hoped, attract donations from Indian Princes and from others interested in archaeology and from winter visitors to India......"

বজেটে গরীব লোকের প্রতি অমনোযোগ

ভারতীয় বজেটে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু গরীব লোকদের যাহাতে বিশেষ ভাবে সুবিধা হয়, এরূপ কোন ট্যাক্স্ রহিত করা বা কমান হয় নাই। লবণের উপর ট্যাক্স্ রহিত করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা করা হয় নাই। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

—

ডাকমাশুল না-কমান

মহাযুদ্ধের সময় বিলাতেও ডাকমাশুল বাড়িয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পর তাহা কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ডাকমাশুল কমিতেছে না।

রাজস্ব-সচিব উহা না-কমাইবার নানা কারণ দেখাইয়াছেন। একটা কারণ এই দেখাইয়াছেন, যে, ১৯১৩ সালে দ্রব্যাদির মূল্য যদি ১০০ ছিল ধরা হয়, তাহা হইলে ১৯২৫ এর ডিসেম্বরের শেষে তাহা বাড়িয়া ভারতবর্ষে ১৬৩, আমেরিকায় ১৫৮ ও বিলাতে ১৫৩ হইয়াছিল। ১৫৩ ও ১৬৩তে বেশী প্রভেদ নাই। বিলাতে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও যদি ডাকমাশুল কমিতে পারে, তাহা হইলে ভারতবর্ষে কেন কমিতে পারিবে না? তা ছাড়া, মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ত রেলভাড়া কমান চলিতেছে, টেলিফোনের ভাড়া কমান চলিতেছে, ট্রামগাড়ির ভাড়া কমান চলিতেছে, এবং মোটরগাড়ির উপর ও পেট্রলের উপর পণ্যশুল্ক কমাইবার প্রস্তাব হইতেছে।

রাজস্বসচিবের আর-একটা যুক্তি এই যে, ডাকমাশুল কমাইলে ভারতীয় করদাতাদিগকে প্রতি বৎসরই তাহাদের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে ডাকবিভাগের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ক্রমবর্দ্ধমান বেশী বেশী টাকা দিতে হইবে। যদি দিতে হয়, তাহা হইলেও, যাহারা টাকা দিবে, সুবিধা ত তাহারাই ভোগ করিবে। কেন না, ভারতবর্ষের লিখনপঠনক্ষম লোকেরা ত পোষ্টকার্ড্ ও চিঠি লিখেই, নিরক্ষর লোকেরাও অন্যের দ্বারা পোষ্টকার্ড্ ও চিঠি লেখায়। অধিকন্তু লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে।

ডাকবিভাগকে ঠিক্ একটা ব্যবসার জিনিষ বলিয়া মনে করা ভুল। যে-ব্যবসাতে লাভ হয় না, তাহা তুলিয়া দেওয়াই উচিত। কিন্তু ডাকবিভাগ ব্যবসা নহে; ইহার অন্য দিক্ আছে।

এখনও অনেক রেলওয়ে লাইন আছে, যাহাতে লাভ হয় না, লোকসান হয়। প্রথম প্রথম সব লাইনেরই অবস্থা এইরূপ ছিল। কোন-কোন এরূপ লাইন আছে যাহা সামরিক কারণে, অর্থাৎ অন্তর্বিপ্লব নিবারণের জন্য, বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য, ভারতসরকার রাখা দর্কার মনে করেন। সেগুলির সম্বন্ধে ক্ষতিলাভ গণনা করেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, যাহা প্রধানতঃ ব্যবসা হিসাবে চালাইতে হয়, তাহাও কোন-কোন স্থলে লোকসান দিয়া রক্ষা করা উচিত বিবেচিত হয়। ডাকবিভাগ দ্বারা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার পরোক্ষভাবে সাধিত হয়। বস্তুতঃ ডাকবিভাগ ভিন্ন দেশব্যাপী ব্যবসাবাণিজ্য আধুনিক সময়ের উপযোগী সুচারুভাবে চলিতে পারে না। ডাকবিভাগ জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারেরও উপায়। অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এবং কোন-কোন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্য্যন্ত অবৈতনিক। আমাদের দেশে তাহা নহে। অধিকন্তু ডাকবিভাগের বন্দোবস্ত এরূপ যে, ভ্যালুপেয়েবে্ল্ ডাকে একখানি চারি পয়সার বহি বেহ আনাইতে চাহিলে তাহার খরচ হইবে।৵০ (ছয়) আনা। সাড়ে ছয় আনা বলাই ঠিক্; কেননা দুপয়সার পোষ্টকার্ডে ক্রেতা পুস্তকবিক্রেতাকে বহি পাঠাইতে লিখিলে তবে বহি আসিবে। জ্ঞান ও শিক্ষাকে দুর্মূল্য করা কোন সভ্য গবর্ণ্মেণ্টের উচিত নহে। প্রতিবেশীর সহিত সংবাদের আদানপ্রদান এবং ভাব ও চিন্তার বিনিময় মানব-সমাজের একটি বিশেষত্ব ও আনন্দের উপায়। অসভ্য নিরক্ষর দেশে প্রতিবেশী কেবল নিজের পাড়ার বা গ্রামের লোক। কিন্তু যে-দেশ যত সভ্য এবং যেখানকার ডাকবিভাগ যত সুশৃঙ্খল ও ডাকমাশুল যত কম, সেখানে প্রতিবেশী বলিতে তত দূরের লোকও বুঝায়। অতএব সস্তা ও সুশৃঙ্খল ডাকবিভাগকে দেশবিশেষের সভ্যতার মাপকাঠি, লক্ষণ এবং সভ্যতাবৃদ্ধির কারণও বলা যাইতে পারে।

ডাকমাশুল কমাইলে ডাকবিভাগ বরাবর লোক্সান দিয়া চালাইতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য অর্থসচিব যাহা বলিয়াছেন ও যেরূপ হিসাব দিয়াছেন, তাহাও ঠিক্ নহে।

ডাকমাশুল বৃদ্ধি হওয়ায় পোষ্টকার্ড্ ও চিঠির সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এক পয়সার পোষ্টকার্ড্ ও দুই পয়সার চিঠি আবার চলিত হইলে কার্ড্ ও চিঠির সংখ্যা খুব বাড়িবে। তাহাতে ডাকমাশুলের হ্রাসজনিত কতকটা ক্ষতির পূরণ হইবে।

তা ছাড়া, এখন বাস্তবিক শুধু ডাকবিভাগে লোক্সান না হইয়া লাভই হয়। বর্ত্তমান বৎসরে সম্মিলিত ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগে ১৮ লক্ষ টাকা নিট্ লাভ থাকিবে, আশা করা যাইতেছে। আগামী ১৯২৬-২৭ সালে শুধু ডাক-বিভাগে ২০ লাখ টাকা লাভ অনুমিত হইয়াছে; কিন্তু টেলিগ্রাফ-বিভাগে ২০ লাখ ও টেলিফোনে ১০ লাখ লোকসান হইবে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন ডাক-মাশুল বৃদ্ধি হয় নাই অথচ ডাকবিভাগের লাভ হইত, তখন সেই লাভটা সরকার সাধারণ রাজস্বের অন্তর্ভূত করিয়া পরের ধনে পোদ্দারী করিতেন। এখনও ডাক-বিভাগের হিসাবকে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগের সঙ্গে জড়াইয়া ডাকবিভাগকেই লোক্সানের কারণ বলিয়া প্রকাশ করিয়া ডাকমাশুল কমাইতে চাহিতেছেন না।

ইহা যে অন্যায়, তাহা অন্য প্রকারেও দেখান যায়। সাধারণতঃ যাহারা টেলিগ্রাফ বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোক। প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবহৃত বিভাগের লোক্সান অতি দরিদ্র হইতে অতি ধনী পর্য্যন্ত সকলের ব্যবহৃত ডাক বিভাগের ঘাড়ে চাপান অন্যায়। অধিকন্তু ইহাও বক্তব্য যে, টেলিগ্রাফের মাশুল অত্যন্ত বেশী রাখা হইয়াছে। বার আনা ন্যূনতম মাশুল না রাখিয়া উহা কমাইলে টেলিগ্রামের সংখ্যা বাড়িয়া লাভ হইবার সম্ভাবনা। সংকারী টেলিফোন-বিভাগ এবং রেডিও বা বে-তার বার্ত্তা বিভাগ প্রধানতঃ যুদ্ধসম্পর্কীয় লোকেরাই ব্যবহার করে। তাহার লোক্সানটা ডাকবিভাগের ঘাড়ে চাপান অনুচিত।

মোটের উপর আমাদের মত এই, যে, আগেকার মত পোষ্টকার্ডের দাম এক পয়সা, চিঠির ন্যূনতম মাশুল দু পয়সা, বহির প্যাকেটের মাশুল প্রতি দশ তোলায় দু পয়সা হওয়া উচিত, এবং খবরের কাগজের মাশুল দশ তোলা পর্য্যন্ত এক পয়সা ও চল্লিশ তোলা পর্য্যন্ত দু পয়সা হওয়া উচিত। টেলিগ্রামের ন্যূনতম মাশুল আট আনা হওয়া উচিত।

—

বাংলা গবর্ন্মেণ্টের আয় ব্যয়

১৯২৬-২৭ সালে বাংলা গবর্ন্মেণ্টের আয় ১০,৭৬,৭৮০০০ (দশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা হইবে অনুমিত হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে কোন্ বিভাগে কত খরচ হইবে, তাহার আলোচনা অবশ্যই করা উচিত। আগে আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া প্রতি বারের বজেটের এইরূপ আলোচনা করিতাম। গত বৎসর অন্য রকমের কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। এবারেও তাহা করিতেছি।

কোন্ বিভাগ কত টাকা পাইবে, তাহা বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে বাংলা গবর্ন্মেণ্টের মোট রাজস্ব ও অন্যান্য কোন-কোন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের মোট রাজস্বের দিকে দৃষ্টিপাত করা ভাল। নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইয়াছে।

১৯২৬-২৭ সালের অনুমিত রাজস্ব

প্রদেশ	অধিবাসীর সংখ্যা	রাজস্ব
বাংলা	৪৬৬৯৫৫৩৬	১০৭৬৭৮০০০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪৫৩৭৫৭৮৭	১২৮৯৬৮০০০
মাদ্রাজ	৪২৩১৮৯৮৫	১৬৩৪২০০০০
পঞ্জাব	২০৬৮৫০২৪	১৪৪৯০০০০০
বোম্বাই	১৯৩৪৮২১৯	১৪৫১০০০০০
ব্রহ্মদেশ	১৩২১২১৯২	১০৩৫০১০০০

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, যে, খাস্ ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশের লোকসংখ্যা বাংলা দেশের চেয়ে কম হইলেও তাহাদের রাজস্ব বেশী। পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা বাংলার অর্দ্ধেকেরও কম হইলেও উহাদের রাজস্ব বাংলার চেয়ে অনেক বেশী। ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা বাংলার এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা কম হইলেও উহারও রাজস্ব বাংলার প্রায় কাছাকাছি। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, বাংলা দেশের উন্নতির জন্য যথেষ্ট টাকা ভারতসরকার বাংলার রাজকোষে থাকিতে দেন না; বাংলা অন্য অনেক প্রদেশ অপেক্ষা কম টাকা পায়।

বাংলার জমীর খাজনা জমীদারেরা মোট যাহা দেন, কর্ষিত ও কর্ষণযোগ্য জমীর পরিমাণ-অনুসারে তাহা কোন-কোন প্রদেশ অপেক্ষা কম নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রবাসীর এক সংখ্যায় দেখাইয়াছি। যদি জমীদারেরা চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে কিছু কম খাজনা দিয়া আসিয়া থাকেন, সে বন্দোবস্ত গবর্ন্মেণ্টেরই নিজের সুবিধার জন্য শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। রায়তরা সে-সুবিধার অংশভাগী কার্য্যতঃ হয় নাই, এবং দেশের অধিবাসীর অধিকাংশ তাহারাই। অতএব, জমীদাররা যদি সত্য-সত্যই কম খাজনা দেন, তাহা হইলেও তাহার জন্য বাংলা দেশে সংগৃহীত অন্য রকম প্রচুর রাজস্ব হইতে বাংলা দেশকে বঞ্চিত করা উচিত নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাই করা হইয়াছে দেখা যাইতেছে।

আমাদের নিকট ১৯২০-২১ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সব রকম রাজস্বের মোটামুটি তালিকার যে-বহি (Statistical Abstract for British India from 1911-12 to 1920-21) আছে, তাহাতে দেখিতেছি, বাংলা দেশ হইতেই ইন্‌কম্ ট্যাক্স্ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (১৯২০-২১ সালে ৮৩:৭৫২৯১ টাকা) আদায় হয়। অথচ ইন্‌কম্ ট্যাক্স্ হইতে বাংলা গবর্ন্মেণ্টের কার্য্যতঃ কোন লাভ হয় না, উহার সবটাই বা প্রায় সবটাই ভারত-গবর্ন্মেণ্ট্ লইয়া থাকেন। পাট বাংলা দেশের একচেটিয়া পণ্য। তাহা হইতে যে কয়েক কোটি টাকা আয় হয়, তাহাও বাংলাদেশ পায় না, ভারত-সরকার লইয়া থাকেন। অথচ পাট উৎপন্ন করিতে গিয়া বাংলা দেশের জল ও বায়ু দূষিত হয়, দেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, এবং তাহাতে বাঙালী মরে। এমন ন্যায়সঙ্গত চমৎকার বন্দোবস্ত আর কি হইতে পারে?

বাংলা গবর্ণমেন্টের আয় যে অন্যান্য কয়েকটি প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট্ হইতে কম, তাহার কারণ হয়ত অনেকে এই

বলিলেন, যে, বাংলা দেশ ট্যাক্স কম দেয়, রাজস্ব আদায়ই এখানে কম হয়, এইজন্য বাংলা সরকারের আয় কম। বাস্তবিক কিন্তু সেটা কারণ নয়। বাংলা দেশ হইতে ট্যাক্স আদায় হয় খুব বেশী, কিন্তু ভারত-গবর্মেণ্ট খুব বেশী টাকা বাংলা দেশ হইতে শোষণ করিয়া লন বলিয়া বাংলা সরকারের টাকা কম।

যেরূপ বন্দোবস্তের ফলে বাংলা সরকারের আয় কম, তাহার কর্ত্তা লর্ড মেষ্টন্। এবার বাংলার বজেট আলোচনার সময় স্যার আব্দুর রহিম পর্য্যন্ত এই মেষ্টনী বন্দোবস্তের নিন্দা করিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে আশা পাওয়া গিয়াছে, যে, ইহার পুনর্বিবেচনা হইবে। কিন্তু পুনর্বিবেচনার ফল বাংলার পক্ষে ভাল হইবে কি না, বলা যায় না।

—

রাজবন্দীদের অনশনব্রত

সম্পাদকদিগকে নানা বিষয়ে কলম চালাইতে হয়। অথচ খুব বিদ্বান্ সম্পাদকদিগেরও সব বিষয়ের জ্ঞান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে তাঁহাদিগকে সবজান্তা বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়া থাকে। এই বিদ্রূপ সহ্য করা কঠিন নহে।

কিন্তু সম্পাদকদিগকে অন্য কোন-কোন বিষয়েও মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তাঁহাদের অধিকতর সঙ্কোচ বোধ করা স্বাভাবিক। যাঁহারা স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন এবং দেশহিত সাধন করিতে গিয়া লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইতেছেন, তাঁহাদের কোন কাজের সমালোচনা করিলে লোকের পক্ষে ইহা মনে করাই স্বাভাবিক, যে, এরূপ সমালোচনা সম্পাদকদের অনধিকারচর্চ্চা ও ধৃষ্টতা মাত্র; কারণ, তাঁহারা ত দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন নাই এবং তাঁহাদের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগে নাই; আরামে সম্পাদকীয় কক্ষে বসিয়া অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ।

তথাপি, যে-সব ঘটনায় সর্ব্বসাধারণের চিত্ত আন্দোলিত হয়, তাহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও নয় বলিয়া, ব্রহ্মদেশে বাঙালী রাজবন্দীদের অনশনব্রত সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইতেছে।

খুব গুরুতর কারণেও মানুষের অনশন দ্বারা আত্মহত্যা করা উচিত কি না, সে-বিষয়ে সকল মনীষী একমত নহেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বদেশপ্রেমিক ম্যাক্‌স্বইনী যে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সত্তর দিনেরও অধিক উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রশংসা সকলেই করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য তিনি যে-উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বধর্ম্মী রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিও তাহার সমর্থন করেন নাই। কলিকাতার ক্যাথলিক হেরাল্ড অব্ ইণ্ডিয়া তাঁহার কার্য্যের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মান্দালয় ও ইন্‌সেইন্ জেলের রাজবন্দীরা কি কি কারণে অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিষয়ের আলোচনার সময় তাহা সমস্ত জানা যায় নাই। কেবল এইটুকু জানা গিয়াছিল, যে, সরকার পক্ষ হইতে প্রথমতঃ বাঙালী রাজবন্দীদিগকে দুর্গাপূজা করিবার জন্য ৫০০ টাকা আগাম দেওয়া হয়, পরে তাহা আবার তাঁহাদের সাধারণ মাসিক ভাতা হইতে কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হয়, এবং সরস্বতী-পূজা প্রভৃতি করিবার জন্য তাঁহারা টাকা চাহিলে তাহা দেওয়া হয় নাই। ইহাও খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, আলিপুর জেলে খৃষ্টিয়ান্ কয়েদীদিগকে খৃষ্টমাস উৎসব করিবার জন্য ১২০০ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে।

খৃষ্টিয়ান্ কয়েদীদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যদি টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী কয়েদীদিগকেও তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য নিশ্চয়ই টাকা দেওয়া উচিত, না-দেওয়া অন্যায়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিবেচ্য কেবল ইহাই, যে, সরকার এইজন্য টাকা না দিলে বন্দীদের অনশন অবলম্বন দ্বারা প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা ঘটান উচিত বা আবশ্যক কি না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, খুব গুরুতর কারণেও অনশন দ্বারা প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা ঘটান উচিত কি না, সে-বিষয়ে মনীষীরা একমত নহেন। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক, যে, গুরুতর কারণ থাকিলে অনশনে প্রাণত্যাগ বৈধ। তাহা হইলে এখন বিবেচ্য, দুর্গাপূজা করিতে সরকার টাকা না দিলে হিন্দুর পক্ষে অনশন করা উচিত কি না।

নামে মাত্র হিন্দু, নামে মাত্র বৌদ্ধ, নামে মাত্র জৈন, নামে মাত্র খৃষ্টিয়ান্, নামে মাত্র ব্রাহ্ম, ইত্যাদি অনেকে আছেন। তাঁহারা কি ভাবেন করেন, আমরা তাহা অবলম্বন করিয়া এই বিষয়টির বিচার করিব না। যাহারা স্ব স্ব সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মমত মানেন, দেশাচার ও লোকাচার মানেন, এবং তদনুসরণে নিষ্ঠাবান্, তাঁহাদের ব্যবহার দ্বারাই বিচার করিব।

বাংলা দেশে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু লক্ষ লক্ষ আছেন, শাক্ত হিন্দু বিস্তর আছেন, যাঁহাদের পরিবারে দুর্গাপূজা হয় না, হয় ত কখনও হয় নাই। তাঁহাদের অনেকের দুর্গাপূজার সময় পুষ্পাঞ্জলি দিবার সুযোগও হয় না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের হিন্দুত্ব লোপ পায় না, ধর্ম্মনাশ হয় না। কেহ

একবার বা বহুবার দুর্গাপূজা করিয়া পরে তাহা করিতে না পারিলে তাহাতে তাঁহার হিন্দুত্ব বা ধর্ম্ম লুপ্ত হয় না। সুতরাং ইহা স্বীকার করা যায় না, যে, রাজবন্দী হিন্দু বাঙালী কেহ দুর্গাপূজা করিবার টাকা বা সুযোগ না পাইলে তাঁহার হিন্দুত্ব লুপ্ত হইত বা ধর্ম নষ্ট হইত। এই কারণে আমরা মনে করি, দুর্গাপূজার টাকা লইয়া সরকারের সহিত মতান্তর ও বাদপ্রতিবাদ অনশনব্রত গ্রহণের যথেষ্ট কারণ হইতে পারে না। রাজবন্দীদিগের অন্য কোন গুরুতর অভিযোগ থাকিলে, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

সাধারণভাবে রাজবন্দীদের অনশন অবলম্বন সম্বন্ধে আরও একটি কথা সঙ্কোচ-সত্ত্বেও বলিতে হইবে। যদি জেলে রাজবন্দীরা, স্বগৃহে যত প্রকার আরাম ও সুবিধা পাইয়া থাকেন, তাহার সমস্তই পাইতেন, তাহা হইলে বন্দী হওয়ার যে-গৌরব, তাহা অনেকটা লুপ্ত হইত। প্রধানতঃ, স্বদেশের জন্য দুঃখভোগ করিতে হয় বলিয়াই, এই বন্দীরা দেশবাসীর বন্দনা পাইয়া থাকেন। যদি জেলে সব বিষয়ে দিব্য আরামে থাকিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনের ভাব কিছু পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য, স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়াটাই একটা মহা দুঃখ, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সে-কারণে ত রাজবন্দীদের কেহ অনশনব্রত অবলম্বন করেন না। তাঁহারা উপবাস করেন, খাদ্য, পরিধেয়, পুস্তক, সংবাদপত্র, বিশ্রাম, জেলের কর্ম্মচারীদের শিষ্টতা-অশিষ্টতা, উৎসবাদি করিবার সুযোগ, ইত্যাদি বিষয় লইয়া। এইজন্যই বলিতেছিলাম, যে, উপবাস আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যে, কারণটা যথেষ্ট গুরুতর কি না।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু খুব বুদ্ধিমান্, কর্ম্মিষ্ঠ এবং দেশ-ভক্ত ত্যাগী পুরুষ। তাঁহার প্রাণ তুচ্ছ নয়—কাহারও প্রাণ তুচ্ছ নয়। তিনি যে অনশন ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়। তিনি চিরকাল বন্দী থাকিবেন না। তিনি আবার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবেন। তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসুন, এবং দীর্ঘজীবী হইয়া দেশহিত-ব্রত পালন করিতে থাকুন, ইহাই আমরা চাই।

—

রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার

এগার বৎসর পূর্ব্বে জেল-কমিশনের সম্মুখে নূতন আলিপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল্ মাল্‌ভ্যানী যে-সাক্ষ্য দেন, তাহা, এবং তিনি রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে জেলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনের্যালকে যে-চিঠি লেখেন, তাহা ফর্‌ওয়ার্ড্ কাগজ প্রকাশ করিয়া ও শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামী রাজবন্দীদের অনশনসম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় তর্ক-বিতর্কের সময় তাহা পাঠ করিয়া দেশের লোকদের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। এখন জানা গিয়াছে, যে, রাজবন্দীদের নির্জ্জন কারাবাসে তাঁহাদের উন্মাদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও পুলিসের হুকুম অনুসারে তাহাদের কঠোর নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা হইত এবং সম্ভবতঃ এখনও হয়, এবং তাহাদের স্বাস্থ্য আদি সম্বন্ধে মিথ্যা রিপোর্ট লিখিতে জেলসুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট্‌দিগকে বাধ্য করা হইত, এবং সম্ভবতঃ এখনও হয়।

জেল-কমিশনের সম্মুখে মাল্‌ভ্যানী সাহেব এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত কমিশনের রিপোর্টে রাজবন্দীদের উপর কোন অত্যাচারের কথা নাই; তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার যে বেশ ভাল, তাহাই লেখা আছে।

তুলসী গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতার পর সরকার পক্ষ হইতে মাডিম্যান্ সাহেব বলেন, যে, উহা ১৫ বৎসর আগেকার কথা। কিন্তু পনের বৎসর আগেই বা এমন অত্যাচার ও মিথ্যাবাদিতার প্রশ্রয় গবর্ন্মেণ্ট্ কেন দিয়াছিলেন, এবং জেল-কমিশনই বা মিথ্যা রিপোর্ট কেন লিখিলেন? পনের বৎসর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়া-ছিল, এখনও যে তাহাই হইতেছে না, তাহার প্রমাণ কি? স্যার্ আলেক্‌জাণ্ডার মাডিম্যানের বক্তৃতার পরই লালা লাজপৎ রায় বলেন, যে, জেলবাস সম্বন্ধে তাঁহার ১৯১৫ সালের পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতা আছে। তদনুসারে তিনি বলিতে পারেন, যে, এখনও বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার হয়।

সরকারী কলঙ্কের কথা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইলেও তাহার প্রতিকার করিবার ক্ষমতা যে আমাদের নাই, ইহা ঘোরতর দুঃখ, অপমান ও লজ্জার কথা। "ভাল ছেলের মত" চিরকাল কৌন্সিলে গিয়া "সহযোগিতা" করিলে, এমন কি কড়া কড়া বক্তৃতা করিলেও ইহার প্রতিকার হইবে না। তাহা অপেক্ষা দুঃসাধ্য সাধনার প্রয়োজন।

—

কৌন্সিল হইতে স্বরাজ্যদলের নিষ্ক্রমণ

কানপুর কংগ্রেসে বলা হইয়াছিল, যে, গবর্ন্মেণ্ট্ যদি জাতীয় দাবীতে কর্ণপাত না করেন তাহা হইলে স্বরাজ্য-দলের সভ্যেরা প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা-গুলি হইতে বাহির হইয়া আসিবেন ও তাহার পর স্বরাজ লাভের চূড়ান্ত উপায় অবলম্বনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিবেন।

ইহা লিখিতে আমাদের কোনই সুখ হইতেছে না, যে, আমরা কংগ্রেসের পরেই ভাবিয়াছিলাম ও লিখিয়া-

ছিলাম, যে, গবর্ন্মেণ্ট কংগ্রেসের কথায় বিচলিত হইবেন না এবং ভ্রূক্ষেপও করিবেন না। ঘটিয়াছেও তাহাই।

প্রকৃত কথা এই, যে, ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা আমাদের কোন প্রকার মনুষ্যোচিত ভঙ্গী ও ব্যবহার দর্প ও ধৃষ্টতা মনে করেন। আমরা তাঁহাদের "সহযোগিতা" করিব অর্থাৎ তাঁহাদের অভিপ্রেত কাজে আজ্ঞানুবর্ত্তী ও সহায় হইব, একটু-আধটু অবান্তর পরিবর্ত্তন করিব, দুঃখের কাঁদুনী গাহিব, আবেদন-নিবেদন করিব, কখন কখন খুব কড়া বক্তৃতা করিব—এসব তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা "দাবী" করিব, মাথা হেঁট না করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইব—ইহা অসহ্য। সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য, যে, আমরা নিজেদের সাহস, দুঃখভোগশক্তি, সাধনা ও কৃতিত্ব দ্বারা স্বরাজ লাভ করিবার স্বপ্ন দেখি, এবং সে-কথা প্রচারও করি। ইংরেজদের মতে, আমরা যাহা কিছু পাইতে চাই, তাহা তাঁহাদের অনুগ্রহের দান বলিয়া লইতে হইবে।

স্বরাজীরা নিজেদের প্রতিজ্ঞা-অনুসারে ব্যবস্থাপক সভা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঠিক্ কাজ করিয়াছেন। ইহার পর তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাতে যেন লোক-হাসি না হয়, ইহা ত দেখিতেই হইবে, অধিকন্তু তার চেয়ে বড় যাহা তাহা করিতে হইবে—আত্মোৎসর্গ ও সেবা দ্বারা জাতীয় দাবীর পশ্চাতে সমগ্রজাতির শক্তিকে দাঁড় করাইতে হইবে।

—

বাঙালীর মস্তিষ্কের অবস্থা

বাঙালীদের একটা ধারণা আছে, যে, ভারতবর্ষের মধ্যে তাহারা সব চেয়ে বুদ্ধিমান্ জাতি। এই ধারণা সত্য কি না বলিতে পারি না, এবং এবিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তাহা হইলেও কিছু দিন আগে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজে কয়েকজন বাঙালী মহারথী এই বিষয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কথাটা উঠিয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, পরীক্ষা প্রভৃতি লইয়া। আমাদের মত এই, যে, আর্থিক ও অন্যান্য কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ করিয়া দেওয়ায়, অনেক বৎসর হইতে ছাত্রেরা আর জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আগেকার মত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয় না। ক্লাস্‌গুলিতে, বিশেষতঃ কলেজে, ছাত্রের আধিক্যবশতঃ শিক্ষাও যথেষ্ট ভাল হয় না। এইজন্য গড়ে তাহাদের জ্ঞান আগেকার পাস্‌করা ছেলেদের চেয়ে কম হইবার কথা। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙালীর মস্তিষ্কের অবনতিও হইতেছে কি না, বলিতে পারি না। কারণ মস্তিষ্কের অবনতি-উন্নতির বিচার করিতে হইলে পরীক্ষা পাস্ করা ছাড়া আরও অনেক তথ্য জানা দরকার।

কেহ কেহ বলেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া, তর্কবিতর্ক করা প্রভৃতি কাজে বাঙালীর প্রাধান্য ত নাই-ই, অন্য প্রাদেশিকদের সহিত সমকক্ষতাও নাই। ইহা মোটের উপর সত্য কথা; যদিও, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, বিপিনচন্দ্র পালের মত বাগ্মী ও তর্কনিপুণ ব্যক্তি এবং ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মত ধীর ও তথ্যজ্ঞ সভ্য তথায় আছেন। ইহার কারণ নানা রকম হইতে পারে। ব্যবস্থাপক সভায় যে-সব বিষয় আলোচিত হয়, সে-সব বিষয়ে জ্ঞানবান্ বাঙালীরা উহার সভ্য হন না, এটা একটা কারণ হইতে পারে; এপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট বাঙালীর সংখ্যা কমিয়াছে, ইহাও হইতে পারে; শুষ্ক বিষয়ের আলোচনা ও তদ্বিষয়ে তথ্যসংগ্রহে বাঙালীর শ্রমশীলতার ও ধৈর্য্যের অভাবও একটা কারণ হইতে পারে।

ইহা কিন্তু ঠিক্, যে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও মুদ্রাবিষয়ক আলোচনায় বাঙালী বক্তা ও সাংবাদিকরা সাধারণতঃ বেশী উৎসাহ বা পারদর্শিতা আগেও দেখাইতেন না। শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিংএ বহু বৎসর হইতে বাঙালীর স্থান সামান্য হইয়া যাওয়া ইহার একটা কারণ; এসব বিষয়ে তাঁহারা আদার ব্যাপারী বলিয়া জাহাজের খবর বেশী রাখেন না। তা ছাড়া, যে শ্রমবিমুখতা-বশতঃ বাঙালীকে অন্য অনেক কার্য্যক্ষেত্র হইতে বেদখল হইতে হইয়াছে, সম্ভবতঃ সেই অলস ও আরামপ্রিয় প্রকৃতি বশতঃ পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলিতেও বাঙালী অনুরাগী, উৎসাহী ও পারদর্শী হইতে পারে নাই। কিন্তু এবিষয়ে বাঙালীদের যে কোন কৃতিত্বই নাই, তাহা বলিলেও ভুল হইবে ও তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। এসব বিষয়ে কোন-কোন বাঙালী ইংরেজী ও বাংলা ভাল বহি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

—

তুরস্কের কথা

জনপ্রবাদ আছে যে, অটোমান তুর্কীদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন কারাখানের পুত্র ওঘুজ্। ইতিহাসে তুর্কীদিগের কথা শুনা যায় সর্ব্বপ্রথম ১২২৭ খৃঃ অব্দে। তার পর কখন কি কি অবস্থার ভিতর দিয়া তুর্কীগণ তাহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করে, তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সম্রাট্ দ্বিতীয় মহম্মদ ও সম্রাট্ প্রথম সুলেমানের প্রতাপে তুর্কীগণ এক সময় ইয়োরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বক্ষ জুড়িয়া এক

বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ব রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট্ কনষ্টান্-টাইনকে জয় করিয়া কনষ্টান্টিনোপ্‌ল অধিকার করেন। তাঁহার আমলে যে-কার্য্যের আরম্ভ হয়, সুলেমান তাহাই আরও উত্তমরূপে সম্পন্ন করেন। সুলেমানের সময়েই তুরস্ক সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য ইতিহাসে সুলেমানের নাম "সুলেমান দি ম্যাগ্নিফিসেণ্ট" অর্থাৎ বৈভবশালী সুলেমান বলিয়া উল্লিখিত হয়। সুলেমান ১৫২১ হইতে ১৫২৯ মধ্যে বেলগ্রেড্ ও বুডাপেষ্ট অধিকার এবং ভিয়েনা অবরোধ করেন। তাঁহার প্রতাপে শক্তিশালী ভিনিসীয়গণ হার মানিতে এবং তাঁহাকে দণ্ডস্বরূপ বহু অর্থ দিতে বাধ্য হয়। সুলেমানের সময়ে তুরস্কের সাম্রাজ্য জার্ম্মানীর সীমান্ত হইতে পারস্য উপসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল। সেই অতীত গৌরবের কথা তুর্কীরা আজিও ভুলে নাই।

সুলেমানের সময় হইতে গত মহাযুদ্ধের শেষ অবধি ভাল মন্দ নানান্ অবস্থার ভিতর দিয়া তুরস্কের অবনতি সম্পূর্ণ হয়। ইহার কারণ জাতীয় গৌরবে অন্ধ হইয়া তুর্কীদিগের অধোগতি এবং ইয়োরোপের শক্তিসমূহের তুরস্ক-বিদ্বেষ। সেই ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এখন দেখিব মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তুরস্কের কি অবস্থা ছিল।

১৯১০ খৃঃ অব্দে সাক্ষাৎভাবে তুরস্কের অধীনস্থ প্রদেশগুলির মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৫৯,২৬,০০০। এইসব লোক বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ২৫ জন মাত্র হিসাবে ছড়াইয়া বাস করিত। তুরস্ক প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ। এই দেশের উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে গম, ভুট্টা, জই, যব, তুলা, তামাক, আফিং, কমলা লেবু, খেজুর, আঙ্গুর, রেশম, তুন, তিসি, শন, ভেরেণ্ডা, মৌরি, জলপাইয়ের তেল, এঙ্গোরা ছাগের পশম, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, স্পঞ্জ, সোহাগা, শিরীষ, সোনা, রূপা, তামা, শিষা, লোহা, কয়লা, পারা, দস্তা, মসলিন, কারপেট, মখমল ইত্যাদি বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক হিংসা ও অর্থনৈতিক লোভ, এই দুই কারণেই ইয়োরোপের শক্তি-পুঞ্জের তুরস্কের উপর দৃষ্টি পড়ে। তুরস্কের দুর্দ্দশার দিনে ঐসকল ইয়োরোপীয়গণ "তুরস্ককে দি সিক্ ম্যান্" বা "রুগ্ন ব্যক্তি" বলিয়া বিদ্রূপ করিলেও সেই রোগীর খরচে কিছু লাভবান্ হইবার আশা তাঁহাদের মধ্যে কেহই ত্যাগ করেন নাই।

১৯০৫-১৯০৬ খৃঃ অব্দে তুরস্কের অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল আমদানী ২,৭৫,১৪০,৫২ পাউণ্ড্ (৪১,২৭,১০,৭৮০৲ টাকা) ও রপ্তানী ১,৭২,৫৫,৪৬৭ পাউণ্ড্ (২৫,৮৮,৩২,০০৫৲ টাকা)। এই ব্যবসায়ে ইংলণ্ডের ভাগ ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও তৎপরে অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও আমেরিকার। যে-সকল জাহাজের সাহায্যে এই ব্যবসা চলিত, সেগুলির অতি অল্পসংখ্যকই তুর্কীদের হাতে ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই ইংরেজের।

তুরস্কের রেললাইনগুলির মধ্যে অতি অল্পই তুর্কীদিগের হাতে ছিল। কি ভাবে রেললাইনগুলি নানা দেশের মধ্যে ভাগ করা ছিল ও তাহা হইতে কোন্ দেশ কি পরিমাণে লাভ করিত তাহা নিম্নের সংখ্যাগুলির সাহায্যে বেশ বুঝা যায়।

১৯০৮ খৃঃ তুরস্কের সমুদয় রেললাইনের মধ্যে ছিল

তুর্কীর	৯৩২	মাইল
জার্ম্মানের	৯৩৮	”
ইংরেজের	৩২০	”
অষ্ট্রো-জার্ম্মানের	৮১৫	”
ফরাসীর	১০৫৪	”
অপরের	২৬	”

এইসকল রেললাইন হইতে ১৯০৮ খৃঃ অব্দে লাভ করিয়াছিল

তুর্কী	২২,৫৬,৫২৫৲	টাকা
জার্ম্মান	১,২৬,১৬,২১৫৲	”
ইংরেজ	৪৩,৯৬,৫৬০৲	”
অষ্ট্রো-জার্ম্মান্	৭৩,৭২,১০০৲	”
ফরাসী	১,৬৩,৯৪,৩৫৫৲	”
অপরে	২,২৫,৫৮৫৲	”

অর্থাৎ তুরস্ককে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়া ক্রমশঃ সুলতানকে কোন ভারতীয় "নেটিভ" রাজার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া ইয়োরোপীয় সুখে উক্ত দেশে বসবাস করিবেন, এইরূপই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে তুরস্কে যে সকল ব্যাঙ্ক ছিল, সেগুলির জাতীয়তা আলোচনা করিলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। তুরস্কের 'রাষ্ট্রীয়' ব্যাঙ্কএর নাম ছিল ইম্পীরিয়াল অটোম্যান্ ব্যাঙ্ক। উহা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের সম্পত্তি ছিল এবং সুলতানকে কোন-কোন সুবিধা করিয়া দিবার বিনিময়ে উক্ত ব্যাঙ্ক হইতেই তুরস্কের নোট-মুদ্রণ কার্য্যও সম্পাদিত হইত। ইহা ব্যতীত যে-কয়টি ব্যাঙ্ক ছিল, তাহার মধ্যে ইংরেজের সম্পত্তি দি ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব টার্কির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। জার্ম্মান, ফরাসী, অষ্ট্রীয়, রুশীয় ও গ্রীক যে-কয়টি ব্যাঙ্ক তুরস্কে ছিল তাহাদের নাম ছিল, ডয়েট্শে বাঙ্ক, ডয়েট্শে ওরিয়েণ্ট্ বাঙ্ক ক্রেদি লিয়োনে, ভিয়েনের বাঙ্কফেরান্, রাশিয়ান

ব্যাঙ্ক্ অব্ কমার্স্ এণ্ড্ ইণ্ডাষ্ট্রী, ব্যাঙ্ক অব্ মিটিলীনি, ব্যাঙ্ক অব্ শালোনিকা, ও ব্যাঙ্ক অব্ এথেন্স্।

এইরূপে ইয়োরোপীয়গণ ব্যবসাবাণিজ্য ও তুরস্কের জাতীয় ঋণের সূত্রে তাহার উপর প্রভুত্ব করিত। তুর্কীগণের অবস্থা ঠিক্ চীন কিম্বা ভারতবর্ষের মত না হইলেও, সেইরূপ হইবার আশঙ্কা যে ছিল না, তাহা নহে। শুধু সৌভাগ্যের বিষয় ছিল এই, যে, ইয়োরোপীয়দিগের নিজেদের মধ্যে "চোরে চোরে মাসতুত ভাই" ধরণের কোন-প্রকার গভীর ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল না। তুরস্কের রাজনীতিবিদ্‌গণও এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অটুট রাখিবার ও বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতেন।

যে-সকল স্বাধীনচেতা ও আদর্শবাদী ব্যক্তিদিগের চক্ষে তুরস্ককে নূতন করিয়া উন্নতির পথে দাঁড় করাইবার স্বপ্ন প্রথম জাগিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্যা ছিল দ্বিবিধ ;— ১। তুরস্ককে বিদেশীর কবল হইতে রক্ষা করা; ২। তাহাকে সামাজিক সকল প্রকার দুর্নীতি হইতে মুক্ত করিয়া সভ্যতার বর্ত্তমান আদর্শে গড়িয়া তোলা। তাঁহারা তাঁহাদের এই দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য যে আন্দোলন করেন, তাহাই ইতিহাসে "তরুণ তুর্কী প্রচেষ্টা" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার মূল সূত্রগুলি পাশ্চাত্য ও বিশেষ করিয়া ফরাসী আদর্শে গঠিত। তুরস্কের আধুনিক অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাব বিশেষ প্রবল, এবং নবীন তুর্কী সাহিত্য যেরূপ আবহমান কালের ফার্সী, আর্বী আদর্শ ত্যাগ করিয়া ফরাসী আদর্শ ধরিয়াছিল, সমাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তুরস্ক তেম্নি ফরাসীকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। যেখানে ফরাসী আদর্শ তাহার পছন্দ হয় নাই সেখানে সে জার্ম্মান্ অথবা ইংরেজের অনুসরণ করিয়াছে। অর্থাৎ যে-সময়ে ইয়োরোপের পরস্বলোভী শক্তিপুঞ্জ তুর্কীকে জগতের সম্মুখে প্রাচ্যের অবনত চরিত্রের নিদর্শনস্বরূপ বলিয়া সত্য মিথ্যা উভয় প্রকার বর্ণনার সাহায্যে প্রচার করিতেছিলেন, যে-সময় বিশ্বের সকলে ইয়োরোপীয় ছাপাখানার কৃপায় তুর্কী বলিতে চরিত্রহীন ও বর্ব্বর-জাতীয় একপ্রকার মনুষ্য ব্যতীত আর কিছু বুঝিত না, সেই সময়ে এক দল লোক এই পতিত জাতিকে পুনরায় উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের জাতীয়তার আদর্শ ইয়োরোপীয় আদর্শ হইতে কোন প্রকারে বিভিন্ন ছিল না। তাহারা তুরস্ককে একটি আধুনিক ইয়োরোপীয় জাতির মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই প্রাণপাত করিতেছিল। কোন অতীত আদর্শ, কোন দার্শনিক অভিনবত্ব, কিছু দিয়াই তাহারা অনুপ্রাণিত হয় নাই! তাহাদের চক্ষের সম্মুখে শুধু ছিল একটি শক্তিশালী, সুসভ্য ও সমৃদ্ধ তুরস্কের চিত্র!



মুস্তাফা কামাল পাশা

এই নবীন তুর্কী প্রচেষ্টার নেতারা গোড়া হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, অধিক হৈ চৈ, বোমা ছোড়া, অযথা বিদ্রোহ ইত্যাদি করিয়া সময় নষ্ট করিলে তাঁহাদের কাজের ক্ষতি বই লাভ হইবে না। তাই ১৯১৮ খৃঃ অব্দে যখন তাঁহারা নিয়াজি বে-র নেতৃত্বে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া সুলতানকে নিয়মতন্ত্রের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন, তাহার পূর্ব্বে লোকে নবীন তুর্কীদিগকে সামর্থ্যহীন আদর্শবাদী ব্যতীত আর কিছু বলিয়া জানিত না। নবীন তুর্কীগণ প্যারিস ও সালোনিকায় বসিয়া তাহাদের প্রচেষ্টার বিরাট্ প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যথাসময়ে এইরূপে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

নবীন তুর্কীদিগের আকাঙ্ক্ষা এই ঘটনার পর কতকটা পূর্ণ হইলেও সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় নাই। তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা কমাইয়া নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের সংস্কার-কার্য্যের আরম্ভ মাত্র। সমাজসংস্কার ও শক্তি-

পুঞ্জের কবল হইতে মুক্ত হওয়া তখনও বাকি ছিল। মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এই বিষয়ে নবীন তুর্কীগণ সফলকাম হন নাই।

মহাযুদ্ধের পর সকলেই ভাবিয়াছিল, যে, এই বার তুরস্ক বুঝি চিরতরে ডুবিল। কেননা, যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিপুঞ্জ তুরস্কের বিশেষ দুর্দ্দশার বন্দোবস্ত করে। অটোমান সাম্রাজ্যের নিকট হইতে তুরস্কের অধীনস্থ আরব, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া কাড়িয়া লওয়া তুরস্কের রাজস্বের উপর হস্তক্ষেপ, তুরস্কের জলপথের উপর প্রভুত্ব ইত্যাদি নানা প্রকার অবমানকর আয়োজনই শক্তিপুঞ্জ বিজিত শত্রুর জন্য করিয়াছিলেন; শুধু একটি ভুল করিয়া তাঁহারা তুর্কীদিগকে খোঁচাইয়া জাগাইয়া তুলিলেন। তাহা গ্রীসের হস্তে স্মার্ণা ও থেস্ সমর্পণ। ইহা আর তুর্কীগণ সহ্য করিতে পারিল না। কি করিয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তুর্কীগণ কামাল পাশাকে নেতা করিয়া আবার নিজেদের লুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিল ও পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাহা আমাদের সকলেরই বিদিত আছে। আজ অর্দ্ধেকের অধিক সাম্রাজ্য ও জনবল হারাইয়াও তুরস্ক জগৎজাতি-সভা মণ্ডপে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। জাপানের উত্থানের পর এইরূপ ঘটনা আর হয় নাই। নবীন তুর্কী আজ তাহার বহুকষ্টে রক্ষিত স্বাধীনতার উপরে এমন একটি কিছু গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, যাহা সহজে মরিবে না। কামাল পাশা তুরস্ককে বলিতেছেন, "আমরা যেন অন্ধ হইয়া না থাকি। জগতের অন্যান্য জাতি আমাদের ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। আমাদের তাহাদের অনুসরণ করিয়া সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অতীতের দাসত্ব-ভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া আগাইয়া চলিতে হইবে"। তাঁহার মতে যদি উন্নতির দিকে কেহ স্বেচ্ছায় না চলে, তাহা হইলে তাহাকে চাবুক মারিয়া চালান প্রয়োজন। ইহা আধুনিক কিণ্ডারগার্টেন্ শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধ হইলেও ইহাতে তুরস্কের উন্নতি হইতেছে দেখা যাইতেছে। তুরস্ক চিরকালের সুলতান-পূজা ও খলিফা-পূজা ত্যাগ করিয়া আজ সাধারণতন্ত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তুরস্কের নারী আজ সুদূর অতীতের দাসত্বচিহ্ন অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনে যত্নবতী। কামাল পাশা বলিতেছেন, "তুর্কী নারীর কর্ত্তব্য ভবিষ্যৎ জাতি যাহাতে চরিত্রে, বুদ্ধিতে ও শক্তিতে বিশেষরূপে উন্নত হয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া"। তুর্কীর আজ জগৎজোড়া ইস্লামিক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন নাই, সুলতান নাই, খলিফা নাই, অবরোধ নাই, বহুবিবাহ নাই, ফেজ নাই। "আমরা জগৎকে আমাদের অপরূপ আচার-ব্যবহার, পোষাক ইত্যাদি দেখাইয়া আমোদ দিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই"।—এই কথা কামাল পাশা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতেছেন। তুরস্কের ১,৪০,০০,০০০ লোক তাঁহার সহিত একপ্রাণ ও একমত। সত্যের উপর তাহাদের সকল আশা প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের প্রত্যেক কথা ও প্রত্যেক কার্য্য সত্য চিন্তা ও সত্য অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত—তাহার মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনা অথবা জনতুষ্টিকর (জনহিতকর নহে) "আদর্শ"বাদের স্থান নাই। এইজন্যই তুরস্কের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অ

—

তুরস্ক হইতে কি শিখিতে পারি।

এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ বা পরামর্শ দিলে তাহাতে সুফল না হইয়া অনেক সময় কুফলই হইয়া থাকে বটে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে; কিন্তু তথাপি আমরা সবাই এক দেশে থাকি ও সকলের ভাগ্য পরস্পরের সহিত জড়িত বলিয়া সকলের কথাই ভাবিতে ও বলিতে হয়।

তুরস্কের আধুনিক পুনরভ্যুত্থান হইতে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোকদেরই শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। তুরস্কের ধর্ম্ম ইস্লাম বলিয়া ভারতীয় মুসলমানদেরই উহার নিকট হইতে বেশী শিখিবার আছে।

তুরস্ক মুসলমান ধর্ম্মের ও ইস্লামিক সভ্যতার উৎপত্তি-স্থল নহে। ইস্লাম ও ইস্লামিক সভ্যতার আকর প্রথমতঃ আরব দেশ ও তৎপরে পারস্য। তুরস্ক অবশ্য পরে আর্থিক শক্তি ও সম্পদে অপর সব মুসলমান দেশকে অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু এখন তুরস্ক আরব ও পারস্যের এবং নিজের অতীত কালের গৌরবের স্বপ্নে বিভোর না থাকিয়া, বর্ত্তমান কালে **নিজের** উন্নতিতে মন দিয়াছে। তাহারা মুসলমান নহে এরূপ মনে করে না, এবং তাহা বলিতেছেও না। কিন্তু তাহাদের **প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য** যে স্বদেশের প্রতি—বিদেশের মুসলমানদের প্রতি নহে, ইহা তাহারা বুঝিয়াছে ও তদনুসারে কাজ করিতেছে। তুরস্কে মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্ম্মেরও লোক আছে। ভারতীয় মুসলমানদেরও ভাবিয়া দেখা উচিত, যে, তাঁহাদেরও তুর্কদের মত চিন্তা ও কাজ করা কর্ত্তব্য কি না।

তুর্করা যাহা কিছু করিতেছে অবিচারিত ভাবে তাহারই নকল করিতে হইবে, কোন চিন্তাশীল লোক এরূপ বলিবে না। কিন্তু তাহাদের কাজের মূলে যে-নীতি আছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। একটা সোজা কথা ধরুন, তাহাদের পোষাক পরিবর্ত্তন। তাহারা ইউরোপের অন্যান্য জাতির মত হ্যাট্ পরিতেছে। ইহা ভাল কি মন্দ, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু ইহার ভিতর তাহাদের

উদ্দেশ্যটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহারা অন্য ইউরোপীয়দের হইতে স্বতন্ত্র, আমোদজনক কোন পোষাক না রাখিয়া ইহাই দেখাইতে চায়, যে, অপর মানুষের সহিত পার্থক্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বড় জিনিষ।

তুর্করা অলস ফকীর ও দরবেশদিগের আড্ডা তুলিয়া দিয়াছে, খলিফার ক্ষমতার উচ্ছেদ করিয়াছে, অবরোধ-প্রথা ও বহুবিবাহের মূল উচ্ছেদ করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে একজনের বা কয়েকজনের প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। খেয়াল-বশতঃ ইহা করে নাই; জীবনস-ংগ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছে, যে, পূর্ব্বতন প্রথা ও ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ও সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। তাহারা নারীদিগকে শিক্ষা লাভের সুযোগ ও স্বাধীনতা দিয়াছে।

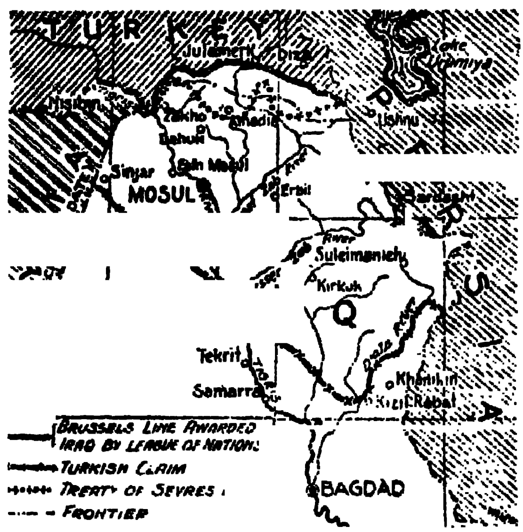
তুর্করা অন্য দেশের ও নিজের দেশের অতীত গৌরবের নেশা নষ্ট করিয়া বর্ত্তমানে সচেতন ভাবে কাজে লাগিয়াছে। তাহারা আরবের ও পারস্যের মোহে মুগ্ধ না থাকিয়া নিজেদের এমন একটি নবীন তুর্কী সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে চায় যাহার সহিত অতীতের সম্বন্ধ থাকিলেও যাহা বর্ত্তমান কালের ও তাহাদের নিজের দেশের বিশেষ উপযোগী। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা তাহা করিবেন কি না, ভাবিয়া দেখুন।

তুরস্ক হইতে কেবল ভারতীয় মুসলমানদেরই কিছু শিখিবার আছে এমন নয়; ভারতবর্ষের হিন্দু প্রভৃতিরও শিখিবার আছে। আমরা যে যে-সম্প্রদায়েরই হই না কেন, সকলেই অল্লাধিক অতীতের গৌরবে স্ফীত ও অলস ও পথভ্রান্ত। অতীতকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে, অতীতের শিক্ষা ও আলোক অগ্রাহ্য করিতে হইবে বলিতেছি না; বরং অতীতের খোসাটা ছাড়িয়া দিয়া ভিতরে তাহার প্রাণশক্তির আবিষ্কার করিতে হইবে, ইহাই বলিতেছি। কিন্তু শুধু তাহার দ্বারাই বর্ত্তমানে বাঁচিয়া থাকিবার ও অগ্রসর হইবার উপায় হইবে না। বর্ত্তমান জগতে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তদনুযায়ী সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধার্ম্মিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবরোধ-প্রথা, বহুবিবাহ, নারীদের অজ্ঞতা, অলস তথাকথিত সাধুগণ, মহান্তদের হস্তগত মঠ ও মন্দিরের সম্পত্তি, প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু-ভারতের অবস্থাও তুরস্কের সহিত তুলনীয়। কিন্তু এসকল বিষয়ে, অহিন্দুর কথা দূরে থাক্, কোন হিন্দুও কোন সংস্কার করিতে চাহিলে এক শ্রেণীর হিন্দু ভীষণ কোলাহল উত্থাপন করেন। রাষ্ট্রীয় বিষয়েও আমাদিগকে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের মতকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। আমাদের এবং অন্য সব জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগকে ভগবান্ যেমন বুদ্ধিশালী জীব করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের মানুষদিগকেও তিনি তেম্নি বুদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছেন। তাহার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, যে, আমরা কেবল অতীতের অনুসরণ না করিয়া বর্ত্তমানের উপযোগী ব্যবস্থা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করি, ভগবানের ইহাই ইচ্ছা। গড্ডলিকা-প্রবাহ রক্ষাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে মানুষ না করিয়া মেষই করিতেন।

—

মোসল বিপাক

ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌গণের মতে মোসল প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে। ইহাকে মত না বলিয়া শুধু আশা বলিলেই ঠিক্ হইত; কেননা লীগ অফ্ নেশান্‌সের বিচার ব্রিটিশের সুবিধাজনক হইয়াছে বলিয়াই ব্রিটিশ পণ্ডিত-বৃন্দ এই বিচারকে মোসল সমস্যার সুসমাধান বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তুর্কীগণ এবিষয়ে ব্রিটিশের সহিত একমত নহে এবং এই মতদ্বৈধ যে শুধু বাক্যে ও লেখায় শেষ হইবে



ইরাক ও তুরস্কের সীমান্ত সমস্যা

সর্ব্বোচ্চ লাইনটি ব্রুসেল্‌সে নির্দ্দিষ্ট লাইন। বর্ত্তমানে লীগ্ অফ্ নেশান্‌স্ এই লাইন বরাবর সীমান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাহার নীচে বর্ত্তমান সীমান্ত; তাহার নীচের লাইনটি সেভ্রএর সন্ধি-সভায় নির্দ্দিষ্ট হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা নীচের লাইনটিতে তুর্কীর দাবী দেখান হইয়াছে।

এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। লীগ অফ নেশ্যন্‌সের বিচার-অনুসারে মোসল ইরাকের অন্তর্গত হইবে এবং ইহার অর্থ এই যে,মোসলে ব্রিটিশের আধিপত্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকিবে। ইরাকের সীমান্ত ব্রসেল্‌সে নির্দ্দিষ্ট লাইন বরা-



তুরস্কে যুদ্ধ বাধিলে ব্রিটিশের বিপদ্

তুরস্কে যুদ্ধ করিতে হইলে ব্রিটিশদিগকে সৈন্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ পৃষ্ঠে করিয়া ৭৫০০ মাইল যাইতে হইবে। তুর্কীরা প্রায় ঘরে বসিয়া যুদ্ধ করিবে। ব্রিটিশ সেনানায়কগণের মতে মোসলে গোলমাল বাধান এইসকল কারণ প্রচণ্ড নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

বর হইবে। সঙ্গের মানচিত্রে এই লাইন মোটা করিয়া সর্ব্বোর্দ্ধে দেখান হইয়াছে। তুর্কীদিগের মতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা নীচের লাইন অবধি। ইহাতে তাহারা মোসল ও তৎপ্রদেশস্থ কেরোসিন তৈলের খনির অধিকারী হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, যত সহজে প্রশ্নের মীমাংসা হইল বলিয়া ব্রিটিশ ছাপাখানা হইতে প্রচার হইতেছে, ঠিক্ ততটা সহজে এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে।

লীগ্ অফ্ নেশ্যন্‌সের যে-সভায় এই তুর্কীদিগের পক্ষে ক্ষতিকর মীমাংসা করা হয়, সে সভায় তুর্কী প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিতে নারাজ হন। ইহাতে প্রমাণ হয়, যে, তুর্কীগণ এই বিচার মানিয়া লইতে ইচ্ছুক নহে। তাহারা নিজেদের দাবী বজায় রাখিবার জন্ত যুদ্ধ করিবে কি না সে-কথা বিভিন্ন, কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

ব্রিটিশের এখন বড় দুর্দ্দিন চলিতেছে। রুশিয়া, চীন, তুরস্ক, মিশর, ভারতবর্ষ, সর্ব্বত্র তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা যে তাহারা জানে না, তাহা নহে। শ্রীযুক্ত এইচ, এম্, ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড্ একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক। তিনি দি নিউ লীডার পত্রিকায় লিখিতেছেন :—

"আমরা এই প্রাচ্য সমস্যা যতই দেখিতেছি, ততই বুঝিতে পারিতেছি, যে, ইহার মধ্যে কি নিদারুণ পরিণতির আশঙ্কা রহিয়াছে। রুশিয়া, তুরস্ক, চীন, আমাদের কি ইহাদের সকলকেই শত্রু করিয়া তুলিতে সাহস করা উচিত? একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, যে, কাল যদি রুশিয়ার বন্ধু জেনারেল্ ফেঙ্ যুদ্ধে জয়ী হইয়া চীনের প্রভু হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে কি হইবে। তাহার সহিত যদি কোন নূতন ভাবের বন্যায় পড়িয়া ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মিলন হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। একদিকে তুরস্ক ও অপর দিকে রুশিয়াকে শত্রুরূপে লইয়া তখন আমাদের সামরিক সমস্যা যা দাঁড়াইবে, তাহার মীমাংসা কে করিবে? এরূপ অবস্থায় মোসলের তেলের কূপের দিকে নজর দেওয়া ও ঘরে আগুন দেওয়া এক কথা।"

ইহার উপর শ্রীযুক্ত ব্রেলস্‌ফোর্ডের মতে ইরাক ও মোসলের আরবগণ ব্রিটিশদিগকে কিছুমাত্র প্রীতির চক্ষে দেখে না। তাহারা ব্রিটিশদিগকে অতি শীঘ্র তাহাদের দেশ হইতে বাহির হইতে দেখিলে বিশেষ খুসী হয়—যদিও ব্রিটিশগণ তাহাদের আবহমান কালের অভ্যাস অনুসারে পৃথিবীতে প্রচার করিতেছে, যে, ঐসকল দেশের লোকেদের হিতের জন্যই তাহারা ইরাকে বসিয়া আছে। ব্রিটিশ জাতির পরার্থপরতার কথা আমাদের অপেক্ষা ভাল করিয়া আর কেহ জানে না। সুতরাং ব্রিটিশের মোসলে আধিপত্য করিবার ইচ্ছার মূলে জনহিত-চেষ্টাই আছে অথবা অন্য কিছু আছে, তাহা নির্ণয় করিতে আমাদের অধিক সময় লাগা উচিত নহে।

অ

—

রাজবন্দীদের মুক্তির আশা

ইংরেজরাই একটি প্রবাদের প্রচলন করিয়াছেন, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, প্রাণী-বিশেষকে ফাঁসি দিবার প্রয়োজন হইলে প্রথমে তাহার বদনাম রটাইতে হয়। রাজবন্দীদের সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্টের ব্যবহারে বুঝা যায় যে, এই প্রবাদটি ব্রিটিশ রাজনীতির অন্তর্গত। আজ অবধি যতবার গবর্ণ্‌মেণ্ট্ সাধারণের উপর কোন-প্রকার যথেচ্ছাচারিতা করিয়াছেন, ততবারই আমরা শুনিয়াছি, যে, ঐরূপ না করিলে দেশের সমূহ বিপদের, শান্তিভঙ্গের

কিম্বা বিদ্রোহের সম্ভাবনা। শান্তিভঙ্গ, বিদ্রোহ অথবা অন্য কোন-প্রকার অসামাজিক অপরাধের সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে অবশ্যই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য বিপদ্জনক অবস্থার প্রতিবিধান করা; কিন্তু "বিচার" বলিয়া যে-একটা সামাজিক ব্যবস্থা আজ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া মনুষ্য-সমাজে চলিয়া আসিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য এইরূপ অপরাধজনক অবস্থা (অথবা সত্য-সত্যই কোন অপরাধ) যথার্থই ঘটিয়াছে কি না তাহা নির্ণয় করা। বিচারের অপর কোন শোভাবর্দ্ধনকারী উদ্দেশ্য নাই।

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন গবর্ণমেণ্ট্ অনেকগুলি নির্দ্দোষ প্রজাকে বিনাবিচারে জেলে বদ্ধ করেন, তখনও তাঁহাদের পুরাতন বুলিই তাঁহারা পুনর্ব্বার আওড়াইলেন। আমরা শুনিলাম, যে, উক্ত প্রজাদিগকে স্বাধীনতা-বিচ্যুত না করিলে অবিলম্বে দেশে অরাজকতা আরম্ভ হইবে এবং কোন অলৌকিক কারণে সেইসকল নির্দ্দোষ প্রজাদিগের বিচার সম্ভব নহে। সুতরাং বাংলার অনেকগুলি যুবক, যাঁহাদের মধ্যে অনেক বাংলার খ্যাতনামা সুসন্তানও ছিলেন, নিজেদের স্বাধীনতা হারাইলেন। আমরা তাঁহাদের নির্দ্দোষ বলিতেছি ও বলিব‌ও, কেননা তাঁহারা কোন বিচারের ফলে দোষী স্থির হন নাই। এমন কোন কারণ থাকিতে পারে, যাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাদের বিচার করিতে পারেন নাই। হয়ত সে-কারণ প্রমাণের অভাব। অবশ্য তাহা হইলে তাঁহাদের জেলে বদ্ধ করা গবর্ণমেণ্টের বিশেষরূপে অন্যায় হইয়াছে। হয়ত বা সে-কারণ, গবর্ণমেণ্ট্ কোন-কোন লোককে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা প্রকাশ হইয়া যাইবার ভয়। অবশ্য তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের এইসকল যুবককে শাস্তি দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। কেন-না, গুপ্তচরগণ সচরাচর অতিশয় নীচ-প্রকৃতির লোক হয় এবং তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়া কাহাকেও শাস্তি দেওয়া ও অরাজকতার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। বিচার না-করা অথবা গুপ্তচর-তন্ত্র অনুসারে রাজ্য-শাসন, ইহার কোনটিই যে আদর্শ রাজনীতি নহে, এ-কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু "ন্যায় ও সুবিচারের" একাধারে মাতাপিতা ব্রিটিশরাজের আমলে ভারতবর্ষে আজ বিনা-বিচারে লোকে বৎসরের পর বৎসর জেলে বদ্ধ থাকিতেছে। তাহাও আবার নিজের মাতৃভূমির এলাকার মধ্যে নহে, কোন-কোন রাজবন্দীকে সুদূর মান্দালয়ে তত্রস্থ জেলারের কোমলতার আশ্রয়েও ..স করিতে হইতেছে।

রাজবন্দীদিগের সম্বন্ধে গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে পার্লামেণ্টে কথা ওঠে। শ্রমজীবী-সংঘের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত পার্ট্লন্, শ্রীযুক্ত আর্ল্ উইন্টারটন্‌কে কিছুকাল পূর্ব্বে অনুরোধ করেন যে, সকল রাজবন্দী বেঙ্গল-অর্ডিনান্স্ অনুসারে ছয় মাসের অধিককাল বন্দী ... তাঁহাদের অবিলম্বে যেন প্রকাশ্য বিচার করা হয়। ... আর্ল্ উইন্টারটন্ উত্তরে বলেন, যে, ১১০ জন ... উপর এই "আইন" খাটান হইয়াছে, তাহা... অর্দ্ধেকের কম জেলে বন্দী আছেন। গবর্ণমেণ্ট্ ইণ্ডিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, যখনই জনসা... মঙ্গলের দিক্ দেখিয়া এইসকল বন্দীদিগকে মুক্তি ... তাঁহারা সম্ভব মনে করিবেন, তখনি ইহারা মু... করিবেন এবং বর্ত্তমানে যে কয়জনকে জেলে না ... শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে, শুধু তাঁহাদেরই জেলে ... হইবে। গবর্ণমেণ্ট্ যে-নীতির অনুসরণ করি... তাহা এই যে, যখনই প্রকাশ্য বিচার সম্ভব, তখনই ... বিচার করা হইবে।

গবর্ণমেণ্টের এই উক্তির মধ্যে আমরা সেই ... সুর আবার শুনিতেছি। কেহ শান্তিভঙ্গের ... করিতেছে কি না, তাহাই বিচার করিয়া স্থির করা ... কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ সুবিচারবিবর্জ্জিত কোন অ... উপায়ে লোক-বিশেষের অপরাধ নির্ণয় করিয়া ... শাস্তি দিতেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেবতার ... কাজীর বিচার, আইন ও প্রমাণের সাহায্যে বিচার ... নানাপ্রকার বিচারের কথা শুনা গিয়াছে। ... "জাষ্টিস্" ইহার মধ্যে কোন্‌টি? ব্রিটিশ গবর্ণ... এক দেবতা বলিয়া মানিয়া লইলেই লোকে ... বিচারে তুষ্ট থাকিবে। অ

—

রাজকর্ম্মচারীদের নৈতিক অবনতি

পঞ্জাবের গভর্ণর্ সার্ ম্যাল্কম্ হেলি ৮ই ... তারিখে লায়ালপুরে একটি দরবার করেন। ... তিনি যে-বক্তৃতা দেন, তাহার মধ্যে রাজকর্ম্মচা... নৈতিক অবনতির (অর্থাৎ অত্যাচার, উৎকো... ইত্যাদি কথার) উল্লেখ করেন। তিনি বলে... উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য, যখনই কো... প্রকার অকর্ম্মের কথা তাঁহারা জানিতে পারেন ... সেই-বিষয়ে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা।

তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্টের 'প্রেষ্টীজ্' বা সুনাম নি... কর্ম্মচারীদের চরিত্রের উপর বিশেষরূপে নির্ভর ক... এই কারণে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের উচিত, ... কোন কারণে দুর্নীতির প্রশ্রয় না-দেওয়া ও সর্ব... সর্ব্ব-উপায়ে ইহা দমন করা। তবে, জনসা... একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা যদি সর্ব্ব... কর্ম্মচারীদের গোচরে নিম্নপদস্থদিগের দুষ্কৃতির ক... আনয়ন করেন এবং নিজেদের অভিযোগ সমর্থনে...

... করেন, তাহা হইলে এই দোষ
... সম্ভব হইবে না। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের
এবিষয়ে গরীব ও দীনের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য
এমন-কি ইহাতে নিজেদের অসুবিধা হইলেও
... হইয়া লড়া।

...ম কথা। প্রথমতঃ, স্যর্ ম্যাল্কমের মত
... মুখ দিয়া রাজকর্ম্মচারীদের ভ্রষ্টতা স্বীকৃত হওয়াতে
... আনন্দিত হইলাম। অপরে একথা বলিলে
...প্রায় সিডিশ্যনের সামিল হইত। সে যাহা হউক,
একথা স্থির হইল, যে, অন্ততঃ নিম্নস্তরের রাজ-
...গণ "ন্যায় ও সুবিচার" মনে রাখিয়া সর্ব্বত্র
করেন না। ইহাও স্থির যে, উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণ
...তা নিবারণের জন্য যতটা করা কর্ত্তব্য ততটা
না। তাঁহাদের মধ্যেও ভ্রষ্টচরিত্রের লোক আছে
স্যর্ ম্যাল্কম্ বলেন নাই এবং থাকিলে সেই-
উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের কে দমন করিবে, তাহাও
...াই। শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ানের ঘুষ লইয়া দণ্ডিত
দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী-
...বা ছাড়িয়া দিয়া দেখা যাউক নিম্নপদস্থদিগের
...ধন সম্ভব কি না এবং সম্ভব হইলেও উন্নতির
...তদূর আছে।

... ম্যাল্কমের কথা হইতে ইহাই মনে হয় যে,
... রাজকর্ম্মচারিগণ যতটা চেষ্টা করিয়া ও খাটিয়া
দমন করা প্রয়োজন ততটা চেষ্টা করেন না।
করার মধ্যে তাঁহাদের কোন স্বার্থ আছে কি না
... কোন অনুসন্ধান হইয়াছে কি? কোন-কোন
...ট, মেজে...্ট, বড় লাটের এ-বিষয়ে বদ্নাম

...ন্ততঃ, নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীদের উপর গবর্ণ্মেণ্টের
...র্ভর করিলেও তাহাদের চরিত্রবল অটুট রাখিবার
...মেণ্ট্ যথাসাধ্য করেন কি? চরিত্রভ্রষ্ট হইবার
...ধান কারণ অর্থলোভ। অর্থলোভ দূর করিবার
...পায় উপযুক্ত বেতন-দান। গবর্ণ্মেণ্ট্ কি সর্ব্ব-
নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের চরিত্র ভাল রাখিবার
করিবার জন্য বেতন-বর্দ্ধনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন
...চ্ছেন? উচ্চপদস্থদিগের বেতনের কথাই দেখা
... গবর্ণ্মেণ্টের মনে অধিক জাগে। নিম্নপদস্থ-
...দের ভাগটুকু দিয়া উপর-ওয়ালাদিগকে মোটা
...য় পুষ্ট করা শ্রমবিভাগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে।
... কর্ম্মচারিগণ বেশীর ভাগ ভারতবর্ষীয়।
নামে সমস্ত দোষ চাপাইতে পারিলে গবর্ণ্মেণ্টের
...র সুনাম বাড়িতে পারে, কিন্তু দেশের উন্নতি
... হইবে না।

তৃতীয়তঃ, জনসাধারণের কর্ত্তব্য কি তাহা বলা সহজ, কিন্তু জনসাধারণ যদি গবর্ণ্মেণ্টের ব্যবহারে দেখে যে, দুষ্ট কর্ম্মচারীকে যেমন করিয়া হউক রাজকোষের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতেই গবর্ণ্মেণ্টের অথবা গবর্ণ্মেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের উৎসাহ অধিক, তাহা হইলে কোন্ আশায় ও কাহার ভরসায় লোকে দুষ্টের দমন করিবার চেষ্টা করিবে? বরদাসুন্দরীর মোকদ্দমায় যে-দুজন পুলিস-কর্ম্মচারীর কাজ গিয়াছে, বে-সরকারী লোক হইলে তাহাদের পাঁচ-সাত বৎসর জেল হইত। সকল দিক্ দেখিয়া দেশের ছোট-বড় সকলেই ব্রিটিশ রাজের কর্ম্মচারীদিগের অকস্মাৎ ধার্ম্মিক হইয়া উঠা সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণ্মেণ্ট্ যদি লোকের প্রাণে পুনরায় উন্নতির আশা জাগাইয়া তুলিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া ভিতর হইতে দুর্নীতির দমন করা। ইহাতে হয়ত অনেক ভিতরের কথা জানাজানি হইয়া পড়িবে, হয়ত শ্বেতাঙ্গদিগের নিষ্কলঙ্কতা জগতে উচ্চকণ্ঠে ও বড় হরফে জাহির করা ইহাতে একটু কমাইতে হইবে; কিন্তু নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

অ

—

শিক্ষার বাহন

বাংলা দেশে শিক্ষার বাহন যে বাংলাই হওয়া উচিত, এটা এত সোজা কথা যে, এবিষয়ে সন্দেহ জন্মিবার একমাত্র কারণ আমাদের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থা। ভারতের মত জাপানেরও আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ জ্ঞান লাভের জন্য ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষা জানা দরকার। তথাপি জাপানে শিক্ষার বাহন জাপানী, এবং তৎসত্ত্বেও সেখানকার লোকেরা ভারতবর্ষের চেয়ে অধিক শিক্ষিত এবং নূতন আবিষ্কারে ও যন্ত্র-উদ্ভাবনে সক্ষম।

আমাদের অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থার জন্য আমাদিগকে ইংরেজী লেখা ও বলায় অত্যন্ত বেশী সময় ও মন দিতে হয়। মাতৃভাষার সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিলে তাহা যেমন মজ্জাগত এবং হৃদয়মনের একান্ত অঙ্গীভূত হয়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা তেমন হয় না। তদ্ভিন্ন মাতৃভাষার সাহায্যে যে-বয়সে যতটা জ্ঞান লাভ করা যায়, বিদেশী ভাষার সাহায্যে সে-বয়সে ততটা জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমাদের মনে পড়ে, আমরা ও আমাদের সহপাঠীরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য ১০।১১ বৎসর বয়সে বাংলা স্কুলে ইতিহাস ভূগোল পাটীগণিত প্রভৃতি যতটা শিখিয়াছিলাম, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইংরেজীতে তাহা অপেক্ষা বেশী শিখে না। অধিকন্তু আমরা বাংলা স্কুলে পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, স্বাস্থ্য-

রক্ষা, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা শিখিয়াছিলাম, প্রবেশিকাপরীক্ষার্থীরা তাহা শিখে না। অথচ বাংলা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকদের চেয়ে বেশী বিদ্বান্ বা যোগ্য নহেন। সুতরাং বাংলা ইস্কুলে কোন-কোন বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছেলেদের ইংরেজী স্কুলের তার চেয়ে বড় ছেলেদের সমান শিখিবার এবং অধিকন্তু ইংরেজী স্কুলে অনধীত কোন-কোন বিষয় শিখিবার একমাত্র কারণ বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা।

বাংলাভাষায় ভাল পাঠ্যপুস্তকের অভাব একটা বাধা বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান গণিতাদির বহি যদি বাংলা বিদ্যালয়ের জন্য লিখিত হইতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে এখনকার অধিকতর অগ্রসর বাংলা ভাষায় কেন তাহা হইতে পারিবে না? এমন সময় ছিল যখন ইংলণ্ডেও লাটিন গ্রীকের প্রভুত্ব ছিল; কিন্তু ক্রমশঃ ইংরেজীতে সব রকম ভাল বহি লিখিত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় রচিত পাঠ্য পুস্তকের ক্ষেত্রে খুব প্রতিযোগিতা থাকায় এবং বিলাতের খুব যোগ্য লোকও ছেলেদের কোন-কোন পাঠ্য পুস্তক লেখায় অনেক ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক বেশ ভাল। কিন্তু সবগুলি আমাদের দেশের বালকবালিকাদের উপযোগী নহে। প্রবেশিকার জন্য অধীতব্য সকল বিষয়ে বাংলা পুস্তক যথাসম্ভব ভাল করিতে হইলে অবাধ প্রতিযোগিতার দরকার। এইজন্য যদিও বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করাইলে তাহা হইতে উহার খুব আয় হইবে, তথাপি আমরা সেরূপ বন্দোবস্তের সমর্থন করি না। উপযুক্ত অনেক লোক পাঠ্য পুস্তক লিখুন। তাহার পর পক্ষপাতশূন্য নির্ব্বাচক কমিটির দ্বারা শ্রেষ্ঠ পুস্তক নির্ব্বাচিত হউক। প্রবেশিকার পর ছাত্রদিগকে কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইবে। এইজন্য ভূগোল গণিত প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব বাংলা পাঠ্য পুস্তক লিখিত হইবে, তাহার পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দগুলির ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া দরকার হইবে।

উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য, ভারতবর্ষের বাহিরের জগতের সহিত এবং বঙ্গের বাহিরে ভারতবর্ষের সহিত যোগ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বদা জ্ঞান-রাজ্যে জগতের অগ্রগতির সহিত অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, সরকারী চাকরী পাইবার জন্য, ব্যবস্থাপক সভার কাজ চালাইবার জন্য, ওকালতী ব্যারিষ্টারী করিবার জন্য, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত, বাঙালী ছাত্রদিগকে ইংরেজী ভাল করিয়া শিখিতে হইবে। বর্ত্তমান

সময়ে ইংরেজী ইস্কুলে তাহারা ইংরেজী
ছাড়া অন্যান্য বিষয় শিখিবার নিমিত্তও
পড়ে বলিয়া, পরোক্ষভাবে তাহার দ্বা
ইংরেজী ভাষার জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। ইংরেজী
এখন আর-সব বিষয় বাংলায় শিখিলে ইং
এই পরোক্ষ সাহায্যটি ছাত্রেরা আর পাইবে
তাহাদিগকে ইংরেজী শিখাইবার নিমিত্ত স
অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা করিলে
ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে শিখিবে। অ
ইউরোপের অনেক অ-ইংরেজ অধিবাসী
মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় এবং ইংরেজী
অবান্তর ভাষা স্বরূপ শিখে, অথচ
লিখিবার ও বলিবার ক্ষমতা চলনসই।
নরওয়ের একটি ছেলে আসিয়াছিল।
১৮।১৯। সে ঐ বয়সের বাঙালীর ছেলেদের
মন্দ জানিত না। অথচ নরওয়েতে শিক্ষার
নহে, উহা অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় মাত্র;
তথাকার শিক্ষাপ্রণালী ভাল। এইজন্য
এই ভরসা আছে, যে, শিক্ষাপ্রণালী ও
হইলে আমাদের ছেলেরাও, মাতৃভাষা শিক্ষা
সত্ত্বেও, ইংরেজী ভাল শিখিতে পারিবে।

বাংলার যাহা সুবিধা, ইংরেজীর চর্চ্চা
অন্য প্রাদেশিকদিগের তুলনায় অসুবিধায় পরি
বাংলার খাস অধিবাসীদের ভাষা কেবল বাং
বাঙালীদের প্রায় সব কথাবার্ত্তা ও কা
ভাষার সাহায্যেই চলে। কিন্তু, দৃষ্টান্ত স্বরূপ
বোম্বাই প্রদেশের প্রত্যেকটিতে চারিটি প
প্রধান ভাষা প্রচলিত। মান্দ্রাজে তামিল, তে
মলয়ালম, প্রভৃতি প্রচলিত। বোম্বাইয়ে মরা
কন্নাড ও সিন্ধী প্রচলিত। এইসব ভাষা যাহ
ভাষা তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা ও পত্রব্যবহা
হইলে অনেকে সাধ্যপক্ষে ইংরেজীর আশ্রয় ল
আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে এবং পঞ্জাবেও শিক্ষি
বাঙালীর চেয়ে অধিক পরিমাণে ইংরেজীতে
বেশী অভ্যস্ত। আমি যখন ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে
একটি কলেজে কাজ করিতে গিয়াছিলাম, ত
যে, আমি যদিও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তথাপি
অনেক ছাত্র এবং হিন্দুস্থানী শিক্ষক ও অধ্যাপক
চেয়ে তাড়াতাড়ি ইংরেজী বলেন।

এইসকল অবস্থা ও কারণ বিবেচনা করি
দিগকে ইংরেজীর চর্চ্চা বেশী করিয়া করিতে হই

অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, যে, ক
হউক, জ্ঞানলাভের জন্য ভাল ইংরেজী বহি এ

...শের ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের বেশী আছে। ...ষীদের বিদেশী ভাষায় লিখিত-জ্ঞান ভাল বহি ও ভাল ...ত্রৈমাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র পড়িবার ...স না বাড়িলে তাহারা ইংরেজীর জ্ঞানে এখনকার ... আরও পিছাইয়া পড়িবে। তাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় ...।

সেদিন স্যর আবদুর রহিম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ...লেছেন, যে, তাঁহার সমাজ অর্থাৎ বঙ্গের মুসলমান ... বাংলাকে বিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষার বাহন করিবার ...শ গ্রহণ করিবে না। তিনি বাঙালী মুসলমানদের ...ইতে যে-কথা বলিবার দাবী করিয়া বলিয়াছেন, তাহা ...হইলে সাতিশয় দুঃখের বিষয় হইত। কিন্তু বাস্তবিক ... যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজেরই অবিবেচনা-...; তাহা বাঙালী মুসলমান সমাজের কথা নহে। এ-... বাঙালী মুসলমানদের প্রধান মুখপত্র ইংরেজী "মুসল-... নামক কাগজে যাহা লেখা হইয়াছে তাহাই ঠিক কথা। ... বঙ্গের মুসলমানদের মাতৃভাষা; কলিকাতায় ...লের ২।১টি শহরের অল্পসংখ্যক মুসলমানগণ ছাড়া ...বাই বাংলায় কথা বলে, ভাবে, স্বপ্ন দেখে। বঙ্গীয় ...ন সাহিত্যিক সমিতি প্রভৃতি মুসলমান ...ভুক্ত সমিতি বাংলাকেই নিজেদের মাতৃভাষা ...মানেন, মানেন। তাঁহারা বাংলাকে শিক্ষার ...দেখিতে চান। ইত্যাকার যে-সব কথা ...মান" কাগজে লেখা হইয়াছে তাহা খাঁটি সত্য।

...নামে যাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে, তাঁহাদের জন্য ...র স্বতন্ত্র সুবন্দোবস্ত হউক; বঙ্গে যাঁহারা উর্দ্দু বলেন, ...দের জন্যও যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত স্বতন্ত্র হউক; কিন্তু ...মের জন্য বঙ্গের শাস্তি কিম্বা উর্দ্দুভাষীর জন্য বঙ্গে ...ষীর শাস্তি হওয়া ন্যায়-সঙ্গত নহে। গ্রেটব্রিটেনে, ...শে ও গেলিকে এবং আইরিশ ভাষায় অনেকে কথা ... তা ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানা রঙের ...জাতির নানাভাষাভাষী লোক শিক্ষার জন্য বিলাত ... কিন্তু তাহাদের খাতিরে গ্রেট্‌ব্রিটেনে ইংরেজীকে ...র বাহনের পদ হইতে চ্যুত করা হয় নাই। আমে-...র সম্মিলিত রাষ্ট্রে ইউরোপের সকল জাতির লোক ... বসবাস করিয়াছে ও করিতেছে; কিন্তু তাহাদের ...রে তথায় শিক্ষার বাহনত্ব হইতে ইংরেজী পদচ্যুত ...নাই।

—

প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিষের রপ্তানী

জমীতে যে-ফসল জন্মে তাহা পুনঃ পুনঃ জন্মে। অরণ্যে ...দ্যানে যে-সব গাছ, ফলফুল জন্মে, তাহাও পুনঃ পুনঃ বস্তু বিদেশে রপ্তানী করিলে ক্ষতি চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু খনিতে যে-সব ধাতু রত্ন তৈল আদি পাওয়া যায়, তাহা উত্তোলন করিবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বা প্রধানতঃ বিদেশীদের হস্তগত হইলে তাহা হইতে লভ্য ধনের যে-প্রধান অংশ তাহারা পায়, তাহা দেশের পক্ষে চিরস্থায়ী লোক্‌সান। কারণ খনি একবার নিঃশেষ হইলে তাহাতে আবার ধাতুরত্নাদি নূতন করিয়া গজায় না।

যাহা হউক, এক্ষেত্রেও এই সান্ত্বনা ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জাতিকে দেওয়া চলে, যে, তাহাদের দেশের ধাতু বিদেশী কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া গেলেও তাহারা ভবিষ্যতে ধনের বিনিময়ে তাহা বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু আর-একরকম মূল্যবান্ জিনিষের রপ্তানী আছে, যাহা একবার গেলে আবার অন্যত্র হইতে সংগৃহীত হইবার নহে। সেগুলি হইতেছে প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান্ পদার্থ।

ভারতবর্ষের মাটি খুঁড়িয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ও ইতিহাসের নিদর্শন মুদ্রা, লিপি, প্রভৃতি অনেক জিনিষ এদেশ হইতে বিদেশীরা লইয়া গিয়াছে। আরও অন্যায় এই, যে, ভারতবর্ষেরই করদাতা জনসাধারণের অর্থে যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহা হইতে লব্ধ অনেক জিনিষ বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অর্থে ভারতের বাহির হইতে সংগৃহীত এইরূপ জিনিষও বিলাতে পাঠান হইয়াছে। মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে বালী খুঁড়িয়া ষ্টেইন্ সাহেব ভারতীয় ঔপনিবেশিক সভ্যতার যে-সকল নিদর্শন আবিষ্কার করেন, তাহার মধ্যে খুব মূল্যবান্ জিনিষগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মে চালান করা হইয়াছে। অথচ তাঁহার কাজের ব্যয় ভারতবর্ষ দিয়াছিল।

এখন খবরের কাগজে দু'রকম প্রস্তাবের কথা দেখা যাইতেছে। একটা এই, যে, সিন্ধু দেশে মোহেন্-জো-দড়ো নামক স্থানে বহু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রমাণ স্বরূপ যে-সকল জিনিষ পাওয়া গিয়াছে, (সচিত্র যাহার বৃত্তান্ত আমরা প্রবাসীতে ছাপিয়াছি,) তাহার মধ্যে যে-সব জিনিষ একাধিক পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটি করিয়া ভারতবর্ষে থাকিবে, বাকী লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রেরিত হইবে। এই ব্যবস্থা অন্যায়। পুনার ভাণ্ডারকার রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ (গবেষণা-প্রতিষ্ঠান) ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভারতীয় অন্য সমুদয় বিদ্বন্মণ্ডলীরই ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের ভূগর্ভনিহিত এই জিনিষগুলি ভারতবর্ষেরই; সুতরাং সংখ্যায় তাহারা যত বেশীই হউক, প্রথমতঃ সেগুলি ভারতেরই নানাপ্রদেশের মিউজিয়ম্-সকলে বাঁটিয়া দেওয়া উচিত। তাহার পরও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে

[illegible] হইতে বিবেচনা করা [illegible] নিষগুলি ভারতবর্ষের [illegible] রাং সে দিক্ দিয়াও [illegible]। [illegible] রেজ নিজেদের টাকায় [illegible] ধামেনের কবর খনন [illegible] সংগ্রহ করেন; কিন্তু ত [illegible] জিনিষ মিশর হইতে স্থ [illegible]

আর-একটি প্রস্তাবের কথা যাহা আমরা কাগজে পড়িয়াছি, তাহা এই, যে, যেহেতু ভারতবর্ষের মাটির নীচে এখনও অতীতকালের এত জিনিষ আছে, যে, পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া খুঁড়িলেও তাহা সমস্ত বাহির করা যাইবে না, সেইজন্য বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিকদিগকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ডাকা হউক এই সর্ত্তে যে তাঁহারা তাঁহাদের আবিষ্কৃত জিনিষের একটা ভাগ পাইবেন। এই প্রস্তাবকেও আমরা আশঙ্কাজনক মনে করি। হইতে পারে যে, আমরা এখন এই সব জিনিষের কদর বুঝি না; হইতে পারে, যে, এখন আমাদের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্যে দক্ষ লোক যথেষ্ট নাই; হইতে পারে যে, খননদ্বারা আবিষ্কৃত লিপি প্রভৃতি বুঝিবার-বুঝাইবার লোক একজনও বা যথেষ্ট আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু আমরা অপেক্ষা করিতে চাই; আমরা দেশবাসী সর্ব্ব-সাধারণকে এই-সব জিনিষের অমূল্যতা বুঝাইতে চাই; আমরা ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক স্বদেশবাসীকে এইগুলি বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য দেশে ও বিদেশে শিক্ষা দিতে চাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ও ইতিহাসের প্রমাণ ভারতবর্ষেই থাকা উচিত। সকল সভ্যদেশই নিজের দেশের প্রাচীন জিনিষ-সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহা কঠিনতর করিতেছে।

ইহা অতি অসঙ্গত ব্যাপার, যে, আমাদের দেশের ইতিহাসের মূল উপকরণ ও আকরগুলি পরীক্ষা ও অধ্যয়ন করিতে হইলে আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইতেছে। আগে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই, প্রতিকারের উপায় থাকিলে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এখন যে-সব জিনিষ আবিষ্কৃত হইতেছে ও ভবিষ্যতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে এখন হইতেই এরূপ কড়া ব্যবস্থা হওয়া উচিত, যাহাতে সেগুলি হাত-ছাড়া না হয়।

ধনের প্রতি কৃপণের লোভ, কিম্বা কথামালায় বর্ণিত অশ্বের খাদ্যাধারে শয়ান পরশ্রীকাতর কুকুরের মনোবৃত্তির মত কোন ভাব হইতে আমরা এসব কথা লিখিতেছি না। অন্য কারণ আছে। প্রথমতঃ, আমাদের অতীত ইতিহাস আমাদেরও লেখা উচিত। তাহার জন্য কেবল মাত্র বিদেশীদের-লেখা ইতিহাস অবলম্বন না করিয়া মূল উপকরণ ও আকরগুলিই প্রধানতঃ অবলম্বন করা উচিত। সেইজন্য এই উপকরণগুলি এদেশে রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। আমরা যথেষ্ট যত্ন-সহকারে রক্ষা করিতে না জানিলে বিদেশ হইতে শিখিয়া আসা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানি, প্রাচীন ভারতের কথা বিদেশীরা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক ভুল ও অসম্পূর্ণতা আছে। এইরূপ খুঁৎ নানা কারণে জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব একটি কারণ; আর একটি কারণ, ভারতবর্ষকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি ভারত-শাসক ইংরেজ-জাতির মধ্যে প্রবল ও সুস্পষ্ট; অন্য পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যেও আছে। সকলে জ্ঞাতসারে এই প্রবৃত্তির অধীন হইয়া চলিতে না পারেন, কিন্তু বৈদেশিক অনেক ঐতিহাসিকের মনের উপর ইহার প্রভাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমানে ত ভারত হীন আছেই; অতীতেও হীন ছিল দেখাইতে পারিলে কোন-কোন বিদেশীর আত্মাভিমান তৃপ্ত হয়। এইজন্য তাঁহারা অতীতের ভারতকে যথাসম্ভব আসিরিয়া, কালডিয়া, বাবিলন, গ্রীস ও পারস্যের নিকট ঋণী করেন, এবং বর্ত্তমানে ভারত ও ইউরোপের নিকট হইতে শিখিতেছেই। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়ায় এই, যে, ভারতবর্ষ আগেও ইউরোপের অন্ততঃ একটি দেশের শিষ্য ছিল, এখন ত সকলেরই শিষ্য। অসভ্য ভারতবর্ষকে সভ্য করিবার অহঙ্কার ইহাতে বেশ তৃপ্ত হয়।

তা' ছাড়া, রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরেজের দাবী সাধারণত এই যে, ভারতবর্ষে আগে কোন কালে প্রজার অধিকার বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না, এবং স্বায়ত্ত-শাসন ইংরেজরাই প্রথম এদেশে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। ভারতবর্ষকে স্মরণাতীত যুগ হইতে আত্মশাসনে অনভ্যস্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তাহাকে স্ব-শাসন ক্ষমতা হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া বঞ্চিত রাখিবার বেশ-একটা ওজুহাত পাওয়া যায়। কেন না, যে জাতি কোন কালে স্বশাসক ছিল না, তাহার ঐ বিদ্যা শিখিতে দু'পাঁচ শতাব্দী লাগা চাই!

যে-সব তথাকথিত প্রমাণের বলে যে-সব প্রমাণ চাপা দিয়া ভারতবর্ষের অতীতকে বিকৃত করিয়া দেখান যায়, সবগুলিই ভারতীয়দের চোখের সামনে থাকিলে বিদেশীদের ভুল সংশোধনের সুবিধা হয়। অবশ্য, স্বদেশ-ও স্বজাতি-প্রীতিবশতঃ আমাদেরও ভুল হয়। কিন্তু একদিকে আমাদের অতিরিক্ত ভারত-প্রীতি ও অন্যদিকে

কোন-কোন বিদেশীর অতিরিক্ত ভারত-বিদ্বেষ বা ভারতের প্রতি অবজ্ঞা—এই উভয়ের ফলে প্রকৃত সত্যে উপনীত হইবার সাহায্য হইতে পারে।

এই সকল কারণে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক সব-রকম জিনিষের ভারতবর্ষে রক্ষণেরই পক্ষপাতী।

—

ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী সরাইবার প্রস্তাব

কলিকাতায় ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী-নামক যে বৃহৎ গ্রন্থাগার আছে, তাহার বহিগুলি দিল্লীতে সরাইবার প্রস্তাব অনেক বৎসর হইতে শুনা যাইতেছে। এখন বোধ হয় ব্যাপারটা ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাই কলিকাতায় কিছু সাড়া পড়িয়াছে।

এই প্রস্তাবটি অসঙ্গত। প্রস্তাবকদের যুক্তি এই, যে, আগে কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল এবং লাইব্রেরীটি ভারত গবর্ণ্মেণ্টের টাকায় সমৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখন রাজধানী দিল্লীতে হইয়াছে, অতএব লাইব্রেরীটিকেও সেখানে লইয়া যাইতে হইবে। এই যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তটিকে ঠিক ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত করিতে হইলে বলা উচিত, বৎসরের যে কয়মাস রাজধানী দিল্লীতে থাকে সেই কয় মাস দিল্লীতে এবং যে কয়মাস উহা সিমলায় থাকে সেই কয়মাস সিমলায় লাইব্রেরীটিকে রাখা উচিত। কারণ দিল্লী একমাত্র রাজধানী নহে।

বস্তুতঃ রাজধানী হইলেই সাম্রাজ্যের সব কিছু সেইখানে রাখিতে হইবে, ইহা বড় অদ্ভুত কথা। অষ্ট্রেলিয়ার নূতন রাজধানী ক্যানবেরা নামক স্থানে নির্ম্মিত হইতেছে, এখন আছে মেলবাযুর্নে। ক্যানবেরায় যখন রাজধানী যাইবে, তখন কি মেল্‌বোর্নের সব বিদ্যাসম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানও উক্ত স্থানে স্থানান্তরিত হইবে? কখনই না। ভারতবর্ষেরও সব সাম্রাজিক প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে অবস্থিত নহে, পরেও হইবে না, হইবার কোন প্রস্তাবও উত্থাপিত হয় নাই। সামরিক বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য দেরাদূনে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ কলেজ আছে; তাহা ভারত গবর্ণ্মেণ্টের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। তাহা দেরাদূনেই থাকিবে। যাহা রাজধানীতে ছিল, অন্যত্র তাহা রাখিলে কাজ ভাল হইবে বলিয়া তাহা স্থানান্তরিত করিবার দৃষ্টান্তও আছে। এপর্য্যন্ত মীটিঅরলজিক্যাল বিভাগের (যাহার দ্বারা ঝড়ের গতি, মেঘবৃষ্টির সময় ও সম্ভাবনা প্রভৃতি লক্ষিত ও সূচিত হয়) প্রধান আফিস্ ছিল সিমলায়, কিন্তু এই কাজ মহারাষ্ট্র দেশের প্রধান নগর পুনা হইতে অধিকতর সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইবে বলিয়া, গবর্ণ্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যে আবহ বিদ্যার প্রধান পর্য্যবেক্ষণ মন্দির ও আফিস অতঃ-

গ্রন্থাগারের প্রধা[illegible] উৎকর্ষ সাধনে, সাহিত্য রা[illegible] শহরে যত বেশী লোক বিদ[illegible] করিতে চায়, সাহিত্যরস চা[illegible] লাইব্রেরীর উপর দাবী তত[illegible] অপেক্ষা বিদ্যার্থী, গবেষক, স[illegible] আছে। এখানে যত স্কুল কলেজ আছে, তাহার সংখ্যার সহিত দিল্লীর তুলনাই হয় না। তাছাড়া এখানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃহৎ আর্টস্ ও বিজ্ঞান শিক্ষার পোষ্ট গ্রাজুয়েট দুটি বিভাগ আছে, যাহার সমতুল্য কিছু দিল্লীতে নাই। এখানে এশিয়াটিক সোসাইটি আছে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আছে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি আছে, আরও কোন কোন সমিতি আছে, যাহাদের সমতুল্য দিল্লীতে কিছু নাই। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি কাগজের সম্পাদক ও লেখকগণেরও ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর সাহায্য দরকার হয়। কলিকাতায় এইরূপ যত রকম-দরের কাগজ আছে, দিল্লীতে তাহা নাই। হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবীদেরও ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী কখন কখন কাজে লাগে। দিল্লীতে হাইকোর্ট্ নাই। দিল্লীর পক্ষে কেবল এই কথা বলা যায়, যে, সেখানে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের বৈঠক বসে। কিন্তু উহাদিগের সভ্যগণের ব্যবহার্য্য স্বতন্ত্র লাইব্রেরী আছে। তাছাড়া, তাঁহারা ত সিমলাতেও বৈঠক করেন; তাঁহাদের সুবিধার জন্য ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীকে স্থানান্তরিত করিতে হইলে উহাকে চাকার উপর বসাইয় এঞ্জিন্ সহযোগে চলিষ্ণু করিয়া কখন দিল্লীতে কখন সিম লায় লইয়া যাইতে হয়।

শেষ যুক্তি এই, যে, ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক গবর্ণ্মেণ্টে টাকায় যখন এই লাইব্রেরীটি সমৃদ্ধ হইয়াছে ও রক্ষি হইতেছে, তখন উহা কেন কলিকাতায় থাকিবে? আম বলি কেন থাকিবে না? কলিকাতাও ত ভারতসাম্রাজ্যে অন্তর্গত; কলিকাতার লোকেরাও ভারতসাম্রাজ্যের প্রজ ভারত গবর্ণ্মেণ্ট্ যে টাকা ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীকে দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন, তাহা একমাত্র দি হইতে সংগৃহীত হয় নাই, কলিকাতা হইতেও তাহ অনেক অংশ সংগৃহীত হইয়াছে। দিল্লীর ওকালতী যাঁহা করেন, তাঁহারা দেখান্ যে দিল্লী কলিকাতার চেয়ে বে টাকা ভারত গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে দেয়। একা কলিকা ভারত গবর্ণ্মেণ্টকে ভারতগবর্ণ্মেণ্টের লভ্য ইন্‌কম্-ট্য ও পাটের শুল্ক যত কোটি টাকা দেয়, দিল্লীর সব রকে রাজস্ব তাহা হইতে অনেক অনেক কম।

ইহা অবশ্য ঠিক কথা, যে, সাম্রাজ্যিক জিনিষ হই লাভবান্ হইবার অধিকার সাম্রাজ্যের সব লোকে আছে। কিন্তু ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীটি সাম্রাজ্যের যে

একটা স্থানে রাখিতে হইবে, আলো ও বাতাসের মত উহা সর্ব্বত্র থাকিতে পারে না। দিল্লীর পক্ষপাতীদিগকে দেখাইতে হইবে, যে, উহা সেখানে রাখিলে কলিকাতায় রাখা অপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিকতর লোক তদ্দ্বারা উপকৃত হইবে। ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী টাকা জমানৎ রাখিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ডাকে বহি পাঠাইয়া থাকেন, যাতায়াতের ডাকমাশুল পাঠককে দিতে হয়। ডাকমাশুল দিল্লী হইতে যত কলিকাতা হইতেও তত; অধিকন্তু শিক্ষিত জনবহুল নগরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির অধিকাংশ দিল্লী অপেক্ষা কলিকাতার অধিকতর নিকটবর্ত্তী।

পূর্ব্ববর্ণিত সমুদয় কারণে আমরা মনে করি, কলিকাতা ও বাঙালীর প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় এবং দিল্লীর অন্যায় লোভ এই প্রস্তাবের মূলীভূত; সমুদয় ভারত-সাম্রাজ্যকে অধিকতর উপকৃত করিবার ইচ্ছা ইহার মূলীভূত নহে।

কলিকাতার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্বন্-মণ্ডলী, প্রভৃতি সকলের সম্মিলিত ও স্বতন্ত্র প্রতিবাদ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট অবিলম্বে প্রেরিত হওয়া উচিত।

—

ক্ষিতীশ নিয়োগীর পণ্যদ্রব্য-বিষয়ক বিল্

ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে কারখানা ও মিলে-প্রস্তুত যত-রকম জিনিষ আমদানি হয়, তাহা কোন্ দেশে উৎপাদিত, তাহার ছাপ বা অন্যবিধ বর্ণনা দিতে রপ্তানী বা আমদানী-কারককে বাধ্য করিবার কোন আইন নাই। পণ্য-বিষয়ক আইনে এইরূপ বাধ্যতামূলক ধারা বসাইবার জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী একটি বিল্ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আনিবার নোটিস্ দিয়াছেন। এইরূপ আইন হইলে জাপানী ও অন্য বিদেশী যে-সব জিনিষ স্বদেশী বলিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকান হয়, তাহা বিদেশী বলিয়া জানা পড়িবে। অনেক বিদেশী মোটা মিলের কাপড় অনেক দোকানে খদ্দর বলিয়া বিক্রী হয়। এইরূপ প্রতারণা ক্ষিতীশ-বাবুর প্রস্তাবিত আইনদ্বারা বন্ধ হইলে দেশের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উপকার হইবে।

—

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংশোধন হইতেছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু একটা সাধারণ নীতির কথা এখানে বলা দরকার। জমিদার কিম্বা কোন শ্রেণীর প্রজার এতাবৎকাল-প্রচলিত কোন অধিকার খর্ব্ব বা রহিত করা ন্যায়সঙ্গত ও আবশ্যক বিবেচিত হইলে, যাহার অধিকার খর্ব্ব বা রহিত হইবে, তাহাকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ উপযুক্ত মূল্য দেওয়া কর্ত্তব্য; কেবল আইনের জোরে কাহারও ক্ষতি করা উচিত নয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের নূতন ফ্রীষ্টেট্ রাষ্ট্র জমির উপর জমিদারদের স্বত্ব লুপ্ত করিয়া কৃষককে মালিক করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে জমিদারদিগকে কিস্তিবন্দী করিয়া সরকার হইতে পুরা মূল্য দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই মূল্য কতক কৃষক-প্রজার নিকট হইতে আদায় হইবে, কতক ফ্রীষ্টেট্ রাষ্ট্র সরকারী টাকা হইতে দিবে।

এই বিষয়-সম্বন্ধে যাহারা আরও-কিছু জানিতে চান, তাঁহারা বিখ্যাত সাংবাদিক মিঃ সেণ্ট্ নিহাল্ সিং-লিখিত ও ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ওয়েল্ফেয়ার (*Welfare*) মাসিকে প্রকাশিত "বায়িং আউট্ ল্যাণ্ডলর্ডস্" ("Buying Out Landlords")-শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িতে পারেন।

—

অধ্যাপক ফর্মিকির বিদায় উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক আচার্য্য কার্লো ফর্মিকির বিশ্বভারতীতে কয়েক মাস কাজ করিবার জন্য আগমনের সংবাদ আমরা যথাসময়ে দিয়াছিলাম। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় তিনি গত ২৬ শে ফাল্গুন স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। তদুপলক্ষ্যে প্রথমতঃ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী তাঁহাকে বিদায়-সূচক সংবর্দ্ধনা করেন। তাহাতে উভয় পক্ষের পরস্পরের সহিত হৃদয়ের যোগ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহার পর ২৫ শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' গৃহে তাঁহাকে বিদায় দান উপলক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সদ্ভাবপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। উত্তরে আচার্য্য ফর্মিকি সাশ্রুনেত্রে ও বাষ্পভারাক্রান্ত কণ্ঠে ভারতবর্ষের প্রতি, বিশ্বভারতীর প্রতি, এবং কবির প্রতি নিজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে বিশ্বভারতী ও কবি যে প্রীতি ও সম্মান দেখাইয়াছেন, এবং কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বর্গগতা জননী শুনুন ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইহা